সচিত্র মাসিক-পত্র

তৃতীয় বর্ষ

প্রথম খণ্ড

বৈশাখ—আশ্বিন ১৩৩৭
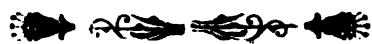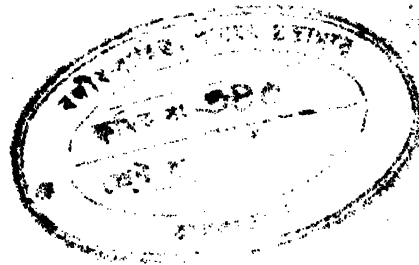
সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

—পঞ্চপুষ্প-কার্য্যালয়—

২৮ বি, তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা

বর্ণানুক্রমিক চিত্র-সূচী

তৃতীয় বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৩৭ { প্রথম সংখ্যা

পঁচিশে বৈশাখ

ওঁ

শান্তিনিকেতন

তোমার পুষ্প দানের প্রীতি
বাঁধিল আমার চিত্ত।
তোমার ভক্তি স্নেহের মন্ত্রে
স্মরণে রহিল নিত্য।
তব শ্রদ্ধার অমল পাত্র
ভরিয়া রহিবে দিবসরাত্র
উপনিষদের পুণ্য মন্ত্রের
অমৃতবাণীর বিত্ত॥

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পঁচিশে বৈশাখ বাঙ্গালার তথা ভারতের স্মরণীয় দিন, বিশ্ব-বরেণ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের জন্ম-তারিখ। রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয় কবি, তাঁহার তুলনা নাই। তিনি সাহিত্যের যে বিভাগ স্পর্শ করিয়াছেন—প্রবন্ধ, উপদেশ, ছোট গল্প, গান, কবিতা, নাট্য, উপন্যাস তাহাই অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ছাড়া এত বড় ব্যক্তিত্বও ভারতে আর কাহারও নাই। শিক্ষা-দীক্ষার দিক্ দিয়া তাঁহার উপমা নাই। বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন—একমাত্র বেদব্যাস ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করা চলে না। এ উক্তি অত্যুক্তি নয়।

এই মে মাসে অক্স্‌ফোর্ডে রবীন্দ্রনাথের 'হিবার্ট' বক্তৃতা দিবার কথা। ইহার পূর্ব্বে কোনও কবি 'হিবার্ট'—বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হন নাই।

১২৬৮ সালের ২৫এ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণ এই উপলক্ষে কোথাও না কোথাও এই তারিখে উৎসব করেন।

আমরা শ্রীভগবানের নিকট অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি, যেন আরও বহু বৎসর তিনি জীবিত থাকেন; বৈশাখের পঁচিশ তারিখে যেন আমরা এমনই উৎসব করিতে পারি, বর্ষে বর্ষে যেন নূতন করিয়া এই দিনকে স্মরণ-যোগ্য করিয়া রাখিতে পারি। কবীন্দ্রের নিজের ভাষাতেই তাঁহার উদ্দেশে বলি—

"হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক কুজ্ঝটিকা করি' উদ্‌ঘাটন
সূর্য্যের মতন।
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি,'
শূন্যশাখে কিশলয় মুহূর্ত্তে অরণ্য দেয় ভরি'—
সেই মতো, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি' আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,

ব্যক্ত হোক, তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।"

আর বলি—

"উঠুক্ স্পন্দিত হ'য়ে শাখে শাখে পল্লবে বল্কলে
সুগম্ভীর তোমার বন্দনা।"

রবীন্দ্রনাথ

[অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত]

পূর্ব্বগগন মন্থন করি' জাগিল যে রবি জ্যোতির্ম্ময়,
সাগর উতরি' প্রতীচী আকাশে স্পর্শিল যার রশ্মিচয়,
যে ভণে চণ্ডীদাসের পীরিতি, উপনিষদের মৈত্রীগান
যার সঙ্গীতে হয়েছে মূর্ত্ত, ভারত-সত্য লভেছে প্রাণ ;
যে জানাল কত নিগূঢ় বারতা সহজ ভাষায় প্রকাশ করি',
সত্য যে খোঁজে দেশে দেশে আর কালে কালে যেথা রয়েছে পড়ি' ;
যে বলিল, প্রেম পরম কাম্য নরে নরে আর দেশে ও দেশে ;
তেয়াগিল যেই রাজার উপাধি দেশের দুঃখে দারুণ ক্লেশে ;
প্রাচীন-ভারতমূর্ত্তি যে জন আপন কাব্যে মূর্ত্ত করে ;
সাম্য মৈত্রী স্বদেশের প্রেম যার সঙ্গীতে আপনি ঝরে ,
প্রাচীন-কাব্য-রীতি সনে যেই মিশাল সহজ কাব্য-রীতি ;
বঙ্গপ্রীতির সাথে সাথে যার আপনি আসিল বিশ্বপ্রীতি ;
দেশে যে দেখায় দেশের মূর্ত্তি, বিদেশে দেখায় বিশ্বরূপ ;
অন্যায়ে যেই বলে অন্যায়, মেনেছে কেবল বিশ্বভূপ ;
কোমল কান্ত গীতাবলি যার চণ্ডীদাসের গীতির পারা ;
বঙ্গভূমির সুধা-নির্ঝর যার গানে পেল লক্ষ ধারা ;
শ্রাবণের ধারা-সম যার গীত বঙ্গভূমিতে প্লাবন আনে ;
শারদ জ্যোৎস্না সম যার গান তপ্ত হৃদয়ে শৈত্য দানে ;
ব্যথাতুরা নারী যার সঙ্গীতে আপনার ব্যথা মূর্ত্ত ছাখে ;
শিশুগণ যার কাব্যে আপন খেলা আর হাসি ফুটায়ে রাখে ;
বিরহ-মিলন দুঃখ-যাতনা কাব্যে যাহার পেয়েছে রূপ ;
বর্ষা-শরৎ রাত্রি-দিবা ও ফাগুনের হাসি—রসের কূপ ;
সকলে যেথায় করিয়াছে ভিড়, ভিজা মাটী যেথা গন্ধ ছাড়ে ;
ঝরা ফুল আর পথহারা নদী জানায় বেদনা দুঃখভারে ;
ক্ষোভে স্নেহে প্রেমে হেরি যেথা মোরা মানবের বহু লক্ষ ছবি ;
তৃণ ও আকাশ অন্ধকারের লীলা ও বেদনা বুঝে যে কবি ;
সেই সে মহান্ সেই সে বিরাট্ সেই প্রতিভায় নমস্কার ;
বঙ্গপ্রদীপ হইয়া হরিল জগৎজোড়া যে অন্ধকার।
প্রণাম প্রণাম, হে রবি মহান্, পূর্ব্ব-গগন-উজলকারী,
রশ্মি যাহার পূরব হইতে হ'ল পশ্চিম আঁধার হারী।

গ্রাণ্টের রেখাচিত্রে সেকালের লোক

[শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ,এফ-এস্-এস্, এফ-আর্-ই-এস্।]

কোল্সওয়ার্দি গ্রাণ্ট

কলিকাতার পশুক্লেশনিবারণী সভার প্রতিষ্ঠাতা কোল্সওয়ার্দি গ্রাণ্টের নাম অনেকের নিকট সুপরিচিত, কিন্তু তিনি যে একজন অত্যুৎকৃষ্ট চিত্রকর ছিলেন, এ যুগের অনেকেই তাহা অবগত নহেন। তিনি স্বকীয় চেষ্টায় চিত্রবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে কলিকাতায় তৎকালীন ইঙ্গবঙ্গীয় সাময়িক পত্র সমূহে সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় ও ভারতীয় ব্যক্তিবৃন্দের যে অসংখ্য রেখাচিত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অসামান্য চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিল। এই চিত্রগুলিতে দুই চারিটি রেখার টানে তিনি চিত্রের বিষয়ীভূত মহাত্মগণের ভাব-ভঙ্গী এতাদৃশ নিপুণভাবে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন যে কোনও প্রতিভাশালী চিত্রকর তৈলচিত্রেও সেরূপ জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার চিত্রগুলি আর এক হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান্। সেকালে ফটোগ্রাফ বা হাফটোন ছবির ছড়াছড়ি ছিল না, এবং তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবৃন্দের প্রতিকৃতি দেখিয়া কৌতূহল পরিতৃপ্তির উপায় অনেক স্থলেই নাই বলিলেও চলে। গ্রাণ্টের চিত্রগুলি সেই কৌতূহল পরিতৃপ্তির সহায়তা করে। আমরা 'পঞ্চপুষ্পে'র পাঠকগণকে গ্রাণ্টের অঙ্কিত কতকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি উপহার দিতেছি। নবীন পাঠকগণের জন্য চিত্রাঙ্কিত ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। স্যর চার্লস্ থিওফিলাস (পরে লর্ড) মেটকাফ্ (১৭৮৫-১৮৪৬)—ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে নানা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে অস্থায়ী ভাবে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হন। ইহার সময়েই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করা হয় এবং কলিকাতাবাসী ইঁহার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ 'মেটকাফ্ হল' নামক স্মৃতিসৌধ ও একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

To Baboo
Peary Chand Mittra
with my kind regards
from his sincere friend
The Original.
June
1870.

কোল্স ওয়ার্দি গ্রাণ্টের হস্তাক্ষর

THE HON^BLE SIR CHARLES T. METCALFE BART. G.C.B.

লর্ড মেটকাফ্

The Right Hon^ble George Eden, Earl of

Auckland.

২। জর্জ্জ ইডেন, আর্ল অব অক্‌ল্যাণ্ড্ (১৭৮৫-১৮৪৯)।—ইনি ১৮৩৬ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও স্যর চার্লস্ মেটকাফ্ দেশের মঙ্গলের জন্য যে সকল সংস্কার প্রবর্ত্তিত করেন, লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড তাহার সাফল্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। বেণ্টিঙ্কের সময়ে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে এদেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের যে সংকল্প হয়, অক্‌ল্যাণ্ডের গুণে সে সংকল্প সিদ্ধিলাভ করে। প্রথম ইংলণ্ডে বিদ্যার্থী ডাক্তার ভোলানাথ বসু, নাট্যসাহিত্যের অন্যতম অগ্রণী হরচন্দ্রঘোষ প্রভৃতি অনেক বাঙ্গালী ছাত্র অক্‌ল্যাণ্ডের নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহিত ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেশীয়গণকে উচ্চ রাজকর্ম্মে নিয়োগ করিবার নীতি বেণ্টিঙ্ক প্রবর্ত্তিত করিলেও অক্‌ল্যাণ্ডের সময়েই রসময় দত্ত সর্ব্বপ্রথম ছোট আদালতের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভিত্তি স্থাপন অক্‌ল্যাণ্ডের সময়েই হইয়াছে বলিতে পারা যায়।

৩। মহামান্যনীয় ডেনিয়েল উইলসন (১৭৭৮-৫৮)।—

বিশপ উইলসন

ইঁহারই চেষ্টায় কলিকাতার সেণ্টপলের গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গির্জ্জার প্রতিষ্ঠাকল্পে এই ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা স্বোপার্জ্জিত দুই লক্ষ টাকা দান করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ইনি কলিকাতাতেই দেহত্যাগ করেন এবং স্ব-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমন্দিরেই তাঁহার দেহ সমাহিত হয়।

৪। মাননীয় উইলিয়ম ইয়েট্‌স্ (১৭৯২-৪৫)। —ইনি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপ্রচারক রূপে এদেশে আসেন এবং শ্রীরামপুরে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু দুইবৎসর পরে কলিকাতা মিশনারী ইউনিয়নে যোগ দেন। ইনি বহুভাষাবিৎ ছিলেন এবং য়ুরোপীয় ভাষা ব্যতীত সংস্কৃত বাঙ্গালা, হিন্দী, হিন্দুস্থানী ও আরব্য ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী, সংস্কৃত, আরব্য পারস্য, হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু এবং বাঙ্গালা ভাষায় ইনি ব্যাকরণ, ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

জন মার্শম্যান

৫। জন্ ক্লার্ক মার্শম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭)। ইনি শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পাদ্রী কেরী ও ওয়ার্ডের সহকর্ম্মী রেভারেণ্ড ডাক্তার জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র এবং পিতার ন্যায় প্রাচ্যভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনিই এদেশে সর্ব্বপ্রথম কাগজের কলের প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাঙ্গালার প্রথম মাসিকপত্র 'দিগ্দর্শন' ইঁহারই দ্বারা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে প্রবর্ত্তিত হয়। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' ও ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ইনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। সংবাদ প্রভাকর-সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে ইঁহার বড় বনিবনাও ছিল না এবং 'বাবাজান বুড়াশিবের স্তোত্রে' গুপ্তকবি ইঁহার উপর খুব একহাত লইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস বাঙ্গালার ইতিহাস, কেরী মার্শম্যান এবং ওয়ার্ডের জীবনী ও তৎ সাময়িক বৃত্তান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া, এদেশে ইংরাজী শিক্ষা, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিস্তারে সহায়তা করিয়া এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রগুলির দ্বারা দেশের নানাবিধ উপকার সাধন করিয়া তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি বহুবৎসর গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদকের কার্য্যও করিয়াছিলেন।

৬। জেম্স্ প্রিন্সেপ (১৭৯৯—১৮৪০)।—ইনি কলিকাতা মিণ্টে অ্যাসে মাষ্টারের পদে বহুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু তিনি আমাদের চিরস্মরণীয় হইয়াছেন নানা শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য। বিজ্ঞানে, ভাষাতত্ত্বে ও সাহিত্যে ইহার সমান অধিকার ছিল এবং অশোকের অনেক শিলালিপির পাঠ উদ্ধার করিয়া এবং ব্যাক্ট্রিয় মুদ্রা হইতে নূতন ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত করিয়া ইনি সমসাময়িক পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩২ খৃঃ হইতে ১৮৩৮ খৃঃ অবধি ইনি এসিয়াটিক সোসাইটীর সম্পাদক ছিলেন এবং উহার মুখপত্রে বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ

জেম্‌স প্রিন্সেপ

প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমের জন্য অল্প বয়সেই এই সদাশয় মহাত্মার মৃত্যু ঘটে। কলিকাতাবাসী ইঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ ৪০০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নামে ভাগীরথী তীরে একটি ঘাট নির্ম্মিত করেন।

৭। জোয়াকিম হেওয়ার্ড ষ্টকেলার (১৮০০-৮৫)।—ইনি একজন সুলেখক ছিলেন এবং অনেক ইংরাজী সাময়িক পত্র সম্পাদন ও ইংরাজী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি সমসাময়িক সমাজে যশস্বী হন। এক্ষণে "ইংলিশম্যান" নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদ-পত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক রূপেই তিনি স্মরণীয় হইয়া আছেন।

৮। রেভারেণ্ড আলেক্‌জাণ্ডার ডাফ্ (১৮০৬-৭৮) এ দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই স্কটল্যাণ্ড দেশীয় ধর্ম্ম-প্রচারক যাহা করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালী চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুলাই জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসন নামে যে বিদ্যালয়

জোয়াকিম ষ্টকেলার

ডাক্তার আলেক্জাণ্ডার ডাফ

প্রতিষ্ঠিত করেন এক্ষণে তাহাই স্কটিশচার্চ্চেস কলেজে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা বিষয়ে যে প্রসিদ্ধ ডেসপ্যাচ আসে, যাহার ফলে এ দেশে বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির জন্ম হয়—তাহার রচনায় আলেকজাণ্ডার ডাফের হাত ছিল।

৯। আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫)—ইনি ডিরোজিওর অন্যতম শিষ্য এবং সহপাঠী রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত সেকালে নব্য-বঙ্গের অন্যতম নেতা ছিলেন। ডাক্তার ডাফের প্ররোচনায় ইনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও ইঁহার স্বদেশপ্রেম অতি গভীর ছিল। ইনি বহু ভাষাবিৎ ছিলেন এবং যখন বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক অধিক ছিল না, 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, জ্যামিতি প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনার সুবিধা করিয়া দেন। ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে 'ডক্টর অব ল' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক রাজনীতিক সভার সভাপতিরূপে ইনি দেশবাসীর জন্য রাজনীতিক অধিকার লাভার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন

আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
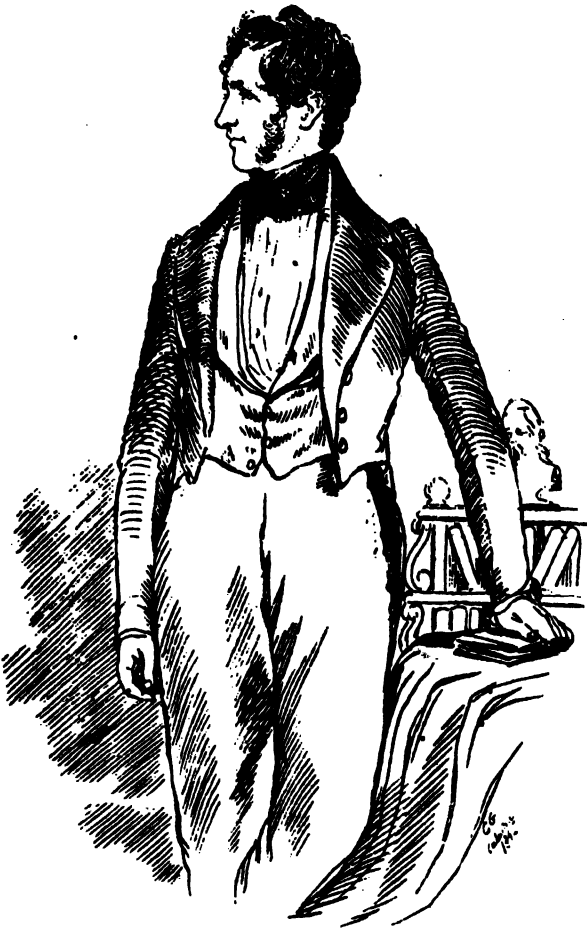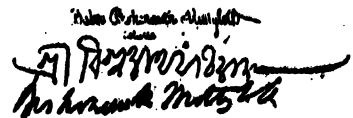
ডাক্তার টমাস স্মিথ

এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শিক্ষিত দেশবাসীর নেতা বলিয়া মান্য করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দেশ-সেবার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

১০। রেভারেণ্ড ডাক্তার টমাস স্মিথ (১৮১৭-১৯০৬)।—ইনি স্কট্‌ল্যাণ্ড দেশীয় ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন এবং এদেশে জেনানা মিশনের প্রবর্ত্তন করেন। ইনি "কলিকাতা রিবিউ" নামক সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈমাসিক কিছুকাল সম্পাদন করিয়াছিলেন। গণিত শাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।

১১। বিশ্বনাথ মতিলাল (১৭৭১-১৮৪৪)।—রামদুলাল সরকার, মতিলাল শীল, রামকমল সেন প্রভৃতির ন্যায় ইনি অধ্যবসায় ও সাধুতার গুণে সামান্য অবস্থা হইতে অসাধারণ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণের গোলায় ৮৲ টাকা মাসিক বেতনে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়, কিন্তু অধ্যবসায়, বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে তিনি নিমকের দেওয়ান হন এবং মৃত্যুকালে কলিকাতার প্রাসাদোপম আবাসভবন এবং বহু লক্ষ মুদ্রার বিষয় রাখিয়া যান। বহুবাজার নামক প্রসিদ্ধ বাজারটি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর বাজারটী তাঁহার এক পুত্রবধূর কর্ত্তৃত্বাধীনে আসে এবং সেই সময় হইতে বাজারটী বহুবাজার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার এবং কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিবারেরই এক কন্যা হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করেন। নদীয়া ও ভাওয়ালের রাজপরিবারও বিবাহ-সূত্রে এই পরিবারের সহিত সম্বন্ধ।

OCHTERLONY.

জেনারেল অক্টার্লনী

১২। মেজর জেনারেল স্যর ডেভিড অক্টার্লনী (১৭৫৮—১৮২৫)।—ইনি এক জন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। কলিকাতাবাসী ইঁহারই স্মৃতিরক্ষার্থ ময়দানে একটী মনুমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

১৩। রবার্ট হ্যালডেন র‍্যাট্রে (১৭৮১—১৮৬০)। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী লইয়া কলিকাতায় আসেন এবং নব-প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কলেজের নিয়ম লঙ্ঘন করিবার জন্ত তিনি এক বৎসরের জন্ত কলেজ হইতে বিতাড়িত হন। পরে যথারীতি শিক্ষালাভ করিয়া এবং নানা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়া তিনি সদর নিজামত আদালতের প্রধান্ বিচারপতি হন। ইনি এক জন সুকবি ছিলেন এবং ইহার বন্ধু জেম্‌স্ প্রিন্সেপকে উৎসৃষ্ট 'Exile, a tale of the Sea' নামক গ্রন্থে যথার্থ কবিত্ব আছে।

১৪। ফ্রেডরিক করবিন (১৭৯২—?)। ইনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চিকিৎসা বিভাগে কার্য্য করিতেন এবং বহুকাল ফোর্ট উইলিয়মের অন্যতম প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞানে ইঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল এবং কয়েকখানি সাময়িক পত্র সম্পাদনে ইঁহার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

১৫। জেম্‌স্ সাদার্ল্যাণ্ড (১৭৯৪-১৮৫৭)। ইনি নৌবিভাগে কার্য্য করিতেন, কিন্তু সাহিত্য-সেবার জন্যই স্মরণীয়। বেঙ্গল হরকরা এবং অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ

রবার্ট হ্যালডেন রাট্রে

Yours very truly
Ja. Sutherland

জেম্‌স্ সাদর্ল্যাণ্ড

সংবাদ-পত্র সম্পাদনে তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খৃঃ তিনি হরকরার সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিয়া হুগলী কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। অধ্যক্ষরূপে তিনি যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় মৎপ্রণীত "রঙ্গলাল" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

১৬। হেনরি মেরেডিথ পার্কার (১৭৯৫-১৮৬৮)। ইনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে নানা কার্য্য করিয়া পরে বোর্ড অব রেভিনিউ এর সভ্য হন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ইঁহার অধীনে দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। গদ্য, পদ্য ও ব্যঙ্গ রচনায়, হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদানে, নাটকাভি নয়ে, সর্ব্বদিকেই ইনি অতুল্যপ্রতিভশালী ছিলেন। ইঙ্গ-বঙ্গীয় সাময়িক সাহিত্যে ইনি চিরদিন অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া থাকিবেন।

মেজর ডি-এল্-রিচার্ডসন

১৭। মেজর ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন (১৮০০—৬৫)। ইঁহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষরূপে ইনি যে কিরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ছাত্রদের নাম স্মরণ করিলেই বোধগম্য হইবে। কিশোরীচাঁদ মিত্র, ভোলানাথ চন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, শশীচন্দ্র দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও দেশনায়কগণ সকলেই রিচার্ডসনের শিষ্য। রিচার্ডসন প্রণীত গদ্য ও পদ্য গ্রন্থনিচয় এবং তাঁহার সম্পাদিত সাময়িক পত্রাদি ইংলণ্ডের প্রথম শ্রেণীর মনীষিগণের রচিত গ্রন্থাদি অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট

১৮। হেনরি হোয়াইটলক্ টরেন্স (১৮০৬—৫২)। ইনি ১৮২৮ খৃঃ কলিকাতায় আসেন এবং ১৮২৯ খৃঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হিন্দীতে পারদর্শিতার জন্য সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। অতঃপর বহু দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া মুর্শিদাবাদে গবর্ণর জেনেরলের এজেন্ট নিযুক্ত হন। ইনি বহুকাল এসিয়াটিক সোসাইটীর সেক্রেটারী ও পরে সহকারী সভাপতি ছিলেন। ইনি বহু সাময়িক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং গদ্য-পদ্য রচনা দ্বারা সাময়িক ইঙ্গ-বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার প্রবন্ধাবলী বন্ধু জেম্‌স্ হিউম সংক্ষিপ্ত জীবন চরিতের সহিত দুই খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

১৯। সার জন পিটার গ্রাণ্ট (১৭৭৪—১৮৪৮)। ইনি বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর নীলকর-প্রপীড়িত

প্রজানিকরের অকৃত্রিম বন্ধু স্যর জন পিটার গ্রাণ্টের পিতা। ইনি বোম্বাই এর প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং এরূপ স্বাধীন-চেতা ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন যে বোম্বাই এর গবর্ণর স্যর জন ম্যালকল্‌ম্‌ রাজনীতিক কোন কারণে তাঁহার এক আদেশ অমান্য করায় তিনি বিচারালয় বন্ধ করিয়া দেন এবং ইংলণ্ডাধিপতির নিকট গবর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তাঁহার মতে ইংলণ্ডরাজের নিযুক্ত বিচারপতির নিকট ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ গবর্ণরের অবস্থা সাধারণ বাদী-প্রতিবাদীর সমতুল্য। রাজনীতিক কারণে যদিও বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি লর্ড এলেন-বরা ম্যালকল্‌মকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি বোম্বাইএ নূতন দুই জন বিচারপাতি নিযুক্ত করিবার সময় বলেন, যে দুইটি পালিত হস্তীর মধ্যে স্যর জন প্রিটার গ্রাণ্ট একটি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় হইবেন বলিয়া তাঁহার ভয় হয়। অবশ্য স্যর জন ইহার পর পদত্যাগ করেন এবং কলিকাতায় আসিয়া ব্যারিষ্টারীতে প্রবৃত্ত হন। এখানে তিনি ক্রমে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ও পরে প্রধান বিচারপতি হইয়াছিলেন। শনবিজ্ঞান ও ব্যবহারশাস্ত্রে ইনি দুই একখানি গ্রন্থও লিখিয়া ছিলেন।

হেনরি টরেন্স

স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট

২০। স্যর এডওয়ার্ড রায়ান্ (১৭৯৩-১৮৭৫)। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইয়া আসেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রধান বিচারপতির পদে উন্নীত হন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই পদ অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং প্রায়ই হিন্দু কলেজের ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিতেন। তাঁহার অবসর গ্রহণ কালে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কবি ভরুদত্তের পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে একটি প্রশংসালিপি ও রৌপ্য পুষ্পপত্র উপহার দেন। কৃষিবিজ্ঞান সমাজ তাঁহার সভাপতিত্বে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ একটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করে। কলিকাতার জনসাধারণও এক সভা করিয়া তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করে ও তাঁহার প্রতিকৃতি স্থাপিত করে। ইংলণ্ডে গিয়াও রায়ান [illegible]। তাঁহারই চেষ্টায় ডাক্তার সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বপ্রথমে এদেশে চিকিৎসাবিভাগে ইউরোপীয়দের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটি উচ্চপদ প্রাপ্ত হন।

২১। মহামাননীয় টমাস ডিয়াল্‌ট্রি (১৭৯৫-১৮৬১) ইনি বহুদিন কলিকাতায় আর্চডিকন ও পরে মান্দ্রাজের বিশপ ছিলেন। ইঁহারই চেষ্টায় কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের ('কৃষ্ণবন্দ্যোর) গির্জ্জা নির্ম্মিত হয় এবং সর্ব্ব প্রথম দেশীয় ধর্ম্মযাজক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধর্ম্মমন্দিরে পুরোহিত নিযুক্ত হন। ইনিই বাঙ্গালার মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

২২। জর্জ্জ টম্‌সন (১৮০৪-৭৮)। ইঁহার ন্যায় বাগ্মী পূর্ব্বে এদেশে আসেন নাই। আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথা রহিত করিয়া ইনি অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন। তাহার পর যখন ইনি ভারতবর্ষের রাজনীতিক উন্নতির চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে। দ্বারকানাথ ভারতবর্ষে আসিবার সময়

স্যর এডওয়ার্ড রায়্যান

টমসনকে লইয়া আসেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা"র সভ্য তাঁহাকে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করেন। টমসনের বক্তৃতার ফলে এদেশের প্রথম রাজনীতিক সভা বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজনীতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই সভা পরে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের সহিত মিলিত হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নাম ধারণ করে। টমসনকে এতদ্দেশে 'রাজনীতিক আন্দোলনের পিতা' বলা যাইতে পারে। মৎপ্রণীত রাজা 'দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়' নামক পুস্তকে এবং অন্যান্য গ্রন্থে ইঁহার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

আর্চডীকেন ডিয়্যাল্‌ট্রি

২৪। জেনারেল স্যর জর্জ সেণ্ট প্যাট্রিক লরেন্স। (১৮০৪-৮৪)। ইনি 'পঞ্জাবের রক্ষাকর্ত্তা' স্যর হেন্‌রি মণ্টগোমারী লরেন্স এবং ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্সের সহোদর। ইনি স্যর উইলিয়ম ম্যাক্‌নটেনের সহকারীরূপে কাবুলে গিয়াছিলেন এবং কিছুকাল আফগানদের বন্দী ছিলেন। ম্যাক্‌নটেনের মৃত্যুর পর ইউরোপীয় রমণী ও শিশুদের নিরাপদে কাবুল হইতে ফিরিয়া আসিতেও তিনি সাহায্য করেন। তিনি বহুদিন রাজপুতানায় গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট ছিলেন এবং সিপাহী যুদ্ধের সময় ইঁহারই গুণে রাজপুতানায় কোনও গোলযোগ বাধে নাই।

২৫। স্যর চার্লস ট্রেভেলিয়ান (১৮০৭—৮৬)। ইঁহার ন্যায় সাধু ও কর্মদক্ষ সিভিলিয়ান এ দেশে অল্পই আসিয়াছেন। ইঁহার নানাবিধ সদ্‌গুণে ভারতবর্ষের ব্যবস্থা-সচিব লর্ড মেকলে মোহিত হন এবং মেকলে-পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে চার্লসের সহিত মেকলের ভগিনী হানার বিবাহ হয়। স্যর চার্লস পরে মান্দ্রাজের গবর্ণরের পদে উন্নীত হন। এই সময়ে একটা ঘটনায় তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সিপাহী যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল এবং ইংলণ্ড হইতে জেমস্ উইলসন নামক এক জন প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্‌কে ভারতবর্ষের রাজস্ব সচিব করিয়া প্রেরণ করা হয়। ই[illegible] দেশের তৎকালীন

জর্জ টমসন্

জেনারেল স্যর জর্জ পারেল

অবস্থায় আয়কর প্রবর্তিত করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন দেশীয় ব্যক্তি উহার প্রতিবাদ করেন। স্যর চার্লসও নিজের পদের কথা বিস্মৃত হইয়া প্রকাশ্যে রাজস্ব-সচিবের অবলম্বিত নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন। সেক্রেটারী অব ষ্টেট স্যর চার্লসের বিশেষ বন্ধু হইলেও উইলসনকে সহায়তা করিতে বাধ্য হন এবং স্যর চার্লসকে ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দেন। কয়েক বৎসর পরে সেক্রেটারী অব ষ্টেট স্যর চার্লসকেই রাজস্ব-সচিবের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। যদিও এ পদ মাদ্রাজের গবর্ণরের পদ অপেক্ষা নিম্নতর তথাপি স্যর চার্লস ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য ঐ পদ গ্রহণ করেন এবং আয়কর উঠাইয়া দিয়া, ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া এবং অন্যান্য সংস্কার-সাধন করিয়া ভারতবাসীর ধন্যবাদভাজন হন।

C.E. TREVELYAN ESQ.

স্যর চার্লস ট্রেভেলিয়ান

চার্লস হে ক্যামেরণ

ডাক্তার জন গ্রাণ্ট

২৬। চার্লস হে ক্যামেরণ (১৭৯৫-১৮৮০)। ইনি ব্যারিষ্টার ছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইনি 'ল কমিশনের' সদস্য হইয়া এদেশে আসেন এবং লর্ড মেকলের সহযোগে বিবিধ আইন প্রণয়ন করেন। ১৮৪৩ খৃঃ হইতে ১৮৪৮খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি ভারতবর্ষের ব্যবস্থাসচিব ছিলেন। কিন্তু শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি রূপেতিনি দেশে ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারে যে কার্য্য করিয়াছিলেন তজ্জন্যই তিনি চিরস্মরণীয় থাকিবেন। অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি সিংহল দ্বীপে বাস করেন এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।
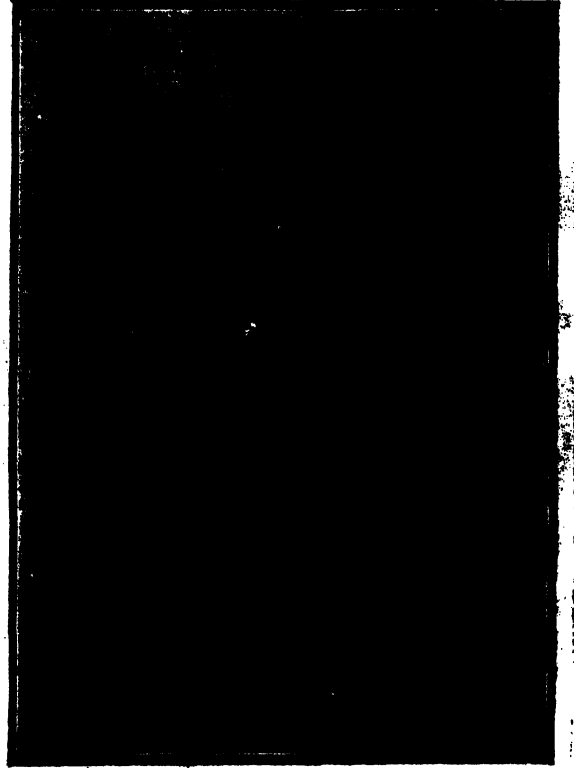
২৭। ডাক্তার জন গ্রাণ্ট ইনি কোম্পানীর চিকিৎসা বিভাগে অস্ত্র চিকিৎসকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুখপাঠ্য সন্দর্ভাদি রচনাদ্বারা ইঙ্গ-বঙ্গীয় সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়া তদপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার জন হাচিন্স
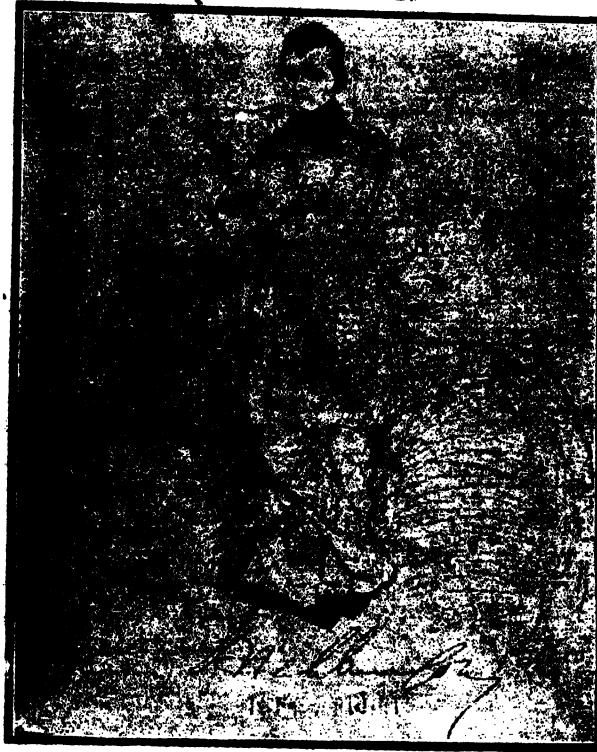
২৮। ডাক্তার জন হাচিন্স ইনিও গ্রাণ্টের ন্যায় কোম্পানীর চিকিৎসাবিভাগে কার্য্য করিতেন এবং "সন্ন্যাসী" নামক কাব্যগ্রন্থ এবং অন্যান্য কবিতা প্রকাশ করিয়া সুকবি বলিয়া খ্যাতি-অর্জ্জন করিয়া ছিলেন।

২৯। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী (১৮০৪-?) ইনি হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের এক জন প্রসিদ্ধ ছাত্র। ইংরাজী বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় ইঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ইনি প্রথমে জেমস্ সিল্ক বাকিং হামের 'কলিকাতা জর্ণ্যালে'র জন্য 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'সংবাদ কৌমুদী'র প্রস্তাবাদির সার সংগ্রহ করিতেন। অতঃপর তিনি রামকমল সেন ও শিবচন্দ্র ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে হোরেস হেম্যান উইলসনকে পুঁথিপত্রাদির ইংরাজী

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

অনুবাদে সহায়তা করেন। ডেভিড হেয়ারের অনুগ্রহে তিনি কিছুকাল পটলডাঙ্গায় এক স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং এই সময়ে তাঁহার প্রসিদ্ধ বাঙ্গলা-ইংরাজী অভিধান প্রকাশ করেন। অতঃপর কিছুকাল তিনি ক্রমান্বয়ে ইউরোপীয় ব্যারিষ্টারের বন্ধু, মুন্সেফ, সদর দেওয়ানী আদালতের ডেপুটী রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত থাকেন। এই সময়ে তিনি মনুসংহিতার এক সংস্করণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে সংস্কৃত মূল, ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ ও টীকা ছিল। এই গ্রন্থ দেখিয়া তাঁহার বন্ধু (তখন ইংলণ্ড-প্রবাসী) রাজা রামমোহন রায় তাঁহাকে উৎসাহ-পূর্ণ পত্র লিখেন কিন্তু সাধারণের নিকট তাদৃশ সাহায্য না পাওয়ায় অর্থাভাবে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি. হিন্দুকলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্রগণ 'যখন সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা' প্রতিষ্ঠিত করেন তখন তারাচাঁদকেই উহার সভাপতি করেন এবং যখন জর্জ্জ টমসন এদেশে রাজনীতিক আন্দোলনের বীজ বপন করেন, তখন 'চক্রবর্ত্তীর দল'ই তাহাতে উৎসাহবারি সেচন করেন। তিনি কিছু কাল ব্যবসায় বাণিজ্যও করিয়া-ছিলেন কিন্তু উহাতে তাদৃশ সুবিধা হয় নাই। শেষজীবনে তিনি বর্দ্ধমান-রাজের প্রধান সচিব ছিলেন। তিনি কিছু কাল "কুইল" নামক একখানি ইংরাজী পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন ;এবং সুপণ্ডিত বলিয়া সমসাময়িক সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।
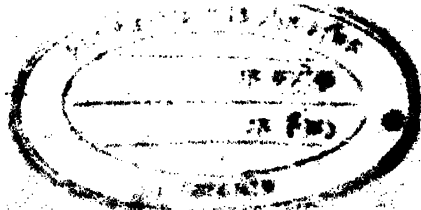
'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রধান চরিত্রগুলি ব্যর্থ হইল কেন ?

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু বি-এ]

'কৃষ্ণকান্তের উইল' পড়িলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহার ঘটনাবলী ও প্রধান চরিত্রগুলি প্রধানতঃ নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেন শত চেষ্টাতেও তাহারা নিয়তির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। বইখানি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন সমস্তটাই অদৃষ্টের পরিহাস। গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণী এই তিনটী 'সংসার-পতঙ্গ' যেন অদৃষ্ট-চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অদৃষ্টের বহ্নিতে পুড়িয়া মরিল।

প্রথমে গোবিন্দলালকে দেখা যাউক। গোবিন্দলাল শিক্ষিত, ধার্ম্মিক, রূপবান্ যুবক। জগতে যাহাতে যাহাতে সাধারণতঃ সুখ পাওয়া যায় সে সকলই তাঁহার ছিল,—তাঁহার "রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ্, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম," আর ছিল তাঁহার ভ্রমর, যে ভ্রমর "জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত।" তবে তাঁহার এ সাজান বাগান শুকাইল কেন ও কাহার দোষে? গোবিন্দলালের দুরবস্থা রোহিণীকে লইয়া। এখন দেখা যাউক এই রোহিণীর সংস্রবে গোবিন্দলাল আসিলেন কি করিয়া। রোহিণীর সহিত এই উপন্যাসে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ বারুণীর ঘাটে। গোবিন্দলাল নিজের বাগানে বেড়াইতেছিলেন। সে সময়টা বড়ই মধুর; কোকিল ডাকিতেছে, উপরে নীল আকাশ, চারিদিকে সুন্দর ফল-ফুলে শোভিত উদ্যান, আর নীচে বারুণীর স্বচ্ছ জলে সেই আকাশ ও উদ্যানস্থ বৃক্ষরাজির ছায়া; ক্রমে চন্দ্র উদিত হইল। সেই স্থানে, সেই কালে উদাসমনা বালবিধবা রোহিণী যদি রূপবান্ সহৃদয় গোবিন্দলালের প্রতি আকৃষ্ট হয় তবে সে দোষ আর যাহারই হউক গোবিন্দলালের যে নয় সে বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। গোবিন্দলালের হাতে বাঁশীও নাই, মুখে হাসিও নাই, গলায় বনফুলের মালাও নাই। বসন্তের শোভা, কোকিলের ডাক বা রোহিণীর মনের উদাসভাব এ সকলের কিছুই গোবিন্দলালের সৃষ্ট নহে। তার পর 'অপর সংসার-পতঙ্গ' রোরুদ্যমানা রোহিণীকে দেখিয়া গোবিন্দলাল যদি তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখান, তাহা হইলে গোবিন্দলালের কি দোষ দেওয়া যায়। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাবলী দেখিলে মনে হয় যেন এই সহৃদয়তা প্রকাশই গোবিন্দলালের কাল হইল।

রোহিণী চৌর্য্যাপরাধে অপরাধিনী, কিন্তু সহৃদয় গোবিন্দলাল তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। রোহিণীকে চুরি করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াও স্বয়ং কৃষ্ণকান্ত বলিতেছেন, "তুমি চুরি করিতে আসিয়াছ এ কথা সহসা বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোরের অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতেছি।" যেখানে রোহিণীকে দোষী সাব্যস্ত করিতে বহুদর্শী কৃষ্ণকান্ত সন্দিহান, সেখানে সরল-হৃদয় গোবিন্দলাল যে তাহাকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? বিশেষ, যখন ইতঃপূর্ব্বেই এক দিন রোহিণীকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার প্রতি গোবিন্দলালের সহানুভূতি জন্মিয়াছে। নির্দ্দোষিতা-সম্বন্ধে গোবিন্দলালের বিশ্বাসের হয় তো আরও একটা কারণ থাকিতে পারে (এবং তাহা থাকা খুবই স্বাভাবিক), গোবিন্দলাল হয় তো মনে মনে ভাবিলেন, 'এত সুন্দর যার চেহারা তার ভিতর কখনও এরূপ দোষ থাকিতে পারে'—যত্র আকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি।

তার পর গোবিন্দলাল রোহিণীর উদ্ধারের জন্যই তাহার ভিতরকার আসল কথাটা কি তাহা জানিতে চাহিলেন। ইহাতে যে রোহিণী তাঁহার কাছে প্রেম-জ্ঞাপন করিয়া বসিবে তাহা তিনি কেমন করিয়া জানিবেন। ভ্রমরের উপস্থিতিতে রোহিণী প্রেম-জ্ঞাপন করিতে পারিত না; কিন্তু ভ্রমর সেখানে নাই। বিপন্না রোহিণীর গোপনীয় কথা শুনিতে চাহিলে বা গোবিন্দলালের কাছে রোহিণী যখন সে কথা বলিবে, তখন দাঁড়াইয়া শুনিলে পাছে রোহিণী আরও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, এই ভাবিয়া ভ্রমরও সেখান হইতে চলিয়া গেল। রোহিণী তখন তাহার কথায় সকল কথাই প্রকাশ করিয়া [illegible]

এ প্রেম-নিবেদনেও গোবিন্দলাল কোনরূপ বিচলিত হইলেন না; রোহিণীর প্রতি তাঁহার দয়া হইল।

ভ্রমর সকল কথা গোবিন্দলালের মুখে শুনিয়া রোহিণীকে জলে ডুবিয়া মরিতে উপদেশ দিয়া পাঠাইল; রোহিণী তাহাই করিয়া বসিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়া আপন উদ্যান-গৃহে লইয়া গেলেন। জলমগ্না মৃতপ্রায় রোহিণীকে অন্দরে লইয়া যাইতে ভরসা হইল না, তাহাতে ভ্রমর রাগ করিতে পারে। যে রোহিণীর সংস্রব ত্যাগ করিতে গোবিন্দলাল সচেষ্ট হইয়াছিলেন ঘটনা-চক্রে সেই রোহিণীরই অতি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তাঁহাকে আসিতে হইল। "জীবনে হউক, মরণে হউক, রোহিণী শেষ গোবিন্দলালের গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভ্রমর ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক কখনও সে উদ্যান-গৃহে প্রবেশ করে নাই। বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশাল দীর্ঘ বিলম্বিত ঘোর কৃষ্ণ কেশ-রাশি জলে ঋজু—তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘ যেন জল বৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত; কিন্তু মুদ্রিত পদ্মের উপরে ভ্রূযুগল জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণ শোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাটে—স্থির, বিস্তারিত, লজ্জা-ভয়-বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাব-বিশিষ্ট—গণ্ড এখনও উজ্জ্বল—অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলী পুষ্পের লজ্জাস্থল। গোবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল। এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল—একথা মনে করিয়া তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল।" রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের যে সকল কারণে আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব সকলগুলিই এখানে বর্ত্তমান। ইহার উপর আবার অসংবৃতা অসহায়া মৃতকল্পা রোহিণীর দেহের স্পর্শ এবং সর্ব্বোপরি রোহিণীর গোবিন্দলালের প্রতি প্রবল অনুরাগ; সকলগুলি মিলিয়া গোবিন্দলালের দয়া ও সহানুভূতিকে আসক্তিতে পরিণত করিল। সুন্দরী অসহায়া, বালবিধবা তৎপ্রতি প্রবলরূপে আকৃষ্টা, তাহারই প্রেমে হতাশ হইয়া জল-নিমগ্না অসংবৃতা যুবতীকে সেই দেশ ও কালে সন্দর্শন; তাহার উপরে তাহার দৈহিক সংস্পর্শ—অধরে ফুৎকার—পরে তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় পুনর্জীবন-লাভ, এবং পরিশেষে রোহিণীর উক্তি "রাত্রি দিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই;" এ সকল মিলিয়া গোবিন্দলালকে বিচলিত করিল। কিন্তু গোবিন্দলাল যে মুহূর্ত্তে রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভ্রমরের কপাল ভাঙ্গিল; "সেই সময়ে ভ্রমর একটা লাঠি লইয়া একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।" আমরাও বুঝিলাম যে কোনও অদৃশ্য ও অজ্ঞাত শক্তিই এ সকল ঘটনার পরিচালক।

ভ্রমর যখন গোবিন্দলালকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, গোবিন্দলাল হয় তো মনে করিলেন যে, ভ্রমর সকল কথা না বুঝিয়া তাঁহাকে সন্দেহ করিবে ও নিজেও সন্দেহ-জনিত কষ্ট ভোগ করিবে; তার চেয়ে কিছু দিন পরে যখন তিনি স্বীয় চিত্ত সম্যক্ জয় করিতে সমর্থ হইবেন, যখন তাঁহাকে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ থাকিবে না, তখন ভ্রমরকে সকল কথা বলিবেন; এইরূপ মনে করিয়া সে-দিনকার কথা ভ্রমরকে বলিলেন না।

অতঃপর গোবিন্দলাল রোহিণীর চিন্তা দূর করিবার জন্য দূরদেশে বিষয়-কর্ম্মে মন দিতে চাহিলেন। এই সময়ে ভ্রমর তাঁহার কাছে থাকিলে হয় তো গোবিন্দলালের চিত্ত রোহিণীর রূপ ছাড়িয়া ভ্রমরের গুণে আকৃষ্ট হইত। কিন্তু ইহাতে গোবিন্দলালের মাতা অন্তরায় হইলেন; তিনি ভ্রমরকে বিদেশ যাইতে দিলেন না। "গোবিন্দ-লালের জীবন-তরণী তাঁহার ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের অনুকূল পবনে সংসার-তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিয়া চলিল।" গোবিন্দলাল সেই দূরদেশে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এক সঙ্গে দুই খানি অদ্ভুত চিঠি পাইলেন। এক খানিতে ভ্রমর বলিয়াছে, তিনি রোহিণীতে আসক্ত, আর এক খানিতে ব্রহ্মানন্দ লিখিয়াছেন ভ্রমর রটাইয়াছে যে গোবিন্দলাল রোহিণীকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়াছে। গোবিন্দলাল কিছুই না বুঝিতে পারিয়া দেশে ফিরিতে মনস্থ করিলেন। ভ্রমর সে কথা জানিতে পারিয়া কৌশল করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। গোবিন্দলাল সে দুই খানি চিঠির মর্ম্ম কিছুই বুঝিলেন না, আসল কথা তাঁহার অজ্ঞাত রহিল। কিন্তু ভ্রমর এইরূপ মিথ্যা কৌশল করিয়া চলিয়া যাওয়াতে গোবিন্দলালের

বিশেষ অভিমান হইল—তিনি কি করিয়াছেন, না করিয়াছেন, ভ্রমর সে কথা তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই মিথ্যা সন্দেহে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল, এই মনে করিয়া গোবিন্দলাল অভিমান করিলেন, দেশে আসিয়া ভ্রমরের অভাব অনুভব করিয়া গোবিন্দলালের অভিমান হইল। গোবিন্দলাল ভাবিলেন, "এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া, আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণ-ধারণ করিতে পারে না?" এ কথা সেই বলিতে পারে এবং বলে, যাহার পক্ষে সত্যই ভ্রমর না থাকিলে প্রাণ-ধারণ করা কঠিন। গোবিন্দলালের পক্ষে ভ্রমরকে ভুলিয়া যাওয়া নিতান্তই কঠিন। ভ্রমরের মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসর পরেও সন্ন্যাসিবেশী গোবিন্দলাল ভগবৎ-পাদ-পদ্মে মন স্থাপন করিয়াও ভগবৎ-সম্বন্ধে শচীকান্তকে বলিতেছেন, "এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমরাধিক ভ্রমর।" এখন জিদ্ করিয়া ভ্রমরকে ভুলিতে হইবে, কাজেই হৃদয়ের অভ্যন্তরে রোহিণীর রূপের প্রতি তাঁহার যে আকর্ষণ ছিল তাহাকে সম্মুখে লইয়া আসিলেন; রোহিণীর রূপের মোহে সাধ করিয়া ডুব দিলেন। এই সময়ে ঘটনাচক্রে রোহিণীর সঙ্গে এক দিন তাঁহার নিভৃতে সাক্ষাৎ হইল। তখন গোবিন্দলালও 'বে-পরোয়া', রোহিণীও তাই—উভয়েরই ধারণা, কলঙ্ক যাহা রটিবার তাহা রটিয়াছে, যথার্থ পাপাচরণে ততোধিক কি হইবে। কৃষ্ণকান্ত এ সম্বন্ধে গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ-লালের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিল না, কৃষ্ণকান্ত হঠাৎ পরলোক গমন করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত মৃত্যুকালে গোবিন্দলালের অংশ ভ্রমরকে দিয়া নূতন উইল করিয়া গেলেন। গোবিন্দলালের সহিত ভ্রমরের কোনও মনান্তর না হইয়া যদি শুধু শুধুই গোবিন্দ-লালের চরিত্র-দোষ ঘটিত, তবে উইলের এই পরিবর্তনে সুফল দর্শিত। কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হইল; ভ্রমরের উপর গোবিন্দলালের অভিমান দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, ভ্রমরের প্রতি তাঁহার চিত্ত অধিকতর বিমুখ হইয়া গেল। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া দ্রুতগতি অশ্বপৃষ্ঠে বুঝি অধঃপতনেরই পথে ছুটিয়া চলিলেন। কিছু-দিন পরে দেখিলাম, গোবিন্দলাল প্রসাদপুরে রোহিণীকে লইয়া ঘর করিতেছে। রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের কোনও দিনই যথার্থ প্রেম ছিল না, সংসর্গেও প্রেম জন্মায় নাই; তাহার কারণ গোবিন্দলাল এখন দুষ্কৃতকারী এবং তাহার পাপের সহায় রোহিণী। এই সময়ে এক দিন হঠাৎ নিশাকরের প্রসাদপুরে আগমনে বিষম অমঙ্গল সূচিত হইল—"অকস্মাৎ রোহিণীর তবলা বেসুরা বলিল। ওস্তাদ্জির তম্বুরার তার ছিঁড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল —গীত বন্ধ হইল, গোবিন্দলালের হাতের নবেল পড়িয়া গেল।" নিশাকরের মুখে ভ্রমরের নাম শুনিয়া গোবিন্দ-লালের পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, তাঁহার কান্না আসিল, "ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই।" গোবিন্দলাল "রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের রূপ-তৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে —এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দার-ঘর্ষণ—পীড়িত বাসুকি-নিঃশ্বাস-নির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি-ভাণ্ড-নিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়-সাগর মন্থনের পর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদ্গীরণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই আস্বাদিতপূর্ব্ব বিশুদ্ধ ভ্রমর-প্রণয়-সুধা—দিন-রাত্রি স্মৃতি পথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীত-স্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবল প্রতাপযুক্ত অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপ্যনীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা,—তবু ভ্রমর অন্তরে। রোহিণী বাহিরে। যদি তখন গোবিন্দলাল, রোহিণীর ব্যবস্থা করিয়া স্নেহময়ী ভ্রমরের কাছে যুক্তকরে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিত, "আমায় ক্ষমা কর—আমায় আবার হৃদয়ে স্থান দাও;" যদি বলিত, "আমার এমন গুণ নাই যাহাতে আমায় তুমি ক্ষমা করিতে পার, কিন্তু তো[মার] তো অনেক গুণ আছে, তুমি নিজগুণে আমায় ক্ষমা [কর]...

বুঝি তাহা হইলে, ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিত। কেন না রমণী মূর্ত্তিমতী ক্ষমা, দয়াময়ী, স্নেহময়ী; স্ত্রী আলোক; পুরুষ ছায়া। আলো কি ছায়া ত্যাগ করিতে পারিত? গোবিন্দলাল তাহা পারিল না। কতকটা অভিমানের বশে আর কতকটা লজ্জার জন্য। দুষ্কৃতকারীর লজ্জাই দণ্ড। কতকটা ভয়েও বটে—পাপ সংজ্ঞে পুণ্যের সম্মুখীন হইতে পারে না। ভ্রমরের কাছে আর মুখ দেখাইবার পথ নাই। গোবিন্দলাল আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহার পর গোবিন্দলাল হত্যাকারী। তখন গোবিন্দলালের আশা-ভরসা ফুরাইল। গোবিন্দলাল যেন রোহিণীকে ত্যাগ করিতে পারিলেই বাঁচিয়া যান; কিন্তু রোহিণীকে কুলভ্রষ্টা করিয়া এখন তাহাকে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করা সাধারণ লম্পটের পক্ষে সহজ হইতে পারে, সহৃদয় গোবিন্দলালের পক্ষে তাহা অসম্ভব।

গোবিন্দলালেরও মনের যখন এই অবস্থা সেই সময়ে রোহিণীকে নির্জ্জনে নিশীথে নিশাকরের সঙ্গে দেখিলেন। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। কোথায় ছিল নিশাকর; সে আসিয়াছিল কি উদ্দেশ্যে, আর হইল কি! ফলে গোবিন্দলাল স্ত্রী-হত্যার পাপে লিপ্ত হইলেন। আত্ম-গ্লানিতে মন যখন পূর্ণ, তখন জেল হইতে মুক্ত হইয়া ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথের সহিত সহিত দেখা করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। অন্নাভাবে যখন ভ্রমরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, তখন ভ্রমরের সে কি কঠোর উত্তর! কাজেই গৃহে আসা গোবিন্দলালের পক্ষে অসম্ভব হইল। মাধবীনাথের পত্রে সংবাদ পাইয়া শেষে ভ্রমরের মৃত্যু-সময়ে একবার জন্মের মত ভ্রমরকে দেখিতে ও তাহাকে দেখা দিতে আসিলেন। সাত বৎসর পরে দুই জনের ক্ষণিকের সাক্ষাৎ হইল। ভ্রমর মরিল, গোবিন্দলাল আজীবন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাঁচিয়া রহিল। গোবিন্দলালের এ যন্ত্রণা কেন ও কাহার দোষে? এই উপন্যাসের সমস্তটাই গোবিন্দলালের পরাজয়ের কাহিনী, কিন্তু সে পরাজয়ও সে স্ব-ইচ্ছায় মানিয়া লয় নাই। এক অদৃশ্য প্রতিকূল শক্তির একটার পর একটা ভীষণ ঢেউ আসিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে করিতেছে এবং সে শক্তির বিরুদ্ধে সেও যথা-শক্তি সংগ্রাম করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অবশেষে পরাস্ত হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে।

এবার ভ্রমরকে দেখা যাউক। ভ্রমরের সহিত প্রথম পরিচয় রোহিণীর চুরির পরদিন প্রভাতে। ভ্রমর কৃশাঙ্গী বালিকা। ভ্রমরের বর্ণ কিছু কালো, প্রকৃতি কিছু হাল্কা রকমের—সে নিজে হাসিতে যত পটু শাসনে তত পটু ছিল না। ভ্রমর স্বামীর প্রেমে বিভোর, স্বামীর উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস—তাহার আপনার অস্তিত্বে যতদূর বিশ্বাস গোবিন্দলালের একটী সামান্য ধারণায় (রোহিণীর নির্দ্দোষিতায়) তাহার ততদূর বিশ্বাস। ভ্রমর পরদুঃখকাতর, রোহিণী চুরির দায়ে ধরা পড়িয়া তাহার কাছে প্রেরিত হইলে, সে "রোহিণীকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাল কথা বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে এ দায় সম্বন্ধে ভাল কথা বলিলেও রোহিণীর কান্না আসে, এ জন্য তাহাও বলিতে পারিতেছে না।" আশৈশব গোবিন্দলালের শিষ্যা ভ্রমর, গোবিন্দলালের উপযুক্ত পত্নী, গোবিন্দলালের কাছে সে ভ্রমর "জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত।" কিন্তু সেই ভ্রমর অল্পদিন পরেই ধূলায় লুটাইয়া দেবতাদিগকে স্বীয় দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছে, বলিতেছে, "আমার সতর বৎসর মাত্র বয়স, আমি এই বয়সে স্বামীর ভালবাসা বিনা আর কিছু ভালবাসি নাই—আমার ইহলোকে আর কিছু কামনা নাই—আর কিছু কামনা করিতে শিখি নাই—আমি আজ এই সতর বৎসর বয়সে তাহাতে নিরাশ হইলাম কেন?" এখন দেখা যাউক তাহার জীবন ব্যর্থ হইল কেন ও কাহার দোষে?

ভ্রমরের সর্ব্বনাশের কারণ রোহিণী। যখন রোহিণী চৌর্য্যাপরাধে অপরাধিনী হইয়া ভ্রমরের কাছে প্রেরিত হইল, সরলা সহৃদয়া ভ্রমর যে কি করিবে, কি করিলে রোহিণীর দুঃখের ও অপমানের লাঘব হইবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না; "ভাল কথা বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে এ দায় সম্বন্ধে ভাল কথা বলিলেও রোহিণীর কান্না আসে, এজন্য তাহাও বলিতে পারিতেছে না।" কাজেই, যখন গোবিন্দলাল সেখানে আসিয়া পৌছিল, সে সব কর্ত্তব্য গোবিন্দলালের উপর ন্যস্ত করিয়া নিজে একেবারে সে মহল হইতে পলাইল—পলাইবার কারণ, পাছে গোবিন্দলাল মনে

করেন যে, ভ্রমর তাঁহাকে একাকী রোহিণীর কাছে রাখিয়া যাইতে ভরসা করে না, পাছে সেখানে উপস্থিত থাকিলে রোহিণী আরও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, পাছে সেখানে রোহিণীর বিচারকর্ত্রী, ত্রাণকর্ত্রীরূপে দাঁড়াইলে কোনরূপ অহঙ্কার প্রকাশ পায়। ইহার মধ্যে ভ্রমরের কোনও দোষ দেখি না; সে কেমন করিয়া জানিবে চৌর্য্যাপরাধে অপরাধিনী বিপন্না রোহিণী গোবিন্দলালের কাছে প্রেম-জ্ঞাপন করিবে—চোর তাহার বিচারকের কাছে প্রেম-নিবেদন করিয়া বসিবে? কিন্তু তাহার এই অনুপস্থিতিই পরে তাহার সর্ব্বনাশের মূল হইয়া দাঁড়াইল। সাধ্বী ভ্রমর গোবিন্দলালের মুখে নির্লজ্জা রোহিণীর প্রেম-নিবেদনের কথা শুনিয়া ক্রোধ-পরবশ হইয়া তাহাকে বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে উপদেশ দিল; কিন্তু সেটা শুধু তাহাকে ধিক্কার দিবার জন্ম; সে জানিত যে সত্যই কিছু রোহিণী ডুবিয়া মরিবে না, যে গোবিন্দলালের প্রেমে মজিয়াছে সে সাধ্যমত বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু ভ্রমরের দুর্ভাগ্যক্রমে রোহিণী সত্যই ডুবিল অথচ মরিল না; বরং মৃতপ্রায় অবস্থায় গোবিন্দলালকে অধিকতর আকৃষ্ট করিল। সেইদিন রাত্রে গোবিন্দলালের গৃহে ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া ও তাঁহার মুখে দুশ্চিন্তার ভাব পরিস্ফুট দেখিয়া ভ্রমর গোবিন্দলালের বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গোবিন্দলাল কিছুই বলিলেন না। কিন্তু ভ্রমরের হৃদয়ে যেন ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের ছায়াপাত হইল। "কেমন একটা বড় ভারী দুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে লাগিল। যেমন বসন্তের আকাশ—বড় সুন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জ্বল—কোথাও কিছু নাই—অকস্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারিদিক্ আঁধার করিয়া ফেলে—ভোমরার বোধ হইল যেন, তার বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ উঠিয়া সহসা চারিদিক্ আঁধার করিয়া ফেলিল

গোবিন্দলাল যখন বিষয়-কর্ম্মে মন দিয়া রোহিণীকে ভুলিবার জন্ম বিদেশে যাইতে প্রস্তুত, ভ্রমর তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিল, কিন্তু তাহার শাশুড়ী তাহাকে যাইতে দিলেন না। এ সময় দুই জনে একত্র থাকিলে পরবর্ত্তী মনান্তর ঘটিত না, "বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত। ভ্রমরের এত ভ্রম ঘটিত না। এত রাগ হইত না। রাগে এই সর্ব্বনাশ হইত না।" পরস্পর অদর্শনে বিষময় ফল ফলিল।

গোবিন্দলাল চলিয়া যাইবার পর, ভ্রমরের কিছুই ভাল লাগে না। সে তীব্র অভিমানে নিজের দেহের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। এ সকল দেখিয়া দৈবাৎ ক্ষীরি চাকরাণী তাহার কাছে বলিয়া ফেলিল, "ভাল বউ ঠাকুরাণি, কার জন্ম তুমি অমন কর?...তিনি হয়ত... রোহিণী ঠাকুরাণির ধ্যান করিতেছেন।" যদি ইহার ফলে বাচনিক বিবাদে সমস্ত মিটিয়া যাইত তাহা হইলে হয় তো পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ ভিন্নরূপ ধারণ করিত; কিন্তু তাহা না হইয়া ক্ষীরোদার ভাগ্যে কিল চড় বিস্তর পড়িল। এতটা বাড়াবাড়িতে সেও পাঁচি চাঁড়ালনীকে সাক্ষী মানিল এবং নিজে গ্রামময় রাষ্ট্র করিয়া বেড়াইল যে, গোবিন্দলাল রোহিণীতে আসক্ত। ফলে, ভ্রমরের মনে রোহিণীর প্রেম জ্ঞাপন বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া গোবিন্দলালের গৃহে ফিরিতে বিলম্ব, দুশ্চিন্তাযুক্ত মুখ ও বিলম্বের কারণ গোপন এ সমস্ত আনুপূর্ব্বিক ঘটনা একত্র হইয়া সন্দেহের সঞ্চার করিল। সেই সন্দেহ-অনলে অনেকেই ইন্ধন জোগাইতে লাগিল। শেষে রোহিণী স্বয়ং আসিয়া প্রমাণ-স্বরূপ কতকগুলি বস্ত্রালঙ্কার দেখাইয়া ভ্রমরের সন্দেহ সুদৃঢ় করিয়া দিল। গোবিন্দলাল ও কাছে নাই যে তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন। তাহার গোবিন্দ-লালের উপর অভিমান হইল। সে গোবিন্দলালকে কঠিন ভাষায় পত্র লিখিল। এই পর্য্যন্ত করিয়াও যদি ভ্রমর ক্ষান্ত হইত তাহা হইলেও গোবিন্দলালের প্রত্যাগমনেই সকল মিটিয়া যাইত। কিন্তু তাহা না হইয়া দুষ্ট গ্রহের ফেরে, দুর্জ্জয় অভিমান ভরে ভ্রমর ভূতগ্রস্তের ন্যায় মিথ্যা কৌশল করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। ভ্রমরকে কেহ শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া লইয়া গেল না, কৃষ্ণকান্ত প্রভৃতিও ভ্রমরের মাতার সংবাদ পর্য্যন্ত লইলেন না।

ভ্রমরের অনুপস্থিতিতে গোবিন্দলাল ও রোহিণী পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইল। কৃষ্ণকান্ত এ সকল জ্ঞাত হইয়া গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু ভ্রমরের কপাল-দোষে তিনিও হঠাৎ পরলোক গমন করিলেন। মৃত্যুকালে উইল পরিবর্ত্তন করিয়া গোবিন্দ-লালের প্রাপ্য অংশ ভ্রমরকে দিয়া কৃষ্ণকান্ত ভ্রমরের শাসন

বিপরীত' ঘটাইলেন। গোবিন্দলাল ও গোবিন্দলালের মাতা ভ্রমরের প্রতি বিরূপ হইলেন। "পুত্র থাকিতে পুত্র-বধূর বিষয় হইল, ইহা তাঁহার (গোবিন্দলালের) মাতার" অসহ্য হইল। তিনি একবারও অনুভব করিতে পারিলেন না যে, ভ্রমর-গোবিন্দলাল অভিন্ন জানিয়া এবং গোবিন্দলালের চরিত্র-দোষ সম্ভাবনা দেখিয়া, কৃষ্ণকান্ত রায় গোবিন্দলালের সংশোধন জন্য ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমরাও বলি—"আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকার মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বধূর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রীলোক ইহা সহজেই বুঝিতে পারে।" ফলে গোবিন্দলালের মাতার দিক্ হইতেও ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধ্যে আন্তরিক বিচ্ছেদ দূরীকরণের কোনও চেষ্টা হইল না বরং তিনি কাশীযাত্রা করিয়া সে বিচ্ছেদ আরও বাড়াইয়া দিতে সহায়তা করিলেন।

গোবিন্দলাল মাতাকে লইয়া কাশী যাইবার সময় যখন ভ্রমরকে "আসিব না" বলিয়া চলিয়া যাইতেছেন তখন ভ্রমরের কান্নাকাটিতে, তাহার পুনঃ পুনঃ গৃহে থাকিতে অনুরোধে এবং অবশেষে তাঁহাকে যে আবার আসিতে হইবে, ভ্রমরের জন্য কাঁদিতে হইবে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁহার মন কতক নরম হইয়া ভ্রমরের দিকে ঝুঁকিল, "মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না"……"সেই সময়ে যদি গোবিন্দলাল দুই পা ফিরিয়া গিয়া ভ্রমরের রুদ্ধদ্বার ঠেলিয়া একবার বলিতেন—'ভ্রমর আমি আবার আসিয়াছি,' তবে সকল মিটিত। গোবিন্দলালের অনেকবার সে ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলেও তিনি তাহা করিলেন না। ইচ্ছা হইলেও একটু লজ্জা করিল। ভাবিলেন, এত তাড়াতাড়ি কি? যখন মনে করিব, তখন ফিরিব। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী। আবার ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। যাহা হয়, একটা স্থির করিবার বুদ্ধি হইল না।" অবশেষে ছয় বৎসর পরে মৃত্যু-শয্যায় যখন ভ্রমর নিঃস্ব ভিখারী গোবিন্দলালের পত্র পাইল তখন, কতক রোগ-কতক গোবিন্দলালের প্রতি দুর্জ্জয় অভিমানের পুনরুদ্রেকে এবং কতক "গোবিন্দলাল যে হত্যাকারী ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না" বলিয়া গোবিন্দলালকে কঠোর পত্র লিখিয়া বসিল। গোবিন্দলাল পত্রের কথা ধরিয়াই স্থির করিয়া বসিলেন যে ভ্রমর বুঝি তাঁহার সান্নিধ্য বা সংশ্রব যথার্থই চাহে না। ভ্রমরের যথার্থ মনের অবস্থা কি হইতে পারে তাহা গোবিন্দলাল একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না। ফলে ভ্রমরের মৃত্যুর সময়ের পূর্ব্বে গোবিন্দলালের সহিত ভ্রমরের দেখা হইল না।

তৃতীয় সংসার-পতঙ্গ রোহিণী। রোহিণী বালবিধবা। আমাদের সহিত যখন প্রথম পরিচয় তখন, "রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল, শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ।……সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।" রোহিণী শিল্পকার্য্যেও বেশ পটু। রোহিণী কৃতজ্ঞতার খাতিরে হরলালের মঙ্গলের জন্য মরিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত, কিন্তু সে কোন মতেই চুরি করিতে প্রস্তুত নয়—কৃষ্ণকান্তের সমস্ত বিষয়ের বিনিময়েও নয়। রোহিণী রসিকা।

এখন দেখা যাউক রোহিণীর অধঃপতন ও পরিশেষে মৃত্যু ঘটিল কেন ও কাহার দোষে? বাল-বিধবা রোহিণীর আর কেহ ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে থাকিত। দরিদ্রের সংসারে সকল কর্ম্ম তাহাকে স্বহস্তে করিতে হইত—তাহাতেই সে ব্যাপৃত থাকিত; অন্য কিছু চিন্তা করিবার তাহার বড় অবসর মিলিত না। এই সময়ে হরলাল এক দিন নিজ কৌশল-সিদ্ধির জন্য ক্রীড়াচ্ছলে তাহাকে বিবাহের প্রলোভন দেখাইল। হরলাল বোধ হয় কোন দিন যথার্থ বিধবা-বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে নাই। সে প্রথমে বিধবা-বিবাহের কথা কৃষ্ণকান্তকে লিখিয়াছিল, তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া উইলের নিজ অংশ বাড়াইয়া লইবার জন্য। এখন সে রোহিণীর কাছে এমন ভাব দেখাইল যেন সে সত্যই বিধবা-বিবাহ করিতে ইচ্ছুক—এবং রোহিণীকে বিবাহ করিবে। "যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নাই, যে মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা নাই, যা ইতর-বর্ব্বরে মুখেও আনিতে পারে না" হরলাল তাহা করিল। হরলালের কৌশলে রোহিণীর হৃদয়ের তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল—রোহিণী প্রলুব্ধ হইয়া প্রকৃত উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিল। সে জাল উইলে

গোবিন্দলালের অংশে কিছুই নাই। পরে যখন রোহিণী হরলালকে তাহার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইতে গেল, তখন হরলাল তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল; বিষয়ের লোভেও সে চোরকে বিবাহ করিতে রাজি নহে। হরলাল কৌশল করিল, কিন্তু তাহার ফলে রোহিণীর হৃদয়ে অতৃপ্ত তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল এবং একবার জাগিয়া উঠিয়া শান্ত হইবার কোনও উপায় না দেখিয়া অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। হরলালের এই ক্রীড়া, রোহিণীর মৃত্যুর কারণ হইল। রোহিণীর হৃদয়ে যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি ছিল, হরলালের ফুৎকারে সে ভস্ম উড়িয়া গিয়া বহ্নি আরও প্রবল হইয়া উঠিল। রোহিণীর তখন "জলয়তি তনুমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ।"

রোহিণীর মনের যখন এইরূপ অবস্থা তখন একদিন বসন্তের সন্ধ্যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে বারুণীর ঘাটে কোকিলের ডাক শুনিয়া রোহিণী উন্মনা হইয়া পড়িল। সে "বোধ হয়, ভাবিতেছিল যে কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল। আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না? কোন দোষে আমাকে এ রূপ-যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ জীবনে সকল সুখে সুখী—মনে কর ঐ গোবিন্দলালবাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী—কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য? দূর হৌক—পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই, কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি?" রোহিণী যখন উদাস মনে এই সমস্ত বিষয় ভাবিয়া আকুলভাবে কাঁদিতেছে, যখন গোবিন্দলালবাবুর চিন্তা একটা যুক্তির সামান্য উদাহরণের সংশ্রবে তাহার মনে আসিয়াছে, তখন গোবিন্দলাল তাহার দুঃখে সহৃদয়তা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে রোহিণীর চিত্ত দিনে দিনে গোবিন্দলালের প্রতি আকৃষ্ট হইবে না কেন?

রোহিণী উইল বদলাইয়া গোবিন্দলালের প্রতি যে অত্যাচরণ করিয়াছিল এখন তাহার প্রতিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। যেমে জাল উইলের পরিবর্ত্তে আসল উইল রাখিতে গিয়া রোহিণী চৌর্য্যাপরাধে ধরা পড়িল। এই বিপন্নাবস্থায়ও গোবিন্দলালের অযাচিত করুণা, অবিশ্বাস-যোগ্য কথাতেও বিশ্বাস করিবার সম্ভাবনা, তাঁহার প্রতি রোহিণীর আকর্ষণকে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। একান্তে গোবিন্দলালের সহিত কথায় কথায় রোহিণী হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া ফেলিল এবং গোবিন্দলাল যে তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছেন তাহা জানিয়া বড় সুখী হইল; তাহার আবার বাঁচিতে সাধ হইল। প্রথমে সম্মত হইলেও কৃষ্ণকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রোহিণী গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইল না। পূর্ব্বে তাহার যে বিপন্ন অবস্থা ছিল চৌর্য্যাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তাহা আর রহিল না. এখন সে স্বাধীনভাবে নিজের অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখিল যে, গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব সুতরাং তাহার গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়া হইল না।

ভ্রমর সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাকে জলে ডুবিয়া মরিতে উপদেশ দিল। ইহাতে রোহিণীর জীবনে ধিক্কার জন্মিল। তাহার প্রথম কারণ প্রেমে হতাশা, দ্বিতীয় কারণ ভ্রমর সমস্ত জানিতে পারিয়াছে এবং গোবিন্দলালের সহিত মিলনের প্রধান অন্তরায় ভ্রমরই আবার বিচারকের আসনে বসিয়া তাহাকে মরিতে উপদেশ দিতেছে। রোহিণীর মনোভাব তাহার কথায় প্রকাশ পাইল যখন সে পুনর্জীবিত হইয়া গোবিন্দলালকে বলিতেছে, "রাত্রি-দিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।" এ ঘৃণিত অভিশপ্ত জীবনধারণ করা রোহিণীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল; কাজেই সে আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিল। আত্মহত্যা করিতেও গেল।

রোহিণীর এই আত্মহত্যা ব্যাপারের ফল হইল দুইটী। প্রথম গোবিন্দলাল তাহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন; দ্বিতীয়, সেই গভীর রাত্রে রোহিণীকে গোবিন্দ-লালের উদ্যান-গৃহ হইতে বাহির হইতে দেখিয়া তাহার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রাষ্ট্র হইল। দ্বিতীয়টী না ঘটিলে, প্রথমটী হয় তো কালে অন্তর্হিত হইত। কিন্তু আপাততঃ দ্বিতীয়টী লইয়া বড় গোল বাধিল। "এখন, ভ্রমরেরও যে জ্বালা রোহিণীরও সেই জ্বালা।......রোহিণী শুনিল—গ্রামে রাষ্ট্র যে, গোবিন্দলাল তাহার গোলাম—পাশ-[illegible]াসন

হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। কথা যে কোথা হইতে রটিল, তাহা রোহিণী শুনে নাই—কে রটাইল, তাহার কোন তদন্ত করে নাই";—তদন্ত করিবার মত মনের অবস্থাও তাহার ছিল না। সে বেচারী একে নিজের অন্তর্জ্বালায় জ্বলিতেছে তাহাতে আবার যাহার অভাবে তাহার সকল দুঃখ তাহাকে লইয়াই তাহার নামে মিথ্যা রটনা।

ইহার পরেও ভ্রমর বা বিনোদলালের স্ত্রী, অথবা বিনোদলালের ভগিনী কেহই গোবিন্দলালের মাতা বা বিনোদলালের মাতার গোচরে এ-সকল ব্যাপার আনিলেন না। তাহা করিলে বোধ হয় রোহিণীর রায়-গৃহে আসা বন্ধ হইত। গোবিন্দলালের সহিত রোহিণীর সাক্ষাৎ হওয়া কঠিন হইত।—গোবিন্দলাল হরলাল নহে যে রোহিণীর বাড়ী গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। গোবিন্দলাল দেশে ফিরিয়া আসিয়া যখন ভ্রমরকে না দেখিয়া ভ্রমরেরই উপর সমস্ত গোলযোগের দোষারোপ করিয়া সাধ করিয়া রোহিণীর চিন্তায় ডুব দিলেন, সেই সময় এক দিন ঘটনাচক্রে তাঁহার সহিত রোহিণীর সাক্ষাৎ হইল। তখন দুই জনেরই মনের সমান অবস্থা—দু'জনেই' পরস্পরকে পাইবার জন্য ব্যাকুল, দু'জনেরই' নাম একত্র হইয়া কলঙ্ক রটিয়াছে, দু'জনেরই' এক চিন্তা, 'পাপ না করিয়াও যদি এই কলঙ্ক, পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে? কলঙ্ক সমানই থাকিবে, লাভের মধ্যে উভয়ে উভয়কে পাইব।' "সে রাত্রে রোহিণী গৃহে যাইবার পূর্ব্বে বুঝিয়া গেল যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।" রোহিণীর অনেক দিনের ব্যাকুলতা শান্ত হইবার উপায় হইল এবং পরে ইহাতে তাহার সহায় হইলেন তাহার খুড়া ব্রহ্মানন্দ—তিনি টাকার লোভে, ভ্রাতুষ্পুত্রীর সতীত্ব-বিক্রয় অনুমোদন করিলেন, রোহিণীকে কৌশলে বিদেশে গোবিন্দলালের কাছে পাঠাইলেন।

রোহিণী যে, গোবিন্দলালকে যথার্থই ভালবাসিত না এমন নহে। কিন্তু সে কোন দিনই গোবিন্দলালের মন পায় নাই। সে গোবিন্দলালের রূপ-তৃষ্ণা-শান্তির উপায়, ভ্রমরের প্রতি অভিমানে ভ্রমরকে ভুলিবার যন্ত্রমাত্র, গোবিন্দলালের উপভোগের বস্তু মাত্র হইয়াছিল। গোবিন্দলাল "রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপ-তৃষা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন।...... যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীত-স্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবল প্রতাপান্বিতা অধীশ্বরী—'ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে'। তখন ভ্রমর অপ্রাপনীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে; তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল।" তাই গোবিন্দলাল কোন দিন তাহাকে যথার্থ ভালবাসেন নাই। গোবিন্দলালের এ মনোভাবের জন্য আর যেই দায়ী হউক, রোহিণী নয়। রোহিণী যে অত শীঘ্র মরিল তাহার কারণ যে, শুধু তাহার নিশাকরের সহিত নিভৃতে রহস্যালাপ নয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই রহস্যালাপেও আমরা রোহিণীর খুব বেশী দোষ দেখি না। গোবিন্দলাল যখন প্রসাদপুরের প্রমোদ-গৃহে রোহিণীর সঙ্গীত-স্রোতে ভাসমান, সেই সময় সেই গৃহের দ্বারে নিশাকরের আগমনে বিষম অমঙ্গল সূচিত হইল, "অকস্মাৎ রোহিণীর তবলা বেসুরা বলিল। ওস্তাদজীর তম্বুরার তার ছিঁড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল, গীত বন্ধ হইল, গোবিন্দলালের হাতের নবেল পড়িয়া গেল"—যেন কোন অদৃশ্য শক্তি জানাইয়া দিল যে, শৃঙ্খলার দিন গিয়া এবার বিশৃঙ্খলার দিন আসিবে, এ প্রমোদের সুখনীড় শীঘ্রই ভগ্ন হইবে।

নিশাকর যখন গোবিন্দলালের নিকট স্বীয় আগমন সংবাদ পাঠাইয়া প্রমোদ-গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে বেড়াইতে ছিলেন সেই সময় রোহিণী তাঁহাকে দেখিল, দেখিয়া তাহার রূপের তারিফ করিল ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহিত দুটো কথা কহিতে ইচ্ছা করিল। রোহিণী যদি কুলবধূ হইত, তাহার পক্ষে এরূপ ইচ্ছা করার পাপ ছিল, এরূপ ইচ্ছা বোধ হয় তাহার মনেও হইত না। কিন্তু রোহিণী এক্ষণে কুলটা, সে কথা তাহারও অজ্ঞাত ছিল না। মনের এরূপ অবস্থায় পরপুরুষের সহিত রহস্যালাপে এমন কিছু দোষ নাই। গোবিন্দলালের প্রতি সে বিশ্বাসহন্ত্রী হয় নাই। রূপজীবিনী হইয়া সে যদি রূপবান্ পুরুষকে দেখিয়া তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া একটু রঙ্গ দেখিতে ইচ্ছা করে—বিশেষ যখন সে বহুদিন যাবৎ গোবিন্দলাল ভিন্ন অন্য কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক এমন কোন লোক দেখে নাই, যাহার সহিত দুটো কথা কহিতে পারে—তাহাতে

অস্বাভাবিকতাও কিছুই নাই, অন্যায়ও কিছু নাই। কিন্তু গোবিন্দলালের কাছে তখন "রোহিণী অত্যাজ্যা" গোবিন্দলাল যেন কোন রূপে রোহিণীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলে বাঁচেন। তাই গোবিন্দলাল সবিশেষ বিচার না করিয়াই ভাবিলেন, 'যে রোহিণীর জন্য আমি সব ছেড়েছি সেই রোহিণী আমার প্রতি বিশ্বাসহন্ত্রী হইল'। এই ভাবিয়াই তিনি রোহিণীকে হত্যা করিলেন।

আঁধারে আলো

(গল্প)

[শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী]

শীতের সন্ধ্যা। তায় আবার অবিরাম বৃষ্টি। সময়টা যেন নেহাৎ বিষণ্ণ, অলস ও ক্লান্তিকর ঠেক্‌ছিল।

বন্ধুবান্ধব নিয়ে জটলা পাকানো, কোন কালেই অভ্যাস নেই, কলেজ আর বাড়ী, বাড়ী আর কলেজ, এই ক'রেই দিন কাটে, তবু সন্ধ্যার সময়টা একবার খোলা মাঠে বা নদীর ধারে একটুখানি বেড়িয়ে না এলে কেমন যেন হাঁপ ধরে যায়, তবে—এমন দিনও গিয়েছে এক সময়—যখন এই সান্ধ্য ভ্রমণের অবসরটুকুও অনাবশ্যক মনে হ'ত, কিন্তু এখন থাক্ গে।

বিষম শীত ও বৃষ্টির দাপটে রুদ্ধ-দ্বার, বদ্ধ-বাতায়ন। ঘরে বসে আমি একা, আজ প্রাণটা ঠিক হাঁপিয়ে না উঠ্‌লেও কেমন যেন উদাস ও নিঝুম হয়ে পড়েছিল।

কাল শনিবার, কলেজে মিটিংয়ে শোনাবার জন্য একটা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনার মাল-মসলা মনে এবং দোয়াত-কলম-কাগজ হাতের কাছে নিয়ে বসেছিলুম। নূতন কেনা ইংরাজী নভেল ক'খানা সামনে টেবিলের ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছিল, কিন্তু কিছুতেই মন লাগ্‌ছিল না।

আমার অবসাদগ্রস্ত ক্লান্ত চিত্ত, আজ যেন সেই মেঘ-মেদুর সন্ধ্যাকাশের মত ঝাপ্সা হয়ে উঠেছিল।

বাড়ীখানাও কি তেমনি নিস্তব্ধ! সমস্ত চুপ চাপ, মনে হচ্ছিল না—সেখানে আর দ্বিতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব আ'ছে।

ইজি চেয়ারে এলিয়ে প'ড়ে, বন্ধ জানালার সার্সী দিয়ে আমি দেখছিলুম, দুর্য্যোগ-বিধুরা প্রকৃতির অশ্রুসজল করুণ রূপ,—নীরবে শুন্‌ছিলুম, উতলা বাতাস ও বর্ষণের মাতামাতির সন্ সন্ ঝুপ ঝাপ শব্দ। মনে পড়্‌ছিল কত দিনের কত কথা!

অতীত দিনের কোন্ দূরদূরান্তরের হারিয়ে যাওয়া সুখ-দুঃখের স্মৃতিগুলি আজ আমার স্তব্ধ অন্তরের নিরালা কোণটীতে ধীরে ধীরে এসে ভিড় কর্‌ছিল। কেন?—জানি না,—

বাহিরের দুর্য্যোগের সঙ্গে মানুষের অন্তরের কোন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে না কি?

শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের কত কথা, কত চিন্তাই মনের ভিতর সেই আকাশ-ছাওয়া বাদলের মত চারিদিক থেকে ঘোর করে ঘনিয়ে আসছিল।

মা'য়ের মমতা-স্নিগ্ধ শান্ত সুখদৃষ্টি, কালধর্ম্মে যা বিস্মৃতির তলদেশে গিয়ে ছায়ার মত অস্পষ্ট হ'য় এসেছিল, আজিকার এই নিভৃত মুহূর্ত্তে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল, মনে পড়্‌ল, পিতার কঠোর শাসন হতে আত্মরক্ষার জন্য যখন মায়ের কাছে ব্যাকুল হয়ে ছুটে যেতুম,—তখন কি আগ্রহে, কি গভীর স্নেহেই তিনি অপরাধী সন্তানকে তাঁর স্নেহতপ্ত কোমল বুকখানিতে টেনে নিতেন!—আঃ! মা গো! ক্ষমাময়ী, মমতাময়ী মা আমার!—এ পাপ-পৃথিবীতে তোমার তুলনা কোথায়!—

তারপর সেই মায়ের জীবনান্তকারী পীড়া ও লাঞ্ছনা, তিনি কতদিন শয্যাশায়িনী ছিলেন, তা ঠিক মনে নাই; তবে তাঁ'র, সেই আরোগ্য-আশাহীন দীর্ঘকালব্যাপী শাপ-

শাসন

আমার রুক্ষ-প্রকৃতি পিতাকে যে কতখানি অসহিষ্ণু ও খিট্‌খিটে করে তুলেছিল, সেটা বেশ গভীরভাবেই মনে পড়ে,—মনে পড়ে মায়ের মৃত্যুর দিনকয়েক মাত্র পূর্ব্বে তিনি একদিন ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে মায়ের সাক্ষাতে স্পষ্টই বলে ফেলেছিলেন—

"নাঃ,—এমন ক'রে আর তো পারা যায় না বাপু!—নিত্যি রোগ নিয়ে একেবারে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ!—এ যে না মরে না তরে—"

মা তখন বাক্‌শক্তি-রহিত, কিন্তু অনুভব-শক্তি তখনো ছিল বোধ হয়। তাই চোখের জলের বড় বড় ফোঁটা, তার' চোখ ছাপিয়ে টস্ টস্ করে বালিসের ওপর গড়িয়ে পড়েছিল।—উঃ!—সে মর্ম্মান্তিক দৃশ্য মনে করলে এখনো যেন বুকের মাঝখানটা মোচড় দিয়ে ওঠে!—

যাক্,—মা'র সে ভোগেরও একদিন শেষ হয়ে গেল, আপদের শান্তি হ'ল! আমার ভাগ্যবতী এয়োরাণী জননীর শেষকৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ করে ফেলে পিতা তা'র অগোছান শূন্য সংসার ভর্ত্তি করে নিলেন অবিলম্বে।—

মনে পড়ে, নবাগতা গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গে পরিচিত করতে পিতা যখন আমার হাত ধরে, অস্বাভাবিক মিষ্ট বচনে বলেছিলেন—"ইনি তোমার নতুন মা রবি!—এ'কে তুমি তোমার মায়ের মতই মনে করো, তা হ'লে—ওকি ছিঃ!—অমন করে কি!—"

আমি তখন জোর করে তা'র হাত ছাড়িয়ে সেই যে উধাও হয়েছিলুম, সারাদিন কেউ খোঁজ করতে পারে নি, গভীর রাত্রে সন্ধান ক'রে আমাকে যখন ঘরে আনা হ'ল, তখন সারা দিনের অনাহারে দারুণ মনঃকষ্টে আমি প্রায় অচৈতন্য।

আমার বয়স তখন কতই?—দশ কি এগারো বছরের বেশী নয়। বিমাতার ভাগ্য ভাল যে আমার আর ভাই-বোন কেউ ছিল না, কিন্তু সতীন-কাঁটা একটাই যথেষ্ট!—তবে একথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে, যে বিমাতা-ঠাকুরাণী প্রথম পদার্পণেই সপত্নী-কণ্টক উচ্ছেদের চেষ্টা করেন নি, বরং বালকের বিদ্রোহ-বিমুখ চিত্তকে—বাধ্য ও বশীভূত করতে যথেষ্ট যত্ন ও আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তা'তে অকৃতকার্য্য হয়ে তিনি পিতা ও প্রতিবাসিনি-দের সাক্ষাতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "মাগো মা! এমন একরোখা ছেলে তো জন্মে দেখি নি! ছেলে মানুষ, খাবি দাবি, হেসে খেলে বেড়াবি,—তা নয়, অষ্টপ্রহর পেঁচার মত মুখ গোমড়া করে আছেন!—পোড়ামুখে ভুলেও কি একবার হাসি আসে না ছাই?—কেন রে বাপু!—মা কি আর কারুর মরে না?"

তার সে অনুযোগ—একটুও মিথ্যা নয়—বাস্তবিক মা গিয়ে পর্য্যন্ত আমি হাস্‌তে বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলুম,—সেই ভুলে যাওয়া হাসি, হারিয়ে যাওয়া আনন্দ, আমি ফিরে পেলুম আবার যৌবনে, জীবন যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে সংসারে প্রতিষ্ঠা এবং সুশিক্ষিতা সুশীলা অনীতাকে জীবন-সঙ্গিনী রূপে লাভ করে।

মাধুর্য্যময়ী অনীতার মধুময় সঙ্গ আমার জীবন ইতি-হাসের কালো খাতাখানায় সোণার রংয়ের তুলি বুলিয়ে বড় উজ্জ্বল বড় সুন্দর করে তুলেছিল,—কিন্তু—এই নশ্বর সংসারে কিছুই স্থায়ী হয় না বুঝি!—তাই আমার দুঃখের জীবনে দুর্লভ মুহূর্ত্তে পাওয়া—সেই মধুর আনন্দ ক্ষণগুলি অতি সংক্ষেপ হয়ে গেল একটী অনাহুত ক্ষুদ্র অতিথির আগমনে—কথাটা যে শুনবে সেই হাসবে, আমাকে মাথা-পাগলা মনে করে নিও না, এ ভুল নয়—খাঁটি সত্য, আমি ঠিক জানি, অনীতাকে আমার অন্তর থেকে অন্তর করে দিয়েছে সেই-ই, নইলে সংসার তো আগেও ছিল, এমনি অলস বাদল বেলা—আগেও তো কতবার গিয়েছে, যখন অনু আমার কাছ-ছাড়া হবার ভয়ে নিতান্ত প্রয়োজনেও ঘরের বাইরে যেতে দেয় নি, এমন কি তার, একান্ত আগ্রহে অসুস্থতার অজুহাতে আমাকে কলেজ কামাই করতে হয়েছে কতবার, আর এখন?—আঃ! কি আশ্চর্য্য! কি ঘোরতর পরিবর্ত্তন! এ পরিবর্ত্তন বুঝি শুধু নারী-জীবনেই সম্ভব!

আমার মনের এই দ্বন্দ্ব অনীতার কাছে কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিলুম না, একদিন উচ্ছ্বসিত আবেগে স্পষ্টই বলে ফেললুম নারী সন্তানের জননী হ'লে তাতে আর পত্নীত্ব থাকে না, তখন সে স্বামীকে যেটুকু ভালবাসে শুধু স্বার্থের খাতিরে, তার সন্তানের পিতা বলে—ইত্যাদি...

শুনে অনীতা খানিক স্তব্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল', তারপর মৃদু মধুর হাসি হেসে বল্‌লে...

বেশ !—তোমার এ ফিলসফি উদ্ভট হ'লেও নূতনতর বটে —কিন্তু আমি বলি খবরদার !—কলেজের লেক্‌চারে যেন এ ফিলসফি কোনদিন ভুলেও প্রকাশ করো না, তা'হলে সকলে তোমাকে পাগল ঠাওরাবে,—বুঝলে ?"

কিন্তু সত্যিই কি এ পাগলামী ?—তা যদি হয় তবে—

আমার জট-পাকানো চিন্তা-সূত্রের গ্রন্থি ছিন্ন করে দিয়ে, স্তব্ধ গৃহে অপর প্রাণীর অস্তিত্ব জানিয়ে, রান্নাঘরের দিক থেকে ছুটে এল, কাঁসার থালা পড়ে যাওয়ার তীব্র ঝন্ ঝন্ শব্দ।

তারপর ক্রমশঃ ঢন-ন-ন-নম্ করে শব্দটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল, ধরিত্রী হতে চিরন্তরে মিলিয়ে-যাওয়া মরণাহত প্রাণের শেষ আর্ত্তনাদের মত।

চকিত হয়ে, জানালা হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে দরজার দিকে চাইলুম—ভেজানো দুয়ার খুলে এল অনীতা, তার কোলে গরম কাপড়ে জড়ানো সেই আমার সুখের জীবনের অভিশাপ।

ঘর তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, আলোর সুইচটা খুলে দিয়ে ধীরে ধীরে আমার খানিক তফাতে রাখা চেয়ারখানায় বসে পড়ে অনীতা যেন আপন মনেই বল্‌লে—

"না !—এ বৃষ্টি আজ আর থাম্‌বে না দেখ ছি,—তেমনি শীতও কি ঝাঁকিয়ে পড়েছে !—একে পশ্চিমে হাড় ভাঙা শীত, তায় আবার দুর্য্যোগ—"

"ঘরখানা ভারি ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে, না ?—চিমনীতে আগুন দিতে বল্‌ব' ?"

"না, দরকার নাই।"

"তবে থাক্" বলেই সে তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে খোকার গায়ের শালখানা ভাল করে জড়িয়ে দিয়ে—পায়ের খসে-পড়া মোজাটা পরিয়ে দিতে লাগল',—তার ননীর পুতুলের ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে,—এ বাড়াবাড়ি নয় কি ?

আমি তখন অপ্রসন্ন বক্র দৃষ্টিতে পুঁটলী পাকানো মাংসপিণ্ডটার দিকে চেয়েছিলুম,—ও যেন ঠাসা ময়দার একটা তাল !—ওতে যেন চেতনার স্পন্দন বা অনুভূতি কিছুই নেই !—অনীতা ওর মধ্যে এমন কি পেয়েছে—যার জন্যে—জগৎসংসার ভুলে—"

"ওমা মা !—এরি মধ্যে ঘুম এসে গেল আমার বাবলু সোনার ?" স্নেহ-গাঢ় কণ্ঠে আধ আধ স্বরে কথাটা বলে,—সেই জড়পিণ্ডের নিদ্রা-নিথর মুখখানা গভীর মমতায় চুম্বন করে অনীতা—আস্তে আস্তে তাকে চাপড়াতে লাগল'। যেন এই আদর করা—আর ঘুম পাড়ানো ছাড়া তা'র জীবনে আর কোনো কাজ,—কোনো কর্ত্তব্যই নেই। হায় ! নারী !—তোমার নারীত্বের কি এই পরিণতি !

আমার মর্ম্মস্থল মথিত ক'রে একটা রুদ্ধ গভীর নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

নিস্তব্ধ কক্ষে, সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুন্‌তে পেয়েই বোধ হয় অনীতা এতক্ষণ পরে তার বাবলু সোণার দিক্ থেকে দৃষ্টি তুলে আমার পানে পরিপূর্ণ ভাবে চাইল, কিন্তু যে দৃষ্টি একদিন আমার অন্তরে আনন্দের সাড়া, পুলকের উচ্ছ্বাস জাগিয়ে মনের সকল ব্যথা গ্লানি এক নিমিষে মুছে দিত, এ তো সে দৃষ্টি নয় !

আমার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও নির্ব্বিকার ভাব দেখে সে মনে মনে কি একটা আন্দাজ ক'রে কোমল স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌ল',—"কালকের জন্যে সে প্রবন্ধটা লিখছিলে বুঝি ? লেখা হয়ে গেল ?"

"না, আরম্ভই করিনি এখনো—"

"ওমা ! তবে এতক্ষণ কাগজ-পত্র নিয়ে চুপচাপ বসে কি কর্‌ছ' ? মনে আস্‌ছে না বুঝি ?—যা দুর্য্যোগ !—"

দুর্য্যোগ কোথায় ? বাহিরে না অন্তরে ? ইচ্ছে হল একবার মুখ ফুটে বলি, কিন্তু প্রবৃত্তি হ'ল না। যে ব্যথার মর্ম্ম বোঝে না, তাকে ব্যথা জানিয়ে লাভ কি ?

আমাকে নীরব দেখে অনীতা আবার বল্‌লে, "এখন তুমি লিখবে নাকি।"

"দেখি"—

"তা হ'লে আমি যাই, খোকনকে শুইয়ে দিই গিয়ে, ঘুমিয়ে একেবারে কাতা হয়ে গেছে।"

ঘুমন্ত খোকনকে সাদরে সন্তর্পণে বুকে তুলে নিয়ে অনীতা উঠে পড়ল'। আমি অসহিষ্ণু হয়ে বল্‌লুম, "আমি এবেলা কিছু খাব না, বুঝলে !"

"কেন ?"

চোখ খুল্‌ল' একেবারে রাত কাবার ক'রে,—কি আশ্চর্য্য!—আজ কি ঘুমে ধরেছিল আমায়!

হন্ত-দন্ত হ'য়ে উঠে বাতিটা নিবিয়ে দিতেই ভোরের স্বচ্ছ স্নিগ্ধ আলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল'।—রাতের দুর্য্যোগ নিঃশেষে কেটে গেছে,—নির্ম্মল প্রভাত!—সুন্দর প্রভাত!

চোরের মত চুপি চুপি শয়ন-কক্ষে এসে দেখি, অপরূপ দৃশ্য!—

খাটের পাশে বেতের মোড়ায় বসে অনীতা, ঘুমের ঘোরে মাথাটা তার বিছানায় ঢলে পড়েছে, একখানি হাত সুপ্তশিশুর অঙ্গে ন্যস্ত, অপর হাতখানি শ্লথ হয়ে কোলের ওপর নেতিয়ে পড়েছে।

বেশ বুঝতে পার্‌লুম, সে অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে বসেছিল আমারই প্রতীক্ষায়—ত আমাকে ডাক্‌তে যায় নি, কেন? অভিমানে?—

কিন্তু অভিমান ক'রে এই দীর্ঘ শীতের রাত ঠায় বসে কাটাবার কি দরকার ছিল!—না, এ শুধু অভিমান নয়, আরো,—আরো কিছু! আমার প্রাণ যার তরে হাহাকার করছে—এ তাই!—

আমি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে অনিমেষ মুগ্ধ নয়নে দেখতে লাগলুম, সেই সুপ্তি-নিথর অদৃষ্টপূর্ব্ব মধুর ছবিখানি!—

সেই সংযমের, ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জল স্নেহময়ী জননী এবং মহীয়সী প্রেয়সীরূপ,—একাধারে দুই ই! এ যেন গঙ্গা-যমুনার বিচিত্র পবিত্র সম্মিলন!—এ রূপ এতদিন দেখতে পাই নি, আমি কি অন্ধ!

ধীরে ধীরে পাশে এসে দাঁড়াতেই অনীতা চম্‌কে জেগে উঠল'। আমার দিকে চেয়ে, সে কুণ্ঠিত চকিত হ'য়ে বল্‌লে—"ওমা!—সকাল হ'য়ে গেছে?—কি ঘুম আমার!—তুমি যে আজ এত ভোরেই উঠেছ?"

আমি অনীতার হাত দুখানি ধরে আদরমাখা গাঢ় কণ্ঠে বললুম,—"এই হাওয়ায় তুমি সারারাত বসে কাটিয়েছ অনু?—কেন?—"

সলজ্জ মধুর হাসি হেসে অনু উত্তর দিল,—

"কি করব', মনে করেছিলুম, তুমি এলে শোবো,—কিন্তু—"

"আমাকে তুমি ডাকোনি কেন?"

"ডাক্‌তে গেছলুম,—কিন্তু ভরসা হ'ল না। যদি বিরক্ত হও,—একে তো আজকাল তুমি এমনই আমার ওপর—"

"না অনু! না,—এমন ভুল আর কক্ষনো হবে না আমার!"

উচ্ছ্বসিত গভীর আবেগে, নিবিড় অনুরাগে অনুকে আমার বুকের ভেতর টেনে নিলুম।

মনের সংশয়-কুয়াসা কেটে গেল এক নিমেষে! তখন নিমেঘ নির্ম্মল পূর্ব্বাকাশে ঝল্‌মলিয়ে ফুটে উঠ্‌ছিল—জ্যোতির্ম্ময় স্বর্ণশতদল,—হাজার হাজার সোণার পাপড়ী মেলে!—

আরব সুলেমানের ভ্রমণ-কথা ৮৫১ খৃষ্টাব্দে লিখিত

(মূল আরব পুঁথির ফরাসী অনুবাদ হইতে)

[শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ]

রাস্-অল্-জমজমা অন্তরীপ ছাড়িয়ে জাহাজগুলো লা'র উপসাগরে এসে পড়ে। লা'র প্রদেশের আজ-কালকার নাম হচ্ছে গুজরাট্। এই সাগরটা এতই গভীর যে কেউ তার পরিমাপ করতে পারে না; আর এত বিস্তীর্ণ যে এর সীমা নির্দ্দেশ করাও কঠিন। অনেক জাহাজী লোকে বলে যে এত উপসাগর আর খাড়ি এর চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে যে তার ঠিক যথাযথ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কখন কখন এ সমূদ্র পার হয়ে আসতে দু'তিন মাস লাগে—আবার যদি সুবাতাস মেলে, আর জাহাজের পাল আর দড়িদড়া ঠিক থাকে তা'হলে মাস খানেকের মধ্যেও পার হওয়া যায়। হাবসীদের দেশ থেকে আরম্ভ করে এ অঞ্চল পর্য্যন্ত যে সকল সমূদ্রে পাড়ি দিতে হয় তার মধ্যে এইটিই হচ্ছে সব চেয়ে ঝোড়ো (বাটিকা-সঙ্কুল)। আফ্রিকার পূর্ব্বধারে লাগা যে জাংসমুদ্র সেটাও এর মধ্যে পড়ে গেছে। এই লা'র সমূদ্রে "অম্বর" জিনিসটা বড় বেশী পাওয়া যায় না। যদিও জাং সমূদ্রের ধারে আর আরব দেশের সির উপকণ্ঠে এ সামগ্রী যথেষ্ট মেলে। এই সির দেশের লোকগুলোকে মাহারা বলে। তারা হচ্ছে খুদা-বিন্ মালিক বিন্ হিমারের বংশধর। অবিশ্যি অন্য আরবদের সঙ্গে যে এরা মিশ খায়নি তা' নয়। এদের মাথায় খুব ঘন চুল হয়, আর তা' তাদের কাঁধে এসে পড়ে। এরা বড় গরীব আর এদের কষ্টেরও অন্ত নেই। সে যা হোক এদের দেশের উটগুলো বড়ই ভাল অন্যান্য জায়গার উটের চেয়ে এ উটের কদর খুব বেশী। এরা সেগুলো রাত্রে চড়ে বেড়ায়। সমুদ্রের ধারে এসে উটগুলো যদি দেখে যে ঢেউয়ে ভেসে এসে কোথাও অম্বর লেগে রয়েছে অমনি তারা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আর আরোহী তখনি নেবে তা' কুড়িয়ে নেয়। সবচেয়ে যা ভাল অম্বর তা' পাওয়া যায় কিন্তু দ্বীপের ভিতর আর জাং সমুদ্রের ধারে। সেগুলো হয় বেশ গোল গোল আর উটপাখীর ডিমের মত বড়—কখন বা তার চেয়ে একটু ছোটও হয়। রং হচ্ছে তার একটু নীলাভ। আওয়াল বলে' এক রকম মাছ আছে সেগুলো এই সব অম্বরের টুক্‌রো গিলে ফেলে; আর যখন সমুদ্রে খুব ঢেউ হয়, তখন সব উগরে দেয়। সে টুকরো এক একটা এত বড় হয় যেন ঠিক পাহাড়ের টুক্‌রো। যে সব মাছ অম্বর গিলে ফেলে তাদের ভিতরে সেই টুক্‌রোগুলো যাদের আটকে যায় তারা মড়ার মত হয়ে ভেসে উঠে। জাং দেশের ও অন্যান্য দেশের লোকগুলো তারাও এইরকম সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে, আর তাদের শাল্‌তির মত নৌকায় চেপে দড়ি বাঁধা বল্লম ছুঁড়ে মারে। তারপর সেই বিশাল মাছের পেটটা চিরে ফেলে আর ভিতর থেকে অম্বর বের করে নেয়। নাড়ীভুঁড়ির ভিতর থেকে যে সব টুকরাগুলো বের করে, সেগুলো বড়ই দুর্গন্ধময়। ইরাক আর পারস্য দেশের যা'রা খুস্‌বু তৈরী করে তারা এগুলোকে বলে নাড। কিন্তু পিঠের কাছে যা' পাওয়া যায় তা' সে মাছের দেহে যতদিনই থাক না কেন খারাপ হয় না, ভালই থাকে। এই লা'র সাগরের ধারেই হচ্ছে সায়মূর সহর, সুবারা, তানা, সিন্দান, কানবায়া আরও নানান স্থান। এগুলো সব পশ্চিম-ভারত আর সিন্ধুদেশের অন্তর্গত। (সুবারা প্রাচীন সূর্পারক বন্দর; তানা বা থানা বোম্বাই সহরের নিকটে অবস্থিত। কানবায়া ক্যাম্বে নামেই বর্ত্তমানে সুপরিচিত ও এই নামে একটা উপসাগর আছে।) লার সাগরের পর হচ্ছে হারকন্দ সমূদ্র (বঙ্গোপসাগর); যে সাত সমূদ্র পার হয়ে চীনে যেতে হয় হারকান্দ হচ্ছে তার তেসরা সমূদ্র। এই সমুদ্র আর লার (গুজরাট্) দেশের মধ্যে অনেকগুলি দ্বীপ আছে। এগুলির আধুনিক নাম লাক্কা দ্বীপ ও মালদ্বীপ। কেউ কেউ বলে যে গুণতিতে এগুলো উনিশ শো'র কম হ'বে না। এই পুঞ্জই হচ্ছে দুই সমুদ্রের সীমানা। আর এগুলি

করেন একটী স্ত্রীলোক। কখন কখন এই সব দ্বীপের ধারে বড় বড় অম্বরের টুক্‌রো এসে পড়ে। সেগুলো দেখতে অনেকটা গাছগাছালীর মত। এসব অম্বর সমুদ্রের মধ্যে গাছের মতই জন্মায়। আর যখন সমুদ্রে খুব ঝড় হয় তখন তলা থেকে উপরে ভেসে উঠে। এগুলো দেখতে কি রকম জান? যাকে 'ব্যাঙের ছাতা' বা 'পস্থাল কোঁড়ের' বলে সেই গুলোর মত। এই স্ত্রী-শাসিত দেশে নারিকেলের চাষই বেশী। দ্বীপগুলো একটা থেকে আর একটা মাত্র তিন চার পারসাং তফাৎ। প্রত্যেক দ্বীপেই লোকের বাস, আর প্রত্যেক দ্বীপেই নারিকেলের চাষ। এদের যা' কিছু ধনদৌলত তা' সবই কড়িতে। এদের রাণী তাঁর রাজকোষে যথেষ্ট পরিমাণ কড়ি সঞ্চয় করে রাখেন। লোকে বলে এদের মত পরিশ্রমী জাত আর নেই। এমনি এরা বাহাদুর যে সেলাই না করেও এক একটা গোটা জামা যায় হাতা-গলা সমেত বুনে ফেল্‌তে পারে। এরা জাহাজ তৈরী করে। আর এদের মধ্যে যারা স্থপতি ও কারুশিল্পী তারাও খুব সুদক্ষ। কড়িগুলো সমুদ্রের উপর ভেসে বেড়ায় আর কোন কিছু দেখ্‌তে পেলেই তারা তাদের টেনে নিয়ে তাতে আট্‌কে থাকে। কড়ি সংগ্রহ কর্‌বার জন্ত এরা নারিকেলের ডাল ভাসিয়ে দেয়, আর কড়ি তাতে আপনি এসে আট্‌কে যায়। দ্বীপ-বাসিরা কড়ি না ব'লে, বলে কবদাজ্। এই দ্বীপমালার শেষ দ্বীপের নাম সীরন্‌ দীব্ (সিংহল)। সেটা একেবারে হারকন্দ সমুদ্রের মধ্যে। অপর সকল দ্বীপের চেয়ে এইটাই বড়ো আর প্রধান। এই দ্বীপপুঞ্জকে লোকে বলে দীবাজাৎ। সীরন্‌ দ্বীপে মুক্তা সংগ্রহ করার জন্তে সমুদ্র থেকে শুক্তি তোলা হয়। এ দ্বীপটীর চারিদিকে সমুদ্রে ঘেরা। দ্বীপের ভিতর রাহুন বলে একটা পাহাড় আছে। আদমকে (প্রথম মানবকে) ফার দউস থেকে তাড়িয়ে এই দ্বীপেই ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এই পাহাড়ের চূড়ায় তাঁহার একটী পায়ের চিহ্ন আঁকা আছে। লোকে বলে আদম সমুদ্রের ভিতরের এক পা' ফেলেছিলেন আর এক পা' ফেলেছিলেন এই পাহাড়ের উপর—তাই একটী বই আর পায়ের চিহ্ন নাই। শুন্‌তে পাওয়া যায় যে এই পায়ের দাগটী লম্বায় ৭০ হাতের কম নহে। এই পাহাড়ের চারিদিকে অনেক মণিরত্ন পাওয়া যায়—চুনি, নীলমণি, টোপ্যাজ সবই মেলে। সীরন্‌ দ্বীপে দু জন রাজা—একজন বড়, একজন ছোট। এখানে কি কি পাওয়া যায় তা' বল্‌ছি। এ্যানোজ, সোণা, মণিমুক্তা আর বড় বড় শাঁক। এ শাঁকগুলো ভেরীর মতো ফুঁ দিয়ে বাজায়। লোকে মূল্যবান জিনিসের মত এ গুলোকে যত্ন করে তুলে রাখে।

সোনা পাতিলার বিল

[বন্দে আলী মিয়া]

রহিমপুরের পাশ দিয়ে সোজা গেছে যে বাঙর চলে',
ওরি নাম নাকি 'সোনা পাতিলা' সে গ্রামবাসী সবে বলে,
কে জানে কাহারা দীঘি কাটাইয়া কবে সে কিসের লাগি'
সোনা আর মেটে পাতিল লইয়া করি' তায় ভাগাভাগি,
দুইপারে এর পুঁতিয়া দিয়াছে হিজল গাছের নীচে
সে দিনের কথা কাহিনী সে আজ—সত্য হয়েচে মিছে।
দুটি গাছ—আজো দুইপারে থাকি' শাখা নাড়ি' কথা কয়,
বাদলের দেয়া ঝঞ্ঝা দাপট রোদের সোহাগ সয়;
এই জল আর কখনো বা কমে কখনো ভরিয়া ওঠে,
লোকে বলে হোথা 'দেউদে' যে আছে শুকাবেনা তাই মোটে.
সাত কোলা টাকা 'দেউদে' হয়েচে—পূজার মাদার গাছ
—এরি পাহারায় আছে নাকি হোথা মস্ত গজার মাছ;
সিঁদুরের ফোঁটা মাথায় তাহার জ্বলিচে সোনার মত,
যায়নিক নাকি ধুইয়া মুছিয়া—বছর গিয়েছে কত।
রাখাল ছেলেরা দুপুর বেলায় মোষের পিঠেতে চড়ি'
লাফাইয়া পড়ি' বিলের বুকেতে ঝাঁপায় প্রহর ভরি'।
কেহ বা ছিটায়ে গায়ে দেয় জল কেহ বা সাঁতার কাটে
'টগে' 'টগে' খেলি ডুব ভেঙে ভেঙে চলে' যায় ভিন্ ঘাটে।
নিত্য দুপুরে এই ক'রে ক'রে সন্ধ্যেবেলায় উঠি'
পাট-খড়ি জ্বেলে তামাক খাইয়া ল'য়ে যায় তারা ছুটি।

পোষের শেষ দিনটীতে যেন বিলের মহোৎসব,
গাঁয়ের লোকেরা বুকে নেমে এর করে মহা কলরব;
টানা দূর হতে বাহতেরা আসে মাছ ধরিবার লাগি'
কারো কাঁধে 'পলো'—কারো হাতে জাল—কেহ আনে শুধু ভাগি।

সারি বেঁধে বেঁধে বিলময় তারা পলো চাপা দিয়া চলে,
মাছ পড়ে যার টেনে তোলে সে-ই—কেহ বা সাথীরে বলে,
দুজনের কেহ হাত দেয় পুরে—কেহ বা শক্ত করি'
নিকটেই তার দাঁড়াইয়া থাকে হাতের পলোটি ধরি'।
জলে হাত দিয়ে হাত্‌ড়ে দেখায় অন্ধকারের কোঠে,
কখনো বা মাছ—কখনো বা ব্যাঙ—কখনো বা সাপ ওঠে।
ঠ্যালা জাল লয়ে কূলে কূলে যারা ক্ষুদে মাছ সুধু ধরে,
দুই পা চলিয়া তুলে' ঝাড়ে জাল যদি কিছু এসে পড়ে।
ছোট ছেলেপুলে—পলো কিবা জাল কিছুই যে আনে নাই,
লোকের খচায় মরেচে যে পুঁটী কুড়ায়ে লইচে তাই।
সোনা পাতিলার ঘোলা জলটুকু যেন এই দিনটায়
তলের কাদায় মাখামাখি করি' কাজল হইয়া যায়।
গাঙচিলগুলা মাথার ওপরে উড়ে' উড়ে' সুধু চলে
ঝুপ করে' ধরে' দাঁড়কাণা মাছ—পাখা ঝাপ্‌টায় জলে।
তাড়া খেয়ে যত মাছগুলা সব জুলার দাউনে এসে,
চুল-বুল করে সারাদিন ধরি'—খল্‌সে বেড়ায় ভেসে।
মাছ-মারা শেষে পলো কাঁধে তুলি' বাহতেরা যায় ঘর,
সারি দিয়ে চলে আল্‌ বেয়ে বেয়ে পলো থাকে কাঁধ' পর।
হালি গাঁথা মাছ কারো পিঠে ঝোলে কারো ছোট কারো বড়ো,
কেউ ফেরে সুধু খালি হাত নিয়ে—কিছুই হয় নি জড়ো।

চড়ুই ভাতির ধূম পড়ে' যায় শেষ পৌষালি দিনে,
আমোদ হয় না মারা-মাছ আর মটরের শাক বিনে।
মাঠের মাঝেতে আখা করা হয় তিনখানা ইট দিয়া,
কেহ আনে নুন—কেহ আনে জল—কেহ আসে খড়ি নিয়া,
সোনা পাতিলার ধরা-মাছ আর চুরি করা শাক, পাতা;
চাল-ডাল কিছু চেয়ে চিন্তিয়ে সুরু হয় সব রাঁধা,
চাষার ছেলেরা রেঁধে বেড়ে খায়—মেয়েরাও কেহ আসে,
হাঁড়িগুলা আর এঁটো কলাপাতা ফেলে যায় পথ-পাশে।

বৈরাগ্য

২

[শ্রীঅপর্ণাচরণ সোম]

নিজের লাভ ছাড়া যে-লোক এ জগতে আর কিছু দেখে না, যে-লোক কর্ম্মবিধি না বুঝিয়া কেবল ফলের প্রত্যাশায় কার্য্য করে, সে নিঃস্বার্থভাবে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া কেবল কর্ত্তব্যের খাতিরে কার্য্য করা অসম্ভব মনে করিবে; কিন্তু "যৎ কর্ম্ম কুরুতে তৎ অভিসম্পদ্যতে"—যে কর্ম্ম করা যায়, তাহার ফল ফলিবেই,—তা' তাহা শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক বা আমরা তাহা দেখিতে পাই বা না পাই, এবং "ক্রিয়তে যাদৃশং কর্ম্ম তাদৃশং প্রতিপদ্যতে"—যেরূপ কর্ম্ম করা যায়, তাহার ফলও সেইরূপ হয়, ইহাই যখন প্রাকৃতিক বিধি, মানুষের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কিছুতেই যখন ইহার ব্যতিক্রম হয় না, তখন কর্ম্মের ফল প্রত্যাশা করা নিরর্থক। বিশেষতঃ "অযুক্তকামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে"—ফল-কামনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে মানব যখন ফলে আবদ্ধ হইয়া জন্ম-মৃত্যু-চক্রে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, তখন ফল-কামনা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করা মূঢ়তা মাত্র। "লোকে আম্রেরই জন্য যেমন আম্রবৃক্ষ রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সদ্গন্ধ তাহারা বিনা চেষ্টাতেই পাইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ত্তব্যের অনুরোধেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফল-কামনা না করিলেও উহা স্বতঃই প্রাপ্ত হইবে, ফলে ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ম্মের স্বভাবগুণেই সেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।" সুতরাং পরের উপকারের জন্যই পরোপকার করা কর্ত্তব্য,—উপকৃতের নিকট হইতে প্রত্যুপকার পাইবার আশায় নয়; দানের জন্যই দান করা কর্ত্তব্য—দানের ফলে আমার স্বর্গাদি লাভ হইবে, এইরূপ আশায় নয়। কিন্তু নিজের জন্য ফল-কামনা না থাকিলেও উপকার বা দান করিয়া উপকৃতের বা দানগ্রহীতার কি ফল হইল, তাহা দেখিবার কামনা হইতে পারে। সেই জন্য কার্য্য—কর্ম্মের অনুরোধেই অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম কার্য্য বা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত, তাহা কেবল পরহিতার্থ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে করিবে। মোট কথা, অধ্যাত্মবিদ্যার্থীকে সকল প্রকার ফল-কামনা-শূন্য (১) হইয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহাই কর্ম্মযোগের প্রথম সোপান (২)। পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগদ্বাসীকে পুনঃ পুনঃ এই উপদেশ করিয়া গিয়াছেন।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

গীতা, ৩।১৯

"অতএব অসক্ত অর্থাৎ ফল-কামনা-শূন্য হইয়া সতত কার্য্য-কর্ম্ম সম্পাদন করিবে অর্থাৎ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে পরম পদ প্রাপ্ত হয়।"

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥—গীতা, ৩.২৫

---

(১) আহার-বিহার, অর্থোপার্জ্জনাদি স্বার্থ কর্ম্মও কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে কর্ম্মযোগের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। "পঞ্চীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যোঃ স্থূলেভ্যঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা"—"পূর্ব্বজন্মের স্বকৃত কর্ম্মফলে আমি এই পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ পাইয়াছি, এবং "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"—এই শরীর ধর্ম্ম-সাধনের অর্থাৎ বিশ্ব-হিতসাধনের সহায়, সুতরাং ইহাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য—এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে আহার-বিহারাদি করিলে এবং নিজের কর্ম্মবশতঃ স্ত্রীপুত্রাদি লাভ করিয়াছি, শিক্ষা ও পালনের জন্য তাহারা ভগবৎ কর্ত্তৃক আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের পালন ও শিক্ষাদান করা আমার কর্ত্তব্য—এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে অর্থোপার্জ্জনাদি করিলে স্বার্থকর্ম্ম পরার্থ কর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। এইভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না।

(২) ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে—ইহার অর্থ এমন নয় যে, কর্ম্মের কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকিবে না। "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে"—উদ্দেশ্য ভিন্ন মূঢ় ব্যক্তিও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। উদ্দেশ্যহীন কর্ম্মই হইতে পারে না। তবে ফল-কামনাশূন্য কর্ম্মের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার নহে, তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে—ঈশ্বরের অভিপ্রায় সাধন, অপরের হিত-সাধন। কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে কর্ম্ম আচরণ, তা তাহার ফল যাহাই হউক না কেন।

"হে ভারত, অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন কর্ম্মে আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করে, বিজ্ঞ ব্যক্তির সেইরূপ কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া লোক-সংগ্রহের অর্থাৎ বিশ্বের হিতসাধন জন্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।" কারণ তিনি বিশ্বনাথের প্রেম বশতঃ বিশ্বকে ভালবাসেন, সে-জন্য তিনি বিশ্বের হিত সাধন জন্য কার্য্য করিতে আত্ম-নিয়োগ না করিয়া পারেন না।

ভালবাসা মানব-হৃদয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৃত্তি। এই ভালবাসাই যখন ঊর্দ্ধ জগতে কার্য্য করে, তখন তাহা প্রেম নামে অভিহিত হয়। সেই জন্য অধ্যাত্ম-বিদ্যার্থীকে তাহার হৃদয়ের ভালবাসা বৃত্তিটীকে বিকসিত করিয়া সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সম্প্রসারিত করিতে হইবে—কেবল নিজের মাতা পিতা, স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। কিন্তু ভালবাসা বৈরাগ্য-সাধনের অন্তরায় ও বন্ধের হেতু—এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে হৃদয়কে স্নেহ-ভালবাসা-শূন্য করিতে চায়। কিন্তু জলে কৃমি আছে বলিয়া জলপান ত্যাগ করা, বায়ুতে ব্যাধি-বীজাণু আছে বলিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করা, কর্ম্ম বন্ধের কারণ বলিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করা আর ভালবাসা বৈরাগ্য-সাধনের অন্তরায় ও বন্ধের হেতু বলিয়া হৃদয়কে শুষ্ক করা সমান কথা। জল ও বায়ু যদি কৃমি ও বীজাণু-দুষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই দোষের স্খালন করিতে হইবে, নতুবা আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হইয়া জল ও বায়ুর অভাবে আত্মহত্যা করা বিজ্ঞের কার্য্য নহে। কর্ম্ম যদি বন্ধের কারণ হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম সুকৌশলে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে, নতুবা বন্ধনের ভয়ে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজকে জড় পদার্থে পরিণত করা সমীচীন নহে। সেইরূপ ভালবাসা যদি বৈরাগ্যের অন্তরায় হয়, তাহা হইলে ভালবাসাটীরও পবিত্রতা সাধন করিতে হইবে, নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে হইবে, নতুবা হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া বৈরাগ্য অর্জ্জন করা, এক গুণ অর্জ্জনের জন্য অন্য গুণটীকে বিনষ্ট করা সাধনা নহে। দাদূ-শিষ্য রজব বলিয়াছেন :—

দয়া লাগি নরপণ বধৈ ঘাতক ধরম ন কোয়।
ভাই কূঁ হতি ভাই কূঁ পোষে সমঝে বহু দুখ হোয়॥
বচ্চু মরি বচ্চ খিলাবৈ জৈসে বাঘ বিড়ালী।
ভাব মারি ভাবকূঁ সাধৈ সাধন কী বলিহারী॥

"দয়া জিনিসটী খুব ভাল, কিন্তু তাহা পোষণ করিতে যাইয়া যদি কেহ পৌরুষকে নষ্ট করে, তাহা তো দয়া হইল না, তাহা হত্যা করা হইল। এ যেন ভাইকে মারিয়া ভাইকে পোষণ করা। ইহা বুঝিলে আমরা দুঃখ অনুভব করিতাম। বাঘিনী, বিড়ালী তাহাদের দুই একটা বাচ্চাকে শক্তিশালী করিবার জন্য অন্য বাচ্চাগুলিকে মারিয়া তাহাদিগকে খাওয়ায়; তেমনি মানুষের কতকগুলি হৃদয়-ভাবকে হত্যা করিয়া অন্য কোন বিশেষ হৃদয়-ভাবকে বিকসিত করার যে সাধনা, সেই সাধনাকে বলিহারী যাই।" যদিও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:

"যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহ......তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা" (গীতা ২।৫৮)—

যে সর্ব্বতোভাবে স্নেহ-শূন্য, সে স্থিতপ্রজ্ঞ, কিন্তু ইহার এমন অর্থ নয় যে, হৃদয়কে স্নেহ-ভালবাসাশূন্য করিতে হইবে। "আমার" এই অভিমানে দেহ ও স্ত্রী পুত্রাদিতে যে মমতা, যে আকর্ষণ, তাহাই এ স্থলে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। নতুবা ভালবাসার জন্য যে ভালবাসা, তাহা কখনও দূষণীয় নহে। উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন :

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" (বৃঃ আঃ, ২।৪।৫)—

পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় পতি প্রিয় হয়। আমরা যখন কাহাকেও ভালবাসি, তখন আমাদের অন্তরাত্মা তাহার অন্তরাত্মাকেই ভালবাসে। এক জনের প্রতি অন্য এক জনের আত্মার যে ভালবাসা, তাহা স্বর্গীয় ও সনাতন; আমরা ইচ্ছা করিলেও ইহার পরিবর্ত্তন করিতে পারি না। এই ভালবাসা বৈরাগ্যের অন্তরায় বা বন্ধের কারণ নয়। কিন্তু সেই ভালবাসা যখন প্রিয়জনের আত্মার জন্য না হইয়া তাহার দেহের জন্য হয়, যখন তাহা স্বার্থপূর্ণ কামনা-মিশ্রিত হয়, তখনই তাহা বৈরাগ্যের অন্তরায় ও বন্ধের হেতু হয়।

অতএব আমাদিগকে সকলকেই ভালবাসিতে হইবে এবং নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে হইবে। আমাদের অন্তর্নিহিত প্রেম ভাবটীকে সুব্যক্ত করিয়া সমগ্র বিশ্ব মধ্যে সম্প্রসারিত করিতে হইবে। কারণ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। ব্রহ্ম যে কেবল সৎস্বরূপ, কেবল চিৎস্বরূপ, তাহা নহে,

তিনি আনন্দস্বরূপও বটেন। সৎ, চিৎ ও আনন্দ একই অখণ্ড পদার্থ। প্রেম এই আনন্দের নামান্তর বা ভাবান্তর; জীব সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অংশ। সে নিজেও অস্ফুট সচ্চিদানন্দ। সাধনার চরম যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তাহাতে সিদ্ধ হইতে হইলে, কেবল সদ্‌ভাবের বা কেবল চিদ্‌ভাবের বিকাশ করিলে হইবে না,—আনন্দ-ভাব বা প্রেমেরও বিকাশ করিতে হইবে। কেবল তাহার ধ্যান-ধারণা করিলে হইবে না, কেবল ঈশ্বরের কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে হইবে না, তাঁহাকে উপভোগ করিতে হইবে। অন্তরের অন্তরে ব্রহ্মরূপে, অনন্ত বহিঃপ্রকৃতিতে পরমাত্মরূপে এবং অনন্তলীলা বা ইতিহাসের মধ্যে তাঁহাকে ভগবদ্‌রূপে উপভোগ করিতে হইবে। তিনি প্রেমস্বরূপ, তাঁহার প্রেমের কণা লাভ করিয়া জগৎ আনন্দে অধীর। তাঁহার সেই প্রেম উপভোগ করিতে হইবে। সেই প্রেমের স্বাদ লইতে হইবে, সেই প্রেমে মত্ত হইয়া তাহা জগৎকে বিলাইতে হইবে, তিনি বিশ্বের সহিত অনুস্যূত; সুতরাং বিশ্বের সহিত মিশিয়া বিশ্বের কার্য্য করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই সাধনা।

যোগ-বিভূতি

যোগ-বিভূতি সর্ব্বসমেত আঠার প্রকার। এই আঠার প্রকার বিভূতির মধ্যে আটটী শ্রীভগবানের আশ্রিত, আর দশটী গুণের কার্য্য।

অণিমালঘিমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ।
প্রাকাম্যঞ্চ তথেশিত্বং বশিত্বঞ্চ তথাপরং।
যত্র কামাবসায়িত্বং গুণানেতানথৈশ্বরান্॥

যোগবল্লভ, ৯ অধ্যায়।

"যোগিদেহস্য শিলাদাবপি প্রবেশপ্রযোজকোঽণুত্বলক্ষণগুণোঽণিমা।" যোগী তাঁহার দেহকে শিলা প্রভৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য অণুর মত ক্ষুদ্র করিতে পারেন। এই শক্তির নাম অণিমা।

"সর্ব্বব্যাপনলক্ষণো মহিমা।" যোগী তাঁহার দেহকে এত বড় করিয়া প্রসারিত করিতে পারেন যে, তিনি সর্ব্বব্যাপী হইতে পারেন। এই শক্তির নাম মহিমা।

"যেন সূর্য্যমরীচীরবলম্ব্য দেহস্য সূর্য্যলোকপ্রাপ্তির্ভবতি স লঘুত্বলক্ষণগুণো লঘিমা।" সূর্য্যকিরণ ধরিয়া সূর্য্যলোকে যাইবার জন্য স্বীয় দেহকে লঘু করিবার যে শক্তি, তাহার নাম লঘিমা।

"প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।" সকল প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই সেই ইন্দ্রিয়ের দেবতারূপ হইয়া সম্বন্ধ স্থাপনের যে ক্ষমতা তাহার নাম প্রাপ্তি। এই শক্তি পাইলে যোগী ইন্দ্রিয়ের অভীষ্ট বিষয় ইচ্ছানুসারে পাইয়া থাকেন।

"প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু।" শাস্ত্রে পরলোক আদি সম্বন্ধে যে সকল শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সকলে ও দৃষ্ট অর্থাৎ দর্শনযোগ্য ভূবিবরাদি সমূহের ভিতর অবস্থিত ভোগ দর্শনের যে ক্ষমতা তাহার নাম প্রাকাম্য। এই সিদ্ধি লাভ করিলে যোগীর ইচ্ছার কোথায়ও ব্যাঘাত হয় না।

"শক্তিপ্রেরণমীশিতা।" মায়া ও তাহার অংশভূত শক্তিসমূহকে প্রেরণ করিবার যে ক্ষমতা, তাহার নাম ঈশিতা। এই সিদ্ধি লাভ করিলে সাধক জীব সকলের মধ্যে নিজ শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন।

"গুণেষসঙ্গো বশিতা।" গুণে অর্থাৎ বিষয়ভোগে যে অনাসক্তি তাহার নাম বশিতা।

"যৎকামস্তদবস্যতি।" যে যে সুখ কামনা করা যাইবে তাহার চরম আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই শক্তির নাম কামাবসায়িতা।

অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা, এই অষ্ট সিদ্ধি শ্রীভগবানের স্বাভাবিকী।

অনূর্ম্মিমত্ব অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসাদি ছয় প্রকার তরঙ্গবিহীনতা, দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, মনোজব অর্থাৎ মনের বেগে দেহের গতি, কামরূপ অর্থাৎ যে রূপ ধারণের ইচ্ছা হইবে, সেইরূপ ধারণের শক্তি, পরকায়প্রবেশ, স্বেচ্ছামৃত্যু, দেবতা ও অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়াকরণ, যথাসঙ্কল্প-সংসিদ্ধি, অপ্রতিহত আজ্ঞা ও অপ্রতিহত গতি, এই দশটী সিদ্ধি গুণের কার্য্য।

ক্ষুদ্র সিদ্ধি পাঁচ প্রকার:—ত্রিকালজ্ঞতা, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত না হইবার শক্তি, পরের চিত্ত বুঝিবার শক্তি, সূর্য্যাগ্নি প্রভৃতির স্তম্ভন করিবার শক্তি ও তৎকর্ত্তৃক অপরাজেয়ত্ব।

এই সকল বিভূতি ধারণা দ্বারাই লাভ করা যায়। কোন্ ধারণায় কি সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত

(১১ অধ্যায়) ও পাতঞ্জল-দর্শনের বিভূতিপাদে বর্ণিত আছে। কিন্তু সে সকল উপযুক্ত সদ্গুরুর অধীনে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়, নতুবা শিক্ষার্থী বিষম বিপদ্গ্রস্ত হয়। যেমন, কেহ সূক্ষ্ম জগৎ দর্শন করিবার শক্তিলাভ করিয়াছে। ক্রম-বিকাশের প্রাকৃতিক বিধি অনুসারে অনেকেই স্বভাবতঃ এই শক্তি লাভ করিয়া থাকে। এই রূপ এক ব্যক্তি যদি গুরুর অধীনে না থাকিয়া সূক্ষ্ম জগতের তথ্য সকল শিক্ষা করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে সে আত্মপ্রবঞ্চিত ও বিপদ্গ্রস্ত হয়। কারণ সে সূক্ষ্ম জগৎ সম্বন্ধে কিছুই এখনও জানে না। এই স্থূল জগতে ক্ষুদ্র শিশু যেমন, সূক্ষ্ম জগতে সে-ও তেমন। মাতা নিকটে না থাকিলে ক্ষুদ্র শিশু যেমন গৃহ-মধ্যস্থ জলন্ত প্রদীপ দেখিয়া তাহা ধরিবার জন্য ধাবমান হয় ও তাহাতে হাত দিয়া বিপদ্গ্রস্ত হয়, সূক্ষ্ম জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীর অবস্থাও সেইরূপ হয়। সে জীবিত মানবের সূক্ষ্মদেহ ও "মৃত" মানবের সূক্ষ্মদেহের পার্থক্য বা তাহার নিজের দ্বারা ও তাহার বন্ধু দ্বারা গঠিত তাহার চিন্তা-মূর্ত্তির পার্থক্য জানে না। এই সকল বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষকবিহীন ও অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীর আত্ম-প্রবঞ্চনা ভিন্ন অন্য কিছু লাভ হয় না। কিন্তু এই স্থূল জগতে মাতা বা অন্য কোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিকটে থাকিয়া ক্ষুদ্র শিশুকে যেমন তাহার নানাপ্রকার ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করে ও নানাপ্রকার শিক্ষা দেয়, সূক্ষ্ম জগতেও সদ্গুরু বা তাঁহার নির্দেশে তাঁহার কোন অভিজ্ঞ শিষ্য অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীর নিকটে থাকিয়া তাহার নানাপ্রকার ভ্রান্তি সংশোধন করেন ও হাতে কলমে নানাপ্রকার বিষয় সূক্ষ্মভাবে শিক্ষা দেন।

আসল কথা হইতেছে যে, সূক্ষ্ম জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান অনুশীলনের, বিশেষতঃ প্রাথমিক অবস্থায় নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-বিভ্রম হইবার সর্ব্বদা খুবই সম্ভাবনা আছে। এই স্থূল জগৎ, যাহার সহিত আমরা খুবই পরিচিত, এখানেই কি ইন্দ্রিয়-বিভ্রম হয় না? অজীর্ণতা বা পিত্ত-বিকৃতি-জনিত রোগে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার দৃষ্টি-বিভ্রম হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানেন। কামলরোগী সমস্ত বস্তুই হরিদ্রাবর্ণ দেখিয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত বস্তুই কি হরিদ্রা-বর্ণ? আমরা প্রাতঃকালে সূর্য্যকে উদিত ও সন্ধ্যাকালে অস্তমিত হইতে দেখি। কিন্তু সূর্য্যের কি কখনও উদয় বা অস্ত আছে? আমরা জানি

নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা সতঃ।
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ॥

"সূর্য্য, যাহা আকাশে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে, তাহার উদয় বা অস্ত নাই, আমরা যাহাকে সূর্য্যের উদয় বা অস্ত বলি, তাহা আমাদের সূর্য্যের দর্শন বা অদর্শনবশতঃই হইয়া থাকে।" এই সকল উদাহরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের পরিচিত এই স্থূল জগতেও আমাদের ইন্দ্রিয় বিভ্রম ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা অ-যুক্তিবাদী, তাঁহারা বলেন যে, যাহা তাঁহারা দেখিতে পান না, তাহাতে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, কিন্তু যদি তাঁহারা দেখিতে পান, তাহা হইলে তাঁহারা বিশ্বাস করেন। কেহ কেহ আরও অগ্রসর হইয়া বলেন যে, যদি তাঁহারা কোন বস্তু স্পর্শ করিতে পারেন, তবেই তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করেন। একটা সামান্য উদাহরণ হইতে তাঁহাদের এই অপসিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইবে। একটী পাত্রে গরম জল, আর একটী পাত্রে বরফের মত ঠাণ্ডা জল ও তৃতীয় একটী পাত্রে নাতি-শীতোষ্ণ জল রাখিয়া, যদি একটী হাত গরম জলে ও অন্য হাত ঠাণ্ডা জলে কয়েক মিনিট ডুবাইয়া রাখা হয় এবং তারপর ঐ হাত দুইটী তুলিয়া ঐ নাতিশীতোষ্ণ জলে ডুবান হয়, তাহা হইলে যে হাতটী পূর্ব্বে গরম জলে ডুবান হইয়াছিল, সেই হাতে এই নাতিশীতোষ্ণ জল খুব ঠাণ্ডা বোধ হইবে, আর যে হাত পূর্ব্বে ঠাণ্ডা জলে ডুবান হইয়াছিল, সেই হাতে এই জল খুব গরম বোধ হইবে। একই জল অবস্থাবিশেষে "ঠাণ্ডা" বা "গরম" বোধ হইবে, যদিও "উষ্ণতামান" যন্ত্র বলিবে, তাপ একই রহিয়াছে।

সুতরাং এই সকল উদাহরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি অনেক সময় প্রকৃত তথ্য নিরূপণে বিভ্রান্ত হয়, তাহাদের অনুভূতি সব সময় অভ্রান্ত হয় না। জ্ঞান, যুক্তি-তর্ক ও অনুশীলন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের ভ্রান্তি সংশোধিত হয়। এই স্থূল জগতে স্থূল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে যে কথা, সূক্ষ্ম জগতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও সেই কথা।

যিনি বিভূতি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে প্রথমে ইহাদের বিকাশের জন্য অগ্রে নিজেকে প্রস্তুত করিতে

হইবে। কিন্তু বিভূতি লাভ হইলেও সকল বিষয়ে অভ্রান্ত জ্ঞান লাভ করিতে অনেক সময় ও শক্তির আবশ্যক হইবে। ইতোমধ্যে আমাদের যে শক্তিটুকু আছে, তাহা সদ্‌-গুরুর কার্য্যে, বিশ্ব-মানবের সেবায় সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য ও যত দিন না সদ্‌-গুরু বিভূতি লাভের উপযুক্ত দেখেন তত দিন আমাদের তাহা লাভের কোন আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন ; "প্রথমে তোমরা ধর্ম্মের ও ঈশ্বরের রাজ্য অন্বেষণ কর, তাহা হইলে সকল বস্তুই তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে।"

বিভূতি সকল পাইবার জন্য কেন যে কামনা করা উচিত নয়, সদ্‌-গুরু এ স্থলে তাহার আরও একটা কারণ বলিতেছেন। সূক্ষ্ম জগতে অনেক বিভিন্ন শ্রেণীর দেব-যোনি বাস করে।

বিদ্যাধরোঽপ্সরো যক্ষরক্ষোগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোঽমী দেবযোনয়ঃ।
—অমরসিংহ।

অনেক দেবযোনি বড় ধূর্ত্তঃ ফন্দীবাজ ও আমোদ-প্রিয় অথচ ক্ষুদ্র প্রাণী। তাহারা যাহা বলে, যাহা আদেশ করে, তাহা যদি তাহারা কোন একজন মানুষের দ্বারা করাইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা খুব আমোদ পায়। তাহারা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, চিত্তরঞ্জন দাশ, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, জুলিয়াস সিজার প্রভৃতি যে সকল মহৎ ব্যক্তির নাম জানে, নিজদিগকে সেই সকল মহৎ ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেয় ও তাহারা যাহা ইঙ্গিত করে সেই অনুসারে তাহা যদি এক জন মানুষ—যে তাহাদের অপেক্ষা ক্রম-বিকাশে অধিক উন্নত—কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহারা বড়ই আমোদ উপভোগ করে। আবার অনেক সময় অনেক "মৃত" ব্যক্তি ভুবর্লোকে থাকিয়া পৃথিবীতে তাহাদের আত্মীয়-গণের সহিত আদান প্রদানের জন্য ও পরামর্শাদি দিবার ব্যবস্থা করে। সূক্ষ্ম জগতে অনভিজ্ঞ সাধক ঐ সকল দেবযোনি বা "মৃত" ব্যক্তির বাণীকে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের বাণী মনে করিয়া ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া পড়ে।

আবার অনেক অনভিজ্ঞ সাধক এই সকল বিভূতির দুই একটা লাভ করিয়াই মনে করে যে, "যোগ-সিদ্ধ হইয়াছে, সে "সবজান্তা" হইয়াছে, তাহার আর ভুল হইতে পারে না। তাহার অহঙ্কার হয়। এই অহঙ্কারবশে কার্য্য করিয়া সে-ও বিপথগামী হইয়া পড়ে।

এই সকল অনর্থ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে এই সকল বিভূতি জোর করিয়া অধিগত করিবার জন্য যে শক্তি ও সময় লাগে, সেই শক্তি ও সময়ের অপচয় না করিয়া তাহা জন-সেবায় ব্যয়িত করাই কর্ত্তব্য। সকল প্রকার স্বার্থ-কামনা হইতে মুক্ত হইয়া আমাদিগকে "সর্ব্বভূত-হিতে রত" হইতে হইবে, ইহা আমাদের প্রণিধান করিবার বিষয়। সদ্‌গুরু যদি দেখেন যে, আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে শক্তিলাভ করিয়াছি, তাহা সমস্তই লোকের হিতের জন্য প্রয়োগ করিতেছি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে আরও শক্তি দিবেন, কারণ তাহাও আমরা নিঃস্বার্থভাবে ব্যবহার করিব। যদি আমরা তাহা করি, তাহা হইলেই তিনি আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। যদি কেহ অকপটভাবে বলিতে পারেন যে, তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি জন-সেবায় বিনিয়োগ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চতরূপেই জানিবেন যে, তিনি আবার নূতন শক্তি সদ্‌গুরুর নিকট হইতে পাইবেন। কিন্তু এরূপ বলিতে পারেন, এমন লোক খুবই বিরল। প্রত্যেকের এই অবস্থা লাভ করিবার জন্য তাহার সমস্ত শক্তি জন-সেবায় নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সুতরাং ধ্যান-কালে নিজের নিকট শ্রীগুরুদেবকে আত্ম-প্রকাশিত হইবার জন্য আবেদন না করিয়া, প্রত্যেকে স্ব স্ব গ্রামে বা সহরে মানবের কল্যাণের জন্য কি সৎ কার্য্য করিতে পারেন, তাহা স্থির করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই সদ্‌গুরু তাহাকে সাহায্য করিবেন, অনুপ্রাণিত করিবেন ও তাহার প্রতি শক্তি সঞ্চারিত করিবেন।

যখন মানুষ ক্রম-বিকাশ-মার্গের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে থাকে, তখন বিভূতিগুলি স্বতই তাহার নিকট আগমন করে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্ভূত জয়ঃ।
ততোঽণিমাদি প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ।
৩।৪৪-৪৫

অর্থাৎ ভূতগণের স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব এই কয়েটীর উপর সংযম করিলে ভূত জয় হয়; ইহা হইতেই অণিমা ইত্যাদি সিদ্ধির আবির্ভাব হয়, কায়সম্পৎ লাভ হয় ও সমুদায় শারীরিক ধর্ম্মের অনভিঘাত হয়। এই বিভূতিলাভ সম্বন্ধে যোগ-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ একালের এক জন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন; "Self-reverence, self-knowledge, self-control—these three alone lead life to sovereign power, yet not for power (power of herself would come uncalled for)" অর্থাৎ আত্ম-সম্মান, আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম-সংযম,—এই তিনটী দ্বারা মহীয়সী শক্তি লাভ করা যায়, কিন্তু এই শক্তি-লাভের জন্য সাধনা নয়, প্রকৃতির শক্তি আপনা হইতেই আসিবে। সুতরাং এই সকল শক্তি প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হওয়া কর্ত্তব্য নয়।

লোকে প্রায়ই বলে: "এই সকল অলৌকিক শক্তিলাভ করিলে মানুষ অনেক হিতকর কাজ করিতে পারে. আমি জন-হিতকর কাজ করিতে ইচ্ছুক, সে-জন্য এই সকল শক্তি আমি পাইতে চাই।" ইহা কিছু দোষের কথা নয় বটে; কিন্তু সেই সকল শক্তি পাইবার সম্বন্ধে সদ্-গুরু এস্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য—যতদিন না সেই সকল শক্তি স্বভাবতঃ আইসে, যতদিন না ইহাদিগকে নিরাপদে লাভ করিবার প্রণালী সদ্ গুরু বলিয়া দেন, ততদিন ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। সাধক যখন প্রস্তুত হইবে, তখন সদ্-গুরুর সে সকল লাভ করিবার প্রণালী নিশ্চিত বলিয়া দিবেন। সদ্-গুরুর সকল শিষ্যই ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সকল শক্তি লাভ করিবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে—পরহিতার্থে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ। যিনি আত্মোন্নতির চিন্তা না করিয়া তাহা করিতেছেন, তিনি নূতন শক্তি পাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর কর্ম্মপ্রেরণা

[শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

মহাপুরুষদের জীবন 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ,' —এই ঋষিবাক্য শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবনে যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়া গিয়াছে, তার অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ তাঁহার শিষ্য-শিষ্যাগণ-পরিচালিত বিশ্বহিতকর বিভিন্ন কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান। এ বিষয়ে কিছু লিখিয়া প্রকুল্ল করিবার আবশ্যকতা মোটেই নাই. তবে কি করিয়া এই কর্ম্ম-মহীরুহের বীজ শিষ্য-শিষ্যাদের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত করিয়া গিয়াছিলেন সে বিষয়েই সামান্য আলোচনা করা হইবে।

শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ তৎকৃত "গুরুমহারাজ-স্তবে" বর্ণনা করিয়াছেন,—"লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোক-কল্যাণ মার্গম্'.........'কর্ম্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টম্'—যিনি লোকাতীত হইয়াও লোকহিতব্রতের পথ ত্যাগ করেন নাই,......যাঁর দেহ অদ্ভুত কর্ম্মপ্রচেষ্টাতে পরিপূর্ণ।—এই দুইটি উক্তি দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের অত্যদ্ভুত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এখানে সহজেই একটা প্রশ্ন উঠে যে, যিনি জীবনের অধিকাংশই ভাবসমাধিতে বিভোর থাকিতেন তাঁহাদ্বারা কর্ম্মপ্রচেষ্টা কিরূপে সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের উত্তর এইটুকু ভাবিলেই পাওয়া যায় যে—মহাপুরুষেরা নিজ হাতে সব কাজ করেন না, তাঁহারা আত্মশক্তি দ্বারা শিষ্য-শিষ্যাদের ভিতর এমন প্রেরণা সঞ্চারিত করেন যে, তৎপ্রভাবে তাঁহারা অনন্ত-শক্তিশালী হইয়া তাঁহাদেরই যন্ত্ররূপে বিরাট্ ও সুমহৎ কর্ম্ম অনায়াসে সাধন করিয়া থাকেন। একথা সর্ব্বজন-বিদিত যে, শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের অতীব প্রিয়শিষ্য ছিলেন। তিনি যখন নির্ব্বিকল্প সমাধির জন্য ব্যাকুল হইয়া ঠাকুরের অনুগ্রহে তাহা লাভ

করিয়াছিলেন, তখন ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"যা, চাবি-কাঠিটি আমার হাতে রইল,—এখন জগতে ঢের কাজ কর্ত্তে হবে। কাজ হয়ে গেলে ফের চাবি খুলে দিব।" ঐ দিন স্বামিজী ভাব-সমাধির অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসাস্বাদ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ মন মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতেছিল, কর্ম্ম-সাধনের জন্য ঠাকুরের ইঙ্গিতটি তত গভীরভাবে ভাবিবার অবসর সে দিন তিনি পান নাই। স্বামিজী বাড়ী আসিলেন, সাংসারিক কাজকর্ম্মে মহা উদাসীন, পারিবারিক অভাব মোচনের জন্য উপায়ের চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কোন ফল হইতেছিল না, মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং ঠাকুরের কাছে রাত্রি যাপনও করিতেন। ঐ সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ও শিষ্য-শিষ্যাগণের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছিল। ঠাকুরের উচ্চাবস্থার ভাবসমাধি-লীলা তখন বিশেষভাবে চলিতেছিল। এই সমস্তের ভিতরেও ঠাকুর তাঁর 'জগদ্ধিতায়' কর্ম্মের ভার অর্পণ করিবার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পুরুষ ও নারী উভয়ের উন্নতির জন্যই ব্যাকুল! তাই এক শুভদিনে পবিত্র দক্ষিণেশ্বরের কোনও নিভৃত স্থানে নিজের মনোনীত দুই জনকে কাছে ডাকিলেন। একজন তাঁর শিষ্যা শ্রীগৌরী মা, অপর ব্যক্তি তাঁর শিষ্য নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর উভয়কেই অতীব ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিলেন,—"জগতের জন্য তোমাদের কাজ করিতে হইবে, ঈশ্বর-আরাধন এবং পরার্থে কর্ম্ম-সাধন এ দুই করিতে হইবে—" এই বলিয়া দুই জনের হাতে দুইটি ফুল প্রাণভরা আশীর্ব্বাদের সহিত সমর্পণ করিলেন এবং আবার বলিলেন—"গৌরী মেয়েদের কাজ করিবে আর নরেন ছেলেদের!" উভয়েই সশ্রদ্ধচিত্তে এবং অবনত-মস্তকে এই গুরু-আজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। এক অপার্থিব আনন্দের লহর উপস্থিত সকলকেই কিছু কালের জন্য মৌন করিয়া রাখিল। পরে গৌরী-মা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমায় কি কর্ত্তে হবে বলে দাও?"

ঠাকুর বলিলেন—"তোমায় মেয়েদের শিক্ষার ভার নিতে হবে।"

গৌরীমা—"বেশ আমায় কয়েকটি মেয়ে দাও, আমি তাদের নিয়ে হিমাচলে চলে যাই।"

ঠাকুর বলিলেন, "সে কি গো! তাহ'লে আর হ'ল কি? এখানে এই লোক-সমাজের ভিতর থেকেই কাজ কত্তে হবে, তবে ত হাজার-হাজার, লাখ-লাখ মেয়েদের ভেতর আদর্শ শিক্ষা প্রসারিত হয়ে দেশের মহা কল্যাণ হবে! গুটিকতক মেয়েকে মুক্তি দিয়ে কি লাভ হবে?" গৌরীমা—'তবে তোমার ইচ্ছাই হউক পূরণ!'—বলিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উভয়কে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ঠাকুরের এই কর্ম্ম-প্রেরণার অদ্ভুত রহস্য এ দুজন ছাড়া অপর কেহ বড় জানিতেন না। ইঁহারাও বিশেষ ক'রে অপরকে জানিতে দেন নাই; কাজেই এ বিষয়ে মুখ্য সাক্ষী একমাত্র উঁহারাই দুজন, আর সাক্ষী উঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান। গৌরীমা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই এ বিষয়ে আমূল বৃত্তান্ত সহজেই জানিতে পারিবেন। শ্রীগৌরীমা আরও এক দিন কর্ম্ম-প্রেরণাপূর্ণ অহেতুকী আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, সেদিনকার ঘটনার সাক্ষী ছিলেন স্বয়ং শ্রীমা সারদামণি দেবী। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা যে নহবৎ গৃহে থাকিতেন, সেই গৃহের অদূরে বকুলতলায় একদিন ভোর বেলায় গৌরীমা মৃদুস্বরে কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে ফুল কুড়াইতেছিলেন, আর শ্রীমা ঘরে থাকিয়া ঘুলঘুলির ভিতর দিয়া ফুল কুড়ানো দেখিতেছিলেন, এবং আনন্দে কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন। এমন সময় ঝাউতলা হইতে গাড়ু হাতে করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর গৌরীমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং সহাস্যে গাড়ুস্থিত জল মাটিতে ঢালিতে ঢালিতে বলিতে লাগিলেন—'মা! আমি জল ঢাল্‌ছি তুই কাদা চটকা, তা হলেই সব হয়ে যাবে।' এই কথা কয়টি বলিয়া ঠাকুর খুব খানিকটা হাসিলেন ও পরে হাত মুখ ধুইতে চলিয়া গেলেন। গৌরীমা ঠাকুরের কথার রহস্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিলেন, কর্ম্মগ্রহণের জন্য আশঙ্কার যে ক্ষীণ রেখা তাঁহার হৃদয়ে মাঝে মাঝে ভাসিতেছিল, ঠাকুর স্বয়ংই তাহা আজ অপসৃত করিয়া দিলেন। শ্রদ্ধায় ও উৎসাহে তাঁহার প্রাণটা ভরিয়া উঠিল। মা ঠাকুরাণীও ঠাকুরের এই খেলা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং গৌরীমা নিকটে গেলে প্রাণ খুলিয়া ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কর্ম্ম-প্রেরণামূলক আশীর্ব্বাদ লাভের পরেও বহুবৎসর অতিবাহিত হইল, তখনও কর্ম্মানুষ্ঠানের কোনই চেষ্টা হয় নাই। ক্রমে ঠাকুর দেহ রাখিলেন। অনেকেই আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। ত্যাগী শিষ্যদের ভিতর অনেকে গৃহে ফিরিয়া যাইতেই মনস্থ করিলেন; স্বামিজীকেও অনেকে ঘরে ফিরিবার জন্ম অনুরোধ জানাইলেন; কিন্তু তাঁর প্রাণ মহৎ উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ ছিল, ঠাকুরের অসীম স্নেহাশীর্ব্বাদ তাঁহাকে সংসারের সকল বাধা বিঘ্নের প্রতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বোধ জন্মাইয়া দিতেছিল, তিনি প্রাণে অনন্ত শক্তি, অনন্ত উৎসাহ অনুভব করিতেন; তিনি অনুরোধকারী ভগ্নোৎসাহ গুরুভাইদিগকে বলিয়াছিলেন—'ভাই, তোমরা যদি সবাই ঘরে ফিরে যাও, এ বিশ্বও যদি উল্টে যায়,—তথাপি আমি যে পথ নিয়েছি সে পথ ছাড়বো না।" স্বামিজী সর্ব্বদা গুরুর মহাপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হইয়া লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলিয়াছিলেন, তাই তিনি সিদ্ধকাম হইয়া গুরুর আদেশ ও আশীর্ব্বাদকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় পৃথিবীময় ঘুরিতেছিলেন। যেই ঠাকুর সুযোগ উপস্থিত করিলেন, অমনই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গুরুভাইদের ডাকিয়া আনিয়া সংঘবদ্ধ করিলেন, মঠস্থাপন করিলেন, নানাবিধ জনহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানে নিজেদের বিলাইয়া দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা সত্যে পরিণত করিয়া ধন্ত হইলেন।

অপরদিকে ঠাকুরের প্রিয় শিষ্যা গৌরীমা ঠাকুরের দেহ-রক্ষার কিছু কাল পূর্ব্ব হইতেই বৃন্দাবনের নিকটস্থ রাওল নামক স্থানের পার্ব্বত্য গুহায় তপস্যায় নিরতা ছিলেন, সেখান হইতেই ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ সংবাদ জানিতে পারিয়া এত ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে ভৃগুপাতে জীবন বিসর্জ্জন দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা পারেন নাই—দুইটী বিশেষ কারণে। একটী হইতেছে—সেই অবস্থায় অলৌকিক ভাবে ঠাকুর উপস্থিত হইয়া বাধা প্রদান করিয়াছিলেন এবং অপরটী হইতেছে নারী-জাতির হিতার্থে কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্ম ঠাকুরের পূর্ব্বেকার আদেশ। পরে সেখান হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া প্রথম বারাকপুরে এক আশ্রম ও মেয়েদের শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উহাই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান "শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দুবালিকা-বিদ্যালয়"-রূপে পরিণত হইয়াছে। মাতৃ-জাতির সেবায় এই প্রতিষ্ঠানের দান কি পরিমাণে মহৎ ও মূল্যবান্, তাহা আজকাল বোধহয় কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু প্রতিষ্ঠাত্রী তাঁর নিজের কৃতিত্ব কিছুতেই স্বীকার করেন না, তিনি সর্ব্বদাই মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন, —"ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ ও আদেশ সত্যে পরিণত হইয়াছে তাঁর কাজ তিনিই সব করিয়াছেন, ইহাতে মানুষের কোনই হাত নাই। যশ ও প্রশংসা সব তাঁরই প্রাপ্য, আমি তাঁর পায়ের নীচে তুচ্ছ দাসী মাত্র, কাদা চটকাইয়াই আমি খালাস।"

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধনা ও কর্ম্ম-প্রেরণার বীজ জগতে নর-নারী মাত্রেরই হিতের জন্ম সত্য সত্যই মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে। উত্তরোত্তর আরও ফলফুল-সমন্বিত হইয়া নিশ্চিতই অসীম ও অক্ষয় হইয়া বিশ্বরাজ্যে বিরাজিত থাকিবে, আর জয় 'রামকৃষ্ণ' নামের উচ্চধ্বনি গগন-পবন মুখরিত করিয়া অনন্ত কাল বিঘোষিত হইতে থাকিবে।

অমলা

(উপন্যাস)

[অধ্যাপক শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ এম-এ]

এক

ছোট বড়

ঢাকা, বিক্রমপুর, নন্দীবাগগ্রাম। গ্রামটী ছোট কিন্তু পরিপাটী।

"সুশীল, জমীদার বাড়ী থেকে তোকে ডেকেছে রে, ছেলেদের নৌকা ক'রে নদীর চরে নিয়ে যেতে হবে।"

সুশীলের পিতা পশ্চাৎ হইতে এই কথা বলিলেন। সুশীল গ্রামের এক কলের মালিকের ছেলে। সুশীলের পিতা জাতিতে বৈদ্য হইলেও শিক্ষার অভাবে এই ব্যবসায়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার একটা ছোট তেলের কল।

সুশীল চিন্তিত মনে পায়চারি করিতেছিল। তাহার বয়স পনের-ষোল, রং রৌদ্র ও বৃষ্টিতে মেটে মেটে; সে গ্রামের বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে, লেখা পড়ায় খুব ভাল এবং তার মাথায় বিস্তর কল্পনা। সে ভাবিতেছিল বড় হইয়া একটী মস্ত কারখানা খুলিবে, শহর হইতে অনেক যন্ত্রপাতি লইয়া আসিবে, কেমন উচ্চাঙ্গের অথচ চমৎকার কারখানা তৈয়ারী করিবে, সারা হাত বারুদ ও গন্ধক মাখাইয়া যখন সে বাহির হইয়া আসিবে, তখন তার দলের সকলে ভয়ে তার নিকট হইতে সরিয়া যাইবে; উঃ কি মজাই হইবে। সুশীল বনের ধার দিয়া পুকুর পাড় দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছিল। সে তার চিরপরিচিত পাখীর বাসাগুলির দিকে তাকাইতেছিল, তাহাদের বিভিন্ন সুরের কলধ্বনি শুনিতে শুনিতে শিস্ দিতে দিতে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে উহাদের উত্তর দিতেছিল। পথের পাশের খেজুর গাছগুলি সুশীলের নিত্য সঙ্গী, গ্রীষ্মে সে তাহাদের রসপান করিয়াছে, বর্ষায় তাহাদের চারি ধার হইতে সযত্নে কাঁটা পরিষ্কার করিয়াছে। খালের ধারে কতকগুলি পাথরখণ্ড কুড়াইয়া সে জড় করিয়াছে, কয়েকটীর মধ্যে যন্ত্র দিয়া সে অক্ষর ফুটাইয়াছে, কতকগুলিকে স্তরে স্তরে সাজাইয়া একটী মন্দিরের মত গড়িয়া তুলিয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সব দেখিতে দেখিতে সে তাহার পিতার কারখানার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

কারখানায় পূর্ণবেগে কাজ চলিতেছিল। ঘট্ ঘট্ ঘটাং। কারখানাটী ঠিক খালের ধারে। কারখানার ফেনিল জলধারা নালা দিয়া নামিয়া আসিয়া খালের উপর পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছিল! মাঝে মাঝে উহার মধ্য হইতে ছোট ছোট মাছ লাফাইয়া লাফাইয়া উপরে উঠিতেছিল।

ঐ যে চিক্ চিক্ করিতেছে, নিশ্চয়ই উহার নিম্নে গভীর তলদেশে আলোর রাজ্যে শত শত দীপ জ্বলিতেছে! সুশীল ভাবিতেছিল সে বড় হইয়া এক মস্ত ডুবুরি হইবে, তারপর একখানি নৌকা লইয়া টুপ করিয়া নদীর জলে ডুব দিবে, নীচে—আরও নীচে—আরও নীচে ক্রমে অতল পাতাল-প্রদেশে গিয়া পৌছিবে—চারিদিকে অদ্ভুত দেশ, অফুরন্ত মণিমুক্তাখচিত অট্টালিকা, একটী প্রাসাদের কক্ষবাতায়ন হইতে এক অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে—ভিতরে এস, ভিতরে এস!

সুশীলের পিতা পশ্চাৎ হইতে ডাকিল—"সুশীল, জমীদার বাড়ী থেকে তোকে ডেকেছে রে, ছেলেদের নৌকা করে, নদীর চরে নিয়ে যেতে হবে।"

সুশীল চমকাইয়া উঠিল। দৌড়াইয়া গিয়া কাপড়-চোপড় পরিয়া জমীদার বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

জমীদার বাড়ীটি ঠিক পদ্মার উপরে। সাদা ধব্‌ধবে পাথরে নির্ম্মিত। পদ্মার উপর হইতে সারি সারি সিঁড়ি উঠিয়া একেবারে বাড়ীর দরজায় লাগিয়াছে। •সন্ধ্যাতে

ঢুকিতেই নাটমন্দির ও পূজামণ্ডপ, পরে একটী প্রকাণ্ড সিংহদ্বার, প্রশস্ত এক প্রাঙ্গণ পার হইয়া দালানে যাইবার পথ।

বৎসরের সকল সময়ে কোনও না কোন পূজা লাগিয়াই আছে, সুতরাং নাটমন্দির লোকজনে প্রায়ই পূর্ণ থাকে। কাজেই নাট-মন্দির ও পূজা-মণ্ডপ লইয়া একটা পৃথক্ বাড়ী বলিলেই চলে, আসল জমীদার বাড়ীর আরম্ভ ঐ সিংহদ্বার হইতে। এক পার্শ্বে একটি ঘাট বাঁধান পুষ্করিণী, অপর পার্শ্বে একটি প্রশস্ত ফুলবাগান, দালান সবই পাকা গাঁথুনির।

সুশীল গিয়া জমীদার বাড়ীর নাট-মন্দিরে উপস্থিত হইতেই দেখিতে পাইল, সকলেই প্রস্তুত হইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে তাহাদের সকলকেই চিনিত —অমলা জমীদার মহাশয়ের পৌত্রী, তার ছোট ভাই সন্তোষ এবং পাশের গ্রামের জমীদার-পুত্র বিপিন। অমলার পিতা নাই, সুতরাং সে পিতামহের বড় আদরের। আজ সে বায়না ধরিয়াছে নৌকা করিয়া নিকটবর্ত্তী পদ্মার চরে বেড়াইতে যাইবেই—তাই সুশীলের ডাক পড়িয়াছে নৌকা চালাইয়া লইতে।

বিপিন ও সন্তোষ গিয়া নৌকায় চড়িল, কিন্তু নয় বৎসরের বালিকা অমলা বালিকাসুলভ ভয়ে উঠিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। ইহা দেখিয়া সুশীল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমায় উঠিয়ে দেব, অমলা।"

"না, না, তোমার অত প্রয়োজন নেই," এই বলিয়া আঠার বছর বয়স্ক বিপিন অমলাকে ধরিয়া তুলিয়া নৌকায় উঠাইল। সুশীল একবার বিপিনের দিকে আর একবার অমলার প্রীতিভরা মুখের মৃদুহাসির পানে তাকাইল, তার পরই চক্ষু সরাইয়া লইয়া দাঁড় টানিতে লাগিল।

নৌকা আসিয়া চরে ঠেকিল। বিপিন নামিয়া পড়িয়াই সন্তোষ ও অমলার হাত ধরিয়া বলিল,—"এস সন্তোষ, এস অমলা; আর দেখ সুশীল, তুমি নৌকা পাহারা দাও।" সুশীল অসন্তুষ্ট মনে বিপিনের দিকে তাকাইল। কিন্তু অমলা নামিয়া বলিল—"সুশীলদা, তুমি নৌকা পাহারা দাও, আমরা চরে বেড়িয়ে আসি।" তখন সুশীল মুখখানি গম্ভীর করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিপিন সন্তোষ ও অমলার হাত ধরিয়া চরের উপর চলিতে লাগিল, নুড়ি পাথর ও ঝিনুক সংগ্রহ করিবার জন্য কয়েকটা চুবড়ী লইয়া গেল। সুশীল পশ্চাতে পড়িয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল, আহা, সে যদি উহাদের সহিত যাইতে পারিত? নৌকা পাহারার এমন কি দরকার ছিল? টানিয়া চরে উঠাইয়া রাখিলেই ত হইত, কে চুরি করিতে আসিত! ভারী? ইস্ কিইবা ভারী! নিশ্চয়ই সে টানিয়া চরে তুলিতে পারিত। এই বলিয়া সুশীল নিজের শক্তি দেখাইবার জন্য এক টান দিয়া নৌকাখানি চরের উপর কিছু দূর উঠাইয়া দিল।

ঐ ত বিপিন, সন্তোষ ও অমলার কলহাস্য শোনা যাইতেছে। ঐ যে ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। আচ্ছা, দেখা গেল, এবার তোমরা নাই বা নিলে! কিন্তু তারা তাহাকে লইলে ভালই করিত। সে অনেক পাথর ও ঝিনুকের সন্ধান জানে, অনেক গুপ্ত গহ্বরের কথা জানে, নানা বর্ণের সুন্দর সুন্দর পাথরের সন্ধান সে তাহাদিগকে বলিয়া দিতে পারিত! সুশীল নৌকায় আর স্থির থাকিতে পারিল না। লাফাইয়া চরে নামিল, দ্রুতবেগে পাথর কুড়াইতে কুড়াইতে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গেল।

"যাও, যাও, শিগ্‌গির নৌকায় ফিরে যাও, এখনি কেউ এসে নৌকা নিয়ে পালাবে।"

দূর হইতে বিপিন সুশীলকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া এই কথা বলিল। সুশীল উত্তর করিল—"কোথায় কোথায় সুন্দর সুন্দর নানা রঙের পাথর ও ঝিনুক পাওয়া যায়, তাই দেখাতে এসেছি। আমি সব জানি কি না।" বিপিন কোনও উত্তর দিল না, অমলা বলিল—"না সুশীলদা, নৌকা পাহারা দাও গিয়ে।"

গম্ভীর পদক্ষেপে সুশীল নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া বসিল। সুশীল ভাবিতে লাগিল, সে বড় হইয়া পদ্মার পারের এক প্রকাণ্ড চর কিনিবে, কাহাকেও বাহির হইতে সেখানে আসিতে দিবে না, পাড়ের চারিদিকে বন্দুক কামান সাজাইয়া রাখিবে, অনেক দাস-দাসী নিয়া সে সুখে বাস করিবে, প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইবে—জমীদার বাড়ীর চতুর্গুণ, চারিদিকে চারিটী সিংহ-দরজা এবং অনেক বড় চকমিলন দালান। হঠাৎ একদিন প্রাসাদের

চাকর আসিয়া বলিবে—"কর্ত্তাবাবু, চরে একটী নৌকা লাগিয়াছে, লাগিয়াই ফুটা হইয়া গিয়াছে, নৌকার আরোহীরা পারে উঠিবার জন্ত কাতরস্বরে অনুমতি চাহিতেছে, না হইলে অল্পক্ষণের মধ্যে নৌকাডুবি হইয়া তাহারা মারা পড়িবে। সে কঠোরস্বরে উত্তর দিবে—"মরুক তারা, আমার কি ?"

"কিন্তু কর্ত্তাবাবু, আমরা তাদের এখনও রক্ষা করিতে পারি, কাতরকণ্ঠে তাহারা সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে, আর তাহাদের মধ্যে একটী রমণী আপনার নাম করিয়া কাঁদিতেছে !"

রমণী ? য়্যাঁ, তাদের বাঁচাও, বাঁচাও,—সে আর স্থির থাকিতে পারিবে না, পাগলের মত নদীর ধারে ছুটিয়া যাইবে। অনেকদিন পরে জমীদার বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে তাহার মিলন হইবে, অমলা নতজানু হইয়া প্রাণ-রক্ষার জন্ত তাহাকে ধন্তবাদ দিতে আসিবে। সে সরিয়া গিয়া গম্ভীরভাবে বলিবে—ধন্তবাদ পাওয়ার মত সে তো কিছু করে নাই, তাহার জমীদারিতে উপস্থিত মগ্নপ্রায় বিপন্নদিগের সাহায্য করিয়া সে কর্ত্তব্য করিয়াছে মাত্র। সে তখনি চাকরদিগকে চারিটী সিংহদ্বার খুলিয়া দিতে বলিবে, তাহার ঐশ্বর্য্য, তাহার বাগান পুষ্করিণী দেখাইয়া অমলাদের চমকাইয়া দিবে, তারপর যখন সোনার থালে কত নূতন নূতন খাবার তাহাদের খাইতে দিয়া কত অলঙ্কার-পরিহিত সুন্দরী দাসীর দ্বারা পরিবেষণ করাইবে, তখন অমলা অবাক্ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিবে। সে গম্ভীরভাবে বলিবে সেন-জমীদারদের মত দাশ-বংশের পূর্ব্ব-পুরুষদেরও অনেক ঐশ্বর্য্য ছিল, সে তাহাই বাড়াইয়াছে মাত্র। তারপর যখন তাহাদের যাইবার সময় উপস্থিত হইবে, তখন বাগানের ভিতরে কত নূতন রকমের পাখীর গান শুনিয়া অমলা স্তম্ভিত হইয়া যাইবে, অমলা তাহাকে ছাড়িয়া কোন খানেই যাইতে চাহিবে না। কারণ, অমলা ত তাহাকেই ভালবাসে, বিপিন—ও কে ! অমলা তাহার হাত ধরিয়া কত মিনতি করিবে, তাহার দাসী হইয়া সেখানে থাকিবার অনুমতি চাহিবে। সে ধীরে ধীরে তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিবে—"ছিঃ অমলা, দাসী কেন ? তুমি আমার-

উরুমত্তিকে সুশীল নৌকা হইতে উঠিয়া চরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে আঁচল ভরিয়া নানা বর্ণের ঝিনুক ও পাথর কুড়াইতে কুড়াইতে অগ্রসর হইল। অমলারা এখনও ফিরিতেছে না কেন ? তবে কি তাহারা পথ হারাইয়াছে ! হয় তো, অমলা কোনও গর্ত্তের মধ্যে পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, কেহই তাহাকে তুলিতে পারিতেছে না, অমলা বুঝি ভয়ে কাঁদিতেছে। সে কাছে থাকিলে নিশ্চয়ই এক টানে তুলিয়া দিত। এখন—

বিপিন দূর হইতে সুশীলকে আসিতে দেখিয়াই রাগে চীৎকার করিয়া উঠিল—"সুশীল, আবার নৌকা ছেড়ে চলে এসেছ ! নৌকা যদি হারায় তবে তুমি দায়ী হবে।"

"চরের উত্তরে একটা গাছে কেমন সুন্দর কালজাম পেকে আছে, তাই তোমাদের দেখাতে এসেছি।"

অমলা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায়, সুশীলদা ?"

বিপিন মুরুব্বিয়ানা সুরে বলিল—"না, ওসবে এখন প্রয়োজন নেই।" সুশীল আবার বলিল—"পশ্চিমের একটা বাদামগাছে প্রচুর বাদাম ফলে আছে।"

বিপিন মুখ ভেংচাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"সোণা তো' আর ফলে নি।" অমলা হাসিয়া বলিল—"সোণা ফল্লে বেশ হত, না সুশীলদা ?"

সুশীল লজ্জায় ও অভিমানে চুপ করিয়া রহিল। তাহার কোলের আঁচল পাথর ও ঝিনুকের ভারে নুইয়া পড়িয়াছিল। বিপিনের লক্ষ্যে পড়িতেই সে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার আঁচলে কি সুশীল !"

"পাথর ও ঝিনুক।"

অমলা আনন্দে লাফাইয়া উঠিল—"এত রঙের পাথর আর ঝিনুক কোথায় পেলে সুশীলদা ! আমাদের চেয়ে যে অনেক বেশী কুড়িয়েছ।"

"আমি যে জানি কোথায় ভাল ভাল এ-সব পাওয়া যায়। এস অমলা, তোমার ও-গুলির সঙ্গে এগুলি মিশিয়ে দিই।"

সুশীল কোঁচড় হইতে ঢালিতে উদ্যত হইলে, বিপিন জোরে ধমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার নোংরা কাপড়ের কোল থেকে ওগুলি অমলার চুবড়িতে দিতে হবে না, তোমার কাপড়ে কি সব ময়লা কে জানে।"

রাগে ও ক্ষোভে সুশীলের মুখ পাংশু হইয়া গেল। বিপিনের মত বহুমূল্য কাপড় পরিধান না করিলেও সুশীলের কাপড় বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। সে ধীরে ধীরে আঁচল হইতে সেগুলিকে নামাইয়া জলে টুপ্ টুপ্ করিয়া এক একটী ফেলিয়া দিতে লাগিল।

অমলা জিজ্ঞাসা করিল—"কি কচ্ছ, সুশীলদা!"

"আমার এগুলির দরকার নেই, কি হবে এত ভার বয়ে নিয়ে গিয়ে।"

উভয়ে উভয়ের পানে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তার পর সুশীল কোল ওজাড় করিয়া সব পাথর ও ঝিনুক পদ্মার গর্ভে নিক্ষেপ করিল।

নৌকা বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল। জমীদার বাটীর ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগিলে একে একে সকলে নামিয়া গেল। বাড়ী যাইবার সময়ে সুশীল অমলাকে চুপি চুপি বলিল—"কাল যাবে অমলা, চরে বাদামগাছের তলায় আমার খেলা ঘর দেখতে যাবে!"

"কিন্তু আমার যে ভয় করবে সুশীলদা, তুমি যে বল সে ঘরটা বড় অন্ধকার।"

"আমি সঙ্গে থাকলেও ভয় করবে অমলা!" "না" বলিয়া অমলা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

নূতন চরে বাদামগাছের তলায় সুশীল অনেক যত্নে একটী ছোট ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছে। পাথর জড় করিয়া উহার প্রাচীর রচনা করিয়াছে, উপরে পাতার ও টিনের ছাউনি। অনেক দিন দ্বিপ্রহরে সে একাকী চরে গিয়া সারা দিন ধরিয়া ঘরটী নির্ম্মাণ করিয়াছে। কিন্তু আলোক প্রবেশের ব্যবস্থা না থাকায় ঘরটী অন্ধকার হইয়াছিল, সহসা প্রবেশ করিতে বেশ ভয়ই করিত।

সুশীল ঘাটে বসিয়া তাহার ঘরটীর কথা ভাবিতেছিল। সে যেন এক প্রবল শক্তিশালী দস্যুদলের সর্দ্দার, অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার তার। সে ঘণ্টা বাজাইবে, আর হীরা-মুক্তাজড়িত ভৃত্য আলো লইয়া উপস্থিত হইবে। ভৃত্য রাজকন্যা অমলার আগমনবার্ত্তা দিয়া যাইবে, অমনি তাহাকে সে আদেশ করিবে—শীঘ্র লইয়া আইস। অমলা আসিলে সে তাহাকে সোণার পালঙ্কে বসিতে দিয়া দুই ধারে দুইটী দাসীকে ব্যজন করিতে হুকুম দিবে, চাকরেরা সোণার থালে কত মিষ্ট ফল লইয়া আসিবে, অমনি চারিদিকে পাখীরা গাহিয়া উঠিবে।

"সুশীলদা, আমি এসেছি।"

"কে! অমলা।"

"যাবে ত, চল সুশীলদা।" তাহারা দুজনে নৌকা বাহিয়া চরে পৌছিল, তারপর বাদামগাছের তলায় আসিয়া অমলা বলিল—"সুশীলদা, ভয় করছে যে।"

"কেন, আমি ত সঙ্গে আছি।" সুশীল আলো জ্বালিয়া অমলাকে নিয়া প্রবেশ করিল। অমলাকে একটী বড় প্রস্তর-খণ্ডের উপর বসাইয়া সুশীল বলিল—"ওর উপর একটা রাক্ষস বসেছিল, জান।"

"না, তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ। আচ্ছা, সত্যি না কি! তুমি দেখেছ না কি! তোমার ভয় করল না?"

"না।"

"রাক্ষসটার কি এক চোখ ছিল!"

"না, দুচোখই ছিল, তবে এক চোখ নাকি কোন একটা যুদ্ধে নষ্ট হয়ে গেছিল, এ-কথা সে নিজেই আমাকে বলেছে।"

"আর কি বলেছে! না না বলবার দরকার নেই, আমার ভয় করবে।"

"সে আমাকে তার চেলা হতে বল্লে।"

"না না, তুমি যেও না। যাবে?"

"না, আমি একেবারে যাব না—এ কথাও বলি নি।"

"তুমি কি পাগল হয়েছ সুশীলদা, তুমি যেতে পাবে না।"

"কিন্তু আমার এখানে আর ভাল লাগছে না।" অমলা নীরব।

"বিপিনের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে, অমলা, তুমি আমার সঙ্গে খেলা করা কমিয়ে দিয়েছে।"

অমলা তথাপি নিরুত্তর।

"কিন্তু আমার গায়ে কি তার চেয়ে কম জোর। আমি কি তোমায় নৌকা থেকে উঠাতে কি নৌকায় চড়াতে পারতুম না! আমি তোমায় এক ঘণ্টা তুলে ধরতে পারি অমলা, দেখবে।" এই বলিয়া সুশীল অমলাকে মাথার উপর তুলিয়া ধরিল, অমলা ভয়ে সুশীলের গলা জড়াইয়া ধরিল।

"ছেড়ে দাও সুশীলদা, পড়ে যাব যে।" সুশীল অমলাকে নামাইয়া দিল।

"কিন্তু, বিপিনদার গায়েও ত খুব জোর আছে সুশীলদা।"

"ইস্, ছাই জোর!"

"সত্যি সুশীলদা, বিপিনদা'র গায়েও খুব জোর।"

সুশীল কিছুক্ষণ নিরুত্তর রহিল, তার পর বলিল—"তা হলে রাক্ষসের চেলা আমাকে হতেই হবে।"

"না, না, সুশীলদা, তুমি কি পাগল হয়েছে!"

"কিন্তু আমাকে যে চেলা হতেই হবে, অমলা।"

"যদি রাক্ষসটা আর না আসে!"

"সে আমাকে নিতে আস্‌বেই।"

"এখানে!"

"হ্যাঁ, এইখানে।"

অমলা আসন হইতে উঠিয়া পড়িল এবং ভয়চকিত নয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

"চল সুশীলদা, এখন আমরা বাড়ী যাই।"

"এত তাড়াতাড়ি কেন, অমলা? রাক্ষস ত' রাতদুপুর ছাড়া আসে না।"

কিন্তু সুশীলের নিজেরই একটু একটু ভয় করিতেছিল। অমলা বসিতে যাইতেছিল, কিন্তু সুশীলের আর ভিতরে থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না, মাঝে মাঝে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল।

"চল, অমলা, বাড়ী যাই, যাবার পূর্ব্বে তোমার নাম খোদাই করা একখানি পাথর তোমাকে দেখিয়ে আনি, চল।"

তাহারা বাহির হইয়া আসিল। একটা পাথরের নিকট আসিয়া অমলা উত্তমরূপে তাহার নাম খোদাই-করা পাথরখানি দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মন গর্ব্বে ভরিয়া উঠিল। সুশীলের মনও আর্দ্র হইল।

"দেখ অমলা, আমি যখন চলে যাব, তখন এই পাথরের দিকে তাকালে আমার কথা তুই একবার মনে হবে না তোমার?"

"নিশ্চয়ই, কিন্তু সুশীলদা তুমি কি আর ফিরে আস্‌বে না?"

"কি ক'রে বলি, সম্ভবও নয়।"

অনেকক্ষণ উভয়ই নীরব রহিল। তারপর নৌকায় উঠিয়া ঘাটের কাছে আসিতেই অমলা বলিল—"এখন যাই সুশীলদা।"

"কেন অমলা, আর কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে থাকলে কি দোষ?"

অমলা যে আসিতে-না আসিতেই সুশীলকে বিদায় দিতে চাহিতেছে এই চিন্তায় সুশীলের মনে বড় আঘাত লাগিল। সে অভিমানবিক্ষুব্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল—"কিন্তু জেনো অমলা, আমার চেয়ে ভাল ব্যবহার তোমার সঙ্গে কেউ করবে না। এ কথা তোমায় বলে গেলাম।"

"কেন সুশীলদা, বিপিনদাও আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে।"

"তবে তার সঙ্গেই খেলা ক'রো।"

কিছুক্ষণ উভয়েই নিরুত্তর। তারপর অমলা বলিল—"রাগ করলে, সুশীলদা?"

"না, ভাবছি রাক্ষসটার সঙ্গে গেলে কত মজা হবে! কত পুরস্কার আমার ভাগ্যে জুটবে!"

"কি পুরস্কার, শুনিই না।"

"প্রথমতঃ, একটা প্রকাণ্ড রাজ্যের অর্দ্ধেক।"

"আর!"

"আর একটী সুন্দরী রাজকন্যা।"

অমলা কিছুক্ষণ নীরব রহিল, তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ইস্, সব মিছে কথা!"

"না, রে না, সব সত্যি।" অমলা নিরুত্তর। আপন মনে যেন বলিল—"রাজকন্যাটী দেখিতে কি খুব সুন্দর?"

"ওঃ, তার মত সুন্দরী পৃথিবীতে আর কেউ নেই!" অমলার মনটা দমিয়া গেল।

"সুশীলদা, তুমি কি সত্যি তাকে বিয়ে করবে?"

"এই রকমই ত কথা আছে।" এই সময়ে অমলার ছলছল চোখের দিকে সুশীলের দৃষ্টি পড়ায় সে একটু সান্ত্বনার সুরে অমলাকে বলিল—"তবে মাঝে মাঝে তোমায় আমি দেখতে আস্‌ব', অমলা।"

"কিন্তু তোমার সেই রাজকন্যাকে সঙ্গে এনো না, সুশীলদা। তার সঙ্গে কিন্তু আমার বনবে না, বলে দিচ্ছি!"

"না অমলা, আমি একাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবো।"

"সুশীলদা, নিশ্চয় আসবে? প্রতিজ্ঞা করছ'?"

"হাঁ প্রতিজ্ঞা কচ্ছি। কিন্তু তাতে তোমার কি এসে যায় অমলা? তুমি ত আমায় চাও না!"

"ইস্, চাই না? ও কথা বলো না সুশীলদা." তারপর একটু অভিমানের সুরে বলিল—"জেনো সুশীলদা, তোমার [illegible] তোমায় আমার অর্দ্ধেকও ভালবাসবে না।" অমলার গুরুগম্ভীর মুখ দেখিয়া সুশীলের হাসি পাইল। কিন্তু তাহার কিশোর অন্তঃকরণে গর্ব্ব ও আনন্দের একটা উৎস বহিয়া গেল। লজ্জায় ও তৃপ্তিতে তাহার মাথাটা নত হইয়া আসিল, চক্ষুদ্বয় ভূসংলগ্ন হইল; [illegible] অমলার দিকে তাকাইতে পারিতেছিল না, ভূমি হইতে একটা যষ্টি কুড়াইয়া লইয়া সে নিজের হস্তে সজোরে দুই একবার আঘাত করিল। তারপর একটু শিস্ দিয়া একটু কাসিয়া সে অমলার দিকে তাকাইয়া বলিল—"এখন [illegible] অমলা।" অমলা ধীরে ধীরে সুশীলের হাত ধরিয়া বলিল—"আবার আসবে সুশীলদা?" একটীবার [illegible] ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া সুশীল প্রস্থান করিল।

দুই

পদ্মা-সলিলে

তিন বৎসর হইল সুশীল গ্রামের বিদ্যালয় ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা শহরে পড়িতে গিয়াছে। সেখানে এক আত্মীয়ের বাটী থাকিয়া [illegible] অধ্যয়ন করিতেছে। পড়াশুনায় তাহার যথেষ্ট মন, মেধাও তার বেশ তীক্ষ্ণ, সুতরাং শিক্ষা-ব্যাপারে সে বিশেষ উন্নতি করিতে লাগিল। সে এখন যুবক, বলিষ্ঠদেহ, অধরে নব-সঞ্জাত গুম্ফ। ছুটিতে এই তিন বৎসর সুশীলের বাড়ী আসা হয় নাই, যাতায়াতের খরচের অভাবে তাহার পিতা তাহাকে বাড়ী আনেন নাই। [illegible] ছুটীর সময়ে সুশীল অধিকতর মনোযোগের সহিত পড়াশুনা করিয়াছে। সে আই-এ পরীক্ষা পাস করিয়া বি-এ ক্লাসে পড়িতেছে।

তিন বৎসর পরে একদিন ষ্টীমারে চড়িয়া সুশীল বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। তারপর ষ্টীমার ছাড়িয়া একখানি ছোট নৌকা করিয়া সে গ্রামের ঘাটে উপস্থিত হইল।

আজ জমীদার বাটীতে বড় আনন্দ। সন্তোষও শহরে পড়িতে গিয়াছিল, সেও আজ ছুটিতে বাড়ী ফিরিতেছে। সুশীল ও সন্তোষ একই ষ্টীমারে আসিয়াছে, কিন্তু সন্তোষ প্রথম শ্রেণীতে আর সুশীল তৃতীয় শ্রেণীতে ষ্টীমারে থাকায় পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। জমীদারবাড়ীর ঘাটে সন্তোষের নৌকা লাগিলে জমীদার মহাশয় ও অমলা তাহাকে লইতে আসিল। এই তিন বৎসরে অমলার অঙ্গসৌষ্ঠব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, বালিকা কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছে। সুশীল জমীদার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া অমলাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিল। অমলা একবার তাকাইয়া নমস্কার না করিয়াই সন্তোষকে জিজ্ঞাসা করিল—"দেখ্ সন্তোষ, কে যেন আমাকে কি বলছে!"

"ওকে চেন না দিদি? ওযে সুশীলদা।" অমলা সুশীলের দিকে তাকাইল, কিন্তু সুশীল লজ্জায় এবার মুখ তুলিতে পারিল না। জমীদার মহাশয়ের সহিত অমলা ও সন্তোষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সুশীলও বাড়ী চলিয়া গেল। সে এক নূতন অনুভূতি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাদের পুরাতন গৃহখানি যেন তাহার নূতন বলিয়া মনে হইল, তাহার স্বহস্তরোপিত পেয়ারা গাছটা যত্নের অভাবে শুকাইয়া গিয়াছে, তাহার পোষা তোতা-পাখিটী মরিয়া গিয়াছে, তাহার ময়নাটী উড়িয়া গিয়াছে। গৃহে সবই যেন ওলট-পালট। সুশীলের মা-বাবা সাদরে তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া বসাইল। সুশীলের মনে হইল তাহার মা যেন কত বুড়া হইয়া গিয়াছে, বাপের দেহ যেন শিথিল হইয়া আসিয়াছে।

সন্ধ্যার সময়ে সুশীল চারিদিকে ঘুরিয়ে বেড়াইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার পিতার কারখানা, তাহার মাছ ধরিবার স্থান, তাহার পাখীর খাঁচা, পাখীদের কলরব-পূর্ণ পুরাতন বৃক্ষতল। তারপর নৌকাখানি লইয়া সে তাহার চরের ঘরটী দেখিতে গেল। তাহার ঘরটী তেমনি খাড়া রহিয়াছে, কিন্তু পাশে পাশে কাঁটাবনে ভরিয়া গিয়াছে। আর একদিন দিনের বেলায় আসিয়া কাঁটা পরিষ্কার করিবে ভাবিয়া সে বাড়ীর দিকে নৌকা ফিরাইল। ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সে জমীদারবাড়ীর বাগানের ধার দিয়া আসিতেছিল। পশ্চাতে তাহার পিতার কণ্ঠস্বর শুনিতে

পাইল—"কি রে সুশীল, চিনতে পারচিস্ এ সব জায়গা ?"

"অনেকটা পরিবর্ত্তন দেখছি, বাবা, কতকগুলি গাছ যেন কাটা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

"অর্থের অভাব রে সুশীল, জমীদার মহাশয়ের অর্থের বড় টানাটানি পড়েছে, তাই অনেকগুলি ভাল ভাল গাছ বিক্রী করে ফেলেছেন।"

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। সুন্দর সুখস্মৃতি-ভরা দিনগুলি! নির্জ্জনতার সাথী, শৈশব ও কৈশোরের আনন্দ-স্মৃতিটুকু! সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই বনের ধার, সেই নদীর পার!

সেদিন জামগাছে জাম পাড়িতে গিয়া ঠোঁঠে বোলতার কামড় পাইয়া সুশীল বাড়ীতে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কি যেন কার্য্যোপলক্ষ্যে তাহার পিতা তাহাকে জমীদার বাটীর দিকে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। সুশীল তার ফোলা ঠোঁট ঢাকিয়া পথে চলিতেছিল, পথে কাহাকেও দেখিতে পাইলেই দুই হাত দিয়া মুখ আড়াল করিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল। জমীদারবাড়ীর বাগানে কাহাকে যেন দেখা গেল, সুশীল একটা নমস্কার করিয়াই হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিল। জমীদারবাড়ীর নিকট দিয়া গেলেই পূর্ব্বের মত এখনও তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে থাকিত। ঐ বড় বাড়ীটার উপর তাহার একটা সমীহভাব, উহার সিংহদ্বার, উহার প্রকাণ্ড বাতায়নের প্রতি একটা বিস্ময়দৃষ্টি, এবং ঐ বাড়ীর মালিকের গম্ভীর মূর্ত্তির প্রতি একটা আতঙ্ক সুশীলের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল।

হঠাৎ পথে সন্তোষ ও অমলার সহিত সুশীলের সাক্ষাৎ হইল। সুশীলের মনে একটা অস্বস্তির ভাব খেলিয়া গেল। অমলা হয় তো মনে করিবে যে তাহাকে দেখিতেই বুঝি ও পথে আসিয়াছে। ছিঃ, তার উপর তাহার ঠোঁঠটি যে একেবারে ফুলিয়া গিয়াছে। সুশীল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কোন্ দিকে যাইবে তাহা তাহার খেয়াল ছিল না। দূ. হইতে সন্তোষ ও অমলাকে দেখিয়া সে অভিবাদন করিল। তাহারা উভয়ে নীরবে প্রতিনমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া চলিল। অমলা একবার চক্ষু তুলিয়া সুশীলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সুশীলের মনে হইল যেন সে তাহাতে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ করিল।

সুশীল নদীর ধার দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতেছিল। কি যেন কি একটা চাঞ্চল্য তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পা ফেলার ভঙ্গী কিছু খামখেয়ালি হইয়া উঠিয়াছিল। অমলা ত বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে! কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে যেন তাহার সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে! তাহার ঘনকৃষ্ণ ভ্রূ-যুগল শরতের নির্ম্মল আকাশে দুইখণ্ড মেঘের মত শোভা পাইতেছে। তাহার চক্ষুদুটী যেন সেই আকাশের গায়ে দুইটী তারার মত ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

সুশীল ফিরিল। সে বনের মধ্য দিয়া পথ ধরিল। আর ত কেহ বলিতে পারিবে না যে সে অমলা ও সন্তোষের অনুসরণ করিতেছে। সে বনের ধারে আসিয়া একটী প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিল। চারিদিকের পাখীর দল তখন নানাসুরের গান ধরিয়াছে। সম্মুখ হইতে বনফুলের মেঠো গন্ধ আসিয়া তাহার নাসিকা ভরিয়া দিল। দূরে একটা 'বউকথা কও' পাখী তাহার অপূর্ব্ব ... সুশীলের মন বিভোর করিয়া দিতেছিল।

সুশীল উঠিয়া পড়িল। আবার চলিতে লাগিল, কোন্ পথে সে জানে না। কতদূর চলিয়া হঠাৎ সম্মুখে সে অমলাকে আসিতে দেখিল। একটা অসহায় অস্বস্তিতে তাহার মন ভরিয়া গেল. কেন সে অন্যদিকে চলিয়া যায় নাই? হয়ত, অমলা ভাবিবে, সে এতক্ষণ তাহার অনুসরণ করিয়াছে। ছিঃ। না, সে কথা না বলিয়াই পাশ কাটাইয়া অনেকদূরে চলিয়া যাইবে। কিন্তু অমলা তখন এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে যে সুশীলের তাহাকে লক্ষ করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। অমলা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সুশীলদা কেমন আছ?" অমলার ঠোঁটদুটী নড়িয়া উঠিল, মনে হইল যেন সে আরও কিছু বলিবে। কিন্তু সে আপনাকে সামলাইয়া লইল।

সুশীল বলিল, "এ বড় অদ্ভুত অমলা, আমি জানতাম না যে তুমি এখানে আছ।"

"কি করে জানবে সুশীলদা! আমি খেয়ালের বশে এই বনের ধার দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম; তুমি আর কতদিন এখানে থাকবে, সুশীলদা?"

"কেন? গ্রীষ্মের ছুটী শেষ হওয়া পর্য্যন্ত।"

সুশীল অতিকষ্টে অমলার সহিত কথা কহিতেছিল। অমলার এত অধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে তাহার সহিত কথা বলা সুশীলের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িতেছিল। অমলা বলিল, "সন্তোষের কাছে শুনলাম, তুমি না কি খুব ভালছেলে সুশীলদা, প্রতি বৎসর ক্লাসে প্রথম হ'য়ে বৃত্তি পাও। তা ছাড়া না কি খুব ভাল কবিতা লিখতে পার. সত্যি?"

সুশীল সঙ্কোচের সহিত উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তা কবিতা ত সকলেই লিখতে পারে!"

সুশীল ভাবিল অমলা বুঝি আর অধিকক্ষণ এখানে থাকিবে না, কই সে ত আর কিছু কথা কহিতেছে না। সুশীল আপনা হইতে অমলাকে বলিল, "দেখেছ অমলা, আজ সকালে বোল্‌তাটা কি ভীষণ ঠোঁটে কামড়িয়েছে! উঃ কি জ্বালা, দেখেছ কি বিশ্রী দেখাচ্ছে

"সুশীলদা, তুমি এতদিন বাড়ী ছেড়ে ছিলে কি না তাই বোল্‌তারা তোমায় ভুলে গেছে।" এই বলিয়া অমলা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সুশীল রাগে ফুলিতে লাগিল। অমলাটা কি মেয়ে! তাহাকে এমন ভাবে বোল্‌তায় কামড়াইয়া ফুলাইয়া দিয়াছে, আর অমলা সহানুভূতি ত করিলই না, আবার হাসিল। আচ্ছা, দেখা যাইবে। কিন্তু এমন দিন ছিল যখন সুশীল কাঁধে করিয়া অমলাকে কত জায়গায় লইয়া গিয়াছে অমলা কি সব ভুলিয়া গিয়াছে?

"অমলা, বোল্‌তাগুলো পর্য্যন্ত আমায় চিনতে পারল না! তারাও ত আমার বন্ধু ছিল।" অমলা ইহার অন্তর্নিহিত শ্লেষটুকু ধরিতে পারিল না। সে নিরুত্তর রহিল। সুশীল বলিতে লাগিল—"কিন্তু আমিও ত অনেক কিছু চিনতে পার্চ্ছি না। ঐ বাগানের অনেক গাছ আর দেখতে পাচ্ছিনা বলে ওটাও যেন নতুন নতুন ঠেকছে।"

অমলার মুখের ভাবের একটু পরিবর্ত্তন হইল।

কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য অমলা কহিল, "সুশীলদা, এখানে তুমি কবিতা লিখতে পার না? পার? তবে এক দিন আমার সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখবে?" এই কথা বলিয়া ফেলায় অমলার কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। তখনই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল; "দেখছ সুশীলদা, কি যে মাথামুণ্ডু আমি বলি!"

সুশীলের অভিমানও হইল, রাগও হইল। অমলা কি বন্ধুতাছলে তাহার অপমান করিতে চাহে। সুশীল মনে মনে স্থির করিল, সে অমলাকে শুনাইয়া দিবে যে এ তিনবৎসর সে কেবল কবিতা লিখিয়াই কাটায় নাই. যথেষ্ট পড়াশুনাও করিয়াছে। কিন্তু আজ থাক্।

"আচ্ছা অমলা, আবার পরে দেখা হবে, আজ যাই।" এই বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সে দ্রুত পদ-বিক্ষেপে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল।

সুশীল পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল, অমলা যদি জানিত তাহার প্রত্যেক কবিতাটী তাহারই উদ্দেশে রচিত—তাহার "জ্যোৎস্নারাণী," তাহার "স্বপনবালা," সবই যে অমলার উদ্দেশে। কিন্তু অমলার ত তাহা জানিবার উপায় নাই

সেদিন রবিবার, সন্তোষ আসিয়া চরে যাইবার জন্য সুশীলকে ডাকিয়া লইয়া গেল। শুধু অমলা ও সন্তোষ, আর কেহ ছিল না। সুতরাং কোন গণ্ডগোলই ছিল না। সুশীলও খুব আনন্দের সহিত নৌকা বাহিয়া চলিল নিকট দিয়া আর একখানি বড় নৌকা ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছিল। নৌকার ভিতর হইতে সুন্দর সঙ্গীতধ্বনি তরঙ্গের তালে তালে ভাসিয়া আসিতেছিল। সুশীলের মনপ্রাণ একটা কবিত্বের ঝঙ্কারে ভরিয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ, একি? ঐ কিসের পতন-শব্দ! ঐ কিসের আর্ত্ত-নাদ? ঐ নৌকা হইতে কাহারা যেন ক্রন্দন করিয়া উঠিল না? ঐ যে সঙ্গীতধ্বনিও থামিয়া গেল! সুশীলের নৌকা তখন চরের পারে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। সুশীল নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া শুনিল, অপর নৌকাখানি হইতে রমণীকণ্ঠের কাতর আর্ত্তনাদ হইল "কৈরে, আমার মেয়ে গেল কোথা?" সুশীল আর কিছু দেখিবার বা শুনিবার প্রতীক্ষা করিল না, নৌকা হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডুব দিল। সকলে দেখিল, সুশীল কোন্‌স্থানে লাফাইয়া পড়িল, তার পর কিছুক্ষণ তাহাকে দেখা গেল না। বড় নৌকাখানি হইতে তখনও কান্নার রোল ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল।

সুশীলকে জলের উপর একবার ভাসিয়া উঠিতে দেখা

গেল। অমনি সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ঐ যে, ঐখানে।" সুশীল আবার ডুব দিল।

আবার কিয়ৎক্ষণ কাটিল। সেই উৎকণ্ঠা, সেই কান্নার রোল, সেই চারিধারে উদ্বেগের লক্ষণ। বড় নৌকা হইতে একজন কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, যে স্থানে বালিকাটী পড়িয়াছিল, সেই স্থান সে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। সকলে ভাবিল বুঝি এইবার বালিকার উদ্ধার হইবে।

উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের মধ্যে হঠাৎ দূরে জলের উপরে সুশীলের মাথাটী দেখা গেল, সূর্য্যের কিরণে চিক্ চিক্ করিয়া ভাসিতেছে। মনে হইল যেন সে কি একটা ভারি দ্রব্য টানিয়া আনিতেছে, অতিকষ্টে সন্তরণ দিতেছে; একটা হাত দিয়া সে সাঁতার কাটিতেছে, আর একটা হাত তার জলের মধ্যে। এক মুহূর্ত্তপরে সুশীলের সমস্ত দেহটা ভাসিয়া উঠিল, তাহার হস্তে একটা কাপড়ের পুটুলী। ঐ যে, ঐ বালিকা! চারিদিক্ হইতে আনন্দ ও বিস্ময়ের ধ্বনি উত্থিত হইল।

সুশীল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া এক হস্তে বড় নৌকাখানির দাঁড় শক্ত করিয়া ধরিল এবং অপর হস্তে বালিকাটীকে নৌকায় উঠাইতে সাহায্য করিল। এত সত্বর এতগুলি কার্য্য সম্পন্ন হইল যে সকলে বিস্মিত নেত্রে সুশীলের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বালিকার পিতা আবেগকম্পিত কণ্ঠে সুশীলের হস্তধারণ করিয়া বলিল,—"বাবা, আজ তুমি যে আমার কি উপকার করিলে তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। কিছুক্ষণ নৌকায় থাকিয়া বিশ্রাম কর।"

সুশীল অধিকক্ষণ সেখানে রহিল না। আসিবার সময়ে বালিকার মাতা তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। সুশীল চরে আসিবার পূর্ব্বে দেখিয়া আসিল বালিকাটী প্রায় সংজ্ঞালাভ করিয়াছে। বালিকাটী সুন্দরী ও সুশ্রী বটে, মুখে, চোখে তার একটা মধুর লাবণ্য।

সুশীল চর হইতে দেখিল বড় নৌকাখানি আবার পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্গীত লহরীতে ভাসিতে ভাসিতে তরঙ্গের তালে তালে নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইল।

"সুশীলদা, এইবার আমাদের আর খানিকটা নৌকা চড়িয়ে বেড়িয়ে নিয়ে এস, তারপর বাড়ী ফেরা যাবে, কেমন?" এই বলিয়া সন্তোষ সুশীলকে টানিয়া লইয়া আসিল। কথাটা শুনিয়াই অমলা ধমকাইয়া বলিয়া উঠিল,—"কি যে বলিস্ সন্তোষ, দেখছিস্ না সুশীলদার কাপড় চোপড় এখনও ভিজে জবজবে। এখনি বাড়ী চল সুশীলদা।"

জমীদারবাড়ীর ঘাটে সন্তোষ ও অমলাকে নামাইয়া দিয়া সুশীল গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। সে কিন্তু বাটী ফিরিল না, বনের ধার দিয়া অগ্রসর হইয়া সূর্য্যের উত্তাপ লাগে এমন একটী স্থান বাছিয়া লইয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপরে উপবেশন করিল। তখনও তাহার কাপড় জামা হইতে টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। নৌকার সেই মধুর সঙ্গীতধ্বনি তখনও তাহার কাণে বাজিতেছিল। আজ তাহার মন এক নূতন ছন্দে ভরপুর। সুশীল আনন্দাতিশয্যে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। তাহার মন আজ বিপুল আনন্দে পূর্ণ। "ভগবান্, আজ আমার যেন আনন্দে নাচতে ইচ্ছা করছে।" এই বলিয়া সুশীল যুক্তকরে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিল। আজ তার কি আনন্দ! অমলা তীর হইতে তাহার অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখিয়াছে, চারিদিকের প্রশংসাধ্বনি শুনিয়া নিশ্চয়ই সে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়াছে, তারপর তার সেই কারুণ্য মাখা কথা—"সুশীলদা, কাপড় চোপড় ছেড়ে ফেল গিয়ে।" সুশীল আনন্দে বুঝি কাঁদিয়া ফেলিল।

সুশীল আবার বসিল, বসিয়াই আনন্দের আতিশয্যে সে এক বিরাট্ হাস্য করিয়া বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। অমলা নিশ্চয়ই তাহার কার্য্য দেখিয়াছে এবং দেখিয়া নিশ্চয়ই সে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। "অমলা অমলা! তুমি জান কি দিন দিন কেমন ধীরে ধীরে আমার সত্তা তোমার মধ্যে মিশিয়ে যাচ্ছে।" আহা, সুশীল যদি অমলার ভৃত্য হইত, যদি তাহার দাস হইত, তাহার অঞ্চল দিয়া অমলার সারা পথের ধূলি সে ঝাড়িয়া দিত, এবং সে আর কি করিত! সেই অমলার চলা পথের প্রতি ধূলিকণা গায়ে মাখিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া সারাপথ চুম্বনে ভরিয়া দিত। "অমলা, অমলা!" সুশীল চীৎকার করিয়া উঠিল। সুশীল কি পাগল হইয়া গেল?

সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কেহ ত নিকটে নাই। যাক্ বাঁচা গেল, কেহই তার পাগলামি শুনে নাই। সে ধীরে ধীরে প্রস্তরের উপরে সংলগ্ন শেওলা ছাড়াইতে লাগিল এবং গাছের একটা ছোট ডাল ধরিয়া আবেগভরে চুম্বন করিতে লাগিল। অমলা কিন্তু তাহার দিকে তাকাইয়া কিছু বলে নাই ত! না, অমলার সেরূপ ধরণ নয়। সে তো তাহার দিকে অপলক-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, আর সে চাহনিতে কি মাধুর্য্য! গণ্ডে তাহার রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, না।

ক্রমে রৌদ্র গড়িয়া গেল, সুশীলের বড় শীত করিতে লাগিল। সে দৌড়াইয়া গিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

সেদিন বিপিন জমীদার বাটীতে বেড়াইতে আসিয়াছে। জমীদারের ছেলে, খামখেয়ালী; আসিয়াই সে দুপুরবেলায় সুশীলের বাবার কল-ঘরে প্রবেশ করিয়া কলটা চালাইয়া দিয়াছে। কল চলার শব্দ শুনিয়াই সুশীলের পিতা কলঘরে আসিয়া দেখে কলটা জখম হইয়াগিয়াছে, সারাদিন পরিশ্রম করিয়া পিতাপুত্রে কলটা মেরামত করিয়াছে।

পথে অমলার সহিত বিপিনকে আসিতে দেখিয়াই সুশীল চীৎকার করিয়া বলিল—"বিপিনবাবু, আমরা গরীব লোক আমাদের উপর এ অত্যাচার কেন? আমরা ত আপনার কোনও অনিষ্ট করতে যাই নি। কাল আপনি খালি কলটাকে এমন ভাবে চালিয়ে দিলেন যে আর একটু হলেই ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। কাল সারা দিন পরিশ্রম করে বাবা কলটা মেরামত করেছেন।"

বিপিন রুক্ষকণ্ঠে উত্তর দিল—"আমি কেমন করে জানব যে কলটা খালি ছিল।"

রাগে সুশীলের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। এক চড়ে সে বিপিনের মাথাটা ঘুরাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু অমলা কি ভাবিবে।

বিপিনের অন্তরালে গিয়া অমলা সুশীলের হাত টানিয়া ধরিয়া বলিল—"সুশীলদা, বিপিনদার কাজের জন্য আমি ক্ষমা চাইচি।"

"কিন্তু বিপিনবাবুর নিজে ক্ষমা চাইলে ভাল হ'ত না কি, অমলা?"

"ভাল হ'ত বটে, কিন্তু সে কি প্রকৃতির ছেলে তা ত' তুমি জান, সুশীলদা।"

কিছুক্ষণ থামিয়া অমলা আবার বলিল—"তোমায় অনেকদিন দেখি নি, না সুশীলদা।"

সুশীল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অমলার মুখপানে চাহিল। অমলা কি বলিতেছে, সে কি সেই রবিবারের ব্যাপার সব ভুলিয়া গিয়াছে! সুশীল উত্তর করিল—"কেন, গত রবিবারই ত দেখা হয়েছিল, মনে নেই?"

"হাঁ, মনে পড়েছে, ঐ যে একটী বালিকাকে উদ্ধার করতে তুমি সাহায্য করেছিল। তুমিই কি তাকে প্রথম দেখতে পেয়েছিলে?"

"আমি শুধু প্রথম দেখি নি, অমলা, আমিই তাকে প্রথম টেনে তুলেছিলাম।"

অমলা মনে মনে কি যেন বলিল, অস্পষ্টভাবে তাহার ঠোঁট দুটি নড়িল মাত্র। তারপর সুশীলের দিকে তাকাইয়া বলিল—"যাক্ ও সব কথা, আমি তা হ'লে যাই এখন সুশীলদা।" এই বলিয়াই অমলা বিপিনের সঙ্গে মিলিত হইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল।

অমলার ব্যবহারে সুশীলের বাস্তবিকই রাগ হইল। সে চঞ্চল পদবিক্ষেপে নদীর পাড় দিয়া বনের ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে কতক্ষণ ঘুরিয়াছিল, তাহার মনে নাই। ফিরিতেই সে দেখিল একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া অমলা একা অঝোরে কাঁদিতেছে। অমলার কি হইল? সে কি পথে পড়িয়া গিয়া ব্যথা পাইয়াছে? সুশীল অমলার নিকট গিয়া সান্ত্বনার সুরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে অমলা?"

অমলা এক পদ অগ্রসর হইল, তাহার দুই হাত দিয়া সুশীলের একখানি হাত ধরিয়া তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। তাহার চক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তারপর সে যেন আপনাকে সামলাইয়া লইয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া বলিল —"কই, কিছু ত হয় নি, সুশীলদা। এই পথ দিয়ে একা যাচ্ছিলাম, পায়ে কাঁটা ফুটে গিয়ে ব্যথা পেয়েছি।" অমলা কিন্তু এটা মিথ্যা বানাইয়া বলিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অমলা বলিল—"সুশীলদা, আমার মুখের পানে তখন তুমি অমনভাবে চেয়েছিলে কেন? না, না,

তোমার ঐ দৃষ্টি আমি সইতে পারি না। তুমি কিছু বল্‌বে, সুশীলদা?"

সুশীল ভাঙা ভাঙা স্বরে উত্তর দিল—"আমি কি বল্‌ব' নিজেই যে বুঝি না অমলা!"

"কি বলিষ্ঠ দেহ তোমার, কি সুন্দর গড়ন তোমার সুশীলদা!" এই কয়টি কথা বলিতেই অমলার যেন লজ্জা হইল, সে আর কিছু বলিতে পারিল না। সুশীল অমলার হাত দুটী নিজের হাতে ধরিতে যাইতেছিল। অমলা একটু সরিয়া গিয়া আপনাকে সামলাইয়া বলিল—"আমার কিছু হয় নি, সুশীলদা। মাথাটা বড় গরম লাগছিল কি না, তাই একটু বাতাসে বেড়াতে এসেছিলাম। আমি যাই এখন সুশীলদা!"—বলিয়া অমলা আর অপেক্ষা না করিয়াই গৃহের দিকে যাত্রা করিল।

তিন

কবি

সুশীল আবার শহরে চলিয়া গিয়াছে। প্রায় তিন বৎসর কাটিয়া গেল, সুশীল বি-এ অনার্স পাস করিয়া সাহিত্যে এম্‌-এ পড়িতেছে। কবিতা ও গান লেখায়ও সে বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। "পরীরাজ্যের রাণী" নামে একটী ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক সে লিখিয়াছে, সকল কাগজেই উহার প্রশংসা বাহির হইয়াছে। তারপর বয়েক মাস হইল "প্রেমের পসরা" নামে আর একখানি কাব্য সে প্রকাশিত করিয়াছে, সাহিত্যিক মহলে ইহাতে তাহার নাম বিশেষ সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে।

ঢাকা ও কলিকাতার মাসিকপত্রিকাদিতে এই কবিতাটীর বিশেষ প্রশংসা হইল। তারপর যখন সুশীলের "প্রেমের পসরা" গ্রন্থে বাহির হইল—

প্রেম একটা সুখস্বপ্নের মত রজনীর অন্ধকারে শ্রান্ত ইন্দুর ম্লান কর-লেখার মধ্যে কুসুমের সুরভি নিঃশ্বাসে কোন্‌ অজ্ঞাত পুলক জাগাইয়া তুলে, সে প্রেম-স্নিগ্ধ আলোকের মত নব বিকসিত প্রাণের তীরে স্বপ্নের তরী আনিয়া উপস্থিত করে, সে প্রেম ভুজঙ্গের জীবন জড়াইয়া যেন মরণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া যায়। সে প্রেম নিষ্ঠুর অদৃষ্টের মত কখনও কাঁদে, কখনও হাসে, তবু জীবন-মরণ যেমন অদৃষ্টের পায়ে লুটাইয়া থাকে, পরাণও তেমনি সেই প্রেমের রাজীবচরণে লুটাইতে থাকে। তারপর সেই প্রেম এক সূর্য্যালোকবিভাসিত সুন্দর প্রভাতে প্রস্ফুটিত কুসুম-সৌরভ বহিয়া প্রেমিকের প্রাণে একটা চঞ্চল পুলক, একটা রঙীন স্বপ্নের সৃষ্টি করিতে থাকে। এই ভাবটা লইয়া সুশীল "প্রেমপসরা" কাব্যে একটা কবিতা লিখিয়াছিল।

এই কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে সুশীল সাহিত্যিক-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করিল।

ভাদ্রমাস। বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমন সূচিত হইয়াছে। ঢাকায় যে পথটী শহর হইতে নদীর ঘাটে গিয়া পড়িয়াছে, সেই পথটীই ছিল সুশীলের বেড়াইবার প্রধান স্থান। পথের দুধারের প্রশস্ত বৃক্ষশ্রেণী পথটাকে বেশ স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আকাশে কালো মেঘের স্তর সারি দিয়া আসিয়াছে, এখনি বুঝি বৃষ্টি আসিবে। সুশীল হন্‌ হন্‌ করিয়া ঘাট হইতে ওয়ারীর পথ ধরিয়া চলিয়াছিল, এখনও অনেকটা পথ বাকী। তাহাকে টীকাটুলিতে এক আত্মীয়ের বাসায় যাইতে হইবে।

ও কে? অমলা বলিয়া না বোধ হইতেছে? ঐ যে র‍্যান্‌কিন ষ্ট্রীটের পাশের গলি দিয়া বাহির হইতেছে? সুশীলের ভুল হয় নাই, নিশ্চয়ই সে অমলা। সুশীলের হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে শুনিয়াছিল বটে অমলা ও সন্তোষ ঢাকা শহরে তাহাদের মামার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছে। কিন্তু অমলার মামারা এত বড়লোক যে সুশীলের সেখানে গিয়া সন্তোষ কি অমলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস হয় নাই। এমন কি পথে সন্তোষের সহিতও তাহার দেখা হয় নাই। সুশীল আপনাকে সামলাইয়া লইয়া অমলার নিকটবর্ত্তী হইল। অমলা কি তাহাকে চিনিতে পারিল না? চিন্তান্বিত অমলা মনে দ্রুত পথ চলিতেছে বলিয়া মনে হইল। অমলা পথে একা কেন? যদিও ঢাকার ওয়ারী প্রভৃতি অঞ্চলে স্ত্রীলোকদিগের পথে অবাধ যাওয়া-আসা এবং বড় ঘরের মেয়েরাও হাঁটিয়া পথ চলিতেই ভালবাসেন, তথাপি সুশীল বুঝিতে পারিল না বড়লোকের কন্যা অমলা কেন একাকিনী পথে চলিতেছে। যাহা হউক সে নিকটে গিয়া ডাকিল, "অমলা, ভাল আছ তো?"

"আছি" বলিয়াই অমলা পাশ কাটাইয়া চলিল। সুশীলের পা কাঁপিয়া উঠিল, সে প্রতিজ্ঞা করিল, আর

সে পথে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিবে না, মাটির দিকে চোখ রাখিয়া পথ চলিবে। হঠাৎ ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আসিল। সুশীল হস্তস্থিত ছাতাটী মাথায় দিয়া দ্রুতপদে চলিয়াছিল। তেমাথায় ফিরিবার মুখে সুশীল উপরের দিকে তাকাইয়া দেখিল অমলা বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ওয়ারীর বালিকা-বিদ্যালয়ের বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বিদ্যালয়টী একতলা, কিন্তু সম্মুখের বারান্দাটী বেশ প্রশস্ত, বৃষ্টির ছাট গায়ে লাগিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। অমলা চারিদিক্ দেখিয়া ধীরে ধীরে হাত নাড়িয়া সুশীলকে ডাকিল। সুশীল বারান্দায় যাইতেই অমলা একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া অমলা বলিল, "সুশীলদা, তোমাকে দেখে এত আহ্লাদ হচ্ছে!" তারপর সে নিজের মনেই যেন বলিতে লাগিল— "এই সামনে আমার এক সইয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম, সন্তোষ সঙ্গে ছিল। বৃষ্টি আস্‌ছে দেখে তাকে বাড়ী থেকে একটা ছাতা আন্‌তে পাঠালাম, কিন্তু তার আস্‌বার নামটী নেই। এদিকে আকাশ কালো করে এলো দেখে আমি তাড়াতাড়ি বাড়ীতে চলে যাব ভেবে পথে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের বাড়ী ত আর বেশী দূর নয়। ঐ যে বড় রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, ওর দুটো তিনটে বাড়ীর পরেই সেনেদের বড়বাড়ী, ঐটাই আমার মামার বাড়ী।

সুশীলের হৃদয়টা দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল; না, বুকটা ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে যেন কি বলিতে চাহিতেছিল, কিন্তু পারিল না। একবার ঠোঁটদুটী তার নড়িয়া উঠিল, কিন্তু কোনও কথা বাহির হইল না। চারিদিক্ হইতে কি যেন একটা সৌরভ আসিয়া তাহার মন মুগ্ধ করিতে লাগিল। অমলার পরিচ্ছদ হইতে কি, না তাহার উজ্জ্বল অঙ্গ হইতে?—সুশীল বুঝিতে পারিল না। অমলার মুখের দিকে তাকাইতেও পারিতেছিল না। কেবল অমলার সুগোল হাত দুখানি তাহার চক্ষে পড়িতেছিল। হঠাৎ অমলার হাতে একজোড়া সুন্দর হীরার বালার ওপর সুশীলের দৃষ্টি পড়িল। পূর্ব্বে ত কখন সুশীল অমলার হাতে এ বালাজোড়া দেখে নাই।

অমলা বলিল—"প্রায় এক সপ্তাহ আমি ঢাকায় এসেছি, কিন্তু তোমায় ত কোথায়ও দেখি নি সুশীলদা। তুমি এখন একজন মস্ত মানুষ হয়ে উঠেছ!" সুশীলের একবার ওষ্ঠ নড়িল, কিন্তু সে কিছু বলিতে পারিল না। বোধ হয় তাহার বলিবার ইচ্ছা ছিল—"তোমার কাছে যেতে আমার সাহস হয় না, অমলা!"

তারপর কিছু সামলাইয়া লইয়া সুশীল বলিল— "আমি জান্‌তাম তুমি ঢাকায় এসেছ। কতদিন এখানে থাকবে, অমলা?"

"বোধ হয় আর বেশী দিন নয়, পূজার পূর্ব্বেই দেশে যাব।"

"দয়া করে যে আমায় ডেকে কথা বলেছ, তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ, অমলা!"

অমলা নিরুত্তর। তাহার মুখখানি একটু রক্তিম হইয়া উঠিল। তারপর ঈষৎ হাসিয়া অমলা বলিল—"বৃষ্টি প্রায় ধ'রে এসেছে, সুশীলদা। আমার মামার বাড়ীতে আমায় এগিয়ে দেবে? তোমার সঙ্গে ছাতি রয়েছে কি না তাই বলছি। ঐ যে, বেশী দূরও আর নয়।"

"চল, অমলা।"

উভয়ে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। তখন ঘন মেঘে অন্ধকার করিয়াছিল বলিয়া লোকের চলাচল এক রকম ছিল না বলিলেই হয়। একটী ছাতার মধ্যে দুই জনকে যাইতে হইতেছিল বলিয়া অমলা মাঝে মাঝে সুশীলের গায়ের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। অমলা অনুনয়-জড়িত কণ্ঠে বলিল—"সুশীলদা, ক্ষমা করো। কি করব', দামী বেনারসী সাড়ীটা বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে গিয়ে তোমার গায়ে পড়ে যাচ্ছি।"

সুশীলের প্রাণের তারে এ নব ভাবের গুঞ্জন ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল। এই অননুভূত স্পর্শে মাঝে মাঝে তাহার মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিতেছিল। সে মনটা অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য বলিল—"অমলা, তোমার গায়ে নূতন গয়না যে, বিয়ের জন্য কি ঢাকায় এসেছ?"

"আর তোমার সুশীলদা? শুনলাম তোমার বিয়ে নাকি একেবারে ঠিকঠাক! কে যেন আমায় একথা বলেছিল, এখন আমার তার নাম মনে পড়ছে না। তুমি এখন মস্ত কবি, কাগজে-কাগজে তোমার

নাম, কত লোকে তোমার কথা বলে।" এই বলিয়া অমলা সুশীলের পানে চাহিয়া একটু মুচকে হাসিল।

"হাঁ, কয়েকটা কবিতা লিখেছিলাম। তা তুমিত দেখ নি অমলা।"

"না সুশীলদা, একটা গোটা বই, আমি শুনেছি।"

"হ্যাঁ, একটা ছোট বই বটে!"

অমলার মামার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইতেই হঠাৎ সুশীল অমলার একখানি হাত ধরিয়াই বলিয়া উঠিল—"তা হলে অমলা তোমার বিয়ের সব ঠিকঠাক? আমি তোমার ছেলেবেলার খেলার সাথী আমাকেও কিছু জানতে দিলে না?"

অমলা ধীরে ধীরে হাতখানি টানিয়া লইল, তারপরে সুশীলের দিকে তাকাইয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল—"আমার বিয়ের কথা সম্বন্ধে ত এখন আলোচনা করার প্রয়োজন নেই, সুশীলদা।"

অমলার কথা বোধ হয় সুশীলের কাণে প্রবেশ করিল না। সে বলিতে লাগিল—"আমি জানতাম অমলা যে বিপিনের সঙ্গেই তোমার বিয়ে ঠিক হবে। আমি বুঝি এত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখা আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছিল। আমি তোমার পিতার একজন সামান্য প্রজার সন্তান! আমার পক্ষে—উঃ একেবারে অসম্ভব! আমি এখনও বুঝছি না কেমন করে তোমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে আমি সাহস পাই? কিন্তু, কিন্তু, অমলা...। যাক্, এক বছর দূরে থাকায় আমার উপকার হয়েছে। আমি আর এখন শিশু নই, আমি বুঝতে পেরেছি তোমার আমার মধ্যে দূরত্ব কতটা। আজ তাই সাহস করে তোমায় সব কথা বলে যেতে চাই। রাগ করছ অমলা?"

অমলা ছোট করিয়া উত্তর দিল—"না।"

সুশীল উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তবে আমি সব কথা বলতে পারি অমলা? তোমার এই দয়ার জন্য শত ধন্যবাদ! তুমি যদি জানতে অমলা তোমার কথা ভাবতে আমি কত সুখ পাই। সত্যি বলছি তোমার কথা ছাড়া আর কোনও চিন্তা আমার মনে স্থান পায় না। যারই সঙ্গে কথা কই কিংবা যারই কথা শুনি সব সময়ে কেবল মনে জাগে অমলা সব চেয়ে রূপসী! জানি, জানি, অমলা, আমি তোমার কাছ থেকে কত দূরে সরে যাচ্ছি, কিন্তু তবু এই কথা মনে ভেবে আনন্দ পাই যে তুমি আমার খেলার সাথী ছিলে, তুমি এখনও মাঝে মাঝে আমার কথা চিন্তা কর, আমায় দয়া করে স্মরণ কর। হয়ত আমার কথা তোমার মনে পড়ে না, কিন্তু তথাপি সন্ধ্যার পরে যখন একলা ঘরে বসে থাকি তখন যে এই কথা ভেবেই আনন্দ পাই যে, তুমি মাঝে মাঝে আমায় স্মরণ কর। তুমি বুঝতে পারবে না, অমলা, সে কল্পনায় কি সুখ! স্বর্গসুখ তার কাছে কোন্ ছার! আমি তোমার উদ্দেশে কবিতা লিখেছি, যা কিছু পয়সা সংগ্রহ করতে পারতাম তাই দিয়ে ফুল কিনে এনে তোমার ছেলেবেলার ফটোখানি মনের মতন করে সাজিয়ে অপলকনেত্রে তার পানে চেয়ে রয়েছি। আমার সমস্ত কবিতা তোমারই বন্দনাগান, অমলা! কিন্তু তুমি বোধ হয় তার একটাও পড়নি অমলা! তা যদি পড়তে তা হলে জানতে পারতে আমি তোমার কাছে কত ঋণী! তোমারই স্মৃতিতে আমি ভরপুর হয়ে থাকি, তোমারই চিন্তায় আমি সুখ পাই। আমি আর একখানি বড় কাব্য আরম্ভ করেছি, অমলা, তাও তোমারই অর্ঘ্যরচনা! দিনের প্রতিক্ষণে আমি এমন কিছু দেখি কিংবা এমন কিছু শুনি যাতে তোমার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। জান, অমলা, আমার শয্যার নিকটে দেওয়ালের গায়ে তোমার নাম অতি সংগোপনে লিখে রেখেছি, আমি শুয়ে শুয়ে তা দেখতে পাই। আর কেউ তা দেখতে পায় না, এমন গুপ্তভাবে আমি তা লিখেছি। ঐ তিন অক্ষরে নামটী দেখতে দেখতে আনন্দে আমার প্রাণ মশগুল্ হয়ে উঠে, তোমার উদ্দেশে উৎসের ধারার মত কবিতার ফোয়ারা আপনি বেরিয়ে আসে! যদি দেখতে সে সব অন্তরের অকুণ্ঠ উপহার!"

"তবে দেখবে সুশীলদা সে অর্ঘ্য আমার কাছে পৌচেছে কি না? এই দেখ। কোন্ মাসিকপত্রে যেন এ কবিতাটা বেরিয়েছিল! প্রথমে এটা দাদামণির চোখে পড়ে, তিনিই আমায় দেখতে দেন। লজ্জায় আমি তখন ভাল করে পড়তে পারছিলাম না। কিন্তু রাত্রিতে একলা দ্বাররুদ্ধ করে বার বার পড়েও আমার সাধ মিটছিল না। তারপর সে পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে—এই আমার বুকের মধ্যে রেখে

দিয়েছি। ওঃ, কত আনন্দই না সে রাত্রে আমার হয়েছিল!"

এই বলিয়া অমলা ব্লাউসের ভিতর হইতে অনেক ভাঁজে মোড়া একখণ্ড ছাপা কাগজ বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া সুশীলের নয়নসমুখে ধরিল। সুশীল দেখিল সত্যই তাহার একটী ছোট কবিতা, তাহার মানস-সুন্দরীর উদ্দেশ্যে লিখিত। তাহার হৃদয়ের সরল ও আবেগময় উচ্ছ্বাস, যাহার তরঙ্গ হৃদয়ের দুই কূল ছাপাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়াছে। সুশীলের মনটা আনন্দে ভরিয়া গেল, ঐযে তাহার বন্দনা-গানটী তাহার আরাধ্যদেবীর নিকটইত পৌছিয়াছে; ঐযে সযত্নরক্ষিত কাগজখানি, উহার প্রতি ভাঁজে অমলার দেহের সৌরভ মাখান রহিয়াছে! সুশীল প্রীতিপূর্ণ স্বরে অমলাকে কহিল—"হাঁ, অমলা, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি এ কবিতাটী লিখেছিলাম বটে! সে একদিন রাত্রে আমি এক দেবীমূর্ত্তির ধ্যানে বসেছিলাম, জানালার চারিধারে তখন জ্যোৎস্নাতরঙ্গ নেচে নেচে খেলা করছিল, আর সম্মুখের ঝাউগাছগুলি মৃদু মধুর ধ্বনি করতে করতে যেন কাকে ডাক্‌ছিল—"আয়, আয়, আয়।" অমলা, তোমায় শত ধন্যবাদ, তুমি যে আমার কবিতাটী এত যত্নে রেখেছ!"

আবেগে সুশীলের গলার স্বর নামিয়া আসিল—"আজ, তোমার সঙ্গে পাশে পাশে চলেছি, অমলা, তোমার স্পর্শ অনুভব করছি, আর পুলকে আমার মন-প্রাণ ভরে উঠছে। অনেক দিন যখন একাকী বসে বসে তোমার চিন্তায় বিভোর থাকি তখন কল্পনা করেছি যেন তোমার কাছে আছি; সে কল্পনায় আমার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠে, কিন্তু আজ ত তা হচ্ছে না। এবার যখন বাড়ী ছিলাম, তখন তোমায় বড় সুন্দরী দেখে এসেছি, কিন্তু আজ তোমায় তার চেয়েও শতগুণে সুন্দরী, অপূর্ব্ব সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে। কি সুন্দর চোখ, কি টানা টানা ভ্রূ, কি মিষ্টি হাসি,—না, তোমার সব সুন্দর, অমলা?"

অমলা ঈষৎ হাসিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে সুশীলের দিকে তাকাইল। তারপর আনন্দের প্রাবল্যে বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতসারেই সুশীলের একখানি হাত ধরিয়া অমলা বলিয়া উঠিল—"তোমার এ প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ সুশীলদা।"

"ধন্যবাদ, অমলা, ধন্যবাদ?" সুশীল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল। সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠস্বরে বলিতে লাগিল—"ধন্যবাদ শুধু অমলা? আঃ, তুমি যদি আমায় ভালবাসতে! একবার না হয় বল যে বাস্‌লে, নাইবা বাস্‌লে তবু মিথ্যে করে বল যে ভালবাস! আমি সত্যি বলছি আমি অনেক বড় কাজ করব, অনেক খ্যাতি লাভ করব! তুমি জাননা অমলা আমি কত বড় কাজ করতে পারি! আমি মাঝে মাঝে এ বিষয়ে চিন্তা করি এবং আমার মনে হয় আমার দ্বারা অনেক বড় কাজ হতে পারে। অনেক সময়ে এই চিন্তা আমায় পাগল করে তোলে এবং আমি সেই কল্পনার ভারে উত্তপ্তমস্তিষ্কে ঘরের ভিতরে পায়চারি করে বেড়াই! আমার পাশের ঘরে আমার আত্মীয়ের এক ছেলে শয়ন করে, আমার প্রলাপে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, সে রাগে আমার ঘরে তেড়ে আসে। তার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে ঠাণ্ডা করি! কিন্তু তাতেও আমি শান্ত হতে পারি না, কারণ তোমার চিন্তায় আমাকে এত ভরপুর করে দেয় যে সত্যি মনে হয়, অমলা, তুমি আমার কাছে রয়েছ! আমি জানালার ধারে গিয়ে গান করতে থাকি, তখন বাইরের জ্যোৎস্নায় ঝাউগাছগুলা নাচতে থাকে, আর হাত নেড়ে নেড়ে যেন তোমারই কথা বলতে থাকে। তখন মনে পড়ে তুমি নিদ্রা যাচ্ছ। "অমলা, শান্তিতে থাক" এই কথা বলে আমি শুতে যাই। রাত্রির পর রাত্রি এই রকম উন্মত্তের মত জেগে থাকি। কিন্তু স্বপ্নেও ত ভাবি নি অমলা তুমি এত সুন্দরী! এখন থেকে এইরূপই আমার ধ্যান হবে, তুমি চলে যাবার পর অমলা, ঐরূপই আমি ধ্যান করব।........."

অমলা সুশীলের কথার স্রোত অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য বলিল—"সুশীলদা, এবার পূজার বাড়ী যাবে না? পূজার পূর্ব্বেই ভাদ্র মাসেই ত তোমার এম্‌-এ পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে?"

"হাঁ, তবুও বোধ হয় যাওয়া হবে না। না, না, যাব। তুমি বলছ? যাব, নিশ্চয়ই যাব। তুমি যেখানে যেতে বলবে সেইখানেই যাব, অমলা। তোমার বাড়ীর বাগানে তুমি কি পূর্ব্বের মত বেড়িয়ে বেড়াও, অমলা! সন্ধ্যার সময়ে আগের মতন? তা হলে মাঝে মাঝে আমি তোমায় দেখতে পাব; আর কিছু চাই না, শুধু দেখা, অমলা।

একবার মুখ ফুটে বল, অমলা, তুমি আমায় এ সুখ থেকে বঞ্চিত করবে না। জান, এক রকম গাছ আছে যার জীবনে একবার ফুল ফোটে, আমারও তেমনি ফুল ফোটাবার সময় এসেছে। যদি এখন সে ফুল ফুটল' তো ভাল, নইলে আজীবন শুষ্ক পুষ্পহীন তরুর দশা! হাঁ আমি বাড়ী যাব, কিছু টাকা যোগাড় করে নিশ্চয়ই যাব। আমি যে বই খানা লিখছি, সেইটে বিক্রী করে—যে দরে পাই তাইতে বিক্রী করেই—যাব! তুমি বাড়ী যেতে বল্‌ছ' অমলা?"

অমলা ছোট করিয়া বলিল—"হাঁ।"

"অমলা, সুখে থাক। ক্ষমা করো তোমায় অনেক কথা বলেছি। আমি অনেক কল্পনা করি, অনেক আশা করি, তাই এই প্রলাপ বকি। এ অসম্ভবকে সম্ভব বলে ভাবতেও যে সুখ আছে, অমলা। যদি জান্‌তে অমলা আজ আমার কি সুখের দিন!......"

অমলা শুনিল তাঁহার মামার বাড়ীর ফটক হইতে কাহার যেন বাহির হইবার পদশব্দ! অমলা বলিল—"এখন যাই তবে সুশীলদা?

"যাবে, অমলা? তবে যাবার আগে একবার বলে যাও তুমি আমায় ভালবাস! একবার তোমার সে মধুর কথা শুনে প্রাণ জুড়াই! আমি তোমায় সব চেয়ে ভাল বাসি, অমলা, এবং ভালবেসেই তৃপ্তি পাই! তুমি কি কিছু বল্‌বে না, অমলা?"

অমলা নিরুত্তর। সুশীল অস্থিরচিত্তে বলিল—"কিছু বল্‌বে না অমলা?"

অমলা কেবল ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"এখন থাক্‌, সুশীলদা।"

অল্পক্ষণ পরে অমলা বলিল—"সকলে বলে সুষমা সেনের সঙ্গে না কি তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে—ঐ সুষমা যাকে তুমি জল থেকে উদ্ধার করেছিলে, সত্যি?"

"পাগল! কে বলে? সে ত একেবারে ছেলে মানুষ। হাঁ, তাদের বাড়ীতে আমি দু-চারবার গিয়েছি বটে। তা, তার বাবা আমায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, অস্বীকার করতে পারি নি। তাদের খুব প্রকাণ্ড বাড়ী, ঠিক তোমাদের মত অমলা!"

"সে ত ছেলে মানুষ নয়, সুশীলদা! আমি সুষমাকে দেখেছি, তার সঙ্গে আলাপ করেছি। তার বয়স প্রায় আমার মতই পনের-ষোল হবে। কি সুন্দর মেয়েটি!"

"আমি তাকে বিয়ে কর্‌ছি না, অমলা। সত্যি বল্‌ছি।"

"সত্যি সুশীলদা?"

"হাঁ সত্যি, কিন্তু একথা তুমি এখন তুল্‌ছ' কেন? তুমি কি আমায় অন্য কথা দিয়ে ভুলাতে চাও?"

"না, সুশীলদা" বলিয়াই অমলা ফটকের ভিতরে অগ্রসর হইল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই আবার ছুটিয়া বাহির হইল এবং সুশীলের একখানি হাত ধরিয়া অতি মধুরস্বরে বলিল—"তোমায় আমি ভালবাসি, সুশীলদা, খুব ভাল বাসি; সারাজীবনে শুধু তোমাকেই ভালবেসেছি" বলিয়াই অমলা ছুটিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ডায়েরীর এক পাতা

[শ্রীতারকচন্দ্র রায় বি-এ]

বেলা ২টার সময় বোলপুরে পৌছিলাম। ৪টার সময় শান্তি-নিকেতনে কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। শরীর দেখিয়া কবিকে বেশ সুস্থ বলিয়া মনে হইল। সেবার ঢাকায় গিয়া তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। বহুদিন পরে আজ তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, তিনি আরও বহুদিন ভারতবর্ষ ও জগতের কল্যাণের জন্য পরিশ্রম করিতে পারিবেন। ভগবান তাঁহাকে নিরাময় করুন।

কবির সহিত অনেক বিষয়ে আলাপ করিবার ইচ্ছা ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "Personal God" এ (ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে) আপনার বিশ্বাস আছে কি? আপনার কবিতার মধ্যে যাহা পাইয়াছি, তাহাতে আমার সংশয় যায় নি।"

কবি কহিলেন, "নিশ্চয় বিশ্বাস করি।"

আমি কহিলাম, "একটা বাস্তব (Concrete) দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার সন্দেহটি আমি প্রকাশ করিব। ভক্ত যখন আবেগ-ভরে ভগবানকে ডাকে, তখন কি সে আবেগ ভগবানকে চঞ্চল করিয়া তোলে, অথবা সে আবেগধারা তিনি অবিচলিতভাবে গ্রহণ করেন? সে আবেগ তাঁহার মধ্যে কোনও তরঙ্গ তুলিতে সমর্থ হয় কি? পুত্র যখন হাত তুলিয়া অসীমের দিকে ছুটিয়া আসে, তখন তাহার চিত্তের আবেগে জননীও চঞ্চল হইয়া উঠেন এবং তিনিও বাহু প্রসারিত করিয়া পুত্রের দিকে অগ্রসর হন। ভক্তের জন্য ভগবানের এই রূপ ব্যাকুলতায় আপনি বিশ্বাস করেন কি?"

কবি কহিলেন, "না। ঈশ্বরের চঞ্চলতায় আমি বিশ্বাস করি না। তাঁর তো চঞ্চল হ'বার কোনও কারণ নাই। জননীর মত তিনি সর্ব্বদাই আমাদের কোলে করে রেখেছেন। আমরা যে তাঁর জন্য চঞ্চল হয়ে উঠি, সে তাঁকে আমরা পাই না বলে। তিনি যে সর্ব্বক্ষণ নিবিড় আলিঙ্গনে আমাদের বদ্ধ রেখেছেন, তাঁর তো চঞ্চল হ'বার কোন কারণই নাই। তাঁকে পাবা'র আমাদের যা কিছু বাধা তা' আমাদের দিক্ হ'তে। তাঁর দিক হ'তে কোনও বাধাই নাই। আমরা তাঁর দিকের সমস্ত জানালা বন্ধ করে আছি, তাই তাঁকে দেখতে পাই না, যখনই জানালা খুলে দি' তখনই তিনি দৃষ্টিগোচর হ'ন। তাঁকে পেতে হ'লে আমাদের নিজেদেরই চেষ্টা কর্ত্তে হবে। কেবল নিজের চেষ্টাতেই তাঁকে পাওয়া যায়, মন্ত্র পড়লে কিছুই সুবিধা হয় না।"

আলোচনায় বাধা পড়িল। কবির নিকট একখানা Visiting Card ভিজিটিং কার্ড আসিয়া উপস্থিত হইল, আমি বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম।

আমার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই আলোচনা বন্ধ হইল। কবির মতে আমার চিত্তের জানালা আমাকেই খুলিতেই হইবে; খুলিলেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। কবির ভাব প্রকাশ করিতে উপমান্তর ব্যবহৃত হইতে পারে। নলের (Pump 'পাম্পে'র) ভিতর যে বাতাস আছে, তাহাকে বাহির করিয়া দিলে, আপনা হইতেই তাহার মধ্যে জল ঢুকিবে। জলকে পাইতে হইলে, জলের উপাসনার প্রয়োজন নাই, বাতাসকে ঠেলিয়া বাহির করিলেই চলিবে। বাতাস ঝিল্লীকে (Valve কে) চাপিয়া আছে বাতাস বাহির হইয়া গেলে জলের চাপে ঝিল্লী-দ্বার খুলিয়া যাইবে এবং জল পাম্পের মধ্যে ঢুকিবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, জল যখন পাম্পের মধ্যে ঢুকিবে, তখন পাম্পকে পাইয়া কি সে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিবে? পাম্পকে পাইবার জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা ছিল কি? পাম্পের মধ্যে বাতাস ছিল বলিয়া সে ঢুকিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু বাতাস বাহির হইয়া যায় এই আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল কি?

ঈশ্বর আমাকে কোলে করিয়া আছেন সত্য। বাতাসও আমাকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া আছে। কিন্তু ঘিরিয়া থাকিলেও আমার জন্য বাতাসের কোনও চিন্তা নাই; ঈশ্বর যে

আমাকে কোলে করিয়া আছেন, সে কি বাতাসেরই মত?

ঈশ্বরের 'ব্যক্তিত্ব' বলিতে আমি বুঝি, ঈশ্বর—যিনি একটী ব্যক্তিবিশেষ Person অর্থাৎ যিনি মানবীয় ভাব-যুক্ত। মানবে Intellect (বোধশক্তি) Emotion (অনুভূতি) ও Will (ইচ্ছাশক্তি) আছে। যে ঈশ্বরে এই তিনটীই নাই, তাহাকে Personal god বলা যায় কি?

ঈশ্বরকে শুধু চিৎস্বরূপ বলিলেই তাঁহাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয় না। বেদান্তের ঈশ্বর চিৎস্বরূপ, কিন্তু তিনি Personal God নহেন। তাঁহাকে আনন্দস্বরূপ বলিলেও, 'ব্যক্তিত্বের' সমস্ত গুণ তাহাতে আরোপিত হইল বলিয়া মনে হয় না। ইচ্ছাশক্তি না থাকিলে ব্যক্তিত্ব বা Personality পূর্ণ হয় না, ইচ্ছা তাঁহাতে আছে কি? যদি তিনি ইচ্ছাময় will হন—তাহা হইলেও জাগ্রত Conscious intelligent will প্রকৃত ইচ্ছাশক্তি—অচেতন ইচ্ছাশক্তি Unconcious will নন—এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি তিনি প্রেমস্বরূপ হন, তবে ভক্তের ব্যাকুলতা তাঁহাকে বিচলিত করিবে না কেন?

দার্শনিক বলিবেন তিনি অসীম (Absolute), তিনি অনন্ত (Infinite), তিনি পূর্ণ (Perfect) তাঁহাতে বিকার সম্ভবপর নয়। তিনি দ্বন্দ্বাতীত, নির্ব্বিকার—তাহাই তাঁহার স্বরূপ। বিকার তাঁহাতে অসম্ভব।

এই Absolute ও Infinite শব্দ দুইটিই যত অনর্থের মূল। Absolute ও Infiniteএর ধারণা আমাদের নাই। তবুও অপরিহার্য্য কারণ (Necessity of reason) বলিয়া আমরা উহা স্বীকার করিয়া লই। সীমাবদ্ধের (finite এর) সঙ্গে সঙ্গে না কি অনন্তের (infinite এর) একটা ধারণা আমাদের হইয়া থাকে; আপেক্ষিকের (relative এর) সঙ্গে সঙ্গে নিরপেক্ষের (absoluteএর) ধারণা জন্মে। কিন্তু এই যে সিদ্ধান্ত-মূলক অপরিহার্য্য ভাব (Theoretical necessity) বার্গসোঁর মতে ইহা ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা (Practical necessity) হইতেই উৎপন্ন। যে বোধশক্তি (Intellect) আমাদিগকে এই absoluteএর অস্পষ্ট ধারণা আনিয়া দেয় তাহার প্রামাণ্য কতটা? বার্গসঁ বলেন, বোধশক্তির সমস্ত শক্তি আমাদের জীবনের প্রয়োজন-সাধনে ব্যাপৃত। বোধশক্তি (Intellect) আমাদিগকে সত্যে পৌঁছিয়া দিতে পারে না। সত্য আবিষ্কারের জন্য তাহা উদ্ভূতই হয় নাই। (Practical) ব্যাপার ব্যবহারিক হইতে তাহাকে বিযুক্ত করিতে না পারিলে তাহার দ্বারা সত্যে পৌঁছিবার আশা দুরাশামাত্র। বোধশক্তি বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যেও ব্যবহারিক, মানুষের কাজে লাগা। বিজ্ঞান জড়জগতে যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহার প্রামাণ্য কতটা? প্রাণ ও চিৎশক্তি তো সে নিয়মে বাঁধা পড়ে না। বিশ্বের প্রাণ বলিয়াই আমরা ঈশ্বরকে জানি। আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণ যে বৈজ্ঞানিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে, বিশ্বের প্রাণরূপী ঈশ্বর কি তাহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? প্রত্যেক প্রাণীজীবন সে নিয়ম অতিক্রম করিতে চায়, পারুক আর না পারুক, তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। মানুষের ইচ্ছাশক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে সেই নিয়মের উপর আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। চিন্তার স্বাধীনতায় (Free willএ) যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে Free-will এর প্রত্যেক কার্য্য এক একটা অপ্রাকৃত বস্তু (miracle) জড়ের নিয়ম, বিজ্ঞানের নিয়ম সেখানে খাটে না। মানুষের ইচ্ছা স্বয়ংপ্রভু। মানুষের will ইচ্ছাশক্তি প্রেমের আকর্ষণে চঞ্চল হইয়া ওঠে, প্রেমের পাত্রকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, ইহা তো আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি; ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহা দেখিয়া আমরা বিস্মিতও হই না কিন্তু বিশ্বপ্রাণ কি প্রেমময় হইয়াও প্রেমের বৈশিষ্ট্য হইতে বঞ্চিত? তিনি যদি প্রেমের আবেগে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসেন, তাহা হইলে কি সেই অগ্রসর হওয়াকে একটা অপ্রাকৃত ব্যাপার বলিয়া অস্বীকার করিতে হইবে?

কবির নিজে গাহিয়াছেন "যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু, দ্বার ভেঙ্গে তুমি এস মোর প্রাণে ফিরিয়া যেওনা প্রভু।" আমার চিত্তের দুয়ার কি আমাকেই খুলিতে হইবে! তিনি কি সে বদ্ধ দুয়ার নিজে ভাঙ্গিয়া কখনও আসিবেন না! ভাঙ্গিলে কি তাহার অসীমত্ব সঙ্কুচিত হয়? সেটা কি নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার! তবে কেন বৃথা উপাসনা! কার উপাসনা!. যাঁহাকে ডাকিলে তিনি শোনেন না, অথবা শুনিয়াও

শোনেন না, যাঁহার জন্য আমার ঐকান্তিক ব্যাকুলতা, তাঁহার উপর বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করিতে পারে না, তাঁহাকে প্রেমময় বলা প্রেম শব্দের অপব্যবহার মাত্র। তাঁহাকে ব্যক্তি বলা, Person শব্দের অপব্যবহার। জড়বাদীরাও জড় জগতের একত্ব স্বীকার করেন ; বিজ্ঞান ও জাগতিক সমস্ত শক্তিকে একই বলিতে অভ্যস্থ। কিন্তু যে শক্তিতে প্রাণ নাই, যে শক্তিকে শুধু সচেতন (Conscious) বলিয়া স্বীকার করিলেই তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হইল না। সেই চিৎশক্তি (Consociousness) যদি জড়ের মতই নিয়মানুগ হয়, যদি তাহার স্বাধীনতা না থাকে, যদি তাহা ইচ্ছাশক্তি-বর্জ্জিত হয়, তবে সে শক্তি আর যাহাই হউক, সে শক্তিধর প্রেমময় ভগবান নহেন। তাহার উপাসনা করা মূর্খতা, তাহার ধ্যান করিলে মানুষের মনে একটা বিরাটের ধারণা হইতে পারে, কিন্তু সে ধারণা বৈজ্ঞানিক জগতের চিন্তাতেও হয়। বৃথাই তাহার জন্য ব্যাকুলতা।

ঘরছাড়া

[শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম-এ]

ওগো ঘরছাড়া !

দু'ধারে তিলের ফুল যে পথে ঘটায় ভুল,

সেই পথে পাই তোর সাড়া।

গর্ব্বিত পদ-ভরে দূর্ব্বা লুটায়ে পড়ে

ফড়িঙেরা বাঁধে যেথা বাসা,

রাতের শিশিরদল ধানশীষে টলমল

সেথায় আমার ভালবাসা

ভিড় করে বার বার ; তাই আজ হ'ব বা'র

তোমার পায়ের ধূলা হেরি'।

দু'ধারে তিলের ফুল ঘটায় মনের ভুল

সাঁঝের আঁধার আসে ঘেরি'।

ধূসর মেঘের সনে সুদূর কাশের বনে

তুমি কেন হ'য়ে যাও হারা ?

তোমার চাদর দেখি ; তোমারে হেরি না এ কি !

পথভোলা হয়ে ঘরছাড়া !

ভেবেছিনু তোমারেই　　শুধাইব কেন এই
কেন ওই রুখু কালো চুল !
একটি পলকে হায়,　　দেখি' যাহা দেখা যায়,
মন মোর কাঁদিয়া আকুল।
ঘরে কি গো সুখ নাই　　এমন আকার তাই—
খালি পায়ে হাঁটো দূর পথ !
আঁকা-বাঁকা বহুদূর　　যেথায় স্বপন-পুর
সেথায় উধাও মনোরথ।
ধূলায় ধূলায় ধাও　　কুলায় ভুলিয়া যাও ;
কোথা' শেষ—ঠিকানা কি নাই ?
মনের পাখাটি মেলে　　কেন ঘর ছেড়ে এলে ?
ভোলা মন, তোমারে শুধাই !

ওগো ঘরছাড়া !
আমার পরাণে ভাই,　　কোথা' কোনো সুখ নাই
বুঝি না কেন বা দিশাহারা !
তোমারে লাগিল মনে,　　জানি না গো অকারণে,
কেন বা সে কেঁদে কেঁদে কয়,—
ঘরে শুধু অভিনয়　　সরল হিয়ার নয়
নীড়বাঁধা দুনিয়ায় রয় !
একটি মুখের ডোল　　তবু তোলে কলরোল,
ঘরে তবু থাকা হ'ল দায় !
দুইটি চোখের নীচে　　পরাণ কাঁদিবে মিছে
কালো কেশে মুরছে বৃথায় !
আমার এ' দ্বিধাভার　　মুছিবে কি এইবার
আমারে করিবে পথহারা ?
মটর-তিলের ফুল　　যে পথে ঘটায় ভুল,
সেই পথে ডাকো ঘরছাড়া !

প্রাচীন-পঞ্জী

নিছনি

(১)

তৃতীয় সংখ্যক সাধনায় কোন পাঠক "নিছনি" শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; তাহার উত্তরে জগদানন্দ বাবু "নিছনি" শব্দের অর্থ "অনিচ্ছা" লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অনিচ্ছা অর্থ নিছনির ব্যবহার কোথাও দেখা যায় নাই। গোবিন্দদাসে আছে "গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি"—স্পষ্টই অনুমান করা যায়, "বালাই লইয়া মরি" বলিতে যে ভাব বুঝায় "নিছনি লইয়া মরি" বলিতেও তাহাই বুঝাইতেছে। কিন্তু সর্ব্বত্র নিছনি শব্দের এরূপ অর্থ পাওয়া যায় না। বসন্তরায়ের কোন পদে আছে—

পরাণ কেমন করে, মরম কহিনু তোরে,
জীবন নিছনি তুয়া পাশ।—

এখানে নিছনি বলিতে কতকটা উপহারের ভাব বুঝায়।

বসন্তরায়ের অন্যত্র আছে—

তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী,
মূলে বিকালাঙ আর কি দিব নিছনি।

এখানে নিছনি বলিতে কি বুঝাইতেছে ঠিক করিয়া বলা শক্ত।

এরূপ স্থলে নিছনি শব্দের সংস্কৃত মূলটী বাহির করিতে পারিলে অর্থ নির্ণয়ের সাহায্য হইতে পারে।

গোবিন্দ দাসের এক স্থলে আছে—

দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই।

এ স্থলে "নিছিয়া" এবং "নিরছাই" এক ধাতুমূলক বলিয়া সহজেই বোধ হয়।

অন্যত্র আছে—

"বরু হাম জীবন তোহে নিরমঞ্ছব
তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ।"

ইহার অর্থ, বরং আমার জীবন তোমার নিকট পরিত্যাগ করিব তথাপি অঙ্গ সমর্পণ করিব না।

আর এক স্থলে দেখা যায়—

"কুণ্ডল পিচ্ছে চরণ নিরমঞ্ছল
অব কিয়ে সাধসি মান।"

অর্থাৎ তোমার চরণে মাথা লুটাইয়া কানের কুণ্ডল ও চূড়ার ময়ূর-পুচ্ছ দিয়া তোমার পা মুছাইয়া দিয়াছে তথাপি তোমার মান গেল না?

এই নির্মঞ্ছন শব্দই যে নিছনি শব্দের মূল রূপ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অভিধানে নির্মঞ্ছন শব্দের অর্থ দেখা যায়— "নীরাজনা, আরুতি, সেবা, মোছা।" নীরাজনা অর্থ "আরাত্রিক দীপমালা সজলশঙ্খ ধৌতবস্ত্র বিল্বপত্রাদি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম—এই পঞ্চ দ্বারা আরাধনা, আরতি।" উহার আর এক অর্থ "শান্তিকর্ম্ম বিশেষ।"

অতএব যেখানে "নিছনি লইয়া মরি" বলা হয়, সেখানে বুঝায় তোমার সমস্ত অমঙ্গল লইয়া মরি—এখানে "শান্তিকর্ম্ম" অর্থের প্রয়োগ।

"দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই"—এস্থলে নিরছাই অর্থে মোছা।

নিরমল কুলশীল বিদিত ভুবন,
নিছনি করিনু তোমার ছুঁইয়া চরণ।

এখানে নিছনি অর্থে স্পষ্টই আরাধনার অর্ঘোপহার বুঝাইতেছে।

"পরাণ নিছিয়া দিই পিরীতে তোমার"—অর্থাৎ তোমার প্রেমে প্রাণকে উপহারস্বরূপে অর্পণ করি।

তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী
মূলে বিকালাঙ, আর কি দিব নিছনি!

ইহার অর্থ বোধ করি নিম্নলিখিত মত হইবে—তোমার প্রেমে যখন আমি সমূলে বিক্রীত হইয়াছি তখন বিশেষ করিয়া আরাধনাযোগ্য উপহার আর কি দিব?

বর্ত্তমান প্রচলিত ভাষায় এই "নিছান" শব্দের ব্যবহার আছে কি না জানিতে উৎসুক আছি ; যদি কোন পাঠক অনুগ্রহ করিয়া জানান ত বাধিত হই। চণ্ডিদাসের পদাবলীতে নিছনি শব্দ কোথাও দেখি নাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সাধনা, ১ম বর্ষ চৈত্র ১২৯৮)

(২)

৫ম সংখ্যক সাধনায় ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিছনির যে অর্থগুলি দিয়াছেন প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থে তাহার দুই একটীর ব্যবহার অতি বিরল ; "শান্তি কর্ম্ম বিশেষ" ও 'মোছা' এই দুই অর্থে 'নিছনি'র প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী, কিন্তু 'পরাণ নিছিয়া দিই চরণে তোমার', 'যৌবন নিছনি দি' 'নিছনি'র এই প্রকার প্রয়োগ অত্যন্ত সাধারণ', সুতরাং আমার বোধ হয় মোটামুটী 'উপহার' অর্থেই প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণ 'নিছনি' শব্দ ব্যবহার করিতেন।

কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে 'নিছনি' শব্দের এমন প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায় যেখানে তাহার 'নীরাজনা, আরুতি, সেবা, মোছা ও শান্তি কর্ম্ম বিশেষ' ছাড়াও অন্য প্রকার অর্থ হইতে পারে। নিম্নে দুই একটি উদাহরণ দিতেছি—

"মনেতে করিয়ে সাধ যদি হয় পরিবাদ যৌবন সকল করি মানি
জ্ঞানদাসেতে কয় এমত যাহার হয় ত্রিভুবনে তাহার নিছনি।"

এখানে নিছনি কি গৌরবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? (১)

---

১ এস্থলে "নিছনি" অর্থে পূজা। আমার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি "নির্মঞ্ছন" শব্দের একটি অর্থ আরাধনা। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গোবিন্দদাসের একস্থানে আছে

"সই এবে বলি কিরূপ দেখিনু
দেখিয়া মোহনরূপ আপনে নিছিনু।"

তাহার পরই

'যাচিয়া যৌবন দিব শ্যাম রূপের নিছনি।'

এই শেষোক্ত নিছনি অর্থে 'উপহার' ধরা যাইতে পারে, কিন্তু 'আপনে নিছিনু'র 'আপনাকে ভুলিলাম' এরূপ অর্থ কি অধিক সংগত নহে? (২)

অন্যত্র

'পদপঙ্কজপরি মণিময় নূপুর রুণুঝুনু খঞ্জন ভাষ
মদন মুকুর জনু নখমণি দরপণ নিছনি গোবিন্দদাস।'

এখানে 'নিছনি' 'ভণিতা' স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে কি? (৩)

আর একস্থানে দেখিলাম,

'যশোদা আকুল হইয়া ব্যাকুলি রাইএরে করল কোলে
ও মোর বাছনি জান মু নিছনি ভোজন করহ ব'লে।'

এখানে 'নিছনি' দ্বারা বোধ হয় আশীর্ব্বাদ বুঝাইতেছে। (৪)

ঘনশ্যামদাস রচিত পদের একস্থানে আছে

নয়নে গলয়ে ধারা দেখি মুখখানি
কার ঘরের শিশু তোমার যাইতে নিছনি'। (৫)

আর একটি পদে

'সবার অগ্রজ তুমি, তোরে কি শিখাব আমি বাপ মোর যাইবে নিছনি।' (৬)

এবং

'নিছনি যাইয়ে পুত্র উঠহ এখন কহয়ে মাধব উঠি বসিল তখন।' (৭)

এই শেষোক্ত তিনস্থানে নিছনি কি অর্থে যে ব্যবহৃত হইয়াছে তা বুঝিতেই পারিলাম না। সম্ভবতঃ তিনটি প্রয়োগেরই এক অর্থ।

ভক্তিভাজন উত্তরদাতা উপসংহারে বলিয়াছেন "চণ্ডিদাসের পদাবলীতে নিছনি শব্দ কোথাও দেখি নাই" আমাদের বাড়ীতে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের রচিত একখানি পদাবলী আছে। মাজ্জাতার জন্মের দুই পাঁচ বৎসর আগে কি পরে সে এডিশনের পুঁথি বাহির হইয়াছিল তা জানিবার কোন উপায় নাই, তবে আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হয় বেশী পরে নয়; চণ্ডিদাসের ভণিতা দেখিয়া তাহা হইতে চারিটি পদাংশ নিয়ে তুলিয়া দিলাম

'অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘনে মধুর মুরলী গীত
অবিচল কুল রমণী সকল শুনিয়া হরল চিত।'

এ 'নিছনির' অর্থ কি 'জিনিয়া'? (৮)

২। 'নন্দের নন্দন গোকুল কানাই সবাই আপনা বোলে
যোপুনি ইছিয়া নিছিয়া লইনু অনাদি জনম কলে।'

এখানে 'নিছিয়া'র 'ক্রয় করা' অর্থই অধিক সম্ভব। (৯)

৩। 'তথা কনক বরণ কিয়ে দরপণ নিছনি দিয়ে যে তার
কপালে ললিত চান্দ যে শোভিত সিন্দুর অরুণ আর।'

৪। 'তনু ধন জন যৌবন নিছিনু কালার পিরিতে।'

এই কয়টি পদ ভিন্ন অন্য কোথাও চণ্ডিদাস 'নিছনি' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন কি না জানি না, এবং উদ্ধৃত পদ কয়টি চণ্ডিদাসের কি না 'ভণিতা' ছাড়া অন্য উপায়ে তাহা আবিষ্কার করিবার যো নাই, ভণিতা দেখিয়া বিচার করিতে হইলে এ কয়টি চণ্ডিদাসেরই ইহা স্বীকার করিতে হইবে; তবে বটতলার প্রভুরা অনেক সময়ই 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাইয়া থাকেন, বর্ত্তমান পদ কয়টি সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে কি না প্রাচীন বৈষ্ণব-পদাবলীতে বিশেষ অভিজ্ঞ ভক্তিভাজন উত্তরদাতা বোধ হয় তাহা বলিতে পারিবেন। *

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় (সাধনা, ১ম বর্ষ বৈশাখ ১২৯৯)

---

২ নিছন অর্থে যখন মোছা হয় তখন "আপনে নিছিনু" অর্থে আপনাকে মুছিলাম অর্থাৎ আপনাকে ভুলিলাম অর্থ অসঙ্গত হয় না। শ্রীরঃ—

৩ আমার মতে এস্থলে নিছনি অর্থে পূজার উপহার। অর্থাৎ গোবিন্দদাস চরণ-পঙ্কজে আপনাকে অর্ঘ্যস্বরূপে সমর্পণ করিতেছেন। শ্রীর :

৪ "জান মু নিছনি" অর্থাৎ আমি তোমার নিছনি যাই। অর্থাৎ তোমার অশান্তি অমঙ্গল আমি মুছিয়া লই, যেরূপ ভাবে "বালাই লইয়া মরি" ব্যবহার হয় "নিছনি যাই" বলিতেও সেইরূপ ভাব প্রকাশ হইতেছে। শ্রীরঃ—

৫ আমার বিবেচনায় এখানেও 'নিছনি' অর্থে বালাই বুঝাইতেছে। শ্রীরঃ—

৬ এখানেও তাহাই। শ্রীরঃ—

৭ 'নিছনি যাইয়ে' অর্থাৎ সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া। শ্রীরঃ—

৮ 'অমিয়া নিছনি' অর্থাৎ অমৃত মুছিয়া লইয়া। শ্রীরঃ—

৯ নিছিয়া লইনু—আরাধনা করিয়া লইনু অর্থাৎ বরণ করিয়া লইনু অর্থ হইতে পারে। শ্রীরঃ—

* উদ্ধৃত অংশগুলি চণ্ডিদাসের পদের অন্তর্গত সন্দেহ নাই।

'নিছনি' শব্দ যদি নির্মন্থন শব্দেরই অপভাষা হয় তবে নির্মন্থন শব্দের যতগুলি অর্থ আছে নিছনি শব্দের তদতিরিক্ত অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বিরল। দীনেন্দ্রকুমার বাবু নিছনি শব্দের যতগুলি প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সকলগুলিতেই কোন না কোন অর্থে নির্মন্থন শব্দ খাটে।

দীনেন্দ্রবাবু শ্রম স্বীকার করিয়া এই আলোচনায় যোগ দিয়াছেন সে জন্য আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমাদের প্রাচীন কাব্যে যে সকল দুর্ব্বোধ শব্দ প্রয়োগ আছে সাধারণের মধ্যে আলোচিত হইয়া এইরূপে তাহার মীমাংসা হইতে পারিলে বড়ই সুখের বিষয় হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওমর-ই-খাইয়ামের প্রথম অনুবাদ

পাষাণে আছাড়ি ভাঁড় করি চুরমার।
অবোধ আমোদে মন মাতিল আমার॥
কহিল খর্পরচয় ক্ষণ ক্ষীণ স্বরে।
"মম সম গতি তব হবে অতঃপরে॥"

নরে ভয়ে কভু আমি নহি ভয়াতুর।
হেথা কর্ম্মভোগ চেয়ে সে তো সুমধুর॥
মম প্রাণ অযাচিত ঋণের সমান।
শুধিবার দিনে সুখে দিব পুনর্দ্দান॥

ঈশ্বরের কিবা লাভ মম আগমনে।
বাড়িবে না তাঁর মান যাব যেই ক্ষণে
কোন নর না কহিল এ তত্ত্ব আমারে॥
আসা-যাওয়া কি কারণ এ ভব সংসারে।

স্বতন্ত্র হইলে নাহি আসিতাম আমি॥
গমন স্বাধীন হলে না হতেম গামী॥
এ আমার ধরাধামে সব চেয়ে শ্রেয়ঃ।
নাহি আসা নাহি যাওয়া অভূত অজেয়॥

হেথা আসি নাই আমি স্বেচ্ছার অধীন।
বাসনার বশ নহে যাব যেই দিন॥
হে সুন্দরি! যথা সাজে মধু পরিবেশ।
ভব-চিন্তাচয় তাহে ডুবাইব এস॥

তোমার আমার প্রাণ নাশিবার তরে।
ঘুরিছে আকাশ ঐ মাথার উপরে॥
এ তৃণ শয়নে প্রিয়ে রহ কিছু দিন।
আমাদের রক্তে পুন উঠিবেক তৃণ॥

যৌবন পুস্তক পাঠ সাঙ্গ হলো হায়।
সুখদ বসন্ত নব বিগত জরায়॥
উড়ে গেল শুকপাখি সুখের যৌবন।
না জানি আইল কবে যাইল কখন॥

তুমি হে মোচন-কর্ত্তা দায় খুলে দাও।
তুমি গুরু, মানসের উড়িতে শিখাও॥
কোন নর গুরু মম নহে প্রিয়তর।
তারা তো অনিত্য, তুমি নিত্য নিরন্তর॥

পাঠশালে ধর্ম্মশালে মন্দিরে কি মঠে।
নিরয়ের ভয় কিবা স্বর্গ-কথা রটে।
কিন্তু বিধু-মর্ম্ম কেহ না জানে না শুনে।
চিত্তক্ষেত্রে হেন চিন্তা বীজ নাহি বোনে॥

হায়! পীড়া নাহি দিও কভু কার মনে।
ক্রোধানলে দগ্ধ করিও না কোন জনে॥
অনন্ত আনন্দে যদি অভিলাষ থাকে।
আপনি সহিবে, নাহি সহাবে কাহাকে॥

এই তো কুসুম-কাল সুখের আকর।
প্রান্তর-প্রবহা-নদীতটে শ্রান্তি হর॥
এই এক বন্ধু সুরা পদ্মিনী ললনা।
কেহ না শুনিবে তত্ত্ব-গুরুর ছলনা॥

স্ফটিক আধারে স্থিত মাণিক্য * সুন্দর।
সরল মনের এই সত্য সহোদর॥
তুমি তো জানহ ভাল জীবন-পবন।
বেগে ধায়, হায়! আন পাত্র সুশোভন॥

সাদরে অধরে ধরি পাত্র শুধে খাই।
কত দিন রবে প্রাণ তাহারে সুধাই॥
মৃদুস্বরে কহে পিও যাবৎ জীবন।
প্রাণগতে পুনঃ আর নাহি আগমন॥

মধুর মারুত বহে সেবতী-হৃদয়ে।
মধুর কটাক্ষ জ্বলে কুসুম নিলয়ে॥
মৃত গত দিবসের কি মধুর আছে।
কিছুই মধুর নহে আজিকার কাছে॥

পূর্ব্বে এই পাত্র মম সম প্রেমী ছিল।
তোমা-সমা প্রমদা প্রমোদে বিরাজিল॥
যে দেখিছ কণ্ঠে তার হাতল সুন্দর।
ও নহে হাতল তার প্রেয়সীর কর॥

মম মুড়া মাথা গাথা তব প্রেম-জাল।
উক্ত সুরা বসে মম ওষ্ঠ তাই লাল॥
মতীমত অনুতাপে তুমি হলে লাল।
ধৈর্য্যকৃত বর্ম্ম ছিন্ন করিলেক কাল॥

বিস্তার কাথাৎ রচিলাম বহুকালে।
অবশেষে পড়িলাম দুঃখ অগ্নি শালে।
অদৃষ্টের কাচী-কাটা কাথাকের ডোর।
আশার নীলামে শূন্য ডাক হলো মোর॥

—রহস্য-সন্দর্ভ, সংবৎ ১৯২১ (১২৭১ বঙ্গাব্দ)

---

* হরিদ্বর্ণ সুরা।
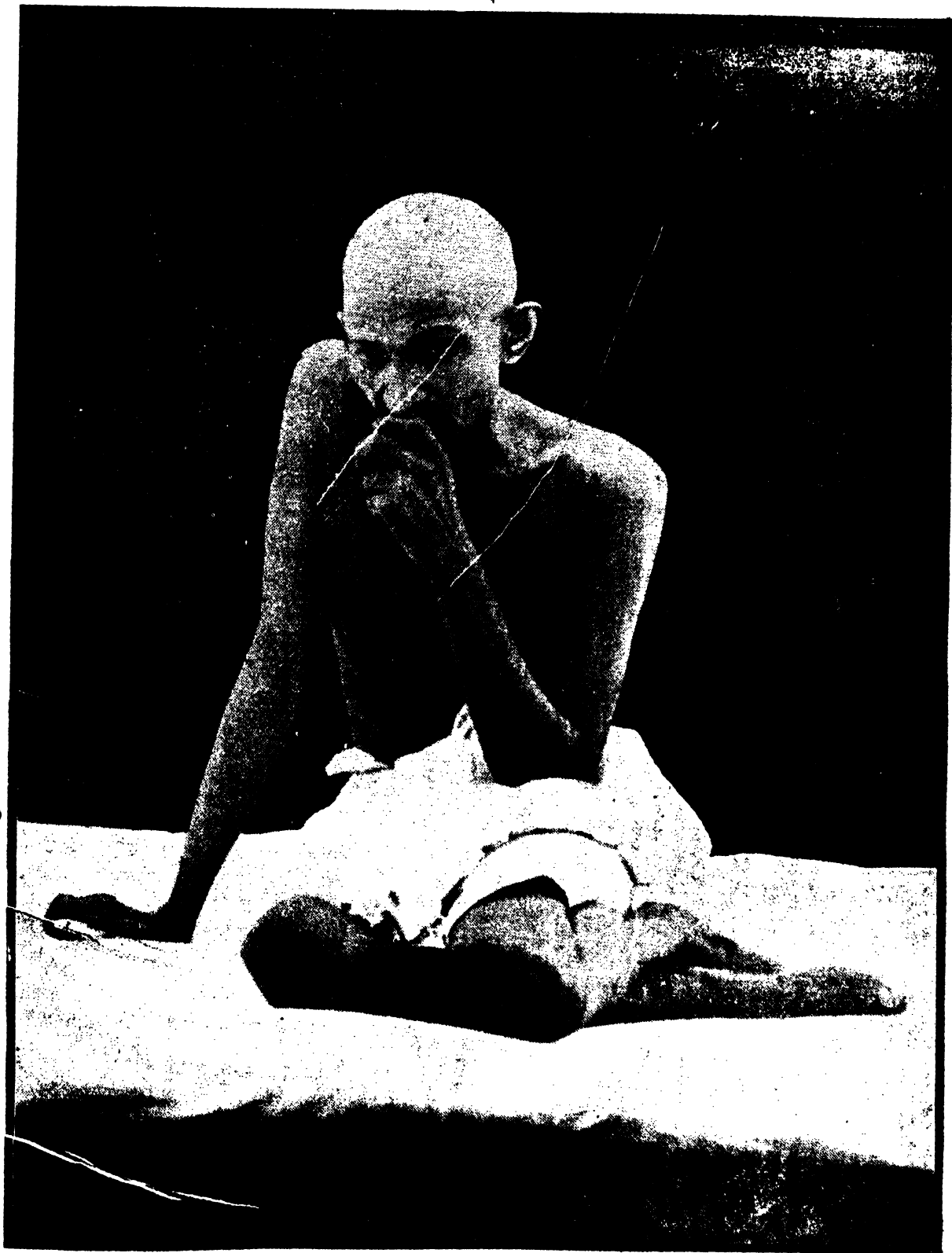
অহিংস-অসহযোগ-আন্দোলনের প্রবর্ত্তক

মাসপঞ্জী

[শ্রীসত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়]

১লা বৈশাখ—শ্রীযুক্ত জে, এম সেনগুপ্তের ৬ মাস কারাদণ্ড—এলাহাবাদে কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহরু ধৃত ও ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

২ রা বৈশাখ—শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও পণ্ডিত জহরলালের গ্রেপ্তারের জন্য কলিকাতায় সম্পূর্ণ হরতাল।—ভবানীপুরে দাঙ্গা।

৩ রা বৈশাখ—শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু, শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় প্রভৃতির দণ্ডাজ্ঞা হ্রাস—১ বৎসরের স্থলে ৯ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ।

৪ ঠা বৈশাখ—কলিকাতায় হাঙ্গামা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর অভিমত,—মহাত্মাজীর সম্বন্ধে ব্রিটিশ মন্ত্রি-সভার সিদ্ধান্ত।

৫ই বৈশাখ—চট্টগ্রামের হাঙ্গামা—বিপ্লবী যুবকদল কর্ত্তৃক রেলওয়ে ষ্টেশন ও রিজার্ভ পুলিস আক্রান্ত—তমলুকে পুলিস ও সত্যাগ্রহীদিগের সংঘর্ষ।

৬ই বৈশাখ—চট্টগ্রামে দাঙ্গা সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের সতর্কতা, নানা স্থানে খানাতল্লাস—বিপ্লবীদল নিরুদ্দিষ্ট—নীলায় লবণ প্রস্তুত অপরাধে মহিলাদিগের লাঞ্ছনা।

৭ই বৈশাখ—বঙ্গীয়-প্রাদেশিক-সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী রাজসাহীতে ধৃত—করাচীতে ডেপুটী কলেক্টর নিহত। লাহোরে চাঞ্চল্য।

৮ই বৈশাখ—পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণা নেহরুর নেত্রীত্বে এলাহাবাদে লবণ তৈয়ারী—জালালপুরে শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গন্ধীর মদ্যপান নিবারণ চেষ্টা—রেঙ্গুনে অগ্নিকাণ্ড।

৯ই বৈশাখ—আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত-প্রমুখ বন্দীগণ প্রহৃত—মহিষবাথানে সত্যাগ্রহীদিগের লাঞ্ছনা।

১০ই বৈশাখ—চট্টগ্রামে বিদ্রোহীদের সহিত সেনাদলের সংঘর্ষ—সবরমতী জেলে বন্দীদিগের প্রায়োপবেশন—মাদ্রাজে টি, প্রকাশম্ গ্রেপ্তার—কলিকাতায় পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের আগমন।

১১ই বৈশাখ—বড়বাজারের কংগ্রেস-নায়ক শ্রীযুক্ত বসন্তলাল মুরারকার গ্রেপ্তার—সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে মহাত্মার অভিমত।

১২ই বৈশাখ—ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেলের পদত্যাগ—পেশোয়ারে চাঞ্চল্য।

১৩ই বৈশাখ—বঙ্গীয় আইন-অমান্য পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ধৃত—শ্রীযুক্ত প্যাটেলের প্রতি বড়লাটের প্রত্যুত্তর—মহাত্মা গন্ধী সম্বন্ধে বড়লাটের নিকট মহম্মদ আলির তার।

১৪ই বৈশাখ—আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য বড়লাটের প্রেস আইন জারী। সিরাজগঞ্জ ও পাবনার মধ্যে কন্দর নামক জাহাজ ডুবি ও বহুলোকের প্রাণনাশ।

১৫ই বৈশাখ—কলিকাতায় গাড়োয়ান হাঙ্গামা সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের প্রত্যেকে ১ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত। দিল্লীতে শ্রীযুক্ত প্যাটেলের সংবর্দ্ধনা।

১৬ই বৈশাখ—শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত পঞ্চমবার কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত—দিল্লীতে সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ। বিলি-মোরা হইতে অর্ডিনান্স সম্বন্ধে মহাত্মার অভিমত।

১৭ই বৈশাখ—পেশোয়ারে পররাষ্ট্র সচিব মিঃ হাওয়েল—পেশোয়ার ও অমৃতসরের টিকিট বন্ধ—দিল্লীতে মহাত্মা গন্ধীর পুত্র শ্রীযুক্ত দেবদাস গন্ধীর প্রতি ১ বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ।

১৮ই বৈশাখ—কলিকাতায় শান্তিপূর্ণ হরতাল—সংবাদপত্র সেবীদিগের সভা।

১৯এ বৈশাখ—কলিকাতায় সমস্ত দেশী সংবাদপত্র বন্ধ—সমস্ত সহরে হস্তলিখিত কাগজে সংবাদ প্রকাশ।

২০এ বৈশাখ—শ্রীযুক্ত প্যাটেলের কলিকাতায় আগমন।

২১এ বৈশাখ—মহিলাগণ কর্ত্তৃক কলিকাতার রাস্তায় শোভাযাত্রা ও পিকেটিং।

২২এ বৈশাখ—মহাত্মা গন্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদ ভারতময় রাষ্ট্র এবং হরতাল আরম্ভ।

২৩এ বৈশাখ—মহাত্মার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ভারতব্যাপী হরতাল পালন।

———

কংগ্রেসের সভাপতি

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহেরু

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
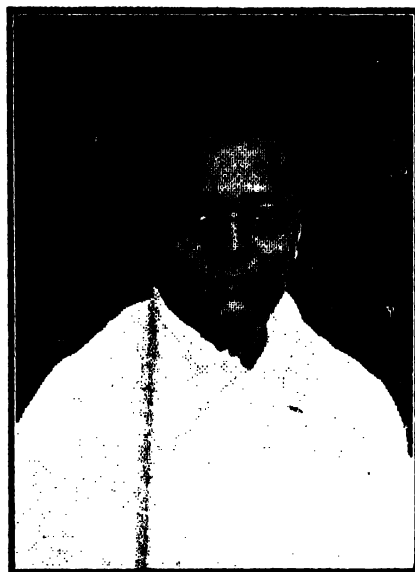
শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার

মহিষাবাথানের নেতা—
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

কাঁথির নেতৃবৃন্দ

শনার' (police commiss-
নেতৃত্বে 'জাষ্টিস্ অফ্
নামক গভর্ণমেণ্ট মনো-
ব্যবস্থা করিত।
রাস্তা ও খোলা

স্মৃতি-রেখা

[স্যর শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্-এ, ডি-লিট্]

পূর্ব্বাভাষ

স্মৃতি-কথা লিখিয়াছে অনেকে, লেখেও অনেকে এবং লিখিবেও অনেকে। রাজনারায়ণ বসুর "সেকাল ও একাল" ও জটাধারীর "রোজনামচা" পড়িয়া বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতি-কথা লিপিবদ্ধ করিবার কল্পনা আমারও মনে কখনও কখনও উদয় হইত। সময় ও সুযোগ এতদিন ঘটে নাই, সহৃদয় বান্ধবগণের সাগ্রহ অনুরোধ সত্ত্বেও তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। "ইউরোপে তিন মাস" ও "প্রবাস-পত্র" যাঁহাদের রুচিকর হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বান্ধব-শ্রেণীর অন্তর্গত। সহৃদয়তার এ আহ্বান আবার পৌঁছিতেছে। প্রত্যাখ্যান করা অসঙ্গত ও অপ্রয়োজন। এরূপ স্মৃতি-কথার মূল্য, ফল বা উপযোগিতা আছে কি না তাহার বিচার আমার নিষ্প্রয়োজন। হয়তো কাহারও ভাল লাগিতে পারে, হয়তো কাহারও কিছু উপকার হইলেও হইতে পারে। আর কিছু না হউক আত্ম-প্রসাদের অভাব হইবে না।

বাল্যের ও শৈশবের কথা পরবর্ত্তী সময়ের কথার অপেক্ষা সুস্পষ্ট ও বহুলভাবে স্মৃতিপটে চিরদিন অঙ্কিত থাকে, কিন্তু কোথায় সে কথার আরম্ভ তাহা স্থির করা কঠিন।

কলিকাতা বহুবাজার লোহাপটী, ৫৩ নং ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীটের বাটী, রাধানগরের পল্লীভবন ও ভূরশিট্ট পরগণার বামুনপাড়া গ্রামের মাতুলালয়ের কথা এই স্মৃতি-সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিশদভাবে মনে পড়ে না, কিন্তু এই তিন স্থানের মধ্যে স্মৃতির প্রথম রেখার সূত্রপাত ও উদয় কোথা তাহা স্থির নির্ণয় দুঃসাধ্য। তিন স্থানেরই স্মৃতি নিবিড় ও জটিলভাবে পরস্পরের সহিত জড়াইয়া আছে। তিন স্থানেরই যথাসম্ভব চিত্র লিখিতে পারিলে সে স্মৃতি-সংরক্ষণ অপেক্ষাকৃত সম্ভব।

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাটীর সহিত বহু মহাত্মার স্মৃতি বিজড়িত। জ্যেষ্ঠতাত শ্রীযুক্ত প্রসন্ন... রায়বাহাদুর সূর্য্যকুমার, পিতৃব্যগণ শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার, শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার, শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার প্রভৃতি সে স্থানে বাস করিতেন। গৃহ নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তন হইলেও আত্মীয়, আত্মীয়ের আত্মীয়, কুটুম্ব, কুটুম্বের কুটুম্ব, পল্লীবাসিগণ এবং তাঁহাদের আত্মীয়গণে গৃহ সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। দেওয়াল হইতে দেওয়াল পর্য্যন্ত তক্তপোষ পাতা এবং তাহার উপর সকলেই সমভাবে সমান অধিকারে সারি সারি শুইয়া থাকিতেন। গৃহস্থালী ব্যবস্থায় যাহা আয়োজন থাকিত তাহাই সকলে সমাংশে আহার করিতেন। বাবুদের ছেলে, বাবুদের ও বাহিরের "লোকের" আহারে ও শয়নে কোনরূপ পার্থক্য ছিল না। সর্ব্বদা অনেক মনীষী ও মহাত্মার সমাগম হইত, একথা স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। আসিতেন (ও কেহ কেহ কখনও থাকিতেন)—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচরণ সরকার, শ্যামাচরণ দে, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, গঙ্গাপ্রস... [illegible]শায়, শ্রীনাথ দাস, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল [illegible]চার্য, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রঙ্গলাল বন্দ্যোপা[illegible] [illegible]মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, [illegible]লাল চক্রবর্ত্তী, তারকনাথ পালিত, মনোমোহন [illegible] [illegible]গেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রমাধব ঘোষ, নৃসিংহচন্দ্র [illegible]য়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, [illegible]ভূষণ [illegible] [illegible]চন্দ্রমোহন গুপ্ত, [illegible]মেশচন্দ্র বটব্যাল, শিবনাথ [illegible] [illegible]নীকান্ত গুপ্ত, [illegible]নাথ দাস, দেবেন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার বড়াল, কৃষ্ণ[illegible] পাল, [illegible]রচন্দ্র মিত্র, কালিকাদাস দত্ত, গোপালচন্দ্র সরকার, নীলমণি কোঙার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, উমেশচন্দ্র দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ

[illegible] ায়, রাধিকা- [illegible] ঞকৃষ্ণ মু. [illegible] াপাধ্যায়, [illegible] ীর দে, মহেন্দ্রলাল সরকার, [illegible] নারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, [illegible], দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ভরত-চন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এমন কথা বলি না যে ইঁহারা একই সময়ে আসা যাওয়া করিতেন; কখনও ইনি, কখনও উনি, কখনও এদল, কখনও ওদল আসিতেন। অবসর-ক্রমে তাঁহাদের কাহারও কাহারও সম্বন্ধে অল্প বিস্তর আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এরূপ মহাজনগণের সঙ্গ সৌজন্য লাভ অধিকাংশ বালক, কিশোর, তরুণ ও যুবকের ঘটে না। এ প্রভূত সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া আমি কতদূর ধন্য ও উপকৃত হইয়াছি তাহা বলিয়া বা লিখিয়া ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। অপর উচ্চ শিক্ষার অধিকারী না হইলেও আমার পক্ষে ইহা বিশিষ্ট উন্নতশিক্ষার কার্য্য করিয়াছিল। পিতৃদেব সর্ব্বদা চিকিৎসা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। অনেক সময় এই সকল মহাপুরুষের অভ্যর্থনার ভার ইচ্ছা করিয়া আমি সুকুমার স্কন্ধে বহিতাম। ইঁহাদের অনেকের জন্য ঠাকুরমার অর্থাৎ মাতৃহীন পিতা পিতৃব্যগণের মাসী-ঠাকুরাণীর নিকট হইতে, অনেক থাল গরম লুচি ও 'ভুমো' আলুভাজা বহিয়া আনিয়া দিয়াছি। আমিও অংশ হইতে বঞ্চিত হইতাম না। উ[illegible]গ করায় শিবনাথ শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য্য)র পি[illegible]হাকে বাটীর বাহির করিয়া দেন। ছাত্রবৎসল জ্যে[illegible] তাঁহাকে স্ব-গৃহে স্থান দেন। পরে রাস্তার ওপ[illegible] বাসাও করিয়া দেন, সেখানে আহারাদির ব্যবস্থা [illegible]য়ায় আমাদের বাড়ী হইতে তাঁহার আহার যাইত [illegible] ভাবে তাঁহার এম, এ, পড়া [illegible] পরীক্ষা দেও[illegible]। "দেশের লোক" ও [illegible] জন্য বাটী [illegible] শীলের বাড়ীটীও [illegible] ওয়া হইয়াছিল। [illegible] পাশাপাশি ও সামনাসামনি তিনটী বাড়ী লইয়া [illegible] অধিকারীদের গৃহস্থালী ও আতিথ্য চলিত। খুল্লতাত রাজকুমার বাবু ক্যানিং কলেজে প্রফেসারি করিতেন।

রাস্তার দু'ধারে ও পিছনের গলির ভিতর বড় বড় খোলা নর্দ্দমা [illegible]। বাটীর দরজা হইতে রাস্তায় পড়িতে ইটের সাঁকোর উপর দিয়া যাতায়াত করিতে হইত। তার পর যখন সহরে ড্রেন ও জলের কল বসিল তখন সে সাঁকো ভাঙ্গিয়া নর্দ্দমা বুজাইয়া ফুটপাথ হইল। জলের পাইপ বসান ও রাস্তার মাঝখানে জমির নীচে পাকা ড্রেন গাঁথা অনন্যমনা হইয়া রাস্তার উপর বারাণ্ডা হইতে দেখিতাম এবং সেই পর্ব্বতপ্রমাণ রাস্তা খোঁড়ার মাটীর স্তূপ হিমাচল ও বিন্ধ্যাচলের স্থান অধিকার করিত। ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার তখন গোলদীঘি নামে খ্যাত ছিল। পুষ্করিণীতে তখন মিঠা পানি পাওয়া যাইত। রাস্তা ও পুষ্করিণীর পাড় সমান উঁচু ছিল, মধ্যে রেলিং—ফুটপাথের জন্ম তখনও হয় নাই।

লালদীঘির জল ও গঙ্গাজলের মত গোলদীঘির মিঠা-পানিরও পানার্থ ব্যবহার চলিত। সকল বাটীতে এক বা একাধিক কূপ ছিল। নীচের তলায় মাটীর বড় বড় জালা অর্দ্ধেক পুঁতিয়া 'নির্ম্মাল্য' দিয়া গঙ্গাজল রক্ষিত হইত। উড়িয়া ভারি প্রত্যহ গঙ্গার ও লালদীঘির জল আনিয়া দিত। খাটা পায়খানার ময়লা অনেক সময় মেথররা গোপনে পিছনের নর্দ্দমায় ঢালিয়া দিত। সেই উপলক্ষে সময় সময় পুলিশ হাঙ্গামাও হইত। "কানা সার্জ্জনের" (ইউনান্) নাম এই সময় প্রথম শুনি। তার পর পুলিশের দুইটা বড় নাম কাণে আসে 'ল্যাম-বার্ট' ও 'হগ্' সাহেব। কলুটোলার হীরালাল শীলের ধর্ম্মতলার বাজার ভাঙ্গিয়া হগ্ সাহেবের নামে বাজার বসে। সে ব্যাপার লইয়া সহরে তুমুল আন্দোলন ও দাঙ্গা হাঙ্গামা অনেক দিন ধরিয়া হইয়াছিল। রাস্তায় মাতালদের দৌরাত্ম্য যথেষ্ট ছিল। খোলা নর্দ্দমায় বা তাহার ধারে তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্রাম-স্থান ছিল। পাহারাওয়ালাদের কাঁধে ঝোলায় চড়িয়া থানায় যাওয়া ও জরিমানা দেওয়া তাহাদের নিত্যকর্ম্ম ছিল। উত্তর-কালে "টেম্পারেন্স ফেডারেশন"এর সভাপতিত্বের সম্মানের বীজ এই সময়েই এবং এই সকল দৃশ্য দেখিয়াই বপন হইয়াছিল। লালবাজারের রাস্তার দুধারে 'সেলার্স হোম' (Sailors Home) ছিল, বিস্তর মদের দোকান ছিল; সেখানের দৃশ্য আরও ভয়াবহ। সকালে

তত গোলযোগ থাকিত না বলিয়া সময়ে সময়ে মা ও সেজকাকীর সঙ্গে পাল্কী চড়িয়া গঙ্গাস্নানে যাইতাম। মেয়েদের গঙ্গাস্নানের এক অদ্ভুত নিয়ম ছিল। ঘাটে পৌঁছিয়া আমি পাল্কী হইতে নামিয়া পড়িতাম, তাঁহারা নামিতেন না। পাল্কী তাঁহাদিগকে লইয়া গঙ্গায় নামিত আর তাহাতেই তাঁহাদের গঙ্গাস্নান সম্পন্ন হইত। তখনকার পাল্কী এখনকার মত যন্ত্রণার যন্ত্র-স্বরূপ ছিল না। পাল্কী তখন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের অন্যতম যান ছিল। জ্যাঠামহাশয়ের সহিত পাল্কী করিয়াই কলেজে যাইতাম। উড়ে বেহারারা পাল্কী বহিত। তাহাদের আদর আমার প্রতি যথেষ্ট ছিল। সময় সময় 'তাহাদের থড়াতে' আমায় যত্ন করিয়া লইয়া যাইত ও সুস্বাদু 'গুড়ের মালপো' খাওয়াইত। প্রকাণ্ড 'আওট পাতা'য় এক রাশি ভাত ঢালিয়া এক মালা দুধ ও এক ঘটি জল সংযোগে তাহারা দুধে ভাতে থাকিত। আর তাহা খাইয়াই 'দর্শন' ও তাহার দলের শক্তি ও স্বাস্থ্য দেখে কে! 'দর্শন' ও তাহার 'দল' 'দোলের' সময় ফাগ খেলিতে আসিত—আর খেলিত 'চিতাবাড়ী'। লম্বা সরু লাঠি লইয়াই খেলা হইত। খেলায় কৌশলের অভাব ছিল না, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক আওয়াজ, গণ্ডগোল ও গোলযোগ। বীররসের অভিনয় হইত। সে খেলা ইদানীং আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

'পাল্কী' ছাড়া গাড়িতেও কখনও কখনও চড়িতাম। কখনও বা ব্রানি সাহেবের পেয়ারি ডাকাবি 'হাফ' (Half) গাড়ী কিংবা ভাড়াটিয়া 'দশফুকুরে' গাড়ী চড়িয়া গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে যাইতাম। লাট-সাহেবের বাড়ীর ফটকের উপর ও ময়দানের ধারে বিলাতী বাংলো (Bunglow) নামে খ্যাত বাড়ী—"স্কট টমসনের" 'দাওয়াইখানার' ছাদের আলিসার উপর বসিয়া থাকিত—বড় বড় 'শকুনি', 'গৃধিনী' ও 'হাড়গিল্লা'—তাহারাই সহরের ময়লা পরিষ্কার করিত। উপকারী এই পক্ষিজাতির প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ তাহাদের প্রতিকৃতি 'মিউনিসিপ্যালিটী কোর্ট অফ্ আরমস' (municipality coat of Arms) এর স্থান অধিকার করিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটি (munici-pality) ও 'করপোরেশন' (corporation) বহু পরে সৃষ্ট হয়। তখন 'পুলিশ কমিশনার' (police commiss-ioner) হগ (Hogg) সাহেবের নেতৃত্বে 'জাষ্টিস অফ্ পিস্' (Justice of Peace) নামক গভর্ণমেণ্ট মনোনীত কর্তৃবৃন্দ সহরের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিত। গঙ্গায় মড়া ভাসিত, বিষ্ঠা ভাসিত। রাস্তা ও খোলা নর্দ্দমা কদর্য্য আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ থাকিত। সুখের মধ্যে ছিল, বড় রাস্তার একধারে পাকা 'নহর'। ভিস্তিরা মসকে করিয়া সেই 'নহর' হইতে জল লইয়া রাস্তায় জল দিত।

রাস্তায় জল দেওয়া গাড়ীসমূহ পরে প্রবর্ত্তিত হয়। তাহারও বহুদিন পরে ক্যাম্বিশের নল দিয়া রাস্তায় জল দেওয়া হয়। তেলের আলোই প্রথমে সহরের একমাত্র অবলম্বন ছিল। তার পর গ্যাস-আলোকের প্রাদুর্ভাব। মই ঘাড়ে করিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে 'ফরাশ' 'লণ্ঠন' পরিষ্কার করিত, আলো জ্বালিত ও নিবাইত। যেখানে 'ইলেকট্রিক' (Elec-tric) আলো প্রবর্ত্তিত হয় না সেখানে এখনও তাহাই করে।

'পাল্‌কী' 'ঘরের গাড়ী' ও 'দশফুকুরে' ভাড়াটিয়া গাড়ীর উল্লেখ না করিলে চিত্র অসম্পূর্ণ রহিবে। বড় রাস্তার প্রধান প্রধান মোড়ে, শীর্ণকায় অশ্বিনীকুমার-যুগল বাহিত এই সকল 'যান' 'বাহন' আরোহীর আশার অপেক্ষা করিত। এ গুলি সেয়ারের (Share) গাড়ীর কাজ করিত। 'কোচম্যান' (Coachman) পাদানে পা বসিতে বসিতে, হাইকোর্ট, আলুগুদাম, বান হাউস, কালীঘাট, ভবানীপুর বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিত ও যাত্রি-সংখ্যা পূর্ণ হইলেই গন্তব্য পথে যাত্রা করিত। গাড়ীর পা দানের মাঝামাঝি সরু [illegible] দিয়া তাহাতেও যাত্রী উঠাইত। ছাদের উপর উঠাইত, 'কোচবাক্সে' (Coach box) নিজের পাশে [illegible] বসাইত—সহিসের পাদানেও বসাইত। যত উঠাইবে তত 'সেয়ার' share) কম বলিয়া আরোহিগণ বড় আপত্তি করিত না।

এখনকার মত তখনও সাদা 'কোট' প্যাণ্টালুন' (Coat pantaloon) ও লাল পাগড়ী পরিয়া পাহারাওয়ালা সহরের শান্তিরক্ষা করিত। তবে পাছে

পট্টি লাগান, বুকে চামড়া বাঁধা জুতা লইয়া, পোষাক-পরিচ্ছদের এখনকার মত সৌষ্ঠব ছিল না। তবে ছাতা ছিল—বর্ষার সময় গোলপাতার প্রকাণ্ড ছাতা লইয়া পাহারাওয়ালারা রাস্তার শোভা-বর্দ্ধন করিত। সন্ধ্যার পর হাতে থাকিত ছোট আঁধারে লণ্ঠন—তাহাকে "গবাক্ষ" বলিতে হয় বলুন—কারণ ইংরাজি নাম "বুলস্ আই" (Fulls eye) কোমরে চামড়ার পেটী হইতে ঝুলিত 'রুল'—এখন রেগুলেশন্ (regulation) লাঠী তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। আঁধারের অন্তর্দ্ধানের সহিত বর্ত্তমান ও ভাবী 'নিমচাঁদেরা' 'সার্জ্জন সাহেবের' (Sergeant) শুভ আগমনে আর 'হেল্ হোলি লাইট,' (Hail Holy Light) বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে পারিবে না! 'জমাদার' লইয়া 'সার্জ্জন সাহেব' (sergeant) এখন আর রোঁদে বাহির হয় না। কি নিয়মে সহরে শান্তি রক্ষা হয় তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে।

বৌবাজার গোলদীঘির কথাটা বিশেষভাবে মনে পড়ে, তাহার কারণ তীর্থ-ভ্রমণ-প্রণেতা পূজ্যপাদ পিতামহ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী, গঙ্গাস্নান ও তর্পণ উপলক্ষে যখন কলিকাতার বাসায় আসিয়া থাকিতেন, তখন নিত্য গোলদীঘির ধারে তিনি বেড়াইতে যাইতেন, সময় সময় আমার হাত ধরিয়া যাইতেন। এখন তাঁহার একমাত্র যে আলোক-চিত্র পাওয়া যায় এই সময়েই সেই চিত্র গৃহীত হইয়াছিল। আমারও একখানি আলোক-চিত্র সে সময় গৃহীত হয়। বহুদিন হইল সেখানি নষ্ট হইয়াছে। নষ্ট হইবার পূর্ব্বে উহা দেখিয়া মনে হইত আমার বয়স তখন চার, পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না। তদানীন্তন প্রসিদ্ধ আলোক-চিত্র... 'বেকার' (Beaker) সাহেবের ষ্টুডিও (St...)তে এই চিত্র গৃহীত হয়। সে ষ্টুডিও (studio) উঠিয়া গিয়াছে; নেগেটিভ (negative) আর পাওয়া যায় না। সময়-নির্দ্ধারণের জন্য এত কথা বলিলাম।

পিতামহ প্রতি বৎসর 'তর্পণ' ও 'মহালয়া' শ্রাদ্ধ করিতে নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিতেন। তিনি পৌঁছিয়াই দুই তিন খানা নৌকায় মোটা, মাঝারি, সরু সূতা দেশে পাঠাইতেন। পূজার কাপড় অল্পই খরিদ করিতেন—সূতাই অধিক। দেশে যাইয়া এই সূতা পরিবারস্থ লোকের মধ্যে, আত্মীয়, স্বজন ও পল্লী-প্রতিবেশিগণের মধ্যে, বণ্টন করিয়া দিতেন ও 'বানি' ধরিয়া দিতেন। এই সূতা ও 'বানি' দিয়া সকলে 'পোরমে খুড়ো', 'ভূতোদাদা' প্রভৃতি পল্লী-তন্তুবায়গণের নিকট ফরমায়েশ মত কাপড় তৈয়ারী করাইয়া লইতেন। মা, খুড়ি, পিসির নিকট দু'এক পয়সা আদায় করিয়া তাহা তন্তুবায় খুড়া ও দাদামহাশয়গণকে জল খাইতে দিয়া কাপড়ের তাগাদা করা হইত। প্রত্যহ অন্ধকার তাঁতঘরের ভিতর বসিয়া কাপড়ের নিত্য প্রসার দেখিয়া বড় আমোদ বোধ হইত। নীল 'কোর' মাখান ধুতি তৈয়ার হইলে আনন্দের অবধি থাকিত না।

অনুচ্চ-সুরে কৃষ্ণলীলা গায়িতে গায়িতে তাঁত-খালে হাত ও পা চালাইয়া, পা রাখিয়া অভিনিবিষ্ট-ভাবে যুগপৎ সমস্বরে গানের সুরে তালে তালে পায়ের চাপে, ঝাঁপে ঝাঁপে 'সানার' নামা-ওঠার ফাঁকে দুই হস্তে পর্য্যায়ক্রমে 'মাকু' চালা, বুনানি বসাইতে 'দক্তি' ঠেলা, ছেঁড়া 'খেই' গ্রন্থি দেওয়া, এক এক 'দাগ' বোনার পরে তলা উপরে 'নুটী' দিয়া মাজা ও পরে তাহা গুটান, কাটা, ও পাট পিট করিয়া হাতে দেওয়া—এই সকলটুকু মিলাইয়া যে দক্ষতা, তন্ময়তা ও আনন্দের স্পর্শ দেখিতাম তাহা ঐ পল্লী-শিল্পালয়েরই নিজস্ব।

আমাদের গ্রামের চতুঃপার্শ্বে তখন সাত শত ঘর তাঁতি ছিল। তাঁতিদের অবস্থা বেশ সমৃদ্ধ ছিল। 'কলমে'র, ধুতি ও উড়ানী প্রসিদ্ধ ছিল। উড়ানীর প্রসিদ্ধি কিছু বেশী, এখন তাহা অন্তর্হিত। কিছু দিন পূর্ব্বে 'দেশে' যাইয়া 'দেশের চাদরে'র সন্ধান করিয়াছিলাম। বাগানের সর্ব্বাধিকারী (বড়) তাঁতরা হাওড়ার হাটের দু'জোড়া চাদর আনিয়া দিল। ইহা স্বদেশী যুগের পূর্ব্বের কথা।

পূজার অন্যান্য বহু আসবাবের মধ্যে 'ঠন্‌ঠনের' চৌদ্দ আনা দামের 'পাম্প' (Pump) আর লাল-বাজারের দেড় টাকা দামের বার্ণিশ (varnish) জোড়-

তলা জুতা আর 'চাঁদনি'র ছিটের জামা। তার পর 'টেরিটী' বাজারে নাকছেদি ও 'কশাইটোলার' আচিন চিনেম্যানের (chinaman) প্রাদুর্ভাব। বাবুদের বা বাবুদের ছেলেদের স্বতন্ত্র পূজার আস্‌বাবের আয়োজন ছিল না। পিতৃদেবের একজন ধনী রোগী একবার মা'ঠাকুরুণের জন্য বহুমূল্য বারাণসী সাটী উপহার দিয়াছিল, সে সাটী পিতৃদেব পূজার কাপড়ের সহিত পল্লী-ভবনে প্রেরণ করেন নাই।

এইরূপে পিতামহ রাধানগর চলিয়া যাইবার পর আর দুই তিন নৌকা বোঝাই হইয়া আমরা অনেকে রাধানগর যাই। স্মৃতির এইটী দ্বিতীয় রেখা। রাধানগর যাইবার জন্য বড়বাজার মিরবহর ঘাটে তখন নৌকায় উঠিতে হইত। আমরা চলিলাম 'পানসিতে' তাহার অপর নাম 'গ্রীন্ বোট' (Green Boat) বা 'কুঠীর পান্‌সি'। সবুজ রং বলিয়া 'গ্রীন্‌বোট' (Green Boat) বলিত এবং কলিকাতার উত্তরে গঙ্গার দু'ধারের 'কুঠীয়াল'রা এই 'পানসিতে' যাতায়াত করিত বলিয়া ইহার অপর নাম 'কুঠীর পান্‌সি'। একটু বড় আকারের নৌকাকে "ভাউলিয়া" বলিত। এই সকল নৌকা লইয়াই তখনকার প্রসিদ্ধ 'বাচ' খেলা হইত। 'মহেশ বল্লভপুরের' 'রথ' উপলক্ষে, 'দ্বাদশ গোপালে' এই সকল নৌকায় মহা সমারোহ হইত।

এই পান্‌সির সঙ্গে চলিল দু'খানা মাঝারি আড়ার 'ভড়'। তাহাতে রান্না খাওয়া হইত, কতক আরোহীও থাকিত, প্রধানতঃ হইল তাহাতে মাল বোঝাই। দুই তিন দিন ধরিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতে হইবে বলিয়া আহার ও পানীয়ের প্রচুর আয়োজন সঙ্গে ছিল। কলিকাতায় কিয়দ্দূর দক্ষিণে যাইয়াই গঙ্গার জল লোনা।

কলিকাতার লোক সহজে "লালদীঘির" মিঠা পানির মহিমা ভুলিতে পারিত না; তাই গঙ্গাবক্ষে নৌকা করিয়া যাইতেও 'মিঠা পানি' সংগ্রহ করিয়া লইত। যে পারিত সে আরও সংগ্রহ করিত মার্কিণ কোম্পানির আমদানি 'বরফ'। এখন যেখানে কলিকাতার ছোট আদালত তাহারই কাছাকাছি 'বরফ গুদাম' বা 'আইশ হাউস, (Ice House) ছিল। 'আমেরিকা' (America) হইতে বড় বড় চামড়া আসল উত্তর মেরু হইতে আমদানি জাহাজের খোলে পাষাণ ভাঙ্গিবার জন্য Ballast আসিত। দুই আনা হইতে চারি আনা সের দরে বিক্রী হইত। বাবুরা 'অফিস' (office) 'আদালত' হইতে ফিরিবার সময় কম্বলে জড়াইয়া নিত্য-ব্যবহার্য্য 'বরফ' সংগ্রহ করিতেন। সমস্ত দিন রাতে তাহা গলিয়া যাইত না। বরফের কথা এত স্পষ্ট ভাবে মনে থাকিবার একটা বিশিষ্ট কারণ আছে। কি কারণে জানি না মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে জ্যাঠামহাশয়ের সতীর্থ ও প্রিয় বন্ধু, শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে আমরা এই সময় ছিলাম। সেইখানে আমার পঞ্চম পিতৃব্য অক্ষয়কুমার বাবুর 'ওলাওঠা' রোগে মৃত্যু হয়। যেমন 'শুটের' গুড়া মাখান হইত তেমনই অহর্নিশ 'বরফ' খাইতে দেওয়া হইত। কথিত আছে যে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের (Presidency College.) নিকট অক্ষয় বাবুর ছায়া-মূর্ত্তির সহিত আমার কোনও নিকট আত্মীয়ার সাক্ষাৎ হয়। আত্মীয়া তাঁহার পীড়ার কথা জানিতেন না। রামগোপালবাবুর বাটী পৌঁছিয়া শুনিলেন ও শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন যে সেই মাত্র অক্ষয়বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। এই সময়—প্রতি শনি ও রবিবার জ্যাঠামহাশয় রামকৃষ্ণপুরে তাঁহার প্রিয় শিষ্য রামকমল ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের বাটীতে বাস করিতেন। আমিও সঙ্গে থাকিতাম। সেখানেও করাত গুঁড়া দিয়া কম্বল বাঁধা বরফের পুঁটুলি যাইত। নৌকা-যাত্রার সময়ও তাহা গেল।

হাওড়ার পোল তাহার বহু পরে হয়। লোহার পাটী দিয়া খিলানের ছাতের প্রবর্ত্তন মাত্র সেই সময় হইয়াছে। দুই খানা নৌকায় বোঝাই ছিল সেই লোহার পাটী। কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্ত ও শীতলা-নন্দের মন্দিরের সুমুখে এক সারি বৈঠকখানা ঘর এই প্রণালীতে নির্ম্মিত হয়।

বোধ হয় দুই তিন দিন ধরিয়া নৌকায় যাইতে হইয়াছিল। 'বার গাঙ্গ' হইয়া উলুবেড়ের 'লকের' ভিতর দিয়া 'রূপনারায়ণ' নদীতে 'হোজা

পাড়ার খাল' ধরিয়া, 'শোভা পাড়ার জলা'আড়াআড়ি পার হইয়া নৌকা 'কানায় ঘাই' ঘুরিয়া বরাবর রাধানগরে ঘাটে যাইয়া লাগে। মাঠ জলে পরিপূর্ণ। যেদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল দিগন্তবিস্তারি জলরাশি। দিগন্তের সীমানায়—যেখানে আকাশ জলের মেশামিশি ছায়াবাজীয় মত গাছের সবুজ মাথায় সূর্য্যপ্রভার কচিৎ ও ক্ষণিক খেলা। জলরাশির মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ মাথা তুলিয়া নাবিককে সাবধান করিয়া দিতেছিল। যুগপৎ ভয় ও আনন্দের মধ্যে সেই বয়সেই সমুদ্র-যাত্রার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বহু বৎসর পরে সে আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হয়। তখন বঙ্গের উপকূলে অপূর্ব্ব "বনরাজি নীলা" বেলাভূমি বহু পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবার সময় শৈশব-স্মৃতির মধুরিমাপূর্ণ শোভাপাড়ার জলার গম্ভীর সুন্দর সলীল-ঐশ্বর্য্য মনে পড়িয়াছিল। পরবর্ত্তী জীবনে ভ্রমণের অভাব ঘটে নাই। 'ইউরোপ', 'আশিয়া' ও 'আফ্রিকা' মহাদেশে লক্ষ লক্ষ ক্রোশ জল-পথ ও স্থল-পথ ভ্রমণ হইয়াছে এবং তাহারও আংশিক স্মৃতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই রাধানগর যাত্রা জ্ঞান-সঞ্চারের পর ভ্রমণ ক্ষেত্রে হাতে খড়ি বলিয়া সে কথা এত মধুর ভাবে মনে পড়িতেছে।

এক খানি বড় নৌকায় শয়ন ও পাকের ব্যবস্থা ছিল। জ্যাঠামহাশয় নিজ হাতে 'ভুমা' আলুভাজা ভাজিয়া দিতেন, তাহা অমৃততুল্য বোধ হইত। রাত্রে দাঁড় টানার ক্যাঁচোৎ ক্যাঁচোৎ শব্দে পুলকিত হইতাম —কত স্বপ্ন দেখিতাম তাহার ইয়ত্তা নাই। মাঝিদের মুখে "দরিয়ার পাঁচ পীর বদর বদর" সে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর নাবিক সেই যাত্রকালে এই উৎসাহপূর্ণ মাঙ্গল্য জয়-ধ্বনি করিত। হিন্দু 'সত্য পীরের', 'মানিক পীরের' গান দিত —'সত্য নারায়ণ' ও "ওলাবিবির 'সিন্নি' দিত। মহরমের সময় মুসলমানের সঙ্গে কাঁদিত—ইদের সময় কোলাকুলি করিত—কোন্ পাষণ্ড হিন্দু মুসলমানের এই প্রীতির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে! পূর্ব্বদিন 'চেড়ো বাঁদিতে' প্রেমচাঁদ মাঝির বাটীতে পাক-শাকের আয়োজন হইল। জ্যাঠামহাশয় সিদ্ধ-হস্ত পাচক। তাঁহার পাক-কার্য্যের সহায়তায় জল গড়াইয়া ও নুনের 'কেটো' আগাইয়া দিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। উত্তরকালে বহুস্থানে "চড়াই ভাতি" আয়োজনে রন্ধন-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইলেও "রবিনসন্ ক্রুসোর" (Robinson Crusoe) দ্বীপের মত 'চেড়ো বাঁদির' সেই উচ্চ দ্বীপের আয়োজনের অভিনয় অসম্পূর্ণ থাকিত না। বড় আনন্দে, উৎসাহে ও প্রতীক্ষায় এ কয়দিন কাটিয়াছিল। রাত্রিশেষে ঘাটে পৌঁছিবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে বিষম অনর্থ উপস্থিত হইল। দাঁড় টানার শব্দে মোহমুগ্ধ হইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিলাম, এমন সময় ডোবা-গাছের ডালে লাগিয়া লোহার পাটী বোঝাই একখানা নৌকার তলা ফাঁসিয়া গেল। মহা কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জ্যাঠামহাশয় স্থিরবুদ্ধি নিপুণ নৌবাহিনীর অধ্যক্ষের ন্যায় জ্যোৎস্নালোকে মগ্ন-প্রায় নৌকা হইতে লোকজন ও মালপত্র অপর নৌকায় উঠাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন; কেবল ভারি লোহার পাটী নৌকাতেই রহিল, ও সে নৌকা গাছের সহিত কাছি করিয়া ও নোঙর করিয়া রাখা হইল, কারণ জল মরিয়া গেলে সে পাটী আদায় হইবে। জ্যাঠা-মহাশয় সংস্কৃত কলেজের স্থিরবুদ্ধি অধ্যক্ষ—এই বিপদের সময় যে স্থির বুদ্ধির পরিচয় দিলেন তাহার স্মৃতি কখনও মুছিবে না। উত্তরকালে নানা—বিপদের সময় এই স্মৃতি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

রক্ত-কমল

(উপন্যাস)
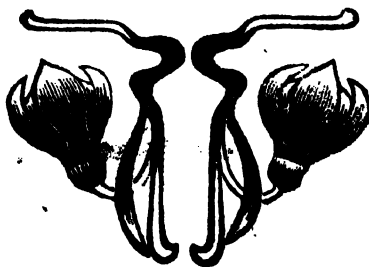
[রায় সাহেব শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি-এ]

পরদিন সকালে লীলা যখন শয্যা ছাড়িল, তখন দেখিল, বাহিরের আকাশটাও ঝাপসা—টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং তাহার ভিতরের আকাশটাও তেমনি ঝাপসা মেঘে ঢাকা। চিন্তা-মেঘগুলি কেবলই উড়িয়া উড়িয়া আসিতেছে, আবার উড়িয়াই যাইতেছে। লীলা তাড়াতাড়ি তাহার গাড়ীতে উঠিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কাশ্মীরে যাইয়া সে যে কিছুদিন বীণার সঙ্গে থাকিবে —কি সূত্রে, কেমন করিয়া হঠাৎ তাহার এই খেয়ালটা হইয়াছিল, লীলা তাহা মনে করিতেই পারিল না। স্বামীর সঙ্গে কাল আহারে বসিয়া হঠাৎ সে বলিয়া ফেলিয়াছিল—কাশ্মীরে যাইবে। ইহার বেশী তো আর কিছু নয়।

ডাক্তার মিত্র তাহার সঙ্গে যেমন হৃদয়হীনের মত ব্যবহার করিয়াছিল, লীলার কাশ্মীরে যাইবার ইচ্ছাটা কি তাহারই প্রতিশোধ? তাহা তো নয়। ডাক্তার মিত্র যখন আনন্দে শিকার করিয়া বেড়াইবে, লীলাও না হয় তখন কাশ্মীরের ডলহ্রদে একটু ফুলের মহোৎসবই দেখিল। ইহাতে হানি কি? হাঁ, তবে এ কথাটা ঠিক সে এবার ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তার তাহাকে আর কলিকাতায় দেখিতে পাইবে না। কয়েক দিন অদর্শনের পর লীলাকে পাইলে ডাক্তার যে খুবই আনন্দিত হইত, তাহাতে আর ভুল কি। এবার ডাক্তারের সে আনন্দ আর হইবে না। লীলা তাহার গাড়ীর মধ্যে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল· ভাবিল, বেশ হইয়াছে। যেমন সে—তেমনি এবার আশা-ভঙ্গের ব্যথাটা বুঝুক!

আজ গাড়ীতে বসিয়া এই ভাবটা লীলার মনে আসিল বটে, কিন্তু কাল যখন সে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"কাশ্মীর যাইবে," তখন এ-সব কথা তাহার মনেই হয় নাই। ডাক্তারকে একটু ব্যথা দিয়া, সে মজা দেখিবে, কিংবা ডাক্তারের উপর প্রতিশোধই লইবে—এ-কথা ভাবিয়া সে কাশ্মীরে যাইবার কথা বলে নাই। তখন ডাক্তারের উপর লীলার আর তেমন একটা টান ছিল না, যাহা থাকিলে এক জন আর একজনের উপর অভিমান করিতে পারে; বরং লীলা তখন ডাক্তারের উপর মমতা শূন্যই হইয়াছিল। ডাক্তার তখন হইয়াছিল যেন বহু দিনের পুরাতন এবং বিস্মৃতপ্রায় সুখ স্বপ্নের শেষ ভাগটা অতিশয় অস্পষ্ট একটা স্মৃতি মাত্র। যে ডাক্তার এতদিন লীলার আকাঙ্ক্ষা দগ্ধ হৃদয়ের একমাত্র শীতল প্রলেপ ছিল, এক রাত্রির অন্তরেই সেই শীতল প্রলেপ খসিয়া পড়িল! লীলার জীবনটাকে যে ব্যাপিয়া ছিল, এক রাত্রির পরই সে হইয়া গেল লীলার চোখে এক জন অজানা পান্থ—ভোগের সরাইখানায় কবে যে এক দিন তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল সে কথা আর মনে পড়ে না! যদি আবার ডাক্তারের সঙ্গে পুনর্মিলন হয়? লীলার মন অমনি ভয়ানক বিদ্রোহী হইয়া বলিল—কখনো নয়, কিছুতেই নয়। পৃথিবীটাই ওলোট-পালট হইয়া সে মিলনের সম্ভাবনাকেই দূর করিয়া দিবে! কলিকাতা ছাড়িয়া দূরে বহুদূরে কাশ্মীরে যাইবার নামেই আনন্দের একটা অস্পষ্ট সূচনা দেখা দিতেছে কেন, লীলার বিদ্রোহী মন তখন এ কথাটার কোন কৈফিয়ৎ দিল না।

গাড়ী আসিয়া বালিগঞ্জের পেজেট মিসেস্ কাদম্বিনী ঘোষের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কাদম্বিনী যখন শুনিলেন, লীলা কাশ্মীরে যাইতে চায়, এবং তাঁহাকেই সঙ্গে লইতে চায়, তখন তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লীলার মুখের দিকে চাহিলেন।

লীলা যখন তাঁহাকে বেড়িয়া ধরিল, তখন তিনিও কাশ্মীরে যাইতে সম্মত হইলেন। বলিলেন, "কবি শশধর-বাবু কাল কাশ্মীরে যাবেন বলেছেন।"

লীলা বলিল, "আমিও তাই শুনেছি। তাঁর মত লোক সঙ্গে থাক্‌লে দেশ-ভ্রমণের আনন্দটা অপরিসীম হ'বে।"

কাদম্বিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি

বরাবর দেখে আসছি, দুনিয়ার নিয়মই এই, যে যে জিনিসটার কিছুই বোঝে না—সে বড় গলায় সেইটেরই বেশী নিন্দা করে! মানুষের বাহিরটা তো তারপরিচয় নয়—পরিচয় হলো ভিতরের পদার্থে। লোকে বলে কবি শশধর উন্মাদ! তারা জানে না যে কবি প্রেমের পাগল। কবি যদি আমাদের সঙ্গী হ'ন, তা হ'লে দেখে নিও পথে কত আনন্দ পাবে।"

পরদিন কাশ্মীরে যাইবার জন্য লীলা ও কাদম্বিনী যাইয়া যখন পাঞ্জাবমেলে উঠিয়া বসিল, গাড়ী ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টাটাও পড়িয়া গেল। তখনো কবিকে না দেখিয়া লীলা বলিল, "এখনো যখন দেখছিনে; শশধরবাবু বোধ হয় আর এলেন না।"

কাদম্বিনী কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার ব্যথিত-দৃষ্টি তখন প্ল্যাটফর্মের শেষের দিকে আবদ্ধ ছিল।

গাড়ীর শেষ ঘণ্টা বাজিল। বলিল—"আর তবে এলেন না।"

কাদম্বিনী গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওই যে—ওই যে—"

লীলা দেখিল, লালবর্ণের কার্পেটের একটা ভারি ব্যাগ টানিতে টানিতে শশধরবাবু ছুটিয়া আসিতেছেন। গলার কম্ফর্টারটা খুলিয়া গিয়া এক একবার পায়ে জড়াইতে চাহিতেছে।

কোনওগতিকে গাড়ীতে উঠিয়া কবি তাঁহার ব্যাগটা ধপাস করিয়া ফেলিলেন এবং কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"আঃ বাঁচা গেল।"

ট্রেণ ছাড়িল।

শশধরবাবু বলিলেন—"আমার বড্ড দেরি হ'য়ে গেল। ক্ষমা করবেন। আমার কি এক জ্বালা! পতিতাদের ঘরে ঘরে যেয়ে উপাসনা করে' আস্‌তেই ট্রেণের সময় হয়ে গেল। কোন রকমে গোটাকতক জিনিস বেঁধে নিয়েই ছুটেছি। যা' বা দু'চার মিনিট সময় ছিল, লাগেজের ব্যবস্থা করতেই কেটে গেল। ভাবলাম, ট্রেণটা বুঝি আর পাই নে। না পেলে, বর্দ্ধমানে নেমে থাকবার জন্য আপনাদের কাছে তার দিতাম।"

কাদম্বিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আমরা কিছুতেই নামতাম না।"

কবি উচ্চহাস্যে কামরাটা ধ্বনিত করিয়া কহিলেন—"তা বেশ,বেশ ;দুনিয়াটাই তো এই রকমের। মহা ব্যোমের ভিতর দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ছুটে' চলেছে গ্রহ-উপ গ্রহ-জ্যোতিষ্কমণ্ডল। চলেইছে। কেউ ধরা দেয় না। আমিও না হয় তেমনি আপনাদের পেছন-পেছন ছুটে যেতাম সেই কাশ্মীর পর্য্যন্ত।"

কাদম্বিনী ও লীলার তরল-হাস্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কাদম্বিনী কহিল—"আজ যে আপনার উপাসনার দিন, কাল তো সে কথা বল্লেন না? আপনার সে লোহার শিকলটা গেল কোথায়? ফেলে এসেছেন বুঝি?"

শশধরবাবু বলিলেন—"চিত্রকরবাবু বুঝি শিকলের কথাটা বলেছেন? তার কথা ধরবেন না। শুনছি তিনি না কি বলেছেন—আমার সেই শিকলটা হ'লো পতিতাদের ঘরের দুয়ারের ভাঙ্গা একটা লোহার কড়া মাত্র! দুয়োর ঠেল্‌তে গিয়ে আমিই কড়টা ভেঙ্গেছি। আমিই ভেঙ্গেছি বটে, কিন্তু কেন যে ভেঙ্গেছি তাতো কেউ বোঝে না! সেই ভাঙ্গা কড়াটা দিয়েই আমি এই শিকল গড়ে' হাতে বেঁধেছি।"

শশধরবাবু ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার পাঞ্জাবী জামার আস্তিনটা সরাইয়া কব্জিতে বাঁধা শিকল দেখাইলেন। বলিলেন, "আমার এ শিকল মর্ম্মব্যথার প্রতীক মাত্র। যাদের আমরা সমাজের শিকলে অন্যায় করে' বেঁধে রেখেছি, অথচ বাঁধনের ব্যথাটা বুঝছিনা—এ শিকল হাতে বেঁধে আমি প্রতিমুহূর্ত্তে বন্ধনের ব্যাথাটাই অনুভব করছি, আর ছুটে' বেড়াচ্ছি, কেমন করে' এই শিকলটাকে ভাঙ্গতে পারি। ব্যথা ছাড়া তো মুক্তি নাই। আমি তাই তাকেই যেচে নিয়েছি—যাদের আমরা বেঁধে রেখেছি তাদের মুক্ত করবো বলে।"

লীলা ভাবিতে লাগিল, কতদিনে নারী তার পায়ের শিকল ভেঙ্গে মুক্ত হবে!

পাঞ্জাব মেল হু হু করিয়া চলিতে লাগিল।

কবি শশধরের একখানা কাঁচা কাঠের ছড়ি ছিল। ছোট ছুরি দিয়া তিনি ছড়ির মাথায় একটী মূর্ত্তি গড়িতে-ছিলেন। ছড়িটা কাটিতে কাটিতে তিনি বলিলেন,—"এই যে দেখছেন্ বিষাদময়ী নারীর প্রতিমা আমার এই ছড়িতে এ হলো বিশ্ব মানবের বেদনা। এই নারীর অন্তর ফেটে

তা' গৈরিকের মত নিত্য বেরিয়ে আসছে। সংসারে যে দিকে চাইবেন, সেই দিকেই দেখবেন এই মূর্ত্তি। সমাজতন্ত্র রাজতন্ত্র, শাসন, আচার যা' কিছু দেখছেন—সবই কেবল নির্ম্মম হ'য়ে ব্যথাই দিচ্ছে। সে কথা বলবার অধিকার পর্য্যন্ত আপনার নাই! বলেছেন কি, রাজার রোষ বজ্রের মত মাথায় এসে পড়বে—সমাজের রোষ আগুনের শিখার মত আপনাকে পোড়াবে!"

শশধরবাবু ছড়িগাছটা তুলিয়া ধরিয়া সেই অসম্পূর্ণ নারী মূর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"আর এই তো এখানে তুমি—বিশ্বমানবের প্রতিমূর্ত্তি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে শুষ্ক শীর্ণ দীর্ণ হয়েছ—লজ্জায়, অপমানে, দীনতায় যে আজ তোমার চৈতন্যকে লুপ্ত করে' দিয়েছে, সে তোমারই সমাজের অন্ধ আচর। সে তোমাকে শুধু আচার দিয়েই বেঁধে রাখতে চায়—তোমার পাখা দুটী কেটে নিয়েছে সে। বল্‌ছে—উড়ো না—উড়তে পাবে না মুক্ত নীলাকাশ তোমার জন্য নয়। তুমি থাকো এই খানে, শিকলে বাঁধা!"

কবির কথায় লীলার মনে বড় দাগ বেশী পোড়লো। সে বলিল—"আমার মনে হয়, আগেও যেমন—এখনো তেমনি—মানুষ এই রকমই স্বার্থপর, এই রকমই প্রচণ্ড সে, এই রকমই আত্ম সুখপরায়ণ। স্নেহ মমতা কোনো দিনই তার নাই। হতভাগ্য যারা—নিয়ম আর সমাজ, এই দুটো দৈত্যের পায়ের তলায় পড়ে' তারা চিরদিনই পিষে' মরে যাচ্ছে। দাঁড়ায় না তারা উঠে—যায় ভেঙ্গে চুরমার করে' দিয়ে। তারপর গড়ে' নেবা নূতন একটা সমাজ। সে সাহস যাদের নাই, তাদের চোখের জল সে মুছিয়ে শেষ করতে পারে, আপনাদের কাছে আমার কিছু বলবার নাই—কিন্তু নারী সমাজের কাছে এই নিবেদনটাই আমার করতে ইচ্ছা হয়।"

"পুরুষদের বাদ দিচ্ছ কেন লীলা?"

কাদম্বিনী তীব্র দৃষ্টিতে লীলার দিকে চাহিল।

লীলা বলিল—"আগুনকে যদি বলি, তুমি আর পোড়াতে পাবে না—আগুন কি তা মানে? সে পোড়াবেই। আচার, নিয়ম, সমাজ—এ সব তো পুরুষদেরই সুবিধার জন্য তারাই গড়েছে। আমরা যদি দল বেঁধে তার বিদ্রোহী হই, তবে না সংস্কার হ'বে।"

কথায়-কথায় রাত্রি গভীর হইতেছিল দেখিয়া গাড়ীর আলোটা যথাসম্ভব কমাইয়া দিয়া যে যার শয্যা-গ্রহণ করিল।

লীলা শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কাশ্মীরেতো যাইতেছি, কিন্তু কেন?

সমস্ত রাত্রি ভাবিয়াও লীলা এই 'কেন'র উত্তরটা খুঁজিয়া পাইল না।

তাহার মন বলিতে লাগিল, আমরা চাই নিবিড় ভালবাসা—আর কিছু নয়। কিন্তু যারা আমাদের ভালবাসে, তারা হয় শুধুই কাঁদায়—না হয় হাড় জ্বালায়।

লীলার চক্ষু একবার নিদ্রিতা কাদম্বিনীর মুখের উপর পড়িল। সে আপন মনে বলিতে লাগিল—এই ত এক নারী, প্রথমে বড় বিশ্বাস ছিল, তাঁর, স্বামী তাকে যত ভালবাসে—অমন আর কেই কাউকে বাসে না। কিন্তু আমি তো জানি সব। মিসেস্ ঘোষকে পরে কতদিন শুধু কেঁদে কেঁদেই কাটাইতে হয়েছে। এক পাশে প্রত্নতত্ত্বের রাশি রাশি নীরাস নিদর্শন নিয়ে চিন্তায় মগ্ন মিষ্টার ঘোষ—আর আর এক পাশে এই ক্ষুধিতা নারী! দিনের পর দিন মাথার উপর দিয়ে নীরবে চলে গেল, কেউ কাউকে কথাটাও জিজ্ঞাসা করল না। কোন বন্ধু এসে যে মিসেস ঘোষের সঙ্গে কথা কয়ে তাঁকে দু'দণ্ডের জন্য শান্তি দিবেন তারও কি উপায় ছিল? ঘোষসাহেব ঈর্ষায় জ্বলে উঠতেন—তাঁর শোণিতের চেয়ে প্রিয় ইট পাথর আর ধাতুর টুকরোগুলো তখন ধুলায় মলিন হতো! মিসেস ঘোষ বলিল—"আমায় ষোল আনা পেয়েও ঘোষসাহেব তখন ভাবতেন, বুঝি সবটুকু পাওয়া হয় নি—আমি বুঝি একটু খানি আলাদা করে' সরিয়ে রেখেছি! এইতো নারী জীবন, আর এই তা পুরুষের সমাজ!"

লীলার মাথাটা এতই গরম হইয়া উঠিল যে, সে গাড়ীর জানালা খুলিয়া মাথা বাহির করিয়া দিল। জ্যোৎস্নার স্নাত শীতল বাতাস হুহু করিয়া মাথায় আসিয়া লাগিতে লাগিল।

তখন পূবের আকাশে ঊষা হাসিতেছে।

৯

শ্রীনগরে আসিবার পরদিন লীলা যখন বীণার ত্রিতল

বাড়ীর সর্ব্বোচ্চ বারাণ্ডার রেলিংএ ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়া প্রকৃতির বিচিত্র শোভা দেখিতেছিল, বীণা ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল এবং এক বাহু লীলার কণ্ঠে রাখিয়া অঙ্গুলি তুলিয়া কহিল—"কি ভাই, ওই যে আমাদের কাশ্মীরের আকাশ—ও কেমন দেখাচ্ছে?"

লীলা বলিল—"চমৎকার!"

বীণা বলিল—"দেখ দেখ—আবার দেখ। পৃথিবীতে এমনটী আর কোথাও পাবে না। প্রকৃতি এত সুন্দরী—এত রমনীয়া—বর্ণে বর্ণে এমন লীলাময়ী, আবার এমন গম্ভীরা—কোথাও ভাই এমন পাবে না, এই কাশ্মীরে যেমন। যে ভগবান কাশ্মীরের এই তুষার-শৃঙ্গমালা গড়েছিলেন, তিনি পরম শিল্পী—তা নৈলে, মণি-মুক্তা নিয়ে কি কেউ এমন খেলা খেলতে পারে? সকল চিত্রকরের গুরু না হ'লে কি রংএ এমন মদিরা কেউ ঢাল্‌তে পারে? সকল কবির প্রাণ এক সঙ্গে না হ'লে, গাছে, পাথরে—আকাশে, জলে এত কাব্য কি কেউ ফোটাতে পারে?"

লীলা কোনো কথা কহিল না। সেই তুষার-কিরীট গুলির দিকে চাহিয়া রহিল। সূর্য্যের কিরণে সেগুলি কেমন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহাই সে দেখিতে লাগিল। বরফের আলিঙ্গন ছাড়িয়া শীতল মুক্ত পবন তখন ডল্ হ্রদের বুকের উপর দিয়া ধীরে ধীরে ভাসিয়া আসিতেছিল। তপন-স্পর্শে ঈষদুষ্ণ হইয়া উহা লীলার চূর্ণকুন্তলরাশি লইয়া খেলা করিতে লাগিল। লীলা তন্ময় হইয়া বলিল—"চমৎকার—চমৎকার!"

বীণা বলিল—"আমার ভাই এক এক সময় মনে হয় যে পৃথিবীর জন্ম কালে বিধাতা বুঝি চিরসুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্যই এই শোভার মন্দিরটী রচনা করেছিলেন। দেখছ না—এ যেন চিত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখা, এ যেন ভাস্কর্য্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। কোনো দিকে—কোনো-কিছুতে এতটুকু খুঁত পাবে না। যতই দেখি, ততই মনে হয়—কি যেন আরও আছে এর মধ্যে—যার নাম জানি নে, অভিব্যক্তি জানিনে—ভাষায় যাকে প্রকাশ ক'রে বলতে পারিনে—কিন্তু বুঝি যে আছে, নিশ্চয়ই তা আছে। এটা এমন দেশ যে সর্ব্বদাই মনে হ'বে—বুঝি একটা স্বপ্ন তোমায় ঘিরে রেখেছে—একটা যেন কি মাধুরী কি বিষাদ, কি গাম্ভীর্য্য, কি বিরাট্ উদারতা—একটা যেন পরশহীন ফুলের মালা তোমায় জড়িয়ে রেখেছে। ছুঁতে চাও, ধরতে চাও—পাবে না, কিন্তু অন্তরে তা' বুঝতে পারবে। চেয়ে দেখ, দেখবে, ওই যে নঙ্গা পর্ব্বত—নীল আকাশটা ফুঁড়ে' মাথা তুলেছে—কি যেন একটা কাতরতা ওর সর্ব্ব অঙ্গ থেকে ঝরে' পড়ছে—কি যেন সে চায়, তা পায়নি, যেন তারই আশায় অমন করে' অনন্তের পথে নির্নিমেষে চেয়ে আছে। আর ওই যে দেখছ বিতস্তা—বাড়ীটার নীচেই—ঝির্-ঝির্ তির্ তির্ করে' বয়ে যেতে যেতে শ্রীনগরের বুকটা চিরে' নীচে নেমেছে—ওর গানেও শুনবে কি এক বেদনার সুর—যা তোমায় একটা বিষাদ-মাখা পুলকে শিউরে তুলবে।"

সূর্য্য তখন ক্রমেই পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িতেছিল। দেখিতে দেখিতে আকাশের সকল মেঘে আগুন লাগিল। বাতাস বেশ একটু শীতল হইয়া উঠিল। কাদম্বিনী গলায় একটা শালের কম্ফর্টার জড়াইয়া দুই একবার হাঁচিতে হাঁচিতে সেই বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বীণা বলিল—"ভাই লীলা, এ তোমার বাঙ্গালা দেশ পাও নি যে ঠাণ্ডাকে ভয় করবে না। কাশ্মীরের ঠাণ্ডা বড় দুরন্ত। গরম কাপড়-চোপড় পরবে চল। ওই দেখছ না, কাশ্মীরী মেয়েগুলো ওদের গরম ঢিলে ফেরনের নীচে আগুন ভরা কাংড়ি নিয়ে বেড়াচ্ছে।

লীলা তখন দেখিতেছিল, এক জন হাস্যমুখী তরুণী বাজারের কাজ সারিয়া কবরীতে পীত গোলাপ গুঁজিয়া গায়িতে গায়িতে নীচের সরু পথটী দিয়া বিস্তার সেতুর দিকে যাইতেছে। তাহাদের গানের সুরে কি যেন একটা ছিল যাহা সেই সমাগত গোধূলির রক্তিমার সহিত মিশিয়া লীলার অন্তরকেও রাঙ্গাইয়া দিল। লীলা বলিল—"চল বীণা যাই, তোমার মোগলাই চা বুঝি এতক্ষণ ঠাণ্ডা হচ্ছে।"

বীণা একটু হাসিয়া বলিল—"হাঁ চল। আজ কলকাতা থেকে চিঠি পেলাম। ভাল, তুমি অরুণদাদাকে কি চেন? বাঙ্গালার সেই বিখ্যাত ভাস্কর? তাঁরই চিঠি আজ পেয়েছি। দু'চার দিনের মধ্যেই তিনিও কাশ্মীরে আসছেন তুমি থাক্‌তে থাক্‌তে তিনি এলে কত আনন্দ হ'বে। ললিত-কলার সৌন্দর্য্য বুঝ্‌তে তাঁর মত অমনটী আ/

দেখি নি। তিনি যখন আসছেন, তোমার কাশ্মীর ভ্রমণ সার্থক হবে। কাশ্মীরের রূপ যে কি মধুর, তা' তিনি যেমন বুঝিয়ে দিতে পারবেন—অমন আর কেউ নয়। আমি তোমায় কাশ্মীরের পাহাড়ের মধ্যে টেনে এনেছি। এখানকার মাধুরী পাছে মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে যেতে না পারে, এই বড় ভাবনা ছিল। যাক্ অরুণদা যখন আসছেন, সে ভাবনা আর রইল না। এখানে যা' কিছু দেখবার আছে, তিনি তোমায় এমন করেই দেখিয়ে আনতে পারবেন যে কাশ্মীরী গাইডের তা' সাধ্য নাই। সাধারণ গাইড শুধু মূর্ত্তির কাঠামোটা দেখে—মূর্ত্তির রূপ তো দেখতে পায় না।"

লীলা বলিল—"এই ভাস্করকে তুমি জান্‌লে কেমন করে ?"

"আমি আর জানি নে ? দুবার তিনবার তিনি কাশ্মীরে এসেছেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর যে একটু সম্পর্কও আছে। তিনি আমাদের জ্ঞাতি-ভাই।"

কাদম্বিনী আবার একবার হাঁচিলেন, বলিলেন—"চল বীণা ভিতরে যাই, বাইরে বড় ঠাণ্ডা। অনেকদিন পর এলাম কি না, এ ঠাণ্ডাটা সইয়ে নিতে সময় লাগবে।"

তিন জন বারান্দা ছাড়িয়া ড্রইংরুমে যাইয়া বসিল। চিম্‌নীর নীচে রাঙ্গা হইয়া কয়লা জলিতে লাগিল। বীণার ড্রইংরুমের ভিতরটাও ছিল রক্তাভ। শ্বেত-প্রস্তরের ছোট বড় নানা মূর্ত্তি দিয়া বীণা সেই ঘরটী সাজাইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের টিব্বা হইতে বীণা একটী বৃহৎ শঙ্খ সংগ্রহ করিয়াছিল। উহার গায়ে একটী সংস্কৃত শ্লোক লেখা ছিল। ছোট একখানি সুন্দর টেবিলের উপর বীণা পরম যত্নে সেই শঙ্খটী রাখিয়াছিল। বীণা বলিত, সেই শঙ্খটার নিনাদ কত পুরাতন অতীতের সঙ্গে নবীনকে বাঁধিয়া দিয়া, কত দিনের কত স্মৃতিকে জাগ্রত সচেতন করিয়া রাখিয়াছে। শঙ্খের ধ্বনি স্বর্গ হইতে শিশুর আগমন বার্ত্তা জানায়—যৌবনে শঙ্খই তাহার কণ্ঠে জয়মাল্য দেয়—শঙ্খই আবার তাহাকে প্রেমলক্ষ্মীর ভক্ত-সাধক করিয়া তোলে। শেষে মঙ্গলময় মৃত্যুর আহ্বান শঙ্খের মুখেই নিনাদিত হইয়া থাকে। অরুণকুমার যেবার কাশ্মীরে আসিয়া কিছু বেশী দিন ছিলেন, সেবার এই ভাবগুলি মূর্ত্তি দিয়ে প্রকাশ করিয়া বীণাকে উপহার দিয়ছিলেন।

চা-পানের পর বীণা যখন সেই মূর্ত্তিগুলির অর্থ প্রকাশ করিয়া দিল, লীলা তখন বিস্মিত নয়নে চাহিতে চাহিতে বলিয়া উঠিল—"সুন্দর—অতি সুন্দর এই মূর্ত্তিগুলি। মানুষ কি এমন করিয়াই মানুষের মন দেখিতে পারে ?"

"শিল্পী যিনি, তিনিই শুধু পারেন। তুমি আমি কি পারি ? অরুণদাইতো আমার এই বাড়ীটার নাম রেখে গেছেন শঙ্খ-কুটীর। আসুন আগে অরুণদা, তারপর তাঁর মুখেই শুনবে এই সব মূর্ত্তিগুলির ভাব ও ব্যাখ্যা।"

পরদিন কাশ্মীরের রাজ-প্রাসাদ দেখিয়া ফিরিবার কাদম্বিনী শেষ কহিলেন—লীলা, দেখ-দেখ কবির কাণ্ডটা দেখ—দর্জ্জিটার পাশে বসেই চুরুট টানছেন, আর মধ্যে মধ্যে সুর করে' কবিতা আওড়াচ্ছেন !

লীলা চাহিয়া দেখিল, একটা দর্জ্জি দুই পায়ে সেলাইয়ের কলটা চালাইতে হাসিতেছে এবং শশধর বাবুর মুখে কবিতা শুনিতেছে।

লীলা কহিল—"এই যে, শশধরবাবু ! আপনার খোঁজে ধর্ম্মশালায় গিয়ে আমরা ফিরে এলাম। আপনি বলে ছিলেন, রাজবাড়ী দেখতে নিয়ে যাবেন—আপনার ভরসায় থাক্‌লে—"

বাধা দিয়া শশধরবাবু বলিলেন—"বলেছিলাম ত যাবো - ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু হয়ে উঠলো না। আপনার সুন্দরী, তাই আছেন কল্পনার রথে—আর আমি মাথায় কাঁচা-পাকা চুলগুলো নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি জীবনের সুখ দুঃখের পিছনে পিছনে। সাহেব আজ তবে আসি, কাল আবার দেখা হ'বে" বলিয়া দর্জ্জিকে একটী প্রীতি নমস্কার জানাইয়া কবি শশধর লীলাদের সঙ্গ লইলেন।

যাইতে যাইতে লীলা জিজ্ঞাসা করিল—"দর্জ্জির কাছে কি কোন কাজ ছিল ? আমরা বুঝি সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেম ?"

"না না না—মোটেই না। আমিও বসেছিলাম 'শঙ্খ কুটীরে' যেতে যেতে দেখি দর্জ্জিটা বড় যত্ন করে' একটা জামা সেলাই করছে। দেখেই মনে হলো লোকটা খুবই সরল। তাই একবার ওর কাছে গেলাম। ওরও তো মাথার চুলে পাক ধরেছে। দু'জনে সুখ-দুঃখের কথা আরম্ভ হলো। বল্লে এক পেয়ালা নাম্‌কি চা দেবো কি ?" তখন নিমন্ত্রণটা কি কেউ ঠেল্‌তে পারে ? আমি

বল্লেম, দাও। দু'খানা লুচি আর একখানা বাখর খানি সমেত গরম গরম এক পেয়ালা নামকি এনে হাজির!"

"আপনি এ দেশের সেই নুন-চা খেতে পারেন?"

"সময়ে সময়ে পারতে হয় বৈ কি? কাঁধে কাঁধ না মিলতে পারলে কি সুখ-দুঃখের কথা চলে? দর্জ্জিটার কাছে এ দেশের পতিতাদের খবর শুনছিলেম। আহা তাদের বড় দুঃখ! আসুন এই বাগানটায় একটু বসা যা'ক। এখান থেকে চারিদিকের দৃশ্যটা বড় মধুর।"

সকলে বাগানে গিয়া একখানি শিলাসনে বসিলেন। তখন ক্ষীরপ্রিয়া ভবানীর উদ্দেশ্যে একটা শোভাযাত্রা সমারোহের সহিত যাইতেছিল। শুভ্রবর্ণ শুভ্রবসনা নারীরা স্তব পাঠ করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল। কাশ্মিরী ব্রাহ্মণদের পোষাকের জাঁক-জমক দেখিয়া কবি কহিলেন—

"এই যে এত আড়ম্বর দেখছেন, এ সব আর থাকবে না। সেকালের সেই জীর্ণ চীর—সেই গাছের বাকল আর গৈরিকের দিন আবার ফিরে আসছে। ভারতের তীর্থে-তীর্থে যেয়ে শুধু এই দেখলাম যে দম্ভ, সম্পদ, আর ঐশ্বর্য্যের গরিমা, অবিনয় এবং ভক্তির অভাব। দেবতার পূজারী সেখানে এই মূর্ত্তিতেই বিরাজ করছে। কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন শুধু দরিদ্রের ডাকেই বেদীর উপর শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব হ'তো। পৃথিবীর চেহারা তখন ফিরে যেতো। এই জন্যই একদিন রাজসন্ন্যাসী ভিক্ষুর দল গড়েছিলেন। তারা বিলিয়ে দিত শুধু প্রেম। কি হিমালয়ের মূলে, কি ভাগীরথীর তীরে—তাই এক দিন প্রেমেরই বন্যা নেমেছিল! যাকগে সে কথা। আমি বুঝি দীনের রোদন। সে যেখানে ক্ষুধায় কাঁদছে, লাঞ্ছনায় মরছে, রোগে জীর্ণ হচ্চে—সেই খানেই তো সত্যিকার ভগবান থাকেন। আমি চাই বিশ্বের ঘরে ঘরে সেই কথাই বলতে। সমাজ যাদের চির-অভাগিনী ক'রে রেখেছে—তাদেরই কুটীরের দ্বারে গিয়ে আমি চাই বলতে —আয়, তোরা আয়—তোদেরই জন্য আমি দয়া এনেছি, ক্ষমা এনেছি, ভালবাসা এনেছি। কিন্তু করি যদি তাই, স্বার্থপর সমাজ নিজের কালিটা ঢেকে রেখে, তার উদ্যত দণ্ড নিয়ে অমনি মারতে আসবে। কি ধনী, কি নির্ধন—কি শক্তিমান, কি দুর্ব্বল—সকলেই তখন ব্যঙ্গের হাসিতে আকাশটা ভরিয়ে তুলবে—ভয়, পাছে তাদেরই কলঙ্কের কথাটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। এই যে দেখছেন, যাচ্ছেন ব্রাহ্মণের দল—এঁরাই তখন দল বেঁধে একঘরে করবার জন্য ঠাকুরেরই প্রাঙ্গণে জটলা ক'রে দাঁড়াবেন। যে কর এক দিন ছিল অভয়দানের জন্য—সেই করে তুলে দেবেন শুধু অভিসম্পাত। বলবেন তাঁরা—এই দেখ একটা আস্ত পাগল। কিন্তু জানবেন—এই বিশ্বকে যাঁরা বারবার বাঁচিয়ে গেছেন, তাঁরা সেই পাগলেরই দল। বুদ্ধিমানরা শুধু হত্যাই করে—বাঁচায় না!"

উত্তেজনার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে কবি একেবারে হাঁপাইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার মোটা বর্মাটা ধরাইয়া ঘন ঘন টানিতে লাগিলেন। উত্তেজনা যখন কমিল তখন ধীর কণ্ঠে কহিলেন—"

"আমার কোন গুণ নেই বটে মিসেস ঘোষ। কিন্তু দুইয়ে আর দুইয়ে যে চার হয়, এটা আমি খুবই বুঝি। যদি একটু খোঁজ নেন, তা হ'লে দেখতে পাবেন পৃথিবীতে যখনই যে বড় কাজ হয়েছে, পাগল ছিল তার গোড়ায়। এই যে এতবড় একটা দেশ ভারতবর্ষ দেখছেন, এ যদি কোন দিন এগিয়ে চলে তবে তার পিছনেও দেখবেন সেই এক দল পাগলেরই ছুটা-ছুটি।"

কাদম্বিনী ঘোষ বলিলেন—"আমি অত-শত জানি না শশধরবাবু। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি, সংসারে যাঁরা নিজেদের খুব জ্ঞানী ব'লে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, আমি তাঁদের দু'চক্ষে দেখতে পারি নে।"

কিছুক্ষণ পর বাগান হইতে উঠিয়া লীলা, মিসেস ঘোষ এবং কবি শশধর যখন শঙ্খ কুটীরে আসিলেন, তখন বীণা তাহারই একটী নূতন কবিতা সোনালী কালীতে পুরুকাগজে নকল করিতেছিল। লীলাকে দেখিয়াই বীণা কহিল—"এঁর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি। এঁর নাম কুমার অজয় সিংহ। আমার একজন পরম বন্ধু।"

কুমার অজয় সিংহ তখন লীলা ও মিসেস্ ঘোষকে নমস্কার করিয়া কহিলেন—"আপনারা যে কাশ্মীরে এসেছেন, এটা খুবই সৌভাগ্য। বাঙ্গলাদেশের সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠতা হবার সুযোগ হ'লো। আমাদের এই পাহাড়ে ঘেরা কাশ্মীরকে কেমন লাগছে?"

লীলা কহিল—"চমৎকার। এ দেশ কবি এবং

শিল্পীদেরই যোগ্য দেশ। তাই এই বীণার তারে ঝঙ্কার আর থামতে চায় না।"

লীলা সস্নেহে বীণার স্কন্ধের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইল। "ওটা ক কবিতা ভাই, পড় না শুনি।"

বীণা কহিল—"শুন্‌বে? এ কবিতাটা কি তোমার ভালো লাগ্‌ছে?" বীণা পড়িতে লাগিল—"

জনহীন সুনিবিড় কান্তারের মাঝে
উৎস যথা ঝরে' পড়ে কুসুমের গায়ে,
ধারা তার ধায় ধীরে—কভু বা লুকায়—
গান তার ভাসে শুধু আকাশের গায়ে;—
সেই খানে আসিত সে বাঁশী লয়ে করে।
সেইখানে বসি শিলাসনে, বাজাইত
আপনার মনে, কত কথা কত গানে—
নাহি জানে কাহার উদ্দেশে।

চমকিয়া

এক দিন উঠিল সহসা অপরূপ
নারীকণ্ঠ শুনি, নেহারিয়া মোহিনীর
মধুর-মূরতি—নেহারিয়া সেই তার
স্বপ্নমাখা আঁখি। বনদেবী বলি তারে
করিলা সম্ভাষ যুবা কত না পুলকে।
অন্তরের অন্তস্তলে ছিল যে প্রতিমা,
মূর্ত্তি লয়ে আজ তাহা দিল দরশন।
নব জলধর বুকে বিজলীর মত
হাসিয়া লুকালো বালা কাননের মাঝে।
তার পর কত দিন হইল অতীত—
কত ম্লান সন্ধ্যালোকে করি আলোকিত
বিতস্তার শ্রান্তি-হরা শীতল সে ধারা।
বাঁশী শুধু কেঁদে কেঁদে ডাকিল তাহারে—
তারই গানে তারে খুঁজি ফিরিল কাননে।

তারপর সেই এক পূর্ণিমা নিশীথে
হৃদয়ে হৃদয়ে যবে হইল মিলন—
নিবে গেল আকাশের জ্যোৎস্নার হাসি,
থেমে গেল বাঁশরীর যত গান ছিল।

দুই-জনে হেরিল বিস্ময়ে—কিছু নাই,
কেহ নাই আর; কিবা রবি, কিবা শশী
কিবা তারা-হার—কি প্রান্তর, কি কান্তার
কিবা জল-স্থল—সহসা সকলি গেছে—
মুছিয়া তখন; সর্ব্বস্থান সর্ব্ব কাল,
সকল পৃথিবী—পরিপূর্ণ আনহারা
আবেশে বিহ্বল-মুগ্ধ তাহাদেরি প্রেমে।

* * *

দেবতায় ডাকি দোঁহে কহিল কাতরে—
মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও এই ভিক্ষা মাগি,
বিচ্ছেদ দিও না দেব, তিলেকের তরে।

কবি শশধর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—"বাঃ চমৎকার আখ্যান। মনে হচ্ছে যেন কাশ্মীরের আকাশটাই আজ এই প্রণয়ী-যুগলের সুখে হাস্‌ছে।"

লীলা বলিল—"তারা তবে মর্‌তে চাচ্ছে কেন?"

বীণা কহিল—"তাদের যা' কিছু কাম্য ছিল, সবই তো পেয়েছে তারা। পাওয়ার পরই তো আবার সেই হারানো—সেই বিচ্ছেদ! তবে আর কিসের আশায় বেঁচে থাকবে তারা?"

"তুমি হবে বল্‌তে চাও, যার আশা আছে, সেই শুধু বাঁচ্‌তে চায়?"

"তা নয় তো কি? ভবিষ্যতের সেই সোনালী মেঘের আড়ালে আমাদের জন্য যে কোন্ মহাবস্তুটী লুকিয়ে আছে, সেইটের আশাতেই তো আমরা বেঁচে থাক্‌তে চাই। যে তা' পেয়েছে, সে আর বাঁচ্‌বে কেন? এই ভবিষ্যৎ—এই আমাদের অনাগতই তো ভাই, কল্পনার পরী-রাজ্যের রাজা। ওই দেখ সেই দীপ্ত সম্রাটের রাজবেশ ফুলে ফুলে ঢাকা—সারি সারি তারার মালা তার কণ্ঠে ঝিলিক্ দিচ্ছে; আর ওই দেখ, চোখের জলের কত গঙ্গা যমুনা, বিতস্তা কিশনগঙ্গা সে চোখের প্রান্ত ব'য়ে ব'য়ে ব'রে শেষে নীরবে গড়িয়ে চলেছে। হে আমার অনাগতের সম্রাট্—তোমার জয় হোক্।"

ক্রমশঃ

গ্রন্থ-সমালোচনা

সটীক ও সানুবাদ মহাভারত

সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর, বিবিধ কাব্যনাটক গ্রন্থের টীকাকার ও অনুবাদক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সম্পাদিত নীলকণ্ঠাচার্য্যকৃত টীকা, স্বরচিত বিবৃত ভারত কৌমুদী নামে নূতন টীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত মহাভারতের আদিপর্ব্বের প্রথম খণ্ড (১২৮পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমে পরিষ্কার ইংলিশ টাইপে মূল, তৎপরে পাইকা অক্ষরে বঙ্গানুবাদ এবং সর্ব্ব নিম্নে পাঠান্তরাদি প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য গ্রাহকদিগের পক্ষে ১৲ সাধারণের পক্ষে ১।০। প্রতিমাসে এইরূপ এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে।

গ্রন্থ আলোচনার পূর্ব্বে মহাভারত প্রচারের জন্ত বঙ্গদেশে যে সকল চেষ্টা হইয়াছে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহাতে তুলনায় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের গ্রন্থের উৎকর্ষা-পকর্ষবিচারের সুবিধা হইবে।

কিঞ্চিন্যূন শতবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশে মহাভারতের মূল প্রথমে দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হয়। Committe of Publio Instructionএর প্রযত্নে এই কার্য্যের সূত্রপাত হয় এবং ৮৩১ পৃষ্ঠায় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত কলেজের বিশাল পুস্তকাগারের হস্তলিখিত পুস্তকগুলির পাঠ মিলাইয়া এই গ্রন্থ সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড (৮৪৮ পৃষ্ঠা), তৃতীয় খণ্ড (৪৩৯ পৃষ্ঠা) এবং চতুর্থ খণ্ড (১০০৭পৃষ্ঠা) যথাক্রমে ১৮৩৬, ১৮৩৭ ও ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রযত্নে প্রকাশিত হয়। এই বিরাট্ গ্রন্থের সম্পাদন কার্য্য নিমাই শিরোমণি, নন্দগোপাল পণ্ডিত, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রামগোবিন্দ পণ্ডিত, ও রামহরি ন্যায়পঞ্চানন সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বহুদিন যাবৎ মহাভারতের এই সংস্করণই প্রামাণিক রূপে বিবেচিত হইত। St. Petersburg অভিধানে এই সংস্করণই উদ্ধৃত হইয়াছে। ৮০৲ টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় এই গ্রন্থ সাধারণের পক্ষে দুর্ল্লভ ছিল।

কালক্রমে ভারতের অমূল্য রত্ন সাধারণের সুলভ করিবার জন্ত ১৭৮৪—১৮০৩ শকে বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে মহারাজ মহাতবচাঁদ বাহাদুরের ব্যয়ে ও প্রযত্নে বঙ্গাক্ষরে এই গ্রন্থের মূল পুনঃ প্রকাশিত হয় এবং পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। ইহার পরে শ্রীরামপুর হইতে হরিশ্চন্দ্র দেব চৌধুরী মহাশয়ের ব্যয়ে এবং সত্যব্রত সামশ্রমি মহাশয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গাক্ষরে নীলকণ্ঠের টীকাসহ মহাভারত ১৭৯৩ শক হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সম্পাদকতা ও কেদারনাথ রায় কর্তৃক নাগরী অক্ষরে মূল মহাভারত মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার পর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে নীলকণ্ঠের টীকাসহ মহাভারত বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়।

কেবল মূল এবং টীকা প্রকাশের দ্বারা পণ্ডিত সমাজের উপকার হইতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা সাধারণের পক্ষে মহাভারত পড়িবার ও বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হয় না। সেইজন্ত মহাভারতের তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্ত বাঙ্গলা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ হয়। এই প্রচেষ্টা বর্ত্তমান যুগেরই একটা বৈশিষ্ট্য। সঞ্জয়, কাশীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের রচিত মহাভারতের পদ্যানুবাদ প্রকৃত অনুবাদ নামের উপযুক্ত নহে। মূলের আক্ষরিক অনুবাদ তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। মূল উপাখ্যানগুলি সাধারণের রুচিকর ভাষায় (অনেক স্থলে নূতন উপাখ্যানের সহযোগে) সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়াই তাঁহাদের কল্প ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু "দুধের আস্বাদ ঘোলে মিটে না।" সেই সকল পাঁচালী সাধারণের যতই উপযোগী ও উপভোগ্য হউক না কেন, সংস্কৃতানভিজ্ঞ শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তাই মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদের এই নবীন চেষ্টা। এই চেষ্টার অগ্রণী ছিলেন বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা, বিবিধ নবীনজনহিতকর বিষয়ের উদ্ভাবক স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায়, তিনি স্বতন্ত্র কার্য্য করা অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া সিংহ মহাশয়ের কার্য্যে সহায়তা করিতে আরম্ভ করেন। বহু পণ্ডিতের সহায়তায় সিংহ মহাশয় প্রায় আট বৎসরে এই কার্য্য সমাপ্ত করেন। তাঁহার অনুবাদের আদিপর্ব্ব ১৭৮১ শকে এবং শান্তিপর্ব্ব ১৭৮৭ শকে প্রকাশিত হয়। তাঁহার গ্রন্থ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইত এবং ইহা পুরাণ সংগ্রহ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শান্তিপর্ব্ব পুরাণ সংগ্রহের ১৪শ ও ১৫শ খণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়। তিনি হরিবংশের অনুবাদ প্রচার করেন নাই। এই অভাব পরিপূরণের জন্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন মহাশয় গোপালকুড়িয়া হইতে গোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য-সংগ্রহে হরিবংশের অনুবাদ করেন। তাঁহার অনূদিত পূর্ণ গ্রন্থ সন ১২৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতেও পণ্ডিতবর্গের সহায়তায় একটী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সিংহ মহাশয় এবং বর্দ্ধমানাধিপতির প্রকাশিত গ্রন্থ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজে বিতরণ করা হয়।

কিন্তু প্রথমে ইহা সাধারণের অলভ্য ছিল। সেই জন্ত সন ১২৭৩ সালে জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদসহ মহাভারতের আদিপর্ব্ব ও নীলকণ্ঠের টীকা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কথা ছিল প্রতিমাসে দশ ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইবে। কতদূর এই

---

* কলিকাতা ৪১নং দুর্গি সেন লিম্বাস্ত বিভাগম হইতে শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কর্তৃক প্রকাশিত।

কার্য্য অগ্রসর হইয়াছিল—তাহা জানা যায় না, যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে মূল ও অনুবাদ একত্র দেওয়া হয় নাই। অনুবাদ স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছিল।

প্রতাপচন্দ্র রায় মহাশয়ও মহাভারতের এক অনুবাদ প্রকাশ করেন। অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর তিনি মূল প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। দেববংশীয় হরিশ্চন্দ্র দেব চৌধুরী মহাশয়ের প্রার্থনায় ও ব্যয়ে কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় রচিত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হয়। ১৭৮৩, ১৭৯৩, ১৮০০ এবং ১৮০৩শকে যথাক্রমে সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ ও ভীষ্মপর্ব্ব প্রকাশিত হয়।

গদ্য অপেক্ষা পদ্যের আদরই ভারতবাসীর নিকট অপেক্ষাকৃত বেশী। সেইজন্য কেহ কেহ বর্ত্তমান যুগে মহাভারতের আক্ষরিক পদ্যানুবাদ কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। শ্রীযুক্ত গিরিধর বিদ্যারত্ন মহাশয় সভাপর্ব্বের কিয়দংশ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া শারীরিক অস্বাস্থ্য নিবন্ধন সে কার্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহাভারতকে নাট্যকাব্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আদিপর্ব্বের কিছু অংশের অধিক আর তিনি রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বর্ত্তমানে উপরি বর্ণিত প্রায় সকল গ্রন্থই একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। দুইএকখানি ব্যতীত অপরগুলি বাজারে পাওয়া যায় না। তাহার উপর, ভাষার ক্রম পরিবর্ত্তনের ফলে বঙ্গানুবাদগুলি বর্ত্তমান পাঠকবৃন্দের নিকট যে কথঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সংশয় নাই। মূলের সঙ্গে একস্থানেই বঙ্গানুবাদ না থাকায়, সাধারণ পাঠকের পক্ষের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। কেবল মাত্র বঙ্গানুবাদের বা নীলকণ্ঠের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত টীকার সাহায্যে জিজ্ঞাসু, সংস্কৃতে অবিশেষজ্ঞ পাঠকের মূল সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করা একরূপ অসাধ্য।

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে এই সকল অভাব দূরীভূত হইবে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার ভারত-কৌমুদী টীকা অযথা পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের বৃথা প্রয়াসে ভারাক্রান্ত নহে। প্রতি শ্লোকের প্রতি শব্দের অর্থ অতি সরলভাবে ইহাতে বুঝান হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে যে ইহাতে পরম উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার রচিত বিবিধ কাব্য ও নাটকের সরল টীকা ছাত্রসমাজে যেরূপ অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে, তাঁহার এই ভারত-কৌমুদী টীকাও সেইরূপ সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। অথচ পণ্ডিত-সমাজেরও বিশেষ চিন্তা ও আলোচনা করিবার বিষয় এই টীকা মধ্যে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গীয় পণ্ডিতবর্গের রচিত মহাভারতের টীকার সংখ্যা অধিক নহে। আর সেই স্বল্পসংখ্যক টীকার অধিকাংশই অতি সংক্ষিপ্ত, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের টীকা সমাপ্ত হইলে, তাহা বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর বিশেষ মূল্যবান সম্পদ্ হইবে। তাঁহার রচিত বঙ্গানুবাদ অতি সরল এবং বর্ত্তমান সময়োপযোগী হইয়াছে। প্রতি পৃষ্ঠায় মূলের নিম্নেই টীকা ও বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হওয়ায় পাঠকবর্গের আলোচনার যে বিশেষ সুবিধা হইবে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় ইহার প্রচার অনেক কম হইবে। কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দের ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। ছাপা, কাগজ সকলই বেশ ভাল। ইহা অপেক্ষা সুন্দর সংস্করণ পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

তবে নিঃসহায়, নিঃস্ব ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পক্ষে এরূপ বিরাট কার্য্য সুসম্পন্ন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই। সেই জন্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় যেন সুস্থশরীরে নির্ব্বিঘ্নে এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দেশের ও দশের ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারেন।

অনন্তসহায় একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিতই অন্য শত কার্য্যের মধ্যে বিশাল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাচস্পত্যাভিধান প্রণয়ন করিয়া অমর হইয়াছেন। নিঃস্ব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ই এযাবৎ ষোলখানি অনতিক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া নিজের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং, দৈব প্রতিকূল না হইলে তাঁহার মত কর্ম্মী, অধ্যবসায়ী ও উৎসাহী লোকের পক্ষে এই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করা অসম্ভব হইবে না।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ

আলাপ-আলোচনা

নববর্ষের প্রথম দিনে আমরা আমাদের পরম সুহৃদ সুকবি সুধীনগোপাল বসুকে হারাইয়া শোকসন্তপ্ত। তিনি ছিলেন আমাদের বাল্যের একান্ত বন্ধু, যৌবনের সখা, প্রেমের পরামর্শদাতা—আমাদের সহকর্ম্মী, সাহিত্য-সাধনার সহকর্ম্মী। জীবনে বহুশোক পাইয়াছেন। প্রথম পক্ষের দুইটী পুত্র ও পত্নীকে হারাইয়া তিনি 'শেষ', 'ব্যথা' 'শোকে শান্তি' কাব্য রচনা করিয়াছেন। অভিন্নহৃদয় বন্ধুবর প্রমথনাথ বটব্যালের মৃত্যুতে তিনি তাঁহার জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি কবিতায় নিবেদন করিয়াছেন—সে 'অঞ্জলি' পাঠে তাহার বন্ধুপ্রীতির গভীরতা যে কতদূর ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রমথনাথ ছিলেন তাহার সহকর্ম্মী—কালেক্টরী গভর্ণমেন্টের জনৈক কেরাণী। তাঁহার দর্শনে জ্ঞান ছিল অপরিমেয়। প্রমথনাথ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদর্শনের প্রায় প্রত্যেক দার্শনিকের অহং-জ্ঞানের স্বরূপ
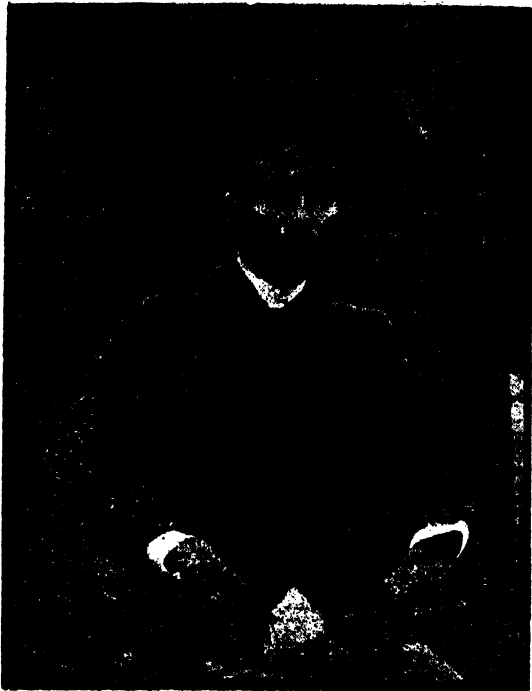
স্বর্গগত সুশীলগোপাল বসু

বিবৃতি করিয়া সুললিত চতুর্দ্দশপদী কবিতায় 'আমি' নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এত শোক পাইয়াও তিনি শোকে কোন দিন মুহ্যমান হইয়া পড়েন নাই—বাস্তবিকই তিনি শোকে শান্তি পাইয়াছিলেন—শ্রীভগবানের কৃপায় সত্যই তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন—'তারি মায়া, তারি ছায়া ভাসিতেছি মহাশূন্যে ব্যাপি চরাচর।' সর্ব্বত্রই তিনি ব্রহ্মের সত্তার অনুভূতি করিতেন।

তাই পুত্রশোকাতুর হৃদয়ে 'আবাহানে গাহিয়াছিলেন—

'এস বৎস একবার পরমাত্মা রূপ ধরি
দাও শান্তি শোকে
শিখাও অশোকমন্ত্র, স্বার্থহীন ভালবাসা
ধর্ম্মের আলোকে।
ভেদি স্থূল জড়ত্বের অসার বিরাট্ দেহ।
আন স্থির জ্যোতি;
হোক্ লক্ষ্য ভগবান্ নাহি চাই পরকাল
জড়দেহ স্থিতি।
নাহি চাহি মোক্ষমুক্তা নাহি চাই ভোগাসক্তি
থাক্ পদতলে;
নাহি চাই বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানোদীপ্ত দাম্ভিকতা
যাক্ রসাতলে।
বহুমত উপদেশ ভ্রান্তিময়ী বহুভাষা
শুনিয়াছি কাণে
তৃষা লয়ে ছুটিয়াছি পাই নাই বারিবিন্দু
দাবদগ্ধ প্রাণে।
স্থিরচিত্তে ভরিয়াছি স্থিরনেত্রে হেরিয়াছি
মূরতি মহান্,
আমার সে পুত্র নয় পুত্ররূপী নারায়ণ
আমি কি অজ্ঞান!"

পরিণত বয়সে কয়েকজন আর্য্য রমণীর জীবনের কাহিনী তিনি কাব্যে রচনা করিয়াগিয়াছেন। 'আর্য্য নারী'র ভাব ও আদর্শ যেমন অনবদ্য সুন্দর, ভাষাও তেমনই মনোরম। তাঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তিনি সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

তাঁহার বহু গীতি-কবিতা পুরাতন 'বাণী' ও 'সঙ্কল্প' পত্রিকার পাঠকদিগের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছিল। সে গুলি এখনও কাব্যকারে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার ন্যায় সরল উদারপ্রাণ বিশ্বপ্রেমিক বড় কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

* * *

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর বয়সে তাঁর জন্মদিন ২৫শে বৈশাখে প্যারিসে অবস্থিত ভারতবাসীর উৎসব করিয়াছিালন। রবীন্দ্রনাথ হিবার্ট বক্তৃতা ন্যাসের সভাপতির অতিথি হইয়া তখন অক্সফোর্ডে ছিলেন। ম্যাঞ্চেষ্টারও তাঁকে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছে। আমরা ভগবানের কাছে তাঁহার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

* * *

সংবাদ-পত্র-সেবক সঙ্ঘ সমস্ত দৈনিক পত্র-পত্রিকা বন্ধ করিবার স্বপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সঙ্ঘ-সেবীদের কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা কোন কোন স্থানে হইয়াছে। আমরাও মনে করি যে তাঁহারা একেবারে সমগ্রভাবে সকল দৈনিকের মুদ্রণ বন্ধ করাইয়া ঠিক কাজ করেন নাই। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, যাদের কাছে জামিনের টাকা দাবী করা হইবে, কেবল সেই সকল

কাগজই প্রচার বন্ধ করিবে। সহসা গান্ধীজীর মন্তব্যের উপরেও সম্পাদকেরা চাল চলিলেন কেন ?

* * *

দেশের এমন অবস্থায় দৈনিক সংবাদ-পত্রের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। অবশ্য সংবাদপত্র না পড়িলে আমরা যে মারা যাইব এমন কথা নয়--এতদিন যে পড়ি নাই, তবুও টিকিয়া আছি। তবে ইংরাজ-চালিত কাগজ থাকিবে, কেবল তাহাদের কথাই আমরা শুনিব, আমাদের তরফ হইতে আমাদের কথা শুনাইবার কোন বাহনই থাকিবে না, এমন অবস্থা কখনই সমীচীন নহে।

* * *

দেশের এমন অবস্থায় কাহাকে মানিব ? গান্ধীজীকে না অন্যকোন কর্ত্তাকে। একজনকে কর্ত্তৃত্ব না দিলে বহু কর্ত্তার দ্বারা কার্য্যের ব্যাঘাত হইবারই সম্ভাবনা। মহাত্মা বলিয়াছিলেন, তিনি যত দিন জেলের বাহিরে থাকিবেন, তাঁহারই পরামর্শ মতেই সব কাজ হইবে। তাহা যদি না হয়, জিজ্ঞাসা করি তাঁহার মতের ব্যতিক্রমে কাজ করাইবেন যাঁহারা, তাঁহারা কর্ত্তৃত্বের ভার কোথা হইতে বা কাহার নিকট হইতে পাইলেন ?

* * *

অবশ্য যাঁহারা অন্য কাগজের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের কাগজ বন্ধ করিবেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। আমরা কেবল যাহাদের কাছে জামিনের টাকা দাবী করা হয় নাই এমন সব কাগজকে থামকা বন্ধ করিতে বলার বিরুদ্ধে জনমতকে শিক্ষিত ও গঠিত করিবার পক্ষে সংবাদ-পত্রের অত্যন্ত প্রয়োজন-সে প্রয়োজন দেশের বর্ত্তমান সময়ে যার-পর-নাই উগ্র।

* * * *

কোন শহর হইতে সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীলোকদের দ্বারা লিখিত ও পরিচালিত মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, সে প্রস্তাব কার্য্যেও পরিণত হইবে জানিলাম। ইহাতে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যাঁহারা এই পত্রিকা চালাইবেন তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এমন মন্তব্য করিয়াছেন যে তাহার সরল অর্থ হইয়াছে পুরুষদের কাগজে মেয়েরা স্পষ্টভাবে তাঁহাদের মত ব্যক্ত করিতে পারেন না।

* * *

কেন ? পুরুষদের কাগজ কি মেয়েদের স্বাধীন উক্তি ছাপাইতে কখনও আপত্তি করিয়াছেন ? না পত্র পরিচালকদের আসল কথা হইতেছে এই যে পুরুষদের সম্বন্ধে কঠিন মন্তব্য-সূচক লেখা পুরুষদের কাগজে দিতে তাঁহাদের চক্ষু লজ্জা হয়। যদি কেবল যুক্তিহীন গালি না হয়, তবে তাহাতেও চক্ষু-লজ্জার কোন কারণ নাই ?

* * * *

বাঙ্গালার নারী জাগিয়াছে। যদিও এই জাগরণ মুষ্টিমেয় নারীর মধ্যে হইয়াছে, তবুও হইয়াছে যে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। পুরুষদের কিন্তু একেবারে বাদ দিয়া বা তাহাদের কেবলমাত্র রূঢ়কথা বলিয়া নারীদের সাধনা সকল ও জাগরণ জয়যুক্ত হইবে না। কোনও শিক্ষিত পুরুষই নারীর যথার্থ উন্নতি ও প্রগতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না।

* * * *

তবে পুরুষকে ও নারীকে পরস্পরের সাহায্যে অগ্রসর হইতে হইবে। ইঁহাদের কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া আপন কল্যাণ-সাধন করিতে পারিবেন না। শিক্ষা-কার্য্যকুশলতা, দেশহিতৈষিতা, সকল দিক দিয়াই নারী প্রতিষ্ঠালাভের উদ্যম করিতেছেন সে উদ্যম আংশিক ভাবে সার্থকও হইয়াছে। ইহাতে দেশের পুরুষরা আশান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছেন—ক্ষুণ্ণ হন নাই। নারী জাগুন, সুখেরই কথা ; কিন্তু পুরুষকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া নারী জাগিবেন, এমন অদ্ভুত কল্পনা তাঁহারা যেন না করেন। তবে তাঁহাদের জাগরণ দেখিবে কে ?

* * *

পুরুষদের সঙ্গে নারীদের মতভেদ হইলেও প্রীতি-ভেদ যেন না হয়। শুধু কাঠিন্যও যেমন পীড়াদায়ক শুধু কোমলতাও সেইরূপ মোহজনক। পীড়ার উপশম এবং মোহের দূরীকরণকল্পে কোমলে-কঠোরে মিলিত হউক, নারী ও পুরুষ একযোগে, পাশাপাশি দাঁড়াইয়া দেশের

তাবৎ মঙ্গল প্রচেষ্টায় অবহিত হউন। পুরুষের গরুম-ঘুচিবে, নারী বলবতী হইবেন।

* * *

ভূপালের শ্রদ্ধেয়া বেগম সাহেবা, ভূতপূর্ব্ব কর্ত্রী ঠাকুরাণী সে, দিন পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। এত বড় বৃহৎ ভূপাল রাজ্যের কর্ণধার রূপে সুশৃঙ্খলে এত দিন চালাইয়া তিনি যেমন কার্য্য-কুশলতা ও সুশাসনের পরিচয় দিয়াছেন, তেমনই জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রজাদিগের কল্যাণ-কামনায় সর্ব্বদা অবহিত থাকিয়া মহাপ্রাণতারও পরিচয় দিয়াছেন প্রাচীন নবাব ঘরের ঘরণী হইয়া দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী নানাবিধ সদনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া দেশবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। দেশের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার না হইলে দেশ যে উন্নত হইতে পারে না এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ভূপাল রাজ্যে শিক্ষার বিস্তারে মনঃপ্রাণ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সুপ্রাচীন পর্দ্দাপ্রথা তুলিয়া দিয়া ও নারীদিগের ভিতর শিক্ষার বিস্তার করিয়া নারী-জাগরণের তিনি সহায়তা করিয়া-ছিলেন। স্বয়ং সমুদ্রযাত্রা করিয়াও তিনি একটা নূতন পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব রক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর তিনি কোন দিন আবদ্ধ থাকিতেন না। আশা করি বর্ত্তমান নবাববাহাদুর মাতৃপদ অনুসরণ করিয়া মাতার প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলি রক্ষাকল্পে মনোযোগী হইবেন।

* * *

চাকুরীগত প্রাণ বাঙ্গালীকে চাকুরী ছাড়িয়া অন্যান্য দিকে নিয়োজিত করিতে পরামর্শ দিবার প্রথা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ইহার সমর্থনে আমরা বলি যে, বিমান-চালনা-শিক্ষার এদেশে ব্যবস্থা হওয়ায়, বাঙ্গালীর চাকুরী ব্যতীত আর একটা জীবিকার উপায় হইল। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন সিং নামক পাঞ্জাবী যুবক ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে একক বিমান চালনা করিয়া আগা খাঁর প্রতিশ্রুত পাঁচশত পাউণ্ডের পুরস্কার পাইয়াছেন।

* * *

কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রমানাথ চৌলা ও এ্যাস্পি এঞ্জিনিয়ারও ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে বিমান-চালনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। দু একজন বাঙ্গালী পাইলটের পদ-মর্য্যাদা পাইয়াছেন শুনিয়াছি, আমরা আশা করি কোনও বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত মনোমোহন সিং, শ্রীযুক্ত রামনাথ চৌলা ও শ্রীযুক্ত এঞ্জিনিয়ারের মত বিমান-চালনায় সমাদর ও সুখ্যাতি লাভ করিয়া, তাঁহাদের মত সমুদয় ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করিবেন এবং আমরা আশা করি যে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী এই নূতন শিক্ষা গ্রহণ করিবেন। কয়েকজন ভারত মহিলাও বিমান-বিদ্যা আরম্ভ করিতেছেন শুনিলাম।

* * *

কিন্তু বলিতে পারি না আমাদের এ আশা কতদূর ফলবতী হইবে। মোটর-চালকের কার্য্য যখন এ দেশে প্রথম প্রচলিত হয়, তখন এ দেশের বহু সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা যোগ দিয়াছিল, কিন্তু সে শ্রেণীর ছেলেদের আর যোগ দিতে বড় একটা দেখা যায় না। তখন মোটর গাড়ীর সংখ্যাও ছিল খুব কম, এখন সংখ্যা খুবই বাড়িয়াছে। অথচ বেতন ইহাতে বড় কম নয়। পাঞ্জাবী মোটর চালকে বাঙ্গালা দেশ ছাইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীরা চেষ্টা করিয়া অর্থাগমের এ পথটা ধরেন না কেন বুঝিতে পারা যায় না, অথচ আরোহীরা একবাক্যে বলিবেন যে, যে কয়েক জন বাঙ্গালী মোটর-চালক দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের কর্ম্ম-কুশলতা পাঞ্জাবী মোটর চালকদের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। বাঙ্গালী এ দিকে ও বিমান-চালনায় যোগ দিয়া অর্থাগমের পথটা একটু সুগম করুন না কেন?

* * *

গত চৈত্র সংখ্যায় 'উত্তর-ভারত' প্রবন্ধের ১৬৭৯ পৃষ্ঠার একাদশ পংক্তিতে ('অধুনা স্বর্গত') চারুবাবুর পূর্ব্বে ভ্রমবশতঃ ছাপা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চারুবাবু সুস্থ শরীরে জীবিত আছেন। এই ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। এই চারুবাবু ও হাওড়ার প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী চারুচন্দ্র সিংহকে এক বিবেচনা করিয়াই এই ভুল হইয়াছে।

* * *

অশনিপাত

(গল্প)

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি-এ

১

আমার যখন বৎসর পাঁচেক বয়স, সেই সময় আমি মাতা পিতা দুই হারাইয়া দূর সম্পর্কের মাতুল রামরতন সরকারের গৃহে আশ্রয় লাভ করি। সে আজ কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন মাতুলের অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। এখন তাঁহার অবস্থা একেবারে ফিরিয়া গিয়াছে। তিনি এক প্রকাণ্ড তেল-কলের মালিক, ইউরোপের বাজারেই তাঁহার তেলের চাহিদা এবং কাটতি। এখন কলিকাতার মধ্যে তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়াই পরিগণিত।

যখন নিজের অবস্থাটা বুঝিবার মত বয়স আমার হইয়াছিল, তখন আমি বুঝিতেই পারি নাই যে আমি পিতৃমাতৃহীন অনাথ, পরের গৃহে প্রতিপালিত হইতেছি। মাতুলের তিন পুত্র, দুইজন আমার অপেক্ষা বয়সে বড় এবং একজন ছোট, তাহাদেরই একজন হইয়া আমি মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলাম। বাহিরের লোকে মনে করিত আমরা চারি সহোদর। এখন আমরা চারিজনেই বিবাহিত, চারিজনের বিবাহেই ঠিক একই রকম ধুমধাম হইয়াছিল, এবং চারি বধূকে মাতুল একই রকমের মূল্যবান্ বস্ত্রাদি এবং অলঙ্কার আশীর্ব্বাদস্বরূপ দান করিয়াছিলেন। মাতুল এবং মাতুলানীর ব্যবহারে কোথাও এতটুকু ইতর বিশেষ ছিল না।

স্নেহপরায়ণ মাতুলের আর একটা ব্যবস্থা ছিল যাহা সত্যই অভিনব এবং সুন্দর। তাঁহার দুই কন্যা, যখন তাঁহার অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না সেই সময় তিনি কন্যাদের পাত্রস্থ করেন। কাজেই সামান্য গৃহস্থ ঘরে তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের দুই সংসারের যাহা কিছু খরচ পত্র তিনি সমস্তই বহন করিবেন, সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিদিন প্রাতঃকালে মাছ তরকারী কিনিয়া দুই গৃহে পাঠান হইত। মাতুল বড়লোক হইলেও প্রতিদিন পালা করিয়া আমাদের চারি ভ্রাতারই উপর বাজার করিবার ভার ছিল।

এমনই একটানা সুখের মধ্যে আমাদের দিন কাটিতেছিল, অকস্মাৎ একদিন মাতুলের পরপারে যাইবার ডাক পড়িল। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি আমাদের সকলকে নিকটে ডাকিয়া বসাইলেন। প্রথমেই তিনি পুত্রদের সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি যাচ্ছি, এইবার তোমাদের মার একার উপর সমস্ত ভার পড়ল। আমি বর্ত্তমানে তোমরা যে ভাবে তাঁর সমস্ত আদেশ মান্য করে চলেছ, আমি চলে গেলে ঠিক সেই ভাবে তাঁর সমস্ত আদেশ অমান্য করে চলবে। কোন কারণে তাঁর অবাধ্য হবে না, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করবে না। অসিকে এতদিন যে ভাবে দেখে এসেছ ঠিক সেই ভাবে দেখবে—তোমরা যে মামাত পিসতুতো ভাই একথাটা কোনদিন ভাববে না। আমার সমস্ত বিষয়সম্পত্তির উপর তোমাদের যেমন অধিকার তারও তেমনই অধিকার,—এই কথা সর্ব্বদা মনে রেখে চলবে,—কারু কোন কুপরামর্শে কান দেবে না। ব্যবসার সমস্ত ভার তারিণীর ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি যে ভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করছিলুম, তোমরাও ঠিক সেইভাবে কাজ করবে। এতদিন তাঁর হুকুমে যে ভাবে চলছিলে ঠিক সেই ভাবে চলবে। যে ধারায় আমি সংসার চালাচ্ছিলুম, তার যাতে এতটুকু অদলবদল না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখবে।"

তিনজনই চোখের জলের মধ্য দিয়া জানাইল, পিতার অন্তিম আদেশ তাহারা কোনদিন অবহেলা করিবে না, তাহা অক্ষরে অক্ষরে তাহারা পালন করিবে।

মৃত্যুপথযাত্রী মাতুলের মুখ তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে তিনি আমাকে আরও নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন, আমি তাঁহার আদেশ পালন করিতে তিনি কহিলেন, "অসি আমি যাচ্ছি, তোমার মামীমা ত

রহিলেন।" আমার দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

২

মাস দুই-পরের কথা। সে দিন আমি ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া যথারীতি বাজার করিতে যাইতেছিলাম, মামীমা ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে অসি, আজ কদিন দেখছি তুইই বাজার যাচ্ছিস; কেন রে?"

উত্তর দিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলাম। তারপর ঘুরাইয়া বলিলাম, "একজন গেলেই হ'ল মামীমা।"

মামীমা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সে আমিও জানি, কিন্তু এ ব্যবস্থা কে করলে এবং কি জন্যে হ'ল সেইটাই আমি জানতে চেয়েছি।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বড়দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া মেজদাদাই যে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, সে কথা মুখ দিয়া যে কিছুতেই বাহির হইতে চাহে না।

মামীমা আমায় আর কোন প্রশ্ন করিলেন না, বুঝিলাম আসল ব্যাপারটা তিনি অনুমান করিয়া লইয়াছেন, আমি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, "দাঁড়া", তারপর ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "বড়দাদাবাবুকে ডেকে আনত রে।"

বড়দাদা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই মামীমা কহিলেন, "শিরু, অসি রোজ বাজার যাবে এ ব্যবস্থা কে করলে?"

বড়দাদা একটু কিন্তু হইয়া কহিল, "কেউ ত করে নি মা, অসি নিজেই এ ব্যবস্থা করেছে।"

মামীমা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার বড়দাদার মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর কহিলেন, "যেই করুক, এ ব্যবস্থা চলবে না, আজ তুমি বাজার করে এস।"

বড়দাদা কহিল, "আমার বাজার করার সময় হবে না ত মা। বাবা নেই আমার সব দেখা শুনা করতে হয় যে।"

মামীমা অল্পক্ষণ নিঃশব্দে কি যেন ভাবিয়া লইলেন, পরে কহিলেন, "হ্যাঁ সে ভারটা তোমার ওপর দেওয়াই উচিৎ ছিল, যাক্ তুমি তার ব্যবস্থা করেছ ভালই হয়েছে। ধীরুকে ডেকে দাও, সেই তা হলে বাজার করে আসুক।"

আমি কহিলাম, "মামীমা কাল মেজদাদাকে না হয় পাঠাবেন, আজ বেলা হয়ে যাচ্ছে আমি ঘুরে আসি।"

মামীমা আর কিছু বলিলেন না, আমি ভৃত্যকে লইয়া বাটীর বাহির হইয়া গেলাম।

বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর মেজদাদা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল, বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেখানে বড়দাদা ও সুরেশ বসিয়া আছে।

আমাকে দেখিবামাত্র মেজদাদা সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কহিল, "দেখ অসি বড়দা যে ব্যবস্থা করে দিয়েছে তার ব্যবস্থামতই সবাইকে চলতে হবে, ওসব লাগানি-ভাঙ্গানি চলবে না।"

মেজদাদার মুখে এরূপ কথা কোন দিন শুনি নাই, এরূপ কথা যে কখনও শুনিব তাহাও কল্পনা করিতে পারি নাই। তাই বিস্ফারিত নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

মেজদাদা কহিল, "বাজার করতে যদি তুমি অসুবিধে বোধ কর, বড়দাদাকে সে কথা বললেই পারতে, মার কাছে লাগাতে গেছ কেন?"

আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, কহিলাম, "আমি মামীমার কাছে কিছু বলি নি মেজদা।"

বড়দাদা কহিল, "তা হ'লে মা জানলে কি করে?"

আমার সত্যই রাগ হইল, কহিলাম, "মামীমাই ত বাজারের টাকা দেন, তিনি কিছু দেখতে পান না তোমরা মনে কর?"

বড়দাদা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তা মনে করি না,—কিন্তু তুমি যে তার কাছে লাগাও নি, তা হ'তে ঐ কথাটা প্রমাণ হয় না অসি। যাক্ তোমার সঙ্গে মিছে কথা কাটা-কাটি করতে চাই না। আমি যা ব্যবস্থা করে দিয়েছি তাই হবে, তোমার যদি অসুবিধা হয় বল, চাকরদের ওপর বাজার করবার ভার দিয়ে দিব।"

চুপ করিয়া থাকা ছাড়া আর কোন উপায় আমি দেখিলাম না। বুঝিলাম ইহাদের অন্তরের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু বুকের ভিতর আমি ভারি ব্যথা পাইলাম। বড়দাদা মেজদাদার একি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! কে জানে ইহার শেষ কোথায়?

পরদিন আমি ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া বাজার করিতে বাহির হইলাম, মামীমার নিকট হইতেই টাকা চাহিয়া লইয়া

গেলাম, আজ আর তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। আমি মনে মনে স্বস্তি অনুভব করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন ব্যথাও পাইলাম। দীর্ঘ দিন পরে আজ প্রথম মনে হইল, আমি যেন পর হইতে চলিয়াছি। ইহাও কি সম্ভব?

এমনই ভাবে সপ্তাহ খানিক কাটিল। আমি প্রতি দিনই বাজার করিতে যাই। তাহা লইয়া আর কোন কথা উঠে না। মামীমা কেমন যেন গম্ভীর হইয়া থাকেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে কেমন যেন বেদনার আভাষ পাই। কিন্তু কোথায় তাঁহার ব্যথা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না।

সেদিন অপরাহ্ণে মেজবৌদিদি সাজিয়া গুজিয়া মামীমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। তাহার এরূপ সাজসজ্জা ত ইতিপূর্ব্বে কোন দিন দেখি নাই। বাঁকা সিঁথি দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মত ক্ষীণ সিন্দুর রেখা বক্ষে ধারণা করিয়া একেবারে রগ ঘেষিয়া মাথার উপর বিরাজ করিতেছে, অবগুণ্ঠন সম্মুখ ছাড়িয়া মাথার পিছনে গিয়া উঁকি দিতেছে, পায়ে উঁচু গোড়ালির জুতা। এ বাড়ীর বধূদিগের পায়ে জুতা পরা রেয়াজ ছিল না। সাধারণ গৃহস্থবধূদিগের মত এই ধনী গৃহস্থ বধূদিগের মাথায় অবগুণ্ঠন টানিয়া চলিতে হইত, সোজা সিঁথর উপর মোটা করিয়া সিন্দুর পরিতে হইত। তাই মেজবৌদিদির বেশভূষার এই কল্পনাতীত পরিবর্ত্তনে সত্যই আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। মামীমাও বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহার দেহের পানে চাহিয়াছিলেন।

মেজবৌদিদি বলিল, "নদাদা নিতে এসেছে। আমি যাচ্ছি মা।"

মামীমা হাঁ না কিছুই বলিলেন না। এ বাড়ীর বধূদিগের পিতৃগৃহে বা অন্য কোথায় যাইতে হইলে পূর্ব্বে মামীমার অনুমতি লইতে হইত। পূর্ব্বে অনুমতি না লইয়া কাহারও কোথায় যাইবার উপায় ছিল না, আর আজ কি না মেজ-বৌদিদি সাজিয়া গুজিয়া 'যাচ্ছি মা' বলিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইবে কেমন করিয়া?

মেজবৌদিদি প্রণাম করিতে গেলে, তিনি শুধু 'থাক্' বলিয়া একটু সরিয়া বসিলেন, মেজবৌদিদি কপালে দুই হাত ঠেকাইয়া জুতার মচ্ মচ্ শব্দ করিতে করিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

মামীমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর আমার মলিন মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "বৌয়ারা নিশ্চয় এতদিন হাঁপিয়ে উঠেছিল, এইবার যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। স্বাধীন হওয়াই ত দরকার, কি বলিস্ রে অসি?"

আমি আর কি বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম।

মামীমা কহিলেন, "সব চাপা ছিল রে, এখন বেরুচ্ছে। তবে বড় তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে।"

দেখিলাম বাড়ীর অন্য দুই বৌও মেজবৌদিদির পথ ধরিল। যখন ইচ্ছা তাহারা বাপের বাড়ী এবং বায়স্কোপ থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল। মামীমার অনুমতি লওয়ার কোন প্রয়োজনই বোধ করিল না। মাতুলের মৃত্যুর পর যে এখনও তিন মাস পূর্ণ হয় নাই! আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। মনে পড়িল নিজের অবস্থার কথা। আমি ত ইহাদের আশ্রিত মাত্র। যে-কোন মুহূর্ত্তে এ গৃহ হইতে আমি স্ত্রীপুত্র লইয়া বিতাড়িত হইতে পারি। সেদিনও এ গৃহের যিনি সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, আজ তাঁহাকেই যখন সকলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন আমার ত কথাই নাই। তাই ত হঠাৎ যদি তাড়িত হই তাহা হইলে কোথায় গিয়া দাঁড়াইব, কি খাইব? আমার স্ত্রীও দেখিলাম শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কি যে করিব কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না।

এমনইভাবে দিন চলিতে লাগিল। তিন ভাই এবং তিন বৌয়ের স্বভাবেরও দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। আমার এবং আমার পত্নীর উপর তাহারা বেশ প্রভুত্ব চালাইতে আরম্ভ করিল। নিরুপায়ের মত আমরা তাহাদের এই হঠাৎ প্রভুত্বের দাপট নীরবে সহ্য করিতে লাগিলাম। বিক্ষুব্ধ মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে লাগিলাম, মামীমার উপরই যখন প্রভুত্ব চালাইতেছে তখন আমরা ত কোন ছার। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিলাম, মামীমা যেন আর কিছু দেখিয়াও দেখেন না। তাঁহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে আর সে

বেদনার আভাষ পাই না। পুত্র এবং পুত্রবধূদের কোন কার্য্যেরই তিনি এতটুকু প্রতিবাদও করেন না এবং মুখ ভাঁর করিয়াও থাকেন না।

৩

প্রতি ইংরেজি মাসের ১লা তারিখেই তারিণীমামা মাসিক সংসার-খরচের সমস্ত টাকা মামীমার হাতে দিয়া যাইতেন। এইবার মাসের শেষ তারিখে বড়দাদা তারিণীমামাকে কহিল, "দেখুন খুড়োমহাশয়, সংসার-খরচটা বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে, কমান দরকার।"

তারিণীমামা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "বেশী ত কিছু হচ্ছে না। বরাবর যা হয়ে আসছে, তাই ত হচ্ছে। কমান ত কিছু যায় না।"

বড়দাদা কহিল, "এখন্ বাপ নেই, অত খরচ করা ত চলে না। এখন দিন কাল যে রকম পড়েছে আমাদের না বুঝে সুঝে চললে ত হবে না। তিনি যে রকম রকম ভাবে খরচ-পত্র করে গেছেন আমরা ত তা পারি না।"

তারিণীমামা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন; তারপর কহিলেন, "কিন্তু উপায় ত কিছু নেই, তাঁর শেষ আদেশ ত তোমাদের মেনে চলতে হবে।"

বড়দাদা কহিল, "তা চলতে হবে বৈ কি, কিন্তু দরকার বোধ করলে খরচ বাড়ান কমানর ব্যবস্থা ত আমাদেরই করতে হবে। আমরা তিন ভাইয়ে পরামর্শ করে দেখলুম, মাসে অন্ততঃ শ' আড়াই টাকা কমান যায়।"

তারিণীমামা কহিলেন, "আচ্ছা কি খরচ কমাতে চাও শুনি?"

বড়দাদা যেন একটু ইতস্ততঃ করিল, তারপর কহিল, "এই ধরুন, দুই জামাইবাবুর বাড়ী—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া তারিণীমামা কহিলেন, "ছি ছি শিরু ওকি বলছ তুমি! ওকথা যে মনে আনতেও নেই।"

বড়দাদা কহিল, "না না আমি ও কথা বলি নি, ও এমনই কথার কথা বলছিলাম। ওখরচটা আপাততঃ নাই কমালুম।"

মেজদাদা কহিল, "কমাতে না চান কমাবেন না, কিন্তু বাড়াবার বেলা কোন আপত্তি আপনার শুনব না।"

তারিণীমামা কহিলেন, "দরকার হ'লে বাড়াতে হবে বৈ কি। তবে হঠাৎ খরচ কিসে বেড়ে যাবে তা ত বুঝতে পারছি না?"

মেজদাদা কহিল, "একখানা মোটরে আমাদের হচ্ছে না, আর দু'খানা মোটর এমাসে কিনতে হবে।"

তারিণীমামা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "তুমি কি বলছ! কর্ত্তা থাকতে একখানা মোটরে সব কাজ চলে এল, আর—"

সুরেশ অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি সব কথাতেই বাধা দেন কেন বলুন দেখি? এ আপনার অন্যায়।"

দেখিলাম তারিণীমামার মুখের উপর ক্রোধের রেখা ফুটিয়া উঠিল। বোধ করি তখনই নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সে ভাব সামলাইয়া লইয়া তিনি কহিলেন, "বাধা দেওয়া দরকার মনে করি বলেই দিয়ে থাকি।"

বড়দাদা অতিমাত্রায় গম্ভীর হইয়া কহিল, "মিছে, কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই খুড়োমহাশয়। আমরা স্থির করেছি, আর দু'খানা মোটর কিনব। তার ওপর আর কোন কথা নেই। মোটর রাখার ত একটা খরচ আছে,—সংসার-খরচ কমিয়ে সেটা আমাদের চালিয়ে নিতে হবে। সে আমরা ঠিক করে নেব, তার জন্যে আপনার মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। আমরা একটা হিসাবের খসড়া করে দেব, সেইভাবে আপনি চলবেন।"

তারিণীমামা স্তব্ধ হইয়া গেলেন! সত্যই ত, প্রভুর এইরূপ সুস্পষ্ট আদেশের উপর ভৃত্যের ত আর কোন কথা বলা চলে না!

পরদিন ব্যয়ের একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া বড়দাদা আমাকে দিয়া তারিণীমামার কাছে পাঠাইয়া দিল।

কাগজখানির উপর চোখ বুলাইয়া তিনি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ওহে অসি, এ মাস থেকে তোমার মাসহারা কমে গেছে দেখছি। একশ টাকা থেকে একেবারে পঞ্চাশ টাকা!"

কথাটা শুনিয়া ক্ষোভে দুঃখে অপমানে আমার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল, মাথার ভিতর হইতে

যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল।

তারিণী মামা তেমনই হাসিমুখে কহিলেন, "তুমি ত এদের পিসতুতো ভাই,—তাও দূর সম্পর্কের; তোমার মাসহারা কমবে তাতে দুঃখ পেলে হবে কেন। বাবুদের মায়ের পেটের বোনদের বাড়ী যে মাছ তরকারী পাঠান হত সেটা বাজে খরচ হিসেবে বাদ দেওয়া হয়েছে।"

তারিণীমামা ঠিক কথাই বলিয়াছেন, আমি কে! তাহাদের অতি দূর সম্পর্কের এক পিসির ছেলে, তাহাদের আশ্রিত, পঞ্চাশ টাকা মাসহারাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তাহারা সমস্ত সম্পত্তির মালিক। আমি ত তাহাদের অনুগৃহীত বেতনভোগী ভৃত্য মাত্র। দুঃখ করিবার কোন অধিকার আমার নাই। কিন্তু নিজের ভগিনীদের প্রতি একি অবিচার। এ কি মর্ম্মান্তিক ব্যবহার! এই সংবাদ পাইয়া স্নেহময়ী মামীমা যে কত বড় আঘাত পাইবেন, তাহা ভাবিয়া আমি অন্তরের মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা পাইলাম! হায় কি করিব? ইহার ত প্রতিকারের কোন উপায় নাই।

তারিণীমামা আবার কহিলেন, "আর কি হুকুম হয়েছে জান এমাস থেকে খরচের টাকা বড় বৌমার হাতে পৌঁছে দিতে হবে।"

আমি চমকিয়া উঠিয়া কহিলাম, "এঁ্যা সে কি মামাবাবু!"

তারিণীমামা হাসিয়া কহিলেন, "এতে অমন করে চমকে ওঠবার ত কিছু নেই। এই সংসারের নিয়ম। বৌঠাকরুণ এখন বুড়ো হয়েছেন, পূজা অর্চ্চনা ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ে থাকবেন, সংসার নিয়ে জড়িয়ে থাকবার কোন দরকার তাঁর নেই। তাঁর কৃতী ছেলেরা ত ভাল ব্যবস্থা করেছেন।"

ব্যথিতকণ্ঠে আমি কহিলাম, কিন্তু মামাবাবুর অন্তিম আদেশ অমান্য করা কি উচিৎ হল?"

তারিণীমামা কহিলেন, "তারা অমান্য করাটাই উচিৎ বলে মনে করেছে, এটা তারা জানে ত যিনি আদেশ দিয়ে গেছেন তিনি ত আর ফিরে এসে দেখতে যাচ্ছেন না সে আদেশ পালন হলো কি না।" একটু থামিয়া দৃঢ়কণ্ঠে তিনি আবার কহিলেন, "দেখ অসি, তারা তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারে, কিন্তু আমি পারি না। আমি যতদিন আছি তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাব, অন্য কারো আদেশ মানব না। সংসার খরচ থেকে একটা আধলাও কমাব না; তোমার মাসহারাও ঐ একশ টাকাই থাকবে। এ কথা তুমি আমার হয়ে তাঁদের জানাতে পার। এই নাও এমাসের খরচের টাকা তুমি বৌঠাকরুণকে দিয়ে এস।" এই বলিয়া তিনি ক্যাসবাক্স খুলিয়া এক তাড়া নোট বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন।

নোটগুলি আমি হাত পাতিয়া লইলাম বটে, কিন্তু মনটা আমার অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তারিণীমামা কাজটা কি ঠিক করিলেন? তাহারা তিন ভাই এখন সম্পত্তির মালিক, মুখে খুড়োমহাশয় বলুক আর যাই বলুক, সম্বন্ধ ত প্রভু ভৃত্যের। তাহারা যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে মুখের উপর রূঢ় কথা বলিয়া তারিণীমামাকে অপমানিত লাঞ্ছিত করিতেও হয় ত তাহারা পশ্চাৎপদ হইবে না। কি করা যায়?

তারিণীমামা কহিলেন, "কিহে অসি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে, টাকাটা বৌঠাকরুণকে দিয়ে এস।"

আমি কিন্তু হইয়া কহিলাম, "দাদারা হয় ত আপনার ওপর চটে যাবেন।"

তারিণীমামা হাসিয়া কহিলেন, "চটে গেলে আর কি করব বল। আমার যা কর্ত্তব্য তা আমি করব। তুমি তার জন্যে ভেব না অসি।"

আমি ধীরে ধীরে নোটের তাড়াটি লইয়া চলিয়া গেলাম এবং মামীমার হাতে পৌঁছাইয়া দিলাম।

দাদাদের অবশ্য আমি কিছু বলিলাম না, কিন্তু কথাটা তখনই জানাজানি হইয়া গেল। বড়দাদা আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, "তুমি কি জন্যে খুড়োমহাশয়ের কাছ থেকে টাকা এনে মাকে দিয়েছ? এরকম কাজ আর [illegible] না। আর এও বলে দিচ্ছি আমাদের কোন কথার মধ্যে তুমি থাকবে না। যে যার অবস্থা বুঝে চলা দরকার এ কথাটা যেন মনে থাকে।"

এই রূঢ় কথায় অন্তরের মধ্যে যে দারুণ ব্যথা পাইলাম, অশ্রুর আকারে তাহা ঝরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই আমি তাড়াতাড়ি বড়দাদার সম্মুখ হইতে চলিয়া

গেলাম। উঃ এই অল্পদিনের মধ্যেই আমি একেবারে পর হইয়া পড়িলাম।

আমি মনে করিয়াছিলাম এই ব্যাপার লইয়া আজই একটা তুমুল কাণ্ড বাধিবে। কিন্তু কিছুই হইল না। তারিণীমামাকে কেহ কিছু বলিল না। যে ভাবে সব কাজ চলিতেছিল, সেই ভাবে চলিতে লাগিল, ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ভাবিলাম হয় ত দাদারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া সামলাইয়া গিয়াছেন। ঝড়ের পূর্ব্বে বায়ু মণ্ডল যেমন স্তব্ধ হইয়া থাকে, এ যে ঠিক তাহাই তাহা আমি ভাবিতে পারি নাই। যাক্ বেশ নিরুপদ্রবে নির্ব্বিবাদে পাঁচ দিন কাটিল।

৪

সে দিন রবিবারের অপরাহ্ন। আমি মামীমার সহিত বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় বড়দাদা মেজদাদা আর অনিশ সুরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাকে দেখিয়া তিনজনের ভ্রূই যেন একসঙ্গে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

আমার মুখের দিকে তেমনই ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বড়দাদা বলিল "অসি, তুমি বাইরে গিয়ে বস।"

কথাগুলা সুতীক্ষ্ণ শায়কের মত আমার বক্ষে আসিয়া বাজিল। আমি অন্তরের মধ্যে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আমার অপমানাহত বিবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া মামীমা কহিলেন, "তুই বস্ অসি।" তার পর বড়দাদার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "শিরু, অসির কথা উনি কি বলে গেছেন তা এর মধ্যে ভুলে গেলে? এ কথা ভুলল চলবে না যে, তোমরা চার ভাই। তুমি কি অসিকে ভাই ব'লে স্বীকার করতে চাও না?"

বড়দাদা থতমত খাইয়া কহিল, "তা কেন চাইব না মা, তোমার সঙ্গে আমাদের তিন জনের বিশেষ কথা আছে, আর কেউ সে সময় উপস্থিত থাকে সেটা আমরা চাই না।"

মামীমা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "আমার সঙ্গে তোমাদের এমন কোন কথা থাকতে পারে না, যা অসি শুনতে পাবে না। তোমাদের যা বলবার অসির সামনেই বল।"

বড়দাদা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর কহিল, "বেশ তাই হ'ক মা। তোমার যখন তাই ইচ্ছে, তখন তা মানতে আমরা বাধ্য। মা, বাবা বলে গেছেন, তোমার কথামত চলতে, তাই তোমাকে না জিজ্ঞেসা করে ত কিছু করতে পারি না, অবশ্য আমার শ্বশুরমহাশয় বলছিলেন, ব্যবসা সম্বন্ধে মেয়েছেলের সঙ্গে পরামর্শ করবার কোন দরকার নেই, তাঁরা এর কি বোঝে, কিন্তু—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া মামীমা কহিলেন, "আর ওটুকু কিন্তুর দরকার নেই। তোমার শ্বশুর-মহাশয়ের সৎপরামর্শ নিয়েই চল।"

বড়দাদা হাসিয়া কহিলেন, "মা, অমনই তুমি রেগে গেলে। আমি কি তা পারি। তাঁর পরামর্শ ত আমি নিই নি।"

মামীমাও এবার হাসিয়া কহিলেন, "তা বেশ করেছ, কিন্তু আমার সঙ্গেই বা কিসের পরামর্শ? উনি ত সব ব্যবস্থাই করে গেছেন, আপাততঃ তোমাদের করবার ত কিছু নেই। ব্যবসার সম্বন্ধে কিছু জানাবার যদি তোমাদের থাকে, তারিণীঠাকুরপোকে গিয়ে বলগে তিনিই তার ব্যবস্থা করে দেবেন।"

বড়দাদা কহিলেন, "তাঁর কথাই ত তোমাকে বলতে এসেছি মা। তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন তাঁকে দিয়ে আর আমাদের কাজ চলবে না।"

মামীমা তেমনই হাসিয়া কহিলেন, "তারিণীঠাকুরপো বড়বৌমার কাছে খরচের টাকাটা না পাঠিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছেন এই জন্যই তিনি বুড়ো অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছেন, কি বল শিরু?"

বড়দাদা আমার মুখের দিকে একবার কট্‌মট্ করিয়া চাহিল। কিন্তু কিছুই বলিল না।

মেজদাদা কহিল, "তোমার কাছে টাকাটা পাঠিয়েছেন বলে তাঁর অপরাধ হয় নি মা, তবে বড়দাকে জিজ্ঞেস করা তাঁর উচিত ছিল, এভাবে বড়দার আদেশ অমান্য করা তাঁর পক্ষে ধৃষ্টতা হয়েছে কি না তুমিই বল না মা?"

মামীমা কহিলেন, "হাঁ, যদি তোমাদের সঙ্গে তাঁর প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ থাকত, তা হ'লে খুবই ধৃষ্টতা হত বৈ কি, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তাঁর সে সম্বন্ধ নয় ধীরু।"

মেজদাদা কহিল, "মন্, একথা তোমার ত আমরা মানতে পারি না মা। তবে আমার তাঁকে সে চোখে দেখে নি এই পর্য্যন্ত। তা ছাড়া সাহেব পাড়ায় আমাদের আপিস করতে হবে। সাহেবদের সঙ্গে চলতে পারে এমনই একজন ম্যানেজার আমরা রাখব।"

মামীমা হাসিয়া কহিলেন, "সাহেবদের সঙ্গেই ত এত দিন তিনি কারবার চালিয়ে এলেন—যাক্ বিষয়ের যিনি মালিক, তিনি কি আদেশ করে গেছেন, তা তুমিও এর মধ্যে ভুলে গেলে ধীরু ?"

মেজদাদা কহিল, "তা আমরা ভুলি নি মা। কিন্তু অত্যাচারের প্রতিকার করব না, কিংবা কারবারের উন্নতির চেষ্টা করব না এমন আদেশ তিনি করে যান্‌নি।"

একবার বড়দাদার একবার সুরেশ মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মামীমা কহিলন, "ধীরু সুরো তাহ'লে তোমরা তিন জনই কি তাঁর শেষ আদেশ অমান্য করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছ ?"

তিন ভাই পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল, হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর তিন জনে ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। মামীমাও কোন কথা বলিলেন না স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

৫

পরদিন প্রাতঃকালে বড়দাদার শ্বশুরমহাশয় অবনীবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মামীমার সহিত তাঁহার কি কথা হইল তাহা আমি শুনিতে পাইলাম না। মাত্র শেষের কয়টি কথা কানে গেল, "বেশ বেয়ান ঠাকরুণ তাই হবে, কাল সকালেই আর একবার আসব।"

যথা সময়ে তিনি আসিলেন। মামীমা তাঁহাকে যথারীতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। অল্পক্ষণ পরে মামীমা আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বড়দাদা, মেজদাদা ও সুরেশ বসিয়া আছে, সকলেরই মুখ গম্ভীর।

অবনীবাবু কহিলেন, "অসিতের সঙ্গে কাজটা তা হ'লে আগে সেরে নিন বেয়ান ঠাকরুণ।"

মামীমা কহিলেন, "আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন বেয়াই-মশায় যে আমার চারটি ছেলে।"

অবনীবাবু হাসিয়া কহিলেন, "হাঁ, বেয়াই মশায় অসিতকে সেই ভাবে মানুষ করেছেন সত্যি, কিন্তু—"

মামীমা কহিলেন, "এর ভেতর আর কোন কিন্তু নেই বেয়াইমশায়, বিষয় সম্পত্তির উপর শিরুদের তিনভায়ের যে অধিকার, অসিরও ঠিক সেই অধিকার—তিনি যাবার সময় সবাইকে কাছে বসিয়ে সেই কথাই বলে গিয়েছেন, —তাঁর কথার কোনদিন নড়চড় হয় নি, ভবিষ্যতেও হবে না। আপনি যখন আমার ছেলেদের মুরুব্বি হয়ে এসেছেন তখন তাদের এই কথটা বুঝিয়ে দিন। হাঁ আর একটা কথা, আমার আরও দুইটী সন্তান আছে জানেন, আমার দুই মেয়ে ?"

অবনীবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আপনি এ সব কি বলছেন বেয়ান-ঠাকরুণ, আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না। অসিত আর আপনার দুই মেয়ের সঙ্গে বিষয়সম্পত্তিরই বা কি সম্পর্ক ?"

মামীমা হাসিয়া কহিলেন, "আপনি জানেন না কিন্তু "শিরু জানে, সে কি আপনাকে কিছু বলে নি ?"

অবনীবাবু কহিলেন, "বাবাজী কি বলবেন, এর ভেতর বলবার ত কিছু নেই বেয়ান ঠাকরুণ। বেশ ত, আপনি যদি চান মেয়েদের না হয় কিছু দেওয়া যাবে। আর অসিত যেমন খেয়ে পরে আছে তেমনই থাকবে, কাজকর্ম্ম করবে।"

মামীমা সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "বিষয় আমার স্বামীর, আপনার নয় বেয়াইমশায়। কাজেই ব্যবস্থা করবার অধিকার সম্পূর্ণ তাঁর আর কারু নয়। আমার মেয়েরা বা অসি আপনার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে থাকবে না।"

অপমানে অবনীবাবুর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। বড় বৌদিদি এতক্ষণ দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, এইবার ভিতরে আসিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "তুমি চলে এস বাবা, অধিকার কার—"

তাহার মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল, মামীমা হঠাৎ দপ করিয়া জলিয়া উঠিলেন, কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "চুপ কর ছোটলোকের মেয়ে, এতদিন কি বলি নি

বলে একেবারে মাথায় উঠেছিস্। কার বাড়ী দাঁড়িয়ে এত বড় কথা বলিস্ জানিস্ না ছোটলোকের মেয়ে।" মামীমা থর্থর্ করিয়া কাঁপিতেছিলেন তাঁহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। এত রাগিতে তাঁহাকে কোন দিন দেখি নাই!

এমন সময় তারিণীমামা কতকগুলি কাগজপত্র হাতে লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বড়দাদা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপনাকে এখানে কে ডেকেছে, যান্ এখান থেকে।"

মামীমা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া আদেশের স্বরে কহিলেন, "আমি ওকে ডেকে পাঠিয়েছি।"

বড়দাদা কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "আমাদের সবাইকে এমনইভাবে অপমান করবার মতলব আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছ মা। একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে তার বাপের সামনে ছোটলোকের মেয়ে বলে গাল দিতেও তোমার মুখে বাদল না! কি বলব, তুমি আমার মা। যাক্, আমার শ্বশুর মহাশয়কে তুমি যেভাবে অপমান করলে মা, তারপর তোমার সঙ্গে এক বাড়ীতে আমার বাস করা অসম্ভব,—ধীরু সুরেশ কথা আমি বলতে পারি না।"

মেজদাদা ও সুরেশ এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "তুমি যা ব্যবস্থা করবে বড়দা আমরা তাই মাথা পেতে নেব।"

বড়দাদা কহিল, "এখানে তোমার আর থাকা চলে না মা, কালই তোমায় আমরা কাশী পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব।"

অবনীবাবু রাগে ও অপমানে ফুলিতেছিলেন, কহিলেন, "সে ব্যবস্থা না করলে, আমার মেয়েকে আর একটী দিনের জন্যও এ বাড়ীতে রাখতে পারব না। আমার মুখের ওপর কি না আমার মেয়েকে ছোটলোকের মেয়ে বলে গাল দেয়।"

এই অভাবিত ব্যাপারে আমি কেমন যেন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম। মামীমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম। সে উত্তেজিত ও বিচলিত ভাব আর তাঁহার মুখের উপর নাই।

তারিণীমামাও বোধ করি এ ধরণের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এখন কি বলিবার উদ্যোগ করিতেই বড়দাদা বলিয়া উঠিল, "আপনি তবু দাঁড়িয়ে আছেন। মার সামনেই আপনাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি আপনার দ্বারা আমাদের কাজ চলবে না। আপনি কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে এক মাসের মাইনে নিয়ে আজই চলে যাবেন। যান কাগজপত্র ঠিক করুন গে।" তারপর আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, "অসি তোমারও এখানে থাকা উচিৎ ছিল না!"

আমি অসহায়ভাবে একবার মামীমার দিকে চাহিলাম। বেশ বুঝিলাম, আমিও আজই এ গৃহ হইতে বিতাড়িত হইব। হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এগৃহে বাস করা অপেক্ষা গাছ-তলায় বাস করাও সুখের।

তারিণীমামা বেশ ধীর শান্তভাবে কহিলেন, "দেখ শিরু তুমি ত সব ব্যবস্থাই করে ফেল্‌লে, কিন্তু এ ব্যবস্থা করবার কোন অধিকার তোমার নেই শুধু এই কথাটিই তুমি জান না। এই রেজেষ্ট্রী-করা দানপত্রখানি পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। যাঁর বিষয় সম্পত্তি তিনি তোমাদের কিছুই দিয়ে যান নি, সমস্ত তোমার মা জননীকে লিখেপড়ে দিয়ে গেছেন। আর কর্ত্তারই সঙ্গে পরামর্শ করে তোমার জননী এই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তোমাদের ছ'জনকে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন—সে দলিলও রেজেষ্ট্রী হয়েছে —আর তাঁদের দুজনের দয়ায় কারবারের মালিকানি স্বত্বও আমর কিছু জন্মেছে, তুমি ইচ্ছে করলে আমায় তাড়াতে পার না! দু'খানি দলিলই সঙ্গে করে এনেছি, পড়ে দেখ। কর্ত্তার অন্তিম আদেশ যদি মেনে চলতে তা হ'লে এ দলিল বার করবার কোন প্রয়োজনই হত না।"

আমার দেহের মধ্য দিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ শিহরণ খেলিয়া গেল। আমার চোখের দৃষ্টি যেন আপনা-আপনি তিন ভাই, অবনীবাবু এবং বড়বৌদিদির মুখের উপর নিপতিত হইল। দেখিলাম সকলেরই মুখ বিবর্ণ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে সহসা বজ্র পতন হইলে মানুষের যে অবস্থা হয় তাহাদেরও ঠিক সেই অবস্থাই হইয়াছিল।

আমার দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্নেহপ্রবণ মাতুল ও মাতুলানী যে এত বড়, তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। তাঁহারা মানুষ নহেন, দেবতা!

উর্ব্বশী

[শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি এ]

হে চিরতরুণী শ্যামা বিশ্বমনোমোহিনী, সুন্দরি
অয়ি উর্ব্বী-অয়ি গুর্ব্বী কবি তোমা বলেছে উর্ব্বশী।
ব্যোমলোকসভাতলে ঘূর্ণনৃত্যে চপলা অপ্সরী,
বনশ্রী-কুন্তলা গিরি পয়োধরা ইন্দ্রের প্রেয়সী।

মিত্র-বরুণেরে কবে যজ্ঞস্থলে মোহিলে চকিতে,
দোঁহার আসঙ্গ লভি কবে তুমি হইলে উর্ব্বরা,
আদি মহামানবের জন্ম হ'ল তোমার কুক্ষিতে,
অগস্ত্য বশিষ্ঠরূপে সেই হ'তে হ'লে বসুন্ধরা!

অনার্য্যের উপদ্রবে কবে তুমি কাঁদিলে কাতরে,
উদ্ধারিল আর্য্যবীর, বীরভোগ্যা তুমি সেই হ'তে।
কত বীর বীরধর্ম্ম পাসরিল তব মোহ-ঘোরে,
কত তপস্বীর তপ ভেসে গেল তব মায়াস্রোতে।

কত কেশী হ'ল হত, এল গেল কত পুরুরবা,
শাশ্বতশ্রী তুমি আছ, চিরশ্যামা চিরমনোহরা।

আধুনিক বাঙ্গলা কাব্যে যতীন্দ্রনাথ

[শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি-এস-সি]

কবি যতীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকের দরবারে উচ্চ আসন লাভ করিলেও, বাঙলার পাঠকসমাজের কাছে বিশেষ পরিচিত নহেন। তাহার কারণ, প্রথমতঃ তিনি লেখেন কম ও সে লেখা প্রকাশ করিবার বিশেষ ব্যাকুলতাও তাঁহার নাই বলিয়াই মনে হয়, অবকাশ বোধহয় তাঁহার আরও কম। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার কবিতার সুর গোড়া হইতে না বুঝিতে পারিলে অসাবধান পাঠকের কাছে সব বেতাল বলিয়া মনে হয়; তৃতীয়তঃ, লোকের চাহিদা অনুসারে তিনি প্রেম বা আদিরসের কাব্য জোগান না।

এখানে আরও একটী কথা বলিবার আছে। আমাদের মনে হয়, যতীন্দ্রনাথ হয়তো মহাকবির আশীর্ব্বাদ সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার নিকট যান নাই—কারণ তাঁহার পরিচয় আমরা এখনও কোনও বিজ্ঞাপনস্তম্ভে পাই নাই। এটীকে যাঁহারা অবান্তর কথা মনে করিবেন, তাঁহারা ভুল করিবেন সন্দেহ নাই। কারণ, এদেশে আশীর্ব্বাদী পুষ্প লাভ করিয়া প্রসাদী না হইলে কোনও জিনিসের গৌরব ও সম্মান লাভ একেবারে অসম্ভব না হইলেও সুদূর-পরাহত।

রবীন্দ্রনাথের পর যাঁহারা কাব্যসাহিত্য রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই রবীন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত ও বিচরিত পথ অনুসরণ করিয়াছেন; তাঁহাদের চিন্তা-শক্তি বা বৈশিষ্ট্যের অতি ক্ষীণ আলোকরেখা রবীন্দ্রনাথের চির উজ্জ্বল আলোকের আবর্ত্তে হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দলের বিশিষ্টতাও যে বিশেষ কিছু ছিল এ[illegible] জোর করিয়া বলা চলে না। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অল্পাধিক সেই মহাকবির অনুকরণের ব্যপদেশই কালির আঁচড় কাটিয়াছেন, সে মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই।

কবি যতীন্দ্রনাথ এই প্রভাব হইতে প্রায় মুক্ত হইয়াছেন। এই প্রভাবের চিহ্ন তাঁহার পূর্ব্বতন রচনা 'মরীচিকা'য় দেখা গেলেও পরবর্ত্তী কালের রচনা 'মরুশিখা'য় বড় দেখা যায় না, অর্থাৎ মূলতঃ তাঁহার রচনার ভঙ্গি বা সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনও মিল নাই। তাঁহার ধারণা, চিন্তা ও দৃষ্টি নূতন প্রকাশ-ভঙ্গি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র—তিনি গতানুগতিক পথে চলেন নাই। এই বিশিষ্টতা এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁহার কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। তাঁহার কবিতার মনোযোগী পাঠকের কাছে এ সকলই ধরা পড়িবে। আমরা অত্যন্ত মোটামুটিভাবে এ তারতম্য সাধারণের সম্মুখে ধরিতে প্রয়াস পাইব।

(ক) স্বতন্ত্রতা

১। ভাষা:—রবীন্দ্রনাথের ভাষা মসৃণ কারুকার্য্যময়—রূপ ও রসে টলমল। মনে হয়, দক্ষ শিল্পী তাঁহার শক্তি-নৈপুণ্যে ভাষার অঙ্গরাগ করাইয়াছেন—তাঁহার দৈন্য কোথাও নাই। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের ভাষা 'কাটখোট্টা' ধরণের। আমরা যে ভাষায় কাঁদি, এ সেই ভাষা; যে ভাষায় অদৃষ্টের পরিহাসকে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিতে পারি, এ সেই ভাষা। কথার কারচুপি বা প্যাঁচালো যুক্তি ইহাতে নাই—

> সেদিন বন্ধু পড়েছিনু পথে ছুটাইলে তুমি ঘোড়া
> লোহা বাঁধা তার পদাঘাতে মোর ঠ্যাংটি হইল খোঁড়া
> দেখি চলিবার কালে—
> গতি বিজ্ঞানে লেখা নাই তবু খোঁড়া ঠ্যাং পড়ে খালে!
> ঘুমের আড়ালে এলে তুমি ধীরে কহিলে হরিয়া জ্ঞান
> প্রাণের দুঃখ না যাক বন্ধু! যাবে দুঃখের প্রাণ!
> বন্ধু প্রণাম হই—
> শীতের বাতাসে জমে যায় দেহ—ছেঁড়া কাঁথাখানা কই?

সোজা এবং অত্যন্ত সাধারণ কথা, কিন্তু প্রাণে বিঁধে। এ সকল আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্ত্তার মতই মনে হয় যেন অত্যন্ত পরিচিত ও অতি আপন। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের অমন সুঠাম ও ঝঙ্কৃত ভাষার বৈভব হইতে আসিয়া সহসা এই বিচিত্র খসখসে ভাষাটী বড়ই উপাদেয়

ও হৃদয়গ্রাহী মনে হয়। তাই একান্ত ভয়ে ভয়েও মাঝে মাঝে ভাবি, এ যেন কলে ছাঁটা চালের দপ্তর হইতে একেবারে ঢেঁকি ভানার দপ্তরে হাজির হইয়াছি।

২। শব্দচয়ন :—যতীন্দ্রনাথের শব্দচয়নে স্বাতন্ত্র্য আছে, অথবা তাঁহার নিজস্ব চিন্তাধারার কল্যাণে শব্দসম্পদ্‌ও অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। অনেক সাধারণ শব্দ কাব্য-সভায় একেবারে অপাংক্তেয় হইয়াছিল সে শব্দগুলিকে তিনি 'জলচল' করিয়া এমন স্থান দিয়াছেন যে উহার প্রত্যেকটীর দ্বারা তাঁহার কাব্যসম্পদ্ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি এদিকে কাব্যজগতের শক্তি বাড়াইয়া দিয়াছেন। কাব্যের জন্য বিশেষ শব্দ ও ভাষার ব্যবহারই আমাদের সংস্কারগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যতীন্দ্রনাথ সে গতানুগতিকতার ধার ধারেন নাই, তাই তিনি লিখিতে পারিয়াছেন :—

নিত্য প্রবল নব কোলাহল, ঘুমানোই হ'ল দায়—
সব চেয়ে বাধা চারিধারে দাদা, গরীবের ক্ষুধা পায়!

আজি তার সেই অসাড় বাতে যে নূতন কামড় ধরে
গত সন্ধ্যার মরা রবি গাহে ঘুম ভাঙানিয়া স্বরে।

অন্য অর্থটী—

যাহার পাঁঠা সে যেদিকে কাটুক, তাতে অপরের কি?

প্রতি কবিতায় তাঁহার এই শব্দচয়ন লক্ষ্য করিলে মনে হয়, তিনি প্রাণের কথাকে ছন্দে বাঁধিয়াছেন।

৩। ছন্দ ও মিল :—রবীন্দ্রনাথ ছন্দের রাজা—তাঁহার কাব্যে, মিল অভাবনীয়। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের কাব্যে মিল সকল সময় নিয়ম-কানুন মানিয়া চলে না। তাঁহার কথার ধার ও ব্যগ্রতা এত বেশী যে, সে মিলের দিকে প্রধানতঃ কাহারও দৃষ্টি পড়ে না—আর যখন পড়ে, তখন মনে হয় এই মিলটুকুর দৈন্য তাঁহার প্রতিভাকে ক্ষুন্ন তো করে নাই বরং ইহার একটী কথারও ব্যতিক্রম ঘটিলে যেন সমস্ত জিনিসটাই নষ্ট হইয়া যাইবে। যথা :—

(ক) চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবী সাহারার বুকে?

(খ) ক্ষুধা দিয়ে দেওয়া-অন্ন
গরু মেরে জুতা দান অপেক্ষা নহে কভু বেশি পুণ্য।

(গ) নিজে এসে এসে ছদ্মবেশে যে ঠুকে ঠুকে দাও জোর
দু'দিন না যেতে ঢিল হয়ে যায় হেন বিদ্যার দৌড়!

মিলের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখি, তিনি একটি মাত্র ছন্দেই কবিতা লিখিয়াছেন—সে ছন্দের গতি অতি সাবলীল যে কোন পাঠকের কাছে ইহার স্পষ্ট রূপটী ধরা পড়িবে সন্দেহ নাই। তথাপি এই ছন্দের দিক্ দিয়া আমরা যতীন্দ্রনাথকে কৃতী বলিতে পারি না—তিনি কাব্যের রূপে মোহিত হন নাই—রসে তাহার প্রাণ মজিয়াছে।

৪। বিষয়-নির্ব্বাচন—বিষয়-নির্ব্বাচনে যতীন্দ্রনাথের অশেষ বৈচিত্র্য। রবীন্দ্র-পর কাব্যে প্রায় সকলেই প্রেমের গাথা, নয় ব্রজলীলা, একান্ত পক্ষে বাঙ্গালী পরিবারের দুঃখ, দারিদ্র্য, সুখ ও আনন্দের কথা গায়িয়া চলিয়াছেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ এ-সব ছাড়াইয়া একেবারে অন্য দিক্ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিষয়-নির্ব্বাচন প্রধানতঃ দুই রূপ—

(ক) একটা অত্যন্ত বাস্তব জিনিস দিয়া কবিতা আরম্ভ করিয়া তিনি তাহার মধ্য হইতে একটা সার্ব্বজনীন চিন্তাধারার স্রোত বাহির করিয়া আনেন। কাজেই এখানে তাঁহার কবিতাও যেমন স্বচ্ছ, বিষয়-নির্ব্বাচনও তেমনই সাধারণ। সামান্য কর্ম্মকারকে আশ্রয় করিয়া তিনি 'লোহা'র যে ব্যথাকে প্রাণবন্ত করিয়াছেন, অথবা সামান্য খেজুর গাছ হইতে যে অসামান্য রস সংগ্রহ ও পরিবেষণ করিয়াছেন কিংবা ঘুমের ঝোঁকে জীবনের যে সত্যরূপের সন্ধান দিয়াছেন তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। সামান্য দৈনন্দিন জিনিস মাত্র অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে কেমন করিয়া সার্ব্বজনীনতার ধাপে পৌঁছায় এবং নূতন চিন্তাধারার প্রসার করে তাহার পরিচয় এই কবির সকল কবিতায় বিশেষরূপে পাওয়া যাইবে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ তিনি সুপরিচিত কোন জিনিসকে নব নব রূপে চিত্রিত করিতেছেন। তাহার অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কবিতায় ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাইবে। তাঁহার 'ভীষ্ম' 'বিভীষণ' প্রভৃতি কবিতা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাহাদিগকে আর ইহার তাৎপর্য্য বলিতে হইবে না। ভীষ্ম কবিতাই ধরা যাউক। তিনি দেবব্রতকে নবরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। বংশের শত কলঙ্ক-কালিমায় ভীষ্ম মর্ম্মাহত—সে চিন্তাতেই এত বড় যোদ্ধা একেবারে পঙ্গু

আজ শরশয্যায় শয়ন করিয়া সেই সকল কথাই তাঁহার মনে হইতেছে। একে একে দুর্ব্বলতা আসিয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিতেছে—দৃঢ়চিত্ত দেবব্রতেরও ক্ষণতরে মনে হইতেছে—

বীর্য্য সত্য মনুষ্যত্ব সবই যদি হ'ল ফাঁকি
মর্ত্ত্যে কেবল অমরতা নিয়ে কতকাল বেঁচে থাকি ?
বৃথা যৌবনে কুলকল্যাণে ত্যজিনু রাজ্য দারা —
মিথ্যার তরে সত্য যে করে সে হয় সত্য হারা !
পাপকে পন্থা যে ছেড়ে দ্যায় সে লভেনা ত্যাগের পুণ্য
দেবলীলা ফোটে মানুষ যখন মনুষ্যত্ব শূন্য !

আমরা এদিকে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিলাম; ক্রমে ভাব-স্বাতন্ত্রের কথাও বলিব। এই প্রভাবহীনতাই তাঁহার বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রকৃষ্ট চিহ্ন। প্রথমতঃ যে শক্তি এত শীঘ্র এত বড় একজন যুগ-প্রবর্ত্তকের মোহ প্রায় কাটাইয়া উঠিয়াছে, তাহা কোনও ক্রমেই ক্ষীণ নহে; দ্বিতীয়তঃ তাহার রচনায় কাব্যসম্পদ্‌ও যথেষ্ট।

(খ) কাব্যসম্পদ্‌

(১) সূক্ষ্ম সত্যদৃষ্টি ও অনুভূতিঃ—যতীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িতে বসিলেই প্রথমতঃ সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্ম ও সত্য অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের যে দিক্‌টা আমরা চক্ষু মুদিয়া ভুলিয়া যাইতে চাই—সর্ব্ববিষয়ে সকল দিক্ দিয়া তিনি আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। তাই অসহায় মানবের শোয়া-বসা সব সমান দেখাইতে তিনি বলেন :—

"মিছে দিন যায় বয়ে—
উপরে ও নীচে ঘুমের তুলসী ; থাকি শালগ্রাম হ'য়ে !"

অবশ্য যাঁহারা শালগ্রামই দেখেন নাই—পূজার পরে শালগ্রামটী উপরে ও নীচে চন্দন-মাখানো তুলসী দিয়া কেমন করিয়া তুলিয়া রাখা হয় তাহা জানেন না,—তাঁহারা মানবের এই জন্মপূর্ব্ব ও মৃত্যুপর ঘুমের সঙ্গে তুলসীর আর মানবের সহিত শালগ্রামের এ উপমা বুঝিতে পারিবেন না—এবং সেটুকু না বুঝিলে কবিকে মোটেই বুঝা যাইবে না।

দৃষ্টির কথা ছাড়িয়া অনুভূতির কথায় আসিলেও কবির কৃতিত্ব উপলব্ধি করা যায়। এই বিশ্বকারা অপার—আর তার গরাদে একটী কালো অন্যটী সাদা—একটী রাত্রি অন্যটী দিন—তাহার মধ্যে মানব বন্দী—এ অনুভূতি সহজলভ্য নহে। এই অনুভূতির দৌলতেই তিনি বলেন :—

"বন্ধু আমারে খাটো পিঞ্জরে বন্দী করিয়া রাখো।
এত বড় খাঁচা মুক্তির ধাঁচা বিদ্রূপ করোনাকো !
সীমা নাই যার অসীম দুয়ার না বন্ধ, নহে খোলা—
গম্বুজে গাছে দাঁড় হাজার হাজার দাঁড়ে দাঁড়ে
দেওয়া ছোলা !
—এ ব্যঙ্গ কিসে সহি'—
কয়েদে যখন ব্যবস্থা কর কয়েদীর মত রহি !

(২) উপমা ; মাত্র দুই একটী কবিতা পড়িলেই কবির বিচিত্র ও বিভিন্ন উপমার দিকে পাঠকের চোখ পড়িতে বাধ্য হয়। এই সকল উপমা একদিকে যেমন নূতন অন্যদিকে আবার বাস্তবতার সঙ্গে তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিল। আমরা এই দ্বিতীয় ব্যাপারটীর কথা আলোচনার অন্যস্থলে বলিব; এখানে মাত্র দুই একটী নমুনা দিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন এ গুলি সাধারণ 'মুখকমল' হইতে কত বিভিন্ন। ইহাতে কষ্ট-কল্পনা নাই, কিন্তু বিচিত্রতা আছে। তিনি বলেন :—

"বজ্র লুকায়ে রাঙ্গা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা—
রাঙ্গা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙ্গীণ বারাঙ্গনা !"

সান্ধ্য মেঘের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াও কবি ভোলেন নাই যে, তাহার বুকে বজ্র লুকানো থাকে, তাই রাঙ্গা সন্ধ্যার বারান্দায় তাহাকে রঙ্গীণ বারাঙ্গনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অন্যদিকে জীবনের প্রকৃত স্বরূপ দেখাইতে যে উপমা তিনি আহরণ করিয়াছেন, তাহাতে কবি-কল্পনার প্রসার দেখা যায় !

"তড়িৎ যেমন মেঘে সঞ্চিত বেদনার শিহরণ —
আলোক যেমন অন্ধ ব্যোমের হাহাকার কম্পন—
মিলন যেমন বিরহের ভয়ে মুখে মুখ, বুকে বুক—
জীবন তেমনি মরণের ভয়ে হৃদয়ের ধুক্ ধুক্ !"

(৩) প্রকাশভঙ্গিঃ—কবির প্রকাশভঙ্গি অনবদ্য, সুন্দর। যে দৃষ্টি দিয়া তিনি জীবনকে দেখিয়াছেন—জীবনের যে স্বরূপ তাঁহার কবিপ্রাণকে আলোড়িত করিয়াছে, সে দৃষ্টি, সে আলোড়ন কখনও তিনি ভোলেন নাই। জড় ও অজড় সকলকেই তিনি সেই দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। 'মৃত্যুঞ্জয়ের' কথা কাব্যে অনেকেই লিখিয়াছেন, কিন্তু যতীন্দ্রনাথ মাত্র প্রকাশভঙ্গির দৌলতে তাঁহার দুঃখ কেমন করিয়া ফুটাইয়া

তুলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এখানে তিনি নূতন কোনও জিনিসের আমদানী করেন নাই; যাহা আছে এবং যাহা আছে বলিয়া সকলেই জানে, সেই চির-পরিচিত মাল মসলা নিয়াই তিনি যে কাব্য-সৌধ গড়িয়াছেন, তাহা অতুলনীয়!

"নবনীনিন্দী সুন্দর তনু কামেরও কামনা ঠাঁই—
কত অভিমানে লেপিলে কে জানে অজানা চিতার ছাই!
কত মরণের স্মরণ গাঁথিয়া পরেছ হাড়ের মালা—
কটির কাপড় গিয়াছে খুলিয়া, না জানি সে কত জ্বালা!
সুরের জনম যার কণ্ঠে সে বেণু বীণা তেয়াগিয়া
সাধারণ দুখে কাটায় কি কাল শিঙা ডুগ্‌ডুগি নিয়া?
কি জ্বালা ভুলিতে জ্ঞানের আকর ধরেছ ভাঙের নেশা—
অন্নপূর্ণা-পতি কম দুঃখে ভিক্ষা করেনি পেশা!
—কহ কহ দিগ্‌বাস—
পূজার অর্ঘ্যে চাপা পড়া যত বেদনার ইতিহাস!
সুখের দেবতা মরে যুগে যুগে তুমি চির দুঃখময়—
সুখে বাঁচে মরে দুঃখ অমর তুমিই মৃত্যুঞ্জয়!"

রক্তসন্ধ্যার বিচিত্র বর্ণনায় কবি বলেন :—

"দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্ত শিখর' পরে,
ছেঁড়া মেঘে পাতি মৃত্যু-শয়ন রক্ত বমন করে!"

আবার শরৎ-কালের বর্ণনায় অতি সাধারণ তথ্যের ভিতর দিয়া নূতন রূপে একটী পুরাতন স্মৃতি মনে পড়ে :—

"বর্ষা মলিন যত মেঘবাসে—
কাচিয়া শুকায় শারদ আকাশে
কিরণে ডুবায়ে দিতেছে ছোবায়ে
মেঘগিরি নির্ঝর!"

(৪) ভাবসম্পদ্ ও প্রাঞ্জলতা :—যতীন্দ্রনাথের ভাব সার্ব্বজনীন, ভাষা প্রাঞ্জল। তিনি যাহা দেখিয়াছেন, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাই কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার কাব্যে আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোথাও আবছায়া নাই—কখনও বুঝিবার জন্য অভিধানের দরকার হয় না—সর্ব্বদা স্বচ্ছ ও মর্ম্ম-স্পর্শী। সত্যকার অনুভূতি না হইলে ভাষা প্রাঞ্জল ও রচনা কোনও প্রকারেই স্বচ্ছ হইতে পারে না। কবির বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির সামঞ্জস্যের জন্য অসারল্য কোথায়ও নাই। যতীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন জগতে দুঃখের ভাগ বেশি—প্রত্যেকটী লোক যেন এক একটি সজীব দুঃখমূর্ত্তি—তাহাদের জীবনের ভিত্তি অদৃষ্টের উপহাসে—পেষণ তাহাদের নিত্য প্রাপ্য। কাজেই সিন্ধু দেখিয়া কবির মন্থনের কথাই মনে পড়ে। মন্থনে যে সুধা উঠিয়াছিল সেটা কবি সত্য যুগের স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন—তিনি জানেন, এখনও মানবের প্রাণে প্রাণে মন্থন চলে—ঘানি টানিয়া টানিয়া নিত্য তাহারা প্রাণ বলি দেয়—মর্ম্মে মর্ম্মে এই চিরন্তন পেষণের কষ্ট উপলব্ধি করে। এই সার্ব্বজনীন ভাব কবির প্রাণে সাড়া দেয়—এই ক্লিষ্ট মানবের দুঃখকে স্মরণ ও অনুভব করিয়া তিনি বলেন :—

"চলে মন্থন চলে মন্থন টলেরে ব্রহ্মকোষ—
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ ভৈরব নির্ঘোষ!
ভরিয়া আকাশ মহা গণ্ডুষে উজ্জ্বল নীলবিষ—
হাঁকে ধূর্জ্জটী কে কোথায় চির দুখ নিশা বঞ্চিস্?—
আয় আয় যত চির-বঞ্চিত এক সাথে করি পান
অমৃত সিন্ধু মন্থনোত্থ দুর্ভাগ্যের দান!"

পড়িতে পড়িতে সঙ্গে সঙ্গে যেন মন্থনের কষ্ট মনে পড়ে; দুঃখদারিদ্র্যক্লিষ্ট এই অসহায় মানব আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া আছে—কবি মাভৈঃ বাণী নিয়া আসিয়াছেন—তিনি বলেন, আয় আয় সবাই এক সঙ্গে দুঃখ পান করি। 'কে কোথায় চির দুখ নিশা বঞ্চিস।' —সুন্দর! এখানে 'বঞ্চিস' এই শব্দটীর প্রয়োগে সমস্ত পদটীর অর্থ স্পষ্টতম হইয়া উঠিয়াছে—এ প্রয়োগ অতিশয় সুষ্ঠু। অন্য দিকে সুখের মূর্ত্তিকে তিনি যে ভাবে দেখিয়াছেন তাহা এই—

"অশ্রু সাগরে শোভে সহস্র নয়ন কমল দল—
তারি পরে ওই রেখেছ তোমার রক্ত-চরণতল:
তব প্রসন্ন আঁখির আলোক আমার পিছন ভরি'—
যে ছায়া পড়েছে তাহাতে মিলায় কত শোক-বিভাবরী!

প্রসাদ গুণে ও ভাবমাধুর্য্যে জিনিসটী অপূর্ব্ব হইয়াছে।

(৫) কল্পনার প্রসার :—যতীন্দ্রনাথের কাব্যে কষ্টকল্পনা প্রায় কোথায়ও নাই তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি—অপর দিকে তাঁহার কল্পনার প্রসারও সমধিক। সাধারণতঃ কবি দৈনন্দিন কোনও বাস্তব ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিয়াছেন এবং সেইখানেই সত্যকার স্রষ্টার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার কবিতার

অনেক স্থলেই অন্তর্নিহিত একটা অর্থ আছে, সেটাকে সম্যক্ ধরিতে না পারিলে, কবিতাগুলি কেবল কথার সমষ্টি বলিয়া মনে হইতে পারে। কাব্য জিনিসটা অনুভূতির—তাহাকে ফাঁকি দিয়া জানিবার বা বুঝিবার সুবিধা হয় না. দরদী ব্যতীত কাহারও তেমন বোধগম্য হইতে পারে না—হৃদয়বান্ ব্যতীত কাহারও চোখে কাব্যের প্রকৃত রূপটী ধরা পড়ে না। যতীন্দ্রনাথের কল্পনা এত সার্ব্বজনীন যে, যে কেহ একটু নিবিষ্টমনে পড়িলেই সেটুকু ধরিতে পারিবেন। তাঁহার দৃষ্টির মূল সূত্রটী জানা থাকিলেই সকল জিনিস স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। 'লোহার ব্যথা'কে যদি কেহ কেবল লোহা ও কর্ম্মকারের আবেদন নিবেদন মনে করেন—মানব-জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যের প্রতি যদি দৃষ্টি না পড়ে, তবে যতীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝিবার চেষ্টা তাঁহার বৃথা। যতীন্দ্রনাথের মূল সূত্র প্রহার—প্রহারে বেদনা-বোধ—সে দৃষ্টিতে বিধাতৃদেবকে কর্ম্মকারের পদে বসাইয়া নিজে লোহা হইয়া ভাবুন তো—

"দেখগো হেথায় হাপর হাঁফায় হাতুড়ী মাগিছে ছুটি—
ক্লান্ত নিখিল করগো শিথিল তোমার বজ্রমুঠি !"

অসহায় মানবের প্রাণে প্রাণে যেন বাজিতে থাকে—

"ক্লান্ত নিখিল করগো শিথিল তোমার বজ্রমুঠি !"

"খেজুর গাছে'র রসক্ষরণকে কবি রক্তক্ষরণ বলিয়া মনে করেন—

"কাটারির কাট বহি দেহময় দীর্ঘ শীতের রাতি
খাড়া দাঁড়াইয়া হাজারে হাজারে কাঁদে
খেজুরের পাঁতি !"

এই দুঃখদৈন্যে দীর্ঘ শীত-রাত্রে মানবের এই অসহায় ক্রন্দনের করুণ কণ্ঠ যাঁহার মানস-কর্ণে পৌঁছিবে না তিনি কবির সহিত বলিতে পারিবেন না—

"এ ধরণী ভরি খেজুর গাছের
আবাদ করিছে কেবা—
নয়নের জলে জ্বাল দেওয়া চিনি
কোথা কে করিছে সেবা"

তিনি বুঝিবেন না, কি দাহনের যন্ত্রণায়—কোন অসহায়ত্বের বেদনায় কবি জড়ের বুকে প্রাণ সঞ্চার করিয়া তাহার বেদনাকে সার্ব্বজনীনতার ধাপে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন—কিন্তু যিনি কণামাত্রও বুঝিবেন, তিনি মুগ্ধ হইবেন। যে পন্থা ধরিয়া তাঁহার কল্পনা চলে, সেটা বাঙ্গলা সাহিত্যে অত্যন্ত নূতন—তিনি সত্যই "নব পন্থা" আবিষ্কার করিয়াছেন।

(গ) দুঃখবাদ

যতীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতা ও বিশিষ্টতার অন্যতম নিদর্শন তাঁহার দুঃখবাদ। কিন্তু তিনি দুঃখবাদ প্রচার করিতে আসেন নাই—তিনি প্রচারক নহেন ; তিনি স্রষ্টা।

এই দুঃখবাদ বুঝিতে হইলে উহার মূল সূত্র ও ক্রমপরিণতি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। আমরা পাঠকের সম্মুখে সেটুকু ধরিয়া দিতে চেষ্টা করিব।

(১) বিদ্রোহ :—যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের মূল সূত্র বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ, দেশ, কাল ও পাত্রের অতীত—সর্ব্বজনে, সর্ব্ব সময়ে ও সর্ব্বদেশে প্রসারিত। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ এই যে অদৃষ্টের সহিত নিতান্ত উপায়হীনের মত নিত্য নব চুক্তি করিয়া বাঁচিয়া আছে—এই যে কৃত্রিমতা ও অসারল্যের মাঝখানে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, এই যে দুঃখ পাইয়াও ভয়ে ভয়ে উর্দ্ধদিকে পিতৃমাতৃ সম্বোধন করিতেছে—যতীন্দ্রনাথ এ সকলের বিরোধী ; তিনিই বাঙ্গলা ভাষার একমাত্র সত্য বিদ্রোহী কবি। তিনি উচ্চৈঃশ্রবার চি-হি হিও নহেন—তরুণীর বেণী নহেন—তিনি বিদ্রোহী। তিনি দুঃখকে বরণ করিয়া নেন সত্য, কিন্তু সে কেবল উপায় নাই বলিয়া 'দান' বলিয়া গ্রহণ করেন না—দুর্ভাগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। তাই বলেন—

"তবু সগর্ব্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুরীর ঘায় !"

আবার বলি ;—তিনিই আদর্শ এবং একমাত্র বিদ্রোহী কবি। তিনি বলেন,—

"বন্ধু এ কার পাপ ?—
এত দোষ ত্রুটি এত অন্যায় এত যে দুঃখ তাপ ?"

* * *

"যা কিছু গড়েছে—যা কিছু করেছ দশদিকে শতো দোষ
তাই তব প্রাণে দাগে বিফলের অসীম অসন্তোষ !
আরো ভালো গড়া সম্ভব কিনা নহে আজ সে বিচার—
না যদি পারিবে গড়িতে বন্ধু কিবা ছিল অধিকার ?"

* * *

আবার—

চির বিদ্রোহী মানব-আত্মা
আজিও তোমার মানেনি বশ—
জনে জনে তারা বিশ্বামিত্র হরিতে বিশ্বকর্ম্মাযশ !"

এই গতানুগতিক জীবনে তাহার আসক্তি নাই—এই বাঁধা পথে চলা তাঁহার সহে না —এই অসহায়ত্বে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে—

"সহে না এ বেঁচে থাকা—
বাপ পিতামহ মামুলী ধরণে প্রতিদিন মরে রাখা !"

—কিন্তু তথাপি বাঁচিতে হইবে—নিত্য এই দুর্ভাগ্যের দহন সহিতে হইবে—গরুর গাড়ীর গরুকে গাড়ী টানিতেই হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া কি এই অধীনতার পেষণে উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া 'পিতৃ-মাতৃ' সম্বোধন করিতে হইবে? —দুঃখদাতার গুণগান করিতে হইবে শুধু ভয়ে ?—তা নয় বিদ্রোহী কবি বলেন,—

"আমি রয়ে গেনু বিনাশের আগে দুষ্কৃতদের দলে—
দেখিব বন্ধু মড়ার উপরে কত খাঁড়ার ঘা চলে !"

এমন নির্ভীক বিদ্রোহ-বাণী মানবের প্রাণকে শক্তিমান্ করিয়া তোলে—প্রকৃত মনুষ্যত্বের সন্ধান আনিয়া দেয়।

জীবনের এই দাসত্ব—এই অসীম কারা-কক্ষের যন্ত্রণা 'আলো আঁধারের গরাদে বসানো' এই অনন্ত কারাগারের অনুভূতি—এ অসহ—কি চাই ?—

নচেৎ মুক্তি দাও—
চারি দিকে এই অসীমের কারা একবার খুলে দাও !
জীবনে, মরণে কর্ম্মে ও জ্ঞানে থাকিব না পরাধীন
আমার আদেশ না পাইয়া যেন
কাটে না আমার দিন !"

অপূর্ব্ব ! এমন কথা বাঙলার আধুনিক কোনও কবির কাব্যে নাই—যতীন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বন্ধু ! এইযে নিরুপায় হইয়া কেহ তোমাকে পিতা কেহ বা মাতা বলে, এ চাহি না—এ অসহনীয়। ধনী ও দরিদ্রের বন্ধুত্ব হয় না প্রভু ও দাসের মিলন অস্বাভাবিক, তাই—

"নাহি যবে প্রয়োজন—
আমার মাথায় আকাশের মেঘ করিবেনা গরজন।
বুঝি প্রয়োজন বহিবে পবন প্রয়োজনে ঝরে বৃষ্টি
আপনারে ঘিরে প্রতি মুহূর্ত্তে করিব নূতন সৃষ্টি !
যদি ভাল লাগে ভালবেসে তোমা ডাকিব বন্ধু বলে—
সমানে সমানে ছলনাবিহীন দিন যাবে কুতূহলে।"

(২) বিদ্রোহের পরিণতি ও দুঃখবাদের মূল :—যতীন্দ্রনাথের এই বিদ্রোহের ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করিলে তাঁহার অপূর্ব্ব দুঃখবাদের সন্ধান মিলে। আমরা ক্রমশঃ তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কবি মুক্তি চাহেন—মুক্তির স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন— কিন্তু সে মুক্তি চাহিতেও তাঁহার হাসি আসে—

"চাহিতে মুক্তি হাসি আসে হায় পাকাইতে কাঁচা হাত
কোন্ অধিকারে আমারে সৃষ্টি করিলে জগন্নাথ ?"

কোন্ অধিকারে বন্ধু যে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন— কোন কারণে যে একের পর একটী করিয়া দুঃখদান করিতেছে—তাহার উত্তর কি ? কিন্তু কবির প্রাণবতী কল্পনা এখানে আসিয়া থামে নাই। তিনি ইহার অত্যন্ত সরল ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কবি বলেন, বন্ধু নিজেই দুঃখী তাঁহার দুঃখ অফুরন্ত —দুঃখই তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি, কাজেই দান করিতে সে আর কি করিবে ?—

"যাহা আছে যার তাহা ছাড়া আর কি পারে সে পরে দিতে
অপার দুঃখ তাই তোমা হতে ঝরে পড়ে চারিভিতে।
ওগো অক্ষয় বট
যত বেড়ে যাও ততই ছড়াও শত দুঃখের জট !"

এই যে মানবের প্রাণে প্রাণে বেদনা চোখে চোখে অশ্রু, এ কার বেদনা ? এ কার অশ্রু ? মানবের এই যে মৃত্যু এ কার মরণ ? মানবের এই চোখের জল সেই সেই বন্ধুবরের,—সেই কাঁদে— তারই এ বেদনা—

"চোখে চোখে ঝরে কার যে অশ্রু বুঝেও বুঝিনে কেউ
বুকে বুকে ভাঙ্গে কোন্ সে অতল বুকের দুখের ঢেউ !
কণ্ঠে কণ্ঠে কে কণ্ঠহীন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠে।
মরণে মরণে তিল তিল করি কোন্ মহাপ্রাণ টুটে !"

এত যে দুঃখী এত যার বেদনা তাহাকে কি দয়া না করিয়া থাকিতে পারা যায় ?—তাই তিনি বন্ধুর সহিত মাত্র "আধা সন্ধি" করিয়াছেন—

কিছু আনন্দ কিছু সুখ আর বাকি আঁখিভরা জল
তোমার আমার যেমন চলেছে তারো তাই অবিকল!
অশ্রু পরশি অগত্যা তাই করিলাম-"আধা সন্ধি"
হে চিরদুঃখী ব্যথার বাঁধনে ব্যথিতে করিলে বন্দী!"

সন্ধি হইল বটে—কিন্তু দুঃখের উপায় কি? সে রোগের যে নিদান তিনি বাহির করিয়াছেন—সেটী "ঘুমিয়ো-প্যাথী"

"চারিদিকে দেখে চারিদিকে ঠেকে ঠিক বুঝিয়াছি তাই—
নাকে শাঁক বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই!"

যতীন্দ্রনাথ বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন, কাজেই তিনি দুঃখবাদী—তিনি গতানুগতিক নহেন, কাজেই তিনি দুঃখবাদী—তিনি দুঃখকে দান বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, বিদ্রূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই তিনি দুঃখ-বাদী—পরিশেষে বলি তিনি সত্যদ্রষ্টা, কাজেই দুঃখবাদী!

(ঘ) ব্যঙ্গ

যতীন্দ্রনাথের কাব্যে যে ব্যঙ্গ আছে তাহা অত্যন্ত ধারালো। এই সহজ ও নিপুণ ব্যঙ্গ কবির বিশিষ্টতার অন্যতম নিদর্শন। তাহার ব্যঙ্গ জগতের যাবতীয় কৃত্রিমতাকে লইয়া; প্রধানতঃ তিনি তিনটী দিকে এই ক্ষুরধার ব্যঙ্গশেল নিক্ষেপ করিয়াছেন :—

(১) সৃষ্টির এই অসামঞ্জস্যকে তিনি বিদ্রূপের চক্ষে দেখেন।

(২) স্রষ্টার স্বামীত্বকে লইয়া তাঁহার ব্যঙ্গ চলে।

(৩) মানবের চির অধীনতায় এই নিশ্চিন্ততা দেখিয়া তাঁহার বিদ্রূপোক্তি প্রচারিত হয়।

স্রষ্টাকে তিনি চামড়ার কারখানার অধিকারী বলিয়া যে ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না।—

"এতদিন হেথা ঘুরি ফিরি কই ছিলনাতো মোর জানা—
গোপনে বন্ধু খুলেছ হেথায় চামড়ার কারখানা!

* * *

ব্যথার গুমটে এ ধরণী সদা পচিয়া উঠিতে চায়—
পবন, তপন কত রসায়ন লেপন করিছ তায়!
প্রেমের প্রলেপে ঘসিয়া ঘসিয়া চক্‌চকে করে রাখা—
থেকে থেকে সেই আদিম গন্ধ তবুত পড়েনা ঢাকা!
গোপনে আড়ালে কাটাইছ দিন এ হীন ব্যবসা ধরে—
প্রাণের বন্ধু! তুমি যে না হ'লে করিতাম একঘরে!"

এইরূপ ব্যঙ্গ কবির কবিতার সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে—যে কোন মনোযোগী পাঠকের কাছে তাহার স্বরূপ ধরা পড়িবে। ব্যঙ্গের এমন সাবলীলতা ও খুরধার তাহার রচনাকে নিতান্ত রসাল ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে।

(ঙ) অসন্দিগ্ধতা

সর্ব্বশেষে যতীন্দ্রনাথের অন্য একটী মহৎ এবং প্রধান গুণের কথা বলিয়া আমরা আলোচনার সমাপ্তি করিব। যতীন্দ্রনাথে এ বৈশিষ্ট্যটী তাঁহার অসন্দিগ্ধতা (Precision)। তাঁহার কাব্যে এমন ব্যাপার নাই যাহা বাস্তবের সঙ্গে মিলেনা—বর্ষার মধ্যে তিনি শেফালিকা ঝড়াইয়া ফেলেন না—শীতেও মলয় আনেন না। তিনি বহির্জগতে যাহা দেখেন তাহা ভাল করিয়াই দেখেন এবং এত ভাল করিয়া দেখেন যে, অন্তর্জগতের কথা বলিতে গিয়া সে গুলি তাল পাকাইয়া ফেলিয়া একটা হাস্যকর ব্যাপার গড়িয়া তোলেন না। বাস্তবতার এত নিকট সম্পর্ক তাঁহার কাব্যে আছে বলিয়াই তাহা প্রাণে এমন গভীরভাবে আঘাত করে। তাঁহার কাব্যে বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের সম্বন্ধ টানিয়া আনে। এই অসন্দিগ্ধতা জিনিসটী প্রায় শতকরা নব্বুই জন কবির কবিতায় পাওয়া যায় না। এই নিজস্বতা তাঁহার কাব্যকে প্রখর শক্তি দান করিয়াছে।

যিনি বাস্তব জগতের সহিত বিশেষ পরিচিত নহেন, তিনি যতীন্দ্রনাথের কবিতা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন না। যেমন, যিনি গরুর গাড়ীতে না চড়িয়াছেন, তিনি 'কাণ্ডারী' কবিতাটীর সম্পূর্ণ রসগ্রহণে অসমর্থ হইবেন।

প্রথমেই বলিয়াছি, তাঁহার কবিতার প্রায় দুইটী করিয়া অর্থ আছে; একটু নিবিষ্ট চিত্তে পড়িলেই সেটা ধরা পড়ে এবং সেটুকু ধরা পড়িবার পূর্ব্বে প্রকৃত ও সম্যক্ রসবোধ হওয়া সম্ভবপর নয়। এই গতানুগতিক জীবনযাত্রা সঙ্গে গরুর গাড়ীর চলার সামঞ্জস্য করিয়া পড়ুন :—

"হাতের গোড়ায় যে কচা মিলিবে পথের পাশের বনে—
তারি ঘায় ঘায় যাবে ঠায় ঠায় পরম তুষ্ট মনে !
কভু ওলা কভু দাবা হবে গাড়ী কখনো চলিবে বেঁকে—
চিহ্নিত পথে অবিচ্ছন্ন চলার বেদনা এঁকে !
নূতন ভাঙনে সনাতন পথ কোথাও বা গেছে বাঁকি—
মাঝে মাঝে নিক্ এমন গভীর বুকে ঠেকে যাবে মাটী !
তথাপি বন্ধু হত শ হয়োনা গরুর গাড়ীর গরু—
জাওর কাটিয়া পার হ'তে পারে মরীচিকাহীন মরু !

বাস্তবের সঙ্গে কাব্যের কেমন নিখুঁত সম্বন্ধ ও মিল। এই বাস্তবকে ফাঁকি না দিয়া—শুধু ফাঁকি নয়, যথাযথ ভাবে এবং পরিপূর্ণ ভাবে তাহাকে রক্ষা করিয়া কাব্যকে বজায় রাখা যে কত কষ্টসাধ্য তাহা পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকাতে, বহির্জগতের জ্ঞানের অভাবে আমাদের দেশে কেবল 'হাওয়ার কবিতা' রচিত হয়—যতীন্দ্রনাথ একটী নূতন দিক্ দেখাইয়াছেন। খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার এই precisionএর নমুনা দেখাইবার বস্তু নয়—এক কথায় বলিতে গেলে যেখানে তিনি বাস্তবকে সাধারণ ভাবে বা উপমার সাহায্যে চিত্রিত করিতে চাহিয়াছেন সর্ব্বত্রই তাহার এ বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের মনে হয়, বহির্জগতের সঙ্গে কবির নিত্য নৈমিত্তিক মিলনের ব্যপদেশেই কাব্যে এমন precision আসিয়া পড়িয়াছে। কবি চতুর্ভুজ বা ত্রিভুজ আকাশের নীচে কবিতা লিখেন না, ধার-করা বুলির বৈভবে বাজার মাৎ করিবার চেষ্টা করেন না; তিনি নিজে যাহা দেখেন, সত্য বলিয়া উপলব্ধি করেন, মুক্ত আকাশ বাতাসের নিকট হইতে যাহা সংগ্রহ করেন, গরুর গাড়ীতে চড়িয়া যে অনুভূতি জাগে—সবই সরল সরস, ও স্পষ্ট করিয়া লিখিতে পারেন—কাজেই তাঁহার কাব্যে কোথাও অসারল্য বা কৃত্রিমতা নাই—কোনও কষ্ট কল্পনা নাই—বাস্তবের সঙ্গে অমিল নাই।

এই আলোচনায় যতীন্দ্রনাথের কাব্যরূপ দেখাইতে গিয়া হয়তো তাঁহার উপর অবিচারই করিলাম। তবে যদি কেহ আমাদের আলোচনায় একটুকুও উৎসুক হইয়া তাঁহার কাব্যগ্রন্থ পড়িয়া দেখেন, তবে সেখানে যে একটী নূতন সুর পাইয়া নানা ভাবে তন্ময় হইয়া পড়িবেন একথা জোর করিয়া বলিতে পারি এবং এইটুকুই আমাদের কথা।*

* 'রবিবাসরের' ১০ম অধিবেশনে পঠিত।

ধ্বনি

(গল্প)

[শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

পূর্ব আকাশে ইন্দ্রধনু উঠিয়াছে।

এই কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেছে।

ধরণী সিক্তগন্ধোচ্ছ্বাস বিরহী ও দুঃখীদের প্রাণে একটা ব্যথা ও ব্যবধানের সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে।

বর্ষাকাল; ভাসমান পল্লী।

খাল, ডোবা, পুকুর সমস্ত জলে ভাসিয়া গেছে। স্কুলের সুমুখে খেলার মাঠের উপরেও জল উঠিয়াছে। রাস্তা ঘাটও বড় একটা জাগিয়া নাই। এক বাড়ী হইতে অপর বাড়ী যাইতে হইলে নৌকা ও ডিঙ্গি ছাড়া যাওয়া দুঃসাধ্য।

গ্রাম ছোট; কিন্তু ভদ্রলোকের বাস অনেক। পূর্ব্বে গ্রামের অবস্থা না কি ইহার চেয়েও ভাল ছিল।

গাঁয়ের জমিদার বাবুরা গ্রাম ছাড়িয়া ঐ বিজলী ঝিল-

টার ও-পারেই বেশ ছোট-খাটো একটা শহর গড়িয়া তুলিয়াছেন।

বিলের এ পারে বামুন-পাড়া। গাঁয়ের নামই বামুন-পাড়া। অদূরে সংলগ্ন বাগ্দী বস্তি।

তাহারই মাঝখানে চারিদিকে জল-বেষ্টিত সুন্দর তক্-তকে, ঝক্-ঝকে যে বাড়ীখানি, তাহার ভিতর হাসি কান্নার সুর মিশিয়া দুইটি প্রাণীর অন্তরে অন্তরে যে কত অরুন্তুদ কাহিনী মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—সেই কথাই আজ বলিব।

বৃষ্টির পর, সন্ধ্যার কিছু আগে ওপাড়ার বাগ্দীদের ছেলে ভানু কলার 'ভেউরায়' চড়িয়া একটি বাঁশের 'লগি' দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে আসিয়া পৌছিল সেই বাড়ীর ঘাটে।

আশে-পাশে চার পাঁচখানি গ্রামে ওস্তাদ্জিকে না চিনিত এমন লোক খুব কমই ছিল। কেহ বলিত—কানা ওস্তাদ; কারণ, চোখে দেখিতে পায় না—অন্ধ। কেহ বলিত—বংশী ওস্তাদ; নাম বংশীলাল, তাই। কিন্তু টিকিতে টিকিতে গিয়া শেষে কেবল সংক্ষেপে দাঁড়াইয়াছিল—ওস্তাদ্-জি। গান বাজ্নায় অমন একজন ওস্তাদ লোক খুব কম মেলে; অন্ততঃ ঐ তল্লাটে ছিল না। মানুষ হিসাবেও না কি অমন একজন জ্ঞানী-গুণী মানুষ প্রায়ই দেখা যায় না। লোকে বলে এইরূপ। ওস্তাদ্জীর এখন জীবন-মরণের সাথী হইয়াছে তাহার প্রিয়তম সেতারখানি, আর পৃথিবীর ভিতর তাহার সব চেয়ে ভালবাসার বস্তু—একটি কালো মেয়ে। সে মেয়েও তার নিজের নয়। —সে অনেক কথা। পরে বলিব।

বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া ওস্তাদ্জি সেতার কোলে লইয়া সুর ভাঁজিতেছিলেন।

ভানু ছোঁড়াটি আসিয়া মাথা নোয়াইয়া বলিল—সেবা দিলাম ঠাকুরদা।

গলার আওয়াজ শুনিয়া ওস্তাদ্জি বলিলেন—কেরে, ভানু? তিন দিন যে বড় এলি না? কোথাও গিয়াছিলি ক'দিন? —

শহরে গিয়েছিনু দা'ঠাকুর।

ভানু দিনরাত অষ্টপ্রহর একরূপ প্রায় ওস্তাদ্জির বাড়ী তেই পড়িয়া থাকে। ওস্তাদ্জির ছিলিমে ছিলিমে তামাক চড়াইয়া দেয় আর বসিয়া বসিয়া গান শোনে।

ওস্তাদ্জিও ছেলেটিকে বড় ভাল বাসেন।

ভানু বলিয়া উঠিল—দা' ঠাকুর খবর আছে; সেই জন্যই আর বৃষ্টির পর ছুটে এলাম তোমার কাছে। বড় জমিদার বাড়ীতে আজ্কে ভারী মজ্লিস বসবে। তোমায় খবর দিতে আমায় বার বার করে বলে দিয়েছে। শিগ্গির ক'রে যেও কিন্তু। নৌকো নিয়ে আসি—কি বল?

—দাঁড়ানা রে; তোর সবটাতেই যে—দে ছুট্।

ওস্তাদ্জির এই রকম ডাক্ প্রায় প্রত্যহই আসে। না হইলে তাহার দিন চলাই হয়তো ভার হইয়া উঠিত। ওস্তাদ্জি ডাকিলেন—যমুনা!

যমুনা তখন এককোণে তুলসীমঞ্চে বাতি দিতেছিল। গলবস্ত্রে তুলসীমূলে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কি বাবা, ডাক্ছো?

—আজকেও মা আস্তে বোধ করি একটু রাত্তির হবে। ভাত চাপা দিয়ে রাখিস্। ভানু আমায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে তোর কাছে থাক্বে।

ভানু এরি মধ্যে গিয়া নৌকা লইয়া আসিয়াছে। ওস্তাদ্জি এক হাতে ও কাঁধে সেতার রাখিয়া আর এক হাতে অন্ধের যষ্টি ধরিয়া—চালক ভানু—গিয়া উঠিলেন সেই ছোট্ট ডিঙ্গিটার উপর।

বংশীলাল সেতার বাজাইতে ওস্তাদ। ভানু নৌকা চালাইতে ওস্তাদ। দুই ওস্তাদে পাল্লা দিতে দিতে চলিল বিজ্লী বিলের উপর দিয়া ঐ পাড়ের দিকে।

কথাটা বৃদ্ধের বুকে বড় নিদারুণ বরজিল।

জমিদার বাড়ী যাইবার কথা ছিল; যায় নাই। বাড়ুই-হাটার ভাদুড়ীদের বাড়ী হইতে ডাক আসিয়াছিল; ফিরা-ইয়া দিয়াছে। সাধের সেতার, তাকে পর্য্যন্ত আজ একবার সারাদিনের ভিতর আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লয় নাই। সেই যে শয্যা লইয়াছে বংশীলাল আর শয্যা ছাড়িয়া কিছুতেই উঠিতে চায় না।

কথাটা বৃদ্ধের সত্যিই নির্ঘাত লাগিয়াছে। মাথার কাছে বসিয়া যমুনা কত সাধ্য সাধনাই না করিতেছে, কিন্তু বৃদ্ধের সেই এক কথা——

না মা, এর উত্তর না পেলে আমি আজ কিছুতেই উঠ্‌ছি না। অন্ধ আমি কিছু চিরদিন ছিলাম না।

চোখ আমার এক কালে ছিল। সুন্দর জগৎ আমিও একবার চোখ মেলে দেখবার অবসর পেয়েছিলাম। বেঁচে থাক্‌বার সখ কার না হয়! কিন্তু আর নয়—নিজের ছেলে; তাকে যখন বিশ্বাস করতে পার্‌লেম না, তখন দুনিয়ায় আর কাকে বিশ্বাস করতে পারি? বল্‌ত'!

—দু'টো যা হোক পেটে কিছু দিয়ে তার পর সারা-বেলাটাত'পড়ে রয়েছে, যত খুশী বোলো। এখন একবার ওঠোত'—বলিয়া যমুনা বৃদ্ধকে উঠাইতে চেষ্টা করিল।

কিন্তু বংশী সে কথা কাণেও তুলিল না। বলিয়া যায়—

তুইত' সব জানিস, সব পাপ গিয়ে আমার ঘাড়ে বর্ত্তাবে। তোর মামা যখন কিছু টাকা আর তোকে দিয়ে আমার ঘাড়ে সমস্ত বিশ্বাসের বোঝা চাপিয়ে নেংটী পরে বেড়িয়ে গেল, তখন কি আমি জান্‌তুম যে বিশ্বাসের মর্য্যাদা আমি তার রাখ্‌তে পারবো না। যে ছেলে আমার কথা ছাড়া এক পা নড়তে চাইত না, তাকে কি না শেষে তোরি টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিলুম বিলেত থেকে বড় পাস হয়ে মানুষ হয়ে আস্‌তে; যার সঙ্গে দিনরাত খেলা করতিস্, ভাবকরতিস্—মনে করে দেখ্ দিকি সেই সব দিনের কথা। আর সেই ছেলে এখন বিলেত-ফিলেত না গিয়ে ধাপ্পাবাজি ক'রে আমার কাছ থেকে টাকা বার ক'রে নিয়ে কল্‌কাতায় গিয়ে বড়মানুষ সেজে বস্‌ল।' আবার কি না বলে পাঠয়—কালা মেয়ে বিয়ে করব না! উঃ কি নিদারুণ কথা বল্‌ত' মা! আমি যে তোরই টাকা দিয়ে তাকে বড় মানুষ সাজিয়ে দিলাম—সে কথাও কি তার একবার মনে পড়ল না?

যমুনা বলিয়া উঠিল—আঃ! তুমি চুপ কর না বাবা! কিছু খেয়ে নিয়ে না হয় যত ইচ্ছে বোলো।

কিন্তু বৃদ্ধ তবু উঠে না। আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া যায়।

যমুনা শেষে আর কোন মতেই না পারিয়া সেতারটি আনিয়া বৃদ্ধের বুকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলে—নাও বাজাওত', একটা গান গাইব!

এই যন্ত্রটির কাছে ওস্তাদ্‌জির সমস্ত যন্ত্র বিকল হইয়া যায়। অবশেষে না উঠিয়া পারে না।

বংশীলাল আঙুলে মেরজাই পরাইয়া তারে ঝঙ্কার দেয়। যমুনা গান ধরে—

ভুলি কেমনে আজো যে মনে
বেদনা মনে রহিল আঁকা—

* * *

আগে মন করলে চুরি
মর্ম্মে শেষে হান্‌লে ছুরি
এত শঠতা এত যে ব্যথা
তবু যেন তা মধুতে মাখা

অশ্রান্ত একটা ব্যথার ঝঙ্কার দিবানিশি আজকাল ঐ বাড়ীটার উপর লাগিয়াই আছে। সে সুখনীড় ভাঙ্গিয়া গেছে। আছে শুধু দুইটি প্রাণীর অন্তঃসলিলা রোদনের ধ্বনি।

যমুনা কালো। তাই তার বড় দোষ। নইলে কালো মেয়ের অমন কালো চোখ হাজারেও মেলে না। বাঁশীর মত নাক। ছিপ-ছাপ সুঠাম গড়ন। মেঘবরণ চুল। কিছুরই ত তার অভাব ছিল না, কিন্তু সব চেয়ে অভিশাপ—তার গায়ের বর্ণ কালো; খুবই কালো।

তা হউক কালো। ওস্তাদজির সেই বড় আপশোষ কালো বলিয়া কি সে মানুষ নয়?

মাতৃপিতৃহীনা এই মেয়েটিকে বংশীলাল তাহার সমস্ত অন্তর উজাড় করিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল।

সে আজ বড় বেশী দিনের কথা নয়। বংশীলালের কোন দূরাত্মীয় যমুনার মাতুল হাজার পাঁচেক টাকা আর এই মেয়েটিকে বংশীলালকেই উপযুক্ত নির্ভরশীল পাত্র মনে করিয়া তাহার উপর এই মেয়েটির ভালমন্দের সমস্ত ভার চাপাইয়া তিনি গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাহার পর হইতে বংশীলাল যমুনা ও তাহার একমাত্র পুত্র গোরাচাঁদ দুইজনকে এক সঙ্গে করিয়া মানুষ করিয়া তোলেন। তখন হইতেই বংশীলাল এইরূপ একটা গোপন আশা ও ভরসা পোষণ করিয়া চলে এবং সেই সর্ত্তেই পরে ছেলেকে স্বীকৃত করাইয়া মানুষ করিতে পাঠায়—সেই কোন দূর দেশে। কিন্তু ছেলে যখন নিতান্ত অমানুষের মতই তাহার সঙ্গে মিথ্যাচার করিতে

একটুমাত্র কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ বোধ করিল না; তখন বৃদ্ধের আপশোষ করা ছাড়া আর গতি ছিল কি ?

কিন্তু খালি আপশোষ করিলেও ত আর গতি মেলে না। তাই বংশীলাল আজকাল বড় একটা বাড়ীর বাহির হয় না। মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবে।

ভানু গান শুনিতে আসে, কিন্তু ওস্তাদজির কাছে আজকাল বড় একটা আমোল পায় না। তাই সে সময়টা ভানু আজকাল ওস্তাদজির ঘরের পিছনে বসিয়া বসিয়া মাছ ধরে। আজও সে চার পাঁচটি বাঁশের কঞ্চি তার সঙ্গে খানিকটা করিয়া রেলসুতা, আর তারি সঙ্গে একটা করিয়া বর্শি গাঁথিয়া মাছ ধরিতে বসিয়া গেছে। পায়ের কাছে একটা নারকেলের ভাঙ্গা খোলের ভিতর অল্প কিছু মাটি মাখানো কেঁচো আর একটা কচুর পাতার উপর কয়েকটা ট্যাংরা মাছ, তাহারই ধৈর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ পড়িয়া আছে। অধিকতর আগ্রহে ভানু তখনো নিপুণতা সহকারে টোপগুলির দিকে দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ করিয়া চাহিয়া আছে। হঠাৎ ওস্তাদজির ডাকে সাড়া পাইয়া ভানু সেগুলি গুটাইয়া একদিকে সরাইয়া রাখিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া বলিল—ডাকৃছেন দা'ঠাকুর ?

ওস্তাদজি বলিলেন—হাঁ বাবা পারবি একটা কাজ করতে ভারী উপকার হয়। আমাদের নিয়ে যেতে পারবি কলকাতা সহরে ? আমি যে অন্ধ বাবা! অপর কারো সঙ্গ ছাড়া আমি যাই কি করে! পারবি ? বলত' আজকেই বেরোই।

কল্‌কাতা সহর!

ভানুত শুনিয়াই আহ্লাদে আটখানা। যার এত নামডাক সেই কল্‌কাতা সহর—দেখা হয়ে যাবে। তাহার না বলিবারত' কিছুই নাই। এক কথাতেই ভানু রাজি হইয়া গেল।

তা হলে বাড়ী থেকে কাপড় জামা নিয়ে আসি, কি বল ?

অদূরে দাঁড়াইয়া যমুনা সব শুনিতেছিল। চুপ করিয়া থাকিতে আর সে পারিল না। চোখ তখন তাহার ভিজিয়া উঠিয়াছে।

বলিল—তোমার কি বাবা শেষে মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি ? নিজের চেহারা ত আর নিজে দেখতে পাও না, কিন্তু আমরা দেখতে পাই। কি ছিলে আর ভাবতে ভাবতে কি হয়ে গেলে বল দেখি! না কোথাও যেতে পারবে না। কলকাতায় যাওয়া টাওয়া হবে না।

বংশীলাল বলিল—কিন্তু মা একটা ব্যবস্থা ত করতে হবে। না হলে যে আর গাঁয়ে টেকা দায় হয়ে উঠবে!

যমুনার মুখ ফুটিল, বলিল—আমায় তাড়াতে যদি তোমার এতই সাধ জেগে থাকে, তা হলে স্পষ্ট করে বল না কেন ? তার তো উপায় ভগবান্ কম বাৎলে দেন নি। গায়ের রং কালো তা তুমি বেশ জানো—এ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে আমার জীবনটা আরো দুর্ব্বহ করে তুলে লাভ কি ? আর তোমারি বা সেই ভাবনা ভেবে ভেবে দেহ মাটি করে কি লাভ ? তার চেয়ে এইত, আমরা বেশ আছি—বাপ বেটিতে।

—কিন্তু মা তা যে হয় না সমাজে থাকলে—গাঁয়ে থাকলে দশজনের কথা শুন্‌তে হবে বৈ কি ?

যমুনাও উত্তর দিতে ছাড়িল না। বলিল—কিন্তু আমাদের দেশে এদৃষ্টান্তও ত বিরল নয়। বাঙ্গলার মেয়ের আজীবন কুমারী হয়ে থাকা সে অত্যাচারও আমাদের দেশে কম ঘটে নি। এখানেও না হয় সেই ব্যবস্থাই হবে।

বৃদ্ধ সজোরে মাথা ঝাঁকিয়া বলিলেন—না না সে হয় না, তোর জীবনটা আমি নষ্ট করে দিতে কোন মতেই পারি না। তুই কালো, কিন্তু আমি ত নিজে হাতে তোকে গড়ে তুলেছি; আমি জানি এই কালো মেয়েটার ভেতর যা আছে তা বহু বসরার গুলবাগেতেও মেলে না। আমি যাব। কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নে।

—তা হলে যাবেই, কিন্তু বাবা তুমি বুঝলে না যতখানি দুঃখ ছিল, ঐ ভাল ছিল এর পরে হয়তো জীবন আরো অবসন্ন হয়ে উঠবে। এখনো ভেবে দেখ—কালো মেয়ে—সেটা তুমি ভুলেই যাচ্ছ।

কিন্তু বৃদ্ধ সে সব কথা মানিতেই চায় না। তাহার বিশ্বাস হয়ত এত বড় একটা দুনিয়ায় অন্ততঃ একটা মানুষ খুঁজে বার করা যাবেই যাবে, সকলেই ত আর তার ছেলে নয়।

কিন্তু সরল বৃদ্ধের ভুল যে ঐখানেই।

কলিকাতা সহর ত আর এতটুকু নয় বামুন পাড়াও নয় এই বিশাল জনারণ্যের মধ্যে একটি অন্ধ সঙ্গে একটি যুবতী নারী আর তাদেরি কর্ণধার কি-না একটি অজ পাড়াগাঁয়ের বাগ্দীদের ছেলে, ভানু—

কি করিবে, কোথায় যাইবে, সব চেয়ে বেশী ভাবনা হইল যমুনার।

যমুনা বলিল—কিন্তু এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে; দেশ ত' ছেড়ে এলে!

বৃদ্ধ 'কিন্তু'কে বড় একটা গ্রাহ্যই না করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ভরচিত্তে বলিলেন—অত ভাবচিস কেন মা? যিনি আমাদের দেশ ছাড়িয়ে এখানে টেনে এনেছেন তিনিই যে উপায় বাৎলে দেবেন সে বিশ্বাসটুকু খুব জোর করে চেপে রাখবি। জীবনের একটা সহজ সরল সত্য পথ আবিষ্কার করে নিবি, আর সেটি কল্পনার গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ ক'রে ধরে না রেখে বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে চল্‌তে থাক্‌বি, কিন্তু সে পথটা সত্য হওয়া চাই, আর তার ভেতর আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠা থাকলে শত সহস্র আপদ্-বিপদ্‌কে তুচ্ছ ক'রে গিয়ে তোর সীমানায় পৌঁছুতে পারবিই পারবি—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস!

সে কথা তোমার মুখে বাড়ীতে হাজারবারেরও বেশী শুনেছি, কিন্তু সে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ত' আর রাস্তা-ঘাটে চল্‌তে পারে না। রাগ কোরো না বাবা—ও থেকে ত' আর কোন উপায় এখন বেরিয়ে আসচে না। আমার কিন্তু ভারী ভাবনা হচ্চে—

বৃদ্ধ তথাপি নিরস্ত হইলেন না। বলিলেন—অত দুর্ব্বলতা কেন মা? নিজের ভেতর যে ভগবান্ নিয়ত বাস করছেন তাঁকে অত অবিশ্বাস করিসনে। ঘা খেয়ে খেয়ে এই পঙ্গু জীবনটা অনেক কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে। ব্যর্থতায় গিয়ে পড়লেও, তখন মনে মনে এই কথাটাই ঠিক জেনে নিবি যে ঠিক পথে চলে আসতে পারিসনি। তখন নিজের ভুলের জন্য দুঃখ করতে পারিস, কিন্তু সেই ভগবানের গলা টিপে মারতে পারিস না। আর সে শক্তিই তোদের আছে কোথায়? এ খালি খালি গলা কাটিয়ে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার জিনিস নয় রে যমুনা; এ যা হৃদয় দিয়ে বোঝবার!.....

বৃদ্ধের যেন চোখ নাই; কিছু দেখিতে পায় না, মুখ দিয়া যা খুশী বলিয়া গেলেই হইল, কিন্তু যমুনার ত' চোখ আছে—এই আজব-সহরের গাড়ী চলা-চলি, লোক ঠেলা-ঠেলি, যৌবনের উপর কটাক্ষ কিছুই সে বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না। নিতান্ত নিরুপায়ের মতই বলিল—কিন্তু বাবা, কি হবে?

বৃদ্ধের অসীম ধৈর্য্য!—এ 'কিন্তু'র মীমাংসা মা হয়েই আছে। দাঁড়া না; তুই যমুনা ভারী ব্যস্ত হচ্ছিস। বলিয়া বৃদ্ধ একান্ত নির্ভয়ে ভানুর গতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

এ যেন ভগবানের বলিয়া দেওয়া কথা! নইলে সত্যি করিয়াই এমন অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিবে কিরূপে?

বংশীলাল হঠাৎ মাঝ রাস্তায় থামিয়া পড়িয়া অনুচ্চ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—গান্......

ঠায় দাঁড়াইয়া খানিকটা শুনিয়া ওস্তাদ্‌জি ভানুকে বলিলেন—চল এই বাড়ীতে, নয় দুটো মন্দ কথা ক'য়ে তাড়িয়ে দেবে; তা দিক্, চেষ্টা করতে দোষ কি?

ভানু বলিল—কিন্তু দা'ঠাকুর দরজায় যে সেপাই রয়েছে!

বংশীলাল কহিলেন—চল্ না, দেখেই আয় না! যমুনাও পিছনে পিছনে চলিল।

ভানু ভুল করে নাই। সেপাই তাহার গরম মেজাজে ফোঁস করিয়া উঠিল—এও, ঢোকো মৎ, ভাগো—

যাই বাবা রাগ করিস নে। চেষ্টা দেখছিলাম। ঘাটিতে গিয়ে পৌছান অত সহজ নয় রে বাবা; ভুল-চুক ত' হবেই! চল ভানু, লক্ষ্মী আবার চল্‌তে থাক···

বলিয়াই ওস্তাদ্‌জি যেমন পিছন ফিরিয়াছেন, উপরে যে ঘরে মজলিস চলিতেছিল সেই ঘর হইতে একটি বাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—মশাই ভেতরে আসুন!

সেপাই সসম্ভ্রমে রাস্তা ছাড়িয়া দিল।

বংশীলাল জোড়হস্ত কপালে ঠেকাইয়া সেতারটি জোরে বুকে চাপিয়া ধরিল।

যমুনা মনে মনে বলিল—ভাগ্যিস সেতারটি সঙ্গে ছিল! বৃদ্ধ হয়ত' ভাবিলেন—ওটি উপলক্ষ্য মাত্র!

বাবুটি আর কেহ নন্; বিজলি-বিলের ওপারের ছোট তরফের জমিদার নন্দকিশোর বাবু। বংশী ওস্তাদ্‌-জিকে তিনি বিশেষরূপেই চেনেন্। ঘরের ভিতর হইতে

তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁহাকে বেশ চিনিতে পারিয়াছিলেন।

ওস্তাদ্‌জির মুখে হঠাৎ তাহাদের সহরে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত শুনিয়া তিনি আশ্বাস দিলেন, সমস্ত ব্যাপারেই তিনি তাহার যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

যমুনা অন্দরমহলে স্থান পাইল। ওস্তাদ্‌জির ত' কথাই নাই; যতদিন খুশী তাহার ইচ্ছামত সেখানে থাকিয়া যাইতে পারিবেন।

ভানু দিন পাঁচ-সাত থাকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সহর দেখিয়া মহানন্দে দেশে ফিরিল।

এ দিকে দিনও যায়! কিন্তু ঠিক আর কিছুই হইয়া উঠে না। ওস্তাদ্‌জির চিন্তা বাড়ে বৈ কমে না।

তারপর প্রায় মাসখানেক ত' খুবই কাটিয়া যাইবার পর হঠাৎ একদিন নন্দকিশোরবাবু ওস্তাদ্‌জিকে ডাকিয়া বলিলেন—একটি ভাল পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে; আমি প্রায় সবই ঠিক করে ফেলেছি। ছেলেটি বড় কারবার করে। ঐ এক বাপের এক ছেলে। নগদ টাকাও না কি বেশ আছে। আমাদের দিক্‌ থেকেও কিছু দিতে-থুতে হবে, তা আমিই দেব ওস্তাদ্‌জি; আপনার ভাবতে হবে না……

ওস্তাদ্‌জি যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। বলিল—হুজুর এতখানি ত' আমি আশা করিনি, আমায় কিনে রাখলেন হুজুর। আমার যে আনন্দে বুক ফুলে উঠছে—কথা দিয়ে বোঝাতে পারছিনে ..

নন্দকিশোরবাবু মাঝখানে বৃদ্ধকে থামাইয়া বলিলেন আঃ! অত বিনয় প্রকাশ করছেন কেন! আপনারা গাঁয়ের লোক, তাতে আপনার মত লোকের যদি কিছু করতে পারি, সেত আমারি আনন্দের কথা……

বিবাহ হইয়া গেল।

কিন্তু বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই যমুনার যেন সব বদলাইয়া গেল। এত দুঃখের প্রাচুর্য্যের মধ্যেও তাহার মুখে হাসি ফুটিত, একটা আত্মতৃপ্তি সে অনুভব করিত। মধুর ভবিষ্যৎ সে যেন কোনমতেই রঙ্গিন করিয়া তাহার চোখের সম্মুখে উড়িতে পারিল না। ওস্তাদজিকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া তাহার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল, আর তার চেয়ে আর একটা নিষ্ঠুর শঙ্কা তাহার প্রাণে জাগিয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া তোলে, সেটি হইল তাহার বিধাতার দেওয়া—কালোরূপ!

যমুনা বংশীবাদের গলাটা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল—তোমার গলার কাঁটা আজ থেকে নেমে গেল বাবা, আর দুঃখ কোরো না।"

অভিমান করিস্‌ নে মা! আর এ বুড়োকে ক'দিনই বা মনে থাক্‌বে! সব ভুলে যাবি। নারী হয়ে জন্মেছিস এই মিলনই তার স্বার্থকতা।

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের গলা ভিজিয়া আসিল, দুই চক্ষু দিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সজোরে যমুনাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

বুকের ভিতর থাকিয়াই যমুনা বলিতে লাগিল—তুমি বুঝলে না, কি ভুল করলে! স্বাধীন জীবন ত' বেশ ছিল। তুমি সেতার বাজিয়ে বেশ উপার্জ্জন করতে পারতে, আর আমিও মেয়েদের গান শিখিয়ে দু'পয়সা বেশ আন্‌তে পারতাম—বাপ বেটিতে বেশ থাকৃতাম!

দুঃখ করিস নে মা! জীবনে যত বিপাকেই পড়িস না কেন, সত্য—এই মহাবাণী ভুলিসনে যেন। আমার এই শেষ কথাটি মনে রাখিস!

যমুনা চলিল বরের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ীতে। ভয়ে বরের দিকে সে এপর্য্যন্ত একবার ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখে নাই।

কিন্তু চাহিয়া যখন দেখিল, তখন সে এ কথা ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না, যে দুনিয়াটার সব আলো এক সঙ্গে দপ্‌ করিয়া নিবিয়া গেল কি করিয়া!

কল্পনাতেও যা সে ভাবিতে পারে নাই, তাই যে তাহার মত এই নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর অতি তুচ্ছ দুঃখময় জীবনটার উপর একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিবে, এ কথা যে সে একবার স্বপ্নেও ভাবে নাই।

ওস্তাদজির অভয়বাণী যমুনা কোন মতেই মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিল না।

ভাল করিয়া সে আর একবার সন্দেহ-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল—ভুলও সে করে নাই।—সেই ঘৃণাব্যঞ্জক মুখখানি তাহার দিকেও অমনি বিস্ময়ে তাকাইয়া আছে।

মুখখানি বড়ই চেনা অন্ততঃ এককালে খুবই ছিল।

এখনো না চেনার কোন মানে নাই। সেও কালো; সুন্দর কোন মতেই নয়! ঐ ওস্তাদজিরই ছেলে যমুনার টাকাতেই বড়লোক! গোরাচাঁদ!

তবু চেনে না। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তাহার ভিতর হয়ত বা কিছু আছে!

গোরাচাঁদ পরিষ্কার শুদ্ধ মাতৃভাষায় নিঃশঙ্কোচেই বলিল—তোমায় তখনি আমি চিনেছিলাম, চমকেও উঠেছিলাম, কিন্তু ঐ জায়গাটায় একটা হাঙ্গামো বাধানো নিরাপদ নয় বুঝে চুপ করে গেলাম। আর যা হবার হয়ে গেছে। ও নিয়ে আর ঘাঁটাঘাটি করে কোন লাভ নেই। তুমি ওস্তাদজিকে নিয়ে দেশে গিয়ে বাস করগে। বরং মাসে মাসে আমি তোমাদের কিছু কিছু করে পাঠাবো।

যমুনার মনে হইল এ বাড়ীতে সে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিবে না. কিন্তু হঠাৎ তাহার একটি কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় সে গোঁরাচাদের পায়ের কাছে বসিয়া বলিল—তোমার বাড়ীতে ত দাসী চাকরও থাকে, আমি না হয় সেই সামিল হয়েই থাকবো, কিন্তু বাবার সুমুখে যদি এই ভাবে ফিরে চলে যাই তা হলে এ ব্যথা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। এইটুকু দয়া তোমায় করতেই হবে, তিনি যে তোমারও বাপ।

কিন্তু দয়ারও একটা সীমা আছে। তাই গোঁরাচাঁদ বলিল—ও সব জবরদস্তির কথা চলতে পারে না, আর ওরকম কোন ব্যবস্থা এখানে কোন মতেই হতে পারে না। তুমি এখানে থাকলে আমার অনেক কিছু বাধা আছে, সে সব তুমি বুঝবে না। আর তোমাকে আমি ইচ্ছে করে নি। বড়লোকের বাড়ীতে কিছু পাব খোব সেই আশাতেই সেখানে বিয়ে করেছিলাম—তা যে সেখানে গিয়েও তোমরা কণ্টক হয়ে জুড়ে আসবে এ আমি কি করে জানবো! দেশে গিয়েই থাকগে। তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না আমি টাকা পাঠাবো।

এহেন উক্তির পর যমুনার কিছু বলা চলিলেও তাহার বলিবার শক্তি রহিল না। কেবল তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—উঃ! মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়!

কিন্তু সে কথাই বা কে শোনে!

যমুনা আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া ঠিক যেমন ভাবে আসিয়াছিল ঐ ভাবেই বাড়ীর একটি ঝিকে সঙ্গে লইয়া গোরাচাঁদের বাড়ী হইতে নামিয়া গেল।

* * *

নীচের খালি ঘরটাতে পরম নিশ্চিন্তে বসিয়া ওস্তাদজি তখন সবে মাত্র শুধু গলায় একটা গান ধরিয়াছেন—

সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে
আমি করি দুঃখের বড়াই
আমি কি দুঃখেরে ডরাই

গাড়ী হইতে নামিতেই যমুনা শুনিতে পাইল ওস্তাদজি রামপ্রসাদী ধরিয়াছেন।

তাহার পা আর সরে না। বৃদ্ধের এ সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিতে তাহার মন যেন কিছুতেই অগ্রসর হইতে চায় না। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া অত ভাবিবার সময়ও নাই। একবার ভাবিল ফিরি। আবার কি ভাবিয়া সে ঘরের দিকে আগাইয়া চলিল। অতি ধীর পাদক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়া যমুনা ওস্তাদজির পায়ের কাছে যাইয়া বসিল দুই ফোটা চোখের জল, একটি ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ বৃদ্ধ যেন তাহার পায়ের উপর বেশ অনুভব করিল। গান বন্ধ করিয়া বলিলেন—কে?

বাবা চল দেশে ফিরে যাই!

যমুনার গলা শুনিয়া বৃদ্ধ নূতন এক বিপদের সম্ভাবনায় শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—তুই চলে এলি যে?

যমুনা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। কোন মতেই কিছু বলিতে পারে না। কেবল ঐ দুটি কথা—চল দেশে!

কিন্তু বৃদ্ধ না শুনিয়া ছাড়িল না।

উঃ!—সঙ্গে সঙ্গে একটা অতি বড় দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বৃদ্ধ যমুনার কোলে এলাইয়া পড়িল

আধ ঘণ্টা ঠিক এই একই অবস্থায় কাটিয়া গেছে! হঠাৎ বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল—তাই চল মা, দেশেই চল; কিন্তু আমার বড়ই বিশ্বাস ছিল।

নীল আকাশের গায়ে মাঝে মাঝে লম্বমান সুপারি গাছ আর ভাসমান বিলের উপর ঘন আমজাম বৃহদাকার গাছ গুলির ফাঁক দিয়া যে দুই একটি টীনের চাল আবছায়ার

মত দেখা যাইতেছে—ঐ বামুন পাড়া ; এখনও বহুদূর !

সুপ্তগঙ্গা নদীটি এখন আর সুপ্তা নয়, তাহার উপর দিয়া জোর স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। ধারে কাছে আর মাটী দেখা যায় না। কেবল জল, আর জল। একদিকের সীমারেখা যাইয়া মিশিয়াছে ঐ অস্পষ্ট গ্রামের কোল ঘেঁষিয়া, আর অন্য দিক্‌গুলি দূর চক্রবালের শেষ সীমায় কোথায় গিয়া মিশিয়াছে কিছু ঠাহর করিবার যো নাই। উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ। মেঘের আড়ম্বর মাত্র নাই। রাত্রি প্রহর খানেক। জ্যোৎস্নাস্নাত পৃথিবী যেন কার স্পর্শে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

ষ্টেশন হইতে দূরাগত দুই একটি যাত্রীর নৌকা চলিয়াছে যার যার ঘরের দিকে।

একটি ছোট এক মাল্লা ডিঙ্গির উপর বংশীলাল ওস্তাদ আর যমুনা গৃহে ফিরিতেছিল।

ওস্তাদজির অদ্ভুত মনের বল। পুরানো কথা বড় একটা বলে না। কেবল দু'একটা কথা মাঝে মাঝে ভুলের সঙ্গে বলিয়া ফেলে—যমুনা আমি কেবল ভাবি তোর কালো রূপটাই সকলের সুমুখে বড় হয়ে ধরা পড়ল। কিন্তু এই কালোর ভেতরেও যে কি আলো ছিল তা যে কোন দরদীর চোখেও ধরা পড়ল না ; আমি সব চেয়ে বিস্মিত হচ্ছি এই ভেবে। আর কেবল ভাবি জগৎটা এত ঘোরালো কেন ?

যমুনা সে কথা চাপা দিয়া আবার বলে—হ্যাঁ, সেই গানটা ধরো !

ওস্তাদজি আবার তারে ঝঙ্কার দেয়,—সঙ্গে সঙ্গে নিজেই গান ধরে—

নমোনমঃ নমো যন্ত্রপতি নমো নমো অশান্ত !
তন্ত্রে তব ত্রস্ত ধরা, সৃষ্টি পথভ্রান্ত"

*　　　*　　　*

ওস্তাদজি গান থামাইয়া বলে—আমি বাজাই, তুই একটা ধর—সেই, সেই গানটা।

যমুনা গান ধরে—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
তোমার মাঝে আমার প্রকাশ
তাই এত মধুর"

যমুনার সুললিত নারীকণ্ঠ উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর স্বচ্ছন্দগতিতে নৃত্য করিয়া তালে তালে বেড়ায়।

অকস্মাৎ স্তব্ধ ধরণীর একান্ত সঙ্গোপনে সাধনার ব্যাঘাত ঘটাইয়া সমুদ্রগর্জ্জনের মত একটি আলোড়িত ভীষণ শব্দ ঐ দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল।

আশ পাশের নৌকার আরোহীরা একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—বান আসছে, বান আসছে। সঙ্গে সঙ্গে যার যার নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সাঁতরাইয়া পার ধরিতে চেষ্টা করিল।

এই ছোট্ট ডিঙ্গিটার মাঝি, তারো প্রাণের মায়া আছে, সেও পালাইল যদি বা প্রাণে বাঁচিতে পারে।

এই আসন্ন বিপদ্‌কে নিতান্ত তুচ্ছ করিয়া পড়িয়া রহিল দুইটি প্রাণী যাদের এ হেন বিপদ্‌কে বন্ধু ছাড়া ভাবিবার আর কিছুই নাই।

ওস্তাদজি একান্ত নির্ভয়ে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—যমুনা! আমাদের ভয়ও নেই ভাবনাও নেই, ভয় করিসনে! আজকের সৃষ্টির এই আস্ফালন শুধু আমাদের জন্যই। সবকে বাদ দিয়ে, কেবল আমাদের আদর করে তুলে নিয়ে যাবে। এই বন্ধুর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে নেই। এও আনন্দ, আমাদের জীবন প্রলয়ের ভেতর আনন্দ কুড়িয়ে নেবার জন্যে! আমার প্রাণে বড়ই উল্লাস জেগে গেছে, হ্যাঁ মা ঐ গানটা—

যমুনার আর্ত্ত কণ্ঠে আবার ধ্বনিয়া উঠিল—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
তোমার মা···আ···আ···

একটি প্রবল ঘূর্ণীপাকে ডিঙ্গি কাৎ করিয়া ফেলিল! সেই বন্যাস্রোতে বিক্ষিপ্ত হইয়া ঘূর্ণীপাকে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় ভাসিয়া চলিল সে বৃদ্ধ, কোথায় গেল সে যমুনা, আর কোথায় গেল তাহাদের সে সাধের সেতার!

কোথায় গিয়া তাহারা ঠেকিল, নিষ্ঠুর নিয়তির নির্ম্মম হস্তে যে কর্ম্মকোলাহলময় সংসারের ঘূর্ণীচক্র হইতে তাহদের টানিয়া লইয়া গিয়া কোথায় যেন কোন আবর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দিল—তাহারা মরিল কি বাঁচিল—কে বলিবে!

পৃথিবীর ধর্ম্মান্দোলনের প্রগতি

[অধ্যাপক শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী পি-এচ-বি, পুরাণরত্ন]

"আলো প্রাচ্য হইতে আসে" (ex orientelux)—পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ধর্ম্ম ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা এ-উক্তিটির যাথার্থ্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্ম মতগুলির প্রত্যেকটি প্রাচ্যদেশে উদ্ভূত হইয়াছে। চৈনিক, আর্য্য ও সিমাইট্ (semites)-মনুষ্য জাতির এই তিনটি প্রধান শাখা কর্ত্তৃক সুদূর অতীতে যে দশটি ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, তাহাই শত শত শতাব্দী যাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে, আজিও তাহাদেরই অনুবর্ত্তন চলিতেছে। সেমিটিক জাতি মিশরীয়, আসীরীয়, য়ীহুদী, খৃষ্টীয় ও ইস্‌লাম—এই ৫টি ধর্ম্মের জন্মদাতা। আর্য্যজাতি হইতে হিন্দু, জরথুস্ত্রীয়, জৈন ও বৌদ্ধ—এই চারিটি ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। আর চৈনিক জাতি কনফুচীয় ধর্ম্মের জন্মদাতা। মিশরীয় ও আসীরীয় ধর্ম্ম বহু পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অপর ৮টি ধর্ম্ম জাতীয় বা সার্ব্বভৌম ধর্ম্মরূপে (national or world religions) অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। প্রায় ৬৬০ খৃঃ পূঃ পারস্যের প্রাচীন অধিবাসী ইরাণীয় দিগের মধ্যে জরথুস্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। প্রায় সমসময়ে চীনদেশে কংফুৎস ও লাওৎসের আবির্ভাব হয়। কংফুৎস উচ্চনীতিমূলক ধর্ম্ম ও লাওৎসে সত্যিকার আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ প্রচার করেন। প্রায় সমসময়ে ভারতবর্ষে আর একটি বিরাট্ আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উত্থিত হয়, যাহার শিখর-দেশে আমরা দেখিতে পাই ভগবান্ বুদ্ধদেবকে। তিনি "চতুরার্য্যসত্য" আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রচার দ্বারা মানবজাতিকে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি রূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার প্রায় ৬০০ বৎসর পরে প্যালেষ্টাইনে প্রভু ঈশব আবির্ভূত হইয়া ঈশ্বরপ্রেম ও মানবভ্রাতৃত্বের উচ্চ আদর্শ প্রচার করেন। কিন্তু প্যালেষ্টাইনে যে আলো জ্বলিল, তাহাদ্বারা গভীর তমসাচ্ছন্ন আরবের ঘনান্ধকার নিরাকৃত হইল না। তাই প্রভু ঈশার আবির্ভাবের ৬০০ বৎসর পরে আরববাসীদের মধ্যে হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইল। তিনি এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রচার দ্বারা তাহাদিগকে সত্য ধার্ম্মিকতার পথ প্রদর্শন করিলেন।

সেমিটিক ধর্ম্ম

সেমিটিক্ জাতি হইতে উৎপন্ন ৫টি ধর্ম্মের মধ্যে প্রথম দুইটি অর্থাৎ মিশরীয় ও আসীরীয় ধর্ম্ম বহুকাল পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়া গেলেও আজিও এই ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে জানিতে হইলে উপকরণের অসম্ভাব হয় না।

যে সকল প্রাচীন ধর্ম্মমত বিশেষ পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, য়ীহুদী ধর্ম্ম (Judaism) তাহাদের অন্যতম। Old Testament ইহাদের শাস্ত্রগ্রন্থ; হিব্রু ভাষায় লিখিত। ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমক সম্রাট্ টিটাস্ (Titus) জেরুজালেম্ অবরোধ করেন। য়ীহুদীদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্যালেষ্টাইন্ হইতে য়ীহুদী ধর্ম্ম বিতাড়িত হয়। সে সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহারা পৃথিবীর নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থান করিয়া নিজেদের ধর্ম্ম মত অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে য়ীহুদী ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা ৪০ লক্ষ। গৃহহারা য়ীহুদীদের আবার স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিরুদ্বেগে স্বকীয় ধর্ম্মমত অনুসরণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

য়ীহুদী ধর্ম্ম জাতীয় ধর্ম্মরূপে (National Religion) গণ্ডীবদ্ধ হইয়া থাকিলেও; তাহারই দুইটি শাখা খৃষ্টধর্ম্ম ও ইস্‌লাম্ সার্ব্বভৌম ধর্ম্মরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, আর ইস্‌লাম্ পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ স্থানে এবং মরক্কো পর্য্যন্ত উত্তর আফ্রিকাতে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

খৃষ্টীয় ১ম শতকে যীশুখ্রীষ্ট কর্ত্তৃক প্যালেষ্টাইনে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হয়। খৃষ্টানদের ধর্ম্মপুস্তক New Testament

গ্রীক্‌ভাষায় লিখিত। বর্ত্তমানে খৃষ্টানদের সংখ্যা প্রায় ৫৩ কোটি ৫০ লক্ষ।

ইস্‌লাম পৃথিবীর সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। ৬২২ খৃষ্টাব্দে আরব দেশে মহম্মদ কর্ত্তৃক এই ধর্ম্মমত প্রচারিত হয়। ইহার পবিত্র গ্রন্থ "কোরাণ" আরবী ভাষায় লিখিত। ইহার অনুবর্ত্তীদের সংখ্যা বর্ত্তমানে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ।

আর্য্য-ধর্ম্ম

আর্য্যজাতি চারিটি ধর্ম্মের জন্মদাতা :——জরথুস্ত্রীয়, হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম। জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্ম পারস্যে এবং অপর তিনটি ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইয়াছিল।

জরথুস্ত্র-কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত বৈদিক আর্য্যধর্ম্মের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। "আবেস্তা" পারসিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ; জেন্দ্‌ ভাষায় লিখিত। প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিজেতা মুসলমান কর্ত্তৃক এই ধর্ম্ম পারস্য হইতে নিরাকৃত হয়। পারসিকদিগের মধ্যে অনেকেই ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, মুষ্টিমেয় বিশ্বাসী পারসিক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হয়। বর্ত্তমানে পারস্যে প্রায় ১০,০০০ হাজার জরথুস্ত্রীয় মতাবলম্বী পারসিক আছে। আর ভারতবর্ষে উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ। ইহারা ভারতবর্ষের একটি উন্নতিশীল সম্প্রদায় এবং পার্শীনামে খ্যাত। এই জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্মমত এক কালে বিশাল পারসিক সাম্রাজ্যের একমাত্র ধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্ম হইতেই মিথ্রীয় * (Mithraism) ধর্ম্মের উদ্ভব হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে রোম নগরে মিথ্রীয় ধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হয়, খৃষ্টীয় প্রথম শতক সমাপ্ত হইতে না হইতে, ইহা সৈন্যদল, ক্রীতদাস ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে। তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে এই ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মরূপে পরিণত হইবার সম্ভাবনা হয়। চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভেও কয়েক জন রোমক সম্রাট্‌ মিথ্রোপাসক ছিলেন; কন্‌ষ্টেণ্টাইন্‌ (Constantine) কর্ত্তৃক খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ এবং উক্ত ধর্ম্মকে রাজকীয় ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিবার পর হইতে (৩২৬) মিথ্রীয় ধর্ম্মের অবনতি হইতে আরম্ভ হয় এবং চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে রোম হইতে এই ধর্ম্ম একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়।

অপর তিনটি আর্য্য ধর্ম্ম ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। প্রায় ৩ হাজার বৎসর যাবৎ এই ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় ২৪ কোটি।

জৈন-ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা-বিশেষ। ইহাও প্রায় আড়াই হাজার বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। এই সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তীদের সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ১৫ লক্ষ।

বৌদ্ধধর্ম্মও বিরাট্‌ হিন্দু ধর্ম্মেরই শাখান্তর। বহু শতাব্দী হইল, ইহা ভারতবর্ষ হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ধর্ম্ম ভারতের উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে বিস্তার লাভ করিয়া তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান, ব্রহ্ম-দেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন এবং সিংহলে স্বীয় আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মকে পূর্ব্ব-এশিয়ার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় ১২ কোটী। *

প্রাচীন কালে আর্য্য-ধর্ম্মের আরও কয়েকটি শাখা বিদ্যমান ছিল, যেমন গ্রীক্‌, রোমক, কেল্‌টিক্‌, টিউটানিক, স্লাভনিক; কিন্তু এ গুলি খৃষ্টীয় অব্দের প্রারম্ভে খৃষ্টধর্ম্ম দ্বারা পর্য্যুদস্ত হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কেবল গ্রীক্‌ ও রোমক ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের নিজস্ব সাহিত্য হইতে বিবরণ পাওয়া যায়; অপর তিনটী ধর্ম্ম সম্বন্ধে জানিতে গেলে রোমক বা খৃষ্টীয় সাহিত্যের আশ্রয়-গ্রহণ ব্যতিরেকে গত্যন্তর নাই। কিন্তু ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের দ্বারা লিখিত বিবরণ নিরপেক্ষ ও সম্পূর্ণ সত্য হওয়া সম্ভব নহে। গ্রীক্‌ ধর্ম্ম পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

চৈনিক ধর্ম্ম

চৈনিকজাতি কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত কন্‌ফুচীয় ধর্ম্ম ২৫০০

* বৈদিক "মিত্র"—সূর্য্যদেবতার উপাসনার অনুকরণে এইধর্ম্মমত প্রচারিত হয়।

* কনফুচীয় ও তাও মতাবলম্বীদের বাদ দিয়া খাঁটি বৌদ্ধ সংখ্যা।

বৎসর যাবৎ চীনদেশের প্রধান ধর্ম্মরূপে প্রচলিত হইয়া আছে। উহার অনুবর্ত্তীর সংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি।

কংফুৎস (Confucius ৫৫১—৪৭৯ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ) চীনের "লু"-প্রদেশে এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু তিনি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন ও পরিশেষে শিক্ষাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি রাজকার্য্যেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রক্ষেত্রে নানাবিধ সংস্কার আনয়ন করিয়া বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তাঁহার ধর্ম্মনীতিও সদাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত; তিনি আমাদের দেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্রকার অর্থাৎ সামাজিক ব্যবস্থা-প্রণেতাদের সহিত তুলনীয়। তাঁহার শিক্ষা চীনদেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। দেশীয় কোন শাসনকর্ত্তা তাঁহার মতবাদ-প্রচারে পৃষ্ঠপোষকতা না করায় তিনি অত্যন্ত ভগ্নহৃদয়ে দেহত্যাগ করেন।

কংফুৎস ছিলেন বিশেষভাবে উত্তর চীনের ধর্ম্মগুরু। আর লাওৎস (Lao Tse) ছিলেন বিশেষভাবে দক্ষিণ চীনের ধর্ম্মগুরু। লাওৎস চো বংশীয় (Chow dynasty) নৃপতিদের রাজকীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহার ধর্ম্ম, ইঁহার সিদ্ধান্ত ও সাধনায় ভারতীয় ঋষিদের বেদান্ত-বাদ, প্রধানতঃ উপনিষদের আনন্দ-ব্রহ্ম-বাদের ছায়া অনেক খানি পাওয়া যায়। লাওৎসের মতবাদ পরবর্ত্তী কালে আধুনিক তাও ধর্ম্মের (Taoism) প্রবর্ত্তক Cheu Tuan কর্ত্তৃক প্রাচীন তাও মতবাদের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হয়।

অদ্যাপি প্রচলিত পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি লক্ষ্য করিবার বিষয় রহিয়াছে;—

(১) এশিয়া খৃষ্টধর্ম্মের জন্মস্থান হইলেও, ইহা এ মহাদেশ হইতে লুপ্ত হইয়া অপর তিন মহাদেশে যাইয়া আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। একটি সেমিটিক ধর্ম্ম পশ্চিমদেশীয় আর্য্যজাতির ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(২) পক্ষান্তরে আবার এইটিও লক্ষ্য করিবার বিষয় আর্য্য বৌদ্ধধর্ম্ম স্বীয় জন্মভূমিতে প্রায়ঃ সহস্র বৎসর মাত্র স্থায়ী হইয়া তৎপর লোপ প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ব্বদিকে প্রচারিত হইয়া ক্রমে ক্রমে তত্তৎ দেশের প্রাচীন ধর্ম্মমতকেও উচ্ছেদ্ করিয়া স্বকীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। এরূপে একটি আর্য্যধর্ম্ম প্রধানতঃ লোহিত অনার্য্য জাতির ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়।

(৩) আরবদেশের সেমিটিক্ ধর্ম্ম স্বীয় জন্মভূমিতে আপন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ইহা মনুষ্য-জাতির অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শাখা তুরাণীয় জাতির (Turanians) প্রাচীন সামান্ ধর্ম্মের (Shamanism) উচ্ছেদ সাধন করিয়া তাহাদের মধ্যে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই তুরাণীয় জাতির আদিম বাসস্থান ছিল মধ্য-এশিয়ার আল্তাই পার্ব্বত্য প্রদেশ। ইহারা ক্রমে ক্রমে চীন সীমান্ত হইতে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত এবং এশিয়া ও ইয়ুরোপের উত্তর অংশে ছড়াইয়া পড়ে। তুরাণী জাতির পাঁচ শাখার মধ্যে মোগল (Mongoles) ও তুর্কীরা (Turks) প্রধান। এই তুর্কীরাই ছিল ইস্লামের উৎসাহশীল গোঁড়া ভক্ত ও সর্ব্বপ্রধান প্রচারক। তাহা-দিগকে যথার্থই 'ইস্লামের তরবারি' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকারে ইস্লাম্ প্রধানতঃ তুর্কী জাতির ও তুর্কী-সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দু ও কংফুৎসীয় ধর্ম্ম প্রধানতঃ জাতীয় ধর্ম্মরূপে রহিয়া গিয়াছে। ইহারা কদাচিৎ জন্মভূমির সীমারেখা অতিক্রম করিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কনফুচীয় ধর্ম্মে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম নানাবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

কেন যে এই দুইটি ধর্ম্ম জন্মভূমির চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে নাই, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা খুব কঠিন নহে। হিন্দু ও চৈনিক—ইহারা উভয়েই বহির্জগতের প্রভাব ও আক্রমণ হইতে নিজেদের দেশ ও সভ্যতাকে মুক্ত রাখিতে সচেষ্ট ছিল। চীনের প্রসিদ্ধ দেয়াল এই উদ্দেশ্যেই নির্ম্মিত হয়। কনফুৎসের মৃত্যুর প্রায় হাজার বৎসর পরেও হিউএন্-ৎসাংকে অশেষ লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়া ভারতে আসিতে হইয়াছিল। কতবার যে তাঁহার প্রহরীর হস্তে নিপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং কি রকম কৌশল করিয়া যে তাঁহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল, তাহা তদীয় আত্মজীবনীতে সবিস্তার বর্ণিত আছে।

ইহা পৃথিবীর ইতিহাসের একটা বিস্ময়কর ঘটনা-সমাবেশ যে, পৃথিবীর ৪জন প্রধান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক প্রায় একই

সময়ে আবিভূ´ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ত্রনই স্বাধীনভাবে একে অপরের অজ্ঞাতসারে প্রায় একই তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীন দেশে কংফুৎস ও লাওৎস, ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধ ও পারস্যে জরথুস্ত্র আবিভূ´ত হন। গৌতমবুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম্মমতের সহিত কংফুৎস ও লাওৎসের ধর্ম্মমতের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। চীনদেশে একটি কিংবদন্তী আছে যে, একই ভাণ্ডের মদ্য আস্বাদন করিয়া তিন জনে তিন মত দিয়াছিলেন। জরথুস্ত্রীর ধর্ম্মমত য়ীহুদী ধর্ম্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং য়ীহুদী ধর্ম্ম দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে—এ কথা পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়া থাকেন। জরথুস্ত্রীর মতের উপর বৌদ্ধ প্রভাব কতটুকু, তাহা এখনও সঠিকরূপে নিরূপিত হয় নাই। Prof. Darmester বলেন, জরথুস্ত্রীয় মতের উপর য়ীহুদী ও বৌদ্ধ এই উভয় ধর্ম্মমতের প্রভাব বিদ্যমান। য়ীহুদী ধর্ম্মমতের উপর যে বৌদ্ধ প্রভাব রহিয়াছে. এ বিষয়ে প্রমাণের অসদ্ভাব নাই।

বৈশাখ

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

সকলেই বলে বেশ হোলো
প্রাচীনের আয়ু শেষ হোলো
বিষাদের আজি লেশ ভোলো
হৃদয়ের নব দেশ খোলো
    নূতনেরে 'স্বাগত' বলিয়া
        উচ্ছ্বসিয়া উচ্ছলিয়া
আশাভরা বুকে
বিরাজো ভূলোকে।

*

বর্ত্তমান যদি কোনোদিন
অতীতের চেয়ে দয়াহীন
আরো তীব্র আরো সুকঠিন
তিক্ততর'-বেদনা-বিলীন
    অদৃষ্টের পরিহাসে হয়
    দিকে দিকে ধরাময়
জাগিবে ক্রন্দন,
কোথা পুরাতন ?

*

পুরাতনে বোলোনা ভুলিতে
সোহাগের রঙিন্ তুলীতে
দুঃখ সুখ দুই থেকে থেকে
    সে যে গেছে এঁকে
শোক তার লভুক্ বিস্মৃতি,
তার স্নেহ তার মধু-প্রীতি
অন্তরের অমৃত আধারে
    রবে নির্ব্বিচারে।

*

ব্যথা যার হোলো চিরসাথী
যাতনার পোহালো না রাতি
পুরাতনে নূতনে তাহার
    ভেদ কোথা আর ?
বহু ঝঞ্ঝা ধরেছে যে মাথে
বঞ্চনার আঘাতে আঘাতে
ভালবাসা-হারা হিয়া যার
    সে যে নির্ব্বিকার।

*

তবু লহ আগমনী মোর
মরমের প্রেম-পুষ্প-ডোর ;
পিপাসিত পরাণ-চকোর
নবীনের সুধা পানে ভোর
দেখি যদি হোলো কোনো ক্ষণে,
বুঝিব যে এ জীবনে
তবু এক পল
হইল সফল।

পুষ্পের বর্ণ-সমস্যা

[শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু বি-এ]

কুসুমের মধ্যে যে বর্ণবৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় ইহার তাৎপর্য্য কি ? আমাদের নয়নরঞ্জন ও মনোবিনোদনের নিমিত্তই কি পুষ্পের এত শোভা সম্ভার ও বিচিত্র বর্ণ-সম্পদের সৃষ্টি হইয়াছে ? কবি যাহাই বলুন উদ্ভিদ্-তত্ত্বজ্ঞের মতে ইহার কারণ ভিন্ন। পরাগ সম্মিলনের সহায়ক কীট পতঙ্গকে প্রলুব্ধ করিয়া আমন্ত্রিত করিবার ব্যপদেশেই প্রেম-পরাগদীপ্ত কিশোরীদের মত প্রসূনের এই বর্ণচ্ছটা ও বিচিত্র বর্ণসমাবেশ।

কীট-পতঙ্গেরা শুধু যে বর্ণে আকৃষ্ট হয় এমন নহে ; গন্ধ ও মধু উহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে। তবে দূর হইতে আকৃষ্ট করিতে বর্ণ ও গন্ধই প্রধান। অবশ্য বর্ণ ও গন্ধের মধ্যে কোন্‌টীর আকর্ষণ অধিক তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। এ বিষয় প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে পুষ্পের বর্ণ-প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

পুষ্পের এই বর্ণ কোথা হইতে আইসে। ভূমির অভ্যন্তর-ভাগ হইতে গাছেরা মৃত্তিকা-রসের সহিত যে সব ধাতব পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে তাহার মধ্যেই রঞ্জন পদার্থের কণিকা সকল বিদ্যমান থাকে। এ সকল কণিকা সূর্য্যালোক-সম্পর্কে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মনোমদ বর্ণে মুকুল, পুষ্প প্রভৃতিতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। পুষ্পের মধ্যে এই সকল উজ্জ্বল বর্ণের বিকাশ যে কি উপায়ে ঘটিয়া থাকে তাহা এখনও সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যায় নাই।

সকল বর্ণের মধ্যে শ্বেত বর্ণের পুষ্পই সচরাচর অধিক লক্ষিত হইয়া থাকে। শ্বেতের পর পীত, তৎপর রক্ত, নীল, বেগুণী, হরিৎ, কমলা, পিঙ্গল ও কৃষ্ণ। কৃষ্ণবর্ণের কুসুম একরূপ বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গড়ে সহস্র বৃক্ষের মধ্যে প্রায় ২৮৪টীর কুসুম শ্বেত, ২২৬টীর হরিদ্রা, ২২০টীর লোহিত, ১৪১টীর নীল, ৭০টীর বেগুণী, ৩৬টীর হরিৎ, ১২টীর কমলা, ৪টীর পিঙ্গল এবং মাত্র ২টীর কুসুম কৃষ্ণ হইতে দেখা যায়।

এই সকল কুসুমের মধ্যে শ্বেতেরই সৌরভ অধিক। শ্বেত কুসুমগুলির অধিকাংশই রজনীতে বিকসিত হইয়া থাকে। অধিক মনোজ্ঞ ও রঙ্গিণ পুষ্প সকল প্রায়ই গন্ধ-হীন হয়। শ্বেত কুসুমের মধ্যে যে গুলি নিশায় প্রস্ফুটিত হয় সেগুলি প্রভাতালোকের সংস্পর্শে সৌরভহীন হইয়া পড়ে এবং সূর্য্যালোকের স্পর্শেই পরিমল-ভাণ্ডার বন্ধ করিয়া মুদিত হইয়া পড়ে। প্রভাতে ঐ সকল কুসুমকে দেখিলে মলিন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু রজনীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই উহারা পুনরায় বিকসিত হইয়া সৌরভ দ্বারা ষট্‌পদকে আমন্ত্রণ করিয়া থাকে।

কুসুমের পরাগবাহী ও যৌন-মিলনের সহায়ক

পতঙ্গাদির মধ্যেও বর্ণ বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। মধুমক্ষিকা, প্রজাপতি, অন্যান্য মক্ষিকা ও মথ্ প্রভৃতি পতঙ্গাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ পছন্দ করে। গাঢ় নীল ও নীলাভ বেগুণী বর্ণই মৌমাছি ও ভ্রমরের মনোমদ। নীলাভ হইতে গাঢ় বেগুণীর মধ্যে সকল বর্ণের পুষ্পই ইহারা পছন্দ করে। রক্ত কুসুমের উপর অলিকে কদাচ উপবেশন করিতে দেখা যায়। একই উদ্যানে রক্ত ও নীল কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত হইলে অলিকে রক্তকুসুম পরিহার করিয়া নীল ও বেগুণী বর্ণের পুষ্পেই বিহার করিতে দেখা যায়। ইহারা কেন যে রক্তফুল পরিত্যাগ করে তাহা ঠিক বলা যায় না। অনেক অনুমান করেন যে রক্তবর্ণে মধুমক্ষিকার বর্ণান্ধতা প্রযুক্ত ইহারা লোহিত বর্ণের কুসুম দেখিতে পায় না। মৌমাছির চক্ষে রক্তবর্ণের অনুভূতিগ্রাহী স্নায়ুর অভাব প্রযুক্ত এইরূপ ঘটিয়া থাকে কি না তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

বেগুণী ও নীলের পরেই মধুমক্ষিকারা হরিদ্রাবর্ণের ফুল পছন্দ করে। সবুজ ফুলে ইহাদের একরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ পায়।

প্রজাপতিরা রক্তবর্ণের পুষ্পই পছন্দ করে। কোনও পুষ্পোদ্যানে ক্ষণকাল লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ভ্রমর প্রজাপতি ও মৌমাছিদের মধ্যে—প্রজাপতিরা কেবল রক্তবর্ণের পুষ্পে এবং ভ্রমর ও মৌমাছিরা প্রগাঢ় অধ্যবসায় সহকারে নীল ও বেগুণী পুষ্প সকলের পরিমল সংগ্রহ করিতেছে। প্রজাপতিরা—প্রায়ই বেগুণী ফুল স্পর্শ করে না। এই রক্তবর্ণের পক্ষপাতিত্ব প্রজাপতি ব্যতীত আমেরিকার ক্ষুদ্র হামিংবার্ডদিগের মধ্যেও দেখা যায়। এই জন্যই বোধ হয় হামিংবার্ডদিগের বাসভূমিতে অর্থাৎ ক্যারোলিনা, টেক্সাস্, মেক্সিকো পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ, ব্রেজিল, পেরু ও চিলি প্রভৃতি দেশে অন্যান্য কুসুম অপেক্ষা রক্ত পুষ্পই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্য আমেরিকার বিজন অরণ্য মধ্যেও অজস্র লোহিতকুসুম বিকসিত হইতে দেখা যায়।

মথ প্রভৃতি নিশাচর পতঙ্গেরা শ্বেত পুষ্পের অনুরাগী। রাত্রে শ্বেত ও পীত ভিন্ন অন্য বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়াই বোধহয় রজনীতে শ্বেত কুসুমের এত বিকাশ হইয়া থাকে। মথের লোভনীয় শ্বেত কুসুমগুলি আবার প্রায়ই সুরভিত হইয়া থাকে। এই সকল শ্বেতপুষ্প শুভ্রদল ও সৌরভ দ্বারা বহুদূর হইতেও মথ-জাতীয় পতঙ্গকে আকৃষ্ট করিয়া আনে। এই সকল শ্বেত কুসুম যে শুধু মথের প্রিয় এমন নহে, কুসুমচারী প্রায় সকল প্রকার কীট-পতঙ্গই শ্বেত পুষ্পে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

পিপীলিকা প্রভৃতি পরাগভোজী কীটসকলকে হরিদ্রাবর্ণের কুসুমেই অধিক বিহার করিতে দেখা যায়। পরাগের বর্ণ পীত হওয়ায় ইহারা পীতবর্ণের পুষ্পে দলে দলে বিচরণ করিয়া থাকে।

অন্যান্য মক্ষিকারা অপ্রীতিকর গন্ধবিশিষ্ট এবং পিঙ্গল পীতাভ বা মেদমাংসের বর্ণবিশিষ্ট পুষ্পের অন্বেষণ করিয়া থাকে। উচ্ছিষ্ট, গলিত মাংস ও পুরীষের গন্ধবিশিষ্ট ও উক্ত ঘৃণিত বস্তু সকলের বর্ণবিশিষ্ট পুষ্পাদিতে মক্ষিকাদিগকে সাধারণতঃ গমনাগমন করিতে দেখা যায়।

বোলতকেরা (বোল্‌তা) কিন্তু "কটা রঙ্গের" ফুলেই প্রীতি প্রদর্শন করে। 'কটা' বা লাল্‌চে রঙ্গের ফুল দেখিলেই বোল্‌তারা বিশেষ আগ্রহের সহিত উড়িয়া যায়। ঈষৎ বেগুণীর আভাযুক্ত পুষ্প ইহারা পছন্দ করে।

আবার প্রাণীর বাসভেদে পুষ্পেরও আকার এবং গঠনে তারতম্য হইয়া থাকে। মধ্য আমেরিকায় হামিংবার্ড ও প্রজাপতির আধিক্যবশতঃই যে রক্তকুসুমের বাহুল্য হইয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুইটজারল্যাণ্ডের উপত্যকা ও নিম্নভূমি-ভাগে অধিক মধুমক্ষিকা দেখা যায় বলিয়া ঐ স্থানের কুসুম সকল বর্ণ ও আকারে মধুমক্ষিকার অভিমত হইয়া ফুটিয়া থাকে। এই সকল নিম্ন প্রদেশে labiate familyর কুসুম অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার সুইস অধিত্যকায় প্রজাপতির প্রভাব বলিয়া ঐ সকল স্থানের কুসুম সকলের বর্ণ ও গঠন প্রজাপতির রুচিকর হইয়া থাকে।

ঋতুভেদে কুসুমশ্রেণীর মধ্যে বিশেষ বিশেষ বর্ণের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বল্টিক সাগরের সন্নিহিত প্রদেশের কুসুমরাজীতে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বিকাশ হইতে দেখা যায়। এই সকল স্থানে এপ্রেল ও মে মাসে শ্বেতকুসুমের, মে মাস ও অক্টোবর হইতে হরিদ্রা পুষ্পের এবং সেপ্টেম্বর মাসে রক্তফুলের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

পরাগ-মিলনের পর পুষ্পের বর্ণের তারতম্য ঘটিতে দেখা যায়। অলি কর্তৃক পরিমল লুণ্ঠিত ও গর্ভকেশরে পুংরেণু চালিত হইবার পরেই অনেক পুষ্পের বর্ণ ম্লান হইয়া পড়ে ও প্রফুল্লতা বিনষ্ট হইয়া যায়। অনেক স্থলে কুসুমদিগের যৌন-সম্মিলনের পর রক্তবর্ণের পুষ্পকে ক্রমে ক্রমে নীলাভ হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। এই বর্ণমালিন্যের যে আর এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। মধুমক্ষিকারা এই সকল নিষ্প্রভ পুষ্প দেখিলেই তাহা নিঃসন্দেহে পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন কুসুমের অন্বেষণ করিয়া থাকে।

কীট-পতঙ্গদিগের স্বচ্ছন্দ দর্শনের সুবিধার জন্য পুষ্পের অংশবিশেষের বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বা মালিন্য ঘটিয়া থাকে। উড্ডীয়মান অবস্থায় পতঙ্গের পুষ্পের যে সকল অংশ দেখিতে পায় সেই সকল অংশের বর্ণই খুব রঙ্গীন ও উজ্জ্বল হইয়া থাকে; এবং যে সকল অংশ উহারা দেখিতে পায় না তাহাদের বর্ণেরও চাকচিক্য থাকার আবশ্যক হয় না। এই জন্যই বহুপুষ্পের বহির্ভাগের বর্ণ নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। পুষ্পের পাপড়ীর বর্ণ উজ্জ্বল না হইলে পাপড়ীর নিম্নের পাতাগুলি বা পুষ্পের কেশরগুলির বর্ণ খুব রঙ্গীন হইয়া থাকে।

এই সকল কারণেই বোধ হয় যে বিচিত্র বসন-ভূষণ সুশোভিত সুন্দরী ললনাগণের মত কুসুমের এত শোভা সম্পদের মুখ্য উদ্দেশ্য অলিকে প্রলুব্ধ করা এবং গৌণ উদ্দেশ্য কাননের শোভা-বিস্তার ও মানবের মনোরঞ্জন করা মাত্র।

অমৃতবাজার ভ্রাতৃ-সমাজ

[অধ্যাপক শ্রীনারায়ণচন্দ্র মজুমদার এম-এস সি]

আজ আসমুদ্র-হিমাচল ভারতে যে নবজীবনের সঞ্চার অনুভূত হইতেছে তাহার মূলমন্ত্র পল্লীসংস্কার এবং পল্লীমঙ্গল আজ সর্ব্বত্রই এই একই সুর বাজিতেছে, ভারত তুমি আত্মস্থ হও, পল্লীর দিকে ফিরিয়া চাও! পল্লীই ভারতের প্রাণ এবং পল্লী-স্বরাজেই ভারতের প্রকৃত স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে। এই মহাসত্য মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁহার সহোদরবর্গ যে কত বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন তাহা হয় তো অনেকেই অবগত নহেন! শিশিরকুমার সাধারণের নিকট রাজনৈতিক নেতা এবং সংবাদ-পত্র-সেবী রূপেই বিদিত! কিন্তু পল্লীকে যে তিনি কি ভালই বাসিতেন এবং তাহার অবনতিতে প্রাণে যে কি তীব্র বেদনা অনুভব করিতেন তাহার পরিচয় তদানীন্তন অমৃতবাজার পত্রিকার অতুলনীয় ভাবসম্পদময় প্রবন্ধ-নিচয়ে কতকটা পাওয়া যায়! তাঁহার কৈশোরের স্বপ্ন, যৌবনের কর্ম্মক্ষেত্র এবং বার্দ্ধক্যের বারাণসী তাঁহার জন্ম-পল্লীর সংস্কারের জন্য সেই মহাপুরুষও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের প্রচেষ্টা আজ আমরা পাঠকগণের গোচর করিব।

কলনাদিনী কপোতাক্ষীর কূলে মাগুরা নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামই শিশিরকুমারের জন্মস্থান। এই ক্ষুদ্র পল্লী ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার অন্যান্য শত সহস্র পল্লীর ন্যায় অবনত ও অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন ছিল এবং পল্লীবাসীরা অদৃষ্ট-নির্ভর হইয়া রোগ-ব্যাধি-যন্ত্রণা ভোগ করিত। এই ক্ষুদ্র পল্লী ও পল্লীবাসীর উন্নতিকল্পে শিশিরকুমার ও তাঁহার অগ্রজদ্বয় ভ্রাতৃ-সমাজ নাম দিয়া একটী ক্ষুদ্র সমিতি স্থাপন করেন। তখন শিশিরকুমার উদ্ভিন্ন-যৌবন, ১৬ বছর বয়স মাত্র। আর তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ বসন্তকুমার ২০ বৎসরের ও হেমন্তকুমার ১৮ বৎসরের যুবক। মতিলাল তখন ১০ বৎসরের কিশোর বালক মাত্র। কয়েক বৎসর পরে তিনিও ভ্রাতাদিগের সহিত এই ভ্রাতৃ-সমাজের কার্য্যে যোগদান করেন।

তাঁহাদিগের প্রচেষ্টার প্রথম ফল গ্রামে একটী বাজার স্থাপন। তাঁহাদিগের মাতৃদেবী অমৃতময়ীর নামানুসারে তাহার নাম-করণ হইল অমৃতবাজার। পরে তদনুসারে গ্রাম ও তাঁহাদের স্মৃতি-বিজড়িত হইয়া অমৃতবাজার নামে

খ্যাতিলাভ করিল এবং তাঁহাদের পরিচালিত পত্রিকা প্রথমে এখান হইতে বাহির হইত বলিয়া তাহার নাম "অমৃতবাজার পত্রিকা" হইল।

এতদ্ভিন্ন ক্রমে এখানে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়, শিল্প ও কৃষি বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, নারী-শিক্ষা মন্দির, দাতব্যঔষধালয়, সেবাসমিতি ও ডাকঘর প্রভৃতি সংস্থাপিত হয়।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ভারতের সর্ব্বত্রই অতি অল্প ছিল। যাহা ছিল তাহাও বড় বড় সহরে,—নগণ্য পল্লীতে বোধ হয় এরূপ বিদ্যালয় আদৌ ছিল না। ভ্রাতৃ-সমাজ হইতে ঘোষ ভ্রাতাদিগের যত্ন ও আগ্রহে অসাধ্য সাধিত হইয়াছিল। অমৃতবাজারে সুধু বিদ্যালয় স্থাপিতই হইয়াছিল না, তাহার যশ এরূপ সুদূর-প্রসারী হইয়াছিল যে আসাম প্রভৃতি স্থান হইতেও ছাত্রেরা উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিত। এই সকল ছাত্রদিগকে ঘরের ছেলের মত আহারাদি দিয়া বিনা বেতনে লেখাপড়া শেখান হইত। এতদ্ভিন্ন ঘোষ বাবুদের আত্মীয় স্বজন অনেকে এখানে আসিয়া ইহাদের বাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন।

শিল্প ও কৃষি-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ও পল্লীর সূত্রধর ও কর্ম্মকারদিগকে সুকুমার কলার নানাবিধ সূক্ষ্ম কার্য্য শিখাইবার জন্য সুনিপুণ সূত্রধর ও কর্ম্মকার স্থানান্তর হইতে উপযুক্ত পারিশ্রমিকে অমৃতবাজারে আনীত হইত। কৃষির উন্নতিকল্পে নানা প্রকার ধান্যের বীজ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া স্থানীয় কৃষকদিগের দ্বারা বপন করাইয়া পরীক্ষাকার্য্য চালান হইত। এতদ্ভিন্ন আক, গোলআলু প্রভৃতির চাষ এখানে প্রচলন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। মহাত্মা শিশিরকুমার চাষের কার্য্যে এরূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে অনেক কৃষক এই বিষয়ে তাঁহার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিত

হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদিগের ছেলেরা চাষের কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় দিনের বেলা বিদ্যালয়ে আসিতে পারিত না। তাহাদিগকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

যখনকার কথা বলা হইতেছে তখন নারী-শিক্ষার কথা দূরে থাক ছেলেদের লেখা-পড়া শিখাইবার সুবন্দোবস্ত অনেক স্থানেই ছিল না। বিশেষতঃ মেয়েদের লেখা-পড়া শিখিতে নাই, শিখিলে লক্ষ্মী ছাড়িয়া যাইবেন, ইহাই ছিল তখনকার ধারণা। কাজেই যখন "ভ্রাতৃ-সমাজ" হইতে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল তখন গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এমন কি মহাত্মা শিশিরকুমারের পিতামহ ও খুল্লতাতেরা পর্য্যন্ত এই কার্য্যে বিশেষভাবে বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে শিশিরকুমারের পিতা হরিনারায়ণ উদার-প্রকৃতির লোক ছিলেন। ছেলেরা যখন তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন-প্রসঙ্গে কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা এই অনুষ্ঠান করিতে যাইতেছেন তাহা সন্তোষজনকভাবে বুঝাইয়া দিলেন, তখন দূরদর্শী পিতা আনন্দ সহকারে ইহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তার পর মায়ের আদেশের প্রতীক্ষা। শিশির-জননী অমৃতময়ীর ন্যায় সন্তান-বৎসলা নারী অতি বিরল। তিনি যে কেবল ইহাতে মতই দিলেন তাহা নহে, তিনি নিজেই লেখা-পড়া শিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কাজেই ঘোষ-ভ্রাতারা প্রথমে আপনাদের বাটীস্থ বালিকা ও মহিলাদিগকে লইয়া নারী-শিক্ষা-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। শিক্ষার্থিনীদের শিক্ষালাভে যত্ন ও উৎসাহ দেখিয়া অনেকে স্তম্ভিত হইলেন। কলসী-কক্ষে জল আনিতে চলিয়াছেন, কি ঘাটে বসিয়া বাসন মাজিতেছেন, কি অন্য কোন গৃহ-কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, তখনও সুযোগ অনুসারে লেখা পড়ার চর্চ্চা। উৎকৃষ্টের আকর্ষণ দুষ্টের সংক্রমণ হইতে কম শক্তিধর নহে। ঘোষ-পরিবারের নারীদিগের শিক্ষা-লিপ্সার তীব্রতা ক্রমে পল্লীর অন্যান্য পরিবারের নারীদিগের মনে শিক্ষালাভের বাসনা সঞ্চার করিল। এই রূপে একটী দুইটী করিয়া ঘোষ-ভ্রাতৃগণ-প্রতিষ্ঠিত নারী-শিক্ষা-মন্দিরে শিক্ষার্থিনীতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এই সময়ে যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন মিঃ মনরো এবং জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন মিঃ ওকেনালী (যিনি পরে হাইকোর্টের জজ হন)। ইঁহাদের সহিত শিশিরবাবুদের বেশ সদ্ভাব ছিল। তাঁহাদের সাহায্যে গ্রামে একটি দাতব্য ঔষধালয় সংস্থাপিত হয়। এই ঔষধালয় হইতে রোগীদিগকে ঔষধ বিতরণ করা হইত, আর ভ্রাতৃ-সমাজের

সভ্যবৃন্দ বাড়ী বাড়ী গিয়া রোগীদিগকে শুশ্রূষা ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

এই সময় ভ্রাতৃ সমাজ হইতে গ্রামে একটি ছাপাখানার সরঞ্জাম আনা হয়। এই প্রেস হইতে প্রথমে "অমৃতপ্রবাহিণী" নাম্নী একখানি শিল্প ও কৃষি বিষয়িণী পত্রিকা বাহির হয়। বসন্তকুমার ছিলেন ইহার সম্পাদক। কিছু দিন পরে বসন্তকুমারের মৃত্যু হওয়ায় ঐ কাগজ বন্ধ হইয়া যায়। তাহার কয়েক বৎসর পরে 'অমৃতবাজার' পত্রিকা বাহির হয়। পল্লীর এই প্রথম কাগজ,—ইহার পূর্ব্বে ভারতের পল্লী প্রান্ত হ'তে তার করুণ-কাহিনী-প্রচার আর কোন পত্রিকার কণ্ঠে শোনা যায় নাই। কাগজের গ্রাহক-সংখ্যা ভগবানের অশীর্ব্বাদে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিছু দিন পূর্ব্বে অমৃতবাজারে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। পত্রিকার জন্য ডাকঘরের আয় ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং পরিশেষে এই ক্ষুদ্র পল্লীর ডাক ঘর সব-অফিসে পরিণত হয়।

এই সমস্ত ৭৫ বৎসরের কথা। তখন দেশে রাজনৈতিক জীবনের সঞ্চার হয় নাই, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সেবাসঙ্ঘ প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয় নাই, সংবাদপত্রের ও তেমন প্রচলন হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় এই প্রকার অনুষ্ঠানের কল্পনা ও তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে কি প্রকার মানসিক শক্তি ও নৈতিক দৃঢ়তা এবং অদম্য উৎসাহ ও একনিষ্ঠ আদর্শের প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। সেই মহাপুরুষদের প্রচেষ্টায় অমৃতবাজার যথার্থ ই এককালে অমৃত পূর্ণ হইয়া আদর্শ পল্লীতে পরিণত হইয়াছিল; সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, সুস্থ ও সবল সন্তানে বহু বলধারিণী হইয়া কবির কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিয়াছিল।

কিন্তু কি কুক্ষণেই ১৮৭১ সালে ম্যালেরিয়া রাক্ষসী মহামারীরূপে আবির্ভূত হইয়া যশোহরের পল্লী জনশূন্য করিল। রোগাক্রান্ত হইয়া পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই সময় হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার ও মতিলাল চিকিৎসার্থ সপরিবারে সজলনয়নে জন্ম-পল্লীর নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতা গমন করেন। ইচ্ছা ছিল, রোগমুক্ত হইয়া আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিবেন; কিন্তু নানা কারণে তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই। ছাপাখানা কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল, অমৃতবাজার কলিকাতা হইতে বাহির হইতে লাগিল।

যাঁহারা এই সমস্ত কার্য্যের প্রাণ ছিলেন তাঁহাদের অভাবে ও কালের করাল প্রবাহে ভ্রাতৃ-সমাজ প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি লয় প্রাপ্ত হইল। এদিকে নদী শীর্ণতোয়া হইয়া শৈবাল ও কচুরী পানায় পূর্ণ হইল, গ্রামে ম্যালেরিয়া স্থায়ী আবাস স্থাপন করিল; গ্রাম দুরবস্থা ও অবনতির চরম সোপানে উপনীত হইল।

আজ আবার বহু বৎসর পরে নব-জাগরণের দিনে সেই পরিত্যক্ত, লাঞ্ছিত, অবনত গ্রামের প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই মহাপুরুষগণ এক্ষণে স্বর্গগত। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ আবার শিশিরকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোলাপলাল ঘোষ এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়দ্বয় সেই ভ্রাতৃ-সমাজকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া গ্রামের সেই পূর্ব্বগৌরব ও হৃতশ্রী পুনরানয়নে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সেই মহাপুরুষগণের স্মৃতি তাঁহাদের মনে শক্তি দান করুক এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ তাঁহাদের চেষ্টাকে জয়যুক্ত করুক।

আমরা এক্ষণে সেই পুনরুজ্জীবিত ভ্রাতৃ-সমাজের কার্য্যপ্রণালীর কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে অমৃত বাজার ভ্রাতৃ সমাজের নিম্ন প্রকার কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারিত হয়:—

(ক) গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন ও সংরক্ষণ দ্বারা শিক্ষার উন্নতি, কৃষিশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বালিকা ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন।

(খ) চিকিৎসালয় স্থাপন ও রক্ষণ, জঙ্গল কাটা, পুষ্করিণী পরিষ্কার করা, ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতি দ্বারা স্বাস্থ্য-বিষয়ক বক্তৃতা দেওয়া, সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবে লোককে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া এবং রোগে শুশ্রূষা করা।

(গ) গ্রামে মামলা, মোকদ্দমা, বিবাদ-বিসংবাদ ও দলাদলি যথাসম্ভব আপোষে সালিশী দ্বারা নিষ্পত্তি করা।

(ঘ) গ্রামে বারোয়ারী পূজা-পার্ব্বণ প্রভৃতি কার্য্য

সম্পন্ন করা ও গ্রামের নৈতিক উন্নতির ও বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে কথকতা; যাত্রা ও সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা।

(ঙ) অন্ন-সমস্যা-সমাধান জন্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও ধানের কল স্থাপন, চালানি ব্যবসায়, তরিতরকারী ইত্যাদি উৎপাদন-বিষয়ে সাহায্য করা।

(চ) গ্রামের জনহিতকর কার্য্য সমূহকে কেন্দ্রীভূত করা।

এই সমাজের কার্য্য অতি অল্প দিনেই আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছে; কিঞ্চিদধিক এক বৎসর হইল মহাত্মা শিশিরকুমারের নামে শিশিরকুমার দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেও এই চিকিৎসালয় সুন্দরভাবে পরিচালিত হইয়া অমৃতবাজার ও তৎসংলগ্ন গ্রামসমূহের বহু দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তির রোগ নিরাময় করিতেছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্যর হরিশঙ্কর পাল, ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, বেঙ্গল ইমিউনিটীর পরিচালকবর্গ ও অন্যান্য পরোপকারী ভদ্রমহোদয় ইহার কার্য্যে প্রীত হইয়া ঔষধ প্রভৃতি দান করিয়া নানা প্রকারে সাহায্য করেন। রোগী-চিকিৎসা ব্যতীত রোগ নিবারণও ইহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য। এজন্য ডাক্তার বেণ্টলী-প্রদত্ত চার্টের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যবার্ত্তা প্রচার করা হইয়া থাকে। আশা আছে অর্থানুকূল্য হইলে চিকিৎসালয়ের সহিত একটী হাঁসপাতালও স্থাপন করা হইবে।

শিক্ষা-বিস্তারের জন্য একটী অবৈতনিক মধ্য ইংরাজী বালকদিগের জন্য বিদ্যালয় ও আর একটী অবৈতনিক প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বালক-বিদ্যালয়টী স্বর্গগত মতিলালের ও বালিকা বিদ্যালয়টী স্বর্গগত হেমন্তকুমারের পুণ্যস্মৃতিপূত করা হইয়াছে। গ্রামে বেতন দিয়া ছেলে পড়াইবার শক্তি সাধারণের নাই। সেইজন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে দরিদ্রগণের কোনই উপকার হয় না। এই বিদ্যালয় দুটীর শিক্ষা-প্রণালী ও আদর্শ সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী ও আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। মানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে শারীরিক উৎকর্ষ এবং স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়ার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়া থাকে। ছাত্রগণের হৃদয়ে পরিশ্রমের প্রতি সম্মান-বোধের জন্য নিজ হস্তে সমস্ত কার্য্য করিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ে সুবিধা ও সুযোগমত একটী কৃষি ও আর একটী ব্যাবহারিক শিক্ষা-বিভাগ খুলিবার অভিপ্রায় আছে। এই অন্ন-সমস্যার দিনে এখন আর শুধু আক্ষরিক শিক্ষায় চলিবে না; অর্থকরী বিদ্যার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। ব্যাবহারিক ও কৃষি-শিক্ষা দ্বারা এই অভাব অন্ততঃ অংশতঃ পূর্ণ হইবে আশা করা যায়। যে সমস্ত বালক অথবা প্রাপ্তবয়স্ক লোক দিনের বেলা পাঠশালে অধ্যয়ন করিবার অবকাশ পায় না তাহাদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় অবিলম্বে খুলিবার প্রস্তাবও ভ্রাতৃ-সমাজে চলিতেছে।

সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে চর্চ্চা অভাবে পাঠ-ত্যাগের অল্প কয়েক বৎসর মধ্যেই পল্লী-গ্রামের অল্প-শিক্ষিত লোক পূর্ব্বোধীত বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া অশিক্ষিত দল-ভুক্ত হইয়া পড়ে। তন্নিবারণোদ্দেশ্যে অবৈতনিক হেমন্ত-কুমার পাঠাগার ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্তঃ-পুরবাসিনী মহিলাদের মধ্যেও যাহাতে জ্ঞান-চর্চ্চা হয় তদুদ্দেশ্যে তাঁহাদের বাটীতে গিয়া জ্ঞান ও তথ্যপূর্ণ পুস্তক দেওয়া হইয়া থাকে।

দেশের পরম শত্রু সর্ব্বনাশী ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে ভ্রাতৃ-সমাজ যুদ্ধঘোষণা করিয়া য়্যান্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটী (Anti-malaria Society) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গ্রামের উৎসাহী যুবকগণকে দলবদ্ধ করিয়া জঙ্গল কাটান এবং গর্ত্ত প্রভৃতি ভরাট করানই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য সম্প্রতি হেমন্তকুমার নলকূপ খনন করা হইয়াছে এবং একটী মরা পুকুর ভরাট করা ও অপর একটী সংস্কার করার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহার কর্ম্ম-তৎপরতার ফলে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ বিদূরিত না হইলেও প্রকোপ অনেকটা কমিয়াছে। ইহার উদ্যোগে আরও একটী নলকূপ খনিত হইয়াছে।

সম্প্রতি শিশিরকুমার দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম বার্ষিকী ও মতিলাল বিদ্যালয়ের উদ্বোধনকল্পে অমৃতবাজারে একটী মহতী জনসভার অধিবেশন হয়। বঙ্গের শিক্ষা-সচিব খাজা নজিমুদ্দিন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ডাক্তার বেণ্টলী, যশোহরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসিগণের উৎসাহ

মতিলাল বিদ্যালয়ের উদ্বোধন-সভা

বর্দ্ধন করেন। পণ্ডিত অমূল্যচরণ মঙ্গলাচরণ পাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। ডাক্তার বেণ্টলী স্বাস্থ্যের কতক সাধারণ নিয়ম বিবৃত করিয়া দেখান যে তাহার প্রতিপালন দ্বারা কলেরা,বসন্ত,বেরী-বেরী, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। তিনি পল্লীগ্রামের নিরাড়ম্বর সরল খাদ্য যথা, মুগ ও ছোলার অঙ্কুর, গুড়, ফেন-মিশ্রিত ভাত প্রভৃতির প্রশংসা করিয়া বলেন যে, তথা-কথিত সভ্যতার নামে আমরা এই সমস্ত কল্যাণকর খাদ্য ত্যাগ দ্বারা স্বাস্থ্য্যনাশ করিতেছি। শিক্ষা-সচিব মহাশয়ও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতি দেশে বহুল প্রচার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। সভার শেষে ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা স্বাস্থ্যতত্ত্ব বুঝান হইয়াছিল। এই সভার ফলে জনসাধারণের মনে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং ভ্রাতৃ-সমাজের অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান-গুলির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আ হয়।

পল্লীতে কর্ম্মক্ষেত্র বহু বিস্তৃত ও বহু আয়াসসাধ্য। সহরের কার্য্য বা কার্য্যপ্রণালীর তাহার সঙ্গে তুলনা হইতে পারে না। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার পল্লীর উন্নতির প্রধান অন্তরায়। পল্লীসেবকের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে পল্লীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়া সে ধন্য হইতেছে। ভ্রাতৃ-সমাজ যাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনের ভাব তাহাই ছিল। এখন আবার যাঁহারা তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন তাঁহারা সেই আদর্শই বজায় রাখিয়াছেন। দেশের উন্নতির পথ ইহা ছাড়া আর নাই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

কবি প্রসন্নময়ী

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত]

পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের চৌধুরী জমিদার-বংশ উত্তর বঙ্গে প্রসিদ্ধ। এই গ্রাম পূর্ব্বে রাজসাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন পাবনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই গ্রামে বহু জমিদারের বাস ; তাঁহাদের মধ্যে বড় তরফ ও ছোট তরফ প্রধান। বড় তরফের ছোট কর্ত্তা স্বর্গগত দুর্গাদাস চৌধুরী পিতার মৃত্যুর পর জমিদারীর বেশীর ভাগ হস্তান্তরে গেলে গভর্মেণ্টের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন। প্রসন্নময়ী তাঁহার প্রথমা কন্যা। ৺দুর্গাদাস চৌধুরীর পুত্রেরা এক্ষণে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা সাত ভাই। ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গত স্যর আশুতোষ চৌধুরী হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রসন্নময়ী স্যর আশুতোষের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও প্রায় পাঁচ ছয় বৎসরের বড়। তাঁহার জন্ম ১৮৫৬।৫৭ সালে ১৪ই আশ্বিন। ইঁহার মাতামহবংশ ধানকাশীনাথপুরের রায়েরা বাঙ্গালার দ্বাদশ ভূম্যধিকারিগণের অন্যতম। বংশ-মর্য্যাদায় এখনও বানকাশীনাথপুরের রায়েরা বারেন্দ্র সমাজে প্রধান।

প্রসন্নময়ীর শৈশব অতি মধুর ছিল। নাটোরের মহারাণী কৃষ্ণমণি-ইঁহার পিতামহীর সহোদরা ছিলেন। তিনি প্রসন্নময়ীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

যদিও সে সময় বর্ত্তমান কালের মত অন্তঃপুর-শিক্ষার প্রচলন ছিল না এবং অধিকাংশ স্থলেই মেয়েরা লেখাপড়া শিক্ষা প্রয়োজন মনে করিতেন না, তথাপি হরিপুরের চৌধুরীবংশের মেয়েরা সকলেই কিছু না কিছু লেখাপড়া শিখিতেন। প্রসন্নময়ীর পিতৃ-স্বসারা রীতিমত পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। প্রসন্নময়ীর পিতা নিজেই প্রসন্নময়ীকে পড়াইতেন ; তিনি ও স্যর আশুতোষ একসঙ্গে পাঠাভ্যাস করিতেন।

বংশের নিয়মানুসারে তাঁহার দশবৎসর বয়সে পাবনা ও নাইগাছা গ্রাম-নিবাসী কুলীন-শ্রেষ্ঠ ৺কৃষ্ণকুমার বাগচী

মহাশয়ের সহিত বিবাহ হয়। কিন্তু তিনি শ্বশুরালয়ে খুব কম দিনই কাটাইয়াছিলেন। বিবাহের মাত্র দুই বৎসর পরেই তাঁহার স্বামী উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হন। তদবধি তিনি চিরদিনই পিত্রালয়ে বাস করিতেন। এইরূপে অতি অল্প বয়স হইতেই তাঁহার জীবন বিষাদের হইয়াছিল এবং বলিতে গেলে চিরদিনই তিনি কোন না কোনরূপ দুঃখ পাইয়া আসিয়াছেন।

কবি প্রসন্নময়ী

তাঁহার পিতা কন্যার এই মর্ম্মক্লেশ কিছু মাত্রায় দূর করিবার জন্য তাঁহাকে গৃহে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে মনস্থ করেন প্রসন্নময়ীকে ইংরাজী ও গীতিবাদ্য শিখাইবার জন্য মেমশিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন এবং নিজে তাঁহার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ইংরাজী ও গীতিবাদ্য শিক্ষা যদিও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই, তথাপি প্রসন্নময়ী নিজের চেষ্টায় উত্তর কালে বেশ সুন্দর ইংরাজী শিখিয়াছেন।

জীবনের দুর্দ্দৈববশতঃ লেখাপড়া ভিন্ন তাঁহার সংসারে অন্য কাজ বিশেষ ছিল না—সুতরাং তিনি শৈশব হইতেই সাহিত্য-চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন। বারো বৎসর বয়সে তাঁহার কবিতাপুস্তক "আধ-আধ ভাষিণী" প্রকাশিত হয়। সে সব কবিতা হইতেই পরজীবনে তাঁহার কাব্যশক্তি যেরূপ বিকাশ পাইয়াছে তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

তিনি যে যুগে লিখিতে আরম্ভ করেন তাহা বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যের প্রারম্ভ কাল। তিনি সেই সময়কার অনেক মাসিক পত্রে রচনা, গল্প ও কবিতা লিখিয়াছিলেন। এখন তিনি "ভারতবর্ষ", "মানসী ও মর্ম্মবাণী" ও "মাতৃমন্দির" প্রভৃতি মাসিকে প্রায়ই লিখিয়া থাকেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার রচিত স্যর আশুতোষ চৌধুরীর জীবনী "মাতৃমন্দির" মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। উক্ত রচনা হইতে সেকালের নানা কথা, যাহা বর্ত্তমান যুগের তরুণের দল অজ্ঞাত তাহা জানিতে পারা যায়। ইংরাজীতে উহার অনুবাদ হইতেছে।

ইঁহার লিখিত কবিতা এবং গদ্য-রচনার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডারে তিনি গদ্য রচনার দ্বারা যে পুষ্পের সাজি উপহার দিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। সত্যই তাঁহার গদ্য লিখিবার ভঙ্গী বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা সৃষ্টি করিতেছে।

পূজ্য সাহিত্যিক রাজনারায়ণ বসু ইঁহার গ্রন্থাবলীর একজন অতি ভক্ত পাঠক ছিলেন। তিনি প্রসন্নময়ীকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন।

প্রসন্নময়ীর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর নাম বঙ্গসাহিত্যে এবং সকলের নিকটই পরিচিত। প্রসন্নময়ী ইঁহাকে জীবনে সুখী করিয়া নিজের বিষাদময় জীবনে

একটু আলোক আনিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিধাতা তাহাতেও বাদ সাধেন। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁহার স্বামী ও একমাত্র পুত্রকে হারান। এইরূপে মা ও মেয়ে উভয়েই দুঃখ ও বিষাদে জর্জ্জরিত হইয়া পড়েন। প্রসন্নময়ীর রচিত গ্রন্থাবলী যথা—"বনলতা", "নীহারিকা" ১ম ও ২য় ভাগ ও "অশোকা", "আর্য্যাবর্ত্ত" প্রভৃতি। ইহার মধ্যে 'পূর্ব্বকথা' ও 'তারাচরিত' এই দুইখানি গ্রন্থ তাঁহার ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনের ঘটনা লইয়া রচিত। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে তাঁহার জীবন কিরূপ দুঃখ ও বিষাদের তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি স্যর আশুতোষ চৌধুরী ও কর্ণেল মন্মথনাথ চৌধুরী এই দুই ভ্রাতাকে হারাইয়াছেন। এই শোকে তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

প্রসন্নময়ী নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছেন।

কবিতা—আধ আধ ভাষিণী, বনলতা ও নীহারিকা (১ম ও ২য় ভাগ)

গদ্য—অশোকা (উপন্যাস সিপাহী-বিদ্রোহের ঘটনা অবলম্বনে)

আর্য্যাবর্ত্ত—উত্তরভারত ভ্রমণ কাহিনী।
পূর্ব্বকথা—সামাজিক ও পারিবারিক চিত্র।
তারাচরিত—জীবনী।

আমরা এখন তাঁহার কাব্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'আধ আধ ভাষিণী।' ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা ১২৭৬ সালে G. P. Roy & Co. Printers-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সে হিসাবে এ বইখানির বয়স দাঁড়াইতেছে ষাট বৎসর। প্রসন্নময়ীর বয়স তখন ছিল মাত্র বারো বৎসর। এই ক্ষুদ্র বহিখানি ডিমাই ১২ পৃষ্ঠা মাত্র। মলাটে লিখিত ছিল "অমৃতং বালভাষিতং"। 'আধ আধ ভাষিণী' লেখিকা তাঁহার পরমারাধ্য পিতা শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয়ের শ্রীচরণে সাদরে অর্পণ করিয়াছেন। ইহাতে সতেরটি ছোট ছোট কবিতা আছে। ষাট বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু পরিবারের একটী দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার রচনা কেমন ছিল তাহা দেখাইবার জন্য আমরা এখানে একটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম :—

বসন্ত-বর্ণন

শীতঋতু করে শেষ বসন্ত আইল।
হায় কি সুন্দর সাজে ধরণী সাজিল।
প্রকৃতি প্রকৃত বেশ ধরিল এখন।
হেরিয়ে প্রফুল্ল হলো ভাবুকের মন।
কোকিল আইল দেখ বসন্তের সাতে।
ভূলোক পুলক হলো সুখের আশাতে॥
মলয় সমীর এবে বহে মন্দ মন্দ।
প্রকাশিছে ঋতুরাজাগমনে আনন্দ।
তুলসী মুঞ্জরী হয় আম্রের মুকুল।
নানাজাতি ফুল ফুটে সৌরভে আকুল।
কতরূপ ফল ফলে এ সময়ে হায়।
ফলের ভরেতে তরু বিনম্র দেখায়॥
শিশির পড়িয়ে রাত্রে থাকে দূর্ব্বাদলে।
যেন ছেঁড়া মুক্তা হার তাহাদের গলে॥
কতই অপূর্ব্ব শোভা এ সময়ে হয়।
বসন্তের শোভা দেখি নয়ন জুড়ায়॥
ওহে প্রভু দয়াময় জগতের সার।
তোমার সৃষ্টির ভাব বুঝে উঠা ভার॥

সেকালের প্রচলিত পয়ার ছন্দের অনুকৃতিই এই কবিতায় দেখিতে পাইতেছি। 'প্রার্থনা' কবিতায় সেকালের সামাজিক চিত্রের একটু আভাষ আমরা পাই।

একেত অবলা নারী তাহে পরাধীনা।
কেমনে তোমারে পাবে এ সম্বল হীনা।
শ্বশুর শাশুড়ীগণ সবে প্রতিকূল।
সতত থাকিহে নাথ ভয়েতে ব্যাকুল॥

*　　　*　　　*

অতিশয় ভয়ানক দেশের আচার
কতদিনে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হবে হে প্রচার॥
যত সব ভদ্রলোক একত্রিত হয়ে।
আমোদ আহ্লাদ করে পুত্তলিকালয়ে॥
বিদরিয়া যায় হৃদি দেখে দেশাচার।
হবে নাকি এই দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মাচার।"

প্রসন্নময়ীর দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ 'বনলতা' ১২৮৭ সালে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংর বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই বহিখানা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানিও লেখিকা আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে তদীয় পিতৃদেবের শ্রীচরণ কমলে উৎসর্গ করিয়াছেন। পঁচিশটি

খণ্ড কবিতা লইয়া এই গ্রন্থের কলেবর পূর্ণ। ইহার মধ্যে তিনটী কবিতা ইংরাজী কবিতার অনুবাদ।

'বনলতা'—লেখিকার তরুণ বয়সের রচনা। বনলতা প্রকাশিত হইবার পর লেখিকা সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। সেকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক সুপণ্ডিত রাজনারায়ণ বসু, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরাও যেমন ইহার প্রশংসা করেন, 'আর্য্য-দর্শন' Indian Nation, "Brahmo Public Opinion, Calcutta 'Review' 'Indian Mirror' প্রভৃতি পত্রিকা ও এই গ্রন্থের উৎসাহ-ব্যঞ্জক সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

'Calcutta Review'র সমালোচক বলিয়াছিলেন—The Banalata is from the pen of a Hindu (Brahmin) lady who dedicates the work to her father It consists of several short poems on a variety of subjects, which bear the impress of a mind emancipated from the thraldom of Jati, Juti—Mallika, Malati of bygone ages, and awakening to an appreciative perception of the beautiful the grand and the sublime, not simply in ternestrial objects, but, likewise in the phenomenal as pects of Nature, in all her immensity. The following lines will partially illustrate our views, if they will not remind the reader of I an the in the Magic car of Shelly.

রবি-শশী তারা কল্পনা নয়ন
শারদ-কৌমদী কল্পনা বরণ
কল্পনার কণ্ঠ বীণার নিক্কণ
কল্পনার খেলা সুখের স্বপন!

'জন্মভূমি' কবিতা পড়িতে প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বের সমাজ-চিত্রের কথা মনে পড়ে। নারীজাতির কল্যাণের দিকে না চাহিয়া, সমাজের দিকে চাহিয়া কৌলিন্য ও দেশাচারকে বড় করিয়া দেখিয়া কেমন করিয়া শত শত কুসুম কোমলা নারীর জীবনের সর্ব্বনাশ করা হইত, এখানে তাহার একটু আভাষ পাই।

পরিণয়-হার পরিয়া গলায়,
দিবানিশি কাঁদে তাহারি জ্বালায়,
সোণার প্রতিমা শোভা নাহি পায়;
মুকুতার হার বানর-গলায়।
জনক-জননী, স্নেহের আশায়,
দুহিতার সুখ, না চিন্তিল হায়!
স্নেহ বিসর্জ্জিল দেশাচার পায়,
স্বর্গের কুসুম সঁপিল চাবায়।

'বনলতা'য় অনেক কবিতার মধ্য দিয়াই একটা দুঃখের সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'কেন জানিলাম'—কবিতায় কবি স্বপ্নের ছবি হারাইয়া দুঃখ করিয়া বলিতেছেন:—

আর কি দেখিব সেই সুখের স্বপন?
জীবনে কি সে চিত্রের পাব দরশন?
আজীবন কাঁদিবারে,
জাগিলাম মরিবারে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মৃত্যু! নিরাশ-অনল
জ্বলিবে, পিপাসা মম বাড়িবে কেবল।

জগতে শিশুর হাসির তুলনা মিলে না। হাসি কবিতাটী বড় সুন্দর। শিশুর ঢল ঢল অরুণসমসুন্দর বদনের হাসি দেখিয়া কবি-চিত্ত বিমুগ্ধ-শিশু যখন—টলে টলে ঢলে ঢলে, আদরে গলিয়া,

হাসির তরঙ্গ তুলি,
চল তুমি দুলি দুলি,
বিমুগ্ধ হইয়া আমি থাকিরে চাহিয়া,
হাসির তরঙ্গে প্রাণ যায় রে ভাসিয়া।

তাই কবি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—

এমন সুন্দর তুমি স্নেহের কুসুম,
পবিত্র জীবন ল'য়ে,
চিরকাল সুখে রয়ে,
থাকরে সংসারে শিশু উজ্জ্বলি জীবন,
জগতের শোক-তাপ পেওনা কখন!

হায়রে এই আশীর্ব্বাদ যদি সত্য হইত! 'বনলতার' কবিতাগুলি সে কালে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। সরল, সহজ ভাষা, সুন্দর শব্দসম্পদ্, সুরুচিসঙ্গত অভিব্যক্তি সে যুগের নূতন আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। কোন কোন কবিতায় দেশপ্রীতি স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা 'বীরনারী লক্ষ্মীবাঈ' শীর্ষক কবিতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের কথার সমর্থন করিতেছি।

রণবেশে মত্ত সতী নাচিছে সমরে, রে
নাচিছে সমরে,
বিমুক্ত কুন্তলভার,
মুখে শব্দ মার মার,
তীক্ষ্ণ তরবার ওই শোভিতেছে করে, রে
শোভিতেছে করে।

অতুলিত রূপরাশি,
শরতের পৌর্ণমাসী,
রবি ছবি পরকাশি করিতেছে রণ রে
করিতেছে রণ। ইত্যাদি।

প্রসন্নময়ীর তৃতীয় গ্রন্থ 'নীহারিকা' ১২৯০ সালে কলিকাতা ১৪ নং কলেজ স্কোয়ার এস কে লাহিড়ী কোং দ্বারা প্রকাশিত। এই হিসাবে এ বইখানার বয়স ছচল্লিশ বৎসর। নীহারিকার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮১৮ শকে। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এই হিসাবে 'নীহারিকা' দ্বিতীয় ভাগের বয়স বত্রিশ বৎসর।

নীহারিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের কবিতাগুলির মধ্যেই কবির হৃদয়ের বেদনা প্রকাশিত। একটা বিষাদ-রাগিণীর করুণ সুর প্রবাহিত। মানুষের জীবন লইয়াই মানুষের কাব্য ও কবিতা একথা প্রসন্নময়ীর প্রত্যেকটি কবিতার ভিতরই প্রকাশ পাইতেছে। কবি কখন এই পৃথিবীর সুখ-দুঃখের, ক্ষণিক হাসির, ক্ষণিক আনন্দের মধ্যে আত্মহারা হইতেছেন, তখন দেখিতে পান—

আকাশে নক্ষত্র আছে,
বারি কোলে ঊর্ম্মি নাচে,
কুসুম সুরভিময়, শশধরে হাসি,
প্রদীপ্ত অরুণে সদা তীব্র কর-রাশি।
দামিনী বারিদ-কোলে,
তরুকণ্ঠে লতা দোলে,
ছায়া শীতলতাপূর্ণ, সমীরে জীবন।
তেমনি এ ভালবাসা আত্মার মিলন!

কিন্তু এ মিলন ত চিরস্থায়ী হয় না! কেন না—

সকলি স্বার্থের দান, স্বার্থের ধরণী
নিজ সুখে মুগ্ধ নর দিবস রজনী।

তাই সাধপূর্ণ হয় না। নীহারিকা প্রথম ভাগে মোট একুশটী কবিতা আছে। নীহারিকায় তাঁহার কবিত্বশক্তি পূর্ণবিকসিত। কল্পনা, ভাব ও ভাষা সে যুগের তুলনায় প্রশংসনীয়। "স্নেহোপহার", "সেই চন্দ্রলোকে" "গাওরে আবার" "আর্য্যনারী," "জাহ্নবী সৈকতে" "জীবন-কাহিনী" আমাদের ভাল লাগিয়াছে। নীহারিকা দ্বিতীয় ভাগের কবিতার মধ্যে জীবনের নিগূঢ় রহস্য ব্য... ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'Criticism of life' তাহা বেশ দেখিতে পাই। মোট আটত্রিশটি কবিতা গুচ্ছ লইয়া নীহারিকা রচিত হইয়াছে।

কবির স্বদেশ-প্রীতি অনেক কবিতার মধ্যেই বর্ত্তমান। কখনও যমুনার কলপ্রবাহের মধ্যে কবি দেখিতে পাইতেছেন—

দীপ্তিমান সৌভাগ্যের সেদিন অতীত
খুঁজিলে যমুনা প্রাণে,
মিলিবে না বর্ত্তমানে,
ভারতের ইতিহাস আর্য্যের গরিমা,
বিলুপ্ত স্মৃতির ছবি জাহ্নবী যমুনা।
আঁধার সৈকত-ভূমি, ভগন শ্মশান,
দীপমালা নির্ব্বাপিত,
হাহাকারে পরিণত
স্নিগ্ধ সমীরণ, শুধু আকুল ক্রন্দনে
প্রতিধ্বনি তীরে তীরে জাগে রাত্রি দিনে।

কবি প্রসন্নময়ী নানা বিষয়ে খণ্ড কবিতা রচনা করিয়াছেন। বিধাতা তাঁহার জীবনের প্রারম্ভকাল হইতে সুদীর্ঘ জীবনে শোকের যে দারুণ ব্যথা দ্বারা আঘাত করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক কথার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

বর্ত্তমান সময়েও তিনি সমানভাবে গদ্য ও পদ্য রচনা দ্বারা বাঙ্গলা ভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লিখিত 'সন্ধ্যাতারা' কবিতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম।

উঠেছিলে সন্ধ্যার আকাশে,
প্রভাত না হতে রাতি
নির্ব্বাণ ঝরিয়া ভাতি
চলে গেলে পুন পরবাসে
তব পানে নেত্র তুলে
অজানা নদীর কূলে
ভেবেছিনু হয়ে যাব পার,
ঘাটে নাই তরীখানি
পথ কভু নাহি জানি
কেমনে যাইব পর পার।

* * *

সেই এক সন্ধ্যাতারা মম,
সাঁঝের আকাশতলে
নিত্য যাহা নিভে জ্বলে

"আহা মেয়ের কথা দেখ না। অত বড় হ'লে তবু ছেলেমি তোমার গেল না দিদিমণি।"

অঞ্জলির দিকে চাহিয়া উজ্জ্বল বলিল, "আমি তা হ'লে যাই এবার ?"

ব্যস্তভাবে অঞ্জলি বলিল, "এখনি ? না না বসুন একটু। সারি এঁকে চা দে।"

"মাপ করবেন এখন আমার চায়ের কিছু দরকার নাই। তা হ'লে আমি এখন আসি।"

"কবে আসবেন ? আবার আস্‌বেন তো ?"

ক্ষণেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া উজ্জ্বল বলিল, "আচ্ছা আস্‌বার জন্য চেষ্টা কর্বো। নমস্কার।" সে অগ্রসর হইল অঞ্জলিও তাহার সহিত দ্বার-প্রান্তে আসিল। পথে আসিয়া উজ্জ্বল বলিল, "চল্লুম তা হ'লে। আপনি ভিতরে গিয়ে শুয়ে থাকুন একটু।"

"যাচ্ছি। আপনি আস্‌বেন তো ?"

"আচ্ছা আসব,।" সে দ্রুত পাদক্ষেপে অগ্রসর হইল। অঞ্জলি নীরবে সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে-দিন প্রভাত হইতেই নভোমণ্ডল নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল ; ঘন মেঘস্তর ভেদ করিয়া রবিকর তখন ম্লান হাসির মত বারেক ধরাবক্ষে আসিয়া পড়িয়াছিল।

জ্ঞান-উন্মেষের সঙ্গে অঞ্জলি জননীর নিকট হইতে, দাসদাসীর নিকট প্রতিপালিত। আর কোন আত্মীয়-স্বজনকে সে চক্ষে দেখে নাই। সংসারে মা ভিন্ন তাহার আপনার বলিতে কেহ ছিল না কিন্তু সে মাতার সান্নিধ্য হইতেও বহুদূরে অবস্থিত। জননী তাঁহার জননীর সহিত কাশীতে থাকেন। অঞ্জলি শুনিয়াছিল বিধবা হইয়া পর্য্যন্ত সংসারে বৈরাগ্যহেতু জননী কাশীবাস করিতেছেন। কন্যার শিক্ষার ত্রুটি হইবে বলিয়া তাহাকে দাসীর তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় রাখা হইয়াছে। দাস-দাসীর নিকট পালিত হইলেও কোন অভাব, কোন ক্লেশ অঞ্জলির ছিল না। সারদা মাতার মতই তাহাকে যত্ন করিত। সতীর্থা ছাড়া অঞ্জলির কাহারও সহিত পরিচয় ছিল না। সারদা তাহাকে কাহারও সহিত মিশিতে দিতে চাহিত না। সারদার স্বামী নবীন তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য এই গৃহেই থাকিত। প্রথমতঃ আপন অধ্যয়ন ও শিল্প-শিক্ষা লইয়া অঞ্জলির দিন সুখেই কাটিয়া যাইতে ছিল। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই একান্ত সঙ্গ-হীনতা ক্রমশঃই তাহাকে পীড়িত করিতেছিল। একটু স্নেহ-মমতার জন্য তাহার অন্তর তৃষিত হইয়া উঠিল।

জননী মালতী বৎসরান্তে কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া তনয়াকে দেখিয়া যাইত। তাহার স্নেহ-বঞ্চিত উন্মুখ-চিত্ত মাতার পার্শ্বে থাকিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিত। মা চলিয়া গেলে আবার সেই গভীর অতৃপ্তি নিঃসঙ্গ-জীবনের নিবিড় জ্বালায় অঞ্জলি অধীর হইয়া উঠিতেছিল। মাতাকে এখানে আসিয়া বাস করিতে অনেক বার সে অনুনয় করিয়াছে। মালতী আসিতে সম্মত হয় না। অঞ্জলি বিদ্যালয়ের অবকাশে তাঁহার নিকট যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেও মালতী নিষেধ করিয়া পাঠাইত। ক্ষুব্ধা অঞ্জলি অধ্যয়ন-মধ্যে চিত্ত নিমগ্ন রাখিয়া আপনাকে শান্ত রাখিতে চাহিলেও তাহার অবাধ্য অন্তর সময় সময় বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। ইদানীং সে সতীর্থাদের গৃহে যাইয়া কিছুক্ষণ কাটাইয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সারদা প্রথম প্রথম নিষেধ করিয়া ব্যর্থ হওয়ায় আর বড় কিছু বলিত না। মালতী সর্ব্বদাই পত্র দিয়া কন্যার সংবাদ লইত। সেই পত্রের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়াই অঞ্জলি কতকটা তৃপ্তি অনুভব করিত।

দুই

সমস্ত দিন যাইব না বলিয়া স্থির করিয়া রাখিলেও সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে সহসা উজ্জ্বলের মনে হইল অঞ্জলি সুস্থ হইয়াছে কি না সে সংবাদটা একবার লইয়া আসা কর্ত্তব্য। ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িল। সন্ধ্যা তখন ধরা-বক্ষে নামিয়া আসে নাই। পথপ্রান্তে আলোক-শিখা জ্বলিয়া উঠিলেও তাহা তখনও তেমন দীপ্তভাবে জ্বলিতেছিল না। মলিন মেঘের ছায়া সমস্তদিনই গগন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। শীকর-সম্পৃক্ত অনিল থাকিয়া থাকিয়া প্রবলভাবে বহিয়া চলিয়াছিল। বর্ষণ তখনও আরম্ভ হয় নাই। অঞ্জলির গৃহ-দ্বারে আসিয়া আহ্বান করিতেই একজন বৃদ্ধ ভৃত্য দ্বার উন্মোচন করিয়া দিল। উজ্জ্বল কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাহার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আপনিই বুঝি সকালে দিদিমণিকে পথ থেকে তুলে এনেছিলেন ? দিদিমণি সারাদিনই আজ আপনার কথা

বলেছেন। দিদিমণির বড় জ্বর হয়েছে বাবু।"

"জ্বর হয়েছে!"

বৃদ্ধ চিন্তিত ভাবে বলিল, "হাঁ বাবু জ্বর হয়েছে, জ্বর হ'তে কৈ বড় একটা তো দেখি নি, এই সতর বছর বয়স পর্য্যন্ত আমিই তো তাকে হাতে করে মানুষ কচ্ছি, জ্বর তো বড় হয় না কখন। সকালে পড়ে গিয়ে বড় লেগেছে বল্‌ছিলেন, সারা গায়ে ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা।"

আশ্বাসের স্বরে উজ্জ্বল বলিল, "ঐ পড়ে যাওয়ার দরুণই জ্বরটা হয়েছে, ভয় নাই।" অঞ্জলিকে দেখিয়া যাওয়া উচিত কি না সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না। অসুস্থ যখন তখন একবার দেখিতে যাওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বজন-বিহীনা একাকিনী তরুণীর কক্ষে প্রবেশ করাটাও কি সঙ্গত হইবে? সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভৃত্য বলিল, "দিদিমণিকে দেখে যাবেন না বাবু? তিনি কেবল আপনার কথাই বল্‌ছেন, আসুন না একবার।"

"যাব? আচ্ছা চল তা হ'লে।" সে আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না। নীরবে বৃদ্ধের অনুগমন করিল।

দ্বারের দিকে চাহিয়াই অঞ্জলি শুইয়াছিল। ভৃত্যের সহিত উজ্জ্বলকে দেখিয়াই তাহার জ্বরোত্তপ্ত আননে আনন্দের স্নিগ্ধ রেখা ফুটিয়া উঠিল। ত্রস্তে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল, "আসুন উজ্জ্বল বাবু। আমি জান্‌তুম আপনি একবার অন্ততঃ আমি কেমন আছি জান্‌তেও আস্‌বেন। নবীন, চেয়ারটা সরিয়ে উজ্জ্বল-বাবুকে বস্‌তে দে।"

ব্যস্তভাবে উজ্জ্বল বলিল, "আপনি উঠ্‌বেন না, উঠ্‌বেন না, শুয়ে পড়ুন। আমি বস্‌ছি, আমার অভ্যর্থনার জন্য আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।"

অঞ্জলি শুইয়া পড়িল। চেয়ারটা টানিয়া লইয়া বসিতে বসিতে উজ্জ্বল বলিল, "সকালে খুব শুভ সময়ে বাড়ি থেকে বার হয়েছিলেন যা হোক, শেষে তার জের জ্বরে এসে দাঁড়াল।"

অঞ্জলি মৃদু হাসিয়া বলিল, "এ রকম হবে কি করে জান্‌ব' বলুন, তবে জ্বরটা পড়ে যাওয়ার জন্য নাও হতে পারে।"

উজ্জ্বল প্রশ্ন করিল, "ডাক্তার ডাকা হয়েছিল?"

"না, সবে আজ জ্বর হয়েছে, এর মধ্যে ডাক্তার ডেকে কি হবে?"

নানা প্রসঙ্গের অবতারণার ভিতর দিয়া উভয়ের ভিতর যে প্রথম পরিচয় হইয়াছিল ক্রমশঃ তাহা গাঢ় হইয়া আসিল, সঙ্গহীনা অঞ্জলি উজ্জ্বলকে পাইয়া আপন মনেই বকিয়া চলিয়াছিল। কথার মধ্যে সন্ধ্যা কখন্ নিশায় পরিণত হইয়া গিয়াছে তাহা কাহারও লক্ষ্যে পড়ে নাই।

সারদা কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এখন কিছু খাবে দিদিমণি?"

উজ্জ্বল্ সচকিতে বলিল, "তাই তো অনেক রাত্রি হয়ে গেছে, আসি তবে?"

"এখনি যাবেন আর একটু বসুন না।"

কুণ্ঠিতভাবে উজ্জ্বল বলিল, "আপনি অসুস্থ, বেশী কথা বলা উচিত নয়। আজ যাই, কাল আস্‌ব'। আপনি এবার ঘুমোতে চেষ্টা করুন।"

"কাল আপনি আস্‌বেন তো? ঠিক আস্‌বেন?"

"আস্‌ব' আপনি কেমন আছেন জান্‌তে আস্‌ব'।

উজ্জ্বল কক্ষ ত্যাগ করিল। পরদিন সকালেই সে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রবল জ্বরে অঞ্জলি তখন প্রায় লুপ্তসংজ্ঞ। তাহাকে দেখিয়াই সারদা বলিল, "কি কর্‌ব' বলুন দেখি বাবু, দিদিমণির এ রকম অসুখ তো কখনও হ'তে দেখি নি, আমাদের বড় ভয় কচ্ছে।"

অঞ্জলির নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া উজ্জ্বল প্রশ্ন করিল, "ডাক্তার আনা হয়েছিল?"

"ডাক্তার তো এই একটু আগে দেখে গেছেন, বল্লেন মাথায় বরফ দাও জ্বর কমে যাবে।"

"আচ্ছা তা হলে ভয়ের কিছু নাই। বরফ আর আইস-ব্যাগ আন্‌তে দাও, ওষুধটাও অমনি নিয়ে আসা হ'ক!"

"হাঁ, সে সব আন্‌তে গেছে এই এল বলে।"

উজ্জ্বল অঞ্জলির শয্যার একান্ত সন্নিকটেই একটা চেয়ার টানিয়া বসিল। দারুণ জ্বরে অঞ্জলির সুশ্রী সুগৌর আননে রক্তাভা ফুটিয়া প্রস্ফুটিত শতদলের মতই দেখাইতেছিল। দীর্ঘায়ত অক্ষিপল্লব, গোলাপের পাঁপড়ির মত সূক্ষ্ম ওষ্ঠ দুইটী মধ্যে মধ্যে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। আপনার অজ্ঞাতে উজ্জ্বলের বিমুগ্ধ দৃষ্টি কিছুক্ষণ সেই

মায়ের একটি সন্তান কি না দিদিমণি তাই হয়তো মা তোমার বিয়ে দিয়ে পরের ঘরে পাঠাতে চান না।"

"আহা কি কথাই বল্লে, আমাকে যদি মা তত ভালবাস্তেন তা হ'লে চিরদিন ধরে এমন করে দূরে রেখে দিতে পার্তেন না। মার কি এই কাশীবাস কর্বার বয়স মা কি? বিধবা কি কেউ হয় না—আমার অনেক বন্ধু আছে তাদেরও ত অনেকের বাবা নেই; কিন্তু মা তো তাদের কাছেই থাকেন, তাদের কত ভালবাসেন। আমার মা আমায় একটুও ভালবাসেন না।"

অঞ্জলির সুনীল নয়ন-প্রান্তে অশ্রু বিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

ব্যস্তভাবে সারদা বলিল, "কি ছেলে মানুষের মত কর দিদিমণি। মা কখনও সন্তানকে না ভালবেসে পারে, তোমার মা তোমাকে খুব ভালবাসেন। এত দিন তোমার পড়ার সুবিধা হবে বলেই তোমাকে এখানে রেখেছেন।"

"সে তো ভালই, কিন্তু মা কেন এখানে থাকেন না, যাদের বয়স বেশী তারাই কাশীবাস করে, মা কেন—"

"আহা তুমি বুঝ্ছ' না দিদি, বিধবা হয়ে মা বড়ই মনস্তাপে—"

বিরক্তভাবে অঞ্জলি কহিল, "হাঁ হাঁ আমি সব বুঝেছি তুই এখন যা।" সারদা পলাইতে পারিয়া বাঁচিয়া গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অঞ্জলি পুনরায় বাহিরের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল।

সত্য বড় কষ্টকর জীবন কি তাহার নহে? জীবনে পিতার স্নেহ সে অনুভব করিল না, মা থাকিয়াও যেন নাই। কেন এখনই তাঁহার কাশীবাস করিবার কি প্রয়োজন? কন্যার ভার দাস-দাসীর উপর দিয়া কোন্ মাতা এমনভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন? স্বামীকে হারাইয়া সংসারে তাঁহার ঔদাস্য আসা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু কন্যার প্রতিও কি একটা কর্ত্তব্য তাঁহার নাই?

অভিমানে অঞ্জলির চিত্ত ভরিয়া উঠিল! বেশ তো এত দিন যখন তাহাকে দূরে রাখা হইয়াছে তখন আর এখন কাছে লইয়া যাইবার প্রয়োজন কি? তাহার আকাঙ্ক্ষিতের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করুন, সে আর তাঁহার নিকটে যাইতে চাহিবে না। জননীর কর্ত্তব্য কি শুধু কন্যার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই শেষ হয়? একটু স্নেহ-মমতা যে সে চাইতে পারে এ কথা কি কখনও তাঁহার মনে হয় না? এত দিন যখন এই ভাবেই সে অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে, তখন এখন আর তাহাকে নিকটে রাখিবার কি প্রয়োজন? সেও আর তাহা চাহে না।

তাহার অভিপ্সীতের সহিত মিলনই আজ তাহার একান্ত কাম্য—একান্ত প্রার্থনীয়।

নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তামগ্না অঞ্জলির দিকে চাহিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে উজ্জ্বল ডাকিল,

অঞ্জলি সচকিতে চাহিল। হর্ষের দীপ্তি লাগিয়া তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। ক্ষুণ্ণস্বরে প্রশ্ন করিল, "কখন্ এলে তুমি? আমি তো জান্তে পারি নি!"

তাহারই পার্শ্বে শোফার একধারে বসিয়া পড়িয়া রহস্য-ভরা কণ্ঠে উজ্জ্বল বলিল, "যে গাঢ় চিন্তায় তুমি মগ্ন ছিলে তাতে আমি কখন এলুম তা টের পাওয়া দূরে থাক, তোমায় কেউ চুরি করে নিয়ে গেলেও যে তোমার চেতনা ফিরে আস্তো তাতো মনে হয় না। এত কি ভাবছিলে অঞ্জলি? আমাকে নয় নিশ্চয়ই! বল তো কে সে ভাগ্যবান্?"

সরল সপ্রেম দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া অঞ্জলি বলিল, "কাকেই যে আমি ভাব্‌ছি, তুমি অনুমান কর্লে কি করে?"

"সে কথা পরে জানাব অনুমান টা সত্যি কি না বল?"

"কতকটা কিন্তু—ও কথা যাক্, আমার মা আস্ছেন যে, কালই আস্বেন।"

"তাই না কি, ভালই হ'ল, আমি তো এই চাই-ছিলুম, এই বার তোমায় তা হ'লে আমার করে নিতে পার্ব্ব অঞ্জলি।"

উজ্জ্বলের আশাদীপ্ত পুলক-উদ্বেল কণ্ঠস্বর অঞ্জলির বক্ষেও হর্ষস্পন্দন জাগাইয়া তুলিল। হাসিমুখে সে বলিল, "কিন্তু মা যদি তোমাকে আমায় না দেন তা হ'লে? এইতো লিখেছেন আমায় এখন থেকে তাঁর কাছে গিয়ে থাক্তে হ'বে।"

উজ্জ্বলের দীপ্ত মুখশ্রী ঈষৎ ম্লান হইয়া আসিল, পর-ক্ষণেই সহাস্য মুখে সে বলিল, "হাঁ, নিয়ে গেলেই হ'ল আর কি,—আমি যেতে দিলে তো? এক বার তাঁকে

আস্‌তেই দাও মা তারপর দেখো আমি কেমন করে তাঁর কাছ থেকে তোমায় আদায় করে নিই ? তুমি কি আমায় এত অকেজো মনে কর; সত্যি অঞ্জলি আমি আর অপেক্ষা কর্‌তে পারছি না। কবে যে তোমায় পাব ?

অঞ্জলি কিছু বলিল না।

সেও যে উজ্জ্বলকে একান্ত আপনভাবে পাইতে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতের সুখময় চিত্র অনেক মোহন আশা লইয়া তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। পশ্চিম গগনপ্রান্তে তখন দিবসের চিতা জ্বলিয়া উঠিতেছিল। অস্ত-রবির বিদায়-কিরণ লেখা সুমধুর হাসির মত ধরণীর বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পাঁচ

সেদিন উষার আলো ভাল করিয়া আকাশের গায়ে না ফুটিতেই অঞ্জলি শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। আজ তাহার মা আসিবে,—দীর্ঘ এক বৎসর পর আবার সে জননীকে দেখিবে। আনন্দের পুলক-শিহরণ তাহার সর্ব্ব দেহ-মনে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। দ্রুতপদে সে সারদার কক্ষদ্বারে আসিয়া ডাকিল, "সারি উঠিস নি এখনও ? উঠে পড়, নবীনকে ডাক সে মাকে আন্‌তে ষ্টেশনে যাবে না ? কত বেলা হয়ে গেল যে।"

সারদা বাহিরে আসিয়া হাসিয়া বলিল, "এখনও ভাল করে ফর্সা হয় নি দিদিমণি, এত ব্যস্ত কি ?"

অসন্তোষভরা কণ্ঠে অঞ্জলি বলিল, "ডেরাডুন এক্সপ্রেস খুব সকালেই আসে, তুই নবীনকে পাঠিয়ে দে।"

নবীন চলিয়া গেলে, অঞ্জলি বাতায়ন সম্মুখে দাঁড়াইল। এই একটী বৎসর কি আগ্রহে, কি বেদনাতেই সে এই দিনটীর প্রতীক্ষা করিয়াছে। মা আসিবেন। তাহার দেহের প্রতি অণু পর্য্যন্ত যেন মাতার দর্শন-লালসার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। অধীর চিত্তে বার বার সে প্রাচীর-বিলম্বিত—ঘটিকার দিকে চাহিতেছিল। আশাদীপ্ত হৃদয়ের মত পূর্ব্ব গগন উজ্জ্বল করিয়া তরুণ অরুণ তখন পৃথিবীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল।

একখানা ট্যাক্সি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইতেই চঞ্চলপদে অঞ্জলি ছুটিয়া বাহিরে আসিল। মালতী তখন ট্যাক্সি হইতে সবে অবতরণ করিতেছিল। হর্ষ-বিজড়িত চক্ষে মাতার পদধূলি লইতে অগ্রসর হইয়াই অকস্মাৎ তড়িতাহত মূর্ত্তির মত অঞ্জলি স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। তাহার লঘু চরণের গতি বাঁধা পাইল। একটী বাক্যও তাহার ওষ্ঠের বাহিরে আসিল না।

মালতী কন্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বহুমূল্য সূক্ষ্ম সুনীল রেশমী সাড়ী তাহার অঙ্গে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পদযুগল বিনামা-মণ্ডিত। কণ্ঠ ও প্রকোষ্ঠে অলঙ্কারে শোভমান।

অঞ্জলি আপন নেত্রকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না! উভয় হস্তে নয়ন-মার্জ্জনা করিয়া সে জননীর দিকে চাহিল! এই কি তাহার মাতা ? অঞ্জলির সমস্ত জীবনের সত্তা যেন শুধু নয়নেই আশ্রয় লইয়াছিল!

বৈধব্যের শুভ্রবাসের পরিবর্ত্তে এ বেশে মালতীকে ঠিক পূর্ব্বের মত দেখাইতেছিল না। অঞ্জলি আর একবার নয়ন মুছিয়া সংশয়াকুল দৃষ্টিতে এই নারীই তাহার জননী কি না বুঝিতে চেষ্টা করিল।

কন্যার মনোভাব হয় তো মালতী ঠিকই অনুমান করিয়াছিল। তথাপি বাহিরে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া স্নেহমধুর কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, "ভাল ছিলে তো অঞ্জলি ?"

না আর সন্দেহ মাত্র নাই, এ কণ্ঠস্বর তাহার জননীরই! এই সুবেশ-সজ্জিতা নারী পূর্ব্বেকার বিধবা বেশধারিণী তাহার জননী! কিন্তু এ কি! এ কি! অঞ্জলি কিছুই বুঝিতে পারিল না। অচিন্তনীয় ঘটনার সংঘাতে তাহার চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল।

কন্যার হাত ধরিয়া মালতী বলিল, "পথের ধারে এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না, ভিতরে এস।"

যন্ত্রচালিতের মতই অঞ্জলি মাতার অনুসরণ করিল। আলোকোজ্জ্বল জগতের সমস্ত দীপ্তি তাহার নয়ন-সম্মুখ হইতে যেন নিবিয়া সমস্ত মসীময় করিয়াদিয়াছিল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অবশভাবে অঞ্জলি একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। নবীন ও সারদা অত্যন্ত নির্ব্বিকার ভাবেই মালতীর আনীত দ্রব্যাদি গৃহে আনিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াদিতেছিল। কোনরূপ চাঞ্চল্য কাহারও মধ্যে নাই! অঞ্জলি একবার তাহাদের দিকে চাহিল;

আর একবার জননীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিল। কথা বলিবার শক্তি তখনও তাহার ফিরিয়া আসে নাই।

সারদাকে ডাকিয়া মালতী কহিল, "আমার স্নানের ব্যবস্থা করে দে! এখনি আমায় এক জায়গায় যেতে হবে।" মুহ্যমানা তনয়ার দিকে একবার চাহিয়া মালতী সে স্থান ত্যাগ করিল। সারদাও তাহার সঙ্গে চলিল।

স্তব্ধ জড়মূর্ত্তির মত অঞ্জলি সেখানেই বসিয়া রহিল। কিছু যেন সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। আজন্ম মাতার বিধবা বেশই সে দেখিয়া আসিয়াছে। সে তো জানে জননী বিধবা হইয়া তীর্থে বাস করিতেছেন, তবে মাতার এ বেশ পরিবর্ত্তনের কি কারণ? লোক-সমাজে অধিক না মেশার দরুণ চিরদিন একাকী অবস্থান-হেতু সাংসারিক অভিজ্ঞতা অঞ্জলির বড় ছিল না। মাতার এ সুবেশ-ধারণের প্রকৃত কারণ অনেক ভাবিয়াও সে নির্ণয় করিতে পারিল না। সম্ভব-অসম্ভব নানারূপ চিন্তা এক-সঙ্গে তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। সারদা নবীনের দিকে চাহিয়া দেখিল তাহা-দের এই বেশ পরিবর্ত্তনে একটুও ভাবান্তর হইয়াছে কি না; কিন্তু তাহা দেখিতে না পাইয়া ভাবিল তাহারা কি তবে তাহার মাতার বেশ-পরিবর্ত্তনের কারণ পূর্ব্ব হইতে জানে? যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া শূন্য নয়নে অঞ্জলি আকাশের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বেলা বাড়িয়া উঠিতেছিল প্রভাতসূর্য্যের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ক্রমশঃ তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। কর্ম্মব্যস্ত জগতের কলরোল অঞ্জলির কর্ণে প্রবেশ করিয়া মাঝে মাঝে তাহার চমক ভাঙ্গিয়া দিতেছিল।

সারদাকে কি একটা উপদেশ দিতে দিতে মালতী নীচে নামিয়া আসিতেছিল। ব্যথিত-ক্লিষ্ট-দৃষ্টি তুলিয়া অঞ্জলি সে দিকে চাহিল। সুলোহিত সূক্ষ্ম বারাণসী বস্ত্র হইতে মালতীর সুগৌর বর্ণাভা বেশ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, মালতী সুন্দরী। মহার্ঘ্য রত্নালঙ্কার-সমাবেশে তাহাকে অধিকতর শ্রীমণ্ডিত করিয়াছিল। অঞ্জলি যেন জননীকে আজ প্রথম ভাল করিয়া দেখিল। যাতনা দিগ্ধ দীর্ণ হৃদয়ে সে আজ প্রথম দেখিল তার মাতার অপূর্ব্ব সুন্দর মুখে কুল-নারী-সুলভ সুপবিত্র ভাবের একান্ত অভাব। নারীর শীলতা সরম-জড়িত ভাবের পরিবর্ত্তে লালসার তীব্র বহ্নি তাহার বিশাল নেত্র হইতে যেন বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছিল। বঙ্গ-বিধবার পবিত্র বেশের অন্তরালে তাহার এ বেশ ত এতদিন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আজ এ কি সে দেখিতেছে! স্তব্ধভাবে সে জননীর অভিনব মূর্ত্তি কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিল। মালতী নিঃশব্দে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বিপুল বলে আপনাকে সংযত করিয়া অঞ্জলি এবার উঠিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তমধ্যে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, এ বেশ-পরিবর্ত্তনের কারণ সে জিজ্ঞাসা করিবে—এর কারণ অনুমান করিতে গিয়া সে পলে পলে আর দগ্ধ হইবে না—দৃঢ়চিত্তে অঞ্জলি ডাকিল, "মা!"

মালতী তখন কিছু দূরে গিয়াছিল। কন্যার আহ্বানে ফিরিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, "কি বল্‌ছো অঞ্জু?"

অঞ্জলির ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, ক্ষণেক নীরব থাকিয়া জড়িতকণ্ঠে সে কহিল, "এর কারণ কি তুমি আমায় বল।" প্রত্যেক বাক্যের সঙ্গেই একটা অজানা আশঙ্কা তাহার সর্ব্ব দেহ স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছিল। প্রত্যুত্তরে সে কি শুনিবে কে জানে।

একটু কুণ্ঠিত ভাবে মালতী কহিল, "কি বল্‌ব মা।"

"কি বল্‌বে আমি জানি না, তুমি বল। আজ এ বেশে কেন দেখা দিলে?"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া মালতী বলিল, "বুঝ্‌তে পাচ্ছি তুমি কি বল্‌তে চাও। কিন্তু মা হয়ে সে কথা আমি আর তোমায় কি বল্‌বো মা, ঐ সারদা সব জানে ঐ তোমার কথার উত্তর দেবে" বলিয়া ধীরে ধীরে কক্ষের বাহির হইয়া গেল।

তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টিতে অঞ্জলি সে-দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। এতক্ষণে সকল কথা যেন তাহার উপলব্ধি হল। মালতীর কথাগুলা তীক্ষ্ণ শায়কের মত শ্রবণে বিঁধিয়াছিল। এতক্ষণ যাহা রহস্যের মত প্রতীত হইতেছিল জননীর বাক্যে যেন তাহা কতকটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। একটা কৃষ্ণ যব-নিকা তাহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া গেল। জননীর এই দূরে দূরে অবস্থান, তাহার এই একান্ত নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন সকলের মর্ম্মই সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। একটা অপ্রিয় অতি ঘৃণ্য সত্য তাহার

সুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া সর্ব্বদেহ যেন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। স্খলিত-চরণে সে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বোধ করিল তাহার সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া পড়িয়াছে। সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া প্রাণপণবলে অসাড় দেহটা সে কোন গতিকে লইয়া চলিল। কারণটা জানিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া কোন রকমে রন্ধন গৃহের দ্বারে গিয়া অঞ্জলি ডাকিল, "সারি।"

ভিতর হইতে সারদা বাহিরে আসিল। অঞ্জলি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নতনেত্রে বলিল, "তুই কি জানিস্ বল্ আমাকে ?"

কুণ্ঠিতভাবে সারদা বলিল, "নাই শুন্‌লে দিদিমণি, সে সব কথা।"

বিকৃতকণ্ঠে অঞ্জলি কহিল, "না সমস্ত কথাই আমি জান্‌তে চাই, বল তুই।"

সারদা তথাপি নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

তীব্রস্বরে অঞ্জলি বলিল, "বল সমস্ত।"

"কি বলবো দিদিমণি মায়ের কথা তুমি মেয়ে—"

বাধা দিয়া রুষ্টকণ্ঠে অঞ্জলি বলিল, "তবু আমি সব জান্‌তে চাই, বল তুই।"

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া সারদা বলিল, "কি আর তুমি শুন্‌বে ? তুমি যাঁকে তোমার পিতা বলে জান তাঁর সঙ্গে তোমার মায়ের বিয়ে কোন দিন হয় নি। তোমার মা—" সারদার মুখ হইতে আর বাক্য নিঃসরণ হইল না।

বাত্যান্দোলিত তরুশাখার মত অঞ্জলির দেহ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। প্রাণান্ত চেষ্টায় আপনাকে সংযত করিয়া স্থিরকণ্ঠে সে বলিল, "তোর কথা শেষ কর।"

জড়িতকণ্ঠে সারদা বলিল, "তোমার মা, হাঁ তোমার মা কাশীর এক জন বিখ্যাত—আর কি বলব দিদিমণি।"

"না আর বল্‌তে হবে না, আমার মা পতিতা ; আমি পতিতার কন্যা। এই, এই তো তুই বল্‌চিস ?"

ম্লানমুখে সারদা বলিল, "হাঁ দিদিমণি, তোমার মা, তোমার মায়ের মা সকলেই তাই।"

অঞ্জলি অবশ দেহে ধীরে ধীরে ভূমির উপর বসিয়া পড়িল। বিশ্বের সমস্ত আলোক, সমস্ত সত্তা যেন তাহার চোখের সমুখ হইতে মুছিয়া গেল, শুধু একটা গভীর ধিক্কারে তাহার দেহ-মন ভরিয়া উঠিল।

তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া ব্যাকুলভাবে সারদা বলিল, "দিদিমণি, দিদিমণি অমন কচ্ছ কেন ? ওমা কেন মর্‌তে আমি ও-কথা বল্‌তে গেলুম। দিদিমণি !"

দুই হস্তে আপন বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া অঞ্জলি বলিল, "ভয় নাই আমার কিছু হয় নি। যে স্থান থেকে আমার উদ্ভব বল্লি তাতে এত শীগ্‌গির আমার আর কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। তারপর বাকিটা বলে দে, আমি এখানে আছি কেন ?"

"মার ইচ্ছা ছিল তুমি একটু লেখাপড়া শেখ। তারপর সন্তান,তার সামনে—একটু সংকোচ তো আছে। তাই তুমি যখন দু বছরের তখন হতেই আমাদের কাছে তোমায় দিয়ে দেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী কাশীতে তাঁর কাছে চাকরী কর্ত্তুম। এতদিন তুমি কষ্ট পাবে, লোকেও ঘৃণা করবে, তোমার পড়ার ক্ষতি হবে, সেই জন্যে এ কথা গোপন রেখেছিলুম, আর তাই তোমায় বড় কারো সঙ্গে মিশ্‌তে দিই নি।"

"এর চেয়েও একটা কাজ যদি কর্ত্তিস পারি তা হ'লে সব চাইতে ভাল হ'ত, একটু বিষ খাইয়ে যদি আমায় শেষ করে দিতিস তা হ'লে ভগবানও বোধ হয় তোদের উপর খুসী হতেন।"

টলিতে টলিতে কোনরূপে আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া অঞ্জলি শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। এই ঘৃণ্য হীন পরিচয়ের কথা তাহার সর্ব্বদেহে বিষাক্ত শলাকার মত বিঁধিতেছিল। সমস্ত জগৎ তাহার নিকট লুপ্ত হইয়া গিয়া শুধু একটী কথাই তাহার কাণে ধ্বনিত হইতেছিল,—সে পতিতার কন্যা, সে পতিতার কন্যা! সকলের অস্পৃশ্যা। কোন দোষে দোষী না হইলেও জগতের নিকট শুধু জন্মের অপরাধে সে হেয়, ঘৃণ্য, স্পর্শের অতীত। ও কি কষ্ট! এই হীন জন্মের পরিচয়, এই দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমার টীকা ললাটে ধরিয়া কিরূপে সে বিশ্বের সম্মুখে বাহির হইবে ? এই ঘৃণ্য জীবন কি করিয়া সে অতিবাহিত করিবে। অদৃষ্ট-দেবতার এ কি কঠোর পরিহাস! ভগবানের এ কি গুরুদণ্ড! সে তো কোন অপরাধ করে নাই। তবে কেন অমন হীন স্থানে বিশ্বদেবতা তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিলেন ? এ দুর্ব্বহ ঘৃণ্য জীবন কেমন করিয়া সে বহিবে ? গভীর বেদনায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ড

বহিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে আকুলভাবে সে কাঁদিতে লাগিল।

সে ভাবিল তাহার সতীর্থা, প্রতিবেশিনীবৃন্দ সকলেই যখন শুনিবে যে সে পতিতার দুহিতা, তখন তাহারা ঘৃণায় তাহার দিকে মুখ ফিরাইবে না। তাহার সহিত বাক্যালাপ করিবে না।

এই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় সে যখন অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তিমিরাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলে বিদ্যুৎবিকাশের মত উজ্জ্বলের কথা তাহার মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আরও নিবিড় ব্যথা তাহার সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন করিয়া দিল। এ কথা সেও তো জানিবে। নিশ্চয়ই জানিবে। অঞ্জলিই জানাইবে। তাহার নিকট এ বার্ত্তা গোপন থাকিবে না। কিন্তু তখন উজ্জ্বলও তাহাকে ঘৃণা করিবে। উঃ, না নাঃ! সমস্ত বিশ্ব তাহাকে ঘৃণা করুক, ক্ষতি নাই কিন্তু উজ্জ্বলের বিন্দু মাত্র ঘৃণাও যে তাহার অসহ্য হইবে। না না, উজ্জ্বল তাহাকে ঘৃণা করিবে না, করিতে পারিবে না। সে যে তাহাকে ভালবাসে। নিশ্চয় সে বুঝিবে জন্মের অপরাধ তো তাহার নয়, আর পূতিগন্ধময় পঙ্কের ভিতর পদ্মেরও তো জন্ম হয়। উজ্জ্বল আসিলেই সকল কথা তাহাকে জানাইয়া সে অন্তরের ভার লঘু করিবে। সেও তাহার এ ব্যথার অংশ লইবে। এ যে একাকী—আরও অসহনীয়। কখন সে আসিবে। অন্য কথা ক্ষণেক তাহার অন্তর হইতে বিদূরিত হইয়া উজ্জ্বলের চিন্তাই চিত্ত পূর্ণ করিল।

ধীর পদক্ষেপে মালতী কখন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল অঞ্জলি তাহা জানিতে পারে নাই। কন্যার ললাটে হস্ত স্পর্শ করিয়া সস্নেহ কণ্ঠে মালতী বলিল, "এমন সময় শুয়ে যে অঞ্জু? অসুখ করে নি তো?

উত্তপ্ত অঙ্গারখণ্ড হস্তে স্পর্শ হইলে মানুষ যেমন সত্রাসে সরিয়া যায়, তেমনি ভাবে কিছু দূরে সরিয়া অঞ্জলি উঠিয়া বসিল।

তনয়ার আরক্ত বিশুষ্ক মুখ, রোদন-স্ফীত নয়ন, বিশৃঙ্খল কেশবাস তাহার মনোভাবকে মালতীর নিকট সুস্পষ্ট করিয়া ধরিল। তথাপি সে তাহা লক্ষ্যের মধ্যে না আনিয়া স্নিগ্ধস্বরেই বলিল, "সব কথা শুনেছ তো?"

আর্ত্ত তীব্রস্বরে অঞ্জলি বলিয়া উঠিল, "শুনেছি, শুনেছি—সব জেনেছি। নিজের প্রকৃত পরিচয় জান্‌তে পেরেছি। এ কথা জানবার আগে মলুম না কেন? কেন তুমি আমার জন্মের সঙ্গেই গলা টিপে মেরে ফেল নি। তা হ'লে তো আজ এই সংকোচ, এই গভীর ঘৃণা আমায় বইতে হত না!"

মালতী উত্তর দিতে পারিল না। অপরাধীর মত শুধু মুখে একবার কন্যার অশান্ত নেত্রের দিকে চাহিয়া সে দৃষ্টি নত করিল।

গভীর ব্যথা-ভরা স্বরে অঞ্জলি আবার বলিল, "কেন আমায় বাঁচিয়ে ছিলে, যদি বাঁচিয়েছিলে তবে এ ভাবে আমায় পালন কর্ল্লে কেন? কেন জ্ঞানের সঙ্গেই নিজের পরিচয় আমায় জান্তে দাও নি। তা হ'লে তো এ কষ্ট এত কঠিন ভাবে ব্যথা দিত না।"

এবার নতমুখেই মালতী বলিল, "সে তোমারই ভালর জন্যে মা, ভেবেছিলুম—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিকৃতকণ্ঠে হাসিয়া অঞ্জলি বলিয়া উঠিল, "ভাল, আমার ভাল, মা যার বারাঙ্গনা তার আবার ভাল। উঃ এ আমার কি সর্ব্বনাশ তুমি করেছ!" উচ্ছ্বসিত অশ্রুভারে ছিন্ন লতাটীর মতই অঞ্জলি শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

মালতী বিশুষ্ক মুখে তাহার এই অবর্ণনীয় বেদনার তীব্রতা অনুভব করিতেছিল বহুক্ষণ কাঁদিয়া অঞ্জলি একটু শান্তভাবে উঠিয়া বসিল। ধীরে ধীরে মালতী বলিল, "সকাল থেকে কিছু খাও নি শুনলুম, এই বার খাবে চল।" অঞ্জলি উত্তর দিল না। মালতী পুনরায় তাহার হস্তে হস্ত রাখিয়া ডাকিল।

চকিতে তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া গিয়া অঞ্জলি বলিল, "বিরক্ত করো না, যাও এখান থেকে।"

মালতী কি বলিবার উপক্রম করিতেছিল।

তীব্রকণ্ঠে অঞ্জলি বলিল, "অনর্থক বাক্যব্যয় করে লাভ নাই। তুমি আমায় এ জগতে এনেছ। মায়ের কর্ত্তব্য কিছু পালন না কর্ল্লেও তুমি আমার গর্ভধারিণী জননী। তোমায় মিনতি করছি এখান থেকে চলে যাও, কতকগুলা অপ্রিয় সত্য বল্‌তে আমায় বাধ্য করো না। আর দেরী কর্ল্লে হয় তো মার সম্মান তোমায় দিতে পারব না।"

মালতীর মুখে এতক্ষণ যে টুকু অপরাধীর ভাব দেখা

যাইতেছিল কন্যার বাক্যে এবার তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। রোষগম্ভীরকণ্ঠে সে বলিল, "দেখ্ অঞ্জলি তুই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ কর্‌ছিস। কি এমন ব্যাপারটা হয়েছে শুনি যার জন্যে তুই এতকাণ্ড করছিস হঁা, আমি তো পতিতাই, তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে। এত টাকা খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়ে এখন এই ফল বুঝি আমায় উল্টো চোখ রাঙান, কিছু বলি নি এতদিন, তাই বড় আস্কারা পেয়ে গেছিস্ দেখ্‌ছি। ভাল চাস্ তো উঠে খেয়ে আসবি চল।"

অঞ্জলি স্তম্ভিত হইয়া গেল! মাতার এ মূর্ত্তিও তাহার সম্পূর্ণ অগোচর। এতদিন যতটুকুই সে তাহাকে দেখিয়াছে, তাহাতে তাহাকে স্নেহশীলা জননীরূপেই সে দেখিয়াছে।

অঞ্জলির মুখভাব দেখিয়া মালতী বুঝিল, তাহার বাক্য কাজ করিতেছে। পূর্ব্বের মত পরুষ-কণ্ঠে সে বলিল, "ওঠ, খা-দা বেড়া সব তাতে অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। আর তাতে দুঃখ্‌ই বা কি, রাণীর মত সুখে দিন্ কাটুবে। আমি তোর মা, তোর ভালর জন্যই চেষ্টা করি। লেখাপড়া তো অনেক হয়েছে এবার কাশীতে নিয়ে যাব। নিজেদের ব্যবসা আরম্ভ কর্‌বি। কাশীর একজন বড়লোক—"

এতক্ষণ নির্ব্বাকভাবে অঞ্জলি মাতার কথা শুনিয়া যাইতেছিল, তাহার শেষ বাক্য কয়টা শুনিবামাত্র জলন্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া তীব্রকণ্ঠে সে বলিল, "থাম তুমি, আর একটাও কথা উচ্চারণ কর' না।"

তাহার কণ্ঠস্বরে মালতী প্রথমটা থতমত খাইয়া গিয়াছিল। পরক্ষণেই উচ্চকণ্ঠে ভৎসনার স্বরে বলিল, "কেন আ মর? মনে কর্‌ছিস তুই আমায় চোখ রাঙিয়ে চল্‌বি! বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে না? আমি মালতী, কাশীর গুণ্ডারা পর্য্যন্ত আমায় ভয় করে, তুই আমায় ধমক দিতে আসিস। দু দিনে তোকে টিট্ করে দিতে পারি জানিস্। কালই তোকে কাশী নিয়ে যাচ্ছি দেখি তুই কেমন মেয়ে। আমারই অন্যায় হয়েছে এতদিন পর্য্যন্ত তোকে এখানে রাখা, চল এখন খেয়ে আস্‌বি চল। ভেবেছিলাম দু দিন এখানে থাক্‌ব তার দরকার নাই। তোকে নিয়ে কালই যাব। ওঠ এখন" বলিয়া মালতী তাহার দিকে হস্ত প্রসারণ করিল।

অঞ্জলি পর্য্যাঙ্ক হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবিচলিতকণ্ঠে বলিল, "তুমি যাই বল আর যাই হও মনেও করো না আমায় দিয়ে তোমার ঐ জঘন্য হীন কাজ করাতে পার্ব্বে! কি বলবো তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তেও আমার ঘৃণা হচ্ছে, এত নীচ তুমি! তুমি যে আমায় গর্ভে ধরেছ এতেই আমার দুঃখ। এইটা যদি আমি অস্বীকার কর্‌তে পার্‌তুম। যাও নিজের কাজে যাও, জালিও না।"

বিকৃতমুখে হাত দুইটা আন্দোলন করিয়া মালতী বলিল, "থাক্ যথেষ্ট নভেলী ঢংএ এক্ট করা হয়েছে, থিয়েটারে গেলেও তুই দেখ্‌ছি নাম কর্‌তে পার্ব্বি কিন্তু ও-সব কথায় আমি ভুলি না, আমার এই কাজই তোকে কর্ত্তে হবে। বেশ্যার মেয়ে তুই, সমাজ তো তোকে স্থান দেবে না। খাবি কি করে?"

"বেশ তো ভিক্ষে কর্ব্বার পথ তো কেউ বন্ধ করে নি।"

"ওরে ভিক্ষে করে দিন কাটানোও তত সহজ নয়। তাও তোর সে পথ বন্ধ কর্ব্বে, এই উঠ্‌তি বয়স আর ঐ রূপ। এতে ভিক্ষে করাও তোর পক্ষে নিরাপদ নয়, জেনে রাখিস। ও সব কথা ছেড়ে ভালভাবে আমার কথা মত চল, সুখে থাক্‌বি চিরদিন।"

গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া নবীন কহিল, "উজ্জ্বল বাবু এসেছেন দিদিমণি।"

মগ্ন ব্যক্তি উদ্ধারের উপায় দেখিলে যেমন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে তেমনই আগ্রহ ও আনন্দভরে অঞ্জলি বলিয়া উঠিল, "বস্‌তে বল আমি যাচ্ছি।"

সে অগ্রসর হইতে গেলে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর-কণ্ঠে মালতী বলিল, "তাকে বলে দাও নবীন এখন যেতে, দেখা হবে না।" তারপর কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিল, "দাঁড়া ঐ খানে!"

অঞ্জলি প্রথমটা স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া বলিল, "কি তুমি আমায় এমনি করে আট্‌কাতে চাও, কখনও না, আমি এখনই যাব। নবীন তুমি তাকে বস্‌তে বলো। আমি যাব পথ ছাড়।"

দ্বারের অর্গল বন্ধ করিয়া দিয়া মালতী কহিল, "বাবুকে বল নবীন, অঞ্জলি বাড়ি নাই কাল আসেন যেন।"

নবীন চলিয়া গেল। হতাশভাবে অঞ্জলি ভূমির উপর লুটাইয়া পড়িল।

স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ কন্যার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মালতী বলিল, "তোর উজ্জ্বল বাবুটীর কথাও আমি সারদার কাছে

শুনলুম। এঁর সঙ্গে বিয়ের স্থির পর্য্যন্ত করে রেখেছ, আর সেইজন্যই তোর এই তেজ, আমার কথার বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস। এর সঙ্গে আর দেখা হওয়া ঠিক নয়। কালই তোকে কাশী নিয়ে যাব। দেখি তুই সোজা হোস্ কি না।"

উঠিয়া বসিয়া তীব্রকণ্ঠে অঞ্জলি বলিল,—"কিছুতেই পারবে না। আমার মরণ তো তুমি আটকাতে পারবে না, মর্ব্ব সেও স্বীকার তবু তোমার পথ অনুসরণ কর্ব্ব না তোমার বৃত্তি অবলম্বন করব' না, কিছুতেই না। দেখি তুমি আমার কি কর্ত্তে পার।"

রোষতীব্রকণ্ঠে মালতী বলিল, "এই তোকে কর্ত্তে হবে। আর দু এক দিনের মধ্যেই এই পথে তোকে আসতেই হবে।"

"ওরে মরা তত সোজা নয় আমি অনেক দেখেছি, আচ্ছা তুই কর কতদূর করতে পারিস্। বাড়ির দরজা আজ চাবি বন্ধ করছি, কাল একবারে ট্রেণে তুলতে পারলে হয়। আমার পথে চলবেন না। বেশ্যার ঘরে সতী-সাবিত্রী হবেন, মরণ আর কি? বেশী লেখাপড়া শিখে গুণ বেড়েছে। দেখ ভাল ভাবে রাজি হবি কি না এখনও বল?"

"কিছুতেই না, যা ইচ্ছে তোমার কর্ত্তে পার।"

"বেশ তাই কর্চ্ছি তবে। ক্রুদ্ধা মালতী কক্ষ ত্যাগ করিল; অঞ্জলি আবার ভূমির উপর লুটাইয়া পড়িল।

সাত

গভীর রজনী। অঞ্জলি স্তব্ধভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। আজি সমস্ত ক্ষণ ধরিয়াই মালতী এক একবার আসিয়া উৎপীড়ন করিয়া গিয়াছে। কাল তাহাকে কাশী লইয়া যাইবার সমস্ত ব্যবস্থাই সে স্থির রাখিয়াছে। মুক্তির উপায় অন্বেষণ করিতে সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। কিরূপে এ গৃহ হইতে বাহির হওয়া যায়? দ্বারে মালতী চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া গিয়াছে। আজি না বাহির হইতে পারিলে আর তো উপায় নাই। অঞ্জলি নিঃশব্দপদে বাহিরের দ্বারের সন্নিকটে আসিল। গৃহবাসী সকলেই নিদ্রার ক্রোড়ে সুখ-সুপ্ত। সন্তর্পণে সে দ্বার স্পর্শ করিয়া দেখিল দ্বার রুদ্ধ। হতাশ ভাবে সে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। কি উপায়ে সে মুক্তি লাভ করিতে পারে? আজিকার এই রাত্রিটুকু মাত্রই যে সময়। সে সময় প্রতি মুহূর্ত্তে সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে কি করা যায়? আজি না মুক্ত হইতে পারিলে আর মৃত্যু ভিন্ন গত্যন্তর নাই। জননীর বৃত্তি জীবন থাকিতে সে গ্রহণ করিবে না। মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় তখন তাহার থাকিবে না। কিন্তু মৃত্যু? শত আশাময় এই তরুণ জীবন! উজ্জ্বল! উজ্জ্বলকে ছাড়িয়া সে স্বর্গেও যাইতে চাহে না। এখান হইতে বাহির হইয়া উজ্জ্বলের পার্শ্বেই সে আশ্রয় লইবে। আর তাহার দ্বিতীয় কামনা নাই। কিন্তু উজ্জ্বল তাহাকে আশ্রয় দিবে তো? সে যদি তাহাকে ঘৃণা করে, যদি পতিতার কন্যা বলিয়া সংকোচে তাহার সংস্পর্শ ত্যাগ করে। না না তাও কি সম্ভব? অপ্রিয় চিন্তাটা জোর করিয়া সে মন হইতে বিদূরিত করিল। উজ্জ্বল তাহাকে ঘৃণা করিবে না। সমস্ত জগৎ তাহার দিক হইতে ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেও উজ্জ্বল নিশ্চয়ই তাহাকে তুলিয়া লইবে। পত্নীরূপে না হোক দাসী-ভাবেও সে কি গৃহে স্থান দিবে না? নিশ্চয়ই দিবে। অধীর চঞ্চল ভাবে পুনরায় সে উঠিয়া দ্বার সমীপে আসিয়া সবলে রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিল। আবদ্ধ দ্বার মুক্ত হইল না। বার কয়েক নিস্ফল আঘাত করিয়া অঞ্জলি উঠিয়া দ্বিতলস্থ বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

অমানিশার আবরণ ভেদ করিয়া রাজপথ-প্রান্তস্থ অগণ্য দীপাবলি নিস্ফল নয়নে চাহিয়াছিল! নৈশ অম্বর নিবিড় মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন। আসন্ন-বর্ষণ সূচনা করিয়া শীতল সমীরণ উত্তাল ভাবে বহিয়া চলিয়াছিল। গগন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তীব্র হাস্য রেখার মত উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-শিখা রহিয়া রহিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। নগরীর সমস্ত সৌধই প্রায় নীরব। কখনও কখনও শুধু রাজপথ-বাহি শকটের কর্কশ শব্দ অতি বিকটভাবেই ধ্বনিয়া উঠিতেছিল। রজনী তখন অবসান প্রায়। বহুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া একটা অসম সাহসিক উপায় তাহার মনে আসিল। ইহাতে সে কতকটা উৎফুল্ল-চিত্তে আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া খান দুই বস্ত্র লইয়া ফিরিয়া আসিল। একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া দেখিল। কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে কি না, তাহার

পর নিপুণ হস্তে সে বস্ত্র দুই খানা বারান্দার লৌহ-থামের সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া নিম্নের দিকে ঝুলাইয়া দিল। তাহার বক্ষ সবলে স্পন্দিত হইতেছিল। ভয়ে সে বারেক নীচের দিকে চাহিল। তাহার পর বস্ত্রাংশ ধরিয়া ধীরে ধীরে নামিতে আরম্ভ করিল।

অঞ্জলি যখন ভূমিতে পদার্পণ করিল, তখন কিছু কিছু বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। মুক্তির গভীর আনন্দ তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া দিল। ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দ্রুত পদক্ষেপে সে রাজ-পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। মাথার উপর মত্ত পবন তখন ভৈরব লীলায় তাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আকাশের বক্ষ চিরিয়া শাণিত অসির ফলার মত বিজলী ছুটিয়া বেড়াইতে ছিল। দেখিতে দেখিতে প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হইল।

অবিশ্রান্ত বর্ষণে অনাবৃত-মস্তকে অঞ্জলি যখন উজ্জ্বলের গৃহ-দ্বারে আসিল, তখন মেঘস্তর ভেদ করিয়া প্রভাত আলো ধীরে ধীরে ধরণীর বক্ষে নামিয়া আসিতেছে। সিক্ত দেহে কম্পিত পদে অঞ্জলি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কর্ম্ম-নিরত এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া উজ্জ্বলকে সংবাদ দিতে বলিল। অঞ্জলি এ গৃহে সকলেরই পরিচিত। তাহার আর্দ্র দেহের ও শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া দাসদাসী সকলেই বিস্ময় বোধ করিল।

নিদ্রা-বিজড়িত চক্ষে অঞ্জলির আগমন সংবাদ পাইয়াই ত্রস্ত-চরণে উজ্জ্বল বাহিরে আসিল। একটা কাষ্ঠাসনের উপর ক্লিষ্ট অবশ দেহ-ভার ন্যস্ত করিয়া অঞ্জলি ব্যগ্রভাবে উজ্জ্বলের আগমন পথের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার আলুলায়িত দীর্ঘকেশ বহিয়া বারি রাশি ঝরিয়া ভূতল সিক্ত করিতেছে। সিক্ত-দেহ প্রভাতের শীতল সমীর স্পর্শে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। নয়নের ম্লান দৃষ্টি বেদনা-ভারাক্রান্ত।

একবার তাহার দিকে চাহিয়া বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে উজ্জ্বল বলিল, "একি অঞ্জলি, কি হয়েছে ?"

অঞ্জলির ওষ্ঠাধর একবার কম্পিত হইল, সহসা সে কিছু বলিতে পারিল না। পুনরায় উজ্জ্বল প্রশ্ন করিল, "একি তোমার সমস্ত কাপড়-জামা যে একেবারে ভিজে গেছে, কি হয়েছে ?"

উজ্জ্বলের মুখের দিকে একবার সকরুণ নয়নে চাহিয়া ক্ষীণ কম্পিত কণ্ঠে অঞ্জলি বলিল, "আমি, আমি এসেছি তোমার কাছে একটু আশ্রয় নিতে, আমার এ বিশ্বে আর কোথাও স্থান নেই।"

তাহার পার্শ্বে এক খানা চেয়ার টানিয়া লইয়া উজ্জ্বল স্নেহমাখা স্বরে বলিল, "কি হয়েছে আমায় বল দেখি অঞ্জলি ? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। কিন্তু তার আগে তোমার এ কাপড়গুলা বদ্‌লাবার আর একটু চায়ের ব্যবস্থা করি; এত ভেজার পর চা তোমার খুবই দরকার।"

অঞ্জলির বারণ না শুনিয়াই পরিচারিকাকে ডাকিয়া চা ও শুষ্ক বস্ত্র আনিতে আদেশ দিয়া উজ্জ্বল পুনরায় অঞ্জলির পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "হাঁ, এইবার বল তো অঞ্জলি কথাটা কি ?"

"বলেছি তো আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"

"এ আর নতুন কথা কি অঞ্জলি। আগেই স্থির হয়ে আছে। আমার এ ঘর যে তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছে,—তবে আজ নতুন করে বন্দোবস্তের কথা কেন ?"

বেদনা-ক্লিষ্ট হাসির রেখা অঞ্জলির শুষ্ক ওষ্ঠে ফুটিয়া উঠিল। ব্যথিত স্বরে সে বলিল, "কিন্তু আমি পূর্ব্বের সে অঞ্জলি নেই। আমার প্রকৃত পরিচয় আজ জেনেছি, শুনে হয় ত তুমিও ঘৃণা কর্ব্বে। নিজের উপর আজ আমারই ঘৃণা হচ্ছে। তবুও বড় আশায় আমি তোমার কাছে এসেছি।"

অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে উজ্জ্বল বলিল, "কি কি বলছো তুমি,—কি তোমার পরিচয় ?"

মর্ম্মভেদী স্বরে অঞ্জলি বলিল, "আমি, আমি পতিতার কন্যা, আমার মা পতিতা।"

"ওঃ ওঃ অঞ্জলি অঞ্জলি।" শরাহত বিহঙ্গ শিশুর মত উজ্জ্বল চেয়ারের উপর ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

স্তব্ধভাবে অঞ্জলি সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

বহু ক্ষণ এই ভাবে অতীত হইল। ভৃত্য চা ও বস্ত্রাদি রাখিয়া প্রস্থান করিল। তেমনই স্পন্দহীন দেহে উজ্জ্বল ও অঞ্জলি নির্ব্বাকভাবে বসিয়া রহিল। বাহিরে মেঘজাল সরাইয়া তরুণ অরুণ সরল হাসির মতই কিরণজাল তখন বিস্তার করিতেছিল। শীকর-স্নিগ্ধ সমীরণ স্পর্শে তরুপত্র

স্থিত সলিল-কণা বৃষ্টিধারার মতই ঝরিয়া পড়িতেছে। সিক্ত মৃত্তিকার গন্ধের সহিত অদূরস্থ বকুলগাছের মূল হইতে ঝরা-ফুলের মিঠা সৌরভ টুকু পবন বহিয়া চলিয়াছিল।

সহসা চেয়ার ছাড়িয়া উটিয়া দাঁড়াইয়া অঞ্জলির দিকে চাহিয়া নীরস কণ্ঠে উজ্জ্বল প্রশ্ন করিল, "এ কথা আমায় এতদিন জানাও নি কেন?"

তাহার শুষ্ক কণ্ঠস্বর অঞ্জলির বক্ষে সবলে আঘাত করিল। কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, "আমিও জানতুম না, কাল এসেছেন, কালই জানতে পেরেছি, মা আমায় কাশীতে নিয়ে ঐ বৃত্তি অবলম্বন করাতে চায়। আমি কোন রকমে পালিয়ে এসেছি তুমি ভিন্ন আর তো আমার কোন আশ্রয় নাই।"

"তুমি তোমার মায়ের অনুসরণই কর, সেই তোমার ভাল হবে।"

তীক্ষ্ণ সংশয়াকুল নয়নে অঞ্জলি উজ্জ্বলের দিকে চাহিল। একি তাহার অন্তরের বাণী, না পরিহাস! কিন্তু তাহার এই অবস্থায় পরিহাস কি সম্ভব। ব্যাথাতুর-কণ্ঠে সে বলিল, "একি বলছো তুমি? আমায় ঐ জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন কর্ত্তে বলছো।"

"কিন্তু তা ভিন্ন তোমার উপায় কি, সমাজে তো তোমার স্থান নাই।"

"কিন্তু কেন কি অপরাধ আমার, আমি পতিতার কন্যা সত্য কিন্তু সে অপরাধ তো আমার নয়, তবে কেন আমার স্থান সমাজে নাই?"

"তা জানি না কিন্তু সমাজের দ্বারে তোমার পক্ষে রুদ্ধ অঞ্জলি।"

"কিন্তু তোমার দ্বারও কি আমার কাছে বন্ধ; তুমি কি আমায় আশ্রয় দেবে না?"

"অঞ্জলি আমি তো সমাজের বাইরের নই।"

"এই তোমার বিচার? কিন্তু আমার কি উপায় হবে?"

"নতমুখে" উজ্জ্বল বলিল, "তোমার মা'র সঙ্গে যাও, ঐ ভাবেই দিন কাটান ভিন্ন আর কি উপায় তোমার হতে পারে।"

"কোন উপায় নাই? শুধু জন্মের অপরাধে আমার এই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র জীবন ধরে বেঁধে তোমরা নরকের দ্বারে এগিয়ে দেবে, অথচ আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধী।" যুক্ত-করে নতজানু হইয়া অঞ্জলি উজ্জ্বলের পাদমূলে বসিয়া বলিল, "দয়া কর, দয়া কর আমায়। তোমার পত্নীত্ব চাই না, দাসীর মত আমায় গৃহে স্থান দাও।"

একটু সরিয়া গিয়া ব্যথিতকণ্ঠে উজ্জ্বল বলিল, "আমি নিরুপায় অঞ্জলি, সমাজের বিরুদ্ধাচরণ কর্ত্তে পারবো না। আমায় ক্ষমা কর।"

"তার কিছু দরকার নাই—এত তরল চিত্ত তোমাদের, অথচ কালপর্য্যন্ত তুমি আমায় ভালবাস, কত ভালবাস বলেছ।"

"অঞ্জলি অঞ্জলি ভগবান জানেন তোমায় কত ভালবাসি কিন্তু তবু আমি যে তোমায় স্থান দিতে পাচ্ছি না তোমার মা পতিতা এ কথা কি করে ভুলব', সমাজই বা কি বলবে।"

"তার কিছু দরকার নাই, তোমায় বিব্রত কর্ত্তে চাই না আমি চল্লুম।"

"কোথায় যাবে অঞ্জলি তোমার মার কাছেই যাবে তো?"

"না—কখনই মার কাছে যাব না। অনাহারে মরণকে বরণ কর্ব্ব সেও ভাল তবু মার বৃত্তি অবলম্বন করব না।"

"কিন্তু কোথায় যাবে তুমি, একটা স্থান তো চাই?"

অঞ্জলি পুনরায় বসিয়া পড়িল, ভাবিতে লাগিল সত্যই তো কোথায় গিয়া সে দাঁড়াইবে? বান্ধবী সতীর্থারা যে তাহাকে গৃহে স্থান দিবে তাহারই বা স্থিরতা কি? যেখানে হউক আশ্রয় তো একটা চাই। তাহার পর জীবন-ভার নির্ব্বাহের জন্য একটা পন্থা তো অবলম্বন করিতে হইবে, কিন্তু উপস্থিত কোথায় যাওয়া যায়?

ক্ষণেক ভাবিয়া সে বলিল, "তোমার বাড়ীতে কি আমায় দিন কয়েকের জন্যও স্থান দিতে পার না, মাত্র চার পাঁচ দিন, তার মধ্যে একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় আমি করে নেব।"

কুণ্ঠিতভাবে অন্য দিকে চাহিয়া উজ্জ্বল বলিল, "অঞ্জলি বুঝতে পারছো তো এই সব দাসী-চাকর রয়েছে, কি ভাববে তারা। নইলে দুদিন তোমায় স্থান দেওয়া সে আর বেশী কথা কি? এই বোঝাই কি না।"

"থাক আর বোঝবার দরকার নাই! দাসী চাকর কি ভাববে এইটাই আজ তোমার সমস্যা দাঁড়াল,

অথচ একটু আগেও এ গৃহে সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে তুমি আমায় বরণ কর্ত্তে সম্মত ছিলে। কিন্তু যাক ও কথা একটা উপকার কর্‌বে কি ?”

উজ্জ্বল আনত আননে দাঁড়াইয়াছিল। ধীরে ব্যথিত দৃষ্টি উন্মিলিত করিয়া বলিল, “কি বল ?”

কণ্ঠবিলম্বিত মূল্যবান্ হারটা উন্মোচন করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া অঞ্জলি বলিল, “এইটার বদলে আমায় কিছু টাকা দাও।”

“টাকা এখনি দিচ্ছি অঞ্জলি, কিন্তু হারটা তুমি পর, ওটা আমি নিতে পার্‌ব’ না।”

তা হ’লে থাক্ আমি অন্য কোথা হতে এটা বিক্রী করে টাকা নেব। তোমার দয়ার দান আমি নেব না” বলিয়া অঞ্জলি উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যগ্রভাবে উজ্জ্বল বলিল, “আচ্ছা তুমি হার রেখেই টাকা নাও। উজ্জ্বল সে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

শূন্যদৃষ্টিতে অঞ্জলি সেই দিকে চাহিয়া রহিল। এই জগত এত স্বার্থপর, এত নির্ম্মম! অবস্থার প্রভাবই এখানে এত অধিক। মানব হৃদয়ের স্নেহ-মমতা, করুণাও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এত ক্ষণভঙ্গুর, এত চপল তাহা।

নোট কয়খান অঞ্জলির সম্মুখে রাখিতেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, “যাচ্ছি তা হ’লে।” উজ্জ্বলের অক্ষি-প্রান্তে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

শুষ্ক হাসির সহিত অঞ্জলি বলিল, “ও উচ্ছ্বাসের কোন প্রয়োজন নাই। যাই তা হ’লে সে কয় পদ অগ্রসর হইল।

“একটু দাঁড়াও অঞ্জলি। আমায় এতটা ভুল বুঝ না।”

সকরুণ নয়ন অঞ্জলি একবার উত্তোলিত করিল। উজ্জ্বলের কাতর-কণ্ঠ তাহার সমস্ত অন্তর আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু কেন এ অপ্রয়োজনীয় উচ্ছ্বাস। কর্ত্তিত নীপমূলে বারি-সেচনের মতই যে ইহা অর্থহীন। শুধু ব্যথিতকে আরও উৎপীড়িত করা। আপন অন্তরের আকুলতা প্রাণপণে দমন করিয়া সহজ সুরে সে বলিল, “সবই যখন শেষ হয়ে গেছে তখন বৃথা কেন এ আবার। না তোমায় আমি ভুল বুঝি নি। তুমি ভালই করেছ’। সত্যই এ সমাজচ্যুতা পতিতার কন্যার কন্যাকে গ্রহণ করে কেন তুমি চিরদিন কষ্ট সহ্য কর্ব্বে এ ভালই হ’ল।” দ্রুতপদে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিষ্পলক নয়নে সেই দিকে চাহিয়া স্তব্ধ মর্ম্মর মূর্ত্তির মত উজ্জ্বল দাঁড়াইয়া রহিল।

আট

জাহ্নবীর শীতলবক্ষে আশ্রয়-গ্রহণের তীব্র লালসাটাই অঞ্জলিকে ক্রমাগত প্রলুব্ধ করিতে থাকিলেও প্রাণপণে সে আপনাকে সংযত করিল। মৃত্যু সে তো আছেই। কিন্তু যদি কোনরূপে জীবন-ধারণের একটা ব্যবস্থা করা যায় তাহার উপায় করাই এখন কর্ত্তব্য।

সর্ব্বাগ্রে একটা আশ্রয়ের সন্ধান করাই অঞ্জলি প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করিল। যেখানে হউক একটা বাটী ভাড়া লইয়া প্রথমটা তো একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যাক, অন্য কথা পরে। উৎসুক ব্যগ্র-নয়নে পথ-প্রান্তস্থিত বাটী গুলির দিকে চাহিতে চাহিতে সে পথ চলিতে লাগিল। সম্পূর্ণ একটা বাটী না লইয়া কোন ভদ্র-গৃহস্থের বাটিতে একখানা ঘর লইয়া থাকাই সে সঙ্গত মনে করিয়া সেইরূপ ঘর ভাড়ার সন্ধানে ব্যাকুল ভাবে সে পথ হইতে পথান্তরে চলিতে লাগিল।

বহুক্ষণ ঘুরিবার পর ক্লান্ত অবসন্ন ক্ষুধা-তৃষ্ণা-পীড়িত নির্জ্জীব দেহটাকে যখন সে একটা অনতিবৃহৎ বাটীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থাপিত করিল, তখন প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। প্রখর রবিকরে সন্তপ্ত অঞ্জলি একটা উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বক্ষ মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া একবার কি মনে করিয়া উপরের দিকে চাহিল। বাটীর সম্মুখের দ্বিতল বারান্দা হইতে ঘর ভাড়া দেওয়া যাইবে লেখা একখানা চৌকা কাগজ দড়ি দিয়া ঝুলান রহিয়াছে দেখিতে পাইল। সেইদিকে চাহিয়া আশান্বিত হৃদয়ে অঞ্জলি রুদ্ধ বাহির দ্বারের কড়া নাড়িল। তাহার শ্রমক্লিষ্ট দেহ তখন প্রায় অবশ হইয়া আসিয়াছিল।

মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি দ্বার উন্মোচন করিয়া অবাক হইয়া অঞ্জলির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার বেদনা-কাতর মুখশ্রী, বিশৃঙ্খল বেশভূষা, সর্ব্বোপরি একাকিনী তরুণীকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় সীমাতিক্রম করিতেছিল।

লোকটী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই অঞ্জলি প্রশ্ন করিল,

"এই বাড়িতে ঘর ভাড়া দেওয়া হবে? বাড়ির মালিক কি আপনি?"

আরও বিস্মিত হইয়া লোকটী বলি, "হাঁ। কেন?"

"আমি তা হ'লে ভাড়া নেব। আগাম ভাড়া দিচ্ছি।" অঞ্চলাগ্রে বাঁধা নোট কয়খানা সে স্পর্শ করিল।

"আপনি ভাড়া নেবেন, আর কে থাকবে?"

"কেউ না একা আমিই থাকব।"

"একা আপনি?" অতীব আশ্চর্য্যে সে চাহিয়া রহিল।

"হাঁ একা আমিই। আর আগেই বলে রাখি আমি ভদ্রবংশজাতা নই। এক পতিতা নারী আমার মা। আমি পতিতার কন্যা।"

ভদ্রলোকটী সঙ্কোচের সহিত কিছু দূরে সরিয়া গিয়া রূঢ়কণ্ঠে বলিল, "তোমার তো স্পর্দ্ধা কম নয়, বেশ্যার মেয়ে হয়ে এসেছ' ভদ্রলোকের বাড়িতে ঘর ভাড়া নিতে। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখনি।"

আরক্ত-মুখে নিঃশব্দে অঞ্জলি পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। কোনরূপে কিছুদূর চলিয়া একটা জনহীন গলির মধ্যে আসিয়া সে শ্বলিত দেহে বসিয়া পড়িল। এখন উপায় কি? জন্মগত এ কালিমার টীকা থাকিতে সে তো কোন ভদ্রপরিবারের মধ্যে বাস করিতে পারিবে না। বেচারা ভাবিল, পথের ধূলাই বুঝি তাহার যোগ্য স্থান। কি পাপে এ শাস্তি তাহার হোল? সে তো কোন অপরাধে অপরাধী নহে। নিষ্ঠুর জগৎ কোন্ দোষে এ কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিল। ক্ষোভে দুঃখে তাহার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু না এত শীঘ্র হতাশ হইয়া পড়িলে চলিবে না তো। সত্যই তো ভদ্রগৃহস্থ ঘরে তাহার স্থান হইবে কি রূপে? স্বতন্ত্র বাটীর চেষ্টা দেখা যাক। আশ্রয় তো চাই, এ ভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে কি করিয়া। অশ্রু মুছিয়া অবসন্ন দেহটা কোন মতে তুলিয়া আবার সে অগ্রসর হইল।

পঞ্চম

অঞ্জলির মাতৃ-গৃহ হইতে বিদায় লইবার মাস দুই অতীত হইয়া গিয়াছে। কোন ভদ্র পরিবারের মধ্যে স্থান পাওয়া দুরূহ দেখিয়া বাধ্য হইয়া একটা স্বতন্ত্র বাটী লইয়া সে বাস করিতেছিল। বাটী ভদ্রপল্লী মধ্যেই অবস্থিত। তথাপি একাকিনী তাহাকে বাস করিতে দেখিয়া তাহার প্রকৃত পরিচয় অনুমান করিয়া লইতে পল্লীবাসীর কষ্ট হইল না। উপদ্রবও তাহারা তাহার উপর যথেষ্ট আরম্ভ হইল। নিত্য অকর্ম্মণ্য যুবকগণের কুৎসিত ইঙ্গিতের অত্যাচারে অঞ্জলি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উপায়ও তো নাই। যেখানে যাইবে সেখানে এ ব্যাপারের পুনরাভিনয় ঘটিবে। কোন মতে চোখ-কাণ বন্ধ করিয়া সে দিন কাটাইতে লাগিল।

এই দুই মাস ধরিয়া সহরের সমস্ত বালিকা-বিদ্যালয়, সমস্ত হাঁসপাতালে সে চাকরীর জন্য চেষ্টা করিয়াছে। শুধু তাহার জন্মের অপরাধে কোনস্থানেই সে কার্য্য পায় নাই। কলিকাতার বাহিরেও বহুস্থানে সে আবেদন পত্র পাঠাইয়া বিফল হইয়াছে। প্রত্যহ প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই কার্য্যের সন্ধানে ঘুরিয়া ফিরিয়া দিনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করাই তাহার একরূপ নিত্য কার্য্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া আহার কোন দিন হয়, কোন দিন হয় না। ক্রমাগত আশাভঙ্গ হওয়ায় ক্লান্ত অবসন্ন হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অঙ্গস্থিত অলঙ্কার-বিক্রয়-লব্ধ অর্থও প্রায় নিঃশেষিত। অভাবের তাড়নায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ সহস্র দুঃখের চিত্র ফুটাইয়া তাহার অন্তরে নিবিড় আতঙ্ক জাগাইয়া তুলিতেছিল। চিরদিন সুখের অঙ্কে পালিত দেহও কঠিন ক্লেশে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তথাপি সকল বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়াও প্রাণপণে সে একটা কিছু কার্য্যের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। যাহাতে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলা সৎপথে থাকিয়া সে অতিবাহিত করিতে পারে।

স্তব্ধভাবে শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া অঞ্জলি ভাবিতেছিল, কি দারুণ অভিশপ্ত জীবন তাহার। আশা-ভরা তরুণ হৃদয়ে কত সুখের স্বপ্নই সে রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। আকস্মিক বজ্রাঘাতের মত অদৃষ্টের কঠিন হস্তস্পর্শে তাহার সমস্ত আশা অঙ্কুরেই শুকাইয়া গেল। তাহার কুমারী হৃদয়ের অম্লান প্রেমের অর্ঘ্য যাহাকে সে নিবেদন করিয়াছিল, সে স্পষ্টই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এই নিঃসঙ্গ, লাঞ্ছিত রিক্ত জীবন-ভার চিরদিন বহিয়া চলিতে হইবে। হৃদয়ভরা এ বেদনার হাহাকার তাহার সমস্ত জীবন পুড়াইয়া ছার করিবে। কেহ তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে

না। কারণ সে পতিতার কন্যা, ঘৃণ্য, সকলের অস্পৃশ্য। জননীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াই এই তাপদগ্ধ হতাশ জীবন তাহাকে বহন করিতে হইবে। এই তাহার অদৃষ্ট-লিপি! যাক্ তাহাতে দুঃখ নাই। একবার ভাবিয়াছিল উজ্জ্বল হয়তো তাহাকে গ্রহণ করিবে! সে কিন্তু তাহা না করিয়া তাহার ক্ষীণ আশার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে।

থাক সে অতীতের বৃথা চিন্তা। কি ভাবে এখন দিন অতিবাহিত হইবে সেই যে আজ দারুণ সমস্যা।

পরিচয় গোপন করিলে কার্য্য-সংগ্রহ তাহার পক্ষে দুরূহ ছিল না কিন্তু দারুণ ঘৃণায় সে মিথ্যার আশ্রয় লয় নাই। ইহাতে চিরদিনই এই ভাবে কাটাইতে হয় যদি তাও ভাল। একটা উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোন এক বালিকা বিদ্যালয়ে ও হাঁসপাতালে দুইটা কার্য্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আর একবার সেই চেষ্টায় সে বাহির হইবে স্থির করিল। সমস্ত দিবসের শ্রমক্লান্ত দেহ আর চলিতে চাহিতেছে না। তবু সে অসীম ধৈর্য্যের সহিত মনে মনে বলিল, এ টুকু শ্রান্তিতে অবসন্ন হইলে চলিবে না তো।

অঞ্জলি গৃহদ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া পুনরায় পথে বাহির হইল। বিদ্যালয়-গৃহে যখন সে উপনীত হইল, তখন সেখানকার কর্ত্রী কার্য্য-অবসানে গৃহে ফিরিতেছেন; তথাপি ক্ষণ কালের জন্য তিনি অঞ্জলির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আশা-উদ্বেগ বক্ষে অঞ্জলি আবেদন পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিল। কর্ত্রী বাঙ্গালী, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীনী। অঞ্জলিকে বসিতে বলিয়া তিনি কাগজখানিতে দৃষ্টি সংযোগ করিলেন।

কিছুদূর পড়িয়া দুইটা আবশ্যকীয় প্রশ্নের পর তিনি বলিলেন, "তোমায় কাজে নিযুক্ত কর্ত্তে আমার আপত্তি নাই, কাল তুমি আমার সঙ্গে দেখা কর'। এখানে বোর্ডিং-এই তুমি থাকৃতে পাবে। আচ্ছা আজ যেতে পার।" আশাদীপ্ত পুলকভরা বক্ষে অঞ্জলি ফিরিল।

সহসা বিদ্যালয়ের কর্ত্রী ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "একটা কথা, তুমি কি হিন্দু?" অঞ্জলির বুকের মধ্যটা বারেক কাঁপিয়া উঠিল। আরক্ত-মুখে সে উত্তর দিল, "হাঁ হিন্দু।"

"কোন জাতি? কিছু মনে কর'না আমাদের নিয়ম এগুলো জেনে রাখা।"

অঞ্জলি স্তব্ধভাবে স্থিরকণ্ঠে কিছুক্ষণ ভূমির দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বিনীতস্বরে বলিল, "কি জাতি তাহা আমি জানি না, আমি পতিতার কন্যা।

কর্ত্রী চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠি আরক্ত-লোচনে বলিলেন—যাও যাও তুমি, তোমায় আমি কাজ দিতে পারবো না, কোন্ সাহসে তুমি এসেছ ভদ্র মেয়েদের শিক্ষার ভার নিতে। চলে যাও এখান থেকে। জেনে রেখ এ সব স্থানে তোমাদের আস্‌বার কোনও অধিকার নাই।"

নীরবে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া অঞ্জলি পুনরায় পথে আসিয়া পড়িল।

নৈরাশ্যের তীব্র আঘাতে সমস্ত অন্তর যেন তাহার দীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। সে ভাবিল, আর তো সহ্য করিতে পারা যায় না। অভাগিনী জননী এ কি দুরপনেয় কালিমার টীকা আমার ললাটে বসাইয়া আমাকে জগতে আনিয়াছিলে, যাহার জন্য আমার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। কি অপরাধ আমার। আমি সৎচরিত্রা, শান্তপ্রকৃতি। শিক্ষা যাহা পাইয়াছি তাহাতে জীবন-ভার নির্ব্বাহের উপযুক্ত কার্য্য তো অনায়াসেই সংগ্রহ করিতে পারি। তবে কেন সকল স্থান হইতে ঘৃণ্য সারমেয়র মত আমাকে বিতাড়িত হইতে হইতেছে। চিন্তিত অন্তরে স্খলিত-শিথিল গতিতে গৃহাভিমুখে ফিরিয়া চলিল। কাল একবার হাঁসপাতালে গিয়া শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে, তাহারপর নিশ্চেষ্ট হইয়া ঘরে থাকিয়া অনাহারে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবে।

দশ

সন্ধ্যা রজনীতে পর্য্যবসিত হইয়া নিশীথিনীর তিমির-বসন তখন সমস্ত বিশ্বের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তৃতীয়ার চন্দ্রমা অস্তের পথে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

বালীগঞ্জের একটা হাঁসপাতালে একজন রোগিণীর শিয়রে অঞ্জলি বসিয়াছিল। রোগিণী অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছে, নিপুণ-হস্তে অঞ্জলি তাহাকে পরিচর্য্যা করিয়া শান্ত করিতেছিল।

মাস তিনেক হইল সে এখানে কাজ লইয়াছে। তাহার সৌভাগ্য বশতঃ এখানে তাহার পরিচয় না লইয়াই

কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল! ইতিমধ্যে শুশ্রূষাকারিণীর কার্য্যে সে দক্ষতা লাভ করিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

অঞ্জলি আশা করিয়াছিল তাহাকে ছন্নছাড়াভাবে আর দিন অতিবাহিত করিতে হইবে না। এত দিনে তাহার লক্ষ্য-হীন জীবনতরী কূলে আসিয়াছে। জীবন কাটাইবার একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থা সে লাভ করিয়াছে। এই ভাবে পীড়িতের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়া সে তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়াছে।

এই সময় রোগিণী একবার অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ক্ষিপ্রহস্তে একটা ঔষধ গ্লাসে ঢালিয়া অঞ্জলি স্নেহার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"বড় কষ্ট হচ্ছে কি? মঃ পালিতকে সংবাদ দেব?"

"কর যা হয় আর সহ্য করতে পার্চ্ছি না, বড় কষ্ট।" বিকৃতমুখে রোগিণী পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিল।

অত্যন্ত ধীরতার সহিত তাহাকে অন্য পার্শ্বে শোয়াইয়া দিয়া অঞ্জলি বলিল, এই ওষুধটুকু খেয়ে নিন, আমি ডাক্তার পালিতকে ডেকে আনছি। তাহার গাত্র স্থিত আবরণ খানা টানিয়া দিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল

ডাক্তার পালিতের কক্ষে বসিয়া যে লোকটীর কথা বলিতেছিল তাহার দিকে চাহিয়াই অঞ্জলি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য পাইবার জন্য একবার ইহারই গৃহে গিয়া জন্মের অপরাধে অত্যন্ত অপমানিত হইয়াই সে বিদায় হইয়া আসিয়াছিল।

তাহাকে ভদ্রলোকটী চিনিলেন। মৃদু হাসিয়া অঞ্জলির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বুঝি শেষে এখানে কাজ নিয়েছ? ভাল। ডাক্তার পালিত আপনি কি এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের এখানে এখন কাজ দিচ্ছেন? এরাই আপনার নার্স?"

অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত ডাক্তার পালিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই শ্রেণী মানে? ও কোন্ শ্রেণীর স্ত্রীলোক?"

"ওকেই? জিজ্ঞাসা করুন না। আমার কাছে কাজ নিতে গিয়ে তো উনি সত্য পরিচয়ই দিয়েছেলেন? আপনার কাছেও সত্য গোপন করবেন না নিশ্চয়।

অঞ্জলি মুখ তুলিয়া বলিল, "না সত্য আমি কোন অবস্থাতে গোপন করবো না এ আপনারা জানবেন।"

ডাক্তার পালিতের উত্তরে অকপটে সমস্ত কথা সে বলিয়া গেল।

গম্ভীরভাবে শির-সঞ্চালন করিয়া বালীগঞ্জ নার্সিং হোমের অধ্যক্ষ—ডাক্তার পালিত বলিলেন, "তোমায় কাজ থেকে আমি অবসর দিচ্ছি মিস্ রায়।"

রুদ্ধকণ্ঠে অঞ্জলি বলিল, "কি আমার অপরাধ?"

"তোমার অপরাধ। দোষ তুমি কিছু কর নি অবশ্য কিন্তু ও-কথা জানবার পর তোমার এখানে স্থান দেওয়া আমার অসাধ্য। আর তোমারও এ ভাবে আত্ম-পরিচয় গোপন করা উচিত হয় নি।"

আসন হইতে দাঁড়াইয়া স্থিরকণ্ঠে অঞ্জলি উত্তর করিল, "কিন্তু আমার পরিচয় তো আপনি কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন নি। আমি নিজে কিছু তখন বলি নি সত্য কিন্তু মিথ্যা আচরণের প্রবৃত্তি আমার নাই, তাই আজ এ আপনার জিজ্ঞাসার উত্তরে সত্য পরিচয়ই দিয়েছি।"

অপ্রতিভভাবে ডাক্তার পালিত বলিলেন, "তা সত্য, আমারই অন্যায় হয়েছিল পরিচয় না জেনেই তোমার কার্য্যে নিযুক্ত করেছিলাম। তুমি কিছু মনে করোনা তোমার এ মাসের পুরো বেতনই দিয়ে দিচ্ছি, নার্সের কাজ তুমি তো বেশই শিখেছ। আমি না রাখলেও আর কোথাও কাজ নিশ্চই পাবে।"

বাস্পগদগদ কণ্ঠে অঞ্জলি বলিল, "সে আশা একটুও নাই এই পাঁচ মাস ধরে সমস্ত কলকাতা সহরের প্রতি হাঁসপাতালে ও বালিকা-বিদ্যালয়ে কাজের জন্য চেষ্টা করেছি। শুধু জন্মের অপরাধে সকলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। অন্য স্থানেও আবেদন করে বিফল হয়েছি। নিজের পরিচয় আমি কোথাও গোপন করি নি। তবে আপনি কিছু জানতে চান্ নি বলেই তখন বলি নি।"

ক্ষুব্ধভাবে ডাক্তার পালিত বলিলেন, "আমি দুঃখিত হচ্ছি মিস্ রায়, কিন্তু কি করবো বল, এক জন পতিতার কন্যাকে তো এখানে কোনক্রমেই রাখা চলে না।"

"থাক্ আমি চল্লুম তবে, দেখি অদৃষ্ট আবার কোন্ পথে নিয়ে যায়।" বলিয়া ধীরপদে অঞ্জলি অগ্রসর হইল।

পালিত ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার মাইনেটা।"

"ওঃ ভুলে গেছি দিন। এইটাই এখন উপস্থিত আমার সম্বল।" সে টাকা কয়টি তুলিয়া অঞ্জলি হস্তস্থিত ক্ষুদ্র

ব্যাগটীর মধ্যে রাখিয়া দিয়া বলিল, "চলুম তবে। আপনার চিকিৎসা আর পবিত্রতা অব্যাহত ত থাক। নমস্কার।"

"নমস্কার মিস রায়। আশা করি তুমি দুঃখিত হবে না।"

"ডাক্তার পালিত দুঃখ আমার হবে না। যে অবস্থায় এসে পড়েছি তাতে আমার পক্ষে সুখ-দুঃখ প্রায়ই সমান।"

আপন কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া হতাশভাবে অঞ্জলি বসিয়া পড়িল, তাহার দ্রব্যাদি লইয়া এখনই এস্থান হইতে বিদায় লইতে হইবে। কিন্তু কোথায় সে যাইবে, আর তো তাহার দাঁড়াইবার স্থান কোথাও নাই। সম্বলমাত্র বেতনের কয়টা টাকা, তাহাতেই, বা কয় দিন চলিবে? আর তো কোনও উপায় নাই। যেখানেই যাইবে সেখান হইতে তাহার জন্মগত অভিশাপের বার্ত্তা এমনি ভাবেই বিতাড়িত করিয়া দিবে। কোথায় তাহার স্থান? জীবন কাটাইবার আর কোন উপায় নাই। দুইটী পথ মাত্র তাহার সম্মুখে রহিয়াছে। হয় মৃত্যু, নয় পুনরায় জননীর আশ্রয়ে ফিরিয়া যাওয়া। সেও মৃত্যুর মতই ভয়ঙ্কর।

এ অবস্থায় সে কোন পথে চলিবে, কে তাহাকে বলিয়া দিবে—কোন্ সমাজ-সংস্কারক তাহার পথ-নির্দ্দেশ করিয়া দিবে? অঞ্জলি ভাবিতেছিল, তাহার ন্যায় সমাজ-তাড়িতা উৎপীড়িতাদের কোন পথে চলা কর্ত্তব্য মৃত্যুকে বরণ না নরকের পথের দিকে অগ্রসর হওয়া। এ দুইটার কোন পথই গ্রহণ করা সমীচীন নয় ভাবিয়া অঞ্জলি অনন্যোপায় হইয়া ভগবানের নিকট আত্ম-নিবেদন করিয়া আলোকের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

জান্‌বার কথা

জ্ঞান বিস্তারের সাহায্যের জন্য এই বিভাগে আমরা প্রতি মাসের সহযোগী সাহিত্য হইতে শিক্ষণীয় বিষয় যথাসম্ভব আহরণ করিব।

মানসী ও মর্ম্মবাণী, মাঘ ১৩৩৭

হস্তাক্ষর ও চরিত্র—শ্রীশশধর রায়। প্রবন্ধটি কৌতুককর, হস্তাক্ষর দেখিয়া মানুষের চরিত্র বুঝিবার প্রচেষ্টা। হস্তাক্ষর নির্দ্দিষ্ট এক প্রকারের, অনির্দ্দিষ্ট একাধিক প্রকারের অথবা মিশ্রিত প্রকারের হইতে পারে। মানব-চরিত্রও এই সকল প্রকারের লক্ষিত হয়। লিখনকালে পংক্তির ঊর্দ্ধগতি লেখকের উচ্চাশার পরিচায়ক; পংক্তির অধোগতি উচ্চাশার অভাবের পরিচায়ক। সরল রেখার ন্যায় সমান পংক্তি স্থিরচিত্ততা জ্ঞাপন করে। যে লেখার প্রত্যেক অক্ষর জোরে লিখিত এবং প্রত্যেক অক্ষরে অতিরিক্ত কালি ব্যবহৃত হয় সে লেখা বিলাস-প্রিয়তা সূচনা করে। যখন অক্ষরের শেষ রেখা ঊর্দ্ধগামী, দীর্ঘ এবং গোলাকার, তখন উহা দয়া ও সহৃদয়তার পরিচায়ক। এই রেখা সরল হইলে এবং দুই শব্দের মধ্যগত স্থান অধিকার করিলে বুঝিতে হইবে, লেখকের দানশক্তি আছে। অক্ষরের শেষ রেখা যদি ঊর্দ্ধগামী ও ক্ষুদ্র হয় তবে লেখকের ব্যয়কুণ্ঠতা বুঝা যায়। নাম ও দস্তখতের নীচে সরল বা বক্ররেখা থাকিলে লেখকের অহঙ্কার, আত্মপ্রশংসা বা প্রশংসা-লাভের কামনা সূচিত হয়; এবং একটি মোটা লাইন থাকিলে সৌন্দর্য প্রিয়তা ও দৃঢ়তা জ্ঞাপন করে।

ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৩৭

বিজ্ঞানে টমাস্ এল্‌ভা এডিসন্ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ই যে প্রতিভার বিকাশ সাধন করে, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসনের জীবন তাহার অদ্ভুত দৃষ্টান্ত স্থল। বাল্যকালে এডিসন্ ষ্টেশনে ফল ও কাগজ বিক্রয় করিতেন। এখন তাঁহার স্থান জগতের বরেণ্য শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের পার্শ্বে। দারিদ্র্য ও অসাফল্য তাঁহার প্রতিভাকে উৎসাহিত করিয়াছে, নিরুৎসাহ করে নাই। এডিসনের প্রধান আবিষ্ক্রিয়াগুলি এই:—ফনোগ্রাম, বৈদ্যুতিক ইন্‌কান্‌ডিসেণ্ট আলো; ভোট গণনা করিবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র; মেগাফোন;

ছায়াচিত্র ফেলিবার কোডাক্ ক্যামেরা ; চলন্ত সার্চ্চলাইট; এবং কিনামেটোগ্রাফ্ যন্ত্র। ইহা ছাড়া, তিনি বিদ্যুতের দ্বারা এঞ্জিন চালাইয়াছেন, এবং এডিফোন যন্ত্রে মুখের কথা কাগজে লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইত্যাদি।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭

আমাদের কথা—শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী লেখিকা স্বর্গগত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জননী, অর্থাৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী। যে শান্ত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় মহর্ষি তাঁহার বৃহৎ পরিবারটিকে আদর্শ ভারতীয় পরিবাররূপে গঠিত করিয়াছিলেন, তাহার বহু আভাস এই প্রবন্ধে পাওয়া যায়।

মহর্ষি যখন উপাসনা করিতেন, তিনি তাঁহার পাশে বসিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন। অত বড় বৃহৎ পরিবারের সমস্ত সংসারের ভার তাঁহার উপর ছিল। তিনি প্রত্যেককে সমান আদর-যত্নে পালন করিতেন। কাহাকেও কোনও কিছু হইতে বঞ্চিত করিয়া মনে ব্যথা দিবার কখনও চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার মনটি শিশুর মত কোমল ছিল। কোনরূপ বিলাসিতার ছায়া তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই।

বলেন্দ্রনাথের জন্মের পরেই তাঁহার পিতা বীরেন্দ্রনাথের মস্তিষ্ক-বিকার ঘটে। পিতার এই অবস্থায় আট নয় বৎসর বয়সেই বলেন্দ্রনাথের মনে বড় হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তখন হইতেই তাঁহার অধ্যয়নের স্পৃহা জাগ্রত হয়। তের বৎসর বয়সে তিনি ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। পঞ্জাবের আর্য্য সমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলন ঘটাইবার জন্ত তিনি যৌবনে বিশেষ চেষ্টা করেন।

রবীন্দ্রনাথের পত্নীর নাম ছিল মৃণালিনী। তিনি যশোহর জেলার বেণীমাধব রায়ের কন্যা। তিনি শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয় স্বজনদের লইয়া নানা রকম আমোদ-আহ্লাদ করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার মনটি খুব সরল ছিল, সেইজন্ত বাড়ীর সকলেই তাঁহাকে খুব ভালবাসিত।

ঢাকাপ্রকাশ, বৈশাখ ১৩৩৭

ঢাকার বস্ত্রশিল্প—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ শাস্ত্রী। ঢাকার বস্ত্রশিল্প এককালে সমগ্র জগতের বিস্ময়দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পারস্য-দূত মহম্মদ আলী বেগ পারস্যের শাহকে ৬০ হাত দীর্ঘ একখানি ঢাকাই মস্‌লিন একটি নারিকেল-খোলায় পূরিয়া উপহার দিয়াছিলেন। ৩০ হাত দীর্ঘ ২ হাত প্রস্থ একখানা মস্‌লিন ওজনে ৪।৫ তোলার বেশী হইত না। উহা একখানি ৪।৫ শত টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। বিভিন্ন শ্রেণী অনুযায়ী ঢাকাই মস্‌লিনের বিভিন্ন নাম ছিল—সঙ্গতি, সরগতি, ঝুনা, আবরুয়া, সরকার আলি, সব্‌নাম, মলমল খাস, রঙ্, বদন খাসা, আলবল্লা, তঞ্জেব, তরন্দাম, নয়নসুখ, সরকন্দ, ইত্যাদি। আবরুয়া কাপড় জলে ফেলিলে জলের সহিত মিলিয়া যাইত। সবনাম রাত্রিতে ঘাসের উপর পাতিয়া রাখিলে শিশির সম্পাতে ঘাসের সহিত মিশিয়া যাইত। রমণীগণ কাশিদা মস্‌লিনের উপর সুন্দর বিচিত্র বুটা তুলিত। কোন কোন বৎসরে ১২ লক্ষ খণ্ড, অর্থাৎ প্রায় ৪৮ কোটী টাকার কাশিদা ঢাকা হইতে রপ্তানি হয়। কারেলা, তোড়াদার, বুটীদার, তেরছা, জলবার, পান্নাহাজার, ছাওয়াল, ডুবলী জাল, মেল ইত্যাদি নামের জামদারী প্রস্তুত হইত। এক ইউরোপেই বৎসরে কোটী টাকার ঢাকাই মস্‌লিন বিক্রীত হইত। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর ঢাকাই মস্‌লিনের উপর শতকরা ১৫৲ টাকা শুল্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং ক্রমে ক্রমে মস্‌লিনের বিক্রয় কমিতে লাগিল। অবশেষে বিলাতি চিকণ সুতা আমদানির সঙ্গে সঙ্গে মস্‌লিন বিলুপ্ত হইল।

টমাস মান

[শ্রীবিজনবিহারী বসু বি-এ]

গত বৎসর সাহিত্য-বিভাগে নোবেল সমিতি জার্ম্মানীর সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক টমাস মানকে পুরস্কৃত করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এ দেশের লোকেদের কথা দূরে থাক বিলাতের লোকেরাও তাঁহার সাহিত্যের সহিত বিশেষ-ভাবে পরিচিত ছিল না। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে মার্ত্তিন সেকার তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাঁহার আমেরিকার প্রকাশক ঐগুলি Knopf প্রকাশ করিয়া জগতের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই তাঁহার প্রতিভার অমল জ্যোতিঃ সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান জার্ম্মানীর তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীদিগের মধ্যে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেক লেখকের জীবন জটিলতায় আবৃত ও বিচিত্র কাহিনীপূর্ণ থাকে; কিন্তু মানের জীবন খুব সাধারণ লোকের মত, কোনরূপ অলৌকিক ঘটনা তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। তিনি ৫৪ বৎসরকাল তাঁহার অনাড়ম্বর জীবন কাটাইয়া আসিয়াছেন।

লিউবেক শহরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন টমাস মান জন্মগ্রহণ করেন। ১৯ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তিনি পিতা-মাতার সহিত মিউনিচে গমন করেন এবং তথায় একটী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানিতে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। সাহিত্যের প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকায় তিনি অবসর-কালে সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। শতকরা নিরানব্বই জন বাঙ্গালীর মত তখন তিনি ছিলেন একজন সামান্য মসী-জীবী মাত্র। তখন কে জানিত যে এই সামান্য বিনা-বেতনের কেরাণী একদিন জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বিশ্বের কথা-সাহিত্যেকের চরম কাম্যবস্তু লাভ করিবেন। তখন কে ভাবিয়াছিল তিনিই এক দিন জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ অদ্বিতীয় সাহিত্য-রথী হইয়া উঠিবেন।

১৮৯৪ খৃঃ Gefallen লিখিয়া তিনি রস-রসিক দিগের নিকট হইতে উৎসাহ ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা Buddenbrooks প্রকাশিত হয়। আধুনিক যুগের অন্যান্য সাহিত্যিকের মত এই পুস্তকেও তিনি পুরাতনের সহিত নূতনের, প্রাচীনের সহিত তরুণের দ্বন্দ্ব ও কলহ বিবৃত করিয়া এবং অবশেষে তরুণের বিজয়-ঘোষণা করিয়াছেন।

কিন্তু এখানি লিখিয়াই যে তিনি এই পুরস্কার পাইয়াছেন তাহা নয়। একখানি পুস্তকের জন্য কেহ কখনও নোবেল পুরস্কার-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন না। লেখকের রচনার ভিতর মানবজীবনের ঘটনাবহুল জটিল ও বিরাট্ সমস্যার উত্থাপন ও সেগুলির সমাধানের জন্য লেখকের হৃদয় ও চিন্তা যদি একটা উচ্চ আদর্শের দিকে ধাবিত হয়, যদি লেখক জগতের ভাব-ধারায় নূতন কিছু দান করিতে পারেন তবেই তিনি এ পুরস্কার পাইবার অধিকারী হইতে পারেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কয়েকটী গল্প লিখিয়া Little Mr Friede Man নাম দিয়া একখানি গল্পের বই প্রকাশ করেন। প্রত্যেক গল্পটী সহজ, সরল ও সুললিত ভাষায় লিখিত। ইহাতে কিছুমাত্র অআড়ম্বর নাই; রূপে ও রসেকে এই গল্পগুলি সমৃদ্ধ। বিষয়-বস্তুর অভিনবত্বে, সমস্যার প্রাচুর্য্যে ও সেগুলি সৌষ্ঠব-সম্পন্ন। প্রত্যেক গল্পটীতে টমাসের রচনা-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। Budden-brooks প্রকাশিত হইবার পর টমাসের প্রতিভার জ্যোতিঃ দেশের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ না থাকিয়া সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইতে দেখা গিয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত জগতে তাহা ব্যাপ্ত হইয়াছে ও জগদ্বাসী তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পরিচয় পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

Buddenbrooksকে জার্ম্মানীর ফরসাইথ সাগা বলা হইয়া থাকে। ইহার সহিত গল্‌সওয়ার্দির ফরসাইথ সাগার মূলগত ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর টিউবারকুলেসিস স্যানিটেরিয়ম লইয়া লিখিত দুই খণ্ডে সমাপ্ত বৃহৎ উপন্যাস The Magic

Mountain (Der Zauberberg) প্রকাশিত হয়। আধুনিক জাতির মনোজগতে যে সব বিভিন্ন ও বিচিত্র শক্তি আসিয়া ক্রমাগত দ্বন্দ্ব বাধাইয়া তুলিতেছে, পুস্তকখানিতে সেগুলির সমাবেশ আছে। দক্ষ শিল্পীর রচনায় সেগুলি যে ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য ও লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। ইহার মধ্যে তিনি রোগজীর্ণ সমাজের ক্ষতগুলি অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। ১৯১৪ সালের বিপুল ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী সমরের পূর্ব্বে কিরূপে ইউরোপের সমাজে কীট প্রবেশ করিয়া তিলে তিলে ধ্বংসের পথে সমাজকে লইয়া যাইতেছিল এবং অবশেষে মহাযুদ্ধ আসিয়া কিরূপে তাহাকে মুক্ত করিল—তাহার ইতিহাস এ পুস্তকে সুন্দর-ভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

মানুষের মনের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা,আশা ও আশঙ্কার সুন্দর নিখুঁত চিত্র তাঁহার Magic Mountainএ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের অন্তরের তন্ত্রীতে সেগুলি সবেগে আঘাত করে। অধুনা তিনি মিউনিচে বসিয়া Joseph ও Pharoahএর কাহিনী লইয়া একখানি পুস্তক রচনায় নিযুক্ত আছেন। বন্ধুগণ ও আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত জোসেফ ঘুরিতে ঘুরিতে ব্যাবিলনে আসিয়া জ্ঞান ও সভ্যতার আলোকের সম্যক্ দর্শন পাইয়া বিমুগ্ধ হন। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনাবলী লইয়া পুস্তকখানি লেখা হইতেছে। তাঁহার অধুনা প্রকাশিত Early Sorrow নামক উপন্যাসখানি বিলাতে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। উহাতে তিনি অলৌকিক কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। কোন এক অধ্যাপকের গৃহে কতকগুলি কদাচার-পরায়ণ দুশ্চরিত্র ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া একটি বালিকার সহিত যে ঘৃণ্য প্রেম-লীলার অভিনয় করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করে তাহার নিখুঁত বাস্তব চিত্র ইহাতে আছে। পুস্তকখানি আমেরিকাতে বেশ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। অবশ্য আমাদের পুস্তকখানি পড়িবার সৌভাগ্য হয় নাই বলিয়া, এখানি সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে পারিলাম না—বলিতে পারি না এরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া তিনি সমাজের দুষ্ট ঘায়ে প্রলেপ দিয়াছেন কি না?

টমাস মান সুখবাদী (Optimist) কথা-শিল্পী। জীবনকে তিনি মঙ্গলময়ের অপূর্ব্ব রচনা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। মানুষের জীবনে যে রাশি রাশি বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে, শত চেষ্টাতেও আমরা যে সকল বেদনার আগুন নিবাইতে পারি না, সে সকলের পরিচয় তিনি বারবার রচনার ভিতর দিয়াছেন। সুখকে অনুভব করিতে হইলে দুঃখকে ভুলিলে চলিবে না। তাঁহার সকল রচনার ভিতর তাঁহার জীবনের আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচনার ভিতর যে সকল ভাবের ও আবেগের পরিচয় পাওয়া যায়, মনে হয় সেগুলি তিনি গভীরভাবে অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছেন।

বারান্তরে টমাস মানের গ্রন্থাবলীর আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল

সঙ্কলন

[শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ]

সঙ্গীতের যাদুমন্ত্র

সঙ্গীত যে কেবল মানব-সমাজেরই উপর যাদুমন্ত্র বিস্তার করিয়াছে তাহা নহে, জীব-জগৎও ইহার জন্য লালায়িত। সম্প্রতি আমেরিকা হইতে এক মজার খবর আসিয়াছে। ঐ দেশের এক পশুশালার অধ্যক্ষ তাঁহার পশুদের বিশ্রামস্থানে 'রেডিও' বসাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন যে, ইহাতে তিনি আশ্চর্য্য রকম ফল পাইয়াছেন। যে সকল পশু অসুস্থতার জন্য বিষণ্ণ থাকিত, তাহাদের প্রফুল্ল দেখা গিয়াছে। যাহাদের কোনরূপ রোগ ছিল তাহারা কিছু দিনের মধ্যেই নীরোগ হইয়াছে। এমন কি কয়েকটী গাভী অল্প দিনের মধ্যে অতিরিক্ত রকম দুধ দিতে আরম্ভ

করিয়াছে। সঙ্গীত আরম্ভ হইলেই উহাদের মধ্যে একটা ঔৎসুক্যের ভাব লক্ষিত হয়। আনন্দের আতিশয্যে কেহ বা কাণ খাড়া করিয়া শোনে, কেহ বা স্ফূর্ত্তিতে লেজ নাড়ে, আবার কেহ বা তালে তালে পা ঠোকে। কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে বলিয়াছেন যে, কেবল পশু নয় গাছ পালা সম্বন্ধেও ইহা খাটে ; কারণ পশুপক্ষীদের ন্যায় ইহাদেরও সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে। পরীক্ষা স্বরূপ এক নিস্তেজ গাছকে কিছু দিন 'রেডিও'র গান শোনাইবার পর সতেজ হইতে দেখা গিয়াছে। তাই মনে হয়, কিছুদিন পরে আমেরিকার চাষীরা হয় তো আর খাল কাটিয়া ক্ষেতে জলসেচন করিবে না ;—এক একটা রেডিও-সেট বসাইয়া দিলেই চলিবে। ধন্য বিজ্ঞানের ক্ষমতা !

* * * *

শ্রেষ্ঠ সবাক্-চিত্র

কোন্ বৈদেশিক পত্রিকার সংবাদদাতা এইরূপ সংবাদ দিতেছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে "Journey's End" নামক যে ছবিটী তোলা হইতেছে, উহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিখুঁত সবাক্-চিত্র বা Talkie হইবে। কিন্তু ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উহাতে কোন স্ত্রী-চরিত্র নাই। দৃশ্য, ঘটনার নাটকীয় ভঙ্গী এবং বাক্-যন্ত্রের স্পষ্টতার প্রতি পরিচালক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। কারণ, এই শ্রেণীর ছবির মধ্যে ঐরূপ ত্রুটী প্রায়ই দেখা যায়। চিত্রের দিক্ দিয়া যত রকম কৌশল দেখান যাইতে পারে, তাহা ইহার মধ্যে দেখান হইয়াছে। শেষ দৃশ্যে কুয়াশার মধ্য দিয়া যে ছবি তোলা হইয়াছে তাহার তুলনা না কি চিত্র-জগতে বিরল।

* * *

ওয়ালেসের পদোন্নতি

ইংলণ্ডের কৃতী কথাশিল্পী এডগার ওয়ালেস্ (Edgar Wallace) সম্প্রতি পারলিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহার এই পদোন্নতিতে তাঁহার স্বদেশীয় সাহিত্য রসিকগণের মধ্যে বহু আলোচনা চলিতেছে। কেহ কেহ পারলিয়ামেণ্টে তাঁহার Labour Partyর সপক্ষে ভবিষ্যৎ বক্তৃতা শুনিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। এমন কি ঐ দেশের সংবাদপত্রে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধের লেখক ওয়ালেসের সাহিত্য-প্রতিভার সহিত রাজনৈতিক-প্রতিভার সমন্বয়কে শুভসূচনা বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। তিনি মানস চক্ষে দেখিয়াছেন, যেন তিনি পারলিয়ামেণ্টের বক্তৃতাকালে বিশ্রাম-সময়টীতে বসিয়া Orber Book এর পশ্চাৎভাগে তাঁহার উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণ করিতেছেন—কখন বা কোন অখ্যাত বক্তার বক্তৃতা সময়ে নিবিষ্ট মনে কোন নাটকের দৃশ্যের পরিকল্পনা করিতেছেন ইত্যাদি। ওয়ালেসের পারলিয়ামেণ্টের নীরস অভিজ্ঞতা যে তাঁহার ভবিষ্যৎ গল্প উপন্যাসে নব নব রসধারায় প্রবাহিত হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে ?

* * *

ডাঃ রমণের আবিষ্কার

Nature নামক ইংরাজী পত্রিকায় Dr. A. C. Menzies নামক এক ব্যক্তি ডাঃ রমণের এক আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, আজ দুই বৎসর কাল ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহার আবিষ্কার পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যায় এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এই আবিষ্কারের নাম "Raman Effect" এবং ইহা অনু-পরমাণুর (Atoms and molecules) রাসায়নিক মিশ্রণের সহিত জড়িত। বহু পদার্থ বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতের নিকট এই আবিষ্কারের কথা বিদিত এবং তাঁহারা ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া বহুবিধ গবেষণায় অগ্রসর হইয়াছেন। ডাঃ রমণ যদি ইহা আবিষ্কার না করিতেন, তাহা হইলে বিজ্ঞান-জগতের ইতিহাসের একটী অধ্যায় অসমাপ্ত থাকিয়া যাইত। আমরা এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

* * *

ডিউরিয়াম

নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Dr. Beans এক প্রকার পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার

নাম Metal Durium. তিনি তাঁহার পরীক্ষাগারে বসিয়া নূতন এক প্রকারের ফনোগ্রাফ্ রেকর্ড তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং সেই সময় অপ্রত্যাশিত-ভাবে ইহার সৃষ্টি করিয়া ফেলেন। ইহা Resinএর ন্যায় এক প্রকার পদার্থ—বহু চেষ্টাতেও ভাবিয়া ফেলা যায় না। বোধ হয় ভবিষ্যতে Talkie-disc তৈয়ারী করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইবে।

* * *

কুকুরের স্নানাগার

ফ্রান্সে বা পাশ্চাত্য দেশে অন্যত্র Turkish Bath বা মানুষদিগের জন্য স্নানাগার প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু হঠাৎ এক নূতন খবর শোনা গিয়াছে। Londonএ Beauchamp-place নামক স্থানে কুকুরদের জন্য একটী স্নানাগার স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন স্বয়ং যুবরাজ। বহু চিত্রকর এই অভিনব স্নানাগারের দেওয়ালে ছবি আঁকিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। কুকুরের মালিক দিগের জন্যও যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে।

* * *

সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী এঞ্জিন

Glasgowর North British Locomotive Coy একটী এঞ্জিন তৈয়ারী করিয়াছেন এবং ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী এঞ্জিন। ইহার নাম হইয়াছে "Fury"। ইহার বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, অপর এঞ্জিন অপেক্ষা আরও অধিক দূর পরিভ্রমণ করিবার পরও ইহার মধ্যস্থ বাষ্প নিঃশেষ হইয়া যায় না। ইহার মধ্যে তিনটী বয়লার আছে এবং তাহা হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে। বহু দূরদেশে যাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইবে। ইহার এক দিন শক্তি পরীক্ষা হইতেছিল; সেই সময় হঠাৎ মধ্যস্থিত একটী নল ফাটিয়া যায়। তাহাতে চালক ও আর এক ব্যক্তি নিহত হইয়াছে। শীঘ্রই পুনরায় ইহার শক্তি পরীক্ষা করা হইবে।

* * *

ডাঃ ডেম্পষ্টারের গবেষণা

"American Association for the Advancement of Science", চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ "Ryerson Physical Laboratory"র অধ্যক্ষ Dr. A. J. Dempsterকে তাঁহার পদার্থবিদ্যার নূতন গবেষণার জন্য এক সহস্র ডলার পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। এই গবেষণায় ডাঃ ডেম্পষ্টার 'প্রোটনে'র যে কম্পন-শক্তি (wave characteristics) আছে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। ঐ বিজ্ঞানাগারের অপর একজন অধ্যাপক নোবলে পুরস্কার-প্রাপ্ত Arthur H. Compton, বলিয়াছেন যে প্রোটন-বিষয়ক গবেষণা। বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান গবেষণা, কারণ সমস্ত জড়জগৎকে যে তিনটী ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র পরমাণুতে বিভক্ত করিতে পারা যায় তাহা হইতেছে Protons, Electrons, এবং Photons. ডাঃ ডেম্পষ্টারের গবেষণা হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে কম্পন-শক্তি (wave characteristics) বর্ত্তমান। কিছুদিন পূর্ব্বে ফরাসী বৈজ্ঞানিক Broglie তাঁহার এক প্রবন্ধে এই বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন—আজ জড়ের মধ্যে যে সত্য প্রচ্ছন্ন ছিল ডাঃ ডেম্পষ্টার তাঁহার গবেষণায় যন্ত্রের ভিতর দিয়া তাহা জগতের সমক্ষে প্রচার করিলেন। "Bell's Telephone Laboratory"র কয়েক জন বৈজ্ঞানিক এই বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ডাঃ ডেম্পষ্টারের এই আবিষ্কারে পদার্থ-বিজ্ঞানে যে এক নব-যুগের সূত্রপাত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * *

Printed by Sarat Chandra Bhar at the Manasi Press, 77 Hari Ghosh Street and Published by the same from the Panchapushpa Office, 28B, Telipara Lane, Calcutta.
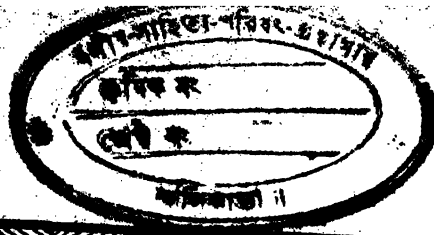
তৃতীয় বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ { দ্বিতীয় সংখ্যা

মহাত্মা গন্ধী

জাগ্রত ভারত

[অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত]

আজি গুর্জ্জর করে গর্জ্জন—সিংহের হুঙ্কার,—
কাঁপে হিমাদ্রি, কাঁপে সমুদ্র, কুমারিকা, গান্ধার।
কাঁপে মান্দ্রাজ, কাঁপিছে সিন্ধু, পঞ্জাব, উৎকল,
কাঁপিছে বঙ্গ, বেহার, অন্ধ্র, বোম্বাই ও কেরল।
মাতে ভাগীরথী, যমুনা, পদ্মা, রাবী ও ব্রহ্মনদ,
মাতে নর্ম্মদা, কৃষ্ণা,কাবেরী,—কে করে সে গতি রদ ?
জাগে রাজপুত, জাগিয়াছে শিখ, মরাঠা, মুসলমান ;
জেগেছে বাঙ্গালী, ওড়িয়া, বেহারী, অন্ধ্রী, মত্তপ্রাণ !
জাগে মান্দ্রাজী, সিন্ধী ও জাঠা—সীমাহীন জাগরণ !
সুপ্ত ভারত-আত্মার এ কি সুপ্তির বিদারণ ?
গরুড় আজি কি অধীর কাতর অমৃতের পিপাসায় ?
মথিয়া আকাশ ছুটিবে সে কি রে পূরিবারে দুরাশায় ?

* * *

কে ঘোষে পাঞ্চজন্য আজি রে, কে কলির হৃষীকেশ ?
রথ কোথা তার ? কোথা অর্জ্জুন, যোদ্ধা শস্ত্রবেশ ?
গন্ধী গন্ধী হৃষীকেশ দেখ, শঙ্খ অহিংসার,
কোটী অর্জ্জুন ভারত জুড়িয়া জেগেছে দুর্নিবার।
নাহিক শস্ত্র, অস্ত্র ও তূণ, ধৈর্য্য আত্মবল,
দুঃখ-সহন বীর্য্য, দুঃখবিজয়ী চিত্ততল,
অস্ত্র-আঘাত দেহে লতে পারে, ব্যথায় নির্ব্বিকার,
প্রহার সহিয়া করে নিষ্ফল প্রহারের অনাচার।
হেন দুর্জ্জয় কোটী অর্জ্জুন অস্ত্রবিহীন যোধ
নেমেছে আহবে, অস্ত্র কেবল নির্ব্বাক্ প্রতিরোধ।
ধূলি-লুণ্ঠিত নত কলেবরে বহে গুরু ক্লেশভার,
নির্ব্বাক্ সহে সত্যাগ্রহী সকল অত্যাচার।
দেশে দেশে আর গ্রামে গ্রামে আজ কোটী দৃঢ়চেতা নর
মৃত্যুরে চায়, তবু নাহি চাহে ঘোর অন্যায় কর।
ধায় ব্যবসায়ী, ছাত্র, উকিল, বৃদ্ধ, যুবক আজ,
ভারত-বনিতা মুক্তি-অধীর, বলে ওই—সাজ সাজ।
এ কি এ প্লাবন,এ কি রে বন্যা, এ কি এ প্রেমোচ্ছ্বাস !
..ণ বিলাবার তরে এ কি আজ উদ্দাম উল্লাস,
রোধি' অন্যায় ন্যায় বিধানিতে এ কি আশা দুর্জ্জয় !
আজি দুর্ব্বল করে নির্ভয়ে প্রবলেরে পরাজয় !
দুঃখ-দহনে দগ্ধ পরাণ ধরে পবিত্র রূপ,
হিংসা-ক্রোধের ছায়া নাহি সেথা, সে যে মৈত্রীর কূপ,
মৈত্রী-ধারায় নিস্নাত মন দুষ্টেরে ভালবাসে,
দুঃখ সহিয়া জিনিছে দুঃখ, নির্ভয়ে জিনে ত্রাসে।
এ কি বুদ্ধের অক্রোধ এল, খৃষ্টের খাঁটি প্রেম ?
এ কি নিমাইর প্রেমের নৃত্য, জগাই-বিজয়ী ক্ষেম ?

* * *

এসেছে এসেছে মৈত্রীপ্লাবন, আত্মার মহাজয়,
দূরে গেছে আজ মৃত্যুর ভয়, লোকভয়, রাজভয়।
.. গুর্জ্জর হ'তে পাঞ্চজন্য তোলে আজি নির্ঘোষ,
সত্যাগ্রহ-বিষাণে বিগত আজি শত আফশোষ।

বিজিত দলিত ক্লিষ্ট দেশের বক্ষে এ কোন্ প্রাণ
জাগিল শঙ্কাবিহীন, মূর্ত্ত আত্মার অভিমান!
অভিনব এই কৃষ্ণ মহান্ গীতা রচে রণ-মাঝে,
সমর-চাতুরী নাহি এর, বলে সব কথা অরি-কাছে।
পদবিক্ষেপে ভারতের মাটী নড়িয়া কাঁপিয়া উঠে,
বাক্যকণায় কত শতকের নিদ্রা আপনি টুটে!
কাহার বাণীর অগ্নির শিখা ভারতে আগুন জ্বালে?
উৎসুক চোখে জগৎ তাকায় কার পবিত্র ভালে?
বাক্য কাহার ধ্বনিছে ছাপিয়া কামানের গর্জ্জন?
হিংসাক্লিষ্ট জগৎ মানসে করে কারে অর্চ্চন?
কৌপীনধারী কোন্ সে যোগীর পদতলে ধনী ছুটে?
গর্ব্ববিহীন কাহার চরণনিম্নে গর্ব্বী লুটে?
কাহার বিশাল উদার চিত্তে নাহি কোন ভেদ নাই,
দ্বিজ-চণ্ডাল, ধনী-নির্ধন মিলিয়াছে এক ঠাঁই?
হিংসা, চাতুরী, মারণ, দম্ভ, অস্ত্রে জর্জ্জরিত
জগতের চিত খুঁজিত যে সুধা সুচির-আকাঙ্ক্ষিত,
সেই সুধা আজ ঝরে অবিরাম, সে সুধার নির্ঝর
গান্ধী দাঁড়ায়, জগৎ জুড়ায় পিপাসায় জর্জ্জর।
পরপদতলে অপমানে দুখে আঁধারে অবজ্ঞায়
পোষিল সত্যধর্ম্ম ভারত যুগ-যুগ বেদনায়,
আজি সে সত্য হয়েছে মূর্ত্ত, অতীতের তপোবন-
গুহা হ'তে আজ জাগিয়াছে যেন উদ্দাম উজ্জ্বল।
বিজিত ভারত, ক্ষুব্ধ ভারত, লাঞ্ছিত, ক্লেশনত,
বিজেতারে বলে—তোমার প্রতাপ-গর্ব্ব করিব গত।
মিথ্যা দম্ভ, সমর-সজ্জা, অস্ত্রের কৌশল,
আত্মার বলে অস্ত্রে কামানে করি' দিব নিষ্ফল।
পেয়েছি সত্য, পেয়েছি ধর্ম্ম, প্রেমে মোর অভিযান,
দলনে এ দেহ হউক চূর্ণ, না লব কাহারো প্রাণ।
আহব এ নয়, প্রেমের যজ্ঞ, আত্মার আরাধন,
নব দীক্ষায় হবে মানবের অভিনব জাগরণ।

পরেশনাথ

(ভ্রমণ-কাহিনী)

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র]

নিসর্গসুন্দরের পূজারীর সুযোগ ও সুবিধার অভাবে এতদিন পরেশনাথ পাহাড় দেখা হয় নাই। যখনই কোন বন্ধু-বান্ধবের মুখে পরেশনাথের সুষমার কথা শুনিয়াছি, তখনই হৃদয়ে একটা অদম্য বাসনা জন্মিয়াছে; কিন্তু সে বাসনার তৃপ্তি-বিধান করিতে পারি নাই। পাহাড় দেখার উপর আমার যে একটা অতিরিক্ত মাত্রায় আসক্তি আছে এ কথা অনেকবার বলিয়াছি। একবার দলমা-পাহাড়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতে দুই একটা কারণও বলিয়াছিলাম :—'বাঙ্গালার সমতল ক্ষেত্রে জন্মেছি। মাটীর ঢিপি দেখে ছেলেবেলা থেকে পাহাড়ের কল্পনা করে অনেকটা আনন্দ পেতাম; কিন্তু পাহাড় দেখ্‌বার ইচ্ছাটা ছেলেবেলা থেকে খুবই বেশী ছিল। ১৮ বছর বয়সের সময় মুঙ্গের-জামালপুরের পাহাড় প্রথম দেখে ভূগোলের ধারণা কতক যাচাই করি; তারপর পাহাড় অনেক দেখেছি কিন্তু বাল্যকালের সে ইচ্ছাটা প্রৌঢ়ে কিছুমাত্র কমেনি। প্রকৃতির ভীম-ভয়াল দৃশ্য দেখ্‌তে ভালবাসি যে কেন, তা ঠিক করে বল্‌তে পারি না; বোধ হয় [illegible]ট্‌ স্রষ্টার কল্পনার বিশালত্বের পরিচয় কতকটা ঐ খানে উপলব্ধি কর্‌তে পারি বলে ভালবাসি। আর একটা কারণ-বোধহয় 'আমি'র ক্ষুদ্রত্ব ওখানে বেশ বোঝা যায়।' ১৯০৬ সাল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আমি একবার না একবার দ্বাদশ আদি-জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম লিঙ্গরাজ বৈদ্যনাথকে দেখিতে বৈদ্যনাথধামে গিয়া থাকি এবং পরেশনাথ-যাত্রীর সঙ্গী-সংগ্রহের চেষ্টা করি। পথের দুর্গমতা ও যানবাহনাদির অসুবিধার জন্য কখনই সঙ্গী জুটাইতে পারি নাই। পরে ১৯২৬ সালে যখন আমার পরম সুহৃদ ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্তরা সদলবলে পরেশনাথ দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, 'এর পরে আর পরেশনাথ পাহাড়ে ওঠা সম্ভবপর হবে না—পঞ্চাশের কোঠায় যখন বয়েস পড়্‌বে, তখন আর নিজের পায়ে ভর করে ওঠা চল্‌বে না—ডুলিতে চড়ে উঠ্‌তে হ'বে।' উত্তরে বলেছিলাম 'জাত-বেহারার কাঁধে চড়ার দিন ছাড়া মানুষের কাঁধে বোধ হয় চড়্‌তে হবে না; আর এমন দৃশ্য যদি আমার অদৃষ্টে ঘটে তা হ'লে তার চেয়ে শোচনীয় দৃশ্য আমার ও আমার বন্ধু-বান্ধবদের দেখ্‌তে কষ্টকর হবে?' কথাটার ভিতর যে একটু আত্মাভিমানের আমেজ নাই, তাহা অস্বীকার করি না—কারণ পদব্রজে চলিতে পারার অহঙ্কার আমার একটু ছিল। তাহার পর দুই বৎসর কাটিতে চলিল—দেখার সুবিধা ঘটিয়া উঠিল না। যাহা হউক ১৯২৮ সালের শীতকালে আমার পরম ক্ষেমঙ্কর আলিপুরের নবীন উকীল শ্রীমান্ সত্যনারায়ণ দাস বাবাজীবন সপরিবারে গিরিডি যাত্রা করে। শ্রীমান্ আমার অগ্রজ-প্রতিম আলিপুরের প্রসিদ্ধ উকিল, এক্ষণে স্বর্গগত রাসবিহারী দাস মহাশয়ের পুত্র। বাবাজী আমাকে বড়দিনের ছুটিতে তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে, আমি এক সর্ত্তে স্বীকার করি যদি তোমার পুত্রের কল্যাণে আমাকে পরেশনাথ পাহাড় দেখাতে পার, তবে যেতে পারি, তাহা না হ'লে গিরিডির উপর আমার এমন কোন মোহ বা আকর্ষণ নেই যার জন্য বহুবার দেখা স্থানে আবার যাব—অবশ্য এখানকার উশ্রী-প্রপাতের দৃশ্য খুবই সুন্দর। আর কয়লার খনির ভিতরটা একবার দেখ্‌বার ইচ্ছেও আছে।' বাবাজী সোৎসাহে বলিল, 'তার আর কি কাকাবাবু বেশ সে সময় আমার কয়েকজন বন্ধু যাবে বলেছে—আর আজ কাল মধুবন পর্য্যন্ত মোটর যায়। নিশ্চয়ই যাব।' শুনিয়া পুলক-শিহরণ হইল, অনেকদিনের আশা মিটিবার ক্ষীণ-রেখা মানস-চক্ষে দেখিতে পাইলাম। যুবকের উৎসাহে এ বৃদ্ধের হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার হইল।

কথামত ১৯২৮ সালের ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে

আমি সত্যনারায়ণের গিরিডির বাসায় উপস্থিত হই, তখন বাবাজী ও তাহার কলিকাতার তিন জন বন্ধু ও স্থানীয় দুই জন বন্ধু উশ্রী-প্রপাত দেখিতে যাইতেছেন—বাড়ীর সম্মুখে মোটরে কয়েকজন বসিয়া রহিয়াছেন। ধুলা-পায়ে আমি তাহাদের সঙ্গী না হইয়া অত্রস্থ অভ্র-খনির মালিক পুরুষপুঙ্গব শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সহিত পরেশনাথ-যাত্রার আলোচনা করিতে লাগিলাম। এই অমায়িক ব্রাহ্মণ যুবকের প্রাণে জৈন-তীর্থ দেখিবার বাসনা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই; পুঁথি-পড়া বিদ্যার বলে যখন তাঁহাকে বলিলাম, ২৪জন জৈন-তীর্থঙ্করের মধ্যে বিশ জন তীর্থঙ্করের সাধনক্ষেত্র—অহিংস-মন্ত্রের ও জীব-প্রীতির প্রচারক দিগের অধ্যুষিত পূত স্থান আপনি ১৫।১৬ বৎসর এখানে থাকিয়াও দেখেন নাই এটা বড় আশ্চর্য্যের কথা, এ স্থান দেখা হিন্দুদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অবশ্য পরেশনাথ ও মহাবীর শেষ দুই তীর্থঙ্কর ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহারা আজ হইতে ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন—নির্ব্বাণের অধিকারী হইয়াছেন। ইঁহাদের পূর্ব্বগামী তীর্থঙ্করদিগের কথা তো ছাড়িয়া দিন—তাঁহারা আরও কত পূর্ব্বের লোক। এই একত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবকের প্রাণে স্থান-মাহাত্ম্যের সুস্পষ্ট ধারণা যে একটা জন্মাইয়া দিতে পারিয়াছিলাম তাহা তাঁহার মুখ-চোখের ভঙ্গীতে বেশ বুঝিতে পারিলাম। তিনি আমাকে হস্তমুখ-প্রক্ষালনাদি করিবার জন্য তাহার বাসায় লইয়া গেলেন ও স্বয়ং শরৎবাবুর ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত অকূলচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতে ছুটিলেন। ইনি আমার অপেক্ষা বয়সে দুই বছরের ছোট—ইঁহারা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। আজ কয়েক বৎসর পত্নী-বিয়োগ হওয়ায় ছোট কন্যাটীকে লইয়া বাড়ীতেই সর্ব্বদা থাকেন। এই কয় জনের বাড়ীই কাছা-কাছি—এক হাতার ভিতর। তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় হইল, তিনিও বহুদিন এখানে বাস করিতেছেন, কিন্তু কখনও পরেশনাথ দেখিতে যান নাই। তিনিও আমাদের সঙ্গী হইতে চান—আরও তিনি বলিলেন, যে জায়গাটা শুনেছি এমন বন-জঙ্গল ও হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ যে দলে ভারী না হ'লে চলা উচিত নয়। এখানকার কয়েকজনকে সঙ্গী করিয়া লইব।' 'শুভস্য শীঘ্রং'—কারণ শুভ কার্য্যে অনেক ব্যাঘাত ঘটিতে পারে ভাবিয়া দিন স্থির করিয়া ফেলিলাম, পরদিন প্রাতঃকালেই যাত্রা করা যাইবে—কারণ শাস্ত্রেই আছে "মঙ্গলে উষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।" অবশ্য এ শাস্ত্র খনার। বহুদিন ধরিয়া বাঙ্গালী খনার বচনে আস্থা-স্থাপন করিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যার সময় জানিলাম যাত্রী-সংখ্যা ১০।১১ জন হইবে। তখনই কর্ম্মবীর সরোজবাবু ২খানা ট্যাক্সি ঠিক করিয়া ফেলিলেন—যাত্রার সময় অবধারিত হইল ভোর ছটা।

যাত্রার সময় দেখিলাম আমরা ১৪ জন হইয়াছি। ২খানা ট্যাক্সিতে স্থানাভাব—কিন্তু কি করা যায় তিনজন বালককে তো বাদ দেওয়া যায় না—তাহাদের উৎসাহ-প্রবণ জীবনে বড় পাহাড় দেখার আশার মূলে কুঠারাঘাত তো করিতে পারি না—কারণ গভীর জঙ্গল ও বৃহৎ পাহাড় দেখার যে আনন্দ, সে আনন্দ—সে প্রকৃতির সুষমা দেখিবার সৌভাগ্য হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারি না; তবু একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, তাহারা ক্ষুণ্ণ হইল। অগত্যা স্থির করিলাম ২০ মাইল তো পথ আমরা 'সুজন' হইয়াই যাইব। এই তিন জনের দুই জন হইতেছে সত্যনারায়ণের শ্যালক শ্রীমান্ প্রফুল্ল রায় (১৯ বছর) ও শ্রীমান্ দেবেন পাইক (১৮) ও অন্য জন শরৎবাবুর আত্মীয় শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চৌধুরীর (৩৫) কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ ভূপেশচন্দ্র (১৯)।

যুবকদিগের তো কথাই নাই, তাহারাই ত আমাদিগের সহায়, সম্বল - পথ-প্রদর্শক। এই দলে সত্যনারায়ণ (৩১), ও তাহার খিদিরপুরের তিনজন বন্ধু সত্যচরণ সরকার (৩১) যুগলকিশোর সাহা (৩৪) এবং প্রমথনাথ মণ্ডল, (৩৪) এবং জগদীশবাবুর অন্য ভ্রাতা নরেশচন্দ্র (২৬) ও কর্ম্মবীর সরোজবাবু। কাজেই রহিলাম বুড়ার দলে আমরা তিন জন—খিদিরপুরের হোলিয়ারির মালিক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ দাস (৫৭), অকূলচন্দ্র সিংহ (৪৯) ও শর্ম্মা (৫১) কিন্তু 'শর্ম্মা' তো বাদ যাইতে পারেন না। কারণ এ ক্ষেত্রে শর্ম্মাই যে প্রস্তাব-কর্ত্তা। ইংরেজের আদর্শে কোন কমিটি গঠিত করিতে হইলে ইংরাজের প্রথা অনুসারে প্রস্তাব-কর্ত্তার সেই কমিটিতে একটা স্থান থাকেই

—এই নজীরেও যে আমার একটা স্থান আছে সেটা সকলেই গ্রহণ করিলেন। অমূল্যবাবুর শরীরটা ভাল নয় বলিয়া কেহ কেহ তাহাকে থাকিতে বলিলেন, কিন্তু আমি বলিলাম, বুড়র দল আমাদের গুণা দিন যে কবে ফুরাইবে, তার কিছু স্থিরতা নাই, আমাদের শরীরে সামর্থ্যও কমিয়া আসিতেছে, সুতরাং আমাদের ভাগ্যে এ সুযোগ আর ঘটিয়া উঠিবে না—অধিকন্তু একজন তো বোঝার উপর শাকের আঁটী; সকলেরই স্থান সংকুলান হইবে। সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ভগবানের নাম করিয়া বেলা ৬টা ১৫ মিনিটের সময় যাত্রা করিলাম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, সরোজ বাবু তাঁহার চাকর সুকিয়াকেও সঙ্গে লইলেন। সে দিন পূর্ণিমা। সমস্ত দিন থাকিতে হইবে বলিয়া রসদ পূর্ব্ব হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। আমার ও সরোজবাবুর 'পূর্ণিমা' বলিয়া ফলমূলাদিও লওয়া হইয়াছিল।

জৈনদিগের এই পবিত্র তীর্থ ছোটনাগপুরের হাজারিবাগ জেলায় ২৩ ডিগ্রী ৫৮´ উত্তর নিরক্ষবৃত্ত (latitude) ও ৮৬ ডিগ্রী ৮´ পূর্ব্বদ্রাঘিমান্তর (longitude) পরেশনাথ পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এই পর্ব্বতের প্রাচীন নাম সমেত্ত শেখর অর্থাৎ সংযুক্ত পার্ব্বত্য শিখর। ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছে পরেশনাথ পাহাড়। তিনটীর মধ্যবর্ত্তী পাহাড়ের উপরই পার্শ্বনাথের মন্দির। এখানে অন্যান্য অনেকগুলি অসমতল ছোট ছোট পর্ব্বত চূড়া আছে। তাহাদের উপর অন্যান্য তীর্থঙ্করদিগের ছোট ছোট মন্দির। এগুলি তাঁহাদের সাধন-ক্ষেত্র ছিল। সমগ্র পর্ব্বতটী দেখিতে অর্দ্ধ চন্দ্রকারের মত সুন্দর ও ছোট ছোট পর্ব্বত চূড়ার মধ্যে হঠাৎ বৃহত্তর চূড়াটী সমুদ্রতল হইতে ৪৪৮০ ফুট উচ্চ হইয়াছে।

এ যুগের যে বিশ জন জৈন তীর্থঙ্কর এই তীর্থে সাধনা করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন, সাধারণের জ্ঞাতার্থে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় একটু দিতেছি। বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনরাও সাধু ব্যক্তিদিগকে ঈশ্বরের ন্যায় পূজা করিয়া থাকেন (deified saint। সাধন বলেই মানুষ দেবত্বলাভ করেন ইহাই জৈনদিগের বিশ্বাস।

দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথ সূর্য্যবংশের রাজা জিতশত্রু ও রাণী বিজয়ার পুত্র। অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া সেই খানেই দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। দীক্ষান্তে এই সমেত শিখরে সাধনা করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ইহার বর্ণ স্বর্ণাভ ও বাহন ছিল হস্তী।

৩য় তীর্থঙ্কর সম্ভবনাথের বর্ণ ছিল স্বর্ণাভ ও বাহন ছিল অশ্ব। ইনি সূর্য্যবংশীয় রাজা জিতারি ও রাণী সেনার গর্ভে শ্রাবস্তী নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

৪র্থ তীর্থঙ্কর অভিনন্দনের বর্ণ স্বর্ণাভ ছিল ও বাহন ছিল কপিল।

৫ম তীর্থঙ্কর সুমতিনাথের বর্ণ ছিল হরিদ্রাবর্ণ, বাহন ছিল ক্রৌঞ্চ। ইনিও সূর্য্যবংশীয় রাজা সম্বর ও রাণী সিদ্ধার্থার পুত্র। অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। দিগম্বর-মতাবলম্বদিগের মতে ইহার বাহন ছিল চক্রবাক। ইনিও রাজা মেঘও রাণী মঙ্গলার পুত্র। অযোধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন।

৬ষ্ঠ তীর্থঙ্কর পদ্মপ্রভের বর্ণ ছিল রক্তাভ ও পদ্ম ছিল ইহার প্রতীক। ইনি সূর্য্যবংশীয় রাজা শ্রীধর ও সুসীমার পুত্র। কোশাম্বীতে জন্মগ্রহণ করেন।

৭ম তীর্থঙ্কর সুপার্শ্বনাথ সূর্য্যবংশীয় রাজা প্রতিষ্ঠা ও রাণী পৃথিবীর পুত্র। বারাণসী ধামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্বেতাম্বরদিগের মতে ইঁহার বর্ণ ছিল স্বর্ণাভ এবং দিগম্বর দিগের মতে ছিল সবুজ বর্ণ। স্বস্তিক ইহার প্রতীক।

৮ম তীর্থঙ্কর ছিলেন চন্দ্রপ্রভ। ইনিও সূর্য্যবংশীয় রাজা মহাসেন ও রাণী লক্ষ্মণের পুত্র ছিলেন। চন্দ্রপুরায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার বর্ণ ছিল শ্বেত। চন্দ্র ছিল ইঁহার প্রতীক।

৯ম তীর্থঙ্কর সুবিধানাথ ইক্ষাকু বংশের রাজা সুগ্রীব ও রাণী রমার পুত্র। কাকনন্দীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বর্ণ ছিল শ্বেত, বাহন ছিল মকর। ইনি পুষ্পদন্ত নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন।

১০ম তীর্থঙ্কর সূর্য্যবংশীয় শীতলানাথ ও রাজা দ্রিহর্থ ও রাণী সুনন্দার পুত্র। ইঁহার বর্ণ ছিল স্বর্ণাভ ও প্রতীক ছিল শ্রীবৎস মূর্ত্তি। দিগম্বরদিগের মতে কল্পবৃক্ষ ছিল ইঁহার প্রতীক।

১১শ তীর্থঙ্কর শ্রেয়াংসনাথও সূর্য্যবংশীয় রাজা বিষ্ণু ও রাণী বিষ্ণার পুত্র। বারাণসীর নিকটবর্ত্তী সিংহপুরে

জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বর্ণ ছিল স্বর্ণাভ, বাহন ছিল গণ্ডার। দিগম্বরদিগের মতে গরুড়।

১৩শ তীর্থঙ্কর বিমলনাথ ছিলেন সূর্য্যবংশীয় রাজা কৃতবর্ম্মা ও রাণী শ্যামার পুত্র। কম্পিলপুরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বর্ণ ছিল পীতাভ; বাহন ছিল বরাহ।

১৪শ তীর্থঙ্কর অনন্তনাথ ছিলেন সূর্য্যবংশীয় রাজা সিংহসেন ও রাণী সুযশের পুত্র। ইঁহারও বর্ণ ছিল স্বর্ণাভ, বাহন ছিল শ্যেন পক্ষী। দিগম্বর দিগের মতে ছিল ভল্লুক।

১৫শ তীর্থঙ্কর ধর্ম্মনাথ ছিলেন সূর্য্যবংশীয় রাজা ভানু ও রাণী সুজাতার পুত্র। অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী রত্নপুরীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বর্ণ ছিল স্বর্ণাভ ও বজ্র ইহার দণ্ড ছিল।

১৬শ তীর্থঙ্কর ছিলেন শান্তিনাথ। ইনিও ছিলেন ইক্ষাকুবংশীয় রাজকুমার। রাজা বিশ্বসেন ও রাণী অচিরার পুত্র। মিরাটের নিকট হস্তিনাপুর, যাহার অন্য নাম গজপুর হইতেছে সেই স্থানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বর্ণ ছিল পীতাভ ও বাহন ছিল মৃগ।

১৭দশ তীর্থঙ্কর ছিলেন কুন্থনাথ। ইনিও ইক্ষাকুবংশীয় রাজা সুর ও রাণী শ্রীর পুত্র। ইনি হস্তিনাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বর্ণ ছিল হরিদ্রাভ ও বাহন ছিল ছাগ।

১৮দশ তীর্থঙ্কর অর্হনাথ সূর্য্যবংশীয় সুদর্শন ও রাণী দেবীর পুত্র। ইনিও হস্তিনাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বর্ণ ছিল স্বর্ণাভ ও প্রতীক ছিল নন্দ্যাবর্ত্ত; দিগম্বরদিগের মতে ইহার বাহন ছিল মীন। হিন্দুদিগের ভগবানের অবতার পরশুরাম ইঁহার সমসাময়িক।

১৯শ তীর্থঙ্কর ছিলেন মল্লিনাথ। ইনিও ইক্ষাকুবংশীয় রাজা কুম্ভ ও রাণী প্রভাবতীর কন্যা ছিলেন। দিগম্বরীরা স্ত্রীলোকের মোক্ষলাভ সম্ভবপর নয় বলিয়া থাকেন, একারণ তাঁহাদের মতে মল্লিনাথ পুত্র ছিলেন তিনি মথুরায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বর্ণ ছিল নীলবর্ণ দণ্ড ছিল কুম্ভ।

২০শ তীর্থঙ্কর ছিলেন মুনি সুব্রত। রাজগৃহের হরিবংশ-রাজ সুমিত্র ও পদ্মাবতীর পুত্র। ইঁহার বর্ণ ছিল কৃষ্ণ ও বাহন ছিল কূর্ম্ম।

২১শ তীর্থঙ্কর নমিনাথ। ইনিও ইক্ষাকুবংশীয় রাজা বজয় ও রাণী বিপ্রার পুত্র। মথুরায় ইঁহার জন্ম হয়। বর্ণ হরিদ্রাভ ছিল ও নীলোৎপল ছিল ইঁহার বাহন।

২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথও ইক্ষাকুবংশীয় রাজা অশ্বসেন ও বামাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৮৭৭ সালে বারাণসী ধামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বর্ণ ছিল নীল ও বিষধর গোখুরা সর্প ইহার ছত্রধার। শত বৎসর বয়সে ইনি নির্ব্বাণ লাভ করেন।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে ২৪জন তীর্থঙ্করের ভিতর ২০জন তীর্থঙ্করএই স্থানে নির্ব্বাণ বা মোক্ষলাভ করিয়াছেন। এইস্থানই তাঁহাদের সাধনার ক্ষেত্র। এইখানে বসিয়াই তাঁহার সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের ভিতর ১৯জন ইক্ষাকুবংশীয় রাজকুমার ও একজন হরিবংশীয় রাজকুমার। ভোগৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া যে রাজকুমারেরা সাধারণ মানবের পক্ষে নির্ব্বাণের পথ সুগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সাধনক্ষেত্র হিন্দুমাত্রেরই যে দ্রষ্টব্য স্থান তাহা আর কাহাকেও কি বলিয়া দিতে হইবে? সৌন্দর্য্যপ্রিয় জৈনরা প্রকৃতির নয়নাভিরাম লীলাক্ষেত্র, গ্রাম ও সভ্যতার কেন্দ্র হইতে দূরবর্ত্তী কল-কোলাহল-শূন্য স্থানে আসিয়া সাধনা করিয়া গিয়াছেন। জৈনদের নির্ব্বাণের সহিত বৌদ্ধ বা বেদান্তবাদীদের নির্ব্বাণের একটু পার্থক্য আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাদের মোক্ষ বা নির্ব্বাণ জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধন হইতে আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ। যে সাধনা করিলে সংসারে আর আসিতে হইবে না সেই সাধনা করাই মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য। কেবল জ্ঞান লাভ করা ছাড়া এ নির্ব্বাণের দ্বার কাহারও নিকট উদ্‌ঘাটিত হয় না। মতি, শ্রুতি, অবধি ও মনঃপরায়—এই চারি প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়া তবে ৫ম প্রকার কেবল-জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। মতি—ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা সংসারের অনুভূতি লাভ; শ্রুতি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা এবং প্রতীক ও চিহ্নাদির ব্যাখ্যানদ্বারা জ্ঞানলাভ। ইন্দ্রিয়-গ্রামের সাহায্য ব্যতিরেকে অন্যস্থানের ঘটনা জানা অবধি দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ৪র্থ প্রকারের জ্ঞানদ্বারা অপরের চিন্তা ও ভাবের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় জন্মে। মতি ও শ্রুতির

সাহায্যে সাধারণ জ্ঞানলাভ হয় সত্য, কিন্তু অতীন্দ্রিয় সত্য-দর্শনের জন্য শেষোক্ত তিন প্রকার জ্ঞানের প্রয়োজন; সুতরাং এগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাম সাহায্যে হইতে পারে না। অবধিতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়া দেশ কাল, ঘটনা ও দূরস্থ পাত্রের সংবাদাদির সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ হয় সত্য, কিন্তু এ জ্ঞানও সীমাবদ্ধ। এ জ্ঞানের দ্বার দিয়া অপরের অন্তরের অনুভূতির সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু কেবল জ্ঞান দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সকলই জানিতে পারা যায়—দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের সমস্তই চাক্ষুষ দেখিতে পাওয়া যায়: যিনি এই জ্ঞানের অধিকারী তাহাকে 'কেবলিন' বলে। কেবলিনের দেহত্যাগ হইলে তাঁহার আত্মা আলোক-রাজ্যে বা স্বর্গের অভিমুখে উধাও হয়। বিশ্বজগতের উপরিভাগেই এই রাজ্য। এইখানেই কেবলিনের আত্মা উজ্জ্বল আলোকে চিরকাল শান্ত সমহিত ভাবে বাস করিতে থাকে। কোন বিক্ষোভের কারণ তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে পারে না—তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট করিতে পারে না। ইহাই জৈনদিগের নির্ব্বাণের অবস্থা, কর্ম্মের বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিতে না পারিলে এ অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়। এই মুক্তি বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণের ন্যায় আত্মার ধ্বংস নয় কিংবা শঙ্করপন্থী বেদান্তবাদীদের পরমাত্মার সহিত আত্মার মিলন বা আত্মার পরমাত্মায় লীন হওয়া নয়।

বৌদ্ধদিগের কুমার সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিয়া যে ত্যাগের নূতন পথ দেখাইয়াছিলেন তাহা আজ সংসারের এক পঞ্চমাংশ লোক ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, আর এই যুগের প্রায় ২৪ জন রাজকুমার সংসার ত্যাগ করিয়া যে অহিংসা ও জীব-প্রীতিধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা ভারতের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবার কারণ কি? ধর্ম্মের কঠোর-সাধন ও প্রচার-ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

তীর্থঙ্করেরা জীবন্মুক্ত পুরুষ—কর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাঁহারা আলোক-রাজ্যে প্রবেশের অধিকারী হইয়াছেন—যাঁহারা শাশ্বত শান্তি ভোগ করিতেছেন। এই ধর্ম্মের সন্ন্যাসীদিগকে যতি বলা যায় ও ইঁহাদের কোনরূপ সম্পত্তি নাই। আহারের জন্য ভিক্ষা করিবার সময় কেবলমাত্র ইঁহারা বাসস্থান ত্যাগ করিয়া বাহির হন। তদ্ভিন্ন সকল সময়েই ইঁহারা অধ্যয়ন ও সাধনায় রত থাকিয়া জ্ঞান-লাভের পথে উন্নীত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ছাগ-লোমের পাখার বাতাসে সম্মুখ হইতে জীবদিগকে সরাইয়া দিয়া ইঁহারা পথ চলিয়া থাকেন। মুখ-বিবরে কোন জীব উড়িয়া আসিবার ভয়ে ইঁহারা মুখের সম্মুখে ও নাসিকা-বিবরে ঐরূপ জীবের প্রবেশ ভয়ে একটুকরা বস্ত্র ব্যবহার করেন। এই সম্প্রদায়ের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান এত অধিক যে জৈনদিগের প্রধান প্রধান তীর্থগুলি সৌন্দর্য্যনিলয় তরুরাজি সমাকীর্ণ নির্জ্জন পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। সভ্যতার কেন্দ্র স্থল হইতে বহুদূরে এগুলি অবস্থিত।

এক্ষণে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর শব্দের একটু আলোচনা করিব। অনেকেরই ধারণা শ্বেতাম্বরেরা শ্বেতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন আর দিগম্বরেরা নগ্ন অবস্থায় থাকেন। প্রকৃত পার্থক্য এখানে নয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পূরণচন্দ্র নাহার এম-এ, বি-এল, মহাশয় গত ঊনবিংশ সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস শাখায় শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন ও যাহা মাঘ মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—"ভগবান মহাবীরের সময় জৈনধর্ম্ম কোন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় নাই এবং তৎপরেও বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত যে অবিভক্ত ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্বেতাম্বরগণের যেরূপ আচারাঙ্গসূত্রাদি পঁয়তাল্লিশটী প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ আছে ও যে গুলিকে তাঁহারা জৈন-সিদ্ধান্ত বা জৈনাগম বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, দিগম্বরগণ সেরূপ এই প্রাচীন জৈনসূত্রাদিকে মান্য করেন না।" * * "সম্রাট্ অশোকের সময় জৈন সাধুগণকে 'নিগ্রন্থ' নামে অভিহিত করা হইত। 'নিগ্রন্থ' অর্থে নগ্ন সাধু নয়—যাঁহারা গ্রন্থীরহিত অর্থাৎ রাগদ্বেষ কষায়াদি বন্ধন-রহিত সাধু। খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৭০ অব্দে উৎকীর্ণ খারবেলের শিলালিপি পাঠে জানিতে পারা যায় যে জৈন সাধুগণকে নানাবিধ পট্টবস্ত্র ও শ্বেতবস্ত্র দান করা হইয়াছিল, সুতরাং সে সময়ে জৈনসাধুগণ শ্বেতবস্ত্র ও পট্টবস্ত্র যে পরিধান করিতেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এক্ষণে আমরা আমাদের ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। ৭টা ২৫ মিনিটের সময় আমরা মধুবনের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম—ইহার পূর্ব্বে পথে পড়িয়াছিল থাকা ব্রিজ,

গুনিয়াড়ি বাংলা, জোড়াপাহাড়,বরাবর ব্রিজ,যাহা পাব্‌লিক ওয়ার্কসের কাপ্তেন গ্রীন সাহেব-কর্ত্তৃক ১৯২০-১৯২৩ সালে নির্ম্মিত হইয়াছে;—চরকী ব্রিজ। হাজারিবাগ-গয়া রাস্তা বেশ প্রশস্ত, সুন্দর রাস্তা—মোটর চলিবার পক্ষে বেশ সুবিধাজনক পথ বটে। মধুবনের নাম যাহারা এমন চির মধুময় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের ও রুচির তারিফ না করিয়া

মধুবনের সাধারণ দৃশ্য

থাকিতে পারা যায় না। যেন একখানা মনোরম সাজান বাগান—ছোট-বড় গাছ সারি দিয়া প্রহরীর কার্য্য করিতেছে—আর ভিতরে নানাবিধ কুসুম ও ফলের গাছ, যাহারা এমন সুন্দর নয়নাভিরাম করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে তাহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। প্রকৃতিদেবী নিজহস্তে যেন এই মধুবনকে একখানি সজীব চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছেন। জীবজন্তু এখানে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। ইহারই মধ্যে জৈনদিগের ধর্ম্মশালা আছে। দিগম্বর সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে অবস্থান করিতে পারেন, জৈনদিগের গোশালাও এখানে আছে। গো-সেবা আজকাল ভারত হইতে উঠিয়া যাইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু এই সম্প্রদায়ের লোকেরা গো-মাতার সেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকাতরে অর্থ দান করিয়া গো-শালা ও পিঁজরা-পোলের ব্যবস্থা সর্ব্বত্র করিয়া দিয়া প্রাচীন ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, গো-জাতির দুর্দ্দশার জন্যই ভারত সন্তান যে দুর্ব্বল হইতেছে তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ডুলি লইতে হইলে এখান হইতেই সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। এখানে জৈনদিগের কয়েকটী মন্দির আছে। তাঁহারা-পন্থী ও বিশপন্থী বা দিগম্বরী দিগের ও শ্বেতাম্বরী-দিগের কয়েকটী মন্দিরও আছে। এখানে অক্টোবর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বহুদূর হইতে লক্ষ লক্ষ জৈন সম্প্রদায়ের যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে। উৎসবের কথা বলিবার সময় সে কথার আলোচনা করা যাইবে। আমরা মধুবনের কয়েকটী চিত্র সংগ্রহ করিয়া পত্রস্থ করিলাম; আমরা এগুলির চিত্র তুলিতে পারি নাই, কারণ স্থানীয় দু একজন লোক আমাদিগকে যাইবামাত্র বলিয়া দিল, আপনারা যখন ডুলি লইতেছেন না, তখন শীঘ্র শীঘ্র উপরে উঠিয়া যান, কারণ উঠিতে অনেক সময় লাগিবে, অবশ্য আসিবার সময় অল্প সময় লাগিবে। উপরের সব দেখিয়া নীচে আসিয়া এগুলি দেখিবেন; কিন্তু উপর হইতে

চরকি পুলিশ কাঁড়ি—মধুবন
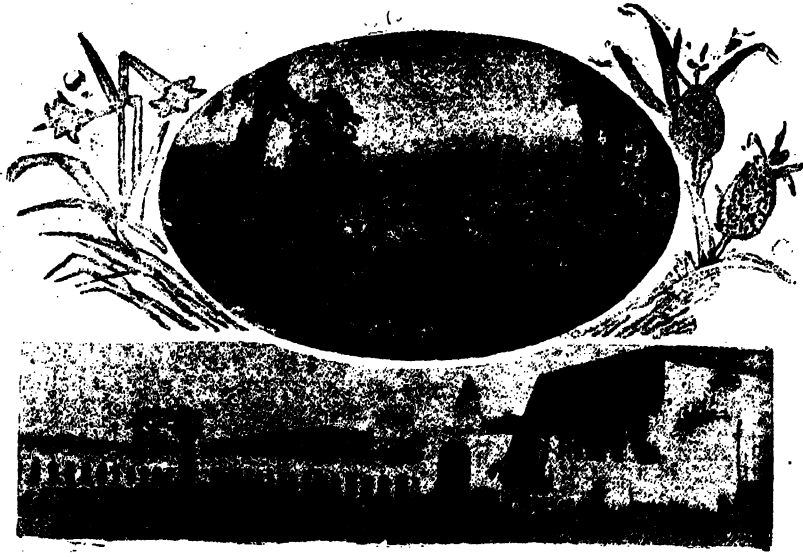
উপরে, পরেশনাথ পাহাড়ের উপর হইতে মধুবনের চিত্র
নিম্নে, দিগম্বর জৈন-ধর্ম্মশালা

নামিয়া আর আলোর সাহায্য না পাওয়ায় অগত্যা এগুলির ফটো তুলিতে পারা যায় নাই।

আমরা পার্শ্বনাথের নাম স্মরণ করিয়া পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিলাম। দুই জন কুলী মালপত্র বহন করিবার জন্য মধুবন হইতেই লওয়া হইয়াছিল। একটু উঠিয়াই আমরা একজন পথ-প্রদর্শককে লইলাম ও নিকটের এক বৃদ্ধার নিকট হইতে দুই পয়সা করিয়া পর্ব্বত-উঠিবার সহায় স্বরূপ এক একগাছি লাঠি খরিদ করিলাম। অবশ্য আমি খরিদ করি নাই, কারণ সর্ব্বত্রই আমার হাতে ঝালদার একগাছি বংশদণ্ড থাকেই। আমি পথ-প্রদর্শকের সহিত কথা কহিতে কহিতে অনেক কথা জানিয়া লইলাম। এখানে তিন স্তর (range) পাহাড় আছে। দুই স্তরে বন্য জাতিরা বাস করে, তাহারা জীবহিংসা করিয়া থাকে, কাঁড় ও তীর ছুড়িয়া তাহারা ব্যাঘ্র, চিতা ও ভল্লুকাদি হিংস্রজন্তু মারিয়া থাকে। সাহেবেরা ও দেশীয় শীকারী আসিয়া তাহাদের সাহায্য লইয়া এখানে শীকার করিয়া থাকে। ব্যাঘ্রেরা সদা-সর্ব্বদাই ঝরণার জল পান করিতে আসে, তবে সন্ধ্যার পরই বেশী আসে। টাঙ্গি হাতে না লইয়া কোন 'বুনোই' চলে না। ঢাক, দামামা, কাড়া পিটিয়া জঙ্গলীরা জানোয়ার দিগকে তাড়াইয়া লইয়া আসিলে শীকারীরা গুলি চালাইয়া থাকে। এখানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শীকারের জানোয়ার পাওয়া যায়; কোন শিকারী কোন কালেই এখান হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরে না। শুনিয়া প্রাণে যে একটু ভয় হয় নাই তাহা নয়; তার পর প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, পার্শ্বনাথের এমন মহিমা যে কোন জানোয়ারই কোন তীর্থযাত্রীকে আজ পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলে নাই বা তাহার নিকট আসিতে সাহস পায় নাই। যাক্ পার্শ্বনাথের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমিই ছিলাম অগ্রগামী। চলিতেছি আর মাঝে মাঝে পশ্চাতের সঙ্গীদের জন্য কিছুক্ষণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছি। তাহারা আসিলে আবার চলিতে লাগিলাম। হিংস্রজন্তুদের কথা কাহাকেও বলিলাম না। ২॥ মাইল উঠিয়া 'সীতানালা থানাকে রাস্তা ৩ মাইল' একটী ফলকে লেখা রহিয়াছে দেখিলাম। এ পর্য্যন্ত খুব সরু পথ ধরিয়া উঠিয়াছি, উভয় পার্শ্বেই ভীষণ অরণ্য। অসংলগ্ন প্রস্তর খণ্ডের উপর দিয়া এ পথ চলিতে হয়। উঠিবার সময় পথ ক্রমশঃই অধিকতর গড়ান হইতে লাগিল। আমরাও আস্তে আস্তে লাঠির সাহায্যে উঠিতে লাগিলাম; বামদিক দিয়া উঠিবার একটী রাস্তাও আছে। তবে সে রাস্তাটা আরও একটু অসমতল হইয়া পড়িয়াছে। এখন পরিষ্কৃত হইতেছে দু এক স্থলে

হামাগুড়ি দিতে হইয়াছে। দু একটি হরিণ ও ময়ূর ছাড়া অন্য কোন জানোয়ার আমাদের চক্ষে পড়ে নাই। আমরা দক্ষিণ দিকেই উঠিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে পথে দাঁড়াইয়া নিম্নের মন্দির গুলিকে ছবির মত দেখিতে লাগিলাম। এখনও পরেশনাথের মন্দিরের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাই নাই। কেবল সুবিস্তৃত শাল-সেগুণ-তমাল হরিতকী প্রভৃতি তরুলতা-সমাচ্ছন্ন বিস্তৃত জঙ্গল-তরাই চক্ষে পড়িতেছিল, আর নিম্নদিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম যদি কোন গতিকে পা পিছ্‌লাইয়া পড়ে তবে জীবনের আশা কিছুতেই থাকিবে না, কিংবা যদি পাহাড়ের গহ্বরে পড়িয়া যাই তাহা হইলেও রক্ষা নাই। দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সমতল সরু রাস্তা দিয়া বহু কষ্টে উঠিয়া প্রথম স্তর শেষ করিলাম। পথটা ৩ মাইল, সাড়ে তিন মাইল হইবে। চড়াই গুলিতে উঠিবার সময় বেশ একটু ফুসফুসে জোর লাগিতেছিল। শীতকালেও গলদঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল। এইখান হইতেই প্রথম পরেশনাথের মন্দির দেখিতে পাইয়া পুলকিত হইলাম। সত্যনারায়ণ একখানা ফটো লইল।

এইখানে অনেকটা জমীতে তামাকের পাতার মত পাতা দেখিয়া ঠিক করিয়াছিলাম যে এখানে তামাকের চাষ হয়। তাহার পর যখন নিম্নে নামিলাম তখন অমূল্যবাবুর নিকট শুনিলাম, তাঁহার বুক কেমন ধড় ফড় করিতে লাগিল বলিয়া তিনি আর উঠিতে সাহস করেন নাই। তার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর সুস্থ হইয়া আবার ২৲৷৩ মাইল পর্য্যন্ত তিনি উঠিয়াছিলেন। তিনি যে চা-বাগিচা দেখিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিলেন। তখন আমি যাহাকে দূর হইতে দেখিয়া তামাকের চাষ ঠিক করিয়াছিলাম তাহাকেই চা-বাগিচা সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম। তাঁহার নিকট চার পাতা দেখিলাম। ছয় মাইল লম্বায় ও তিন মাইল চওড়া জায়গায় চার চাষ হইয়া থাকে।

ফটো হইতে পরিপার্শ্বিক দৃশ্যের অবস্থাটা কতকটা বুঝা যাইবে। কি ভীষণ বন-জঙ্গলসমাকীর্ণ এ স্থান। এইখান হইতে দেখিতে পাওয়া যায় তিন থাক মন্দির উপর্য্যুপরি উঠিয়াছে। ২০টী উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের গম্বুজ (dome) উঠিয়াছে—তাহাদের শিখর দেশে পিত্তলের চূড়া সূর্য্যকরে ঝল্‌ মল্‌ করিতেছে এবং শ্বেতাম্বর মন্দিরগুলিতে রক্ত ও হরিদ্রা বর্ণের পতাকা উড়িতেছে। এইখান
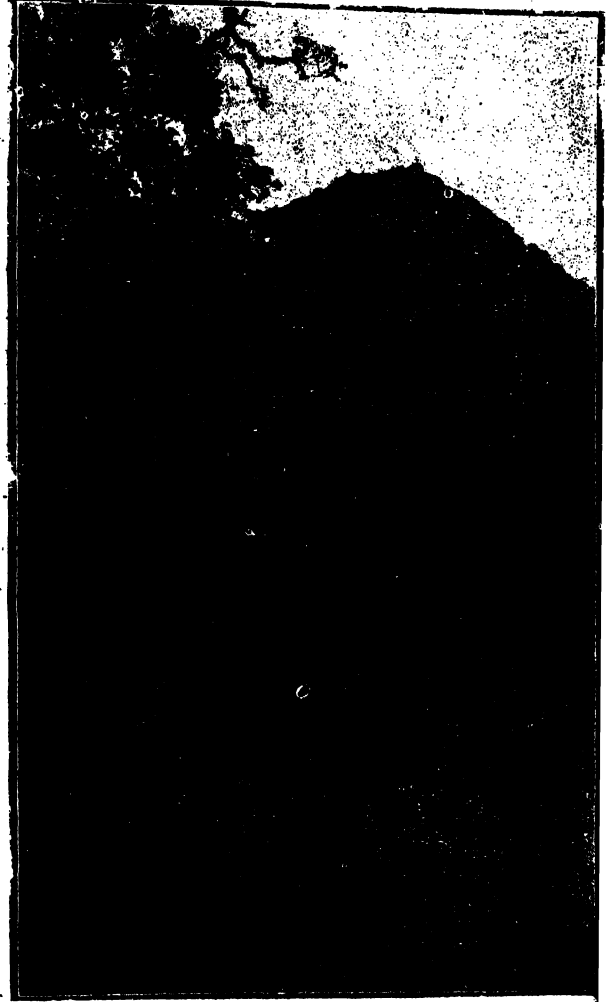
দূর হইতে পরেশনাথের মন্দির

হইতে উচ্চ পথে উঠিতে হয় ও পবিত্র পরেশনাথ পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত যাইতে হয়। এখানে ৪২৯টী সিঁড়ি চাতাল-সমেত আছে। এগুলি দৈর্ঘ্যে ৬ হইতে ৯ হাত ও প্রস্থে অর্দ্ধ হাত হইতে দেড় হাত পর্য্যন্ত। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে খানিকটা করিয়া সমতল ভূমিও আছে। সেই স্থানে একটু সাবধানের সহিত উঠিতে হয়। এই পথে উঠিতে উঠিতে অব্যক্ত মধুর জল-কল্লোল শুনিয়া জানিতে পারিলাম পার্ব্বত্য নদী গন্ধর্ব্ব আপন মনে ছুটিয়া চলিতেছে; অল্পক্ষণ পরে গন্ধর্ব্বের সাক্ষাৎ পাইলাম। পর্ব্বতের উপর বেশ ছায়াশীতল তরু-লতার মধ্য দিয়া গন্ধর্ব্ব আপন মনে গায়িতে গায়িতে ছুটিয়া চলিয়াছে। আবার এই নদীর সহিত সাক্ষাৎ

হইল এবং কিছুক্ষণ পরে ১১টা বাজিতে ২০ মিনিটের সময় পাহাড়ের দ্বিতীয় স্তর পার হইলাম। গ র্ব্ব নদীর তীর হইতে উপরে বিধুনিত তুলার মত মেঘ খণ্ড দেখিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম। বাবাজী সত্যনারায়ণ এই দৃশ্যের একটী ফটো লইলেন; কিন্তু ফটো খানি ভাল উঠে নাই। পথপ্রদর্শকের নিকট শুনিলাম এদৃশ্য দেখা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে না; অপর দিকে আমরা মেঘের খেলা দেখিতে লাগিলাম। কোন অপরূপ শিল্পী যেন মেঘগুলির উপর তুলির সাহায্যে অপূর্ব্ব রঙ ফলাইয়াছে—নানাবর্ণ-সম্পাতে এমন অদ্ভুত মিশ্রবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছে যাহা দেখিবার সৌভাগ্য বড় একটা ঘটে না; সে দৃশ্যের মনোহারিত্ব বর্ণনা করিবার নয়—উপভোগ করিবার। আর যে স্রষ্টা এইরূপ সৌন্দর্য্য দেখিবার সুযোগ ও অবসর আমাদিগকে দিলেন তাহার শ্রীচরণে মস্তক নত করিলাম। এই স্থানে আসিবার পূর্ব্বে আমরা বেশ শৈত্যানুভব করিয়াছিলাম। এইখানে সীতা নদীর তর্জ্জন-গর্জ্জন বেশ শুনা যাইতে লাগিল। এইখানে দক্ষিণ দিকে হনুমানের মূর্ত্তি ও বামদিকে সীতাদেবীর একটী ছোট মন্দির দেখিলাম। জনৈক সঙ্গী যিনি 'সীতানালা'র জল স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহার নিকট শুনিলাম বরফের মত নদীর জল শীতল ও পরিষ্কার কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। এইখানে আসিয়া বন্ধুরা বিশ্রাম করিতে ও চা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে বসিলেন; কিন্তু আমরা চ রিজন বিশ্রাম না করিয়া দেখিতে ছুটিলাম, প্রাণের ভিতর দর্শনের যেন নেশা লাগিয়াছে। পথশ্রমকে গ্রাহ্য না করিয়াই চলিতে লাগিলাম। এই স্থান হইতে দুই দিকে মন্দির ও টোকা বাহির হইয়াছে। আমরা সম্মুখের কষ্টিপাথরের দুইটী ছোট চরণ দেখিয়া, বামদিক ধরিয়া চলিলাম। এখানে প্রত্যেক শৈলশৃঙ্গের উপর পৃথক পৃথক তীর্থঙ্করদিগের মন্দির ও আসনের উপর চরণ চিহ্ন আছে। এই আসনগুলির কোনটী কষ্টিপাথরের আবার কোনটী শ্বেত পাথরের। চরণগুলির আকৃতিও একরূপ নয়—কোনটী ছোট, কোনটী সুবৃহৎ। এই শৈলশৃঙ্গগুলি দুরারোহ। বহু কষ্টে আমরা প্রায় সকলগুলি শৃঙ্গেই উঠিয়াছিলাম—মাত্র দুইটী শৃঙ্গে উঠি নাই; না উঠিবার কারণ দূর হইতে পথপ্রদর্শক নিষেধ করিতে লাগিল—আমরা যে দিক ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম সে দিক দিয়া যাইবার পথ ছিল না। অনেকটা ঘুরিয়া আসিয়া আবার সেই দিকে চলিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ শৃঙ্গগুলি অন্যান্য শৃঙ্গের অনুরূপ বলিয়াও বটে।

বামদিকের মন্দিরগুলির ভিতর জল-মন্দিরই দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। জল-মন্দিরের নিকটে একটী ফলকে লিখিত আছে—দিগম্বরোয়ো কো জানেকো

জল-মন্দির

সুমানীয়ৎ হৈ। এইখানে ভগবান্ নেমিনাথ, ভগবান্ পার্শ্বনাথ ও ভগবান্ আদিনাথের সুবৃহৎ নয়নমোহকর ধ্যানী মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। প্রত্যেক তীর্থঙ্করের চক্ষুতে বহু মূল্যের পাথর বসান। মধ্যস্থলের পার্শ্বনাথের চক্ষুতে বড় বড় দুইটী উজ্জ্বল হীরক খণ্ড যেন জ্বলিতেছে। অপর দুইটীর একটীতে বহু মূল্যের নীলা ও অপরটীতে চুণি জ্বলিতেছে। মূর্ত্তি গুলি এমনই ভাবব্যঞ্জক যে দেখিবামাত্র মনে ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। শান্ত, স্থিতধী তীর্থঙ্করেরা সংসারের সকল বন্ধন দূর করিয়া নির্ব্বিকারভাবে কেমন ধ্যানস্তিমিত নয়নে বসিয়া আছেন! দেখিয়াই ফটো লইবার লোভ হইল। সত্যনারায়ণ ফটো লইতে উদ্যোগ করিলেই মন্দিরের গোমস্তা বলিলেন, 'মন্দিরের ফটো তুলিতে পারেন, ভগবানের ফটো লওয়া আমাদের ধর্ম্মনিষিদ্ধ।' অবশ্য আমি একবার মাত্র তাহাকে বলিলাম কলিকাতায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহার মহাশয় জৈনধর্ম্মের উপর ইংরাজীতে যে সুন্দর পুস্তক লিখিয়াছেন (An Epitome of Jainism) তাহাতে কিরূপে তাহা হইলে পার্শ্বনাথের চিত্র দিয়াছেন।' অবশ্য তাহার মত করিতে পারিলাম না। কাজেই দেবতার মূর্ত্তি তুলিয়া দেখাইতে পারিলাম না। যাহা হউক যে ভাস্কর বা যাহারা এই সুন্দর মূর্ত্তি তিনটী গঠন করিয়াছেন সে ব্যক্তি বা তাহারা যে সুধু কলা ও কল্পনাকুশলী ভাস্কর ছিলেন, তাহা নয়—ভাব-রাজ্যের ও সাধন-মার্গের পথিকও ছিলেন, তাহা না হইলে প্রস্তরের ভিতর এমন প্রাণ-মাতান ভাবের বিকাশ দেখাইতে কখনই পারিতেন না। মন্দিরটী বাস্তবিকই হিন্দুস্থাপত্যেরও সুন্দর নিদর্শন। এইখানে একজন ধর্ম্মপ্রাণ জৈনকে স্তবপাঠ করিতে শুনিয়া বিমুগ্ধ চিত্তে কিছুক্ষণ শুনিতে লাগিলাম। স্থান মাহাত্ম্য ও ভক্তের আকুতিপূর্ণ প্রার্থনায় আমাদের মত বিষয়ীর মনও অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য গলিয়া গেল।

বিশ্রাম স্থানে আমরা ১|৫০ মিনিটের সময় উপস্থিত হইলাম। এইবার আমরা চারিজনে চা-পান ও জল-যোগাদি করিলাম। অপর সঙ্গীরা ইতিপূর্ব্বেই বিশ্রাম ও আহারাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এখানে আমরা ১৫ মিনিট মাত্র বিশ্রাম করিয়া আবার বাম দিকের মন্দিরগুলি

জিতনাথের মন্দিরের নিকটের টোক।

দেখিতে চলিলাম। এবার সকলেই এক সঙ্গে যাত্রা করিলাম। এখানেও কয়েকজন তীর্থঙ্করের মন্দির দেখিলাম। ভিতরে একইরূপ চরণ-চিহ্ন—তবে আকৃতিতে বড় আর ছোট। এই গুলিকে "বসু পাদুকা" বলা হয়। তবে কতক গুলি পাদুকা এত ছোট যে সেগুলি যে মানুষের পাদুকা বা চরণের চিহ্ন হইতে পারে তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, আবার সুবৃহৎ পাদুকাগুলির সম্বন্ধেও ঐরূপ মন্তব্যই প্রযোজ্য।

এই সকল মন্দিরে ভক্ত-যাত্রীরা কিসমিস্, বাদাম, পেস্তা আখরোট, মনক্কা, ডালিম, বেদনা প্রভৃতি ফল ও বাতাসা লবঙ্গ, জয়িত্রী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দিয়া থাকেন। অনেক সেইরূপ প্রসাদী দ্রব্য আমরা সংগ্রহ করিয়া ভক্তি-

নিম্নতম সোপান হইতে পরেশনাথের মন্দির-দৃশ্য
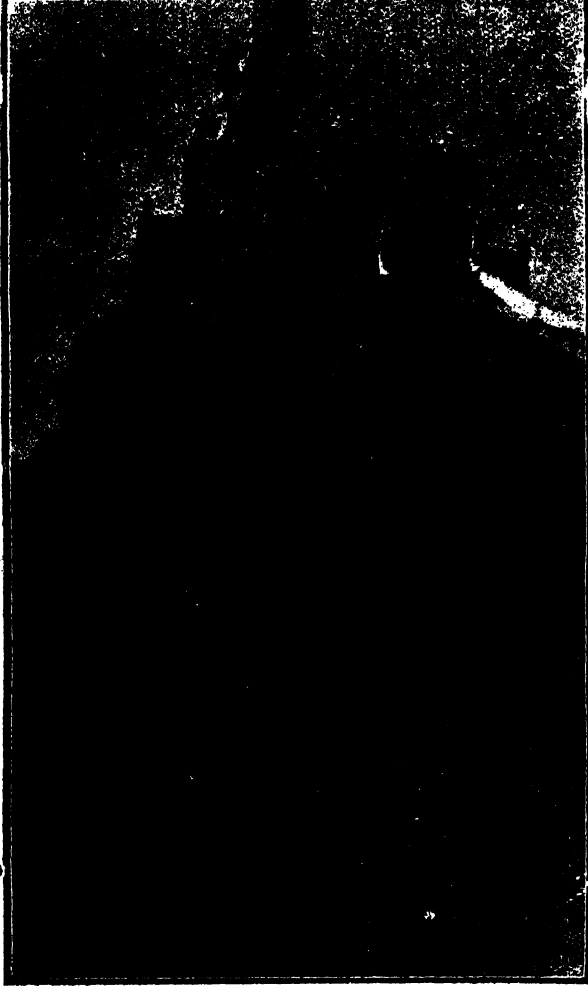
ভরে গ্রহণ করিয়াছি। না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে যে চুরি করা হয়, তাহা কিছুতেই মনে করিতে পারি নাই। পূজারী বা কোন ব্যক্তি থাকিলে অবশ্য চাহিয়া লইতাম। প্রসাদের লোভ ছাড়িতে পারি নাই, ইহা সদা-জাগ্রত ভক্ত তীর্থঙ্করেরা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। জিতনাথের মন্দিরের নিকট যে টোকাটী আছে তাহার যে ফটো গৃহীত হয় তাহা এখানে প্রদর্শিত হইল। দক্ষিণদিকে লেখক বসিয়াছিলেন, রৌদ্রের ঔজ্জ্বল্যবশতঃ লেখককে চিনিবার উপায় নাই। এইরূপ টোকা প্রত্যেক মন্দিরেই আছে বলিলে হয়। দু একটী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। তাহার পর আমরা আমাদের কাম্য মন্দিরের—পরেশনাথের মন্দিরের পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখানে এই সময় আজমীর, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে পদব্রজে ও ডুলিতে চড়িয়া বহু মাড়োয়ারী আসিয়াছেন দেখিলাম। আজমীর-যাত্রীরা সপরিবারে আসিয়াছেন—বালক-বালিকারা উৎসাহের সহিত চাকর-বাকরের কোলে চড়িয়া যাইতেছে—মন্দিরে উঠিয়া 'জয় পার্শ্বনাথ কি জয়' বলিয়া তাহারা চীৎকার করিতেছে। বালক-বালিকাদের ধর্ম্মপ্রবণতা দেখিবার জিনিস। ৮০টী সিঁড়ি পার হইয়া মন্দিরে উঠিলাম। মন্দিরের সিঁড়ি হইতে যে চিত্র তোলা হইয়াছে তাহা এখানে প্রকাশ করিলাম। জল-মন্দির, পরেশনাথ মন্দির ও অন্যান্য মন্দিরের সম্মুখে গীত-বাদ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। সকাল বেলা ৮টার সময়, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যার সময় দামমা ও বংশী বাজিয়া থাকে। পূজার সময় সর্ব্বক্ষণই বাজনা বাজিয়া থাকে এবং প্রত্যেক মন্দিরের সম্মুখেই দর্শনার্থীদের জন্য চত্বর ও ধর্ম্মশালা আছে। পরেশনাথের মন্দিরের মধ্যভাগে যে চরণ চিহ্ন দুইটী আছে তাহার চিত্র অভ্যন্তরে চিত্রসহ পরপৃষ্ঠায় দিলাম। ছাতে চতুষ্কোণযুক্ত শ্বেতবর্ণের চন্দ্রাতপ ও তাহার নিম্নে একখানি ছোট সুচিকণ-কারু-কার্য্যযুক্ত চন্দ্রাতপ ভগবানের চরণদ্বয়ের উপর রহিয়াছে। চারিটী দণ্ডের উপর আসন খানি প্রতিষ্ঠিত। আমরা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মূল মন্দিরটী প্রদক্ষিণ করিয়া ২।৫০ মিনিটের সময় পাহাড় হইতে নামিতে সুরু করিলাম। পর্ব্বতে উঠিবার ও নামিবার সময় আমাদের প্রত্যেকেই কমলা লেবু ব্যবহার করিয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় হাজারিবাগ হইতে পরেশনাথ দেখিতে গিয়াছিলেন, এবং তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও মন্দিরের পর্য্যন্ত ফটো লইতে পারেন নাই। ভাগ্যে তিনি পূর্ণিমা তিথিতে গিয়াছিলেন, তাই রাত্রিকালে তিনি পরেশনাথের দুই খানি চিত্র না বলিয়া তুলিয়া লইয়াছেন। আমরা তাঁহার সৌজন্যে প্রাপ্ত সে দুইখানি চিত্রও শেষপৃষ্ঠায় দিলাম।

বৎসরের সর্ব্ব সময়েই ধর্ম্মপ্রাণ জৈনরা এখানে পূজার্চ্চনা করিতে আসেন—অনেকে আবার পদব্রজে ১৫০০।২০০০ মাইল পর্য্যন্তও আসিয়া থাকেন। এখানে মাঘ মাসে এক মাস-ব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে। তখন সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী সমাগম হয়।

এই মন্দিরগুলিতে কাহাদের প্রবেশাধিকার আছে

তাহা জানাইয়া দিবার জন্য নিম্নলিখিত নোটীশ লিখিত আছে :—

No one but Jains and Hindus of High caste can enter the large Temple and the 25 little temples of the Jaina Sitambaris, which, are situated on Paresnath Hill.

If any other person than a. Jain or a Hindu of high caste enters the said temples he will be prosecuted under chapter 15 of the Indian Penal Code.

According to the contents of a letter no 719 dated Feb 7th 1865 from the Leiutenant Governar of Bengal to the Commissinoer of Chotanagpur.

This tablet is put up in January 1904 A. D. to replace the former one dated the 25th March 1870 A. D.

By order of the Jain Sitambari Society
Maharaj Bahadur Sing.
January 1st 1904 General Manager

ডাক বাংলার নিকট এই ইস্তাহার লিখিত আছে। ইহার ভাবার্থ এই যে,১৮৬৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুর ছোটনাগপুরের কমিশনার সাহেবকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার সর্ত্তানুসারে জৈন মাত্রেই এবং উচ্চজাতির হিন্দুরা জৈন শ্বেতাম্বরদিগের এই বৃহৎ মন্দিরে ও ছোট ছোট ২৫টী মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া যাহারা প্রবেশ করিবেন তাহারা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের পঞ্চদশ অধ্যায়ের ধারাগুলির কোন একটী বা ততোধিক ধারায় অভিযুক্ত হইবে। ১৮৭০ সালে ২৫শে মার্চ্চ এই ইস্তাহার প্রথম জারি হয়। তাহার পর প্রস্তরখানি নষ্ট হওয়ায় পুনরায় ১লা মার্চ্চ ১৯০৪ সালে ইহা তাহার স্থলে গ্রথিত হইল।

এখানে কোন ইংরাজকে এই মন্দিরগুলিতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না ; কিন্তু পূর্ব্বে যে দেওয়া হইত তাহা ১৮২৪ সালে প্রকাশিত লেঃ কর্ণেল উইলিয়ম ফ্র্যাঙ্কলিন সাহেবের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই জানিতে পারা যায়। ও

মন্দিরের অভ্যন্তরের দৃশ্য

১৮২৭ সালের ডিসেম্বর মাসের Quarterly Magazineএ প্রকাশিত সাহেবের প্রবন্ধ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মূল মন্দিরে পূর্ব্বে পার্শ্বনাথের একটী ধ্যানটী মূর্ত্তি ছিল। তাহার মস্তকে সর্প কুণ্ডলীকৃত ভাবে ছিল। সন্ধ্যা ৫টার সময় আমরা মধুবনে আসিয়া উপস্থিত হই ও ৬৷৹টার সময় নিরাপদে বাসায় উপস্থিত হই।

হিংস্র বন্যজন্তুসমাকুল পার্শ্বনাথ পাহাড়ে ১ম ও ২য় স্তবক হিংসার রাজ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না—এখানকার বন্য পাহাড়ীরা মাংস ভুক্-সর্ব্ববিধ মাংসদ্বারাই উদর পূর্ণ করিয়া থাকে। আর তাহার উপরের স্তবকে মুনি-ঋষি-অধ্যুষিত তীর্থঙ্কর দিগের পাদচারণে পবত্রীকৃত তাঁহাদের সাধন-ক্ষেত্র। এখানে হিংসার নাম মাত্র নাই—
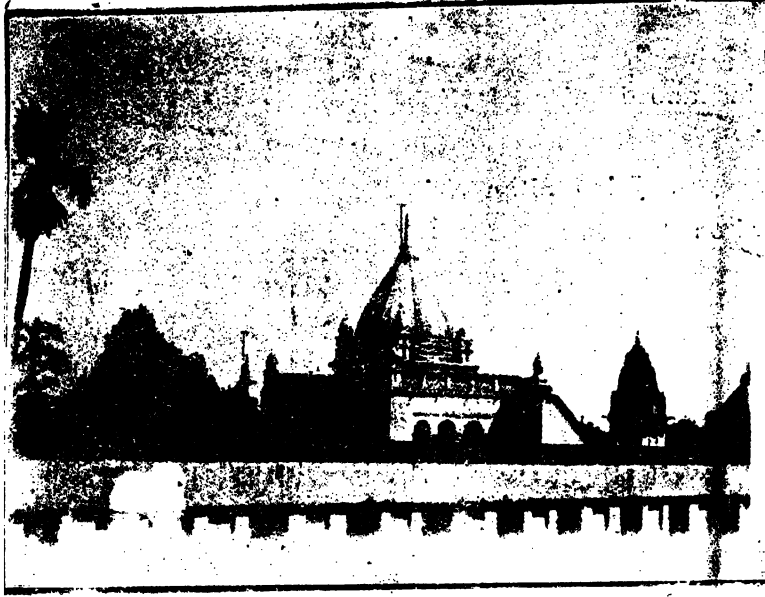
জ্যোৎস্নালোকে পরেশনাথের মন্দির

অহিংসার রাজ্য। ভারত চিরদিনই হিংসার উপরে অহিংসাকে স্থান দিয়াছে। এ দেশে হিংসার স্থান নাই, আছে প্রীতি ও ভালবাসার স্থান। পূর্ব্বে যে সকল জাতি, ধর্ম্ম ও সভ্যতার স্রোত ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, ভারত তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে কোন দিনই কুণ্ঠিত হয় নাই। ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে। ভারত চিরকালই পরকে আপন করিয়া লইয়া আপনার মহত্ত্ব ও সজীবতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে।

জ্যোৎস্নালোকে মন্দিরের একাংশ

সাহিত্য-পঞ্জী

বৈশাখ

১লা—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১২৯৪)। কিছুদিন 'রসসাগর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন; 'রহস্য সন্দর্ভে' অনেক লেখা বাহির হইত; Mukherjea's Magazine'এ কতিপয় ইংরেজী লেখা প্রকাশিত করেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থসকল—পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী, শূরসুন্দরী, কাঞ্চীকাবেরী। ইনি 'Willow Drops'এর বাঙলা অনুবাদ করেন—নাম 'বিরহ-বিলাপ'। প্রত্নতত্ত্বেও ইঁহার জ্ঞান ছিল।

—'প্রভাকর' কার্য্যালয়ে ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সাহিত্যিক সম্মিলনের প্রথম অনুষ্ঠান (১২৫৭)

দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ (জন্ম)১২২৭—ইহার রচিত গ্রন্থ:—গ্রীস ও রোমের ইতিহাস, ভূষণসার ইত্যাদি। সোম-প্রকাশ-সম্পাদক।

—প্রভাকর (মাসিক) প্রথম প্রকাশ (১২৬০)

—বঙ্গদর্শন (মাসিক) প্রথম প্রকাশ (১২৭৯)

২রা—প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জন্ম—(১২১২) ইঁহার রচিত গ্রন্থ:—'পূর্ব্বনৈষা' রাঘবপাণ্ডবীর, কুমারসম্ভব (৮ম সর্গ), অভিজ্ঞান শকুন্তল, চাটু পুষ্পাঞ্জলী, অনর্ঘ-রাঘব, উত্তররাম-চরিত, কাব্যাদর্শ, প্রভৃতির অনুবাদ।

৩রা—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের জন্ম (১২৮৫)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ:—'মহিলা' প্রভৃতি কাব্য।

৬ই—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম (১২৪৫)। ইঁহার রচিত গ্রন্থ:—'চিন্তাতরঙ্গিণী, বৃত্র-সংহারকাব্য দশমহাবিদ্যা, ছায়াময়ী, বীরবাহু কাব্য, ও কবিতাবলী।

—অমৃতলাল বসুর জন্ম (১২৬০)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ:—তরুবালা, বিজয়বসন্ত, ও হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি।

৯ই—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম (১৮৪৬)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ:—সুরুচির কুটীর, বীর নারী, নববার্ষিকী, ইত্যাদি।

১৫ই—দুর্গাদাস লাহিড়ীর জন্ম (১২৬০)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ:—বাঙ্গালীর গান, স্বাধীনতার ইতিহাস, বঙ্গের ইতিহাস, পৃথিবীর ইতিহাস, রাণী ভবানী। ১২৯৪ সালে 'অনুসন্ধান' প্রকাশ করেন।

১৬ই—গোবিন্দরাম ঠাকুরের মৃত্যুতিথি।

১৭ই—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা (১৩০১)।

—হরচন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যু (১৩০৫)।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

'লক্ষ্ণৌ টাইমস্' পত্রের সত্ব ক্রয় করেন।

২১শে—ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের জন্ম (১২৫১)। ঠাকুরদাস দত্তের মৃত্যু (১২৮৩)। ইনি বহু কবিদলের গান রচনা করিয়াছেন।

২২শে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম (১২৫৫) ইঁহার রচিত গ্রন্থ:—অশ্রুমতী, সরোজিনী, পুরুবিক্রম—বহু ফরাসী ও সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত, প্রণয়-সঙ্গীত ও জাতীয়-সঙ্গীত প্রভৃতি আছে।

২৪শে—কাঙ্গাল হরিনাথের মৃত্যু (অক্ষয় তৃতীয়া, বুধবার)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ:—বিজয়-বসন্ত, দক্ষযজ্ঞ, বিজয়া, অক্রুর-সংবাদ পরমার্থ গাথা, মাতৃমহিমা, ব্রহ্মাণ্ডবেদ। ইঁহার অনেকগুলি বাউল সঙ্গীত আছে। সেগুলি ফিকির চাঁদের বাউল নামে প্রসিদ্ধ।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জন্ম (১৮৩১ খৃঃ)। ইঁহার রচিত গ্রন্থ:—উভয় সঙ্কট, চক্ষুদান, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি।

২৫শে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম (১২৬৮) ইঁহার রচিত প্রধান গ্রন্থ:—বৌঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, চোখের বালি, নৌকাডুবি, রাজা ও রাণী কড়ি ও কোমল মানসী, বিসর্জ্জন, গীতাঞ্জলি, তপতী, গোরা, যোগাযোগ, সোনার তরী, কল্পনা, শিশু, খেয়া প্রভৃতি

৭২শে—জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ প্রতিষ্ঠা।

২৯শে—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১২।৫।১৮৮৫ ইনি 'সুধাংশু' এবং 'Inquirer' নামক পত্রিকাদ্বয়ের প্রকাশক। সর্ব্বার্থ সংগ্রহ, ষড়দর্শন, বিদ্যাকল্পদ্রুম রোমের পুরাবৃত্ত, প্রভৃতির লেখক ও রঘুবংশ, কুমার-

সম্ভব, নারদ-পঞ্চরাত্র এবং ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদক।

জগন্মোহন তর্কলঙ্কার সম্পাদিত—'পরিদর্শ' নামক দৈনিক পত্রিকা (১২৬৭) প্রকাশ, ১২৬৯ ইহা উঠিয়া যায়।

৩০শে — মহাপুরুষ মাধবদেবের জন্মতিথি।

জ্যৈষ্ঠ।

১লা — ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩০১—১৬।৫।১৮৯৪ খৃঃ) ইঁহার রচিত গ্রন্থ :—পারিবারিক প্রবন্ধ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ত্ব, ইংলণ্ডের ইতিহাস, পুরাবৃত্তসার, রোমের ইতিহাস, শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পুষ্পাঞ্জলি, আচার প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ ; ইনি বহুকাল এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ছিলেন।

ঢাকা হইতে 'চিত্তরঞ্জিকা' পত্রিকার প্রকাশ (১২৬৯)।

২রা — ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম (১৭৭১ শক) ইঁহার রচিত গ্রন্থ :—ভারত-উদ্ধার, কল্পতরু, ক্ষুদিরাম। ইনি 'পঞ্চানন্দ' নামক, মাসিকের প্রতিষ্ঠাতা, পরে এই পত্রিকাখানি 'বঙ্গবাসী'র সঙ্গে মিলিত হয়। ইনি 'সাধারণী'র একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'বঙ্গবাসী' ও 'জন্মভূমি'তে ইঁহার রচনা মাঝে মাঝে বাহির হইত।

৩রা — দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম (১২২৪)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ :—ব্রাহ্মধর্ম, ব্রাহ্মধর্মের বাখ্যান, ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস, উপদেশাবলী, ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা বক্তৃতাবলী, জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি, পরলোক ও মুক্তি, উপহার, আত্মজীবনী ; ইনি ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ করেন এবং উপনিষদের বৃত্তি রচনা করেন।

৪ঠা—প্রমদাচরণ সেনের জন্ম (১২৬৫—১৮।৫।১৮৪৯)।

—রসিকচন্দ্র রায়ের জন্ম (১২২৭ বৈশাখী পূর্ণিমা) ইঁহার রচিত গ্রন্থ :—হরিভক্তিচন্দ্রিকা, কৃষ্ণপ্রেমাঙ্কুর, বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয় পদাঙ্কদূত, শকুন্তলাবিহার, দশমহাবিদ্যা সাধন, ইনি দশ বৎসর বয়সেই কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। পরে ইনি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচয়িতা রূপে পরিগণিত হইত।

৮ই—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর জন্ম (১২৪২)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ :—সারদা মঙ্গল, বঙ্গসুন্দরী, প্রেম-প্রবাহিনী ; বর্ত্তমান যুগের বহু প্রতিভাবান কবি আদর্শের জন্য ইঁহার নিকট ঋণী।

৯ই—সাপ্তাহিক 'সমাচার-দর্পণ', প্রকাশ (২৩।৫।১৮১৮)।

১০ই—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩১০)। প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩০৬)। ইঁহার রচিত গ্রন্থ 'সঙ্গীতময়' ১ম ও ২য় খণ্ড।

১১ই—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু (১৩১০)

১৩ই— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম (১২৪৫)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ :—ললিতা ও মানস দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম, আনন্দমঠ, রজনী, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, রাজসিংহ, ইন্দিরা, কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ। ইনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। ইনি গীতার কিয়দংশের বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। ইংরেজী রচনায়ও ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'Mukherjea's Magazine'এ ইঁহার অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল।

—সারদারঞ্জন রায়ের জন্ম (১২৬৫)

১৩ই—অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু (১২৯৩)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ,—চারুপাঠ, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, পদার্থবিদ্যা, ধর্ম্মনীতি, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়। ইনি 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'মাদক সেবনের অপকারিতা' সম্বন্ধে ইঁহার বহু প্রবন্ধ বাহির হয়।

১৫ই—'দুর্জ্জন-দমন-মহানবমী' পত্রিকার প্রকাশ (১২৫৪)।

১৬ই—বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্মতিথি

কৃষ্ণবিহারী সেনের মৃত্যু (১৩০২)। ইঁহার রচিত গ্রন্থ :—

অশোক চরিত, নববিধান কি? কবিতামালা, বুদ্ধচরিত (অসমাপ্ত)—১৮৯০, সাধনা, গল্পমালা (অসমাপ্ত)। ইনি Sunday Mirror, Indian Mirror The Liberal, The New Dispensation প্রভৃতির সম্পাদক ছিলেন।

১৯শে—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জন্ম (১২৪৪)। ইঁহার
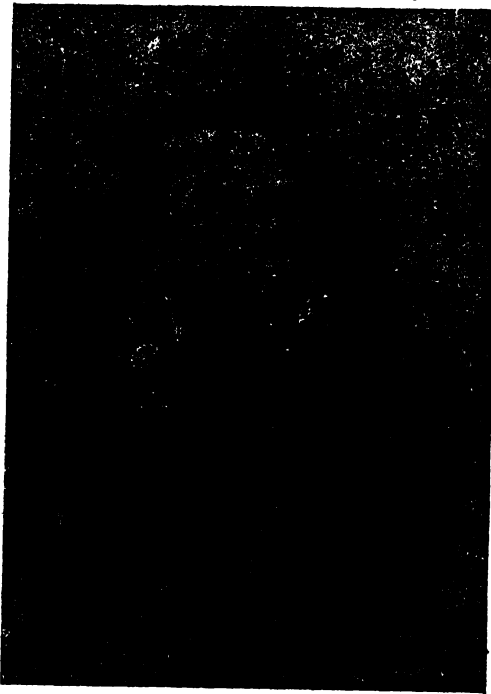
ভূদেব মুখোপাধ্যায়

জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রচিত গ্রন্থ :—'সম্ভাবশতক', 'রা-সের ইতিবৃত্ত, মোহ-ভোগ, ও কৈবল্যতত্ত্ব। ইনি যথাক্রমে ঢাকা প্রকাশ, বিজ্ঞাপনী ও বৈভাষিকী—এই তিনখানি পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। গুপ্ত-কবির সংবাদপ্রভাকরে কৃষ্ণচন্দ্রের বহু লেখা বাহির হয়।

২১শে—ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের জন্ম (১৮৬০ খৃঃ)। ইঁহার রচিত গ্রন্থ :—ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, বিদ্যাপতি ও অন্যান্য কবির জীবনী, নেপালের পুরাতত্ত্ব, রাজতরঙ্গিণী, বঙ্গে সংস্কৃতচর্চ্চা।

২২শে—শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যু (১৩২১)।

২৩শে—ব্রহ্মমোহন মল্লিকের জন্ম (৬।৬।১৮৩২ খৃঃ)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যু (১৩২৬)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ :—প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, কর্ম্মকথা, চরিতকথা।

২৭শে—চণ্ডীচরণ সেনের মৃত্যু (১০।৬।১৯০৬)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ :—জীবনগতি নির্ণয়, লঙ্কাকাণ্ড (বিদ্রূপাত্মক কাব্য, টমকাকার কুটীর প্রভৃতি।

—দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জন্ম (১২৫৩)

—বর্দ্ধমান রাজবাটীর মহাভারত অনুবাদের পরিসমাপ্তি (১২৯১)—

৩০শে—রজনীকান্ত গুপ্তের মৃত্যু (১৩০৭)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ :—সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, আর্য্যকীর্ত্তি, নব-

ভারত, ভারত-প্রসঙ্গ, ভীষ্মচরিত, বীরমহিমা, প্রতিভা, বোধ-বিকাশ, রচনা।

—যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যু (১৩১১)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ :—গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্তান্ত, ওয়ালেসের জীবন বৃত্ত, জন্‌ষ্টুয়ার্টমিলের জীবনবৃত্ত, আত্মোৎসর্গ, হৃদয়োচ্ছ্বাস, প্রাণোচ্ছ্বাস, কীর্ত্তিমন্দির, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন-বৃত্ত, শান্তিপাগল, সমালোচনমালা, জ্ঞানসোপান, ইত্যাদি।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—মৃত্যু (১৩১২) ইঁহার রচিত গ্রন্থ :—আশীষ, স্ত্রীচরিত্র-সংগঠন ইত্যাদি।

প্রমদাচরণ সেন—জন্ম (১২৬৬)—গ্রন্থ :—চিন্তাশতক সাথী, ইত্যাদি।

পরলোকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র]

গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৭) শুক্রবার রাত্রি দেড়টার সময় আমাদের সোদরোপম বন্ধু রাখালদাস অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। ছাত্রাবস্থা হইতে আমরা তাঁহাকে জানিতাম। তাঁহার ন্যায় সরল, অমায়িক, বন্ধুবৎসল লোক বাঙ্গালা দেশে বড় কম দেখিতে পাওয়া যায়। যখনই কোন বন্ধু-বান্ধবের দুর্দ্দশার কথা ঘুণাক্ষরে তাঁহার কর্ণে পৌঁছিয়াছে, তখনই তাহার সে দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য রাখালদাস বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কোন ছাত্র অর্থাভাবে লেখা-পড়া শিখিতে পারিতেছে না শুনিতে পাইলে তাহার কোমল হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। বহু ছাত্র তাঁহার দানে উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কৃতী হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৬ বৎসর হইয়াছিল। রাখালদাসের পরিচয় বিশেষ করিয়া দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে তিনি যে লব্ধ-প্রবেশ ছিলেন একথা শুধু ভারতবাসী নহে, পাশ্চাত্য-দেশবাসী বিশেষজ্ঞেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যাঁহারা ইতিহাসের আলোচনা করিয়া থাকেন, রাখালদাস ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। এম-এ পরীক্ষা দিবার কিছু দিন পূর্ব্বে এক দিন আমার নিকট রাখাল-ভায়া আসিয়া বলিল,"দাদা' ইতিহাসে এম-এ দেব না, সংস্কৃতে দেব স্থিরে করছি।' কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে বলিলেন,—"দাদা, সে অপমানের কথাটা হঠাৎ কাল রাত্রে মনে পড়ে গেল। সংস্কৃতেই এম-এ দেব ঠিক করেছি।" উত্তরে আমি বলিলাম, "পাগলাম ক'র না।" কথাটা তখন মনে পড়িয়া গেল। প্রথম বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়কে পত্রস্থ করিতে দিলে, উহা বাঙ্গালা হয় নাই বলিয়া তিনি ছাপান নাই। তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "দাও তোমার ঐ প্রবন্ধ, আমি পত্রস্থ করিব।" একটু-আধটু সংশোধন করিয়া 'কুক্কুটপদ গিরি' আমরা ১৩১২ সালে বাণী পত্রিকায় প্রকাশিত করি। তাহার পর তাঁহার অসংখ্য প্রবন্ধ বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর। 'প্রাচীন মুদ্রা' ১ম ভাগ সে-বিষয়ে জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে।

বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাখালদাস কলিকাতা মিউজিয়মে সামান্য একটী কেরাণীগিরি কার্য্যে প্রবেশ করেন। এই সময় ডাক্তার ব্লকের সহিত তাহার বেশ পরিচয় হয় ও তাঁহারই চেষ্টায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করেন। ছয় বৎসর কর্ম্ম করিয়া মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে উন্নীত হন। এই সময়ে রাখালদাস এম-এ পরীক্ষা দেন। অনেক বলিয়া তাহাকে সংস্কৃত পরীক্ষা দিতে নিবারণ করি। মাত্র দুই মাস পড়িয়া তিনি পরীক্ষা দেন ও ১৯১০ সালে

২য় বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি বোম্বাই প্রদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভার প্রাপ্ত হন। ১৯১০ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলী রিসার্চ পুরস্কার পান। এই সময় তিনি পুণার শানওয়ারাওয়াদা দুর্গের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া বিস্মৃত-যুগের ইতিহাসের উপর নূতন আলোকপাত করেন। এই স্থানে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অকালে প্রাণত্যাগ করে। তাহার পর মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কার করিয়া তিনি ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন ভারতবাসী বলিয়া অনেকে তাঁহার এই কর্ম্মের যথোপযুক্ত প্রাপ্য সম্মান দিতে প্রথমে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং স্যর জন মার্শেল অকুণ্ঠিত চিত্তে সাধারণে প্রচার করেন যে, ইহার জন্য কৃতিত্ব তাঁহার কিছুই নাই ইহা সম্পূর্ণই শ্রীযুক্ত রাখালদাসের প্রাপ্য। এই আবিষ্কার হইতে সভ্য-জগতে রাখালদাসের নাম গৃহ-পঞ্জীর মত আদৃত হইয়া আসিতেছে। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরের খনন-কার্য্যে ও বগুড়ার মহাস্থানের খনন-কার্য্যে রাখালদাসের সুদক্ষ হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া রাখালদাস ইংরেজী বসুমতীতে কিছুদিন সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করেন ও তৎপরে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী-চেয়ার পাইয়া ইতিহাসের অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বহুদিন হইতে বহুমূত্র রোগে তিনি ভুগিতেছিলেন এবং এই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে ও অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তাঁহার বিচার-বিশ্লেষণা, সত্য-নির্দ্ধারণের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনিই প্রথমে নূতন ভাবে সহজ সরল ভাষায় 'পাষাণের কথা'য় সাধারণের বোধগম্য করিয়া ইতিহাসের এক নূতন রূপ দান করিয়াছেন।

কথা-সাহিত্যেও তাঁহার দান সামান্য নহে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "বেণের মেয়ে" উপন্যাসে যে-প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন, ঠিক সেই প্রথা রাখালদাস 'ধর্ম্মপাল', 'শশাঙ্ক' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসে অনুসরণ করিয়াছেন। সমসাময়িক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সামাজিক বিধি নিষেধের চিত্র এগুলিতে যেমন ফুটিয়াছে, ইতিহাসের মর্য্যাদাও তেমনই

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্ষুন্ন আছে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—উপন্যাস, ইতিহাস নহে—এ কথার ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য যে, এগুলিতেও অনেক অবাস্তব ও কাল্পনিক চরিত্র, ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানের সংযোজনা তিনি করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজী ঔপন্যাসিক স্কট্ এক্ষেত্রে তাঁহার আদর্শ ছিল।

অভিনয়ের দৃশ্য-পটাদির বৈষম্য দেখিয়া রাখালদাস মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাই তিনি ঐতিহাসিক নাটকের দৃশ্য-পট, সাজ-সজ্জা প্রভৃতি স্থান, কাল, ও পাত্রের উপযোগী করিয়া 'ষ্টার' ও 'নাট্য-মন্দিরে'র কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটকে স্বয়ং সংযোজনা করিয়া, এমন কি অনেক স্থলে সেকালের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া নাট্যামোদী দর্শকদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

সমালোচনা-ক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্ব বড় কম ছিল না। কামশাস্ত্র সম্বন্ধে অযথা 'যা' তা' বাহির হইতে দেখিয়া

মর্ম্মাহত হইয়া তিনি কয়েকটী আলোচনামূলক প্রবন্ধ বাহির করেন। কয়েকখানি নাটকেরও সমালোচনা তিনি বিশদভাবে করিয়া গিয়াছেন ও আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, তিনি একখানি নাটকও লিখিয়া গিয়াছেন।

আমরা তাঁহার লিখিত কতকগুলি ইংরেজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধের তালিকা নিম্নে দিলাম ঃ—

Mem. A. S. B.

1. The Palas of Bengal, Vol. 5.

2. The Palæography of the Hathigumpha and Nanaghat Inscriptions.

Books

1. Origin of the Bengali Script., Calcutta, 1919.

2. Temple of Siva at Bhumava, Calcutta, 1924

3. Bas-reliefs of Badami, Calcutta, 1928.

J. A. S. B. (N. Ser.)

1. Account of the Garpa Hill in the District of Gaya, Vol. 2.

2. Belabo Grant of Bhojavarman, Vol. 10.

3. Belkhara Inscription, vol. 7.

4. Catalogue of Inscriptions on Copper plates in the collection of A. S. B., Vol. 6.

5. Discovery of the Seven New-dated Records of the Scythian Period, Vol. 5.

6. Edilpur Grant of Kesavasena, Vol. 10.

7. Evidence of the Faridpur Grants. Vol. 7.

8. Four Forged Grants from Faridpur, Vol. 10.

9. Guru Govinda of Sylhet, Vol. 16.

10. Inscribed Guns from Assam, Vol. 7.

11. Kotwalipara Spurious Grant of Samacava Deva, Vol. 6.

12. Laksmanasena. Vol. 9.

13. Madhainagar Grant of Laksmanasena, Vol. 5.

14. Mathura Inscriptions in the Indian Museum, Vol. 5.

15. Note on the Stambhesvari, Vol. 7.

16. Clay-tablets from the Malay Peninsula, Vol. 3.

17. Saptagrama or Satgawn, Vol. 5.

18. Two Inscriptions of Kumara Gupta I, Vol. 5.

19. Unrecorded Kings of Arakan, Vol. 16.

Indian Antiquary.

1. Scythian Period of Indian History, Vol. 37.

2. Pratihara Occupation of Magadha, Vol. 47.

Non-Muhd : Coins

Coinage of the Later Guptas, Asr. 1913-14.

Punch-marked Coins from Afghanistan. (Num. Suppl.) (1910) N. S. 13.

Karshapana Coins found at Besnagar, A. S. R. 1913-14.

A New Type of Andambara Coinage, N. S. 23 (1914.)

Coins of the Jajapella Dynasty, N.S. 33, 1918.

Silver Coins of the Chandella, Madhavavarman, N. S. 22, 1914.

Coins of Hill Tippera, A.S.R., 1913-14.

Unrecorded Kings of Arakan, N. S. 33, 1918.

Coinage of the Gond Kings of Central India, A. S. R., 1913 14.

Coins of Danujamarddana, A.S.R. 1913-14.

Muhd. Coins.

A Muhar of Alauddin Muhd : Shah (Khilji) restruck in Assam, G. B. & O. 5, 1919.

Gold Coins of Shamsu-d-din Muzaffar Shah of Bengal, N. S. 16, 1911.

Two New Kings of Bengal, A. S. R. 1911-12.

A New Type of Silver Coinage of

Jalaludin Muhd. Shah of Bengal, A. S. , 1913-14.

Gold Coin of Ghyasuddin Muhd. Shah of Bengal, J. A. S. B., 42.

Silver Coins of Mahmud Shah II Khilji of Malwa, A.S.R. 1913-14.

Alamgirnagar, A New Mughal Mint, N.S. 33, 1918.

Modern Review.

1919—Nov. The Last Hindu King of Sylhet.

1918—Feb.

"The Bas-reliefs of Boro-budur."

1917.—Jan—June

"Reviews and Notices of Books."

1917—July—Dec. (p.p. 165, 547)

"Bas-reliefs at Boro-budur."

"Reviews of Books"

1921—June—Method of Research Work in the Calcutta University.

1927—September—Dravidian Civilization.

—Nov.—Dravidian Civilization.

—Dec.—Apsidal Temples and Chitya-Halls.

1928—Feb.—Stupas or Chaityas.

—March—Rajput Origins in Orissa.

প্রবাসী—ধর্ম্মপাল—১৩২১-১৩২২

" —কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতার দৃষ্টান্ত—আশ্বিন, ১৩২০

" —হেমকণা—বৈশাখ ১৩১৯-১৩২০

" —গৌড়রাজমালা (সমালোচনা)—ভাদ্র, কার্ত্তিক ১৩১৯

" অগ্রহায়ণ ১৩১৯

" ফাল্গুন ১৩১৯

" চৈত্র ১৩১৯

" —দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব—শ্রাবণ, ১৩১৯

" —লক্ষ্মণসেনের সময় — শ্রাবণ, ১৩১৯

" —শুশুনিয়ার পর্ব্বতলিপি —ফাল্গুন, ১৩২০

" —আওরঙ্গজেবের টাঁকশাল—শ্রাবণ, ১৩২৩

" —ঐতিহাসিক উপন্যাস—মাঘ, ১৩০০

" —ভেড়াঘাট—শ্রাবণ, ১৩৩২

" —দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের শিল্প—মাঘ, ১৩৩২

" —কান্যকুব্জে এক দিন—ভাদ্র, ১৩৩৬

" —উড়িষ্যার সাম্রাজ্য, কপিলচন্দ্র দেব—আষাঢ়, ১৩৩৬

ভারতবর্ষ (১৩২০-২১) ২য় খণ্ড, ১ম বর্ষ

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম

ভারতবর্ষ ১৩২২-২৩ ২য় খণ্ড—পৃ ৪৭৬/০

শ্রীবিক্রমপুর

ভারতবর্ষ ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড ১৩২০-২১

ভারতবর্ষ, ৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১৩২২, পৃ ৪৭৪/০

প্রতীচ্য সাহিত্যে প্রাচ্য কথা

মানসী ১৩১৭-১৮ (৩য় বর্ষ)

শেষ গাহড়বাল, পৃ ৫২৭

মানসী — ১৩২০-২১ (১ম খণ্ড)

একটি নিবেদন

J. R. A. S.

(1) Nahapana and the Saka Era, 191'

(2) The Kharoshti Alphabhet, 1920.

(3) Nahapana and the Saka Era, pt. I 1925.

J. B. & O.

A vol. IV (1918)

1. Some unpublished records of the Sultans of Bengal.

B. vol. V. (1919) (June).

2. A Note on the Status of Saisunak Emp.s in the Cal. Museum.

3. A Seal of King Vaskarabarman of Pragjyotisa found at Nalanda.

4. Inscriptions on the Patna Statues (with plates).

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ

[শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত এম-এ, বি-এল]

কত নাট্যকারের আবির্ভাব ও বিলোপ হইয়াছে, অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে কিন্তু বঙ্কিমের প্রভাব অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। গীতিনাট্য বা প্রহসনের কথা বলিতেছি না, বঙ্কিমের উপন্যাসে বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চও য অনেক পুষ্ট হইয়াছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মানবের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও অন্তরের পরস্পর বিরোধী ভাবের দ্বন্দ্ব ও ঘাত-প্রতিঘাত লইয়াই ট্যকলার স্ফুরণ। এই সমস্তের উপকরণ, উপাদান ও াবলী বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়াই রূপান্তরিত নাটক দর্শকের এত হৃদয়গ্রাহী হয়। "নয়শো রুপেয়ার সমালোচনা" কালে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলা নাটকে নাটকীয় উপাদান না পাইয়া ব্যথিত হন এবং নাটক লিখিতে অনুরুদ্ধ হইলেই তিনি বলিতেন, "নাটক লিখিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার এখনও হয় নাই।" তার অল্প পরেই গিরীশচন্দ্র আসরে অবতীর্ণ হ'ন। কিন্তু পাকা নাট্যকারেরও হাতেখড়ি হয় বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া। লিতে কি, পূর্ব্বাপর দেখিতে পাওয়া যায় রঙ্গমঞ্চে নাটকের অভাব হইলেই বঙ্কিম-সাহিত্যের মন্থন হইত এবং প্রতি-বারে যে সুধারাশি উত্থিত হইত তাহাতে নাট্য-রসিকগণ তৃপ্তি লাভ করিতেন। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, দেবী চৌধুরাণী আজও সমভাবে দর্শকের তৃপ্তি-সাধন করিতেছে।

স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যখন অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন, তখন রামনারায়ণের কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, নবনাটক; মধুসূদনের শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী; দীনবন্ধুর নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী ও মনোমোহন বসুর সতী, হরিশ্চন্দ্র ও রামাভিষেক নাটকের সহিতই দর্শকগণ পরিচিত ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশনেল থিয়েটারের জন্মদিন। দুই একখানি নাটক অভিনীত হইবার পরেই গিরীশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলাকে নাটকে পরিবর্ত্তিত করেন—১০ই মে ১৮৭৩। ভীমদর্শন কাপালিক প্রকৃতি-পালিতা সরলতার প্রতিমূর্ত্তি মৃন্ময়ী, প্রেম-পিপাসিতা তেজস্বিনী পদ্মাবতী প্রকৃষ্ট নাটকীয় চরিত্র; তাই নাটকাকারে রূপান্তরিত কপালকুণ্ডলা একখানি উৎকৃষ্ট নাটক।

মতিলাল সুর কাপালিকের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। এই চরিত্র বঙ্কিমের অজ্ঞাত ও কল্পনা-প্রসূত চরিত্র নয়। তিনি স্বয়ং ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি যখন কাঁথিতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন তমসাচ্ছন্ন কোন নিশীথে নিজের বাংলায় বসিয়া আছেন, দেখিলেন দীর্ঘদেহ, দীর্ঘ-শ্মশ্রু, জটাজুটমণ্ডিত, গণ্ডদেশে নরকঙ্কাল পরিশোভিত ভগ্নবাহু এক ভীষণ মূর্ত্তি বাতায়ন-পথে উপস্থিত হইয়া 'বঙ্কিম' 'বঙ্কিম' বলিয়া কয়েকবার ডাকিল। নিঃশঙ্ক বঙ্কিমচন্দ্র সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—

"কে তুমি, কেন আমায় ডাকছ?"

ভীমদর্শন পুরুষ উত্তর করিল,—"বঙ্কিম, বাহিরে এসো, কাজ আছে।"

নির্ভয়ে বঙ্কিম বাহিরে গেলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কেন ডাক্‌লে?"

গম্ভীর গর্জ্জনে উত্তর হইল, "সমুদ্রতীরে বালিয়াড়িতে চল।"

উত্তরে বলিলেন—"না যাব না, কেন যাব? খুলে বলো, নচেৎ যাবো না।"

এই প্রকারে তিনবার সেই ভীমদর্শন বিরাট্ পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হন। এই ঘটনা হইতেই কাপালিক-চরিত্র-সৃষ্টির সূচনা। মতিলাল সুর এই চরিত্রের যথাযথ অভিব্যক্তি করিতেন। উল্লিখিত ঘটনার কিছু দিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বালিয়াড়িতে গিয়াছিলেন। সেই বর্ণনাই পাঠক কপালকুণ্ডলায় দেখিতে পাইবেন।

অতঃপর ১৮৭৩ খৃঃ ৩১ ডিসেম্বর বর্ত্তমান মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে 'কাম্যকানন' লইয়া গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটার খোলা হয়। নাটক নাই, গীতিনাট্যও প্রবর্ত্তিত হয়

নাই, কোন অভিনেত্রীকেও তখন পর্য্যন্ত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ অধিকার দেওয়া হয় নাই। অভ্যুদয়ের সঙ্গেই পতনের সূত্রপাত হইলে গিরীশচন্দ্র মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ লইয়া কিছুদিনের জন্য নাটকের অভাব পূর্ণ করেন।

মৃণালিনীতে মনোরমা এক অদ্ভুত সৃষ্টি। মনোরমা কখনও সরলা বালিকা, কখনও বুদ্ধিমতী গম্ভীরা রমণী। কখনও শিক্ষাদাত্রী তেজস্বিনী সহধর্ম্মিণী, আবার পরক্ষণেই "পশুপতি তুমি কাঁদছ কেন?" বলিয়া প্রেমবিহ্বলা বালিকার মত চঞ্চলা। হেমচন্দ্রের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে এই স্নেহশীলা ভগিনী ভ্রাতার মনোবেদনায় সহানুভূতি করিতেছে, আবার পরক্ষণেই পুকুরে হাঁস দেখিগে" বলিয়া বালিকা-সুলভ চপলতা প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ বিরূপ ভাব প্রদর্শনে মনোরমা চরিত্র অসাধারণ অভিনয়-চাতুর্য্য প্রদর্শনের যোগ্য বিষয়। পশুপতি চরিত্রেও নানা-রূপ প্রবৃত্তির সমাবেশ দেখা যায়। বক্তিয়ার খিলিজি গিরিজায়ার গান ও চটুলতা, দিগ্বিজয় ও গিরিজায়ার কলহ, হেমচন্দ্রের হৃদয়-দ্বন্দ্ব, মৃণালিনীর প্রেমও নির্ভীকতা প্রভৃতি উপাদানে রূপান্তরিত 'মৃণালিনী' নাটক আজও দর্শকের মনে ভাব সঞ্চার করে। স্বয়ং গিরীশচন্দ্র পশুপতির ভূমিকা গ্রহণ করিয়া এরূপ অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন যে, স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয় বরাবর বলিতেন, "অন্য কোন দেশে এক পশুপতি ভূমিকাই তাঁহাকে রাজ-সম্মানে বিভূষিত করিত।" এ পর্য্যন্ত মনোরমার ভূমিকায় যাঁহারা এই অদ্ভুত চরিত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী বিনোদিনীই সর্ব্বোচ্চ সম্মানের যোগ্য অধিকারিণী। প্রথমে ইহা অভিনয়ে স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এরূপ অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন যে, বিজ্ঞাপনে উল্লেখ থাকিত Look look, to your Monorama, she jumps at the fire,।

বিষবৃক্ষের অভিনয়েও ন্যাশনেল থিয়েটারের গৌরব আরও বাড়িয়া যায়। নগেন্দ্রনাথ ভূমিকায় গিরীশচন্দ্র বিভিন্ন অবস্থার চিত্রগুলি প্রদর্শন করিয়া দর্শকের হৃদয়ে রেখাপাত করিতেন। কপালকুণ্ডলাও এখানে দ্বিতীয়বার নাটকাকারে রূপান্তরিত হইয়া অভিনীত হয়।

এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রঙ্গমঞ্চের অভাব বিদূরিত হইলে ক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুরুবিক্রম, সরোজিনী; হরলাল রায়ের শত্রু-সংহার, ভারতে যবন প্রভৃতি কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক, সতী কি কলঙ্কিনী ও নন্দনকানন গীতি-নাট্য; উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের শরৎসরোজিনী ও সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক কিছুদিন আসর জমাইয়া রাখে। কিন্তু এগুলিরও নূতনত্ব বেশী দিন না থাকায় গিরীশচন্দ্রের আবির্ভাবে রঙ্গালয়ের অভাব ঘুচিয়া যায়।

বেঙ্গল থিয়েটারেও মাইকেলের শর্ম্মিষ্ঠা ও মায়াকাননের পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী অভিনীত হয় (১৮৭৩, ২০ অক্টোবর)। সুকুমারী দত্ত বিমলা, হরিদাস দাস ওসমান, গ্রন্থকার বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায় অভিরাম স্বামী ও শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় (ছাতুবাবুর দৌহিত্র ও বেঙ্গল থিয়েটারের স্থাপয়িতা) জগৎসিংহ সাজিতেন। শরৎবাবু যেমন সুপুরুষ তেমনই উৎকৃষ্ট ঘোড়সওয়ার ছিলেন। শরৎবাবু গায়ে হাত দিলে দুষ্ট ঘোড়াও শান্ত হইয়া যাইত। সেনাপতি মানসিংহের যোদ্ধপুত্র বেশে ঘোড়ায় চড়িয়া যখন তিনি ষ্টেজে আসিতেন, তখন দর্শকগণ চমৎকৃত হইত। এই নাটকেই বেঙ্গলের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হয়।

ন্যাশনেল থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর মাতামহ) কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণবাবু বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করিয়া গিরীশবাবুর রূপান্তরিত মৃণালিনী নাটকের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এখানেও মৃণালিনীর অভিনয় হয়। সুকুমারী দত্তের গান শুনিতে আকৃষ্ট হইয়া অনেক দর্শক আসিতেন। পশুপতি সাজিতেন কিরণবাবু।

বেঙ্গলে দুর্গেশনন্দিনীর প্রতিপত্তি দেখিয়া গিরীশচন্দ্র উহা নাটকে রূপান্তরিত করিয়া ন্যাশনেলে [illegible] করেন (১৮৭৮ খৃঃ)। গিরীশচন্দ্র এখানে [illegible], মতিলাল বসু কতলুখাঁ ও বিনোদিনী দাসী আয়েষার ভূমিকা গ্রহণ করিতেন এবং দুর্গেশনন্দিনীর বিশিষ্ট অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইত। তবে অপরপৃষ্ঠে

শরৎবাবুর আরোহণ-দক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া দর্শকগণ অভিনয়-কৌশলের জন্য গিরীশচন্দ্রের অধিক প্রশংসা করিত না।

ইহার পরে গিরীশচন্দ্রের লেখনী অজস্র নাটকাবলী প্রসব করে। ন্যাশনেলে আনন্দরহো, রাবণবধ, সীতার বনবাস, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস প্রভৃতি বহু নাটকের অভিনয়ের পরে তিনি ষ্টার থিয়েটার স্থাপন করেন এবং আরও উচ্চাঙ্গ নাটক দক্ষযজ্ঞ, নলদময়ন্তী, চৈতন্যলীলা, ও বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ে তাঁহার যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। গিরীশচন্দ্র চলিয়া যাইবার পরে ন্যাশনেলের জীবন-প্রদীপ একেবারে নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে উহা বঙ্কিমবাবুর "আনন্দমঠ" লইয়া কিছুকাল বাঁচিয়া ছিল। কেদার চৌধুরী মহাশয় তখন নাট্যকার ও শিক্ষক। মাতৃমূর্ত্তির আবির্ভাব, বন্দে মাতরম্ গীত, সন্তান-বিদ্রোহ, শান্তির ক্ষিপ্রকারিতা, দুর্ভিক্ষের ছায়া, আনন্দমঠকে অমর করিয়াছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর মহাপুরুষ, মতি সুর সত্যানন্দ, মহেন্দ্র বসু জীবানন্দ ও বনবিহারিণী শান্তি। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভুবনমোহন পুনরায় ন্যাশনেল থিয়েটার লিজ্ লইলে সুকুমারী দত্ত শান্তির ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী গিরীশচন্দ্র-পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিলেও বঙ্কিমচন্দ্রই কিছুদিন ন্যাশনেলের আয়ু বাড়াইয়া রাখেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী গোপাললাল শীল ষ্টার রঙ্গমঞ্চ ক্রয় করিয়া এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন এবং গিরীশচন্দ্র ঘোষকে অনেক টাকা বোনাস্ দিয়া ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। পর বৎসরে ষ্টার সম্প্রদায়ও হাতীবাগানে তাহাদের নিজ নামে থিয়েটার খোলে। গিরীশচন্দ্রের "পূর্ণচন্দ্র" ও "বিষাদ" কিছুদিন চলার পরে, তিনি চলিয়া আসেন এবং এমারেল্ড থিয়েটার নাটকের দৈন্য অনুভব করিতে লাগিল। স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্রের কয়েকখানি গীতিনাট্য কিছুদিন চলিলেও, থিয়েটার না চলিবার মতই হইয়া উঠিল। তখন মিত্রজাই "কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "বিষবৃক্ষ" নাটককে রূপান্তরিত করিয়া এমারেল্ডকে কিছুদিন জীবিত রাখেন। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ দেবেন্দ্র দত্তের ভূমিকায় অননুকরণীয়। বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্তেও বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্য, বিষয়-বুদ্ধি ও অহিফেন-মাদকতা বেশ ফুটিয়া উঠিত। মহেন্দ্র বসু গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রনাথে, সুকুমারী দত্ত রোহিণী ও সূর্য্যমুখীতে এবং হরিসুন্দরী (ব্লাকী) ভ্রমর ও কুন্দনন্দিনীতে বেশ কৃতিত্ব দেখাইতেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গিরীশচন্দ্র আবার যখন ন্যাশনেল রঙ্গমঞ্চে মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিয়া ম্যাক্‌বেথ, আবুহোসেন ও জনা প্রভৃতি নাটকের সহায়তায় রঙ্গজগতে নূতনভাবে উপস্থিত করেন, ষ্টারের গৌরব তখন ম্লান। এই সময় চন্দ্রশেখরই তাঁহাদিগকে যশঃশিখরে আরূঢ় করে। ঐতিহাসিক নাটক হইলেও বাঙ্গালীর নিকট ইহার বিষয় দুরূহ নয়। বালকেরাও স্কুলে ইংরেজ-মীরকাশিমের দ্বন্দ্ব-কাহিনী পাঠ করিয়া থাকে। শ্বেতাঙ্গগণের অর্দ্ধ বাঙ্গলা অর্দ্ধ ইংরেজীতে কথোপকথন, গঙ্গাস্রোতে সন্তরণ, চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী-বিরহে কাতরতা, গঙ্গাবক্ষের তরঙ্গমালায় চন্দ্রমার জ্যোতিশ্ছটা, প্রতিফলিত গঙ্গার কূলে বাঁধা বিলাসতরণী. তালীবন-বেষ্টিত ভীমা পুষ্করিণী (আজিও যাহার আভাস কাঁটালপাড়ায় পাঠকের নয়নগোচর হয়) দলনীর মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত-লহরী, শৈবলিনীর উন্মাদ-দৃশ্য নানা রসের উৎপাদন করিয়া দর্শকের প্রাণ অভিভূত করে। তারপর অধ্যয়ন-নিরত ধীর চন্দ্রশেখর ও আত্মত্যাগী প্রতাপের চরিত্র-গৌরব। বস্তুতঃ চন্দ্রশেখর প্রথমাভিনয় রজনী হইতেই (১৮৯৪, ৮ সেপ্টেম্বর) আশ্চর্য্যরূপে জমিয়া ওঠে এবং সাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া স্বত্বাধিকারিগণের অর্থাভাব ঘুচাইয়া দেয়। চন্দ্রশেখর বেশে স্বর্গীয় অমৃত মিত্র মহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শৈবলিনীর বিরহে কাতর হইয়া যখন বাল্য-কৈশোর-যৌবন ও প্রৌঢ়ের প্রিয় সহচর শোণিততুল্য অমূল্য গ্রন্থরাজী অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিতেন—"নানা পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, সাহিত্য, ব্যাকরণ আজ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করব। ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য, পতঞ্জল, শ্রুতি, স্মৃতি, আরণ্যক, উপনিষদ আজ বহ্নি-দেবতাকে আহুতি প্রদান করবো। ওঃহো, বহুযত্নে সংগৃহীত, বহুকাল হ'তে অধীত অমূল্য গ্রন্থরাশি আমার—হোক্ হোক্, ভস্ম হোক্, শৈবলিনী আমায় ভস্ম ক'রে গেছে, সংসার ভস্ম হোক"—সকলেই শিহরিয়া উঠিত।

বেঙ্গল থিয়েটারেও ইতিপূর্ব্বে চন্দ্রশেখর নাটকখানি অভিনীত হয়, কিন্তু জমে নাই। স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয় চন্দ্রশেখরে নানারূপ বিস্ময়কর দৃশ্য বিশেষতঃ

অগাধ জলে সন্তরণ এইটী অবতারণা করিয়া ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথাযোগ্য ভূমিকা প্রদান করিয়া "চন্দ্রশেখরকে" এক চিরনূতন নাটকে পরিণত করেন।

রয়েল বেঙ্গলও বিষবৃক্ষ অভিনয় করিয়া সকলের প্রীতি-সম্পাদন করেন। ইতিপূর্ব্বে সুকুমারী ও মহেন্দ্র বসু আসিয়া স্ব স্ব ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ৪।৫ মাস মধ্যে বেহারীবাবু "রজনী" নাটকে রূপান্তরিত করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করান।

রজনী নাটকে রূপান্তরিত হওয়ায় সকলেরই বিস্ময়ের সীমা রহিল না, কারণ অন্যান্য উপন্যাস হইতে রজনী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণে লিখিত। প্রথমে ইংরেজী উপন্যাস লর্ড লীটন প্রণীত Last Days of Pompeii লাষ্ট ডেজ অব পম্পী অবলম্বনে লিখিত উপন্যাসের অংশ বিশেষ বিভিন্ন নায়ক বা নায়িকা দ্বারা অভিব্যক্ত। উক্ত পুস্তকে নিদিয়া নামে যে কাণা ফুলওয়ালী আছে, রজনী সেই চরিত্র স্মরণে সূচিত। ফরাসী ভাষায় লিখিত একখানি পুস্তকেও এইরূপ একটী চরিত্র আছে—তাহার সহিতও রজনীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

রজনী বঙ্কিমবাবুর ছায়াময়ী কল্পনা। কিন্তু ইহা একেবারে অস্বাভাবিক মনে করাও যায় না। ঘরে ঘরে কাণা ফুলওয়ালী যদিও আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু "জন্মান্ধের প্রাণে প্রণয় সঞ্চার হইতে পারে না" এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও উচিত নয়। রসসৃষ্টি ব্যতীত এই সূক্ষ্মতত্ত্বও রজনীতে পরিলক্ষিত হয়। এই গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াই নাটককার লিখিয়াছিলেন—

> চখে চখে ভালবাসা পদ্মপাতা জল,
> ক্ষণে চায় ক্ষণে ধায় নিরাশ কেবল ;
> মনে মনে ভালবাসা প্রেম বলি' গণি,
> প্রেমের প্রতিমা অন্ধ দুঃখিনী রজনী।

রজনীর ভূমিকা গ্রহণ করিতেন সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত। বয়সে কিছু বড় দেখাইলেও তাঁহার ভাব-ভঙ্গী ও কথাবার্ত্তায় দর্শক তাহা ভুলিয়া যাইত। বঙ্কিম-চন্দ্র লিখিয়াছেন, "রজনী জন্মান্ধ,কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। চক্ষু আয়ত, নির্ম্মল ও কৃষ্ণতার। অতি সুন্দর চক্ষু, কিন্তু কটাক্ষ নাই"। অভিনেত্রী চক্ষের ভাব ঠিক এই বর্ণনার অনুরূপ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এরূপ ভাবে চক্ষুর ভঙ্গী বিধান কতদিনের অভ্যাস বলা যায় না, কিন্তু অভ্যাসের কৃতিত্বের তুলনা ছিল না। সুকুমারীর কথায় ও গানে দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া থাকিত।

রামসদয় ও লবঙ্গলতার কথোপকথনে বঙ্কিম যেরূপ রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন নাটকেও অবিকল তাহাই ছিল। রামসদয় বলিতেন—"কইগো! আমার ললিত লবঙ্গলতা-পারিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে কোথায় গো!" আর সদাপ্রফুল্ল মূর্ত্তি তৃতীয়পক্ষের পত্নী "আজ্ঞে, ঠাকুর দাদা মহাশয়, দাসী হাজির" বলিয়া হাসিতে হাসিতে কাছে আসিতেন। এই স্বামী-স্ত্রীর গভীর প্রণয় বাবু কুঞ্জবিহারী বসু ও নিস্তারিণী রক্ষা করিতেন। হরিদাস দাস, অমরনাথ ও মহেন্দ্র বসু মহাশয় শচীন্দ্রের ভূমিকায় আশ্চর্য্য স্বাভাবিকতা প্রদর্শন করিতেন। "ধীরে রজনী ধীরে, ধীরে ধীরে আমার এই হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ কর"— প্রভৃতি প্রলাপবাক্যের স্বাভাবিকতা এখনও পুরাতন দর্শকেরা সাক্ষ্য দেন।

বেঙ্গল থিয়েটার অতঃপর দেবীচৌধুরাণীও বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনয় করিত। লেফ্টানাণ্ট ব্র্যানান ব্রজেশ্বরের দৃঢ়মুষ্টির আঘাতে যে কাতর হইয়া বঙ্গযুবকের সামর্থ্য ও নির্ভীকতার কতকটা পরিচয় পান, আর তাহা দেখিয়া ভয়ে বেতসের ন্যায় কম্পমান বৃদ্ধ পিতা ভূমিতলে পড়িয়া যান, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী চরিত্রের একটা নূতন দিক্ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ভাব থাকাতেই নাটকখানি জমিয়া গেল। নিশির মুখে নিম্নলিখিত গানটীতে তাহার শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্ব অর্পণের ভাবটীই প্রকটিত—

> (আমি) ত্যজেছি বাসনা ত্যজেছি কামনা,
> ভবের ভাবনা ভাবি নে।
> আমি সঁপেছি জীবন সঁপেছি যৌবন,
> সেজেছি যোগিনী নবীনে।
> আমি চলেছি হাসিয়ে অকূলে ভাসিয়ে
> কূল পেতে হরি-চরণে ;
> আমার ঘুচে গেছে ধাঁধাঁ আছে প্রাণ বাঁধা
> (শুধু) পরহিত-সাধা-কারণে।

তবে দেবীচৌধুরাণী "সিটিতে" যে অভিনীত হয়, তাহাই সবিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সিটি তখন বীণা

হইতে এমারেল্ড মঞ্চে স্থানান্তরিত। স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র দেবীচৌধুরাণী নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া সিটিকে প্রায় ছয় মাস সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। ম্যানেজার নীলমাধব চক্রবর্ত্তীর ভবানীপাঠক ও শ্রীমতী তারাসুন্দরীর "দেবী" দর্শকবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত।

এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে অতঃপর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। হরিরাজ ও আলিবাবা কিছুদিন চলিবার পরে নাটকের অভাব পূর্ণ করেন বঙ্কিমচন্দ্র। দেবীচৌধুরাণীকে নূতন ভাবে রূপান্তরিত করিয়া অমরবাবু নিজেই ব্রজেশ্বর সাজেন। ইহার পরে আবার ইন্দিরাও অভিনীত হয়। কালাদীঘিতে অপহৃতা ইন্দিরা, বুদ্ধি-বলে ও সহৃদয়তায় অতুলনীয়া সুভাষিণী, রামরাম দত্ত ও তাহার কালীর বোতল, উপেন ও রমেনবাবু, হাস্যময়ী হারাণী এবং ঈর্ষাপরায়ণা ব্রাহ্মণপাচিকা—বঙ্কিমের প্রতি চরিত্রই অতি সরস।

পরবৎসরেই অমরেন্দ্রনাথ কৃষ্ণকান্তের উইল নূতন ভাবে রূপান্তরিত করিয়া 'ভ্রমর' নাটকে ক্লাসিক মঞ্চকে একেবারে সর্ব্বজন-প্রশংসিত করিয়া ফেলিলেন। রোহিণীর হত্যাব্যাপার উপন্যাসেই নাটকের ভাবে লিখিত। গোবিন্দলাল-বেশী অমরবাবু স্বাভাবিক সুকণ্ঠে যখন অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া বলিতেন—

"পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রেখেছিলেম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ ধর্ম্ম সব তোমার জন্য ত্যাগ করেছি। তুমি কি রোহিণি, যে তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ ক'রে বনবাসী হ'লেম। তুমি কি রোহিণি, যে তোমার জন্য যে ভ্রমর জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর—তা পরিত্যাগ কল্লেম—"

শ্রোতৃবৃন্দের করতালধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনিত হইত। অনেক দিন পর্য্যন্ত ভ্রমর অমরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। গিরীশচন্দ্র ঘোষ তখন ক্লাসিকে আসিয়াছেন। বারুণী পুকুর ও পোষ্টাফিসের দৃশ্য দুইটি তাঁহারই রচিত এবং ব্রহ্মানন্দের কয়খানি গানও তিনিই রচনা করিয়াছেন।

কিছুদিন পরে অমরেন্দ্রনাথের সহিত মনোমালিন্য হইলে গিরীশচন্দ্র ক্লাসিক ছাড়িয়া দেন। মিনার্ভা তখন নরেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া অনবরত ঘা খাইতে খাইতে গিরীশচন্দ্রের শরণাপন্ন হয়। 'সীতারাম'কে নাটকে পরিণত করিয়া গিরীশচন্দ্র মিনার্ভাকে দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করেন (১৯০০)। সুবিখ্যাত অভিনেত্রী তিনকড়ি বৃক্ষের উপরে উঠিয়া চাবি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিতেন, 'মার মার।' সন্ন্যাসিনীবেশে মধুরকণ্ঠী গায়িকা সুশীলার অপূর্ব্ব সঙ্গীত—

"উদার অম্বর, শূন্য সাগর, শূন্যে মিশাও প্রাণ।
শূন্যে শূন্যে ফোটে কত শত ভুবন,
তারকা চন্দ্রমা কত শত তপন,
শূন্যে ফেটে অভিমান,
অহম্ অহম্ ইতি শূন্যে বিভাসিত
শূন্যে বিকসিত মনোবুদ্ধিচিত,
মদ-মাৎসর্য্য, ভোক্তা ভোজ্য শূন্য সকলি এ ভাণ।

থিয়েটারে বসিয়াও দর্শকের কানে গভীর উদাসভাব সঞ্চার করিত। 'সীতারাম'-বেশী গিরীশচন্দ্র গম্ভীর স্বরে যখন বলিতেন, "আমি কোন্ সীতারাম? প্রজাপালক হিন্দু ধর্ম্ম-সংস্থাপক আত্মত্যাগী পরহিতরত সীতারাম, সেইটে ঠিক না, কামুক রাজ্যভ্রষ্ট সীতারাম সেইটে ঠিক? এইখানে দর্শকের লোমহর্ষণ হইত। গানটি ও উল্লিখিত উক্তি গিরীশচন্দ্র রচিত। আরও অনেকগুলি অনুশোচনা-জনিত উক্তি সীতারামের মুখে আরোপিত হইয়াছে। বঙ্কিমের উপরে এইখানে কলম চালানো অনুপযোগী হয় নাই। বঙ্কিম-উপন্যাসে রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের কথোপকথনে সীতারাম ও শ্রীর মিলনের কোনও আভাস পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। সেই রাত্রে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কেহ জানিল না।" অথচ ইতিপূর্ব্বে শ্রী সীতারামের চরণের উপর পড়িয়া উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিল—"এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি, আমি আর সন্ন্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে

সীতারাম, "তুমিই আমার মহিষী।"

জয়ন্তী আশীর্ব্বাদ করিলেন, "আজ হইতে অনন্তকাল আপনারা উভয়ে জয়যুক্ত হইবেন।"

গিরীশচন্দ্র পরস্পর বিরোধীয় অবস্থায় সামঞ্জস্য সাধন করিয়া শেষ কালে আবার উভয়ের মিলন সংঘটন করিয়াছেন, কিন্তু সেই মিলন মৃত্যু-মিলন, অনুশোচনা-উতপ্ত চিন্তা-ব্যথিত অর্দ্ধোন্মত্ত রাজার শেষকালে। এই দৃশ্যের পূর্ব্বের দৃশ্যে জয়ন্তী ও শ্রীর প্রার্থনা ও সীতারামের সহিত কথোপকথন বঙ্কিম-প্রতিভার উৎকৃষ্ট পরিচায়ক।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে নাটকের উপাদান অধিক মাত্রায় ছিল বলিয়া গিরীশচন্দ্র এত আদর করিতেন যে, অতঃপর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দেও চন্দ্রশেখর উপন্যাসখানি নাটকে পরিণত করিয়া নিজেই চন্দ্রশেখর রূপে কয়েক রাত্রি দর্শন দেন। পুনরায় নাটকে রূপান্তরিত দুর্গেশনন্দিনী বরাবর দর্শকের তৃপ্তি বিধান করিতেছে। দানীবাবু ও তারাসুন্দরীর ওসমান ও আয়েষার অভিনয়ও চিরনূতন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহও নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল ১৮৯৬ ফেব্রুয়ারীতে নাটকে রূপান্তরিত করেন। ষ্টারে ঐ সময় নাটকের বড়ই অভাব, বহুদিন গিরীশচন্দ্র ছাড়িয়াছেন, রাজকৃষ্ণ রায় পরলোক গমন করিয়াছেন, রাজসিংহই দশ মাসের অধিক ষ্টারে নাটকের অভাব পূর্ণ করিয়াছিল।

এখনও বঙ্কিমচন্দ্র চিরনূতনই রহিয়াছেন। উপযুক্ত অভিনেতার সাহায্য পাইলে, এখনও বঙ্কিমের উপন্যাস দর্শকের মনে নাট্যামোদ প্রদান করিতে পারিতেছে। এখনও বিষবৃক্ষ, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর ও কপালকুণ্ডলা অভিনীত হইলে লোক-সমাগমের অভাব হয় না। সেদিনও অপরেশ বাবু 'রজনী' নাটকে পরিণত করিয়া দর্শকের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। উপন্যাসের তো কথাই নাই, কমলাকান্ত, মুচিরাম গুড় পর্য্যন্ত নাটকের রূপ ধারণ করিয়া হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, রসাবতারণায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যেন চিরকালই নূতন, সুনীতি প্রচারক সুরুচিবর্দ্ধক ও জনমনোরঞ্জক। আজিও রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সমভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে এত বৎসর ধরিয়া বিচিত্র রুচির দর্শকের যিনি মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার রসমাধুর্য্যের ও কৃতিত্বের শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

অমলা
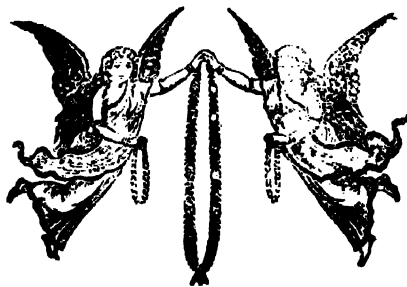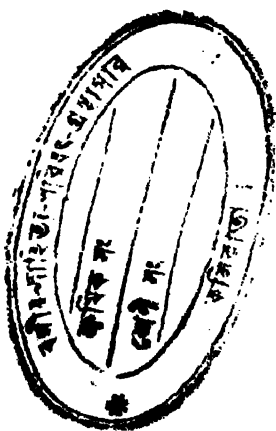
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অধ্যাপক শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ এম-এ

চার

প্রলাপ

ভাদ্রের শেষ, রাত্রিকাল। প্রায় সকাল হইয়া আসিয়াছে। উষার দুই চারিটী রেখা আকাশের গায়ে দেখা দিয়াছে। পথের ধারের গাছে তখনও দু'একটী নিশাচর পাখী ডাকিয়া ডাকিয়া ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাইতেছিল। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস আশ্বিনের আগমন সূচিত করিতেছিল।

একটী বাটীতে একতলার একটী ঘরের জানালা খোলার শব্দ হইল। একজন লোক যেন গান গায়িতে গায়িতে একটী জানালার ধারে আসিয়া বসিল। তাহার শিথিল বাস, গাত্রে কোনও আচ্ছাদন নাই। যেন সে সারা রাত্রি কোন সুখের ধারা পান করিয়া মাতাল হইয়া প্রলাপ বকিতেছে।

কে যেন সজোরে তাহার ঘরের দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ করিল। পূর্ব্বোক্ত লোকটী চমকাইয়া ফিরিয়া বলিল, "কে? অনাথবাবু? কি খবর? এত রাত্রে যে?" আগন্তুক মুখ ভেংচাইয়া উত্তর করিলেন—"এত রাত্রে যে! সুশীলবাবু, এ কি রকম ব্যবহার আপনার? অন্য কেউ কি আপনার জন্য সুখে নিদ্রা যেতে পারবে না?" রাগে তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া গেল।

সুশীল মিনতির সুরে বলিল—"রাগ করবেন না, অনাথবাবু! আজ একটা সুন্দর ভাব মনে জেগেছিল। সেইটাই কবিতায় গেঁথে রাখছিলাম। ওঃ, এমন সহজে মনে ভাবটা এসেছে! দেখুন অনাথবাবু, প্রায় সবটা লেখা হ'য়ে গেছে। আজ আমার বড় সৌভাগ্য! এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন সুন্দর কবিতাটী লিখ্‌তে পারব আশা করি নি! তাই, অনাথবাবু, জানালাটা খুলে কবিতাটার খানিকটা সুর দিয়ে গান করছিলাম।"

"একে গান বলেন, সুশীলবাবু? এমন রাসভ-বিনিন্দিত স্বরে জীবনে আর কখনও গান শুনেছি ব'লে মনে পড়ছে না! আর এই রাত্রিবেলায়! উঃ, কি ভীষণ!"

সুশীল ইতিমধ্যে তাহার কবিতা লেখা কাগজগুলি একত্র করিয়া এক মুষ্টিতে অনাথবাবুর সম্মুখে ধরিয়া বলিল—"দেখুন, অনাথবাবু, জীবনে আমি এত ভাল কবিতা আর কখনও লিখি নি। ঠিক যেন বিদ্যুতের স্ফুরণের মত আমার মনে জেগে উঠেছে। একদিন ঐ ঝাউগাছের মাথায় বিদ্যুৎ চমকাতে দেখেছিলাম, যেন একটা আগুনের ফুলকি। ঠিক সেইরকম একটা ফুলকি আজ রাত্রে আমার মনের কোণে উঁকি মেরেছে! আমি কি করব বলুন, অনাথবাবু! আমার বিশ্বাস আপনি যখন সব কথা শুনবেন তখন আর রাগ করতে পারবেন না। ঐখানে আমি কবিতাটী লিখতে বসেছিলাম। বেশ চুপ চাপ ক'রেই লিখছিলাম, কারণ আপনার কথা আমার মনে ছিল, অনাথবাবু। আমি একটুও শব্দ করি নি। কিন্তু ক্রমে এমন এমন হ'য়ে উঠল, যে তখন স্থান, পাত্র, কাল আর কিছুই মনে রইল না, নিজেকেই ভুলে গেলুম। মনে হ'ল বুঝি এতটা আনন্দে আমার বুক ভেঙ্গে যাবে। তখন আমি উঠে পড়লাম, পায়চারি করতে লাগলাম। তারপর একটা জানালা খুলে ধীরে ধীরে গান ধরেছিলাম মাত্র। কি আনন্দে যে আমার বুকখানি ভ'রে গিয়েছিল, তা' যদি জানতেন, অনাথবাবু!"

অনাথবাবু একটু নরম হইয়া বলিলেন, "না, আজ খুব বেশী-গোলমাল শুনি নি বটে। কিন্তু আপনিই বলুন, সুশীলবাবু, এতরাত্রে জানালা খুলে চীৎকার করা আপনার অন্যায় কি না!"

"অন্যায়, নিশ্চয়ই, অনাথবাবু। কিন্তু সব কথাতো আপনাকে খুলে বললাম, বলুন আমি কি করতে পারি? আজ রাত্রির মত রাত্রি আমার জীবনে আসে নি। বুঝলেন, অনাথবাবু, কাল বিকেলে যখন পথে বেড়াচ্ছিলাম, আমার

দেবীমূর্ত্তিকে দেখতে পেয়েছিলাম—আমার হৃদয়ানন্দ, আমার জীবনে ধ্রুবতারা! তারপর কি হয়েছিল জানেন, তাহার সুন্দর মুখখানি আমার কাছে এনে ব'লে গেল—"তোমায় ভালবাসি।" আপনার জীবনে কি এ অনুভূতি কখন এসেছে, অনাথবাবু? আমি আনন্দে কথা বলতে পারিনি, আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। আমি দৌড়ে বাড়ী চ'লে এলাম, এসেই নিদ্রামগ্ন হ'য়ে পড়লাম। সন্ধ্যার কিছু পরে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার হৃদয় যেন কোন ভাবের তালে তালে দুলতে লাগল। আমি লিখতে বসলাম। কি লিখলাম, আমার মনে নেই, তবে অনেক পাতাই লিখে ফেললাম। ভাবের তরঙ্গ যেন নাচতে নাচতে এসে আমার মনে খেলা করতে লাগল। যেন স্বর্গের দ্বার আমার নিকটে উন্মুক্ত হ'য়ে গেল। যেন বসন্তের এক মধুর রজনীতে এক অপ্সরা ফুলের মধু পান করিয়ে আমাকে মাতাল ক'রে দিল। তখন কি আর স্থান ও কালের কথা মনে থাকে, অনাথবাবু? উঃ, আপনি যদি আমার সে মনের ভাব বুঝতেন! আমি যেন নতুন জীবন লাভ করলাম। আমার মানস-সুন্দরী এসে আমার হাত ধ'রে ফুলের বাগানের মধ্যে নিয়ে গেল, তারপর অনেকক্ষণ আমরা সেখানে বেড়ালাম। অকস্মাৎ স্বর্গ হ'তে ইন্দ্র নেমে এলেন, আমরা অভিবাদন ক'রে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম তিনি অপলকনেত্রে আমার প্রেয়সীকে দেখতে লাগলেন। কারণ আমার প্রেয়সী যে অপূর্ব্ব-সুন্দরী। তারপর ঈষৎ হেসে তিনি চ'লে গেলেন! আমরাও অনেকক্ষণ সেই উদ্যানে বিচরণ করতে লাগলাম। হঠাৎ আমার হৃদয়-রাণী আমার হাত ধ'রে বলল—"আমি তোমায় খুব ভালবাসি, সারাজীবন শুধু তোমাকেই ভালবেসেছি। এই যে আনন্দের ধারা, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের সুখ-নির্ঝর, তাই আমার কবিতায় আজ ধ'রে ফেলেছি। মনে হচ্ছে যেন আনন্দের এক অপরূপ মূর্ত্তি কি মধুর হাসি হেসে আমার প্রাণের মাঝে খেলে বেড়াচ্ছে!"

অনাথবাবু হতাশ হইয়া বলিলেন, "না আপনার প্রলাপ শুনে রাত কাটান আমার পক্ষে অসম্ভব, সুশীলবাবু। আপনাকে কিন্তু আমি শেষ বারের মত সাবধান ক'রে দিয়ে গেলাম। এ রকম পাগলামি করলে আর আমার বাবার বাড়ীতে থাকা চলবে না।"

এই বলিয়া অনাথবাবু চলিয়া যাইতেছিলেন। দ্বারের কাছে আসিতেই সুশীল তাঁহাকে থামাইয়া বলিল—"এক মিনিট দাঁড়ান, অনাথবাবু। আপনি আমার উপর রাগ করবেন না, বলুন। আমি আনন্দের আবেগে চীৎকার ক'রে গেয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল পৃথিবীর মধ্যে যেন আর কেউ নেই, শুধু আমি একা আনন্দসাগরে ভেসে বেড়াচ্ছি। আমার মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয়, তখন আর নিজেকে সামলাতে পারি না। কিন্তু অনাথবাবু, সত্যি আমার ভাবা উচিত ছিল আপনি পাশের ঘরে নিদ্রা যাচ্ছেন।"

"শুধু আমি কেন সারা শহর ঘুমে অচেতন, সুশীল-বাবু।"

"তাই বটে! আচ্ছা দাঁড়ান, অনাথবাবু। এই ফুলের তোড়াটা আমি আপনাকে উপহার দিচ্ছি, কাল অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছি। নেবেন না? কেন? আপনার কোনও প্রিয় লোকের ছবি সাজাবেন! ফুল দিয়ে সাজাবার মত কোনও ছবি নেই? তবে? কিন্তু এমন একখানা ছবি অন্ততঃ থাকা উচিত ছিল, অনাথবাবু। আচ্ছা, তবে কাল আমি আপনার ঘরে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসব। আমারও কিছু একটা করা প্রয়োজন! ... ..."

"এখন যাই আমি, সুশীলবাবু।"

"যাবেন? আচ্ছা। আমি এই শুতে যাচ্ছি। সত্যি বলছি, অনাথবাবু। আর টুঁ শব্দটী করব না। এবং ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হ'ব, কেমন?"

অনাথবাবু দ্বারের বাহিরে গেলেন। হঠাৎ সুশীল দ্বার খুলিয়া মুখখানি বাড়াইয়া বলিল—"শুনুন অনাথ-বাবু, আমি কালই চ'লে যাব। আর আপনাকে জ্বালাতন করব না। এই কথাই আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

পরদিন কিন্তু সুশীলের বাড়ী যাওয়া হইল না। কয়েকটী জরুরী কাজের জন্য তাহাকে শহরে থাকিয়া যাইতে হইল। সন্ধ্যার সময়ে তাহার অসাবধান পদযুগল তাহাকে তাহার অজ্ঞাতসারে অমলার মামার বাড়ীর দ্বারদেশে লইয়া উপস্থিত করিল। দ্বারবানের নিকট সংবাদ লইয়া সে জানিল, অমলা মামার সহিত বাহিরে গিয়াছে। না, তাহার এমন কিছু প্রয়োজন ছিল না, অমলা আর সে এক গ্রামের প্রতি-বেশী কি না, তাই দেখা করিতে আসিয়াছিল। দেশ হইতে

কোন নূতন সংবাদ আছে কি না জানিতে আসিয়াছিল। আচ্ছা সে পরে একদিন আসিবে।

সুশীল শহরের মধ্যে গিয়া ঘুরিতে লাগিল। হয় তো সেখানে অমলার সহিত তাহার দেখা হইতে পারে। সুশীল ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রাউন থিয়েটারের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। দেখিল টিকিট ঘরের কাছে অমলা তাহার মামার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুশীল অগ্রসর হইয়া অমলার দিকে তাকাইল, অমলাও সুশীলকে লক্ষ্য করিল। চারি চক্ষু মিলিত হইলে অমলা মৃদু হাসিল। সুশীল মনে করিল অমলা এইবার চক্ষুর ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে ডাকিবে। কিন্তু অমলা তাহার কিছুই করিল না। লজ্জাবনতমুখে অমলা মামার হাত ধরিয়া থিয়েটারের ভিতর চলিয়া গেল। সুশীলও একখানি টিকিট কিনিয়া প্রবেশ করিল।

সুশীল বসিয়া বসিয়া অমলাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। ক্রমে প্রথম অঙ্কের শেষে দশ মিনিট ইণ্টারভ্যাল হইল। অমলা মামার হাত ধরিয়া খাবারের দোকানে প্রবেশ করিল। সুশীলও দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল। অমলারা বাহির হইতেই সুশীলের সম্মুখে পড়িয়া গেল। সুশীল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ, অমলা?"

"ভাল আছি সুশীলদা।" বলিয়াই অমলা তাহার মামার দিকে তাকাইয়া বলিল "এর নাম শ্রীসুশীল চন্দ্র দাসগুপ্ত, আমাদের একগ্রামবাসী প্রতিবেশী। এবার এম্-এ পরীক্ষা দিয়েছেন।"

"ভাল, ভাল।" বলিয়া অমলার মামা একটু হাসিলেন।

অমলা ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বুঝি আমাকে বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা করতে এয়েছ, সুশীলদা। একজন বাড়ী থেকে এসেছে বটে, কিন্তু আমি কোনও খবর পাই নি। তবে নিশ্চয়ই তারা ভাল আছেন। আমার তো তাই বোধ হয়।"

"তাই হবে, অমলা। তুমি কি শীগ্‌গির দেশে যাচ্ছ?"

"হাঁ; [illegible] সময়ে নিশ্চয়ই যাব সুশীলদা। তোমার বাবা মাকে তোমার সংবাদ দে'ব। এখন তোমারও ত পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, তুমিও চল না!" এই বলিয়া অমলা মামার হাত ধরিয়া নিজের স্থানে চলিয়া গেল।

সুশীল থিয়েটার হইতে বাহিরে আসিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে মামার বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। হয় তো বাড়ী ফিরিবার মুখে অমলার সহিত দেখা হইতে পারে। প্রায় রাত্রি সাড়ে দশটার সময়ে অমলা তাহার মামার সহিত গাড়ী করিয়া ফিরিয়া আসিল। সুশীল দেখিল, গাড়ী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, বাড়ীর ফটক বন্ধ হইয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ বাড়ীর সম্মুখে সুশীল পায়চারি করিয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে দেখিল ধীরে ধীরে ফটকটা খুলিয়া অমলা পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে আসিল। আসিয়াই সে চারিদিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া সুশীলকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। সুশীল সম্মুখে আসিতেই অমলা বলিল—"এখনও মনের ভিতর একরাশ চিন্তা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, সুশীলদা!"

"কই আর ঘুরে বেড়াচ্ছি? আর আমার চিন্তাই বা কি? এই বাড়ী ফিরছিলাম আর কি!"

"কিন্তু বাড়ী ফিরবার সময়েও যে আমি তোমায় পায়চারি করে বেড়াতে দেখেছি, সুশীলদা। তারপর ঐ জানালা দিয়ে তোমাকে বাহিরে দেখে তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বল্‌তে ইচ্ছা হ'ল। আবার এখনই ভিতরে চ'লে যেতে হ'বে।"

"এত কষ্ট ক'রে এলে, তার জন্য তোমায় আশীর্ব্বাদ করি অমলা। আমি হতাশ হ'য়ে পড়েছিলাম, মনে হয়েছিল তোমার সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না! তোমার সঙ্গে থিয়েটারে যে দেখা করেছিলাম, তাতে বোধ হয় বিরক্ত হয়েছ! ক্ষমা কর, অমলা। তুমি সে দিন যা বলেছিলে, তার অর্থ কি, তাই জিজ্ঞাসা করতে আজ আমি এসেছিলাম।"

"কিন্তু সে দিন আমি এত কথা বলেছি যে, তাতে বুঝ্‌বার বাকী কিছু আছে বলিয়া আমার ত মনে হয় না, সুশীলদা।"

"আমার যে সবটাই স্বপ্ন ব'লে মনে হচ্ছে অমলা।"

থাক্, সুশীলদা, ও বিষয়ে আর আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আমি অনেক কথা বলেছি, যা বলা উচিত হয় নি, তাও বলেছি। আমি তোমায় ভালবাসি। সত্যি কথা। সেদিনও আমি মিছে কথা বলি নি, আজও মিছে কথা বল্‌ছি না। তথাপি এত সব কারণ জুটে আমাদের দুজনকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে যে, ও সব কথার আর আলো-

চনা না করাই ভাল। তোমায় আমার বড় ভাল লাগে সুশীলদা. তোমার সঙ্গে কথা কইতে ভাল লাগে, তোমার সঙ্গে বেড়াতে ভাল লাগে, এমন ভাল আর কাহারও সঙ্গে লাগে না। তবুও সুশীলদা, ...। কে যেন আমাদের দেখছে ব'লে মনে হচ্ছে। এখন যাই তবে সুশীলদা ? তুমি জান না, এমন অনেক কারণ আছে যাতে আমাদের মিলন অসম্ভব। আমি রাত্রিদিন ও-কথা ভেবে দেখেছি আমার মনে হয়, সেটা একেবারে অসম্ভব !"

"কি অসম্ভব, অমলা ?"

"সবটাই অসম্ভব, সুশীলদা। দোহাই তোমার, এ সম্বন্ধে আর কিছু আমায় জিজ্ঞাসা কর না।"

"আর কিছু জিজ্ঞাসা করব না, অমলা ? আমার বোধ হয় সেদিন তুমি আমায় মিছে আশার কথা শুনিয়েছিলে। কেমন, না ?"

অমলা মুখ ফিরাইল।

"রাগ করলে, অমলা ?" সুশীলের মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। "এ দুদিনে এমন কি করেছি অমলা, যে সব মিথ্যা হয়ে গেল ?"

"পায়ে পড়ি সুশীলদা, ও কথা ছেড়ে দাও। আমি দুদিনে ভাল করে ভেবে দেখেছি মাত্র। এমন কি হয় না ? তবু বলছি, তোমায় আমার ভাল লাগে, আমি তোমার প্রশংসা করি।—"

"এবং সম্মান করি ! কেমন না, অমলা ?"

অমলা সুশীলের দিকে একটু বক্রদৃষ্টিতে চাহিল। সুশীলের কথায় অমলার একটু রাগ হইয়াছিল। অমলা উত্তেজিত স্বরেই বলিল—"কেন তুমি কি দেখিতে পাও না সুশীলদা, যে ঠাকুরদার মত কিছুতেই হবে না ! কেন তুমি এ কথা আমায় বলতে বাধ্য করালে ? তুমি ত নিজেই এটা বেশ বুঝতে পার। তবে ?"

উভয়েই নিরুত্তর। কিছুক্ষণ পরে সুশীল বলিল—"তা বটে অমলা, আমারই ভুল হ'য়েছিল।"

"তা ছাড়া আরও কত কারণ রয়েছে, তা তোমাকে বলা যায় না, সুশীলদা। তুমি এ রকম ক'রে আমার অনুসরণ কর না, তোমার পায়ে ধরে বলছি। এতে আমার বড় ভয় করে !"

"আর কখনও এমন হবে না, অমলা।"

অমলা ধীরে ধীরে সুশীলের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—"তা হলে পূজার সময় বাড়ী যাবে ত, সুশীলদা।" বলিয়াই অমলা ফটকের মধ্যে চলিয়া গেল।

সুশীল সোজা পথ ধরিয়া বুড়ীগঙ্গার দিকে চলিল। পথে একটী ছোট বালক গোলাপফুলের মালা বেচিতেছিল, সুশীল একগাছি মালা কিনিয়া লইল। তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে সে গঙ্গার ধারে আসিয়া করোনেশন পার্কের মধ্যে গিয়া একটী বেঞ্চে উপবেশন করিল। তখন বৃষ্টি পড়িতেছিল, কিন্তু সুশীলের তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। তাহার হস্তস্থিত ছাতাটা শুধু সাক্ষীস্বরূপ তাহার হাতে শোভা পাইতেছিল। ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কিন্তু সুশীলের খেয়াল নাই। অন্যমনস্কভাবে ছাতাটী খুলিয়া মাথায় দিয়া সে তন্দ্রামগ্ন হইল। তারপর কখন্ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল সে জানিতে পারিল না।

হঠাৎ এক পাহারাওয়ালার ধাক্কায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সুশীল চমকাইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার মাথাটা অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা তাহার মনে পড়িল। থিয়েটার দেখা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট ছেলেটীর নিকট হইতে গোলাপ ফুলের মালাটী কেনা পর্য্যন্ত। সুশীল মালাটী খুঁজিয়া পাইল না, বোধ হয়, দয়া করিয়া কেহ উহা সরাইয়া লইয়া গিয়াছে ! সে পথে বাহির হইয়া পড়িল; দেখিল তাহার সম্মুখ দিয়া একটী ভদ্রলোক ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে হাঁটিয়া চলিতেছে, তাহার মাথায় ছাতা নাই, সে বৃষ্টিতে বড় ভিজিতেছে। সুশীল তাহার নিকট গিয়া তাহাকে নিজের ছাতার ভিতর আসিতে অনুরোধ করিতে সাহস করিল না। তাই সুশীল নিজের ছাতাটীও বন্ধ করিয়া দিল। না, সে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীকে একা ভিজিতে দিবে না।

সুশীল যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে। দেখিল, টেবিলের উপর একখানি নিমন্ত্রণ পত্র রহিয়াছে—সুষমার পিতা তাহাকে পর দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাড়ীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, সেই সঙ্গে অমলা ও সন্তোষকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে আসিতেই হইবে।

সুশীল শয্যায় শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে সে উষ্ণমস্তিষ্কে জাগিয়া উঠিল। যদিও সমস্ত দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তথাপি কিছুতেই তাহার নিদ্রা আসিল না। সুশীল টেবিলের নিকট গিয়া নিমন্ত্রণ পত্রখানির উত্তর লিখিতে বসিল। বিশেষ কারণে সে যাইতে পারিবে না, বলিয়া সে উত্তর লিখিয়া দিল। তার পর উঠিয়া নিজেই চিঠিখানি ডাকে দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার মনে হইল যে অমলাও ত নিমন্ত্রিত হইয়াছে। তবে অমলা তাহাকেও সে কথা বলিল না কেন? সে বুঝি ইচ্ছা করে না যে, সুশীল এত লোকের মধ্যে গিয়া তাহার সহিত আলাপ করে। সুতরাং তাহাকে যাইতেই হইবে। সুশীল তাহার লেখা চিঠিখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। সে আর একখানি চিঠি লিখিয়া দিল যে সে নিমন্ত্রণে যাইবে। আবেগে ও অভিমানে তাহার হাত কাঁপিতেছিল। কেন সে যাইবে না? কেন সে আপনাকে লুকাইয়া রাখিবে? সে নিশ্চয়ই যাইবে।

অদম্য উৎসাহে সুশীল কক্ষের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। দেওয়াল হইতে ক্যালেণ্ডার টানিয়া আনিয়া তার তিন-চার খানি তারিখের পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিল। বিপুল আনন্দে সে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। হঠাৎ তাহার কান খুঁটিবার প্রয়োজন হইল। সে আর কিছু না পাইয়া টেবিলের উপরিস্থিত ঘড়ির একটা কাঁটা অন্যমনস্কভাবে খুলিয়া লইয়া কান খোঁচাইতে লাগিল। তারপর যখন তাহার দৃষ্টি এই ব্যাপারে আকৃষ্ট হইল, তখন সে অট্টহাস্য করিয়া ঘরটা কাঁপাইয়া তুলিল। আর কি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সে নষ্ট করিতে পারে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

দৌড়াইয়া আসিয়া সুশীল শয্যায় শুইয়া পড়িল এবং সেই ভিজা কাপড়েই নিদ্রামগ্ন হইল। পরদিন তাহার যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল। রাস্তাঘাট সব কর্দ্দমাক্ত। সুশীলের বেশ একটু মাথা ধরিয়াছিল। তাহার চিন্তাগুলি সব এলোমেলো হইয়া যাইতেছিল।

ডাকপিয়ন আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। সুশীল চিঠিখানি খুলিয়া বার বার পাঠ করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না, আবার সে পাঠ করিতে লাগিল। অমলার [illegible]। সে লিখিয়াছে, সুষমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণের কথা সে তাহাকে কাল বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল; সে যেন সেখানে নিশ্চয়ই যায়। তাহাকে অমলার বিশেষ প্রয়োজন। তাহার অনেক কথা বলিবার আছে। সুশীল তাহার পূর্ব্বের লেখা চিঠিখানি আবার ছিঁড়িয়া ফেলিল। সুষমার পিতার নিকট সে লিখিয়া দিল, যে অন্যত্র বিশেষ প্রয়োজন থাকায় ইচ্ছা থাকিলেও সে সন্ধ্যার সময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিল না বলিয়া সে দুঃখিত। সুশীল নিজের হাতে চিঠিখানি ডাকে দিয়া আসিল।

পাঁচ

কল্পনার রাজ্যে

পূজার ছুটীর আর দুই-এক দিন বাকী। অমলারা দেশে চলিয়া গিয়াছে। শহরের পথ ঘাট অনেকটা নিস্তব্ধ, নির্জ্জন। সুশীল তখনও শহরে। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহার শয়নকক্ষে বাতি জ্বলিতেছিল। তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, পুস্তকখানি শেষ না করিয়া সে উঠিবে না। কয়েক দিন ধরিয়া সে কোথায়ও যায় নাই, কাহারও সহিত সাক্ষাৎও করে নাই, বসিয়া বসিয়া কেবল লিখিতেছিল। কখনও কখনও তাহার উষ্ণ মস্তিষ্ক হইতে কতকগুলি অসংলগ্ন ভাব জন্মগ্রহণ করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়া যাইতেছিল। তাহার প্রকৃত অবস্থা ফিরিয়া আসিলে, সেগুলি তাহাকে আবার কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইতেছিল, ইহাতে তাহার লেখার বড় বিলম্ব হইয়া যাইতেছিল। হয় তো রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা গরুর গাড়ীর ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দে তাহার কল্পনার সূত্র মাঝে মাঝে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছিল।

ঐ গরুর গাড়ীটা রাস্তার এক কোণে গিয়া ঠেকিল। একটা খঞ্জ রাস্তার খুঁটি ধরিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়াছিল। ঐ বুঝি গরুর গাড়ীর তলায় সে চাপা পড়িয়া গেল! বুঝি তাহার মাথাটা গাড়ীর চাকায় লাগিয়া গুঁড়া হইয়া গেল! আহা বেচারী সত্যই কি মারা গেল! আবার ও কে পথের ধারে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে? ঐ তার বুক-পকেট হইতে এক খানি পত্র বাহির হইয়া রহিয়াছে না! সে বুঝি তাহার কোন প্রিয়জনকে লেখা পত্রখানি ডাকে দিতে যাইতেছিল।

আহা, বেচারী কি জানিত যে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে!

সুশীল কল্পনায় দেখিতে লাগিল, কে একজন এক নির্জ্জন কক্ষে মৃত্যুর কাঙাল হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে! তাহাকে যে মরিতেই হইবে। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, আটটার সময় সে মরিবে। একটী দেওয়াল-ঘড়ী টিক্‌ টিক্‌ করিয়া শব্দ করিতেছিল। কৈ আটটা বজিল কৈ? ঘড়ী ত সেই টিক্‌ টিক্‌ করিতেছে। আহা বেচারী! আটটা কখন্‌ বাজিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার বিকৃত মস্তিষ্কে সে শব্দ প্রবেশ করে নাই! তাহার সম্মুখে একটা ফুলদানি স্থাপিত ছিল, ফুলদানি হইতে ফুলগুলি লইয়া সে কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, তার পর ফুলদানিটী মাটিতে সজোরে আছাড় মারিয়া সে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কেন? সে মরিবে আর ঐ জিনিসগুলি অখণ্ড অবস্থায় থাকিবে কেন? লোকটা বিকৃত মস্তিষ্কে এক সপ্তাহের মধ্যে মরিয়া গেল।......

সুশীলের কল্পনা-সূত্র আবার ছিন্ন হইয়া গেল। সে উঠিয়া ঘরের ভিতর আবার পায়চারি করিতে লাগিল। তাহার পাশের ঘরে যেন ঘুমভাঙ্গার শব্দ হইল। ঐ বুঝি অমাথবাবু ঘুমভাঙ্গার রাগে তাহাকে গালাগালি দিতে আসিতেছেন। সুশীল ধীরে ধীরে টেবিলের নিকটে আসিয়া বসিল। সম্মুখের জানালাটী উন্মুক্ত ছিল, তাহা হইতে স্নিগ্ধ বাতাস আসিয়া তাহার মস্তিষ্কের উষ্ণতা অনেকটা দূর করিয়া দিল। সে তাহার লিখিত কাগজগুলি উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। সে দেখিল যে, তাহার কল্পনা তাহার সহিত লুকাচুরি খেলিতেছে। ভাঙ্গা গরুর গাড়ীর ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ ও মৃত্যুর বীভৎসতা—ইহার সহিত তাহার লেখার কি সম্বন্ধ আছে? সে লিখিতেছে, নদীর ধারে একটী পুষ্পবিভূষিত উদ্যানে বসন্তের মলয়হিল্লোল পুষ্পসৌরভ বহিয়া বেড়াইতেছিল, সন্ধ্যায় স্বচ্ছ তরঙ্গের মাঝে চন্দ্রের জ্যোৎস্না হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছিল। সেই অনাবিল সৌরভময় সৌন্দর্য্যের রাজ্যে উদ্যানের এক নির্জ্জন প্রান্তে বসিয়া একটী সুসজ্জিত সুন্দরী ষোড়শী বালিকা। কলাবর্ষের মুগ্ধ কুসুমের মধ্যে সে যেন সুন্দরতম ফুলটী উদ্যান আলো করিয়া বসিয়া আছে। ধীরে ধীরে একটী পুরুষ-মূর্ত্তি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বালিকাটী চমকাইয়া উঠিয়া পুরুষটীকে চলিয়া যাইতে বলিল। পুরুষটী বলিল—"শুধু এই কথা বলতে এসেছিলাম, তুমি যা বলেছ তাই ঠিক। আমি বুঝতে পারি নি। বাস্তবিকই উহা অসম্ভব।" বালিকা উত্তর করিল, "তবে আবার কেন এসেছ আমার কাছে?" পুরুষটী বালিকার একেবারে নিকটে আসিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে বলিল, "শুধু একবার তোমায় দেখ্‌ব ব'লে। এক মুহূর্ত্ত তোমার কাছে থাক্‌ব,' শুধু এক মুহূর্ত্ত!" পুরুষটীর এক মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল। মৃদুস্বরে সে বলিল, "বিদায়, ওগো বালিকা বিদায়।" বালিকা একবার তাকাইল মাত্র। তার পর পুরুষটী চলিয়া গেল।

ছিঃ ছিঃ, এই সুন্দর কল্পনায় সহিত মৃত্যুর কি সম্বন্ধ আছে? সুশীল পূর্ব্বলিখিত কাগজগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিল। তাহার প্রাণের দুকূল ছাপাইয়া কল্পনার-ধারা ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। সুশীল আবার লিখিতে বসিল।

পুরুষটী বালিকার নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদ্যানের বাহিরে আসিল। তাহার স্মৃতিটী লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। তার পর কোথায় চলিয়া গেল, কেহ জানিতে পারিল না। এক বৎসর কাটিয়া গেল, আবার বসন্ত আসিল। আবার কোকিল ডাকিল, আবার গাছে গাছে ফুল ফুটিল, সুগন্ধ বহিয়া বাতাস ছুটিল। আবার জীবনের স্পন্দন দেখা দিল। পুরুষটী রাত্রি দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই শহরে আসিয়া পথের ধারে বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। নির্জ্জন সন্ধ্যায় পথ ঘাট নিস্তব্ধ, কেবল নির্মেঘ আকাশে কয়েকটী তারা জল জল করিয়া জ্বলিতেছিল। পুরুষটী যেন অনেক দূর দেশে যাইতেছিল, তাই শ্রান্তিদূর করিবার জন্য পথের ধারে বসিয়াছে। এক বৎসরে তাহার চুল অনেক পাকিয়া গিয়াছে, তাহার অলক্ষ্যে বৃহৎ শ্মশ্রু গজাইয়া উঠিয়াছে। পথে একটী বালক যাইতেছিল, তাহাকে মারবেল কিনিতে একটী পয়সা দিয়া নিকটে ডাকিয়া পুরুষটী জিজ্ঞাসা করিল—"ঐ জমীদার-বাটীতে এখন কে থাকে, জান?" বালকটী উত্তর দিল, "কেন আপনি জানেন না? জমীদারবাবুর নাতনীর এক জন বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে; তারা খুব

বড়লোক! সেই বাড়ীর মালিক নূতন জমীদার! তাঁর স্ত্রীর কিন্তু বড় দয়া তিনি সবাইকে দয়া করেন।" পুরুষটী বালককে বিদায় দিয়া দিল। তার পর নিজের মনে বলিতে লাগিল, "হাঃ,হাঃ, নূতন জমীদারগৃহিণীর বড় দয়া! তবে তাহাকেও কি সে দয়া করিবে?" বলিয়া হোঃ, হোঃ, শব্দে পুরুষটী অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল। পরে গুণ গুণ স্বরে একটী করুণ সঙ্গীত গায়িতে গায়িতে জমীদার-বাটীর সম্মুখে পায়চারি করিতে লাগিল। অকস্মাৎ উদ্যানের ফটকের নিকট হইতে জমীদার-বাড়ীর নূতন গৃহিণী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। পুরুষটী দেখিল তাহার পূর্ব্বপরিচিতা কিশোরীই বটে। সে অগ্রসর হইল, মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার মন পুলকে নাচিয়া উঠিল। তার পরই সে একটু শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি না কি বড় দয়ালু? তাই বুঝি দয়া ক'রে আমার পূর্ব্বস্মৃতি মনে করিয়ে দিতে এসেছ?" কিশোরী নিরুত্তর রহিল, শুধু তাহার মুখখানি আকর্ণ রক্তিম আভা ধারণ করিল। পুরুষটী বলিতে লাগিল, "কিন্তু সুন্দরী আর কেন? আমি চিরকালের মত এদেশ ছেড়ে যাচ্ছি।" তথাপি কিশোরী কোনও উত্তর দিল না. কেবল তাহার ঠোঁটদুটী ঈষৎ কাঁপিল মাত্র। কিন্তু পুরুষটীর বলা থামিল না। সে বলিল, "আমার অপরাধের জন্য আমার পূর্ব্বের ক্ষমাভিক্ষা যদি যথেষ্ট না হয়ে থাকে, আমি আজ আবার ক্ষমা চাচ্ছি। দয়া করে ক্ষমা কর। আমি তোমায় বড় ভালবেসেছিলাম, কিন্তু তখন বুঝতে পারি নি আমি তোমার এত অযোগ্য। এখন তা বুঝতে পেরেছি এবং তার জন্য বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করছি। হয়েছে সুন্দরি?" কিয়ৎক্ষণ থামিয়া আবার সে বলিতে লাগিল, "তুমি ত আমায় গ্রহণ কর নি, তুমি অপরের গৃহিণী! আমি মূর্খ; বুদ্ধিহীন, বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গিয়েছিলাম!" পুরুষটী আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না, মাটীর উপর বসিয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তারপর সে চীৎকার করিয়া বলিল, "দয়া কর; দয়া করে সম্মুখ হ'তে চলে যাও! কেন আমার আবার ডাকলে?" কিশোরীর মুখখানি পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, সে ধীরে ধীরে অতি ধীরে অথচ স্পষ্ট করিয়া বলিল, "আমি তোমায় ভালবাসি! আমায় ভুল বুঝো না, আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসি। ওগো বিদায়, তবে বিদায়!" বলিয়াই সুন্দরী কিশোরী, নূতন জমিদার-গৃহিণী, দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহের মধ্যে ছুটিয়া চলিয়া গেল।...

বাস্! এত দিনে সুশীলের পুস্তকখানি সমাপ্ত হইল। নয় মাসের কঠিন পরিশ্রমের পর সে সমাপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। সুশীলের প্রাণের পরতে পরতে একটা তৃপ্তির শিহরণ খেলিয়া গেল। তখন উষার আলোক ঘরের উন্মুক্ত বাতায়ান-পথে ভিতরে আসিয়া পড়িতেছিল। সুশীলের মাথা ঝিঁ ঝিঁ করিতেছিল, বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। কল্পনার কত স্পষ্ট দৃশ্য তখন তাহার মস্তিষ্কে জড় হইতেছিল, তাহার মনে হইল যেন তাহার মস্তিষ্কটী-কুয়াসা-ঘেরা অযত্ন-রক্ষিত উদ্যান, চারিদিকে ফুলের গোড়ায় গোড়ায় কাঁটাবন ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সুশীল নিদ্রামগ্ন হইল। সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল যেন সে ঘুরিতে ঘুরিতে কি এক অদ্ভুত উপায়ে এক পরিত্যক্ত শহরে আসিয়া পড়িয়াছে। শহরটী একটী উপত্যকা-প্রদেশে, লোকজনের কোনও চিহ্ন নাই। দূরে একটী ভাঙ্গা বীণা বাজিতেছে, কে বাজাইতেছে তাহার কোন ঠিকানাই নাই, কারণ কাহাকেও দেখা যাইতেছে না। সুশীল নিকটে গিয়া দেখিল যেন বীণার ভাঙ্গা স্থান হইতে রক্ত ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঝলকে ঝলকে রক্ত উথলাইয়া উঠিতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে সুশীল শহরের বাজারে উপস্থিত হইল; প্রতি দোকানে আহার্য্য-সামগ্রী সাজান রহিয়াছে, কিন্তু জন-মানবের লক্ষণ কিছুই নাই, একেবারে পরিত্যক্ত, এমন কি তরুলতার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। অথচ মাটিতে মানুষের সদ্য পদচিহ্ন রহিয়াছে এবং আকাশে বাতাসে মানুষের শেষ কথাবার্ত্তার ধ্বনি তখনও পর্য্যন্ত বাজিতেছে। এত অল্প পূর্ব্বে শহরটী পরিত্যক্ত হইয়াছে! এক অপূর্ব্ব অনুভূতিতে তাহার মন আচ্ছন্ন হইল; মনে হইল যেন ঐ আকাশে-বাতাসে ভাসমান শব্দগুলি তাহাকে ভয় দেখাইতেছে, যেন উহারা তাহার বড় নিকটে আসিতেছে, যেন তাহার গলার টুঁটি টিপিয়া ধরিতেছে! সুশীল উহাদের হাত ছাড়াইতে চাহিতেছে, কিন্তু উহারা যে ছাড়ে না। তখন সুশীল দেখিল, উহারা শুধু

শব্দ নহে, এক দল বৃদ্ধ নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেছে। কেন তাহারা এমন ভাবে নাচিতেছে, অথচ তাহাদের মুখ চোখে জীবনের লক্ষণ আদৌ নাই কেন? এই বৃদ্ধের দলের দিক্ হইতে একটা ঝটকা কনকনে শীতের হাওয়া সুশীলকে কাঁপাইয়া দিয়া গেল। সুশীল তাহার দিকে অগ্রসর হইল, তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইল না, তাহারা অন্ধ; সুশীল তাহাদিগকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, তাহারা শুনিতে পাইল না, তাহারা বধির; সুশীল তাহাদের সম্মুখীন হইয়া দেখিল, তাহারা মৃত। সুশীলের ভয়ে গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল। সুশীল দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল; পূর্ব্ব দিক্ ধরিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে একটা পাহাড়ের ধারে আসিয়া সে বিশ্রাম করিতে লাগিল। তখন এক গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনি হইল, "তুমি কি পাহাড়ের গায়ে দাঁড়াইয়া আছ?"

সুশীল উত্তর দিল, "হাঁ, আমি পাহাড়ের ধারে দাঁড়াইয়া আছি।"

আবার শব্দ হইল, "ঐ পাহাড় আমার পা, দৈত্যেরা আমায় দূর দেশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমায় আসিয়া মুক্ত করিয়া দাও।"

সুশীল দূর দেশে যাত্রা করিল। পথে আসিতে আসিতে দেখিল একটা সেতুর নিয়ে এক জন লোক তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সে সেখানে দাঁড়াইয়া ছায়া সংগ্রহ করিতেছে। মানুষটার মুখে একটা প্রকাণ্ড মুখোস। মানুষটাকে দেখিয়া ভয়ে সুশীলের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। মানুষটি সুশীলের নিকট আসিয়াই তাহার ছায়া লইতে চাহিল। সুশীল তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য মানুষটার গায়ে থুতু দিতে লাগিল, মুখ ভেংচাইয়া তাহাকে ঘুসি দেখাইতে লাগিল। মানুষটা কিন্তু বিন্দুমাত্র নড়িল না, দুই হাত বিস্তার করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পশ্চাৎ হইতে কে যেন বলিল, "ফেরো, ফেরো, পালাও!" সুশীল পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, একটা মড়ার খুলি গড়াইয়া গড়াইয়া চলিতেছে, যেন তাহাকে পথ দেখাইয়া যাইতেছে। খুলিটা মানুষের মাথার খুলি, গড়াইতে গড়াইতে হাসিতেছে আবার কাঁদিতেছে। সুশীল মড়ার খুলির অনুসরণ করিতে লাগিল। কত রাত্রি দিন ধরিয়া মড়ার খুলিটা গড়াইয়া চলিল, সুশীলও উহার অনুসরণ করিতে লাগিল। নদীর ধারে আসিয়া খুলিটা কোথায় গড়াইয়া লুকাইয়া পড়িল, সুশীল আর উহাকে দেখিতে পাইল না। সুশীল নদীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ডুব দিল। ডুব দিয়া সুশীল একটা প্রকাণ্ড দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল, সেখানে দেখিল একটা বৃহৎ মৎস্য দ্বারে পাহারা দিতেছে, মৎস্যটা কুকুরের মত ভীষণ চীৎকার করিতেছে, উহার গায়ে ছুরীর মত ধারাল বড় বড় কাঁটা; সুশীলের দিকে ফিরিয়া উহা চীৎকার করিয়া উঠিল। ভয়ে সুশীল চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। দেখিল, দূরে দাঁড়াইয়া অমলা। সুশীল অমলাকে দেখিয়াই তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল। অমলা সুশীলের পানে তাকাইয়া হাসিল মাত্র, কোনও কথা কহিল না। অমলার অলকগুচ্ছ কাঁপাইয়া এক প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গেল। সুশীল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অমনই তাহার নিদ্রা ভাঙিয়া গেল।

সুশীল উঠিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। ভোর হইয়া আসিয়াছে, দুঃস্বপ্নে তাহার মাথা ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতেছে। সে আলোটা নিবাইয়া দিয়া উষার আলোকে শেষ পৃষ্ঠাটা আবার পড়িল। তারপর সুশীল শয্যায় শুইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

পর দিন প্রকাশকের হাতে সুশীল পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দিয়া সুশীল ঢাকা শহর পরিত্যাগ করিল। কোথায় সে গেল, কেহই জানিতে পারিল না।

ছয়

প্রবাসে

সুশীলের পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল—কল্পনার একটী নূতন রাজ্য, ভাবের একটী নূতন দৃশ্যপট সাধারণের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। প্রথম মাসেই পুস্তকখানির বহুল প্রচার হইল। তার পর পূজার ছুটী শেষ হইতেই, সুশীলের আর এক খানি নূতন পুস্তক বাহির হইল। অদ্ভুত কাব্য—লোকের মুখে মুখে প্রশংসা ফিরিতে লাগিল। গ্রন্থ-বিক্রয়ে সুশীলের উপার্জ্জনও মন্দ হইল না। দূর প্রবাসে বসিয়া সুশীল গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছে। কাব্যখানি মানুষের ছোট বড় সুখ-দুঃখ ও আকাঙ্ক্ষা অভাব লইয়া রচিত। তাই গ্রন্থখানি পাঠকের প্রাণের দ্বারে গিয়া আঘাত করিল।

সুশীল লিখিয়াছে, "দুইটী প্রাণের গভীরতম প্রদেশের ইহা গুপ্ত কথা। ছোট্‌খাট দুঃখের দিনে যখন সমস্ত জগৎ সুন্দর ও সরল হইয়া মনে হয় তখন প্রেমের শরবিদ্ধ প্রাণের ইহা গোপন বাণী........."। সুশীল প্রবাসে কোথায় গিয়াছে তাহা কেহ জানে না, কবে ফিরিয়া আসিবে তাহারও ঠিকানা নাই।

এক দিন সন্ধ্যার সময় সুশীলের পিতা দ্বারে মৃদু করাঘাত শুনিল। সুশীলের মাতা বলিল, "ও কিছু নয়, বোধ হয় বাতাসে অমন শব্দ কচ্ছে।" কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইল, দ্বারে আবার সেই করাঘাত। এবার যেন একটু স্পষ্টতর! সুশীলের পিতা আসিয়া দেখিল, অমলা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অমলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি দরজায় আঘাত কর্চ্ছিলাম, কাকা। খুড়ীমার সঙ্গে একটু সাক্ষাৎ করে যাব।" এই বলিয়া অমলা ভিতরে প্রবেশ করিল।

অমলা সুশীলের মাতার নিকটে গিয়া বলিল, "ও গ্রামের জমীদার-বাড়ীর সকলে আজ আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। তাঁরা কাল ঐ বনে শীকার কর্ত্তে বেরোবেন। আপনাদের বাড়ীর কাছে, পাছে আপনারা ভয় পান, এই জন্য আপনাদের জানাতে এসেছি।"

সুশীলের পিতা ও মাতা অমলার দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। পূর্ব্বেও ত এরূপ ব্যাপার অনেকবার ঘটিয়াছে, কিন্তু তখন তো কেহ তাহাদিগকে জানায় নাই। আর জানাইবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? এ সন্ধ্যাবেলায় অমলার একা আসা ভাল হয় নাই। যাহা হউক তাহারা এই সংবাদের জন্য অমলাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

অমলা দ্বারের নিকট গিয়া আবার ফিরিয়া বলিল, "এই কথা বলতেই আমি এসেছিলাম। আপনারা বুড়া মানুষ, পাছে আপনারা ভয় পান।"

সুশীলের পিতা বলিল, "বেশ, বেশ, এখন তুমি বাড়ী যাও, অমলা।"

"যাই আমি এ পথ দিয়েই বেড়াচ্ছিলাম, বেশী রাত হয় নি ত আর।" সে দ্বারটী খুলিয়া বাহির হইল, আবার মুখ ফিরাইয়া বলিল, "সুশীলদার কোনও সংবাদ পেয়েছেন, কাকা?"

"না, কিছুই ত পাই নি অমলা! কোথায় যে আছে!"

"বোধ হয় সুশীলদা শীগ্‌গিরই ফিরে আসবেন? আমি ভেবেছিলাম আপনারা কিছু সংবাদ পেয়েছেন।"

"না, পূজার পূর্ব্ব থেকে কোনও খবর পাইনি, অমলা। সকলে বলে সে অনেক দূর-প্রবাসে গিয়াছে।"

"তাই হবে। বোধ হয় সুশীলদা ভাল আছে। তার একখানা নতুন বই বের হয়েছে, তাতে লিখেছে যে তার এখন ছোট-খাট দুঃখের দিন পড়েছে। তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম সুশীলদা ভাল আছে কি না। নিশ্চয়ই সে ভাল আছে।"

"তাই হোক, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, অমলা। তার জন্য আমরা বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছি। সে আমাদের কাছে কিংবা কারও কাছে চিঠি লেখে না কেমন আছে কে জানে!"

"বোধ হয় সে যেখানে আছে, সেখানেই বেশী ভাল আছে, কাকা। তা না হ'লে কি সে এত সুন্দর বই লিখতে পারতো! সুশীলদার প্রকৃতিই এই রকম! আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম বড়দিনের ছুটীতে সুশীলদা বাড়ী আসবে কি না? আসি তা হলে কাকা।" বলিয়া অমলা বাহির হইল। যতদূর লক্ষ্য হয় সুশীলের পিতা অমলাকে দেখিতে লাগিল। দেখিল দ্রুতপদবিক্ষেপে পথ অতিক্রম করিয়া অমলা বাটীতে প্রবেশ করিল।

দুই দিন পরে সুশীলের পিতার নিকট সুশীলের একখানি পত্র আসিয়া পৌছিল। সে লিখিয়াছে শীঘ্রই বাটী আসিয়া পৌছিবে। একখানি কাব্য সে লিখিতেছে, সেখানি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, একেবারে শেষ হইলেই সে যাত্রা করিবে। এ দুই মাস সে ভালই ছিল, বেশ দ্রুতগতিতে তাহার বই লেখা চলিয়াছে, সমস্ত পৃথিবী যেন তাহার নিকট প্রাণময় জীবন্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।

পত্র পাইয়াই সুশীলের পিতা জমীদার-বাটীতে উপস্থিত হইল। পথে সে অমলার নাম-লেখা একখানি রুমাল কুড়াইয়া পাইয়াছিল, সেখানি লইয়া যাইতেও সুশীলের পিতা ভুলিলেন না। অমলা উপরে দ্বিতলের ঘরে ছিল, দ্বারবানকে দিয়া তাহার নিকট সংবাদ দেওয়া হইল।

অমলা আসিয়া সুশীলের পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "কি সংবাদ কাকা?"

"অমলা, তুমি এই রুমালখানি পথে ফেলে এসেছিলে। —নাও" বলিয়া কিছুক্ষণ থামিয়া আবার সে বলিল, "সুশীলের কাছ থেকে চিঠি এসেছে।"

অমলার মুখের উপর দিয়া একটা আনন্দের ঢেউ খেলিয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চক্ষুর উপর বিদ্যুৎ ঝলসাইয়া গেল।

"হাঁ, কাকা, রুমালখানি আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।"

সুশীলের পিতা আবার চুপে চুপে বলিল, "সুশীল বাড়ী ফিরে আসছে।"

"কি বলছেন, কাকা?"

"সুশীল আসছে।"

"তাই না কি? বেশ।"

"আমার মনে হ'ল অমলা, তোমাকে বলা উচিত। তুমি সে দিন সুশীলের খবর জিজ্ঞাসা করছিলে কি না, তাই সুশীলের মা বললে তোমাকে এ সংবাদটা দিয়ে আসতে।"

"আপনার খুব আহ্লাদ হয়েছে। না, কাকা? কবে আসছে?"

"পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই।"

"বেশ, আর কিছু সংবাদ আছে?"

"না, আর কিছু সংবাদ নেই। আমরা ভাবলাম সুশীলের খবর তুমি জানতে চেয়েছিলে, তাই তার আসার সংবাদ তোমায় দিয়ে গেলাম।"

"আচ্ছা, কাকা।"

সুশীলের পিতা ফিরিয়া চলিল। কতদূর অমলা তাহার সঙ্গে আসিল। সুশীলের পিতা পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল, না, সে আর তাহাদের ঘরের সংবাদ পরকে দিতে যাইবে না, অন্যের তাহাতে কি ক্ষতি-বৃদ্ধি! সে এ কথা ভাবিয়াছিল, কিন্তু সুশীলের মাতাই তো তাহাকে জোর করিয়া অমলাকে সংবাদটি দিতে পাঠাইয়া দিল। সুশীলের পিতা প্রতিজ্ঞা করিল, সুশীলের মাতাকে সে দুই চারিটি কড়া কথা শুনাইয়া দিবে।

সাত

স্বগ্রামে

সুশীল গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। আসিয়া দেখিল, তাহার পরিচিত স্থানগুলির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বনের ধারে যে আমগাছ দুইটা সে পুঁতিয়াছিল তাহা তাহার মাথা ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। সুশীল তাহাদের দিকে বিস্ময় ও স্নেহজড়িত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। নদীর ধার দিয়া জংলা গাছের সারি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অতি কষ্টে সুশীলকে পথ করিয়া হাঁটিতে হইতেছিল। চরের উপরে সুশীলের সেই পূর্ব্বের আশ্রয়ের ঘরখানি কাঁটাবনে ভরিয়া গিয়াছে। সে সেখানে একবার বসিল, তাহার শৈশব ও কৈশোরের কথা মনে পড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে দুই একটা "বউ কথা কও" পাখী ডাকিয়া যাইতেছিল। সুশীল ফিরিয়া আসিয়া জমীদার-বাড়ীর বাগানের ধারে একটী প্রস্তর-খণ্ডের উপর বসিল। সে নিজের মনে শীস্ দিয়া গান গায়িতে লাগিল। দূরে পদশব্দ শুনিয়া সে ফিরিয়া দেখিল। সূর্য্য তখন আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে ডুবিয়া গিয়াছে কিন্তু দিনের আলো একেবারে নিবিয়া যায় নাই। চারিধারে একটা শান্তির ছায়া বিদ্যমান। সুশীল দেখিল একজন রমণী তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। অমলা না? অমলার হাতে একটী ফুলের সাজি। সুশীল উঠিয়া পড়িল, উঠিয়া অমলাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। অমলা বলিল, "সুশীলদা, আমি তোমাকে বিরক্ত কর্ত্তে আসি নি। আমি কয়েকটা ফুল নিতে এসেছি মাত্র।" সুশীল কোনও উত্তর দিল না। অমলা বলিতে লাগিল, "ফুলের সাজি নিয়ে এসেছি, কিন্তু ফুল যে কিছু পাচ্ছি না। আমার যে অনেক ফুলের প্রয়োজন। আমাদের বাড়ীতে একটা নিমন্ত্রণ আছে কি না সেইজন্য ঠাকুরমা ফুল দিয়ে টেবিল সাজাবেন।"

"ঐ ত ঐখানে বেল আর যুঁই রয়েছে, নাও না অমলা। আর তার উপরে গোলাপ ফুটে আছে। এখন ত বেশী ফুল ফোটবার সময় নয়।"

"সুশীলদা তোমাকে এত ফেকাশে দেখাচ্ছে কেন? অনেক দিন তুমি বাড়ী আস নি। এবার আমি তোমার দু'খানা বইই পড়েছি।"

এ কথায় সুশীল কোনও উত্তর দিল না। তাহার একবার মনে হইল সে বলে, "বেশ করেছ অমলা, বিশেষ ধন্যবাদ! তবে এখন যাও।" সুশীলের দুই ধাপ সম্মুখে অমলা দাঁড়াইয়াছিল। সুশীল ভাবিল, সে বুঝি তাহার

পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একটা ছাইয়ের রঙের কাপড়ের উপর একটা বাসন্তী রঙের ব্লাউজ পরায় তাহাকে খুব সুন্দর দেখাইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে "আমি বোধ হয় তোমার পথ রোধ ক'রে রয়েছি, অমলা" বলিয়া সে দু'পা সরিয়া গেল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, কোনও চাঞ্চল্য দেখাইবে না। তাই সে খুব সংযমের সহিত কথা বলিতেছিল। তাহাদের উভয়ের মধ্যে এখন মন্দ ব্যবধান নাই। উভয়েই নীরব, নিস্পন্দ। দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে একবার তাকাইল। সহসা অমলার মুখ রক্তিমভাব ধারণ করিল। সে চক্ষু নত করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ-চোখের উপর দিয়া একটা কি যেন করুণ ভাব খেলিয়া গেল। অমলার এই দুঃখব্যঞ্জক হাসিটী দেখিয়া সুশীলের মন নরম হইয়া গেল। সে অমলার নিকটে গিয়া বলিল, "অনেক দিন তুমি শহরে ছিলে কি না, অমলা, তাই কোথায় কোথায় ফুল ফোটে তুমি ভুলে গেছ। আমার কিন্তু সব মনে আছে।"

অমলা সুশীলের দিকে তাকাইল। সুশীল দেখিল, অমলার মুখখানি পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। অমলা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "কাল সন্ধ্যের সময় আসবে, সুশীলদা, আমাদের নিমন্ত্রণে? শহর থেকেও কেউ কেউ আসছে। বোধ হয় বেশী গোলমাল হবে না। যাবে, কেমন?" অমলার মুখের ভাবের আবার পরিবর্ত্তন হইল। সুশীল কোনও উত্তর দিল না। নিমন্ত্রণ তো তাহার কি? জমীদার বাড়ীতে তো তাহার স্থান নাই।

"অস্বীকার কোরো না, সুশীলদা। তোমায় কেউ বিরক্ত কর্ব্বে না, আমি সত্য বল্‌ছি। আর তা'ছাড়া তোমায় আমি নতুন জিনিস দেখিয়ে চম্‌কে দেব।" উভয়ে নীরব।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুশীল বলিল, "তুমি আমায় আর কি চম্‌কে দেবে, অমলা?" অমলা ক্ষোভে নিজের অধর দংশন করিল। তাহার মুখের উপর দিয়া একটা নৈরাশ্যের ভাব খেলিয়া গেল। অমলা হতাশস্বরে বলিল, "কেন তুমি আমার সঙ্গে অমন কর্চ্ছ, সুশীলদা'?"

"আমি ত কিছুই করি নি, অমলা। আমি এসে এই পাথরে বসেছিলাম, তা তোমায় দেখে তো আমি উঠে যেতে চেয়েছিলাম।"

"আমি সমস্ত দিন বাড়ীতে একা বসেছিলাম, কোনও কাজকর্ম্ম ছিল না, তাই সন্ধ্যের সময় এখানে এসেছি, সুশীলদা'। আমি নদীর ধার দিয়ে অন্য পথে যেতে পার্ত্তাম। তা' হ'লে আর এখানে এসে তোমায় বিরক্ত কর্ত্তে হ'ত না?"

"এ তো আর আমার জায়গা নয় অমলা, এ তোমাদের জায়গা।"

"সুশীলদা', একবার আমি তোমার উপর অন্যায় করেছি। তাই আমি ভেবেছিলাম, এই অন্যায়ের প্রতীকার করব। বাস্তবিকই একটী ব্যাপারে তোমাকে চম্‌কে দেব। আমার আশা আছে, হয় তো তাতে তুমি আনন্দ পাবে, সুখী হবে। আর বেশী কিছু বলতে আমি পারি না! তুমি কাল যেও, সুশীলদা'।"

"যদি তুমি তা'তে খুসী হও, অমলা, তবে যাব।"

"যেও, সত্যি!"

"আচ্ছা, যাব। তোমার এ দয়ার জন্য ধন্যবাদ, অমলা!"

সুশীল বনের ধার দিয়া ফিরিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া সুশীল ফিরিয়া দেখিল, অমলা তাহার পরিত্যক্ত প্রস্তর-খণ্ডে উপবেশন করিয়া আছে, তাহার সম্মুখে ফুলের সাজিটী শূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সে বাড়ীতে ফিরিতে পরিল না, বনের ধারে এধার-ওধার পায়চারি করিতে লাগিল। কত বিরুদ্ধ চিন্তা তাহার মনকে তোলপাড় করিতে লাগিল। অমলা বলিয়াছে, তাকে চম্‌কে দেবে! এ কথা বলিবার সময়ে অমলার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল কেন? চঞ্চল পুলকে তাহার মন ভরিয়া গেল; তাহার হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। অমলা কেন আজ এমন সুন্দর সাজিয়া আসিয়াছিল? কেন তাহার সুন্দর মুখের উপর এমন একটা নৈরাশ্যের ছায়া পড়িয়াছিল?

বনের পথ দিয়া মাঠের ওপার হইতে একটা সৌরভ ভাসিয়া আসিয়া সুশীলের নাসারন্ধ্র বহিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতেছিল। সুশীল একটী বৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়া কোকিলের কুহুতান শুনিতে লাগিল। চারিদিক হইতে পাখীর মিষ্ট গান আসিয়া তাহার মনকে মাতাল করিয়া তুলিতেছিল।

এই রকমেই আর এক দিন বনের ধারে অমলা এমনই

সুন্দর সাজে সাজিয়া সুশীলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তাহাকে মনে হইয়াছিল, যেন একটী প্রজাপতি ডানা মেলিয়া এক প্রস্তরখণ্ড হইতে অপর প্রস্তরখণ্ডে উড়িয়া ফিরিয়া-ঘুরিয়া আসিয়া তাহার কাছে ধরা দিয়াছে! অমলা বলিল, সে তাহাকে বিরক্ত করিতে আসে নাই; বলিয়াই সে মৃদু হাসিল। সে হাসিতে তাহার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল, সে হাসির জ্যোতিতে তাহার মুখের চারিদিকে তারা ফুটিয়া উঠিয়াছিল! কোন্ আশ্চর্য্য সামগ্রী অমলা তাহার জন্য ঠিক করিয়াছে? অমলা কি তাহার সম্মুখে তাহার পুস্তকগুলি আনিয়া দেখাইবে যে সে সেগুলি কিনিয়া বার বার পড়িয়াছে? একটু সহানুভূতি, একটু দয়া? না, এমন দয়া দেখাইয়া তাহাকে অপমান করিয়া অমলার কি লাভ হইবে!

সুশীল আবেগপূর্ণ হৃদয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। অমলাও ফিরিয়া আসিতেছিল তাহার ফুলের সাজি একেবারে শূন্য।

"কোনও ফুল পেলে না, অমলা? সাজি শূন্য যে।"

"না, ফুল আর নিলাম না। আমি ত ফুল নিতে আসি নি অমনি একটু বেড়াতে এসে ওখানে বসেছিলাম মাত্র

সুশীল অবাক্ হইয়া অমলার পানে চাহিল। তার পর শান্তকণ্ঠে বলিল, "অমলা, তুমি যে আমার উপর কোনও অন্যায় করেছ, এটা কেন ভাব বল তো? আর কোনও দয়া দেখিয়ে তার প্রতীকার করা প্রয়োজন এই বা ভাব কেন?"

অমলা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি?" কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার বলিল, "আমি ভেবেছিলাম, সুশীলদা, তোমার ওপর আমি অন্যায় ব্যবহার করেছি। তাই মনে করেছিলাম তুমি যাতে আমার উপর চিরকাল বিরক্ত না থাক তার একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।"

"না, আমি তোমার উপর আদৌ বিরক্ত হই নি, অমলা।"

সহসা অমলা তাহার মুখটী ফিরাইয়া বলিল, "তা হ'লেই ভাল! আমারও তাই বোঝা উচিত ছিল। অবশ্য তাতে যে মনে একটা গভীর দাগ রেখে যাবে, এ কথা আমি ভাবি নি। বেশ, তা হ'লে ও বিষয়ে আমরা আলোচনা কর্ব্ব না।

"না, প্রয়োজন নেই। আমার ও-সব মনেই থাকে না।

"আচ্ছা, তবে এখন যাই?"

"এস, অমলা।"

তাহারা উভয়ে ভিন্ন পথে চলিল। সুশীল একবার থামিয়া ফিরিয়া দেখিল। অমলাকে তখনও দেখা যাইতেছিল। সুশীল অমলাকে লক্ষ্য করিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "না, অমলা, তোমার উপর আমার কিছুমাত্র বিরক্তির ভাব নেই, তোমায় আমি এখনও ভালবাসি, খুব ভালবাসি!——"

"অমলা" বলিয়া সুশীল চীৎকার করিয়া উঠিল।

অমলা শুনিতে পাইল। চমকাইয়া পিছন ফিরিয়া একবার দেখিল, তার পর আবার চলিতে লাগিল। সুশীল মাটীর উপর বসিয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কিছুক্ষণ কাঁদিয়া মনের গুরু ভার কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করিয়া লইল।

সে দিন রাত্রে সুশীলের নিদ্রা হইল না। সে প্রত্যুষে উঠিয়াই বনের ধারে নদীর তীরে বেড়াইতে লাগিল। দেখিল শহর হইতে কয়েকখানি নৌকা আসিয়া জমীদার বাড়ীর ঘাটে লাগিল। অতি যত্নের সহিত আরোহীদিগকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। বাড়ীর মধ্যে হাসির লহর ছুটিল, আনন্দের ফোয়ারা খুলিল! বড় ধুমধাম! ও গ্রামের জমীদার পুত্র বিপিনও আসিয়াছে!

সুশীল নির্ণিমেষনেত্রে সকলই দেখিল, চুপ করিয়া জমিদার বাড়ীর আনন্দের কোলাহল শুনিল। তার পর সে বাড়ীর দিকে ফিরিতেছিল, পথে অমলার দাসী আসিয়া তাহাকে বলিল, অমলা তাহাকে এই চিঠি দিয়াছে, এখনই উহার উত্তর চাহিয়াছে। সুশীল স্পন্দিত হৃদয়ে চিঠিখানি পড়িল। তাহা হইলে সত্যই অমলা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে! বড় মিষ্ট কথায় তাহাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছে; লিখিয়াছে সে যেন নিশ্চয়ই যায়; পত্রবাহকের হাতে উত্তর দিয়া দেয়।

একটা অসম্ভাবিত ও অচিন্ত্য আনন্দে সুশীলের মনঃপ্রাণ

পূর্ণ হইয়া গেল। সে দাসীর হস্তে উত্তর লিখিয়া দিল যে, সে নিশ্চয়ই যাইবে, একটু সকাল সকাল করিয়াই যাইবে। আনন্দের আতিশয্যে সুনীল অমলার দাসীকে এই সংবাদের জন্য একখানি পাঁচ টাকার নোট বকশিস্ দিয়া ফেলিল।

ক্রমশঃ

সমর্পণ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

যখন তোমায় পাইনি আমার ঘরে,
আমি ছিলেম ডুব দিয়ে মোর স্বপন-সরোবরে!
ঘুমের গাঢ় চুমোর মাঝে রাত্রি আমার ফুরিয়ে যেত, রাণী;
শিশির-ধোওয়া আসত প্রভাতখানি,
হাস্য-নত তরুণ দিবার প্রথম প্রণাম সম —
শান্ত শীতল স্নিগ্ধ অনুপম!
নিরালা মোর গৃহের দ্বারে নীরবে কর হানি'
উষার আলো বিলিয়ে যেত রঙীন লিপিখানি।
হিরণ-বরণ অরুণ-কিরণ-লেখা
আমার দ্বারে ছড়িয়ে আবীর—রাঙা সরম-রেখা—
নিঃসাড়ে তার চরণ ফেলে—মুখের 'পরে নু'য়ে
পালিয়ে যেত ঘুমন্ত মোর চোখ দুটিকে ছুঁয়ে!
সকাল-বেলার চপল বাতাস নিবিয়ে প্রদীপটীরে
অঙ্গে আমার ফুলের পরশ বুলিয়ে যেত ধীরে!
ভোরের আলোয় ভৈরবীতে উঠত বেজে সুর,—
আমার হৃদয়-পুর
উতল হ'ত নূতন প্রাণের পুলক লেগে নিতি—
বিশ্বে যেন বিলিয়ে দিতে ব্যাকুল বুকের প্রীতি!
জীবনে তার সবার তরেই উঠত জেগে মায়া!
পথের বাঁকে হঠাৎ কোনো জ্যোতির্ম্ময়ীর ছায়া
প'ড়ত যদি তরুণ মনের অমল-ধবল-পটে!
ছন্দ-গীতের আনন্দময় মধুর ছায়ানটে
জাগিয়ে দিত জীবন-বীণায় রাগ-রাগিণী তার—
মর্ম্ম মাঝে মুখর মীড়ের মূর্চ্ছনা ঝঙ্কার!

কিশোর কবির তূলির লিখন-পাতে—
কাব্য-কলার আলপনা আর রঙীন কল্পনাতে
কাটত আধেক রাত!
স্বপন রচি' আপন মনে আপনি হ'ত মাৎ!

* * * *

এমনি ক'রেই নিরুদ্দেশে কাট্‌ছিল তার দিন;
যৌবনেরও জোয়ার ক্রমে হ'চ্ছে যখন ক্ষীণ,
হঠাৎ তুমি বধূর বেশে উদয় হ'লে বালা,
দু'লিয়ে দিলে কণ্ঠে যে তার প্রিয়ার বরণ-মালা,
বাঁধলে মিলন-ডোরে,
মুক্ত ছিল যে পাখী তার সুখের স্বপন-ঘোরে
পড়ল সে আজ ধরা।
ওগো স্বয়ম্বরা!
তোমার সোহাগ-শৃঙ্খলে আজ বন্দী যে তার মন,
তাই ত অনুক্ষণ—
লুটিয়ে আছে তোমার পায়ে— নিত্য অনুগত;
নিচ্ছে মেনে নির্ব্বিচারে ক্রীতদাসের মতো'
তোমার শাসন-দণ্ড-বিধির অখণ্ড সব ধারা!
তোমায় পেয়ে চিত্ত যে তার মত্ত আত্ম-হারা—
সব গিয়েছে ভুলে।
লুকিয়েছে তার অসীম আকাশ তোমার কালো চুলে,
নিখিল ভুবন মিলিয়ে গেছে রাঙা চরণ-মূলে!
আজকে সে আর চায় না কিছুই—চায় না কারো মুখে,
তোমার মাঝেই তলিয়ে আছে নিবিড় অতল সুখে!
তোমার সাথেই মিলেছে তার জীবন ইতিহাস;
পূর্ণ প্রাণের আশ!
আজকে যে তার প্রতিক্ষণের পরিচালক তুমি,
সর্ব্বহারার হৃদয় জুড়ে তোমার রাজ্যভূমি!
সব কিছু তার ভার
তোমার হাতেই ত্যাগ ক'রে সই মান্‌লে সে আজ হার;
বিলিয়ে দিলে আপনাকে সে তোমার অধিকারে,
যুগে-যুগে জন্মে-জন্মে কালাকালের পারে!

সনাতনী

(গল্প)

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

প্রথম পরিচ্ছেদ

(১)

বাজারের ঝোলাটা নামাইয়া রাখিতেই রান্নাঘর হইতে বৌদিদি হেমাঙ্গিনী বলিয়া উঠিলেন,—"ঠাকুরপো, চট্ ক'রে দৈ-মিষ্টিটা এনে দাও তো; তোমার দাদার চান হ'য়ে গেছে।"

ঘর্ম্মাক্ত মুখখানা মুছিতে মুছিতে সুকুমার একবার বলিবার চেষ্টা করিল—"কেন, বোঘো…?"

মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল; হেমাঙ্গিনীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ঝাজিয়া উঠিল—"রোঘো খোকাকে নিয়ে রয়েছে! একটা কাজ বল্লে তার সাতশো কৈফেত্ দিতে হবে; আমারও যেমন হয়েছে পোড়া কপাল……"

ইহার পর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সুকুমার বাহির হইয়া গেল।

(২)

তাহার প্রতি বিধাতার দেওয়া অনেকগুলি আশীর্ব্বাদের মধ্যে সব থেকে বড় ছিল—তাহার অপরিসীম সহন-শক্তি! তাহারই আশ্রয়ে সুকুমার তাহার স্নেহ-হীন জীবনের রুক্ষ দিনগুলা অতিবাহিত করিতেছিল।

বৌদিদি প্রত্যহ তিনবার করিয়া মুখ ঘুরাইয়া বলেন—"বুড়ো মদ্দ, কাজ করবার খ্যামতা নেই; খালি ভেয়ের পয়সায় এল-এ, বি-এ পাশই দিচ্ছেন…"

বাজারের জিনিস-পত্র নামাইয়া রাখিয়া সুকুমার তাহার ছোট্ট পড়িবার ঘরখানিতে গিয়া বসিল; অভিমান বা দুঃখ,—কোনটাই মনের মধ্যে সাড়া দিল না; মনে হইল—সংসারের ইহাই বোধ করি সনাতন-নিয়ম।

বৌদিদির তাড়ায় যে-সব কাগজ-পত্রগুলি তাড়াতাড়ি অগোছাল-ভাবে ছোট টেবিলটীর উপর রাখিয়া সে বাজার করিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সেগুলি ঘরের চারিদিকে ইতঃস্ততঃ ছড়ানো, বেশীর ভাগই ছেঁড়া; কতকগুলি রেণু পটলা-নিভার হাতে কাগজের নৌকা-টুপী-পাখীতে নবজন্ম লাভ করিয়াছে!

বৌদিদির কথায় বিশেষ কিছু হয় না, হয়—মাসিকের জন্য লেখা গল্পটী নষ্ট হওয়ায়! সমস্ত দুঃখ-বেদনা অবহেলা করিবার তার একমাত্র উপায় এই রচনা—আর নিজের থেকে প্রিয় জিনিস এই নূতন সৃষ্টির অপচয়ে তাহার সারা অন্তর মুচড়াইয়া উঠিল। ইহাও নূতন নহে; ইতঃপূর্ব্বে এ অভিজ্ঞতা সে আরও অনেক বার লাভ করিয়াছে! হেমাঙ্গিনীর উত্তর তাঁহার মুখাগ্রে—"আমি সারাদিন ছেলে-পুলে আগ্লেই বেড়াব না কি? ডান-হাতের ব্যবস্থা তা হ'লে করবে কে? কতকগুলো ছাই-পাঁশ কাগজ, সেগুলো কিই বা এমন দরকারী …!"

প্রয়োজনীয়তা তাঁকে বোঝানো অসম্ভব। সুকুমার মৌন-মুখেই তাহার ক্ষতিটুকু সহ্য করিয়া লইল। চুপ করিয়া থাকাই তাহার এখন অভ্যাস হইয়া গেছে!

(৩)

এত ব্যাঘাত, এত প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও কিন্তু কি জানি কেমন করিয়া সুকুমারের নাম সাহিত্য-জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

তাহার কাব্য এবং কথা-সাহিত্যে না কি জাতির বিশিষ্ট রূপটি অভিনব রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে! তাহা যে কি, এবং সে রূপই বা কেমন, তাহা সুকুমার নিজেই কিছুই জানিত না; মাসিক-সাপ্তাহিকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সে তাহার রচনা পাঠাইয়া দিত। অন্তরের

বেদনাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিবার জন্যই সে সাহিত্য-সাধনার নেশায় নিজেকে অনুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিত। অন্তর-জোড়া ব্যথার মধুচক্র ছাঁকিয়া সুকুমার তাহার গল্প কবিতায় যে রস পরিবেষণ করিত, নিজেদের অন্তরের সঙ্গে তাহার আস্বাদ মিলাইয়া লইয়া পাঠক-পাঠিকা ব্যথিত-বিস্ময়ে এই অপরিচিত তরুণ লেখককে একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

ছোট্ট ঘরখানিতে বসিয়া সুকুমার একমনে পড়িতেছিল। 'টেষ্ট' পরীক্ষার আর দিন কয়েক মাত্র বাকী! প্রিন্সিপাল বলিয়াছেন—"তোমার ওপর আমরা অনেক-খানি আশা রাখি...!" এই কথাটাই সম্মুখে রাখিয়া সুকুমার সহস্র বছর আগেকার রোমের অতীত গৌরব-কাহিনার মাঝে ডুবিয়া গিয়াছিল। ক্ষমতান্ধ 'পাত্রিসিয়' দিগের নির্ম্মম অত্যাচার এবং দুর্ব্বল 'প্লিবীয়'গণের দারুণ দুঃখে সে যখন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়ানোর শব্দে সুকুমারের ধ্যানের সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল; মুখ তুলিয়া দেখিল—একজন প্রৌঢ়া আর তাঁরই পিছনে একটি তরুণী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল; হেমাঙ্গিনীর কল-কণ্ঠও শোনা গেল।

একবার দেখিয়াই সুকুমার পুস্তকের পাতায় পুনরায় চক্ষু নিবদ্ধ করিল। এ বই-খানা সকালের মধ্যেই একবার শেষ করিতে হইবে; দুর্ব্বল প্লিবীয়-গণ কেমন করিয়া অকস্মাৎ প্রবলের বিরুদ্ধে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়ায়, প্রাচীন কালের এই শাশ্বত ইতিহাস তাহাকে বার বার মন্ত্র-মুগ্ধ করিয়াছে। সুকুমার আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু মানুষ যাহা চায়, তাহা যদি সকল সময়েই পাইত? নিভা আসিয়া ডাক দিল—"কাকা, মা ডাকচে; ওঠ শীগ্‌গির!"

মার আহ্বানে কাকাকে যে-কোন কাজ হইতে শীঘ্রই উঠিতে হয়- এ জ্ঞানটুকু বালিকা বহুদিন লাভ করিয়াছিল; না-ওঠার ফলাফল সে দেখিয়াছে কি না বহুবার!

সুকুমার প্রশ্ন করিল—"ও কারা এল যে, নিভা?"

নিভা তৎক্ষণাৎ বলিতে আরম্ভ করিল—"বা রে! তুমি জান না! আমার মাসিমা, আপনার নয় তা ব'লে; আর ছোট মতন যে, ও হ'চ্ছে মাসিমার আপনার বোন-ঝি! ওরা খুব বড়লোক, জান, কাকা; আমাদের চেয়েও......।"

শেষের ধারণাটাও বোধ করি মায়ের কাছ হইতেই পাওয়া।

উপরে উঠিতেই হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন;—"ঘরের ভেতর এসো, ঠাকুরপো,...এইটী হচ্ছে আমার দেওর, বড্ড ভাল ছেলে, আমার হাতেই মানুষ, দুটো পাশ দিয়েছে, আর একটা এই বার দেবে...।"

দু-জোড়া কৌতূহলী চোখের সম্মুখে সুকুমার মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী দেবরের সুখ্যাতি করিতে করিতে আঁচল হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া বলিলেন,—"আট আনার জলখাবার নিয়ে এসো তো, ঠাকুরপো। রোঘোটা যে থেকে থেকে কোথায় যায়, টিকি দেখ্‌বার জো থাকে না।"

বহুদিন পরে আজ প্রথম বৌদিদির হুকুমে সহসা সুকুমারের অপমান বোধ হইল। এ নূতন অনুভূতির কোন সঙ্গত হেতু সে কিন্তু খুঁজিয়া পাইল না। বোধ হয় অপরিচিতা তরুণীর সম্মুখে হীন প্রতিপন্ন হইবার জন্য দুর্জ্জয় অভিমান আসিয়াছিল।

হেমাঙ্গিনীর দিদি বলিলেন—"তোর দেওরটি, ভাই, বেশ! এই বার ওর একটি বে'-থা দে; আমরাও দু'দিন আমোদ-আহ্লাদ করি।"

নামটা শোনা অবধি তরুণী মনে মনে উৎসুক হইয়া উঠিতেছিল; জিজ্ঞাসা করিল—"সুকুমারবাবু কি কাগজে লেখেন-টেকেন, রাঙা-মাসিমা?"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—"খুব লেখেন! কত লোক রোজ ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে; কত কাগজ অমনি পায়! কাব্যি, গল্পের বই অনেক লিকেছে। ভায়ের খরচায় আছে, ভাবনা চিন্তে তো আর কিছু নেই!"...

টিপ্পনীর মধ্যে শ্লেষটুকু অতি বড় অমনোযোগী শ্রোতারও কান এড়াইল না; তরুণীর মুখের প্রদীপ্ত হাসিটুকু ম্লান হইয়া আসিল

(২)

জলযোগের আয়োজনকে পাশ কাটাইয়া সুজাতা উঠিয়া পড়িল—"যাই, সুকুমারবাবুর সঙ্গে পরিচয় ক'রে আসি তো ; এসো তো, নিভা।"

নিভাকে সঙ্গে লইয়া সুজাতা নীচে নামিয়া গেল।

এতক্ষণে দুই ভগিনীর মধ্যে সত্যকার আলাপ সুরু হইল।

"হাঁ দিদি, তোমার [illegible] কি বিয়ে-থা করবে না? বাবা, কি খিষ্টানী ধরণ!"

"কে জানে ভাই! যেমন বাপ ছিল, তেমনি মেয়ে হয়েছে! বাপ বল্‌ত—আমার মেয়ের যে দিন ইচ্ছে হবে বিয়ে কর্‌বে ; তার জন্যে অন্য পাঁচ-জনের মাথা ঘামাবার কি দরকার? মেয়েও তেমনি ; চোপর দিন ব'য়ে-মুখে হ'য়ে ব'সে আছে ; সংসারের কুটোটি যদি নাড়্‌বে!"

"হাঁগা, অমন সরু একগাছা ক'রে চুড়ি হাতে কেন? গয়না টয়না নেই বুঝি?"

"থাকবে না কেন! বাক্স-পোরা গয়না কাপড়। ছুঁড়ী ওই রকম শুধু হাতে, শাদা কাপড়ে থাক্‌বে ; কেউ কিছু বলে কার সাধ্যি! বাপ-মা কি আর কারুর মরে না ; তা ব'লে ২৪ ঘণ্টা ওই রকম খিষ্টান্‌-নী সেজে থাক্‌তে হবে!"

"আজকাল ওতেই হয় তো পুরুষের মন ভোলে।" হেমাঙ্গিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—"যা বলেছিস্‌ ; বেহায়ার একশেষ! নেহাৎ কাচ্ছাবাচ্ছাগুলো নিয়ে আশ্রয়ে আছি তাই কিছু বলি নে! হবে একদিন গোঁসাইদের নিরির মতন!"

গোঁসাই-পরিবারের মুখ-রোচক প্রসঙ্গ শেষ করিয়া হেমাঙ্গিনীর দিদি প্রশ্ন করিলেন—"দেওরটি কি তোরই গলায়?"

"আর বল কেন! যেমন পোড়াকপাল! কত দিন বলি—যা হয় একটা বন্দোবস্ত কর ; রোজই, আজ—নয় কাল, আজ—নয় কাল! গা জ্ব'লে যায় বাপু!"

"হাঁ, দরকার কি ঝক্কি পোয়াবার ; খরচও তো কম নয়।"

"কম আবার! হাতীর খোরাক চাই ; অগ্নি হয়।"

এইটুকুই বোধ করি বাঙ্গালী-সংসারের দৈনন্দিন জীবনের একমাত্র সত্যকার পরিচয়!

(২)

—"নমস্কার, সুকুমারবাবু···"

সহসা এক জন অপরিচিতা তরুণীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সুকুমার থতমত খাইয়া গেল। উত্তরে তাহার কোন কথা মুখে আসিল না ; প্রতিনমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুজাতা মৃদু হাসিয়া কহিল—

"—আপনি আমাকে চেনেন না ; কিন্তু আপনাকে শুধু আমি কেন, অনেকেই চেনে—অনেক দিনের

তাহার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ টুকু সুকুমার ধরিতে পারিল না ; নিঃশব্দ বিস্ময়ে নীরব হইয়াই রহিল।

সুজাতা বলিল—"আপনিই তো প্রখ্যাতনামা তরুণ লেখক—শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়?"

এতক্ষণে সুকুমার বুঝিল।

"ও, হাঁ, হাঁ।" সে হাসিয়া ফেলিল।

"আমি প্রথমটা ঠিক বুঝ্‌তে পারি নি ; মাপ করবেন।"

সুজাতা হাসিয়া বলিল—

—"অত বড় অপরাধ কিছুই নয়। সে যাক্‌, কিন্তু সম্প্রতি আপনার লেখা এত ক'মে গেল কেন বলুন তো? 'যুগবাণীতে' তো পরপর দু'মাস আপনার কোন লেখাই বেরোয় নি!"

—"কাজের মধ্যে হ'য়ে ওঠে নি ; পরীক্ষার তাড়ায়ও··· আপনি বসুন।"

ঘরের একমাত্র বসিবার আসন, ভাঙ্গা কেদারাখানি সুকুমার সুজাতার দিকে আগাইয়া দিল।

—"ধন্যবাদ।" সুজাতা কেদারার পিঠটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—

—"আপনি কোথাও যান-টান না বুঝি ; আপনাকে তো এর পূর্ব্বে কোথাও দেখি নি?"

সুকুমার বলিল—

—"না, আমি বড় একটা কোথাও যাই না—"

--"বিশ্বের আলো-হাওয়া নিয়ে আপনার কারবার—আপনাকে দেখে কিন্তু তা মোটেই মনে হয় না—"

সুজাতা হাসিয়া ফেলিল।

—"কিন্তু কি চমৎকার লেখেন আপনি! যেমন কবিতা, তেমনি গল্প! লেখার মধ্যে মানুষের মনের এতখানি নিবিড় পরিচয় দিতে খুব কম লেখকই পারেন।—এঃ! আপনি দেখ্‌ছি বড্ড লজ্জিত হ'য়ে পড়্‌ছেন;—আচ্ছা থাক তবে আপনার লেখার কথা!"

একে স্বভাবতঃই লাজুক, তায় অনভ্যস্ত, সুকুমার কোন রকমে জড়িতকণ্ঠে বলিল!—

—"আপনি বসুন।"

—"আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে না; আমার দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যাস আছে খুব।"

ঘরের চারিদিকে চাহিয়া সুজাতা বলিল,—

—"আপনার ঘরটি দেখলে বাস্তবিক লোভ হয় কিন্তু;—কত স্বপ্ন, কত কল্পনা, কত চরিত্রই না এর ভিতর সৃষ্টি হচ্ছে, প্রতিদিন!"

এবার অনেকটা সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া সুকুমার বলিল,—

—"এ ঘরের মধ্যে কি দেখলেন, আপনিই জানেন; কিন্তু কোন অতিথিকে এ ঘরে বসাতে আমার সত্যই লজ্জা করে!"

কথা কয়টির অন্তরালে অন্তরের নিগূঢ় বেদনা যেন আত্ম-প্রকাশ করিতে চাহিতেছিল।

সুজাতা তৎক্ষণাৎ বলিল,—

—"কিছুমাত্র লজ্জা পেতে হবে না আপনাকে। অতিথি যারা আস্‌বে, এ ঘরে দাঁড়াতে তারা নিজেকে ধন্য মনে করবে; তা যদি তারা না পারে, তা হ'লে মানুষ হিসাবে অনেক কিছুই তাদের এখনো শিখ্‌তে বাকী...!"

হয় তো শুধুই সাহিত্যের প্রতি সম্মান, অনুরাগ; তাহা সে যাহাই হোক, কথাগুলি সুকুমারের দুই কান ভরিয়া এক অশ্রুতপূর্ব্ব রাগিণীর সৃষ্টি করিল; এস্রাজের যে তারগুলি এতদিন ধরিয়া লাঞ্ছনা-অবহেলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, মরমীর কোমল স্পর্শে আজ তাহারা উন্মাদ ঝঙ্কারে গাহিয়া উঠিল!

আরও দু'চার কথার পর সুজাতা বলিল,—

—"কিন্তু আজ আর আপনাকে বেশীক্ষণ বিরক্ত ক'র্‌ব না; চল্লুম, নমস্কার!"

সুজাতা যেমন সহসা আসিয়াছিল, তেমনই সহসা চলিয়া গেল। রাখিয়া গেল—স্বচ্ছ সুন্দর হাসির রেশটুকু; ঘরের সকল অন্ধ-রন্ধ্র যেন তাহারই গানে মুখরিত হইয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে সুকুমার বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যানমুগ্ধের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। একটা নূতন অস্পষ্ট অনুভূতির মন্দ মধুর আনন্দ তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

সকাল-সন্ধ্যায় প্রত্যহ কথাটা উঠিতই, বেশীর ভাগই সুকুমারের দাদা শ্রীকুমারের আহারের সময়।

প্রতিবারেই শ্রীকুমার কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিতেন। ছোট ভাইয়ের প্রতি স্নেহ হয় তো কিছু ছিল; কিন্তু তাহাকে প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না; সংসারে তাহার অপেক্ষা বড় বস্তুর তো অভাব নাই!

সেদিনও নিয়মিত ভাবে কথাটা উত্থাপিত হইল; শ্রীকুমার তাড়াতাড়ি বলিলেন,—

—"সে তো নিশ্চয়ই; যা-হয় একটা কিছু করতে হবে বৈ কি; এমন ক'রে—সে তো বটেই—খরচ অনেক—"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন,—

—"হয় ওকে একটা পষ্টা-পষ্টি ব'লে দাও, না-হয় তোমাদের আপিসে যা হোক কুড়ি-পঁচিশ টাকায় বের ক'রে ফেলো; তবুও গোটাকতক টাকা সংসারে আসবে; সব দিক বুঝে কাজ করতে হবে তো;—দু'দুটো আইবুড়ো মেয়ে! মা সে দিন বলছিল—"

হেমাঙ্গিনী তাড়াতাড়ি কথাটা চাপিয়া গেল; উহা নেহাৎ অন্তরালের কথা—যখন-তখন প্রকাশ করা চলে না;—কাব্যে যাহাকে বলে—প্রেরণার মূল উৎস!

শ্রীকুমারের বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হইল না—

—"সে তো বটেই; খুবই সঙ্গত কথা; নিশ্চয়—"

উদ্দেশ্যে, কথার সঙ্গতি লইয়া অনেক কথাই বলা অভ্যাস হইয়া গেছে—আজ দশ বছর ধরিয়া; বাধে না।

আহার শেষ করিয়া জলের গেলাসটা তুলিয়া লইতেই হেমাঙ্গিনী হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন—

—"না না, এ-ক'টি ভাত আর ফেলে রাখলে চলবে না; খাটুতে যেতে হবে, এমন করলে শরীর থাকবে কেন! ঘাড় নাড়লে চলবে না, মাথা খাও—এ ভাত ক'টি খেতেই হবে!—"

স্নেহের অনুযোগে এই জবরদস্তিটুকুই বোধ করি বাঙালী-সংসারের একমাত্র সত্য বস্তু;—অনেকবিধ অত্যাচারের সহিত তাহাকেও সহ্য করিয়া চলা ছাড়া 'গতিরন্যথা' নাই!

(২)

দিন কয়েক পরের কথা। সুজাতা সে-দিন একাই আসিয়াছিল।

স্নিগ্ধহাস্যে মুখখানি রঞ্জিত করিয়া বলিল—

—"আজ কিন্তু আর কোন সঙ্কোচ মান্‌বো না; কবির সমস্ত পুঁথি-পত্র আজ প'ড়ে তবে যাব!"

বাক্যহীন সস্মিতমুখে সুকুমার চাহিয়া রহিল। এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে তাহার সারা অন্তর আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল! এই আন্তরিকতা! এতখানি দরদ! জীবনের এতগুলা দিন সে যাহা পাইয়া আসিয়াছে, তাহার তুলনায় ইহা যে স্বর্গের অমিয়-ধারা! ইহাও এ জগতে ছিল না কি? আশ্চর্য্য তো!

সুজাতা একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল—

—"আপনি হয় তো ভাবচেন, এটা আমার অত্যন্ত স্পর্দ্ধিত চাওয়া। তা হোক; যিনি আপনার সাহিত্য-নিকুঞ্জে প্রবেশ করবার সাত্যকারের অধিকারী হবেন, তাঁর কাছে না হয় আমার এ জবরদস্তিটুকু গল্পচ্ছলেই বলবেন; কিছু না পারি—খানিকটা হাসির খোরাক জোগাতে পারব তো—।"

সুকুমার সুজাতার কথার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না; চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিতান্ত অকারণেই যেন তাহার কথা বলিবার ইচ্ছাটা পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া তাহার অন্তরের অন্তঃস্তল হইতে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব পুলকের একটা মৃদু গুঞ্জন ভাসিয়া উঠিতেছিল; শীর্ণ রিক্ত বনভূমি বসন্তের মলয় স্পর্শে যেন আবার হিল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে!

সুজাতা ভাবিতেছিল, খাতার পাতায় চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া এই কণ্টকাকীর্ণ আবেষ্টনে, ওই লোকটি অহর্নিশি ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিতেছে, অথচ কেমন করিয়া তাহা উপেক্ষা করিয়া ও আজ এমন নিঃশব্দে সকল দুঃখ-লাঞ্ছনার উপরে চলিয়া গেছে?

সহসা সে বলিয়া উঠিল—

—"দেখুন, সুকুমারবাবু, জীবনের যে বাস্তব দুঃখময় দিক্‌টা নিয়ে আপনার সাহিত্য, আগে আগে মনে হ'ত আপনার নিতান্ত বাড়াবাড়ি, নিছক কল্পনা। আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে আমার সে ধারণা দূর হয়েছে ...।

কথাগুলার ভিতর নিজের পিতৃ-মাতৃহীন নিঃসঙ্গ জীবনের অনেকখানি ব্যথা উপচিয়া পড়িয়া শেষের দিকে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সহসা সুজাতার এই সজল কথায় সুকুমার বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল; কিছু একটা বলিবার জন্য তাহার মন উন্মুখ হইয়া উঠিল; কিন্তু সে ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। বাকপটু সুজাতাও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নীরব হইয়া রহিল।

অন্তরের ভাষা যখন আত্ম-প্রকাশের জন্য কলরোল করিয়া ওঠে, মুখের ভাষা বুঝি তখন এমনই করিয়া মূক হইয়া যায়। সেই ক্লেদ-কলুষহীন পরম মুহূর্ত্তে, ক্ষণেকের জন্য দুইটি স্নেহ-বঞ্চিত পীড়িত অন্তর অব্যক্ত সমব্যথায় পরস্পরের সান্নিধ্য অনুভব করিতে চায়।

স্বপ্নোত্থিতের মত সহসা সুজাতা বলিয়া উঠিল; —"আচ্ছা, সুকুমারবাবু, চল্লুম। নমস্কার।"

বিহ্বল কণ্ঠে সুকুমার বলিল—

—"নমস্কার! আবার কবে আসবেন?"

আধুনিক আদব-কায়দার প্রচলিত প্রথা অনুসারে কি বলা উচিত অনুচিত তাহা সে জানিত না; কিন্তু সুজাতা বুঝিল—অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণায় ওই সরল অনভিজ্ঞ লোকটীর নিকট হইতে যে প্রশ্ন আসিল তাহা কেবল উঁহারই মুখ দিয়া অমন করিয়া বাহির হইতে পারে। একবার থামিল; পরক্ষণেই মৃদুকণ্ঠে বলিল—

—"পারি তো আসচে বুধবার আবার আসব।"

মিষ্টি হাসিটুকু তখন তাহার মুখে ফিরিয়া আসিয়াছে।

(৩)

গাড়ি চলিয়া যাইতেই হেমাঙ্গিনী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—

—"কি গো ঠাকুরপো; কথা শেষ হ'ল! আমি বলি বুঝি, তোমরা আজ আর কেউ থামবে না। তোমার নতুন আলাপীটী কখন গেলেন?"

—"এই মাত্র। কি চমৎকার মেয়ে, বৌদি! এমন উচুদরের শিক্ষিতা সচরাচর দেখা যায় না!"

—"তাই না কি! ভাব-সাব হ'ল?"

শ্লেষ-পূর্ণ ইঙ্গিতটা একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল; সুকুমার পরমাগ্রহে বলিল—

—"হাঁ! বুধবার দিন আবার আসবেন ব'লে গেছেন। সে দিন কিন্তু জলটল খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে, বৌদি, আজ কিছু হ'ল না...।"

অধীর উৎসাহে এত কথা একসঙ্গে অল্প-ভাষী সুকুমার জীবনে বোধ করি আর কোন দিন বলে নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(১)

শ্রীকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—

—"টেষ্ট কবে থেকে আরম্ভ?"

সুকুমার বলিল. "পরশু থেকে।"

পিছন হইতে ঝঙ্কার শোনা গেল—

"—তা ব'লে পাঁচ মিনিটের জন্যে একটা জিনিস বাজার থেকে এনে দেওয়া যায় না? আমি কি দোকান যাব—তোমাদের মুখ পুড়িয়ে?"

"—আচ্ছা, আচ্ছা; যাবে তো বলেছে; ... ... হাঁ, ভাল কথা,—জমার দরুণ কত টাকা লাগবে?"

—"পঁচাশী টাকা।"

পিছন হইতে সখেদ-বিস্ময়ের একটা অস্ফুট ধ্বনি শোনা গেল। শ্রীকুমার তাহারই রেশ বজায় রাখিয়া বলিলেন— "পঁ-চা-শী!! তাই তো অনেকগুলো টাকা; কি যে করি! এই এদের গয়না গড়াতে কালই স্যাকরাকে আড়াই-শো টাকা দিতে হ'ল; আবার এক্ষুণি এত টাকা! পাই কোত্থেকে ...জেরবার হ'য়ে গেলুম!"

সুকুমারের মুখ দিয়া কোন দিনই কোন কথা বাহির হয় না, আজিও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না।

(২)

বুধবার ঘুরিয়া আসিল। সুকুমারের মনে হইল—যেন যুগান্তের পর!

সারা সকালটা সে কি যেন একটা কথা বলিবার জন্য বারবার হেমাঙ্গিনীর কাছে আসিতেছিল। কিন্তু তাহার পিছনে হেমাঙ্গিনীর ঠোঁটের কোণে সাপের জিবের মত যে হাসি খেলিয়া যাইতেছিল, তাহা দেখিতে পাইলে সুকুমার অপরাহ্ন বেলায় কখনও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না—

—"বৌদি, কই ওঁরা ত এলেন না!"

—"কারা ভাই? ভাল মানুষের মত হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন।

—"ওই যে ওঁরা ... সুজাতা, তাঁর মাসিমা ... আজকে তাঁদের আসবার কথা ছিল যে!"

নিতান্ত নিস্পৃহকণ্ঠে হেমাঙ্গিনী বলিলেন—

"—কি জানি ভাই; ওরা সব হ'ল—বড় মানুষ লোক; ওদের কথা ছেড়ে দাও! ব'লে পাঠিয়েছে—আমার দেওর না কি ভারী অসভ্য; একটুও ভদ্রতা জানে না—এমনি সব কত কটু কথা! তাই ওরা আর আমার বাড়ী আসবে না ...।"

হেমাঙ্গিনী একবার আড়চোখে সুকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সুকুমার বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া রহিল। দীন পূজারীর অনেক সাধের দীপ-রচনা অতর্কিত বায়ুবেগে নিঃশেষে নিবিয়া গেল! সুকুমারের চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে দিনের আলো নিবিয়া আসিতে লাগিল। একটা সূচী তীক্ষ্ণ ব্যথার তীব্র অনুভূতি তাহার অন্ধকার অন্তরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া গেল।

শ্রীকুমার ঘরে ঢুকিলেন—

—"সুকুমার; থাক থাক ব'স। তোমার সঙ্গে গোটাকয়েক দরকারী কথা আছে … ।"

—"বল, দাদা।"

—"হাঁ বলি।" কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া শ্রীকুমার বলিলেন—

—"দেখ্‌তেই তো পাচ্ছ, আমি একলা মানুষ; এত বড় বৃহৎ পরিবারের খরচ আর তো একলা চালিয়ে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। আর পারবই বা কোত্থেকে; জানই তো আয় আমার অতি সামান্য। তাই ঠিক করলুম— তা ছাড়া তোমার বৌদির মুখের দিকে একটু চাইতে হয়—ঠিক করলুম, তোমাকে আপিসে বের ক'রব। আমাদের ওখানে একাউন্ট্‌স্‌ ডিপার্টমেণ্টে একটী কাজ খালি হয়েছে; হাতে পায়ে ধ'রে সাহেবকে রাজীও করিয়েছি। মনে করছি—তুমি ওই কাজে জয়েন কর। কোম্পানীর আপিস, টিঁকে থাক্‌তে পারলে আখেরে ভালই হবে। আশা করি, তোমার অমত নেই। যাহোক বি-এ-টা অবধি পড়া তো হ'ল…।"

সুকুমার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—"বেশ!"

(৩)

রাত্রে হেমাঙ্গিনী আশাতীত সাফল্য-গৌরবে হাসিমুখে স্বামীকে বলিলেন—

"—দেখ্‌লে তো; বলুম এই সময়! দেরী করলে কি আর রাজী হ'ত! বড় মানুষের মেয়েকে দেখে মজলেন; ভাবলেন—আমার হ'ল আর কি! পোড়াকপাল!"

শ্রীকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—

—"তাদের কি ব'লে পাঠালে?"

—"ব'লে পাঠালুম যে, সোমত্ত মেয়ে অমন রোজ-রোজ হুট্ হুট্ ক'রে আস্‌বার কি দরকার? আমাদের ভালো ছেলেটির মাথা খাওয়া?…"

শ্রীকুমারকে স্বীকার করিতেই হইল যে, পত্নীর এই সূক্ষ্ম চালটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা-বাদশার কূটতম বুদ্ধিকে প্র্যর্যন্ত ম্লান করিয়া দিয়াছে!

প্রফুল্ল

[শ্রীপ্রকাশচন্দ্র গুপ্ত]

শোচনীয়তার দিক দিয়া দেখিতে গেলে রামায়ণের সীতা-বিসর্জ্জন ব্যাপারটা যত বড় ঘটনা লক্ষ্মণ-বর্জ্জন ঘটনাটীও তাহা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। সেইজন্যই, যে কবি রামায়ণ হইতে 'সীতার বনবাসের' নাটকীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণবর্জ্জনের শোকাবহ দৃশ্যের নাটকীয় উপকরণও সেই কবি রামায়ণের ভিতরেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ভালবাসা বা প্রেম বস্তুটা, মাতাপিতারই হউক্ বা ভ্রাতাভগিনীরই হউক, যাহারই হউক না কেন, প্রকৃত কবি-হৃদয় যেখানেই উহার সন্ধান পাইয়াছে, সেখান হইতেই মধুসংগ্রহ করিয়া মধুচক্র রচনা করিয়াছে। কাব্য লিখিতে গেলেই কেবল যে নায়ক-নায়িকার প্রেম লইয়াই নাড়াচাড়া করিতে হইবে, রসশাস্ত্রে এমন কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম-কানুন নাই।

অন্য দেশে ভাই-ভাইয়ের মিলন-বিচ্ছেদ লইয়া কোন বড় কাব্য লিখিত হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষের হৃৎপদ্মসম্ভূত দুইটী মহাকাব্যেই ভাই-ভাইয়েরই মিলন-বিচ্ছেদের কাহিনী সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ একবার লিখিয়াছেন—"এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহু দুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের বেহারা সাত টাকা বেতনের তিন টাকা পেটে খাইয়া চার টাকা বাড়ী

পাঠাইতেছে, পনেরো টাকা বেতনের মুহুরী নিজে আধমরা হইয়া ছোট ভাইকে কলেজে পড়াইতেছে—সে কেবল, আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে।" বাস্তবিক ভারতবর্ষীয় সমাজ-ব্যবস্থানের এমন একটা অনন্য-সাধারণ গুণ আছে, যাহা নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই, পরিবারভুক্ত সর্ব্বজনের ভিতরেই ভক্তি-প্রীতি ও মধুর রসের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে নানা বিচিত্র ভাবে পরিস্ফুট হইবার সুযোগ দিয়া থাকে।

ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শটা যে কত বড় আদর্শ,—এক বিপরীতমুখী সভ্যতার সংঘর্ষের ফলে, তাহা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের দেশের কবি, যখন তাঁহার স্বদেশবাসীকে দেশভক্ত হইতে বলেন, তখন ঐ ভাবেই বলেন—"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, হের দেশবাসিগণে,—" অন্য কোন ভাবে নহে। প্রকৃত কথা হইতেছে দেশাত্মবোধ বা বিশ্বাত্মবোধকে এ দেশের লোকেরা পারিবারিক ভ্রাতৃত্ববোধেরই ক্রম-পরিণতি বলিয়া মনে করিয়া থাকে। অত্যুৎকট স্বার্থের আকর্ষণেই আমাদের সেই পারিবারিক প্রীতিবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। কাজেই, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের সংসারে যে কত বড় একটা ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করে, তাহা অনুভব করিবার মতও শক্তি আমরা ক্রমশঃই হারাইয়া ফেলিতেছি। দেশবন্ধু যথার্থই বলিয়াছিলেন—'এখন ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বৎসরে একবার সাক্ষাৎ হয় না! খুড়া, ভাইপো, ভাইঝি, Cousin হইয়াছে—পরিবারের সে সুখ নাই, শান্তি নাই, আনন্দ নাই।'

সমস্ত জাতির যখন এমন একটা সঙ্কটাপন্ন অবস্থা উপস্থিত, তখন জাতীয় কবির বিরাট্-হৃদয় তাহা দেখিয়া বিচলিত না হইয়া কি থাকিতে পারে? "প্রফুল্ল" নাটক সেই বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ কবি-হৃদয়েরই এক অপরূপ সৃষ্টি। যত দিন বাঙ্গালীজাতির হৃদয়ে ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের স্বাভাবিক মমত্ববোধের কণামাত্রও অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিন এ নাটক বাঙ্গালীর কাছে পুরাতন হইতে পারে না।

ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় দুইখানি মাত্র অনুপম নাট্যকাব্য রচিত হইয়াছে, অথচ বাঙ্গালী সমালোচক ইতিমধ্যেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ঐ দুইখানি কাব্যের কোন আবেদনেরই না কি এখন আর প্রয়োজন নাই। ইহা সত্য হইলে, ঐ দুইখানি নাটকের তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না; কিন্তু এই সকল উক্তি হইতে ব্যক্তি বিশেষের যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সত্য সত্যই ভয়াবহ! অনবরত কাম-কাহিনীর রোমন্থন করিয়া যাও, তাহাতে বাঙ্গালী সমালোচকের লেশমাত্র অরুচি বোধ হয় না, তাহার ভিতর হইতে কত নূতন সমস্যাই না প্রতিনিয়ত গজাইয়া উঠিতে থাকে, অথচ যে সমস্যা যথার্থই আমাদের জাতির পক্ষে একটা জীবন-মরণ সমস্যা, কবিচিত্ত যদি তাহাতে ব্যথিত ও উদ্বেলিত হইয়া কাব্যের আকারে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে, তবে বিস্ময়ের বিষয়, আধুনিক বাঙ্গালী সমালোচকের মনকে তাহা আকৃষ্ট করিতে পারে না।

'স্বর্ণলতা' উপন্যাস অথবা উহার নাট্য-বিগ্রহ 'সরলা' নাটকে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা খুব করুণ হইলেও তাহার ভিতরে সে গভীরতা নাই, যাহা 'প্রফুল্ল' নাটকে পাওয়া যায়। আমাদের সংসারে ভাই ভাইতে যে বিরোধ ঘনাইয়া ওঠে, তাহার মূলে বধূগণই যে বিরাজ করেন, 'সরলা' নাটক পড়িয়া মনে এই রকমই একটা ধারণা জন্মে।—অর্থাৎ বাঙ্গালীর ঘরের বধূগণ 'প্রমদা' না হইয়া 'সরলার' মত আদর্শ বধূ হইলেই যেন বাঙ্গালার গৃহ-পরিবারে আর বিবাদ-বিসংবাদের নাম-গন্ধ থাকিবে না—'সরলা' নাটকের ভাবগতিক যেন অনেকটা এই ধরণের বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু মাতা যেখানে ধর্ম্ম-পরায়ণা ও বধূদিগের প্রতি স্নেহশীলা, পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা যেখানে ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্রের মতই আদর্শ ভ্রাতা বলিলেও চলে, বধূগণ যেখানে অন্নপূর্ণা ও লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, এমন যে সোনার সংসার, সেখানে সহসা নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠে কেন?—উচ্চশিক্ষিত উকীল রমেশচন্দ্র কেন তাহার প্রতিপালক বড় ভাইকে পথের কাঙাল করিয়াও তৃপ্ত হয় নাই, ছোট ভাইকে জেলে পাঠাইয়াও ক্ষান্ত থাকে নাই, এবং বংশের প্রদীপ ভাইপোকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই?—মাতা উন্মাদ হইয়া গেল, বড় ভাজের অপঘাত মৃত্যু ঘটিল, এবং স্ত্রী জীবন্মৃতা হইয়া রহিল—রমেশের তো চৈতন্য হইল না? রাবণ ও বিভীষণের ভ্রাতৃবিচ্ছেদের একটা

কারণ আছে—মতবৈষম্য, সুগ্রীব ও বালীর ভ্রাতৃ-বিরোধেরও একটা কারণ আছে—পৈতৃক রাজসিংহাসন। কিন্তু ইহার কোনটাই তো রমেশের পক্ষে খাটে না?

আসল কথা, কুমন্ত্রণাই, হউক, মতবৈষম্যই হউক, আর বিষয়-সম্পত্তিই হউক—ইহার কোনটাই মানুষে-মানুষে প্রকৃত বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না। উন্মত্ত লোভ হইতে যে স্বার্থপরতার উদ্ভব হয়, যাহা দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতাকে ভাবপ্রবণতা বলিয়া উপহাস করে, যাহা নিজের শুষ্ক কঠোর ও অপরিণত বুদ্ধিবৃত্তিকেই একমাত্র ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, মানুষের সেই নির্ম্মম স্বার্থপরতার উষ্ণ নিঃশ্বাসেই মানুষের সোনার সংসার ছারখার হইয়া যায়। মানুষের সাজান বাগান শুকাইয়া যায়! 'প্রফুল্ল'—সেই নির্ম্মম স্বার্থপরতারই এক অতি উজ্জ্বল চিত্র।—এবং এই-জন্যই উহা সরলা অপেক্ষাও অধিকতর গভীর এবং অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী। ইহা ছাড়াও 'সরলা' হইতে 'প্রফুল্ল'র আরও কয়েকটী বিষয়েও বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 'সরলার' ভ্রাতৃবিচ্ছেদের ফলে, অ-সাংসারিক বিধুভূষণ রীতিমত কর্ম্মঠ হইয়া উঠিল। আর "প্রফুল্ল" নাটকের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, "উদ্যোগী পুরুষসিংহ" যোগেশচন্দ্রকেও একেবারে কঠোর অদৃষ্টবাদী করিয়া ফেলিল! 'সরলা' নাটকের সরলা অশেষ দুঃখযন্ত্রণার ভিতরেও স্বামীর স্নেহ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। উহাই ছিল তাহার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা—আর প্রফুল্ল?—তাহার জন্য ঐ দিকটার কবাট একেবারে আজীবন রুদ্ধ হইয়া রহিল। কাজেই বলিতে হয় "প্রফুল্ল" নাটকখানি ট্র্যাজেডির দিক দিয়া "সরলা" অপেক্ষাও বড় ট্র্যাজেডি, আর সেইজন্যই প্রফুল্ল নাটকের অন্তর্নিহিত সুর, নিবিড়তর ভাবে হৃদয়স্পর্শী!

সুখ-স্বচ্ছন্দের অন্তরালে, সংসারে অনেক কিছুই গোপন থাকিয়া যায়। কিন্তু একবার কোন কারণে যদি উহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে মানব-মনের যে স্বার্থ-পরতার বীভৎস কুৎসিত নগ্নমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে শিহরিয়া উঠিতে হয়। কুৎসিত মানুষের অদৃষ্ট দেবতা মাঝে মাঝে স্বাচ্ছন্দ্যের ঐ স্থূল আবরণটুকু উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া, মানুষের হৃদয় লইয়া অতি নিষ্ঠুর রহস্য-অভিনয় করিয়া থাকেন। যোগেশ-চন্দ্রের পারিবারিক রঙ্গমঞ্চে এমনই একটা দৈবদুর্ঘটনা কতকগুলি একান্ত নিশ্চিন্ত মধুর জীবনকে একেবারে ছন্নছাড়া করিয়া দিল। বস্তুতঃ, ব্যাঙ্ক্ যদি ফেল্ না হইয়া যাইত, কে বলিতে পারে, রমেশচরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ হয় তো শেষ পর্য্যন্ত লোকলোচনের অগোচরেই রহিয়া যাইত। শুধু রমেশেরই বা কেন, কোন চরিত্রটীই মনে হয়, স্ব স্বরূপে বিকসিত হইবার অবকাশ পাইত না। এক প্রকার নিরবলম্ব বিশেষত্বহীন জীবনযাত্রার মধ্য দিয়া, অন্য পাঁচটা বাঙ্গালী সংসারের মতই যোগেশচন্দ্রের পারিবারিক-জীবন হয় তো অতিবাহিত হইয়া যাইত। তীর্থ-যাত্রী যে জননী একবার বলিয়াছিলেন—"আমার আর কিছু সাধ নেই, বাবা, যারা ধারে, তাদের যদি ঋণে মুক্তি দিয়ে যেতে পারি, এইটি আমার ইচ্ছে, শুনেছি বাবা, দেনা দিতেও আস্‌তে হয়, পাওনা নিতেও আস্‌তে হয়!" —অবস্থার ফেরে পড়িয়া তিনিই পরে "ছেলেটা-পুলেটা" হওয়ার অজুহাত দেখাইয়া রমেশের অসৎপ্রস্তাবে সম্মত হইতে যোগেশকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। অবস্থার ফেরে পড়িয়াই পরম-বিষয়ী যোগেশচন্দ্রকে বলিতে হইয়াছিল—"চেষ্টায় ব্যাঙ্ক্ ফেল্ হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না।" চির-আবর্ত্তনশীল অবস্থাচক্রই অকপট-হৃদয়া প্রফুল্লর মনেও একদিন এই প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিয়াছিল—"মা আমায় কি ব'লে দিয়েছেন—স্বামীর কথা কি করে শুন্‌বো—মিথ্যা-কথা কি ক'রে শুনব—" ঐ অবস্থাচক্রই আবার অন্য আর এক দিন তাহার মুখ দিয়া বলাইয়া লইয়াছিল—"দিদি, এখন আমি মিছে কথা শিখেছি।" বস্তুতঃ, অবস্থার ফেরে পড়িয়া যে কত বিচিত্র রকমের "বিষম-সমস্যার" সম্মুখীন হইতে হয়, 'প্রফুল্ল' নাটক তাহারই একটী জীবন্ত আলেখ্য।

শুধু যদি মদ্যপানের অপকারিতা দেখানই—'প্রফুল্ল' নাটকের উদ্দেশ্য হইত, তাহা সেজন্য এতবড় একটা শোকাবহ ঘটনাবহুল নাটকের সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন ছিল না—একটা প্রহসন লিখিলেই চলিতে পারিত। যোগেশের মদ্যপান মুখ্যতঃ এ নাটকের কোন 'ট্র্যাজেডি'ই সৃষ্টি করে নাই, মদ শুধু আনুষঙ্গিক উপলক্ষ্য মাত্র। রমেশের বিশ্বাসঘাতকতা হইতে যে 'ট্র্যাজেডির' উৎপত্তি হইল, ধরিতে গেলে তাহাই

ক্রমশঃ একটার পর একটা করিয়া করুণ ও হৃদয়বিদারক দৃশ্যের মধ্য দিয়া চরম পরিণতি লাভ করিল। ব্যাঙ্ক্ ফেল হওয়া একটা 'ট্র্যাজেডি' নহে, ঐ ঘটনাটীকে একটা 'ট্র্যাজেডি' মনে করাইবার যে চেষ্টা সেইখান হইতেই সকল 'ট্র্যাজেডির' সূত্রপাত। "মা আমায় চান্ না—বিষয় চান্; পরিবার আমায় দেখেন না—বিষয় দেখেন; ভাই আমার দেখেন না—বিষয় বাগিয়ে নেন্। বাঃ কি সুখের সংসার!"—যোগেশের এই মর্ম্মান্তিক কথাগুলিই আসন্ন ভাবী অমঙ্গলের যেন ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে। সুরেশের চোর হওয়া, সপরিবারে যোগেশের পথে দাঁড়ান, জ্ঞানদার মৃত্যু, যাদবকে হত্যা করিবার চেষ্টা, প্রফুল্লর মৃত্যু, এবং মাতাল অবস্থায় যোগেশের যে হৃদয়-দ্বন্দ্ব এ সমস্তই ঐ মূল 'ট্র্যাজেডি'রই ক্রমিক অভিব্যক্তি।—শুধু ইহাই নহে রমেশের জীবনও যে একটা বড় 'ট্র্যাজেডি' নাটকের যবনিকা-পাতের কিছু পূর্ব্বে প্রফুল্লর মুখেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে—"তুমি বড় অভাগা, সংসারে কারুকে কখন আপনার কর নি!" বাস্তবিক, 'প্রফুল্ল' নাটকের মত এত বড় একটা জমাটবাঁধা বিয়োগান্ত নাটকের অন্তর্নিহিত রসবস্তুকে যাঁহারা "মদ্য নিবারণী সভার" প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে এক করিয়া ফেলেন, তাঁহাদের রসগ্রাহীতা কেবল হাস্যোদ্রেকই করিয়া থাকে।

মানুষের সরল ও স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি যদি প্রতিহত না হইয়া যায়, যদি তাহা সর্ব্বপ্রকার কৃত্রিম ও অকৃত্রিম বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া সহজভাবে বিকাশের পথে অগ্রসর হয়, তবে এই দুঃখকষ্টের সংসারেও বহু অকল্যাণ—অনেক অমঙ্গল নিবারিত হইতে পারে। প্রফুল্লর জীবন এ-কথারই একটী উজ্জ্বল উদাহরণ। ধর্ম্মবুদ্ধি—উমাসুন্দরীরও ছিল, যোগেশেরও ছিল, জ্ঞানদারও ছিল। কিন্তু পুত্রস্নেহাতুরা জননী, ধৈর্য্যহারা যোগেশ এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া জ্ঞানদা, স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ধর্ম্মের ঋজুপথ অনুসরণ করিয়া ইঁহারা কেহই চলেন নাই। অটল বিশ্বাস, অকপট হৃদয় এবং সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত সহনশীলতা থাকিলে তবেই ধর্ম্মপথে মানুষ আজীবন অবিচলিত থাকিতে পারে। যোগেশ চরিত্রের প্রধান ত্রুটী ঐ ধৈর্য্যগুণের অভাব। তাই, যে যোগেশ একবার বলিয়াছিলেন, "যিনি অধর্ম্মে মতি দেবেন, তিনি মাই হোন্, আর বাপ্ই হোন্, তাঁর কথা শুন্‌তে নেই"। হৃতধৈর্য্য সেই যোগেশই আবার নিদারুণভাবে নিয়তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। কিন্তু প্রফুল্ল-চরিত্র অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাইব, ধর্ম্মসম্বন্ধে—কর্ত্তব্যসম্বন্ধে, তাহার চরিত্রে কোথাও এতটুকু দ্বিধা নাই। স্বামীভক্তির সুযোগ লইয়া স্বামী দুর্ব্বুদ্ধির প্ররোচনা দিতেছে, প্রফুল্লর জবাব অতি স্পষ্ট এবং করুণ—"আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও।" বেচারা পতিনিন্দা শুনিতে চাহে না, অথচ পতির কথায় সংশয় যখন জাগিয়া উঠিল, তখন স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল, "—মা আমায় কি ব'লে দিয়েছেন—স্বামীর কথা কি ক'রে শুন্‌বো—মিথ্যা কথা কি ক'রে শুন্‌বো!" ভক্তি-প্রীতি-স্নেহ-মায়া-মমতা প্রভৃতি জলাঞ্জলি দিয়া নহে, উহাদিগকে আপন জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশাইয়া লইয়া; ধর্ম্মাচরণে এই যে অনাড়ম্বর নিষ্ঠা—ইহাই রমেশের মত রাক্ষসের হাত হইতে যাদবকে বাঁচাইবার সময়ে প্রফুল্লর মুখ দিয়া বলাইয়াছিল—"আমি ধর্ম্মকে চিরদিন আশ্রয় করেছি, ধর্ম্মকে ভয় করেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই।" বাস্তবিক, এই দিক দিয়া যদি প্রফুল্ল নাটকখানিকে ধর্ম্মের জয়-প্রচারকারী নাটক বলা যায়, তবে তাহা দোষের হয় না, গুণেরই হইয়া থাকে। ধর্ম্মের জয় দেখাইতে গিয়া নাটকের স্বাভাবিকতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই—ধর্ম্ম আপন মহিমায় আপনিই মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, সাংসারিক লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ খতাইয়া লইয়া ধর্ম্মভাবের জয়-পরাজয় নির্ণয় করা চলে না।

'প্রফুল্ল' নাটকের স্রষ্টা যিনি, তাঁহার অঙ্কিত সংসার-চিত্রে নিরবচ্ছিন্ন বীভৎস দৃশ্য কোথাও দেখা যায় না। সংসারে রমেশের মতও ভাই আছে, যোগেশ-সুরেশের মতও ভাই আছে; কাঙ্গালীচরণ-জগমণিও আছে, পীতাম্বর, শিবনাথ ও ভজহরি আছে। কাজেই, অন্যায় ও অধর্ম্মের স্রোত যদি অনন্তকাল ধরিয়া কোথাও অবাধে বহিতে না পারিয়া থাকে, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। নিরপরাধের উপর, সংসার ও সমাজের কেবল নির্ম্মম ও নিরবচ্ছিন্ন নিষ্পেষণ দেখাইতে পারিলেই যে তাহা সংসারের সত্যকার ছবি হইয়া উঠিবে, এমন কথা শুধু কেবল গায়ের জোরেই বলা চলে। নিপুণ চিত্রকরের হাতে

পড়িয়া ঐ জাতীয় দৃশ্য হয় তো আপাতমনোরম ভাবে অতি সহজে পাঠক সাধারণের মনোহরণ করিয়া লইয়া তাহার সাধারণ বিচারশক্তি লোপ করিয়া দিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি, ভগবানের প্রতি, এবং মানুষের প্রতি মানুষের যে সরল প্রীতিবিশ্বাস সে প্রীতিবিশ্বাসের যোগ-বন্ধন তাহা সুদৃঢ়তর করিয়া দিতে পারে না। কাজেই 'প্রফুল্ল' নাটকে রমেশের কীর্ত্তিকলাপের যদি একটা সীমা-রেখা বা পরিসমাপ্তি দেখা না হইয়া থাকে এবং ফলে যদি কোন একদল পাঠকের রুচিকে তাহা পীড়া দিয়াই থাকে, তবে সেজন্য দায়ী 'প্রফুল্ল'র নাট্যকার নহেন, সেজন্য দায়ী ঐ শ্রেণীর পাঠকের একদেশদর্শী মনোবৃত্তি

প্রতারিত করিবার প্রবৃত্তি কেবল প্রতারিত হইয়াই হয় না। দুর্দ্দমনীয় লোভ-রিপু হইতেই উহার উৎপত্তি। জীবনে যাহারা প্রতারণা করিয়াই জয়ী হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের চিত্তের অনেক সুকুমার বৃত্তিই বিকসিত হইবার অবসর পায় না। রমেশ, জগমণি ও কাঙ্গালীচরণ এই জাতীয় চরিত্রেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বার্থ সাধনের জন্য ইহারা মাতার পুত্রবাৎসল্যকে, ভ্রাতার ভ্রাতৃস্নেহকে, পত্নীর পাতিব্রত্যকে, এবং মানুষের ধর্ম্ম ও নীতি-বোধকে ইচ্ছামত আপনাদের কাজে খাটাইয়া লয়। ইহারা শুধু সোনার সংসারই ছারখার করিয়া দেয় না, সুবিধা এবং সুযোগ পাইলে, রঙ-বেরঙের মুখোস পরিয়া ইহারা দেশ এবং জাতিকে যে সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়, চোখ মেলিয়া চাহিলেই তাহা সকলেই ধরিয়া ফেলিতে পারেন। মানুষের গড়া জেলখানা ইহাদের উপযুক্ত স্থান নহে, কারণ সুরেশের কথায় বলিতে গেলে আজও ইহাদের জন্য "উপযুক্ত জেল ত'য়ের হয়নি" ইহাদের চরিত্রের নির্ম্মমতা দেখিয়া কবির প্রতি বিরূপ হইলেই যথার্থ সহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হইবে না, প্রফুল্লর ভাষায় যদি বলিতে পারি—তোমরা বড় অভাগা, 'সংসারে কারুকে কখন আপনার কর নি', অথবা ভজহরির মত চোখের জল ফেলিতে পারি,—"মামাবাবু, মামীমা, রমেশবাবু, দেখ আমি যদি জজ হ'তেম, তোমাদের মাপ করতেম, তোমরা যথার্থই অভাগা", মনে করি ইহাদের প্রতি যথার্থ সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

সংসারে বাস্তবঃ যাহাকে যেমন ভাবে দেখা যায় সেই রূপই তাহার নিজস্ব রূপ নয়, তাহাই তাহার সম্পূর্ণ পরিচায়ক নয়। যে মাতাল যোগেশ এক ভাঁড় মদের জন্য 'ওহে, একটা পয়সা দেও না' বলিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে, স্ত্রীকে লাথি মারিয়া তাহার হাত হইতে শেষ সম্বলটুকু ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে, শুধু বাহির হইতে দেখিলে হয় তো তাহাকে লোকে বলিবে—"দেখ, মদে লোকটার কি অধঃপতনই না হইয়া গেল!" কিন্তু ইহাই তো যোগেশ চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় হইল না! সুরেশ ও শিবনাথের প্রকৃত স্বরূপটীতে 'বিদ্যাধরী'র সঙ্গে ইয়ারকি-মস্‌করার সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না! ভজহরির ভিতর-কার মানুষটী তো, রমেশের কাছ হইতে ঘুস্ লইতে রাজি হইবার সময়ে ধরা পড়ে না! কবি ইহাদের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া না দিলে, ইহারা হয় তো সমাজের কাছে আজীবন উপেক্ষিতই রহিয়া যাইত! যোগেশ কি কেবল অনুভূতি-শূন্য মাতাল?—সুরেশ, শিবনাথ ও ভজহরি কি কেবল বখাটের দল?—মদন-দা' কি কেবল পাগল?

শুধু বর্ত্তমানেই মানব-জীবনের সকল সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যায় না। পট উঠিবার পরই, ঘোষ-পরিবারের গৃহপ্রাঙ্গণের স্নিগ্ধ মধুর যে ছবিখানি আমাদের মন এবং চক্ষু জুড়াইয়া দিয়াছিল, নিয়তি তাহার উপর নিষ্করুণ ভাবে তুলি বুলাইতে, পট পড়িয়া যাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে, কি মর্ম্মভেদী দৃশ্যই না আমাদের চোখের সামনে ধরিয়া রাখিল!—কিন্তু এইখানেই কি সব শেষ হইয়া গেল?—শেষ হইয়া গেল তো সুরেশ-যাদব বাঁচিয়া রহিল কেন?—শেষ হইয়াই যদি গেল, তবে জ্ঞানদা-প্রফুল্লর মৃত্যুকালীন করুণ মিনতিও কি নিষ্ফল হইয়া যাইবে? উমাসুন্দরী আর কত কাল পাগল হইয়া রহিবেন? যোগেশই বা আর কত কাল মদের স্রোতে গা' ভাসাইয়া রাখিবেন? প্রফুল্লর মৃত্যুতে রমেশের প্রায়শ্চিত্ত কি আর হইবে না? ভজহরির আক্ষেপোক্তি কি তাহার মামা-মামীর হৃদয় স্পর্শ করিবে না? বাঙ্গালী সমাজের যোগেশ-রমেশদিগকে এই কথাগুলির জবাব দিতে অনুরোধ করিয়া, আজ আমরা 'প্রফুল্ল' নাটকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এইখানেই শেষ করিয়া ফেলিলাম।

ইংরেজ শাসনের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা

[শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন]

গড়ের মাঠে যে মেঘস্পর্শী স্তম্ভটী দাঁড়াইয়া গোটা কলিকাতা শহরটাকে সর্ব্বক্ষণ বিহঙ্গের দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতেছে, ঐ অতিদীর্ঘ ইমারতটী একজন ইংরেজ সেনা-নায়কের স্মৃতিরক্ষার্থ নির্ম্মিত হয়। স্বজাতিপোষক ইংরেজ কৃতজ্ঞতার ঋণস্বরূপ ঐ অত্যুচ্চ মনুমেণ্ট গড়িয়া অকৃটার-লোনীর স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড় দুঃসময়ে অকৃটারলোনী তার মান বাঁচাইয়াছিলেন।

অকৃটারলোনী জাতিতে ইংরেজ, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হন আমেরিকার মাসাচুসেট্‌স্ (Massachushetts) প্রদেশের বোষ্টন্ (Boston) নগরে। তাঁর পিতা বোধ হয় আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ (American War of Independence)-সংশ্রবে কর্ম্মসূত্রে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া তথায় গমন করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে পুত্রটী জন্মিল, নাম রাখিলেন ডেভিড। ডেভিডের শৈশবজীবন কি ভাবে কাটিয়াছিল তাহা জানা যায় না। আমেরিকার স্বাধীনতা-সমর শেষ হইয়া গেলে সেখানে আর কোন সুযোগ-সুবিধার আশা নাই দেখিয়া ১৯ বৎসর বয়সে ডেভিড Cadet বা শিক্ষানবীশ সৈনিক হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া ডেভিড শীঘ্রই প্রতিপত্তিশালী উঠিতে লাগিলেন।

অকৃটারলোনীর পরবর্ত্তী পরিচয় দিতে হইলে একটু অবান্তর কথার প্রয়োজন হয়। ইং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার পরাজয় ঘটে। লর্ড লেকের পত্রে লিখিত "The secret manner in which things have been conducted" (যে গোপন উপায়ে কার্য্য সাধিত হয়) এবং মার্কুইস-অব ওয়েলেসলির ঘোষণাপত্রের সাহায্যে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণকে হাত করা হয় এবং আরও অনেক ব্যাপার সাধিত হয়। (১) সিন্ধিয়ার অধিকৃত দিল্লী বিজিত হইলে ঐ নগরকে রাজনীতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র জানিয়া সেনাপতি লর্ড লেক তাঁহার প্রিয়শিষ্য ডেভিড অকৃটারলোনীকে উহার Chief Commandant and Resident নিযুক্ত করেন। এই লর্ড লেক যে কি চরিত্রের লোক তাহার কতক আভাস মেজর বসু মহাশয়ের ইতিহাসে পাওয়া যায়। কি কারণে জানি না, অকৃটারলোনী তথায় বাসকালে ঘোরতর প্রাচ্য-ভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। তিনি এ-দেশী পোষাকে থাকিতেন, এ-দেশী ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন, সাম, দান, দণ্ড ও ভেদনীতির কোথায় কোনটী প্রয়োগ করিতে হইবে তাহাও শিখিয়াছিলেন।

ইং ১৮১৪ সালে লর্ড ময়রা নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। প্রথম নেপাল-যুদ্ধে জেনারেল গিলেসপি কর্ণেল মবে, জেনারেল মাট্রিন্ ডেল্ প্রভৃতি জয়লাভে অসমর্থ হইলেন, বলভদ্র সিং ও অমরসিংহের বীরত্বে এবং গুর্খাসৈন্যের সাহস-বিক্রমে কোম্পানী বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন ডাক পড়িল অকটারলোনীর। প্রায় ছয়শত মাইল ব্যাপী নেপাল সীমান্তের পশ্চিমপ্রান্ত শতদ্রুতীর হইতে অকটারলোনী অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয় প্রকারেই তিনি শিখিয়াছিলেন যে, অসির সাহায্যে সুবিধা হইবে না। ইংরেজ-সীমা পার হইয়াই তিনি নেপালের করদ ও মিত্র সামন্তগণকে একে একে নানা উপায়ে 'হাত করিতে' লাগিলেন। এই সকল প্রত্যন্ত খণ্ডরাজ্যের মধ্যে লালাগড়, তারাগড়, হিন্দর, রামগড় ও দেবথল প্রধান। হিন্দর তালুকের সামন্ত রামশরণ এই

(১) Vide "Rise of the Christian Power in India" by Major B. D. Basu.

অভিযানে অক্টারলোনীকে সাহায্য না করিলে, তিনি সফলকাম হইতে পারিতেন না। ইহার পর বিলাসপুরের রাজাকে বশীভূত করা হয়। ইনি নেপাল-সেনাপতি অমর সিংহের কুটুম্ব। অপর দিকে অর্থাৎ পূর্ব্বমণ্ডলেও 'হাত করার' কাজটা কর্ণেল গার্ডেনার দ্বারা সুসম্পন্ন হইতেছিল। মন্ত্রৌষধির প্রয়োগে নেপাল-রাজ্যে প্রবেশ করার রাজপথ দুইটী দেশের করায়ত্ত হইয়াছিল—এ দুইটী কুমায়ুন ও গাড়োয়াল রাজ্য। এই দুইটী দেশের মধ্যেই আবহাওয়া হিসাবে শ্রেষ্ঠ শৈলনিবাসগুলি অবস্থিত, যথা নৈনিতাল, মশুরী প্রভৃতি। তবেই দেখিতেছি একদিকে অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত পাহাড়ী সৈন্য, আর্থিক অসচ্ছলতা, সৈন্য সংখ্যায় ন্যূনতা; তাহার উপর আবার মিত্রসামন্ত ও সর্দ্দারগণ নানা উপায়ে শত্রুপক্ষভুক্ত। অপরদিকে শিক্ষিত বহুসংখ্যক সৈন্য, বিশ্বাসী কর্ম্মচারী. প্রধান প্রধান পথগুলি মুষ্টিগত, ষড়যন্ত্র ও গুপ্তনীতি সফল করিবার জন্য অসীম ধনরাশি।

কোম্পানীর আমলে ভারতের যে কয়েক জন পলিটিক্যাল রেসিডেন্টের খবরদারিতে বাস করিবার জন্য ইষ্টাম্বর কাগজে সোলেনামা সম্পাদন করিয়াছিলেন. এবং এই বন্ধুত্ব অটুট রাখিবার জন্য সময়ে-অসময়ে প্রীতিদান উদগার করিতে বাধ্য হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে আর্কটের নবাব এবং উত্তরাপথে অযোধ্যা'র নবাব ছিলেন প্রধান। আর্কটের ব্যাপার লিখিতে গেলে একটী স্বতন্ত্র বড় রকমের প্রবন্ধের প্রয়োজন। অযোধ্যার নবাবেরা তিন পুরুষ ধরিয়া কামধেনু ছিলেন। হেষ্টিংসের আমলে অযোধ্যার বেগমদিগের ধনরত্ন লুণ্ঠন-ব্যাপার সকলেই জানেন। লর্ড ময়রা যখন শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন তখন অযোধ্যার নবাব ছিলেন গাজিউদ্দীন হাইদর। নেপাল-যুদ্ধ চালাইবার জন্য কর্ত্তা এই বন্ধুটীর বাড়ী একবার পায়ের ধূলা দিলেন। এই সময় ঐ অপদার্থ ভোগবিলাসী নবাবটীর খবরদারি করার ভার ছিল পলিটিকাল রেসিডেন্ট্ মেজর বেলীর উপর। তার যত্ন-তদ্বিরের পরিমাণ একটু মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া (২) নবাব সাহেব লর্ড ময়রার নিকট এক

অক্টারলোনী

[শ্রীযুক্ত অমল হোমের সৌজন্যে]

দরখাস্ত পেশ করেন। সপারিষদ গভর্ণর জেনারল্ অনেক সান্ত্বনা, অনেক আশা প্রভৃতির ভিতর ফেলিয়া নবাবকে একচোট হাবুডুবু খাওয়াইলেন। তার পর নানাপ্রকার মিঠা ও কড়া নীতির প্রয়োগ পূর্ব্বক নগদে আড়াই কোটী টাকা প্রীতিদান অথবা প্রীতিঋণ স্বরূপ গৃহীত হইল! এই অর্থরাশিই নেপাল-যুদ্ধে কোম্পানীর বিজয়ের প্রধান কারণ। ইহারই সুপ্রয়োগ করেন অক্টারলোনী, গার্ডনার প্রভৃতি নায়কগণ। দ্বিতীয় নেপালযুদ্ধে জয়লাভের দ্বারা তরাই অঞ্চলের দক্ষিণস্থ সমগ্র ভূভাগ ইংরেজদের হস্তগত হয় আর নেপালে রেসিডেন্ট কায়েম হয়, গভর্ণর জেনারল ওয়েলেস্লি এবং ডাল-

(২) Vide "Private Journal of the Marquiss of Hastings" under date October 13, 1814

হাউসীর তুল্য আসন ইংরেজ-আমলের ইতিহাসে প্রাপ্ত হন। মার্কুইস হইতে, ধনশালী হইতে গভর্ণর জেনারেল্‌কে কে সাহায্য করিয়াছিল? কে ভারতবাসী সাজিয়া ভারতীয়দের জয় করিয়াছিল? কে বিব্রত, কোম্পানীর মানরক্ষা করিতে সেই বিষম বিপদের দিনে কর্ণধার হইয়াছিল?—ডেভিড অক্‌টারলোনীই। গভর্ণর জেনারেলের সুপারিশে কোর্ট অব-ডিরেক্‌টারস্‌ অক্‌টার-লোনীকে বার্ষিক ১০০০ পাউণ্ড্‌ পেন্সন মঞ্জুর করেন, আর স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল্‌ কিঞ্চিৎ বিষয়-সম্পত্তি খরিদের জন্য ("for the purchase of an estate") পুরস্কার পান নগদ ৬০০০০ পাউণ্ড্‌। বলা বাহুল্য, এই ছয় লক্ষ টাকা গৌরী সেনের তহবিল হইতেই পাইয়াছিলেন

এই ঘটনার পর হইতে প্রায় দশবৎসর কাল পূর্ব্বে অখ্যাত, অজ্ঞাত অক্‌টারলোনী কর্ণেল পদ হইতে ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া মেজর জেনারেল্‌ স্যর্‌ ডেভিড অক্‌টারলোনী, বেরণেট, কে, সি, বি রূপে জমকাল খেলাৎ ও উপাধিভূষিত "কেও কেটা নয়" হইয়া রহিলেন। এই সময়ের মধ্যে অকটারলোনী ১৮১৭ সালে পিণ্ডারী যুদ্ধে রাজপুতানা খণ্ডে যোগদান করেন। সেখানে আমীর খাঁন নামে যে পিণ্ডারী সর্দ্দারের বিরুদ্ধে তিনি প্রেরিত হন তাহাকে অনুচরগণ সহ মূল দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিনা লড়াই ও রক্তপাতে তাহাকে বশীভূত করেন। কি গুপ্ত উপায়ে এই কার্য্য শেষ হয় তাহা স্পষ্ট বোঝা যায় না। ঐ সালের শেষের দিকে গভর্ণর জেনারেল্‌ অকটারলোনী অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, অপরি-পক্ক ও অনভিজ্ঞ কর্ণেল টডকে রাজপুতানার পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত করেন। ইহাতে অক্‌টারলোনীর প্রতি একটু অবিচার ক' হয় বলিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং কিছুকাল পরে টডের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনয়ন করেন। অতঃপর অক্‌টারলোনী স্বস্থানে থাকিয়াই চতুর্দ্দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকাইতেছিলেন, কোথাও কোন নূতন সুযোগ উপস্থিত হয় কি না। ধৈর্য্যের ফল মধুময়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরে এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। অমনই ইংরেজ কোম্পানী ন্যায়, ধর্ম্ম ও শান্তিরক্ষার দোহাই দিয়া বৃদ্ধ রাজার দুঃখে সমবেদনায় গলিয়া গেলেন। ভরতপুরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হস্তক্ষেপই সিদ্ধান্ত হইল। এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন অক্‌টারলোনী নিজে। মরাঠা যুদ্ধে পরাজিত হোলকারকে যখন তদানীন্তন ভরতপুররাজ রণজিৎসিংহ আশ্রয় দিয়াছিলেন, তখন বড়লাট ওয়েলেস্‌লীর আদেশে সেনাপতি লেক—ভরতপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গ অবরোধ করেন। সুবিধা করিতে না পারিয়া অবশেষে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই পরাজয়ের দুঃখ ইংরেজ ভুলিতে পারেন নাই। তাই বোধ হয় উপস্থিত ভরতপুরের ব্যাপারটাকে যেন-তেন-প্রকারেণ সুযোগে পরিণত করা হইল। ভরতপুরের রাজা বলদেব সিংহ বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য এবং তাঁহার বৃদ্ধবয়সের পুত্র বলবন্ত সিংহ তখন ছয় বৎসরের বালক। রাজা যখন দেখিলেন যে, সর্দ্দার ও প্রজাগণ সকলেই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্জ্জন সালের অনুরক্ত, তখন বৃদ্ধ বয়সের নয়নমণি পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তান্বিত হইলেন। পুত্রের গদি-প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য তিনি দিল্লীর ইংরেজ রেসিডেন্টের শরণাগত হন। অবশ্য ইংরেজের লিখিত ইতিহাসে (৩) এই কথাই বলে। যাহাই হউক, অকটারলোনীর তদ্বিরের জোরে অথবা রাজার চেষ্টায় কোম্পানির সঙ্গে বোঝাপড়া পাকা হইয়া গেল একথা ঠিক বলা যায় না। ছয় বৎসরের শিশু অকটারলোণীর আগ্রহে ও চেষ্টায় যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হইল। ইহার এক বৎসরের মধ্যেই বৃদ্ধ রাজা চক্ষু মুদিলেন। যুবরাজের মাতুল রামরতন সিংহ নাবালকের প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনের গুণে এক মাসের মধ্যেই রাজ্যের প্রধানগণ দুর্জ্জন সালকে যুবরাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন এবং রামরতন বিতাড়িত হইলেন। অক্‌টার-লোনী তখন অনেক নজির ও যুক্তি দেখাইয়া দুর্জ্জন সালকে চরম পত্র দিলেন। যথানিয়মে কিছুদিন উত্তর-প্রত্যুত্তর, কথা কাটাকাটি চলিল। তারপর কোম্পানীর পক্ষে অক্‌টারলোনী 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া বসিলেন। ঠিক এই সময় ব্রহ্মযুদ্ধের অসম্ভব খরচের ফলে অর্থাভাব ঘটে। অকটারলোনী উদ্যোগপর্ব্বে ব্যস্ত, এমন সময় তাৎকালিক গবর্ণর-জেনারল লর্ড আমহার্ষ্ট হুকুম দিলেন যে, যুদ্ধ হইবে না, আপোশের চেষ্টা করা হউক। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর

(৩) Vide "A comprehensive History of India by Henry Beveridge.

কোম্পানীর অধীনে কাজ করিয়া যে ব্যক্তি পাকা হইয়াছে, হস্তক্ষেপ করিবার এমন সুবিধা যে ব্যক্তি কোম্পানীর হাতে তুলিয়া দিল, তারই উপর কি না এমন কড়া হুকুম জারি! পর পর দুই আঘাত পাইয়া ভগ্নহৃদয় অক্‌টারলোনী কর্ম্মে ইস্তফা দিলেন, এবং কিছুকাল পরে বহু নারীকে অনাথা করিয়া ৬৮ বৎসর বয়সে মীরাট নগরে দেহত্যাগ করেন। উত্তরকালে একজন সৈনিক কর্ম্মচারী কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের রক্ষিত কাগজপত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অক্‌টারলোনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া এই জীবন-কথা শেষ করিব ;—

"Ochterlony brought himself into touch with native life in a way which though not uncommon a hundred years ago, hardly commends itself to the moral sense of more recent days. In private life he dressed and lived as a native of India, while a harem formed a part of his domestic establishment". (4)

অক্‌টারলোনী কোম্পানীর আমলের কর্ম্মচারীদের একটা সামান্য নমুনা মাত্র কি না তাহা প্রমাণ করিবার ভার বিশেষজ্ঞদের উপর। বড়ই দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গালা দেশের বিশেষজ্ঞগণ কেবলমাত্র হিন্দুযুগ, বৌদ্ধযুগ, পাঠান ও মোগলযুগ লইয়াই গবেষণা করিতেছেন এবং পুস্তক প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। ইংরাজ আমলের গবেষণামূলক স্বাধীন নিরপেক্ষ ইতিহাস এ পর্য্যন্ত একখানি মাত্র ইংরেজীতে লিখিত হইয়াছে বলিয়া জানি। বাঙ্গালায় লিখিত যে দুই একখানি ঐ পর্ব্বের ইতিহাস আছে তাহা মেজর বামনদাস বসুর "Rise of the Christian Power in India" নামক পুস্তকের ন্যায় চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ও সমসাময়িক লেখকের গ্রন্থরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইতিহাসের মালমসলা হিসাবে যাহা প্রামাণ্য সেই মাপকাঠিতে বিচার করিলে বসু মহাশয়ের বিস্তৃত গ্রন্থ ভারতবাসীর এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু।

(৪) Contributed by Col. Weg. Hamilton to the "United Service Journal," 1903, July, Quoted by Major B. D. Basu in his "Rise of the Christian Power in India.

বিষ্ণুপুরের কথা

[শ্রীনিখিলনাথ রায় বি-এল]

পশ্চিমবঙ্গের পার্ব্বত্য ও অরণ্যময় ভূভাগে দুইটী প্রাচীন রাজ্য অনেকদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে অবস্থান করিয়াছিল। যে সময়ে পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা * শুশুনিয়া শৈলে আপনার নাম উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল কি না বলিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহাদের অন্যতর পঞ্চকোট রাজ্য শকাব্দের প্রথম হইতেই আপনার অস্তিত্বের বিজ্ঞাপন দিয়া আসিতেছে। দ্বিতীয় বিষ্ণুপুর অবশ্য তাহার কয়েক শত বৎসর পরে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। আমরা সেই বিষ্ণুপুরের কথা বলিতেছি।

বিষ্ণুপুর রাজ্য এককালে উত্তর দিকে সাঁওতাল পরগণার কতকাংশে, পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের কতকাংশে, ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের কতকাংশে বিস্তৃত ছিল। বিষ্ণুপুরের রাজগণ প্রথমে যেখানে রাজত্ব আরম্ভ

* আমরা ভারতবর্ষে 'শুশুনিয়া শৈলে' প্রবন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছিলাম যে, সন্ধান করিলে শুশুনিয়ার নিকট পুষ্করণার অবস্থান জানা যাইতে পারে। এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটী থানার মধ্যে 'পোখরাণা' (পুষ্করণা) নামে একখানি গ্রাম আছে। তাহাতে ভগ্নাবশেষেরও চিহ্ন আছে। সুতরাং শুশুনিয়া শৈলে খোদিত সিংহবর্ম্মা ও চন্দ্রবর্ম্মা এই পুষ্করণার অধিপতি বলিয়া অনুমান হয়।

করেন, তাহা মল্লভূমি নামে অভিহিত হইত, এবং তাহারা মল্লরাজবংশীয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। এই মল্লভূমি বর্ত্তমানে বাঁকুড়া জেলার মধ্যে অবস্থিত। কতদিন হইতে এই মল্লভূমির উৎপত্তি তাহা স্থির করা কঠিন। মল্ল-জাতির অস্তিত্বের কথা অনেক দিন হইতে জানা যায়। * পশ্চিম বঙ্গে মল্ল বা মাল জাতির অস্তিত্ব দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের নাম হইতে কি বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ হইতে মল্লভূমির উৎপত্তি হইয়াছে তাহা স্থির করা যায় না। সে যাহা হউক ক্ষুদ্রায়তন মল্লভূমি হইতে মল্লরাজগণ ক্রমে আপনাদের অধিকারবিস্তার করিয়া পশ্চিম-বঙ্গে এক বিশাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং অনেকদিন পর্য্যন্ত স্বাধীন-ভাবেই শাসনদণ্ড পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মল্ল-রাজগণের রাজ্যপ্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে বিষ্ণুপুর তাঁহাদের রাজধানী হইয়া উঠে। সেই বিষ্ণুপুরকে ক্রমে তাঁহারা অমরাবতী-তুল্য করিয়া তুলেন। সুদৃঢ় দুর্গে, অসংখ্য দেবমন্দিরে, বিশাল বাঁধ সকলে, অগণন সৌধ-রাজিতে বিষ্ণুপুর যে এককালে অমরাবতীর শোভাকে পরাজিত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণে সেই বিষ্ণুপুর ভগ্নস্তূপের আধার ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহার সেই সুদৃঢ় দুর্গের নাম মাত্র অস্তিত্ব রহিয়াছে, দেবমন্দির সমূহ ভগ্নস্তূপেই পরিণত হইতেছে, হ্রদ সদৃশ বাঁধ সকল শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে, সৌধরাজিও ভূমিসাৎ হইয়া যাইতেছে। সেই বিশাল রাজ্যের রাজধানী বিশাল নগরী এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া লোকের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিতেছে। কালের বিচিত্র লীলা ভিন্ন ইহাকে আর কি বলা যাইতে পারে?

মল্লরাজগণেয় বংশপত্র * বিষ্ণুপুরে প্রচলিত মল্লাব্দ বা বিষ্ণুপুরাব্দ ও মন্দির সকলের শিলালিপির সময় আলোচনা করিলে এরূপ স্থির হয় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে মল্ল-রাজগণের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল। রঘুনাথসিংহ বা আদি মল্ল নামে জনৈক ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। রঘুনাথের পিতা সপত্নীক রাজপুতনার রণঅম্বরের নিকট জয়নগর হইতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাত্রাকালে পথিমধ্যে বিষ্ণুপুরের নিকট লাউগ্রামে উপস্থিত হন। তথায় মনোহর পঞ্চানন নামে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে রঘুনাথের জন্ম হয়। রঘুনাথের পিতা তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে পুরুষোত্তমে গমন করিয়াছিলেন, তিনি ভগীরথ গুহ নামে এক কায়স্থের প্রতি রঘুনাথের মাতার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া যান। পুত্রের জন্মের অল্পকাল পরেই মাতা পর-লোক গমন করেন। একটী বাগ্‌দী-জাতীয় রমণী রঘুনাথের ধাত্রী নিযুক্ত হইয়াছিল। রঘুনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পঞ্চাননের গোপালক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি উক্ত প্রদেশের মাল, বাগ্‌দী প্রভৃতি জাতির বালকগণের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইতেন, ক্রমে মল্ল-বিদ্যায় অভ্যস্ত হওয়ায় এবং তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করায়, রঘুনাথ

---

* "ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥"

মনুসংহিতা, ১০ অধ্যায়, ২২ শ্লোক

মনুসংহিতার মতে মল্লগণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন, মহাভারত প্রভৃতিতে মল্ল-জাতির উল্লেখ আছে।

"ততো গোপালকক্ষঞ্চ সোত্তরানপি কোশলান্।
মল্লানামধিপঞ্চৈব পার্থিবঞ্চাজয়ৎ প্রভুঃ॥"

সভাপর্ব্ব, ৩০ অধ্যায়, ৩ শ্লোক

মহাভারতের এই মল্লজাতির নিবাস-স্থানের সহিত শ্রীযুক্ত অভয়পদ মল্লিক তাঁহার History of Bishnupur Raj নামক পুস্তকে বাঁকুড়া জেলার মল্লভূমির যে অভিন্নতা স্থির করিয়াছেন তাহা প্রকৃত নহে। মহাভারতের কথিত মল্লজাতির নিবাস উত্তর-কোশলের নিকট। বৌদ্ধ-গ্রন্থে ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে উত্তর-কোশলের নিকটবর্ত্তী মল্ল জন-পদের কথাই বলা হইয়াছে। ইউয়েনচোয়াং কুশীনগরে মল্লদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই মল্লজনপদের সহিত বাঁকুড়া জিলার মল্লভূমির কোনই সম্বন্ধ নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মল্লজাতিকে অনার্য্য বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারেরা তাহাদিগকে আর্য্যবংশ হইতে সমুদ্ভূত ও ক্রমে অনার্য্য ভাবাপন্ন বলেন। উত্তর-কোশলের নিকটবর্ত্তী মল্লগণ কোন সময়ে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন কি না এবং বিষ্ণুপুরের রাজগণের উত্তর হইতে আগমনের প্রবাদানুসারে উত্তর-কোশলের নিকটবর্ত্তী মল্লজাতির সহিত তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কোন-রূপ সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধানের বিষয়।

---

* বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারে মল্লরাজগণের যে বংশপত্র আছে, History of Bishnupur Raj গ্রন্থে তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। বিশ্ব-কোষে মল্লরাজবংশ নামে এক প্রাচীন হস্তলিপি হইতে রাজগণের রাজত্ব কালের পরিমাণ, রাজগণের ও রাজপুত্রগণের নাম উদ্ধৃত দেখা যায়। এই উভয় বংশপত্রে রাজগণের রাজত্বারম্ভ ও রাজত্বকালের পরিমাণের অনৈক্য আছে। কোন কোন রাজার নামেরও অনৈক্য দেখা যায়। তাহা সম্ভবতঃ লিপিকর বা মুদ্রাকর প্রমাদ হই...

নিকটবর্ত্তী পঞ্চমগড়ের অধিপতি বাগ্‌দী রাজার নিকট হইতে 'আদিমল্ল' উপাধি লাভ করেন। তাহার পর তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের অধীশ্বর প্রদ্যুম্নপুর বা পদম্‌পুরের রাজা নৃসিংদেবের নিকট হইতে সম্মান লাভ করিয়া তাঁহার সামন্ত শ্রেণীভুক্ত হইয়া উঠেন। পদম্‌পুর লাউগ্রামের নিকটেই অবস্থিত। রঘুনাথ লাউগ্রামে দণ্ডেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। পদম্‌পুরের সামন্ত রাজা জাতবিহারের অধিপতি প্রতাপনারায়ণ অবাধ্যতা প্রকাশ করায়, রঘুনাথ পদম্‌পুরের রাজার আদেশে প্রতাপনারায়ণকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। তিনি লাউগ্রামেই আপনার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের রক্ষিত বংশপত্রানুসারে আদিমল্ল ৬৯৪ খৃঃঅব্দ হইতে মল্লাব্দের প্রচলন করেন। ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী শক্রোত্থান তিথি হইতে মল্লাব্দের আরম্ভ হয়। ঐ দিনে বিষ্ণুপুরের রাজগণ ইন্দ্রদেবের পূজা করিয়া থাকেন। আদিমল্লের রাজত্বারম্ভ হইতেই মল্লাব্দ প্রচলিত হয়। * তাঁহাকে লোকে বাগ্‌দী রাজা বলিত। বাগ্‌দী-গণের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করায় তিনি উক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকিবেন। †

আদিমল্লের পর তাঁহার পুত্র জয়মল্ল মল্ল-বংশের রাজত্ব-লাভ করেন। জয়মল্ল পদম্‌পুর আক্রমণ করিয়া রাজার দুর্গ অধিকার করিয়া লন, পদম্‌পুরের রাজ-পরিবার তথাকার কানাই-সায়রের জলে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন।

জোড় বাংলা

পদম্‌পুর অধিকার করিয়া জয়মল্ল পশ্চিম-বঙ্গের অধীশ্বর হইয়া উঠেন এবং বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।* জয়মল্ল বিষ্ণুপুর দুর্গের সূচনা ও দুর্গাধিষ্ঠাত্রী মৃন্ময়ী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রাজ-পরিবারের বংশপত্রানুসারে জয়মল্ল দশ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। † তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া কোন কোন সময়ে জয়-

* বিশ্বকোষে লিখিত মল্লরাজবংশে রাজগণের যে রাজত্বকালের পরিমাণ আছে, তাহা হইতে স্থির হয় ৬৯৪ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে আদিমল্লের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল এবং ৬৯৪ খৃঃ অব্দে আদিমল্লের পুত্র জয়মল্লের রাজত্বমধ্যে পড়িয়া যায়। বিশ্বকোষের মল্লবংশের এবং Hunter's Statistical Account of Bankuraর মতে আদিমল্ল ৩৪বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। District Gazetteer Bankura র মতে তিনি ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন, কিন্তু বিষ্ণুপুরের রাজ-পরিবারে রক্ষিত বংশপত্রের মতে তাঁহার ১৫ বৎসর রাজত্বকাল স্থির হয়।

† হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থেই এরূপ লিখিত আছে যে রঘুনাথের মাতা তাঁহাকে বনমধ্যে প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, কাশমেতিয়া নামে বাগদী তাঁহাকে লইয়া গিয়া লালন-পালন করে। তাঁহার সপ্তম বৎসর বয়সের সময় কোন এক ব্রাহ্মণ তাঁহার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়া এবং তাঁহার শরীরে রাজলক্ষণ দেখিতে পাইয়া রঘুনাথকে নিজ বাটীতে লইয়া যান।

* District Gazetteer Bankuraর জয়মল্ল-কর্ত্তৃকই বিষ্ণুপুরের রাজধানী স্থাপনের কথা আছে।

† বিশ্বকোষে মল্লরাজবংশে ও হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থে জয়মল্লের ৩০ বৎসর রাজত্বকালের উল্লেখ আছে। বিশ্বকোষের মল্লরাজবংশানুসারে জয়মল্লের রাজত্বকালে মল্লাব্দের প্রবর্ত্তন ঘটে, মল্লাব্দকে বিষ্ণুপুরাব্দও বলিয়া থাকে। জয়মল্ল বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়, যদি উক্ত কারণে মল্লাব্দকে বিষ্ণুপুরাব্দ বলা যায়, তাহা হইলে জয়মল্লই মল্লাব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বিষ্ণুপুরের রাজপরিবার আদিমল্ল কর্ত্তৃক মল্লাব্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল মনে করিয়া আদিমল্ল ও জয়মল্লের রাজত্বকাল সংক্ষেপ করিয়া লইয়াছেন কি না বলা যায় না। আবার বিষ্ণুপুর প্রদেশে প্রচলিত বলিয়া মল্লাব্দের অপর নাম বিষ্ণুপুরাব্দও হইতে পারে। মল্লাব্দে ও বঙ্গাব্দে ১০১ বৎসর ব্যবধান।

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯ সংখ্যক রাজা জগৎমল্ল বিষ্ণুপুরের অনেক উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে জগৎমল্ল বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।* জগৎ-মল্লের সময় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে ও একাদশ শতাব্দীর প্রথমে ধর্ম্মপূজা-প্রবর্ত্তক শূন্য-পুরাণ-প্রণেতা রমাই পণ্ডিত বিষ্ণুপুর প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৩৩ সংখ্যক রাজা রামমল্ল বিষ্ণুপুর দুর্গের উন্নতি-সাধন ও সৈন্য-গঠনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ৪২ সংখ্যক রাজা শিব-সিংহ মল্লের সময় হইতে বিষ্ণুপুরে বিশেষরূপে সঙ্গীতচর্চ্চা আরম্ভ হয়; তদবধি বিষ্ণুপুর সঙ্গীতবিদ্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছে।

অবশেষে ৪৮ সংখ্যক রাজা ধাড়ি মল্লের সময় হইতে আমরা বিষ্ণুপুর রাজগণের ঐতিহাসিক পরিচয় পাই। ধাড়ি মল্লের রাজত্বের শেষভাগে মোগল পাঠানের সংঘর্ষে বঙ্গভূমি সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিতেছিল। কতলুখাঁর অধীনে পাঠানগণ উড়িষ্যা হইতে দামোদর নদ পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তার করে। বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়।* মোগল সুবেদার সাহাবাজ খাঁ পাঠানদিগকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিলে, পাঠানেরা পশ্চিম-বঙ্গ পরিত্যাগ করে। ধাড়িমল্ল ৮৯২ মল্লাব্দে বা ১৫৮৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৪৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষ বৎসরে তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়া সুবেদারকে রাজস্ব প্রদানে সম্মত হন।† ধাড়ি মল্লের পুত্র ৪৯ সংখ্যক রাজা বীর হাম্বীরের সময় হইতে বিষ্ণুপুরের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে পারা যায়। তাঁহার রাজত্বকালে পাঠানেরা আবার পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করিয়া বীর হাম্বীরকে তাহাদের অধীনতা স্বীকার করাইতে বাধ্য করে। এই সময়ে মানসিংহ বাঙ্গলা ও বিহারের সুবেদার হইয়া আসেন। তিনি কতলুখাঁর অধীনে পাঠানদিগকে দমন করিবার জন্য ১৫৯১ খৃঃ অব্দে বিহার হইতে উড়িষ্যার দিকে যাত্রা করিয়া জাহানাবাদে শিবির সন্নিবেশ করেন। কতলুখাঁও ধীরে ধীরে অগ্রসর হন, তিনি বাহাদুর খাঁকে প্রথমে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলে, রাজা মানসিংহ তাঁহার পুত্র জগৎসিংহকে বাহাদুরের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। জগৎসিংহের যুদ্ধ-যাত্রার সংবাদ পাইয়া বাহাদুর একটী দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং কতলুখাঁর নিকট সৈন্যের সাহায্য চাহিয়া পাঠায়। সে জগৎসিংহের নিকট সন্ধির ভাণ দেখাইলে, জগৎসিংহ পাঠানদিগকে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবেই অবস্থিতি করিতে থাকেন। বীর হাম্বীর এই সময়ে পাঠানদিগের সহিত যোগদান করিয়া-ছিলেন, কিন্তু তিনি মনে মনে মোগলদিগেরই পক্ষপাতী ছিলেন। বীর হাম্বীর পাঠানদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া জগৎসিংহকে সতর্ক হওয়ার জন্য গোপনে উপদেশ দেন; কিন্তু জগৎসিংহ সে কথায় মনোযোগ প্রদান করেন নাই। যখন পাঠানেরা তাঁহার শিবির আক্রমণ করিয়া বসিল, তখন তিনি পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বীর হাম্বীর তাঁহাকে রক্ষা করিয়া বিষ্ণুপুরে লইয়া যান।* মানসিংহ পাঠানদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার অভিপ্রায় করিলে, সহসা কতলুখাঁর মৃত্যু হয়। তখন পাঠানেরা

---

* History of Bishuupur Raj.

* Stewart's History of Pengal

† বাঁকুড়া গেজেটিয়ারে লিখিত আছে যে, ৪৯ সংখ্যক রাজা Dhar Hambir এর সহিত ১,০৭০০০৲ টাকায় প্রথমে রাজস্ব বন্দোবস্ত হয়। Dhar Hambir ৯৯৩ বঙ্গাব্দে বা ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। এই Dhar Hambir ধাড়ি মল্লই হইবেন। ধাড়ি হাম্বীর বীর হাম্বীরের পুত্র, ধাড়ি মল্লই তাঁহার পিতা। ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে ধাড়ি মল্লেরই রাজত্বের অবসান হয়। বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারে রক্ষিত বংশ-পত্রানুসারে তিনি কিন্তু ৪৮ সংখ্য রাজা, ৪৯ সংখ্যক নহেন। বিশ্বকোষের মল্লরাজ বংশে তাঁহাকে 'বা[illegible] লিয়া দেখা যায়, ইহা সম্ভবতঃ লিপিকর বা মুদ্রাকর-প্রমাদ হইবে। হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থে বীর হাম্বীরের সহিত মোগলদিগের প্রথম বন্দোবস্ত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে, উক্ত গ্রন্থে বীর হাম্বীর কিন্তু ৪৮ সংখ্যক রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুর রাজ-পরিবারের বংশ-পত্রানুসারে ও বিশ্বকোষের মল্ল-রাজবংশের মতে বীর হাম্বীর ৪৯ সংখ্যক রাজা।

* 'Jagat Singh was warned of his danger but paid no heed. At length he was attacked by the rebcle, and was obliged fo fly and abandon his camp; but he was saved by Hambir, the Zemindar who had given him warning and conducted to Bishnupur"

(Akbar-Nama, Elliot's History of

Vol. VI. P. 86 .

বাধ্য হইয়া মোগলদিগের সহিত সন্ধি করে। কিছুকাল পরে আবার ১৫৯৩ খৃঃঅব্দে পাঠানেরা পশ্চিম-বঙ্গ অধিকার করিয়া বীর হাম্বীরের রাজ্য লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয়। * মানসিংহ আবার আসিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন, এবং উড়িষ্যা অধিকার করিয়া লন। পাঠানেরা ক্রমে পূর্ব্ব-বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহার পর পশ্চিম-বঙ্গে শান্তি স্থাপিত হয়।

পশ্চিম-বঙ্গে মোগল পাঠানের সংঘর্ষ নিবৃত্ত হইলে, বীর হাম্বীর ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবন হইতে ভক্তিগ্রন্থ সকল লইয়া বিষ্ণুপুর রাজ্যে উপস্থিত হইলে, বীর হাম্বীরের লোকেরা গোপনে গ্রন্থসকল লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হয়। শ্রীনিবাস গ্রন্থের অনুসন্ধানে রাজসভায় আগমন করিলে, রাজা তাঁহার পরিচয় পাইয়া শ্রীনিবাসের পদতলে লুটাইয়া পড়েন, এবং গ্রন্থ সকল ফিরাইয়া দেন। পরে তিনি শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষিত হন, তাঁহার মহিষী রাণী সুলক্ষণা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র ধাড়ি হাম্বীরও শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষালাভ করেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধুর রসে ডুবিয়া বীর হাম্বীর পদ-রচনায়ও প্রবৃত্ত হন। তাঁহার দুইটী প্রসিদ্ধ পদ বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন জীব গোস্বামীর নিকট হইতে তিনি যে চৈতন্যদাস নাম পাইয়াছিলেন, সেই চৈতন্যদাস নামে আরও অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন। † ১৫৯৩খৃঃ অব্দের পর শ্রীনিবাসের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ‡ বীর হাম্বীর বিষ্ণুপুরে কালাচাঁদ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন, শ্রীনিবাসাচার্য্য কালাচাঁদের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে জানা যায়। বীর হাম্বীরের দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথ সিংহ কালাচাঁদের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এইরূপ কথিত হইয়া থাকে যে, বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ দেবতা মদনমোহন বীর হাম্বীর কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিল। এ কথা

মদনমোহনের মন্দির

এই ঘটনা আকবরের রাজত্বের ৩৫ তম বৎসর ঘটিয়াছিল বলিয়া আকবর-নামায় লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৫৯১ খৃঃ অব্দ হইতেছে। Stewart's History of Bengal-এ উক্ত ঘটনা এইরূপ লিখিত আছে,—The Young Raja (Jagat Singh) was deceived by their artifices; and as soon as the additional force arrived, the Afghans made an attack upon him by night, surprised his camp, took him prisoner, * * who was carried prisoner to Bishnupur."

ষ্টুয়ার্ট সাহেব পাঠান-হস্তেই জগৎসিংহের বন্দী হওয়ার কথা এবং তাহারাই তাঁহাকে বিষ্ণুপুরে লইয়া গিয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু বীর হাম্বীর যে জগৎসিংহকে পাঠানদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুপুরে লইয়া গিয়াছিলেন, আকবরনামায় তাহাই লিখিত আছে। অবশ্য বীর হাম্বীর সে সময়ে পাঠানদিগের পক্ষেই ছিলেন। ইহাতে ষ্টুয়ার্টের লিখিত বিষয়ের সহিত আকবরনামার অনৈক্য ঘটে না। ষ্টুয়ার্টের বিবরণ অবলম্বন করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছিলেন। বীর হাম্বীর-কর্ত্তৃক জগৎসিংহের উদ্ধারের কথা সে সময় তিনি অবগত থাকিলে, দুর্গেশনন্দিনী সম্ভবতঃ অন্য আকার ধারণ করিত।

* Akbar Nama, Elliot's History of India. Vol. VI. P, 89.

† "শ্রীচৈতন্যদাস নামে যে গীত বর্ণিল।
বিস্তারের ভার তাহা নাহি জানাইল।"
ভক্তিরত্নাকর।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' চৈতন্যদাসের ১৫টী পদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

‡ শ্রী[illegible] [illegible]ন হইতে যখন গৌড়দেশে আসেন, তখন ভক্তি-গ্রন্থ সকলের সঙ্গে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত চৈতন্য-চরি[illegible] আনিয়াছিলেন, বৈষ্ণব-গ্রন্থপাঠে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিতেছে।* রঘুনাথ সিংহ বিষ্ণুপুরের কোন কোন বাঁধ খনিত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৯৬২ মল্লাব্দ বা ১৬৫৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রঘুনাথ সিংহ রাজত্ব করিয়াছিলেন। রঘুনাথের সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তিনি রাজস্ব-প্রদানে শৈথিল্য করায় সাহ্ সুজার সুবেদারী সময়ে বন্দীভাবে রাজমহলে নীত হইয়াছিলেন। পরে সুবেদারের একটী দুষ্ট অশ্বকে সংযত করিয়া মুক্তিলাভ করেন, ও সিংহ উপাধি প্রাপ্ত হন। এ কথা কতদূর সত্য বলা যায় না। মুর্শিদকুলী খাঁর পূর্ব্বে জমীদারেরা যে রাজস্বের জন্য বন্দী হইতেন ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরের রাজারা মুর্শিদকুলী খাঁর সময়েও নিজেরা দরবারে উপস্থিত হইতেন না। তবে সাহ্ সুজার সময়ে বাঙ্গলার নূতন রাজস্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল এবং রঘুনাথ সিংহ হইতেই বিষ্ণুপুরের রাজারা 'সিংহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

* "শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদেশকেহঙ্ক বেদাঙ্কযুতে নবরত্নরত্নম্।
শ্রীবীরহাম্বীরনরেশসূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ।"
(শ্যামরায়)

"শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে সুধাংশুরসাঙ্কনে সৌধগৃহংশকেহঙ্কে।
শ্রীবীরহাম্বীরনরেশসূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথ সিংহঃ।"
(কৃষ্ণরায়)

"শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদেশকে দ্বিরসাঙ্কযুক্তে নবরত্নমেতৎ।
শ্রীবীরহাম্বীরনরেশসূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ।"
(কালাচাঁদ)

History of Bishnupura Raj গ্রন্থে শ্যামরায় ও কৃষ্ণরায়ের মন্দির-লিপির 'শ্রীরাধিকা'র স্থানে শ্রীরাধা এবং শ্যামরায়ের মন্দির লিপির 'শকেহঙ্ক'র স্থানে যে 'শশাঙ্ক' লেখা আছে, তাহা ঠিক নহে।

বিশ্বকোষে রঘুনাথ সিংহ-কর্ত্তৃক ৯৬৯ মল্লাব্দে যে গিরিধরলালের মন্দির-নির্ম্মাণের কথা আছে তাহা তাঁহার রাজত্বকাল মধ্যে পড়ে না।

সুদে-আসলে

(গল্প)

[শ্রীহরিপদ গুহ]

এক

নিকুঞ্জ ও নিরাপদ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে মেসের সিঁড়ি ভাঙিতে ভাঙিতে ডাকিল—"ফটিক-দা', ও ফটিক-দা' !"

ফটিকচাঁদ তখন উপরের ঘরে দ্বিপ্রহরের সুখ-নিদ্রায় মগ্ন; ডাকাডাকিতে বিরক্তভাবে উত্তর দিল—"কি রে ?"

নিকুঞ্জ কহিল—"খুব যা হোক্; সারা হরি ঘোষের ষ্ট্রীট্‌টা খুঁজেও তো কই বের কর্ত্তে পারলুম না। ছি, ছি, ঠিকানাটা অন্ততঃ টুকে রাখা উচিত ছিল তোমার। ওঃ, এতদিনের ক্লাস ফ্রেণ্ডটা এল, কেবল তোমার দোষেই দেখা করতে পারলুম না !"

ফটিক কোন কথাই বলিল না। নিকুঞ্জ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"আচ্ছা, সে আর এখানে আসবে কি না কিছু বলেছে ? কালো দোহারা চেহারা, গালে একটা তিল আছে তো ? ঠিক্, ঠিক্, সুহাসই বটে ;—কিন্তু—।"

ফটিকচাঁদের শয্যাকণ্টক উপস্থিত হইল। সে

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতে আসিতে বলিল—"এরই মধ্যে গিয়েছিলি না কি, কুঞ্জ? হাঃ হাঃ হাঃ!"

তাহার হাসির ভঙ্গী দেখিয়া নিকুঞ্জ জ্বলিয়া উঠিল; বলিল—"থাম্, আর হাস্‌তে হবে না; যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ

ফটিক হাসিতে-কাশিতে মিশাইয়া বহুকষ্টে যাহা জানাইল, তাহার মর্ম্ম এই,—কেহ তাহার সহিত দেখা করিতে আসে নাই,—শুধু একটু রহস্য করিবার জন্যই সে ঐরূপ করিয়াছে। নিকুঞ্জ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেও মুখে কিন্তু কোন কথা বলিল না; নিরাপদকে লইয়া সে ধীরে ধীরে আপনার রুমে চলিয়া গেল। নিরাপদ বলিল—"কীর্ত্তি দেখ; এই রৌদ্রে অযথা মানুষকে কষ্ট দিলে।"

নিকুঞ্জ বোমার মত ফাটিয়া উঠিয়া বলিল—"তা ব'লে তুই মনে করিস্ নি যে, ওকে অমনই-অমনই ছেড়ে দেব। হাঁ আমিও নিকুঞ্জ ভট্‌চার্য্যি, অসিত ভট্টাচয্যির ছেলে! যাই, এখন একটু বরফ নিয়ে আসি।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ফিরিবার মুখে লেটার-বক্সটায় তাহার কোন চিঠি-পত্র আছে কি না দেখিতে গিয়া ফটিকের নামের একখানি বাহারি খামের উপর নজর পড়িতেই তাহার মুখে তড়িৎ খেলিয়া গেল। সে সেখানিকে পকেটে পুরিয়া নিজের ঘরে আসিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। নিরাপদ অবাক্ হইয়া কহিল—"কি রে, কি হ'ল আবার?"

"একটা প্ল্যান পাওয়া গেছে।" বলিয়া অতি সন্তর্পণে খামটা খুলিয়া ফেলিল। তারপর এক নিঃশ্বাসে পত্রখানি পড়িয়া ফেলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে কলমটায় কালি ডুবাইয়া একখানা কাগজে একটা আঁচড় টানিয়া বলিল—"উঁহু, হ'ল না।" তারপর দোয়াতে একটু জল দিয়া বাঁ হাতে গোটাকতক কথা লিখিয়া সে নিরাপদকে বলিল—"দেখ দেখি, কেমন হ'ল? শেষটা এক হাতের লেখা বোঝাচ্ছে তো?"

বিস্মিতভাবে নিরাপদ কহিল—"তা ত বোঝাচ্ছে; কিন্তু, কেন ব'ল দেখি?"

"বলছি। এখন 'টপ' ক'রে দেখ ত মার্টিন কোম্পানীর গাড়ী ক'টায়? থাক্; আমিই দেখ্‌ছি। এই যে সাতটা পঁচিশ মিনিটে যাবার গাড়ী, আর আস্‌বার ছ'টায় শেষ। ব্যস, কেল্লা ফতে!" সে আরও কি লিখিয়া চিঠিখানা মুড়িয়া ফেলিল; তারপর অতি সাবধানে লেটার-বক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া বলিল—"যাক্, এইবার মজাটা টের পান।"

নিরাপদ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কি কর্‌লি ভেঙেই বল্ না, ভাই?"

তাহার কাণে-কাণে নিকুঞ্জ কয়েকটা কথা বলিতেই সে হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দুই

ছাত্রদের নিত্য-কর্ম্ম প্রত্যহ দুই বেলা লেটার-বক্স দেখা, তা চিঠি থাকুক, আর নাই থাকুক;—সেটা মেসের সনাতন রীতি। তাই পত্রখানি বিকালেই ফটিকের হস্তগত হইল। পত্নীর নিমন্ত্রণ পায়ে ঠেলিবার ক্ষমতা শতকরা নিরানব্বই জন যুবকের নাই; কাজেই সেও পারিল না। সে তখন তাড়াতাড়ি কামাইতে বসিয়া গেল; তারপর ভাল করিয়া সাবান মাখিয়া স্নান সমাপনান্তে নব-কার্ত্তিকের বেশে বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় মেস হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, যাইবার সময় চাকরকে রন্ধন করিতে নিষেধ করিয়া গেল।

কল্পনা তাহাকে নাচাইতে নাচাইতে কোন্ স্বপ্নলোকে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল। ট্রামের কাষ্ঠ বেঞ্চের কথা ভুলিয়া সে অনুভব করিল,—প্রিয়ার কোমল ভুজবল্লরীর মধ্যে সে শায়িত, কত সোহাগে-আদরে-অনুরাগে ঢলিয়া পড়িয়া প্রেয়সী তাহাকে কহিতেছে—"এসেছ?"

সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না;—ট্রামের ঝাঁকুনিতে মাথা ঠোকা গিয়া তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তখন সে একটু সজাগ হইয়াই রহিল। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া জীবনবল্লভপুরের একখানা টিকিট কিনিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে বসিয়া মহা আগ্রহে সে ট্রেণের অপেক্ষা করিতে লাগিল। দুর ছাই, এ লাইনটার দশাই এই; না আছে কোন সময়ের ঠিক্, না আছে কিছু;—আরঃঘড়িটাও বলে আমায় দেখ।

যাক্, গাড়ী আসিলে সেও একটা কামরায় গিয়া

উঠিয়া বসিল। আবার চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসিল ;—এখনও ছয় মাস হয় নাই তাহার বিবাহ হইয়াছে এবং মাত্র সে দুইবার শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিয়াছে।—তন্বী ভার্য্যার সুখ-স্মৃতি তাহার হৃদয়টাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। শালীদের অম্ল-মধুর পরিহাসের সহিত আরও কাহার সুন্দর মুখের সুমিষ্ট কথা তাহাকে উন্মনা করিয়া দিল। সে পত্রখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার শেষ অংশটা আপন মনে বার বার পাঠ করিতে লাগিল।

তিন

সে যখন জীবনবল্লভপুরে পৌঁছিল, তখন বেশ রাত্রি হইয়াছে। একে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার, তাহার উপর আকাশে মেঘ জমিয়াছে ; কোলের মানুষ দেখা দায়। ষ্টেশনে তেলের আলো মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল ; তবে তাহা অন্ধকার দূর করিবার জন্য নয়, বৃদ্ধিরই উদ্দেশে।

কোথায় লোক ? যাত্রীর মধ্যে সেই একা, আর লোকের মধ্যে ষ্টেশন মাষ্টার ;—টিকিট কালেক্টর, বুকিং-ক্লার্ক একাধারে নানাগুণবিশিষ্ট পুরুষপুঙ্গব। সে রিষ্ট-ওয়াচটায় চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল,—রাত প্রায় দশটা। আর একবার বিফল আশায় সে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল ;—কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না ;—বরং মাষ্টারবাবু তখন দুয়ারে তালা দিতেছিলেন।

সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মশাই ভুব—"

অর্দ্ধ-সমাপ্ত কথাটাতেই রেলের হুজুর জবাব দিলেন, "হাঁ, হাঁ, ও দিকে রশিভোর গেলেই পাবে।"

সে আর কি জিজ্ঞাসা করিতে গেল, কিন্তু বড় প্রভু তাহার উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন না ; দ্রুতপদে আপনার বাসার দিকে চলিয়া গেলেন।

কল্পনার অযুত কুসুম-স্তবকে বজ্রাঘাত হইল! অগত্যা ভীত-অন্তরে ধীরে ধীরে সে গ্রামের পথে অগ্রসর হইয়া চলিল। ওঃ কি অর্ব্বাচীন সে! একবার স্ত্রীকে পাইলে হয়, তাহাকে দেখিয়া লইবে ; আর সকলকেই উচিত মত শিক্ষা দিয়া তবে ছাড়িবে! সেদিন যদি আর ট্রেণ থাকিত, তবে সে নিশ্চয়ই ফিরিয়া যাইত ;—এত বড় অপমান কখনই মাথা পাতিয়া লইত না!

পথে এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল ; অকস্মাৎ সে একজন লোকের ঘাড়ের উপর পড়িয়া গেল। লোকটা তাহাকে এমন জোরে ধাক্কা মারিল যে, সে খানায় পড়িতে পড়িতে কোন রকমে বাঁচিয়া গেল। ওঃ, মণিমালা! পাষাণী!

দূরে একটা আলো দেখা যাইতেছিল ; সে সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ মশায়, ভুবন চাটুয্যের বাড়ী কোথা বল্‌তে পারেন ?"

গৃহ হইতে উত্তর আসিল—"জানি না, এগিয়ে জিজ্ঞেস কর। ওরে বেটা হরে, দে না দরজাটা বন্ধ ক'রে

পরমুহূর্ত্তে সশব্দে কবাট রুদ্ধ হইয়া গেল।

আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া ফটক দেখিল,—কতকগুলা লোক একটা চাতালে বসিয়া গল্প করিতেছে ; সে তাহাদের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

একজন সন্দিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল -"কোথা হতে আস্‌ছিছ, কর্ত্তা ?"

"কোলকেতা।"

"কোলকেতা হ'তি কখন আলেন ?"

"এই আস্‌ছি ; বল্‌তে পার ভুবন চাটুয্যে বাবুর বাড়ী কোথায় ?"

প্রশ্নকারী তখন উপেক্ষার সহিত বলিল—"ওই যে, ওই আলো জ্বলছে, যান্ ওইখানে গিয়ে শুধোন। ভুবন-বাবু ওইখানেই থাকেন।"

তাহার মনে আশার সঞ্চার হইল ; সে দ্রুতপদে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল।

শব্দ-তরঙ্গ ভাসিয়া আসিল—"শালা স্বদেশী ডাকাত নয় তো রে ; একবার দেখ্‌লি হতো না ? যাক্, সজাগ থাক্‌লিই চল্‌বে।

একটা বাটীর দরজার নিকট গিয়া রাত্রের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সে সজোরে কড়া নাড়িতে লাগিল।

দ্বিতলের আলোকের সম্মুখে কে ওই দাঁড়াইয়া ? সৌন্দর্য্যের আকর মণিমালা না ? বা, বা, কি সুন্দরই না তাহাকে দেখিতে হইয়াছে! সে স্নিগ্ধ অথচ নিম্নকণ্ঠে

ডাকিল—"কবাটটা খোল না মণি, আমি এসেছি!"

তাহার পশ্চাতে আর একটি মূর্ত্তি আসিয়া দেখা দিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"কে?"

ফটিক ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল,—"আমি জামাই।"

জল না কি খানিকটা আসিয়া তাহার মাথায় ঝপাৎ করিয়া পড়িল। এঃ কি দুর্গন্ধ! নিজেকে সামলাইয়া লইতে না লইতে সে শুনিল, উপর হইতে কে হাঁকিতেছে—"তেওয়ারী পাকড়ো; শালা মাতোয়ালা হায়।"

একে ত সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া কাপড়-চোপড় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর কথাটা শুনিয়া অন্তরটাও হিম হইয়া গেল। সে তখন 'যঃ পলায়তি স জীবতি'-নীতির অনুসরণ করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু হায়, সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় চাহিয়া দেখিল,—বৃথা চেষ্টা।

তেওয়ারী ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল। বলা বাহুল্য, সঙ্গে-সঙ্গে বিরাশী সিক্কা ওজনের একটা চড় বেচারীর পিঠের উপর আসিয়া পড়িল। পূর্ব্ব-পুরুষের পুণ্যবলে তাহাকে আরও ঘা কতক সহ্য করিতে হইল না; হাত তুলিয়াই ছাতু ভায়াকে নিষ্ফল আক্রোশে তাহা নামাইয়া লইতে হইল। বাবু বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"এগিয়ে এস তো চাঁদ, মুখখানা এক-বার দেখি?"

ফটিকের মনে হইতেছিল,—হে পৃথিবী দু ফাঁক হও, আমি তোমার মধ্যে আশ্রয় লই! দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের লজ্জা অপেক্ষা তাহার লজ্জা যে অনেক বেশী! কিন্তু উপায় কি? একটা হ্যাঁচকা টানেই তাহার নড়াটা ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। হায় রে, বিপদে মা ধরিত্রীও তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন!

আগন্তুক বাবুটী আলোর সাহায্যে ভাল করিয়া ফটিকের মুখখানা দেখিয়া লইয়া মনে করিলেন—না, লোকটা দেখছি অল্পদিনই টানতে শিখেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি?"

ফটিক মহা-সমস্যায় পড়িল;—তখন সত্য বলিবে, কি মিথ্যা বলিবে? মুক্তি পাইবার আশায় ও মার খাইবার ভয়ে সে ধীরে ধীরে বলিল,—"আজ্ঞে, ফটিক-চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

ভিতর হইতে কে দরজার শিকল নাড়িল। ভদ্র-লোকটী বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"তা তুমি যাও, তেওয়ারী; আমিই তার ব্যবস্থা কর্‌ছি।"

বলির পাঁঠাকে স্নান সমাপনান্তে যখন হাঁড়িকাঠের নিকট আনা হয়, তখন তাহার কণ্ঠনিঃসৃত যেমন মর্ম্মভেদী 'ব্যা ব্যা' চীৎকার শোনা যায় ফটিকেরও অন্তরের ভিতর হইতে তেমনই 'ব্যা-ব্যা' শব্দ উত্থিত হইতেছিল। ভদ্র-লোক তাহাকে টানিয়া লইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

সেখানে একটা চাপা হাসির স্রোত বহিয়া গেল। ফটিক আর মাথা তুলিতে পারিল না। ভদ্রলোকটী বলিলেন—"পাজীটার কি ব্যবস্থা করা যায় বল তো নিভা?"

একটী তন্বী দ্বারের আড়াল হইতে বলিলেন—

"বামুনঠাকুর আজ আসে নি, এখনই তেওয়ারীকে দোকানে পাঠাচ্ছিলুম, যা হোক কিছু খাবার আন্‌তে। তা ভালই হয়েছে; ভগবান্ লোক জুটিয়ে দিয়েছেন। রান্নার কাজটা ওকে দিয়েই চালিয়ে নাও না।"

সর্ব্বনাশ! বলে কি! রান্না! জীবনে যে সে কখন রান্নাঘরেই প্রবেশ করে নাই! কাতরকণ্ঠে বলিল—"আজ্ঞে, রান্না তো করতে জানি না।"

এবার কর্ত্তার বদলে গিন্নীই উত্তর দিলেন—"না বল্‌লে শুনছে কে? হাঁ, তবে যদি রান্না ভাল হয়, তা' হ'লে বেকসুর খালাস পেতে পার; নইলে—"

আর না বলিলেও ফটিক বুঝিল,—তেওয়ারীর প্রচণ্ড চপেটাঘাত! কিন্তু হায়, উপায় কি? মুখ মুছিবার ছলে সে চোখের জল মুছিয়া লইল। তাহাকে নীরব দেখিয়া যুবতী বলিলেন,—"তা আমরা একটু-আধটু দেখিয়ে দেব 'খন। এখন চট্ ক'রে ও সব ছেড়ে ফেল, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে; আর আঁস্তাকুড়-কাস্তাকুড় ঘেঁটে এসেছ তো?" বলিয়া তিনি একখানা পাছাপাড় কাপড় তাহার দিকে আগাইয়া দিলেন।

অহো কি দুর্দ্দৈব! ফটিকের স্পন্দন রহিত হইয়া

গেল। কর্ত্তা কহিলেন—"তা হ'লে আমি বাইরের ঘরে চল্‌লুম। যদি ভ্যাঁদ্‌ড়ামি করে, খবর দিও; তেওয়ারী এসে টিট ক'রে দেবে।

কাপড় ছাড়িয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া ফটিক অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তন্বী দরজার পাশ হইতে বলিলেন—"ও মা, লোকটা যেন ন্যাকা! যাও না, মণি, ধনি কর্‌তে তো খুব মজবুত, এখন হাঁড়িটা ধরো।"

ফটিকের কেমন-কেমন ঠেকিতেছিল। এ কি রকম বাড়ী রে, বাবা! মেয়েরাও যে মিলিটারী! কথাগুলোও যেন ধারাল ছুরি! কিন্তু সে-সব চিন্তার তখন সময় নয়। সে নতমুখে ভাতের হাঁড়িটা উনানে চাপাইয়া দিল।

যুবতী একটু-একটু করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ব'স না, ঠাকুর। ঘোড়ার মত কতক্ষণ দাঁড়াবে? আহা, নতুন মানুষ, ভালরকম কাজ তো জান না!"

ফটিক কোন কথা বলিল না; যেমন নীরবে দাঁড়াইয়াছিল, তেমনই রহিল। তন্বী পুনরায় বলিলেন—"দেখ দেখি, এই দুপুর রাত্তিরে ভদ্রলোকের ছেলের কি কষ্ট! মদ না হয় খেতে শিখেইছে; তা ব'লে এতটা ভাল নয়। কিন্তু কি করি ব'ল? যদি না এ কাজ দিতুম, তা হ'লে হয় ত বাবু তোমাকে আস্তাবল পরিষ্কার করতে পাঠাতেন। সেবার তোমারই মত একটা মাতাল এসেছিল; বল্‌তে লজ্জা করে, তাকে তিনটী মাস গোয়ালের কাজ করিয়ে তবে ছেড়েছিলেন।"

অত করুণাতেও যদি সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে, তবে আর কখন করিবে? তরুণীর প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার হৃদয়টা ভরিয়া উঠিল। কি ভাগ্য তাহার যে, সে সেই সুন্দরীর কৃপা লাভ করিয়াছে! তা না হইলে, ওঃ অশ্বের মল-মূত্র ইত্যাদি ঘাঁটিয়া, রাম! রাম! সে যুবতীকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল—"আপনার অসীম দয়া!"

"দয়া আর কি ঠাকুর, এ তো গেরস্থের কাজ। দোষীকে যদি কেবল সাজাই দেওয়া হয়, তা হ'লে মানুষের মহত্ত্বটা থাকে কোথায়?"

ফটিক উত্তর করিতে পারিল না, নীরবেই রহিল; মাথা তুলিয়া কথা বলিবার সামর্থ্যও বুঝি তাহার ছিল না। ভয়ে তো সে কেমন একপ্রকার হইয়া গিয়াছিলই, তাহার উপর তেওয়ারীর কথাটা মাঝে-মাঝে মনে পড়ায় তাহাকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে যুবতী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আমার কিন্তু তোমায় বড় পছন্দ হয়েছে, ঠাকুর। ও কি! ও রকম ক'রে কেন গড়ায় না; হাতে লাগ্‌বে যে। তার চেয়ে বরং আমিই গড়িয়ে দি। এখন তো আর কেউ আস্‌বে না,—জান্‌তেও পার্‌বে না।"

ফটিক ভয়ে-ভয়ে কহিল—"আজ্ঞে, না থাক্; আমিই গড়াচ্ছি।"

কিন্তু তন্বী সে কথায় কাণ দিলেন না; তাহাকে মৃদু ঠেলা দিয়া সরাইয়া বলিলেন—"ব'স; আহা, পুরুষ মানুষ পার্‌বে কেন? তবে মনে রেখো,—প্রেমের খেলা খেলতে গেলে রান্নাটা তার প্রধান গুণ। নায়িকার মূর্চ্ছা রোগ-টোগও ত থাক্‌তে পারে; উপোসটা অবিশ্যি সইবে না। সেই সময় বুঝেছ কি না, খাইয়ে-দাইয়ে দিতে হ'তে পারে।" বলিয়া তিনি হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ফটিক মরমে মরিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। যুবতী পুনরায় বলিলেন—"তা সত্যি ঠাকুর-মশায়, তুমি বেশ সুন্দর;—বল্‌তে কি—"

কথাটা আকুল-আগ্রহে শুনিবার জন্য ফটিক মুখ ফিরাইতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল,—কে জানে, রমণী হয় তো ছলনাময়ী; ছল করিয়া আবার তাহাকে বিপদে ফেলিতে পারে। তাহা হইলেই অদৃষ্টে আবার তেওয়ারীর প্রহার; বাপ্, সে আর ফিরিল না, ভয়ে কাঠ্ হইয়া রহিল।

তন্বীই সমস্ত রান্না শেষ করিলেন; তবে মাঝে-মাঝে টিট্‌কারী করিতেও ছাড়িলেন না। কর্ত্তাবাবু রান্না খাইয়া রাঁধুনীকে তারিফ্ দিলেন; গিন্নীও 'সার্‌টিফাই' করিলেন,—মন্দ রাঁধে না। তিনি তখন ফটিককে অন্যান্য কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য কর্ত্তাকে অনুরোধ করিলেন। "তবে পা টেপাটা ত আর বিশেষ কাজ নয়; খেয়ে-দেয়ে তা না হয় কর্‌বে 'খন।"

কর্ত্তা বলিলেন, "না, না, ও সব হ'বে না; তোমার

যেমন স্বভাব, মাতালের ওপর আবার দয়া। ভাবছিলুম—"

"না গো, না, ব্রাহ্মণের ছেলেকে আর আস্তাবলে পাঠায় না; গেরস্তর অকল্যাণ হবে যে। আমার মিনতি ওকে ছেড়ে দাও।"

নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত কর্ত্তা বলিলেন—"আচ্ছা অমন ক'রে যখন বল্‌ছ, তখন আর কি করি বল? তবে তুমি যেন আমায় কাঁদিও না।"

গ্রীবা হেলাইয়া যুবতী বলিলেন—"যাও, তুমি বড় ইয়ে; ও মাতাল যে!"

* * * *

তন্বী বলিলেন—"এস, খাও সে।"

ফটিক অবাক্ হইয়া গেল; মাথা নত করিয়া বলিল, "আজ্ঞে খিদে নেই।"

"সেও কি একটা কথা। খাবে এস; নইলে যাই বল্‌তে। সেই যে বলে, কিসের ঢেঁকি, কিসে ওঠে!"

আর আপত্তি করিবার সাহস বেচারীর রহিল না; তবে সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, খাওয়াইবার রকম দেখিয়া, —বাটীর জামাই বুঝি তত আদর পায় না! ব্যাপারটা হেঁয়ালী বলিয়াই তাহার মনে হইল। তবে রমণী-হৃদয় বোঝা যায় না, তাই যা!"

আহার শেষ করিয়া সে অনুমতির অপেক্ষায় আসিয়া দাঁড়াইল। যুবতী তাহাকে একটী ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন—"এই খানে থাক। একজন বেতো রোগীর পা টেপান অভ্যাস, সময় মত টিপ্‌তে হবে।"

হায় রে, ভাগ্য! ধনবান্ গৃহস্থের সন্তান সে; তাহার পা টিপিবার জন্য কত লোক ব্যাকুল, আর সে কি না আজ হেয় চাকরের ন্যায়…! খাটের পায়াটায় মাথা রাখিয়া সে আপন মনে কত কি চিন্তা করিতে লাগিল। অবসাদে তাহার চক্ষুদ্বয় জড়াইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিল, তন্বী বলিতেছে—"কি গো, ঘুমোও যে? যাও, ওই বিছানায় রোগী আছে, পা টেপো গে; আমি ততক্ষণ একটা কাজ সেরে আসি। কিন্তু ফিরে এসে যদি দেখি চুপ ক'রে আছ, তা হ'লে ভাল হবে না বল্‌ছি।"

ফটিক একটা মর্ম্মভেদী নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে পালঙ্কের দিকে অগ্রসর হইল। পরক্ষণে হোহো হাসির শব্দে শিহরিয়া উঠিয়া সে শুনিল—"ছি, ছি, তুমি কি হ'লে ব'ল ত?"

এ্যাঁ! এ স্বর যে,—না, না, ভ্রম! সে পুনরায় অগ্রসর হইতে গেল, তখন একটী ষোড়শী উঠিয়া বসিয়া তাহার অঙ্গের আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিল। ফটিক অবাক-বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল,—সত্যই মণিমালা।

মণিমালা তখন তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল।

সে ডাকিল—"মণি!"

মণিমালা উত্তর দিল,—"কি?"

"এ কি হ'ল?"

"কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! তবে তোমায় যে লিখেছি, দু-চার দিন আমাদের এক জায়গা যাবার কথা আছে, তা সে এখানেই। কিন্তু কাল তোমায় চিঠি দেবার পরেই হঠাৎ মামাবাবু গিয়ে আমাদের জোর ক'রে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে এসেছেন। আমার মামাত ভায়ের বিয়ে কি না; তাঁদের দেখ্‌বার-শোন্‌বার লোকের একান্ত অভাব। আমার চিঠি পেয়েছিলে?"

"হাঁ, এই যে সঙ্গেই রয়েছে।"

"প্রিয়তম,

বহু দিন তোমার কোন সংবাদ না পাইয়া বড়ই ভাবিত আছি; পত্রপাঠ মাত্র উত্তর দিবে। আমাদের দু'-চার দিন এক জায়গায় যাইবার কথা আছে; যদি যাওয়া হয়, পরে জানাইব। মা, বাবা সকলেই ভাল আছেন। তোমার কুশল-সংবাদ দানে সুখী করিবে। ইতি,

চরণাশ্রিতা
মণি

পুঃ—ভাল কথা, বাবা জীবনবল্লভপুরে বদলী হইয়াছেন। তুমি একবার এখানে আসিতে পারিলে বড় ভাল হয়; না, না, নিশ্চয়ই এস। আগামী কল্য রাত্রে ষ্টেশনে লোক থাকিবে।

মণি"

মণিমালা বিস্মিত হইয়া কহিল—"বা রে, এ সব কে লিখলে ? দেখি; ও মা এ তো আমার হাতের লেখা নয়! তা ছাড়া আমরা যে এখানে এসেছি, লোকটাই বা জানলে কেমন ক'রে ?"

ফটিক আশ্চর্য্য হইয়া র অক্ষরগুলি ভাল করিয়া মিলাইতে মিলাইতে বলিয়া উঠিল—"তাই তো এ যে বড় সমস্যা দেখ্‌ছি! কে এ লিখ্‌লে!"

"আমি কেমন ক'রে জান্‌ব? হঠাৎ জামাইবাবু দিদির বড় অসুখ করেছে ব'লে এইমাত্র আমায় মামার বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে ত তোমার জানাশোনা নেই; আমার বিয়ের সময় জামাই-বাবুর বড় ব্যায়রাম, তাই দিদিরা কেউই যেতে পারেন নি। এখন এখানকার ঘটনাটা ব'ল ত ?"

এতক্ষণে আগাগোড়া ব্যাপারটা জল হইয়া গেল। আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া ফটিক বলিল—"কিন্তু তেওয়ারীর মারটা এখনও—"

মণিমালা স্বামীর পিঠে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল, "আহা! বড় লেগেছে, না ?"

তাহার অশ্রুজলে ফটিকের সমস্ত ব্যথা ধুইয়া-মুছিয়া গেল। তখন বাহির হইতে শব্দ আসিল—"কি ঠাকুর, টিপ্‌ছ তো ? বেতো রোগী, সাবধান!"

* * * *

ফটিকের কিন্তু আর সেখানে থাকিবার মত ধৈর্য্য রহিল না। মুখরা নিভাননার চোখা-চোখা বাক্য-বাণের ভয়ে এবং সকলের বিদ্রূপের আশঙ্কায় সে পরদিন ভোর ৫টার ট্রেণেই কলিকাতা রওনা হইয়া পড়িল। মেসে যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন বেলা প্রায় সাড়ে আটটা। যাক, সেখানে যে কেহ তাহার দুর্দ্দশার কথা জানিতে পারে নাই, তাহাই পরম রক্ষা! ভগবান্ কিন্তু তাহাতেও বাদ সাধিলেন। মধ্যাহ্নে আহারের সময় কথাগুলা হঠাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িল। ফটিক কাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল,—"কেও, তেওয়ারী না ? সেই ত বটে! সে কোন কথা বলিবার পুর্ব্বেই তেওয়ারী কহিল,—"আজ্ঞে, মাপ কর্‌বেন বাবু, কাল যে মারধোর করেছিলুম, বড় কসুর হ'য়ে গেছে!"

ফটিক বাধা দিয়া বলিল, "কি পাগলের মত বক্‌ছ ? নেশা—টেশা—"

"আজ্ঞে নেশা ত কিছুই করি না হুজুর। কাল বাবু বল্লেন, তাই চড়টা-চাপড়টা,—আর রান্নাবান্নার জন্তেও তিনি দুঃখ করছিলেন। বাবু এই এলেন ব'লে।"

মেসের সকলেই সরল তেওয়ারীর নিকট একটু একটু করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া হোহো করিয়া হাসিতে হাসিতে খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া গেল। সব-চেয়ে বেশী হাসিল,—নিকুঞ্জ ও নিরাপদ।

ফটিক রাগিয়া কহিল—"এমন ছাতুখোর দেখি নি, বেটা এখানেও পেছু নিয়েছে!"

তাহার ভায়রাভাই সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"যাই হোক্, পালান চল্‌বে না কিন্তু; বড় না হ'লে মাপ্‌ চাইতুম—দেখ ভাই তোমার দিদির কাছ থেকে, না হোক মণির কাছ থেকে সবই শুনেছি—এক বেটা মাতালের জ্বালায় জ্ব'লে ঐ রকম কর্‌তে হয়েছে—আজ এখানে নেমন্তন্ন খেয়ে, তোমাকে নিয়ে না গেলে গিন্নীর কাছে আর রক্ষে নেই। এখন দোহাই ভাই সব দিক বজায় রেখে চল।

ফটিক তখন ভাবিতেছিল, নাছোড়-বান্দা আসল পেয়েও সন্তুষ্ট নয়—আবার সুদের আশায় এতদূর ধাওয়া করেছেন! যাহা হউক কাষ্ট হাসি হাসিয়া ফটিক বলিল—"সে কথা আবার আপনাকে বল্‌তে হবে ? আপনাকে দেখ্‌বামাত্র, এ গরীবদের মেসে আপনাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করা যেতে পারে তাই মনে মনে ঠিক কর্‌ছিলাম।"

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ও বহুপত্যাত্মক-বিবাহ

[শ্রীনীহাররঞ্জন মিত্র বি-এ]

সমগ্র মহাভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা হইতেছে, একা দ্রৌপদীর পঞ্চপাণ্ডবের সহিত বিবাহ। সতীত্বধর্ম্মের প্রতি হিন্দুজাতির প্রগাঢ় অনুরাগ জগদ্বিখ্যাত। এই জাতির একপতিগতপ্রাণা রমণীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর সহাস্যমুখে স্বামীর চিতাগ্নিতে প্রাণবিসর্জ্জন দিতেন। সেই হিন্দুজাতির রমণীরত্ন দ্রৌপদী এককালে পাঁচটী ব্যক্তিকে বিবাহ করিলেন, ইহা যেমন বিস্ময়কর তেমনই অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, চন্দ্রবংশের ন্যায় লোকখ্যাত পবিত্র বংশে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণের দ্বারা এই অত্যন্ত নীতি-বিগর্হিত কার্য্য সাধিত হইয়াছিল এবং মহাভারতের ন্যায় পবিত্র গ্রন্থে তাহা স্থান পাইয়াছে। আপাত-দৃষ্টিতে ব্যাপারটীকে এতই কুৎসিত বলিয়া মনে হয় যে, শুনিবামাত্র নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ শিহরিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিবেন এবং সভ্যসমাজ ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিবে। এক স্বামীর বহুস্ত্রীগ্রহণের কথা সকলেই জানেন, কিন্তু এক স্ত্রীর বহুস্বামী, এরূপ অসম্ভব ব্যাপার সভ্যজগতে সুদুর্লভ।

কেহ কেহ এই ব্যাপারের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান। তাঁহারা বলেন, দ্রৌপদীর পঞ্চপাণ্ডবের সহিত বিবাহ হইয়াছিল ইহা কবির কল্পনা মাত্র, প্রকৃত ঘটনা নহে। তিনি প্রকৃত পক্ষে সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের মহিষী ছিলেন, অপর চারি পাণ্ডবের সহিত তাঁহার বিবাহের কথা সত্য নহে।

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র এই দলভুক্ত। তিনি বলেন, দ্রৌপদী প্রকৃতপক্ষে সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের পট্টমহিষী ছিলেন, অপর চারি পাণ্ডবের সহিত তাঁহার বিবাহ কবির মনগড়া কথা মাত্র। মহাভারতকার কেন এইরূপ অসম্ভব কল্পনা করিলেন তাহার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাসঙ্গ ধর্ম্মের মূর্ত্তি স্বরূপিণী; তৎস্বরূপে তাঁহাকে স্থাপন করাই কবির উদ্দেশ্য" (দ্রৌপদী দ্বিতীয় প্রস্তাব—বিবিধ প্রবন্ধ)।

মহাভারতের যে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং মহাভারতের মেরুদণ্ডস্বরূপিণী দ্রৌপদীর বিবাহ-ব্যাপারটীকে নিতান্ত কবির কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। যুক্তি এবং প্রমাণের দ্বারা ইহার সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, যদি দ্রৌপদীকে অনাসঙ্গ ধর্ম্মের মূর্ত্তি স্বরূপিণী করিবার ইচ্ছাই কবির ছিল এবং দ্রৌপদী যদি পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী না হইয়া একা যুধিষ্ঠিরেরই পত্নী ছিলেন, তবে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে লাভ করিলেন কি উপায়ে? মহাভারতের কোথাও এমন উল্লেখ নাই যে, যুধিষ্ঠির একা তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; বরং এরূপ উল্লিখিত আছে যে, বীর্য্যশুল্কা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুন স্বীয় বীর্য্যবলে লাভ করিলে মাতার ভ্রমাত্মক আদেশে এবং মহর্ষি ব্যাসের যুক্তিতে পাঁচ ভাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন।

স্বয়ম্বর সভায় লক্ষ্যভেদ করিয়া বীর্য্যপরীক্ষা দিতে যুধিষ্ঠির অগ্রসর হন নাই। তবে তিনি কনিষ্ঠের বীর্য্যলব্ধ রমণীকে আত্মসাৎ করিলেন কোন্ যুক্তিবলে? তিনি কি দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনের দান স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন? ইহা কি তাঁহার ন্যায় আদর্শ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পক্ষে সম্ভব এবং তদানীন্তন ভারত-সম্রাটের পক্ষে সম্মানজনক? আর যদি লক্ষ্যভেদ করিলেন অর্জ্জুন, এবং দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন যুধিষ্ঠির, তবে দ্রুপদের প্রতিজ্ঞার মূল্য রহিল কি? লক্ষ্যভেদ ব্যাপারটী একটী তুচ্ছ প্রহসনে পরিণত হইল না কি?

উপরি উক্ত মতের আর একজন সমর্থক হইতেছেন Mr. Dahlmann. তিনি বলেন যে, পাঁচজন স্বামীর সহিত দৌপদীর বিবাহ কাল্পনিক। তৎকালে একান্নভুক্ত পরিবারই সমাজের আদর্শ ছিল। যাহাতে পাণ্ডবদের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ না ঘটে ("ভেদভয়াৎ") সেইজন্য পঞ্চভ্রাতার একপত্নী। তিনি আরও বলেন যে একান্নভুক্ত পরিবারে সমস্ত দ্রব্যই (এমনি কি স্ত্রীপর্য্যন্ত?) যে

অবিভাজ্য তাহাই দেখাইবার জন্য দ্রৌপদীর বহুপত্যাত্মক বিবাহ পরিকল্পিত হইয়াছে।

তাঁহার মতটি যে কতদূর হাস্যকর এবং অজ্ঞতার পরিচায়ক তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না। তুচ্ছ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ বন্ধ করিবার জন্য যে একজন স্ত্রীলোক এককালে একাধিক স্বামীকে বিবাহ করিবে, এরূপ উদাহরণ হিন্দুসমাজে তো দূরের কথা সমগ্র সভ্য-জগতে কোথাও বোধ হয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সতীধর্ম্মের প্রতি হিন্দু রমণীগণের ঐকান্তিক অনুরাগের কথা যিনি বিন্দুমাত্রও অবগত আছেন তিনিই এই যুক্তির অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। একস্ত্রীর অঞ্চলে একাধিক ভ্রাতাকে বাঁধিয়া ভ্রাতৃবিচ্ছেদ নিবারণ Dahlmann সাহেবের নিজের দেশে চলিলেও চলিতে পারে কিন্তু এদেশে যে উহা একেবারেই অচল তাহা বলাই বাহুল্য।

তাঁহার দ্বিতীয় মতের অসারতা তাঁহারই একজন স্বদেশবাসীর উক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিব। Mr. Winternitg তাঁহার Polyandry in the Mahabharat শীর্ষক প্রবন্ধে একস্থানে লিখিয়াছেন, "একান্নবর্ত্তী পরিবারের সাধারণ সম্পত্তি যে অবিভাজ্য, উহাই উদাহরণের দ্বারা প্রদর্শনের নিমিত্ত দ্রৌপদীর বহু পত্যাত্মক বিবাহ পরিকল্পিত হইয়াছে Mr Dahlmann এর এই অনুমানটী আরও কল্পনামূলক। (মহাভারতের) উল্লিখিত অংশ পাঠ করিলেই নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারা যায় যে গল্পটী একব্যক্তির দ্বারা লিখিত নহে। বিশেষতঃ যে অধ্যায়ে পঞ্চ-ইন্দ্রের উপাখ্যান রহিয়াছে ঐ অধ্যায়টী এক অপরিপক্ক ব্যক্তির দ্বারা সংগৃহীত নানা উপাখ্যানের বিক্ষিপ্ত অংশ-সমষ্টি মাত্র।.................... অপরিহার্য্যরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, মৌলিক মহাভারতে দ্রৌপদীর বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রকৃত ঘটনারূপে বিবৃত করা হইয়াছিল। পরন্তু কোন কারণ দর্শাইয়া ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করা হয় নাই।" [................ but even more fanciful is Mr. Dahlmann's next hypothesis that tne polyandnric marriage of Droupadi was only invented in order to illustrate symbolically the indivisibility of the common property belonging to the joint-family. Any body who only reads the passage in question must see that the story cannot be the work of one hand and more specially the chapter in which the Panchendropakhyan (পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যান) occurs, is nothing but a collection of fragments of stories patched together by a very unskilled hand. Even the shortest epitome will show how numerous the inconsistencies are which occur in the stories relating to Draupadi's marriage...............The conclusion is inevitable that the original Mahabharat related the polyandric marriage as a fact without any attempt to explain it away. (Journal of the Royal Asiatic Society 1897. pp 754)]

আমাদেরও মনে হয়, দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী ছিলেন, ইহাই প্রকৃত ঘটনা, তিনি একা যুধিষ্ঠিরের মহিষী ছিলেন একথা সত্য নহে। কারণ তাহা হইলে মহাভারতকার কখনই এত বড় একটা কুৎসিত এবং দুর্নীতিমূলক বিষয়কে কল্পনাও স্থান দিতেন না বা লিখিতে সাহস করিতেন না, অথবা তিনি করিলেও পরবর্ত্তী লেখকগণ কখনই ইহাকে নিষ্কৃতি দিতেন না।

মহাভারতে দ্রৌপদীর বহুপত্যাত্মক বিবাহের কৈফিয়ৎ স্বরূপ যতগুলি গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে তন্মধ্যে তিনটী প্রধান। (১) কুন্তীর ভ্রমাত্মক আদেশ, (২) পঞ্চ-ইন্দ্রের উপাখ্যান এবং (৩) যে ঋষিকন্যা মহাদেবের নিকট পুনঃ পুনঃ পতি-প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহার উপাখ্যান। শেষোক্ত দুইটী উপাখ্যান, সুতরাং সহজেই অবিশ্বাস্য, কিন্তু প্রথমটিকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

ঘটনাটী যতদূর সম্ভব মনে হয় এইরূপ :—দ্রৌপদীকে লইয়া পঞ্চভ্রাতা কুম্ভকার-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ভীম উচ্চৈঃস্বরে গৃহাভ্যন্তরস্থা মাতাকে বলিলেন যে, আজ তাঁহারা এক বিচিত্র ভিক্ষা আনিয়াছেন। কুন্তীদেবী দ্রৌপদীকে না দেখিয়াই বলিলেন, "তোমরা পাঁচ ভ্রাতায় ভাগ করিয়া লও।" পরে কুন্তি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন বটে কিন্তু সমস্যায় পড়িলেন পাঁচ ভাই। কি করিয়া মাতৃবাক্য পালিত হয়? সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির যাহাতে মাতার বাক্য অসত্যে পরিণত না হয় অথচ কোনরূপ ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিতে না হয় সেজন্য অর্জ্জুনের সম্মতিক্রমে

পঞ্চভ্রাতায় মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু আপত্তি করিলেন দ্রুপদরাজ। তিনি বলিলেন, এরূপ বিবাহ অশাস্ত্রীয় সুতরাং অধর্ম্মজনক। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলিলেন যে, ইহা অধর্ম্ম নহে। কিন্তু দ্রুপদ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। এই সময়ে মহর্ষি ব্যাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য সমর্থন করিলেন এবং দ্রুপদকেও বুঝাইলেন যে ইহা অধর্ম্ম নহে।

> অনৃতং মোক্ষসে ভদ্রে ধর্ম্ম চৈষঃ সনাতনঃ।
> নতু বক্ষ্যামি সর্ব্বেষাং পাঞ্চাল শৃণু মে স্বয়ম্॥
> যথায়ং বিহিতো ধর্ম্মো যথাচায়ং সনাতনঃ।
> যথা চ প্রাহ কৌন্তেয় স্তথা ধর্ম্মো ন সংশয়ঃ॥

দ্রৌপদীর এককালে বহুস্বামি-গ্রহণ তৎকালে একেবারে আকস্মিক এবং নূতন ঘটনা নহে। কারণ, এরূপ প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, মহাভারতে যে সময়ের কথা লিখিত আছে তাহার পূর্ব্বেও কোন কোন প্রদেশে এবং কোন কোন বংশে বহু পত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত ছিল। সুতরাং সেই নজিরের বলেই পাণ্ডবগণ মাতার বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। John Muir তাঁহার "On the question whether polyandry existed in the Northern Hindusthan" শীর্ষক প্রবন্ধে এই কথাই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "দেখা যাইতেছে যে কুন্তী প্রথমে ভ্রমবশতঃ দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চভ্রাতার মিলনের অনুমতি দিয়াছিলেন এবং যদিও ব্যাপারটীকে ব্যাখ্যা এবং সমর্থন করিবার জন্য নানা অস্বাভাবিক গল্পের অবতরণা করা হইয়াছে তথাপি স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত প্রথারূপে ইহার বৈধতা যুধিষ্ঠির ও ব্যাস উভয়েই দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করিয়াছেন। [It appears that Kunti is represented as having at first sanctioned the union of five brothers with Droupadi only by a mistake and although supernatural occurences are introduced to explain and justify the transaction, its lawfulness as a recognised usage practised from time immemorial, is also affirmed both by Judhisthira and Vyas. (Indian Antiquary 1877 pp 262)]

মহাভারতে বর্ণিত যুগের পূর্ব্বেও যে বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত ছিল তাহাই প্রমাণ করিতে গিয়া M. Winternitz লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমানকালের ন্যায় প্রাচীন কালেও যে ভারতবর্ষে বহুপত্যাত্মক বিবাহ একেবারে বিধিসঙ্গত সামাজিক অনুষ্ঠানরূপে প্রচলিত না থাকিলেও কোন কোন প্রদেশে এবং কোন কোন বংশে প্রচলিত ছিল তাহার আরও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৭,৩ সংখ্যক শ্লোকের ("কুলায় হি স্ত্রী প্রদীয়ত ইতি উপদিশন্তি") অর্থে বহুপত্যাত্মক বিবাহ অথচ ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ না বুঝাইলেও বৃহস্পতির ২৭ অধ্যায়ের ২০ সংখ্যক শ্লোকে ইহার সন্দেহ দূর করে। ঐ শ্লোকে লিখিত আছে যে, একটি বিবাহযোগ্যা কুমারীকে একটি পরিবারে সম্প্রদান করিবার প্রথা অন্যান্য দেশে দৃষ্ট হইলেও উহা নিষিদ্ধ।" [And we have other historical evidence proving that polyandry existed, as it exists now, in India not indeed as a general legal institution but as a local or tribal custom. Apastamba (Dharmasutra, ii,27 3) may or may not refer to polyandry or"phratbiogamy but there can be no doubt about Brihaspati xxvii, 20 (Sacred Books of the East. vol xxxiii, pp 389) where the delivery of a marriagable damsel to a family is mentioned as a forbidden practice found in other countries. [Journal of the Royal Asiatic Society. 1897, pp 754.)]

Th. Goldstucker মনে করেন, প্রাচীন কালেও যে বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত ছিল দ্রৌপদীর পঞ্চপাণ্ডবের সহিত বিবাহ তাহারই ঐতিহাসিক প্রমাণ।

এখন দেখিতে হইবে, প্রাচীনকালে বহু পত্যাত্মক বিবাহ কেবল মাত্র অনার্য্য জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কি না। তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে দ্রৌপদীর এইরূপ বিবাহ কখনই সম্ভব হইত না এবং যুধিষ্ঠিরও ইহাকে ধর্ম্ম বলিতেন না অথবা ব্যাসদেবও ইহাকে সমর্থন করিতেন না। বরং দ্রুপদের আপত্তি খণ্ডনার্থ ব্যাসদেব ইহাকে প্রচলিত রীতি বলিয়াছেন।

বহু পত্যাত্মক বিবাহ যে পৌরাণিক যুগেও প্রচলিত

ছিল তাহারও প্রমাণ আছে। জটিলা গৌতমীর সাত জন ঋষির সহিত বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে। (আদি পর্ব্ব, ১৯৬ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ভাগবৎ পুরাণের ৬ষ্ঠ স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে উল্লিখিত আছে যে "বার্ক্ষী" (বৃক্ষোৎপন্না) নাম্নী এক জন ঋষি কন্যার দশ জন ভ্রাতার সহিত বিবাহ হইয়াছিল।

বস্তুতঃ বহুপত্যাত্মক বিবাহ অনার্য্যদের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত থাকিলেও আর্য্য-সমাজে উহা একেবারে অচল ছিল না। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রাহ্মণ-গণ এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এমন কি জনসাধারণ পর্য্যন্ত এই প্রথার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা দায়ে পড়িয়া অথবা কোন কারণবশতঃ এরূপ বিবাহ করিতে বাধ্য হইতেন তাঁহারা সমাজে একেবারে অপাক্তেয় হইতেন না। সেইজন্যই বোধ হয় পাণ্ডবদের এইরূপ বিবাহে এক দ্রুপদরাজ ব্যতীত আর কেহ আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। কুরুপিতামহ ভীষ্ম, মহামতি দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণও কোনরূপ প্রতিবাদ করেন নাই।

Prof. Jolly লিখিয়াছেন যে কুমায়ুন প্রদেশে group-marrige অর্থাৎ পাণ্ডবদেরই মত কয়েক ভ্রাতায় মিলিয়া একপত্নীকে বিবাহ করিবার রীতি ব্রাহ্মণ, রাজপুত এবং শূদ্রদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে প্রাচীন কালে বহুপত্যাত্মক বিবাহ কেবল মাত্র অনার্য্য জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল একথা বলা যায় না। (Jolly, Retche und Sitte. i. c. pp 48.)

পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইন্দ্রজিৎ Jolly সাহেবের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বলেন, "In Kumaun between the Tons and Jamuna about Kalsi, the Rajputs, Brahmans and Sudras all practice polyandry, the brotners of a family all marrying one wife, like the Pandavas. The children are all attributed to the eldest brother. (Indian Antiquary 1879 pp. 88.)

পঞ্জাবের জাঠদের মধ্যেও বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধে C. S. Kirkpatrick লিখিয়াছেন যে, "কোন জাঠ সঙ্গতিপন্ন হইলে নিজের প্রত্যেক পুত্রকে এক একটী কুমারীর সহিত বিবাহ দেয়, কিন্তু যদি কাহারও প্রত্যেক পুত্রের বিবাহের ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য না থাকে তবে সে কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেয় এবং ঐ বধূ তাহার দেবরগণকেও উপ-পতি (co-husband)-রূপে গ্রহণ করে। ইহাতে সমাজে কোনরূপ আপত্তি উঠে না।" (Indian Antiquary 1878 pp. 86.)

পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন যে, তিনি ভ্রমণ ব্যপদেশে গঙ্গোত্রীতে উপস্থিত হইলে একটি বহুপত্যাত্মক-বিবাহ-পরায়ণ পরিবার দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহারা হিন্দু। গৃহস্বামিনী পরমাসুন্দরী এবং নিষ্ঠাবতী রমণী। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবং তাঁহার সঙ্গিগণ ঐ পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করিলে ঐ রমণী প্রাচীন হিন্দু-আচার অনুসারে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া অতিথি সৎকার করিয়াছিল। ঐ মহিলাটির সাত জন স্বামী ছিল। গঙ্গোত্রী-অঞ্চলে বহুপত্যাত্মক বিবাহ এখনও প্রচলিত আছে।

পৃথিবীর কোন কোন দেশে এবং ভারতের কোন কোন প্রদেশে আজ পর্য্যন্ত বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত আছে।

হিমালয়ের অধিবাসী কুলুদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে কয়েক ভ্রাতায় মিলিয়া একটি স্ত্রীকে বিবাহ করিলে ঐ রমণী প্রথম মাসে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠের, দ্বিতীয় মাসে দ্বিতীয় ভ্রাতার এইরূপে এক এক মাসে এক এক ভ্রাতার পত্নীরূপে গণ্য হয়।

হোয়েটেনট্, ডামারা, মিরি, ডোফ্‌লা, বুতিয়া, সিসী আবর (Sisee Abor,) খাসিয়া, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে এবং সিউয়ালিক পর্ব্বতে, সিরমুরে, থাদাখে, বাওয়ার এবং জৌনসারের পার্ব্বত্য প্রদেশে, কুনোয়ারে, কোটেপেড়ে, তিব্বতে, আরবে, সাইবেরিয়ার পূর্ব্বাংশে এবং আরও অনেক স্থানে বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত আছে। (E. Wesrermarck, History of Human Marriage. pp. 452—3.)

সিংহলেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু ইউরোপীয় দিগের প্রযত্নে এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এক রাজকীয় নিষেধাজ্ঞার বলে এই প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে দমন হইলেও

একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন বৃটনদের সম্বন্ধে Julius Cæsar লিখিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে একই স্ত্রীলোকের দশ বার জন স্বামী। ভ্রাতায়-ভ্রাতায় এমন কি পিতাপুত্রে একই স্ত্রীলোককে পত্নীরূপে গ্রহণ করে।

পত্নীর স্বামিগণ ভ্রাতৃসম্বন্ধ-যুক্ত হইলে ঐরূপ বিবাহকে "তিব্বতীয় বহুপত্যাত্মক বিবাহ" কহে। ইহার কারণ ঐ প্রথা তিব্বতেই অধিক প্রচলিত। চীন হইতে কাশ্মীর ও আফ্‌গানিস্থানের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে এই প্রথা প্রচলিত আছে। পৃথিবীতে যে সকল জাতির মধ্যে বহু-পত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে নায়র, খাসিয়া, এবং সাপ্‌রোজীয় কোসাক্ জাতি ছাড়া আর সকলের মধ্যেই তিব্বতীয় প্রথা প্রচলিত।

তিব্বতীয় প্রথায় সর্ব্বাগ্রজ ভ্রাতা পত্নী-নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করে এবং তৎকর্ত্তৃক বিবাহিতা পত্নীই অপরাপর ভ্রাতার পত্নী বলিয়া পরিগণিত হয়। জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী, সম্পত্তি এবং প্রভুত্ব পরবর্ত্তী ভ্রাতা প্রাপ্ত হয়। যে সকল সন্তান জন্মে তাহারা মাতার পতিদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠকে পিতৃসম্বোধন করে এবং তাঁহার ভ্রাতাদিগকে খুল্লতাত বলে, কোথাও বা সকলকেই পিতা বলে।

মালাবারের নায়রদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রথায় নায়র যুবক-যুবতী বিবাহের চারি পাঁচ দিন পরে পরস্পর হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয় এবং ঐ যুবতী পরে বিবাহিত পতি ভিন্ন অপর যে কোন পুরুষকে বরণ করিতে পারে। সাধারণতঃ নায়ররমণীদের স্বামিসংখ্যা চারিটি হইতে বারটি পর্য্যন্ত দেখা যায়। এই সকল পতিগণের কোনরূপ জ্ঞাতি সম্বন্ধ থাকে না।

মহীশূরের কুর্গজাতির মধ্যে প্রচলিত প্রথায় জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার বিবাহিতা পত্নী যেমন তাহার ভ্রাতাদেরও পত্নীত্ব প্রাপ্ত হয় তেমনি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্বামিগণ তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীদেরও পতিত্ব প্রাপ্ত হয়। নীলগিরির তোড়াজাতিও এই প্রথা অনুসরণ করে।

হাসিনিয়ে আরবদের মধ্যে প্রচলিত প্রথায় কন্যা কোন্ কোন্ দিন বরের পত্নী থাকিবে তাহা বিবাহের সময় নির্দ্দিষ্ট হয়। ছুটির দিনে সে ইচ্ছামত অন্য যে কোন পুরুষকে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। গুয়ানা-জাতির বিবাহ প্রথাও অনেকটা এইরূপ।

দক্ষিণ ভারতে রেদ্দি জাতির-মধ্যে প্রচলিত বহু-পত্যাত্মক বিবাহে প্রাপ্ত যৌবনা কুমারীর একটি অল্প বয়স্ক বালকের সহিত বিবাহ হয়। বালকস্বামীর যৌবনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া সেই স্ত্রী স্বামীর মাতুল বংশীয় কোন যুবার সহবাসে গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব করিতে থাকে। সন্তানগুলি বালকস্বামীর সন্তান বলিয়া গণ্য হয়।

কোইম্বাতুর অঞ্চলে ভেলেল্লা জাতির মধ্যেও এইরূপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে।

বাণীহারার দেশ

[শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর বি-এ]

স্তব্ধ নীরবতার দেশে, এস তাপস,
এস ভাবুক, শিল্পী, ধ্যানী, রসিক, কবি,
হেথায় মহাশান্তি-ছায়ার গহন-তলে,
এস তোমার অন্তঃসলিল সঙ্গলভি।
বাগ্মী হেথায় থামাও তোমার বাচালতা,
মুখর হেথায় থামাও তোমার কল-কথা,
হেথায় হের আঁখে আঁখে রসালাপন
কণ্ঠ, তালু, দন্ত হেথায় নীরব সবি,
বধির সমীর শব্দ হেথা সয়না মোটে,
বয়না ধ্বনি, বয় কেবলি ফুল-সুরভি।

মেঘের মুখে তড়িৎ আছে, মন্দ্র নাহি,
নিঃশব্দে নদী-নদে লহর তুলে,
গায়না অলি শুধুই মধু সেবন-রত
পাখী শুধুই নাচে রঙীন পালক খুলে'।
গানের পাখা গুটিয়ে পড়ে হেথায় এসে
নরেশ হেথায় প্রবেশ করেন দীনের বেশে
ওষ্ঠে রাখি তর্জ্জনী তার হেথায় দ্বারী
দাঁড়িয়ে রয় সদাই কনক-বেত্র তুলে'।
দেয় ফিরিয়ে বন্যা পাথার বজ্র-ঝড়ে,
যায় ফিরে' সব, এ দিক পানে আস্‌লে ভুলে,

বনের বাণী জাগে হেথায় ফলে-ফুলে,
মনের বাণী হাস্যে এবং অশ্রুধারায়,
তৃণের বাণী হেথায় নীহার-মালায় দুলে
গগন-বাণী জাগে কেবল তারায় তারায়।

নদীর বাণী জাগে শীতল করুণাতে,
নিশার বাণী জাগে উষার অরুণাতে,
তুষার বাণী জাগে গিরির অধর-কূলে
ভাষার ধ্বনি মধুর আশার স্বপ্নে হারায়।
সনাতনী ব্রাহ্মী বাণী নিশিদিনই
মানস-লোকের মনের চোখের দৃষ্টি বাড়ায়

বাদ্য হেথায় লঘু চরণ-নৃত্যে জাগে
সঙ্গীতপুর ইঙ্গিতে আর ভঙ্গিমাতে,
জয়ধ্বনি রক্তকেতুর আন্দোলনে
ছন্দে জাগে ইন্দ্রধনুর রঙ্গিমাতে।
শব্দ হেথায় নেইক বলে' গন্ধ পরশ
দ্বিগুণ হ'য়ে ব্যঞ্জনাতে জাগায় হরষ,
কাব্য জাগে গহন বুকে গগন গায়ে
স্বর্ণময়ী বর্ণময়ী বর্ণনাতে।
জীবন হেথায় শঙ্খ-সমান শব্দাহরা
অতল গভীর শান্তি-সাগর হিন্দোলাতে।

ঝঞ্ঝনাতে গঞ্জনাতে উচ্চরোলে
হট্টগোলে কর্ণ যাদের ঝালা-পালা,
হেথায় নীরব শান্তি মায়ের স্নেহের কোলে
এস তারা জুড়াও কাতর জীবন-জ্বালা।
শব্দ হেথায় নেইক বলে', সহায়-হারা
তর্ক-বিবাদ, রোষ-অসূয়া এ-দেশ ছাড়া।
এস সাধক এইত তপের ধ্যানের গুহা
এ আশ্রমে ভক্ত ঘুরাও জপের মালা,
হেথায় কবি হের তোমার কল্পস্বপন,
শিল্পী রসিক এই তো তোমার চিত্রশালা।

———

জানবার কথা

[জ্ঞান-বিস্তারের সাহায্যের জন্য এই বিভাগে আমরা প্রতি মাসের সহযোগী-সাহিত্য হইতে শিক্ষণীয় বিষয় যথাসম্ভব আহরণ করিব।]

মাসিক মোহম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

লবঙ্গলতার দেশ -- আমরা পান হইতে পোলাও পর্য্যন্ত লবঙ্গ ব্যবহার করি বটে, কিন্তু ইহা কোথা হইতে আসে তাহা অনেকেই জানি না। আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে জাঞ্জিবার প্রদেশ লবঙ্গের জন্মস্থান। এই প্রদেশ ব্রিটিশ "প্রোটেক্‌টোরেট ষ্টেটস্"এর অন্তর্ভূক্ত। ইহা আসলে একটী প্রবাল-দ্বীপ। বাণিজ্য-জগতে ইহা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। লবঙ্গের ব্যবসায়ই ইহার সর্ব্ব প্রধান বাণিজ্য। ১৯১৯—২০ সালে জাঞ্জিবার হইতে দুই কোটী নব্বুই লক্ষ পাউণ্ডের লবঙ্গ জগতের নানা দেশে রপ্তানী করা হয়। তাহার মূল্য পাঁচ লক্ষ ছিয়াশী হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় ৮৭ লক্ষ টাকা। লবঙ্গ গাছ দেখিতে খুব বড় নয়। আমাদের দেশে গাবগাছ যেমন খুব ঝোপওয়ালা হয়, লবঙ্গগাছ দুর হইতে সেইরূপ দেখায়, তবে তাহা গাবগাছের অপেক্ষা অনেকটা ছোট। লবঙ্গ প্রথমে গাছ হইতে পাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। তাহার পর তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া চালান দেওয়া হয়।

কৃষক, চৈত্র ১৩৩৬

বৃক্ষের জন্ম-রহস্য—গাছের যেরূপে বংশ বৃদ্ধি হয় তাহা অতিশয় বিস্ময়কর। কোন কোন গাছের শিকড়, ডাঁটা বা পাতা হইতেই নূতন গাছ জন্মে। যেমন পেঁয়াজ ও রসুনের কোষা, আলু, আদা, হলুদ ও কচু পুঁতিলেই তাহা হইতে নূতন গাছ জন্মে। গোলাপের ডাল, আক এবং লাল-আলুর ডাঁটা পুঁতিলেই গাছ হয়। পাথরকুচি বা হিমসাগরের পাতা হইতেই নূতন গাছ জন্মে। ফার্ণ জাতীয় গাছের পাতার উপরে বা পাতার ডাঁটায় গোড়ায় এক রকম ছোট-ছোট বীজের মত দানা হয়। এই দানা হইতেই নূতন গাছ জন্মে। লাউ, কুমড়া, শশা, মটর, অড়হর, সরিষা প্রভৃতি অনেক গাছের বীজ হয়। এই সকল গাছের গর্ভকেশরের গোড়ায় বীজ-কোষ থাকে এবং বীজকোষের ভিতর বীজাণু হয়। এই বীজাণুগুলি বড় হইয়া বীজ হয় এবং বীজকোষটী বড় হইয়া ফল হয়। সরিষা জাতীয় ফুলের পাপড়িগুলির ভিতর পুংকেশর বা পরাগ এবং তাহাদের মাঝখানে গর্ভকেশর থাকে। এই গর্ভকেশরের নীচের অংশটী বীজ-কোষ। ইহার ভিতর ছোট ছোট বীজাণু থাকে। বীজকোষটী বড় হইয়া শুঁটি হয় এবং বীজাণুগুলি সরিষা হয়। মটরের বীজ-কোষটি বড় হইলে শুঁটি হয় এবং বীজাণুগুলি মটর হয়। এই সকল ফুলের পরাগ-কেশরের মাথায় পরাগের থলি থাকে। এই থলিতে পরাগ বা রেণু হয়। এই পরাগ গর্ভ-কেশরের মাথায় না পড়িলে বীজাণু বাড়ে না এবং তাহা হইতে বীজ হয় না এবং বীজ না হইলে বীজ-কোষটীও বাড়ে না ও ফল হয় না। বীজ ও ফলের জন্য গর্ভকেশরের ভিতরের বীজাণুর সহিত পরাগের মিলন আবশ্যক এই মিলনের দ্বারাই গাছের বংশ-রক্ষা হয়।

মাধবী, চৈত্র ১৩৩৪

আমাদের শিক্ষা—আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়। জ্ঞান অর্জ্জন করিবার জন্য বিদেশে যাইবার এখন আর আবশ্যকতা নাই। অধ্যবসায় থাকিলে দেশে থাকিয়াই সমস্ত শিক্ষা করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, ডিগ্রীধারীর অজ্ঞানতা ঢাকিয়া রাখিবার আবরণ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পরীক্ষায় যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করি—ব'ল তো আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ কেন হয়েছিল, ও কে কে তাতে নেতৃত্ব করেছিলেন? এম-এ পাশ করা উত্তর দিবে—আজ্ঞে, ওটা তো আমি যে বছর পাশ করি সে বছর পাঠ্য ছিল না!

আমাদের দেশে বহু প্রতিভাশালী লোক ছিলেন ও আছেন, যাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নাই। যেমন কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তখনকার দিনে বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিতে দীর্ঘ সময় লাগিত। এই সময়েই জাহাজে বসিয়া মেকলে সাহেব হাজার হাজার পুস্তক পড়িয়া ফেলিতেন। গিবন অক্সফোর্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া লাইব্রেরীতে বসিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

জ্ঞানী জন্‌সনের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিবার সঙ্গতি ছিল না। মহাপণ্ডিত কার্লাইল লাইব্রেরীতে বসিয়া কয়েকটী ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রমণ, হীরালাল হালদার, সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, যদুনাথ সরকার, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি এই দেশে বসিয়াই জ্ঞানী হইয়াছেন। মেঘনাথ সাহা ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ইচ্ছা করিয়াই লণ্ডনের ডক্টরেট উপাধি লন নাই

আমরা যে বিদেশী ডিক্রীর জন্য ব্যস্ত হই, সেটাও আমাদের দাস-মনোভাবের ফল। তবে আমাদের শিক্ষালাভের একটী প্রধান বাধা এই যে, আমাদিগকে আগে ইংরেজী ভাষা শিখিয়া পরে তাহার মারফত অন্য সব শিক্ষা করিতে হয়। ইহা পরিশ্রমের অপব্যয়। কোন ইংরেজকে যদি বলা যায়, "তোমাকে আগে জার্ম্মন্ শিখে তার পর সেই ভাষার মারফত অপর যা কিছু শিখ্‌তে হবে," তবে ঐ কথাতে সে পাগলের প্রলাপ ভাবিবে। অথচ এই বিষম অস্বাভাবিক শিক্ষা-প্রণালী আমাদের দেশে প্রচলিত।

উপাসনা, বৈশাখ ১৩৩৭

কবিবর হাফেজ—কাজী নওয়াজ খোদা। কবির প্রকৃত নাম মোহাম্মদ। কিন্তু তিনি নিজেকে হাফেজ নামেই প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ ঈরানের 'সরকান্' নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীর অধিবাসী ছিলেন। এই বংশ শিক্ষা, সভ্যতা ও আভিজাত্য-মর্য্যাদায় সুপরিচিত ছিল। কবির পিতার নাম কামালুদ্দীন। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। কবি ৭১৫ হিজরী সনে সিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি সমগ্র কোরান্ শরীফ কণ্ঠস্থ করিয়া হাফেজ-কোরান নামে পরিচিত হন। কবিতার শেষে 'হাফেজ' নাম ব্যবহার করার ইহা একটী কারণ হইতে পারে। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত মৌলানা শমসুদ্দীন মোহাম্মদের প্রসিদ্ধ শিক্ষালয়ে শিক্ষালাভ আরম্ভ করেন। কবি সকল শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্বান্বেষী হইয়া পড়েন। সাধকদের সাহচর্য্য করিতে ও তাঁহাদের উপদেশ লাভ করিতে কবি খুব ভালবাসিতেন। ৭৪৫ হিঃ সনে তিনি পারস্যরাজের প্রধান মন্ত্রী হাজী কেওয়া-মদ্দীনের স্থাপিত জগদ্‌বিখ্যাত শিক্ষাগারে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল হইয়াছিলেন। এই সব বিষয় কর্ম্ম তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্ব বিনষ্ট করিতে পারে নাই। ফারসী ভাষায় গজল গান রচনায় তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার গজলের বৈশিষ্ট্য এই যে, পণ্ডিত, ছাত্র, ঈশ্বরপ্রেমিক আবার পতিত, হেয় ব্যক্তিও তাহাতে সমান তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। তাঁহার কবিতা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি অতি ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। হাফেজের জন্মের পূর্ব্বেই মহাকবি সাদীর মৃত্যু ঘটে। সাদীর অসাধারণ সাহিত্যিক প্রভাবের মধ্যে হাফেজ যে তাঁহার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা হাফেজের কৃতিত্বের পরিচায়ক। সাহিত্য-চর্চ্চার পর কবি অধিকাংশ সময় সাধন-ভজনে নিরত থাকিতেন। রাজদরবার ও আমীর ওমারাদের মজলিসে তাঁহার যথেষ্ট সমাদর ছিল। তিনি অত্যাচরিত ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের দুঃখ নিবারণে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। সময় সময় বিপন্নের উদ্ধার চেষ্টায় তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। কবি সংসারী হইলেও সংসারে বীতস্পৃহ ছিলেন। তাঁহার কবিতায় এত গভীর তত্ত্ব বর্ত্তমান যে, অনেকে তাঁহার কবিতা দৈববাণী-স্বরূপ মনে করে। সম্রাট্ হুমায়ুন ও জহাঙ্গীর দীওয়ান-এ-হাফেজ হইতে ফাল' (শুভাশুভ নির্দ্ধারণ) গ্রহণ না করিয়া কোন বিশেষ কাজে হাত দিতেন না। এইজন্য হাফেজের আর একটী নাম 'লেসালুল গায়েব' বা দৈব রসনা। দীওয়ান-এ-হাফেজ ৩৯০০ গজলীয়াতে পূর্ণ। এই 'গজলীয়াতে'র জন্যই ফারসী সাহিত্যে হাফেজ অমর হইয়া আছেন। দীওয়ান-এ হাফেজ' বলিতে এই গজলীয়াতই বুঝায়। ৭৯১ হিঃ সনে কবির মৃত্যু হয়।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

সেকালের কলিকাতায় লটারি খেলা—শ্রীহরিহর

শেঠ। কলিকাতার উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে সে কালে কলিকাতায় যে লটারি খেলা হইত তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। তখনকার দিনে সমাজের সকল স্তরের লোক, এমন কি পাদ্রীরাও, এই খেলায় যোগ দিতেন। লটারির টাকা হইতে রাস্তাঘাট ও সাধারণের ব্যবহারের জন্য বহু অট্টালিকা নির্ম্মাণ হইত। কলিকাতার তখনকার ইংরেজ অধিবাসিগণ এই খেলার প্রবর্ত্তক ছিলেন। কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথমে লটারি খেলা আরম্ভ হয় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে। তখনও ইউরোপীয় মালপত্র বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় দোকান বা আফিসের সৃষ্টি হয় নাই। ১৭৮৭ খৃঃ কাপ্তেন ডান্স নামে এক ভদ্রলোক তাঁহার আমদানী মালপত্র বিক্রয়ের জন্য যে লটারি করেন, তাহার প্রথম পুরস্কারের মূল্য ছিল ৩৫০০ টাকা। ১৭৮৯ খৃঃ এডওয়ার্ড টিরেটা নামে এক কলিকাতাবাসী ইতালীয় ভদ্রলোকের বাজার একটী লটারির প্রথম পুরস্কার ছিল। এই বাজারই টেরিটি বাজার নামে পরিচিত। ১৭৮৯ খৃঃ এক্সচেঞ্জ বাটী নির্ম্মাণার্থ এক লটারি হয়। ১৮০৫ খৃঃ কলিকাতা টাউন হল নির্ম্মাণের জন্য যে প্রসিদ্ধ লটারি হয় তাহাতে ১৪০০ টিকিটের মধ্যে এক হাজার পুরস্কার ছিল। এই লটারি চার বৎসর ধরিয়া চলে। ইহাতে মোট সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তোলা হইয়াছিল তাহার মধ্যে ৬,৬০,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট ৭৫,০০০ টাকা টাউন হল নির্ম্মাণে ব্যয়িত হয়। ১৮০৩ খৃঃ লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালে টাউন ইম্প্রুভমেণ্ট কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি লটারির ব্যবস্থা করিতেন। কলিকাতার বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতিকল্পে সরকারের অনুমোদনে ১৮০৯ খৃঃ যে লটারি হয় তাহার মোট পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল তিন লক্ষ টাকা এবং উদ্বৃত্ত অর্থে রাস্তা মেরামত, সাধারণ উদ্যান ও ভ্রমণের স্থানসমূহ, সাধারণ সৌধাবলী প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। ইলিয়ট রোড, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রিট, মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, মৃজাপুর ট্যাঙ্ক রোড প্রভৃতি নির্ম্মাণ বথা উন্নতি এবং হর্ত্তিবাগানের উন্নতি ও পুষ্করিণী-খনন-কার্য্যও লটারি তহবিল হইতে সাধিত হয়। এই সরকারী লটারি ব্যতীত তখনকার বহু বে-সরকারী লটারিরও সংবাদ পাওয়া যায়। বিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি এই সব লটারির অনেক টিকিট কিনিতেন।

স্মৃতিরেখা

[স্যর শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম-এ, ডি-লিট,কে-টি]

এক

কয়েক মাস ধরিয়া পল্লী-ভবনের আনন্দ উপভোগ করিয়া রাসের পর, রাধানগর হইতে দশ ক্রোশ দূরে বেহারার কাঁধে মাঠ ভাঙ্গিয়া মাতুলালয় বামুনপাড়ায় গমন করি। এ সময় রাধানগরের উল্লেখযোগ্য কয়েকটী ঘটনা মনে পড়ে। উড়িষ্যায় তখন দারুণ দুর্ভিক্ষ। জগন্নাথ যাইবার পথ আমাদের পল্লীর অনতিদূরে। ঐ পথ মহকুমা আরামবাগের (পূর্ব্বতন জাহানাবাদ) উপর দিয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধি এই যে, মহারাজা মানসিংহ 'কতলুখাঁ' প্রভৃতি পাঠান সর্দ্দারদিগের বিরুদ্ধে অভিযানকালে এই পথে দুই বার গিয়াছিলেন ও এই দুই বারের একবার প্রচণ্ড বর্ষাগম দেখিয়া কিছুদিন এই জাহানাবাদের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিয়া বাধ্য হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। 'কালাপাহাড়ের' উড়িষ্যা-অভিযানও এই পথেই বোধ হয় হইয়াছিল। রাধানগরের এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে "বড়া খাল" পারে "কালাপাহাড় জাঙ্গাল"

ও তাহার 'ব্যাঘ্র-বাহন-বিচরণ' প্রবাদ এ-যুক্তির পোষক না হইলেও চিন্তার উদ্রেক করে। 'নাংড়ীক্ষেত্র পীরে'র ঘোড়া ও 'কালাপাহাড়ের' বাঘে না কি এখনও গভীর রাত্রে সম্মিলন হয়। ইহা এই মুক্ত প্রান্তরের কবেকার কোন্ ফকিরের ধারণা কে জানে, আর সে ধারণার ধারা এতদিন বহিয়া আসিতেছে।

বঙ্কিমবাবুও জাহানাবাদে (বর্ত্তমান আরামবাগ) মহকুমার অন্তর্গত গড় মান্দারণ সান্নিধ্যে মানসিংহ ও জগৎ-সিংহের তাঁবু ফেলাইয়াছিলেন।

শত শত দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারী আশ্রয় ও সাহায্যের জন্য আমাদের বাটী আসিয়া পৌঁছিত। জ্যাঠামহাশয় ও বাবা পূর্ব্ব হইতে সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের সেবার অনুরূপ আয়োজন করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। বাটীর ছেলেমেয়েরা ভোর হইতে দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের সেবার জন্য ব্যস্ত থাকিত; অনেক দিন তাহাদের নিজেদের আহার জুটিত না। এই অক্লান্ত আর্ত্ত-সেবার স্মৃতি জীবনে অনেক কাযের সাহায্য করিয়াছে। ১৮৭৭ সালে সুদুর মান্দ্রাজে দারুণ দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়া এই স্মৃতি জাগিয়া উঠে। হেয়ার স্কুলের কয়েকজন সহৃদয় সমপাঠীর সাহায্যে ছাত্র-মহল হইতে মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সাহায্যের প্রথম চেষ্টা হয় ও সে চেষ্টা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে। আমি ছিলাম সে সভার অকৃতী সম্পাদক আর সভাপতি ছিলেন—উত্তেজনা ও উৎসাহে পরিপূর্ণ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী। মান্দ্রাজবাসীদিগের সহিত আমার আত্মীয়তা ও সখ্যের এই প্রথম ভিত্তি। উত্তরকালে বঙ্কিম-চন্দ্রের "আনন্দমঠে" বর্ণিত দুর্ভিক্ষের যে মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ পড়িয়াছিলাম, তাহার সজীব পূর্ব্বাভাষ এই সময়ে প্রকট হইয়াছিল।

বিপদ কখনও একা আসে না। এই সময় দারুণ আশ্বিনে ঝড় পল্লী-প্রদেশ বিধ্বস্ত করে। সে রাত্রির বিপদের কথা কখনও ভুলিব না। বাটীতে পাঁচ ছয়টী মহল ছিল। কতকগুলি একতল, কতকগুলি দ্বিতল, কতকগুলি ত্রিতল। ভিন্ন ভিন্ন মহল ও ঘরের সহিত পর-জীবনের সাহিত্যিক ধারণা, স্মৃতি ও সম্পর্ক জটিলভাবে আবদ্ধ—সে কথা পরে বলিব। আপাততঃ ঝড়ের রাত্রির কথাই বলি।

দ্বিতল ত্রিতল ও সকল মহল হইতে সকলকে এক-তলার ঘর ও দালানে একত্র করা হইল। মুষলধারে বৃষ্টি সত্ত্বেও পাড়ারও অনেকে আসিয়া সেই স্থানে যোগ দান করিলেন। অতি সুন্দর ও নৈসর্গিক ভাবেই বিপদভঞ্জনের চরণে কৃপা-ভিক্ষায় সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইল। গৃহ-ভিত্তি-গাত্রে তদানীন্তন পটাদিষ্টের প্রথানুসারে অঙ্কিত শিবদুর্গার চিত্র ছিল। যুক্ত করে আর্ত্তগণ সেই চিত্র লক্ষ্য করিয়া কৃপা-ভিক্ষায় নিযুক্ত। চিত্রমূর্ত্তি যেন সজীব হইয়া অভয় বাণী ঘোষণায় আশ্বস্ত করিলেন। অরুণোদয়ের সহিত প্রকৃতি প্রকৃতিস্থ হইলেন। রজনীর তাণ্ডব নৃত্য অবসানে সর্ব্বমঙ্গলার মঙ্গল মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। গ্রামের অধিকাংশ কাঁচা ঘরই ভূমিসাৎ হইয়াছে। আর্ত্তসেবায় বদ্ধপরিকর পরিবারস্থ সকলেই বিগত রজনীর বিপদ-কাহিনী ভুলিয়া দারুণ কর্ত্তব্যের আহ্বানে দুর্দ্দিনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু বৎসর পরে পূর্ব্ববঙ্গের ভীষণ জলস্তম্ভ ও ঘূর্ণীবায়ুর (Tornado) প্রবল প্রকোপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যতদুর ব্যাপিয়া ঘূর্ণীবায়ু চলিয়াছিল সে স্থানের ঘরবাড়ী, গাছপালা সব যেন ঠিক একেবারে ঘুরে নিশ্চিহ্ন করিয়া লইয়া গিয়াছে, দেখিয়াছি। তীব্র করকাধারা তীরের মত আসিয়া গায়ে লাগিয়াছে, অভিভূত করিয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি। কিন্তু "রাধানগরের আশ্বিনে ঝড়ের" কাহিনীর সহিত পূর্ব্ববঙ্গের কাহিনী তুলনীয় নহে।

এই সময়ই হাতে-খড়ি হইল। রাধাকান্তের মন্দিরের বাহিরের দালানের মসৃণ মেঝের উপর হাতে-খড়ি হইল। জ্যেঠাইমা হইলেন প্রথম শিক্ষয়িত্রী। বংশে বিদুষী মহিলার নিতান্ত অসদ্ভাব ছিল না; শিক্ষয়িত্রীরও অভাব হইল না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উত্তরকালে স্থায়ী সাহিত্যেও স্থান পাইয়াছেন।

জ্যাঠাইমার "তারা-চরিত", সেজ-কাকীমার "মনোরমা" ও "মাতার উপদেশ", ইন্দুদিদির "দুঃখমালা", প্রভৃতি রাধানগরের পারিবেশ প্রভাবেই এত পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। হাতে-খড়ির পর বিদ্যা পাকা না হইলেও দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইল। 'তাল পাত', 'কলা পাত' পর্য্যায় আপাততঃ উহ্য রহিল। শীঘ্রই কাগজে লেখার পালা পড়িল। দাদা-মহাশয়ের বহু যত্নে রক্ষিত

সাদা তুলট কাগজ তাঁহার দপ্তরে তাঁহারই সিন্দুকে থাকিত। যে তুলট কাগজে তাঁহার প্রসিদ্ধ 'তীর্থ ভ্রমণ' লিখিত হইয়াছিল, সে কাগজ তাহারই অবশিষ্টাংশের অংশ। তাহারই মধ্যে একখানি কাগজ নিজ হস্তে ভাঁজ করিয়া নিজ হাতে 'খাগড়া'র কলম কাটিয়া লিখিতে দিলেন। তাঁহার কহতমত মাতুলালয়ে মাতাঠাকুরাণীকে পত্র লেখা হইল। "দেবাক্ষরের" এই প্রথম সৃষ্টি। বাহবা ও তারিফের অভাব হইল না। সেই অবধি কিন্তু লেখার ছাঁদটা এমনই হইয়া পড়িল যে, পায়ে ব্যথা হইলে আর লিখিবার 'জো' থাকিত না। অর্থাৎ স্বয়ং যাইয়া পড়িয়া না দিতে পারিলে পত্রের পাঠোদ্ধার পাঠকের পক্ষে দুরূহ হইত ও এখনও হয়। ইহার কিছুদিন পরে জ্যাঠা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দুমতী—'ইন্দুদিদির' বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। দশঘরার বিশ্বাস বংশীয় শ্রীযুক্ত লালবিহারী "বর"। বিশ্বাস-বংশ ধনী ও দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ জমিদার। হাতী, ঘোড়া, উট, পাল্কী, তাঞ্জাম-চোপদার, লাঠিয়াল, বরকন্দাজ লইয়া নদীর পরপারে 'কৃষ্ণনগরের' বাসা হইতে'বরের' শোভাযাত্রা এক অপরূপ ব্যাপার হইয়াছিল। নদীর ধার হইতে বাটী পর্য্যন্ত বাঁধা 'রোশনাই'—অর্থাৎ কলাগাছ ও বাঁশ পুঁতিয়া তাহাতে মশাল রং-মশাল, ও আঁধারে লণ্ঠন ঝোলাইয়া বাঁধিয়া ও গাঁথিয়া অপূর্ব্ব আলোকশ্রেণীর সৃষ্টি হইল। মাঝে মাঝে 'সরা আলো' অর্থাৎ বড় 'সরায়' সরিষার তেলের মধ্যে সরিষার পুঁটুলি বাঁধিয়া বাঁশের 'তেপতিঙ্গের'মাথায় রাখিয়া জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল সচল ও অচল আলোকশ্রেণীর সহিত দেশের 'মালাকর'গণের খাস্ গেলাস' ও 'ফুলছড়ি'র কারিগরি শিল্পও প্রচুর ছিল। 'অ্যাসিট্যালিন্-গ্যাস' এখন সুদূর নিভৃত পল্লীতেও সে শিল্পের স্থান অধিকার করিয়াছে। মালাকরের সম্বল হইয়াছে 'চাঁদ-মালা'। উন্নতি যথেষ্ট নহে কি? সে দিনের রংমশালের ধোঁয়ার গন্ধ এখনও নাকে লাগিয়া আছে।

আমাদের সুবৃহৎ পরিবারের মধ্যে যে অকপট সৌহার্দ্দ্য ও আন্তরিকতা ছিল সে দৃশ্য কখনও জীবনে ভুলিব না। মারামারি 'পিটাপিটি'ও যেমন চলিত, গলাগলি ভাবও সেইরূপ। নদীর তীরে হেলিয়া-পড়া খেজুর গাছ হইতে নদী-বক্ষে ঝাঁপ দেওয়া, 'একটে ও জোড়া' ডোঙ্গায় বাচখেলা, স্কুলের ময়দানে 'কুস্তিকাঠ' অর্থাৎ আজকাল যাহাকে প্যারাল্যাল্ বার (Parallel Bar) বলে তাহার সাহায্যে ব্যায়াম শিক্ষা, উচ্চ আম্র শাখা হইতে ঝোলান দড়ীর দোলায় দোল খাওয়া, এ সকল নিত্য কার্য্যের মধ্যে ছিল। 'ডাণ্ডা গুলি' ও 'হাডু-ডুডু'ও বিশেষ অভ্যস্ত হইয়াছিল। উত্তরকালে 'প্রেসিডেন্সি কলেজ' (Presidency College) ক্রীড়া-ক্ষেত্রেও ক্রিকেটের যুগে এই খেলা প্রবর্ত্তন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং আরও বহু পরে তাহা বিজ্ঞান-সম্মত সভ্য-ক্রীড়ার অন্তর্গত করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। তাহার ফলে এখন 'হাডু-ডু-ডু' খেলার 'চ্যালেঞ্জ সিল্ড ও কাপ' (Challange Shield & Cup) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তৎ-সংক্রান্ত বিজ্ঞানসম্মত পুস্তকও প্রকাশ হইয়াছে। ওজস্বী ভাষায় সে পুস্তকের ভূমিকা লিখিবার সুযোগ ও সম্মান পাইয়া প্রাচীন বয়সে ধন্য হইয়াছি। ছেলেদের সভাসমিতিতে যেখানে পারি তাহার মাহাত্ম্য গান করি, কিন্তু আধুনিক যুগের 'টেনিস' (Tennis), 'ফুটবল' (Football) ও 'হকী'র (Hockey) হুড়াহুড়িতে সে খেলা কেমন খাপ্ খাইতেছে না। এখনও অল্প-স্বল্প কর্ম্ম-শক্তি যাহা ভগবান রাখিয়াছেন, তাহা পল্লী-ক্রীড়া-ক্ষেত্রের এই সব 'ডান্‌পিটেমীর' গুণে।

সকাল সন্ধ্যায় সময়-ক্ষেপের নানা উপায় ছিল। তাহার মধ্যে 'চাটুয্যে মহাশয়ের' সহিত শিকারে যাওয়া অন্যতম। ইহাকে শিকার না বলিয়া শিকারের অভিনয় বলাই অধিক সঙ্গত। কারণ 'ঘরে-বাহিরের' ফলকর বাগানে বানরের বিষম উৎপাত, আর সেই উৎপাত নিবারণ উদ্দেশ্যেই বানর তাড়াইবার মূল সঙ্কল্পে এই শিকার-যাত্রা। ইনি শ্রীযুক্ত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, (চাটুয্যে মহাশয়), পিতা ও পিতৃব্যগণের আজীবন অকৃত্রিম সুহৃদ—আমাদের পরিবারবর্গের ঐকান্তিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। ইনি ও কলিকাতা ছোট আদালতের জজ ৺কিশোরী-মোহন চট্টোপাধ্যায়, রাধানগর মুখোপাধ্যায়-বংশের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তদুপলক্ষে তাঁহাদের রাধানগরে বাস। তিনি শিকারে সিদ্ধহস্ত। এই শিকার-যাত্রা প্রসঙ্গে দেশের লোক মুক্তকণ্ঠে বলিত যে, "চাটুয্যে মহাশয়ের দোনালা বন্দুক রাধানগর কৃষ্ণনগর বানরশূন্য করিয়াছে"। কথাটা ঠিক হইতেছে না। লোকে বলিত

"চাটুর্য্যে মহাশয়ের বন্দুক" ও "প্রসন্ন বাবুর" স্কুল রাধানগর কৃষ্ণনগরকে বানরশূন্য করিয়াছিল। একবার একটা কৌতুকজনক অথচ বিপজ্জনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। চাটুয্যে মহাশয়ের হাতে বন্দুক নাই, এমন সময় একদল বানর যোগ বুঝিয়া তাঁহাকে ঘেরাও করে; "কৈলাস হাড়ি"-কাকার লাঠির সাহায্যে তিনি সেবার পরিত্রাণ পান। কৈলাস কাকা (হাড়ি) ছিল বাড়ীর পাইক। "বঙ্কিম-বাবুর" "রামচরণ" বোধ হয় লাঠিতে কৈলাসকাকার মন্ত্র-শিষ্য। কৈলাসকাকা লাঠি চালাইতে আরম্ভ করিলে তেল-মাখান ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়িয়াও তাহার গায়ে তেলের দাগ লাগাইতে পারা যাইত না। কৈলাসকাকা বলিতেন, ইচ্ছা করিলে লাঠির সাহায্যে তিনি ছাতার কাজ করিতে পারেন অর্থাৎ লাঠি চালাইলে বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টি গায়ে পড়িতে পারে না। তাঁহার এ কীর্ত্তি কিন্তু কখনও দেখি নাই। কৈলাসকাকার ন্যায় অসংখ্য লাঠিয়াল তখন দেশে ছিল। 'পোল', 'চক্রপুর' প্রভৃতি নিকটস্থ পল্লীতে 'পাঠান', 'রাজপুত', 'হাড়ী','ডোম','বাগ্দি' 'দুলে' কত সিদ্ধ-হস্ত লাঠিয়ালই যে ছিল তাহা বলা যায় না। তাহা 'বর্দ্ধমেনে' জ্বর (Burdwan fever) ও ম্যালেরিয়া (Malaria) জ্বরের বহু পূর্ব্বে এবং 'ঠগি' কমিশনার (Thagi Commissioner) 'ওয়াকোফ' (Wakof) সাহেবের প্রবল প্রতাপ তখনও দেশে পৌঁছায় নাই। কথিত আছে যে, 'ওয়াকোফ' সাহেবের অনুচরবর্গ লম্বা চুল ও লম্বা লাঠি দেখিলেই তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া দিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'রাধানগর সাহিত্য-সম্মিলন' উপলক্ষে অভ্যর্থনা সভায় সভাপতিরূপে আগন্তুকগণকে দেশের লাঠি খেলা দেখাইব মনে করিয়া লাঠিয়ালের মত লাঠিয়াল অতি অল্পই পাইয়াছিলাম।

পল্লী-ক্রীড়ার বিস্তৃত আলোচনায়, বর্ত্তমান বক্তব্য প্রসঙ্গ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িতেছি।

প্রসন্নবাবু অর্থাৎ জ্যাঠামহাশয়ের স্কুলের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। স্কুলটীর নাম ছিল—"খানাকুল কৃষ্ণনগর এঙ্গলো সংস্কৃত স্কুল"। 'দারকেশ্বর' ওরফে 'কানা'-নদীর ধারে স্কুলের অতি সুন্দর বাটী ছিল। হাল ফ্যাসানের হল্, কামরা, বারাণ্ডা, শার্সি ও খড়খড়ি প্রভৃতি ছিল। স্কুল ও লাইব্রেরীর আসবাব অতি পরিপাটী ছিল। সে প্রদেশে তেমন সুন্দর বাটী ও আসবাব তখনও ছিল না এখনও নাই। জিম্নাসিম্ (Gymnasium) ছিল, আখড়া ছিল, পরিপাটী বাগান ছিল—নদীর ধারে হইলেও ছেলেদের স্নানের ও সাঁতার দিবার স্বতন্ত্র পুষ্করিণী ছিল, হেড্‌মাষ্টার ও অন্যান্য বিদেশী শিক্ষকগণের জন্য পৃথক পাকা বাসা বাটী ছিল। জ্যাঠামহাশয়ের আয়ের চারি ভাগের তিন ভাগ এই স্কুলে ব্যয় হইত। গরীব ছেলেরা মাহিনা দিত না—বই কাপড় জল খাবার পাইত। তদানীন্তন ইন্‌স্পেক্টার উড্রো সাহেব প্রভৃতি শতমুখে স্কুলের সুখ্যাতি করিতেন। উড্রো সাহেবকে আমি দেখিয়াছিলাম, চেয়ারকেদারায় বসিয়া তাঁহার তেমন আরাম হইত না। টেবিলের কোণের উপর দু'দিকে পা'ঝুলাইয়া, পা দুলাইতে দুলাইতে তিনি কাজ করিতে ও কথা কহিতে ভালবাসিতেন।

তাঁহার সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি শুনিয়াছিলাম, তাহার সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে কিন্তু প্রস্তুত নহি। ডাবের প্রশংসা শুনিয়া তিনি নাকি ডাব খাইতে চাহিয়াছিলেন এবং ডাব কাটিয়া আনিয়া দিলে 'ছোবড়া'য় কামড় দিয়া বলিয়াছিলেন, "এ ফলের এত প্রশংসা কিসের?" স্কুলে পাস হইয়া ছেলেরা জ্যাঠামহাশয়ের তত্ত্বাবধানে, অনেক সময় তাঁহার খরচে কলিকাতায় আসিয়া কলেজের পড়াশুনা করিতেন। স্কুলের কৃতী ছাত্রেরা জ্যাঠামহাশয়ের চেষ্টায় ও সাহায্যে সংস্কৃত কলেজের পড়া শেষ করিয়া বড় বড় চাকরি পাইতেন। বাঙ্গলা, বেহার, নাগপুর, জব্বলপুর, বর্ম্মা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক এরূপ লোকের সহিত উত্তর-কালে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। বাছাই বাছাই হেড্-মাষ্টাররা স্কুলের কাজ করিতেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, প্রথম বাঙ্গালা ভূগোল-লেখক তারিণী-চরণ চট্টোপাধ্যায় (পরে সংস্কৃত কলেজ-স্কুলের হেড্‌মাষ্টার হন), নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র গুঁই (পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ), শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী (পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক), দীননাথ মুখোপাধ্যায় (পরে জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ), এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান কবি ষ্টার জন্ সাহেব প্রভৃতি শিক্ষা বিভাগের প্রধান পুরুষগণ স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। তখন রাধানগরের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও স্বাস্থ্য অতি উত্তম ছিল। পিতা ও পিতৃব্যগণের আত্মীয় বন্ধুগণ সর্ব্বদা বায়ু-পরিবর্ত্তন জন্য রাধানগরে যাইতেন এবং

বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কার্য্যের সহায়তা করিতেন। এই আবহাওয়ার মধ্যে রাধানগর প্রদেশের শিক্ষার্থিগণ মানুষ হইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। তাই লোকে বলিত যে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বন্দুক ও প্রসন্নবাবুর স্কুল দেশটাকে বানরশূন্য করিয়াছিল।

যখন আমার প্রথম জ্যাঠাইমার কাল হয় এবং দারান্তর গ্রহণের জন্য সকলে জ্যাঠামহাশয়কে অনুরোধ করেন, তিনি স্কুল-বাড়ী দেখাইয়া বলিয়াছিলেন ঐ আমার সর্ব্বস্ব এবং ঐ খানেই আমার সব সন্তান-সন্ততি। কাল-স্রোতে স্কুল বাড়ী 'দ্বারকেশ্বরের' প্রবল বন্যায় নদীগত হয়, এখন চিহ্নমাত্রও নাই, আর বহুযত্নে সংগৃহীত লাইব্রেরীর পুস্তক 'অবলাস্তে চেয়ে নেওয়া' পাঠকগণের অনুগ্রহে কৃষ্ণ-নগর বাজারে মুদীর দোকানে ঠোঙ্গার কার্য্য করিয়াছে। রাধানগর পল্লী-সমিতির চেষ্টায় "প্রসন্নকুমার লাইব্রেরী" নামে এক লাইব্রেরী সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে স্কুল লাইব্রেরী পুস্তকের অবশিষ্ট ভগ্নাংশ সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছে।

লাইব্রেরীতে তখনকার সচরাচর প্রয়োজনীয় সকল পুস্তকই ছিল—এন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা (Encyclopaedia Britannica) হইতে স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থ পর্য্যন্ত কিছুরই অসদ্ভাব ছিল না। পণ্ডিত-প্রধান স্থানের প্রয়োজনীয় সংস্কৃত ছাপা পুস্তক ও পুঁথিও সংগৃহীত হইয়াছিল। স্কুলটী সংস্কৃত কলেজ-স্কুলের আদর্শে পরিচালিত হইত। নিম্ন শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যাপনা হইত। সঙ্গে সঙ্গে এণ্ট্রান্স (Entrance) পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পুস্তকই অধ্যয়ন করান হইত। সংস্কৃত কলেজ-স্কুলের ক্লাশ পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র 'রাধানগর স্কুলে' ব্যবহার হইত। ফলে রাধানগর হইতে যাহারা পাশ করিত তাহারা একেবারে সংস্কৃত কলেজের 'ফার্ষ্ট-ইয়ার' (First year) 'স্মৃতি, ন্যায় ও অলঙ্কারের ঘরে' প্রবেশ করিতে পারিত। সংস্কৃত কলেজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীকে ক্লাশ বলা হইত না ধার বলা হইত। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যালের মত প্রতিভাশালী ছাত্র সংস্কৃত কলেজের সকল ছাত্রকেই পরাস্ত করিতে পারিত। জ্যাঠামহাশয়ের স্কুলের অনতিদূরে নদীর ধারে আর একটী সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত ছিল। ছোট ঠাকুর-দা কেদার বাবু, ডিস্পেন্সারি করিয়া নিজে ডাক্তারি ব্যবসা করিতেন ও পিতৃদেবের নির্দ্দেশমত তাঁহার ব্যয়ে আর্ত্ত-সেবা করিতেন। ছোট ঠাকুর-দা, পিতৃদেব, সুরেশপ্রসাদ ও নিখিলচন্দ্রকে লইয়া বংশে চারি পর্য্যায় ডাক্তার হইয়াছে। কেদারবাবুর ডিস্পেন্‌সারি যাইবার পথে নদীর পাড় বড় উচ্চ ছিল। প্রশস্ত ঢালু রাস্তা পাড়ের মাঝখান দিয়া নদীর জলে পৌঁছাইত, তাহাতে সাধারণের স্নান-পানের সুবিধা হইত। "জড় ভরত" উপাখ্যানের হরিণী উচ্চ নদী-পাড় উল্লম্ফনের চেষ্টায় যেখানে "পপাত চ মমার চ", আমার কল্পনা সেই ঘটনার সহিত এই স্থানের নির্দ্দেশ করিত, এখনও করে। আর এই পাড়ের অপর কোন এক অংশ হইতে 'কপালকুণ্ডলা' ও 'নবকুমার' নদী-গর্ভ-গত হন, কল্পনা এই বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ দেয়।

অপরের কি হয় জানি না; বাল্য-পরিচিত বহু স্থানের সহিত আমার সাহিত্যিক স্মৃতি এইরূপ নিবিড় ভাবে জড়িত! এখানের বাটীর পশ্চাতের একতলার ছাদের আলিসার ধারে 'ওসমান' 'বিমলার' উড্ডীয়মান ওড়না ধরিয়া-ফেলিয়া কৌশলে বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গের চাবি আদায় করেন। ঠিক তাহারই নীচে দরজা আকারের একটী জানালা ছিল। সেই পথে 'বিমলা' 'জগৎসিংহকে' লইয়া দুর্গে প্রবেশ করেন—পশ্চাৎ পশ্চাৎ 'ওসমান'ও অনুসরণ করেন।

অনতিদূরে 'হিংচাগেড়ে' পুষ্করিণীর পাড়ে চন্দ্রমোহন ঘোষ প্রভৃতির বাটীর নিকট প্রকাণ্ড দেবদারু গাছ ছিল। তাহারই উপর হইতে 'জগৎসিংহ' 'বিমলার' আনীত বীরাষ্টমীর শাণিত বর্শা নিক্ষেপ করিয়া পাঠানের উষ্ণীষ ও মস্তিষ্ক বিদ্ধ করেন। বাটীর যে সকল প্রকোষ্ঠে 'খড়ো খড়ো'র ব্যাপার চলিয়াছিল তাহা একটী একটী করিয়া সমস্ত সনাক্ত করিতে পারি, কেবল পারি না কোন্ কক্ষে বসিয়া 'তিলোত্তমা' হিজিবীজি লিখিতে লিখিতে 'কুমার জগৎসিংহ' লিখিয়া ফেলিয়াছিল। যে উঠান বীরেন্দ্রসিংহের বধ্যভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, সেই উঠানেই চন্দ্রশেখর তাহার অমূল্য পুঁথি-রাশি পোড়াইয়া পরিব্রজ্যা গ্রহণ করেন—সুন্দরীকে আমি খিড়কী দিয়া ঢুকিতে দেখিয়াছি। বাড়ীর পিছনে আর এক

পুকুর ছিল, এখন নিতান্ত পুরাতন হইলেও তাহা চিরকাল "নূতন পুকুর" নামে খ্যাত। সে দিককার একটা ঘরের জানালার গরাদেতে, লতাবন্ধনে 'অহং ব্রাহ্মণ-বেশী' "কপালকুণ্ডলার" জন্য পত্র বাঁধিয়া রাখিয়া যায়—পুকুর-পাড়ের নিবিড় আম্রবনের মাঝে 'লরেন্স ফষ্টার'কে (Lawrence Foster) লুকাইয়া আসিতে দেখিয়াছি, আর ধীর পাদবিক্ষেপে নামিতেছে "শৈবলিনী"। আবার সেই ঘাটের উপরই বসিয়া দেখিয়াছি সদ্যস্নাতা, মুক্তকেশী 'মনোরমা', পশ্চাতে 'হেমচন্দ্র'। কিন্তু এ 'বাপীতটে' দেখি নাই 'কুন্দনন্দিনী'। 'বিষবৃক্ষের' পালাটা স্থানান্তরে—মাতুলালয়ে। মাতুলালয় যাইতে বিলম্ব আছে, তথাপি কথাটা এখানে সারিয়া রাখি। সেখানেও চার পাঁচ মহল জোড়া বিস্তীর্ণ গৃহ—'নগেন্দ্রনাথ দত্তর' বাটীর 'বক্সলিস নকল'। ঘরে ঘরে যেখানে যাহাকে রাখিতে হয় রাখিয়াছি। এত ঘর দ্বার ছিল যে কোনও ভুল-চুকের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু 'দেবেন্দ্র দত্তর' বাগানবাটীটা বামুনপাড়া হইতে অনেক দূরে পড়ে। দেবীপুর গ্রামে এক অতি উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র মাতুলগণের আত্মীয় বাস করিতেন। সেইখানেই 'দেবেন্দ্রকে' বসাইয়াছি আর 'হীরার' ঘরটাও ঠিক করিয়া লইয়াছি। 'গোবিন্দলাল' উড়ে মালির সাহায্যে 'রোহিণীর' জলমগ্ন হইবার পর যে বাগানে তাহার চৈতন্য সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা এখনও চক্ষের উপর ভাসিতেছে। আর সীতারামের "চিত্ত বিশ্রাম" গ্রামের অপর প্রান্তে ছিল।

এরূপ কত কথা বলিয়া পুঁথির কলেবর বৃদ্ধি করিব?

বামুনপাড়া হইতে ক্রোশাধিক দূরে রামেশ্বরপুরে এক মাইনর স্কুল ছিল। সেইখানেই আমার স্কুল-জীবন আরম্ভ। কারণ, রাধানগরের স্কুলে বয়সের অল্পতার জন্য পড়িবার অনুমতি পাই নাই। স্কুলের পিছনে একটা প্রকাণ্ড 'মজা' দীঘি। সেই দীঘির পাঁক ভাঙ্গিয়া প্রখর মধ্যাহ্নে আঁচলা আঁচলা করিয়া স্কুলের ছাত্রগণকে জল খাইতে হইত। সহৃদয় স্নেহশীল মাতামহকে বলিয়া কলসী করিয়া পানীয় জলের ব্যবস্থা শীঘ্র হইল, তাই দীঘি ও স্কুলের কথাটা বিশেষভাবে মনে আছে। যদিও দশক্রোশের অধিক দূরে রাধানগর পল্লীভবনে 'বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ' স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু বামুনপাড়া হইতে রামেশ্বরপুর আসিবার পথে মাঠের মাঝেই, 'শৈলেশ্বরের মন্দির'।

দীঘির স্কুলের পূর্ব্বদিকে ছিল প্রকাণ্ড তপোবন,—বটগাছের ঝুরি, অশ্বত্থ গাছের ডাল ও তপোবনের অন্যান্য অনেক সরঞ্জাম। তাহারই একটা গাছের পিছনে উঁকি মারিতেছেন—'মহারাজ দুষ্মন্ত', অনতিদূরে শুনিতেছি "হলো, হলো পিয় সহিও', 'সেই মজাদীঘির পাড়ে আবার দেখিতে পাই 'মহাশ্বেতা'; দীঘি তখন হইয়াছে 'অচ্ছোদ সরোবর'! মাতুলালয়ের একটা উঁচু তেতলার 'চিলের ছাতের' ঘরে 'আইভ্যান হো'র (Ivanhoe) বন্দিত্বের সাহচর্য্য করিয়াছি ও জানালার নীচে দুর্গপ্রাকারের পারে যে দারুণ যুদ্ধ চলিতেছিল তাহার সুনিপুণ বর্ণনা করিয়াছি। এ সকল পড়িয়া লোকের সহসা মনে হইতে পারে "অপূর্ব্ব মদের লীলা, কত উঠে মনে, আকাশেতে কাদা ওড়ে, ঘর পোড়ে বানে"। সংক্ষেপে এই বিকৃত-মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, উত্তরকালে পূর্ব্ব-লিখিত গ্রন্থ বা সেইরূপ অপর গ্রন্থ পড়িয়া কাহারও বাল্য-স্মৃতির পরিচিত স্থানের সহিত এইরূপ 'জগা-খিচুড়ির' মিশ্রণ আর কখনও হইয়াছে কি না?

এখন একবার রাধানগরে ফেরা থাক। সদর দেউড়ীর দুই পাশে মণ্ডপে সকাল, সন্ধ্যা কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও পল্লীবাসী অন্যান্য ভদ্রলোকে মণ্ডপ পরিপূর্ণ থাকিত। শাস্ত্রীয় বিচার, গৃহস্থালীর সুখ-দুঃখের আলোচনা এবং অন্যান্য অনেক বিচার সে মণ্ডপে পিতামহের সম্মুখে হইত।

সমস্ত দিন ও প্রায় অর্দ্ধেক রাত্র, রাধাকান্তের মন্দির ও এই মণ্ডপ লোকে লোকারণ্য থাকিত। উঠানের কোণে ছিল বেলতলার ঘর, তাহার পাশে অন্যান্য ঘর। বেল-তলার ঘরের খোলা ছাদ। প্রকাণ্ড বেলগাছ সে ঘর থেকে উঠিয়া গৃহের সে অংশকে ছায়া দান করিত। তেমন বেল এ প্রদেশে কখনও ছিল না, এখনও নাই। ছেলেদের জমায়েৎ সেই ঘরের আশে-পাশে, বারান্দায়, দালানে হইত। লেখাপড়াও সেইখানে হইত। সে বেলগাছ আশ্রয় করিয়া পল্লী-চোর সময়ে সময়ে বাড়ীর ভিতরের ছাদের উপর দিয়া ঘটী, বাটী চুরি করিত। তথাপি বেল-ডালে হাত দিবার কাহারও অধিকার ছিল না।

এই সকল চর্চ্চা হইতে হইতে অপূর্ব্বশ্রী শরৎকাল

উপস্থিত। বানের জল, মাঠের জল সরিয়া গেল। শরৎ-শোভার সমৃদ্ধির মধ্যে সর্ব্বাধিকারীদের বাড়ীর রাস, সকল পর্ব্ব গৃহস্থ জনোচিত সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। কিন্তু এই 'শরৎ রাস' উপলক্ষে বিশিষ্টতর সমারোহ হইত, কারণ তাহা যদুনাথের নিজস্ব উৎসব। আমাদের দেশের সাধারণ রাস অগ্রহায়ণ মাসেই হয়, শ্রীবৃন্দাবনের রাস হয় শরৎ কালে। সেখান হইতে দেখিয়া ও শিখিয়া আসিয়া পিতামহ রাধানগরে রাধাকান্তেরও শরৎ রাস আরম্ভ করেন।

বাটীতে 'শরৎ-রাস' হয় তো হয়, এই জানি। কোথা হইতে কিরূপে আসিল জানিতাম না। গত বৎসর 'শারদীয়' পূজার পর 'কোজাগরী পূর্ণিমায়' শ্রীবৃন্দাবনে 'শরৎ-রাসের' মহা আয়োজন দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলাম। শুভ্র-জ্যোৎস্না-স্নাত বৃন্দাবনের রজে শুভ্র বসন পরিহিত সহস্র নরনারী আনন্দের রোল তুলেন। ঘরে ঘরে মন্দিরে মন্দিরে শরৎ রাসের আয়োজন। ঠাকুর তখন "চন্দ্রিকা-ধৌত রম্য" মন্দিরের ভিতরেও তিষ্ঠিতে পারেন না। স্বভাবের শোভা দেখিবার ও বাড়াইবার জন্য যেন মন্দিরের বাহিরে 'বার' দিয়া বসেন। যাঁহাদের প্রাঙ্গণে স্থান নাই, তাঁহাদের ছাদে আয়োজন হয়। বৃন্দাবনের কোজাগরী পূর্ণিমা রাত্রের সে অপূর্ব্ব শোভা কখনও ভুলিব না। সঙ্গে ছিলেন 'সর্ব্বতীর্থ-সহচরী' সহধর্ম্মিণী। পুরোহিত-মুখে রাধানগরের বাটীর শরৎ রাসের কথা তিনি শুনিয়াছিলেন, চক্ষে দেখার সৌভাগ্য না ঘটিলেও সে রাসস্মৃতি তাঁহার হৃদয়-পটে অঙ্কিত ছিল। তিনি আমায় স্মরণ করাইয়া দিলেন—বাল্যের কথা মনে পড়িল। যদুনাথের মণ্ডপের সম্মুখে 'ঝুমকোলতা' ঘেরা এক সুন্দর বাঁখারির তোরণ ছিল। তাহারই তলের সিঁড়ি দিয়া রাধাকান্তের মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরের বাহিরের রোয়াকের উপর 'রাধাকান্ত' ও শীতলানন্দ আসিয়া বার দিয়া বসিতেন—পরিবার ও পল্লী আনন্দে বিভোর হইত। 'কৃষ্ণসখীর' যে শোভা তখন দেখিয়াছিলাম, সে শোভা স্মরণ করিয়া কৃষ্ণনগর ঘূর্ণীর প্রসিদ্ধ কারিগর বক্রেশ্বরের হাতের ক্ষুদ্র কৃষ্ণসখী মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছি। স্বরী লেন, প্রসাদপুরে গোবিন্দজীর ক্ষুদ্র মন্দির সে সখির শোভায় আলোকিত; কলাবিৎ ও ভক্ত উভয়েই সে শোভায় মুগ্ধ হইয়া আমায় ধন্য করেন।

রাধানগরে ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা তখন ছিল, লুচি চিনি ও রসকরা সন্দেশ। ডাল, তরকারি, ভাজা, চাট্‌নি তখন ব্রাহ্মণ ভোজনের অঙ্গ ছিল না। তারপর ক্রমে আলুনা তরকারির আবির্ভাব, এখন তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে। রাস-মন্দিরে, দালানে, মণ্ডপে, আশে-পাশে কত রকমের ফুল, ফল, বানর, কুমীর, হাঙ্গর ঝুলিয়া কত আনন্দ ও ভীতি উৎপাদন করিত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। উৎসবান্তে তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টারও ত্রুটী ছিল না। রং-বেরংএর কত ঝাড়, কত গোল লণ্ঠন, কত বেল লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি, কত দেওয়াল চাপা 'আঁধারে' ও 'আইল বরণ, চারিদিকে ঝুলিত, তাহার সংখ্যা কে ইয়ত্তা করিবে? এইরূপ সমারোহ হইত সরস্বতী পূজার সময়। পূজা হইত বেলতলার ঘরের পাশে। প্রচলিত পারিবারিক প্রসিদ্ধি অনুসারে সর্ব্বাধিকারীদের বাটী একা সরস্বতীর পূজা হইত না। বিবাদ-ভঞ্জন চেষ্টায় লক্ষী-স্বরস্বতী একাসনে অধিষ্ঠিতা হইতেন, স্বভাব দোষেই হউক কি কারিকরের দুষ্টামিতেই হউক দুই ঠাকুর দুই দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন, এটা কখনও সংশোধন হয় নাই।

সে মণ্ডপে সর্ব্বদা আসিতেন—বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে, সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গোস্বামী, হলধর চোওদার এবং শ্রীরাম-স্তোত্রশতকম্-প্রণেতা পরম পণ্ডিত কালিদাস তর্ক-সিদ্ধান্ত, কেনারাম বিদ্যাবাগীশ, পাঠকও কথক গোপাল চূড়ামণি এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ। সর্ব্বদা শাস্ত্র-চর্চ্চা, ধর্ম্ম-চর্চ্চা, ও সামাজিক চর্চ্চা হইত। ঠাকুরের ভোগ, কুটুম্ব-বাড়ীর তত্ত্ব, ও কৃষ্ণনগর বাজারের 'মোণ্ডা' ও 'কারকাণ্ডা' এই সকল ব্রাহ্মণসজ্জন-সেবায় লাগিত। আমরাও সেইখানেই প্রসাদ পাইতাম। এই সকল সস্তার বাড়ীর ভিতর পৌঁছিবার বড় অবকাশ পাইত না।

পিতামহ যেমন প্রিয়দর্শন তেমনই রাসভারী লোক ছিলেন। বহু পরে 'রঘুবংশ' পড়িবার সময়—অধৃষ্যশ্চা-ভিগম্যশ্চ, যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ"—এ কথার জীবন্ত আদর্শ বলিয়া পিতামহকে মনে পড়িত। তাম্বুল ও তামাকু তাঁহার বিশেষ প্রিয় পদার্থ ছিল। প্রকাণ্ড 'বাটার' সাজা পান তাঁহার সেবার্থ মণ্ডপে সঞ্চিত থাকিত। তিনি প্রাতে ও মধ্যাহ্ন আহারের পর দুইবার নদীতে স্নান করিতেন—

নিজের হাতে নদী হইতে কাপড় কাচিয়া আনিতেন, বিলাসের লেশমাত্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। 'বিদ্যাসাগরী চাদর' তাঁহার পরিধান ছিল। তালতলার চটী ও কটকী চটী পায়ে দিতেন। গলায় তুলসীর মালা, নাকে তিলক। পিতামহের চাদরের অনুকরণে 'বিদ্যাসাগরী চাদর' সৃষ্টি হইয়াছিল। গ্রামের অনতিদূরে 'বীরসিঙ্গা' গ্রামে 'বিদ্যাসাগর' মহাশয়ের জন্ম হয়। জ্যাঠামহাশয়ের সহিত তাঁহার আশৈশব সৌহার্দ্দ্য। গ্রামের পাশেই 'বড়া' পারে তাঁহার মাতুলালয় 'পাতুল'—মাতামহ শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি। অনেক সময় তিনি পাতুলে আসিয়া থাকিতেন। সেই সময় সেই সূত্রেই বোধ হয় জ্যাঠামহাশয়ের সহিত তাঁহার এই প্রণয়ের সূত্রপাত। প্রায় শেষ পর্য্যন্ত সে অকপট সৌহার্দ্দ্য দেখিয়াছি। সর্ব্বদা আমাদের রাধানগর ও কলিকাতার বাটীতে আসা-যাওয়া ছিল। শুনিয়াছি, বহুবাজার পুরাতন বাসায় সকলে একত্র থাকতেন।

'বিদ্যাসাগর' মহাশয় রাঁধিতেন ও বাবা এবং জ্যাঠামহাশয় যোগাড় দিতেন। তাঁহাদের পাচক ও ভৃত্য রাখিবার সকল সময়ে সঙ্গতি ছিল না। বৌবাজারের পুরাতন বাসাতেই এক পারিপার্শ্বিক ভাবের মধ্যে 'বিদ্যাসাগর' মহাশয়ের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও যদুনাথের তীর্থভ্রমণের শেষ অংশ রচিত হইয়াছিল।

আসল কথা হইতে আবার অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু 'বিদ্যাসাগরী চাদর' যে বিদ্যাসাগরের না এবং তাহার বনিয়াদ যে যদুনাথের চাদর, একথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। এই পোষাকেই বেকার (Becker) সাহেবের 'ষ্টুডিয়ো' (Studio) তে পিতামহের 'ফটোগ্রাফ' লওয়া হয় এবং সেই চিত্রের প্রতিলিপি যদুনাথের তীর্থভ্রমণ পুস্তকে স্থান পাইয়াছে; অতএব দলিলের প্রমাণ অকাট্য। যদুনাথ পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার গোঁড়ামীর লেশ ছিল না। তাঁহার 'সঙ্গীত-লহরীতে' 'শ্যাম-শ্যামার' প্রতি অবিরোধী ভাব ও অচলা ভক্তির নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। রামচাঁদ গোস্বামী ও হলধর চোঙদার প্রভৃতি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই সঙ্গীত-লহরীর সুধা-ধারায় সকলকে মাতাইতেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গোপাল চূড়ামণির ভাগবত পাঠ হইত। পিতামহ অনেক দিন শ্রীমন্দিরের চৌকাঠে মাথা রাখিয়া রজনী শেষ করিতেন—ঘুমাইতেন। শুনিয়াছি, পিতা পিতৃব্যের বাল্যকালে বাটীতে সখের যাত্রার দল, নিজ জন লইয়া গঠিত হইয়াছিল। বাবা 'কৃষ্ণ' সাজিতেন, জ্যাঠামহাশয় 'বলরাম' সাজিতেন। আর দূতীর ভূমিকা গ্রহণ করিতেন তাঁহাদের খুল্লতাত বৈকুণ্ঠনাথ। 'উষাহরণ' নামে একখানি গীতিনাট্য বৈকুণ্ঠনাথ রচনা করেন এবং বাটীতে তাহা মহাসমারোহে অভিনীত হইত। পারিবারিক ঘটনাসমূহ হিসাব করিয়া দেখিলে মনে হয়, এ অভিনয় ১৮৩৯ সালের পূর্ব্বে হইয়াছে। অতএব বৈকুণ্ঠনাথের 'উষাহরণ'কে বাঙ্গলার প্রথম গীতিনাট্য বলিলে বোধ হয় বিশেষ ভ্রম হইবে না। 'উষাহরণের' দুই একটা গান চাটুয্যে মহাশয় জানিতেন এবং তাহা সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় "তীর্থভ্রমণ" গ্রন্থের ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট করেন। যদিও পিতামহের সঙ্গীতানুরাগ যথেষ্ট ছিল, তথাপি নিয়ম ও শৃঙ্খলা উল্লঙ্ঘন করিয়া সঙ্গীত চর্চ্চা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

বাটীতে কয়েকজন যুবক ও কিশোরবয়স্ক তাঁহার বিনানুমতিতে দূর পল্লীতে সখের যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল বলিয়া তিনি তাহাদিগকে বিশেষ শাসন করেন। সে শাসনের চিত্র আমার চক্ষের সমক্ষে জ্বলিতেছে এবং জীবনে অনেক সাহায্য করিয়াছে।

এইরূপ নৈতিক শাসন সদরে-অন্দরে সমান ছিল। আমাদের এক বড় ঠাকু'মা ছিলেন, পিতামহের সম্পর্কে ভগিনী—নাম 'ব্রহ্মময়ী' তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন 'দ্রবময়ী'। উগ্রচণ্ডা 'ব্রহ্মময়ী'র শাসন শুধু মা, খুড়ি, পিসীরা নন, ঠাকুমা পর্য্যন্ত মাথা পাতিয়া লইতেন। অবশ্য ঠাকু'মা পিতামহের দ্বিতীয় পক্ষের অতএব বয়ঃকনিষ্ঠা। অন্তঃপুর শাসন ও সকলের আহারাদির ব্যবস্থা 'ব্রহ্মময়ী'র হাতে ছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে কথা কওয়া দূরে থাক, চিন্তা করিবারও কাহারও সাহস হইত না। 'ব্রহ্মময়ী'র বিপরীত গুণোপেত [illegible]ন 'দ্রবময়ী'—তাঁহার করুণা-দ্রব, 'ব্রহ্মময়ী'র নির্য্যাতন-জ্বালা প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করিত। ব্রহ্মময়ীর নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদাস ঘোষ আমার ক্রীড়া-সহচর ছিল। অতএব ব্রহ্মময়ীর কৃপা আমি

অকাতরে অর্জ্জন করিতাম; সময় সময় তাহার অংশ, মা, খুড়ীদের বণ্টন করিতাম। অতএব তাঁহাদেরও যথেষ্ট কৃপা প্রাপ্ত হইতাম। 'ব্রহ্মময়ী'র কর্তৃত্বাধীনে আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন 'জয় কাকার' মা, কারণ ব্রহ্মময়ী সর্ব্বদা 'মালা জপে' থাকিতেন, আহার্য্য দ্রব্য স্পর্শ বা পরিবেষণ করিতেন না। 'জয় কাকার' মা ঠাকুর-মার সহোদরা ভগিনী। আমাদের বাটীতে থাকিয়া 'জয় কাকা' লেখাপড়া করেন। পরে তিনি 'ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল' (Campbell Medical School) হইতে ভাল করিয়া পাস করিয়া চাকরি করেন। এইরূপ অনেক কুটুম্বিনী ও কুটুম্ব রাধানগর বাটীতে ও কলিকাতার বাসায় থাকিতেন। বাটীর সব ছেলেদের মানুষ হইবার ইচ্ছা ও অবকাশ না থাকিলেও অসংখ্য কুটুম্ব সন্তানেরা এই দুই বাড়ী আশ্রয় করিয়া মানুষ হইয়াছে।

বাটীর ছেলে হউক আর কুটুম্বের ছেলে হউক আহারাদির ব্যবস্থা অকাট্যরূপে এক ছিল, কখনও কোন ইতরবিশেষ ছিল না। অতএব প্রত্যক্ষভাবে না হউক পরোক্ষভাবে 'জয় কাকার' মার কৃপাভাজন না হইলে এটা ওটা উপরি সংগ্রহ—একখানার জায়গায় দুইখানা মাছ আদায় সম্ভব হইত না। এখন দেশে কিছু পাওয়া যায় না। তখন কিন্তু দুধ, দৈ, মাছ, তরকারির কোনও অভাব হইত না। তথাপি জয় কাকার মার অতিরিক্ত কৃপার প্রয়োজন হইত। অতএব 'জয়কাকার'ও উপাসনা করিতে হইত। এই সদ্ভাব রহিয়া যায় এবং উত্তরকালে যখন 'জয় কাকা' ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে (Campbell Medical School) পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসেন তখন এ সদ্ভাব বৃদ্ধি পায়। কথাটা বিস্তৃতভাবে বলিলাম; একটু কারণ আছে। সব জিনিস ধারাবাহিক ভাবে যথাসময়ে সম্ভব হইবে না বলিয়া এইখানে বলিয়া রাখিলাম। বৌ-বাজারের বাসার নীচে একটী ঘরে খুল্ল-পিতামহ বৈকুণ্ঠ-নাথের পুত্র নরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও জয় কাকার আবাসস্থান ছিল। নরেন্দ্রনাথ পড়িতেন মেডিকেল কলেজে (Medical College), সুরেন্দ্রনাথ পড়িতেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (Engineering College) এবং জয় কাকা পড়িতেন ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে (Campbell Medical School)। অবসর সময়ে ডাক্তার কাকাদের ডাক্তারি পুস্তক হইতে নকল ও অনুবাদ করিতাম; আর সুরেন কাকার ইঞ্জিনিয়ারিং পুস্তক হইতেও নকল ও অনুবাদ করিতাম। ডাক্তার হইবার প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে। একদিন শব-ব্যবচ্ছেদ গৃহ দেখিতে গিয়া দ্বিতীয় দিন যাইবার শক্তি ও প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইল; অতএব ডাক্তার হওয়া হইল না। সুরেশপ্রসাদ পরে জোর করিয়া সে স্থান অধিকার করে।

সুরেন কাকার নিকট ড্রয়িং বা ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে যে সামান্য প্রাথমিক সাহায্য পাইয়াছিলাম তাহার ফলে উত্তর কালে বৈষয়িক ও ব্যবহারিক ব্যাপারে প্রভূত উপকৃত হইয়াছিলাম। আমার ভাইস্ চ্যান্সেলারী (Vice-Chancellor) সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিদ্যাসাগর কলেজ, সিটী কলেজ, সেণ্টস্ জেভিয়ার কলেজ (St. Xavier College), বঙ্গবাসী কলেজের যে প্রকাণ্ড হোষ্টেল গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নির্ম্মিত হয় তাহার সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজ হস্তে করিয়াছিলাম। তাহার ফলে উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে বেলগাছিয়া হাঁসপাতাল কম্পাউণ্ডে (Hospital Compound) ষ্টুডেণ্টস্ ইন্‌ফারমারি (Students' Infirmary) নামে ছাত্রদিগের এক স্বতন্ত্র হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হয়। যাট বৎসর পরেও রাধানগর ও বামুনপাড়ার গ্রাম্য পথ সুস্পষ্ট ভাবে আঁকিয়া দিতে পারি। এই যাট বৎসরের মধ্যে দুই তিন বারের অধিক, পুণ্য-স্মৃতি-মণ্ডিত এই সকল স্থান-গরিমা উপভোগ করিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই, তথাপি এই সকল স্মৃতিরেখা মানসপটে সুদৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

আবার কথায় কথায় বহুদূর আসিয়া পড়িলাম। এই সকল পল্লীপথে আনন্দবিভোর হইয়া, প্রকৃতির অবাধ সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে অতি সুন্দর সরল ও স্বচ্ছন্দ গতিতে সময় অতিবাহিত হইত। নদীতীরের অক্ষুণ্ণ শোভা কখনও ভুলিতে পারিব না। 'রাধা-সায়র', 'ভিটেল পুকুর' প্রভৃতি প্রকাণ্ড সরোবরের ধারে প্রকৃতির বিপুল ঐশ্বর্য্য—সে সব শোভা এখন অন্তর্হিত।

হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলা সরোবর-প্রধান দেশ। হুগলী জেলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মহকুমা জাহানাবাদের (বর্ত্তমান আরামবাগ) সৌভাগ্য সেই সম্পর্কে সর্ব্বাধিক। আরাম-বাগের সর্ব্বপ্রধান থানা খানাকুলের গৌরীর দুইটী

সুবৃহৎ 'সায়র'—এক 'রাধাসায়র', অপর 'কৃষ্ণসায়র'। একটী রাধানগরের ও অপরটী অপর পারে কৃষ্ণনগরের। একটী সর্ব্বাধিকারীদিগের ও অন্যটী চৌধুরী মহাশয়দিগের পুণ্য কীর্ত্তি। বানের দেশের সে কীর্ত্তি, বহুব্যয়সাধ্য; রীতিমত সংস্কার অভাবে এখন অকীর্ত্তনীয়ই হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যত অকীর্ত্তনীয়ই হউক, এত বড় জলকর অতি অল্প স্থানেই দেখিয়াছি।

নিজের হিজিবিজি লেখাপড়া যত কিছু হউক না হউক আশে-পাশের কথা শুনিয়া অনেক শিখিতাম। হাড়ী, বাগ্দি, দুলেরা পর্য্যন্ত সাধুভাষা ব্যবহার করিত। তাহারা বলিত 'না বাবু, অত আর ফণি ভাষ্যি করতে হ'বে না'; অর্থাৎ বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়া তর্কজাল বিস্তার করিতে হইবে না। বহু বৎসর পরে 'ফণি ভাষ্যের' আলোচনার সময় একথা মনে পড়িয়াছিল। লব্ধপ্রতিষ্ঠ অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সুকুমার হালদার মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, তিনি অনেক মহকুমায় কর্ম্ম করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, খানাকুল থানার মধ্যে ছোট বড় লোকের মুখে যেরূপ ভাষা তিনি শুনিয়াছেন তাহা কোথাও শোনেন নাই। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে, বয়স্ক ছাত্রেরা সমাস করিয়া নামের অর্থ করিত—"বিদ্যাকে বাঘ মনে করিয়া 'ইস্' বলিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন"। সেইজন্য ইঁহার উপাধি বিদ্যাবাগীশ। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সমাস সম্বন্ধে নিজের সংস্কারও নিতান্ত অল্প কৌতুহলজনক ছিল না; মুখে+চুল=মুচুলী; মুচুল বিদ্যতে যস্য সঃ মুচুলমান" এই একটা তাঁহার সমাস কৌতুহল ছিল। আর বলিতেন, বল দিকিন্ "কং বলবন্তং ন বাধতে শীতঃ নিজেই উত্তর করিতেন "কম্বলবন্তং ন বাধতে শীতঃ"—ইত্যাদি।

এইরূপ 'অ্যাঙলো-সংস্কৃত স্কুলের' (Anglo-Sanskrit School) ও কৃষ্ণনগর টোলের ছাত্র ও পণ্ডিতগণের রহস্য-কৌতুকের ভাষার মধ্য দিয়া সংস্কৃত শিক্ষার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ জ্যেষ্ঠতাতের উৎসাহে কলিকাতায় ফিরিয়া ৯ বৎসরে (নয় বৎসরে) মুগ্ধবোধের ঘরে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম।

মাঝের অনেক কথা রহিয়া গেল, পরে বলিব।

যে খানাকুল কৃষ্ণনগরে শতাধিক টোল ও পণ্ডিত ছিল, তাহার আবহাওয়ার মধ্যে যে অতি শৈশব অবস্থাতেই সংস্কৃত শিক্ষার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি? কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় "শ্রীরামস্তোত্রশতকম্" হইতে শ্লোক, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার স্বয়ং, যদুনাথের মণ্ডপে আবৃত্তি করিতেন। আর সে আবৃত্তি শুনিয়া জ্যাঠামহাশয়, সে বইখানি নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়া দেন। সেই সময়েই ছাপা হয় পিতামহের "সঙ্গীত-লহরী"। তাহার সঙ্গে ছিল ছোটকাকা রাজকুমার-বাবুর কয়েকটী সঙ্গীত। "সঙ্গীত-লহরীর" ভূমিকা হইতেই পীযূষ কথাটা প্রথম শিখি ও তাহার অর্থ করিয়া লই। সে পীযূষ-ধারা এখনও নিত্য প্রবাহিত। অতি যত্নে সংগৃহীত ও রক্ষিত "সঙ্গীত-লহরী" ও 'শ্রীরামস্তোত্রশতকম্' এই দু'খানি কোনও রসজ্ঞ সাহিত্যিক না বলিয়া চাহিয়া লইয়াছে।

সদরেও যেমন এই সকল আলোচনা হইত, অন্দরেও তাই। অপরাহ্নে শ্রীমতী ধ্রুবময়ী 'রামায়ণ', 'মহাভারত' পাঠ করিতেন। মধ্যাহ্নে জ্যাঠাইমার গুরুগিরির বিষম তাড়না এবং তাহার পরে ও পূর্ব্বে, পিসী ও ছোট বড় কাকীদের 'কতদূর কেমন পড়াশুনা হইতেছে' তাহার পরীক্ষা। অতএব এই সময় হইতেই পরীক্ষা-সাগরে নিমজ্জিত ছিলাম। ফলে যাহা হয় তাহাই হইল। জ্যাঠামহাশয় পাটীগণিত ও ছোট কাকার ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী কিছু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। "বাড়ীর বই" বলিয়া বয়স্কেরা সর্ব্বদা তাহার আলোচনা করিতেন; আমিও গুঁড়াগাঁড়া পাইতে বঞ্চিত ছিলাম না। "আছিল দেউল এক বিচিত্র গঠন, ক্রোধে জলে ফেলে দিল পবন নন্দন" এ সব মুখস্থ হইয়া গেল। শুনিয়াছিলাম, জ্যাঠামহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের বাসর-ঘরের সময় কোনও বিদুষী শ্যালিকা তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং গ্রন্থকারেরই প্রতি এই প্রশ্ন প্রয়োগ হইয়াছে জানিতে পারিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিলেন। প্রসন্ন-বাবুর পাটীগণিত না পড়িয়া তখন বাঙ্গালা দেশে কেহ মানুষ হইয়াছে এমন কথা শুনি নাই, এবং তাহার পরে সেই অপূর্ব্ব পরিভাষা-সমৃদ্ধ পাটীগণিতের জাল ও নকল প্রচার অনেক হইয়াছে।

রক্ত-কমল

(উপন্যাস)
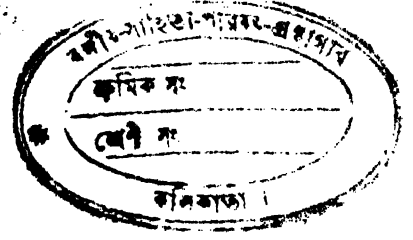
[রায় সাহেব শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ]

(১০)

কয়েক দিন পর একদিন নৈশভোজের জন্য প্রস্তুত হইয়া সকলে বীণার ড্রইংরুমে আসিয়া বসিয়া ছিলেন। উত্তপ্ত বুখারি ঘরটীকে বেশ গরম করিয়া রাখিয়াছিল।

কুমার অজয়সিংহের ক্ষিপ্র অঙ্গুলীগুলি পিয়ানোর বুকে ঘা দিয়া মধ্যে মধ্যে সুরের ভাঙ্গা তরঙ্গ তুলিতে লাগিল। বীণা সহসা একটু ব্যস্ত হইয়া কহিল—"আটটা তো বেজে গেল। কৈ এখনো ত দেখছিনে।"

কবি শশধর বলিলেন—"কারো কি আস্‌বার কথা আছে না কি?"

বিলম্বের জন্য লজ্জিত হইয়া বীণা বলিল—"হুঁ। আমি অরুণদা'র অপেক্ষা করছি। ফোহালা থেকে তিনি খবর পাঠিয়েছেন, আজ এখানে এসেই খাবেন। কাল থেকে হাউস-বোটে যাবেন। তাই বোধ হয় কোনো কারণে বিলম্ব হচ্ছে, নৈলে আসবার সময় তো গেল।"

কবি শশধর নিজের চেয়ার হইতে উঠিয়া মিসেস ঘোষের কাছে গিয়া বসিতে বসিতে বলিলেন—"আচ্ছা, মিসেস ঘোষ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই ধরুন না—আমারই বাড়ী হোক্‌, কি আপনারই বাড়ী হোক্‌—দুয়োর-টার দিকে চাইলেই—সেই মুক্তদ্বার দিয়ে লোকে কি ভাব মনে নিয়ে যে প্রবেশ করছে, সেই কথা ভেবে কি একটু শঙ্কা জাগে না; আমাদের ঘরের দুয়োর যে অনন্তমুখী হ'য়ে খোলা রয়েছে, এ কথাটা কি একবার মনে হয় না? পরিচিত একখানা মুখ নিয়ে, যে মানুষ আমাদের মুক্ত দুয়োর দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছে, তার আসল নামটা যে কি, তা' কে জানে বলুন।"

মিসেস ঘোষ বলিলেন যে, তাঁহার মনে আদৌ কোনো শঙ্কা জাগে না। আসেন যাঁরা সকলকেই তো তাঁর জানা আছে—তাঁর আর ভয় কি?

একটু উত্তেজিত কণ্ঠে কবি বলিলেন—"তা নয়—তা নয়। সকলেরই একটা লৌকিক নাম আছে বৈ কি। কিন্তু সেই নামের পিছনে তাদের আসল নামটা, খাঁটি পরিচয়টা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে লুকিয়ে আছে। সে পরিচয়টা তো আপনার জানা নাই—কিন্তু সেইটেই তো তাদের সত্যিকার নাম।"

প্রত্যুত্তরে মিসেস ঘোষ বলিলেন—"বিপদ যখন আসে, তখন সে তাকে একেবারে ঘরের ভিতরেই প্রবেশ করতে হ'বে, এরও তো কোনো মানে নাই।"

"কি বল্লেন? নাই? দুর্ভাগ্য ও দুঃখ যে কত বড় শঠ, কত বড় বুদ্ধি-কৌশলময় তা'কি জানেন না? প্রকাণ্ড একটা দুয়োর ত দূরের কথা—ছোটো একটা ঘুলঘুলি দিয়েও সে অনায়াসে প্রবেশ করে। দেওয়ালের গা ফেটে, সেই সরু ছিদ্রপথেও তার গতি অব্যাহত।"

মিসেস ঘোষ বলিলেন—"দুর্ভাগ্যের হাত থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নাই। অমন শত্রু কি আর আছে?"

"দুঃখকে আপনি আমাদের শত্রু বলছেন? অমন বন্ধু কি আর আছে? আমাদের সকল কর্ম্মের অমন কর্ত্তা কি আর একটী খুঁজে পাবেন? জীবনের উদ্দেশ্য যে কি, শুধু দুঃখই তা' বুঝিয়ে দিচ্ছে। যখনই ব্যথায় বুক ফাটে, কি যে চাই—সে কথাটা কেবল তখনই বুঝতে পারি। কাকে বিশ্বাস করব—কার আশ্রয় নেবো—দুঃখের দিনেই তা' স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। নিজের কর্ত্তব্যটা যে কি দুঃখই তা' চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। যেমনটী হওয়া উচিত দুঃখ পেলে তবেই আমরা তাই হই। যে পরমানন্দকে সুখ আপনার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেয়—তাকেই আবার ফিরিয়ে আনে দুঃখ। আনন্দটা জানবেন বড়ই লাজুক। উৎসবের ভিতর দিয়ে সে আপনাকে প্রকাশ করতে চায় না।"

কুমার অজয়সিংহ বলিলেন—"মিসেস বীণাই বলুন, কি

তাঁর বন্ধুটীই বলুন—এদের গুণের শেষ নাই। দুঃখকে অবলম্বন ক'রে এঁরা আর নূতন কি গুণ পাবেন? অন্যখানে যা' হ'ক্—আমাদের এই সোনার কাশ্মীরে ব্যথার সাধনা ক'রে নিজেকে গুণময় ক'রে তোলাকে লোকে নৃশংসতার একশেষ ব'লে মনে করে।

কিছুক্ষণ এই ভাবে কথাবার্ত্তার পর অজয়সিংহ আবার পিয়ানোতে সুর দিলেন। এবার তাঁহার কোমল মধুর-কণ্ঠে সেই সুরের তরঙ্গে শঙ্খ-কুটীর প্লাবিত করিয়া দিল। সে সুর এক একবার ময়ূরপুচ্ছের মত প্রসারিত হইয়া সকলকে মোহিত করিতে লাগিল।

এমন সময় মিসেস কাদম্বিনী ঘোষ বলিয়া উঠিলেন—"এই যে, অরুণকুমার এসেছেন।"

একখানি হাসির প্রতিমার মত বীণা বলিল—"এত দেরি দেখে আমরা অস্থির হ'য়ে উঠেছিলাম। পথে কোনো বিঘ্ন হয় নি তো?"

বিলম্বের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া অরুণকুমার সকলকে অভিনন্দন করিয়া বসিলেন। বলিলেন—"হাউস-বোটে গিয়ে কোনো মতে কাপড় ছেড়ে আসতেই দেরী হ'য়ে গেল। অনেক দিন পর আবার কাশ্মীরে পা দিতেই মনে হচ্ছিল যে, চোখের সামনে আনন্দের ফুল ফুটে উঠ্‌ল।"

লীলার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"কলকাতা ছাড়ার আগে আপনাদের বাড়ীতে একদিন গিয়েছিলেম। শুনলাম বীণার সঙ্গে কাশ্মীরের বসন্তটা উপভোগ করার জন্য আপনি আগেই বেরিয়ে পড়েছেন। ভাবলাম, কাশ্মীরেই তবে আপনার দেখা মিলবে। আপনি এখানে আসায়, কাশ্মীরকে যে একটা নূতন চোখে দেখতে পাব, সেই জন্যই আনন্দ হ'চ্ছে।"

বীণা কহিল—"আমিও লীলাকে সে কথা বলেছি, অরুণদা, তোমার মত শিল্পীর চোখ দিয়ে কাশ্মীর দেখ্‌লে তবেই সে দেখা সার্থক হয়। তুমি কি এবার বরাবর শ্রীনগরেই এলে, না অচ্ছাবলের পদ্মবন আর মানসবলের সেই অপূর্ব্ব লহরী-লীলা দেখে তার পর আস্‌ছ?"

অরুণ বলিল—"শ্রীনগরের এখন যা' শোভা, কোথায় লাগে তার কাছে মানসবল আর অচ্ছাবল। আমি বরাবর এইখানেই এসেছি। পথে কোথাও দেরি করি নি। তোমার ঘর-টরগুলো যে ঠিক তেমনই আছে—আর ছবিগুলো? কৈ রং দেওয়া হয় নি তো? আমি সেবারে যেমন রেখে গেছি, তেমনই আছে যে।"

"তোমার হাতের জিনিসের উপর তুলি ধরবে কে ব'ল? আবার যখন এসেছ, তখন সে কাজ তোমাকেই করতে হ'বে।"

ছোট একটা টেবিলের উপর বড় একটা শঙ্খ দেখিয়া অরুণ বলিল—"ওটা কোথায় পেলে?"

বীণা কহিল—"ওই যে শঙ্খটা দেখছেন, ওর পিছনে মস্ত একটা ইতিহাস আছে। শঙ্করাচার্য্যের টিব্বা থেকে ওটা এনেছি।"

"আমি কিন্তু ওই শঙ্খটার গায়ে তেমন কিছু একটা সৌন্দর্য্য দেখতে পাচ্ছি নে।"

বীণা হাসিয়া বলিল—"তুমি হ'লে কবি—তুমি হ'লে ভাস্কর। রূপই তোমার পূজার সামগ্রী। শঙ্খটার রূপ নাই বটে, কিন্তু ওর ইতিহাসটা একটা গৌরবের কথা।"

"কি রকম?"

"শঙ্খটার বয়স যে কত তা কে জানে? শুনতে পাই, দু'হাজার বছর আগে কোন হিন্দু রাজা শঙ্করাচার্য্যের টিব্বায় মন্দির রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ। দু'হাজার বছর আগে ওই শঙ্খের ধ্বনিতে সেই মন্দিরটী কেঁপে উঠেছিল—সে কথা মনে করলে আজ আনন্দ হয় না কি? তার পর কত দিন গেছে—কত রাজা, কত রাজ্য, কত ধর্ম্ম-মত—এল, গেল। এই কাশ্মীরের বুকে আপন আপন দাগ রেখে যেতে কতই না চেষ্টা করলে তারা। মনে হচ্ছে, এই পুরানো কথাগুলো তোমার ভাল লাগছে না। তা আমি মানব না—তোমায় শোনাবই!"

অরুণ হাসিয়া বলিল—"কে বলে পুরান' কথা আমার ভাল লাগে না? আমরা যে তুলির মুখে রং দিয়ে নূতন গড়ি—সে নূতনও তো পুরাতনেরই একটা ভিন্ন মূর্ত্তি।"

লীলা কহিল—"সবই তাই। নূতন পুরাতন মিলেই তো সকল রচনার হার গাঁথা।"

অরুণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে লীলার দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনিও দেখছি একজন শিল্পী।"

বীণার দিকে চাহিয়া অরুণ বলিল—"হাঁ, টিব্বার কথাটা কি বল্‌ছিলে ?"

বীণা বলিতে লাগিল—"শঙ্করাচার্য্যের টিব্বা যা', ভারতবর্ষে এমন আর একটা পাবো। আগে কাশ্মীর ছিল হিন্দুদের। তার পর হ'ল মুসলমানদের। এই টিব্বায় তখন হয় তো আল্লা হো আক্‌বর ধ্বনি জাগ্রত হয়েছিল। তার অনেক দিন পর মহারাজ রণজিৎসিংহ কাশ্মীর উদ্ধার করেন। হিন্দুর মন্দির আবার ধূপের ধূমে পবিত্র হ'য়ে উঠ্‌ল। মুসলমানেরা যে শিবলিঙ্গ উৎপাটিত করেছিলেন, রণজিৎ আবার নূতন ক'রে তারই প্রতিষ্ঠা করলেন। ওই যে দেখছ শঙ্খ—একবার ভেবে দেখ দেখি সে-দিন ওরই মুখেই কি বিপুল একটা নিনাদই না বেরিয়েছিল, হিন্দুর জয় ঘোষণা করতে। আজ যা তক্‌ত-ই-সুলেমান, সেই দিন তার নাম ছিল শঙ্করমঠ।"

কিছুক্ষণ পর আহার করিয়া কুমার অজয়সিংহ যখন ভারতের প্রাচীন চিত্র-শিল্পের কথা তুলিলেন। তখন একে একে সকলেই সেই আলোচনায় যোগ দিলেন। অজয়-সিংহ বলিলেন—

"সে ছিল একদিন, ভারতের শিল্পী যে, দিন রং আর তুলিতেই তার চরম দিনের পরম মুক্তিটাকে ফুটিয়ে তুলতে চাইত। তারা চাইত না হাল্কা রং-এর দু'দিনের ফাঁকা বাহার! তারা তাই ভক্তের মত শিল্প-দেবীর পূজা করত। তিনিও প্রতিভার বর দিয়েছিলেন, দু'টী কর পূর্ণ ক'রে।"

অরুণকুমারও ভারত-শিল্পের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভিন্ন রকমে। সে কহিল—"সেই সেকালের চিত্রলেখা থেকে আরম্ভ ক'রে, অষ্টাদশ শতাব্দীর কাঙ্গরা কলমের "শিবের নৃত্য" পর্য্যন্ত—শিল্পীর অভাব নাই, চিত্রের অভাব নাই। তাঁরা যে কত সরল, কত অনাড়ম্বর ছিলেন—তাঁদের হাতের ছবি দেখলে তা' বোঝা যায়। পুঁথির বিদ্যার সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধটা নিবিড় না ক'রে তাঁরা শুধু বাহিরের প্রকৃতির দিকে চাইতেন। আর তন্ময় হ'য়ে নিজেদের অন্তরকে দেখতেন। যমুনাতীরে সেই বংশীবাদন, বৃন্দাবনে সেই মানভঞ্জন, কৈলাসশিখর আর অমনই আর গোটাকতক দেশ-প্রসিদ্ধ পুরাতন কথাই ছিল তাঁদের শিল্পের সম্ভার। বিশ্বের জটিলতাকে নিয়ে তাঁরা কলমের মুখে নাড়া-চাড়া করতেন না।"

লীলার দিকে চাহিয়া অরুণ বলিল—"আপনি যে বল্লেন নূতনের সঙ্গে পুরাতন এক সূতায় গাঁথা, একথাটা খুবই ঠিক। ভারতের শিল্পীরা সেই পুরাতন আখ্যান-ক'টাকেই নিত্য নূতন ভাবে, নূতন চোখে দেখতে জানতেন। যে শিল্পী যেখানে থাকতেন, সেইখানেই তাঁর সাধনার আরম্ভ হ'ত, সেইখানেই হ'ত তার শেষ। বিশ্ব-শিল্পের পরিচয় নেবার জন্য তাঁরা দেশের পর দেশে ছুটে বেড়াতেন না।"

কুমার অজয় বলিলেন—"আপনি ঠিক বলেছেন, অরুণ-বাবু। আমার মনে হয়, নিজের শিল্প-শালায় ব'সে তাঁরা নিজেরাই নূতন রং, নবীন ভাবের আরাধনা করতেন। শিষ্য তার গুরুর কাছ থেকেই সেই সাধন-মন্ত্রটা পে'ত বটে—কিন্তু সমস্ত বিশ্বে তার গুঞ্জনটা বেজে উঠত না।"

অরুণ বলিল—"কি সুখেরই দিনই সে ছিল! আজ আমরা সকল কাজেই মৌখিকতার সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছি। জীবনের উৎসাহটা ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে তাতেই। অথচ যে আদর্শটা হাতে পেয়েছি, সেটাকে সার্থক করা ঘটছে না। সেকালে শিষ্য তার গুরুর পথটাকেই মেনে নিত তার চরম লক্ষ্য ব'লে—শিষ্যের সাধনাই ছিল এই যে, সারা জীবন তপস্যা ক'রে সে শুধু গুরুর মতই হ'বে। তাই মনে হয়, যশের সন্ধানে সে যতটা না ফিরত, তার বেশী ফিরত জীবিকার সন্ধানে।"

কবি বলিলেন—"ঠিকই করত তারা, জীবিকার জন্য কাজ করাই তো মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য।"

অরুণকুমার কহিল—"কালের অবরোধ ভেঙ্গে তাদের নাম যুগে যুগে প্রচারিত হোক্, এ-কথা সে-কালের শিল্পীরা আদৌ ভাবত না, অতীতের সঙ্গে তাদের বেশী পরিচয় ছিল না ব'লে তারা অনাগতের জন্যও বড় বেশী ব্যস্ত হ'ত না। তাদের স্বপ্ন ছিল, শুধু বর্ত্তমানটাকেই ঘিরে, তারা ছিল একান্ত অনাড়ম্বর, তাই নিজেদের মনকে ষোল-আনা সংগ্রহ ত করতে পারত। সত্যটা তাই সহজেই তাদের মনে ফুলের মত ফুটে উঠত। আমরা এখন বিচার-বুদ্ধি দিয়ে তাকে ধরতে চাই ব'লে, সে হাতের ফাঁকে ফাকেই বেরিয়ে যায়।"

লীলা বলিল—"চিত্র সম্বন্ধে আমি বড় বেশী কিছু জানি নে। যখন বাবার সঙ্গে বিলাতে ছিলাম তখন

অনেক ছবি দেখেছি। সে সবই পঞ্চদশ শতকের। ছবি দেখে মনে হ'ত, শিল্পীরা শুধু স্থূলটাকে নিয়েই ব্যস্ত। দেহকেই খুব ভালো ক'রে ফুটিয়ে রেখেছেন, মনের দিকে তেমন চোখ নেই—তাঁদের দেবদূতী দেখুন, দেবকুমারীদের মূর্ত্তি দেখুন। আমি তাই বলতে চাই যে, সে শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ভোগে। ওপারের ঋষিদের ছবি দেখলেও আমার এই কথাই মনে হয় যে, শিল্পীরা তাঁদের এঁকেছেন শুধু দেহের রূপ দিয়ে। সে সব মূর্ত্তি যেন প্রকাশ করছে খৃষ্টানী সুরা-দেবীর মর্ম্ম-ব্যথা। কিন্তু ভারতের মহাদেব দেখুন, বুদ্ধ দেখুন, বোধিসত্ত্ব দেখুন — আর দেখুন অজন্তা, অমরাবতী, সাঁচী।"

অরুণকুমার আনন্দে মত্ত হইয়া লীলার মুখে শিল্প-সমালোচনা শুনিতেছিল। দীপ্ত হইয়া কহিল—"ঠিক বলেছেন আপনি। ইটালীর কোন কোন শিল্পচূড়ামণিও এই রকমই বলেছেন, শিল্পে ধর্ম্মভাব না দেখতে পেয়ে তাঁরা বলেছিলেন, 'ও সব আর গির্জ্জায় রেখে কাজ নাই।' আপনার শিল্পানুরাগ অসাধারণ। বসন্তের উষার ফুলে সাজানো কাশ্মীরী বাগানে যদি যান দেখবেন, প্রকৃতির সেই শিল্পশালায় পৃথিবীর শিল্পের আদর্শ যেন জড়' হ'য়ে আছে।"

লীলা বলিল—"আমি তো আর শিল্পী নই। আমার এই চোখ নিয়ে রূপের মাধুর্য্য দেখতে পাব কেন ?"

বীণা একটু হাসিয়া বলিল—"এবার আর সে ভয় নেই, লীলা, আমি তো তোমায় আগেই বলেছি কাশ্মীরের রূপের তীর্থে অরুণদাই পাণ্ডা। ওঁর চোখে দেখলে তবে কাশ্মীর দেখা সার্থক হবে।"

অরুণ একটু অপ্রতিভভাবে বলিল—"বেশ তাই যদি হয়, কালই আমি তোমাদের অচ্ছয়লে নিয়ে যাব।"

রাত্রিতে নিজের হাউসবোটে ঘুমাইতে ঘুমাইতে অরুণ স্বপ্নে দেখিল লীলা যেন সম্রাট সাজাহানের অচ্ছয়ল উদ্যানের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তলে মুর্গীর মত বেড়াইতেছে। অচ্ছয়ল উৎস আনন্দে মাতিয়া আপনাকে শত ধারে ঢালিয়া দিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারার সহিত বৃহৎ ধারা মিশিয়া নদীর স্রোতের মত ছুটিয়া যাইতেছে—সেই অতি নিম্নে বিতস্তায়। তরুণ অরুণের নবীন রাগ তখন যেমন জলে নাচিতেছে, তেমনি লীলার কণ্ঠে, গ্রীবায়, কেশে কপোলে চূর্ণ রশ্মির মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। একটা চেনার গাছের ছায়া যেন লীলার চক্ষু দুইটীকে জালের মত ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অরুণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নটা যেন সত্যের মতই তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। অরুণের বার বার মনে হইতে লাগিল—কাশ্মীরের সেই নৈসর্গিক শোভার অগ্রভাগে লীলার মত সুন্দরী নারীরত্নকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই বুঝি উহার জন্ম।

(১১)

কয়েক দিন চলিয়া গেল।

সে দিন অচ্ছয়ল হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন শঙ্খকুটীরে চা পান করিতেছিল তখন কবি শশধরের কথার প্রতিবাদ করিয়া বীণা বলিল,—

"শশধর-বাবু আমায় বলতেই হচ্ছে, এটা আপনার বড় অবিচার। আপনি মুড়ী মিছরির একই দাম করতে চান। যে বাঁশী সুরে মন মজায়, তারও ছিদ্র ক'টা দেখুন, একটা থেকে আর একটা সমান দূরে নয়। চাকর আর মনিব বড়লোক আর গরীব—এদের চিরকালের সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দিয়ে, আপনি চান সবই এক ক'রে ফেলতে, এটা বর্ব্বরতা ব'লে মনে হয় না কি ? নিজ নিজ মর্য্যাদায় পৃথিবীর মানুষ কোঠায় কোঠায় বিভক্ত হ'য়ে আছে। যারা সেই কোঠাগুলো ভেঙ্গে সবই সমান করতে চায়, আমি বলব তারা বড় মানুষেরও যেমন শত্রু—গরীবেরও তেমনি শত্রু।"

কবি শশধর চা'র পেয়ালায় এক চামচ চিনি মিশাইতে মিশাইতে গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"তাই বটে! বিশ্ব-মানবেরই শত্রু তারা! যে দিন বুদ্ধদেব প্রেম বিলিয়েছিলেন, শ্রীচৈতন্য যেদিন সকলকেই কোল দিতে হাত বাড়িয়েছিলেন সে-দিনও তো এ দেশে মানুষ ছিল, যারা বলত—ওরা মানবের শত্রু।"

বীণার সঙ্গে যখন কবির এইরূপ কথা হইতেছিল তখন অরুণকুমার লীলার আড়ম্বর পরিচ্ছদ, তাহার দেহের আনন্দসুন্দর গঠন-সৌষ্ঠব, তাঁহার মাধুর্য্যময় অনায়াস চলন-ভঙ্গীর নানা প্রশংসা করিতেছিল। সে বলিল, "লীলার সেই নীলাভ শাড়ীখানা এমনই মানাইয়াছে যে, তেমন বড় বেশী চোখে পড়ে না।"

চার মজলিস তখন বেশভূষার আলোচনায় মুখর হইয়া উঠিল। এতদিন লীলার ধারণা ছিল যে, পুরুষে নারীর বসন-ভূষণের শুধু একটা সাধারণ সৌন্দর্য্যই বোধ করিতে পারে—কিন্তু সে, হার হইতে বলয়কে শাড়ী হইতে শাড়ীর ফুলটীকে পৃথক করিয়া দেখিতে সে জানে না। ইহা সে জানিত যে, নারীর বিচার-বুদ্ধি সর্ব্বদাই ঈর্ষা এবং দ্বেষের কলঙ্কে মলিন থাকে বলিয়া এক নারী আর এক নারীর দেহ-সজ্জায় ত্রুটীই দেখিতে পায়। আজ অরুণের মুখে নিজের নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্য-বোধের পুরুষোচিত প্রশংসা শুনিয়া লীলা অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং পুলকিত হইয়া সে প্রশংসা শুনিতে লাগিল। অরুণের কথার মধ্যে যে একটা পরিচিত পুরাতন সুরটাই বাজিতেছে, সে-কথা লীলার মনে হইল না; ইহাও তাহার মনে হইল না যে, অরুণের পক্ষে এতটা প্রশংসাবাদ শোভন নয়।

লীলা বলিল—"আপনি দেখছি শুধু ভাস্কর নন—দেহ-সজ্জার ভালো-মন্দও বেশ বুঝতে পারেন।"

অরুণ কহিল—"আমি ভাস্কর। নারী নিত্যই তার নূতন নূতন বেশ-ভূষার সযত্ন প্রসাধন নিয়ে আমাদের সামনে আসছে। শিল্পীর কাছে যে সে মূর্ত্তি নূতন নূতন আদর্শ এনে দিচ্ছে, সেটা তো আমি ভুলতে পারি না। জীবনের অতি অল্প কয়েকটা দিনই নারী তার বেশের প্রসাধনে রত থাকে—তার বেশ-ভূষার লাবণ্যের দিকে সে চায়। অল্প হোক, কিন্তু তার সে শ্রম তো বৃথা যায় না। তারই মত আমাদেরও উচিৎ, ভবিষ্যতের চিন্তাটা ছেড়ে দিয়ে, জীবনের বর্ত্তমানটাকেই সুন্দর ক'রে তোলা। অনাগত ভবিষ্যতের রূপতৃষ্ণাকে মিটাবার জন্য আজই ছবি এঁকে লাভ কি? তারই জন্য কাব্য রচনায়—তারই জন্য কাঠ-পাথরের মূর্ত্তি গ'ড়ে ফেলে তো কিছু দেখি না।"

কবি কহিলেন—"আমার নিজের কথা বলতে পারি, এই লৌকিক ভবিষ্যৎটাকে আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না, তাইত আমার সবচেয়ে ভালো কবিতাগুলো আমি ঘুড়ীর কাগজে লিখে হাওয়ায় উড়িয়ে দি। বুঝতেই পারছেন, কাগজগুলো সহজেই নষ্ট হয় বটে, কিন্তু আমার কবিতা বেঁচে থাকে মানুষের অন্তরে।"

বীণা বলিল—"অরুণদা, ভবিষ্যৎটাকে আমি বাদ দিতে চাইনে, জীবনকে পূর্ণতা দিতে হ'লে, তাকে উদার ক'রে তুলতে হ'লে—অতীতকেও চাই, ভবিষ্যৎকেও চাই। মৃত্যু যাদের কেড়ে নিয়েছে, কাব্য আর শিল্পই তাদের স্মৃতিমন্দির। যারা পরে আসছে—সে মন্দির যে তাদেরও জন্য। কাজেই যা আছে, যা ছিল, আর যা হ'বে—এই তিনের সমন্বয়ে আমাদের যা-কিছু। কি আশ্চর্য্য, অরুণদা! শিল্পের ভিতর দিয়ে অমর হ'তে তোমার সাধ হয় না?"

অরুণ কহিল—"ভবিষ্যৎ তার অন্ধকার নিয়েই থাকুক, আমি চাই শুধু বর্ত্তমান নিয়েই বাঁচতে।"

কথায় কথায় রাত্রি বেশী হইতেছিল দেখিয়া অরুণ-কুমার এবং কবি বিদায় হইলেন।

রাত্রির মত লীলা যখন তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, তখন সে-দিনের উচ্ছল ভ্রমণের স্মৃতিটা তাহার মনে জাগিতেছিল। শঙ্খকুটীরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরটী ছিল লীলার শয়নকক্ষ। নানা চারু চিত্রে তাহা সুশোভিত ছিল, তাহার দুয়ার ও জানালাগুলির পর্দায় পর্দায় রেশমে তোলা দ্রাক্ষালতা ও থোকা থোকা আঙ্গুর বৃহৎ বাদাম গাছকে জড়াইয়া জড়াইয়া শোভা পাইতেছিল। বাদামের সোনালী ফলগুলি তখন আলোকে ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। সে পর্দাগুলির দিকে চাহিলেই মনে হয়—কে যেন পরীর বন রচনা করিয়াছে। মাথাটী বালিসে রাখিয়া তাহার সুগঠিত নগ্ন বাহুখানি লীলা কপালের উপর স্থাপন করিল এবং ঘরের স্নিগ্ধ রক্তিম আলোকে জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। মানস নয়নে লীলা দেখিল, তাহার এই নূতন জীবনের ছবি—সে যেন কেমন একটা এলো-মেলো! বীণা ও তাহার শঙ্খের হার—দেওয়ালের গায়ে ধন্যভাবে পরিপূর্ণ কতকগুলি ছবি—কোথাও বা কাশ্মীরের কোনো একটা নৈসর্গিক শোভা, কোথাও কাশ্মীরী সুন্দরী ও কাশ্মীরী পুরুষ, কোথাও বা হিন্দু অশ্বারোহী—চাহিয়া চাহিয়া লীলা একে একে সবই দেখিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সকলেই যেন একা একা—যেন উদাসীন তাহারা—সকলের মুখে-চোখে যেন ব্যথার একটা ছাপ দেওয়া। এ কথাও লীলার মনে হইতে লাগিল, সেই উদাসীনতা ও বিষাদের ভাবই যেন তাহাদিগকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার পরই মনে পড়িল, বীণার শঙ্খ-কুটীর, সে-দিনের সেই সুন্দর সন্ধ্যায় কুমার অজয়সিংহ, কবি শশধর, কাদম্বিনী ঘোষ এবং নানা বিষয়ের কথোপকথন।

গত মহাযুদ্ধের ব্যয়ের হিসাব

গত মহাযুদ্ধে কত অর্থব্যয় হইয়াছে League of Nations তাহার এক হিসাব দিয়াছেন। ইহার বিবরণ British Magazine তাঁহাদের "Life of Faith" ও "The Dawn" নামক দুইটী প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, গত মহাযুদ্ধে ৩০ জীবন ক্ষয় ও ৮০,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ের পর শেষ হইয়াছে। এই অর্থের মধ্যে গ্রেটবৃটেন, আমেরিকা, ক্যানাডা, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, বেলজিয়ম ও রাশিয়ায় যত পরিবার আছে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য ৮০০ পাউণ্ড খরচ করিয়া এক একখানি সুন্দর বাসোপযোগী ঘর তৈয়ারী করিয়া দেওয়া যাইত। ঘর তৈয়ারীর পর যে অতিরিক্ত অর্থ পড়িয়া থাকিত তাহাতে ঐ সকল দেশের প্রতি শহর পিছু ১,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করিয়া পাঠাগারে স্থাপন করা হইত। ইহার পরও হাঁসপাতাল তৈয়ারী করিবার জন্য ১,০০০,০০০ পাউণ্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় তৈয়ারী করিবার জন্য ২,০০০,০০০ পাউণ্ড অবশিষ্ট থাকিত। যুদ্ধ যে কতদূর অশান্তিকর তাহা এই তালিকাটী পাঠ করিয়া বেশ বুঝা যায়।

নবাবিষ্কৃত কার্পেট-পরিষ্কারক যন্ত্রের দ্বারা দেওয়ালের কার্পেট পরিষ্কার করা হইতেছে।

কার্পেট-পরিষ্কারক বৈদ্যুতিক যন্ত্র

পাশ্চাত্য দেশে অধিকাংশ গৃহেই দেয়ালে Wall-paper অথবা কার্পেট লাগান থাকে। কার্পেট কিছুদিন দেয়ালে থাকিবার পর ক্রমশঃ ধুলায় মলিন হইয়া যায়; তখন সেগুলিকে খুলিয়া কোন খোলা জায়গায় লইয়া গিয়া ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে হয়। কিন্তু সে কাজ অস্বাস্থ্যকর এবং ব্যয়সাপেক্ষ। ইহার প্রতিবিধান-স্বরূপ লণ্ডনের Aeg Electric Co. Ltd. 'Vampire' Vacuum Cleaner নামক এক প্রকার কার্পেট-পরিষ্কারক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহাতে সামান্য পরিশ্রমে অথচ অতি সুন্দরভাবে যত ইচ্ছা কার্পেট পরিষ্কার করা যাইতে পারে। ইহার যে ছবি দেওয়া হইল তাহাতে দেখা যাইবে, একজন মহিলা কেমন স্বচ্ছন্দে তাঁহার দেয়ালের কার্পেটগুলি 'Vampire' cleaner দিয়া পরিষ্কার করিতেছেন। ইহার দ্বারা পরিষ্কার করিলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই কার্পেট ছিঁড়িয়া যায় না। এমন কি এই যন্ত্রের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা আছে যে, কার্পেট যদি খুব দামী হয় এবং অতিরিক্ত সতর্কতা না হইলে যদি তাহা ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেইরূপ সতর্কতার সহিত কার্পেটের অঙ্গ-সজ্জাকে অটুট রাখিয়া পরিষ্কার করা যাইতে পারে। এই যন্ত্রটী চালাইবার জন্য যে বৈদ্যুতিক শক্তির খরচ হয় তাহা খুবই সামান্য।

ফোনোগ্রাফ ও রেডিও

ফোনোগ্রাফ ও রেডিও কিছুদিন পূর্ব্বে বিভিন্ন যন্ত্র বলিয়া আমাদের জানা ছিল। কিন্তু সে জ্ঞান এখন বদ্‌লাইতে হইবে। শিকাগোর Electrical Research Laboratory এক নূতন যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন; তাহাতে

বেতারের গানও শুনা যাইবে এবং গ্রামোফোন রেকর্ড লাগাইয়াও গান শুনা যাইবে। সাধারণ রেডিও-সেটের যেরূপ হর্ণ থাকে ইহাতেও সেইরূপ একটী হর্ণ আছে। তাহার মধ্য দিয়াই সঙ্গীত শ্রুত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে। কিছুদিনের মধ্যেই যে ইহার আদর বাড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুগন্ধময় কবর

Sphinxএর নিকট প্রাচীনতম High Priest, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ Ra-Ouerএর যে কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে এক মজার খবর শুনা গিয়াছে। যাঁহারা ঐ কবরটী দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ঐ স্থানটীর আবেষ্টনীর মধ্যে পদার্পণ করিবামাত্র কেমন একটা ফুলের সুগন্ধ পাওয়া যায়; মনে হয় বুঝি একরাশ টাট্‌কা ফুল কে যেন এই কিছুক্ষণ মাত্র রাখিয়া গিয়াছে। সমাধিক্ষেত্রে অনেকগুলি Alabasterএর (শ্বেত প্রস্তরের ন্যায় এক প্রকার দ্রব্য) ফুলদানী আছে এবং তাহা হইতে চারিদিকে সুগন্ধ ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন যে, ঐ সমস্ত ফুলদানী তৈয়ারী করিবার সময় রাসায়নিক উপায়ে যাহাতে ইহাতে চিরকাল সুগন্ধ থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ইহারই নিকটস্থ একটী স্থান খুঁড়িয়া Ra-Ouerএর বাসভবন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে একটী প্রস্তর-খণ্ডের উপর লেখা আছে যে, Ra-Ouer খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২,৭০০ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। এই বাসভবনের মধ্যে আবিষ্কৃত অপরাপর দ্রব্যের মধ্যে যে স্বর্ণময় ফুলদানীটী পাওয়া গিয়াছে, তাহা ঐতিহাসিকদিগের নিকট বহু মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। একটী সুন্দর নেক্‌লেসও পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে চার হাজার মূল্যবান পাথর গাঁথা আছে। শুনা যায় এই নেক্‌লেসটী Ra-Ouerএর মাতার ছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর Ra-Ouer উহা তাঁহার স্ত্রীকে উপহার দেন।

নব-নির্ম্মিত বিমান-পোত

নব-নির্ম্মিত বিমান-পোত—ইহার নূতনত্বে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না—বিপদের আশঙ্কাও নাই বলিলেই হয়।

বিলাতের এক Aeroplane Cy. নূতন এক প্রকারের বিমান-পোত আবিষ্কার করিয়াছেন; ইহার নাম 'Gipsy Moth Aeroplane.' পূর্ব্বে যে সকল বিমান-পোত তৈয়ারী হইত তাহাতে একটা না একটা ত্রুটি থাকিয়া যাইত। কোনটীর বা অতিরিক্ত ভার বহিবার শক্তি থাকিত না, কোনটীর থাকিবার জন্য প্রকাণ্ড গ্যারেজ তৈয়ারী করিতে হইত, আবার কোনটী বা সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতে যাইতে কল বন্ধ হইয়া ডুবিয়া যাইত। কিন্তু এই নব-নির্ম্মিত বিমানপোতটীকে এই সকল অসুবিধা আর ভোগ করিতে হয় না। ইহার সহিত যে ছবি দেওয়া হইল তাহাতে দেখা যাইবে যে 'Gipsy Moth' কেমন সুন্দর ভাবে তাহার প্রকাণ্ড পাখা দুইটী মুড়িয়া ফেলিয়াছে এবং এইরূপ অবস্থায় তাহাকে দশ ফিট প্রস্থ যে কোন সাধারণ গ্যারেজে নির্ব্বিঘ্নে পুরিয়া ফেলা যাইতে পারে। আরোহী ও চালক ব্যতীত ইহাতে আরও অতিরিক্ত মালপত্র লইবার স্থান আছে। ইহার সহিত আর একটী অংশ জুড়িয়া লইলে ইহাকে Sea-plane রূপেও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অভিনব মানচিত্র

Indian Air Survey & Transport Co. বিমানপোত হইতে ছবি তুলিয়া কলিকাতার এক প্রকাণ্ড মানচিত্র তৈয়ারী করিয়াছেন। প্রতি ইঞ্চ আট মাইলের সমান করিয়া উহা তৈয়ারী হইয়াছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের

কোন শহরের এইরূপ ধরণের মানচিত্র ছিল না। এই মানচিত্রটী উত্তরে লিলুয়া হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে Tallygange Golf Clubএ আসিয়া শেষ হইয়াছে। সমস্ত শহরের বিভিন্ন অংশের ছবি তোলা দুই ঘণ্টার মধ্যে শেষ করা হয়। ফোটোগ্রাফারকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন যে সমস্ত শহরের বিভিন্ন স্থানের ছবি তুলিবার জন্য তাঁহাকে ক্যামেরায় দুইশত বিভিন্ন exposures দিতে হইয়াছিল; পরে উহাদের একত্র গ্রথিত করিয়া ফেলা হয়। ছায়াকে বাদ দিয়া ছবি তোলা হয় বলিয়া দুই দিনই বেলা বারটার সময় ছবি তুলিতে হইয়াছিল। এই মানচিত্রটী তৈয়ারী হওয়ায় বিমানপোত চালকদের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে।

বিলাতে পুলিশের সুব্যবস্থা

নিম্নে যে ছবি দেওয়া হইল তাহাতে বিলাতের কোন একটী শহরের পুলিশ কিরূপ সহজে যানাদির গতি নির্দ্দেশ করিতেছে তাহা বুঝা যাইবে। উপরে চারিধারে যে চারিটী আলো আছে তাহাতে বিভিন্ন রঙের আলো জ্বালিয়া যানাদির গতি সঙ্কেত করে প্রত্যেকটী বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন অর্থ আছে যথা:—

লাল—থাম

হলদে—সাবধান

সবুজ—যাও

প্রত্যেকটী আলো ত্রিশ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত এক রকম রঙে জ্বলিতে পারে, পরে রঙ বদলাইয়া যায়। এই সময়টীর মধ্যে পথের নির্দ্দিষ্ট দিক্ হইতে যান বাহনাদি চলিয়া যাইতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত Automobile Association মিলিয়া প্রত্যেক দেশের প্রধান প্রধান শহরে এইরূপ আলো বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আশা করা যায়, দুই চারি বৎসরের মধ্যে কলিকাতায়ও এরূপ আলো বসান হইবে।

রাস্তায় যানাদির গতিবিধি সঙ্কেতে নির্দ্দেশ করিবার নূতন উপায়। ইহাতে পুলিশ ও যান-চালক উভয়েরই বেশ সুবিধা হইয়াছে।

মোটর-চালিত জাহাজ

পূর্ব্বে বাষ্প-চালিত এঞ্জিনেই জাহাজ, ষ্টীমার প্রভৃতি চালিত। কিছুদিন হইল এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। বহু কারণে পূর্ব্বের ব্যবস্থা ততটা কার্য্যকরী হইতেছিল না; সেই জন্য নূতন তৈয়ারী জাহাজে বাষ্প-চালিত এঞ্জিনের পরিবর্ত্তে মোটর বসাইয়া দেওয়া হইতেছে। নব-নির্ম্মিত মোটর-চালিত জাহাজগুলির মধ্যে White Star Linerএর Britannic জাহাজখানিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই জাহাজখানিতে সাড়ে পনের শত যাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে। জাহাজখানি দৈর্ঘ্যে ৬৮০ ফুট, প্রস্থে ৮২ ফুট এবং গভীরতায় ৪৩ ফুট ৯ ইঞ্চ, এরূপ মাপিয়া দেখা গিয়াছে। ইহা ২৭,৮৪০ টন ওজনের ভার বহিতে পারিবে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই জাহাজখানি 'Belgenland' প্রভৃতি জাহাজের মত একখানি শক্তিশালী জাহাজ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জাহাজের মধ্যে আসবাবপত্র প্রভৃতি যাহা আছে তাহা ছোট-খাট একটী শহরের সমস্ত অধিবাসীদের কুলাইয়া যাইতে পারে।

এই জাহাজের পরিচালক ইহাকে New York হইতে Liverpoolএর পথে চালাইবেন এরূপ ঠিক হইয়াছে।

খাদ্যের ভেদাভেদ

খাদ্যের ভেদাভেদের উপর আমাদের স্বাস্থ্য অনেকখানি নির্ভর করে। কেহ কেহ খাদ্য বিশেষ খাইয়া হজম করিতে পারে না, অথচ অপরে সেই খাদ্যই রাশি রাশি খাইয়া হজম করিতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, মানুষের পরস্পরের পরিপাক-শক্তির তারতম্য আছে। কিছুদিন হইল Damran নামক এক ডাক্তার ইহার প্রতিকার-স্বরূপ এক প্রকারের টীকা আবিষ্কার করিয়াছেন। যাহার যে খাদ্য হজম করিবার ক্ষমতা নাই তাহা দেখিয়া তাহাকে এই প্রতিনিরোধক টীকা দিয়া দিলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সেই খাদ্য হজম করিবার শক্তি ফিরিয়া আসে। ইহাতে বহু অজীর্ণ রোগীর যে যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

মোটরে Speed Record স্থাপন করিবার জন্য Miss Dorothy Brittonএর প্রচেষ্টা। এই নূতন ধরণের গাড়ীখানি একটী দেখিবার জিনিস।

ডরথি ব্রিটনের নূতন রেকর্ড

কয়েক বৎসর হইল পশ্চিমের দেশগুলিতে মোটর Speed Record স্থাপন করিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। প্রতি সপ্তাহেই একজন না একজন এক একখানি গাড়ী লইয়া চাকার কেরামতি দেখাইতেছেন। সম্প্রতি Michigan শহরে Miss Dorothy Britton নামে জনৈক নারী এক নূতন Speed Record স্থাপনা করিয়াছেন। Miss Dorothy Britton তাঁহার যে গাড়ীখানি লইয়া প্রতিযোগিতায় নামিয়াছিলেন তাহা বড় অদ্ভুত প্রকৃতির। ইহা কতকটা ছোট ছেলেদের পায়ে চালান মোটর মডেলের ন্যায়। এই গাড়ীখানির নাম 'Mystery'. Miss Brittonএর এই গাড়ীখানি ঐ দেশীয় দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা এই মজার গাড়ীখানির একটী ছবি দিলাম।

চলন্ত ট্রেণে টেলিফোন

পূর্ব্বে চলন্ত ট্রেণ হইতে কোন দূর দেশে কাহাকে কিছু সংবাদ পাঠাইতে হইলে মহা অসুবিধায় পড়িতে হইত। বিজ্ঞানের বলে আর আমাদের এ অসুবিধায় পড়িতে হইবে না। Canadian National Railways তাঁহাদের প্রত্যেক ট্রেণের মধ্যে টেলিফোন বসাইয়া দিয়াছেন। গত এপ্রিল মাসে একটী চলন্ত ট্রেণ হইতে লণ্ডনের এক অফিসে সংবাদ পাঠান হয় এবং পরে জানা যায় যে ঐ সংবাদ যথাযথ ভাবে সেখানে পৌঁছিয়াছিল। এই যন্ত্রের এখনও যথেষ্ট ত্রুটি আছে। সেই কারণে ইহার বহুল প্রচার হইতেছে না। আশা করা যায় কিছু দিনের মধ্যে ইহাকে একটী নিখুঁত যন্ত্র হিসাবে গড়িয়া তোলা হইবে।

ম্যালেরিয়ার প্রতিকার কি সম্ভবপর নয়?

গত এপ্রিল মাসের Scientific American পত্রে Dr. Theo Krysto M. D. নামক বিখ্যাত চিকিৎসক ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার সার সঙ্কলন আমরা করিয়া দিলাম। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা কল্পনাপ্রসূত নয়—সমস্ত জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে তিনি তাহা বলিতে সমর্থ হইয়াছেন। Medical

Geographyতে দেখা যায় যে ৪০ ডিগ্রী উত্তর এবং ৩০ ডিগ্রী দক্ষিণ এই ভূখণ্ডের মধ্যেই ম্যালেরিয়ার আধিক্য বেশী। কেবল অষ্ট্রেলিয়া, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের পশ্চিমাংশ, আরব ও মিশর এই কয়েকটী প্রদেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয় না। অপরাপর স্থানে এই রোগ দৃষ্ট হইলেও, আফ্রিকার অধিকাংশ স্থান, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইন্দো-চীন, ও ভারতবর্ষের সমতল ভূমিতে যে পরিমাণে হয় সেরূপ কোথাও হয় না। আফ্রিকার বহুস্থানে ম্যালেরিয়া হইলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যদি কোনরূপ ঔষধ ব্যবহার করা না হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য।

হাজার হাজার লোক প্রতি বৎসর এই দুরারোগ্য রোগে প্রাণ হারাইতেছে। ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? Dr. Theo Krysto বলিতেছেন যে সে প্রতিকার অতি সহজেই করা যাইতে পারে। ম্যালেরিয়া যে কি তাহা তিনি ভালরকম জানেন, কারণ বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহাকেও ঐ রোগে ভুগিতে হইয়াছিল।

সাধারণতঃ এই রোগের জন্ম মশা হইতে। তেল, emulsion প্রভৃতির দ্বারা ইহাদের বংশ সম্পূর্ণ নাশ করা অসম্ভব। সেই কারণে তিনি Beans ও Alfalfar নাম করিয়াছেন,(Dr. Krysto শুধু পাশ্চাত্য জগতেরই কথা বলিতেছেন, কারণ Beans কিংবা Alfalfa আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না, তবে আমাদের দেশে উহার পরিবর্ত্তে তুলসীগাছের দ্বারা ম্যালেরিয়া তাড়ান যায়) যাহাতে মশকের নিষ্করুণ দংশন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। Alfalfa বর্দ্ধিষ্ণু হইলেই সে স্থানে আর ম্যালেরিয়া থাকিতে পারে না। লেখক নিজেই দেখিয়াছেন যে, যেখানে এনোফিলিসের খুব প্রাদুর্ভাব সেখানে Alfalfa কিংবা Beans রোপণ করিলেই ম্যালেরিয়া সমূলে বিনষ্ট হয়। এইরূপ আরও এক প্রকারের উদ্ভিদ পদার্থ আছে, তাহার চাষ করিলে মশক-বংশ ধ্বংস হয়। এই কারণে যে দেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী সে দেশে শুঁটীওয়ালা উদ্ভিদ—Leguminous Plant বসানর যথেষ্ট প্রয়োজন। তৈল, emulsion কিংবা ম্যালেরিয়ার বীজাণু ধ্বংসকারী মৎস্য প্রভৃতির দ্বারা ম্যালেরিয়া নষ্ট করিতে বহু অর্থ ব্যয় হয় অথচ অল্প খরচে অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ সমূলে ম্যালেরিয়া ধ্বংস করা প্রত্যেকেরই আয়াসসাধ্য।

ম্যালেরিয়াকে আমরা একেবারে দুরারোগ্য বলিয়া ধরিয়া লই কিন্তু ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় যে আমাদের প্রত্যেকের হাতেই রহিয়াছে তাহা আমরা ভাবি না।

পোয়েট লরিয়েটের মৃত্যু

গত ২১শে এপ্রিল Oxfordএর নিকট ইংলণ্ডের রাজ-কবি—(Poet-Laureate) Dr. Robert Bridgesএর মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১৩ খৃঃ তিনি ঐ পদে মনোনীত হন। তাঁহার লেখার মধ্যে 'Growth of Life', 'Prometheus the Forgiver', 'Eros and Psyche' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সাধারণের নিকট হইতে বিশেষ সম্মান পান নাই, কারণ তাঁহার সমস্ত কবিতাই প্রায় দুর্ব্বোধ্য। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি 'Testament of Beauty' নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। Dr. Bridgesএর মৃত্যুতে জন-মেশফিল্ডকে ইংলণ্ডের রাজসচিব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মেশফিল্ডের সহজ স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল কবিত্ব-শক্তিজ্ঞানের সকলের মনস্তুষ্টি করিবে।

প্রতীচ্যের আধুনিক চিত্র-শিল্প

বর্ত্তমান সময়ে প্রতীচ্য-জগতে বিখ্যাত শিল্পীরা কে কি করিতেছেন তাহার একটী বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিলাম:—

লণ্ডন—হাল উল্‌ফ (Hal Woolf) গত হেমন্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত Refern Galleryর শিল্প-প্রদর্শনীতে কেবল উল্‌ফেরই ছবি দেখাইয়া আসিয়াছেন। উল্‌ফ নবীন হইলেও তাঁহার বৈশিষ্ট্য শিল্প-জগতে যথেষ্ট আদর পাইয়াছে। তাঁহার অধিকাংশ Landscapes পারী ও কোর্‌সিকার দৃশ্য লইয়া অঙ্কিত। তাঁহার বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে 'Rue de Bau bourg' 'Les Halles', 'Cafe', 'Rue de Bucci' ও 'Onions'এর নাম উল্লেখযোগ্য।

Godfrey Phillips Galleries কিছু দিন পূর্ব্বে এক চিত্র-প্রদর্শনী খোলেন। এই প্রদর্শনীতে ছোট বড় বহু শিল্পী তাঁহাদের ছবি পাঠাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের

শিল্পী Geoffery Nelson যে পিরেনিস্ পর্ব্বতের দৃশ্য-পট-খানি আঁকিয়াছেন তাহা না কি যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। এই প্রদর্শনীর অপরাপর চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে Miss Nina Hamnolt, Edgar Gilmont, Dietz Edyardএর নাম শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ট্রোয়িন্ নামক এক কৃষক কিছু দিন হইল কয়েকখানি চমৎকার ছবি আঁকিয়াছে। সে Pissarroর ছাত্র বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহার ছবিগুলি খুব পুরাতন ধরণের হইলেও সে যাহা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে তাহা তাহার ছবির প্রত্যেক অঙ্গে সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পারী—বিখ্যাত শিল্পী ও পটুয়া Emile Bourdelle আজ মৃত। তাঁহার মৃত্যুতে ফরাসী-শিল্প-জগতের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি Carriereর বিদ্যালয়ে প্রথমে এই বিদ্যা শিক্ষা করেন। ফ্রান্সের বহু স্থানে তাঁহার তৈয়ারী মূর্ত্তি আছে। গত বৎসর ব্রাসেল্‌স্‌এ তাঁহার তৈয়ারী মূর্ত্তিগুলির এক প্রদর্শনী খোলা হয়।

Vergesarrat একজন ফ্রান্সের উদীয়মান শিল্পী। তিনি গত মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি Charles Heymanএর দলের। তিনি Poussin, Durer প্রভৃতির দরুন পদ্ধতিকে অনুসরণ করেন। পূর্ব্বে তাঁহার খ্যাতি ততটা বিস্তৃত হয় নাই; কিন্তু গত বৎসর লণ্ডনের এক প্রদর্শনীতে তাঁহার ছবি পুরস্কার পাওয়ার পর এখন তিনি সকলের নিকট পরিচিত।

বার্লিন—বর্ত্তমান সময়ের স্থপতি-বিদ্যার সর্ব্বাপেক্ষা জটিলতম সমস্যা হইয়াছে গির্জ্জা-তৈয়ারী-সমস্যা। Kunstdienst Dresden এই বিষয়ে একটী প্রদর্শনী খোলেন। বিশেষজ্ঞরা বর্ত্তমান সময়ের ভাবোপযোগী করিয়া নূতন ধরণে গির্জ্জা তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পরীক্ষা স্বরূপ পুরাতন ধরণে আর গির্জ্জা তৈয়ারী না করিয়া নূতন ধরণে কয়েকটী গির্জ্জা তৈয়ারী করা হইয়াছে।

বিখ্যাত শিল্পী Curt Hermann ৭৫ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। তাঁহার ছবিগুলি তাঁর বিরাট্ প্রতিভার পরিচায়ক। জীবনের যে সত্য তিনি তাঁর ছবিগুলির মধ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা চিরকাল অক্ষয় অমর হইয়া থাকিবে।

Felix Meseck, Weimarএর একটী কলেজের অধ্যাপক। তিনি আজ কয়েক বৎসর হইল যথেষ্ট শিল্প-কুশলতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ছবিগুলি Ferdinand Moller Galleryতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্পেন—Don Ignacio Pinazo Camarlnecএর পুত্র Don Jose Pinaoz Martinez কিছু দিন হইল ছবি আঁকিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার ছবিগুলি বিশেষজ্ঞদের নিকট যতটা আদর পাইয়াছে তাহা হইতে বেশী আদর পাইয়াছে সাধারণের নিকট হইতে। স্পেনের কয়েকটী museumsএ তাঁহার ছবি আছে।
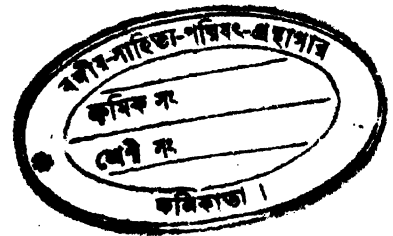
শতবর্ষ পূর্ব্বে কলেজীয় ছাত্রের পদ্যরচনা

[শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্ এ—]

অনেকের এইরূপ ভ্রান্ত সংস্কার আছে যে প্রাচীন হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেরই অনুশীলন করিতেন, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করা দূরে থাক্, মাতৃভাষাকে তাঁহারা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন। কিন্তু যখন আমরা স্মরণ করি যে কবি কাশী-প্রসাদ ঘোষ, যাঁহার বাঙ্গালা গীতাবলী একদিন বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে গীত হইত, আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁহার 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীকে প্রতীচ্য জ্ঞানের সাম্রাজ্যে অনায়াস প্রবেশের অধিকার দিয়াছিল, রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র, যাঁহারা 'মাসিক পত্রিকায়' সহজ ও সরল গদ্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু, যাঁহারা বঙ্গভাষায় ধর্ম্মবিজ্ঞান-বিষয়ক সন্দর্ভ রচনায় অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, মধুসূদন দত্ত, যিনি বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যাঁহার সুচিন্তিত প্রস্তাবসমূহ বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুলনীয়—ইঁহারা সকলেই হিন্দুকলেজের ছাত্র, এবং ইঁহাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগের নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উচ্চ গণিত-বিষয়ক গ্রন্থাদির প্রণেতা প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতিও হিন্দু কলেজের ছাত্র, তখন পূর্ব্বোক্ত সংস্কার যে কতদূর অমূলক তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। সে-কালে উৎকৃষ্ট পাঠ্য গ্রন্থাদির অভাব সত্ত্বেও ইঁহারা কিরূপে মাতৃভাষায় এতাদৃশ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা আজ 'পঞ্চপুষ্পে'র পাঠকগণকে সেকালের একজন বাঙ্গালী ছাত্রের পদ্যরচনা উপহার দিতেছি। এই রচনাটী ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত ইংরাজী লেখক ও অধ্যাপক কাপ্তেন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন-সম্পাদিত "Bengal Annual A Literary Keepsake for 1830" নামক বার্ষিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পত্রে বিখ্যাত ইয়ুরেশীয় শিক্ষক ও কবি হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো, 'বোর্ড অব রেভিনিউ'এর সদস্য হেনরি মেরেডিথ পার্কার, প্রাচ্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত হরেস হেম্যান উইলসন, সদর আদালতের বিচারপতি রবার্ট হ্যাল্ডেন র‍্যাট্রে কাপ্তেন ম্যাকনটেন, কর্ণেল ইয়ং, ডেভিড ড্রামণ্ড, মিস্ এমা রবার্টস্, কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং সম্পাদক প্রভৃতির রচিত প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী গদ্য ও পদ্য রচনার সঙ্গে হিন্দুকলেজের ছাত্রের রচিত এই বাঙ্গলা পদ্যটী কেন মুদ্রিত হইয়াছিল বলিতে পারি না, তবে এইরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, এই বাঙ্গালা পদ্য রচনাটী তৎকালে অনেকের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

হরচন্দ্র ঘোষ

রচনাটী উপহার দিবার পূর্ব্বে রচয়িতা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কিন্তু সেই স্বনামধন্য পুরুষের বিষয় অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কলিকাতার ছোট

আদালতের প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে যে মহাত্মার প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে সেই হরচন্দ্র ঘোষের পরিচয় দিবার জন্য 'সুরধুনী কাব্যের' কবি দীনবন্ধুর নিম্নোদ্ধৃত দুইটী পংক্তিই কি যথেষ্ট নহে ?—

"নিরপেক্ষ হরচন্দ্র জানা নানা মতে,
সুবিজ্ঞ বিচারপতি ছোট আদালতে।"

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ৩রা মে যোড়াসাঁকোয় হরচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা দেওয়ান অভয়চরণ ঘোষ একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ডেভিড হেয়ারের স্কুলে ও হিন্দুকলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তৎকর্ত্তৃক মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার অন্যতম পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ছোট আদালতের অন্যতম বিচারপতির পদে বৃত হন। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ, বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ বিচারপতি ছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৩রা ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হইলে টাউন হলে তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনের জন্য এক মহতী শোকসভা আহূত হয়। হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নর্ম্মাণ সাহেব এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হরচন্দ্র কোনও বাঙ্গলা গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই। হুগলী-নিবাসী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হরচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গলা নাটকের অন্যতম জন্মদাতা এবং তাঁহার অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। নাম এক বলিয়া এই রচনাটীর লেখক ও নাট্যকার হরচন্দ্র একই ব্যক্তি বলিয়া যেন কেহ ভ্রমে পতিত না হন। নাট্যকার হরচন্দ্র হুগলী কলেজের ছাত্র ছিলেন, এই রচনাটী হিন্দুকলেজের ছাত্র হরচন্দ্রের—ইহা সুস্পষ্টভাবে 'বেঙ্গল অ্যানুয়্যালে' লেখা আছে।

বিচারপতি হরচন্দ্র স্বয়ং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি রচনা না করিলেও তিনি যে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুরাগী ও উন্নতি-কামী ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়'-রচয়িতা প্রতাপচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া-ছিলেন। মহাভারত-অনুবাদক মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়—যাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে—তিনিও ইঁহারই তত্ত্বাবধানে 'মানুষ' হইয়াছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃ-বিয়োগ হইয়াছিল বলিয়া হরচন্দ্রই যে কালীপ্রসন্নের অভিভাবক হইয়া ছিলেন এবং তাঁহার রুচি গঠনে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা সিংহ মহোদয়ের জীবনী পাঠকগণের অবিদিত নাই।

যার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীজ হইতে পারে, ইহা প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং এইখানেই ভূমিকা সমাপ্ত করিয়া হরচন্দ্রের রচনাটী আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।—

Anacreon, Ode xxxv
Literally translated,
By Hara Chandra Ghose.

পুষ্পের শয্যাতে এক দিবস মদন।
শ্রমযুক্ত হইয়া তাহে করিল শয়ন॥
দুর্ভাগ্য বালক তাহা চক্ষে না হেরিল।
পুষ্প-পত্রে মধুমক্ষি নিদ্রিত আছিল॥
মক্ষিকা জাগিয়া হইল ক্রোধান্বিত মন।
জাগিয়া শিশুকে তখন করিল দংশন॥
উর্দ্ধস্বরে শিশু তখন করিয়া ক্রন্দন।
মাতার নিকট শীঘ্র করিল গমন॥
আঘাত পাইয়াছি আমি শুন গো জননি।
বেদনাতে প্রাণ যায় মরিব এখনি॥
ক্রুদ্ধ জন্তু আসি মোরে দংশন করিল।
বুঝি কোন সর্প হবে ক্ষুদ্র পক্ষ ছিল॥
মক্ষিকা তাহার নাম স্মরণ এই হয়।
পূর্ব্বেতে রাখাল-মুখে শুনেছি নিশ্চয়॥
সে আসি কহিল এই মাতার সদনে।
শ্রবণ করিল মাতা সহাস্য বদনে॥
শুনিয়া কহিল মাতা বালক আমার।
মক্ষিকা স্পর্শেতে এত দুঃখ হে তোমার॥
কি দশা হইবে তার হায়রে মদন।
যাহার হৃদয়ে তুমি করিবে দংশন॥

Hindoo College, Nov. 1829.

প্রাচীন-পঞ্জী

নাট্যশালার ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই যে দল হবার সূত্রপাত হল, এই আপনাদের সুপরিজ্ঞাত ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অঙ্কুর। এই গোবিন্দবাবুকে অবলম্বন করে আমরা নগেন্দ্রবাবু, ধর্ম্মদাসবাবু, রাধামাধববাবু, আর আমি এই চারজনে ন্যাশনাল থিয়েটারের গোড়া পত্তন করলেম। দুঃখের বিষয় তখন গিরীশবাবুকে আমরা আমাদের মধ্যে পেলেম না। তারপর যেদিন যেমন করে নাম করণ হয়, তাও বলছি।

যেদিন আমরা গোবিন্দনাথকে পেলেম, সেই দিনই যে আমাদের দল—ন্যাশন্যাল থিয়েটারের দল, বসে গেল তা নয়। তখন আমাদের ৺নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতেই বৈঠক হত। গোবিন্দবাবুও সেইখানে আসতেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে গোবিন্দবাবু নিজের অমায়িকতায় আমাদের মধ্যে এমন মিশে গেলেন যে, আমরা তাঁকে গোবিন্দনাথ থেকে একবারে "গোবে বাঙ্গাল" করে নিলেম। আনন্দপ্রকৃতির গোবিন্দবাবুও "গোবে বাঙ্গাল" নামটা বড় আদর করতেন। তিনি নিজেই আপনাকে Gobey Bengal (গোইবা অফ বাঙাল) বলে অভিহিত করতেন। "গোবে বাঙাল" বলে পরিচয় দিতে তাঁর এত আনন্দ বোধ হত যে, তিনি এক সময়ে ৺মতিলাল সুরকে অনুরোধ করেছিলেন যে, যদি তিনি কোন দিন থিয়েটারের সংস্রবে তাঁর নামটা ছাপান, তবে যেন "গোবিন্দনাথের" পরিবর্ত্তে "গোবে অফ বেঙ্গল" ছাপান। আজ সে অনুরোধ রক্ষার জন্য মতিবাবু বেঁচে নাই, যদি আজকের এই সভার বিবরণ কোথাও ছাপা হয়, তবে আমাদ্বারাই সে কাজটা হয়ে যাক। গোবিন্দবাবু আজও বেঁচে আছেন, দেশে আছেন।

বাগবাজার মুখুয্যে পাড়ার হরলাল মিত্রের লেনে গোবে বাঙ্গালের শ্বশুরবাড়ী ছিল। এবার তাঁকে অবলম্বন করে তাঁরই শ্বশুরবাড়ীতে থিয়েটারের দল বসান হল। সধবার একাদশীর দলের এক গিরীশবাবু ব্যতীত আর সকলেই এসে জুটলেন। যাত্রার দল হতে আমরা মতিলাল সুরকে পেয়েছিলেম, তিনিও এলেন। মহেন্দ্রলাল বসুর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে দিন দিন ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গিয়েছিল ; এই সময়ে তিনিও যোগ দিলেন। হিঙ্গুলখাঁও এলেন। নূতন অনেকগুলি লোক যোগ দিলেন ; তার মধ্যে শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র, ৺কার্ত্তিকচন্দ্র পাল প্রভৃতি বিশেষ উৎসাহে কার্য্যে অগ্রসর হলেন। ধর্ম্মদাসবাবুও এই সময়ে আমাদের মধ্যে সকল প্রকার কার্য্য যাতে যথাসময়ে সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ হয়, তার জন্য এত বহু চেষ্টা করতে লাগলেন যে, তিনিই আমাদের মধ্যে অধ্যক্ষ হয়ে পড়লেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের প্রথমে ১২৭৭ সালের মাঘে আবার আমাদের থিয়েটারের দল বসে গেল। আমারই ঘাড়ে শিক্ষার ভার পড়ল। গিরীশবাবু নাই, কাজেই সবাই আমায় চেপে ধরলে। লীলাবতীর রিহারস্যাল আরম্ভ হল। গোবিন্দবাবু যে খরচা দিতেন তাতে আখড়ার খরচটা মাত্র চলত। ষ্টেজ, পোষাক বা অভিনয়ের খরচা তার কাছ থেকে পাবার আশা ছিল না। রিহার্স্যাল যত সম্পূর্ণ হয়ে আসতে লাগল, ততই অভিনয়ের জন্য উদ্বেগ বাড়তে লাগল। আমি উপায়ান্তর না দেখে প্রস্তাব করলেম—এরকমে একটা লোকের অর্থ নষ্ট করা যুক্তিসঙ্গত নয়, বরং কোথাও একটা ষ্টেজ ভাড়া করে এনে, টিকিট বেচে অভিনয় করার চেষ্টা করা যাক, তা হলে কিছু অর্থসংগ্রহ হতে পারে। তার পর কোথাও একটা স্থায়ী ষ্টেজ বাঁধবার চেষ্টা করা যাবে। আমার পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বলে সকলে গ্রহণ করলেন। রিহার্স্যালে আরও তাড়া পড়ে গেল। তখনও গিরীশবাবু আমাদের মধ্যে নেই। (Hear Hear) ধর্ম্মদাসবাবু, হেমেন্দ্রবাবু, হিঙ্গুল খাঁ প্রভৃতি ললিতের অংশ শিক্ষা করতেন। শেষে টিকিট বেচেই অভিনয় করবার জন্য কৃতসংকল্প হয়ে একদিন ড্রেস রিহার্স্যাল দেবার (Experimental play) প্রস্তাব করা গেল। নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতেই ১৮৭১ সালের ১২৭৭ সালের শেষে এক্সপেরিমেণ্টাল প্লে হয়ে গেল। এই অভিনয়ে ধর্ম্মদাসবাবু ললিতের অংশ অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের সুখ্যাতি পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে পড়ল, গিরীশবাবু তখন এসে যোগ দিলেন, আমরাও মহা আনন্দে তাঁকে ললিতের অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেম। তিনিও সম্মত হলেন। শেষে তাঁকে আমাদের অভিপ্রায় জানালেম। তিনি পেশাদার হয়ে টিকিট বেচে থিয়েটার করতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। তিনি প্রস্তাব করলেন মাইকেলের কথামত সকলে ৫ হাজার টাকা চাঁদা তোলবার চেষ্টা দেখ। আমরাও তখন কাজ বড় সহজ ভেবে তাঁরই কথায় সম্মত হলেম।

তার পর চাঁদার খাতা প্রস্তুত হল। রাধামাধববাবুর বাড়ী ১০৭ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে আমাদের থিয়েটারের কার্য্যালয় স্থির হল। ধর্ম্মদাসবাবু ম্যানেজার, নগেন্দ্রবাবু সেক্রেটারী হলেন। চাঁদার ৮ খানি খাতায় A হতে H পর্য্যন্ত নম্বর দেওয়া হল। প্রত্যেক খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় ইংরাজীতে এক একখানি আবেদন-পত্র আঁটিয়া দেওয়া হল, তার মধ্যে উদ্দেশ্য লেখা হল "Subscription to be raised for the benefit of a public stage and the dramatic writing"—খাতায় ধর্ম্মদাসবাবু, নগেন্দ্রবাবু আর যোগেন্দ্রবাবু Projector বলে নাম সহি করেছিলেন। শেষে ঐরূপ নাম দিয়ে একটা সাধারণ বিজ্ঞাপনও ছাপান হয়। ধর্ম্মদাসবাবুর বাড়ীতে বসে এই সকল কার্য্য হয়। এক একখানি খাতা এক এক জনের নিকট

চাঁদা আদায়ের জন্ম দেওয়া হয়। A সংখ্যক খাতায় রাধামাধববাবু, ধর্ম্মদাসবাবু, নগেন্দ্রবাবু আর আমি প্রত্যেকে ২০৲ টাকা করে চাঁদা সহি করি। এই খাতা নিয়ে মতিলাল সুর, গোপালচন্দ্র দাস আর আমি সহরের বড় মানুষদের নিকট চাঁদা সাধতে যাই। প্রথমেই নাট্যামোদী বলিয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের বাড়ী যাই। তখনও তিনি মহারাজ নন। আমার আত্মীয়-স্থল বলে, আমি ভিতরে যাই নি। মতিবাবু আর গোপলবাবু যান। মহারাজের ভগ্নিপতি নবীনবাবু প্রস্তাবটি শুনে বল্লেন, "বাপু, তোমাদের বোধ হয় আমোদের পয়সার অভাব হয়েছে, সাধারণের জন্ম থিয়েটার হল আর না হল বড় বয়েই গেল, আর বোধ হয় তার কোন প্রয়োজনও নেই। মহারাজার বাড়ীতে এইরূপ নিরুৎসাহ হওয়ায় আমরা আর কোন বড় মানুষের দ্বারস্থ হলেম না। পাড়া-প্রতিবাসী গৃহস্থদের নিকট ২৲, ৩৲ করে ৩০০৲ পর্য্যন্ত সহি হয়। এই তিনশ টাকার মধ্যেও আবার ২৫০৲ টাকা মাত্র আদায় হয়েছিল। তাই নিয়েই কার্য্য আরম্ভ করা গেল, ষ্টেজ তৈয়ারীর জন্ম কিছু কিছু জিনিষ পত্র ধর্ম্মদাসবাবুকে আনতে দেওয়া গেল; দৃশ্যপটের উপযুক্ত কাঠ, কাপড়, রং কেনা হল। গোবর্দ্ধন পোটো একখানি রাজপথের দৃশ্যপট এঁকে দিলে আর পয়সা নাই, পোটোকে বিদায় দিয়ে ধর্ম্মদাসবাবু নিজেই তুলি ধরলেন। এই সময়ে আবার গোবিন্দনাথবাবুও দেশে গেলেন। আখড়ার খরচ চালান দায় হল। তখন মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু নগেন্দ্রবাবু, আমি,—আমরাই মধ্যে মধ্যে ১০।২০ টাকা দিয়ে দলটি বজায় রাখলেম। এত কষ্টে পড়ে আমি আবার একদিন ষ্টেজ ভাড়া করে টিকিট বেচে টাকা তোল্‌বার প্রস্তাব কর্‌লেম। শেষে তিনি বিরক্ত হয়ে আবার আমাদের সঙ্গ ত্যাগ কর্‌লেন।

ধর্ম্মদাসবাবুর বাগবাজারের বাড়ীর সম্মুখে একটা মাঠ পড়ে আছে, তখন সেখানে একটা পুষ্করিণী ছিল। এই পুকুরের পাড়ে একঘর কামারের বসতি ছিল। সে উঠে গেলে তার ভিটে পড়েছিল। আমরা সেইখানে নাট্যমঞ্চ বেঁধে টিকিট বেচে অভিনয় কর্‌ব বলে স্থির কর্‌লেম। স্থানটা বাগবাজার ষ্ট্রীটের উপর। এই পরামর্শই স্থির হল। তখন প্লাটফর্ম্মের কাঠের ভাবনা জুটলো, ইতিপূর্ব্বে শ্যামপুকুরের গোপাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ব্রজবাবুর প্রস্তুত প্লাটফর্ম্মের কথা বলেছি, সেকাঠ-কাঠরা তখন মজুত ছিল। ব্রজবাবু তখনও পীড়িত। আমি একদিন গিয়ে সেগুলি প্রার্থনা করলেম। ব্রজবাবু সমস্ত শুনে আনন্দ মনে সমস্ত দান কর্‌লেন। তখন অর্থের অবস্থা এমনি স্বাচ্ছল্য যে, শ্যামপুকুর হতে কাঠগুলা বাগবাজারে মুটে ভাড়া দিয়ে আন্‌বার সঙ্গতি নেই। শেষে গভীর রাত্রে আপনারাই হাতাহাতি করে সেই সকল কাঠ এনে ফেলা গেল। (hear hear) ঠিক এই সময়ে একটা ইংরাজ নাবিক ভিক্ষা কর্‌তে আসে, তার নাম ম্যাক্‌লীন।—তার থাকবার স্থান, খাবার উপায় ছিল না। ধর্ম্মদাসবাবু তাকে আহার দিতে স্বীকার করেন। তার পর যৎসামান্ত খরচ করে আমরা জমীটাকে ঘিরে নিয়েছিলেম বটে, কিন্তু লোকাভাবে টুক্‌রো কাঠ চুরী যেতে লাগল দেখে, ঐ সাহেবটাকে তার রক্ষক রাখা গেল। সে ধর্ম্মদাসবাবুর বাড়ী খেত আর সেই মাঠে পড়ে থাক্‌ত। তাকে দিয়ে আমরা কুলীমজুরের কাজও করিয়ে নিতেম। লোকটা জাহাজে থাকার জন্ম অনেকগুলা রং প্রস্তুত করতে জান্‌ত। আমরা তাকে দিয়ে অল্প খরচে অনেকগুলো রং প্রস্তুত করিয়ে নিয়েছিলেম। ধর্ম্মদাসবাবু আঁকতেন, ক্ষেত্রমোহন যোগাড় দিতেন আর সাহেব রং বেটে রং ফলিয়ে দিত। কিছুদিন থাক্‌তে থাক্‌তে সাহেব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীর কোচম্যান হয়ে গেল। লোকটার বস্ত্রাদি নেই দেখে কৃষ্ণকিশোরবাবু একসুট ইংরাজী পোষাক কিনে দিলেন, পোষাক পেয়ে, একদিকে চলে গেল আর এল না।

আমাদের দৃশ্যপট আঁকা আর প্লাটফর্ম্ম তৈয়ারী যখন অর্দ্ধেক প্রস্তুত হয়ে এসেছে, তখন শুন্‌লেম আমাদের একজন বাল্যবন্ধু আগুন দিয়ে পুড়িয়ে উহা নষ্ট করবার চেষ্টায় আছেন। তিনি আমাদের মধ্যেই ছিলেন, তবে মনের মিল হ'তনা বলে মাঝে মাঝে আসতেন আবার ছেড়ে দিতেন। আমরা তাঁর এই অভিসন্ধি জান্‌তে পেরে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মদাসবাবুর পরামর্শ মত একদিনে সমস্ত খুলে শ্যামবাজারে ৺বৃন্দাবন পালের বাড়ীতে নিয়ে গেলেম। বৃন্দাবনবাবুর পোষ্যপুত্র রাজেন্দ্রনাথ পাল আমাদের একজন বাল্যবন্ধু। তাঁর আশ্রয়ে ও তাঁর সাহায্যে তাঁরই বাড়ীর উঠানে নাট্যমঞ্চ বাঁধা হতে লাগল। কার্ত্তিকচন্দ্র পাল, ধর্ম্মদাসবাবু এই সময় একপ্রকার ২৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করে কাজ কর্‌তে লাগলেন। আশ্রয় পেয়ে আমরা টিকিট বেচবার পরামর্শ ত্যাগ কর্‌লেম। নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আবার রিহার্সেল চল্‌তে লাগল। গিরীশবাবু টিকিট নাই শুনে আবার এসে যোগ দিলেন। এইরূপে প্রায় অনেক দিন রিহার্সালের পর (১৮৭১)১২৭৮ সালের বর্ষাকালে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়ীতে আমাদের নিজের ষ্টেজে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হল। এই অভিনয়ে মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু আর হিঙ্গুল প্রথম অভিনয় করেন। রাজেন্দ্র নিয়োগীর কনসার্ট বাজে। এই সময় কোন কোন দিন রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর আমাদের দলে ঢোল বাজাতেন। এই সময় হিন্দু-মেলার নবগোপাল মিত্র আমাদের দলে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি অভিনয় করতেন না বটে, কিন্তু দেখা শুনায় অনেক সাহায্য কর্‌তেন। একদিন নগেন্দ্রবাবুর বাড়ী নগেন্দ্র, রাধামাধব, মতিলাল সুর, ধর্ম্মদাস, যোগেন্দ্র মিত্র আর আমি বসে আছি। কথা উঠল থিয়েটারের কি নাম দেওয়া হবে? নানা জনে নানা নাম প্রস্তাব করলে। নবগোপালবাবুর ন্যাশান্যাল নামটার উপর ভারী ঝোঁক ছিল, তিনি যা কিছু কর্‌তেন তার নামে ন্যাশান্যাল শব্দ যোগ করে দিতেন। এই জন্ম আমরা তাঁর নামই ন্যাশান্যাল নবগোপাল করে নিয়েছিলাম। নবগোপালবাবু আমাদের থিয়েটারের নাম The Calcutta National Theatre রাখবার প্রস্তাব করেন, শেষে মতিবাবুর প্রস্তাব মত Calcutta টুকু বাদ দিয়ে কেবল The National Theatre রাখা হয়। প্রথম দিন ঐ নামেই অভিনয় হয়।

রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়ীতে পর পর তিনটী শনিবারে তিনটী অভিনয় হয়। ঐ অভিনয়ে গিরীশবাবু ললিতের, নগেনবাবু হেমচন্দ্রের, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মদের চাদের. শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীনাথের, মহেন্দ্রবাবু ভোলানাথের, মতিবাবু মেজ খুড়োর, হিঙ্গুলখাঁ। রঘুয়া উড়ের, সুরেশচন্দ্র মিত্র লীলাবতীর, বেলবাবু সারদাসুন্দরীর, আর রাধামাধববাবু ক্ষীরোদবাসীর, ক্ষেত্রবাবু রাজলক্ষ্মীর অংশ, আর আমি হরিবিলাসের অংশ আর একটা ঝিয়ের অংশ অভিনয় করি। এই ঝিয়ের ভাষা গ্রন্থকার যা রেখেছেন অভিনয়ের সময়ে তা বদলে আমি মেদিনীপুর অঞ্চলের ভাষায় অভিনয় করি। হিঙ্গুল খাঁ ২।১বার রঘুয়া সাজেন, শেষে পশিলাল দাস ঐ অংশ অভিনয় করে এতটা গুণপণা দেখিয়েছিলেন যে শেষে তাঁর ভাষা "বিশাড়ী" হয়ে গিয়েছিল, তারপর ঐ স্থানেই বন্দুকওয়ালা মথুরামোহন বিশ্বাসের বাড়ীতে পূজার সময় এক রাত্রি লীলাবতীর অভিনয় হয়। ন্যাশান্যাল থিয়েটারের অবৈতনিক ভাবে এই শেষ অভিনয়। ইহা ১৮৭৮ সালের মাঝামাঝির ঘটনা।

রাজেন্দ্রবাবু ও অন্যান্যের সাহায্যে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল তা এই চারটি অভিনয়ে মঞ্চ প্রস্তুত করতেই শেষ হয়ে গেল। শেষে আর এমন খরচাও হাতে রইল না যে আর একদিন অভিনয় হয়। তখন আমি আবার টিকিট বেচে অভিনয় করবার প্রস্তাব তুললেম। এবার ষ্টেজ ছিল, বেশী ভাববার বিষয় ছিল না। সকলেই সম্মত হলেন, গিরীশবাবু কিন্তু শুনেই বেঁকে বসলেন, তিনি বল্লেন,—পেশাদার যদি হতে হয়, তবে এ রকমে হওয়া হবে না। একেবারে যদি ছাতুবাবুর মাঠে প্যাভিলিয়ন করতে পার, আমি রাজী আছি। আমরা তাঁর সেই অসম্ভব প্রস্তাব শুনে চমকে গেলেম, তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেম,—পীড়াপীড়ি করতেই তিনি দল ছেড়ে দিলেন।

আমাদের তখন বড়ই অর্থকষ্ট। এমন সামর্থ্য নাই যে তখন টিকিট বেচে অভিনয় করবার জন্য যতটা টাকার প্রয়োজন, তা আমরা আমাদের নিজেদের মধ্য হতে তুলতে পারি। রাজেন্দ্রবাবুর উঠানে ষ্টেজ ছিল, কিন্তু বর্ষায় তা খারাপ হয়ে যেতে লাগল। সে উঠান এত বড় নয় যে তাতে টিকিট বেচে দর্শকের স্থান কুলান হতে পারে। কাজেই টিকিট বেচে থিয়েটার করতে হলে অন্যত্র ষ্টেজ নিয়ে যেতে হয়। সে খরচ কুলাবার অবস্থা নাই, কাজেই গোলমালে দিন কাটতে লাগল. রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীর উঠানে প্ল্যাট্ফর্ম পচতে লাগল। ক্রমে দলও ভেঙ্গে গেল। নগেন্দ্র, ধর্ম্মদাস, মতি আর আমি আমরা চারজনে প্রায় কাছাকাছি বাড়ীতে থাকতেম, কাজেই আমাদের দেখা শুনা, শৃগালের ন্যায় বৃথা যুক্তি বন্ধ হত না। শেষে আমরা পরামর্শ করে আবার এক নূতন প্রথায় কার্য্য করতে অগ্রসর হলেম। আপনাদের স্মরণ আছে, আমরা যখন পাড়া-প্রতিবাসীর নিকট চাঁদা আদায় করতে যাই সেই সময়ে আমাদের সঙ্গে এ পাড়া ও পাড়ার কতকগুলি ভদ্র লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। লীলাবতীর অভিনয়ে তাঁরা আমাদের দেখা শুনা, তদ্বির করা প্রভৃতি কার্য্যে বিস্তর সাহায্য করতেন। আমরা এবার তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে আমাদের পরামর্শদাতা ও পরিচালক মত স্থির করলেম। তাঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রনাথ পাল (বৃন্দাবন পালের পৌত্র পুত্র), আর এক রাজেন্দ্রনাথ পাল ওরফে বুধ পাল, শ্রীঅমৃতলাল পাল, শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, ইন্‌স্পেক্টার শ্রীব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনন্দগোপাল নিয়োগী (এক্ষণে এটর্নী), কর্টিক ওরফে হরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, আমাদের নগেন্দ্রবাবুর বড় ভাই দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রের পিসতুতো ভাই শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাদের বেশ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

চাঁদা আদায়ের সময় আমরা রসিকচন্দ্র নিয়োগীর বয়স্ক পৌত্র ভুবনমোহন নিয়োগীর নিকট কিছু সাহায্য পেয়েছিলাম। এই বালক এই দুর্দশার সময়ে আমাদের সহিত কিছু বেশী মিশতে আরম্ভ করলে। ক্রমে ক্রমে আমাদের দুর্দশার কথা জানতে পেরে আপনা হতে আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত হল। ভুবনবাবুর নিকট ভরসা পেয়ে আমরা আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। ধর্ম্মদাস, নগেন্দ্র, মতি, রাধামাধব আর আমি, আমরা আবার দল বসাবার আয়োজন করতে লাগলেম।

ভুবনবাবুকে স্থানের কথা বলায় তিনি তাঁহার পিতামহ প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণার ঘাটের চাঁদনীর উপর বারদারী বৈঠকখানা ছেড়ে দিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে ১২৭৮ সালের শীতকালে আমরা এইখানে গিয়ে আশ্রয় নিলেম। গিরীশবাবু ব্যতীত লীলাবতীর দলের সকলেই এসে দলে যোগ দিলেন। এবার পৃষ্ঠপোষকগণের যত্নে আমাদের কার্য্যপ্রণালীর একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করা গেল। দলের নগেন্দ্রবাবু সেক্রেটরী, ধর্ম্মদাসবাবু সকল বিষয়ের ম্যানেজার, কার্ত্তিকচন্দ্র পাল ড্রেসার হলেন, ডিরেক্টরী আর মাষ্টারী আমার ঘাড়ে পড়ল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সুবিখ্যাত গায়ক বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় এই সময় আমাদের গীত শিক্ষক ছিলেন। গান গাইবার আবশ্যক হলে তিনিই ষ্টেজের ভিতর গান করতেন। আর সকলে অভিনেতা হলেন। এই সময়ে আমরা আমাদের সধবার একাদশীর দলের যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেশচন্দ্র মিত্র, নন্দলাল ঘোষ, রাধামাধব, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জনকে হারালেম। অনেকে আর থিয়েটার করবেন না বলে, আর অনেকে অন্যান্য অসুবিধায় ছেড়ে দিলেন। অবশেষে সুবন্দোবস্তের সঙ্গে কার্য্য আরম্ভ হল। আমার প্রস্তাব মত "নীল দর্পণ" রিহার্শাল দেওয়া হতে লাগল।

কিছুদিন রিহার্শাল দেওয়ার পর একদিন শ্যামবাজারের বেণীমাধব মিত্র ও পূর্ণচন্দ্র মিত্র তাঁদের কোন আত্মীয়কে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে অন্নপূর্ণার ঘাটে এনে রাখেন। মুমূর্ষুর তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁরাও ঐখানে থাকতেন। এই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে আমাদের

ঘনিষ্ঠতা হয়। আমরা দোতালায় রিহার্স্যাল দিতেম আর তাঁরা মুমূর্ষুকে নিয়ে নীচে থাকতেন। বেণীবাবু, পূর্ণবাবু, যিনি যখন থাকতেন, তিনি তখনই আমাদের রিহার্স্যাল শুনতে যেতেন; এবং আমাদের সৎপরামর্শ দিতেন। তাঁদের এই নিঃস্বার্থ যত্ন আর সহানুভূতি দেখে আমরা বেণীবাবুকে আমাদের প্রেসিডেন্ট হতে অনুরোধ করলেম। বেণীবাবুও স্বীকার করে আরও যত্ন প্রকাশ করতে লাগলেন। এই সময় একদিন শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার আমাদের রিহার্স্যাল দেখতে আসেন। এখানে রাধামাধববাবু উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা একা তাঁরই কতকটা আবৃত্তি শুনে চলে যান, পরে তাঁরা মাঝে মাঝে আসতেন। এই সময় কিছু দিন থাকার পর রাধামাধববাবুও আমাদের ত্যাগ করেন।

যখন আমাদের রিহার্স্যাল নির্বিবাদে চলছে, বেণীবাবু প্রত্যহ পরিদর্শন করে কাজ যাতে সুশৃঙ্খলে চলে যায় তার জন্য বিশেষ পরিশ্রম কচ্ছেন, সেই সময়ে গিরীশবাবু এক সখের যাত্রার দল করেন। এই দলে তিনি একটি সঙএর পালা বেঁধে দেন। ঐ সঙএর মধ্যে একজন প্রয়াগের লুপ্তবেণী ত্রিধারা ভাগীরথীর বর্ণনাত্মক একটী গান গাইত। ঐ গানটীতে আমাদের থিয়েটারের দলের প্রেসিডেন্ট হ'তে আরম্ভ করে প্রত্যেক ব্যক্তির নাম এমন সুন্দর সুকৌশলে গাঁথা ছিল, যে তাতে রচয়িতা গিরীশবাবুর বিশেষ কবিত্ব শক্তি ও শব্দ গাঁথবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল। আমাদের বন্ধু রাধামাধব বাবুই এই গানটী গাইতেন।

লুপ্তবেণী বই তিরিধার।
তাতে পূর্ণ অর্দ্ধ ইন্দু কিরণ, সাঁদুর মাখা মতির হার।
নগ হ'তে ধারা ধায়, সরস্বতী ক্ষীণকায়,
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়;
শিব শম্ভু সুত মহেন্দ্রাদি যদুপতি অবতার।
অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু করে গান, কিবা ধর্ম্ম ক্ষেত্র স্থান,
অবিনাশী মুনিঋষি করছে বসে ধ্যান;
সবাই মিলে ডেকে বলে দীনবন্ধু কর পার।
কিবা বালুময় বেলা, পালে পালে রেতের বেলা,
ভুবনমোহন চরে করে গোপনে খেলা;
মিলে যত চাষা, করে আশা, নীলের গোড়ায় দিচ্ছে সার।
কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত সরষে,
জ্ঞান হয় দীনের গৌরব যায় বুঝিবা খসে;
স্থান-মাহাত্ম্যে হাড়ীগুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার।

যাক্ এইরূপ আমোদ-আহ্লাদ উৎসাহের মধ্যে আমরা দৃঢ় অধ্যবসায়ে ও মহাযত্নে রিহার্স্যাল্ দিয়ে নীল দর্পণ খোলবার মত করে প্রস্তুত হ'লেম। রিহার্স্যালে আমাদের প্রায় একটি বৎসর কেটে গেল। ১৮৭২ সালের নভেম্বর মাসে (১২৭৯ সালের কার্ত্তিক মাসে) নগেন্দ্রবাবুর বাড়ী আমাদের ড্রেস রিহার্স্যাল হ'ল। অভিনয় হবার কিছুদিন পূর্ব্বে আপনাদের সুপরিচিত ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীঅমৃতলাল বসু আমাদের দলে যোগ দেন। তিনি পাটনায় হোমিও-প্যাথিক্ ডাক্তারী করতেন। এই সময় তিনি কলকেতায় আসেন। আমারই আগ্রহে তিনি আমাদের দলে যোগ দেন। যদুনাথ ভট্টাচার্য্য আমাদের দলে সৈরিন্ধ্রীর অংশ নিয়েছিলেন, তিনি দীর্ঘকায় পুরুষ বলে তাঁকে বধূ সাজ্‌লে মানাত না। আমি অমৃতবাবুকে এই পাঠ দিলেম। অমৃতবাবুও অতি অল্প দিনে বেশ অভ্যাস করে নিলেন। তিনিই আমাদের সৈরিন্ধ্রীর অংশ অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে যাঁরা অভিনেতা ছিলেন, তাঁরাই শেষে পাবলিক থিয়েটারের প্রথমাভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন সুতরাং তাঁদের নামগুলি পাবলিক থিয়েটারের ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা থাকা উচিত,—

গোলোক বসু	...	শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
নবীনমাধব	...	৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিন্দুমাধব	...	শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
তোরাপ	...	৺মতিলাল সুর।
রাইচরণ	...	ঐ ঐ।
সাধুচরণ	...	শ্রীমহেন্দ্রলাল বসু।
উডসাহেব	...	শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
রোগসাহেব	...	৺অবিনাশচন্দ্র কর।
গোপীনাথ	...	শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
ম্যাজিষ্ট্রেট	=	শ্রীমহেন্দ্রলাল বসু।
গোপ	...	৺মতিলাল সুর।
কবিরাজ	...	৺শশিদাস দাস।
লাঠিয়াল	...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র।
রাখাল	...	শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য।
নীলকরের মোক্তার	...	৺মতিলাল সুর।
নবীনমাধবের মোক্তার	...	৺গোপালচন্দ্র দাস।
সাবিত্রী	...	শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
সৈরিন্ধ্রী	...	শ্রীঅমৃতলাল বসু।
সরলতা	...	শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।
রেবতী	...	৺তিনকড়ি মান্না।
ক্ষেত্রমণি	...	৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়।
পদী-ময়রাণী	...	শ্রীমহেন্দ্রলাল বসু।
খুড়ী	...	৺অবিনাশচন্দ্র কর।
আদুরী	...	৺গোপালচন্দ্র দাস।
খালাসী	...	৺গোলকনাথ দে।

ক্রমশঃ

শেষ-বেশ

(গল্প)

[শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ বি-এ]

(১)

তখনও দিনের আলো ভাল করিয়া প্রকাশ পায় নাই। যদু ভট্টাচার্য্য 'দুর্গা-দুর্গা' বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলেন, নিতাই চাটুয্যে রকে বসিয়া বিড়ি ফুঁকিতেছে। শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইতেই যদু বলিল—"কি ভায়া, এত ভোরে যে, খবর সব ভাল তো ?"

নিতাই এক দমে বলিয়া যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, বছর পনের পূর্ব্বে তাহার স্ত্রী যেদিন বছর খানেকের একটা কন্যা লইয়া রাগের ঝোঁকে বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন, সে-দিন হইতে আজ অবধি তিনি সেই স্ত্রীর সহিত কোন সংস্রব রাখেন নাই; এমন কি দুই এক বার বিবাহের চেষ্টাও হইয়াছিল, শুধু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ না থাকাতেই তাহা ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই, সে সব কথা না জানে এমন লোক গ্রামে নাই। সে না হোক নিতাইয়ের তাতে কোন ক্ষোভ নাই, নির্ঝঞ্ঝাটে একরকম দিনগুলি ভালই যাইতেছিল। শ্বশুরের পয়সা কড়ি ছিল, তিনি 'সহুরে' লোক, মেয়ে-নাতনীকে সুখে স্বচ্ছন্দেই এতদিন প্রতিপালন করছিলেন। কিন্তু মানুষ তো ইচ্ছা করিলেই জীবনের মেয়াদ বাড়াইয়া লইতে পারে না, গেল বছর তাঁর 'কাল' হইয়াছে। এক বছরের মধ্যে শ্যালকেরা ভিন্ন হইয়া সেখানে এমন অবস্থা করিয়া তুলিয়াছে যে, স্ত্রী ও কন্যাকে শেষটায় প্রাণ লইয়া আবার এই কুঁড়েতেই ফিরিতে হইয়াছে। এখন সে এই পেল্লায় মেয়ে নিয়ে দাঁড়ায়ই বা কোথায়, আর তাকে বিয়েই বা দেয় কার কাছে। তার মাথার ঠিক নাই, মেয়ে আবার পড়াশুনো ক'রে পণ্ডিত হয়েছে—বিয়ের কথায় না কি বেঁকে বসেছে। মাধবপুরের চন্দ্র চৌধুরীর 'বৌ' মরিয়াছে শুনিয়া সেখানে সে গিয়াছিল। চন্দ্র চৌধুরী নিতাইকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতে প্রস্তুতও ছিল; কিন্তু মা ও মেয়েতে মিলিয়া এমন কাণ্ড বাধিয়েছে যে, সে কথা মুখে আনিতেও আর তার ভরসা হয় না। এই শেষ বয়সে তার অদৃষ্টে যে কি আছে তাই ভাবিয়া সে প্রায় পাগল হইতে চলিয়াছে, এখন যদুর কাছে আসিয়াছে, দাদা 'যা হোক' একটা ব্যবস্থা না করিলে তার ইহকাল এবং পরকাল কোনটাই আর অবশিষ্ট থাকিবে না।

সে আরও বলিল, "আজ ক' রাত্তির ঘুম নেই, দিনে যে একটু গড়িয়ে নেব তাও আর ঘটে উঠছে না।"

যদু ভট্টাচার্য্য নিতাইকে চিনিতেন। তিলকে তাল করিয়া বর্ণনা করা তাহার স্বভাব; সুতরাং প্রত্যুষে তাহার আগমনের যথার্থ কারণ শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন,— "তবু ভাল, নিতাই, মেয়ের বিয়ে; আমি ভেবেছিলুম না জানি কি।"

"না জানি কি !!" নিতাই ক্ষণকাল যদুর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি জান না, যদু-দা, আমি কি ভাবে দিন কাটাচ্ছি। আজ চন্দ্র চৌধুরীকে আমি কি ব'লে ব'লে পাঠাই যে, তোমাকে মেয়ে দেব না।"

"আচ্ছা সে ব্যবস্থা তোমায় করতে হবে না, আর তোমায় তার জন্যে ভাবতেও হবে না। মেয়ের বিয়ে চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে না হয় অন্য জায়গায় হবে।"

"তুমি তো ব'ল্লে হবে কিন্তু আমি এমন ছেলে পাই কোথা ? যে রকম দিন কাল পড়েছে কানা খোঁড়া অমনি মেলে না; বিয়ের বাজারে কানা হয় পদ্মলোচন, খোঁড়া হয় কন্দর্প। চন্দ্র চৌধুরী চায় শুধু মেয়েটী।"

নিতাইয়ের উদ্বেগের কারণ এতক্ষণে বুঝা গেল। যথেষ্ট পয়সা থাকিতেও বিনাব্যয়ে কন্যাদানের লোভেই নিতাই এই ষাট বছরের চৌধুরীকে জামাই করিতে প্রস্তুত। তার সেইটী হাত ছাড়া হইবার ভয়েই সে এমন মরিয়া হইয়া

উঠিয়াছে। যদু একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার মতিভ্রম ধরেছে, নিতাই, বছর পনর তো যক্ষের ধন আগলালে, আজ না হয় মেয়েটাকে একটু সৎ পাত্রেই দাও।"

নিতাই বিস্মিত দৃষ্টি যদুর মুখের প্রতি তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—"যক্ষের ধন! তুমিও দাদা এই কথাই বল্লে? আমার দিন চলা ভার।"

যদু হাসিয়া বলিলেন, "তা জানি বই কি ভাই—কিন্তু সে কথা নয়, একটী মেয়ে অমন ক'রে জলে ফেলে দিও না—অন্য পাত্র খুঁজে দেখ।"

নিতাই বিবাহের উদ্যোগটা গোপনেই করিতেছিল। সে ভাবিয়াছিল, কথা একবার পাকা হইয়া গেলে আর কোন গোল থাকিবে না। কিন্তু কোন এক অভাবনীয় সূত্রের সাহায্যে, কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ায়, গত রাত্রিতে তাহাকে বিশেষ লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে; তাই ভোর না হইতেই যদুনাথের কাছে দুঃখ নিবেদন করিতে আসিয়াছে। ভাবিয়াছিল, যদু তাহার কথাতেই সায় দিয়া তাহার দুঃখে সমবেদনা জানাইবেন; কিন্তু ফলে হইল বিপরীত। সুতরাং সবিস্ময়ে যদুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকা ছাড়া আর কিছুই সে করিতে পারিল না।

যদুনাথ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—"তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘরে যাও, তোমার মেয়ের অদৃষ্ট ভাল, তাই এই সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল। তোমার কি আছে না আছে সে কথা আমি জানি।"

নিতাইয়ের পক্ষে এবার কথাটা সহ্য করা অসম্ভব হইল। সে প্রায় কাঁদিয়া বলিল, "তা জানবে না কেন, দাদা, আমার পয়সাটাই দেখতে পাও, কিন্তু অবস্থাটা তোমাদের চোখে পড়ে না। আচ্ছা আমিও দেখব—একটী পয়সা আমি খরচ করব না। এতে যদি মেয়ের বিয়ে না হয়, আমি নাচার।" নিতাই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

যদু ভট্টাচার্য্য সকালে উঠিয়াই যে নিতাইকে দেখিবেন, একথা জানা থাকিলে বোধ করি অশুভ-দর্শনের প্রতিবিধান করিয়াই তাহার সহিত দেখা করিতেন—কারণ কৃপণ বলিয়া গ্রামে নিতাইচন্দ্রের এমনি অপূর্ব্ব খ্যাতি ছিল। কিন্তু কৃপণ হইলেও মানুষ যে এত বড় পর্য্যন্ত হইতে পারে, একথা ব্রাহ্মণের জানা ছিল না। তাই ক্ষুণ্ণমনে অন্দরে প্রবেশ করিতে যাইতেই পায়ের শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, পুত্র অনন্ত প্রবেশ করিতেছে।

"এমন অসময়ে যে" বলিয়া পিতা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন।

অনন্তর প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হইয়াছে আজ দুই দিন। গত রাত্রিতে আসিবে মনে করিয়াই সে ট্রেণে উঠিয়াছিল, কিন্তু অনিবার্য্য কারণে মধ্যপথে আটক হওয়ায় এই অসময়ে আসিতে হইয়াছে। পিতৃচরণে প্রণত হইয়া সে বলিল,—"চলুন ভিতরে সব বলছি।" অনন্ত স্যুটকেশটী হাতে করিয়া অন্দরের দিকে অগ্রসর হইল। যদুনাথ পুত্রের মুখে তাহার পথের কাহিনী শুনিবার আশায় সোৎসুক হৃদয়ে তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন।

অনন্ত যদু ভট্টাচার্য্যের একমাত্র সন্তান। শুনা যায় দরিদ্রের ঘরে প্রায়ই নিখুঁত সুন্দর ছেলে হয় না। কিন্তু যদু ভট্টাচার্য্যের সুকৃতিবলেই বোধ করি অনন্ত তাহার ঘরে আসিয়াছিল। এমন লোক বোধ হয় জগতে নাই, যে, অনন্তের দিকে চাহিয়া কিছুকাল শুদ্ধ বিস্ময়ে চোখ মেলিয়া থাকিবে না। তাই গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির অনেক কন্যার পিতাই এই চাঁদের মত ছেলেটীকে জামাই করিবার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু বয়স নিতান্ত অল্প বলিয়া ও লেখা পড়া শেষ না হইলে যদুনাথ কাহারও কথায় কাণ দেন নাই। সুতরাং যদুনাথ আজ অবধি গৃহিণীর বধূর মুখদর্শন এবং সাধ-আহ্লাদের পথটা প্রশস্ত করিয়া দিতে বিলম্ব করিতেছেন। তবে জন্ম-মৃত্যু বিবাহে না কি মানুষের হাত নাই, তাই জোর করিয়া কিছু বলা চলে না।

অন্দরে প্রবেশ করিয়া পুত্রের মুখে যাহা শুনিলেন, তাহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বার কয়েক দুর্গা নাম করা ভিন্ন আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, কারণ ট্রেণের দুর্ঘটনার বিষয় লোকমুখে শুনা এবং কদাচিৎ কোন দিন সংবাদপত্রে পাঠ করা ছাড়া তিনি বা তাঁহার পরিচিত কেহ কোন দিন এই ব্যাপারের মধ্যে পড়েন নাই। তবে এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে যতটুকু তাঁহার জানা আছে, তাহাতে তাঁহারই একমাত্র সন্তান যে ইহার কবলে পড়িয়া অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আসিয়াছে,

ইহা একমাত্র জগন্মাতার অসীম করুণা; সুতরাং দুর্গা নাম ছাড়া ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ আর কোন কথাই উচ্চারণ করিতে পারেন নাই। এবং প্রাতঃকালে নিতাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ অমূলক নয় তাহা বুঝিতে পারিয়া ভবিষ্যৎ অমঙ্গল দূর করিবার জন্য সেই দিনই নারায়ণকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক তুলসী দিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইতে দ্রুত পদে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্ত পিতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মায়ের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিল, মা তখন ঘরে নাই। তবে এই সময়ে অভ্যাসমত তিনি পূজার ফুল তুলিতে বাগানে যাইয়া থাকেন জানা থাকায় অনন্ত বাগানে উপস্থিত হইয়া একটু বিস্মিত হইল। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে যে মেয়েটী ফুল তুলিতেছে, তাহাকে পূর্ব্বে অনন্ত কোন দিন দেখে নাই। বয়স প্রায় তাহারই মত হইবে; কিন্তু এত বড় ধেড়ে মেয়েকে এখনও এই রকম লাফাইয়া বেড়াইতে দেখিয়া, অনন্তের মন কেমন যেন অস্বস্তিতে ভরিয়া গেল। কিন্তু এই আসন্নযৌবনা কিশোরীটী তাহার মাকে এমন করিয়া পাইয়া বসিল কিরূপে তাহাই জানিবার জন্য অনন্তের মন অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অপরিচিতা মেয়েটীর সুমুখে যাইতেও তার কেমন যেন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

দূর হইতে মেয়েটীকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু মুখের যতটুকু দেখা গেল তাহাতে তাহাকে রূপসী বলিলে বেশী বলা হয় না। কিন্তু কোন তরুণীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইবার মত বয়স বা শিক্ষা এই পল্লীবালকের না থাকায় মেয়েটীর এই ছুটাছুটি উচ্চহাস্য প্রভৃতি পুরুষোচিত ব্যবহার-টাই অনন্তের চোখে ধরা পড়িল। আর সেই সঙ্গে এই মেয়েটার প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত বিমুখ হইয়া উঠিল। সে অগ্রসর হইয়া মায়ের কাছে যাইবে কি না ভাবিতেছে এমন সময় শুনিল,—

"দেখ দেখ জেঠাইমা কে, একটা ছোঁড়া বাগানে ঢুকেছে।"

অনন্তর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া গেল – তাহাদের বাগানে দাঁড়াইয়া কিনা তাহারই প্রতি এমন কটুক্তি –কিন্তু স্ত্রীলোক সকল অবস্থাতেই কৃপার পাত্র, সুতরাং সে শান্ত হইয়া ডাকিল—"মা"

"কে রে খোকা, আয় আয়" বলিতে বলিতে মাতা শ্যামাসুন্দরী অগ্রসর হইয়া আসিলেন কিন্তু; সেই মেয়েটীর প্রগল্‌ভতা এক নিমেষে কোথায় চলিয়া গেল। সে শুধু—"ওমা, তোমার ছেলে এই? ছি, ছি" বলিয়া সেখান হইতে অদৃশ্য হইল।

অনন্ত অগ্রসর হইয়া মায়ের পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসিল,—"এই মেয়েটা কে মা? আগে ত কখনও দেখিনি?"

শ্যামাসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন,—"তোর নিতাইমামার মেয়ে গীতা। মামার বাড়ীতে থাকত, বাপের [illegible] এখানে এসেছে।"

অনন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল,—"তা আসুক, কিন্তু এমন ডানপিটে কেন? মেয়ে [illegible], একটু [illegible] নেই, যেন মানোয়রী গোরা!"

মা ছেলেকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—"না রে, বড় ভাল মেয়ে, একটু [illegible] কিন্তু ভারী মিষ্টি ওর স্বভাব। তুই কখন এলি বাবা, খবর সব ভাল তো?"

"তুমি বাড়ী চল, সব বলব।"

"তুই যা, আমি এই ফুল কটা তুলে আসছি।"

"একটু শীগ্‌গির এস, অনেক কথা আছে।" অনন্ত অগ্রসর হইল কিছু দূর যাইয়া ফিরিয়া জিজ্ঞাসিল, "কি নাম ঐ মেয়েটার বল্লে?"

"গীতা।"

"চণ্ডী হ'লেই ভাল হ'ত।' বলিয়া অনন্ত চলিয়া গেল।

(২)

দিন পাঁচ ছয় পরে এক সন্ধ্যায় পুকুরের ঘাটে বসিয়া অনন্ত একাকী নূতন শেখা একখানি গানের সুরে কোন-খানে কণ্ঠের স্বর কি ভাবে খেলাইলে শুনিতে মধুর হয়, বার বার গাহিয়া পরীক্ষা করিতেছিল। বালকের কণ্ঠে সুরের সপ্তগ্রাম যেন লীলা করিয়া বেড়াইতেছিল। এ দিন আবেগ সহকারে অনন্ত তাহার মধুর কণ্ঠস্বরের লীলা-ভঙ্গী একবার উঠাইয়া ও একবার নামাইয়া যেখানে যেটুক প্রয়োজন সুকৌশলে সেইখানে সেইটুক নিপুণতার প্রয়োগে পুকুরঘাটের চারিধারে সুরের একটা মধুর রাজ্য সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। নিশ্চিন্ত আরামে সে তাহার সুর-

সাধনা করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু এই অসময়ে তাহার গানের যে কোন শ্রোতা সেখানে সন্ধ্যার অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া, আপনা ভুলিয়া তাহার গান শুনিবার জন্ম উপস্থিত থাকিবে, ইহা অনন্ত আশা করে নাই। কিন্তু সে আশা না করিলেও শ্রোতা সেখানে একজন ছিল, এবং সে রকম শ্রোতা সকল গায়কের ভাগ্যে প্রায় জুটে না। অথচ অনন্তের সে দিন একজন যে জুটিয়াছিল তাহা সে জানিতে তো পারিত না, যদি না হঠাৎ তাহার গান থামিয়া যাইত। গান থামিতেই সে টের পাইল কে একজন অন্ধকারে পলাইতেছে। অনন্ত চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার সন্দেহ হইল কোন দুষ্ট লোক বোধ হয় বদ মতলবে আসিয়া সেখানে তাহাকে দেখিয়া পলাইতেছে। সে উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিল, কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। ছুটিয়া [illegible] গিয়া সে যাহার সহিত অন্ধকারে ধাক্কা খাইল, তাহাকেই সবলে ধরিয়া টানিয়া ঘাটে লইয়া আসিল কিন্তু [illegible] এই যে, ধৃত ব্যক্তি না দিল বাধা না করিল কোন কাতরোক্তি। অপেক্ষাকৃত আলোতে আসিয়া নিতান্ত অপ্রস্তুতের মত সে গীতাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "কি [illegible]! আপনি এই অন্ধকারে একলা কোথায় যাচ্ছিলেন।"

গীতা প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এই ঘাটে কাপড় কাচিয়া [illegible]। আজ আসিতে দেরী হওয়ায়, ঘাটে পৌঁছিয়াই অনন্তকে দেখিয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল কিন্তু অনন্তের গান শুনিয়া তাহার আর যাওয়া হইল না, সে তন্ময় হইয়া সেই সুর-সুধা পান করিতেছিল। গান চলিলে বোধ করি আরও কিছুকাল থাকিতে তাহার কোন সঙ্কোচ হইত না, কিন্তু গান থামিয়া যাইতেই তাহার মনে হইল, [illegible] ভাবে দাঁড়াইয়া গান শোনা তাহার নিতান্ত অন্যায় হইয়া গেছে; সুতরাং অনন্ত টের পাইবার পূর্ব্বেই সে পলাইবে; কিন্তু পলাইতে যাইয়াই তাহার এই বিপদ।

অনন্তর আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া প্রথমটা সে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া অনন্ত সরিয়া দাঁড়াইলে তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। সে সরিয়া দাঁড়াইয়া তেজের সঙ্গে বলিল—"বলিহারি বুদ্ধি তোমার, পথে ঘাটে এরকম যাকে তাকে জড়িয়ে ধরাই বুঝি স্বভাব?" অনন্ত বেচারা প্রথমেই হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, কারণ কাজটা নিতান্ত ছেলেমানুষী হইলেও লোকচক্ষে কোন মতেই ভাল দেখাইবে না;—তার পর আবার গীতার এই স্পষ্ট অভিযোগ সে একেবারে অপ্রস্তুতের একশেষ হইয়া বলিল,—

"আমি তো জানিনা যে আপনি—ভেবেছিলাম চোর-টোর বুঝি, তাই।"

গীতা—"হাঁ, এই সন্ধ্যে বেলা পুকুর ঘাটে চোর আসবে কি চুরি কর্ত্তে শুনি? চোর আসে কি না জানি না, কিন্তু আজ জানলাম, যে যারা চোর-ডাকাতের চাইতেও খারাপ তারা এখানে আসে।"

অনন্তর এইবার আর সহ্য হইল না, একেই তো গীতাকে দেখিয়া অবধি তাহার মনটা তাহার উপর বিরূপ হইয়াছিল; তার পর সে তার বাড়ীতে বসিয়া এই সামান্য কারণে তাহাকে যা নয় তাই বলিয়া যাইবে কেন? অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অনন্ত বলিল—"চোর-ডাকাতের চাইতে যারা খারাপ তারা এই সন্ধ্যের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পরের বাগানে ঢুকে উৎপাত কর্ত্তে যায় নি—আর যায়ও না কোন দিন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কোন ধর্ম্ম-কার্য্যে এমন সময় এই বাগানে আসা হয়েছিল শুনি?"

এইবার উল্টা চাপ দেখিয়া গীতা যেন একটু কোণ-ঠাসা হইয়া পড়িল, কিন্তু কোন কারণে সে হার মানিবার পাত্রী নয়। সে কহিল, "এটা যে আজ কাল বাবুর বাগান-বাড়ী হয়েছে তা জানা থাকলে, ধর্ম্মবুদ্ধি না হোক পাপ-বুদ্ধি নিয়ে আসবার সাহসও কারও হ'ত না; কিন্তু এটা বাগান-বাড়ী হয়েছে কত দিন?"

"বাগান-বাড়ী না হলেও এটা যে ভূতের বাড়ী নয় সে খপর জেনে তার পর এখানে আসাই উচিত ছিল, কিন্তু যাক্, সে কথার কোন দরকার দেখি না, এরকম অসময়ে আর কোন দিন পথে বেরুবেন না—এখানে না হোক অন্যত্র বিপদ ঘটলে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না।"

গীতার এমন হার আর কোন দিন হয় নাই—কিন্তু এক ফোঁটা একটা ছেলে তাহাকে হারাইয়া দিবে ইহাও যে অসহ্য, কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া কথা কাটাকাটি করিতেও আর তাহার ভরসা হইতেছিল না, কারণ কাহারও চক্ষে পড়িয়া গেলে তখন আর আত্ম-সমর্থনের কিছুই থাকিবে না। তথাপি সে কহিল, "এবার থেকে সাবধানেই পথে

বেরুব, এ গ্রামে যে আজকাল অপদেবতা এসে জুটেছে জেনে একটু সাবধান হ'তে হবে বই কি।"

গীতা অন্ধকারেই চলিয়া যায় দেখিয়া অনন্ত বলিল, "যে জন্যে আসা তা না করে ফিরে যেতে কিন্তু অপদেবতা বলে নি, আপনি বোধ হয় গা ধুতে এসেছিলেন, তা ধুয়ে নিন আমি চলে যাচ্ছি।"

কথাটা গীতার মনেই ছিল না, সে ফিরিল কিন্তু একলা এই অন্ধকারে গা ধোয়ার সাহস আর তাহার নাই। সে কহিল, "না তোমায় যেতে হবে না—আমি গা ধুয়ে যাচ্ছি।" অনন্তর উপস্থিতিতে সে সমীহ করিবার মত কিছুই দেখিতে পাইল না কারণ—বয়সে সে বালক বই আর কিছু নয়, তা ছাড়া এই গ্রামে এই একটী ছেলেকে সে আজ দেখিল যাকে বিশ্বাস করা চলে; সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া সে গা ধুইয়া কাপড় কাচিয়া লইল, এবং আর কোন দিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়াআসিয়া বলিল, "আমায় একটু এগিয়ে দেবে, অন্ধকারে কেমন ভয় কচ্ছে।"

অনন্ত অন্যমনস্কের মত বলিল, "চলুন, কিন্তু রাস্তা দিয়ে নয় আমাদের বাড়ীর ভেতর দিয়ে।"

অনন্ত উঠিয়া জলের ধার হইতে হাত তিনেক এক খানা লাঠি কুড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই, গীতা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "ওকি, লাঠি কেন নিচ্ছ?"

"ওখানা আমার সখের জিনিস, প্রায় সঙ্গেই থাকে।"

"তুমি কি লাঠি খেল না কি?"

"খেলি না, তবে শিখে রেখেছি, আপদ-বিপদে কাজে লাগতে পারে।

গীতা আর কোন কথা বলিল না, আগে আগে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল—অনন্ত তাহার পশ্চাতে গুণ গুণ করিয়া সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে চলিতে লাগিল।

বাড়ীর দরজায় আসিয়া অনন্ত বলিল, "আমার আর যাবার দরকার নাই আপনি যান এবার।"

"তুমি এ রাত্রিতে আবার কোথায় যাবে, ভয় করবে না?"

"আমি মেয়ে মানুষ নই—তা ছাড়া হাতে এই সখের জিনিসটী থাকতে এ গ্রামের কোন কিছুতেই আমার ভয় করে না।"

গীতা ফিরিয়া কি বলিতে যাইয়া দেখিল, অন্ধকারের অন্তরালে তাহার সহচর কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছে, দূরে শুধু তাহার পদশব্দ ক্রমশঃ দূর হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

সে রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া গীতা দেখিল তাহাকেই উপলক্ষ করিয়া বাড়ীতে পিতা ও মাতার মধ্যে একটা কলহ চলিতেছে। পিতা ব্যক্তিটী তাহার কাছে আজন্ম অপরিচিত; সুতরাং ইঁহাকে সে কোন দিনই ভাল চক্ষে দেখিতে পারে নাই। তারপর চন্দ্র চৌধুরীর ব্যাপারটাতে সে একেবারে পিতার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়াছে। আজ আবার সেই আলোচনা শুনিয়া তাহার ধৈর্য্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। তথাপি আলোচনাটা কোন দিক দিয়া যায় দেখিবার ইচ্ছায়, সে লুকাইয়া শুনিতে লাগিল। মা বলিলেন, "আমার ওই একটা মেয়ে, তোমার কাছে না হলেও খেতে পরতে কষ্ট কোন দিন পায় নি, তুমি যে আজ তাকে একটা বুড়ো হাবড়া ধ'রে গছিয়ে দেবে, এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না।"

"কি করতে চাও তুমি শুনি, গরীবের ঘরে রাজপুত্তুর জামাই আসবে কোথেকে—আমি যে ভিটে-মাটী বেচে তোমার জন্যে যুবরাজ জামাই ধ'রে আনব, সে আমার দ্বারা হবে না। এ আমার স্পষ্ট কথা।"

"কেন হবে না সেই কথাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি। মেয়েকে খেতে পরতে তো দিলে না কোন দিন, আবার যার তার হাতে দিতে লজ্জা করে না? মায়া মমতার বালাই তো নেই-ই।"

"কিন্তু মায়া-মমতা দেখাতে গিয়ে যে হাজার পাঁচেকে টান পড়বে—সে আমি দেব কি চুরি ক'রে না ডাকাতি ক'রে।"

"সে আমি জানি না—যেমন করে পার মেয়েকে ভাল ছেলের হাতে তোমাকে দিতেই হবে, নইলে আমি কুরুক্ষেত্র করব। বলি তোমার এই যখের ধন খাবে কে শুনি?"

তাহার পয়সা আছে এই কথা নিতাই শুনিতেই পারিত না। স্ত্রীর মুখে সেই অভিযোগ শুনিয়া নিতাই ক্ষেপিয়া গেল, ভীষণ চীৎকার করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "যখের ধন আগলাই, বেশ করি। আমার পয়সার ওপর নজর!

আমার মেয়ে আমি যেখানে খুস বয়ে দেব—দেখি কে ঠেকাতে পারে। এক পয়সা আমি দেব না কোন ব্যাটাকে।"

তাহার এই গলাবাজী কিন্তু এক নিমেষে খাদে আসিয়া নামিল গীতাকে দেখিয়া। মেয়েটাকে সে ভালবাসিত আর বোধ করি একটু ভয়ও করিত। গীতা ধীরে ধীরে আসিয়া বলিল, "আচ্ছা মিছামিছি চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো ক'রে কি লাভ হবে আপনার শুনি? বাড়ী যে একেবারে হাড়ী বাগ্দীর বাড়ীর চেয়েও অধম হয়ে উঠল।"

"আমার বাড়ীতে বসে আমি চেঁচাব তাতে বলবার কার কি আছে। আমি কোন কথা শুনব না বলে দিচ্ছি।" বলিয়া নিতাই বোধ করি পলায়ন করিয়াই আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু শেষের কথাটা যে কাহার উদ্দেশে প্রয়োগ করা হইল, তাহা তাহার বলার ভঙ্গীতে বুঝা গেল'না।

পিতার প্রস্থানের পর গীতা, মাকে বলিল—"কেন মা তুমি রোজ রোজ ওই এক কথা নিয়ে গোলমাল কর? ও'র যা ইচ্ছে উনি করুন; তুমি কোন কথায় থেকো না।"

"তুই বলিস কি গীতা আমি মা হ'য়ে এই সব অবিচার সইব?"

"হাঁ সইবে—তুমি যদি আর কোন দিন এ নিয়ে কথা বলবে ত আমি সত্য বলছি, আমায় আর জ্যান্ত দেখবে না।"

গীতা আগুনের ফুলকীর মত সেখান হইতে চলিয়া গেল। মাতা চোখের জল মুছিতে লাগিলেন।

প্রথম জীবনে সহরে প্রতিপালিতা ধনীর কন্যা এই পল্লীগ্রামে আসিয়া কতকটা নিজের অভিমানে আর কতকটা স্বামীর কার্পণ্যের অত্যাচারে, এই নারী একটুও সুখী হইতে পারে নাই। বঞ্চিতার অতৃপ্ত-জীবন যে ভাবে বিনা বৈচিত্র্য কাটিয়া যায় গীতার মা মন্দাকিনীর ও সেই ভাবেই কাটিয়াছিল। তাই একমাত্র কন্যার পরিণাম-সম্বন্ধে তাঁহার একটা আশঙ্কা ছিল। স্বামীর ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার সেই আশঙ্কা এখন ভয়ে পরিণত অথচ করিবারও তাঁহার কিছুই নাই। শুধু চোখের জলে তাই মনের গ্লানি দূর করিবার ব্যর্থ প্রয়াসই তাঁর একমাত্র সম্বল।

আর গীতা—সে এখনও অবস্থাটা তেমন ভাল করিয়া না বুঝিলেও—ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে একটু ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছে। আজ সন্ধ্যায় ঝগড়া-কলহের ভিতর দিয়া যে একটু মাধুর্য্য ঘনীভূত হইয়াছিল, বাড়ী ফিরিয়া তাহা একেবারে কোথায় উড়িয়া গেল, বেচারা মায়ের কাছ হইতে নিজের ঘরে শুইয়া পড়িল।

(৩)

নিতাই অর্থ-সম্বন্ধেই যে সর্ব্বদা সশঙ্ক, শুধু তাই নয়, ধর্ম্মের দিকটাও তাহার দৃষ্টির বাহিরে যাইত না। বয়স্থা কন্যা ঘরে রাখিয়া যে ধর্ম্মের অঙ্গ হানি হইতেছে এবং আর বিলম্ব হইলে যে ধর্ম্ম বলিতে তাহার আর কিছুই বাকী থাকিবে না, ইহা সে দিব্যচক্ষে দেখিতেছিল। লোকটা কিন্তু যে পরিমাণ কঞ্জুষ, ঠিক সেই পরিমাণ ভীরু সুতরাং তাহার মনের মধ্যে কন্যা-দান করিয়া ধর্ম্ম-রক্ষার যে কল্পনা জমিয়া উঠিতেছিল, তাহার, প্রকাশ করিয়া দুইবার যে রকম অপদস্থ হইয়াছে, তাহাতে সেই কল্পনা আবার প্রকাশ করিতে আর তাহার সাহস নাই। এক দিকে ধর্ম্ম আর এক দিকে অর্থ, এই দুই রাখিতে গিয়া নিতাইএর অবস্থা নিতান্ত করুণ হইয়া পড়িল।

এদিকে আবার চন্দ্র চৌধুরী লোক পাঠাইয়া শেষ কথা জানিতে চাহিয়াছে। নিতাইয়ের আশায় আর সে অপেক্ষা করিতে পারে না; তা ছাড়া গুজব রটিয়াছে যে নিতাই বিবাহের বায়না স্বরূপ চৌধুরীর কাছ হইতে বেশ মোটা হাতে কিছু পাইয়া যক্ষের ধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এখন না কি কিন্তু কিন্তু করিতেছে। ঘরে-বাহিরে এই ভাবে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া নিতাই কি করিবে কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া সে-দিন ম্লান মুখে যদুনাথের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ছাতার মাথায় অর্দ্ধমলিন উত্তরীয় খানি বেশ করিয়া জড়াইয়া দেয়ালের কোণে রাখিয়া ভিজা গামছা দিয়া মুখও গায়ের ঘাম মুছিবার পর, সে যখন হাত পা ছড়াইয়া বৈঠকখানার সতরঞ্চীর উপর শুইয়া পড়িল, তখন তাহাকে দেখিলে অতি বড় পাষণ্ডের মনেও দয়া না হইয়া পারে না।

যদুনাথ সংবাদ পাইয়া বাহিরে আসিলেন এবং নিতাইকে অমন গড়াইতে দেখিয়া সোদ্বেগে প্রশ্ন করিলেন "কি হ'ল আবার।"

"কিছু না, এমন বাকী শুধু মরণ হবার—সেইটে হ'লেই বাঁচি।"

কিন্তু বাঁচিবার জন্ম যে মরার প্রয়োজন হয় এবং তাহা আবার নিতাই চাটুর্য্যের, যদুনাথের তাহা জানা ছিল না; তা ছাড়া পথে মড়া দেখিলে যে তার পর তিন দিন ঘরের বাহির হয় না তাহার পক্ষে এত বড় বৈরাগ্য যে কত বড় অস্বাভাবিক, তাহা যদুনাথ ভাল করিয়া জানিতেন, সুতরাং ব্যাপারটা আনুপূর্ব্বিক জানিবার বাসনায় তিনি জিজ্ঞসা করিলেন :—

"কিন্তু ও জিনিসটার প্রতি তো তোমার চিরদিনই বিরক্তি তবে হঠাৎ এমন মতিভ্রম কেন?"

"মতিভ্রম নয় দাদা, এখন দেখ্‌ছি মরণ হ'লেই রেহাই।"

"কেন টাকা পয়সার হিসাবে কোথাও গোলযোগ বেঁধেছে না কি?"

নিতাই এই টাকার খোটার জ্বালায় অস্থির হইয়াই এখানে আসিয়াছিল; তাই আবার সেই টাকার কথা তাহার সহিল না।

সে একেবারে মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমার সব নিয়ে তুমি যাহোক একটা, ব্যবস্থা করে দাও দাদা আমি আর পারি না।" শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বরে আর্ত্তনাদ ফুটিয়া বাহির হইল।

যদুনাথ ত্রস্তে তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "এত উতলা হলে চলে না ভায়া, একটা বিবাহ-ব্যাপার বড় সোজা নয়। একটু মাথা ঠাণ্ডা করে সুপাত্রের খোঁজ কর; তাতে দুচার টাকা বেশী চায় ক্ষতি নেই।"

নিতাই দেখিল টাকার কথা আর কোন দিক দিয়াই যাইবার নয়। নিতান্ত ঝোঁকের মাথায় সব নেওয়ার কথাটা বলিয়া ফেলিলেও তাহার যে কিছুমাত্র দিবার কথা ভাবিতেও প্রাণ কাঁপে সে-কথা তো আর কাহারও জানা নাই। নিতাই উঠিয়া বসিল।

যদুনাথ, তাহার হস্তে হুকাটি দিয়া বলিলেন, "এখনি উঠছ কোথায়? বস তামাক খাও। হাঁ ভাল কথা, ঐ চন্দ্র চৌধুরীর কথাটা নিয়ে আর মিথ্যা গোলমাল করো না। এ গ্রামে না হয় অন্য গ্রামেও তো ছেলের অভাব নেই।"

"কিন্তু হাজার পাঁচেকের কমে তো আর কেউ কথা বলবে না। আমি এই মেয়ের বিয়েতে ফতুর হই এইটেই কি তোমরা চাও দাদা?"

যদুনাথ একটু পরুষকণ্ঠে বলিলেন, "দেখ নিতাই চার পাঁচ হাজার না হোক, হাজার দুই আড়াই তোমাকে খরচ কত্তেই হ'বে, আর তাতে তুমি মারা পড়বে না, সে-কথা তুমি নিজেও জান। আর গোল করো না, রতন-পুরের হরিদাস গাঙ্গুলীর ছেলেটা শুনেছি ভাল, তাকে হাত করবার চেষ্টা করগে।"

প্রস্তাব শুনিয়া নিতাইয়ের চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল; কোথায় সে বিনা ব্যয়ে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবে না একেবারে হাজার দুয়েকের ফেরে! একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "ও ছেলে কি আমাদের পাওয়া সম্ভব দাদা —মিছে।"

"হোক মিছে তোমায় সেই চেষ্টা দেখতেই হবে। তা নইলে যা তোমার খুসী করগে, আমার কাছে ও আলোচনা কত্তে আর এস না।"

নিতাই দেখিল আর সুবিধা হইবার কোন আশা নাই। বেচারা হুকাটা কোন গতিকে নামাইয়া রাখিয়া ছাতাটী লইয়া নিতান্ত ম্রিয়মাণ ভাবে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

সপ্তাহ পরে পাড়ার সকলে শুনিল বিনা পণে নিতাইয়ের কন্যার বিবাহ কোথায় স্থির হইয়াছে; দিনও না কি স্থির।

পাত্রপক্ষ হইতে কিন্তু মেয়ে দেখা বা অন্য কোন প্রকার বিবাহেব পূর্ব্বানুষ্ঠানের অবশ্য পালনীয় প্রক্রিয়ার কোন চেষ্টা না দেখিয়া, এই ব্যাপারটা লইয়া প্রকাশ্য ও গোপন আন্দোলনে গ্রামখানি মুখর হইয়া উঠিল। কিন্তু কোথায় এবং কি উপায়ে যে নিতাই এই কলিকালে এমন ঋষিকল্প বরকর্ত্তার সন্ধান পাইল, তাহা গ্রামের নারদকল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু বিবাহ যে আসন্ন এটা বুঝিতে কাহারও বেগ পাইতে হইল না।

নিতাইয়ের সহিত ইতিমধ্যে যদুনাথের আর দেখা সাক্ষাত হয় নাই। কথাটা যদুনাথ শুনিয়াছেন কিন্তু যাচিয়া কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, তাই নিতাইকে ডাকিয়া বা তাহার বাড়ী গিয়া

ও বিষয়টা জানিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হয় নাই। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় যেন একটু গোল আছে, এই রকম একটা সন্দেহ যেন যদুনাথের মনে হইতে লাগিল। তাই হঠাৎ সে দিন বাজারে নিতাই যখন জানাইল যে, ব্যাপারটা যদুনাথের কাছে গোপন রাখিবার একমাত্র কারণ এই যে, নিতাই পাত্রপক্ষের কাছে সকল কথা প্রচ্ছন্ন রাখিতেই প্রতিশ্রুত; যদুনাথের সন্দেহ আশঙ্কায় পরিণত হইল এবং সেই সঙ্গে একটু অভিমানও দেখা দিল। তিনি শুধু বলিলেন, "বেশ কথা তোমার কন্যাদায় উদ্ধার হয় এইটাই চাই জানবার বা শোনবার আমাদের দরকারই বা কি আর অধিকারই বা কোথায়?"

নিতাই বিনয়ে জানাইল, "সে প্রতিশ্রুত বলিয়াই নহিলে দাদাকে না জানাইয়া কাজ সে কোন দিন করে নাই এবং ভবিষ্যতে ও করিবে বলিয়াও ভাবিতে পারে না সুতরাং দাদা যেন মনে না করেন।" এবং এই বলিয়া সে যেন যদুনাথের কাছ হইতে পলাইয়া বাঁচিল।

যদুনাথ একটু ক্ষুন্ন মনেই সে দিন গৃহে ফিরিলেন।

(৪)

বিবাহের প্রতি নারীর লিপ্সা থাকে কি না সে সম্বন্ধে গবেষণার ভার মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের উপর দিয়া, এই কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে, যে গীতার বিবাহে অনিচ্ছা কোন দিনই ছিল না। তাহা ছাড়া মাতামহের গৃহে আদরে প্রতিপালিতা হইয়া এবং সহরের অনেক কিছু দেখিয়া বিবাহ-সম্বন্ধে তাহার ধারণাটা ছোট না হইয়া বেশ একটু জমকাল রকম বলিয়াই সে মনে মনে গড়িয়া রাখিয়াছিল। তারপর মানুষ মাত্রেরই যে বয়সে মনের পটের রঙিন তুলির রেখা-পাত হইতে আরম্ভ হয়, এ মেয়েটী সে বয়সে যদি একটা মধুর চিত্র প্রাণের পটে আঁকিয়া থাকে, আর পিতার দিক হইতে তাহার বিপরীত চেষ্টার ফলে যদি সেই কল্পনা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে দুঃখ করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়; সুতরাং পিতাকে প্রথমে চন্দ্র চৌধুরীর মত ষাট বৎসরের বৃদ্ধকে পরম গুরু করিয়া দিতে ব্যস্ত দেখিয়া এবং পরে অনির্দ্দিষ্ট অনেক ব্যক্তিকে পরম গুরু করিয়া দিবার কথা শুনিয়া গীতা এক রকম হইয়া গেল।

এই ভাবে নিজের কল্পনাকে অকারণে ভাঙ্গিয়া যাইতে দেখিয়া গীতার দুঃখ যত বড়ই হোক মুখে সে কিছুই প্রকাশ করিল না। এই গ্রামে সে নূতন আসিয়াছে, ভাল করিয়া কাহাকেও না চিনিলেও তাহার এই দুঃসময়ে সহায় হইতে পারে এমন কাহাকেও তাহার মনে পড়িল না। তবে একজনকে সে জানে যে দরকার বুঝিলে প্রাণ পণ করিয়াও...কিন্তু সে যে নিতান্ত বালক, একেবারেই ছেলে-মানুষ, তাহাকে লইয়া?...না সে ভারী বিশ্রী। ঐ কচি ছেলেকে সে কোনদিন সম্মান সম্ভ্রম করিতে পারিবে না। আর তা ছাড়া অনন্ত যদি রাজী নাই হয়, যে রকম এক-রোকা ছেলে সে। গীতা কত রকম ভাবিয়া দেখিল; এই ভাবে বিবাহের নামে আধমরা হওয়া ছাড়া আর তাহার কোন উপায় নাই। একবার মনে হইল, অনন্তকে বলিয়া দেখিলে কি হয়; ছেলে-মানুষ হইলেও তাহার মধ্যে যতখানি পৌরুষ আছে সে রকম আর কয়জন মানুষের মধ্যে থাকে? হয় তো সে চেষ্টা করিলে একটা উপায় হইতে পারে। কিন্তু যদি অনন্ত তাহাকে বিবাহ করিতে চায়? গীতা যেন কি! এ অসম্ভব! একজন বিপন্না নারীর বিপদে সাহায্য করিতে গিয়া সে কি এমন অসম্ভব প্রতিদান চাহিয়া বসিবে? না সে তেমন নয়। তা সে করিতে পারে না।

আচ্ছা, তাই যদি হয়—তাতেই বা—গীতা লজ্জায় রাঙিয়া উঠিল—সে হয় না। তাহাকে বলিয়া অন্য ব্যবস্থা করিতে বলিলে অনন্ত একটা কিছু করিবেই। গীতা অনন্তের খোঁজ করিয়া জানিল, পাঁচ সাত দিন সে গ্রাম-ছাড়া, এবং দুই চারি দিনের মধ্যে তাহার আসিবার সম্ভাবনাও নাই। গীতার মনে হইল এ রকম ভাবে এত দিন কোথাও যাইয়া থাকা অনন্তের অমার্জ্জনীয় অপরাধ। নিতান্ত অসহায়ের মত গীতা শুধু ছট্ ফট্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সে দিন মাকে সে বলিল, "আচ্ছা বিয়ে যদি না হয় তাহলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হইবে শুনি। এ রকম বিয়ে না ক'রেও ত অনেক মেয়ে থাকে মা।"

মাও নিতান্ত সুখী ছিলেন না, বলিলেন, "থাকে কি না জানি নে গীতা, তবে থাকলে যে কিছু দোষ হয় না, তা বুঝি।"

"তবে আমায় তাই থাকতে দেও মা আমিও"—

গীতা কাঁদিয়া ফেলিল।

মা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"আমিও যে এতে সুখী তা মনে করিসনে মা, কিন্তু হিন্দুর মেয়ের বিয়ে না হলে চলে না তাই সব বুঝেও চুপ করে থাকতে হয়। তা' ছাড়া কোথায় কি যে উনি করেছেন তা তো ঠিক জানি না—হয় তো ভাল হতেও পারে গীতা।"

"ভাল না ছাই হবে"—বলিয়া গীতা সে খান হইতে চলিয়া গেল। মাতা কন্যার ভবিষ্যতের দিকে চিন্তা করিয়া চোখে আঁচল দিলেন।

নিতাই আসিয়া বলিল,—"আজ তারা আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে আসবে মেয়েকে যাহোক কিছু গোছ-গাছ কর অমন চোখে কাপড় দিয়ে বসে থাকলে চলবে কি করে।"

"কিন্তু তোমাকে আমি বলে রাখছি, যদি দেখি এর মধ্যেও তোমার কারসাজী আছে—আমি পিঁড়ে থেকে বর তুলে দেব, আমার মেয়ের না হয় বিয়ে না হবে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা সে তখন যা হয় কোরো, আজ যাহোক নিয়ম রক্ষা কর তো।"

নিতাই চলিয়া গেল। গীতা আসিয়া বলিল, "আমি কারুর সামনে বেরুতে পারব না মা, এই তোমার বলে রাখলাম।"

কন্যাকে বুকে টানিয়া লইয়া মাতা বলিলেন,—"ছিঃ মা শুভ কাজে অমন কর্তে নেই। আজকের দিনটা একটু আমার কথা শুনে থাক।"

"শুধু আজ কেন মা, আজ থেকে তোমাদের কথা শুনবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে থাকব।"—বলিয়া গীতা উচ্ছ্বসিত অশ্রু রোধ করিবার জন্য সেই খান হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

মায়ের এবার মেয়ের এই কাঁদা কাটা যেন একটু বেশী বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইল। সংসারে আসিয়া ঠিক মনের মত সব কিছু পাওয়া, প্রায় কাহারও ভাগ্যেই ঘটিয়া ওঠে না। তাহা না হইলে আজ তিনি নিজে—কথাটা মনে হইতেই একটা দীর্ঘশ্বাস মন্দাকিনীর বুকখানাকে দোলা দিয়া গেল। আজ যদি তিনিই ঠিক যেমনটী মনে ভাবিয়াছিলেন তেমনটী পাইতেন, তাহা হইলে মেয়েরই বা দুঃখ কি ছিল? সুতরাং তাহা যখন হয় নাই—হইবার নয়, তখন মিথ্যা আশঙ্কায় এমন করিয়া কষ্ট পাওয়া কেন?

আজ তাহারা আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবে; অথচ এই তাহারা যে কাহারা সেই কথাটাই মন্দাকিনী কোন ক্রমেই ভাবিয়া পাইতেছিলেন না, ভাবিয়া পাইলেও তাহাদের জন্য তাহাদের আপ্যায়নের জন্য তাঁকে উদ্যোগ-আয়োজন করিতেই হইবে। মন্দাকিনী সেই উদ্যোগ-আয়োজনের চেষ্টায় চলিলেন।

কাজের ফাঁকে একবার নিতাইকে পাইয়া মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো মেয়েটাকে কোথায় দিচ্ছ, সত্যি কোন"—কথাটা তিনি শেষ করিতে পারিলেন না।

নিতাই কি একটা কড়া জবাব করিতে যাইতেছিল কিন্তু পত্নীর চোখে জল দেখিয়া কেমন যেন হইয়া গেল। এ-রকম ব্যাপার তাহার জীবনে এই প্রথম। চোখের জল দূরে থাক কোন দিন একটা নরম কথা নিতাই তাহার সহধর্ম্মিণীর মুখে শোনে নাই। তা'ছাড়া বিবাহিত-জীবনের প্রায় অর্দ্ধেক দিন যে তাহাদের বিচ্ছিন্ন ভাবেই কাটিয়াছে। দুর্ব্বলচিত্ত নিতাই, "সে হ'বে, কিছু ভাব্তে হ'বে না, ভাব্তে হবে না" বলিতে বলিতে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

মন্দাকিনী চোখ মুছিয়া পুনরায় কাজে মন দিলেন। কিন্তু সন্দেহের ছায়া তাহার মন হইতে দূর হইল না; বরং স্বামীর ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহা আরও ঘনীভূত হইল।

(৫)

রাত্রি বোধ করি তখন আর বেশী নাই। হঠাৎ পিতার কণ্ঠস্বরে অনন্তের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সেই রাত্রিতেই সে মাতুলালয় হইতে গ্রামে ফিরিয়াছে, এখানে যে তাহার অনুপস্থিতির মধ্যে কি হইয়াছে এবং কি হয় নাই সে সংবাদ অনন্ত জানে না।

ঘুম ভাঙ্গিতেই পিতা বলিলেন, "মুখ হাত ধুয়ে নে বাবা, এখনই আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

কোথায় যাইতে এবং কেন যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করিবার কথা মনে হইলেও পিতার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া অনন্ত আর সে-কথা উচ্চারণ করিতে সাহস পাইল

না। মায়ের কাছে কিছু জানিতে পারা যায় কি না দেখিতে গিয়া মনে পড়িল মা তো বাড়ীতে নাই, গীতার বিবাহে তিনি সকাল হইতে সেইখানেই আছেন।

ভাবিবার অবসরও তাহার হইল না, পিতার দ্বিতীয় আহ্বান কাণে আসিতেই সে কোচার খুটখানা গায়ে জড়াইয়া তাহার অনুসরণ করিল।

পথে পিতা-পুত্রে কোন কথা হইল না। দ্রুতপদে পথটুকু অতিক্রম করিয়া অনন্ত যখন নিতাই খুঁখুজ্জের গৃহে উপস্থিত হইল এবং পিতা হাত ধরিয়া তাহাকে বরের আসনে বসাইয়া দিলেন, সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কি যে হইল এবং আর কি যে হইবে অনন্ত ভাবিয়া তাহার কিনারা করিতে পারিল না এবং তাহার ভাবনার ফাঁকে কোন সময়ে যে তাহার হাতের সঙ্গে আর একখানি হাত বাধা হইয়া গিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

অনন্ত বুঝিতে না পারিলেও যাহা হইবার তাহা হইয়া গেল এবং যে মেয়েটাকে দেখিয়া অবধি তাহার প্রতি একটা অহৈতুক অবজ্ঞায় অনন্তের মন ভরিয়া গিয়াছিল, সেই ডানপিটে মেয়েটাই কি না তাহার জীবন-পথে সহযাত্রী হইয়া পড়িল।

এমনটা কিন্তু হইল কেন? ব্যাপারটা এই—নিতাই বিনা ব্যয়ে 'মেয়ে পার করিতে গিয়া যে সৎপাত্রটী সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার যে কতগুণ সে কথা জানিবার ইচ্ছা বা আবশ্যক নিতাইয়ের হয় নাই নানা গুণের আধার বলিয়া কোন কন্যাকর্ত্তাই এই "বরায় বিদুষে" কন্যাদান করিতে ভরসা না পাওয়ায় তিনি এতদিন কুমার ছিলেন এবং নিতাইয়ের? প্রস্তাবে একমাত্র বয়স্থা কন্যা জানিয়াই এক কথায় সম্মত হইয়াছিলেন।

এই গুণধর পাত্রটীকে বিবাহ-রাত্রিতে কোন বিশেষ কার্য্যে আবদ্ধ থাকায় অনেক অনুসন্ধানেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই; তবে লোকমুখে শুনা গেল যে তিনি বর্ত্তমানে এক প্রণয়-ব্যাপারের নায়ক হওয়ায় শ্রীঘর বাস করিতেছেন এবং অদ্য তাহার উপস্থিতির আর কোন সম্ভাবনা নাই: ফলে অনেকক্ষণ বরের আশায় অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহার শুভাগমনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, অথচ বিবাহের লগ্ন অতিক্রান্ত হইয়া গেল এবং এই রাত্রিতে অন্য পাত্র সংগ্রহ না হইলে যে কি হইবে তাহা ভাবিয়া নিতাই যদু ভট্টাচার্য্যের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তারপর যাহা হইয়াছে তাহা অনন্ত না বুঝিতে পারিলেও জানে সব।

বিবাহের পর সে রাত্রিতে এমন সময় আর রহিল না যে বাসর প্রভৃতি আনুষঙ্গিক কিছু হইতে পারে, সুতরাং দিনে যে আর এই মুখরা মেয়েটীর সঙ্গে তাহার চোখের মিলন ঘটিবে না তাহা বুঝিতে পারিয়া অনন্ত যেন বাঁচিয়া গেল এবং নিতান্ত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান গুলি একমাত্র পিতার ভয়ে সে কোন রকমে সারিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তবে এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে একটা জিনিস সে লক্ষ্য করিয়াছে, যে যখনই যে কারণেই গীতার হাত তাহার হাতের সহিত মিলিত হইয়াছে, তখনই একটা অননুভূত আনন্দে তাহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই আনন্দ যে একটু বেশীক্ষণ অনুভব করা, তাহা অনন্ত পারে নাই, কেমন যেন একটা লজ্জা আসিয়া তাহাকে জোর করিয়া সেদিকে টানিয়া আনিয়া ছাড়িয়াছে।

গীতার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে আজ কেন কোনদিনই সে চাহিতে পারে নাই। কারণ তাহার জানা ছিল কোন; রমণীর প্রতি চাহিয়া দেখা অন্যায়; তাহা ছাড়া, পূর্ণাঙ্গী এই তরুণীটীর প্রতি চাহিয়া দেখিতে গেলে এমন লজ্জা করিত যে দেখা হইলেই পলাইয়া আসিত। অথচ এমনই যোগাযোগ যে লজ্জা যতই করুক তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিলে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ মাত্র হইতে হইবে। তথাপি সে-দিনটা সে কোনমতে পলাইয়া ফিরিল পাছে গীতার সহিত চোখো-চোখী হইয়া যায়।

নিতাই এক সময় গৃহিণীকেডাকিয়া বলিলেন, "কেমন আর তোমার কোন দুঃখ নেই তো?"

মন্দাকিনী "না তোমাকে তো আগেই বলেছিলুম আমি বুড়ো হাবড়ার হাতে মেয়ে দিব না কিন্তু এমনটী যে হবে তা আমিও ভাবি নি।"

নিতাইয়ের টাকার টান ধরে নাই সুতরাং আনন্দ করিবার বাধাও কিছু নাই, তথাপি নিজের আচরণের লজ্জা আসিয়া বোধ করি তাহাকে অত্যধিক উচ্ছ্বাস প্রকাশে বাধা দিল, তখন সে শুধু, "যাক্ তোমার পছন্দ হ'ল" বলিয়া ব্যস্ততার সহিত প্রস্থান করিল।

ফুল-শয্যার রাত্রিতে কিন্তু অনন্ত একটু বিপন্ন হইয়া পড়িল; কারণ পাড়ার একজন বৌদিদি সম্পর্কীয়া না জানি কেমন করিয়া গীতাকে তাহার চোর বলিয়া ধরার কথাটা জানিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাই তিনি যখন অনন্তর কি কথার জবাবে বলিলেন, "থাক ভাই আমরা সব জানি। পথে ঘাটে জড়িয়ে ধরার মত ব্যায়ামই যখন তোমার হয়েছে, তখন আর লজ্জা কেন গো মহাশয়! তা' ছাড়া ধর তো ধর একেবারে গীতাকেই," অনন্তর মুখে কে যেন আবির মাখাইয়া দিল। সে শুধু বলিল, "যান আপনি ভারী ইয়ে—সে তো চোর মনে করে।"

ঘরের মধ্যে একটা হাসির ধুম পড়িয়া গেল। এমন সময় গৃহিণী আসিয়া সকলকে বাহিরে যাইতে আদেশ দেওয়ায়, বৌদিদি অনন্তের কাণে কাণে কি একটা কথা বলিয়া উঠিয়া গেলেন এবং অনন্ত তাহাকে তাড়া করিয়া সীমানা পার করিয়া দিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল শয্যাতলে বসিয়া গীতা। অনন্তর বুকের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল। কোন দিকে না চাহিয়া ঘরের মধ্যে একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল।

এ সংবাদ কিন্তু পাওয়া গিয়াছে যে সে রাত্রিতে ঠিক ঐ ভাবেই অনন্তর কাটে নাই। গীতার নামটা চণ্ডী হওয়া উচিত কি গীতা হওয়া উচিত তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়া এক সময়ে না কি গীতা নামটাই বাহাল হইয়া গিয়াছে।

স্মরণ

[শ্রীসুকুমার সরকার]

বিস্মৃতির অন্ধকারে ব'সে স্মরণের আলো অকস্মাৎ
জ্বলে ওঠে বিদ্যুতের মত চূর্ণ ক'রে বিচ্ছেদের রাত।
হৃদয়ের দৈন্য দূরে যায় আকাশের উৎসব-লীলায়
আনন্দের মধু-উন্মাদনা অন্তরেতে স্পন্দন বিলায়!
অরুণিমা সুবর্ণ-মদিরা প্রভাতের পাত্র ভ'রে আনে;
পল্লবের গুঞ্জন-কুণ্ঠিত শাখী ডাকে ইসারা-আহ্বানে।
কুসুমিকা কৈশোরের নেশা জানায়েছে গন্ধ-লিপি দিয়ে,
বিহঙ্গীরা বিহ্বলে বিলাপে ডাকে মোরে 'প্রিয়ে
প্রিয়ে প্রিয়ে!'
বায়ু সে যে ছলনা-ষোড়শী লুকায়েও আড়ালে দৃষ্টির,
থামায় না না-দেখা বাহুর ধারা তবু স্পর্শের বৃষ্টির।
মানময়ী তরঙ্গিণী আজি, মোর চক্ষে চেয়ে মান ভোলে
আজি তার আধ-স্থির জলে মোরি মৃদু ছায়া-ছবি দোলে!
শুকতারা সলজ্জ চাহনি কভু খোলে কভু মৃদু বোজে,
দূর থেকে ভালোবাসিয়াছে আমারেই আমারেই ও যে!
মোরে চাহে মোরে চাহে সবে মোরে চাহে সুন্দর সকলে,
স্বপ্ন-ভরা প্রেম নিয়ে তার কত শত প্রিয় কথা বলে।

আর্ট ও বঙ্কিমচন্দ্র
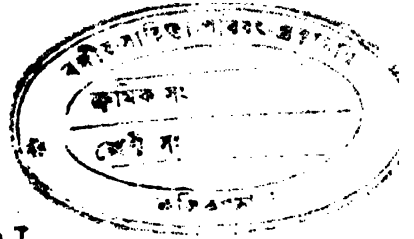
অধ্যাপক শ্রীমঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য্য, এম-এ]

(ক)

অবৈধ আসক্তি

শৈবলিনী-প্রতাপ এবং রোহিণী-গোবিন্দলাল ভিন্ন বঙ্কিমচন্দ্র সবিস্তারে অবৈধ প্রণয়ের চিত্র আঁকেন নাই। কৃষ্ণকান্তের উইল এবং চন্দ্রশেখরে যেমন নিষিদ্ধপ্রেম উপন্যাসের একটী প্রধান আখ্যানবস্তু, সমস্ত প্লট অনেকটা ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে, অন্য কোনও উপন্যাসে (বোধ হয় বিষবৃক্ষ ছাড়া) এরূপ নাই। সে গুলিতে নিষিদ্ধ, প্রেম যে নাই তাহা নহে তবে, ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। নানাবিধ ঘটনার মধ্যে ইহাও এক ঘটনা মাত্র; উপন্যাসের গতির উপর ইহার প্রভাব বেশী নাই।

এই চিত্রগুলির মধ্যেও কতকগুলিতে পাপ এমন উৎকট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, পাপীর প্রতি কোন সহানুভূতি হয় না; অন্ততঃ এ কথা মনে হয় যে, যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল হইয়াছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আর্টের অপকর্ষ হইয়াছে এ কথা ওঠে না। বস্তুতঃ এ চিত্রগুলি এতই হীন যে আর্টের আলোচনার মধ্যে ইংাদের স্থান নাই। পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীর উপর অত্যাচার, অথবা সরলা অসহায় বালিকার উপর আক্রমণ এই শ্রেণীর চিত্র। এ-গুলিতে মানুষের পশুত্ব ব্যতীত অন্য কোন প্রবৃত্তির পরিচয় নাই। মহম্মদ তকি, বোমকেশ অমরনাথ, হীরালাল, পরাণ চৌধুরীর গোমস্তা দুর্ল্লভচন্দ্র, এই সকল চরিত্রের কার্য্যকলাপের আলোচনা এক্ষেত্রে অনাবশ্যক। কেবল অমরনাথ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাইতে পারে। সে ইতর প্রকৃতির লোক নহে—তদ্ভিন্ন বহু দিন হইতে লবঙ্গকে সে দেখিয়া আসিতেছিল— তাহাদের বিবাহের সম্বন্ধও হইয়াছিল। তবুও গভীর নিশীথে লবঙ্গর ঘরে যাওয়াটা অতি গর্হিত কাজ হইয়াছিল এবং তাহার শাস্তিও সে পাইয়াছিল। এ চিত্রগুলি নিতান্তই স্থূল। আর্টের নামে সৌন্দর্য্য-পিপাসু পাঠকের পাতে এ-গুলি পরিবেষণ করা চলে না।* বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এই সব পাপীদের দণ্ড দেওয়া অথবা তাহাদের অসদুদ্দেশ্য ব্যর্থ করাই আর্ট।

বস্তুতঃ মন যদি নির্ব্বিবাদে পাপের দণ্ডে সায় দিয়া বলে 'বেশ হইয়াছে' তখন বলিতে হইবে ঘটনা আর্ট-বিরোধী হয় নাই। আর্টের সহিত বিরোধ তখনই হয়, যখন দণ্ডিত ব্যক্তির পরিণাম আমাদের অভিভূত করিয়া ফেলে। যখন উপন্যাসকার এমনই ঘটনা সাজাইয়া ফেলেন এবং চরিত্র-চিত্রণ এমন ভাবেই করেন যে, তাহার প্রতি আমাদের গভীর সহানুভূতি হয়। যখন মনে হয় তাহার লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে অথবা তাহারই মত কিংবা তাহার চেয়ে বেশী অপরাধীরা দণ্ডিত হয় নাই সেই কেবল শাস্তি পাইয়াছে। সেই জন্য এখনও সাইলক এবং ফলষ্টাফের পরিণাম অনেক রসগ্রাহী লোককে পীড়া দেয়।

কথা হইতে পারে তবে শৈবলিনীকে অপহরণ করার অপরাধে ফষ্টরের সাজা হয় নাই কেন? সেও ত অতি ইতর প্রকৃতির দুর্ব্বৃত্ত। ইহার উত্তর এই যে, তাহার অপরাধ অনেক। শৈবলিনীকে অপহরণ করা 'বোঝার উপর শাকের আটি মাত্র।' এবং এ ক্ষেত্রে তাহার ততটা দোষও নাই, কারণ তাহাকে বাধা দেওয়া দূরে থাক্ শৈবলিনী বরং তাহাকে আস্কারা দিয়াছিল। সে তাহাকে গৃহত্যাগের সহায়রূপে ব্যবহার করিয়াছিল এবং তাহাকে কাছে ঘেসিতে দেয় নাই; সুতরাং এ ক্ষেত্রে ফষ্টরের অপরাধ খুব গুরুতর হইয়া পড়ে নাই। বরং শৈবলিনীই তাহার দ্বারা নিজের কার্য্য উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহা ছাড়া ভীরু কাপুরুষ লম্পট ও বিশ্বাসঘাতক হইলেও ফষ্টর তকির তুলনায় অনেক ভাল। শেষ দৃশ্যে

* অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র বীভৎস বস্তুতন্ত্রতা (disgusting realism) যাহার পোষাকী নাম naturalism বা নিসর্গপন্থা তাহাকে আর্ট বলিতেন না। তাহা হইলে হয় তো এই সব পাপীরাও নিজ কার্য্যসিদ্ধি করিয়া ফেলিত।

সে যথার্থ বীরের ন্যায় আচরণ করিয়াছিল এবং তকির ন্যায় পশুবৎ চীৎকার না করিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ডাকিয়াছিল। বোধ হয় সেই জন্যই নবাব তাহাকে বধ করেন নাই। শৈবলিনী-ঘটিত ব্যাপারে তাহার অপরাধ এমন গুরুতর নহে যে তাহাকে দণ্ড না দিলে আমাদের মনে অস্বস্তি বোধ হয়। তাহার অপরাধের অন্ত নাই। নবাবের হাতে রক্ষা পাইলেও ইংরেজরা তাহাকে ক্ষমা করিবে না ইহা নিশ্চিত। কৃতকার্য্যের ফল সে পাইবে, তবে উপন্যাসের মধ্যে ইহা দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

বঙ্কিম-সাহিত্যে অবৈধ আসক্তির অন্য চিত্রগুলি এমন মোটা ধরণের নহে। সে-গুলিতে একটু রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। এ চরিত্রগুলি এমন কদর্য্যভাবে নিজ কার্য্য উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে নাই। ইহারা দোষী হইলেও ইহাদের কতকগুলি গুণ আছে, যাহা আমাদিগকে আকৃষ্ট করে।

গঙ্গারাম—গঙ্গারাম এই শ্রেণীর দুর্ব্বৃত্ত। সে অতি চতুর ও কার্য্যদক্ষ এবং সীতারামের রাজ্যস্থাপনে তাহার একজন প্রধান সহায় ছিল; কিন্তু কুক্ষণে ছোট-রাণী ভয়বিহ্বলা হইয়া তাহাকে ডাকিয়াছিল। তাঁহার অতুল রূপরাশি দেখিয়া গঙ্গারাম সব ভুলিল। তাহার একমাত্র চিন্তা হইল রমাকে হস্তগত করা। যে বুদ্ধির বলে সে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল, সেই বুদ্ধিই এখন রমাকে লাভ করিবার জন্য প্রয়োগ করিল। বিচার-সভায়ও তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। চন্দ্রচূড়, চাঁদশাহ, পাঁড়ে, মুরলা এমন কি রমার সাক্ষ্য সত্ত্বেও সে যেরূপ সুকৌশলে আত্মরক্ষা করিতেছিল তাহাতে তাহার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তবে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের উপর কথা নাই। ভৈরবীকে দেখিয়াই ভয়ে তাহার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল এবং সে নিজ দোষ স্বীকার করিয়া ফেলিল। তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া অবশ্য রাজধর্ম্মের দিক দিয়া সীতারামের মারাত্মক ভুল হইয়াছিল। তবে যে জয়ন্তী একবার তাহার রাজ্য রক্ষা করিয়াছে এবং আর একবার তাহার কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে, সে নিজে তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছে, তাহাকে অদেয় সীতারামের কিছুই নাই। দ্বিতীয়তঃ গঙ্গারাম স্ত্রীর ভাই এবং তৃতীয়তঃ সীতারাম গঙ্গারামের বিনিময়ে স্ত্রীকে পাইবেন এই ভরসা পাইয়াছিলেন। রাজদণ্ড-প্রণেতা হইয়া স্ত্রীর লোভে গঙ্গারামকে ছাড়িয়া দেওয়া সীতারামের অন্যায় হইয়াছিল। তবে এ ক্ষেত্রে জয়ন্তীরই দোষ বেশী। স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক স্নেহবশতঃ সে এটা মনে করে নাই যে, রাজ্য-রক্ষা করিতে হইলে বিশ্বাস-ঘাতকের দণ্ড দেওয়া একান্ত আবশ্যক। গঙ্গারামের ন্যায় অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক যে শত্রুপক্ষে যোগদান করিয়া মহা অনিষ্ট করিতে পারে এ জ্ঞানও তাহার থাকা উচিত ছিল। যাহা হউক তবুও গঙ্গারামের শাস্তি মন্দ হইল না। যে নগরের সে একজন মহামান্য প্রধান নাগরিক ছিল, সেখান হইতে রাত্রে চোরের মত পলাইয়া যাওয়াও কম অপমানের কথা নহে। তবে রমার লোভ তাহার অত্যন্ত বেশী; সেইজন্য সে পুনরায় শত্রুসৈন্যের সহিত মহম্মদপুর আক্রমণ করিল এবং স্বয়ং কামান লইয়া সূচীব্যূহের মুখে গিয়া সীতারামের হাতে মারা পড়িল। তাহার মত মহা-পাপীষ্ঠের পূর্ব্বেই মরা উচিত ছিল।

ভবানন্দ—পরনারীতে অবৈধভাবে আসক্ত যত-গুলি চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রে আছে, তন্মধ্যে ভবানন্দের ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠ একজনও নাই। এই একটীমাত্র চরিত্রের প্রতি তাহার সদ্‌গুণাবলীর জন্য মনে গভীর শ্রদ্ধা হয়। এই বলিষ্ঠকায় অতি সুন্দর যুবাপুরুষ প্রথম হইতেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কার্য্যতৎপরতায়, সাহসে, বিক্রমে, রণকৌশলে দায়িত্বজ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি সন্তান-সম্প্রদায়ে কেহই নাই। সত্যানন্দ নিজের অনুপস্থিতে সেইজন্য আনন্দমঠের কাজ তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। তিনি যে অযোগ্য হস্তে কার্য্য-পরিচালনের গুরুভার ন্যস্ত করিতেন না তাহার প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। কিন্তু "সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ"। সত্যানন্দ তাহা জানিতেন এবং সেই জন্য তিনি সন্তানদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন। এবং দীক্ষিতদের জন্যও আজীবন সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করেন নাই। করিলে হয় ত এতগুলি সুদক্ষ কর্ম্মক্ষম সহায় পাইতেন না। কিন্তু তবুও বলিতে হয় সেনাপতিদের নিয়মগুলি অত্যন্ত কঠোর ছিল। তিনি সম্পূর্ণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সুতরাং তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে,অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কায়মনোবাক্যে সর্ব্বত্যাগী হওয়া অসম্ভব। মহেন্দ্র এ বিষয়ে তাঁহার চেয়ে বেশী সূক্ষ্মদর্শী।

সেইজন্য সত্যানন্দ যখন তাঁহাকে বলিয়াছেন, "পুত্র-কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই।———তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে?" তখন উত্তর করিয়াছে "না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব?" এবং যখন পুনরায় সত্যানন্দ বলিয়াছেন, "না ভুলিতে পার এ ব্রত-গ্রহণ করিও না" তখন বলিয়াছে, "সন্তানমাত্রই কি এইরূপ পুত্র-কলত্রকে বিস্মৃত হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছে? তাহা হইলে সন্তানেরা সংখ্যায় অতি অল্প।" সত্যানন্দ মনে করিতেন, "যাহারা দীক্ষিত তাহারা সর্ব্বত্যাগী"—কিন্তু তাহারা সন্ন্যাসীও নহে গৃহীও নহে। পুরা সন্ন্যাসী হইলে হয় তো স্বাভাবিক মনোবৃত্তিগুলি মন হইতে সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু তাহারা তাহা নহে। মানস সিদ্ধ হইলেই তাহারা নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দৈনন্দিন জীবন যাপন করিবে। সুতরাং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-গুলি তাহাদের মনে চাপা আছে। উৎকট প্রলোভনে এই বলপূর্ব্বক নিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি আত্মপ্রকাশ করিবে এ আশঙ্কা আছে। অতএব কল্যাণীর ন্যায় অসামান্যা সুন্দরীকে শুশ্রূষা করিতে গিয়া ভবানন্দের মন বিচলিত হইল। তিনি যে ভাবে বহুক্ষণ ধরিয়া তাহার শুশ্রূষা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মন ঠিক থাকিলে অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় হইত সন্দেহ নাই। মৃতপ্রায় সুন্দরীকে এইভাবে বাঁচাইতে গিয়া গোবিন্দলালও বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ভবানন্দ কল্যাণীর কোনরূপ অমর্য্যাদা করেন নাই। বহুদিন নিজের মনেই যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, তারপর আর না পারিয়া কল্যাণীর নিকট নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন এবং কল্যাণী যখন তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছে, তখন অশ্রুপূর্ণলোচনে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। মনের উপর হাত নাই সুতরাং কল্যাণীর উপর আসক্তি তিনি ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার মন ইন্দ্রিয়-বশ হইয়াছে তিনি সন্তানদলের এক জন প্রধান নেতা হইয়া ব্রতের নিয়মভঙ্গ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি ধীরানন্দের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া বীরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়-পরবশ হইয়া ধর্ম্মত্যাগী হওয়ার জন্য তাঁহার তীব্র অনুশোচনা, এইগুলি তাঁহাকে এই পন্থা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। কঠোর সামরিক নিয়ম ভাঙ্গিবার একমাত্র দণ্ড তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। এ দণ্ড বঙ্কিমচন্দ্র দেন নাই, দিলে লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইত সন্দেহ নাই। তিনি বরং সত্যানন্দের মুখ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, "মৃত্যুকালে তাহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইবে।"

হীরা ও দেবেন্দ্র—এইখানেই হীরা ও দেবেন্দ্রর পঙ্কিল কাহিনীর আলোচনা করিতে হয়। তাহাদের চিত্রটী বীভৎস কিন্তু দুইজনেই বুদ্ধিমান্ এবং নিজ কার্য্যোদ্ধারের জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিতে জানে। কিন্তু দুজনের লক্ষ্য এক ছিল না। সেইজন্য কেহই কৃতকার্য্য হয় নাই। দেবেন্দ্র কুন্দকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং সে হীরাকে নিজ কার্য্যের সহায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু হীরা তাহাকে ভালবাসিয়া যত গোল বাধাইল। হীরা প্রথম হইতেই দেবেন্দ্রর প্রতি আসক্তা হইয়াছিল। ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। সে বিংশতি-বর্ষীয়া নারী; চিত্তসংযম কখনও করে নাই। তবে ভদ্র ঘরে বাস করিত বলিয়া কখনও পরপুরুষের সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পায় নাই, সুতরাং স্বভাব ভালই রাখিয়াছিল। কিন্তু সে লোক ভাল নহে। অর্থলালসা তাহার খুব ছিল, এবং সে একটু সৌখীন প্রকৃতির ঝি ছিল। "সে সধবার ন্যায় বেশ বিন্যাস করিত এবং বেশ-বিন্যাসে বিশেষ প্রীতা ছিল।" আমরা ইহাও জানি যে, আতর, গোলাপ চুরি করা তাহার অভ্যাস ছিল; সুতরাং লোভ সংবরণ করা সে কখনও শেখে নাই। অতএব দেবেন্দ্রের মত রূপবান পুরুষ যখন তাহার সহিত আলাপ করিল তখন যে তাহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। প্রথম প্রথম সে নিজেকে ঠিক রাখিয়াছিল কিন্তু পরে আর পারিল না। তাহার ভয়াবহ পরিণাম ও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। তাহার মন চক্রান্ত না করিলে স্থির থাকিতে পারে না। অপরের সুখ-সমৃদ্ধি সে দুইচক্ষে দেখিতে পারে না; সেইজন্য সে কুন্দকে দিয়া সূর্য্যমুখীর সুখ নষ্ট করিল। আশা ছিল, সে নিজে দত্ত বাড়ীতে প্রভুত্ব করিবে এবং মনের সুখে নিজের অর্থলালসা মিটাইবে। সুখ কিন্তু তাহার অদৃষ্টে নাই। ইতিমধ্যে অর্থলালসার চেয়েও বলবান একটী প্রবৃত্তি তাহাকে

বশীভূত করিয়া ফেলিল। দেবেন্দ্র তাহাকে না ভজিয়া কুন্দকে ভজিতে চায়, এ ভাবনাও তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। মনের কোণে, সূর্য্যমুখীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে বলিয়া ক্ষোভ তাহার হয় তো হইত। তাহার পর, যখন সে দেখিল যে, দেবেন্দ্র তাহার হয় নাই, সেই কেবল লাভের মধ্যে অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছে এবং এতকাল সযত্নে রক্ষিত অকলঙ্ক চরিত্রটুকু হারাইয়া ফেলিয়াছে, তখন ঈর্ষায়, ক্রোধে, অপমানে, ব্যর্থ অনুশোচনায় তাহার মস্তিষ্কের স্থিরতা নষ্ট হইয়া গেল। সূর্য্যমুখীর পুনরাগমনে তাহার প্রভুত্বও গেল। নিরপরাধা কুন্দের মৃত্যু ঘটাইয়া সে তাহার গাত্রদাহ মিটাইল বটে, কিন্তু সে নিজেকে সকল বিষয়ে বঞ্চিতা মনে করিয়া ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া অপরের অনিষ্ট করিত, এখন ভগবান সত্যসত্যই তাহাকে সকল দিক দিয়া বঞ্চিতা করিলেন। চরিত্র হারাইয়া সর্ব্ববিষয়ে পরাভূত হইয়া, শেষকালে একজন নিরপরাধা বালিকাকে হত্যা করিয়া সে সম্পূর্ণ পাগল হইয়া গেল। তাহার ভীষণ পরিণাম তাহার কৃতকর্ম্মের স্বাভাবিক ফল।

দেবেন্দ্রের পরিণাম সম্বন্ধে কিছু লেখা নিষ্প্রয়োজন—অত্যধিক অত্যাচারের ফল যাহা হয়, তাহাই তাহার হইয়াছে।

নগেন্দ্র ও কুন্দ—কুন্দর প্রতি নগেন্দ্রের প্রেমের আলোচনা কি এখানে করিতে পারা যায়? বোধ হয় যায়? কারণ তাহাদের বিবাহ হইলেও সূর্য্যমুখীর ন্যায় সুন্দরী পতিব্রতা ভার্য্যা থাকা সত্ত্বেও একটী বিধবা কন্যা বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াকে বিশুদ্ধ প্রেম বলিতে পারা যায় না। সে যে "কেবল চোখের ভালবাসা এ কথা নগেন্দ্রও পরে স্বীকার করিয়াছেন। এখানে কেবল দুইটী বিষয় আলোচনা করিলেই চলিবে নগেন্দ্রের আসক্তি এবং কুন্দের মৃত্যু।

নগেন্দ্রের মন বিচলিত হওয়ায় সহসা একটু যেন কেমন কেমন বোধ হয়। গোবিন্দলাল ও দেবেন্দ্রের বেলা যে কারণ ছিল এখানে তাহা নাই, কারণ সূর্য্যমুখী সুন্দরী। তবে বঙ্কিমচন্দ্র কারণটি সুস্পষ্ট ভাবে দিয়াছেন। চিত্তসংযম পক্ষে প্রথমতঃ চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি দ্বিতীয়তঃ চিত্তসংযমের শক্তি আবশ্যক। ইহার মধ্যে শক্তি প্রকৃতি জন্য। প্রবৃত্তি শিক্ষার জন্য। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং চিত্ত-সংযম পক্ষে শিক্ষাই মূল। ... ... অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা।" এ শিক্ষা নগেন্দ্রের কখনও হয় নাই। "কুন্দনন্দিনীকে লুব্ধ-লোচনে দেখিবার পূর্ব্বে নগেন্দ্র কখনও লোভে পড়েন নাই। ... সুতরাং লোভ সংবরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক তাহা তাঁহার হয় নাই। এই জন্যই তিনি চিত্ত-সংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না।" প্রতাপে ও নগেন্দ্রে এইখানে প্রভেদ। প্রতাপ জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট পাইয়াছিলেন।

কুন্দর মৃত্যুর জন্য দুঃখ হয় বটে কিন্তু যে রূপ ঘটনাপরম্পরা দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে কুন্দর বিষপান আশ্চর্য্য তো নহেই বরং সম্মুখে বিষ পাইয়াও যদি সে লোভ সংবরণ করিত তাহা হইলেই বরং ব্যাপারটী অস্বাভাবিক হইত। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের জন্য একে তাহার মনে নিদারুণ কষ্ট, তাহার পর কমলের ভালবাসা, স্বামীর প্রেম সবই সে হারাইল। সংসারে সকল রকম দুঃখ কষ্টের সেই যে মূল ইহা সে বেশ বুঝিল। নগেন্দ্র যখন বহুকাল পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, তখনই সে মৃত্যুকামনা করিয়াছিল, সুতরাং যখন হীরা তাহার নিকট হইতে উঠিয়া গেল, তখন বিষের মোড়কটী সে চুরি করিল। সে মনে মনে স্থিরই করিয়াছিল, "দিদি যদি কখনও ফিরিয়া আসেন" তবে তাঁহার কাছে স্বামীকে রাখিয়া সে মরিবে। তাহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিবে না।

বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র নিজের প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারার জন্য যথেষ্ট শাস্তি পাইয়াছেন, কিন্তু ঘটনাপরম্পরায় কোন অস্বাভাবিকতার অবতারণা না করাতে বঙ্কিমচন্দ্র আর্টের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন

উপেন্দ্র ও ইন্দিরা—নিষিদ্ধ প্রেম করিয়া সুখে থাকার চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র আঁকেন নাই, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আপাত দৃষ্টিতে একটি মাত্র উদাহরণে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। উপেন্দ্র ও ইন্দিরা কিছুকাল বড়ই সুখে কাটাইয়াছিল। কিন্তু প্রথমতঃ ইন্দিরার পক্ষে ইহা মোটেই নিষিদ্ধ-প্রেম নহে—সে মনের সাধ মিটাইয়া স্বামী-সেবা করিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ ইন্দিরা উপন্যাসে দুঃখ-কষ্টের স্থান নাই। যাহা কিছু প্রতিকূল ঘটনার

বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব্ব অধ্যায়গুলিতে দিয়াছেন, তাহা কেবল শেষের মিলনকে মধুরতর করিবার জন্য। ইন্দিরা মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছে, "যদি কখনও দিন পাই, তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব"—ইহাই যথেষ্ট। উপন্যাসখানির আবহাওয়া নিছক সুখ ও আমোদের আবহাওয়া, ইহার মধ্যে তীব্র দুঃখ কিংবা অসহনীয় কষ্ট আনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র রসাভোগে ব্যাঘাত ঘটান নাই।

আমরা একে একে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত অবৈধ প্রণয়ের চিত্রগুলি আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, কোন স্থানেই তিনি কলালক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দেন নাই। পরিণাম কখনই ভাল হয় নাই কিন্তু সে পরিণামও পারিপার্শ্বিক ঘটনার স্বাভাবিক ফল। দোষীকে দণ্ড দিতেই হইবে সুতরাং সম্ভাব্যতার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কোন রকমে ঘটনাগুলি সাজাইয়া ফেলা—এ অপরাধ বঙ্কিমচন্দ্র কখনও করেন নাই।

(খ)

সমাজ-বিধি

বঙ্কিমচন্দ্র যে সামাজিক নিয়ম ভাঙ্গিলেই দণ্ড দিয়া থাকেন, এ কথাও ঠিক নহে। সমাজের নিয়ম ও আর্টের নিয়ম এক নহে। সমাজ অনেক সময় বাহিরের জিনিস দেখিয়া বিচার করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু আর্টে সে রকম কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। সমাজ এমন অনেক দণ্ড দিয়া থাকে যাহাতে আমাদের মন সায় দেয় না। যে লোক সমাজের কোন নিয়ম ভাঙ্গিয়াছে, অথচ যাহার অন্তর পরিষ্কার, সমাজ তাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহে না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আর্টে সে রকম দণ্ডের বিধান নাই, কারণ ইহা অন্তরের জিনিস লইয়া বিচার করে।

কুন্দ, সূর্য্যমুখী, রজনী, ইন্দিরা ও শৈবলিনী ইহারা সকলেই গৃহত্যাগ করিয়াছিল, সুতরাং ইহাদের কেহই সমাজে গৃহীত হইত না। কিন্তু এক শৈবলিনী ছাড়া যথার্থ দোষী ইহাদের মধ্যে কেহই নহে, সুতরাং তাহারা নিরর্থক সমাজের উৎপীড়ন সহ্য করে নাই।

সাগরও একবার গৃহত্যাগ করিয়াছিল। তাহার বেলায় অবশ্য নিশি ঠাকুরাণী ব্রজেশ্বরের সহিত পিত্রালয়ে ফিরিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, "সাগর কাহাকেও না না বলিয়া রাণীর সঙ্গে আসিয়াছে এখন অন্যলোকের সঙ্গে ফিরিয়া গেলে সকলেই জিজ্ঞাসা করিবে, 'কোথায় গিয়াছিলে?' আপনার সঙ্গে ফিরিয়া গেলে উত্তরের ভাবনা নাই।" কিন্তু এ ব্যবস্থা সাগরের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশতঃ নিশি ও দেবী করিয়াছিল; তাহাকে কোন রকম কৈফিয়তের দায় হইতে মুক্ত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। নতুবা সমাজের দ্বারা উৎপীড়িত হইবার এ ক্ষেত্রে কোন সম্ভাবনা ছিল না। সাগরের পিতা মহাধনী এবং স্বামী তো সব ব্যাপার স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন দেবী-চৌধুরাণী যাহার সহায় তাহাকে কোন রকমে বিপন্ন করা কোন সমাজের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। বোধ হয় দেবীর আসল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কোন প্রকারে ব্রজেশ্বরকে সাগরের বাপের বাড়ী পাঠাইয়া শ্বশুর-জামাইয়ে মনোমালিন্যের অবসান করা।" জামাই "জন্মের মত বিদায় হইলাম" বলিয়া চলিয়া গিয়াছে, তা ছাড়া মেয়েকেও ডাকাতে লইয়া গিয়াছে—এমন সময় যদি মেয়ে জামাই পুনরায় দেখা দেয় তো বাড়ীতে আনন্দস্রোত বহিয়া যাইবে এবং যে টাকা লইয়া এত গোল তাহাও ব্রজেশ্বর পাইয়াছেন সুতরাং মেঘ কাটিতে দেরী হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র সমাজকে একবারে ছাঁটিয়া ফেলেন নাই, তবে আমাদের সমাজের আসলরূপটি তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। সেই জন্য সমাজ-শাসনকে আর্টের উপর আধিপত্য করিতে দেন নাই।

এ-সমাজে পয়সার জোরে সব হয়। নগেন্দ্র সেই জন্য শ্রীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য? যেখানে আমিই সমাজ সেখানে আবার সমাজচ্যুতি কি?"

উপেন্দ্রও প্রথম প্রথম ইন্দিরাকে গ্রহণ করিবেন না বলিয়াছেন কিন্তু যখন 'কুমুদিনী'র মায়াজালে এমনই জড়াইয়া পড়িয়াছেন যে তাহাকে ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, তখন তাহাকেই ইন্দিরা বলিয়া চালাইতে তাঁহার আপত্তি নাই। "তাতেও যদি কোন কথা ওঠে, গ্রামে কিছু সামাজিক দিলেই গোল মিটিবে। আমাদের টাকা আছে—টাকায় সবাইকে বশীভূত করা যায়।"

পুনশ্চ এ সমাজে পিয়ারা-ঠাকুরাণীর ন্যায় স্ত্রীলোক ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে বেহায়াপণার অধিকার পায়, কারণ তাহার সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিবার সামর্থ্য আছে। কিন্তু

নিরপরাধা দুঃখিনী প্রফুল্লর মা কুলটা, জাতিভ্রষ্টা বাগ্‌দিনী আখ্যা পাইয়া থাকে, কারণ তাহার পয়সা নাই।

এখানে তর্ক উঠিবে হরবল্লভ তো ধনীলোক, তিনি ত সমাজের ভয়ে প্রফুল্লকে গ্রহণ করেন নাই। গৃহিণীও প্রফুল্লকে বলিয়াছেন "লোকে পাঁচ কথা বলে—একঘরে করবে বলে, কাজেই তোমাকে ত্যাগ কর্‌তে হয়েছে।" কিন্তু এ যুক্তির যে বিশেষ কোন মূল্য নাই তাহা দেখান বেশী কঠিন কাজ নহে। গৃহিণী স্বামীর মুখ রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি মামুলী গৎ আওড়াইয়াছেন মাত্র। যখন তিনি দেখিলেন, "মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে," তখন তিনি নিজেই বলিলেন, "তা যাই দেখি কর্ত্তার কাছে, তিনি কি বলেন।" কর্ত্তার কাছেও তিনি "বাগ্‌দীর মেয়ে বা কিরূপে হলো? লোকে বল্লেই কি হয়?" ইত্যাদি বলিয়া সুপারিশ করিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে হরবল্লভ ইচ্ছা করিলেই গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু এরূপ উদারতা হরবল্লভের ন্যায় পামরের নিকট আশা করাই অন্যায়। তা ছাড়া ইহাতে অর্থব্যয় আছে। হরবল্লভ এক দুঃখিনী বিধবার মেয়ের জন্য অর্থব্যয় করিবেন, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ব্যাপার। সমাজ-শাসন এক ছুতা মাত্র। দশ বৎসর পরে কিন্তু এই বাগ্‌দিনীকেই হরবল্লভ গ্রহণ করিতে পথ পান নাই। এত দিন সে কোথায় কাহার কাছে ছিল এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্যও অপেক্ষা করেন নাই। অবশ্য লোকের কাছে নূতন বিবাহের কথাটাই প্রচার রহিল। কারণ তা ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না। হরবল্লভ যে স্ব-খাত সলিলে ডুবিয়াছেন। যে বউকে একবার বগ্‌দিনী বলিয়া বাড়ী হইতে হাঁকাইয়া দিয়াছেন তাহাকেই আবার দশ বৎসর পরে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিতে হইতেছে—এ সংবাদ লোকে শুনিলে হরবল্লভের যে আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকে না। তবে এত বড় ধেড়ে বউ কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল এই খোঁজের জন্য সমাজও যে খুব বেশী মাথা ঘামাইয়াছিল, তাহাও আমরা শুনি নাই। সুতরাং প্রফুল্লর যাহা কিছু কষ্ট তাহা কতকটা সমাজের জন্য হইলেও বেশীর ভাগ হরবল্লভের জন্য এবং এ ক্ষেত্রেও সমাজের বিচার বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারের নিকট পরাস্ত হইয়াছে।

(গ)

নগ্ন-চিত্র

আর একটী অভিযোগের আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সেটী এই যে বঙ্কিম শুচিবায়ু-গ্রস্ত রুচিবাগীশ; তিনি নিতান্তই আদর্শবাদী। মানুষ মানুষই, দেবতা নহে। যেমন তাহার ভাল দিক্ আছে তেমনই আর একটা দিক্‌ও আছে যাহার প্রভাব অতিক্রম করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ইহার প্রভাবে মুনিগণের মনও টলিয়া যায়। প্রতিপক্ষরা বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান চরিত্রগুলি প্রায়ই দেবধর্ম্মী। তাহারা যেন সুদৃঢ় বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া সব রকম প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে। হৃদয়ের যে সব প্রবৃত্তি রক্তমাংসে গড়া মানুষের পক্ষে দমন করা দুঃসাধ্য তাহাও তাহারা অবলীলাক্রমে দমন করিয়াছে। সুতরাং মনে হয় তাহারা যেন এ পৃথিবীর মনুষ্য নহে। কোন অবাস্তব লোকের অবাস্তব জীবেরা যেন বঙ্কিমচন্দ্রের পৃষ্ঠায় নিজেদের লীলা দেখাইতেছে।

অবশ্য একথা প্রথমেই স্বীকার করিলে ক্ষতি নাই যে বঙ্কিমচন্দ্র পাপের পঙ্কিল চিত্র অসঙ্কোচে সব রকম আবরণ উন্মোচন করিয়া বর্ণনা করেন নাই। মানুষের মধ্যে যে পশু লুক্কায়িত আছে, তাহার তাণ্ডবলীলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া তিনি পছন্দ করিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল বাস্তব জীবনে এমন অনেক জিনিস ঘটিয়া থাকে, যাহার সম্পূর্ণ চিত্র আঁকিলে আর্টের ক্ষতি হয়। তাহাতে রসাস্বাদে বিঘ্ন হয়। আর্টের কোঠায় আনিতে গেলে অনেক জিনিস বাদ দিতে হয়, অনেক জিনিস কাটছাঁট করিতে হয়। এ বিশ্বাস ঠিক কি ভ্রান্ত সে তর্ক তুলিয়া কোন লাভ নাই—তিনি এরূপ কোন চিত্র আঁকেন নাই ইহাই আমরা বলিতেছি। সুতরাং ব্যাপার এইখানেই চুকিয়া গেল—যাহা তাঁহার পুস্তকেই নাই তাহার বিচার করা যায় কিরূপে?

তবে এ কথা বলিলে ভুল হইবে যে, যে সব চরিত্র তিনি আঁকিয়াছেন সেগুলি সাধারণ মানুষের চরিত্র হইতে বিভিন্ন। যে প্রলোভনে সকলে পড়িয়া থাকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ চরিত্রেরাও তাহার প্রভাব অতিক্রম করেন নাই।

গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রের কথা তো পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহাদের চরিত্রবল বড় কম ছিল না, কিন্তু তাঁহারা লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। ভবানন্দের মত চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রে বেশী নাই কিন্তু তিনিও রূপের মোহিনী-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অমরনাথ তো এক অতি জঘন্য কাজ করিতেই বসিয়াছিল। দেবেন্দ্রের চরিত্র যে এককালে নিষ্কলঙ্ক ছিল, "লেখাপড়ায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল এবং প্রকৃতিও সুধীর সত্যনিষ্ঠ ছিল, ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। তাঁহার অধঃপতনের একটী প্রধান কারণ এই যে, "বয়োগুণে তাঁহার রূপতৃষ্ণা জন্মিল কিন্তু আত্মগৃহে নিবারণ হইল না।" সেইজন্য (এবং পত্নীর ব্যবহারের জন্যও বটে) তিনি "কলিকাতার পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া অতৃপ্ত বিলাস-তৃষ্ণা নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন।"

উপেন্দ্র কুমুদিনীকে পরস্ত্রী জানিয়াও তাহার প্রণয়াশায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সুভাষিণীর নিকট ইন্দিরা এ বিষয়ে অনুযোগ করিলে সে বলিয়াছিল, "তোর মত বাঁদর গাছে নেই, ওঁর যে স্ত্রী নেই।" সে কুলের কুলবধূ,—ইহা যে অন্যায় তাহা সে নিশ্চয় বুঝিত— কিন্তু ইহা যে অস্বাভাবিক নহে তাহাও সে জানিত। শশিশেখর ভট্টাচার্য্যের চরিত্রবল ছিল না, তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিই। কিন্তু চন্দ্রশেখরের ন্যায় সংযমীরও শৈবলিনীকে দেখিয়া "ব্রতভঙ্গ হইল।" তিনি আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। সৌন্দর্য্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয় ?"

(ঘ)

পারিবারিক জীবন।

পারিবারিক জীবন সম্বন্ধেও সেই কথা। বিবাহিত জীবনে স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্যের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি তাঁহার নভেলে সুখী হয় নাই। গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্র দুই জনেই জীবনে যথেষ্ট কষ্টভোগ করিয়াছেন। নগেন্দ্র অবশ্য কুন্দকে বিবাহ করিয়াছেন কিন্তু সে বিবাহ মোহজনিত বিবাহ, চোখের ভালবাসা মাত্র। নিজের প্রবল আসক্তি দমন করিতে না পারিয়া তিনি বিদ্যাসাগরের আশ্রয় লইয়াছেন। নিতান্ত মোহে অন্ধ না হইলে তিনি বলিতেন না, "সূর্য্যমুখী এ বিবাহে দুঃখিত নহেন...তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে উদ্যোগী।" স্ত্রী বর্ত্তমানে চিত্তসংযমে অপ্রবৃত্তি এবং তজ্জন্য শাস্তির আর এক উদাহরণ দেবেন্দ্র।

এখানেও কিন্তু তিনি বাস্তবতার সহিত যোগ হারান নাই। গৃহস্থ-জীবনের শুচিতায় তিনি আস্থাবান ছিলেন। বিবাহিত-জীবনে অবৈধ-প্রণয় এবং তজ্জন্য প্রবৃত্তিনিরোধে অপ্রবৃত্তি তিনি ক্ষমা করেন নাই। কিন্তু তেমনই বিবাহিত-জীবনে অস্বাভাবিক চিত্তসংযম করিতে গেলেও যে উল্টা ফল হয় ইহা বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিতেন। গৃহস্থাশ্রম সন্ন্যাস নহে। সন্ন্যাসাশ্রমের মূল মন্ত্রই হইল কঠোর আত্মসংযম কিন্তু সংসারাশ্রমের মূল মন্ত্র তাহা নহে। সব মানুষ সন্ন্যাসী হইতে পারে না এবং তাহা ভগবানের অভিপ্রায়ও নহে। পক্ষান্তরে সকলেই প্রবৃত্তিস্রোতে গা ঢালিয়া দিলে সমাজ টিকিতে পারে না। সেই জন্য গৃহস্থাশ্রম মধ্যপথের সৃষ্টি। এই আশ্রমে থাকিতে গেলে অবৈধ-প্রণয় করা অন্যায় এবং সন্ন্যাসাশ্রমের উপযুক্ত চিত্তসংযমের চেষ্টা করিতে গেলেও ফল বিপরীত হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী।

আনন্দমঠের ন্যায় অত বড় প্রতিষ্ঠানটী ভাঙ্গিয়া গেল তাহার অন্য কারণও ছিল—কিন্তু একটী প্রধান কারণ হইল সত্যানন্দের নিয়মের অস্বাভাবিক কঠোরতা। ইহারই জন্য তিনি তাঁহার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি ভবানন্দকে হারাইয়াছিলেন। অবশ্য ভবানন্দ বিবাহিত ছিলেন না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি দীক্ষিত সন্তানেরাও যতদিন না মানস-সিদ্ধ হয় কেবল ততদিন পর্য্যন্ত কঠোর ব্রতধারণ, করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। আজীবন সন্ন্যাসব্রত তাঁহারাও গ্রহণ করেন নাই; বিশেষতঃ ভবানন্দ যেরূপ কঠিন পরীক্ষায় পড়িয়াছিলেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া সাধারণ সন্ন্যাসীর পক্ষেও শক্ত। তাঁহার চিত্ত অবশ হইয়াছিল মাত্র কিন্তু এই অপরাধেই সন্তানধর্ম্মের বিধানে তাঁহাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইল।

ভবানন্দের পরই সত্যানন্দের প্রধান সহায় জীবানন্দ। তিনিও এই কঠোর নিয়ম কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। নিমাইয়ের গৃহে শান্তির সহিত কথোপকথনে আমরা দেখি ভবানন্দের ন্যায় তিনিও সন্তান-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত। সন্তান-ধর্ম্মের প্রতি বিরাগবশতঃ তিনি যে ইহা ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা নহে। শেষ যুদ্ধের পর যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়

সন্তানধর্ম্ম তাঁহার কতখানি অন্তরের জিনিস ছিল। কিন্তু সন্তানধর্ম্ম রাখিতে গেলে গৃহস্থ-জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ, শান্তির ন্যায় স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে হয়। এই দুই পরস্পর বিরোধী মনোভাবের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার ন্যায় মহাবীরও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং শেষে বলিয়াছিলেন, "চল গৃহে যাই আর আমি ফিরিব না।" শান্তির ন্যায় সহধর্ম্মিনী পাইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সে যাত্রা পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইয়া গেলেন। তবুও তিনি ব্রত সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই। পরে অবশ্য তাঁহারা পূরাপূরি সন্ন্যাসী হইয়া চিরব্রহ্মচর্য্যই পালন করিয়াছিলেন—তবুও এই ব্রত-ভঙ্গের অপরাধে তাঁহাকেও শেষ যুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করিতে হইল। আনন্দমঠ অবশ্য অন্য কারণে ভাঙ্গিয়া গেল কিন্তু সে কারণ না থাকিলেই কি ভবানন্দ-জীবানন্দের ন্যায় দিক্‌পালদিগকে হারাইয়া সত্যানন্দ মঠের কাজ চালাইতে পারিতেন?

বিবাহিত-জীবনে অস্বাভাবিক চিত্তনিরোধের কুফলের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক উদাহরণ সীতারাম। বহুকাল পরে যখন জয়ন্তী শ্রী ও সীতারামের মিলন ঘটাইয়া দিল, তখন শ্রীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে পতিপরায়ণা শ্রীর যুক্তির নিকট জয়ন্তীও নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিল, সে শ্রী আর নাই। এখন সে বলিত, "আমি সন্ন্যাসিনী; সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি।" সীতারাম ঠিকই বলিাছিলেন, "পতি-যুক্তার সন্ন্যাসে অধিকার নাই"—বিশেষতঃ যদি পতির সন্ন্যাসে মন না থাকে। পতিসেবা একটা কর্ম্ম এবং কর্ম্ম করিলেই তাহার সন্ন্যাস ধর্ম্ম ভ্রংশ হইবে, এ ধারণা শ্রীর জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে সে একান্ত পতিগতপ্রাণা ছিল—"সে ভ্রমটা এখন গিয়াছে।" সেই জন্য সে কতকগুলি উদ্ভট সর্ত্তে সীতারামের নিকট থাকিতে রাজী হইল। সে রাজপুরীতে মহিষীর মত রহিল না, চিত্ত-বিশ্রামে উপ-পত্নীর ন্যায় রহিল। অথচ সেই মত না থাকিয়া সন্ন্যাসিনীর মত থাকিল। সে সীতারামকে বলিল, "আপনি যখন নিষ্পাপ হইয়া শুদ্ধচিত্তে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারিবেন, তখন আমি এই গৈরিক বস্ত্র ছাড়িব।" সে বুঝিল না, সন্ন্যাসাশ্রমে যাহা পাপ বলিয়া গণ্য হয়, সংসারা-শ্রমে তাহা হয় না। যদি সন্ন্যাসিনী থাকাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল তাহা হইলে তাহার সীতারামের নিকট আসাই উচিত হয় নাই। "কিন্তু এই ইন্দ্রাণীর মত সন্ন্যাসিনী বাঘছালে বসিয়া বাক্যে মধুবৃষ্টি করিতে থাকিবে, আর সীতারাম কুকুরের মত তফাতে বসিয়া মুখপানে চাহিয়া থাকিবে—অথচ সে সীতারামের স্ত্রী।......এ দুঃখের কি আর তুলনা হয়? ইহাতেই সীতারামের সর্ব্বনাশ ঘটিল।" শ্রী মনে করিত তাহার মুখের ভগবৎপ্রসঙ্গ তিনি মনোযোগ দিয়া শুনিতেন। কিন্তু জয়ন্তীর ন্যায় সন্ন্যাসিনীও তাহার এই ভুল ধরিতে পারিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, "তোমার মুখের কথা, তাই মনোযোগ দিতেন। তোমার মুখ পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতেন, তোমার রূপে ও কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন, ভগবৎ-প্রসঙ্গ তাঁর কাণে প্রবেশ করিত না।"

শান্তি জীবানন্দকে সন্ন্যাস ধরাইতে পারিয়াছিল, তাহার কারণ জীবানন্দ পূর্ব্ব হইতেই সন্তান-ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শান্তি সহধর্ম্মিণীর কাজই করিয়াছিল—স্বামীর তপস্যায় তাহার সহায়তা করিয়াছিল। সত্যানন্দ যখন তাহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ", তখন সে দম্ভভরে উত্তর দিয়াছে, "আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি... স্বামী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন আমি তাহার ভাগিনী কেন হইব না? তাই আসিয়াছি।" শ্রী কিন্তু স্বামীর ধর্ম্মে ভাগিনী হইল না—তাঁহার রাজ-ধর্ম্মে সহায়তা করিল না—বরং তাঁহাকে সন্ন্যাসী করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন, "শ্রী হইতে সীতা-রামের সর্ব্বনাশ হইল।"

শ্রী মনে করিত সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই যথার্থ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পালন করা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ অনাসক্ত ও নিষ্কাম থাকিয়া পরের সুখের জন্য কর্ম্ম করাই যথার্থ সন্ন্যাস। প্রফুল্লর সে শিক্ষা হইয়াছিল। "প্রফুল্ল সংসারে আসিয়া যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোন কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্ম্মপরায়ণ; তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী।" সেই জন্যই সে হরবল্লভের সংসারে কল্যাণ-ময়ী দেবীর ন্যায় শোভা পাইয়াছিল—সে "যাহা স্পর্শ করিত তাই সোনা হইত।" শ্রীর এ শিক্ষা হয় নাই সেই

জন্য সে ভাল করিতে গিয়া সোণার সংসার ছারখারে দিল। নিজের ভুল সে বুঝিয়াছিল—কিন্তু বড় দেরীতে।

যাহা হউক্ সীতারামের শোচনীয় পরিণামের বর্ণনা দিবার এখানে আবশ্যকতা নাই। তাহার কারণ নির্দ্দেশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। "কুকুরের মত সীতারাম তফাতে বসিয়া মুখপানে চাহিয়া থাকিবে—অথচ সে সীতারামের স্ত্রী"—ইহাই হইল সীতারামের সর্ব্বনাশের মূল কারণ। সে সীতারামের স্ত্রী, সর্ব্বদা সীতারামের সাহচর্য্য করিতেছে, অথচ তাহার উপর সীতারামের কোন অধিকার নাই। এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থাতেই সীতারামের ঘোর অধঃপতন হইল।

অতএব আমরা দেখিলাম যে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা রাখার আবশ্যকতা বুঝিতেন তেমনই তিনি ইহাও বুঝিতেন যে সাধারণ গৃহস্থরা দেবতা কিংবা সন্ন্যাসী নহে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারাই তাহাদের জীবন পরিচালিত হয়।

সংসারাশ্রমে থাকিয়া সন্ন্যাসাশ্রমের মত কঠোর আত্ম-সংযম ও প্রবৃত্তি-নিরোধ করিতে গেলে তাহার ফল শুভ হয় না।

আমাদের বক্তব্য এইখানেই শেষ হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আমরা সচরাচর শুনিতে পাই তাহার কোন তালিকা আমরা পাই নাই। সেইজন্য পূর্ব্বপক্ষ নিজেকেই করিয়া লইতে হইয়াছে। যথাসাধ্য অভিযোগগুলির বিচার করিয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সে গুলি ভিত্তি-হীন। বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক শুচিতা ও নীতিধর্ম্ম রক্ষা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন বটে কিন্তু তাহা করিতে গিয়া তিনি কখনও বাস্তব-জীবনের সহিত যোগ হারান নাই।

লিপি

(গল্প)

[শ্রীমতী তমাললতা বসু]

(১)

ভাই অমলাদি,

তুমি চিরদিনই আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, বন্ধু, সখী। আমায় নিজের বোনের মতই ভালবাস, স্নেহ কর? তাই আজ সকলে পায়ে ঠেল্‌লেও তুমি ঠেল্‌তে পার নি।

আমি বহুদিন তোমার খবর না নিলেও তুমি ঠিক্ খবর নিয়েছ। তাই আজ আমার দুঃখের সংবাদ পেয়ে সঠিক খবর জান্‌বার জন্যে আমায় চিঠি লিখেছ?

বলছি ভাই সব একে একে. তোমার চিঠি না পেলেও তোমায় এ চিঠি আমি দিতুমই। জগতে শুধু তোমাকেই আমার অবস্থার কথা জানাতুম—আর জানাতুম যে বাঙ্গালীর মেয়ে, হিন্দু ঘরের বৌয়ের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

ভাই অমলাদি, আজ আর কিছু গোপন করব'না, তুমি বন্ধু হ'লেও তোমার কাছেও সব এতদিন প্রকাশ করি নি, কর্ত্তে পারি নি, নারীর এ যন্ত্রণা যে কি যম-যন্ত্রণা, তা যে ভুক্তভোগী সেই শুধু বোঝে।

তোমরা সকলেই জান', আমার স্বামী ধনবান, রূপবান এবং চরিত্রবানও বটে, আর আমায় তিনি ভালবাসেন। সবই যে ভ্রম, ভ্রম। প্রথম প্রথম ভালবাসতেন বটে, এখন বুঝি সেটা আসলে রূপের মোহ ছাড়া আর কিছু নয়।

তারপর তিনি ধনবান, রূপবান বটে কিন্তু চরিত্রবান্ মোটেই তাঁকে বলা যায় না, কারণ তিনি মদ্যপ, আর যা,

তা নাই শুনলে, রাত্রে অর্দ্ধেক দিন বাড়ী আসেন না, বাইরে কাটান, এমন কি বাড়ীতে ব'সে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মদ খেতেও তাঁর বাধে না।

তা ছাড়া আমাকে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌তেন না, বল্‌তেন তুমি আবার কথা বল্‌তে এসেছ কি, খেতে পরতে দিচ্ছি এই ঢের, আমার কাছে দাসী বাঁদীও যা তুমিও তাই।

গাল-মন্দ, মার-ধর সেতো অঙ্গের ভূষণ আমার।

এ-সব নীরবে সয়ে ও হাসিমুখে তোমাদের কাছে গোপন রেখে দিন কাটিয়েছি। কাউকে কোনদিন এর বিন্দু বিসর্গও জান্‌তে দিই নি।

যাই হোক্ এমনি করেই ছেলে মেয়ের মুখ চেয়ে কোন রকমে এই ব্যর্থ জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিলুম। হঠাৎ একদিন রাত্রে স্বামীর ঘরে গোলমাল শুনে ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘরে গিয়ে দেখি, ঘরে ডাকাত পড়েছে, স্বামী তাঁর যথা-সর্ব্বস্ব তাদের হাতে তুলে দিয়ে জীবন-ভিক্ষা চাইছেন, আর পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

আমি সবে ঘুম থেকে উঠে এসেছি, তখনও ঘুম ভাল ক'রে ছাড়েনি, সব বুঝতে না বুঝতে একজন আগন্তুক এসে আমার হাত ধরলে।

স্বামীর দিকে চাইলুম, তিনি আমার অবস্থা দেখেও দেখ্‌লেন না, নিজের প্রাণ নিয়ে বাঁচবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে যেমনি উঠে যাচ্ছিলেন, তেমনি একজন তাঁকে ধ'রে হাতে দড়ি বেঁধে ফেলে রাখ্‌লে আর সব ডাকাতরা তৎক্ষণে টাকা কড়ি ধন দৌলত জিনিস-পত্র নিয়ে সরে পড়েছে। কেবল দুজন ছিল, তাঁর পথ আগ্‌লে।

স্বামীর দ্বারা যখন কিছুই সাহায্য পাবার সম্ভাবনা দেখলুম না, তখন বুঝলুম নিজের রক্ষা নিজেকেই কত্তে হবে, বুকে সাহস সঞ্চয় করে বল্‌লুম, "কি চাও তোমরা বল। হাত ছেড়ে দাও।"

ঐ দু'জনের ভেতর একজন বল্‌লে "আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে চাই, আমাদের সর্দ্দারণী করতে। ভাল ভাবে আমাদের সঙ্গে চলো নৈলে তোমায় মেরে ফেলবো।" এই অপমানকর কথা শুনে গা জ্বল্‌তে লাগল।

জীবন-মরণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে একটু হাসলুম—মৃত্যু ভয় দেখাচ্ছে আমায়। যে বাঙ্গালীর মেয়ে হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ কর্‌তে পারে তাকে দেখায় মৃত্যু-ভয়।

যাই হোক বললুম, "হাত ছাড়, আমি আপনিই যাচ্ছি।"

বল্‌তে তারা হাত ছেড়ে দিলে!

জানই তো ভাই অমলাদি ছেলেবেলা থেকে বাবা আমায় কি রকম লেখা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি-সঞ্চয়ের ও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। মনে হ'ল সে শিক্ষা কি বৃথাই হয়েছিল, আজ একবার তার পরীক্ষাটা এই দু'জন জোয়ান মদ্দ ডাকাত ও বলির ছাগের মত ভয়ে কম্পবান কর্ত্তাকে দেখিয়ে দিই। ভাব্‌তে ভাব্‌তে জানি না কি মহাশক্তির শক্তিতে শক্তিময়ী হয়ে উঠে আমি চকিতের মধ্যে খাটের তলা থেকে শাণিত কাটারী একখানা তুলে নিয়ে সেই কাটারীর আঘাত সজোরে দিলুম, একটার মাথায় আর দিলুম, একটার পায়ে। দুজনেই 'বাপ্‌রে' ব'লে ভুঁয়ে লুটিয়ে প'ড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লো। আমিও তখন কাঁপতে কাঁপতে এসে স্বামীর বাঁধন খুলে দিলুম। তিনি ভয়ে মৃতপ্রায় পড়েছিলেন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে তুলে বললুম, আর ভয় নেই, দেখো তাদের কি অবস্থা করেছি; এখন সর্ব্বস্ব যদি ফিরে পেতে চাও লোক জনকে, পাড়া-পড়শীদের সকলকে ডাক ডাকাতগুলো সব নিয়ে বেশী দূর এখনও যেতে পারে নি বোধ হয়।

তখন স্বামী উঠে চেঁচামেচি ক'রে লোকজন ডাকলেন, বাড়ীতে লোক ভরে গেল। আর অনেক লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটলো ডাকাতগুলোর সন্ধানে।

তারপর বিধির আশীর্ব্বাদে ডাকাতেরা সব ধরা পড়লো জিনিস-পত্তর, টাকাকড়ি, জমীদারীর কাগজাদি সবই পাওয়া গেল। কোম্পানী আমার অসীম সাহসের পুরস্কার দিলেন।

পাড়ার নবীনরা করলেন আমার অদ্ভুত সাহসের প্রশংসা। প্রবীণরা করলেন আমার মেয়ে মদ্দানীর নিন্দা, আর স্বামী কৃতজ্ঞতা জানালেন এই বলে যে তোমার জন্যেই আবার সব ফিরে পেলুম, তোমায় না বুঝে এতদিন অনেক কষ্ট দিয়েছি। সে সব ভুলে গিয়ে আমায় ক্ষমা করো।

ভাব্‌লুম বুঝি বা কপালের গ্রহটা কেটে গেল। তা কিন্তু সত্য কাটল না। এখন সমাজ এলেন বাদ

সাহসে। সমাজের মাতব্বররা যাদের গাঁয়ে মানে না কিন্তু তারা আপনি মোড়ল, এসে বললেন, আমি পর-পুরুষ স্পর্শে কলুষিতা পতিতা অর্থাৎ সমাজে আমার স্থান নেই। আর স্বামী আমায় ছাড়তে পারেন, কিন্তু সমাজকে ছাড়তে পারেন না। তাই আমি তাঁর পরিত্যাজ্যা—সন্তান হোতেও বঞ্চিতা, কারণ সন্তান তাঁর, আমি শুধু গর্ভে ধরেছি, মাত্র। আরও আমি ঘরে থাক্‌লে আমার বিবাহ-যোগ্য মেয়ে লতিকাকে কেউ বিয়ে কর্‌তে চাহিবে না। এও আমায় ত্যাগ করার আর একটা কারণ। দুগ্ধপোষ্য দেড় বছরের শিশু পুত্র, কন্যা স্বামী, ঘর-সংসার সব ছেড়ে আজ আমাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। কে আর এ গৃহ-তাড়িতা পতিতা, অসহায়া নারীকে স্থান দেবে, হাঁ, আমার স্নেহময়ী মা আছেন, তিনি আমাকে স্থান দেবেন জানি কিন্তু সেই পতি-পুত্রহীনা দুঃখিনী কাশী-বাসিনী মার আমার দুঃখের জীবনে বোঝা হয়ে শান্তি ভঙ্গ করি কেন?

আজ আমি পথের ভিখারিণী, কাঙ্গালিনী, যদি কোন কাজ-টাজ জোগাড় করে দিতে পার তবে দুটো পেটের জোগাড় হয়। তাই আজ নারীর সাহসের ও শক্তির এই পুরস্কার। যে রাজরাণী, আজ সে পথের ভিখারিণী।

স্বামী দয়া করে কিছু অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছেন, কিন্তু আমি তা ঘৃণায় প্রত্যাখান করেছি। দুচার দিনের জন্যে স্বামীর প্রাসাদের বাইরের ঘরে ঝিয়েদেয় পাশে একটু স্থান পেয়েছি। তোমার চিঠির পথ চেয়ে রইলুম। হাঁ ভাই অমলাদি, তুমিও কি সব শুনে আমায় ঘৃণা করছো ভাই। শুধু এইটুকু জান্‌বার জন্যেই এখনও বেঁচে রইলুম।

ইতি—

তোমার দুঃখিনী বোন

কমলা

(২)

ভাই কমলা, ছোট বোনটি আমার, তোর চিঠিখানি পড়ে আমার প্রাণে আনন্দও হল, আবার দুঃখুও হল। হায়রে অন্ধ মানুষ, এমন রত্নও হেলায় হারায়, এর মূল্য বুঝ্‌লি না। তুই যা করেছিস, যে সাহসের ও শক্তির পরিচয় দিয়েছিস, এমন কটা পুরুষেই বা করতে পারে। তোর স্বামীর কর্ত্তব্য ছিল, প্রাণ দিয়েও তোকে রক্ষা করা, তা না করে তিনি কেঁদেই অস্থির, এই তো তাঁর পুরুষত্বের গর্ব্ব!

তারপর তাঁরই আজ পথের ভিখারী হবার কথা, তা না হয়ে বিধির উল্টো বিচারে তুই তাঁর সর্ব্বস্ব বাঁচিয়ে দিয়ে নিজে হলি পথের ভিখারিণী। আর তিনি পুরুষ বলে স্বেচ্ছাচারী, মদ্যপ, চরিত্রহীন হয়েও সমাজে পেলেন ঠাঁই। আর তুই সতী-সাধ্বী শক্তিময়ী হয়েও হলি সমাজ-পরিত্যক্তা। ধন্য এই সমাজ, আর ধন্য এই অন্ধ বিচারকারী, মানব নামের অযোগ্য লোকগুলো।

ভাল কথা তোমার কর্ত্তাই না সমাজ-পতি—তাঁর পকেটেই না সমাজ। সমাজের দাম তো কিছু কাঞ্চনমূল্য। না হয় একদিন বেশ ভাল করে কয়েকজনকে ভোজন করান মাত্র। তা কি তোর কর্ত্তা এত টাকা-কড়ি যে রক্ষা করলে তার জন্যে খরচ কর্ত্তে পারেন না।

তাই এখন ন্যায় ধর্ম্ম বলে কিছু নেই, অন্যায়েরই এখন বাঙ্গলা দেশের সমাজ-পতিরা প্রশ্রয় দেন, এদের কাছে বিচারের জন্যে দাঁড়ানও মহাপাপ।

যাই হোক্ ভাই তোর অমলাদিদি থাকতে তোকে পথে দাঁড়াতে হবে না—হবে না—হবে না। তুই এখানে চলে আয়, তোকে বুকে করে রাখব, তোকে মাথায় করে পূজা কর্‌ব। তোকে আনতে আমরা নিজেরাই যাচ্ছি। ভাই তোর মেয়ের বিয়ের জন্যে তোর মত সতী-লক্ষী শক্তিরূপিণী মাকে ঘরে রাখতে ভয় থাচ্ছে তোর কর্ত্তা—সেটা একটা মিথ্যে গুজব মাত্র।—প্রাণ ও মান রক্ষার যথোপযুক্ত প্রতিদান বটে! অমল, কথাটা বলি শোন —তোর ভোম্‌রা জাতীয় কর্ত্তাটী তোর হাত থেকে রক্ষা পেতে চান, তাই এই একটা চাল—এত বড় চালিয়েতের কাছে আর তোকে থাকতে হবে না—যতদিন না ঐ জীববিশেষটী নিজের ভুল বুঝে তোকে পত্নীর ন্যায্য দাবী দেবে, ততদিন আর তোর ওখানে থাকতে হবে না। তোর মত মার মেয়েকে সবাই আদর করে গ্রহণ করবে।

ছেলেবেলা থেকে আমরা দুজনে যেহান হ'ব বলে

প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, তা কি মনে আছে। তোকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সেই কথাটা রাখবার সময় এসেছে। অতএব তোর মেয়েকে আমিই পুত্রবধূ করবো, আমার ছেলে অজিত এবার এম-এতে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছে। তুই তো জানিস্ সে রূপে-গুণে তোর সুন্দরী মেয়ে লতিকার অনুপযুক্ত হবে না। আমার একটী ছেলে, এই বিশাল জমীদারী সবই তার। অতএব লতিকার কোনই কষ্ট হবে না। তোর মেয়েটী আমায় দিবি, মেয়ের সাধ আমার মেটাব। ফিরে পাবি একটী ছেলে, সেটীর ভার তোর ওপর। আর সেই ছেলের মা হয়ে তুই সুখে থাক্‌বি। ছেলে শীগিগরই ডেপুটি হয়ে বিদেশে যাবে বিয়ের পর। আর তুই যাবি তাদের সঙ্গে তাদের ঘর-সংসার গুছিয়ে দিতে। আমি তো ভাই সংসার ছেড়ে এক-পাও নড়তে পারবো না। তুই ভাবছিস্ সংসার ছেড়ে না তোর সয়াকে ছেড়ে। তা যা ইচ্ছে ভাবিস ভাই। আমরা কালই যাচ্ছি, লতিকাকে পাকা দেখে আস্‌ব অমনি। আমার আর দেরী সইছে না। আর তোর কর্ত্তাকেও ছুটো শিক্ষে দিয়ে আস্‌ব। ইতি—

তোর নিত্য শুভার্থিনী—

অমলাদি

ব্যবসা-বাণিজ্য

[শ্রীসত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়]

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একদা রেল-পথে কটকে যাইতেছিলেন। তখন আষাঢ় মাস, অসম্ভব গরম পড়িয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহরে ট্রেণখানি আসিয়া কটক ষ্টেশনে থামিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অবতরণ করিলেন। এমন সময় একটী দীনবেশী বালক আসিয়া তাঁহার কাছে একটী পয়সা চাহিল। বিদ্যাসাগর বালকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "একটী পয়সা লইয়া তুমি কি করিবে?" বালক বলিল—"মুড়ি কিনিয়া কিছু আমি খাইব আর কিছু বাড়ীতে লইয়া গিয়া মাকে দিব।" ঈশ্বরচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"যদি চারিটী পয়সা দিই?" সে বলিল—"দুই পয়সার মুড়ি কিনিয়া আমি খাইব আর দুই পয়সার মুড়ি মাকে দিব।" তখন প্রশ্ন হইল—"আর যদি আটটী পয়সা দিই?" এবারে বালক উত্তর দিল—"চার পয়সার মুড়ি কিনিয়া মা ও আমি খাইব, আর বাকী চার পয়সার পাকা জাম কিনিয়া তাহা বেচিয়া কিছু লাভ করিব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বালকের বুদ্ধিমত্তায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে চারি আনা দিয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন, তখন ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলেন সেই ভিক্ষুক বালক ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া জাম বিক্রয় করিতেছে। বালকটী আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে খুব উৎসাহিত করিয়া তাহার হাতে একটী টাকা দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে পুনরায় কর্ম্মোপলক্ষ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় কটকে যান। সেবারে দেখিলেন সেই বালক একখানি দোকান খুলিয়া সুন্দররূপে ব্যবসা চালাইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার অসীম অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণ ব্যবসায় বুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। এই বালক কালে একজন বড় ব্যবসায়ী ব্যক্তি হইতে পারিয়াছিলেন।

উপরোক্ত গল্পটী অনেকেই জানেন। এস্থলে ঐ

৺বৈকুণ্ঠনাথ গুই

বালকের সূক্ষ্ম ব্যবসায়-বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত দিবার জন্য আমরা এই গল্পটীর অবতারণা করিলাম।

এই অজ্ঞাতনামা উদ্যোগী বালকটী ব্যতীত বঙ্গদেশের কয়েকটী খ্যাতনামা ব্যবসায়ীর উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাঁহারা সামান্য মূলধনে সামান্য ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া কেবলমাত্র নিজেদের উদ্যম, অধ্যবসায় ও সাধুতা-গুণে জীবনে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। স্বর্গগত বটকৃষ্ণ পাল, প্রহ্লাদচন্দ্র পাল, বৈকুণ্ঠনাথ গুঁই প্রভৃতির কথা বলিতেছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বৈকুণ্ঠবাবুর উদ্যমী-শীল জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

এই অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি প্রায় অশীতিবর্ষ কাল ব্যবসায় কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। ইনি ১২৬০ সাল জন্মগ্রহণ করেন। সম্প্রতি ইঁহার পরলোকগমন হইয়াছে। ১৮ বৎসর বয়সে বৈকুণ্ঠবাবু মাত্র দেড় শত টাকা মূলধন লইয়া কলিকাতায় একটী ক্ষুদ্র কারবার আরম্ভ করেন। এই সঙ্গে তাঁহাদের নিজেদের কারখানার (নিমতলা, মেদিনীপুর) তৈয়ারী জিনিস আনিয়া দেশ-বিদেশে রপ্তানি করিতে থাকেন। তাঁহার একনিষ্ঠ পরিশ্রমে পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে কার-বারের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া তিনি কলিকাতা খোঙ্গরাপটীতে একটি স্থায়ী ও বৃহৎ কারবার প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন পর্য্যন্ত এদেশে জার্ম্মান্ শীতবস্ত্রের আমদানি হয় নাই। ১৮৮২ সাল হইতে ইহার আমদানি

আরম্ভ হয় এবং বৈকুণ্ঠবাবুই ইহার একমাত্র আমদানিকারক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈকুণ্ঠবাবু যে নিজ কারখানার তৈয়ারী বস্ত্রাদি বিদেশে রপ্তানি করিতেন, তাহা, প্রচুর পরিমাণে বিদেশী বস্ত্রাদির আমদানির সঙ্গে সঙ্গে, কমিতে থাকে। তথাপি, এখনও পর্য্যন্ত ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে চারি শত তাঁত আছে। বৈকুণ্ঠবাবু যে সমস্ত কাপড় তৈয়ারী করাইয়া বিদেশে রপ্তানি করিতেন, তাহা আজ লুপ্তপ্রায়। ইহাদের কতকগুলির নাম ছিল—মালদহ, দরিয়াই, সুরেখা, আজিজি, খলিলি, চিলমিখানা, চড়চড়ি, নবাবী ইত্যাদি

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা হিসাবে বৈকুণ্ঠবাবু বাঙ্গালী-ব্যবসায়ীগণের অন্যতম ছিলেন। সুদূর সাউথ আফ্রিকা বাহারিণ, এডেন, বসারা কায়রো, ইজিপ্ট, বোগদাদ প্রভৃতি দেশে এবং ভারতের বোম্বাই, আহমেদাবাদ, সুরাট ইন্দোর, গোয়ালিয়ার, উজ্জয়িণী, ক্যানানোর, কালিকট, কটক, বর্ম্মা প্রভৃতি প্রদেশে নিজ কারখানায় প্রস্তুত বস্ত্রাদি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর তিনি রপ্তানি করেন।

চাকুরীসর্ব্বস্ব বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এরূপ স্বাধীনচেতা ব্যক্তির একান্ত অভাব। এইরূপ উদ্যমী পুরুষ বাঙ্গালীর মধ্যে যত জন্মগ্রহণ করিবেন, ততই বাঙ্গালী পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার লাভ করিতে থাকিবে।

আজকাল এদেশে জীবিকা-সমস্যা দিন দিন জটিল হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ জনসমাজ তো দূরের কথা, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী তাঁহারাও অনেকস্থলে স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহের সদুপায় নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এখন ডাক্তারী, ওকালতী প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করা নূতন লোকের পক্ষে দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল চাকুরী ও স্কুল মাষ্টারী এখন মধ্যবিত্তদিগের জীবিকার প্রধান অবলম্বন হইয়া পড়িয়াছে। অধুনা চাকুরীর বাজার কিরূপ মন্দা হইয়াছে তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। আজকাল এম্ এ পাশ করিয়াও অনেকে ৩০ টাকা বেতনে সওদাগরী আপিসের চাকুরী যোগাড় করিতে পারিতেছেন না। চাকুরী সংগ্রহ করা একে খুব কষ্টকর তাহার উপর চাহিদার তুলনায় চাকুরীর সংখ্যা অল্প। অতএব এখন আমাদের কর্ত্তব্য স্বাবলম্বী হইয়া যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করা।

আজকাল সহরে ও পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্রই শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা খুব বেশী। অতএব যাঁহারা শিক্ষিত হইয়া বেকার বসিয়া আছেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য সাধ্যমত ব্যবসায়, কৃষি, গৃহশিল্প অথবা কুটীর-শিল্পের কোন একটী অবলম্বন করা। অবশ্য ব্যবসায়, কৃষি বা শিল্পের কোনটীই বিনা মূলধনে আরম্ভ করা যায় না। কিন্তু অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বন থাকিলে সেরূপ মূলধন সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব নহে। অল্প মূলধনে ছোটখাট ব্যবসায় কিরূপে আরম্ভ করা যায় সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করিব।

আমাদের ধারণা, ব্যবসায় অতি ক্লেশকর। কিন্তু এ কথার কোন ভিত্তি নাই। প্রত্যেক ব্যবসায়েরই Trade Secrets আছে, যাহা প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ভালরূপে জানা দরকার। যিনি যে ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন তাঁহাকে সেই ব্যবসায়ের প্রাথমিক শিক্ষা-উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহার পর অল্প মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবেন। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক সেই কার্য্যে কিছুদিন ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। তবে সেই ব্যবসায়ে লাভ দাঁড়াইবে এবং তাহা হইতে ব্যবসায়ীর সমৃদ্ধিলাভ ঘটিবে।

অল্প মূলধনের ব্যবসায়ের মধ্যে 'অর্ডার সাপ্লাই'এর কার্য্য বিশেষ লাভজনক। ইহাতে বেশী মূলধনের প্রয়োজন নাই। খুব পরিশ্রমী হওয়া দরকার। রৌদ্র, জল কিছুতেই দৃকপাত না করিয়া শহর-মফঃস্বল সর্ব্বত্র খরিদ্দারের বাড়ী বাড়ী গিয়া অর্ডার সংগ্রহ করিতে হয়। অনেক লোকের সহিত আলাপ পরিচয় রাখাও প্রয়োজন। নিজের লাভ অপেক্ষা খরিদ্দারের লাভের দিকে বেশী দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। তবে এ কার্য্যে উন্নতি। ২।৩ বৎসরেই এ ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি করা যায়।

ফল ও তরি তরকারী চালান দেওয়ার কার্য্য ও কম লাভজনক নহে। দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে আম, কাঁটাল, লেবু, প্রভৃতি ফল, এবং পটল, বেগুণ কুমড়া ও শাকশব্জী যদি প্রত্যহ কলিকাতায় আনার ব্যবস্থা করা যায় তাহার দ্বারাও যথেষ্ট লাভের আশা আছে। অবশ্য টাটকা মাছ প্রভৃতি আনিতে পারিলে আরও বেশী লাভ হইবে। এই

কার্য্যে একসঙ্গে ৩।৪ জন ব্যাপৃত থাকিতে হয়। একজন গ্রামে থাকিয়া চাষীদিগকে দাদন দিয়া প্রত্যহ যাহাতে টাটকা জিনিস সংগ্রহ করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন, একজন মাল কলিকাতায় লইয়া আসিবেন এবং অপর একজন এখানকার ব্যাপারীদের জিনিস দেওয়া ও দেনা পাওনার ব্যবস্থা করিবেন। কমপক্ষে ৩০০ টাকা হইলে এই কার্য্য চলিবে।

চায়ের দোকানও একটী কম লাভের বিষয় নহে। ইহাতে প্রায় শতকরা ৭৫৲ টাকা লাভ থাকে। দোকান এমন স্থানে খুলিতে হয় যেখানে চায়ের দোকান অল্প এবং রাস্তায় লোক চলাচল বেশী। পরিচ্ছন্নতা একান্ত প্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ তিন পয়সায় যে চায়ের কাপ বিক্রয় হয় সেই চা তৈয়ারী করিতে দেড় পয়সারও কম খরচ পড়ে। ইহার সঙ্গে সরবৎ, চপ' প্রভৃতি থাকিলে ব্যবসায় আরও ভাল চলে। ন্যূনপক্ষে ৫০৲ টাকা মূলধনে এই ব্যবসায় আরম্ভ করা যায়।

কাটা কাপড়ের ব্যবসায় ৫০০৲ টাকা মূলধনেতেই আরম্ভ করা যায়। এই ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সকল প্রকার কাপড় ও তাহার দর জানিতে হয়। দর্জ্জির কাজ (কাটিং ও টেলারিং) ও ভালরূপে জানা প্রয়োজন। একটী অন্ততঃ কল ক্রয় করা করা দরকার। প্রথমতঃ অল্পলাভে জিনিস ছাড়িতে হয়। তৈয়ারী (Ready made) জামা ইত্যাদি বিক্রয়ে বেশ লাভ আছে। সাধারণ সার্ট ও পাঞ্জাবীর সেলাই ৵০ ও কোটের সেলাই ১৷০; ইহাতে খুব লাভ। এ কার্য্যে অনেকগুলি নিয়মিত খরিদ্দার সংগ্রহ করিতে হয়।

পল্লীগ্রামে ও ক্ষুদ্র শহরে সোডার কলের ব্যবসায় খুব লাভজনক। ৩০০৲ টাকা হইলে এই কার্য্য আরম্ভ করা যায়। আজ কাল দেশী অনেক কোম্পানী সোডার কল বিক্রয় করিতেছেন। এই ব্যবসায় বৎসরে ৯মাস বেশ চলে। ইহার সঙ্গে বিড়ি তৈয়ারী প্রভৃতি কার্য্য করিলে সমস্ত বৎসর ভাল ভাবে ব্যবসা চলে। ইহাতে সত্বর উন্নতির আশা আছে।

ষ্টেশনারী ও মুদিখানার দোকান চালাইতে প্রায় এক প্রকার মূলধনই প্রয়োজন। ন্যূনপক্ষে ১০০৲ টাকা হইলে একখানা ষ্টেশনারী অথবা মুদীখানার দোকান আরম্ভ করা যায়। এই প্রকার দোকানে টাকা প্রতি দুই আনা লাভ রাখিলে চলিয়া থাকে। কিছু কিছু টাকার জিনিস খরিদ্দার দিগকে ধারে দিতে হয়। প্রথমতঃ অল্প লাভে বিক্রয় করিলে কিছু দিন পরে খুব লাভ আশা করা যায়।

"কাজের কথা" নামক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কীয় সুন্দর পত্রিকায়, সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বেকার-সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে যে কতকগুলি পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

বয়ন-শিক্ষা—শ্রীরামপুর, বহরমপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, বরিশাল, এবং খুলনাতে বয়ন-বিদ্যালয় আছে। বেতন লাগে না বরং উপযুক্ত ছাত্রকে কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া হয়। আবার শিক্ষা শেষ হইলে উপযুক্ত পুরস্কার বা লভ্যাংশের কিছু দেওয়া হয়।

ইছাপুরে একটি অর্ডন্যান্স্ টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল আছে। এখানে মাত্র ৬০ জন ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। যাহারা অন্ততঃ ইংরাজী স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে তাহাদের এখানে লওয়া হয়।

বহরমপুরে একটি Silk Weaving Dyeing Institute) সিল্ক্ উইভিং ডাইং ইনষ্টিটিউট্ আছে; ইহাতে ২টি বিভাগ আছে। ১৫ হইতে ১৬ বৎসরের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ কিংবা সিনিয়ার মাদ্রাসা হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রদের এখানে প্রথম স্থান দেওয়া হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১০৲ টাকা করিয়া ১০টি বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। কোন বেতন লওয়া হয় না।

জরিপ-শিক্ষা—যাহারা অন্যূন ১৬ বৎসর বয়স্ক অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়িয়াছে তাহারা জরিপ শিখিতে পারে। এই শিক্ষার জন্য কুমিল্লা, ময়নামতি, বর্দ্ধমান, রংপুর, পাবনা, ও রাজসাহীতে সার্ভে স্কুল আছে।

খনির কাজ শিক্ষা। (Mining)ধানবাদে (মানভূম জেলা) একটী Mining School আছে। এই স্কুলে প্রধানতঃ মাইনিং সার্ভে (Mining Survey) শিক্ষা দেওয়া হয়। মাইনিং সার্ভে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে

যোগ্য ছাত্রগণের মধ্যে ৮।১০ জনকে কয়লার খনিতে কাজ শিখিবার জন্য পাঠান হইয়া থাকে। রাণীগঞ্জে এবং সীতারামপুরে দুইটি মাইনিং স্কুল আছে।

সাব্‌-ওভারসিয়ারের কাজ শিক্ষা—(Sub-overseership) বর্দ্ধমান, ঢাকা, পাবনা, এবং রাজসাহীতে এই কাজ শিখিবার জন্য স্কুল আছে।

রিভেটিং ও টার্ণিং বা ফিটারের কাজ—কলিকাতায় Jessop Co. Burn Co ইত্যাদির কারখানায় এই কাজ শিখিবার জন্য লোক লওয়া হয়।

কৃষিশিক্ষা—সাধারণতঃ বাঙ্গালা দেশে কৃষি সম্বন্ধীয় উচ্চ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকিলেও চুচুঁড়া ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে সরকারী কৃষি-কার্য্যালয় আছে। সেখানে হাতে কলমে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সাধারণতঃ মধ্যইংরেজী বা মধ্য-বাঙ্গালা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ এখানে প্রবেশাধিকার পায়। যাহারা কৃষি-সম্বন্ধীয় উচ্চশিক্ষা চায় তাহাদের জন্য নাগপুরে ও সাবরে কলেজ আছে। তাহাতে আই, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রবেশ করিয়া তিন বৎসর পড়িতে হয়।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেকার বসিয়া আছেন তাঁহারা যদি উপরোক্ত অথবা অনুরূপ কোন একটী ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন, তবে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কখন ভাবিতে হইবে না। তাঁহারা দেশের ও দশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। শিল্প ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধিত হইলেই দেশ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ

[বৈদ্যরঞ্জন কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী এল্‌-এ-এম্‌-এস্‌]

আজ যে মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিব তিনি ১৩২ বৎসর পূর্ব্বে ১২০৫ সালের ২৪এ আষাঢ় শুক্রবার কৃষ্ণা নবমী তিথিতে যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ। ইনি বঙ্গীয় কবিরাজ মণ্ডলীর গৌরব-স্তম্ভ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কবিশেখর কালিদাস সত্যই বলিয়াছেন,—

> "ভারতের নব ধন্বন্তরি
> আজিকে তোমারে হৃদয়ে স্মরি।"

শুধু বাঙ্গালা দেশে নহে—সমগ্র ভারত বর্ষে এমন কি সুদূর ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত ইনি পাণ্ডিত্যের জন্য সুপরিচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় কবিরাজ সম্প্রদায় ইঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এমন কি নেপাল কাশ্মীর এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতেও অনেক ছাত্র ইঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিতে আসিত। নিম্নে ইঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম।

পিতা-মাতার নাম। ইঁহার পিতার নাম ভবানীপ্রসাদ রায় ও মাতার নাম অভয়া দেবী। ইনি পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন।

শিক্ষা। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় মাগুরা গ্রামের তাঁহাদের কুলপুরোহিত ৺গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তীর নিকট ইঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হয়। তাঁহার নিকট দশমবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করার পর তিনি ৺নন্দকুমার সেনের নিকট মুগ্ধবোধ, ব্যাকরণের কিয়দংশ পাঠ করিয়া অবশিষ্ট অংশ ৺মানিকচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট শেষ করেন। তাহার পর যশোহর জেলার ৺রামরতন চূড়ামণির নিকট অভিধান, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া রাজসাহী জেলার বৈদ্য-বেলঘরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺রামকান্ত সেনের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে

আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর মাত্র।

সেকালের শিক্ষা-পদ্ধতি। সেই সময় এখনকার মত মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলন হয় নাই। হাতে লেখা পুঁথি দেখিয়া সে সময় সকল শাস্ত্রই পড়িবার পদ্ধতি ছিল। গঙ্গাধর প্রত্যহ পুঁথির দশ পৃষ্ঠা পাঠ স্বহস্তে লিখিয়া লইয়া অভ্যাস করিতেন। ৺রামকান্ত সেন মহাশয় গঙ্গাধরের অসামান্য প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠীর ব্যাকরণ, অভিধান ও সাহিত্য শিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে অধ্যাপনার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন।

পাঠ্যাবস্থায় মুগ্ধবোধের টীকা রচনা। এই সময় মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একখানি টীকা তিনি প্রস্তুত করেন। ইহার পর তিনি সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন সেই স্থানে সমাপ্ত করিয়া নাটোরে তাঁহার পিতৃদেবের নিকট গমন করেন। তাঁহার পিতা নাটোর মহারাজার সর্ব্বপ্রধান কবিরাজ ছিলেন।

পাণ্ডিত্যের পরিচয়। সেই সময় নাটোর রাজসভায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত আগমন করেন। গঙ্গাধরের পিতা ঐ পণ্ডিতের নিকট তাঁহার পুত্রের লিখিত টীকার কতক অংশ পড়িয়া শ্রবণ করান। পণ্ডিত মহাশয় তাহা শ্রবণ করিয়া বলেন যে, ইহা অতি প্রাচীন টীকা, এ টীকা আপনি কোথায় পাইলেন? গঙ্গাধরের পিতা তখন বলেন যে, ইহা প্রাচীন রীতির অনুসরণ করিয়া লিখিত বটে, কিন্তু ইহা প্রাচীন ঋষিদিগের রচিত নহে, ইহা তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র যুবক গঙ্গাধরের রচিত। পণ্ডিতপ্রবর সেই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং গঙ্গাধরকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন।

কর্ম্মময় জীবন। এইবার গঙ্গাধরকে পঠদ্দশার জীবন ছাড়িয়া কর্ম্মময় জীবনে প্রবেশ করিতে হইল। তিনি প্রথমে কলিকাতাতেই চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পিতৃদেবের ইচ্ছায় মুর্শিদাবাদের সৈদাবাদে একটী খোলার বাড়ী ভাড়া লইয়া চিকিৎসা-কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২১ বৎসর মাত্র।

মুর্শিদাবাদে প্রতিভার বিকাশ।

মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ

মুর্শিদাবাদে তখন সুচিকিৎসকের অভাব ছিল না। শাস্ত্র-কুশল বহু পণ্ডিত তখন সেখানে বাস করিতেন। অত অল্প বয়স হইলেও গঙ্গাধর কিন্তু নিজের প্রতিভায় সমগ্র পণ্ডিত এবং চিকিৎসকদিগের মধ্যে অল্পদিনের মধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন; এমন কি সকল পণ্ডিত ও প্রাচীন চিকিৎসকের সহিত বাদানুবাদ করিয়া সকলের নিকট স্বীয় মত স্থাপনা করিতে সমর্থ হন।

সে সময় মহারাণী স্বর্ণময়ীর গৃহে রায় রাজীবলোচন সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ দুই ঘণ্টাকাল পণ্ডিতের সভা বসিত। স্থানীয় ও বিদেশীয় বহু পণ্ডিত সেই সভায় উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রের বিচার করিতেন। গঙ্গাধরও সময় সময় সেই সভায় যোগদান করিয়া বিচার করিতেন। বিচারের ফলেও তাঁহাকে অতি শীঘ্র পণ্ডিত-সমাজ চিনিতে পারিলেন।

রাজবাটীর চিকিৎসক। রাজীববাবু গঙ্গাধরের অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাহার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। সেই সময় মহারাণী স্বর্ণময়ীর উৎকট পীড়া হয়। রাজীবলোচন গঙ্গাধরের উপরই চিকিৎসার ভার অর্পণ করেন। গঙ্গাধর অতি অল্প দিনের

মধ্যে তাঁহাকে আরোগ্য করেন। ইহার পর হইতে রাজসংসার হইতে তাঁহার মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়।

বিবাহ। মাগুরার নিকটস্থ বাটোহার গ্রামের ৺গোবিন্দচন্দ্র সেনের কন্যা দিগম্বরী দেবীর সহিত গঙ্গাধরের বিবাহ হয়। কিন্তু ১২৫৭ সালে তাঁহার বয়স যখন ৪০ বৎসর, সেই সময় একটী শিশু পুত্রকে রাখিয়া তাঁহার পত্নী পরলোক গমন করেন।

পুত্র ধরণী। পত্নী-বিয়োগে তাঁহার সংসারে অতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটিলেও তিনি আর দার পরিগ্রহ করেন নাই। একটী পরিচারিকার উপর তাঁহার শিশুপুত্র ধরণীধরের প্রতিপালনের ভার অর্পণ করেন। ঐ পরিচারিকাকে "বুকোবুড়ি" বলিয়া ডাকা হইত। ধরণীধর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে তিনি নিজেই প্রথমাবধি শিক্ষাদান করেন। গঙ্গাধরের পত্নী-বিয়োগ হওয়ার পর দার পরিগ্রহ করিবার জন্য অনেকে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পুত্র ধরণীধরের দুই বিবাহ। প্রথমবার তাঁহার বিবাহ হয় বড়কালিয়া গ্রামের বক্সীদিগের বাটীতে। অল্প দিনের মধ্যে ধরণীধর বিপত্নীক হওয়ায় ঐ বড়কালিয়া গ্রামেই তাঁহার আবার বিবাহ হয়। এই পুত্রবধূটীকে তিনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী মনে করিতেন। কারণ—এই পুত্রবধূটীকে গৃহে আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অর্থকষ্ট অপনোদন হয়। ১২৭২ সালের প্রারম্ভে বহরমপুরের জমীদার ৺পুলিনবিহারী সেন ও সৈদাবাদের ৺রামলাল চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের উৎসাহে গঙ্গাধর বাসোপযোগী একখানি ইষ্টকালয় প্রস্তুত করেন। কয়েক সহস্র টাকাও এই সময় তাঁহার সঞ্চিত হয়।

শিষ্যপ্রীতি। তিনি শিষ্যদিগকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। তিনি ২১ বৎসর বয়স হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বহু ছাত্রকে অন্ন দিয়া শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।

অধ্যয়নস্পৃহা। গঙ্গাধরের অধ্যয়নস্পৃহা অত্যধিক ছিল। তিনি বহু রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারশিষ্য দিগের মধ্যে অন্যতম মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ ৺দ্বারকানাথ সেন মহাশয় বলিতেন, "বহুদিন এমন গিয়াছে যে, খাওয়া-দাওয়ার পর গুরুশিষ্যে পড়িতে বসিয়াছেন, আর কোথা দিয়া রাত্রি ভোর হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহই টের পান নাই। তিনি রাত্রিতে খুব অল্পই ঘুমাইতেন। কারণ রাত্রিতে উঠিয়া বহুবার তাঁহার তামাক খাইবার অভ্যাস ছিল। তিনি অল্প বয়সে বিপত্নীক হওয়ায় শিষ্যদিগের সহিত একত্র শয়ন করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে খুব বড় একটা বৈঠকখানা ছিল, সেইখানে আমরা সকলেই এক সঙ্গে শুইতাম। তিনি একটী আগুনের মালসা, খানিকটা তামাক, হুঁকা ও কলিকা রাখিয়া সেইখানে শুইতেন। আর বিছানার পার্শ্বেই একটী দোয়াত. খাগের কলম, একটী কড়ি, কিছু হরিতাল গোলা ও দিস্তা খানেক তুলোট কাগজ থাকিত। গুরুদেব সারারাত্রি বসিয়া তামাক সাজিতেন, খাইতেন আর লেখাপড়া করিতেন। যদি কোথাও কাটাকুটির দরকার হইত, তাহা হইলে সেই জায়গায় হরিতাল গোলা ঢালিয়া দিতেন, উহা শুকাইয়া যাইলে সেই জায়গায় কড়ি ঘসিয়া দিতেন এবং চক্‌চকে পালিশ হইলে তাহার উপর আবার লিখিতেন। তিনি সারারাত্রি এই কর্ম্ম করিতেন। বিদ্যাচর্চ্চায় যদি কোথাও কোন সন্দেহ বা নূতন কথা উপস্থিত হইত, তাহা হইলে শিষ্যদিগকে তুলিয়া দিয়া গুরু-শিষ্যে শাস্ত্রালোচনায় কাটাইয়া দিতেন। তিনি শিষ্যদিগকে বলিতেন, "নিজের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া পরের দুয়ারে যাইও না এবং স্বাবলম্বনের পথ ত্যাগ করিও না।"

শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক গঙ্গাধর। গঙ্গাধর যে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার চিকিৎসায় অনেক অলৌকিক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিরাজ শ্রীযুক্ত জীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন লিখিয়াছেন যে—সৈদাবাদ আগমনের অল্পদিন পরেই একদা তিনি নৌকাযোগে বালুচর নামক স্থানে গমনকালে আচ্ছাদনের বাহিরে বসিয়া ভাগীরথীর পবিত্র শোভা দর্শন করিতেছিলেন। নৌকা তীরের নিকট দিয়াই যাইতেছিল; পথিমধ্যে শ্মশানে আনীত একটী গঙ্গাযাত্রী মুমূর্ষু রোগী তাঁহার নয়নপথে পতিত হয়। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তীরে নামিলেন এবং মুমূর্ষুকে দেখিয়া বুঝিলেন, তখনও আসন্ন মৃত্যু-লক্ষণ দেখা দেয় নাই। শ্মশানবন্ধুদের প্রশ্ন করিয়া ইহাও জানিলেন—তাঁহারা কয়েক দিন ধরিয়া এইভাবে তথায় আছেন। তখন গঙ্গাধর নিজের চিকিৎসা-বৃত্তির পরিচয় দিলেন এবং বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া

দৃঢ়স্বরে বলিলেন, ইঁহার মৃত্যুর এখনও দেরী আছে, চিকিৎসা করাইলে এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন। তরুণ যুবকের এ দৃঢ়তা সহযাত্রীদিগকে বিচলিত করিল। তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই রোগী তৎপর তাঁহার সুচিকিৎসায় পুনর্জ্জীবন লাভ করেন। ইহাতে গঙ্গাধরের চিকিৎসার খ্যাতি বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে। তৎকালে বাঙ্গালার নাজীমের পীড়া সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। ডাক্তার 'কোটা' প্রভৃতি খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ তাঁহার পীড়ার উপশম অসাধ্য বলিয়া ত্যাগ করিলে গঙ্গাধর তাঁহার চিকিৎসার ভার প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাকে নিরাময় করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ্ করেন।

গঙ্গাধর কায় ও শল্য চিকিৎসা—উভয় চিকিৎসায় সমান পারদর্শী ছিলেন। এইস্থানে একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। কবিরাজ শ্রীযুক্ত জীবনকালী রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, একবার তাঁহাদের পল্লীর জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে এক ব্যক্তির একটী স্ফোটক হইয়াছিল। অস্ত্রোপচার জন্য স্থানীয় খ্যাতনামা ডাক্তার আহূত হইলেন। তিনি সে দিবস অস্ত্র প্রয়োগের সময় হয় নাই বুঝিয়া সে দিনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন এবং পরদিবস অস্ত্রোপচার করিবেন বলিলেন। প্রসঙ্গক্রমে কোথায় কি ভাবে অস্ত্র করা হইবে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অপরাহ্নে কবিরাজ মহাশয় পীড়িত প্রতিবেশীর তত্ত্ব লইতে আসিয়া ডাক্তারবাবুর অভিমত শুনিলেন এবং একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, ডাক্তারকে আমার নাম করিয়া বলিও—এখানে কাটিলে শিরা কেটে বিলক্ষণ রক্তস্রাব হবে, আর ক্ষত শুকাতে দেরী হবে।' তাহার পর নিজেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এইখানে যেন কাটে, অমত করে তো আমাকে খবর দিও।" পরদিন যথাসময়ে ডাক্তারবাবু উপস্থিত হইয়া সকল কথা শুনিলেন এবং ঈষৎ সহাস্য বদনে "কবিরাজ মহাশয়ের কাছে কি এখন আমাদের অস্ত্র প্রয়োগের উপদেশ নিতে হবে"—এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। কিন্তু গঙ্গাধর তখন সাক্ষাৎ "গঙ্গাধর" তুল্য, তাই মুখে ঔদাস্য প্রকাশ করিলেও অন্তরে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। এই সময়ে খবর পাইয়া কবিরাজ মহাশয়ও উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবু তৎপূর্ব্বেই পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিয়া নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বহরমপুরে এক ব্যক্তির যকৃতে অন্তর্ব্বিদ্রধি হইয়া জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল। স্থানীয় সিভিল সার্জ্জন অস্ত্রোপচার ভিন্ন কোন উপায় নাই বলিলেন, কিন্তু অস্ত্র প্রয়োগও যে নিরাপদ তাহা স্বীকার করিলেন না। বিপদের সময় তখন গঙ্গাধরকে একবার সকলেই দেখাইত। তিনিও দেখিয়া অস্ত্র-যোগ্য ব্যাধি স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিপন্ন হইবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া নিজেই চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন এবং সামান্য পাচন প্রলেপের সাহায্যে বিদ্রধিটী বিদীর্ণ করিয়া রোগীর জীবন দান করেন।" এইরূপ তাঁহার চিকিৎসার বহু ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। পুঁথি বাড়িয়া যাইতেছে সেজন্য উহার আর উল্লেখ করিলাম না। তবে এখানে একটা বিষয় বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার শিষ্য কবিরাজ মহাশয়েদের খ্যাতিতে জানা যায় যে, তিনি শ্রেষ্ঠ কবিরাজ ছিলেন। তাঁহারই শিষ্য প্রথিতযশা কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ-মতে শল্য চিকিৎসা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

গ্রন্থ প্রণয়ন। গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। আমরা তাঁহার রচিত পুস্তকাবলীর যতদূর সন্ধান পাইয়াছি তাহাতে ৭৭ খানি পুস্তকের নাম পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁহার প্রণীত পুস্তকাবলীর নাম প্রদত্ত হইল।

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ ১১খানি

(১) আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ, (২) পরিভাষা (মুদ্রিত), (৩) ভৈষজ্য-রামায়ণ, (৪) আগ্নেয় আয়ুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা,(৫) নাড়ী পরীক্ষা, (৬) রাজবল্লভীয় দ্রব্যগুণের বিবৃতি, (৭) ভাস্করোদয়, (৮) মৃত্যুঞ্জয় সংহিতা (৯) আরোগ্য-স্তোত্র (১০) প্রয়োগ, চন্দ্রোদয়, (১১) জল্পকল্পতরু টীকা (মুদ্রিত)

তন্ত্রগ্রন্থ ২খানি

(১) নির্ব্বাণসার (২) মহানির্ব্বাণতন্ত্র

জ্যোতিষগ্রন্থ ১খানি

(১) কালবিজ্ঞান

ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ৮খানি

(১) কৌমার ব্যাকরণ, (২) ত্রিপাট ব্যাকরণ, (৩) মুগ্ধবোধের মহাবৃত্তি, (৪) পাণিনীয় বার্ত্তিক,

(৫) দোষ-সন্দর্শনা (মুদ্রিত), (৬) শব্দশক্তি-প্রভা, (৭) ধাতুপাট, (৮) বাদার্থ।

স্মৃতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ৭ খানি

(১) প্রমাদভঞ্জনী টীকা (মুদ্রিত), (২) পরাশর সংহিতার টীকা, (৩) স্মৃতি-সেতু, (৪) দায়ভাগ (মুদ্রিত), (৫) বৈধ হিংসাদি নির্ণয়, (৬) ধর্ম্মানুশাসন, (৭) বিষ্ণু পুরাণের টীকা।

নাটক, আখ্যায়িকা, মহাকাব্য ও ছন্দগ্রন্থ ১৩ খানি

(১) লোকালোক পুরুবীর মহাকাব্য, (২) শিখণ্ডী প্রাদুর্ভাব আখ্যায়িকা, (৩) তারাবতী স্বয়ম্বর মহানাটক, (৪) শৌরীশ্বর চরিত (মহাকাব্য), (৫) সপ্তকাব্য, (৬) সত্যোপাখ্যান, (৭) দুর্গাবধ (মহাকাব্য), (৮) ছন্দসারের বৃত্তি, (৯) আগ্নেয় অলঙ্কারের কাব্য-প্রভাবৃত্তি, (১০) কাব্যলক্ষণের বৃত্তি, (১১) ছন্দোনুশাসন, (১২) পিঙ্গলের টীকা, (১৩) বৈশেষিকের ভাষ্য।

ষড়্‌দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ১৩ খানি

(১) ষটসিদ্ধান্ত, (২) বেদান্ত-সর্ব্বস্ব, (৩) ব্রহ্মবিদ্যামৃত, (৪) শারীরিক সূত্রবার্ত্তিক, (৫) বস্তু নির্ণয়, (৬) পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি, (৭) তত্ত্ববিদ্যাকর (পাতঞ্জলাদি ষড় দর্শনের ব্যাখ্যা,) (৮) সংস্কারবাদ, (৯) সাংখ্য-ভাষ্য, (১০) পাতঞ্জল ভাষ্য, (১১) গৌতমীয় বাৎস্যায়নবৃত্তি, (১২) কুসুমাঞ্জলীয় টীকা, (১৩) বেদান্তদর্শনের ভাষ্য

উপনিষদ্ গ্রন্থ ৮ খানি

(১) মিশ্রোপনিষদের ব্যাখ্যা, (২) তৈত্তরীয়োপনিষদের ব্যাখ্যা, (৩) ছান্দোগ্যোপনিষদের ব্যাখ্যা, (৪) মাণ্ডুক্যোপনিষদের ব্যাখ্যা, (৫) প্রশ্নোপনিষদের ব্যাখ্যা, (৬) কেনোপনিষদের ব্যাখ্যা, (৭) বাজসনেয়োপনিষদের ব্যাখ্যা, (৮) কৈবল্যোপনিষদের ব্যাখ্যা।

বিবিধ গ্রন্থ ১৪ খানি

(১) ত্রিকাণ্ড শব্দশাসন, (২) জগন্নাথ-স্তব (৩) সংসার সংবরণ, (৪) কাত্যায়ণ, বার্ত্তিক, (৫) গায়ত্রী ব্যাখ্যা, (৬) সিদ্ধান্ত শতক স্তবরাজ, (৭) রামগীতা ব্যাখ্যা, (৮) আনন্দতরঙ্গিনী স্তব, (১১) নবগ্রহ স্তোত্র, (১২) লিপিবর্ণ-বিজ্ঞানীয়, (১৩) শাস্তিকাস্তিক বাক্যবোধ, (১৪) ভাগবত বিচার।

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি "কাব্যপ্রভাবৃত্তি" লেখা শেষ করেন। ইহাই তাঁহার শেষ গ্রন্থ।

গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় বরাবরই সরস্বতীর উপাসক ছিলেন। তিনি বলিতেন, "চির দারিদ্র্যকে যিনি বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন, তিনি যেন চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী না হন।" ইহা যে তাঁহার মুখের কথা ছিল, তাহা নহে। তিনি নিজেও এইজন্য অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা অপেক্ষা শাস্ত্রানুশীলনের চর্চ্চাতেই অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন।

তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে চকর-সংহিতার জল্পকল্পতরু টীকাই সর্ব্বপ্রধান। অতি অল্পসংখ্যক গ্রন্থই তাঁহার মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত অন্য পুস্তকাবলি যদি মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহার যথার্থ স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা যেমন করা হইবে সেইরূপ বহু অমূল্য গ্রন্থের দ্বারা দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে। কবিভূষণ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি-এ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের রচিত সকল গ্রন্থ বৈদ্যরত্ন কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম-এ মহাশয়ের নিকট আছে। গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের পুস্তকগুলি এক এক করিয়া মুদ্রণের জন্য দেশবাসী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন

তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির প্রকাশের জন্য তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া নিজের বাটীতে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ মুদ্রাযন্ত্র হইতে তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মুদ্রাযন্ত্র হইতেই তাঁহার জল্পকল্পতরু টীকা প্রকাশিত হয়। আয়ুর্ব্বেদে ইহা অমূল্য রত্ন। তাঁহার এই মুদ্রাযন্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বিশ্বম্ভর দাস।

গঙ্গাধর পরম শৈব ছিলেন। প্রত্যহ শিবমন্ত্র জপ না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। হিন্দুর করণীয় সমস্ত কর্ম্মই তিনি যথানিয়মে সম্পন্ন করিতেন।

অতিরিক্ত মস্তিষ্ক পরিচালনের জন্য সময় সময় গঙ্গাধরের বায়ু বৃদ্ধি হইত। এইজন্য মধ্যম নারায়ণতৈল মর্দ্দন এবং বায়ুনাশক ঘৃতাদি তিনি প্রত্যহ সেবন করিতেন। তিনি

৮৬ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনার ফলে তাঁহার মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ হয় এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহারই ইচ্ছায় সৈদাবাদের ৺ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ আটচালায় তাঁহাকে রাখা হয়। তিনি যে কয় দিবস জীবিত ছিলেন, সে কয় দিবস রাজা মহারাজাগণকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেও যত লোকের সমাগম না হয়, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তদপেক্ষা অনেক বেশী লোকের সমাগম হইত। এক কথায় আটচালা ঘরটী দিবারাত্র বহু লোকে পূর্ণ হইয়া থাকিত।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন তিনি বলিলেন, "আগামী কল্য আমি কেবল মাত্র গঙ্গাজল পান করিয়া থাকিব, কারণ ৩৩দণ্ড পরেই আমার মৃত্যু হইবে।" ফল হইলও তাহাই, ক্রমে ক্রমে তাঁহার বাক্য-স্ফুরণ-ক্ষমতা লোপ পাইল। প্রাণ-প্রয়াণের অত্যল্পকাল পূর্ব্বে "আমার চরক" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না। ১২৯২ সালের ১৯জ্যৈষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ গগনের সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, আর্য্য চিকিৎসার শেষ ঋষি প্রাতঃস্মরণীয় গঙ্গাধরকে ইহসংসার হইতে চির-দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে হইল।

পরম শৈব গঙ্গাধর তাঁহার পৌত্রের নাম রাখিয়াছিলেন 'ত্র্যম্বক।' কয়েক বৎসর হইল তাঁহার শেষ বংশধর পৌত্র ত্র্যম্বকও ক্ষয়-রোগে লাহোরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার বিধবা পত্নী ও দুইটী কন্যা মাত্র বর্ত্তমান।

বড়ই দুঃখের বিষয়, গঙ্গাধরের মত সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসকের পূজা বাঙ্গালা দেশ করে নাই। গঙ্গাধর যদি বাঙ্গলায় না জন্মিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সেই প্রদেশের অধিবাসিগণ তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থে সেই প্রদেশের রাজধানী-বক্ষে তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিদিন তাঁহার উদ্দেশে ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান না করিয়া কখনই থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু আমরা এমনই অধম যে, এই মহাত্মার জন্ম-দিবস বা তিরোভাব দিবসের দিনটীকে পর্য্যন্ত স্মরণীয় করিয়া তাঁহার ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করি না।

সমালোচনা

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড, ৩য় খণ্ড ৮নং বিশ্বকোষ লেন হইতে প্রকাশিত, মূল্য ২॥• টাকা, কাপড়ে বাধাই ৩৲ টাকা।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে বিশাল বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস লিখিতেছেন তাহার নবম খণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহা কায়স্থ-কাণ্ডের পঞ্চম খণ্ড বা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের ইতিহাসের ৩য় খণ্ড। এই খণ্ডে ঘোষ, মিত্র, দত্ত, দাস, শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজ সিংহ বংশের বিস্তৃত ইতিহাস ও বংশলতা প্রকাশিত হইয়াছে। সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যে অসাধারণ কৃতিত্ব ও প্রতিষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাহা অতি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। মুসলমান শাসনে বহু শতবর্ষ নিপীড়িত ও নিগৃহীত থাকিয়াও বাঙ্গালী কিরূপে জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই মহাদুর্দ্দিনেও কিরূপে বাঙ্গালী স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিল, শাসন-বিভাগে ও স্বরাজ-বিভাগে কিরূপ অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এই আলোচ্য ইতিহাসে তাহা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে মিত্র বংশ প্রসঙ্গে বট মিত্র কিরূপে গৌড়াধীপ বল্লাল সেনের সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে মগধের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, মহম্মদী-ই-বক্তিয়ার ১১৯৯ খৃঃ অব্দে মগধ আক্রমণ করিলে বট মিত্রের পুত্র টিকাইত (Prince elect) মগধদের কিরূপে মগধ ত্যাগ করাইয়া উত্তর রাঢ়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

তাঁহার বংশধরগণ উত্তর রাঢ়ে আসিয়া ক্রমশঃ ১৪

খানি গ্রামে ছড়াইয়া পড়েন। বট মিত্রের বংশে বহু স্বনামধন্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বট মিত্রের অপর ভ্রাতা নরসিংহের বংশে সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গাধিকারীগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সমাজে খাজুরডিহির মিত্র বংশ বলিয়া পরিচিত। ডাহাপাড়ায় বাস করেন বলিয়া ডাহাপাড়ার বঙ্গাধিকারী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। নরসিংহের অধস্তনঃ ষষ্ঠ পুরুষে ভগবান রায় ও বঙ্গবিনোদ রায় নামে দুই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবিনোদ রায় হইতে অষ্টম পুরুষ রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় পর্য্যন্ত এই বংশ পুরুষানুক্রমে বঙ্গাধিকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গাধিকারী পদ অধুনা Divisional Commissioner পদ অপেক্ষা উচ্চ ছিল। রাজস্ব-বিভাগে ইহাদের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা থাকায় বাঙ্গলার জমিদার মাত্রই ইহাদের অনুগত ছিলেন। বঙ্গাধিকারীর অনুমতি ভিন্ন কোনও জমি-জমার বন্দোবস্ত হইতে পারিত না। বাদসাহ শাহ-জাহানের সময় হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাক্কাল পর্য্যন্ত বঙ্গাধিকারিগণই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন।

উপরোক্ত নরসিংহের বংশেই ময়নাডালের মিত্র ঠাকুরগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ময়নাডালের মিত্র ঠাকুরগণের বিশেষত্ব হরিনাম সংকীর্ত্তন। কেবল কীর্ত্তন বলিয়া নহে, কত শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত এই বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, কত সাধু ভক্তের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার পরিচয় ও বংশলতা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে কাশ্যপ-গোত্র দত্ত বংশের যে পরিচয় বিবৃত হইয়াছে তাহাই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব ও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। যিনি মুসলমান দিগের কবল হইতে হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সামান্য জমিদার হইতে ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিয়া সমগ্র গৌড়বঙ্গে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, ছত্রপতি শিবাজী অথবা রাজা প্রতাপাদিত্য বহু চেষ্টায় যাহা করিতে পারেন নাই, দত্ত বংশজাত রাজা গণেশ সেই অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। রাজা গণেশের অভ্যুদয়ের বিস্তৃত ইতিহাস ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের আদ্যোপান্ত বংশলতা ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা বঙ্গবাসী প্রত্যেকরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

রাজা গণেশের জ্ঞাতি বংশেই কেশ দত্ত বা কৃষ্ণ দত্ত এবং বিশু বা বিষ্ণু দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা দত্ত উত্তরে নেপালের তরাই হইতে দক্ষিণে রাজসাহী পাদ-বিধৌত পদ্মা এবং পূর্ব্বে করতোয়া এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের রাজস্ব বিভাগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অসাধারণ প্রভুত্ব বিস্তারের সহিত ধনকুবের বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই বংশে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য ঠাকুর নরোত্তমের পিতা রাজা কৃষ্ণানন্দ ও তাঁহার ভ্রাতা 'গৌড়াধিরাজ মহামাত্য' পুরুষোত্তম দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা এবং রাজা বিষ্ণু দত্তের বংশধর দিনাজপুর রাজ-বংশের প্রামাণিক ইতিহাস এই গ্রন্থে উজ্জ্বল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কেবল রাজা বিষ্ণু দত্ত ও তাঁহার বংশধরগণ বলিয়া নহে, রাজা বিষ্ণু দত্তের ভ্রাতা কেশবদত্তের বংশধর পাটুলি, বাঁশবেড়িয়া ও সেওড়াফুলির রাজ-বংশ কিরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহাও এই গ্রন্থে বিবৃত আছে। এমন কি, পদ্মার দক্ষিণ তট হইতে বঙ্গোপসাগরের তট পর্য্যন্ত এই বংশের করায়ত্ত ছিল। অপর দিকে রাজা বিষ্ণুদত্তের জ্ঞাতি থাকদত্ত পাঠান-শাসন কাল হইতেই তাঁহাদের সাত পুরুষ পর্য্যন্ত সমগ্র ভাগলপুর জেলা ও পূর্ণিয়া জেলার অধিকাংশ কানমগুই রূপে শাসন-বিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহারও পরিচয় বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের মুখবন্ধে যথার্থ লিখিয়াছেন— দত্ত বংশের ইতিহাস হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে গৌড়-বঙ্গের অধিকাংশ স্থানই এক সময় দত্ত বংশের শাসনাধীন ছিল। রাজা গণেশের ত কথাই নাই। তিনি সমস্ত গৌড় বঙ্গের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশ মুসলমান ও পরে তাঁহাদের রাজ্য লোপ হইলেও মোগল রাজত্ব কালে রাজা বিষ্ণুদত্ত ও তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ হিমালয়ের তরাই হইতে গঙ্গা ও পদ্মার উত্তর কুল পর্য্যন্ত, এবং বিষ্ণুদত্তের ভ্রাতা দেশ দত্তের বংশধরগণ উত্তরে গঙ্গা ও পদ্মা হইতে দক্ষিণে সমুদ্রকুল পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে বেহার সীমা হইতে সমগ্র ভাগলপুর জেলা থাক দত্ত ও তাঁহার বংশধরগণ কানুনগোরূপে শাসনদণ্ড পরি-চালিত করিতেন। রাঢ়াগত দত্তবংশীয় ১ম দেবদত্ত হইতে রাজা গণেশের পুত্র পর্য্যন্ত এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের জ্ঞাতি শ্রেষ্ঠ দত্ত বংশের বর্ত্তমান জীবিত ব্যক্তি পর্য্যন্ত

ধারাবাহিক বংশলতা দেওয়া হইয়াছে তাহা সকলেরই দেখা উচিত।

দত্ত বংশের ন্যায় উত্তররাঢ়ীয় সমাজের কাশ্যপ গোত্র দাস বংশ ও শাণ্ডিল্য গোত্র ঘোষ বংশ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত দাস বংশেই সুপ্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম রায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সীতারাম ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ এবং অধস্তনগণের বিস্তৃত বংশ পরিচয় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

সীতারামের জীবন-কাহিনী পাঠ করিলে, তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, স্বদেশানুরাগ; কীর্ত্তি-কলাপ এবং সমাজ-শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস, মুসলমান শাসনে নিগৃহীত হিন্দু সমাজের পক্ষে বাস্তবিক গৌরবোদ্দীপক এবং জাতীয়-জীবন গঠনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হইতে হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে যে ভাবেই চিত্রিত করুণ তিনি যে বাহুবলে স্বাধীন রাজ্য গঠন করিবার জন্যই অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবন-কাহিনী হইতে তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সীতারামের উত্থান ও পতনের ইতিহাস পাঠ করিলে মনে হইবে মহাপ্রাণ সীতারামের সাধু সঙ্কল্প বুঝিবার ও তদনুসারে কার্য্য করিবার লোকাভাব ছিল; কিন্তু হিন্দু জমিদারগণের তখনও মোহ কাটে নাই। শতাধিক বর্ষ মোগল শাসনে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি বিকৃত হইয়াছিল। উত্থানের আশা স্বাধীনতার জ্যোতিঃ তাঁহাদের হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করিবার সুবিধা পায় নাই; বলিতে কি রাজা সীতারামের সহিতই বঙ্গের হিন্দু জাতির স্বাধীন হইবার শেষ আশা বিলুপ্ত হইয়াছিল।

এই বিস্তৃত সামাজিক ইতিহাসের সম্যক্ পরিচয় সাময়িক সংবাদ পত্রে প্রকাশ করা অসম্ভব। আশা করি বাঙ্গালী মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আপনাদের অতীত গৌরব পাঠে হৃদয়ে শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিবেন।

বিদ্যুৎ লেখা (উপন্যাস)—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স (কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

বঙ্গদেশের সাহিত্য পড়িলে মনে হইবে সেখানে সারা বৎসরই বসন্ত ঋতু চলিতেছে। দখিনা পবন, ফুলের নিঃশ্বাস ও আকাশের নীলিমা—বার মাসের সেই একই কথা। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের আদিরস ও কবি-ওয়ালাদের চিতানে প্রেমের দেবতার নানা উপচারে পূজা হইয়াছে। ইংরেজীর প্রভাবে মদনোৎসবের উৎকট অভিনয় থামে নাই, বরং বাহিরে কতকটা ঢাকা চাপা পড়িয়া প্রেমের এক নূতন ধরণের লুকোচুরি খেলা সুরু হইয়াছে। ফল্গুর ন্যায় এই লীলা ভিতরে ভিতরে প্রাচীন নিবৃত্তিমূলক আদর্শের ভিত ধ্বসিয়া ফেলিতেছে। এদিকে দেশের চারিদিকে আগুন জ্বলিয়াছে, সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, রাজনৈতিক প্রাচীন দেশের সমস্তটা যেন ডুবিয়া যাইতেছে;—শিশুরা কারা-বরণ করিতেছে, ছিন্ন কন্থার ন্যায় লোক যথাসর্ব্বস্ব ফেলিয়া দিয়া, মরিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে; মোল্লা ও পুরোহিত এ উহার টিকী ও দাড়ি ধরিয়া টানা-হেঁচড়া করিতেছে। কারাগার ভর্ত্তি, দেশে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প ও দস্যুবৃত্তি। এই চতুঃসাগরী যোগের মধ্যে বসিয়া কবি ও লেখকেরা "ফাগুনে আগুন" "গোলাপী গণ্ড," এবং "কিশোরীর চুলের মৃদুলগন্ধের মধ্যে" নিজকে বিলাইয়া দিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া হল্লা করিতেছেন। দেশের অবস্থা দেখিবার চক্ষু কি তাঁরা হারাইয়াছেন? রোম যখন পুড়িয়া যায়, নীরো তখন বীণা বাজাইয়াছিলেন। এই প্রেমচর্চ্চা এখন আমাদের কাছে তেমনই বিসদৃশ মনে হয়। কতক দিনের জন্য এই প্রেমবীরদের লেখনীগুঞ্জন থামিলে মন্দ হয় না।

কিন্তু গ্রন্থকার যদি দেশকে প্রকৃত ভাল বাসেন, তবে দেশের মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা তিনি ভুলিবেন কিরূপে? প্রফুল্লবাবু সম্প্রতি যে কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটী সামাজিক সমস্যা লইয়া। "বিদ্যুৎ লেখায়" সমাজের কতকগুলি দিক লেখক চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কার ও পাপ এখন সমাজকে সপ্তরথীর মত আক্রমণ করিয়াছে—ইহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে কে? এই পাপে জাতি-ভেদ-সমস্যা তীব্র হইয়া পড়িয়াছে, ব্রাহ্মণত্বের দর্পবিভীষিকায় দাঁড়াইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পূর্ব্বে ভক্তি, ধর্ম্ম, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় যাহা করিয়াছে, এখন কাঁধে হাত দিয়া জোর করিয়া তাহা-

দিগকে উহা করাইবে কে? 'ব্রাহ্মণ' এই নামটী শুনিলেই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেতর জাতির হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। এখন তাহারা উত্তর দিতে শিখিয়াছে। এখন ব্রাহ্মণের সে তপস্যা নাই, ত্যাগ, সংযম ও আদর্শ চলিয়া গিয়াছে; এখন তাঁহারা পৈতা দেখাইয়া অত্যাচার করিলে বরদাস্ত করিবে কে?

পল্লীজীবন, যাহা পূর্ব্বে শান্ত-সমাহিত ছিল, তাহা এখন অস্থির ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীর স্বাস্থ্য-সমস্যা হইতেও এখন পল্লীর সমাজ-সমস্যা গুরুতর। প্রফুল্লবাবু তাঁহার নূতন উপন্যাস "বিদ্যুৎ লেখায়" এই সকল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। এই সামাজিক উপদ্রবের ফল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পড়িয়াছে নারীর কোমল স্কন্ধের উপর। মাতৃজাতির সহিষ্ণুতা যত অসীম, তাঁহাদের উপর অত্যাচার তত ভীষণ; তাঁহারা সমস্ত তাণ্ডব নীরবে সহ্য করিতেছেন। এই অত্যাচার ও নীরব-সহিষ্ণুতা কিরূপ, 'মালতী'-চরিত্রে প্রফুল্লবাবু তাহা দেখাইয়াছেন। যে অত্যাচারের সামান্য ভাগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার পিতা বিপিন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, এই মালতী কিন্তু সে সব চুপ করিয়া সহ্য করিল,—পুরুষ হইলে তাহা পারিত না। চণ্ডীদাসের কথায়—তাহার অবস্থা বলা যাইতে পারে—"এতেক সহিল অবলা ব'লে, ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে।" তাহারও দেহে যৌবনাগম হইয়াছিল এবং প্রেমের আকর্ষণে স্বভাবগুণে সেও ধরা দিয়াছিল; কিন্তু ফুলশরের আঘাত ছিল তাহার পক্ষে নীরবে সহিবার। যে প্রেম চিত্তকে তীর্থে পরিণত করিয়া শত সুষমায় পরিশোভিত করে, তাহা তাহার নিকট হইয়াছিল যেন মস্ত বড় অপরাধ। সেই নিষ্পাপ হৃদয়ের স্বভাবজ অনাবিল ভাব তাহার পক্ষে বড় গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। সে কিছু না বলিয়া শুধু কাঁদিয়া একদিন চিত্ত-ভার লঘু করিয়াছিল। এই চিত্রটী লেখক অতি আড়ালে রাখিয়া দেখাইয়াছেন। এখানে তাঁহার সংযম প্রশংসনীয়, তরুণ লেখকদের অনুকরণীয়।

আমাদের সমাজ পাপেতাপে জীর্ণ। এই রুদ্ধ গঙ্গা কোন ভগীরথের শঙ্খ নিনাদে গতিশীল হইবে? এই সমাজের উদ্ধার করিবে কে? যিনি সে ভার লইবেন, তাঁহার চাই ধরিত্রীর মত সহিষ্ণুতা, খৃষ্টের ক্ষমা ও চৈতন্যের প্রেম। এত বড় পাপ জমিয়াছে যে, ইহা দূর করিতে যিনি চেষ্টা করিবেন, তাঁহার কত বড় সাধনা ও পুণ্য লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, "বিজয়ের" চরিত্রে প্রফুল্লবাবু তাহা দেখাইয়াছেন। বিজয়ের মত যুবকেরা হয় তো ভাবী বঙ্গের সমাজের দায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। লেখক যাঁহাদের পূর্ব্বাভাস দিয়াছেন, সেই অনাগত প্রেমিকগণ পরকৃত শত অপরাধের শাস্তি স্বেচ্ছায় মাথায় লইয়া, উদার, বিশাল, ক্ষমাশীল বক্ষ বিস্তার করিয়া হয় তো শীঘ্রই আবির্ভূত হইবেন। তাঁহাদের কর্ম্ম-নিরত, পরসেবাব্রত হস্তের গতি থামাইতে পারে, এরূপ পীড়াদায়ক যন্ত্র এখনও উদ্ভাবিত হয় নাই,—তাহাদের বক্ষপঞ্জর নিষ্পেষিত করিতে পারে, এরূপ লৌহের হাতুড়ি এখনও গঠিত হয় নাই। এই উপন্যাসখানি সেই স্বদেশ-প্রেমিক নির্ভীক বীরগণের আগমনী গাহিয়াছে।

পুস্তকখানির মনোজ্ঞ ভাষা। দেশহিত-সঙ্কল্প ও করুণায় ভরপুর কাহিনী পাঠকের চিত্তকে আর্দ্র ও উন্নত করিবে। আমরা বড়ই দুর্ব্বল ও হীন হইয়া পড়িতেছি; অসূয়া ও ঘৃণার দ্বারা যতই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছি, ততই অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে, হিন্দুত্বের শেষ চিহ্ন জগত হইতে মুছিয়া ফেলিবার সুযোগ দিতেছি, গ্রন্থের এই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়টী পাঠকদের মনে স্বতঃই মুদ্রিত হইবে এবং আমরাও তাঁহাদের দৃষ্টি এই বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

কবিকথা

বিগত সন ১৩২২ সালে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিল চন্দ্র রায় বি, এল মহাশয়ের কবিকথা প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিরাট গ্রন্থে ভারতের কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাসের ও মহাকবি ভবভূতির নাটক সমূহ ও ১৩২৬ সালে কবিকথার ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় তাহাতে মহাকবি ভাসের সমস্ত নাটকগুলি উপন্যাসাকারে অনূদিত হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অধুনা অনুরাগের যথেষ্ট হ্রাস হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ব্যতীত সংস্কৃত কাব্য নাটকাদি অতি অল্প লোকেই পাঠ করিয়া

থাকেন। যাহারা বিদেশীর মুখে স্বদেশের মহাকবিগণের অমরলেখনীর সমালোচনা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হয় তাহাদের মত হতভাগ্য আর কে আছে? ইউরোপের সমস্ত সভ্য-জগত পৃথিবীর যেখানে যে অমূল্য সাহিত্য ও রত্ন আছে তাহার মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া নিজের সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া থাকে। আমাদের বঙ্গ ভাষারও পরিপুষ্টে এইরূপে যথেষ্ট সাধিত হইতে পারে। এক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার অমূল্য নাটক সমূহের এই মনোরম আখ্যায়িকাকারে অনুবাদ আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টি সাধন করিয়াছে।

কবিকথার প্রথমখণ্ডে মহাকবি কালিদাসের

(১) অভিজ্ঞান শকুন্তল,

(২) বিক্রমার্ব্বশীও

(৩) মালবিকাগ্নিমিত্র এবং ভবভূতির

(৪) মহাবীর চরিত,

(৫) উত্তর রাম চরিত ও

(৬) মালতীমাধব এই ছয়খানি শ্রেষ্ঠ নাটকের আখ্যায়িকা আকারে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ-প্রণয়নের সময় গ্রন্থকার বোম্বাইয়ের ও বঙ্গদেশের প্রকাশিত সংস্কৃত নাটক-গুলির আলোচনা করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলা, লোহারাম শিরোরত্নের মালতীমাধব, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকানুবাদ এবং Wilson's Theatre of the Hindus ও আলোচনা করিয়াছেন। ইহা নাটকগুলির হুবহু অনুবাদ নহে, বঙ্গ-ভাষায় সেগুলির আখ্যায়িকাকারে রূপান্তর। ইহাতে কবির কোন কথাই পরিত্যক্ত হয় নাই অথচ Lamb's Tales from Shakespeareএর ন্যায় ধারাবাহিক উপন্যাসাকারে রচিত হইয়াছে। ইহাতে দুইখানি ত্রিবর্ণ ও চারিখানি একবর্ণ হাফটোন ছবি আছে।

যে অমূল্য নাটকাবলী বহু দিন যাবৎ বিস্মৃতির সাগর-তলে নিমজ্জিত ছিল ও ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ও পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রীর প্রচেষ্টায় যাহা লোকচক্ষুর গোচর হইয়াছে সেই মহাকবি ভাসের মনোরম নাটকাবলীর আখ্যায়িকাকারে অনুবাদ কবিকথা ২য় খণ্ডে লিখিত হইয়াছে। এই খণ্ডে (১) প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ (২) স্বপ্নবাসবদত্ত (৩) অবিমারক (৪) চারুদত্ত (৫) প্রতিমা (৬) অভিষেক (৭) বালচরিত (৮) মধ্যম (৯) পঞ্চরাত্র (১০) দূতকাব্য (১১) দূতঘটোৎকচ (১২) কর্ণভার ও (১৩) ঊরুভঙ্গ-ভাসের এই ত্রয়োদশ খানি নাটক আখ্যায়িকাকারে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে একখানি ত্রিবর্ণ ও ৫খানি ১ বর্ণ হাফটোন ছবি আছে। গ্রন্থকার ত্রিবাঙ্কুরের গভর্ণমেণ্টর অনুমোদন-ক্রমে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। সে সময় ভাসের নাটকাবলীর কোন টীকা আবিষ্কৃত বা লিখিত হয় নাই সুতরাং নিখিলবাবু অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া এই দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এই নাটকগুলির কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই এবং আমরা যতদুর দেখিয়াছি অনুবাদে কোথাও একটুকুও ভুল বা ভ্রান্তি নাই। এইরূপ নির্ভুল ও নির্দ্দোষে আখ্যায়িকাকারে অনুবাদ প্রকৃতই অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়। ইতিমধ্যে ইহার ২।১টি আখ্যায়িকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাসবদত্তা নাটকাকারে লিখিয়া ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন এবং গণেশ অপেরা নামক অপেরা কোম্পানি ইহার প্রতিমা নাটক-অবলম্বন কৈকেয়ী নাটকের গীতাভিনয় করিতেছেন। সুতরাং আশা করি যে দেশবাসী নিখিলবাবুর এই প্রচেষ্টার যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিবেন।

গাছপালার গল্প—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য এম এ—মূল্য দেড় টাকা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত 'গাছপালার গল্প' পড়িলাম। এইরূপ পুস্তকের অভাব না হইলেও প্রয়োজন আছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখিবার ভঙ্গী সহজ, সরল ও অভিনব। পুস্তকের অধিকাংশ চিত্র তিনি নিজেই অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া নির্ভুল ও বিজ্ঞানসম্মত হইয়াছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের কোন আদর্শ পরিভাষা নাই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ও নিজেও পরিভাষা সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কতকগুলি পরিভাষার নির্ব্বাচন ভাল হয় নাই। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলাম—'বীজদল', 'পত্রাঙ্কুর', 'পুষ্পবেষ্টন', 'বীজাধার'। 'দাঁতভাঙ্গা ও গালভরা শব্দও দুই একটী পড়লাম, যেমন 'গণ্ডসংযুক্ত রোম' ও পচ্যমান জৈব পদার্থজাত উদ্ভিদ।' শেষের কথাটী যেন চারু গুহ মহাশয়ের অভিধানে

দেখিয়াছিলাম। বাঙ্গলা প্রতি শব্দ থাকা সত্ত্বেও দুই একটি ইংরাজী শব্দ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন; যেমন— 'এসিড' ও 'ওসমোসিস্'। দুই এক জায়গায় লিখিত অংশের পরিভাষার সহিত ছিত্র চিহ্নত পরিভাষার অমিল লক্ষিত হইল।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন এবং পড়িয়া দেখিলাম, তিনি কতিপয় প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার সার্থকতা কি, বুঝিলাম না। কতকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'গাছের ডালা', 'পাতার বটা', 'ফুলের বটা', 'চেপ্টা পাশাল অংশ' ও 'নিয়া আস'।

দুই এক জায়গায় ভাষা আড়ষ্ট হইয়াছে, যেমন—

'দাদার সাথে', 'ঠিক মধ্যখানে', 'নিয়া আসিয়াছ', 'নিয়া পরীক্ষা করিলে', 'সূতা সূতার মত', 'মাটির উপর ভাসিয়া উঠে'

পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই, ও বিশেষ করিয়া মুখপত্রটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে।

বইটি কাহাদের জন্য লেখা? উত্তরে লেখক বলিয়াছেন —"প্রশ্নবহুল মনটি যাদের সদাই কিছু শিখতে চায় তাদের তরে এই যে প্রয়াস—"

কতকগুলি সচিত্র প্রশ্ন মুখপত্রে দেওয়া হইয়াছে। সে গুলি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

"এ দুটী কি তেঁতুল চারায়।
আলোর দিকে গাছ কেন ধায়॥
ডুমুর সে ফল, ফুল কোথা তার।
মূল কোথা এই স্বর্ণলতার॥
কি লাভ গাছে কাঁটা থাকায়
ঘট কেন বা পাতার ডগায়॥'
সূর্য্যমুখীর একটী ফুলেই ফুল থাকে কেন রাশি রাশি।
শিমূল তুলার বলগুলি কেন হাওয়ায় বেড়ায় ভাসি ভাসি॥

বংশানুক্রমিতা—শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়। বাঁকুড়া। মূল্য দুই টাকা। ১৩৩৭।

ফরাসী গ্রন্থকার Th. Ribot প্রণীত d' la Heredite নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। বংশগত গুণাগুণ মানুষের মধ্যে কিরূপে সংক্রামিত ও বিকসিত হয়, তাহাই গ্রন্থখানির আলোচ্য বিষয়। আলোচ্য বিষয়টি বহু দিক্ হইতে বিশদ ভাবে বিশেষ বিশ্লেষণমূলক পন্থায় উপস্থিত করা হইয়াছে। অধ্যায়গুলির উল্লেখ করিলেই বিষয়টীর পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইতর প্রাণীর বুদ্ধির বংশানুক্রমিতা, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের বংশানুক্রম এবং স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, ভাব, কাম, ক্রোধ ইচ্ছাশক্তি, জাতীয় চরিত্র, অসুস্থ মনোবৃত্তি ইত্যাদির বংশানুক্রম; বংশানুক্রমের নিয়ম, সীমা ও ব্যতিক্রম এবং ইহার নৈতিক ফলাফল ও সামাজিক প্রভাব, ইত্যাদি বহু বিভাগে বিষয়টী বিভক্ত। অনুবাদক মহাশয় অত্যন্ত যত্নের সহিত বিষয়টি পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক আলোচনামূলক পুস্তকের অত্যন্ত অভাব। সেই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত করিয়া অনুবাদক বাঙ্গালী পাঠকগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অনুবাদের ভাষায় স্থানে স্থানে দোষ আছে। তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিতে যাওয়ায় এইরূপ ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।
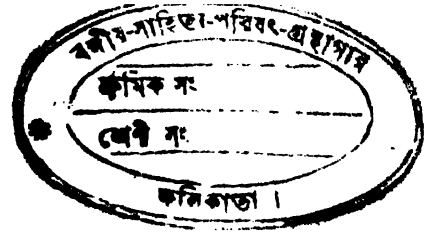
পুষ্পের গন্ধ

[শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু বি-এ]

যে সৌরভের নিমিত্ত পুষ্পের এত আদর এবং যে গন্ধের জন্য প্রসূন কবি-কল্পনায় এত গৌরব লাভ করিয়াছে, সে গন্ধের প্রকৃতি বা স্বরূপ বোধ হয় সাধারণে বিদিত নহেন। বৈশাখ মাসের "পঞ্চপুষ্পে" আমি "পুষ্পের বর্ণ সমস্যা" বিষয়ে কিঞ্চিৎ সমাধান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। বর্ণের সহিত গন্ধের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে বলিয়া এক্ষণে গন্ধের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

ঘ্রাণশক্তি সম্পূর্ণরূপে পুষ্ট না হইলে গন্ধের বিচার করা বধিরের সুর আলোচনার মত কঠিন হইয়া পড়ে। আমরা এক্ষণে নানা প্রকার দৈহিক অবনতির সহিত ঘ্রাণশক্তিও অনেক পরিমাণে হারাইয়া ফেলিয়াছি। পূর্ব্বে আমাদের ঘ্রাণশক্তি বিশেষ প্রখর ছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন অসভ্য অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁহারা এই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বনের মধ্যে হারাণ পথ খুঁজিয়া বাহির করিতেন; ঘ্রাণের সাহায্যে আম মাংসের আস্বাদ বুঝিতেন এবং গন্ধ দ্বারা দ্রব্য চিনিয়া লইতেন। তখন তাঁহাদের ঘ্রাণশক্তি ফক্স্‌টেরিয়ার বা ব্লড্‌হাউণ্ডের মত প্রখর ছিল। এখনও আফ্রিকার অসভ্য জাতিদের মধ্যে ঘ্রাণশক্তি প্রখর আছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহারা অনেক কর্ম্ম সম্পাদন করে বলিয়া ইহার অপকর্ষতা ঘটিতে পারে নাই। যাহা হউক আমাদের এই দুর্ব্বল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পুষ্প-সৌরভের বিষয়ে যতটুকু জানিতে পারা গিয়াছে তাহাই এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

প্রথমে দেখা যাক্ পুষ্পের মধ্যে গন্ধের উদ্দেশ্য কি? পরাগ-সম্মিলনের সহায়তার নিমিত্ত নানারূপ পতঙ্গকে প্রলুব্ধ করিয়া আনাই সৌরভের মুখ্য উদ্দেশ্য। পুষ্পের মধ্যে বর্ণের উদ্দেশ্যও এইরূপ। তবে বর্ণ ও গন্ধের মধ্যে যে তারতম্য আছে তাহা পরে বলিব। কীট-পতঙ্গকে প্রলুব্ধ করিবার নিমিত্ত বর্ণ ও গন্ধ ব্যতীত পুষ্পে পরিমল ও পরাগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই পরিমল ও পরাগ ভোজনের ব্যপদেশে সঞ্চরণ করিবার সময় কীট-পতঙ্গের বর্ণ ও গন্ধের দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হয়।

কীট-পতঙ্গকে আকৃষ্ট করিতে বর্ণ ও গন্ধের মধ্যে কোন্‌টীর প্রভাব অধিক ইহা লইয়া উদ্ভিদতত্ত্ববিদদিগের মধ্যে নানারূপ মতদ্বৈধ আছে। তাঁহারা যাহাই বলুন একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বোধ হয় যে কীট-পতঙ্গকে কুসুমের নিকট আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে গন্ধের শক্তিই অধিক। ডারউইনের "Cross and Self-fertilisation of Plants" নামক পুস্তকে দেখা যায় যে, সুরভি কুসুম-স্তবককে সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলেও তাহার উপর পতঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। এ স্থলে বস্ত্রদ্বারা পুষ্পের বর্ণ ঢাকিয়া ফেলিলেও প্রসূনগুচ্ছে অলির আগমনে কোনও বাধা জন্মায় না; সুতরাং পুষ্প-সন্ধানে বর্ণই যে অলির প্রধান সঙ্কেত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

দূর হইতে মধুমক্ষিকা প্রভৃতি গন্ধদ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া উপস্থিত হয় এবং উদ্যানের সন্নিকটে আসিলেই ফুলের বর্ণ তাহাদের পরাগ ও পরিমলের আগারে লইয়া উপস্থিত করে। পুষ্পের উপর যে লাল বা অন্য বর্ণের ছিট্ ছিট্ দাগ দেখিতে পাওয়া যায় অনেকের মতে—উহাই অলি বা প্রজাপতির গর্ভকেশরের নিম্নে মধু সন্ধানের পথ-সঙ্কেত মাত্র। বাটীর বাগানের চারিধারে সখ করিয়া যে কেনা ফুলের গাছ রোপণ করা হয় সে কেনা ফুলের মধ্যে এই ছিট্ দাগ সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। পাপড়ীর উপর বর্ণের ছিট্ তত গভীর হয় না—কিন্তু ফুলের মধ্যের ছিট্‌গুলি খুব গভীর হইয়া একেবারে ভিতরে নামিয়া যাইতে দেখা যায়। ফুলের যে স্থানে মধু থাকে অনেক ফুলে সে স্থানের বর্ণ খুব গভীর উজ্জ্বল বর্ণের হইয়া থাকে। এই বর্ণই সেখানে অলি প্রভৃতিকে মধু-ভাণ্ডারের পথ-নির্দ্দেশ করিয়া দেয় বলিয়া অনুমান করা যায়।

তবে কীট-পতঙ্গের বর্ণজ্ঞান যে কতটা পরিস্ফুট সে

বিষয়েও অনেক সন্দেহ আছে। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের যেরূপ বর্ণবোধ আছে কীট-পতঙ্গের সেরূপ নাই, কারণ তাহাদের চক্ষুর স্নায়ু ও রেটিনা আমাদের মত নয়; সুতরাং কীট পতঙ্গেরা যে আমাদের মত বর্ণরশ্মি অনুভব করিতে পারিবে—তাহা বোধ হয় না। কিন্তু উহাদের ঘ্রাণ-শক্তি যে অতীব প্রখর তাহা নানারূপ পরীক্ষায় জানা গিয়াছে। এমন কি আমরা যে সব ফুলের গন্ধ অনুভব করিতে পারি না, পতঙ্গেরা সেই সব সৌরভ অনুভব করিয়া পুষ্পের অন্বেষণ করিয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায়—যে ফটকের উপর বর্ণহীন পুষ্প-স্তবক পত্রাবলীর মধ্যে লুক্কায়িত থাকিলেও এবং তাহার কোন গন্ধ আমরা অনুভব করিতে না পারিলেও মধুমক্ষিকারা বহুদূর হইতে সে সৌরভ অনুভব করিয়া পুষ্পের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অদ্ভুত ঘ্রাণ শক্তির দ্বারাই বিশেষ বিশেষ কুসুমকে বিভিন্ন প্রকারের পতঙ্গ কাননে নির্ব্বাচন করিয়া লয়। এ বিষয়ে কদাচ তাহাদের ভ্রম হইতে দেখা যায় না।

ডারউইনের উক্ত পুস্তকে মধুমক্ষিকা প্রভৃতির ঘ্রাণ-শক্তি বিষয়ে আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ Nageli একবার কতকগুলি কাগজের কৃত্রিম ফুলকে পুষ্পবৃক্ষের বিভিন্ন শাখায় স্বাভাবিক ফুলের মত যথা স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার কতকগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট পুষ্পসার বা এসেন্সের দুই এক বিন্দু করিয়া মাখাইয়া দিয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণের পর দেখা গেল যে, কাগজের যে ফুল গুলিতে এসেন্স মাখান হইয়াছিল সেই ফুল গুলিতেই মধুমক্ষিকা আসিয়া উপবেশন করিয়াছে; কিন্তু যে গুলিতে এসেন্স দেওয়া হয় নাই সে গুলিতে কোন পতঙ্গ আসে নাই। ইহাতে গন্ধের আকর্ষণ শক্তির যে, বিশেষত্ব আছে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ডারউইন্ আবার কতকগুলি ফুলের পাপ্ড়ি ছিন্ন করিয়া দিয়া দেখিয়াছিলেন যে পাপড়িহীন পুষ্পেও অলিরা উড়িয়া আসিয়াছিল ফুলে রঙ্গীন পাপড়ী না থাকায় মধুমক্ষিকাদের আগমনে কোন বাধা জন্মায় নাই। ইহাতেও বর্ণ অপেক্ষা গন্ধেরই প্রাধান্য প্রমাণিত হয়।

সাধারণতঃ খুব রঙ্গীন ফুলে গন্ধ থাকে না। জবা, রঙ্গণ, ক্যানা, শিমুল, পলাশ প্রভৃতিই এ বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য। আবার রঙ্গীণ ফুলে গন্ধ থাকিলেও তাহার উগ্রতা থাকে না যেমন করবী, কলিকা প্রভৃতি। শ্বেত বর্ণের কুসুমেই অধিক স্থানে গন্ধ বেশী থাকে। বেল, যুঁই, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান যাইতে পারে। তবে সব সাদা ফুলে গন্ধ থাকে না। ডারউইন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে শতকরা প্রায় ১৪·৬ রকম সাদা ফুলে বেশ গন্ধ থাকে লাল ফুলের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮·২ টী ফুল সৌরভযুক্ত হইয়া থাকে।

পুষ্পবিদেরা পুষ্পের সৌরভ লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহারা পুষ্পের মধ্যে প্রায় পাঁচশত বিভিন্ন প্রকার সৌরভ নির্ণয় করিয়াছেন এবং এই সকল সৌরভকে পাঁচটী পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। এই পঞ্চ-পর্য্যায়ের নাম indoloid, aminoid, paraffinoid, terpenoid এবং benzoloid। ইহাদের মধ্যে প্রথম পর্য্যায়ভুক্ত অর্থাৎ indoloid শ্রেণীর গন্ধ অতি নিকৃষ্ট। এই পর্য্যায়ভুক্ত পুষ্পের গন্ধ পচা মাচ-মাংস, পচা মদ, পচা তামাক প্রভৃতির মত হইয়া থাকে। এই সকল ফুলের বর্ণও নিষ্প্রভ ও বিবর্ণ হয়। পল্লীগ্রামের বন-বাদাড়ের ঘ্যাঁটকোল ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সর্ব্বাপেক্ষা benzoloid শ্রেণীর গন্ধই অতি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। বেল, যুই, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, গোলাপ প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। অধিক সংখ্যক ফুলে paraffinoid অর্থাৎ নেবুর মত গন্ধই অনুভূত হইয়া থাকে।

অনেক সময়ে আবার ফুলের গন্ধে মিশ্র সৌরভ অনুভব করা যায়। আমাদের সুপরিচিত গোলাপ ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। paraffinoid অর্থাৎ নেবুর গন্ধযুক্ত ফুলে benzoloid শ্রেণীর গন্ধ মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। এই মিশ্র-গন্ধের মধ্যে মধুর মিষ্ট গন্ধও বিমিশ্রিত থাকে। নানাজাতীয় গোলাপের মধ্যেই মিশ্র-গন্ধের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ গোলাপ ও কাট-গোলাপের গন্ধের মধ্যে তুলনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। রক্ত-গোলাপ, (গোলাপী) গোলাপ, সাদা গোলাপ ও হল্দে গোলাপের গন্ধের মধ্যে অনেক প্রকার মিশ্রণ আছে। এই মিশ্র-গন্ধের বিচার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষতার উপরেই নির্ভর করে। সময় বিশেষে একই পুষ্পের মধ্যে গন্ধের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। একই পুষ্পে প্রভাত, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও

অপরাহ্ণের গন্ধে অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। আবার সন্ধ্যা, নিশীথ ও রজনীর শেষ যামে পুষ্পের-সৌরভের মধ্যে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। সৌরভ বিকীরণের মধ্যেও আবার এক রহস্য নিহিত আছে। কীট-পতঙ্গের আগমন কাল ও সাক্ষাৎ সময়ের সহিত পুষ্পের সৌরভ বিকীরণের নিকট সম্বন্ধ লক্ষিত হইয়া থাকে। যে সময় কীট-পতঙ্গেরা তাহাদের আশ্রয়স্থান করে, সেই সময়েই কুসুমের পাপড়ীর মধ্যে সুরভি ভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করিয়া থাকে। অথবা পুষ্পের সৌরভ-বিকাশের সময়ানুযায়ীই কীট পতঙ্গেরা তাহাদের আশ্রয়স্থান পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পের, অন্বেষণে উড়িতে আরম্ভ করে। এ বিষয়ে Kerner and Oliver এর "Natural history of Plants" নামক গ্রন্থে একটী দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। একজন বৈজ্ঞানিক একটী পতঙ্গকে পরীক্ষার নিমিত্ত সিন্দুর মাখাইয়া এক স্থলে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সারা দিবস পতঙ্গটী স্থির ভাবে অবস্থান করিয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যা হইবামাত্রই পতঙ্গটী বার কতক শুঁড় নাড়িয়া ছয় শত হস্ত দূরস্থিত এক হনিসকল্ এর ঝোপে সোজাসুজি উড়িয়া গিয়া বসিয়াছিল।

সাধারণতঃ সন্ধ্যার সময়েই অধিক সংখ্যক পুষ্পের সৌরভ বাহির হইয়া থাকে। বাগানে বেল ও যুঁই ফুলের গাছ থাকিলে সন্ধ্যা হইতেই বাগান গন্ধে ভরিয়া যায়। জাপানী হাস্না-হেনার গন্ধ রাত্রে অত্যন্ত তীব্র হইয়া থাকে। কিন্তু দিনের বেলায় আদৌ গন্ধ থাকে না। দিবসে যুঁই, বেলের গন্ধও একেবারে না থাকার মত হইয়া থাকে। এমন কি ঝিঙ্গে ও শশা ফুলের মধ্যেও আমি এ রীতি লক্ষ্য করিয়াছি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঝিঙ্গের ফুলে লেবুর গন্ধের মত একটী উগ্র ও মিষ্ট গন্ধ বাহির হইয়া থাকে এবং তাহাদের গন্ধকের মত পীতবর্ণের মধ্যেও ফস্‌ফরাসের মত একটা বেশ উজ্জ্বলতা আসিয়া থাকে। এই উজ্জ্বল পীতবর্ণ ও parffinoid গন্ধে নানাপ্রকার পোকা আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

অনেক পুষ্পের সৌরভ ৬৷৭টা হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যরাত্রি অবধি বেশ প্রখর থাকে। মধ্যরাত্রির পরে আবার গন্ধের উগ্রতা ধীরে ধীরে হ্রাস হইয়া পড়ে। পুষ্পের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই অর্থাৎ পুংকেশর হইতে গর্ভকেশরে পরাগ চালিত হইয়া গেলেই পুষ্পের গন্ধের আর তত প্রয়োজন হয় না। সুতরাং পরাগসম্মিলনের পরেই গন্ধের সহিত বর্ণের প্রভাব কমিয়া আসে। সেই কারণে বাসি ফুলে গন্ধ ও বর্ণের লালিত্য থাকে না। আবার যে সকল কুসুমে মধুমক্ষিকা ও প্রজাপতিরা বিহার করে সে সব ফুল দিবসে বিকসিত হইয়া থাকে এবং সারা দিবস বিশেষতঃ সকালে সৌরভ বিকীরণ করিয়া সূর্য্যাস্তে গন্ধহীন হইয়া পড়ে। বিলাতী সুগন্ধী লতা ক্লোভারের (ornamental clover) স্তবক হইতে দিবসে সুমিষ্ট গন্ধ বাহির হইয়া থাকে কিন্তু সন্ধ্যার সময় মধুমক্ষিকার চক্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে উহারা একেবারে গন্ধহীন হইয়া পড়ে। এ স্থলে মধুমক্ষিকার আগমন ও প্রস্থান কালের সহিত ক্লোভারের সৌরভ বিকীরণের কালের নিকট সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

পুষ্পের সৌরভ আবার অনেক সময়ে নিকট অপেক্ষা দূরে তীব্র হইয়া থাকে। লেবু ও দ্রাক্ষা ফুলের মধ্যে এই বৈশিষ্ট ও লক্ষিত হইয়া থাকে। ফুলের সময় বাতাপীলেবু গাছের তলায় বসিলে তত গন্ধ পাওয়া যায় না কিন্তু বিশ ত্রিশ হাত দূরে বেশ গন্ধ পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন যে বায়ু-চালিত হইয়া যাইবার কালে বায়ুস্থিত জলকণিকা ও অম্লজান প্রভৃতির দ্বারা গন্ধকণিকার মধ্যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে এবং সেই অব্যক্ত ও জটিল রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের উপরেই গন্ধের উগ্রতা নির্ভর করে।

———

আলাপ-আলোচনা

অক্সোফোর্ডে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট বক্তৃতা দেওয়া শেষ হইয়াছে। হার্ভার্ড-য়ুনিভার্শিটিতে ঐ বক্তৃতা দিবার পর শরৎকালে তাঁর পুস্তক মুদ্রিত হইবে। তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর কবিত্বময়ী ইংরেজী রচনা, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর বক্তৃতার ভঙ্গীমা তাঁর আকৃতি—সমস্ত দেখিয়া অক্সফোর্ড মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। স্যর মাইকেল স্যাড়লার বলিয়াছেন, 'আমরা ইহা কখনও ভুলিব না।' আমাদের কাছে কবীন্দ্রের এই সম্বর্দ্ধনা ও অভ্যর্থনা প্রভৃতি নূতন নয়, পাশ্চাত্যের লোক তাহা ভাল করিয়া উপলব্ধি করুক।

* * *

কবীন্দ্র নূতন কলা-বিদ্যায় রত হইয়াছেন। লেখনীর পরিবর্ত্তে এখন তুলির দিকে ঝোঁক দিয়াছেন। চিত্র বিদ্যাতেও তিনি কিরূপ প্রতিভা দেখাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ এ-কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, প্যারিসের দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিত্র-সমালোচকেরা তাঁর ছবির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। প্যারিসে ও ইংলণ্ডের বহুস্থানে তাঁর অঙ্কিত চিত্র সমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে।

* * *

বর্ত্তমানে দেশের অবস্থা-সম্পর্কে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিতে চান যে, কোন দিন কেহ যন্ত্র বা দেহের শক্তিতে কাহাকেও জয় করিতে পারিবে না। হৃদয়ের প্রেম দিয়া যতদিন না হৃদয়কে আকর্ষণ করা হইবে, ততদিন কিছুই হইবে না। অন্তরের ক্ষতে প্রলেপ দিতে হইলে সহানুভূতির সহিত ঔষধের ব্যবস্থা করা চাই।

* * *

দেশী জিনিস যতদুর সম্ভব সকলের ব্যবহার করা উচিত এ বিষয়ে তর্কের স্থান নাই। এই সৎ-কার্য্যে ছলনা চলিবে না। এমন অনেক লোককে আমরা জানি, যাহারা বিলাতী পণ্যের ব্যবসা করেন, কিন্তু যাহারা খদ্দর পরেন না তাহাদিগকে দেখিলে তাহারা মারিতে আসেন। ইহাকে প্রবঞ্চনা বা ছলনা ছাড়া আর কি বলিব? খদ্দর-পরা কেবল ফ্যাসান হইলে যারপর নাই দুঃখের কথা, খদ্দর পরিবার আগে মন ও প্রবৃত্তিকে খদ্দর-পরিধান করিবার যোগ্য করিতে পারা চাই।

* * *

১৯২৭-২৮ সালে ভারতবর্ষে কত মূল্যের বিলাতী দ্রব্য আসিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল:—

	কোটী	লক্ষ
কাপড় ও সুতা	৭১	৯০ টাকা
সিগারেট ও চুরুট	২	৯০ "
ঔষধ	১	৯৮ "
ডাক্তারি ও রাসায়নিক যন্ত্রাদি	৪	৪৬ "
কল-কব্জা	১৫	৯৩ "
ইঞ্জিন মোটর, কল	৬	১৭ "
মোটর গাড়ী	৩	৫৩ "

* * *

অষ্টম সংখ্যায় 'বিজলী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্তের 'অমাবস্যা' সমালোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত লীলাময় রায় লিখিয়াছেন—'চণ্ডীদাসের পর থেকে আমাদের সাহিত্যে প্রেমের কবিতা ছিল না।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরে প্রেমের কবিতা যাহা লিখিয়াছেন লেখকের মতে তাহা 'অবান্তর প্রেমের কবিতা।' সুতরাং লেখকের সিদ্ধান্ত 'অচিন্ত্যকুমার চণ্ডীদাসের নিকটতম উত্তরাধিকারী।' তিনি দয়া করিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, 'রবীন্দ্রনাথের পরে খুচরো প্রেমের কবিতা দু' চারিটি লেখা হয়েছে—বেশীর ভাগ পত্নী-বিরহ।'

* * *

লেখকের কোন্ বিষয়ে কৃতিত্বের প্রশংসা করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাঁর অদ্ভুত জ্ঞানকে, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রেমের কবিতার সংবাদ রাখিবার বাহাদুরীকে, না চণ্ডীদাসের ওয়ারিশ

আবিষ্কারকে। এই রকম লেখা কি করিয়া 'বিজলীর' মত পত্রিকায় ছাপা হয়, যেখানে সম্পাদক হচ্ছেন সুকবি শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। বেচারা অচিন্ত্যবাবুকে এমন লজ্জায় ফেলিবার কারণ কি? অচিন্ত্যবাবু নিশ্চয় এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া লীলাময়ের কাণ্ড দেখিয়া বলিয়াছেন, "এরূপ বন্ধুর হাত থেকে ভগবান আমায় রক্ষা কর।"

* * *

লাহোরে তাবৎ এসিয়ার মহিলাদের যে সম্মেলন হইবার কথা হইয়াছে তাহার দিন স্থির হইবার সংবাদ আমরা এখনও পাই নাই। সম্মেলনের কার্য্য নিশ্চয়ই ইংরেজী ভাষায় পরিচালিত হইবে, কারণ, আরব, চীন জাপান প্রভৃতি দেশের মহিলারাও সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন। তাহা হইলে খুব শিক্ষিত নারীদের ছাড়া আর কোন মহিলাদের ঐ সম্মেলনে যোগ দেওয়া সম্ভব হইবে কি প্রকারে?

* * *

বরিশালের 'কাশীপুর নিবাসী' বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিল। রায় সাহেব প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নব্বই বৎসর বয়সে 'কাশীপুর নিবাসী'র পঞ্চাশ বৎসরের উৎসব করিলেন। সাংবাদিকের এমন সম্ভ্রমজনক উদাহরণ আর কৈ? প্রথমে এই 'কাশীপুর নিবাসী' হস্ত-লিখিত হইয়া প্রচারিত হইত। একবার রায় সাহেব ইহার পরিবর্ত্তে 'স্বদেশী' নামক কাগজ বাহির করিয়াছিলেন। এই ব্যতিক্রমটুকু ব্যতীত আজ পঞ্চাশৎ বৎসর কাল 'কাশীপুর নিবাসী' পাঠকের মনোরঞ্জন করিয়াছে।

* * *

অন্য দিকেও রায় সাহেব প্রতাপচন্দ্র বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিতেন; আজ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পেন্সন পাইতেছেন। তাঁহার দানশীলতার ও মহানুভবতার অনেক পরিচয় আছে। আমরা প্রার্থনা করি, বাঙ্গালার সাংবাদিকেরা রায় সাহেব প্রতাপচন্দ্রের ন্যায় দীর্ঘজীবী হন এবং বাঙ্গালার সংবাদপত্রগুলি যেন কাশীপুর-নিবাসীর মত আয়ুলাভ করে।

* * *

এই বৎসর লইয়া তিন বৎসর অক্সফোর্ডের নিউগেট কাব্য-পুরস্কার মহিলারাই লাভ করিলেন! এ বৎসর যিনি ঐ পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহার নাম কুমারী জোসেফাইন গিল্‌ডিং, বিষয়ের নাম ছিল—'ডিডেলাস্।

* * *

জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসীতে' শ্রীমতী স্নেহসুধা গুপ্ত 'মায়ের প্রতি'—শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটা সমীচীন কথা লিখিয়াছেন। আমরা সকলকে ঐ প্রবন্ধটী পড়িতে বলি। তিনি বলিয়াছেন,—'প্রত্যেক মা যদি মেয়েদের কতকগুলি বিষয়ে উপযুক্ত সময়ে সাবধান ক'রে দেন, আর মেয়েদের রক্ষার বিষয়ে নিজেরাও যথেষ্ট সাবধান হ'ন, তা হ'লে মেয়েদের প্রতি অত্যাচার অনেকটা কমতে পারে। আমার যতদুর মনে হয়, মায়েদের অনভিজ্ঞতা ও অসাবধানতায় অনেক স্থলে মেয়েরা নিগৃহীত হচ্ছে।'

* * *

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "যে-সব মেয়েরা বড় হ'য়ে উঠছে তারাই বেশী নিগৃহীত হচ্ছে। তাদের সম্বন্ধে মেয়েদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সাবধান হওয়া দরকারঃ—

(১) মেয়ে যে বড় হ'য়ে উঠছে সে-বিষয়ে তাকে সচেতন ক'রে দিতে হবে।

(২) মেয়েদের গতিবিধি সম্বন্ধে অতিশয় সতর্ক থাকৃতে হবে।

(৩) পুরুষের বিশেষতঃ আত্মীয় পুরুষের সঙ্গে কি ভাবে মিশতে হবে তা মেয়েকে ব'লে দিতে হবে, আর তাদের মেশামেশির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৪) পোষাক-পরিচ্ছদের শালীনতার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

* * *

'ম্যানচেষ্টার গার্জেন' ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ডাক্তার আনী বেসান্তের অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, ভারতবর্ষকে উপনিবেশ করিয়া দিবার ব্যবস্থা এখনই করা চাই, না করিলে যে গোলযোগের সৃষ্টি হইবে তাহার আর শেষ হইবে

না। 'রাউণ্ড টেবিল'-সম্মিলনে সর্ত্তগুলি নির্দ্ধারিত হওয়া চাই; ভারতবর্ষ ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে যে, এখন উহা না পাইলে ভাল হইবে না। তাঁহার মতে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের ভিতর থাকিতে ইচ্ছুক, যদি ঔপনেবেশিকের মত এখনই অধিকার পায়। প্রশ্ন-কর্ত্তাও তাহাকে 'এখনই' শব্দ তিনি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছেন জানিতে চাহিলে উত্তরে তিনি বলেন, সর্ত্ত গুলির খসড়া এখনই করিতে হইবে এবং দিবার মতলবলটা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিতে হইবে।

* * *

শ্রদ্ধেয়া ডাঃ আনি বেসান্ত ভারতের ও ইংলণ্ডের মঙ্গলকামী। বহুকাল তিনি ভারতবর্ষে বাস করিয়া আসিতেছেন। ভারতের অবস্থা-সম্বন্ধে তাঁহার মত যে খুব বেশী দামী তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? বহু জ্ঞানী, মানী ভারতবাসী শুধু তঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না, তাঁহাকে গুরুর আসন দিয়া থাকেন। তিনিও তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সম্পূর্ণভাবে পরিচিত। গত ৫ই জুন তারিখে Committe of the House of Commonsএ বহু পর্লিয়ামেণ্টের সদস্যদের নিকট তিনি ভারত-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। সেখানেও তিনি ভারতবাসীকে এখনই ঔপনিবেশিক অধিকার দিতে বলেন। তাঁর বিশ্বাস ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড একত্র থাকিলে ও উভয় দেশবাসীর অধিকারের সমতা থাকিলে ভবিষ্যতে সভ্যতা উজ্জ্বলতর হইবে। আর যদি ইংলণ্ড ভারতকে শীঘ্র এই অধিকার না দেয়,তাহা হইলে ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের মধ্যে রাখিতে পারা যাইবে না।

* * *

পার্শীদিগের করচীরা প্রধান পুরোহিত High priest দস্তর ডক্টর দল আমেরিকা, জাপান ও চীনে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক অনুসন্ধান-কার্য্য শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে 'ডক্টর অব লেটার্স' এই সম্মানই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

* * *

পার্শী বিমানচালক মিষ্টার এস্ পি ইঞ্জিনিয়ার সম্প্রতি একটী বিমান-চালনায় হিজ হাইনেস আগা খাঁর ৫০০ পাউণ্ড পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহাকে করাচীতে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসী তাঁহাকে একখানি ছোট রৌপ্য বিমান প্রদান করিয়াছেন। তিনিই ভারতবাসীর ভিতর প্রথম বিলাত হইতে ভারতবর্ষে একাকী বিমানপথে চলিয়া ভারতবাসীর পথ প্রদর্শক হইয়াছেন।

* *

এই প্রতিযোগিতায় দৈব-দুর্ব্বিপাকে যে ভারতবাসী পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নয় বলিয়া বিবেচিত হন তাহার নাম সর্দ্দার মনোমোহন সিং। ইনি বিলাত হইতে ৮ই এপ্রেল তারিখে বিমানে চড়েন এবং ১২ তারিখে সেণ্ট রামবর্দ্দ নামক স্থানে তাহার যন্ত্রটী বিগড়াইয়া যায়। যন্ত্রটীকে মেরামত করিয়া লইতে তিন সপ্তাহ সময় লাগে। ক্রয়ডন হইতে পার্শী বিমান-চালক মিঃ ইঞ্জিনিয়ার তাঁহার বিমানে একসঙ্গে চলিতে থাকেন, ইহাতে পার্শী চালক সিংএর অপেক্ষা চারি দিনের সময় বেশী পান। তারপর আফ্রিকায় দুই জন চালকের প্রতিযোগিতায় চলে এবং সিং প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পার্শী চালকের দুই দিন পূর্ব্বে ভারতে আসিয়া পৌঁছেন।

* *

দুর্ভাগ্যের বিষয় পরীক্ষকেরা সিংকে পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন না, কারণ পুরস্কারের সর্ত্তের মধ্যে একটী সর্ত্ত ছিল যে, এই ভ্রমণ চারি মাসের মধ্যে শেষ করিতে হইবে। সিংএর সময় কয়েক দিন অধিক লাগিয়াছিল। যাহা হউক সুপ্রসিদ্ধ খেলোয়াড় পাতিয়ালাধিপতি সর্দ্দার মনোমোহন সিংকে খিলাৎ ও ১৫০০০৲ পনর হাজার টাকা পুরস্কার দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

মাসপঞ্জী

১লা জ্যৈষ্ঠ—বোম্বাইয়ে শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে ভারতীয় সংবাদপত্র-সম্মিলনের অধিবেশন ও অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে প্রতিবাদ।

২রা জ্যৈষ্ঠ—ময়মনসিংহে পুলিশের সহিত কংগ্রেস স্বেচ্ছা-সেবকদিগের সংঘর্ষ ও বহু স্বেচ্ছাসেবক আহত। কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে অনেক সংবাদপত্র প্রকাশ আরম্ভ। বোম্বাইয়ে কংগ্রেস-বুলেটীন প্রচার বন্ধ।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহিগণ কর্তৃক ধরাসনার লবণ-গোলা অধিকারের প্রচেষ্টা।

৩রা জ্যৈষ্ঠ—বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ধৃত এবং ৯॥০মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। মহাত্মা গন্ধীর সহিত সাক্ষাৎলাভের জন্য মোলানা মহম্মদ আলীর অনুমতি প্রার্থনা।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ—বুলসরে শ্রীযুক্তা নাইডু ও স্বেচ্ছাসেবক-দল ধৃত ও পরে মুক্ত। ধরাসনায় স্বেচ্ছাসেবকদিগের অভিযান।
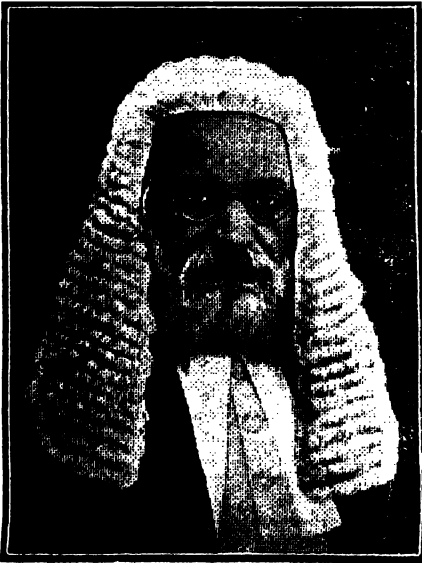
শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেল—ধরাসনাকে সমগ্র ভারতের আন্দোলন-কেন্দ্র করিবার অভিমত প্রকাশ করেন।

৫ই জ্যৈষ্ঠ—ওয়াদালায় পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকগণের সংঘর্ষ এবং ৪৭২ জন গ্রেপ্তার।

৬ই জ্যৈষ্ঠ—মান্দ্রাজে দাঙ্গা—পুলিশ কর্তৃক সভা বন্ধের চেষ্টা, প্রকাশ্যে বোমা নিক্ষেপ। শোলাপুর হাঙ্গামার বিবরণ গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত করেন।
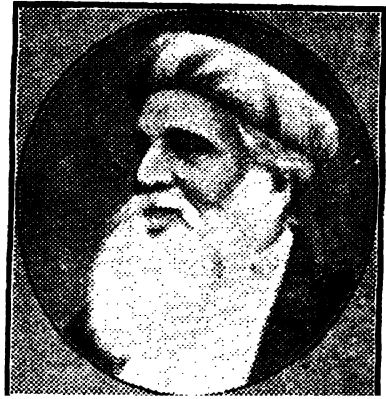
আব্বাস তায়েবজী—মহাত্মার পর নেতৃত্ব গ্রহণপূর্ব্বক ধরাসনা অভিযানে ধৃত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। গ্রেপ্তারকালে বৃদ্ধ তায়েবজী সহাস্য বদনে আত্মসমর্পণ করেন।

৭ই জ্যৈষ্ঠ—ময়মনসিংহ হাঙ্গামায় সিটি স্কুল হইতে ৪০ জন এবং বরিশাল ও তমলুকে মদের দোকানে পিকেটীংএর জন্য অনেকে ধৃত। কলিকাতা রোটারী ক্লাবে মিঃ রেমফ্রী কর্তৃক নূতন হাওড়া সেতু বিষয়ে বক্তৃতা।

৮ই জ্যৈষ্ঠ—ধরাসনায় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু গ্রেপ্তার। বোম্বাইয়ে শ্রীযুক্ত নরীম্যান পুনরায় ধৃত। যারবেদা জেল হইতে মহাত্মা গন্ধী কর্তৃক গোল টেবিলে যোগদানের সর্ত্তাবলি প্রকাশিত।

৯ই জ্যৈষ্ঠ—পুলিশ কর্তৃক উন্টাদি সত্যাগ্রহ-শিবির ভগ্ন। ওয়াদালায় অভিযানে সত্যাগ্রহিগণ ধৃত। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ধরাসনা লবণ-গোলা আক্রমণের বিবরণ প্রকাশ করেন।
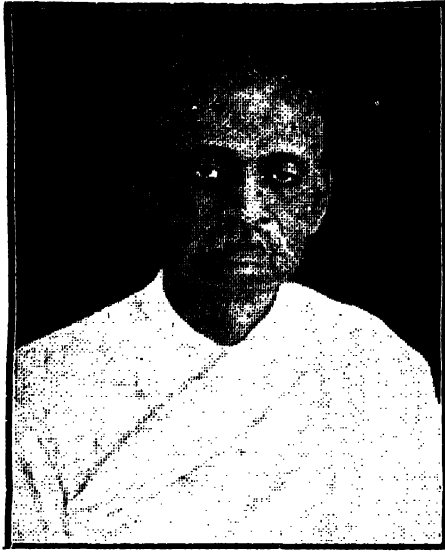
শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল

১৪ই জ্যৈষ্ঠ—বোম্বাইয়ে মুসলমান ও পুলিশের সংঘর্ষ। উন্টাদি সত্যাগ্রহ-শিবির সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত। লক্ষ্ণৌয়ে ভীষণ দাঙ্গা। পুলিশ-চৌকীতে আগুন লাগাইবার চেষ্টা। পুলিশ কর্ত্তৃক গুলি বর্ষণ ও ১৮ জন গ্রেপ্তার।

ঢাকায় হাঙ্গামার ফলে বহু দোকান ভস্মীভূত। বহু হিন্দু-মুসলমান আহত। লাহোরে পণ্ডিত মালব্যজী ধৃত ও পরে মুক্ত। রেঙ্গুনে ভীষণ হাঙ্গামা; প্রায় ১০০০ জন আহত ও ৫২ জন নিহত।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ—উন্টাদি-সত্যাগ্রহ-শিবির স্বেচ্ছা-সেবকদিগের দ্বারা পুনরধিকৃত। ঢাকার হাঙ্গামার ফলে শহরে ভীষণ অশান্তি। বোম্বাইয়ে মহাত্মা গন্ধীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ পার্শী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরাট্ শোভাযাত্রা।

১০ই জ্যৈষ্ঠ—শ্রীযুক্তা নাইডুর ৯ মাস কারাদণ্ডের আদেশ। কাঞ্চনজঙ্ঘা-অভিযানকারীদের বিপদ। ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার ফলে বহু লোক আহত। বোম্বাইয়ে ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার।

১১ই জ্যৈষ্ঠ—কলিকাতা কর্পোরেশন আফিসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতিকৃতি উন্মোচন। ঢাকায় ভীষণ হাঙ্গামা। ব্রাহ্মণবেড়িয়ার স্যর আব্দুর রহিমের প্রতি ১৪৪ ধারার নোটিশ জারী। লক্ষ্ণৌয়ে মিসেস মিত্র গ্রেপ্তার।

১২ই জ্যৈষ্ঠ—ঢাকার দাঙ্গার ফলে পুলিশের গুলিবর্ষণে ৬ জন নিহত। কলিকাতা টাউনহলে স্বরাজী কাউন্সিলারদিগের কার্য্যের প্রতিবাদকল্পে মুসলমানদিগের বিরাট্ সভা।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ—পেশোয়ার দাঙ্গা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের তদন্ত আরম্ভ। লাহোরে প্রেস-অর্ডিন্যান্স বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্যাটেলের বক্তৃতা। ধরাসনায় বহু স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার।

করাচীতে ভারতীয় বণিক-সঙ্ঘের বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের সংকল্প।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু—প্রবীণ আব্বাস তায়েবজীর গ্রেপ্তারের পর শ্রীযুক্তা নাইডু নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন এবং ধরাসনায় আক্রমণ কালে ধৃত হইয়া ৯মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। নেতৃত্ব গ্রহণকালে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি এখন নারী নহি—একজন সৈনাধ্যক্ষ।"
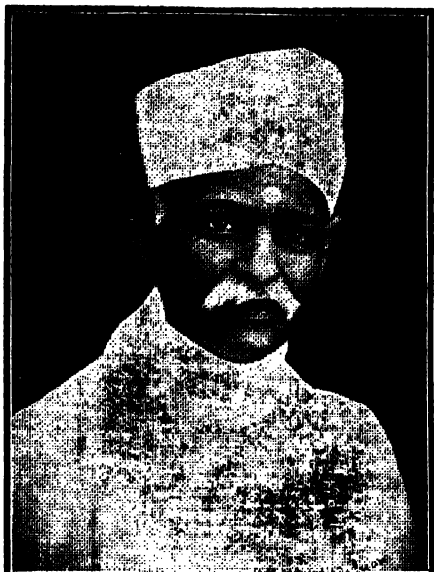
ক্ত মদনমোহন মালব্য—বিলাতী দ্রব্য-বর্জ্জন-আন্দোলনে মালব্যজী বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পুলিশের আইন অমান্ত করিয়া পেশোয়ারে গমনকালে ইনি ধৃত হন, কিন্তু পরে আবার মুক্তি পান।

শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়—বোম্বাইয়ে নারী-আন্দোলন এবং প্রচার-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় শ্রীযুক্তা কমলাদেবী ৯॥ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গন্ধী—বোম্বাইয়ে পিকেটিং এবং নারী-আন্দোলন সুশৃঙ্খলভাবে চালাইয়া আসিতেছেন।

শ্রীযুক্ত কে, এফ, নরীম্যান—মুক্তি পাইয়াই পুনরায় আইন-অমান্ত-অপরাধে ধৃত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস—বঙ্গীয় আইন-অমান্য-সমিতির সম্পাদকরূপে কার্য্য করায় পুলিশ-কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ—বিলাতী-বস্ত্র-বর্জ্জন সম্বন্ধে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর অভিমত। রেঙ্গুনের অবস্থা শান্তিপূর্ণ। পেশোয়ারে তদন্ত-কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত। লক্ষ্ণৌয়ে মিসেস্ মিত্রের ৬ মাস কারাদণ্ড।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ—ধরাসনায় পুলিশের সহিত সত্যাগ্রহিগণের সংঘর্ষ ও বহু সত্যাগ্রহী আহত।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ—ঢাকা শহরের অবস্থা শঙ্কাজনক। শহরের সর্ব্বত্র লুটতরাজ ও দাঙ্গা। সতীন সেনের পুনরায় প্রায়োপবেশন। ঢাকায় হাট-বাজার বন্ধ। সরকারী টেলিগ্রাম ব্যতীত অপর টেলিগ্রাম বন্ধ। পোষ্ট অফিসের কাজও প্রায় অচল।

১৯'শ জ্যৈষ্ঠ—বঙ্গীয় আইন অমান্য সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস গ্রেপ্তার। লাহোরে একটী বাটীতে বোমা আবিষ্কার। বড়লাট কর্ত্তৃক নূতন অর্ডিন্যান্স জারি।

২০শে জ্যৈষ্ঠ—ধরাসনায় লবণগোলা আক্রমণকারীদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষ ও সত্যাগ্রহিগণ আহত। ওয়াদালায় ১৩২ জন স্বেচ্ছাসেবকের কারাদণ্ড। চট্টগ্রামে পুনরায় আর্ম্মারি আক্রমণ। দিল্লীতে মৌলানা আমেদ সৈয়দ কর্ত্তৃক মুসলমানগণকে কংগ্রেসে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান।

২১শে জ্যৈষ্ঠ—দিল্লীতে চাঁদনী চকে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড; প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি।

২২শে জ্যৈষ্ঠ—ছগনলাল যোশী কর্ত্তৃক ধরাসনার লবণ-গোলা আক্রমণ বর্ষার জন্য বন্ধ রাখিবার আদেশ।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ ধরাসনার শেষ আক্রমণ এবং বহু সত্যাগ্রহী আহত। মিস্ মণিবেন প্যাটেলের আহ্বানে পুলিশের নীতির প্রতিবাদ সভা। বোম্বাইয়ে ইউরোপীয় দোকানে পিকেটীং।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ—ভারতের গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক কাটিয়াবাদ রাজ্যে সত্যাগ্রহ দমন করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা।

বঙ্গ-চিত্র

অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, ম্যালেরিয়া, গৃহকলহ—এই চারিটিই বাঙ্গলা দেশের সনাতন দুঃখ। এই দুঃখ নিবারণের জন্য আমরা রাজশক্তির মুখের দিকে চাহিয়াই হাহাকারে দিন কাটাইতেছি; আত্মশক্তি উদ্বোধনের চেষ্টাই করি না। অল্প শক্তি ও অল্প অর্থ ব্যয়ে যে অভাব দূর করা যায়, তাহার জন্য পরমুখাপেক্ষী হওয়া দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। এই দুর্ব্বলতা আমাদিগকে পরিহার করিতেই হইবে। অনেক সময়ে আমরা গ্রামবাসিগণ সম্মিলিত পরিশ্রমে অল্প খরচে ইঁদারা কাটাইয়া জলকষ্ট দূর করিতে পারি। কিন্তু আমরা তাহা করি না বলিয়া এই দুঃসংবাদ এখনও জানা যায়—

গীধগ্রামে জলকষ্ট

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত গীধগ্রাম একটী দরিদ্র গ্রাম। এই স্থানে পানীয় জলের উপযুক্ত পুষ্করিণী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মকালে ভয়ানক জলকষ্ট উপস্থিত হয় এবং বৎসর বৎসর এই সময় বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এই বৎসরেও এই রোগে বহু লোক মারা যাইতেছে। এই গ্রামে টিউবওয়েল ও ইন্দারার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। জলকষ্ট নিবারণ না হইলে গ্রামটী কয়েক বৎসরের মধ্যে ধ্বংসমুখে পতিত হইবে; সুতরাং আমাদের অনুরোধ যেন বর্দ্ধমান জেলাবোর্ড এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া এই দরিদ্র গ্রামবাসিগণকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করেন।

—শক্তি

অন্নকষ্ট, জলকষ্ট ব্যতীত আর একটী কষ্টে গ্রামবাসিগণ প্রপীড়িত। তাহা কদর্য্য রাস্তাঘাটের কষ্ট। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী। অবশ্য বড় বড় রাস্তা সরকারের সাহায্য ব্যতীত সংস্কৃত হওয়া দুষ্কর; কিন্তু এমনও দেখা যায় যে, মাত্র দুই গাড়ী মাটী ফেলিয়া দিলে গ্রামের কোন পাড়ার একটি ছোট রাস্তা সুগম হইয়া যায়, তথাপি গ্রামবাসিগণ মিলিত হইয়া এ কাজ করে না। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে একটি শুভ সংবাদ আছে—

বাঙ্গালা দেশের রাস্তার উন্নতি।—ভারতবর্ষের রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রদেশে বোর্ড গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের জন্য এবৎসর ১৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গীয় রোড বোর্ড এবৎসর কলিকাতা যশোহর রোড, বারাশত ডায়মণ্ড হারবার রোড, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, চট্টগ্রাম আরাকান ট্রাঙ্ক রোড, ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রোড, পাবনা ঈশ্বরদী রোড, মাগুরা ঝিনাইদা চুয়াডাঙ্গা রোড, বর্দ্ধমান আরামবাগ রোড চওড়া করা হইবে, সেতুগুলি চওড়া করা হইবে এবং সম্ভব মত রাস্তার উপর পাথর দেওয়া হইবে। এক গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের কাজেই ৪ লক্ষ টাকা খরচ হইবে।

—সঞ্জীবনী

যে-সমস্ত কষ্টের উল্লেখ করিলাম, তাহা দ্বারা বঙ্গদেশ কেবল প্রপীড়িত নহে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। এই ধ্বংস-লীলার সঙ্গে ভগবানের অভিশাপ মাঝে মাঝে মিলিত হইয়া বাঙ্গালীর জীবন জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে। তাহার দৃষ্টান্ত—

নদীগর্ভে ভীষণ দুর্ঘটনা

গত ১৫ই বৈশাখ রাত্রিকালে পাবনার নিকটে যমুনা নদীতে প্রায় তিনশত যাত্রিসহ "কণ্ড" নামক ষ্টীমার ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে পতিত হইয়া জলমগ্ন হইয়াছে। ঐ ষ্টীমারে গোয়ালন্দের ডাক এবং মাল বোঝাই ছিল। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক এবং কর্ম্মীদিগের চেষ্টায় মাত্র কুড়ি জন যাত্রীর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। ডাকের ব্যাগসহ মেল সর্টারগণের সলিল সমাধি হইয়াছে।

—হিতবাদী

এই বিড়ম্বিত-জীবন বাঙ্গালীর সুদিন কবে আসিবে কে বলিতে পারে? বর্ত্তমানে ভারত-ব্যাপী যে আত্মনির্ভরতা লাভের চেষ্টা চলিতেছে, সে চেষ্টার উদ্বোধন বাঙ্গালীই প্রথমে করিয়াছিল। বাঙ্গালীর মধ্যে মহৎ প্রতিভাশালী ব্যক্তির অভাব নাই। সম্প্রতি সেইরূপ দুইটী সন্তানকে বঙ্গদেশ হারাইয়াছে।—

পরলোকে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন।—অকৃত্রিম দেশ-সেবক স্বদেশী যুগের সুপ্রসিদ্ধ নায়ক কর্ম্মী-পুরুষ মৌলবী শ্রীযুক্ত লিয়াকৎ হোসেন মহাশয় সম্প্রতি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। ইনি দেশপ্রাণ, তেজস্বী, স্বাধীনচেতা কর্ম্মীপুরুষ ছিলেন। নির্ভীক ভাবে দেশসেবা করিতে গিয়া স্বদেশী যুগে তিনি বহুবার কারাবরণ করিয়াছিলেন। দেশের জন্য তিনি বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশের কার্য্যেই ব্যয় করিয়াছেন। বন্যা-বিপন্নদের এবং দুঃস্থ

ছাত্রদের সাহায্য দান দ্বারা তিনি দেশের বহু উপকার করিয়াছেন। দেশের বহু দুঃস্থ ছাত্র ইঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেক বার কাঁথিতে এবং মেদিনীপুর, ঘাটাল, ও তমলুকে আসিয়া বক্তৃতার দ্বারা স্বদেশী আন্দোলনকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। স্বদেশী তাঁহার প্রাণের বস্তু ছিল। তিনি স্বদেশী যুগের রাখীবন্ধন উৎসবকে এতাবৎ কাল বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমানে প্রীতি ও একতা স্থাপন জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সরল, নিরহঙ্কার, নিঃস্বার্থ, নির্ভীক পুরুষের বিয়োগে আমরা প্রাণে গভীর বেদনা অনুভব করিতেছি। তাঁহার একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কেহই নাই। ভগবান তাঁহার পিতৃবিয়োগ-শোকে সান্ত্বনা দান করুন।

—নীহার

পরলোকে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—

আমরা অত্যন্ত গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই। অতি অল্প বয়সেই রাখালবাবু ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রতিলিপি তত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। প্রত্নলিপিতত্ত্ব সম্বন্ধে ইনি বিখ্যাত জার্ম্মানপণ্ডিত ব্লখের শিষ্য ছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রে একাধিকবার সম্রাট কণিষ্ক সম্বন্ধে ইঁহার গবেষণামূলক সন্দর্ভ বাহির হইয়াছিল। তাহাতেই তাঁহার যশোজ্যোতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। ইহা ভিন্ন ইনি বহু-সংখ্যক প্রবন্ধ অনেক মাসিক পত্রে প্রকাশ করেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণালে ইঁহার লিখিত লক্ষ্মণ সেন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার লিখিত বাঙ্গালার ইতিহাস অতি সুন্দর পুস্তক। ইহার প্রথম খণ্ডে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত ও দ্বিতীয় খণ্ডে আকবর কর্ত্তৃক বাঙ্গালা-বিজয় পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস অতি সুন্দর ও আধুনিক ভাবে বিবৃত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ইহার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত 'পাষাণের কথা' ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন ইনি কয়েকখানি উপন্যাসও রচনা করিয়া গিয়াছেন। মহেন্‌জোদোরোতে যে পুরাবস্তু ও ৬ সহস্র বৎসরের পুরাতন নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা রাখাল-বাবুরই অনুসন্ধানের ফল। তিনি যে একজন বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য যে, এ হেন প্রতিভাশালী ব্যক্তি অকালে ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন।

—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

দেশের উন্নতির মূল শিক্ষা-বিস্তার। ইহার অভাবে দেশে যে কি কুফল ফলিতেছে, তাহা গ্রামে গ্রামে নারীদের প্রতি অসম্মানের সংবাদ হইতেই আমরা বুঝিতে পারি। এই সংবাদে ক্ষোভে ও নৈরাশ্যে চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।—

নারী-নিগ্রহ

কলিকাতা

মুন্নী বিবির বাড়ীর এক অংশ ভাড়া লইয়া সেক সালাবু তথায় বাস করিত। মুন্নী বিবির কন্যার নাম জাইতুন, বয়স ১৫ বৎসর। সালাবু জাইতুনকে অসৎ অভিপ্রায়ে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে. এই অভিযোগে শিয়ালদহ আদালতে সালাবুর বিচার হইয়াছে। বিচারক সালাবুকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

নদীয়া

নদীয়া নাকসীপাড়া ভবানীপুর গ্রামের খোকন সেখ নামক জনৈক মুসলমান তাহার প্রতিবেশী মনোরদ্দিন সাহা ফকিরের যুবতী স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার অছিলায় গত ভাদ্রমাসে গৃহ হইতে লুকাইয়া লইয়া গিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল ও তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ঘটনার চার পাঁচ দিন পরে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম শুকপুকুরিয়াতে কাঙ্গালী বিশ্বাস নামক মুসলমানের বাটীতে তাহাকে পাওয়া যায়। পুলিস তদন্ত করিয়া খোকন সেখকে চালান দেয়। গত ৭ই চৈত্র দায়রা জজ জুরিদিগের সহিত একমত হইয়া আসামীর প্রতি ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

গত ১৯ এ এপ্রিল মেহেরপুরের মহেন্দ্রনাথ তরফদারের (মোদক) বিধবা কন্যা অশিলা কুমারী দাসী আহারের পরে তাহার মার সহিত রাত্রে উঠানে মুখ ধুইতেছিল তখন ৪।৫ জন মুসলমান দুর্ব্বৃত্ত তাহাকে ধরে। তাহার চীৎকারে তাহার পিতা ও ভ্রাতা আসে। ইতিমধ্যে দুর্ব্বৃত্তগণ উক্ত বিধবাকে কিছুদূর লইয়া যায়। তাহার নিকটে যখন তাহার পিতা, ভ্রাতা ও মাতা গিয়া পৌঁছায় তখন অশিলার চীৎকারে ম্যাজিষ্ট্রেটের চাপরাশী মেন্টু ঘোষ ঐ পথ দিয়া যাইবার সময় আকৃষ্ট হয় ও তথায় যায়। তাহাতে দুর্ব্বৃত্তগণ উক্ত বিধবাকে ছাড়িয়া দেয়। সকলেই উক্ত মুসলমানদের চিনিতে পারিয়াছে। পুলিশে এজাহার দেওয়ায় একজন ধৃত হইয়াছে ; অপর সকলে পলাতক।

পাবনা

সিরাজগঞ্জ মহকুমা হাকিম ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে সাহজাদপুর থানার এক গ্রামের একজন মুসলমান যুবক ১৩।১৪ বৎসর বয়স্কা কুনামে ওরফে দিতি বিবি নামে একটী মুসলমান বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া পরে উহাকে বেশ্যালয়ে ২০ টাকায় বিক্রী করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। আসামী সেসনে সোপর্দ্দ হইয়াছে।

—সঞ্জীবনী

দেশের এই অবস্থায় নৈরাশ্যের যেমন সৃষ্টি করে, অপর পক্ষে তেমনি আশার সংবাদও আছে। বিলাতীপণ্য ও বস্ত্র বর্জ্জনের যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে আমাদের বহু দুর্দ্দশার অবসান হইবে। নিম্নলিখিত সংবাদগুলি আনন্দের সহিত পঠনীয়।—

বিলাতী বস্ত্র।—কলিকাতার মাড়োয়ারী বস্ত্রব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের এক সভায় সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে, আগামী ১৯৩০ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত বিদেশী বস্ত্রের জন্য কোন অর্ডার দেওয়া হইবে না। ১৯৩০ সনের ৩১ ডিসেম্বর তারিখ উত্তীর্ণ হইলে, মাড়োয়ারী বস্ত্রব্যবসায়ীরা পুনরায় সভায় সমবেত হইয়া তখনকার অবস্থা বিষয়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহিত পরামর্শ করিবেন এবং পরামর্শ অনুসারে যৎকর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন। কেবল কলিকাতা নহে, দিল্লীর বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীরাও ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র-ব্যবসায়ীদিগকে জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা দেখিয়া এবং ভারতে যে ভাবে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জিত হইতেছে তাহা দেখিয়া, তাঁহারা সমস্ত জাহাজওয়ালা ও কাপড়ের কলওয়ালাদিগকে মাল পাঠাইতে নিষেধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি এই নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহারা মাল পাঠাইতে বিরত না হন, তাহা হইলে মাল পৌঁছিলে উহা লওয়া হইবে না, লইলেও উহা বিক্রয় হইবে না। বোম্বাইএর কাপড় ব্যবসায়ীরাও এই ভাবের নিষেধাজ্ঞা দিয়াছেন।

ভারতে ঔষধ প্রস্তুত।—গত ১০ বৈশাখ ৩৬ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে স্যর হরিশঙ্কর পালের সভাপতিত্বে ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির প্রতিনিধিগণ, বিলাতী ঔষধ ও যন্ত্রপাতির আমদানীকারকগণ এবং রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুতকারকগণ মিলিত হইয়া সভায় ভারতে প্রস্তুত কোন্ কোন্ ঔষধ ও যন্ত্রপাতি নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায় এবং বিদেশ হইতে এই সকল দ্রব্য যাহা আসে তাহা দেশে তৈয়ারী হইতে পারে কি না ইত্যাদি সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য বিখ্যাত চিকিৎসকগণ দ্বারা একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। ভারতীয় ঔষধ ও যন্ত্রপাতি যাহাতে ভারতে বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয় তাহা প্রচারের জন্যও এই সভায় একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

—সম্মিলনী

সিগারেট বর্জ্জন—"দীপালী"তে প্রকাশ, সিগারেট বর্জ্জনের ফলে এক সপ্তাহে দেড় লক্ষ টাকার সিগারেট বিক্রয় কমিয়া গিয়াছে।

—নীহার

মেথরদের সুরা বর্জ্জন। রঙ্গপুরের মেথর ও ডোমগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহারা আর মদ্যপান এবং বিলাতী কাপড় ব্যবহার করিবে না।

—সঞ্জীবনী

মুন্সীগঞ্জে সত্যাগ্রহ সফল।—২৬১ দিন সত্যাগ্রহের পর মুন্সীগঞ্জের কালীবাড়ীতে নমঃশূদ্রগণ প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়াছে।

—সঞ্জীবনী

বকর-ঈদ—এবার ঈদ্ উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সর্ব্বত্র সম্প্রীতি বিদ্যমান ছিল। কেবল আসামের ডিব্রুগড় ব্যতীত ভারতের কোথাও কোনরূপ গোলযোগ হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

—সম্মিলনী

আমাদের বহু সামাজিক গলদের মধ্যে বালিকা বধূর উপর পীড়ন একটী প্রধান গলদ। নিম্নের সংবাদটী একটী মুসলমান পরিবারের। কিন্তু আমাদের হিন্দু পরিবারে যে এরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্টই আছে, তাহা আমরা সকলেই জানি; এবং তাহা বহুবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান না হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতি অসম্ভব।

অন্তঃপুরে নারীর দুর্ভাগ্য

ওয়াহেদুন্নিসা নামক ত্রয়োদশবর্ষীয়া এক বালিকা তাহার স্বামী বসীর খাঁন এবং শাশুড়ী নাজিবনের সহিত বাস করিত। এই হতভাগিনী বধূ নিত্য তাহার স্বামী ও শাশুড়ীর হস্তে নির্য্যাতিত হইত। একদিন শাশুড়ী তাহাকে উনুনের জ্বালানি কাষ্ঠ দিয়া সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করিয়াছিল। আর একদিন লাঠির আঘাতে ওয়াহেদ উন্নিসার একটী দাঁত ভাঙ্গিয়া দেয়। অত্যাচারের দারুণ চিহ্ন এখনও তাহার শরীরে রহিয়াছে। শেষে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, ইহাদের উৎপীড়নে বালিকার জীবন-সংশয় হইয়া উঠে। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ওয়াহেদের ভ্রাতা সংবাদ পায় যে, তাহাকে একটী ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। তখনি পুলিশ যাইয়া তালা ভাঙ্গিয়া বালিকাটীকে উদ্ধার করে। তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। স্বামী ও শাশুড়ীর বিরুদ্ধে মামলা চলিতে থাকে। আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইসলামের বিচারে শাশুড়ীর চারি মাস এবং স্বামীর দুই মাস জেল হইয়াছে। বিচারক বলেন, স্বামী অপেক্ষা শাশুড়ীর অপরাধ বেশী।

—সঞ্জীবনী

সামাজিক গলদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দারিদ্র্যেরও অন্ত নাই। তাহা দূর করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে সচেতন, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হইতে হইবে। এমন অনেক ছোট-খাট শিল্প আছে যাহা শিক্ষা করিলে আমাদের দারিদ্র্য কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে নিম্নের উপায়টী অনেকেই অবলম্বন করিতে পারেন।—
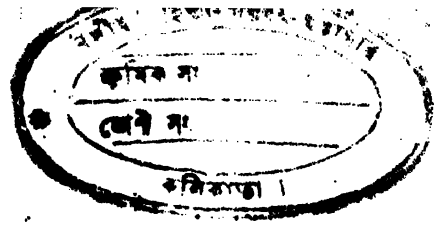
তৃতীয় বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৩৭ { তৃতীয় সংখ্যা

পারের যাত্রী

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ]

সিন্ধুতীরে পড়ে' এল বেলা,
শামুক ঝিনুক কড়ি রয় পড়ি'—সাঙ্গ হ'ল খেলা।
ফিরিছে দিবস-শিশু ফেলি' তার বালুকার ঘর,
সৈকতের শুভ্রবক্ষে গাঢ়তর ঘনায় ধূসর!
শষ্পহীন বেলাভূমে ছেয়ে আসে সন্ধ্যার সুরভি,
অস্তমান সূর্য্যকর দূরে কোথা বাজায় পূরবী
মূর্চ্ছিত বনের বুকে।
ঊর্দ্ধলোকে নীলাম্বর ছেয়ে
বাহিরিয়া আসে তারা—কৌতূহলী ওপারের মেয়ে!
পরিপাটী নীল সাটী শ্রীঅঙ্গে জড়ানো সবাকার,
চোখ টিপে হাসে শুধু—বুঝিলাম রহস্য তাহার!

* * * *

এপারের যাহা কিছু, পেয়ে পেয়ে হারিয়ে হারিয়ে,
আজি এই অন্ধকারে চোখ মেলে রয়েছি দাঁড়িয়ে
জীবনের বাতায়নে প্রাণপণে চাহি পরপার,
বাসনার জতুগৃহে বন্ধ করি যত ছিল দ্বার।

জীব মরে, ফুল ঝরে, দীপ নিবে, সলিল শুকায়,
দিন যায়—প্রেম নাই, অহঙ্কার লজ্জায় লুকায়,
—এপারের এই মন্ত্র, সে পাঠ তো করিয়াছি সারা,
আজি অনন্তের পারে চিত্ত মোর খুঁজিছে কিনারা
চাহি ঐ পরপারে—সেথা যদি মিলে সে অমৃত,
অমর করে যা লোকে, মরণে যা করে সঞ্জীবিত,
অকুণ্ঠ অমরাবতী, যেথায় অনন্ত রাত্রিদিন,
চাঁদ উঠে, তারা ফুটে, হাসি যার অম্লান নবীন।

আধুনিক সাহিত্য

[শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ]

'সাহিত্য' কথাটা অনেকেই ব্যবহার করেন, কিন্তু ইহার অর্থটা এখনও নিশ্চিত বলিয়া মনে হয় না। এরূপ শব্দ সকল ভাষাতেই আছে। ইংরেজি "Literature" কথাটীও এইরূপ।

ইহা যখন প্রথম সৃষ্ট হয়, তখন একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ হয় তো ইহার ছিল। তারপর শব্দটার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিল না। অর্থটা কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কখন ব্যাপক, কখন বা সংকীর্ণ হইতে লাগিল। 'আত্মা' শব্দের অর্থ কখন হইল 'দেহ', কখন 'জীব', কখন 'স্বভাব', কখন বা 'পরমাত্মা'। এখনও শব্দটার অর্থ সুনিশ্চিত বলিয়া মনে হয় না।

এই অর্থবাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে শব্দবাহুল্যের সৃষ্টিও অনিবার্য্য। 'সিংহ' কখন 'হর্য্যক্ষ', কখন 'কেশরী', কখন বা 'হরি' হইয়া দাঁড়াইল।

'সাহিত্য' কথাটীও নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ বলেন যাহা লিখিত তাহাই সাহিত্য, কেহ বলেন যাহা জাতির ভাব-ধারার নিয়ামক বা আধার তাহাই সাহিত্য। তারপর ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় এই 'সাহিত্যে'র প্রতিশব্দগুলি কত প্রকার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

তারপর এই অর্থ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা সদৃশার্থক শব্দও সৃষ্ট হইল। 'সাহিত্যে'র অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য 'কাব্য' 'নাটক', 'প্রহসন' প্রভৃতি শব্দগুলি অভিধানের পৃষ্ঠায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। তবুও ইহার অর্থ কি তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিয়া ওঠা এখনও সম্ভব হয় নাই।

অর্থ পরিবর্ত্তনশীল। তবে শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় হইতে যে অর্থ নির্ণীত হয় তাহা মুখ্য। এই মুখ্য অর্থ হইতে গৌণ অর্থ অনুমান করা অসম্ভব নয়। এই জন্য শব্দ বুঝিতে হইলে আমরা প্রথমেই তাহার মুখ্য অর্থের অনুসন্ধান করি। এই নিয়ম মানিয়া চলিলে সর্ব্বত্র না হউক অনেক স্থলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। সেই জন্য 'সাহিত্য' শব্দের মুখ্য অর্থ আমাদের নির্ণয় করিতে হইবে।

ইংরেজীতে Literature কথাটীর অর্থ লইয়া যে গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে 'সাহিত্য' কথাটী লইয়া আমাদের দেশে সেরূপ হয় নাই। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথই প্রথমে ইহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। সংস্কৃত আলংকারিকরা শব্দটীর উল্লেখ অল্পই করিয়াছেন। বিশ্বনাথ কবিরাজই তাঁহার অলঙ্কার শাস্ত্রের নাম দিয়াছেন 'সাহিত্য-দর্পণ'। কিন্তু 'সাহিত্য' শব্দটীর কোন বিশেষ অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই। তবে গ্রন্থে যে সব বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয় সাহিত্য অর্থে তিনি শুধু কাব্যই বুঝিয়াছেন।

'সহিত' শব্দের উত্তর ভাবার্থক 'ষ্ণ' প্রত্যয়ের যোগে 'সাহিত্য' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন সাহিত্য ব্যক্তিগত জিনিস নয়, সমষ্টিগত। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়াছেন, 'সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।' এখানেও শব্দটীর মুখ্য অর্থ ই সূচিত হইতেছে।

'সাহিত্য' শব্দটীর মুখ্য অর্থ আমরা আর এক ভাবে গ্রহণ করিতে চাই। সহিতের ভাবই সাহিত্য; সেইজন্য যাহা একক নয়, অনেকের সহিত বর্ত্তমান তাহাকেই সাহিত্য বলিতে হইবে। যাহাতে ব্যাকরণ, ন্যায়, মীমাংসা, বিজ্ঞান, কলাদির মিলন ঘটিয়াছে তাহাই সাহিত্য। কথিত আছে—

ন স শব্দো ন তদ্বাক্যং
ন স ন্যায়ো ন সা কলা।
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গম্
অহো ভারো মহান্ কবে।

কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ ব্যাখ্যার অনুমোদন করিয়াছেন। ভরত বাক্যও এই ব্যাখ্যার সমর্থক।

কাব্যের মধ্যে নাটকই শ্রেষ্ঠ, এইরূপ একটা কথা প্রচলিত আছে; এই নাটকের উৎপত্তি বর্ণনা করিতে গিয়া ভরত এমন কতকগুলি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা সাহিত্যের পক্ষেও প্রযোজ্য। ভরত বলেন, নাটক সার্ব্ব-বর্ণিক অর্থাৎ সকল বর্ণেরই ইহাতে অধিকার আছে। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রার্থসম্পন্ন ও চতুর্বেদাঙ্গসম্ভূত। ভরতের সাহিত্য-সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা তাহা আমরা উক্ত বাক্য হইতে অনেকটা অনুমান করিতে পারি।

সাহিত্য বলিতে কেহ পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের অথবা শব্দ ও অর্থের মিলনজাত বস্তু বুঝিয়া থাকেন। শিব-পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

শব্দজাতমশেষন্তু ধত্তে শর্ব্বস্য বল্লভা।
অর্থরূপং যদখিলং ধত্তে মুগ্ধেন্দুশেখরঃ॥
যস্য যস্য পদার্থস্য যা যা শক্তিরুদাহৃতা।
সা সা বিশ্বেশ্বরী দেবী স স সর্ব্বো মহেশ্বরঃ।
যৎপরং যৎপবিত্রঞ্চ যৎপুণ্যং যচ্চ মঙ্গলম্।
তৎ তদাহুর্মহাভাগাস্তয়োস্তেজো-বিজৃম্ভিতম্।
যথা দীপস্য দীপ্তস্য শিখা দীপয়তে গৃহম্।
তথা তেজস্তয়োরেতদ্ব্যাপ্য দীপয়তে জগৎ॥

এখানে শব্দ ও অর্থের মিলনের কথা উক্ত হইয়াছে। এই মিলন হইতেই দর্শন-মতে সর্ব্ববিষয়ই উৎপন্ন হইয়াছে, সাহিত্যেও সেই মিলনেরই কথা।

সাহিত্যে যে মিলনের কথা আছে তাহা নানা-বিষয়ক, একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন। এই মিলন কত প্রকারের তাহার বর্ণনাও দুঃসাধ্য; সুতরাং শব্দার্থপ্রসূত নানা বিষয়ই সাহিত্য। কিন্তু ইহা যে মুখ্যতঃ কাব্য তাহা আলঙ্কারিকেরা স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, যাহা হিতের সহিত বর্ত্তমান তাহাই সহিত, এই সহিতের ভাবই সাহিত্য। ইঁহারা বলিতে চান্ সাহিত্য প্রধানতঃ মঙ্গলবিধায়ক।

বক্রোক্তিজীবিতকার কুন্তক বলেন বাচ্য ও বাচক অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের মিলন যখন রসের পরিপোষক হইয়া সহৃদয়ের আনন্দ বিধান করে তখন তাহা সাহিত্য। সুতরাং সাহিত্য যে যুগপৎ আনন্দ ও মঙ্গল বিধান করে ইহা আলংকারিকমাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন।

প্রাচীন অলংকার-শাস্ত্রের মতে সাহিত্য ও কাব্য একার্থক এখন কাব্যের অর্থ কি তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইলে একটু গোলযোগে পড়িতে হয়। ব্রহ্মাই আদি কবি বলিয়া বেদে বর্ণিত। তাহা হইলে বেদ-পুরাণ প্রভৃতি সবই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং 'সাহিত্য' ও কাব্যে কোন প্রভেদই থাকে না।

কাব্য কথাটীর বিচার সম্প্রতি স্থগিত রাখিয়া আমরা বলিতে চাই, 'সাহিত্য' শব্দটীর অর্থ এখন কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আলংকারিকেরা শব্দ তিন প্রকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—বেদ, ইতিহাসাদি ও কাব্য। তাঁহাদের মতে কাব্যই সাহিত্য-পদবাচ্য। তাঁহারা বুঝিতেন বেদের রীতি নৃপতির মত, ইতিহাসাদির রীতি বন্ধুদের মত, কাব্যের রীতি কান্তার মত; বেদের উপদেশ নৃপতির আজ্ঞার মত অনুল্লঙ্ঘ্য; ইতিহাসাদির উপদেশ বন্ধুর উপদেশের মত সুফলপ্রদ, কিন্তু কাব্যের উপদেশ কান্তার উপদেশের মত মধুর ও সরস। প্রাচীনেরা শব্দের এই তিন প্রকার ভেদ মানিয়া চলিতেন।

কালক্রমে কিন্তু শব্দের এই ত্রিধারা আর পৃথক্ রহিল না।

মানুষের চিন্তা-ক্ষেত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শব্দভেদও নানারূপ হইয়া উঠিল। তখন লেখকগণ জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়া যাহা রচনা করিতেন তাহা স্বগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিত এবং মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে তাহা অপ্রচারিত থাকিত না। আধুনিক যুগে মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে যাহা কথ্য তাহা লেখ্য হইয়াছে, যাহা সাধনার জিনিস, তাহা সখের জিনিসে পরিণত, যাহা সত্য, শিব ও সুন্দর তাহা অর্থোপার্জ্জনের উপায়রূপেও গৃহীত। তারপর বিদেশীয় গ্রন্থ ও মতবাদের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন ত্রিধারা ক্রমশঃ দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য আমরা আজ 'সাহিত্য' শব্দটী খুব ব্যাপক অর্থেই প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এখন যাহা লেখ্য তাহাই সাহিত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে।

এই জন্য আজকাল নানা সাহিত্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়ঃ—যথা শিশু-সাহিত্য,তরুণ-সাহিত্য, যৌবনের সাহিত্য, বিদেশী-সাহিত্য, ইত্যাদি। কেহ বলেন ইহাতে সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে, কেহ বলেন সাহিত্যের আদর্শ খর্ব্ব হইতেছে।

এখন বন্ধন ছিন্ন করিবার দিন। অনেকে বলেন, সাহিত্যকে সমাজ ও নীতির বন্ধনে আড়ষ্ট করা উচিত নয়, তাহার স্বাধীন প্রসারই বাঞ্ছনীয়। শুধু সমাজ ও নীতি নয়, ইহাকে কোন প্রকার বাঁধাধরা নিয়ম, এমন কি অলংকারশাস্ত্র ও ব্যাকরণের বন্ধন হইতেও মুক্তি দেওয়া উচিত।

অপর পক্ষ বলিবেন—

স্বাধীনো রসনাঞ্চলঃ পরিচিতাঃ শব্দাঃ কিয়ন্তঃ
কচিৎ
ক্ষৌণীন্দ্রো ন নিয়ামকঃ পরিষদঃ শান্তাঃ স্বতন্ত্রং জগৎ।
তদ্‌যুয়ং কবয়ো বয়ং বয়মিতি প্রস্তাবনা হুংকৃতি-
স্বচ্ছন্দং প্রতিসদ্মং গর্জ্জত বয়ং মৌনব্রতালম্বিনঃ॥

কিন্তু মৌনব্রতা লম্বনও সর্ব্বত্র সাধু পন্থা নয়। সব সময়ে আদর্শ মানিয়া না চলিলেও মানুষ তাহাকে একেবারে ছাড়িয়া চলিতে অক্ষম। সেই জন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শক্তির সংঘাতে সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহার মধ্যেও পথ চিনিবার জন্য আমরা যে আদর্শ ভুলিয়াছি তাহাকে স্মরণ করিতে হইবে। শুধু অগ্রসর হইলেই চলিবে না, মাঝে মাঝে পিছনেও চাহিতে হইবে, নচেৎ পথভ্রান্তি অনিবার্য্য। যে পথেই চলি না কেন তাহা সত্য, শিব ও সুন্দরের পথ হওয়া চাই।

আমরা দেখিয়াছি আধুনিক যুগে লেখ্য বিষয় মাত্রেই সাহিত্য হইলেও কাব্যকেই বিশেষভাবে সাহিত্য বলা হইয়াছে। এখন লেখ্য বিষয় সবই সাহিত্য একথা বলিতে গেলে পথে যে সব হ্যাণ্ডবিল বিলান হয় তাহাও সাহিত্য-পদবাচ্য হইয়া পড়ে। চল্‌তি কথায় যাহাই বলি না কেন, প্রকৃত সাহিত্য কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সাহিত্যের আদর্শ কি তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। তাহা হইলে কাব্য কি তাহা প্রথমে দেখিতে হইবে, কেন না সাহিত্য মুখ্যতঃ কাব্য ছাড়া অপর কিছু হইতে পারে না।

এখন কাব্য শব্দটী পরীক্ষা করিতে গেলে কবির কর্ম্মই কাব্য এইরূপ সিদ্ধান্তে আসিতে হয়। ব্রহ্মা আদি কবি, তাঁহার কাব্য অলৌকিক। আমরা লৌকিক কাব্যের কথাই পাড়িয়াছি, বাক্য ব্যতীত আমাদের কাব্য হইতে পারে না।

এই কাব্য কিরূপ তাহা লইয়া নানা দেশে নানা কথার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীনেরা কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়মের দ্বারা কাব্যকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতে কবিত্বের প্রসার কমিয়া যায় এইরূপ আক্ষেপ আজকাল অনেকেই করিয়া থাকেন।

আমরা কিন্তু এই আক্ষেপের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না। যুক্তিসঙ্গত নিয়ম ও বন্ধন প্রসারের অনুকূল। বাষ্পকে রুদ্ধ না করিলে এঞ্জিন চলিত না। এক সময়ে প্রাচীন মনীষীরা কাব্যের নিয়মাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই যুগে যুগে সাহিত্যবিৎ পণ্ডিতেরা অধিকতর কাব্যালোচনার সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

তারপর আর একটা কথাও আমাদের ভাবিতে হইবে, যাঁহারা কাব্যকে রসাত্মক বাক্য বলিয়াছেন তাঁহারা কখনই ইহাকে একটা কঠিন নিগড়ে বাঁধেন নাই, বাঁধিলেও সেই বন্ধন কাব্যের গতিরোধ করে নাই বরং তাহার প্রসারেই সহায়তা করিয়াছে।

প্রাচীনেরা বলিয়াছেন রসাত্মক বাক্যই কাব্য। এই রস কি তাহা বুঝিতে গেলে মনে হয় কাব্যের স্বরূপ আরও সুন্দরভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। 'রসো বৈ সঃ'—রসই

তিনি, জীব এই রস লাভ করিয়া আনন্দময় হইয়া থাকে। প্রাচীনেরা কাব্যের জন্য কত উন্নত আদর্শ বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহা আলংকারিকদের এই সব বাক্য হইতে বিশেষভাবেই বুঝিতে পারা যায়। কাব্যের বিচার করিতে বসিয়া তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই—

"কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরম্, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্য্যাপদিবৎ দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ রীতয়োদ বয়বসংস্থান বিশেষবৎ অলংকারাঃ কটককুণ্ডলাদিবৎ, ইতি।"

কাব্যের শরীরাদির কথা আপাততঃ পরিত্যাগ করিয়া আমরা ইহার আত্মার কথা বলিতে চাই। রসই কাব্যের সার, যাহাতে রস নাই তাহা কাব্য নয়। এই রস আনন্দময়, ব্রহ্মস্বরূপ; সেই জন্য কাব্যের দ্বারা চতুর্বর্গ লাভ করা যায়, এ কথাও আলংকারিকেরা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মনে রস সত্ত্বস্বরূপ, রজঃ ও তমঃ এখানে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। ইহা অখণ্ড, স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ ও চিন্ময়, ইহার সহিত বিষয়ান্তরের সম্বন্ধ নাই, ইহার আস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদস্বরূপ।

রস কি, ইহার তাত্ত্বিক বিচার দার্শনিকের স্কন্ধে চাপাইয়া তাঁহারা রসের উদ্বোধন কিরূপে হয় তাহা নির্ণয় করিয়াছেন।

নির্ব্বিকার চিত্তে প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব। লৌকিক জগতে যে শোক-হর্ষ দুঃখ-সুখের কারণ, কাব্য-জগতে তাহাই আস্বাদযোগ্য। লৌকিক-জগতে যে ভাব ব্যক্তিগত, কাব্য-জগতে তাহা রসরূপ, সামাজিক এবং শুধু সুখেরই কারণ হইয়া পড়ে। তখন তাহার নাম বিভাব। মনে ভাবের উদ্বোধন ঘটিলে যে সব বিকার কার্য্যরূপে বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহাই কাব্যের অনুভাব। কতকগুলি ভাব স্থায়ী নয়, তাহারা স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করে না, কোন একটা স্থায়ী ভাবকে অবলম্বন করিয়াই অন্তরে বিকসিত হয় তাহাদের নাম সঞ্চারী। আলংকারিকেরা বলেন রসের উদ্বোধন ব্যাপারে বিভাব কারণ, অনুভাব কার্য্য ও সঞ্চারী সহকারী।

আমাদের নয়টী ভাব প্রধান—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও সাম। এই ভাবই রসরূপে পরিণত হয় বলিয়া ইহাদের নাম স্থায়ীভাব। এই ভাবগুলিই যথাক্রমে নয়টী রসের কারণ-স্বরূপ। এই ভাব ও রসের স্বরূপ ও পার্থক্য আধুনিক সাহিত্যে সুস্পষ্ট নয়, সেইজন্য এমন অনেক বিষয়কে আমরা রস বলিয়া চালাইতেছি, যাহা প্রকৃত পক্ষে সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযোগী নয়।

লেখ্য বস্তুমাত্রেই সাহিত্য হইলে আর সাহিত্যের বিচার অনাবশ্যক। কিন্তু সাহিত্য বিশেষভাবে কাব্য এবং কাব্যের আত্মা রস। সেই জন্য যাহাতে রস আছে তাহাই মুখ্যতঃ সাহিত্য। আজকাল যদিও অনেক তথ্যমূলক প্রবন্ধ সাহিত্য বলিয়া পরিচিত, তবুও আমাদের এই রসবস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেখানে রস নাই কখনই তাহা সাহিত্য হইতে পারে না।

ব্রহ্ম ও রসকে এক বলিয়া প্রাচীন সাহিত্যবিৎ পণ্ডিতেরা সাহিত্য কথাটীর অর্থ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তারপর তাহার বৃত্তি, ভাষ্য, টীকা টিপ্পনী হইয়াছে, কিন্তু আদিম সূত্রের পরিবর্ত্তন হয় নাই। কাব্যের আত্মা রস এবং 'রসো বৈ সঃ' একথা চিরন্তন হইয়াই আছে ও থাকিবে—অন্ততঃ যত কাল আমরা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ স্বীকার করিব। আমাদের দেশের চিন্তাধারা এইরূপ ছিল।

তারপর অপর ধরণের চিন্তাধারাও আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধারা অনুসরণ করিতে গেলে অনেক সাহিত্য-গ্রন্থ আলোচনা করিয়া নির্ণয় করিতে হয়, তাহার মধ্যে স্থায়িত্ব কোনখানে। তখন সাহিত্যের বা কাব্যের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়। কেহ বলেন কাব্য প্রকৃতির অনুসরণ (Imitation of nature), কেহ বলেন ইহা subjective বা আত্মগত, কাহারও মতে ইহা আত্মবিকাশ বা (expression of personality), কাহারও মতে ইহা বাহ্য বস্তুর মানসিক অভিব্যক্তি (subjective expression of external realities)। এইরূপ সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ অনন্ত এবং এ পথ দিয়াও অবশেষে সার সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব নয়।

আমরা প্রাচীন চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমের যুগ পর্য্যন্ত আসিতে না আসিতেই বিচার-প্রসূত এই নূতন চিন্তাধারার বন্যায় ভাসিতে হইল। প্রাচীন রসজ্ঞদের কথা ভুলিয়া আমরা নবীন বিচারকদের কথা মানিয়া

লইলাম। রস কি তাহা আলোচনা না করিয়া কতকগুলি আধুনিক বিদেশী পরিভাষার প্রয়োগ করিলাম; এ সব বিষয় লইয়া প্রাচীনেরা কি বলিয়াছেন তাহা জানিবার প্রবৃত্তিও রহিল না। তারপর স্বাধীন জাতি যাহাকে সংযম বলে এবং যাহা তাহার স্বাধীনতার প্রতিকূল বলিয়া বিবেচিত হয় না, পরাধীন জাতি তাহাই বন্ধন মনে করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতে চায়। আমরাও সেই জন্য আধুনিক সাহিত্যের মোহে আপনাদের পুরাতন বিদ্যা-বুদ্ধি ভুলিয়া মত্তের মত উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিয়াছি। যে স্বাধীনচিত্ত জাতির অনুসরণ করিয়া আমরা চলিয়াছি তাঁহারা বিপথে চলিলে সহজেই সতর্ক হইতে পারিবেন, পথে যদি কোন খাত থাকে তাঁহারা লঙ্ঘন করিবেন, কিন্তু অন্ধ অনুসরণকারীদের সে খাতে পড়িতেই হইবে।

সাহিত্যের কোন নিগড় থাকিবে না, তাহাকে নীতি বা সমাজের গণ্ডীতে আবদ্ধ করা উচিত নয়, যত প্রকার বন্ধন আছে সব ঘুচাইয়া দাও এ সব বহুকাল বদ্ধ থাকিয়া যাঁহারা সহসা মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহাদেরই কথা চির-পীড়িত রাশিয়া সহসা মুক্তি লাভ করিয়াছে; এখন পুরাতন অত্যাচারের প্রতিহিংসা তাহার চিত্তকে কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে। পর-পথানুবর্ত্তী আমরা তাহাদের কথায় নাচিয়া উঠিতেছি। কিন্তু প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি যখন মুক্তির আনন্দ-ধারায় ভাসিয়া যাইবে, তখন সে নিজের জন্য নূতন পন্থা বাছিয়া লইবে, আমরা কিন্তু অনুকরণকারীর গ্লানি ভোগ করিতে থাকিব।

এখন দিন আসিয়াছে যখন আমাদের নিজের পথ বাছিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। নবীন রসজ্ঞেরা প্রাচীন রসজ্ঞদের সহিত সহজ সম্বন্ধ স্বীকার করুন। যাহা প্রাচীন তাহাই এককালে নবীন ছিল,আজ যাহা নবীন কাল তাহাকে প্রাচীনের গণ্ডীতে আসিতেই হইবে।

ভাব নানা প্রকার। ভাব হইতেও এক প্রকার আনন্দের উৎপত্তি হয়। এ আনন্দ ইন্দ্রিয়সুখেরই নামান্তর। সুতরাং অস্থায়ী; সাহিত্যের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। পাঠকের চিত্তে কতকটা পাশব ভাবের উদ্রেক করিতে পারিলেই রসের উদ্বোধন হয় না। সাহিত্য সমাজ বা নীতির গণ্ডীতে আবদ্ধ না হোক্, তাহা যে সমাজ ও নীতির বিরোধীই হইবে এ মতও পোষণ করা চলে না।

একজন বিদেশী সমালোচক ও চিন্তাশীল পণ্ডিত কোন দুর্নীতিমূলক গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ আমরা সংবরণ করিতে পারিলাম না :—

The most dangerous effect that any fictitious character can produce, is when two or three of its popular vices are varnished over with everything that is captivating and gracious in the exterior, and ennobled by association with splendid virtues; this apology will be more sure of its eflect, if the faults are not against nature, but against society. The aversion to murder and cruelty could not perhaps be so overcome, but a regard to the sanctity of marriage vows, to the secred and sensitive delicacy of the female character, and to numberless restrictions important to the well-being of our species may easily be relaxed by this subtle and voluptuous confusion of good and evil.

এরূপ গ্রন্থ আধুনিক সাহিত্যে কত তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

সাহিত্যের একদেশদর্শী হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। শুধু ইহার বাঁধন ছিঁড়িতে হইবে, বা ইহাতে আপনার ব্যক্তিত্ব অপ্রতিহত রাখিতে হইবে এ সব একদেশদর্শীর কথা। সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে সাহিত্যে রসই প্রাধান্য লাভ করে, এই রসই আমাদের চরম লক্ষ্য হোক্।

জয়ন্তি তে সুকৃতিনো
রসসিদ্ধ কবীশ্বরাঃ
নাস্তি যেষাং যশঃকায়ে
জরামরণজং ভয়ম্ ॥*

* 'রবিবাসরে'র প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

ভাতার-মারীর মাঠ

[রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর]

অনেকদিন আগের একটা কাহিনী আজ নিবেদন কর্‌ব। 'অনেকদিন আগে' কথাটা শুনে কেহ যদি মনে ক'রে বসেন যে, আমি প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বল্‌ছি, অথবা পৌরাণিক কাহিনী বল্‌ছি, অথবা ঐতিহাসিকেরা যদি ভেবে থাকেন যে মোগল-পাঠান বা কোম্পানী বাহাদুরের ভারতের রাজতক্ত অধিকারের সম-সাময়িক কোন ঘটনার উল্লেখ করছি, তা হ'লে তাঁদের নিরাশ হ'তে হ'বে। আবার 'অনেকদিন আগের' সীমানা এই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর; এবং এ কথাও আগে থাক্‌তে বলে রাখছি যে, আমি যে ঘটনার কথা বল্‌ব, তার যাথার্থ্য প্রমাণ করবার জন্য আমি তাম্রশাসনও দেখাতে পারব না, ভিন্‌সেন্ট স্মিথকেও তলব করতে পারব না, বা আমার সোদরোপম স্নেহভাজন ঐতিহাসিক শ্রীমান্‌ ব্রজেন্দ্রনাথের অনুগ্রহে রেকর্ড আফিসের পুরাতন কাগজপত্রও নজির স্বরূপ হাজির করতে পারব না,—আমার বর্ণিত কাহিনী একেবারে শোনা কথা, আর সে কথা শুনেছিলাম আমার পালকী বাহক নিরক্ষর পোদ-পুঙ্গবদের কাছে। আর এ কথাও আমি বলে রাখছি যে, আমি সেই পল্লীবাসী অশিক্ষিত পোদদের কথা বিশ্বাস না করে থাক্‌তে পারি নি এবং এতকাল পরে, যখন জীবনের অনেক কথা একেবারে ভুলে গিয়েছি—কত বন্ধুবান্ধবের কত স্নেহ, কত অনুগ্রহের কথা, কত বিপদ-আপদের কথা ভুলে গিয়েছি, তখনও সেই 'ভাতার-মারীর মাঠে'র কাহিনী আমার মনে আছে—শুধু মনে আছে নয়—হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে আছে। সেই কাহিনীই এতদিন পরে বল্‌তে বসেছি। অতএব আর ভূমিকা না বাড়িয়ে কথাটাই বলি।

তখন আমি একটা সামান্য পাড়াগাঁয়ে মাষ্টারি করতাম। তাতে সুখ যথেষ্টই ছিল—যা কষ্ট ছিল অন্ন-বস্ত্রের। মাইনে পেতাম একত্রিশ টাকা পনর আনা—পুরা বত্রিশ টাকার এক আনা পয়সা রসিদ-ষ্ট্যাম্পের জন্য সেলামী দিতে হ'ত সৌভাগ্যের কথা এই ছিল যে আটাশ টাকা পেয়ে বত্রিশ টাকার রসিদ লিখে দিতে হ'ত না। আর একটা কথাও ব'লে ফেলি, মাইনে কিন্তু মাসে মাসে পেতাম না—কিস্তিবন্দী করেও না। জমীদারের স্কুল, তিন চার মাস পরে কর্ত্তাদের তহবিলের অবস্থা যখন একটু সচ্ছল হ'ত, তখনই তাঁদের অনুগ্রহ-দৃষ্টি পড়ত এই গরীব অসহায় স্কুল মাষ্টারদের উপর। এ অবস্থায় আর আর মাষ্টারেরা এই হতভাগ্য বাঙ্গালা দেশে যা করে থাকেন, আমাকেও সেই উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিল—অর্থাৎ প্রাইভেট টুইসনি করতে হ'ত। তাইতে যা পাওয়া যেত তাই দিয়ে আর গ্রামের সদাশয় মুন্সিপ্রবর হরেকৃষ্ণ মাইতীর দোকানের প্রসাদে কোন রকমে দিনান্নের ব্যবস্থা করা যেত। কথাটা অতিরঞ্জন বলে কেউ মনে করবেন না—বাঙ্গলা দেশের গ্রাম ও পল্লীর সাড়ে পনর আনা শিক্ষকদেরই এই অবস্থা—ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেও এই অবস্থা ছিল, এখনও তাই আছে, আর যদি কখন স্বরাজ লাভ হয় তখনও ঐ অবস্থাই থাক্‌বে।

থাক্‌ সে দুঃখের কষ্টের কথা এখন। বলেছি তো, আমাকেও বাধ্য হয়ে প্রাইভেট টুইসনি করতে হ'ত। আমি দুইটী ছেলেকে পড়াতাম। তারা রবিবার বাদে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমার বাসায় এসে পড়ে যেত। দুইটী ছেলেই একই শ্রেণীতে পড়ত, সুতরাং একসঙ্গে দুই জনের পড়া বলে দিলেই চলত। একটী ছেলে তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকত, অপরটী স্কুলের বোর্ডিংয়ে বাস করত। পূর্ব্বোক্ত ছেলেটী মাষ্টার মশাইয়ের দক্ষিণা দিত দেড় মণ চাউল—ধান নয় ভাই, চাউল। তার বাপ তিন ক্রোশ দূরের একগ্রামের সম্পন্ন কৃষি গৃহস্থ; নগদ টাকার বদলে চাউল দিতে তার গায়ে বাধত না। দ্বিতীয় ছেলেটীর বাড়ী প্রায় সাত ক্রোশ দূরে, তার বাপ বড় জমীদার, সুতরাং টাকার মানুষ। তিনি মাসে মাসে যথাসময়ে দশটী করে টাকা পাঠিয়ে দিতেন; এ টাকা কখন বাকী পড়ত না।

মাসের প্রথমে ছেলের খরচ যখন পাঠাতেন, তখন আমার টাকাটাও পাঠাতেন এবং যে লোক টাকা দিতে আসত', তার সঙ্গে ছেলের বাপ তারকবাবু ছেলের জন্য এবং সেই সঙ্গে মাষ্টারমশায়ের জন্য, কখনও এক কলসী গুড়, কখনও বা একটা বড় মাছ, কখনও বা দুধের ঘি পাঠিয়ে দিতেন, এবং কোন কার্য্য উপলক্ষে যখন জেলায় যেতেন, তখন এই পথ দিয়ে যাবার সময় এক-আধ বেলা আমার মত গরীবের প্রবাস-গৃহে আতিথ্যও স্বীকার করতেন। তাই, তারকবাবু ও তাঁর ছেলে আমার ঘরে-বাহিরের ছাত্র লক্ষ্মীকান্তের সঙ্গে আমার বেশ একটা আত্মীয়তা হয়েছিল।

এই আত্মীয়তার ফলস্বরূপ এক দিন তারকবাবু তাঁর ছোট ভাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন—উদ্দেশ্য, তাঁর বাড়ীতে একবার আমাকে পদধূলি দিতে হবে; উপলক্ষ তারকবাবুর নবজাত পুত্রের অন্নপ্রাশন। দিনও স্থির করেছিলেন ভাল—এক রবিবার। তারকবাবু অনুরোধ করে পাঠিয়েছিলেন যে, শনিবার মধ্যাহ্নে একটু সকাল সকাল স্কুল থেকে বেরিয়ে তাঁর বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করতে হ'বে—ছয়-সাত ক্রোশ পথ, তিন চার ঘণ্টাতেই অতিক্রম করা যাবে। রবিবার সেখানে থাকতে হ'বে; সোমবার খুব ভোরে বেরিয়ে এসে যথাসময়ে স্কুলে হাজিরা দেওয়া যাবে। লক্ষ্মীকান্ত দিনদুই আগেই বাড়ী যাবে। শনিবার প্রাতঃকালে পালকী বেহারা আমার বাসায় এসে হাজির হ'বে। বলা বাহুল্য, এমন মক্কেলের সাগ্রহ নিমন্ত্রণ আমি অস্বীকার করতে পারি নি—সম্মতি দিয়েছিলাম।

শনিবার এসে পড়ল। সেটা বৈশাখ মাস, রোদ একেবারে ঝাঁ ঝাঁ করে, দুপুর বেলা ঘরের বার হওয়া যায় না। আমাদের স্কুল তখন প্রাতঃকালে বসে—৭টার মধ্যেই ছুটী হয়ে যায়, নইলে যে সব ছেলে দূর গ্রাম থেকে পড়তে আসে তাদের কষ্ট হয়।

আমি জানতাম নটা-দশটার মধ্যেই পালকী ও বেহারা এসে পড়বে; কি জানি আমার বাসায় আসতে যদি একটু বিলম্ব হয়, তা হলে লোকগুলো এলে তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করবার কথা বাসায় বলে গিয়েছিলাম।

আমি স্কুল থেকে যখন বাসায় এলাম, তখন দেখি বেহারারা পৌঁছে গেছে। আমি আসতেই তারা নমস্কার করে বলল যে, তাদের বাবু বলে দিয়েছেন, সকাল সকালই যাত্রা করতে। 'কাল বোশেখী'র দিন, বেলা পড়তেই জল-ঝড় হ'বার সম্ভাবনা।

আমি বললাম, যে রোদ উঠবে তার মধ্যে তোমরা পালকী কাঁধে করে যাবে কেমন করে? তার বদলে এক কাজ করা যাক; সন্ধ্যার পর ঠাণ্ডা পড়লে যাওয়া যাবে।

বেহারাদের মধ্যে যে প্রধান, সে বলল, না, বাবু তা হবে না; বাবুর হুকুম কি অমান্যি করতে পারি! রোদ দেখে আমরা ডরাইনে। রাস্তার মধ্যে ঝড় তুফানেরই ভয়। আপনি স্নান-আহার করে নিন—এই এগারটা-বারোটার মধ্যে বেরুলে আপনার আশীর্ব্বাদে এ সাত কোশ পথ তিনটের মধ্যেই পাড়ি জমিয়ে দেব।

আমি বললাম—সে না হয় হ'বে। তোমরা যে চুপ করে বসে আছ; খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হয়েছে।

তারা বলল—মা ঠাকরুণ তো রান্না করবার কথাই বলেছিলেন; আমরা ও হাঙ্গামায় নারাজ। বাবু একটা টাকা দিয়েছিলেন, তাই দিয়ে চিড়ে ফলার করব ঠিক করেছিলাম। মাঠাকরুণ সে টাকাটা কেড়ে নিয়ে তাঁর চাকরকে কি বলে বাজারে পাঠিয়েছেন, আর আমাদের চুপ করে বসে থাকবার হুকুম দিয়েছেন—আমরা বসে আছি।

এখানে 'মাঠাকরুণ' কথাটার ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে। যাঁকে বেহারারা মা ঠাকরুণ বলে অভিহিত করেছিল, তিনি আমার স্বর্গগতা পূজনীয়া দিদি—আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী: বেহারাদের 'মা ঠাকরুণে'র আমার গৃহে আগমনের সুদূর সম্ভাবনাও আমার মনে তখন উদিত হয় নাই। হায় রে, সে সময়!

যাক সে কথা; বুঝলাম যে দিদি বেহারাদের আহারের জন্য চিড়ামুড়কি সংগ্রহের জন্য বাজারে লোক পাঠিয়েছেন।

বেহারারা এগারটার মধ্যেই খেয়ে দেয়ে প্রস্তুত হ'ল, আর আমাকে ঘন ঘন তাগিদ দিতে লাগিল; তাদের ঐ এক কথা রোদে কি করবে, ভয় কালবোশেখীর! কাল-বৈশাখীর ভয় আমার ছিল না—তার পূর্ব্বে অনেক কাল-বৈশাখী আমার মাথার উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল; ভীষণ

পদ্মাবক্ষে কালবৈশেখীর ঝড়ে নৌকো ডুবে আমাকে মারতে পারে নি, হিমালয়ের মধ্যে কত কালবৈশেখীর ঝঞ্ঝাবাত আমাকে চূর্ণ করে ফেলতে পারে নি—কত কালবৈশেখীর আক্রমণ সহ্য করে এই সত্তর বছর পর্য্যন্ত বেঁচে আছি! সে কথা থাকুক।

বেহারাদের তাড়নায় বারোটার সময়ই যাত্রা করতে হ'ল। আমার বিপুল দেহের কথা ভেবে বন্ধুবর তারক-বাবু আটটা বেহারা পাঠিয়েছিলেন—বারবার কাঁধ বদল করতে হবে যে!

প্রথম ক্রোশ দেড়েকের মধ্যে পথের পাশে গ্রামও ছিল, মাঠও ছিল, গাছপালাও ছিল, ছায়াও ছিল। কাঁচা রাস্তা, বর্ষাকালে অনেক স্থান ডুবে যায়, যেটুকু মধ্যে মধ্যে জেগে থাকে সেখানেও এক হাঁটু-ভর কাদা। আমি যেদিন যাত্রা করেছিলেম, সে দিন পথের মাঝে মাঝে কাদা ছিল, কিন্তু জলে ডুবে যায় নি।

দেড় ক্রোশ, কি তার একটু বেশী অতিক্রম করবার পর এমন একটা মাঠে গিয়ে পড়লাম যাকে মাঠ বল্‌লে 'মাঠে'র মর্য্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়—সে মাঠ নয়—একটা প্রান্তর। এমন বিশাল প্রান্তর, আমি তো অনেক স্থান ঘুরেছি, আর কোথাও দেখেছি ব'লে মনে হয় না। পিছনের দিক্ ছাড়া সম্মুখে, বাঁয়ে, ডাইনে যে দিকে চাই, সেই দিকেই যেন ধূ-ধূ করছে; দূরে—অতি দূরে দৃষ্টি-রেখার সীমান্তে কালো মত কি যেন লি-লি করছে; সে গ্রাম কি মরীচিকা, তাও ঠাহর করা যায় না। আমার মনে হ'ল এই প্রান্তরের পরিমাণ-ফল অন্ততঃ দশ বর্গ মাইল। আর এই প্রান্তর একেবারে শূন্য। এ-দেশের জমীতে একটি মাত্র দ্রব্যের চাষ হয়—সে ধান। ধান কাটা হয়ে গেলেই শূন্য মাঠ হা, হা করতে থাকে; পর বৎসর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে আবার ধানের চাষ আরম্ভ হয়। তাই তখন মাঠের শোভা অতি ভয়ানক। আমি পাল্‌কীর মধ্য থেকে সভয়ে চেয়ে দেখলাম, এত বড় প্রান্তরের মধ্যে একটা কি বড় গাছ নেই, যার তলায় একটু আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। একে এই জনমানবহীন প্রান্তর, তাতে বৈশাখের মধ্যাহ্নের অনলবর্ষী সূর্য্যকিরণ—আমি পালকীর মধ্যে বসে মধ্যাহ্নের এই ভীষণ মূর্ত্তি দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—প্রকৃতির এই দৃশ্য আমার কাছে একবারে নূতন—একেবারে অপূর্ব্বদৃষ্ট! কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই প্রখর রৌদ্রের তাপে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে বেহারারা তাদের সেই শব্দ মাত্রে পর্য্যবসিত হুঙ্কার করতে করতে একই-ভাবে চল্‌ছে—মাঝে মাঝে কেবল কাঁধ বদলাবার জন্য এক একবার থামছে। আমি এদের এই কষ্ট-সহিষ্ণুতা দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম।

এইভাবে বোধ হয় মাইল দুই-তিন গিয়ে তারা পথের পাশে একটা জায়গায় পাল্‌কী নামালে। আমি রোদের জালায় কিছুক্ষণ আগে থেকে চোক বুঁজে ছিলাম। হঠাৎ পালকী ভূমি স্পর্শ করায় আমি দেখ্‌লাম একটা বটগাছের ছায়ায় পালকী নেমেছে। তার পরেই দেখি বেহারারা সেই বটগাছের গোড়ায় গিয়ে নতমস্তকে প্রণাম করল। আমি আর তখন পালকীর মধ্যে ব'সে থাক্‌তে পারলাম না, পালকী থেকে নেমে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি বটগাছের গোড়ায় ছোট একখানি কুটীর—আর তার মধ্যে কয়েকটা জলের জালা ও কলসী। এক জন লোকও সেখানে ব'সে আছে। বুঝতে পারলাম যে, কোন সদাশয় মহাত্মা এই প্রান্তরের মধ্যে, এই একটীমাত্র বটগাছের ছায়ায় পথিকদের তৃষ্ণা দূর করবার জন্য জলছত্র খুলেছেন। বিশেষ বিবরণ জানবার জন্য সেই কুটীরের সম্মুখে যেতেই আমার বেহারাদের একজন বল্‌ল' বাবু, জল খাবেন কি?

আমি বল্‌লাম—জল পরে খাব; আগে শুন্‌তে চাই, কে এই জলছত্র দিয়েছেন। বেহারা বল্‌ল—সে অনেক কথা বাবু। আপনি এই ছায়ায় বসুন, আমি বল্‌ছি।

তার কথামত সেই বটগাছের ছায়ায় বসে সত্য সত্যই আমার শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। যে বাতাস বইছিল তা আগুন-মাখা হ'লেও আমার কাছে স্নিগ্ধ বোধ হ'ল তখন সেই বেহারা যা বলেছিল, এত দিন পরে তাহার ভাষায় ঠিক ঠিক সে কাহিনী আমি বল্‌তে পারব' না; কিন্তু সে যে ইতিহাস বলেছিল, তার একটা বিবরণও আমি ভুলি নি। সে বলেছিল—

বাবু, এই যে মাঠ দেখ্‌ছেন এর নাম আগে ছিল বিশ হাজারী মাঠ। এর মধ্যে বিশ হাজার বিঘে জমী আছে না কি। এখন এই মাঠের নাম হয়েছে ভাতারমারীর মাঠ। এ নামও শুনেছি এই পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে

দেওয়া; আমরা তখন জন্মাই নি। এই যে বটগাছটি দেখ্‌ছেন, এরও বয়স ঐ পঞ্চাশ-ষাট বছর।

তার পর সে যে কাহিনী বল্‌ল, তা আমি আমার ভাষাতেই বল্‌ছি। এই স্থান থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা গ্রাম আছে; তার নাম এলাইপুর। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এই এলাইপুরে মহেশ দাস নামে এক জন মাহিষ্য চাষী বাস করত। এখন যেখানে বটগাছ জন্মেছে, সেই জমী ঐ মহেশ দাসেরই ছিল। সে নিজেই ঐ জমী চাষ করত'। জমীর পরিমাণও বেশী নয়—এই দুই বিঘে কি আড়াই বিঘে। এই জমীটুকু চাষ করবার জন্য মহেশ অন্য জন-মজুরের সাহায্য নিত না, কারণ তাদের পারিশ্রমিক দেওয়ার সামর্থ্য মহেশের ছিল না। দূরবর্ত্তী গ্রামগুলির কাছে যে সব জমী ছিল, কৃষকেরা সে সকল জমী যখন তখনই চাষ করত, কিন্তু এই প্রকাণ্ড প্রান্তরের মাঝখানে যে সমস্ত জমি, সে গুলি চাষ করবার জন্য চাষীরা খুব ভোরে জমীর উপর আসত'; বেলা আটটা-নয়টা পর্য্যন্ত চাষ করত'; তার পরই বাড়ী চলে যেত, কারণ মাঠের মাঝে না আছে ছায়া, না পাওয়া যায় জল; দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে কি এ হেন স্থানে চাষ করা যায়?

একদিন মহেশের কি দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল। সে তার স্ত্রীকে প্রাতঃকালে বলল যে, সে তার লাঙ্গল ও দুইটা গরু নিয়ে মাঠের মাঝের জমী চাষ করতে যাবে। দুপুর বেলা সে আর ঘ'রে আসবে না। সারাদিনই মাঠে থেকে সবটা জমী চাষ করে সন্ধ্যার সময় সে ঘরে ফিরবে—রোজ রোজ এই দুকোশ পথ যাওয়া-আসা সে করতে পারবে না। তার স্ত্রী সে কথার প্রতিবাদ ক'রে বলেছিল, এই রোদের মধ্যে সারাদিন সেই মাঠের মাঝে থাকা ঠিক হবে না, সেখানে না আছে ছায়া, না পাওয়া যায় জল। তারও কষ্ট হবে, বলদ দুটাও মারা যাবে। মহেশ সে কথা কাণেও তুলল' না, সে বলল',—"দেখ, তুমি এক কাজ কর'। দুপুর বেলার আগেই আমার জন্য কিছু চিড়ে মুড়ি আর এক কলসী জল নিয়ে মাঠে যেও। আমি তাই খাব, আর বলদ দুটোকেও জল খাওয়াব।" তার স্ত্রী বলেছিল এতটা পথ এখন যাবে, ঘটিখানেক জল সঙ্গে নিয়ে যাও। যদি সকাল সকাল আসতে পার তা হলেই ভাল হয়। এক প্রহর বেলার পরও যদি তোমাকে ফিরে আসতে না দেখি, তা হ'লে তোমার খাবার, আর এক কলসী জল নিয়ে আমি মাঠে যাব।"

মহেশ এই ব্যবস্থা ঠিক করে লাঙ্গল গরু নিয়ে মাঠে চলে গেল, তার স্ত্রী হরিমতি গৃহকার্য্যে মন দিল।

হরিমতি ভেবেছিল তার স্বামী এই নটা-দশটার মধ্যে ঠিক ফিরে আসবে—দুপুর রৌদ্রে কার সাধ্য যে ঐ তেপান্তর মাঠের মাঝখানে থাকে। কিন্তু সে ভুল বুঝেছিল। বেলা যখন বেড়ে গেল, হরিমতি তখনও একবার ঘরে যাচ্ছে, একবার বাইরে এসে পথের দিকে চাইছে। এমনি করতে করতে বেলা যখন দুপুরের কাছে গেল, তখন হরিমতি আর অপেক্ষা করতে পারলে না; সে কিছু মুড়কি আর বাতাসা আঁচলে বেঁধে আর একটা মেটে কলসী ভ'রে জল নিয়ে সেই মাঠের দিকে যেতে লাগল। কম পথ তো যেতে হবে না? আর এই প্রচণ্ড রোদের মধ্যে। হরিমতি জলের কলসীটা একবার কক্ষে নেয়, আঁচল দিয়ে বিড়ে পাকিয়ে মাথায় দিয়ে তার উপর কলসীটা বসিয়ে জমির আ'ল ধরে যেতে লাগল।

এদিকে মহেশ বেলা দশটা পর্য্যন্ত চাষের কাজেই নিযুক্ত ছিল। দশটার পরে যখন রোদ বেড়ে উঠ্‌ল, তখন সে একবার মনে করল বাড়ী ফিরে যায়, আবার ঠিক করল, আর একটু কাজ করলেই সবটা জমী চাষ করা হয়ে যায়—এই তো আর একটু পরেই হরিমতি খাবার ও জল নিয়ে আসবে, তখন না হয় দুজনে এক সঙ্গেই বাড়ী ফেরা যাবে।

ঘণ্টাখানেক যেতেই জল-তৃষ্ণায় মহেশের গলা কাঠ হ'য়ে গেল। সেই বেলা সাতটা থেকে এই বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রের মধ্যে সে কাজ করেছে—তৃষ্ণার আর অপরাধ কি? সে তখন আর লাঙ্গল চালাতে পারল না—নিকটে গাছপালাও নেই যে, তার ছায়ায় বসে। মহেশ অধীরভাবে পথের দিকে চাইতে লাগ্‌ল—তার শরীর অবসন্ন হ'য়ে পড়ল, চোক বুজে আসতে লাগল, সেই জনহীন প্রান্তরের মধ্যে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় সে পথের দিকে চেয়ে রইল, এমন শক্তি তার নেই যে, তিন মাইল পথ হেঁটে তখন বাড়ী যায়।

মহেশ একবার চোক বুজে শুয়ে পড়ে, আবার উঠে

পথের দিকে চায়। জল—জল—ওগো একটু জল! কিন্তু কোথায় জল—কোথায় হরিমতি।

"তার পর বাবুজি, কি আর কব। মহেশ তেষ্টার জ্বালায় পাগল হ'য়ে গিয়েছিল, পরাণ বা'র হবার আর দেরী ছিল না। এমনি সময় সে দেখলে তার ইস্তিরী মাথায় জলের কলসী নিয়ে আসছে। মহেশ আর তখন বসে থাকতে পারলে না, একেবারে পাগলের মত উঠে দৌড়ল তার ইস্তিরীর দিকে—আর সবুর চলে না—ঐ তো জলের কলসী।

"তেনারে ছুটে আসতে দেখে তেনার ইস্তিরী ভাবল, ত'র দেরী হ'য়ে গেছে, তাই বুঝি তার স্বোয়ামী ত্যকে মারবার তরে ছুটে আসছে। সে তখন ভয় পেয়ে যেই বেসামাল হয়েছে, অমনি তার মাথার উপর থেকে কলসীটা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। এই না দেখেবাবুজি, মহেশ ঠিক এইখানডায়, যেখানে আপনি বসে আছেন, সেইখানে আপ্রাণ চেষ্টায় কি যেন ব'লে মাটীতে পড়ে গেল —আর তো জল পাবার উপায় নেই ভেবে তার দম আটকে গেল— এই ঠিক এইখানডায়—আর মহেশ উঠল না। তার ইস্তিরী কি হ'ল ঠাহর করতে না পেরে দৌড়ে এসে ঠেলা দিয়ে দেখে মহেশের সাড়া নেই। হরিমতি তখন চেঁচিয়ে উঠে তার স্বোয়ামীর মাথাটা কোলে নিয়ে এইখানডায় বসল।

বোশেখ মাসের বেলা গড়িয়ে গেল হরিমতি যেমন ব'সে ছিল, তেমনি ব'সে রইল। বিকেল বেলায় তার পাড়াপড়শীরা তাকে ঘরে না দেখে খুঁজতে খুঁজতে এই জায়গায় এল। হরিমতি তখনও সেই ভাবে ব'সেই আছে। মেয়েরা এসে তার গায়ে ঠেলা দিতে তার হুঁস হ'ল। সে ডুকরে কেঁদে উঠে অতি কষ্টে সব কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেল, তার মাথাটা তার স্বোয়ামীর বুকের উপর ঝুকে পড়ল। যারা এসেছিল তারা, কি হ'ল, কি হ'ল ব'লে তার গায়ে ঠেলা দিয়ে দেখে সতীলক্ষ্মী স্বোয়ামীর সঙ্গে চ'লে গিয়েছে। বাবুজি, আপনি যেখানে বসে আছেন, আমার বাবার মুখে শুনেছি, ঠিক ঐখেনেই তারা পরাণ দিয়েছিল। তাই তার পর হতে এই মাঠের নাম হ'য়েছে 'ভাতার-মারীর মাঠ'। আর বাবুজি, এই যে বটগাছ দেখছেন, আমাদের মনিব তারকবাবুর বাবা গঙ্গাধরবাবু এই বটগাছ পিত্তিষ্ঠে ক'রে দিয়ে গেছেন। তিনি এখানে একটা পুকুর দিতে চাইছিলেন; কিন্তু বটগাছ দেবতা কি না; তিনি রেতের বেলায় গঙ্গাধরবাবুকে স্বপন দিয়ে ব'লে গেলেন, তুই এখানে পুকুর কাটাসনি, জলছত্তর দে। যদ্দিন এখেনে জলছত্তর রাখবি তদ্দিন লক্ষ্মী তোর ঘরে অচলা হবে। তারই জন্যই তো বাবুজি গঙ্গাধর বাবু সগ্গে গেলেন তাঁর পুত্তুর আমাদের মনিব এই জলছত্তর চালাচ্ছেন। এলাইপুরে মহেশের বাড়ীর উপর পুকুর কাটিয়ে দিয়ে সেই জল আনিয়ে এই জলছত্তরে রোজ রোজ বারমাস পথচলতি লোকের জল খাওয়ানোর বেবস্থা করেছেন। মহেশ যে জল জল করেই এখানে পরাণ দিয়েছিল—তার ইস্তিরী যে এখান থেকে আর ঘরে ফিরে যায় নি বাবুজি।

এই কাহিনী সেই দুপুর রৌদ্রের গাছতলায় ব'সে শুনতে শুনতে আমি দেশ-কাল ভুলে গিয়েছিলাম। আমি তখন আমার ঝাপসা-চ'খে দেখতে পেয়েছিলাম মহেশ আর হরিমতির দেব-মূর্ত্তি; শুনতে পেয়েছিলাম তৃষ্ণাকাতর মহেশের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ; দেখতে পেয়েছিলাম সতীলক্ষ্মী হরিমতির অসহায় মুখ। আর এতদিন পরেও আজ আপনাদের কাছে সেই ভাতার-মারীর মাঠের করুণ কাহিনী বলবার সময় সেই দৃশ্যই আমার চোখের সুমুখে ভেসে উঠছে—সেই মহেশের প্রাণপণ আর্ত্তনাদ—জল! জল! একটু জল। অনেক কাল আগে কারবালার প্রান্তরে একদিন এমনই ভাবে জল, জল, একবিন্দু জল ব'লে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ উঠেছিল—আর এই নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে—এই ভাতার-মারীর মাঠেও একদিন সেই কাতরধ্বনি 'জল, জল একবিন্দু জল' মহেশের মুখ থেকে শেষ উচ্চারিত হয়েছিল। কারবালা জগতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে—আর এই ভাতার-মারীর মাঠে মহেশের প্রাণ-দানের কথা—সতী-সাধ্বী হরিমতির স্বামীর বুকের উপর প্রাণ-ত্যাগের কাহিনী সেই ভাতার-মারীর মাঠের মধ্যেই হায় হায় করে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

আমি তখন সেই জলছত্রের রক্ষকের সম্মুখে গিয়ে যুক্তপানি হ'য়ে জল খেলাম—শরীর মন পবিত্র হয়ে গেল—এ যে সতীকুণ্ডের জল। তারপর মহেশ-হরিমতির উদ্দেশে সেই বটগাছকে প্রণাম ক'রে আমি পালকীতে উঠে বসলাম সেই নিস্তব্ধ জনহীন ভাতার-মারীর মাঠের মধ্য দিয়ে আমার পালকী গন্তব্য স্থানের অভিমুখে চলতে লাগল।*

---

* 'রবি-বাসরের' ষোড়শ অধিবেশনে পঠিত।

বাদল-বিরহ

[বন্দে আলী মিয়া]

ঘোলাটে মেঘে আজ ভাঙ্গন লেগে গেছে,—
অঝোর ধারা বেয়ে ঝরিছে জল।
তমাল-শাল বীথি ভিজিয়া হ'ল'সারা
নাচিয়া হাসিতেছে যূথীর দল।
পূবের মাঠখানি সবুজ ঘাসে ঢাকা
আগাছা ভ'রে গেছে বুকের 'পর ;
বাব্‌লা চারা গাছে কাঁপন লাগিয়াছে,
ব্যথায় দুলে কাঁদে ও উলুখড়।
বাতাসে দোলা লাগে আমের শাখে শাখে
ফুলেলা নিমগাছ হাসিয়া তারে ডাকে,
মাঝের ব্যবধান ঘুচেনা যেন আর,
তার এ বেদনার নাহি যে তল।
তাপসী হিয়া মোর কাঁদিছে পথ চেয়ে
আজিকে সাথীহীন নিজন ঘর ;
তোমারে হারাইয়া নিখিল বেদনা যে
নেমেছে ভীরু মোর বুকের 'পর ;—
আমার বিরহ যে আকাশে ছেয়ে গেছে,
মেঘের মাঝে তার পেয়েছে পথ,
বাদল বায়ু সাথে সুদূর লোক পানে
চলিছে দিশেহারা মানস-রথ।
আজিকে অবেলায় বাদল-ছায়া মাঝে
জলের ধারা সনে যে-সুরধ্বনি বাজে,
সে যে গো চেনা মোর স্বপনে কহে কথা
মনের দরপণে সে অগোচর।
আজিকে পরবাসে কেবলি গণি দিন,
কবে যে দেখা হবে তোমারি সাথ ;
দীর্ঘ দিন আর কাটিতে চাহে না গো,
তাহার পরে আসে দীরঘ রাত—

প্রাণের সাথীহারা একেলা শয়নেতে
বুকের সাথে আজ তোমারে চাই ;
ঘুমের ঘোরে যেন তোমারে কাছে লভি,
মেলিয়া আঁখি আর নাহিক পাই।
যেথায় শুয়ে তুমি হাসিতে মোর সনে
সেথায় খালি দেখি কি ব্যথা বাজে মনে !
সহসা বিনা মেঘে ফুলের মায়া-বনে
হয়েছে যেন প্রিয়া অশনিপাত।
তুমিও সেথা বুঝি আমার লাগি আজ
করোনি প্রসাধন—বাঁধোনি চুল,
মেঘের পানে চাহি' সেজেছে বিরহিণী,
সকল কাজে বুঝি হ'তেছে ভুল ?
সকল বাধা ঠেলি দুঁহুর মন আজ
দোঁহার কাছে যেতে কেবলি চায় ;
আমার ভালবাসা পূবের বায়ু করে
পাঠায়ে দিনু তব উপোষী হিয়া তরে,
তাহারে বুকে ধরি' অ-থির চুমো দিয়ে
হয়োনা প্রিয়তমা, বেদনাকুল।
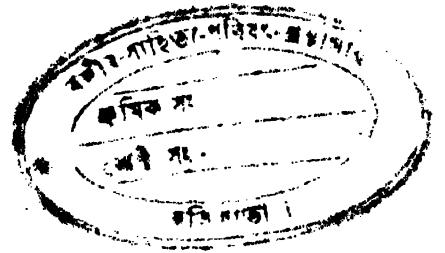
নিশীথ রাতে

(গল্প)

[শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী]

এক

"ওঃ হো। ক্যায়সী আঁধেরী রাত!"

বর্ষার অন্ধকার রাত্রি। আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন। কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুকেশিনীর কৃষ্ণকুন্তলে হীরার ফুলের মত দু'টী একটী তারা ফুটে ঝিক্-মিক্ ঝিক্-মিক্ করিতেছিল।

মুক্ত বাতায়ন পথে দুর্য্যোগভরা অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ নির্জ্জন ঘরে একলাটী শুয়েছিলাম, কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। আত্মীয় পরিজন-বর্জ্জিত বনাকীর্ণ, অজানা অচেনা স্থানে আমি একা, আমার মনের অবস্থা তখন নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত যক্ষের মত।

অদৃষ্টে নিতান্তই বনবাস ছিল, নহিলে অমন সুবিধায় চাকরীতে ইস্তফা দিয়া এই চা-বাগানে আসিতে হইবে কেন?

যেখানে দুটী দিন দুটী যুগ বলিয়া মনে হয়, সেখানে বার মাস বাস করা—পোষাবে কি? বিছানায় নিঝুম হইয়া পড়িয়া এই সব কথাই ভাবিতেছিলাম। অস্থির মনের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা যেন সেই বর্ষা-নিশীথের অবিচ্ছিন্ন গাঢ় স্তব্ধতা ও অন্ধকারের মতই ঘোরাল হ'য়ে উঠ্ছিল—সেই সময় আমার চিন্তাচ্ছন্ন মনকে সহসা সচকিত করিয়া জানালার দিকে ত্রস্ত মৃদুস্বরে কে বলিয়া উঠিল,—"ওঃ হোঃ ক্যায়সী আঁধেরী রাত!"

সঙ্গে সঙ্গে জানালায় কার ছায়া পড়িল এবং একটা সুদীর্ঘ গাঢ় নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা গেল।

আমি বাস্তবিক চমকিয়া উঠিলাম; এই দুর্য্যোগের আঁধার রাতে কে ওখানে! চকিত-কণ্ঠে বলিলাম—"কে ওখানে, কোন হ্যায়?"

ছায়াটা সরে এল, এবার স্পষ্ট দেখিতে পেলাম, ছায়া-মূর্ত্তি নয়, কে একজন দীর্ঘকায় পুরুষ, জানালার গরাদে মুখ রাখিয়া মিনতি-করুণ-কণ্ঠে,ব্যগ্রতার সহিত ডাকিতে লাগিল "অরে মোহন!—মোহন ভাই! উঠ্ ভাই! জল্‌দি! জল্‌দি!"—

কি ব্যাকুল, কি আর্ত্ত সেই আহ্বান!

আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম।

ঘরের কোণে-রাখা হেরিকেনটা তুলিয়া নিয়া জানালার কাছে ছুটিয়া গেলাম।

ল্যাম্পের আলোয় অস্পষ্ট সুস্পষ্ট হইয়া গেল। এ যে আমার সহকর্ম্মী মুন্সী সুজন সিং!

কিন্তু লোকটার চেহারা কি অস্বাভাবিক বিবর্ণ দেখাইতেছিল। তার আধনিমীলিত চক্ষু দুটীতে কি স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব—দেখে বোঝা যায় না, সে ঘুমন্ত না জাগ্রত

আলোটা তার দিকে উঁচু করিয়া ধরিয়া আমি শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম:—"একি মুন্সিজী! এতরাত্রে এখানে এসে কাকে—?

উজ্জ্বল আলোর রেখা চোখের উপর পড়িতেই সুজন সিং যেন স্বপ্নঘোর থেকে জাগিয়া উঠিল; তারপর আমার মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণ চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "ওহো! বাবুজী! মাফ্ কর্ না, ম্যায়—"

বলিতে বলিতেই হন্ হন্ করিয়া তার কোয়ার্টারের দিকে চলিয়া গেল, সুতরাং কথার শেষটা শুনিতে পাই-লাম না।

অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায় তার পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার!

দু-তিন দিনের স্বল্প আলাপে এই সুজন সিংএর পরিচয় যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয়, লোকটা বাস্তবিক ভদ্রসন্তান। কথাবার্ত্তায় খুব অমায়িক। বয়স ছাব্বিশ সাতাশের বেশী হইবে না।

বাঙ্গালী-সংস্পর্শহীন চা-বাগানে, সম্পূর্ণ বিদেশী কর্ম্ম-চারীদের মধ্যে এই একটী লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়াই

মনে একটু সান্ত্বনা পাইতাম,—তাকেই আমার ভাল লেগেছিল। উভয়ের বয়স ও অবস্থার সমতাই হয় তো এই ভাল লাগার কারণ।

সুজন সিং পাহাড়ী রাজপুত; দেশে তার আত্মীয় স্বজন কে আছে জানি না, এখানে সে একাই থাকে। আমিও একা, তাই প্রথম পরিচয়েই তার সঙ্গে আমার একটু বন্ধুতার ভাব আসিয়াছিল, কিন্তু এই দুর্য্যোগের রাত্রে সে ঘুম থেকে হঠাৎ উঠে এসে চুপি চুপি চোরের মত আমার ঘরে উ কি মারছিল কেন? আর 'মোহন' 'মোহন' ব'লে অমন কাতরভাবে, ব্যাকুল আগ্রহেই বা ডাকিতেছিলই বা কাহাকে, কিছু বোঝা গেল না। ব্যাপারটা যে বড় রহস্যময় ঠেকিতেছিল।

মনে বিস্ময়, সংশয়, কৌতুহল একসঙ্গে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, ইচ্ছা হইল আলো নিয়া সুজন সিঙের নিকট জানিয়া আসি ব্যাপার কি? কিন্তু অতরাত্রে ভদ্রলোকের বাড়ী চড়াও হইয়া যাওয়াটা সমীচীন নয়, বিশেষ লোকটা যখন অপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গেল।

তখন কি আর করি, মনের অদম্য কৌতুহল সবলে দমন করিয়া বিছানায় আশ্রয় লইলাম।

এবার বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল, প্রথমে টিপি টিপি, তার-পর মুষল ধারে। অনেক ক্ষণ ঘুম আসিল না বাদল-ধারার অশ্রান্ত ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দের মধ্যে যেন কেবলই কাণে বাজিতেছিল সেই বেদনা-মথিত কাতর আহ্বান-ধ্বনি "মোহন! মোহন ভাই!

দুই

সকালে আকাশ বেশ পরিষ্কার, দুর্য্যোগের কোন লক্ষণই ছিল না। আমাদের কারখানায় চায়ের ওজন হইতেছিল, তাই কাজের বড় ভিড়। কিন্তু সকল ব্যস্ততার মধ্যে আমি সুজন সিঙের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে চোখো-চোখি হইবামাত্রই সে যেন তাড়াতাড়ি কুণ্ঠায় সঙ্কোচে অপরাধীর মত দৃষ্টি অবনত করিয়া লইল। তাহার ভাবান্তর দেখিয়া আমার বিস্ময়-কৌতুহল আরও অদমনীয় হইয়া উঠিল। এই পাহাড়ী যুবকের জীবনে নিশ্চয়ই কোন বিচিত্র রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে এবং রহস্যের রুদ্ধ দুয়ার উদ্ঘাটন আমাকেই যেমন করিয়া হউক করিতে হইবে। অধীর চিত্তে আমি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

দুপুর বেলা আমাদের আহার এবং বিশ্রামের জন্য দু' ঘণ্টা ছুটী, আমাদের কোয়াটার কারখানা হইতে বেশী দূরে নয়। সুজন সিং আর আমার একই পথ। সেই জন্য রোজই আমরা গল্প করিতে করিতে এক সঙ্গে আসি-তাম, একই সঙ্গে ফিরিতাম, আজ কিন্তু সুজন সিঙের মুখে কথা ছিল না। আজ যেন সে বড় উন্মনা, বড়ই উদাস।

নীরবে পথ চলিতে, চলিতে মৌনতা ভঙ্গ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"মুন্সিজী! আপনার সঙ্গে আমার একটী কথা আছে, অবশ্য আপনি যদি কিছু মনে না করেন—"

সুজন সিং যেন চম্‌কিয়া উঠিল। চকিত ম্লান দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া সে ব্যথিতস্বরে বলিল, "ওঃ! বুঝেছি আপনি কি কথা বলতে চান, কিন্তু বাবুজী! সেতো এখন হ'তে পারে না, সন্ধ্যার পর যদি একবারটী আমার বাসায় আস্‌তে পাবেন—"

"পারব না আবার!" বলিয়া আনন্দ-গদ্‌গদ্-কণ্ঠে বলিলাম—পাগ্‌লা ভাত খাবি না হাত ধোব কোথায়!" সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তর সহিল না, তার আগেই আমি মুন্সিজীর বাসায় হাজির। সুজন সিং তখন নির্জ্জন ঘরে সম্ভবতঃ আমারই প্রতীক্ষায় খাটিয়ার ওপর চুপটী করিয়া বসিয়াছিল।

আমাকে হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইয়া সে মৃদু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "খুব আগ্রহ হচ্ছে আপনার, না? কাল রাতের ব্যাপারটা জানবার জন্যে—"

"নিশ্চয়ই আমি সারা দিনমান ছট ফট্ করেছি মুন্সিজী! আপনি অত রাত্রে যে কেন অমন করে—"

"এ আমার জ্ঞানকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বাবুজী! কত দিন হ'য়ে গেল তবু এ ভোগের আর বিরাম নেই, কখনও হবে কি না তাও জানি না।" লোকটার কাতরতা দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল, আমি বলিলাম, "থাক্ যদি কষ্ট হয় বলতে, তা হ'লে কাজ নেই ব'লে—"

মর্ম্ম মথিত করা তপ্তদীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল :—"কষ্ট তো আমার সারা জীবন

তোর আছেই বাবুজী। এ রাবণের চিতা যে এ জীবনে নিববার নয়। উঃ!—"

সুজন সিং স্তব্ধ হইয়া রহিল, তার বুকের ভিতর যে তখন কি তুফান উঠিতেছিল, তাহা তাহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়াই বেশ বোঝা যাইতেছিল।

খানিক পরে আর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিতে লাগিল,—

"বছর দুই আগে আপনি এখন যে কাজ করছেন এই হেডক্লার্কের পদে বাহাল হ'য়ে এসেছিল মোহন সিং। সে আমার স্বজাতীয়, পাহাড়ী রাজপুত এবং আমারই সমবয়স্ক।

প্রবাসে দেশের লোক দেখলেই আনন্দ হয়, তারপর মোহনের সঙ্গে আমার বয়স, অবস্থা এবং স্বভাবেরও মিল ছিল, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই আমরা দুজনে পরস্পর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ'য়ে পড়লুম। সে বন্ধুতা যেমন তেমন নয়, যাকে বলে এক আত্মা, এক প্রাণ।

অফিসের সময় ছাড়া আমরা সর্ব্বক্ষণই প্রায় এক সঙ্গে কাটাতুম। পৃথক কোয়ার্টার নিতে হয়েছিল শুধু নিয়ম-বিরুদ্ধ ব'লে।

বন্ধু মোহনের সাহচর্য্যে আত্মীয়-স্বজন-হীন প্রবাসে থেকে দিনগুলি বড় আনন্দে কেটে যাচ্ছিল। এমনি ক'রে একটা বৎসর কেটে গেল। তারপর মোহনের যেন কেমন ভাবান্তর দেখতে পেলুম। সে এখন আর প্রাণ খুলে আমার সঙ্গে গল্প করে না, হাসে না, আমার বন্ধুতা, আমার সঙ্গ যে তাকে পূর্ব্বের মত আনন্দ দিচ্ছে না, তাও বুঝতে পারলুম, কিন্তু কেন? মোহনের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

আমাদের এষ্টেট্ থেকে দেরাদুন সহর প্রায় দেড় ক্রোশ পথ, মোহন আগে কখনও কচিৎ শহরে যেত, অনিবার্য্য প্রয়োজনে তাও আমারই সঙ্গে। কিন্তু এখন অফিসের ছুটীর পর, প্রায়ই বেরিয়ে পড়্‌ত, ফিরত' সন্ধ্যার পর, কখনও রাতও হ'য়ে যেত'. জিজ্ঞাসা করলে বলত' একটা দরকার ছিল; কিন্তু রোজ রোজ বর্ষার অন্ধকার রাতে ও বন্যাকীর্ণ নির্জ্জন পাহাড়ী রাজ্য ভেঙ্গে এতদূরে আনাগোনা করতে হয়, এমন কি দরকার তার? একথার উত্তরে 'বিশেষ কাজ আছে' ব'লে সে কখনও একটু হাস্‌ত, কখনও অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ত'।

যা হোক, দরকার ঘন ঘনই পড়্‌তে লাগল। এখন মোহন আরও রাত করে ফেরে, এক একদিন সেই খান থেকেই খাওয়া-দাওয়া সেরে আসে। আমার মনে শুধু সংশয় নয়, আশঙ্কা, ও উদ্বেগ ঘনিয়ে এল। বন্ধুর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র কলুষিত হল না কি?

একদিন অনেক পেড়াপিড়িতে আসল কথা জানতে পারলুম, মোহন বিয়ে করছে। পাত্রী এই দেরাদুনেরই এক পদস্থ ব্যক্তির সুন্দরী কন্যা।

আমি মোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু, কিন্তু এ শুভ সংবাদে যত খানি খুসী হওয়া উচিত, বাস্তবিক তা হ'তে পারলুম না, বরং অন্তরের কোথায় যেন একটা ব্যথা লাগল' মনে হ'ল। মোহন অভেদাত্মা বন্ধু হ'য়েও এ সুসংবাদ আমার কাছে গোপন রেখেছিল কেন? এত পেড়াপিড়ি ক'রে না ধরলে হয় তো এখনও সে প্রকাশ করত' না।

আমার সাভিমান অনুযোগের উত্তরে সে বিষণ্ণ গম্ভীর-মুখে, শুষ্ককণ্ঠে, বললে, 'কথাটা তোমাকে আমি কবেই জানাতুম, কিন্তু—'

আমি উত্তরে ব্যাকুল আগ্রহে বললাম—"কিন্তু কি? বলো, আমার কাছে এ সুসংবাদ এতদিন গোপন রেখে-ছিলে কেন? আমি কি তোমার—"

সে উত্তরে বল্‌লে—"সুজন! তুমি জানো না, যাকে তুমি সুসংবাদ বলছ', সেটা তোমার পক্ষে ঠিক সুসংবাদ না, দুঃসংবাদ, সেই জন্যই এতদিন চেপে রেখেছিলুম, নইলে তোমার কাছে আমার লুকোনো কি আছে?" আমি কথাটা শুনে শুধু বিস্মিতই নয় দুঃখিতও হ'লুম?

বন্ধুর আনন্দ সংবাদ আমাকে পীড়া দেবে, এ ভ্রান্ত ধারণা মোহনের মনে এল কেমন ক'রে?

মনের ক্ষোভ ও অভিমান প্রকাশ না ক'রে আমি রহস্য-চ্ছলে হাসতে হাসতে বল্লুম, 'এ রকম অদ্ভুত ধারণা তোমার মনে এল কেমন করে বলো দেখি? তোমার সুখে আমি সুখী হব না? হিংসা করব? কেন? বিয়ে করে একবারে পর হবে? বন্ধুর পাওনা-গণ্ডাও তাকেই দিয়ে ফেলবে বুঝি, কিন্তু আমি তো ছাড়ব না, আমার পাওনা তোমাদের দুজনের কাছ থেকেই জোর করে আদায় করে নেব'।

মোহনের মুখ-চোখ লাল হ'য়ে উঠল'। একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে কাতরভাবে বল্লে—'সুজন! ভাই! তুমি যে আমার যথার্থই সুখে সুখী, তা আমি জানি, কিন্তু তুমি জানো না আমি'—কথাগুলো যেন মোহনের গলায় বেধে যাচ্ছিল, তাকে থামতে দেখে—আমি অধীর আগ্রহে তার হাত দুখানা ধ'রে বললুম, –'আমি যা জানি না সেটা আমায় জানিয়ে দাও না, ভাই! এ যে সব হেঁয়ালী মনে হচ্ছে।'

অপরাধীর মত নতমস্তকে কুন্ঠিত স্বরে মোহন বললে—

'আমি যাকে বিয়ে করছি, সে তোমার অচেনা নয়, তাকে তুমি খুব ভাল ক'রেই জানো, আর সে, সেও তোমাকে—'

'অ্যাঁ সত্যি? সে কে বলো দেখি?'

'সুভদ্রা, তেজসিংয়ের মেয়ে।'

আমার বুকের ভেতর যেন সজোরে হাতুড়ীর ঘা পড়ল'। সারা অঙ্গ তড়িৎস্পৃষ্টের মত শিউরে কেঁপে উঠল'। সুভদ্রা! সেই সুভদ্রা! আঃ! যার রূপ-যৌবন, যার ভালবাসা আমাকে একদিন মৃগতৃষ্ণিকার মায়ায় মুগ্ধ ও লুব্ধ ক'রে তুলেছিল, যার স্মৃতির প্রতিমা এখনও আমার অন্তরের অন্তস্তলে গোপনে বিরাজ করছে, যাকে পাবার আশা এই দীর্ঘ দিনের চেষ্টাতেও মন থেকে মুছে ফেলতে পারি নি, সেই সুভদ্রা, আমার দীর্ঘ দিনের আপনার ধন সুভদ্রা, সে এখন মোহনের অঙ্কলক্ষ্মী হ'বে! শুধু তাই নয়, তাদের মিলন-উৎসবে আমন্ত্রিত হ'য়ে আমাকেও যোগদান করতে হ'বে, এবং হয় তো তাদের প্রেমলীলাও নিত্য চোখের সুমুখে নির্ব্বিকারভাবে দেখতে হবে, উঃ! ভগবান! এত বিড়ম্বনা অভাগার ভালে লিখেছিলে!

সেই মুহূর্ত্তে আমার বন্ধু-প্রীতিমুগ্ধ চিত্ত বিরূপও কঠিন হ'য়ে গেল; সমস্ত অন্তরাত্মা বন্ধুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল'। অন্তরের সুকুমার কোমল বৃত্তিগুলি সবলে দলিত, পিষ্ট ক'রে দিয়ে রাক্ষসী মূর্ত্তিতে জেগে উঠল' প্রতি-হিংসা,—জ্বালাময়ী ভীষণ প্রতিহিংসা!

সুভদ্রার পিতা তেজসিং, তখন আমাকে প্রত্যাখান করেছিলেন, আমার যৌবনের আশার স্বপ্ন অতি নিষ্ঠুর-ভাবে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, আমি তার দুহিতার অযোগ্য পাত্র ব'লে, কিন্তু এখন? রূপ-গুণ-বিদ্যায়, মোহন আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হ'ল কিসে

সে আমার চেয়ে গোটা কতক টাকা বেশী বেতন পায় এইটুকুই তো তফাৎ! মোহনকে মেয়ে দিলে তা'র মান সম্ভ্রম খর্ব্ব হবে না?"

তাহার আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। অন্তরের দুঃখ জ্বালা গলিয়া অশ্রুরূপে, প্রবল ধারায় পড়িতে লাগিল। আমিও নির্ব্বাক-বিস্ময়ে তাহার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

তিন

অনেকক্ষণ পরে একটা ক্ষোভের নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুজন সিং আবার বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল—

"মানুষের মনের ছবি বোধ হয় মুখেও প্রতিফলিত হয়, তাই আমার মুখ পানে চেয়ে মোহন তখন চমকে উঠল', যেমন প্রেতাত্মা দেখলে লোকে চমকে ওঠে।

আমার হাত দুখানা কোলের ওপর টেনে নিয়ে মিনতি-করুণ কাতরকণ্ঠে সে বলিল, "সুজন! আমাকে ক্ষমা ক'র, ভাই! আমি তোমার কাছে অপরাধী, কিন্তু এ অপরাধ আমার ইচ্ছাকৃত নয়। আমি যদি আগে জানতুম সুভদ্রাকে তুমি—"

বাধা দিয়ে বললুম, "সে যা হবার হয়েছে, তার জন্যে আমার মনে কোনও আপশোষ নেই। তবে আমি না কি তোমার বন্ধু, তোমার যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই বারণ করছি, তুমি সুভদ্রাকে বিয়ে ক'র না, মোহন!"

মোহন সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করল'—'কেন?—কেন?'

মোহনের মুখ পাংশু হ'য়ে গেল, উত্তর প্রত্যাশায় নিঃশ্বাস রোধ ক'রে সে আমার দিকে চেয়ে রইল, যেন এই প্রশ্নের উপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে—এমনি ভাবে।

আমি বললুম, 'তোমার ভাল'র জন্যেই বলছি, তেজসিং লোক ভাল নয়—সে আমাকে কি রকম ধোকা দিয়েছে তুমি জান না বোধ হয়—'

'জানি, তেজসিং লোকটা বাস্তবিক বড় দর্পিত, কিন্তু সুভদ্রা,—তার কি দোষ, ভাই! সে যে আমাকে সত্যি সত্যিই……'

ভালবাসে? কথাটা মুখে আনতে এত কুন্ঠিত হচ্ছ

কেন, বন্ধু ?—কিন্তু মেয়েমানুষের ভালবাসায় বিশ্বাস ক'র না, তুমি জেন ও ভালবাসার কোনও দাম নেই। একদিন আমিও মনে করতুম সুভদ্রা আমাকে যথার্থই ভালবাসে, আর এখন—এখন বেশ বুঝেছি, সেটা শুধু আমার মোহ, ভ্রান্তি, আর কিছু নয়।'

মোহন মাথা হেঁট ক'রে সঙ্কোচের সহিত বললে, 'আমি সব শুনেছি, সুভদ্রা বলে সে না কি তখন নিজের মন বুঝতে পারে নি, তারপর বাপের অমতে……

আমার আপাদমস্তক দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠল'। একেবারে স্পষ্টবাক্যে অস্বীকার! উঃ। ছলনাময়ী নারী!

আমার উত্তেজিত মুখের পানে ক্ষমাপ্রার্থীর দীন নয়নে চেয়ে মোহন বললে, 'সুজন! রাগ ক'র না, ভাই। ভেবে দেখ, এতে আমার কি অপরাধ? যদি জানতুম আমি বিয়ে না করলে তোমার আশা আছে তা' হ'লে—'

আমার অন্তরাত্মা রুদ্ধরোষে গর্জ্জে উঠ্‌ছিল—ওরে হতভাগা! আমার আশার ধন, অন্তরের নিধি ছিনিয়ে নিয়েছিস, তোর অপরাধ কি সামান্য,কিন্তু মনের বিরাগ মনে চেপে রেখে আমি বললুম, 'ওসব আশায় আমি জলাঞ্জলি দিয়েছি, মোহন। সুভদ্রা কেন, সংসারে কোনও মেয়েকেই আমি জীবনে ভালবাসতে পারব' না আর, সেই জন্যেই তো বিয়ে করি নি, করব'ও না কখন। ও জাতটারই ওপরে আমার অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে। তবে তুমি যদি বিয়ে ক'রে সুখী হ'বে মনে কর, তা হ'লে—'

'ওঃ। সুখী আমি নিশ্চয়ই হ'ব সুজন! সুভদ্রাকে পেলে আমার জীবনে আর কোনও অভাব, কোনও অতৃপ্তিই থাকবে না।'

বল্‌তে বল্‌তে মোহনের মুখ ও চক্ষু এক অভিনব পুলক-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। উঃ! এত এত দূর!

সমস্ত শরীরের রক্ত আমার তীব্র উত্তেজনায় যেন টগ বগ্‌ ক'রে ফুটতে লাগল'। তখন কোথায় গেল বিবেক-বুদ্ধি আর কোথায় রইল বন্ধুপ্রীতি!

বাবুজী কাসীতে একটা কথা আছে 'জন্‌ জমীন্‌ জর্‌' অর্থাৎ নারী, ভূমি আর সোণা এই তিনটী জিনিসের জন্যই পৃথিবীতে যত বিরোধ, যত অনর্থপাত হ'য়ে থাকে, আমার জীবনে সে কথা প্রত্যক্ষ ঘটে গেল। প্রাণের বন্ধু মোহন সেই দিন থেকে যেন আমার চক্ষুঃশূল হ'য়ে উঠল। কিন্তু মনের বিরোধ-বিদ্বেষ আমার মৌখিক আচরণে প্রকাশ পেত না। প্রতিহিংসার কালানল বুকের মধ্যে গোপন রেখে আমি মোহনের সঙ্গে বন্ধুতার কপট অভিনয় করছিলুম, আর সে বেচারা আমার ছলনায় ভুলে আমাকে যথার্থ বন্ধু জেনে তাদের প্রেমের কাহিনী সমস্তই অকপটে আমার কাছে বলত', কিছুই গোপন করত' না। সে সব কথা শুনে আমার মনে কি হ'ত, তা সেই অন্তর্য্যামীই জানেন। আমার তখন ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল তাদের বিয়ে ভেঙ্গে দেবার, কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ ক'রে দিয়ে বিয়ের দিন দ্রুত ঘনিয়ে আসছিল, তার দুর্নিবার গতি রোধ করতে না পেরে আমি যেন ক্রমে মরিয়া হ'য়ে উঠছিলুম।

সুকৃতির সাহায্যকারী ভগবান, কিন্তু দুষ্কৃতির সাহায্যকারীও একজন আছে, সে শয়তান। সেই শয়তানই আমাকে পথ দেখিয়ে দিলে নির্দ্দোষী বন্ধুর প্রতি প্রতিশোধ তোলবার।

সে দিন বৈকাল থেকেই দুর্য্যোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। আকাশ ঘনঘোর মেঘে আচ্ছন্ন। গাছপালাগুলা আসন্ন-প্রলয়ের সূচনা দেখেই যেন নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গিয়ে, স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। মনে করলুম, মোহন এই দুর্য্যোগে আজ আর বেরুবে না, কিন্তু দেখলুম সে যথাসময়েই ছাতা হাতে বেরিয়ে গেল।—এ যে প্রাণের টানে অভিসার-যাত্রা—এ যাত্রা কে রোধ করতে পারে?

বন্ধুকে দুর্য্যোগ মাথায় ক'রে বেরুতে দেখেও আমি বারণ করতে পারলুম না। যাক্‌ গে, সে মরুক গে,—আমার তাতে কি? সে এখন আর বন্ধু নয়,—আমার প্রতিদ্বন্দ্বী,—পরম শত্রু, শত্রুর মঙ্গল কামনা কেউ করতে পারে কি?

রাত তখন বোধ করি ন'টা। বিশ্বজগৎ যেন আজ অন্ধকারে ডুবে লীন হ'য়ে গেছে। টিপি টিপি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আমি আহারাদি সেরে একবার দেখতে গেলুম মোহন বাসায় ফিরেছে কি না; কিন্তু সে তখনও ফেরে নি। এই বাদল রাতে প্রিয়তমার সঙ্গে নিভৃত প্রেমালাপে সে হয় তো—এতক্ষণ……উঃ! কথাটা কল্পনা করতেও যে বুক-

খানা ফেটে যায়! — সুভদ্রা,—আমার কত আকাঙ্ক্ষার ধন সেই সুভদ্রা!

মোহনের বুড়া চাকরটা প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় ব'সে ঝিমোচ্ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম,—মোহনের ফিরতে দেরী হওয়াই সম্ভব, কারণ তার সেখানে আজ নিমন্ত্রণ।

কিন্তু কতই দেরী হবে;—পাহাড়ী জায়গা, নিরাপদ নয়—তার ওপর এই দুর্য্যোগের ঘটা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনে একটা উদ্বেগ ও অস্বস্তি অনুভব হ'ল। বাসায় ফিরে না গিয়ে—মোহনের শোবার ঘরে, আলোর কাছে একখানা বই নিয়ে বসলুম।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল' তার প্রসারিত শয্যার দিকে। ধপ্‌ধপে পরিষ্কার বিছানার ঠিক মাঝখানটীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে একটা সাপ! ভয়ঙ্কর বিষধর প্রকাণ্ড গোখরো! কি সর্ব্বনাশ!—ভাগ্যে মোহন এখনও আসে নি!

আতঙ্কে শিউরে উঠে, ঘরের কোণে রাখা লম্বা বাঁশের লাঠিটা তুলে নিয়ে আমি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলুম, সেই সাক্ষাৎ কৃতান্তের দূত বিষধরটার প্রাণ সংহার ক'রে বন্ধুর বিপন্ন জীবন রক্ষা করতে। কিন্তু আমার অন্তরের অন্তর থেকে কে যেন চীৎকার ক'রে উঠল'—ওরে হতভাগা! বন্ধু বলিস তুই কা'কে? যে তোর বুকে তীব্র বিষের জ্বালা ছড়িয়ে দিয়ে সারাজীবন বিষময়, দুর্ব্বহ ক'রে তুলেছে, সে তোর মিত্র নয়—শত্রু,—পরম শত্রু। তবে শত্রু নিপাতের এই—এই বিধিদত্ত অবসর, প্রতিহিংসা চরিতার্থের এই অনুকূল মুহূর্ত্তে প্রত্যাগমন করিস কেন রে মূর্খ!

আমি থমকে দাঁড়ালুম। হাতের মুঠা শিথিল হ'য়ে লাঠিটা প'ড়ে গেল। খট্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল, কিন্তু সাপটার তাতে বিশ্রামের ব্যাঘাত হ'ল না। সে তখনও অনড় নিশ্চল। সুপ্ত বিষধরের দিকে একবার বিস্ফারিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে ঘরের দরজাটা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিয়ে আমি আস্তে আস্তে নিজের বাসায় ফিরে এলুম।

আমার মন তখন তীব্র পৈশাচিক আনন্দে পরিপূর্ণ। মোহনের অন্ধকারে শোওয়া অভ্যাস,—পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে সে আজ ঘরে এসে আলো নিবিয়ে যেই শোবে, অমনই··· উঃ! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! সুভদ্রাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেবার এই তো সমুচিত প্রতিফল! কিন্তু তার আর কত দেরী; মোহন ফিরবে কতক্ষণে। ততক্ষণ সাপটা যদি পালিয়ে যায়—তবেই তো——

আমি আর স্থির হ'য়ে ঘরে থাকতে পারলুম না। বৃষ্টিবাদল উপেক্ষা ক'রে বেরিয়ে পড়লুম—সিক্ত অন্ধকার পথের ওপর। এই পথ দিয়েই তো মোহন আসবে। উঃ! কি ভয়ানক নিবিড় অন্ধকার! যেন জমাট বেঁধে পাথর হ'য়ে গিয়েছে! সুদূর প্রসারিত চা'য়ের ঘন সবুজ ক্ষেতগুলা সেই সীমাহারা মিশ্‌মিশে অন্ধকারে যেন কালির নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত দেখাচ্ছিল।

নিকষ-কালো আকাশের বুক চিরে তীব্রোজ্জ্বল তড়িৎশিখা যেন সৈনিকের রক্তপিপাসু তলোয়ারের মত থেকে থেকে ঝক্ ঝক্ ক'রে উঠছিল।—ওঃ আজ কি প্রলয়ের রাত্রি?

আমাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। অন্ধকারে পথের উপর 'টর্চ্চলাইটে'র উজ্জ্বল দীপ্তি দেখে বুঝলুম মোহন আসছে। তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়ালুম—একটা ঝাঁকড়া জাম-গাছের আড়ালে। ছাতা মাথায় 'টর্চ্চ' হাতে মোহন বেপরোওয়াভাবে এগিয়ে আসছিল হন্ হন্ ক'রে, রাত্রির অন্ধকার দুর্য্যোগ এবং পথের ক্লান্তিতেও তার স্ফূর্ত্তির এতটুকু অভাব নেই। সে যে তার তরুণী প্রিয়ার মিলন-স্বপ্নে মশ্‌গুল!—মনের পুলকোচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে--মোহন তখন উৎফুল্ল স্বরে প্রেমের গান গাইছিল—

"দিল্ দিয়া হম্‌নে সনম্ কো—দিল্ দুঃখানে কে লিয়ে
রথ্‌ দিয়া দিল্‌কো নিশান্না—তীর খানে কে লিয়ে।" *

ওঃ! কি আনন্দ! কি স্ফূর্ত্তি! ক'রে নে আনন্দ!—এই শেষবার প্রেমের গান গেয়ে নে রে, অভাগা! এ সুযোগ আর তো পাবি না জীবনে! তোর জীবনের যে শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত!

আমি নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলুম,

---

* এ প্রাণ দিয়েছি প্রিয়কে আমার—
পরাণে বেদনা পাবার তরে।—
ব্যথার তীরেতে বিঁধিতে এ হিয়া—
পাতিয়া রেখেছি নিশান ক'রে।

মোহন বাড়ীর মধ্যে ঢুকল', চাকরটা কম্বল মুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর খোলা জানালা দিয়ে মোহনের শয়ন-ঘরের যে আলো দেখা যাচ্ছিল, সেটুকু নিবে গেল। ব্যস!—এইবার!—এইবার আর দেরী নেই, আঃ!

আমি আর তিষ্ঠিতে না পেরে—পালিয়ে এলুম নিজের ঘরে, কিন্তু সেখানেই কি নিস্তার আছে ছাই; কিসের একটা বিরাট্ চাঞ্চল্য—একটা আনন্দময় উন্মাদনাময় তীব্রতর অনুভূতি আমাকে তখন যেন উদ্ভ্রান্ত,—উন্মাদ ক'রে তুলেছিল। আমি বিকারগ্রস্ত রোগীর মত ছট্‌ফট্ করতে করতে যেন মানসচক্ষে দেখছিলুম,—আমার প্রতিদ্বন্দ্বী—মোহন এইবার তার শ্রান্ত দেহখানা সুখশয্যায় ঢেলে দিয়েছে, মৃত্যুদূত কালভুজঙ্গের মরণ-শীতল আলিঙ্গনে, গরলভরা চুম্বনে মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে—সে এতক্ষণে তার আদরিণী প্রেয়সীর সোহাগ-অনুরাগের মধুর স্বপ্ন দেখছে!

বাঃ! বাঃ! কি মজা!—কি মজা!

আমার বুকের রক্ত অগ্নিস্রাবের মত উষ্ণ উচ্ছল হ'য়ে যেন প্রলয়ের তাণ্ডব-নর্ত্তন বাধিয়ে দিলে।

বৃষ্টি আরও জোরে—ভয়ানক জোরে নেবে তড়্ তড়্ ক'রে এল। সে তো বৃষ্টি নয় কান্না! দুর্য্যোগ-ব্যথিতা নিশীথিনীর মর্ম্মবিদারী অন্তহীন রোদন! এ কান্না—এ হাহাকার বুঝি আর কখনও থামবে না; কিসে কি হ'ল জানি না।—হঠাৎ সেই অবিশ্রান্ত বারিপাত উপেক্ষা ক'রে আমি কর্দ্দমাক্ত পথে তীরের মত ছুটে গেলুম মোহনের ঘরে দিকে, কিন্তু দুয়ার বন্ধ। জানালার অল্প একটুখানি ফাঁক ছিল, তারই জলেভেজা শক্ত লোহার গরাদগুলোয় প্রাণপণ শক্তিতে ঝাঁকুনি দিয়ে আমি ডাকতে লাগলুম—'মোহন! মোহন!—উঠে পড়, ভাই! উঠে পড়—শীগ্‌গির! তোর বিছানায় যে সাপ! ভয়ঙ্কর বিষাক্ত……'

মোহনের সাড়া পেলুম না। কেবল একটা অস্পষ্ট, অস্ফুট কাতর গোঙানীর শব্দ উঃ! সে শব্দ যেন এখনও আমার কাণে লেগে রয়েছে। জ্ঞানহারা মুহ্যমান হ'য়ে—সেই লোহার উপর আমি সজোরে মাথা ঠুক্‌তে লাগলুম—কপাল কেটে ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল, কিন্তু মোহন উঠল' না—সাড়াও দিল না।

শুধু ব্যথা-বিধুরা অশ্রুময়ী নৈশ প্রকৃতিকে সচকিত ও ত্রাসে কণ্টকিত ক'রে, তমসাচ্ছন্ন উন্নত গিরি-শিখরগুলি প্রলয়ের আলোয় ঝলসে দিয়ে,—কোথায় কি জানি বজ্রপাত হ'ল—কড়্ কড়্ কড়াৎ! আঃ সে বজ্রাগ্নি তখন এই প্রিয়-প্রাণহন্তারক বিশ্বাসঘাতকের মাথায় পড়ল না কেন?"

সুজন সিং এবার ঝর ঝর ক'রে সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেল্লে। অনেকক্ষণ ধ'রে বালকের মত সে কাঁদতে লাগল—বর্ষণ-ক্লান্ত মেঘের মত তার চক্ষু দুটো নিস্তব্ধ হ'ল। তারপর কাটা দাগটায় হাত রেখে গভীর অনুশোচনায় ব্যথা-বিদ্ধ কণ্ঠে সে বললে, তকদীরে যা লেখা থাকে, তাই ঘটে বাবুজী! কিন্তু মন যে কিছুতেই বোঝে না। এই বর্ষায় পূরো একটী বছর হ'য়ে গেল,—এখনও তার চিন্তা,—তার স্মৃতি—আমাকে যেন পাগল ক'রে রেখেছে। এখনও অন্ধকারে নিশুতি রাতে এক একদিন ঘুমের ঘোরে কি মোহের ঘোরে জানি না, নিজের অজ্ঞাতেই উঠে যাই, সেই জানালায়—তাকে ডাক্‌তে।—লোকে বলে, এরকম আশ্চর্য্য বন্ধুত্ব সচরাচর দেখা যায় না,—হায়!—তারা জানে না তো এ বন্ধুত্বের কি শোচনীয়—ভয়াবহ পরিণাম।"

বঙ্গসাহিত্যের স্থায়িত্ব

[শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি-এ.]

আজকাল একটা কথা উঠেছে—রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বের বা পরের বাংলা সাহিত্য টিকবে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যে হিসাবে টিকবে হয় তো সেই হিসাবে কোনটাই টিকবে না, কিন্তু উদ্ধতকণ্ঠে কেউ যদি বলেন, একেবারে কোনটাই বেশীদিন টিকবে না—তা হ'লে দুই একটা কথা বল্‌তে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি,—যদিই বা রবীন্দ্রেতর সাহিত্য নিজগুণে নাই টেঁকে, ক্রমোন্নতিশীল জাতির স্বাভাবিক সংরক্ষণী প্রবৃত্তি কি তাকে টিকিয়ে রাখবে না?

এ প্রবৃত্তি আগের চেয়ে আজকাল যে ঢের বেশী বেড়ে গেছে, এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না। এ প্রবৃত্তি আমাদের একপ্রকার ছিল না বল্‌লেই হয়—এটা ইউরোপীয় শিক্ষা হ'তেই পাওয়া। এ প্রবৃত্তি ছিল না ব'লেই এদেশের ইতিহাস নাই—অনেক উৎকৃষ্ট জিনিসও ক্রমে ধ্বংস পেয়েছে। এখন জ্ঞানভাণ্ডারের তুচ্ছতম জিনিসটি পর্য্যন্ত রক্ষা করার যে একটা প্রবৃত্তি জেগেছে—তা ক্রমে বেড়েই চলবে ব'লে মনে হয়।

গুণী জ্ঞানী ও শিল্পিগণ শিক্ষা দীক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্র যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা উৎকৃষ্ট হোক্ অপকৃষ্ট হোক্, সমস্তকেই নির্ব্বিচারে রক্ষা করবার চেষ্টা ও বাসনা বর্ত্তমান সভ্যতার একটা অঙ্গ। এ প্রবৃত্তিটা অনেকটা ঐতিহাসিক প্রেরণার নামান্তর। যা কিছু প্রাচীন তার প্রতি একটা শ্রদ্ধা—এই প্রবৃত্তিরই অঙ্গ। ইতিহাস রচনার উপকরণ হিসাবে—জ্ঞানপিপাসুদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে সকল সৃষ্টিকেই তাই রক্ষা করা হয়। বর্ত্তমান সভ্যতা একদিকে সর্ব্বধ্বংসী মহাকালের সঙ্গে যেমন যুদ্ধ করছে—অন্যদিকে তেমন রসায়ন প্রয়োগে অল্পায়ুর আয়ু বৃদ্ধি করছে।

দেশাত্মবোধের চোখে দেশের তুচ্ছতম সৃষ্টিটা পর্য্যন্ত আদরের জিনিস। দেশাত্মবোধ যত বাড়বে—দেশের সাহিত্যিকদের রচনার আদরও তত বাড়বে। জীবিত সাহিত্যিককে কতকটা অবহেলা করলেও মৃত সাহিত্যিকের রচনাকে দেশের লোক ক্রমে আরও শ্রদ্ধাই করবে—কতকটা উদারতার সহিতই বহু সাহিত্যিকের রচনাকে গ্রহণ করবে এবং দোষ-ত্রুটী ক্ষমা করবে। সাহিত্যকে জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়ে সাহিত্যের অপকৃষ্টতা বা আদর্শের হীনতার জন্য জাতীয় জীবনকেই দায়ী করবে—সাহিত্যিকের সাধনার অবমাননা করবে না।

যতদিন বিদেশীয় সাহিত্য দেশে সমাদৃত হ'বে—ততদিন দেশী সাহিত্যেরও সমাদর থাকৃতে বাধ্য। অপকৃষ্ট হ'লেও আমাদের যে সাহিত্য ব'লে কিছু আছে তার গৌরব করা দেশাত্মবোধেরই অঙ্গ।

একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জীবন-চরিত লিখতে গেলে তাঁর পিতা-পিতামহের, পুত্র-পৌত্রাদিরও পরিচয় দিতে হয়। কোন্ আবহাওয়াতে কাদের সংস্পর্শে তিনি প্রতিপালিত হ'য়েছেন তাও বলার প্রয়োজন হয়। দেশে যদি একজনও মৃত্যুঞ্জয় অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিক জন্মে থাকেন—তবে তাঁর অভ্যুদয়ের মূলে যে সকল শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল—তাদেরও সন্ধানের প্রয়োজন। দেশের যে যে লেখক যে যে শ্রেণীর রচনার দ্বারা দেশের সাহিত্য-ধারাকে পরিপুষ্ট ক'রে মহাকবির হাতে সমর্পণ করেছেন, তাঁদের জীবনযাত্রা এবং তাঁদের রচনা চিরদিনই আলোচনার বস্তু হ'য়ে থাকবে। চরম সার্থকতার পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরগুলি কখনই উপেক্ষণীয় নয়। সাহিত্যের যারা ইতিহাস অনুসন্ধান করবে তাদের কাছে সে সকল স্তরের মূল্য ঢের বেশী। জাতীয়-সাহিত্যের বিচারে অনুসন্ধিৎসুব্যক্তিগণ, সকল মহাকবিরই রস-সৃষ্টির উপাদান, মূলসূত্র, অঙ্কুর—এমন কি প্রেরণা পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের মধ্যেই অনুসন্ধান ক'রে থাকেন। অন্যান্য মহাপুরুষের জন্মের মত কোন মহাকবির জন্মই আকস্মিক নয়। বাল্মীকির মত কেহ ভুঁই ফোড় নহেন। মহাকবির অভ্যুদয়ের আগে বহুদিন ধরে সাহিত্য-রাজ্যে যে বিরাট্ আয়োজন চলে তা কে অস্বীকার করবে? সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও হয় তো তাঁর অভ্যুদয়ের সমান আয়োজনই

চলে—কিন্তু অনুসন্ধিৎসু সাহিত্য-সেবীরা সর্ব্বাগ্রে সাহিত্য-রাজ্যেই অনুসন্ধান ক'রে থাকেন—এমন কি তাঁরা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণকে মহাকবির শিক্ষাগুরুই মনে করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে মহাকবির পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরা যে শ্রেণীরই হোন্ মহাকবির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মর্য্যাদা টিকে যাবেই।

তার পর মহাকবির সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরের সাহিত্যিকদেরও যথাযোগ্য মর্য্যাদা স্বীকার করতে হয়। মহাকবির অনুগ্রহে তাঁরাও বেঁচে যান। জাতীয় সাহিত্যের একই শক্তি একজনে চরম সার্থকতা লাভ করে—অন্যান্য অনেকের মধ্যে তাহার আংশিক অভিব্যক্তি ঘটে। সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যিকদের মধ্যে কি ভাবে তা অভিব্যক্ত হয়েছে, তাও আলোচনা করবার ও লক্ষ্য করবার বিষয়। সমসাময়িক সাহিত্যিকরা যদি আত্মস্বাতন্ত্র্য রাখতে পেরে থাকেন—মহাকবির বিশ্বগ্রাসী প্রভাবে যদি অভিভূত না হ'য়ে থাকেন—তবে তাঁদের মর্য্যাদা তো অল্প নহে। আর যদি তাঁদের শক্তি পরিপূরক (supplementary) হিসাবে মহাকবির শক্তির সহিত যুক্ত হ'য়ে সমগ্র জাতীয় জীবনের পূর্ণাভিব্যক্তি ঘটিয়ে থাকে তাতেও সমসাময়িক সাহিত্যিকদের কিছু কৃতিত্ব ও মর্য্যাদা অবশ্যই আছে। আর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে যদি দেশের জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি ঘটে, আর মহাকবি যদি জাতীয় জীবনকে অতিবর্ত্তন ক'রে উঠেন—অর্থাৎ সমগ্র মহাদেশ বা মহামানবের কবি হ'য়ে উঠেন—সমস্ত জগৎই যদি তাঁকে মহাকবি ব'লে স্বীকার ক'রে নেয়,—তবে সীমাবদ্ধ জাতীয় জীবনের পক্ষ হ'তে—কেবল মাত্র দেশবাসীর পক্ষ হ'তে মহাকবি বাদশার মর্য্যাদা পেলে ঐ সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ অন্ততঃ সুবাদারের মর্য্যাদা তো পাবেনই।

আর সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ যদি মহাকবির প্রভাবের দ্বারাই সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত হন, তবে তাঁহারা এবং মহাকবির পরবর্ত্তী শিষ্যস্থানীয় সাহিত্যিকগণও যে কোন মর্য্যাদাই পাবেন না এমনটাও হ'তে পারে না। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের রচনারও স্থান আছে। মহাকবির দুর্জ্জয় প্রভাব ও অলৌকিক শক্তি জাতীয় সাহিত্যে কি ভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে, তা লক্ষ্য করবার জিনিস। মহাকবির জ্ঞানসম্পদ ও রসসম্পদ কি ভাবে তাঁর সহচর ও শিষ্যগণের দ্বারা দেশময় বিকীর্ণ হয়েছে তাও আলোচনার বিষয়। একটা বিরাট শক্তি একটা বিরাট ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় ক'রে কিরূপে বিশ্বে প্রতিবিম্বে বিচ্ছুরিত হয়েছে—তার সন্ধান নিতে গেলেই মহাকবির প্রবর্ত্তিত যুগের সকল সাহিত্যিকের রচনাই আলোচ্য হ'য়ে পড়ে। একটী কেন্দ্রে বহু শক্তির সংশ্লেষণও যেমন গবেষণার বস্তু, একটী মহাশক্তির বহুচ্ছটার বিশ্লেষণও তেমনি গবেষণার বস্তু। সাধারণ লোক কেবল সূর্য্যকেই দেখে—তার সঙ্গে আর কোন গ্রহ-উপগ্রহের সম্বন্ধ লক্ষ্য করে না,—কিন্তু জ্ঞানপিপাসু সূর্য্যকে অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে মিলাইয়া সৌরজগতের কেন্দ্রস্বরূপ দেখে—তার কাছে প্রত্যেক গ্রহ-উপগ্রহেরও মূল্য-মর্য্যাদা আছে।

এক শতাব্দীর মধ্যে মাত্র একজন মহাকবি জন্মাতে পারে—কিন্তু তাই ব'লে দেশ কখনও একজনের গৌরব ক'রেই তুষ্ট থাকে না। এক শতাব্দীর মধ্যে আর কোন কবি জন্মে নাই—একথা কোন্ দেশ স্বীকার করবে? যিনি মহাকবি তাঁকে মহাকবির মর্য্যাদা দিবে—আর যারা শুধু কবিমাত্র—সাহিত্যিকমাত্র তাদের কথাও বিস্মৃত হ'বে না। এ দেশের লোক বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসকে মহাকবি মনে করে,—তাই ব'লে গোবিন্দদাস জগদানন্দ জ্ঞানদাসকেও ভোলে নাই। ভারতচন্দ্রকে মহাকবি বলে পূজা করলেও রামপ্রসাদকে কে ভুলেছে? তারপর কাব্য ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গও আছে—সে সকল অঙ্গে যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—তাঁদের মর্য্যাদা মহাকবির অত্যুজ্জ্বল আলোকেও কখনও ম্লান হ'বে না। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাসকে কে ভুল্‌তে পারে? ৫০০ বৎসর পরেই বা কে তাঁকে ভুলবে?

বিশ্বব্যাপী খ্যাতি শতাব্দীতে কচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে—দেশব্যাপী খ্যাতিও অতি অল্প সাহিত্যিকের ভাগ্যে ঘটে। দেশের অংশবিশেষে বা জাতির অংশবিশেষে অনেকের খ্যাতি থেকে যায়। যারা দেশের অংশবিশেষকে দেশ ব'লে মনে করে তারা নিজেদের অঞ্চলের কবি-খ্যাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। আবার যারা নিজেদের সম্প্রদায়কেই জাতি ব'লে কল্পনা করে, তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের কবির খ্যাতি নষ্ট হ'তে দেয় না। সংকীর্ণ প্রকৃতির হ'লেও এও এক প্রকারের দেশাত্মবোধ বা জাতিপ্রেম।

এক শতাব্দী পরে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কারও নাম থাকবে না—একথা যারা বলে, তারা ঠিক করেছে—একশ' বছর পরে সমস্ত বাঙ্গালী জাতি আজকালকার ব্রাহ্ম প্রভাব-পুষ্ট সাহিত্যিকদের মত বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানে ও রসজ্ঞতায় গরীয়ান্ হ'য়ে উঠবে। আমরা কিন্তু তা মনে করি না—বাঙালী যতই উন্নতি করুক—একশ' বছর পরেও বাঙালীর খুব কম ধ'রেও শতকরা ৯০ জন লোক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ ধরতে পারবে না—রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস উপলব্ধি করতে পারবে না। এখনকার মত তখনও অধিকাংশ লোকই আরও নিম্নগ্রামের বা অনুচ্চস্তরের সাহিত্যেই আনন্দ পাবে। চিত্তবিনোদনের জন্য তারা সাহিত্য চাবেই।—অবশ্য সমসাময়িক সাহিত্যিকদের কাছ হ'তে কতকটা পাবে। কিন্তু সব যুগের লোকের মতই তারাও বর্ত্তমান অপেক্ষা অতীত সাহিত্যকেই বেশী মর্য্যাদা দেবে। বর্ত্তমানের প্রতি অবহেলা এবং অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কাজেই তারা বর্ত্তমান শতাব্দীও গত শতাব্দীর সাহিত্যকেই বেশী বেশী খুঁজবে। রবীন্দ্রনাথকে যতটা পারবে বুঝবে -অধিকাংশ ক্ষেত্রে না বুঝেই রবীন্দ্রনাথের গৌরব করবে। রবীন্দ্রেতর সাহিত্যকে ভাল বুঝতে পারবে ব'লে খুব গৌরব না দিক,—আদর করবে। সে হিসাবে—আজকে জীবিত থাকার অপরাধে যারা কতকটা অনাদৃত তাদের আদর বাড়বে বৈ কমবে না।

তা ছাড়া, বাঙালী জাতি যদি আত্মস্বাতন্ত্র্য না হারায়—তার মূলধাতু যদি বদলে না যায়—তবে তার বৃত্তি, প্রবৃত্তি, রুচি, তার আত্মার পিপাসার বৈশিষ্ট্য,—এমন কি দুর্ব্বলতাগুলি পর্য্যন্ত কতক কতক থেকেই যাবে। দেশশুদ্ধ লোকই কিছু বিদগ্ধজন হ'য়ে উঠবে না। বর্ত্তমান যুগে বা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যে-সকল কবি উচ্চ শ্রেণীর রসের সাধনা না ক'রে কেবল বাঙালী জাতির রুচি-প্রবৃত্তিকে অনুসরণ ক'রে নিম্নশ্রেণীর রসসৃষ্টি করেছেন, বাঙালীর জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তিকেই ভাষায় ঝঙ্কৃত ও রূপায়িত করেছেন, —তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখের কথা লিখে গেছেন—তাদের দুর্ব্বলতার ও দীনতার জন্য সহানুভূতি দেখিয়েছেন—তাঁদের আদর তখনও থাকবে। লোকে তখনও তাঁদের রচনায় অন্তরের সাড়া পাবে। রবীন্দ্র-সাহিত্যকে তারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের বস্তু মনে করলেও বহু ত্রুটী সত্ত্বেও রবীন্দ্রেতর সাহিত্যকে তারা ভাল না বেসে পারবে না—নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের ভাষাতেই প্রকাশ করতে চাবে।

তা ছাড়া দেশের সাহিত্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য—আরও অনেক শক্তি আছে।

(১) বিশ্ববিদ্যালয়। ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ বাংলা ভাষারই বিশ্ববিদ্যালয় হ'বে। একা রবীন্দ্রনাথই তার উপজীব্য হ'বে না।

(২) পাঠ্যপুস্তক।—একা রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়েই পাঠ্য-পুস্তক গঠিত হ'বে না।

(৩) সংকলন পুস্তক—এ শ্রেণীর পুস্তক ক্রমেই বেড়ে যাবে।

(৪) শোভন সংস্করণ প্রকাশকগণ শোভনতর সংস্করণ ক'রে পুরাতন সাহিত্য প্রচার ক'রবে।

(৫) পাঠাগার—গ্রামে গ্রামে পাঠাগার হ'বে। পাঠাগারে কি শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্য থাকবে?

(৬) সাহিত্য-সভা, সাহিত্য-পরিষদ্ সাহিত্যসম্মিলনী, ইত্যাদি সাহিত্যিক অনুষ্ঠান দেশে ক্রমেই বাড়বে। তাদের আলোচ্য কি হ'বে?

(৭) সংবাদপত্রাদি। তারা কি দেশের অন্যান্য কৃতী লোকদের সঙ্গে সাহিত্যিকগণের স্মৃতিকে নানা ভাবে সঞ্জীবিত রাখবে না?

(৮) মাসিক পত্র—মাসিক পত্রের সংখ্যা আরও বাড়বে, দেশের সর্ব্ববিধ পুরাতন সাহিত্য নিয়েই তাদের আলোচনা ক'রতে হ'বে।

(৯) কৃতী ছাত্রেরা যে অবজ্ঞাত বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিকের সাহিত্য আলোচনা ক'রেও ডিগ্রী নেবে এ বিষয়ে সংশয় নেই।

(১০) তারপর যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তনে লোকের রুচি-প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বসংঘর্ষে কখন যে কোন্ সাহিত্যিককে টান পড়বে তাও বলা কঠিন।

তা ছাড়া আর একটা মস্ত জিনিস আছে। আজ যে সাহিত্য অনাদৃত—বাচ্যার্থসর্ব্বস্ব ব'লে যা মর্য্যাদা পাচ্ছে না, তা পুরাতন হ'লেই ব্যঙ্গার্থে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে। উৎসাহী পাঠকগণ তাতে নূতন নূতন অর্থ আরোপ করবে—আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এ সাহিত্যকে

নূতন ক'রে গড়ে নেবে। নিজেদের সাধমার্জ্জিত বা যুগ-ধর্ম্মের গুণে প্রাপ্ত অনেক সম্পদেরই পূর্ব্বাভাস বা পূর্ব্ব-বিম্ব তারা এ সাহিত্যের মধ্যে দেখতে পাবে। আজ যে মধুতে নেশা হয় না, পুরাতন হ'লে সে মধু "মাধ্বী" হ'য়ে উঠবে, তাতে নেশাও ধরবে। ভবভূতি ব'লে গেছেনই "কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী"—সমানধর্ম্মার অভাব কোন যুগেই হয় না। দার্শনিকরা স্থবিরের গোটা কতক উপদেশকেও একটী ধর্ম্মতত্ত্বে পরিণত করতে পারেন, ভাষ্যকারগণ 'হিংটিং ছট্' বা ও 'তট তট তোটয়ে'র ব্যাখ্যা ক'রেও একটা শাস্ত্র গড়তে পারেন। আর নবীনচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের জন্ম দুচার জন Boswellও জুটবে না? দেশের লোকের বৈদগ্ধ্য যত বাড়বে, প্রাচীন সাহিত্যের গৌরব ততই বাড়বে বৈ কমবে না।

বর্ষা এল'

[শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]

বাদল আজি পাগল হ'য়ে
আসছে ব'লে,
শুক্‌নো তরু উঠল' জেগে
কানন-কোলে।

কানন-রাণীর গোপন ব্যথা,
ঝুম্‌কো লতার অসাড়তা,
মেঘের ডাকে বাদল-বায়ে
যায় যে চ'লে।
বর্ষা আবার বিপুল বেগে
আসছে ব'লে॥

উদাস চাষীর ফুটল' হাসি,
ভরসা হ'ল,
কে আর কঠোর রৌদ্র-শাসন
মানবে বল'?
মেঘ-মাদলের সজল খেলা,
বনাঞ্চলের হাসির মেলা
তৃপ্তি আনায়, চিত্ত জাগায়
বাদল দোলে।
বাদল আজি নামল' ধরায়
অট্টরোলে॥

অন্ধজনে আলো

[অধ্যক্ষ অরুণকুমার শাহ এম-এ-টি-বি]

(১)

সর্ব্ব দেশের পরোপকারী লোকেরা 'অন্ধ জনে দয়া' করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এই দয়ার কার্য্য তাহাদিগকে অন্নদান, বস্ত্রদান ও আশ্রয়দানেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। প্রকৃত-প্রস্তাবে ইহাতে তাহাদের উপকার করা হয় না। অধুনা সভ্য-জগতের 'অন্ধ জনে আলোক দিবার' ব্যবস্থাই প্রকৃত ব্যবস্থা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। এ আলোক-দান শুধু তাহাদিগকে চক্ষুষ্মান্ করিতে পারিলেই হয় না—তাহাদের ভিতর কেবলমাত্র জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া দিতে পারিলেও হয় না। এ আলোক জ্বালিতে হইবে এমন করিয়া, যাহাতে অন্ধরা তাহাদের সময় অলস-ভাবে কাটাইতে না পারে—সর্ব্বদাই কার্য্যে তাহারা নিযুক্ত থাকিতে পারে। অন্ধদিগের ভিতর এই কার্য্য-প্রবণতা বৃদ্ধি করিতে না পারিলে প্রকৃতই তাহাদের কোনরূপ উপকার করিতে পারা যায় না। অন্ন-বস্ত্র ও আশ্রয়দান দ্বারা ইহাদিগকে যথার্থ পথে চালিত করিতে পারা যায় না। শিক্ষার অভাবে অন্ধরা সংযমী হইতে পারে না। তাহার উপর যদি তাহারা জানিতে পারে যে, দয়া-প্রবণ মহাত্মাদের কল্যাণে তাহাদিগকে অন্ন-বস্ত্রের ভাবনা ভাবিতে হইবে না, তাহা হইলে সংযমের বন্ধন তাহাদের আদৌ থাকিবে না। তাহারা যদি মনে করে যে, তাহাদের সকল প্রকারের অন্যায়ই ক্ষমার্হ, তাহা হইলে

কলিকাতা অন্ধ-বিদ্যালয়
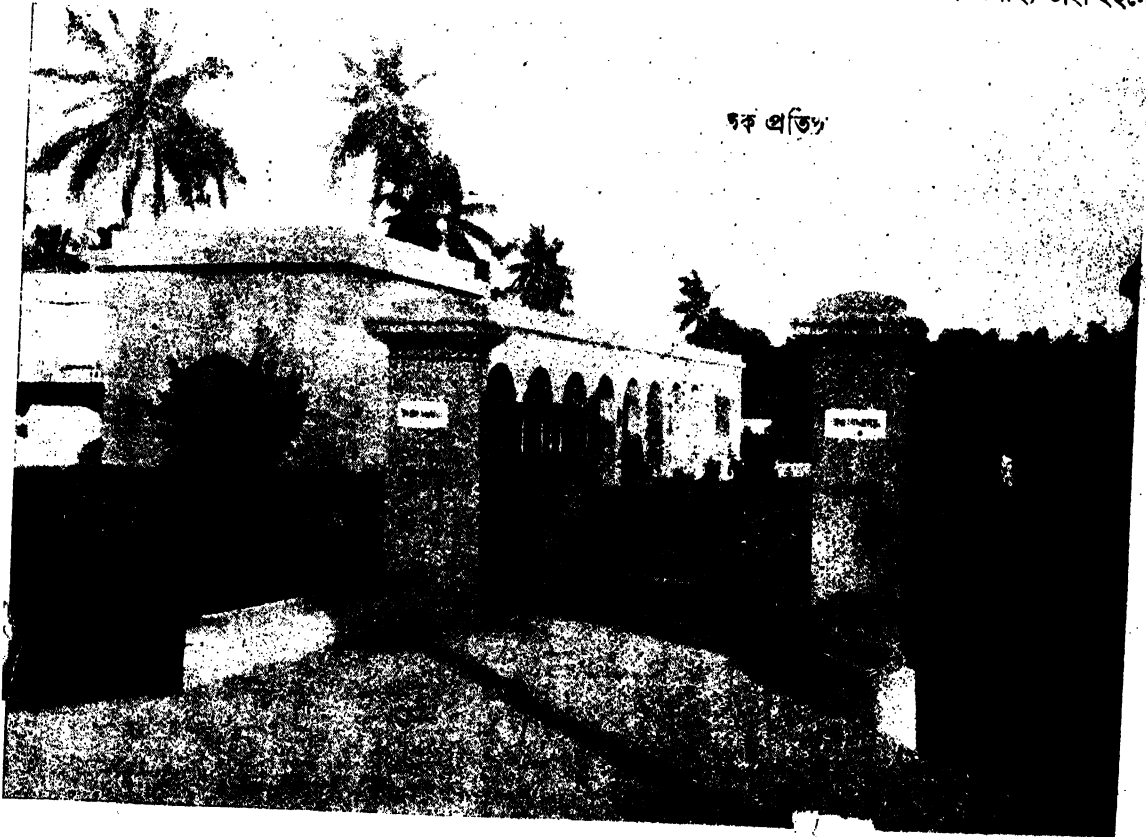
সমাজে তাহারা মনুষ্য-নামের অযোগ্য হইবে.না তো কি? এই জন্যই কর্ম্মের ভিতর দিয়া অন্ধদিগকে আলোক দিবার ব্যবস্থা সভ্য-জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে প্রত্যেক দেশেই এমন একটা-না-একটা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। Helen Keller সত্যই বলিয়াছেন, অন্ধের অন্ধত্বই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোঝা নয়, আলস্যই এইরূপ বোঝা; আর এই গুরুতর-বোঝার ভার হইতে সহজেই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারা যায়। (The heaviest burden on the blind is not blindness but idleness and they can be relieved of this greater burden".) আজকালকার অন্ধরা অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় ভিক্ষা চায় না—চায় আলোক—চায় কাজের ভিতর দিয়া আলস্যকে দূর করিয়া আলোক।

বড়ই দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষ সর্ব্বদিকেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেও 'অন্ধদিগকে আলোকের পথে আনিতে এখনও এদেশ সভ্য-জগতের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে. যদিও ভারতের অন্ধের সংখ্যা প্রচুর।

আদমসুমারী হইতে জানিতে পারা যায়, ভারত-সাম্রাজ্যে সমগ্র ৩২ কোটী মানবের ভিতর ৪,৪৩,৬৫৩ জন অন্ধ অর্থাৎ প্রত্যেক দশ লক্ষ লোকের ভিতর ১৪০৮ জন অন্ধ। ইহার উপর যদি স্বাধীন রাজ্যগুলির জন-সংখ্যা ধরা যায়, তাহা হইলে মোটামুটি বলিতে পারা যায়, ৬ লক্ষ লোক অর্থাৎ প্রত্যেক ৫০০ জনের ভিতর একজন অন্ধ।

আদমসুমারীর গণনার যাথার্থ্য নির্ণয় করা সহজ নয়। এদেশের লোকদের কেমন একটা প্রবৃত্তি আছে যে, যাহাদের অল্প-বিস্তর দৃষ্টির দোষ আছে, তাহারাও অন্ধ

ছাত্রবৃন্দসহ অধ্য[illegible]ক্ষমার শাহ মধ্যস্থলে অবস্থিত—বামদিক্ হইতে দক্ষিণে—বঙ্কিমচন্দ্র রায়চৌধুরী,

বলিয়া গণনার সময় জানাইতে কুণ্ঠিত হয়। আবার অন্ধ বলিতে একেবারে দুই চক্ষুর সাহায্যে যাহারা কিছুমাত্র দেখিতে পায় না তাহাদিগকে বুঝাইয়া থাকে, যাহারা সামান্য মাত্র দৃষ্টিশক্তির অধিকারী, যাহার সাহায্যে মাত্র চলিতে পারে কিংবা আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য বুঝিতে পারে, তাহারাও আপনাদিগকে 'অন্ধ' বলিতে স্বীকৃত নয়, শিক্ষার দিক্ হইতে বলিতে গেলে ইহারা সম্পূর্ণরূপেই অন্ধ, কারণ ইহাদিগের ভিতর শিক্ষার-আলোক আদৌ প্রজ্জ্বলিত হয় নাই। গ্রেট বৃটনে অন্ধের সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া হয়—যদি কোন বালক বা বালিকা চক্ষুর সাহায্যে বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাকে 'অন্ধ' বলা হয়। কিন্তু এদেশে সেরূপ করা হয় না। অনেক যুবক-যুবতী যাহাদের দৃষ্টি-শক্তির অল্পতা আছে, তাহাদিগকে গণনার সময় ধরা হয় না; একারণ মনে হয় গণনার সংখ্যা অপেক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে অন্ধের সংখ্যা অনেক বেশী। যাহা হউক যে-সংখ্যা উদ্ধৃত হইয়াছে, জগতের ভিতর এ সংখ্যা সর্ব্বা-

জ্যামিতিক প্রতিপাদ্য-সাধনে নিযুক্ত বালক
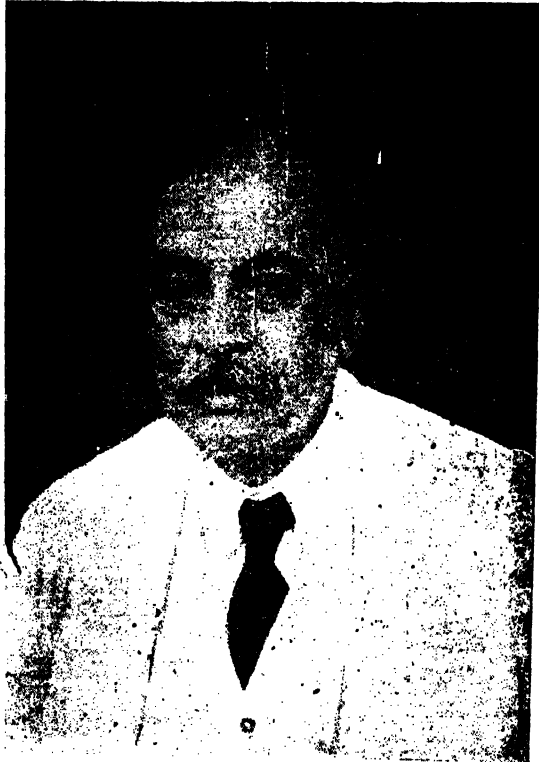
কার্য্যাধ্যক্ষ রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

পেক্ষা বেশী। অন্ধত্বের দিক্ দিয়া ভারতের স্থান সর্ব্ব-প্রথম। ভারত অপেক্ষা জনবহুল চীন দেশের অন্ধের সংখ্যা ৫ লক্ষ বেশী। আয়তনে ভারতবর্ষ রুষদেশ ছাড়া সমগ্র ইউরোপের সমান, কিন্তু অন্ধত্বের দিক দিয়া গণনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, রুষদেশ-সমেত সমগ্র ইউরোপের অন্ধের সংখ্যা অপেক্ষা ভারতের অন্ধের সংখ্যা ১ লক্ষেরও উপর। লোক-সংখ্যার অনুপাতে অবশ্য ভারতবর্ষের স্থান প্রথম নয়; মিশরের স্থানই প্রথম। সেখানে প্রত্যেক দশ লক্ষের ভিতর ১৪,০০০ অন্ধ। ভারতবর্ষে মিশরের এক দশমাংশ। ভারতে মাত্র ১২টী প্রতিষ্ঠান বা অন্ধদিগের 'কর্ম্মশালা' আছে। অনুপাত হিসাবে ধরিতে গেলে প্রত্যেক ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার অন্ধের জন্য একটী প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষাগার আছে।

বাঙ্গালাদেশের লোক-　　কোটি ৫৪ লক্ষ ৮০ হাজার। আর ইহার ভিতর পঞ্চাশ হাজার অন্ধ।

এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, ইহাদের ভিতর বিদ্যালয়ে যায় এমন অন্ধের সংখ্যা বিশ হাজার হইবে।

ইহার উপর কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়াই বলিতে পারা যায় যে, এই অন্ধদিগের সহিত কার্য্য করা ও ইহাদিগকে প্রকৃত আলোক দান করা কতদূর ন্যায় ও যুক্তি-সঙ্গত।

অন্ধত্বের প্রধান কারণ তিনটী—(১) বসন্ত, (২) নবজাত শিশুর চক্ষুঃপ্রদাহ (Opthalmia neonatorum) ও (৩) চক্ষুর শ্লৈষ্মিক আবরণে দানাদার অবস্থা (trachoma or granular lids) চক্ষুপীড়ার চিকিৎসা করিতে লোকে ভয় পায়। চক্ষুর উপর অস্ত্র চালাইতে এদেশের লোক একেবারেই রাজী হয় না। সময়মত চক্ষুর চিকিৎসা না করার ফলে অথবা অনভিজ্ঞ 'গো-বদ্যি'র দ্বারা চিকিৎসিত হওয়ায় প্রায় অধিকাংশ স্থলে চক্ষু একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। বাল্যকালে যদি চক্ষুর প্রতি যত্ন লওয়া হয়, ভালরূপে বসন্তের টীকা দেওয়া হয়, দেশী নাড়ীকাটা 'দাই'-দিগকে শিক্ষিত করা যায় ও গরীবদের বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে অন্ধত্বের পরিমাণ অনেক হ্রাস পায়। পাশ্চাত্য অনেক দেশে আইনের সাহায্যে অন্ধ বালক-বালিকাদের নৈসর্গিক কারণে যে চক্ষু-পীড়া হয় (opthalmia) তাহার উপশমের জন্য যদি সুব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে পীড়িত বালক-বালিকার পিতা-মাতা বা অভিভাবককে দণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষে এখনও এমন অবস্থা হয় নাই যখন সুচিকিৎসার সুব্যবস্থা হইতে পারে।

এখানে গরীবদের ভিতরই অন্ধের সংখ্যা খুব বেশী। ইহাদের ভিক্ষাই উপজীবিকা। মুসলমানদের ভিতর অন্ধরা সমগ্র কোরাণ মুখস্থ করিয়া 'হাফেজ' হয়। উপাসনা ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সভাসমিতিতে ইহারা কোরাণ পাঠ করিয়া বেশ অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভালভাবে জীবন-যাপন করিতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ অন্ধরাই দুঃখে ও ঘৃণিতভাবে জীবন কাটায়।

বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠাতা লালবিহারী শাহ

বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ

হাতের কাজে বালিকারা

যতদিন না অন্ধদিগকে তাহাদের ও তাহাদের পোষ্য-বর্গের জীবন-ধারণোপযোগী অন্ন-বস্ত্রের সংকুলান করিয়া দিতে পারা যায়, ততদিন তাহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতেই পারে না, কারণ অধিকাংশ-স্থলেই এইরূপ অন্ধদের ভিক্ষার উপরই পরিবারবর্গ জীবন-ধারণ করিয়া থাকে। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, অন্ধ-দিগের সাহায্যে কত লোক কত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। তাহারা ইহাকে অর্থোপার্জ্জনের একটী ব্যবসা করিয়া তুলিয়াছে। এই সকল লোক অন্ধ, খঞ্জ, আতুর প্রভৃতির সাহায্যে বেশ দু পয়সা রোজগার করিয়া থাকে, আর তাহাদের সহিত চুক্তিমত তাহাদিগকে সামান্য যৎ-কিঞ্চিৎ দিয়া থাকে; কোন কোন ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ করিবার ব্যবস্থা থাকে। পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পিতামাতার নিকট হইতে অনেক লোক অন্ধবালকদিগকে ভাড়া করিয়া লইয়া আসিয়া কলিকাতায় রোজগার করে। সুতরাং এই শ্রেণীর অন্ধ বালক-বালিকাদের পিতামাতা শিক্ষার জন্য ছেলেদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতে রাজী হয় না, কারণ তাহার দ্বারা তাহাদেরও বেশ দুপয়সা রোজগার হয়; কিন্তু এই সকল অন্ধদের যে কিরূপ কষ্টে জীবন কাটাইতে হয় তাহা যাঁহাদের এবিষয়ে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাই বলিতে পারেন। যাত্রা বা থিয়েটার-পার্টির মত ইহাদিগকে নানাস্থানে ঘুরাইয়া বেড়ান হয়।

বড় লোকেরা তাহাদের অন্ধ আত্মীয়দিগের শিক্ষা দেওয়া অনাবশ্যক কার্য্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা

সঙ্গৎ

অন্ধদের সহিত পরামর্শ করেন না—যদি করিতেন তাহা হইলে অন্ধের কষ্ট কি ও কোথায় তাহা জানিতে পারিতেন। অন্ধত্বের বোঝার ভারে অন্ধরা যত পীড়িত না হউক আলস্যের গুরুভারে ততোধিক পীড়িত।

অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য ভারতে যাহারা অগ্রণী, তাহাদিগকে অনেক কষ্টের ভিতর দিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। অন্ধেরা যে লিখিতে ও পড়িতে পারে কিংবা গৃহ-শিল্পের দ্বারা বা ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতে পারে বা সমাজের দশজনের একজন হইতে পারে, এ ধারণা পোষণ করিতে পারে না। এই কুসংস্কারের ফলে, যে সকল শিক্ষক ছাত্র সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হন, তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি উপহাসাস্পদ হইতে হয়; অনেক সময়ে অজ্ঞ লোকেরা বলিয়া থাকে এই সকল বালকবালিকাদিগকে লইয়া

ভাবেন ভগবান্‌ই যখন তাহার চক্ষুরত্ন লইয়াছেন, আর যখন তাহার অন্নবস্ত্রের জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে না, তখন কেন শিক্ষালয়ে প্রবেশ করিয়া পরিশ্রম করিবে? ভগবানের মারের উপর আবার কেন খাঁড়ার ঘা? দুঃখের বিষয় কিন্তু এই সকল ধনী ব্যক্তি কখনই

আলোক হস্তে প্রতিষ্ঠাতা (১৯২৭)

ড্রিলরত বালকবৃন্দ

গিয়া কোন দেবতার স্থানে বলি দেওয়া হইবে! যাহাহউক এই সকল কুসংস্কারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। আর সময়ের পরিবর্ত্তনও হইতেছে; এ দিকেও দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িতেছে।

এদেশে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছেলেদের ভিতরই যখন বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন নাই, তখন অন্ধদের শিক্ষার কথা তো ছাড়িয়া দিতে হয়।

অধিকন্তু সাধারণ বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যয়-ভার অপেক্ষা এ শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষার খরচ কিছু বেশী। অন্ধদিগের জন্য সাধারণ শিক্ষা বা ব্যাবহারিক (টেকনিকাল) শিক্ষার জন্য বড় বড় উৎকীর্ণ আকারে পুস্তক (embossed books) ছাপাইতে খরচ বেশী পড়ে। আবার শিক্ষার খরচের ভিতর অন্নবস্ত্রের খরচও যোগ দিতে হইবে, কারণ যাহারা প্রথম প্রথম ছাত্র ভর্ত্তি করিয়া দেয় বা যাহাদের গৃহ হইতে অন্ধ ছাত্র আনীত হয়, তাহাদের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, তাহারা ছাত্রের বিদ্যা ও অন্নবস্ত্রের ব্যয়-ভার সংকুলন করিতে পারে। আবার এইসকল পুস্তক ইংরেজীতে মুদ্রণ করিতে যে খরচ হয়, তাহার অপেক্ষা ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণ করিতে অনেক বেশী খরচ পড়িয়া যায়। সাধারণতঃ যত পৃষ্ঠার ভিতর ইংরেজী পুস্তক মুদ্রিত হয়, এ দেশের ভাষায় মুদ্রিত করিতে গেলে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক পৃষ্ঠা লাগে। কাজেই কাগজের দাম বেশী পড়ে; তাহার উপর উৎকীর্ণ অক্ষরে ছাপিতে গেলে আরও বেশী কাগজ লাগে। এ দেশের এ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে পুস্তকের অভাব বড়ই পরিলক্ষিত হয়। অনেক স্থানেই হাতে লেখা বই ব্যবহৃত হয়। আজকাল কোন কোন প্রতিষ্ঠানে বিলাত হইতে মুদ্রিত হইয়া পুস্তক আসিতেছে। ইহাতে খরচা অতিরিক্ত মাত্রায় পড়িয়া যায়। সুধু যে সেখানে ছাপার খরচ বেশী, তাহা নয়, পাঠাইবার খরচও খুব বেশী।

তাহার উপর প্রকৃত শিক্ষিত শিক্ষকের, যাঁহারা

সাধারণ শিক্ষা ও ব্যাবহারিক শিক্ষা দুই-ই দিতে পারেন, অভাবও এ দেশে খুব বেশী।

যতদিন না অন্ধদিগের শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষকেরা বিশেষভাবে শিক্ষিত হইবেন, ততদিন অন্ধদিগের শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইবে না।

অন্ধদিগের শিক্ষা দুই দিকে চালিত হওয়া উচিত—বিদ্যালয়ে ও গৃহে। শিক্ষিতব্য বিষয় (ক) সাধারণ সাহিত্য, (খ) ব্যাবহারিক, (গ) গীতবাদ্য। বিদ্যালয়ে এই সকল বিষয়ের শিক্ষা প্রচলিত হওয়া উচিত।

ব্যাবহারিক বিষয়ে পুরুষদিগের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবসা-গুলি কার্য্যকরী হইবে :—

ঝুড়ি, ব্রুশ ও জুতা তৈয়ারী; কাঠের তলার জুতা, বেতের চেয়ার তৈয়ারী, ছুতার মিস্ত্রির কাজ, বেনা বা কলমীর চেয়ার তৈয়ারী, আল্‌না ও কাটির মাদুর তৈয়ারী, গান, পিয়ানোর সুর দেওয়া (piano tuning) ও পিয়ানো সারান, শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং, বাগান তৈয়ারী, গৃহপালিত পশুপক্ষী রক্ষণ, ছাপাখানার কাজ, ষ্টিরিয়ো মুদ্রণ, ও টেলিফোঁ যন্ত্র নির্ম্মাণ।

স্ত্রীলোকদিগের জন্য :—ঝুড়ি, ব্রুশ তৈয়ার করা; বেতের চেয়ার বোনা, হাতের ও কলের শেলাই; ধোলাই কাজ; আল্‌না তৈয়ারী, রোগ উপশম করিবার জন্য পেশী মর্দ্দন, গান, পিয়নোর সুর দেওয়া; শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং, টেলিফোঁ যন্ত্র নির্ম্মাণ, বয়ন, বাগান তৈয়ারী, গৃহপালিত পশুপক্ষী রক্ষণ, পুস্তক বাঁধান ও গৃহ-কর্ম্ম।

এই সকল কার্য্যে যুবক-যুবতীরা স্কুল ও কলেজে শিক্ষা পাইতে পারে; কিন্তু ব্যাবহারিক কাজ ভালভাবে শিখিতে হইলে কর্ম্মশালার প্রয়োজন, যেখানে অন্য অন্ধরাও কার্য্য করিতে পারিবে। কোন আকস্মিক কারণে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যদি চক্ষু হারাইয়া ফেলে তাহা হইলে এইরূপ কর্ম্মশালায় কিছুদিন কার্য্য করিয়া ভালভাবে জীবিকা-অর্জ্জন করিতে সহজেই পারিবে। ইংলণ্ডে এই শ্রেণীর

খেলার মাঠে বালকেরা

শ্রমিকেরা সাধারণ শ্রমিকদের অপেক্ষা মাহিনা ও এককালীন দান (bonus) অধিক পাইয়া থাকে।

ইহা ছাড়াও এমন অনেক অন্ধ আছে যাহাদের বাড়ীতে শিক্ষা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। এ শ্রেণীর ভিতর সেই সকল অন্ধই স্থান পাইবে যাহারা অত্যন্ত রুগ্ন বা দুর্ব্বল—যাহারা অন্ধদিগের বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাইতে পারে না ও যাহারা জীবনের শেষ সীমায় চক্ষুরত্ন হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইহাদের শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডের Home Teaching Societies শিক্ষার অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে অর্থাৎ শিক্ষকেরা অন্ধের বাড়ীতে গিয়া গৃহ-শিক্ষক হইয়া শিক্ষা দিবে। এরূপ করাও অন্ধদিগের শিক্ষার একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এইরূপ ব্যবস্থার প্রচলন আছে বলিয়া অন্ধদিগের শিক্ষা খুব দ্রুতভাবেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

খেলা-ধূলা

এ দেশেও এইরূপ প্রথার প্রবর্ত্তন হওয়া উচিত; কিন্তু এ-কথা উঠিলেই আবার সেই শিক্ষকের অভাবের কথা ওঠে।

কলিকাতায় চারি পাঁচ জন শিক্ষককে গৃহ-শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত রাখা দরকার। আর পূর্ব্বেই এই সকল শিক্ষককে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত হইতে হইবে। যখন তাঁহারা শিক্ষিত হইয়া শিক্ষাদান-কার্য্যে ব্রতী হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তখন তাঁহাদের বেতনের কিয়দংশ ছাত্রদের বেতন হইতে উঠিবে; কিন্তু ইঁহাদের বেতনের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হইবেন এখানকার Home Teaching Society. এ দেশে এরূপ সমিতির গঠনও আবশ্যক হইয়াছে।

বিলাতে অন্ধদের সাহায্যের জন্য আর এক প্রকারের সমিতি আছে, যাহাদিগকে "After-care Society" বলা হয়। সে সমিতির কাজ হইতেছে শিক্ষিত অন্ধ ছাত্রদিগকে জীবন-যাত্রার পথে সুনির্দ্দিষ্টভাবে চালিত করা, শিক্ষিত অন্ধ ছাত্রদিগকে কাজের সন্ধান বলিয়া দেওয়া, ব্যবসাদি চালাইবার জন্য অর্থ-সাহায্য করা, যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া দেওয়া। এক কথায় শিক্ষিত হইবার পর জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দেওয়া। এই সকল সমিতি যে কেবল অর্থসাহায্য করিয়া থাকে তাহা নয়, শিক্ষিত অন্ধদিগের গুণপনার ব্যাখ্যা করিয়া ও কার্য্যদক্ষতার নিদর্শন দেখাইয়া তাহাদিগকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সত্যই প্রচারের অভাবে অনেক কার্য্যক্ষম ব্যক্তিও কার্য্যের যোগাড় করিতে না পারিয়া অন্নাভাবে দিন-যাপন করিতে বাধ্য হয়।

(২)

ভারতবর্ষে অন্ধদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার প্রচলন মাত্র ত্রিশ বৎসর হইয়াছে। যে কয়টী বিদ্যালয়ে অন্ধদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাদের ভিতর অধিকাংশই খৃষ্টান-ধর্ম্ম প্রচারকদিগের যত্নে ও উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্ধদিগের জন্য আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া 'মুন'-প্রথায় (Moon System) উৎকীর্ণ অক্ষরে খৃষ্টান ধর্ম্ম-পুস্তক মুদ্রিত করিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। ক্রমশঃ হস্তের কার্য্যের প্রচলন এই আশ্রমগুলিতে প্রবর্ত্তিত হয়। এবং এক্ষণে অনেক বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

কুমারী আস্কুইথ-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ ভারতের পালামকোটার সি-এম-এস স্কুল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। মহীশূরের

ষ্টেট-চালিত বিদ্যালয়টী আমাদের নর্ম্মাল ক্লাসের ছাত্র-দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইনিই সেখানকার প্রধান শিক্ষক। ১৮৮৭ সালে রাজপুরে খৃষ্টান অন্ধদিগের জন্য The North India Industrial Home for Christian Blind স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্‌ভিন্ন এলাহাবাদে ও লাহোরে একটী করিয়া বিদ্যালয় আছে। আমেরিকার ধর্ম্ম-প্রচারক কুমারী মিলার্ড বোম্বায়ে আর একটী অন্ধদিগের জন্য বিদ্যালয় চালাইয়া থাকেন। রাঁচীতে একটী বিদ্যালয় আছে, ইহার কর্ত্তৃত্ব-ভার ছোটনাগপুরের বিশপের উপর ন্যস্ত; পাটনায়ও একটী বিদ্যালয় আছে। ছোটনাগপুরের বিদ্যালয়ে আমাদের পূর্ব্বতন ছাত্র শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী আছে, ও পাটনায় আমাদেরই দুই জন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র মিলিয়া বিদ্যালয়টী স্থাপিত করিয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে স্ত্রী ও পুরুষ পাঠ করিয়া থাকে। এখানে সাধারণভাবে বিদ্যা-শিক্ষা ছাড়া কিছু কিছু কুটীর-শিল্প ও ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষের মানচিত্র-শিক্ষা

এই সকল বিদ্যালয়ে মাত্র পাঁচশত ছাত্র শিক্ষা-লাভ করিয়া থাকে, তন্মধ্যে আমাদের বিদ্যালয়েই ৮৫ জন ছাত্র পড়িতেছে। অন্ধের সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষার্থীর তুলনা নগণ্য, স্বীকার করি। সাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করিয়া বলিতে চাই দেশের ধনকুবেররা এ দিকে অবহিত হউন। এই সকল অন্ধরা যাহাতে পরের গলগ্রহ না হইয়া স্বাধীনভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সমাজের একজন হইয়া চলিতে পারে, এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হউন—শুধু ধনকুবেরদিগের দিকে চাহিলেও চলিবে না—সাধারণের সমবেত চেষ্টায় ইহাদিগের সাহায্যে বদ্ধপরিকর হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। সাধারণের মধ্যে মনকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করিতে না পারিলে দেশের ও দশের মঙ্গল কখনই হইতে পারে না।

বয়ন ও বেতের কাজ শেখা

এ সম্বন্ধে ১৯১৪ সালে ভারত-সম্রাট্ যখন ইংলণ্ডের অন্ধদিগের জন্য National Institute for the Blind অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন, তখন বলিয়াছিলেন —"সাধারণতঃ মানুষ যা কখনও হারায় নাই তাহার মূল্য বুঝিতে পারে না (আমাদের দেশের প্রবাদেও আছে, দাঁত থাকৃতে দাঁতের মর্য্যাদা লোকে বোঝে না) এবং আমি সেই সকল চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদের, যাঁহারা কখনও দৃষ্টি শক্তির মূল্যের বিষয় ভাবেন না, বেশী করিয়া তাঁহাদের অন্ধদের প্রতি কর্ত্তব্যটা বুঝাইয়া দিতে চাই—তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে কার্য্যে অন্ধদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখান, যাহার দ্বারা অন্ধরা জীবনের আনন্দ উপভোগ করিতে ও সাধারণের আনন্দে যোগদান করিতে পারে এবং অন্ধত্ব ও চক্ষুষ্মানের পার্থক্য যতদূর সম্ভব ভুলিতে পারে।

বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সময় প্রতিষ্ঠাতা লালবিহারী শাহ

(৩)

কলিকাতার অন্ধ-বিদ্যালয়ের পশ্চাতে ৩২ বৎসরের ইতিহাস রহিয়াছে—অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটী যাহা করিতে পারিয়াছে—যে সামান্য অবস্থা হইতে বিদ্যালয়টী বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত করিব।

অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য যতদূর জানিতে পারা যায় তাহা হইতে বলিতে পারা যায়, ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে কোনরূপ চেষ্টাই হয় নাই। ঐ বৎসর আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গগত লালবিহারী শাহ মহাশয় মিঃ এল গার্থওয়েট বি-এ (লণ্ডন) সাহেবের সহিত পরিচিত হন। ইনি এক সময় ইন্স্পেক্টার অব স্কুলের কার্য্য করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ ও মালয়লম ভাষার অনুবাদকেরও কার্য্য করিয়াছেন। ইনিই আমার পিতৃদেবকে ব্রেইল্ রীতিতে (Braille System) শিক্ষিত করেন। ১৮৯৭ সালে পিতৃদেব তাঁহার বাটীতে অন্ধদিগের আশ্রম ও বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত করেন। একটী অন্ধ ছাত্র লইয়াই বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি ৩ বৎসরের মধ্যেই Braille System বাঙ্গলা ভাষায় অনুসরণ করিয়াছিলেন। অন্ধদিগের শিক্ষা দিবার জন্য এই রীতিতে কেবলমাত্র লিখিতে ও পড়িতে তিনি শিক্ষিত হন নাই, কিন্তু পাটীগণিত প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য লণ্ডনের ব্রিটিশ ও ফরেন ব্লাইণ্ড এসোশিয়েশন, এক্ষণে যাহার নাম হইয়াছে The National Institute for the Blind, হইতে পুস্তকাদি ও যন্ত্রপাতি আনয়ন করিয়া শিক্ষা করিতে থাকেন। এইরূপে তিনি অন্ধদিগের শিক্ষাকার্য্যে জ্ঞান-লাভ করিতে থাকেন। ১৮৯৮ সালের মার্চ্চ মাসে আরও তিনটী ছাত্র শিক্ষার জন্য আসে। ইহার এক বৎসরের মধ্যে শিক্ষা-কার্য্য কিছুদূর অগ্রসর হইলে তিনি শ্রদ্ধেয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুষ্ঠানটীকে সাধারণের গোচরে আনয়ন করিতে অনুরোধ করেন। সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী বাগ্মী কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় বাঙ্গালীর নিকট নূতন করিয়া দিতে হইবে না। চিরজীবনই ইনি অধ্যাপনার কার্য্য লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। কিছু কালের জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের পদে ইনি বৃত হন। তাঁহারই সভাপতিত্বে ১৮৯৯ সালে বিদ্যালয়ের ১ম বার্ষিক অধিবেশন জেনারেল এসেম্বলি ইন্‌ষ্টিটিউশনের হলে (এক্ষণে যাহা স্কটিশ চার্চ্চ

লর্ড লিটন ও স্যর লানস্‌লেট স্যান্‌ডারসনের সহিত স্থাপয়িতা

কলেজ হইয়াছে) হয়। এই অধিবেশনের পর হইতে বিদ্যালয়টী সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সর্ব্বপ্রথম সাধারণের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয় এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইয়া আমার পিতৃদেবের একার যত্নে বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে; বস্তুতঃ ৩০ বৎসর ধরিয়া তিনি সকল কার্য্যই একা করিয়া আসিয়াছেন। এক সময় মিষ্টার গুর্‌লে সত্যই বলিয়াছিলেন, তিনি একাধারে বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, কার্য্যাধ্যক্ষ, কমিটি, হিসাব-নিকাশ-পরিদর্শক এবং শিক্ষক। কিন্তু অধিক দিন তিনি এই সকল কার্য্য একাকী করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার সাহায্য লইবার আবশ্যক হইল। তিনি স্যর আর্চডেল আরল ও মিঃ ডবলিউ, আর, গুর্‌লে সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করেন ও ১৯১১ সালে বিদ্যালয়টী ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করিয়া ট্রষ্টিদের হস্তে ন্যস্ত করেন। ১৯২৪ সালে বাঙ্গালার লাট সাহেব লর্ড

লিটনের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি আবেদন-পত্র প্রচারিত হয় ও বিদ্যালয়ের স্থায়ী বাটী নির্ম্মাণের জন্য প্রায় লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। ১৯২৫ সালের মার্চ্চ মাসে লর্ড লিটন্-কর্ত্তৃক বেহালায় নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়; জুন মাসে বিদ্যালয় নূতন ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ইহাই হইতেছে বিদ্যালয়ের ভিত্তি হইতে বিকাশের সামান্য ইতিহাস।

আমার পিতৃদেব ১লা জুলাই ১৯২৮ সালে মারা যান। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যালয়ের কার্য্যভার বহন করিয়াছিলেন।

এ বিদ্যালয়ের আদর্শ হইতেছে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া, যাহাতে ছাত্রেরা স্বাবলম্বনবলে সমাজের কৃতী সদস্য হইতে পারে।

এখানে এই বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত পাঁচটী শ্রেণী-বিভাগ আছে—প্রাথমিক (Preparatory), মাধ্যমিক (Secondary), ব্যাবহারিক (Technical), সংগীত (Music) ও নর্ম্মাল শ্রেণী (Normal class)

নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষা দান করা হয়।—

প্রথম—ব্যায়াম শিক্ষা (Physical Education), ইহার ভিতর জিমনাষ্টিক, ড্রিল ও খেলাধুলার প্রতিযোগিতা (athletic sports)।

অন্ধ ছাত্রদের জীবনী-শক্তি সাধারণ ছাত্রদের অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ কম। অতএব তাহাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে অধিকতর মনোযোগী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কখনও কখনও বালকদিগকে অনেক দূর পর্য্যন্ত পদব্রজে লইয়া যাওয়া হয়।

২য়—সাধারণ শিক্ষা—(ক) প্রাথমিক শ্রেণীতে কিণ্ডারগার্টেন মতে পড়া, লেখা, অঙ্ক, মডেলিং, প্রকৃতি হইতে পাঠ লওয়া (Nature study) ও বস্তু বা দ্রব্য হইতে যাহা শিক্ষা করিতে পারা যায় (object lesson) তাহাই শিখান হয়।

(খ) মাধ্যমিক শ্রেণীতে—সাহিত্য, (সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী) ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং। এই শ্রেণীতে ছাত্রেরা প্রাথমিক কিংবা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারে।

৩য়—সংগীত—যন্ত্র ও গলার সাহায্যে সংগীত শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহারা সংগীতকে ব্যবসারূপে গ্রহণ করিতে চায়, তাহাদের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

৪র্থ ব্যাবহারিক শিক্ষা—এ শ্রেণীতে চেয়ার বোনা, ঝুড়ি প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

সূত্রধরের যন্ত্রাদির ব্যবহার কি ভাবে করিতে হয়, তাহা বিশদভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। বালিকাদিগকে সূচীকার্য্য ও বয়নকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

৫ম শ্রেণীতে—নর্ম্মালে শিক্ষকদিগকে নব-প্রথানুসারে শিক্ষিত করা হইয়া থাকে।

হাতের শিক্ষার দিকে আমরা বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিয়া থাকি, কারণ স্পর্শ দ্বারা অধিকাংশক্ষেত্রে অন্ধরা জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারে ও জগতের অনুভূতি লাভ করিয়া থাকে। এমন যে স্পর্শ শক্তি, যাহার প্রকৃতভাবে বিকাশ সাধিত না হইলে অন্ধ সংসারের জ্ঞান লাভেই অসমর্থ হয়, সেই স্পর্শের বিকাশ সাধিত না হইলে অন্ধের শিক্ষাই সর্ব্বাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। স্থান ও দিকের পরিচয় লাভ যাহাতে সহজে হয়, সে শিক্ষার ব্যবস্থাও আমরা করিয়া থাকি, কারণ সহজ-জ্ঞানে কোন কোন অন্ধ ছাত্র এ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিলেও অধিকাংশ ছাত্রের এ বিষয়ে সহজ-জ্ঞান আদৌ পরিলক্ষিত হয় না।

সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা

দৈনিক ও সাময়িক পত্রাদি হইতে উপযোগী অংশ বিশেষ প্রত্যহই ছাত্রদিগকে পড়ান হয়, যাহাতে তাহারা বিশ্বের সহিত সম্বন্ধচ্যুত না হয়—বিশ্বের কোথায় কি ঘটনা ঘটিতেছে তাহার সহিত পরিচিত থাকিতে পারে ও সাময়িক ঘটনাবলী ধারাবাহিকভাবে বুঝিতে পারে।

নিম্নে আমরা আমাদের ভূতপূর্ব্ব কয়েকজন ছাত্র এবং তাহারা এক্ষণে যে ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন তাহার তালিকা সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ নিম্নে প্রদান করিলাম—

১। অমূল্যকান্ত বাগচী, রঙ্গপুরের জনৈক ব্যবসাদারের পুত্র, ১০ বৎসর বিদ্যালয়ে শিক্ষার পর তাহার পিতার পাটের ব্যবসায়ে সাহায্য করিতেছেন এবং স্বয়ং ব্রেলী-মতে হিসাবাদি রক্ষা করিতেছেন।

২। ইয়াকুব আব্দুল লতিফ, কলিকাতায় সুন্দরভাবে ব্যবসা চালাইতেছেন।

অধ্যক্ষ অরুণকুমার শাহ

৩। কমলাকান্ত মজুমদার, তিন বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা-কার্য্য শেষ করিয়া পাটনায় অন্ধ-বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও শিক্ষার কার্য্য চালাইতেছেন। এই পরিশ্রমী যুবক পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৪। ব্যোম বাহাদুর। জনৈক নেপালী-বালক, এখানে ১০ বৎসর থাকিবার পর তাহার স্বদেশ কালিম্পংএ গিয়া বেতের কাজ করিয়া মাসিক ৩০৲ টাকা বেতন পাইতেছে। যেখানে ব্যোম বাহাদুর কাজ করিতেছে সেখানকার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট হইতে তাহার সম্বন্ধে ভাল মন্তব্য পাইয়াছি। তাহার আপনার উপর এতদুর নির্ভরতা জন্মিয়াছে যে, কোন সাহায্যকারীকে সঙ্গে না লইয়াই সে একাকী তাহার পুরাতন বন্ধু-বান্ধব ও শিক্ষকদিগের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে সেবার কলিকাতায় আসিয়াছিল। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে, সে এখানে থাকে ; কিন্তু আমাদের তাহা অভিপ্রেত নয় বলিয়া আমরা সে কার্য্য হইতে তাহাকে বিরত করি। আমরা চাই, আমাদের ছাত্রেরা সুশিক্ষিত হইয়া তাহাদের নিজ নিজ সমাজের একজন কৃতী সভ্য হউক।

৫। বঙ্কিমচন্দ্র রায় চৌধুরী এম-এ (রৌপ্য-পদক প্রাপ্ত), বরিশাল ১৯২৮ সালে ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষায় ১ম বিভাগের ২য় স্থান অধিকার করেন। এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইনি একজন 'রিসার্চ্চ স্কলার'। মাসিক ৭৫৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেছেন এবং ছয় মাস দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। জনৈক রিডারের (পাঠকের) সাহায্যে তিনি গবেষণা-কার্য্য সুচারুভাবে চালাইয়া আসিতেছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা এক সময় ভাবিয়াছিলেন যে, ইঁহার দ্বারা কার্য্য চলিতে পারিবে না ; কিন্তু তাঁহাদের সে ধারণা যে অমূলক তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

৬। অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—১৯১৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা ও ১৯২৫ সালে দর্শন শাস্ত্রে এম-এতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন ও আজ কয় বৎসর ধরিয়া বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনার কার্য্য সুন্দরভাবে চালাইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি ইনি জনৈক শিক্ষিতা যুবতীকে বিবাহ করিয়াছেন। মহিলাটি স্বেচ্ছায় ইঁহাকে বিবাহ করিয়া
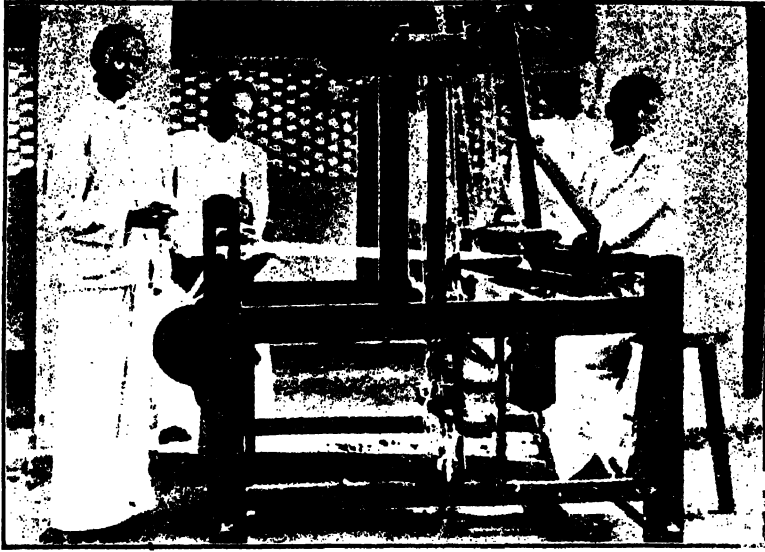
তাঁতশালায় বালকরা

ইঁহার দৃষ্টিশক্তি পূরণ করিয়াছেন—ইনিই নগেন্দ্রনাথের চক্ষুরত্ন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এতদ্ভিন্ন অনেক জন ছাত্র সংগীত ও হাতের কাজ করিয়া বেশ জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছে।

রবার্ট সেড্রিক শেরিফ

[শ্রীবিজনবিহারী বসু বি-এ]

Journey's End নামক নাটকখানি ও তাহার রচয়িতা রবার্ট সেড্রিক শেরিফের নাম আজ সমস্ত বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া গত বৎসর এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইয়াছিল। পাঁচলক্ষ টাকা এখানি বর্ত্তমান যুগ-সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বিশ্বমানবের মনের উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। নাটকখানি রবার্ট সেড্রিক শেরিফকে বিশ্ববরেণ্য করিয়াছে এবং লেখক জগতের নিকট হইতে যে সমাদর ও অম্লান যশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা উত্তরোত্তর জগতের জ্ঞানপিপাসুদের নিকট বর্দ্ধিত হইবে ও অক্ষুণ্ন রাখিবে।

আলোচ্য নাটকখানির ভিতর কোন সামাজিক-সমস্যার জটিলতা নাই, সাধারণের দুর্ব্বোধ্য সূক্ষ্ম ভাবের অবতারণা নাই। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করিয়া আখ্যানবস্তুটী গড়িয়া উঠিয়াছে। স্ত্রী-চরিত্রহীন এই নাটকখানি নাট্যামোদীদের নিকট প্রহেলিকার মত। সহজ অনাড়ম্বর সরল ভাষা নাটকখানিকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এই জটিলতাশূন্য নাটকে লেখকের অক্ষমতার পরিচয় কোথাও নাই। বাহিরের আড়ম্বরের প্রাচুর্য্যের অভাবই নাটকখানিকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছে। সাধারণতঃ নাটকের ভিতর দৃশ্যাবলীর যে বিপুল সমারোহ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে রসিকজনের চিত্ত ক্ষুব্ধ ও পীড়িত হয়। দর্শকের চিন্তাশক্তিকে অসাড় করিয়া তোলে। Journey's Endএর ভিতর এরূপ আড়ম্বরপূর্ণ দৃশ্যাবলী নাই ও ইহা

রবার্ট সেড্রিক শেরিফ

চিন্তার খোরাক জোগায় বলিয়া সমস্ত য়ুরোপ নাট্যকারের রচনানৈপুণ্য ও নাটকের অভিনয় সফলতার কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহা শিক্ষিত ও কলানুরাগীদের নিকট অধিকতর উপভোগ্য হইয়াছে।

Journey's End নাটকখানির অনাড়ম্বর সরস ভাষায় সরল সত্যকাহিনীর প্রকাশ আমাদের মনের দ্বারে যেরকম আঘাত করে, কোন মিথ্যা ঘটনাকে কল্পনার বলে রঙীন করিয়া চিত্রিত করিলে তেমন করিত না এবং নাটকখানিও তেমন হৃদয়গ্রাহী হইত না। মাত্র চার বৎসর পূর্ব্বে নাটক লিখিবার কল্পনাও তাহার মনে স্থান পায় নাই। তা' ছাড়া ইহা যে একখানি যুদ্ধবিষয়ক নাটক হইয়া উঠিবে একথা তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই। পুস্তক-প্রকাশের অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার নাম খুব অল্প লোকেই জানিত।

Hampton Wick নামক স্থানে সামান্য একটী গৃহে তাঁহার পিতামাতার সহিত শেরিফ একত্র বাস করিয়া থাকেন। এ গৃহের স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীর সহিত জড়িত। এই গৃহেই বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রথম জগতের আলো দেখিতে পান।

এই যশস্বীর দ্বারে আজ কত ভক্ত ভারে ভারে অর্ঘ্য

সৈনিকবেশে শেরিফ

লইয়া আসিতেছে। সমস্ত জগৎ তাঁহার প্রতিভায় আজ মুগ্ধ হইয়া নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু যশের প্রাচুর্য্য, অর্থসমাগম তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার জীবন-ধারার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করিবার পূর্ব্বে যে সকল বন্ধু একত্রে আমোদ-প্রমোদ, খেলা-ধূলা করিতেন আজও তাঁহারা শেরিফের সঙ্গসুখ সমানভাবে উপভোগ করিয়া থাকেন। যদিও রাজপরিবারের সহিত হস্ত-মর্দ্দন করিবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছে এবং লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ ভোজনাগারে উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীদের সহিত একসঙ্গে এক টেবিলে ভোজন করিবার সুযোগ তিনি পাইয়াছেন, তথাপি রবার্ট শেরিফ তাঁহার পুরাতন দরিদ্র হোটেলটীকে ভোলেন নাই। পুরাতন বন্ধুদের লইয়া আজও সেখানে একত্র আহার করিয়া থাকেন, রঙ্গমঞ্চের পুরাতন অভিনেতাদের সহিত এখনও তাঁহাকে পূর্ব্বের মত রসিকতা করিতে দেখা যায়। এই নিরহঙ্কার, নিরভিমান লেখকের সহিত আলাপ করিবার সময় অনেকের বুক গৌরবে ভরিয়া উঠিয়াছে, সসম্ভ্রমে মস্তক নত হইয়া আসিয়াছে।

একটী প্রশস্ত বসিবার ঘরে একটী বৃহৎ লিখিবার টেবিল তাহার চারিধারে গদি আঁটা চেয়ার ও কয়েকখানি পুস্তক এবং একটী আধারে কয়েকটী রৌপ্য-নির্ম্মিত সন্তরণ-প্রতিযোগিতার পুরস্কার (Rowing Trophies)-এগুলি বেশ সুন্দরভাবে রক্ষিত। গৃহসজ্জা ও সুরুচির পরিচায়ক। এইস্থানে শেরিফ তাঁহার দর্শনপ্রার্থীদের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রশস্ত উন্নত ললাট বুদ্ধিদীপ্ত, তেজোব্যঞ্জক চক্ষুদুটীর তীক্ষ্ণতা তাঁহার গভীর চিন্তাশক্তির পরিচয় দেয়। কথা কহিবার সময় মাঝে মাঝে তিনি চঞ্চল হইয়া ওঠেন। ঠোঁট দুটিতে সর্ব্বদাই সরল হাসি মাখান। যে কোন বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা ও পারদর্শিতার সহিত অক্লান্তভাবে তাঁহাকে আলাপ করিতে শুনিলে বাস্তবিকই মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। নাট্য-রচনার বিষয় উল্লেখ করিলে বলেন যে খেয়ালের বশে তিনি নাটক লেখেন। চার বৎসর পূর্ব্বে তিনি কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই যে তাঁহাকে নাটকের জন্য লেখনী ধারণ করিতে হইবে।

চার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব বিদ্যালয়ের কয়েক-জন ছাত্র মিলিয়া কোন এক সদনুষ্ঠানের সাহায্যকল্পে নাটকাভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রকাশকদের দ্বারে অভিনয়যোগ্য ক্ষুদ্র একখানি নাটিকা মনোনীত করিয়া লইতে অপারগ হইলে শেরিফের এক বন্ধু তাহাদিগকে পরামর্শ দিলেন, "দেখ, তোমরা যদি থিয়েটারই করতে চাও তো লোকের দ্বারে দ্বারে না গিয়ে নিজেরাই নাটক লিখে তার অভিনয় কর।" দলের মধ্যে একা শেরিফেরই একটু-আধটু লেখার অভ্যাস ছিল; সুতরাং নাট্য-রচনার ভার তাঁহারই উপর আসিয়া পড়িল। নাট্য-রচনা যে তাঁহার পক্ষে কখনও সম্ভবপর হইতে পারে এ ধারণা তাঁহার কোন দিনই ছিল না। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবার শক্তি ভগবান্ তাঁহাকে সম্যগ্‌রূপে দিয়াছেন। তিনি উপর্য্যুপরি কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সাহিত্য-সাধনার বাসনা তাঁহার ভিতর জাগ্রত হইয়া ওঠে। একখানি তিন অঙ্কের নাটক লিখিয়া স্থানীয় রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের নিকট যান, কিন্তু তিনি তাহা অমনোনীত করিয়া ফেরৎ পাঠান। ইহাতে ভগ্নমনোরথ হইয়া বালকেরাও একটী সৌখীন অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায় গড়িয়া তোলে এবং শেরিফের নাটকের মহলা আরম্ভ করিয়া দেয়। এই মহলা দিবার সময় তিনি যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। সাজ-সজ্জা, মঞ্চ-বৈশিষ্ট্য ও দৃশ্যপটাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁহার নিজের কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় কতকগুলি ত্রুটি-বিচ্যুতি অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। মহলা দিবার সময় সেই সকল দোষ তিনি নিজে দেখিতে পাইলেন এবং পরে ঐ গুলি পরিহার করিয়া কলাসম্মত সুচারু সৌন্দর্য্য ও শ্রী-মণ্ডিত করিয়া নাটক বাহির করিতে লাগিলেন, সময়ে সময়ে তাঁহাকে এক একটী দৃশ্য আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব শিল্পী মহলা দিবার সময়ই প্রকৃত 'হাতে খড়ি' লাভ করিয়াছেন। যাহা হউক তাঁহার নাটকখানি সর্ব্বশ্রেণীর দর্শককেই পরিতৃপ্ত করিয়াছিল এবং তাহার ভিতর নাটকীয় মাল-মশলার প্রচুর সমাবেশ দেখিয়া অনেকে আশা করিয়া-ছিলেন যে কালে ইনি একজন খ্যাতনামা নাট্যকার হইয়া উঠিবেন। স্থানীয় কাগজগুলি তাঁহার নাটকের নির্ভীক সমালোচনা করিয়াও স্থানে স্থানে তাঁহার ভ্রম-ভ্রান্তি দেখাইয়া প্রকৃত বন্ধুর মত তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল।

তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্ব্বক বিশিষ্ট চরিত্র-চিত্রণে অপারগ হইলে নাটক কিছুতেই স্থায়ী হইতে পারে না। নাটক-রচনার কয়েকটী বিশিষ্ট নিয়ম আছে, সে গুলি জানা না থাকিলে অভিনেতাদের বিপুল চেষ্টা ও সাজ-সরঞ্জামের সুচারু ব্যবস্থা থাকিলেও নাটককে দীর্ঘজীবী করিয়া তুলিতে পারা যায় না। এইজন্য তিনি William Archer প্রণীত Play-Making ও তাহার সঙ্গে নিয়মিতভাবে বিখ্যাত নাট্যকারদিগের শ্রেষ্ঠ রচনা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইব্‌সেনেরই তিনি বিশেষ ভক্ত। শেরিফের সাহিত্য-জীবনে ইব্‌সেন যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া নাট্যরচনা করিয়াছেন, শেরিফও সেই আদর্শ ও উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত; কিন্তু উভয়ের রচনা-ভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট।

১৯২৭ সালে আদর্শের পূজা (Hero-worship) লইয়া শেরিফ একটী নূতন নাটক লিখিবার পরিকল্পনা করেন। কোন বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর একটী বালক তাহাদেরই উচ্চশ্রেণীর একটী সর্ব্বগুণান্বিত যুবককে সর্ব্বতো ভাবে তাহার জীবনের আদর্শরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। যুবকটীও ওই বালকটীর প্রতি স্নেহাবিষ্ট। উভয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া সংসারের জটিল আবর্ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িলে সেই বালকটীর আদর্শের পরিণতি কোথায় কি ভাবে ঘটিবে—নাটকখানিতে সেই সমস্যারই সমাধান আছে। পরে যুদ্ধের কয়েকটী ঘটনার ভিত্তির উপর দু'চারিটী নূতন চরিত্র গঠিত করিয়া ইহাতে সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে যে শুধু নাটকের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নয় দর্শকদিগের মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়াছে। নূতন ঘটনার সমাবেশে চরিত্র এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে যে দর্শকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে—তারপর কি ?

নাটকখানি বিচিত্র কল্পনায় উদ্ভাসিত হইয়া পাঠকের মনে আনন্দের লহর তুলিয়া দেয়। এই সর্ব্বরসসমন্বিত নাটকখানিই পরে Journey's End নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা যাহা নাটকে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা কি না প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছেন যে উহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। অবশ্য আমি আমার রোজনামচায় দৈনিক কাহিনী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি সত্য এবং ঐ রোজনামচার কয়েকটী ভাবের ছায়া যে Journey's Endএ আসিয়া পড়িয়াছে তাহাও খাঁটি সত্য। শেরিফ তাঁহার কোনও এক বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে Osborneএর চরিত্রটি বাস্তব জীবন হইতে গৃহীত এবং যুবক সেনানায়ক Stanhopeএর সহিত ফ্রান্সে পরিচিত শেরিফের অপর এক বন্ধুর মিল আছে।

এই নবীন প্রতিভাশালী নাট্যকারকে এক সময়ে অভিনয়ের জন্য থিয়েটারের ম্যানেজারের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। বহুবার নিজ হাতে তাঁহাকে নাটকখানির টাইপ করিয়া পাঠাইতে হইয়াছে, এক বন্ধু আসিয়া বলিলেন যে, জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার বার্ণার্ড শ' নাটকখানি পড়িয়া দেখিবার একদিন বাসনা জানাইয়াছেন। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পাণ্ডুলিপি হইতে নকল করিয়া শেরিফ তাঁহাকে নাটকখানি পাঠান। বার্ণার্ড শ' এই তরুণ সাহিত্য-শিল্পীর প্রতিভার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

অবশেষে একদিন Stage Society এই নাটকখানির অভিনয় ঘোষণা করেন ও Jame Whale ইঁহার প্রয়োগ-শিল্পের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। সম্প্রতি বিখ্যাত Savoy Theatreএ উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি ইহার অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি এই নাটকখানি উপন্যাসাকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। লেখকের সাহায্য লইয়া Vermon Bartlett উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন। অনেক বুদ্ধিমান্ পাঠক আছেন যাঁহাদিগকে নাটক তেমন আনন্দ দিতে পারে না, নাটক পাঠে তাহারা প্রীত হন না, এই শ্রেণীর লেখক-দিগের প্রীতির জন্যই উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে।

স্নেহের ক্ষুধা

(গল্প)

[শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]

এক

সারা দুপুর আজ যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল—লু চলিতেছিল। তাহার জ্বালায় ছটফট করিয়া পাঁচটার কিছু পরে মৃণাল তাহার কচি মেয়েটীকে লইয়া বাহিরের রকে আসিয়া বসিল।

বড় রাস্তার উপর ছোট্ট বাড়ীখানি, রকও তাহার খুব ছোট। কন্যা পিতাকে নানারূপ প্রশ্নবাণে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে লাগিল—"বাবা! ওতা কি?"

মৃণাল বলিল—"ঘোড়ার গাড়ি।"

"—ঘোলাল গালি? ওতা—"

"মটর গাড়ী।"

"মতল গাড়ি—কে চলবে।"

শিশু কন্যার রাশি রাশি প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মৃণাল যেন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

দিব্য ফুটফুটে মেয়েটী, নধর গোল-গাল চেহারা, দেখিলেই একবার বুকে করিতে ইচ্ছা করে। পথচারিগণ একবার করিয়া সে স্থানে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিয়া যাইতেছে।

হঠাৎ আকাশের কোলে পূর্ণিমার চাঁদ দেখিতে পাইয়া কন্যা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! ওতা কি?"

মৃণাল বলিল—"চাঁদ।"

"তাঁদ? ঠাকুল?" বলিয়া কন্যা পিতার কোলে বসিয়া যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া বলিল—"ঠাকুল। বাবাকে ভাল লাখ।"

কন্যার এই অভাবনীয় কামনা পিতার হৃদয়ে কি একটা ভাবের সৃষ্টি করিল, তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কচি মুখখানিতে স্নেহ-চুম্বন বসাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর—তোকে কে বল্লে, মা?"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া কন্যা কেবল হাসিতে তাহার মুখখানিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

হঠাৎ একটী স্ত্রীলোক তাহার নিকটে আসিয়া মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে কন্যাকে দেখিতে দেখিতে তাহাকে আবেগভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"একবার কোলে নেবো?"

সম্পূর্ণ এই অপরিচিতার কথায় মৃণাল প্রথমটা চমকাইয়া বলিল—"নাও না, বাছা, তাতে আর আপত্তি কি? দেখ, যায় কি না?"

স্ত্রীলোকটী তাহার দুইটী হাত বাড়াইতেই মেয়েটী হাসি-মুখে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। রমণী কিছুক্ষণ তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া তাহার মুখখানি একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। যুগ্মভ্রূর নীচে ডাগর চোখ দুটী, পাতলা দুটী ঠোঁট, নরম তুলতুলে গোল হাত দু'খানি।

স্ত্রীলোকটী পুনরায় তাহাকে তাহার বুকের মধ্যে নিবিড় ভাবেই চাপিয়া ধরিল। বস্ত্রাঞ্চল হইতে কয়েকটী লিচু বাহির করিয়া একটী একটী করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিল।

মৃণাল বলিল—"ও কি?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া স্ত্রীলোকটী বলিল—'একবার দেবেন?...একটু বেড়িয়ে আনি।"

মৃণাল আপত্তি করিল না।

স্ত্রীলোকটী পথের এদিক্-ওদিক্ বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু দশ-পনর মিনিটের মধ্যে মৃণাল যখন তাহাকে দেখিতে পাইল না, তখন সে আশঙ্কান্বিত হইল। চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইল চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া স্ত্রীলোকটী কন্যাকে অজস্র চুম্বনে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। কাছে গিয়া বলিল, "এইবার আমাকে দাও।"

"আর একটু থাক না, বাবু।"

মৃণালের অন্তরে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা আসিয়া দেখা দিল, বলিল—"না-না, সন্ধ্যা হ'য়ে এল, বাড়ী নিয়ে যেতে হবে।'

স্ত্রীলোকটী বলিল—"তবে চলুন, আমিই দিয়ে আসছি।"

বাটীর সম্মুখে আসিয়া মৃণাল বলিল,—"এইবার দাও।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কন্যাকে তাহার কোলে তুলিয়া দিতেই সে বাটীর মধ্যে যাইবার জন্য পা বাড়াইলে স্ত্রীলোকটি পুনরায় বলিল,—"আর একবার দিন না।..."

বিস্মিত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর ফেলিয়া মৃণাল বলিল,—"ব্যাপার কি ?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া স্ত্রীলোকটী বলিল,—"আপনার পায়ে পড়ি, আর একটীবার দয়া ক'রে দিন।"

মৃণালের অন্তরে সন্দেহের ছায়াপাত হইলেও একথার পর এমন কাতর প্রার্থনায় কন্যাকে তাহার কোলে না দিয়া থাকিতে পারল না।

কন্যাকে কোলে লইয়া স্ত্রীলোকটী কতকটা অগ্রসর হইতেই মৃণাল জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা নিয়ে যাচ্ছ ওকে ? —দাও।'

হাস্য-তরল কণ্ঠে স্ত্রীলোকটী বলিল—"বাড়ী নিয়ে যাব ?"

মৃণাল আর থাকিতে পারিল না; তাড়াতাড়ি তাহার কোল হইতে কন্যাকে ছিনাইয়া লইয়া বলিল—"সহরের আবহাওয়ার মধ্যে বাস ক'রে তোমাদের চাল-চলন সবই আমরা বুঝি ; ভদ্রতার সীমা অনেকক্ষণ লঙ্ঘন করেছ।"

অপ্রস্তুতের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্ত্রীলোকটী সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

সেইখানে দুই চারি জন যাহারা জড় হইয়াছিল তাহারা বলিল—"এমন কাজ আর কখনও করবেন না, মশাই। এরা সুবিধে বুঝে মেয়ে চুরি করবে।"

কথাটা নারীটার কাণে যাইতেই মাথাটা তাহার আপনা হইতেই হেঁট হইয়া গেল।

দুই

এই সম্পূর্ণ অপরিচিত শিশুটীর প্রতি কিসের একটা আকর্ষণে প্রকাশ্য রাজপথে এই নারীটী যাছা করিয়া বসিল এবং তাহার বিনিময়ে পথিকদের বা মৃণালবাবুর নিকট যে ব্যবহার পাইল সেইটার আলোচনা করিতে করিতে সে যেন মরমে মরিয়া যাইতে লাগিল। কে এই শিশু,—কেনই বা তাহার নিকট হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ লইয়া তাহাকে এমনি ভাবে কোলে লইতে গেল ? সে নিজে একজন দাসী মাত্র, এটা তাহার বোঝা উচিত ছিল, স্নেহ বলিয়া কোন জিনিসই তাহার চিত্তের এতটুকু স্থানে থাকা উচিত নয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা বলিয়া তাহার কিছু থাকা উচিত নয়।

সন্ধ্যায় রাজপথ গ্যাসের আলোয় উজ্জ্বল হইলেও চক্ষের জলে সে চারিদিক্ ঝাপসা দেখিতে লাগিল।

বিরাট্ জন-সমুদ্রের মাঝে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বহুকালের একটা স্মৃতি তাহার মনে উঁকি মারিল। তারপর মনিব-বাড়ী যাইবার জন্য সে কখন বাটী হইতে বাহির হইয়াছে, আর এখনও পর্য্যন্ত পথে পথে সে কাটাইয়া দিল !

সে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

যখন সে প্রভুর বাড়ী গিয়া পৌছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

তাহাকে এই এতটা রাত্রে আসিতে দেখিয়া গৃহিণী রুক্ষ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"এ রকম ভাবে কাজে এলে তোমাকে আমি রাখতে পারব' না বাছা, তুমি অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখ।"

নলিনী এ কথার উত্তরে কোনও কথা বলিল না। নীরবেই সে গৃহিণীর পরুষ বাক্যগুলি সহ্য করিয়া বাসনের স্তূপ লইয়া কলের নিকট গিয়া বসিল।

অন্তরের সমস্ত একাগ্রতাটুকু এই কাজের উপর দিলেও নলিনীর চিত্তের পরতে পরতে কোথা হইতে সেই শিশুর হাসিমাখা মুখখানি উঁকি মারিয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া তুলিতে লাগিল। নলিনীর চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। কেন আজ সে ও পথ দিয়া আসিতেছিল ? তাড়াতাড়ি কোন রূপে কাজ শেষ করিয়া সে নিজের বাড়ীখানার দিকে পা বাড়াইয়া দিল।

একবার মনে করিল, যাইবার সময় একটীবার সেই বাটীর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখে যদিই সেই মুখখানি আর একটীবার দেখিতে পায়। তখনই আবার মনে হইল না—না, কে সে তার ? সে স্থির করিল, অন্য পথ দিয়াই সে যাতায়াত করিবে।

কিন্তু পথের বুকে পা দিতেই কে যেন জোর করিয়া তাহার পা দুইটাকে সেই দিকেই লইয়া চলিল। যখন সে সেই বাড়ীর দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার কাণের ভিতর ভাসিয়া আসিল—স্বামী-স্ত্রীর কথা। স্ত্রী বলিতেছে—"এমন করে যার তার কোলে সীতাকে আমার ছেড়ে দিও না। নিজেদের ব্যবসা চালাবার জন্যে আজকাল অনেকে মেয়ে চুরি ক'রে আনাদের মেয়ে ব'লে চালিয়ে দেয় ; কার মনে কি আছে! সেদিনকার কাগজে এই রকমের একটা খবর পড় নি ?" , নলিনীর মন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। ছিঃ ছিঃ, কি কুক্ষণে আজ সে সতীকে কোলে লইয়া বাহির হইয়াছিল !

নিজের জীবনকে ধিক্কার দিতে দিতে নলিনী সে স্থান ত্যাগ করিল।

তিন

বাটীতে আসিয়া নলিনী দেশলাইএর সাহায্যে প্রদীপ জ্বালিয়া তক্তায় বিছানা মাদুরখানার উপর চিন্তাক্লিষ্ট অবশ দেহখানাকে এলাইয়া দিল।

আকর্ষণের কিছুই নাই। নলিনীর মনের ফাঁকা জায়গায় কত কথাই উঁকি মারিতে লাগিল।

স্বামী কোনও কারখানায় কাজ করিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে যাহা পাইত, তাহা সবই তাহার হাতে আনিয়া দিত। সে নিজে দুই বেলার এক বেলা খাইয়া স্বামীকে দুই বেলা খাওয়াইয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল তাহাতে এই জায়গাটুকু জমা লইয়া দুই খানি খোলার ঘর বাঁধিয়া আনন্দেই দিনগুলি কাটাইয়া দিতেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন কলের ঢালাই ঘরে গলিত লৌহের মধ্যে স্বামী যখন প্রাণত্যাগ করিল, তখন সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কারখানার পাওনা টাকায় কয়েকমাস চলিবার পর তাহাকে দাসীবৃত্তি করিতে হইল।

আহারের স্পৃহা আজ তাহার ছিল না। শুইয়া শুইয়া আজ কেবল সারা অপরাহ্নের কথাটাই তাহার মনের মাঝে খেলা করিতে লাগিল। হায়রে আজ নিজেরটাও যদি থাকিত, তাহা হইলে অন্যের কন্যাকে একবার বুকে লইবার প্রবল বাসনার জন্য এমন ভাবে অপমানিতই বা হইতে হইবে কেন ? সে স্থির করিল ও পথে আর কিছুতেই যাইবে না, চক্ষুর নেশা নাই বা তাহার মিটিল,—নিজের যখন কিছুই সে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, তখন অন্যের স্নেহের দুলালীকে বুকে করিতে গিয়া অপযশের কলঙ্ক নাই বা মাথা পাতিয়া সে লইবে। না—না, ও কাজ আর সে কিছুতেই করিবে না।

নিজের মনেই এইরূপ সমাধান করিয়া নিজেকে সমস্ত চিন্তার বাহিরে রাখিয়া যেন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। কখন যে নিদ্রা আসিয়া তাহার চেতনাটুকু কাড়িয়া লইল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।...দেখিল সতী তাহার হাসিভরা কচি মুখখানি লইয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ডাকিল—মা।

সেই তো সেই সতী...পশমের মত বেণী-বাঁধা চুলগুলির শীর্ষদেশে একটী রূপার ঘুমুর বাঁধা।

অঝোর ঝরে কাঁদিতে কাঁদিতে নলিনী বলিল,—'কোথা ছিলি সতী এতদিন...আয় মা আয়!'

তেমনি মধুর হাসিয়া সতী বলিল,—'এসেছি তো অনেক দিনই মা—আমায় কোলে কর।"

'—আয় আয় মা আয় ওরে এবার তোকে এমন ভাবে ধরে রাখব' কেউ দেখতে পাবে না, কেবল তোতে আমাতে হাস্‌ব খেল্‌ব কথা কইব।—'

সতীর মুখে আবার সেই নির্ম্মল হাসি, সেই আধ-আধ কথা, সেই মুক্তার মত দাঁতগুলি।

হঠাৎ তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল,...সতী তখন কোথায় পলাইয়া গিয়াছে।

কান্না-জমাট কণ্ঠে নলিনী ডাকিয়া উঠিল, 'কোথা গেলি মা ?...আয় আয়, আমার এই ফাঁকা বুকখানার মাঝে তোকে লুকিয়ে রাখব আয়।'

সতী কিন্তু আসিল না।

নলিনীর চক্ষুর কোণ দিয়া ধারা নামিয়া আসিল।

চার

কয়দিন ধরিয়া নলিনী সেই পথ দিয়া আর নিজের কর্ম্ম

স্কুলে গেল না, একটী বার দেখিবার চোখের নেশাকে বড় কষ্টেই দমন করিল……নাই বা গেল সে !

দৃঢ় প্রতিজ্ঞার রজ্জুতে মনটাকে বাঁধিয়া সমস্ত দিনটা মনিব বাড়ীর কাজে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিলেও রাত্রিতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় সেই মেয়েটীরই চিন্তা কোথা হইতে তাহাকে পাইয়া বসিল।

সাতটা দিন এই ভাবেই তাহার কাটিয়া গেল। এক দিন কি-জানি কেন তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাহার পা দুইখানা তাহাকে সেই পথের ধারে টানিয়া লইয়া গেল!

বাড়ীখানার সম্মুখে উপস্থিত হইতেই তাহার সারা দেহ যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল…সেই ছোট মেয়েটীর মুখ খানিকে একটী বার দেখিবার জন্য।

সেই খানেই সে থমকাইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু বাহির রকে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া যেন একটু হতাশ হইয়া পড়িল, তবুও কে যেন তাহাকে দ্বার-দেশে টানিয়া লইয়া গেল, মনে পড়িল সতীর আধ-আধ কথা—এসেছি তো অনেক দিনই মা! কোলে কর।

তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কোথায় ভাসিয়া গেল।

বেলা তখন প্রায় তিনটা, মৃণাল বাবু আপিসে।

দ্বার ঠেলিতেই খুলিয়া গেল, নলিনী আর অপেক্ষা না করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল শিশু কন্যা ও তাহার মাতা অকাতরে ঘুমাইতেছে। মনে করিল মেয়েটীকে লইয়া সে চলিয়া যাইবে, কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনার কথা মনে পড়িতেই সে চমকাইয়া উঠিল, দ্বার-প্রান্তে বসিয়া সতীর মুখের উপর নিজের ক্ষুধিত আঁখির দৃষ্টি ফেলিয়া অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ যুবতী নিদ্রা হইতে উঠিয়াই এই সম্পূর্ণ অপরিচিতাকে এমনইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অবাক-বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—'কে গা তুমি—কি চাও ?"

নলিনী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না… অপ্রতিভের মত বসিয়া রহিল।

যুবতী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—'কি চাও বল না ?'

কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দুঃখের হাসি হাসিয়া নলিনী বলিল,—'খুকিকে দেখছি দিদি !"

হঠাৎ যুবতীর মনে সেদিনকার কথাটী জাগিয়া উঠিতেই জিজ্ঞাসা করিল—'সেদিন কি তুমিই খুকিকে নিয়ে গিয়েছিলে ?'

নলিনীর মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না, লজ্জানত মুখে সেইখানে বসিয়া রহিল।

যুবতী বলিল,—'জবাব দিলে না যে ?'

নলিনী এবারও সে কথার উত্তর দিল না, তাহার কাণের মধ্যে বাজিতেছিল—আমায় কোলে কর মা,…চমক ভাঙ্গিলে বলিল,—'খুকিকে একবার দেবে বৌ-দিদি ?'

কি জানি কেন কোন এক অজ্ঞাত কারণে যুবতী শিহরিয়া উঠিলেও নলিনীর বলিবার ভঙ্গী ও প্রাণের আকুতি তাহাকে আর "না" বলিতে দিল না, সে ঘুমন্ত কন্যাকে তুলিয়া তাহার কোলে তুলিয়া দিল।

এতক্ষণ পরে সতীকে কোলে পাইয়া নলিনীর রিক্ত প্রাণ তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল, তাহার মুখের উপর নিজের মুখ রাখিয়া বলিল,—'আমি তোকে পেয়েছি মা' !

তারপর যুবতীকে বলিল,—'একবারটী একে নিয়ে যাই, আবার আমি তোমার কোলে দিয়ে যাব'।'

যুবতী চমকাইয়া উঠিয়া, বলিল,—'না—না—না, কোনও মতলব নিয়ে যদি এসে থাক, বেরিয়ে যাও বলছি, আর কখনও এখানে এস না।

ব্যাকুল ভাবে নলিনী বলিয়া উঠিল,—'একটীবার দয়া করে দাও—একটীবার নিয়ে যাই।"

বেশ কঠোর অথচ দৃঢ়-কণ্ঠে যুবতী বলিল,—'কেন মিছে জ্বালাতন করছ' ওসব হ'বে না।'

এতক্ষণে এই কথা কাটাকাটিতে নিদ্রিত সতীর নিদ্রা টুটিয়া গেল, নলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিভরামুখে বলিল,—'মা' !

বুভুক্ষু মাতৃ-হৃদয়ে স্নেহের উজান বহিয়া গেল। বলিল,—'তোকে কোলে পেয়ে ধন্য হয়েছি সতি! কথাটা বুঝিতে না পারিলেও সতীর মুখখানি হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় যুবতী তাহার কোল হইতে কন্যাকে ছিনাইয়া লইয়া বলিল,—'যাও আর এক দণ্ডও নয়।'

কিয়ৎক্ষণ হতভম্বের মত থাকিয়া আত্ম-সম্ভ্রম-আহতা

নলিনী চ'খের জল ফেলিতে ফেলিতে নিঃশব্দেই উঠিয়া গেল।

পাঁচ

সেই দিন হইতে সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিলেও নলিনী সে বাড়ীতে আর কোন দিন প্রবেশ করিত না, কিন্তু দ্বার প্রান্তে কিছুক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, যদি হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তে সেই মুখখানি একবার দেখিতে পায়!

কিন্তু দেখা সে পাইত না, তবে, কন্যার কলহাস্য কখনও কখনও বা তাহার কাণে গিয়া তাহাকে এ পৃথিবী হইতে যেন অন্য একটা আনন্দময় রাজত্বে লইয়া গিয়া ফেলিত, কখনও বা তাহার কান্না কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া বুক-খানাকে তোলপাড় করিয়া তুলিত··· ইচ্ছা হইত সকল অপমান ভুলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলে, তুমি কেমন মা গা বাছা, ছেলের কান্না বুকে বাজে না?

তখনই কিন্তু কোথা হইতে তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিত এ অনধিকারীর দাবী কেন? এই চিন্তাই তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিত,—দুঃখের পাহাড় বুকে লইয়া সে সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইত। মনে করিত কি দুষ্টগ্রহই না তাহার স্কন্ধে আসিয়া চাপিয়া বসিয়াছে। সব হারাইয়াও নিজের জীবনটাকে এতদিন ধরিয়া একটানা চালাইয়া আসিতেছিল বেশ, কোথা হইতে এই মিথ্যা আকর্ষণ একেবারে টানিয়া—মিথ্যা মোহ আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

সে দিন রবিবার।

পথ চলিতে চলিতে নলিনী দেখিতে পাইল মৃণালবাবু তাহার কন্যাকে লইয়া বাহিরের রকে বসিয়া আছেন।

সে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সতীর মুখখানির প্রতি নির্নিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিল—হঠাৎ তাহার অন্তরের মণিকোটর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—আবার?

তাহার চক্ষু দুইটী জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল,—তাহার চক্ষুই যে তাহাকে টানিয়া আনে, কি করিবে সে?—

সেখান হইতে চলিয়া যাইবার জন্য সে আকুল হইয়া উঠিলেও সতীর মুখের আকর্ষণে যে আর নড়িতে পারিল না,—জ্ঞান-হারার মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নলিনী মৃণালবাবুর কাছে কাতর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু ঝি রাখবেন?'

মৃণাল বলিল,—'গরীব লোক আমরা, লোক রাখবার পয়সা কোথা? তা ছাড়া কাজও এমন কিছু বাড়ীতে বেশী নেই।'

'সতীর জন্যে বোধ হয় দরকার বাবু' বলিয়া নলিনী চুপ করিয়া আবার বলিল,—'যখনই এই পথ দিয়ে যাই তখনই ওর কান্না শুনতে পাই।'

মৃণালের অন্তরের মধ্যে সেদিনকার পথিকদের কথাগুলা জাগিয়া উঠিবামাত্র বলিল,—'তাতে তোমার কি?'

বিনীতভাবেই নলিনী বলিল,—'রাখতেন যদি তাহলে সোণামণির কষ্ট হ'ত না।"

মৃণাল একবার তাহার মুখের দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। তার পর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কোনও কথা বলিল না।

মেয়েটার কাছে সরিয়া গিয়া তাঁহার চুলগুলির মধ্যে আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে নলিনী বলিল, 'মাইনে না হয় নাই দেবেন বাবু, তবু খুকিমণিকে—'

অধৈর্য্যের মত মৃণাল বলিয়া উঠিল, "তোমার কি মতলব বলতে পার, গরীবের মেয়েটীর ওপর এত খানি দরদ কেন? যাও বলছি, সে দিন অমনি দুপুর বেলা বাড়ী ঢুকে ছিলে?"

মহা অপরাধীর মত নলিনী বলিল, "মেয়েটীকে কোলে করতে ইচ্ছে করে বাবু তাই,—উত্তেজিত মৃণাল বলিয়া উঠিল, "তোমার এত খানি করুণার দরকার নেই।"

নলিনী শুধু উদাস-দৃষ্টিতে মেয়েটীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ছয়

বার বার অপমানিত হইয়াও নলিনীর চ'খের সম্মুখে যখন সতীর কচি মুখের ছবি ভাসিয়া উঠিত, তখন সে যেন শুনিতে পাইত সেই ছোট মেয়েটী যেন তাহাকে হাত ছানি দিয়া ডাকিতেছে, আমায় কোলে কর। কথাটা শুনিবা মাত্র অপমানের জ্বালা হিতাহিত জ্ঞান অতল তলে ডুবাইয়া দিয়া সেই বাড়ীর দিকেই ছুটিয়া যাইত। মনের মধ্যে এই কথাটাই কেবল জাগিয়া উঠিত স্নেহের কাছে

আবার অপমান কি? সতীকে একবার কোলে পাইবার জন্য জগতের শত লাঞ্ছনা সে অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারে।

সেদিন মনিব বাড়ীর প্রাতঃকালীন কাজ শেষ করিয়া যখন সে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন প্রায় বারটা, সে দেখিল মৃণালবাবুর বাটির বহির্দ্বার উন্মুক্ত।

বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল সতী কতকগুলা পুতুল লইয়া খেলা করিতেছে, আর তাহার গর্ভধারিণী নিদ্রার কোমল কোলে সুখ-শায়িতা।

নলিনীর মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাত ছানি দিয়া ডাকিল—'আয়—মা · আয় · আমি তোকে কোলে করতে এসেছি।

খেলা ছাড়িয়া সতী তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল।

স্নেহ-চুম্বনে তাহার মুখখানিকে ভরাইয়া দিয়া কি এক অদম্য আকর্ষণের বশে তাহাকে লইয়া নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। খাওয়াইতে খাওয়াইতে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল,—বল দেখি সতী আমি কে?

হাসিয়া সতী বলিল—'মা!'

আনন্দের উচ্ছ্বাস নলিনীর সমস্ত শরীরে খেলিয়া গেল, সে বলিল—"আর তো পালাবি না মা?" মাথা নাড়িয়া সতী জানাইল—'না'

কতক্ষণ কাটিয়া গেল। যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াগিয়াছে, তাড়াতাড়ি পোষাকের দোকানে গিয়া পছন্দমত একটী পোষাক কিনিয়া দিয়া, পুনরায় সতীদের বাটীর দিকে পা বাড়াইল কিন্তু তাহাকে বাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে হইল না কি, একটা পর্ব্বে দুইটার সময় আফিস বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।—বাটীতে কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া ভীত চকিত হইয়া তাহার অনুসন্ধানের জন্য পথে বাহির হইয়া পড়িল।

কন্যাকে কোলে লইয়া নলিনীকে পথে চলিতে দেখিতে পাইয়া উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল—'পুলিশ পুলিশ—ছেলে-চোর—ছেলে-চোর।"

নলিনীর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সতীকে পথে নামাইয়া দিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে বাবুর দুইটা পা জড়াইয়া বলিল—"না বাবু না চুরি আমি করিনি—আপনার বাড়ীতেই আমি দিতেই যাচ্ছিলুম।"

মৃণালের উন্মত্ত চীৎকারে সেখানে অনেক লোক জমা হইয়া গিয়াছিল, নলিনীর কথা তাহারা কেহই কাণে তুলিল না · তাহাকে পুলিশের হাতে তুলিয়া দিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়িল, অনেক কাঁদাকাটির পর কতকগুলি লোক বলিল,—"ওরে কাণ মল, নাকে খত দে।"

নলিনী বাধ্য হইয়া তাহাদের আদেশ পালন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

সাত

ছয়টী মাস কাটিয়া গেল।

এই কয় মাসের মধ্যে নলিনী আর সে পথেই চলে নাই; যদি কোনও রূপে যাইতে হয় সেই আশঙ্কায় সে সেখানে কাজ করিত যেখানকার কাজ ছাড়িয়া দিয়া স্থানান্তরে কাজ করিতে লাগিল।

এই ঘটনার পর কেমন একটা ঘৃণা তাহার অন্তরের মধ্যে এমনই ভাবে সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল, যে সতীর মুখ-খানি একবার চ'খের সাম্নে ভাসিয়া উঠিলে আপনহারা হইয়া সে ছুটিয়া যাইত, সতীর সেই মুখখানা বার বার তাহার মনের মাঝে উঁকি মারিলেও অসীম ধৈর্য্যে সেটাকে আমল দিত না।

অন্যের কন্যার প্রতি তাহার এই অহেতুক আকর্ষণকে দূর করিবার জন্য তাহার সমস্ত স্নেহ দিয়া বর্ত্তমান মনিবের শিশু পুত্রটীকে একান্তভাবেই জড়াইয়া ধরিত, তবুও কি-জানি-কেন তাহার কাণে ভাসিয়া আসিত সতীর কাঁদ-কাঁদ গলার আহ্বান—আমি এসেছি মা—আমায় কোলে কর।

সে উন্মনা হইয়া পড়িত।

সেদিন হঠাৎ তাহাদের বাটীর সম্মুখ দিয়া মৃণালকে দুই শিশি ঔষধ লইয়া ব্যস্তভাবে যাইতে দেখিয়া তাহার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিল অসুখ কি সতীর?"

একবার মনে করিল জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু পারিল না; বেদনার পাষাণ-ভার তাহার বুকখানাকে মুসড়াইয়া দিল।

তবুও তাহার অন্তরের মধ্যে দুর্ভাবনার যে ঝড় বহিল তাহা হইতে সে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করিতে পারিল না।

দ্বিপ্রহরে সে সতীদের বাটীর ধারে গিয়া দাঁড়াইল। উন্মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া দেখিতে পাইল—অর্দ্ধচেতন সতীকে কোলে লইয়া ছলছল নেত্রে বসিয়া আছে সতীর মা, আর—তারই পাশে উদাস-নয়নে তার বাবা।"

নলিনীর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, মনে করিল ছুটিয়া যায়। কিন্তু কি ভাবিয়া সে যাইতে পারিল না। বুকের কান্না চাপিয়া সে বাটীতে ফিরিয়া গেল। সতীর অসুখ—তাহার কি ? যদি সে বাড়ীতে যায় তবে হয় তো তাহারা পুলিশের হাতে তাহাকে ধরাইয়া দিবে।

সমস্ত দিনটা তাহার এমনি ভাবেই কাটিয়া গেল। কিন্তু আর সে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না—সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। দিন-শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া গেল সতীদের বাড়ী। মাতার কোল হইতে সতীকে লইয়া বলিল—"আমার কোলে দাও বৌদি! একবার সতী আমাকে ছেড়ে পালিয়েছে, এবার আমার কোল হতে যায় কি ক'রে দেখ্‌ব'—সত্যি সত্যি—মা—সতী কথা কইছে না যে বৌদি! ভাল ডাক্তার নিয়ে এস দাদাবাবু সতীকে আমার বাঁচিয়ে তুলতেই হ'বে।"

বস্ত্রাঞ্চল হইতে দশ টাকার দশ খানি নোট বাহির করিয়া নলিনী মৃণালবাবুর হাতে দিল।

এই অসম্ভাবিত ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী হতবুদ্ধি হইয়া বলিল,—"সতীর ওপর তোমার এত খানি স্নেহ ?"

'ওগো! সতী যে আমার, ঠিক এমনি সুন্দর মেয়েটী, এই মুখের এই খানে তারও তিল ছিল—ঠিক এমনিই হাসি ছিল তার—এমনি পশমের মত চুল—এমনি ক'রে আমিও তার ঝুঁটি বেঁধে দিতুম। সে আমার স্বস্থি দেখে গড় ক'রত—"

মৃণাল বলিয়া উঠিল—"মা আমার চন্দ্র দেখে প্রণাম করে দিদি!"

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে বক্ষ ভাসাইতে ভাসাইতে নলিনী বলিতে লাগিল—"ঠিক সেই, দাদাবাবু সবই ঠিক, একবার মা আমার পালিয়েছে—আর তো ছাড়বো না ওকে, ভাল ডাক্তার আন দেখি—মা আমার কি ক'রে এবার পালায়।"

বৈরাগ্য

(৩)

[শ্রীঅপর্ণাচরণ সোম]

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনাসমূহ

"কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা আছে; প্রাত্যহিক জীবনে সে-গুলি সাধারণ। তাহাদের প্রতি তোমাকে সাবহিত দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখাইবার জন্য বা চালাক বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য ইচ্ছা করিও না।"

এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা আছে, যাহা প্রাত্যহিক জীবনে খুব সাধারণভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। সদ্‌গুরু এ স্থলে তাহার দুইটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অধিকাংশ লোক নিজকে খুব বুদ্ধিমান্ বা চালাক বলিয়া পরিচয় দিতে চায়। কিন্তু যে ব্যক্তি একবার সাক্ষাভাবে সদ্‌গুরুর দর্শনলাভ করিয়াছে, সে কখনও তাহা করে না, এমন কি, তাহার চিন্তা পর্য্যন্ত করে না। যে মুহূর্ত্তে সে সদ্‌গুরুর মহিমার আলোক দেখে, সেই মুহূর্ত্তেই সে উপলব্ধি করে যে, প্রখর সূর্য্যালোকের তুলনায় একটা ক্ষুদ্র প্রদীপের আলোক যেরূপ তুচ্ছ, "জ্ঞানমূর্ত্তি" সদ্‌গুরুর আলোকের তুলনায় তাহার আলোক সেইরূপ তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। সেজন্য বুদ্ধিমান্ বা চালাক বলিয়া পরিচয় দিবার বাসনা তাহার কখনও হয় না।

তথাপি প্রত্যেক সম্ভবপর উপায়ে আমাদের প্রত্যেক সদ্‌গুণের সুচারুভাবে সদ্‌গুরুর কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদের যে ক্ষুদ্র আলোক আছে, তাহা ধামার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিলে চলিবে না। আমাদের এই

আলোক সদ্‌গুরুর জ্ঞানালোকের মত বিশাল নহে,—ক্ষুদ্র। তথাপি ইহার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা আছে। সদ্‌গুরুর সেই বিশাল আলোক এত প্রখর ও দীপ্তিমান্ যে, ইহা অনেকের চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়; আবার অনেক লোক আছে, যাহারা কখনও চক্ষু তুলিয়া দেখে না ও ইহার অস্তিত্বও জানে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকগুলি তাহাদের নিজের ধীশক্তির নিকটবর্ত্তী বলিয়া তাহাদের নিকট উপযোগী বলিয়া বোধ হইতে পারে। এমন অনেক লোক থাকিতে পারে, যাহারা মহৎ ব্যক্তিগণের জ্ঞান-সাহায্য পাইবার এখনও আদৌ প্রস্তুত হয় নাই; আমরা এই সকল লোককে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দ্বারা সাহায্য করিতে পারি। সুতরাং প্রত্যেকের স্ব স্ব স্থান আছে। কলের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য বড় বড় চাকার সঙ্গে ছোট ছোট চাকারও যেমন উপযোগিতা আছে, সদ্‌গুরুর বিরাট্ জগদ্-ব্যাপার কার্য্য চলমান রাখিবার জন্য আমাদেরও ক্ষুদ্র জ্ঞানেরও উপযোগিতা আছে। কিন্তু বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখাইবার অভিলাষে আমরা যেন কখনও বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখাইতে ইচ্ছা না করি; এরূপ করা মুর্খতা। সেই জন্য উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন:—"তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" অর্থাৎ পাণ্ডিত্য হইতে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া অবস্থান করিবে।

"কথা বলিবার আকাঙ্ক্ষা করিও না। খুব কম কথা বলা ভাল; যদি না তুমি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হও যে, তুমি যাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা সত্য, প্রিয় ও হিতকর, তাহা হইলে কিছুই না বলা আরও ভাল। কথা বলিবার পূর্ব্বে যত্নের সহিত ভাবিয়া দেখিবে যে, যাহা তুমি বলিতে যাইতেছ, তাহাতে ঐ তিনটী গুণ আছে কি না। যদি না থাকে, তাহা হইলে সেই কথা বলিও না।"

যাহারা সব সময় অনাবশ্যকভাবে বেশী কথা বলে, তাহারা সকল স্থলে বিজ্ঞভাবে বা লাভজনকভাবে কথা বলিতে পারে না, উপরন্তু তাহারা সত্যবাদীও হইতে পারে না। লোকে যদি সর্ব্বদা শিথিলভাবে কথা বলে, ইহা নিশ্চিত যে, তাহাদের অনেক কথাই সত্য হইবে না, যদিও সে-সব ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা না হইতে পারে। তাহারা অনেক সময় অ-যথার্থ কথা বলে ও পরিশেষে বলে,—"তাই তো, আমার এইরূপ কথা বলিবার অভিপ্রায় থাকে নাই, সুতরাং ইহাতে কিছু যায় আসে না।" কিন্তু যাহা অভিপ্রেত থাকে নাই, তাহা যে ফল উৎপন্ন করে, তাহা নহে,—যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই ফল উৎপন্ন করে। যদি আমি ভ্রম-বশতঃ একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য ভাল ছিল বলিয়া ঐ অন্যায় কাজের প্রকৃতি যে পরিবর্ত্তিত হইবে ও আমাকে দুঃখ পাইতে হইবে না, তাহা নহে। ঐ অন্যায় কাজের ফলে আমাকে পার্থিব দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে, তবে আমার উদ্দেশ্য যদি শুভ ও সুস্পষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহার জন্য আমি ভাল নৈতিক চরিত্র পাইতে পারি। কেহ কোনও একটা কথা বলিয়া পরে আত্ম-সংশোধন করিয়া বলে,—"তাই তো, আমি ভুল বলিয়াছি দেখিতেছি, কিন্তু ইহা তো ঠিক নয়।" এস্থলে সে অ-যথার্থ বলিয়াছে, এই অ-যথার্থতাই মিথ্যা। এই মিথ্যা বলিবার তাহার উদ্দেশ্য থাকে নাই বটে, কিন্তু যাহা সত্য নয়, তাহা সে বলিয়াছে। সে জন্য তাহাকে মিথ্যার কর্ম্মভোগ করিতে হইবে। তাহার মিথ্যা বলিবার অভিপ্রায় থাকে নাই, এরূপ ওজর কোন কাজের নয়। যদি কেহ ভুলবশতঃ বা ঘটনাক্রমে কাহাকেও গুলি দ্বারা নিহত করিয়া বলে,—"তাহাকে হত্যা করিবার আমার অভিপ্রায় থাকে নাই, বন্দুকটা যে গুলিভরা ছিল, তাহা আমি জানিতাম না", তাহা হইলে কি সে হত্যার কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে? না, তাহাকে হত্যার কর্ম্ম-ভোগ করিতেই হইবে, তা' সে হত্যা জ্ঞানকৃত হউক, বা অজ্ঞানকৃত হউক্। ঋষি পরাশর বলিয়াছেন:—

অহং তু তাবৎ পশ্যামি কর্ম্ম যৎ বর্ত্ততে কৃতম্?
গুণযুক্তং প্রকাশং বা পাপেনানুপমং হিতম্॥

অর্থাৎ পাপ-পুণ্য অজ্ঞানকৃত হউক্ বা জ্ঞানকৃত হউক্, ভোগ ব্যতীত কখনই বিনষ্ট হয় না।

বাচাল লোক বেশী কথা বলিয়া তাহার শক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় করে, সেই শক্তিটা কোন হিতকর কার্য্যে প্রয়োগ করিলে খুবই ভাল হইত। প্রাত্যহিক জীবনে লোকে যে সকল সামান্য সামান্য যন্ত্রণা ভোগ করে, যেমন মাথাধরা, বিরক্তি, অবসাদ প্রভৃতি, এই সব তাহাদের আবশ্যক-বিহীন বেশী কথা বলিবার ফল—প্রতিক্রিয়া। লোকে যদি মৌনভাব অবলম্বন করিতে শিখে, তাহা হইলে শীঘ্রই তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। ইহার দুইটা কারণ আছে। একটা কারণ এই যে, বাচালতায় তাহাদের যে নাড়ী-শক্তি (nerve-energy) নষ্ট হয়, তাহা মৌনা-

বলম্বন জন্য আর নষ্ট না হইয়া সঞ্চিত থাকিবে। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাহাদের বাচালতার ফলে যে কর্ম্ম-ঋণ উৎপন্ন হয়, তাহা মৌনাবলম্বন জন্য সর্ব্বদা পরিশোধ করিতে হয় না। তাহা ছাড়া, বেশী কথা বলিবার অভ্যাস থাকিলে, মুখ হইতে অনেক সময় হঠাৎ এমন কথা বাহির হইয়া পড়ে, যাহা মনোমালিন্য, বিদ্বেষ ও শত্রুতা উৎপন্ন করে। সেইজন্য সদ্‌গুরু বলিতেছেন যে, কথা বলিবার পূর্ব্বে যত্নের সহিত ভাবিয়া দেখিবে যে, তুমি যাহা বলিতে যাইতেছ, তাহা সত্য, প্রিয় ও হিতকর কি না। কথা না বলাই ভাল; যদি কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে এমন কথা বলিতে হইবে, যাহা সত্য, প্রিয় ও হিতকর। ব্যাসদেবও বলিয়াছেন ঃ—

অব্যাহৃতং ব্যাহৃতাচ্ছ্রেয় আহুঃ, সত্যং বদেদ্ব্যাহৃতং তদ্দ্বিতীয়ম্।
ধর্ম্মং বদেদ্ব্যাহৃতং তত্তৃতীয়ং, প্রিয়ং বদেদ্ব্যাহৃতং তচ্চতুর্থম্ ॥

"প্রথমতঃ, কোন কথা বলা অপেক্ষা কথা না বলাই ভাল; দ্বিতীয়তঃ, যদিই কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে সত্য কথাই বলা ভাল; তৃতীয়তঃ, ধর্ম্ম অর্থাৎ হিত কথাই ভাল; চতুর্থতঃ, প্রিয় বাক্য বলাই ভাল।"

প্রাচীন ভারতে মুনিগণ মৌনভাবে অবস্থিতি করিতেন বলিয়া, তাঁহারা "মুনি" নামে অভিহিত। আধ্যাত্মিক জীবনে মৌনভাব অবলম্বন করিতে না শিখিলে কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ঃ "যোগস্য প্রথমদ্বারং বাঙ্নিরোধঃ"—বাক্-সংযমই যোগ-সাধনের প্রথম সোপান। সে-জন্য পাইথাগোরস কাহাকেও শিষ্যরূপে গ্রহণের পূর্ব্বে তাহাকে দুই বৎসর কাল মৌনভাবে থাকিতে আদেশ করিতেন। অবশ্য আমরা যখন বাহ্য জগতে বাস করিতেছি ও এই জগতে থাকিয়া আমাদিগকে সকল প্রকার কার্য্য করিতে হইবে, তখন আমরা সম্পূর্ণরূপে মৌনী হইয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু মৌনভাবের অনুসরণ করা উচিত ও তাহা আমরা করিতে পারি; যে-স্থলে কথা বলা আবশ্যক ও যতটুকু কথা বলা আবশ্যক, সেই স্থলেই ততটুকুই কথা বলাই আমাদের কর্ত্তব্য, এবং সেই কথা সত্য, প্রিয় ও হিতকর কি না তাহা পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখিয়া তাহা বলা কর্ত্তব্য; নতুবা নীরব থাকাই কর্ত্তব্য। ইহাতে কেহ ক্ষুণ্ণতা অনুভব করিবেন না। ইহা অভ্যাস করিবার জন্য আমরা একটা কাজ করিতে পারি। যদি আমরা প্রত্যহ বা সপ্তাহের মধ্যে এক দিন বা দুই দিন প্রতিজ্ঞা করি যে, সেই দিন আমরা এমন কোন কথা বলিব না, যাহা সত্য, প্রিয় ও হিতকর নয়। সেই দিনটা বাক্‌হীন দিন হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে কাহারও বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না, উপরন্তু আমরা প্রচুর লাভবান হইব। অবশ্য ইহাতে দ্রুতগামী কথাবার্ত্তার স্রোত অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হইবে না, কারণ সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিতে হইলে, প্রত্যেকবার কথা বলিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। সে জন্য হঠাৎ কথা বলা হইবে না ও মনে যাহা আসিবে, তাহার সকল কথাই বলা হইবে না। কিন্তু ইহাতে কিছু যায় আসে না। এই সকল নিয়ম আধ্যাত্মিক জীবন-গঠনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যিনি ত্বরিত আধ্যাত্মিক উন্নতি চাহেন, তাঁহাকে এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতেই হইবে। যাহা লাভ করিবার যোগ্যতা এখনও আমাদের হয় নাই, তাহা লাভ করিতে আমরা ইচ্ছুক বলিয়া যে নিয়মগুলি পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহা নহে। নিয়মগুলি অপরিবর্ত্তনীয়, নিজকে সেই সকল নিয়মের উপযোগী করিবার জন্য নিজের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে; এমন কি যদি সেই সকল আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম সাংসারিক জীবনের নিয়মের সহিত ও ইহার কার্য্য-প্রণালীর সহিত অসমঞ্জস হয় ও সেগুলিকে ইহাদের বিরোধের মধ্যে আনয়ন করে, তাহা হইলেও আধ্যাত্মিক নিয়মগুলি যে অপরিবর্ত্তনীয় তাহা ধারণা করিতে হইবে। সম্ভবতঃ এরূপ করা কঠিন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।" যদি যত্নের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবার পরও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিপাল্য নিয়মগুলি কাহারও নিকট কঠিন বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ত্বরিত আধ্যাত্মিক উন্নতির আশা ছাড়িয়া দিয়া দুই এক জন্ম অপেক্ষা করিতে হইবে। সেই পথ পড়িয়া আছে। কিন্তু যাহারা সদ্‌-গুরুর উপদেশগুলি পাঠ করিতেছেন তাঁহাদের নিকট এই সকল নিয়ম কঠিন বলিয়া বোধ হওয়া উচিত নয়। কোনরূপ প্রচেষ্টা ও কষ্ট না করিয়া আরামের জীবন, আর দুরূহ সাধন-পথের জীবন—

এই দুইটী পরস্পর অসমঞ্জস। এই দুইটী কখনও এক সঙ্গে থাকিতে পারে না। "যাঁহা রাম, তাঁহা কাম নেহি।" ঐ দুইএর মধ্যে যে কোন একটী আমরা অবলম্বন করিতে পারি ও অন্যটীকে পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ আরামের পথ অবলম্বন করিলে, তাহাকে আমরা দোষ দিতে পারি না।

"এমন কি, এখন হইতেই কথা বলিবার পূর্ব্বে সযত্নে ভাবিয়া দেখিবার অভ্যাস করা ভাল। কারণ দীক্ষা গ্রহণের পর যাহা বলা উচিত নয়, পাছে তাহা বলিয়া ফেল, সে জন্য তোমাকে প্রত্যেক কথার উপর বেশ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।"

দীক্ষা অতি পবিত্র ও গুহ্য বিষয়। যদি কেহ দীক্ষা সম্বন্ধীয় তথ্যগুলি না বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে আচার্য্যদেবের এই উক্তিটী তাহার নিকট বুজরুগী বলিয়া বোধ হইতে পারে। যদি দেহ ইতঃপূর্ব্বে দীক্ষার প্রকৃত গুহ্য বিষয়গুলি প্রকাশ করিবার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকে, তাহা হইলে দীক্ষার বিষয়গুলি প্রকাশ করিবার সম্বন্ধে দাগাবাজি করিবার যে কিছু আছে, ইহা সে দীক্ষাগ্রহণ করিবার কালে বাক্য উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে ভুলিয়া যায়। সুতরাং দীক্ষার প্রকৃত গুহ্য বিষয়গুলি চিরকাল গুপ্তভাবেই থাকে,—সে-সব কখনও প্রকাশিত হয় নাই ও হইতে পারে না। তথাপি দীক্ষিত শিষ্য বিপদাপন্ন হয়, যদি সে তৎসম্বন্ধে অসতর্ক হয়। সে যথার্থই একটা খুব অপ্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পতিত হয়। দীক্ষা সম্বন্ধীয় এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা প্রকাশ করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হইতে পারে না; কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিবার জন্য শপথ গ্রহণ করিতে হয়। যাহা শপথ, তাহা শ—প—থ,—তাহা কখনও ভঙ্গ না করিয়া পবিত্র বস্তুরূপে রক্ষা করাই উচিত। যে ব্যক্তি তাহা না করিতে পারে, তাহার আত্মোন্নতির সকল চিন্তাই অবিলম্বে পরিত্যাগ করাই ভাল।

"খুব সাধারণ কথাবার্ত্তা অনাবশ্যক ও মুর্খতার পরিচায়ক; যখন ইহা পরনিন্দা হয়, তখন ইহা অপরাধ।"

আমরা সাধারণতঃ যত কথাবার্ত্তা বলি, তাহার অধিকাংশই প্রকৃত প্রস্তাবে অনাবশ্যক। যাহাকে আমরা আবশ্যকীয় কথাবার্ত্তা বলি, তাহা প্রায়ই অপরকে পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে বা সময়টা আনন্দে কাটাইবার উদ্দেশ্যে বলা হইয়া থাকে। আমাদের যুগের ইহা একটা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক প্রথা যে, বাজে কথাবার্ত্তায় অনেকটা সময়ের অপচয় হয়, কিন্তু সেই সময়টা চিন্তা দ্বারা অপরের মঙ্গলের জন্য ব্যয়িত করিলে অনেক সুফল লাভ হইত। অবশ্য এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন আমরা অনাবশ্যক কথাও বলিতে বাধ্য হই, কারণ যদি আমরা চুপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে লোকে আমাদের সম্বন্ধে ভ্রম ধারণা করিবে। কাজেই তাহাকে প্রমোদিত করিবার জন্য আমাদিগকে কোন না কোন কথা বলিতে হয়। কিন্তু ইহা ছাড়িয়া দিলেও, অনেক কথাবার্ত্তা আছে, যাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। সে সব কথাবার্ত্তা কোনও কিছু বলিবার জন্যই লোকে বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহা একটা ভুল। যখন আমরা আমাদের প্রকৃত কোন বন্ধুর সহিত থাকি, তখন সর্ব্বদা তাহার সহিত কথা বলিবার আবশ্যক হয় না। তখন চুপ করিয়া থাকিলেও, আমরা উভয়েই আনন্দ লাভ করি এবং বন্ধুও কোন ভুল ধারণা করেন না। প্রকৃত বন্ধুত্বের চিহ্ন ইহাই। কিন্তু কেহ যদি এমন অবস্থার মধ্যে পতিত হয়, সেখানে কথাবার্ত্তা না বলিলে পাছে অপরে ক্ষুণ্ণ হয়, এই জন্য কথাবার্ত্তার স্রোত অব্যাহত রাখিতে হয়, তাহা হইলে দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক কথাই বলিতে হইবে,—যাহা না বলিলে খুবই ভাল হইত' কিন্তু যে বাচাল, সে জ্ঞানী নহে—মূর্খ। ব্যাসদেব বলিয়াছেন "বিভাকর যেমন সূর্য্যকান্তমণির সংযোগবশতঃ আপন অগ্নিরূপ প্রদর্শন করে, সেইরূপ গর্ব্বিত মূঢ়গণের অসারময় বহুভাষণ অন্তরাত্মার ক্ষুদ্রতমত্ব প্রকটন করিয়া থাকে।" (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ২৮৭।৩৩)

"অতএব কথা বলা অপেক্ষা বরং কথা শুনিবার অভ্যাস কর; সাক্ষাত্তাবে জিজ্ঞাসিত না হইলে সে সব কথা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিও না।"

অনেক লোকের এমনিই স্বভাব যে, অপরের কোন কথা যদি তাহারা অন্যায় বা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে তাহারা সে বিষয়ে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ না করিয়া ও তদ্দ্বারা একটা বিবাদ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি না করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে পারে না। কিন্তু আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অপরের মত সংশোধিত করা বা যে ব্যক্তি অন্যায় বলিতেছে, তাহার ভ্রম সংশোধিত করা আমাদের ব্যাপার নয়। আমরা যতটা পারি, অপরকে

শান্ত ও ধীরভাবে সাহায্য করা এবং মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তেজিত না হইয়া স্থিরভাবে আমাদের মতামত বলাই আমাদের ব্যাপার। আমাদের মতামত অপরে যে গ্রহণ বা সমাদর করিবে, এমন ধারণা করা আমাদের আবশ্যক নাই। অনেক সময় লোকে তাহা গ্রহণ করে না, কিন্তু সে-জন্য তাহাদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে জবরদস্তি করা অন্যায়। কেহ নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারে যে, বিষয়টা এইরূপ; আর আমরাও উত্তমরূপে জানিতে পারি যে, বিষয়টা সেরূপ নয়। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাকে তাহার মত বলিতে দেওয়াই ভাল। সম্ভবতঃ সে যাহা জানে, তাহা তাহাকে পরিতৃপ্ত করে ও আমাদের কোন ক্ষতি করে না। সে বিশ্বাস করিতে পারে যে, পৃথিবী চতুষ্কোণ বা পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। ইহা তাহার ব্যাপার—আমাদের নয়। যদি কেহ স্কুলের শিক্ষকরূপে বালকগণের শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি ধীর ও শান্তভাবে তাহাদের এই ভ্রান্তির নিরাস করিতে পারেন, কারণ ইহা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কোন ব্যক্তিই কিন্তু সর্ব্বসাধারণের শিক্ষক-রূপে নিযুক্ত নহেন।

অবশ্য যদি আমরা কাহারও চরিত্রের নিন্দা শুনিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের বলা কর্ত্তব্য: "মাপ করুন, মশায়, অমুকের চরিত্র সম্বন্ধে আপনি ঠিক জানেন না, আপনি যা' বলছেন. তা' সত্য নয়।" এই বলিয়া যতদূর সম্ভব, তাঁহার সম্মুখে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ ইহা একজন অসহায় লোককে আক্রমণের বিষয়। তাহাকে অপরাধ হইতে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

"একটী তালিকার গুণগুলির এইরূপ নির্দ্দেশ আছে:—জ্ঞান, সাহস, ঈচ্ছা ও মৌন; এই চারিটীর মধ্যে শেষেরটী সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।"

নিসর্গের সত্যগুলি সম্বন্ধে আমাদিগকে অগ্রে জ্ঞান-লাভ করিতে হইবে, সেই সত্যগুলিকে প্রয়োগ করিবার জন্য সাহস অর্জ্জন করিতে হইবে; সাধনার পথে মহিয়সী শক্তিনিচয় প্রয়োগ করিলে আমরা প্রবল ঈচ্ছাশক্তি লাভ করিব, যাহা ঐ শক্তিগুলিকে সংযত করিবে ও আমা-দিগকেও সংযত করিবে। তারপর, যখন আমরা এই সমস্ত আরও করিতে পারিব, তখন মৌন হইবার জন্য আমরা যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিব।

নিজের কার্য্যে অভিনিবেশ

"অন্য লোকের কার্য্যে অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা আর একটী সাধারণ কামনা; এই কামনাটী তুমি দৃঢ়রূপে দমন করিবে। অন্য লোকে যাহা করে বা বলে বা বিশ্বাস করে, তাহাতে তোমার কোনই প্রয়োজন নাই, এবং তাহাকে [তাহার পথে] সম্পূর্ণ রূপে চলিতে দিতে শিক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। সে যতক্ষণ না অন্য কাহারও উপর হস্তক্ষেপ করে, ততক্ষণ তাহার স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে, কথা বলিতে ও কার্য্য করিতে পূর্ণ অধিকার আছে। তুমি যাহা সঙ্গত মনে কর, তাহা করিবার জন্য তুমি নিজে যেরূপ স্বাধীনতা চাও, তাহাকেও সেই সমান স্বাধীনতা দাও; আর যখন সে সেই স্বাধীনতার পরিচালনা করে, তখন তাহার সম্বন্ধে কথা বলিবার তোমার কোনই অধিকার নাই।"

আমাদের মনে হয় যে, যাহারা বেশ আগ্রহী ও উৎসাহী, তাহারা যাহা শিখিয়াছে, তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে তাহারা এত বিশ্বাসী ও সন্দেহশূন্য (এরূপ বিশ্বাসী ও সন্দেহশূন্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়) যে, তাহারা অপরকেও ঠিক তাহাই অনুভব করাইতে চায় ও তাহারা যাহা করে, তাহা অপরকে দেখিবার জন্য তাহাদিগকে জবরদস্তি করে। প্রায় প্রত্যেক উৎসাহশীল ব্যক্তির প্রকৃতির এই একটা দোষ। কিন্তু তাহাদের উপলব্ধি করা দরকার যে, মানুষ ইতঃপূর্ব্বে ভিতরে যাহা শিখিয়াছে, কেবল তাহাই সে সানন্দে গ্রহণ করিতে পারে,—তা' যদিও সে তাহার স্থূল মস্তিষ্কে অনুভব করে নাই বলিয়া এখনও তাহা তাহার নিজের নিকট স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে পারে না! যতদিন না সে এই প্রাথমিক অবস্থা লাভ করে, ততদিন বাহির হইতে কোনও সত্য তাহার নিকট উপ-স্থাপিত করিলে, সে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই তখন তাহাকে উহা গ্রহণ করিবার জন্য জবরদস্তি করিলে, ভাল অপেক্ষা মন্দই হয়।

ঠিক সেই প্রকারে বাহির হইতে মানুষের কর্ত্তব্য-জ্ঞান (Conscience) গঠিত হইতে পারে না। কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের ফল। সুতরাং যদি কোনও সত্য ও উপদেশ কাহারও সম্মুখে উপস্থাপিত করিলে, সে তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে ইতঃপূর্ব্বেই তাহার সম্বন্ধে ভিতরে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। সেই জ্ঞান তাহার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল, এখন সেই বাহ্য উপদেশ

বা সত্য তাহার নিকট উপস্থাপিত হওয়ায় সেই সুপ্ত জ্ঞান প্রবুদ্ধ হইয়া তাহার স্থূল মস্তিষ্কে স্ফুরিত হইল। অধ্যাত্ম-বিদ্যা সম্বন্ধীয় উপদেশ সম্বন্ধে উপদেষ্টা শিক্ষার্থীর অন্তর-লব্ধ জ্ঞানকে প্রবুদ্ধ করেন মাত্র। উপদেশ পাঠ শ্রবণ করিলেও সব সময় অনেকে যে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার কারণ উপরি-উক্ত সত্যের মধ্যে বিদ্যমান। একজন সৎ পুরুষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, শিক্ষার্থী নিদ্রা-কালে তাহার স্থূলদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, তাহাকে শিক্ষা দান করা হয়। আসল মানব তখন তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করে এবং সেই শিক্ষা-লব্ধ জ্ঞান ভৌতিক জগতের উপদেষ্টা যখন তাহাকে পুনরায় প্রদান করেন, তখন তাঁহার বাক্যগুলি সেই জ্ঞানকে মস্তিষ্কে প্রতিফলিত করিবার জন্য শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে। ভৌতিক জগতের উপদেষ্টা এইমাত্র করিতে পারেন।

পৌনঃপুনিক ব্যর্থতা দ্বারা আমাদের সকলকে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে যে, কোনও ব্যক্তি যে পথ গ্রহণ করিবার জন্য এখনও প্রস্তুত হয় নাই, তাহাকে সেই পথ দিয়া সাহায্য করা যায় না। সাহায্য করিলে যখন ফল লাভ হইবে, তখনই সাহায্য করা ও সাহায্য যেখানে আদৌ সাহায্য করে না, সে-স্থলে অপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা অধ্যাত্ম-বিদ্যার শিক্ষক, তাঁহারা তাহাই করেন। কিন্তু অজ্ঞ লোকে তাহা না বুঝিয়া মনে করে যে, উপদেষ্টা তাহাকে উপেক্ষা করেন। কিন্তু আসল কথা এই যে, উপদেষ্টা, যিনি শিক্ষার্থী অপেক্ষা বিজ্ঞ ও উন্নত, তিনি উত্তমরূপে জানেন যে, কোথায় তিনি শিক্ষার্থীর সাহায্য করিতে পারেন, আর কোথায় তিনি পারেন না।

লোকে নিজের জন্য স্বাধীনতার দাবী করিতে সর্ব্বদা খুবই ইচ্ছা করে, কিন্তু অন্যকে তাহার নিজের স্বাধীনতা দিতে অসাধারণভাবে নারাজ। ইহা একটা গুরুতর দোষ, কারণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে, স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে, স্বাধীনভাবে কথা বলিতে আমাদের নিজের যেমন অধিকার আছে, অন্য ব্যক্তির ঠিক সেইরূপ অধিকার আছে এবং তাহাকে তাহার স্বাধীনতা অনুসারে কার্য্য করিতে দেওয়াই কর্ত্তব্য, যতক্ষণ না সে অন্য কাহারও বিরক্তি উৎপাদন করে।

অন্য দিকে আর একটা দোষ কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য লোকের মত যে গ্রহণ করিতেই হইবে, এরূপ ধারণা করা ভুল। সেই মত গ্রহণ না করিবার জন্য প্রত্যেকেরই পূর্ণতম অধিকার আছে। যদি তাহার মতের সহিত আমার মতের মিল না হয়, তাহা হইলে তাহাকে আক্রমণ না করিয়া সম্পূর্ণ সংযত ও মিষ্টভাবে বলা উচিত; "না, মহাশয় আপনার মতের সহিত আমি একমত হইতে পারিতেছি না"; অথবা সে-স্থলে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। যখন কেহ কোন মত প্রদান করে, তখন তাহা শুনিয়া প্রথমতঃ নিজের সহজ বুদ্ধি প্রয়োগ করা দরকার, যাহা শুনা যায়, তাহার প্রত্যেকটীতে নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করা দরকার। অন্য লোককে স্বাধীনভাবে থাকিতে দিতে হইবে, কিন্তু নিজের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের বিরুদ্ধে তাহার দাসত্ব স্বীকার করিতে দেওয়া ঠিক নয়।

"যদি তোমার মনে হয় যে, সে অন্যায় করিতেছে, তাহা হইলে তোমার এরূপ মনে করিবার কারণ তাহাকে সৌজন্যের সহিত ও গোপনে বলিবার জন্য একটা সুযোগের ব্যবস্থা করিবে; খুব সম্ভবতঃ তুমি তাহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে পারিবে; কিন্তু অনেক স্থল আছে, যেখানে, এমন কি এরূপ হস্তক্ষেপ করাও অনুচিত। কোন কারণেই তুমি কোন তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যাইয়া সে বিষয় রটনা করিও না, কারণ তাহা একটা নিতান্ত গর্হিত কাজ।"

যে ব্যক্তি যথার্থতঃ অন্যায় করিতেছে বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি, তাহাকে সেই অন্যায় হইতে নিরস্ত করিবার জন্য সাহায্য করা প্রয়োজন এবং কখন কখন সমর্থ হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এ স্থলে খুব সতর্কতা আবশ্যক। কারণ এরূপ স্থলে ভাল অপেক্ষা মন্দ করিয়া ফেলা খুব সম্ভব। এরূপ স্থলে সাহায্য করিতে পারা যায়, তবে সদ্‌গুরু যেমন ইঙ্গিত করিতেছেন ঠিক সেই ভাবে অর্থাৎ গোপনে ও বন্ধু-চিতভাবে করিতে হইবে। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি তাহার নিজের মতে অত্যাসক্ত বা একগুঁয়ে হয়, তাহা হইলে তাহার অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষা লাভ করিবার জন্য তাহাকে বলিতে দেওয়াই মঙ্গল, কারণ তাহাই তাহার মহান্ উপদেষ্টা।

যদি কেহ কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে ও আমাদের নিকট তাহা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহাকে তাহার সেই ধারণা ভ্রান্ত বা অন্যায় বলিবার দরকার নাই, যদি না আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি যে, তাহার নিজের

বিবেচনা অপেক্ষা আমাদের বিবেচনার উপর তাহার বেশী বিশ্বাস আছে, কিংবা আমাদের বিবেচনাকে অন্ততঃ গভীর-ভাবে চিন্তা করিতে সে ইচ্ছুক ; অনেক স্থলে সে নিজের জন্ম ভুল বাহির করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে ইহা করিতে দেওয়াই শ্রেয়ঃ। ক্রমশঃ সকলই তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইবে, অন্যায় ও ভ্রান্তি দূরীভূত হইবে এবং আসল জিনিস রহিয়া যাইবে।

"যদি তুমি কোনও শিশু বা পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখিতে পাও তাহা হইলে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

কাহারও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু কিন্তু এমন অনেক স্থল আছে যেখানে হস্তক্ষেপ করা অপরিহার্য্যভাবে কর্ত্তব্য। যেখানে কোনও শিশু বা জন্তুর প্রতি অত্যাচার দৃষ্ট হইবে সেখানে সেই শিশু বা জন্তুর রক্ষার জন্ম হস্তক্ষেপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ শক্তি দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহাকে রক্ষা করাই শক্তির সকল স্থলেই কর্ত্তব্য, কারণ দুর্ব্বলতা আত্মরক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং যেখানেই কোন শিশু বা পশুর প্রতির নির্য্যাতন দৃষ্ট হইবে, সেই স্থলেই শক্তিমানের কর্ত্তব্য যে অগ্রসর হইয়া ইহাকে রক্ষা করা ও ইহার অধিকার ভঙ্গ হইতে এবং অপরের স্বাধীনতা হৃত হইতে না দেওয়া। অতএব যেখানেই আমরা কোন অসহায় শিশু বা পশুর প্রতি নির্দ্দয়তা দেখিতে পাইব, সেই স্থলেই আমাদের হস্তক্ষেপ করিতে হইবে ও সেই হস্তক্ষেপ যেন ফলপ্রদ হয় তাহার জন্ম চেষ্টা করিতে হইবে।

যদি তুমি দেখিতে পাও যে, কেহ দেশের আইন লঙ্ঘন করিতেছে, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষকে জানান তোমার কর্ত্তব্য।"

সদ্‌গুরুর এই উক্তিটী সম্বন্ধে অনেকে নানা প্রকার প্রতিবাদ করিয়া ইহার ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যদি কেহ কাহারও অপরাধ গোপন করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও আইন অনুসারে ঐ অপরাধীর সহকারী বলিয়া গণ্য হয়। লোকে বলে "কেহ কোন আইন ভঙ্গ করিতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্ম আমরা কি গুপ্তচর হইব ?" নিশ্চিতই না, কেহ কোন আইন ভঙ্গ করিতেছে কি না তাহা জানিবার জন্য তিনি গোয়েন্দা নিযুক্ত হন নাই।

আইন দেশকে সুনিয়মিত করিয়া রাখে ; সকলের মঙ্গলের জন্য শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপন করে ; সে জন্য ইহার সমর্থন ও পালন করা প্রত্যেক পৌরজনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তথাপি প্রত্যেকের সহজ-বুদ্ধি প্রয়োগ করা দরকার। লোকে অপ্রচলিত আইন (obsolete laws) পালন করিবে ইহা প্রত্যাশা করা যায় না, যদিও তাহা আইন বহিতে (Statute book) নিবদ্ধ থাকে। আর সামান্য সামান্য অপরাধ কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইবার জন্য স্বীয় পথের বাহিরে যাইবার জন্য কাহারও আবশ্যক করে না। যদি কেহ অবৈধভাবে প্রবেশ করিয়া এক জনের জিনিস গ্রহণ করে বা সোজাপথ ধরিবার জন্য কেহ এক জনের প্রমোদ উদ্যানের মধ্য দিয়া গমন করে তাহা হইলে তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিবার জন্য অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি যে বাধ্য, তাহা মনে হয় না কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইলে তাহাকে অবশ্য তাহাই বলিতে হইবে। অনেক দেশে শুল্ক (Customs) দিয়া জিনিস আমদানী ও রপ্তানী করিবার আইন আছে। এই আইন পালন করা প্রত্যেক দেশবাসীর উচিত, বিনা শুল্কে কোন দ্রব্য আমদানী বা রপ্তানী করা কর্ত্তব্য নয়।

কাহারও কোন আইনই ভঙ্গ করা উচিত নহে, কারণ যখন তাহা গঠিত হইয়াছে তখন তাহা পালন করাই সকলের কর্ত্তব্য। তবে কোন আইন যদি খারাপ হয় তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তনের জন্য বৈধ ও শান্তভাবেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

দেখিতে পাইলে কোন্ কোন্ অপরাধ কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা কর্ত্তব্য, তাহা ভারতীয় আইন বহিতে লিখিত আছে—অবশ্য সে সকল অপরাধ গুরুতর অপরাধ। যদি কেহ কাহাকে হত্যা করিতে বা চুরী করিতে দেখে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষকে জানান তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধ আছে যাহা কর্ত্তৃপক্ষকে না জানাইলে দর্শক সেই অপরাধের সহকারী বলিয়া ভারতে আইনতঃ অপরাধী বলিয়া গণ্য হয় না।

কোন্ স্থলে অপরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য সদ্‌গুরু তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন—

"যদি তুমি কাহাকেও শিক্ষা দান করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে তাহার দোষগুলি তাহাকে শান্তভাবে বলাই তোমার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম।"

বাহিরিনু বিশ্বপথে

[শ্রীসুলতা সেন]

আয়——
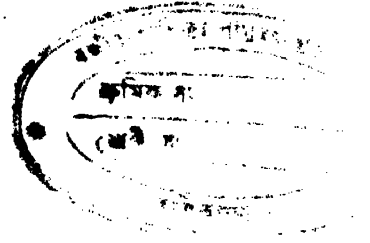
বেলা ব'য়ে যায়,

ছুটেছে তরণী মোর আজ

অবহেলি' জীবনের যত কিছু কাজ।

অতীত পিছনে ফেলি' দৃষ্টি তার অনাগত পানে

লক্ষ্যহারা চিত্ত তার অনির্দ্দেশ চলা শুধু জানে।

অজানার যাত্রীদের আদরে সে লবে বুকে তুলে—

চলার আগ্রহে তাই প্রাণ তার সর্ব্ব অঙ্গে ওঠে দুলে দুলে।

তরী'পরে জ্বলিতেছে উৎসবের বাতি,

নিবে যাবে না পোহাতে রাতি,

কে রাখিবি তায়?

ওরে আয়।

আয়——

স্রোত ব'য়ে যায়,

ব'সে আছি তরী বেঁধে কূলে

কত যুগ যুগান্তর আপনারে ভুলে—

প্রতীক্ষায় ছিনু যার দীর্ঘকাল আশাপথ চাহি'—

সহসা আজিকে প্রাণে জ্যোতির্ম্ময় তারি আবির্ভাব কোন্ পথ বাহি'!

বাহিরিনু বিশ্বপথে তাহারই ইঙ্গিতে আজ—শুধু তারে স্মরি—

জানিনা সমাপ্তি কোথা—কোন্ তটে ভিড়িবে এ তরী!

তোমাদের প্রেম-প্রীতি বিদায়-সজল যত আঁখি

লইনু পাথেয় করি'—মর্ম্মতলে আঁকি'

আজি মোর যাবার বেলায়

বিদায় বিদায়!—

———

অমলা

(উপন্যাস)

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ এম-এ]

আট

প্রতিদ্বন্দ্বী

সুশীল ধীরে ধীরে কম্পিতবক্ষে জমীদার-গৃহে প্রবেশ করিল। তথায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল এবং উপর হইতে কলহাস্য ভাসিয়া আসিতেছিল।

অমলার ঠাকুরমা, জমীদার-গৃহিণী সুশীলকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। তাহাকে দেখিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইল, কারণ অতি শিশুকাল হইতে তিনি সুশীলকে দেখিয়া আসিতেছেন। সে এখন উচ্চশিক্ষিত যুবক ও মস্ত কবি। সুশীলের হাতখানি ধরিয়া তিনি তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। এমন সময় জমীদার মহাশয় আসিয়া সুশীলকে ডাকিয়া—আপনার সঙ্গে লইয়া গেলেন। তিনি সুশীলকে বলিলেন, "তুমি আমাদের সেই সুশীল এখন কত বড় হইয়াছ, শিক্ষায় ও জ্ঞানে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছ, তোমার রচিত গ্রন্থ উচ্চ-প্রশংসিত, তোমাকে দেখিয়া বড় আনন্দ হইতেছে।" তারপর তিনি সুশীলকে লইয়া গিয়া বিপিনের পিতা ও বিপিনের অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। তিনি সুশীলকে বলিলেন, "আজ অমলার পাকা দেখা। বিপিনের সহিত অমলার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। বিপিনের পিতা অমলাকে দেখিয়া আজ আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন, সুতরাং এই আয়োজন।" জমীদার মহাশয়, বিপিনের পিতা ও আত্মীয়দের লইয়া, অন্যত্র কার্য্যোপলক্ষে চলিয়া গেলেন। সুশীল একাকী বসিয়া রহিল। তাহার চোখদুটী চারিদিকে কাহার যেন অন্বেষণ করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে অমলা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখখানি শুষ্ক—তাহার পশ্চাতে সুষমা।

সুশীলের নিকট আসিয়া অমলা জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "দেখ দেখি সুশীলদা, একে চিনিতে পার? তোমায় যে বলেছিলাম একটী নূতন জিনিস দেখিয়ে আশ্চর্য্যান্বিত কর্ব্ব, তা'তো দেখলে এখন!" সুশীল নিস্পন্দ ও নীরব হইয়া রহিল। এই না কি অমলার নূতন জিনিস, যাহা দেখাইয়া সে তাহাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া দিতে চাহে। অমলার ত বড় দয়া!......

সুষমা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ওঁকে তো আমি খুবই চিনি। ঐ ঘাটের ওদিকে উনি আমায় নদী থেকে উদ্ধার করেছিলেন।"

কিশোরী সুষমা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। সুষমা সুন্দরী, পরিহিত মেহেদী রঙের শাড়ীতে তাহার অঙ্গের শোভা আরও বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। সুষমার সরলতা-মাখা হাসি ও কথা-বার্ত্তায় সুশীলকে কতক্ষণ বেশ প্রফুল্ল রাখিয়াছিল, কিন্তু অমলার নূতন জিনিস দেখাইয়া তাহাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিবার কথা মনে পড়িতেই সুশীল আবার বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সুষমা তাহার পরিচিত, সুতরাং তাহার আশ্চর্য্যান্বিত হইবার তো কিছুই ছিল না। তবে অমলার এ ছলনা কেন?

এমন সময়ে অমলা ঘুরিয়া আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। "কি সুশীলদা, সুষমার সঙ্গে গোপন কথা শেষ হ'ল?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে অমলা সুষমা ও সুশীলের মুখের পানে তাকাইল। সুষমা লজ্জায় আরক্তিম হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

"সুশীলদা, ও গ্রামের জমীদার-বাড়ীর সকলের সঙ্গে আলাপ হোল?"

"না, অমলা, বিপিনবাবুর বাবার সঙ্গে এখনও ভাল ক'রে আলাপ হয় নি। তবে যাচ্ছি। আচ্ছা অমলা, এই কি তোমার নতুন জিনিস দেখান?"

অমলা একটু লজ্জিত, একটু অপ্রতিভ হইয়া উত্তর দিল, "কেন সুশীলদা আমি কি আমার যথাসাধ্য করতে চেষ্টা

করি নি ? আমার উপর অন্যায় বিচার ক'র না। আমি মনে করেছিলাম এতে তুমি সুখী হবে।"

"আচ্ছা বেশ, অমলা, আমি খুব সুখী হ'য়েছি, হ'ল তো, এখন যাই বিপিনবাবুদের সঙ্গে আলাপ করি গিয়ে। অমলা, তোমার রুচির প্রশংসা করতে হয় বটে! তবে পকেটে অনেক টাকা আছে, ওতে সব শুধরে যাবে বোধ হয়।"

অমলার বেশ একটু ক্রোধের উদয় হইল। সে বিরক্ত হইল, কিন্তু প্রকাশ করিল না। সুশীল আনমনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কখন পশ্চাৎ দিক হইতে সুষমা আসিয়া তাহাকে ডাকিয়াছিল, তাহা তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তাহা দেখিয়া অমলা হাসিয়া সুষমাকে বলিল, "ওরে সুষমা, সুশীলবাবুকে মিছে ডাকা, উনি কবি মানুষ, বেড়িয়ে বেড়িয়ে কবিতা ভাবছেন। দেখলে না, আমাকেও তাড়িয়ে দিলেন" বলিয়া অমলা সুশীলের দিকে অগ্রসর হইয়াই বলিল, "কি ভাবছ সুশীলদা আমার কাছে ক্ষমা চাইবে কেমন ক'রে ? কিছু প্রয়োজন নেই। আমারই বরং এত বিলম্ব করে নিমন্ত্রণ করার জন্য তোমার নিকট ক্ষমা চাওয়া উচিত। তোমার কথা আমাদের একরকম মনেই ছিল না, শেষ মুহূর্ত্তে কেবল মনে পড়ল। তা আশা করি তুমি কিছু মনে কর নি।"

সুশীল অমলার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইল, সুষমাও কিছু বুঝিতে না পারিয়া একবার সুশীলের মুখের পানে আর একবার অমলার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। সুশীল বুঝিল অমলা তাহার পূর্ব্বের কথার প্রতিশোধ লইয়াছে।

এমন সময়ে অমলার ঠাকুরদাদা আসিয়া সংবাদ দিলেন, "সুশীল, আহারের স্থান হয়েছে চল; অমলা, সুষমা, তোমরা ও ঘরে যাও, পাশের ঘর থেকে আমাদের খাওয়া দেখবে চল।"

পুরুষেরা সকলে আহারে বসিল। মধ্যস্থলে অমলার ঠাকুরদাদা, তাঁহার একপাশে বিপিন ও তাহার আত্মীয়-স্বজন এবং অপর পার্শ্বে সন্তোষ, ও অমলার গৃহশিক্ষক প্রবীণ মথুরবাবু। মথুরবাবু সুশীলকে তাহার শৈশব ও কৈশোরে অনেকবার দেখিয়াছে এবং এই সুন্দর বালকটীর উপর তাহার বিশেষ স্নেহদৃষ্টিও ছিল। তাঁহার কবি বলিয়া নিজের একটু গর্ব্ব ছিল, সুতরাং এখন যুবক কবি সুশীলকে নিকটে পাইয়া তিনি বেশ আলাপ জমাইয়া লইলেন। যৌবনে তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন নাই, তবে বহুযত্নে বাঁধান খাতায় নকল করিয়া রাখিয়াছেন। সুশীলকে তিনি একদিন তাঁহার বাসায় গিয়া দেখিয়া আসিতে বলিলেন। আজ যে এই শুভদিনে এই পরিবারের সকলের সহিত প্রীতিভোজে যোগ দিবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, ইহার কারণ অমলা তাহার ছাত্রী বলিয়া।

মথুরবাবু বলিলেন, "সুশীল, আমি তোমার কোনও কবিতাই পড়ি নি। আমি নিজের কবিতা ভিন্ন কারও কবিতা পড়ি না। আমার মৃত্যুর পর যাতে আমার কবিতা-গুলি প্রকাশিত হয়, তার ব্যবস্থা ক'রে যাব। তখন সকলে জানতে পারবে, কত বড় কবি হ'য়ে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমরা প্রবীণের দল এখনকার ছেলেদের মত বই ছাপাবার জন্য এত ক্ষেপে উঠি না।"

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ভোজন-ব্যাপার চলিতে লাগিল। তার পর জমীদার মহাশয় তাঁহার চক্ষুর উপরের চশমাটী কপালে উঠাইয়া অভ্যাগতদিগের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আজ আমার বড় আনন্দের দিন, আজ আমার একমাত্র পৌত্রীর বিবাহের পাকা দেখা। আজ যদি আমার পুত্র ও পুত্রবধূ বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহারা আজ তাহাদের প্রিয়তমা কন্যার বিবাহের এই পাকা-দেখা উপলক্ষে কত আনন্দ-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিত" বলিয়াই বৃদ্ধ তাঁহার চক্ষু মুছিলেন।

সুশীলের মনটা হঠাৎ বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সে তাহার চঞ্চলতা দমন করিয়া লইয়া মথুরবাবুর সহিত কথোপকথনে যোগ দিল।

ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণ হাসিগল্প চলিল। সুশীল ও মথুরবাবু তাহাতে যোগদান করিলেন। তারপর মথুরবাবু সুশীলের নিকট নিজের সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে লাগিলেন, "চারিদিকেই দেখি হাসি ও গল্প এবং যৌবনের উচ্ছ্বসিত কলরব। আর আমি জীর্ণ, অজ্ঞাত একাকী কোনও প্রকারে জীবনটাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছি। কিন্তু আমি নির্ব্বিকার, কেউ আমাকে কখনও দুঃখপ্রকাশ করিতে শোনে নাই। আমি স্রোতের

সেওলার মত ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়াছি। কিন্তু এতেও আমি সুখের সন্ধান খুঁজিয়া লই। এই আজ যেমন অমলার এই শুভকার্য্যে আমার প্রাণে আনন্দের উৎস ছুটিতেছে। আমি তাহার শিক্ষক, সে আমার কন্যার মত তাই আজ আমার প্রাণে এত আনন্দ। অমলার বিবাহ হইবে, তাহার সন্তানাদি হইবে, আমি তাহাদেরও শিক্ষকতা করিব। আমার জীবনে এই রকম কয়েকটী আনন্দের ধারা এখনও বহিতেছে।.........হাঁ, সুশীল তুমি মেয়েদের করুণা ও প্রভুত্ব-লিপ্সা সম্বন্ধে কি বলিতেছিলে, বোধ হয়, ঠিক বলিয়াছ। বোধ হয়.........।"

সকলের ভোজন শেষ হইল, জমীদার মহাশয় সকলকে উঠিবার জন্য আহ্বান করিলেন। সকলে উঠিয়া আচমন করিয়া বসিবার ঘরে উপস্থিত হইলেন। কেবল জমীদার মহাশয় সুশীলকে একবার ভিতরে কি যেন কার্য্যে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কার্য্য শেষ করিয়া বাহিরে আসিবার সময়ে সুশীল জমীদার মহাশয় ও জমীদার গৃহিণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়া বলিল, "আজ আপনাদের এই পারিবারিক অনুষ্ঠানে আপনারা যে আমার মত বাহিরের লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি আপনাকে বিশেষ অনুগৃহীত মনে করিয়াছি, এই নিমিত্ত আপনাদিগকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি; এই শুভকার্য্যে যোগদান করিবার আমার একমাত্র অধিকার যে আমি জমীদার মহাশয়ের প্রতিবেশী-পুত্র............"।

সুশীলের কণ্ঠস্বর চঞ্চল হইয়া আসিল, সে আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল। অমলা তাহার ঠাকুরদাদার পার্শ্বে আসিয়া কখন যে, দাঁড়াইয়াছিল, তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই। সে সুশীলের সব কথাই শুনিয়াছিল, শেষ কয়েকটী কথা শুনিয়া অমলা আর স্থির থাকিতে পারিল না, সে সুশীলের দিকে কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তারস্বরে বলিল, "সুশীলদা, শুধু ঐ একটাই কারণ, না?"

অমলার ঠাকুরদা বিস্ময়নেত্রে তাহার আরক্তিম মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ছিঃ অমলা কি করছিস্ তুই?"

সকলেই কিছুক্ষণ নিরুত্তর রহিল। সুশীল একবার চারিদিকে চাহিল, তারপর অমলার অভিমানপূর্ণ নয়ন দুটীর দিকে তাকাইল এবং দেখিল অমলার ঠাকুরমাও সজলনেত্রে অমলার মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে। সুশীলের বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে সে বলিতে লাগিল, "না, না, অমলা আমাকে ঠিকই স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, প্রতিবেশি-পুত্র বলিয়া তাহার এ নিমন্ত্রণে একমাত্র দাবী নয়, বোধ হয় অমলা ও সন্তোষের আশৈশব খেলার সাথী বলিয়া আজ সে এখানে নিমন্ত্রিত। ইহার জন্য অমলার নিকট সে কৃতজ্ঞ, এক সময়ে ঐ বন-প্রান্তর তাহার একমাত্র পরিচিত রাজ্য ছিল। তখন অমলা ও সন্তোষের নিকট হইতে তাহার কাছে নৌকা চড়ান কাঁধে ওঠান প্রভৃতি কত বায়না আসিত, হাসিমুখে সে ঐ সমস্ত আবদার পালন করিয়াছে; পরে যখনই সে শৈশবের ঐ সমস্ত সুখস্মৃতির সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে, তখনই তাহার মনে হইয়াছে যে তাহার জীবনে উহাদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, হয় তো তাহা কেহ জানে না, কিন্তু তথাপি ইহা ধ্রুবসত্য যে, আমার কাব্যের মাঝে যে বর্ণনা আছে, তাহা আমার সেই শৈশবের সুখস্মৃতিতে উদ্ভাসিত; শৈশবে আমার খেলার সাথী দুইটী আমাকে যে আনন্দ দান করিয়াছে, আমার সকল কাব্যে সেই আনন্দের ধারা ওতপ্রোতভাবে খেলিতেছে, সুতরাং আমার কাব্যরচনায় তাহাদের এ প্রভাব অল্প নয়; তাই আজ এই শুভবাসরে আমার পক্ষ হইতে সেই শৈশবের অনাবিল আনন্দ-স্মৃতির জন্য তাহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি" বলিয়া অমল প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল।

সন্তোষ তাহার ঠাকুরমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল সে তাহার ঠাকুরমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ঠাকুরমা, আমি তো জান্‌তাম না যে, সুশীলদার কাব্যরচনায় আমার এতটা হাত আছে।" তাহার ঠাকুরমা কোনও উত্তর দিলেন না।

সুশীল বাহিরে আসিয়া বাগানের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। সে দেখিল সেখানে জমীদার মহাশয়ের দুইজন কর্ম্মচারী তাঁহার আর্থিক অবস্থার সম্বন্ধে চুপি চুপি আলোচনা করিতেছে। জমীদার মহাশয়ের জমীদারির কোনও ভাল ব্যবস্থা হয় না; বনে জঙ্গলে জমী-জমা ভরিয়া উঠিতেছে, ধানের ক্ষেতে বন্যার প্লাবনে ধান হয় নাই, বাঁধ সব ভাঙ্গিয়া জল উপচাইয়া উঠিয়াছে, এমন কি সে বৎসর

জমীদারির খাজনা দিতেই জমীদার মহাশয়কে বেগ পাইতে হইয়াছে এবং তাহাতে কতক জমী জমা বাঁধা পড়িয়াছে। জমীদার-বাটীতে কখনই অর্থকে অর্থ বলিয়া গ্রাহ্য করা হইত না, কিন্তু এখন অর্থকোষ একবারেই শূন্য ; এমন কি জমীদার-গৃহিণীর মূল্যবান্ গহনাগুলিও কতক বাঁধা পড়িয়াছে, কতক বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই ও গ্রামের জমীদার-পুত্র বিপিনবাবুর সঙ্গে অমলার বিবাহের প্রস্তাব পাকাপাকি হইয়াছে।

সুশীল আর সেখানে দাঁড়াইল না, একেবারে বৈঠক-খানা গৃহে চলিয়া আসিল। সে দেখিল সেখানে কেহ নাই। ফুলদানিতে কতকগুলি বেল ও যুঁই ফুল গন্ধে ঘরটীকে আমোদিত করিতেছিল, একটা গোলাপের তোড়া টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল, সে গোলাপগুচ্ছটী হাতে লইয়া তাহার দলগুলিকে ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে একমনে কি চিন্তা করিতে লাগিল। সে বসিয়া বসিয়া কত কথা ভাবিতে লাগিল ; সেই বৃষ্টির দিনে অমলার সঙ্গে তাহার সাক্ষাতের কথা, সেই থিয়েটারের পর রজনীতে তাহাদের গোপন-মিলন, সেই যে সেদিন অমলা তাহাকে বলিয়াছিল, "আমি তোমাকেই ভালবাসি,সারাজীবন শুধু তোমাকে ভালবেসেই এসেছি।" এই সব মধুর স্মৃতিগুলি সুশীলের মনকে তোলপাড় করিতে লাগিল, সে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "অমলা, তুমি সুখী হও।"

পশ্চাৎ ফিরিতেই সুশীল দেখিল, বিপিন রোষকষায়িত লোচনে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে এবং সুশীল ফিরিতেই বিপিন বিরক্তির সহিত তাহাকে বলিল, "সুশীল-বাবু, আপনার সঙ্গে আমার দু'চারটী গোপন কথা আছে ?"

"কি কথা বিপিনবাবু ?"

"আপনি এ বাড়ীতে কেন আসেন বলুন তো ? অমলার সঙ্গে আপনার কথা বলবার কি অধিকার ?"

"কি অধিকার শুনতে চান, বিপিনবাবু ?"

"আপনার কথা শুনে আমার লাভ কি ক্ষতি নেই। আপনি এ বাড়ীতে আর আসতে পাবেন না ব'লে দিচ্ছি।"

সুশীলের হাসিও পাইল, রাগও হইল। এখনও বিপিন এ বাড়ীর প্রভু হয় নাই, এখনই এত প্রভুত্ব। তাহার মুখ-চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আচ্ছা তাই হবে, বিপিনবাবু।"

কিন্তু সুশীলের মুখ-চোখের ক্রুদ্ধ ভাব দেখিয়া বিপিনের মেজাজ সপ্তমে চড়িয়া গিয়াছিল, সে আর কিছু না বলিয়াই বাহির হইবার মুখে সুশীলের চোখে এক মুষ্ট্যাঘাত করিয়া গেল।

"বিপিনবাবু, আপনার এ কাজের অর্থ কি ?"

"বড় ভুল হয়েছে সুশীলবাবু, আমি মনে করেছিলাম আমি আপনার কাণটা ছিঁড়ে দিয়ে যাব, তা হ'ল না।"

"বিপিনবাবু, রাগে জ্ঞানহারা হবেন না, আপনি জানেন আমি আপনাকে তুলে দলা পাকিয়ে ঐ খালে ফেলে দিতে পারি। হয় তো আপনি দেখতে পান নি !"

"দেখতে পাই নি ? খুব পেয়েছি, বেশ করেছি মেরেছি। পাজী, নচ্ছার, বদমায়েস ?" বলিয়াই বিপিন দ্রুতপদে সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

সুশীলের চক্ষু ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। দূর হইতে অমলা এই ব্যাপারটী দেখিতে পাইয়াছিল। দেখিয়াই সে ছুটিয়া আসিয়া সুশীলকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় মেরে গেল, সুশীলদা ?"

"না, না, দৈবাৎ লেগে গেছে !"

অমলা কিছু না বলিয়াই তাহার কাপড়ের কোণা হইতে কয়েক টুকরা কাপড় ছিঁড়িয়া লইয়া কুঁজার জলে ভিজাইয়া সুশীলের চক্ষুতে বাঁধিয়া দিল। তারপর তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া নিজের পরিচারিকাকে দিয়া সুশীলকে বাড়ী পাঠাইয়া দিল। বিদায়ের সময় সুশীলের হস্তে অমলার কয়েক ফোঁটা চোখের জল পড়িল।

নয়

কোন্ পথে ?

"কই গো সুশীলের মা ?" বলিয়া অমলার ঠাকুরমা পরিচারিকার সহিত সুশীলদের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুশীলের মাতা সবেমাত্র আহার শেষ করিয়া প্রাঙ্গণে পা দিয়াছেন, এমন সময়ে জমীদার গৃহিণীর আহ্বানে চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিয়াই জমীদার-গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর, খুড়ীমা ?" উত্তরে

তিনি বলিলেন, "খবর এমন কিছু নয়, সুশীল কেমন আছে দেখতে এলাম। কাল অমলার কাছে সমস্ত ব্যাপার জানতে পেরে আমার মনটা এমন খারাপ হয়েছিল। বউমা, কি ভাল ছেলে তোমার সুশীল, যেন হীরের টুকরো। বিপিনটা তেমনি বদ-মেজাজী, খামকা কাল সুশীলকে মারলে, চোখটা আর একটু হলে কাণা ক'রে দিয়েছিল আর কি! মেয়েটাকে কেমন রাখবে কে জানে!"

সুশীল কারখানায় ছিল, সেখান হইতে তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল। তাহার চক্ষু তখনও রক্তবর্ণ, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সুশীল অমলার ঠাকুরমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, "সুশীল, ভাল ওযুধ কিনে চোখে দিয়ো, খরচ যা লাগে আমি দেব, বিপিনের ব্যবহারে আমরা বড় লজ্জিত হয়েছি।"

সুশীল বিনীতভাবে বলিল, "তাহার এমন কিছু লাগে নাই এবং বেশী ঔষুধ না দিয়াই শীঘ্র সারিয়া যাইবে, সুতরাং উৎকণ্ঠার কারণ নাই।"

অমলার ঠাকুরমা বলিলেন, "হঠাৎ বিপিনের কেন যে রাগের উদয় হ'ল, কে জানে? তার রাগ দেখে বাড়ীর সকলে ভয়ে একেবারে তটস্থ। সেই যে বনে শীকার করবার নাম ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, এখনও ফিরবার নাম নেই। আবার সন্তোষকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছে। অমলা ভয়ে কেমন হ'য়ে গিয়েছে, রাত্রে একটুও ঘুমাতে পারে নি।"

সুশীল বলিল, "কিছু ভাববেন না, ঠাকুমা। আজ থেকে অমলার আবার বেশ সুনিদ্রা হবে। সুষমারা কি চ'লে গিয়েছে?"

"হাঁ, কাল বিকালে তারা চলে গিয়েছে। যাবার সময় সুষমার মা বারবার তোমাকে ঢাকা গিয়েই তাদের বাড়ী যেতে বলে গিয়েছে। যাবে তো?"

"আচ্ছা, যাব।"

"এখন তবে যাই, বৌমা" কথা বলিয়া অমলার ঠাকুরমা পরিচারিকার সহিত প্রস্থান করিলেন।

সুশীল বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নদীর পাড়ে ঘুরিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে সে একটা হিজলগাছের তলায় একটী প্রস্তরখণ্ডের উপর আসিয়া বসিল। এমনি এক দিন শরতের দ্বিপ্রহরে সে একাকী নির্জ্জনে নদীর পাড়ে বেড়াইতেছিল, কত চিন্তার ধারা আসিয়া তাহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছিল, তখন আকাশ হইতে দেবীমূর্ত্তির মত এক কিশোরী তাহার পার্শ্বে নামিয়া আসিয়াছিল; তারপর তাহার সহিত কত হাসি-গল্পে সে সময় কাটাইয়া দিল। কোথায় গেল তাহার চিন্তা, কোথায় গেল তাহার মনের অবসাদ? আবার তাহার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময়ে কিশোরী তাহার হাত দুটী ধরিয়া বলিয়াছিল। "কি সুন্দর তুমি।"

সহসা মাথার উপরে একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল। সুশীলের চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া প্রাণের মাঝে একটা বিরাট্ আতঙ্ক খেলিয়া গেল। সুশীল উঠিয়া পড়িল, উঠিয়া বনের ধার দিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। তাহার প্রাণের মধ্যে কি যেন একটা অব্যক্ত যাতনা শেলের মত বিঁধিতে ছিল। তাহার মনে হইতেছিল যেন তাহার জীবনটা এক প্রকাণ্ড মরুভূমি, জল নাই, বৃক্ষলতার স্নিগ্ধ ছায়া পর্য্যন্ত নাই, কেবল মাঝে মাঝে মরীচিকার মত জাগিয়া ওঠে কয়েকটী সুখের কল্পনা। সুশীল বুঝিতে পারিতেছিল না, কোথায় যাইলে তাহার অশান্ত মন স্থির হইবে, কে জানে কোন্ পথে তাহার জীবনের গতি! সুশীলের বক্ষ ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠিল। সে কিয়ৎক্ষণ নীরবে পায়চারি করিতে লাগিল।

তারপর অস্ফুট কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ভগবান্-আর তো সহ্য হয় না! প্রাণে বল দাও, প্রভু।" সুশীল ভাবিল, হয় তো সুষমাদের বাড়ী যাইলে তাহার মনটা কতক শান্ত হইবে। সে আজই ঢাকায় চলিয়া যাইবে স্থির করিল। সুশীল ফিরিয়া গৃহে গমন করিয়া মাতা ও পিতার নিকট অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া সেই দিনই ঢাকায় যাইবার জন্য যাত্রা করিল।

দশ

গ্রামের সংবাদ

ঢাকায় আসিয়া সুশীল শুনিল, তাহাদের এম্-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, কলেজের অধ্যক্ষের নিকট সংবাদ আসিয়াছে। পরদিন সুশীল কলেজের অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া জানিতে পারিল এম্-এ পরীক্ষায় ইংরেজি সাহিত্যে সে প্রথম শ্রেণীতে

সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। সুশীলের মনটা কতকটা প্রফুল্ল হইল। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত হইয়া সুশীলের মন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আজ এই সাফল্যের সংবাদে তাহার মনে কিছু কিছু নূতন বল ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ সুশীলের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া জানাইলেন, "আগামী জানুয়ারি মাস হইতে তিনি সুশীলকে ঢাকা কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক করিয়া লইবেন।

সুশীল সেই দিনই পিতার নিকট পত্র লিখিয়া সকল কথা জানাইয়া দিল।

কয়েদিন পরে সুশীল তাহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে সুষমার পিতার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে আজ তাহার বিশেষ সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা হইল, সকলেই দেখা হইবামাত্র তাহাকে তাহার পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিল। কারণ ইতি মধ্যেই ঢাকা সহরে সুশীলের পরীক্ষার ফল অনেকে জানিতে পারিয়াছিল এবং সুষমার পিতা তাহা জানিতে পারিয়াই সুশীলের সহিত সুষমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া সুশীলের পিতার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রের উত্তর সবে মাত্র পূর্ব্ব দিবস আসিয়াছে। সুশীলের পিতা লিখিয়াছেন, ইহা তো তাঁহার একান্ত সৌভাগ্য যে, সুষমা তাঁহার পুত্রবধূ হইবেন, কিন্তু তথাপি সুশীল বিদ্বান্ যুবক, তাহারও সম্মতি আছে কি না সুষমার পিতা যেন তাহা জানিতে চেষ্টা করেন এবং সুশীলের সম্মতি থাকিলে বিবাহে কোনও বাধাই নাই।

সুতরাং সুশীল আসিতেই সুষমার দিদিমা সুশীলের সহিত সুষমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সুষমার সহিত সুশীলের দুই চারিটী কুশল-বার্ত্তার আদান-প্রদান হইল মাত্র। বাহিরে আসিতেই ঠানদিদি সুশীলকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "সুষমার সহিত তোমার বিবাহে তোমার পিতার কোনও আপত্তি নাই, বরং বিশেষ আগ্রহই আছে। আর শুধু তোমার পছন্দ হইলেই হয় ভাই। এখন আমার সোনার চাঁদ নাতনীকে তোমার মনে ধরে কি না, সেইটা আমার জিজ্ঞাস্য ?" সুশীল সহসা বিরক্ত হইয়া উঠিল, তাহার মনে জাগিল আর একখানি সুন্দর মুখ। সুশীলের মনে ধরা ? অমলার সেই অনিন্দ্যসুন্দর লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি ভিন্ন আর কাহাকেও কি সুশীলের মনে ধরিতে পারে ? সুশীলের মনটা বিছু চঞ্চল হইয়া উঠিল! সে কিয়ৎক্ষণ কোনও কথাই বলিতে পারিল না। সুষমার দিদিমা ভাবিলেন, ইহা মানুষের স্বাভাবিক লজ্জার বহিঃপ্রকাশ। সুশীল অল্পক্ষণ পরে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কি ভাবিয়া বলিল, "এ বিবাহে তাহার আপত্তি নাই, তবে এখন নয়, কয়েক মাস পরে হইলেই ভাল হয়।" যাহা-হউক সকল বিষয় ধীর চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে বুড়ী গঙ্গার ধার দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুশীল বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

সেদিন একটুক অধিক রাত্রেই সুশীল বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহার টেবিলের উপর দুইখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। একখানি সকালে ডাকে আসিয়াছে, আর একখানি সন্ধ্যার পর আসিয়াছে। প্রথম পত্রখানি সুশীলের মাতার তিনি লিখিয়াছেন।—

"কল্যাণবর সুশীল তোমার ভাল পাশ হওয়ার সংবাদ পাইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুখে কালযাপন কর। আমাদের গ্রামে বড় বিপদ হইয়া গিয়াছে। সেই যে বিপিন সন্তোষকে লইয়া শিকার করিতে গিয়াছিল, সে আজ তিনদিন হইল সন্তোষের হাতের বন্দুকে গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহারা উভয়ে এক গভীর জঙ্গলে গিয়া ভাল্লুক শিকার করিবার জন্য গাছে উঠিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, অনেকক্ষণ পরে কোনও পশু আসিতে না দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া বিপিন বৃক্ষ হইতে নামিয়া দুই একপদ অগ্রসর হইয়াছিল। এদিকে বিপিনের গায়ের কাল জামা দূর হইতে দেখিয়া এবং বনের পাতার উপর খস্ খস্ শব্দ শুনিয়া সন্তোষ ভাল্লুক আসিতেছে ভাবিয়া গুলি ছুঁড়িয়াছিল গুলি গিয়া একেবারে বিপিনের মস্তক ভেদ করিয়াছে। তারপর বিপিনের চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া সন্তোষ নামিয়া দেখে এই ব্যাপার। তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিপিনের ভৃত্যদের ডাকিয়া আনিয়া বিপিনকে তুলিয়া লইয়া আইসে। বিপিনের আত্মীয়-স্বজন তো সন্তোষকে এই মারে ত এই মারে। কিন্তু তখনও বিপিনের অল্প অল্প জ্ঞান থাকায় সে তাহাদিগকে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার করিয়া বলিলে, তবে সন্তোষ উদ্ধার পায়। ইহার কিছুক্ষণ পরেই বিপিনের মৃত্যু হয়। কি দুর্দ্দৈব! এই সংবাদ সন্তোষ ফিরিয়া আসিয়া দিতেই জমীদার

বাটীতে কান্নার রোল পড়িয়া গিয়াছে। অমলার ঠাকুরদাদারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনঃকষ্ট হইয়াছে, কারণ অমলার ঠাকুরমা আমাকে বলিয়াছেন যে, এই বিবাহে কাহারও তেমন মত ছিল না, কেবল জমীদার-মহাশয়ই পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। জমীদার মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা না কি নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে বিপিনের অগাধ অর্থ ও অগাধ সম্পত্তি সেই অর্থের দ্বারা কোন গতিকে নিজের ঋণ পরিশোধ করা জমীদার মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল। এই জন্যই তাঁহার এত আগ্রহ ছিল। আমলাও না কি তবু অসম্মত ছিল, কিন্তু যখন তাহার ঠাকুরদা অমলাকে তাঁহার নাম ও বংশমর্য্যাদার দিকে তাকাইতে বলিলেন, যখন সন্তোষের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য অমলাকে ভাবিতে বলিলেন, তখন অমলা স্বীকার না হইয়া পারে নাই। অমলা কিছু দিন সময় চাহিয়াছিল বলিয়াই এতদিন বিবাহ হয় নাই। তারপর যেদিন বিপিনরা পাকা দেখিয়া সম্বন্ধ স্থির করিতে আইসে সেইদিন অমলা তাহার ঠাকুরমার নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়া বলিয়াছিল সে বিপনকে বিবাহ করিতে পারিবে না। অমলার ঠাকুরমা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিয়াছিলেন যে, এখন সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া অসম্ভব। এই সময়ে অমলার ঠাকুরদা বাড়ীর ভিতরে আসিলে অমলা তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিল যে সে বিপিনকে ববাহ করিতে পারিবে না বরং অমলাকে কোথাও বিক্রী করিয়া দিয়া তাঁহারা কিছু অর্থ অর্জ্জন করুন। অমলার ঠাকুরদা কোনও কথা না বলিয়া বিষণ্ণ বদনে মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া অমলা বিবাহে স্বীকৃতা হইল; সুতরাং এই ব্যাপারে জমীদার মহাশয়ের বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। তিনি কাহারও সহিত কথা বলিতেছেন না, কেবল তাঁহার নিজের ঘরে চুপ করিয়া পায়চারি করিতেছেন। সমস্ত দাসদাসীর ছুটী দিয়াছেন। তিনি যেন একদিন অনেকটা জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলে তুমি ভয় না করিয়া থাকিতে পারিবে না। আশা করি তুমি ভাল আছ। ইতি তোমার মা।"

সুশীল দু তিনবার চিঠিখানি পড়িল। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে টেবিলের উপর রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে তন্দ্রাভঙ্গের মত চিন্তাযুক্ত হইয়া অপর পত্রটী পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। এই পত্র তাহার পিতা লিখিয়াছেন :—

"স্নেহের সুশীল সকালে তোমার মাতার পত্রে গ্রামের একটী দুঃসংবাদ শুনিয়াছ। এ পত্রে আমি তোমাকে আর একটী ভীষণতর দুঃসংবাদের কথা জানাইতেছি, কাল দ্বিপ্রহরে সন্তোষের সহিত অমলা ও অমলার ঠাকুর-মাকে জমীদার মহাশয় পার্শ্বের গ্রামে তাঁহার এক ভাইয়ের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন। নদীর ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বাহির দিকের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া ভাণ্ডার-ঘরে প্রবেশ করেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই গৃহ-দ্বার হইতে ধূম ও অগ্নি বাহির হইতে দেখিয়া পাড়াপ্রতিবেশী ও আমরা চীৎকার করিয়া লোক-সংগ্রহ করিলাম কিন্তু আগুন নিবাইয়া যখন আমরা জানালা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম তখন প্রায় সমস্ত ঘর খানি জ্বলিয়া গিয়াছে জমীদার-মহাশয়ের দেহ প্রায় ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে তাঁহার অন্তিম নিঃশ্বাস অনেকক্ষণ বাহির হইয়া গিয়াছে। সন্তোষ অমলা ও তাহার ঠাকুরমাকে আনিবার জন্য লোক পাঠান হইয়াছে, বোধ হয় কালই তাহারা আসিয়া পৌছিবেন। এই ব্যাপারে আমরা মনের অশান্তিতে আছি। আশা করি তুমি ভাল আছ। ইতি তোমার বাবা।"

সুশীল চিঠি খানি একবার পড়িল, তাহার মনে হইল সে যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দুই তিনবার পড়িবার পর যখন সকল ব্যাপারটা তাহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন সে মাটীতে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে জানিত অমলাকে জমীদার মহাশয় কত ভালবাসেন, সেই অমলাকে ও যখন তিনি ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন, তখন নিশ্চয়ই আর্থিক অপমানের ও বংশের অমর্য্যাদার আশঙ্কায়ই তিনি এই কার্য্য করিয়াছেন। অমলার জন্য সমবেদনায় সুশীলের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

সুশীল প্রথমে কি করিবে স্থির করিতে পারিল না। তার পর তাহার মনে হইল যে এই পরমাত্মীয়-বিয়োগে অমলাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাহার অমলার নিকট যাওয়া প্রয়োজন। সে পরদিন গ্রামে যাইবে বলিয়া সংকল্প করিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু সে

রাত্রি তাহার নিদ্রা আসিল না। সমস্ত রাত্রি শয্যায় শুইয়া ছটফট করিতে করিতে সুশীল একপ্রকার বিনিদ্র অবস্থায় সেই রাত্রি কাটাইয়া দিল।

এগারো

শহরে

সুশীল ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষের তার পাইয়া শহরে চলিয়া আসিয়াছে। গ্রামে গিয়া অমলার ঠাকুরমার সহিত সুশীলের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু অমলার সহিত তাহার কোনও কথা বলিবার সুযোগ হয় নাই। অমলার এক মামা আসিয়া তাহাদের জমীদারির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি কতক অংশ বিক্রয়ের দ্বারা ঋণশোধ করিয়া এবং পতিত জমি সব প্রজাবিলি করিয়া জমীদারির স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

সুশীল ঢাকা কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছে। সুষমার পিতা, মাতা ও সুষমা তাঁহাদের আন্তরিক আনন্দ জানাইয়া সুশীলকে পত্রদ্বারা অভিনন্দন করিয়াছেন।

সেদিন সুশীল সুষমাদের বাটীতে গিয়া দেখিল, একজন সাহেববেশধারী ভদ্রলোকের আগমনে সকলে মিলিয়া হাসি গল্প করিতেছেন। সেখানে সুষমার দিদিমা, মাতা ও পিতা ভদ্রলোকটীর নিকটে বসিয়া রহিয়াছেন, সুষমা একটু দূরে একখানি চেয়ারে বসিয়া পশম ও কাঁটা লইয়া থলি বুনিতেছে। সুশীল প্রবেশ করিলে সুষমার পিতা আনন্দসূচক ধ্বনি করিয়া সুশীলকে টানিয়া আনিয়া নিকটে বসাইয়া ভদ্রলোকটীরসহিত আলাপ করাইয়া দিলেন, "এর নাম রণজিৎ সেন, আমার বিশিষ্ট বন্ধুর পুত্র, আমার নিজের সন্তানের মত স্নেহভাজন, কয়েকদিন হইল ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা পাশ করে এসে কলিকাতা হাই-কোর্টে প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করেছে, ঢাকায় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।" তারপর রণজিতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এর নাম সুশীলকুমার দাশগুপ্ত, ঢাকা কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক।" নবীন ব্যারিষ্টার সুশীলের দিকে একটু কৃপাকটাক্ষ করিলেন, সুশীল হউক না অধ্যাপক, কিন্তু সে তো আর বিলাত যায় নাই, সে কি আর মানুষ! রণজিতের কৃপাকটাক্ষের বোধ হয় ইহাই অর্থ।

আজ সুশীল অধিকক্ষণ সুষমাদের বাটী টিকিতে পারিল না। সুশীলের দিকে বড় কাহারও লক্ষ্য নাই, আজ আকর্ষণের কেন্দ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, রণজিৎকে লইয়াই আমোদ আহ্লাদ চলিতেছে। সুশীল সে দিনের মত বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল।

কয়েকদিন সুশীল সুষমাদের বাটী যাইতে পারে নাই। প্রথমতঃ তাহার মনটা তত ভাল ছিল না, দ্বিতীয়তঃ তাহার সময়ের অভাব। একখানি নূতন পুস্তক আরম্ভ করিয়া সুশীল সেখানি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিন হঠাৎ সুষমার এক আত্মীয় একখানি লাল খামে মোড়া বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া গেল। সুষমার বিবাহ রণজিৎ-সেনের সহিত ওয়ারী ৮নং র‍্যান্‌কিন ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে সম্পন্ন হইবে। বিবাহ ৫ই ফাল্গুন শুক্রবার। সুশীল প্রথমে কিছু বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল, তারপর মনকে কশাঘাত করিয়া টানিয়া আনিয়া মৃদু হাসিল, তাহার অর্থ বোধ হয় ইহাও বিলাত-ফেরতের উপর একটা সশ্রদ্ধ মোহ!

সুষমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সুশীলের ইচ্ছা থাকিলেও বিশেষ প্রয়োজনে যাইয়া উঠিতে পারে নাই। একদিন হঠাৎ পথে সুষমার পিতার সহিত সুশীলের সাক্ষাৎ হইল। সুশীলকে দেখিয়াই সুষমার পিতা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সুশীল, সে দিন সুষমার বিয়েতে গেলে না যে? নিশ্চয়ই রাগ করেছ?" সুশীল মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, সে রাগ করে নাই। সুষমার পিতা না থামিয়াই বলিতে লাগিলেন, "কেন রাগ করেছ, সুশীল? আমি কি করেছি, আমার কি দোষ? আমার তো আদৌ এ বিয়েতে মত ছিল না। বাড়ীর মেয়েরাই তো জেদ ধরলে আমি কি করব? আর মেয়েটাই বা কেমন, সেও না কি এই বিয়েতে মত দিলে! আমি ভেবেছিলাম সুষমা তোমাকেই ভালবাসত', কিন্তু আমি কি ভুলই করেছিলাম। তথাপি সত্যি বলছি সুশীল, আমার এখনও তোমাকেই বেশী ভাল লাগে। কিন্তু আমার কোনও হাত ছিল না" বলিয়া সুষমার পিতা ছল-ছল চোখে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন। সুশীল শান্ত সংযত কণ্ঠে বলিল, "আপনি কেন দুঃখ করছেন, আমি তো কারও উপর রাগ করি নি। আমি কি জানি না আপনি আমায়

কত স্নেহ করেন। আপনারা ভালই করেছেন, রণজিৎ-বাবুর সঙ্গে বিয়েতে সুষমা সুখে থাকবে।” সুষমার পিতা বলিলেন, “তা জানি না সুশীল, আশীর্ব্বাদ কর যেন মেয়েটা সুখী হয়—ঐ আমার একমাত্র মেয়ে। চল তোমায় বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।” পথে আর কোনও কথা হইল না। সুশীলকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া সুষমার পিতা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বারো

শ্মশানে

সুশীলের নৌকা আসিয়া জমীদারবাটীর ঘাটে লাগিল, দূর হইতে বাটীখানি পরিত্যক্ত জনমানবশূন্য মনে হইতেছিল। নদী পথে এই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান সুশীলের নিকট কয়েক বৎসর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। নৌকা ঘাটে পৌঁছিবামাত্র সুশীল দ্রুতবেগে তীরে উঠিল। উঠিতেই দেখিতে পাইল, অদূরে শশ্মানঘাটে চুল্লী জলিতেছে। সুশীলের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, মাথার উপর একটা পেচক ডাকিয়া গেল। কম্পিতবক্ষে শশ্মানঘাটে ছুটিয়া গিয়া সুশীল যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে সে আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। দেখিল, তাহার মাতার ক্রোড়ে অমলার ঠাকুরমা মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। সুশীলের আগমন সংবাদে ঈষৎ মাথা তুলিয়া তিনি সুশীলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “এস দাদা, ঐ দেখ আমার সোণার প্রতিমা আগুনে ছাই হ'য়ে গেল; ঐ দেখ দাদা, সে এখনও তোমার প্রতীক্ষায় শেষ হয়ে যায় নি, সে যে শেষ পর্য্যন্ত তোমার কথা বলতে বলতেই অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলেছে।” সুশীলের মুখে কোনও সান্ত্বনার কথা আসিল না, সে অপলকনেত্রে সেই দাহ্যমান চিতাচুল্লী ও তদুপরি ভস্মাবশেষ স্বর্ণ-প্রতিমার দিকে তাকাইয়া রহিল, কেবল তাহার কাণে বাজিতে লাগিল, “সে যে শেষ পর্য্যন্ত তোমার কথা বলতে বলতেই অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলেছে।” *

* প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক নুট-হ্যামসনের উপন্যাসের ছায়াবলম্বনে।

নালন্দা

[শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ]

খৃষ্ট-জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে প্রায় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নালন্দা-মহাবিহার মগধ-রাজধানী রাজগৃহের অতি নিকটে (বর্ত্তমান বড়গাঁ নামক ছোট গ্রামের দক্ষিণে) * প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধ-জগতে শিক্ষা-দীক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র-রূপে শত শত বর্ষ ধরিয়া ইহা ভারতে গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছিল। যদিও তখন ভারতে ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষা-কেন্দ্রের † অভাব ছিল না, তথাপি তাহারা ইহার যশ কিংবা প্রতিপত্তির কিছুমাত্র লাঘব করিতে পারে নাই। ভারতীয় ছাত্রের অভাব তো ইহার ছিলই না, পরন্তু বিদেশীয় বহু শিক্ষার্থী ছাত্র ও শ্রমণ প্রভৃতি এখানে উপস্থিত থাকিত। তাঁহারা যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকিয়া ইচ্ছামত শিক্ষা অর্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিতেন।

শিক্ষা-কেন্দ্র বলিলে লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ই বুঝিয়া থাকে; সুতরাং নালন্দা-বিহারকে আমরা নালন্দা-

* এখন নালন্দার যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহাদের সমস্তই বড়গাঁ গ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত। বড়গাঁ বিহার-লাইট-রেলওয়ের একটী ছোট ষ্টেশন এবং রাজগৃহ কিংবা গয়া হইতে উহার দূরত্ব বেশী নয়।

† বিক্রমপুরের মহাবিহার এইরূপ শিক্ষাকেন্দ্র। ভাগলপুরের পাথরঘাটায় ইহা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এতদ্ভিন্ন তক্ষশিলা এবং গুজরাটের বলভীও (Valabhi or Balabhi) অন্যতম। Sir Charles Eliot এর Hinduism and Buddhism, 2nd Vol. ১০৫ পৃষ্ঠায় দেখা যায় বলভী-বিদ্যালয়ে একশত বিহার ও প্রায় ছয় হাজার ভিক্ষু-ছাত্র থাকিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ও বলিয়া থাকি। নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে এবং কবে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা বলা বড়ই কঠিন। এস্থলে আমরা ক্ষোদিত লিপি, প্রাচীন পুঁথি এবং পুরাকালের বিদেশীয় পর্য্যটকদের বিবরণ প্রভৃতি হইতে যথাসম্ভব উপাদান সংগ্রহ করিয়া মোটামুটি ইহার ইতিহাস বর্ণনা করিতে চেষ্টা পাইব। নালন্দার কোন সম্পূর্ণ ইতিহাস আমরা পাই না। যুয়ন্-চোয়ঙ্, ঈ-চিঙ্ প্রমুখ তৎকালীন চৈনিক কিংবা ভিন্নদেশীয় পর্য্যটকবর্গের লিখিত বিবরণ হইতে তথ্য ও সি-য়ু-চি (Hsi-yu-chi) নামক পশ্চিমদেশীয় বিবরণ-গ্রন্থের যেখানে বৌদ্ধদের বিদ্যা ও আচার বিশেষভাবে বর্ণিত আছে, সেগুলি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। আবিষ্কৃত প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির পুষ্পিকা, ক্ষোদিত লিপি হইতেও নালন্দার যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় তাহাও সংগ্রহ করিয়াছি।

অনেকে বলেন গুপ্তযুগেই নালন্দার প্রাদুর্ভাব হওয়া সম্ভব, কারণ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ফা হিয়ান যখন এদেশে আসেন, তখন তিনি মগধ-ভ্রমণকালে নালন্দার উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু পরে সপ্তম শতাব্দীতে যুয়ন্-চোয়ঙ্ যখন আসেন, তখন নালন্দার উন্নতির যুগ। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন ৪র্থ শতকে নালন্দা একটী ছোট গ্রাম মাত্র, কারণ এই সময়ে সিংহলরাজ মঘবর্ম্মা সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (৩৩০-৩৭৫ খৃঃ অব্দ) আম্রবনে প্রকাণ্ড বিহার নির্ম্মাণ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। উহাই নালন্দা-বিহার। বিহারের জৈন ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, খৃষ্টজন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে রাজা শ্রীনিকের (বিম্বিসারের) রাজত্বকালে কোন জৈন সন্ন্যাসী নালন্দায় বাস করিতেন এবং তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বিহার পরবর্ত্তী বৌদ্ধযুগে নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক তারনাথের মতে মহারাজ অশোক নালন্দার প্রতিষ্ঠাতা। বুদ্ধের প্রিয়শিষ্য শারিপুত্রের মন্দিরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তিনি মহার্ঘ্য ভক্তি-উপহার দিয়া অনেক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে অনেক স্তূপও উত্তোলন করেন। শারিপুত্র নালন্দায় জন্মগ্রহণ করেন এবং নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামেই দেহত্যাগ করেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজ অশোক তখন বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচার এবং শিক্ষা-বিস্তার-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়েই শারিপুত্রের জন্মস্থানে যে একটী শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হইতে পারে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। নিদর্শন-স্বরূপ কাছাকাছি দু'একটী মূর্ত্তি, স্তূপাদিও দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজগৃহের পর্ব্বতগুহা, বিহার প্রভৃতি যখন বিশেষভাবে উপেক্ষিত হইতেছিল এবং বুদ্ধদেবের অনুবর্ত্তিগণ যখন তথাগতের সহিত পর্ব্বতবাস ছাড়িয়া আসেন এবং নালন্দায় প্রবেশ করেন, তখন হইতে নালন্দা তাহার শিক্ষা-সম্পদে উন্নত হইতে আরম্ভ করে এবং পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধ-জগতে শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়।

নালন্দায় বাস করিবার সময় যুয়ন্-চোয়ঙ্ বলেন যে, বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মহারাজ শক্রাদিত্য-কর্ত্তৃক নালন্দার প্রতিষ্ঠা হয়। যুয়ন্-চোয়ঙের বিবরণে এইরূপ লেখা আছে,—

"বহুপূর্ব্বে এখানে এক ধনী ব্যক্তির এক সুবৃহৎ আম্রকুঞ্জ ছিল। পাঁচশত ধনী বণিক্ বহু লক্ষ মুদ্রা দ্বারা সেই আম্রকুঞ্জ ক্রয় করিয়া ভগবান্ বুদ্ধকে উপহার দেন। বুদ্ধ তখন এখানে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন এবং তিন মাস কাল সেইখানেই বাস করিয়াছিলেন। উক্ত ধনী বণিগ্‌গণের মধ্যে অনেকে তাঁহার নিকট হইতে 'বোধি' অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের 'নির্ব্বাণের' পরে মহারাজ শক্রাদিত্য তাঁহার প্রতি যথাযথ সম্মান-প্রদর্শনার্থ নিজ অর্থব্যয়ে এক বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। শক্রাদিত্যের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র বুদ্ধগুপ্ত কর্ত্তৃক ঐ বিহারের আরও উন্নতি সাধিত হয়। পিতার নির্ম্মিত বিহারের দক্ষিণদিকে তিনি আর একটী বিহার নির্ম্মাণ করেন। বুদ্ধগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র মহারাজ তথাগত আর একটী বিহার নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র বালাদিত্য কর্ত্তৃক উহার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে আর একটী বিহার নির্ম্মিত হয়। অতঃপর সুদূর চীন হইতে কোন পরিব্রাজক তাঁহারই সাহায্যার্থ আসিবেন জানিতে পারিয়া তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তাঁহার পুত্র বজ্র তখন সিংহাসন অধিকার করিয়া উত্তরদিকে আর একটী মঠ নির্ম্মাণ করেন। ইহার পরে মধ্য-ভারতের কোন নৃপতির দ্বারা

উক্ত বিহারের পার্শ্বে আর একটী বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে পরস্পর ছয় জন রাজা ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করেন। ইহাদের মধ্যে ষষ্ঠ অর্থাৎ শেষ নৃপতি ঐ বিহার সমূহকে ইটের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া সমস্তগুলিকে এক বিরাট্ বিহারে পরিণত করিয়া তুলেন। ইহাতে একটী সু-উচ্চ বৃহৎ তোরণ নির্ম্মিত হয়। অধ্যাপনার জন্য তিনি আটটী বৃহৎ বৃহৎ প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করেন। সারি সারি বহু স্তম্ভ ও স্তূপ নির্ম্মিত হয় এবং উহার মণ্ডপসমূহ কারুকার্য্যযুক্ত প্রবালদ্বারা সজ্জিত করা হয়। বিহারের চূড়াগুলি আকাশে গিয়া ঠেকিত এবং সূর্য্যোদয়ের সময় উহার গবাক্ষ হইতে মেঘের জন্মস্থান দেখা যাইত। মহাবিহারের চারিধারে খাদ কাটিয়া জল দ্বারা বেষ্টিত ছিল; উহাতে সকল সময় পদ্ম ফুটিয়া থাকিত। প্রায় সর্ব্বত্র আমের ঝোপের ফাঁক দিয়া লাল 'কনক' ফুটিয়া থাকিত ইত্যাদি......"

A. M. Broadley বলেন, য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ যে শক্রাদিত্যের নাম করিয়া থাকেন তাঁহাকে অনেক সময় তিনি শীলবাহন নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। তবে শক্রাদিত্য কিংবা শীলবাহন যে নালন্দার প্রতিষ্ঠাতা নহেন ইহাই Broadleyর মত। তিনি বলেন নাগার্জ্জুনই ইহার প্রতিষ্ঠাতা, তবে নাগার্জ্জুন যে কোন সময় জীবিত ছিলেন সে কথা তিনি বলেন নাই। Broadleyর কথায় মনে হয় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তিনি জীবিত ছিলেন। যাহা হউক নালন্দার জন্ম যে কবে তাহা আমরা ঠিক জানিতে পারি না, তবে সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী কিংবা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতেই উহা হওয়া সম্ভব বলিয়া আশা করা যায়।*

নালন্দার গঠন-বিবরণ সম্বন্ধে য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ বলেন যে উহা অগণিত মন্দির, বিহার, স্তূপ, সুবৃহৎ অধ্যাপনা-গৃহ, পাঠাগার প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ছিল। বহু বৃহৎ পুষ্করিণীও তথায় ছিল। সেগুলি হইতে প্রচুর পরিমাণে নির্ম্মল জল পাওয়া যাইত। ঈ-চিঙের বিবরণ হইতেও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। তাহাতে জানা যায় যে,সমগ্র নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয় একটী চতুর্ভুজ আয়ত-ক্ষেত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রধানতঃ নালন্দার সমস্ত অংশ ইষ্টক এবং প্রস্তরে নির্ম্মিত ছিল। প্রধান মণ্ডপটী দীর্ঘ চতুরস্র, বিদ্যালয়ের দশটী অধ্যাপনা-গৃহ—প্রত্যেকটী প্রায় ত্রিশ ফুট উচ্চ। এ ছাড়া আরও আটটী হল ছিল সেগুলিতে ৩০০টী ঘর ছিল। হলগুলিতেও অধ্যয়নাদি হইত। বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দিক্ বারাণ্ডায় ঘেরা; প্রত্যেক হর্ম্ম্যতল মসৃণ অথচ সুদৃঢ় বজ্রলেপে আবৃত ছিল। অলিন্দগুলি বিস্তৃত এবং ভ্রমণোপযোগী ছিল। ঘরের ছাদ সমতল—উহার চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, কাজেই চলাফেরা করিবার সুবিধা হইত।

মধ্যস্থলের বিহার-প্রকোষ্ঠগুলি বহু প্রকারের অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন, মূর্ত্তিদ্বারা সজ্জিত থাকিত। বহুস্থানে অত্যুচ্চ স্তূপ, মিনার, মূর্ত্তি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ এই সকল বিহার-গৃহের অবস্থানের ও মহিমার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—পূর্ব্বেই তাহার অনেকটা আভাস দেওয়া হইয়াছে।

নালন্দার স্থাপত্য সম্বন্ধে য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ এবং ঈ-চিঙের বর্ণনার বৈষম্য দৃষ্ট হয় না। ইঁহাদের বর্ণনা-পাঠে মনে হয়, সে সময়ে এই শ্রেণীর স্থাপত্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং উহার অনুকরণ-প্রভাব চীনদেশ এবং সমগ্র বৌদ্ধজগতে প্রসার লাভ করিয়াছিল।

য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ স্থান-নির্দ্দেশ এবং বিহারের আয়তন প্রণালীর যেরূপ বর্ণনা দেন তাহাতে জানা যায় যে, পূর্ব্ব-প্রান্তে দুইশত ফুট উচ্চ একটী বিহার ছিল। ইহাতে ভগবান্ তথাগতের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই বিহারের আরও উত্তরে তিনশত ফুট উচ্চ আর একটী বিহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরগুপ্ত-তনয় নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য উহা নির্ম্মাণ করেন। উহাতে একটী প্রতিমূর্ত্তি ছিল। এই মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং খুব সুন্দর। বিপুল স্বর্ণ ও বহু মণিমুক্তা-খচিত মন্দিরটী অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-নৈপুণ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। উক্ত বিহারের উত্তরদিকে বুদ্ধদেবের একটী তাম্রমূর্ত্তি ছিল, তাহা

* Beal's Life of Hsuan Chuang, গ্রন্থে (pp. 111), দেখা যায় যে নালন্দা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছিল। ইতিহাসে দেখা যায় যে নরসিংহগুপ্ত, বালাদিত্য ৪৮৫ খৃষ্টাব্দে একটী বিহার নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু বস্তুতঃ নালন্দা এই বালাদিত্যের সময়ের প্রায় সাতশত বৎসর পূর্ব্বে নালন্দায় স্থাপনা হয়, সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতক কিংবা তৎপূর্ব্বেই উহার আবির্ভাব হওয়া সম্ভব।

প্রায় আশী ফুট উচ্চ। মহারাজ অশোকের বংশধর রাজা পূর্ণবর্ম্মা ৬০০ খৃষ্টাব্দে মূর্ত্তিটী নির্ম্মাণ করেন। মূর্ত্তিটী দণ্ডায়মান এবং গঠন-শিল্প-পটুতায় উহা জগতের একটী অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য-নিদর্শন।

নালন্দা বিদ্যাপীঠে অনেকগুলি সুবৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ পুঁথি-শালা ছিল। এখানে 'রত্নোদধি'তে পুঁথি সংরক্ষিত হইত। 'রত্নোদধি' হীনযান এবং মহাযানদের নয়-তলা মন্দির *। বিভিন্নস্থানে ছাত্রগণের বাসোপলক্ষে যে সমস্ত বাটী ছিল তাহাদের প্রত্যেকটীই চারিতলা উচ্চ। সুবৃহৎ মণ্ডপগুলিতে নানারূপ জীব জন্তুদের মূর্ত্তিতে অঙ্কিত থাকিত। ছাদের কড়িগুলি রামধনুর বর্ণে চিত্রিত, বরগাগুলি সুন্দর-ভাবে সজ্জিত এবং থামসকল মণিরত্ন-খচিত ও নানা-বর্ণে বিভূষিত এবং ক্ষোদিত মূর্ত্তিতে পূর্ণ ছিল। দরজার কপাটগুলি সুনিপুণ শিল্পীর কারু-কার্য্যের পরিচায়ক ও সৌন্দর্য্য-শ্রীমণ্ডিত এবং মেঝেগুলি রঙীন উজ্জ্বল বজ্রাসনে গঠিত। ঐ সমস্ত বজ্রাসনের চাকচিক্য দেখিবারমত জিনিস ছিল। ফার্গুসন বলেন যে; রাজা অশোকের সময় ভারতে স্থাপত্য-শিল্পে কাষ্ঠের প্রচলন ছিল এবং তাহা নালন্দায়ও ব্যবহৃত হইত।

ঐতিহাসিকগণ বলেন যে তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের দ্বারা ভারতীয় উচ্চ আদর্শে নালন্দা নির্ম্মিত ছিল—তাঁহাদের নিপুণতায় এখানে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য বিরাজ করিত। নালন্দা ভারতের যে একটী শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টব্য স্থান ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সৌন্দর্য্য, শিল্প, স্তূপাদির উচ্চতা এবং কারুকার্য্যের গৌরবে ইহা যে ভারতের বিহার-স্থাপত্যের আদর্শসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। Beal's life of Hsuan Chuang এর ১১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"The monasteries of India are counted by myriades, but this is the most remarkable for grandeur and height". †

নালন্দার নাম লইয়াও অনেক সময় অনেক গোল বাধে। নালন্দা নাম কোথা হইতে যে আসিল সে সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। জনশ্রুতি হইতে ইহার নাম নানারূপ পাওয়া যায়। তিব্বতীয় পুস্তকে নালন্দাকে 'নালেন্দ্র' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে উহার নাম 'কুণ্ডলীপুর'। বুকানন্ হ্যামিল্টন্ (Buchanan Hamilton) জনৈক জৈন ঐতিহাসিকের মুখে শুনিয়াছিলেন যে উহার নাম 'পম্পাপুরী'। এরূপ মতবাদের কোনটীই যে সত্য নহে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে; কারণ প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজকগণের বিবরণে কিংবা লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোন ঐতিহাসিকের নিকট ইহার কোন সম্যক্ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফা-হিয়ানের বর্ণনায় 'নাল' নামে একটী গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু নালন্দার বৈশিষ্ট্যের সহিত ইহার সাদৃশ্যের কোন আভাস পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নালন্দা মঠটী একটী আম্র-কুঞ্জে অবস্থিত ছিল। যুয়ন্-চোয়ঙ্ বলেন, সেই কুঞ্জের মধ্যে একটী পুষ্করিণী ছিল ‡ তাহাতে না কি এক নাগ বাস করিত। উহার নাম ছিল নালন্দা। সেই নাম হইতেই আম্র-কুঞ্জটীর নাম হয় 'নালন্দাদেশ', পরে এই স্থানেই নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় বলিয়াই উহার নাম নালন্দা-বিহার হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ভগবান্ তথাগত যখন বোধিসত্বরূপে এখানে তপস্যা করিতেন তখন জীবের দুঃখ-কষ্টে তাঁহার হৃদয় কাঁদিত, তাই মুক্ত-হস্তে তিনি জিনিস-পত্রাদি আর্ত্তগণকে বিলাইয়া দিতেন। সেইজন্য তাহার নাম হয় 'না—অলম্ দা' অর্থাৎ 'নালন্দা'। 'না—অলম্ দা' অর্থে 'যাঁহার সর্ব্বস্ব বিলাইয়াও তৃপ্তি হয় না'; এবং 'সর্ব্বস্ব বিলাইয়া যাঁহার তৃপ্তি হয় না সেই রাজার দেশ' বলিয়া উহার নাম হইল 'নালন্দাদেশ'। যুয়ন্-চোয়ঙ্ তাঁহার বিবরণে নালন্দাকে 'না-লন্-তো' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে

* Archeological Report, 1915-16 এ উল্লেখ আছে যে ঘরগুলি ১২ ফুট × ১৮ ফুট। এই বিরাট্ পুঁথিশালাটী কিরূপে যে নষ্ট হইল, তাহা জানা যায় না, তবে তিব্বতীয় প্রবাদ অনুসারে উহা তৈর্থিক ভিক্ষু কর্ত্তৃক অগ্নিদগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হওয়া সম্ভব।

† The sangharamas of India are counted by thousands but there are none equal to thisin majesty or richness or the height of their construction—Archeological survey of India. Annual Report 1914-15, pp 57,

‡ A. M, Broadley এই পুষ্করিণীকে 'ইন্দ্রপুকুর' বলেন।

কোনটী ঠিক তাহা বলা বড়ই কঠিন। তবে কয়েকটী কারণে দ্বিতীয়টীকে ঠিক বলিলেও বলা যাইতে পারে; কারণ ভগবান্ তথাগত যে এখানে তপস্যা করিতেন তাহা পূর্ব্বেই আমরা য়ুয়ন্-চোয়ঙের বর্ণনায় পাইয়াছি। তিনি যে দুই হস্তে আর্ত্তদিগকে দান করিতেন, সে কথাও য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ বলিয়াছেন। ঈ-চিঙের বিবরণে এ কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে নালন্দার প্রতিষ্ঠা হইলেও খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নাগার্জ্জুনের সময় হইতে ইহার উন্নতি হইতে থাকে এবং প্রায় ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানবিজয়ের সময় পর্য্যন্ত ইহার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন ছিল। বৌদ্ধরাজ পরিচালিত এবং বৌদ্ধ-বিদ্যালয় হইলেও এখানে সর্ব্ব-শাস্ত্রের ও সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। হিন্দুর যোগ-শাস্ত্র, উপনিষদ্ প্রভৃতি আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধ ত্রিপিটক পর্য্যন্ত কিছুরই আলোচনা বাকী থাকিত না।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা প্রকৃষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করে। এই সময়ই নালন্দার ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। থানেশ্বরের অধিপতি হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য তখন নালন্দার অধীশ্বর। বিদেশীয় পর্য্যটক, শিক্ষার্থী ছাত্র এই সময় অধিক পরিমাণে আসিতে থাকেন, সেই সঙ্গে প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্য্যটকদ্বয় য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ (৬৩৭—৪২-৩খৃঃ) এবং ঈ-চিঙ (৬৭২—৯২খৃঃ) ভারতে আগমন-কালে নালন্দায় অবস্থান করেন। তখন প্রায় দশ হাজার ছাত্র নালন্দায় বাস করিতেন, একথা য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ বলিয়া গিয়াছেন। ঈ-চিঙের বিবরণে দেখা যায় যে মাত্র তিন হাজার ছাত্র নালন্দায় বাস করিতেন, তন্মধ্যে শত করা ২০ হইতে ৩০ জন বিদেশীয় ছাত্র। ব্রহ্ম-পুত্রের পূর্ব্বতীরে সমতট-দেশবাসী রাজপুত্র শীলভদ্র তখন নালন্দার সঙ্ঘস্থবির অর্থাৎ মহাস্থবির (অধ্যক্ষ) ছিলেন। শীলভদ্রের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবান্ ব্যক্তি নালন্দায় খুব কমই ছিলেন। য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ বলিয়া-ছেন, কি ধর্ম্ম, কি বিদ্যা, কি জ্ঞান, যে কোন বিষয়েই হউক শীলভদ্র জীবিত কিংবা মৃত সমস্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। শৈশব হইতেই তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও পাঠাসক্তির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিশ-বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তিনি অন্যান্য ছাত্রদের ন্যায় নালন্দায় পাঠাভ্যাস করিতে আসেন। তখন বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মপুত্র নালন্দার অধ্যক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। শীলভদ্র তাঁহার নিকটেই শিক্ষা গ্রহণ করেন। নিজের অসামান্য গুণগ্রাম এবং পাণ্ডিত্যের জন্য * পরে তিনি মহাস্থবির হন। শীলভদ্রের যে কয়টী পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায় সব গুলির ভাষা সরল, টীকা সহজ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

ধর্ম্মপুত্রের পূর্ব্বে সম্ভবতঃ ভববিবেক নালন্দার সঙ্ঘা-রামের সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রধান শিক্ষকগণের মধ্যে তখন দিবাকরমিত্র, জিনপ্রভ, জ্ঞানচন্দ্র, জয়সেন ও রত্ন-সিংহ অন্যতম। ইঁহাদের পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণ-মতি, স্থিরমতি, শীঘ্রবুদ্ধ, প্রভামিত্র, পদ্মসংস্থ, বীরদেব, জিন-মিত্র প্রভৃতি নামধেয় মহাপণ্ডিতগণের নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে স্থিরমতি বহুমূল্য দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। একখানি 'মহাযানাবতারশাস্ত্র' এবং অপরটী 'মহাযানধর্ম্মধাতুবিশেষতাশাস্ত্র'। স্থিরমতি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, কারণ 'মহাযানাবতারশাস্ত্র' ৩৯৭ খৃঃ হইতে ৪৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থটী ৬৯১ খৃষ্টাব্দে চীন ভাষায় অনূদিত হয়। জিনমিত্র 'মূলসর্ব্বাস্তিবাদ-নিকায়-বিনয়-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। পরিব্রাজক ঈ-চিঙ্ উহা চীনভাষায় ভাষান্তরিত করেন। জয়সেন বসুবান্ধবের 'অভিধর্ম্মকোষে'র টীকা প্রস্তুত করেন এবং তাঁহার শিষ্য বসুমিত্র 'অভিধর্ম্মকোষ-ব্যাখ্যা'র টীকা প্রণয়ন করেন।

গুণমতির পুস্তকাবলীর সমস্তই সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে লিখিত এবং দর্শন-সম্বন্ধে বহু সুচিন্তিত জ্ঞান-পূর্ণ তথ্য

* একবার এক মহাপণ্ডিত ধর্ম্মপুত্রের সহিত তর্কযুদ্ধ করিতে নালন্দায় আগমন করেন। শুনা যায় শীলভদ্র তখন তাঁহার গুরুকে না যাইতে দিয়া নিজেই তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তিনি বলেন শিষ্যকে পরাস্ত না করিয়া গুরুকে তিনি পরাস্ত করিতে দিবেন না। এইরূপ শোনা যায় যে শীলভদ্র সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন এবং সর্ব্ব-সাধারণে বিশেষ খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি লাভ করেন। মগধরাজ শীল-ভদ্রের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে একটী নগরীর অধিপতি করিয়া দেন। প্রথমে তিনি নিজের জন্য অর্থ নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া উহা লইতে অস্বীকৃত হন কিন্তু পরে রাজার অনুরোধে তিনি তাহা লইতে বাধ্য হন এবং তাহার উপস্বত্ব হইতে একটী বিরাট্ সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করেন।

এ গুলিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের কতকটা ধারণা করিতে পারা যায়। দিনাজ নামে এক পণ্ডিতের নালন্দার অবস্থানের কথা শুনা যায়। বহু দিন নালন্দায় অবস্থান করিয়া তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যদিও সে সমস্ত পুস্তক এখন আর পাওয়া যায় না, তথাপি তাহাদের তিব্বতীয় অনুবাদ এখনও সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। দিনাজের গ্রন্থগুলির মধ্যে 'প্রমাণ-সমুচ্চয়' এবং 'ন্যায়-প্রবেশ' অন্যতম। য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ দিনাজকে 'সেন্-না' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

জ্ঞানচন্দ্র এবং রত্নসিংহ উভয়ে ঈ-চিঙের নালন্দায় অবস্থান কালে তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। ঈ-চিঙ্ নিজেই তাঁহার বিররণে একথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হুয়ন্-চাও (Hsuan Chao) নামক চৈনিক পর্য্যটকও * তাঁহাদের নিকট শিক্ষালাভ করেন। এই সময় হর্ষবর্দ্ধনের বিধবা ভগিনী রাজ্যশ্রীও একজন ভিক্ষুণী-রূপে অবস্থান করিতেছিলেন। †

নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে রাজগৃহ হইতে ‡ য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ নালন্দায় গমন করিয়াছিলেন। মেজর ক্যানিংহাম বলেন যে, য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ নালন্দার তোরণের সম্মুখে উপনীত হন। ইনি সর্ব্বসমেত পাঁচ বৎসরকাল (কাহারও কাহারাও মতে দুই বৎসর কাল) নালন্দায় অবস্থান করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রাদি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। মহামতি শীলভদ্র নিজে তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন। নিজের গুণবত্তার ফলে তিনি শীলভদ্রের অতি প্রিয় শিষ্য হইয়া ওঠেন। একদিকে য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ ছিলেন হর্ষবর্দ্ধনের প্রিয় বন্ধু, অপর দিকে ছিলেন শীলভদ্রের প্রিয় শিষ্য। এই উভয় সম্বন্ধের মধ্যে পড়িয়া ইঁহার জ্ঞানচর্চ্চার অনেক সুবিধা হইয়াছিল। শীলভদ্র সর্ব্বতোভাবে য়ুয়ন্-চোয়ঙ্কে বিদ্যা-শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হইতেন। স্বয়ং পাণিনি অধ্যয়ন করিয়া য়ুয়ন্-চোয়ঙ্কে যাবতীয় টীকার সহিত তিনি শিক্ষা দিতেন। শুধু শীলভদ্রই যে য়ুয়ন্-চোয়ঙ্কে শিক্ষা দিতেন, তাহা নহে। হর্ষবর্দ্ধনের গুরু প্রবীণ মিত্রসেনও তাঁহাকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।*

য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ এত জনপ্রিয় ছিলেন যে, কথিত আছে দেশে ফিরিবার সময় অনেকে তাঁহাকে স্থায়ী ভাবে নালন্দায় থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শীলভদ্র নিজেই তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, য়ুয়ন্-চোয়ঙের দেশে ফেরা উচিত, কারণ চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচার তাঁহার উপরই নির্ভর করে। ইহাতে কেহ আর কোন আপত্তি করেন নাই।

য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ দেশে ফিরিবার সময় নালন্দা হইতে বহু পুঁথি পত্রাদি লইয়া এবং অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া যান। প্রতিদানে যথাসাধ্য নালন্দার বর্ণনা লিখিয়া যান। নালন্দার প্রত্যেক জিনিস, আচার, রীতি, ভাষা এবং পর্য্যায়ক্রমে রাজন্যবর্গের দান এবং উপহারের কথা সমস্তই নিখুঁতভাবে তাঁহার বর্ণনায় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন স্থাপত্যশিল্পের, অগণিত বৃহৎ চৈত্য, স্তূপ প্রভৃতির বিবরণ সুন্দর এবং সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার এই অকৃত্রিম প্রতিদানের জন্য ভারতবাসী তাঁহার নিকট ঋণী।

ঈ-চিঙের সময় রাহুলমিত্র নালন্দার মহাস্থবির ছিলেন। রাহুলমিত্রের বয়স তখন মাত্র ত্রিশ বৎসর। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানচন্দ্র এবং রত্নসিংহ ঈ-চিঙের শিক্ষক ছিলেন। দিবাকরমিত্র তথাগতগর্ভ এবং সুমাত্রার

* ইঁহার সংস্কৃত নাম 'প্রকাশমতি'। ইনি প্রায় চতুর্দ্দশবর্ষ ভারতে অতিবাহিত করেন। নালন্দায় থাকিয়া ইনি শিক্ষালাভ করেন। জিনপ্রভের শিক্ষাধীনেও বহুদিন ইনি যাপন করেন। সম্ভবতঃ ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

† হর্ষচরিত্র, পৃঃ ৪৭৪

‡ According to "Memoires Sur les Contrees Occidentals, (Vol III, pp. 15-41)" Hwen Thasang travelled to Rajagriha from Nalanda, but the "Histoire de la Vie de Hwen Thsang (pp. 153—61)", he travelled first at the ancient town of Bimbisara via Bodh-Gaya and Kakkuhapada ; but both translations of the earliest pilgrim agree in taking him to the capital by the former route,

—Journal, Asiatic Society of Bengal, Vol. XLI, pp. 231.

* Mitrasena, pupil of Gunaprabha and Vasubandhu, and Guru of Harsavardhana taught Hiuen Tsang, being ninty years old at that time.

—The Chronology of India by C. Mabel Duff.

শ্রীভোজের শাক্য-কীর্ত্তিও তাঁহাদের সমসাময়িক। তাঁহারাও সময়ে সময়ে ঈ-চিঙ্-কে শিক্ষাদান করিতেন। ঈ-চিঙ্ নালন্দা বিদ্যাপীঠে ১০ বৎসর (৬৭৫-৮৫ খৃঃ) কাল অতিবাহিত করেন। নাট্য-কাব্য 'বেস্সন্তর'-রচয়িতা চন্দ্রও সেই সময়ে নালন্দায় থাকিতেন। এই সময় চে-হং (Tche-hong) নামে আর একজন ভিক্ষু সমুদ্র-পথে ভারতে আসিয়া বহুদিন নালন্দায় অবস্থান করেন।

৬৪০ খৃষ্টাব্দে আর্য্যবর্ম্মা অ-লিয়ে-পো-মোনো (A-li-ye-po-mono) এবং ওই-য়ে (Hoei-ye) নামক দুইজন কোরীয় ছাত্রের আগমনের সংবাদ পাওয়া যায়। উভয়েই নালন্দায় দেহত্যাগ করেন।

তিব্বত হইতে সপ্তম শতকে থন্-মি-প্রমুখ সাত জন রাজ-মন্ত্রী লিখন ও পঠন-পদ্ধতি শিখিবার জন্য নালন্দায় আগমন করেন। আচার্য্য দেববিৎ সিংহের নিকট তাঁহারা শিক্ষালাভ করেন।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উ-কঙ্ (Ou-kong) নামে একজন চীন পরিব্রাজকের বিবরণ পাওয়া যায়। মধ্য-এশিয়া ভ্রমণ করিয়া তিনি ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে গান্ধারে উপস্থিত হন। তথা হইতে ৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশ্মীরে গমন করেন। পুনরায় গান্ধারে গিয়া আবার ৭৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মধ্য-ভারতের পথে অগ্রসর হন এবং কপিলবস্তু, বারাণসী, কুশীনগর এবং শ্রাবস্তী হইয়া নালন্দায় উপস্থিত হন। সেখানে বহুদিন বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া ৭৮৩-৪ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। নালন্দায় অবস্থানকালে তিনি 'ধর্ম্মধাতু' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গমনকালে 'দশভূমি' এবং 'দশবলসূত্র' নামক দুইখানি পুস্তক তিনি সঙ্গে লইয়া যান। য়ুয়ন্-চোয়ঙের ন্যায় তিনিও নালন্দাকে 'না-লন্-তো' বলিয়াছেন।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিব্বতরাজ নালন্দা হইতে আচার্য্য পদ্মসম্ভবকে আনয়ন করেন। তথায় তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের পুরোহিত নিযুক্ত হন। এইজন্য অনেক ঐতিহাসিক তাঁহাকে তিব্বতীয় বৌদ্ধপুরোহিতের প্রবর্ত্তক (Founder of Lamaism) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

খৃষ্টীয় নবম শতকে নালন্দা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। শ্রদ্ধেয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে ইহা বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ছিল না। তিনি বলেন, এই সময় পাল রাজাদের চেষ্টায় দুইটী বিহার নির্ম্মিত হয়—একটী বিহার ওদন্তপুরী আর একটি বিক্রমশিলায়। পাল-বংশের ২য় রাজা ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক ৮০০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমশিলা বিদ্যাপীঠ ও গ্রন্থভাণ্ডার এবং ওদন্তপুরী রাজ গোপাল ওদন্তপুরী বিদ্যাপীঠ নির্ম্মাণ করেন। সম্ভবতঃ বিক্রমশিলা তখন শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া উঠে। নালন্দা, ওদন্ত-পুরী ও বিক্রমশিলার পুঁথিশালা হইতে তিব্বতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি। ওদন্তপুরীর পুঁথিশালা বিহারের মন্দিরেই অবস্থিত এবং নালন্দার পুঁথিশালার চেয়েও বড়। এই চমৎকার পুঁথিশালাটী ১২০২ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জির এক সেনাপতি পুড়াইয়া দেন।*

দশম শতাব্দীতে কি ঈ (Ke-ye) নামক আর একজন চীন-পরিব্রাজক ভারতে আগমন করেন। তাঁহার বিবরণে নালন্দা সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। নালন্দায় অনেক মঠ ছিল এবং তাহাদের দ্বারগুলি সমস্তই পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল এতদ্ব্যতীত রাজগৃহ হইতে নালন্দা বেশী দূর ছিল না, একথাও তিনি বলিয়াছেন—অধিক আর কিছুই বলেন নাই।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে ধর্ম্মদেব নামক ভারতীয় শ্রমণ নালন্দা হইতে চীনে গমন করেন। চীন ভাষায় তাঁহাকে ফা-হিয়ান্ (মতান্তরে ফা-থিয়ান) বলা হয়। চীনদেশে গিয়া ধর্ম্মদেব চীনভাষা উত্তমরূপে শিখিয়া লন এবং তথায় কয়েকটী বৌদ্ধগ্রন্থ চীনভাষায় অনূদিত করেন। সম্ভবতঃ ১০০১ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ধর্ম্মদেবের পর ৯৮৯ খৃষ্টাব্দে আর একজন ভারতীয় ভিক্ষু চীনদেশে গমন করেন। ভারতীয় ভাষায় তাঁহার নাম পাওয়া যায় না, তবে চীন ভাষায় তাঁহাকে পো-তো-কি-তো (Pou-to-ki-to) বলা হয়। দশম শতাব্দীর শেষভাগে সে-হোয়ন্ (Ts'e-hoan) নামক একজন চীন পরিব্রাজক নালন্দায় আগমন করেন। তিনি কোন বিবরণ লিখিয়া যান নাই।

---

* শ্রদ্ধেয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে ওদন্তপুরীর নাম করিয়াছেন তাহা উদণ্ডপুরীর গিরিদুর্গ স্থিত পুঁথিশালা, কারণ মহম্মদ বক্তিয়ারের সেনাপতি যখন উদণ্ডপুরী গিরিদুর্গ আক্রমণ করেন তখন দেখা যায় যে ভিক্ষুরা তাহা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হন। অতঃপর ভিক্ষুদের পরাস্ত করিয়া যখন তাহাদের তাড়াইয়া দেওয়া হয় তখন দেখা গেল যে উহা একটি বিদ্যালয়। মহম্মদের সেনাপতি বিদ্যালয়টি পুড়াইয়া দেন।

মগধ-জয় কালে নালন্দাও যখন বাঙ্গলার পালরাজগণের করতলগত হয়, তখন তাঁহাদের প্রতিপত্তিও ইহাতে খুব বাড়িয়া উঠে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নালন্দা সমতটের পালবংশীয়দের করতলগত ছিল। তখন মহারাজ দেবপাল দেব মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নগরহার(বর্ত্তমান নাম জলালাবাদ) নগরের অধিবাসী ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেবকে তিনি নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত করেন। বীরদেব বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কণিষ্কবিহারে (প্রাচীন পুরুষপুর বর্ত্তমান পেশোয়ার) গমন করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করেন। অতঃপর যশোধর্ম্মপুরে (ঘোষরাঁবা) আগমন করিলে দেবপাল কর্ত্তৃক পূজিত হন। নালন্দায় অবস্থান কালে বীরদেব ইন্দ্রশীলা পর্ব্বতে দুইটী চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। * বীরদেবের পরে নরোতপ নালন্দার অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নরপাল দেবের রাজত্বকালে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নালন্দার সঙ্ঘাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নালন্দায় পালবংশীয় রাজাদের আধিপত্য ছিল খুব বেশী—সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইতিহাসেও তাহার প্রমাণের অভাব হয় না। পালবংশীয় নরপতি মহীপাল দেবের রাজত্বকালে শাক্যাচার্য্য স্থবির সাধুগুপ্তের ব্যয়ে প্রকাশিত নালন্দাবাসী কল্যাণমিত্র চিন্তামণির প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহীপালদেবের রাজত্বকালে তৈলাঢকনিবাসী হরদত্ত পৌত্র এবং গুরুদত্ত পুত্র বালাদিত্য নামক জনৈক ব্যক্তি নালন্দা মহাবিহারের জীর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন। নালন্দায় প্রাপ্ত একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মহাবিহার একবার অগ্নিদাহে কতকটা পুড়িয়া গেলে জ্যাবিষ বালাদিত্য উহার পুনঃ সংস্কার করেন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজির আক্রমণকালে গোবিন্দপালদেব মগধে রাজত্ব করিতেন। তিনিই পালবংশীয় শেষ রাঁজা। তখন গোবিন্দপালের হস্তে কেবলমাত্র নালন্দা, উদণ্ডপুর, বিক্রমশিলা প্রভৃতি কয়েকটী নগর ছিল। মহম্মদ আসিয়া যুদ্ধে গোবিন্দপালকে নিহত করেন এবং তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লন। বক্তিয়ারের অনুচরবর্গ নালন্দাস্থিত বহুমূল্যবান্ পুস্তক পুড়াইয়া ফেলিয়া বিশাল নালন্দা মহাবিহার ধ্বংস করিয়া ফেলে (১১৯৬ খৃষ্টাব্দে)। এই সময়েই নালন্দার গৌরব-রবি অস্তমিত হয়।

নালন্দার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা এখন তিনটী জিনিস বিশেষরূপে দেখিতে পাই—শৌর্য্য, শিল্প এবং শিক্ষাপদ্ধতি। ইহাদের মধ্যে শৌর্য্য ও শিল্পের পরিচয় আমরা যথেষ্টই পাইয়াছি। শিক্ষা-পদ্ধতির পরিচয়েরও কোন অভাব হয় নাই। তবে ছাত্রদের উপর যে সমস্ত কঠোর নিয়ম অর্পিত ছিল তাহা আরও সুন্দর।

নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশকালীন ছাত্রদিগকে প্রথমে দ্বারপালের নিকট পরীক্ষা দিতে হইত। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে নালন্দায় প্রবেশের আশাও ত্যাগ করিতে হইত; সুতরাং শিক্ষার্থী ছাত্রকে সম্যকরূপে শিক্ষিত হইতে হইত। প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে শতকরা বিংশতির অধিক ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারিত না। নালন্দার ছাত্রদিগকে পুঁথির কিরূপ যত্ন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিতে হইত। সমস্ত ছাত্রবৃন্দের নৈতিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখা হইত। প্রতি দিন, সূর্য্যোদয়ের সহিত ঘণ্টাধ্বনি হইলেই ভিক্ষু এবং ছাত্রেরা স্নানে যাইতেন। সে সময় তাঁহাদের এক এক দলে ১০০টী করিয়া ছাত্র থাকিতেন। বড় বড় জলাশয়ে তাঁহাদের নিত্যক্রিয়া সম্পাদিত হইত। পরে তাঁহারা শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং সমস্ত দিন নানারূপ জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতেন। সন্ধ্যার সময় ভিক্ষুগণ একগৃহ হইতে অন্য গৃহে সন্ধ্যা-গীত গায়িয়া বেড়াইতেন।

ছাত্রদের নিকট হইতে কোনরূপ বেতন লওয়া পদ্ধতি নালন্দায় ছিল না। উহার সকল ব্যয় ভার নির্ব্বাহ করিবার জন্য রাজন্যবর্গ নানাভাবে সাহায্য করিতেন। প্রতি ছাত্রের জন্য এখনকার হষ্টেলের ঘরের মত একখানি করিয়া থাকিবার ঘর দেওয়া হইত। প্রতিদিন আহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে জম্বীর ফল, সুপারি, কর্পূর এবং মগধের সুগন্ধযুক্ত তণ্ডুল দেওয়া হইত। যুয়ন্-চোয়ঙ্ বলিয়াছেন, তাঁহার জন্য প্রত্যেক দিন ২২০টী জম্বীর, ২০টী জামফল, ২০ খেজুর, আড়াইতোলা কর্পূর, কিছু মাখম, এক পোয়া তণ্ডুল এবং মাসে তিন রাশি তেল দেওয়া হইত। নালন্দার পুরোহিতগণ কখনও অশ্বোপরি আরোহণ করিতেন না। কাষ্ঠাসনে আসীন হইয়া বাহক দ্বারা নীত হইতেন।

---

* রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ১ম ভাগ পৃঃ ১৮৬

আলোচনা

[শ্রীমনীন্দ্রমোহন বসু এম-এ]

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব
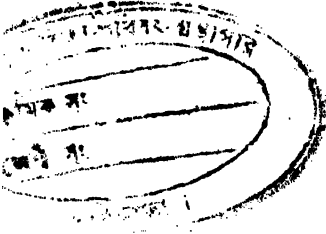
সাহিত্য-পরিষদ হইতে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রকাশিত হইবার পরে ইহার ভাষা ও লিপি-সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে অভিজ্ঞগণ ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত গ্রন্থ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। ইহার অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পরে চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলামূলক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই সময় হইতে এদেশে বৈষ্ণব ইতিহাসের নবযুগ আরম্ভ হইয়াছিল, যাহার প্রভাব বর্ত্তমান কালেও চলিয়া আসিতেছে। আর জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত ইহার প্রাচীন যুগ কথিত হইয়া থাকে। এই দুই যুগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশিষ্টতা দুই প্রকারের ; ইহাদের চিন্তা ধারারও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অতএব ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাতে নিশ্চয়ই ঐ যুগের বিশিষ্টতাজ্ঞাপক ভাবের সমাবেশ রহিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কি না আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

১। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা সাগরের ঘরে পদুমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (৬ পৃঃ দ্রঃ)। এই দুইটী নামই আমাদের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হয়। বসন্তবাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের টীকায় (৪২৪ পৃঃ দ্রঃ) লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মবৈবর্ত্তের উক্তি অনুসারে রাধা বৃষভানু বৈশ্যের পত্নী কলাবতীর বায়ুগর্ভে উৎপন্না হন। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে, কীর্ত্তিদা রাধার জননী। মতান্তরে বৃষভানু মহামায়ার আরাধনা করিয়া যমুনায় কমল বনে একটী মায়াময় ডিম্ব প্রাপ্ত হন এবং সেই ডিম্বেই রাধার উদ্ভব।" রূপগোস্বামী চৈতন্যদেবের জীবিতকালেই বিদগ্ধমাধব ও ললিত মাধব নামক দুইখানি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ললিতমাধবের প্রথম অঙ্কে তিনি রাধার জন্ম-সম্বন্ধীয় এক অদ্ভুত উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রভানু ও বৃষভানু দুই ভাই ; তাঁহাদের দুই পত্নীর গর্ভে প্রথমতঃ চন্দ্রাবলী ও রাধার উদ্ভব হয়। তৎপর মায়া ঐ দুই রমণীর গর্ভ হইতে রাধা ও চন্দ্রাবলীকে আকর্ষণ করিয়া বিন্ধ্য-রমণীর গর্ভে স্থাপন করেন। তথায় তাঁহারা ভূমিষ্ঠ হন। এদিকে দৈবকীর কন্যা মায়া কংসকর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে বলিয়া গেলেন যে পৃথিবীতে দুই তিন দিনের মধ্যে অষ্টনারী প্রকট হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধানা দুই জনের পাণিগ্রহণ যিনি করিবেন, তিনিই কংসকে বিনাশ করিবেন। এই কথা শুনিয়া কংস পুতনাকে ঐ অষ্ট বালিকার অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। পুতনা গোপনে বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে রাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতিকে হরণ করিয়া লইয়া আসে। পথে বিন্ধ্যপুরোহিতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি রাক্ষস-মারণ মন্ত্র জানিতেন। তাঁহার ভয়ে পুতনা কন্যাগণকে —বিদর্ভদেশগামিনী নদীর জলে ফেলিয়া দেয়। ঐ দেশের রাজা ভীষ্মক কন্যাগণকে পাইয়া যত্নের সহিত প্রতিপালন করেন। তৎপর জাম্বুবান তাঁহাদিগকে ভীষ্মকের রাজধানী হইতে আনিয়া বৃন্দাবনে পৌর্ণমাসীর হস্তে অর্পণ করেন। তিনি বৃষভানু প্রভৃতিকে ঐ কন্যাগণকে পালনের জন্য প্রদান করেন, তৎপরে অভিমন্যু, গোবর্দ্ধন মল্ল প্রভৃতির সহিত ইহাদের বিবাহ হয়।

রাধার জন্ম-সম্বন্ধীয় এই যে বিচিত্র উপাখ্যান ও ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কারণ কি ? এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ও হরিবংশ প্রভৃতি বৈষ্ণবদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে রাধার নাম পাওয়া যায় না। যদিও পঞ্চতন্ত্র, গাথা সপ্তসতী, ও জ্ঞানামৃতসার প্রভৃতি গ্রন্থে রাধার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা অতি সংক্ষিপ্ত, তাহাতে রাধার মাতাপিতার নাম-সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। তারপর বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য রাধার উল্লেখ করেন নাই। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নিম্বার্ক তাঁহার দশশ্লোকীতে রাধার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু রাধার নাম বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়া-ছিল, দক্ষিণ ভারতে বল্লভাচার্য্যের দ্বারা, আর বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের দ্বারা। ইহা ষোড়শ শতাব্দীর কথা। তৎপূর্ব্বে জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাধার মাতাপিতার কোন সন্ধান দেন নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনেই আমরা প্রথমতঃ সাগর ও পদুমার নাম পাইতেছি। তৎপর চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মে রাধা স্থায়ীভাবে বৃষভানুর দুহিতা হইয়া গিয়াছেন। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তৎপূর্ব্বে লেখকেরা নিজ নিজ খেয়াল অনুযায়ী রাধার মাতাপিতার নামকরণ ও তাঁহার জন্মের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। এখন চণ্ডীদাসের কথাই আলোচনা করা যাউক। পদাবলীর চণ্ডীদাস সর্ব্বত্রই রাধাকে বৃষভানু-নন্দিনী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই

চণ্ডীদাসই যদি কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত গ্রন্থে রাধাকে সাগরের মেয়ে বলিবেন কেন? একই কবি রাধার বাপের নাম দুই স্থানে দুই প্রকার লিখিবেন, ইহা অবিশ্বাস্ত। অতএব কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি নহে, তাহা সহজেই ধরা পড়ে। ইঁহাদের কে আগে ও কে পরে তাহা নির্ণয় করাও কষ্টকর নহে। চৈতন্যদেবের সময় হইতে রাধা স্থায়ীভাবে বৃষভানুর নন্দিনী হইয়াছেন। ইহার পরে এমন কোন দুঃসাহসিক কবি থাকিতে পারেন কি যে, রাধাকে সাগরের মেয়ে বলিয়া পরিচিত করিতে প্রয়াস পাইতে পারেন? কৃষ্ণকীর্ত্তন গানের বহি, পরস্পরের উত্তর-প্রত্যুত্তরের ধারা লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে। প্রচলিত বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কোন কথা এইরূপ পালাগানে থাকিলে, লোকে সেই কবিকে ক্ষমা করিত কি, না, তাঁহার গান শুনিতে যাইত? অতএব দেখা যাইতেছে যে কৃষ্ণকীর্ত্তন চৈতন্য-পরবর্ত্তী কালে রচিত হয় নাই। ইহা চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী কালের গ্রন্থ, যখন রাধার মাতাপিতার নামকরণ করিবার যথেষ্ট স্বাধীনতা কবিদের ছিল। চৈতন্য-পরবর্ত্তী কালে কিন্তু তাঁহাদের সেই স্বাধীনতা লোপ পাইয়াছে, আজও কবিরা এ বিষয়ে স্বাধীন নহেন।

২। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাধা নিজকে তাঁহার মাতার কানীন কন্যা, বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। "কালিনী মাত্র মোর নাম থুইল রাধা" (৯৬ পৃঃ), এবং "পাছে ডাক দিল কালিনী মাত্র" (২৩২ পৃঃ)। ইহাতে বুঝা যায় যে নিজের জন্ম-সম্বন্ধে রাধা নিজেই সন্দেহবতী। এইরূপ অদ্ভুত সৃষ্টি চৈতন্য-পরবর্ত্তী-যুগে হইতে পারে না, কারণ লাঠি ও ঠেঙ্গার ভয় আছে।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা ও চন্দ্রবলীতে তাঁহারা পৃথক গোপী, এবং কৃষ্ণ-প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী। ললিতমাধবে চন্দ্রাবলী চন্দ্রভানুর কন্যা। বৈষ্ণব-সমাজে রূপ গোস্বামীর কথার একটা মূল্য আছে। কৃষ্ণকীর্ত্তন চৈতন্য-পরবর্ত্তী কালে রচিত হইলে রাধা ও চন্দ্রাবলী তৎকাল প্রচলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পৃথক গোপীতে পরিণত হইত।

৪। ভাগবতে গোপীদের কথা আছে, কিন্তু তাহাদের নামকরণ হয় নাই। গীতগোবিন্দেও রাধার সখীদের ভূমিকা আছে, কিন্তু কাহার কি নাম ছিল সে সম্বন্ধে কবি কিছুই বলেন নাই। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনেও গোপীদের কথা আছে, অথচ নাম নাই। কিন্তু গোস্বামীদের গ্রন্থে সর্ব্বত্রই ইহাদের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ভাগবত হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন পর্য্যন্ত এক যুগ, আর গোস্বামীদের সময় হইতে অন্য যুগের আরম্ভ হইয়াছে। গোস্বামীগণ নানা ভাবে ও নানা ভঙ্গীতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বর্ণনা নিতান্ত একঘেয়ে ও অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। ভাগবতে যে স্রোতের উদ্ভব, চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে তাহার পরিসমাপ্তি। এই যুগে বিস্তৃত ভাবে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিবার জন্য সখীগণের নামকরণের প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম যুগে, তাহা হয় নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, কৃষ্ণকীর্ত্তন চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লক্ষণাক্রান্ত।

৫। কৃষ্ণের আদরের নাম শ্যাম। চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব পদে ইহার পুনঃ পুনঃ, প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, অথচ কৃষ্ণকীর্ত্তনে একবারও এই শব্দটী ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা একটা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

৬। তারপর প্রেম-বর্ণনা। পদাবলীতে দেখা যায় যে রাধা প্রথম হইতেই কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর। আলেখ্য দেখিয়া, দূতীর মুখে শুনিয়া, চাক্ষুষ দেখিয়া তিনি কৃষ্ণের জন্য পাগলিনী হইয়াছিলেন। আর কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের নমুনা দেখুন। কৃষ্ণ রাধার নিকট মহাদান প্রার্থনা করিয়াছেন, আর তাহার উত্তরে রাধা বলিতেছেন—

লাজ না বাসসি তোঞ গোকুল কাহ্ন।
সোদর মাউলানীত সাধ মহাদান॥
জীবার উপায় নাহিঁ বোল মহাদানী।
বাছিআঁ পাইলি সোদর মাউলানী॥ ইত্যাদি ৫০পৃঃ

তখন কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

নহসি মাউলানী রাধা-সম্বন্ধে শালী।
রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী॥
মাউলানী মাউলানী বোলসি তুণ্ডে।
মোর মহাপাতক পড় তোর মুণ্ডে॥ ইত্যাদি ৫১ পৃঃ

তার পর কৃষ্ণ যখন বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, তখন রাধা বলিতেছেন—

যোল শত গোআলিনী জাইএ বিকে হাটে।
মাগু কিলেঁ কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে॥
ছাওআল না দেখ মোরেঁ মাথে যোড়া-চুলে।
মুণ্ডেঁ মুণ্ডেঁ ডসাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা হেলে॥
ইত্যাদি। ৮৫—৬ পৃঃ

ইহাতে কৃষ্ণের প্রতি রাধা যে সম্ভ্রম দেখাইলেন, কৃষ্ণ তাহার প্রতিশোধ নিতে ক্রুটি করেন নাই। একস্থানে তিনি রাধাকে বলিতেছেন—

পামরী ছেনারী নারী হআঁ বড় আছিদরী
আসহন বোলহ সকলে।
তোর ভাল রিত নহে কে তোহোর হেন সহে
দান লৈবোঁ ধরিআঁ আঞ্চলে॥ ৮০ পৃঃ

কৃষ্ণ বলিতেছেন যে রাধা তাঁহার বাঁশী চুরি করিয়াছে, কিন্তু রাধিকা তাহা অস্বীকার করিয়াছেন তখন ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন—

নটকী-গোআলী ছিনারী পামরী
সত্য ভাব নাহি তোরে।
তোঞ নিলী বাঁশী গাইল চণ্ডীদাস
দেবী বাসলীর বরে॥ ৩১৮ পৃঃ

কৃষ্ণকীর্ত্তনের সর্ব্বত্র রাধাকৃষ্ণের এইরূপ কথাকাটাকাটি ও গালাগালি দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্য পরবর্ত্তী যুগের রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলার সহিত যাঁহারা পরিচিত আছে, তাঁহাদের নিকট এই প্রেমের নমুনা অতি উৎকট ও অস্বাভাবিক ঠেকিবেই। চৈতন্যের পরে কোন কবি কৃষ্ণলীলা এইভাবে বর্ণনা করিবার সাহস করিতে পারেন এই ধারণা আমাদের নাই। কাব্য লিখিবার একটা উদ্দেশ্য থাকে; লোকে পড়িয়া ইহার রস আস্বাদন করিবে এবং আদর করিবে এইরূপ বাসনা সকল কবিই পোষণ করেন। চণ্ডীদাসও সেই উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়াছিলেন তাহা ধারণা করা যাইতে পারে। এই পদগুলি আবার গান করিয়া সকলকে শুনান হইত, কারণ বহিখানা সেই রীতিতেই লিখিত হইয়াছে। চৈতন্য-পরবর্ত্তীকালে এই প্রেমলীলার শ্রোতা ও পাঠক মিলিতে পারে কি? অতএব কৃষ্ণকীর্ত্তন চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগে রচিত হয় নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। ইহার প্রত্যেক অণুপরমাণুতে চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের নিদর্শন বর্ত্তমান আছে।

৭। সকল গোপী আসিয়া যশোদার নিকট নালিশ করিলেন যে কৃষ্ণ তাঁদিগকে উৎপীড়ন করেন। শুনিয়া যশোদা কৃষ্ণকে তিরস্কার করিলেন। তখন কৃষ্ণ আত্মদোষ গোপনকরিয়া বলিতেছেন যে, গোপীরাই তাঁহাকে নানাপ্রকারে জ্বালাতন করিয়াছে এবং তাহারাই অপরাধী। যথা—

কেহো ধরে যোড়াচুলে কেহো ধরে হাথে।
দধির পসার তুলিআঁ দেতি মাথে॥
আজর না জাগিব মা বাছা রাখিবারে।
ষোল শত যুবতীএ আহ্মারে বল করে।
যমুনার তীরে গোপীজন লআঁ রঙ্গে।
কেলি কৈল রাধা পরপুরুষের সঙ্গে॥
বুলিতে চাহিলে। আসসী রাধার দোষে।
আগে আসী দোষে রাধা মোরে সেই রোষে॥ ইত্যাদি। ২৬৫পৃঃ

ইহার উপর টীপ্পনী অনাবশ্যক। কৃষ্ণের চিত্রও চণ্ডীদাস অপূর্ব্ব আঁকিয়াছেন। তাঁহার পায়ে মকর খাড়ু, মাথায় যোড়া চুল, তিনি যমুনার কুলে চাঁচরী খেলেন—

পএর মগর খাড়ু মাথে যোড়া চুলে।
চাঁচরী খেলাওঁ মোঞেঁ যমুনার কুলে। ইত্যাদি ৭৯ পৃঃ

আবার তিনি মৃদঙ্গ, করতাল, এবং অন্য বাদ্য বাজান—

খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ।
তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ॥ ইত্যাদি ২৯৩পৃঃ

বংশীধারী নটবর বেশ শ্যামের যে মূর্ত্তির সঙ্গে বর্ত্তমান যুগে আমরা পরিচিত, তাহার সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই। দুই যুগে দুইটি চিত্রে যে বিভিন্নতা থাকে, তাহাই এস্থানে প্রমাণিত হইতেছে।

কৃষ্ণলীলার এইরূপ বর্ণনা থাকাতে অনেকে হয় তো কৃষ্ণকীর্ত্তনকে অবহেলার চ'খে নিরীক্ষণ করিবেন। বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে। চণ্ডীদাসের সময়ে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন নাই, তখন কৃষ্ণলীলার উৎকর্ষও সাধিত হয় নাই। কাজেই সেই সময়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার যে ধারণা সাধারণে প্রচলিত ছিল, চণ্ডীদাস তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। এই জন্য কৃষ্ণ-কীর্ত্তন বাঙ্গলায় সাহিত্য ও ধর্ম্মের ইতিহাসের এক অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। বর্ত্তমানে কৃষ্ণলীলার উন্নত আদর্শের সহিত আমরা পরিচিত আছি বলিয়া, অনেকে হয় তো কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রতি চাহিয়া নাক সিঁটকাইতে পারেন কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে ঐরূপ অমার্জ্জিত অবস্থার মধ্য দিয়া আসিয়াই কৃষ্ণলীলা চৈতন্যযুগে পূর্ণ বিকসিত হইতে পারিয়াছে। জয়দেব ও চণ্ডীদাস যে ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, চৈতন্যদেব তার ওপরে সুদৃশ্য ও মনোহর হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস সর্ব্বদাই বর্ত্তমান বৈষ্ণব-যুগের পূর্ব্বস্তরে বিরাজিত থাকিবেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আধুনিক ছাত্র-সমাজ ও তাহার উন্নতির উপায়

[শ্রীপঞ্চানন দত্ত]

মনুষ্য-সমাজের আশা, ভরসা ও গৌরব, দেশের ধর্ম্ম, সমাজ, অর্থ ও রাষ্ট্রনীতির ভবিষ্যৎ শোধনকর্ত্তা—ছাত্র-সমাজ। দেশকে ধর্ম্মের পথে চালাইতে, সমাজ সংস্কার করিয়া সময়োপযোগী করিতে, কৃষি-বাণিজ্যের প্রসার করিতে, জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুগঠিত করিয়া মুক্তির আলো দেখাইতে বা স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সকল দেশই এই নারায়ণী-সেনার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। কৃষক যেমন ফল-লাভের আশায় মাটী খুঁড়িয়া বীজ বপন ও রোপণ করিয়া সময় মত জল-সেচন করে এবং অঙ্কুর নির্গত হইবার পর ফলোপযোগী করিতে আরও সচেষ্ট হয়, জাতি ও সমাজ তেমনই ভবিষ্যৎকে আরও মধুর ও সুখভোগ্য করিবার জন্য বালকগণের মনে অতি শৈশব হইতে শিক্ষাবারি সেচন করিয়া তাহাদিগকে প্রাণবন্ত ও পত্রপুষ্পে সুশোভিত করিয়া তুলে। সন্তানগণ বৃদ্ধ পিতামাতার যেমন ভরসাস্থল, ছাত্র-সমাজও সেইরূপ দেশ-মাতৃকার একমাত্র আশা-ভরসা-স্থল। কবি সত্যই গায়িয়াছেন—

> "আমরা শক্তি, আমরা বল,
> আমরা ছাত্রদল।"

আমরা অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া বাঙ্গলার আধুনিক ছাত্র-সমাজের অবস্থাই আলোচনা করিব।

শিক্ষার আদর্শ—জ্ঞানে গরিষ্ঠ, দেহে বলিষ্ঠ ও নৈতিক বলে সমুন্নত হওয়া; কিন্তু আধুনিক ছাত্রগণ আজ তাহা হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। ছাত্রগণের না আছে স্বাস্থ্য, না আছে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, না আছে ধর্ম্মপ্রাণতা ও সংযম।

প্রাচীন যুগে সমাজের কল্যাণে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রার প্রণালী বিভিন্নসূত্রে গ্রথিত ছিল। তখন বাঙ্গালী-সমাজে শৃঙ্খলা ছিল, সমাজবাসী উদর পূরিয়া খাইতে পাইত, শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারিত; তাই বাঙ্গলার আকাশ-বাতাস সাধকপ্রবর জয়দেব, রামপ্রসাদ ও মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমময় সঙ্গীতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; তাই প্রতাপাদিত্য, সীতারামের বীরত্ব কাহিনী এখনও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিগোচর হয়, এখনও চাঁদ-সদাগর, কৃষ্ণপান্থীর নাম লোপ পায় নাই।

ইউরোপের অনেক সভ্য-সমাজের বালকগণ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পরই গভর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োজিত চিকিৎসকগণ-কর্ত্তৃক তাহাদের মানসিক বৃত্তি ও মস্তিষ্কের ক্ষমতা সম্বন্ধে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারা পরীক্ষা করিয়া শিক্ষার প্রণালী নির্দ্ধারণ করেন অর্থাৎ কোন ছাত্রকে কিরূপ শিক্ষা দিলে ভবিষ্যতে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ স্ফুরণ হইবে তাহাই স্থির করেন। বিদ্যালয়ে ছাত্র সেইভাবে শিক্ষিত হইবার পর তাহাকে তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্রে স্থাপন করা হয়; ইহাতে তাহার ভবিষ্যৎ-জীবনের উন্নতি অনিবার্য্য। কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে যাঁহারা শিক্ষিতব্য বিষয়ের প্রত্যেক বিভাগে নূতন নূতন সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন সেই হিন্দুরা আজ পাশ্চাত্যের কার্য্য দেখিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া আছে! আপন সত্ত্বা হারাইলে যাহা হয় তাহাই হইয়াছে। বাঙালীকে অতি দীন নিঃস্বভাবে অন্যের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইয়াছে।

বাঙালী ছাত্র-সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় একরূপ উদাসীন। অভিভাবকগণও সন্তানগণের শিক্ষা সম্বন্ধে অবহিত নন। সন্তানগণের মনোবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করাইয়া দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁহারা শিক্ষার উচ্চ আদর্শকে পর্য্যন্ত অত্যন্ত হীন করিয়া ফেলিয়াছেন। কেরাণীর পুত্র কেরাণীর উপযুক্ত বিদ্যা অর্জ্জন করিলেই যথেষ্ট, অর্থাৎ মনিবের সহিত ইংরেজীতে দুটা কথা বলিতে পারিলে, দুই এক কলম লিখিতে পারিলে ও অফিসের কার্য্যের উপযুক্ত অঙ্ক কষিতে পারিলেই হইল ভাবিয়া, পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া থাকেন। অভিজাতসম্প্রদায়ের ধারণা যে পুত্রের নামের শেষে কয়েকটা ইংরেজী অক্ষরযুক্ত পুচ্ছ যোগ থাকিলেই হইল, তাহাতে ভাবী

পুত্রবধূর পিতাকে নাগপাশে দৃঢ়রূপে বন্ধন করা যাইবে।

প্রকৃত রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষিত না হওয়ায় দেশের ছাত্রমণ্ডলীর যে দুরবস্থা হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, উকীল ও ডাক্তাররা বংশধরগণকে নিজ নিজ ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী করিবার জন্য অর্থ-ব্যয়ে কুণ্ঠিত হন না। ছাত্ররাও মুখস্থ বিদ্যার জোরে অভিভাবকের অর্থের বিনিময়ে তকমা আনিয়া উপস্থিত করে, কিন্তু কার্য্যে দক্ষতা দেখাইতে পারে না। জমীদার, পুত্রকে হাকিম করিবার আশায় প্রজার রক্ত-শোষণ করা অর্থে পুত্রের বিদ্যামন্দিরের ব্যয়-ভার বহন করিতে লাগিলেন। সে টাকা খরচ ব্যর্থ হইল না, অল্প দিনেই পুত্র গম্ভীর মেজাজে এজলাস আলো করিয়া বসিলেন; কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই বাহিরের দুষ্ট লোকগুলা আপনাপনি কাণা-ঘুষা করিয়া বদনাম করিতে লাগিল ও বিচারে যে হাকিমের মাথা নাই ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল। দেখা যায়, কোন ব্যক্তি হয় তো ওকালতীতে পশার করিতে না পারিয়া সাহিত্য-চর্চ্চায় মন দিলেন ও অল্প দিনেই সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু পাকা হাতের লেখা দেশবাসী আরও কিছুদিন পাইতে না পাইতে ললাটপটে বিধাতার লেখা মুছিয়া গেল কিংবা একজন কেরাণী চাকুরী করিতে করিতে আপনাপনি ডাক্তারী পুস্তক পড়িয়া বেশ সুচিকিৎসা করিতে লাগি-লেন। অফিসে এমনও দেখা যায় যে, একজন সবল ও দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি টাইপিষ্টের কাজ করিতেছেন কিন্তু টাইপ করা অপেক্ষা মেসিনের যন্ত্রপাতির বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা অধিক। তাহার প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিলে সে উন্নতি করিতে পারিত, অন্যথায় শক্ত আঙুলের চাপে কল ভাঙ্গিতেছে অথচ নিজের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হয় না। এইরূপে বাঙ্গালী ছাত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া শিক্ষালাভ করিয়া পরবর্ত্তী জীবনে কেহই উন্নতি করিতে পারে না। সাংসারিক জীবনে সকলেরই সমান অবস্থা দেখিলে মনে হয়, যদিও ইহারা একই টাকশাল হইতে একই ছাপ লইয়া বাহির হইতেছে Coming from a mint; তথাপি হইতেছে ইহারা কেহ ডাক্তার, কেহ উকীল, কেহ কেরাণী ইত্যাদি।

তাহার পর শিক্ষনীয় বিষয়গুলিতে ছাত্রগণ সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে না, কারণ এত অধিক পাঠ্যপুস্তকের পাষাণপ্রমাণ বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয় যে, দুর্ব্বল বাঙালী সন্তানের বুদ্ধির মাপকাঠিতে তাহা মাপ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। পরীক্ষায় অকৃত-কার্য্য হইবার ভয়ে রাতদিন পরিশ্রম করিয়া শরীর নষ্ট করিয়া শুধু তোতাপাখীর মত পড়া মুখস্থ করা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজারে তাহাই উদ্গীরণ করিয়া অধিক মূল্যে না হয় যেমন-তেমন করিয়া বিক্রীত হইয়া যায়। ইহা কি কম দুঃখের বিষয় যে আট-নয় বৎসরের বালকগণকে বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীতে বিজ্ঞান (Hygiene) শিক্ষা (?) দেওয়া হয়। তাহারা ইহার কিছুই বুঝে না, অনর্থক মুখস্থ করিয়া মেধা নষ্ট করে। এইরূপেও বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। গভর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত সাহিত্য পুস্তকগুলিতে না আছে জাতীয় ভাব, না আছে ধর্ম্মভাব। এ শ্রেণীর পুস্তক পাঠে চরিত্র গঠন কি করিয়া হইতে পারে?

ভাগ্যগুণে যাঁহারা প্রকৃতি ও রুচি অনুযায়ী আপনাদের পথে চলিতে পারিয়া ছাত্র-সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহারা জগতে বরণীয় হইলেও, সেইরূপ ছাত্রের সংখ্যা অনুপাতে অতীব অল্প।

অতঃপর যুবকগণের শিক্ষার প্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়া জাতি হিসাবে শিক্ষার আদর্শকে উচ্চ করিতে হইবে। যাহাতে সাহিত্যে জাতীয় ভাব ও ধর্ম্মভাব বর্ত্তমান থাকে এইরূপ পুস্তক নির্ব্বাচন করা বিশেষ আবশ্যক, কারণ যে সাহিত্যে সে ভাবের অভাব, তাহা সাহিত্য বলিয়াই গণ্য হওয়া উচিত নয়। অভিভাবক-গণ দাসমনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সরকারপক্ষ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা করিয়া পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করুন। শিক্ষা-সম্বন্ধে দেশবাসীর যাহাতে সম্পূর্ণ অধিকার থাকে সেইরূপ দাবীই উপস্থিত করিতে হইবে। এই পথ যদি অনুসৃত না হয় তবে আপনা-দিগকে স্বাবলম্বী হইয়া পথ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

এরূপ করা সময়সাপেক্ষ হইলেও পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। দাসভাব, বিলাসিতা ও বৈদেশিক মোহ ত্যাগ করিয়া নিজেদের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে, নচেৎ ছাত্র-সমাজের তথা দেশের ভবিষ্যৎ আরওগভীর অন্ধকারে আবৃত হইয়া যাইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার ছাত্র-সমাজের স্থান যেরূপ নিয়ে ছিল আজ তাহা অপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন পাশ্চাত্যের মোহজালে তাহারা এতটা আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে আশে-পাশে ও সম্মুখে চাহিয়া দেখিবার তাহাদের অবসর ছিল না। আজ ছাত্রেরা অনেকটা আপনাদের অবস্থা বুঝিবার জন্য অবহিত হইয়াছে; কিন্তু এক কলসী গঙ্গাজলে সামান্য একটু কূপ-জল পড়িলে যেমন নষ্ট হইয়া যায়, তেমনই ছাত্রগণের উদ্যম ও চেষ্টা একমাত্র মানসিক দুর্ব্বলতায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

প্রায়ই দেখা যায়, আজকাল যুবকগণের উদ্যমে গ্রামে গ্রামে, সহরের অলিতে-গলিতে লাইব্রেরী, ক্লাব, দরিদ্র-ভাণ্ডার, সেবা-সমিতি প্রভৃতি অনেকরূপ প্রতিষ্ঠানই স্থাপিত হইতেছে; আবার দেখিতে দেখিতে তাহার নামও লোপ হইয়া যাইতেছে। দেশের মঙ্গল কামনায় এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া যুবকগণ আপনা-আপনি কলহ-বিবাদে মত্ত হইয়া প্রতিষ্ঠান তো নষ্ট করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মধ্যেও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিতেছে, ইহার কারণ মানসিক দুর্ব্বলতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ; তাই ছাত্রগণের মানসিক অবনতির আলোচনার পূর্ব্বেই শারীরিক বিষয় আসিয়া পড়িতেছে। ইহা নিশ্চিত যে শারীরিক দুর্ব্বলতা না থাকিলে মানসিক অবনতি হইতেই পারে না, কারণ শরীর সুস্থ ও সবল হইলে মন দৃঢ় হয় ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য; সুতরাং যাহারা মানসিক দুর্ব্বল তাহারা নিশ্চিতই শারীরিক হীনবল সম্পন্ন। এই দুর্ব্বলতার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মচর্য্যহীনতাই একমাত্র কারণ। অতএব মন দৃঢ় করিতে হইলে শরীর-গঠন আবশ্যক এবং ব্রহ্মচর্য্য পালনেই শরীরের দৃঢ়তা আসে। জগতে জয়ী হইতে হইলে দৃঢ় শরীর ও মনের প্রয়োজন। শুধু অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে শরীর গঠন আবশ্যক তাহা নহে, ভগবৎ আরাধনা—যাহা মনুষ্য মাত্রেরই কাম্য, সেজন্যও শরীর ও মনের দৃঢ়তা প্রয়োজন।

প্রাচ্যের সনাতন প্রথা ব্রহ্মচর্য্য পালন ও শরীর-গঠন, বাঙালীর প্রবৃত্তি ও লালসার তীব্র অগ্নিতে কোন্ দিন পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছে; তাই বাঙালী সন্তান আজ ভগ্ন-স্বাস্থ্য, ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ও হীনচেতা বক্ষ, শক্ত পেশীসম্পন্ন ছাত্র অধুনা দৃষ্টিগোচর হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙালীর ছাত্র স্বাস্থ্য যে কিরূপ হীন, বিগত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টই তাহার প্রমাণ। বাঙালীর জাতীয় ক্রীড়া 'হাডুডুডু', (কপাটী,) লাঠি খেলা এখন দেশের নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যেই আবদ্ধ। ছাত্রগণ সাগর পারের আমদানী ব্যয়বহুল ক্রীড়া 'ফুটবল', 'হকি' প্রভৃতি লইয়া মত্ত। কিন্তু তাহাও মাত্র কয়েক জনের মধ্যে আবদ্ধ; কারণ দর্শকের তুলনায় ক্রীড়কের সংখ্যা কিছু নয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বালকগণ তো 'লুডো', 'ক্যারম্' প্রভৃতি বৈদেশিক অলস ক্রীড়ায় মাতিয়া আছে।

ছাত্রগণের খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই। চা-পান, ধূমপান যেন তাহাদের দোষের মধ্যেই নয়। থিয়েটার,-বায়স্কোপে যাওয়া অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য, হাব-ভাব সাগর পারের আমদানী। সংযমতার নাম ছাত্রেরা একরূপ বিস্মৃতই হইয়াছে।

এই ছাত্র-সমাজকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমেই দেহকে কর্ম্মঠ করা বিশেষ আবশ্যক, নচেৎ উন্নতির সোপানে উন্নীত হওয়া দুরূহ। ব্রহ্মচর্য্য ও ব্যায়ামই তাহার একমাত্র পন্থা।

আজ যে ছাত্রগণের ধৃতি, একাগ্রতা ও স্বাধীন-চিন্তার অভাব দেখা যায় তাহার মূলেও এই সত্য নিহিত। প্রাচীন কালে মুনিঋষিগণ যোগ-সাধনায় চক্ষু মুদিয়া বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন

একাগ্রভাবে কাটাইয়া দিতেন। দীর্ঘ সময়ের আরাধনা শেষেও তাঁহাদের মুখমণ্ডলে শ্রান্তি চিহ্ন দেখা যাইত না বরং পবিত্র আভা ফুটিয়া উঠিত। বালক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ স্কুল হইতে ফিরিবার পথে পাহাড়ের নীচে প্রস্ফুটিত "ডেজী" পুষ্প দেখিয়া মুগ্ধভাবে বসিয়া পড়িতেন, উপরে পাহাড়, নীচে মৃদুল পবনে আন্দোলিত হইয়া পুষ্প মাতামাতি করিতেছে, আকুল ভ্রমর গুণ গুণ করিয়া প্রাণের কথা জানাইয়া পার্শ্বে ঘুরিয়া মরিতেছে—দেখিতে দেখিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। কখন বেলা পড়িয়া সন্ধ্যার আঁধার পাহাড় হইতে নীচে নামিয়া পড়িত খেয়াল থাকিত না। জ্যোৎস্নার শুভ্র আলো আসিয়া ফুল স্পর্শ করিলেই বালক আপনা হইতে ধীরে ধীরে বাড়ী চলিয়া যাইতেন। এরূপ একাগ্রতা, এরূপ স্বাধীন চিন্তা আধুনিক বাঙালী ছাত্রগণের মধ্যে বিরল। তাহারা এক ঘণ্টা চুপ করিয়া একাগ্রভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না। ইহার কারণ, একাগ্রতার অভাব অর্থাৎ লঘু চিত্ততা ও ব্রহ্মচর্য্যহীনতা।

ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিতে ও শরীর গঠন করিতে হইলে ছাত্রগণকে আহারের দিকে বিশেষরূপে অবহিত হইতে হইবে, কারণ ব্রহ্মচর্য্য ও ব্যায়াম করিলেই শরীর গঠিত হয় না। সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিকর আহার্য্যের প্রয়োজন। ঢেঁকি-ছাঁটা চালের ভাত, বলকা দুগ্ধ, গব্যঘৃত, ডাল, আটা প্রভৃতি খাওয়াই বিধেয়, কারণ ঐ সমস্ত আহার্য্যে এবং দুগ্ধে ও ঘৃতে প্রচুর পরিমাণে 'ভাইটামিন্' ও 'প্রোটিন্' থাকায় দেহের পুষ্টিকরণে বিশেষ সাহায্য করে। সময়ের টাটকা শাক-সব্জি ও ফলে যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন্ থাকায় শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী; পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, কেন না পোষাকের তারতম্য অনুসারে মনের গতিও পরিবর্ত্তিত হয়। বিলাসিতা মনে মদ ও লালসা বৃদ্ধি করে; সুতরাং সাধারণ পরিধেয় ব্যবহারই কর্ত্তব্য। সদ্‌চর্চ্চা ও সদ্‌গ্রন্থে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে, অসৎ সঙ্গ একবারেই পরিত্যজ্য। নিদ্রা ছাড়া মনকে সকল সময়ই সৎকার্য্যে ও সদ্‌চর্চ্চায় নিযুক্ত রাখাই উচিত, কারণ অলসভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে মনে কুচিন্তা আসিবার বিশেষ আশঙ্কা।

বাঙালী অভিভাবকগণ যুবক সন্তানগণকে এ সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দিতে একেবারেই উদাসীন; ইহাতে যুবকদিগের যে যথেষ্টই অপকার হয়, তাহা কি আর বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতরূপে দৈনন্দিন প্রার্থনার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যে হিন্দু ধর্ম্মগতপ্রাণ ছিল, ধর্ম্মই যাহাদের মেরুদণ্ড তাহারা আজ সে কথা বিস্মৃত। দিনান্তে একটীবারও তাহাদের মনে হয় না—যাঁহার অসীম করুণায় তাহাদের মানব-জন্ম গ্রহণ তাঁহাকে একবার ডাকি। দুঃখের বিষয়, ঈশ্বর আরাধনা, যাহা হিন্দুর আহার-নিদ্রার মতই কার্য্য ছিল, যে কথা হিন্দু-মাত্রেই জানিত, সেই কথা আজ সাগরপারের কবির মুখ হইতে এপারে ধ্বনিত হইতেছে—"If knowing God we lift not hands in prayer, What are men bteter than beasts and goats!"

ছাত্র-সমাজকে উন্নত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে পিতা-মাতাকে অবহিত হইতে হইবে। তাঁহারাই যদি হীন আদর্শ সন্তানগণের সম্মুখে ধরেন, হীন স্বার্থ ও ভোগের পথভ্রষ্টা হন, তাহা হইলে জাতি-গঠন করিবার কোন উপায়ই নাই। শিশুগণের পালন ও প্রাথমিক শিক্ষার ভার যে জনক-জননীর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তাহা সর্ব্বদেশের মনীষিরা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা সন্তানগণকে সুস্থ ও সবল করিতে এবং উচ্চ আদর্শে চালাইতে বদ্ধপরিকর হইলে আর দুঃখের কারণ থাকিবে না।

পাগল হরনাথ ঠাকুর

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী এল্-এ-এম্-এস্]

পাগল হরনাথ ঠাকুরের নাম এখন বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই পরিচিত। শুধু বাঙ্গালা নহে, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানেও ইঁহার অনুরক্ত ভক্তমণ্ডলীর অভাব নাই। নাম ও প্রেমধর্ম্মের উজ্জ্বল পতাকা হস্তে লইয়া যে পাগল হরনাথ বহু স্থানের অধিবাসীদিগকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই পবিত্র জীবনকথা নিম্নে প্রদান করিলাম।

১২৭২ সালের ১৮ই আষাঢ় বাঁকুড়া জেলার সোণামুখী গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভগবতী দেবী।

পাগল হরনাথ ঠাকুর

জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি কলিকাতায় গালার কারবার করিতেন। সেই কারবারে তাঁহার প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন হইত, তিনি সেই অর্থ হইতে সোণামুখীতে একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

হরনাথকে লইয়া জয়রামের চারিটী পুত্র। তন্মধ্যে সারদাপ্রসাদ ও কন্দর্পনারায়ণ নামক দুইপুত্র হরনাথের জন্মের কিছুকাল পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, তৃতীয় পুত্র শিবনাথ মাত্র বর্ত্তমান। হরনাথের জন্মের পর তাঁহার পিতা হরনাথের একখানি কোষ্ঠী প্রস্তুত করান। ঐ কোষ্ঠীর ফলে জানা যায়, এই বালকের রাজযোগ ও সন্ন্যাসীযোগ; ভক্তিযোগ প্রবল, কর্ম্মবহুল; নানাবিভূতিলাভ ও বহুলসেবকযুক্ত, উদারমতাবলম্বী, বৈষ্ণব-উপাসক। বালকভাব। মিথুন

পাগল হরনাথ ঠাকুর (কাশ্মীরে গৃহীত)

১৮৮৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে বর্দ্ধমান রাজ-কলেজ হইতে ১৮৮৭ সালে First Arts (এল-এ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেট্রপলিটন (Metropolitan) কলেজে বি-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার আর সাংসারিক কোন বন্ধনই ভাল লাগিতেছিল না।

এখানে একটা কথা বলা দরকার, হরনাথের বয়স যখন ১৪ বৎসর, সেই সময় সোণামুখী গ্রামের নিমতলা পল্লীর কন্দর্পসুন্দরের কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

এই সময় তাঁহার সকল জিনিসেই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। যেখানে হরি-কথা হয়, নাম সঙ্কীর্ত্তন হয়, হরিনামের উচ্চরোলে যে স্থান মাতিয়া উঠে, হরনাথ সেই স্থানে গমন করিয়া আত্ম-বিহ্বল হইয়া যান। কোন মৃতদেহ সৎকার করিতে লইয়া যাইতে দেখিলে, তিনি আপন মনে বলিতেন, "যা'কে আমরা জন্ম-মৃত্যু বলি, সে কেবলমাত্র দেহ-পরিবর্ত্তন, একটা একটা দেহ জীর্ণ হইলেই আবার একটা নূতন দেহ ধারণ করে; কাপড় ছাড়িয়া অন্য কাপড় পরে বলিয়াই মনে হয়। মৃত্যুর সময় ঠিক করা কার সাধ্য? উপরের পোষাকটী খুব ভাল মনে হ'লেও ভিতরে ভিতরে জীর্ণ হয়, তখন লোকে মনে করে হঠাৎ মারা গেল, কিন্তু তা' নয়। একটা একটা Sceneএ আমরা Play করিতে বাহির হই; জন্ম মৃত্যু এইরূপই মনে হয়।" তা'র পরক্ষণেই আবার আপনা আপনি বলিতেন—"এ সকল কথা ভাবিবার বা জিজ্ঞাসা করিবার কোনও কারণ দেখি না। যা'র থিয়েটার, সে এ সকল ঠিক করিয়াই রাখিয়াছে। এক পোষাক গেলে আবার কি পোষাক পরিতে হ'বে Actorকে তা ভাবতে হয় না। উপযুক্ত পোষাক—যাঁর এ রঙ্গমঞ্চ, তিনিই ঠিক

ও কন্যারাশি বা লগ্নের জাত ব্যক্তি ইঁহা দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হইবে। ইনি নূতন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক নহেন, কিন্তু পুরাতন ভাবকে নবজীবন প্রদান করিবেন। কোষ্ঠীর ফল জানিয়া জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় অপার আনন্দ লাভ করেন; কিন্তু বেশী দিন তাঁহাকে এ আনন্দ ভোগ করিতে হইল না, হরনাথের যখন দুই বৎসর বয়স, সেই সময় ১২৭৫ সালের পৌষমাসে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

পঞ্চম বর্ষে হরনাথের হাতেখড়ি হয়। প্রথমতঃ গ্রাম্য পাঠশালায়, তাহার পর সোণামুখীর স্কুল হইতে ১৮৮০ সালে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিষ্ণুপুরের নিকট কুচিয়াকোলের রাধাবল্লভ ইনষ্টিটিউসন হইতে

করিয়া রাখিয়াছেন।”

হরনাথের আর পড়াশুনায় মন বসিল না। আধ্যাত্মিক চিন্তাতেই তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ১৮৮৯ সালে যে বৎসর তিনি প্রথম বি-এ পরীক্ষা দেন, সেই বৎসর তাঁহার প্রথম পুত্র অনুকুলচন্দ্রের জন্ম হয়। এই শুভ সংবাদ যখন তাঁহার নিকট পৌছিল, তখন তিনি একেবারে যেন উদাসীন। প্রথমবার বি-এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে তাঁহাকে পুনরায় পড়িবার জন্য তাঁহার মাতাঠাকুরাণী অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধে ১৮৮৯, ৯০ ও ৯২ অব্দে তিনি তিন তিনবার বি-এ, পরীক্ষা দিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন তাঁহার জননী আর তাঁহাকে কিছু বলিলেন না। হরনাথ তখন দেশে আসিয়া বসিয়া থাকেন। শিবনাথের কিন্তু ইহা আদৌ ভাল লাগে না। শিবনাথ একদিন হরনাথকে যথেষ্ঠ তিরস্কার করেন। ফলে হরনাথ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিকট অযোধ্যা নামক স্থানের একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ছয় মাস উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর ১৯০৩ খৃঃ অব্দে ভূস্বর্গ কাশ্মীর ষ্টেটের ধর্ম্মার্থ অফিসের অধ্যক্ষের পদ পাইয়া তিনি কাশ্মীরে গমন করেন। এই কাশ্মীর হইতেই তাঁহার বিকাসের সূচনা হয়। কাশ্মীরে থাকিতে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে রাওলপিণ্ডিতে আসিতে হইত। রাওলপিণ্ডিতে একটী কালীবাড়ী ছিল, তাঁহার সেবক ছিলেন কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। ইনি ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী হন। ইহার পর হাতরাসের হেডবুকিংক্লার্ক অটলবিহারী নন্দী মহাশয় পাগল হরনাথের বহু অলৌকিক ঘটনা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। অটলবিহারী নন্দী মহাশয় সেই সকল ঘটনা মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ-সম্পাদিত “হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে” ধারাবাহিক বাহির করেন। স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ও বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। চুঁচুড়ার নন্দলাল পাল মহাশয় উক্ত পত্রিকায় সেই সংবাদ পাঠ করিয়া পাগল হরনাথ ঠাকুরকে কাশ্মীর হইতে কয়েক দিনের জন্য চুঁচুড়ায় লইয়া আসেন। কলিকাতা টালানিবাসী শ্রীযুত ভাগবতচন্দ্র মিত্র ও আলিপুরের উকীল শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ সেই সময় চুঁচুড়া গিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন ও অনেকের মধ্যে তাঁহার অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ করেন।

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে এমনই করিয়া পাগল হরনাথকে সকলে চিনিতে আরম্ভ করিলেন। পাগল হরনাথের বহু অলৌকিক ঘটনার কথা আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব কবিরাজ শ্রীযুত সত্যচরণ সেন-প্রণীত “হরনাথ চরিতামৃত,” নামক পুস্তকে বাহির হইয়াছে। পুঁথি বাড়িয়া যাইবে বলিয়া কোন অলৌকিক ঘটনার বিষয় এখানে প্রদান করিলাম না।

পাগল হরনাথ ঠাকুর ভক্তবৃন্দকে যে সকল পত্র লিখিতেন, সেই সকল পত্রের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, সেইরূপ সকল পত্রই ধর্ম্মমূলক উপদেশে পূর্ণ। তিনি ভক্তবৃন্দকে যে সকল পত্র লিখিতেন, সেই সকল পত্র “শ্রীহরনাথ ঠাকুরের পাগলামী অর্থাৎ শ্রীমদ্ হরনাথ ঠাকুরের উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী” এই নামে অটলবিহারী নন্দী মহাশয় ৪২০ চৈতন্যাব্দে (১৯০৫ খৃঃ) শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে প্রথম প্রকাশিত করেন; প্রথম পুস্তকে মাত্র ৩৪ খানি পত্র থাকে। ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইত। তাহার পর নন্দী মহাশয় উহার ২য় খণ্ড বাহির করেন এবং ২য় খণ্ডে নামটী পরিবর্ত্তিত করিয়া “পাগল হরনাথ” এই সংক্ষিপ্ত নাম দেন। ৪২২ চৈতন্যাব্দে (১৯০৭ সালে) ২য় খণ্ড বাহির হইয়াছিল। এক্ষণে এই পত্রাবলীর ১ম ও ২য় খণ্ড ৫ম সং, ৩য়খণ্ড ২য় সং এবং ৪র্থ খণ্ডের বহু সংস্করণ হইয়াছে। এই সকল পত্রাবলী ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। পত্রাবলীর সার সঙ্কলন করিয়া “উপদেশামৃত” নামক অপূর্ব্ব পুস্তক বাহির হইয়াছে। সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম জীবনেই ধর্ম্ম সঞ্চয়ের ব্যবস্থা কর—ইহাই ছিল পাগল হরনাথের একমাত্র উপদেশ। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম “ভেদ বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সকলকেই আপন করিতে চেষ্টা কর এবং কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হও। শুচি অশুচি মনে করিবার কোন কারণ নাই, যদি থাকে, তবে কৃষ্ণ নামের স্পর্শে তাহাও শুচিতম হইয়া যাইবে।” পাগল হরনাথের প্রত্যেক পত্র বহু অমূল্য উপদেশে পূর্ণ একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই সকল পত্রের কিঞ্চিৎ এখানে উল্লেখ করিব। তিনি বহু ভক্তকেই লিখিয়াছেন এবং আমাকেও

লিখিয়াছেন—"স্ত্রীকে খেলিবার জন্য সহযোগিনী মনে করিয়া ইহ-পরকালের সকল শক্তি হারান কোন রকমে উচিত নহে। স্ত্রীকে ইহ-পরকালের প্রধান সঙ্গিনী মনে করিতে হয়, সামান্য পার্থিব খেলার সঙ্গিনী স্ত্রী নন্। তাঁকে চিরসঙ্গিনী মনে করিয়া তাহারমত ব্যবহার করা উচিত। তাঁকে তাঁর উপযুক্ত মান্য দিয়া সকল অবস্থায় সহযোগিনী করা কর্ত্তব্য। তাঁদের গুণগুলি লইয়া নিজের গুণ তাঁহাদিগকে দিতে হয়; এই রকম আদান-প্রদানে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া ক্রমে দু'টিতে একটি হইতে হয়। তাহাতেই আনন্দ, তাহাতেই মজা। যদি ভাল বাসিয়াছ, যাহাতে দুদিনে সে ভালবাসা ভুলিতে না হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। নিকৃষ্ট কামের বশবর্ত্তী হইয়া চির-সুখ বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নয়। তাঁদের উপযুক্ত মান্য করিবে। তাঁরাই গৃহলক্ষ্মী ও মূলশক্তি বলিয়া মনে করিবে। জগতের স্ত্রীমাত্রেরই উপযুক্ত মান্য করিবে। কুকুর বিড়ালের স্ত্রীকেও সেই মহাশক্তি মনে করিয়া মান্য করিবে। তাঁহাদের মর্য্যাদার অতিক্রম করিবে না। তাঁরাই বল দিবার ও হরিবার একমাত্র মালিক।

স্বর্গীয় অটলবিহারী নন্দী

স্ত্রী আদরের ও ভালবাসার ধন। অনেক কর্ম্মে শক্তি নাই বলিয়া তাঁর সাহায্যে সশক্তি হইয়া এ জগতে কার্য্য করিতে পারি বলিয়াই তাঁর নাম শক্তি। তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে সহায়তা করেন বলিয়াই তাঁর নাম সহধর্ম্মিণী, আমাদের সন্তাকে গর্ভে ধারণ করেন বলিয়া তাঁর নাম জায়া। বিলাসের দ্রব্য নন। স্ত্রীগণই জগজ্জীবন; তাঁরাই প্রেম ভক্তির আধার। আবার অসদ্ব্যবহার করিলে তাঁরই ঘোর কালরূপিনী পিশাচী ও রাক্ষসী হইয়া সকলকে গ্রাস করেন্। বেশ্যাগণ সেই কালান্তক মূর্ত্তির সামান্য ছবি মাত্র। হিন্দু রমণীকে বিবি না সাজাইয়া গরীবের মা বাপ সাজাইবার চেষ্টা করিও। তা' না হ'লে সুখ নাই, লাভের মধ্যে বিস্তর কলঙ্ক ও বিপদ আছে। আদর্শ যুগল হইয়া আদর্শ যুগলকে ভজনা করিবে।"

পাগল হরনাথ লিখিয়াছেন—"মাকে রক্তমাংসের শরীরধারী কৃষ্ণ মনে করা সকলের কর্ত্তব্য। যে মা এই শরীর ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিয়াছেন, তাঁকেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিবে মা তো আর ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কিসে? তিনি জগৎ ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিতেছেন, মাও তেমনি এই শরীরের সম্বন্ধে; তবে মা আমাদের পক্ষে

কেন ঈশ্বর হইবেন না? আর একটী কথা—আমি যে দেব মূর্ত্তিটী পূজা করি, সেইটিকে মান্য করিয়া অন্যের পূজিত দেব মূর্ত্তিটীকে যদি ঘৃণা বা অবমাননা করি, তাহা হইলে পাপ হয় কি না বল দেখি? সেই রকম কেবল নিজের মাকে দেবী মনে করিয়া অন্যের মাকে যদি অবমাননা করি, তাহা হইলে মহৎ পাপের সঞ্চার করা হয়; তাই বলি নিজের মা'র মত সকলের মাকেই দেখিবে। কুকুর বিড়াল মনে করিয়া তাহাদের মা দিকেও ঘৃণা করিও না।"

পাগল হরনাথ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী

যে মা হৃদয়ের রক্ত দিয়া তোমাকে পালন করিতেছেন, তোমার কর্ত্তব্য সেই মাকে হৃদয়ের প্রেমভক্তি দিয়া সেবা করা। মা অপেক্ষা পরম দেবতা আর নাই। ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেবতাই মায়ের শরীরে বর্ত্তমান মনে করিও। পিতামাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতে হয়, তবে সেই দয়াময় হরির দয়া পাওয়া যায়।" আবার কোন ভক্তকে লিখিয়াছেন—"পিতামাতার শ্রীচরণতল অপেক্ষা মহাতীর্থ আর নাই। অতএব মাতৃচরণ আশ্রয় ক'রে থাক; সমস্ত তীর্থই ঘরে বসে দর্শন করিতে পারিবে। একবার "পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গঃ" ইত্যাদি কথা কয়টি মনে ক'রে দেখিলেই একথা বুঝিতে পারিবে। তাঁদের চরণোদক নিত্য পান করিয়া সর্ব্বতীর্থ স্নানের ফল ঘরে বসে লইতে ভুলিও না; ঐ চরণ-ধৌত জলই ভবরোগ নিবারণ করিয়া কৃষ্ণভক্তির উদয় করিবে—এ'টি মনে প্রাণে এক করিয়া জানিও, ইহাতে যেন কোন রকম সন্দেহ না আসে।"

আবার কোন ভক্তকে লিখিয়াছেন—"নাম অপেক্ষা মহামন্ত্র ও মহা ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। নামে আর কৃষ্ণতে কোন প্রভেদ নাই। কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ নাম পাপীর পক্ষে বেশী আদরের ধন, কেন না পাপীর নিকট কৃষ্ণ যান না, কিন্তু পাপী কৃষ্ণ নামটি ইচ্ছা করিলেই লইতে পারে এবং কৃষ্ণ নাম লইলেই কৃষ্ণও পাইতে পারে; তাই বলি আমাদের কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ নামটি বেশী আদরের ধন ম করিতে হইবে। কৃষ্ণকে বরং ভুলিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন কৃষ্ণ নামটি ভুলিও না। নাম করিতে করিতে প্রেম, আর প্রেমের ফলস্বরূপ কৃষ্ণকে পাইবে।" আমি যখন প্রথম চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্রতী হই তখন পাগল হরনাথ আমাকে লেখেন যে, "ভাই, রোগীর রোগ নিবারণের ইচ্ছা সর্ব্বদা প্রাণে জাগাইয়া রাখিবে। অর্থের দিকেই কেবল দৃষ্টি করিও না, তা'তে কবিরাজ না হ'য়ে নৃশংস কষায়ের মত হৃদয় হয়ে পড়ে। জীবন রক্ষার জন্য অর্থ লইবে, তবে অর্থ নিয়ে সর্ব্বদা রোগীর বিষয় চিন্তা করিবে। সকল কর্ম্মে প্রথমে প্রভুর নাম স্মরণ করিবে। প্রভু কর্ত্তা, মানুষ নিমিত্ত মাত্র মনে ক'রে সকল কাজ করিবে।" তাঁহার সকল পত্রই এইরূপ অসংখ্য উপদেশে পূর্ণ।

পাগল হরনাথ যখন কাশ্মীরে সেই সময় তিনি সেখান হইতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীমতী কুসুমকুমারা দেবীকে যে সকল পত্র লিখিতেন তাহাতেও কৃষ্ণকথাই অধিক থাকিত। তাঁহার সেই সকল পত্র "পত্রাবলী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে কিরূপভাবের পত্র লিখিতেন তাহার একটু নমুনা দেখুন—

প্রাণ প্রিয়তমে—

"অনেক দিন তোমাদের পত্র পাই না, কিন্তু নিত্য নিত্য খবর পাই। নানাভাবে নূতন নূতন সাজে

পাগল হরনাথ ঠাকুর (বোম্বাইয়ে গৃহীত)

তো বড়র কথাই বলি, বড়তে হাত দেওয়াই উচিত। দেখ তোমাদের কৃষ্ণ মথুরাতে আর বৃন্দাবনে, তফাৎ অতি সামান্য তবে কেন নিকটে রাখিতে পারিতেন না। এই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ। কই কেহই তো সঙ্গে রাখেন নাই কেন জান কি, কেবল কাঁদিবার জন্য। কেবল সেই অপরূপ রূপরাশি নির্জ্জনে একমনে ধ্যান করিয়া আত্মহারা হইবার জন্য, দ্বারকাতে কি মথুরাতে কৃষ্ণের প্রেয়সীর তো অভাব থাকে নাই, তবে কেন কাঁদিতেন, এইটীই ভাবিবে। ভাবিতে ভাবিতেই জীব শিব হয়, ভাবিতে ভাবিতেই তোমাদের কালা গৌরাঙ্গ হ'ল, ভাবিতে ভাবিতেই শিব গোপীশ্বর হইলেন, ভাবিতে ভাবিতে ছয় মঞ্জরী ছয় গোপেশ্বর হইলেন। তাই বলি, প্রাণের পুতলি আমার, আমরা পরস্পরকে ভাবিতে ভাবিতে একদিন তুমি আমি, আর আমি তুমি হইলেও

সাজিয়া কেমন তোমরা নিত্য নূতন খেলা কর দেখিয়া কত আনন্দিত হই—তা' আমিই জানি আর সেই জানে। চক্ষের দেখা অপেক্ষা এ দেখা যে কতগুণে ভাল, তা' এক মুখে বলা যায় না। চক্ষে দেখা নিস্কাম। এই দেখা দেখিবার জন্যই তো কৃষ্ণের মথুরায় গমন, এই সুখ পাইবার জন্যই তো কৃষ্ণের গৌরাঙ্গ রূপ ধারণ। নিকটে থাকিলে যাহাকে কাম বলিয়া থাকি, দূরে সেই বিষয়ই অজ্ঞাত হইয়া প্রেম নাম ধারণ করে। তাই তো মথুরায় কৃষ্ণ গমন করিলে শ্রীমতীর চক্ষে জল, তাইতো আমার গৌরাঙ্গের নেত্রবারির বিরাম নাই।—কা'র কথা বলিব, বলি

হইতে পারি।"

আর এক পত্রে তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে লিখিয়াছেন—

"তোমার কথা বুঝিলাম, কি করিব হাত নাই। যাহার কেহ নাই কৃষ্ণ তাহারই, এ কথা বেদে পুরাণে বলিয়াছেন সেই সাহস, অন্য কেহ নাই, ভরসাও নাই। দেখ ভাই, স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, মা, বাপ, এ সব সম্বন্ধ দু'দিনের জন্য। যাহার সঙ্গে, যে কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের নিত্য ও চির সম্বন্ধ তিনি আমাদের নিকট হইতে কত দূরে আছেন। কিন্তু ভাই, কি আশ্চর্য্য, তোমার জন্য আমি যত কাতর হইতেছি

সেই প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণের জন্য হয় তো তাহার শতাংশের এক অংশও অস্থির হই না। কিন্তু ভাই, তিনি আমাদের সামান্য দুঃখ দেখিলেই হয় তো একেবারে আকুল হইয়া পড়িতেছেন। আমরা এমনি মূর্খ ও অপবিত্র যে আমরা তাঁহার জন্য না ভাবিয়া খেলাঘরের সাজান পুতুলের জন্য সর্ব্বদাই অস্থির ও চঞ্চল। জানি না কবে এ ভবের ঘোর ও নেশা ছুটিবে; কবে বুঝিব এ ভোজবাজীর খেলা, কবে প্রাণ বলিবে সব মিথ্যা, কৃষ্ণ সত্য। কবে জানিব সব পর, কৃষ্ণ আপন। .... যেন শীঘ্রই আমার সে দিন আসে।"

তাঁহার সকল পত্রই এরূপ ভাবে কৃষ্ণকথায় পূর্ণ থাকিত।

ঠাকুর হরনাথ সংসার-রহস্য বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন—"এই পৃথিবীর কটা দিন পথিকের পান্থশালায় রাত্রি বাসের মত কোন রকমে কাটাইয়া পুনরায় গমনের জন্য সবল হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু যাহারা সামান্য সামান্য কারণে বিবাদ-বিসম্বাদ করিয়া রাত্রিটুকু কাটায় তাহারা উভয়পক্ষেই ঠকে মাত্র; না বিশ্রাম করিতে পারে, না ক্লান্তি দূর করে, না দ্বিতীয়বার গমনের জন্য সবল হইতে পারে।"

জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন—"জন্ম-মৃত্যু দুইটী একই জিনিস, আমরা না জেনে কেবল মৃত্যুর আতঙ্কে দিনে সাতবার করে মরে যাই। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে জন্মেও যেমন আনন্দ করা উচিত, মরণেও তাই করা উচিত। জন্ম-মৃত্যু একই জিনিস, কোন পার্থক্য নাই. আমরা কেবল-মাত্র সংস্কার দোষে ভয় পাই। মৃত্যুর জন্যই জন্ম হইয়া থাকে। জীব চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইলে কোন না কোন শরীর ধারণ ক'রে একবার বিশ্রাম ক'রে লয় মাত্র। অতএব আমরা যাহাকে জীবন বলি সত্য সম্বন্ধে তাহাই প্রকৃত জীবন নয়, মৃত্যুর পরই আমাদের নব জীবন আসে, তখন আমরা নিজের পায়ে চলিতে থাকি। জেল হইতে খালাস পাওয়ার মত আমাদের এক এক শরীর ত্যাগ হয়। জেল খাটিবার সময় সব কয়েদীদের সঙ্গে আলাপ হয়, তখন একজন খালাস হ'লে অন্য কয়েদীগণ যেমন দুঃখ ক'রে, কিছুদিন পরে আবার ভুলিয়া যায়, আবার নূতন সঙ্গী মিলে, তেমনই আমরা যে যায়, তা'র জন্য দুঃখ করি, আবার ভুলে যাই।"

বার্দ্ধক্যে পাগল হরনাথ ঠাকুর

পাপপুণ্য সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন—যাহারা পাপকে পাপ জানিয়া করে তাহারা কৃষ্ণের নিকট ক্ষমা পায়, কিন্তু যাহারা প্রভুর নাম লইয়া, ধর্ম্মের ভাণ করিয়া পাপ করে তাহাদের উদ্ধার কোথায়? গত কর্ম্ম ভুলিয়া যাও, তার জন্য দুঃখ করিও না। পাপীগণ যে দিন কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হয়, সেই দিন হইতে তাহাদের পূর্ব্ব পাপ ধ্বংস হইয়া নবজীবন হয়। পাপ পুণ্য ততক্ষণই জীবকে ভয় দেখাইতে পারে যতক্ষণ তাহারা এই অমোঘ অস্ত্র-নামের আশ্রয় না লয়। নামের মত নিরাপদ ও সুদৃঢ় আশ্রয়স্থল, ত্রিতাপজড়িত জীবের নিকট আর দ্বিতীয় নাই। মুখ লুকাইবার কাজে হাত দিও না। যে কাজটী করা হ'লে, পরে চিন্তা করিলে মন

"বিকৃত দত্তা"

(গল্প)

[শ্রীনুটবিহারী মজুমদার বি-এল]

(১)

ভূমিকা

জায়গাটার নাম ভুলে গেছি, সে আজ অনেকদিনের কথা, মাত্র এইটুকু মনে আছে যে সেটা এক অজ পাড়াগাঁ। এমন মাঝে মাঝে যাই তাই সেবারেও গেছলুম। যে ঘরটীতে শু'তে জায়গা পেলুম, সেটা এক রিহার্স্যাল ঘর। মাটীর ঘর হ'লেও বেশ তরতরে, মেঝেতে ঘরজোড়া চ্যাটাই,এককোণে একটা পুরোণো কাঠাম' বোধ হয় কোন প্রতিমারই হ'বে, মাটীর নামগন্ধ নেই, শুধু বাখারিতে খড় জড়ান', তাও মুণ্ডুর জায়গাটা খালি—আর এককোণে দুটো তিনটে তেলচকচকে হুঁকা—দেখলেই বোঝা যায় দিন দুবেলা এদের মাথায় আগুন জ্বলে। ঘরে ঢুকেই চোখে পড়ে একটা উইএর ছবি ফ্রেমে বাঁধান। অবশ্য এককালে বোধ হয় উই ছিল না,—সরস্বতীই ছিল,কেন না বীণার কাণগুলা নজর করলে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। সামনের দাওয়ায় বোধ হয় এককালে পাঠশালা বসত, একটা ভাঙ্গা কাঠের বোর্ড এক বোঝা ধূলা বুকে নিয়ে বারান্দার একদিকে পড়ে রয়েছে।

সন্ধ্যা হয় হয়, মশার জ্বালায় সবেমাত্র কোঁচাটী খুলে বেশ ক'রে গায়ে জড়াচ্ছি, দেখি লণ্ঠন হাতে গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সব একে একে এসে জমতে লাগল'। আসছে বছর "দুর্দ্দান্ত সিংহ" প্লে হবে তাই 'রিহাচ্চ্যালটা'এ বছর থেকেই দিতে হ'বে? পঞ্চুই তাদের মধ্যে বিদ্বান্ অর্থাৎ ম্যাট্রিক ফেল, বয়স আন্দাজ ২০।২১। পাশের বুড়ার হাত থেকে হুঁকাটা তুলে নিয়ে আমার দিকে ফিরে ব'ল্লে—হাঁ দাদা, বি এ, এম্-এ তো পাস করেছ! শরৎ বাঁড়ুর্য্যের 'দত্তা' বলে কি একখানা ভাল্ বই আছে না কি শুনেছি—সেটা কেমন! জানাটানা আছে কিছু? না আদার ব্যাপারী"—ব'লে নিজের রসিকতায় নিজেই খানিকটা হেসে নিল? উত্তরে বল্লুম—জানি।

পঞ্চু—আরে জান তো? কেমন, প্লে জমে বলতে পার?

বল্লুম—হ্যাঁ, বেশ হয়, খাসা বই তবে সেটা তো নাটক নয়, উপন্যাস, নইলে……

পঞ্চু হুঁকাটা পাশের ছোকরাটার হাতে দিয়ে ঠোঁঠ উল্‌টে ব'ল্লে—আরে লাও কথা, ও উপন্যাস নাটক একই—যদি প্লে জমান যায়, ওতে কিছু এসে যাবে না। এই তো সেবার বর্দ্ধমানে মেরে দিয়ে এলুম, আর তেমন হয় তো উমাপদ ডাক্তারকে দিয়ে নাটক বানিয়ে নে'ব্। বলি আছে তোমার কাছে এক খানা? দিতে পার?" বল্লুম—কাছে নেই, তবে…

পঞ্চু বল্লে—তবে কি?

মনে মনে অহঙ্কার ছিল স্মৃতিশক্তিটা আমার খুব বেশী, তা'ছাড়া বাবাও বলতেন—"বেটা বড় হ'লে নয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন আর নয় 'মেকলে' দাঁড়াবে।" ভাবলুম আজ যদি শরৎবাবুর সব গ্রন্থাবলী কোনও রকমে জলে ডুবে কিংবা আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায় তাহ'লে কি পঞ্চাশ বছর পরের লোকের কাছে তাঁর অতবড় দানটা অজ্ঞাতই থেকে যাবে না কি? উঁহুঃ, এ হ'তেই পারে না—ভাবতে গেলেই গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে, বিশেষতঃ আমাদের মত শক্তিশালী লোক বেঁচে…

বল্লুম—"দেখ পঞ্চুদা, বইটা কাছে নেই, তবে কালকের মধ্যেই লিখে দিতে পারি।"

পঞ্চু—"দাও না মাইরি, বড় সুবিধে হয়, এ বছর তাহ'লে একেবারে জমিয়ে দিই।"

গোবরের বোধ হয় একটু জানা ছিল, তার পরদিন যখন প'ড়ে শোনালুম গোবর লাফিয়ে উঠে বল্লে—"ইস্, একদম ঠিক্ যাকে বলে হুবহু মাইরি, সেই জগদীশ, সেই পুণ্য গাঙ্গুলীর বাজনা, সেই নেড়া বটগাছ ইস্।"

তারপর অনেক কাল কেটে গেছে, অহঙ্কারও গিয়েছে,

সেই জায়গায় এসেছে দারুণ লজ্জা আর আত্মগ্লানি, তবুও আজ সেই বিকৃত "দত্তা"ই বলব যদি গুরুপাপের একটুও প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি।

দত্তা

(২য় সংস্করণ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত, বর্দ্ধিত)

এক

সেটা প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের দিন, হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের হেড্‌মাষ্টার মশাই খুব ব্যস্তভাবে তিনটী ছেলেকে কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে, নিজে মঞ্চের ওপর উঠে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে বল্লেন—"হে ভদ্র মহোদয়গণ, আজ্ আমাদের আনন্দের দিন, গর্ব্বের দিন, আমাদের স্কুলে আজ তিনটী রত্ন খুঁজে পেয়েছি, প্রথমটী" ব'লে ১৫ বছরের ছেলে জগদীশের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্লেন—"জগদীশ—সাকিম দিঘড়া। আমাদের মুখ উজ্জ্বল ক'রে"...হঠাৎ থেমে গিয়ে বল্লেন—"পকেটে কি বাবা?" হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের স্নেহমাখা হাত কখন মাথা থেকে বুকের পকেটে নেমে গেল, নিজেই টের পান নি, হঠাৎ খড়মড় ক'রে আওয়াজ হ'তেই খেয়াল হ'ল। জগদীশ ঘাড় হেঁট ক'রে বল্লে—"আজ্ঞে ঠোঙা, সল্টেড্ পেস্তা আছে"। হেড্‌মাষ্টার মশাই বিচক্ষণ লোক, অনেক শাস্ত্রই ঘাটা আছে, কি একটু ভেবে নিয়ে মুখটী চুণ করে কোনও মতে দুচার কথা ব'লে তাকে ছেড়ে দিয়ে পরেরটীকে কাছে টেনে এনে বল্লেন—"এটী রাসবিহারী—সাকিম রাধাপুর, বেশ সাবধানী ও অতীব মেধাবী, আজ একটী রচনা পড়বে।" রাসবিহারীর দিকে ফিরে বল্লেন—"কি বিষয়ে লিখেছ বাবা?"—

"আজ্ঞে অর্থনীতি"।

এবার মাষ্টার মশায়ের মুখে কে যেন এক ছোপ্ কালি লেপে দিলে, নিজের মনেই ব'লে ফেল্লেন—"এত অল্প বয়সেই অর্থনীতি," একটী ছোট নিঃশ্বেস ফেলে বল্লেন—"আচ্ছা পড়।"

এম্নি ক'রে আর একজনেরও পরিচয় হ'য়ে গেল—তৃতীয়টীর নাম বনমালী—গ্রাম কৃষ্ণপুর, এটীও অতি ধীশক্তিসম্পন্ন ও চিন্তাশীল।

সেইদিন হেডমাষ্টার মশাই ভাবনার বোঝা বুকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন, কিন্তু তিন বন্ধু বইএর বোঝা বুকে নিয়ে মাঠের মাঝখানে যে নেড়া বটগাছটার তলা দিয়ে তিনটে রাস্তা তিনদিকে চলে গেছে—সেইখানে এসে দাঁড়াল, তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। জগদীশ ক্লান্ত হ'য়েছে, বই বেশী, তার হাতটাই বেশী অবশ হয়েছিল, ব'ল্লে—"এইখানে বইগুলো রেখে একটু জিরিয়ে নেওয়া যা'ক্ কি বল ভাই।" জগদীশ নেড়া বটগাছের সিমেণ্ট করা বেদীর ওপর বইগুলো রেখে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বল্লে—'বনমালী একটিপ্ নস্যি দে তো"। এক সেকেণ্ড বাদে লাফিয়ে উঠে বল্লে—'আচ্ছা ভাই এক কাজ করলে হয় না, আমাদের তো এবার একদম ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেল—কে কোথা যাবে তার কিছুই ঠিক নেই। এই নেড়া বটগাছটা সাক্ষী ক'রে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে কিছু প্রতিজ্ঞা করলে হয় না" ১৫।১৬ বছরের ছেলে, হরেক রকমের রঙিন ছবি মাথার মধ্যে ভিড় ক'রে ঠেলাঠেলি করছে। দুজনেই জগদীশের মুখের দিকে চেয়ে ব'ল্লে—"হ্যাঁ বেশ হয়, কি প্রতিজ্ঞা করা যায় বল?"

জগদীশ বল্লে—"আমরা তিনজনেই কবি হ'ব আর যে যেখানেই থাকুক, প্রত্যেকের বই প্রত্যেককে প্রেজেণ্ট করব'।" রাসবিহারী বল্লে—"না বাবা, কবিটবি নয়, তার চেয়ে বিজ্ঞানের উন্নতি ক'রে তিনজনেই পয়সা করব।" বনমালী বল্লে—"না, না, তিনজনেই অবিবাহিত থেকে পয়সা রোজগার করব, আর সেই পয়সায় দেশের কাজ করব।"

অনেক তর্কাতর্কির পর শেষে বনমালীর প্রস্তাবই বাহাল রইল। তিনজনেই নেড়া বটগাছের বেদী ছুঁয়ে কথামত প্রতিজ্ঞা করলে। কিন্তু যিনি সবই দেখেন তিনিই শুধু অন্ধকারে দেখতে পেলেন, তর্কের মাথায় প্রত্যেকের হাত বেদী থেকে প্রায় আধ ইঞ্চি উঁচুতেই ছিল, বেদী স্পর্শ করে নি।

দুই

বেদীতে সত্যিই হাত ঠেকলে কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু হাত না ঠেকে যা হ'য়েছিল সেই কথাই বলি। অনেক কাল কেটে গেছে। রাসবিহারী এখন ব্রাহ্ম, বয়স প্রায় ৫৫, বয়সটাই বুড়িয়ে গেছে, কিন্তু শরীর এখনও

শক্ত, কেবল সামনে দিক্‌টা একটু ঝুঁকে পড়েছে। দেশের বাড়ীতেই থাকে, যা অল্প টাকা আছে তাই গাঁয়ের চাষা-ভুষোদের বেশী সুদে ধার দেয়, বুকে হাঁটু দিয়ে সুদ আদায় করে, আদায় না হ'লে ভিটেছাড়া করে, কাকুতি মিনতি কিছুই শোনে না, সুদ ক'ষে ক'ষে বাঁ চোখটা প্রায় অন্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু বাইরেটা বেশ তকতকে, পাকা ধবধবে দাড়ি চোখে সোণার চশমা। ছেলেবেলাকার রচনা "অর্থনীতি" তা'র কাছে আজ আর ছোট্টটী নয়, সে বীজ এখন তা'র সমস্ত মনের মধ্যে প্রকাণ্ড মোটা মোটা শিকড় গেড়ে ফেলেছে।

তখনও আটটা বাজে নি, মাত্র দু'একজন চাষী মাথায় বজরা নিয়ে হাটের দিকে যেতে আরম্ভ ক'রেছে। বৈঠকখানা ঘরে সামনে কাঠের বাক্সের ওপর খাতা ফেলে রাসবিহারী একমনে কিসের হিসেব কষছে—বোধ হয় সুদেরই, হঠাৎ ঘরের মধ্যে কে যেন একরাশ টাট্‌কা ফুল রেখে গেল। "এত গন্ধ আসে কোথা থেকে" দেখবার জন্যে চোখ তুলতেই দেখলে গুণধর বংশধর বিলাসবিহারী দিব্যি সেজে গুজে ছড়ি দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে যাচ্ছে। রাসবিহারীর গায়ে যেন এ্যাসিড পড়ল। ভ্রু কুঁচকে রুক্ষস্বরে খিঁচিয়ে উঠে বলল—"এত ভোরে কোথায় যাচ্ছিস? বেটা যেন নবাবপুত্তুর, এত ক'রেও তোকে পারলুম না, অমন উড়নচণ্ডে হচ্ছিস কেন বল দিকিন, অত বাবুগিরি করলে একটা পয়সাও রাখতে পারবি না, তা ব'লে দিলুম। লক্ষীছাড়া কোথাকার! এত ক'রে কচ্ছি কার জন্যে? তোর জন্যে না আমার জন্যে, তুইই মরবি, আমার আর কি।" বিলাস রাসবিহারীর একমাত্র পুত্র। ব্রাহ্ম বলে বিলাসের একটা মস্ত বড় অহঙ্কার আছে, যা "সত্যম্" তা বলব', তা সে বাপই হ'ক্ আর স্বয়ং ব্রহ্মই হোক্। একটু ঘুরে ছড়ির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ক'রে উচ্চারণ ক'রে বল্লে—"যাচ্ছি কলকাতায়। বিজয়ার কাছে কিছু দরকার আছে।" রাসবিহারীর বাল্যসঙ্গী বনমালী একমাত্র মেয়ে বিজয়াকে নিয়ে কলকাতায় থাকে। তার প্রকাণ্ড জমীদারিটা রাসবিহারীই দেখে। এখন আর শুধু দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না, অনেকদিন ধরেই লোভ আছে। সুরটা একটু নরম ক'রে "হাঁ দাঁড়া, একটু বিশেষ দরকার আছে"—বলেই উঠে গিয়ে ডান দিককার সেলুক থেকে কতকগুলো লাল খেরোবাঁধান মোটা খাতা নামিয়ে ছেলেকে —"এদিকে একবার আয় তো, এই খানটা একবার পড়ে দেখ" বলে এক খানা খাতার বিশেষ একটা জায়গায় বাঁ হাতের তর্জ্জনী টিপে রইল। বিলাস ঘাড় নীচু ক'রে পড়লে—'একষট্টি হাজার আটশ' পঁচাত্তর।" বাপের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—"হাঁ, তা কি হয়েছে?" ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে রাসবিহারী বল্লে—"আহাম্মক কোথাকার, কি তা বুঝতে পাচ্ছিস না?" ছেলের মাথায় ঢুকল না দেখে রাসবিহারী ব্যাপারটা নিজেই খুলে বলে দিলে— "আসল কথাটা হচ্ছে, বনমালীর এই আয়টা বড় কম নয়, প্রায় লাখ খানেক। তা' তুই এক কাজ কর্ত্তে পারিস? বনমালীর যা অসুখ, বাছাধনকে সেরে আর উঠতে হ'চ্ছে না, আজ যায় কাল যায় হ'য়ে আছে। তুই সেখানে দিন দুয়েক থেকে বিজয়াকে কোনও রকমে ভজন-ভাজন দিয়ে এখানে একবার এনে ফেলতে পারিস, তারপর সব ব্যবস্থা আমি ক'রে নিতে পারি।" গলাটা আরও একপর্দ্দা নামিয়ে ব'ল্লে—"তোর একটা হিল্লে হয়, ব্যাপারখানা একবার তলিয়ে বোঝ—বনমালীর এই জমীদারি, কলকাতার অতবড় চলতি কারবার মায় আমার যা কিছু সব তোর"। বিলাসের দিক্ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে রাসবিহারী একটু চড়া গলায় ব'ল্লে—"যা, যা, তোর দ্বারা কোনও কাজই হ'বে না, তা অনেক আগেই জানি, আর তা ছাড়া—তুই যা।" বিলাস এবার চটে উঠল, বলল— "দেখ বাবা, রাতদিন কেবল গালমন্দ ক'রনা তা ব'লে দিচ্ছি, ঝাঁ ক'রে কোন্ দিন রাগ সামলাতে পারব না, তখন বলবে, খামকা অপমান করলে। কি করতে হ'বে তাই খুলে বল।"

রাসবিহারী কাজ আদায়ের ফন্দী বেশই জানে, তাই শুনবামাত্র বললে "আহা-হা, চটিস্ কেন বাবা? শোন্, সেখানে থাক্ বনমালীর শেষ হওয়া পর্য্যন্ত। তারপর বনমালীর সৎকার হ'য়ে গেলে তুই শুধু বিজয়াকে বলবি—মন খারাপ ক'রে কি হ'বে, সংসারে থাকতে গেলে অমন হ'য়েই থাকে। তিনি মানুষ ছিলেন না, দেবতা ছিলেন। ব্রহ্ম দয়া ক'রে কোলে টেনে নিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রে-কর্ম্মে যেমন বলা দরকার আর কিছু বুঝছিস্ না, তারপর কাজের কথা পাড়্‌বি,

"চলুন, দেশে আপনার জমীদারিটা ঘুরে আসবেন, মনটা হাল্কা হ'য়ে যাবে, তাতেও যদি অরুচি হয় তো জগদীশের দিঘড়ার বাড়ীটা বনমালীর কাছে বাঁধা আছে জানিস্ তো বলবি 'ওটার বিষয় কি ঠিক করেছেন ?' বল্‌বি পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক না। ওটা ক্রোক ক'রে অন্ততঃ ধর্ম্মের জন্য ওটাকে ব্রাহ্ম মন্দির ক'রে ফেলা যা'ক্। দেশে একটা নামও হ'বে। তারপর এখানে এনে ফেল্ না। তোর বিয়ের ভার আমার ওপর রইল, আর বিয়ে নামেই সব। বনমালীর ছেলে বলতেও ওই মেয়ে বলতেও ঐ।"

বিজয়াগতপ্রাণ বিলাস বাপের মুখে 'বিজয়া' নামটা অতবার শুনে আর সামলাতে পারলে না, ঠিক ঐ খানেই ওর দুর্ব্বলতা, মনের মধ্যে ভাবের ঢেউ খেলে গেল, ঢেউএ ঢেউএ ধাক্কা খেল, ব'লে ফেল্লে—'প্রপার্টি' সম্বন্ধে যা হয় তুমি ক'র বাবা, ওসবের আমি ধার ধারি না, চাই শুধু বিজয়া - স্রেফ্ বিজয়া। রাসবিহারী চটে উঠে বল্লেন—'বেটা আহাম্মুক মরেছে রে, আরে বিজয়া, বিজয়া, বিজয়া—শুধু বিজয়ার দাম কি ? একেবারে ভাব উথ্‌লে উঠ্‌ল, যা বলছি কর হতভাগা।" বিলাস হঠাৎ কি একটু ভেবে নিয়ে ব'ল্লে—"আচ্ছা তুমি ঠিকই বলেছ, দেখি কতদূর কি কর্ত্তে পারি" ব'লে বেরিয়ে চ'লে গেল।

তিন

আজ দশটী বচ্ছর লোহার কারবার ক'রে বনমালী একদিকে যেমন লক্ষ্মীকে মুঠোর ভেতর এনে ফেলেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি একটু একটু ক'রে নিজেই কখন চিত্রগুপ্তের মুঠোর মধ্যে এগিয়ে গেলেন তা' খেয়ালই ছিল না, খেয়াল যখন হ'ল তখন আর করবার কিছু নেই। এ্যাপোপ্লেক্সি না কি সাংঘাতিক অসুখ। খাটের ওপর শুয়ে আছেন, মাঝে মাঝে মাথা চালছেন। একমাত্র মেয়ে বিজয়া শিয়রে ব'সে। বাঁ হাত আধুনিক রসে ভর্ত্তি 'ব্যালজ্যাকে'র কি একখানা বই, আর ডান হাতে বালিশ ঘষছে, অবশ্য এরকম চলছে প্রায় বিশ মিনিট ধরে, কেন না বইটা এইমাত্র জমেছে, নইলে আগে হাতটা বাপের মাথার ওপরেই ছিল। এই মাত্র বনমালীর একটু জ্ঞান হ'য়েছে বিজয়ার হাতটা ধরবার জন্যে নিজের হাত দিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বালিশের এদিক্ ওদিক্ হাত্‌ড়ে বিজয়ার হাতে হাত ঠেকতে বিজয়া বই থেকে চোখ না উঠিয়েই জিজ্ঞাসা কল্লে, "কিছু বলছ বাবা"! বনমালী চোখ বুজেই ব'ল্লে—"হুঁ! মা, আমি বোধ হয় আর বেশীক্ষণ নয়। একটু জল দে দিকিন। উঃ, ব্রহ্ম-কৃপা হি কেবলম্। দেখ্ মা ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু এই শেষ সময়ে কা'কে মনে পড়ছে জানিস্ ? মা জগদম্বাকে। এমন কি তাঁর অসুরটাকে পর্য্যন্ত যেন চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি। ব্রহ্মাকেও না আর পরম ব্রহ্মকেও না। উঃ! একটু জল, ঘড় যাতনা মাগো!"—একটু চুপ ক'রে থেকে ফের বল্লে, কে যেন কতদূর থেকে কথা কইছে এম্নি গলার স্বর—"জগদীশের দিঘড়ার বাড়ীটা তা'র ছেলে নরেনকে ফিরিয়ে দিস্। বাপের পাপে ছেলেকে—" সব কথা আর বেরুল না। "উঃ" বলেই একবার চোখ দুটী উল্টে নিয়ে স্থির হ'য়ে গেল। বিজয়া হুমড়ি খেয়ে বাপের কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"নরেনকে আমি চিনি না বাবা, তোমার কথা আমি রাখতে পার্ব্ব না, বাড়ী ফিরিয়েও দেব না। আব্দার! টাকা দেয় ফেরত পাবে, এম্নি একখানা ইঁট পর্য্যন্ত দিচ্ছি না।" যাঁর উদ্দেশ্যে বলা, তাঁর কাণে পৌঁছুল কি না দেখবার জন্যে বিজয়া বাপের গা অল্প নাড়া দিয়ে ডাক দিলে—"বাবা"! কিন্তু সাড়া দেবে কে ? যে সাড়া দেবে সে এতক্ষণে কতদূর চলে গেছে, কে জানে হয় তো একমেবাদ্বিতীয়মের অংশ হয়ে গেছে। বিজয়া মুখে রুমাল দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে যাবে, শরীর সবে মাত্র কেঁপে দুলে উঠেছে ঠিক্ এম্নি সময় বেয়ারা এসে চুপি চুপি খবর দিলে—"মাজি, বিলাসবাবু।"

চার

বনমালী মারা যাবার পর দিন বার কেটে গেছে। বাপের কথামত বিলাসের 'ভজনভাজন' কোনও কাজ দিলে কি না কে জানে, যে জন্যেই হ'ক জমীদারিটা নিজের চোখে দেখা হ'বে বলেই হ'ক কিংবা পাড়াগাঁ, ফাঁকা জায়গা, বিলাসবাবুর সঙ্গে কোর্টশিপটা জমবে ভাল ভেবেই হ'ক, শরতের গোড়াতেই এক দিন বিজয়া দেশের প্রকাণ্ড বাড়ীটায় এসে হাজির হ'ল। আসার পর ৫।৬ দিন কেটে

গেছে, বিজয়ার শোকদগ্ধ প্রাণটা অনেকটা চাঙ্গা হ'য়েছে। সেদিন সকালে ডানদিকের বড় বৈঠকখানায় ব'সে বিলাস আর বিজয়া চা খেতে খেতে দিব্যি গল্প জমিয়েছে, সামনে টেবিলের ওপর বড় একটা ফুলের তোড়া একটু আগে মালী রেখে গেছে, টাট্‌কা ফুলের গন্ধে ঘরটা ভরপুর, দুজনেরই দিল আজ খুস, বিলাস ফুর্ত্তির মাথায় নিজের চেয়ার খানাকে একটু একটু ক'রে বিজয়ার ঠিক পাশটীতে এনে ফেলেছে, আর এক সেকেণ্ড দেরী হ'লে বিজয়ার গণ্ডে আনন্দের একটা মাঝারি রকমের ছাপ এঁকে দিত, কিন্তু ঠিক সেই সময় বেহারা এসে খবর দিলে—"একঠো বাবু"।

এরকম রসভঙ্গ একদম সহ্যের বাইরে। বিলাস রুক্ষস্বরে খিঁচিয়ে উঠল—"যাও, উল্লু কাঁহাকা, অভি ফুরসুৎ নেহি।" কিন্তু বিজয়া এরকম ব্যাপারকে যা' তা' ব'লে উড়িয়ে দিতে পারলে না, ভাবলে কি আশ্চর্য্য, যৌবনের সাদা খাতায় মাত্র ছোট্ট একটা আঁচড় তাতেও বাধা! নিশ্চয়ই পরম ব্রহ্মের কিছু গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, বেহারাকে ডেকে ব'ল্লে—"আচ্ছা বোলাও।"

যে ঘরে ঢুকল সে নরেন, জগদীশের ছেলে। আজ বছর কতক হ'ল, জগদীশ একমাত্র বংশধর নরেনকে রেখে পৃথিবীর একটু জায়গা খালি ক'রে চলে গেছে, তবে যে ভাবে অন্য সকলে মা বসুন্ধরার কাছে শেষ বিদায় নেয় ঠিক সে ভাবে নেওয়া হয় নি। তবে 'মেটিরিয়া মেডিকা'য় লেখা আল্‌কহলের অ্যাকসনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বিদায় নিয়েছেন। তাতে আছে "It makes the melancholy hilarious," জগদীশের মন খারাপ ছিল, কারণ, প্রথমতঃ, প্রিয়তমা পত্নী ছেড়ে গিয়েছে, দ্বিতীয়তঃ দেনার দায়ে দেশের বাড়ীখানি বনমালীর কাছে বাঁধা, 'মনমরা'র হাত এড়াবার জন্যে এতদূর "হিলেরিয়স" হ'য়েছিলেন যে একদিন ছাদের উপর থেকে লাফ না মেরে থাকতে পারেন নি। তবে গুছোন' লোক ছিলেন। নরেন বাবাজীকে চারটী বচ্ছর বিলেতে ডাক্তারি পড়িয়েছেন, অবশ্য বনমালীরই সাহায্যে।

সে যা'ক, নরেনের দিব্য গৌরবর্ণ ঢেঙা গড়ন, চোখ দুটী বেশ ভাসা-ভাসা কেমন একটা উদাস ভাব-মাখান, দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। খুব পাকা লোক, বিলেতের সকল রকম নারীজয়ের পাকা ফন্দীবাজিতে বেশ দুরন্ত, বাইরে থেকে তা বোঝবার যোটী নেই। ঘরে ঢুকেই বিজয়াকে দেখে চমকে উঠল। সৌন্দর্য্যের এরকম চটক এর আগে কখনও চোখে পড়ে নি—না, বিলেতেও না। বিলাসের চেয়ার বিজয়ার অত কাছে দেখে এক নিমেষে বুঝে নিলে ব্যাপার খানা কি। নিশ্চয়ই ভালবাসার সেই চিরকেলে একঘেয়ে বুলি চলছে, যা আদমের আমল থেকে চলে আসছে। যাই হ'ক প্রথম দৃষ্টিতে নিজেও বেশ একটু আকৃষ্ট হ'য়েছে বুঝতে পেরে ধাঁ ক'রে ঠিক ক'রে নিলে একে জয় করা চাই; তবে জয় কর্ব্বার কোন্ পন্থা অবলম্বন কর্ব্বে, ভাবলে—কোনও গুণ্ডার হাত থেকে উদ্ধার ক'রে বীরত্ব দেখান উচ্চ, অসম্ভব; সে সুবিধে হবে না। তবে? আর্টিষ্টের লক্ষণ দেখিয়ে 'ইম্প্রেস' করা বড় পুরোণো, তা ছাড়া সময় কম। একটা নূতন কিছু—স্যাভেজ্ লভ্? Indifference দেখিয়ে—ঠিকই, আজকালকার মেয়ে, তায় ব্রাহ্ম, কাজ হতেও পারে। স্রেফ্ বুঝিয়ে দেওয়া—যত সুন্দরীই হউক না কেন, আমার কাছে নারী তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য। মতলব ঠিক করবার সঙ্গে সঙ্গেই, কেউ কিছু বলবার আগেই নিজেই খুব আওয়াজ ক'রে মেঝের উপর রগড়াতে রগড়াতে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে গলার আওয়াজ একটু কড়া ক'রেই বল্লে, "ওঃ! আপনি বুঝি জমীদার, তাই জমীদার হ'ন আর যেই হ'ন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার মামা পূর্ণ গাঙ্গুলীর পূজোটা বন্ধ ক'রেছেন কেন? নিজের ব্রাহ্ম ধর্ম্মটাই বড় আর সব ধর্ম্ম চুলোয় যাক্ কেমন? বাঃ! আপনি না শিক্ষিত? শিক্ষায় বুঝি এই রকম উদারতা এনেছে? না, না, ওসব সঙ্কীর্ণ মতলব ছাড়ুন। জবাব দিচ্ছেন না যে? উঃ, কি মুস্কিলেই পড়া গেল। স্ত্রীলোকের ঘাড়ে জমীদারি পড়লে যা হয় আর কি? কি ঠিক করলেন একটু চটপট জবাব দিন। আমার আবার অন্য কাজ আছে—" বলে যেন ঘৃণার অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

পূর্ণ গাঙ্গুলী নরেনের মামা, জমীদার-বাড়ীর গায়েই তাঁর বাড়ী, প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হয়। এ বছর হবার কথা কিন্তু হঠাৎ বিজয়ার হুকুম হইয়াছে—ওসব চলবে না। নরেন আজ কদিন ধরেই বিজয়ার সঙ্গে দেখা করবার উপলক্ষ্য খুঁজছিল, হঠাৎ এই সুযোগ পেয়ে এসেছে।

বিজয়া বাপের আদুরে মেয়ে, বায়োস্কোপ দেখে আর বই মুখস্থ করেই বড় হ'য়েছে, তার ওপর জমীদার, কড়া কথা চুলোয় থা'ক, চেঁচিয়ে কথা কখনও শোনে নি, বরং আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, সমাজ, দাসদাসী মায় বিলাস পর্য্যন্ত যে কেউ যা বলেছে সবই খোসামুদির বুলি, এরকম উদ্ধত ব্যবহার কারুর কাছেই পায় নি—তাই এ-দিকে যেমন অভিমানে চোখে জল এসে পড়েছিল,অন্যদিকে তেমনই তা'র নিজের চিরকেলে অহঙ্কার, সৌন্দর্য্য আর শিক্ষা—তারই ওপর এরকম অবহেলা দেখে সত্যিই মুগ্ধ হ'য়ে গেল। আরও মুগ্ধ করলে, বক্তার সুন্দর মুখ, চোখ আর গড়ন ; চট্ ক'রে কিছু জবাব খুঁজে পেলে না, যে জবাব দিলে সে বিলাস। গলার আওয়াজ-টাকে সপ্তম পর্দ্দায় চড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে বললে—"কি ? এত বড় আস্পর্দ্ধা ? কা'র সঙ্গে কথা কইছ জান'? কাণের কাছে ঢাক ঢোল বাজাবে আবার তাই নিয়ে বাড়ী ব'য়ে ঝগড়া কর্ত্তে এসেছ ? এখুনি বেরিয়ে যাও বলছি, নইলে, দারোয়ান.........."কথাটা আর শেষ করতে হ'ল না। বিজয়া দাঁড়িয়ে উঠে ব'ল্লে—"খবরদার, বিলাসবাবু, হোল্ড, ইয়োর টাং-চুপ করুন," পরে নরেনের দিকে ফিরে মিঠে সুরে বল্লে—"আপনি কি বা কে তা জানতে চাই না,তবে আমার বারণ আমি উঠিয়ে নিলুম,আপনি আপনার মামাকে যত খুসী ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পূজা কর্ত্তে বলবেন, আর যদি কিছু না মনে করেন, তো বলবেন—বাজনার সব খরচ আমি দেব—শুধু এ বছরের জন্যে নয়, প্রতি বছরের জন্যে। বুঝেছেন, আপনার মামাকে বলবেন ভুলবেন না।" একটু থেমে বললে—"সে যা'ক্, এসেছেন যখন, বসুন, চা আনতে বলে দি।"

নরেন দেখলে "indifference"এ অনেকটা কাজ হ'য়েছে। 'চা খাইনা' 'ধন্যবাদ' বা 'আচ্ছা উঠি' বা 'কিছু মনে ক'রবেন না' ইত্যাদির কোনটাই না ব'লে কোটের পকেটে হাত দুটী ঢুকিয়ে দিয়ে মুখে কি একটা বিলিতি গানের সুরে শিষ দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

বিলাস চেয়ারের হাতল ধ'রে ব'সে পড়েছে। যতদূর দেখা গেল নরেনকে দেখে নিয়ে বিজয়া একটা নিঃশ্বেস ফেল্লে। বিলাসের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "লোকটী কে বিলাসবাবু ? চেনেন ?" হাতলের ওপর মাথা রেখেই বিলাস বলল'—"দিঘড়ার জগদীশবাবুর ছেলে ন-রে-ন।" বিলাসকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়েই বিজয়া ২।৩টী সিঁড়ি এক এক লাফে উঠে ওপরে চলে গেল, ওঠবার সময় শুধু ব'লে গেল, "আপনি যাবেন না বিলাসবাবু, আপনার চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

পাঁচ

জীবনে যা'রা কখনও বাধা পায় নি তাঁদের এই রকমই হয়। তাই বিজয়া যখন মনে মনে ঠিক করলে নরেনবাবুকে চাই, তখন চাইই—তা সে যেমন ক'রেই হ'ক। কিন্তু বিলাস-সম্বন্ধে কি করা যায় ভেবে একটু সমস্যায় পড়ল।

এই ঘটনার পর আর ৫।৬ দিন কেটে গেছে। নরেন এদিক্ একদম মাড়ায় নি, বিজয়ার মন আদৌ ভাল নয়, বিলাসকে পর্য্যন্ত কাছে ঘেষতে দেয় না। রাসবিহারী জমীদারের দলিলগুলা হস্তগত করবার জন্যে রোজই এসে একবার ক'রে বিজয়ার বন্ধ দরজায় লাঠি ঠুকে গেছে তবুও বিজয়া দেখা করে নি। তেতলার ছোট্ট ঘরটীতে ব'সে কেবল বই পড়ে আর ছটফট্ করে। প্রথমে এমারসন আর টলষ্টয় খুললে, মন বসল না, নুট হামসুনের 'হাঙ্গার' খানা শেষ ক'রে ভাবতে ব'সল—নরেনবাবুকে কি ক'রে পাওয়া যেতে পারে। হঠাৎ মনে মনে কি ঠিক ক'রে নীচে এসে বিলাসকে ডেকে পাঠালে। বিলাস এসে হাজির হ'ল। বিজয়া বললে—"দেখুন জগদীশবাবুর বাড়ীখানা আজই দখল করা হ'ক, আর নরেন না কে ওকে আজই বাড়ী থেকে বিদেয় ক'রে দেওয়া হ'ক, পারবেন তো ?" বিলাস কদিনের পর আজ মনটায় ভারি আরাম পেল, ভাবলে—তাহ'লে এখনও 'কেস হোপলেস' নয়। একটু আবেগভরে বলে ফেল্লে—"বহুৎখুশ, আজই ব্যবস্থা কচ্ছি"। মনে মনে বললে—শুধু বাড়ী কেন, একদম গাঁ ছাড়া কচ্ছি। বিলাস চলে যেতেই বিজয়া আবার তেতলার ঘরটীতে গিয়ে ঢুকল—ভাবতে লাগল—নরেনবাবুকে এবার আমার কাছে আসতেই হ'বে, আর আমার কাছে যদি নাই বা আসে, ঐ সামনের মাঠ দিয়ে যেতেই হ'বে, যে যেখানেই থা'ক্, মাঠ ছাড়া আর গতি নেই, গাঁয়ের ঐ একটী মাত্র পথ, তা ষ্টেশনেই যা'ক্, বা অন্য কোন গাঁয়েই যা'ক্। যা'ক, উপস্থিত এইখান

থেকেই একটু নজর রাখলেই চলবে—ভেবে মাঠের দিকে গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ দূরে মাঠের ওপর একটা লম্বা লোক দেখেই ৪।৫টা সিঁড়ি একসঙ্গে লাফাতে লাফাতে নীচে নেমে এসে হাঁক দিলে—"পরেশ! পরেশ!" পরেশ বাচ্চা চাকর, কাছেই কোথায় খেলছিল, মনিবের ডাক শুনে' এসে দাঁড়াইতেই বিজয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—"যা, যা, চট্ ক'রে যা, মাঠের ওপর ঐ যে লম্বা মতন লোকটা—ডেকে আন' ডেকে আন, তোকে একটা জিনিস দেব, বোমা লাটাই দেব চট্‌পট্ যা।" পরেশ ভোঁ দৌড় দিলে। বিজয়া চেঁচিয়ে বলে দিলে—"যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে কে ডাকছে, বলিস—আমি নই বাড়ীর…"। পরেশ ততক্ষণে অনেকদূর চলে গেছে সব কথা কাণে পৌঁছুল না। বারান্দাতেই বিজয়া মাঠের দিকে চেয়ে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগল। মিনিট ১৫ বাদে পরেশের সঙ্গে যে এল সে নরেন নয় একজন লম্বা চওড়া মিশ কাল' মুসলমান, একটু রামছাগলের মত দাড়িও আছে। দেখেই বিজয়ার অন্তরাত্মা শিউরে উঠ্‌ল—বিকৃতস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "কানাই সিং।" কানাই সিং চাপাটি বানাচ্ছিল, মায়িজীর করুণ ডাক শুনেই ছুটে এল। বিজয়া ভীতিবিহ্বলস্বরে আদেশ দিল—"ইস্‌কো ভাগায় দেও।". আগন্তুকটী প্রথমে একটু আশ্চর্য্যই হ'য়েছিল পরে সে ভাবটা কাটতেই রুখে দাঁড়িয়ে বললে—"কেঁও।" কানাই সিং সামনে একটু এগিয়ে যেতেই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"আরে যাও সাত্তুখোর, আউর পচাশ আদমিকো বোলাও" সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে এক রদ্দা দিতেই কানাই সিং হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। বিজয়া ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপছে। ঠিক্ সেই সময় আওয়াজ হ'ল "নমস্কা-র"। বিজয়া পেছন ফিরেই দেখলে নরেনবাবু। ছুটে এসে নরেনের হাতদুটো বগলদাবা ক'রে বললে—"নরেনবাবু! মানসম্ভ্রম বাঁচান"। নরেন indifferenceএর জের টানবার জন্যেই বিজয়াকে জোর ক'রে ছাড়িয়ে হাতখানেক মেপে নিয়ে তফাতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বল্লে—"ঐখানে দাঁড়ান।" তারপর নিমিষের মধ্যেই 'নাইটে'র মত লাফিয়ে পড়ে বিজয়াকে আড়াল করে আগন্তুকটার ঘাড় ধরে হাতে কি একটা সাদা চকচকে জিনিস গুঁজে দিতেই লোকটী সটান উবুড় হ'য়ে প'ড়ে নরেন আর বিজয়ার পায়ে ধরে "কসুর হো গিয়া" "কসুর হো গিয়া" বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

এই অল্প লম্ফ প্রদানেই নরেন বেশ একটু ঘেমে উঠেছিল, ঘরের মধ্যে এসেই বললে—"বড্ড গরম, পরে নিজেই উঠে গিয়ে বন্ধ জানালার একটা কড়া ধরে টান দিলে। অনেক কেলে পুরোণ বাড়ী, পাল্লাটা সর্ব্বসমেত উঠে এল, সেটাকে মেঝেতে আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে টেবিলের একপাশ চেপে ব'সে পড়ল।

"উঃ! এই রোগা হাড়ে কি দারুণ ক্ষমতা, যে পাল্লা দরওয়ানে লাঠি ঠেঙিয়ে খুলতে পারে নি সেই পাল্লা অনায়াসে খুলে ফেল্লে, অত বড় জোয়ান পাট্টা লোকটাকে এক সেকেণ্ডে কাবু ক'রে দিলে"—ভাবতে ভাবতে বিজয়ার দুটী চোখ ছলছলিয়ে উঠ্‌ল' জলে ডবডবে চোখ দুটী পাছে নরেনের নজরে পড়ে সেই ভয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে—"আপনার জন্যেই আজ আমি ইজ্জত বাঁচাতে পারলুম ও প্রাণটা ফিরে পেলুম। এ প্রাণটা এখন আপনারই, তবে একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দিই আমি আপনাকে ভালবা—" ব'লে জিভ্ কেটে বল্লে, "দেখুন দিখি আর একটু হ'লে" বিজয়া থেমে গেল। নরেন মুখে একটা অদ্ভুত আওয়াজ ক'রে বিজয়ার চিবুকটা ধরে অল্প একটু নাড়া দিয়ে ঠোঁট উল্টে বল্লে, "এ নিয়ে কি করব'? সে য'াক্, এখন কিছু খেতে দিতে পারেন? না ওসব পাট নেই।" বিজয়া লাফিয়ে উঠে বল্লে—"নিশ্চয়ই আছে। কি আশ্চর্য্য, আমারই আগে খেয়াল হওয়া উচিত ছিল। আপনি একটু বসুন, আমি আসছি" বলেই বেরিয়ে গেল। মিনিট খানেক বাদে ফিরে এসে ব'ল্লে, "আসুন আপনার জায়গা হ'য়েছে, আর দেরী নয় অনেক বেলা হ'য়েছে। আপনার হলে তবে আমি বসতে পারব।" সামনের হলঘরটায় খাবার ঠাঁই হ'য়েছে। নরেন আসনে বস্‌তেই বিজয়া সামনে বসে পড়ল'। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, নরেন দুধের বাটীটায় চুমুক দিচ্ছে, বিজয়া হঠাৎ "মাফ করুন, আসছি" ব'লে দৌড়ে চলে গেল। একটু বাদে ফিরে এল আবার নিজের জায়গাটীতে ব'সে পড়ল। এবার তার হাতে বাটখারার মাপের একটা ছোট্ট 'টয়ক্যান', নরেনের মুখের কাছে টিপছে আর বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। নরেন ভয় পেয়ে গেল। হাঁ ক'রে মুখটা

সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"ব্যাপার কি? ওটা কি? থামান না. কি আশ্চর্য্য নাকটা কেটে যাবে যে।" বিজয়া থামিয়ে ফেল্লে। নরেন আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে, "মৎলব মন্দ নয় তো? এ-রকম অতিথি-সৎকার শিখলেন কোথা থেকে? যা'কে বলে "খেতে দিয়ে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া'।" বিজয়া ফিক্ ক'রে হেসে বললে,—"আপনারা সব জিনিস বুঝবেন না, আপনারা পুরুষ মানুষ। যা'ক্, সরিয়ে নিয়েছি এবার খান তো।" নরেন জিদ্ ধরলে, "ওটা ঘোরালেন কেন?" বিজয়া মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে বললে—"ও কিছু না, বাবা বলতেন পুরুষ মানুষের খাওয়ার কাছে শুধু হাতে বসতে নেই, অন্ততঃ একটা পাখা নেবে। কিন্তু পাখা তো মাথার ওপর ঘুরছেই। হাওয়ার তো দরকার নেই তাই 'টয়ফ্যানটা' এনেছিলুম।—না শুনে আর ছাড়লেন না।" নরেন মুচকে হেসে বল্লে—"ওঃ, তাই ভাল।"

খাওয়া শেষ হ'তেই বিজয়া নরেনকে চুপি চুপি বললে,—"দেখুন, না বল্লেও চলে না, অথচ বলতেও হ'বে, কেননা এখানে আমার আপনার বল'ত কেউ নেই—এক আপনি ছাড়া—তাই আপনাকেই বলছি। এ সমস্ত জমীদারি চাকর-বাকর, মায় টেবিল চেয়ার, আসবাবপত্র সবই আমার—বাবা ব'লে গেছেনও বটে,তাছাড়া আমি নিজেই আপনাকে দিতে চাই, অবশ্য এম্নি নয়, যেমন ভাবে স্ত্রীর সম্পত্তি স্বামীর হয় সেই ভাবে।"

মাছ ডাঙ্গায়, আর Indifferenceএর দরকার নেই, কে জানে বাবা, মেয়ে মানুষের মন বেঁকে দাঁড়াতে কতক্ষণ। নরেন সোহাগভরে বললে—"বেশ, আমিও রাজি। তবে স্ত্রী হ'তে হ'লে, বিবাহ চাই তো? কিন্তু সেইটাই তো মুস্কিল। যা তোমার বিলাস আর রাসবিহারী ঘাঁটী আগলে আছে।"

বিজয়া তাড়াতাড়ি বললে,—"এক কাজ করলে হয় না, দয়ালবাবু ব'লে এক ভদ্রলোক আছেন, বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তাঁর ঐখানে আজ রাত্তিরেই ব্যবস্থা করতে পার না? তা হ'লে বেশ হয়। তবে খুব সাবধানে, আর নমো নমঃ ক'রে সারতে হ'বে। কাক-চীলটী পর্য্যন্ত টের না পায়।"

নরেন উত্তরে বললে—"বেশ. তুমি তা হ'লে ঠিক হ'য়ে থেকো', আমি রাত বারটা নাগাদ্ তোমার বাগানের ঐ কোণে হাস্নাহানার ঝোপের মধ্যে এসে শিষ দেব, তুমি জেগে থেকো।" তারপর কাণে কাণে বল্লে—"কি শিষ দেব তোমায় বলে যাই কে জানে অন্য কেউ যদি আমাদের কথা সব শুনে থাকে" ব'লে আরও গলার স্বর নীচু ক'রে ব'ল্লে 'মাত্র তিনটী কথা, Tra-la-la ব্যস্।" তারপর সহজ গলায় বল্লে,—মাইক্রোস্কোপটা এনেছিলুম—বেচে বর্ম্মা যাবার টাকার জোগাড় কর্ত্তে, ওটা এখানেই থাক্ কি বল'! এখন আমাদেরই তো সব। তা হ'লে ঐ কথাই রইল ব'লে নরেন চ'লে গেল।

নরেন দয়ালবাবুকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে রাজি করিয়েছে। রাতারাতি একরকম সব জোগাড়ও হ'য়ে গেল। গাঁয়ের কাণা ভটচার্য্যি মন্তর আওড়াতে রাজি হ'য়েছে কিছু পাবার আশায়। রাত ২॥• টায় লগ্ন।

বিয়ের মন্তর প্রায় শেষ হ'য়েছে, হঠাৎ বাইরে অনেক লোকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তার মধ্যে রাসবিহারী আর বিলাসবিহারীর আওয়াজই বেশী। যারা ঢুকল তাদের মধ্যে দু'জন পুলিশের লোকও আছে। একজনের হাতে একখানা কি কাগজ। রাসবিহারী ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠল—"বিজয়া, বিজয়া, বিজয়া।"

পুলিশের লোকটী রাসবিহারীর হাত ধ'রে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বল্লে—"মিছে 'হ্যারাস্' কল্লেন, এ তো দস্তুরমত বিয়ে হ'চ্ছে, 'আব্‌ডাক্‌সন' কই, বুড়ার ভিমরতি হয়েছে রে" ব'লে হাসতে হাসতে অপর লোকটীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। মন্তর শেষ হ'তেই বিজয়া উঠে এসে বল্লে, "চমকে গেছেন, না কাকাবাবু। উঃ একদম্ এ্যাব্‌ডাকসন্। সে যাক্, যখন এসেই পড়েছেন, আজ এইখানেই খাওয়া-দাওয়া ক'রে যাবেন, বরযাত্রী তো আর বলা হয় নি, বিলাসবাবু আপনিও না খেয়ে যাবেন না।"

রাসবিহারী রাগের মাথায় প্রায় অর্দ্ধেক চুল ছিঁড়ে ফেলেছে, কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে,—"যত সব জোচ্চোর, তখনই বলেছিলুম ও বেটা বিলেত-ফেরত ঘুঘু। তারপর বিলাসের ঘাড় ধরে টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বিজয়ার কাণে এল, রাসবিহারী বিলাসকে ধমকাচ্ছে "ব্রাহ্ম হ'লে কি হয় তুই বেটা আসল চাষার ছেলে চাষা"।—নরেন আর বিজয়া একসঙ্গে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল।

বিষ্ণুপুরের কথা

[শ্রীনিখিলনাথ রায় বি-এল]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রঘুনাথসিংহের পুত্র বীরসিংহ অতি উগ্র প্রকৃতির রাজা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তিনি স্ববংশীয়গণের এমন কি পুত্রভ্রাতার প্রতিও অত্যাচার করিয়াছিলেন —এরূপ শুনা যায়। বীরসিংহ কিন্তু আপনার সামন্ত রাজাদিগকে বশে রাখিয়াছিলেন। এরূপ শুনা যায় যে, বীরসিংহই বিষ্ণুপুরের বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বীর সিংহের বহুপূর্ব্বে বিষ্ণুপুর দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া স্থির হয়। এইরূপ শুনা গিয়া থাকে যে, বীরসিংহই বিষ্ণুপুরের সাতটী বাঁধই খনিত করিয়াছিলেন। একথাও সত্য বলিয়া মনে হয় না, তবে তাঁহার সময়ে কোনও কোনও বাঁধ নিখাত হইয়াছিল। রাজা হইবার পূর্ব্বে বীরসিংহ প্রথমে ৯২৮ মল্লাব্দে বা ১৬২২ খৃঃ অব্দে মল্লেশ্বর শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। * তাহার পর ৯৬৪ মল্লাব্দে বা ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে রাজা বীরসিংহ কর্ত্তৃক লালজীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। † ৯৭১ মল্লাব্দে বা ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মহিষী রাণী চূড়ামণি মুরালীমোহন ও মদন গোপালের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ‡

* "বসুকরনবগণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন।
অতিললিতং দেবকুলং নিহিতং শিবপাদপদ্মেষু॥"
(মল্লেশ্বর)

মল্লেশ্বর মন্দিরে যে বীরসিংহের নাম আছে, কেহ কেহ তাঁহাকে বীর হাম্বীর বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বীর হাম্বীরকে কোন স্থানে বীরসিংহ বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় না। রঘুনাথসিংহের নির্ম্মিত তিনটী মন্দিরে তিনি আপনাকে 'শ্রীবীরহাম্বীরনরেশসূনু' বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। মল্লেশ্বরের মন্দির ধাড়ি হাম্বীরের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়, সে সময়ে রঘুনাথসিংহ রাজা না থাকায় বীরসিংহ আপনার কোন পরিচয় দেন নাই। পিতার পরিচয় না দিয়া পিতামহ বীর হাম্বীরের পরিচয়-প্রদান তিনি সম্ভবতঃ সঙ্গত মনে করেন নাই।

† "শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে শকেঽঙ্কিরসাঙ্কযুতে নবরত্নমেতৎ।
মল্লাধিপঃ শ্রীরঘুনাথসূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীযুতবীরসিংহঃ॥" (লালজী)

‡ শ্রীদুর্জ্জনসিংহভূপজননী মল্লাবনীবল্লভ
শ্রীলশ্রীযুতবীরসিংহমহিষী শ্রীলশ্রীচূড়ামণিঃ।

বীরসিংহের পুত্র দুর্জ্জনসিংহ ৯৮৮ মল্লাব্দে বা ১৬৮২ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১০০৭ মল্লাব্দ বা ১৭০১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। দুর্জ্জনসিংহ বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ দেবতা মদনমোহনকে কোন স্থানের এক ব্রাহ্মণের বাটী হইতে লইয়া আসেন, এবং ১০০০ মল্লাব্দে বা ১৬৯৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার বিচিত্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। * বিষ্ণুপুর রাজগণের মধ্যে দুর্জ্জন সিংহের

মল্লাব্দে শশিসপ্তরন্ধ্রবিমিতে শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়োঃ।
প্রীত্যৈ সৌধগৃহং স্তবেদয়দিদং পূর্ণেন্দুতোঽপুজ্জ্বলম্॥"
(মুরলীমোহন)

"রাধাকৃষ্ণপদপ্রাপ্ত্যৈ সোমসপ্তাঙ্কগে শকে
রঘুনাথমহীনাথতনয়স্যোন্নতা প্রিয়াঃ।
বীরসিংহনরেশস্য শ্রীচূড়ামণিসংজ্ঞয়া
মহিষ্যাতিপ্রমোদেন নবরত্নং সমর্পিতম্॥
(মদনগোপাল)

এই মন্দির-লিপির পাঠ লইয়া বিশ্বকোষে ও History of Bishnupur Raj গ্রন্থে অনেক গোলযোগ আছে। বিশ্বকোষে বৎসরের 'সোম' এর স্থলে 'ষষ্ঠ' আছে, চতুর্থ চরণের প্রথমার্দ্ধে একেবারে অন্যরূপ পাঠ আছে। কিন্তু শ্রীচূড়ামণি সংজ্ঞয়া'র স্থানে বিশ্বকোষে 'ভীরবোমান সংশয়া' ও History fo Bishnupur Raj এ 'ভীরবমানসংশয়া' আছে। ইহার কোনই অর্থ হয় না, বা ইহা হইতে রাণার নামও পাওয়া যায় না। Dr. Bloch' চূড়ামণি'র স্থলে 'শিরোমণি' বলেন, কিন্তু মুরলীমোহনের মন্দির চূড়ামণিই আছে লিখিয়াছেন। যখন মুরলীমোহনের মন্দির 'চূড়ামণি' রহিয়াছে, তখন মদনগোপালের মন্দিরে তাহা 'শিরোমণি' হইতে পারে না, 'চূড়ামণি'ই হইবে। চূড়ামণি সম্ভবতঃ প্রধান মহিষীর উপাধি। বিশ্বকোষে রাজা বীরসিংহ কর্ত্তৃক ৯৮৬ মল্লাব্দে নির্ম্মিত রাধাকৃষ্ণের একটী শৈলমন্দিরের কথা আছে।

"কালবসুঙ্কমল্লাব্দে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্মুদা।
দদৌ সৌধগৃহং শৈলং বীরসিংহো মহীপতিঃ॥"

* "শ্রীরাধাব্রজরাজনন্দনপদাম্ভোজেষু তৎপ্রীতয়ে
মল্লাব্দে কশি রাজশীর্ষগণিতে মাসে শুচৌ নির্ম্মলে।
সৌধং সুন্দররত্নমন্দিরমিদং সার্দ্ধংস্বচেতোহলিনা।
শ্রীমদ্দুর্জ্জনসিংহভূমিপতিনা দত্তং বিশুদ্ধাত্মনা॥"
(মদনমোহন)

নাম প্রথমে খালসা বা রাজস্ব সেরেস্তায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।* চেতোবর্দ্দার জমীদার সভাসিংহ ও উড়িষ্যার পাঠান-

লালজীর মন্দির

সর্দ্দার রহিম খাঁর বিদ্রোহের সময় দুর্জ্জয়সিংহ সরকার-পক্ষকে বিশেষ রূপে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। * দুর্জ্জনসিংহর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহ ১০০৮ মল্লাব্দ বা ১৭০২ খৃঃ অব্দ হইতে রাজত্ব আরম্ভ করেন, তিনি দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বসময়ে ১৭০৭-৮ খৃঃ অব্দে মুর্শিদকুলীখাঁ নূতন ভাবে বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্ত আরম্ভ করিয়া জমীদারদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হন, জমীদারদিগের পরিবর্ত্তে আমীনগণকে রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত করা হয়। কেবল বঙ্গদেশের দুইজন মাত্র জমীদার এ ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বীরভূমের ও আর একজন বিষ্ণুপুরের জমীদার। বিষ্ণুপুর প্রদেশ অনুর্ব্বর হওয়ায় এবং তথা হইতে রাজস্বসংগ্রহে ব্যায়াধিক্যের সম্ভাবনা থাকায়, বিষ্ণুপুরের রাজা অব্যাহতি লাভ করেন। † বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের জমীদার মুর্শিদাবাদ-দরবারে উপস্থিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, তাঁহারা দরবারস্থ নিজ নিজ উকীল দ্বারা রাজস্বপ্রদানে অনুমতি পাইয়াছিলেন। ‡ প্রথমে বিষ্ণুপুর রাজগণের সহিত যে রাজস্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা সামান্যমাত্র পেস্কসে পরিণত হয় বলিয়া জানা যায়। রঘুনাথসিংহ লালবাই নামে কোন মুসলমান রমণীর প্রণয়ে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। তিনি তাহার জন্য বিচিত্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া শুনা গিয়া থাকে। এমন কি বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ লালবাঁধ নিখাত হইয়া লালবাই

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বীর হাম্বীর-কর্ত্তৃক মদনমোহন আনীত হইয়াছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা প্রকৃত নহে। কারণ, বৈষ্ণব গ্রন্থে মদনমোহনের কোনই উল্লেখ নাই। যিনি বিষ্ণুপুরের এইরূপ সুপ্রসিদ্ধ দেবতা, বীর হাম্বীর তাঁহাকে বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠিত করিলে, বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ কি তাহার উল্লেখ করিতেন না? আর বীর হাম্বীরের সুদীর্ঘ কাল পরে রাজা দুর্জ্জনসিংহই বা তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন কেন? এতদিন মদনমোহন কি কুটীরেই অবস্থিতি করিতেছিলেন? অথবা তাঁহার মন্দির নির্ম্মিত হইলে, সেই প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন বা তাহার স্থান পর্য্যন্তও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কেন? মদনমোহনবন্দনা কবিতা হইতে কোন্‌রাজা মদন মোহনকে আনিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। তাঁহার পাথরের রথ নির্ম্মাণের কবিতায় যে রঘুনাথসিংহের নাম আছে তিনি দুর্জ্জনসিংহের পুত্রই হইবেন, এবং এই সকল কবিতা পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

"Raja Disjen Singh however is the first that occurs on existing records of the khalsa as Zemindar of Bishnupur in Bengal and of Buggury with Raipur in Orissa. His name appears enrolled in jummakhurch accaount of the latter soubah as early as fussullee Year 1112 or 1707 of the Christian era. (Fifth Report)

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে দুর্জ্জনসিংহ বর্ত্তমান ছিলেন না। সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র রঘুনাথসিংহের নাম পত্তন না হওয়ায় তাঁহারই নাম চলিয়া আসিতেছিল।

* Bankura District Gazetteerএ ও History of Bishnupur Raj এ লিখিত আছে যে, দুর্জ্জনসিংহের পুত্র রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে সভাসিংহের বিদ্রোহ ঘটে. এবং রঘুনাথসিংহ সরকারপক্ষকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৬৯৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬৯৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই বিদ্রোহ বিদ্যমান ছিল. সে সময়ে দুর্জ্জন সিংহেরই রাজত্বকাল, রঘুনাথ সিংহের নহে। তবে রঘুনাথ সিংহ পিতার পক্ষ হইয়া বিদ্রোহ-দমনে সাহায্য করিতে পারেন।

† রিয়াজুস সালাতীন ও Steward's History of Bengal.

‡ "These two Zemindars therefore, having refused the summons to attend at the court of Moorshuadbda, were permitted to remain on their estates, on condition of regularly remitting their assessment, through an agent stationed at Moorshudabad."

(Stewart's History of Bengal)

এর নামানুসারে তাহার নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদও প্রচলিত আছে। কিন্তু লালবাধ তাহার পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়। তবে লালবাইওর নামে তাহার নামকরণ হইতে পারে। লালবাই এর প্রণয়ে পতিত হইয়া রঘুনাথসিংহ নিজ ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়ায়, এমন কি সকল লোককেই তাঁহার অনুগামী করিতে চেষ্টা করায়, সকলে মিলিয়া তাঁহার হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করে। তাঁহার প্রণয়িণীও তাঁহার পথানুসরণ করিতে বাধ্য হয়। রাজার মহিষী এবং তাঁহার পুত্র গোপালসিংহও এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহের পর তাঁহার পুত্র গোপাল-সিংহ ১০১৮ মল্লাব্দে বা ১৭১২ খৃঃ অব্দে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। গোপাল সিংহের রাজত্ব কাল ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান হইয়া যে নূতন রাজস্ব বন্দোবস্ত আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং নবাব হওয়ার পর যাহা পূর্ণতা লাভ করে, অবশেষে নবাব সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁর সময় যাহা কার্য্যে পরিণত হয়, বিষ্ণুপুরসম্বন্ধে সেই বন্দোবস্ত গোপাল সিংহেরই সহিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুর ও সেরপুর দুই পরগণায় তাঁহার ১,২৯,৮০৩৲ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়। * আবার গোপালসিংহের রাজত্বকালে সেই সুপ্রসিদ্ধ বর্গীর হাঙ্গামাও ঘটিয়াছিল। বিষ্ণুপুরে তাহারা বিশেষরূপে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বেরারের মহারাষ্ট্রীয় প্রধান রঘুজী ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্করপণ্ডিত পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্য লইয়া বঙ্গ-দেশে উপস্থিত হইলে, বাঙ্গলার তদানীন্তন নবাব আলি-বর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে বাধা প্রধানে উদ্যত হন। মহারাষ্ট্রীয়গণ বঙ্গসৈন্য আক্রমণ করিয়া নবাবকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে আশ্রয় লইতে বাধ্য করে এবং তাহারা কাটোয়া পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লয়। নবাব পরিশেষে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে
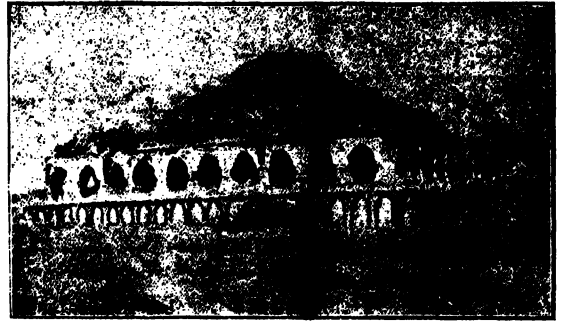
মদনমোহনের রাসমঞ্চ

কাটোয়ায় পরাজিত করিলে, তাহারা ১৭৪২ খৃঃঅব্দে পঞ্চ কোটের পার্ব্বত্য পথ দিয়া চলিয়া যাইবার অভিপ্রায় করে। কিন্তু সে পথে যাইতে অশক্ত হওয়ায়, বিষ্ণুপুরের বনপথে চন্দ্রকোনা দিয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হয়। * শিবরাও নামক মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি হুগলী হইতে বিষ্ণুপুরের দিকে প্রস্থান করেন। † এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা বিষ্ণুপুর-লুণ্ঠনের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা নগরমধ্যে প্রবেশ করিলে, রাজার সৈন্যেরা তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়া

* "Bishnupoor comprised in the chuckleh of Burdwan, and surrounded by the districts of the great Zemindary of this name of Midnapoor in Orissa and Pacheat, is affirmed to have been the inheritance of a Rajepoot family for 1021 years under a regular succession of 55 Rajahs, and only subject to a small peshcush or tribute to the sovereign of Bengal, untill the year 1715, soon after the commencement of Jaffer Khan's administration, when the country was more completely reduced, though yet imperftetly explored and conferred again in Zemindary tenure on Gopal Sing, the heir of line, assessed under the head of—perghs...1, 29, 803. (Fifth Report)

১৭১৫ খৃঃ অব্দে ১০২১ মল্লাব্দ হয়, এবং বিষ্ণুপুরে রাজ-পরিবারে রক্ষিত বংশপত্রে ও বিশ্বকোষের মল্লরাজ বংশে গোপাল সিংহ ৫৫ সংখ্যক রাজা। হণ্টার সাহেবের গ্রন্থে তিনি কিন্তু ৫৪ সংখ্যক।

* "So far from being able to hear of the enemy, Bha-sukur unable to open his way to his own frontiers, through such a difficult country, and at a loss how to manage with such an enemy at his heels found himself obliged to have the management of the march to Mir-habib; and that able General found means to bring him back to the woods of Bishenpur from whence he proceeded through the plain of Chendrocona, and at last emerged about Midnapur.". (Seir Mutaqherin)

† "ভাস্কর পণ্ডিতের পরাজয়সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া শিবারাও হুগলীর দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।" (রামপ্রাণ গুপ্তের রিয়াজুস্ সালাতীন্)

কিছুই করিতে পারে নাই। অবশেষে রাজসৈন্য দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়া কামান ছাড়িতে আরম্ভ করে। মহারাষ্ট্রীয়েরা দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, রাজা গোপালসিংহ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করা আপনার পক্ষে অসম্ভব মনে করিয়া সকলকে তাহাদের সুপ্রসিদ্ধ দেবতা মদনমোহনের আশ্রয় লইতে বলেন এবং হরিনামসংকীর্ত্তন করিতে উপদেশ দেন। রাজা ও নগরবাসীর প্রার্থনায় মদনমোহন দলমর্দ্দন (দলমাদল) কামান আশ্রয় করিয়া না কি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ইহার পরও যে মহারাষ্ট্রীয়েরা বিষ্ণুপুরে মধ্যে মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইত, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। গোপালসিংহের রাজত্বকালে বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ করিয়া কতকাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে বিষ্ণুপুর রাজ্যের আয় কমিয়া যাওয়ায়,
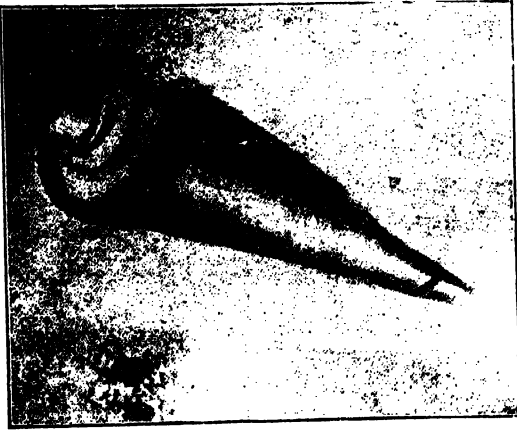
দলমাদল কামান

গোপালসিংহকে সরকার হইতে কতক রাজস্বের কমী দেওয়া হইয়াছিল।*। গোপালসিংহ একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, বীর হাম্বীরের পর বিষ্ণুপুর রাজগণের মধ্যে গোপাল সিংহেরই প্রবল ধর্ম্মানুরাগের কথা শুনা যায়। তিনি তাঁহার প্রজাবর্গকে প্রত্যহ হরিনামের মালা জপিবার জন্য বাধ্য করিয়াছিলেন। সকল লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা না করায় এই মালা-জপ 'গোপালসিংহের বেগার' বলিয়া কথিত হইত। গোপালসিংহ ধর্ম্মচর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকায়, জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণসিংহকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, কৃষ্ণসিংহই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ১০৩২ মল্লাব্দে বা ১৭২৬ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণসিংহ রাধাগোবিন্দের মন্দির নির্ম্মাণ করেন ; তাঁহার মহিষী রাণী চূড়ামণি ১০৪৩ মল্লাব্দে বা ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে রাধামাধবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। *

গোপালসিংহের পর তাঁহার পৌত্র এবং কৃষ্ণসিংহের পুত্র চৈতন্যসিংহ বিষ্ণুপুর রাজ্যের অধীশ্বর হন। †

* "Gopal Sing, his (Disjea Sings) second son, from 1135 to 1150 (fussullee) and subsequently stands rated in the Ausil Toomary, or net original rent-roll for the two pergunnahs of Bishenpoor and Sherpoor, comprizing the whole of his territory in Bengal in the sum of sicca Rupees 1,29,803, reduced at the last mentioned period in consideration of the Maharatta devastations to teshkheessy revenoue of 1,11,803, and including at all times what was called peshcush or tribute of 17,806 rupees" (Fifth Report)

* "মল্লাব্দে পক্ষরামাম্বরশশিগণিতে ফাল্গুনে শুক্লপক্ষে
রাধাগোবিন্দপাদামলতলে বেদয়ন্ যত্নতো ভক্তিমালাং।
শ্রীশ্রীগোপালসিংহক্ষিতিপতিকৃতিনা যৌবরাজ্যেঽভিষিক্তঃ
শ্রীল শ্রীকৃষ্ণসিংহঃ সুরুচিরসমলং সৌধরত্নং দদৌ তৎ ॥

(রাধাগোবিন্দ)

Dr. Bloch ১০৩২ মল্লাব্দের স্থলে ১০৩৫ বলেন, সম্ভবতঃ তিনি 'পক্ষ' শব্দের স্থলে পঞ্চ পাঠ করিয়াছিলেন।

"মল্লাব্দে গুণবেদখেন্দুবিমিতে শ্রীরাধিকামাধব-
প্রীত্যৈ সৌধমিদং সুধাংশুবিমলং মাঘে দদৌ চিত্রিতং।
শ্রীশ্রীমল্লমহীমহেন্দ্রগুণবিদ্‌গোপালসিংহাত্মজ-
শ্রীলশ্রীযুক্তকৃষ্ণসিংহমহিষী শ্রীশ্রীলচূড়ামণিঃ ॥"

(রাধামাধব)

বিশ্বকোষে ইহার অনুরূপ পাঠ আছে। History of Bishnupur Raj গ্রন্থে 'বিমিতে'র স্থলে 'মিলিতে' আছে।

Dr. Bloch ১০৩২ মল্লাব্দে বা ১৭২৬ খৃঃ অব্দে গোপাল সিংহের নির্ম্মিত যোড় মন্দিরের কথা লিখিয়াছেন। বিশ্বকোষে ১০৪০ মল্লাব্দে বা ১৭৩৪ খৃঃ অব্দে গোপালসিংহের নির্ম্মিত চৈতন্যদেবের মন্দিরের কথা লিখিত আছে।

'মল্লাব্দে ব্যোমবেদাম্বরবিধুগনিতে মাঘে পক্ষে চ শুক্লে
সৌধেঽলঙ্কারযুতে নৃপগুণরচিতে শ্রীলশ্রীচৈতন্যচন্দ্রঃ।
শ্রীনিত্যানন্দসঙ্গী সুরুচিরমুদিতঃ শ্রীশ্রীগোপালসিংহ
ক্ষৌণীভর্ত্তৃপ্রিকামং পরমকরুণয়া পূরয়েদ্ ভাগধেয়ং ॥"

বিশ্বকোষে প্রথম চরণের 'মাঘে' স্থলে 'মাসি' ও তৃতীয় চরণের 'শ্রীনিত্যানন্দসঙ্গী'র স্থলে 'রাজত্যানন্দসঙ্গী' আছে। আমরা যাহা লিখিলাম, সম্ভবতঃ তাহাই হইবে।

† History of Bishnupur Rajএ রাজপরিবারে রক্ষিত বংশপত্রে

তিনি ১০৫৪মল্লাব্দে বা ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যসিংহের রাজত্বকাল ঘোর অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামার অব্যবহিত পরেই তিনি রাজত্বারম্ভ করেন। তাহার অল্পকাল পর হইতেই বাঙ্গলার মসনদ লইয়া যে রণ ক্রীড়ার অভিনয় চলিয়াছিল; এবং ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের বিভীষিকায় দেশমধ্যে যে হাহাকারের রোল উঠিয়াছিল, তাহাতে চৈতন্যসিংহ নিরাপদে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তাহার পর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্ববংশীয় দামোদরসিংহ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, কিছুকাল বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। অবশেষে উভয়ের মধ্যে রাজত্ব লইয়া মামলা মোকদ্দমাও চলিয়াছিল। রাজস্বপ্রদানে অশক্ত হওয়ায়, চৈতন্যসিংহ কারাগারেও নিক্ষিপ্ত হইরাছিলেন। তাঁহার সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজস্ববৃদ্ধি চরম সীমায় উঠিয়াছিল। আমরা ক্রমে ক্রমে সংক্ষেপে সেই সকল বিষয়ের পরিচয় দিতেছি।

চৈতন্যসিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, কিছুকাল পরে নবাব আলিবর্দী খাঁ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। আলিবর্দ্দীর শেষ আমল পর্য্যন্ত বর্গীর হাঙ্গামার বিষময় ফল সমস্ত পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীরাই ভোগ করিয়াছিল। তাহার পর সিরাজ-উদ্দৌলা বাঙ্গালার মসনদে বসিয়া বিশ্বাসঘাতকদিগের ষড়যন্ত্রে রাজ্যচ্যুত হইলেন ও জীবন হারাইলেন। মীরজাফর খাঁ ইংরেজদিগের সাহায্যে নবাবী লাভ করিলেন। ইংরেজেরা মীরজাফরের নিকট হইতে অনেক বিষয়ের সুবিধা করিয়া লইতে লাগিলেন। তাঁহারা জিনিসপত্রক্রয়ের শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য জমীদারদিগের নামে নবাবের পরওয়ানা বাহির করাইলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরের রাজা সে পরওয়ানা না মানিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় শুল্কের জন্য তাঁহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।*

গোপালসিংহের পর চৈতন্য সিংহেরই নাম আছে। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, গোপালসিংহের জীবিতকালে কৃষ্ণসিংহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন। বিশ্বকোষের মল্লরাজবংশে কিন্তু গোপালসিংহের পর কৃষ্ণসিংহের ১০ মাস রাজত্ব করার কথা আছে। গোপালসিংহের জীবিতকালে কৃষ্ণসিংহ যে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

* Long's Selections from unpublished Records, proceedings, November 3, 1757.

তাহার পর ১৭৬০ খৃঃ অব্দে শাহাজাদা আলিগহর পরে বাদশাহ শাহআলম বাঙ্গলা আক্রমণ করিয়া বসেন। তাঁহার সেনাপতি কামগার খাঁ মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইলে, নবাব মীরজাফর খাঁ ইংরেজদিগের সাহায্যে তাঁহাকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করেন। এই সময়ে শিবভট্ট ও বাবুজান নামে দুই জন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বিষ্ণুপুরে আসিয়া, রাজা চৈতন্যসিংহকে আপনাদের সঙ্গে লইয়া বাদশাহের পক্ষে যোগদান করিতে অগ্রসর হন। তাঁহাদের সাহায্য পাইয়া কামগার খাঁর উৎসাহ বাড়িয়া যায়। * কিন্তু নবাব ইংরেজদিগের সাহায্যে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া বিহারের দিকে বিতাড়িত করিয়া দেন। ইহাতে চৈতন্য সিংহের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। দামোদর সিংহ পূর্ব্ব হইতে বিষ্ণুপুরের রাজত্বলাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। কথিত আছে যে, সিরাজ-উদ্দৌলার সময় একবার চেষ্টা করিয়া তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এবার কিন্তু তাঁহার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। মীরজাফর চৈতন্যসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, দামোদরসিংহ বিষ্ণুপুরের রাজগদীতে বসিলেন। তিনি ১৭৬১ ও ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে যে বিষ্ণুপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা জানা গিয়া থাকে। † আবার এরূপও দেখা যায় যে ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে নবাব মীরকাশীম চৈতন্যসিংহের সহিত বিষ্ণুপুরের রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ‡ দামোদরসিংহ মীরজাফর

* "During all these movements, two Marhatta commanders of character, namely Shyu-bahat and Babu-dian, with the Radja of Bishenpur, came to join the Emperor, to whom they paid their respects. This junction of so much light cavalry put Camcor qhun upon exerting himself." (Muatqherin)

† Long's selections from unpublished records হইতে জানা যায় যে, ১৭৬১ খৃঃ অব্দের প্রথমে বিষ্ণুপুরের রাজা দামোদরসিংহের কোন কোন কর্ম্মচারী তাঁহার বাটী ও রাজ্যাদি লুণ্ঠন করায় রাজা কলিকাতা কাউন্সিলে সে বিষয়ে পত্র লিখিয়াছিলেন। আবার ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে কোন ঘোড়ার সওদাগরের মূল্য মিটাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে কলিকাতা কাউন্সিল হইতে পত্র লেখা হইয়াছিল।

‡ Fifth report

ও ইংরেজদিগের পক্ষে থাকায়, মীরকাশীম সম্ভবতঃ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আবার চৈতন্য সিংহকে বিষ্ণুপুর রাজ্য প্রদানের চেষ্টা করেন। * কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। কারণ, আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে দামোদরসিংহই বিষ্ণুপুরের রাজপদে আসীন ছিলেন। চৈতন্য সিংহ কিন্তু তাহার পর আবার ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে বিষ্ণুপুরের রাজত্ব ভার প্রাপ্ত হন। দামোদর সিংহ মোকর্দ্দমা করিয়া অর্দ্ধেক রাজত্বলাভের আদেশ পাইয়াছিলেন, কিন্তু আপীলে চৈতন্যসিংহই সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। দামোদরসিংহ কেবলমাত্র খোরপোষের ব্যয় পাইবার অধিকারী হইয়া ছিলেন। তাহার পর দামোদর সিংহ পুনর্ব্বার আবেদন করায়, ১৭৯১ খৃঃ অব্দে তিনি অর্দ্ধেক সম্পত্তিলাভের আদেশ পান। অবশেষে উভয়ের মধ্যে আপোষ মীমাংসা হইয়া চৈতন্যসিংহ অধিকাংশ সম্পত্তিই প্রাপ্ত হন। † দামোদরসিংহ জামকুঁড়ি নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। মীর কাশীমের সময় হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চৈতন্যসিংহের সহিত ক্রমাগত বর্দ্ধিত হারে রাজস্বের বন্দোবস্ত হইয়া ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে ৪,৫১,৭৫০৲ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়। ‡ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তাঁহাকে ৪ লক্ষ সিক্কা টাকার বন্দোবস্ত লইতে হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত নানা কারণে বিষ্ণুপুর রাজ্যের দুরাবস্থা ঘটায় এবং দস্যুতস্করে লুণ্ঠন করায়, চৈতন্যসিংহ ঐরূপ অতিরিক্ত রাজস্ব দিতে অশক্ত হইয়া পড়েন, এবং তজ্জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে আসিষ্টাণ্ট কালেক্টার মিষ্টার হেসিলরিজ তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। *। কারামুক্ত হওয়ার পরে তাঁহার সহিত দশ-

গড় খাইয়ের উপরে দুইটী কামান

শালা বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু সে অতিরিক্ত রাজস্বপ্রদানে তাঁহার ক্ষমতা না থাকায়, ক্রমে ক্রমে তাঁহার জমীদারি

---

* Long's Selections from unpublished records হইতে জানা যায় যে, ১৭৬২ খৃঃ অব্দের ১লা নবেম্বরের কাউনসিলের কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, বর্দ্ধমান হইতে এইরূপ সংবাদ আসে যে, বীরভূমের ফৌজদার নবাব মীর কাশীমের আদেশে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটের রাজাকে তাঁহার অধীনে আনিবার ও তাঁহাদের রাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য যাইতেছেন।

† Bankura District Gazetteer.

‡ "Under Choiten Sing, the present occupant, gra ndson of Gopaul, in 1164, the assessment of this district was brought back to its former standard, by levying the abwab chout. In 1169, with the additional increase of the serf Sicca, the established rental was 1,36,045. In 1172, after restoration of the teshkeessy deduction, it rose to 1,61,044, of which M. R. Khan, only gives credit in the public bundoobust, rendered for 1,43, 544, including muscoorat particulars as follows ; viz, nanker to the Zamindar himself 658, neemtooky caunongoyaee, 306 ; and paikan, 2,500 making altogether 3464 rupees, as the compromised mofussil charger of management to be subtracted from the annual gross collections. The following year, a further arbitrary import of 56,455 was added to the former Jumma subjected then to a muscoorat deduction of 7,498 Rs. In 1177, under the auspecies of a British Supervisor, the constitutional mode of settlement by a regular hustabood, seems to have been adopted with considerable advantage in point of income, notwithstanding the ravages of the famine, and in 1178, the jumma kanmil, or highest complete valuation of the whole territory, capable of realization, appears to have been ascertained thus, progresslively, and then fixed in gross at sicca Rupees 4,57750 arising from 79 hoodas or farms clased under 10 new pergunnah divisions."

(Fifth Report)

* Hunter's Annals of Rural Bengal.

বিক্রীত হইতে থাকে। চৈতন্য সিংহ দারুণ দুরবস্থায় নিপতিত হইয়া, তাঁহাদের কুলদেবতা মদনমোহনকে কলিকাতা বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্রের নিকট বন্ধক দিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহাকে আর ফিরাইয়া লইতে পারেন নাই, মদনমোহন এক্ষণে বাগবাজারেই অবস্থিতি করিতেছেন। মীরজাফর নবাব হইবার সময় কোম্পানীকে যে টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ করিতে না পারিয়া, বর্দ্ধমান চাকলা প্রভৃতির তহশীল কোম্পানীর হাতে ছাড়িয়া দেন। সেই সঙ্গে বিষ্ণুপুরও কোম্পানীর হাতে আসে। তাঁহারা কালেক্টার আদি নিযুক্ত করিয়া বিষ্ণুপুরে রাজস্ব আদায়ের ও তাহার শাসন কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু দস্যুতস্করের উপদ্রবে তাঁহাদিগকে অনেক দিন পর্য্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কাজেই চৈতন্যসিংহের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ১৮০২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত চৈতন্যসিংহ জীবিত ছিলেন। তাঁহার জীবিত কালেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মদনমোহনসিংহ পরলোক গমন করেন। চৈতন্যসিংহও পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি অনেক ব্রাহ্মণকে ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। ১০৬৪ মল্লাব্দে বা ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার নির্ম্মিত রাধাশ্যামের মন্দির আজিও চৈতন্যসিংহের ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিতেছে।*

চৈতন্য সিংহের পর তাঁহার পৌত্র: মাধবসিংহ বিষ্ণুপুরের সম্পতির অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজস্বপ্রদানে অশক্ত হওয়ায়, তাঁহার অবশিষ্ট সম্পত্তি ১৮০৬ খৃঃ অব্দে বিক্রীত হইয়া যায় এবং বর্দ্ধমানের রাজা তাহা ক্রয় করিয়া লন। এইরূপে বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ জমীদারী বর্দ্ধমান জমীদারীর অন্তর্ভূক্ত হইয়া গিয়াছে। সামান্য দেবোত্তরাদি সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হওয়ায়, মাধবসিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, এবং বাঁকুড়া কালেক্টারী আক্রমণ করিয়া বসেন। কিন্তু বন্দী হইয়া কলিকাতায় নীত ও কারাগারে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। তাঁহার পুত্র গোপালসিংহ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাসিক চারিশত টাকা মাত্র বৃত্তি পাইয়াছিলেন। গোপালসিংহের দুই পুত্র রামকৃষ্ণসিংহ ও রামকিশোর সিংহ প্রত্যেকে দুই শত টাকা করিয়া বৃত্তি পান। রামকৃষ্ণ সিংহ অপুত্রক প্রাণ ত্যাগ করিলে, তাঁহার বিধবা রাণী রামকৃষ্ণের ভাগিনেয় নীলমণিসিংহকে সম্পত্তি দান করেন। নীলমণি সিংহ একমাত্র পুত্র ও পত্নীকে রাখিয়া, পরলোকগত হন। মাতাপুত্রে গর্ভণমেণ্টের নিকট হইতে ৭৫৲ টাকা অন্ত-বৃত্তি পাইতেন। সেই শিশুপুত্র রামচন্দ্রও স্বর্গগত হইয়াছেন। তাঁহার বিধবা মাতা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে, বিষ্ণুপুর রাজবংশের সহিত আপনারও ভাগ্যের কথা স্মরণ করিতেছিলেন, সম্প্রতি তাঁহারও অবসান ঘটিয়াছে।

‘সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই’। বিষ্ণুপুরেরও সেই কথা। রাজবংশের অস্তিত্বই নাই, আর বিষ্ণুপুরও এক্ষণে ধ্বংসের শেষ মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা ভগ্নস্তূপের আধার হইয়া উঠিয়াছে। বিষ্ণুপুর দুর্গ এক্ষণে কেবল তাহার প্রবেশ দ্বার পাথর দরজায় ও স্থানে স্থানে পরিখার চিহ্নে তাহার পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। পাথর দরজা ঝামা পাথরে নির্ম্মিত। এই দ্বিতল তোরণ-দ্বারের দুই পার্শ্বে বাণ বা গুলি নিক্ষেপের ছিদ্র আছে। দুর্গমধ্যে একটী দালানে দুর্গাধিষ্ঠাত্রী মৃন্ময়ী দেবী বিরাজ করিতেছেন। তিনি অষ্টশক্তিসমন্বিতা দশভুজা মূর্ত্তি। দুর্গনির্ম্মাণের সময় ইহার মুখমণ্ডল ভূগর্ভে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রাজপ্রাসাদ এক্ষণে ভগ্নস্তূপে পরিণত। দুর্গের বাহিরে কতকগুলি কামান দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে দলমর্দ্দন বা দলমাদলের নামই উল্লেখযোগ্য। বর্গীর হাঙ্গামার সময় এই দলমর্দ্দন অগ্নিময় গোলা উদ্গিরণ করিয়া বর্গীদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। দলমর্দ্দনের দৈর্ঘ্য প্রায় ১২॥০ ফুট ও ব্যাস প্রায় ১ ফুট হইবে। দুর্গের বাহিরেপ্রাচীন বাঁধসকলের কতকগুলি শুষ্কাবস্থায় ও কতকগুলি অর্দ্ধ

---

* শ্রীরাধাশ্যাম চন্দ্রাঙ্ঘি ভ্রমররসিজতলে দিব্যমেতৎ সুশোভং, মল্লাব্দে বেদকালাম্বরবিধুগণিতে বাহুলে পৌর্ণমাস্যাং। গেহং নানা বিচিত্রং বিমিত মতি দৃঢ়ং পুজিতশ্চাপি ভক্ত্যা, শ্রীচৈতন্যো নৃপেন্দ্রঃ শুভকৃতি
নিপুণঃসম্প্রযচ্ছেৎ সভায়াম্ ॥

শকাব্দা ১৬৮০
(রাধাশ্যাম)

এই রাধাশ্যামের মন্দিরেই কেবল মল্লাব্দের সহিত শকাব্দা লিখিত আছে। বিশ্বকোষে ও History of Bishnupur Rajএ এই মন্দিরলিপির পাঠের কিছু কিছু ভুল আছে।

ভগ্নাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। ইহারা লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, গাঁতাত বাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দী বাঁধ, শ্যাম বাঁধ এবং পোকা বাঁধ এই সাত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লালবাঁধই ইহাদের মধ্যে রমণীয়, ইহার বাঁধাঘাটে একটী সাধু আশ্রম করিয়াছেন। এই সকল বাঁধের ধারে পূর্ব্বে রাজাদের প্রমোদ-কানন ছিল। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি ভগ্নাবস্থায় পরিণত হইলেও আজিও বাঙ্গলা স্থাপত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে বিরাজ করিতেছে। বঙ্গদেশে যে একটী স্বতন্ত্র স্থাপত্য-রীতি প্রচলিত আছে, বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি হইতে তাহার বিশেষরূপই পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের কতকগুলি ইষ্টকে ও কতকগুলি ঝামা পাথরে নির্ম্মিত। ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরের মধ্যে শ্যামরায় ও মদনমোহনের মন্দির প্রসিদ্ধ। আর ঝামা-পাথরের মন্দিরের মধ্যে লালজী, রাধাশ্যাম ও মদনগোপালের মন্দিরই প্রধান। শ্যামরায় এবং মদনগোপালের, মন্দির পঞ্চরত্ন শ্রেণীর সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল। বাঙ্গলার চালের ন্যায় নির্ম্মিত যোড়-বাঙ্গলা ও বিশিষ্ট স্থাপত্যবিদ্যার পরিচায়ক। বিষ্ণুপুরের অনেকগুলি মন্দিরের গাত্রে নানা দেবদেবীর ও অন্যান্য অনেক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দশাবতারের মূর্ত্তির-বুদ্ধের স্থলে জগন্নাথ-মূর্ত্তি দেখা গিয়া থাকে। * এই সকল মন্দিরের মধ্যে মল্লেশ্বর, মদনমোহন, মুরলীমোহন এবং মদনগোপালের মন্দির নগরমধ্যে, শ্যামরায়, যোড়-বাঙ্গলা, লালজী ও রাধাশ্যামের মন্দির দুর্গ মধ্যে এবং যোড়-মন্দির, কালাচাঁদ, রাধাগোবিন্দ, রাধামাধব প্রভৃতির মন্দির লাল-বাঁধের ধারে অবস্থিত। অধিকাংশ মন্দিরই দেবতাহীন, দেবতাসকল রাধাশ্যামের মন্দিরে সমবেত হইয়াছেন। পূজার্চ্চনার সুবিধার জন্য রাজপরিবার এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাধাশ্যামের মন্দিরে অষ্টোত্তরশত 'রাধা-গোবিন্দ' নামযুক্ত একখানি বিশাল প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরগুলি প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষা আইনের অধীনে আসিয়া আপাততঃ ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। বিষ্ণুপুর নগরও এক্ষণে সামান্য একটী সহর মাত্র, বাঁকুড়া জেলার ইহা একটী উপরিভাগ। সে অমরাবতীতুল্য বিষ্ণুপুরের কোনই চিহ্ন নাই, অনেকস্থলে জঙ্গলপরিপূর্ণ। তবে বিষ্ণুপুর আজিও সঙ্গীতচর্চ্চার ও সুবাসিত তামাকের জন্য বঙ্গদেশমধ্যে আপনার নাম বিস্তার করিতেছে।

* যাঁহারা জগন্নাথকে বুদ্ধমূর্ত্তি বলেন, তাঁহারা বিষ্ণুপুরের বুদ্ধাবতার জগন্নাথের কথা প্রমাণ দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু বুদ্ধ অবতার, জগন্নাথ প্রতিমা বা মূর্ত্তি। অবতারের ও মূর্ত্তির অভিন্নতা আমরা বুঝিতে পারি না।

ফিরে পাওয়া

(গল্প)

[শ্রীঅসিতকুমার সেন বি-এল]

সব গল্প যেখানে শেষ হয় এ গল্পের আরম্ভ হচ্ছে সেই-খানেই,—তারা (অর্থাৎ বিভাস আর সবিতা) বেশ সুখে ঘর-করণা করতে লাগল'।

কিন্তু সত্যি কি তাই ?

নিজের সংসারে এসে সবিতা ঘরদোর বেশ মনের মত সাজিয়ে ফেল্‌ল। তারপর যৌবনের অফুরন্ত আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে দিন কাটাতে লাগল। সুখের সীমা নেই। কপোত-কপোতীর মত আপনাদের প্রেমে মাতোয়ারা। বাইরের দিকে চাইবার অবকাশ তাদের নেই। এই তো জীবন!

বাড়ীর সদরে 'ট্যাবলেট' মারা হ'ল "নীড়"। রেডিও এল। রোজ সকালে ও সন্ধ্যার পর টেবিল হারমোনিয়মের সঙ্গে মিলিয়ে সবিতা তার অনিন্দ্যকণ্ঠ চারিদিকে ছড়িয়ে দিত। দুটী পাখী পোষা হ'ল,—কাকাতুয়া আর টিয়া। আপিসের কার কাছ থেকে একটা টেরিয়ার কুকুর আনা হ'ল—তার নাম 'টম'। আর হ'ল বাড়ীর সামনেই তাদের

দুজনের যত্নে দুই শ্রেণীতে বসান নানারকম ফুলের গাছ,—মধ্যে লাল সুরকীর পথ। মোট কথা তাদের এই নীড়কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করতে যত্নের ত্রুটি করে নি। ছোট সংসার—দুজনের প্রাণদিয়ে গড়া। এ সংসারের এমন মাধুর্য্য যে, ছটায় আপিসের ঘড়িতে ছুটির ঘণ্টা পড়তে না পড়তেই দেখা যেত বিভাস তার ডেস্ক বন্ধ করে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। আর বাড়ী পৌঁছেছে সাতটা বাজতে ১০ মিনিট। এই সময়টুকু বাসে ট্রেণে এবং পদব্রজে কেটে যেত। রোজ এই রকম; কখনও এর ব্যতিক্রম হয় নি। সে পাড়ায় আরও দু'চারজন ঐ আপিসে কাজ করত,তাদের স্ত্রীরা কিন্তু বুঝতে পারতেন না কেমন করে বিভাস অত শীঘ্র বাড়ী ফেরে।—সবিতার বুক গর্ব্বে ও আনন্দে ফুলে ওঠে; গোপনে সে দেবতাকে প্রণাম জানায়।

রোজ একরকম। সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই টম্ ডেকে ওঠে, আর সেই মুহূর্ত্তেই সবিতা দরজা খুলে দাঁড়ায়। টম্ লাফিয়ে ওঠে প্রভুর কোমরে, শোনা যায় মিষ্টহাসিতে ভরা দুচারটী প্রশ্ন ও তেমনই হাসিমাখা উত্তর।

সুন্দর তাদের ছোট বাগানটীতে সব রকম ভাল গাছই আছে। সবিতা বলত,—"কেবল একটা স্থলপদ্মের গাছের অভাব। ঠিক এই গোলাপ গাছের মাঝখানে"—।

"বাস্তবিকই কি সুন্দরই মানাত! কিন্তু কোথা থেকে যোগাড় করা যায় বল তো।"

"বোসেদের বাড়ী আছে। ওদের কাছে চাইলেই একটা দেবে।"

"ছিঃ সবি, সামান্য একটা গাছ তাও চাইতে হ'বে বিশেষ করে ওদের কাছে। ওরা আমাদের হিংসেয় মরে।"

"তা হ'লে কিনে এন।"

"হাঁ, আপিসের চৌধুরীর সঙ্গে গিয়ে নিয়ে আস্‌ব'।"

পরদিন আপিসের পর বিভাস চৌধুরীর সঙ্গে হগ্-সাহেবের বাজারের ষ্টল থেকে একটা গাছ নিয়ে এল। সেদিন তার হাতে যে গাছ দেখা গেল অমন সুন্দর স্থল-পদ্মের গাছ আর ও গাঁয়ে দেখা যায় নি।

সেদিন আরও একটা জিনিস দেখা গেল—একেবারে অদৃষ্টপূর্ব্ব,—সবিতার ম্লান মুখে ঈষৎ ভ্রূকুটি! গম্ভীরমুখে সে বল্‌ল—"এখন আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট।"

"হাঁ। কেন?—ওঃ দেরী? এই গাছ কিন্‌তে যেতে হ'ল।"

"কিন্তু তুমি যে রোজ সাতটা বাজতে দশ মিনিটে বাড়ী আস।"

"তা বটে,—কিন্তু, কি মুস্কিল। দেখে শুনে কিন্‌তে হ'ল। ওসব কথা থাক্। দেখ, কি সুন্দর ফুল,"—বলেই সে তাকে আদর-সোহাগে জড়িয়ে ধরল'।

সবিতার কিন্তু রাগ তখনও যায় নি; অভিমান-ক্ষুণ্ণস্বরে সে বললে,—"কেন তুমি ঠিক সময়ে এলে না। আজ রেডিওতে 'মানভঞ্জন' প্লে ছিল, শুন্‌বে বলেছিলে। আমারও শোনা হ'ল না। তারপর 'পাকপ্রণালী' থেকে দু-রকম খাবার তৈরী করলুম, সব খারাপ হয়ে গেল।"

"কিন্তু তুমিই তো গাছ আন্‌তে বলেছিলে!"

কথায় কথা বাড়ে। তাদের ভিতর দাম্পত্য-কলহ—এই প্রথম। যথারীতি মানভঞ্জন হ'ল এবং বিভাস প্রতিজ্ঞা করলে আর কখনও এমন হবে না।

তার পরদিন বিভাস যথাসময়েই, অর্থাৎ ৭টা বাজতে দশমিনিটে বাড়ী এল। এইরকম আবার চলতে লাগল—দিনের পর দিন।

একদিন বাড়ীতে ঢুক্‌বে এমন সময় মহকুমার হাকিমের সঙ্গে দেখা। তিনি তাদের বাগানের অজস্র সুখ্যাতি করলেন—বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন। কাজেই বাড়ী ঢুকতে বিভাসের দেরী হ'ল। কিন্তু বাগানের প্রশংসার কথা শুনে—বিশেষ করে হাকিমের মুখে—সবিতার ম্লান মুখে গৌরবের হাসি দেখা দিল।

এই রকম প্রায়ই হ'তে লাগল। হাকিম ঠিক ঐ সময়ে বেড়াতে বেরুতেন আর রোজই বিভাসের সঙ্গে দেখা হ'ত। সুতরাং বাড়ী ঢোকার সময় পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল এবং সাধারণতঃ বাড়ী ঢোকার সময় হল সাতটা বেজে দশ মিনিট।

কিন্তু তা বলে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা না কয়ে—বিশেষ করে তিনি যখন বিভাসের স্ত্রীর যত্নে পুষ্ট বাগানের অজস্র প্রশংসা করেন, সেটা না শুনে চলে

আসা যায়! বিভাস তো চলে এসে কখনই অভদ্রতা করতে পারে না।

তারপর—আজ ওখানে আগুন-লাগা, কাল আফিসের সাহেবের বিদায়-ভোজ—এই রকম একটা না একটা লেগেই আছে। আর সেদিন ছেলেবেলার বন্ধু অনিলের সঙ্গে দেখা। প্রায় একযুগ পরে দুজনের মিলন। সেদিন পৌণে দশটায় বাড়ী ফিরল'। বাড়ীতে এসে খাওয়া দাওয়া হ'ল না। বিভাস অনিলের সঙ্গে 'ন্যাশন্যাল হোটেলে' খেয়ে এসেছে। তাদের সংসারে রাত্রিতে একসঙ্গে আহারের ব্যবস্থা ছিল।—ঝড় ওঠবার আগে প্রকৃতির স্তব্ধ ভাব। সবিতা বিছানায় শুয়ে রইল'। সেদিন রাত্রিতে সে আহার করিল না। তারপর ঝড় উঠ্‌ল'। কথার পর কথা—চোখের জলে নিবৃত্তি।

এই ভাবে বাড়ী আসার নির্দ্দিষ্ট সময় বলে কিছু রইল না। সেই শান্তির নীড়ে আজকাল অশান্তি বাসা বাঁধিল। কারও আর কোন বিষয়ে যত্ন নেই। রেডিওর 'কাণ' তোলা রইল তাকে। হারমোনিয়মের চাবীর ওপর একরাশ ধুলা জমল'। পাখী দুটা শেখান বুলি ভুলে চাঁ চাঁ করতে শিখল'। দুজনে নেহাৎ প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া আর কথা বলে না। বুকের মধ্যে কিন্তু দুজনেরই ব্যথা পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠতে লাগল'।

এ' রকমভাবে কতদিন কাটত বলা যায় না। কিন্তু একদিন আপিসে গিয়ে শুন্‌ল, খুড়োর বিয়ে।

আপিসের বিশ্বনাথ সরকারী খুড়া। অনেক দিন একলা জীবনতরী ভাসিয়ে আজ একজন কর্ণধারের প্রয়োজন বোধ করেছেন। বিভাসের মনে বিবাহের দিনের কথা মনে পড়ল'—কত আশা, কত উৎসাহ সে-দিন!

আপিসের কাজ আর কেউ মনোযোগ দিয়ে করল' না বেয়ারাগুলাও পাগড়ীতে সাবান মাখাতে সুরু করল'।

আপিসের পর বাড়ী আসবে বলে বেরোতেই সবাই 'হাঁ. হাঁ' করে ধরে ফেল্‌ল, "কি হে যাচ্ছ কোথায়।"

"বাড়ী।"

"By Jehova বাড়ী কিহে। 'শ্রীমুখপঙ্কজ' একদিন না দেখলে এমন কিছু ক্ষতি হ'বে না। ধন্যি টান বাবা। আমাদের তো বাড়ী যেতে মনই সরে না। ও প্যান্‌প্যানের চেয়ে আপিসে—"

বুড়ো বিপিনবাবু ধরলেন, "হাঁ আপিসে গৌরাঙ্গদেবের খিচুনী খেয়ে ভাল থাকি, নয় বাবা! আহা কিন্তু বুঝলে ভাই তবুও সারাদিনের পর সেই দেবী যিনি 'হস্তীরূপেণ সংস্থিতা' তার আঁচলের পাশে না বস্‌লে মনটা কেমন করে। আদর করবার তাঁর অবকাশ নেই, চাদর এনে বলেন যাও দিকি এখন বেরিয়ে—'আড্ডায় যাও। বলি 'প্রেয়সী মুগ্ধময়ী', অমনই বলে বসেন, 'মরণ আর কি যাও ছেলে মেয়ে এখনি কেউ দেখবে বুড়ো হচ্ছেন যত'—মুখ নামিয়ে সুড় সুড় করে দাবায় গিয়ে বসি। চল্ ভাই চল্ বিভাস, আজকের অদর্শনে দেখবি ভালবাসা একেবারে জমে দই হয়ে গেছে, কাল এক এক চামচ তুল্‌বি আর খাবি আর বলে; রাখলাম গিন্নীর শ্রীমুখপঙ্কজ অভিমানের আঁচে লাল হ'য়ে বড়ই সুন্দর দেখাবে।

বিভাসকে বরযাত্রী হয়ে বনগাঁয়ে যেতে হ'ল। সে রাত্রে ফেরবার গাড়ী ছিল না। সারারাত হট্টগোলে কেটে গেল। বিভাসের মনের অলিন্দে সবিতা কেবলই ঘোরাঘুরি করতে লাগল'।

ভোরবেলা বিভাস তাদের গাঁয়ের ষ্টেশনে পৌঁছল। বাড়ী খানিক দুর। প্রথম প্রথম সে খুব জোরে হাঁট্‌তে লাগল'। কিন্তু বাড়ী যতই কাছে আসতে লাগল' তার গতিও তত মন্দ হ'তে লাগল'। ঐ যে পাড়া দেখা যাচ্ছে। রাস্তা জনশূন্য—দোকানপাট এখনও খোলে নি।

কোথায় রাত কাটালাম, কেন কাটাতে বাধ্য হলাম, সব কথা খুলে বল্লে কি ছাই বিশ্বাস করবে—আর কেনই বা প্রতিজ্ঞা করতে গেছলুম।

বিরক্তিতে আর সারারাত্রির মাতামাতিতে চোখ বুঁজে আসতে লাগল।

রাস্তার মোড় ঘুরতেই অদূরে তাদের বাড়ী দেখা গেল। এখন চারিদিক বেশ পরিষ্কার হয়েছে। দুচারটে গরুর গাড়ী যাওয়া-আসা করতে আরম্ভ করেছে। বাড়ীগুলার খিড়কীতে লোকের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে।

এখনও তাদের বাড়ীটা আন্দাজ দেড়শত হাত দুরে। বিভাসের পায়ের জোর কমে এল। মনে হ'ল তাই তো কেমন করে বাড়ী ঢুকি। লজ্জা হতে লাগল। বাড়ী গিয়ে কি বলব'! বাড়ীর বন্ধ জানালার দিকে চোখ

পড়ল'। বলবার কিছু থাকলেও অবকাশ পাব না।

তাদের বাড়ীর কিছুদূরের একটা বাড়ীর দরজা খোলার শব্দ তার কাণে এল। অমলদের বাড়ী। হাঁ অমলের এ সপ্তাহে সকালে 'ডিউটি'। এই অমল বিভাসকে বড় ঠাট্টা করত' এবং তাদের একটু ঈর্ষার চোখেও দেখত'। অমল দেখবে তো সকাল বেলা বাড়ী ফিরছি। সে ভাববে আমাদের প্রেমের বন্ধনটা একটু শিথিল হয়েছে! তা কখনও হ'বে না। সে ঘুরে পড়ল যে দিক দিয়ে এসেছিল সেদিকেই আস্তে আস্তে চল্‌তে লাগল। বেশীদূর যেতে না যেতেই সে অমলের সামনে পড়ে গেল। সে প্রশ্ন করলে—"কি হে, তুমি যে এত সকালে বেরিয়েছ ?"

"হাঁ"।

"আজকের দিনটা বড় সুন্দর না! কেমন বাতাস দিচ্ছে!"

"হাঁ।"

"তোমার বাগান থেকে কেমন মিষ্টি হাওয়া আস্‌ছে। আঃ!"

"হাঁ"।

"ও কি! তোমার কি হ'ল হে সব কথাতেই এক 'হাঁ' ছাড়া আর কোন কথা তোমার মুখ থেকে বেরুচ্চে না।"

"হাঁ"। এবার অমল প্রাণভরে হেসে উঠল'। তারপর জিজ্ঞাসা করলে,"তুমি কি বাসে যাবে না ট্রেণে। ট্রেণের তো দেরী আছে।"

"না চল, বাসে।"

"বাসে বসে অমল বললে, "বাস্তবিক সকালে ওঠার চেয়ে আর আরাম নেই।"

"না ?" অমল অবাক হয়ে বিভাসের দিকে চেয়ে রইল। আর কোন কথা কইল না।

* * *

ক্ষুধাও পেয়েছিল। "বিশুদ্ধ ভদ্রমহোদয়গণের আহারের স্থান—অন্নপূর্ণা হোটেলে" গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিভাস আপিসের পথ ধরল'। পথে অনবরতই ভাবতে লাগল—কি বলব'। কি উত্তর দেব!

আপিসে যেতেই সবাই জিজ্ঞাসা করলে, "কি হে, কি হ'ল কাল।" কাজিল সুকুমার সুর করে বল্লে, "আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায়"—এবং "দেহিপদপল্লবমুদারম্।" সুকুমারের ভঙ্গী দেখে সবাই "হো হো" করে হেসে উঠল'।

বিভাসও মৃদু হসিয়া বললে,"না তেমন কিছু হয় নি।"

"হয় নি—মৃদুমন্দ বাতাসও ওঠে নি চায়ের পেয়ালার মধ্যে ?"

বিপিনবাবু বললেন, "আরে ভাই কত দিন আর প্রেমের রস থাকে। আমার উনি তো আজ নথ ঘুরিয়ে আমার দিকে 'পশ্চাদভাগ দেখহ' বলে উপবেশন করলেন। আমি ব্যাপার বুঝে বল্লুম—"প্রেয়সীর যখন অভিমান হয়েছে, এবং তা হ'তেই পারে, তখন আমিই কষ্ট করে একটু কয়লা তুলি। কাল থেকে প্রেয়সীর হাতের মিঠে তামাক খাওয়া হয় নি। হাত থেকে কয়লা ফস্কে পায়ে পড়তেই এই দেখ ভাই বাঁধা, আমার তাঁর হাতের প্রেমের বাঁধন—'মরণ আর কি মুখপোড়া সারারাত কোথায় আড্ডা মেরে এলেন, এখনও নেশা কাটে নি। আমার মরণও হয় না বলেই, আর কি! জলপটি জামবক, টিন্‌চার আইডিন, হোমিওপ্যাথির বাক্স ইত্যাদি এনে ডাক্তারি। এও বলি ভাই, একটু-আধটু মুখঝামটা দেয় তা, সেটা আদর ছাড়া আর কিছু নয়। বল্লেই সব বোঝে।"

বিভাস দেখ্‌ল' তাদের দলের সবাই, তাদের স্ত্রীর কাছে সব কথা খুলে বলেছে, আর সেই কেবল একা, যে বাড়ী যায় নি বা গৃহিণীর সঙ্গে লজ্জায় দেখাও করে নি। তার খালি মনে হ'তে লাগল' তারাই কত সুখী যারা বিয়ে করে নি। যারা স্বাধীনভাবে সব কাজ কর্‌তে পারে—পই পই যাদের প্রত্যেক কাজে গিন্নীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। হাঁ—পৃথিবীতে আনন্দ আছে বৈ কি—কিন্তু তার নাগালের কত বাইরে।

টিফিনের সময় খেতে খেতে মনে হ'ল-তাই তো তারই তো দোষ! ও-দিকে সবাই মোহনবাগান ও ক্যালকাটা ম্যাচে মোনা দত্ত কেমন করে গোল দেবে এই নিয়ে তর্ক করছে, কিন্তু বিভাসের আজ আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। তারই তো দোষ, সত্যিই তো। সেই তো আজকাল রোজ দেরী করে বাড়ী যায়। কিন্তু সবিতার তো কোন কাজে দেরী হয় না। সকালে উঠে চা তৈরী থেকে জুতো ঝেড়ে রাখা সবই তো তার ঠিক সময়ে হয়। টেবিলে

হাতের ওপর মাথা রেখে, চোখ বুঁজে সে ভাবতে লাগল'। নিজের ওপর রাগ হ'তে হ'তে হঠাৎ নিজের ওপর সহানুভূতি এল। 'হতে পারে আমি অন্যায় করেছি, কিন্তু তাই বলে কি স্ত্রীর কথা-মত উঠ্‌তে বস্‌তে হ'বে। কেন আর কারুর তো স্ত্রীকে অত কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। তারা তো যখন খুসী বাড়ী যায়—রাত ১২টা নেই ১টা নেই। সে কেন সবিতার কথা শোনে। তার উচিৎ ছিল—'

কি উচিৎ ছিল?

প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। তিনটে-চারটে বেজে গেল, তবুও কোন কিনারা হ'ল না। অনেক রকম উত্তর পাওয়া গেল। নরম হতে হবে। দোষ স্বীকার কর্‌তে হ'বে। শক্ত হতে হ'বে। কথা শোনা উচিত। সে এবার অনবরত কথা কইবে। প্রতিজ্ঞা করবে। কেন প্রতিজ্ঞা করবে? এ রকমের নানা মীমাংসা করার কথা মনে হ'ল, কিন্তু কোনটাই মনোমত হ'ল না।

পাঁচটার সময় মনে হ'ল আচ্ছা এ সব বিষয়ে তো বিপিন-বাবুর বেশ জ্ঞান। ওঁর কাছেই পরামর্শ নেওয়া যাক্ না। মনে হওয়ামাত্রই বিপিনবাবুর কাছে উপস্থিত—"আচ্ছা ঠাকুর্দা মনে করুন ঠান্‌দির সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য হয়েছে, অবশ্য দোষটা আপনার, এবং আপনি সেটা ভাল রকমই জানেন—এমন অবস্থায় আপনি কি করেন?"

বিপিনবাবু একটু মুখ টিপে চোখ ঘুরিয়ে বল্লেন "হুঁ!" তারপর বল্লেন "বুঝলে ভায়া, ক্ষেত্র-কর্ম্ম বিধিয়তে। তবুও একটা 'তুক্' বলে দিই; এসব অবস্থায় বাড়ী ঢুকেই কথা আরম্ভ করে দেবে। মোটেই থাম্‌বে না। তুমি যদি কথা না কও তো নাতনী সুরু ক'রে দেবেন। আর মেয়েমানুষ যদি একবার কথা আরম্ভ করে তো সহজে থামে না। তাকে একেবারে কথা কইবার অবকাশ দিও না। কি কথা?—এই, এই ধরণা কেন, সামান্য খুঁটি নাটি নিয়ে, সেই বিয়ে করা থেকে এ-নাগাদ তার যা কিছু খুঁৎ, সে থাক্ বা নাই থাক্—সব হুড় হুড় করে বক্তৃতা দেবে। প্ল্যাটফর্ম্ম স্পিচ্ ভায়া, বাঙালীর একমাত্র অস্ত্র। নাত্‌নী 'দেখ্‌বে, একেবারে থ'। তার পর—"

"তার পর?"

একটু মুচকে হেসে বিপিনবাবু তার পিঠ চাপড়ে বল্লেন, "আঁ, একেবারে নাবালক—। তারপর, দেখাবে তুমিই যেন তাকে ক্ষমা কর্‌লে—অপাঙ্গদৃষ্টিতে একবার চাইবে আর সন্ধি হয়ে যাবে—একটা সোহাগভরা অধরামৃত পানে।"

বিভাস নিজের জায়গায় ফিরে এসে এ-সব কথা বেশ আলোচনা করে দেখ্‌ল। তারপর ৬টা বাজ্‌লে আপিস থেকে বেরুল। ভাব্‌ল' এবার জয়ের আশা নিশ্চিত। সদর দরজা ভেজান ছিল। সে ঠেলে বেশ গট্‌গট্ করেই ঢুক্‌ল'। সামনেই চোখে পড়্‌ল স্থলপদ্মের গাছ। বিভাস সেদিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ধরল' এবং হাত মুঠো কর্‌ল'।

সমস্ত পথ সে ঠাকুর্দার ব্যাবস্থাগুলা রিহার্স্যাল দিতে দিতে এসেছে—কি বলবে কি করবে। সব তার বেশ মনে আছে। আরো এ ঘটনা তারপর ওটা, তারপর সেইটে এইরকম! বাড়ীর দরজা ঠেলে বাইরে ঘরের পাশ দিয়ে দালানে পড়বে—তখনও তার সব মুখস্থ।

তারপর—উঠানে পড়তেই সাম্‌নে দেখে সবিতা দাঁড়িয়ে। তার সঙ্গে চোখোচোখী হ'তেই বিভাস কথার খেই হারিয়ে ফেল্লে, ঢোক্ গিলে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথাই তার মনে আসে না—শত চেষ্টা করেও সে একটা উপদেশ মনে আন্‌তে পারলে না। তার শরীর যেন কেমন অবশ হ'য়ে এল। নিশ্চল পাথরের মতন সে দাঁড়িয়ে রইল'। তার দৃষ্টি মাটিতে সম্বদ্ধ থাক্‌লেও বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ল' ঐ সবিতা তার দিকে এগিয়ে আসছে। এইবার—তিরস্কারের পালা। সেই কথার পর কথা! তারই দোষ, হাঁ সত্যি সেই দোষী!

সবিতা কাছে এগিয়ে এল। তার শাড়ীর আঁচল বিভাসের গায়ে ঠেক্‌ল'। হঠাৎ সে অনুভব কর্‌ল সবিতার বাহুপাশে সে আবদ্ধ—সবিতার মুখ তার গালের ওপর, সবিতার চোখের জল তাঁর গালে পড়্‌ছে।

"সবিতা! সবি! আমি—"

"কিছুই শুন্‌তে চাই না গো আমি। কিছু না, কিছু না। কিছু বলিতে হ'বে না, অমল ঠাকুরপোকে আমার সেই চিঠি পাঠিয়ে দিল তার উত্তর থেকে জান্‌তে পেরে তুমি আফিসে আছ, সব দুর্ভাবনা কেটে গেছে কত দেবতাকেই না সারারাত মানত করে কাটিয়েছি—তাঁদের আশীর্ব্বাদে

তোমাকে যে অক্ষত শরীরে ঠিক সময় কতকাল পরে ফিরে পেয়েছি—আজ আমার শোনবার কিছু নেই।"

"কিছুই শুনবে না, কাল কোথায় ছিলাম ?"

মিষ্টি হাসি হেসে সবিতা বল্‌লে "না গো না অন্ততঃ এখন তো নয়ই। আজ তোমায় ঠিক সময়ে পেয়েছি অনেক দিন পরে—আজ পাবার সুখে আমার প্রাণ ভোর-পুর— আজ আমি বড় সুখী।"

"সুখী ?"

"হাঁ। দেবতা আমায় দয়া করেছেন। দেখ, কত-কাল পরে।"—বলে বিভাসের মুখ আস্তে আস্তে ঘড়ির দিকে ফিরিয়ে দিল।

বিভাস দেখ্‌ল' ৭টা বাজ্‌তে ১০ মিনিট।

আনন্দগদগদকণ্ঠে বিভাস বলিল, "আমায় ক্ষমা চাইবার অবকাশ দেবে না।"

"ছিঃ ছিঃ ও কথা মুখে আনতে আছে—আমার যে অকল্যাণ হ'বে—তবে আজকার এই সুখের ভাগ তোমাকে একটু দিতে পারি—"বলিয়াই অনুরাগের আবীর-রাঙা চিহ্ন তাহার ওষ্ঠে মৃদুভাবে মুদ্রিত করিয়া দিল।

মেঘদূত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত]

উত্তর-মেঘ

(২৫)

মলিন বাস পরি' হয়ত মম নারী আমারি নামে রচি' ব্যথার গীত,
বীণাটী লয়ে কোলে সে গীতি গান ছলে করে সে অভিলাষ সুর-সহিত ;
নয়ন-বারিধার ভিজায় বীণা-তার, মাজিয়া পুনঃ তারে গাহিতে যায় ;
চেষ্টা বৃথা তার, ভুগিছে বার বার আপন হাতে তোলা মূর্চ্ছনায় ।

(২৬)

বিরহ-দিন হ'তে প্রেয়সী প্রতিদিন দ্বারেতে রাখি' দেয় একটী ফুল ;
হেরিবে হয়ত সে কুসুম গণি' দেখে বিগত হবে কবে বিরহশূল।
অথবা মনে মনে মিলিয়া মোর সনে, হৃদয়ে উপভোগ করে সে সুখ,
এমনি বিরহিণী কল্পনায় লভে পতির সহবাস দলিয়া দুখ।

(২৭)

দিবসে নানাকাজে ততটা নাহি বাজে তাহার বুকে মোর বিরহ ঘোর ;
নিশায় হায় হায়, বুক যে ফেটে যায়, তাহার যাতনার নাহিক ওর ।
জাগিয়া আঁখিজলে লুটায় ধরাতলে, ঘুমেতে নত যবে পৌরজন ;
তখন জানালায় বসিয়া, সখা, তা'য় বারতা দিও মোর, তুষিও মন।

(২৮)

বিরহ-শয্যায় হেরিবে কৃশকায় প্রেয়সী এক পাশে করিয়া ভর ;
যেমন প্রতি ভোরে পূর্ব্বদিকে পড়ে' বিরাজে শশিকলা মলিনকর।
বিহরি' মোর সনে কাটিত সুখ-মনে মুহূর্ত্তের মতো যাহার রাত,
আজিকে রাতি তার কাটে না যেন আর, নিয়ত করে বসি' অশ্রুপাত।

(২৯)

শীতল সুধাময় চন্দ্রকর যবে বাহিয়া বাতায়ন করে প্রবেশ,
পূর্ব্ব সুখ আশে ছুটিয়া তারি পাশে, তাহাতে নাহি লভি' সুখের লেশ ;
ফিরিয়া আসে প্রিয়া, পক্ষ্মজাল দিয়া ঢাকে সে আপনার আঁখি সজল,
ঢাকিলে রবি তুমি, যেমন ধরা 'পরে না ফুটে নাহি মুদে স্থলকমল।

(৩০)

দীর্ঘশ্বাসে দহে অধর-কিশলয় রুক্ষ স্নানে কেশ চিকণ নয়,
নিশ্বাসে দোলা পায় পরুষ সেই কেশ ঢাকিয়া রহে যাহা গণ্ডময়।
স্বপনে যদি পায় আমার সঙ্গম, নিদ্রা তাই মনে করে সে সাধ ;
অশ্রুস্রোত আসি' নিদ্রাপথ রোধে, তাহার সুখসাধে ঘটায় বাদ।

(৩১)

মোদের বিরহের প্রথম দিনে বালা বেঁধেছে যেই বেণী পুষ্পহীন,
আজি তা জটপড়া, বাঁধিব আমি তারে বিগত হ'লে পরে বিরহ-দিন।
হয়ত প্রিয়া মোর নখর-যুত করে গণ্ড হ'তে তার বারংবার
সরায় সেই বেণী বিষম সুকঠিন, বড় যে ক্লেশকর স্পর্শ তার।

(৩২)

অধিক ক'ব কিবা, হয়ত অবলার ভূষণহীন সেই দেহ কোমল,
অশেষ বেদনায় দীরঘ শ্বাসে, হায়, লুটায় বার বার শয্যাতল।
হেরে সে দুখিনীরে, আকুল আঁখি-নীরে দেখায়ো তুমি তারি দুঃখে দুখ ;
আপনি গলি' যায় যাদের চিততল করুণাময় তারা কোমল-বুক।

(৩৩)

প্রগাঢ় অনুরাগে তোমার সখী, ভাই, আমারে ভালবাসে সঁপিয়া প্রাণ,
বিরহে তাই তার এমনি ব্যবহার আমার মনে মনে এ অনুমান।
প্রণয়-ভাগ্যের গরবে যদি, ভাই, অনেক ব'লে থাকি, বাচাল নই ;
চোখে, বুঝিবে আমি সবি সত্য কই।

(৩৪)

চূর্ণ কেশজালে নয়নে নাহি খেলে অপাঙ্গের লীলা, সুহাস লোপ ,
কাজল নাহি তাই রুক্ষ আঁখি-যুগ', মদিরা বিনে ভ্রূর বিলাস লোপ।
মৃগীর সম তার নয়ন যবে প্রিয়া তোমার 'পরে দিবে আবেগবান,
তখন মনে হবে কমল শোভে যেন মীনের গতি হেতু কম্পমান।

(৩৫)

যদি সে সে-সময় নিদ্রাগত রয়, বসিয়া তার পাশে, হে জলমুক্,
প্রহরকাল তুমি নীরব থেক, ভাই, ক'রো না গর্জ্জন ভাঙায়ে সুখ।
হয়ত স্বপনে সে সুদৃঢ় বাহুপাশে আমারে বাঁধিবারে করেছে আশা ;
এ হেন কালে যদি ডাকিয়া উঠ তুমি, শিথিল হ'য়ে যাবে সে বাহুপাশ।

(৩৬)

তোমার জলকণা-শীতল অনিলের ব্যজনে ধীরে ধীরে প্রবোধি' তায়,
মালতীকলিকার বিকাশ সাথে তুমি জাগায়ে দিও, মোর প্রিয়ায়।
বক্ষে চপলায় চাপিয়া জানালায় বসিলে তুমি, মেলি' স্তিমিত চোখ,
মানিনী চাবে যবে ললিত রবে তবে এ কথা ব'লো তারে দূরিতে শোক।

(৩৭)

"শুন গো অবিধবে, অম্বুবাহ আমি তোমার ভর্ত্তার মিত্রবর ;
বারতা বহি' তার এসেছি বহু দূর তোমার পাশে হ'য়ে সুতৎপর।
যতেক পরবাসী হয় যে অভিলাষী খুলিতে প্রেয়সীর বদ্ধ কেশ ;
আমি সে সকলেরে মন্দ্রধ্বনি ক'রে পাঠায়ে দিই ত্বরা আপন দেশ।"

(৩৮)

মারুতী-মুখে যথা শুনিয়া রাম-কথা জানকী উন্মুখ হেরিল তা'য়,
তোমারে সেইরূপ হেরিবে প্রিয়া মোর হরষে সমাদরে আকাশ গা'য়,
স্বাগত করি' তোমা' শুনিবে তব কথা গভীর মনোযোগে হ'য়ে ব্যাকুল,
মিত্র-মুখে শুনি' প্রিয়ের শুভ বাণী মিলন বলি' মানে রমণীকুল।

(৩৯)

আমারে তুষিবারে অথবা আপনারে করিতে সার্থক ব'লো এ ভাষ—
"তোমার সহচর কুশলে রহে জেনো, সে রামগিরি 'পর করিছে বাস।
দুঃখ শুধু তার বিচ্ছেদের ভার, আমার মুখে মাগে তব কুশল।"—
প্রাণীরা পদে পদে পড়ে যে পরমাদে, কুশল জানা প্রথা তাই যে চল্।

উত্তরা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

সাহিত্যে ভাঙা-গড়া—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের তুলনায় আধুনিক সাহিত্যে বিচিত্রতর ঘটনাবস্তু দেখা যাইতেছে। আধুনিক সাহিত্য বাস্তব-চিত্রণের ও সমাজগঠনের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; পূর্ব্বেকার ভাব ও কল্পনার রাজ্য দূরে যাইতেছে।

ঘৃণ্য, পরিত্যক্ত, 'ভবঘুরে' প্রভৃতিকে লইয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠে তাহাকে নূতন সমাজ-নিয়ম গড়িয়া লইতে হয়। তাহাদের জীবন বে-পরোয়া জীবন। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের যে কোন নিয়ম-কানুন নাই, তাহা নহে। অনেক সময়ে, বে-পরোয়াদের জীবন আঁকিতে যাইয়া মানুষের সার্ব্বজনীন নিয়মকানুন পদদলিত করিয়া একটা বাধা-বন্ধনহীন পশুর জীবনকে আদর্শ করা হইয়াছে। ইহাতে একই সঙ্গে শিল্পের মর্য্যাদা হানি ও সমাজের অনিষ্ট হইতেছে।

নূতন সাহিত্য সমাজের অভ্যস্ত রীতি ও নিয়ম-কানুনকে পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যোগী হইতেছে, ইহা খুব আশার কথা। প্রত্যেক দেশে সমাজবিপ্লবের ইহাই একমাত্র প্রণালী। কিন্তু যে-সকল প্রাথমিক বিধিনিষেধ মানুষ তাহার সামাজিক ক্রমবিকাশের ফলে একান্ত আবশ্যক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই যখন নূতন সাহিত্য লঙ্ঘন করিতে সাহস করিয়াছে, পশুর জীবন ও মানুষের জীবনে কোন প্রভেদ মানে নাই, তখন মনে হয় এ নূতন সাহিত্য বোধ হয় মানুষকে অনিশ্চিতের পথে লইয়া যাইতেছে।

বাংলার মাটি—পলিপড়া মাটি, ক্ষণভঙ্গুর; এ মাটি যেমন উর্ব্বর তেমনি পরিবর্ত্তনশীল। এ মাটি নদীর দেওয়া; কত গৌড়, কত রামপাল, কত নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ এ মাটি গড়িল ও ভাঙ্গিল। বাঙ্গালীর দেহ ও মন এইরূপই নমনীয়। বাঙ্গালীর দেহে বিভিন্ন জাতির রক্তমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ইহা একই সঙ্গে গৌরব ও ভয়ের কথা। তাই বাঙ্গালী সমাজ, রাষ্ট্র ও সাহিত্যের যত কিছু নূতন আন্দোলনের প্রবর্ত্তক।

বর্ত্তমান যুগ গড়িবার যুগ। রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ভাঙ্গনের প্রবর্ত্তক। নূতন সাহিত্য ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে; স্নায়বিক বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের প্রশ্রয় দিয়া ইহা গড়িতেছে কম। বর্ত্তমান সাহিত্য যদি গড়িবার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে আমাদের জীবন একই সঙ্গে সার্থক ও সুন্দর হয়।

কৃষক, বৈশাখ ১৩৩৭

কার্পাসের চাষ—বাংলা দেশে চাটগাঁ পাহাড়ে ও মৈমনসিংহের উত্তরে গারো পাহাড়ে যে কার্পাসের চাষ হইয়া থাকে, তাহার আঁশ অত্যন্ত ছোট ও কর্কশ। এইজন্য এই তুলা দ্বারা সূতা কাটা যায় না। মিহি কাপড়চোপড় ও বিছানার চাদর ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার জন্য যে তুলার দরকার, তাহার চাষ বাংলা দেশে হয় না। এই তুলার আঁশ লম্বা, চিক্কণ ও মসৃণ। এই জাতীয় কার্পাস পাঞ্জাব প্রভৃতি পশ্চিম অঞ্চলের টান জমিতে ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যে জন্মে। ঢাকা

সরকারী কৃষিক্ষেত্রে কয়েক বৎসর যাবৎ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই জাতীয় আমেরিকান কার্পাসের ফলন হয় না ;—তবে ইহা যে খুব লাভজনক কৃষি তাহাও বলা যায় না।

ক্ষেত কার্পাসের চাষ করিতে হইলে জমি উত্তমরূপে "পাইট" করিতে হয়। যে সকল উঁচু জমি বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া যায় না সে-সব জমি কার্পাসের উপযুক্ত। দোয়াঁশ বা অল্প এঁটেল মাটিতে কার্পাস ভাল জন্মে। বেলেমাটিতে ভাল হয় না। কার্পাসের ভাল জোরাল জমি আবশ্যক। কার্পাসের চাষে বিঘা প্রতি ৫০/—৬০/ মণ গোবর সার দেওয়া আবশ্যক। ঢাকার 'টেঙ্গরিয়া' জমির মত লাল মাটীতে কার্পাসের চাষ করিবার পূর্ব্বে ঐ জমিতে যে ফসল করা যায় তাহাতে বিঘা প্রতি ৩/ মণ চুণ ও ১/ মণ হাড়ের গুঁড়া দিলে কার্পাসের ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে ইহাতে অপেক্ষাকৃত একটু খরচ বেশী পড়ে, এবং এই খরচটা পূর্ব্বের ফসলেই তুলিয়া লইতে না পারিলে লোকসানের সম্ভাবনা।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে প্রথম বৃষ্টি হইলেই জমিতে চাষ দিবে। কার্পাসের জমিতে যত চাষ বেশী পড়ে ততই ভাল, কারণ কার্পাস গাছের শিকড় অনেক নীচু পর্য্যন্ত খাবারের খোঁজে যাইয়া থাকে।

কার্পাসের বীজগুলি খুব ছোট ছোট আঁশে ঢাকা থাকে। সেইজন্য বীজ বপনের পূর্ব্বের দিন গোবর ও বালির মধ্যে বীজগুলিকে বেশ রগড়াইয়া লইতে হয়। লাইন করিয়া বীজ বপন করিতে পারিলে অনেক সুবিধা হয়। জমিতে দুই হাত অন্তর অন্তর লাঙ্গলের ঈষ দিয়া চিহ্নিত করিয়া লইয়া সেই দাগের লাইনে আধ হাত দূর দূর এক-একটী বীজ ফেলিয়া মাটী দিয়া চাপিয়া দিলেই বীজ বপন করা হইয়া গেল। বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে বৃষ্টির পর জমিতে যো হইলে বীজ বপন করিবে। বিঘা প্রতি /১॥০ সের হইতে /৩ সের বীজ বপন করিতে হয়।

৬।৭ দিনের মধ্যেই চারা মাটী ভেদ করিয়া বাহির হইতে থাকে। চারাগুলি একটু বড় হইলেই জমি নিড়াইয়া দিবে এবং ক্ষীণ ও নির্জ্জীব চারা ফেলিয়া দিয়া, এক বা দেড় হাত অন্তর একটী করিয়া সবল চারা রাখিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই অর্থাৎ বর্ষা আসিবার পূর্ব্বে চারাগুলির নীচে মাটী দিতে হয়, যেন চারার গায়ে জল বসিতে না পারে ; স্থান কাল ভেদে দুইবার পর্য্যন্ত মাটি দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে। কার্পাসের ক্ষেতে ঘন ঘন নিড়ানি দিতে হয়। বৃষ্টি হইবার পর জমি শুকাইয়া চাপ বাঁধিয়া গেলে নিড়ানি দিয়া জমি উস্‌কাইয়া দেওয়া উচিত।

আশ্বিন মাসের শেষ ভাগেই তুলার ফুল ধরে, এবং অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগেই ফুটী বা কলীগুলি কাটিতে আরম্ভ হয়। এই মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত কার্পাস সংগ্রহ কার্য্য চলিতে থাকে। ভোর বেলা গাছ হইতে শিশির ঝরিয়া পড়িলেই কার্পাস তুলিয়া ফেলা উচিত। যাহাতে কার্পাসের পাতা প্রভৃতি না মিশে সেজন্য একটু সাবধান থাকিতে হয়। অভ্যস্ত হইলে এই কাজ বেশ তাড়াতাড়ি করা যায়।

বাংলা ১৩২৬ সালে ঢাকা কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রে বিঘা প্রতি মণ ২॥৬ সের কার্পাস পাওয়া গিয়াছিল। ১৩২৭ সালে ৩॥৯ সের পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু সাধারণতঃ কার্পাসের ফলন বিঘা প্রতি ১॥০—২/০ মণের অধিক হয় না। গত দুই বৎসর পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে বুড়ি, কাম্বোডিয়া, ধাড়োয়াড় এই তিন জায়গার কার্পাসের মধ্যে ধাড়োয়াড়েরই ফলন অধিক এবং ইহা হইতেই বেশ চিক্কণ সুতা কাটিতে পারা যায়। ঢাকা কৃষিক্ষেত্রে কার্পাসে পোকার উপদ্রব বিশেষ হয় নাই। এক প্রকার বিছা পোকা মাত্র পাওয়া গিয়াছিল। উহারা গাছে জড়াইয়া পাতার বাসা প্রস্তুত করে এবং অবশেষে পাতাগুলি খাইয়া গাছের জীবনী-শক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। এগুলি বাছিয়া ফেলিয়া দিলেই উপদ্রবের শান্তি হয়। তুলা-ক্ষেতের চারিপাশে ঢেঁড়স বুনিয়া দিলে পোকাগুলি কার্পাসের গাছের পাতায় বাসা করে।

কার্পাসের চাষে বিশেষ লাভ হয় না। তবে অনেকেই বাড়ীর আশে-পাশে পুকুরের পাড়ে উঁচু জায়গায় ২০।২৫টা করিয়া গাছ লাগাইতে পারেন। ক্ষেত কার্পাস এক বৎসরের বেশী জমিতে রাখা যায় না।

রাম কার্পাসে বা দেব কার্পাসে প্রথম বৎসর তুলা বিশেষ হয় না, দ্বিতীয় বৎসর হইতে ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত বেশ ফসল পাওয়া যায়; তবে এ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকাতে নানারূপ পরীক্ষা করিতেছি।

তুলার বীজ স্থানীয় কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে পাইতে পারেন।

মাধবী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

ইউরোপে সংবাদপত্রের প্রচার—শ্রীইন্দুবিকাশ বসু। ইউরোপে সম্রাট্ হইতে শ্রমিক অবধি সকল শ্রেণীর লোকেই প্রাতঃকালে দৈনিক সংবাদ পাঠের জন্য সমান ব্যগ্র। সংবাদপত্র প্রকৃত পক্ষে জার্ম্মানীতে ১৬১৫ খৃঃ প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এই পত্রের নাম Frank Furter Journal। ইহা সাপ্তাহিক পত্র ছিল। ইহার পরে ১৬১৬ খৃঃ বেল্‌জিয়াম হইতে Nieuwe Tijdinghen পত্র বাহির হয়। ১৬২২ খৃঃ ইংলণ্ডে The Weekly Notes প্রকাশিত হয়। ১৭০২ খৃঃ রুষদেশে The Gazette পত্র প্রচারিত হয়। ইটালীতে ১৭১৬ খৃঃ পূর্ব্বে সংবাদপত্র ছিল না। ১৭৪৯ খৃঃ ডেনমার্কে Berlingske Tidende নামক সংবাদপত্রের জন্ম হইয়াছিল। স্পেনে ১৮২৬ খৃঃ পূর্ব্বে কোন সংবাদপত্র ছিল না বলিলেও চলে।

সংবাদপত্রের বহুল প্রচার ও দেশ বিদেশ হইতে অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে সংবাদ সংগ্রহের কথা প্রথম জাগে জুলিয়াস রয়টারের মনে। তাঁহারই উদ্যমে স্থানে স্থানে এই কার্য্যের জন্য লোক নিযুক্ত হয়।

সৌরভ, বৈশাখ ১৩৩৭

লোকশিক্ষার পুরাতন রীতি—শ্রীরসিকচন্দ্র বসু। বঙ্গদেশ, রাজার অপেক্ষা না করিয়া আপনিই আপনার সমাজে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল। পাঁচালী গান, কথকতা, শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন, ও ভাসান-গান সেই ব্যবস্থারই ফল। সারি, জারি নৌলা, পর্ব্ব এবং ঘাটুও তাহাই। কথকেরা পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের কথা ভাষায় লোকদিগকে বুঝাইতেন। তাহাই আবার পদবন্ধ, দীর্ঘ ও খর্ব্ব ছন্দ এবং পাচাড়ীতে গাঁথিয়া ওঝা ও পণ্ডিতেরা সুরতালে মনোহর করিয়া তুলিতেন। ইহাই পাঁচালী গান। শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ও নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করেন। পাঁচালী গানে ছিল—সংযম, ত্যাগ, বিনয়, সাধুতা ও কর্ত্তব্যের শিক্ষা। সে শিক্ষা ছিল রসে ভরা, করুণায় কোমল ও আনন্দে উজ্জ্বল। সংকীর্ত্তন লোককে পরম ও চরমের সন্ধানে প্রবর্ত্তিত করিত।

এই শিক্ষা ও দীক্ষার কর্ম্ম, বৃত্তি হিসাবে কোন ব্যক্তি বা জাতির উপর অর্পণ করিয়া, সমাজ লোকপালন ও লোকশিক্ষা দুইই একসঙ্গে করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ব্যবস্থা উত্তম ছিল, এখনও ইহার কিছু অবশেষ আছে। কিন্তু তাহাও থাকিবে না, কারণ, বিনা বিচারেই আজ আমরা তাহা ত্যাগ করিয়া, যাহা আমাদের অবস্থা ও চরিত্রের সহিত খাপ খাইবে না, তাহাই অবিচারে গ্রহণ করিতেছি। এখন সেই সুকণ্ঠ ভক্ত কথক ও পাঁচালী গায়ক দৈবাৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

এ হেন সময়ে পূর্ব্ব বঙ্গে "লক্ষ্মীর পাঁচালী" শুনিয়া মনে পুরাতনের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। লক্ষ্মীর পাঁচালী গায়কেরা মুসলমান ফকির। ইহাদের অধিকাংশেরই নিবাস ফরিদপুর জেলায়, ঢোল সমুদ্র ও পদ্মার চরে বা পারে। সেখান হইতে ইহারা শীতে ও বসন্তে ঘরে ঘরে "লক্ষ্মীর পাঁচালী" শুনাইয়া ভিক্ষা করিবার জন্য বাহির হয়। "লক্ষ্মীর পাঁচালী"টি এই :—

লক্ষ্মীর পাঁচালী কিছু শোন দিয়া মন।
মন দিয়া শোন সবে লক্ষ্মীর বচন।
এক নাম ধৈরাছেন তিনি লক্ষ্মী নারায়ণী।
নর লোকে বলে তারে জগত-জননী।
লক্ষ্মী বলে কারে আমি করি মহারাজা,
অন্ন বিনা কারো শরীর করি ভাজা ভাজা।
সকাল বেলা ছড়া দেয় মা সন্ধ্যাকালে বাতি,
লক্ষ্মী বলে সেই ঘরে আমার বসতি।
রাইন্ধ্যা বাইর্‍্যা যেই নারি পুরুষের আগে খায়।
ভরা না কলসের জল তরাসে শুকায়।

স্নান কৈরা যেবা নারী মুখে দেয় রে পান।
লক্ষ্মী বলে সেই নারী আমার সমান।
পায়ের উপর পাও থুইয়া যেই নারী বসে।
ছয় মাসের মধ্যে তার সীথার সিন্দুর খসে।
আউলাইয়া মাথার কেশ ফিরে পাড়া পাড়া।
নিশ্চয় জানিবা মাগো সে যে লক্ষ্মীছাড়া।
থুর থুরাইয়া হাটে নারী চোখ পাকাইয়া চায়,
ঐ নারী অভাগিনী আগে পুরুষ খায়।
হিরল দাত, চিরল দাত যেবা নারীর হয়,
আড়াই মাসের মধ্যে তার পতি যাবে ক্ষয়।
বিছাইয়া সোয়ামীর শয্যা পাও দিয়া ঠেলে,
সেই নারীরে ছাড়ি আমি নিশা ভোরের কালে।
হস্তিনী নারীর কথা শোন নারায়ণ,
উজল নয়নে চলে হস্তীর চলন।
শঙ্খমণি নারীর কথা শোন গুণমণি।
শঙ্খের সমান রূপ জলন্ত-অগিনী।
সেই নারীর শুয়াস যদি লাগে পতির গায়।
ছয় মাসের মধ্যে বান্দার হায়াত হয় ক্ষয়।
পদ্মমণি নারীর কথা করি নিবেদন,
সেই নারীর শরীরে লক্ষ্মী থাকে সর্ব্বক্ষণ।
সতী নারীর পতি যেন পর্ব্বতের চূড়া,
অসতী নারীর পতি ভাঙ্গা নায়ের গুড়া।

কাজের কথা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

শিশুপালনের গোড়ার কথা—শ্রীসত্যানন্দ। শিশুদের যে-সব দুরূহ পীড়া জন্মে, তাহাদের প্রায় সকল গুলিই কোন না কোনরূপে পরিপাকের বিশৃঙ্খলা হইতে উৎপন্ন। প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, নবজাত শিশুর পাকস্থলী অত্যন্ত কোমল। ইহাতে দুই আউন্সের বেশী খাদ্য বা পানীয় ধরে না এবং ইহার হজম-শক্তি অতি সহজেই বিশৃঙ্খল হইয়া যায়।

শিশু জন্মাইবার চব্বিশ ঘণ্টা পরে তাহাকে স্তন্য দিতে হইবে। তাহার শরীরে তখন যে চর্ব্বি থাকে তাহাতেই কিছুক্ষণ চলিয়া যায়। জননী সুস্থ থাকিলে তাঁহার স্তনদুগ্ধ অপেক্ষা শিশুর পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য আর নাই।

অপরিপুষ্ট শিশুকে অতি কষ্টে দুগ্ধ পান করাইতে হয়। এ বিষয়ে চিকিৎসককে অনেক কৌশল অবলম্বন করিতে হয় এবং শিশুর জননী বা স্তন্যদায়িনীকেও অনেক ধৈর্য্য ধারণ করিতে হয়। অপুষ্ট শিশুগণ প্রথম বৎসর প্রায় জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে পড়িয়া থাকে। এই সময়ের মধ্যে প্রায়ই ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, হুপিংকাফ, হাম প্রভৃতি সংক্রামক রোগের কোনটা তাহাদিগকে সাংঘাতিকরূপে আক্রমণ করিতে পারে।

শিশুর পাকস্থলীতে একবার গোলযোগ ঘটা অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ। তখন তাহার কিছুই হজম হয় না, প্রায় সকল খাদ্যই বমন হইয়া যায়। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, পাকস্থলী ও অন্ত্র হইতে সমস্ত খাদ্য ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা। পরে যখন পাকস্থলী আবার শান্ত হয় এবং হজম-শক্তি ফিরিয়া আসে তখন একটু বার্লি-বা সাগুর জল পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। তাহার পর ধীরে ধীরে খুব সামান্য দুধ দিয়া হজম করিতে অভ্যস্ত করান উচিত। স্তনদুগ্ধ খাওয়াইতে হইলে, দুধ গালিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাহার পর ঝিনুক দিয়া শিশুকে খাওয়াইতে হইবে। এই সময়ে শিশুকে অতি সাবধানে সকল প্রকার সংক্রামক রোগের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। দৈহিক তাপ, ওজন প্রভৃতিও মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে হইবে।

ম্যারাস্মস্ নামে শিশুদের অপর একটি ব্যাধি হয়। তাহার মূল কারণ, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, প্লীহা বা মূত্রযন্ত্রের পীড়া। কখন কখন পাকস্থলীর পীড়ার জন্য পাকস্থলী হইতে জীর্ণ খাদ্য অন্ত্রে আসিতে পারে না। এই রোগে কেবল খাদ্য সম্বন্ধে সুব্যবস্থা না করিয়া রোগের চিকিৎসাও করাইতে হইবে। কেবল ঔষধ খাওয়াইলে চলিবে না, অস্ত্রচিকিৎসকের সহায়তা লইতে হইবে।

রক্তকমল

(উপন্যাস)

[রায়সাহেব শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ]

(১২)

প্রভাতে প্রসাধন-কক্ষের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া লীলা যখন মাথার চুল আঁচড়াইতেছিল, তখন শুনিতে পাইল অরুণকুমার কবি শশধরের কাছে কবিতা আবৃত্তি করিতেছে। লীলা বেশ-ভূষা করিয়া নীচে সেই বাগানে নামিয়া আসিল। লীলাকে দেখিয়াই অরুণ উল্লাসে বলিল, —"কাশ্মীরের প্রভাত আপনার চোখে কেমন লাগছে?"

"বে—শ। মনে হয় যেন স্বপ্ন-জড়ান।"

কবি শশধর তাঁহার ভ্রমণ-দণ্ডের মাথায় ছুরি দিয়া একটা ক্ষীনা নারীমূর্ত্তি খুঁদিতে খুঁদিতে বলিলেন—"আপনি এখনি যে কবিতাটা আবৃত্তি করছিলেন, আমি কখন ওটা পড়িনি। কবি বলছেন,—মানুষও মনের মধ্যে ঐশিক প্রত্যাদেশ পায়। কিন্তু কখন যে পায়, কবি তো সে-কথা বলেন নি?"

অরুণ কহিল—"কখন পায়? যখন উষার প্রথম আলোক দেখা দেয়, তখন মানুষ যখন কোনও একটা ধর্ম্মে একান্তে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে তখন—আর যখন প্রেমের ফুল তার অন্তরে ফুটে ওঠে ঠিক কমলের মত, তখনই সে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ পায়।"

মাথা নাড়িয়া কবি বলিলেন—"উহুঃ আমার মনের সঙ্গে মিলছে না। প্রভাতের স্বপ্নটাকে আমি ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ বলতে পারি নে। জাগরণের পরই তো সে স্বপ্ন ভাঙ্গে। রেখে যায় শুধু সত্যিকার বেদনার একটা অশ্রুতপ্ত স্মৃতি—সে স্মৃতিকে তো কিছুতেই মন থেকে দূর করা যায় না। তুষার-কিরিটের উপর রবির কর যে একটা সোণালী প্রভাতকে স্বর্গ থেকে নামিয়ে এনেছে, তাই দেখেই বুঝি আপনার মনে প্রত্যাদেশের কথা জেগে উঠেছিল। রাত্রে স্বপ্নের ঘোরে আমি যে সব বিচিত্র চিত্র দেখতে পাই, অবাক্ হ'য়ে আমি সে সম্বন্ধ কত দিন ভেবেছি। আমার মনে হয়—যে সব জিনিসের চিন্তা আমরা মন থেকে একেবারে দূর করে দিয়েছি—তারাই সময়ে সময়ে হঠাৎ মনের সামনে এসে দাঁড়ায়। এই দেখুন না—যে জিনিসের চিন্তা আমাদের মনকে সারাদিন জুড়ে রাখে—আমরা কদাচিৎ তাকে স্বপ্নে দেখি।"

লীলার মনের ভিতরটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, রাত্রিতে স্বপ্নে সে যাহা দেখিয়াছে, সে সম্বন্ধেও তো এই কথাই বলা চলে!

কবির কথার উত্তরে অরুণকুমার বলিল—"দিনের বেলা যা' কিছু আমাদের কাছে প্রত্যাখ্যান লাভ করে, আমার বিশ্বাস, তাদের দুঃখটা নিয়েই রাত্রের স্বপ্ন গ'ড়ে ওঠে। আমরা যা'কে পরিত্যাগ করি, কিংবা যাকে আমরা হতাদরে 'সরিয়ে দি'—তাদেরই প্রতিহিংসা শেষে স্বপ্নের বেশে এসে দেখা দেয়। সেই জন্যই দেখতে পাই—স্বপ্ন সহসাই আসে, আগে জানতে দেয় না যে আসছে। যখন আসে, তখন দেখি তার মূর্ত্তিটী বিষাদে মাখা। প্রত্যাখ্যানের ব্যথায় সে যেন মরে আছে!

লীলা কতকটা আপন মনে, কতকটা অরুণের কথার উত্তরে বলিয়া উঠিল—"আপনার কথাই ঠিক।"

সে তখন বাগানের রেলিং এর উপর ভর দিয়া সম্মুখের দিগন্তও বিস্তৃত আলোক-সমুদ্রের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার পশ্চাতে যেখানে চির-তুষারাবৃত স্বপ্ন-রাজ্যে নঙ্গা পর্ব্বতের শৃঙ্গ মেঘের মতই একটা ছায়া বলিয়া মনে হইতেছিল—লীলার দৃষ্টি সেইখানে প্রসারিত হইল।

অরুণ বুভুক্ষিতের মত নয়ন দিয়া লীলাকে গ্রাস করিতেছিল। প্রভাতের সেই স্নিগ্ধ-মধুর আলোক-ধারায় স্নাত হইয়া লীলাকে তখন আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। কাশ্মীরের প্রভাত চিরদিনই সুন্দরকে আরও সুন্দর করে এবং অন্তরের মধ্যে ভাবের তরঙ্গ ছোটায়। সেই প্রভাতে

যৌবনের সজীবতায় সুন্দরী লীলার রূপের দিকে চাহিয়া অরুণ মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, যৌবনশ্রী যেন সহসা মূর্ত্তি লইয়া তাহারই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল!

লীলা বলিল—"ওই যে কালো ঝাপসা জায়গাটা দেখা যাচ্ছে, শুনলাম ওরই নাম অচ্ছয়ল। ওইখানেই তো সম্রাট্ সাজাহানের বাগান আছে।

অরুণ চমকিয়া উঠিল। ভাস্করের শত সাধনার মানসী-প্রতিমাও আবার কথা কহে!

অরুণের হৃদয়ে বীণার ঝঙ্কার উঠিল অরুণ ভাবিতে লাগিল—কণ্ঠে এত মধু থাকে, ইহা ত কখনও শুনি নাই।

মুখে যাহা আসিল তাহাই উচ্চারণ করিয়া অরুণ লীলার কথার উত্তর দিল এবং মনের গভীর উত্তেজনাকে গোপন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া নিতান্ত বলপূর্ব্বক ওষ্ঠের প্রান্তে একটু হাসি আনিল।

লীলা এ সকলই লক্ষ্য করিতেছিল, কিন্তু এমন ভাব দেখাইল, যেন সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই! কিন্তু সে-ও তখন আর অরুণকে বলিবার মত কোনও কথা খুঁজিয়া পাইল না। কেবল ধীরে ধীরে বলিল—"কি সুন্দর ছবি চারিদিকে। আজকার দিনটাও কি সুন্দর!"

পরদিন প্রভাতে শয্যায় পড়িয়া থাকিয়াই লীলা আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। গত দিন অরুণের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়া লীলা একটা পুরাতন মন্দিরের গায়ে পাথরের যে মূর্ত্তিগুলি দেখিয়াছিল, লীলার মনের সম্মুখে সেগুলি ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। কুমারী পার্ব্বতীকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া অপ্সরীরা নৃত্য করিতেছে, দেব-শিশুরা হাততালি দিয়া আনন্দে গায়িতেছে। তাহাদের কণ্ঠস্বরও যেন ভাস্করের অস্ত্রের মুখে মূর্ত্ত হইয়া শুধু আনন্দই প্রকাশ করিতেছে। সেইখানে দাঁড়াইয়া অরুণকুমার দীপ্তকণ্ঠে এমন ভাবেই অজন্তা এবং সিংহলের সেই স্বতঃমূর্ত্ত পরমসুন্দর প্রাচীন প্রাচীর-শিল্পের ব্যাখ্যা করিয়াছিল—এমন ভাবেই রেখা-পাতের অনন্যসাধারণ কৌশলকে ব্যক্ত করিয়াছিল যে, তখন লীলার মনে হইয়াছিল, দেড় হাজার বৎসর পরও সে যেন সেই অসাধারণ শিল্পীকে তক্ষণ-নিরত দেখিতেছে। শিল্পীর ভাব-গম্ভীর মুখ লীলার সম্মুখে জীবন্তবৎ ফুটিয়া উঠিল। লীলা যেন দেখিতে পাইল, শিল্পী তাহার নিজের গড়া রূপের সাগরে নিজেই পরমানন্দে ডুবিয়া মরিতে উন্মুখ।

পূর্ব্বদিনের প্রভাতটা লীলার কাছে বড়ই অলৌকিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাঁহার অন্তর বলিয়াদিল, উহা লীলার আরাধনার সামগ্রী—অরুণ যেন সেখানে পূজারী, আর লীলা তাহার নৈবেদ্য লইয়া নিবেদন করিবার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছে! লীলা ভাবিতে লাগিল, মন্দিরের গায়ের সেই সব মূর্ত্তি-শিল্প যেন অরুণের প্রাণেই প্রাণ পাইয়াছে—অরুণেই যেন প্রকট হইয়াছে। জীবনের সহিত ললিত-কলার সম্বন্ধটা যে কি, অরুণকে অবলম্বন করিয়া এবং অরুণেই লীলা এই প্রথমবার বুঝিতে পারিল। লীলা ভাবিল, বীণা ঠিকই বলিয়াছে—কাশ্মীরের রূপ যদি দেখিতে হয় তবে অরুণের সঙ্গে এবং অরুণের চোখে—নতুবা নয়। অরুণের চোখে সুন্দর লাগে বলিয়াই-কাশ্মীরের নৈসর্গিক সুষমা এত সুন্দর—ফুলে গান, জলে রূপ, মেঘে স্বপ্ন।

লীলায় এবং অরুণে একটা মনের মিল যে কিরূপে হইল লীলা তাহা ঠিক জানিত না। চিত্রকর বসু যেদিন কলিকাতায় অরুণের সঙ্গে লীলার পরিচয় ঘটাইতে চাহিয়াছিল, তখন অরুণের সঙ্গে পরিচিত হইবার কোনও আকাঙ্ক্ষাও লীলার ছিল না। কোনও দিনই তো লীলা তাহার মনে এমন পূর্ব্বাভাস পায় নাই যে কোনো দিনও সে অরুণের প্রতি তিলমাত্র অনুরাগিণী হইবে। কলিকাতার শিল্প-প্রদর্শনীতে অরুণ কতকগুলি মোমের ও মাটীর পুতুল গড়িয়া দিয়াছিল বটে, সেগুলি যে দেখিতে সুন্দর ছিল না তাহাও নয়; কিন্তু সে পুতুলগুলি দেখিয়া তো লীলার একথা মনে হয় নাই যে, একজন সাধারণ ভাস্কর নিজের গুণপনায় লীলাকে এমন করিয়া টানিতে পারিবে!

কলিকাতায় প্রথম দেখা হইবার পর ধীরে ধীরে লীলার মনে হইয়াছিল যে, অরুণে এমন গুণ আছে যে সে তাহার বন্ধু হইবার যোগ্য। মধ্যে মধ্যে অরুণের সঙ্গ পাইলে মন্দ হয় না। লীলা সে সঙ্গ-লাভের জন্য একটু চেষ্টাও করিয়াছিল। তাহার পর কিছুদিন গেল। অরুণ লীলাদের বাড়ীতে অনেক ভোজ ও পার্টিতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে লীলা বুঝিতে লাগিল যে, অরুণের সঙ্গ পাইলে যে মন্দ হয় না, শুধু ইহাই নহে—

অরুণের সঙ্গ তাহার মন যেন চায়, কারণ অরুণ কবি, অরুণ শিল্পী, অরুণের উন্নত হৃদয় সুন্দরকে পূজা করিয়া সার্থক হইয়াছে। লীলা চিরদিনই নিজেকে বিদুষী বলিয়াই ভাবিত এবং তখন এই বলিয়াই গর্ব্ব অনুভব করিত যে নানা বিদ্যায় পণ্ডিত অরুণকুমারও তাহাকে ভক্তি নিবেদন না করিয়া পারে না!

এইভাবে কিছুদিন গেল। লীলা যেন একটু ত্যক্ত হইয়া উঠিল। সে দেখিতে পাইল, অরুণ শুধু নিজের কথাই বেশী বলে, নিজেকে লইয়া সে যত বেশী ব্যস্ত লীলাকে লইয়া তত নয়। তখন এক একদিন লীলার ইচ্ছা হইত যে অরুণকে একটু আঘাত করিবে। লীলার মনে যখন এই রকম একটা অস্বস্তির ভাব চলিতেছিল এবং তাহাকে সর্ব্বদাই মনে করাইয়া দিতেছিল যে সংসারে সে নিতান্তই একা—ডাক্তার মিত্রও আর নাই, তাহার স্বামীও বাঁচিয়া থাকিতেও বহুদিন আগেই মরিয়াছে—তখন একদিন সন্ধ্যার সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখে লীলার সঙ্গে অরুণের দেখা হইল। অরুণ সে দিন ভারতের চিত্রশালা সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়াছিল! মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সেই প্রকাণ্ড মূর্ত্তির পাশে দাঁড়াইয়া অরুণ যখন লীলাকে পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তিগুলির পরিকল্পনা বুঝাইতেছিল, পূর্ণিমার চন্দ্রকর তখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেই সন্ধ্যায় লীলার মনে হইয়াছিল, অরুণের কণ্ঠস্বর বড় কোমল, তাহার দৃষ্টি বড় মধুর, কিন্তু সে শিল্পের সঙ্গে এমনভাবেই মজিয়াছে যে, তাহা লইয়াই নিজেকে পৃথিবী হইতে দূরে রাখিতে চায়—বন্ধুর কাছে বন্ধু যে আশা করে, অরুণের কাছে তাহা পাইবার আশা নাই। তাহার মনে সেদিন একটা সন্দেহের উদয় হইল—মন কি সত্যই অরুণের সঙ্গ চায়—না চায় না?

লীলা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না।

কাশ্মীরে অরুণের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাহার সঙ্গে নিসর্গ-সুন্দরের পূজা করিতে করিতে কিছুদিনের মধ্যেই লীলার একমাত্র আনন্দ হইল অরুণের সঙ্গ, একমাত্র তৃপ্তি হইয়া উঠিল অরুণের মুখে শিল্পের ব্যাখ্যা। এক একবার এ কথাটাও যে লীলার মনে হয় নাই তাহা নহে যে, তাহার অতৃপ্ত জীবন-মরুতে অরুণকুমারই মরুদ্যানের মত দেখা দিয়াছে—অরুণই তাহার হৃদয়ে নানা বৈচিত্র্য আনিয়াছে, নবীনতা ঢালিয়াছে সেই হৃদয়ে অরুণই ইন্দ্রধনুর বর্ণ ফলাইয়াছে; তাহার চিন্তার অবসাদকে অরুণ কি যেন এক পরমানন্দজনক মাধুর্য্য দান করিয়াছে। এতদিন লীলা যে হর্ষের স্বাদ জানিত না—সুন্দরের পূজারী অরুণ লীলাকেও পূজারিণী করিয়া সেই স্বাদে তীব্র রুচি দিয়াছে।

লীলার তখন মনে হইতে লাগিল—চাই অরুণের সঙ্গ চাই—চাই কিন্তু কিরূপে? মুহূর্ত্তের জন্য লীলা তাহার মনকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিল। সে বুঝাইল যে, অরুণ তো স্বপ্ন লইয়া স্বপ্নের দেশেই বাস করে—শিল্পসাধনাই তাহার সর্ব্বস্ব—সুকুমার শিল্পেই তাহার যত উৎসাহ। সুতরাং নারীর নারীত্বের প্রতি তাঁহার কোনও আসক্তি হইতেই পারে না। সে যে লীলার সঙ্গ চায় ইহা বুঝিতে লীলার বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু লীলা মনকে বুঝাইল যে সেও সুন্দরের পূজারিণী বলিয়াই শিল্পের সাধন-সর্ব্বস্ব অরুণকুমার তাহার প্রতি অনুরক্তি দেখাইতেছে!

হঠাৎ লীলার মন বলিল—তুমি কি সত্যই শিল্পসাধনা চাও না ভালবাসা চাও? তোমার অন্তরের অন্তস্তলে খুঁজিয়া দেখ দেখি!

লীলা আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। কি যেন একটা দারুণ আঘাতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

লীলার দাসী তাহার পালংচাএর সঙ্গে সঙ্গে ডাকের চিঠি আনিয়া দিল।

লীলা দেখিল—ডাক্তার মিত্রের পত্র!

কক্ষের মধ্যে প্রসারিত প্রভাতের ভাঙ্গা আলোকও তখন লীলার আছে অন্ধকার ঠেকিতে লাগিল।

লীলা জানিত যে ডাক্তারের চিঠি আসিবেই। সে তাই মনকে অনেকটা প্রস্তুত করিয়াই রাখিয়াছিল। পত্রের মধ্যে কত অনুযোগ ছিল। লীলা কি কাশ্মীরে আসিবার সময় ডাক্তারের জন্য দুইটী কথাও লিখিয়া রাখিয়া আসিতে পারিত না? শিকার হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তার কলিকাতার জনারণ্যের মধ্যে নিজেকে বড়ই একা একা মনে করিতেছে। এখনও কি লীলার কাশ্মীর-ভ্রমণ শেষ হয় নাই? সেখানে কি দেখিবার জিনিস এতই আছে যে, এক মাসেও ফুরায় না? তবে ডাক্তারের সময়টা বর্ষার স্রোতের মত ছুটিয়াছে, কারণ তাঁহার খুড়তুতো ভাই

লাট-কাউনসিলের সদস্য হইবার জন্য মাথা কুটিতেছেন। ডাক্তার তাঁরই জন্য ভোট কুড়াইতে ব্যস্ত। লীলার স্বামী বুলিয়াছেন যে, লীলার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বলিয়াই তিনি জোর করিয়া তাহাকে কাশ্মীরে পাঠাইয়াছেন! লীলা আসিতেই চায় না, তিনিও ছাড়েন না। ডাক্তার এবার তিনটা বাঘ শিকার করিয়া লীলার জন্য তিনখানা ভাল চামড়া আনিয়াছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

লীলা ডাক্তারের চিঠিখানা পড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং টুকরাগুলি চিমনির আগুনে ফেলিয়া দিল। ডাক্তারের পত্র যখন পুড়িতে লাগিল লীলা তখন একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

চিঠির টুকরাগুলি কখন পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। লীলা তখনও মোহাবিষ্ট মত বসিয়াইছিল।

বীণা আসিয়া যখন ডাকিল তখন লীলার চমক ভাঙ্গিল। সে মনে মনে বলিল—আর না, ডাক্তার আমার কে? সংসারে আমি এখন একা। সে যদি সত্যই আমাকে ভালবাসিত তাহা হইলে আমাকে কলিকাতায় না দেখিয়া এখনও কি সে সেইখানেই থাকিতে পারিত?

(ক্রমশঃ)

নিদাঘ প্রভাতে

(মরিসের অনুভাবে)

[শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

অস্ফুট অধরপ্রান্তে একটী প্রার্থনা শুধু মোর তরে ক'রো উচ্চারণ,
তারকার তীর্থলোকে মোর লাগি' রেখে দিয়ো অচঞ্চল একটী ভাবনা।
নিদাঘের রাত্রি হলো শেষ! দূরে ওই বুঝি প্রভাতের অরুণ-কিরণ,
নিমের পল্লব আর মেঘের কঙ্কণমাঝে পাংশুম্লান হ'লো অন্যমনা।
যে পল্লব ছিল জাগি; ঊর্দ্ধমুখে,—তপস্বীর ধ্যানসম ধীর প্রতীক্ষায়,
বর্ণহীন, স্থিরমূর্ত্তি!—তবু দূর নন্দনের আমূর্চ্ছিত হিরণ সুষমা।
গণিছে মুহূর্ত্ত যেন!—জাগ্রত তপন করে রশ্মিটীর প্লাবন-বন্যায়,
মগ্ন করি দিবে তারে। দূরে শ্যাম তৃণ শস্য-শিহরিত মাঠের সীমায়!
দীর্ঘ আলি পথগুলি প্রতীক্ষিছে অধীর আগ্রহে! অশান্ত তুষার সমা,
ব্যাকুল সমীর-বধূ স্পন্দনে শিহরি' উঠে। গোলাপের দল শিহরায়।
অ-দূর গোধূলি তার আলো-ছায়া-আঁকা নীল, ধূসরিত বটের শাখায়,
রেখেছিল উদয়-বাণীরে,—সে যেন পশিল চুপে প্রান্তরের ভবন-কাণায়।
নিঃসঙ্গ নির্জ্জনে; তারি মত কামনা আমার। তুমি শুধু একটী কথায়,
সার্থক করিয়ো তারে। আনমিত শস্যশীর্ষে প্রাণ মোর আজো মূরছায়।
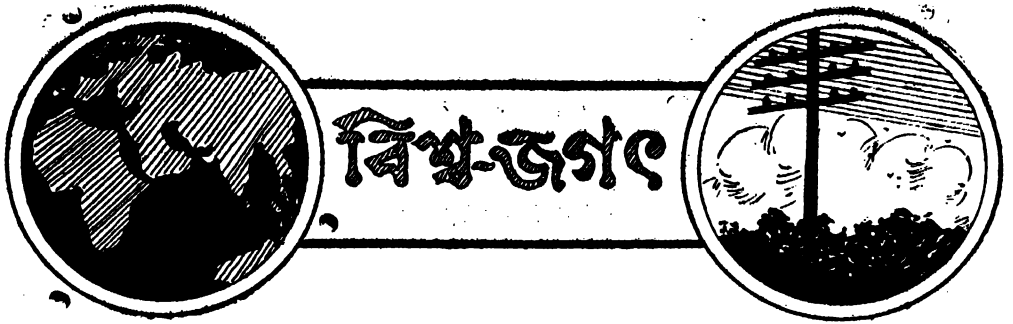
অভিনব আলোক-স্তম্ভ

টেমস্ নদীতে উলউইচ নামক স্থানের নিকট যে এক আলোক-স্তম্ভ আছে, শুনা যায় না কি তাহার ন্যায় বিচিত্র আলোকস্তম্ভ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। এই আলোক-স্তম্ভটীর বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, সন্ধ্যা হইলে আপনা হইতেই ইহার মধ্যে আলো জ্বলিয়া উঠে এবং সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা নিবিয়া যায়। ইহার মধ্যে কল-কব্জার এরূপ বন্দোবস্তআছে যে, ইহাতে আলো জ্বালিবার জন্য কোন লোক দরকার হয় না—কেবল বৎসরে দুইবার করিয়া ইহার মধ্যে এসিটিলিন গ্যাস পুরিয়া দিতে হয়, কারণ আলো গ্যাসেই জ্বলে। দূর হইতে দেখিলে ইহাকে কোন জাহাজের মাস্তুল বলিয়া ভ্রম হয়। এই আলোকস্তম্ভটীর এমনই গুণ যে, যদি দিবাভাগে কোন দিন হঠাৎ চারিদিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া যায় তাহা হইলেও তখনই ইহার মধ্যে আলো জ্বলিয়া উঠে। ইহা জাহাজের নাবিকগণের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। শুনা যায়, ইহা সম্প্রতি নির্ম্মিত নহে। গ্রেট-বৃটেনের যে সমস্ত পুরাতন আলোক-স্তম্ভ আছে ইহা তাহাদেরই মধ্যে একটী।

অদৃশ্য-চশমা

এই ছবিখানির উপরে যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে উহা Prof. L. Heineএর। ইনি Kiel বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। ছবিতে ইহার চোখে চশমা আছে কি না তাহা কিছুতেই বোঝা যায় না—কিন্তু সত্যই ইনি চশমা পরিয়া আছেন। ইনি এই অদৃশ্য-চশমা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চশমার বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, চোখের উপর বসাইয়া দিলে কিছুতেই বুঝা যায় না যে, চশমা পরা হইয়াছে। ইহাতে কোন বেড় নাই। ছবিতে নিম্নে এইরূপ কতকগুলি চশমার নমুনা দেওয়া হইল। চশমাগুলি
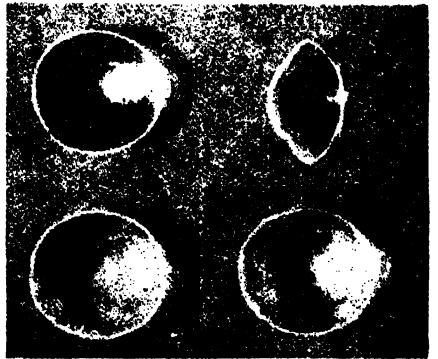
উপরে Prof. L. Heine—তলায় তাঁহার নবাবিষ্কৃত চশমা

বেশ আরামপ্রদ। পূর্ব্বে যে সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা চশমা ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের চশমা খুলিয়া রঙ্গমঞ্চে

অবতীর্ণ হইতে হইত। কিন্তু এই অভিনব চশমার প্রচলনে আর তাহা করিতে হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতে একটী অভিনেত্রী এইরূপ অদৃশ্য চশমা পরিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন—কিন্তু দর্শকগণের মধ্যে কেহই বুঝিতে পারে নাই যে তিনি চশমা পরিয়াছিলেন

ভবিষ্যৎ বাসগৃহ

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যতটা পারিতেছে আপনাকে পুরাতনের কবল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। শুনা যাইতেছে, বর্ত্তমানে আমরা যে সকল ইটপাথরের তৈয়ারী বাড়ী বাসভবন রূপে ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা আর কিছুদিন পরে থাকিবে না—তখন নূতন কিছুর উদ্ভাবন হইবে। শিকাগোর একজন বিখ্যাত মিস্ত্রী Mr. Pierre Bloukeএর বিশ্বাস যে, আর পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান সহরগুলিতে কাচের বাড়ী তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হইবে। ইহাতে আমরা সাধারণ ইট-পাথরের গৃহে যে সকল সুবিধা পাইয়া থাকি তাহা যে পাইব না এমন নহে, দরজা জানালা প্রভৃতি সমস্তই থাকিবে। ঘরগুলি কতকটা জাহাজের কেবিনের মত হইবে। রাত্রিতে বাড়ীর মধ্যে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিলে ভারি সুন্দর দেখাইবে। এইরূপ গৃহ না কি সর্ব্বদিক দিয়া বিজ্ঞান সম্মত।

নিউইয়র্কে Palais de France নামক যে পৈষট্টি-তলা বাড়ীটী তৈয়ারী হইবে তাহার উপরের পাঁচ-তলা কাঁচের ইট দিয়া গাঁথা হইবে। মাটীর ইটের সহিত যেমন চুণ শুরকী ব্যবহার করা হয়, এই ইটের সহিতও তাহাই ব্যবহার করা হইবে। এই নূতন ইটগুলি এক প্রকারের Plate Glass হইতে গঠিত।

জার্ম্মানী হইতে আর এক অদ্ভূত সংবাদ আসিয়াছে। সেখানের মিস্ত্রীরা আমেরিকান মিস্ত্রীদের হারাইয়া দিয়াছে। তাহারা এমন এক মজার বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছে যে, তাহাকে আসবাবপত্তর সুদ্ধ যখন খুসী বাড়াইতে বা কমাইতে পারা যায়। জার্ম্মানীতে আর এক প্রকারের বাড়ী নির্ম্মাণের পরিকল্পনা সম্প্রতি বাহির হইয়াছে; সেগুলি কতকটা ভূ-গোলকের (Globe) ন্যায়। এগুলির নূতনত্ব হইতেছে এই যে, দিবাভাগে সূর্য্য যে-দিকেই থাকুক না কেন, গৃহগুলির মুখ সেই দিকেই ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

প্রাচীন শহরে অধিবাসিগণের আধিক্য

সাধারণতঃ আমরা ভাবিয়া থাকি যে লণ্ডন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি শহরের লোকাধিক্য বর্ত্তমান সভ্যতার ফল, পূর্ব্বে ঐরূপ ছিল না। কিন্তু তাহা নহে। কিছুদিন হইল প্রাচীন পুঁথিপত্র হইতে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, খৃষ্ট জন্মাইবার পর প্রথম শতাব্দীতে রোম নগরে প্রতি একার স্থানে এক হাজার লোক বাস করিত। আর যে স্থানটীতে জুলিয়াস সিজারের Forum ছিল সেই স্থানটীর দাম ছিল প্রতি একর পিছু ৪০০,০০০ পাউণ্ড করিয়া। ৩৩০ শতাব্দীতে কনষ্টানটিনোপল শহরে যথেষ্ট লোকাধিক্য হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

দ্রুতগামী ট্রেণ

L. M. S, এর "Royal Scot" নামক ট্রেণখানিই বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ট্রেণ। Euston হইতে Scotland এর দূরত্ব ৩৯৯৩ মাইল। এই ট্রেণখানি আটঘণ্টা পনর মিনিটে এই পথ অতিক্রম করিয়াছিল।

উক্ত ট্রেণ খানিই কিছুদিন পূর্ব্বে না থামিয়া ৫ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে ২৯৯১ মাইল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে না থেমে চলার (non-stop) রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিল।

আমেরিকার খেয়াল

পুরাকালে রাজাদের মাঝে মাঝে বাড়ী তৈয়ারী করিয়া আকাশে পৌঁছিবার সখ হইত এবং ফল স্বরূপ দুই চারি খানি বাড়ীও যে না উঠিয়াছিল এমন নহে। সম্প্রতি আমেরিকা যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী তৈয়ারী করিতেছে তাহা ইহারই কতকটা অভিনয়ের ন্যায় হইলেও ফলে যে কি হইবে তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়!

কিছুদিন হইল ঐ দেশীয় হোটেলওয়ালাদের মধ্যে এইরূপ বৃহৎ বৃহৎ আকাশস্পর্শী বাড়ী তৈয়ারী করিবার বেশ রেশারিশি পড়িয়া গিয়াছে। নিউইয়র্কের Waldrof

Astoria Hotel তাঁহাদের যে বাড়ীখানি তৈয়ারী করিবেন তাহার এক নক্সা হইয়াছে। আমরা ইহার একখানি

Waldrof Astoria Hotelএর নক্সা

ছবি দিলাম। শুনা যাইতেছে, ইহার ন্যায় প্রকাণ্ড বাড়ী পূর্ব্বে আর তৈয়ারী হয় নাই। এই সকল এক একখানি বাড়ীকে এক একটী সহর বলা যাইতে পারে; কারণ ইহার কোন তলায় হয় তো বাজার, কোন তলায় স্নানাগার, কোন তলায় বল খেলিবার মাঠ প্রভৃতি মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক যাহা কিছু দরকার পড়ে, তাহা সমস্তই ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাতে সুবিধা এই যে, যখন-তখন অকারণে বাহিরে যাইতে হয় না। আমেরিকার ন্যায় এরূপ বাড়ী ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে নাই, কারণ এইরূপ গৃহ নির্ম্মাণ বহু দেশে আইন-বিরুদ্ধ।

বহুরূপী সিড্‌নি সাইম

সিড্‌নি সাইম (Sidney Sime) বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ শব্দানুকরণ শিল্পী ও বহুরূপী। নানারূপ জীব-জন্তুর ডাক ডাকিবার বা এক সময়ে বহু বেশে সজ্জিত হইবার দক্ষতা ইঁহার অসাধারণ। কিছুদিন হইল ঐদেশে এক প্রদর্শনীতে তাঁহার খেলা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। সাইম কতকটা ভবঘুরে গোছের অদ্ভুত প্রকৃতির

সিড্‌নি সাইমের ক্রীড়া

লোক। তিনি বর্ত্তমানে Warpesdonএ একটী গ্রাম্য কুটীরে বাস করিতেছেন। ইঁহার অনেক গুলি জীবজন্তু আছে। তাহাদের সহিত খেলা করিয়াই না কি ইঁহার দিন কাটে। ইঁহার একটী প্রিয় বিড়াল আছে। তাহার সহিত প্রায়ই বিড়াল ডাক ডাকিয়া ঝগড়া করেন। তিনি তাঁহার সেই বিড়ালটীর সহিত কেমন খেলা করিতেছেন তাহা ছবিতে দেখা যাইবে। সাইম অত্যন্ত নির্জ্জনতা-প্রিয়। তিনি কেবল জীবজন্তু লইয়াই থাকেন—লোক-চক্ষুর সম্মুখে খুব কমই বাহির হন। তিনি প্রথম জীবনে কয়লার খনিতে সামান্য কুলীর কাজ করিতেন।

মডেল রেলওয়ে ক্লাব

'মডেল রেলওয়ে ক্লাব' কথাটা আমাদের নিকট নূতন বলিয়া মনে হইলেও লণ্ডনে এরূপ একটী প্রতিষ্ঠান আছে। এই ক্লাবের সভ্যদের কাজ হইতেছে, অবসর সময়ে বসিয়া মডেল ট্রেণ তৈয়ারী করা। বহু উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার প্রভৃতি এই ক্লাবের সভ্য। অনেক গৃহস্থ তাঁহাদের ছুষ্ট ছেলেদের ইহার সভ্য করিয়া দিয়াছেন—তাহারা নিজহাতে রেল গাড়ী তৈয়ারী করিয়া যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করে। এরূপ নিজহাতে রেল, এঞ্জিন প্রভৃতি তৈয়ারী করার উপকারিতাও খুব বেশী! ইহাতে ছোট ছোট ছেলেদের পর্য্যবেক্ষণ শক্তির যথেষ্ট অনুশীলন হয়—এবং নিজহাতে কোন কিছু তৈয়ারী করিবার শক্তিও অর্জ্জিত হয়। এই মডেল তৈয়ারী করিতে করিতে দু-একটী সভ্য এক-আধ খানি নূতন ধরণের রেলগাড়ীও উদ্ভাবন করিয়া ফেলিয়া-

Mr. G. P. Keen ক্লাবে কাজ করিতেছেন

ছেন। বিলাতী রেলওয়ে কোম্পানী এই ধরণের ক্লাবের বহুল প্রচারের জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। যে ছবি দেওয়া হইল তাহাতে এই ক্লাবের সভাপতি Mr. G. P. Keen তাঁহার মডেল রেলওয়ে ষ্টেশনটীতে কেমন কাজ করিতেছেন দেখা যাইবে। এই ধরণের সৎ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সকল দেশেই আছে।

তুলার রাস্তা

তুলা বা পাট প্রভৃতি পূর্ব্বে আমাদের বস্ত্রাদি তৈয়ারী করিবার জন্য প্রয়োজন হইত বলিয়া জানা ছিল; কিন্তু চতুর বৈজ্ঞানিকের হাতে পড়িয়া সম্প্রতি রাস্তা তৈয়ারীর কাজে লাগিয়াছে। কিছুদিন হইল New Orleans এর একটী বিজ্ঞানাগারে বৈজ্ঞানিক তুলা হইতে এক প্রকার নরম জিনিস তৈয়ারী করিয়াছেন। পূর্ব্বে পিচ প্রভৃতি হইতে তৈয়ারী রাস্তায় ভারবাহী লোহার চাকাওয়লা গাড়ী যাইলে রাস্তার অনেক অংশ অত্যধিক চাপে ভাঙ্গিয়া যাইত। কিন্তু এই নবাবিষ্কৃত দ্রব্যটীর উপর যদি পিচ্ দিয়া রাস্তা তৈয়ারী হয় তাহা হইলে রাস্তা খুব সহজে ভাঙ্গিয়া যায় না, কারণ ইহাতে রাস্তা elastic হয়—অতিরিক্ত বন্ধন ও কুঞ্চনে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে না। বহুদিন পরে রাস্তা যদি একান্তই ভাঙ্গিয়া যায়, তবে তাহা পুনরায় তৈয়ারী করিবার জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। ইহার উপরের পিচের আবরণ সহজেই তুলিয়া ফেলা যাইতে পারে।

বসিবার কারসাজি

বহুলোক যখন একত্রে সমবেত হয়, তখন বসিবার বা দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে যে কত বিচিত্র দৃশ্যের সৃষ্টি হয় তাহা বিরাট্ জনতার প্রতি যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। নিম্নে যে চিত্তাকর্ষক ছবিখানি দেওয়া হইল তাহাতে উপবিষ্ট বহুলোকের মাথা মিলিয়া কেমন একটী সুন্দর ঘোড়ার ছবি হইয়া গিয়াছে। ইহা আমেরিকার একটী ফুটবল খেলার জনতার দৃশ্য। কলেজের ছাত্ররা কেহ কেহ কাল জামা ও টুপী পরিয়া এমন কৌশল করিয়া বসিয়াছে যে, তাহাতে ঐ অপরূপ দৃশ্যটীর সৃষ্টি হইয়াছে।

বসিবার কারসাজি
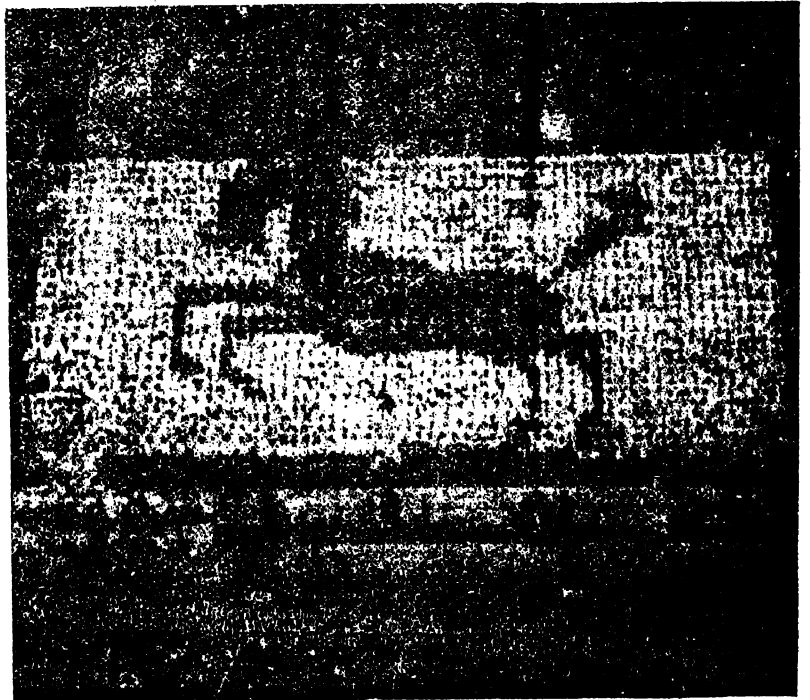
পীসার হেলান' স্তম্ভ

পীসার হেলান' স্তম্ভটী Leaning tower of Pisa পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের মধ্যে একটী। কিছুদিন হইল বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এই স্তম্ভটীর অবস্থা এইরূপ যে অচিরেই উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। স্তম্ভটীকে একেবারে ভাঙ্গিয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় তৈয়ারী করা অসম্ভব। তাই সকলে বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিছুদিন হইল একটী মিস্ত্রী উহাকে না ভাঙ্গিয়া এমন সুন্দর করিয়া মেরামত করিয়াছে যে, ভবিষ্যতে আর পড়িয়া গিয়া স্তম্ভটী নষ্ট হইয়া যাইবে না। মিস্ত্রীটী এমনই কুশলী যে মেরামত করিবার সময় ইহার পূর্ব্বের ঝুকৃতি কমাইয়া দিয়াছে। মাপিয়া দেখা গিয়াছে, ইহার বর্ত্তমান ঝুকৃতি ৪·২৬৫ মিটার। এই স্তম্ভটী মেরামত করিবার জন্য গত বাইশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা চলিতেছিল। ঐতিহাসিকেরা এই সংবাদ শুনিয়া সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যামেরা ক্লাব

কয়েক বৎসর হইল পাশ্চাত্য দেশে বহুলোকের চলচ্চিত্রের ছবি তুলিবার অত্যন্ত ঝোঁক হইয়াছে। ব্যবসাদারী ছবিতুলিবার যথেষ্ট সমিতি থাকিলেও লণ্ডনের যেখান-সেখান হইতে সখ করিয়া ছবি তুলিবার প্রতিষ্ঠানও
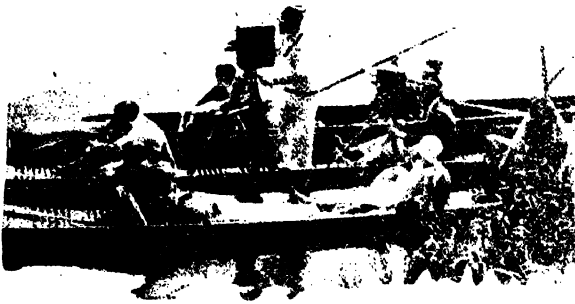
ক্যামেরা ক্লাবের অভিযান

অসংখ্য গড়িয়া উঠিতেছে। বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও এই ঝোকের হাত হইতে রেহাই পায় নাই। অল্পদিন হইল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় একটী Camera Society স্থাপন করিয়াছেন। এই Societyর সভ্য ছাত্রছাত্রীরা ছুটির দিনে শহর হইতে দূরে কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া ফিল্ম তুলিয়া আনে। আমরা এই সমিতির একটী ছবি দিলাম। ছুটির দিনে ছবি তুলিয়া ছাত্রছাত্রীরা কেমন আনন্দ করিতেছে!

আমাদের গ্রামে গ্রামে বহু প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন রহিয়াছে। ছাত্রগণ অবকাশকালে সে সমস্ত নিদর্শনের ছবি তুলিয়া আনিলে দেশের ইতিহাস-গঠনে সাহায্য করা হয়।

অদৃশ্য আলোক

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন চোর ধরিবার নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে। কিছুদিন হইল James L. Mackey নামক একব্যক্তি এক প্রকারের অদৃশ্য আলোক আবিষ্কার করিয়াছেন। এই আলোক সাধারণতঃ চোর ধরিবার কাজে ব্যবহার হইবে। ইহা একটী যন্ত্র হইতে নির্গত হয়। যে ঘরে সিন্দুকে মূল্যবান দ্রব্যাদি থাকে সেই ঘরে এই যন্ত্রটী বসাইয়া রাখিলে যখন চোর আসিয়া সিন্দুক ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহার অলক্ষ্যে আপনা-আপনি ইহা হইতে এক আলোক রশ্মি নির্গত হইবে। কিন্তু এমনই মজা যে চোর নিজে তাহা দেখিতে পাইবে না। সে আপন মনে সিন্দুক ভাঙ্গিতে থাকিবে। ইহারই আলো দেখিয়া বাড়ীর লোকেরা চোর ধরিয়া ফেলিবে। এই অদৃশ্য-আলোকের প্রবর্ত্তনে বহু চোরের অন্ন উঠিবে, সন্দেহ নাই।

আকাশপথে স্পীড রেকর্ড

পাশ্চাত্য দেশে স্পীড রেকর্ডের (Speed Record) হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। জলে, স্থলে, আকাশে সর্ব্বত্র স্পীড রেকর্ড স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশে Captain Boris Sergievsky নামক এক ব্যক্তি আকাশ পথে ঘণ্টায় ১৪৩৯ মাইল করিয়া বিমানপোত চালাইয়া এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। Cap. Sergievsky ভার লইয়া বহু উচ্চ স্থান দিয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত বিমানপোত চালাইতে পারেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ৪৪০৯ পাউণ্ড ভার লইয়া ২০,০০০ ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া এক রেকর্ড স্থাপন করেন। Sergievsky ভবিষ্যতে আরও বিপদসঙ্কুল অভিযানে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এই অসীম সাহস প্রশংসনীয়।

নূতনতম গ্রহ

Arigonaর Lowell observatory হইতে Tombaugh নামক এক তরুণ বৈজ্ঞানিক একটী নূতন গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার হিসাবঅনুযায়ী এই গ্রহটী সূর্য্য হইতে চারকোটী মাইল রে দূঅবস্থিত। নবাবিষ্কৃত গ্রহটী কতকটা নেপচুন প্রভৃতি গ্রহের ন্যায়। একটী চব্বিশ ইঞ্চি প্রকাণ্ড টেলিস্কোপের সাহায্যে গ্রহটীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ধ্বনি-বিশেষজ্ঞ মার্টিন

Mr. Hinks Martin পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধ্বনি-বিশেষজ্ঞ (noise expart) তাঁহার কয়েকটী যন্ত্র আছে। তাহার দ্বারা তিনি যখন যেমন ইচ্ছা নানারূপ শব্দ করিতে পারেন; কিন্তু প্রত্যেক বিভিন্ন শব্দের জন্য তাঁহাকে বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। তাঁহার এই যন্ত্রগুলির মধ্যে কোনটীতে বা সিংহ গর্জ্জন, কোনটীতে বা কামানের ভীষণ শব্দ, আবার কোনটীতে বা জাহাজের ভেঁপু ধ্বনি বাহির হয়। বরড়িওতে অভিনয় কালে অথবা Talkie Film তুলিবার সময় মিঃ মার্টিনের যন্ত্রগুলি যথেষ্ট কাজে লাগে। নিম্নের ছবিতে দেখা যাইবে মিঃ মার্টিন দূরের একখানি চলন্ত ট্রেণের শব্দ-কম্পন সৃষ্টি করিতেছেন। কেবল যন্ত্রের উপরই ইহা নির্ভর করে না, ইহাতে হাতেরও যথেষ্ট কারসাজি দেখাইতে হয়। মিঃ মার্টিন যন্ত্রের উপর কতক, গুলি বাঁকান তারের ন্যায় জিনিস বুলাইয়া বুলাইয়া শব্দের কম্পন সৃষ্টি করিতেছেন।
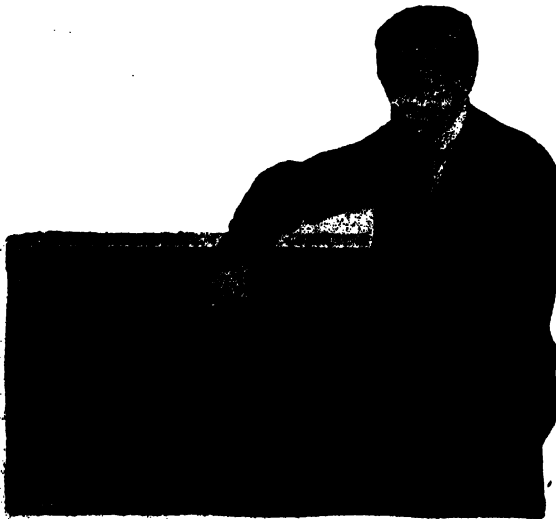
Mr. Hinks Martin.

মঙ্গলগ্রহে সংবাদ প্রেরণ

জ্ঞানের নবোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কেবল পৃথিবীর লোকের সহিত পরিচয় করিয়া ক্ষান্ত নয়—পৃথিবীর বাহিরে অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীর সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য সে ব্যাকুল। গত কুড়ি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া পৃথিবী হইতে বিভিন্ন গ্রহে সংবাদ পাঠাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েক জন দুঃসাহসী বৈজ্ঞানিক রকেটে করিয়া মঙ্গল গ্রহে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় নি। এখন বৈজ্ঞানিকেরা উভয়-সঙ্কটে পড়িয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে এ কাজ সহজ-সাধ্য নয়—বাস্তবের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে ইহার সত্যতার সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রতিকূল যুক্তি আছে। যে সমস্ত কথা বিশেষজ্ঞদের ভয়ানক চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের মধ্যে এই তিনটীই প্রধান। প্রথমতঃ আকাশ-পথে যে সংবাদ পাঠান হইবে তাহা বায়ু তরঙ্গ চাপে লীন হইয়া যাইবে কি না? প্রেরিত সংবাদটী যে সেখানে পৌঁছিবে তাহাই বা কিরূপে সম্ভব? সংবাদটী যদি সত্যই সেখানে পৌঁছায় তাহা হইলে তাহার প্রত্যুত্তর কি পাওয়া যাইবে?

এই সকল প্রশ্নের যতদিন না সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে ততদিন গ্রহাদিতে সংবাদ পাঠান যে বিশেষ ফলবতী হইবে তাহা মনে হয় না। তবে আশার বিষয় এই যে সম্প্রতি Prof John Thompson নামক এক ব্যক্তি এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং তিনি তাহাতে মঙ্গল গ্রহে সংবাদ প্রেরণ করিবার আর এক নূতন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস তিনি এক প্রকার বৈদ্যুতিক তরঙ্গের (Hertrian waves) সাহায্যে এই কাজ করিতে সমর্থ হইবেন। Thompsonএর পূর্ব্বে আর এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে যে জ্ঞানী মানুষ আছে এই কথা অপর গ্রহে জানাইতে হইলে পৃথিবীর উপরিভাগে আকাশের বুকে এক প্রকাণ্ড right-angled triangle তৈয়ারী করিতে হইবে এবং উহার গঠন যেন এইরূপ হয় যে তাহা অপর গ্রহের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। rt-angled triangle তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্য এই যে অপর গ্রহের অধিবাসিরা যদি সভ্য হয়, তাহা হইলে উহা দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিবে যে পৃথিবীতে সভ্য ও জ্ঞানী মানুষ আছে, কারণ জ্যামিতির সাধাবণ নিয়মগুলি ব্রহ্মাণ্ডের সভ্য প্রাণী মাত্রেই জানে।

বৈজ্ঞানিকদের এই পুনঃ পুনঃ বিফলতা ভবিষ্যতে তাঁহাদের জয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে না যে তাহাই বা কে বলিবে?

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

ভালবাসিতাম তোমা

(মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত ইংরাজী
কবিতা* হইতে অনূদিত)

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ)

১

ভালবাসিতাম তোমা',—চাহি' স্নিগ্ধোজ্জ্বল আঁখিদ্বয়ে
যাপিয়াছি কতদিন উচ্ছ্বসিত ব্যাকুল হৃদয়ে!
তোমার ভ্রূকুটী ছিল মৃত্যু মোর,—হাসিতে জীবন;
কণ্ঠস্বরে পরাজিত সুমধুর বীণার নিক্কণ!

২

ভালবাসিতাম তোমা', স্বপ্নরাজ্যে লয়ে যেত আশা
কত পুষ্পাস্তৃত পথে, সেথা শুধু সুখ, ভালবাসা,
কি আনন্দ সেই দিন, ভবিষ্যৎ ভাগ্যাকাশে যবে
মোর ধ্রুবতারা—তোমা'—সাজাইত গরিমা-বিভবে।

৩

অতীত সেদিন আজি—স্বর্গের আলোক-রশ্মি-প্রায়
আসিয়া অদৃশ্য হ'লে, উজলিয়া মুহূর্ত্ত ধরায়,
দেবী তুমি নন্দনের, এসেছিলে স্বর্গ ত্যাগ করে,
অপূর্ব্ব গরিমালোকে উদ্ভাসিতে—দুদণ্ডের তরে।

৪

অতীত সেদিন আজি; সত্যই কি অতীত সকল?
সত্য কি সে প্রেমপূর্ণ বক্ষ আজি তুষার-শীতল?
সত্য কি সে স্নিগ্ধ আঁখি—চাহিত যা' তত প্রেমভরে,
নিমীলিত সমাধির অন্ধকারে চিরদিন তরে?

মনে হয়, ভাবি, ইহা স্বপ্ন শুধু, কিছু নহে আর,
মনে হয়, ভুলি' স্বপ্নে ভাবি তুমি আসিবে আবার,
ভেঙ্গে যায় স্বপ্ন মোর, চূর্ণ করি কল্পনা ও আশা,
বাস্তব লইয়া আসে নির্ম্মম নিষ্ঠুর তা'র ভাষা।

---

* হিন্দু কলেজে পঠদশায় অনুমান সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে রচিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[জন্ম ১২ই মাঘ, ১২৩০—মৃত্যু ১৭ই আষাঢ়, ১২৮০। গত ৪ই আষাঢ় রবিবার মাইকেলের সপ্তপঞ্চাশত্তম শ্রাদ্ধ-বার্ষিকী হইয়া গিয়াছে। আপন জীবনের মত নিজরচিত সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিবার মত শক্তি খুব অল্প কবিরাই দেখা যায়। এই স্বদেশ-বৎসল প্রবাসী বাঙ্গালী-কবির সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিতে যাওয়াই ধৃষ্টতার বিষয়।]

বঙ্গমহিলা-বিরচিত প্রথম বাঙ্গলা নাটক

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত]

(সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকালয়ে "উর্ব্বশী" নামক একখানা বাঙ্গালা নাটক আছে। এই নাটকখানা একজন বঙ্গমহিলা-বিরচিত। এই বঙ্গমহিলা গ্রন্থমধ্যে তাঁহার নাম ও পরিচয় প্রদান করেন নাই। শুধু দ্বিজতনয়া নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। নাটকখানির টাইটেল পেজ এইরূপ—

উর্ব্বশী নাটক

দ্বিজতনয়া-প্রণীত

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত ডি রোজারিও কোম্পানীর মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত।

সন ১২৭২—ইং ১৮৬৬

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র)

লেখিকা বিজ্ঞাপন-পত্রে লিখিয়াছেন "দণ্ডীপুরাণে দণ্ডীরাজার বৃত্তান্ত সকলেই পড়িয়াছেন। ভগবান্ চক্রী কি প্রণালীতে সৃষ্টি পালন করেন, পুরাণকর্ত্তা এই গ্রন্থে তাহা বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঈশ্বরের এতাদৃশ পরিচয় নব্য-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে অনেকের রুচিপীড়া জন্মায়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা জগতের নিয়মসকল উন্মীলিত নয়নে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন, মহর্ষি এবিষয়ে অভ্রান্ত কি না। দণ্ডীপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের সেই বর্ণনা রক্ষা করিয়া দিয়াছেন। আমার নাটক পুরাণ অবলম্বন করিয়া লেখা হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু সে কেবল প্রসঙ্গতঃ মাত্র। বিস্তৃত প্রস্তাবে ভগবানের বর্ণনার চেষ্টা পাওয়া কেবল মুনি ঋষিদিগেরই সম্ভবে। এই হেতু অধিক সাহস করি নাই।

দণ্ডীপুরাণের বৃত্তান্তে উর্ব্বশী ও দণ্ডী রাজাই প্রধান। আমিও নাটকে তাঁহাদেরই প্রাধান্য রাখিয়াছি। সুতরাং আবার গ্রন্থে অপবিত্র প্রণয়ের ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু কেবল তাহা বলিয়াই সূক্ষ্মদর্শী পাঠকমণ্ডলী আবার তাহাকে অনাদর করিবেন না।

এই নাটকে ভূরি ভূরি দোষ আছে, তথাপি আমি ইহাকে পাঠক-সমাজে প্রেরণ করিলাম। আমি অশিক্ষিত অবলা, এই আমার প্রথম রচনা, একথা বলিয়া পাঠকগণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে সাহসী হই না। গ্রন্থমাত্রেই নিজ গুণে পরিচিত হয়; গ্রন্থকারের অবস্থা বিবেচনা করিয়া হয় না। পাঠক-সমাজ অপক্ষপাত বিচারপতি সদৃশ। তাঁহাদের অনুগ্রহও নাই! অতএব বৃথা অনুনয়-বিনয়ের ফল কি? তথাপি প্রবোধের নিমিত্ত এই এক ভরসা যে, যদিই আমার গ্রন্থ নিতান্ত নীরস হইয়া থাকে তবে ইহা আপনিই অচিরাৎ লয় পাইবে ও আমিও পাঠকমণ্ডলীর তিরস্কার হইতে উদ্ধার পাইব।

এই গ্রন্থ প্রচার বিষয়ে অনেকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের সকলেরই নিকট চিরকাল অনুগৃহীত থাকিব। মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি প্রণেতা হরিলাল ন্যায়রত্ন মহাশয় এই গ্রন্থ সংশোধনাদি দ্বারা অধিনীকে চিরবাধিত করিয়াছেন। আর রোজারিও কোম্পানীর মুদ্রাযন্ত্রের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র দাস মহাশয় কত উপকার করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না; আর যে মহাশয় এই বিজ্ঞাপন রচনায় সাহায্য করিয়াছেন তাঁহার নিকটেও অনুগৃহীত হইলাম।
—দ্বিজতনয়া।"

(প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এই নাটকখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। ডিমাই আট পেজি—পত্রাঙ্ক।/+৮৫। চারিটি অঙ্কে সমাপ্ত। দৃশ্য বিভাগ নাই। এই নাটকখানির পূর্ব্বে কোনও বঙ্গমহিলা কর্ত্তৃক বিরচিত কোনও নাটকের পরিচয় পাওয়া যায় না বলিয়া ইহাকেই বঙ্গমহিলা-বিরচিত প্রথম বাঙ্গালা নাটক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলাম। নাটকখানি গদ্যে লিখিত, মধ্যে মধ্যে পাত্র ও পাত্রীর কথোপকথনের মধ্যে পয়ার ছন্দও ব্যবহৃত হইয়াছে) নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। তাহা হইতেই পাঠকগণ ভাষার নমুনা বুঝিতে পারিবেন।

"দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বারাবতী

নারদ। আমি অমরাবতীতে শুনে এলেম মহর্ষি দুর্ব্বাসা

উর্ব্বশীকে অভিসম্পাত করেছেন তা উর্ব্বশী এক্ষণে অবন্তীরাজগৃহে অবস্থিতি করিতেছে, আর ইন্দ্রও তাহার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন। অনেকদিন বিবাদটাও লাগান হয় নাই। আমি নারদ, এমন সুযোগে চুপ করেই বা কি করে থাকি? কলহ যাহাতে শীঘ্র লাগে এমন উদ্যোগ করতে হলো। খুব একটা যুদ্ধ হয় কিসে? [নয়ন নিমীলিত করিয়া মনে মনে চিন্তা] হাঁ হয়েচে। একবার যাই দ্বারাবতী, কৃষ্ণকে এই সংবাদ দিয়ে আসি, তিনি শুন্‌লেই হবে। বীণাটা ভাল করে বাঁধিয়া

[উচ্চ হাস্য ও বাহু তুলে নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈস্বরে গান]"

ভাষা সর্ব্বত্রই এইরূপ, সহজ ও সরল, সংস্কৃত-বহুল একেবারেই নয়; সঙ্গীতগুলির ভাষাও গদ্যেরই অনুরূপ, দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী উদ্ধৃত করিতেছি। উর্ব্বশী স্বর্গচ্যুতা হইয়াছেন, সেইজন্য উর্ব্বশীর দুঃখে দেবরাজ ইন্দ্র গায়িতেছেন—

"বিনে সে উর্ব্বশী রূপসী, স্বর্গে কি আর শোভা আছে।
জীবন, নয়ন, মন, সুন্দরীর সঙ্গে গেছে।
হায় সখা চিত্ররথ, আমার যে মনোরথ, তাহে বিধি বিপরীত
খেদে হৃদি বিদরিছে।"

অবন্তীরাজ উর্ব্বশীর বিয়োগ-ব্যথায় গায়িয়াছেন—

"কি কব মনের কথা, সকলি রহিল মনে।
এমন হইবে শেষে, না জানি কখন জ্ঞানে॥
কি আর জানাব আমি, জানেন অন্তরযামী,
শুনিয়া তোমার বাণী, যে করে আমার প্রাণে।
করেছিনু এক আশা, ঘটিল আর এক দশা,
বিষম স্বপন ধনী, দেখালে অধীন জনে।"

আরও দুই একটী সঙ্গীত আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"বসন্তগীত

সুখ বসন্তকালে
সুখে সারী শুকে, থাকে মুখে মুখে,
মনের সুখে ডাকে কোকিলে॥
কুসুম-কাননে অশোক, করবী,
গন্ধরাজ আর মল্লিকা, মাধবী,
মুঞ্জরিছে কলি গুঞ্জরিছে অলি
সুখে সরোজিনী ভাসে সলিলে।"

বসন্ত আসিয়াছে। বসন্তের মধুর রূপ-মাধুরীতে ব্যাকুল হইয়াছে তাই মদনদেবকে সম্বোধন করিয়া গায়িতেছেন,

"বলি রতিপতি শোন্
নিবারণ করে দেরে মধুকরে
গুণগুণ আগুন কেন করে বরিষণ॥
কুসুম-সৌরভে রবে নারে প্রাণ,
সবেনা শরীরে কোকিলের গান!
মলয় বাতাসে, মরিরে হুতাশে,
হুতাশন সুধাকরের কিরণ!"

উর্ব্বশী রাজার বিরহবেদন-আশঙ্কায় বলিতেছেন:—

"তোমারি অধিনী আমি গুণমণি জান মনে।
বিনা দেখা প্রাণে সখা, বিচ্ছেদে বাঁচি কেমনে॥
নিতান্ত তব আশ্রিতা, যেন মীন জলাশ্রিতা!
চকোরিণী হরষিতা সুধাকর দরশনে।
চাতকিনী ঘন ঘন চাহে যেন নবঘন
তেমতি হে প্রাণধন সদাভাবি মনে মনে।"

নাটকখানি গীতবহুল এবং গদ্য ও পয়ার ছন্দে বিরচিত। ভাষার পরিচয় উদ্ধৃত অংশ হইতেই পাঠকগণ উপলব্ধি করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বঙ্গের মুদ্রিত পুস্তক, তালিকায় এই বইখানির উল্লেখ নাই। এই নাটকখানা কোথাও কখন অভিনীত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। দ্বিজতনয়ার পরিচয় কি কোন প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া দিতে পারেন?

গান
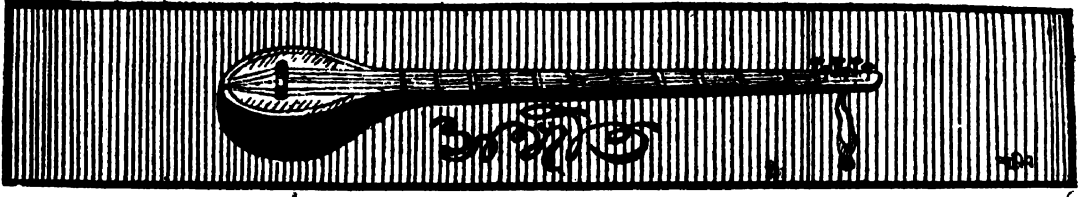
[শ্রীবিভূতিভূষণ দাস বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন]

ছেড়ে চ'লে যাবে সেই দিনই জানি
যে-দিন পেয়েছি কাছে,
পুলকের মাঝে গভীর বেদনা
কত যে লুকায়ে আছে।
চ'লে যাবে, হ'বে সকলি বিফল,
কাঁদিয়া মুছিব নয়নের জল,
নিভৃতে হিয়ার স্মৃতিটী কেবল
ফিরিবে তাহারি পাছে।

ধ'রে যে রাখিব কি আছে তেমন
বন্ধন সে কি মানে,
ব্যথা রয়ে যায় কোথায় গোপনে
সে কি তাহা কভু জানে।
ব্যাকুলতা সব রয়ে যায় বুকে,
কথা যে তখন নাহি সরে মুখে,
মিনতি জানায় মৌন-নয়ন
করুণা কেবল যাচে।

স্বরলিপি

মালকোষ—একতালা

(ওড়ব, গা ধা নি কোমল, রে ও পা বর্জ্জিত)

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীহরেন্দ্রকুমার সিংহ]

০ ১ + । । । । ০ ১ + ৩
গা র্সা | নি নি | ধা নি | র্সা মা -া -া -া | মা মা ধা | নি নি নি | সা -ধা -ধা নি সা |
ছে ড়ে | চ লে | যা বে | সেই দি নই জা নি | যে দি ন | পে য়ে ছি | কা ০ ০ ০ ছে |
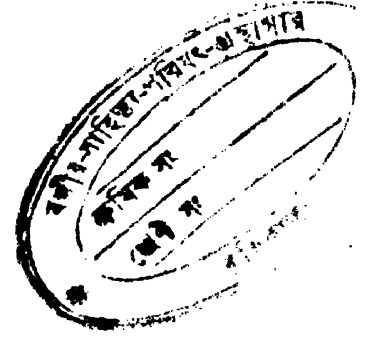
সা -া -া -া র্সা র্সা | সা নি ধা নি | ধা মা মা | মা নি নি নি | ধা ম মা | মা গা -া -া -সা |
পু ল কে র - মা ঝে | গ ভী ০ র | বে দ না | ক ত ০ যে | লু কা য়ে | আ ০ ০ ০ ছে |

মা ম মা গা | ম ধা | নি নি সা - নি নি ধা - ধা ধা সা |
চ লে যা বে | হ বে | স ক লি ০ ০ ০ বি ফ ল |

সা সা গা | গা গা সা | সা নি ধ নি ধা—মা |
কাঁ দি য়া | মু ছি ব | ন য় নে ০ র জল |

মা -া -া | ম গা -া | মা ধ নি | সা -া -া | সা সা নি | ধা নি ধা মা | মা গা গ সা ||
নি ভৃ তে | হি য়া য় | স্মৃ তি টী | কে ব ল | ফি রি বে | তা হ া রি | পা ০ ০ ছে ||

সা -া -া | সা গ গা—মা মা -া -া -া -া | মা ধা ধ ধা | নি নি | নি -ি -ি -ি -ধ -মা |
ধ রে যে | রা খি ব—কি—আ ছে তে ম ন | ব ০ ন্ধ ন | সে কি | মা ০ ০ ০ ০ - নে |

মা মা মা মা | মা গা | মা ধ নি | সা -া -া | সা স স সা | নি ধা | র্সা র্সা ধা ধা সা |
ব্য থা র য়ে | যা য় | কো থা য় | গো প নে | সে কি তা হা | ক ভু | জা ০ ০ ০ নে |

গা মা ম মা | ধা নি সা সা | সা—সা—০ |
ব্যা কু ল তা | স ব র য়ে | যায় বু কে |

র্সা -া -া | র্সা মা—০ | মা মা মা গা গা | সা—া |
ক থা যে- | -ত খ ন | না হি স রে ০ | মু খে |

সা সা সা | সা সা সা | নি ধা নি ধা—মা | মা ম নি | নি ধা মা | মা গা গা গা মা সা ||
মি ন তি | জা না য় | মৌ ০ ন নয় ন | ক রু ণা | কে ব ল | যা ০ ০ ০ ০ চে ||

নাট্যশালার ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

* * * * * আমরা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর ১৩৭৯ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ শনিবারে নীলদর্পণ প্রথমে খোলা হবে স্থির করলাম। বৃন্দাবন পালের পুত্র রাজেন্দ্রবাবু গভর্ণমেণ্ট প্রিন্টিংএ কাজ করতেন। প্রথম রাত্রের প্লাকার্ড পুলিশ নোটিফিকেসানের মত করে কেবল ইংরাজিতে ষ্ট্যানহোপ প্রেস হতে ছাপিয়ে আনেন। তারপর ২য় রাত্রিতে ইংলিশম্যান আফিসের ছাপাখানা বা ইরাসম্যাস জোন্সের ছাপাখানা হতে ইংরেজিতে দস্তুর মত প্লাকার্ড ছাপান আরম্ভ হয়।

নগেন্দ্র ষ্টেজের হ্যাণ্ডবিল, প্লাকার্ড ইত্যাদি ছাপাল, বেহারা নিয়ে আমরা নিজেরাই এক এক জন সহরের এক এক দিকে প্লাকার্ড লাগিয়ে এলেম। স্বহস্তে হ্যাণ্ডবিল বিলালেম। সে উৎসাহ যে কি তা ভাষায় প্রকাশ করে বলা যায় না। দর্শকের বসবার জন্ম চেয়ার ভাড়া করে আনা হল। গৌরমোহন ধর কোম্পানী প্রথমে বিনা পয়সায় গ্যাসের আলোর বন্দোবস্ত করে দিলেন, ষ্টেজের সিন আঁকা তখনও চল্‌চে। অভিনয়ের দিন বেলা ৪টার সময়ও ধর্ম্মদাসবাবু নিজে তুলি ধরে উইংস্ আঁকছেন, এমন সময় মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের ভগিনীপতি ৺নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একখানি শাল মুড়ি দিয়ে এসে ২৲ টাকা দিয়ে একখানি সিট রিজার্ভ করে গেলেন। তখন আমরা তিন রকম সিটের বন্দোবস্ত করেছিলেম ; ২৲ ১৲ ॥৹ আনা উঠানের মাঝখানে ২০ খানি চেয়ার একটা বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়াছিলেম সেইগুলি ২৲ টাকার, তার নাম রিজার্ভ সিট। তার সাম্নে ষ্টেজের নিকটে কতকগুলি চেয়ার, দাম ১৲ নাম ফার্ষ্ট ক্লাস ; আর রিজার্ভসিটের পিছনে বেঞ্চির দাম ॥৹ আনা নাম সেকেণ্ড ক্লাস। আর দালানের দাম ।৹ আনা। তার আগে থেকেই টিকিট বেচা শুরু হয়েছিল। ৭ টার মধ্যে আমাদের সমস্ত সিট বিক্রয় হয়ে গেল। অধিকাংশ বড়মানুষ এবং কৃতবিদ্য লোক রিজার্ভ করে গেলেন। যথাসময়ে অভিনয় আরম্ভ হবে। দর্শকেরা সব সাজ-সজ্জায় সজ্জীভূত হয়ে এসে বসেছেন। তখনকার সময়ে ভদ্রলোকে বাড়ী হতে বার হতে গেলেই যথাযোচিত পোষাক পরে বার হতেন, এখনকার যথেচ্ছা পোষাক পরে কোন মজলিসে যাওয়া তখন ঘৃণাকর ছিল। শালের পাগড়ী, শালের চোগা, জামিয়ার, শাল-দোশালায় উজ্জ্বল হয়ে দর্শকবৃন্দ সভা উজ্জ্বল করে বসেছেন। কন্‌সার্ট বেজে উঠল। কন্‌সার্টে সে দিন কালীদাস সান্নাল হারমোনিয়ম, নিতাই ওস্তাদজী বেহালা, গৌরদাস বাবাজী বেহালা, বোসপাড়া নিবাসী সুবিখ্যাত বেহালা-বাদক রাজাবাবু বেহালা, আর শ্যামপুকুর নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ওরফে কানা যোগে ঢোল বাজিয়েছিলেন। যোগেন্দ্র আমাদের দলস্থ অভিনেতাও বটে। তাঁহাদের বাজনার ধুম দেখে কে? বাজাতে বাজাতে এক একবার এক একটা যন্ত্রে উপেন বাজাতে লাগ্‌লেন, আর অন্য সকলে তাঁকে অনুসরণ করে সুর দিতে লাগ্‌লেন। শ্রোতারা মোহিত হয়ে গেলেন, কিন্তু অভিনয়ে বড় বিলম্ব হতে লাগ্‌ল ; আমরা মধ্যে মধ্যে বল্‌তে লাগ্‌লেম আমরা প্রস্তুত, আপনারা বন্ধ করুন। তখন তাঁরা মত্ত, কে সে কথা শোনে? সহরের অধিকাংশ গুণগ্রাহী বড় মানুষ এবং সঙ্গীতজ্ঞ লোক একস্থানে জড় হয়েছেন, বাহবা দিচ্ছেন, তাঁরা কি সে অবসরে সে মত্ততা সহজে কাটাতে পারেন? যাই হোক শেষে অভিনয় আরম্ভ হল। সুশৃঙ্খলে শেষও হল। দর্শকে কেঁদে কেটে সারা হয়ে গেল। সহস্রমুখে প্রশংসা বৃষ্টি হতে লাগ্‌ল। আমরা আনন্দে প্রত্যেকে যেন ডবল ফুলে উঠলেম। সে রাত্রিতে ৭০০ টাকা বিক্রয় হয়।

তারপর আমরা সেই প্যাভিলিয়নে গিয়ে অভিনয় আরম্ভ করে দিলেম। একদিন অন্তর অভিনয় চল্‌তে লাগল। আমাদের বেশ পসার জমে গেল। বিক্রয়ও বেশ হতে লাগল। এমন সময় শুনলেম ন্যাশন্যাল থিয়েটার ধর্ম্মদাসবাবুর সহিত ঢাকায় এসেছে। এই সময়ে ডাক্তার আর, জি, কর ও শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর ন্যাশন্যাল থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। এ সময়ে গিরীশবাবু ন্যাশন্যালে ছিলেন কিন্তু ঢাকায় যান নি। তাঁরা রাধিকামোহনবাবুর বৈঠকখানায় আশ্রয় নিয়ে জীবনবাবুর চাঁদনীতে অভিনয় আরম্ভ করেন। তাঁদের ৪।৫ রাত্রি অভিনয়েও বড় সুবিধা হল না। তাঁদের অনেকেই পীড়িত হয়ে বাড়ী ফিরলেন। অবশিষ্ট যাঁরা রইলেন তাঁরা ঋণগ্রস্ত হয়ে আমাদের কাছে ষ্টেজ পোষাক ইত্যাদি রেখে চলে এলেন, আমরাই তাঁদের ঋণ পরিশোধ করে দিলেম। এই সময়ে তাঁদের দুই একজন অভিনেতা আমাদের সঙ্গে রয়ে গেলেন। তারপরও আমরা ঢাকায় আর কিছুদিন অভিনয় করে

কলকেতায় ফিরলেম। ফিরলেম বটে কিন্তু উভয় দল একত্রিত হল না।

ন্যাশন্যাল থিয়েটারে এসে আবার ভুবনবাবুর ঘাটের চাঁদনীতে এসে জমলেন আর আমাদের দলের কখন আমার বাটীতে কখন বা নগেন্দ্রের বাড়ীতে রিহার্স্যাল হত। এসকল ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসের ঘটনা।

একদিন আমরা সকলে বসে আছি, এমন সময় রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের এক হরকরা গাড়ী নিয়ে আমার নামে এক পত্র এনে উপস্থিত। পত্রে লেখা See me just now, রাজা নিজে লিখেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ সেই গাড়ীতে গেলাম। সেখানে দেখি ৺যতীন্দ্রকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বাবু নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় উপস্থিত। কথাবার্ত্তায় জানলেম যে দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্রের বর্ত্তমান রাজা প্রমদানাথ রায়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কলিকাতা থেকে থিয়েটার যাবে। রাজা প্রমথনাথ রাজা রাজেন্দ্রলালকে লিখেছেন যে, শুনিয়াছি ন্যাশনাল থিয়েটার দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে পার্টিতে অর্দ্ধেন্দুবাবু আছেন, সেই পার্টি যাইবেন, রাজা আমার পার্টি নিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন, আমিও স্বীকৃত হলেম। কথাবার্ত্তাও স্থির হয়ে গেল। আমি রাজা রাজেন্দ্রলালের নিকট হতে রাজা প্রমথনাথের পত্রখানি নিয়ে বাড়ী এলেম। পরদিন প্রাতে হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটার আর ন্যাশন্যাল থিয়েটার একত্র হবার জন্ম অনুরোধ কল্লেম। হিন্দু ন্যাশন্যাল স্বীকৃত হল কিন্তু ন্যাশন্যালের কয়েকজন সম্মত হল না। তারপর রাজার চিঠি দেখালেম। ন্যাশন্যালের গিরীশবাবু, ধর্ম্মদাসবাবু ব্যতীত আর সকলেই সম্মত হলেন। পরদিন প্রাতে বেলবাবু আর আমি গিয়ে রাজা রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে লেখাপড়া করে বায়না নিয়ে ফিরে এলেম। সকলেই যেতে প্রস্তুত হলেন। ধর্ম্মদাস বাবু, গিরীশবাবু, দেবেন্দ্রবাবু, অমৃতলালবাবু আর মহেন্দ্রবাবু তখন আপিসে চাকরী কত্তেন বলে আমাদের সঙ্গে গেলেন না। আমরা সদলে যথা সময়ে দীঘাপতিয়ায় রওনা হলেম। সেখানে চার রাত্রি অভিনয় হয়। বায়না নিয়ে বিদেশ যাওয়া এই প্রথম। এই সময় ঘোর বর্ষা। আমরা এসে রামপুর বোয়ালিয়ার ডুরাচাঁদ কণ্ডেলীমলের গোমস্তা দেবিদাস বাবুর কুঠিতে যেখানে Peoples Association ছিল সেইখানে দিন কয়েক অভিনয় করি তার পর আমরা বহরমপুরে এসে অভিনয় আরম্ভ করি। এই সময়ে মহেন্দ্রবাবু কলিকাতা থেকে এসে যোগ দিলেন, তার চাক্‌রী ব্যাধি তখন সেরে গিয়েছিল। এই বহরমপুরে আমাদের সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়, তিনি আমাদের অভিনয় প্রত্যহ দেখতে আসতেন। এই সময়ে আমরা শুনতে পেলেম ধর্ম্মদাসবাবু আর নগেন্দ্রবাবুর উদ্যোগে ভুবনবাবুর সাহায্যে বীডন ষ্ট্রীটে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার নাম দিয়ে একটা প্যাভিলিয়নের ভিত্তিস্থাপন করেছেন। কিরূপে ভিত্তি স্থাপন হয় তার বিষয় পরে ধর্ম্মদাস বাবুর নিকট যেরূপ শুনেছিলেম তা আপনাদের বল্‌ছি। আমরা যখন রামপুর বোয়ালিয়ায় তখন বেঙ্গল থিয়েটারে "উঃ মোহন্তের এই কি কাজ" নামে নাটক খুব জোরে চলছিল। একদিন রাত্রিতে ধর্ম্মদাসবাবু আর ভুবনবাবু ঐ নাটক দেখতে আসেন সে দিন এত বিক্রী হয়েছিল যে ৪৲ টাকার টিকিট ৮৲ টাকা দিয়ে কিনতে গিয়েও ওঁরা পান নি। পথে এঁদের সঙ্গে নগেন্দ্রবাবুও মিলিত হন। সেই বিক্রয়ের অবস্থা দেখে বেঙ্গল থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে তিনজনে একটা থিয়েটার হাউস করবার পরামর্শ করেন। ভুবনবাবু তখন নাবালক, তবুও তিনিই অর্থ সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হন। তারপর ধর্ম্মদাসবাবু একটি ছোট দল গড়ে নিয়ে চুঁচড়ার ব্যারাকে গিয়ে ন্যাশন্যাল থিয়েটার নাম দিয়ে মোহন্ত নাটক অভিনয় করেন। সেখানে তাদের ৭।৮ শত টাকা আয় হয়। এই দলে নগেন্দ্রবাবু, অমৃতলাল বসু, মহেন্দ্রবাবু, যোগেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি পুরাতন অভিনেতারা ছিলেন। তার পর ধর্ম্মদাসবাবু দল নিয়ে বর্দ্ধমান যান। সেখানে লক্ষ্মী বাড়ীতে ৩টা অভিনয় করেন, যথেষ্ট আয় হয়। বর্দ্ধমানে ধর্ম্মদাসবাবু ষ্টেজ পোষাক নিয়ে থাকতেন অন্য সকলে ডেলি প্যাসেঞ্জার হয়ে যাতায়াত করতেন। এই অবস্থায় নগেন্দ্রবাবুর সাহায্যে ভুবনবাবু ৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করে গ্রেট ন্যাশন্যালের ষ্টেজ তৈয়ারীর জন্য দেন। ধর্ম্মদাসবাবু তখন সদলে কলিকাতায় ফিরে এসে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার পত্তন করেন। যেদিন ভিত্তি স্থাপন হয় সেদিন ন্যাশন্যাল নবগোপাল মিত্র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। আমরা যখন ফিরে এলেম তখন দেখি, ধর্ম্মদাসবাবুর ষ্টেজ আর বিলডিং অর্দ্ধ সমাপ্ত হয়ে এসেছে তখন নভেম্বর মাস যায় যায়। আমরা আসতেই ভুবন বাবু আমাদের একত্র হতে অনুরোধ কল্লেন, আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেম কিন্তু আর কেহ হলেন না। তার কয়েকদিন পরেই ৭ ডিসেম্বর। ধর্ম্মদাস আর আমি উভয়ে মিলে প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসবের আয়োজন কল্লেম। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতি হয়েছিলেন, নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু, আর আমি সেদিন বক্তৃতা করি। সেইদিন আমি এসে প্রকৃত প্রস্তাবে যোগ দিলেম।

তার পর নগেন্দ্রবাবুর "কাম্যকানন" রিহার্স্যাল দেওয়া আরম্ভ হয়। এই বই নিয়েই গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার খোলা হয়। ১৮৭৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর শনিবারে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রথম খোলা হল। প্রথম রাত্রিতে প্রথম অঙ্কের অভিনয় শেষ হতে না হতে দোতালার সিঁড়ির মুখে বক্সের প্রবেশের দরজায় কি জানি কেমন করে আগুন লাগে। বহু কষ্টে ও বহু যত্নে আহীরীটোলার প্রসিদ্ধ জিমন্যাষ্টিক মাষ্টার অখিলচন্দ্র সে আগুন নিবিয়ে দেন। পরদিন ১৮৭৪।১ জানুয়ারী ক্যালীকেয়ার উপলক্ষে আমরা বেলভিডিয়ারে অভিনয় করতে যাই। সেখানে অনেক ইংরাজী থিয়েটার আর তামাসা গিয়েছিল, দেশীয়ের মধ্যে আমরাই কিন্তু একা ছিলেম। এদিকে মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু, বেলবাবু প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রাধামাধব

বাবুকে আপনাদের মধ্যে নেতা করে ন্যাশন্যাল থিয়েটার নাম দিয়ে আবার সান্যালদের বাড়ীতে অভিনয় আরম্ভ করে দিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের স্ত্রী অভিনেত্রীর আকর্ষণ আর গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারের প্রতি সাধারণের প্রীতিবশে ওঁরা বড় সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। ৬।৭ রাত্রি অভিনয়ের পর এক রাধামাধববাবু ব্যতীত আর সকলে এসে আমাদের গ্রেট ন্যাশ্যন্যাল থিয়েটারে যোগ দিলেন। গ্রেট ন্যাশান্যালের দল পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে উঠল। অদম্য প্রভাবে অভিনয় চল্‌তে লাগল। ১৮৭৪ মার্চ্চ মাসের শেষ গিরীশ বাবুও এসে যোগ দিলেন, তখন তাঁর আর পেশাদারী থিয়েটার বলে আপত্তি ছিল না। তাঁর আগমনে আমরা আরও একটী সুদক্ষ অভিনেতা পেলেম।

এই সময়ে সাধারণে দিন দিন বেঙ্গল থিয়েটারের পক্ষপাতী হয়ে উঠ্‌তে লাগল। বেঙ্গল থিয়েটার এ সময় মোহন্ত ছেড়ে "পুরুবিক্রমের" অভিনয় কচ্ছিলেন। দর্শকেরা স্ত্রীকণ্ঠের সঙ্গীত শ্রবণে বড়ই আগ্রহান্বিত হয়ে পড়লেন। আমাদের প্রতিপত্তি, আমাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা যদিও বিন্দুমাত্র কমে নি তবুও প্রলোভন বেঙ্গলে বেশী হওয়ায় আমরা একটু ভবিষ্যচ্চিন্তায় মন দিলেম। তখনকার সমাজে ও সংবাদপত্রে বেশ্যা নিয়ে অভিনয়ের সপক্ষে বিপক্ষে বিস্তর আন্দোলন চলছিল। আমাদের দলের মধ্যেও দুমতের পোষক দু দল হয়ে বেশ্যা অভিনেত্রী লওয়ার কল্পনা চল্‌তে লাগল। এই সূত্রে নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি কয়েক জনের সঙ্গে ধর্ম্মদাসবাবু আর আমার মতভেদ হওয়ায় আমি ও ৺ মতিলাল সুর উভয়ে একটি কোম্পানী নিয়ে ঢাকায় গেলেম ; সেখানে ন্যাশান্যাল থিয়েটার নামে কিছুদিন অভিনয় করে বগুলা কৃষ্ণনগরে এসে কিছু দিন অভিনয় করলেম, সেখান হ'তে রাণাঘাটে এসে ৺ গোপাললাল চৌধুরীর বাড়ীতে টিকিট বিক্রয় করে অভিনয় করি। এই সময় কলিকাতা হতে আমার নিকট সংবাদ যায় যে আমার মাঠাকুরুণ মৃত্যুশয্যায়। অগত্যা আমাকে মতিবাবুর হস্তে দল রেখে কলিকাতায় আস্‌তে হল। মতিবাবু দল নিয়ে শান্তিপুর, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে অভিনয় করতে লাগলেন। আমি বাড়ী আসার কয়েকদিন পরে মাঠাকুরুণের ৺গঙ্গালাভ হল। এই সময়ে ভুবনবাবু আর আমাকে বিদেশ যেতে দিলেন না। তিনি আমার মাতৃ-শ্রাদ্ধের বিশেষ সাহায্য করায় আমি তাঁর গুণে আবদ্ধ হয়ে অশৌচান্তে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারেই যোগ দিলেম। (অর্দ্ধেন্দুবাবু এই কথা বলিবামাত্র শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "thank you অর্দ্ধেন্দু," অমনি শ্রোতৃবর্গের মধ্যেও thanks thanks শব্দ উঠিল। পশ্চাৎ হইতে একব্যক্তি বলিলেন ও সকল ব্যক্তিগত কথা ইতিহাসের মধ্যে কেন? অর্দ্ধেন্দু বাবু বলেন—থিয়েটারের ইতিহাসের প্রত্যেক পরিবর্ত্তন, আমার জীবনের প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে এমন বিজড়িত, যে আমি সে গুলার উল্লেখ না করে থাকতে পারি নে, বা তা করে থিয়েটারের ইতিহাস বলা যায় না, বিশেষতঃ ভুবনবাবু সে সময় আমার যে ভাবে উপকার করেছিলেন বলেছি তার প্রতি বর্ণ যখন সত্য তখন সে কথা বলতে আমার কোন লজ্জা নাই বা আমি দোষ বোধ করি নে। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে তখন অনেকে করতালি দিয়া অর্দ্ধেন্দু বাবুর কৃতজ্ঞ হৃদয়ের সম্বর্দ্ধনা করিল।) তার পর অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিতে লাগিলেন, "তারপর যখন যোগ দিলাম তখন ন্যাশান্যালে বেশ্যা অভিনেত্রী লওয়া হয়েছে আর "সতী কি কলঙ্কিনী" নামে একখানি গীতি-নাট্যের রিহার্স্যাল চল্‌ছে, শেষে জুলাই মাসে গ্রেটন্যাশান্যাল থিয়েটারেও বেশ্যা অভিনেত্রী লওয়া হয়। যাদুমণি, রাজকুমারী, বড় হরি, কাদম্বিনী, লক্ষ্মীমণি ও ক্ষেত্রমণি এই ছয়জনকে প্রথমে লওয়া হয়। তখন নগেন্দ্রবাবু ম্যানেজার। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠকে দিয়ে "সতী কি কলঙ্কিনী" নামে গীতিনাট্যখানি লিখিয়ে ছিলেন। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ "সতী কি কলঙ্কিনী" প্রথম খোলা হয়। বইখানাও ছাপান হয় এবং অভিনয়ের রাত্রিতে টিকিট ঘর হতে বেচাও হয়। ৺মদনমোহন বর্ম্মা তখন আমাদের দলে সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। কান্তপ্রসাদ নামে সুবিখ্যাত নাচের ওস্তাদকে এনে নাচ শেখান হয়। বাঙ্গলা থিয়েটারে অপেরার এই প্রথম অভিনয়। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়ের লিখিত পুস্তকের অভিনয় এই প্রথম।

এই সময় আমাদের প্যাভিলিয়ন্ ছিল বটে কিন্তু তখনও এখনকার মত রিহার্স্যাল ষ্টেজেতে হ'ত না, ভুবনবাবুর চাঁদনীর বৈঠকখানাতেই হ'ত। "সতী কি কলঙ্কিনী"র শিক্ষাও সেইখানেই হয়েছিল। অভিনেত্রীদিগকে সেইখানেই নিয়ে যাওয়া হইত।

২৬শে অক্টোবর মিঃ আলেগ্জোমণি সি, বি, দেশীয় অপেরায় অভিনয় দেখতে এসেছিলেন।

৩রা অক্টোবর আমরা "পুরুবিক্রম" অভিনয় করি। এই দিন বেঙ্গল থিয়েটার "দুর্গেশনন্দিনী" অভিনয় ক'রে আমাদের ঠাট্টা ক'রে একটা afterpiece অভিনয় করেন, তার নাম দেন "Opera Troubles" ১০ই অক্টোবর আমাদের "ভারতে যবন" ও বেঙ্গল থিয়েটারে "কেরাণীদর্পণ" অভিনয় হয়। ৩১শে অক্টোবর পূজার পর আমরা বাঙ্গলা ম্যাক্‌বেথ্ বা হরলাল রায়ের "রুদ্রপাল" অভিনয় করি। এই দিন লকের অনুকরণে ম্যাক্‌বেথের ইংরাজী গান গাওয়া হইয়াছিল। সে কথা হ্যাণ্ডবিলে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল—"Macbeth ! Macbeth ! with an original music in imitation of Lockes" এই দিন কর্ণেল হাইড্ আমাদের দর্শক ছিলেন। ইহার পর ২১শে নভেম্বর "আনন্দ-কানন" আর "কিঞ্চিৎ জলযোগ" অভিনীত হয়।

এর পর আমাদের ২য় সাম্বৎসরিক উৎসব হয়।

এই সময় বেঙ্গল থিয়েটারের দল কাল্‌নায় গিয়েছিলেন আর বর্দ্ধমানের মহারাজা তাঁদের পেট্রন্ হবেন স্বীকার করেন। ১২ই অক্টোবর শনিবার সে জন্য বেঙ্গল থিয়েটারে খুব ধুমধাম হয়।

তা'র পর ১২শে ডিসেম্বর আমরা হরলালবাবুর "শত্রুসংহার" (বেণীসংহার) অভিনয় করি। এর পর সপ্তাহে ২৬শে ডিসেম্বর বেঙ্গল থিয়েটার "মণিমালিনী" অভিনয় ক'রে কিছু দিনের জন্ম অভিনয় বন্ধ দেন।

তা'র পর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী ২রা তারিখে বেথিয়ার মহারাজ আমাদের থিয়েটারে আসেন। সেদিন "শরৎ সরোজিনী" অভিনয় হয়—ধর্ম্মদাসবাবুর চেষ্টায়; তিনি এই সময়ে দলে যোগ দেন।

এই সময় ৮৷৷ টার সময় অভিনয় আরম্ভ হ'ত।

এর পর সপ্তাহে আমাদের মধ্যে গোলমাল বাধে। নগেন্দ্রবাবু রয়েল থিয়েটার ভাড়া নিয়ে, গ্রেট ন্যাশন্যাল অপেরা কোম্পানী বলে নাম দিয়ে অভিনয় আরম্ভ করেন। ৯ই জানুয়ারী রয়াল থিয়েটারে "সতী কি কলঙ্কিনী" খোলা হয়। সে দিন যোধপুরের মহারাজ যশোবন্ত রাও উপস্থিত ছিলেন। মদনমোহন বর্ম্মার কনসার্ট ছিল। "কিঞ্চিৎ জলযোগ" প্রহসন হয়। তার পরের সপ্তাহে নগেন্দ্রবাবুর দল হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেজে অভিনয় করেন। নগেন্দ্রবাবুরা ছেড়ে গেলে ধর্ম্মদাস সুর ম্যানেজার হন। এই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটার "আলালের ঘরে দুলাল" অভিনয় করেন। তা'র পর আমরা প্রথম প্যাণ্টোমাইম্ অভিনয় করি। তখনও আমাদের প্যাণ্টোমাইমের অভিনয়ের কথাবার্ত্তা ছিল না। আমরা Dumb showর মত কোন একটা বিষয় আপনাআপনি গড়ে ষ্টেজে গিয়ে অভিনয় করতেম।

আর পর বর্ম্মার রাজদূতের সম্মুখে জানুয়ারীতে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার হয়। ৩০শে তারিখে তুর্কীস্থানের রাজদূতের সম্মুখে অভিনয় হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমরা মিঃ গ্রাণ্ট ডাফ্ এম পির সম্মুখে নীলদর্পন প্লে করি।

তার পর নগেন্দ্রবাবুরা গিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের দলের সঙ্গে যোগ দেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁহাদের উভয় দল একত্র হ'য়ে বেঙ্গল থিয়েটারে "সতী কি কলঙ্কিনী" অভিনয় করেন। ঐ দিন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে আসেন। "শত্রুসংহার" অভিনয় হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারীতে নগেন্দ্রবাবুরা ও বেঙ্গল থিয়েটারের দল একত্রে "কপালকুণ্ডলা" অভিনয় করেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে "নগ নলিনী" অভিনয় হয়। ঐ দিন বেঙ্গল উভয় দলে "অপূর্ব্ব কারাগার" খোলা হয়।

২৭শে তারিখ গ্রেট ন্যাশানালে মহারাজ হোলকার আসেন। "শরৎ-সরোজিনী" অভিনয় হয়। এই সময়ে বেঙ্গলে 'পারিজাত-হরণ' গীতিনাট্য, ওথেলোর বঙ্গানুবাদ—আর"মেঘনাদবধ" রিহার্স্যাল চলছিল। ৬ই মার্চ্চ আমাদের "হেমলতা" খোলা হয়। ঐ দিন বেঙ্গলে "মেঘনাদবধ" খোলা হয়। বেঙ্গলে উভয়দল মিলে "মেঘনাদবধ" অভিনয় হয়।

তার পর কতক দল নিয়ে আমরা—পশ্চিমে গেলাম। মহেন্দ্রলাল বসু এখানে রইলেন। তিনি ধর্ম্মদাস বাবুর অনুমতি নিয়ে অস্থায়ী ম্যানেজার বলে নাম দিয়ে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার চালাতে লাগলেন। ২০শে মার্চ্চ এঁদের দলে "সধবার একাদশী" হয়। তার পর ১০ই এপ্রেল "নশোরূপেয়া" অভিনয় হয়। তখন আমি বাড়ী এসেছিলাম, সাতু খুড়ো সেজেছিলাম। তার পর আবার আমি পশ্চিমে যাই।—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী

[সংগ্রাহক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি-এ, উদ্ভটসাগর]

প্রমাণ-পঞ্জী (Bibliography)

বৈষ্ণব ধর্ম্ম

মাধবসম্প্রদায়

১। মণিমঞ্জরী—[মধ্বশিষ্য ত্রিবিক্রম-পুত্র] নারায়ণ পণ্ডিতাচার্য্য-বিরচিত; বোম্বাই "নির্ণয়সাগর প্রেস" হইতে প্রকাশিত; টি, আর, কৃষ্ণাচার্য্য-সম্পাদিত। ইহাতে মধ্বের সময় পর্য্যন্ত ভারতের ধর্ম্মেতিহাস আছে।

২। মধ্ববিজয়—নারায়ণ পণ্ডিতাচার্য্য-রচিত। ঐ

৩। সকলাচার্য্যমত-সংগ্রহঃ—Benares Sanskrit Series, ১৯০৭। এই গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠা হইতে মধ্বমতের আলোচনা আছে।

৪। মধ্বসিদ্ধান্তসারঃ—পদ্মনাভসূরি-লিখিত। বোম্বাই ১৮৮৩।

৫। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ—মাধবাচার্য্য (?) লিখিত—E. B. Cowell ও A. E. Gough ইহার ইংরেজী তর্জ্জমা করিয়াছেন (লণ্ডন, ১৯০৮) এই ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদাংশে (৫ম অধ্যায়, ৮৭ পৃষ্ঠা হইতে) পূর্ণপ্রজ্ঞ বা মধ্বদর্শন আলোচিত হইয়াছে।

৬। বায়ুস্তুতিঃ ত্রিবিক্রম-লিখিত।

৭। ভক্তিরত্নাবলী—Sacred Books of the Hindus, Allahabad. (মূল ও অনুবাদ)।

৮। সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহঃ—শঙ্করাচার্য্য লিখিত বলিয়া প্রচারিত।

৯। প্রস্থানভেদঃ—মধুসূদন সরস্বতী-লিখিত।

১০। প্রমেয়রত্নাবলী—বলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত।

১১। শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্যম্—বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত।

[১২শ সংখ্যা হইতে ২৮ সংখ্যা পর্য্যন্ত নির্ণয়-সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত]

১২। সর্ব্বমূলম্—(ক) গীতা ও তাৎপর্য্যনির্ণয়ঃ [সটীপ্পনপ্রমেয়দীপিকাযুতঃ]—আনন্দতীর্থ প্রণীত।
(খ) ঋগ্‌ভাষ্যম্, তট্টীকা, ঋকৃসূচিঃ—আনন্দতীর্থ প্রণীত।
(গ) দশোপনিষদ্‌ভাষ্যম্—আনন্দতীর্থ প্রণীত।

১৩। তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা (তত্ত্বপ্রকাশিকার ব্যাখ্যা)—ব্যাসযতি বিরচিত।

১৪। ন্যায়ামৃতপ্রকরণম্ (শ্রীনিবাসতীর্থকৃত টীকাসমেতম্) ব্যাসযতি বিরচিত।

১৫। ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী—রামাচার্য্য রচিত।

১৬। যুক্তিমল্লিকা (সুরোত্তমতীর্থকৃত ভাববিলাসিনী-সমেতা)—বাদিরাজতীর্থ প্রণীত।

১৭। তত্ত্বপ্রকাশিকা—জয়তীর্থমুনি-কৃত। ইহা আনন্দ-তীর্থের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের টীকা।

১৮। তত্ত্বপ্রকাশিকাভাবদীপঃ—রাঘবেন্দ্রযতি-কৃত।

১৯। সত্তত্ত্বরত্নমালা—বিট্‌ঠলাচার্য্য-পুত্র আনন্দতীর্থ প্রণীত।

২০। মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়ঃ।

২১। তত্ত্বমঞ্জরী—রাঘবেন্দ্রযতি-কৃত।

২২। ভেদোজ্জীবনম্ [শ্রীনিবাসবিরচিতব্যাখ্যাসম্বলিতম্] —ব্যাসতীর্থকৃত।

২৩। প্রমাণলক্ষণটীকা—জয়তীর্থভিক্ষু-কৃত।

২৪। প্রমাণলক্ষণটীকাটীপ্পনী—রাঘবেন্দ্রতীর্থ-রচিত।

২৫। প্রমাণপদ্ধতি [জনার্দ্দনভট্টিসংহিতা]—জয়তীর্থ-মুনীন্দ্রকৃত।

২৬। অনুব্যাখ্যানম্—আনন্দতীর্থকৃত।

২৭। তত্ত্বসংখ্যানটীপ্পনম্ [সত্যধর্ম্মতীর্থরচিত টীকা-সমেতম্]।

২৮। অনুভাষ্যম্—আনন্দতীর্থকৃত।

২৯। Rice Kanarese Literature, Calcutta, 1918.

৩০। Life and Teachings of Madhvacharya—Padmanavachar, Coimbatore, 1909.

৩১। Sri Madhwa and Madhwaism,—C. N. Krishnaswami Aiyer. Madras.

৩২। Account of the Madra Gooroos, collected while Major Mackenzie was at Hurryhurr, 24th August 1800. [Asiatic Annual Register for 1804, "Characters" প্রবন্ধের ৩৩ পৃষ্ঠা হইতে]

৩৩। Sketch of the Religious Sects of the Hindus—H. H. Wilson, London, 1861. Vol.I. pp. 139. ff

৩৪। Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems (G. A. P. III-6) Strassburg, 1913, P 57 ff

৩৫। Bombay Gazetteer, Vol XXII 'Dharwar', Bombay, 1884, P 56 ff [ইহাতে মাধ্বদিগের বর্ত্তমান কালের ইতিহাস, ধর্ম্ম, আচার প্রভৃতির বিশেষ আলোচনা আছে]

৩৬। A Sketch of the History of the Madhva Acharyas. G. Venkobo Rao. Indian Antiquary.Vol XLIII (1914). pp. 233, 262.

৩৭। Life of Madhvacharya—C. M. Padmanabhacharya.

৩৮। Vedanta Sutras, with the Commentary by Sri Madhvacharya, a complete translation, S. Subba Rau. Madras, 1904. [ইহাতে মাধ্বমতের প্রকৃত বিবরণ আছে]

৩৯। The Bhagavad-Gita, Translation and Commentaries in English according to Sri Madhvacharya's Bhashyas—S. Subba Rau, 1906 Madras.

[ইহার ভূমিকায় সাম্প্রদায়িক মতানুসারে মধ্বজীবন-বৃত্তান্ত আছে]

৪০। The Brahma Sutras, Construed literally according to the Commentary of Sri Madhvacharya (সংস্কৃত মূল)

৪১। Madhvas, the second of the Great Vaishnav sects. Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. XIV. P. 34 etc. [N.S].

৪২। হরিকথামৃতসার—কন্নড়ভাষায় লিখিত মাধ্ব-দিগের আদৃত গ্রন্থ।

৪৩। হরিভক্তিরসায়ন—চিদানন্দ-রচিত কন্নড়ভাষায় লিখিত গ্রন্থ।

৪৪। পুরন্দর দাস, কনক দাস, বিট্‌ঠল দাস, বিজয় দাস, কৃষ্ণদাস বরাহতিম্মপ দাস ও মধ্বদাস-কৃত কন্নড়-ভাষায় লিখিত বিবিধ গ্রন্থ।

৪৫। অধ্যাত্ম-রামায়ণ—কন্নড়ভাষায় লিখিত।

আষাঢ়

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

১লা—দৈনিক 'সংবাদ-প্রভাকরে'র আবির্ভাব (১২৪৬)

২রা—'মালঞ্চ' ও 'সাগর-সঙ্গীতে'র কবি এবং নারায়ণ-সম্পাদক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু (১৩৩২—১৬ই জুন, ১৯২৫ খৃঃ)

৩রা—কালীময় ঘটক মহাশয়ের মৃত্যু (১৩০৭)—ইনি একটী বাঙ্গলা বিদ্যালয় এবং শ্রমজীবিগণের জন্য নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ জনহিতকর কার্য্যে তিনি রাণাঘাটের জমিদারগণের যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—পদ্যময় মিত্রবিলাপ, চরিতাষ্টক (১ম ও ২য় ভাগ), ছিন্নমস্তা (উপন্যাস), কৃষিশিক্ষা, কৃষি-প্রবেশ।

৪ঠা—উমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু—(১৩১৭)—একবার রিচার্ডসন সাহেব ইঁহার 'Merchant of Venice'এর আবৃত্তি শুনিয়া পূর্ণ সংখ্যা ৫০ না দিয়া ৬০ দিয়াছিলেন। ইনি শেষ বয়সে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৬ই—চন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যু (১৩১৭)—ইনি জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তৎপরে বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ানের পদ গ্রহণ করেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে ইনি গভর্ণমেণ্টের অনুবাদক হন। ইনি বঙ্গ-দর্শন, প্রচার, নবজীবন, নব্যভারত, সাহিত্য ও ভারতীতে অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিতেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—শকুন্তলা-তত্ত্ব, ত্রিধারা, পশুপতি-সংবাদ, বর্ত্তমান বাঙলা

চন্দ্রনাথ বসু

সাহিত্যের প্রকৃতি, সাবিত্রী-তত্ত্ব, হিন্দুত্ব, বেতালে বহু রহস্য, ফুল ও ফল এবং কতিপয় স্কুলপাঠ্য পুস্তক

৭ই—পাষণ্ডপীড়ন (১২৫৩)।

তারানাথ তর্কবাচস্পতির মৃত্যু (১৮৮৫)—খুব বড় ব্যবসায়ী হইলেও ইনি সাহিত্যসেবায় বিরত ছিলেন না। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—'বাচস্পত্য বৃহৎ অভিধান', 'শব্দস্তোম মহানিধি', 'বিধবাবিবাহ-খণ্ডন,' 'আশুবোধ ব্যাকরণ,' 'শব্দার্থরত্ন,' 'বহু-বিবাহবাদ' প্রভৃতি। ইনি কাদম্বরী প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থেরও টীকা রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত বহু সাময়িক পুস্তকও প্রণয়ন করেন।

১১ই—উমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু (১৩১৪)—ব্রাহ্মসমাজ, সিটিকলেজ ও মূকবধির-বিদ্যালয় ইঁহার কর্ম্মস্থান ছিল। ৪৫ বৎসর ধরিয়া 'বামাবোধিনী' পত্রিকা পরিচালনে তাঁহার স্ত্রী-শিক্ষার জন্য অদম্য উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায়।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি

১২ই—হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১২৬৮—১৪ই জুন, ১৮৬১ খৃঃ) 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্রিকা ইঁহার অসাধারণ কীর্ত্তি। তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এবং নীলকরের অত্যাচারের সময় ইনি ইঁহার লেখনী-শক্তিতে সাধারণকে ক্ষান্ত করিতে সমর্থ হন। ইঁহার স্মরণার্থ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গৃহের নিম্নতলে 'হরিশ-লাইব্রেরী' নামে একটী পাঠাগার নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ইঁহার জীবন-বিষয়ে Lights and Shades of the East নামক একটী পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩ই—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম (১২৪৫—২৭শে জুন, ১৮৩৮ খৃঃ) বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯ সালে 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকার প্রবর্ত্তন করেন। এই পত্রিকায় সমুদয় বিষয় আলোচিত হইত। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—কৃষ্ণচরিত, ধর্ম্মতত্ত্ব, বিবিধ প্রবন্ধ, লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, দুর্গেশ-নন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণ-কান্তের উইল, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম, রজনী, আনন্দমঠ, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, রাজসিংহ, ইন্দিরা প্রভৃতি।

বরদাচরণ মিত্রের মৃত্যু (১৩২২)—ইনি ১৮৮২ খৃঃ ইংরেজী সাহিত্যে এম্-এ পাস করেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—প্যারীচাঁদ মিত্র, (টেকচাঁদ ঠাকুর) ও কিশোরীচাঁদের জীবন-কথা, 'মেঘদূতে'র অনুবাদ এবং 'অবসর' কাব্যগ্রন্থ।

প্রথম উত্তর-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৪ই, মঙ্গলবার—রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের জন্ম(১২৫০) —ইনি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ইনি মুখে মুখে বেশ কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। চিকিৎসা-বিদ্যায়ও ইঁহার জ্ঞান ছিল। ইঁহার প্রণীত গ্রন্থ-সমুহ—শরৎশশী, চিত্রদর্শক, চিত্ত-চৈতন্যোদয়, হরিদাস সাধু। রঙ্গলালই 'বিশ্বকোষ' অভিধানের প্রথম অনুষ্ঠাতা।

১৫ই—ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর মৃত্যু (১৩২৩)।

১৭ই—মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু (১২৮০)—বাঙ্গলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ও 'চতুর্দ্দশ-পদী কবিতাবলীর' (সনেট) প্রবর্ত্তক। ইঁহার রচিতগ্রন্থ—মেঘনাদবধ, শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য, ব্রজাঙ্গনাকাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, বীরাঙ্গনা-কাব্য প্রভৃতি। ইংরেজী সাহিত্যে ইঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত খণ্ড কবিতায়ও মধুসূদন সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যু (১৩১৮)—ইনি স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। অল্প বয়স হইতেই ইনি 'ইণ্ডিয়ান্ মিরর' পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে উহার সম্পাদক এবং তাহার পরে স্বত্বাধিকারীও হন। ইনি 'গীতা-সভা'র সভাপতি ছিলেন। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সুলভ সমাচার নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৮ই—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের মৃত্যু (১৩৩৪)—ইনি জেনারেল এসেমব্লিজ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি বহু নাটক রচনা করেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—ফুলশয্যা, আলিবাবা, প্রমোদরঞ্জন, সাবিত্রী, সপ্তম-প্রতিমা, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, রঞ্জাবতী, পদ্মিনী, প্রতাপাদিত্য, নারায়ণী, নন্দকুমার, চাঁদবিবি, দাদা ও দিদি ইত্যাদি।

২০এ—(রথযাত্রা) কালীপ্রসন্ন দত্তের জন্ম (১২৬৬)।

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু (১৩০৯)।

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর জন্ম-তিথি (১২১৭)—ইঁহার পরিচয় না পাইলেও ইঁহার গ্রন্থের পরিচয় সকলেই পাইয়াছেন। কৃষ্ণকমলের 'স্বপ্নবিলাস', 'রাই উন্মাদিনী', 'বিচিত্র বিলাস', 'ভারতমিলন' ও 'সুবল-সংবাদ' এক সময়ে বাঙ্গলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আদরের জিনিস ছিল। আজকালও বাঙ্গলার নানাস্থানে ঐ সকল গীতিকাব্য কৃষ্ণযাত্রা বা ঢপ্ নামে গীত হয়।

'এডুকেশন গেজেট'এর প্রথম প্রকাশ (৪।৭।১৮৫৬)।

২১এ—প্রমদাচরণ সেনের মৃত্যু

২২এ—ভুবনমোহন রায় চৌধুরীর জন্ম (১২৩০)—ইনি মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে ওকালতী আরম্ভ করেন। বাঙ্গলার ছন্দের ইতিহাসে 'ছন্দঃ-কুসুম' ও 'পাণ্ডবচরিত'এর প্রণয়ন ভুবনমোহনকে যশস্বী করিয়া রাখিয়াছে। ছন্দঃকুসুমে ১৮৩ প্রকারের সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার এবং কতিপয় পারসী ছন্দেরও বাঙ্গলা উদাহরণ এবং বাঙলা নামকরণ হইয়াছে। ইঁহার লেখায় যথার্থ কবিত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়।

২৩এ—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম—(১৮৬৬ খৃঃ)—প্রথম যৌবনে ইনি তপস্বিনী এবং ভারত নামে দুইখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রঙ্গলাল কর্তৃক 'অ' অক্ষর শেষ

করিবার পর ইনি সমস্ত বিশ্বকোষ সঙ্কলন করেন। ইহাই নগেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—Archaeological Survey of Mayurbhanj, শঙ্করাচার্য্য, পার্শ্বনাথ ইত্যাদি।

২৪শে—মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজের জন্ম (১২০৫)—পাঠ্যাবস্থায় ইনি মুগ্ধবোধের টীকা সঙ্কলন করেন। ইঁহার রচিত পুস্তক প্রায় ৭৭ খানি। তাহার মধ্যে নির্ব্বাণ-সার, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, কালবিজ্ঞান, কৌমার ব্যাকরণ, পাণীনিয় বার্ত্তিক, আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ, দায়ভাগ ইত্যাদি।

২৫এ—জগদীশ্বর গুপ্তের মৃত্যু (১২৯৯)—ইনি সংবাদ-পত্রাদিতে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিতেন। ঐ সকল প্রবন্ধে তাঁহার চিন্তাশক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। ইঁহার সঙ্কলিত গ্রন্থ সকল—সটীক 'চৈতন্য-চরিতামৃত', 'লীলাস্তবক' এবং 'চৈতন্যলীলামৃত'।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু

২৮এ—সংবাদ-রত্নাবলী' (মাসিক) প্রকাশ (১৮৩২, ১১ই জুলাই)।

রামগতি ন্যায়রত্নের জন্ম (১২৩৮)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ—'অন্ধকূপহত্যার ইতিহাস', বস্তুবিচার, রোমাবতী আখ্যায়িকা, দময়ন্তী, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাঙ্গালা ইতিহাস, রামচরিত প্রভৃতি। ইঁহার রচিত 'বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ।

২৯এ—নিত্যকৃষ্ণ বসুর মৃত্যু (১৩০৭)—'সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী'তে ইঁহার সমালোচনা-শক্তির বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় অল্পায়ু হইলেও বাঙ্গালা-কাব্যে ইঁহার দান কম নহে।

৩০এ—ভোলানাথ চন্দ্রের মৃত্যু (১৩১৭)—Talboys Wheeler ভূমিকা সংবলিত 'Travels of a Hindoo'তে ভোলানাথের রচনাশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি রাজা দিগম্বর মিত্রের একখানি জীবন-চরিত লিখিয়াছিলেন।

৩২এ—সনাতন গোস্বামীর মৃত্যু-তিথি।

মাসপঞ্জী

আষাঢ়

১লা—মহিষবাথানের লবণ-আইন ভঙ্গকারী নেতা শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্তের এক বৎসর কারাদণ্ড। কেওড়াতলা ঘাটে দেশবন্ধুর পঞ্চম স্মৃতিবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত। শ্রীহট্টে জলপ্লাবন। [illegible] পিকেটিংএর জন্য বহু স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার।

২রা—গোল-টেবিল বৈঠকে মহাত্মা গন্ধীর আমন্ত্রণ বিষয়ে লাহোরে পণ্ডিত মালব্যজীর অভিমত প্রকাশ। ঢাকার হাঙ্গামায় জনৈক হিন্দুর গৃহ অগ্নিদগ্ধ। সরকারী তদন্ত-কমিটির অধিবেশন। পাটনায় যোগেন্দ্র সুকুল নামে ডাকাত দলের সর্দ্দার গ্রেপ্তার। জেনিভায় আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-সম্মেলন।

৩রা—কলিকাতায় পিকেটিংএর জন্য ৩৬ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার। বোম্বাই গবর্ণরের শোলাপুর গমন এবং সামরিক আইন প্রত্যাহারের সংকল্প। সিমলা হইতে গবর্ণমেণ্টের কংগ্রেসের সহিত আপোষের সর্ত্তাবলী প্রকাশিত।

৪ঠা—পাঞ্জাবে একযোগে লাহোর, অমৃতসর, রাওলপিণ্ডি, শেখপুরা, লায়ালপুর ওগুজরানওয়ালায় এই ছয়টী শহরে বোমা বিস্ফোরণ। বোম্বাইয়ে গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে পণ্ডিত মতিলালের বক্তৃতা। ঢাকার অবস্থা আতঙ্কজনক। বহু লোক হতাহত।

৫ই—কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানকারী মিঃ উড্ জনসনের ২৪,৩৪০, ফুট উর্দ্ধে অবস্থিতি। দাসপুরে পুলিশ অফিসার হত্যার সম্পর্কে আরামবাগের সন্নিকটস্থ বড় বজলে ৭ সাত জন বাঙ্গালী যুবক ধৃত। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের
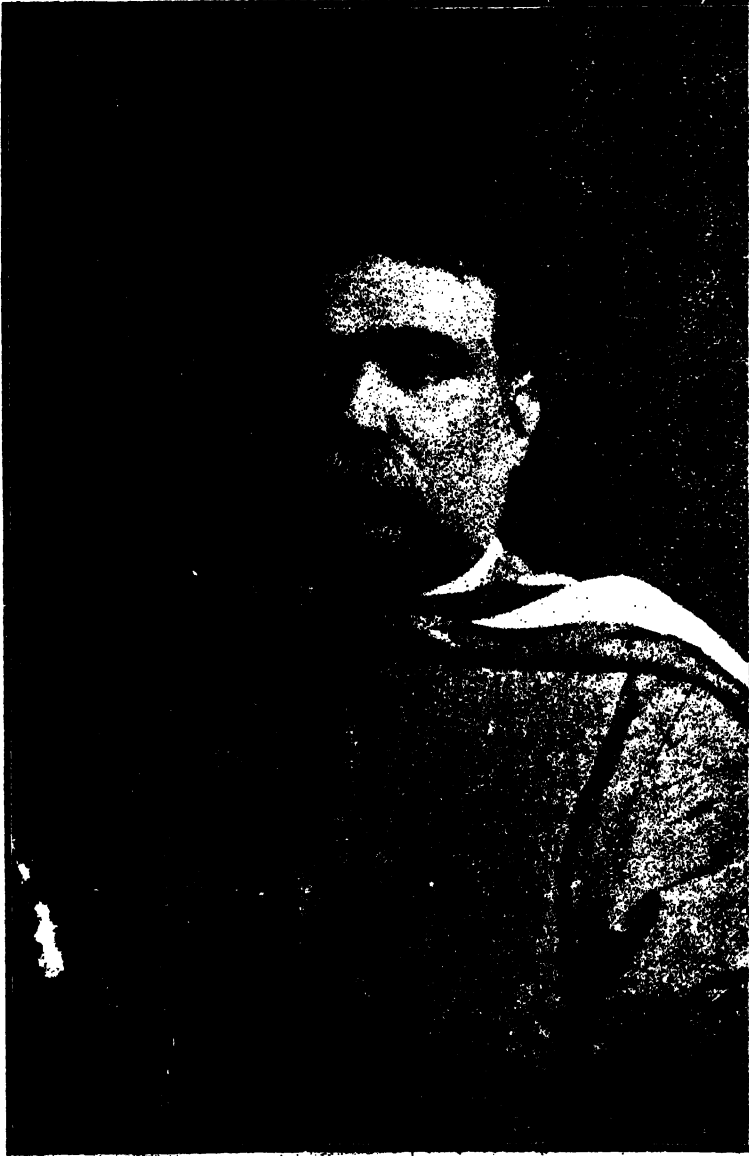
স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম (১২৭১—২৯শে জুন, ১৮৬৪ খৃঃ)

মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ

রামগতি ন্যায়রত্ন

সভাপতিত্বে কলিকাতা অনাথভবন (Refuge)এর বার্ষিক সভার অধিবেশন।

৬ই—বোম্বাইয়ে পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদিগের ৩ ঘণ্টা-ব্যাপী সংঘর্ষের ফলে ৫০০ জন আহত। কলিকাতায় ২৮জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচলক্ষ টাকার অপ্রতুলতা।

৭ই—সাইমন রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কংগ্রেস বে-আইনী বলিয়া অভিমত বিঘোষিত। জাতীয় পতাকা অবনমিত। ঢাকা হাঙ্গামার ফলে কয়েকজন হিন্দু হত।

৮ই আষাঢ়—শেখপুরায় পণ্ডিত মালব্যজীর বক্তৃতা। লণ্ডনে মিঃ, সি, এফ, এণ্ড্রুজের ভারত-সমস্যার সমাধান বিষয়ক বক্তৃতা প্রকাশিত।

বোম্বাই চেম্বার অফ কমার্শ কর্ত্তৃক ভারতীয় ন্যায্য দাবী অক্ষুণ্ণ রাখার অঙ্গীকার।

৯ই আষাঢ়—গুজরাটে শ্রীমতী কস্তুরীবাই গন্ধীর সম্বর্দ্ধনা। শ্রীযুক্ত দেবদাস গন্ধীর সহিত জেলে সাক্ষাৎ। শ্রীমতী গন্ধীর বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জন আন্দোলন। কার্শিং-এর নিকটে দার্জ্জিলিং মেল দুর্ঘটনা। ১জনের মৃত্যু ও ২ [illegible] আহত।

১০ই আষাঢ়—ভারত-সমস্যা বিষয়ে ইউরোপীয়ান এসোসিয়েসনে মিঃ চাপম্যান মার্টিনারের বক্তৃতা। দিল্লীতে সাইমন কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদকল্পে পণ্ডিত মালব্যজীর বক্তৃতা। রেঙ্গুণে জেল বিদ্রোহের ফলে ৪০জন নিহত।

ভোলানাথ চন্দ্র
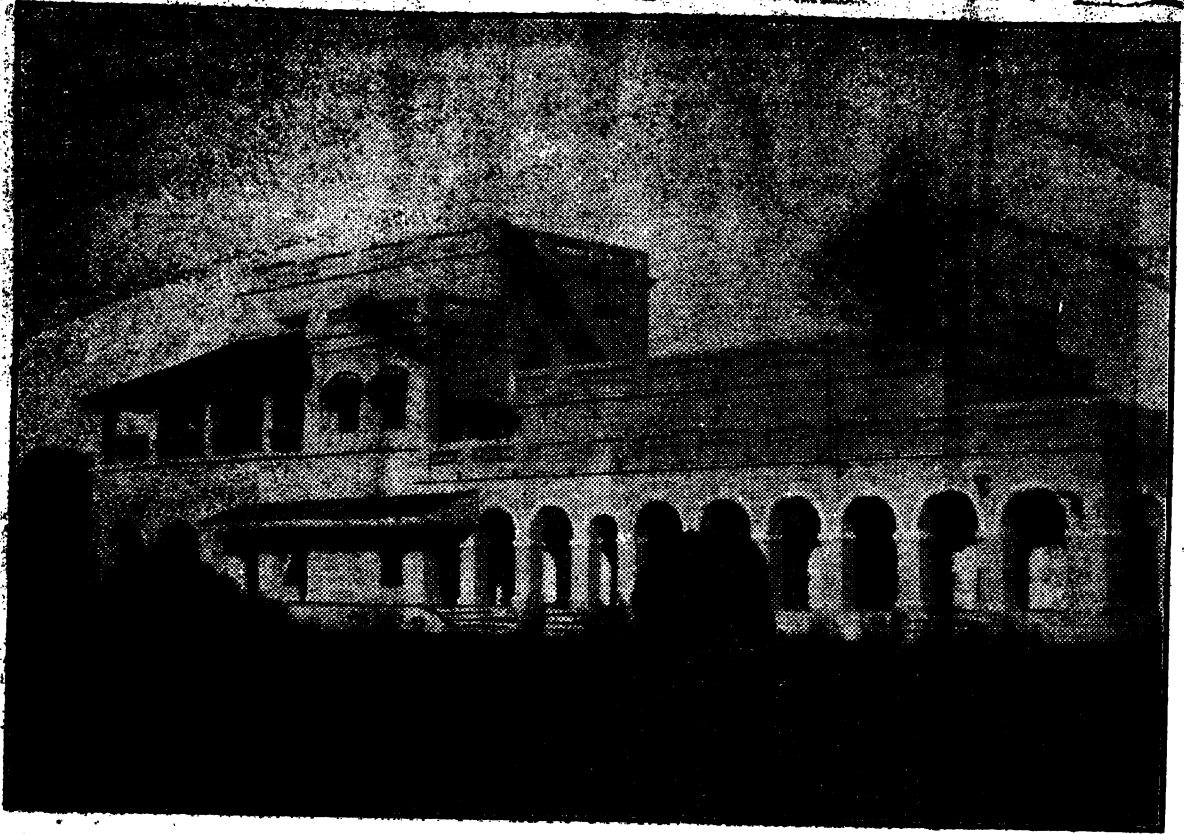
স্বরাজ-ভবন

১১ই আষাঢ়—কলিকাতায় অন্ধ্র প্রদেশের অধিবাসিগণ কর্তৃক অন্ধ্র জাতীয় দিবস পালন। ভাগলপুর বিহপুরে পুলিশকর্তৃক কংগ্রেস শিবির অবরুদ্ধ। বঙ্গদেশের নানা স্থানে খাদ্যাভাব।

নারায়ণগঞ্জে নূতন ষড়যন্ত্রমামলায় অপরাধী গ্রেপ্তার।

১২ই আষাঢ়—করাচীতে ভীষণ বৃষ্টিপাত ও বজ্রাঘাত। শহরে বহু ক্ষতি, গুজরাট কলেজে পিকেটীংএর ফলে ১:৩জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার। ঢাকা হাঙ্গামার তদন্ত-

৭৪ পৃঃ)

কমিটী-কর্ত্তৃক কতিপয় হিন্দু ও মুসলমানের সাক্ষ্যগ্রহণ। ১৪৪ধারা আইন অমান্তের অভিযোগে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ৩মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

১৩ই আষাঢ়—শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী-প্রমুখ চারিজন মহিলার প্রত্যেকের ৬মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ। শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈন ও মদনমোহন মিশ্রের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

১৪ই—মহিলাদিগের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে কলিকাতায় হরতাল। বাঁকুড়ায় নূতন অর্ডিনান্স জারী। কলিকাতায় মাইকেল স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত।

১৫ই আষাঢ়—এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু গ্রেপ্তার। লাহোরে পিকেটীংএর জন্য স্বেচ্ছাসেবক ধৃত। দিল্লীতে সাইমন রিপোর্টের প্রতিবাদকল্পে বিরাট্ মিছিল।

১৬ই আষাঢ়—পণ্ডিত মতিলাল ও সৈয়দ মামুদের ৬মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ড। শোলাপুরে জাতীয় পতাকা নিষিদ্ধ। পণ্ডিত মতিলালের গ্রেপ্তারের জন্য কলিকাতায় হরতাল। বোম্বাই, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে হরতাল অনুষ্ঠিত। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর সভানেতৃত্বে অখিল বঙ্গ ছাত্রসম্মেলনের অধিবেশন। কলিকাতায় পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের চতুর্থ স্মৃতি বার্ষিকী।

১৭ই—সিমলায় ঢাকা হাঙ্গামা সম্বন্ধে আলোচনা। লণ্ডনে দিল্লী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত এরোপ্লেন চালাইবার প্রস্তাব। কলিকাতায় ভূমিকম্প। হাইকোর্ট ও অন্যান্য কতকগুলি অট্টালিকার আংশিক ক্ষতি।

১৮ই—বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিকুমার চক্রবর্ত্তীর দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। শ্রীযুক্ত শৈলেশ মিত্রের আরও দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ। পেশোয়ারে রেল লাইনের নীচে বোমা বিস্ফোরণ। আসাম অঞ্চলে ভূমিকম্পের দরুণ সমূহ ক্ষতি। রেললাইন স্থানে স্থানে ভগ্ন ও টেলিগ্রাফ বন্ধ। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা পেরিন কাপ্তেন ধৃত।

১৯শে—সাইমন রিপোর্ট বিষয়ে মান্দ্রাজে শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তির অভিমত প্রকাশ। স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজীর দৌহিত্রী শ্রীমতী কাপ্তেনের ৩মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড। দিল্লীতে বোমা বিস্ফোরণ।

কলিকাতায় পিকেটীংএর ফলে বহু স্বেচ্ছাসেবক ধৃত।

২০শে—ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীমতী বেশান্তের উক্তি। ল্যাঙ্কেশায়ারের বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে সর্দ্দার বল্লভভাইএর বক্তৃতা। যশোহরে ডাঃ ভূপেন দত্তের মুক্তি। ছাপরায় কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ গ্রেপ্তার।

২১শে—বোম্বাইয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবীকল্পে ভারতীয় খৃষ্টানদিগের সম্মেলন। কংগ্রেস সদস্য হইবার অভিপ্রায়ে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নিকট শ্রীমতী বেশান্তের তার। পুণায় মিছিল বন্ধের দরুণ পুলিশের সহিত জনতার সংঘর্ষ। ডাঃ বিধান রায়ের কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য-পদ পরিত্যাগ।

২২শে—কলিকাতা পিকেটীংএর ফলে আইনের আদ্য পরীক্ষা বন্ধ। পরীক্ষার্থীদিগের অনুপস্থিতি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস ও অপর ৪৯ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার।

২৩শে—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাসের ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড। রংপুরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। ধুবড়ীতে ১১২ বার ভূমিকম্প। আহাম্মদাবাদে "নবজীবন" প্রেস বাজেয়াপ্ত। পুনরায় আইন পরীক্ষা বন্ধ।

২৪—বম্বে কংগ্রেস-গৃহে খানাতল্লাস। পেশোয়ারে দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক সহকারী ডাক পোড়ান। কলিকাতায় বিভিন্ন স্থানে স্কুলের ছাত্রদের ধর্ম্মঘট।

২৫—কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং। আসামে ভীষণ ভূমিকম্প। ল্যাঙ্কাশায়ারের বহু মিল বন্ধ। অর্ডিনান্সে বাঙলার বিভিন্ন জেলা হইতে বহু যুবক ধৃত।

২৬শে—এক পক্ষের জন্য আইন পরীক্ষা বন্ধ। কলিকাতার দুএকটী কলেজে পিকেটিং। ডাঃ মুঞ্জে 'ফরেষ্ট'-আইন অমান্যকারীদের সহিত ধৃত। শ্রীযুক্ত এম, আর, জয়াকরের কংগ্রেসের সহিত ভারত সরকারের মিটমাটের জন্য বড় লাটের সহিত সাক্ষাৎ।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একটী লেখা বিলাতের 'স্পেক্‌টেটার' পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা ইংলণ্ডের লোক জানিবে না ইহাই যেন নিয়তি, কারণ যে সব গভর্ণমেণ্ট শাস্তির বিধান করিয়া সহজেই কার্য্যসমাধা করিতে চান, এই রকম সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেই, সেই সব গভর্ণমেণ্ট তাহাদের আপন শত্রুদের অপেক্ষা নিজের লোকদের উন্নত মনকে ভয় করে।

* * * *

নব-জাগরণের এই উত্তেজনার যুগে ভারতবর্ষ আন্তরিকতাহীন শাসনের অগৌরব ও কাতরতা উপলব্ধি করিয়াছে। ইহার মধ্যে ভাবের দীপ্তি বা সহানুভূতির সজীব স্পর্শ নাই। এমন একটা দুঃস্থ রাজনৈতিক অবস্থা মনুষ্যত্বের এই ত্রুটি হইতে জন্মলাভ করিবার সুবিধা পাইয়াছে। ভারতবাসী আজ কাতর হইয়া এই অবস্থা-পরিবর্ত্তন করিতে চায় এবং কিসে আপনারা এই বিষম ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহার উপায়ের সন্ধান করিতেছে।

* * * *

দুই পক্ষের উদার সহযোগেই কেবল তাহা মিলিতে পারে। মিলিতে পারে মনের এমন সম্মিলনে যাহা মানুষের স্বভাবিক দুর্ব্বলতার অনেক ত্রুটি ক্ষমা করে এবং তাহার মহত্বের প্রতি অবিচলিত আস্থা পোষণ করে। আমাদের কার্য্য দিন দিন কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে, কারণ বর্ত্তমান অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিকদিগেরই হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজনৈতিকগণ রাষ্ট্রগঠন সম্বন্ধেই সাধারণের প্রতিনিধি—তাহাদের মানবতার নহে। তাই যে ভাবতান্ত্রিকতা ইংলণ্ডের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করিয়াছে আজ আমি তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই কথা বলিতেছি। সেই ভাবতন্ত্র বিদেশীদের দেশেও তাহার গরিমা বিস্তৃত করুক।

* * * *

ন্যায়ের অনুরোধে আমাকে বলিতে হইবে যে, নিরস্ত্র আর অসীম শক্তিসম্পন্ন দুই জাতির এই সংঘর্ষে ইংরেজ ব্যতীত আর যে কোন রাজশক্তির নিকট হইতেই আমাদের ভীষণতর যন্ত্রণা পাইতে হইত। বিরোধের উগ্রচেষ্টার মধ্যেও আমাদের দেশ যে হঠকারিতা-প্রসূত বলপ্রয়োগ-ব্যবস্থার অবিচারকে ক্রোধের চোখে দেখিতেছে না, ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ব্রিটিশদের ন্যায় ও মনুষ্যত্বের আদর্শের উপর এখনও তাহার বিশ্বাস আছে।

* * * *

ইহা হইতে আরও প্রমাণ হয় যে, কোন বৃহৎ রাজনৈতিক বিদ্রোহ-সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নাই। বস্তুতঃ যদি ইতিহাসলব্ধ জ্ঞানকে স্বীকার করিতে হয়, তবে একথা বলিতেই হয় যে,যখন গভর্ণমেণ্টের সনাতন ব্যবস্থাকে আমরা ওলট-পালট করিয়া দিই, তখন শাসক-সম্প্রদায়ের বলপ্রয়োগ-সম্বন্ধে আমার দেশবাসীদের অনুযোগ-অভিযোগ করা অনুচিত। বলপ্রয়োগ যে হইবেই তাহা আমাদের ধরিয়াই লওয়া এবং তাহার সম্মুখীন হওয়া উচিত। আমরাই ভাবিয়া-চিন্তিয়া যে সব চরম বিধানকে জন্মাইতে বাধ্য করিয়াছি এবং তাহার ফল কি হইবে তাহাও ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, সে সব বিধান-সম্পর্কে আমরা গভর্ণমেণ্টকে দোষ দিব না।

* * * *

স্যর ফ্লিনডারস্ পেট্রি প্যালেষ্টাইনে ফিরিয়া গিয়াছেন—তাঁহার বয়স হইতে চলিল আশী বৎসর। পুরাতত্ত্ববিদেরা

তাঁহার কার্য্য-কলাপ ও আবিষ্কার-সমূহের সহিত সম্যক পরিচিত। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'ইজিপ্‌টোলজিষ্ট' বলিয়া শ্রীযুক্ত পেট্রি বিশেষজ্ঞদের নিকট পরিচিত। ইজিপ্টের (মিশরের) বিষয় যাহারাই গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এমন একজনও নাই যিনি শ্রীযুক্ত পেট্রির নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করেন নাই এবং আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের ভিতর এমন লোক খুব কমই আছেন যিনি এ বিষয়ের গোড়ার শিক্ষার জন্ম তাঁহার নিকট ঋণী নন। প্রাচীন ইতিহাসে শ্রীযুক্ত পেট্রির অগাধ পাণ্ডিত্য; তিনি একজন বহু ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম মিশরে যান, সুতরাং এ ঘটনার ইহাই জুবিলী।

*　　*　　*　　*

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শার্লক হোমসের স্রষ্টিকর্ত্তা সার আর্থার কোনান ডয়েল গত ৭ই জুলাই মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিশ্ব-সাহিত্যের ক্ষতি হইল। তিনি পরলোকে বিশ্বাস করিতেন এবং ইদানীং পরলোক-তত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতত্ত্ব লইয়া আলোচনা ও অবিশ্বাসীদের সঙ্গে অনেক বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। গত শরৎকালে নরওয়ে-সুইডেনে পরলোক ও প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। নভেম্বর মাস হইতে তিনি পীড়িত ছিলেন। ১৮৫৯ সালে ২২শে মে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে A study in Scarlet, The Captain of Polestar, The Sign of Four, The White Company, Adventures of Sherlock Holmes, The Great Boer Wor, History of British Campaign in France and Flanders, A Visit to Three Fronts, The Wanderings of a Spiritualist, History of Spiritualism প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন তিনি 'Story of Waterloo' নামক একখানি নাটকও লিখিয়াছিলেন এবং Sir Henry Irving-কর্ত্তৃক তাহা সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

*　　*　　*　　*

'ম্যানচেষ্টার গর্জ্জেন'-পত্রের বার্ম্মিংহামের সংবাদদাতাকে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই :—

"আমাদের যৌবনাবস্থায় আমরা ইউরোপকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম। ইহার সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উন্নতি আমাদের ঘরের দ্বারে ইহা আনিয়া দিয়াছে বলিয়া। ইংলণ্ডকে আমরা চিনিতাম তাহার উজ্জ্বল সাহিত্যের ভিতর দিয়া। ঐ সাহিত্য আমাদের প্রাণে প্রেরণা আনিয়া দিত। ইংরেজী লেখক ও কবিদের রচনায় মানবতা, ন্যায় ও স্বাধীনতা-প্রীতি উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত।

১৬৮৮ খৃঃ অব্দের রাষ্ট্র-বিপ্লবের (Revolutionএর) যুগ হইতে এই বিরাট্‌ সাহিত্যের ধারা সমানভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের চতুর্দ্দশপদী কবিতায় মানবের ন্যায্য অধিকার স্বাধীনতার প্রভাব আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতাম। শেলির যৌবনদৃপ্ত রচনা হইতে পুরোহিতদের অত্যাচার-কাহিনী ও তাহা হইতে মুক্তির উপায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়া দিত। অবশ্য সে সকল রচনায় পূর্ণতার ছাপ না থাকিলেও আনন্দ পাইতাম, কারণ উহাদের ভিতর যে সত্য নিহিত ছিল তাহা সকল দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য—উহা হইতেছে এই যে, অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ঐ সকল অত্যাচারকে সাহসের সহিত সহ্য করিতে হইবে।

*　　*　　*　　*

এই সকল পাঠ করিয়া সে-সময় আমরা একরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই লইয়াছিলাম যে, আমরা স্বাধীনতাকামী হইলে প্রতীচ্যের সাহায্য আমরা পাইবই। আমাদের বিশ্বাস ছিল, ইংলণ্ড আমাদের পক্ষ লইবেই লইবে।

সময়ে আমাদের সে ধারণার মূলে কুঠারাঘাত হইল। যৌবনের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। পাশ্চাত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া পাশ্চাত্যদের মনোভাব বুঝিলাম—স্বার্থের দিকেই তাহাদের টান অতি মাত্রায়। (We came to know at close quarters the Western mentality in its unscrupulous aspect of exploitation and it revolted us more and more) এবং আমাদের আত্মা উত্তরোত্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

*　　*　　*　　*

আমরা ভুলিতে বসিলাম ইংলণ্ডের নৈতিক প্রভাব—ইংলণ্ড যে জগতের ভিতর ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিত ও যে উচ্চ আদর্শ স্থাপিত করিয়াছিল তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। এখন আমাদের ধারণা হইয়াছে, পশ্চিমের জাতির প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখা ও অন্য দেশের অর্থ যে কোন উপায়েই হউক ঘরে আনা ইহাদের চরম লক্ষ্য। ভারতবাসীর মনের অবস্থা যখন এইরূপ হইয়াছে, তখন মনোভাবের পরিবর্ত্তন ছাড়া এ ব্যাধির উপশম হইবে না। জোর-জুলুম করিয়া কিছুই হইবে না। আমি বলিতে চাই, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বড় বড় মাথাওয়ালা লোকদের মিলন না হইলে উপায় নির্দ্ধারিত হইবে না।—চাই ভারতের মান-মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া উপায় বাহির করা। ইংলণ্ডের চাই উদারতা ও আন্তরিকতা, আর চাই ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ করিয়া স্বার্থের দিকে না চাহিয়া শান্তিকামী হইয়া মিলনের চেষ্টা।"

* * * *

আমাদের বোধ হয় গোল-টেবিলের প্রস্তাব হইবা-মাত্রই রবীন্দ্রনাথ উভয় দেশের ভাবের আদান প্রদান হইবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া ইহাতে সম্পূর্ণ মত দিয়াছেন। অবশ্য এ কথা সার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর প্রাপ্ত টেলিগ্রাম হইতেই জানিতে পারা গিয়াছে।

* * * *

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ বি দশানন আচারিয়া এম-এ (মান্দ্রাজ) পি এচ-ডি (মিউনিচ) এফ্ ইনষ্টিটিউট-পি (লণ্ডন) ৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-মন্দিরে বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের নবাবিষ্কার সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রথম দিনের সভাপতি ছিলেন বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক স্যর বেঙ্কট রমণ এম-এ, ডিএস-সি, এফ্-আর-এস। বক্তা সম্প্রতি আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যা-লয়ের রায়েরসন পদার্থবিদ্যাবিষয়ক পরীক্ষাগারে Ryerson Physics Laboratoryতে, গবেষণা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী ও আমেরিকার গবেষকদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। ইঁহার গবেষণা ঐসকল দেশের মনীষীরা একবাক্যে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। আরও কয়েকটী বক্তৃতা তিনি দিবেন। সাধারণের নিকট সহজ সরলভাবে এই সকল আবিষ্কারের বার্ত্তা প্রচার করিয়া তিনি দেশের মহোপকার সাধন করিতেছেন।

* * * *

গত ৪ঠা জুন লণ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটীর এক অধিবেশনে ডাঃ আর্ণল্ড বেক 'ভারতীয় সঙ্গীত' ও রবীন্দ্র-নাথ সম্বন্ধে এক সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। স্যর ফ্রান্সিস ইয়ং হসব্যাণ্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তা তাঁহার বক্তৃতার এক স্থলে বলিয়াছেন, এই সকল গানে কবি স্বয়ং সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক মূল্য আছে (highest spiritual value) বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু এগুলি সংরক্ষণের দিকে তাঁহার মনোযোগ যে আদৌ আছে তাহা বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার কবিতার মত এগুলি সংগৃহীত হয় নাই। এগুলির স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ বটে, তিনি বচন-সংযোগ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু সুর সংযোজন করিয়াছেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে রচনা করিয়া দীনেন্দ্রনাথকে বলিয়াই ক্ষান্ত হন। দীনেন্দ্রনাথের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির সাহায্যে এগুলি সাধারণের নিকট প্রচারিত হয়। দীনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সহিত রবীন্দ্রনাথের জীবনের অর্দ্ধেক কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বাঙ্গালার স্বর-লিপি অসম্পূর্ণ। এই স্বর-লিপির সাহায্যেও যে সামান্য গান কয়েকটা রক্ষিত হইয়াছে, দীনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক। তিনি হইতে পাঁচ বৎসর ধরিয়া যদি কেহ দীনেন্দ্রনাথের সাহায্যে এগুলি সংরক্ষণ করেন, তাহা হইলে জগৎ এ বিষয়ে এক নূতন আলোক পাইবে। ভারতীয় সংগীতের-তথা বাঙ্গালার সংগীতে-বৈশিষ্ট্য কোথায় জানিতে পারিয়া ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা ধন্য হইবে।

* * * *

বঙ্গদেশের ছাত্র-সমাজের অধিবেশন আলবার্টহলে হইয়া গিয়াছে। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী। কুমারী কল্যাণী দাশ প্রস্তাব করেন যে সমগ্র বাঙ্গালা দেশের কলেজ ও স্কুলের ছাত্রেরা এই রাজনৈতিক হাঙ্গামার সময় পড়াশুনা বন্ধ করিয়া কংগ্রেস-নির্দ্দিষ্ট পথে দেশের কাজে লাগিয়া যাউন। যতদিন না রাজনৈতিক অবস্থা অনুকূল হয় ততদিন ছাত্র

সমাজের এইরূপ অবস্থাই চলিবে এবং-কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি যখন মনে করিবেন অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তখন এই প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইবে।

* * * *

এ সম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা দুই জনের বক্তৃ[illegible] উদ্ধার করিব—একজন আমাদের দেশ-পূজ্য ছাত্রবন্ধু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, অপর ব্যক্তি ছাত্র শ্রীমান্ জসীমুদ্দিন, বাঙ্গালার একজন উদীয়মান কবি। আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—আজীবন তিনি শিক্ষকতাই করিয়া আসিতেছেন—ছাত্রদের সহিত একযোগেই কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, এখনও তিনি ছাত্রদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না। দর্শকভাবে তিনি সভায় আসিয়াছেন। উপস্থাপিত প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলিতে চান না। তিনি ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চান, তাহারা আন্তরিকতার সহিত দেশের কাজে আত্মপ্রাণ নিয়োগ করিতে চায় কি না—যদি চায় তো স্কুল কলেজ বন্ধ করুক। আর যদি না চায়, যদি তাস খেলিয়া, থিয়েটার ও সিনেমা দেখিয়া সময় কাটাইতে চায় তবে এ প্রস্তাবে সম্মত দিতে বলি না। আমি বলিতে চাই ভাবিয়া-চিন্তিয়া প্রাণের দিকে চাহিয়া কার্য্য নির্দ্ধারণ কর—আর যদি উপস্থাপিত প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত কর তাহা হইলে দেশের কাজ ঠিক মত কর, নচেৎ স্কুল-কলেজ ছাড়িও না।

* * * *

শ্রীমান্ জসীমুদ্দীন উপস্থাপিত প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বলেন, এই যে ছুটীর এত দিন কলেজ বন্ধ ছিল, বুকে হাত দিয়া ছাত্রেরা বলুন কে কতটা দেশের কাজ করিয়াছেন। গভীর দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ছাত্রেরা এই ছুটীতে দেশের কাজ কিছুমাত্র করেন নাই। আমার মনে হয়, স্কুল-কলেজে পাঠরত থাকিয়া, অবসর সময়ে দেশের কার্য্য করাই ছাত্রদের কর্ত্তব্য। ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে অবসর সময়ে দেশের বহু কার্য্য করা যায়।

* * * *

দুঃখের বিষয় বেচারা জসীমুদ্দীনের বক্তব্য শেষ করিতে দেওয়া হয় নাই। তাহার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া ছাত্রেরা ভাল করে নাই। তাহার বক্তব্য শুনা সকলেরই উচিত ছিল। যাহা হউক প্রস্তাব গৃহীত হইয়া গিয়াছে। একটা কথা এখানে জিজ্ঞাস্য—বক্তাদের অধিকাংশই দেখিলাম, যাহারা সাধারণতঃ বক্তৃতা দিয়া আসিতেছেন তাঁহারাই। ছাত্রদের মনোভাব লওয়া হইল কোথায়? বঙ্গদেশীয় ছাত্রসমাজের নামে এরূপ করা কি ন্যায়সঙ্গত?

* * * *

আর ধরিয়াই যদি লই যে, ছাত্রসমাজের এইরূপ মনোভাব, তাহা হইলে এই সম্পর্কে আর একটা কথা জিজ্ঞাস্য দেশবাসী কি ছাত্র-সমাজের দ্বারাই চালিত হইবে? কংগ্রেস তো স্কুল কলেজ বন্ধ করিতে বলে নাই? তবে স্কুল-কলেজ বন্ধ হইতেছে কেন? কংগ্রেসের আদেশ যাঁহারা অমান্য করিয়া কোন কিছু বলেন তাহাদের কথায় কতটা আস্থা স্থাপন করা যায়? ছাত্রদের অভিভাবকদের ও শিক্ষকদের কোন কথাও শুনিবার যোগ্য কি না তাহা কি কখনও বিবেচিত হইয়াছে? আমাদের মনে হয় সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের স্কুল বন্ধ হওয়া কোন মতেই উচিত নয়।

* * * *

ফলে স্কুল-কলেজ বন্ধ করিবার জন্য বাঙ্গালার সর্ব্বত্র পিকেটিং চলিতেছে। এই 'পিকেটিং'কে সর্ব্বত্র অহিংস অসহযোগ বলা যায় কি? মহাত্মা গন্ধীর মতে কি কার্য্য চলিতেছে? যুক্তি সাহায্যে অথবা ভাবের দিক্ দিয়াই যদি বুঝাইয়া কার্য্য করা হইত তাহা হইলে বুঝিতাম অহিংসভাবে কার্য্য চলিতেছে; অনুনয়-বিনয়, অনুরোধ-উপরোধে কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু তাহা তো সর্ব্বত্র হইতেছে না, হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেও দেখিয়াছি। এরূপ করা কখনও উচিত নয়। তাহার উপর জাতীয় পরিষদের অন্যতম অনুষ্ঠান 'যাদবপুরের টেক্‌নিকাল বিদ্যালয়' বন্ধ করা এই সময়ে কি যুক্তিসঙ্গত? দেশের জাতীয় দুর্দ্দিনে ধনাগমের পথ যাহারা প্রশস্ত করিতে ব্যস্ত তাহাদিগের কার্য্যে প্রতিবন্ধক হওয়া আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না।

* * * *

আর একটা দিক দিয়া ছাত্রদিগের মনোভাব আলোচনা করা যাউক। আজ আইন পরীক্ষা পিকেটিংএর দরুণ প্রথম দিন বন্ধ হইয়া গেল। পরীক্ষার্থীরা বালক নয়—শিক্ষিত উপাধিধারী যুবক, সমাজের বিশিষ্ট সভ্য। কেন তাহারা পরদিন পরীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইল? এই 'পিকেটিং' যে সুফলপ্রসূ হয় নাই তাহা কি কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে? পিকেটিং সত্বেও চারি দিনই ক্রমান্বয়ে তাহারা আসিয়াছে। ইহা হইতেও কি তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারা যায় না? তাহারা তো সকলেই পরীক্ষা দিতে ব্যগ্র।

* * * *

'পিকেটিং'এর নূতন প্রথা সাষ্টাঙ্গে শয়ন করিয়া পড়িয়া থাকা আশুতোষের আমলেই প্রথম দেখা গিয়াছিল। তাহার পর আবার সেই প্রথা অনুসৃত হইল। এই প্রথার অনুমোদন আমরা কিছুতেই করিতে পারি না। ইহাকে আমরা অহিংস অসহযোগ কোন মতেই বলিতে পারি না। এদেশে দেবতার স্থানে কার্য্যসিদ্ধির জন্য 'ধর্ণা' দিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু পিকেটাররা কোথায় যাইতেছেন? এইরূপে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলে যে সকল ছাত্র স্কুল কলেজে যাইতেছে বা পরীক্ষা দিতে যাইতেছে তাহাদের মনোভাব কি পরিবর্ত্তিত হইবে?

* * * *

যাঁহারা পিকেট করিতেছেন আমরা তাঁহাদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলিতেছি, পিতা-মাতা, শিক্ষকদিগের সহিত পরামর্শ করিতে বলিতেছি। পরিশেষে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত আমরাও বলি, যদি দেশের কাজ করিবার উদগ্র বাসনা মনে জন্মিয়া থাকে, তবে দেশের কাজে যাও, নচেৎ যাইও না। বিবেকের বাণী শোন—অপরের কথায় নাচিয়া কার্য্য করিও না।

* * * *

এ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাক্তার আর্কোহার্ট সাহেব যে বক্তৃতা প্রচার করিয়াছেন তাহা যেমন সময়োপযোগী, তেমনই সহানুভূতিতে পূর্ণ। তিনি বলিয়াছেন, এ সময় বাস্তবিকই দুঃসময়। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা যাঁহারা শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী আছি ও যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের একটা কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা বলিতেছি ছাত্রদের এক[illegible] পাঠে মনোযোগ দেওয়াই উচিত। যে-সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে থাকিতে চাহে, আমরা তাহাদিগকে বাহিরে থাকিতেই বলি, আমরা তাহাদিগকে ভিতরে আসিবার জন্য কোনরূপ বল-প্রয়োগ করিব না, তাহাদের কোনরূপ ক্ষতিও করিব না, সুধু তাহাদের নিকট এইটুকু চাই তাহারা যেন যে সকল ছাত্র বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতে চায় তাহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংক্রান্ত স্কুল কলেজ খুলিয়া রাখিব—যে সকল ছাত্র সেখানে যাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের স্বাধীনতায়, তাহাদের ইচ্ছায় তাহারা যেন বাধা না দেয়।

* * * চ

এমন যুক্তিসঙ্গত কথায় যাহারা যুক্তির সাহায্যে প্রতিবাদ করেন না, ভাবের প্রাবল্যে ছাত্রদিগকে চালিত করিতে চান তাঁহাদিগকে বলিবার আমাদের কিছুই নাই। আমরা শুধু দেখিতে চাই যাঁহারা প্রকৃতই স্বাধীনতার মূল্য বুঝেন, তাহারা অপরের স্বাধীনতার হন্তারক হইতে পারেন না—হইবেন না। আমরা আবার বলি, কলেজের ছাত্রেরা, আপনাদিগের ভালমন্দ বুঝিবার যাহাদের সামর্থ্য হইয়াছে, তাহারা আপনাদের পথ বাছিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন, কিন্তু কোমলমতি স্কুলের ছাত্রদিগের স্কুল যেন বন্ধ না হয়।

* *

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও গল্প লেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের তৈলচিত্র উন্মোচিত হওয়ায় আমরা সুখী হইলাম।

সমালোচনা

স্মৃতি-রেখা [illegible] সাহিত্যিক ভূতপূর্ব্ব "মানসী" সম্পাদক কবি[illegible] যে উপন্যাস রচনাতেও একজন নিপুণ শিল্পী [illegible]-রেখা উপন্যাসখানি হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এই বইখানির ঘটনা-বৈচিত্র্যে বাস্তবিক মুগ্ধ হইতে হয়। তাহার উপর তাহার প্রাঞ্জল ভাষা স্থানে স্থানে বাধা-বন্ধন-হারা নির্ঝরিণীর মতই অশ্রান্ত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। এমন সহজ ও সুন্দর ভাবে প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণনা তিনি করিয়াছেন যে, পাঠকের নয়ন-সম্মুখে তাহার একটী সুস্পষ্ট ও জীবন্ত ছবি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

বেদেদের কথা লইয়াই এই গ্রন্থের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি হইয়াছে বটে, তথাপি একালের জীবন-যাত্রা প্রণালী, সভ্যতা ও শিক্ষার কথা কহিতেও গ্রন্থকার ভুলেন নাই। দুইখানি চিত্রই যেন [illegible] মত পাশাপাশি চলিয়াছে এবং তাহাদের সংযোগস্থল [illegible] মতই এক অপূর্ব্ব মহিমায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

গ্রন্থকারের সুন্দর লিখন-ভঙ্গীতে প্রত্যেক চরিত্র শতদলের মত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আজন্ম বেদের ঘরে লালিত হইয়াও মনুয়ার ধাতুগত প্রকৃতি যে বদলায় নাই, কঠোরের মধ্যেও সৌকুমার্য্য যে কি অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় মনুয়ার প্রতি কথায় পাওরা যায়। প্রলোভনকে সংযমের বাঁধে বাঁধিয়া রাখার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই আছে, কিন্তু মনুয়া তাহা পারিয়াছিল এবং পারিয়াছিল বলিয়াই তাহার চরিত্রের বিকাশ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দাদু বহু বিষয় শিখাইতে চাহিলেও সে লইত না। কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করিত। মানুষের উপকারের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত শিখিবার যে কোন-কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা সে স্বীকার করিত না। এমনই ছিল তাহার প্রকৃতি। আবার আর একদিকে নারী-সুলভ স্বভাবের স্নেহ-কোমল মূর্ত্তি সে যাহা দেখাইয়াছে তাহাও চমৎকার। ভাল যে কিরূপ করিয়া বাসিতে হয়, নিজের দয়িতের জন্য যে কিরূপ করিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হয় তাহা সে জানিত; উচ্ছৃঙ্খলতার ক্ষীণ আভাষ তাহার চরিত্রে পাওয়া যায় না, সংযমের শান্ত ভাব তাহাতে সমাহিত হইয়া আরও গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে দেখা যায়। দাদুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা তাহার জীবনের সহিত যেন অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়াছিল। তাই যেদিন পরম সুখের সিংহাসনে গিয়া সে উঠিয়া বসিল সে দিনও দাদুকে সে ভুলিতে পারে নাই।

তাহার সমীরের চরিত্র একদিকে যেমন ভীষণ হিংস্র আর একদিকে মনুয়ার প্রতি ঠিক সেই পরিমাণেই স্নেহ-কাতর। আপনার প্রাণাপেক্ষা সে মনুয়াকে ভালবাসিত। বৃদ্ধ সমীরের সমস্ত অভাব মনুয়াই যেন দূর করিয়া রাখিয়াছিল। অশিক্ষিত বেদের প্রাণের মহত্ত্ব ও ভালবাসা যে বহু শিক্ষিত মানুষের চেয়েও বহু গুণে উচ্চ তাহা সমীর দেখাইয়াছে।

সমীর ও মনুয়া ছাড়া লতিকা, করুণাময়ী, প্রবোধ, উমেশ, বিপিন প্রভৃতি চরিত্রগুলি প্রাকৃত রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের "স্মৃতি-রেখা" যে সত্যই একটী উপাদেয় উপন্যাস, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

"বাতায়ন" (কাব্যগ্রন্থ)—শ্রীমতী উমা দেবী প্রণীত; কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকা-সহ। শ্রীশিশিরকুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক ৫৫ নং কেনাল ইষ্ট রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; মূল্য এক টাকা।

"বাতায়নের" কবি তাঁহার অবসর সময়টীতে ঘরের বাতায়ন-কোণে বসিয়া বসিয়া একটী ক্ষুদ্র পৃথিবীর কতকগুলি অনাড়ম্বর জীবনের বিচিত্র-লীলার চিত্র আঁকিয়াছেন; ইহাতে প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার অসংখ্য খুঁটিনাটির মধ্যে হাসি ও কান্নার, দুঃখ ও বেদনার, সুখ ও করুণার সকল প্রকার সহজ অনুভূতির সুপ্রচুর অবসর আছে। এই সরল জীবন-যাত্রার বিচিত্র ছবি এক একটী অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া এই নারী-কবির স্নেহ-সুলভ অন্তরের মধ্যে এক একটী সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। "বাতায়নের" ৪০টী সনেটে তাঁহার অন্তরের এই সুস্পষ্ট রূপগুলিকেই তিনি ভাষা ও ছন্দে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কল্পনার কোন সুদূর-বিসর্পী দৃষ্টি অথবা ভাবের কোন অপরূপ ঐশ্বর্য্য এই কবিতাগুলিকে বিশিষ্টতা দান করে নাই। ইহাদের প্রত্যেকটীই কবির একান্ত পরিচিত প্রত্যক্ষ-দেখা ছবি, এবং সেই ছবিকে তিনি একান্ত ঔৎসুক্যের দৃষ্টিতে ও সহজ সহৃদয় করুণায় দেখিয়াছেন; সে-দৃষ্টি কোথাও কুয়াশার অস্পষ্ট, অথবা ভাব-বেগের বাষ্পে আচ্ছন্ন নয়, বরং বর্ণনার সহজ অকুণ্ঠ ভঙ্গিমায় এবং 'প্রকাশের সরস নৈপুণ্যে' স্বচ্ছ ও সমুজ্জ্বল।

এই যে মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার অসংখ্য খুঁটিনাটির তুচ্ছ ক্ষুদ্র এক একটী অতি পরিচিত অনুভূতির আশ্রয়ে নিত্য-কালের জন্য ছন্দের বন্ধনে ধরিয়া রাখা, কবিতার এই সুরটী প্রথম ধরিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার 'চৈতালী'তে 'দিদি' 'পুটু' প্রভৃতি

কবিতায় তাহার পরিচয় আছে। শ্রীমতী উমা দেবী তাঁহার 'বাতায়নে' এই সুরটীকে নিজস্ব করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার সে প্রয়াস সার্থক হইয়াছে। বাঙ্‌লা ভাষায় এই ধরণের কবিতা খুব বেশী নাই।

এই চতুর্দ্দশ-পদী কবিতাগুলির রূপ কতকটা সনেটেরই মত ; কিন্তু সনেটের সুকঠিন রীতি সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই ; দু'এক জায়গায় মিলের ত্রুটিও আছে, কিন্তু সমস্ত ত্রুটি ঢাকিয়া দিয়াছে এই কবিতাগুলির সুস্পষ্ট সরলতা, বর্ণনার সহজ ভঙ্গিমা ও স্বচ্ছ সহৃদয় দৃষ্টি। প্রত্যেক কবিতা চোখের সম্মুখে একটা ছবিকে ফুটাইয়া তোলে, এবং মনের মধ্যে একটা অনুভূতিকে জাগাইয়া দেয়। ইহাদের একমাত্র ঐশ্বর্য্য-সৃষ্টির মাধুর্য্য, একমাত্র অলঙ্কার প্রকাশের সরলতা ; অথচ এই ঐশ্বর্য্য ও অলঙ্কার লইয়াই এই কবিতাগুলি রসিকজনের সমাদরের যোগ্য হইয়াছে।

বইখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুসঙ্গত সুরুচির পরিচায়ক। পুস্তক-প্রকাশ ব্যাপারে এমন সুন্দর মার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের পরিচয় বাঙলা দেশে খুব কমই পাওয়া যায়। মলাটের উপর বাতায়ন-বর্ত্তিনীর ছোট ছবিখানি সুন্দর ও সার্থক।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

দম্পতি—ডাক্তার শ্রীশশীকুমার সেন বি-এ, এল এম্-এস্। সুন্দর কাপড়ের বাঁধাই, মূল্য ২৷৷০ টাকা। বিবাহিত যুবকদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয় একখানি পাঠ্য পুস্তক। তাহাদের জানিবার, বুঝিবার ও শিখিবার অনেক বিষয়ই এই পুস্তকে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য বিষয়গুলি গৃহচিকিৎসক বা ডাক্তার বন্ধুর দ্বারা বুঝাইয়া লইয়া মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কামশাস্ত্রাদিতে লেখক মহাশয়ের উপদেশ বাক্যগুলি স্থির চিত্তে পালন করিতে পারিলে কৃতদার ব্যক্তি মাত্রেই বিশেষ উপকৃত হইবেন সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

সম্যক শিক্ষা ব্যতীত কোন দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যের ভার আমরা কাহাকেও দিতে পারি না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দেহ ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া আমরা অনায়াসে চঞ্চলমতি যুবক দিগের উপর নূতন সংসার করিবার গুরুভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। সংসারের সৃষ্টি হয়, কিন্তু সুখের নয় দুঃখের। অধিকাংশ স্থলে অতি অল্পকালের মধ্যেই স্বামী স্ত্রীর প্রণয়ের বেগ কমিয়া আসে। রোগ, শোক ও অকাল মৃত্যুতে সংসার ক্রমশঃ তিক্ত ও বিষময় হইয়া উঠে। আমাদের অজ্ঞতাই যে শুভ বিবাহের এই অশুভ পরিণামের মূল কারণ বহুদর্শী চিকিৎসক মহাশয় তাঁহার সযত্ন লিখিত গ্রন্থখানিতে অতি স্পষ্ট করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। উপক্রমণিকায় লেখক বলিয়াছেন "শাস্ত্রজ্ঞান হীন ও উপচার প্রয়োগানভিজ্ঞ দম্পতির মধ্যে সমান তৃপ্তি জন্য প্রেমের অভাব হয়। এই প্রেমের অভাব নানাবিধ বিপদের আকর এবং এ অভাব নানাবিধ ব্যাধির [illegible] "যৌন-বিষয়ে অজ্ঞতা সংস্কার [illegible] নয় এবং ইঙ্গিত ও সংস্কার [illegible]।

সংস্কৃত [illegible] পুস্তকখানির অশ্লীলতা দোষ [illegible] নব-বিবাহিত ও বিবাহার্থী যুবকদিগের হস্তে [illegible] পারে। বাঙ্গলা ভাষার পুস্তকে ডাক্তার [illegible] সুদীর্ঘ অধ্যায়টি বাঙ্গলায় লিখিত [illegible] "নাতিদীর্ঘ" "মেধা" "স্মৃতিবৃত্তি" প্রভৃতি শব্দের [illegible] "অধিকরণবিষয়ক" "আভিমানিক" [illegible] প্রভৃতি শব্দের স্থান হওয়াই উচিত ছিল।

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় থাকিলে বইখানির [illegible] উদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবে সাধিত হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রী[illegible]নাথ [illegible]

মহেশ্বর পোশা পরিচয়—শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, মহেশ্বরপাশা খুলনা জেলার একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহা এক সময়ে সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষিত মানবের বাসভূমি। গ্রন্থকার বিনয়ভাবে জানাইয়াছেন, তিনি ইতিহাস লিখিবার স্পর্দ্ধা রাখেন না কিন্তু তিনি যে উদ্যম ও পরিশ্রম সহকারে গ্রামের কীর্ত্তিকাহিনী এবং [illegible] বংশের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মহেশ্বরপাশায় অনেক সুসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া তাঁহারা স্বগ্রামের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। রায় সাহেব শশীভূষণ পাল একজন বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মহেশ্বরপাশা চিত্রশালায় বড়লাট লর্ড লিটন পদার্পন করেন। এই গ্রামে বহু কৃতবিদ্য ভদ্রমহোদয়ের বাস, গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধন তাঁহাদের অন্যতম চিন্তার বিষয়। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রশংসনীয় উদ্যম অনুকরণ করিয়া বঙ্গদেশের অন্যান্য গ্রামবাসীরা যদি নিজ নিজ পল্লীভূমির উন্নতি বিধান করিতে যত্নবান হন, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে। মজুমদার এবং বসু বংশের শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণ গ্রামের অন্যান্য যুবকগণের অন্নের সংস্থান করিয়াই দিয়াছেন এবং সর্ব্বদা শিক্ষা ও সংস্কার কার্য্যে অগ্রণী। গ্রন্থকার খগেন্দ্রবাবু মহেশ্বর পাশার অধিবাসী. তিনি প্রাণ দিয়া নিজপল্লীকে ভালবাসেন, প্রাণদিয়াও লিখিয়াছেন তাঁহার পুস্তকের ভাষা সহজ সরল চিত্তগ্রাহী তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যদি সাহিত্যিকগণ বঙ্গদেশের প্রধান গ্রামগুলির পরিচয় সঙ্কলণ করেন তাহা হইলে সাহিত্য এবং সমাজের দিক দিয়া অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

ঢাকার কথা

ঢাকায় যে বিগত শোচনীয় হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে সে সম্পর্কে তুইট সংবাদ আমরা নিম্নে দিলাম। এই দাঙ্গার ফলে ঢাকার ধ্বংসপ্রাপ্ত কয়েকটী গৃহের চিত্রও সন্নিবেশিত হইল।

শান্তি-সমিতি

ঢাকার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মৌলনা আবুল কালাম আজাদ মহোদয়ের নেতৃত্বে এক সভায় সম্মিলিত হইয়া সহরে শান্তি স্থাপনের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন, ফলে, ১৫ জন হিন্দু ও ১৫জন মুসলমান দ্বারা এক শান্তি-সমিতি গঠিত হইয়াছে। ঢাকার নবাব বাহাদুর এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট, উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় ও মৌলবী সাহাবুদ্দিন সমিতির সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন। যাহাতে উভয় সম্প্রদায় মনোমালিন্য দূর করিয়া পুনরায় শান্তির সহিত অবস্থান করে, তন্নিমিত্ত শান্তি-সমিতির সদস্যগণ সহরের নানাস্থানে যাইয়া সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং ঢোল দিয়াও সে কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। সমিতির চেষ্টায় সহরে সত্বর শান্তি সংস্থাপিত হউক, সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে সে কামনা করিতেছে।

এরূপ শান্তি-সমিতি ইতিপূর্ব্বেও কয়েকবার গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু তখন সাময়িকভাবে গোলযোগ প্রশমিত হইলেও, উহার পুনরাবির্ভাব নিবারিত হয় নাই। কাযেই, আমাদের মনে হয়, সাময়িক উদ্বেগ নিবারণে শান্তি-সমিতির যেমন যত্ন করা আবশ্যক, এই শান্তির যথার্থ কারণ নির্ণয় করিয়া উহার মূলোচ্ছেদে বদ্ধপরিকর হওয়াও তেমন সমিতির প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। ঢাকা-সহরে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কেই পরস্পরের সহায়তায় বাস করিতে হইবে; সুতরাং উভয়ের মধ্যে যাহাতে প্রীতিবন্ধন সুদৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত থাকে, তাহার উপায় উদ্ভাবনে সমিতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করুন। উভয় সম্প্রদায়েরই যে সকল লোক সহসা উত্তেজিত হইয়া অকাণ্ড ঘটাইয়া থাকে, তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সংযত রাখিতে না পারিলে, স্থায়ী শান্তি সংস্থাপনের আশা সুদূরপরাহত হইবে। কাযেই সমিতি যদি সহরের যথার্থ কল্যাণ-সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এ বিষয়ে প্রতিকার বিধানে যত্নবান হউন।

—ঢাকা-প্রকাশ
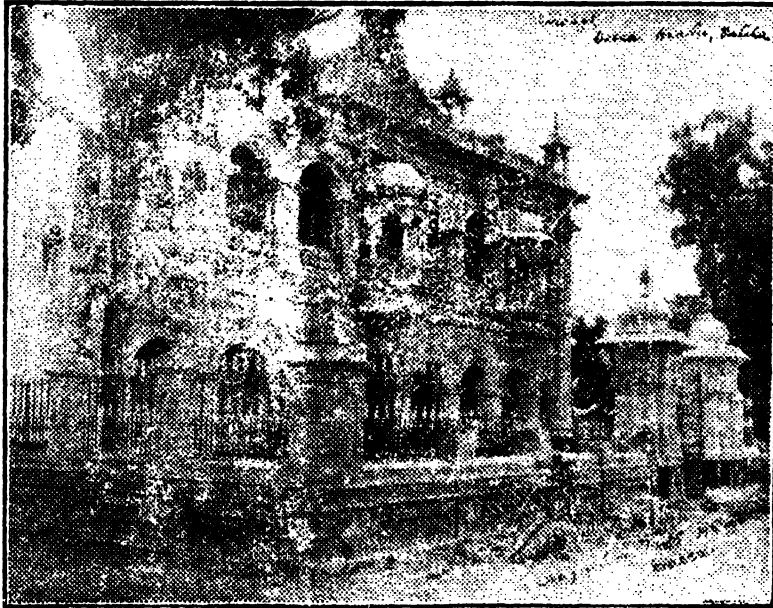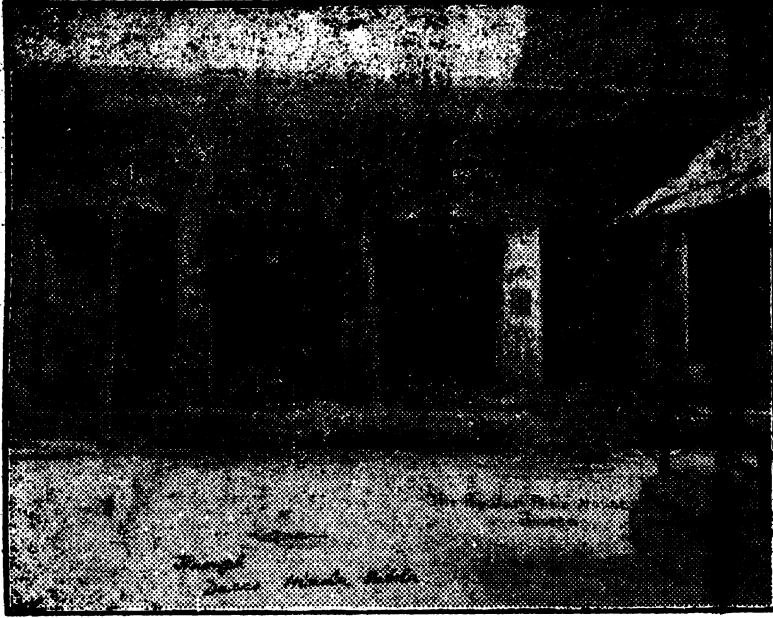
ভারতবর্ষের এবং বঙ্গদেশের এক ভীষণ দুর্ভাগ্যের কারণ—হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ। এই বিরোধে আমাদের পরস্পরের উন্নতি বারংবার বাধাগ্রস্ত হইতেছে। কয়েক শত বৎসর ধরিয়া আমরা দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করিতেছি, অথচ আমরা পরস্পরের আচার-বিচার ও প্রথা-ব্যবহারকে এখনও সম্পূর্ণ সম্মান করিতে পারি না এবং পরস্পরের প্রতি অপ্রীতি পোষণ করি, ইহাতে আমাদের দেশহিতসাধক সম্মিলিত শক্তি

অর্জ্জিত হইতেছে না। এই শক্তি অর্জ্জিত না হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ চিরদিনই অন্ধকারে থাকিবে। সম্প্রতি ঢাকায় যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা ভারতবাসী মাত্রেরই লজ্জার বিষয়।

ঢাকায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ

পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগর ঢাকা অতি প্রাচীন সহর। মুসলমান রাজত্ব-কালে এই নগরী এক সময়ে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। এই সমৃদ্ধিশালী পুরাতন সহরটী ইংরেজের আমলেও দ্বিতীয় রাজধানী এবং শিক্ষা ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থান বলিয়া বিখ্যাত। এখানে লক্ষাধিক হিন্দু ও মুসলমান দীর্ঘ কাল পরস্পর সদ্ভাবের সহিত বাস করিয়া আসিতেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সংস্রবে পরস্পর মনো-মালিন্যের উদ্ভব হয়। বিগত ১৯২৬ সনে এই নগরে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, তাহার বিষময় ফল উভয় সম্প্রদায়কেই ভোগ করিতে হইয়াছে।
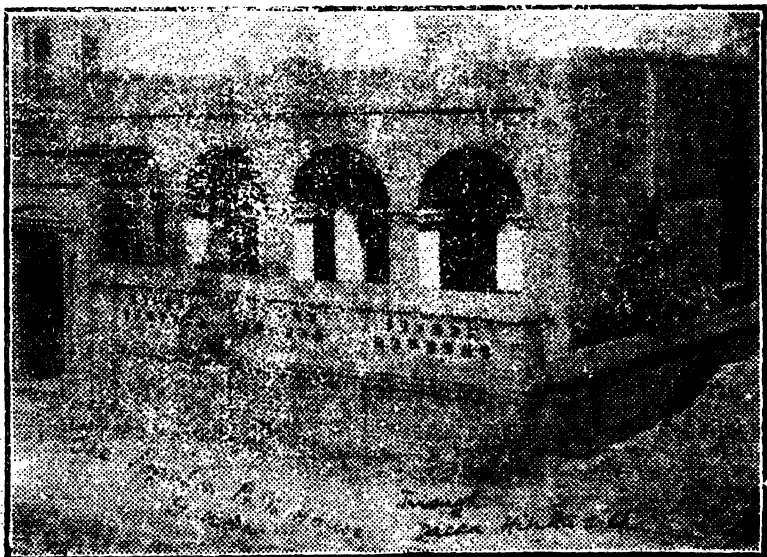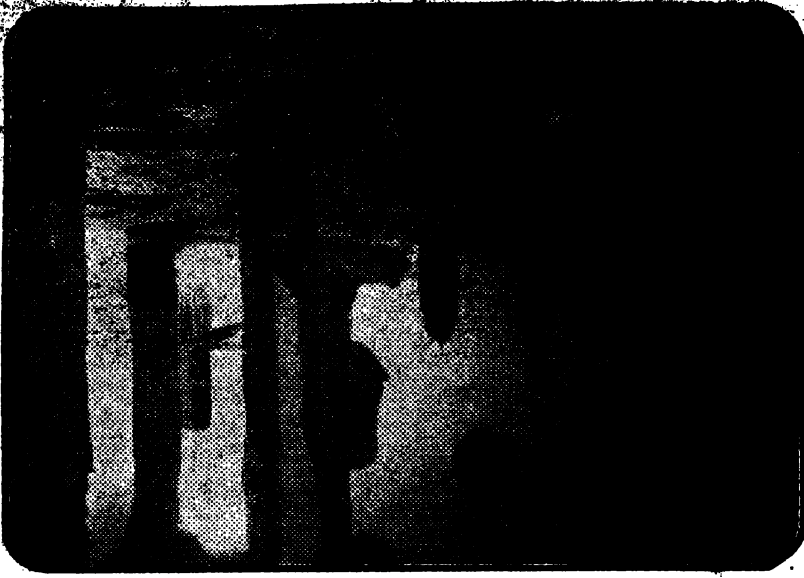
বর্ত্তমান 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের সুযোগে সেই সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি প্রবল দাঙ্গা-হাঙ্গামার আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক লোক হতাহত হইয়াছে ; হাসপাতালে চিকিৎসার্থে নীত হইয়া অনেক হিন্দু ও ৪জন মুসলমান মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন দাঙ্গাক্ষেত্রে কত লোক আততায়ীর দ্বারা নিহত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বহু গৃহ ভস্মীভূত ও দোকান-পাট লুণ্ঠিত হইয়াছে। এই দুর্ঘটনায় যে কত মূল্যবান জীবন বিনষ্ট ও বহুমূল্য সম্পত্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার নিরূপণ করা সুকঠিন।—চারুমিহির

হিন্দু মুসলমানের এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ যে-কোন কারণে ঘটিলেও, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যথার্থ উদারচিত্ত প্রীতিপরায়ণ ব্যক্তির অভাব নাই। এইরূপ ব্যক্তি উভয় সম্প্রদায়ে যত অধিক মাত্রায় বাড়িতে থাকিবে, দেশের ভবিষ্যৎ ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। নিম্নের সংবাদটী বাস্তবিকই আনন্দদায়ক।—

গত ২৮শে মে তারিখে দিনাজপুরে মোসলেম সম্প্রদায়ের একটী বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। পঞ্চ সহস্রাধিক মুসলমান এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মোসলেম নেতা মৌলানা আবদুল্লা বাকী সাহেব প্রেসিডেণ্টের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান স্বরাজ-সংগ্রামে হিন্দু-সম্প্রদায়ের সহিত মোসলেম সম্প্রদায়ের প্রাণপণে যোগদান করা কর্ত্তব্য কি না তাহাই আলোচনা করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বক্তাগণ দেশের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া মুসলমানগণকে কংগ্রেসের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইতে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত দেশমাতৃকার মুক্তিসংগ্রামে যোগদান করিতে উপদেশ প্রদান করেন।—চারুমিহির

শ্রীমতী অনিন্দ্যবালা নন্দী, ঢাকায় গত দাঙ্গার সময় অদ্ভুত সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।
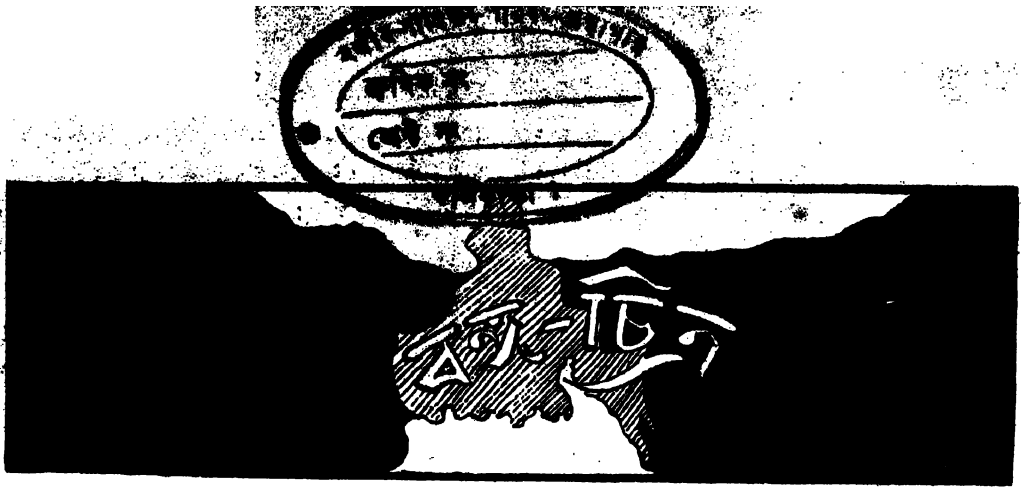
বর্ত্তমানে যখন নানা দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যেও আমরা দেশের উন্নতিমূলক আন্দোলনে লিপ্ত রহিয়াছি, তখন কি কি বিষয়ে আমাদের অবনতি ঘটিয়াছে এবং কি কি বিষয়ে আমাদের উন্নতি সম্ভবপর, তাহা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা ও বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। দেশের দুর্দ্দশার কারণগুলি দূর করিতে হইবে। আপনাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য পরের মুখের দিকে না চাহিয়া আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আত্মনির্ভর হইতে হইবে। আমাদের পরনির্ভরতার লজ্জাকর প্রমাণ ঃ—

বাংলাদেশে কি পরিমাণ বিদেশী পণ্যদ্রব্য আসিয়াছে ঃ—

গত ১৯২৮-২৯ সালে কলিকাতার বন্দরে সর্ব্বশুদ্ধ মোট ৮৬, ৬৫, ৯৮,২০৪ টাকার বিদেশী পণ্যদ্রব্যের আমদানী হইয়াছে। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল ;—

দ্রব্যের নাম	মূল্য (টাকা)
জন্তু	১৪৪৭১৮৩
পোষাক	২৫৪৫১৫৮
অস্ত্রশস্ত্র	১৬২৩৫১৯
যন্ত্রাদির বেল্টিং	৩০৯৭৮৬২
পুস্তক প্রভৃতি	২৮৪৭২৬০
জুতা	২০৫১৬২০
বুরুশ	৪০৮৭১১
ইমারত তৈয়ারীর দ্রব্যাদি	৬৮৯১৩০২
বোতাম	৮৯৪২৩০
বাতি	৪১১৫৮
বেত	১০৩২৯৭
রাসায়নিক দ্রব্য	১০০৭৯০৯৮
[illegible]	২১৯৪৯৩
[illegible]	[illegible]
কয়লা	৩৩৬০৬
কফি	৭৫৬৩০
ছোবড়ার দড়ি	৪৩৭০৭
প্রবাল প্রস্তর	৭৭৪৯২
দড়ি	২৩০৭১৬
কর্ক (ছিপি)	১৭১৭২৪
ছুরি কাঁচি প্রভৃতি	১২২৬৯৪৯
ঔষধাদি	৭১২১৩৭৫
রঞ্জন করিবার মসলা	২২৭০৮২২
মাটীর বাসন	১৬৫৬৫৯৬
বাজী	৩৫৯৪৭২
মাস	৩২৬৭৬
পশ্বাদির খাদ্য	১১৩৪১২
ফল ও শাকসব্জী	৩৬৪৭৭৬
আসবাবপত্র	৯২৩৪৪৭
কাচ প্রভৃতি	১৪৩১৯৯৬
শস্যাদি	৫১৭৩০০৩১
গঁদ প্রভৃতি	৫৬৮৪৪৪
লোম	২৫১৩০
লোহার জিনিস	১৭৬৮৭২৫৪
কাঁচা চামড়া	১৪৩৪৭
বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি	১৪৫৩৭৩৯২
গানবাজনার যন্ত্র	১০১৬৫৯৬
জুয়েলারি	৪,৬৫১২
গালা	১৩০২১৬৮
তৈয়ারী চামড়া	২২৬৪০৪০
মদ্য	১০৩৫৮৭৩৫
যন্ত্রাদি	৬৯৩০৩১৫৬
জমির সার	৩০০৮৯৬৮
দিয়াশলাই	২৩২৬৪৭
দিয়াশলাই তৈয়ারীর দ্রব্য	২,৭২৫

মাদুর	৫২৪৫৩
ধাতু এবং ধাতু প্রস্তর (এলুমিনিয়াম)	৩৫৫৭৭০৩
তাম্র	৩৫৮২১৫৬
জার্ম্মান সিলভার	৪৭১০৬৯
লৌহ	৬৯৫৩৬৩
ইস্পাত	১০৩৭৭৫৫৪
ধাতুর পাত	৪২৩৮৮০৯৩
সীসা	২৮৬০৮০
দস্তা	১৯৩৯০৬
তৈল	৪৬৬৪৮৯৬৪
রং বার্ণিশ	৪৯৬১৫৩৫
কাগজ	১০৫৪০৩৬৬
ছাপান কাগজ	৮০৬৮০
রবার	৭০০৯৮৬৫
বীজ	২৬০০০৩১
সাবান	২৭০২৮৪৫
ধূমপানের সরঞ্জাম	১৫৯৩৯৭
চিনি	৬১৯৯৫৩৯
ছাপান জিনিস	১০২৫৫৮৮১
রংকরা জিনিস	৫৮৮৩৪১৬
কাপড়	২১১১৩,১৮৭
রেশম	১৬৬৭৪১২
পশম	১১৪৯৪৮৭১
তামাক	১১৫২৪১৭
খেলানা	২০৬৭২৮৩
ছাতা	২৮৮৬৪০৪
সাইকেল	৫১২১৪০২
গাড়ী	৫৬৭৯১৭
কাঠ	২৪০৪৫০৪
ডাকের জিনিষ	১১২৫৮০৩৩

—সঞ্জীবনী

দেশের উন্নতির সহায়ক নিম্নলিখিত কর্ম্মগুলির সংবাদ দেশবাসী আনন্দের সহিত পাঠ করিবেন।—

প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে দান।—কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দশহাজার টাকা দিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ টাকা দিয়া যেন গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করা হয়। এই টাকা কি উপায়ে ব্যবহার করা যায় তাহা বিবেচনার জন্য সিনেট এক কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, অনুন্নত শ্রেণীদের উন্নতি বিধানের জন্য যে সমিতি আছে তাহার হাতে তিন হাজার টাকা দেওয়া হউক, কারণ এই সমিতি নানা স্থানে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করিয়া শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। এই দানে আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি।—সঞ্জীবনী

ঐতিহাসিক স্মৃতি।—"বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির" প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ রাজসাহীতে একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। উপযুক্ত স্থানে মৈত্রেয় মহাশয়ের মূর্ত্তি ও ছবি প্রতিষ্ঠা, যোগ্য ছাত্রগণকে ইতিহাস অনুশীলনের জন্য মেডেল ও পুরস্কার প্রভৃতি প্রদানের দ্বারা স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইবে।—সঞ্জীবনী

আর একটী আনন্দের সংবাদ এই, শক্তিহীন বাঙ্গালীর মধ্যে শক্তিচর্চ্চার ও সৎসাহস প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আজকাল বিরল নহে। সম্প্রতি যে পার্শী বৈমানিক বিমান-পথে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁহার কর্ম্ম অনুকরণ করা বাঙ্গালী যুবকদের একান্ত কর্ত্তব্য; কেননা শক্তি ও সাহসই বাঁচিবার প্রধান উপকরণ।

বঙ্গবালার সাহস।—ঢাকার কায়েতটুলীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার নন্দীর পুত্র ভবেশবাবু নবীন উকিল। তিনি কায়েতটুলীতে ডনের আখড়ার উদ্যোক্তা। এজন্য পুলিশ ইঁহার উপর নজর রাখিত। পুলিশ ইঁহাকে সন্দেহ বশে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। ইহার তিন দিন পরে মুসলমান গুণ্ডারা আসিয়া ভবেশবাবুদের বাড়ী আক্রমণ করে। ভবেশবাবুর বড় ভাই ও একটি বালক ঢিল ছুঁড়িয়া গুণ্ডাদের হটাইয়া দেয়, ভবেশবাবুর দুই অবিবাহিতা ভগিনী অনিন্দ্যবালা ও অমিয়বালা ঢিল যোগাইয়া দিয়া ইহাদিগকে সাহায্য করে। মেয়ে দুইটী স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী স্কুলে ৯ম শ্রেণীতে পড়ে। প্রায় আধ ঘণ্টা যুদ্ধ চলিবার পর অনিন্দ্যবালার মাথায় আসিয়া ঢিল পড়ে, তাহার মাথা ফাটিয়া যায়, তখন মুসলমানরা আসিয়া একতলার ঘরের জিনিষপত্র লুটিয়া লইয়া যায়। আমরা এই দুইটী বালিকার সাহসে মুগ্ধ হইয়াছি।—সঞ্জীবনী

শক্তিমান বাঙ্গালী

মুর্শিদাবাদ জেলার মাদাপুর জেলে বাবু শঙ্করীপ্রসাদ সাহা দুই গুলিতে একটা ৭ফুট বাঘ শীকার করিয়াছেন। বাবু শঙ্করীপ্রসাদ বহরমপুরের খাগড়াতে বাস করেন।—সঞ্জীবনী

গতবারে আমরা বঙ্গদেশে জলকষ্টের একটী মাত্র সংবাদ দিয়াছিলাম। এবারে বিশদ সংবাদ দিতেছি।

মফস্বলে জলাভাব।—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও বাঙ্গালার পল্লীগ্রামসমূহে জলাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে। প্রায় সকল জেলা হইতেই আমরা মফস্বলের অধিবাসীদের জলকষ্ট সম্বন্ধে পত্র পাইতেছি। রাজনৈতিক আন্দোলনের কোলাহল যতই তীব্র হউক না কেন, তাহাতে পল্লীবাসীদের জলকষ্টের কাতর ক্রন্দনধ্বনিকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে নাই। পল্লীগ্রামেও আইন-অমান্য আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছে, রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য সকলেই বদ্ধ-

পরিকর ; কিন্তু পল্লীর জলাভাব কিসে দূর হয়, তাহার কোন উপায়ই কেহ করিতে সমর্থ হইতেছেন না কেন, ইহা বড়ই বিস্ময়কর। প্রাচীন কালে দীঘি পুষ্করিণী প্রভৃতিই পল্লীবাসীর জলাভাব মোচন করিত ; এখন সেগুলির অবস্থা শোচনীয়। অনেক দীঘি পুষ্করিণীই মজিয়া গিয়াছে। যেগুলি এখনও মজে নাই,সেগুলিরও জল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এইসব প্রাচীন জলাশয়ের সংস্কার হইতেছে না ; অথচ তাহার স্থানে একালের উপযোগী নলকূপ প্রভৃতিও তৈয়ার হইতেছে না। কাজেই জলাভাব তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। মিউনিসিপালিটী ডেলাবোর্ড এবং ইউনিয়নবোর্ডসমূহ এখন পল্লীগ্রামে জল সরবরাহের ভার পাইয়াছেন। কিন্তু একমাত্র নির্ব্বাচনের সময় ব্যতীত আর কোন সময়েই এই সব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সাড়া-শব্দই পাওয়া যায় না। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামসমূহে এই যে ম্যালেরিয়ার এত প্রকোপ, ইহার মূল কারণ জলাভাব ; কলেরা রক্তামাশয় প্রভৃতি ব্যাধিরও কারণ বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব ছাড়া আর কিছু নহে। বার মাস ব্যাধিতে ভুগিয়া ভুগিয়া বাঙ্গালার কৃষককুল ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে ; স্থানে স্থানে তাহারা প্রায় নির্ম্মূল হইয়া আসিল। আরেক স্থানের কৃষকেরা মড়কের ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছে। বাঙ্গালায় এইরূপ পরিত্যক্ত পল্লীর সংখ্যা অল্প নহে। একমাত্র পানীয় জলের অভাবই যে ইহার কারণ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য সহরে সভা হয়, অস্পৃশ্যদের স্পৃশ্য করিয়া লইবার জন্য কত বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটে, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত অভাব মোচন করিয়া মরণের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা কেন হয় না, তাহা কে বলিবে ?—বঙ্গবাসী

বাঙ্গালীর মধ্যে শক্তি চর্চ্চার অভাব যেমন বিদ্যমান, তেমনই স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে আমরা উদাসীন। স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাইবার একটী উপায় নিম্নের সংবাদে আছে।

ধূমপান ও চা পান

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন, —"কলিকাতার একশত ছাত্রের মধ্যে ৭৫ জন ছাত্র কোন না কোন প্রকার পীড়াগ্রস্ত। ধূমপান এবং চা পানই ইহার প্রধান কারণ। ধূমপানে ও চা-পানে তাহারা যে অর্থ ব্যয় করে, তাহাতে যদি পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে পারে এবং তাহারা বহুবিধ পীড়া হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। তিনি প্রত্যেক ছাত্রকে মুড়ি ও গুড় আহার করিতে পরামর্শ দেন। দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হইলেও ছাত্রগণ প্রতিদিন এক ছটাক কিম্বা অর্দ্ধ ছটাক মাখন আহার করিতে পারে। অর্দ্ধছটাক মাখনের মূল্য /৫ পাঁচ পয়সা মাত্র। ফলের মধ্যে কদলী সহজ-প্রাপ্য এবং ইহা অপেক্ষাকৃত সুলভ, এমন পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্য থাকিতে কেন যে লোকে দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ধূমপানে ও চা-পানে স্বাস্থ্য নষ্ট ও অর্থের অপচয় করে, ইহা এক রহস্যজনক ব্যাপার।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

এ বৎসর বঙ্গদেশের বিদ্যালয়সমূহে নূতন প্রণালীতে রচিত পাঠ্যপুস্তক লিখিবার ও চালাইবার জন্য শিক্ষা-বিভাগ হইতে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে নিম্ন আলোচনাটী বিবেচনার যোগ্য।—

বাঙ্গালার পাঠ্যপুস্তক সমস্যা

প্রত্যেক বিষয়ের কয়খানা করিয়া পুস্তক গৃহীত হইবে, তাহা সম্ভবতঃ স্থিরীকৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা জানি, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে বহু খ্যাত ও অখ্যাত ব্যক্তি এবার পুস্তক রচনা করিয়াছেন। বহু লেখক আপনার জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া তাঁহার রচিত গ্রন্থ সজ্জিত করিয়াছেন। এ সকল সমস্যার সমাধান কি প্রকারে হইবে ? এর উপরে আরও একটা কথা রহিয়াছে, যদি প্রত্যেক শ্রেণীর ৩০ খানি পুস্তক পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়, তবেও সমস্যা সহজ হইতেছে না ; হয়ত ঐ শ্রেণীর ৫০ বা ৬০ খানি পুস্তক বেশ সুলিখিত এবং প্রকৃতপক্ষেই যোগ্যতার দাবী করিতে পারে। তাহা হইলে ৩০ খানি পুস্তক ছাঁটিয়া দিলে কি ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে না ? বিশেষতঃ যাহারা প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ের রক্ত দিয়া, জ্ঞানের পরীক্ষায়, অর্থে, পুস্তকখানিকে সত্যসত্যই উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়ার কি হেতু থাকিতে পারে ?

এ কথাও বাজারে রাষ্ট্র যে বিলিতি বইওয়ালারা দেশী ভাড়াটীয়া লেখককে টাকা দিয়া চক্চকে ঝক্‌ঝকে বই বাজারে উপস্থিত করিবে। এ সকল সমস্যার সমাধান কোথায়, আমরা ঠিক ঠাহর করিতে পারিতেছি না।

তিন বৎসর না কি এবারকার সিলেবাসের মেয়াদ। কাজেই যে সকল গ্রন্থকার শরীরের রক্ত জল করিয়া বই লিখিয়াছেন,—প্রকাশক ঘরের টাকা ফেলিয়া ছাপিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি কোন রকম নেক নজর না দিলে চলিবে কেন ?

আমরা শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি—যোগ্য পুস্তক যেন অনাদৃত না হয়। সংখ্যার গণ্ডীরেখার দৃঢ়তা সর্ব্বত্র একরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

সময়ান্তরে আমরা এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রাখি।—ঢাকাপ্রকাশ

আমরা বিগত ভীষণ ভূমিকম্পের বিশদ সংবাদ দিলাম।

দারাশেকোর লিপি-শিক্ষা

তৃতীয় বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৩৭ { চতুর্থ সংখ্যা

সাক্ষীগোপাল

[শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে)

প্রবীণ বিপ্র নবীনে শুধান—এ দূর তীর্থ-বাসে
পুত্র-অধিক কে তুমি, বৎস, দাঁড়ালে শয্যা-পাশে?
নাহি পরিচয়, তবু মনে হয় তুমি পরম আত্মীয়,
বান্ধবহীন এ মরু বিদেশে প্রিয় হ'তে তুমি প্রিয়।
দেশেতে আমার ঘর-সংসার সাজান সকলই আছে,
'মুখে দিতে জল, শুধাতে কুশল' হেথা কেহ নাহি কাছে।
জ্ঞানে-অজ্ঞানে বিলাপে-প্রলাপে কেটেছে দিবস সাত,
কত দ্বিধাভরে রোগীর শিয়রে জাগিয়াছ দিন-রাত ;
মহানিদ্রার ঘোরে বারবার মুদিয়া এসেছে আঁখি,
দেহ-পিঞ্জরে আধ খোলা দ্বার উড়ু উড়ু প্রাণ-পাখী।
এমন জীবন-মরণের রণে যুঝিয়াছ তুমি একা,
নিশার অন্তে দেখা দিল তাই উষার সোনার রেখা।
যমের দুয়ার হইতে আমার জীবন ফিরালে হেথা,
আমারি এ প্রাণ তোমারি ত দান—তুমি মোর নচিকেতা
জানি জানি আমি এ দানের তব প্রতিদান কিছু নাই,
তাই হে তোমারে মমতার ডোরে বাঁধিয়া রাখিতে চাই।
শুভ দিন দেখি পুরাইব সাধ, রাখিব তোমার মান,
নিজেরে ধন্য মানিব তোমারে কন্যা করিয়া দান।

নবীন বিপ্র উঠিল শিহরি' শুনি' প্রবীণের বাণী,
কহিল তাঁহারে সম্ভ্রম-ভরে যুক্ত করিয়া পাণি,—
তোমার গ্রামের নিকটে আমার পৈত্রিক ভিটা বটে,
জমী-জমা আছে, ভাত-কাপড়ের অভাব কভু না ঘটে :
জনম আমার আচার-নিষ্ঠ সৎ-ব্রাহ্মণ-কুলে.
বংশের খ্যাতি মান-মর্য্যাদা কখনো যাইনি ভুলে।
তোমারে হেথায় হেরে অসহায় পীড়ায় করেছি সেবা,
মানুষের কাজ মানুষে করেছে, প্রতিদান চাহে কেবা ?
তোমারে যে আজ ফিরিয়া পেয়েছি এই ত পুরস্কার,
কৃষ্ণ-চরণে মতি থাক্ মোর, কিছুই চাহি না আর।
যদিও এ দীন সৎকুল-জাত তোমারে জানাই তবু—
তব কন্যার যোগ্য পাত্র এ অধম নহে কভু ;
কুলে শীলে মানে আমি যে তোমার সমাজের চোখে নীচু,
কন্যাদানের এ পণ রবে না, রবে অনুতাপ পিছু।
তোমার সমাজ দিবে তোমা লাজ, গৃহ হবে প্রতিকূল,
আপনি তখন ভাঙিবে এ পণ বুঝিয়া আপন ভুল।
আজিকার এই উত্তেজনার হ'বে যবে অবসান,
প্রাণ হ'তে বড় বলিয়া মানিবে বংশের অভিমান।
তুচ্ছ সেবার কৃতজ্ঞতার জন্য এ গুরু ঋণ
তব শির 'পরি চাপাইয়া দিব, নহি আমি এত হীন।

প্রবীণ বলেন—পুণ্য তীর্থে শপথ করিনু আমি,
সত্য-ভঙ্গে পিতৃসঙ্গে হইব নিরয়গামী।
তুচ্ছ করিয়া জাতি-অভিমান রাখি' সত্যের মান
তোমারি শ্রীকরে বহু সমাদরে কন্যা করিব দান।
নবীন বিপ্র তবুও প্রবীণে বলে সঙ্কোচ-ভরে—
কি হবে উপায়, যদি তুমি হায় ভুলে যাও গিয়া ঘরে,
নাহিক সাক্ষী একাকী আমারে কে করিবে বিশ্বাস ?
কন্যা পাব না, পাব সকলের গঞ্জনা উপহাস।
দু'জনে তখন স্থির করি' মন চলিলেন ধীরে ধীরে,
মন্দিরে গিয়া গোপালের কাছে দাঁড়ালেন নতশিরে।
নবীন বলেন—হে দেবতা, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে থাকি'
ত্রিকাল ধরিয়া ত্রিভুবন পানে মেলিয়া রেখেছ আঁখি,

মুখের কথা বা মনের বারতা নহে তব অগোচর,
তবু প্রার্থনা জানাই তোমারে, হে বৃন্দাবনেশ্বর,—
মোর সাথী এই প্রবীণ বিপ্র হেথা করিলেন পণ—
আমারে দিবেন কন্যা তাঁহার, শুনে রাখ নারায়ণ,
আমার সাক্ষী তুমি হ'লে, দেব, পড়ি যদি কোন দায়ে
রেখো মোর মান, করিব প্রমাণ, এ মিনতি তব পায়ে।
প্রবীণ বিপ্র বলেন—সত্য করিয়াছি এই পণ,
ধর্ম্ম আমার রাখিও ঠাকুর, শ্রীচরণে নিবেদন।
গোপালের হাসি হ'ল মধুতর, পড়িল প্রসাদী ফুল,
ভক্ত বুঝিল দেবতা তাঁদের প্রতি হ'ন অনুকূল।

তীর্থ সারিয়া দু'জনেই তবে গেল নিজ নিজ ঘরে,
যত দিন যায় যুবকের হায় মন আন্‌চান্‌ করে।
কত শুভ দিন এল আর গেল, লগ্ন হইল পার,
বৃদ্ধ বিপ্র তবুও নীরব, নাহি দেন সমাচার।
একদিন শেষে প্রার্থীর বেশে বড় বিপ্রের বাড়ী
নবীন বিপ্র দাঁড়ালেন এসে ধৈর্য্য ধরিতে নারি'।
বিবাহের পণ করাতে স্মরণ তোলেন পুরাণো কথা,
বড় বিপ্রের পুত্র, মিত্র, জায়া শোনে সে বারতা।
সবাই সজোরে নাড়িলেন মাথা, ওঠে আপত্তি ঘোর,
বৃদ্ধও ভয়ে থাকে জাতি ল'য়ে, ছেড়ে সত্যের ডোর।
এল প্রতিবেশী করিতে সালিশী, কেহ রাগে, কেহ হাসে,
কেহ বা নবীনে হইয়া সদয় দাঁড়াল তাহার পাশে।
বাদী-বিবাদীর আর্জ্জী-জবাবে কার্য্য নাহিক হ'বে,
সাক্ষী না পেলে মোকর্দ্দামার বিচার না সম্ভবে।
নবীন বিপ্র স্মরি' ভগবানে কহে নির্ভীক মনে—
মাত্র সাক্ষী গোপাল আমার, আছেন বৃন্দাবনে।
বড় বিপ্রও কৌতুকভরে তাহাতে দিলেন সায়,
নবীন বিপ্র ক্ষিপ্রগতিতে সাক্ষী আনিতে যায়।
গোপনে কন্যা ডাকিছে কাতরে, এস হেথা ভগবান,
পিতার ধর্ম্ম করিও রক্ষা, প্রার্থীরও রেখো মান।

বৃন্দারণ্যে সন্ধ্যা-আরতি গোপালের মন্দিরে,
মন্দিরা বাজে, বাজে মৃদঙ্গ, বংশী বাজিছে ধীরে,
কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খের ধ্বনি উঠিছে গগন-ভালে,
পূজারীর করে পঞ্চ-প্রদীপ নাচিতেছে তালে তালে।
অযুত ভক্ত দাঁড়ায়েছে ঘিরে, মধ্যে শ্রীবিগ্রহ—
দরশনে হ'ল শান্ত সবার অন্তর-নিগ্রহ।
গোপলের মুখে সুধামাখা হাসি, নয়নে করুণা ঝরে,
চরণ-পদ্মে মধু সঞ্চিত ভক্ত-ভৃঙ্গ তরে,
নীল কলেবর, পীত অম্বর, সিত-চন্দন-মাখা,
চরণে নূপুর, অধরে মুরলী, শিখরে শিখীর পাখা,
বঙ্কিম ঠামে ধন্য করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধাম
ভক্ত-হৃদয়ে করেন বসতি সে মূরতি অবিরাম।
আরতি-অন্তে শ্রীপদ-প্রান্তে লুটায়ে প্রণাম ক'রে
অঙ্গনরজে দিয়া গড়াগড়ি ভক্তেরা ফেরে ঘরে।
মন্দির-গৃহ হ'ল নির্জ্জন, নবীন বিপ্র তবে
গোপাল-চরণে করে নিবেদন—সাক্ষ্য যে দিতে হবে ;
আমার সঙ্গে যেতে হবে, দেব, নহিলে ত্যজিব প্রাণ,
প্রাণ যায় যাক্, মান রাখ প্রভু, ভক্তের ভগবান।
হাসিয়া গোপাল বলেন—কি করি সত্য-বদ্ধ আমি,
তোমার বাক্য করিতে প্রমাণ হ'ব তব অনুগামী।
ভাবিও না মনে, যাব তোমা সনে, শুধু এ সর্ত্ত মেনো—
চাও যদি পিছু কিছুতেই মোরে চালাতে নারিবে জেনো।
ভক্ত বলেন—তাই হবে দেব, তবে কিছু চাই চিনা,
নহিলে কেমনে বুঝিব সঙ্গে তুমি আসিতেছ কি না!
হাসিয়া ঠাকুর বলেন—বিপ্র, কাজ নাই মিছে ভেবে,
থাকি কি পালাই আমারি নূপুর তাহার সাক্ষ্য দেবে।

আগে আগে চলে সরল ভক্ত, পিছু যান ভগবান,
সারা পথ ধরি' গুমরি' গুমরি' নূপুর শোনায় গান,
রুণু ঝুনুঝুনু রুণুন-ঝুনুন মণি-মঞ্জীর বাজে,
বেদের মন্ত্র, পুরাণ-তন্ত্র রাজে সে মন্ত্র মাঝে।

গ্রামের নিকটে আসিয়া বিপ্র থাকিতে পারে না আর,
চক্ষু মেলিয়া হেরিল পিছনে সাক্ষী চমৎকার!
হাসিয়া অমনি গোপাল তখনি পাষাণ-মূরতি ধরি'
রেমুণার মাঠে বঙ্কিম ঠাটে দাঁড়ান ভঙ্গী করি'।
ছুটিল বিপ্র প্রবীণের গ্রামে জানাইতে সে বারতা,
লক্ষ লোকের হ'ল সমাগম শুনি' অদ্ভুত কথা।
সাক্ষী হেরিয়া প্রবীণ বিপ্র বিস্মিত অন্তরে
ভাসি' আঁখি-জলে সব কথা বলে, সত্য-পালন করে,
নবীন বিপ্রে মহা সমাদরে কন্যা করিল দান,
চিরকালই এই সাক্ষীগোপাল রাখেন ভক্ত-মান।

যন্ত্র-বিজ্ঞানের (Mechanics) তৃতীয় ধারা

(Quantum Mechanics)

[অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ডি, এস সি]

বৈজ্ঞানিক হাইগেন্‌স্‌ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বলিয়াছিলেন যে, পদার্থবিজ্ঞান যথাযথরূপে বুঝিতে হইলে প্রাকৃতিক ঘটনারাজি যন্ত্র-বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করা প্রয়োজন; নতুবা পদার্থবিজ্ঞান চিরদিনই আমাদের অবোধ্য থাকিয়া যাইবে। পদার্থবিজ্ঞানের তাৎকালিক বহু সত্যই এ উক্তির দ্বারা সমর্থিত হইত বলিয়া বৈজ্ঞানিক-গণ উহা অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সর্ব্বপ্রকারে পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহ যন্ত্র-বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করিতে যত্নশীল হন। সেই প্রচেষ্টার ফলেই অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে গণিতজ্ঞ, পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্‌ ও জ্যোতির্ব্বিদের হাতে যান্ত্রিক গতি-বিজ্ঞান সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে ও উহার মূল্য সত্য স্বরূপ "Principle of least action" বা "অল্পতম ক্রিয়া"র নিয়ম আবিষ্কৃত হয়। গতি-বিজ্ঞানের এই নিয়মের ব্যবহারে তরল পদার্থ মাত্রের গতি-বিদ্যা, নাদ বিজ্ঞান ও আলোক-বিজ্ঞানের বহু দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বের যথার্থ মীমাংসা হইয়া যায়। কেবল মাত্র তাপ-গতি-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় নিয়মটী (Second Law of thermodynamics) বহুকাল পর্য্যন্ত গতি-বিজ্ঞানের ভাষায় ধরা দিতে চায় নাই। এদিকেও, অব-শেষে Maxwell, Baltzmann ও Gibbsএর উদ্ভাবিত Statistical mechanicsএর সহায়তায় সকল বাধাবিঘ্ন দূর হইল।

যন্ত্র-বিজ্ঞানের সহায়তায়পদার্থ-বিজ্ঞানের সকল সমস্যার সমাধান করার এই প্রবৃত্তি, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ পর্য্যন্তও বিজ্ঞান-জগতে প্রবল ছিল। সেই সময়ে, যখন Maxwell, আলোক-বিজ্ঞানের প্রচলিত সমস্ত নিয়ম নূতন ভাবে গঠিত করিয়া দিয়া তাঁহার Electromagnetic theory of light প্রকাশ করিলেন, তখনই পদার্থবিজ্ঞান হইতে যান্ত্রিক গতি-বিজ্ঞানের ভাবাবেশ অপসারিত হইতে আরম্ভ হইল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ৮।১০ বৎসর মধ্যেই পদার্থের অভ্যন্তরস্থ অণু-পরমাণু ইত্যাদি সম্বন্ধে এমন অভিনব তত্ত্ব-সকল আবিষ্কৃত হইল যে, তাহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বৈজ্ঞানিকরা দেখিলেন এ সকল সত্য বুঝিতে হইলে, চিরপরিচিত যন্ত্র-বিজ্ঞানকে, তড়িদ্‌-

বিজ্ঞান, চুম্বক-বিজ্ঞান ও আলোকবিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করা ভিন্ন উপায় নাই। বাস্তবিকই, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-ধারার উপর নির্ভর করিয়া, এ প্রবন্ধের প্রথমেই লিখিত হাইগেন্‌সের বাণীকে পরিবর্ত্তিত করিয়া এই কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, যন্ত্র-বিজ্ঞানের সকল নিয়ম, আলোক, তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারিলে বর্ত্তমান বিজ্ঞান বুঝিবার আশা সুদূরপরাহত।

যন্ত্র-বিজ্ঞানকেই (Mechanics) পদার্থবিজ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন শাখা বলা যাইতে পারে। যাঁহার ধীশক্তি প্রভাবে পদার্থবিজ্ঞান প্রথমে বিজ্ঞান পর্য্যায়ভুক্ত হয়, সেই Galelioই সর্ব্বাগ্রে যন্ত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু প্রকার গবেষণা করেন; আর যে মহাশক্তিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক পদার্থ বিজ্ঞানের ভিতরে গণিতশাস্ত্রের সূক্ষ্মজ্ঞান প্রবেশ করাইয়া উহাকে সর্ব্বপ্রকারে প্রাঞ্জল করিয়া তোলেন সেই নিউটনই এই যন্ত্র-বিজ্ঞানের মূল নিয়মসমূহের উদ্ভাবন করেন। উহাই যন্ত্র-বিজ্ঞানের প্রথম ধারা। Galelio ও Newton এর হাতে এই ধারা এমন সমৃদ্ধ হইয়াছিল যে, ২০০ শত বৎসর পরেও এ সম্বন্ধে নূতন কিছু ভাবিবার থাকিতে পারে, এ কথা বৈজ্ঞানিকের মনেই উদিত হয় নাই। বিজ্ঞানের এ শাখা সম্বন্ধে শেষ কথা নিউটনই বলিয়া গিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত সকল বৈজ্ঞানিকই করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া বৈজ্ঞানিকরা নিশ্চিন্তও ছিলেন না। জ্ঞানের সীমা বর্দ্ধিত করাই যাঁহাদের কার্য্য, তাঁহারা ২০০ শত বৎসরের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ফলে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ১৯০৫ হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আপেক্ষিক তত্ত্ব নামে (Theory of Relativity) যান্ত্রিক গতি-বিজ্ঞানের এক নূতন ধারার সৃষ্টি হয়। ইহাই যন্ত্র-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় ধারা। আমাদের পুরাতন যন্ত্রবিজ্ঞান বিশেষ কালে ও স্থান বিশেষে প্রযোজ্য; কিন্তু নূতন যন্ত্র-বিজ্ঞান সর্ব্বকালে ও সকল স্থানে প্রযোজ্য। এই হিসাবে নিউটনের যন্ত্র-বিজ্ঞানকে আইনষ্টাইনের যন্ত্র-বিজ্ঞানের এক বিশেষ পরিণতি বলা যাইতে পারে।

নূতন যন্ত্র-বিজ্ঞানের প্রয়োগে কয়েক বৎসরের মধ্যেই মানবের জ্ঞান বহু দিকে বহু প্রকারে প্রসারিত হইয়া পড়িল। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিই প্রধান ও আশ্চর্য্যজনক—

১। কোনও পদার্থই কোনও প্রকারেই আলোক অপেক্ষা অধিকতর বেগে চলিতে পারে না; অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার গতির তুলনায় আলোকের গতিই বেগবান্। এই সত্যের সহায়তায় আলোকবিজ্ঞান ও যান্ত্রিক গতি-বিজ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।

২। পদার্থের বস্তুপরিমাণ (mass) ও তেজ (Energy) এই দুইটী শব্দ বৈজ্ঞানিকরা ব্যবহার করেন। আমরা ওজন করিয়া যাহা পাই, পদার্থের বস্তু পরিমাণ তাহার সঙ্গে আনুপাতিক। কোনও বহিঃশক্তির প্রভাবে কোন্ পদার্থের কি প্রকার গতি হইবে, তাহা তাহার বস্তু-পরিমাণের উপর কতকাংশে নির্ভর করে। আর তেজ বলিতে আমরা পদার্থের অন্তর্নিহিত সমবেত তেজ বুঝি। ইহা পদার্থের সাধারণ অবস্থায় দেখা বা বুঝা যায় না। তবে কোনও পদার্থ কোনও ক্রিয়ায় নিয়োজিত হইলেই তাহার তেজের প্রভাব দেখা ও বুঝা যায়। পুরাতন যন্ত্র-বিজ্ঞানের এই দুইটীকে পৃথক ভাবে দেখা হইত; কিন্তু নূতন যন্ত্র-বিজ্ঞান বুঝাইল যে, তাহা নহে, এই দুইটীই এক। কারণ পদার্থের বস্তু-পরিমাণ ও তেজ পরস্পর আনুপাতিক। প্রথমোক্তটী দ্বারা দ্বিতীয়টীকে বিভাগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহার বর্গমূল, শূন্য স্থানে আলোকের গতির সমান।

কেবল মাত্র আপেক্ষিক যন্ত্র-বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলেই যে পুরাতন যন্ত্র-বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইল তাহা নহে, অন্যান্য প্রকারেও পুরাতন গতি-বিজ্ঞানের নিয়মপ্রণালী পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে সূত্রাত্মক জ্ঞানের অসামঞ্জস্য উৎপাদন করিয়াছিল। এই ভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই যন্ত্র-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় ধারা প্রথম ধারাকে স্থানচ্যুত করিয়া দিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষার ফলে ইহা জানা যায় যে, পদার্থ-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পরমাণুতে পর্য্যবসিত করিলে চলিবে না। পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর অবস্থা যন্ত্রে ধরা গেল। প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুতেই ধন ও ঋণ-তড়িদণু আছে। উহাদের স্ব স্ব গতি ও প্রকৃতি পদার্থ-ভেদে অভিন্ন। উহাদিগকেই পদার্থের মূল ও চরম উপাদান বলা যাইতে পারে।

উহাদের মধ্যে ঋণ-তড়িদণু অতি সূক্ষ্ম। উহার বস্তু-পরিমাণও ধন-তড়িদণুর প্রায় ২০০০ অংশ। ঐ সময়ে উহাও আবিষ্কৃত হইল যে, সকল প্রকার পরিমাণ বিদ্যুৎ (Electrical charge) এক ক্ষুদ্রতম পরিমাণ বিদ্যুতের গুণিতক : সুতরাং প্রোটন বা ধন-তড়িদণুতে ও ইলেকট্রণ বা ঋণ-তড়িদণুতে উপরিলিখিত ক্ষুদ্রতম পরিমাণ বিদ্যুৎ ধন ও ঋণাত্মক ভাবে অবস্থান করিতেছে।

পরমাণু-তত্ত্ব ব্যতিরেকে আলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধেও বিংশ শতাব্দীতে আমাদের জ্ঞানের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। Maxwellএর আলোক-তত্ত্বের প্রয়োগে যে জ্যোতিঃরশ্মিকে আমরা ঊনবিংশ শত্যব্দীতে অখণ্ড, নির্ব্বিশেষ তেজ-ধারা বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, বিংশ শতাব্দীতে সেই জ্যোতিরশ্মিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Photon বা জ্যোতিঃকণার ধারা বলিয়া বুঝিয়া লইলাম। কি ভাবে বৈজ্ঞানিক তাঁহার চিন্তাধারার এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিয়াছি (ভারতবর্ষ বৈশাখ, ১৩৩৭)। আমাদের এই আলোক-প্রবাহ নির্ব্বিশেষ নহে। উহা সমপরিমিত তেজবিশিষ্ট জ্যোতিঃকণার প্রবাহ মাত্র।

জ্যোতিঃরশ্মি বলিতে কেবল আমাদের দৃশ্য আলোক বুঝিলে চলিবে না। Maxwellএর আলোক-তত্ত্বের সাহায্যে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আলোক ছাড়াও আরও বহু প্রকারের ইথার-তরঙ্গ জ্যোতিঃরশ্মি পর্য্যায়ে আসিতে পারে। তাহারা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। যন্ত্র সহযোগে তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ করিতে হয়। এই হিসাবে, আগুন হইতে যে তাপ-প্রবাহ কিংবা বরফ হইতে যে শৈত্য-প্রবাহ আমরা অনুভব করি, তাহাদের সকলকেই জ্যোতিঃশ্মি সংজ্ঞায় অভিহিত করা চলে; কারণ জ্যোতিঃরশ্মি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হউক কিংবা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্যই হউক, উহা সর্ব্বদাই ইথারের ভিতর বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। এই সকল তরঙ্গ সমবেগে সকল দিকে প্রধাবিত হয়। উহাদের মধ্যে পার্থক্য সুধু তরঙ্গের দৈর্ঘ্যে কিংবা কম্পন-পৌনঃপুন্যে (vibration frequency)। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই আবিষ্কৃত খণ্ডবিশিষ্ট তেজতত্ত্বের (Quantum theory) প্রয়োগে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আইনষ্টাইন আবিষ্কার করিলেন যে, আমাদের দৃশ্য আলোক ও অন্যান্য সকল প্রকার জ্যোতিঃরশ্মিই অখণ্ড প্রবাহ ধারা নহে। খণ্ড খণ্ড তেজের পরিবর্ত্তনে যে জ্যোতিঃকণার উদ্ভব হইতেছে, তাহার প্রকৃতির সঙ্গে তেজখণ্ডের তেজ-পরিমাণের এক শাশ্বত সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধের বলে উৎপন্ন জ্যোতিরশ্মির কম্পন-পৌনঃপুন্য-সংখ্যাকে ৬.৫৫ × ১০-২৭ দ্বারা গুণ করিলে জ্যোতিঃকণার তেজ-পরিমাণ পাওয়া যাইবে। উপরের এই সংখ্যাটী বর্ত্তমান পদার্থ বিজ্ঞানে বড় প্রয়োজনীয়। ইহাকে Planck এর নিত্য সংখ্যা কহে (Planck's Constant)।

ঋণ-তড়িদণু কিংবা ধন তড়িদণুর মতই জ্যোতিঃকণাও সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সহযোগে বহু প্রকারের পরিদর্শনে ইহার অস্তিত্ব অবিসংবাদিরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাকে আর বৈজ্ঞানিকের কল্পনা বলিলে চলে না। এই Photon বা জ্যোতিঃকণা ধাতব পদার্থের উপর পতিত হইয়া তাহা হইতে ঋণ-তড়িদণু বাহির করিয়া দেয়,তাহাদের গতি-জনিত তেজ উক্ত জ্যোতিঃকণার তেজের সমান, অর্থাৎ জ্যোতিঃকণার তেজই ঋণ-তড়িদণু-সমূহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের মধ্যে বাহির হইয়া যাওয়ার মত চাঞ্চল্য ও শক্তি প্রদান করে। এদিকে আবার রঞ্জন-রশ্মির উদ্ভব-কালে গমনশীল ঋণ-তড়িদণুসমূহ ধাতব পদার্থে আহত হইলে জ্যোতিঃরশ্মিরূপে তাহাদের তেজটী ছাড়িয়া দিয়া স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে সর্ব্বদাই ঋণ-তড়িদণুর তেজ রূপান্তরিত হইয়া জ্যোতিঃরশ্মি উদ্ভব হইতেছে; আবার জ্যোতিঃরশ্মির তেজপ্রভাবে পদার্থ হইতে ঋণ-তড়িদণু বাহির হইয়া পড়িতেছে। তেজের আদান-প্রদানের এই রীতি পরীক্ষিত সত্য বলিয়া সুন্দর-রূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—আপেক্ষিক গতি-বিজ্ঞানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পদার্থের বস্তুপরিমাণ ও তাহার অন্তর্নিহিত তেজ এ উভয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। সেই হিসাবে জ্যোতিঃকণারও বস্তু পরিমাণ আছে, একথা আমরা বলিতে পারি। আমাদের দৃশ্য আলোকের জ্যোতিঃকণায় বস্তুপরিমাণ অতি ক্ষুদ্র ঋণ-তড়িদণুর বস্তু পরিমাণ অপেক্ষাও লক্ষ লক্ষ অংশ ছোট। জ্যোতিঃকণার যে বস্তুপরিমাণ আছে তাহা ঋণ-তড়িদণু ও জ্যোতিঃকণার সংঘর্ষণ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ বৈজ্ঞানিক Compton নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন।

Planck এর নিত্য সংখ্যাটী জ্যোতিঃরশ্মির আলোচনা করিতে গিয়াই প্রথমে পরিকল্পিত হয়। কিন্তু পরে দেখা গেল যে,পরমাণুর অভ্যন্তরে যে-সমস্ত অভাবনীয় গতির ক্রিয়া চলিতেছে তাহাতেও ঐ নিত্য সংখ্যাটীর ব্যবহারের সার্থকতা আছে। ফলে যাহা প্রথমে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আলোক-বিজ্ঞান সম্পর্কেই নিত্য সংখ্যা ছিল তাহা ১৯১০ খৃষ্টাব্দে পরমাণবিক গতি-শাস্ত্রের একটী মৌখিক নিত্য সংখ্যায় পরিণত হইল। ঠিক এই সময়ে রাদারফোর্ড (Rutherford) পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ তড়িদণুসমূহের সন্নিবেশ প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার অভিনব তত্ত্বের প্রচার করেন। সৌর-জগতের সূর্য্যের মত সমস্ত ধন-তড়িদণু পুঞ্জীকৃত অবস্থায় কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে আর ঋণ-তড়িদণু-সমূহ গ্রহগণের মত তাহার চারিদিকে ভীষণ বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তড়িদ্-বিজ্ঞানের নিয়মে দুই প্রকারের তড়িদণুর মধ্যে আকর্ষণ আছে, সুতরাং অন্য কোনও বিকর্ষণ-শক্তি ক্রিয়া-শীল না হইলে ঘূর্ণায়মান তড়িদণুর কক্ষ ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পরিণামে উহা কেন্দ্রীভূত পুঞ্জের সহিত এক হইয়া যাইবে। সুতরাং পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ উক্ত সন্নিবেশ-প্রণালী অব্যাহত রাখিবার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যতিরেকে কেন্দ্র হইতে ঋণ-তড়িদণুর উপর অন্য একটী বিকর্ষণ-শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, এ কল্পনা গ্রহণ ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

উদ্‌জান বাষ্পের পরমাণুর অভ্যন্তর অন্যান্য সকল পদার্থের পরমাণু অপেক্ষা সরলতম, কারণ উহার ভিতরে মাত্র একটী ঋণ-তড়িদণু কেন্দ্রীভূত ধন-তড়িদণুর চারিদিকে ঘুরিতেছে। উহার কক্ষের ব্যাস নিরূপণ করা সাধারণতঃ দুঃসাধ্য মনে হয়। সেজন্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আরও একটু প্রসারিত করিতে হইয়াছে। তড়িদণুর কক্ষটীরও বৈশিষ্ট্য আছে, এরূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক ঐ কক্ষটীকেও খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করেন এবং ঐ প্রত্যেক খণ্ডের সঙ্গে Planckএর নিত্য সংখ্যাটীর এক অবিচ্ছেদ্য ও অপরিবর্ত্তনীয় অনুপাত কল্পনা করেন আর সেই সম্বন্ধ হইতেই ঘূর্ণায়মান তড়িদণুর গতিবেগ ও কক্ষের ব্যাস অতি সূক্ষ্মভাবে নিরূপিত হয়। পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ স্থান অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং কক্ষের ব্যাসও অতি ক্ষুদ্র। আমরা সাধারণতঃ এত ক্ষুদ্র দূরত্বের কল্পনাই করিতে পারি না। কিন্তু এই সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নির্ণয়ে যে কুশলতার প্রয়োজন, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহা প্রচুর ভাবেই আছে।

আলোক-বিকীরণ ও আলোক-শোষণ ব্যাপার পরমাণু দ্বারা কি ভাবে নিষ্পন্ন হয় তাহা Bohr তাঁহার পরমাণু বিজ্ঞানের নূতন প্রণালীতে অতি বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছেন। এজন্য পরমাণু মাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ ও অসাধারণ অবস্থা কল্পনা করা হইয়াছে। বাহির হইতে তেজ শোষণ করিয়া পরমাণু সাধারণ অবস্থা হইতে এক অসাধারণ অবস্থায় যায়, আর কোনও প্রকার প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে পরমাণু ঐ অসাধারণ অবস্থা হইতে পূর্ব্বের সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়া আসে। ফলে, তাহাকে বাহির হইতে গৃহীত তেজ পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহাই আমাদের জ্যোতিঃরশ্মি।

এই প্রকারে যন্ত্র-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় ধারার ফলে পদার্থ-বিজ্ঞান বহুদিক দিয়া বহুপ্রকারে উন্নত হইয়া উঠিল। আবার বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতে চাহিলেন যে, "এইবার সকল সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। পদার্থজগৎ আমাদের নখদর্পণে আসিয়া পড়িল।" কিন্তু সৃষ্ট জগতের রহস্য এত সহজে আয়ত্ত হইবার নহে। এমত সব সত্য আবিষ্কৃত হইল যাহাতে Bohrএর সিদ্ধান্ত আর প্রয়োগ করা চলে না। সুতরাং এ সিদ্ধান্তে কোথায় কোন্ ত্রুটি আছে তাহা বৈজ্ঞানিক ভাবিতে বসিলেন। Bohr সিদ্ধান্তের প্রয়োগে নিত্য নূতন সমস্যার সমাধানে তৎপর বৈজ্ঞানিক নিজের কৃতিত্বে এত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বের অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কোন্ বাধা অতিক্রম করিতে গিয়া Bohr সিদ্ধান্তের পরিকল্পনা হইয়াছিল, বৈজ্ঞানিক আবার তাহাই ভাবিতে বসিলেন। কারণ, এযুক্তির ত্রুটী কোথায় তাহা পূর্ব্বাবস্থা হইতে আলোচনা না করিলে ধরা দুঃসাধ্য।

ঋণতড়িদণুর কক্ষের স্থানে স্থানে কোনও বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে, একথা আমাদের পুরাতন গতিবিজ্ঞানের জ্ঞানসম্মত নহে। পুরাতন জ্ঞান কক্ষ মাত্রকেই নির্ব্বিশেষ বলিয়া মনে করা হয়। এ অবস্থায় যন্ত্র-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় ধারার সাহায্যে কক্ষের বৈশিষ্ট্যের কল্পনা করিয়া অনেক সমস্যার সমাধান হইলেও বৈজ্ঞানিক এ কল্পনার কোনও বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ আলোক-বিজ্ঞান সম্পর্কে কল্পিত এক নিত্য সংখ্যা কি ভাবে

পরমাণু-বিজ্ঞানের মৌলিক নিত্য সংখ্যায় প্রমাণিত হইতে পারে, তাহাও বৈজ্ঞানিক সন্দেহাকুল মনে ভাবিতেছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রকারের অনেক সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে পর্ব্বত প্রমাণ বাধা উপস্থিত করিল। ফলে যন্ত্র-বিজ্ঞানের তৃতীয় ধারার সূত্রপাত হইল। যন্ত্র বিজ্ঞানের প্রথম ধারার প্রবর্ত্তক Galelio। সেই ধারার কার্য্যকারিতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ গতি বিজ্ঞানের আলোচনার উপযোগী। কিন্তু আলোকের গতি-বেগ কিংবা ঐ প্রকারের প্রচণ্ড গতি বেগের পর্য্যালোচনায় যন্ত্র-বিজ্ঞানের প্রথম ধারায় ব্যবহৃত নিয়মসমূহ সুফল প্রদান করে না। সেইসব ক্ষেত্রে আইনষ্টাইন প্রবর্ত্তিত যন্ত্র-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় ধারার প্রয়োগে যথার্থ মীমাংসা পাওয়া যায়। কিন্তু পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম জগতে এই দুই ধারার একটীও কার্য্যকারী হইতে পারে না। সেই সমস্ত সূক্ষ্ম জগতের জন্য যন্ত্র-বিজ্ঞানের তৃতীয় ধারার প্রবর্ত্তন। ঐ আইনষ্টাইনের গতি-বিজ্ঞান বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জগতেও ফলপ্রসূ হয়। সেই হিসাবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নূতন তৃতীয় যন্ত্রবিজ্ঞান সাধরণ গতিবেগ ও অপরিসীম গতিবেগ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে—অর্থাৎ যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রথম ও দ্বিতীয় ধারাকে তৃতীয় ধারারই বিশেষ অবস্থা বিপর্য্যয় বলা যাইতে পারিবে।

নিউটনের খণ্ডবিশিষ্ট আলোকতত্ত্বের সহায়তায় যখন জ্ঞাত সত্য যথার্থরূপে মীমাংসিত হইতেছিল না, তখনই আলোকের তরঙ্গ-তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক জগতে আধিপত্য বিস্তার করিল। আবার যখন এমন সব সত্য আবিষ্কৃত হইতে লাগিল, যাহার মীমাংসা তরঙ্গ-তত্ত্বে পাওয়া যায় না, তখনই Planckএর খণ্ডবিশিষ্ট তেজঃ-তত্ত্বের (Quantum theory) সহায়তায় খণ্ডবিশিষ্ট আলোক-তত্ত্বের কল্পনা করা হইল। ইহাকে আমরা সেই পুরাতন নিউটনের তত্ত্বেরই এক বিশুদ্ধ সংস্করণ বলিতে পারি। যন্ত্রবিজ্ঞানের তৃতীয় ধারায় আবার তরঙ্গ-তত্ত্বের দিকে বৈজ্ঞানিকের মন প্রধাবিত হইয়াছে। অণু, পরমাণু, তড়িদণু সমস্তই এখন আবার বৈজ্ঞানিক ইথার-তরঙ্গ দ্বারা বুঝিতে চাহিতেছেন। বস্তুর বাস্তবতাকে এখন বৈজ্ঞানিক ইথার-তরঙ্গের এক বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরিতে পারিতেছেন। এ ধারার এখনও তরুণ অবস্থা; কিন্তু গত ৫।৬ বৎসর মধ্যেই ইহার প্রয়োগে পরমাণবিক জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের বহুল উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, বহু সন্দেহের অপনোদন হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক এই কথা বলিতেছেন যে, তেজ কখনও কখনও নির্ব্বিশেষ ধারার প্রবাহ আবার কখনও বা তেজখণ্ডের প্রবাহ। কারণ এখনও দুইটী ভাবই না রাখিলে সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কি কারণ-প্রভাবে তেজঃ-প্রবাহের স্বরূপে এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতে পারে তাহাই এখন সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান কবে কি প্রকারে হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

[শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী, সাংখ্যব্যাকরণতীর্থ, বি-এ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারাকপুরে গঙ্গাতীরস্থ একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণে এক তেজঃপুঞ্জময়ী কাষায়বস্ত্রপরিহিতা প্রৌঢ়া গাহিতেছিলেন—"উচ্চ হৃদয়ে দুঃখ ব'লে কি সেবন সাধন ছেড়ে দিব ?"

—অমনই শত কোমলকণ্ঠ শিশু সে গান সমস্বরে গাহিয়া উঠিল।

একটী বড় বাগান; তাহার মাঝখানে একটী দেবালয়। দুইখানি ছোট ছোট বাড়ী—একখানিতে বিধবাগণ এবং অপরখানিতে নিরাশ্রয়া সধবাগণ বাস করেন। মন্দির-সংলগ্ন দুইখানি ঘরে এক প্রৌঢ়া তিনটী অনূঢ়া কন্যা লইয়া থাকেন। অদূরে রন্ধনশালা। প্রায় পঞ্চাশ জন বসিতে পারে এমন একটী বৃহৎ চত্বরে দ্বিপ্রহরে বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। মণিরামপুর, খিতাড়া, পেয়ারা বাগান প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ছোট ছোট বালিকা এখানে পড়িতে আসে। বাগানখানি বেশ বড়; তাহার তিন দিক্ উচ্চ-প্রাচীর-বেষ্টিত, অপরদিকে উত্তর বাহিনী গঙ্গা কলনাদে মন্দিরের পাদদেশ ধৌত করিয়া বহিয়া যাইতেছেন।

বাগানটী ফলে ফুলে পূর্ণ, পাখীর কলগানে নিত্য মুখরিত। মন্দিরে বেদীর উপর এক নারী দেবতার চিত্রপট আর তাঁরই কোলে নারায়ণ শিলা। বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিতা দেবী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা—দেবী সারদেশ্বরী! আর নারী-শক্তি-প্রচারক মাতৃমন্ত্র-উপাসক ঠাকুর রামকৃষ্ণের শিষ্যা শ্রীশ্রীগৌরীমাতা এই মন্দিরের পূজারিণী। তাঁহার অধর কখনও ক্ষোভের হাসি হাসে নাই; ব্যর্থতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; কর্ম্মপ্রেরণার উৎস স্বরূপিণী এই দেবী মহাদেবের রুদ্রতেজে ভরপুর।

গৌরীমা আজন্ম সন্ন্যাসিনী। সংসারের কোন বন্ধনে তিনি বাঁধা পড়েন নাই। শৈশবেই তিনি পাগলিনী হইয়া বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন

শ্রীশ্রীগৌরীমাতা—আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী

এবং বহুকাল হিমালয়ের গহ্বরে বসিয়া কঠোর তপস্যা করেন।

দেশবিদেশ পর্য্যটন কালে ইনি বহুস্থানে অসহায়া নারীজাতির অধঃপতন এবং দুরবস্থা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন। কিন্তু সহায়সম্বলহীনা সন্ন্যাসিনী নারায়ণের উদ্দেশ্যে নয়নাশ্রু নিবেদন ভিন্ন অন্য কোন উপায় করিতে পারিলেন না।

বহুকাল চলিয়া গেলে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে গৌরীমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা! তুই কাদা চটকা, আমি জল ঢালি। যাঁর কাজ তিনিই করবেন, তোর কি আর আমার কি? দেখ—আমাদের

দেশের মেয়েদের শিক্ষার বড়ই অভাব। মায়েদের জন্য তোকে টাউনে ব'সে কাজ করতে হবে।"

গুরুর আদেশে মাথায় লইয়া শ্রীশ্রীগৌরীমা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। ১৩০১ সালে বিধবা এবং একজন কুমারীকে লইয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বারাকপুরে সর্ব্বপ্রথম একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। বিদ্যালয়ে বাহান্নটি ছাত্রী; তাঁহাদের শিক্ষয়িত্রী গৌরীমা নিজে! মেয়েরা লেখাপড়া শেখেন, স্তোত্রপাঠ, হরিনাম ও গীতা পাঠ করেন এবং নানারূপ আনন্দে সময় কাটান। বাগান হইতে ফল এবং শাকসব্জী পাওয়া যায়; মাতাজী ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া পাশাপাশি দুই তিনখানি গ্রাম শ্যামনগর হালিসহর, বেলঘরিয়া এবং কলিকাতায় আসিয়া চাউল এবং বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান,—স্বচ্ছন্দ অনাড়ম্বর জীবন বিমল আনন্দে কাটিয়া যায়।

এই সময়ে দুইজন সমৃদ্ধ ঘরের সধবা নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি লইয়া মাতাজীর চরণে শিক্ষালাভের জন্য আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন পরে পুরীতে আশ্রমের একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে গল্প করেন, "দিদি! সেই যে কড়াইয়ের ডা'ল আর তেঁতুলের অম্বল দিয়ে প্রসাদ খেতুম, তেমন মিষ্টি আর তেমন আনন্দের অনুভব এই স্বামি-পুত্র-সুখেও পাই না। দিদি! তুই আর ফিরিসনি, ভাই! মার কোলের কাছে আমি শুয়ে থাকতুম, ছোট ব'লে মা আমায় বেশী ভালবাসতেন।" এই কথাগুলির মধ্যে বারাকপুরের আশ্রমের পবিত্র চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছে। এমনই করিয়া বড় সহজ এবং সরলভাবে মা নারীজাতির উন্নতির পথ দেখাইলেন।

যে সকল ভক্তিমতী মায়েরা অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে মার ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার রায় মাধবচন্দ্র রায় বাহাদুরের পত্নী, জনৈকা অর্থশালিনী ব্রাহ্মণ মহিলা, রায় উপেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের পত্নী এবং হুগলী জেলার এক জমীদার-কন্যা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ৺মাধববাবু নিজেও বহু সাহায্য করিয়াছেন।

বারাকপুরের কাজ বেশ চলিতে লাগিল। বহু ভক্ত এবং ভক্তিমতী রমণী আশ্রমে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। বাড়ী-ঘর সব "কোয়ার্টার"—ভাবে পৃথক্ পৃথক্ হইল, পাঠশালাখানি সুন্দর হইল। অনশন ও কর্ম্মক্লিষ্ট দেহেও মাতাজীর উৎসাহের অন্ত নাই। সিদ্ধস্থানে সাধ্বীগণের জন্য পূজামন্দির স্থাপিত হইয়া মণিরামপুরে যে বৃহৎ জলের কল আছে, তাহার জমি ক্রয়ের কথা হইল। নানারূপ অসুবিধা দূর করিবার জন্য কলিকাতায় আশ্রমের একটী শাখা স্থাপনের কথা হইল। অতঃপর ১৩১৮ সালের ১৪ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতায় একটী বালিকা বিদ্যালয় এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। এই আশ্রম "শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম" নামে অভিহিত হইল। মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা নূতন ভাবে চলিতে লাগিল।

এখানে আসিয়া গৌরীমা দুই তিনটী শিক্ষয়িত্রী পাইলেন। আশ্রমে ৩টী কুমারী, ৭টী সধবা এবং ২টী বিধবা এবং বালিকা-

বামে—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, মধ্যে শ্রীশ্রীগৌরীমাতা, দক্ষিণে—শ্রীসুতপা দেবী

আশ্রমে কর্ম্মনিরতা ছাত্রিগণ

বিদ্যালয়ে ৮০টী পর্য্যন্ত ছাত্রী হইল। শ্রীশ্রীগৌরীমা নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া সকলকে আহার করান, ধর্ম্মশিক্ষা দেন, সকলকেই স্নেহ করেন। এই সময়ে মহানগরীর কয়েকজন অধিবাসীর আপ্রাণ চেষ্টায় ও যত্নে আশ্রম দিন দিন শৃঙ্খলা ও শান্তির সঙ্গে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। নারী-শক্তি জাগিবার পথ বাহির হইল। মাতা সারদেশ্বরী দেবী বারবার আসিলেন, পদধূলি দিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন—আনন্দময়ী এ আশ্রমে আপনি বসিয়া পূজা করিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন, দুই চারি জন কুমারী সাক্ষাৎ জগদম্বার আদেশ মনে করিয়া শান্তসমাহিত চিত্তে আশ্রম-জীবন বরণ করিয়া লইলেন। এইখানেই ত্যাগের সূচনা হইল।

মেয়েদের শিক্ষা এবং উন্নতি দর্শনে অভিভাবকগণ সন্তুষ্ট হইলেন। উন্নতি ধীরে অথচ দৃঢ় ভাবে হইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যারতির সময় আসাম গৌরীপুরের রাণী সরোজবালা, ৺আশুতোষ সেনের স্ত্রী (কাঁটাপুকুর), ৺ষোড়শী মিত্রের স্ত্রী (গ্রে ষ্ট্রীট) প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আশ্রম বিদ্যালয় বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আজ ২৬নং রাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটে নিজ ভবনে উঠিয়া আসিয়াছে। এই কার্য্যের সফলতার জন্য আসাম গৌরীপুরের সম্মানার্হ রাণীমাতার নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। তাহার পর নদীয়া জেলার দুই মহাপ্রাণ ভক্ত সন্তানের নাম উল্লেখযোগ্য। বৃদ্ধা গৌরীমাতার আরব্ধ কার্য্য সম্পাদনে সহৃদয় দেশবাসিগণ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

ব্রহ্মচর্য্য-বিধানে হিন্দু-বালিকাদিগের চরিত্র-গঠন ও জ্ঞানলাভে সহায়তা করাই এই আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতে যে-সকল আচার-নিয়ম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অনুকূল বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল, তাহা অনেকই এই আশ্রমে যথাসম্ভব প্রতিপালিত হয়। যাহাতে আশ্রম-বাসিনী কুমারীগণ হিন্দুধর্ম্ম এবং সমাজ অনুযায়ী স্ত্রী-শিক্ষা লাভ করিয়া আদর্শ নারী-জীবন যাপন করিতে পারে

এবং সমগ্র হিন্দু-জাতির ক্রমোন্নতির পথে বাধাস্বরূপ না হইয়া উত্তরোত্তর সহায়তা করিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা আশ্রমের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। সদ্বংশজাতা দুঃস্থা বালিকা এবং অসহায় মহিলাদিগকে আশ্রয়-দান এবং জীবনধারণোপযোগী কার্য্যকরী শিক্ষাপ্রদান করাও আশ্রম প্রতিষ্ঠার অপর একটী উদ্দেশ্য।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম-ভবন

কুমারীগণ আশ্রমে সংযম, সদাচার, গৃহকর্ম্ম, সেবা-শুশ্রূষা, শিল্প, ধর্ম্মসঙ্গীত, পূজার্চ্চনা প্রভৃতি এবং গীতা, উপনিষৎ, সাংখ্য, বেদান্ত, সাহিত্য (বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজি, হিন্দি), অঙ্ক, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষালাভ করেন। ব্যাকরণ ও বেদান্তের উপাধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাঙ্গের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণা হইয়াও ইঁহারা আশ্রমের গৌরববৃদ্ধি করিতেছেন। আশ্রমেই ইঁহাদের পড়ার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। সুতাকাটা, বস্ত্রবয়ন, সেলাই, কাটছাঁট এবং নানাপ্রকার গৃহশিল্পের চর্চ্চাও হয়। বালিকাগণ ধুতি, সাড়ী, পোষাকের কাপড়, তোয়ালে এবং ফরমায়েসী জামা প্রস্তুত করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছেন। নিজেদের ব্যয়ভারবহনক্ষম অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়েরাও এখানে আছেন।

সুশিক্ষিতা সন্ন্যাসিনী এবং ব্রহ্মচারিণীগণই "কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির" পরামর্শানুসারে আশ্রম ও বিদ্যালয়ের যাবতীয় কর্ম্ম সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিয়া থাকেন। আশ্রম-মন্দিরের মধ্যে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। সন্তান-হিসাবে অর্থ সাহায্য করিবেন, মাতার সহিত আলোচনা করিবেন এবং আশ্রম-কর্ম্মে পরামর্শ দিবেন। কিন্তু ভিতরে নারীর বিদ্যামন্দিরে নারী গুরু এবং নারীই সেবিকা। পুরুষের সহিত কোনরূপ সংশ্রব থাকিবে না। পুরুষ সন্তান এবং পিতৃস্থানীয়—পূজনীয় হিসাবে মাতা এবং কন্যাগণকে বহির্বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। ধনী-দরিদ্র ও বয়স নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক আশ্রমবাসিনীকেই স্বহস্তে আশ্রমের যাবতীয় গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়। আশ্রমে কাহারও পীড়া হইলে অভিজ্ঞ চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করেন এবং বয়স্থাগণ নিতান্ত আপন জনের মত তাহার শুশ্রূষা করিয়া থাকেন।
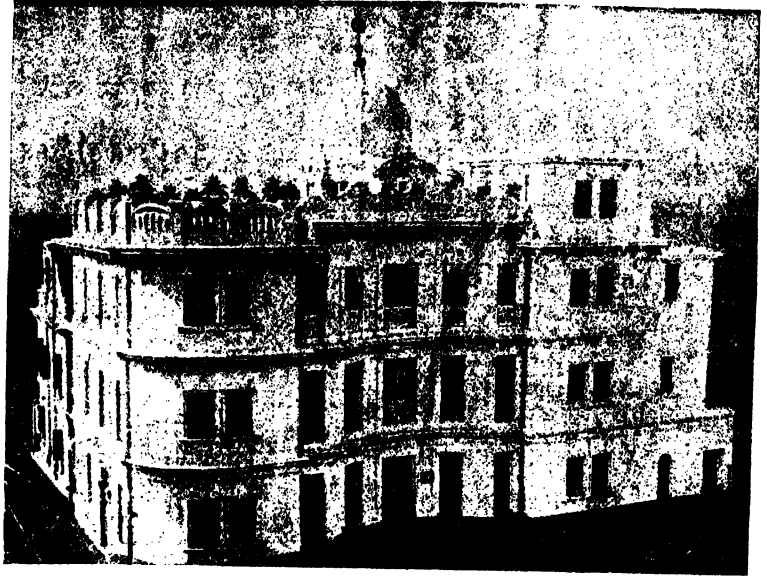
অশীতিপর বৃদ্ধা জননী বাঙ্গালীর হাতে এই শিশু আশ্রমের ভার দিয়া আজ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর চাহিতেছেন। সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির বক্ষে মায়ের যত্নে যে মহা মহীরুহের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে বাঙ্গালার সুসন্তানগণ তাহার মূলে জল সেচন করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিবেন আশা করি। এই দেশের মাটিতে তাঁহারা জন্মিয়াছেন—মায়ের কোলেই বর্দ্ধিত—মায়েরই স্তন্যে পুষ্ট হইয়াছেন—সুতরাং তাঁহারাও মায়ের ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দিবেন, সন্দেহ নাই।

গ্রাম্য দেবতা

(অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ)

অতি প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গের তথা অন্য প্রদেশের জন-সাধারণের মধ্যে এমন অনেক দেব-দেবীর পূজা ও উৎসবের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের কোনও সন্ধান হিন্দুর বিশাল শাস্ত্র ভাণ্ডারে মিলে না। অনেক ক্ষেত্রে এই সকল পূজা ও উৎসব রক্ষণশীল নারী-সম্প্রদায় অথবা অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যে অতি সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের মধ্যেই ইহাদের বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, অনেক সময় শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট উৎসবাদি অপেক্ষা এই গুলিরই বেশী সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাই কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশের জনসাধারণের মধ্যে অনাবিল আনন্দের উচ্ছ্বাস বহাইতে—জাতীয় উৎসবের স্থান গ্রহণ করিত। কালক্রমে নির্ম্মল আমোদের এই সকল উৎস শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এখন আর এই সকল উৎসব দেশের প্রাণে সাড়া জাগায় না —এখন আর ইহারা অনেকস্থলে সেই পূর্ব্ব আগ্রহ ও আবেগের সহিত অনুষ্ঠিত হয় না। আশঙ্কা হয়, অচিরেই এই সকল জাতীয় উৎসবের ক্ষীণ-স্মৃতি পর্য্যন্ত নব্য-সম্প্রদায়ের হৃদয় হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। তাই অবিলম্বে এই সকল পূজাপার্ব্বণের পূর্ণ বিবরণ ইহাদের জীবন্ত সাক্ষিস্বরূপ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

কেবল দেশের আমোদ আহ্লাদের ইতিহাসের দিক্ হইতে নহে—অন্যান্য নানাদিক হইতে এই সকল উৎসব ঐতিহাসিকের নিকট পরম আদরের জিনিস। প্রাচীন দেব-তত্ত্ব, মূর্ত্তিতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এই সকল পূজা ও উৎসবের বিবরণ হইতে বহু অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান মিলে। এই গুলির পূর্ণ বিবরণ সংগৃহীত ও আলোচিত হইলে দেশের ধর্ম্মগত ইতিহাস প্রণয়ণ সম্ভবপর হইবে।

এই সকল পূজা-পার্ব্বণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পূজাপদ্ধতি হইতে ইহাদের পদ্ধতির মধ্যে অনেক নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। মন্ত্রাদির মধ্যেও যে অনেকস্থলেই নূতনত্ব নাই এমন নহে। মোটের উপর, ঐতিহাসিকদিগের মতে অনেক স্থলে এই সকল উৎসব আর্য্যদিগের আগমনের পূর্ব্বকালের অবস্থার স্মৃতি সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং প্রাচীনতার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে এগুলি অনেক স্থলে শাস্ত্রীয় উৎস-বাদি অপেক্ষা প্রাচীনতর। আবার স্থানভেদে একই উৎসবের নানা রূপ বা নানা বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকস্থলে শাস্ত্রীয় উৎসবের মধ্যে এই সকল লৌকিক ও গ্রাম্য উৎসব মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। অনেকস্থলে গ্রাম্য পূজাদির মধ্যেও সংস্কৃত মন্ত্রাদির ব্যবস্থা করিয়া উহাদিগকে শাস্ত্রীয় আকার প্রদান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ফলে, এই সকল উৎসবের বিশুদ্ধ গ্রাম্য ও লৌকিক অংশ শাস্ত্রানুসারী ও নব্য-সম্প্রদায় উভয় দলেরই অবজ্ঞার পাত্র হইয়া দিন দিন বিলোপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিবাহাদি কার্য্যে 'স্ত্রী-আচার' ও অন্যান্য কার্য্যে লৌকিক 'আচার' এই অবজ্ঞার ফলে দিন দিন অতি সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করিতেছে। শাস্ত্রীয় উৎসবাদির ন্যায় এগুলির বিধান কোনও স্থলে লিপিবদ্ধ না থাকায় আর কিছুদিন পরে ইহাদের কোনও সন্ধান ঐতিহাসিকগণ সহস্র চেষ্টা করিয়াও পাইবেন না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। অথচ এই গুলির মধ্যেই দেশের প্রকৃত প্রাণের পরিচয় জীবনে স্ফূর্ত্তি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়

ইতঃপূর্ব্বে কেহ কেহ এই সকল গ্রাম্য উৎসবাদির বিবরণ সংগ্রহ করিতে যে চেষ্টা করেন নাই এমন নহে। উৎসবের বিবরণ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে সত্য; তবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কোনও কার্য্য এখন পর্য্যন্ত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। অবশ্য, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, জর্ণল অফ্ এসিয়াটিক সোসাইটী অফ্ বেঙ্গল,

ম্যান্ ইন্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি পত্রিকায় এ সম্বন্ধে প্রকাশিত ও প্রকাশ্যমান প্রবন্ধগুলি বিচ্ছিন্ন হইলেও উপাদেয় সন্দেহ নাই। মেয়েলি ব্রতাদি সম্বন্ধে প্রকাশিত সাধারণের উপযোগী কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যেও অনেক জানিবার ও শিখিবার কথা আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ত-তীর্থ মহাশয় বঙ্গের গ্রাম্যদেবতার বিবরণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি কয়েকটী দেবতার বিবরণ প্রদানের পরই সে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'বেতালের বৈঠকের' আলোচনার প্রসঙ্গে 'প্রবাসী' পত্রিকায় কয়েকটী উৎসব ও পূজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু যথা-নিয়মে শৃঙ্খলার সহিত বিস্তারিত ভাবে এ বিষয়ের আলো-চনা খুবই কমই হইয়াছে।

এই অবস্থায় ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া বঙ্গের গ্রাম্য দেবতার ও গ্রাম্য উৎসবের বিবরণ সংগ্রহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—এইরূপ উৎসবে স্থানভেদে নানা পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সেই সকল পার্থক্য সেই সেই স্থানের লোকের নিকট ছাড়া অন্যের নিকট হইতে জানিবার উপায় নাই। তাই আমাদের অনুরোধ, আমরা যখন যে বিবরণ এই পত্রিকার প্রকাশিত করিব তাহার সম্বন্ধে কোনও নূতন বিষয় কাহারও জানা থাকিলে পাঠক মহোদয়গণ তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়া জানাইবেন। কাহারও কোনও নূতন দেবতার কথা জানা থাকিলে তাহাও লিখিয়া জানাইলে আমরা সুখী হইব এবং কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিব। দেবতার ধ্যান ও মন্ত্র সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। অনেক সময় প্রাদেশিক ভাষার রচিত মন্ত্রের ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি ভাষাতত্ত্বামোদীদিগের অপূর্ব্ব আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই। সুতরাং সেগুলিও সংগ্রহ করিতে হইবে। যিনি যতটুকু বিবরণ প্রদান করিবেন তাহাই সাগ্রহে কৃতজ্ঞতার সহিত আলোচিত হইবে। বিবরণের স্বল্পতার জন্য কুণ্ঠিত হইবার কোনও কারণ নাই। কারণ নানা ব্যক্তির নিকট হইতে অল্প অল্প বিবরণ সংগৃহীত হইলে তবেই বঙ্গের গ্রাম্যদেবতাও উৎসবের পূর্ণ ও বিস্তারিত বিবরণ সঙ্কলিত হইতে পারিবে।

আমরা আগামী সংখ্যা হইতে নিশানাথ, বনদুর্গা, জয়দুর্গা, হরিপাগল, গাভুর ডলন, মোচরাসিংহ, মধুভাঙ্গর, রণযক্ষিণী, অমসয়নারায়ণী, কৃষ্ণকুমার, পুষ্পকুমার, রূপ-কুমার, রূপমালী, মুচিমুখ, মহামল্লিক, বালিভদ্র প্রভৃতি গ্রাম্য দেব-দেবীর যথাসাধ্য বিবরণ প্রদান করিতে আরম্ভ করিব। পাঠকবর্গ সম্ভাব্যমান ত্রুটিবিচ্যুতি উপেক্ষা করিয়া যথাসম্ভব সাহায্য করিলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে।

মনীষী উমেশচন্দ্র বটব্যাল

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

পিতা—৺দুর্গাচরণ বটব্যাল। জন্ম—১৬ই ভাদ্র ১২৫৯ সাল, ইং ৩০এ আগষ্ট ১৮৫২। মৃত্যু—১লা শ্রাবণ ১৩০৫ সাল, ইং ১৬ই জুলাই ১৮৯৮। জন্মস্থান—রামনগর, খানাকুলের সন্নিকট, জেলা হুগলী।

৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী-স্থাপিত খানাকুল কৃষ্ণনগর ইংরেজী-সংস্কৃত বিদ্যালয় হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, উমেশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই উচ্চস্থান অধিকার করেন।

শিক্ষা ও কর্ম্ম-জীবন

তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিও লাভ করেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে তিনি সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতার জন্য 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধিও প্রাপ্ত হন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্তির পর উমেশচন্দ্র কিছুদিন নড়াইল ইংরেজী বিদ্যালয়ে এবং সংস্কৃত ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরি গ্রহণ করেন। প্রায় ১১ বৎসর পরে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে Statutory Civilian ও পরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হন। মৃত্যুর সময় উমেশচন্দ্র বগুড়া জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

সাহিত্যচর্চ্চা

বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পর হইতেই উমেশচন্দ্র স্বদেশের সাহিত্যচর্চ্চায় রত হইয়াছিলেন। বেদ তাঁহার বিশেষ আলোচনীয় ছিল। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি তাহারই চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। "সাহিত্য" পত্রিকায় উমেশচন্দ্র অনেক গবেষণা-মূলক বৈদিক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি বেদপ্রবেশিকা" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার চরিত-সমালোচনা কালে লিখিয়াছিলেন "তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধগুলির সমালোচনা আমার সাধ্য নহে।"

দর্শনের মধ্যে সাংখ্য-দর্শন তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। উক্ত দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধমালা তৎকালিক "সাধনা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে তাহা "সাংখ্য দর্শন" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহায় সাংখ্য-দর্শন প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া ইহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল—

"আপনার সাংখ্য-দর্শন পাঠ করিয়া উত্তরোত্তর বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছি। তাহা পুনশ্চ আপনাকে কৃতজ্ঞচিত্তে জানাইলাম। বঙ্গভাষায় আপনার এ রচনার আর তুলনা নাই। বড় ইচ্ছা ছিল মালদহে উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় লাভ করিব এবং সশরীরে আপনাকে সাধুবাদ দিয়া আসিব, কিন্তু ব্যস্ততা বশতঃ সে কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইল, কোন এক সময়ে পরিচয়ের অবসর হইবে এরূপ আশ্বাস রহিল। সাক্ষাৎ পরিচয় থাক বা না থাক আমাকে আপনার একটি ভক্ত পাঠকের মধ্যে গণ্য করিয়া লইবেন এবং ভবিষ্যতে কালক্রমে যদি আপনার বন্ধুশ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইতে পারি তবে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব। "সাহিত্যে" আপনার যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইতেছে তাহা আমি সবিশেষ আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া থাকি জানিবেন। অবশেষে সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনি যে পাঠকের বিরাগ ও ভ্রান্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন তাহা মন হইতে দূর করিবেন। ইতি ১৯শে চৈত্র ১৩০০। ভবদীয় ভক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ" যখন শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহার নাম "Bengal Academy of Literature" ছিল। উমেশচন্দ্রকে উহার সভ্য হইবার জন্য যখন অনুরোধ করা হয় তখন তিনি উহার বাঙ্গালা নামকরণ বিধেয় বিবেচনা করিয়া ইংরাজি নামের অনুবাদ স্বরূপ "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ" এই নাম প্রস্তাব করেন। "Academy" শব্দটীর উপযুক্ত প্রতিশব্দ "পরিষদ" ইহা করিতে তিনি অনেক বৈদিক প্রতিশব্দের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রস্তাবানুসারেই "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ" নামের উদ্ভব।

মালদহে অবস্থান-কালে তিনি রাজা ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনখানি আবিষ্কার করিয়া তাহা "সাধনা" ও "Journal of the Asiatic Society of Bengal" পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। তৎকালে উহা অপেক্ষা পুরাতন তাম্রশাসন আর আবিষ্কৃত হয় নাই। উহাতে হিন্দুরাজত্ব কালের অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি "বগুড়া জেলা," "মহানন্দা নদী" "করোতোয়া নদী", "লক্ষ্মণাবতী" প্রভৃতি কয়েকটী ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "সেক শুভোদয়া" নামক একখানি বাঙ্গলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় হস্তলিখিত গ্রন্থ মালদহ জেলার অন্তর্গত দাঁড়ুয়া নগরে "বইসহাজারি" নামক পিরোত্তর বা "বরক" সম্পত্তি সংসৃষ্ট মসজিদে পরিরক্ষিত ছিল। বটব্যাল মহোদয় তাহার অস্তিত্বের বিষয় অবগত হইয়া উহা পাঠ করেন এবং তাহার মর্ম্ম "সাহিত্যে" প্রকাশ করেন। ইহাতে লক্ষণ দেবের রাজত্বের সময়ের ঘটনার উল্লেখ আছে।

তাঁর সত্যই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি ছিল। "বসুমতী" পত্রিকা লিখিয়াছিলেন (৫ই মাঘ ১৩০৬) "সরকারী কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি বেদ, বেদান্ত, দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন এবং তাঁহার সেই গভীর পরিশ্রমের ফলে বঙ্গভাষার সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছিল। দর্শন শাস্ত্রের জটিল সমস্যাগুলি আলোচনা অতি সহজ সরল ভাষায় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ দার্শনিকপ্রবর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বর্গীয় বটব্যাল মহাশয় সুধী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ব্যতীত আর কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ২৪এ কার্ত্তিক ১৩০৭ সালের হিতবাদী পত্রিকায় উমেশচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম—

"বটব্যাল মহাশয় স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতেন নির্ভীক হৃদয়ে মতামত প্রকাশ করিতেন, প্রশংসা বা নিন্দার মুখাপেক্ষা করিতেন না। এগুণ বাঙ্গালী জাতিতে দুর্লভ।"

৪৬ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বাঙ্গলার এই কৃতী সন্তান অকালে দেহত্যাগ করেন। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার অকাল মৃত্যু কেশবচন্দ্রের মৃত্যু স্মরণ করাইয়া দেয়।" আজ বাঙ্গালী হয় তো উমেশচন্দ্রকে ভুলিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য কোন দিন তাঁহাকে ভুলিবে না।

রক্তকমল

(উপন্যাস)

[রায়সাহেব শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সেদিন কুমার অজয়সিংহের চিত্রশালা দেখিতে যাইবার কথা ছিল। দুয়ারে একখানা রবার-টায়ার টাঙ্গা আসিয়া দাঁড়াইল। বীণা বলিল—"চল ভাই, বেরিয়ে পড়ি—এম্‌নি দেরি হ'য়ে গেছে। আসুন মিসেস ঘোষ। এতক্ষণ হয় তো অরুণদা একলাটী সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে।"

তিন জনে গাড়ীতে গিয়া বসিল। বিতস্তার অপর পারে কুমারের বাড়ী ও চিত্রশালা। এক নম্বর পোল্ 'মীরশদল্' অতিক্রম করিয়া মহারাজের প্রাসাদ ও স্বর্ণ মন্দিরের পাশ দিয়া কুমার অজয়সিংহের বাড়ীতে যাইতে হয়। কুমারের বাড়ীটী দেখিলেই মনে হয়, একদিন হয় তো উহা দুর্গের মতই ব্যবহার করা হইয়াছে। এখন আর সে সমৃদ্ধিও নাই, সে দিনও নাই।

অজয়সিংহ পরম সমাদরে সকলকে লইয়া চিত্রশালায় প্রবেশ করিলেন এবং প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রগুলি একে একে দেখাইতে লাগিলেন। কয়েকখানি মূর্ত্তি-চিত্রের দিকে লীলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কুমার বলিলেন—"এই যে ছবিগুলো দেখছেন, আমার বাবা অনেক দামে এসব কিনেছিলেন। এগুলোই হ'লো কাঙ্গড়া-কলার নিদর্শন। আমাদের দেশে পাহাড়ী-চিত্র বল্‌লে যে বোঝা যায়, এ সব ছবি তারই নমুনা। সে কালে আমাদের কাশ্মীরে আর জম্মুতে শিল্পীদের বাস ছিল। মোগল-শিল্প-রীতি যখন হিন্দুস্থান থেকে কেবল মুছতে আরম্ভ করেছে, কাশ্মীরী কীর্ত্তি তখন বেশ প্রবল হচ্ছিল। ছবিতে সামঞ্জস্য আর শৃঙ্খলা কেমন আছে একবার দেখুন।"

কুমার যতই কেন প্রশংসা করুন, ছবিগুলি লীলাকে তেমন একটা আনন্দ দিতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল—ছবির মধ্যে যে বিশেষত্ব কোথায় তাহা সে বুঝিতেই পারিতেছে না। এমন সময় একজন ভৃত্য অরুণের কার্ড হাতে করিয়া প্রবেশ করিল। কুমার উৎফুল্ল নয়নে বলিলেন, "মিষ্টার সেন এসে পড়েছেন। এইবার আপনারা এ সব ছবির কদর বুঝতে পারবেন।"

অরুণ যখন সেই কক্ষে প্রবেশ করিল তখন তাহার দিকে চাহিবামাত্রই লীলার মনে হইল, সে মুখে বিষাদের ছাপ পড়িয়াছে। অরুণ মনে করিয়াছিল যে, ছবি দেখিতে আসিবার নিমন্ত্রণটা সে লীলার নিকট হইতেই পাইবে। তাহা না পাইয়া, সে যখন উহা বীণার নিকট হইতে পাইল তখনই তাহার মনটা একটু ভাঙ্গিয়া গেল। প্রথমে সে মনে করিল, একটা কিছু বাহনা করিয়া নিমন্ত্রণটা ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু লীলার সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হয় বলিয়া অরুণকুমার ছবি দেখিবার জন্য কুমারের বাড়ীতে আসিল না, সে আসিল লীলাকে দেখিবার জন্য।

কিছুক্ষণ ছবিগুলি দেখিয়া অরুণ বলিল, "এ সব ছবি কোন কাজেরই নয়। কে বলে এগুলো প্রাচীন কালের? দু' একখানা হয় তো প্রাচীন হ'তে পারে—তাও দেখছি নিতান্তই তৃতীয় শ্রেণীর চিত্রকরের তুলির আঁকা। কল্‌কাতা আর্ট গ্যালারিতে ভালো ভালো হিন্দুস্থানী আসল ছবি বিস্তর আছে। মনে হচ্ছে এ সব ছবির অনেকগুলোই তাদের নকল।"

অরুণ এ সকল কথা লীলাকেই বলিতেছিল বটে, কিন্তু কিছু কিছু কুমারের কানেও গিয়া পৌঁছিতেছিল। কুমার মনে করিয়াছিলেন, আজ বীণাকে তাঁহার চিত্রশালায় পাইয়া নিজেই শিল্প-সাধকের আসন লইবেন এবং শিল্পে প্রেমের অভিব্যক্তির কথা বলিতে বলিতে বীণার কাছে নিজের অন্তরেরই প্রেম নিবেদন করিবেন। হঠাৎ অরুণ কুমারকে আসিতে দেখিয়া কুমার মুখে হাসি আনিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে রোষ জাগিয়া উঠিল। তাহার পর অরুণ যখন ছবিগুলির নিন্দা আরম্ভ করিল তখন কুমার অজয়ের মুখ রক্তাভ হইয়া উঠিল। কিছু দূরে কয়েক-

খানি ছবি ছিল। সেগুলি দেখাইবার জন্য অজয় বীণাকে সরাইয়া লইয়া গেল। অরুণ তখন অবনীন্দ্রনাথের "অভিসারিকার" ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল এবং লীলাকে বলিতেছিল—"এই ছবিখানা দেখেছেন? এ-তো আসল নয়। আসল ছবি এর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর।"

এই ছবির উপর যাহাতে বীণার চোখ পড়ে কুমারের ছিল তাহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু অরুণের মুখে এই কথা!

অরুণ বলিতে লাগিল—"এবার যখন কলকাতায় ফিরে যাবেন, অসিত হালদারের পেন্‌সিল-স্কেচ্ দেখাবো। তার জোড়া মেলে না! অবনীন্দ্রনাথ একখানা ছবি এঁকেছেন —সখী নায়িকাকে নায়কের মূর্ত্তি দেখাচ্ছেন। সে চিত্রের প্রত্যেকটা রেখায় এমন একটা ভাব আছে যে মনে হয়, অক্ষরগুলা যেন উদগ্র হ'য়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর নির্ব্বাসিত যক্ষের পত্নীর ছবিটী দেখলে যে-কোনো দেশের শিল্পীকে মুগ্ধ হ'তে হ'বে।

কুমার দূর হইতেই বলিলেন—"অভিসারিকার ছবিখানা যে আসল, তা' আমি বলছিনে। তবে নকলেরও একটা দাম আছে—যদি সে আসলের কাছা-কাছিও হয়। এ ছবিখানাও তাই।"

অরুণ বা লীলা একথার কোনো উত্তর দিল না। কুমার দুই একবার অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া বীণার কাছে অন্যান্য ছবির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

অরুণের মনটা সেদিন আদৌ ভালো ছিল না। সে জানিত, লীলা তাহার হৃদয়ের সকল স্থান জুড়িয়া রাখিয়াছে—অরুণ চক্ষু মুদিলেও লীলাকেই দেখে, চক্ষু চাহিলেও লীলাকেই দেখে। গত সন্ধ্যায় চেনারবাগে খণ্ডিত চন্দ্রালোকে লীলাকে সে যেমন দেখিয়াছিল—আজ তাহার মনে হইতে লাগিল, লীলা তাহা অপেক্ষা শত গুণে বেশী কামনার সামগ্রী। লীলা যে শুধু সুন্দরী তাহা নয়, লীলা মনোহারিণী। লীলার রূপ মনকে এমন তীব্র ভাবে টানে যে, কাহারো সাধ্য নাই বাধা দেয়। কিন্তু লীলার মনটী যেন বড়ই দুর্জ্ঞেয়। কি যে সেখানে আছে, এত দিনের এত চেষ্টাতেও অরুণ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না! কলিকাতাতেও নয়—কাশ্মীরেও নয়! তাহার উপর আজ আবার ছবি-দেখার নিমন্ত্রণ লীলার নিকট হইতে আসিল না!

লীলার মনও আজ ভালো ছিল না। ডাক্তারের চিঠিখানা সে সত্যসত্যই আগুনে পোড়াইয়াছে বটে, কিন্তু হঠাৎ এক-একবার সেই পোড়া-চিঠির আগুনমাখা খণ্ডগুলি তাহার চোখের সম্মুখে তখনো ভিড় করিয়া দাঁড়াইতেছিল। অরুণ দেখিল, লীলা যেন আজ বড়ই অন্যমনস্ক, এতটুকু মমতাও যেন তাহার আজ নাই! অরুণ ভাবিতে লাগিল—আমি লীলার কে? যাচকের মত তাহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি বই তো নয়?

লীলাও দাঁড়াইয়া আছে সম্মুখের একখানা ছবির দিকে চাহিয়া।

অরুণও দাঁড়াইয়া আছে সেইরূপেই। কিন্তু উভয়েই নির্ব্বাক!

শেষে অরুণ ফিসফিস করিয়া কহিল—"আজ বোধ হয় আমার সঙ্গটা আপনাকে আনন্দ দিচ্ছে না? আমি তো এখানে আসতে চাইনি। এখানে আমার টানটাই বা কি? মিস বীণা—"

অরুণের মন যে কি বলিতে চায় অথচ পারে না—লীলা তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিল। অরুণ ভয় করিতেছে, বুঝিবা লীলাকে সে হারাইল এবং সেইজন্যই অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মুখে কথা সরিতেছে না—ব্যবহারে একটা আড়ষ্টতা আসিয়াছে;—এ সমস্ত বুঝিতে লীলার বেশী বিলম্ব হইল না। কিন্তু অরুণের সেই হারাই-হারাই ভাবটাই তখন লীলার কাছে বড় বেশী ভালো লাগিতেছিল। সে যে অরুণের মনে কামনার তীব্র জ্বালা আনিতে পারিয়াছে, অরুণকে যে সে এতটা চঞ্চল করিতে পারিয়াছে, এই জয়ের জন্যই লীলা মনে মনে আনন্দিত হইল!

লীলার হৃৎপিণ্ড ঝড়ের দিনের খোলা দরজার পাখীটা মত ধক্ ধক্ করিতে লাগিল!

নিজের মনকে গোপন করিয়া লীলা তাহার কথায় এই ভাবই প্রকাশ করিল যে, এতটা ক্লেশ করিয়া অজয় সিংহ কলা-ভবনে আসিয়া খানকতক বাজে ছবি দেখিয়া যে অরুণকে সময় নষ্ট করিতে হইল, ইহাই দুর্ভাগ্যের কথা! লীলা বলিল—"কে জানে যে ছবিগুলো এমন—দেখে মোটেই আনন্দ হ'ল না।"

কি বলিতে কি বলিয়া পাছে সে লীলাকে চটাইয়া

মেয় এই ভয়েই অরুণ ব্যস্ত হইয়াছিল। এখন সে মনে করিল, লীলা তাহার বিরক্তির ভাবটাকে সাধারণ ভাবেই লইয়াছে এবং তাহার মনের চঞ্চলতার আসল কারণটা ধরিতে পারে নাই। কতকটা নিঃশঙ্ক হইয়া অরুণ বলিল —"সত্যই এ চিত্রশালায় আনন্দ পাবার মত কিছুই নাই।"

কুমার অজয় তখন কক্ষান্তরে বন্ধুদের আহারের আয়োজন করিতেছিলেন।

অরুণের ইচ্ছা ছিল না যে, খানার টেবিলে বসে। তাহার মনটা তখন ছটফট্ করিতেছিল। বীণার সঙ্গে লীলা স্থানান্তরে চলিয়া গেল দেখিয়া অরুণ ধীরে ধীরে খানার ঘরে যাইয়া সবিনয়ে কুমারের নিকট হইতে বিদায় লইল এবং ড্রইংরুমের ভিতর দিয়া নীচে নামিবার সময় দেখিল, লীলা সিঁড়ির মুখে একা দাঁড়াইয়া আছে—যেন মার্ব্বেল পাথরে গড়া স্ত্রী-মূর্ত্তি। কিছুক্ষণ আগেই অরুণ ভাবিয়াছিল, লীলার সঙ্গে আর দেখা করিবে না। খানার টেবিলে তাহাকে না দেখিলে লীলার অন্তরে কি একটুও বাজিবে না ?

লীলাকে দেখিতে পাইয়া অরুণের পণ ভাঙ্গিয়া গেল। বলিল—"কাল সকালেই তো নিশাধবাগ যাওয়া স্থির আছে ? আপনি বলেছিলেন, আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে হ'বে।"

লীলা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল—"বোধ হয় আমার সঙ্গটা আজ খুব কষ্টকর মনে হ'চ্ছে ?"

অরুণের মনটা পাগলা হাওয়ার মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সে বলিল—"না—না—কষ্টকর নয়। তবে আজ আপনাকে একটু বিষণ্ণ দেখছি। আপনার সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি তেমন ভাগ্য তো আমার নয়!"

লীলা তীর-বেগে অরুণের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল—"আপনার কাছে আমার মনের কবাট খুলে দেবো, এতটা বোধ হয় আপনি আশা করেন না ?"

লীলা বেগে সে স্থান ত্যাগ করিল।

(১৪)

সেদিন বিকালে কিছু বেশী শীত পড়িয়াছিল। লোকে বলিতেছিল, রাত্রে হয়ত খুবই তুষার পড়িবে। চা-এর পর্ব্ব শেষ হইলে পর ড্রইংরুমের আগুনের কাছে বসিয়া মিসেস কাদম্বিনী ঘোষ শ্রীপ্রতাপ কলা-ভবনের গল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামীর সংগৃহীত নানাপ্রকার প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন শ্রীনগরের সেই কলা-ভবনে সযত্নে সাজানো ছিল। মিসেস ঘোষের পাশে বসিয়া লীলা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। মিসেস ঘোষের গল্পটা যে এ হাসির কারণ ছিল, তাহা নয়। হাসির কারণ ছিল অন্যরূপ।

ড্রইংরুমের স্নিগ্ধ আলোকে লীলা তখন মানস-চক্ষে দেখিতেছিল, নিশাধবাগের মধ্যে প্রতিবিম্বিত উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ আর প্রস্ফুটিত কমলবনে তাহাদের তরীখানি। সেদিন বীণা, অরুণকুমার, মিসেস ঘোষ এবং লীলা ডাল্ হ্রদে নৌকায় চড়িয়া নিশাধবাগে গিয়াছিল। পদ্মবন হইতে একটী রক্তকমল তুলিয়া অরুণকুমার সেদিন লীলাকে দেখিতে দিল। কি সুন্দর ছিল সেই ফুলটীর বর্ণ! যেন হৃদয়ের সমস্ত রক্ত দিয়া উহা গড়া।

সেদিনের ভ্রমণ-স্মৃতির মদিরা সায়াহ্নে লীলাকে এমনি মত্ত করিয়াছিল যে, নিশাধের চত্বরে চত্বরে বিন্যস্ত ক্রমোচ্চ-উদ্যান—তাহার লহর ও ফোয়ারা, কোথাও বা গম্ভীর বিরাটকায় চেনারের শ্রেণী—কোথাও আবার অগণিত ফুল-ফল—এ সবই লীলার কাছে একটা মধুমাখা স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। এই স্বপ্নের ঘোরে, সেই ভ্রমণ-স্মৃতির মদিরায় লীলা গত দুই দিনের সকল অবসাদ ও দুঃখ ভুলিয়া গেল। ডাক্তারের চিঠির কথা আর মনেই রহিল না। সুদূর কলিকাতা হইতে আগত অভিমান-ভরা মৃদু-তিরস্কার লীলাকে আর বিঁধিতে পারিল না। লীলার মনে হইতে লাগিল, বিশ্বে আর কিছুই নাই, আছে শুধু ডালের সেই কমলবন আর নিশাধের লহর-লীলা ; আর আছে—অরুণের কলহাস্য, যাহা সেদিন লীলার হাতে রক্ত-কমল দিবার সময় অত্যন্ত মুখর হইয়াছিল। লীলার সেদিন মনে হইতেছিল, নিশাধে বসন্ত আসিয়াছে।

অদূরে বসিয়া অরুণকুমার বীণার জন্য একটী শারদ-লক্ষ্মীর মূর্ত্তি গড়িতেছিল।

বীণার কথার উত্তরে কুমার অজয়সিংহ বলিলেন—"আমার মনে হয়, স্বয়ম্বরা হওয়াই নারীদের পক্ষে

স্বাভাবিক। ভারতের রামায়ণ মহাভারতই তার প্রমাণ। সেই স্বভাব-সঙ্গত আদর্শটাকে হারিয়ে আজ ভারত-নারীর প্রাণ যে ব্যথায় মূর্চ্ছিত হ'চ্ছে সেদিকে কারো চোখ নাই। নারীর প্রাণ যাকে চায়, সমাজের এমনি নিয়ম যে, কখনো সে তাকে পায় না। সে যাকে চায় না, তাকে নিয়ে কি কখনো তার সুখের ঘরে সোনার দীপ জ্বালতে পারে?”

বীণা বলিল—“আচ্ছা ভাই, লীলা, তোমার যদি কেউ নারী-বন্ধু থাকে তাহ'লে তুমি তাকে কোন্ বর দিচ্চ?”

“আমি তাকে বলবো—‘তুমি সুখী হও’ বিয়ে ক'রে উদ্বেগে যেন তোমায় কখনো ভুগতে না হয়।”

“শুনলে না, কুমার বলছেন—একালে বিয়ের যা নিয়ম তাতে সুখ আর মনের শান্তি—এ দুটো একসঙ্গে পাওয়া নারীর পক্ষে আকাশ-কুসুম। উনি চান স্বয়ম্বরকে ফিরিয়ে আনতে। তোমার নারী বন্ধুর জন্য তুমি ভাই, কোন্‌টা চাও? সেকালের স্বয়ম্বর—না একালের লোহার বেড়ী?”

লীলা বলিল—“এ প্রশ্নের উত্তর হয় না, বীণা। আমার মতটা যে ঠিক কি, তা' না হয় না-ই বল্লেম।”

কবি শশধরকে আসিতে দেখিয়া বীণা বলিল—“এই যে কবি এসেছেন। বিবাহ সম্বন্ধে ওঁর মতটা কি, শোনা যাক্। কবির কথাগুলো যেন ঠিক ঋষিবাক্য। ওঁর চোখে যা' ধরা পড়ে—আমরা তা' দেখতেই পাইনে।”

কবি একখানি চেয়ারে বসিয়া গলার কম্ফর্টারটা ভালো করিয়া জড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—“স্ত্রী আর পুরুষের একটা মিলন ঘটাচ্ছে ব'লে বিবাহটা ধর্ম্মের একটা অনুষ্ঠান মাত্র। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব'লেই দেখতে পাওয়া যায় যে, চারিদিকে ব্যভিচার ঘট্‌ছে। আবার আইন যে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধে, তাকে একটা লোকাচার ভিন্ন আর কি বল্‌বো? সমাজে যারা বিদ্রোহ ঘটাতে চায়, লোকাচারের তারাই হ'লো বড়-বড় ভক্ত। ভদ্র-সমাজে থাকতে হ'লেই মোহর-মারা একটা পাঞ্জা চাইত! কিন্তু ধর্ম্মের চোখে সেই পাঞ্জাখানার দাম কি? স্ত্রী-পুরুষের যৌনসম্বন্ধের সুখ যারা চায়, তাদের উচিত ধর্ম্মভীরু হওয়া। হাকিমের সামনে খাতায় নাম লিখিয়ে দরকার হ'লেই সে শপথটাকে অনেককেই তো ভেঙ্গে ফেল্‌তে দেখা যায়। এইজন্যই য়ুরোপের সামাজিক অবস্থাটা এত আল্‌গা।”

লীলা বলিল—“কিন্তু কবি, আমাদের দেশে হিন্দুরা ত ঠাকুর সামনে রেখে মন্ত্র প'ড়ে বিয়ে করে। এ দেশে কি বিয়ের পর ব্যভিচার নাই?”

“আছে বৈ কি। যারা সে ব্যভিচার চায়—তারা ঠাকুরকে সামনে রাখে না—বিয়ের সময় তারা সামনে রাখে মৃত ঠাকুরের কঙ্কালটা!”

লীলার কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইয়া উঠিল, সে বলিল—“যাদের বোঝবার বয়স হয়েছে, আমি ভেবেই পাইনে, তারা বিয়ে করার ভুলটাকে কেমন ক'রে বরণ করে।”

কথাটা শুনিয়া কুমার অজয়সিংহ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, একটা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য রাখিয়াই লোকে আপন আপন মত ব্যক্ত করে। শুধু একটা মতের জন্য মত-প্রকাশ—ইহা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কুমার তাই ভাবিলেন, লীলার কথার সঙ্গে নিশ্চয়ই একটা কোনো গূঢ় রহস্য জড়িত আছে। তিনি চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। ভাবিতে লাগিলেন—লীলার মতটা সত্য বলিয়া লইলেই তো বীণার মন ভাঙ্গিতে পারে! তাহা হইলে কুমার এতদিন যে আশালতাটীকে বাড়িয়েচেনে ফলে-পাতায় সুশোভিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা অবিলম্বে শুকাইয়া মরিয়া যাইবে। বীণা হয়ত আর বিবাহ করিতে রাজীই হইবে না।

আত্মরক্ষা করিবার জন্য কুমার বলিলেন—“বিদুষী বঙ্গমহিলার যা কিছু রূপ গুণ আছে, সে সবই আপনাতে দেখতে পাই। আপনারা স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়ে স্বাধীনা হ'তে চান। বিবাহের শিকলটা তাই বুঝি দুঃসহ মনে হয়? আমিও একবার কলকাতার কিছুদিন ছিলাম। সেখানকার বিলাসী-সমাজে মিশে এটা যেন দেখতে পেয়েছি—গল্পে, ভোজে, সভায়, খেলায় নারীরা স্বাধীন হ'য়ে উঠছেন। আমাদের এই পাহাড়-ঘেরা কাশ্মীরে সে হাওয়াটা আসতে পারেনি। পাহাড়ী চিত্রগুলোর মত আমরাও পাহাড়ীই আছি—তেমনি পুরাতন। অতীত ধারার সঙ্গে আমরা তেমনি ক'রেই এখনো নিজেদের যোগ রেখেছি। এই পাহাড়ের দেশে বিবাহটা যেন একখানা মধুর বিচিত্র কাব্য—ভূস্বর্গ কাশ্মীরের মতই তা সুন্দর।”

অরুণকুমার যে পুতুলটী গড়িতেছিল, তাহা প্রায় শেষ

হইয়া আসিল। স্রোতও গল্পে নানাদিকে ফিরিতে লাগিল।

বাঙ্গলার কবি ও কাব্যের আলোচনা হইতে লাগিল। সে আলোচনায় বীণা ও কবি শশধরের উৎসাহই ছিল সকলের অপেক্ষা বেশী। বীণা তাহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা পড়িয়া শুনাইতেছিল। লীলার পাশেই অরুণকুমার বসিয়াছিল। সে অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল যে, কাব্যে এমন আর একখানি চিত্র নাই। দুইদিন আগেই তো তাহারা একখানা ছবি দেখিয়াছিল; উহা যদিও স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যতটুকু প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতেই শিল্পীর প্রাণ মোহিত হইয়া যায়। চিত্রাঙ্গদাও ঠিক সেই রকম। লীলা বলিল যে, সেদিনের ছবিটা এতই অস্পষ্ট যে, সেদিন উহার কোনো মর্ম্মই ধরিতে পারে নাই। এই চিত্রাঙ্গদাও তাহার মনকে তেমন করিয়া টানে না, কারণ উহার অন্তরে অন্তরে একটা তীব্র বেদনার সুর বাজে।

অরুণকুমার লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল যে, এতদিন কি কাব্যে কি শিল্পে, অরুণের চোখে যেটুকু ভালো লাগিয়াছে, বুঝুক না বুঝুক লীলাও তাহাই ভালো বলিয়াছে। আজ চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে অন্যরূপ দেখিয়া অরুণ বিস্মিত হইল, একটু বিরক্তও হইল। আপনার অজ্ঞাতে একটু উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল—কাব্য তো দূরের কথা, তাহার চেয়েও গুরুতর ব্যাপার আছে যাহার আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু তাহার গুরুত্ব ও আকর্ষণী-শক্তিও লীলার অন্তরে স্থান পায় না।

অরুণের মন্তব্য শুনিয়া বীণাও তাহার সঙ্গেই সায় দিল। কিছুক্ষণ গল্পের পর আবার চিত্রাঙ্গদা পাঠ আরম্ভ হইল।

অরুণ লক্ষ্য করিল যে, লীলার মনে এতটুকু একটা তরঙ্গও খেলিতেছে না। সে তাহার রূপের ডালি লইয়া ফুলের মত নিরর্থক হাসিতেছে।

অরুণ মনে মনে ক্ষেপিয়া উঠিল।

অরুণ চাহে—তাহার নিজের হৃদয়ের সমস্ত ভাবগুলি লীলার অন্তরে মালার মত গাঁথিয়া দেয়, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া লীলা শুধু মৃদু মৃদু হাসে এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষীণকণ্ঠে বলে—আপনার যুক্তিগুলিও খুবই প্রবল।

এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। বীণা চিত্রাঙ্গদা পড়িতেই এত ব্যস্ত রহিল যে, লীলার দিকে তাকাইতে পারিল না। কুমার অজয় বীণার স্বর-লহরীর মধ্যে নিজের সত্ত্বাকে ডুবাইয়া দিয়া তন্ময় হইয়া রহিলেন। কবি শশধর তাঁহার চির-দুঃখিনী পরিত্যক্তা নারী সমাজের চিন্তা করিতে করিতে কোমল কুশানের উপর তন্দ্রামগ্ন হইলেন। মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া মিসেস ঘোষ আগেই ড্রইংরুম ছাড়িয়া শয়নকক্ষে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

রাত্রির ভোজনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লীলা ও অরুণে মৃদুকণ্ঠে নানা বাদানুবাদ হইল। অরুণ ধরিতে চায়, লীলা ধরাও দেয় না, পলায়নও করে না! শেষে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে অথচ একেবারেই মৃদুকণ্ঠে অরুণ কহিল —শুধু আমার মুখের ফাঁকা কথা নয়—আমার কথার সঙ্গে যে প্রাণটা গাঁথা আছে, কথার সঙ্গে তাকেও একটীবার বুঝুন। পরের প্রাণ দিয়ে যদি আপনাকে জয় করতে হয় তবে সে জয়ে আমার সুখ কোথায়, গর্ব্বই বা কোথায়?"

লীলার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একাধারে পুলক ও শঙ্কার দুইটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ খেলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই লীলা দেখিল, ঝির-ঝির করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। বৃষ্টির দিনে শ্রীনগরের পথের আর চিহ্ন থাকে না। আলস্য-বিজড়িত দেহে লীলা শুইয়া শুইয়া কাচের গায়ে বৃষ্টির পতন-শব্দ শুনিতে লাগিল।

লীলা স্থির করিল, আজ সে ডাক্তারের চিঠির উত্তর দিবে। ডাক্তারের চিঠি পাইবার পর অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, আর উত্তর না দিলে তো ভালো দেখায় না! লীলা শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রস্তুত হইল। তাহার সেদিন তিন চারিখানা চিঠি লিখিবার ছিল।

বীণা লীলার জন্য যে টেবিল সাজাইয়া রাখিয়াছিল তাহারই উপর নানা রকমের খাম ও চিঠির কাগজ ছিল। সবই মূল্যবান, সবই সুন্দর—রূপালি রং করা। হাল্কা একটা কলম লইয়া লীলা আগে ডাক্তারের কাছে লিখিতে আরম্ভ করিল। কাগজের উপর রক্তাভ কালি শুকাইবা মাত্র সোনালী নীল হইয়া ফুটিতে লাগিল। লীলা লিখিল—"বন্ধু!"

লিখিয়াই লীলা থামিল। সে একটু হাসিল। ডাক্তার

কাছে থাকিলে সে হাসি তাহার বুকে শেলের মত বিঁধিত।

লীলার মনে হইতে লাগিল, অমন কাগজখানার উপর 'বন্ধু' সম্ভাষণটা যেন কেমন বিশ্রী দেখাইতেছে। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত না লিখিয়া সে শুধু জানালার দিকেই চাহিয়া রহিল।

ক্রমে কাগজখানার চারি পৃষ্ঠাই পূর্ণ হইয়া উঠিল। লীলা লিখিল অনেক, কিন্তু কিছুই সে লিখিল না। যাহা লিখিলে হতভাগ্য ডাক্তার চিঠিখানাকে গলার মালা করিতে পারিত তাহার কোন-কিছুই চিঠিতে রহিল না।

পত্রগুলি লেখা শেষ হইলে পর লীলা ডাক্তারের চিঠিখানা সাবধানে ওভারকোর্টের পকেটে লুকাইয়া রাখিয়া আর তিনখানা চিঠি হাতে লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। ভাবিল, ডাক্তারের চিঠি সে নিজেই কোনো একটা ডাক-বাক্সে ফেলিয়া দিবে।

নীচে আসিয়াই লীলা দেখিল, অরুণ বসিয়া আছে এবং বীণার শারদ-লক্ষ্মীর মূর্ত্তিটী লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছে। অরুণ বুঝিল যে, লীলার দুই চোখে হাসি ফুটিয়াছে, কিন্তু মুখখানা বড় ভাবশূন্য—কেমন যেন এক রকমের। ডাকে দিবার জন্য তিনখানা চিঠি একখানি চাঁদির রেকাবের উপর রাখিয়া লীলা বীণার পাশে বসিল।

বহু পূর্ব্বেই বৃষ্টি ধরিয়া রৌদ্র ফুটিয়াছিল। কিছুক্ষণ নানা কথা-বার্ত্তার পর বীণা বলিল—"আজ বৃষ্টির পর চকচকে রোদ দেখে বাইরে বেরুতে ই'চ্ছে হ'চ্ছে।"

অরুণ তাড়াতাড়ি কহিল—"আমি তো সেইজন্যই এসেছি। আজ তো তোমরা অনন্ত নাগ দেখতে যাবে বলেছিলে ?"

বীণা বলিল—"তুমি না হয় লীলাকে সেখানে নিয়ে যাও, অরুণ-দা। আমার আর এ বেলা অবসর হ'চ্ছে না। আমার ঝর্ণার এক রাশি প্রুফ এসে প'ড়ে আছে। ছাপাখানার তাগিদের উপর তাগিদ। আজ খানিকটা না পাঠাইলেই নয়। অরুণদা, তুমি সেদিন বলেছিলে, ঝর্ণার একখানা প্রচ্ছদপট এঁকে দেবে। তা' মনে আছে ত ?"

অরুণ হাসিয়া কহিল—"সে কথা কি শুধু মনে ক'রে রেখেই নিরস্ত হয়েছি ? দু'তিন রকম ক'রে ছবিও এঁকে ফেলেছি। তার একখানাও পছন্দ হচ্ছে না ব'লে আনিনি।"

উল্লাসে বীণা বলিল—"আজ বিকালে তবে এনো। তোমার মত শিল্পীর চোখে যা নিখুঁত হ'চ্ছে না, তাই দেখেই আমরা মুগ্ধ হ'য়ে উঠব।"

লীলা দাঁড়াইয়া কহিল—"তুমি ভাই নিরিবিলি তোমার প্রুফ কাটাকাটি কর। আমরা একটু বেড়িয়ে আসি, সেই অবসরে। ওই প্রুফ দেখার জ্বালার জন্যই তো বই লিখি নে।" লীলা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

হাসিতে হাসিতে বীণা বলিল—"যা বলেছ। আমার আবার কেমন হয় জান ? প্রুফ দেখতে বসলেই অনেক নূতন লেখা কলমের মুখে বেরিয়ে আসে। ছাপাখানার লোকেরা তাই বিরক্ত হ'য়ে ওঠে।"

অরুণ হাসিয়া বলিল—"কবিরা চায় রূপ। রূপের কি শেষ আছে ? বেচারা কম্পোজিটারেরা তো তা বোঝে না, তাই গড়া-জিনিষ রোজ রোজই ভাঙ্গতে হয় দেখে তারা বিরক্ত হ'য়ে ওঠে।"

বৃষ্টির পর রৌদ্র। বেশ ঝকঝকে বেশ চকচকে। ফুলে পাতায়, পাহাড়ে তুষারে—জলে স্থলে যেখানে পড়িয়াছে সেইখানেই জ্বলিতেছে। শ্রীনগর যেন আনন্দে ঝলমল করিতেছে। পথে যাইতে যাইতে লীলা দুই চক্ষে যাহা দেখিতে লাগিল তাহারই প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তনাগ মন্দিরের কাছে আসিয়া অরুণ বলিল—"ওই যে মন্দির, ওরই নাম অনন্তনাগ। আমি যখনই কাশ্মীরে আসি অনন্তনাগ না দেখে যাইনে। এই মন্দিরের দিকে চাইলেই মনে হয়, প্রাচীন তার জীর্ণতা নিয়ে যেন স'রে যাচ্ছে আর যায়গা নিচ্ছে নূতন এসে। মন্দিরটার বাহিরের কুলুঙ্গিতে ওই যে কয়েকটা নাগ-নাগিনীর মূর্ত্তি আছে, ভাস্করের চোখে ওরা অমূল্য। ঐতিহাসিকের কাছেও ওদের অনেক দাম।

অরুণকুমার লীলার কাছে অনন্তনাগ মন্দিরের মূর্ত্তি-শিল্পের পরিচয় দিতে লাগিল।

মন্দিরের একটা পাশ দেখিয়া আর এক পাশে যাইবার সময় লীলা দেখিল, একটী সন্ন্যাসীর ছবির নীচেই লোহার শিকলের সঙ্গে ডাক-বাক্স ঝুলিতেছে। চিঠির বাক্স দেখিয়াই ডাক্তারের চিঠির কথা লীলার মনে পড়িয়া

গেল। লীলা চিঠিখানা বাহির করিয়া বাক্সে ফেলিল।

অরুণ ইহা দেখিল।

অরুণের মনে হইল যেন হঠাৎ বুকের ভিতর সূচীমুখ শলাকা বিঁধিল! অরুণ কথা কহিতে চাহিল, হাসিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। প্রতি মুহূর্ত্তেই সে চোখের সম্মুখে দেখিতে লাগিল লীলার হাতে গন্ধমাখানো খামে একখানা চিঠি। আজ প্রভাতেই তো অরুণ লীলার তিনখানা চিঠি শঙ্খকুটীরে দেখিয়া আসিয়াছে। ডাকে দিবার জন্য সেগুলি একখানা রেকাবের উপর ছিল। প্রভাতে লীলা নিজেই সেগুলি সেখানে রাখিয়াছিল। তবে এই চিঠিখানা সে এতক্ষণ বুকে করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল কেন?

এই 'কেন'র একটা উত্তর অরুণকুমার মনে মনে অনুমান করিয়া লইল। তবে কি লীলার অন্তরঙ্গ বন্ধু আর কেহ আছে? তাহা না থাকিলে, লীলা এই চিঠিখানা গোপন করিবে কেন?

অরুণকে হঠাৎ এমন নির্ব্বাক্‌ ও বিষাদ-মলিন হইতে দেখিয়া লীলা মনে মনে বিস্মিত হইল।

সেদিনের মত অনন্তনাগ মন্দির-দর্শন শেষ হইয়া গেল।

অরুণ আবিষ্টের মত বলিল—"তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা কথা আছে, লীলা।"

"আমার সঙ্গে?"

"হাঁ। পাঁচ নম্বর পোল আলিকদলের পারে জুম্মা মস্‌জেদের সামনে আমি কাল বিকালে পাঁচটায় অপেক্ষা করবো।"

লীলা এ কথার কোনো উত্তর দিল না।

অরুণও আর সেখানে দাঁড়াইল না।

(ক্রমশঃ)

কাজী

(মীর আব্দুল হক বিরচিত পারস্য ভাষায় লিখিত কবিতার ইংরাজী অনুবাদ * হইতে)

[শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ]

জর্জ্জিয়া হ'তে এল একজন বেড়াতে মোদের সহরে,
ইচ্ছা হ'ল তা'র হইবে সে কাজী,
সুবাদার নহে কোন মতে রাজী,
গর্দ্দভ একটি ঘুষ দিয়া শেষে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে,
সুতরাং দেখ দাদা,
না হইত কাজী যদি ইহলোকে না থাকিত কোন গাধা।

---

* ইংরাজী অনুবাদটী শতবর্ষ পূর্ব্বে কাপ্তেন ডি-এল-রিচার্ডসন সম্পাদিত 'বেঙ্গল আনুয়্যাল' নামক বার্ষিকীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্মৃতিরেখা

[স্যর শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একটু ভ্রম-সংশোধন প্রয়োজন। পূর্ব্ব সংখ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে লিখিয়াছি—"গ্রামের পাশেই রড়া পারে তাঁহার মাতুলাশ্রম পাতুল—মাতামহ শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি ইত্যাদি, ইহা ভ্রম। আমাদের স্বগ্রামবাসী সুলেখক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন ঘোষ মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া আমায় জানাইয়াছেন যে, 'পাতুল' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃ-মাতুলালয় ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি তাঁহার মাতৃ-মাতুলাত্মীয় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় 'তাঁহার মাতার সহিত পাতুলে আসিয়া বহু সময় থাকিতেন। এ ভ্রম সংশোধনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এরূপ ভ্রম কাহারও চক্ষে পড়িলে, জানাইলে আমি নিতান্ত বাধিত হইব।

রাধানগরের স্মরণযোগ্য আর একটা কথা বলিয়া এ পর্য্যায় শেষ করিব। তখন আমি সংস্কৃত কলেজের যদু পণ্ডিত মহাশয়ের ঘরে পড়ি। দাদামহাশয়ের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া বাবা ও জ্যাঠামহাশয় সকলে বাটী গিয়াছেন। কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষক সকলেই জ্যাঠা-মহাশয়ের নিতান্ত সহৃদয় বন্ধু। অধ্যক্ষের পিতা কেমন আছেন, এ কথা সকলেই নিত্য আগ্রহ সহকারে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন। জ্যাঠামহাশয়ের পাল্কী করিয়া রোজ কলেজে যাই—হঠাৎ যেন একটা পদবৃদ্ধি ও গৌরববৃদ্ধি হইয়া গেল। সকলকে দাদামহাশয়ের সংবাদ প্রত্যহ দিতে হয়। একদিন হঠাৎ সংবাদ আসিল, "গোপীনাথে"র সম্মুখে পবিত্র বৈষ্ণবপ্রার্থিত কদম-খণ্ডির শ্মশান-ভূমিতে সব শেষ হইয়া গিয়াছে। অধ্যক্ষের দারুণ পিতৃশোকে সমস্ত কলেজ মুহ্যমান। শ্রাদ্ধের দিন নিকট হইয়া আসিলে আমাদের সঙ্গে চলিলেন—প্রথিতনামা পূজ্যপাদ তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, জগন্মোহন তর্কালঙ্কার এবং সংস্কৃত কলেজের আরও কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ইঁহাদের সঙ্গে লইবার বিশেষ কারণ জন্মিয়াছিল। দেশে তখন দলাদলির ভীষণ প্রকোপ। রঘুনাথপুরের তরুণ-বয়স্ক জমিদার রায়বাবুরা ঘোষণা দিয়াছিলেন, যে, লাঠিয়াল সাহায্যে এই সমারোহের শ্রাদ্ধ পণ্ড করিবেন, কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও ব্রাহ্মণদিগকে নদীপার হইয়া আসিতে দিবেন না। অতএব এই সকল পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া যাওয়াই সিদ্ধান্ত হইল এবং সকল সরঞ্জামই কলিকাতা হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়া রূপার দানসাগর শ্রাদ্ধের আয়োজন হইল। আমিও সে ষোলজনের একজন হইবার অধিকার পাইয়া বড় গৌরব অনুভব করিয়াছিলাম।

বাটীর সম্মুখে বিস্তীর্ণ মাঠে আটচালা নয় 'আঠার চালা' তোলা হইয়াছিল। যে সকল অধ্যাপকদের নাম করিলাম, তাঁহারা হইলেন বেদীর ব্রতী। রায় বাবুদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণ-ভোজন ও দশ হাজার কাঙ্গালী-বিদায় হইল। কলিকাতা হইতে পিতা, পিতৃব্যগণের কত বড় বড় বন্ধু গিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। বর্ষা-শেষে যথেষ্ট কাঠের জোগাড় হইবে কি না ভাবিয়া দুই নৌকা পাথরে-কয়লা লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বড় বড় 'ডোব' ও 'জোল' কাটিয়া ভিয়ান ও রান্নার উনান প্রস্তুত হইল। কয়লার অঙ্কুশ পাইয়া কুলোকে রটনা করিল, সর্ব্বাধিকারী বাটীর লুচি কলে ভাজা হইবে। একজন রসজ্ঞ বিদূষক রটনা করিলেন যে, বড় বড় কড়ায় গভীর ঘৃত-সমুদ্রে লুচি ডুবিয়া যাওয়াতে হঠাৎ যেমন ক্রন্দনের রোল উঠিল, লুচি ফুলিয়া ভাসিয়া ওঠাতে ক্রন্দনের রোল তেমন আনন্দরোলে পরিণত হইল। নিয়মভঙ্গ দিনে দেওয়ান অম্বিকা দত্ত মহাশয়কে বাধ্য হইয়া শবের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনিও 'পেছপাও' হইবার লোক নহেন। বৃষকাঠ পুঁতিবার

আধঘণ্টা পর পর্য্যন্ত তিনি "রাধাসায়রের" মাঝ-জলে নিস্পন্দ দেহে ভাসিয়াছিলেন

কোনও গোলোযোগ না হইয়া বৃহৎ কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। 'তষ্টিরাম' তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিল—আমিও কলেজের রামায়ণের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

নির্ব্বিবাদে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার তলে একটু রহস্য ছিল। 'জাহানাবাদে'র (আরামবাগ) সুযোগ্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় গোলোযোগ সম্ভাবনার সংবাদ পাইয়া রত্নাকর(কানা নদী) তীরে তাঁবু ফেলেন। সঙ্গে ছিল বারজন অস্ত্রধারী পাহারাওয়ালা, ছয় জোড়া হাতকড়ী ও একটা ক্যাম্প (camp) কয়েদ। ইহার পর আর কি গোলোযোগ সম্ভবে! ব্রাহ্মণভোজনের দক্ষিণা ছিল এক টাকা। ক্যাম্প (camp) কয়েদ লইয়া একটা কৌতুককর ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমার এক পিসামহাশয় ছিলেন শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিত্র মহাশয়। তিনি বহুবাজার ডাক্তারখানার জিম্মায় থাকিতেন,—বিশেষ রঙ্গপ্রিয় ব্যক্তি। আর এক পিসামহাশয় ছিলেন—এক খুল্লপিতামহের জামাতা। তিনি রাধানগরের বাটীতেই থাকিতেন, আহারের সময় পীঁড়া বাঁকা করিয়া পাতিয়া তাঁহাকে অপমানের ইঙ্গিত করা হইয়াছে কি না তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন এবং সম্ভ্রম-অসম্ভ্রমের বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন

প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত ইঁহাদেরও শয়নের স্থান হইয়াছিল। কেদারবাবু ছিলেন সৌখীন. শয্যা ও বসন সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ পারিপাট্য ছিল। সেসব তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। সে পারিপাট্য অপর পিসামহাশয় সহ্য করিতে পারিতেন না। একদিন কেদারবাবুর বিছানা দখল করিয়া ছোট পিসামহাশয় তাঁহাকে জব্দ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। কেদারবাবুও প্রতিশোধ দিতে সিদ্ধহস্ত। তিনি হাওলদারকে সংবাদ দিয়া আসিলেন, ছোট পিসামহাশয়ের মত চেহারার লোক তাঁহার রূপা বাঁধান হুঁকা চুরি করিয়াছে। সেদিন ছোট পিসামহাশয়কে আর কেদারবাবুর সুকোমল শয্যায় রাত্রি যাপন করিতে হয় নাই। ক্যাম্প (camp) গারদে মাটীর উপর খড় বিছাইয়া রজনী শেষ করিতে হইয়াছিল। জ্যাঠা মহাশয় এ সকল 'অশ্বক্রীড়ার' বিশেষ বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া ডিস্পেন্সারির (dispensary) কাজের অছিলায়, কেদারবাবু অতি প্রত্যুষেই রাধানগর ত্যাগ করেন। তখন নিয়ম-ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

এত বড় সংসার এই ভাবে চলিত। এত বড় সমারোহ কাজ হইয়া গেল অথচ চাকরবাকর লোকজন ঝি চাকরাণীর মূর্ত্তি ও দ্বন্দ্ব আমার স্মৃতির তহবিলে বড় দেখিতে পাই নাই। এখনকার মত স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো এমন পঙ্গু ছিলেন না। যাহার যাহা সাধ্য সকল কার্য্য নিজ হাতে করিতেন। নিতান্ত কষ্টকর হইলে কাজেই ঝি চাকরের ব্যবস্থা ছিল। নতুবা এই এত বড় সংসারের কাজের জন্য হাল প্রণালীর মত ব্যবস্থা করিতে হইলে চাকর-চাকরাণীর একটা ফৌজ দরকার হইত। এখনকার মত এক এক বাবুর এক এক ঘর, এক এক পড়িবার ঘর, বসিবার ঘর ইত্যাদি প্রয়োজন হইলে সমস্ত গ্রামেও পরিবার-বর্গের সঙ্কুলান হওয়া দুঃসাধ্য হইত। এক এক ঘরে 'গড়া-গড়া'—দেওয়াল হইতে দেওয়াল পর্য্যন্ত মানুষ শুইয়া থাকিত। নিজেদের কাপড়-চোপড়ের ভার নিজেরাই লইতেন। লম্বা দালানে সারি সারি পিঁড়া পাতিয়া সকলেরই এক সময় ভোজন হইত। এ বাবুর এখন, ও বাবুর তখন, এ বাবুর গরম গরম লুচি, ও বাবুর খড়খড়ে রুটী—এ সকল আধুনিক ব্যবস্থা ছিল না। যেমন এক সঙ্গে 'গড়া-গড়া' শোওয়া তেমন এক সঙ্গে খাওয়া,—'সাদা মাঠা' এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কোনও পিসি কিম্বা খুড়ি এক পাতায় ভাত মাখিয়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের খাওয়াইয়া দিতেন। অনেক সময় সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এ কার্য্য সমাধা হইত; কারণ, খাওয়ার দালানে আলোর আড়ম্বর খুব প্রচুর ছিল না।

খিড়কিতে বাসন মাজিবার স্বতন্ত্র পুষ্করিণী ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর মেয়েরা সেই ঘাটে বাসন ফেলিয়া আসিতেন ও পর দিন সকালে মাজিয়া আনিতেন। পানীয় জল যে যাহার তুলিয়া আনিতেন। এখনকার মত দু'বেলা এক একজন মেয়ের পাঁচ সাত খানা কাপড়, সেমিজ—কাপড়ের ভারে ঝি চাকরাণী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত না। সে সকলও তাঁহাদের নিজের নিজের জিম্মা। রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, কুটনোর ঘর, বাটনার ঘর সকলই তাঁহাদের জিম্মা। কেবল মাছ কোটা, উঠানের কার্য্য ইত্যাদি বিষয়েই বাগ্দি বৌ তাঁহাদের সাহায্য করিত। বাধ্য

হইয়া যদি কখনও ঝি-চাকরাণীর দ্বারা বাসন মাজাইতে হইত, তবে তাহা রকের উপরে উপুড় করিয়া রাখিয়া যাইতে হইত। গৃহিণীরা তাহা আবার অন্য জলে ধুইয়া ঘরে তুলিতেন। ছেলেরা, বাবুরা সব স্নানের ঘাটে যে যার নিজের গামছা কাপড় কাচিয়া আনিতেন; কেবল বাবা ও জ্যাঠামহাশয়ের কাপড় দাদামহাশয়ের অজ্ঞাতসারে 'ধর্ম্মা চাকর' কাচিয়া দিত। ধোপার বাটী হইতে কাপড় আসিলে তাহা আবার জলকাচা না করিয়া ঘরে তোলা হইত না। কাহার সাধ্য যে নূতন প্রচলিত মাড় দেওয়া বিলাতী কাপড় লইয়া ঠাকুর-দালানে উঠে! বাটীর সক্ষম-দেহ ছেলেপুলেরা, ঘোষেদের বাড়ীর কালী, করালী অম্বিকা দত্তর ভ্রাতুষ্পুত্র বিনোদ, আচূ ইত্যাদির সাহায্যে সকল কাজ সম্পন্ন হইত। এমন রিপাবলিক্ (Republican) সার্ভিস্ কখনও দেখি নাই। খাওয়া-দাওয়া যেমন সাদাসিধা, জল খাওয়াও তাই। আজকাল ভাইটামিনের (vitamine) নানা প্রসঙ্গ শুনিতেছি। পল্লীভবনে সে তত্ত্ব তখন বহুদিন নির্ণীত হইয়া গিয়াছে। "মেছনিকফের" (Metchincoff) বহু পূর্ব্বে দধির মর্য্যাদা করিতে শিখিয়াছিলাম। গুড়-মুড়ি, নারকেল-মুড়ি, মুলো-মুড়ি, শশা-মুড়ি বহু আদরের ছিল। রাধানগর হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া জ্ঞানোদয়ে শিখিলাম যে, মুড়ির চাক্, ছোলার চাক্ খাইতে নাই; এবং নবীন ময়রার কচুরি, সিঙ্গাড়া, জিলাপী খাইয়া অজীর্ণ রোগের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন না করিতে পারিলে সভ্যতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া যায় না।

এ সকল বিষয়ে রাধানগর সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহা মাতুলালয় বামুনপাড়া সম্বন্ধেও সর্ব্বথা প্রযোজ্য। রাধানগরের কথা আপাততঃ এক প্রকার শেষ করিলাম। যাহা যাহা বলিলাম তাহা যে ধারাবাহিক সময়ানুক্রমিক বলিতে পারিয়াছি তাহা নয়, তবে এক স্থানের কথা এক জায়গায় বলিতে পারিলে ভাল হয় বলিয়াই বলিয়াছি।

ইহার বহুকাল পরে তিন চারি বার মাত্র রাধানগর যাইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। রায় বাবুদের মামলার কমিশন জবানবন্দি করাইবার সময় একবার যাই। একবার যাই আততায়ী প্রতিবেশীর হস্ত হইতে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিমন্দির সংক্রান্ত জমির উদ্ধার করিবার জন্য হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট "মোবর্লি" (moberly) সাহেবকে সঙ্গে লইয়া। তৃতীয় বার যাই আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সূতিকাগারে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর পঞ্চদশ অধিবেশন উপলক্ষে। পরবার বোধ হয় শেষ বার দেশে যাওয়া হইয়াছিল ইং ১৯২৮ সালের এপ্রেল মাসে, স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্রবধূ দেশের বড় মাতা দয়াবতী গোলাপসুন্দরী দেবীর দাতব্য চিকিৎসালয়-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে তাঁহারই আমন্ত্রিত রূপে। দেশের সহৃদয় যুবকগণের সহৃদয়তায় কৃষ্ণনগর বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী-সভায় ও কৃষ্ণনগর রমাপ্রসাদ পাব্লিক লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসবে অনেক আপ্যায়ন আদর ও অভিনন্দন পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। এইরূপ পর পর ইদানিং যতবার গিয়াছি গোলডস্মিথের "ডেসার্টেড ভিলেজ" (Goldsmith's Deserted Village)-এর চিত্র চক্ষে জাগিয়া উঠিয়াছে, প্রাণে ব্যথা দিয়াছে এবং ভবিষ্যতের আশাও নষ্ট করিয়াছে। বান ও ম্যালেরিয়ায় দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে—দেশকে দেশ উজাড় করিয়াছে—চাষ-বাস ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট করিয়াছে—বিদ্যাপীঠ সকলকে নিষ্প্রভ করিয়াছে। আমাদের বাটীর দ্বিতল, ত্রিতল, চৌতল ভূমিসাৎ হইয়াছে। কষ্টে-সৃষ্টে দাঁড়াইয়া আছে রাধাকান্ত জিউর মন্দির ও চকমিলান আঙ্গিনা এবং জ্ঞাতি-গণের মধ্যে যাঁহারা এখনও রাধাকান্ত দেবের পূজার সাহায্য করিতেছেন তাঁহাদের কোনও প্রকারে কায়-ক্লেশে বাসোপযোগী দুই একটা মহাল। দেশের পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের বাটী এবং অন্যান্য অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির বাড়ী একেবারে ধূলিসাৎ হইয়াছে, চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। নদীর দুই ধারে সকল গ্রামেই অসংখ্য দেউল ও দেবালয় ছিল। বৈষ্ণব, শাক্ত, শিবপূজার স্থান অধিকাংশ ভগ্ন হইয়াছে, পূজা-পদ্ধতিও বন্ধ হইয়াছে। কলিকাতা হইতে যাতায়াতের কোনও সুবিধা না থাকাতে ইচ্ছা সত্ত্বেও দেশে যাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষের সহায়তায় যাতায়াতের কথঞ্চিৎ সুবিধার জন্য ও বন্যা এবং ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াছি, চেষ্টা সফল হয় নাই।

সম্প্রতি হাওয়া ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে। চাষবাসের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

অভিরামের শাপাভিশপ্ত কানাকে চক্ষুদান দিবার জন্য বহুদিন পরে কথঞ্চিৎ চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও সুবিধা সম্ভব নহে। কারণ, বন্যার জল নাকি অন্য পথ লইয়াছে। যে বন্যার প্রতিকারের জন্য এত দিন চেষ্টা হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্য পথ লওয়াতে নদী একেবারে জলশূন্য হওয়া সম্ভব এবং নৌকা-পথে যাতায়াত হয়তো একেবারে বন্ধ হইবে। আমাদের এত যত্নে আরব্ধ রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-মন্দির নানা কারণে এখনও শেষ হইতেছে না। শীঘ্র রাজার মৃত্যুর শতবার্ষিক স্মৃতি-সভার আয়োজন দেশে বিদেশে হইবে। সভ্য জগতের সকল দেশে সে মহীয়ান স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হইবে। কিন্তু বড় সাধের "রাধানগর" বোধ হয় থাকিবে "যে তিমিরে সে তিমিরে"। রাধাকান্ত-চরণাবিন্দ-দর্শন সৌভাগ্য আর জীবনে ঘটিয়া উঠিবে বলিয়া আশা করিতে ভরসা হয় না।

—"যদ্ বিধের্মনসি স্থিতম্"।

বামুনপাড়া

মাতুলালয় 'বামুনপাড়া'য় শৈশবে, বাল্যে ও কৈশোরে বহুবার গিয়াছি। মাতুলালয়েই জন্ম, সেখান হইতে কবে প্রথম কলিকাতা গিয়াছিলাম, কিছুমাত্র স্মরণ নাই। যে বৎসর রাধানগরে 'শরৎরাস' ও সরস্বতী পূজার কথা বলিয়াছি সেই বৎসর 'রাশফুল' ও সরস্বতী পূজার "চাঁদমালা"র সম্ভার লইয়া দুলে বেহারার কাঁধে দশ ক্রোশ মেঠো পথ ভাঙ্গিয়া রাজার মত রাধানগর হইতে বামুনপাড়া আসিবার কথা মনে আছে। বামুনপাড়ার স্মৃতিরেখার সূত্রপাত এইখানেই। যতদুর মনে পড়ে 'বড় নদী' অর্থাৎ "দামোদর" পার হইতে হইয়াছিল। জল তখন খুব কম; বেহারারা হাঁটিয়াই পার হইয়াছিল। এই পথেই একটা প্রকাণ্ড দীঘির ধারে অশ্বত্থ-বটের ঘন অন্ধকার ছায়ায় বসিয়া জলযোগ হইয়াছিল। যখন বঙ্কিমচন্দ্রের কালীদীঘির কথা পরে পড়িলাম, তখন এই দীঘির কথা মনে পড়িল। পিতামহের আদর হইতে মাতামহের আদরে আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু এত আদরের মধ্যেও মাতার শাসন ও মাতামহের রাস-ভারীর কৃপায় মাথা খাওয়া হইল না। পিতামহের নিজ হস্তে কাটিয়া দেওয়া খাগড়ার কলমে 'কাগজে লেখার' পাণ্ডিত্যের দাবী বামুনপাড়ায় নামঞ্জুর হইল। গুরুমহাশয়ের নিকট তালপাতা, কলাপাতা আবার লিখিতে হইল। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ বাবা কলিকাতা হইতে পাঠাইয়া দিলেন নূতন আবিষ্কৃত সেলেট পেন্সিল, সঙ্গে সঙ্গে গেল "বোটক্লোক" নামে আখ্যাত গলায় পিতলের শিকল বক্লশ্ দেওয়া ছিটের অভিনব গাত্র-বস্ত্র।

শ্রীদাম ও সুদামের পীঠবস্ত্রের মত তাহা পীঠের উপর দিয়া গলার শিকল ও আংটা সাহায্যে আট্‌কান থাকিত। এই অপূর্ব্ব গাত্রবস্ত্রের চলন আমি আর বড় দেখি নাই। দেখিয়াছিলাম একবার ১৯১২ সালে 'ক্যালে' (Calais) হইতে 'ডোবর' (Dovar) পার হইবার সময় 'চ্যানেল-ষ্টিমারে' (Channel steamer) নাবিকের গাত্রে। তাহা দেখিয়া বামুনপাড়ার 'বোটক্লোকের' কথা মনে পড়িয়াছিল। তবে সে গাত্রবস্ত্র ছিটের নয় ওয়াটারপ্রুফের। আমার বামুনপাড়া পৌঁছিবার কুড়িদিন পূর্ব্বে আমার জ্যেষ্ঠাভগ্নী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবা কত কি জিনিষ পাঠাইয়াছিলেন দেখি নাই। ভীমনাগের জোড়া রাতাবি সন্দেশ, কলসী অথবা পিণ্ডিখেজুর এবং বেদানা, কিস্‌মিস্, পেস্তা, মনাক্কা ইত্যাদি। পিতামহের ন্যায় মাতামহেরও বিতরণ-রোগ খুব প্রবল ছিল। উভয়ের কেহই দ্বিতীয় পক্ষের সংসার সত্ত্বেও অন্তঃপুর-প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। রাতাবী ও খেজুরের বিতরণ ও বণ্টন বাহিরে বাহিরেই হইয়া গেল। বণ্টনাংশ খুব প্রচুর করিয়া পাইয়াছিলাম বলিয়া মনে তো পড়ে না। কানের পূজ নিবারণের জন্য চন্দনের আতর গিয়াছে শুনিয়া, জ্ঞাতি-মাতুল মহেশ মামা একটা প্রকাণ্ড 'গয়ার খোরা' লইয়া একটু আতর লইতে আসিয়াছিলেন।

এই রহস্যপ্রিয় মহেশ মামার নিজ ভাগিনেয় গোপাল ঘোষ হইল আমার খেলার ও পড়ার সহচর। কলিকাতার আমদানি সেলেট-পেন্সিলের মাতব্বরিতে আমার তালপাত কলাপাতের দাসত্ব ঘুচিল। এক ক্রোশ দূরে মাঠাপার রামেশ্বরপুরে তখন এক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন হইয়াছে। ইংরাজি ও বাঙ্গালা পড়া হয়। শিশুবোধকের কলঙ্কভঞ্জন ও দাতাকর্ণ ছাড়িয়া আধুনিক রুচি ও প্রণালী সঙ্গত পাঠ্য-

পুস্তকের দাসত্ব আরম্ভ হইল। ভাল কি মন্দ হইল বলিতে পারি নাই ও এখনও ভাল বুঝিতে পারি নাই। শিশুবোধকে ছিল না হেন বস্তু নাই। বইখানির একটা নূতন সংস্করণ করিয়া পাঠশালে, স্কুলে চালাইতে পারিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সম্ভাবনা। চাণক্য শ্লোকের অংশটা রাধানগরে সংস্কৃত পরিচয়ের পর বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল। চার পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আট নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কলিকাতা রাধানগর, বামুনপাড়া যাতায়াতের মধ্যে খাপ-ছাড়া রকমে ইংরাজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের সহিত অল্প-বিস্তর পরিচয় ঘটিতেছিল। সে ভিত্তি ভাল হউক মন্দ হউক, তাহারই উপর ভবিষ্যৎ শিক্ষা দীক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বামুনপাড়ায় তিনজন সংস্কৃত ব্যবসায়ীর সহিত পরিচয়-সৌভাগ্য ঘটিয়া ধন্য ও উপকৃত হইয়াছিলাম এবং সেই সৌভাগ্যে রাধানগরে প্রথম অনুভূত সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি পায়। গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় বহু বৎসর পরে বঙ্গদেশের সংস্কৃত চর্চ্চার প্রসার, সংস্করণ ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে এক কমিটী স্থাপিত হয়। সে কমিটীর সভাপতিত্বের সম্মানও এই অযোগ্য হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। নানা বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও ফলও বোধ হয় কিছু হইয়াছে। পরিণত জীবনে এই গুরুভার বহনের সময় রাধানগর ও বামুনপাড়ায় স্থাপিত সেই ভিত্তির কথা অনেকবার মনে পড়িয়াছিল।

এই তিনজনের পরিচয় পরে দিব। বাবা যেমন সেলেট-পেন্সিল পাঠাইয়াছিলেন, তেমনই মাঠ ভাঙ্গিয়া রামেশ্বরপুর স্কুল যাইবার জন্য একটা ছাতাও পাঠাইয়াছিলেন। পল্লীগ্রামে ছাতার ব্যবহার ছিল না; ছিল 'টোকা' ও 'পেখে'। অতএব অচিরে স্কুলে একছত্র আধিপত্যের অসম্ভাব হইল না। চেয়াড়ি দিয়া বোনা জলপানের কৌটা ছাতার শিকে টাঙ্গাইয়া লইয়া যাওয়ার কথা মনে পড়ে। খাবার যাহাই থাক সাথী সহ মিশিয়া মিশাইয়া খাওয়া-দাওয়াতেই অত্যন্ত আনন্দ হইত। ছোট, বড়, মাঝারী ক্যারিয়ার (carrier), পট্ (pot), কৌটা, টীন (Tin), অ্যালুমিনাম্ (Alluminium), এনামেল (Enamelled), পীতল, তামা, দস্তা, নিকেল (Nickelled), ফিল্‌ড্ (Field), প্লেট্ (Plate) কত হরবিরু প্রকারই এখন হইয়াছে। খাবার কৌটার পদবৃদ্ধি খোরাক বৃদ্ধি ও খাইখিলানের সাধের উচ্ছেদই সাধিয়াছে। সে আনন্দ আজ সুদূরে। ত্বরিৎ পদবৃদ্ধির একটা সুযোগ উপস্থিত হইল! 'দঁক' ভাঙ্গিয়া দীঘির 'টেঁশো' গরম জল খাওয়ার কথা স্নেহময় মাতামহের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। তিনি চার পাঁচটা মাটীর কলসী স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন; একজন মালীর ব্যবস্থাও হইল। "অচ্ছোদ্ সরোবর" হইতে নিত্য পানীয় সংগৃহীত হইয়া সহপাঠীগণের পিপাসা নিবারণ হইল। মাতামহের কৃপায় এক পল্লীমোদক কণ্বঋষির পুণ্য তপোবনের বটচ্ছায়ায় মুড়কী, মোয়া, ভেঁটের নাড়ু প্রভৃতির দোকান লইয়া বসিল। আমারও প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল।

সময়ের ঘণ্টা ঘড়ী পিটিয়া জানানর শব্দ এই শুনিলাম; এখন পর্য্যন্ত মনে আছে। সকাল ইস্কুল! ভোরের হাওয়া মাখিয়া, বিদ্যালয়ে আসিয়াই জানিলাম দিনের আরম্ভ; সূর্য্যোদয়! প্রভাত ছ'টা। হেম-দীপ্তির অভ্যুদয় অন্তরে বিঘোষিত হইল।

রামেশ্বরপুরের স্কুলে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মৃগী-রোগ ছিল। একদিন জলখাবার ছুটীর সময়, স্কুলের উঁচু দাওয়া হইতে তিনি হঠাৎ ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। সে-সময়ে রামেশ্বরপুরে 'কমল কণ্ঠাভরণ' নামে একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ বাস করিতেন। আমার "কণ্ব তপোবনের" অদূরেই তাঁহার বাসস্থান। সেই তপোবনের পথ ধরিয়া 'পড়ি কি মরি' করিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলাম। এই "রেড ক্রস" (Red cross) ভলাণ্টিয়ার (Volunteer) বা 'স্কাউটোচি'ত (Scout) ক্ষিপ্রতায় তিনি পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার চিকিৎসা ও আমাদের সেবায় পণ্ডিত মহাশয় শীঘ্র সুস্থ হইলেন। এই উপলক্ষে কবিরাজ মহাশয়ের নিকট আনুগত্য আমার খুব বাড়িয়া গেল। এইরূপ 'ছোটখাটো' 'খুটিনাটি' কাজের মধ্য দিয়া লোকসেবা ও সমাজসেবার প্রবৃত্তি বর্দ্ধন সম্বন্ধে আশৈশব এই সকল মহাজনের যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়া ধন্য হইয়াছি। মাতামহের বাটীতে কণ্ঠাভরণ মহাশয়ের সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল। তাঁহার নাম ও চেহারাটা আমার খুব ভাল লাগিত; কিন্তু দূর হইতেই নমস্কার করিতাম। এবার এই আর্ত্ত-সেবা উপলক্ষে নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার আমাদের যথেষ্ট কারণ ছিল। পিতৃদেব তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা

করিতেন। আলোপ্যাথিক চিকিৎসায় হার মানিবার পর চির-রুগ্ন ও চির-বিজয়ী ভ্রাতা সুরেশপ্রসাদের ভগ্নস্বাস্থ্য, কথঞ্চিৎ লাভ করিবার প্রধান হেতু "কমল কণ্ঠাভরণ" মহাশয়। সুরেশের জন্ম-কথা অতি বিচিত্র। পিণ্ডাকারে, মৃত-কল্প 'আটাশে শিশু' কোনও অপরিপক্কবুদ্ধি পল্লী-গৃহিণীর প্ররোচনায় ফেলিয়া দেওয়াই সিদ্ধান্তপ্রায় হইয়াছিল। স্থির-বুদ্ধি পল্লীধাত্রী 'বাগ্দি মেয়ের' জেদে সে সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পায় নাই। তাহার যত্ন ও শুশ্রূষায় লুপ্তজ্ঞানপ্রায় পিণ্ডের জ্ঞানোদয় হয়। সে উদয় জ্ঞানে ও কর্ম্মে ও চারিত্র্যে একটা উজ্জ্বল প্রভা রাখিয়া গিয়াছে। শরীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাশাস্ত্রকে আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত করিয়া আধখানা মাত্র ফুসফুসের সাহায্যে এই ক্ষীণ দেহ, মহা-প্রাণ, বিশালহৃদয় বীর জীবনে মহা কাজ করিবার যথেষ্ট অবকাশ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। "কণ্ঠাভরণ" মহাশয় বৈদ্যশাস্ত্রে যেরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন তাঁহার সংস্কৃতানুরাগও ছিল সেইরূপ। রাধানগরের উপেন্দ্র (কবিরত্ন) কবিরাজ মহাশয়ও বিশিষ্ট কবিরাজ ছিলেন। ব্যাকরণ, কাব্য ও আয়ুর্ব্বেদে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, উন্নত রুচির মৌলিক রসিকতায় সিদ্ধমুখ।

কার্ত্তিক মাসে এই সময় নিয়ম-সেবা উপলক্ষে, গোঁসাই মালপাড়া গ্রাম নিবাসী ঋষিকল্প, প্রবীণ, পরম ভাগবত একজন গোস্বামী প্রতি বৎসর আসিতেন। মাতামহের ঠাকুর-দালানে সমস্ত কার্ত্তিক মাস ধরিয়া প্রাতে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং অপরাহ্নে কথকতা হইত। মুগ্ধচিত্তে শত শত নর-নারী ও বালক-বালিকা, পাঠ ও কথকতা শুনিত। গোস্বামী মহাশয়ের পাঠ শুনিয়া "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী" কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলাম। সেরূপ সুন্দর পাঠ শুনিবার সৌভাগ্য জীবনে আর ঘটে নাই। শৈশবোচিত উৎসাহ ও অনুরাগ ইহার জন্য দায়ী কি না বলিতে পারি না, কিন্তু মনের উপর তখনকার সে ছাপ এখনও মুছে নাই। তাঁহার কথকতায় সঙ্গীতোচ্ছ্বাস, অঙ্গভঙ্গি ও মুদ্রাদোষ ছিল না। ব্যাখ্যামুখে গল্পচ্ছলে সরল প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কেবল অনাবিল "তত্ত্ব-কথা" ; নর-নারী শিশু প্রৌঢ় সকলের মনের পরতে পরতে সে "কথা" বসিয়া যাইত। এইরূপ পাঠ ও কথকতা সাহায্যে পল্লী ও নগরবাসী শত শত নর-নারীর যথার্থ উচ্চ শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা যত দিন ছিল, আছে ও থাকিবে ততদিন অক্ষর-পরিচয়ের অভাব বলিয়া তাহাদিগকে অশিক্ষিত বা 'ইললিটারেট' (illiterate) বলা কোনও মতেই চলিবে না।

নর-নারী অভেদে এইরূপ অকাতরে বিতরিত নৈতিক, পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক রহস্যের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ লইয়া প্রাচীন বৈষ্ণব কবি ও নবীন সবুজ কবি রহস্যের আস্বাদনে ধন্য হইয়াছে ; কত গীতাঞ্জলি সে-স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। সরকারী আদমসুমারি রিপোর্টের (Report) 'পারসেণ্টেজ' (Percentage) করিয়া এ উচ্চ শিক্ষার পরিমাণ হয় না ও হওয়া সম্ভব নয়। এই 'গোস্বামী মহাশয়ের' নাম ও 'কমল কণ্ঠাভরণ' মহাশয়ের পূরা নাম ভুলিয়া গিয়াছি। তাহাতে কখনও কিছু আসিয়া যায় না, কারণ আমার নিকটে তাঁহারা 'নাম' বা 'ব্যক্তি' নহেন, চির-অক্ষুণ্ণ ভাবব্যক্তি, আইডিয়ালিজেশন (idealisation) ও আদর্শ। সে-স্মৃতি চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই উভয়ের কৃপায় সংস্কৃত-সাহিত্যানুরাগ ও শাস্ত্র-চর্চ্চার আস্থা এই সময়েই বদ্ধমূল হয়। আর একজনের অনুগ্রহও এই সময় পাইয়াছিলাম। নদীর পরপারস্থিত ঘুরুল গ্রামের শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি জ্যোতিষী মহাশয় মাতামহের নিকট নিত্য যাতায়াত করিতেন। পুরাতন শ্রীরামপুর পাঁজীর ছাপা একাদশীর ন্যায় ছিল তাঁহার চেহারা। দীর্ঘ কেশ, দীর্ঘ নাশা, দীর্ঘতর শিখা ও সেই নাসাগ্রে দড়ি দিয়া বাঁধা পরকোলার ভগ্নাংশ তাহার শ্রীবর্দ্ধন করিত। রং একটু খারাপ হইলে তিনি 'গজপতি বিদ্যা-দিগ্‌গজ'এর ভূমিকা গ্রহণ করিলে অসুন্দর হইত না।

একটা বড় কৌতুকজনক সাহিত্যিক স্মৃতি-বিভ্রাট ঘটিতেছে ; বিদ্যাদিগ্‌গজের কথায় সে কথা মনে পড়িল। বীরেন্দ্র সিংহের দুর্গের অর্দ্ধাধিক অংশ রাধানগরে, অপরাংশ বামুনপাড়া মাতুলালয়ে। এ বিসদৃশ কল্পনার সামঞ্জস্য কখনও করিতে পারিলাম না। মাতামহের অন্দর বাটী হইতে বিমলা অভিসারে চলিয়াছে আর বাহির-বাটীতে মাতামহের গোলবারাণ্ডায় বীরেন্দ্রসিংহ ও অভিরাম স্বামীর কথোপকথন ও পরামর্শ চলিয়াছে। অদ্ভুত ব্যাপার! গোলবারাণ্ডার কথা পরে বলিব। গোলবারাণ্ডা বড় ভাল লাগিত। গোলবারাণ্ডাও গিয়াছে, লম্বা বারাণ্ডাও গিয়াছে,

বাটীও গিয়াছে,—আছে শুধু স্মৃতি! তাহাই অবলম্বন করিয়া ও রাজা 'রাজেন্দ্রলাল মিত্রের' 'বৈদ্যনাথধামের' "আর্কেডিয়া" বাটীর গোলবারাণ্ডার অনুকরণে, মধুপুর বাটীতে অনেক ব্যয়ে গোলবারাণ্ডা সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছি। পিতৃদেব শেষ পীড়ার সময় মধুপুরে ছিলেন, সেইখানেই তাঁহার কাল হয়। সেই গোলবারাণ্ডায় হাঁটিয়া ও ঠেলা গাড়ী করিয়া বেড়াইতে বড় আনন্দবোধ করিতেন।

আবার কথার গোলমাল করিয়া ফেলিলাম—কোথা হইতে কোথা আসিয়া পড়িলাম! চূড়ামণি মহাশয় ছিলেন "কলাপ ব্যাকরণ"এ পণ্ডিত। দুই চারিটা শ্লোক বুঝাইয়া দিলেন—মুখস্থ করাইয়া দিলেন। মাতামহ পুলকিত,—'মা' মাসিরা ততোধিক। জ্যাঠা মহাশয় ও বিদ্যাসাগর মহাশয় হাঁটিয়া এই পথে কখনও কখনও 'কলিকাতা'হইতে 'রাধানগরে' যাইতেন ; রাত্রে বামুনপাড়ায় থাকিতেন। গল্প শুনিয়াছি—একবার ঘাটে নৌকা না পাওয়ায় তাঁহারা সাঁতরাইয়া দামোদর পার হইয়াছিলেন। আর একবার পথে তাঁহাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের প্রয়োজন হয়। অবশ্য সুপাচক "বিদ্যাসাগর" মহাশয়ের হস্তে পথের পাক-কার্য্যের ভার ছিল। উপকরণের মধ্যে পথের পাশের ক্ষেতের 'মূলা-শাক' ও "বোগড়া চাউল"। তাহাই অমৃত তুল্য বোধ হওয়াতে বাটী পৌঁছিয়াই উভয়ে "মূলাশাক সড়সড়ি" ফরমায়েস করেন, কিন্তু তেমন অমৃতস্বাদ পাওয়া গেল না। রন্ধয়িত্রী আত্মীয়ারা বুঝাইয়া দিলেন যে, পথের মাঝে যে ক্ষুধায় মূলাশাক অমৃতস্বাদ হইয়াছিল, বাটীতে তাহার অভাবে সে স্বাদেরও ব্যতিক্রম হইতেছে। জ্যাঠা মহাশয় সর্ব্বদা এ গল্পের উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে উপদেশ দিতেন, যে, স্বাস্থ্য-পরিচায়ক ক্ষুধা থাকিলে নুন-ভাতও অমৃততুল্য হয়। বাবা সর্ব্বদা বন্ধু-বান্ধবকে বলিতেন যে, ছেলেপুলেকে জ্যাঠা মহাশয়ের এই আদর্শে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন, যেন 'জেলেও' তাহাদের কষ্ট না হয়। তখন জেলের পথ এখনকার মত সুপরিসরও ছিল না, সুখকরও ছিল না। অতিথিবৎসল ও কুটুম্ববৎসল মাতামহ রামকৃষ্ণ সরকার মহাশয়, "বিদ্যাসাগর" ও জ্যাঠা মহাশয়কে কত আদর আপ্যায়নে তুষিতেন তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয় ; রাধানগর হইতে ফিরিবার পথে একবার কলাপ-বিদ্যার দৌড় দেখিয়া রামেশ্বরপুর হইতে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে উন্নীত হইবার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে হইয়া গেল। আর হইয়া গেল, কলেজে প্রবেশের প্রথম সোপান স্বরূপ সোনার পুঁঠেয় বাঁধা দীর্ঘ কেশরাশির কাকপক্ষের কর্ত্তন। আমার ঘুমন্ত অবস্থায় জ্যাঠা মহাশয় স্বহস্তে সে কার্য্য করেন। কারণ 'প্রসাদপুরের বাবার' মানত কেশ 'নরসুন্দরের' স্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না। অতএব কাহারও কোনও কথা বলিবার রহিল না। ঘুম ভাঙ্গিলে অনেক কাঁদিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়াছিলেন পরম স্নেহার্দ্রচিত্ত মাতামহ। কার্ত্তিক শেষে নিয়ম-সেবা উপলক্ষে মহোৎসবান্তে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যখন গড়াগড়ি দিতাম, মাতামহ গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া কোলে লইয়া নাচিতেন আর সেই পুঁঠের তালে তালে গাহিতেন,—'এই আমার গোরা এসেছে'।

সংস্কৃত ব্যবসায়ী না হইলেও দাদা মহাশয়ের জমাদার সুব্রাহ্মণ রামস্বরূপ উপাধ্যায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় অনেক আধভাঙ্গা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইত। পঞ্চাননতলার দীঘির দক্ষিণে তাঁহার খোড়ো বাড়ীর ঠাকুর-ঘরে বিস্তর দেবদেবী সংগৃহীত হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে প্রধান "মহাবীর"। উপাধ্যায় সুর করিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিতেন, আমি তদ্গতচিত্ত হইয়া শুনিতাম। মাতামহের কুলদেবতা "শ্রীধরজীউ" পঙ্খের কাজ-করা দ্বিতল দেউলে অধিষ্ঠান করিতেন। পূজারী গণেশ চক্রবর্ত্তী মামা পূজায় ও স্তবে এত মাহাত্ম্য বিকিরণ করিতে পারিতেন না।

রামস্বরূপ মামার ঠাকুরঘরের দাওয়ায় যাইয়া বসিয়া থাকিবার আর একটী কারণ ও প্রলোভন ছিল। "বামুনপাড়া" গ্রামের অনতিদূরে "মাজুর" ও "হাট বলরামপুর" গ্রামে মাতামহের হাট ও বাজার বসিত। তোলা তুলিবার মালিক ছিলেন রামস্বরূপ উপাধ্যায়। অতএব তাঁহার উপাস্য হনুমানজীর প্রসাদ-সম্ভারের আয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। আর তিনি তাহা অকাতরে বণ্টনও করিতেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীধরজীউর সমস্ত প্রসাদই গামছায় বাঁধিয়া নদী-পারে ঘোষাল বাটী গ্রামে লইয়া যাইতেন। উপাধ্যায় মামার ঠাকুর-ঘরের পাশে ছিল আর এক আকর্ষণের বস্তু। সেই সময় একজন বিখ্যাত "পোটো" বামুনপাড়ায় আসে। মাতামহের দশ বারো খানা পাল্কী তৈয়ার হইতেছিল।

একখানা বরের বড় পাল্কী ও আর একখানা তাঞ্জাম ছিল। সেইগুলি রং করাই ছিল সে পোটোর প্রধান

কাজ। অবসর-সময় সে বাসায় বসিয়া নিখুঁত ভাবে আঁকিত দেবদেবীর ছবি আর তন্ময় হইয়া দেখিতাম সেই তুলিকাসঙ্কার ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। কতরকমের কত দেবতার কত ছবি; কত পৌরাণিক আখ্যায়িকা যে, সে পোটো আঁকিত তাহার ইয়ত্তা নাই।

'সূর্য্যমুখীর' গৃহ-ভিত্তি-গাত্রে তাহার অনেকগুলি টাঙ্গাইয়া দিয়াছি। 'বিষবৃক্ষ' সম্বন্ধে এই বামুনপাড়ার বাড়ী বারম্বার মনে পড়িতেছে, তাহার একটা বিশেষ কারণ অনুভব হয়। বামুনপাড়ার অদূরে * * * গ্রামে * * * * সিংহ নামে একজন প্রতিষ্ঠাবান ও ধনী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; তাঁহার দুই স্ত্রী। একজন বিষপানে প্রাণ ত্যাগ করেন; ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মে বাহাল থাকিলেও তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। বোধ হয় এ ঘটনা সাহিত্যিক বাল্যস্মৃতিকে কল্পনাভূষিত করিতে অনেক সাহায্য করিয়াছে। এ পোটোর বাড়ী কোথা ছিল জানি নাই। পরে শুনিয়াছি যে, আমাদের রাধানগরের পাশে 'সোনাটীকরী' ও 'উদয়পুর' গ্রামে অনেক প্রসিদ্ধ পোটো বাস করিত। অবশেষ কিছু এখনও আছে, "খেলানোর" পটও আছে। কিন্তু দেশ জনশূন্য প্রায়, রুচি বিকৃত, পটুয়ারাও বৃত্তি বদল করিয়াছে। সে যুগের চিত্র-শিল্পের ইতিহাস হিসাবে এইরূপ পটের সংগ্রহ, শিক্ষা ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে হওয়া গৌরবজনক। আমাদের সোনাটীকরীর এই পটুয়ারা খুব লম্বা পটে নিপুণ ও নিখুঁত ভাবে এক একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা মায় অবস্থান ও প্রকৃতি চিত্রে বিবৃত করিতেন। 'রামায়ণ' 'মহাভারত' 'ভাগবত' প্রভৃতি হইতে এই সকল আখ্যায়িকা সংগৃহীত হইত এবং চিত্রের পর চিত্র হইতে আখ্যায়িকার মর্ম্ম গ্রহণ হইত। মোটা সুতার থান তৈল-রাঙ্গ জমি করিয়া ও চিত্রিত করিয়া উভয় প্রান্তে গোল কাঠের ডাণ্ডা আঁটিয়া এই সকল পট খোলা ও গুড়ান হইত এবং খেলানও হইত। পট খেলাইতে খেলাইতে ডমরুর তালে তালে, সুর-সংযোগে চিত্রকর চিত্রমর্ম্ম বিবৃত করিত। বহুকাল পরে যখন 'উত্তররামচরিতে' আলেখ্য-দর্শন-কাহিনী পাঠ করি তখন এই পট খেলানোর কথা মনে পড়িয়াছিল। সোনাটীকরীর পাশেই রাধানগর! তথাপি সেখানে এ পট খেলানা দেখার কথা মনে পড়ে না, কিন্তু বামুনপাড়ায় তাহা দেখিয়াছি। আজকাল বায়স্কোপ ও ও ফিল্‌মস্‌ সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। এই আলেখ্য প্রদর্শন, পূর্ব্বে আমাদের পল্লী-সমাজে 'বায়োস্কোপ' (Bioscope) ও 'ফিল্‌ম'সের (Films) স্থান অধিকার করিত। সাধারণ লোকশিক্ষার এই উপকরণ পল্লী-সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়াছে।

বায়োস্কোপ দেখিয়া এখন অনেকে 'চুরি-ডাকাতি', 'খুন-খারাপি' ও চরিত্রহীনতার শিক্ষা পায়। আমাদের পাড়াগাঁয়ের ডাণ্ডা জড়ানো এই পটে অন্ততঃ সে ভয়টা ছিল না। ব্যয় ছিল মুষ্টি ভিক্ষা ও দুই একটা পয়সা। পট দেখার সঙ্কট ও ঝকমারি ছিল না। কলিকাতা অঞ্চলের অনেকেই পট খেলানার এ কথা কখনও শোনেন নাই।

শ্রীচৈতন্যের ব্রহ্ম-নিরূপণ

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার বি-এল]

(১) চতুঃশ্লোকী

বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীচৈতন্য, ভাগবত-পুরাণের "চতুঃশ্লোকী"র নিদর্শন অনুসারে বেদান্ত দর্শনের ব্রহ্মবাদ নিরূপণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য চতুঃশ্লোকী জিনিসটা কি তাহা সর্ব্বাগ্রে নিরূপণ করা প্রয়োজন।

ব্যাকরণশাস্ত্র অনুসারে যেমন পাঁচটী বট বৃক্ষের একত্র সমাহারকে বলে পঞ্চবটী, তেমনি চারিটী বিশেষ শ্লোকের একত্র সমাহারকে বলে চতুঃশ্লোকী। একত্র সমাহৃত যে চারিটী বিশেষ শ্লোক ভাগবতের চতুঃশ্লোকী নামে বিখ্যাত, সেই চারিটী শ্লোক ভাগবত-পুরাণের দ্বিতীয় স্কন্দের ৭ম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ভাগবতের ঐ চারিটী শ্লোক যেমন চতুঃশ্লোকী নামে বিখ্যাত, বেদান্ত-দর্শনের প্রথম চারিটী সূত্রও তেমনই চতুঃসূত্রী নামে প্রসিদ্ধ এবং বেদান্তের চতুঃসূত্রীর প্রসিদ্ধি লাভ করিবার কারণ হইতেছে এই যে, ঐ চারিটী সূত্রের মধ্যেই সমগ্র বেদান্ত-দর্শনের সারভূত সংক্ষিপ্ত অর্থ নিহিত হইয়াছে। অবিকল সেই কারণেই ভাগবতের চতুঃশ্লোকীও প্রসিদ্ধ। সমগ্র ভাগবতের সারভূত মর্ম্মবাণী ঐ চারিটী শ্লোকের মধ্যেই সুরক্ষিত হইয়াছে। তাহাই হইতেছে ভাগবতরূপ মহাবৃক্ষের আদিম বীজ-কোষ। তাহারই মধ্যেই ভাগবতের বিবিধ ও বিস্তৃত কথা ও কাহিনীসকলের চরম তত্ত্ব নিহিত হইয়াছে। এই চতুঃশ্লোকী সম্বন্ধে ভাগবতে এক বিস্তারিত পৌরাণিক বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একদা প্রজাপতি ব্রহ্মার উপর শ্রীভগবান্ সদয় হইয়া তাঁহাকে এই চতুশ্লোকী দান করিয়া বলিয়াছিলেন—

> এতন্মতং সমাশ্রিত্য পরমেণ সমাধিনা।
> ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন মুহ্যতি কর্হিচিৎ॥

—অর্থাৎ, ভগবান্ বলিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনাকে আমি এই চারিটী শ্লোকের দ্বারা যে মত বলিলাম, আপনি সেই মতের পরম সমাধিযোগে সম্যক্‌রূপে অবস্থিত হউন। তাহা হইলে কল্পবিকল্প ও আপনি কদাচিৎ মোহপ্রাপ্ত হইবেন না।

কোন সময়ে ব্রহ্মা আবার নারদের উপর পরিতুষ্ট হইয়া, ঐ চতুঃশ্লোকী নারদকে প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন—"ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণং"—ইহাই হইতেছে (বিস্তৃতভাবে) দশলক্ষণযুক্ত ভাগবত-পুরাণ।

তাহার পরে দ্বাপরের শেষে, বেদব্যাস মহাভারতাদি গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া, একদা ব্রহ্মনদী সরস্বতী-তীরে, "বদরীষণ্ড-মণ্ডিত," শম্যাপ্রাশ নামক আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার মনে এক ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি লোকহিতার্থ যে বিপুল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থের মধ্যে,—তাঁহার মনে হইতেছিল,—কোথায় কি যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে সেখানে নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসের চিত্ত-ক্ষোভের কারণ অবগত হইয়া নারদ তাঁহাকে চতুঃশ্লোকী দান করিয়া চলিয়া গেলেন।

ব্যাস এই চতুঃশ্লোকীর অর্থ ধ্যান করিতে করিতে —"অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ব্বং মায়াঞ্চ তদুপাশ্রিতাং"—আদি পুরুষকে এবং সেই আদিপুরুষাশ্রিত মায়াকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। এইরূপে ব্যাস পরম সমাধিযোগে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—"লোকস্যাজানতঃ বিদ্বান্ চক্রে সাত্বত-সংহিতা"—অজ্ঞ লোকের জন্য তাহাই ভাগবত-সংহিতা রূপে পরিণত করিলেন।

অতএব যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ হইতেছে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও ভক্তিযোগের ব্যাস-প্রচারিত আদিম সুসমাচার, এই চতুঃশ্লোকী হইতেছে সেই সুসমাচারের সারভূত মর্ম্মবাণী এবং যে পরম তত্ত্বকে ব্যাস সমাধির মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া গ্রন্থাকারে বিস্তৃত করিয়াছিলেন,—নদীয়ার শ্রীচৈতন্য সেই পরম তত্ত্বের সাধনাকে দুর্লভ ভক্তিযোগের মধ্য দিয়া আপামর সাধারণকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন—

ভববরিঞ্চিবাঞ্ছিত যে ধন জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙাল পাইয়া, খাইয়া, নাচিয়া, বাজাইল করতালি॥

অতএব মহাপ্রভুর ধর্ম্ম যে শুধুই গোলেমালে হরিবোল, এ কথা কেহই মনে করিবেন না। প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে,মহাপ্রভু তাঁহার অলৌকিক ভক্তিযোগকে এক বিচিত্র জ্ঞানযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞানযোগের মর্ম্মই হইতেছে ভক্তিযোগের প্রাণস্বরূপ এবং আমরা দেখিতে পাই যখনই যে-কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তিযোগের এই প্রাণ উপেক্ষিত ও উপরুদ্ধ হইয়াছে, সেইখানেই ধর্ম্মের কায়া পচিয়া উঠিয়া বীভৎস-রূপ ধারণ করিয়াছে।

আবার আমরা দেখিতে পাই সরস্বতী-তীরে বদরী-বৃক্ষমূলে ব্যাস যেমন ধ্যান-যোগে পরম তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তেমনই একদা নৈরঞ্জনাতীরে বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধ ভগবান্‌ও চরম সত্যকে পরম সমাধিযোগে প্রত্যক্ষ করিয়া, নির্ব্বাণধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণ ধর্ম্ম ও ব্যাসের ভাগবত-ধর্ম্ম এক নহে। কিন্তু সেজন্য দুঃখ করিবার কোনই কারণ নাই। কারণ, পরম সত্য, কোন দেশকালেই আবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ সত্য নহে,—তাহা ভূমা স্বরূপ, বিরাট্, ব্যাপক ও অনন্ত। কোন দিক্ দিয়াই মানুষের বুদ্ধি তাহাকে সম্পূর্ণ ইয়ত্তা করিতে পারে না! ভূমা কোন তন্ত্রের বাঁধনেই বাঁধা পড়েন না। তাই বোধ হয় ভাগবতে আছে, মা যশোদা কৃষ্ণকে যে দড়ি দিয়াই বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন সেই দড়িই দু'আঙ্গুল ছোট পড়িয়াছিল। ভূমার অসীম ব্যাপকতার মধ্যে ব্যাস ও বুদ্ধ দুজনেরই অবসর আছে! তাই সেকালের উদার বৈষ্ণব দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহার ব্যাপক কিছুই এক দেশে ও এক কালে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই জয়দেব গোস্বামী অকুণ্ঠিতচিত্তে গাহিয়াছিলেন—"কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে"। কিন্তু আজ বৈষ্ণবগণের সে উদারতা নাই। নিজেদের মধ্যেই খুটীনাটী লইয়া বিষম হানাহানি ও দলাদলি করিয়া তাঁহারা মহাপ্রভুর উদার ধর্ম্মকে পদে পদে কুণ্ঠিত ও লাঞ্ছিত করিতেছেন

(২) সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ

বেদান্তের চতুঃসূত্রীর মধ্যে যে সূত্রটী ব্রহ্মনিরূপণ করিতেছে সে সূত্রটী হইতেছে—"জন্মাদ্যস্য যত ইতি" অর্থাৎ যাহা হইতে এই বিশ্বের জন্ম বা উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার দ্বারা এই বিশ্ব জীবিত রহিয়াছে এবং যাহাতে এই বিশ্বের লয় হইবে তাহাই ব্রহ্ম। অতঃপর প্রশ্ন উঠিয়াছে, বেদান্ত যাহাকে এইরূপে জগৎ-কারণ ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন—সেই ব্রহ্ম স্বরূপতঃ কি বস্তু। শঙ্করাচার্য্য এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন স্বরূপতঃ ও মুখ্যতঃ ব্রহ্ম হইতেছেন এক নিরাকার ও নির্ব্বিকার তত্ত্ব। তাহা বাক্য-মনের অগোচর, তাহা নেতি-নেতি-স্বরূপ বা জাগতিক কোন কিছুরই মতন নহে, তাহার কোনই কার্য্য নাই, কোনই কারণ নাই, তাহা হানোপাদন-শূন্য; সেইজন্য তাহাকে ভাল-মন্দ কিছুই বলা যায় না। তাহা অ-প্রাণ ও অ-মন, তাহার প্রাণ-মন নাই, তাহার পাণিপাদ নাই, তাহা অশরীরী, তাহার রূপ রসাদি কোনই বিশেষ গুণ নাই, এক কথায় তাহা অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত এক অজাগতিক তত্ত্ব। এই মতে ব্রহ্ম সমস্ত বিশেষ গুণ বর্জ্জিত তত্ত্ব বলিয়া, ইহার নাম নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বাদ।

শ্রীচৈতন্য বলেন,জগৎ-কারণ ব্রহ্ম এইরূপ এক নিরুপাধি নির্ব্বিশেষ তত্ত্বমাত্র নহেন। কিন্তু তিনি হইতেছেন একজন সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় বিশেষ পুরুষ (personality)। ব্রহ্ম যে এইরূপ একজন সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় সবিশেষ পুরুষ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইতেছে, ভাগবতের চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোক। সেই শ্লোক এই:—

অহমেবাসমেবাগ্রে, নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং সদেতচ্চ, যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

—ইহার অর্থ হইতেছে, আমিই অগ্রে ছিলাম, এবং এই সৃষ্টিতে স্থূল সূক্ষ্ম অপর যাহা দেখিতেছ তাহা ছিল না। তাহার পরে সৃষ্টিতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও আমি, এবং প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি।—ইহা হইতে শ্রীচৈতন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—

'অহমেব,' 'অহমেব,' শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহের স্থির নির্দ্ধার॥

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন—বেদান্তের চতুঃসূত্রী যেমন

ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া বলিয়াছেন, জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ হইতেছে ব্রহ্ম, সেইরূপ ভাগবতের চতুঃশ্লোকীও ব্রহ্মনিরূপণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন—এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ ব্রহ্ম এবং চতুঃশ্লোকী সেই কারণকে এক অহং পদবাচ্য পুরুষ বলিয়া বলিতেছেন, কেন না যিনি একজন "অহং" তিনি অবশ্যই কোন না কোন বিগ্রহ ও উপাধিবান্ পুরুষ এবং তিনি কেবলমাত্র এক নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব মাত্র নহেন। শ্লোকে তিনবার "অহমেব" শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় ব্রহ্ম যে এক সবিশেষ তত্ত্ব তদ্বিষয়ে আর কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই।

ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥

শ্রীভগবানের বিগ্রহ বলিতে কেহ যেন তাহা মাটী-গড়া কাঠাম' মাত্র না মনে করেন। এ বিগ্রহ বলিতে ভগবানের আনন্দময় পূর্ণৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, শুদ্ধ, বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ঐশ প্রকৃতি বুঝাইয়া থাকে। যোগদর্শনে এই ঐশ প্রকৃতিই ঈশ্বরের "প্রকৃষ্ট সত্ত্ব-উপাদান" নামে অভিহিত হইয়াছে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য ইহাকে ঈশ্বরের "কারণ উপাধি" নাম দিয়াছেন। "কার্য্যোপাধিঃ অয়ং জীবঃ কারণোপাধিস্ত ঈশ্বরঃ"—জীবের উপাধি বা চিত্ত-সত্তা ও বিগ্রহ হইতেছে, কার্য্য বা সৃষ্ট-উপাধি এবং ঈশ্বরের উপাধি হইতেছে অসৃষ্ট বা কারণ-উপাধি।

এইখানে কিন্তু এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্ম যদি সবিশেষ পুরুষরূপেই প্রকৃতপক্ষে বেদান্তে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকেন, তবে তাহার সহিত উপনিষদের নির্ব্বিশেষ শ্রুতির সামঞ্জস্য হইতে পারে কিরূপে? শঙ্করাচার্য্য যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বাদ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রুতির প্রমাণ অনুসারেই স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম যে 'নেতি-নেতি-স্বরূপ,' 'অ-বাঙ্-মনসগোচর,' 'অ-শরীরী,' 'অ-মন' প্রভৃতি ইহা শঙ্করের উক্তি নহে, শ্রুতিরই উক্তি।

প্রাচীন উক্তি বৈষ্ণব গ্রন্থে খুঁজিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য এই জটিল প্রশ্নের তিনটী উত্তর দিয়াছিলেন। সেই তিনটী উত্তরের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে,"নদীয়ার অবতার," শুধুই ভক্তিরাজ্যের সম্রাট্ ছিলেন না, কিন্তু জ্ঞান ও মুক্তি-রাজ্যেও তাঁহার অসীম অধিকার ছিল। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার হেতুবাদকে বর্ত্তমান যুগের দার্শনিক-নিকষে কষিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যায়, তাহা একেবারে খাঁটি জিনিস—তাহা শুধুই স্তোকবাক্য বা বিতণ্ডা-মাত্র নহে।

(৩) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদের মীমাংসা

কবি কর্ণপূর চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক লিখিয়াছেন। কর্ণপূর তখন অবশ্যই ছেলেমানুষ,—নাও জন্মিয়া থাকিতে পারেন,—যখন চৈতন্যের সহিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বেদান্ত-বিচার হইয়াছিল। কিন্তু শিবানন্দ সেনের সেই ছোট ছেলেটীর, ছেলেবেলা হইতেই চৈতন্য-তত্ত্ব জানিবার জন্য যে প্রবল আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি যে বড় হইয়া সার্ব্বভৌম ঠাকুরের নিকট ঐ বিচারের সমগ্র মর্ম্ম আদায় করিয়া লইয়াছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কবি কর্ণপূর বলিতেছেন—শ্রীচৈতন্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে প্রথম বলিয়াছিলেন—

যা যা শ্রুতি জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাম্
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

ইহার অর্থ হইতেছে—যে যে শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া জল্পনা করিতেছে, সেই সেই শ্রুতিই আবার ব্রহ্মকে সবিশেষ বলিয়া বলিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে, বিচারযোগে অবস্থিত হইলে শ্রুতি সকলের সবিশেষ ব্রহ্মবাদ বলবান্ হইয়া থাকে।

একই শ্রুতি যে ব্রহ্মকে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ দুই রূপে জল্পনা করিতেছেন ইহার উদাহরণ যথা, তৈত্তিরীয় শ্রুতি—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

এই শ্রুতির প্রথম চরণ ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছে এবং তাহার অর্থ হইতেছে, যাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর। আবার এই শ্রুতিরই দ্বিতীয় চরণ বলিতেছে, "সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জানিয়াছেন তিনি আর কিছুতেই ভয় পান না।" চৈতন্যের

মতে এই চরণ সবিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপাদক, কারণ এই চরণ বলিতেছে ব্রহ্ম একান্ত পক্ষে অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত তত্ত্ব নহেন; কিন্তু তিনি আনন্দময়, এবং তাহার আনন্দকে জীবের কদাচিৎ জানিবারও অধিকার আছে।

আরও একটী উদাহরণ যথা—

অপাণিপাদো, জবনো গ্রহীতা—
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ॥

—তাহার অর্থ, তিনি পাণিপাদরহিত অথচ দ্রুতগমনশীল ও গ্রহণ করিতে সমর্থ; তাঁহার চক্ষু নাই অথচ দেখিতে পান; কর্ণ নাই অথচ শুনিতে পান। বলা বাহুল্য, যে-ব্রহ্ম পাণিপাদরহিত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়হীন তিনি অবশ্যই নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। অথচ যাহা দূরে চলে, গ্রহণ করে, দর্শন ও শ্রবণ করে তাহা একান্ত পক্ষে অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত, বাক্য মনের অতীত তত্ত্ব নহে, তাহা অবশ্যই বিশেষ-গুণসম্পন্ন এক বিশেষ পুরুষ।

এইরূপ আরও ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন, শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ দুই রূপেই বলিতেছেন, তখন বিচারযোগে অবস্থিত হইলে শ্রুতির সবিশেষবাদই বলবান্ হয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিচার ও সূক্ষ্ম ন্যায় অনুসারে ধরিতে গেলে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদের মধ্যে সবিশেষ ব্রহ্মবাদই ন্যায় অনুসারে বলবান্। কেন বলবান্,—ইহার যুক্তি চৈতন্যের উক্তি হইতে খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়োজন নাই,—তাহার অকাট্য যুক্তি বর্ত্তমান যুগের দার্শনিক সম্রাট্ হেগেলের ন্যায়দর্শন (Logic) হইতে আমরা তুলিয়া দিতেছি।

সকলেই জানেন যে, ইউরোপখণ্ডেও এক প্রকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বাদ দার্শনিক-সমাজে প্রচলিত আছে এবং ক্যান্ট-প্রমুখ মনীষিবর্গ অবধারণ করিয়াছিলেন যে, চরম সত্যতত্ত্ব হইতেছে এক অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত এবং অনবধারিত (undetermined) তত্ত্ব। হেগেল সেই অজ্ঞেয়বাদ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"An entirely undetermined Being is no Being at all : it is nothing. There is nothing perceivable in it, there is nothing thinkable in it, therefore it is as good as nothing, and neither more nor less than nothing. If you say that the ultimate reality, which is an undetermined Being, is as good as nothing, then according to your confession, it should be all the same whether you do exist or do not exist, whether you possess a hundred dollars or do not possess a hundred dollars.…But certainly your undetermined Being is not wholly undetermined. It has at least the attribute of being thought about or guessed at. And the possession of a single attribute turns the undetermined Essence into a determined Being. *

অর্থাৎ—যাহা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয়, অজ্ঞাত, তাহার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব একই কথা। যদি বল পরমতত্ত্বের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব একই কথা,—তবে আমার বাঁচিয়া থাকা এবং না বাঁচিয়া থাকাও একই কথা হওয়া উচিত এবং আমার এক শত মুদ্রা থাকা এবং একশত মুদ্রা না থাকা একই কথা হওয়া উচিত।……ফল কথা, তোমার অচিন্ত্য তত্ত্ব বাস্তবিকপক্ষে সর্ব্বথা অচিন্ত্য তত্ত্ব নহেন। তাহা যদি হইত, তবে সেই অচিন্ত্যতত্ত্ব তোমার চিন্তায় আসিলেন কিরূপে? সেই নির্ব্বিশেষ ও অচিন্ত্যতত্ত্বের অন্ততঃ পক্ষে এই বিশেষ গুণটী আছে যে, তাহা চিন্তাযোগ্য বা অনুমানযোগ্য একটী তত্ত্ব এবং যাহার একটী মাত্রও বিশেষ গুণ আছে তাহা আর নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব রহিল না, তাহা সবিশেষ তত্ত্ব হইয়া গেল।

শ্রীচৈতন্য যে বলিয়াছিলেন, বিচারযোগে অবস্থিত হইলে সবিশেষ ব্রহ্মবাদই বলবান্ হয়, সেই উক্তির অনুকূলে উদ্ধৃত হেগেল-বাদ হইতে আর কি বলবতী যুক্তি হইতে পারে? শ্রীচৈতন্য এই যুক্তির অনুকূলে আরও দেখাইয়াছিলেন—বেদান্ত-দর্শন যে সূত্রের দ্বারা জগদ্-কারণ ব্রহ্ম-নিরূপণ করিয়াছিলেন, সেই সূত্রের দ্বারাই সবিশেষ ব্রহ্ম সাব্যস্ত হইতেছে, এবং এক নির্ব্বিশেষ, অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত ব্রহ্ম সাব্যস্ত হইতেছে না। যথা চরিতামৃতে—

ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবের।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥

---

* Works, III, pp. 73—97.

অপাদান, করণ, অধিকরণ, কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥

এই হইল তাঁর প্রথম উত্তর। তাঁহার দ্বিতীয় উত্তর এই—যদিও বিচারযোগে সবিশেষ ব্রহ্মবাদই বলবান্ হয়, তথাপি নির্ব্বিশেষ শ্রুতিসকল অর্থহীন শ্রুতি নহে। তাহাদেরও অবশ্য কোন না কোন সঙ্গত অর্থ আছে। সেই সকল সঙ্গত অর্থ হইতেছে—

নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে সেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে, অপ্রাকৃত স্থাপন॥

এই অপ্রাকৃত-বাদ হইতেছে বৈষ্ণব-দর্শনের মধ্যবিন্দু। প্রাকৃত বলিতে এই বুঝায় যাহা সৃষ্টিতে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গীতাতে এই প্রকৃতি দ্বিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা জড় বা অপরা প্রকৃতি, এবং পরা বা জীবভূতা প্রকৃতি। যাহা পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই—তাহাই অপ্রাকৃত। আমাদের দেহ, মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ভগবানের প্রকৃতি-শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহা প্রাকৃত এবং প্রাকৃত বলিয়া তাহা অনিত্য, অবিশুদ্ধ, মায়াগত ও পার্থিব। কিন্তু ভগবানের বিগ্রহ, ঐশ মন, ঐশ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অপ্রাকৃত, কারণ তাহা সৃষ্টিতে উৎপন্ন হয় নাই, অতএব তাহা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। এইজন্য তাহা অজাগতিক, আমাদের বিগ্রহ মন ও ইন্দ্রিয় হইতে স্বতন্ত্র—এবং সেই অর্থে ব্রহ্ম হইতেছেন নেতি-নেতি-স্বরূপ, অ-পাণিপাদ, অ-মন ও অ-শরীরী।

সৃষ্টির পূর্ব্বেও যে ব্রহ্মের ঐশ মন ও ঐশ নেত্র ছিল অর্থাৎ তাঁহার "অপ্রাকৃত" মন ও নেত্র ছিল শ্রীচৈতন্য তাহার প্রমাণ দিয়া বলিয়াছেন—

ভগবান্ বহু হইতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন॥
সেকালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন॥

পাঠক দয়া করিয়া এই যুক্তির শাণিত তীক্ষ্ণধার অবধারণ করিবেন। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে—"তদৈক্ষত, বহু স্যাং, প্রজায়েয়েতি। তত্তেজোঽসৃজত—অর্থাৎ "ব্রহ্ম 'ঈক্ষণ' করিলেন, তিনি বহু হইতে ও প্রজাত হইতে ইচ্ছা করিলেন তিনি সৃষ্টিতে প্রথমে তেজকে উৎপন্ন করিলেন।" এখানে শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন; সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবান্ তাঁহার প্রাকৃত শক্তিকে "ঈক্ষণ" করিয়াছিলেন, অতএব ভগবানের ঈক্ষণ করিবার ইন্দ্রিয়—নেত্র ছিল, তিনি বহু হইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার সঙ্কল্পাত্মক মনও ছিল। কিন্তু সেই মন ও নেত্র, আমাদের মনের ন্যায় সৃষ্ট মন ও সৃষ্ট নেত্র হইতে পারে না,—কারণ তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল—"অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন।"

এই হইল শ্রুতি-কথিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় উত্তর। তাঁহার তৃতীয় উত্তর এই—শ্রুতি যে ব্রহ্ম শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার ধাতুগত মূল অর্থ কি? আমাদের দেশের মীমাংসকগণ আবহমান কাল বলিয়া আসিতেছেন, শ্রুতির অর্থ স্মৃতি অবধারণ করিয়া থাকেন। স্মৃতি ব্রহ্ম শব্দের সে অর্থ করেন তাহা হইতে সবিশেষ ব্রহ্ম অবধারিত হয়, না নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অবধারিত হয়? বিষ্ণু-পুরাণ একটী বিশ্বস্ত স্মৃতি। সেই স্মৃতি শ্রুতির মৌলিক অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতেছেন—"বৃহত্বাৎ বৃংহনত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ"—সেই পরম তত্ত্ব বৃহৎ বলিয়া ও ব্যাপক বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন এবং যে ব্রহ্ম বৃহৎ ও ব্যাপক তাহা অবশ্যই নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহে—

বেদের পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ॥

উদ্ভিদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস

[শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু বি-এ]

গাছেরা যে আমাদের মতই নিঃশ্বাস লয়, এ কথা বলিলে প্রথমে একটু আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। কথাটা কিন্তু মিথ্যা নয়। আমরা যেমন অক্সিজেন ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি না, উদ্ভিদেরাও তদ্রূপ অক্সিজেন অভাবে মরিয়া যায়। আমরা যেমন নিঃশ্বাসের সহিত অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া প্রশ্বাস-বায়ুর সহিত কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করি, গাছেরাও ঠিক সেই রূপেই অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, উদ্ভিদের ফুস্‌ফুস্ কোথায়? জীব-জন্তুর ফুস্‌ফুস্ আছে বলিয়াই তাহাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলিয়া থাকে; কিন্তু গাছের কি ফুস্‌ফুস আছে? গাছের ফুসফুস নাই, তথাপি গাছেরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে। কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর জীবদিগের যে ভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলিয়া থাকে, উদ্ভিদ্‌দিগেরও অনেকটা সেইভাবেই শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কীটদের ফুসফুস নাই, কিন্তু তাহাদের দেহের উপরিভাগে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়াই তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উদ্ভিদ্‌দিগেরও পত্র, পুষ্প, মুকুল, বৃন্ত, শাখা, কাণ্ড, কন্দ, মূল, এমন কি ফলের মধ্যেও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলিয়া থাকে। উদ্ভিদের যেখানেই সজীব কোষ আছে সেখানেই শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র কিছুকাল পূর্ব্বে ইউরোপের কোনও বিজ্ঞানাগারে বক্তৃতা-কালে উদ্ভিদকে নিম্নশ্রেণীর জীবের সহিত তুলিত করিয়া ইহাদের যে অচল জীব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা অনেক পরিমাণে সত্য।

উদ্ভিদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া কোন্ অংশে কিরূপ ভাবে চলিয়া থাকে তাহা এইবার আলোচনা করা যা'ক। পোকা-মাকড়দের দেহের ছিদ্রগুলি দিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সমান ভাবে চলিয়া থাকে, কিন্তু উদ্ভিদের সেরূপ হয় না। উদ্ভিদের কোন অংশে কম এবং কোনও অংশে শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। নবোদ্গত পত্রাবলী, সদ্য-প্রস্ফুটিত কুসুমের পাপড়ী, নূতন শাখার অগ্রভাগ, নব মুকুলমঞ্জরী, নূতন শিকড় প্রভৃতির মধ্যেই দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুরাতন কাণ্ড, শাখা, মূল প্রভৃতিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া মন্দীভূত হইয়া থাকে। গাছের যেখানেই নূতন নূতন পত্র, শাখা, মুকুল, অঙ্কুর, মূল প্রভৃতির গঠন হয় সেখানেই দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ শিকড়, কন্দ প্রভৃতিতে উপরের কাণ্ড ও সবুজ শাখা অপেক্ষা ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস চলিয়া থাকে।

ছোলা, মটর, কড়াই প্রভৃতি হইতে যখন প্রথম অঙ্কুরের উদ্গম হয় তখন শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইতে থাকে; কিন্তু পরে অঙ্কুর যখন বড় হইয়া ছোলা বা মটরের মধ্যে সঞ্চিত সমস্ত আহারীয় পদার্থ নিঃশেষ করিয়া ফেলে তখন শিশু উদ্ভিদের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ-জীবনে আর কোন কালে ইহা অপেক্ষা শ্বাস-প্রশ্বাসের বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় না। পরে নবীন তরু, পত্র ও শাখার পূর্ণ বিকাশ হইলে এবং শিকড়ের সাহায্যে মৃত্তিকা হইতে এবং পত্রের সাহায্যে বায়ু হইতে আহার সংগ্রহ করিতে পারিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমতা আসিয়া উপস্থিত হয়। বৃক্ষ তখন ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে। অবশ্য প্রাচীন তরু অপেক্ষা যে তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত-বেগে চলিয়া থাকে তাহা বলা বাহুল্য।

স্ফুটনোন্মুখ কুসুম অপেক্ষা পূর্ণ বিকসিত কুসুমের মধ্যেই দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলিয়া থাকে। এমন কি যখন আমরা পুষ্পাধারের মধ্যে গোলাপ, পদ্ম, কেনা, গাঁদা, রজনীগন্ধা, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, প্রভৃতি ফুলকে গাছ হইতে তুলিয়া সাজাইয়া রাখি, তখনও তাহাদের মধ্যে সুন্দরভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলিয়া থাকে। পরে ধীরে ধীরে সে প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। ফুল যতক্ষণ তাজা

থাকে; ততক্ষণ তাহাদের মধ্যে নিঃশ্বাস চলে। শুধু ফুল নয়, টাট্‌কা ফলের মধ্যেও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমেরিকা, পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি হইতে যখন বিলাত প্রভৃতি স্থানে আপেল, কলা, কমলা-লেবু ইত্যাদি ফল জাহাজে চালান দেওয়া হয়, তখন ফলের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদিগকে বাক্সের মধ্যে সাজান হইয়া থাকে এবং যাহারা ফল চালান দেয় তাহারাও জানে যে, টাট্‌কা ফল অনেকটা জীবজন্তুর মতই নিঃশ্বাস ফেলিয়া থাকে। এদেশে যাহারা ফুলের ব্যবসা করে, তাহারাও ফুলকে বাতাসের মধ্যে রাখিয়া দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখে। এই বাতাস অর্থে ফুলকে অক্সিজেন সেবন করান মাত্র। এমন কি আমরা যে বর্ষার পূর্ব্বে আলু কিনিয়া ঘরের মেঝের উপর পালঙ্কের নীচে বিছাইয়া রাখি তাহারাও গেড়ী, সামুক, গুগ্‌লী প্রভৃতির মত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিয়া থাকে। যতদিন তাহারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে পারে, ততদিন তাহারা বাঁচিয়া থাকে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গেলেই আলু পচিয়া যায়। আলু যে এতকাল সজীব থাকিতে পারে, তাহা বর্ষার সময় আলুর গাত্র হইতে উদ্ভূত "গেঁড়" দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইবে।

তাজা ফুল ও টাট্‌কা ফল যে নিঃশ্বাস ফেলে, একথা অনেকের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইবে। এ বিষয়ে কিন্তু একটু পরীক্ষা করিলেই আমার কথা প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। শুধু তাজা ফুল নয়, তাজা ফল, মূল, কন্দ—যেমন ওল, কচু, আলু, শাঁখ-আলু, খাম-আলু, মূলা, রাঙ্গা-আলু, গাজর, শালগ্রাম, ওলকপি, পিঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি সমস্ত তাজা জিনিসই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিয়া থাকে এবং সেজন্য আমাদের মতই তাহাদের অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। এই সকল ফল-মূল-কন্দকে কিছুকাল ঘরের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলেই দেখা যাইবে যে, ইহারা ঘরের অক্সিজেন নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে এবং অক্সিজেনের পরিবর্ত্তে ঘরের মধ্যে কার্ব্বনডাইঅক্সাইড্ গ্যাস্ পরিত্যাগ করিয়া রাখিয়াছে। অবশ্য ঘরটী একটী কাচের বড় বাক্সের মত হইলেই পরীক্ষার সুবিধা হয়। এইরূপ কাচের বাক্সের মধ্যে কয়েক দিন ফল-মূল রাখিয়া দিবার পর তন্মধ্যে একটী বাতি জ্বালিয়া দিলে উহা আর জ্বলিবে না এবং দীপ-নির্ব্বাণের সহিতই বাক্সের মধ্যে অক্সিজেনের অভাব প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে।

ডাক্তার লরি তাঁহার "হোমিওপ্যাথিক ডোমেষ্টিক্ মেডিসিনের" প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে, উগ্রগন্ধী কুসুম রোগীর নিকট রাখা উচিত নয়—এবং অধিক সংখ্যক সুগন্ধী কুসুমও রোগীর শয্যায় রাখা সঙ্গত নহে। দুই একটী অল্পগন্ধবিশিষ্ট পুষ্প রোগীর নিকট রাখা যাইতে পারে। ডাক্তার লরি আবার একাদিক্রমে কুসুম রোগীর শয্যায় রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রোগীর ফুল মাঝে মাঝে বদলাইয়া দিতে হইবে। দিবসে কিন্তু ফুল রাখিলেও রোগীর শয্যায় বা ঘরে রাত্রে ফুল রাখিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। এই নিষেধের কারণ কি? ইহার কারণ, কুসুম হইতে প্রশ্বাসের সহিত যে কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস নির্গত হয় তাহা রোগীর পক্ষে মহা অনিষ্টকর।

উদ্ভিদের যে, সকল অংশে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার আধিক্য হয়, সেই সকল স্থানে উত্তাপ-প্রজনন ব্যাপারও লক্ষিত হইয়া থাকে। যে পাত্রে ছোলা, মটর প্রভৃতি অঙ্কুরিত হইতে থাকে, সেই পাত্রের মধ্যে তাপমাণ-যন্ত্র প্রবেশ করাইলে তাপবৃদ্ধির মাত্রা লক্ষ্য করা যাইবে। তবে গাছেরা এত শীঘ্র তাপ বিকীরণ করে যে, এই প্রকার তাপবৃদ্ধি বড় একটা বুঝা যায় না। তাপ-বিকীরণের সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরের বায়ুতে গাছের বহির্ভাগ শীতল হইয়া পড়ে। তবে ফুলের যে, সকল অংশ পাপ্‌ড়ী বা বাহিরের পাতার মধ্যে ঢাকা থাকে, সেই সকল অংশের তাপ তাপমাণ যন্ত্রের সাহায্যে অনুমান করা যাইতে পারে। কচুফুল এবং কদলী-কুসুম অর্থাৎ "মোচা" সকল সময়েই পুরু খোলা দ্বারা আবৃত থাকে; সুতরাং কচু ও মোচার শ্বাস-প্রশ্বাস-জনিত তাপ-বৃদ্ধির পরিমাণ করা যাইতে পারে। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে কচু ফুলের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস কালে প্রায় ৯ডিগ্রি হইতে ১৮ ডিগ্রি (ফার্ণ হাইট) অবধি তাপাধিক্য হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ্ যে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিমিত্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে, তাহা আর এক পরীক্ষায় বুঝিতে পারা যাইবে। একটী ঘরে অক্সিজেন ব্যতীত হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি অপর গ্যাস ছাড়িয়া তাহার মধ্যে একটী উদ্ভিদ্ রাখিয়া দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই উহার পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা যায়।

এইরূপ কক্ষে রক্ষিত উদ্ভিদের কোষস্থিত প্রোটোপ্লাজম্-এর চলাচল শক্তি অক্সিজেনের অভাবে রহিত হইয়া যায়, উহার পত্রাদি ও পুষ্পের পাপড়ি সকল কঠিন হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে বৃক্ষ অম্লজানের অভাবে হাঁপাইয়া মরিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় অচিরে অক্সিজেন প্রয়োগ না করিলে উদ্ভিদকে আর পুনর্জ্জীবিত করা যায় না।

জলাশয়াদিতে যে, সকল জলজ লতা জন্মায় তাহারা শ্বাস-প্রশ্বাসের নিমিত্ত জল হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া থাকে। একটী জলজ লতাকে বোতলের মধ্যে পুরিয়া কর্ক দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিলে বোতলে বদ্ধ মাছের মতই ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বোতলের জল হইতে ও বোতল-বদ্ধ বায়ু হইতে যতক্ষণ অক্সিজেন গ্রহণ করিতে পারিবে মাত্র ততক্ষণই লতাটী বোতলে জীবিত থাকিতে পারিবে। শহরের বড় বড় পার্কে অনেক সময় দুই একটী বৃক্ষকে অজ্ঞাত কারণে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে দেখা যায়। বাহিরে গাছের স্বাস্থ্যনাশের কোনও কারণ লক্ষ্য করা যায় না। ঐ সকল তরুর মূল খনন করিলে মাটীর নীচে গ্যাসের পাইপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঐ সকল পাইপ কোনও রকমে ফাটিয়া গেলেই তাহার সন্নিকটস্থ বৃক্ষের এইরূপ দশা ঘটিয়া থাকে। গ্যাস মৃত্তিকার অণু-পরমাণুর অন্তর্বর্ত্তী বায়ুর সহিত মিশিয়া তরুমূলে প্রবিষ্ট হয় এবং তাহাতেই বৃক্ষের স্বাস্থ্যনাশ ঘটিয়া থাকে। যে সকল বৃক্ষে অবিরত কয়লার ধূম লাগে তাহাদেরও স্বাস্থ্যের অবনতি হইয়া থাকে।

রাত্রে গাছের হাওয়ায় যে মন্দ বলিয়া শুনা যায়, তাহার কারণ রাত্রে গাছেরা আমাদের মত প্রশ্বাসের সহিত কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড্ পরিত্যাগ করে। কিন্তু দিবসে বিশেষতঃ প্রত্যূষে গাছের হাওয়া ভাল, কারণ আলোকের আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গেই গাছেরা তাহাদের পত্ররূপ পাকশালায় সূর্য্যকিরণরূপ অগ্নির সাহায্যে তাহাদের আহার প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই আহার প্রস্তুত-করণে বায়ুমণ্ডলস্থিত বিষাক্ত কার্ব্বান-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস উহারা সাগ্রহে আহরণ করিয়া লয়। কার্ব্বান-ডাইঅক্সাইড্ এর এক পরমাণুর মধ্যে এক ভাগ কার্ব্বন ও দুই ভাগ অক্সিজেন থাকে। গাছেরা কার্ব্বান-ডাইঅক্সাইড্ এর শুধু কার্ব্বন লইয়া অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। সারা দিবসই এই ব্যাপার চলিয়া থাকে; সুতরাং দিবাভাগে আমরা বৃক্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন লাভ করিয়া থাকি। রাত্রে আলোকের অভাবে গাছের পাতার মধ্যে বা বৃক্ষের অপরাপর হরিতাংশে আহার প্রস্তুত করিতে পারে না। সে-সময়ে শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসেই চলিয়া থাকে। রাত্রে বৃক্ষেরা নিঃশ্বাসের সহিত অক্সিজেন শোষণ করে এবং প্রশ্বাসের সহিত কার্ব্বন গ্যাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এই কারণেই রাত্রে বৃক্ষলতায় ভ্রমণ বা শয়ন করা নিষেধ। রাত্রে ঘরের মধ্যে টবের গাছ রাখাও ভাল নয়।

সহরের রাজপথের দুই ধারে যে বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করা হয়, তাহার উদ্দেশ্য যে, শুধু বর্ত্মের শোভা সম্পাদন ও ক্লান্ত পথিককে ছায়াদান তাহা নহে। জনাকীর্ণ সহরের সঞ্চিত কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড্ গ্যাসকে শোষণ করিয়া লইবার উদ্দেশ্যও এই বৃক্ষরোপণের মূলে নিহিত আছে। গাছেরা সারা শহরের বিষাক্ত কার্ব্বনগ্যাস সমস্ত দিনে শোষণ করিয়া লইয়া থাকে। এ বিষয়ে বন-জঙ্গলও যে আমাদের কত উপকার করে তাহা এখন বুঝা যাইবে।

মাছেদের জন্য কৃত্রিম জলাশয়াদিতে জলজ লতা (ঝাঁজি) ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার কারণ বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। জলজ লতাপাতারা জলের মধ্যে কার্ব্বান-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস শুষিয়া লয় এবং কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস হইতে কার্ব্বন গ্রহণ করিয়া অক্সিজেন ত্যাগ করে। মাছেরা এই অক্সিজেন নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়।

দমকা-হাওয়া

(উপন্যাস)

[শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]

—এক—
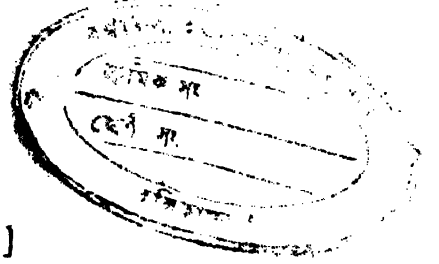
নিঝুম নিশীথের মত গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া জমীদার মাধববাবু রোগশীর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'বেণুকে বুঝি তারা পাঠালে না, মা!'

সমবেদনার সুরে বীণা বলিল, "তোমার এতখানি অসুখের কথা জানতে পেরেও সলিল কি তাকে না পাঠিয়ে থাকতে পারবে, বাবা!...সেও ত মানুষ!"

কাহারও মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। নীরব নিথর ঘরখানার মধ্যে অনেকের উদ্বিগ্নদৃষ্টি জমীদারের মুখের দিকে আবদ্ধ থাকিলেও সকলেরই জিহ্বা যেন দাঁতের সঙ্গে স্ক্রু দিয়া আঁটা।

পিতার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বীণা বলিল, 'কি কষ্ট হচ্চে, বাবা?'

কোটরাগত চক্ষু দুইটা কন্যার মুখের উপর ফেলিয়া হাসিমাখা মুখে অতি কষ্টে মাধব রায় বলিলেন,—'দুঃখ-কষ্টের বাইরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, কষ্ট আর কি, মা! কোনও কষ্ট নেই এখন।'

তাঁহার মুখ দিয়া আর কোনও কথা বাহির হইল না; সস্নেহে শীর্ণ হাতখানি কন্যার মাথায় রাখিয়া সবটুকু আশীর্ব্বাদই যেন উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিলেন।

এতক্ষণ ধরিয়া বীণা নিজেকে কোনওরূপে শান্ত করিয়া রাখিলেও বাটীর বাহিরে প্রজাদিগের কাতর চীৎকার তাহার রুদ্ধ ভাবাবেগকে আর আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না, তাহার চক্ষের দুই কোণ দিয়া ধারা নামিয়া আসিল।

দুঃখ-কাতর কণ্ঠে মাধব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেঁদে কি করবি, মা, চিরদিন তো কারুর থাকবার নয়, যে তোর বাবাকে ধ'রে রাখবি!—হাঁ, মা!'

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বীণা বলিল, 'কেন, বাবা?'

মাধববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'ছেলেগুলো আবার এসেছে বুঝি?'

মাথা হেলাইয়া বীণা জানাইল, 'হাঁ।'

'—একবার জানালাটা খোল, বীণা; আমায় ধ'রে জানলার কাছে নিয়ে চল, তা'দিকে' একবার দেখি। আমার এক দিকটায় তোরা দু' বোনে আর এক দিকটায় এইসব ছেলের দল।—'

বীণা বলিল, 'বাইরে এখন ঝড়-জলের মাতন চলেছে, বাবা, ঠাণ্ডা লেগে—'

অসমাপ্ত কথার মধ্য-পথেই মাধববাবু বলিলেন, 'কি বলছিস্, মা? প্রকৃতির এই ভয়াল নৃত্য মাথায় নিয়ে তারা যদি আমাকে দেখবার জন্যে একান্তভাবেই ছুটে আসতে পারে। তবে, সামান্য ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে আমি তা'দি'কে দেখা দেব না? খোল মা, শীগ্‌গীর খোল, তা'দি'কে দেখবার জন্যে আমার প্রাণটাও কি কম ছট্‌ফট্ করছে রে?'

প্রাণের ব্যাকুলতা লইয়া তিনি উঠিবার চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না, বীণাকে বলিলেন, 'আমাকে ধ'রে নিয়ে চল্, মা। ছেলের দল তাদের বাপকে দেখবার জন্যে এতখানি উতলা হ'য়ে উঠেছে, আর আমি কি এতখানিই পাষাণ রে বীণা—'

পিতাকে আর অধিক কথা বলিবার সুযোগ না দিবার জন্য বীণা বলিল,—"জানালাটা আগে খুলে দেখি, বাবা!" বলিয়াই সে জানালা উন্মুক্ত করিবামাত্র ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি আসিয়া ঘরখানার মধ্যে লুটোপুটি খাইতে লাগিল, বিদ্যুতের বিকাশ মাধবের চোখ দুইটাকে ঝলসাইয়া দিতে লাগিল,—বীণা তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া বলিল, 'কি ক'রে এসে দাঁড়াবে, বাবা?'

অসহায়ের মত মাধব বলিলেন, 'না।' তারপর আরও কিছুক্ষণ নীরবে পড়িয়া থাকিয়া বলিলেন, 'যেতেই যদি

আমাকে হয়, বীণা, তবে, আমার অবর্ত্তমানে তোর ভাই-দের দেখতে পারবি তো ?

অঝোর-ঝরে কাঁদিতে কাঁদিতে বীণা বলিল, 'তারা আমার শুধু ছোট ভাই নয়, বাবা, আমি যে তাদের রক্ষী—আর তাদের যাতে ভাল-মন্দ হয় তা' তো আমাকেই দেখ্‌তে হবে ?'

একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাধববাবু বলিলেন,—'ম'রেও আমি তৃপ্তি পাব মা। ম্যানেজারবাবুকে একবার খবর দে, এইখানেই একবার দেখা ক'রে, আর ছেলেগুলাকে বল্ এখনি যেন তারা বাড়ী যায়, বৃষ্টির জলে ভিজে অসুখ করবে।'

পিতার আদেশ মত ম্যানেজার-বাবুকে ডাকিবার জন্য এবং প্রজাদিগকে সংবাদ দিবার জন্য লোক পাঠাইয়া বীণা বলিল,—'এইবার তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, বাবা।'

স্মিতহাস্যে মাধববাবু বলিলেন,—'হয়েছে ? দে।'

ঔষধ পান করিয়া পুনরায় তিনি বলিলেন,—'বেণুকে যদি তারা না পাঠায়, বীণা, তবে আমাকে শেষ দেখাটা দেখতে না পাবার ধাক্কা সে সামলে উঠতে পারবে তো ?'

তিরস্কারের সুরে বীণা বলিয়া উঠিল—'কেন তুমি এমন সব অলক্ষণে কথা বলছ বল তো ? দেশের লোক, তোমার আরোগ্যের জন্যে দু'বেলা চোখের জলে করালী-মার পা ধুইয়ে যাচ্ছে, সেটা কি নিষ্ফল হবে বলতে চাও ?'

সহাস্যমুখে মাধব বলিলেন—'না হওয়াই হয় তো সম্ভব।' তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলিবার সুযোগ তাঁহার আর ঘটিয়া উঠিল না। ম্যানেজার-বাবু আসিয়া দেখা দিতেই সে প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া বীণা ছাড়া আর সকলকে গৃহান্তরে যাইবার জন্য তিনি অনুরোধ করিলেন।

ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'এখন কেমন আছেন ?'

মাধববাবু বলিলেন—'যেমনই থাকি নীলাম্বর, মা আমার বলছে, আমি ভাল হ'ব।'

অন্যান্য লোকেরা ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেলে, মাধববাবু বলিলেন—'আমি উইল করতে চাই নীলাম্বর, ব্যবস্থা কর।'

বিনীত ভাবেই নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিল, 'সমান ভাবে বেণু আর—'

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন,—'না না, নীলাম্বর, প্রজাদের গচ্ছিত ধন, অসদ্ব্যবহারের জন্য দিয়ে যাব না। তাদের টাকা তাদের সময়-অসময়ের জন্যে—তাদের সুখ-দুঃখের জন্যে,—বীণা আমাকে একটু আগে বলছিল, আমরা তা'দের রক্ষী, কথাটা যে কত বড় সত্যি, সেটা কোনও দিক দিয়েই অস্বীকার করবার উপায় নেই; রক্ষক হ'য়ে তাদের গায়ের রক্ত জল করা টাকার একটাও বাজে নষ্ট হ'তে দিতে পারি না, তুমি বীণার নামেই উইল ক'র।'

'কিন্তু বেণু ?'

'অর্থের অসদ্ব্যবহার হবে নীলাম্বর, যা বল্লুম তাই কর—'

পিতার পা-দুইটীতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বীণা ডাকিল—'বাবা ?' অশ্রুর বাঁধ তাহার ভাঙ্গিয়া গেল।

মাধববাবু বলিলেন,—'কি বলছিস, মা ?'

কান্না-জমাট-কণ্ঠে বীণা বলিল—'করালীমার নামে সব উইল কর বাবা, বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আজন্ম ব্রহ্মচারী পুরুত কাকা তাঁর পূজারী, উইলে এ কথারও প্রকাশ থাকুক, তাঁর ভবিষ্যৎ স্থলাভিষিক্ত যিনি হবেন তাঁকেও ব্রহ্মচারীই হ'তে হ'বে। দুর্ব্বলের রক্ষার জন্যে, আশ্রিতকে আশ্রয় দেবার জন্যে, জমীদারি বাড়াবার জন্যে জমীদারির টাকা ব্যয়িত হ'বে। আমি শুধু যতদিন বাঁচব, দরিদ্র প্রজারা যেমন খায়, তেম্নি আহারের জন্যে দিন চার আনা—'

অতিষ্ঠের মত মাধববাবু বলিয়া উঠিলেন,—'কি বলছিস্, মা ?'

দুঃখ-কাতর কণ্ঠে বীণা বলিল—'বিধবার খাবার খরচ কি, বাবা ?'

বিধবা হইয়া বীণা এতদিন পিতার নিকট থাকিলেও স্নেহপ্রবণ পিতা সে দিকটা একদিনও ভাবিতে পারেন নাই; কেবল এই কথাটাই ভাবিয়া আসিয়াছেন, বীণা কন্যা, তিনি পিতা, আজ কন্যার এই কথাটায় তাঁহার বুকের ভিতর একবার যেন ধক্ করিয়া উঠিল।

তাঁহার বুকের আলোড়ন মুখের উপর প্রতিভাত হইতে দেখিয়া বীণার অন্তর কে যেন মুচড়াইয়া দিল।

তাহার মনে ভয় হইল, কথাটা ভাবিবামাত্র বাবা কেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, আর কেনইবা সে আজ সেই কথাটাই তাঁহার নিকট বলিয়া ফেলিল? অল্পক্ষণ পরে সে টিপয়ের নিকট সরিয়া গিয়া পিতার জন্য আঙুরের রস নিংড়াইতে প্রবৃত্ত হইল।

মাধব-বাবু বলিলেন—'রোজ এক টাকার ব্যবস্থা ক'রে দাও। তবে একথা যেন উইলে স্পষ্ট ক'রে লেখা থাকে যে, প্রজাদের প্রতিনিধি আমার এই মা, তাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে মায়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।'

বীণা ডাকিল—'বাবা!'

মাধববাবু বলিলেন—"আর কোনও কথা নয় মা, যাবার সময় তাদের ভার আমি তোর উপরেই দিয়ে যেতে চাই।"

—দুই—

দশ বারখানা গ্রামের জমীদার দরিদ্রের পিতা-মাতা মাধব রায়ের বাসস্থান ভাগীরথীর তীরে মলয়পুর গ্রামে। গঙ্গার তীরে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বাড়ীর পাশেই বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করালীমার মন্দির। ...মস্ত বড় নাটমন্দির, দেশ দেশান্তর হইতে অসংখ্য নর-নারী তাহাদের প্রাণের অপূর্ণ কামনা লইয়া এই স্থানে সমবেত হন।

দেবী জাগ্রতা। ঐকান্তিকভাবে যে যাহা ইঁহার নিকট কামনা করে, তিনি নাকি সেই কামনা পূর্ণ করিয়া দেন।

মার পূজারী, আজন্ম ব্রহ্মচারী রায় বংশের কুলপুরোহিত শিবানন্দ স্বামী। তাঁহাকে দেখিলে অতি বড় পাষণ্ডেরও মাথাটা আপনা হইতে নত হইয়া আসে।

জমীদারের দুই কন্যা বীণা ও বেণু। বীণা জ্যেষ্ঠা, বেণু কনিষ্ঠা। হিন্দুত্বের গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া অষ্টম বর্ষীয়া বীণার বিবাহ দিবার এক বৎসরের মধ্যেই যখন সে বিধবার বেশ পরিধান করিল, তখন কনিষ্ঠা কন্যার এত কম বয়সে বিবাহ দিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মোটেই রহিল না। মাতৃহারা কন্যা দুইটাকে বুকের সবটুকু স্নেহ দিয়াই বড় করিয়া তুলিলেন। পনর উত্তীর্ণ হইবার পরে তাহার বিবাহ দেন অন্য এক জমীদারের সহিত।

পিতৃ-মাতৃহারা জামাতা সলিলকুমার যৌবনের প্রারম্ভেই তাহাদের বিশাল জমীদারি হাতে পাইয়া নায়েব, ম্যানেজার প্রভৃতির ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া উঠিল। নিজে যে কে, তাহার মর্য্যাদা কতটুকু, তাহা সে বুঝিয়াও বুঝিত না; দুর্ভিক্ষে, প্লাবনে, মহামারিতে প্রজারা মৃত্যুমুখে পড়ুক তাহাতে তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না। সে চাহিত কেবল অর্থের অপব্যবহার করিয়া যৌবনের উদ্দাম লালসার পরিতৃপ্তি করিতে। হিন্দুর অবশ্য প্রতিপাল্য বিধি-নিষেধের মর্য্যাদা সে কখনও রক্ষা করিত না।

এহেন স্বামীর গৃহকে নিজের গৃহ বলিয়া বেণু যেদিন প্রথম প্রবেশ করিল,সেই দিনই ইহাদের উপর কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণায় তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল এবং প্রাণপণে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া প্রতিপদেই সে লাঞ্ছিত হইতে লাগিল।

মরমের দুঃখ মরমের মাঝে চাপিয়া সে তাহার দিনগুলি একটী একটী করিয়া কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও স্বামীর বাসনার অনুকূল না হইবার অপরাধে তাহারই কড়া হুকুমে তাহার পিত্রালয়ে যাইবার পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল।

চক্ষের জল চক্ষে চাপিয়া রাখিয়া স্বামী দেবতার আদেশ মাথা পাতিয়া লইলেও আশৈশবের শিক্ষা বেণু কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিল না। স্বামীকে একান্ত ভাবেই আপনার ভাবিলেও সে এই দিকটায় নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিত। স্বামীর বিশৃঙ্খল জীবনের পরিণাম ভাবিয়া পিতার প্রজাদিগের সহিত স্বামীর প্রজাদের তুলনা করিতে বসিয়া সে শিহরিয়া উঠিত। কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া প্রজার দল যেদিন তাহাদের রাজার নিকট দুঃখ জানাইতে আসিয়া উত্তর পাইত 'জমীদারির আইন ও শৃঙ্খলা কোনও দিক দিয়েই নষ্ট হ'তে দিতে পারি না।' তখন বেণুর মনটা কেমন একটা ঘৃণায় ভরিয়া উঠিত, হরলালকে বলিত, 'হরকাকা, ওঁকে ব'লে এস প্রজার বাপমার আসনেই ভগবান আমাদিগকে বসিয়েছেন অত্যাচার করবার জন্যে নয়।'

হরলাল প্রৌঢ়, বাড়ীর ভৃত্য।

তাহার পদধূলি লইয়া আনন্দাপ্লুত কণ্ঠে হরলাল বলিয়া উঠিত, 'এইত মায়ের মত কথা মা।' সে ছুটিয়া যাইত মার কথা শুনাইবার জন্য।

এমনইভাবে বেণুর পাঁচ-ছয় বৎসর কাটিয়া গেল।

সেদিন যখন পিতার অসুখের সংবাদ লইয়া বীণার পত্র তাহার হাতে পড়িল,তখন সে একেবারে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। স্বামী বাড়ীতে নাই অথচ তাহার প্রাণ, রুগ্ন পিতার কাছে ছুটিয়া যাইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল, চক্ষুর জলে চারিদিক ঝাপসা হইয়া গেল।

হরলাল বলিল—'বাবু বাড়ী নেই তার জন্যে কি হয়েছে মা, তোমার নাম নিয়ে আমি সোফারকে ব'লে দিই এখনই মটর নিয়ে আসবে ; চল তোমার—'

বেণু ভাবিতে লাগিল, হায় রে এযে স্বামীর ঘর, স্বামীর বিনা অনুমতিতে বিবাহিত স্ত্রী হইয়া কোথাও যাইবার তাহার নিজের অধিকার তো নাই। বলিল, 'তিনি না এলে আমি যে কিছুতেই যেতে পারব না, কাকা।'

বিস্ময়-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে হরলাল বলিল—'মা।'

বেণু বলিল—'আমার একটা উপকার করবে, কাকা ?'

আবেগভরে হরলাল বলিয়া উঠিল,—'কিন্তু হচ্চ কেন, মা ? আদেশ কর।'

বিষাদ-জড়িত কণ্ঠে বেণু বলিল—'বাবাকে একবার দেখতে যাবে ?'

সোৎসাহে হরলাল বলিয়া উঠিল—'এটা আর এমন কথা কি মা ? আদেশটাকে এমন অনুরোধে নিয়ে আসছ কেন ? ...কিন্তু মা—'

'কি বলছ, কাকা ?'

'অসুখের কথা তুমি যা বল্লে তাতে তোমার পক্ষে বাবুর অনুমতি না নিয়ে যাওয়া কোনও দিক দিয়েই অপরাধ হবে না।'

'না—কাকা তুমি দেখে এস তাঁকে, তাঁর কছে খবর পাঠাবার আমি অন্য ব্যবস্থা করছি।'

'বেশ তাই হোক, মা। কিন্তু সব সময়েই তৈরী থেক, যদি সেই রকমই দেখি আমি এসেই তোমাকে নিয়ে যাব,'

হরলাল চলিয়া গেল।

স্তব্ধ স্থাণুর মত বেণু ঠিক সেইখানেই বসিয়া রহিল, চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার পিতার সেই স্নেহ-মধুর মূর্ত্তিখানি, তাঁহার এই জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে কোন্ পথটাকে বাছিয়া লইবে ? স্বামীর আদেশ, না, কর্ত্তব্যের হাতছানি ? গতদিনে স্বামী বাটীর বাহির হইয়াছেন, খেয়ালীর খেয়াল, কবে আবার তাহাকে বাটীর দিকে টানিয়া আনিবে...আজও আসিতে পারে আবার দু চার দিন নাও আসিতে পারে। বেণু ভাবিতে লাগিল যদিই তিনি না আসেন আর হরুকাকা যদি সেই রকমই কোন একটা দুঃসংবাদ লইয়া আসে তাহা হইলে ?

অস্বস্তিতে তাহার সমস্ত দেহ ভরিয়া উঠিতে লাগিল, দুশ্চিন্তায়, চাঞ্চল্যে সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

সমস্ত দিনটাই এই ভাবে তাহার কাটিয়া গেল। কাতর প্রাণে অশ্রুসিক্ত নেত্রে একান্তভাবেই ভগবানের পায়ে জানাইতে লাগিল,—'হে ঠাকুর, বাবাকে আমার নিরাময় ক'রে তোল, স্বামীকে একবারের জন্য বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও। তাঁর অনুমতি নিয়ে একটীবারের জন্য আমি আমার বাবাকে দেখে আসি।'

তাহার এই আকুল হৃদয়ের ব্যাকুল রোদন ভগবানের বুকে গিয়া আঘাত করিয়াছিল কি না তাহা জানি না, কিন্তু সেই দিন তাহার স্বামীকে সন্ধ্যার কিছু পরেই বাটীতে টানিয়া আনিয়াছিল।

তাহাকে দেখিয়া বেণু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাঁহার সর্ব্বশরীরের ভিতর দিয়া আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল, আশা-নিরাশার উদ্বেল তরঙ্গ বুকের মাঝে লইয়া স্বামীকে বলিল—'বাবার বড্ড অসুখ।'

পালঙ্কে শায়িত সলিলকুমার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া অর্দ্ধজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'কি অসুখ ?'

টেবিলের উপর হইতে চিঠিখানা আনিয়া বেণু স্বামীর হাতে দিতেই, সেটাকে পাঠ করিয়া বোতল হইতে একটা রৌপ্য-নির্ম্মিত গ্লাসে কতকটা সুরা ঢালিতে ঢালিতে ডাকিল—'হরু-কা ?'

অপরাধিনীর মত বেণু বলিল—'তাকে আমি পাঠিয়েছি —বাবার—'

জলীয় পদার্থটা গলায় ঢালিয়া বিকৃত মুখে সলিলকুমার বলিল—'তুমি গেলে না কেন ?'

—'তোমার বিনা অনুমতিতে—'

তাহাকে আর বলিতে হইল না, সলিলকুমার বলিল—'এতখানি বয়সের মধ্যে জ্ঞানটাও যদি তোমার না হ'য়ে থাকে, তবে তোমাকে বলবার আমার কিছুই নেই। আমি আর যাই হই তোমাকে পাবার জন্যে তাঁর কাছে যতটুকু কৃতজ্ঞ সেটার জন্যেও তাঁকে শেষ দেখতে যাবার পথে

বাধা আমি কিছুতেই দিতাম না। আজ আমি চ'লে এসেছি তাই, কিন্তু দুদিন যদি দেরীই হ'য়ে যেত।'

স্বামীর কথার ধারা আজ বেণুকে যে-দেশে লইয়া গিয়া ফেলিল, সে দেশটা, তাহার মনে হইল, কেবল আনন্দে ভরা, গাছ-পাতায় আনন্দ, আকাশে-বাতাসে আনন্দ, প্রত্যেক ধূলিকণায় আনন্দ। সেই আনন্দের দেশে গিয়া তাহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল।

পুনরায় সলিলকুমার বলিল—'না-যাওয়ার অপরাধ—'

উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বেণু বলিল—'যাবে ?—চল না যাই।'

জড়িতকণ্ঠে সলিলকুমার বলিল, 'আমার এই অবস্থায় সেখানে যাওয়া কি—'

শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই বেণু বলিল,—'তোমাকে দেখলে আনন্দই হবে তাঁদের। চল লক্ষ্মীটী, আমি চাকরকে ব'লে দিই মোটর আনবার জন্যে।

সহাস্যমুখে সলিল বলিল—'বেশ।'

বেণু ঘর হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেই হরলাল ডাকিল—'মা!'

উৎকণ্ঠিতভাবেই বেণু জিজ্ঞাসা করিল—'বাবা কেমন আছেন ?'

ম্লানমুখে হরলাল বলিল,—'বেশ ভাল নয় মা, এখুনি তোমার যাওয়া উচিত।'

বেণুর অন্তরের মধ্যে হাহাকার ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল। বলিল,—'কাকেও ব'লে দাও, কাকা, সোফারকে গাড়ী আনতে। উনিও সঙ্গে যাবেন।'

হরলাল একখানা পা বাহিরের দিকে বাড়াইয়া দিতেই সলিলকুমার ডাকিল,—'হরকাকা!'

হরলাল তাহার মুখের দিকে চাহিতেই সলিলকুমার জিজ্ঞাসা করিল,—'উইল হ'য়ে গেছে ?'

মাথা দুলাইয়া হরলাল বলিল—'হাঁ।'

'—দু' বোনকে সমান ভাগেই দিয়েছেন তো ?'

হরলাল বলিল—'না, কাকেও দেন নি, দেবোত্তর করলেন। বড় মেয়ের দিন চলার মত রোজ এক টাকা, বাকী সব—এ কি বাবু উঠলেন যে ? গাড়ী আনতে বলি, যান।'

যাইতে যাইতে সলিলকুমার বলিল,—'আমার একটা জরুরী কাজ আছে ভুলেই গিয়েছিলুম এতক্ষণ।'

বেণু কহিল,—'তুমি না গেলে—'

সলিলকুমার ততক্ষণ গৃহের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সেই স্থান হইতে বলিল,—'তুমি যাও, উইলখানা পাল্টাবার চেষ্টা ক'র।'

বেণু ও হরলাল স্তম্ভিতের মত সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, কিছুক্ষণের মধ্যে কাহারও মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরলাল বলিল,—'তিনি যা করেছেন, মা, সেটা ভালই করেছেন, জ্ঞানী তিনি—'

বেণু বলিল,—'আমাকে নিয়ে যাবার কি হবে, কাকা ?'

'ব্যবস্থা করছি, মা।'

হরলাল বাহির হইয়া গেল।

নির্জ্জন গৃহে বেণুর চক্ষু দিয়া ধারা নামিয়া আসিল।

—তিন—

জমীদার মাধব রায়ের জীবন-প্রদীপ যতই নির্ব্বাপিত-প্রায় হইয়া আসিতে লাগিল, প্রজাকুলের কাতরতা ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—তিনি যে তাহাদের কেবল জমীদার ছিলেন তাহা তো নয়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু সবই যে তিনি। এহেন জমীদারের জীবন্মৃত্যুর সন্ধিস্থলকে নিজেদেরই গুরু বিপদ জানিয়া সকলেই একরূপ আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া করালীমার পায়ে তাঁহার আরোগ্য-কামনায় মাথা কুটিতে লাগিল। দিশে হারার মত তাহারা পুরোহিতের নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহার পায়ে আছাড় খাইয়া বলিল,—'সাধুবাবা, মহাপাপী আমরা, মা তো আমাদের কান্না শুনলেন না, আমাদের হয়ে আপনিই মায়ের পায়ে জানান,—'

বিষণ্ণ মুখে পুরোহিত বলিলেন—'মাধবের জন্যে চোখের জল দিয়ে সে বেটীর পা দু'খানা কি কম ধুইয়েছি। কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না, বাবা, সাড়া দিচ্ছে না।' সজল চোখে পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন '—সাড়া যখন কিছুতেই দেয় না বাপ তখন মনে হয় বুঝি বা—'

সমস্বরেই সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল—'না-না, শুনতে চাই নি সাধুবাবা, এতগুলা ছেলের চোখের জল

সে বেটীর আসন টলিয়ে দেবে, বুকের ভেতর প্রলয়ের ঝড় বইয়ে দেবে, আপনি সঙ্কল্প ক'রে পূজা করুন।'

ব্রহ্মচারী শিবানন্দের ঠোঁটের উপর দিয়া হাসির রেখা খেলিয়া গেল। সকলেই দেখিতে পাইল, সেই হাসির ভিতর দিয়া যেন কান্না বাহির হইয়া আসিতেছে। বলিলেন,—'তোমাদের আকুল আকাঙ্ক্ষা আমার ঠেলে ফেলে দেবার ক্ষমতা নেই, বাপ। কাল রাত্রেই সে ব্যবস্থা করব, প্রশস্ত দিন। দেখি যদি মায়ের দয়া হয়!'

ক্ষণকালের জন্য বিরাট্ জনসমুদ্রের মধ্যে যেন নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একজন বলিয়া উঠিল —'দয়া তাঁর হ'তেই হ'বে সাধুবাবা! না হ'বে যদি, তবে, পৃথিবীর আকাশ-বাতাস তার নাম গেয়ে বেড়াবে কেন?'

শিবানন্দ বলিলেন —'নামের প্রকৃত মূর্ত্তি যে কোন্ পথ দিয়ে প্রকট হয়, বাপ, তা কি আমাদের মত লোক বুঝতে পারে? তবে, মা—সকলের মা। সন্তানের মঙ্গল তাকে করতেই হবে। করেনও তাই, তার ওপর বিশ্বাস রাখ, তোমার আমার চোখে যেটা মন্দ ব'লে দেখায় তাঁর চোখে সেটা অসীম মঙ্গলের। তাঁর কাজ তুমি আমি বোঝবার মত ক্ষমতা পাব কোথায়? কালী করালবদনি!'

প্রজাদিগকে নানারূপে বুঝাইয়া শিবানন্দ তাহাদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া আপন-ভোলা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—সার্থক তোমার জন্ম মাধব, মা আমার, তোমার মত সকলের অন্তরে আসন পেতে বসতে পারে নি।...মাগো, তাই কি তুমি তোমার সন্তানদের বুক হ'তে তাদের এমন একটা ভাইকে ছিনিয়ে নিচ্ছ? এতগুলো সন্তানের চোখের জলেও কি তোমার বুকের ভিতর দয়া জেগে ওঠে না, মা?—

চোখের জলে তাঁহার গণ্ডদেশ ভাসিয়া গেল।

এই সময়ে জনৈক প্রজা আসিয়া ব্যগ্রাতুর কণ্ঠে তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—'বাবাঠাকুর—বাবাঠাকুর! আমাদের ভেতর বোধ হয় কোনও পাপ ঢুকেছে, যার জন্যে আমাদের এমন দয়াল মনিবকে, মা, আমাদের কাছ-ছাড়া ক'রে নিচ্ছেন,—নয়-নয়, বাবাঠাকুর? আচ্ছা বাবাঠাকুর আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা উপড়ে মার পায়ে দিয়ে যদি পূজা করেন তা' হ'লেও কি বাবা আমাদের ভাল হবেন না? তোমাকে হারা হ'য়ে থাকা—বাবাঠাকুর, বাবাঠাকুর।'

লোকটী আর থাকিতে পারিল না। বালকের মত উচ্চচীৎকার করিয়া উঠিল—শিবানন্দের মত অকৃতদার ব্রহ্মচারীও কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রুদ্ধকণ্ঠে শিবানন্দ বলিলেন—'মানত ক'রে আমি কাল পূজার ব্যবস্থা করেছি, চরণ। তাঁর বিবেচনার উপর তোমরা সব ফেলে রাখ তাঁর কাজ তো কখনও অন্যায় হয় না বাপ!'

'—সেইজন্যেই তো বলছিলুম সাধুবাবা, আমাদের হয় তো কোনও মহাপাপের জন্যেই বাবাকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন, নইলে করালীমা আমাদের সাক্ষাৎ দেবী হ'য়ে সকলের বাসনা পূর্ণ করছেন আর আমাদের—'

চোখের জলে সে চারিদিক ঝাপসা দেখিতে লাগিল।

তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য পুরোহিত বলিলেন,—'প্রাণভ'রে মাকেই ডাক, চরণ। মঙ্গলময়ী তিনি,মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল তো কারো করতে পারেন না, করেনও না। অমঙ্গল ব'লে যেটাকে তোমরা বাহ্য দৃষ্টিতে দেখছ তার ভেতরেও কতখানি মঙ্গল লুকান' আছে সেটা তোমার-আমার মত মায়াবদ্ধ জীব কি করে বুঝবে? প্রাণভরে তাঁর নাম গান কর, একান্তভাবেই তাঁকে নির্ভর কর—তোমার আশা, তোমার আকাঙ্ক্ষা সব, দয়াময়ী তিনি দয়াই করবেন।'

চরণ ততক্ষণ স্তব্ধভাবেই বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে গাহিতে লাগিল :—

শক্তিপূজা কথার কথা না; (শ্যামা)।
যদি কথার কথা হ'ত, চিরদিন ভারত, শক্তি পূজে
শক্তিহীন হ'ত না।
কেবল ডাকের গয়না, ঢাকের বাজনায়, শক্তিপূজা
হয় না;
এক মনোবিল্বদল, ভক্তিগঙ্গাজল, শতদল দিলে
হয় সাধনা। (হৃদয়)
দিলে আতপান্ন, কি মিষ্টান্ন, মা যে তাতে ভোগেন না;
কেবল জ্ঞানদীপ জেলে, একান্ত প ধূ দিলে
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা। (ও ভাই)
বনের মহিষ অজা, মায়ের বাহ্য, মা যে বলি লন না;

যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ, বলিদান
কর বিলাস-বাসনা। (ও ভাই)
কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাত বিচারে, শক্তিপূজা হয় না ;
সকল "বর্ণ" এক হ'য়ে, ডাক মা বলিয়ে
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না। (ও ভাই)॥

গান শেষ হইলে শিবানন্দ বলিলেন—পূজার সময় কাল তুমি এস চরণ, এম্নি ক'রে চোখের জলের সঙ্গে প্রাণের আবেগ যদি জানাতে পার, মা আমার, তোমার প্রার্থনা শুনবেনই।...

তাঁহার পায়ে প্রণাম করিয়া চরণ চলিয়া গেল।

* * *

মাধব রায়ের আরোগ্য-কামনায় পুরোহিত শিবানন্দ ঠাকুর সঙ্কল্প করিয়া করালী মার পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অমাবস্যার ঘোরা তমিস্রা চারিদিকে মসীলিপ্ত করিয়া দেশটাকে যেন প্রেতপুরীতে পরিণত করিয়া দিয়াছে। বাইরে জোনাকির আলো ঠিক যেন কৃষ্ণবর্ণের শাড়ীখানির উপর সোনার চুমকি বসাইয়া দিয়াছে, নাটমন্দিরের মধ্যে বসিয়া আছে অসংখ্য প্রজার দল,...তাহাদের অন্তর-জোড়া আকাঙ্ক্ষা করালীমার রাতুল পাদু'খানিতে জানাইবার আকুল আবেগ লইয়া, একটা কোণে বসিয়া আকুল প্রাণে চরণ 'জাগ জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী' গান গায়িয়া মার ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতেছিল, আর উত্তরে বীণা প্রকাণ্ড ধুনুচিতে ধূনা দিয়া, ধূপ জ্বালিয়া অশ্রু-ধোয়া জলে বুক ভাসাইয়া পিতার আরোগ্য কামনা করিতেছিল। শিবানন্দ তাঁহার উদাত্তকণ্ঠে ভাবোন্মত্ত হইয়া পাঠ করিতেছিলেন,

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং॥

বীণা হঠাৎ দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল, কাঠ হইয়া যেন কত অপরাধিণীর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বেণু।

চাঞ্চল্য ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া বীণা বলিয়া উঠিল, 'বেণু বেণু, কখন এলি বোন ?'

পুরোহিতমহাশয় তখনও আত্মভোলা হইয়া পাঠ করিতেছিলেন,

সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজাং।
অভয়ং বরঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধপাণিকং॥

অশ্রুপূর্ণ লোচনে ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া বেণু ইঙ্গিতে বলিল, 'চুপ কর দিদি, পূজার ব্যাঘাত হ'বে।'

ধীরে ধীরে বীণা তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'কখন এলি বেণু ? বাবার কাছে যা, ছিঃ কাঁদছিস্ কেন ? অসুখ সকলেরই হয়, ভালও হন সবাই, বাবারও হয়েছে ভালও হবেন—ভাবনা কি ?'

বলিল বটে কিন্তু বীণার চক্ষুও শুষ্ক রহিল না।

বেণু বলিল—'পূজা শেষ হ'য়ে যাক দিদি একসঙ্গেই যাব।'

কাতরভাবেই বীণা বলিল,—'বাবার কাছে কেউ নেই বেণু তুই যা, আমি লোক দিচ্ছি তোর সঙ্গে।'

বেণু কিন্তু কোন রূপেই যাইতে চাহিল না। পিতাকে দেখিবার একান্ত বাসনা তাহার অন্তরের মধ্যে মাথা তুলিয়া উঠিলেও কিসের একটা দুর্ব্বলতা আসিয়া তাহার যাইবার পথে বাধা দিতে লাগিল।

বীণা বলিল, "বেণু যা, তোকে দেখবার জন্যে বাবা বড় কম উৎকণ্ঠিত নন, সলিল, এলোনা ?'

বেণু বলিল 'না।'

'কার সঙ্গে এলি তবে ?'

'—আমার হরুকাকার সঙ্গে।'—

অনেক বুঝাইয়া বীণা তাহাকে পিতার নিকট পাঠাইয়া দিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া বসিল।

পুরোহিত ডাকিলেন 'বীণা—মা !'

'কেন—কাকা ?'

'মা যে এখনও সাড়া দিচ্ছেন না রে !'

রোরুদ্যমানা বীণা জিজ্ঞাসা করিল 'তবে কি বাবা আমার—'

বক্তব্যের অবশিষ্ট অংশটুকু তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

পুরোহিত বলিলেন, 'কিন্তু সাড়া যে তার কাছ হ'তে পেতেই হ'বে মা, পুনরায় আমি ধ্যানে বসলুম, তুইও ডাক, দুর্ব্বলতা হয় তো আমাকে ঘিরে ফেলেছে। তুই ত মায়েরই

অংশ ডাক প্রাণ ভরে, সাড়া পেতেই হ'বে, সঙ্কল্প করে পূজোয় বসেছি।'

—চার—

হরলালের নিকট উইলের কথা শুনিয়া সলিলকুমার তাহার ম্যানেজারের নিকট আসিয়া কথাটা প্রকাশ করিতেই তাহাকে উত্তেজিত করিবার জন্য সে বলিল, 'আর ত চুপ করে থাকা চলবে না হুজুর। অহঙ্কারের পাছুতে ছুটে আপনাকে যতটুকু অপমান করে চলছিল' সেটার চরম হ'ল এই উইল। অতবড় জমীদারির আয়ের অর্দ্ধেক নিজেদের আয়ে যুক্ত হ'লে হুজুরের সুনাম বাড়বার পথ কতখানি যে প্রশস্ত হয়ে উঠত!'

সলিলকুমারের অন্তর তখন অশান্তিতে পূর্ণ ছিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রতিকার করবার জন্যে কি উপায় করতে বলেন?'

'আমার মনে হয় আদালতের সাহায্যে এই উইল নাকচ করে—'

'—করবে কেন? তাঁর সজ্ঞানে করা উইল, আপনার আমার বা আদালতের, নাকচ করবার ক্ষমতা কতটুকু আছে?—তা' হয় না অনুপমবাবু।'

আনতমুখে অনুপম বলিল, 'তা' হ'লে কি করতে বলেন?'

একটু উত্তেজিতভাবেই সলিলকুমার বলিল,—'আমিই যদি বলব' তোমাকে জিজ্ঞাসা করব কেন? জমীদারির কাজ করে মাথার চুল পাকালে—'

বাধা দিয়া শান্তকণ্ঠে অনুপম বলিল,—'আমি শুধু বলছিলাম দুজনে একটা পরামর্শ করবার জন্যে। আপনার এতটা অপমানের যোগ্য প্রতিশোধ যদি দিতে নাই পারা গেল তবে বৃথাই আপনার এত বড় জমীদারের আসন অলঙ্কৃত করা।'

দুই জনের মধ্যে আর কিছুক্ষণের মধ্যে একটা কথাও হইল না।

এত বড় একটা ঘোরতর সমস্যার সমাধানের জন্য ম্যানেজারবাবু যেন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে চিন্তার মধ্যে ছাড়িয়া দিল।

একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে সলিলকুমার বলিল,—'বেশ করে ভেবে দেখুন ম্যানেজারবাবু, আইনজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে যেটা ভাল বিবেচনা করবেন সেইটেই করবেন।'

সোফায় আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইতেই অনুপমকে সলিলকুমার বলিল,—'আমি এখন চল্লুম অনুপমবাবু. আমার স্ত্রীকে সেখানে যাবার অনুমতি দিয়ে বলে দিয়েছি উইল পাল্টাবার চেষ্টা করতে। যদি না পারে বা করে তা' হ'লে তার জমীদারিতে ঘুঘু চরাতে হ'বে। দেবীমূর্ত্তি গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে যায়গা সমভূমি করে সেখানে সরষে বুনতে হবে। বুঝলেন? হরলাল আমাকে বলছিল আমাকে বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্য না কি আমার হাতে জমীদারির আয়ের অপব্যবহার হ'বে। উদ্দেশ্য যদি তাই হয়, তবে, শুনুন, ব্যভিচারের স্রোত তাঁর জমীদারির মধ্যে বইয়ে দিতে হবে, সঙ্ঘবদ্ধ প্রজাদের মধ্যে ভেদনীতি চালিয়ে তা'দি'কে বিশৃঙ্খল করে তুলতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে জমীদার সলিলকুমার একজন মানুষ, নির্ব্বিকার চিত্তে সে অপমান সহ্য করে যাবে না, প্রতিশোধ সে নিতে জানে।'

সোফারের সঙ্গে সলিলকুমার চলিয়া গেল।

মটরে উঠিয়াও তাহার অস্বস্তিভরা অন্তরে এতটুকুও শান্তি আসিল না। থাকিয়া থাকিয়া মনের মধ্যে এই কথাটাই ধ্বনিত হইতে লাগিল অবিচারের, অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইবে যেমন করিয়া হোক্।

এই প্রতিশোধ লইবার উপায় উদ্ভাবনে সলিলকুমার নিজেকে বহু চিন্তার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াও প্রত্যেকটীরই যেন খেই হারাইয়া ফেলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দ্দাহ যেন লক্ষ গুণ হইয়া দেখা দিতে লাগিল। সোফারকে হুকুম দিল—'চঞ্চলার বাড়ী।'

চঞ্চলা, বিংশতিবর্ষীয়া বারনারী; নৃত্য-গীত-পটীয়সী সুন্দরী। তাহার বিলোল কটাক্ষ—নৃত্যগীতের লীলায়িত ছন্দ সলিলকুমারকে সময়ে-অসময়ে এইখানে আসিতেই বাধ্য করে। আজও তাহাকে আসিতে দেখিয়া সে সহাস্যে সলিলকুমারকে অভ্যর্থনা করিল।

সলিলকুমার প্রত্যহের মত আজও বসিল বটে কিন্তু চিন্তার দাব-দাহ তাহাকে একটুকুও আনন্দ দিতে পারিল

না ; প্রতি লোমকূপের ভিতর দিয়া যেন জ্বালা বাহির হইয়া আসিতে লাগিল।

তাহার এই ' চঞ্চলার দৃষ্টি এড়াইল: সলিলকুমারের গলা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'আজ তোমার কি হ'ল প্রিয়তম ?'

'তেমন কিছু নয় চঞ্চল, তুমি বোতল বার কর এইটারই অভাব আজ আমাকে কোনও কিছুতে মন দিতে দিচ্ছে না।'

গ্লাসের পর গ্লাস চলিল, কোকিলকণ্ঠী চঞ্চলার সুরের লহর রাজপথে লোক জমা করিয়া দিল। সলিলকুমারের মনে কিন্তু এতটুকুও সুখ আসিল না, হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহানন্দ এসেছে কি জান চঞ্চল ?'

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চঞ্চলা বলিল, 'তাকে আবার এ সময় কি দরকার ?'

স্মিতহাস্যে সলিলকুমার বলিল,—'আছে, এসেছে কি ?'

হাসির লহর ছড়াইয়া চঞ্চলা বলিল—'সর্ব্বরী ঠাকরুণের আঁচল ছেড়ে আর কবে থাকে সে ? সন্ন্যাসী হয়ে, মেয়েমানুষের পায়ে এম্নি ভাবে পড়ে থাকা যে কি কাজ—'

গম্ভীরভাবেই সলিলকুমার বলিল—'তান্ত্রিকদের পঞ্চমকার না হ'লে তো আর কাজ হয় না, আর ওটাও যে তারই একটা অঙ্গ, মদ্য, মাংস, মেয়েমানুষ প্রভৃতি শক্তি আরাধনার প্রধান উপচার কি না ; যাক সে কথা, চল তো কি করছে একবার দেখে আসি।'

গোলাপী নেশায়, আনন্দপুরীর মধ্যে চঞ্চলা তখন বাস করিতেছিল ; বলিল,—'দীক্ষা নেবে না কি ?'

মৃদুহাস্যে সলিলকুমার বলিল—'ভৈরবী তা' হ'লে তোমাকেই হতে হবে চঞ্চল।'

'এম্নি বেনারসী পরে কিন্তু—'

চঞ্চলার অধর-প্রান্তে আর একবার হাসির লহর খেলিয়া গেল।

সলিলকুমার বলিল—'একটু অপেক্ষা কর চঞ্চল, তার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।'

চঞ্চলা কিন্তু একাকিনী অপেক্ষা করিতে স্বীকৃতা হইল না, সে তাহার সঙ্গেই মহানন্দের গৃহের দিকে পা বাড়াইয়া দিল।

সলিলকুমার দ্বার ঠেলিয়া ডাকিল—'মহানন্দ ঠাকুর ?'

ভিতর হইতে উত্তর আসিল—'কে'

'দ্বার খোল,—আমি সলিলকুমার—'

মহানন্দ দ্বার খুলিল। তাহার মুখখান অনেকটা পাঁচের মত, গৌরবর্ণ, ভ্রু-যুগলের মাঝে মস্ত বড় সিঁদুরের টিপ, ললাটে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক, গলদেশে ও হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, যাত্রার দলের রাজার মত ঘাড় পর্য্যন্ত কেয়ারি করা চুল, পরণে গেরুয়া।

তাহাকে দেখিয়াই সলিলকুমার মাথা নোয়াইয়া বলিল,—'প্রণাম হই মহানন্দ ঠাকুর।'

ডান হাতখানাকে বাড়াইয়া মহানন্দ বলিল—'মা আপনার মঙ্গল করুন, বাসনা ?'

'একটু পায়ের ধূলা, একটা বড় বিপদে পড়েছি ত্রাণ করতে হবে যে !'

রক্তবর্ণ চক্ষু তাহার মুখের উপর ফেলিয়া মহানন্দ বলিল—'বিপদহারিণী মায়ের পায়ে পূজা দিন সব বিপদ এখুনি কেটে যাবে।'

একশত টাকার নোট মহানন্দের পায়ের তলায় রাখিয়া বলিল—'উপস্থিত মার পূজার খরচ এই নিন, কিন্তু পূজার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য-ক্ষেত্রেও আপনাকে নেমে পড়তে হবে।'

সাদরে তাহাকে গৃহমধ্যে বসিতে বলিয়া, ভৈরবীকে মহানন্দ বলিল—'মার মহাপ্রসাদ বাবুকে দাও।'

চঞ্চলা তখনও বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—'আমি এই খানেই দাঁড়িয়ে থাকি।'

বিস্ফারিত চোখে মহানন্দ বলিল—'তাও কি হয় ? ভেতরে এস।'

ভিতরে আসিয়া চঞ্চলা বলিল—'হ্যাঁ ঠাকুর তোমরা মদ খাও ?'

একহাত জিভ বাহির করিয়া মহানন্দ বলিল—'ছিঃ ও-কথা বলতে নেই, ও হচ্ছে কারণ—মার মহাপ্রসাদ ও না হলে মার পূজাই হয় না।'

প্রসাদ-গ্রহণের পর সলিলকুমার তাহাকে চুপি চুপি কি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'পারবে মহানন্দ ?'

দুইপাটী দাঁত বাহির করিয়া মহানন্দ বলিল—'এ আর কঠিন কি বাবু ? মার বেদীমূলে একটা হোম আর কাগুপ মন্ত্র জপ। বাস্, মহারাজাধিরাজকে সামনে টেনে আনা যায় আর সামান্য এ কাজ—'

উৎফুল্ল হইয়া সলিলকুমার বলিল—'যার পূজার জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা তা হ'লে পাবে মহানন্দ আর আসন যদি দখল করতে পার চাই কি মাসে পাঁচ হাজার টাকা মুনফা।'

মহানন্দ কহিল—'যার শক্তিতে শক্তিমান মহানন্দ এ সব কাজগুলা হাসতে হাসতে করতে পারে—নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি।'

সলিলকুমার আর একবার তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িল।

পাঁচ

প্রজাগণের হা-হুতাশ, বীণার প্রাণপণ চেষ্টা, শিবানন্দের হোম-যাগ, করালীমার চরণে প্রজাদের অশ্রুর অর্ঘ্য কোনওটাই মাধব রায়ের রোগকে নিবৃত্তির দিকে লইয়া যাইতে পারিল না বরং ক্রমশঃই বর্দ্ধিত আকারে দেখা যাইতে লাগিল। বীণা ও বেণুর মত প্রজাদিগের প্রাণের পরতে-পরতে হাহাকারের ছাপ এমনি ভাবে বসিয়া গেল যে, আহারাদির জন্য কাহারও প্রাণে এতটুকু আকাঙ্ক্ষা ছিল না। লোকে পিতৃ-হারা হইবার পূর্ব্বে তাহার সম্বন্ধে যেমন নিরাশ অন্তরে দিশা-হারার মত হইয়া পড়ে, ঠিক তেমনভাবেই প্রাসাদের চারিদিকে দিবা-রাত্রের সব সময়ই প্রজারা কাটাইতে লাগিল, একবার শেষ দেখা দেখিতে; তাহাদের পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু যেন অনন্ত পথের যাত্রী,—তাহাদের বুকখানা যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

মাধব রায় যখন বুঝিতে পারিলেন তাঁহার স্তিমিতপ্রায় জীবন-প্রদীপ আর কোন রূপেই জ্বালাইয়া রাখিতে পারা যাইবে না, তখন একদিন পুরোহিত মহাশয় ও ম্যানেজার-বাবুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার শেষ কথাটা উইলে যোগ করে দেওয়া হয়েছে তো?'

ম্যানেজার নীলাম্বরবাবু বলিলেন,—'আজ্ঞে হাঁ, এই লেখা হয়েছে যে, "বেণুর অদৃষ্ট কোনও দিন যদি তাহাকে এইখানেই টেনে নিয়ে আসে, তবে তাহাকে দৈনিক দুই টাকা হিসাবে খরচ দেওয়া হইবে।"'

বেণু ও বীণা তখন পিতার পায়ে ও মাথায় হাত বুলাইতেছিল, শিশি হইতে ঔষধ ঢালিয়া বেণু বলিল,—'ওষুধটা—'

অসমাপ্ত কথার মধ্যস্থলেই মাধব বলিলেন,—'আর নয় মা, যে ক'টা দিন বাঁচি, মার চরণামৃত পান করতে দে।' তারপর পুরোহিত মহাশয়কে বলিলেন, 'বদ্ধ ঘরে আর আমাকে রাখবেন না বাবা, হাঁপিয়ে উঠছি, মায়ার সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে না রেখে, যতক্ষণ থাকি, এমন যায়গায় আমাকে রাখুন, যেন ততক্ষণ মায়ের রাঙা পা দু'খানা সব সময়েই চোখে পড়ে।'

ব্রহ্মচারীর প্রাণের মধ্যে ঝড় উঠিল, তাহার দাপটে কিছুক্ষণের জন্য রুদ্ধবাক হইয়া গেলেন

মাধব রায় পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—'এতদিন ধরে যে কাজ করে এসেছি মার চ'খে সেটা কেমন ঠেকবে—মন্দটাই যদি ঠেকে—'

উচ্ছ্বসিত আবেগে শিবানন্দ বলিয়া উঠিলেন, 'মাধব, মাধব! বাবা, মা তোমার অন্তরে ব'সে যে আদেশ করেছেন, তুমি অবনতশিরে সেই আদেশই পালন করেছ মন্দ তো তার ভিতর এতটুকুও হতে পারে না বাপ।'

উৎকর্ণ হইয়া মাধব পুরোহিত মহাশয়ের কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে বিনীতভাবেই তিনি বলিলেন,—'আপনার পায়ের একটু ধুলা দিন বাবা, আমার মনে যে সন্দেহ উঠেছিল এক কথায় আপনি সেটা মিটিয়ে দিলেন। মা'র সামনের নাট-মন্দিরে আমাকে নিয়ে চলুন, যে ক'টা দিন থাকি উন্মুক্ত জানালার ফাঁক দিয়ে জাহ্নবীমার কল-গান শুনতে শুনতে মায়ের অভয় চরণ দু'টী বুকের মাঝে জাগিয়ে রাখি, এখানকার খেলা শেষ হ'ল যখন—'

শিবানন্দ বলিল,—'চঞ্চল হয়ে পড়ছ মাধব?'

সস্মিতমুখে মাধব বলিলেন—'না-না বাবা, যেটা শাশ্বত, যেটা ধ্রুব সেটার জন্যে চাঞ্চল্য আসবে কেন? সব মানুষের মত যেটার জন্যে অপেক্ষা করে বসে রয়েছি, সেটার জন্য চঞ্চল হব কেন বাবা?'

এতক্ষণ ধরিয়া বীণা তাহার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগ গোপন করিয়া রাখিলেও আর রাখিতে পারিল না, নয়নজলে বুক ভাসাইয়া বলিল,—'বাবা বাবা! এ সব কি বলছ?'

শীর্ণ হাতখানি বীণার মাথায় দিয়া মাধব বলিলেন,—'কাঁদছিস কেন মা, জগতের ভেতর যেটা মহা সত্য, যেটা ঘটবেই ঘটবে—যেটাকে কেউ কখন ঠেকিয়ে রাখতে

পারে নি সেটার জন্যে কান্না কেন? কাঁদিস নি, বরং আনন্দ কর তোর বাবা ভাঙ্গা ঘর-বাড়ী ছেড়ে, রাজ-অট্টালিকায় বাস করতে চলেছে—জীর্ণ বস্ত্র ছেড়ে নূতন বস্ত্র পরতে চলেছে—'

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন —'দায়িত্বের যে গুরুভার তোর মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, সেটা ঠিক ভাবে পালন করে যাস মা; মা তোকে আশীর্ব্বাদ করবেন।'

তারপর বেণুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'বেণু! যাবার সময় সলিলকুমারকে একবার দেখতে পেলে তৃপ্তিটা খুব বেশী করেই পেতুম মা, কিন্তু যা'ক এলই না যখন, আমার গোটাকতক কথা তুই-ই শুনে রাখ, তোর প্রজাদের মায়ের আসন দখল করে আছিস তুই, আপদে-বিপদে, রোগে-শোকে দুঃখে-দারিদ্র্যে মায়ের কর্ত্তব্যটা পালন করে যাস। অত্যাচারের হাত হ'তে তাদের রক্ষা করতে গিয়ে নিজের প্রাণটা যদি বলি দিতে পারিস, তবে আমার মৃত আত্মার এই তৃপ্তিটাই সব চেয়ে বেশী হবে। তুই আমার কন্যা, আর তোর ছেলেদের তুই-ই প্রকৃত মা।'

অশ্রুর বড় বড় ফোঁটা বেণুর গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া দিল। আবেগপ্লুত কণ্ঠে ডাকিল—'বাবা!'

স্নেহ-সিক্ত-কণ্ঠে মাধব বলিলেন—'কি মা?'

বেণুর মুখ দিয়া কিন্তু একটা কথাও বাহির হইল না।

তাহাকে বুকের উপর ফেলিয়া তাহার চক্ষুর জল মুছাইতে মুছাইতে মাধব বলিলেন—'ছেলের জন্যে বাপ-মায়ে কত ঝগড়াই হয় মা। আমি যখন ছোট ছিলুম, আমার এক একটা কাজ নিয়ে বাবা আর মার মধ্যে কি ভীষণ বাদানুবাদ না হ'ত, দু'তিন দিন উপোষ দিয়েই হয় তো মা দিন কাটিয়ে দিতেন, শেষে বাবা পরাজয় স্বীকার করতেন—মাতৃশক্তির জয় জয়কার হ'ত।'

বেণু ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, 'তোমার কাছে শপথ করছি বাবা, 'দেহ হ'তে প্রাণটা বেরিয়ে গেলেও তোমার প্রত্যেক আদেশটাই পালন করবার চেষ্টা কর'ব।'

রোগজীর্ণ মাধবের পাণ্ডুর মুখ খানিতে হাসি খেলিয়া গেল। বলিলেন—'করবি বই কি মা, নিশ্চয়ই করবি, তুই যে আমার বীণার বোন্ ও কি বলে জানিস্ বেণু। বলে ও প্রজাদের রক্ষী, কথাটা সেদিন হ'তে আমাকে এতটা আনন্দ দিয়েছে মা, যে, তোদের ফেলে যাবার কষ্টটা তার ভিতর কোথায় তলিয়ে গেছে।'

বেদানার রস নিংড়াইয়া বীণা বলিল—'এইটুকু খেয়ে ফেল বাবা, অত কথা বলছেন কেন? ডাক্তারবাবুর নিষেধ যে!'

মৃদু মধুর হাসিয়া মাধব বলিলেন—'আর দু'একটা দিন পরে একেবারেই চুপ করব' বীণা, তখন হাজার চেষ্টাতেও আর কথা বলাতে পারবি না,—হাঁ বেণু।'

অশ্রুনিরুদ্ধকণ্ঠে বেণু বলিল—'কেন বাবা?'

'আমার শেষ একটা কথা তোকে বলে যাই মা, সলিলের সহধর্ম্মিণী তুই, অধঃপাতের নিম্নতম পথ হতে তাকে টেনে তুলতেই হবে তোকে, তার কাজে রাগ-দুঃখ-অভিমানের সহস্র কারণ থাকলেও সেগুলাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাকে যদি মানুষ করে তুলতে পারিস্…'

মুহূর্ত্তের জন্য মাধব রায় মৌন হইয়া গেলেন।

বেণু বলিল—'পারব কি বাবা?'

"—পারবি বৈ কি মা, আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোকে পারতেই হবে,—"

তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া বেণু নীরবেই বসিয়া রহিল।

পুরোহিত মহাশয়কে মাধব বলিলেন—'বাবা!'

শিবানন্দঠাকুর এতক্ষণ বোধ হয় অন্য কোনও পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলেন, মাধবের ডাকে পুনরায় এ পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'কেন মাধব?'

'এইবার আমাকে নিয়ে চলুন, এখানকার ঝন্‌ঝট এক রকম শেষই করে ফেলেছি, যে-কটা দিন থাকতে হয় সেকটা দিন—'

একটা অদূরাগত আশঙ্কার ভয়াল দৃশ্য শিবানন্দের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উঠিল। বিষাদের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভয় পাচ্ছ মাধব?'

আনন্দ-গর্ব্বে মাধবের মুখখানা যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—বলিলেন, 'কেন বাবা এসংসার ছেড়ে যেতে হবে বলে?'

শিবানন্দ নীরবেই বসিয়া রহিলেন।

মাধব বলিলেন—'মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে দিন-রাত যখন আমার জন্যে কোল পেতে বসে রয়েছেন দেখতে

পাচ্ছি, যখন দেখতে পাচ্ছি শ্মশানের প্রজ্জ্বলিত আগুনের মধ্যে মায়ের কোলে, কচি ছেলের মত মানুষ খেলা করছে, তখন ভয় হবে কেন বাবা? বরং হিংসা হচ্ছে, ব্যাকুলতা এসে প্রাণটাকে বিহ্বল করে তুলছে—ওদের মত কখন আমি মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, সেই সুযোগের জন্যে মনের ভেতর তোলপাড় করছে, আমায় নিয়ে চলুন্।'

পুলকের বন্যা আসিয়া শিবানন্দকে কোথায় যে ভাসাইয়া লইয়া গেল, তাহা তিনি নিজেই ভাবিয়া পাইলেন না, কিছুক্ষণ তাহাতেই হাবুডুবু খাইয়া আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠিলেন—'মাধব—মাধব! গর্ব্বে-আনন্দে বুকখানা আজ আমার ফুলে উঠছেও যেমন হিংসাও তার চেয়ে এতটুকু কম হচ্চে না, সংসারের মধ্যে বাস করে সহস্র সহস্র প্রজার মায়ায় ডুবে থেকেও তুমি সন্ন্যাসী, ভোগের ষোড়শোপচার তোমার চারি দিকে ছড়ান থাকলেও সে সব ত্যাগ করে তুমি যোগী,—তুমিই মায়ের প্রকৃত সন্তান, আর আমি?—যাক্ চল বাবা তোমাকে নিয়ে যাই।'

* * *

নাট-মন্দিরের প্রবেশ-পথেই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন রক্তবস্ত্র পরিহিত প্রিয়দর্শন এক যুবক সন্ন্যাসী করালীমার মন্দির প্রাঙ্গণে যেন কাহার অপেক্ষায় ব্যাকুলভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মাধব তাঁহার পদধূলি লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি চাই?'

হস্ত প্রসারণ করিয়া আশীর্ব্বাদান্তে সন্ন্যাসী বলিলেন, 'চাই মার মন্দিরে একটু আশ্রয় আর ওঁরই পাদপদ্মে দু'টা জবা দিবার অধিকার,—সে অধিকার হ'তে যেন কোনও দিন বঞ্চিত না হই।'

'তথাস্ত' বলিয়া শিবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মধ্যাহ্ন অতীত কিছু খাবার—'

জিহ্বার অগ্রভাগ দাঁতে চাপিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—'ছিঃ ও কথা বলতে নেই।'

'তবে?'

'সন্ন্যাসীর খাওয়া নিষেধ, তবে হাঁ কিছু আহুতি দেবার প্রয়োজন হয়েছে বটে।'

হাসিয়া শিবানন্দ বলিলেন, 'বেশ,'

সেইদিন হইতে সন্ন্যাসী মহানন্দ করালীমার মন্দিরে আশ্রয় পাইলেন; এবং জমীদারের আরোগ্য-কামনায় নিজেই হোম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রজাকুল এবং স্বয়ং শিবানন্দ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, তাহার হোমের ফলে মাধব যেন ক্রমশঃই রোগমুক্ত হইয়া উঠিতেছেন। প্রজার দল এই নবাগত সন্ন্যাসীকে দেবদূত বলিয়া তাঁহার পায়ে মাথা নোয়াইল, শিবানন্দ মুগ্ধ হইয়াগেলেন, মাধব রায় তাঁহাকে প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া তাহার পায়ে সশ্রদ্ধ-চিত্তে প্রণাম করিলেন।

পিতার পাদমূলে বসিয়া বীণা সে দিন মহানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা ঠাকুর আপনার বাড়ী কোথায়?'

মুগ্ধ আঁখির দৃষ্টি বীণার মুখের উপরে ফেলিয়া মহানন্দ বলিলেন,—'আমাদের তো বাড়ী থাকে না দিদি, থাকে একটু আশ্রম, ছিলও, কিন্তু খাজনা দিতে না পারার অপরাধে সে টুকুও জমীদার সলিলকুমারের খাস হয়ে গিয়েছে, এখন নিরাশ্রয়।'

তাহাকে আর বলিতে হইল না, উত্তেজিতভাবেই মাধব রায় বলিয়া উঠিলেন—'সলিল? সে অধঃপাতে গেলেও নরকের পথে এতখানি নেমে পড়েছে যে সন্ন্যাসীর আশ্রম—'

উত্তেজনার আধিক্যে তাঁহার মুখ দিয়া আর একটা কথাও বাহির হইল না, চক্ষু দুইটা একরকম অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল।

ব্যস্তভাবেই সন্ন্যাসী বলিলেন,—'উত্তেজিত হচ্চ কেন বাবা, সবই মায়ের খেলা। তাঁর কোন্ গোপন উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যেই আশ্রম ছাড়া করিয়েছেন—তা' না হ'লে—'

'সন্ন্যাসী! জান না তুমি তার এই ব্যবহারের ভেতর দিয়ে কি যে মর্ম্ম যাতনা আমাকে দিচ্ছে—'

হঠাৎ দশ বারটী লোক আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেইস্থানে আছাড়িয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—'দয়াল রাজ! সলিল জমীদারের অত্যাচারে দেশত্যাগী—তার অত্যাচারে স্ত্রী-বৌ নিয়ে—'

মাধব রায়ের হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া হঠাৎ দ্রুত হইয়া উঠিল, একান্তভাবেই বলিয়া উঠিলেন,—'মা—মা! তোর সন্তানদের ভার তুই নে মা! আর যে পারছি না...বীণা! বুকটা একবার চেপে ধর না মা, বড্ড ধড় ফড় করছে।'

তিনি আর কোনও কথা বলিতে পারিলেন না তাঁহার চক্ষু দুইটা উর্দ্ধে উঠিয়া পড়িল। বেণু ও বীণা পিতার বুকে আছাড় খাইয়া পড়িল, শিবানন্দ নিশ্চল প্রতিমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, মহানন্দ রক্ত চক্ষু বাহির করিয়া প্রার্থীদিগকে বলিতে লাগিলেন,—'রে মৃত্যুর অগ্রদূত! আমি তোদের অভিসম্পাত দেব—অভিসম্পাত দেব।'

শিবানন্দ বলিয়া উঠিলেন,—'কি করছ মহানন্দ, সন্ন্যাসী তুমি—'

তেমনিভাবেই মহানন্দ বলিতে লাগিলেন,—'ও সব আমি কিছু শুনতে চাই না আমি অভিসম্পাত দেব।'

—ছয়—

মাধব রায়ের মৃত্যুর পর নিজের কার্য্যকুশলতায়, মহানন্দ, শিবানন্দের পরম স্নেহভাজন হইয়া উঠিল। জমীদারির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট হইতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা আদায় করিতে করিতে তাহার দিনগুলি কাটিয়া গেলেও বীণার চক্ষুতে তাহার ব্যবহারের একটাও ভাল বলিয়া ঠেকিত না। মহানন্দের প্রত্যেক কথা আর সকলের খুব সরল বলিয়া মনে হইলেও তাহার মনে ঠিক বিপরীত বলিয়াই ধারণা হইত।

একদিন সে নীলাম্বরবাবুকে বলিল, 'ম্যানেজারকাকা মহানন্দঠাকুরকে আপনার কেমন মনে হয় বলুন তো?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বীণার মুখের উপর ফেলিয়া নীলাম্বরবাবু বলিলেন, 'একথা কেন জিজ্ঞাসা করছ' মা?

কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বীণা বলিল, 'লোকটার চাল-চলন, কাজ কর্ম্ম কথা বার্ত্তা, যদিও দিনের আলোর মত পরিষ্কার, তবুও যেন আমার মনে হয় এর পিছনে একটা বিরাট্ অন্ধকার লুকিয়ে আছে।'

মৃদুহাস্যে নীলাম্বরবাবু বলিলেন, 'ভবিষ্যৎ সব সময়েই অন্ধকারের গর্ভে লুকিয়ে থাকে মা, সেটা নিয়ে এখন থেকে—'

বীণা বাধা দিয়ে বলিল, 'প্রজাদের ভবিষ্যৎ বিপদ, যে সময়ই আমার চোখের সামনে ছবির মত ভেসে ওঠে—তখনই যেন হাঁপিয়ে পড়ি, মনে হয় এমন সোনার দেশে প্রেতের নৃত্য সুরু হল।'

তাহার এই কাতরোক্তি নীলাম্বরের প্রাণটাকে একেবারে মুষড়াইয়া দিল, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ আশঙ্কা তোমার কোথা হতে আসছে মা? আশঙ্কার কারণ যদি যথার্থই হয়ে থাকে এখন হ'তে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে বৈ কি।'

উত্তরে বীণা বলিল, 'আমার আশঙ্কার প্রথম কারণ এই, মাঝে মাঝে তার অন্তর্দ্ধান, দ্বিতীয় কারণ দলে দলে সে যে প্রজা নিয়ে আসছে সকলেই সলিলের জমীদারির।'

হাসিয়া নীলাম্বরবাবু বলিলেন, "তোমার প্রথম ভয়ের কারণ আমারও দৃষ্টি এড়ায় নি, কিন্তু পুরোহিতমহাশয় বলেন—'এই অন্তর্দ্ধান অন্য কিছুর জন্য নয়, মাঝে মাঝে সে যায় তার শ্রীগুরুর চরণ দর্শন করতে, আর তাঁর মতে যাওয়াও উচিত। দ্বিতীয়টার সম্বন্ধে আমার এইটাই মনে হয় জামাইবাবুর জমীদারিতে বাস করে নির্য্যাতিত হয়ে এখানে আশ্রয় পেয়েছে তাই আর সকলে—'

বাধা দিয়া বীণা বলিয়া উঠিল, 'নির্য্যাতন পূর্ব্বেও চলছিল, তখন এত লোক আসত না, অথচ এখন এত লোকই বা আসে কেন?'

'তখন তো আর মহানন্দ ছিল না। যাই হোক সন্দেহ যখন তোমার হয়েছে মা, তখন এই নূতন প্রজাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্যে, তুমি প্রজাদিগের মধ্যে যে কয় জনকে তাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করে দিয়েছ, তাদের আমি দেখা করবার জন্যে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি এখন বরং তাঁর সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা কিরূপ সেইটাই জেনে আসি চল মা, বহুদর্শী তিনি তাঁর মতামতও খুব হাল্কা হবে না। কথাটা যখন তুমি তুলেছ তখন তো সেটাকে অবহেলা করতে পারি না।'

নীলাম্বরবাবুর এ কথার পর বীণার আর কোনও কথা বলিবার ছিল না। সন্দেহ যতই তাহার অন্তরকে মসীলিপ্ত করিয়া তুলুক না কেন তাঁহার যুক্তিও তো নিতান্ত অসার নয়। জমীদারির মধ্যে ভবিষ্যত উদ্দাম নৃত্যের কাল্পনিক দৃশ্য তাঁহার সমস্ত শরীরকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিলেও, যেখানে ম্যানেজারকাকার মত কর্ণধার, পুরোহিত-কাকার মত হিতৈষী এখনও বর্ত্তমান, সেখানে সন্দেহের মূল কারণ যে, সে কতটুকুই বা অনিষ্ট করিতে পারে? কিন্তু মহানন্দের ব্যবহারের আর একটা দিক,

শতচেষ্টা করিয়াও বীণা ম্যানেজারবাবুর নিকট প্রকাশ করিতে পারিল না।

তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নীরব থাকিতে দেখিয়া নীলাম্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি এত ভাবছ মা ?'

সঙ্কুচিতভাবেই বীণা বলিল, 'আর একটা কথা—'

কিন্তু তাহাকে আর বলিতে হইল না বাহির হইতে শিবানন্দস্বামী ডাকিলেন—'মা!'

আনন্দাপ্লুত কণ্ঠে বীণা ডাকিল,—'আসুন কাকা!'

তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলে, উভয়েই নতশীর হইয়া প্রণাম করিলেন।

আশীর্ব্বাদান্তে আসন গ্রহণ করিয়া শিবানন্দস্বামী বলিলেন, আজ আবার কতক গুলা লোক এসেছে মা,—তোমার মতামত—

বীণা বলিল, 'পুরুত কাকা ?'

'কেন মা ?'

স্বামীজীর কথার মধ্য স্থলে বীণার এই আহ্বানের অর্থ বুঝিতে পারিয়া নীলাম্বরবাবু বলিলেন, 'এই ধরণের প্রজার আগমন মায়ের মনকে কেমন একটা সংশয়ে ভরিয়ে তুলেছে বাবা, এই সম্বন্ধেই এতক্ষণ আলোচনা হচ্ছিল। এরা কোথা হতে আসছে বাবা ?'

একবার নীলাম্বরবাবুর আর একবার বীণার মুখের দিকে চাহিয়া শিবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সলিলকুমারের জমীদারি হতে আসছে;কিন্তু এ সংশয়ের কারণ কি নীলাম্বর ?"

নীলাম্বরবাবু বলিতে লাগিলেন, 'মা বলছিলেন, আজ পর্য্যন্ত যত প্রজা এসেছে বা আসছে সে সবই যদি সলিলকুমারের জমীদারি হতে আসে তবে তাঁর জমীদারি যে প্রজাশূন্য হয়ে পড়বে, এর জন্যে কি তাঁর সঙ্গে বিরোধের একটা নূতন কিছু সৃষ্টি হবে না ?'

বীণা বলিল, 'এদিকটা ছাড়াও আর একটা কথা আছে কাকা, অত্যাচারী সে পূর্ব্বেও যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে, তবে এখন এত প্রজা আমদানী হচ্চে কেন ? এর ভেতর মহানন্দ ঠাকুরের কোনও—

সরলহাস্যে মুখ খানিকে প্রদীপ্ত করিয়া শিবানন্দ বলিলেন, 'মহানন্দের সম্বন্ধে এতটুকুও সন্দেহ মনে এন না মা, তাকে আমি যতদূর বুঝেছি, তাতে এটা আমি জোর গলায় বলছি, সে সরল, উদার করালীমার ভক্ত সন্তান, তবে প্রজার দল বর্দ্ধিত করবার দিকটা আমি কোনও দিনই ভাবি নি। এইটাই কেবল ভেবেছি মার রাজস্বের আয় বাড়ছে।...এবার হতে ভাবতে হবে।'

এই তিন জনের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আর একটা কথাও হইল না নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে ঘড়িটা কেবল টিক্ টিক্ করিতেছিল আর বাহিরে বারান্দায় পিঞ্জরাবদ্ধ ময়না পাখীটা থাকিয়া থাকিয়া বলিতেছিল—'কালী তরাও—কালী তরাও।'

গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শিবানন্দ বলিতে লাগিলেন,—'তার ব্যবহারের ভিতর দিয়ে মহানন্দ আমাকে এমনই মুগ্ধ করে ফেলেছে বীণা-মা যে, তার, ভাল দিকটা ছাড়া আর কোনও দিকই আমার নজরে পড়ে না। তার উদাত্ত কণ্ঠের মাতৃস্তব, চোখের জলে মা-মা ডাক, আমাকে চেতন-হারার মত করে দিয়ে কোন্ দেশে যে নিয়ে গিয়ে ফেলে, পূজায় তার ঐকান্তিকতা আমার সমস্ত শরীরে পুলক ছড়িয়ে দেয়। মনে হয় করালীমা নিজেই বুঝি তাকে তাঁর পূজারী রূপে এখানে নিয়ে এসেছেন। আমার অবর্ত্তমানে আমি তো তাকেই আসন দিয়ে যাব বলে মনে করেছি।'

শিবানন্দ পুনরায় মৌন হইয়া গেলেন।

নীলাম্বরবাবু বলিলেন,—'আপনার এ কথার পর আমাদের আর কোনও কথাই থাকতে পারে না।"

পুনরায় শিবানন্দ বলিতে লাগিলেন—'আর কোন দিকেও তাকে ছোট করে দেখবার অবকাশ আমি তো পাই নি, তোমরাও পেয়েছ কি না জানি না, যে লোক প্রজার সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলে মনে করে, নিজেকে তাদেরই একজন বলে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়'—

আবেগকম্পিত কণ্ঠে বীণা বলিল—'সে দিক দিয়ে যে খুবই উঁচু একথাও অস্বীকার করবার উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না।'

শিবানন্দ বলিলেন—'তবে ?'

বীণা কহিল—'সলিলের জমীদারি হইতে সে যদি এত প্রজাই—'

শিবানন্দ বলিলেন—'এর ভেতর সলিলেরই কোনও চাল নেই তো ? সে নিজেই যদি কোনও মতলব দিয়ে প্রজার দলকে পাঠিয়ে দেয়...জমীদারির ওপর তার লোভও তো বড় কম নয়।'

তাঁহারযুক্তি নীলাম্বরবাবু ও বীণার মনে একটা নূতন সমস্যা আনিয়া দিল।

নীলাম্বরবাবু বলিলেন,—'আশ্চর্য্যও কিছু নয় বাবা।'

বাহির বারান্দায় ময়নাটা বলিয়া উঠিল—'কালী তরাও —কালী তরাও।'

একটু চিন্তিত ভাবেই বীণা কহিল,—'যে দিক দিয়েই হোক এ বিষয়টা চিন্তা করবার দরকার হয়েছে বাবা। আমাদের একজনের সন্দেহ যদি সত্য হয় তবে সেটার ব্যবস্থা আগে করা দরকার।'

বীণা আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভৃত্য আসিয়া সেই সময় ম্যানেজারবাবুকে বলিল—কাছারী-বাড়ীতে কতকগুলি লোক আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, কি বিশেষ দরকার।'

নীলাম্বরবাবু বলিলেন—'একটু পরে আমি যাচ্ছি দয়াল, তাঁদের অপেক্ষা করতে বল।'

বীণা বলিল—'আচ্ছা কাকা।'

'কেন মা?'

বীণা বলিতে লাগিল,—'বাবার মৃত্যুর সময় বেণু তার কাছে শপথ করেছিল, যে, প্রজাদের মায়ের আসন গ্রহণ করে সমস্ত আপদ-বিপদ হ'তে তাদের রক্ষা করবে সে। এ অবস্থায় তার বিনা অনুমতিতে প্রজাদের আশ্রয় না দিয়ে, যারা আসবে তাদের বেণুর কাছ হতে একখানা অনুরোধ পত্র—'

তাহাকে আর বলিতে হইল না, শিবানন্দ বলিয়া উঠিলেন—'এই তো জমীদার-কন্যা তোমার মত কথা মা, সংসারের কারচুপি বুঝি না, এ সবগুলো ভাবিও না কোনও দিন, তুমি যা বল্লে মা সেইটাই ঠিক।'

বাহিরের বারান্দা হইতে ময়না পাখীটা বলিয়া উঠিল —'ঠিক ঠিক—কালী তরাও—কালী তরাও।'

হাস্য মধুর কণ্ঠে শিবানন্দ বলিলেন,—'দেখলি মা পাখীটা বলছে ঠিক ঠিক, ···হবে না? জমীদারের মেয়ে মা তুই। যাক্ তা'হলে এই কথা বলেই আমি তাদের ফিরিয়ে দিইগে।'

মুহূর্ত্তের মধ্যে কি ভাবিয়া সহাস্য মুখে বীণা বলিল,—'যখন তাদের আপনি অভয় দিয়ে এসেছেন তখন আশ্রয় দেন, ভবিষ্যতে যদি ভাল মনে করেন তবে ঐ পথই ধরবেন।'

বীণা-মার বুদ্ধির সুখ্যাতি করিতে করিতে স্বামীজী চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

"গোলোকের বেণু ভূলোকের মাঝে ভুলে উঠেছিল বেজে!"

[শ্রীরামেন্দু দত্ত বি-এ]

পিঁজরার পাখী উড়িয়া গিয়াছে, শূন্য খাঁচাটি দোলে!
পূর্ণিমা নিশা পোহায়ে গিয়াছে, ঘুম ঘোরে চাঁদ ঢোলে!
নারিকেল শাখা ভোরের বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া কা'রে
'বিদায়! বিদায়!' কহি' ইঙ্গিতে পাতার আঙুল নাড়ে!
ফুলমালা হায় ধূলাতে লুটায়, দলিত হয়েছে দল—
কুসুম-শূন্য মালার সূতায় কাহার চোখের জল!
হায় রে কখন ঘুমায়ে পড়েছি, জেগে দেখি খালি কোল!
আকাশে নেমেছে আলোর প্লাবন, পাখীরা তুলেছে রোল!

সে কি মোর পাশে এসেছিল কভু ?—স্বপন নহে ত ইহা ?
সুখ-স্বপনের মত কেন তবে গেল সে মিলাইয়া !
কভু কি তাহারে পেয়েছিনু বুকে ?—মনে ত পড়েনা ভালো,
মোহের আঁধারে দেখিনি ত আমি স্থধু আলেয়ার আলো ?
আলেয়ার প্রায় কেন তবে হায় ক্ষণতরে দিয়ে দেখা
চির-বিরহের তমসার তীরে ফেলে রেখে গেল একা !
সে এত মধুর, সে এত সুখের, সে এত আশীষময়,
সত্য তাহারে পেয়েছিনু পাশে, ভাবিতেও করে ভয়।

মানুষ-প্রতিমা নহে সে আমার, মানস-প্রতিমা সে যে
গোলোকের বেণু ভুলোকের মাঝে ভুলে উঠেছিল বেজে।
তাই কি গো হায় সহিল না তাহা রজনীর অবসান—
পূর্ণিমা রাতি পোহাইয়া গেল, কুমুদিনী ম্রিয়মাণ।
তাই কি তাহারে নারিনু রাখিতে হেম-পিঞ্জরে বেঁধে
চরণ-নূপুর ফেলে রেখে প্রিয়া ফিরে গেল কেঁদে কেঁদে!
তারি আঁখিজল করে টলমল তরুশিরে, ফুলদলে—
তারি বিরহের অশ্রু-সায়রে তিনটি ভুবন ঢলে !

সে গিয়াছে চ'লে কিছু নাহি ব'লে, ঘুম না ভাঙায়ে মোর,
সে গিয়াছে চ'লে নয়নের জলে ভিজায়ে মালার ডোর।
এখনো রয়েছে অঙ্গ-সুরভি, সুধাকণ্ঠের সুর
মনে হয় প্রিয়া পারেনি চলিয়া যাইতে অধিক দূর।
দিগ্বলয়ের কোলে কোলে ঐ ঝলে যে আলোক রেখা।
দৃষ্টি চলে না—নহিলে এখনো মিলিত প্রিয়ার দেখা।
বিশ্ব-প্রকৃতি আজি এ প্রভাতে দুলিছে কিসের লাগি'
গাহি' সারা রাত এখনো কোকিল কেন বা রয়েছে জাগি' ?
আঁখিজল যত শুকায়ে গেল না কেন সে নিশার বায়
কেন এ প্রকৃতি ডাকিতেছে কা'রে 'ফিরে আয়' 'ফিরে আয়' ?

কতনা নিদয় আমার হৃদয়, কতনা দিয়েছি ব্যথা
বিষ-নিশ্বাসে শুকায়ে গিয়াছে বনের দুলালী লতা।
বিদায়ের কালে তাই সে কিছুই কহেনি বিদায় বাণী
নীরবে মুছিয়া নয়নের জল চ'লে গেল অভিমানী।
চ'লে গেল প্রিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিলন-রজনী ভোরে
বিদায়-নয়ন-সলিল-সায়রে অসহায় করি' মোরে॥
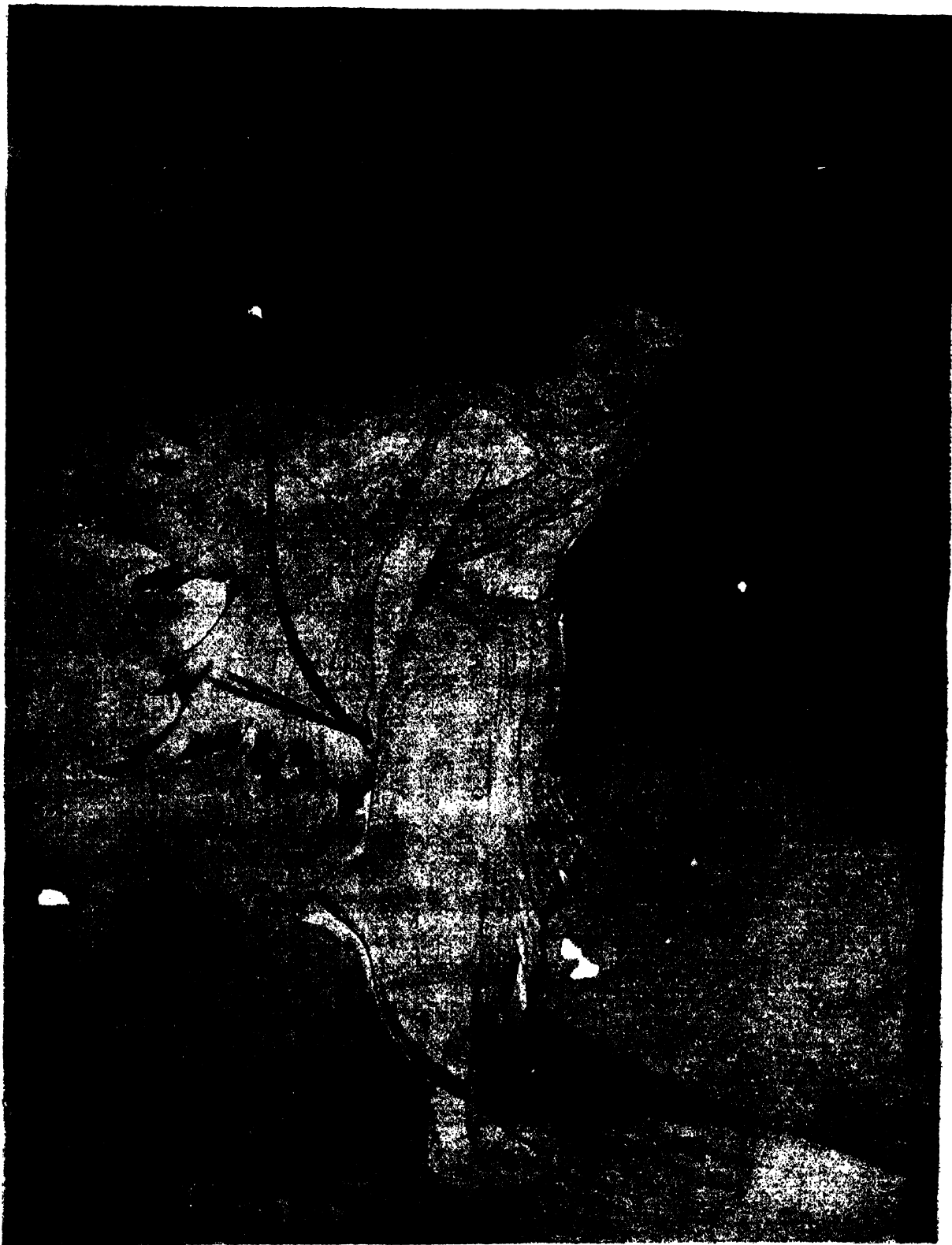
"একদা তুমি অঙ্গ ধরি' ফিরিতে নব ভুবনে,

মরি মরি অনঙ্গ দেবতা!"

—রবীন্দ্রনাথ

"না"

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ]

"না" কথাটী নিষেধাত্মক, অস্বীকৃতিসূচক। ইহার মূর্ত্তি সংহারিণী; লয় এবং ধ্বংসই ইহার কার্য্য, তথাপি জ্ঞানরাজ্যে ইহার প্রতিপত্তি, ইহার শক্তি অক্ষুণ্ণ। জ্ঞানরাজ্য হইতে যদি "না" কথাটী একেবারে সরাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই রাজ্যের ধ্বংস অপরিহার্য্য। "না" কথাটীর তিরোভাবের সহিত জ্ঞানের তিরোভাব অবশ্যম্ভাবী। অতএব ধ্বংসকারী "না"এর উপর জ্ঞানরাজ্যের সৃষ্টি এবং স্থিতি নির্ভর করিতেছে। যাহা বিনাশের কারণ তাহাই সৃষ্টির হেতু,যাহা লয়ের কারণ তাহাই স্থিতির সহায়, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। সুতরাং মানিয়া লইতে হইবে যে, ধ্বংসের অন্তরালে সৃষ্টির বীজ লুক্কায়িত আছে। "না"এর ভিতর "হাঁ"এর অস্তিত্ব বর্ত্তমান।

কোন ধারণাকে অবাস্তব মনে করিয়া প্রত্যাহার করা কিংবা ইহা বাস্তবের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিবার শক্তির অভাব প্রকাশ করাই "না"এর কার্য্য। ইহা প্রকৃত পক্ষে বাস্তব নয় কিংবা ইহা বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিবার শক্তি আমার নাই, ইহা প্রকাশ করাই "না"এর স্বভাব। অস্বীকার করা, সংহার করা, প্রত্যাহার করাই যদি 'না'এর প্রকৃতি হয়, তাহা হইলে সেই জিনিসটী কি যাহাকে "না" অস্বীকার বা সংহার বা প্রত্যাহার করিয়া থাকে, ইহাই আমাদের বিচার্য্য। অস্বীকার, সংহার এবং প্রত্যাহার প্রত্যেক কথাটীই কোন না কোন জিনিসের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। যাহার অস্তিত্ব নাই তাহাকে অস্বীকার, সংহার বা প্রত্যাহার করা বাতুলতার কাজ। যখন আমি "না" বলিতেছি তখন আমি কিছু অস্বীকার করিতেছি, সুতরাং আমার অস্বীকার যাহা আমি অস্বীকার করিতেছি তাহারই নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। সুতরাং অস্বীকার নাস্তিকবাচক হইলেও ইহার অন্তরালে অস্তিত্ব লুক্কায়িত আছে। 'না' এর ভিতর 'হাঁ' বর্ত্তমান। কিন্তু সেই জিনিসটী কি যাহাকে "না" না বলিয়া থাকে অর্থাৎ "না" যাহাকে অস্বীকার করে?

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, যাহা নাই তাহা অস্বীকার করা বাতুলতার কাজ। তবে কি আমরা মনে করিব যে, কিছু অস্বীকার করিবার পূর্ব্বে তাহার স্থিতি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যদি জ্ঞানের নির্দ্দেশ এইরূপ হয়, তবে সে জ্ঞান উন্মাদের প্রলাপ মাত্র। ভগবান নাই বলিবার পূর্ব্বে কি ভগবান আছেন প্রমাণ করিতে হইবে? এখানে জল নাই বলিবার পূর্ব্বে কি বলিতে হইবে এখানে জল আছে? সুতরাং আমি যেটাকে "না" বলিব পূর্ব্বসূচি ঠিক সেইটারই স্থিতি মানিয়া লইতে হইবে ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে!

তবে "না" কথাটী কখন ব্যবহৃত হয়? স্থিরীকরণ প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করা, কোন কিছু নিশ্চয়রূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা প্রতিহত করা "না"র উদ্দেশ্য। এই স্থিরীকরণ-প্রচেষ্টার স্বরূপ কি? আমাদের মনের স্বাভাবিক প্রশ্ন ইহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন বিষয় স্থির-নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে আমাদের মনে প্রশ্নের উদয় হয়। যাহা জানি না তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষাই প্রশ্ন। অতএব প্রশ্ন স্থিরীকরণ-প্রচেষ্টা মাত্র। আমি যখন তোমাকে কোন প্রশ্ন করি তখন প্রকৃত পক্ষে আমি তোমার নিকট, তোমার মনের নিকট তোমার জ্ঞাত বিষয় আমার নিকট প্রকাশ করিবার জন্য দাবী করি। প্রশ্ন দাবী মাত্র! এ দাবী এক মন আর এক মনের নিকট করিয়া থাকে। আমি যখন আমাকে প্রশ্ন করি তখন আমি আমাকে অপর বলিয়া মনে করিয়া থাকি। অতএব প্রশ্ন মনের নিকট মনের দাবী। কিন্তু এই যদি প্রশ্নের যথার্থ অর্থ হয়, প্রশ্ন যদি এইরূপ স্থিরীকরণ-প্রচেষ্টা হয়, তাহা হইলে এরূপ প্রচেষ্টা, এইরূপ প্রশ্ন "না" বিচারের ভিত্তি স্বরূপ হইতে পারে না। "না"এর পূর্ব্বগ বলা যাইতে পারে না। কারণ যদি প্রশ্নের উত্তর আমার জানা থাকে তাহা হইলে প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন নাই, আর যদি প্রশ্নের উত্তর আমি না জানি তাহা হইলে আমি আমাকে প্রশ্ন করিতে পারি না। অতএব উত্তর জানি বা না জানি আমার নিকট আমার প্রশ্নের

কোনই অর্থ নাই, সুতরাং এরূপ অসম্পূর্ণ প্রশ্ন "না"বিচারের পূর্ব্বগ বা ভিত্তিস্বরূপ হইতে পারে না।

প্রশ্নের ভিতর কিন্তু আর একটী গুপ্ত অর্থ আছে এবং সেই গুপ্ত অর্থ ই 'না' বিচারের কারণ। প্রশ্ন আমাদের ধারণা-বিশেষ। এ ধারণা কল্পনা-প্রসূত নহে। বাস্তব এ ধারণার উদ্বোধক এবং প্রতিপোষক। যখন আমাদের মনে কোন প্রশ্নের উদয় হয়, যখন আমরা কোন ইঙ্গিতের আভাস পাই তখন সেই প্রশ্ন বা ইঙ্গিত অনুযায়ী যে ধারণা তাহা স্বার্থ-প্রণোদিত এবং প্রকৃত ব্যাপার অনুমোদিত। প্রশ্ন এবং ইঙ্গিতের অন্তরালে 'ধারণা' আছে, কিন্তু সেই ধারণাটী শূন্য হইতে পতিত হইয়া আমাদের মানস পটে উদিত হয় না। প্রকৃতি দেবীই ইহা আমাদের গোচরীভূত করেন। বাস্তব জগৎই ইহার সৃষ্টি করে। আমার ধারণা আমার বাস্তব জগৎ-অনুদ্দিষ্ট। কিন্তু বাহ্য জগতের সহিত আমার মানস জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে বহু ধারণার সৃষ্টি হইতেছে,কিন্তু ইহাদের মধ্যে মাত্র একটীই আমার ইঙ্গিতের বিষয়ীভূত হইতেছে কেন? আমার প্রশ্ন বা ইঙ্গিতানুযায়ী কারণটীর উৎপত্তি কি প্রকারে হইতেছে? যে ধারণাটির সহিত আমার স্বার্থের সংস্রব আছে সেই ধারণাটীই আমার প্রশ্ন বা ইঙ্গিতের বিষয়রূপে আবির্ভূত হয়। প্রশ্নের অন্তরালে, ইঙ্গিতের অভ্যন্তরে একটী "না" একটী "ধারণা" গুপ্ত থাকিবেই। এই ধারণা অলীক নহে বাস্তব, এবং ইহা স্বার্থ-সম্পর্কে শূন্য নহে, ইহা স্বার্থ-প্রণোদিত। বাস্তব ব্যাপার-সম্ভূত বিষয় সমূহের মধ্যে স্বার্থ-প্রণোদিত ধারণা বিশেষকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাকেই স্থিরীকরণ-প্রচেষ্টা বা প্রশ্ন বলের এবং সেই স্থিরীকরণ-প্রচেষ্টা প্রস্তাবিত ধারণা সত্য হইলে গ্রহণ, মিথ্যা হইলে প্রত্যাহার করিয়া থাকি এবং "না" প্রত্যাহার-সূচক বাক্য। সুতরাং "না" বলিবার পূর্ব্বে স্থিরীকরণ-প্রচেষ্টা প্রস্তাবিত ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। এই ধারণার অভাব হইলে "না"এর স্থিতি নিষ্প্রয়োজন। "না" বাক্য নাস্ত্যর্থসূচক, 'হাঁ' বাক্য অস্ত্যর্থসূচক, নাস্ত্যর্থসূচক বাক্যের পূর্ব্বে অস্ত্যর্থসূচক বাক্যের প্রয়োজন। "না"এর পূর্ব্বে 'হাঁ' বর্ত্তমান।

প্রকৃত বাস্তবের প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটী বাস্তবের চিন্তা করিয়া চিন্ত্য এবং প্রকৃত বাস্তবের মধ্যে অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইলে "না" বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "প্রদীপটী নির্ব্বাপিত হয় নাই" ইহা একটী নাস্ত্যর্থসূচক বাক্য, কিন্তু ইহার অন্তরালে অস্ত্যর্থসূচক বাক্য অন্তর্নিহিত আছে - যথা "প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়"। প্রদীপটী নির্ব্বাপিত হয় নাই বলিবার পূর্ব্বে আমাকে আর একটী প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণার চিন্তা করিতে হয়, যথা "প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়" এবং যখন এই চিন্ত্য ধারণাটীর সহিত প্রত্যক্ষ ধারণাটীর অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইল তখনই আমি বলিলাম, "প্রদীপটী নির্ব্বাপিত হয় নাই।" অতএব এখানেও দেখিতেছি 'হাঁ' এর চিন্তা ব্যতীত "না"এর চিন্তা অসম্ভব।

কিন্তু 'হাঁ' ব্যতীত যেমন "না"এর চিন্তা অসম্ভব, আবার তেমনি "না" ব্যতীত "হাঁ" এর চিন্তা অসম্ভব। যে ধারণাটীকে আমি বাস্তব বলিয়া মনে করি তাহাকেই আমি "হাঁ" বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। অবাস্তব এবং বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিয়া অবাস্তবকে অস্বীকার করিয়া বাস্তবকে স্বীকার করাই "হাঁ"এর কার্য্য। সুতরাং অস্বীকার ব্যতীত স্বীকার, "না" ব্যতীত "হাঁ" অসম্ভব। কিন্তু স্বীকারের ভিতর যে অস্বীকারোক্তি প্রচারিত হইতেছে "হাঁ"এর ভিতর যে "না"এর বাণী ঘোষিত হইতেছে তাহা সাধারণ। যখন আমি বলিতেছি যে, এখানে জল আছে তখন আমি মনে করিতেছি এখানে আগুন নাই, ফল নাই, ফুল নাই, ইত্যাদি! এখানে জল বাস্তব আর ফল-ফুল ইত্যাদি অবাস্তব। এবং এই অবাস্তবগুলিকে প্রত্যাহার করিয়া জলের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি—সুতরাং "না" এখানে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ থাকিতেছে না। কিন্তু "না"এর ভিতর যে "হাঁ" আছে তাহা নির্দ্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ, সুতরাং সাধারণ নহে। যখন আমি বলি—এখানে জল নাই, তখন আমাকে চিন্তা করিয়া লইতে হয়—"এখানে জল থাকে বা থাকিতে পারে"; সুতরাং এ চিন্তাটী পূর্ব্ব চিন্তার অনুযায়ী। সুতরাং "না" এর অন্তর্নিহিত চিন্তা ইহারই অনুযায়ী "হাঁ" এর চিন্তা মাত্র। অতএব ইহা সাধারণ নহে। যখন এখানে জল নাই বলি, তখন মনে করি না এখানে ফল আছে বা ফুল আছে বা তেল আছে, কেবলমাত্র মনে করি এখানে জল থাকে। অতএব "হাঁ"এর ভিতর "না"এর

কার্য্য সাধারণ এবং "না"এর ভিতর "হাঁ"এর কার্য্য বিশিষ্ট-প্রকারের।

"না" বাক্যটী নিষেধাত্মক, কিন্তু ইহা যদি মাত্র নিষেধাত্মক হয়, যদি নিষেধের মধ্যে অস্তিত্বের লেশমাত্র না থাকে তাহা হইলে "না" কথাটী একেবারে অর্থশূন্য শব্দমাত্রে পরিণত হইবে। "ধর্ম্ম চতুষ্কোণ নহে", "প্রস্তর অহিন্দু"—অর্থাৎ হিন্দু নহে। "বৃক্ষটী অমানুষ" অর্থাৎ মানুষ নহে। এখানে "না" কথাটী একেবারে নিষেধাত্মক। এখানে "না"র মধ্যে "হাঁ" এর অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; সুতরাং এরূপ স্থলে "না" অর্থশূন্য শব্দ মাত্র। অহিন্দু মানে মুসলমান হইতে পারে, জল হইতে পারে, শূন্য হইতে পারে,নক্ষত্র হইতে পারে; এক কথায় হিন্দু ব্যতীত যাবতীয় বস্তুই হইতে পারে। সুতরাং "প্রস্তর হিন্দু নয়," এই বাক্য হইতে প্রস্তরসমূহের কোন ধারণারই উদয় হইতেছে না। অতএব "না" এখানে অর্থশূন্য, কোন প্রকারেই জ্ঞানের সহায়ক নহে। পূর্ণবাচক প্রতিজ্ঞা হইতে যেমন জ্ঞানের বিস্তৃতি হয় না, তেমনই মাত্র নিষেধাত্মক বাক্য হইতে জ্ঞানের বিকাশ হয় না। যখন আমি বলি "মানুষ তো মানুষ" তখন আমি একই কথার পুনরুল্লেখ করি মাত্র; কিংবা যখন বলি "মানুষের মন যন্ত্রবিশেষ নহে" তখন আমার মনে কোন জ্ঞানেরই উদয় হয় না। জ্ঞানের জন্য দুইটী জিনিসের আবশ্যক, যথা—ঐক্য এবং পার্থক্য। জ্ঞান-মাত্রেই এই দুইটী অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। একটীর অভাব হইলেই জ্ঞানের অভাব হইবে। পূর্ণবাচক প্রতিজ্ঞাতে ঐক্য আছে কিন্তু পার্থক্য নাই, আবার একবারে নিষেধাত্মক বাক্যে পার্থক্য আছে কিন্তু ঐক্য নাই, সুতরাং দুইটীর কোনটীই জ্ঞানের সহায়ক নহে। কিন্তু সাধারণতঃ এই প্রকার বাক্যে আমরা কোন না কোনরূপ অর্থ সন্নিবেশ করিয়া থাকি, ইহাদিগকে একেবারে অর্থশূন্য বলিয়া মনে করি না। কিন্তু কিঞ্চিৎ অবধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ণবাচক প্রতিজ্ঞার ভিতর অর্থের আভাস আমরা তখনই পাই, যখন আমরা ঐক্যের ভিতর পার্থক্যের যোজনা করি। আবার একবারে নিষেধাত্মক বাক্যের অর্থ তখনই আমাদের গোচরীভূত হয় যখনই আমরা পার্থক্যের ভিতর ঐক্যের স্থাপনা করি। "মানুষ—মানুষ" ইহা একই পদের পুনরুল্লেখমাত্র, সুতরাং ইহাতে জ্ঞানের সহায়ক কিছুই নাই। কিন্তু যেই বলিলে "মানুষ মানুষ" তখনই তোমার মনে উদয় হইতেছে "ভগবান নহে"। সুতরাং মানুষে ভগবানের পূর্ণতা সম্ভব নহে, তখনই এই পূর্ণবাচক প্রতিজ্ঞার অর্থ তোমার নিকট সর্ব্বতোভাবে প্রতীয়মান হইল। "ভগবান নহে" যতক্ষণ এই পার্থক্য, এই 'না' সন্নিবেশিত হইয়াছিল ততক্ষণ তোমার নিকট ইহার অর্থ গুপ্ত ছিল। সুতরাং 'না' ব্যতীত 'হাঁ'র জ্ঞান অসম্ভব। আবার যখন বলিলে "মন যন্ত্রবিশেষ নহে" তখন তোমার কেবল পার্থক্য-জ্ঞানই বর্ত্তমান, "মন যন্ত্র নহে" এই মাত্র তোমার জ্ঞান কিন্তু এ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে। কেবলমাত্র পার্থক্য হইতে জ্ঞানের উন্মেষ হয় না ঐক্যেরও প্রয়োজন। যখন বলিতেছ "মন যন্ত্র নহে" তখন তোমার মনে হইতেছে "মন যন্ত্র নহে" আর কিছু "বা" মনের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য ইহা যন্ত্রের মত কার্য্য করে না। মনের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যাহা যন্ত্ররূপ বিষয়কে দূরীভূত করিয়া দিতেছে। মনের এই বৈশিষ্ট্যটুকু স্বীকার না করিলে "মন যন্ত্র নহে" ইহার অর্থ পরিস্ফুট হইবে না। সুতরাং এখানেও পার্থক্যের ভিতর ঐক্যের সন্ধান লইয়াই কথিত বিষয়ের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি। এখানেও 'হাঁ'এর ভিতর দিয়া "না" ফুটিয়া উঠিতেছে। 'না' তত্ত্ববিচার সম্যকরূপে প্রণিধান করিতে হইলে বিরোধ এবং পার্থক্যের সম্বন্ধ নির্ণয় প্রয়োজন। পার্থক্যের ভিতর বিরোধ না থাকিতে পারে কিন্তু বিরোধের ভিতর পার্থক্য অনিবার্য্য। দুইটী পৃথক জিনিস পৃথকভাবে পরস্পর বিরোধী না হইয়াও অবস্থান করিতে পারে, কিন্তু পার্থক্য ব্যতীত পরস্পরবিরোধী-জিনিসের অবস্থিতি কল্পনা অসম্ভব। লাল, নীল, কাল ইত্যাদি পৃথক পৃথক বর্ণ এবং ইহারা পরস্পরবিরোধী না হইয়াও পৃথকভাবে অবস্থান করিতে পারে, কিন্তু পৃথক পৃথক গুণগুলি যদি একই সময়ে একই বস্তুতে অর্পিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ বিরোধের সৃষ্টি হইবে। যখন বলি এই দিক পূর্ব্ব এবং ঐ দিক পশ্চিম, তখন এই দুইটী পৃথক বাক্যের মধ্যে বিরোধ নাই; কিন্তু যেই বলি এই দিকটী পূর্ব্ব ও পশ্চিম তখনই বিরোধ বাধিয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পৃথক পৃথক গুণাবলী যখনই একই বস্তুতে আরোপিত হয়, তখনই তাহারা বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়, তখনই তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সংহার

করিতে, প্রত্যাখ্যান করিতে, "না" বলিতে উদ্যত হয়। এই দিকটী পশ্চিম ঐ দিকটী পূর্ব্ব—এখানে পার্থক্য বর্ত্তমান, কিন্তু বিরোধ নাই; কিন্তু যেই 'পূর্ব্ব' ও 'পশ্চিম' এই দুইটী পৃথক জিনিস একই বস্তুতে অর্পিত হইল, যেই একই দিক পূর্ব্ব ও পশ্চিম বলিয়া অভিহিত হইল, অমনি বিরোধের সৃষ্টি হইয়া গেল—একটী আর একটীকে নাশ করিবার, "না" বলিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এই দিকটী পূর্ব্ব নয় পশ্চিম কিংবা এই দিকটী পশ্চিম নয় পূর্ব্ব, এই প্রকারে পার্থক্য হইতে বিরোধ এবং বিরোধ হইতে "না"এর সৃষ্টি হইল।

"না" কথাটী বিরোধ-জ্ঞাপক। "ক—খ নহে", "ক—খ নহে কিন্তু গ" অর্থাৎ খ ও গ দুইটী পৃথক্ বস্তু একই বস্তুতে অর্পিত হইতেছে বলিয়া খ ও গ এ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে সুতরাং খ সত্য হইলে গ সত্য নয় কিংবা গ সত্য হইলে খ সত্য নহে। কিন্তু যখন বলিতেছ ক—খ নহে, তখন ইহাই বুঝাইতেছে যে ক-এর সহিত খ-এর বিরুদ্ধ শক্তির সান্নিধ্য-হেতু ক-এর নিকট খ-এর স্থিতি সম্ভব নহে। ক-এর অন্তঃস্থিত বিরুদ্ধ শক্তি ক-এর নিকট হইতে খ-কে অপসৃত করিয়া দিতেছে! ক—খ নহে অর্থাৎ ক, ম বলিয়া খ নহে। ম এবং খ বিরোধী সুতরাং দুইটী বিরোধী দ্রব্যের একত্র স্থিতি অসম্ভব বলিয়া "না"এর আবির্ভাব। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অর্থপূর্ণ "না" মাত্রেরই অন্তরালে 'হাঁ' বর্ত্তমান।

অতএব দেখা যাইতেছে যে 'না' কথাটী কেবলমাত্র নাস্ত্যর্থসূচক নহে, ইহার ভিতর অতি প্রয়োজনীয় অর্থ অন্তর্নিহিত আছে এবং ঐ অন্তর্নিহিত অর্থ অন্তরালে রাখিলে 'না' একেবারে অর্থশূন্য শব্দমাত্রে পরিণত হইবে। 'না' বক্তার স্বার্থ এবং উদ্দেশ্যজ্ঞাপক। কোন বাক্যই একেবারে নিরালম্ব বা সম্পর্কশূন্য নহে। প্রত্যেক বাক্যই তাহার পরবর্ত্তী এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যের সহিত এবং বক্তার পারি-পার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট। কোন একটী বাক্যকে একেবারে এককভাবে দেখিলে তাহার প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করা অসম্ভব, কিন্তু সেই বাক্যটী অন্যান্য বাক্যের সংস্পর্শে বিশেষভাবে প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে, উহা কিছু না কিছুর অস্তিত্ব সূচনা করিতেছে এবং সেই কিছুর ভিতর বক্তার স্বার্থ এবং উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইতেছে। "অমুক লোকটী ভাল নহে" এখানে লোকটী যাহা নহে তাহাই বলা উদ্দেশ্য নহে—কিন্তু এই "ভাল নহের" ভিতর দিয়া সে যাহা বটে তাহাই বলা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ লোকটীর ভিতর এমন কিছু আমি দেখিয়াছি, উহার ভিতর এমন কিছু আছে যাহাতে আমার স্বার্থ আকৃষ্ট করিয়াছে, যাহার জন্য উহাকে আমার ভাল বলিয়া মনে হইতেছে না। অমুক লোকটী ভাল নহে যেহেতু এই গুণটী বর্ত্তমান এবং আমার স্বার্থ ঐ গুণটীতে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে ঐ 'গুণ' এবং 'ভাল' এই দুইটী একই ব্যক্তিতে থাকিতে পারে না, কারণ উহারা পরস্পরবিরোধী।

"না" যদি সর্ব্বদাই অস্ত্যর্থসূচক হয়, তবে পৃথক ভাবে "না" কথাটী ব্যবহার করিবার কি প্রয়োজন? নাস্ত্যর্থসূচক বাক্যের আবশ্যকতা কি? জ্ঞান রাজ্যে "না"এর প্রতিপত্তি যথেষ্ট। বহিষ্করণ এবং শৃঙ্খলীকরণ এই দুইটী ইহার প্রধান কার্য্য। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, পৃথক এবং বিরোধ দুইটী বিভিন্ন জিনিস, এবং "না" ব্যতীত এই দুইটি জিনিসের বিভিন্নতা প্রকাশিত হইতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিলে—'তুমি কি কলিকাতা যাইতেছ?' উত্তর পাইলে—"আমি এলাহাবাদ যাইতেছি।" যদি তোমার পূর্ব্ব হইতে "না"জানা থাকে যে,এলাহাবাদ এবং কলিকাতা পৃথক স্থান, তাহা হইলে এরূপ উত্তরে তোমার শান্তি হইবে না। সুতরাং তোমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাইতে হইলে উত্তরটী এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবে যে,স্থান দুইটী পৃথক এবং এক স্থানে থাকিলে অন্য স্থানে থাকা অসম্ভব এবং সেরূপ উত্তর কেবলমাত্র "না" সংযোগেই সম্ভব। আমি যদি কেবলমাত্র বলি "না" তাহা হইলেই তোমার প্রশ্নের যথেষ্ট উত্তর হইবে, কারণ, তুমি এইটুকুই জানিতে চাহিয়াছিলে। "কিন্তু অমুক স্থানে যাইতেছি" এটুকু বলিলেও চলে, না বলিলেও চলে।

তিনি এই গাড়ীতে যাইবেন।
তিনি ঐ গাড়ীতে যাইবেন।

এই দুইটী বাক্য এইরূপ পৃথক ভাবে থাকিলে একটী সত্য বা মিথ্যা হইলে অপরটীকে মিথ্যা বা সত্য বলিতে পারা যায় না। কিন্তু যদি বল তিনি এই গাড়ীতে বা ঐ গাড়ীতে যাবেন তাহা হইলে একটীকে হাঁ বলিলে অপরটীকে "না" বলিতে পারা যায় কিন্তু একটীকে "না" বলিলে অপর-

টীকে 'হাঁ' বলিতে পারা যায় না। অর্থাৎ যদি তিনি এই গাড়ীতে যান, তাহা হইলে তিনি ঐ গাড়ীতে যাইবেন না এবং তিনি যদি ঐ গাড়ীতে যান তাহা হইলে এই গাড়ীতে যাইবেন না। এখানে "না"এর কাজ বহিষ্করণ। একটী বাক্য অপর বাক্যকে বহিষ্কার করিয়া দিতেছে। "না" এখানে এই বিরোধ-সম্বন্ধ প্রচার করিতেছে, কিন্তু এই বিরোধ-সম্বন্ধের ভিতর একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি যদি এই গাড়ীতে না যান? তবে? তিনি এই গাড়ীতে যাইবেন না বলিলে তিনি ঐ গাড়ীতে যাইবেন একথা বলিতে পারা যায় না, কারণ তিনি তৃতীয় গাড়ীতে বা চতুর্থ গাড়ীতে যাইতে পারেন বা তিনি একেবারেই না যাইতে পারেন। সুতরাং তিনি এই গাড়ীতে বা ঐ গাড়ীতে যাইবেন না বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে কোন মীমাংসাই সম্ভব নয়। তুমি যখন বলিতেছ তিনি এই গাড়ীতে বা ঐ গাড়ীতে যাইবেন তখন তোমার সকলই অনিশ্চিত। তিনি নিশ্চয়ই যাইবেন, তিনি নিশ্চয়ই গাড়ীতে যাইবেন, এবং নিশ্চয়ই এই দুইটীর একটীতে যাইবেন একথা তুমি বলিতেছ না। এখানে তোমার বাক্যের গণ্ডী অনিশ্চিত এবং বিস্তৃত; সুতরাং তিনি এই বা ঐ গাড়ীতে যাইবেন না বলিলে তোমার মনে কোন ভাবেরই উদয় হয় না। কিন্তু তুমি যদি তোমার বাক্যের গণ্ডীকে সংযত, সীমাবদ্ধ এবং সুনিশ্চিত কর অর্থাৎ তুমি যদি বল তিনি হয় এই গাড়ীতে নয় ঐ গাড়ীতে যাইবেন এবং তোমার বাক্যের অর্থ যদি ইহাই হয় যে, তিনি যাইবেনই এবং গাড়ীতেই যাইবেন এবং এই দুইটী গাড়ীর একটীতে যাইবেন তাহা হইলে একটীকে 'হাঁ' বলিলে অপরটীকে "না" একটিকে "না" বলিলে অপরটীকে 'হাঁ' বলিতে পারা যাইবে। তিনি যদি এই গাড়ীতে যান, তবে ঐ গাড়ীতে যাইবেন না। যদি ঐ গাড়ীতে যান তবে এই গাড়ীতে যাইবেন না, যদি ঐ গাড়ীতে না যান তবে এই গাড়ীতে যাইবেন এবং যদি এই গাড়ীতে না যান তবে ঐ গাড়ীতে যাইবেন। পূর্ব্ব উদাহরণে "না" কেবল বাক্য দুইটী পৃথক এবং পরস্পর বিরোধী এই মাত্র দেখাইয়াছে। দুইটি বাক্যের একত্র স্থিতি সম্ভব নয়, একটী আর একটীকে বহিষ্কার করিয়া দেয়। এখানে "না"এর কার্য্য বহিষ্করণ। আর দ্বিতীয় উদাহরণটীতে "না" দেখাইতেছে যে বাক্য দুইটী পৃথক, পরস্পর-বিরোধী এবং একই গণ্ডীর ভিতর এই দুইটি বাক্য ব্যতীত তৃতীয় বাক্যের স্থান নাই। এখানে "না"র কার্য্য শূন্যীকরণ।

"না"এর কার্য্য যখন মাত্র বহিষ্করণ তখন "না"এর ভিতর এই কয়েকটী অর্থ বর্ত্তমান—

১। বাক্য দুইটী পৃথক।

২। বাক্য দুইটী পরস্পরবিরোধী।

৩। একটী সত্য হইলে অপরটী মিথ্যা।

৪। দুইটীই এককালীন সত্য হইতে পারে না।

৫। দুইটী এককালীন মিথ্যা হইতে পারে না

"না"এর কার্য্য যখন বহিষ্করণ এবং শূন্যীকরণ তখন উহার ভিতর এই কয়েকটী অর্থ বর্ত্তমান—

১। বাক্য দুইটী পৃথক।

২। বাক্য দুইটী পরস্পরবিরোধী।

৩। একটী সত্য হইলে অপরটী মিথ্যা।

৪। একটী মিথ্যা হইলে অপরটী সত্য।

৫। দুইটীই এককালীন সত্য হইতে পারে না।

৬। দুইটীই এককালীন মিথ্যা হইতে পারে না।

"না"-বাক্য সাধারণতঃ অস্পষ্ট বলিয়া অভিহিত করা হয়। "না" জ্ঞান হইতে সম্যক জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। "হরি পদব্রজে যাইতেছে না" এই বাক্য হইতে আমাদের কোন জ্ঞানের উদয় হইতেছে না। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না হরি বাড়ী যাইতেছে, কি অন্য কোথাও যাইতেছে কিংবা কি উপায়ে যাইতেছে। হরি যাইতেছে কিংবা হরি বলিয়া কোন লোক আছে তাহাও এ বাক্য হইতে অনুমান করা যায় না। অতএব "না"এর উপস্থিত হেতু বাকটী একেবারে অর্থশূন্য হইয়া যাইতেছে। কিন্তু সচরাচর এরূপ বাক্যকে একেবারে অর্থহীন বলিয়া মনে করা হয় না। এরূপ বাক্য হইতে অন্ততঃ তিনটী বিষয় জানিতে পারা যায়—যথা (১) হরি বলিয়া কোন লোক আছে। (২) তাহার বাড়ী আছে। (৩) এবং কখনও কখনও সে গৃহাভিমুখে পদব্রজে গমন করিয়া থাকে। সত্য বটে, যদি বাক্যটীকে এককভাবে গ্রহণ করা যায়, যদি বাক্যটীর পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বিচার না করা যায়, যদি ইহাকে কতকগুলি কথার সমষ্টি বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে এই বাক্যটীর প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব হইবে। এই বাক্য

হইতে আমরা বুঝিতে পারি না যে, হরি অশ্বারোহণে বা অন্য কোন যানযোগে বাড়ী যাইতেছে। কিংবা গৃহাভিমুখে না যাইয়া অন্য কোন দিকে যাইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাক্যটী পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিবর্জ্জিত বলিয়া অস্পষ্ট হইতেছে, এবং ইহার যথার্থ অর্থ নিরূপণ করা অসম্ভব হইতেছে। "না"এর উপস্থিতিহেতু বাক্যটীকে অস্পষ্ট বলা সমীচীন মনে হইতেছে না। কারণ যদি বাক্যটীর পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ-নির্ণয় করা হয়, তাহা হইলে ইহার প্রকৃত অর্থ গুপ্ত থাকিতে পারে না। অতএব "না"এর উপস্থিতি "না" বাক্যের অস্পষ্টতার কারণ নহে। পূর্ব্বাপর সম্বন্ধের অনুপস্থিতিই ইহার কারণ।

পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত হইলেই "না" বাক্য যেমন অস্পষ্ট হয়, হাঁ-বাক্যও তেমনই অস্পষ্ট হয়। "আমার ঘড়িটী খারাপ হইয়াছে" এই বাক্যটী "না" বাক্য নহে, কিন্তু তথাপি ইহার অর্থ "না"-বাক্যের ন্যায় অস্পষ্ট। এই বাক্য হইতে আমি বুঝিতে পারিতেছি না কি খারাপ হইয়াছে? ইহার কি চাবিটী হারাইয়া গিয়াছে? ইহার কি একটী কাঁটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে? ইহা কি সময় ঠিক রাখিতেছে না? ইত্যাদি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিবর্জ্জিত বাক্যমাত্রেরই নানাপ্রকার অর্থ অনুমান করা সম্ভব, সুতরাং এবংবিধ বাক্য মাত্রেই অস্পষ্ট। পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ জ্ঞাত হইলে "না" বাক্য কিংবা "হাঁ"বাক্যের অর্থ অনুমান করা অতি সহজ। "ও কি হরি যাইতেছে? সে কি পদব্রজে যাইতেছে কিংবা অশ্বারোহণে যাইতেছে? সে কি এই দিকে আসিতেছে?" এই প্রশ্নগুলির উত্তরে মাত্র "না" বলিলে যথেষ্ট উত্তর পাওয়া যায়। "ও কি হরি যাইতেছে?" উত্তরে বলিলে, "না"। এখানে "না" উক্ত প্রশ্নটীর যথেষ্ট উত্তর হইল; কারণ এখানে প্রশ্নকর্ত্তার উদ্দেশ্যের সহিত প্রশ্নের সম্বন্ধ বর্ত্তমান বলিয়া প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেওয়া সম্ভব হইল। প্রশ্নের প্রকৃতিই প্রশ্নকর্ত্তার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতেছে। বলিতে পার যে, এখানে মাত্র "না" হইতে তো বুঝিতে পারিলাম "না" কে যাইতেছে? সত্য, কিন্তু তুমি তোমার প্রশ্নে কে যাইতেছে তাহা তো জানিতে চাও নাই। তুমি মাত্র জানিতে চাহিয়াছিলে ওকি হরি যাইতেছে? অর্থাৎ হরি যাইতেছে কি না তাহাই জানিতে চাহিয়াছিলে। সুতরাং এখানে "না" স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে যে, হরি যাইতেছে না। যদি তুমি প্রশ্ন করিতে 'ও কে যাইতেছে' তাহা হইলে অবশ্য অন্য উত্তর সম্ভব হইত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ যোগে 'হাঁ' বাক্য যেমন সুস্পষ্ট "না" বাক্যও তেমনি সুস্পষ্ট।

ভারতের আমদানি ও রপ্তানী

[শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ]

আমাদের জীবন-ধারণের জন্য যে, সকল জিনিস একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাই আমরা বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকি। আর তাহার পরিবর্ত্তে আমদানী করি বিলাস-ব্যসনের চাকচিক্যময় দ্রব্যসমূহ। অর্থনৈতিক হিসাবে ইহা দেশের পক্ষে মহা অনিষ্টকর। ইহা অধিকতর অনিষ্টকর হয় তখন যখন দেশের অধিকাংশ লোকের ঐ সকল একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করিবার ক্ষমতা থাকে না। দেশবাসীর পরিমিত আহার্য্যোপযোগী খাদ্য দেশের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া যদি বক্রী খাদ্য বিদেশে প্রেরিত হয়, তাহা হইলে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। আমাদের দেশের লোকের ক্রয় করিবার ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছে বলিয়াই আমাদের দেশের বহুল খাদ্য-শস্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। আবার অন্যদিকে দেখিতে পাই "লৌহ, তামা এবং কাংস-নির্ম্মিত জিনিসসমূহ এখন সাধারণ ভাবে গ্রামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং এ সকল দ্রব্যের মূল্য সকলেরই আয়ত্তের ভিতর, গৃহোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য অথবা গহনা যথা কাঁচি,

আয়না, বলায় ইত্যাদি এবং সহস্র প্রকারের চাকচিক্যময় জিনিসে গ্রাম্য দোকানদারের বিপণিগুলি পরিপূর্ণ। এই সকল জিনিস বিদেশ হইতে আসিয়া থাকে।...সেলাইএর কল সর্ব্বত্রই দেখা যায়, এবং বাইসিকলের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। (শ্রমশিল্প কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। এইরূপ বিনিময় যেখানে প্রচলিত সেখানে প্রয়োজনীয় জিনিসসমূহের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বিলাস-সামগ্রীর মূল্যের উত্তরোত্তর হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। স্বর্গীয় পৃথ্বীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের জলন্ত ভাষায় ইহাই হইতেছে "যন্ত্রের তীক্ষ্ণ ধার, যাহা দুই দিকেই কাটে। একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধিতে দেশের লোকের মুখের গ্রাস নষ্ট হয়। বিদেশ হইতে আগত বিলাস-সামগ্রীর মূল্য-হ্রাসে ধন-নাশের সম্ভাবনাই সূচিত করে। যে টাকায় বিলাস-সামগ্রীর সরবরাহ হয় সেই টাকায় বহু লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে।"

আমাদের ইংরেজ ব্যবসাদারেরা প্রায়ই আমাদিগকে বুঝাইয়া থাকেন যে, বিদেশী বাণিজ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতেই এদেশের প্রকৃত ধন বৃদ্ধি সূচিত হয়, কিন্তু বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় বৈদেশিক মালের আমদানী অপেক্ষা দেশীয় মালের রপ্তানীর পরিমাণ অতিরিক্ত হওয়ায় আমাদের উৎফুল্ল হইবার কোন কারণ নাই। এ ধারণা খুবই ভুল যে, আমরা বিদেশ হইতে যে পরিমাণ মাল ক্রয় করিয়া থাকি তাহা হইতে অনেক বেশী মাল বিদেশের বাজারে বিক্রয় করি অতএব আমরা বেশী লাভ করিয়া থাকি। ১৯১৩-১৪ সালের অর্থাৎ মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বের প্রদত্ত মূল্য অনুসারে গভর্ণমেণ্টের (The Review of Trade of India) "ভারতবর্ষের ব্যবসায় বীক্ষণ" সম্পাদিত তালিকা হইতেই এদেশের ব্যবসায়ের তথাকথিত লাভ-লোকসান বুঝা যাইবে

	১৯১৩-১৪	১৯২৫-২৬	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
আমদানী	১৮৩ক্রোর	১৫৩ক্রোর	১৮১ক্রোর;	১৯০ক্রোর
রপ্তানী	২৪৪	২২৮	২৪৮	২৬০
পুনঃ রপ্তানী বাদে আমদানী হইতে রপ্তানীর অতিরিক্ত	৬১	৭২	৬৭	৭০
পুনঃ রপ্তানী বাদে ভারতের মোট বিদেশী বাণিজ্য	৪২৭	৩৮৫	৪২৯	৪৫০

প্রকৃত প্রস্তাবে এই প্রচুর বিদেশী-বাণিজ্যের পরিমাণ —বা বিশেষতঃ আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর আধিক্য— আমাদের ধন-সম্পদের আধিক্য সূচিত করে না। পক্ষান্তরে ইহাতে আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থাই সূচিত হয়, কারণ রপ্তানীর এই আধিক্য রপ্তানীযোগ্য আধিক্য নহে। অধ্যাপক ওয়াডিয়া ও অধ্যাপক যোশী সত্যই বলিয়াছেন, "আধিক্য সকল সময় একটা নিম্ন পরিমাপের আধিক্যই বুঝাইয়া থাকে। ইহা যেরূপ ব্যক্তির পক্ষে জীবনের পরিমাপ দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, সেইরূপ কোন দেশের পক্ষে উহার অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এবং উন্নতির অবস্থা দ্বারা পরিমাপ হইয়া থাকে। কিন্তু মিল-পরিচালক ধনী শ্রমিককে অর্দ্ধ অনশনে রাখিয়া তাহার মাহিয়ানা হ্রাস করিয়া যেরূপ বণ্টনের নিমিত্ত আধিক্য দেখাইতে পারেন, সেইরূপ পরাধীন দেশে যে স্থানে শিল্পোন্নতির সমস্ত দ্বারই রুদ্ধ সেখানে বণিকেরা কাঁচামালের রপ্তানীযোগ্য আধিক্য দেখাইতে পারেন। কিন্তু যেরূপ ঘর্ম্মাক্ত ও অল্পবেতনভোগী শ্রমিক শেষ পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নতির এবং কর্ম্মক্ষমতার পরিপন্থী হয় এবং অংশরূপে বর্ণনের ফলে আধিক্য যেরূপ অর্থনৈতিক বিপদের সূচনা করিয়া দেয় সেইরূপ এই নীতির ফলস্বরূপ কাঁচামালের আধিক্যও অর্থনৈতিক ধ্বংসের সূচনা যে করিয়া দিবে না, তাহা কে বলিতে পারে এবং সেই ধ্বংসের আবর্ত্তে বণিক ও শ্রমিক উভয়েই নিপতিত হইতে পারে।"

অর্থনীতির ইহা একটী অতি সাধারণ নিয়ম যে, স্বদেশী শিল্পের উন্নতি হইলে আমদানী ও রপ্তানী উভয় প্রকার বাণিজ্যেরই হ্রাস হইয়া থাকে। বিগত মহাযুদ্ধে ও অসহযোগ-আন্দোলনের সময় আমাদের কুটীর-শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইতেছিল। কিন্তু এই বিরাট পরিমাণ কাঁচামালগুলি যে দেশীয় শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে সে-বিষয়ে আমরা যেমন উদাসীন

আমাদের শাসকগণও ততোধিক উদাসীন বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশের কাঁচামালের রপ্তানী তখনই সমর্থিত হইতে পারে যখন উহা আমাদের দেশের শ্রম-শিল্পে প্রভূত পরিমাণ ব্যয়িত হইয়া বাজার ছাইয়া ফেলে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর আধিক্য আমাদের ধনবৃদ্ধির পরিচয় না দিয়া উহা আমাদের অন্ন-সংস্থানের অভাব ও আমাদের শ্রমশিল্পের ধ্বংসেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

তৃষ্ণা

(শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি-এ)

তরুর তৃষা মরুর বক্ষে জাগায় রস ধারা,
মরুর তৃষা পাষাণ গলায় ভাঙে গিরির কারা।
ফুলের বুকে জাগায় মধু অলির তৃষা, ক্ষুধা,
বঁধুর তৃষা জাগায় বধূর অধরপুটে সুধা।
ব্যোমের নয়ন সজল করে তৃষিত বশাখ,
তৃষার বেগে গলায় মেঘে ফটিক জলের ডাক
ছেলের তৃষা মায়ের বুকে স্তন্য আনে টানি';
পাখীর তৃষা সরস করে ফলের হৃদয় খানি।
রসের তৃষায় যশের তৃষায় গান র'চে যায় কবি,
সৃজন তৃষায় রঙ্গীন-নেশায় শিল্পী আঁকে ছবি।
সুখের তৃষা ভরায় ধরা কর্ম্ম কোলাহলে,
মুক্তি-তৃষা ধর্ম্মে জাগায় গুরুর পদতলে।
ব্রহ্ম-তৃষায় জ্ঞান-যোগীরা লীলায় ভাবে মায়া,
লীলার তৃষায় ব্রহ্ম স্বয়ং ধরেন মানব কায়া।

কয়েকটী হিন্দু-সংস্কারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

[ডাঃ শ্রীললিতমোহন পাল এম্-ডি, এম্-এ-আই-এচ্ (ক্যালিফোর্ণিয়া)]

বিদেশীর চক্ষে ভারতবাসী অসভ্য, বর্ব্বর, ভীরু, কাপুরুষ ও কুসংস্কারাপন্ন। ভারতবাসী চিরকালই কি ঐরূপ ছিল, না কোনও অনৈসর্গিক কারণে এই অধঃপতন হইয়াছে। যে ভারত এক-দিন ধরাপৃষ্ঠে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, জ্ঞানে ও মর্য্যাদায় জগদ্বাসীকে চমৎকৃত করিয়াছিল, যে ভারতবাসীর নিকট হইতে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া ভারতের অধিবাসীরা আপনাদিগকে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরূঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে গ্রীক্ ও রোমীয়জাতি ভারতের কীর্ত্তিকলাপ ও ঐশ্বর্য্য ইউরোপে সভ্যতার সম্যক্ পরিচয় দিয়া আলোক বিস্তার করিয়াছিল, কি কারণে আজ সেই ভারতবাসী জগতের চক্ষে এত হেয় ও এত অপদার্থ হইল? কি কারণে ভারতবাসী আজ "নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়া" নিজেদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বজায় রাখিতে অক্ষম? প্রবন্ধান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, কোন দেশ হইতে সভ্যতালোক অপসৃত হইলে সেই দেশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া তদ্দেশবাসীকে অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, ভারতবাসীর এই অধঃপতন কি সেই নিদ্রার ফল? তাহা হইলে কি ভারতবাসীর ক্রিয়া-কলাপ ও সংস্কার যাহা বিদেশীর চক্ষে কেবলমাত্র অসভ্যজাতির কুসংস্কার ভিন্ন অন্য কিছুই নয় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, তাহা কি কোনও বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বের সহিত বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট নহে? তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্র চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি। যে-সকল পৌরাণিক ইতিবৃত্ত লইয়া আমরা নিজেদের মধ্যে আস্ফালন করি, যে সকল পুরাণ ও উপনিষদের বাক্যাদি ঋষি-মুখনিঃসৃত বেদবাণী বলিয়া প্রতি পদে প্রতিপালন করি ও যে-সকল মহর্ষির বাক্যাবলী ভগবদ্বাণী বলিয়া নিজেদের মধ্যে গর্ব্ব অনুভব করি, তাহা কেবলমাত্র প্রলাপের উক্তি বা কৃষকের সঙ্গীতমাত্র নহে। এই ভারতের পূর্ব্বতন সুসন্তানদিগের বহুকালব্যাপী গবেষণালব্ধ প্রমাণীকৃত সত্য—মানব-সমাজের হিতার্থে প্রচলিত হইয়াছিল।

যদি আমরা পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মানব-সমাজের হিতার্থে প্রচলিত বিধি-নিষেধের সহিত আমাদের দেশের তথাকথিত কুসংস্কারগুলির পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি যে, আমাদের যে সকল বিধি-নিষেধ কুসংস্কারবিশিষ্ট বলিয়া বিদেশীর মুখে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হইতেছে, সেগুলি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে; বরঞ্চ, অধিকাংশস্থলে উৎকৃষ্ট। অল্প বিদ্যায়, স্বল্পজ্ঞানে, বিনা অভিজ্ঞতায় যেটুকু বুঝিতে পারা যায়, তাহা সাধারণের গোচরণার্থ নিম্নে বিবৃত হইল।

প্রথমেই যখন জীব ভ্রূণরূপে মাতৃজরায়ু মধ্যে প্রবেশ করে তখন হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত সংস্কারগুলির প্রত্যেকটী বিশ্লেষণ করিয়া উহা প্রকৃতই কুসংস্কার কি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার তাহা আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না? গর্ভিণীকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে পুংসবন করান হয়; এই সংস্কার আজ কাল বড় দেখা যায় না। ইহা কেবল কতকগুলি উপদেশমাত্র; ইহাতে গর্ভস্থিত সন্তানের আকৃতি-প্রকৃতির উন্নতি-সাধন হয়। এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। জনৈক স্ত্রীলোকের সন্তানাদি অতি কুৎসিত হইত, সেজন্য তিনি এক দিন একজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের কাছে আসিয়া বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, আমার সন্তান এত কুৎসিত হয় কেন? ডাক্তারি মতে ইহার কি কোন প্রতিবিধান করা যাইতে পারে?" চিকিৎসক বলিলেন, "আছে; আপনার ঘরে দেবচিত্র ও মহাপুরুষদিগের প্রতিমূর্ত্তি রাখিবেন এবং রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে ঐ সকল দেবতা ও মহাপুরুষগণকে প্রণাম ও চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা যাইবেন, এবং গর্ভসঞ্চার হইলে ক্রোধ ও হিংসা যথাসম্ভব ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবেন ও সদা প্রফুল্লচিত্তে থাকিবেন।" প্রকৃত পক্ষে সেইবার তাঁহার সন্তান প্রিয়দর্শী হইয়াছিল। এজন্য গর্ভসঞ্চার হইলে সদুপদেশের দ্বারা গর্ভিণীকে

প্রফুল্লচিত্ত করাইবার ব্যবস্থা আছে। ইহা কুসংস্কার নহে। পঞ্চম মাসে কতকগুলি নিয়ম পালন করা হয়; কি নিমিত্ত সেগুলি প্রতিপালন করা হয় বা সেগুলি প্রতিপালনের কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কিনা তাহা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া কেবলমাত্র ঐ গুলিকে প্রচলিত প্রথা বলিয়া বা স্ত্রীলোকদের কুসংস্কার বলিয়া মনে করা কি যুক্তিসঙ্গত? একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহার কোনটাই কুসংস্কার নহে। ফলতঃ প্রত্যেকটাই মাতার শরীরের ও গর্ভস্থিত সন্তানের হিতার্থে আর্য্য মহাপুরুষগণের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল। ভারত ক্রমান্বয়ে বারবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় জনসাধারণ আর্য্যঋষি-প্রণীত এই নিগূঢ় তত্ব সকল অনুশীলনে অসমর্থ হইয়া কেবলমাত্র কুসংস্কার হিসাবে এই সকল প্রথা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। জীব নিদ্রাবস্থায় হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে,সেকারণ তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ না হইয়া কেবলমাত্র বীজরূপে অবস্থান করিতে থাকে। সে নিমিত্ত জগতের সম্মুখে বিজ্ঞানসম্মত এই প্রথা যথাযথ ভাবে উপস্থিত করিতে সমর্থ না হইয়া বিদেশীরা ইহাকে অসভ্যের কুপ্রথা বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। গর্ভসঞ্চারের পঞ্চম মাসে গর্ভিণীকে যে পঞ্চামৃত দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা বোধ হয় বঙ্গদেশের প্রত্যেক গৃহস্থই পালন করিয়া থাকেন। আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী পণ্ডিতগণ এই প্রথাকে কুপ্রথা বা ব্রাহ্মণদিগের চাতুর্য্য বলিয়া মনে করেন। আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পঞ্চম মাসে গর্ভস্থ সন্তানের গাত্রচর্ম্ম স্বচ্ছ অবস্থা হইতে অস্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয় ও মস্তকে কেশ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও ডাবের জল এই পাঁচটী দ্রব্যকে হিন্দু শাস্ত্রকারেরা পঞ্চামৃত আখ্যা দিয়াছেন। এই পাঁচটী পদার্থ ব্যবহার করিবার মূলে যে মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া সংস্কাররূপে কেবল একদিন মাত্র প্রত্যেক পদার্থের বিন্দুমাত্র করিয়া লইয়া আমাদের কর্ত্তব্য সমাধান করি; কিন্তু বোধহয় শাস্ত্রকারেরা এইরূপ প্রথার জন্য এই পঞ্চামৃতের ব্যবস্থা করেন নাই। যদি এই অনুমান ভ্রমপূর্ণ না হয় তাহা হইলে যতদূর বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাহাতে সম্যক্ জ্ঞাত হইতে পারা যায় যে, পঞ্চম মাসে গর্ভস্থ সন্তানের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়; তৎসঙ্গে গর্ভিণীরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়, এমন কি স্তনে দুগ্ধের সঞ্চারের সূচনা হয়। এই তত্ব হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বিশেষ রূপ জ্ঞাত থাকায় গর্ভিণী ও গর্ভস্থ সন্তানের হিতার্থে পঞ্চামৃত ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

এই পাঁচটী পদার্থ মনুষ্য-শরীরের পক্ষে যে কত উপকারী তাহা প্রত্যেক আধুনিক চিকিৎসকই বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমরা পাশ্চাত্যের মোহে এতই মুগ্ধ হইয়া আছি যে, যতক্ষণ না কোন কথা বিদেশীয় শ্বেতাঙ্গের মুখ হইতে নিঃসৃত হইবে ততক্ষণ প্রত্যেক জিনিসকেই, একটু চিন্তা না করিয়া কুসংস্কার বলিয়া উল্লেখ করিতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা বোধ করি না। যদি উক্ত পাঁচটী দ্রব্য গর্ভিণীকে পঞ্চম মাস হইতে যথাসম্ভব ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে গর্ভিণী ও গর্ভস্থ সন্তান, সুস্থ ও সবলকায় হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। দুগ্ধ—সহজপাচ্য ও বলকারক, ঘৃত—মেধাবর্দ্ধক, দধি—পরিপাচক, মধু—উগ্রবীর্য্যকারক ও উত্তেজক এবং ডাবের জল—মূত্রবৃদ্ধিকারক। এই কারণে শাস্ত্রকারেরা অমৃত-জ্ঞানে এই পঞ্চদ্রব্য যথাসম্ভব ব্যবহার করিবার বিধান দিয়াছিলেন। একদিন মাত্র ব্যবহার করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল না। যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের কল্যাণ কামনা করিয়া বিধি-ব্যবস্থার প্রচলন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের নামে দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে সামান্য দক্ষিণা দানে পরিতুষ্ট করিবার জন্য বিধি-ব্যবস্থা করার অযথা অভিযোগ আনয়ন করা কতদূর যুক্তি-সঙ্গত তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের বিচার্য্য?

ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়নেরও ব্যবস্থা আছে; কেবলমাত্র গর্ভিণীকে সুরঞ্জিতা করিয়া মানসিক চিন্তার পুষ্টিসাধন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। গর্ভিণীর মানসিক চিন্তা সৎ হইলে চিত্ত প্রফুল্ল হইবে, ফলে সন্তানে প্রফুল্লতা শুভলক্ষণ পরিলক্ষিত বর্ত্তিবে। কারণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতে সপ্তম ও অষ্টম মাসে শিশুর মস্তিষ্ক বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয় সুতরাং এ সময়ে মাতাকে প্রফুল্ল রাখিলে গর্ভস্থ-শিশু সন্তানও হৃষ্টচিত্ত হইবে। পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারগণ এই ধারণাবশে এই সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

নবম মাসে সাধ-ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে। তাহাও আধুনিক ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের মতের সহিত তুলনা

করিলে ইহা যে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান-সম্মত তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সাধ অর্থে অভিলাষ বা ইচ্ছা। অষ্টম ও নবম মাসে গর্ভস্থ শিশুর দেহ সম্পূর্ণ পুষ্ট হয়, সেই সময়ে গর্ভিণীর আহারও প্রায়ই অল্প হইয়া থাকে

শিশুর দেহ সুগঠিত হওয়ায় তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আহারের ও রসের প্রয়োজন হয়, সে কারণে গর্ভিণীকে নানা প্রকার সুস্বাদু ও সরস ফলমূল ও আহারীয় দ্রব্য খাওয়ান উচিত ও এই সময় ঐরূপ দ্রব্য খাইবার অভিলাষও তাহাদের জন্মে। এই অভিলাষ পূরণ করার নামই সাধ-ভক্ষণ। ইহা কেবল গর্ভিণীর দেহ সবল রাখিবার জন্য নহে, গর্ভস্থ সন্তানের হিতার্থে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া শাস্ত্রকারেরা ইহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

কোন এক বিলাতী চিকিৎসাসম্বন্ধীয় মাসিকপত্রিকা পড়িয়া এই প্রথা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তদ্বিষয় ধারণা হইয়াছিল। কোন একটী হাঁসপাতালে একটী ইংরেজ মহিলা প্রসবার্থে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে সদ্যোজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে এরূপ ভীষণ ভাবে ক্রন্দন করিতেছিল যে, বহু যত্ন ও চেষ্টা-সত্ত্বেও এবং বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া কোনও রোগের লক্ষণ না পাওয়াতে চিকিৎসক-মণ্ডলী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ছিলেন, পরিশেষে ইঁহাদের মধ্যে জনৈক যুবা চিকিৎসক কৌতুহলবশে ক্রন্দনরত বালকের জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,গর্ভাবস্থায় আপনার কোন দ্রব্য আহারের নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল কি না? মাতা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, গর্ভাবস্থায় তাঁহার ফরাসী দেশীয় সুরা-পানের জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমার সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই। বিজ্ঞ ঐ চিকিৎসক তৎক্ষণাৎ ফরাসী দেশীয় সুরা শিশুর মুখে কিঞ্চিৎ পরিমাণ দিবার জন্য ধাত্রীদিগকে আদেশ করেন। ইহা যাদুমন্ত্রবৎ শিশুর ক্রন্দন বন্ধ করিয়াছিল দেখিয়া চিকিৎসকগণ নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির অপরিণামদর্শিতা ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহা একটী উদাহরণ মাত্র। গর্ভস্থ সন্তানের ক্রন্দন অনেকে শুনিয়াছেন, এরূপ শুনা যায়। "অনুসন্ধান" নামক মাসিক পত্রিকায় এসম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহা সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত,এরূপ প্রকাশ ছিল। আমার বিশ্বাস, ইহাও উক্ত কারণে খাদ্য ও রসের অভাব হেতু হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক আর্য্য শাস্ত্রকারেরা এ বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া প্রসবের পূর্ব্বে গর্ভিণীর যাহা সাধ হয় তাহা ভক্ষণ করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

জাতক সংস্কার—সাধ ভক্ষণের কিছুদিন পরেই গর্ভিণী সাধারণতঃ সন্তান প্রসব করেন। প্রসবের পরও যে-সকল সংস্কার আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে তাহাদের সকল গুলিই আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সম্মত নিয়মাবলী অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও সহজসাধ্য, সেজন্য সর্ব্বসাধারণের প্রতিপালন করাও উচিত। বিদেশীর চোখে দর্শন ও বিদেশীর মুখে শ্রবণ করিয়া এক কথার পরম মতানুসরণ করিয়া আমরা আমাদের প্রাচীন মণীষিগণের সৃষ্ট গভীর বিজ্ঞান-সম্মত নিয়মাবলী বুঝিতে না পারিয়া এই সকল রীতি-নীতিকে অসভ্য জনোচিত কুসংস্কার বলিয়া ধরিয়া লইয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকি; এরূপ করা যে কতদূর নির্ব্বুদ্ধিতার ও মূর্খতার পরিচায়ক তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? কোন কোন সুবিখ্যাত চিকিৎসক ঐ সকল কুসংস্কারই যে আধুনিক শিশু-মৃত্যুর কারণ, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বিদেশীর মুখ-নিঃসৃত অবোধ্য বাক্যাবলী জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। যে ভারতসন্তান একদিন সর্ব্ববিষয়ে জগতের মধ্যে শিক্ষক-রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, সেই ভারত-মাতার কৃতবিদ্য সুসন্তানগণের বহুকালব্যাপী গভীর গবেষণাপ্রসূত অমূল্য সংস্কারগুলিকে যাঁহারা কুসংস্কার বলিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহাদের এইরূপ বলিবার কারণগুলি কেন তাঁহারা সাধারণের গোচর করিতে পারেন না?

গর্ভিণী প্রসব হইবার পূর্ব্ব হইতেই এদেশে সূতিকাগারের বন্দোবস্ত করা হয়। শাস্ত্রকারের মতে সূতিকাগৃহ, সাধারণ ব্যবহার্য্য গৃহ হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়; অর্থাৎ এই গৃহে দৈনিক ব্যবহার্য্য তৈজসপত্রাদি বা শয্যা-বস্ত্রাদি রাখা নিষিদ্ধ। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সূতিকাগৃহগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে উক্ত নিয়মাপেক্ষা কোন সুনিয়ম বা ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রসবান্তে প্রসূতির শারীরিক অবস্থা এরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, গৃহের তৈজসপত্রাদি-সংশ্লিষ্ট রোগ-বীজাণু সকল,

যে কোন সময়ে গর্ভিণীকে আক্রমণ করিয়া তাহার জীবন সংশয়াপন্ন করিতে পারে। অধিকন্তু গর্ভিণীর জরায়ু-নিঃসৃত স্রাবের সহিত নানা প্রকার জীবাণু মিশ্রিত থাকায় উহা অপরের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে। এ জন্ম আমাদের প্রাচীন সূতিকাগৃহ সাধারণ বাসগৃহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন এবং প্রসূতি প্রসবান্তে যাহাতে সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম লাভ করিতে পারে তজ্জন্য শুভাশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অশৌচার্থে আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যবহৃত Segregation বুঝায় অর্থাৎ প্রসূতিকে সম্পূর্ণভাবে সাংসারিক কর্ম্ম হইতে বিরত রাখিয়া যতদিন না জরায়ু পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় ততদিন সম্পূর্ণ বিশ্রামের নিমিত্ত এই অশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রসূতিকে জাতির ধর্ম্ম, বর্ণ ও কর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তিন সপ্তাহকাল পালন করিবার বিধান আছে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আধুনিক ধাত্রিবিদ্যাবিশারদগণের ন্যায়ও তাঁহারা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন যে, প্রসবান্তে প্রসূতির জরায়ু সাধারণ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তিন সপ্তাহ কাল লাগে। সমস্ত মনুষ্য-সমাজেই এই নিয়ম বর্ত্তমান থাকায় জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেই ইহা পালন করিয়া থাকেন। বোধ হয় এই কারণেই গাভী প্রসব হইলে তিন সপ্তাহ অন্তে দুগ্ধ-দোহনের ব্যবস্থা আছে। প্রসূতি একবিংশতি দিবস সম্পূর্ণ বিশ্রাম না করিয়া যদি শ্রমসাধ্য কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন অথবা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান তাহা হইলে জরায়ুর উভয় পার্শ্বস্থ বন্ধন-(Ligamants) গুলি শ্লথ থাকায় জরায়ুর স্থানচ্যুত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। জরায়ু স্থানচ্যুত হইলে প্রসূতিকে যে কি জীবনব্যাপী কষ্ট পাইতে হয় তাহা প্রত্যেক চিকিৎসকই জানেন। অনেক সময় জরায়ুকে যোনিমুখে বহির্গত হইতেও দেখা যায়। অতএব এই অশৌচ-বিধি কিরূপ বিজ্ঞানসম্মত তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমাদের হিতকামী পুরোহিতগণ তাহার যে সকল ব্যাখ্যা জনসমাজে প্রচার করিয়া তাহাদিগের মনের ভিতর দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলেও লজ্জিত হইতে হয়। তাহারা সূতিকা-গৃহ ও প্রসূতিকে অস্পৃশ্য ও হেয়জ্ঞানে একটী অস্বাস্থ্যকর পুতিগন্ধময়, আলোক ও বায়ু-বিবর্জ্জিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা দিয়া নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করেন না। যে আর্য্য ঋষিগণ নবপ্রসূত শিশুর নিমিত্ত সূর্য্যালোক ও বায়ু সঞ্চারিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গৃহের ব্যবস্থা করিয়া ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের পথ উন্মুক্ত রাখিতে দিয়াছেন, তাঁহাদের জনকত পাণ্ডিত্যাভিমানী বংশধর সেই সকল সার্ব্বজনীন নিয়মের অপরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা ভারতের সন্তানদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে ক্রটি করিতেছেন না? অশৌচ-বিধানের অর্থ প্রসূতি অস্পৃশ্য নহে। বরঞ্চ প্রসূতিকে দেবীর তুল্য পৃথক্ আসনে উপবেশন করাইয়া, আপনাদের অস্পৃশ্য ভাবিলে দেশের সমূহ মঙ্গল হইবে। দেব-মন্দিরের ন্যায় আঁতুড়ঘর সর্ব্বদা ধৌত ও দুর্গন্ধনাশক দ্রব্য দ্বারা যথাসম্ভব পরিস্কার রাখিয়া মধ্যে মধ্যে প্রসূতির পরিধেয় বস্ত্রের পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া উচিত এবং সেখানে বিনাস্নানে বা ধৌতবস্ত্র পরিধান না করিয়া কাহারও প্রবেশ করা উচিত নয়; এইরূপ বিধি পালনের জন্য এই অশৌচের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু সেই নিয়মের ভ্রমপূর্ণ ব্যাখ্যার নিমিত্ত বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রসূতিকে অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধযুক্ত ছিন্নবস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবৃত করিয়া রাখার মহাপাপেই আজ ভারতের সন্তান এইরূপ হীনবীর্য্য হইয়া জগতের চক্ষে অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে

অতএব সূতিকাগৃহের পৃথক্ ব্যবস্থা ও অশৌচের বিধান সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। সূতিকাগৃহ উপযুক্ত রৌদ্র ও বায়ুচালিত স্থানে নির্ম্মাণ করাই প্রশস্ত। সেখানে তৈজসপত্রাদি কিছুই থাকিবে না। প্রসূতিকেও সম্পূর্ণভাবে অশৌচের বিধান প্রতিপালন করিয়া, সাংসারিক কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়া একবিংশতি দিবস সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত। যখন কেহ সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিবেন, তখনই তাহাকে যথাসম্ভব শুচিভাবে (aseptic) ধৌত বস্ত্রাদি পরিধান ও হস্তপদাদি ধৌত করিয়া প্রবেশ করিবেন ইহাই আর্য্যঋষিগণের অভিপ্রেত ছিল অতএব অশৌচের অপরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রসূতি ও নবজাত শিশুকে শমনের দ্বারে অগ্রসর করাইলে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের নিয়মাবলী পালন করার নামে প্রকৃত পক্ষে সেগুলিকে অবহেলা করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দেওয়া কোন মতে উচিত নহে।

প্রসবান্তে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হয় তাহাও

যে কতদূর বিজ্ঞান-সম্মত, তাহা নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রসবের পরই যতক্ষণ না জরায়ু হইতে ফুল বহির্গত হয় ততক্ষণ প্রসূতিকে কোনরূপ নড়িতে চড়িতে দেওয়া হয় না, কারণ শরীর বেশী সঞ্চালিত হইলে ফুলের কিয়দংশ ছিঁড়িয়া যাওয়া সম্ভব, তাহাতে রক্তস্রাব হইয়া প্রসূতির জীবননাশও হইতে পারে। ফুল বহির্গত হইতে বিলম্ব হইলে তাহার নিজ মস্তকের চুল মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করাইয়া কৃত্রিম (artificial) বমনের উদ্রেক করান হয়; কারণ বমনের উদ্রেক হইলে জরায়ু সঙ্কুচিত হয়—তাহাতে শীঘ্রই ফুল বাহির হইয়া পড়ে। তৎপরে প্রসূতিকে শয্যার উপরে শায়িত করিয়া নবজাত শিশুর প্রতি লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমে নাড়ীচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। তাহা বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক নিয়মাপেক্ষা অনেকাংশ শ্রেষ্ঠ, সহজ ও বিনাব্যয়-সাধ্য; সুতরাং সর্ব্বপ্রকার লোকের পক্ষে সম্ভব পর। আশ্চর্য্যের বিষয়, শাস্ত্রকারগণ আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রচলিত জীবাণু সকলের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকিয়া বহু গবেষণার পর এই সকল নিয়ম ও প্রথা প্রচলিত করিয়া জগতের হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন। শিশু, মাতৃগর্ভ হইতে বিচ্যুত হইবার পরেই নাড়ীকর্ত্তন প্রথম কর্ম্ম। শাস্ত্রকারেরা জানিতেন যে সুস্থ ও সবলকায় জীব কিংবা উদ্ভিদের উপর রোগ বীজাণু থাকিতে পারে না। আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিশারদগণ বোধ হয় এ বিষয়ে মতভেদ করিবেন না। সেই কারণে বিশেষরূপ বিচার ও চিন্তা করিয়া অপরিষ্কৃত অস্ত্র, শস্ত্র বা অন্য কিছু কোনপ্রকার তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে নাড়ীকর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা না করিয়া সদ্য-কর্ত্তিত, সতেজ বংশখণ্ড হইতে বংশ ছুরিকা তৈয়ারী করিয়া নাড়ীকর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অশিক্ষিত ব্যাখ্যাকার দ্বারা প্রচলিত বংশ-ছুরিকা অর্থে পচা, অপরিষ্কৃত রুগ্ন বংশ হইতে কর্ত্তিত বংশ ছুরিকাদ্বারা নাড়ী-কর্ত্তনের ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় দেশের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। এতদ্দেশীয় লোকের মনে এরূপ কুভাব দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়াছে যে, নবজাত শিশু অস্পৃশ্য, সুতরাং কোনপ্রকার অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ উহা ফেলিয়া দিতে হইবে। আধুনিক-চিকিৎসকগণ যে আস্ফালন করিয়া Sterilised কাঁচি ও Antiseptic Lotionএর ব্যবস্থার জন্য উচ্চ কণ্ঠে উপদেশ দিতেছেন তাহা এই ভারতভূমে একেবারে অসম্ভব। কারণ এমন অনেক পল্লীগ্রাম আছে যে, তথায় বিদেশীর শাস্ত্র ও চিকিৎসকের একবারও পদার্পণ হইয়াছে কি না সন্দেহ। এরূপ ক্ষেত্রে আমার মতে বংশ-ছুরিকাই নাড়ী-কর্ত্তনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

এখন কথা হইতেছে, আমাদের এই ভারতভূমিতে এমন পল্লী বোধ হয় খুব বিরল যেখানে একটী মাত্র বংশ-ঝাড় নাই। তবে ঐ বংশ-ছুরিকা জলে সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা নাড়ী কর্ত্তন প্রশস্ত, ইহাতে কোনপ্রকার ভয়ের কারণ থাকা সম্ভব নহে; অথচ সকল অবস্থা ও সর্ব্বস্থানের লোক সহজে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন। তবে সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, যেন রুগ্ন, অপরিষ্কৃত মৃত বংশ হইতে ছুরিকা প্রস্তুত করিয়া নাড়ীকর্ত্তন না করেন। যদি সতেজ বংশ হইতে ছুরিকা প্রস্তুত না করিয়া ভ্রান্ত ও কুসংস্কারের বশবর্ত্তী রুগ্ন, পচা বংশ হইতে ছুরিকা প্রস্তুত করিয়া নাড়ী-কর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে শিশুর মৃত্যু সুনিশ্চিত। কারণ এই যে নবজাত শিশু দুরারোগ্য (সাধারণতঃ যাহাকে 'পেঁচোয় পাওয়া' বলে) রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, তাহা এই অপরিষ্কৃত বংশ-ছুরিকা ব্যবহারের বিষময় ফল; কারণ ঐরূপ ছুরিকায় প্রচুর পরিমাণে ধনুষ্টঙ্কার রোগের বীজাণু সকল বর্ত্তমান থাকায়, নাড়ী-কর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নবজাত শিশুর কোমল শরীরে রোগবীজাণু প্রবিষ্ট হইয়া ত্বরায় এই মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে; অতএব নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার দোষ না দিয়া বিজ্ঞান-সম্মত প্রথার দোষারোপ করা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কর্ম্ম। আর ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা রোগের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান না করিয়া মূর্খ, অশিক্ষিত, চতুর লোকেদের দ্বারা প্রচারিত এই রোগকে 'পেঁচোয় পাওয়া', 'ভূতে পাওয়া' প্রভৃতি অলৌকিক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া চিকিৎসা-ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকিয়া 'জল-পড়া' ও যন্ত্রাদির সাহায্য লইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না।

নাড়ীচ্ছেদের পরই নাড়ী-বন্ধন একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। আধুনিক চিকিৎসকগণ বীজাণু বর্জ্জিত

(Sterilized) রেশম দ্বারা নাড়ী-বন্ধনের ব্যবস্থা দেন; কিন্তু আমাদের দেশে, যখন-তখন ওরূপ রেশম দুষ্প্রাপ্য জানিয়া বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ সাধারণ কার্পাস সূত্রকে হরিদ্রায় রঞ্জিত করিয়া নাড়ী-বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কারণ তাঁহারা বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন যে, হরিদ্রার রোগ-বীজাণু নষ্ট করিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। এ বিষয়ে বোধ হয় আধুনিক চিকিৎসকগণ মতভেদ করিবেন না এবং বোধ হয় সাধারণে অবলোকন করিয়াছেন যে পিষ্ট হরিদ্রা, বহু দিবস পর্য্যন্ত খোলা অবস্থায় পতিত থাকিলেও তাহাতে কোনপ্রকার জীবাণু জন্মে না, অতএব এইরূপ সদ্য ধৌত ও পিষ্ট হরিদ্রা রঞ্জিত সূত্রের দ্বারা নাড়ী-বন্ধন করিলে কোনরূপ রোগ-সৃষ্টির কারণ থাকিতে পারে না; ইহাও সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত। আরও দেখা যায়, অনেক স্থলে নবমুকুলিত দুর্ব্বা, ঐ সূত্রের সহিত নাড়ী-বন্ধন-কালে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। আমার বোধ হয়, দুর্ব্বার রসে রক্ত-রোধক ক্ষমতা থাকায় এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কারণ ইহাতে কর্ত্তিত নাড়ীর মুখ হইতে রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া শীঘ্র ক্ষত স্থান শুষ্ক হইয়া যায়। ইহাকে কোন মতে কুপ্রথা বা কুসংস্কার বলা যায় না।

নাড়ী-বন্ধন করিয়া দেওয়ার পরই শিশুকে স্নান করাইবার ব্যবস্থা বোধ হয় সকল দেশেই বর্ত্তমান আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ উষ্ণ সাবান-জলে নবজাত শিশুকে স্নান করাইবার বিধান দেন। কিন্তু আমার মতে নবজাত শিশুকে সাবান জলে স্নান করান অপেক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ, কারণ সদ্যজাত শিশুর শরীরের ত্বক অতি কোমল ও পাতলা থাকায় সাবানের রাসায়নিক পদার্থসমূহ অনেক সময়ে চর্ম্মের প্রদাহ উপস্থিত করে, সুতরাং আমাদের দেশে বহুকাল প্রচলিত নিয়ম ও ব্যবস্থা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। আমাদের শাস্ত্রকারগণের মতে, কিঞ্চিৎ হরিদ্রা মিশ্রিত ফুটন্ত জলকে সহনোপযোগী শীতল করিয়াস্নান করান সহজ বিজ্ঞানসম্মত এবং সামান্য ব্যয়-সাধ্য।

তৎপরে নবজাত শিশুকে যে রৌদ্র-তাপ দিবার ব্যবস্থা আছে তাহাও বিজ্ঞানানুমোদিত, কারণ শিশুর গাত্রে মোমের ন্যায় এক প্রকার মসৃণ পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা সূর্য্যের উত্তাপে দ্রব হইয়া যায় ও শিশুর দেহস্থিত প্রসবকালীন রোগ-বীজাণু সমূহ নষ্ট করিয়া কোমল ত্বক্‌কে বাহিরের শীত ও উত্তাপ সহ্য করিবার উপযুক্ত করিয়া তোলে। সৃষ্টিকর্ত্তা, জীব সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই তাহার প্রাণধারণোপযোগী সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন; আমরা নিজেদের মূর্খতা-নিবন্ধন তাহার অপব্যবহার করিয়া জন-সমাজের অনিষ্ট সাধন করি। জীবনধারণের নিমিত্ত কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। কৃত্রিমতা শরীরের সুস্থতা অপেক্ষা অসুস্থতাই বৃদ্ধি করে। আজ-কাল অনেকেই শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরই শীতপ্রধান দেশের অধিবাসিগণের ন্যায় পশমজাত পরিচ্ছদে শিশুকে আবৃত করিয়া রাখিয়া নিজেদের আভিজাত্যের নিদর্শন দেখাইতে গিয়া দেশের যে কি সর্ব্বনাশ করিতেছেন তাহা ব্যক্ত করা যায় না। শীতপ্রধান দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি কি কখন গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের উপযোগী হওয়া সম্ভব? আমাদের দেশে গরম বস্ত্রে শিশুর দেহ আবৃত করিয়া রাখিলে তাহার স্বাস্থ্য যে কতদূর নষ্ট হয়, তাহা প্রত্যেক চিকিৎসাব্যবসায়ী সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত আছেন। এইরূপে নবজাত শিশুদিগকে প্রায়ই নিউমোনিয়া (Penumonia), ব্রংকাইটীস (Bronchitis) প্রভৃতি রোগে ভুগিতে দেখা যায়। কারণ, তাহাদের কোমল দেহ সর্ব্বদা গরম বস্ত্রে আবৃত থাকায় শরীরের অবস্থা এরূপ হইয়া যায় যে, তাহারা গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিলে বাহিরের শৈত্য তাহাদিগকে সহজেই আক্রমণ করিয়া উক্ত প্রকার জীবন সংশয়কারী রোগ আনয়ন করে। আরও অষ্টপ্রহর শরীর আবৃত থাকায় দেহের ত্বক্ দেশোপযোগী আবহাওয়ায় অভ্যস্থ না হওয়াতে নানাপ্রকার কঠিন ব্যাধিতে চিরকাল ভুগিতে থাকে। প্রধানতঃ আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল কারণেই 'ভদ্র'-নামধারী জন-সাধারণের শিশুগণই দরিদ্রদিগের শিশুদের অপেক্ষা দুর্ব্বল ও চিররুগ্ন। এ দেশে প্রচলিত যে প্রবাদবাক্য আছে "শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়" ইহা সম্পূর্ণ ভাবে সত্য। অতএব ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই শিশুকে ধীরে ধীরে সমস্ত জিনিসই সহ্য করান প্রয়োজন। শিশুকে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে রাখিবারও যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহাও যুক্তি-সঙ্গত, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি গর্ভাবস্থায় শিশুর ত্বক্ একই প্রকার মসৃণ তৈলাক্ত পদার্থে আবৃত

থাকে। ঐ পদার্থ তৈল ছাড়া অন্ত কোন পদার্থে সহজে দ্রব হয় না। আবার সর্ষপ-তৈলে স্নায়ু-উত্তেজক শক্তি বর্ত্তমান থাকায় উহা শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া দেয় যে, নবজাত শিশুকে প্রখর সূর্য্যকিরণে স্থাপিত করায় অত্যধিক উত্তাপ-বশতঃ প্রদাহ ও গাত্রে ফোস্‌কা জন্মায়; তাহা কেবল নিজেদের অজ্ঞতাবশতঃ হইয়া থাকে। প্রচলিত নিয়মের কোন দোষ নাই। "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্"—অত্যধিক অমৃত পানেও জীবন সংশয়াপন্ন হয়।

ষষ্ঠ দিবসে যে সংস্কার প্রচলিত আছে তাহা গভীর গবেষণার ফল বলিয়া মনে হয়। কারণ শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর ছয় দিবস পর্য্যন্ত তাহার জীবনের কোন নিশ্চয়তা থাকে না. সেইজন্যই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কোন প্রকার উৎসবাদি হইতে বিরত থাকিয়া ছয় দিবসান্তে শিশু ও প্রসূতির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। ছয় দিবস অতীত হইলে শিশু ও প্রসূতির জীবন অনেক পরিমাণে আশাপ্রদ হওয়ায় সেই দিবস অন্তে ভগবানের নিকট উভয়ের কল্যাণ-কামনায় এই সংস্কার প্রচলিত হইয়াছিল।

বৃন্তহীন

[শ্রীকরুণাময় বসু]

ললিত যৌবন-পাত্রে যত ছিল রসপূর্ণ মধু,
লইয়াছ, হে দেবতা মোর !
অন্তরের ফুলবনে যাহা ছিল প্রেম, তাও বঁধু
কুড়ায়েছ, আছে ফুল-ডোর।
যে বীণায় দিছি গান প্রভাতের শান্ত বনচ্ছায়ে,
ছিঁড়ে গেছে সেই বীণা-তার,
তবুও যে সুর চলে সায়াহ্নের মৃদুমন্দ বায়ে,
মনে রেখ' সে গান আমার।

এই যে শ্যামলী ধরা, হায় হায় এই যে যমুনা
যৌবন-প্রবাহে ভেসে চলে ;
পরপারে প্রিয়তম আর কি গো হ'বে দেখা-শুনা
অন্ধকার নীলাম্বর তলে ?
দিও এইটুকু আশা, যত কিছু ভালোবাসা, গান
তব সনে হোক্ পরিচয়।
চরণে সঁপিয়া দিনু কাঁটাভরা বৃন্তহীন প্রাণ,
যত কিছু মোর পরাজয়। *

---

* সরোজিনী নাইডুর একটী ইংরেজী কবিতার ভাবানুবাদ

দনুজ রাজা

[শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]

আমরা প্রাচীন তাম্রশাসনে, মুদ্রায়, ইতিহাসে এবং বিভিন্ন জাতির কুলজী গ্রন্থাদিতে দনৌজামাধব, নৌজা, দনুজরায়, দনুজ, দামুজ রাজা, দনুজমর্দ্দন, দনুজমর্দ্দন-ভূপ নামে কয়েকজন রাজার উল্লেখ পাই। নাম-সাদৃশ্যে ইহাদিগকে এক ব্যক্তি মনে হইলেও ইহারা যে এক ব্যক্তি কিংবা সমসাময়িক ছিলেন না তৎসম্বন্ধে আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বিক্রমপুরের আদাবাড়ী গ্রাম হইতে একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৩৩২ সালের পৌষ মাসের ভারতবর্ষ পত্রে ইহার আংশিক পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়,

বিক্রমপুর-আদাবাড়ীতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে দনুজমাধব-শ্রীমদ্দশরথদেব।

শ্রীমন্নারায়ণ-কৃপাপ্রসাদে গৌড়রাজ্য লাভ করিয়া বিক্রমপুর-বিজয়স্কন্ধাবার হইতে অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি রাজ ত্রয়াধিপতি দেবান্বয় কমলবিকাশভাস্কর সোমবংশপ্রদীপ-প্রতিপন্ন কর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জ পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথদেবপাদবিজয়ী তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে ২১এ কার্ত্তিক তারিখে দিন্তী, পালী, সেউ মাসচটক মুল, সেহন্তায়ী, পুতি, মহান্তিয়াড় ও করঞ্জগাঞী-বিশিষ্ট কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিতেছেন।

২। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলাচার্য্যগণের মধ্যে এড়ু মিশ্র হরিমিশ্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইঁহারা উভয়েই মহারাজ দনৌজ মাধবের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

হরিমিশ্রের কারিকায় দনৌজামাধব।

হরিমিশ্র লিখিয়াছেন ঃ—

"বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোঽভূন্মহাশয়ঃ।
জন্মগ্রহস্তয়াদ্দোষাৎ কলঙ্কোঽভূদনন্তরম্॥
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রতিগ্রহান্।
তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ॥
মতিং চাপ্যকরোদ্বঙ্গে যবনস্য ভয়াত্ততঃ।
ন শক্নুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং যদা পুনঃ॥
প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজামাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ।
এতৎসভায়াং বহব আগতা ব্রাহ্মণা নরাঃ।
নানাগুণসমাযুক্তা দ্বাবিংশতি কুলোদ্ভবাঃ॥
ধনৈশ্চ রাজসম্মানৈঃ পিতামহজিগীষয়া।
সম্বন্ধং কৃতবন্তশ্চ সর্ব্বে ভূধর-(ভূশূর ?) পুঙ্গবাঃ॥

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, প্রথমাংশ ১৫৩ পৃঃ পাদটীকা (২))

উদ্ধৃতাংশ হইতে দেখা যাইতেছে, বল্লালের পর তৎপুত্র লক্ষ্মণ এবং তৎপর তৎপুত্র কেশব সেন রাজা হইয়াছিলেন। এই কেশব সেন যবনের ভয়ে গৌড় রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। তাঁহার সভাশ্রিত ব্রাহ্মণগণ তৎপরবর্ত্তী রাজা দনৌজামাধবের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাজসম্মানে তাঁহারা তাঁহাদের পিতামহদিগকেও জয় করিয়াছিলেন। "সেনবংশাদনন্তরম্"এবং "পিতামহজিগীষা"র অর্থ যথাক্রমে 'সেনদিগের অনন্তরবংশ্য' এবং "দনৌজামাধবের পিতামহ অর্থাৎ বল্লালসেন" করিয়াছেন। দনুজমাধবের তাম্রশাসন আবিষ্কারের পূর্ব্বে এইরূপ অর্থ করা সম্ভবপর হইলেও এখন আর এরূপ অর্থ করা চলে না। দনুজমাধব নিজকে 'দেবান্বয়' অর্থাৎ দেববংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার নাম দশরথ দেব, বিরুদ দনুজমাধব। দেব-বংশীয়কে সেনবংশীয় বলা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। দনৌজামাধব যে এক ব্যক্তি তাহার প্রমাণ কি? ইহার প্রমাণ ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশে দনৌজামাধবের পাঠান্তর 'দনুজমাধব' পাওয়া গিয়াছে (১) 'ভূধরপুঙ্গবাঃ' পাঠ যে ভুল তাহা যথেষ্টই বুঝিতে

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশে দনুজমাধব বা দনৌজামাধব।

(১) "ইদানীং দনুজমাধবস্য সভাশ্রিতা কুলীনাদি গণস্য।" পাদটীকা দনৌজামাধবস্য—পাঃ (বিশ্বকোষ-প্রেস, মহাবংশ, ৪ পৃষ্ঠা।)

পায়া যায়। ভূধর শব্দের অর্থ পর্ব্বত, সুতরাং এই পাঠ প্রকৃত হইলে এ ে কোন অর্থই হয় না। খুব সম্ভব প্রকৃত পাঠ 'ভূশূর-পুঙ্গবাঃ'। তাহা হইলে অর্থ দাঁড়ায় 'ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের নিজ নিজ পিতামহগণকে ধন ও সম্মান দ্বারা পরাজয় ইচ্ছা করিয়া।' তাঁহাদের পিতামহগণকে? ধ্রুবানন্দের মহাবংশে দেখা যায় দনৌজামাধব বা দনুজ মাধব রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সমীকরণ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে যাঁহারা মহারাজ বল্লাল সেনের নিকট হইতে কৌলীন্য সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের কতিপয় পুত্র ও পৌত্র উপস্থিত ছিলেন। তাহা হইলে অর্থ হয়—প্রথম কুলীনগণ বল্লালের নিকট যে ধন ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের পৌত্রগণ মহারাজদনুজমাধব হইতে তদপেক্ষা বেশী ধন ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

এখন দেখা যাউক এই দনুজমাধবের আবির্ভাব কখন হইয়াছিল। হরিমিশ্রের মতে সেন-বংশের অবসানের পর দনুজমাধব রাজা হইয়াছিলেন। মিনহাজ বলেন ১২৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবকাতে সোণারগাঁওর উল্লেখ পাওয়া যায় না কিংবা মুসলমান রাজত্বের প্রথম একশত বৎসরের মধ্যে সোনারগাঁওর কোন মুদ্রাও পাওয়া যায় নাই। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম সোনারগাঁও ও সাতগাঁওতে মুসলমান শাসনকর্ত্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে দনুজমাধব ১২৬০ খৃষ্টাব্দের পর ও ১৩২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং এই উভয়স্থানই তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। যদি আমাদের এই অনুমান ঠিক হয় তবেই তাঁহার গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচয় দিবার সার্থকতা দেখা যায়।

৩। তারিখ-ই-বরণীতে লিখিত আছে যে ১২৮০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ বলবন বিদ্রোহী মঘিসুদ্দিনের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া লক্ষ্মৌতি হইতে সোনার গাঁও যান। ঐ স্থানের স্বাধীন রাজা মঘিসুদ্দিন যাহাতে জলপথে পলায়ন না করিতে পারে তাহার ভার গ্রহণ করেন। বলবন ৬০ কি ৭০ ক্রোশ গিয়া হাজিনগরের জাজনগরের নিকট মঘিসুদ্দিনকে ধৃত করেন।

তারিখ-ই-বরণীতে দনুজরায়।

এই জাজনগর বা হাজিনগরের অবস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ ইহাকে ত্রিপুরার নামান্তর বলেন, কিন্তু ত্রিপুরার কখনও জাজনগর বা হাজিনগর নাম ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। অপরের মতে এই জাজনগর উড়িষ্যায় অবস্থিত। বরণী বলবনের যুদ্ধ-যাত্রার বিবরণে জাজনগরকে সোনারগাঁও হইতে ৬০।৭০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী লিখিলেও তোগলক শাহের রাজত্বের বিবরণে জাজনগরকে তেলিঙ্গার নিকটস্থ স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (৪৫০ পৃষ্ঠা)। বদাউনী (I. 223), ডাউসন (III, 234) ও আবুল ফজল (Blochmann, p. 472, 1. 6) এর বর্ণনা অনুসারে জাজনগর রাঢ়ের পশ্চিমে, তেলিঙ্গা ও বিহারের মধ্যে কোন স্থান বলিয়া মনে হয়। ব্লকমান এই সব প্রমাণ উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন –

"We are forced either to believe that there were two Jajnagars, one famous for elephants near south-western Bengal (Tabaqat Nasiri, Barani, Firuz Shahi, Ain), and another in Tipprah or south-eastern Bengal (on the testimony of a single passage of Barani); or to assume that there was in reality only one Jajnagar, bordering on south-western Bengal, and that Barani in the above single passage wrote Sunargaon by mistake for Satgaon which would remove all difficulties." (J. A. S. B, 1873, p. 239)

অর্থাৎ আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বিশ্বাস করিতে হয় যে, জাজনগর নামে দুইটী স্থান ছিল; তন্মধ্যে একটী বাঙ্গলার দক্ষিণ-পশ্চিমে (তবকাত-ই-নাশিরী, বরণী, ফিরোজসাহী, আইন-ই-আকবরী) হাতীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং অপরটী বাঙ্গলার দক্ষিণ-পূর্ব্বে বা ত্রিপুরা রাজ্যে। শেষোক্তের প্রমাণ শুধু বরণীর বলবনের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনায় মাত্র পাওয়া যায়; অথবা প্রকৃত পক্ষে জাজনগর নামে মাত্র একটী স্থানই ছিল এবং তাহা বাঙ্গলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল, বরণী ভুলক্রমে এক জায়গায় মাত্র সাতগাঁও

লিখিতে সোনারগাঁও লিখিয়া থাকিবেন। এইরূপ মনে করিলেই সকল গোল মিটিয়া যায়। আমাদেরও মনে হয় সোনারগাঁও স্থলে সাতগাঁও হইবে এবং দনুজরায় বা দনুজমাধবের রাজধানী তাম্রশাসন অনুসারে বিক্রমপুরে হইলেও রাজ্য অন্ততঃ সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যে অংশ মুসলমানগণ অধিকার করিয়াছিল তাহা ভিন্ন অবশিষ্ট অংশ তাহার অধীন ছিল। এই জন্যই তিনি সেন-রাজগণের ন্যায় নিজকে গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

৪। আবুল ফজল সেন বংশের শেষ রাজা 'নৌজা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আইন-ই-আকবরীতে নৌজা।

দনৌজামাধব, দনুজমাধব, দনুজ রায় ও এই নৌজা একই ব্যক্তি, কিন্তু তিনি সেন বংশীয় ছিলেন না তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সেন বংশের সম্পর্কান্বিত হইলেও হইতে পারেন। এই দনুজ মাধবও নিজকে সেন রাজগণের ন্যায় 'সোমবংশ-প্রদীপ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

৫। বঙ্গজ-কায়স্থ-কুল-কারিকায় এক মহারাজ দনুজ মাধবের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি বঙ্গজ-কায়স্থ পুরবসুর কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন পুর বসু অহর্পতি বসুর পুত্র। এই অহর্পতি, বঙ্গজ কায়স্থ প্রথম সপ্ত কুলীনের অন্যতম।[১] পুরবসুর কন্যাদান প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

বঙ্গজ-কায়স্থ-কারিকায় দনুজমাধব।

"সত্যেন কার্ণঘোষায় পশ্চাদ্বীমগুহায় চ।
মহারাজে দনুজায় মাধবায় চ কোপতঃ॥"

(আচার্য্যচূড়ামণি।)

এ স্থলে 'দনুজায় মাধবায়' পাঠ দেখিয়া কেহ কেহ দনুজ ও মাধব দুই বিভিন্ন ব্যক্তি বলিতে চাহেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কার্ণ ঘোষ ও বীম গুহ এই উভয়ই পদবী সংযুক্ত, কিন্তু মাধবের কোনও পদবী নাই কেন? দনুজের কোন পদবীর দ্বারা পরিচয়ের দরকার হয় নাই, কেন না তিনি মহারাজা। মাধবও কি তবে মহারাজা? তাহা হইলে 'মহারাজে' একবচনান্ত না দ্বিবচনান্ত হইত। আর পুরবসু মাধব নামক কোন ব্যক্তিকে কন্যাদান করিয়াছেন বলিয়া কোথায়ও উল্লেখ পাওয়া যায় না। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও বঙ্গজ-কায়স্থগণ একই সময়ে মহারাজা বল্লাল সেন-কর্ত্তৃক কৌলীন্য সম্মানে সম্মানিত হইয়া ছিলেন সুতরাং তাহাদের পুত্রগণ সমসাময়িক। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের প্রথম কুলীনদিগের পুত্র ও পৌত্রগণের কেহ কেহ দনুজমাধব-কর্ত্তৃক সমীকৃত হইয়াছিলেন। এই দনুজমাধবের শ্বশুর পুরবসুও বঙ্গজ-কায়স্থ প্রথম কুলীন অহর্পতি বসুর পুত্র. সুতরাং এই দনুজ-মাধব ও পুর বসু এবং উপরোক্ত দনুজমাধব সমসাময়িক। সুতরাং উভয় দনুজমাধবই এক ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহা যদি না হয় তবে দুই মন দুই জন, 'মহারাজ দনুজমাধব' একই সময়ে এক স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন ধরিয়া লইতে হয়। তাহা সম্ভবপর নহে। দনুজমাধব যেমন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ দিগের প্রথম কুলীনদিগের পুত্রদের ও পৌত্রদিগের কাহারও কাহারও সমীকরণ করেন, সেই প্রকার বঙ্গজ-কায়স্থদিগের প্রথম কুলীনদিগের পুত্রদিগের দুই বারে সমীকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত প্রথম সমীকরণে তাঁহার শ্বশুর পুর বসু অন্যতম।

"শঙ্করো বনমালী চ পুরশ্চ রাম ঘোষকঃ।
এতে চ সমতাং যাতাঃ সর্ব্বে গুণসমন্বিতাঃ॥১॥
গুহোরুদ্রশ্চ শাণ্ডিশ্চ কার্ণ্যপিতাম্বরাখ্যকৌ।
তথা শূলপাণিমিত্রঃ পঞ্চৈতে সমতাং গতাঃ॥২॥

(কায়স্থ বংশাবলী, ৩১ পৃষ্ঠা)

৬। পাবনা জেলাস্থ বেলকুচির সাহা-প্রামাণিক বংশের কুলকারিকায় আমরা আর এক দনুজের উল্লেখ দেখিতে পাই—

"সেনরাজোবাচ—
"দনুজগুরুশাপান্তে রাষ্ট্রিকঃ কৃষিকঃ শুচিঃ।
সৌলুক্যঃ সুলুকোদ্ভবঃ শুক্লো সাহা বভূব হ॥"

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা।)

এই দনুজ ও পূর্ব্বোক্ত দনুজমাধব এক ব্যক্তি বলিয়াই

১। "সো বাদিনাঞ্চ সপ্তানাং ন চ কর্ম্মাত্র লিখ্যতে। বল্লাল-পূজিত স্তস্মাত্তে সর্ব্বে সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ।"

"সোমবসু গুহ ঘোষ হাড় গুহ চিত্রাঙ্গদ গুহ অহর্পতি বসু, অনন্ত ঘোষ জয়ী মিত্রাঃ এতে সমতাং গতাঃ।" (আচার্য্য চূড়ামণি।)

মনে হয়। দনুজমাধব কিন্তু সেন-বংশের পরে রাজা হইয়াছিলেন। দনুজের পরবর্ত্তী এই সেন রাজা কে? আমাদের মনে হয় এই সেন-রাজা বিক্রমপুরের বৈদ্য বল্লালসেন বা পোড়া রায়। তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া প্রবাদ। মুদ্রার দনুজমর্দ্দন বৈদ্য-বল্লালের পরবর্ত্তী ছিলেন।

সাহা-প্রামাণিক বংশের কারিকায় দনুজ

৭। রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাস তাঁহার আত্ম-পরিচয়ে লিখিয়াছেন—

"পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তার পাত্র ছিল নারসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকল অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

'বেদানুজ' স্থলে 'যে দনুজ' পাঠ ধরিয়া কেহ কেহ দনুজমাধব ও এই দনুজ মহারাজাকে অভিন্ন বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। কৃত্তিবাসের বংশাবলী পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা জানা যায়।

কৃত্তিবাসের আত্ম-পরিচয়ে দানুজ মহারাজা

উৎসাহমুখ (প্রথম কুলীন)
|
আহিত (১নং সমীকরণে লক্ষ্মণ সেন-কর্ত্তৃক সমীকৃত)
|
উধো (৪র্থ সমীকরণে দনুজমাধব-কর্ত্তৃক সমীকৃত।)
|
শিয়ো (৭ম সমীকরণ)
|
নরসিংহ (১৪শ সমীকরণ, দানুজ বা দনুজ রাজার মহাপাত্র, ফুলিয়ায় বাসস্থাপন করেন।)
|
গর্ভেশ্বর
|
মুরারি
|
বনমালী
|
কৃত্তিবাস (রামায়ণ রচনা করেন)

মহারাজা দনুজমাধব ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ সমীকরণ করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে নরসিংহ ওঝার পিতামহ উধোমুখ মহারাজ দনুজমাধব কর্ত্তৃক সমীকৃত হইয়াছিল। তাহার পিতা শিয়োমুখ দনুজমাধবের পর সমাকৃত হইয়াছিল, সুতরাং বুঝিতে হইবে তখন দনুজমাধব বর্ত্তমান ছিলেন না। এরূপ অবস্থায় শিয়োর পুত্র নরসিংহ কখনই এই দনুজমাধবের মহাপাত্র হইতে পারে না। এই দনুজমাধবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কোন দনুজ বা দানুজ মহারাজার মহাপাত্র হওয়া সম্ভব। 'দানুজ' দ্বারা মনে হয় এই মহারাজ 'দনুজের অপত্য' অর্থাৎ দনুজমাধবের পুত্র ছিলেন।

৮। বাকরগঞ্জের ইতিহাস-লেখক বেভারিজ সাহেব লিখিয়াছেন,—চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম রামনাথ দনুজমর্দ্দন। আমাদের মনে হয় এই রামনাথ দনুজমর্দ্দন তাম্রশাসনোক্ত দশরথ দনুজমাধবের পুত্র। পিতার নাম দশরথ, কিন্তু বিরুদ দনুজমাধব, তদ্রূপ পুত্রের নাম রামনাথ, বিরুদ দনুজমর্দ্দন। কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা ইহারই মহাপাত্র ছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি ১২৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ রাজত্ব করেন এবং ১৩২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলমানগণের সপ্তগ্রাম ও সোনারগাঁও অধিকার করার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ১৩২৩ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে কিংবা সমকালে দনুজমাধবের পুত্র দনুজমর্দ্দন মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিক্রমপুর হইতে তাড়িত হইয়া চন্দ্রদ্বীপ আশ্রয় করিয়াছিলেন। এই বিপ্লবের সময় তাঁহার মহাপাত্র নরসিংহ গঙ্গাতীরে গিয়া ফুলিয়া গ্রাম স্থাপন করেন।

চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা রমানাথ-দনুজমর্দ্দন

এই দনুজমর্দ্দন বঙ্গজ কায়স্থদিগের প্রথম কুলীনদিগের পৌত্রগণের তিনবারে সমীকরণ করেন। যথা:—

দ্বিজ বাচস্পতির কারিকায় দনুজ

"চণ্ডেশ্বরশ্চ ভাণ্ডশ্চ ভীমশ্চ গুহকাস্ত্রয়ঃ।
বসুশ্চাগ্নিশ্চ ঘোষশ্চ বসুকো ভাগ্নিকস্তথা।
তপনস্তিলমিত্রশ্চ পঙ্ক্তৌ সমতাং গতাঃ॥
নারায়ণশ্চ মধুকঃ পুপির্ভাস্কর এব চ।
দায়ুশ্চ ঘোষকশ্চৈব পঙ্ক্তৌ সমতাং গতাঃ॥
ইতি দনুজসভায়াং ঘটকে ভারতী কৃতম্॥"

(দ্বিজ বাচস্পতির সমীকরণ কারিকা রাজন্য কাণ্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা)

চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ ঘটকদিগের যে বংশাবলী দেখিয়াছি তাহাতে দেখা যায় ঘটকচন্দ্রই প্রথম ঘটক। তাহার পুত্রদিগের নাম ঘটকভারতী, শিরোমণি ঘটক ও ঘটকরাজ। উপরোক্ত শ্লোকে যে ঘটক ভারতীর নাম পাওয়া যাইতেছে তাহা সম্ভবতঃ প্রথম ঘটক, ঘটকচন্দ্রের পুত্র ঘটকভারতী। এই সব কারণে এই 'দনুজসভা' পিতা দনুজমাধবের সভা না হইয়া পুত্র দনুজমর্দ্দনের সভা হওয়াই বেশী সম্ভবপর।

২। আর এক দনুজমর্দ্দনের উল্লেখ পাই ঐ নামাঙ্কিত মুদ্রা হইতে। পাণ্ডুগ্রাম, চাটিগ্রাম ইত্যাদি বাঙ্গালার বিভিন্ন টাঁকশালে মুদ্রিত ১৩৩৯ শক বা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের বহু মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই দনুজমর্দ্দনকে অনেকেই চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দন মনে করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি চন্দ্রদ্বীপের হইলে আমরা চন্দ্রদ্বীপে মুদ্রিত মুদ্রাও দেখিতে পাইতাম, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেরূপ মুদ্রা একটীও আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা কেহ কেহ 'চন্দ্রদ্বীপ' বলিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত পাঠ 'চাটিগ্রাম' আর চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দন আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বের লোক।

মুদ্রার দনুজমর্দ্দন

চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দ রায় ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩০এ এপ্রিল পর্টুগীজদিগের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। (Judice Biker's colleccao de Tratudos e Concretos de pazes, Vol. I, p. 144. and Calcutta Review, May to October, 1925, p. 172.)। পূর্ব্বোক্ত পুরবসু হইতে পরমানন্দ রায় অষ্টম পুরুষ।

তিন পুরুষে একশত বৎসর হিসাবে, আট পুরুষে ২৬৬ বৎসরের তফাৎ হইবে। তাহা হইলে পুরবসু (১৫৫৯—২৬৬) = ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। পুরবসুর জামাতা দনুজমাধব বা দনুজ রায় ১২৮০ খৃষ্টাব্দে বলবনকে সাহার্য্য করিয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দনুজমাধবের পুত্র দনুজমর্দ্দন এই হিসাবে (১২৯৩+৩৩) = ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা দেখাইয়াছি ১৩২৩ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। এই দনুজমর্দ্দন ও মুদ্রার দনুজমর্দ্দন কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারে না।

তবে এই দনুজমর্দ্দন কে? শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন, রাজা গণেশ ও এই দনুজমর্দ্দন একই ব্যক্তি। এই মত অনেকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ন'হন। নলিনীবাবু পাঠান সুলতানদিগের মুদ্রার তারিখ পাঠের ভুল প্রদর্শন করিয়া এই মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আপত্তিকারীরা নাকি নলিনীবাবুর পাঠ ঠিক বলিয়া মানিতে প্রস্তুত নহেন। কৃষ্ণদাসের 'বাল্য-লীলাসূত্র' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"শ্রীমান্ নৃসিংহস্ত মহাত্মনো বৈ যশঃপ্রসূনে
স্ফুটিতে মনোজ্ঞে।
তৎসৌরভব্যূহবিমোহিতাত্মা রাজা গণেশো
বহুশাস্ত্রদর্শী ॥৪৮॥
সদ্বংশশৈলে দ্বিজরাজকল্পো বেদজ্ঞসদ্বিপ্রাশ্রয়ো যঃ।
হৃষ্টস্য শাস্তা কিল সাধুপালো দাতাগুণজ্ঞো
হরিভক্তচূড় ॥৪৯॥
হৃতৈ্যত্তমানীয় চ রাজধান্যাং দিনাজপুরাখ্যে
বহুলভ্যযুক্তে।
তস্মিন নৃসিংহে বহুনীত্যভিজ্ঞ সংস্কস্য
মন্ত্রিত্বমবাপ তস্মাৎ ॥৫০॥
তদ্ব্যক্তিচাতুর্য্যবলেন রাজা শ্রীমদ্গণেশো
বরদস্যুরূপান্।
গৌড়সাপালান্ যবনাত্মজান্ হি জিত্বা চ
গৌড়েশ্বরতামবাপ ॥৫১॥

গ্রহপক্ষাক্ষিশশধৃতিমিতে শাকে সুবুদ্ধিমান্।
গণেশো যবনং জিত্বা গৌড়েকচ্ছত্রধৃগভূৎ ॥৫২॥"

(শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি সম্পাদিত—
শ্রীবাল্যলীলাসূত্র, ১১ পৃষ্ঠা।)

উদ্ধৃতাংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, রাজা গণেশ হরিভক্ত ছিলেন এবং ১৩২৯ শক বা ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের একচ্ছত্র রাজ্য লাভ করেন। আপত্তিকারিগণ আরও আপত্তি করেন যে, দনুজমর্দ্দনের মুদ্রার তারিখ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ গণেশের দশ বৎসর পরে এবং দনুজমর্দ্দন হরিভক্ত ছিলেন না, তিনি চণ্ডীভক্ত ছিলেন। মুদ্রায় 'শ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ' লিখিলেই যে তিনি বৈষ্ণব হইতে পারেন না, এই আপত্তি সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তিনি 'সদাশিব মুদ্রাই' ব্যবহার করিয়াছেন। রাজা গণেশ নিজে বৈষ্ণব হইলেও তাঁহার কুলদেবতা সম্ভবতঃ চণ্ডী ছিলেন; তাই তাঁহার মুদ্রায় কুলদেবতার নামই উল্লিখিত হইয়াছে। তারিখ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয় পাঠোদ্ধার ঠিক মত হয় নাই কারণ দেখা যাইতেছে, ৫২ শ্লোকের প্রথম চরণে ১৬ মাত্রার স্থলে সতর মাত্রা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন তাঁহার বগুড়ার ইতিহাসের ৩য় খণ্ডের ৮৪ পৃষ্ঠার পাদ-টীকায় এই শ্লোকগুলি উদ্ধার করিয়াছেন। তাহার সঙ্গেও উপরি উদ্ধৃত অংশের পাঠের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। প্রকৃত পাঠ 'গ্রহপত্রাক্ষিশশভূৎ মিতশাকে সুবুদ্ধিমান্।' ধরিলে উভয় পাঠে তফাৎ অতি সামান্য হয় এবং মুদ্রার তারিখের সঙ্গেও মিলিয়া যায়। যাহা হউক, হস্তলিখিত পুঁথি না দেখিয়া কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া জোর করিয়া কিছু বলা চলে না।

যদি রাজা গণেশ ও এই দনুজমর্দ্দন এক ব্যক্তি না হন এবং মুদ্রিত বাল্যলীলা সূত্রের লিখিত তারিখ ঠিক হয়, তবে বলিতে হইবে, রাজা গণেশের দশ বৎসর পরে দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্র নামে দুইজন হিন্দু রাজা বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজত্ব যে করিয়াছিলেন সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও অবসর নাই, কিন্তু ইতিহাস কিংবা প্রবাদ ইহাদের সম্বন্ধে নির্ব্বাক্ কেন? আর রাজা গণেশ ও তৎপুত্র যে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য ইতিহাস দিতেছে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ঐ দুই হিন্দু নামের একটীও মুদ্রা পাওয়া গেল না, ইহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়। বিরুদ্ধে অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত রাজা গণেশ ও দনুজমর্দ্দনকে এক ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। এই দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দন যে হইতে পারে না তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। দনুজমর্দ্দন যদিই বা হইল, কিন্তু মহেন্দ্র দেবের ব্যবস্থা কি হইবে? চন্দ্রদ্বীপে মহেন্দ্রদেব বলিয়া কোন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

১০। জীব গোস্বামীর লঘুতোষিণীতে আর এক 'দনুজমর্দ্দনক্ষিতিপ' সনাতন ও রূপ গোস্বামী প্রপিতামহ পদ্মনাভকে নবহট্টে প্রতিষ্ঠিত করেন। দেখা যাউক, এই দনুজমর্দ্দন কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

লঘুতোষিণীতে দনুজমর্দ্দন।

"বিহায় গুণিশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং
স্ফুরৎ সুরতরঙ্গিণীতটনিবাসপর্য্যুৎসুকঃ
ততো দনুজমর্দ্দনঃ ক্ষিতিপঃ পূজ্যপাদক্রম
দুবাস নবহট্টকে সকলি পদ্মনাভঃ কৃতী॥
মূর্ত্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজতস্তত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ
কন্যাষ্টাদশকেন সার্দ্ধমভবন্ তস্য পঞ্চাত্মজাঃ
তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো
ধীরঃ শ্রীলমুরারীরুত্তমগুণঃ শ্রীমুকুন্দঃ কৃতী॥
জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবর শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
কিঞ্চিদ্দ্রোহমবাপ্য সৎকুলজনিবঙ্গালয়ঃ সঙ্গতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ প্রেমাস্পদো জজ্ঞিরে
যে স্বং গোত্রমুত্র চেহ পুনশ্চক্রুস্তরামার্চ্চিতং॥
আদিঃ শ্রীলসনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ
শ্রীমদ্বল্লভ নামধেয়বলিতো নির্ব্বিঘ্ন যে রাজ্যতঃ॥"

(লঘুতোষিণী)

পদ্মনাভ হইতে সনাতন পর্য্যন্ত চারি পুরুষ। সনাতনের জন্ম ১৪৮০-৮২ খৃষ্টাব্দ। এই হিসাবে পদ্মনাভ প্রায় ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমানে ছিলেন। সুতরাং ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের দনুজমর্দ্দন-কর্ত্তৃক তাহার নবহট্টে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নহে।

১১। কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়ে এক গৌড়েশ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহার আজ্ঞায় কৃত্তিবাস সপ্তকাণ্ড রামায়ণ গান রচনা করেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, গণেশ বংশের রাজত্ব-কালেই "কৃত্তিবাস বড়গঙ্গা পার হইয়া গৌড়ে আসিয়া সুলতানের কাছে আদর ও অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ১৬ পৃষ্ঠা।) তিনি আরও বলেন, "রাজা গণেশ, যিনি বাঙ্গলার সুলতান হইয়াছিলেন, তিনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ।" (ঐ ২০ পৃষ্ঠা)। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ও রাজা গণেশকে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বলিয়াছেন। (উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড, ৮০-৯৪ পৃষ্ঠা।) কৃত্তিবাস এই গৌড়েশ্বরের সভাস্থ পাত্রমিত্রগণের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমরা রাজপণ্ডিত মুকুন্দ ও নারায়ণের নাম পাই—

"রাজ ডাইনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥৪৭॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাইনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্রসহরাজা পরিহাসে মন ॥৪৮॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার ॥৪৯॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজ পাশে।
পাত্রমিত্রে লয়ে রাজা করে পরিহাস ॥৫০॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্ম্মাধিকারিণী ॥৫১॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥৫২॥"

লঘুতোষিণী হইতে যে অংশ উদ্ধার করিয়াছি তাহাতে পাই দনুজমর্দ্দন পদ্মনাভকে নবহট্টে প্রতিষ্ঠিত করেন। পদ্মনাভের পঞ্চ পুত্র—পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি, মুকুন্দ। এই মুকুন্দই সম্ভবতঃ রাজপণ্ডিত মুকুন্দ এবং তাহার ভ্রাতা নারায়ণ একজন সভাসদ। এই রাজাকে হিন্দুরাজা বলিয়াই মনে হয়। ইনি দনুজমর্দ্দন কিংবা তৎপুত্র মহেন্দ্রদেব হইতে পারেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মত গ্রহণ করিলে রাজা গণেশ ও তৎপুত্র যদু দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের সঙ্গে যথাক্রমে অভিন্ন ব্যক্তি হইয়া দাঁড়ায়।

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশে দেখা যায়, ৫০ম সমীকরণে তাঁহার পিতা বিষ্ণু সমীকৃত হইয়াছিলেন। তখন ধ্রুবানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কারণ বিষ্ণুর পুত্রগণের মধ্যে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ৫৩শ সমীকরণে কৃত্তিবাসের পিতা বনমালী সমীকৃত হইয়াছিলেন। পুত্রগণের নামের মধ্যে কৃত্তিবাসের নামোল্লেখ রহিয়াছেঃ "কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সাম্যঃ শান্তিজনপ্রিয়ঃ॥" কৃত্তিবাস তাঁহার আত্মপরিচয়ে ছয় সহোদর বলিয়াছেন। কিন্তু ধ্রুবানন্দ শ্রীকণ্ঠ নামে আর এক ভ্রাতার উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস যখন রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, তখন শ্রীকণ্ঠের জন্ম হয় নাই। ধ্রুবানন্দ ১৪৮৫খৃষ্টাব্দে মহাবংশ লিখিয়াছেন; সুতরাং রামায়ণ ইহার পূর্ব্বেই লিখিত হইয়া থাকিবে। ৫৭ম সমীকরণে দত্তখাস বা দত্তখানের সভায় উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমীকরণে সমীকৃত কুলীনদিগের মধ্যে পাটুলীর কাহ্নাই চট্ট অন্যতম। ৭০ম সমীকরণে ধ্রুবানন্দ ও তাঁহার ভ্রাতাদের ক্রিয়াদি বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, ধ্রুবানন্দের ভ্রাতা বৈকুণ্ঠ দত্তখানের সমসাময়িক কাহ্নাই চট্টের সঙ্গে সম্বন্ধ-যুক্ত ছিলেন। ৭৪ সমীকরণে কৃত্তিবাসের ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের উল্লেখ থাকিলেও কৃত্তিবাসের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে মনে হয়, ধ্রুবানন্দ ও কৃত্তিবাস দত্তখাঁনের সমসাময়িক হইলেও তখন অল্পবয়স্ক এবং কৃত্তিবাস অল্পবয়সেই রামায়ণ লিখিয়াছিলেন এবং বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার বিবাহেরও কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না।

নগেন্দ্রবাবু বলেন, দত্তখাঁন্ ও গণেশদত্ত খাঁন্ বা রাজা গণেশ অভিন্ন, কিন্তু ধ্রুবানন্দ ১৪৮৫খৃষ্টাব্দে মহাবংশ লিখিলেও রাজা গণেশের কোন উল্লেখ করিলেন না কেন? তবে কি যখন কুলীনগণ তাঁহার সভায় উপস্থিত হন, তখন তিনি রাজা হন নাই, শুধু দত্তখাঁন্ ছিলেন? তিনি রাজা ছিলেন তাহা ধ্রুবানন্দের মহাবংশের 'ধ্রুবানন্দ-মত-ব্যাখ্যা' নামক টীকায় স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। ৫৭ সমীকরণে টীকায় "শ্রীদত্তখান নৃপস্যসভায়াং" লিখিত আছে। এই টীকা ১৬৭১শকে জ্যৈষ্ঠমাসে গোপাল শর্ম্মা প্রণয়ন করিয়াছেন। রিয়াজ বলেন, কুতুব আলম রাজা গণেশকে 'হাকিম' বলিতেন। আমরা ৫৭ সমীকরণে দেখিতেছি, দত্তখান রাঢ়ী কুলীন ব্রাহ্মণগণের সামাজিক বিবাদের বিচার করিতেছেন। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর অনুমান সত্য হওয়া অসম্ভব নহে। যদি তাহা হয় তবে কৃত্তিবাস ও সম্ভবতঃ রাজা গণেশ কর্ত্তৃকই সম্মানিত হইয়াছিলেন।

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি—এক হইতে ছয় দফার 'দনুজ' এক ব্যক্তি এবং তাহার নাম দনুজমাধব। ৭ ও ৮ দফার দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপের রাজা এবং দনুজমাধবের পুত্র। ৯—১১ দফার দনুজমর্দ্দন ও রাজা গণেশ এক ব্যক্তি।

ভুল

(গল্প)

[শ্রীমনোজ গুপ্ত]

বিজয়া যে-দিন নিজে গিয়া যতীশের নিকট হইতে তাহার ফিসিক্সের নোটের খাতা চাহিয়া আনিল, সে-দিন ছাত্র এবং ছাত্রীদের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল। ছাত্ররা ভাবিল "আচ্ছা যতীশ ত এত ভাল ছেলে নয় তবে ওর কাছ থেকে নোট নেবার কারণ কি ?" ছাত্রীরা আশ্চর্য্য হইল এই ভাবিয়া যে, বিজয়া তো তাহাদের সঙ্গেই ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কয় না, সে যেন কেমন একটা অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। সব সময়েই তার নিজের আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে চলে। আজ হঠাৎ এই উদাস-প্রকৃতির মেয়েটী আপনি যাচিয়া যতীশের নিকট খাতা চাওয়ার অর্থ করিয়া বসিল এটা তার সঙ্গে আলাপ করিবার একটা উপায় মাত্র। ছেলেরা যখন যতীশকে এই বিষয় লইয়া বেশী রকম পীড়াপিড়ি আরম্ভ করিল ও বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে লাগিল তখন তাহাকে অগত্যা বাধ্য হইয়া মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বলিতে হইল যে, সে পূর্ব্ব হইতে বিজয়াকে চিনিত। কিন্তু প্রকৃতই সে নিজেও এ ঘটনায় বড় কম আশ্চর্য্য হয় নাই। সহ-পাঠীদের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ও শান্ত প্রকৃতি বিজয়ার প্রতি অযথা কুৎসা যাহাতে না রটে আর ছেলে মেয়েদের মুখ-চোখের ভাবে তাহাকে লজ্জায় না ফেলে এই জন্যেই সে ঐরূপ বলিল। কিন্তু তাহার মনে হইল নিঃসঙ্গ জীবনে বিজয়া বোধ হয় আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। তাহাদের দুই জনেরই পাঠ্য বিষয় এক রকম ছিল তাই সব সময়েই কলেজে তাহাদের এক সঙ্গে থাকিতে হইত এবং কাছাকাছি আসিয়া পড়িলে কথা কহিতে হইত। ইহাতে বিজয়ার কোন সঙ্কোচ ছিল না কিন্তু যতীশ বড় বেশী বিব্রত হইয়া পড়িত,কারণ অনুসন্ধিৎসু সহপাঠীদের চক্ষু এড়াইয়া তো তাহারা কথাবার্ত্তা কহিত না—তাহার সর্ব্বদাই ভয় হইত ক্লাশের বাহিরে আসিলেই সতীর্থদের প্রশ্নবাণ তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে।

একদিন বিজয়া যতীশকে বলিল, "দেখুন আপনার খাতাটা আজ ফেরৎ দেবার কথা ছিল কিন্তু একেবারে ভুলে গেছি, বিকেলে যদি একবার আমাদের বাড়ী গিয়ে নিয়ে আসেন তো বড় ভাল হয়।" যতীশ যাইতে স্বীকৃত হইল কিন্তু তাহার এক বন্ধু এই কথাটী শুনিয়াছিল। সে ছেলেদের মধ্যে আসিয়া বলিল, "ওহে, আজ যে যতীশের নিমন্ত্রণ।" সকলেই বুঝিয়াছিল 'নিমন্ত্রণ'টা কোথায় ?

আজ এই নূতন সংবাদে সতীর্থদের চিন্তা এবং জিহ্বাও অনেকটা সংযমের গণ্ডী ছাড়াইয়া চলিল। তাহাদের আলোচনা যখন বেশ জমিয়া উঠিল, তখন হঠাৎ যতীশ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে স্বভাবতঃই বেশ শান্ত এবং সংযত কিন্তু আজ হঠাৎ বন্ধুদের মধ্যে তাহারই সম্বন্ধে অযথা আলোচনা শুনিয়া সে বেশ একটু অপ্রসন্নভাবেই বলিয়া ফেলিল, "তোমরা যে নিজেদের কি করে শিক্ষিত এবং ভদ্র-সমাজের লোক বলে পরিচয় দাও তা তো বুঝতে পারি না। যে শিক্ষায় নিজেকে অসংযত করতে শেখায় সে শিক্ষা পাওয়ার চেয়ে না পাওয়া শত গুণে ভাল।" তাহার মত শান্ত ছেলের মুখে কড়া সুরে এতগুলা কথা শুনে অনেকেই চুপ্ করিয়া গেল; কিন্তু দু'একজন তাহাকে বেশ একটু শাসাইয়া দিল এই বলিয়া যে সে তাহাদের অপমান করিয়াছে এবং তাহারা ইহার শোধ তুলিবে। সেও একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

যতীশ যখন বিজয়ার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। বিজয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। বাড়ীটী খুব ছোট তার উপর নিচেকার ঘরে অপর একজনরা থাকে সুতরাং যতীশকে উপরে যাইতে হইল। ঘরখানি বেশ পরিচ্ছন্ন কিন্তু দেখিলেই বুঝা যায় যে ঘরের যাহারা অধিবাসী তাহারা বেশ অর্থশালী নয়। কিছুক্ষণ কথা কহিবার পর যতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা আপনারা কে কে এখানে থাকেন ?"

"শুধু আমি আর দিদি।"

"আপনার বাবা কিম্বা দাদার কেউ থাকেন না?"

"এক মাত্র দাদা ছিলেন তিনি মারা যাবার পর থেকে দুই বোনেই একসঙ্গে থাকি, বাবা থাকেন রেঙ্গুণে।"

"কি রকম? আপনারা থাকেন এখানে, আর আপনাদের বাবা থাকেন রেঙ্গুণে?"

বিজয়া চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া যতীশ আর ও বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিল না। ঠিক সেই সময়ে, "বিজয়া একটু চা করে দিবি ভাই" বলিয়া বিজয়ার দিদি ঘরে ঢুকিলেন। তিনি জানিতেন বিজয়া একাই আছে, তাই অত সহজভাবে ঘরে ঢুকিয়াছিলেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি হঠাৎ বলিয়াফেলিলেন, "এ কে? নীরেণ? তুমি কি করে—?"

বাধা দিয়া বিজয়া বলিল, "না, দিদি, উনি যতীশবাবু আমাদের সঙ্গে পড়েন।" যতীশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল,—"উনি আমার দিদি, আপনি যদি একটু কষ্ট করে বসেন তো বড় ভাল হয়; আমি এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি।"

কাহাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই সে বাহির হইয়া গেল। অতি কষ্টে এই কথাগুলি বলিয়া সে প্রায় এক রকম ছুটিতে ছুটিতেই ঘর হইতে চলিয়া গেল। তাহার এ ভাব যতীশ লক্ষ্য করে নাই কিন্তু তাহার দিদি ঠিক দেখিয়াছিলেন। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা নেহাৎ অভদ্রতা তাই তাঁহাকে কথা কহিতে হইল; বলিলেন, "আপনাকে আমি এর আগে কখন তো দেখি নে, কিন্তু আর একজনকে দেখেছি ঠিক আপনারই মত, তাই হঠাৎ আপনাকে নীরেণ বলি মনে হয়েছিল। আপনি আসবেন তা আমি জানতাম না; কলেজ যাবার পর থেকে আজ আর বিজয়ার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি কি না তাই জানতে পারি নি।"

উত্তরে যতীশ বলিল, "আচ্ছা আপনারা তো শুধু দু'জনে এখানে থাকেন; তাতে আপনাদের অসুবিধা হয় না?"

"প্রায় হয় না, তবে আমার অসুখ করলে বিজয়াকে বড় কষ্ট পেতে হয়। ও শুধু নিজের পড়া ছাড়া কোন কাজে মন দিতে পারে না।"

"উনি খুব পড়েন না?"

"পড়ায় ও আগ্রহ খুব বেশী নেই, অন্য কোন কাজ নেই তাই পড়তে হয়।"

বিজয়া যখন চা লইয়া ফিরিয়া আসিল তখন তাহাদের মধ্যে বেশ স্বাভাবিকভাবে কথাবার্ত্তা চলিল। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর খাতাখানি ফেরৎ দিয়া বিজয়া বলিল, "আপনাকে বলতে সাহস হয় না, কিন্তু যদি মাঝে মাঝে আসেন তো বেশ হয়।" আমার এই দিদি ছাড়া কথা কইবার একজনও নাই—আর —কলেজের মেয়েদের ভেতর যে রকম কথাবার্ত্তা হয় তা আমি আদৌ পছন্দ করি না, কাজেই তাদের সঙ্গেও প্রাণ খুলে কথা কইতে পারি নি। যতীশ স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল।

কিছুদিন যাতায়াত করিয়া যতীশ বুঝিল যে, বিজয়া এবং তাহার দিদি পৃথিবীতে তাহাদের নিঃসঙ্গ জীবন বড়ই দুঃখে কাটান। তাহাদের আপনার বলিবার কেহ নাই। পিতা রেঙ্গুণের একজন বিখ্যাত ধনী কিন্তু তিনি তাহাদের কোন খোজ খবর রাখেন না। একটী ভাই সামান্য চাকরী করিয়া তাহাদের খরচ চালাইত কিন্তু বেচারা যখন অবেলায় জীবনের হাটে বেচা-কেনা শেষ করিয়া চলিয়া গেল তখন বাধ্য হইয়া বিজয়ার দিদিকে অন্নের সংস্থানের চেষ্টায় বাহির হইতে হইল। তিনি বি-এ পাশ করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাকে বেশী কষ্ট পাইতে হইল না। স্কুলে চাকরী করিয়া এবং বিকালে একটী ছাত্রীকে পড়াইয়া তিনি আপনাদের খরচ চালাইতেন। বিজয়া অনেকবার লেখা পড়া ছাড়িতে চাহিয়াছে কিন্তু তিনি তাহা করিতে দেন নাই। তাহাদের এই সহজ এবং সরল জীবন-যাত্রা পদ্ধতি দেখিয়া যতীশ মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহাদের আন্তরিকতায় সে অনায়াসে তাহাদের মধ্যে আত্মীয়তা বজায় রাখিয়া চলিত লাগল। তাহার অন্তর চাহিত কোন উপায়ে তাহাদের কোন কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিতে; কিন্তু সে সুযোগ তাহার বড় একটা জুটিত না। শেষে সে ঠিক করিল, তাহাদের মত সহজ এবং সরলভাবে জীবন কাটাইবে। তাহার অর্থের অভাব ছিল না সেইজন্য বিলাসিতাও তাহার ছিল

যথেষ্ট কিন্তু ইহাদের সাহচার্য্যে আসিয়া সে অনায়াসে তাহা ত্যাগ করিতে পারিল। সে যে-দিন প্রথম খদ্দর পরিয়া কলেজে আসিল সে-দিন ছেলেদের মধ্যে অনেকেই বিস্মিত হইল; কেহ কেহ ঠাট্টা করিতেও ছাড়িল না।

এখন যতীশ প্রায়ই বিজয়াদের বাড়ী যায়; প্রথম প্রথম যে অ-স্বাচ্ছন্দ্যটা ছিল সেটা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। সে-দিন সন্ধ্যার সময় বিজয়া খুব হাসিয়া কথা কহিতেছে দেখিয়া রাত্রে তাহার দিদি বলিলেন, "যাক্ তুই আজ হেসেছিস দেখে আমার অনেকটা ভাবনা কেটে গেল। জীবনটাকে ঠিক এই ভাবে নেওয়াই উচিত। যা চলে গেছে তার জন্য দুঃখ ক'রে কি হবে? জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি দিয়েও যদি তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হ'ত তাহ'লে দুঃখ করা চল্‌ত! শুধু সারা জীবনটা ধ'রে চোখের জলের মালা গেঁথে লাভ কি?"

তিনি যখন বিজয়াকে এত কথা বলিতেছিলেন তখন সে সত্যই চোখের জলে মালা গাঁথিতেছিল।

"ও কি? তুই কাঁদছিস?"

অনেকক্ষণ পরে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বিজয়া বলিল, "দিদি তুমিও যে আমায় ভুল বুঝবে এ আমি কোন দিন ভাবি নি। মানুষের মনটা কি, এত চঞ্চল যে সে এত সহজে, এত অল্পদিনে ভুলে যাবে? চোখের জলেই যাদের জীবনের সার্থকতা তা'রা যে চোখের জল ফেলতেই জন্মেছে, দিদি। তবে লোকের কাছে সেটা হাসি দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়, তাই সে হাসি বড় করুণ, বড় মর্ম্মভেদ হ'য়ে উঠে। সে তো হাসি নয়,সেটা বুক-চেরা কান্না—হাসি দিয়ে ঢাকতে গিয়ে তাকে স্পষ্ট ক'রে তোলে। কিন্তু উপায় নেই; এটাই পৃথিবীর চিরন্তন নিয়ম। জীবনে যেটা সব-চেয়ে বড় দুঃখ সেটার উপরেও মানুষকে হাসতে হয়, এটাই তো মানুষের জীবনে সবচেয়ে বিড়ম্বনা। ভুল বুঝেছ, দিদি; ভুলি নি, কোন দিন ভুলব না।"

সেদিন সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হয়েছে। অনেকে কলেজে আসে নাই। ঘণ্টা পড়ার পর যখন ছাত্রীরা অধ্যাপকের সঙ্গে ক্লাসে ঢুকিল তখন প্রতিদিনের মত যতীশ একবার চাহিয়া দেখিল। যাহাকে দেখিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া চাহিয়া দেখিল, সে আজ আসে নাই। যতীশ ভাবিল, না আসিবার কারণ কি? যে-বৃষ্টি! নিশ্চয় এইজন্য আসে নাই। আজ অনেকদিন পরে সে 'কারে' কলেজে আসিয়াছে। তাহার মনে হইল, বিজয়াকে লইয়া আসিলে ভাল হইত। কিন্তু সে কি আসিতে রাজি হইত? বোধ হয় নয়। আর তাহারা একসঙ্গে কলেজ আসিলে অন্যান্য ছেলেরা কি বলিত? ঠিক সেই সময় অধ্যাপক ডাকিলেন, "Thirty?" (তিরিশ)।

একজন বলিল, "Yes, Sir." (উপস্থিত)

"Who is thirty? Stand up pleaes. Who responded? Have the moral courage to stand up." (কে দাঁড়াও দেখি—কে তার নামে উপস্থিত বললে? সৎ-সাহস দেখিয়ে দাঁড়িয়ে পড়।)

যে ছেলেটী proxy দিয়াছিল সে নির্ব্বিবাদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "Jatish gave the proxy, Sir." (যতীশ বলেছে, স্যর।)

অধ্যাপক বলিলেন, "Jatish! Did you respond in the name of Bijaya?" (যতীশ, তুমি কি বিজয়ার নামে সাড়া দিয়েছ?")

"No Sir, I did not. (না স্যর, আমি দিই নি।)

"Then why does your follow student accuse you?" (তা হ'লে তোমার সতীর্থ কেন তোমার নামে দোষারোপ করছে?)

"Ask him." (তাকেই জিজ্ঞাসা করুন।)

অধ্যাপক যতীশের কথা বিশ্বাস করিলেন না। সকলের সমক্ষে তাহাকে বেশ তিরস্কার করিলেন। সেদিন বিকালে যতীশ বিজয়াকে সব কথা বলিল। শুনিয়া বিজয়ার মুখটা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। কি অন্যায়! তার জন্য আজ যতীশবাবুকে কত অপমানিত না হইতে হইয়াছে। ওঃ এরা শিক্ষিত! অত ছেলের সম্মুখে কি করিয়া এত বড় একটা মিথ্যা কথা বলিল?

পরদিন ক্লাসে যাইবার সময় তাহার বড় লজ্জা করিতেছিল! তাহার মনে হইল, যেন সমস্ত কলেজ শুদ্ধ লোক তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। সেদিন অপর একজন অধ্যাপক আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ, আমার মনে হয়, মেয়েরা যখন ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়ছেন তখন তাঁদের আলাপ রাখা বিশেষ দরকার;

আমরা আশা করি, ছেলেরা মেয়েদের ভগিনীদের মত দেখবে আর তাঁরাও তাদের সঙ্গে ঠিক সেই রকম ভাই-এর মত ব্যবহার করবেন; কিন্তু সব সময়ে তাঁদের মর্য্যাদা এবং আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা চাই।"

কথাটা যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল তাহা সকলেই বুঝিল। যতীশ জানিত, সে নির্দ্দোষ; তাই সে বিষম চটিল। বিজয়া এত বেশী লজ্জিত হইয়াছিল যে, তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে ছুটিয়া ক্লাস হইতে বাহির হইয়া যায়।

সেই দিন হইতে যতীশ প্রায় কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কহিত না। একবার তাহারইচ্ছা হইয়াছিল কলেজ ছাড়িয়া দেয়, তারপর মনে হইল তাহাতে সে-ই পরাজিত হইয়া যাইবে। বিজয়া যখন কলেজ ছাড়িবার কথা দিদিকে বলিল, তিনি বলিলেন, "এই সামান্য কারণে কলেজ ছেড়ে দিলে লোকে কি বলবে?" তাহার উপদেশ মত বেশ নির্লিপ্তভাবে তাহারা কলেজে সময় কাটাইতে ছিল।

একদিন College Magazineএর সম্পাদক আসিয়া যতীশকে ধরিলেন, একটা কবিতা দিবার জন্য; সে মাসিক পত্রে কবিতা লেখে কিন্তু এখানে দেয় না। অনেক অনুরোধ করিয়া তিনি তাহাকে রাজী করাইলেন। পাছে লেখাটা হাতছাড়া হইয়া যায় তাই তিনি বলিলেন, "আপনার ঠিকানাটা ব'লে দিন, আমি আজ গিয়ে নিয়ে আসব'।"

ঠিক সেই সময় কে বলিল, "তার চেয়ে বিজয়ার ঠিকানাটা নিন, যদি ওর দেখা পান।"

যতীশ নিজেকে আর সংযত রাখিতে পারিল না। "Shut upe yo, scoundrel" (চোপরও—পাজী বদমাস) বলিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। অনেকে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

বিজয়া সব শুনিয়াছিল। যতীশ বিকালে যাইতেই সে বলিল, "দেখুন, যতীশবাবু, এরা বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছে। একটা কিছু বিহিত কর্ত্তে হবে।" যতীশও আজ সারাদিন ধরিয়া ভাবিয়াছে। ভাবিয়া সে ঠিক করিয়াছে যে, একটীমাত্র উপায় আছে। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব লইয়া সেই কথাটা বলিতেই সে আজ আসিয়াছে। তাই বিজয়া যখন আপনা হইতে সে কথা তুলিল, সে মহা উৎসাহে বলিয়া ফেলিল, "বিহিত? সে তো তুমি ইচ্ছা করলেই হয়। তুমি যদি—"

বাধা দিয়া বিজয়া বলিল, "ছিঃ; যতীশবাবু আপনিও ঐ একই ভুল করেছেন! যাক্; আপনি যান,—আর এখানে আসবেন না। আমার যা বলবার আছে আপনাকে পরে জানাব।" বলিয়া বিজয়া বাহির হইয়া গেল।

যতীশ ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিল। চিন্তাক্লিষ্ট যতীশ পথে চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, তারই একান্ত অনুরোধে সে এখানে আসে। অপমানের বিহিত করবার কথা তোলাতেই তো আমি ইঙ্গিতে প্রস্তাবটা উপস্থাপিত করবার সাহস পেয়েছি। এ ভিন্ন আর কি বিহিত আমি করিতে পারি? তার সম্মান বজায় রাখতে গিয়ে আমি নিজের সম্মান তুচ্ছজ্ঞান করেছি। মনের এ দুর্ব্বলতা ও সংযমের এ অভাব দেখাবার সুযোগ কেন সে আমায় দিল? যত দিন তার সঙ্গে আমার ভালরূপ আলাপ-পরিচয় হয় নি, তত দিন তার বিষাদক্লিষ্ট গম্ভীর মুখ—তাহার প্রখর আত্মসম্মান জ্ঞান দেখে তাকে দেবীর মত শ্রদ্ধা করেছি; কিন্তু তাহার সঙ্গে আলাপের ফলে কখন যে তাহাকে দেবীর আসন থেকে প্রাকৃত জগতে নামিয়ে এনেছি তা তো বুঝতে পারি নি। বুঝলাম তখন, যখন সে আমায় দেবীর মত এসে আমার ভুল দেখিয়ে দিল। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া আপনা-আপনি বাহির হইল, 'দেবি, আমার এ ভুল করবার সুযোগ কেন দিলে?'

পরদিন সন্ধ্যায় যতীশ বিজয়ার একখানা চিঠি পাইল :—

যতীশবাবু,

একদিন যেচে আপনাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে এসে-ছিলাম, আর একদিন সহজেই আপনাকে আসতে বারণ করলাম। আমার ব্যবহার আপনার নিকট খুব বিসদৃশ ঠেকেছে তা জানি; কিন্তু এ ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। আপনাকে খুব ধীর এবং শান্ত ব'লে মনে হয়েছিল; তাই আপনার কাছে অগ্রসর হয়েছিলাম। প্রথম দিন যখন আপনি আমাদের বাড়ী আসেন তখন দিদি আপনাকে আর একজন ব'লে মনে করেছিলেন। সত্যই তাঁর সঙ্গে আপনার সাদৃশ্যটা বড় বেশী! তাঁকে আর কোন দিন ফিরে পাবার উপায় নাই; আপনাকে দেখলে তাঁর কথাটা মনের মধ্যে বড় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত, তাই

আপনার দ্বারা তাঁর স্মৃতিটীকে সজীব ক'রে রাখতে চেয়েছিলাম। আপনি আমার কাছে যা চেয়েছেন তা আমি কি ক'রে দেব? সে যে অনেক আগে একজনের হাতে তুলে দিয়েছি। আজ আমি নিঃস্ব—সম্পূর্ণ নিঃস্ব।

বিজয়া

ব্যথিত যতীশ তাড়াতাড়ি একখানা চিঠির কাগজ লইয়া লিখিল,—"যদি কোন দিন তোমার কাছে যাবার উপযুক্ত ব'লে নিজেকে মনে করি, তবে তাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও যাব, না হলে জীবনে এই শেষ দেখা। আমায় ক্ষমা কর। মুহূর্ত্তের ভুলেও যে তোমায় দেবীর আসন থেকে মানবীর আসনে নামিয়ে এনেছিলাম সেজন্য আমায় ক্ষমা কর।—তোমার জীবনের পূর্ব্ব-কথা কিছু জানতাম না ব'লেই ঐরূপ ইঙ্গিত করেছিলাম। এতদূর অভদ্র আমাকে মনে করবে না যে, যদি জান্‌তাম যে, তুমি কারও বাগ্দত্তা তা হ'লে ওরূপ প্রস্তাব কর্‌তাম না। তোমার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে আবার তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে চিরবিদায় নিচ্ছি। ইতি

গুণমুগ্ধ—যতীশ"

দুই ফোঁটা আঁখি-জল

[শ্রীঅখিল নিয়োগী]

লিপিকার সাথে পাঠালে যে প্রিয়া দুই ফোঁটা আঁখি-জল—
একি শুধু, সখি, ভোলাতে আমারে অভিনব তব ছল।
দুই ফোঁটা আঁখি-জল।

না গো তা সত্য নহে—
দুই ফোঁটা বারি অভিমানিনীর কত কথা কানে কহে!
এ দুই ফোঁটার ইতিহাস প্রাণে ব'য়ে আনে পরিমল।
দুই ফোঁটা আঁখি-জল।

লিপি যদি তব শুভ্র থাকিত, থাকিত না কোনো রেখা—
দুই ফোঁটা বারি শুনাইত মোরে প্রিয়ার প্রাণের লেখা—
"তোমারে সঁপেছি প্রাণ,"
—এই কথা লিখে আঁখি-জলে তব করিয়াছ অপমান।
শুধু দুই ফোঁটা জল—
তোমায় মনের সকল কথাই করে তাতে টলমল।
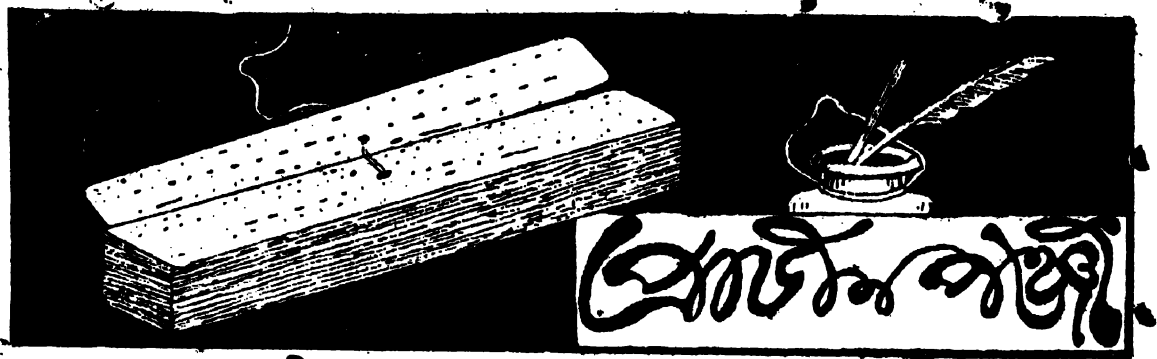
"মাসিক পত্রিকা"

"মাসিক পত্রিকা" যখন প্রকাশিত হইত, তখন সাধারণ বাঙ্গালী কিরূপ ভাবে তাহা আদর করিয়া পাঠ করিতেন তাহা জানাইবার জন্ত আমরা ১২৬১ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণের (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নবেম্বরের) সংবাদ প্রভাকর হইতে একটি সমালোচনা উদ্ধৃত করিলাম :—

"মাসিক পত্রিকা" নামে যে এক নূতন পত্রিকা প্রকাশারম্ভ হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমরা এ-পর্য্যন্ত কোন অভিপ্রায় লিখি নাই,তাহার ৩সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে, তৎসম্পাদক তাহা সর্ব্বসাধারণ বিশেষতঃ স্ত্রীগণের পাঠোপযোগী করণার্থ অতি সহজ ভাষায় অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিয়াছেন। সম্পাদকদিগের : অভিপ্রায় সকল উৎকৃষ্ট বলিতে হইবেক, তাঁহারা নীতি, ইতিহাস গৃহকথাচ্ছলে দেশীয় প্রথা ইত্যাদি বিষয় রচনা করিতেছেন, বালক ও মহিলাগণ যত্নপূর্ব্বক তাহা পাঠ করেন ইহা আমারদিগের নিতান্ত ইচ্ছা, অতএব সকল গৃহের অধিকারিগণের পক্ষে এক এক খণ্ড সুলভ পত্রিকা গ্রহণ করা অতি আবশ্যক হইয়াছে। এই পত্রিকা পি, এস, ডিরোজিও সাহেবের ছাপাখানায় অতি উত্তমঅক্ষরে উত্তম কাগজে ছাপা হইয়াছে, মূল্য /০ আনা, পত্র যাঁহার প্রয়োজন হয় তিনি উক্ত যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকটে অথবা তত্ত্ববোধিনী যন্ত্রালয়ে ও চিপ লাইব্রেরীতে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মাসিক পত্রিকার শেষ ভাগে লিখিত হইয়াছে যে আমারদিগের প্রভাকর যন্ত্রালয়েও তত্ত্ব করিলে সাধারণে তাহা প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু আমরা কেবল তৃতীয় সংখ্যার ২৫ খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি, প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সংখ্যার এক খণ্ডও আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নাই।

"মাসিক পত্রিকা" ১২৬১ সালের ভাদ্র মাস হইতে ১২৬৪ সালের শ্রাবণ মাস (১৮৫৪ আগষ্ট হইতে ১৮৫৭ জুলাই) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল ও কলিকাতা ৮নং লালদীঘির পূর্ব্বাংশে রোজিরিও কোম্পানীর আফিসে বিক্রয় হইত। প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার শিরোদেশে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয় :—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমারদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতিমাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক। তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।"

আমরা "মাসিক পত্রিকা" হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ নিম্নে প্রকাশ করিলাম। প্রবন্ধে কোনও রূপ ভাষা বা ছেদ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই ; তবে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যগুলি (Proper noun) বড় হরপে ছিল, এক্ষণে ঐরূপ প্রচলন নাই এবং পাঠে পাঠকবর্গের অসুবিধা হইবেক, এজন্য সব একই প্রকার অক্ষর দিয়াছি।

কখন মন্দ কর্ম্ম করিও না।

[ভাদ্র—১২৬১]

গ্রীক জাতিদিগের মধ্যে সোলন বড় বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি এক বালককে মন্দকর্ম্ম করিতে দেখিয়া তাহার পিতাকে বলিলেন, তোমার সন্তানকে এমন কর্ম্ম করিতে দেও কেন। পিতা উত্তর দেন, আমার পুত্র বড় শিশু, বুদ্ধি হয় নাই, বুদ্ধি হইলেই সে আপনাপনি এমন কর্ম্ম করিবেক না। সোলন প্রত্যুত্তর করিলেন, মন্দ কর্ম্ম দুই তিন বার করিতে গেলে তাহাতে মন রত হয়, যে কার্য্যে মন রত হয় তাহা ত্যাগ করা বড় দুঃসাধ্য, তজ্জন্যে প্রথম হইতে মন্দ কর্ম্ম না করা কর্ত্তব্য।

ভদ্রলোক পাওয়া ভার।

[আশ্বিন—১২৬১]

গ্রীক জাতিদিগের মধ্যে ডিওজিনিস্ বড় জ্ঞানী ছিলেন, তিনি সাধারণের মতামত গ্রাহ্য করিতেন না, সর্ব্বদা আপনার অভিপ্রায় অনুসারে চলিতেন। এক দিবস দিনমানে একটা লণ্ঠন্ জ্বালিয়া হাতে করিয়া বাজারময় বেড়াইতে ছিলেন, লোকে জিজ্ঞাসা করে—

ডিওগিনিস্ তুমি কি চাহ? তিনি উত্তর দেন,—আমি একজন ভদ্রলোক খুঁজিতেছি।

পরাধীন হওয়া কোনমতে কর্ত্তব্য নয়।

[কার্ত্তিক—১২৬১]

নং ২ পত্রিকায় ডিওগিনিসের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাহার সংক্রান্ত আর একটি গল্প শুন। ডিওগিনিসের মেনস্ নামে একজন চাকর ছিল,—সে তাহার মনিবের বাটী হইতে একবার পলায়ন করে,—তাহাতে ডিওগিনিস্ বলেন,—যদি আমা বিনা মেনস্ গুজরান করিতে পারে, আমিও মেনস্ বিনা গুজরান করিতে পারিব, সন্দেহ নাই।

সকল সময়ে বৃদ্ধ লোককে সম্মান করা উচিত।

[পৌষ—১২৬১]

সরকারি খরচে আথেন্ নগরে একদিবস বড় ধুমধাম করিয়া যাত্রা হইতেছিল। যাত্রা দেখিবার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন নগরের লোক একত্রে বসিতে পায় নাই, দেশের প্রথানুসারে এক২ নগরের লোক সকল, স্বতন্ত্র২ এক২ দিকে বসিয়াছিল। যাত্রা আরম্ভ হইলে পর, একজন বৃদ্ধ আথেনবাসি ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হন। তাঁহার বসিবার উপযুক্ত স্থান না থাকাতে তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, ইহা দেখিয়া কতকগুলিন্ যুবা আথেন্বাসিরা তাঁহাকে ইসারা করিয়া ডাকে, বৃদ্ধপুরুষ ভিড়ের ভিতরে ঠেলাঠেলি-পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হন। বৃদ্ধ পুরুষকে নিকটে দেখিয়া নব-বাবুরা পরিহাসক্রমে ঠেসাঠেসি করিয়া বসে, স্থানাভাবে বৃদ্ধ পুরুষ বসিতে পান না, তাঁহাকে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অপ্রস্তুত হইতে হয়। এই প্রকারে বড় লজ্জান্বিত হইয়া তিনি স্পার্টাবাসিদিগের নিকটে যান, তথায় যাইবা-মাত্র ঐ নগরের লোকেরা সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বড় সম্মান-পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনাদিগের মধ্যে বসিতে বলে। স্পার্টবাসি-দিগের সদ্ব্যবহার দেখিয়া আথেনবাসিরা ধন্য২ করিয়া উঠে, ইহাতে বৃদ্ধ পুরুষ কহেন,—সুজনতা জানা এক কথা, সুজনতা করা আর এক কথা, সুজনতা কাহাকে বলে তাহা আথেনবাসিরা বেশ জানে, কিন্তু স্পার্টাবাসিরা সুজনতাক্রমে চলিয়া থাকে।

সুশিক্ষিত বাবু।

[চৈত্র—১২৬১]

হরিদাসবাবু কলেজে পড়িয়া ইংরাজি উত্তম শিখিয়াছেন। ক্ষেত্র-পরিমাণ, অঙ্ক, পদার্থ-বিদ্যা, ভূগোল, কাব্য-শাস্ত্র, পুরাবৃত্ত ও অনেক২ গদ্য ও পদ্য পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া মনে করেন আমি বড় পণ্ডিত হইয়াছি। ইংরাজি ভাষায় রচনা করিয়া সর্ব্বদা সংবাদপত্রে ও অন্যান্য কাগজে প্রকাশ করেন। বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঐ সকল রচনা দেখান ও প্রশংসা পাইলে আহ্লাদে গলিয়া যান। কখন২ কোন২ সভায় যাইয়া বক্তৃতা করেন এবং সর্ব্বদাই বোধ করেন আমি সর্ব্বপ্রকারে কৃতকার্য্য হইয়াছি। একদিবস নিজ বাটীর উঠানে কামিজ গায়ে দিয়া পদ-বিহার করতঃ সিস দিতেছেন ও ভাবিতেছেন—আমার বংশ তো আমাহইতে ধন্য হইয়াছে এক্ষণে ভারতভূমিকে ধন্য করিব—এ দেশের কুরীতির ও কুনীতির সংখ্যা নাই। স্ত্রীলোকদিগের বেশ-ভূষা কদাকার—পুরুষদিগেরও পোষাক মন্দ—না আছে কামিজ, না আছে পেন্ট্‌লন—পিঁড়ি বসিয়া আহার করিতে হয়—পানের মধ্যে কেবল জল ও দুধ। ইত্যবসরে কৈলাসচন্দ্র গুপ্ত বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুপ্তবাবু অতি ধীর, বহুদর্শী ও সুপণ্ডিত—জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বাবু তোমার ঠাকুর কোথায়?

হরিদাস। সে বাগানে গিয়াছে।

কৈলাসচন্দ্র। অহে বাবু বাপকে সে বলে না—তোমরা জেতে তাঁতি বটে কিন্তু এখন তো অনেকেই ভাল কথা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে—এসো তোমার সঙ্গেই বসিয়া ক্ষণকাল কথাবার্ত্তা কহা যাউক।

হরিদাস। আমি বেঙ্গালি জানি না—অসভ্য ভাষা শিখে কি হবে?

কৈলাসচন্দ্র। ইংরাজি ভাষার সকল শাস্ত্র পড়া হইয়াছে?

হরিদাস। প্রধান প্রধান শাস্ত্র সকলি পড়িয়াছি—এক্ষণে স্বয়ং গ্রন্থ লিখিতেছি—আমার রচনা সকলেই প্রশংসা করে কিন্তু বাবা ও দাদা বুঝিতে পারে না—তারা কেবল বেঙ্গালি জানে।

কৈলাসচন্দ্র। তবে তো তুমিই বংশের তিলক হইয়াছ ইহাও তোমার ঠাকুরের গৌরবের বিষয়। বাবু! আমি নিজ প্রয়োজনে আসিয়াছিলাম, একখানি চিঠির নকল করিয়া দাও দেখি।

হরিদাস একখানা কাগজ লইয়া অনেক চেষ্টা করিয়া চিঠি নকল করিলেন কিন্তু লিপি কদাকার ও অধিক ভুল হইল।

কৈলাসচন্দ্র। চিঠির নকল অন্যের দ্বারা হবে এ সহজ কর্ম্ম, একটা তকরারি জমা-খরচ শেষ করিতে পারি নাই আর ইহার সুদ কসাও কিছু ঠকঠকি—এইটা একবার দেখ দেখি?

হরিদাস (জমা খরচ দেখিয়া গলদঘর্ম্ম হইল) সেলেটের এপিট ও-পিট অঙ্কে পরিপূর্ণ করিয়া পাঁচ ছয় বার পুছিলেন এক একবার কড়িকাটের দিগে চান আবার সেলেটে অক্ষপাত করেন।

কৈলাসচন্দ্র। বাবু তোমার বড় ক্লেশ হচ্চে বটে,?—তবে থাকুক অন্য কাহারও দ্বারা করাইয়া লইব।

হরিদাস। আমি মেথেমেটিক্স পড়িয়াছি—সুদকসা বড় ভারি হিসাব নয়। একটুকু যত্ন করিলে অনায়াসে করিয়া দিতে পারিব।

কৈলাসচন্দ্র। সুদকসা থাকুক—একখানা পুলবন্দির দরখাস্ত লিখিয়া দাও দেখি, যশোহরের কালেক্টর বেটা আমাকে বড় পেড়াপিড়ি করিতেছে।

হরিদাস বাবুর কোন কর্ম্মেই পিচপা নাই—তৎক্ষণাৎ চারি পাঁচ তক্তা কাগজ লইয়া দরখাস্ত লিখিতে আরম্ভ করিলেন—২।৩ ঘণ্টার পর লেখা সমাপ্ত করিয়া পড়িয়া শুনাইলেন—কৈলাসচন্দ্র দেখিলেন দরখাস্ত আলাত পালাত কথাতেই পরিপূর্ণ হইয়াছে কেজো কথা কিছু নাই—জিজ্ঞাসা করিলেন বাবু তুমি কি এই রকম রচনা লিখিয়া থাক? ইহা ভাল হইতে পারে বটে কিন্তু আমরা ইহাতে কোন কাজ পাই না। বাবু, তোমার কোন বিষয় কর্ম্ম আছে কি?

হরিদাস। আমি নানা শাস্ত্র পড়ে তো ছোট কর্ম্ম করিতে পারি না এ জন্য ঘরে বসিয়া আছি।

কৈলাসচন্দ্র। বাবু অগ্রে ছোট কর্ম্ম না করিলে বড় কর্ম্ম কিরূপে করিবে? নীচের কর্ম্ম ভাল না জানিলে উপরের কর্ম্ম উত্তমরূপে কি নির্ব্বাহ হয়? সমরমেট না হইয়া মুৎসুদ্দি হইলে হাবুডুবু খাইতে হয়।

হরিদাস। এ বলে তো ছাতা ঘাড়ে করিয়া সরকারের মত বাজারে বাজারে বেড়াতে পারি না তবে এত পড়লুম শুনলুম কেন?

কৈলাসচন্দ্র। বাবু হে! আপনার ক্ষমতার কতদূর দৌড় তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা কর্ত্তব্য। যে যে ব্যক্তি তাহা জানে সেই আপনার ন্যূনতা সেরে সুরে লইতে পারে ও বিষয় কর্ম্মে তাহার মঙ্গল হয়, না জানিলে ঘোর বিপদ।

হরিদাস চক্ষু কেস কেস করত ঠোঁট দাঁত দিয়া কাটিতে কাটিতে বলিলেন, মহাশয় বাবার বাগান থেকে আসিতে রাত্রি হইবে।

কৈলাসচন্দ্র। আমিও উঠিলাম—বাবু বিরক্ত হইও না—আর একদিন আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিব। আমি তোমার পিতার বন্ধু—প্রাচীন—যদি দুই একটা শক্ত কথা বলিয়া থাকি মনে কিছু করিও না।

প্রাতঃকালে পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার ফল।

[চৈত্র—১২৬১]

কলিকাতা অপেক্ষা বিলাত শহরে অধিক বসতি কিন্তু এমনি পরিষ্কার থাকে যে কিছু মাত্র দুর্গন্ধ নাই। প্রত্যেক বাটীতে নল লাগান আছে; ময়লা সকল ঐ নল দ্বারা বাহির হইয়া ঢাকা নর্দ্দমা দিয়া নদীতে নির্গত হয়। যদি কোন স্থান অপরিষ্কার হয় তবে তন্নিকটস্থ লোকেরা তৎক্ষণাৎ সরকারের কর্ম্মকারিদিগের প্রতি নালিস করে—এ জন্য শহর সর্ব্বদা ভাল থাকে।

বিলাতস্থ ভারি ২ লোক সকল অবকাশ পাইলে শহরের বাহিরে থাকেন। তথায় তাঁহাদিগের বড় ২ অট্টালিকা আছে—চতুষ্পার্শ্বে বাগ-বাগিচা—সরোবর—ঝিল—মধ্যে ২ গুল্ম ও জলের ফোয়ারা। এ মত মনোহর বাসস্থান কর্ম্মা জায়গা ব্যতিরেকে হয় না ও তথায় থাকিলে শরীরের সুস্থতা ও মনের স্ফূর্ত্তি কি পর্য্যন্ত হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। মধ্যবর্ত্তি লোকেরা অনেকে শহরে বাস করে ও কেহ ২ বাহিরেও থাকে—কর্ম্ম অনুরোধে প্রতিদিন গমনাগমন করে।

পূর্ব্বে বিলাতে লোকেরা ষ্টেজকোচ গাড়িতে গমনাগমন করিত। ঐ গাড়িতে ১০।১২ জন লোক ধরিত। এক্ষণে রেলের গাড়ি হওয়াতে ঐ রকম গাড়ির চলন বড় নাই। যে ২ স্থানে রেলের গাড়ি নাই সেই ২ স্থানে ষ্টেজ কোচ গাড়ি অদ্যাপি আছে। কিন্তু শহরের ভিতরে কেবল অমনিবস গাড়ি রাস্তায় ২ ফেরে।

একদিন ষ্টেজ কোচ গাড়িতে কতকগুলি লোক শহরে আসিতে-ছিল। একে গ্রীষ্মকাল, তাতে দুইপ্রহরের সময়—ঘোড়া বেগে *চলিতে না পারাতে প্রায় সকলেই বিরক্ত হইয়া কোচমেনকে তিরস্কার* করিতে লাগিল ও বলিল যদি আমরা পূর্ব্বে জানিতাম যে ঘোড়া এইরূপ চলিবে তবে অন্য উপায় করিতাম—আমাদিগের শীঘ্র না পঁহুছিলে কর্ম্ম সকল ভণ্ডুল হইবে। কোচমেন প্রাণপণে বেগে চালাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু রৌদ্রের জন্য ঘোড়া সকলের গতি ক্রমে ২ মৃদু হইতে লাগিল। গাড়িতে যত লোক ছিল তাহারা সকলেই অতিশয় রাগান্বিত হইল কিন্তু একব্যক্তি পার্শ্বে বসিয়াছিল—একটীও কথা কয় নাই—ইতিমধ্যে গাড়ি একটা উচ্চ স্থান দিয়া নামিবার সময় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল সকলকেই নিচে নামিতে হইল, সেখানে অন্য গাড়ি ছিল না সুতরাং রৌদ্রে চলিয়া যাইতে হইল। পূর্ব্বে যে বিরক্ত জন্মিয়াছিল তাহা এক্ষণে শতগুণ হইল। কোথায় নিরূপিত সময়ে শহরে পঁহুছিয়া কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে—না হাঁটিয়া যাইয়া তথায় পরদিবস উপস্থিত হওনের সম্ভাবনা হইল। সকলেই বিরক্ত ও ত্যক্ত হইয়া যাইতেছেন, কেহ কাহার সঙ্গে কথাও কহেন না। উপরোক্ত ব্যক্তি মিষ্টভাষী, মধ্যে ২ সদালাপ করিতেছেন ও যাহাতে সঙ্গিদিগের বিরক্তি দূর হয় এমন চেষ্টাও করিতেছিলেন। সকলে তাহার মনের গতিক দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে? কি কার্য্য করেন? আপনকার এমত স্বভাব কিপ্রকারে হইল? তিনি উত্তর করিলেন আমার নাম অমুক—আমার সওদাগরি কর্ম্ম অনেক স্থানে আছে—আমার বিরক্ত না হইবার কারণ এই যে আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে পরমেশ্বরের উপাসনা করি—তাহা না করিয়া অন্য কর্ম্মে হাত দি না—প্রাতঃকালে উপাসনা করিলে সমস্ত দিন মনঃ স্নিগ্ধ ও শান্ত থাকে—দৈব-ঘটনা ঘটিলে—চাঞ্চল্য হয় না। আমার প্রাণবল—ধনবল সকলই পরমেশ্বরের হাতে—তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই হইবে—সকল ঘটনাই তাঁহা কর্ত্তৃক হয়, তাহাতে বিরক্ত হইলে কেবল তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। এমত কর্ম্ম করা মানবগণের উচিত নহে। সকলেই তাঁহার কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইল। তিনি শহরে আসিয়া আপন কর্ম্ম সমুহ বিশেষ দেখিলেন কিন্তু তাঁহার মনের ধৈর্য্য জন্য ঐ সকল কর্ম্ম অনায়াসে নির্ব্বাহ করিলেন।

দৃঢ়মনা ও দুর্ব্বলমনা লোক কাহাকে বলে।

[বৈশাখ—১২৬৩]

একবার একজন শিষ্য আপন শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করে,—মহাশয়, আপনি পুনঃ পুনঃ বলেন,—রামচন্দ্রবাবু বড় দৃঢ়মনা, শ্যামলালবাবু দৃঢ়মনা নন, তিনি বড় দুর্ব্বলমনা। মহাশয়, দৃঢ়মনা লোকে ও দুর্ব্বলমনা লোকে প্রভেদ কি।

শিক্ষক উত্তর দেন,—রামচন্দ্রবাবুর বিলক্ষণ ভাল মন্দ বিবেচনা আছে। লোকজনের ভাল মন্দ বিবেচনা থাকিলেই তাহাদিগের যে দৃঢ়মন হয়, তাহা নয়, কারণ অনেকের ভাল মন্দ বিবেচনা আছে, কিন্তু তাহারা ঐ বিবেচনাক্রমে চলিতে পারে না, এমন সব লোকে দৃঢ়মনা হয় না, তবে কেমন লোকে দৃঢ়মনা হয়, তাহা বলি শুন,—লোকজনের প্রথমতঃ ভাল মন্দ বিবেচনা থাকিবেক। দ্বিতীয়তঃ তাহার কোন প্রতিবন্ধক না মানিয়া খুব যত্নবান হইয়া ঐ বিবেচনাক্রমে চলিবেক। অর্থাৎ যে যে ব্যক্তির এই দুই লক্ষণ আছে, তাহারাই দৃঢ়মনা হয়। রামচন্দ্রবাবু একজন গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান। ছেলেবেলায় তিনি খাওয়া-পরার বিস্তর ক্লেশ পাইতেন, তাঁহার বাপের এমন যোত্র ছিল না, যে ছেলেকে জুতো জোড়টা কিনিয়া দেন, রামচন্দ্রবাবু খালি পায়ে হাঁটিয়া ইস্কুলে যাইতেন। ইস্কুল ছাড়িলে পর, তাঁহার একটা ত্রিশ টাকার কেরানিগিরির কর্ম্ম হয়। রামচন্দ্রবাবু মনে ভাবেন,—আমি ত্রিশ টাকার কেরানিগিরির কর্ম্ম করিয়া কি করিব, আমি পনের ষোল বৎসর খাটিব, শেষে হয়তো ত্রিশ চল্লিশ টাকার উর্দ্ধ মাহিনা হইবেক না। ত্রিশ চল্লিশ টাকায় ভদ্রতা পূর্ব্বক সংসার তো চালাইতে পারিব না। আজ কাল খাওয়া পরার অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি বটে, আর কিছুদিন কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখিনা কেন। হবি সওদাগরের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, তিনি আমাকে বড় ভাল বাসেন, বিনা মাইনায় আমি তাঁহার আফিসে কিছুদিন গিয়া কাজ কর্ম্ম শিখি না কেন, হয়তো তিন চারি বৎসরের মধ্যে আমি কিছু না কিছু করিয়া উঠিতে পারিব। এই কথা মনে স্থির করিয়া রামচন্দ্র বাবু হবি সাহেবের আফিসে গিয়া সওদাগরি কর্ম্ম শিখেন। শেষে তিনি আপনি সওদাগর হইয়া বসেন। ছেলেবেলায় কেরাণীগিরি কর্ম্ম না করিয়া খাওয়া পরার কষ্ট স্বীকার করিয়া সওদাগরি কর্ম্ম শিখা, এই একটা রামচন্দ্রের দৃঢ় মনের চিহ্ন বলিতে হইবেক। রামচন্দ্রের আর একটা দৃঢ় মনের কথা বলি শুন,—ইস্কুলে অনেক বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে রামচন্দ্রবাবুর আলাপ হয়, তাহাদিগের বাড়ীতে রামচন্দ্রবাবুর যাতায়াত ছিল। ইস্কুল ছাড়িয়া রামচন্দ্রবাবু দেখেন,—তাহারা সকলি মদখোর ও বেশ্যাবাজ হইয়া উঠিতেছে তাহাদিগের বাড়ীতে গেলেই আমাকে জোর করে মদ খাওয়ায়। এই সকল দেখিয়া রামচন্দ্রবাবু মনে করেন,—এমন সব লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা রাখা ভাল নয়, মাতালের সঙ্গে আত্মীয়তা করিলেই মাতাল হইতে হইবেক। বড় মানুষই হউক, কি গরীবই হউক, আমি মাতালের সঙ্গে কখন আলাপ করিব না। আমার দুই একজনের বাড়ীতে যাতায়াত চাই এই জন্যে দীনবন্ধুর সঙ্গে ভাব ও আত্মীয়তা করিব। দীনবন্ধু আমার পাড়া প্রতিবাসী, তাঁহার বয়স অল্প বটে, কিন্তু তিনি বড় সুধীর ও সচ্চরিত্রের লোক। তিনি কোন নেশা করেন না, মদ খাওয়া দূরে থাকুক তিনি তামাকও খান না, তাঁহার লেখাপড়ায় বড় আস্থি আর সকলের প্রতি তিনি সদ্ব্যবহার করেন, এমন লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা করা সুসংসর্গ বলিতে হইবেক। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে হয়তো আমি তাঁহার বাড়ীতে যাইব, কিম্বা তিনি আমার বাড়ীতে আসিবেন। এই প্রতিজ্ঞা রামচন্দ্রবাবু করিয়া তদনুসারে চলেন। বড়'মানুষ মদখোরের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া একজন মধ্যবিৎ ভদ্র লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা করা, এই একটা রামচন্দ্রবাবুর দৃঢ় মনের চিহ্ন বলিতে হইবেক।

এই সকল শুনিয়া শিষ্য শিক্ষককে বলে,—মহাশয় আপনার কথা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। যে ব্যক্তি আপাততঃ সুখ দুঃখ না মানিয়া শেষে যাহাতে ভাল হয়, তাহাই করে, সেই দৃঢ়মনা হয়।

শিক্ষক উত্তর দেন,—হাঁ।

বাবু ঐ বটে, দীনবন্ধু বাবুর একটা দৃঢ়মনের কথা বলি শুন,—দীনবন্ধুবাবু গরীবও নন, বড় মানুষও নন, তিনি মধ্যবিৎ লোক। তাঁহার পত্নী ভালমানুষ বটে, কিন্তু বড় সাখরচে। টাকা পাইলেই খরচ করিয়া ফেলেন, এই জন্যে দীনবন্ধুবাবুর পত্নীর হাতে টাকা রাখেন না, যেদিন যেমন খরচ, সেইরূপ টাকা দেন, বেশি টাকা দেন না। স্বামির ঠাঁই বেশি টাকা লইবার জন্যে, পত্নী কখন কাঁদেন, কখন পায়ে পড়েন, কখন বা রাগ করেন, কিন্তু দীনবন্ধুবাবু কিছুতেই ভুলেন না। পত্নীর প্রতি সর্ব্বদা স্নেহবাক্য কহেন, কিন্তু তাঁহাকে ন্যায্য খরচের বেশি টাকা দেন না। পত্নীর কান্নাকাটি না শুনিয়া তাঁহাকে বৃথা খরচ করিবার জন্যে টাকা না দেওয়া, দীনবন্ধুর দৃঢ় মনের চিহ্ন বলিতে হইবেক। সকলের সমান দৃঢ় মন নাই। কাহারো বেশি আছে। কাহারো বা কম আছে। কাহারো বা কিছুই নাই। যাহার কিছুমাত্র দৃঢ়মন নাই, সেই, দুর্ব্বলমনা। শ্যামলালবাবু বড় দুর্ব্বলমনা। একজন আসিয়া শ্যামলালবাবুকে বলে,—এবার জাঁকিয়া দুর্গোৎসব করুন, করিলে আপনার খুব নাম হইবেক। শ্যামলালবাবু উত্তর দেন, আচ্ছা, আমি পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া দুর্গোৎসব করিব। দিন কতক পরে, আর এক জন আসিয়া শ্যামলালবাবুকে বলে,—মহাশয়, দুর্গোৎসব করা বৃথা কড়ি খরচ করা, তাহা না করিয়া আপনি একখানা বাগান তৈয়ার করুন। শ্যামলালবাবু উত্তর দেন,—তোমার কথা মন্দ নয়, আমি দুর্গোৎব করিব না, একখানা বাগান তৈয়ার করিব। শ্যামলাল বাবু কখন্ কি করিবেন তাহার ঠিকানা নাই, তিনি আপনাপনি ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে পারেন না, যে যখন যা বলে তিনি তখনই তাহা করিতে উদ্যত হন। এই দুর্ব্বল মনের প্রধান লক্ষণ।

শিষ্য। আপনি দৃঢ়মনা ও দুর্ব্বলমনা লোকের বেশ লক্ষণ দিলেন, ইহার সংক্রান্ত আর কি কিছু কথা আছে?

গুরু আমি কেবল কাজ কর্ম্ম ও সংসার চালাওন বিষয় লইয়া দুই তিনটি দৃঢ়মনের দৃষ্টান্ত দিলাম। কিন্তু ইহা ছাড়া যে বিষয়ে হউক, ধর্ম্ম বিষয়ে হউক, কি মান অপমানের বিষয়ে হউক, কি আর কোন বিষয়ে হউক, যাহা তুমি উত্তম বলে বিবেচনা করিয়া মনে ভাল বুঝ, তাহা কোন প্রতিবন্ধক না মানিয়া করিলেই দৃঢ়মন প্রকাশ পায়।

পরমেশ্বরের বেস একটি সুবিচারের কথা

[আষাঢ়—১২৬৩]

কলিকাতার ফৌজদারি-বালাখানার নিকট ও বড়বাজারে ও চিনে বাজারে ও অন্য অন্য স্থানে ইহুদি বলে এক জাত বাস করে। ইহুদিরা এ দেশের লোক নয়। তাহারা পালাষ্টাইন্ দেশ থেকে আইসে। বঙ্গদেশের উত্তর পশ্চিম দিকে পালাষ্টাইন্ দেশ। সে দেশ কলিকাতা হইতে কমবেশ দুই হাজার ক্রোশ হইবেক। পালাষ্টাইন্ দেশে যাইতে হইলে, খুস্কির রাস্তা দিয়াও যাওয়া যায়, সমুদ্র দিয়া জাহাজ করেও যাওয়া যায়। যাহার যেমন ইচ্ছা সে সেই পথ দিয়া যায়। ইহুদিরা প্রায় ইংরাজদিগের মতন গৌরবর্ণ আঁটা সাঁটা ও বলবান পুরুষ। তাহাদিগের মেয়েরাও বড় সুন্দরী। বাঙ্গালীদিগের মেয়ের মতন তাঁহারা পর্দ্দানসিন নয়। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে তাহারা গাড়ি চড়িয়া হাওয়া খাইতে যায়। সে সময়ে তাহাদিগকে সকলে দেখিতে পায়। ইহুদিদিগের মেয়েরা বাহিরে বেরয় বটে, কিন্তু ইংরাজদিগের মেয়েরা যত পুরুষের সঙ্গে মেশামিসি করে, ইহুদিদিগের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে তত মেশামিসি করে না।

হিন্দুদিগের মধ্যে মনু যেমন শাস্ত্রকর্ত্তা, ইহুদিদিগের মধ্যে মোসা তেমনি শাস্ত্রকর্ত্তা ছিলেন। ইহুদিদিগের মধ্যে মোসা সংক্রান্ত বেশ একটি গল্প প্রচার আছে, সে গল্প বলি শুন,—এক দিবস দুই প্রহরের সময়ে স্বয়ং পরমেশ্বর মোসাকে এক পাহাড়ের উপর ডাকিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহেন, পরে বলেন,—মোশা, নিচে দেখ কি হইতেছে। যেদিক পানে পরমেশ্বর বলিলেন সে দিকে মোসা চাহিয়া দেখেন,—পাহাড়ের নিচে থেকে বড় পরিষ্কার জল উঠিতেছে। সেখানে একজন ঘোড়সোয়ার নামিয়া পোষাক ছাড়িয়া জল খায়। কিছুকাল ঠাণ্ডা হইলে পর, ঘোড়সোয়ার আবার পোষাক পরিয়া ঘোড়ার উপর চড়িয়া চলিয়া যায়। যাইবার কালে, তাহার যে মোহরের থলিটি ছিল, সেখানে ভুলে ফেলিয়া গেল। সোয়ার গেলে পর, সে স্থানে একটি ছেলে আসিয়া মোহরের থলেটি লইয়া পলায়ন করে। সব শেষে জলের নিকট এক বৃদ্ধ অথর্ব্ব পুরুষ আইসে। সে রৌদ্রে অনেক দূর থেকে আসিয়া বড় ক্লান্ত হইয়াছিল। সে আস্তে আস্তে কাপড় চোপড় ছাড়িয়া জল খাইতেছে, এমন সময়ে সোয়ার ঘোড়া দৌড়ি আসিয়া বলে,—এখানে আমি মোহরের থলি ফেলিয়া গিয়াছিলাম, তুই নিয়েচিস্, এক্ষণই ফিরিয়া দে, না দিলে তোকে মেরে ফেলিব। বৃদ্ধ পুরুষ উত্তর দেয়,—মহাশয় আমি এইমাত্র এখানে আসিয়াছি, আপনার মোহরের থলি দেখি নাই, আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী মানিয়া বলিতেছি, আমি আপনার মোহরের থলি দেখি নাই। সোয়ার বৃদ্ধ মানুষের কথা শুনে না, সে তৎক্ষণাৎ তলওয়ার বাহির করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। এই সকল ঘটনা দেখিয়া মোসা আশ্চর্য্য হইয়া পরমেশ্বরকে বলেন,—আপনাকে আমরা সুবিচারক বলিয়া জানি, এই কি আপনার সুবিচার। এক জন মোহারর থলি লইয়া গেল, আর এক জন তাহার সাজা পাইল। পরমেশ্বর উত্তর দেন,—মোসা তুমি সকল সংসার দেখিতে পাও না, এই জন্যে আমি যখন যাহা করি, তাহার সংক্রান্ত তোমার শুদ্ধ বিচার হয় না। সত্য বটে, ছেলেটি মোহরের থলে লইয়া যায়, সেই জন্যে বৃদ্ধ পুরুষ মারা পড়ে; তাহার কারণ,—ঐ বৃদ্ধ পুরুষ টাকার লোভে ছেলেটির বাপকে খুন করিয়াছিল, সেই খুনের দণ্ড বৃদ্ধ পুরুষ এতদিন পরে আজ ছেলের নিমিত্তে পাইল।

জলে ডুবে মরাতে যাতনা নাই

(একটি সত্য গল্প)

[শ্রাবণ—১২৬৩]

সাধারণে মনে করে, জলে ডুবে মরা বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহাতে অশেষ যাতনা বোধ হয়। এ কথা সত্য নয়, জলে ডুবে মরিতে গেলে, প্রথম ভয়টা যাহা হউক, ডুবে মরাতে কিছুমাত্র যাতনা নাই। প্রাণ অতি সহজে শরীর থেকে বাহির হয়, এ বিষয় সংক্রান্ত একটি গল্প বলি শুন।

একজন ইংরাজ বিস্তর সাঁতার জানিত না. সে সমুদ্রের কিনারা থেকে অনেকটা দূর সাঁতারিয়া গিয়া হাঁপাইয়া পড়ে। আর কিনারায় ফিরিয়া আসিতে পারে না, ক্ষণকাল জলে হাঁই পাঁই করিয়া ডুবিয়া যায়। জলে ডুবিয়া যাইবা মাত্র, জন কতক লোক জোট করে গিয়া তাহাকে ডাঙ্গায় তুলিয়া আনে। সে সময়ে ইংরাজ বেহোঁস ছিল। কিছুকাল পরে হোঁস হইলে, সে বলে,—কেন তোমরা আমাকে জল থেকে তুলিয়া আনিলে, এক্ষণে আত্যন্তিক শারীরিক যাতনা বোধ হইতেছে, সে সময়ে কিছুমাত্র শারীরিক যাতনা ছিল না। আমি পরম সুখ ভোগ করিতেছিলাম। এই সকল কথা শুনিয়া লোক জনে বলে,—তুমি জলে ডুবে কি সুখ ভোগ করিতেছিলে, আমরা তোমাকে বাঁচাইলাম, ইহা কি তোমার পক্ষে মন্দ হইল। ইংরাজ উত্তর দেয়,—প্রথমে আমি যখন জলে হাঁপাইয়া পড়ি, তখন তো আমার বড় ভয় হয়, বুঝি এবার জলে ডুবে মরিলাম। পরে ডুবিয়া যাই, বোধ হয় যেন অতলস্পর্শ জলে ডুবিয়া যাইতেছি, তাহার থৈই কখনও পাইব না। ইহার জন্যে, বড় ভয় হয়, কিন্তু সে ভয় বিস্তরক্ষণ থাকে না, শীঘ্র ঘুচিয়া যায়। পরে বোধ হয় যেন আমি একখানা

অতি উৎকৃষ্ট বাগানে বেড়াইতেছি, চতুর্দ্দিকে বড় বড় সুন্দর গাছ, সে সকল গাছ মেওয়া ফলে ভরা, গাছের উপরে নানারকমের সুন্দর পাখি বসিয়া ডাকিতেছে. সে সকল পাখির ডাক শুনিলে, চঞ্চল মন স্থির হয়। আরো রাস্তার দুইধারে কত রকমের ফুলের চারা। সে সকল ফুলের সুগন্ধের কথা কি বলিব। আরো বাগানে অনেক পুষ্করিণী, সে সকল পুষ্করিণীতে অনেক রকমের সোণার মতন ঝকমকে মাছ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আরো কোন কোন জায়গাতে গাছ পালা কিছুই নাই, কেবল দুর্ব্বা ঘাসের ময়দান, তাহা দেখিলে চক্ষু ঠাণ্ডা হয়। বাগানটি সর্ব্বপ্রকারে বড় মনোহর স্থান বলিতে হইবেক। বাগানময় বেড়াইতে বেড়াইতে দূরে থেকে বেশ একখানি থামওয়ালা পাথরের অট্টালিকা বাড়ী দেখি.। সে বাড়ীর নিকটে যাই, গিয়া দেখি সেখানে দেবতাদিগের মতন লোকজন বাস করিতেছে, এমন সময়ে ছেলেবেলা থেকে যে দিবস সাঁতার দিতে আসি, সেদিন পর্য্যন্ত যে কিছু ভাল মন্দ কাজ করিয়াছিলাম, তাহা সকলি একটি একটি করে মনে পড়ে। এই সকল কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে তোমরা আমাকে ঘুম থেকে উঠাইলে. কেন উঠাইলে, না উঠান ভাল ছিল। পূর্ব্বে আমার শারীরিক বেদনা কিছু মাত্র ছিল না, এক্ষণে শারীরিক বেদনা অনেক হইতেছে। এই সকল কথা বলিয়া ইংরাজ বড় খেদ করিতে লাগিল,—আমি ডুবিয়া একেবারে মরিলাম না কেন, কেন তোমরা আমাকে বাঁচাইয়া তুলিলে।

আমাদের বাড়ী ঘর দ্বার সরাই বই কি

[শ্রাবণ—১২৬৩]

মুসলমানদিগের দেশে চোর ডাকাইতের বড় ভয়। এই জন্যে বড় বড় শহরে যাইবার রাস্তার নিকটে পনের ষোল ক্রোশ অন্তর কোঠা বাড়ী আছে। সে সকল বাড়ীতে রাত্রে রাহাগিররা উত্তরিয়া আহার বিশ্রাম করে। পরে সকাল হইলে, তাহারা সকলে উঠিয়া যে দিকে যাহার ইচ্ছা, সেই দিকে চলিয়া যায়। এমন সব বাড়ীকে সরাই বলে। সরাইতে পাহারাওয়ালারা থাকে, তাহারা দিবা-রাত্রি চৌকি দেয়। পূর্ব্বে আগ্রার ও দিল্লীর অঞ্চলে অনেক সরাই ছিল, সে সকল সরাই বাদসাদিগের বানান। এক্ষণে ইংরাজদিগের আমলে সে সকল সরাইয়ের কোন মেরামত হয় না, সুতরাং তাহারা সকলেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইতেছে।

একদিবস একজন ফকির বাক্ সহরে পৌঁছিয়া একেবারে রাজবাটীতে গমন করেন। তথায় গিয়া দালানে আপনার সব রাখেন। পরে সেখানে আসন বিছাইয়া শুইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে পাহারাওয়ালারা আসিয়া বলে,—তুমি এখানে কি করিতেছ, উঠিয়া যাও, আপনা আপনি না গেলে, আমরা জোর করে বাহির করিয়া দিব। ফকির উত্তর দেন,—আজ আমি অনেকদূর থেকে আসিয়া শ্রান্তিযুক্ত হইয়াছি। এ বাড়ীতো সরাই। আজ রাত্রে এখানে বিশ্রাম করিব বলিয়া শুইয়াছি। ফকিরের কথা রাজা দূর থেকে শুনিয়া হাস্য বদনে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে আইসেন, পরে উঁহাদিগের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহা নীচে দেওয়া যাইতেছে।

রাজা বলেন,—ফকির তোমার কি কিছু বোধ শোধ নাই, এ তোমার সরাই নয়,—রাজবাটী তাহা কি তুমি টের পাও নাই।

ফকির উত্তর দেন,—মহারাজ, আপনি যদি অনুমতি দেন, আপনাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলুন দেখি, এ বাড়ী যখন প্রথম বানান হয়, তাহাতে কে বাস করে।

রাজা। এ বাড়ী আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বানাইয়া বাস করেন।

ফকির। মহারাজ, সব শেষে এ বাড়ীতে কে বাস করে।

রাজা। আমার ঠাকুর বাস করেন।

ফকির। মহারাজ, এক্ষণে এ বাড়ীতে কে বাস করিতেছে।

রাজা। এক্ষণে তো আমি বাস করিতেছি।

ফকির। মহারাজ, আপনার পর এ বাড়ীতে কে বাস করিবেক।

রাজা। আমার ছেলে রাজকুমার এ বাড়ীতে থাকিবে।

ফকির। মহারাজ, দেখুন দেখি, এ বাড়ীর বাসিন্দা কতবার বদল হইয়া গিয়াছে। যে বাড়ীর বাসিন্দা এত ঘন ঘন বদল হয়, তাহাকে তো রাজবাটী বলা যায় না, সে সরাই, কারণ সরাই কি,—যে বাড়ীতে ঘন ঘন নুতন লোক বাস করে, সেই সরাই।

পূর্ব্বোক্ত গল্পের তাৎপর্য্য এই,—

এ পৃথিবীতে আমরা কেবল অল্প দিবসের জন্যে আসিয়াছি সুতরাং ইহাতে এমন কোন জিনিস নাই, যাহা আমরা নিজের বলিতে পারি, কেননা কিছুই আমাদিগের সঙ্গে যায় না।

একজন জাহাজী গোরার কথা

(আষাঢ়। ১২৬৪।)

একবার একজন ভদ্রলোক একজন জাহাজি গোরাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন—বল দেখি তোর বাপ কোথায় মরে।

জাহাজি গোরা উত্তর দেয়। মহাশয়, তিনি আমার মতন জাহাজের কর্ম্ম করিতেন, সমুদ্রে জাহাজ ডুবতে মরিয়া যান।

ভদ্রলোক। তোর ঠাকুরদাদা কেমন করে মরে।

জাহাজি গোরা। মহাশয়, তিনিও জাহাজের কর্ম্ম করিতেন, তিনি জাহাজে করে সমুদ্রে গিয়াছেন, এমন সময়ে সমুদ্রে পড়ে ডুবিয়া মরিয়া যান।

জাহাজি গোরার উত্তর শুনিয়া ভদ্রলোক বলেন,—তোর দুই পুরুষ সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে, তোর কি জাহাজের কর্ম্ম করিতে ভয় হয় না।

জাহাজি গোরা। মহাশয় ভয় করে কি করিব। আপনি যদি অনুমতি দেন, আপনাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মহাশয় আপনার ঠাকুরের কোথায় কাল হয়।

ভদ্রলোক। তিনি ঘরে থাকেন, ব্যারাম হয়, বিছানায় শুইয়া মরেন।

জাহাজি গোরা। মহাশয় আপনার পিতামহ কোথায় মরেন?

ভদ্রলোক। তিনিও বাড়ীতে থাকেন, পীড়া হয়, বিছানায় শুইয়া মরেন।

এই সকল কথা শুনিয়া জাহাজী গোরা কহে—মহাশয়, আপনার দুইপুরুষ বিছানায় শুইয়া মরেন, আপনার কি বিছানায় শুইতে ভয় করে না।

নূতন ঘুমপাড়ান ছড়া

বিগত ১৮৭০ সালের ১২ই মে তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ—প্রায় দুইবৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার একটী পরিবার হইতে একজন খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী একটী যুবতী রমণীকে খৃষ্টান করিবেন বলিয়া বাহির করেন। গত ২৯শে এপ্রেল সেইরূপ আর একটী ঘটনা হইয়াছে। মিস্ মার্থার নাম্নী একজন দেশীয় খৃষ্টান রমণী আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের এক পরিবার হইতে তাহাদের একটী বিধবা কন্যাকে সকলের অসাক্ষাতে খৃষ্টান করিবার অভিপ্রায়ে হাজরা নামক এক খৃষ্টানের বাটীতে আনিয়া রাখিয়াছেন। বালিকাকে প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত তাহার আত্মীয়স্বজন আবদ্ধকারীকে উকিলের চিঠি দেন। রেভারেণ্ড নেষ্টার ভন প্রত্যুত্তরে বলেন যে বালিকা স্বইচ্ছায় আসিয়াছে এবং ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গত ৪ঠা মে তারিখে তাহাকে ব্যাপটাইষ্ট করেন। বালিকার অভিভাবকেরা রেঃ ভন, মিঃ হাজরা ও মিস্ মার্থারের নামে হাইকোর্টে অভিযোগ করিয়াছেন।

জষ্টিস ফিয়ারের নিকট ইহার বিচার হয়। বাদীর পক্ষে কৌন্সিল ছিলেন মিঃ কেনিডি ও বাবু মনোমোহন ঘোষ এবং অপর পক্ষে ছিলেন মিঃ উড্রফ। প্রতিবাদী ভন সাহেবের পক্ষ হইতে বলা হয়, গণেশসুন্দরী (বালিকার নাম) আপন ইচ্ছায় পাদরি সাহেবের গৃহে উপস্থিত হয়, তাহার বয়স ১৬ বৎসর এবং সে ধর্ম্মযাজক বাবু কেশবচন্দ্র সেনের আত্মীয়া। গণেশসুন্দরী নিজে বলে তাহার বয়স ১৬বৎসর, কিন্তু বাদীর পক্ষ হইতে বলা হয় তাহার বয়স ১৪ বৎসর। বিচারপতি বালিকার কথা বিশ্বাস করিয়া বাদীদিগের আবেদন অগ্রাহ্য করেন।

এই ঘটনা লইয়া মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ লিখিত একটী ব্যঙ্গ-কবিতা ১৮৭০ সালের ২৬শে মে তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"নূতন ঘুমপাড়ানো ছড়া

"গণেশসুন্দরীকে পাদরি ভন সাহেব খৃষ্টান করিবার নিমিত্ত ঘর হইতে বাহির করায় কলিকাতার মেয়েদের মধ্যে হুলুস্থুলু পড়িয়া গিয়াছে। সেইজন্য কলিকাতার মেয়েরা একটী নূতন "ঘুমপাড়ানো ছড়া" রচনা করিয়াছেন :—

নসী ঘুমাল, পাড়া জুড়ালো,
পাদরী এলো দেশে,
খৃষ্টান করবার আশে ;
ফুলমণি পালা ঘরে
পাদরী সাহেবের ডরে।
পাদরী সাহেবের লম্বা দাড়ি,
খৃষ্টানী ভজায় বাড়ী বাড়ী।
খোকা মেয়ে পেলে গাঁয়,
দাড়িতে বেন্ধে নিয়ে যায়।
আমাদের নসী ঘুমায়েছে,
পাদরী ঘরে গিয়েছে॥

নসীর ঘুম আয়,
পাদরী এল গাঁয়,
না ঘুমালে ধরে নেবে,
দাড়িতে পুরে নিয়ে যাবে।

শ্যামমণি রামমণি ঘরে যত মেয়ে,
চুপ করেছে, ঘুমায়েছে, পাদরী সাহেবের ভয়ে।
শেয়াল ডাকছে বনে,
ব্যাং ডাকছে ঘরের কোণে,
পাদরী সাহেবের আঁধারে দাড়ী,
ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়ী বাড়ী।
আমাদের নসী ঘুমায়েছে,
পাদরী ঘরে গিয়েছে।
আমাদের নসী ঘুমো রে,
পাদরী ঘরে যা রে,
গোকুলমণিকে নে যা ধ'রে,
রাখ গে তারে খৃষ্টান ক'রে।
আমাদের নসী ঘুম যায়,
দেড়ে জুজুর বড় ভয়,
হুতুম ডাকে গাছে,
শাঁকচুর্ণী বাঁশতলায় নাচে,
পাদরী সাহেবের বড় দাড়ী,
মেয়ে ধরে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী,
আমাদের নসী ঘুমায়েছে,
পাদরী ঘরে গিয়েছে।
পাদরী সাহেবের দুটো ঠ্যাং,
কাল্‌কে পরা ড্যাং ড্যাং॥

[শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত।]

নালন্দা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অধুনা নালন্দার যে-সমস্ত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে সেগুলির সমস্তই বিহার প্রদেশের বড়্গাঁ * নামক একটী ছোট গ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত। বড়্গাঁ বিহার-লাইট-রেলওয়ের একটী ছোট ষ্টেশন। বড়্গাঁর উত্তরে বেগমপুর একটী ছোট গ্রাম। ইহার প্রায় ৩০০ ফুট দক্ষিণে একটী সুবৃহৎ সমচতুষ্কোণ চকের খিলান ধ্বংসাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ইহা মুসলমান আমলের কোন এক দুর্গের ধ্বংসাবশেষ—বৌদ্ধদিগের কোন নিদর্শন
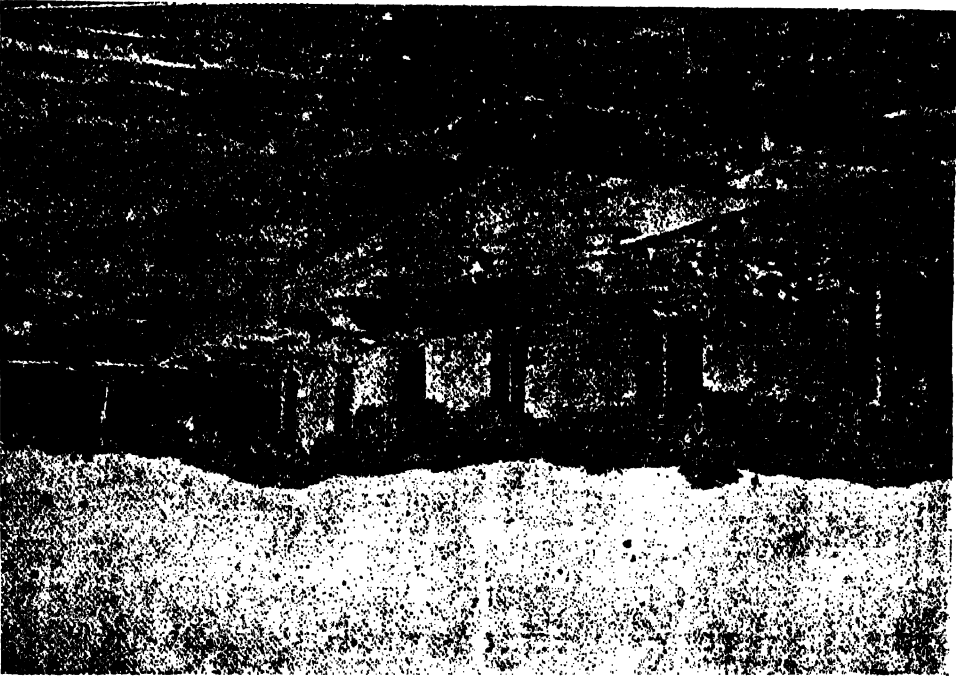
প্রথম: বিহারের ধ্বংসপ্রাপ্ত চতুষ্কোণ প্রাচীরের দৃশ্য

ইহাতে পাওয়া যায় না। ইহারই কিছু দক্ষিণে দুইটী বৌদ্ধ স্তূপ পাওয়া যায়। দুইটীরই পরিধি ৫০ ফুট এবং উচ্চতায় ৬ হইতে ৮ ফুটের মধ্যে। ইহাতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়েরই বহু মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে

* অনেকে ইহাকে 'বাড়্গাঁও' ও বলিয়া থাকেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ T. Bloch, G R. A. S, 1919, pp, 440-43 পৃষ্ঠায় "The Modern Name of Nalanda শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন যে, এক্ষণে নালন্দার স্থানে বাড়্গাঁও নামক গ্রামের নাম বাড়্গাঁও না হইয়া বাড়্গাঁভ্ হইবে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, বটগ্রাম হইতে বাড়্গাঁও-এর উৎপত্তি; কিন্তু এ নাম তিনি বাড়্গাঁওএ অবস্থান-কালে গ্রামের কাহারও নিকট শুনেন নাই। Blochএর এই সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন; সুতরাং তাঁহার মত সমর্থন করা যায় না।

অনেকে বলেন যে, বাড়্গাঁও একটী বড় রাজ্যের রাজধানী ছিল। মগধের কোন রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন। Dr. Buchananও এই মতাবলম্বী ছিলেন। বিহারের কোন জৈন পুরোহিতের নিকট তিনি শুনেন যে,রাজা শ্রীনিক এবং তাঁহার বংশধরগণ ঐ স্থানে বাস করিতেন। কিন্তু ধ্বংসাবশেষের অবস্থা দেখিয়া এবং ঐতিহাসিক স্থান নির্দ্দেশের ফলে বলিতে পারা যায় যে, কাহিনীর মূলে কোন সত্য নাই। এখানে রাজকীয় দ্রব্যসম্ভার, দুর্গ, দুর্গ-প্রাচীর কিংবা রাজপ্রাসাদের চিহ্ন থাকাই উচিত; কিন্তু তাহার কিছুই এখানে পাওয়া যায় না।

১নং বিহারের প্রধান প্রবেশ (বর্ত্তমান সংস্কারের পূর্ব্বে)

গরুড়ারূঢ় চতুর্হস্তবিশিষ্ট একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি অন্যতম।† ইহার নিকটেই প্রাপ্ত উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত দুইটী বুদ্ধমূর্ত্তিও বেশ সুন্দর। এই স্তূপগুলির ঠিক ১৮২৫ ফুট দক্ষিণ-পশ্চিমে সুরজ-পোখর নামে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার দক্ষিণে অনেক সুন্দর সুন্দর ছোট ইষ্টক নির্ম্মিত স্তূপাদির চিহ্ন পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর প্রত্যেক ধারেই তিনটী করিয়া ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট আছে। এই ঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে স্তূপীকৃত বহু মূর্ত্তি রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে A. M. Broadley একটী দ্বিখণ্ড বরাহ-মূর্ত্তি সংগ্রহ করেন। সেটী উচ্চতায় ৯ ফুট এবং প্রস্থে ৪ ফুট। Broadley আর দুইটী খুব সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি সংগ্রহ করেন। একটী সবুজ পাথরে ক্ষোদিত ৩ ফুট দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্ত্তি, অপরটী পাঁচ ফুট একটী পাথরে খোদাই করা বিষ্ণুর দশ-অবতারের দশটী চিত্র। এক একটী চিত্রের পরিমাণ ৮ ইঞ্চি। সুরজ-পোখরের প্রায় দেড় হাজার ফুট দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটী বিরাট্ ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার পরিধি ৬০০ ফুটের কম হইবে না—উচ্চতায় ইহা ৫০ ফুট। ইহারই প্রায় ৮০০ ফুট দক্ষিণে আর একটী বিহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেটী পূর্ব্বের মন্দির অপেক্ষা অনেক বড়। এখান হইতে সাতটী বুদ্ধমূর্ত্তি এবং একটী সিংহাসন পাওয়া গিয়াছে।

য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত বিহারের নাম করিয়াছেন; তাহাতে 'তারা বোধিসত্ত্বের' তাম্র-বিগ্রহ থাকিত। সেটী নালন্দা-মহাবিহার হইতে অর্দ্ধমাইল কিংবা মাইলের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অবস্থিত ছিল। Cunningham ২০০০ ফুট উত্তরে একটী বিহারের আবিষ্কার করেন। তাঁহার মতে এটীই উক্ত বিহার। ইহার উচ্চতা ২২৮ হইতে ২৪০ ফুটের মধ্যে। ইহার আয়তন অর্থাৎ চতুষ্পার্শ্বের পরিধি ৭০½×৬৩ ফুট এবং মাটী হইতে ৬ ফুট উচ্চ নির্ম্মিত। য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ বলিয়াছেন এই বিহারের দক্ষিণে একটী কূপ ছিল। সেটী যথাস্থানেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বড়গাঁ একটী ছোট গ্রাম। ইহার বর্ত্তমান লোক-সংখ্যা প্রায় ছয় শত হইবে। যে ধ্বংসাবশেষের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহার দক্ষিণে ইহা অবস্থিত। বিহার হইতে

† Mojor Cunningham এই মূর্ত্তিটাকে কোন ব্রাহ্মণের মন্দিরের মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন।

ইহা ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এবং রাজগৃহ কিংবা গিরিব্রজ অথবা বর্ত্তমান রাজগীর হইতে সাত মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। গয়া হইতেও ইহার দুরত্ব বেশী নহে।

ফা-হিয়ানের বিবরণে যে নাল নামক স্থানের উল্লেখ দেখা যায়, সেটী গিরিয়েক পর্ব্বত কিংবা রাজগৃহ হইতে এক যোজন অথবা সাত মাইল দুরে অবস্থিত। রাজগৃহ কিংবা গিরিয়েক পর্ব্বত হইতে নালন্দার দূরত্বও বাস্তবিকই একরূপ। সিংহলের পালিগ্রন্থে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ বলিয়াছেন, নালন্দা বুদ্ধ-গয়ার পিপ্পল-বৃক্ষ হইতে সাত যোজন অর্থাৎ ৪৯ মাইল দূরে অবস্থিত। রাস্তা মাপিয়াও এ দূরত্ব সমর্থিত হয়, কিন্তু মানচিত্রের হিসাবে দুরত্ব কিছু কম—৪০ মাইল মাত্র। য়ুয়ন্ চোয়ঙ্ বলেন, রাজগৃহ হইতে নালন্দার দূরত্ব মাত্র পাঁচ মাইল। Major Cunninghamএর মাপে উত্তর দিকের প্রাচীর হইতে রাজগৃহের দূরত্ব হিসাব করিলে য়ুয়ন্ চোয়ঙের কথাই ঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইস্থান হইতে প্রাপ্ত দুই একটী প্রস্তর-লিপি হইতেও স্থানের ও সংস্থানের প্রমাণের অভাব হয় না।

নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এই স্থানে শারিপুত্রের জন্ম হয়, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু Cunninghumএর মতে এ কথা সত্য নহে। তিনি বলেন যে, য়ুয়ন্-চোয়ঙের বিবরণ অনুসারে 'কলপিনাক' নামক স্থানে তাঁহার জন্ম। উহা নালন্দা ও ইন্দ্রশীলা পর্ব্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বুদ্ধের অপর শিষ্য মহা-মৌদ্গল্যায়নও অন্যস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ 'কুলিকা' নামক স্থানে তাঁহার জন্মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নালন্দা হইতে উহার দুরত্ব দেড় মাইলের অধিক নয়। এই 'কুলিকার' ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান জগদীশপুরে Cunningham কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১নং বিহারের ভিতরের চতুষ্কোণ—পূর্ব্বদিকের দৃশ্য

জগদীশপুর ধ্বংসাবশেষের চকের আলির পরিধি ২০০ ফুট সমচতুষ্কোণ; উহার উপরে আবার ৭০ ফুট সমচতুষ্কোণ এক উচ্চ স্থান আছে। ঐ উচ্চ স্থানের দক্ষিণ দিকের একেবারে শেষে একটী বড় নিমগাছ আছে। সেখান হইতে বহু মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটী মূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সুন্দর। মূর্ত্তিটী ভগবান্ বুদ্ধদেবের। ইহার উচ্চতা ১৫ ফুট এবং প্রস্থ ৯½ ফুট। মধ্যস্থলে বুদ্ধদেব বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের তলে ধ্যানরত; তাঁহার চতুর্দ্দিকে ধ্যানভঙ্গকারী মার ও তাহার অনুচরবৃন্দ এবং বহু দৈত্য-দানব, নারীবৃন্দের সমাবেশ আছে। তাহাদের চতুর্দ্দিকে বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন মূর্ত্তি। Cunningham বলেন, স্থানীয় অধিবাসিগণ মূর্ত্তিটীকে রুক্মিণীর * মূর্ত্তি বলিয়া পূজা করিত। এই

* নালন্দার ধ্বংসাবশেষকে ব্রাহ্মণেরা 'কুণ্ডিলপুর' বলিতেন এবং

বিগ্রহের মুখে দুগ্ধ ও দেবতার নিকট ছাগ বলি দিয়া এবং এবং লাল খড়ির সাহায্যে নাসিকা ও কর্ণে তিলক-সেবা প্রভৃতি দ্বারা ভক্তেরা যথারীতি পূজার অনুষ্ঠান করিতেন।

নালন্দার ধ্বংসাবশেষ এখনও সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। বহুদিন পূর্ব্বে Cunningham এবং Broadley সাহেবদ্বয় ইহার চতুঃসীমার একটা মোটামুটি পরিমাপ লন। কিন্তু সে মাপ ফলদায়ক না হওয়ায় পরে Archaeological Survey দ্বারা ইহার মাপ লওয়া হয়। তাহাতে দেখা গিয়াছে, উহার মাপ ১৬০০ × ৪০০ ফুট।

য়ুয়ন্-চোয়ঙ্-বর্ণিত নালন্দা মহাবিহারের প্রাচীর দেখা যায় না। Broadley তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরে খনন-কার্য্য যখন অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিল তখন প্রাচীরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল —উহাতে একটী তোরণ-দ্বারও ছিল। ধ্বংসাবশেষের সমস্তই একরূপ প্রাচীরের মধ্যেই অবস্থিত। প্রাচীরের বাহিরেও বহু বিহার ও স্তূপাদি দেখা যায়—তাহার কতকগুলি নিদর্শনও পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীরের মধ্যে যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আছে সেগুলি নালন্দা-বিহারের। এই ধ্বংসাবশেষের অধিকাংশই ইষ্টকনির্ম্মিত। ইহার মধ্যে কতকগুলি কুটাকৃতি (Conical) উচ্চ বিহারের
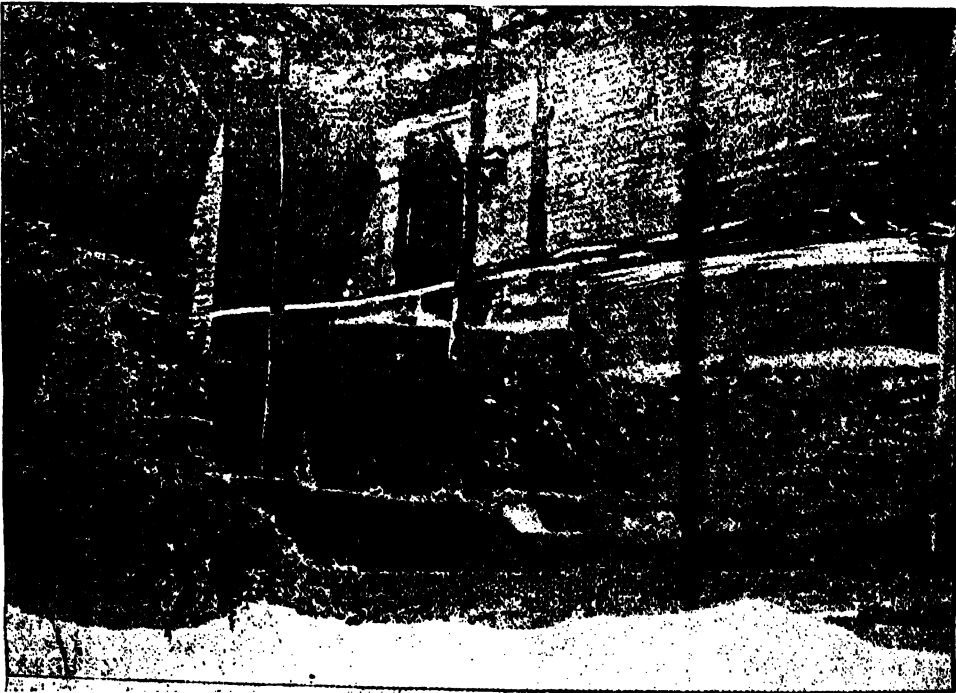
বিহারের পশ্চিমদিকের প্রধান প্রবেশ-পথ

উহা কৃষ্ণের স্ত্রী রুক্মিণীর জন্মস্থান বলিয়া অভিহিত করিতেন। রুক্মিণী বিদর্ভ কিংবা বেরারের রাজা মহারাজ ভীষ্মের কন্যা। Cunnigham বলেন, বেরারের স্থানে ভুল-ক্রমে বিহার হওয়াই সম্ভব। Broadley সাহেব এ মতের সমর্থন করেন। তিনি বলেন, বড়গাঁর অধিকাংশ প্রতিবাসী জগদীশপুরের ধ্বংসাবশেষকে রুক্মিণীর পিতার আবাসস্থান বলিত এবং সেইজন্য উহার নামও রাখিয়াছিল "রুক্মিণ-থান"। নালন্দা হইতে জগদীশপুরের দূরত্ব মাত্র আধ মাইল। জগদীশপুর নালন্দার পার্শ্বেই অবস্থিত বলা যায়, এবং মূর্ত্তিটী এইরূপ অবস্থায় থাকায় স্থানীয় জন-সাধারণের এইরূপ ভুল হইয়া থাকিবে, ইহাতে আশ্চার্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

আলি অর্থাৎ ভিত্তির উপরিস্থিত চারিদিকের দেওয়াল বিশেষে দ্রষ্টব্য। সেগুলি উত্তর দিক হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহারগুলি য়ুয়ন্-চোয়ঙ্-বর্ণিত ছয়টী বিহারের সাক্ষাৎ দেয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্র এবং বৌদ্ধরাজ-পরিচালিত হইলেও হিন্দুর সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। চারি দিকের মূর্ত্তি, শিলা-লিপিতেও এ সম্বন্ধের পরিচয় বেশ সুন্দরভাবে পাওয়া যায়। যেখানে বুদ্ধ কিংবা মায়াদেবীর মূর্ত্তি, সেইখানেই

বিষ্ণু, শিব এবং ব্রহ্মার বিগ্রহ অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে একটী বিষ্ণু ও দুর্গার মূর্ত্তির মাথার উপর বুদ্ধদেবের একটী মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে। অবশ্য ইহাতে উভয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতের উদারতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে ভগবানের নাম অবতার বলিয়া স্বীকার করেন।

য়ুয়ন-চোয়ঙ্ তাঁহার বিচরণের প্রথমে আবেষ্টনী প্রাচীরের বাহিরে একটী বিহার অর্থাৎ মন্দিরের কথা বলিয়াছেন। তথায় ভগবান বুদ্ধদেব তিন মাস কাল থাকিয়া তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। খনন-কার্য্যের সময় Major Cunningham সাহেব মন্দিরটীর আবিষ্কার করেন। উক্ত মন্দিরটী বড়গাঁ ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এখনও উহার উচ্চতা ৫৩ ফুট এবং উপরের প্রস্থ ৬৫ হইতে ৭০ ফুট পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ইহার কিছু দক্ষিণে একটী ছোট স্তূপ ছিল, তাহাতে এক-জন ভিক্ষু বাস করিতেন এবং বুদ্ধদেবের সম্মানার্থ 'পঞ্চাঙ্গ' পূজার অনুষ্ঠান করিতেন। আরও দক্ষিণে একটী অব-লোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটী কষ্টিপাথ-রের ও অতি সুশ্রী এবং তাহার মস্তকের চতুর্দ্দিকে সপ্তফণা

নালন্দায় অবলোকিতেশ্বর

বিশিষ্ট সমর্পণ। ইহার উপরে আবরণের জন্য নিশ্চয়ই কোন মন্দির কিংবা স্তূপ ছিল, কারণ উহার চতুর্দ্দিকে খিলানের আলির সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিটীর দক্ষিণে আর একটী স্তূপ ছিল—তাহাতে বুদ্ধদেবের চুল ও নখ থাকিত। রুগ্ন ব্যক্তিগণ উহার চারিদিকে ঘুরিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিত। উহার আরও দক্ষিণে ঠিক এইরূপ আর একটী স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে। এখনও উহার উচ্চতা ২০ ফুট।

মহাবিহারের পশ্চিমদিকে প্রাচীরের বাহিরে এক স্তূপ ছিল। এখানে ভগবান্ বুদ্ধদেবকে ভিন্নমতাবলম্বী কোন ব্যক্তি জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ইহার ঠিক পূর্ব্বদিকে একটী খুব বড় বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এখনও উহা ৬০ ফুট উচ্চ। মাটী হইতে ৫০ ফুট উপরের ব্যাস ৭০ ফুট এবং মাটী হইতে ৩৫ ফুট উপরে ৮০ ফুট। দেওয়ালের বাহিরের দিকের অনেকটা অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। উহার ভিত্তির পূর্ব্ব-আয়তন সমচতুষ্কোণ ৯০ ফুটের কম ছিল না।

এই সমুদায় ধ্বংসাবশেষের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে কতক-গুলি ছোট ২ স্তূপ পাওয়া যায়। সবগুলিরই উচ্চতা ১০ হইতে ৩০ ফুটের মধ্যে। এই স্তূপগুলি নানা আকারের গাঢ় নীল রঙের পাথরে প্রস্তুত—এখনও অনেকগুলি বেশ সুন্দরভাবে অবস্থিত। উহাদের মাথায় অর্দ্ধগোলাকৃতি চূড়াগুলির ব্যাস ১ হইতে ৪ ফুটের মধ্যে। এই স্তূপ-সমূহে বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলী বেশ সুন্দরভাবে ক্ষোদিত আছে। ইহাদের ভিত্তি এবং উপরের প্রস্তর সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের এবং দুইটীর মধ্যে লৌহ দিয়া বেশ শক্তভাবে আটকান। অনেকদিন টেঁকসই করিবার জন্যই যে এই ব্যবস্থা হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই মন্দিরের দক্ষিণে আর একটী বিহার পাওয়া যায়। এটী বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের মন্দির। কর-পদ্মধৃত তিব্বতীয় পদ্মপাণি এবং এই অবলোকিতেশ্বরের গঠনপ্রণালী একই প্রকারের।

উক্ত ধ্বংসাবলীর উত্তরে একটী খুব বড় ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহার অবস্থিত। এটী বালাদিত্যের মন্দির। এই মন্দিরের মধ্যে একটী বুদ্ধের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে—উহাই য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ বর্ণিত বালাদিত্য-মন্দিরের বুদ্ধবিগ্রহ হওয়াই সম্ভব।
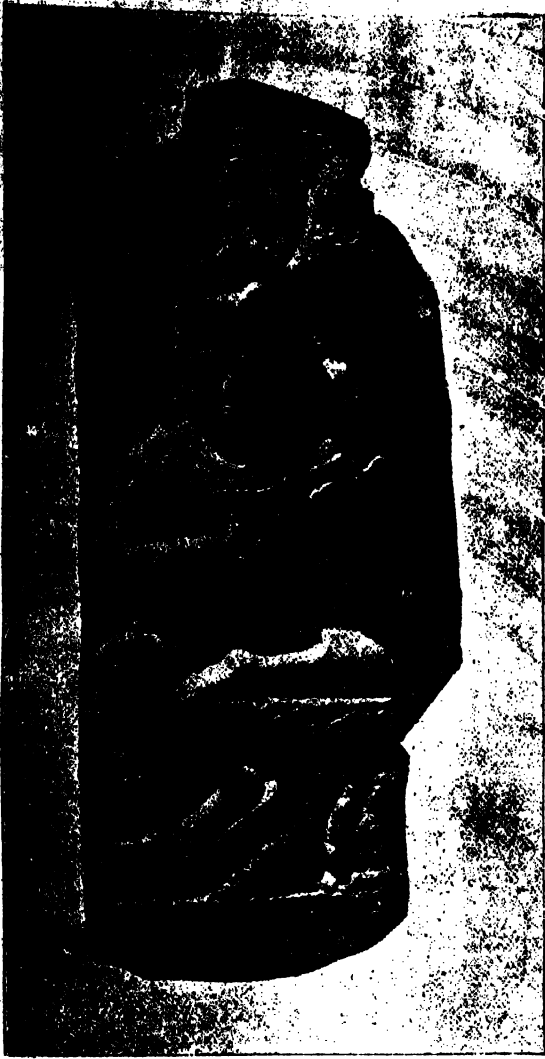
নালন্দার বজ্রপাণি

যুয়ন্-চোয়ঙ্ তাঁহার বিবরণে বালাদিত্য মন্দিরের উচ্চতা ২০০ ফুট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে হিসাব করিয়া দেখিলে কিংবা বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সহিত উহার তুলনা করিয়া দেখিলে ঐরূপই মনে হয়। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সহিত এই মন্দিরের তুলনা করিবারও অনেক কারণ আছে। যুয়ন্-চোয়ঙ্ তাঁহার বিবরণে বলিয়াছেন যে, গঠনকার্য্যে বুদ্ধগয়ার সহিত বালাদিত্য-মন্দিরের বেশ সামঞ্জস্য দেখা যায়। তিনি ইহার উচ্চতা ২০০ ফুট (কোন কোন স্থানে ৩০০ ফুট) বলিয়াছেন। এ কথা আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি, কারণ বর্ত্তমান আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষের মাপের সহিত ইহার বেশ সমতা দেখিতে পাওয়া যায়। *

কেহ কেহ বলেন যে, ব্রহ্মদেশীয় কোন ব্যক্তি এই বিহারের সংস্কার করেন। এ কথা একেবারেই ভিত্তিহীন—কারণ এই মন্দিরের দ্বারের প্রস্তরলিপি হইতে দেখা যায় যে, মহাবিহার তৈলাকে-বংশীয় বালাদিত্য কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছিল। Captain Marshall খনন-কার্য্যের সময় ইহার আবিষ্কার করেন। উহাতে লেখা আছে—

শ্রীমন্মহীপাল দেবরাজ্যে:সম্বত॥ অগ্নী রাম্বার ততে দেয়ধর্ম্মায়ং পবরমা[ম] হবযান যাযীনঃ পরমোপাসক শ্রীমত্তৈলাঢকীয়জ্ঞাণীয় কৌশাম্বী বিনির্গতস্য হরদত্ত নপ্ত গু'রুদত্ত সুত শ্রীবালাদিত্যস্য যদত্র পুণ্যং তন্মতু সর্ব্বসত্ব রাশেরত্ত সুরজ্ঞানাবাপ্তব ইতী॥ অর্থাৎ

শ্রীমৎ মহীপাল দেবের † রাজত্বের সময় সংবৎ ৯১৩ (অর্থাৎ ৮৫৬ খৃষ্টাব্দে)‡ পরম উপাসক তৈলাঢকবংশীয় জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ হরদত্ত-পুত্র গুরুদত্তের পুত্র শ্রীবালাদিত্য কৌশাম্বী হইতে আসিয়া ধর্ম্মাত্মক কার্য্যে এই দান উৎসর্গ করেন। ইহা হইতে যেরূপ শিক্ষাই পাওয়া যাক না কেন, মনুষ্য সমাজে ইহা শ্রেষ্ঠজ্ঞানের উন্নতির কারণ হউক।

উক্ত প্রস্তর-লিপিটী মাত্র ১২ লাইনে লিখিত এবং

* বালাদিত্যের এই মন্দিরটী প্রথমে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে Cunningham সাহেব আবিষ্কার করেন। পরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে A. M. Broadley সাহেব উহার খনন-কার্য্য সমাধা করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে Cunningham সাহেব নালন্দায় পুনরায় গমন করেন এবং পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করিবার পরে বোধিদ্রুম-মন্দিরের উপকরণ, গঠন-পদ্ধতি প্রভৃতির সহিত উহার তুলনা করিয়া যুয়ন্-চোয়ঙএর কথাই যথার্থ বলিয়া মানিয়া লন।

† সারনাথের প্রস্তরলিপিতে এই রাজার রাজত্বকাল ১০২৬ খৃষ্টাব্দ অথবা ১০৪৩ সংবৎ পাওয়া যায়।

‡ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই প্রস্তরলিপির প্রথম অনুবাদ করেন। লিপিটীতে ইহার সময় সাঙ্কেতিক কথায় লিপিবদ্ধ আছে, অর্থাৎ অগ্নি, রাম এবং দ্বার। ইহাতে বেশ একটু রহস্যের যে সৃষ্টি হয় না, তাহা নহে। রাজেন্দ্রবাবু এই রহস্যের দ্বার উদ্মোচন করেন। অগ্নির সংখ্যা ৩, রাম অর্থাৎ শক্তির সংখ্যা ১ এবং দ্বারের সংখ্যা ৯। তিনটী পরের পর রাখিলে ৩১৯ হয়। কিন্তু 'অঙ্ক-বামগতি'র নিয়ম অনুসারে অক্ষরগুলিকে উল্টা করিয়া বসাইলে ৯১৩ সংখ্যা পাই। সুতরাং মূর্ত্তিটীর প্রতিষ্ঠা-কাল ৯১৩ সংবৎ।

একটী ৪×৫ ফুট বুদ্ধমূর্ত্তির নিম্নে ক্ষোদিত হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ কঠিন প্রস্তর-নির্ম্মিত। প্রশস্ত বারান্দার অন্তরালে দ্বারদেশে অবস্থান করায় এবং ধ্বংসাবস্থায় বহুকাল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থাকায় মূর্ত্তিটী ঠিক নূতনের মত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে লেখা আছে 'দেয়ধম্মায়ং' অর্থাৎ 'ধর্ম্মাত্মক কার্য্যে' ইহার প্রতিষ্ঠা হইল। এখানে প্রস্তর-লিপিটীর প্রতিষ্ঠা হইল, কি সমস্ত দ্বারদেশের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। মন্দিরটী পর্য্যবেক্ষণ করিলেই দেখা যাইবে যে, প্রধানতঃ উহা মাটী, চুণ ও ইষ্টকের দ্বারা তৈয়ারী এবং মাঝে মাঝে উহার সংস্কার হইয়াছে। দ্বারটী যে কোন সংস্কার-কার্য্যের সময় নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যায়। সুতরাং সংস্কারান্তে ঐ দ্বারটীর পুনঃস্থাপন হওয়াই সম্ভব।

বালাদিত্যের মন্দিরের দ্বারের প্রস্তরলিপি

যুয়ন্-চোয়ঙ্ অথবা ঈ-চিঙ্গ যে অধ্যয়ন-গৃহ অথবা হল-ঘরের কথা বলিয়াছেন তাহার সন্ধান প্রথমে পাওয়া যায় Broadley সাহেবের খনন-কার্য্য হইতে। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তিনি মাটীর কিছু উপরে প্রায় ১০০ ফুট সমচতুষ্কোণ একটী প্রস্তর-বিশিষ্ট চকের আবিষ্কার করেন। ইহার ঠিক মধ্যস্থলে একটী খুব বড় মন্দির ছিল—তাহার ভিত্তিস্থানের আয়তন সমচতুষ্কোণ ৮০ ফুট। ইহাতে চার পাঁচটী অলিন্দ ছিল। প্রত্যেক অলিন্দ হইতে অপর অলিন্দের ব্যবধান ১৪ ফুট। এই মন্দিরটী সমস্তই ইটের তৈয়ারী। প্রত্যেক ইটের আয়তন ১ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা, ৩ ইঞ্চি পুরু এবং ১০ ইঞ্চি চওড়া। এই ইটগুলি পরস্পর এমন ভাবে রক্ষিত যে, উহাদের জোড়ের স্থান খুব সূক্ষ্ম। মন্দিরটীর প্রথম দুইটী তল একেবারে মাটীর মধ্যে সমাহিত থাকায় উহার আবিষ্কারে উহাকে নূতনের মতনই মনে হয় এবং যুয়ন্-চোয়ঙের বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। এই মন্দিরের প্রধান দরজাটী উত্তর দিকে অবস্থিত। চকের চারিদিকে বহু হল-ঘর, অট্টালিকা ইত্যাদি ছিল, কেবলমাত্র পূর্ব্বদিকে ছাত্রদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের রোয়াক বাহির করা হয়। পূর্ব্বদিকে প্রবেশ পথে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত সিঁড়ি আছে। মাটীর উপরে-মন্দিরের যে অংশ বাহির হইয়া আছে উহা, প্রায় ৫ফুট উচ্চ। উহার গাত্রে নানারূপ

নালন্দার বুদ্ধমূর্ত্তি

স্তূপের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণের দৃশ্য

জন্য গয়া এবং রাজগৃহ অঞ্চলে পাঁচটী গ্রাম দান করা হইল। সুমাত্রারাজ শ্রীবালপুত্রের অনুরোধে এই দানের ব্যবস্থা হয়।

সম্প্রতি Mr. Page কর্ত্তৃক যে খননকার্য্য হইতেছে তাহা হইতে অনেক নূতন সংবাদ জানিতে পারা গিয়াছে বিহারাবলী এবং স্তূপশ্রেণীকে লইয়াই তাঁহার কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছে। তবে তাঁহার কার্য্য স্তূপশ্রেণীর সম্পূর্ণ দক্ষিণদিকে একটী বৃহৎ ধ্বংসাবশেষেই সংসৃষ্ট। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপটীর পূর্ব্বাবস্থায় উপর্য্যুপরি বহুবার উহার উপর স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। পার্শ্বে পর্ব্বতাকৃতি যে বিরাট স্তূপটীর চিত্র দেওয়া হইয়াছে উহাই উক্ত স্তূপের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের দৃশ্য। ইহা সম্পূর্ণ ইটের তৈয়ারী এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার জন্য ইহাকে যেরূপ ভাবে গঠন করা হইয়াছে, তাহা আশ্চর্য্যজনক। Mr. Page বলেন, ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব এই যে, ইহা মাটীর উপর অসংখ্য চূণের মূর্ত্তিতে পরিশোভিত। সেগুলি এমন সুন্দরভাবে রক্ষিত যে, এখনও তাহাদের অনেকগুলি অভগ্ন এবং ভঙ্গিমা-মাধুর্য্যে সুন্দর। পরবর্ত্তী চিত্রটীতে তাহার দৃষ্টান্ত বেশ পাওয়া যাইবে। এই স্তূপটী সমচতুষ্কোণ, কিন্তু উপরে উহা গোল আকার ধারণ করিয়াছে—সর্ব্বোপরি একটী গোল চূড়াও ছিল। এই স্তূপের মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই বুদ্ধদেবের—সেগুলি নিয়মিত ধ্যানাবস্থায় অধিষ্ঠিত। উহাদের আয়তন ২ ফুট ১০ ইঞ্চি × ১ ফুট এবং তাহার অপেক্ষা কিছু কম ও বেশী। দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর এবং একটী ভগ্ন তারামূর্ত্তিও উহাতে পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিগুলির গঠন-পদ্ধতি এবং ভঙ্গিমা দেখিয়া Mr. Page অনুমান করেন যে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতে ৮ম শতাব্দীর মধ্যে স্তূপটীর প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব।

কিন্নর, পক্ষী, সিংহ, মহাদেব, পার্ব্বতী, যম প্রভৃতির মূর্ত্তি খোদিত আছে। মূর্ত্তিগুলি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দীর কোন প্রাচীন মন্দির হইতে সংগৃহীত হওয়াই সম্ভব—এ মত ডাঃ স্পুনার সমর্থন করেন।

সম্মুখের দিকে প্রথম হলটী বেশ সাধারণ ধরণের। উহার আয়তন ৫০×২৬ ফুট। ১২টী বড় থামের উপর উহার ছাদ রক্ষিত। প্রথম চত্বরের চারিদিকের প্রাচীরটী এখনও প্রায় ১০ ফুট উচ্চ। উহার সহিত প্রধান তোরণ দ্বারটীরও পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। উহা প্রায় ২০ ফুট চওড়া এবং ১২ ফুট উচ্চ।

ইহাদের নিকটে গুহার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট একটী খিলান-করা ঘর আবিষ্কৃত করা হয়। উহার ছাদ রাজগৃহের সোন-ভাণ্ডার গুহার ছাদের মত হস্তিপৃষ্ঠের ন্যায়। এগুলিতে ভিক্ষুরা যোগাভ্যাস করিতেন। এই চকের উপরিভাগে ভিক্ষুদের বাসস্থানের জন্য প্রকোষ্ঠ ছিল। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের মধ্যে অল্প পরিসর কুলঙ্গীর ন্যায় স্থানে তাঁহারা শয়ন করিতেন। এই বিহারটীর প্রবেশ-দ্বারের ভিতরে পণ্ডিত হীরানন্দ শাস্ত্রী একটী তাম্রশাসন প্রাপ্ত হন। তাম্রশাসনটী ৮৯১ খৃষ্টাব্দের। উহাতে লিখিত আছে যে, নালন্দা-বিহারের গৃহ নির্ম্মাণার্থ এবং ভিক্ষুগণের আহার ও বাসের সুবিধার

নালন্দার ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের সর্ব্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য 'বটুক-ভৈরব'। * উহা নালন্দার মন্দিরতলের একটী মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত চকের কিছু উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটী বৃহৎ বটগাছ আছে, উহার নিম্নে এই মূর্ত্তিটী অবস্থিত। মূর্ত্তিটী খুব সুন্দর। এখানকার মূর্ত্তিগুলির প্রত্যেকটীর মাথার উপর নাম দেওয়া আছে। ইহাতে আর্য্য শারিপুত্র এবং আর্য্য মৌদ্‌গল্যায়নের দুইটী মূর্ত্তি আছে। উহারা উড্ডীয়মান অবস্থায় ফুলের মালা ধরিয়া আছে। প্রধান মূর্ত্তিটীর দুই পার্শ্বে আরও দুইটী মূর্ত্তি, মন্দিরের নিকট অবস্থিত। মূর্ত্তিটীর গঠন-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে 'কপতিয়া' নামক স্থানে অনেকগুলি মূর্ত্তি একসঙ্গে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বজ্রবারাহী এবং বাগীশ্বরীর মূর্ত্তি অন্যতম। সেগুলিতে নালন্দার ও শ্রীগোপালদেবের নাম পাওয়া যায়। য়ুয়ন-চোয়ঙ্ একটী দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের কথা বলিয়াছেন, উহার ঐশীশক্তি ছিল। কষ্টিপাথরের একটী দণ্ডায়মান পদ্মপাণি অথবা অবলোকিতেশ্বরের সুন্দর

ভিত্তিগাত্রে চুণের ভাস্কর্য্যের নিদর্শন
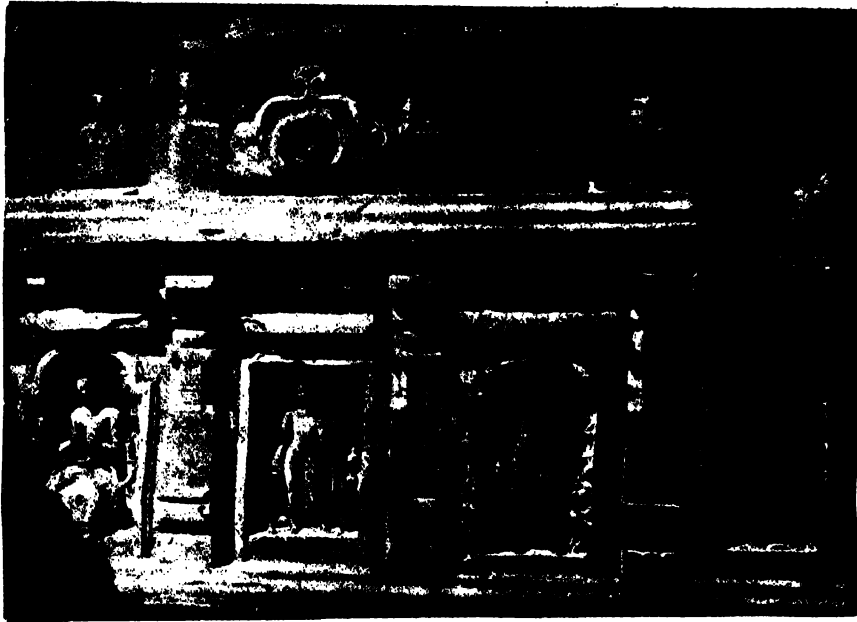
আর্য্য বসুমিত্র এবং আর্য্য মিত্রসেন দণ্ডায়মান। এই 'বটুক-ভৈরবের' নিকটেই একটী ছোট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে—উহাতে ত্রিমস্তক-বিশিষ্টা অষ্টভুজা একটী বজ্রবারাহীর মূর্ত্তি পাওয়া যায়।

নালন্দার ধ্বংসাবশেষ হইতে একটী সিংহাসনের একটী ক্ষুদ্র অংশ দেখিয়া মনে হয় যে উহা প্রাচীন কালের ভাস্কর্য্যের মত নয়। এইখানে দেখা যায় হস্তীর পরিবর্ত্তে Dragonএর মূর্ত্তি করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মূর্ত্তি কিংবা পাথরের কারুকার্য্যের সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। বড়গাঁ গ্রামের মধ্যেই একটী দীর্ঘাকৃতি বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে—সেটী একটী হিন্দু মূর্ত্তিকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সেই মূর্ত্তিই বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

Broadley সাহেব তাঁহার বিবরণে ১১টী মূর্ত্তি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ডাঃ স্পুনার ৬০০ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মোহর এবং ২১১ খানি প্যানেল প্রাপ্ত হইয়াছেন। নালন্দার এইরূপ দু'একটী মোহর এবং প্যানেল দেখিয়াছি। মোহরের লেখাগুলি বেশ স্পষ্ট পড়া যায়, প্যানেলগুলিও বেশ সুন্দর। ডাঃ স্পুনারের সংগৃহীত প্যানেলগুলির প্রত্যেকখানি বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট এবং বিচিত্র অঙ্কন-নৈপুণ্যে মনোরম। আর একটী জিনিসের পরিচয় এখানে দিব। উহা একছড়া মালা। সম্ভবতঃ জপের জন্যই উহা ব্যবহৃত হইত। বহু

* ইহার বর্ত্তমান নাম 'তেলিয়া-ভাণ্ডার'।

সিংহাসনের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ

প্রাচীনপুথির পুষ্পিকা এবং তৎকালীন অনেক দ্রব্যও নালন্দার ধ্বংসাবশেষে বাহির হইয়াছে। নালন্দায় আর একটী দ্রব্য বিশেষ দ্রষ্টব্য। ইহা একটী প্রস্তর-লিপি। ইহাতে বালাদিত্যের মন্দিরের একটী দানের কথা লিপিবদ্ধ আছে। উহাতে লেখা আছে যে, নালন্দায় সুন্দর সুন্দর সৌধশ্রেণী এবং অসংখ্য স্তূপাবলী থাকায় বহু প্রসিদ্ধ অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত সেখানে বাস করিতেন। ঠিক এই স্থানের ধ্বংসাবশেষেই দেবপালের একটী তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় যে, সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা) এবং যবদ্বীপের একজন রাজা নালন্দায় একটী বিহার স্থাপন করেন।

নালন্দা আবিষ্কারের অধিকাংশ দ্রব্যই Major Cunningham এবং Broadley সাহেব সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি উহার খননকার্য্য আরও বর্দ্ধিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত যে সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে সে গুলি দেখিয়া মনে হয় খনন-কার্য্য আরও অগ্রসর হইলে বহু ঐতিহাতিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। ইতিমধ্যেই বহু মূর্ত্তি এবং দ্রব্যাদি মিউজিয়াম এবং পাঠাগার প্রভৃতিতে পাঠান হইতেছে ইহাতে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে নূতন আলোকপাত হইবে তাহা আশা করা যায়।

নালন্দার জপমালা

জানবার কথা

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৬

শব্দ-চয়ন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা ভাষায় গদ্য লিখতে নতুন শব্দের প্রয়োজন প্রতিদিনই ঘটে। অনেক দিন ধ'রে অনেক রকম লেখা লিখে এসেছি। সেই উপলক্ষ্যে অনেক শব্দ আমাকে বানাতে হ'ল। কিন্তু প্রায়ই মনের ভিতরে খট্‌কা থেকে যায়। সুবিধা এই যে, বার বার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দবিশেষের অর্থ আপনি পাকা হ'য়ে ওঠে, মূলে যেটা অসঙ্গত, অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে। তৎসত্ত্বে সাহিত্যের হট্টগোলে এমন অনেক শব্দের আমদানি হয়, যা ভাষাকে যেন চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে। যেমন 'সহানুভূতি'। এটা sympathy শব্দের তর্জ্জমা। 'সিম্প্যাথি'-র গোড়াকার অর্থ ছিল 'দরদ'। ওটা ভাবের আমলের কথা, বুদ্ধির আমলের নয়। কিন্তু ব্যবহারতঃ ইংরেজীতে 'সিম্প্যাথি'র মূল অর্থ আপন ধাতুগত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই কোনো একটা প্রস্তাব সম্বন্ধেও সিম্প্যাথি-র কথা শোনা যায়। বাংলাতেও আমরা ব'লতে আরম্ভ করেছি—'এই প্রস্তাবে আমার সহানুভূতি আছে'। বলা উচিত, 'সম্মতি আছে', বা 'আমি এর সমর্থন করি'। যাই হোক্—সহানুভূতি কথাটা যে বানানো কথা এবং ওটা এখনো মানান-সই হয়নি, তা বেশ বোঝা যায়—যখন ও শব্দটাকে বিশেষণ করবার চেষ্টা করি। 'সিম্প্যাথিটিক্'-এর কী তর্জ্জমা হ'তে পারে, 'সহানুভৌতিক', বা 'সহানুভূতিশীল', বা 'সহানুভূতিমান্'? ভাবায় যেন খাপ খায় না—সেই জন্যেই আজ পর্য্যন্ত বাঙালী লেখক এর প্রয়োজনটাকেই এড়িয়ে গেছে। দরদের বেলা 'দরদী' ব্যবহার করি, কিন্তু সহানুভূতির বেলায় লজ্জায় চুপ ক'রে যাই। অথচ সংস্কৃত ভাষায় এমন একটী শব্দ আছে, যেটা একেবারেই তথার্থক। সে হচ্ছে 'অনুকম্পা'। ধ্বনিবিজ্ঞানে ধ্বনি ও বাদ্যযন্ত্রের তারের মধ্যে সিম্প্যাথির-কথা শোনা যায়—যে সুরে বিশেষ কোনো তার বাঁধা, সেই সুর শব্দিত হ'লে সেই তারটী অনুকম্পিত ও অনুধ্বনিত হয়। এই ত 'অনুকম্পন'। অন্যের বেদনায় যখন আমার চিত্ত ব্যথিত হয়, তখন সেই ত ঠিক 'অনুকম্পা'। 'অনুকম্পায়ী' কথাটা সংস্কৃতে আছে। 'অনুকম্পাপ্রবণ' শব্দটাও মন্দ শোনায় না। 'অনুকম্পালু' বোধ করি ভালোই চলে। মুস্কিল এই যে, দখলের দলিলটাই ভাষায় স্বত্বের দলিল হ'য়ে ওঠে। কেবলমাত্র এই কারণেই 'কান, সোনা, চুন, পান' শব্দগুলোতে মূর্দ্ধন্য ণ-য়ের অনধিকার নিরোধ করা এত দুঃসাধ্য হয়েচে। ছাপাখানার অক্ষর-যোজকেরা সংশোধন মানে না। তাদের প্রশ্ন করা যেতে পারত যে, কানের এক সোনায় যদি মূর্দ্ধন্য-ণ লাগল, তবে অন্য সোনায় কেন দন্ত্য ন লাগে। 'শ্রবণ' শব্দের রফলা লোপ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্দ্ধন্য ণ, সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে দন্ত্য ন হয়েচে। অথচ 'স্বর্ণ' শব্দ যখন রেফ বর্জ্জন ক'রে 'সোনা' হ'ল, তখন মূর্দ্ধন্য ণ-য়ের বিধান কোন্ মতে হয়? হাল আমলের নতুন সংস্কৃত পোড়োরা 'সোনা'কে শোধন ক'রে নিয়েচেন, তাঁদের স্বকল্পিত ব্যাকরণবিধির দ্বারা—এখন দখল প্রমাণ ছাড়া স্বত্বের অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য হ'য়ে গেল। 'শ্রবণ' শব্দের অপভ্রংশ শোনা শব্দ যখন বাংলা ভাষায় বানান-দেহ ধারণ করেছিল, তখন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি

প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিধানকর্ত্তা ছিলেন—সেদিনকার বানানে কান সোনা প্রভৃতিরও মূর্দ্ধন্যত্ব প্রাপ্তি হয়নি।

কিছুকাল পূর্ব্বে যখন ভারতশাসনকর্ত্তারা 'ইণ্টার্ন্' সুরু ক'রলেন, তখন খবরের কাগজে তাড়াতাড়ি একটা শব্দ সৃষ্টি হ'য়ে গেল—'অন্তরীণ'। শব্দসাদৃশ্য ছাড়া এর মধ্যে আর কোনো যুক্তি নেই। বিশেষণে ওটা কী হ'তে পারে, তাও কেউ ভাবলেন না। Externmentকে কি ব'লতে হবে 'বহিরীণ'? অথচ 'অন্তরায়ণ, অন্তরায়িত, বহিরায়ণ, বহিরায়িত' ব্যবহার ক'রলে আপত্তির কারণ থাকে না, সকল দিকে সুবিধাও ঘটে।

নূতন সংঘটিত শব্দের মধ্যে কদর্য্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা'। প্রথমতঃ শিক্ষার মূলের দিকে বাধ্যতা নয়, ওটা শিক্ষার পিঠের দিকে। বিদ্যাদান বা বিদ্যালাভই হচ্চে শিক্ষার মূলে—তার প্রণালীতেই 'কম্পাল্‌শন্'। অথচ 'অবশ্য-শিক্ষা' শব্দটা বলবামাত্র বোঝা যায় জিনিসটা কি। 'দেশে অবশ্য-শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা উচিত'—কানেও শোনায় ভালো, মনেও প্রবেশ করে সহজে। 'কম্পালসারি এডুকেশন'-এর বাংলা যদি হয় 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা', 'কম্পালসারি সাবজেক্ট' কি হবে 'বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয়'? তার চেয়ে 'অবশ্যপাঠ্য বিষয়', কি সঙ্গত ও সহজ শোনায় না? 'ঐচ্ছিক' (optional) শব্দটা সংস্কৃতে পেয়েছি, তারি পরিবর্ত্তে 'আবশ্যিক' শব্দ ব্যবহার চলে কি না, পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি। ইংরেজিতে যে সব শব্দ অত্যন্ত সহজ ও নিত্য প্রচলিত, দরকারের সময় বাংলায় তার প্রতিশব্দ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা বানিয়ে দিতে হয়। সেটা অনেক সময় বেখাপ হ'য়ে দাঁড়ায়, অনেক সময় মূল ভাবটা ব্যবহার করাই স্থগিত থাকে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয় ত তার অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব্দ দুর্লভ নয়। একদিন 'রিপোর্ট' কথাটার বাংলা করবার প্রয়োজন হয়েছিল। সেটাকে বানাবার চেষ্টা করা গেল, কোনটাই মনে লাগল না। হঠাৎ মনে পড়ল কাদম্বরীতে আছে 'প্রতিবেদন'—আর ভাবনা রইল না। 'প্রতিবেদন, প্রতিবেদিত, প্রতিবেদক'—যেমন ক'রেই ব্যবহার করো, কানে বা মনে কোথাও বাধে না। জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি—'ওভারপপ্যুলেশন'—বিষয়টা আজকাল খবরের কাগজের একটা নিত্য আলোচ্য; কোমর বেঁধে ওর একটা বাংলা শব্দ বানাতে গেলে হাঁপিয়ে উঠতে হয়—সংস্কৃত শব্দকোষে তৈরি পাওয়া যায়, 'অতিপ্রজন'। বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্বন্ধে 'রেসিডেণ্ট', 'নন্‌রেসিডেণ্ট' বিভাগ করা দরকার, বাংলায় নাম দেবো কি? সংস্কৃত ভাষায় সন্ধান ক'রলে পাওয়া যায় 'আবাসিক', 'অনাবাসিক'।

বর্ত্তমান জগৎ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

রুশিয়ায় দাড়ী ধ্বংস—পিটার দি গ্রেট ১৬৮২ খৃঃ হইতে ১৭২৫ খৃঃ পর্য্যন্ত রুষিয়ায় রাজত্ব করেন। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন সে-সময়ে রুশিয়ার অধিকাংশ লোকই অসভ্য ছিল। নানাবিধ কুসংস্কার তাহাদের উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ ছিল। দাড়ী রাখা প্রথা তখন বিশেষ ভাবে প্রচলিত। পিটার দি গ্রেট আদেশ প্রচার করিলেন—রাজ্যের সমস্ত পুরুষকে দাড়ী কামাইয়া ফেলিতে হইবে। এই আদেশে রাজ্যময় বিষম হৈ চৈ পড়িয়া গেল। দেশের লোক সকলেই মনে করিত, দাড়ী রাখা ঈশ্বরের আদেশ। সুতরাং রাজার হুকুমে দাড়ী কামাইতে অনেকেই রাজী হইল না। কিন্তু রাজার কঠোর আদেশ অবজ্ঞা করাও চলে না। তাই অনেকে দাড়ী কামাইল, অনেকে বা দেশ হইতে পলাইয়া বিদেশে আশ্রয় লইল। আবার অনেক দাড়ীধারী বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কিন্তু রাজার সঙ্গে কেহই পারিয়া উঠিল না। দেশে নাপিত না থাকায় রাজা ইংল্যাণ্ড হইতে নাপিত আনাইয়া দাড়ী কাটাইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিনের মধ্যে রুশিয়ার দাড়ীলীলা ধ্বংস লাভ করিল।

কায়স্থ সমাজ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৩৭

দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে [illegible]

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা। প্রাচীন বঙ্গদে বঙ্গদেশের পার্থক্য আকাশ-পাতা তখনকার খাদ্য-দ্রব্য ও বস্ত্রাদির বিষ "মহারাজ নন্দকুমার" নামক গ্রন্থে দে ১৭৭৪ খৃঃ নবেম্বর মাসে নবাব মীরজাফ ক্লাইবের সহিত দেখা করিতে আসেন

দ্রব্যাদির এক ব্যয়-তালিকা এই পুস্তকে আছে। সে-সময় ভাল চাউল এক মণের দাম ছিল ১৮/০ আনা। উৎকৃষ্ট ঘৃত একমণ ১৫।৶৮ গণ্ডা। সর্ষপ তৈল একমণ ৮॥০ টাকা। লবণ ১।০ মণ। প্রতি মণ ময়দা ৩।৶০ ও দেশী চিনি ৭।০ প্রতি মণ। মিষ্টান্নের মণ ছিল ১০৲ টাকা। একমণ কিস-মিস বাদাম পাওয়া যাইত ৩১।০ দামে। দধির মণ ২॥০ টাকা। একটা ছাগলের দাম এক টাকা। একখান কাপড়ের দাম ১০৲ টাকা এবং একমণ ডাইল ২॥০ মূল্যে বিক্রীত হইত।

স্থতা কাটার প্রথা বহু পরিবারে প্রচলিত ছিল। স্থতার বিনিময়ে কাপড় পাওয়া যাইত। সাধারণ গৃহস্থ পুরুষের কাপড় ও চাদর হইলেই চলিত, পিরাণের দরকারই ছিল না। মেয়েদের শাড়ীই যথেষ্ট ছিল

যৌথ-পরিবার বাঙ্গালার একটা বৈশিষ্ট্য। পূর্ব্বে এইরূপ পরিবারের সংখ্যা অত্যধিক ছিল। তখন হিন্দু মুসলমানে এত রেষারেষি ছিল না এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর সহিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর অধিকতর প্রীতি বর্ত্তমান ছিল।

সেকালে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম মাত্রেই চতুষ্পাঠী ছিল; মুসলমান গ্রামে মক্তব ছিল; গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ছিল। ব্রাহ্মণেরাই প্রায় টোলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিতেন, শাস্ত্রচর্চ্চায় নিরত হইতেন ও জনসাধারণকে শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত করিতেন। অধ্যাপক পণ্ডিতরা বিনা বেতনে খোরাকী দিয়া ছাত্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। চরিত্র শিক্ষা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দানেরও তাঁহাদের দায়িত্ব ছিল। তাঁহারা নির্লোভ ছিলেন। রাজা জমিদার ও ধনী লোকের অর্থ-সাহায্যে চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। বিদ্যাবিক্রয় পাপ বলিয়া গণ্য ছিল। কায়স্থাদি চাকরীজীবী জাতিরা মক্তবে ফার্সী শিখিতেন। বৈদ্যগণ সংস্কৃত শিখিতেন ও আয়ুর্ব্বেদ পড়িতেন। পাঠশালার শিক্ষকতা কায়স্থেরই একচেটিয়া ছিল। এখানকার মত সর্ব্ব জাতির যে বানানো পচলন ছিল না বটে, কিন্তু নিরক্ষর হইলেও তা বেশ বোঝা শিক্ষার ফল হইতে বঞ্চিত হইত না। চেষ্টা করি। 'পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিয়া তাহারা নীতিধর্ম্ম 'সহানুভৌতিক','ন উপার্জ্জনে সমর্থ হইত। শিক্ষার ব্যয়-ভাবায় যেন খাগ মাদুরের উপর বা ছোট ছোট চৌকির বাঙালী লেখককগণ শিক্ষা দান করিতেন

সতীদাহ অবাধে প্রচলিত ছিল। একজন কুলীন ব্রাহ্মণ শতাধিক পত্নী গ্রহণ করিতেন। বরপণের কথা লোকের অজ্ঞাত ছিল। কন্যাপণ প্রচলিত ছিল। সেই জন্য রাঢ়ী শ্রেণীর বংশজ ও শ্রোত্রীয় অনেককে পণের টাকা সংগ্রহ করিবার শক্তির অভাবে অবিবাহিত থাকিয়া বংশ লোপ করিতে হইয়াছে অথবা তাঁহারা ভরার মেয়ে বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করিয়াছেন।

নারীগণ লেখাপড়া করিতেন না। লেখাপড়া করিলে নারীগণ বিধবা হয়, এই সংস্কার সাধারণের মধ্যে ছিল।

তখনকার ব্রাহ্মণভোজন বলিতে ফলাহার বুঝাইত; অর্থাৎ দই, চিঁড়া ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি। তখন কুটুম্বাদি বাড়ীতে আসিলে নারিকেল-কোরা, বাতাসা, চিনি, ভক্তি, চিঁড়া, মুড়ি, মুড়কি, দুধ, দধি হইলেই তাঁহাদের যথেষ্ট জলখাবার আয়োজন হইত। সেকালের লোকের আহার-শক্তিও অত্যধিক ছিল। আহারান্তে কেহ কেহ একথালা পায়স, কেহ বা ৴৫ সের একখানা দধি ও সেরখানেক চিনি অনায়াসে ভোজন করিয়া ফেলিতেন। অনেকেই মদ্য পান করিতেন; মদ্য সহজেই পাওয়া যাইত।

তখন কবিরাজ ও হকিমগণ সর্ব্বত্র চিকিৎসা করিতেন। তখনকার আমোদ-প্রমোদ ছিল কবির গান, কীর্ত্তন, তরজা, বাই, খেমটা, পাঁচালী, ইত্যাদি। কথকতা, রামায়ণ গান ইত্যাদি পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-গঠনে সহায়তা করিত।

স্থলপথে ঘোড়া, হাতী ও উঠ এবং জলপথে নানাবিধ নৌকা, যাতায়াতের বাহন ছিল।

মুর্শিদাবাদ নগরই ছিল বাঙ্গালার প্রধান নগর। তাহার পরেই ঢাকা। ঢাকার বস্ত্রশিল্প তখনও বিদেশে আপন গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

প্রাচীন কালের এই বঙ্গদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদিগকে আবার মানুষ হইতে হইবে।

অর্চ্চনা, শ্রাবণ ১৩৩৭

মুসলমানের শিক্ষা ও সমাজ— খান বাহাদুর নাসিরুদ্দীন আহ্‌মদ। আরবী ফারসী উর্দ্দু বা মাদ্রাসা মক্তবের ঘোহেপ'ড়ে মুসলমানদের যে কি

অনিষ্ট হচ্ছে তা ব'লে শেষ করা যায় না। এই শিক্ষাতে বুদ্ধি কোনরূপ প্রসার লাভ করতে পারে না। ইহাতে অযথা সময়, শক্তি ও অর্থের অপব্যয় হয়।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের শিক্ষা দীক্ষা জীবন-যাপন-প্রণালী গঠন কর্‌তে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা এই জীবন-যুদ্ধের জন্য আমাদিগকে কতটা উপযুক্ত ক'রে গড়্‌তে পারে তা বিবেচনার বিষয়। ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি প্রভৃতি modern subject শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা নেই, অথচ এগুলি শিক্ষা না করলে বর্ত্তমান জগতে জীবিকা অর্জ্জনই কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়।

আরবী, ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থা Classics রূপে স্কুল কলেজ ও ইউনিভারসিটিতে হওয়াই যথেষ্ট। মাদ্রাসা শিক্ষার আবশ্যকতা কি? যদি ধর্ম্মজ্ঞান বিস্তারের জন্য এর আবশ্যক হয়, সে উদ্দেশ্য তথাকথিত মাদ্রাসায় সাধিত হচ্ছে না। সেজন্য দরকার মাতৃভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থগুলির অনুবাদ, কেননা একমাত্র তাতেই সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ধর্ম্ম-শিক্ষা সম্ভবপর হবে।

একথা আজ সর্ব্ববাদিসম্মত যে, স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত জাতির উন্নতি অসম্ভব। অন্য পক্ষে পর্দ্দা উঠিয়ে না দিলে তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করা অসম্ভব এটাও প্রমাণিত হয়েছে। এই সব খেয়াল ক'রে উন্নততর মুস্‌লিম দেশগুলি পর্দ্দা তুলে দিয়েছে, এবং মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। বাস্তবিকই মেয়েদের শিক্ষা না দিলে দেশের মঙ্গল কি ক'রে সম্ভবপর হ'বে? মেয়েরা পঙ্গু হ'য়ে থাক্‌লে সমাজের এক অর্দ্ধেক যে পঙ্গু হ'য়ে রইল তা নয়—বাকী অর্দ্ধেকও অকেজো হ'য়ে পড়ে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান সন্তান ধারণ কর্‌তে হ'লে মাকে স্বাস্থ্যবতী হ'তে হবে। কিন্তু কৈ, আমাদের স্বাস্থ্য কোথায়? অস্বাস্থ্যকর গৃহে আজীবন বদ্ধ থাকার দরুণ তাদের মনও যেমন দিন দিন সঙ্কীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে—তাদের স্বাস্থ্যও তেমনি খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। যদি মেয়েদের আর কিছুই না হ'তে হয়, তাদের গৃহিণী ও মাতা এ দুটি ত নিশ্চয়ই হ'তে হবে। শিক্ষার অভাবে তা'রা বর্ত্তমান জগতের প্রয়োজনানুযায়ী সুগৃহিণী হ'তে পার্‌ছেন না, সুজননী ত নয়ই। শিক্ষা না পাওয়ায় তাদের মনের প্রশস্ততা জন্মাতে পারে না; এমন কি স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ যে জ্ঞান সকলের থাকা দরকার তাও তাদের হয় না। বৃহত্তর জাতীয় জীবনে যোগ দেওয়ার জন্যে তাদের উচ্চ শিক্ষা পেতে হবে।

বিশেষ কথা, আমাদের দৃষ্টিকে বিস্তৃত করবার সময় এসেছে। ক্ষুদ্র সংসার-প্রাঙ্গণ ছেড়ে বৃহত্তর জাতীয় জীবন—তার সমাজ ও সভ্যতার বিষয় ভাবতে হবে। নারীর শারীরিক বীর্য্য, বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি হেলার বস্তু নয়। তার সেই ঘুমন্ত শক্তি পুরুষের শক্তির সঙ্গে মিলিত কর্‌তে হবে; তা'হ'লেই জাতির কল্যাণ হবে।

বাল্য-বিবাহ যে দোষণীয় এতে সন্দেহ নেই। এতে একদিকে যেমন মেয়েদের স্বাস্থ্য এবং তজ্জন্য সন্তানের স্বাস্থ্য খারাপ করে, অন্য পক্ষে মেয়েদের শিক্ষার ভয়ানক বাধা জন্মায়। তা হ'লে সর্দ্দা আইন সম্বন্ধে এত আপত্তি কেন?

আইন না হ'লে সতীদাহ প্রথা এত দিনে উঠে যেত কি? মুসলমানদের ত বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আইন হওয়ায় কোন আপত্তি থাকতে পারে না, কারণ ইস্‌লামের বিধি অনুসারেই বাল্যবিবাহ একরূপ হ'তে পারে না।

মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা সব-চেয়ে হৃদয়-বিদারক। অর্থাভাব হেতু আমাদিগকে ক্রমাগত মহাজনের নিকট হ'তে ঋণ ক'রে সুদ দিতে হচ্ছে, কিন্তু হারাম ব'লে ঋণ দিয়ে সুদ নেবার বিধি আমাদের নেই। আমার কোন বন্ধুর কথা জানি, যিনি provident fundএর সুদ হারাম মনে ক'রে বছরে হাজার টাকা ক'রে গবর্ণমেণ্টকে ছেড়ে দিচ্ছেন। এখন মনে করুন, এই টাকাগুলি মুসলমান শিক্ষার জন্য কিম্বা এই দুর্ভিক্ষের দিনে Relief workএ ব্যয়িত হ'লে কি দেশের উপকার হ'ত না?

এরূপে কত লক্ষ লক্ষ টাকা যে মুসলমানেরা নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য হারাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ এই সমাজের লোকই অন্নাভাবে মর্‌ছে, বস্ত্রাভাবে শীতের যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছে, অর্থাভাবে পীড়িতের চিকিৎসা হচ্ছে না এবং সহস্র সহস্র মেধাবী ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সংস্থান হচ্ছে না।

হিন্দু আজ শিক্ষা-দীক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে মুসলমান হ'তে প্রায় পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গেছে। তারা বিশ্ব-সভ্যতায় ইতোমধ্যেই অনেক কিছু দান করেছে।

এক কথায়, জাতীয় জীবনে সমস্ত দিকেই হিন্দুর

প্রভাব অনুভূত হয়। মুক্তি কিসে, হিন্দু সে-কথা বুঝ্‌তে পেরেছে। মুসলমান এখনও যেন অন্ধকারে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছে। হিন্দুর কর্ম্মধারা আজ সহস্রমুখে উৎসারিত হচ্ছে —আর মুসলমান এখনও যেন নেশাখোরের মত ঝিমোচ্ছে। অবশ্য সমাজ হিসাবে হিন্দুদের মধ্যে এখনও বহু কুপ্রথা আছে—সে সবের সংস্কার হওয়া একান্ত দরকার।

কিন্তু এদিকেও হিন্দুরা চুপ ক'রে ব'সে নেই। এই বাংলাতেই গত এক শত বছরের মধ্যে কত না মহাপ্রাণ এলেন, তাদের সংস্কারের জন্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, কেশব প্রভৃতির নাম প্রাতঃস্মরণীয়। কিন্তু বাংলার বাহিরের দু' একজনের কথা ছেড়ে দিলে গোটা ভারতীয় মোসলেম সমাজে এমন একজন সমাজ-সংস্কারকও জন্ম নেননি, যাঁর কথা মনে ক'রে এতটুকু গর্ব্বও অনুভব করা যায়।

আজ মুসলমানদের একতার আদর্শ নিয়ে হিন্দুরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের চেষ্টায় উঠে-প'ড়ে লেগেছে। কিন্তু মুসলমানেরা আজ নিজেদিগকে শত ভাগে বিভক্ত ক'রে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ছে। শিয়া, সুন্নি, হানাফি, হাম্বালী প্রভৃতি দল ত আগে হ'তেই ছিল। এখন বাংলা দেশে এক হানাফী বিভাগই না কত খণ্ডে বিভক্ত হ'য়ে বিভিন্ন মৌলানা সাহেবদের নেতৃত্বে পরস্পরকে গালাগালি ও কাফেরী ফৎওয়া দিয়ে ও বিবাহ-সাদী, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি সামাজিক কার্য্যকলাপে পরস্পরকে একঘরে ক'রে, কি ভয়াবহ ভাবেই না ইসলামকে বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত ও শক্তিহীন ক'রে তুল্‌ছে। এক কথায় বলতে গেলে, বর্ত্তমানে হিন্দুরা পরকে আপন ক'রে নিচ্ছে, আর মুসলমানরা আপনাকেও পর ক'রে দিচ্ছে।

ইতিপূর্ব্বে মুসলমানেরা স্বাস্থ্য ও শারীরিক বীর্য্য হিসাবে দেশের গৌরব ছিল। কিন্তু আজকাল তারাই দুর্ব্বল ভীরু ব'লে কলঙ্কিত হচ্ছে।

গত কয়েক বৎসরের হিন্দু-মোসলেম বিরোধের কথা স্মরণ হয়ে মনে বড়ই দুঃখের উদ্রেক হচ্ছে। এ নিতান্তই লজ্জার বিষয় যে, একই দেশে যাদের জন্ম—একই দেশের সুখ-দুঃখের ব্যথায় যারা ব্যথিত—একই দেশের আলো-বাতাস যাদের প্রাণে আনন্দ গান বহন ক'রে আনে, একই দেশের মাটি যাদের শেষ শয্যা—তাদের মধ্যে কলহ, তাদের মধ্যে বিরোধ! এর কারণ আমার এই মনে হয় যে, হিন্দু-মুসলমান এখনও পরস্পর পরস্পরের সহিত ভালরূপে পরিচিত হ'তে পারে নি—বিশেষ আজও তারা বৃহত্তর জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হয়নি, বা ভাবতে শেখেনি।

হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য পরস্পরকে পরস্পরের সভ্যতা ভাল ক'রে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। এজন্য পরস্পরের দর্শন, সাহিত্য, শিল্প নিবিড় ভাবে জান্‌তে হবে। তাদের ক্রমে ক্রমে এই মনোভাব আয়ত্ত করতে হবে, যে, হিন্দু-মুসলমান এক জাতি, ভারতীয়। তাদের মনে করতে হবে যে, শুধু ধর্ম্ম বিষয়ে তারা হিন্দু—তারা মুসলমান,—সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তারা ভারতীয়।

আশা হয়, ইস্‌লামের প্রাণ-শক্তি এখনও নিবে যায় নি। ইসলামে এমন একটী জীবনীশক্তি আছে যে, তার গভীর নিরাশার সময় সে একটী মহাপুরুষের জন্ম দেয়, যিনি এই ঘন নিরাশার কালিমাকে আশার আলোকে রূপান্তরিত ক'রে তুলেন। মুস্তাফা কামাল, রেজাশাহ, ইব্‌নে সাউদ, আমানুল্লা, নাদির খাঁ প্রভৃতি এ কথার সত্যতা প্রমাণ কর্‌ছেন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য, আষাঢ় ১৩৩৭

প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যবসায়ী—মানুষ মাত্রে ত' বটেই, এমন কি, শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের মধ্যেও নিরবচ্ছিন্ন গুণের সাগর অথবা কেবল দোষের আকর হওয়া অসম্ভব ও অস্বাভাবিক।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় সম্বন্ধে একথা বেশ খাটে। অমানুষিক অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম ও কষ্টসাধ্য পথের মধ্য দিয়া তিল তিল করিয়া আপনাকে গঠন করিতে একটির পর একটি, কঠিন হইতে কঠিনতর প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া "ইণ্ডিয়ান প্রেসের" মত এত বড় একটী জীবন্ত কীর্ত্তি গড়িয়া যাইতে এক ইঁহাকেই দেখিতেছি।

শিশুকাল হইতেই তিনি চিন্তাশীল ও বিচারবান ছিলেন। সকলের কথা, সকলের পরামর্শ ধীরভাবে শুনিতেন, কিন্তু আপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই কার্য্য করিতেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালীগ্রামে ১৮৫৪ অব্দের ১০ই আগষ্ট চিন্তামণিবাবুর জন্ম হইয়াছিল। পিতা

স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুত্র ও পরিবার কাশীতে রাখিয়া কমিসেরিয়েটের কর্ম্মে উত্তর-পশ্চিমের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। শেষে অম্বালা হইতে কাশী যাইবার পথে রুগ্ন হইয়া এলাহাবাদে নামিয়া পড়েন এবং এখানেই ৩২ বৎসর মাত্র বয়সে দেহত্যাগ করেন। সেই সূত্রে ১৮৬৫ অব্দের ডিসেম্বর মাসে চিন্তামণিবাবু পিতামহী ও বিধবা জননীর সহিত কাশী হইতে এলাহাবাদে আসেন।

ভবিষ্যতে বড় হইবার এক বিশিষ্ট লক্ষণ, মায়ের প্রতি অকপট ভক্তি। এই মাতৃভক্তি চিন্তামণিবাবুর হৃদয়ে আশৈশব গভীরভাবেই ছিল। পিতার মৃত্যুর পর যখন সংসারে অভাবের পীড়ন জননীকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন তিনি বিদ্যালয়ে লেখা-পড়ার দিকে আর মন দিতে না পারিয়া ১৩ বৎসর বয়সেই মাত্র দশটাকা বেতনে চাকুরী স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম টেবিলের উপর বড় লেজার বহিতে হিসাব লিখিবার কালে তাঁহার হাত পৌঁছিত না বলিয়া খাতা নামাইয়া টেবিলের নীচে উপুড় হইয়া শুইয়া খাতা লিখিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি এত পরিপাটি করিয়া লিখিতেন যে, হিসাবগুলি দর্পণের মত স্পষ্ট বোধ হইত, তাহাতে একটি কাটাকুটির দাগ বা ভুল থাকিত না।

কিশোর বয়সে তাঁহার বিধবা ভগিনী ও ভাগিনেয়ের ভার তাঁহাকে লইতে হইয়াছিল। কিন্তু পাছে তাঁহাদের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয় এবং মা'র মনে কষ্ট হয়, এই ভাবিয়া তিনি অল্প বয়সেই উপার্জ্জনক্ষম হইলেও সময়ে বিবাহ না করিয়া প্রথমে মিতাচার ও মিতব্যয় দ্বারা অর্থ সঞ্চয়ের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অতঃপর অবস্থার উন্নতি করিয়া এই সংযমী পুরুষ ২৮ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। পিতা এক কপর্দ্দকও তাঁহার জন্য রাখিয়া যান নাই। অভাবের কঠোর শাসন তাঁহাকে যেমন সংযমী ও চরিত্রবান করিয়াছিল, বিদ্যালয়ের শিক্ষা না পাইলেও গৃহে অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন তাঁহার হৃদয়কে আলোকিত করিয়াছিল। এই সময় তিনি Smile'sএর Self-help গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সাত আট বার নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "ঐ গ্রন্থ হইতে আমি স্বাবলম্বনের পথে অনেক ইঙ্গিত পাইয়াছি; উহা আমাকে অপূর্ব্ব সহায়তা করিয়াছে।"

এই সময় একবার তিনি অল্পমূল্যে কিছু পুরাতন স্লীপার জ্বালানি কাঠের জন্য খরিদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভৃত্য একদিন তাহা কাটিবার কালে তিনি লক্ষ্য করিলেন, একখানি কাঠ পুনঃ পুনঃ কুঠারাঘাত করিয়াও সে চিরিতে পারিতেছে না, কেবল খণ্ড খণ্ড চকলা বাহির হইয়া যাইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কাঠখানি এবং ঐরূপ কাঠগুলি বাছিয়া আলাদা করিয়া রাখিয়া দিলেন।

ইহার পর একদিন তিনি ও তাঁহার বন্ধু বাবু উমাচরণ নন্দী কাটরার পুরাতন পোষ্ট অফিসের নিকট কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন—কাশীরাম মিস্ত্রী নামে এক ছুতার একটি শিশু-কাঠের সিন্দুক ২০৲ টাকায় বিক্রয় করিল। এই সামান্য ঘটনাটি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি মিস্ত্রীর নিকট জানিয়া কাঠের দাম, মজুরী প্রভৃতি খতাইয়া দেখিলেন যে, সিন্দুকটী ১২৲ টাকার মধ্যে নির্ম্মিত হইয়া ২০৲ টাকায় বিক্রীত হইল। তিনি উপার্জ্জনের একটি নূতন পথ খুঁজিয়া পাইলেন এবং মিস্ত্রীকে দিয়া সঞ্চিত কাঠের টুল প্রভৃতি তৈয়ার ও বিক্রয় করাইয়া বেশ লাভ পাইলেন। অতঃপর দশ টাকার শিশু-কাঠ আনাইয়া উক্ত মিস্ত্রীকেই মাসে চৌদ্দ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দুই বন্ধুতে বাক্স, সিন্দুক প্রভৃতি কাঠের আসবাবের কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রথম দেড় মাসে তাঁহাদের ১০০৲ টাকা মূলধন হয়। বন্ধুদ্বয় যখন দোকানে থাকিতেন, তখন পাড়ার অনেকেই তাঁহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেন। ইঁহারা তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য দোকানের এক দিকের ঝাঁপ ফেলিয়া দিয়া একটু আড়ালে বসিয়া মিস্ত্রীর কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। এই সময় কৃষ্ণকিশোর তেওয়ারী নামে তাঁহার এক বন্ধু অংশীদার হইলে তিনি "তেওয়ারী এণ্ড কোম্পানী" নাম দিয়া ১৪০০ টাকা মূলধনে কারখানা চালাইতে লাগিলেন।

এদিকে পাওনিয়ারে কাজ করিতে করিতে অবসর-কালে প্রেসের চারিদিক ঘুরিয়া প্রত্যেক কাজ লক্ষ্য করিতেন; মেশিনের প্রত্যেক অংশ খোলা, জোড়া, পরিষ্কার করা, কোন্ কলকব্জার দ্বারা কি কাজ হয়, সে সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেন।

তাঁহার আত্মীয় বাবু উমাচরণ ঘোষ পাওনিয়ার অফিসের হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। চাকরি লইয়া তাঁহার সহিত কথা হইত। বালক চিন্তামণি তাঁহাকে বলিতেন—"চাকরীতে আছে কি? বাবার টাকা নাই তাই এখন চাকরি করতে হচ্ছে; টাকা থাকলে আমিও ঐ রকম প্রেস ক'রে এত লোক খাটাতে পারতাম।" এই মনের জোরেই তিনি অল্পদিন গবর্ণমেণ্টের চাকুরি করিয়া ৩৫ বৎসর বয়সে এক চতুর্থাংশ (২৫৲) পেন্সন লইয়া স্বাধীন ব্যবসায়ের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। যিনি একদিন কৈশোরে কথার ছলে বলিয়াছিলেন, টাকা থাকিলে আমিও ঐরূপ প্রেস করিয়া এত লোক খাটাইতে পারি, তিনিই পরে 'ইণ্ডিয়ান প্রেসের' জন্ম দিয়া সাতশত লোকের অন্নসংস্থানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

ইণ্ডিয়ান প্রেস যেমন তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি, বাঙ্গালী হইয়াও তৎকর্ত্তৃক হিন্দী সাহিত্যের বিস্তার এবং অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধন, তাঁহার আর একটি চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। তিনি যে শুধু হিন্দীতে আদর্শ মাসিক পত্রিকার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাই নহে; কিন্তু ইহা যে একাধারে সাহিত্যের প্রচার ও উৎকর্ষ বিধান, লোকশিক্ষার উপায়স্বরূপ এবং ব্যবসায় হিসাবে উপার্জ্জনেরও এক নূতন পন্থা, তাহা কাজে কর্ত্তব্যে দেখাইয়া দিয়া অন্যের দ্বারাও উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র প্রবর্ত্তন ও পরিচালনার কারণ স্বরূপ হইয়াছিলেন।

হিন্দী জগতে এই অবস্থার সৃষ্টি করিতে সরস্বতীর (হিন্দী মাসিক পত্রিকা) বিশ বৎসর লাগিয়াছিল। তাই আজ এই প্রদেশে মাধুরী, সুধা, চাঁদ, মনোরমা, ত্যাগভূমি প্রভৃতি ভাল ভাল মাসিক পত্র ১৯২০ সালের পর হইতে হিন্দী জগতে দেখা দিয়াছে। তিনি হিন্দী সাহিত্যের প্রাণ এবং উৎস স্বরূপ গোস্বামী তুলসীদাসকৃত রাম-চরিত নাটক এবং অসংখ্য হিন্দীগ্রন্থের উৎকৃষ্ট সংস্করণ এবং নব নব উত্তম হিন্দী গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া এই বিভাগীয় প্রকাশ কার্য্যে ও মুদ্রাঙ্কন-শিল্পকে উন্নত পদবীতে উঠাইয়া দিয়াছেন।

দানশীলতায়, আতিথ্যে, বন্ধুবাৎসল্যে, গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনে তিনি যেমন আদর্শ ছিলেন, কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি তেমনি সকলের সহিত সদয় ব্যবহার করিতেন। ধর্ম্মে তিনি উদার ছিলেন, ঈশ্বরে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সমাজ-সংস্কারে তিনি উন্নতিশীল দলের মতাবলম্বী ছিলেন; দেশ-প্রেমিকও বড় কম ছিলেন না। তিনি বিদ্যার অনুরাগী ছিলেন এবং বাল্যে অর্থের জন্য অসময়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়া ও বহু দরিদ্র ছাত্রকে শিক্ষার সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি দারিদ্র-দৈত্যের পীড়ন কি কঠোর, কি নিষ্ঠুর তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই জীবন-সংগ্রামে স্বীয় বাহুবলে তাহাকে দূর করিয়া উত্তরকালে দীন, দুঃখী, আতুর, অসহায়, বিধবাদের প্রকাশ্যে ও গোপনে বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও আপনার কৃতিত্ব বা গৌরবের ইঙ্গিত কখন করেন নাই এবং বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেও ধনের উগ্রতা তাঁহাতে লক্ষিত হয় নাই।

নীড়

[শ্রীপ্রণব রায়]

চঞ্চলিত প্রণয়-অধীর
সুকোমল পাখী দু'টি ঠোঁটে বহি কাঠি-কুটি
রচিল শিরীষ-শাখে ছোট এক নীড়।
নব অনুরাগ-মোহে নীড়ে ব'সে থাকে দোঁহে
মন্থর মধ্যাহ্ন যবে মিলন-মদির!
রচিল নিরালা ছোট নীড়।

সহসা দেখিনু তারপরে,—
চৈত্রের মেঘল সাঁঝে রুদ্রের ডমরু বাজে,
নীড়খানি ভেঙ্গে গেল নৃত্যক্ষিপ্ত ঝড়ে!
আলুণ্ঠিত ছিন্ন শাখা, মেলি' অবসন্ন পাখা
পাখী দু'টি ভেসে গেল তিমির-সাগরে!
নীড়খানি ভেঙ্গে গেল ঝড়ে!

আমরাও নীড় রচি আয়;
শ্রান্ত জনতার ভীড়ে বৃথা মোরা মরি ফিরে
ধূলিধূসরিত এই পথ-কিনারায়!
রুক্ষ নভে রৌদ্র ঝলে, শ্যামপত্রচ্ছায়াতলে
দু'জনে রচিব এক নিভৃত কুলায়।
আমরাও নীড় রচি আয়!

সেথায় রবে' না আর কেহ!
ললাটে গুণ্ঠন টানি' স্মিতাননা, হে কল্যাণী,
তুমি দিও একটুকু সুধাস্নিগ্ধ স্নেহ।
নীলাম্বরে যে-চন্দ্রিকা, চোখে জ্বেলে' তা'রি শিখা
উদ্ভাসিত করিব এ-ছায়াচ্ছন্ন গেহ!
সেথায় রবে' না আর কেহ!

জানি নীড় ক্ষীণায়ু ভঙ্গুর;
মহাকাল অকস্মাৎ করিবে চরণপাত,
মোদের সাধের নীড় হ'য়ে যাবে চুর!
অন্ধকার নিরুদ্দেশে মোরা চ'লে যাব ভেসে,—
তবু আজ জীবনের গাহি জয়-সুর!
হোক্ নীড় ক্ষীণায়ু ভঙ্গুর!

'কাব্যিরোগ'

(গল্প)
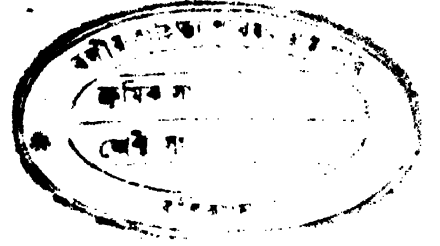
[শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা]

এক

কাব্য-সরস্বতী ছন্নছাড়ার মত অনেক দিন হইতেই রাধাচরণের মনের আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন,—তেমন আমল পাইতেছিলেন না। কিন্তু কৈশোরের গণ্ডী পার হইয়া রাধাচরণ যেদিন যৌবরাজ্যে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি উন্মীলন করিল,—সেদিন সরস্বতীর আমল পাইতে বড় বেশী বিলম্ব ঘটিল না,—রাধাচরণের মানস-সরোবরের অর্দ্ধবিকসিত শতদলের উপরে আসিয়া বীণাপাণি একেবারে বাহনসমেত জাঁকিয়া বসিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সেদিন রাধাচরণের চোখে গেল আকাশের রঙ বদ্‌লাইয়া,—কল্পলোকের দ্বারে অর্দ্ধচেতনার মাঝখান হইতে শুনিতে পাইল, সে সৃষ্টির সাহানা রাগিণী!

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাড়ি দিয়া রাধাচরণ পড়িতে আসিয়াছিল—শহরের এক খ্যাতনামা কলেজে। কিন্তু কলেজের পুঁথিতে তাহার মন বসিল না। যৌবনের যে অগাধ ভাব-সম্পদ একদিন শেলী-ওয়ার্ডসওয়ার্থ হইতে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে পর্য্যন্ত সৃষ্টির সুর জাগাইয়া তুলিয়াছিল, রাধাচরণ সেই ভাব-সম্পদের স্বপ্ন দেখিল! রাধাচরণ স্থির করিল, কলেজের বাঁধা-গতের মধ্যে পড়িয়া থাকিলে কাব্য-সরস্বতী তাহার সহিত 'বাদ' সাধিবেন।... সুতরাং গৃহে ফিরিয়া নির্জ্জনে সাধনা করাই তাহার একান্ত প্রয়োজন!

ইতিপূর্ব্বে খানকয়েক মাসিক পত্রে গল্প ও কবিতা ছাপাইয়া সমালোচকের লেখনীমুখে সে কিছু মন্তব্য শুনিয়াছিল। মন্তব্য তীব্র হইলেও রাধাচরণের কিছু ক্ষোভ হয় নাই। কারণ জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে কে এমন আছেন, যিনি সমালোচকের নির্ম্মম কশাঘাত হইতে নিজের পৃষ্ঠদেশ অক্ষত রাখিতে পারিয়াছেন? শেক্‌স্‌পীয়ার হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্যিকই তো এই কশাঘাতের মধ্য দিয়া অমর হইলেন! রাধাচরণের চোখ-মুখ দিয়া সহসা একটা খুসীর জেল্লা ফুটিয়া বাহির হইল!

এর পর এক প্রত্যূষে রাধাচরণ যখন মেসের ম্যানেজার রাজেনবাবুর নিকট সমস্ত দেনা-পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় চুকাইয়া দিয়া এক শীর্ণকায় মুটের মাথায় তাহার জরাজীর্ণ ট্রাঙ্ক তুলিয়া ধরিল—তখন সদ্যোনিদ্রোত্থিত বন্ধুদের ভিতরে জনকয়েক বেশ একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল; ভাবিল এই হতভাগ্য জীবটীর এখানে হয় তো পোষাইল না।

মেসের কুঞ্জদাস ছেলেটী ছিল একেবারে এক নম্বরের বখাটে;—ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ কথাটা তাহার কোষ্ঠীতে কখনও লেখে না। সে একেবারে গট্ গট্ করিয়া রাধাচরণের সুমুখে আসিয়া বলিল, "বলি ভায়া বুঝি সস্তার খোঁজে পিঠটান দিলে?"

রাধাচরণ গাম্ভীর্য্য-ভরা দৃষ্টিতে মুটের পিছনে পিছনে চলিতে সুরু করিল। কুঞ্জদাসের হৃদয়-বিদারক প্রশ্নের উত্তর দিবারও প্রয়োজন বোধ করিল না?

দুই

রাধাচরণ ঘরে ফিরিতেই পিতা নিশিকান্ত প্রশ্ন করিলেন—"কলেজ বুঝি এখন বন্ধ হ'ল, না, রাধু?"

রাধাচরণ গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিল—"বন্ধ নয়...পড়া-শুনায় মন বস্‌ল না...চ'লে এলাম।"

নিশিকান্তের মাথার শিখা নৃত্য করিয়া উঠিল—"চ'লে এলাম মানে?...বলি ইস্তফা দিয়ে না কি?"

"হাঁ, তাই"—সরাসর রাধাচরণ একেবারে নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। কাব্য-সরস্বতীর সহিত এই নিভৃতেই তাহার আলাপ চলিবে!

নিশিকান্ত রাগে গরগর করিতে করিতে সেখান হইতে পাশ কাটাইলেন। একেবারে গৃহিণীর নিকট আসিয়া

বলিলেন, "ছেলেটার উপায় কি করা যায় বল তো, কলেজে পা দিতে না দিতে বিগ্‌ড়ে গেল…?"

গৃহিণী মায়াদেবী শিবপূজার জন্য রেকাবীতে ফুল তুলিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আঃ মরণ, চিরকালই কি বিদেশে প'ড়ে থাকবে না কি? দুদিন বাড়ী এল… তা' তোমার সহ্য হ'চ্ছে না? বলি প'ড়ে রাজা হ'বে, না বাদ্‌শা হ'বে?"

রাজা বাদ্‌শা না হউক জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার মত অন্ততঃ একটা আশাও নিশিকান্ত এতদিন অন্তরে-অন্তরে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সারাজীবনটা তো তাঁর যজমানী করিতে করিতেই কাটিয়া গেছে—শেষ জীবনে ক'টা দিনের জন্য একটু বিশ্রামও কি তাঁর ভাগ্যে নাই?

নিশিকান্ত ক্ষুণ্ন হইয়া বলিলেন, "রাজা-বাদশা চুলোয় যাক্—পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে এখন সেও দুইএর বার, বলি এমন মতি ওর কেন হ'ল?"

মায়াদেবী একেবারে ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তোমার মত 'ন্যাকা' মানুষ দুনিয়ায় তো আর দ্বিতীয় দেখিনে—বলি তিনকাল তো 'পেরুতে' চল্‌লে,—এখন পর্য্যন্ত ছেলের মনটা বুঝতে পারলে না? একটা ভাল মেয়ে দেখে বেঁধে না দিলে ওসব ছেলে পড়াশুনা করে কেমন ক'রে—? বলি সারা জীবন ধ'রে কি শুধু পুঁথি নিয়েই ভুলে থাকবে?"

নিশিকান্তের একটু আশা হইল। এতদিনে ট্যাকের, পয়সা খরচ করিয়া যে আশায় তিনি বুক বাঁধিয়াছিলেন—তাহা তবে ব্যর্থ হয় নাই? বলিলেন, "তা বেশ, একটা ভাল মেয়ে দেখে শীগ্‌গির শীগ্‌গির ব্যবস্থা ক'রে ফেলি. কি ব'ল?"

"হ্যাঁ, গো হ্যাঁ।"

নিশিকান্তের উৎসাহ বাড়িয়া গেল, বলিলেন, "আমিও তাই ভাবি গো, কথা নেই, বার্ত্তা নেই, শুধু শুধু কলেজ ছাড়তে যাবে কোন্ দুঃখে?"

মায়াদেবী চুপ করিয়া রহিলেন।

পরমুহূর্ত্তে মাথার শিখা নাচাইতে নাচাইতে নিশিকান্ত বহির্বাটীতে আসিয়া গঞ্জিকা সেবনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

তিন

বিবাহের বার্ত্তা কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেই রাধাচরণ প্রথমেই বেশ একটু উষ্ণ হইয়া উঠিল। সাংসারিক বন্ধনের মধ্যে এত শীঘ্র জড়িত হইয়া পড়িলে, কাব্যসরস্বতী যে সত্বরেই তাহার সহিত বোঝাপড়া সুরু করিয়া দিবে—তখন? না, বিবাহ করা তাহার চলেনা। কিন্তু কি ভাবিয়া পর মুহূর্ত্তে রাধাচরণের অন্তর্লোক সহসা একবার দোল দিয়া উঠিল। যে কল্পিত প্রিয়াকে একান্ত কাছে পাইবার জন্য দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন তাহার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে—সে প্রিয়াকে কাছে পাইবার পূর্ব্বে আর একটী প্রিয়ার সহিত তাহার জীবন বিনিময় করিয়া লইতে দোষ কি? কাব্য-সাহিত্যে কত অ-দেখা অপরিচিতা তরুণীর কথা তো তাহাকে অনভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়াই প্রকাশ করিতে হয়—বিবাহ করিলে সে অনভিজ্ঞতাও তাহার আস্তে আস্তে অপসারিত হইবে। তখন প্রেম-রাজ্যের প্রতিটি চিত্র নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই সে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে। রাধাচরণের কল্পনার নেত্রে সহসা একটা তম্বী কিশোরীর মুখচ্ছবি পলকের জন্য ভাসিয়া উঠিল। রাধাচরণ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। ঠিক করিল, বিবাহ সে করিবে। তার অমত নাই, থাকিতে পারে না।

রাত্রে মায়াদেবী আসিয়া বলিলেন, "বিয়ে ত উনি ঠিক্ ক'রে এলেন, রাধু।"

রাধাচরণ একটা প্রেমের গল্প শেষ করিতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, "এলেন?"

"হ্যাঁ, সাম্‌নের অগ্রাণের দোস্‌রা তারিখ পাকা দেখা শেষ। মেয়ে সেয়ানা, শুন্‌ছি লেখাপড়াও জানে।"

রাধাচরণের অন্তর একটা অজ্ঞাত পুলকে নাচিয়া উঠিল। বিদুষী কিশোরীকেই তো সে আজ তার যৌবনের কুঞ্জে পাইতে চায়, তা'র কণ্ঠের ঝঙ্কার, ভ্রূ লালায়িত ভঙ্গী, তা'র হাঁটিয়া চলার আর্ট সে তো আজ সমগ্র অন্তর দিয়াই উপভোগ করিয়া লইতে চায়।

পুত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া মায়াদেবী একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, "ভাবিলেন, দেনা-পাওনার সম্বন্ধে রাধাচরণ হয় তো খুঁত ধরবে।"

অবসর বুঝিয়া মায়াদেবী বলিলেন, "দেনা-পাওনা

তো তেমন ভাল নয়, রাধু। বলি তোর কি এতে অমত আছে ?"

রাধাচরণ তখন কল্পলোকের দোলনায় চড়িয়া আরামের দোল খাইতেছিল; হঠাৎ মায়ের কথায় তাহার চমক ভাঙিল। বলিল—"অমত? অমত থাক্‌বে কেন, মা? মানুষের অবস্থার দিকে না চেয়ে আমি বুঝি চামারের মত দেনা-পাওনা নিয়ে মেয়ের বাপের সঙ্গে বোঝা-পড়া কর্ত্তে যাব ?"

"সেই তো বাবা, তোরা বুদ্ধিমান ছেলে—তোদের কি আর শিখাতে হয় ?"

রাধাচরণ মাথা হেঁট করিয়া নীরব রহিল।

কলেজের শিক্ষার মনে মনে তারিফ করিতে করিতে মায়াদেবী মন্থর গতিতে পাশ কাটাইলেন!

চার

বিবাহ হইয়া গেল—ষোল বছরের অর্দ্ধশিক্ষিতা মেয়ে কমলা স্বামীর ঘরে আসিয়া অবগুণ্ঠন-মুখে প্রথম পদার্পণ করিল। রাধাচরণ ঐ অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়াই কমলার মুখছবি দেখিয়া লইল! দেখিল কল্পনার নেত্রে একদিন যে ছবিখানি সে দেখিয়াছিল,- আজ বাস্তব জীবনের অভিনয়ে ঠিক তেম্‌নিতর একখানি ছবিই সে দেখিতেছে। রাধাচরণ এ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল—ভাবিল, আশা তাহার ব্যর্থ হয় নাই!—যৌবনের কুঞ্জে কুঞ্জে প্রেমের ফুল তাহার ফুটিবে—আর সেই ফুল-সৌরভে তার সারা অন্তর ভরিয়া উঠিবে।

ফুল-শয্যার স্বল্পমাত্রাবশিষ্ট রাত্রিটুকুর মধ্যে কমলার সহিত রাধাচরণের কথা তেমন হয় নাই! কমলাকে সে কেবল নামটী মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। নামের পরিচয় দিয়াই সে ঘুমের কোলে ঢুলিয়া পড়িয়াছিল—রাধাচরণের শত চেষ্টাতেও আর তার ঘুম ভাঙে নাই! আজ কিন্তু রাধাচরণের অন্তরে কল্পনার তরঙ্গ উঠিল!

পর দিন রাত্রি হইতেই রাধাচরণ নিজের শয়ন-কক্ষে আসিয়া কমলার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল—খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া কমলা এখুনই শুইতে আসিবে!

উন্মনাভাবে দরজার দিকে চাহিতেই রাধাচরণ দেখিল দরজাটা কখন খুলিয়া গিয়াছে—আর নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কমলা,—কমলার সর্ব্বাঙ্গ একখানি নীল শাড়ীতে আবৃত—মুখের উপর দিয়া বক্ষঃ পর্য্যন্ত টানা একটা দীর্ঘ অবগুণ্ঠন!

রাধাচরণ তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কমলার পেলব হাতখানা নিজের মুঠার মধ্যে ধরিয়া তাহাকে বিছানার উপর আনিয়া বসাইল। নিজে পাশ ঘেঁসিয়া বসিয়া অবগুণ্ঠনের প্রান্তটা একেবারে সরাইয়া দিয়া বলিল, "এখনও কি তোমার লজ্জা ভাঙেনি, কমল?—ছিঃ, আজকালকার দিনে এ সবগুলো কি 'সুইসেন্স' বল দিকি নি ?"

কমলার মুখখানা লজ্জায় একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল;—সে কোন কথা বলিল না!

রাধাচরণ কমলার মুখখানার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল,—তারপর আবেগ-জড়িত কণ্ঠে শুধাইল—"তুমি কবিতা লিখতে পার, কমল ?"

কমলার মুখে এবার মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল "কবিতা না, তবে চিঠি লিখতে পারি।"

রাধাচরণ একটুখানি কি ভাবিল—তারপর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, ইংরেজী কতদূর প'ড়েছ ?"

"ইংরেজী পড়ি নি, বাংলা খানকয়েক বই যা পড়িছি।"

রাধাচরণের মনটা একটু ভারী হইয়া উঠিল—হায়, কাব্য-রসের পথ হইতে কতদূরে সরিয়া আছে এই কমল!

রাধাচরণ বালিসে মাথা গুঁজিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল তারপর হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিল—"কাল থেকে আমার কাছে দু'ঘণ্টা ক'রে পড়বে, কমল, সকালে এক ঘণ্টা আর সন্ধ্যের পর এক ঘণ্টা, বুঝেছ ?"

কমলা স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে একটীবার চাহিল। রাধাচরণ সে দৃষ্টির দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইতে পারিল না;—দৃষ্টির যে চপলতা যৌবনকে মুগ্ধ করে—দেহের শিরায় শিহরণ জাগায় কমলার সে চপলতা কোথায় ?

রাধাচরণ আর কমলার সহিত কথা কহিল না। বিছানার উপর শুইয়া নিঃশব্দে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

পাঁচ

পরদিন হইতে কমলার জীবন সংসার-চক্রের অবিরাম গতির সহিত তালে-তালে চলিতে লাগিল। কমলা ভোরে

উঠিয়া প্রাঙ্গণ ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে। স্নান-শেষে আরসী লইয়া প্রসাধনে বসে, সিন্দুরের তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল রেখাটা সীমন্তে সুনিপুণভাবে টানিয়া দেয়, গরদের লাল শাড়ীখানা পরিয়া পাশের বাগান হইতে শিবপূজার জন্য ফুল তোলে—এ ছাড়া আরও নানানতর খুঁটিনাটি লইয়া সারাটী দিন সে ব্যস্ত থাকে। কাজ দেখিয়া মায়াদেবী স্বামীর নিকট কমলার শতমুখে তারিফ করেন। নিশিকান্ত হাসিয়া জবাব দেন—"মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; তা না হ'লে কি আর—" কথা শুনিয়া রাধাচরণের সারা অন্তর কিন্তু বিষাইয়া উঠে; সে দেখে কমলা একটা কঠোর বাস্তব, অবিচ্ছিন্ন কর্ম্ম-ধারারই সহিত ওর অন্তরের যোগাযোগ; এই কর্ম্মধারাকে ছাড়িয়া দিলে ওর অন্তর ওঠে শুখাইয়া, তখন ওর ভেতরে নিজের সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

রাধাচরণ ডাকে—"কমল—"

কমলা মুখ তুলিয়া চায়, পাথরের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলে, "কি বল্‌ছ?"

রাধাচরণ বিরক্ত হইয়া ওঠে,—বলে, "কি বল্‌ছ…বলি এখানে আসতে তোমার ভয় করে—না?"

কথা শুনিয়া কমলা মুখ টিপিয়া হাসে; মৃদু স্বরে বলে, "মা রয়েছেন ওখানে, এখন তোমার কাছে যাব বাঃ রে।"

রাধাচরণ ভুরু কুঁচ্‌কে বলে, "হাঁ আসবে—আমার অনুরোধ…বলি রাখবে কি না?"

কমলা হাসে! রাধাচরণের আর ধৈর্য্য ধরে না, দ্বারান্তরালবর্ত্তিনী কমলাকে কাছে পাইবার আকাঙ্ক্ষাটা পলকে তার অদম্য হইয়া ওঠে; হঠাৎ লাফাইয়া আসিয়া কমলার বাঁ হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলে, "একবার এস না কমল, সত্যি একটী বার।"

"কি…তুমি…ছাড় না, বাঃ রে," ঘরের ভিতর আসিয়া লাজরক্ত কমলা মুক্তির জন্য হাঁপাইতে থাকে।

রাধাচরণ মৃদু হাসিয়া কহে, "এস চেয়ারটাতে একবার ব'স কমল। আমি একটা কবিতা পড়ব ভারী সুন্দর কবিতাটা কিন্তু।"

নিরুপায় হইয়া কমলা চেয়ারের একপ্রান্তে বসিয়া পড়ে। বলে, "পড় তোমার কবিতা, কিন্তু বেশীক্ষণ থাক্‌ব না এটা জেনো।"

"কিঃ মুস্কিল, বলি আফিসে যাবে না কি? কবিতা বুঝ্‌তে হ'লে প্রাণ চাই, ভাব, ছন্দ, সুর এর প্রত্যেকটী জিনিস বেশ ক'রে তারিয়ে তারিয়ে দেখ্‌তে হয়; তা' না হ'লে অমন করলে যে…"

"কিছু নয় গো, তুমি পড়" কমলার চোখে একটা নিবিড় অস্বস্তির ভাব ফুটিয়া উঠে।

রাধাচরণ 'গীতাঞ্জলি' খুলিয়া মোলায়েম কণ্ঠে পড়িতে সুরু করিল—

> সে যে পাশে এসে ব'সেছিল
> তবু জাগিনি
> কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
> হতভাগিনী;
> এসেছিল নীরব রাতে
> বীণাখানি ছিল হাতে,
> সে যে স্বপন-মাঝে বাজিয়ে গেল
> গভীর রাগিণী;
> কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
> হতভাগিনী।

"কিছু বুঝতে পারলে কমল? পারোনি না? শোন আগে, কবিতাটা হ'চ্ছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের, একেবারে প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট কবিতা, কবি এখানে তাঁর জীবন-দেবতাকে কাছে পেয়েও হারিয়ে ব'সেছেন,"তাঁর আহ্বান-গুণেও তিনি, ওকি বাইরের দিকে অমন ক'রে চাইছ কেন কমল?"

ত্রস্তগতিতে কমলা চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "মা দেখে গেলেন যে, কি ভাববেন বল দিকিনি।"

"কি ভাববেন? তোমার মত অজ্ পাড়া গেঁয়েকে নিয়ে তো আর পারা যায় না দেখছি। একটুখানি ব'সে থাকতেও কি—?"

"না গো না; আর আমি একদণ্ড বসতে পারবনা ক'—" বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে কমলা একেবারে কক্ষ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

রাধাচরণ আর একটী কথাও বলিতে পারিল না, তার কাব্য-কাননের ফুটন্ত ফুলগুলি নিঃশেষে তখন ঝরিয়া গেল।

ছয়

এক বৎসর পরে কমলা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে।

রাধাচরণের অন্তর কিন্তু কমলার উপর একেবারে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, কি ভুলই না করিয়াছে সে। অনাগতের যে ছবি কল্পনার তুলি ধরিয়া সে একদিন মোহনরূপে মনের পটে আঁকিয়া তুলিয়াছিল, আজ সেই ছবিটি তাহার চোখে বড় বিশ্রী হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

রাধাচরণ ঠিক করিল এ সংসারে থাকা তাহার চলেনা; এখানে থাকিলে অচিরেই তাহার কাব্য-সরস্বতীর আসন টলিবে। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাহার একটু সচেতন হওয়ার প্রয়োজন।

সেদিন সকালে নিজের নিভৃত কক্ষে চেয়ারে বসিয়া রাধাচরণ কি একটা গল্পের 'প্ল্যান' আঁটিতেছিল, এমন সময় দরজার বাহিরে চাবির একটা শব্দ উঠিল। রাধাচরণ দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল কমলা। কমলার দিকে চাহিয়া রাধাচরণের গল্পের 'প্ল্যান, কেমন ঘুলাইয়া গেল, তাহার সমস্ত মুখখানির উপর ফুটিয়া উঠিল একটা বিরক্তির ছায়া।

কমলা ভীতিবিহ্বলকণ্ঠে বলিল, "একটা কথা শুনবে ?"

"কি কথা শুনি ?" রাধাচরণের কণ্ঠস্বর কঠোর ও গম্ভীর ?"

"কাল রাত থেকে খোকার অসুখ ক'রেছে, গা দিয়ে একেবারে আগুন ছুটছে। একবার ডাক্তারের কাছে যাও না।"

রাধাচরণের বিরক্তির ভাবটা এবার স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "অসুখ ক'রেছে তা' আমাকে কেন শুনি, বলি বাড়ীতে কি আর লোক নেই ?"

রাধাচরণ বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইল। কমলার মুখ দিয়া আর উত্তর যোগাইল না। স্তিমিত দৃষ্টিতে অসহায়ের মত সে শুধু স্বামীর মুখের দিকে আর একটীবার চাহিল, তার পর সে যেমন করিয়া আসিয়াছিল, ঠিক তেমন করিয়াই চলিয়া গেল।

বাহিরের দিকে চাহিয়াই রাধাচরণ বসিয়া থাকে—ঠিক তেমনই ভাবে। উষার প্রথম আলোকরেখা প্রকৃতির অঙ্গে আজ নিকষের উপর হেম-রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, চারিদিকেই কেমন একটা নির্ম্মল পারিপাট্য, রাধাচরণের অন্তর সহসা 'রোমান্সের' সপ্তলোকে মুক্ত বিহঙ্গের মত পাখা মেলিয়া উধাও হইয়া চলিল। তাহার যৌবনের অতৃপ্ত কামনা আজ সে সমস্ত অন্তর দিয়া মিটাইতে চায়। আজ সে এই নিভৃত কক্ষের মধ্যে বন্দী থাকে কেমন করিয়া ? সাহচর্য্য আজ তা'র কাছে মৃত্যুর মতই ভয়ানক, সহসা অতীত দিনের একখানি মুখ তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল, গতবৎসর কলেজের পড়ায় ইস্তাফা দিয়া সে যখন ঘরে ফিরিতেছিল, তখন চলন্ত ট্রেণে নিজের পাশ ঘেঁসিয়া একটি তরুণীকে সে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। তরুণীর চোখ দুটি ছিল কি স্বচ্ছ আর কি উজ্জ্বল। তাহার সূক্ষ্ম শাড়ীর আবরণ ভেদ করিয়া নীল ব্লাউজের একটা আভা তাহার চোখের সুমুখে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। তরুণী তা'র সঙ্গী তরুণটীর সহিত নিঃসঙ্কোচে কথার পর কথা কহিয়া চলিয়াছিল। তা'র লাল ঠোঁট দু'খানির পাশ দিয়া হাসির একটা হিল্লোল মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ফুলঝুরির মত দানা কাটিয়া পড়িতেছিল। আর তারই একটা রেশ সমস্ত আবেষ্টনীকে মায়ালোকের মতই মধুর ও মোহন করিয়া তুলিতেছিল। রাধাচরণের অন্তর সহসা একটা নিবিড় রিক্ততায় ভরিয়া উঠিল। কি ভাবিয়া আস্তে আস্তে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সাত

বাড়ীতে চাকরীর দোহাই দিয়া রাধাচরণ আজ এক মাস কলিকাতায়। রাধাচরণের ইচ্ছা গৃহে সে আর ফিরিবে না; এখানে থাকিয়া যেমন-তেমন একটা চাকুরী জুটাইয়া তাহার সাহিত্য-সাধনা অটল রাখিবে। ভোরে বাহির হইয়া রাধাচরণ সারা সহরটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সহরের বিচিত্র জীবনধারার সহিত নিজের জীবনটাকে সে পরিচিত করাইয়া লয়।

কিছুদিন এমনই করিয়া কাটিয়া গেল। কিন্তু যে কল্পিত 'রোমান্সের সৌরভ পাইয়া তাহার সারা অন্তর আজ অধীর হইয়া উঠিয়াছে বাস্তব-জীবনে সে 'রোমান্সে'র সন্ধান মিলিল কই ? রাধাচরণ দেখিল, জীবনটায় তার মস্ত বড় একটা ফাঁক থাকিয়া গিয়াছে।

বিকাল হইলে রাধাচরণ প্রত্যহই পার্কের ধারে বেড়াইতে যায়। পার্কটা তা'র চোখে বেশ লাগে। দেখে সুবেশা সুন্দরী কিশোরীর দল সুচিক্কণ ঘাসের উপর দিয়া

হাটিয়া বেড়াইতেছে ; চোখে-মুখে তাদের খুসীর হিল্লোল-জীবনে কেমন একটা সজীবতা ! রাধাচরণ ভাবিল, "এমনি না হইলে আর জীবন, সহসা কমলাকে তার মনে পড়িয়া গেল, লজ্জার আস্তরণে সমস্ত দেহ মন ঢালিয়া দিনরাত ঘরেরই কোণটুকুর মধ্যে সে আত্ম-সমাহিত রহিয়াছে। রাধাচরণের মনে হইল কমলা বাঁচিয়া নাই।

সেদিন বাসা হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে রাধাচরণ ঠিক করিল, পার্কে আসিয়া অন্ততঃ একটী মেয়ের সহিত সে আলাপ জমাইবে ! নহিলে এতগুলি দিন সে কিসের আশায় উদ্‌যাপন করিল ! একটা নিবিড় পুলকে রাধাচরণের অন্তর দোল দিয়া উঠিল।

পার্কে আসিয়া রাধাচরণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিলাতী ফুলের অনতিপরিসর কুঞ্জগুলির কাছে আসিয়া চুপ করিয়া সে খানিকক্ষণ দাঁড়ায়, আবার কি ভাবিয়া সে সেখান হইতে সরিয়া পড়ে ! এম্‌নি করিয়া অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া আপনার অজ্ঞাতে সে এক নির্জ্জন স্থানে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল, দেখিল ঘাসের উপর বসিয়া একটী মেয়ে কি একখানা বই পড়িতেছে, তা'র কেশের সৌরভ সমস্ত স্থানটীকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে—মেয়েটির দৃষ্টি বইএর পাতায় নিবদ্ধ !

রাধাচরণ এক পা এক পা করিয়া মেয়েটীর একেবারে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে দাঁড়াইয়া বুকটা তা'র ঘন ঘন দুলিতে লাগিল, আর একটী পাও সে আগাইতে বা পিছাইতে পারিবে না !

সহসা দৃষ্টিটা তার বইএর পাতায় প'ড়িতেই সে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এ কি, এ যে তরুণদেরই একখান মাসিক পত্র, এ মাসে প্রকাশিত তাহারই একটী গল্প মেয়েটী আগ্রহে পড়িতেছে !

রাধাচরণ আর দাঁড়াইতে পারিল না, মেয়ে॰র প্রায় পাশ ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল !

চকিতে দৃষ্টিটা উন্নত করিয়া মেয়েটী তার দিকে চাহিয়া একবার ভ্রূকুটি করিতেই রাধাচরণ মৃদু হাসিয়া উঠিল, বলিল, "রাগ করবেন না গল্পটী আপনি পড়ছেন দেখে এখানে বস্‌লাম, গল্পটী আমারই লেখা।"

মেয়েটীর চোখে-মুখে একটা বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; সে কোন কথা কহিল না !

রাধাচরণ একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "আপনার নামটা জান্‌তে পারি নে।"

কি মুস্কিল, নাম জানিয়া তাহার লাভ কি, মেয়েটী একটু বিরক্তির সহিত বলিল, "শোভনা রায়।"

শোভনা, আঃ কি মোলায়েম নাম, নামের ভেতরও একটা আর্ট ফুটিয়া ওঠে যে, রাধাচরণের অন্তর তালে তালে নাচিয়া উঠিল। সন্ধ্যার ম্লান রক্তরেখা শোভনার মুখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে, দক্ষিণের এক ঝলক বাতাস কেশের সৌরভটাকে লুফিয়া নিয়া চলিয়া গেল। রাধাচরণের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই শোভনার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল।

রাধাচরণ আবেগভরাকণ্ঠে বলিল, "আপনি মাসিকে লেখেন না ?"

"না, কেন বলুন তো ?" শোভনা চট্‌পট্ উঠিয়া দাঁড়াইল। রাধাচরণও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িল ; ঘাড়টা একটু বাঁকাইয়া বলিল, "আর একটু ব'স না শোভনা।"

চঞ্চল পদক্ষেপে শোভনা তখন অনেকদূর চলিয়া গেছে, রাধাচরণ খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া শেষে সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

আট

রাত্রিতে রাধাচরণের ঘুম হইল না, শোভনার মুখ-খানিকে ভাবিতে ভাবিতে কাটিয়া গেল ! সকাল ও দুপুরটাও তা'র বহু কষ্টে কাটিল, শেষে বিকাল হইতেই সাজ্‌গোজ্ করিয়া রাধাচরণ পার্কে বেড়াইতে বাহির হইল। পার্কে আসিয়া রাধাচরণ দেখিল—শোভনা তেম্‌নি ভাবে আজও সেই কুঞ্জতলে বসিয়া রহিয়াছে, কিন্তু এ কি, আজ একটী অপরিচিত তরুণ তাহার পাশ ঘেসিয়া বসিয়া যে, শোভনার গোলাপী গাল দুখানা হাসির চাপে মাঝে মাঝে কুঁচ্‌কিয়া উঠিতেছে, তরুণটীরও মুখে হাসি। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় রাধাচরণের বুকখানা টন্ টন্ করিয়া উঠিল, হায়, শোভনা যদি আজ—রাধাচরণ আর ভাবিতে পারিল না।

একটু পরে রাধাচরণ লক্ষ্য করিল, তাহারই দিকে চাহিয়া ওরা দুজনে বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে। তরুণটীর উপরে রাধাচরণের ক্রোধ সহসা শতমাত্রায় উচ্ছ্বসিত হইয়া

উঠিল, তাহার আরাধ্যা অন্তর লক্ষ্মীকে দুর্ব্বৃত্ত আজ এত শীঘ্রই আপনার করিয়া লইয়াছে ?

রাধাচরণ একেবারে গট্‌গট্‌ করিয়া আসিয়া শোভনার দিকে চাহিয়া বলিল, "নমস্কার শোভনা রায়।"

"নমস্কার" ঠোঁটের কোণে একটু বক্র হাসি হাসিয়া শোভনা তাহাকে প্রত্যাভিবাদন জানাইল !

রাধাচরণ আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া একেবারে শোভনার ঠিক সুমুখে আসিয়া বসিল। শোভনা এবার তরুণটীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল. "এরই নাম রাধাচরণ ভট্‌চাজ মেজ্‌দা, ইনি কাল পার্কে এসে আমার কাছে নিজে থেকে পরিচয় দিয়েছিলেন।"

মেজ্‌দা ! রাধাচরণ আশ্চর্য্য হইয়া গেল ; তবে তরুণ ভদ্রলোকটি শোভনার প্রণয়-প্রার্থী নয়, রাধাচরণ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল !

তরুণ ভদ্রলোকটী রাধাচরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন. "আপনার নাম রাধাচরণবাবু, বেশ বেশ, তা' ম'শায়কে একটা কথা জিজ্ঞেসা কর্চ্ছি দয়া ক'রে যদি এর উত্তর দেন।"

'কথা', রাধাচরণের বুকটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত তালে তালে দোল দিতে লাগিল ; চোখের সুমুখে রঙীন আশাটা একবার কেমন ঝিলিক মারিয়া উঠিল ! বলিল, "কি কথা বলুন না, কোন আপত্তি নেই।"

ভদ্রলোকটী হাসিয়া বলিলেন, "তা' আপত্তি থাক্‌বে কেন, সাহিত্যিক মানুষ আপনারা, আপনাদের কোন আপত্তি থাক্‌তে পারে না যাক্‌, বলি ম'শায়কে এ 'কাব্যি-রোগে' কবে থেকে ধর্‌ল।"

রাধাচরণের মুখখানা সহসা একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল সে স্পষ্ট লক্ষ্য করিল—শোভনা তারই মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে !

ভদ্রলোকটী সে দিকে না চাহিয়া পুনরায় বলিলেন, "পার্কে আপনারা রোম্যান্স খুজ্‌তেই আসেন···না ? তাই মেয়েদের দেখ্‌লে আপনাদের ভেতরে অদ্ভুত রকমের সহানুভূতি জেগে ওঠে, কি বলুন, তাই না ? শোভনা রায়ের সঙ্গে এখানে কাল আপনার কি প্রয়োজন ছিল বলুন তো।"

রাধাচরণের মুখের উপর সহসা কে যেন শপাং করিয়া এক ঘা চাবুক কসাইয়া দিল, সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "প্রয়োজন, না না তেমন কিছু ছিল না, তবে এখানে উনি একা বসেছিলেন তাই, তা' এতে যদি উনি কোন 'অফেন্স' নিয়ে থাকেন, তবে—"

"না না 'অফেন্স' নেবার এমন কি আছে, তবে মশায়কে এইখেনে একটু সাবধান ক'রে দি, ভবিষ্যতে যদি গায়ে প'ড়ে এমনভাবে প্রেম ক'র্ত্তে আসেন, তাহ'লে ম'শায়ের কিন্তু মাথা বাঁচান' দায় হ'বে।"

রাধাচরণ আর তিষ্ঠুতে পারিল না—মাতালের মত টলিতে টলিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখের সুমুখে পৃথিবীর আলো হাসি এক নিমেষে ম্লান হইয়া গেছে, আজ তাহার মত একজন পরিচিত তরুণ সাহিত্যিকের এ কি দুর্গতি, রাধাচরণ পার্ক ছাড়াইয়া ফুটপাতের জনসমুদ্রের মাঝখানে মুহূর্ত্তের মধ্যে মিশিয়া গেল।

নয়

অনেক রাত্রে কমলার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই সে অবাক হইয়া গেল—ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "য়্যাঁ, তুমি ?"

"হাঁ আমিই কমল, এই দেখ না, তোমার জন্যে সাবান তেল আর 'ক্রীম' নিয়ে এসেছি।"

কমলা জিনিসগুলির দিকে একবার দৃক্‌পাত করিয়া সহাস্যে বলিল, "তা আসবার আগে একখানা চিঠিও তো লিখ্‌তে হয়, বাপ্‌রে চাকরী ক'র্ত্তে গিয়ে দুদিনে কি মানুষটাই না হ'য়ে উঠেছ চিঠি লেখবারও বুঝি ফুরসৎ পাওনি না ? তা' মুখ খানা অমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখ্‌ছি যে, কিছু খাওনি বুঝি না ? আচ্ছা একটু ব'স, আমি এখুনই—"

কমলা দ্রুতপদে উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু রাধাচরণ তাহার গতিপথে বাধা দিয়া বলিল, "না না কিছু দরকার নেই কমল, ট্রেণ থেকে নাব্‌বার আগে আমি জল খেয়ে এসেছি"—বলিয়াই বিপুল-আবেগভরে কমলাকে সে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহার আরক্ত কপোলতলে একটি প্রণয়চিহ্ন আঁকিয়া দিল। কমলা কোন কথা কহিল না—স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

পরদিন হইতে রাধাচরণের মানস-সরোবর হইতে সত্য সত্যই কাব্য-সরস্বতীর আসন টলিল। শুনিয়াছি মাসিক-পত্রের তরুণ সম্পাদকেরা তাহার নিকট হইতে বা'র বা'র করিয়া লেখার তাগিদ দিয়াও আর কোন সংবাদ পায় নাই।

আফ্গানীস্থানের কাব্য *

[শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি-এস্‌সি]

আফ্গানদের ভাষার নাম পুস্তু। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইহা পুরাতন পারসী ও হিন্দুস্থানীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন। আফগানদের মধ্যে চিরদিনই পারসীর প্রচলন সমধিক—এবং এখনও প্রায় সেইরূপই। অনেক স্থলে এখনও পারসী লেখ্য ও কথ্য ভাষা, তথাপি পুস্তুর প্রতি সাধারণতঃ আফগানদের দরদ ক্রমশঃ বাড়িতেছে, আর ইহাই স্বাভাবিক।

পুস্তু ভাষায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং যাহা আছে, সাহিত্যের মাপকাঠীতে তাহার মূল্য বিশেষ কিছু নাই। কেন নাই, তাহারও কারণ অনেকগুলি। প্রথমতঃ সমস্ত জাতিটার মানসিক সমৃদ্ধি ও কৃষ্টি মোটেই নাই বলিলেও চলে। ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগের সমসাময়িক সভ্যতার চিহ্ন আফ্গানীস্থানে বিরল নহে, কিন্তু তাহার পর হইতে বহুকাল যাবৎ হিন্দুস্থানের তোরণদ্বার রক্ষা করিয়া, দেশের অধিবাসীরা মানসিক বৃত্তি অপেক্ষা শারীরিক শক্তির চর্চ্চাই বিশেষ করিয়া করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আফ্গানীস্থান পার্ব্বত্যদেশ ; ইহার প্রকৃতি দৈহিক শক্তি চর্চ্চারই পরিপোষক। ফলে দেশে সভ্যতার বিকাশ হইতে পারে নাই।

তৃতীয়তঃ আফ্গানদের মধ্যে যাহারা গ্রন্থাদি রচণা করিয়াছেন, তাহাদের প্রায় সকলেই পারসী ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন—পুস্তুর প্রতি তেমন দরদ দেখান নাই। বিশেষতঃ পারসীর কাব্যরত্নের মোহ জয় করিবার মত ক্ষমতা এই লেখকদের কাহারও ছিল না। কাজেই ইহাদের সকলের রচনাই এই বিদেশী সাহিত্যের নিকট এত ঋণী যে, একটীকে অন্যটীর ছায়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পুস্তু সাহিত্যের ভাণ্ডারে মণি, জহরৎ না থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া যে একেবারে স্বর্ণ রৌপ্যও নাই, একথা বলা চলেনা। আমরা আজ তাহারই কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

পুস্তু সাহিত্যের কথা বলিতে হইলে উহার গদ্য রচনার কথা প্রায় বাদ দিলেই চলে। গদ্যগ্রন্থ যে একেবারেই নাই তাহা নহে, তবে যাহা আছে তাহার মধ্যে লেখকের জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতার জন্য, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, প্রভৃতির এমন সকল মারাত্মক রকম ভুল আছে যে, বর্ত্তমান যুগের পাঠকের তাহাতে শুধু হাস্যোদ্রেকই হইবে। আমরা গদ্য সাহিত্যকে বাদ দিয়া কাব্যকেই অনুসরণ করিব।

কাব্যরচয়িতাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ; সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিক। সাহিত্যিক কবিরা শিক্ষিত—হাফেজ ও সাদীর কাব্য তাহাদের পড়া। ইঁহাদের সকলেই পারস্যের কবিদের পন্থা অনুসরণ করিয়া আপনাপন 'গজল' রচনা করেন। ইঁহাদের লেখা মার্জ্জিত ; শিক্ষার ছাপ প্রতি ছত্রে ছত্রে—ইঁহারা সাহিত্য রচনা করেন বলিয়া দাবী করেন—ইঁহারা "শ-ইর"। কাব্যের বাঁধাধরা নিয়মের ব্যতিক্রম তাঁহাদের রচনায় হইতে পারে না সত্য, কিন্তু আফ্গানদের প্রাণের সম্পদ এ সকল লেখায় মিলে না। তাহা পাইতে হইলে, অসাহিত্যিক স্বভাব কবিদের জগতে বিচরণ করিতে হয়।

আফ্গানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত কম ; কাজেই শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই প্রায় "শ-ইর"। গজল রচনা শিক্ষার একটী অঙ্গের মধ্যেই পরিগণিত।

এককথায় পারস্যের সকল কবিই সুফী-পন্থাবলম্বী। সুফীরা অবশ্য মুসলমান, কিন্তু তাহাদের মত ও গোঁড়া মুসলমানের মত পরস্পর বিরোধী। মুসলমান ধর্ম্মে ভগবানের সঙ্গে মানবের শুধু দাস্যভাবের কথা আছে ; সখ্যভাবে তাঁহার আরাধনা মুসলমানের পক্ষে গর্হিত।

* Selctions from the poetry of Afghans, Selected essays of James Darmsteter, History of Afghans প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে।

সুফীরা নানাভাবে এই প্রেমরসকে জিয়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। কাজেই তাহাদের কবিতা mystic,

এই প্রেমবন্দনাই সুফীকাব্যের মূলমন্ত্র। এই প্রেম দেহের অতীত—শরীর ধর্ম্মের অপেক্ষা ইহাতে নাই। মানবের মধ্যে ভগবানের যে অংশ বর্ত্তমান—সেই অংশেরই পরিপূর্ণতা লাভের জন্যই এ মিলনাকাঙ্ক্ষা; কোনও বিশিষ্ট নারী বা নরের দেহ-সৌন্দর্য্যকে আশ্রয় করিয়া ইহার পরিপুষ্টি হয় না। এই প্রেমের স্তর আছে। স্তর চারিটী নিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া পরম নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত। তাঁহাদের সাধনা "তর্কে তরক্" অর্থাৎ ত্যাগকেও ত্যাগ করা। এই সুফীপন্থার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিতে পারিলে যেমন পারস্যের কাব্য সম্যক উপলব্ধি করা যায় না পুস্তর পক্ষেও এ কথাটা তেমনি সমান ভাবে খাটে।

"শ ইর"দের সকলেরই প্রায় একসুর। সেই শরীরাতীত প্রেম; সেই নির্ব্বাসিত আত্মার করুণ ক্রন্দন—সেই অপূর্ণের পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা—সবই একেবারে পারস্যের কবিদের ছাঁচে ঢালা। মোল্লা আবেদুর রহমান্ ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ খ্যাত ও জনপ্রিয়।

আমীর ওমরাহ গণেরমধ্যে গজল লেখার প্রচলন অত্যন্ত বেশী ছিল; চিরদিনই ইহা জননায়কদের বৈশিষ্ট্যের অঙ্গ। ইঁহাদের মধ্যে খুস্‌হল খাঁ ও আহমদ শা আব্‌দালীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খুস্‌হল খাঁ ও আহমদ সা আব্‌দালীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খুস্‌হল খাঁ একাদশ শতাব্দীর লোক; ইনি একদিকে যেমন পরাক্রমশালী যোদ্ধা অন্যদিকে তেমনই শক্তিমান কবি। ইনি 'খটক্' বংশের নেতা ছিলেন। অনেক সমালোচকের মতে, ইঁহার কবিত্বশক্তি যে কোনও জাতির পক্ষে গৌরবের বস্তু।

আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালী 'দুরাণী'-বংশের নেতা; তিনি আফগানীস্থানের রাজসিংহাসনে তাঁহার বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পারসী ও পুস্ত উভয় ভাষাতেই তাঁহার রচনা আছে। আমরা এই পারস্য-কাব্যের প্রতিচ্ছায়া 'শ ইর'দের রচনার কথা বাদ দিয়া অসাহিত্যিক কবিদের দরবারে যাইব।

অসাহিত্যিক কবিদের নাম 'ডুম'। শিক্ষার গৌরব ইহাদের কিছুমাত্র নাই, কিন্তু সঙ্গীত রচনা ও স্মরণ শক্তির বৈভব যথেষ্ট আছে। ইহারা দেশে দেশে গান গাহিয়া ফিরে। সরল, গ্রাম্য, নিম্ন বংশের লোক ইহারা। অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রশংসা বা সম্মান লাভের সৌভাগ্য ইহাদের হয় না, এমন কি কোথায়ও বা ধিক্কৃত ও নিন্দিত হয়। তথাপি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইহাদের আদর অত্যন্ত বেশী আর ইহাদের কেহ কেহ এই ব্যবসার দৌলতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, সভ্যতার অগ্নিতে যে জাতির সংস্কার হয় নাই, তাহাদের সাহিত্যের স্থান সঙ্গীত অধিকার করিয়া বসে। লেখাপড়া অপেক্ষা গানের মোহ সাধারণের পক্ষে অনেক বেশী এবং তাহাতে রসানুভূতিও মানুষের নিকট অত্যন্ত সহজ। আফ্‌গানদের পক্ষে এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সঙ্গীতের উন্মাদনা তাহাদের জীবনে অত্যন্ত প্রকট। যে কোনও দুইজন আফ্‌গান একত্র হইলেই একটা সঙ্গীতের আরাধনা চলিতে থাকে। তাহাতে তাল মানের প্রতি যে বিশেষ দৃষ্টি থাকে তা' নয়, প্রেরণাই উহার মূল। সাধারণতঃ আমরা "কাবলীওয়ালার গান" বলিতে পরস্পর বিরোধী দুইটী ব্যাপারের পরিকল্পনা করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই 'কাবলীওয়ালাদের' জীবনে সঙ্গীতের উন্মাদনা যতখানি, সভ্যজগতে মার্জ্জিত রুচির মধ্যে ততখানি নাই!

হয় তো হত্যাপরাধে দণ্ডিত হইবার ভয়ে কোনও আফ্‌গান লুকাইয়া লুকাইয়া ফিরিতেছে, পশ্চাতে পুলিশ তাহার খোঁজে তৎপর। কিন্তু সে খেয়াল তাহার নাই। যেই কোথায়ও একটু রসের সন্ধান পাইল, অমনি নির্ব্বিবাদে সে আত্মহারা হইয়া হয় তো একটার পর একটা প্রেমের গজল গাহিয়া চলিল। ধরা পড়িলে, ফল যে তাহাতে ফাঁসী যাইতে হইবে এ কথা তাহার মনে নাই— সে তখন পরম যোগী।

সঙ্গীতের আদর ও উন্মাদনা যেখানে এত সেখানে যে সর্ব্বসাধারণের কাছে এই 'ডুম'দের প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেশী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সাধারণতঃ হুজরাতে (গ্রামের টাউনহলে) এই সকল গায়কের 'মুজরা' হয়। তাহারা সদলবলে সেখানে ফরমাসমত গান গায়িয়া থাকে। এই সকল সঙ্গীত তাহাদের নিজেদের রচিত বলিয়া তাহারা জাহির করে সত্য, কিন্তু সাধারণতঃ এগুলি ধারকরা জিনিস

—পূর্ব্বতন কোনও গায়কের রচনা হইতে নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা। সঙ্গীতের শেষ চরণে রচয়িতার নাম থাকে, কেবল সেইটুকুই পরিবর্ত্তন করিয়া অনেকে নিশ্চিন্ত হয়, কারণ এ ব্যাপার সেখানে এত সহজ যে ইহা একটা সংস্কারের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে একদিকে একটা লাভ হইয়াছে, সেটা এই—

এই ধারকরা ব্যাপারের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে পূর্ব্বতন রচয়িতাদের সঙ্গীতের চিহ্নমাত্রও থাকিত না, কারণ এ সঙ্গীতের কণামাত্রও লিপিবদ্ধ নাই। অপহরণের ফলে বৎসরের পর বৎসর লোকের মুখে মুখে এ সকল সজীব রহিয়াছে।

গায়ক হইতে হইলেই প্রথমতঃ সাগরেদ হওয়া আবশ্যক। প্রথমে ভাবী গায়ককে কোনও ওস্তাদের নিকট থাকিয়া গানের রীতিনীতি শিক্ষা করিতে হইবে। আসরে দুই চারিবার নামিবার পর যখন 'সাগরেদ' বুঝিতে পারিবে যে, ওস্তাদের সাহায্য ব্যতীত সে নিজে সঙ্গীত রচনা ও আলাপে সমর্থ, তখন সে ওস্তাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজেই ওস্তাদ হইয়া বসিবে। অবশ্য পরদিনই পূর্ব্বতন ওস্তাদের গানগুলি বেমালুম নিজের বলিয়া চালাইতে পারে; তাহাতে ওস্তাদ ভায়ারও যে বিশেষ আপত্তি আছে তা' নয়, কারণ ঘাঁটাইতে গেলে নিজের গলদ্ ও বাহির হইয়া পড়িবে।

আফ্গানদের প্রকৃত জীবন-চিত্র এই সকল গানে সম্যক্ ধরা পড়ে। তাহাদের চিরন্তন আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ, দুঃখ, রীতি, নীতি প্রভৃতি সমস্ত জিনিসে এগুলি পরিপূর্ণ। কাজেই সেদিক হইতে ইহার মূল্য সমধিক।

প্রেমের গানই প্রায় এ সকল সঙ্গীতের অর্দ্ধেকের বেশী জুড়িয়া আছে। কিন্তু চিন্তার বৈভব আফ্গানদের অত্যন্ত সীমাবদ্ধ কাজেই এ প্রেমের ধারা অত্যন্ত নিম্নস্তরের এবং অল্প বিস্তর শরীর-ধর্ম্মী। প্রিয়ার দেহের রূপশিখার কল্পনায় তাহার তেজের পরিকল্পনার স্থান হয় নাই, কাজেই কাব্যও প্রাণহীন হইয়াছে।

তারপর গতানুগতিকতা সেই একই প্রকারের রূপ বর্ণনা—সেই 'পেজভানের' (নাকের নথের) চাকচিক্যের কথা—প্রিয়ার সেই গোলাপী গালের ছোট্ট তিলের সৌন্দর্য্য—সেই "তুত্তি' ও খাড়ুর (ময়না) বিরহ বিলাপ! এমন কোনও প্রেমের গান নাই যাহাতে ইহার অভাব। এই বাঁধা পথে চলিতে চলিতে এই গানগুলি অত্যন্ত কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে; ফলে কাব্যের সাবলীলতা অন্তর্হিত হইয়াছে।

কিন্তু আফ্গানদের প্রাণে এ সকল চিরন্তনভাবে উন্মাদনা জোগাইয়া আসিয়াছে- এখনও জোগাইয়া থাকে। এমন কোনও আফ্গান আছে কি না সন্দেহ, যে "মীরার" 'জাকৃমি' গ'নটী জানে না! এ গানটী বিশ্ববিশ্রুত। এমন কোনও আফ্গান নাই যে ইহার সুললিত ছন্দ, তাল ও কাব্য-যোজনায় মুগ্ধ নহে। 'জাকৃমি' অনেকের মতে আফ্গানদের জাতীয় সঙ্গীত; কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত হইলেও এটা একটা প্রেমের গজল মাত্র।*

'নঙ্গি পুক্তান' অথবা 'আফ্গানী সমান'ই যে কোনোও আফ্গানের পক্ষে শ্রেষ্ঠ আইন। এই সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধারণা প্রত্যেক আফ্গানের আছে। কিন্তু

* আফ্গানেরা ইহার তালে তালে নাচিয়া উঠে। আমরা ইহার তাল দিতে পারিলাম না—তবে কাব্য-রসিকের জন্য একটু ভাষাগত অনুবাদ দিতে চেষ্টা করিলাম।

১। বিরহের আঘাতে আমি আহত হইয়া বিষণ্ণ

- দেখ! দেখ!

আমার খারু (ময়না) আজ আমার প্রাণ ছোঁ মারিয়া নিয়া গিয়াছে।

২। আমি সর্ব্বদা মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে রক্তাক্ত—রক্তে লাল—আমি দরবেশ! বিরহই আমার জীবন—প্রেম আমার চিকিৎসক আমি নিদানের জন্য উগ্রীব—দেখ! দেখ!

৩। বুকে তার বেদনা—মুখে তার চিনি দাঁত তো নয় যেন মুক্তার দল!

কার?—কার এ সব?—আমার প্রিয়ার—আমার প্রিয়ার! বুকে আমার উতরোল—আমি আহত—আমি ভিক্ষুক—চীৎকার করি! দেখ! দেখ!

৪। প্রিয়া—প্রিয়া আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব—আমার জন্য একটু ভাব'—একটু ভাব'—প্রিয়া!

সন্ধ্যা সকাল তোমার দ্বারে আমি প্রার্থী হইয়া আছি—আমি তোমার প্রেমভিক্ষু—দেখ! দেখ!

৫। মীরা তোমার দাস—আমার সেলাম নাও! তোমার অলকগুচ্ছ আমার ফাঁদ—তোমার আবাস আমার স্বর্গ—তোমার নিন্দুককে খাঁচায় পোর—প্রিয়া! প্রিয়া আমার!

এককথায় ইহার অর্থ বলা যায় না; কিছু বিবৃতির প্রয়োজন।

'নঙ্গি পুক্তানে' অনেকগুলি নিয়ম কানুন আছে, তাহার মধ্যে তিনটী প্রধান :—

(১) কোনও চিরন্তন শত্রুও আসিয়া যদি আফ্‌গানের গৃহদ্বারে আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাঁহাকে প্রাণান্তেও রক্ষা করিতে হইবে।

(২) যদি কেহ নিজের বা আত্মীয় স্বজনের অনিষ্ট করে তবে সর্ব্বথা তাহাকে দণ্ডিত করিতে চেষ্টা পাইতে হইবে।

(৩) যে কোনও মুসাফিরকে আফ্‌গানেরা বাসস্থান ও আহার দিয়া আতিথেয়তা করিবে।

এই তিনটী নিয়ম যাহারা পালন করে না, তাহারা সমাজে অত্যন্ত নিন্দিত ও ঘৃণিত হইয়া থাকে। আমাদের আলোচ্য গ্রাম্যসঙ্গীত এই 'আফ্‌গান সমানের' গৌরব গাথায় ভরপুর। তবে এ সকল গানে কাব্য অপেক্ষা কথা অনেক বেশি কাজেই আফগানদের কাছে ইহার উন্মাদনা তীব্র হইলেও, কাব্যজগতে ইহার বিশিষ্ট স্থান নাই।

দেশের রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়াও অনেক সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে সমগ্র দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের মালমাস্‌লা এই সকল গানের মধ্যে যথেষ্ট ভাবে পাওয়া যায়। আমরা এ স্থলে আর উহার আলোচনা করিব না।

'জার' 'জমিন' ও 'জান' অর্থাৎ 'অর্থ' 'মাটী' ও নারী এই তিনটী ব্যাপার লইয়াই আফ্‌গানদের যত কলহ। আমাদের আলোচ্য গানে, আফ্‌গানীস্থানের নারীদিগের অবস্থা দুই এক কথায় বেশ ধরা পড়ে—আমরা সেটুকু দেখাইয়া আজিকার এই ক্ষুদ্র আলোচনার শেষ করিব।

আফ্‌গানীস্থানের নারী এখনও প্রায় পণ্য দ্রব্যের মত পণ্য। বিশেষতঃ ইহাদের মধ্যে 'অবরোধ প্রথা এত ভয়ঙ্কর যে কোনও কাফেরের পক্ষে তাহাদের রচিত কোনও সঙ্গীত এমন কি তাহাদের আচার ব্যবহার পর্য্যন্ত জানিবার কোনও উপায় নাই। তথাপি গানের মধ্য দিয়া ইহার কিছু কিছু ধরা পড়ে। পিতার মৃত্যুতে কন্যা, স্ত্রী, ভগিনীর বিলাপ—পুত্রের মৃত্যুতে মাতার করুণ ক্রন্দন—সকলই তাহাদের গাথায় বিদ্যমান। মেয়েদের মধ্যেও অসাহিত্যিক কবি আছেন; তাহাদিগকে 'ডুমান' বলা হয়—কিন্তু তাহাদের কাব্য সাধারণতঃ 'হারেমের' গণ্ডীর বাহিরে আসিতে পারে না।

শিখদের সঙ্গে আফ্‌গানদের বহুদিনের শত্রুতা। শিখদের নিকটে অনেক সময়েই তাহাদের পরাজয় ঘটিয়াছে; এ সম্বন্ধে গাথার অভাব নাই। আমরা এই স্থলে সেই সম্পর্কিত একটী 'ঘুমপাড়ানী' গানের কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

বিজিত আফ্‌গানদের একটী মেয়েকে একজন শিখ ধরিয়া লইয়া যায়—এবং লাহোরে আনিয়া বসবাস করিতে থাকে। ক্রমে তাহাদের একটী সন্তান হয়। ইহার পর মেয়েটীর দুইটী ভাই বোনের খোঁজ করিতে করিতে লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বাড়ীর খোঁজ করিয়া জানালার নীচে দাঁড়াইয়া থাকে। বোনও তাহাদিগকে দেখিতে পায় এবং দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ সন্তানটীকে দোলনায় চাপাইয়া ঘুমপাড়ান গানের ছলে ভাই দুইটীকে সকল খবর বার্ত্তা জানাইয়া দেয়।

আমরা এইখানে সে গানের একটু নমুনা দিতে চেষ্টা পাইলাম :—

"দোল্ দোল্ দোল্ জঙ্গুটাই—
দস্যুরা কি আস্‌লে ভাই!
নীচেই কিগো থাক্‌তে হয়?
উপর তলায় নাইকো ভয়!
—চুপে চুপে আয়না তাই!
দোল্ দোল্ দোল্ জঙ্গুটাই!
কুকুর দেখে ভয় কি পাও?
বাঁধছি আমি দেখবে তাও!
—মোহর ভরা বাক্স চাই?
—দোল্ দোল্ দোল্ জঙ্গুটাই।
কাফের নেশায় রইল চুর—
তার কাছে সব স্বর্গপুর!
কিইবা কাণে শুনবে ছাই?
দোল্ দোল্ দোল্ জঙ্গুটাই!

আফ্‌গানী সাহিত্যে এমন সুন্দর গানের সংখ্যা আর বেশি নাই।*

* 'রবিবাসরের' পঞ্চদশ অধিবেশনে পঠিত।

সাঁঝের আলো

[কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়]

(ক)

রাজেনদের অবস্থা এক সময়ে খুবই সচ্ছল ছিল। গ্রামের মধ্যে তারা একটা বর্দ্ধিষ্ণু ঘর। কিন্তু জ্ঞাতিদের সঙ্গে বিবাদ বাধায় মামলা-মোকর্দ্দমার খরচ যোগাতে তারা সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে গেছে।

রাজেনের পিতা মরবার সময় পুত্রের হাতে তাঁর মাতৃ-হীনা অনূঢ়া কন্যা প্রিয়বালার বিবাহের ভার ও একরাশ ঋণ চাপিয়ে দিয়ে চ'লে গিয়েছিলেন।

সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বেচে রাজেন পিতার পরিত্যক্ত ঋণ অনেকটা পরিশোধ ক'রে এনেছিল বটে, কিন্তু ভগিনীর বিবাহে সে কোন ব্যবস্থাই করতে পারে নি।

অবস্থার মুখ চেয়ে তো আর সময় কোন দিন ব'সে থাকে না। প্রিয়বালার বয়স দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেড়েই চল্‌ল'। গ্রামের লোক রাজেনকে তাড়া দিতে আরম্ভ করল'—যেন দায়টা তার থেকে ওদেরই বেশী।

রাজেন বল্‌লে- খুঁজছি ত ভাই, দেখছ; কিন্তু ভাল ছেলে না পেলে কি করি ব'ল? ওই একটা মায়ের পেটের বোন। বাবা-মা নেই ব'লে তো আর হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারি নে।

গ্রামের লোকেরা কিছু দিনের জন্য চুপ ক'রে রইল; রাজেনও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কিন্তু, এবার যা আরম্ভ হ'ল, তাতে রাজেনের পক্ষে আর ধীরে-সুস্থে সুপাত্রের সন্ধান করা চলল না। ভগিনীর বিবাহের জন্য তাকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে উঠে প'ড়ে লাগতে হ'ল। কারণ, পাড়ায় তখন কাণা-ঘুসো থেকে ক্রমে প্রকাশ্য আলোচনা আরম্ভ হ'য়ে গেছে যে, গোঁসাইদের অরুণ ছোঁড়াটা নাকি প্রিয়বালার দিন-রাতের সঙ্গী হ'য়ে উঠেছে।

(খ)

অরুণরা রাজেনদের প্রতিবেশী। উভয় পরিবারের মধ্যে বহুদিনের সদ্ভাব। অরুণ প্রিয়বালার আজকের সঙ্গী নয়—সে তার ছেলেবেলা থেকেই খেলার সঙ্গী।

এতদিন তাদের ঘনিষ্ঠ মেলা-মেশায় পাড়ার লোক কেউ কিছু আপত্তি করেনি, বরং ওদের দুটিতে বড় বেশী ভাব এবং দিন-রাত ওরা দুজনে মিলে খেলা ধূলা করে দেখে পাড়ার বৃদ্ধ ও বর্ষিয়সীরদল তখন ঠাট্টা ক'রে ওদের 'বর-কণে' ব'লে ক্ষেপাত।

কিন্তু, আজ অরুণ ও প্রিয়বালা দুজনেই এমন একটা বয়ঃ-সন্ধিতে এসে পৌঁছেচে যে, ওদের ছেলেবেলার মেলা-মেশার সম্পর্কটাকে সকলেই সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ ক'রেছে। কাজেই অভিভাবকদেরও বাধ্য হ'য়ে ওদের দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত আজকাল বন্ধ ক'রে দিতে হয়েছে।

সবার সতর্ক দৃষ্টি ও কড়া শাসনের পাহারাকে এড়িয়ে তবু তারা মধ্যে মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না ক'রে থাক্‌তে পার্‌ত না। শৈশবের স্নেহ-ভালবাসা আজ যৌবনের রঙে রঙীন হ'য়ে, এক অভিনব রূপ ধরে তাদের অন্তর আলো ক'রে বসেছে। এর দুর্ণিবার আকর্ষণ রোধ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। রূপ-লাবণ্যময়ী তরুণী প্রিয়বালা আজ অরুণের চোখে সপ্ত স্বর্গের কামনার ধন। নব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত, প্রিয়দর্শন অরুণ আজ রূপ-কথার রাজপুত্রের মতই প্রিয়বালার অন্তর বহির প্রেমের অরুণ-কিরণে সমুজ্জ্বল ক'রে দিয়েছে।

যে কথা এতদিন তারা পরস্পরের কাছে স্পষ্ট ক'রে বলতে পারে নি, বাইরের লোকের মুখে মুখে আজ তার কটু ইঙ্গিত সহসা যেন এদের সমস্ত সঙ্কোচের বাধা বিদূরিত ক'রে প্রকাশের ভাষা এনে দিল।

সেদিন তাদের নির্জ্জনে গোপন সাক্ষাতের অমূল্য ক্ষণটুকুতে তারা পরস্পরের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় ক'রে উভয়ে উভয়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল যে, অরুণ যেমন

ক'রে হোক প্রিয়বালাকে বিবাহ করবেই; এবং অরুণের চরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রিয়বালাও জানিয়ে গেল, আজ থেকে অরুণই তার স্বামী।

কিন্তু মানুষ গড়ে আর বিধাতা ভাঙ্গে, ব'লে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। এদেরও জীবনে সেটা সপ্রমাণ হ'য়ে গেল।

অরুণ যে-দিন প্রিয়বালাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব নিয়ে রাজেনের কাছে গেল, সেদিন তাকে নিদারুণ অপমানিত ও তিরস্কৃত হ'য়ে ফিরে আস্তে হ'ল।

অরুণেরা রাজেনদের চেয়ে কেবলমাত্র বংশমর্য্যাদাতেই নীচু নয়, তাদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুব অসচ্ছল। রাজেন তাই অরুণকে স্পষ্টই তার মুখের উপর ব'লে দিল যে, সে সকল বিষয়েই প্রিয়বালাকে বিবাহ করবার একান্ত অযোগ্য। যার নিজেকে ভরণ-পোষণ করবার সাধ্য নেই, সে আবার বিবাহ করতে চায় কোন্ লজ্জায়? তা ছাড়া সেই মাসেরই শেষ লগ্নে প্রিয়বালার অন্যত্র বিবাহ হ'বার কথা প্রায় পাকা-পাকি রকম স্থির হ'য়ে গেছে। সুতরাং অপদার্থ অরুণ যেন দ্বিতীয়বার আর তার কাছে এরূপ অপমান-জনক প্রস্তাব করবার স্পর্দ্ধা না করে।

অরুণের মুখে প্রিয়বালা এ কথা শুনে আত্মহত্যা করবে বল্ল—জলে ডুবে মরতে চাইল। কিন্তু অরুণ তার দুটি হাত ধ'রে সজল চোখে, মিনতি ক'রে যখন বল্ল—প্রিয়, তুমি আমার; তোমাকে কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। আমি আজই এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি। যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন ক'রে ফিরে আসার অপেক্ষা ক'রে তোমাকে বেঁচে থাক্‌তেই হবে।

প্রিয়বালা তার বিস্মিত মুখের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি অনেকক্ষণ অরুণের দিকে নিবদ্ধ ক'রে রেখে ধীরে ধীরে বল্ল—কিন্তু দাদা যদি এরই মধ্যে জোর ক'রে আমার বিবাহ দেন?

অরুণ কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—তা দিলেই বা। সে বিবাহ ত আর সিদ্ধ হবে না। তুমি যে আমারই স্ত্রী! পুঁথির মন্ত্র প'ড়ে আমাদের বিবাহ হয় নি বটে, কিন্তু প্রিয়, তার চেয়েও বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর বিধান মেনে আমাদের পরিণয় সুসম্পন্ন হয়েছে। এ যে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ।

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে অরুণ আবার বল্ল—বিবাহ যদি হ'য়েই যায়, আমি ফিরে এসে তাঁর কাছ থেকে তোমাকে নেবার জন্য দাবী করব। তিনি যদি আমার স্ত্রীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে না চান, আমি জোর ক'রে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাব।

অরুণের মুখের এই আশ্বাস-বাণীকে প্রিয়বালা কিছুতেই যেন অবিশ্বাস করতে পারল না। অরুণের কাছে এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে সে আজ অনেকটা নিজেকে নিশ্চিন্ত বোধ করল। তার মনের মধ্যে যে উন্মত্ত ঝড় উঠেছিল, যে দুশ্চিন্তার তুফান ছুটেছিল, তা যেন নিমেষে শান্ত হ'য়ে গেল।

তারপর প্রিয়বালার বিবাহের লগ্ন সত্যই যে-দিন নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে গেছে ব'লে প্রতিবেশীরাও জান্‌তে পেরেছিল, অরুণ তার পূর্ব্ব দিনই কাউকে কিছু না ব'লে কোথায় যে নিরুদ্দেশ হ'য়েছিল, পাঁচ বৎসর ধ'রে নানা স্থানে অনুসন্ধান ক'রেও কেউ সে কথা জান্‌তে পারেনি।

(গ)

অবশেষে একদিন সে অকস্মাৎ ফিরে এল। প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন ক'রে এনেছিল বটে, কিন্তু ফিরতে তার বিলম্ব হ'য়ে গিয়েছিল অনেক।

পাঁচ বৎসর তো বড় অল্প সময় নয়। অরুণ এসে দেখল যে, গাঁয়ের অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে। পরিচিত ও আত্মীয় বৃদ্ধেরা আজ অনেকে জীবিত নেই। যাদের সে যুবা দেখে গিয়েছিল, তারা আজ বয়স্থ—সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার করছে।

রাজেনদের ঘর-বাড়ী গাঁয়ের এক কলুদের হাতে এসেছে তখন। তাদের অনেক জিজ্ঞাসাবাদ ও জেরা ক'রে অরুণ আবিষ্কার করল যে, রাজেনের ভগিনী প্রিয়বালা বিবাহের অল্প দিন পরেই বিধবা হ'য়ে ভাইয়ের আশ্রয়েই ফিরে এসেছিল? কিন্তু অভাগিনীর এমনই অদৃষ্ট যে, বছর ফিরতে না ফিরতেই তিন দিনের জ্বরে হঠাৎ রাজেনবাবুর মৃত্যু হ'ল। মেয়েটী একেবারে অসহায় হ'য়ে পড়ল। গাঁয়ের দুষ্ট লোকেরা তাকে কুপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। তারা তার দাদার বিষয়-সম্পত্তিও ফাঁকি দিয়ে নেবার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছিল;

কিন্তু কিছুতেই তা পারে নি। সে ভারী শক্ত মেয়ে। তা ছাড়া, পাশের বাড়ীর গোঁসাই গিন্নী তখনও বেঁচে ছিলেন। তিনি প্রিয়বালাকে ডানা দিয়ে ঘিরে সকল বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন।

গ্রামে কিন্তু বাস করা তাদের পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হ'য়ে উঠল। তাদের অনাথা, অসহায়া বিধবা পেয়ে পাড়ার লোকের অত্যাচার ক্রমেই তাদের উপর বেড়ে উঠতে লাগল। তখন রাজেন-বাবুর ভগিনী আর সহ্য করতে না পেরে, গোঁসাই-গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে জমি-জমা, ঘর-বাড়ী সব বেচে, নগদ টাকা হাতে ক'রে গোঁসাই-গিন্নীর সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। সেই যে তারা দুটীতে গেছে, সে হ'ল আজ প্রায় দুই বৎসরের কথা। এখনও পর্য্যন্ত কেউ ফেরে নি, বা তাদের কোন সংবাদও পাওয়া যায় নি।

অরুণ সমস্ত শুনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, তার গাঁটরী তুলে নিয়ে ধূলা-পায়ে গ্রাম থেকে বিদায় হ'য়ে গেল। পাঁচ বছর আগে আর একবার সে যখন এমনই নিঃশব্দে এই গ্রাম ছেড়ে চ'লে গিয়েছিল সেদিন তার জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহের অন্ত ছিল না। আশা তার এখনও মরে নি বটে, কিন্তু সে উৎসাহ ও উদ্যম আর ছিল না।

প্রিয়! প্রিয়! প্রিয়! দীর্ঘ পাচ বৎসরকাল সুদূর বিদেশে তার অন্তর হাহাকার করেছে—এই মেয়েটীর জন্য! কত বিপদ, কত ঝঞ্ঝা, উত্তীর্ণ হ'য়ে সে যখন দেশে ফিরে এল তার সেই প্রাণ-প্রিয়কে বুকের ধন করতে—না হয় অন্ততঃ একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য—হায়! কোথায় সে? আজ কয় বছর হ'য়ে গেল সেও যে নিরুদ্দেশ! বেঁচে আছে কি? যদি থাকে, কোথায় সে? কোথায় তার দেখা পাওয়া যেতে পারে? কোথায় গেলে তাকে পাবে সে?

অরুণের মনে পড়ে গেল, কলুরা বলেছে তারা তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছিল—আর দেশে ফেরে নি। তবে কি কোন তীর্থে গেলে তার দেখা পাওয়া যেতে পারে?

এমনি ক'রে সারা পথ প্রিয়বালার কথা ভাবতে ভাবতে অরুণ রেল ষ্টেশনে এসে পৌঁছিল। একখানি ট্রেণ তখন ছাড়বে-ছাড়বে করছে। অরুণ ছুটে গিয়ে একখানা কাশীর টিকিট কিনে একেবারে গাড়ীতে গিয়ে উঠে বস্‌ল।

ট্রেণের দোলায় ক্লান্ত শরীরে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, জানে না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছিল, যেন ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ সে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রিয়বালাকে খুঁজে খুঁজে। কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সব তীর্থ শেষ ক'রে সে যখন 'সাবিত্রী' পাহাড়ে এসে পৌঁছল, অকস্মাৎ সেখানে একদিন সন্ধ্যাবেলা পাহাড়ের চূড়ার উপর সে তার প্রিয়বালাকে দেখ্‌তে পেল। অরুণ ছুটে গেল তাকে ধরতে; কিন্তু যেমন সে তার কাছে গিয়ে পৌঁছেচে, প্রিয়বালা যেন হঠাৎ পাহাড়ের চূড়া থেকে একেবারে গভীর অতলে লাফিয়ে প'ড়ে গেল।

অরুণ আতঙ্কে চীৎকার ক'রে উঠল—তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ চেয়ে দেখে, সে রেল-গাড়ীর কামরায় প'ড়ে রয়েছে। ট্রেণ তখন কি একটা ষ্টেশনে এসে থেমেছে। তার সহ-যাত্রীরা কখন যে নেমে গেছে, তা সে জানতেও পারে নি। সে তখন উঠে বসল।

সর্ব্বনাশ! তার গাঁটরী? গাঁটরী কোথায় গেল? পাঁচ বৎসরের কষ্টোপার্জ্জিত সমস্ত সম্পদ্ যে তার ছিল সেই গাঁটরীর মধ্যে।

বাইরের প্ল্যাট্‌ফরম থেকে একটা কুলী তখনও হাঁকছে—মোগলসরাই! থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল, এবং তার এই সর্ব্বনাশের কথা গার্ডকে জানাতে ছুটল। কিন্তু পা যে আর নড়ে না! একটুখানি গিয়েই সে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল।

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখে, অনেক লোকজন তার চারিপাশে জড়' হয়েছে। সবাই তাকে প্রশ্ন করছে—সে কে? কোথায় যাবে? কি হয়েছে তার? অরুণ তাদের সব কথা বল্‌তে, তারা ধরাধরি ক'রে তাকে কাশীর গাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুলে দিল; তার পকেটে কাশীর টিকিটখানা তখনও ছিল। কিন্তু, অনেক অনুসন্ধানেও তার গাঁটরীর কিনারা হল' না।

(ঘ)

অরুণ দেহ-মনে অবসন্ন হ'য়ে কাশীর এক দাতব্যছত্রে এসে আশ্রয় নিল। সেখানে হঠাৎ তার নজরে পড়ল,

সেই ছত্রেরই এক কোণে, ঠিক যেন তার সেই হারান গাঁটরীটা মাথায় দিয়ে একটী স্ত্রীলোক গাঢ় ঘুমে অচেতন। পা টিপে টিপে অরুণ তার কাছে গিয়ে চিন্‌তে পারল—হাঁ ঠিক, এই তো তার হারান' গাঁটরী! কিন্তু, এ স্ত্রীলোকটী কে? আর এর কাছে কেমন ক'রে তার গাঁটরী এল?

ক্ষণকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকটীকে দেখতে দেখতে অরুণ চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—তুমি? তুমি কি প্রিয়বালা?

স্ত্রীলোকটী ধড়মড়িয়ে উঠে বস্‌ল। অরুণের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে দেখে তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো।

সে যুক্ত করে ব'লে উঠ্‌ল—এসেছ! ফিরে এসেছ! এতদিনে কি তোমার মনে পড়ল এই অভাগীকে? ওগো, তা হ'লে তো আমি ভুল করি নি। ঠিক ধরেছি—এ আমারই জিনিস চোরে নিয়ে যাচ্ছিল। এই গাঁটরীর উপর 'তোমার নাম' লেখা রয়েছে দেখে আমি যেমন তাদের জিজ্ঞাসা করেছি-"এ কার জিনিস' তোমরা কোথায় পেলে?" তখন তারা এই গাঁটরী ফেলে কে কোথায় পালিয়ে গেল। তোমার নাম লেখা গাঁটরী—আমি বুকে ক'রে তুলে নিলাম। খুলে দেখ্‌লাম—এ আমারই ধন। আমি তাই এই অমূল্য সম্পদ্ মাথায় নিয়ে শুয়ে ছিলাম।

অরুণ নত হ'য়ে প্রিয়বালাকে পায়ের কাছ থেকে তুলে বসাল! সে বিহ্বলকণ্ঠে বল্‌ল, গাঁটরী না পেলেও কোন দুঃখ ছিল না। যার জন্য এ সঞ্চয় তাকে যে আজ পেলাম। দেশে ফিরে এসে তোমার সমস্ত কথাই শুনেছি। দেখ প্রিয়, এখন আর আমাদের মিলনের পথে কোন বাধা নাই, ভগবান দয়া ক'রে সে বাধা সরিয়ে নিয়েছেন। এস এই বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে আমরা পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হই। হিন্দুর বিধবার বিবাহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ছিল না। এখন লোকাচারেও চ'লে গেছে। এস একটা ভাল দিন দেখে কুসংস্কার-বর্জ্জিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের দ্বারা আমরা পরিণীত হই।

প্রিয়বালা যুক্তকরে কাতর কণ্ঠে "দয়াল বিশ্বনাথ! বিশ্বনাথ!" ব'লে একবার ঊর্দ্ধদিকে চেয়ে চেয়ে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

মেঘের মায়া

(শ্রীপ্রফুল্ল সরকার)

গগন ঘিরে আলো ছায়ায়
মেঘের মায়া!
পরশ বুলায় শুষ্ক শাখায়
তিমির ছায়া।
বাষ্প-সজল আঁখির তলে
তড়িৎ হাসির হীরক জ্বলে,
নিথর কালো আস্‌ছে নেমে
নিটোল কায়া!

ওগো আমার মনের বনে
কদম কেয়া,
উঠ্‌ল' আজি কি হর্ষণে
কণ্টকিয়া!
বুকের বকুল বীথির 'পরে
যে উদাসীর অশ্রু ঝরে,
আভাস তারি দেয় গগনে
সজল দেয়া।
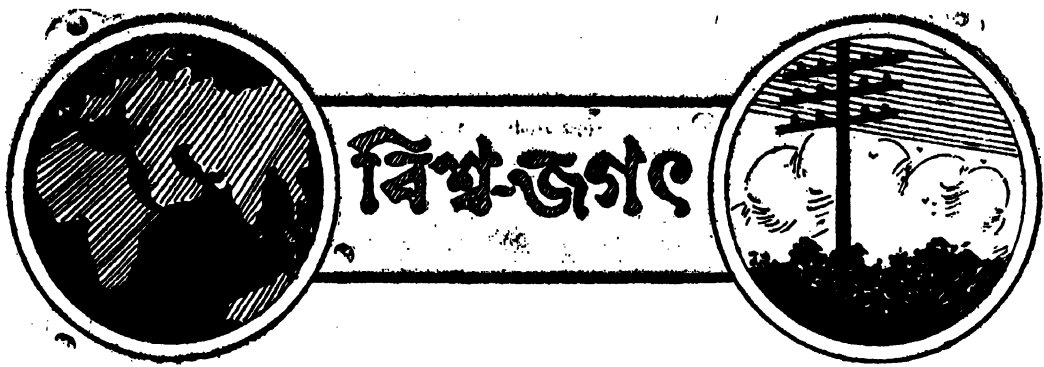
প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের পদচিহ্ন

কিছুদিন হইল Albama প্রদেশের একটী Corbon Hill হইতে একখানি পাথর পাওয়া গিয়াছে। এই পাথরটীর উপর কোন প্রাণী বিশেষের কয়েকটী পদাঙ্ক আছে। বিশেষজ্ঞরা বলিয়াছেন, ঐগুলি ২৫০,০০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত কোন জন্তুর পদচিহ্ন। এইগুলি যে জন্তুর পদাঙ্ক বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে শুনা যায় নাকি তাহারা স্থলচর ও আকাশচর প্রাণীর সৃষ্টিরও পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিল।

এই Carbon Hillটীর আশে-পাশে আরও অনেক স্থানে প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের জীবজন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই স্থানটী প্রাচীন কালের, অধুনা-বিলুপ্ত কোন নগরের ধ্বংসাবশেষ। প্রাপ্ত শিলাখণ্ডটীর একখানি প্রতিলিপি দিলাম।

বেতারে সংবাদপত্র প্রেরণ

বেতার আবিষ্কার হইয়া গত কয়েক বৎসরে বিজ্ঞান-জগতের যে অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিছু দিন হইল পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীদের নিকট বেতার বিপদের বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে—সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক বহু কার্য্যই বেতারে সম্পাদিত হইতেছে।

সম্প্রতি আমেরিকার সংবাদপত্র-ব্যবসায়ীরা বেতারকে তাঁহাদের সুবিধামত কাজে লাগাইয়াছেন। কিছুদিন হইল, আমেরিকার একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ঠিক করিয়াছেন যে, তাঁহারা আর ডাকে বা ফেরিওয়ালা পাঠাইয়া গ্রাহকগণের নিকট কাগজ প্রেরণ করিবেন না—বেতার সাহায্যে সে কাজ চালাইবেন। প্রথম প্রচেষ্টা স্বরূপ সেদিন San Francisco হইতে আড়াই হাজার মাইল দূরে Schenectady নামক নিউইয়র্কের একটী সহরে বেতারে সংবাদপত্র পাঠান হইয়াছিল। শুনা যায় না কি ছাপাখানা হইতে কাগজ বাহির হইবার তিন ঘণ্টার মধ্যে Schenectadyর গ্রাহকেরা কাগজ পান।
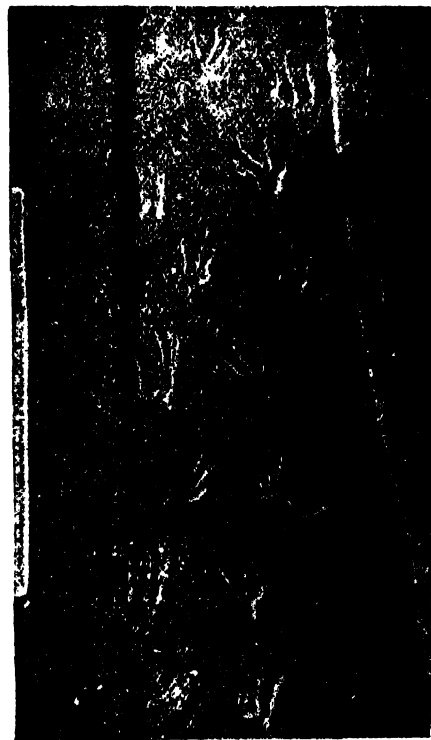
প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তুর পদচিহ্ন

বেতারে পাঠান কাগজটী সাধারণ খবরের কাগজের ন্যায় প্রকাণ্ড কাগজে ছাপা হয় নাই; আট ইঞ্চি লম্বা সরু সরু ফালি কাগজে ছাপা হইয়াছিল। বেতারে যে-উপায়ে ফটোগ্রাফ্‌ পাঠান হইত, এই সংবাদপত্র পাঠাইবার

প্রাণালীও ঠিক তাহাই। সংবাদপত্রের প্রত্যেক গ্রাহককে বেতারে সংবাদপত্র গ্রহণ করিবার জন্য একপ্রকার স্যুটকেসের ন্যায় বাক্স দেওয়া হইয়াছে; এই বাক্সগুলির মধ্যেই প্রত্যহ প্রাতে সংবাদপত্র পাওয়া যায়। যন্ত্র হইতে যখন সংবাদপত্র বাহির হয় তখন সাধারণতঃ ভাঁজ করা থাকে না—একটী আট ইঞ্চি লম্বা গুটান কাগজের বাণ্ডিলের ন্যায় বাহির হয়। এইরূপ বেতারে কাগজ পাইবার জন্য ঐ সংবাদপত্রটীর গ্রাহক-সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির খেয়াল্

এখানে একটী ছাগলের চিত্র দেখা যাইতেছে। ইহা কেহ কাগজের উপর কালী দিয়া অঙ্কিত করে নাই! প্রকৃতির খেয়ালে কাঠের উপর আপনা হইতেই ঐরূপ হইয়া গিয়াছে।

অদ্ভুত ছাগমস্তক

Madisonএর একটী Forest Product Laboratoryতে এই কাষ্ঠখণ্ডটী পাওয়া যায়। একটী মিস্ত্রী ঐ কাঠটির উপর রেঁদা চালাইতেছিল, হঠাৎ তাহার নজর পড়ে যে, কাঠের উপর কেমন একটী ছাগলের ছবি তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। সে তখনই Laboratoryর একজন রাসায়নিককে ডাকিয়া পাঠায়। তিনি আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, সত্যই কেহ উহা আঁকিয়া রাখিয়া যায় নাই। কাঠের আঁশগুলি বিচিত্রভাবে একত্রে সন্নিবেশিত হইয়া ঐরূপ হইয়াছে।

সিডনি হারবার ব্রীজ

পৃথিবীর মধ্যে কোন্ সেতুটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এই এই বিষয়ে অনেকের বহু ভ্রান্ত ধারণা থাকিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি একটি বৈদেশিক পত্রে এই বিষয়ে এক ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; ইহা হইতে জানা যায় যে, Australiaর 'Sydney Harbour Bridge' নামে যে-সেতুটী তৈয়ারী হইতেছে তাহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সেতু হইবে।

এই সেতুটীর নির্ম্মাণ-কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। গত ১৯২৪ খৃঃ ইহার কাজ আরম্ভ হয় এবং আশা করা যায়, কাজ শেষ হইতে আরও দুই বৎসর লাগিবে। এই সেতুটীর পিল্লার মধ্যবর্ত্তী খিলানের উচ্চতা ১,৬৫০ ফিট এবং ইহার তলায় এইরূপ পরিমাণে ফাঁকা রাখা হইয়াছে যে, ১৭০ ফিট উচ্চ যে কোন জাহাজ নির্ব্বিবাদে তলা দিয়া যাইতে পারিবে। শুনা যাইতেছে, যে এঞ্জিনিয়ার এই সেতুটী তৈয়ার করিয়াছেন, তিনি ইহার সৌষ্ঠব-রক্ষার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। এই সেতুটীর উপর দিয়া চারিটী রেল-পথ বিভিন্ন স্থানে চলিয়া গিয়াছে। কেবল তাহাই নহে—মানুষের পায়ে হাঁটিয়া যাইবার জন্য ৬০ ফিট প্রস্থ দুইটী পথ দুই ধারে আছে।

এই সেতুটীর নির্ম্মাণ-কার্য্যের ভার লইয়াছেন এঞ্জিনিয়ার Dorman Long & Co.

শক্তিশালী বৈদ্যুতিক বাতি

আমাদের সাধারণ গৃহে জ্বলিবার জন্য সামান্য শক্তিশালী বৈদ্যুতিক বাতিতেই চলে; কিন্তু চলচ্চিত্রে ছবি তুলিবার সময় যথেষ্ট শক্তিশালী বাতির প্রয়োজন হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চলচ্চিত্রশিল্পিগণ সন্তোষজনক কোন বাতি পান নাই। এই কারণে বহু সুন্দর সুন্দর ছবি তুলিবার সময় পরিচালকদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে।

কিছুদিন হইল, এক প্রকার ৬,০০,০০ বাতি শক্তিশালী

শক্তিশালী বৈদ্যুতিক বাতি

বৈদ্যুতিক আলোকের আবিষ্কারে এই অসুবিধা দূর হইয়াছে। এই আলোক তৈয়ারী করিয়াছেন, আমেরিকার General Electric Company. এই বাতিটীর ভিতরের ফাঁপা অংশটীর ব্যাস তিন ফুট। এই বাতিটী বর্ত্তমানে সবাক্ চিত্র তুলিবার জন্ত ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে সবাক্ চিত্র তুলিবার জন্ত "Kleig" নামক এক-প্রকার বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার ছিল। কিন্তু তাহার প্রধান দোষ ছিল এই যে, আলো জ্বালিলে বাতির মধ্য হইতে ভয়ানক শোঁ শোঁ শব্দ হইত। এইরূপ শব্দ হইলে সবাক্ চিত্রের record তোলা বড়ই শক্ত হইত। সুখের বিষয়, এই নবনির্ম্মিত বৈদ্যুতিক বাতিটীতে এই সকল অসুবিধা আর নাই।

জানালাবিহীন বাসগৃহ

বাস-গৃহে জানালা না রাখিয়া যে থাকিতে পারা যায়, এ ধারণা আমাদের ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি Ohioর এক বিখ্যাত মিস্ত্রী Zay Jeffries এক প্রকার জানালাবিহীন বাসগৃহের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে এইরূপ গৃহ তৈয়ারী করিলে স্বাস্থ্যের দিক দিয়া যে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে, এমন নহে। তিনি বলিয়াছেন, দেহ-রক্ষার জন্য সূর্য্যালোকের যথেষ্ট প্রয়োজন থাকিলেও সে কাজ Ultra-violet lampsএর সাহায্যে চলিবে। কারণ, সূর্য্যালোকে আমাদের দেহের উপর যে কাজ করে, এই আলো হইতে বিকীর্ণ রশ্মি তাহা করিতে সমর্থ হইবে।

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, আমেরিকার অধিবাসীরা এই শ্রেণীর বাস-গৃহ তৈয়ারী করার সপক্ষে। সেই কারণে আশা করা যায়, শীঘ্রই ঐ দেশে এইরূপ দু'একখানি বাড়ী তৈয়ারী হইবে।

সমুদ্রগর্ভে বিবাহ

আমেরিকাটা যে একটা হুজুকের দেশ, তাহা কেহই বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। ঐ দেশের লোকেরা যাহা-কিছু করুন না কেন, অতি তুচ্ছ ব্যাপার হইলেও, তাহারই মধ্যে একটা নূতনত্ব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। সামান্য বিবাহ হইবে, তাহাতেই কত লোকে কত নূতন নূতন পথ দেখাইল। বিবাহে নূতনত্ব সৃষ্টি করিবার জন্য প্রথমে এক ব্যক্তি টেলিফোনে বিবাহ করেন। তারপর আর এক ব্যক্তি গির্জ্জায় না গিয়া রাস্তায় মোটারে চড়িয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বিবাহ করেন। তাহার পর ইহাও যখন পুরাতন হইয়া গেল, তখন বিমানপোত হইতে প্যারা-সুটে (parachute) করিয়া নামিবার সময় একব্যক্তি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

কিন্তু বর্ত্তমানে Los Angelesএর এক ব্যক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত বিবাহ-প্রথাকে হারাইয়া দিয়াছেন। টেলিফোনে বা বিমানপোতে তাঁহার সখ মিটে নাই। সেই কারণে সমুদ্রের তলায় গিয়া স্ত্রীরত্নটী কুড়াইয়া আনিয়াছেন। এই নব-বিবাহিতের মধ্যে বরটী ছিলেন ডুবারী। সেই কারণে বোধ হয় তাঁহার ঐরূপ অদ্ভুত খেয়াল হইয়াছিল।

আকাশ-পথে দমকল

আমাদের দেশে মাটীতে এবং জলে চালাইবার মত দমকল আছে; কিন্তু আমেরিকায় সম্প্রতি এক প্রকারের এরোপ্লেন দমকলের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এই প্রকারের

দমকল সাধারণ ছোট-খাট বাড়ীতে আগুন লাগিলে ব্যবহার করা হয় না; যদি কোন প্রকাণ্ড বাড়ীতে বা জঙ্গলে আগুন লাগে তখন ব্যবহার করা হয়। কয়েকটী ছোট ছোট Moth-planeকে এইরূপ দমকলে পরিণত করা হইয়াছে। এই দমকলগুলির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন Department of Commerce, Canada। এই বিমান দমকলগুলিতে দুই জন পাইলট, একটী মেশিন, ও সাত জন খালাসীর স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে

—

কুয়াসা বিতাড়নের নূতন উপায়

বিলাতে হঠাৎ চারিদিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়া এক নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। ইহাতে সাধারণের এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কিছুদিন হইতে এই কারণে কুয়াসা তাড়াইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছিলেন। সম্প্রতি Massachusetts Institute of Technologyর Meteorological observatory কুয়াসা তাড়াইবার এক নূতন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

তাঁহারা বিভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা বায়ুর গতি, কুয়াসার রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া যদি তাহা ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে গলাইয়া দিতেছেন। এই কুয়াসা তাড়াইবার নূতন প্রচেষ্টায় দিন দিন কত জাহাজ যে বিপদের মুখ হইতে রক্ষা পাইতেছে তাহার সংখ্যা নাই।

—

প্রাচীন ব্যাবিলনের দলিল

যে ছবিখানি দেওয়া হইল, তাহা প্রাচীন ব্যাবিলনের মাটীর উপর খোদিত দলিলের ছবি। সম্প্রতি ইহা ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ হইতে খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কাগজ ছিল না, সেই কারণে এইরূপ শক্ত মাটির উপর আঁচড় টানিয়া লেখা হইত।

এই দলিলটী একটী জমী-বিক্রয়-সংক্রান্ত। বিশেষজ্ঞরা দলিলটী পড়িয়া বলিয়াছেন—ইহাতে লেখা আছে—"Annah-Iddanun, যাহার দ্বিতীয় নাম Dumki-Anu। সে তাহার Urnkএর Ishtar Gate নামক স্থানের বাগানবাটীটী Nurকে চিরকালের জন্য বিক্রয় করিতেছে। যদি ভবিষ্যতে কেহ এই জমীর দাবী করে তাহা হইলে বিক্রেতাকে ইহার বারগুণ দাম ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হইবে।"

দলিলটীর পিছনে বার জন সাক্ষীর নাম স্বাক্ষর করা আছে।

—

বিমানপোত হইতে ঝম্প প্রদান

বিলাতে কোন দুঃসাহসিক কার্য্য করার যথেষ্ট আদর আছে। সেরূপ কাজের মধ্যে বিমানপোত হইতে ঝাঁপ দেওয়ার কদর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই কাজ ভয়ানক বিপজ্জনক হইলেও আজকাল বহুলোক ইহাকে জীবন-ধারণের সংস্থান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল পেশাদার দুঃসাহসিক বিমান-বীরদের মধ্যে Mr. Buddy Bushmeyerই যথেষ্ট নাম কিনিয়াছেন। সাধারণে ইঁহার
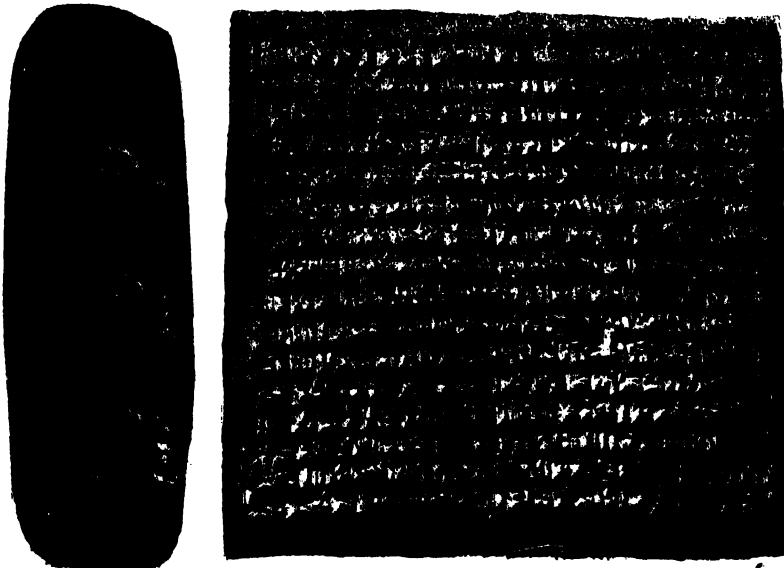
প্রাচীন ব্যবিলনের দলিল

Buddy Bushmeyer ঝম্পদানের অব্যবহিত পূর্ব্বে
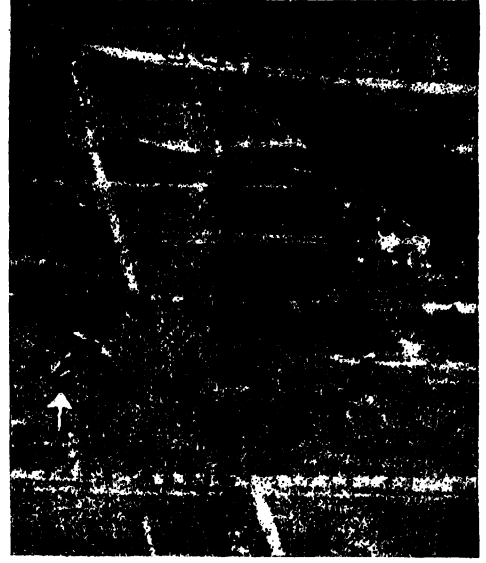
নাম দিয়াছে—"Greatest Dare-Devil of the Air."

ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে Roosevelt নামক বিমানপোতে ৮০০০ ফুট উচ্চ স্থান হইতে মাটীতে লাফাইয়া পড়িবার সময় অবশ্য তিনি খালি হাতে নামেন নাই—প্যারাসুট লইয়া নামিয়াছিলেন। ইনি যে কেবল সমতলভূমির উপরেই সাধারণতঃ নামেন, তাহা নয়—দুএকবার Colorado mountainsএর উপর, আমেরিকার একটী হ্রদে এবং মরুভূমির মধ্যে লাফাইয়া পড়েন।

সম্প্রতি ইনি একটী বিলাতী পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে কি করিয়া আকাশ হইতে ঝাঁপাইয়া পড়া যায়, তাহা বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন, আকাশ হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িবার সময় পূর্ব্ব হইতেই প্যারাসুট খুলিয়া রাখিতে হয় না। প্রথমে খালিহাতে শূন্যে ঝাঁপ দিতে হয়; তাহার পর আস্তে আস্তে কোমরবন্ধ বা পিঠ হইতে (যাহার যেরূপ প্যারাসুট) প্যারাসুট খুলিয়া দিতে হয়। প্যারাসুট মুক্ত করিয়া দিলে হাওয়া লাগিয়া ক্রমে ক্রমে তাহা ছাতার আকার ধারণ করে। এই প্যারাসুট খুলিবার সময়টীই সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক সময়। এই সময় যদি কোন রকমে হঠাৎ প্যারাসুট জড়াইয়া যায়, তাহা হইলে বায়ুবেগে মাটীতে পড়িয়া গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাওয়া অনিবার্য্য। প্যারাসুট গুটাইয়া

বিমানপোত হইতে আকাশপথে উল্লম্ফন

রাখাও বেশ শক্ত কাজ। মাটিতে নামিবার পর ইহাকে কতকটা স্ত্রীলোকের বেণীর ন্যায় বিনাইয়া বিনাইয়া গুটাইয়া রাখিতে হয়। ভাল করিয়া গুটাইতে না পারিলে ঝাঁপ দিবার সময় বিপদে পড়িতে হয়।

Mr. Bushmeyer কিছুদিন হইল কয়েকটী ছাত্র-ছাত্রী লইয়া এই বিদ্যা শিখাইবার জন্য স্কুল খুলিয়াছেন।
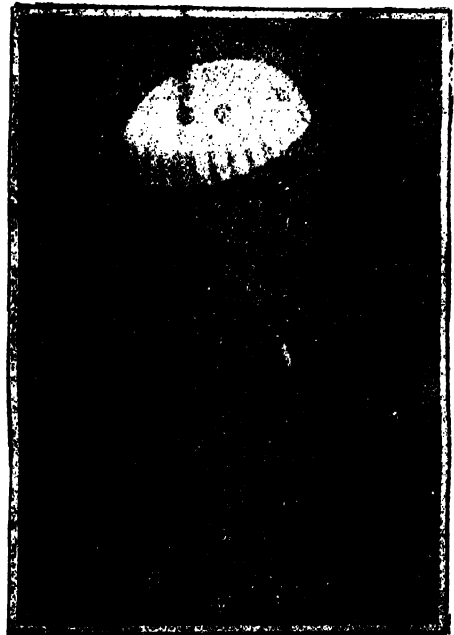
প্যারাসুটের সাহায্যে অবতরণ-কালে

তাঁহার মতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরাই এই কাজে সহজে পারদর্শী হয়। ইঁহার পূর্ব্বে Jack Cope নামক একব্যক্তি বিমানপোত হইতে লাফাইয়া বেশ নাম করিয়া ছিলেন।

প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ

কিছুদিন হইল আমেরিকার Princeton বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক J. Leslie Shear প্রাচীন এথেন্সের পারথিনন (Parthenon) নামক সহরটীর একটী বাজারের ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। সমস্ত সহরটী এখনও সম্পূর্ণ খুঁড়িয়া বাহির করা হয় নাই, কারণ তাহা করিতে প্রায় দশ বৎসর সময় অতিবাহিত হইবে। আমেরিকা হইতে অন্য পক্ষে চল্লিশটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীরা আসিয়া এই অভিযানে যোগদান করিয়াছে।

শত শত লোকের সমাবেশ হইত। শুনা যায়, বিখ্যাত Apellesএর ছবিগুলি এই স্থানেই প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিকদের নির্দ্দেশ অনুসারে জানা যায় যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এই স্থানে Alexander the Greatএর সহিত Diogenesএর সাক্ষাৎ ঘটে। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসের বহুস্থানে এই বাজারটীর সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। অনুসন্ধান-কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই কারণে এথেন্সের বহুস্থান অপরিচিত থাকিয়া গিয়াছে। কিছুদিন পরে খনন-কার্য্য যখন আরও একটু অগ্রসর হইবে তখন Plato, Socrates প্রভৃতি পণ্ডিতেরা যে-স্থানে বসিয়া জ্ঞান-সাধনা করিয়াছিলেন সেই সমস্ত স্থানের নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে। এই অনুসন্ধান-কার্য্য চালাইবার জন্য আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় একলক্ষ ডলার ব্যয় হইবে। আমাদের দেওয়া ছবি-

এথেন্সের ধ্বংসাবশেষ
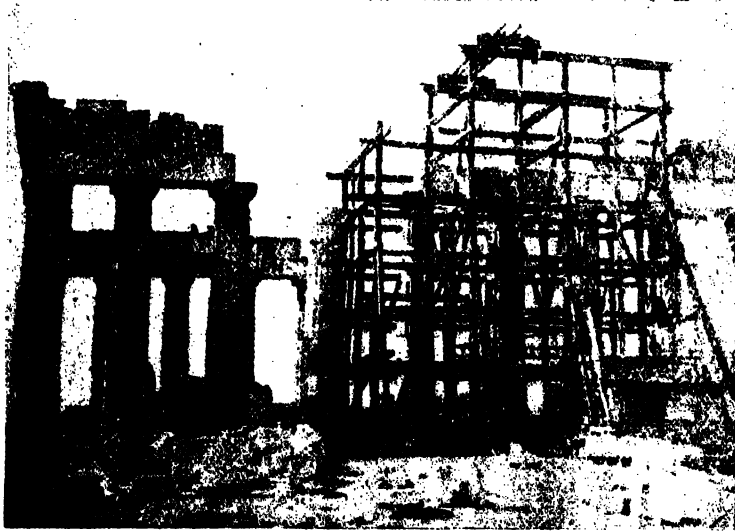
বর্ত্তমানে যে স্থানটী খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে তাহা বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত জড়িত। এই স্থানে এক সময় বহু দোকান বাজার প্রভৃতি ছিল এবং প্রত্যহ

খানিতে পারথিননের বাজারটী কিরূপ মেরামত করা হইতেছে দেখা যাইবে।

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

প্রাচীন রুটিখানা

সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মেসোপোটেমিয়াতে প্রেরিত অভিযানে (Field Museum—Oxford University Joint Expedition to Mesopotamia) জেমদেট নাসর (Jemdet Nasr) নামক নগরীতে রুটিখানার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ঐ রুটিখানা কতকগুলি মাটির উনানের সমষ্টি মাত্র। Field Museum of Natural Historyর নৃতত্বের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেন্‌রি ফিল্‌ড (Henry Field) মহাশয় এগুলি ৪০০০ চার হাজার বৎসরের জিনিস বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। বড় বড় মাটির স্তূপ হইতে উনানগুলি প্রস্তুত করা হইত এবং দেখিলেই বোধ হয় যে তাহাদের ভিতর ফাঁপা ছিল ও আগুনের উত্তাপ বাহির হইবার জন্য উপরে কতকগুলি ছিদ্র ছিল। সেঁকিবার সময়ে রুটির হাঁড়ি ও চাটুগুলি ইহার উপরে বসান হইত। নীচে আগুন রাখিবার জন্য ছিদ্রও ছিল। ছিদ্রগুলি এতই বড় যে, তাহাতে একজন লোক অনায়াসে হামাগুলি দিতে পারে। সে যুগের রাশীকৃত ছাইও উহাদের ভিতরে পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীনযুগের রুটিখানার দৃশ্য

শ্রীজীবনকৃষ্ণ গণ

—–—
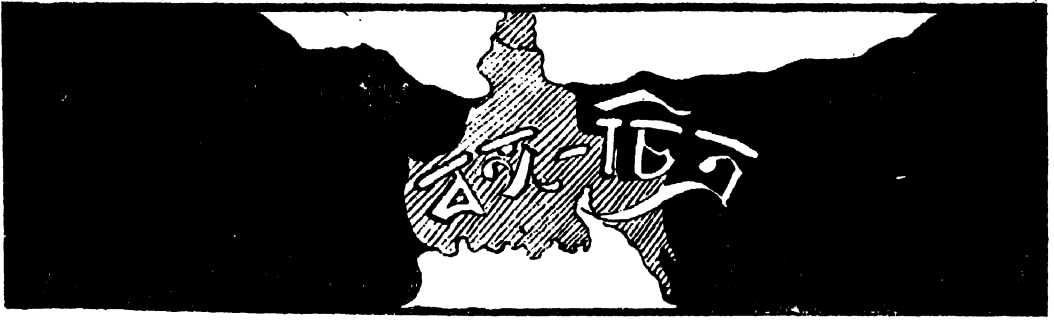
পাটচাষে দেশের ক্ষতি

পাট বাঙ্গালার কৃষকের এক প্রধান সম্পত্তি। বাঙ্গালার মাটীতে যেমন উৎকৃষ্ট পাট উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন হয় না। বাঙ্গালার কৃষককুলের আর্থিক দুরবস্থা পাটের প্রসাদেই সাময়িকভাবে দূরীভূত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু কৃষককুলের সেই আর্থিক স্বচ্ছলতা যে ক্ষণিক, তাহা কেহ বুঝাইয়া দিলেও তাহারা বুঝিতে চাহিত না। এবার বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই যথেষ্ট পাট হইয়াছে। কিন্তু বিদেশী-বর্জ্জন আন্দোলনের ফলে বহু ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়ায় এবার পাটের দাম অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। ফলে, কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়া চক্ষের জলে আজ বুক ভাসাইতেছে। ঠেকার শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা। আমরা আশা করি, বাঙ্গালার কৃষকগণ পাটচাষ-সম্পর্কে ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া কার্য্য করিবে।

বঙ্গের সরকারী কৃষি-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ গত ১৬ই জুলাই এবার-কার পাট চাষের এক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়,—এবার পাট চাষের পরিমাণ বেশ বাড়িয়াছে। আসাম বঙ্গদেশ এবং বিহার-উড়িষ্যা,—এই তিন প্রদেশের এবার সর্ব্বসমেত পাটের চাষ হইয়াছে ৩৫,০৬,৭০০ পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার সাত শত একর জমিতে। এক একর প্রায় তিন বিঘার সমান। অতএব মোটের উপর ১ কোটী ৫ লক্ষ ২০ হাজার ১ শত বিঘা জমিতে পাট হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ১ শত বিঘা। বিহার-উড়িষ্যা ও আসাম বাদ দিয়া কেবল বাঙ্গালার ভিতরেই এবার ৯১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯ শত বিঘা জমিতে পাট চাষ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার চাষ বাড়িয়াছে মোট ১ লক্ষ ২৬ হাজার বিঘা। কৃষি-বিভাগের বিবরণে প্রকাশ,—প্রেসিডেন্সী এবং রাজসাহী বিভাগের সামান্য অংশ ছাড়া বাঙ্গালার আর সকল অংশেই পাটের অবস্থা ভাল। গত জুন মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত খুবই ভাল অবস্থা গিয়াছে। পাটের চাষ এদেশে ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। চাষীরা পাট বেচিয়া এককালে অনেক নগদ পয়সা হাতে পায়; সেই কাঁচা পয়সার লোভই পাট চাষ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ। কিন্তু মোটের উপর পাটের চাষে তাহারা যে লাভবান হয় না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তথাপি কাঁচা পয়সার নেশাই তাহা-দিগকে প্রতি বৎসর আরও বেশী করিয়া পাটের চাষ করিতে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে। যত লোভ তত লোকসান। এবার চাষীরা এই যে এত বেশী করিয়া পাট বুনিয়াছে, ইহার পরিণাম কি হইবে, কে জানে? পাটের দর ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। এমন কি, যুদ্ধের পূর্ব্বে যে দর ছিল, এবার তাহা অপেক্ষাও কমিয়াছে। মফস্বলে এখন প্রতি মণ পাটের দর ৪৲ চারি টাকা হইতে ৫৲ পাঁচ টাকার অধিক নহে। দর আরও কমিয়া যাইবে বলিয়াই বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিতেছেন পাট হইতে যে চট, থলে প্রভৃতি তৈয়ারি হয় তাহারও বিক্রয় নাই, কাঁচা পাটও কম চালান যাইতেছে। এদেশের পাটের কলগুলিতেও কাজ নাই। গত বৎসরের দরুণ বহু লক্ষ গাঁইট পাট মজুত পড়িয়া রহিয়াছে। কলের মালিকেরা কলের কাজের সময় কমাইয়া দিয়াছে; পূর্ব্বে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ চলিত, এখন হইতে ৫৪ ঘণ্টা করিয়া কাজ হইতেছে। ইহার ফলে যাহারা পাট চাষ করে তাহারা যেমন, যাহারা পাটের কলে কাজ করে, তাহারাও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অতঃপর কৃষকদের সুমতি হউক—পাট চাষের পরিবর্ত্তে ধানের চাষ বৃদ্ধি পাউক, ইহাই আমাদের কামনা।

—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

বালকবালিকাগণের স্বাস্থ্যরক্ষা

দেশ-বিদেশের সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় কলিকাতা নগরী এরূপ বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং বৃহৎ সহরের অভাব-অভিযোগ এখানে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

কয়েকজন ভাগ্যবান ব্যক্তি ভিন্ন এই মহানগরীর স্বাস্থ্যপ্রদ অঞ্চলে বাস করিবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর লোক যে সকল অঞ্চলে বাস করেন, তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়। নোংরা, আবর্জ্জনাপূর্ণ পথের দুই পার্শ্বে নূতন এবং জরাজীর্ণ পুরাতন বাসগৃহগুলি একটির গাত্রে আর একটি ভার রক্ষা করিয়া কোনরূপে দণ্ডায়মান আছে। ফুটপাথগুলির অবস্থাও তদ্রূপ—স্বেচ্ছাবিহারী জীবজন্তু ও নানা রোগাক্রান্ত, আশ্রয়হীন ভিক্ষুকের দ্বারা সেগুলি সর্ব্বদাই অধিকৃত।

সমস্তদিন ব্যাপী ময়লা-ধূলার উৎপাত, আবার সন্ধ্যা না হইতেই ধোঁয়ার উৎপাত। তাহা ভিন্ন আর্দ্র বায়ু-মিশ্রিত গরম, স্বাস্থ্যের

পক্ষে হানিকর দুর্গন্ধ ও মশা, মাছির উৎপাত পূর্ণ মাত্রায় এই সকল অঞ্চলে বর্ত্তমান। আশ্চর্য্যের বিষয়, লক্ষ লক্ষ লোক এইরূপ স্থানে বাস করে।

যাঁহারা দীনদরিদ্র, যাঁহারা স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে মুক্তবায়ুপূর্ণ স্থানে—যে স্থানে সহরের জনতা একটু কম, এমন স্থানে অর্থাভাবে বাস করিতে পারেন না, তাঁহাদের অবস্থা যে কি ভীষণ, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। ইঁহাদের মধ্যে প্রায়ই সকলে মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থ; ইঁহারা সাধারণতঃ কেরাণী, দোকানের কর্ম্মচারী ও শিক্ষক। মাসিক একশত টাকা বেতনও ইঁহাদের অনেকে পান না। এই একশত টাকা ও তন্নিম্ন আয়ে ইঁহাদের অধিকাংশ লোককেই বৃহৎ সংসার প্রতিপালন করিতে হয়। দেশ যাহাদের মুখের দিকে মুক্তির জন্য চাহিয়া আছে, দেশের সেই ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল সুকুমার বালক-বালিকাগুলিও কোনরূপে জীবনধারণ করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য না পাইয়া, এমন-কি প্রকৃতির অনন্ত আলো-বাতাসের উপভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াও তাহারা শীর্ণদেহ লইয়া বড় হইয়া উঠিতেছে ও বাঁচিয়া রহিয়াছে।

ভবিষ্যতে নরনারী হিসাবে তাহাদের নিকট আমরা কি আশা করিতে পারি? ভবিষ্যৎ আশাস্থল এই সকল বালকবালিকা যাহাতে জীবন দুর্ব্বহ না মনে করিয়া আনন্দে মানুষ হইয়া উঠিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে আমরা কতটুকু সাহায্য করি? তাহাদের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের জন্যই বা কতটুকু শক্তি আমরা নিয়োগ করি? মানুষের বাসের অযোগ্য স্থানে ইহারা বাস করিতেছে; কেরোসিনের স্তিমিত আলোকে ইহারা লেখাপড়া করে; আর সম্বলমাত্র আলো-বাতাসহীন একখানি ঘরেই বহুলোক পরিবেষ্টিত হইয়া ইহারা নিদ্রার কোলে বিশ্রাম লাভ করে।

সুতরাং কলিকাতা মহানগরীতে যে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা বিস্ময়কর নহে। যৌবনে আমাদের পুত্র-কন্যারা কেন এমন রক্তশূন্য, তেজশূন্য, শীর্ণ, অপ্রশস্তবক্ষ, দৃষ্টিশক্তিহীন ও আলস্যপরায়ণ এবং কেন তাহারা এত সহজে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহার কারণ কি এখনও আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে?

আমাদের ক্ষুদ্রশক্তির সমবেত চেষ্টায় এই সকল বালক-বালিকাকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও সহরের বাহিরে প্রকৃতির কোলে মুক্ত আলো-বাতাসের মধ্যে স্থান দিয়া জীবনের আনন্দ উপভোগ করাইতে পারা কি এতই কঠিন? লক্ষ্মীর যাঁহারা বরপুত্র, তাঁহাদের পক্ষে এই সদনুষ্ঠানে ও সৎচেষ্টায় সাহায্য করা অসাধ্য নহে। এই আশায় আশান্বিত হইয়া আজ আমরা দেশের ভবিষ্যৎ আশা বালক-বালিকার মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহাদের নিকট সহৃদয়তা ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

প্রথম বৎসরে দুইবার—পূজা এবং গ্রীষ্মাবকাশে ৫০টি করিয়া বালক-বালিকাকে সহরের বাহিরে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাইতে চাই। রাঁচি, শিমুলতলা, তিনধরিয়া বা অন্যান্য স্বাস্থ্যকর স্থানে ১০ হইতে ১৬ বৎসরের স্কুলের কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রীকে উপযুক্ত অবৈতনিক কর্ম্মীর তত্ত্বাবধানে পাঠাইতে ইচ্ছা করি।

ইহাতে যে এই সকল বালকবালিকার উপকার হইবে, তাহা অচিরেই আমরা দেখিতে পাইব। বলা বাহুল্য, অর্থসাহায্যের বৃদ্ধি অনুপাতে বালক-বালিকার সংখ্যাও আমরা বৃদ্ধি করিতে পারিব বলিয়াই আশা করি।

দয়াপরবশ হইয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া জাতীয় কল্যাণ-কামনায় মহত্ত্বের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যাঁহারা এই মহদনুষ্ঠানে সাহায্য করিবেন, তাঁহারা এই বালকবালিকার পিতামাতার অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেনই, সর্ব্বোপরি অসহায়কে সাহায্য করার জন্য শ্রীভগবানের করুণা ও আশীর্ব্বাদ তাঁহারা অবশ্যই লাভ করিবেন। সাহায্যাদি নিম্নের ঠিকানায় সেক্রেটারীর নিকট প্রেরিতব্য।

১০ নিউপার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদক—মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। যতীন্দ্রনাথ বসু। কুমার-কৃষ্ণ মিত্র। মিস্ এন্ সোম। শ্রীমতী স্বর্ণলতা বসু। শ্রীমতী হেমলতা মিত্র। শ্রীমুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সেক্রেটারী।

—হিতবাদী

কর্পোরেশনের সৎকার্য্য

কর্পোরেশন স্কুলে ধর্ম্মশিক্ষা।—শিক্ষা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন একটী বিশেষ কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কমিটী পরামর্শ দিয়াছেন যে, কর্পোরেশনের প্রাথমিক অবৈতনিক বিদ্যালয়সমূহে মুসলমান বালকদের জন্য ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। কমিটী ইহাও বলিয়াছেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই। উর্দ্দু অথবা বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে। গত ৮ই জুনের সভায় কর্পোরেশনে এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস দলের সদস্য মিঃ বি, কে, রায়চৌধুরী বলেন, বালকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে কর্পোরেশন আইনতঃ বাধ্য নহেন। মুসলমান বালকগণ নিকটবর্ত্তী মসজিদ হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারে। মিঃ শচীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি উর্দ্দু ভাষা প্রচলন বিষয়ে বিশেষরূপে আপত্তি করেন। তিনি বলেন, মুসলমানদের এই উর্দ্দু ভাষার প্রতি অনুরাগ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের একটী প্রধান কারণ। বাংলাদেশের স্কুলে বাংলা ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা দিতে হইবে। বাঙ্গালীর মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য লর্ড কার্জ্জনের দেশসীমাগত বিচ্ছেদ অপেক্ষা আরও অধিক ক্ষতিজনক। আমরা মিঃ শচীন্দ্র মুখার্জ্জির মন্তব্য সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। এক ভাষা না হইলে একপ্রাণতা আসে না, জাতীয়তার ভিত্তি গঠিত হয় না। যাহা হউক এই সম্বন্ধে

পুনরালোচনার ভার প্রাইমারী এডুকেশন কমিটীর উপর দেওয়া হইয়াছে।—সঞ্জীবনী

কর্পোরেশনের ব্যয়ে বাড়ী

কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া এত বেশী যে এখানে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র এবং শ্রমিকশ্রেণীর লোকেদের বাস করা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল লোকে যাহাতে অল্প ভাড়ায় থাকিতে পারে, তজ্জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যয়ে বাড়ী তৈরী করিবার কথা হয় এবং এই জন্য একটা স্পেশাল কমিটিও নিয়োগ করা হইয়াছিল। এই কমিটি একটি স্কীম দিয়াছেন। কিন্তু বাজেটে টাকার ব্যবস্থা না থাকায় স্কীমটি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। গত মঙ্গলবারে কর্পোরেশনের যে বিশেষ সভা হইয়াছিল, তাহাতে ঠিক হইয়াছে আগামী বৎসর এপ্রিল মাসে এই স্কীম অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে এবং তজ্জন্য টাকার ব্যবস্থাও হইবে।—জাগরণ

বিপন্ন দেশবাসীকে সাহায্য দান

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্য (ঢাকা)—আমাদের গত কার্য্য বিবরণ হইতে জনসাধারণ অবগত হইয়াছেন যে কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে গুণ্ডাদের দ্বারা যাঁহাদের ঘরবাড়ী লুঠ হইয়াছিল, তাঁহাদের ক্লেশ কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য আমরা ঢাকা জিলায় রোহিতপুর গ্রামে একটা সাহায্য-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছি। উক্ত কার্য্য-বিবরণে আমরা পাঠকবর্গকে ইহাও জানাইয়াছি যে, বিপন্নগণের অধিকাংশই হিন্দু এবং দুর্ব্বৃত্তগণ তাঁহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া যাওয়ায় তাঁহাদিগের দুর্দ্দশার সীমা নাই। এই লোকগুলি ছাড়াও অপর কতকগুলি লোক, যাহারা সামান্য ব্যবসা করিয়া খাইত, ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হওয়ার জন্য কোনও কাজ পাইতেছে না। আমরা গত ৫ই জুলাই তারিখে ১১৩টি পরিবারে ৩৪১ জন নর-নারীকে ২৫৷৷২ সের চাউল, এবং ১২ই জুলাই তারিখে ১৫২টী পরিবারের ৪০০ জন নর-নারীকে ৩৫/ মণ চাউল বিতরণ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত ঐ দুই সপ্তাহে প্রায় ১/ মণ চাউল সাময়িক সাহায্য হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত সামান্য ব্যবসায়িগণকে অর্থাগমের কোন উপায় করিয়া দিতে হইবে। এইজন্য আমরা তাহাদিগকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য দান করা আবশ্যক মনে করিতেছি। পরিধেয় বস্ত্র ও বাসনের অভাব অবিলম্বে দূর করা আবশ্যক। আমরা এ জন্যও চেষ্টা করিতেছি। কলিকাতার ব্যবসায়ী মেসার্স জীবনলাল কোম্পানী দুঃস্থগণের জন্য ২৫০৲ টাকা মূল্যের সামান্য রকমের টোল খাওয়া এলুমনিয়মের বাসন দান করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের হাতে যে টাকা আছে, তাহা দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। এই সেবা-কার্য্য চালাইতে হইলে সত্বর উহার পরিপূর্ত্তি করা আবশ্যক। অবিলম্বে অর্থ-সাহায্যের জন্য বিশেষভাবে আবেদন করিতেছি। সাহায্য নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

(১) অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, পোঃ, হাওড়া। (২) ম্যানেজার, অদ্বৈত আশ্রম, ১৮২।এ, মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (৩) ম্যানেজার, উদ্বোধন, ১৩ মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

স্বাক্ষর—বিরজানন্দ

অস্থায়ী সম্পাদক।

—সঞ্জীবনী

সম্প্রতি ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় বহু হিন্দু-পরিবার মুসলমান দুর্ব্বৃত্তগণের হস্তে যেরূপে নির্য্যাতিত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে তাহার হৃদয়বিদারক করুণ-কাহিনী সকলেই জ্ঞাত আছেন। এই অমানুষিক অত্যাচারের ফলে শত শত হিন্দু আজ অন্নহীন, গৃহহীন অবস্থায় কি নিদারুণ কষ্টে কালাতিপাত করিতেছে তাহা ভাষায় অবর্ণনীয়। এই সকল দুঃস্থ পরিবারের অন্নবস্ত্র সংস্থান-বিষয়ে আশু প্রতিকার-কল্পে ময়মনসিংহ হিন্দু জনসাধারণ অদ্য ছোট হিস্তার বাসায় গত ১লা শ্রাবণ এক সভায় সমবেত হইয়া শ্রীযুক্ত রায় শশধর ঘোষ বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক সমিতি গঠন করিয়াছেন। অবিলম্বে যথাসম্ভব অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক সাহায্যের কার্য্য আরম্ভ করাই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

সমাজের এই মহাদুর্দ্দিনে আমরা আশা করি, আমাদের বিপন্ন ও বিধ্বস্ত ভ্রাতৃগণের জন্য যথোপযুক্ত আর্থিক সাহায্য করিয়া হিন্দুমাত্রেই আমাদের প্রারব্ধ কার্য্যে সহায়তা করিবেন। যাবতীয় দান নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট প্রেরিতব্য।

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

সভাপতি, ময়মনসিংহ হিন্দু-সভা, ময়মনসিংহ।

—চারুমিহির

হাঁসপাতাল সম্বন্ধে অভিযোগ

হাঁসপাতাল ও ডাক্তারখানা।—বাঙ্গালার হাঁসপাতাল ও ডাক্তার খানাসমূহ সম্বন্ধে সার্জ্জন-জেনারেলের ১৯২৭-২৮ সালের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, অর্থাভাবে কাজের তেমন সুবিধা হয় নাই। এই সব হাঁসপাতালের ও ডাক্তারখানার অধিকাংশ ব্যয়ই গবর্ণমেণ্টকে বহন করিতে হয়। বে-সরকারী দান বা সাময়িক অর্থসাহায্য হইতে ইহার আনুকূল্য হইলেও, তাহার পরিমাণ অতি সামান্য। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' কলিকাতার হাঁসপাতালগুলির তুলনা করিয়াছেন লণ্ডনের হাঁসপাতালগুলির সহিত। তুলনা করিয়া বলিয়াছেন,—সেখানে আর এখানে অবস্থার অনেক তফাৎ। এখানকার হাঁসপাতালসমূহে না আছে ভাল ডাক্তার, না আছে

নার্স। 'ভারতবন্ধু'র কথাটা এই যে,—এখানকার হাঁসপাতালসমূহে আই-এম-এস ডাক্তারের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের মোটা মাহিনার শ্বেতাঙ্গ ডাক্তারের সংখ্যা মধ্যে কিছু কমিয়া গিয়াছিল বলিয়া,—ভারত হিতৈষীরদল আন্দোলনে আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। সার্জ্জন-জেনারেলের এই রিপোর্টেই প্রকাশ,—আবার শ্বেতাঙ্গ আই-এম-এস্ কর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রায় পূর্ব্বের মতই পূরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। এদিকে বিলাতের মেডিকেল কাউন্সিল ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডাক্তারী উপাধির মূল্য স্বীকার না করিয়া ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে ভারতীয়ের প্রবেশের পথে কাঁটা দিয়াছেন, তাহার উপর আবার 'ভারতবন্ধু'দের এমন নেক্ নজর ; ভারতবাসীর স্বায়ত্ত-শাসনের আর বাকী কি ?

হাঁসপাতালে অব্যবস্থা —কলিকাতার মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতাল এদেশের অন্যতম প্রধান আতুরাশ্রম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানেও অব্যবস্থার অন্ত নাই। মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্ত্তি করা যেমন একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার, ইহার হাঁসপাতালে রোগী ভর্ত্তি করাও তেমনি দুঃসাধ্য, কি তাহারও অধিক। তাহার পর রোগীদের প্রতি হাঁসপাতাল কর্ম্মচারীদের উপেক্ষা ও অমনোযোগিতা সম্বন্ধেও নিত্য অনুযোগ আছেই। যেমন আউট-ডোর, তেমনি ইন-ডোর অর্থাৎ সদর অন্দর সমান। মুমূর্ষু রোগী যে শীঘ্র ভর্ত্তি হইতে পারিবে বা অবিলম্বে চিকিৎসিত হইবে, তাহার কোন উপায়ই নাই। অনেকেই এ সম্বন্ধে অনেকবার অনুযোগ করিয়াছেন ; কিন্তু অবস্থা যেমন ছিল, তেমনই আছে। সেদিন কলিকাতার রোটারি ক্লাবের বৈঠকে মন্ত্রী কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায় হাসপাতাল সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন,—অন্যান্য দেশের লোক হাঁসপাতালের জন্য যে ভাবে অর্থ সাহায্য করে, এদেশের লোকেরও তেমনি করা উচিত। সেণ্টজেমস গীর্জ্জার রেক্টর রেভারেণ্ড মিঃ টি এইচ ক্যাশমোর এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন,—কলিকাতার মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালের কর্ম্মচারীরা রোগীদের প্রতি যত উপেক্ষা ও অমনোযোগিতা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তত আর কোথাও দেখা যায় না। তিনি এ সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাঁসপাতালের এবং ক্যাম্বেলের কর্ণেল করুণা চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মিঃ ক্যাশমোর তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-মূলক একটা ঘটনারও উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। একটি বালক মোটর-সাইকেল চাপা পড়িয়া জখম হইয়াছিল। তাহাকে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়ার জন্য তাহার মাতা ও ভগিনী তিন ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। মিঃ ক্যাশমোর আসিয়া দেখেন যে, তিন ঘণ্টার মধ্যে বালকের আহত স্থানে একটু ঔষধ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই, সে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াই রহিয়াছে। কেহ ঔষধ দেয় নাই বা শুশ্রূষাও করে নাই ; অধিকন্তু দলে দলে ছাত্রেরা আসিয়া প্রত্যেকই বালকটিকে খোঁচা-খুঁচি করিয়া গিয়াছিল। মিঃ ক্যাশমোর অনেক চেষ্টার পর বালককে ভর্ত্তি করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতাল সম্বন্ধে এরূপ অনুযোগ বস্তুতই ইহার কর্ত্তৃপক্ষের ঘোর কলঙ্ক-জনক। কেবল টাকা দাও টাকা দাও বলিয়া কাঁদিলেই কি টাকা পাওয়া যায় ? দাতার অভাব নাই, দানও মিলিতে পারে ; কিন্তু দানের সার্থকতার প্রমাণের প্রয়োজন নাই কি ?—বঙ্গবাসী

খদ্দর ও দেশী সূতা

খদ্দর ভেজাল। সব জিনিষেই যখন ভেজাল চলিয়াছে, তখন খদ্দরেও তাহা চলিবে না কেন ? দেশের লোক যখন খদ্দরের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, সরু মোটা মজবুত বেমজবুত বা সস্তা দুর্ম্মূল্য না বিচার করিয়া কেবল খদ্দর বলিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইতেছে, তখন খদ্দরের ব্যবসায়ের যে ইহা সুক্ষিণ, ইহা কোন্ ব্যবসায়ী না বুঝে ? বিদেশী ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে ভেজাল খদ্দর তৈয়ারি করিয়া ভারতের বাজারে পাঠাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারে কি ? প্রকাশ, প্রকৃতই ভারতে ভেজাল খদ্দরের আমদানী হইয়াছে। তাই আমেদাবাদের স্বদেশী সভা হইতে এই সব ভেজাল বাছিয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। কলিকাতায় সস্তা দরে এক প্রকার খদ্দর বিক্রয় হইতেছে। তাহার একটা সূতা হাতে কাটা ; কিন্তু আর একটা সূতা হাতে কাটা নহে, কলে তৈয়ারি। হাতে কাটা সূতার প্রস্তুত খাঁটি খদ্দরের দাম কিছু বেশী বলিয়া, ইচ্ছা থাকিলেও অনেকে তাহা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না। তাই খদ্দরকে সাধারণের উপযোগী সস্তা করিতে গিয়া তাহাতে ভেজাল মিশাইতে হইয়াছে। হাতে কাটা সূতার তৈয়ারি খাঁটি খদ্দর কি আর সস্তা করা যায় না ?

—বঙ্গবাসী

তাঁতীর হাহাকার।—টাঙ্গাইলের ধুতি ও শাড়ী বঙ্গদেশে বিখ্যাত। বর্ত্তমান বিলাতী বর্জ্জন আন্দোলনে টাঙ্গাইলের কাপড় বিলাতী সূতার তৈয়ারী বলিয়া আর বিক্রয় হইতেছে না। এখন তথাকার তাঁতিদিগের মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছে। তাহারা অনাহারে মারা যাইতে বসিয়াছে।

টাঙ্গাইলের তাঁতিগণ মহাজনের নিকট হইতে সূতা আনিয়া বস্ত্র তৈয়ারী করে এবং ঐ মহাজনকেই বস্ত্র দেয়। সে জন্য সে অল্প পারিশ্রমিক পায়। এখন বিলাতী সূতার বস্ত্র চলে না। মহাজনগণও তাহাদিগকে বলিতেছে যে, বিলাতী সূতা পাইবার উপায় নাই, বিলাতী সূতা ব্যতীত দেশী সূতায় সূক্ষ্ম বস্ত্র হয় না এবং দেশী সূতা পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় তাঁতিগণ একে ঋণে জড়িত তাহার উপর তাহাদের অর্থাগমের উপায় বন্ধ হওয়ায় মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত।

এই সময়ে যদি কেহ তাঁতিদিগকে দেশী সূক্ষ্ম সূতা সরবরাহ

করিতে পারেন, তবে তাঁতিরা কাপড় বুনিতে পারে ও তাহাদের জীবন রক্ষা হয়। টাঙ্গাইলে অনেক ব্যাঙ্ক ও ধনী আছেন, তাঁহারা একদিকে দেশী বস্ত্র শিল্প রক্ষা ও তাঁতিদিগের জীবন রক্ষা এই দুই উভয় কার্য্য এক সঙ্গে করিতে পারেন।—সঞ্জীবনী

আজকাল চারিদিকেই চরকা ও তকলী প্রচার খুবই বৃদ্ধি পাইতেছে। বালক বালিকা হইতে যুবক বৃদ্ধ পর্য্যন্ত বহু ব্যক্তিকে পথে ঘাটে গৃহে দোকানে সর্ব্বত্রই তকলীতে মহা উৎসাহে সূতা কাটিতে দেখা যাইতেছে। চরকার ঘর্ঘরধ্বনি অনেক গৃহেই শুনা যায়। কেবল আমাদের এই অঞ্চলে নহে, কলিকাতা প্রভৃতি সকল স্থানেই এরূপ সূতা কাটার প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। চরকা ও তকলীতে সূতা কাটিবার আকাঙ্ক্ষা ও নিজ হাতে কাটা সূতায় যে কোনও বস্ত্র তৈয়ারী করিবার বাসনা সকলের মধ্যেই খুব প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে। কলিকাতার সংবাদপত্র সমূহে দেখা যায় যে, কলিকাতার অলিতে গলিতে চরকা ও তকলী ছাইয়া পড়িয়াছে। রাস্তার ধারে দোকানদার অবসর সময়ে সূতা কাটিতেছে, ট্রামের যাত্রী, কাগজের ফেরীওয়ালা, মিউনিসিপাল মার্কেটের মুসলমান দোকানদারগণ সূতা কাটিতেছে, চারিদিকেই সূতাকাটা চলিয়াছে। বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মহা উৎসাহে সূতা কাটিতেছে। এ সকল খুবই আনন্দের কথা। এসব দেখিয়া মনে হয় বাধা বিপত্তির জন্য যাঁহারা আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন নাই, তাঁহারা তকলী চরকা কাটায় মনোনিবেশ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফলে দেশময় এক নূতন ব্যবসায়ের ও অর্থাগমের পথ সৃষ্টি হইয়াছে। তকলী, চরকা, লাটাই, ববিন ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া বহু ব্যক্তি একাধারে অর্থোপার্জ্জন ও দেশের হিতসাধন করিতেছেন।

চরকা ও তকলীর এইরূপ প্রসার বাহুল্যে তুলার চাহিদা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন বিপদ হইয়াছে এই যে সর্ব্বত্রই প্রয়োজন মত তুলা পাওয়া যাইতেছে না। প্রকাশ যে, কলিকাতায় প্রত্যহ তিন শত মণ তুলার পাঁজ নিকটবর্ত্তী মিল সমূহ হইতে আমদানী হইয়া ঐ সমস্ত পাঁজই চরকা ও তকলীতে ব্যবহৃত হইতেছে। এ অবস্থায় দেশের সর্ব্বত্রই ঘরে ঘরে যদি সকলে কিছু কার্পাস চাষ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে আর কোন অভাব থাকে না।

সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ৩৫ কোটী লোকের লজ্জা নিবারণ জন্য বৎসর ছয় শত কোটী গজ কাপড় লাগে, তন্মধ্যে গত বৎসরে আমাদের দেশে মিল ও তাঁতের বোনা কাপড়ে মোট এক শত কোটি গজ হইয়াছিল। বাকী জাপান ও ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে আসিয়াছিল। এ অবস্থায় এখন এ দেশের ঘরে ঘরে তুলার চাষ ও চরকা বা তকলী প্রচলনের জন্য সকলেরই সর্ব্বপ্রযত্নে বদ্ধপরিকর না হইলে আমাদের বস্ত্র সমস্যা অতি সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইবে। অতীত কালে যে ভারতবর্ষ একদিন নিজের তৈয়ারী বস্ত্রের দ্বারা জগতের লজ্জা নিবারণ করিয়াছিল, সে দেশে এখন চেষ্টা করিলে নিজেদের বস্ত্র সংস্থান করা কোন ক্রমেই কঠিন হইবে না।—নীহার

ভারতীয় মিলে স্বদেশী সূতার ব্যবহার

ভারতের যে যে কাপড়ের কলে স্বদেশী সূতা ব্যবহৃত হয় তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

(১) স্বদেশী মিল কোম্পানী, বোম্বাই।
(২) টাটা মিল, বোম্বাই।
(৩) মেকেঞ্জি পেটিট মিল, বোম্বাই।
(৪) জুবিলি মিল লিমিটেড্ বোম্বাই।
(৫) বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, শ্রীরামপুর।
(৬) আকোলা কটন মিল, কোং, আকোলা।
(৭) কেশরাম কটন মিল, বেঙ্গল।
(৮) নিউ বড়োদা মিল কোং, বড়োদা।
(৯) জিয়ানজিয়ারাও কটন মিলস, গোয়ালিয়র।
(১০) মতিলাল হীরাভাই স্পিনিং এণ্ড উইভিং, আমেদাবাদ।
(১১) নন্দলাল ভাদুড়ী মিল লিমিটেড, ইন্দোর।
(১২) সরনারায়ণ স্পিনিং এণ্ড উইভিং, গোয়া।
(১৩) সীতারাম স্পিনিং এণ্ড উইভিং, কোচিন।
(১৪) সিটি অব আমেদাবাদ স্পিনিং এণ্ড ম্যানুঃ, আমেদাবাদ।
(১৫) আমেদাবাদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং, আমেদাবাদ।
(১৬) মহারাজা মিলস কোং লিমিটেড, বড়োদা।
(১৭) মোরারজি গোকুলদাস স্পিনিং এণ্ড উইভিং।
(১৮) ব্রোচ ফাইন কাউণ্টস স্পিনিং এণ্ড উইভিং, বোম্বাই।
(১৯) দি গর্ডেন এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং।
(২০) প্রেম স্পিনিং এণ্ড উইভিং লিঃ।
(২১) দীনসোয়াদ পালিত মিল, বোম্বাই।
(২২) আর, বি, বংশীলাল আমির চাঁদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং, ওয়ার্দ্ধা, সি, পি।
(২৩) বম্বে মিলস কোং লিঃ, বোম্বাই।
(২৪) গুজরাট কটন মিলস কোং লিঃ, আমেদাবাদ।
(২৫) আর, এস, রইলকচাঁদ মেহেতা স্পিনিং মিলস, ওয়ার্দ্ধা।
(২৬) নিউম্যানেকচক স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ, আমেদাবাদ।
(২৭) স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস, দিল্লী।
(২৮) মোরাদাবাদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ, মোরাদবাদ।
(২৯) আমেদাবাদ জুবিলী স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, আমেদাবাদ।

(৩০) রায়পুর ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ, আমেদাবাদ।
(৩১) মডেল মিলস লিঃ, নাগপুর সিটী।
(৩২) আরাদর স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ।
(৩৩) কানপুর কটন মিলস কোং, কানপুর।
(৩৪) আলোকা মিলস লিমিটেড, আমেদাবাদ।
(৩৫) আমেদাবাদ ম্যানুফ্যাকচারিং এণ্ড ক্যালিকো প্রিণ্টিং কোং লিঃ, আমেদাবাদ।
(৩৬) ঢাকেশ্বরী কটন মিল, ঢাকা।

—শান্তিপুর

বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

অধ্যাপক বিনয় সরকার—সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষদের ডিরেক্টর খ্যাতনামা অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ইতালীর বিবিধ বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভারতের অর্থনীতি ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত-সমাজে তাঁহার যথেষ্ট সমাদর হইতেছে এবং তাঁহারা আগ্রহের সহিত অধ্যাপক সরকারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা সমূহ শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছেন। ইতালীর সংবাদ পত্রসমূহ এই ভারতীয় অধ্যাপককে আন্তরিকভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।—বরিশাল

সাবানের কারখানা

বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ম্যানেজিং এজেণ্টগণ সম্প্রতি বঙ্গলক্ষ্মীর সোপ ওয়ার্কস নামে এক সাবানের কারখানা খুলিয়াছেন। তাঁহারা কয়েক প্রকার নমুনা আমাদিগকে দেখিতে দিয়াছেন। খস খস, হোয়াইট রোজ, অগুরু, স্যাণ্ডাল ও বাথ সোপ নামে কয়েক প্রকার সাবান সুগন্ধে পূর্ণ। ইহা ব্যতীত বঙ্গলক্ষ্মী ওয়াশিং সোপ কাপড় কাচিবার জন্ত উত্তম হইয়াছে। আমরা এই কারখানার উন্নতি কামনা করি। আশা করি বাঙ্গালী এই কারখানার পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন।—সঞ্জীবনী

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন কর্ত্তা

নূতন ভাইস চ্যান্সেলার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—ডাঃ ডবলিউ. এস, আরকুহার্টের কার্য্যকাল শেষ হইয়াছে। কর্ণেল হাসান সারওয়ার্দি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।—জাগরণ

পণ-প্রথার বিষময় ফল

কাপড়ে আগুণ ধরাইয়া এক অবিবাহিতা যোড়শীর হৃদয়-বিদারক মৃত্যু সংবাদ পুরাপাড়া হইতে মুন্সীগঞ্জে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শুনা যায়, বালিকাটী তাঁহার পিতামহের আর্থিক দুরবস্থায় অতিশয় চিন্তিতা হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পিতামহ অর্থাভাবে ও দারুণ পণের দায়ে তাহাকে বিবাহ দিতে পারিতেছিল না। এই জন্ত সে তাহার কাপড়ে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। পরে সে যখন চীৎকার করিয়া উঠে, তখন বাড়ীর সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু কোনরূপ সাহায্য আসিবার পূর্ব্বে হতভাগিনী মানবলীলা সম্বরণ করে।

—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

বঙ্গদেশের গৃহশিল্প

বঙ্গীয় ব্যাবস্থাপক সভায় শিল্প বিভাগের মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর কারোকী বলেন, শিল্প বিভাগের কাজ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত, যথা—অনুসন্ধান, কুটীর-শিল্প, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প শিক্ষা, গ্রামে শিল্প দ্রব্য প্রদর্শন ইত্যাদি কুটীর-শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্ত বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়াছেন। সমবায় নীতিতে কাজ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কলিকাতা সমবায় দোকানকে ৫০ হাজার টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছোট কুটীর শিল্পকে সাহায্য দিবার জন্ত কাউন্সিলের আগামী অধিবেশনে একটি বিল উপস্থিত করা হইবে। শিল্প বিভাগে মোট ৮ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা খরচ হইবে, তন্মধ্যে ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকাই যাইবে শিল্প শিক্ষার জন্ত। কুটির শিল্পের যে সকল বস্তু তৈয়ার হয় তাহা যাহাতে বিক্রয় হয় গভর্ণমেণ্ট তজ্জন্ত চেষ্টিত হইবেন।—বরিশাল

যাদুঘর স্থানান্তরিত করায় অসম্মতি

বাঙ্গালী এক বাক্যে ইহার প্রতিবাদ করুন।—কলিকাতার যে যাদুঘর (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম) আছে, তাহা দিল্লীতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। বাঙ্গালী একবাক্যে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করুন। গত ৪ঠা জুলাই সিমলাতে পাবলিক একাউণ্টস্ কমিটীর এক সভাতে মিঃ মহম্মদ ইয়াকুব হোসেন প্রস্তাব করেন যে, কলিকাতাস্থিত ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হউক। তিনি বলেন, যে আইনের দ্বারা মিউজিয়মের ম্যানেজিং বোর্ডের উপর কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শাসন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল সেই আইন ২০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। এক্ষণে শীঘ্র তাহার সংশোধন করা প্রয়োজন। যাহাতে মিউজিয়মের ম্যানেজিং বোর্ডে এসেম্বলীর প্রতিনিধি থাকিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মিঃ আবদুল মাতিন চৌধুরী ইহাতে আপত্তি করেন। অবশেষে মিঃ ইয়াকুব হোসেনের প্রস্তাবেই অনেকে সম্মতি দেন। মিউজিয়ম স্থানান্তরিত হইবার বিরুদ্ধে বহু যুক্তি আছে। ম্যানেজিং বোর্ডে এসেম্বলীর প্রতিনিধি থাকিবেন বলিয়াই মিউজিয়মটীকে দিল্লীতে লইয়া যাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার নিকটেই পাটনা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ও অধিক দূর নহে। এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষার একটী সুন্দর ও সুবিধাজনক স্থান এই কলিকাতার মিউজিয়ম। ইহাতে স্থানান্তরিত করিলে ইহার প্রয়োজনীয়তা একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে। আমরা বলি, বরং দিল্লীতে এরূপ আর একটী মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত করা হউক।

—সঞ্জীবনী

ম্যালেরিয়া নিবারণ

সুন্দরবন হইতে ম্যালেরিয়া দূরীকরণ।—বাঙ্গালার ১৯২৮-২৯ সনের রেভিনিউ বোর্ডের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ, বাখরগঞ্জের সুন্দরবন অঞ্চলে ম্যালেরিয়া দূর করিবার কার্য্য দ্রুতবেগে ও যথেষ্ট সফলতার সহিত অগ্রসর হইতেছে। প্রায় ২২ বৎসর পূর্ব্বে ২২টি এষ্টেট একত্র মিলিত হইয়া বাখরগঞ্জ সুন্দরবন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রসর হয়। ইহাদের চেষ্টায় অস্বাস্থ্যকর এবং ম্যালেরিয়ার প্রিয় নিকেতন সুন্দরবন স্বাস্থ্যকর উর্ব্বর ভূখণ্ডে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ যে এই ম্যালেরিয়া দূরীকরণের মোসাবিদা আর এক বৎসরের মধ্যে কার্য্যে পরিণত হইবে।

—বঙ্গরত্ন

প্রকৃত স্বদেশী কাজ

গত এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষের মিলে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ও ৪ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ও ৪ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল।

অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরের এপ্রিল মাসে সূতা শতকরা ৯৫ এবং বস্ত্র শতকরা ৮৭ বেশী উৎপন্ন হইয়াছে।

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩০ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত ৮ মাসে ৬০ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ও ৪০ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড বস্ত্র তৈয়ার হইয়াছে।

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২৯ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত ৮ মাসে ৫৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ও ৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বস্ত্র তৈয়ার হইয়াছিল।

অর্থাৎ ১০ কোটি পাউণ্ড সূতা ও ৬ কোটি পাউণ্ড বস্ত্র বেশী তৈয়ার হইয়াছে।

অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৭৫ লক্ষ বেশী লোক স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিবার আনন্দ উপভোগ করিয়াছে।

গত এপ্রিল ও তাহার পূর্ব্ব এপ্রিল মাসে স্বদেশে কত কোরা ও ধোয়া বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে কত কোরা ও ধোয়া বস্ত্রের আমদানী হইয়াছে, তাহা দেখিয়া সকলে পুলকিত হউন।

১৯৩০ সালের এপ্রিল

কোরা ও ধোয়া কাপড়

স্বদেশজাত ১৫ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪৮ হাজার গজ, বিদেশ হইতে আমদানী ১১ কোটি ১৭ লক্ষ ৩৪ হাজার গজ।

১৯২৯ সালের এপ্রিল

কোরা ও ধোয়া কাপড়

স্বদেশজাত ১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭০ হাজার গজ, বিদেশ হইতে আমদানী ১৬ কোটি ১১ লক্ষ ৭০ হাজার গজ।

অর্থাৎ ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে স্বদেশজাত কোরা ও ধোয়া কাপড় অপেক্ষা বিদেশাগত বস্ত্রের পরিমাণ প্রায় ২ কোটি গজ বেশী ছিল।

১৯৩০ সালের এপ্রিলে বিদেশাগত কোরা ও ধোয়া বস্ত্রের পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি গজ কমিয়াছে।

ভারতবাসীর উৎসাহ ও উদ্যোগের ফলেই এই শুভ পরিবর্ত্তন আসিয়াছে।

১৯৩০ সালের এপ্রিল

রঙ্গিন কাপড়

স্বদেশজাত ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ২১ হাজার গজ।

বিদেশাগত ৪ কোটি ২০ লক্ষ ১৫ হাজার গজ।

১৯২৯ সালের এপ্রিল

রঙ্গিন কাপড়

স্বদেশজাত ৫ কোটি ৫৪ লক্ষ ১ হাজার গজ। বিদেশাগত ৫ কোটি ১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার গজ।

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে বিদেশাগত রঙ্গিন কাপড়ের পরিমাণ স্বদেশজাত রঙ্গিন কাপড় অপেক্ষা প্রায় ৪০ লক্ষ গজ কম ছিল, ১৯৩০ সালের এপ্রিলে ১ কোটি ২৩ লক্ষ কম হইয়াছে।

ইহারই নাম স্বদেশের কার্য্য। এই কার্য্য করিতে বুদ্ধি চাই, অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা চাই, পরিশ্রম চাই। মুখের ফাঁকা বাক্যে বা দম্ভে স্বদেশের কার্য্য হয় না।

স্বদেশের কার্য্য কাহাকে বলে, আমাদের স্বদেশবাসীরা তাহা বুঝিয়া লউন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বদেশী আন্দোলনের ফল, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, বেঙ্গল নেশনেল ব্যাঙ্ক, বেঙ্গল টেক্‌নিস্কুল প্রভৃতি। অসহযোগ বা আইন অমান্য-কারীরা কি দেখাইতে পারেন, তাঁহারা কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন? তাঁহারা কিছু গঠন করিতে পারেন নাই, বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুলের মত মহৎ কার্য্য বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিদ্যাসাগর, আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথের রক্তে যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গলা দেশকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছিল, তাহাই তাঁহারা ধ্বংস করিতেছেন।

ভ্রম দূর হউক, বাঙ্গালী আত্মস্থ হইয়া স্বদেশের খাঁটি কাজ করিতে মনোনিবেশ করুন।—সঞ্জীবনী

৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়*

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

ভূতদর্শী ওগো বন্ধু, অসময়ে তব তিরোধান
বেজেছে সবার বুকে। ব্যথানত নিখিলের প্রাণ।
নহতো গৌড়ের শুধু একান্ত গর্ব্বের ধন তুমি—
আসমুদ্র হিমাচল, হে ধীমান! তব জন্মভূমি!
তোমার অভাবে আজ জননীর কণ্ঠহার হ'তে
অমূল্য মাণিক এক হারাল হে নশ্বর জগতে।

শ্রুতিধর! জাতিস্মর! অসামান্য হে সুহৃদ, তব
ধরণীর লুপ্তলোকে দিগ্বিজয় নিত্য নব নব—
বারে বারে করিয়াছে কালের সীমানা অধিকার,
সংহারের দুর্গ ভেদি' হৃত-কীর্ত্তি করেছে উদ্ধার!
তোমার তপস্যা-তেজে ভারতের বিস্মৃত অতীত
ভূগর্ভ হইতে উঠি' শুনায়েছে গৌরবের গীত!

আপনার বীর্য্যবলে মহীরাজ্য করেছ লুণ্ঠন,
'প্রত্নতা' দিয়েছে ধরা, তুমি তার খুলেছ গুণ্ঠন!
পুরাবৃত্ত বারিধির আলোড়িয়া দুর্জ্জেয় অতল
কালের কলঙ্ক মুছি' লিপি তার করেছ উজ্জ্বল!
নবরাজতরঙ্গিণী রচিয়াছ, হে পুরাণকার,
বিগত বৈভব যত খুঁজিয়া ফিরেছ অনিবার!

প্রাচ্যের প্রাচীন কথা একাধিক সহস্র বর্ষের
পুরাতন দুঃখ সুখ যুদ্ধ প্রীতি বেদনা হর্ষের
শুনায়েছ তুমি বন্ধু, অশ্রুত কত না ইতিহাস,
অরণ্য কান্তার মরু প্রস্তরের খুলি' ছদ্ম-বাস
তুমি দেখায়েছ সেথ—কী ছিল সম্পদ কালে কালে,
কী ঐশ্বর্য্য আছে ঢাকা ধ্বংস যবনিকা-অন্তরালে।

---

* ২৮এ আষাঢ় ১৩৩৭ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

যে নব জাতক তুমি রচিয়া গিয়াছ সভ্যতার
অক্ষয় গরুড়-স্তম্ভ হ'য়ে রবে জানি সে তোমার।
ঘুমন্ত পাতালপুরে বন্দী ছিল যে রাজনন্দিনী
তারে তুমি মুক্তি দিয়ে ভুবনেরে করিয়াছ ঋণী।
হে মনীষী, তব ঋণ চিরদিন ঘোষিবে জগৎ,
যুগে যুগে পৌরাণিকে তোমারে নমিবে দণ্ডবৎ।

চিত্ত ও বিত্ত

(গল্প)

[শ্রীগোপেন্দ্র বসু]

(১)

শ্রাবণ-মেঘের কাজল-কাল বুক চিরিয়া বিদ্যুদ্-রেখা মাঝে মাঝে আকাশের গায়ে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বর্ষণ-ক্লান্ত অপরাহ্নে সিক্ত কর্দ্দমময় বঙ্কিম পল্লী-পথ ঝিল্লীরবে মুখরিত।

ধীর-মন্থর গতিতে এক প্রৌঢ়া একটী জীর্ণ কুটীরের সম্মুখে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন—"ললিতা, ললিতে।" কুটীরের ভিতর হইতে উত্তর আসিল—"যাই, মাসী!"

* * *

শান্তিপুর হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে গঙ্গা-তীরে কয়েক ঘর বৈষ্ণব লইয়া একখানি ছায়া-নিবিড় ক্ষুদ্র পল্লী। নাম রাখালপুর। রাখালপুরে "মাসী" বলিতে উক্ত প্রৌঢ়াকেই বুঝায়। প্রৌঢ়ার নাম গোষ্ঠমণি। কিন্তু এ নাম রাখালপুরের খুব কম লোকই জানে। জানিবার প্রয়োজন কাহারও হয় না, যেহেতু "মাসী" সকলেরই মাসী। সকলেরই সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার, বদন সদা হাস্যময়। পাট কাটিয়া মাসীর দিন চলে। বাল-বিধবা আত্মীয়স্বজনহীনা ললিতা মাসীর পরম প্রিয় পাত্রী ও প্রতিবেশিনী,—প্রায় এক চালায় বাস বলিলেই হয়।

একটী দীপ-হস্তে ললিতা গৃহের বাহিরে আসিয়া বলিল—"এস, মাসী।"

ললিতা যুবতী, বিধবা—পরিধানে ধূলি মলিন শতছিন্ন একখানি থান কাপড়; রাত্রি বলিয়া উহাতে কোন মতে লজ্জা নিবারণ হইয়াছে; মলিন বস্ত্র ভেদ করিয়া উদ্ভিন্ন যৌবনের অনিন্দ্য রূপের আভাস লক্ষিত হইতেছে। যুবতী পথ দেখাইয়া প্রৌঢ়াকে গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া একটী অর্দ্ধ-ভগ্ন চৌকির উপর বসাইল এবং বিশেষ আগ্রহান্বিত চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ঘর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—কোনরূপ আড়ম্বরের চিহ্ন মাত্র নাই। এক পার্শ্বে শয়নের জন্য একখানি চৌকী, অপর দিকে একটী ক্ষুদ্র মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মঞ্চের উপর শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি, মূর্ত্তির পার্শ্বে কিছু নিম্নে দুইটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত চন্দন-লিপ্ত পাদুকা বিশেষ ভক্তি ও যত্নে রক্ষিত।

একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাসী বলিল—"আজ কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না, সব্বাই বল্লে; দড়ির দাম সামনের হাটে দেবে।"

ললিতারও পাট ও সূতা কাটিয়া দিন চলে। আকুল শুনিয়া ললিতা বলিল—"হাটের তো ৪ দিন

বাকি, মাসী। তাই তো কি হবে, গরুর খাবার খড় নেই মোটে, বর্ষার দিন গরুরা মাঠে যেতেও পারে না, গরুটাই বা খায় কি আর এদিক্‌কারই বা কি হয়।"

ললিতা বিশেষ চিন্তাগ্রস্তা হইয়া পড়িল।

মাসী বলিল—"কি ক'রব বল? দোকানদার হতভাগারা আজ কিছুতেই দাম দিলে না, নতুন ব্যাপারীদের কাছে দড়ি নে গেলুম, তারাও বল্লে দড়ি বিক্রী না ক'রে দাম দিতে পার্ব্বে না"। ললিতা পূর্ব্বের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাটীর দেওয়ালে টাঙ্গান শ্রীকৃষ্ণের একটী পটে আঁকা ছবির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চিন্তা করিতে করিতে ঈষৎ গম্ভীর স্বরে মাসী বলিল—"আমাদের কি বল, এক পা এগিয়ে আছি, আমাদের সবই সয়, কিন্তু তোর এই কাঁচা বয়েস, ছেলেমানুষ তুই, কি ক'রে এসব সহ্য ক'রবি? আজ দু'দিন তোর পেটে কিছু পড়ে নি। সে খবর তুই কিছু না বল্লেও আমি রেখেছি। তোর গরুও দুদিন উপোসী রয়েছে তাও জানি। আমারও এমন দশা হয়েছে যে, এ সময় তোকে কিছু দোবো—"

বাধা দিয়া ললিতা বলিল—"না মাসী, তোমার কাছে রোজ রোজ আর কত ধার ক'রব—তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ হবে না, মাসী।"

* * *

নির্জ্জন গৃহটী সমাধি-প্রাঙ্গণের ন্যায় নিস্তব্ধ; কেবল মধ্যে মধ্যে ঝটিকার শব্দ ও ঝিল্লীরব বদ্ধ-অর্গল ভেদ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। ক্ষুদ্র দীপটী অতি ক্ষীণ-ভাবে জ্বলিতেছে—যেন সেও গৃহস্থের কঠোর দিনের কথা ভাবিতে শিখিয়াছে, তাই সে আজ ম্লান—সহানুভূতি-কাতর। অনেকক্ষণ পরে মাসী পুঞ্জীভূত স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—"দেখ ললিতা, আজও গোকুল আমায় বলছিল তোর কথা; আমি বলি তোর এই সোমত্ত বয়েস, তা ছাড়া আমাদের বোষ্টমের ঘরে যখন ও নিয়ম আছে—আর গোকুলের বয়েস যখন বেশী নয়—গ্রামের মাতব্বর—জমিদার, তা মন্দ কি? তোকে বড্ড মনে ধরেছে, রাজি হ'য়ে যা, আখেরের একটা হিল্লে হ'য়ে যাবে। জানিস তো গোকুলের অবস্থা—"

ললিতা বলিল—"সে কথা এখন থাক্ মাসী। একগাছা বালা দিচ্ছি তুমি যদি ওটা বাঁধা দিয়ে কিছু আনতে পার তো দেখ, হাটের পরদিন ছাড়িয়ে নোবো; এই রাত্রে আবার তোমায় কষ্ট দিচ্ছি কিছু মনে কোরো না—কাল সকালে কিছু চাই-ই চাই।"

মাটীর কুলুঙ্গির মধ্যস্থিত একটী টিনের বাক্স হইতে একগাছা বালা বাহির করিয়া ললিতা মাসীর হস্তে দিল। মাসী চলিয়া গেলে ললিতা শুষ্ক মুখে চৌকির উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

(২)

রাখালপুর গ্রামের মাতব্বর জমীদার গোকুল বৈরাগীর ধনী বলিয়া খ্যাতি আছে, গ্রামবাসীরা কেহ বলিত দু' ঘড়া টাকা আছে, কেহ বলিত, না, সাত ঘড়া টাকা আছে।' গোকুলের টাকা দু'ঘড়া আছে কি সাত ঘড়া আছে তাহা ঠিক করিয়া বলা বা জানা সম্ভব নয়; তবে আশ-পাশের গ্রামগুলির মধ্যে তাহার মত ধনী ও ধড়িবাজ লোক নাই বলিলেই হয়। পাঁচখানা পাশাপাশি গ্রামের মধ্যে গোকুল ব্যতীত কেহ কোটা-ইমারত তুলিতে পারে নাই। গোকুলের বয়স প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর, চেহারা বেশ গোল-গাল, সর্ব্বদা হস্তে জপমালা এবং চক্ষু স্তিমিত। দুর্জ্জনে বলিত—অবশ্য অন্তরালে—যে 'গোকুল থলির মধ্যে হাত রাখিয়া সুদ গোনে, আর চক্ষু বুজিয়া ফন্দী আঁটে কখন কার সর্ব্বনাশ করবে।' এ কথাটা কতদূর সত্য তা' জানা নিতান্ত কষ্টকর নহে। গোকুল সম্প্রতি মৃতদার হইয়াছে।

গৌরাঙ্গী ললিতার পূর্ণ-যৌবনের অসামান্য রূপ গোকুলের লোলুপদৃষ্টি ও চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। লোক-মারফত বহুবার বহুরূপ প্রস্তাব করিয়াছিল, কণ্ঠি-বদলেরও প্রস্তাব মাসীর দ্বারা বহুবার করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই, ললিতা এসবে একেবারেই বিরূপ। তথাপি উদ্যোগী পুরুষ গোকুল নিশ্চেষ্ট হয় নাই। আর ৫।৭ খানা গ্রাম-বিস্তৃত খ্যাতি, গোলা-ভরা ধান, ঘড়া বোঝাই টাকা, এ হেন গোকুল বৈরাগীর আবেদন একটী সামান্য বিধবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে তাহা রাখালপুর গ্রামের লোকদের নিকট অতি আশ্চর্য্যের ও আলোচনা বিষয়।

* * *

পরদিন প্রাতে মাসী আসিয়া বলিল—"এই নে, ললিতা, পাচ টাকা।"

বিস্মিত হইয়া ললিতা বলিল—"বল কি মাসী, ঐ এক-গাছা রূপোর বালা রেখে কে পাঁচ টাকা দিলে? আমি ভেবেছিলুম বড় জোর বার আনা পয়সা পাব—ওর দামও যে পাঁচ টাকা নয়, মাসী?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া মাসী বলিল, "এই দেখ বালাও ফিরিয়ে এনেছি।"

ললিতা বিস্মিত-নেত্রে দেখিল, মাসীর কাপড়ের খুঁটে বালাটী বাঁধা রহিয়াছে।

চাপা সুরে মাসী বলিল, "গেছলুম গোকুলের বোন কৃষ্ণদাসীর কাছে, তার কাছে মাঝে মাঝে এমনিও যাই, টাকা ধারও মাঝে মাঝে ক'রে থাকি। বলা দেখে ওরা ধ'রে ফেলে ইবালা না নিয়েই টাকা দিলে। যা, বল্ ওদের দয়া-ধর্ম্ম আছে।"

প্রতিবাদ করিয়া ললিতা বলিল, "ছাই আছে, কেন তুমি এ টাকা নিতে গেলে, মাসী? আমি ও টাকা নোবো না, তুমি ফেরত দিয়ে এস।" ললিতার চক্ষু রাগে ও অভিমানে রক্তিম হইয়া উঠিল।

মাসী সস্নেহে বলিল, "নিতে দোষ কি ললিতা, ধার ব'লেই তো নেওয়া, টাকা হাতে এলে তুই নয় ফেরত দিস; এখুনি ফেরত দিতে গেলে খারাপ দেখায়, তা ছাড়া গোকুল এ ভিটের মালিক, এমন কি তোর বাড়ীর কুটী গাছটী পর্য্যন্ত দেনায় ওর কাছে বিকিয়ে রয়েছে। ওদের কাছে কি রাগ ভাল দেখায়? টাকা হাতে হ'লে ফিরিয়ে দিতে বাধা কি?

দারুণ অভাবের সংসার—গর্ভবতী গাভী খাদ্য অভাবে তিন দিন প্রায় অনাহারে রয়েছে, মুদীর দোকানে বিস্তর দেনা, সে আর ধারে জিনিস দেয় না, মুখে যতদূর বলিতে পারা যায় সে বলিতে ছাড়ে না, স্ত্রীলোক বলিয়া একটু সম্ভ্রম করিয়া চলে, তবে সে সম্ভ্রমের বাঁধ আর বেশী দিন থাকিবে না। গৃহের দেওয়ালে নানাস্থানে ফাট ধরিয়াছে, সংস্কার না করিলে শীঘ্রই পড়িয়া যাইবে। চাল ফুটো হইয়া গিয়াছে, রোজই গৃহের মধ্যে জল পড়িয়া মাটির মেঝে কর্দ্দমে পরিণত করে। স্বামীর অসুখের সময় ভিটা অগ্রাসন গোকুলের কাছে বাঁধা পড়িয়াছিল, পরে তাহারই কাছে বিক্রীত হইয়াছে; সাতপুরুষের ভিটায় এখন আর কোন অধিকার নাই—উঠ্‌বন্দী প্রজা, হুকুম হইলেই উঠিয়া যাইতে হইবে, এখন ভিটায় বাস করা না-করা গোকুলের করুণার উপর নির্ভর করিতেছে। ললিতা চিন্তান্বিতা হৃদয়ে কম্পিত হস্তে মাসীর নিকট হইতে টাকা কয়টী লইল। যাইবার সময় মাসী গোকুলের আবেদনটী জানাইতে ভুলিল না।

ললিতা বলিল—'আচ্ছা ভেবে দেখি।' ললিতার মনটা এতদিনে নরম হইয়াছে দেখিয়া মাসী বিলক্ষণ খুসী হইল।

(৩)

বৎসরের এই সময়ে রাখালপুর গ্রামখানা হরিনামের স্বর্গীয় মাদকতায় কিছুদিনের জন্য বিশেষ করিয়া মাতিয়া ওঠে। ভাদ্র মাস, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী। বৈষ্ণবরাজ্যে ভক্তি-প্লাবনের একটা জাগ্রত সাড়া দিগ্বিদিক্ বিস্তৃত করিয়া বৈষ্ণবদের প্রাণ অধীর ও আবেগময় করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর সময় প্রতি বৎসরই গ্রামের বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপে এক সপ্তাহকাল অহোরাত্র হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হয়। এবারও হইবে, অধিকন্তু এবার স্বয়ং কীর্ত্তনদাস বাবাজী আসিবেন; সেইজন্য এবার অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা কিছু বিশেষ আয়োজন চলিতেছে। বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপে এবার স্থান সঙ্কুলান হইবে না বলিয়া গোকুল স্বীয় গৃহের সম্মুখের মাঠটী চাঁচিয়া পরিষ্কার করাইয়াছে। পরিষ্কৃত স্থানের মধ্য ভাগে চাঁদোয়া টাঙ্গান হইয়াছে; নিতাই, গৌর, শ্রীকৃষ্ণ, রাধা প্রভৃতি দেবদেবীর ও মহাপুরুষদের মৃত্তিকা, মূর্ত্তি ও আলেখ্য যথাস্থানে স্থাপন করা হইয়াছে। কাগজের লতা, পাতা, শিকল দিয়া চাঁদোয়াটী বিশেষ করিয়া সাজান হইয়াছে। বাবাজীর আগমনের অপেক্ষায় রাখালপুর গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ব্যগ্র ও আগ্রহান্বিত। বাবাজী আসিতে আরও দুইদিন দেরী আছে; সপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় তিনি আসিবেন।

(৪)

"ললিতা, ললিতা!"

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, বর্ষাকালের মেঘলা দিন। দু'একটী

মেঘ আকাশের গায়ে ছুটাছুটি করিতেছিল, তবে শীঘ্র বৃষ্টি নামিবার সম্ভাবনা কম। ললিতা চরকায় সূতা কাটিতেছিল। মাসীর ডাকে তাহা বন্ধ করিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, মাসী ও গোকুল বৈরাগীর ভগিনী কৃষ্ণদাসী। ললিতা সাদরে তাহাদের গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া দুখানি কাঠের পিঁড়ির উপর বসাইয়া স্বয়ং একটী নারিকেল পাতার আসনে বসিয়া অন্তরে অন্তরে দারুণ কুণ্ঠা ও লজ্জা বোধ করিতে লাগিল।

গরীবের বাড়ীতে ধনীর আগমন ঘটিলে গরীবের কুণ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক। ললিতার পরিহিত বস্ত্রটী এরূপ মলিন ও ছিন্ন ছিল যে, তাহা পরিয়া স্ত্রীলোকও স্ত্রালোকের কাছে যাইতে লজ্জাবোধ করে। ইহা ব্যতীত ললিতার বিশেষ কুণ্ঠিত হইবার কারণ যদি এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সছিদ্র চাল ভেদ করিয়া জল ঘরের মধ্যে পড়িবে, তখন এই ধনী অতিথিকে কোথায় স্থান দিবে। ঘরে এক খিলি পানও নাই যাহা কৃষ্ণদাসীর হাতে দেওয়া যাইতে পারে।

গোকুলের ভগিনী হইলেও কৃষ্ণদাসী লোকটা একেবারে সাদাসিদে ও ভাল মানুষ। ভাল করিয়া কথা গুছাইয়া বলিতেও জানে না, তাই মাসীকেই কথাটী অর্থাৎ কৃষ্ণদাসীর আগমনের কারণটা বলিতে হইল। সেদিন সকালে ললিতার 'আচ্ছা ভেবে দেখি' কথাটায় আস্থাবতী হইয়া মাসী আজ কৃষ্ণদাসীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণদাসী রিক্ত হস্তে আসে নাই, গোকুলের পরামর্শে এক বাক্স গহনা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

মাসী মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল, "দেখ ললিতা, আজ তোর ভাঙ্গা ঘরে যে এসেছে, তাকে লোকে অনেক সাধ্যি সাধনাতেও পায় না, কিন্তু এসেছে সে আর তোকে নতুন কোরে বল্‌তে হবে না—আমার বাক্যি রাখ তুই, আজই রাজী হ'। তোরই আখেরের একটা হিল্লে হ'য়ে যাবে।

ললিতার বদন-মণ্ডল দারুণ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। উদ্দীপনাময় অনেক কথা বলিতে গিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

কৃষ্ণদাসী সস্নেহে স্বীয় বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া ললিতার কপোলে একটী চুম্বন করিয়া স্নেহের সুরে বলিল, "আমি ভাই তোর দিদি, তোর বড় বোন্‌, আমাদের ভাঙ্গা সংসার জোড়া লাগাবার আশায় তোমার কাছে ছুটে এইছি। আর গোকুল আমার তোমা-অন্ত প্রাণ। বল আমাদের নিরাশা ক'রবে না, বল অরাজী নও তো।

দারুণ লজ্জায় ললিতা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মাসী বলিল—"এই কচি বয়েসে এত দুঃখু-কষ্টকে সহ্য ক'রে সাধ ক'রে দিব্যি না বিইয়ে কানায়ের মা হবি, একেবারে সর্ব্বে-সর্ব্বা জমিদার গিন্নী যার নাম; কবে হ'তে পারাতস্‌, কেবল বুদ্ধির দোষে এত দেরী করলি।"

যে ললিতার উগ্র ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পল্লীর চরিত্রহীন যুবকেরা এমন কি স্বয়ং গোকুল বৈরাগী পর্য্যন্ত তাহার দিকে ত করিতে ভীত হইত, সেই ব্যক্তিত্ব আজ যেন কাহার মায়াস্পর্শে তরল নিস্তেজ হইয়া গেল। ললিতা যেন মাসী ও কৃষ্ণদাসীর উপর নিজেকে সমর্পণ করিল। চাবি ঘুরাইয়া কৃষ্ণদাসী গহনার বাক্সটী খুলিয়া ফেলিল। ললিতা গরীবের কন্যা; বিবাহ হইয়াছিল অতি গরীবের সঙ্গে। এতগুলি গহনা তা' আবার সোনার, সে কখনও এক সঙ্গে দেখে নাই, দেখিবার আশাও করে নাই। অনিমেষ নয়নে গহনাগুলি ললিতা দেখিতে লাগিল। মাসী হাস্য করিয়া বলিল, "দেখছিস্‌ কি? আরও এমন কত বাক্স আছে, তোর সব হবে, বুঝলি?" কৃষ্ণদাসীর দিকে মুখ ফিরাইয়া মাসী বলিল—"তা' হ'লে দিনটা আজই ঠিক কর গিয়ে গোকুলকে দিয়ে; আমার ইচ্ছে এই মাসের শেষ দিকে কাজটা ক'রে ফেলা ভাল।" গহনার বাক্সটী বন্ধ করিয়া কৃষ্ণদাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া ললিতাকে পুনরায় স্নেহ-চুম্বন করিয়া বলিল, "আজ আসি ভাই, তুমি আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, তোমায় সোনা দিয়ে মুড়ে নিয়ে যাব।" ললিতার হস্তে গহনার বাক্সটি দিয়া কৃষ্ণদাসী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"মাসী"ও তাহার সঙ্গে বাহির হইতেছিল। ললিতার গম্ভীর আহ্বানে তাহাকে থামিতে হইল। ললিতা গয়নার বাক্সটী মাসীর হাতে দিয়া অস্বাভাবিক রুক্ষ স্বরে বলিল, "এটা ওঁকে ফেরত দাও মাসী, এর পরীক্ষা হ'বার হ'বে।"

(৫)

কয়েক দিন যাবৎ পরম ভক্ত কীর্ত্তনদাসের সুমধুর কীর্ত্তনে ক্ষুদ্র রাখালপুর আনন্দ-সাগরে ভাসমান। মৃদঙ্গ,

খঞ্জনী ও অন্যান্য বাদ্যধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত। গোকুল মহা ব্যস্ততা সহকারে অতিথি, অভ্যাগত ও ভক্ত-জনের তত্ত্বাবধান করিতেছে এবং ললিতা আসিয়াছে কি না দেখিবার জন্য মুহুর্মুহু চিকের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতেছে। তাহার দৃষ্টি প্রতিবারই ব্যর্থ হইয়া তাহাকে পীড়িত করিতে-ছিল। আজ শেষ দিন; প্রভুর কীর্ত্তন আরম্ভ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। গোকুল দেখিল, মাসী একলা আসিতেছে। ললিতা না আসিবার কি কারণ থাকিতে পারে? গোকুল সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। একটু সুবিধা পাইলে গোকুল জিজ্ঞাসা করিল—"মাসী, তুমি যে একলা এলে!"

মাসী বলিল—"ললিতার বড্ড মাথা ধরেছে, সারাদিন কিছু খায় নি, তাই আসতে পারে না।"

বাবাজীর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।—

"আয় আয় দেখি সখি যশোদার অঙ্কে
উঠেছে পার্ব্বন চাঁদ ত্যজিয়া কলঙ্কে।
চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়—
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
আয় আয় দেখি সবে……।"

গোকুল অস্থিরচিত্তে আসরের মধ্যে বসিয়া রহিল; কীর্ত্তনের একবিন্দুও তাহার কর্ণবিবরে প্রবেশ লাভ করিল না।

(৬)

কাল হইতে ললিতা যেন কিছুমাত্র উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। অসুখের অছিলা দেখাইয়া আজ সারাদিন কিছু খায় নাই—সারাদিন উদাসভাবে ভাবিয়াছে, কি ভাবিয়াছে সেই জানে। মাসী দুই তিন বার গায়ে হাত দিয়া দেখিয়াছে, খওয়াইবারও চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ললিতা খায় নাই।

সন্ধ্যার পর মাসী চলিয়া গেলে গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া গৌরাঙ্গদেবের মূর্ত্তির সম্মুখে মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, "প্রভু, কি আমার করলে, প্রভু! কেন আমায় এ কুমতি দিলে? গোকুলের বোন যখন এসেছিল, কেন তুমি তখন আমার গলা হ'তে স্বর কেড়ে নিয়েছিলে? কেন আমি তখন বলি নি, তুমি আমার স্বামী! আমার স্বামী যে তোমার হাতে আমায় সমর্পণ ক'রে গিয়েছিল। কেন আমায় স্বর্ণ-মোহে ফেললে প্রভু,—এই কি তোমার পরীক্ষা দয়াল!"

লাল চক্ষু অঙ্গারের মত জ্বলিতেছে, কেশপাশ আলুলায়িত, বস্ত্র বিশৃঙ্খল, ললিতা বিগ্রহের সম্মুখে মহা উদ্বেগময় চিত্তে স্বর্গগত স্বামীর পাদুকা দুইটী বক্ষে ধারণ করিয়া অসাড় হইয়া শুইয়া রহিল।

মোহ জয়ী হইয়া যেন তাহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল।

(৭)

শেষ রাত্রে গঙ্গাস্নান সারিয়া শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম গাহিতে গাহিতে মাসী গৃহে ফিরিবার পথে দেখিল, একটী নারী আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া কোথায় যাইতেছে, বেচারী আত্মগোপনে বিশেষ ব্যস্ত, যেহেতু সাধারণ পথ ছাড়িয়া মাঠের পথ দিয়া যাইতেছে। মাসী জিজ্ঞাসা করিল—"কে গো বাছা, কেগা তুমি? সাড়া দাও না কেন?"

নারীটী ধীরে ধীরে মাসীর নিকটে আসিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল—"আমি, মাসী।"

বিস্মিতা হইয়া মাসী বলিল,—"কে ললিতা! এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিস।"

ললিতা বলিল—"প্রভুর পায়ে শ্রীবৃন্দাবনে।

অধিকতর বিস্মিতা হইয়া মাসী বলিল, "বৃন্দাবনে! সত্য!"

ললিতা দৃঢ়স্বরে বলিল, "সত্যিই, মাসী, বৃন্দাবনে যাচ্ছি। প্রভু যেন আমায় ডেকেছে। তুমিও চল মাসী, মাসী বোনঝিতে দুইজনে বেশ ব্রজবাসী হ'ব। সংসারের চূড়ান্ত তো কোল্লে মাসী, শেষ ক'দিন আর পাঁক ঘেঁটে না, এস।"

ললিতা মাসীর হাত ধরিল।

মাসী বলিল—"বলিস্ কি এক্ষুনি?"

ললিতা বলিল, "এক্ষুণি ভোরের আগে ষ্টীমারে উঠতে হ'বে।"

নদীর তীর হইতে ললিতার কুটীর দেখা যায়। কুটীরের

উন্মুক্ত দ্বার দিয়া অন্ধকারের বুকের উপর এক ঝলক আলো আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া মাসী বলিল, "তোর ঘর খোলা রইল, শিকল—"

বাধা দিয়া ললিতা বলিল, "আর ওদিকে চেয়ো না, মাসী। আর শেকল ছোঁব না, অনেক কষ্টে সংসারের শেকলটা খুলেছি—বৃন্দাবনে যেতে হ'লে সব খুলে একেবারের মত যেতে হয়।" মাসী অতি চিন্তিত ও ধীরভাবে ললিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের নিঝুম নিস্তব্ধতাকে বিধ্বস্ত করিয়া কীর্ত্তনদাসের সুমধুর কীর্ত্তনের প্রভাতী সুর বাটিকা আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল।

"—হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥
রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥

গভীর অন্ধকারে গা ঢাকিয়া ললিতা গ্রাম ত্যাগ করিয়া ষ্টীমার ঘাটের অভিমুখে চঞ্চলগতিতে চলিতে লাগিল। মাসী অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

সমুদ্রবক্ষে

[শ্রীঅমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী, এম্-বি]

কোন্ এক সুদূরের সুষুপ্ত বাসনা
কালের অতল গর্ভে ছিল লুকায়িত,
সহসা কাহার ডাকে তন্দ্রা গেল টুটি'
মূর্ত্ত হ'য়ে দেখা দিলে, চির সে বাঞ্ছিত।
বহুদিন চ'লে গেছে, আমারি অন্তরে
তোমার দর্শন-আশা আছিল গোপনে
কর্ম্মের আবর্ত্ত মাঝে; কর্ম্মক্লান্ত যবে,
রে সাগর, এতদিনে পড়িল কি মনে?
আজি এই নৃত্যরোলে নাচে মোর হিয়া
কি মহান, কি গভীর, কি ভৈরব তানে
নীলাম্বু-বারিধি-বক্ষে। কোটী কোটী হ'য়ে
নীলাম্বর নাচিছে কি যমুনা-পুলিনে?
আজি তোর বক্ষ'পরে কত ক্ষুধা লয়ে
ফেনিল এ শুভ্র সুধা করিতেছি পান;—
কেন এই আকুলতা? ক্ষুব্ধ নিরবধি?
কি রতন হারায়েছ পাগল পরাণ?
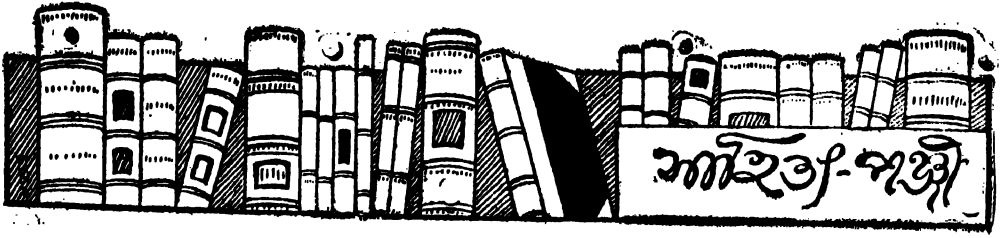
শ্রাবণ

১লা—অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম (১২২৭, শনিবার)। ইঁহার রচিত গ্রন্থ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। মাদক সেবনের ইনি বিশেষ বিরোধী ছিলেন; তৎসম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধাদিও লিখিয়া ছিলেন।

উমেশচন্দ্র বটব্যালের মৃত্যু (১৩০৫)—ইনি ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃতে এম্-এ, ও বি-এল পাস করিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ইনি স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। 'সাহিত্য' পত্রে বৈদিক যুগে গো-হত্যা সম্বন্ধে ইনি প্রবন্ধাদি লেখেন, পরে 'সাধনা' পত্রে সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধেও বহু প্রবন্ধ লেখেন।

—ঢাকায় পাক্ষিক সংবাদ-পত্র "বঙ্গবন্ধু"র প্রচার।

২রা—'সংবাদ-প্রভাকর' পুনরুজ্জীবিত।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৯০৬ খৃঃ)—ইনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া কলিকাতায় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'ন। এদেশীয়দের মধ্যে ইনি প্রথম ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সেল হ'ন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ও ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হ'ন। ইনিই প্রথম ভারতীয় জাতীয় সম্মেলনের সভাপতি।

৪ঠা—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম (১২৭০)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ—কল্কি অবতার, আর্য্যগাথা, আষাঢ়ে, হাসির গান, ত্র্যহস্পর্শ, বিরহ, পাষাণী, তারাবাই, রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস, নুরজাহান, সাজাহান, মেবার পতন, Lyrics of Ind, Crops of Bengal, পুনর্জ্জন্ম, চন্দ্রগুপ্ত, পরপারে, আনন্দ-বিদায়, ভীষ্ম, সিংহল-বিজয়, বঙ্গনারী, মন্দ্র, আলেখ্য ও ত্রিবেণী। ইনি যে কেবলমাত্র বঙ্গ-ভাষারই কবি ছিলেন তাহা নহে—ইংরেজীরও ছিলেন—তাহার উদাহরণ আমরা তাঁহার Lyrics of Ind নামক ইংরেজী কাব্য-গ্রন্থে পাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

—যোগীন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যু (১৩৩৪)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী, অহল্যাবাই, তুকারাম চরিত, দেববালা, পতিব্রতা, পৃথ্বীরাজ, শিবাজী প্রভৃতি।

ইঁহার কবিত্বশক্তিও অসাধারণ—'ভারতের মানচিত্র' নামক সর্ব্বজনপ্রিয় কবিতা ইঁহারই বিরচিত। স্যর গুরুদাস, স্যর আশুতোষ প্রভৃতি ইঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া প্রকাশ্য সভায় ইঁহাকে কবিভূষণ উপাধিতে সমলঙ্কৃত করেন।

৬ই—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম (১২৫৪)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ—Visit to Europe, Art Manufactures of India প্রভৃতি। জন্মভূমি নামক পত্রিকায় ইনি বহু প্রবন্ধাদিও লিখিতেন। "বিশ্বকোষ" অভিধান ইনি ও ইঁহার অগ্রজ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রথমে আরম্ভ করেন।

৮ই—প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম (১২২১)—ইনি স্বীয় গ্রন্থাদিতে টেকচাঁদ ঠাকুর এই কল্পিত নাম ব্যবহার করিতেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—আলালের ঘরের দুলাল, রামারঞ্জিকা, মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, আধ্যাত্মিকা, অভেদী ও ডেভিড হেয়ারের জীবন-চরিত। বিশেষতঃ ইনি প্রেততত্ত্ব ও অধ্যাত্ম-বিদ্যার আলোচনা করিতেন। ইনি 'মাসিক পত্রিকা' নামক একখানি পত্রিকার প্রবর্ত্তন করেন।

যোগীন্দ্রনাথ বসু

প্যারীচাঁদ মিত্র

—রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের জন্ম (১২৫৫)—বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া ইনি বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং ভ্রমণ-শেষে 'তিব্বত-ভ্রমণ বৃত্তান্ত' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি Buddhist Text Society স্থাপন করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে Tibetan English Dictionary সম্পূর্ণ করেন। ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম্ম-তত্ত্ব ও তিব্বত সংস্পৃষ্ট ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে ইঁহার পারদর্শিতা অসামান্য।

—বেঙ্গল একাডেমী অব লিটারেচারের প্রতিষ্ঠা (১৩০০)।

—শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর জন্ম (১৭৮৪ শক);—'শঙ্করাচার্য্য' এবং 'রামানুজ' ইঁহার দুইটী উৎকৃষ্ট

গ্রন্থ। ইনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া দেশের অনেক কৌতুকপূর্ণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন।

চন্দ্রশেখর বসুর জন্ম (১২৪০)

—লঙ সাহেবের কারাদণ্ড (১৮৬১ খৃঃ)—ইনি বাঙ্গলা

রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ

ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—বাঙ্গলার অধিবাসী, ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে লিখিত। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে "নীলদর্পণ" নাটকের ইংরেজী অনুবাদে সহায়তা করায় এবং উহার মুখবন্ধ লেখায় নীলকরগণ কর্ত্তৃক ইনি অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।।

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর জন্ম (১২৪২)।

৯ই—দ্বারকানাথ গুপ্তের জন্ম (১২৩০)

—কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যু (১২৭৭)—মহাভারতের বাঙ্গলা অনুবাদ ইঁহার অমর কীর্ত্তি। অতি তরুণ বয়স হইতেই ইনি সাহিত্য-চর্চ্চার পথে অগ্রসর হ'ন। ইনি বেণীসংহার, বিক্রমোর্ব্বশী, মালতী-মাধব প্রভৃতি নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। বঙ্গেশবিজয়, সাবিত্রী সত্যবান্, হুতোম পেঁচার নক্সা প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহারই রচিত।

১০ই—'সংবাদ রত্নমালা' প্রকাশিত (১২৩৯)

—কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যু (১২৯১)—ইনি হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হইয়া সুযোগ্যভাবে উহা পরিচালনা করেন। কোন কার্য্য ইনি অসম্পূর্ণ রাখিতেন

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

না।

১১ই—রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যু (১২৯৮)—ইনি একজন প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্। ইনি মোট ১২৮ খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে ১০খানি বাঙ্গলা ও ১৩ খানি সংস্কৃত। বাঙ্গলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, পারস্য উর্দ্দু, হিন্দী, গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, জর্ম্মান প্রভৃতি ভাষায় ইনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার লিখিত বিবিধার্থসংগ্রহ, প্রকৃতি ভূগোল, পত্রকৌমুদী, ব্যাকরণ প্রবেশ, রহস্যসন্দর্ভ, মিবারের ইতিহাস, শিবাজীর জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রে ইনি বহু প্রবন্ধাদি লিখিয়া ঐ পত্রের বহুল উন্নতি সাধন করেন।

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু (১৩০১)।

১২ই—রজনীকান্ত সেনের জন্ম (১২৭২)—বাল্যকাল হইতেই রজনীকান্তের কবি-প্রতিভা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইঁহার কাব্য-গ্রন্থ—বাণী, কল্যাণী, আনন্দময়ী, সদ্ভাব-কুসুম, অমৃত, বিশ্রাম ও অভয়া।

রজনীকান্ত সেন

—বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আইন পাশ (১২৬৩)

১১ই—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু (১২৯৮)—

—কালীপ্রসন্ন ঘোষের মৃত্যু (১৩১৪)—ইনি 'প্রভাত চিন্তা, নিভৃত-চিন্তা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি 'বান্ধব' নামে একটী মাসিক পত্রও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় চিন্তাশীল লেখক দুর্লভ।

১৬ই—রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয়ের মৃত্যু (১৩৩৭, শনিবার) ইনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বহু দিন সহঃ সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ও বহু সামাজিক ও সাহিত্য-বিষয়ক কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৭ই—কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু (২রা আগষ্ট, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ)—ইনি বিধবা-বিবাহ, কৃষি-বিদ্যা, স্ত্রী-শিক্ষা মাদক নিবারণ, গার্হস্থ্য ব্যবস্থা, শিশু-চিকিৎসা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২০শে—মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্নের জন্ম (১৮৪২ খৃঃ ৫ই আগষ্ট) —মহা পণ্ডিত হইয়াও ইনি বাঙ্গলা সাহিত্য-চর্চ্চা বিশেষরূপে করেন নাই।

—মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি (১৭৭৫ খৃঃ)

২১শে—দেবেন্দ্রনাথ দাসের জন্ম (১২৬৩)—ইনি একজন অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। পাঁচ বৎসরে তিনি ৩১ খানি ইংরেজী পুস্তকের নোট প্রস্তুত করেন।

২২শে—উপেন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যু (১৩০২)—ইহার রচিত নাটক—শরৎ-সরোজিনী, সুরেন্দ্র-বিনোদিনী ও দাদা ও আমি।

—কাশীপ্রসাদ ঘোষের জন্ম (১৮০৯ খৃঃ)—ইনি বহু ইংরেজী ও বাঙ্গলা পদ্য ও গদ্য রচনা করেন। তন্মধ্যে On Bengali Works and Writers, Shair and other poems, Memoir of Native Dynasties উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে The Hindu Ihntelligencer নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচার করেন।

২৩শে—কিশোরীচাঁদ মিত্রের মৃত্যু (১২৮০—৬ই আগষ্ট, ১৮৭৩)—ইনি Calcutta Review পত্রের প্রথম

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাঙ্গালী লেখক। ইনি Indian Field নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়া তাঁহার সাহিত্য-সাধনার বিশেষ পরিচয় দেন। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের একটি জীবনী ইনি প্রণয়ন করেন।

২৫শে—অমূল্যচরণ বসুর জন্ম (১০ই আগষ্ট, ১৮৬২)

২৬শে—কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়ের মৃত্যু (১৩৩২)—অষ্টাঙ্গ আর্য্যুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় এবং আয়ুর্ব্বেদীয় আরোগ্য-শালা ইঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। ইনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত চিকিৎসক।

২৭শে—শ্রীরূপ গোস্বামীর মৃত্যু তিথি।

২৯শে—বহু ভাষাবিদ্ হরিনাথ দে মহাশয়ের জন্ম (১২৮৪)—অল্প বয়সেই ইনি ২০টী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন—তন্মধ্যে ১৪টি ভাষায় এম্-এ পাশ দেন। ইনি বহু কবিতা নানা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি Herald পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। অতি কম বয়সে ইঁহার ন্যায় ভাষাবিদ্ জগতে বিরল।

—রমেশচন্দ্র দত্তের জন্ম (১২৫৫)—ইঁহার রচিত গ্রন্থ—মাধবীকঙ্কণ, বঙ্গ-বিজেতা, জীবনপ্রভাত, জীবনসন্ধ্যা, সংসার, সমাজ, Ancient civilization in India, Lays of Ancient India, Ramayana and Mahabharata in English Verse, Economic History of British India, The slave girl of Agra, The lake of palms ইত্যাদি।

৩০শে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের দেহত্যাগ (১২৯৩)

৩১শে—দামোদর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু (১৩১৪)—ইনি একজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক। ইঁহার প্রথম কথা গ্রন্থ মৃন্ময়ী; অন্যান্য গ্রন্থ—মা ও মেয়ে, দুই ভগিনী, বিমলা, কর্ম্মক্ষেত্র, শান্তি, সোনার কমল, যোগেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, সপত্নী, নবাব-নন্দিনী, ললিতমোহন, অমরাবতী, নবীনা প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন ইনি ৯টী টীকা ভাষ্য ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইনি জ্ঞানাঙ্কুর, প্রবাহ, ও একখানি ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

২১এ—সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা (১৩২৩, রবিবার)। ইহার প্রথমে নাম ছিল 'বঙ্গীয় ছাত্র-সমিতি।' প্রতিষ্ঠার পাঁচ মাস পরে নাম হয় "সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ।" উদ্দেশ্য সংস্কৃত মাসিকপত্র, সংস্কৃত নাটকাভিনয়, সংস্কৃত

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

প্রবন্ধ পাঠ; সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা, সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থের সংগ্রহ ও প্রকাশ :এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সাধারণের অনুরাগবর্দ্ধন।

২৩শে—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম-এ বি-এল'এর জন্ম (১২৬১)। ইঁহার রচনা—বিবিধ (বামাবোধিনী ১৮৭১); Two editorials in the Bengali reviewing Barooah's Eng-Sanskrit Dictionary (১৮৭৭); Kalidasa—A Study (১৮৮৩, সংশোধিত ১৯১১), অম্বিকা দেবজায়ার চতুর্থাহক্রিয়ায় পঠিত প্রবন্ধ বামাবোধিনী (১৮৯৪); শ্রাদ্ধে পঠিত প্রবন্ধ (তত্ত্বকৌমুদী)। প্রীতি-গীতি (১৮৯৯) Life of Girish Chander Ghose (১৯১১)Modern Review (1912); পত্রে কুঞ্জলাল ভিষগ্‌রত্নের English Tran slation of Sushruta Samhita Vol. 1. নামক গ্রন্থের সমালোচনা —১৯০৭।

আরবী ও পার্সী মূলক বাঙ্গলা শব্দ সংগ্রহ (১৯১৯); বার্দ্ধক্য, শৈশব, যৌবন (প্রবাসী); জীবনের সুখ দুঃখ (নব্যভারত); প্রেম (আর্য্যাবর্ত্ত); বন্ধুত্ব, আতিথ্য, বঙ্গে পর্ত্তুগীজ প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পর্ত্তুগীজ পদার্থ (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা)—১৯১০ শিশুচুরি (স্বাস্থ্য-সমাচার) অচ্যুতানন্দ বাবাজী, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বাঙ্গালীর জীবনের ছায়াপাত (মানসী ও নব্যভারত পত্রিকায় প্রকাশিত) ১৯১২ বিপিনবিহারী গুপ্ত পুরাতন প্রসঙ্গের সমালোচনা (প্রবাসী) শিশুর শোকে বৃদ্ধের মর্ম্মোচ্ছ্বাস Life of Docowry Ghose (Hinaoo Patriot ৺রমাসুন্দরী ঘোষ (সুপ্রভাত—১৯১৩) নরদেব শিবচন্দ্র দেব ও তৎসহধর্ম্মিণীর জীবনালেখ্য (বীরেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত)—১৯১৮ —আত্মজীবনী (১৯২০—২১) শান্তির জল (অর্চ্চনা পত্রিকায় প্রকাশের পর) ১৯২৪—২৫ গাথা সপ্তশতী (মাসিক বসুমতী), সংস্কৃত ভাষার শব্দ-কাব্য, মহাভারতের প্রধান চিত্র (মাসিক বসুমতী), রামের চরিত্রদ্যোতক একটি মর্ম্মোচ্ছ্বাস বাতায়ন, মৃত্যুর আসামী, কবি ও কাব্য, কুলত্যাগিনী—১৯২৬ Character and anticedent of Late Babu Gopal Chander Bose of Colootola—১৮১৭ 'সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের পদ্যানুবাদ—১৯২৮

মাসপঞ্জী

শ্রাবণ

১লা—কলিকাতায় দেশীয় সংবাদপত্রসেবীদিগের সভা ও নবজীবন প্রেস বাজেয়াপ্ত সম্বন্ধে আলোচনা। প্রেসিডেন্সি কলেজে পুলিস ও পিকেটারদিগের সংঘর্ষ। বহু ছাত্র অনুপস্থিত। কলেজ-গৃহে প্রবেশ করিবার অনুমতির জন্ম স্যর নীলরতন সরকারের ব্যর্থ প্রয়াস। বারাণসীতে শ্রীযুক্ত প্যাটেলের সম্বর্দ্ধনা। বড়লাট কর্ত্তৃক স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু ও মিঃ জয়াকরকে মহাত্মা গন্ধী, পণ্ডিত মতিলাল ও জহরলালের সহিত জেলে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রদান।

২রা—সিমলা আইন-পরিষদে মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা। সিমলায় স্যর জর্জ্জ স্যাকচারের ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা-বিষয়ে বক্তৃতা।

পেশোয়ারের দাঙ্গার তদন্ত বিষয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অভিমত।

৩রা—মাদুরায় জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ। ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যা বিষয়ে বিকানীর-মহারাজের মন্তব্য প্রকাশ। আট্‌লাণ্টিক্‌ মহাসাগরে জাহাজ অগ্নিদগ্ধ

৪ঠা—লণ্ডনে স্যর বিনোদ মিত্রের মৃত্যু। বারাণসীতে 'কংগ্রেসের সহিত মহাত্মা গন্ধীর সম্বন্ধ' বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্যাটেলের ওজস্বিনী বক্তৃতা। জব্বলপুরে পুলিশের গুলিবর্ষণ—১৫ জন আহত।

৫ই—মহাত্মা গন্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে

শ্রীযুক্ত সপ্রু ও জয়াকরের বোম্বাইয়ে উপস্থিতি। লক্ষ্ণৌয়ে মোস্‌লেম্ কনফারেন্সে সাইমন রিপোর্টের তীব্র প্রতিবাদ। বোম্বাইয়ে পিকেটীং করায় অপরাধে ৪৬ জন রমণী গ্রেপ্তার।

বাল গঙ্গাধর তিলক

৬ই—লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে শ্রীযুৎ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সাইমন রিপোর্টের প্রতিবাদকল্পে বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত সপ্রু ও জয়াকর মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পথে পুনায় উপস্থিতি। কলিকাতায় সর্ব্বত্র পিকেটিং ও বহু গ্রেপ্তার।

৭ই—সুয়েজে ভীষণ দাঙ্গা। ১০০০ জন লোক গ্রেপ্তার। ঢাকায় কলেজ-ছাত্রদিগের সহিত পুলিশের সংঘর্ষ। জনৈক কলেজের ছাত্র নিহত। শ্রীযুক্ত সপ্রু ও জয়াকরের মহাত্মা গন্ধী ও শ্রীমতী নাইডুর সহিত যারবেদা জেলে সাক্ষাৎকার। কলিকাতায় বড়বাজারে পিকেটীংএর জন্য ২২ জন মহিলা পিকেটার গ্রেপ্তার। শ্রীযুক্ত সুভাষ বসুর আলিপুর জেলে অনশন-ব্রত।

৮ই—মহিলা পিকাটারদিগের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ-কল্পে কলিকাতায় হরতাল। ডাঃ আরকুহাটের সভাপতিত্বে স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের স্মৃতিসভার অধিবেশন। বড়বাজারে পিকেটীংএর জন্য ৭ জন মহিলা গ্রেপ্তার। রোমে ভীষণ ভূমিকম্প—১৭৭৮ জন মৃত, ৪২৬৪ জন আহত। ঢাকার অবস্থা শঙ্কাজনক।

৯ই—ইতালীর আগ্নেয়গিরি উদ্গীরণ। বহু ব্যক্তি মৃত। বহু অট্টালিকা ভূমিসাৎ। বড়বাজারে পিকেটীংএর জন্য ৪ জন মহিলা গ্রেপ্তার। শ্রীযুক্ত সুভাষ বসুর দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি। অন্যান্য রাজবন্দীদিগের অনশন ব্রত-পালন।

১০ই—কলিকাতায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে
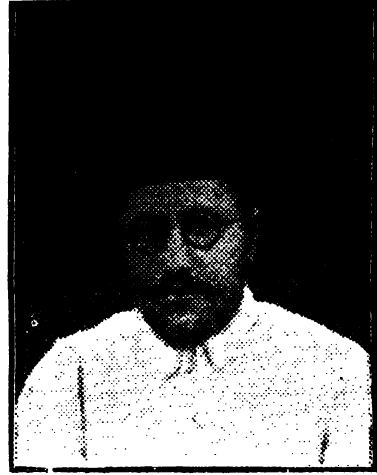
আবুল কালাম আজাদ

জীবনবীমার এজেন্টদিগের সম্মিলন। বিলাতী জীবনবীমা কোম্পানী বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল অভিমুখে ছাত্রদিগের শোভাযাত্রা। সিন্ধুদেশে বন্যায় একশত গ্রাম জলপ্লাবিত।

১১ই—ধুবড়ীতে ভীষণ ভূমিকম্প। তিন মাস কার্য্যে উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের মেয়রের কার্য্য কাল সমাপ্ত।

১২ই নাইনী জেলে শ্রীযুক্ত সপ্রু ও জয়াকরের সহিত পণ্ডিত মতিলালের ৪ ঘণ্টা ব্যাপী পরামর্শ। নোয়াখালীতে ঘূর্ণী বায়ুর দরুণ বহু ক্ষতি।

১৩ই—স্যর নীলরতন সরকারের সভাপতিত্বে কলি-কাতায় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-বার্ষিকী সভার অধিবেশন। হাইকোর্টে শ্রীযুক্ত সতীন সেনের মামলা। কলিকাতা রোটারী ক্লাবে কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়ের বক্তৃতা। বঙ্গীয় হাঁসপাতাল সমূহের জন্য সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা।

১৪ই—পুণাতে ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা বিষয়ে কোলা-পুরের মহারাজের বক্তৃতা। কলিকাতায় স্কটিশচার্চ্চ কলেজে পিকেটীংএর ফলে পিকেটারদিগের সহিত পুলিশের সংঘর্ষ।

লণ্ডনে লর্ড সভায় লর্ড বার্ণহামের গোল-টেবিল বৈঠক সম্বন্ধে আলোচনা।

১৫ই—লাহোরে পুলিশ কর্ত্তৃক একটী বাটীতে ১২টী বোমা আবিষ্কার। মহাত্মা গন্ধীর সহিত বারবেদা জেলে শ্রীযুক্ত জয়াকরের সাক্ষাৎ।

বোম্বাইয়ে ১৫ জন পিকেটার গ্রেপ্তার। পণ্ডিত মতিলাল ও জহরলাল নেহরুকে বারবেদা জেলে মহাত্মা গন্ধীর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আনয়নের জন্য শ্রীযুক্ত জয়াকরের বড় লাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা। লণ্ডনে ভারত-সমস্যা বিষয়ে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের বক্তৃতা।

১৬ই—চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার শুনানী। তিলক স্মৃত-বার্ষিকী সভার অনুষ্ঠান হয়।
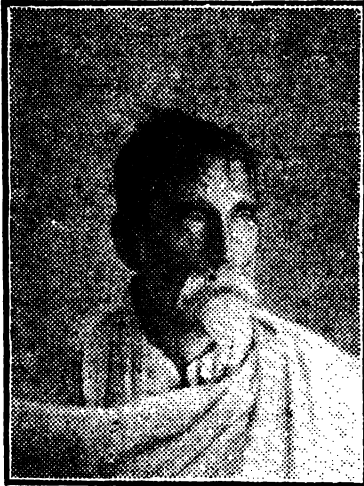
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১৭ই—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল গ্রেপ্তার। আবুল কালাম আজাদের প্যাটেলের পদগ্রহণ। ডাক্তার চুনীলাল বসুর পরলোক প্রাপ্তি।

১৮ই—পণ্ডিত মালব্যজী ও শ্রীযুক্ত প্যাটেলের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ কল্পে কলিকাতায় হরতাল।

১৯এ—হায়দ্রাবাদে কংগ্রেস সেচ্ছাসেবকদিগের সহিত পুলিশের সংঘর্ষ। চট্টগ্রামের মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ।
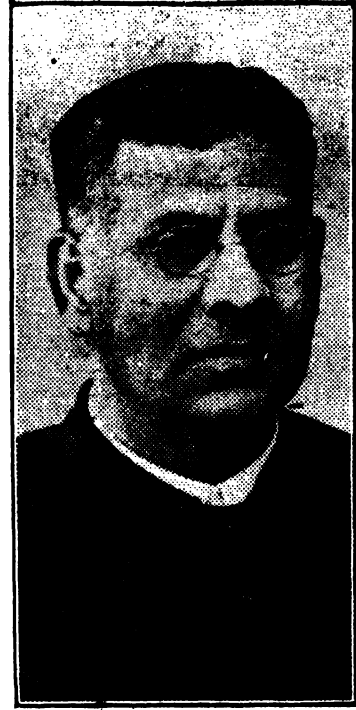
ডাঃ চুনীলাল বসু

২০এ—কলিকাতা কর্পোরেশনে মেয়র নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া হুলুস্থুল।—বড় লাট কর্ত্তৃক পণ্ডিত মতিলাল ও জহরলালকে মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান।

২২এ—বারাকপুরে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-সভায় কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়ের মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বক্তৃতা। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের ১ কোটি টাকা রাজস্ব হ্রাসে আশঙ্কা।

২৩এ—পণ্ডিত মালব্য ও শ্রীযুক্ত প্যাটেলের তিলক শোভাযাত্রায় যোগদানের অপরাধে মালব্যজীর ১০০, জরিমানা এবং শ্রীযুক্ত প্যাটেলের ৩ মাস কারাদণ্ডের আদেশ। ব্রিটেনিয়া ও রুম্যানিয়ার বাণিজ্য-সর্ত্তে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর।

২৫এ—কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ১০০৲ টাকা জমা দেওয়ায় পণ্ডিত মালব্যের মুক্তি। পেশোয়ারে হাঙ্গামা।

আলোচনা

[প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু]

প্রাচীন বঙ্গে দত্তবংশের প্রভাব

মুসলমান আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই দত্তবংশের প্রভাব সমগ্র বঙ্গে প্রসারিত হইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় বাঙ্গলার নানাস্থান হইতে আবিষ্কৃত সুপ্রাচীন তাম্রশাসন হইতে পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

দামোদরপুরের তাম্রশাসন

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী ষ্টেসন হইতে ৪ ক্রোশ দূরে দামোদরপুর গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রাম হইতে ৫খানি সুপ্রাচীন তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের অধীনে চিরাতদত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির প্রধান উপরিক ছিলেন। তাঁহার অধীনে কুমারামাত্য বেত্রবর্ম্মা কোটিবর্ষবিষয় শাসন করিতেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ তাম্রশাসন দুইখানি মহারাজাধিরাজ বুধগুপ্তের সময়ে ১৬৩ গুপ্তাব্দে প্রদত্ত হয়। এই দুইখানিতে লিখিত আছে, মহারাজাধিরাজ বুধগুপ্তের অধীনে প্রথমে মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ও তৎপরে মহারাজ জয়দত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির উপরিক ছিলেন।

পঞ্চম তাম্রশাসন ২১৪ গুপ্তাব্দে মহারাজাধিরাজ ভানুগুপ্তের সময়ে প্রদত্ত হয়। ইহাতে উপরিকের নাম অস্পষ্ট হইলেও তাঁহার মহারাজ উপাধি স্পষ্টভাবে আছে। উক্ত ৫ খানি তাম্রশাসনেই উপরিক ব্যতীত দত্ত উপাধিধারী আরও কয়েকজন প্রধান রাজকর্ম্মচারীর নাম পাওয়া যায়। উপরিক ব্যতীত প্রথম ও দ্বিতীয় তাম্রশাসনে পুস্তপাল (Record-keeper) ঋষিদত্ত ও বিভুদত্ত, চতুর্থ তাম্রশাসনে প্রথমকুলিক বরদত্ত, পুস্তপাল বিষ্ণুদত্ত এবং পঞ্চম তাম্রশাসনে সার্থবাহ স্থানুদত্ত, প্রথমকুলিক মতিদত্ত ও পুস্তপাল গোপদত্তের নাম পাওয়া যায়।

গুণাইঘরের তাম্রশাসন

ত্রিপুরার গুনাইঘর গ্রাম হইতে অল্পদিন হইল মহারাজ বৈণ্যগুপ্তের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, ১৮৮ গুপ্তাব্দে মহারাজ রুদ্রদত্তের বিজ্ঞাপন অনুসারে মহারাজ বৈণ্যগুপ্ত মহাযানমতাবলম্বী শাক্যভিক্ষাচার্য্য শান্তিদেবের উদ্দেশে উক্ত তাম্রশাসন দান করিয়াছিলেন। মহারাজ বৈণ্যগুপ্ত ভগবান্ মহাদেবপাদানুধ্যাত অর্থাৎ মহাশৈব বলিয়া পরিচিত হইলেও মাতাপিতা ও নিজের পুণ্যবৃদ্ধির আশায় মহারাজ রুদ্রদত্তের দ্বারা মহাযানিক বৈবর্ত্তিক ভিক্ষুসংঘের পূজিত ভগবান্ বুদ্ধের সর্ব্বকালীন পূজা ভোগাদি এবং বিহারের ব্যয়াদি নির্ব্বাহের জন্য উক্ত তাম্রশাসন দ্বারা বহু ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনখানি যিনি লিখিয়াছেন তিনি "সন্ধিবিগ্রহাধিকারীকরণকায়স্থ নরদত্ত।"

ধাপরাহাটীর তাম্রশাসন

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ধাপারাহাটী গ্রাম হইতে চারিখানি অতি প্রাচীন তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম দুইখানি মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্যের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ। "তৎপ্রসাদলব্ধাস্পদ মহারাজ স্থানুদত্তের" আধিপত্যকালে তন্নিযুক্ত বারকমণ্ডলের বিষয়পতি ছিলেন জজাব।

অপর দুইখানি তাম্রশাসনের মধ্যে একখানি মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের ও অপর খানি মহারাজাধিরাজ সমাচার দেবের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ। শেষোক্ত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, "মহারাজাধিরাজ শ্রীসমাচারদেবে প্রতপত্যোতচ্চরণকমলযুগলারাধনোপাত্ত নব্যাবকাশিকায়াং সুবর্ণবীথ্যাধিকৃতান্তরঙ্গ উপরিকজীবদত্তদনুমোদিতক—বারকমণ্ডলে বিষয়পতি পবিত্রুক" অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ শ্রীসমাচারদেবের রাজ্যে সেই নৃপতির চরণযুগল আরাধনা করিয়া যিনি নব্যাবকাশিকা লাভ করিয়াছেন এবং যিনি সুবর্ণ-বীথির অধিকারে এবং অন্তরঙ্গ উপরিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই জীবদত্তের শাসনকালে তাঁহার অনুমোদনে নিযুক্ত বারকমণ্ডলে বিষয়পতি হইতেছেন পবিত্রুক।

বিষয়পতির পদ আধুনিক Divisional Commissioner অপেক্ষা বড় ছিল, তাহার উপর ছিলেন উপরিক। এই উপরিকের শাসনাধীনে মণ্ডল বা ভুক্তি অর্থাৎ এক একটী প্রদেশ থাকিত, সুতরাং উপরিককে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা (Governor) মণ্ডলের অধিপতি বলিয়া মাণ্ডলিক এবং 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত থাকায় সামন্ত নৃপতি বলিয়া মনে হয়। মহারাজাধিরাজের নাম মাত্র অধীনতা স্বীকার করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা স্বাধীন বা দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। যেমন মুসলমান আমলে দত্তবংশের প্রায় সমগ্র বঙ্গে দত্তবংশের অসাধারণ প্রভাব ছিল, দেড় হাজার বর্ষ পূর্ব্বেও সেইরূপ সমগ্র বঙ্গে দত্তবংশের ওতোধিক প্রভাব ও শান্তির আভাস পাইতেছি।

মেঘদূত

[অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত]

উত্তর মেঘ

(৪০)

তোমার কৃশ তনু, তাহারো দেহ কৃশ, তাপিত তুমি, সেও তাপী সদাই ;
আঁখিতে তব জল, তাহারও অবিরল ঝরিছে আঁখিধার, বিরাম নাই।
তোমারি সম সেও রহে যে উদ্বেগে, আসিতে অক্ষম, বিধি নিঠুর ;
উষ্ণ শ্বাসে সে যে তাপিত তব সাথে মিশিছে মনে মনে রহি' সুদূর।

(৪১)

সখীর সমুখে যা উচ্চে বলা যায়, বদন-পরশের করিয়া লোভ,
কহিত সে-কথা যে তোমার কানে কানে, তোমার প্রিয় সেই পূর্ণ-ক্ষোভ
শ্রবণাতীত এবে, দৃষ্টি হ'তে দূরে, গভীর উদ্বেগে রচিয়া পদ
আমার মুখে কথা তোমারে পাঠায়েছে বিরহব্যথাতুর মত্তবৎ।

(৪২)

"তোমার অঙ্গের হেরিতে লীলাদোল শ্যামলা লতিকার পাশে যে যাই ;
চন্দ্রে হেরি, প্রিয়া, তোমার মুখছবি, হরিণী-চোখে তব নয়ন পাই ;
ময়ুর-পুচ্ছেতে তোমার কেশভার, নদীর ঢেউএ তব ভ্রূর বিলাস ;
তথাপি এক ঠাঁই কভু না হেরি, সখি, তোমার সে মূরতি, যে লীলা, হাস।

(৪৩)

"কুপিতা তুমি যেন রয়েছ মানভরে,—শিলায় ধাতুরাগে আঁকিয়া, সই,
যেমনি আপনারে তোমার পদমূলে আঁকিতে আমি ধীরে নিরত হই,
উছলি' আঁখিধার ঝরয়ে বারবার, দৃষ্টিপথ মোর করয়ে রোধ ;
বিধাতা দোঁহার নিরমম, সমাগম চিত্রে তাও সে যে করে বিরোধ।

(৪৪)

"স্বপনে যদি, প্রিয়া, দরশ লভি তব, আবেগে পেতে তোমা বাহুর পাশ,
বিথারি' বাহুযুগ' শূন্যে পাতি বুক ব্যাকুল উল্লাসে করিয়া আশ ;—
আমার দশা হেরি' বনানী-দেবতার অশ্রু ফোঁটা ফোঁটা মুকুতা প্রায়
কত না ঝরি' যায় তরুর কিশলয়ে আমার প্রতি প্রীতিকৃপায় হায়!

(৪৫)

"টুটিয়া দেবদারু তরুর কিশলয় মাখিয়া নির্য্যাস অঙ্গময়,
সুরভি বায়ু আসে দখিণ-মুখে ছুটে পরশি' হিমাচল তুষারালয় ;
হয়ত তোমারে সে পরশ করি' আসে, হে প্রিয়া, মনে মনে ভাবিয়া তাই
বক্ষে বাঁধিবারে শীতল সে পবন ব্যাকুল চিতে আমি ছুটিয়া যাই।

(৪৬)

"চটুলনয়না গো, মুহূর্ত্তেরি মত কেমনে ছোট করি দীর্ঘ রাত ?
কেমনে দিবসের দহন-সন্তাপ নিবারি' হয় হৃদে শৈত্যপাত ?—
ভাবিয়া নাহি কূল, নিয়ত বেয়াকুল, রহি যে নিরুপায় ঘুচাতে ক্লেশ ;
জগতে দুর্ল্লভ যাহা তা হিয়া চায়, কবে এ বিরহের হবে গো শেষ ?

(৪৭)

"শুন গো কল্যাণী, ভাবনা বহু সহি' হৃদয় অবশেষে করি যে থির ;
নিরাশ হ'য়ো নাকো, দহন ভুলে থাকো, চিত্ত করো তব শান্ত ধীর।
কেহ না এ ধরায় নিয়ত সুখ পায়, কেহ না লভে সদা দুঃখদায় ;
ভাগ্য অবিরত চক্রনেমি মত উপরে উঠে পুনঃ নিম্নে যায়।

(৪৮)

"ভুজগশয্যায় ত্যজিয়া হৃষীকেশ উঠিবে যবে তবে কাটিবে শাপ ;
রহ এ চারি মাস হৃদয়ে বহি' আশ, নয়ন মুদে আর ভুলিয়া তাপ।
বিরহকালে, প্রিয়া, মোদের দুটি হিয়া করেছে অবিরাম যে সুখ-সাধ,
পূর্ণ-শারদীয়-চন্দ্র-রজনীতে পূরাব সব সাধ, কে সাধে বাদ ?"

(৪৯)

"অবলা শুন পুনঃ" বলেছে স্বামী তব—"একদা নিশাকালে পার্শ্বে মোর
বক্ষে ছিলে বাঁধা, সহসা হেনকালে কাঁদিয়া উঠি, 'টুটি' ঘুমের ঘোর
বলিলে কিবা কথা. যখন শুধানু তা, কহিলে মনে মনে হেসে মৃদুল—
'স্বপনে হেরি একি পরের নারী সাথে করিছ কেলি তুমি শঠ চটুল।'

(৫০)

"অভিজ্ঞান এই লভিলে বুঝি' লবে কুশলে আছি, নাহি অমঙ্গল ;
অশুভ নানা কথা ক'রো না প্রত্যয়, রাখিয়ো চিত তব অচঞ্চল।
কে হেন কথা বলে, বিচ্ছেদের কালে প্রণয় পায় হ্রাস, প্রীতির ক্ষয় ?
ভোগের অভাবে যে প্রিয়ের তরে প্রেম বাড়িয়া সদা প্রেমপুঞ্জ হয়।"

(৫১)

তোমার সখী তিনি প্রথম-বিরহিণী তাঁহারে প্রবোধিতে বলি' এ বাক্,
ত্যজিয়া এস গিরি, শিবের বৃষ যেথা শৃঙ্গে খোঁড়ে সদা শিখরভাগ।
অভিজ্ঞান সহ, শুন হে বারিবাহ, কুশল-সমাচার প্রিয়া যা চায়,
বহিয়া এনো তাহা বাঁচাতে এই প্রাণ, শিথিল এ যে প্রাতঃকুন্দ প্রায়।

(৫২)

সৌম্য জলধর, না কর উত্তর, করিবে নাকি এই সখার কাজ ?
মৌন হেরি, তোমা' বুঝেছি আমি, সখা, আছ যে ইচ্ছুক হৃদয়-মাঝ।
কথা না কহ তবু চাতকে বারি দাও যেমনি যাচে তারা 'ফটিক জল' ;
সাধিয়া ঈপ্সিত করম সাধুজন তোষেন উত্তরে যাচকদল।

(৫৩)

আমারে ভালবেসে অথবা মোর ক্লেশে দুখিত প্রাণে হ'য়ে করুণাবান,
তোমারে নাহি সাজে তথাপি মম কাজে সাধিয়া ক'রো প্রাণে তৃপ্তি দান।
বরষা-সমারোহে শোভন রূপ ধরি' ঘুরিও দেশে দেশে যেথায় চাও ;
বিজলী বধূ যেন সতত রহে সাথে, বিরহ মম সম কভু না পাও।

(৫৪)

নীরদ-বাণী শুনি' ধনেশ কুবেরের শীতল হ'ল হিয়া, নিবিল কোপ ;
সদয় অন্তরে ক্ষমিলা যক্ষেরে, করিয়া দিল নিজ শাপের লোপ।
বিরহ-বিমথিত হইল সুমিলিত যক্ষ আর তার প্রিয়া কাতর ;
অশেষ-ভোগ-সুখে ভুলিল ঘোর দুখে, পুলকস্রোতে ভাসি' নিরন্তর।

সমাপ্ত

ভারতীয় সাংবাদিক সভার (Indian Jourualist's Association) ৮ম বার্ষিক অধিবেশন গত ১৮ই শ্রাবণ 'এলবার্ট হলে' অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯২৯-৩০ সালের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইবার পর আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হন :—

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসী)—সভাপতি

মৌলভী মুজিবর রহমান (মুসলমান)

মিঃ জে, সি, গুপ্ত (এডভান্স)

শ্রীযুক্ত মুলচাঁদ আগারওয়ালা (বিশ্বমিত্র)

—সহঃ সভাপতি।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু (অমৃতবাজার পত্রিকা)

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনডষ্ট্রী)

—সহযোগী কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মিত্র (অমৃতবাজার পত্রিকা)

—সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ (ক্যালকাটা রিভিউ)

—হিসাব পরিদর্শক

কাউন্সিলের সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত সরলা দেবী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বসুমতী), শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ, (অমৃতবাজার) শ্রীযুক্ত অমল হোম (কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট), শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু (হিতবাদী), রায় বাহাদুর হরেন্দ্রনাথ দাস (নায়ক), শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন (এডভান্স) ; শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ মজুমদার (অমৃতবাজার) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু (সঙ্গীত-বিজ্ঞান), শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার নন্দী (মাতৃমন্দির)।

* * *

ইঁহাদের অনেকেই বহুদিন ধরিয়া সংবাদপত্রের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। আশা করা যায় ইঁহাদের কার্য্যকুশলতায় সভার দিন দিন উন্নতি হইবে।

* * *

শ্রীমতী মীরাবেন মহাত্মাজীর শিষ্যা। ইনি একজন ইংরেজ মহিলা। তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল কুমারী শ্লেড্। ইনি বিহারের নানাস্থানে খদ্দর-প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার ফলে খাদি-প্রচার যে বহুল পরিমাণে হইয়াছে তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ২৩এ শ্রাবণ আলবার্ট হলে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে এইরূপ বলিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে—'এ দেশবাসীর পাশ্চাত্য ফ্যাশন ও জীবনধারণের রীতিনীতি ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, দেশের সভ্যতার (Culture) পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করা উচিত। ভারতীয় সভ্যতালব্ধ কালচারের দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। এবং এদেশবাসী যে ভাবে তাহাদের জীবন গঠিত করিতেছেন তাহা ঠিক পাশ্চাত্য সভ্যতা বা দেশীয় সভ্যতার অনুযায়ী নয়। ইহা উভয় সভ্যতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে গঠিত এক নূতন জিনিস।

* * *

এ বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণভাবে জানিতে না পারিলে ইহার আলোচনা করা দুরূহ। ভারতের সভ্যতার স্বাধীনতা কতদূর রক্ষা করিয়া চলা উচিত সে সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

* * *

অধ্যক্ষ ডাঃ ডব্লিউ, এস্ আরকুহার্ট সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলারের পদ অলঙ্কৃত করিয়া যে ভাবে কার্য্য চালাইয়াছেন তাহাতে সাধারণে ও তাঁহার সহযোগীরা

যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। তাঁহার কর্ম্মকাল ফুরাইলে সকলেই আশা করিয়াছিলেন আমার চ্যান্সলার বাহাদুর তাঁহাকে ঐ পদে পুনর্নিযুক্ত করিবেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহা করেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে ২০শে শ্রাবণ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কন্‌ভোকেশনে তাঁহাকে এল্‌-এল্‌-ডি' উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরিচয় এদেশবাসী বহুদিন হইতে পাইয়া আসিয়াছেন। নূতন গদী যে যোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পিত হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত তিনি এই দুই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেবা করিয়া আসিলেন যে ভাবে আপনার অমূল্য সময় ও পরামর্শ দান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপন্ন অমুচর সুন্দরভাবে কার্য্য চালাইলেন তাহার যোগ্য পুরস্কার সুধু উপাধিতে পর্য্যবসিত হইতে দেখিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি।

* * *

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাররূপে এইরূপ জ্ঞানী চিন্তাশীলও কর্ম্মঠ লোকই চাই। তাঁহার স্থানে যাঁহাকে পাইয়াছি তিনি আমাদেরই একজন,—লেপ্টন্যাণ্ট কর্ণেল হাসান সারওয়ার্দ্দী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল-এম্‌-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি বিলাতে যান। সেখান হইতে কয়েকটী উপাধি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া সরকারী চাকুরী করিতেছেন। এখানে তিনি ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের প্রধান মেডিকাল অফিসার। এদেশে থাকার সময় বিদ্যা বা বুদ্ধির এমন কোন পরিচয় তিনি দেন নাই, যাহাতে দেশবাসী তাঁহার দিকে আগ্রহের সহিত দেখিবার অবসর পাইয়াছিল। তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত করিবার দেশবাসীর প্রথম ও প্রধান আপত্তি হইতেছে যে তিনি একজন সরকারী চাকুরিজীবী। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে তিনি কি করিবেন বা না করিবেন তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে রহিয়াছে সত্য, কিন্তু এমন প্রশ্নও হইয়াছে যে, যদি এই পদ কোন মুসলমানকেই দিবার ইচ্ছা লাটসাহেবের মনে জাগিয়াছিল তাহা হইলে ডাঃ আবদাল্লা সরওয়ার্দ্দী বা খোদাবক্স কি ঐ পদের অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না? এই দুইজনের পাণ্ডিত্য ভারতবর্ষের চতুঃসীমায় মধ্যে আবদ্ধ নয়। তাঁহাদের জ্ঞান গরিমার পরিচয় পাশ্চাত্য দেশও পাইয়াছে। তাঁহারা সে দেশেও প্রসিদ্ধ 'স্কলার' বলিয়া পরিচিত।

* * *

জ্ঞানের দিক্‌টা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। এড্‌মিনষ্ট্রেশন কার্য্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা নবনিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলারের কতটা আছে বা না আছে তাহার পরিচয়ও তো দেশবাসী কিছুমাত্র পায় নাই। তিনি যেমন কয়েকটী অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত দুইজন মুসলমান পণ্ডিতও কি তেমন ভাবে সংশ্লিষ্ট নন? তবে তাঁহাদের দাবী অগ্রাহ্য হইল কেন? অধিকন্তু তাঁহারা সরকারী চাকুরে নন।

* * *

আর যদি মুসলমানকে এই পদে প্রতিষ্ঠিত করা না হইত তাহা হইলে বে-সরকারী হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ এমন কয়েকজন পণ্ডিত কর্ম্মী আছেন যাঁহাদের জ্ঞানের পরিচয় স্যাড্‌লার কমিশনরের সদস্যেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই বয়ঃক্রম ষাট বা ততোধিক। তাঁহাদের অভিজ্ঞতারও একটা মূল্য নাই কি?

* * *

গত ৭ই শ্রাবণ তারিখে রায় বাহাদুর ডাক্তার চুনীলাল বসু মহাশয় পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে তাঁহার রাঁচির প্রাসাদে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দেশের সকল প্রকার সদনুষ্ঠানেই তিনি যোগদান করিতেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় একজন প্রকৃত সেবক ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অক্লান্তকর্ম্মী সভ্য ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সহকারী সভাপতির পদ ও তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি-পদেও তিনি একবার বৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িকতায় তিনি সকলকেই মুগ্ধ করিতেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ অনুরাগ ছিল। দেশবাসীকে বিজ্ঞান, রসায়ন ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে তিনি খাদ্য সম্বন্ধে যে সকল সুচিন্তিত পুস্তক-পুস্তিকা রচনাদি করিয়া গিয়াছেন তাহা অমূল্য। আগামী সংখ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা পঞ্চপুষ্পে প্রকাশিত হইবে।

গত ২৬এ শ্রাবণ আমরা আর একজন জ্ঞানগরিষ্ঠ, বয়োজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিক পণ্ডিতকে হারাইয়াছি—তাঁহার

নাম শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন। তিনি ৭৫ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বাল্যকালে তাঁহার গবেষণা-মূলক ভাষাতত্ত্বের প্রবন্ধাদি যখন ভারতী, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় পাঠ করিতাম, তখন হইতেই তাঁহার প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। ভারতের নানান ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালা ও ইংরেজী পুস্তক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার নাম ও যশ পাশ্চাত্য দেশেও বিস্তৃতিলাভ করে। তাঁহার সরল, অমায়িক ব্যবহারে তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

*　　*　　*

ত্রিবাঙ্কুরের রাজ-অভিভাবিকা মহারাণীসাহেবা দেশ হইতে সেবা-দাসী প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। মন্দিরের ভিতর সেবাদাসীরা যে অনাচারের সৃষ্টি করিত তাহাতে মন্দিরের পবিত্রতা কোনরূপেই রক্ষা হইত না। এই কুপ্রথা উঠাইয়া দিয়া তিনি দেবতার নিকট যেমন আশীর্ব্বাদ পাইয়াছেন, তেমনই আবার কাম-লোলুপ পূজারীদের রোষানলে পড়িয়াছেন। যাহা হউক মহারাণীর এই সৎসাহসের দৃষ্টান্ত অন্যান্য দেশেও অনুসৃত হইলে ভারতের দেবস্থানগুলি আবার পূর্ব্বের মত শুচিতায় ভরিয়া উঠিবে।

*　　*　　*

বাঙ্গালার যে কোন সন্তান যে কোন রকমেই বিশ্বের কাছে তাঁর মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিত করেন, তিনিই আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র। কলিকাতার নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে সম্প্রতি দুই রাত্রি শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর ভারতীয় নৃত্যকলার কমনীয় প্রকাশে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্করের যশোহরে বাড়ী। তিনি কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন মেবারের উদয়পুরে। তাঁর পিতা ঝালোয়ারের মহারাণার পররাষ্ট্র-সচিব ছিলেন, তাঁর নাম পণ্ডিত শ্যামশঙ্কর। তিনি আইন, নাট্যকলা, বাগ্মিতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই গুণী ছিলেন। তাঁরই অভিভাবকতায় উদয়শঙ্করের কৈশোর-শিক্ষা পরিচালিত হইয়াছিল।

*　　*　　*

পণ্ডিত শ্যামশঙ্করই ভারতবর্ষের নৃত্যকে সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে প্রদর্শিত হইবার পক্ষে সহায়তা করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সেখানকার 'প্লে হাউসে' তাঁর চেষ্টায় সে নৃত্য দেখান হয়। কনভেন্ট গার্ডেনের 'রয়েল অপেরায়' ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তাঁহার চেষ্টায় এই রকম নৃত্যপ্রদর্শনের শেষ অনুষ্ঠান হয়।

*　　*　　*

১৯২৪ সালের আগষ্টমাসে ওয়েম্বলি ষ্টেডিয়ামে যে 'গ্র্যাণ্ড ইন্‌ডিয়ান পেজাণ্ট' দেখান হয়, সেই উপলক্ষ্যে সেখানকার সম্মিলিত ব্যাণ্ড-বাদ্যে তাঁর স্বরচিত গৎ বাজান হইয়াছিল। আর কোন অ-বিলাতী সঙ্গীতকারের এ সৌভাগ্য হয় নাই। সেই বৎসরই ভারতীয় বাদক-দলের ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীত সর্ব্বপ্রথম তিনি 'ব্রডকাষ্ট' করেন।

*

ঝালোয়ারের মহারাণা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে উদয়শঙ্করকে বিলাতের 'রয়েল কলেজ অফ্ আর্টসে' ভর্ত্তি করিয়া দেন। সেখানে পাঠকালে তিনি তাঁর পিতার নৃত্যপ্রদর্শন প্রচেষ্টায় বহুবিধ ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া দর্শক ও শ্রোতাদের বিস্মিত করেন। পণ্ডিত শ্যামশঙ্কর কর্ত্তৃক ভাড়া করা নানা রঙ্গমঞ্চ ও 'কনসার্ট-হলে' এই সব বাদ্যযন্ত্র তিনি বাজান।

*

এ বিষয়ে পোরবন্দরের মহারাজা, শেঠ মুকৎলাল গগলভাই, ঝালোয়ারের মহারাণা, জামনগর ও বিকানীরের মহারাজা এবং লিম্বদির যুদ্ধরাজপণ্ডিত শ্যামশঙ্করকে অনেক প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। ভারতের কলা-শাস্ত্রের প্রতি ইঁহাদের অনুরাগ উল্লেখযোগ্য।

*　　*　　*

কিন্তু উদয়শঙ্করের কৃতিত্ব বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজানাতেই শেষ হয় নাই। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বিলাতের 'রয়েল কোর্ট থিয়েটারে' তিনি এমন একটী রহস্যময় ব্যাপার (illusion) দেখাইয়াছিলেন যে সমস্ত দর্শকরাই তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আর্টস্ গ্যালারির কোন চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁর নিজের অঙ্কিত স্বীয় প্রতিকৃতি ও 'নক্‌টার্ণ' নামক অন্য একখানি চিত্রের জন্য তিনি দুইটী প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন। শেষোক্ত ছবিটি জামনগরের মহারাজ ক্রয় করেন।

*　　*　　*

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে 'রয়েল কলেজ অফ আর্টসের' ডিপ্লোমাও লাভ করেন। ১৯২৩ সালের গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত তরুণ শিল্পী বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই কলা-লক্ষ্মীর কোন্ গৃহে;

তিনি প্রবেশ করিবেন। এমন সময় মিসেস এন্, সি, সেনের উদ্যমে পৃথিবীখ্যাতা নর্ত্তকী শ্রীমতী অ্যানা প্যাভ্‌লোভার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কভেণ্ট গার্ডেনের রয়েল অপেরায় তাঁকে নৃত্য-প্রদর্শনে সাহায্য করিবার জন্য ও তাঁর আমেরিকা-যাত্রায় সঙ্গী হইবার জন্য প্যাভ্‌লোভা উদয়শঙ্করকে আহ্বান করেন।

* * *

উদয়শঙ্কর প্যাভ্‌লোভার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ঐ নর্ত্তকীর 'রাধা-কৃষ্ণ-নৃত্য-লীলা'-নামক জগদ্বিখ্যাত নৃত্যের সমাবেশ ও পরিকল্পনা উদয়শঙ্করের দ্বারাই হইয়াছিল। তা ছাড়া তিনি অন্যান্য নর্ত্তকীদের শিক্ষাও দিয়াছিলেন এবং শ্রীমতী প্যাভ্‌লোভার সহযোগী হইয়াছিলেন 'কৃষ্ণ'-রূপে। বিলাতে এবং সমগ্র আমেরিকায় এই নৃত্যলীলার জন্যই শ্রীমতী প্যাভ্‌লোভা সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা পাইয়াছিলেন।

* * *

উদয়শঙ্করও পরম গুণী শিল্পীর জয়মাল্য লাভ করিলেন. কিন্তু রয়েল কলেজ অফ্ আর্টসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রটেন্‌ষ্টাইন দুঃখিত হইলেন। তিনি পণ্ডিত শ্যামশঙ্করকে বলিয়াছিলেন 'ভারতীয় চিত্রকলার একজন প্রধান ও কৃতী ছাত্রকে প্যাভ্‌লোভা হরণ করিলেন। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া উদয়শঙ্কর দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

* * *

ওয়েম্‌ব্লিতে ভারতীয় স্ত্রী-দিবসে নৃত্য করিয়া উদয়শঙ্কর লেডি ডোরাবজি টাটা ও মিসেস্ এস, আর, দাস প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় ভারতীয় মহিলাদের প্রশংসা অর্জ্জন করিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে, আর একবার অ্যানা প্যাভ্‌লোভার সহিত কভেণ্ট গার্ডেনে নৃত্য করিবার পর, স্বাধীনভাবে নিজের দল গঠন করিবার জন্য তিনি প্যাভ্‌লোভার দল পরিত্যাগ করিলেন।

কিন্তু পাশ্চাত্যে একজন তরুণ ভারতীয় ছাত্রের এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়ার বহু বাধা। অর্থ, আনুকূল্য, সহানুভূতি, সকলই প্রয়োজন। যাহাই হউক, অসাধারণ কলানুরাগের ফলে উদয়শঙ্কর অবশেষে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সিমকি নাম্নী একজন ফরাসী কন্যাকে সহযোগিনী করিয়া তিনি সমস্ত ইউরোপের বিখ্যাত শহরগুলিতে প্রচুর যশ পাইয়াছেন। প্যারিস, কেমেডো, বার্লিন, বুডাপেষ্ট, ভিয়েনা, টিউরিন্ তিনি তাঁর প্রশংসায় মুখরিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

* * *

চমৎকার মানুষ এই উদয়শঙ্কর, অতি শিষ্ট, অতি ভদ্র ও অতি মৃদু। তাঁর নমনীয় ও কমনীয় দেহ লীলায়িত অঙ্গহারে অপূর্ব্ব নৃত্য-কলার বিকাশ করিয়া জগৎকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে। বাঙ্গালীর সন্তান ভারতের প্রাচীন নৃত্য-কলা ও মূর্ত্তিকে রূপে ভঙ্গীতে নিরুপম করিয়াছে। আমরাও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

* * *

ভ্রম-সংশোধন

গত মাসের পঞ্চপুষ্পে "বাদল-বিরহী" কবিতার ৩৩৩ পৃষ্ঠার

'মেঘের পানে চেয়ে সেজেছে বিরহিণী,
সকল কাজে বুঝি হ'তেছে ভুল ?"

এই অংশের পর ভ্রমক্রমে চারিটী ছত্র ছাড় পড়িয়াছে। সে কয়ছত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মেঘের ধারা সনে
কি ব্যথা বাজে মনে
জানোতো প্রিয়তমা
জানোতো তায় ;

Printed by Sarat Chandra Bhar at the Manasi Press, 71, Hari Ghosh Street and
Published by the same from the Panchapushpa Office, 28B, Telipara Lane, Calcutta.
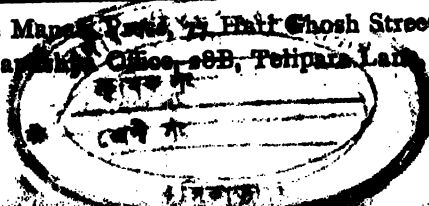
"অভিসারে"

দর্শন করিয়া সেই 'অত্যাশ্রমী' স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার যোগ্য হইবেন। প্রাচীন কালে এই স্বধামকে "অস্ত" বলা হইত।

হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি—ঋগ্‌বেদ ১০।১৪।৮

বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন :—

অত্থং গতস্‌স ন পমাণম্‌ অত্থি। এই স্বধাম কি? ব্রহ্ম—যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। তিনিই জীবের 'প্রভব, প্রলয়, স্থান'। কারণ,—ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্‌ এতি (ছা ২।২৩)।

যে জাতি মানবের জীবন-যাত্রাকে 'আশ্রম' বলিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক ধারণা কত উচ্চ ও উদার ছিল!*

মৈত্রী উপনিষদে 'আশ্রম' শব্দের উল্লেখ আছে—এবং নিয়ম নিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, স্ব স্ব আশ্রম-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, গার্হস্থ্য, তপস্যা ইত্যাদির অনুষ্ঠান ভিন্ন আত্মজ্ঞান-প্রাপ্তি বা কর্ম্মসিদ্ধি হয় না।

আশ্রমেষু এবানুক্রমণং স্বধর্ম্মস্য বা এতদ্‌ ব্রতং। × × এষ স্বধর্ম্মোঽভিহিতো যো বেদেষু ন স্বধর্ম্মাতিক্রমেণ আশ্রমী ভবতি। আশ্রমেষেব অনবস্থস্তপস্বী বা ইত্যুচ্যতে ইত্যেতদ্‌ অযুক্তং। নাতপস্কস্যাত্মজ্ঞানে অধিগমঃ কর্ম্মসিদ্ধি র্বা ইতি—চতুর্থ প্রপাঠক

আবার "আশ্রম"-উপনিষদের নামকরণই হইয়াছে 'আশ্রম' শব্দ লইয়া। কিন্তু এই দুইখানি উপনিষদ্‌ই অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন। প্রাচীনতর উপনিষদে আশ্রমের উল্লেখ আছে কি না? শ্বেতাশ্বতর অত্যাশ্রমীর উল্লেখ করিয়াছেন—

অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যক্‌ ঋষি সংঘজুষ্টম্‌—৬।২১

'অত্যাশ্রমী' বলিলে কি বুঝিব নারায়ণ কৈবল্য-উপনিষদের দীপিকায় বলিয়াছেন অত্যাশ্রমীর অর্থ পরম-হংস অর্থাৎ সংন্যাসের চরম পন্থী।

ব্রহ্মচারি-গৃহি-বানপ্রস্থ-কুটীচকবহূদক-হংসেভ্যঃ আশ্রমঃ পারমহংস্যলক্ষণঃ।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য ও সন্ন্যাস—যিনি এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের পরপারে গমন করিয়া মোক্ষের সমীপস্থ হইয়াছেন, 'অত্যাশ্রমী' শব্দ দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিলে কেমন হয়?

সে যাহা হউক, জাবাল-উপনিষদ্‌ হইতে উদ্ধৃত বচন দ্বারা আমরা জানিয়াছি যে, সে স্থলে 'আশ্রম' শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও ব্রহ্মচারী, গৃহী, বনী ও সন্ন্যাসীর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। মুণ্ডকের নিম্নোদ্ধৃত বচনেও সম্ভবতঃ চতুরাশ্রমের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ—২।১।৭

'ব্রহ্মচর্য্য, বিধি (গৃহস্থের নিয়মসংযম) তপঃ ও শ্রদ্ধা (বানপ্রস্থ) এবং সত্য (সর্ব্বসন্ন্যাস করিয়া সেই সত্যস্য সত্যে প্রতিষ্ঠা)।'

প্রাচীনতর উপনিষদে ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রম-চতুষ্টয়ের কিরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়? অতঃপর সংক্ষেপে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে চাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাদিগকে মুখ্য বা Major উপ-নিষদ্‌ বলেন, তন্মধ্যে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক প্রাচীনতম। ঐ ছান্দোগ্যে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্যের বহুবার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, পিতা পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন :—

পিতোবাচ শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্য্যং। ন বৈ সোম্য অস্মৎকুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতি।

"শ্বেতকেতু! 'ব্রহ্মচর্য্য' আচরণ কর। দেখ বৎস! আমাদের বংশে কেহ অবেদজ্ঞ রহিয়া ব্রহ্মবন্ধুর মত থাকে না।"

শ্বেতকেতুর তখন বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর। বালক পিতার অনুমতিক্রমে গুরু-গৃহে গিয়া ১২ বৎসর ধরিয়া সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করতঃ মহাগর্ব্বিত ও পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্ব্বিংশতিবর্ষঃ সর্ব্বান্‌ বেদান্‌ অধীত্য মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায়—৬।১।২

---

* The whole life should be passed in a series of gradually intensifying ascetic stages, through which a man, more and more purified from all earthly attachment, should become fitted for his home'astam'as the other world is disignated as early as Rig. V. X. 14. 8. The entire history of mankind does not produce much that approaches in grandeur to this thought—Deussen's Philosophy of the Upanisads. p. 367.

ইহা হইতে মনে হয়, সাধারণতঃ ১২ বৎসরই ব্রহ্মচর্য্যের নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল। ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায়ে ইন্দ্র-বিরোচনের যে আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে দেখা যায়, ইন্দ্র ১০১ বৎসর প্রজাপতির সকাশে 'ব্রহ্মচর্য্য' বাস করিয়াছিলেন।

একশতং হবৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যম্ উবাস—ছা, ৮।৭।১১

কিন্তু ইহা আখ্যায়িকা মাত্র। ছান্দোগ্যের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা যায় বটে যে, সত্যকাম জাবালকে বহু বর্ষ গুরুকুলে বাস করিতে হইয়াছিল (স হ বর্ষগণং উবাস); —কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম; কারণ, জাবালের গুরু গৌতম তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবার পর তাঁহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা পরীক্ষার জন্য এইরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন যে, এই যে চারিশত কৃশ গাভীর সেবার ভার তোমার উপর অর্পণ করা গেল ইহাদের সংখ্যা ১০০০ পূর্ণ না হইলে আবর্ত্তন করিবে না—নাসহস্রেণ আবর্ত্তয় ইতি। ছান্দোগ্যে অন্যত্র দেখিতে পাই,—সত্যকামের শিষ্য উপকোসল দ্বাদশবর্ষ গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য-বাসের পর যখন তাহার সমাবর্ত্তনের কাল উপস্থিত হইল তখন গুরু তাহাকে সমাবর্ত্তনে অনুমতি না দেওয়াতে গুরুপত্নী স্বামীর উক্ত ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং শিষ্যও দুঃখিত হইয়া অনশন করিয়াছিলেন। (আশা করি এই অনশন বর্ত্তমান যুগের Hunger strike (প্রায়োপবেশন) নহে।

তং জায়া উবাচ তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলম্ অগ্নীন্ পরিচচারীৎ, মা ত্বা অগ্নয়ঃ পরিপ্রব্রোচন্ প্রব্রূহি অস্মৈ ইতি। × × স হ ব্যাধিনা অনশিতুং দধ্রে। তম্ আচার্য্যজায়া উবাচ ব্রহ্মচারিন্ অশান কিন্নু অগ্নাসি + + ব্যাধিভিঃ পরিপূর্ণোস্মি নাশিষ্যামি ইতি—ছান্দোগ্য ৪।১০।৩

ইহা হইতে মনে করা অসঙ্গত নহে যে, দ্বাদশ বর্ষই গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য-বাসের নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল।

ব্রহ্মচারী সাধারণতঃ গুরু-কুলে বাস করিতেন। সেই জন্য তাঁহার নাম ছিল 'অন্তেবাসী'।

বেদমনূচ্য আচার্য্যঃ অন্তেবাসিনম্ অনুশাস্তি—তৈত্তি, ১।৩।২

আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানম্—ছা, ৮।১৫

শিষ্য অন্তেবাসী আর গুরু আচার্য্য—আচার্য্যাৎ হৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপতি—ছা, ৪।৯।৩। বিদ্যাকা মব্রহ্মচারী সমিৎপাণি হইয়া গুরুর সমীপস্থ হইতেন এবং বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেন—

ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি বৎস্যামি উপেয়াং ভগবন্তম্ ইতি—
ছা, ৪।৪।৩

গুরু বলিতেন,—সমিধং সোম্য আহর উপ ত্বা নেষ্যে—ছা,৪।৫

ইহাই প্রকৃত 'উপনয়ন' ছিল—গুরু কর্ত্তৃক শিষ্যের বেদদীক্ষা।

বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'অনূচানমানী,' দৃপ্ত বালাকির যে আখ্যান আছে, তাহাতে দেখা যায় ক্ষত্রিয় রাজর্ষি অজাতশত্রু তাহার পল্লবগ্রাহিতা প্রতিপন্ন করিলে বালাকি তাঁহাকে বলিলেন—'উপ ত্বা যানি'।

স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং বৈ তদ্ যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্ ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি। ব্যেব ত্বা-জ্ঞাপয়িষ্যামি।
—বৃহ ২।১।১৫

'অজাতশত্রু বলিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকট 'উপনয়ন' গ্রহণ করিবে ইহা প্রতিলোম ব্যাপার'। কৌষীতকী উপনিষদেও ঐ আখ্যান রক্ষিত হইয়াছে।

তত উহ বালাকিঃ সমিৎপাণিঃ প্রতি চক্রমে উপায়ানি ইতি তং হোবাচ অজাতশত্রুঃ প্রতিলোম রূপমেব তৎ স্যাৎ যৎ ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণম্ উপনয়েৎ—২।১৮

ঐ যুগে নিয়ম ছিল, শিষ্য বিদ্যালাভের জন্য যথা বিধি গুরুকে উপসন্ন হইতেন—

শৌনকো হবৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।
—মুণ্ডক ১।১।৩

বিধিবৎ কি? সমিৎপাণিত্বাদি শাস্ত্রীয় নিয়ম-অনতিক্রমেণ।

শ্বেতকেতুর পিতা গৌতম, জৈবলি প্রবাহনের নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যা প্রার্থনা করিলে রাজর্ষি প্রবাহন বলিলেন, 'স বৈ গৌতম তীর্থেন ইচ্ছাসৈ ইতি (তীর্থেন=উপসদন শাস্ত্রবিহিতেন মার্গেন) 'হে গৌতম! তীর্থ অর্থাৎ শিষ্যত্বের নিয়ম-অনুসারে বিদ্যা প্রার্থনা কর'। উত্তরে গৌতম বলিলেন,—উপৈমি অহং ভবন্তম্ ইতি (বৃহ, ৬।২।৭)। তখন প্রবাহন তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। (সহাধ্যায়ীকে যে 'সতীর্থ' বলা হইত, উহা কি ঐরূপ 'তীর্থ'কে লক্ষ্য করিয়া?)

শিষ্য 'উপৈমি অহং ভবন্তম্' ইতি বিধিবাক্য (Formula) উচ্চারণ করিয়া গুরুর চরণ বন্দন করিতেন।

ইহার নাম ছিল 'উপায়ন' (উপায়নম্ = পাদোপসর্পণম্)। এস্থলে শিষ্য গৌতম ব্রাহ্মণ, গুরু প্রবাহন ক্ষত্রিয়—সেই জন্য গৌতম উপায়নের কীর্ত্তন মাত্র করিলেন, পাদ-গ্রহণ করিলেন না।

স হ উপায়ন কীর্ত্ত্যা উবাস—বৃহ, ৬।২।৭

গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম উপনিষদ্ এই ভাবে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন :—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

—মুণ্ডক ১।২।১২

শিষ্য যে সমিৎ হস্তে গুরুর দ্বারস্থ হইতেন, ইহার মধ্যে সেবার ভাব উজ্জ্বল ছিল। সমিৎ এ স্থলে সেবার প্রতীক।

স হ সমিৎপাণিশ্চিত্রং প্রতিচক্রমে

—কৌষী, ১।২

সমিৎপাণী প্রজাপতি সকাশং দ্বাত্রিংশদ্ বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যম্ উষতুঃ—ছা, ৮।৭।৩

শিষ্য নানাভাবে গুরুর সেবা করিতেন—তাঁহার গোপালন করিতেন (সত্যকাম জাবালের আখ্যান স্মরণ করুন), তাঁহার অগ্নি-রক্ষা করিতেন (উপকোশলের সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে—দ্বাদশ বর্ষাণি অগ্নীন্ পরিচচার), তাঁহার জন্য ভিক্ষা করিতেন (শৌনকংচ অভিপ্রতারিণংচ পরিবিশ্যমানৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে—ছা ৪।৩।৫)।

কখন কখন বা সভা সমিতিতে গুরুর অনুগমন করিতেন। বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাই, যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য সামশ্রবাঃ জনকের অনুষ্ঠিত তর্ক-সভায় গুরুর অনুচর রহিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বমেব ব্রহ্মচারিণমুবাচ—
'এতাঃ (গাঃ) সোম্য উদজ সামশ্রবা' ইতি

—বৃহ, ৩।১।২

এমন কি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন ('স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ') —যাহা ব্রহ্মচারীর ব্রতস্বরূপ ছিল, তাহাও 'গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণ' গুরু-সেবার অবশিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠেয় ছিল।

আচার্য্যকুলাৎ বেদমধাত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশয়েন—ছা, ৮। ১৫

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিতেছেন—গুরুশুশ্রূষায়াঃ প্রাধান্যপ্রদর্শনার্থমাহ। গুরোঃ কর্ম্ম যৎ কর্ত্তব্যং তৎ কৃত্বা কর্ম্মশূন্যো যঃ অবশিষ্টঃ কালঃ তেন কালেন বেদমধীত্য ইত্যর্থঃ।

উপনিষদের যুগে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ বেশ মধুর সম্বন্ধ ছিল। আচার্য্য অন্তেবাসীকে বিদ্যা দান করিতেন—বিক্রয় করিতেন না। গুরুকুল বিদ্যার বিপণি ছিল না—বিদ্যার মন্দির, বাগ্‌দেবীর লীলাসদন ছিল।

গুরু কি ভাবে শিষ্যকে বিদ্যা বিতরণ করিতেন, তাহার ইঙ্গিত আমরা তৈত্তিরীয়-উপনিষদের দান-বিষয়ক নিম্নোক্ত আদেশ হইতে প্রাপ্ত হই।

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।—১।১।৩

অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত. শ্রীর সহিত, হ্রীর সহিত, ভীর সহিত, মৈত্রীর সহিত দান করিতে হয়। অশ্রদ্ধায়, অবজ্ঞায়, অনাদরে দান করিলে সে দান ব্যর্থ হয়। এখন যেমন বিদ্যার্থীর প্রবেশ-পথ অবরোধ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার সুকঠিন অর্গলে আবদ্ধ থাকে এবং সুবর্ণ কুঞ্চিকার ঝঙ্কার ভিন্ন অপাবৃত হয় না (opens but to golden key),—প্রাচীন যুগে সেরূপ নিয়ম ছিল না। আচার্য্য প্রার্থনা করিতেন,—

যথাপঃ প্রবতা যান্তি যথা মাসা অহর্জরম্
এবং মা ব্রহ্মচারিণঃ ধাতর্‌ আয়ান্ত সর্ব্বতঃ ॥

—তৈত্তি, ১।৪।৩

'যেমন জল নিম্ন ভূমিতে প্রবাহিত হয়, যেমন মাস বৎসরে সম্মিলিত হয়, হে বিধাতঃ! সর্ব্বদিক্ হইতে ব্রহ্মচারী সেইরূপ আমাতে সংগত হউক।' এমন কি গুরু অগ্নিতে আহুতি দানের সময়ে প্রার্থনা করিতেন,—

আমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বিমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্রমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দামায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।—তৈত্তি, ৪।২

এইরূপ গুরু পুত্রে ও শিষ্যে যে প্রভেদ করিতেন না, ইহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য।

ইদং বাব তৎ জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রব্রূয়াৎ প্রণয্যায় বাঽন্তেবাসিনে। নান্যস্মৈ কস্মৈচন যদ্যপি অস্মা ইমাং অদ্ভিঃ পরিগৃহীতাং ধনস্য পূর্ণাং দদ্যাৎ। এতদেব ততো ভূয় ইতি।—ছান্দোগ্য, ৩।১১।৫-৬

'এই ব্রহ্ম (বিদ্যা), পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কিংবা উপযুক্ত

শিষ্যকে বলিবেন—অন্য কাহাকেও নহে। যদি সে এই সসাগরা বিত্তপূর্ণা বসুন্ধরা দান করে, তথাপি নহে। কারণ ইহা তদপেক্ষাও মহৎ'।

এতদ্ধৈব সত্যকামো জাবালঃ অন্তেবাসিভ্য উক্ত্বা বাচ * * তমেতং নাপুত্রায় বাঽন্তেবাসিনে বা ব্রূয়াৎ।

—বৃহ, ৬।৩।১২

'সত্যকাম জাবাল শিষ্যদিগকে ইহা উপদেশ দিয়া বলিলেন—পুত্র বা শিষ্য ভিন্ন অপরকে ইহা বলিবে না।'

এমন অবস্থায় যাহা হওয়া স্বাভাবিক তাহাই হইত—শিষ্যও গুরুর ভাবের প্রতিধ্বনি করিতেন। শিষ্য গুরুকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিতেন—তিনি 'আচার্য্য-দেব' হইতেন।

তে তম্ অর্চ্চয়ন্তঃ ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকম্ অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়তি—প্রশ্ন ৬।৮

'সেই শিষ্যগণ তাঁহাকে (গুরুকে) অর্চ্চনা করিয়া বলিতে লাগিল—আপনি আমাদের পিতা, যেহেতু আপনি আমাদিগকে তমসের পরপারে লইয়া গেলেন।

গুরু যখন পিতৃস্থানীয়, তখন গুরুপত্নী মাতৃস্থানীয়া ছিলেন। আচার্য্যাণী শিষ্যকে পুত্রবৎ লালন পালন করিতেন—শিষ্যও তাঁহাকে জননীর প্রাপ্য ভক্তি-শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিত। কদাচিৎ যদি কখন কোন পামর শিষ্যে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইত, যদি সে পশুপ্রকৃতির তাড়নায় গুরুর শয্যা কলুষিত করিত, তবে সেই 'গুরুতল্পগ' মহাপাতকী বলিয়া সমাজের বহিষ্কৃত হইত। ছান্দোগ্য উপনিষদে এ সম্বন্ধে এই প্রাচীন শ্লোকটি উদ্ধৃত দেখা যায়

তদেষ শ্লোকঃ—

স্তেনো হিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ
গুরোস্তল্পমাবসন্ ব্রহ্মহা চ।
এতে পতন্তি চত্বারঃ
পঞ্চমশ্চাচরন্ তৈশ্চ॥—ছা, ৫।১০।৯

'সুবর্ণ-চোর, সুরাপায়ী, গুরুতল্পগ, ও ব্রহ্মঘাতী—এই চারিজন পতিত হয় এবং পঞ্চম, যে ইহাদের সহিত আচরণ করে।'

কোন কোন ব্রহ্মচারী যাবজ্জীবন গুরুকুলে বাস করিতেন। পরবর্ত্তীকালে এইরূপ ব্রহ্মচারীকে 'নৈষ্ঠিক' বলা হইত। ছান্দোগ্য উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এইরূপ ব্রহ্মচারীর উল্লেখ আছে।

ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নংদানমিতি প্রথমঃ। তপ এব দ্বিতীয়ো। ব্রহ্মচারী আচার্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্যকুলেঽবসাদয়ন্—২।২৩।১

'ধর্ম্মের তিনটি স্কন্ধ—প্রথম স্কন্ধ যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান, দ্বিতীয় স্কন্ধ তপঃ এবং তৃতীয় স্কন্ধ—আচার্য্যকুলবাসী ব্রহ্মচারী, যিনি যাবজ্জীবন গুরুগৃহে সংযম পালন করিয়া আপনার শরীর ক্ষয় করেন।

অত্যন্তং যাবজ্জীবম্ আত্মানং নিয়মৈরাচার্য্যকুলে অবসাদয়ন্ ক্ষপয়ন্ দেহম্—শঙ্কর।

কিন্তু এইরূপ যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল। সাধারণতঃ ব্রহ্মচারী দ্বাদশ বর্ষ গুরুকুলে বাস করিয়া বিদ্যাধ্যয়নের পর গুরুর অনুমতি লইয়া 'সমাবর্ত্তন' করিতেন এবং দার-প্রতিগ্রহ করিয়া গৃহী হইতেন।

আচার্য্যকুলাদ্ বেদমধীত্য যথাবিধানম্
* * অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে। —ছা, ৮।১৫

অভিসমাবৃত্য গুরুকুলাৎ নিবৃত্য ন্যায়তো দারানাহৃত্য কুটুম্বে স্থিত্বা গার্হস্থ্যে বিহিতে কর্ম্মণি তিষ্ঠন্নিত্যর্থঃ।

—শঙ্করভাষ্য

সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে গুরু শিষ্যকে কয়েকটি অমূল্য উপদেশ দিতেন। নিম্নে আমরা সেই উপদেশগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এ যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা ডিগ্রি-বিতরণের সময় ছাত্রদিগের কর্ণে যদি এই উপদেশ ধ্বনিত করিতে পারেন, তবে বিদ্যার সহিত বিনয় সংযুক্ত হইয়া সেই প্রাচীন আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ, —ধর্ম্মং চর × × স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ—আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মাব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাম্ ন প্রমদিতব্যম্॥

দেব পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। যান্যস্মাকম্ সুচরাতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।

—তৈত্তি ১।১১।২-৩

'বেদ বিদ্যা সাঙ্গ হইলে আচার্য্য ছাত্রকে এইরূপ উপদেশ করেন—'সত্য বল, ধর্ম্ম চর। স্বাধ্যায় হইতে ভ্রষ্ট

হইও না। আচার্য্যকে (দক্ষিণাস্বরূপ) প্রিয় ধন আহরণান্তে গৃহী হইয়া প্রজাসূত্র অচ্ছিন্ন রাখিও। সত্য হইতে, ধর্ম্ম হইতে, কুশল হইতে, ভূতি হইতে, স্বাধ্যায়প্রবচন হইতে, দেব-পিতৃকার্য্য হইতে প্রমত্ত হইও না। মাতৃদেব হও, পিতৃদেব হও, আচার্য্যদেব হও, অতিথিদেব হও। যাহা নির্ম্মল কর্ম্ম, তাহারই অনুষ্ঠান কর, বিপরীত করিও না; যাহা আমাদিগের সুচরিত, তাহারই অনুসরণ কর, বিপরীত করিও না' ইত্যাদি।

অতঃপর ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহী হইতেন—ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ (জাবাল, ৪); এবং ধর্ম্ম-পালনের সঙ্গিনীরূপে সহধর্ম্মিণী গ্রহণ করিতেন। গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে পুত্রোৎপাদন তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত—প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।

অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে ধার্ম্মিকান্ বিদধৎ—ছা, ৮।১৫। ধার্ম্মিকান্ পুত্রান্ শিষ্যান্ ধর্ম্মযুক্তান্ বিদধৎ ধার্ম্মিকত্বেন তান্ নিয়ময়ৎ—শঙ্কর।

এই যে প্রজনন, ইহা একটা কাম-ক্রিয়ারূপে অনুষ্ঠেয় ছিল না—ইহাও একটা যজ্ঞানুষ্ঠান—যোষারূপ অগ্নিতে বীর্য্যাহুতি।

যোষাবাব গৌতম! অগ্নিঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ গর্ভঃ সম্ভবতি—ছা, ৫।৮।১-২

সেই জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিতেছেন—

প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, প্রজননঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ—১।৯।১

এবং প্রশ্ন-উপনিষৎ এই 'প্রজাপতি'-ব্রতের প্রশংসা করিতেছেন—

তদ্ যেহ বৈ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি তে মিথুনমুৎ-পাদয়ন্তে—১।১৫

সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এই বিধিই প্রবল ছিল বটে। কিন্তু যাঁহারা মহা-গৃহস্থ ছিলেন (উপনিষদ্ যাঁহাদিগকে 'মহাশাল' আখ্যা দিয়াছেন) পুত্রোৎপাদন তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত না।

এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নঃ অয়মাত্মা অয়ংলোক ইতি—বৃহ, ৪।৪।২২

এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষা-চর্য্যং চরন্তি—বৃহ, ৩।৫।১

এইরূপ আত্মজ্ঞ, বিদ্বান্ 'ব্রাহ্মণে'র পক্ষে পিতৃ-ঋণ 'অকূপ' ছিল—কারণ তাঁহারা এষণা-ত্রয় মুক্ত, সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী।

উপনিষদে এইরূপ কয়েকজন মহাশালের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শৌণকো হ বৈ মহাশালঃ অঙ্গিরসং বিধিবদ্ উপসন্নঃ পপ্রচ্ছ—মুণ্ডক ১।১।২

(মহাশালঃ—মহাগৃহস্থঃ—শঙ্কর)

ছান্দোগ্য-উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের একাদশ খণ্ডে এইরূপ পাঁচজন 'মহাশাল মহাশ্রোত্রিয়' ব্রাহ্মণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিরিন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো বুড়িল আশ্বতরাশ্বিস্তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাঞ্চক্রুঃ কো নু আত্মা কিং ব্রহ্মেতি ॥১॥

তে হ সম্পাদয়াঞ্চক্রুরুদ্দালকো বৈ ভগবন্তোঽয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ ॥২॥

স হ সম্পাদয়াঞ্চকার প্রক্ষ্যন্তি মামিমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াস্তেভ্যো ন সর্ব্বমিব প্রতিপৎস্যে হন্তাহমন্যমভ্যনু-শাসানীতি ॥৩॥

"উপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল, পুলুষপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভল্লবীপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, সর্ব্বরাক্ষপুত্র জনক ও অশ্বতরশ্ব-পুত্র বুড়িল, এই পাঁচজন মহাশ্রোত্রিয় মহাগৃহস্থ ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন,—'আমাদের আত্মা কি? ব্রহ্ম কি?' তাঁহারা স্থির করিলেন যে অরুণপুত্র উদ্দালকই বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন। এস, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি। তাঁহারা উদ্দালকের নিকট গমন করিলেন। উদ্দালক ভাবিতে লাগিলেন, এই সকল মহাশ্রোত্রিয় মহাগৃহস্থ আমাকে প্রশ্ন করিবেন—আমি সে প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিব না; অতএব অন্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি।"

উপনিষৎ পাঠে জানা যায়, ঐরূপ মহাশাল মহা-

শ্রোত্রিয়গণের মুকুটমণি ছিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য। বৃহদারণ্যকের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় তাঁহার কাহিনীতে মুখ । তিনিও গৃহস্থ ছিলেন এবং তাঁহার আবার দুই ভার্য্যা ছিল

অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুঃ মৈ চ কাত্যায়নী চ।—বৃহ, ৪।৫।১

তন্মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন এবং কাত্যায়নী সাধারণ রমণীর ন্যায় সংসারসক্তা ছিলেন।

তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব, স্ত্রী-প্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়নী।

গৃহী যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস-গ্রহণের সংকল্প করিয়া মৈত্রেয়ীকে বলিলেন :—

প্রব্রজিষ্যন্ বা অরে অস্মাৎ স্থানাদ্ অস্মি।
হন্ত তে অনয়া কাত্যায়ন্যা অন্তং করবাণি।

'আমি প্রব্রজ্যা করিবার ইচ্ছা করিতেছি—এস তোমার সহিত সপত্নীর বিভাগ-বণ্টন করিয়া দিই।' মৈত্রেয়ী স্বামীকে বলিলেন 'যদি কেহ বিত্তপূর্ণা বসুন্ধরা পায়, তদ্দ্বারা কি অমৃতত্ব লাভ হইতে পারিবে ?'
উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—

অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন।

তখন সেই অমৃতের পুত্রী মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন—

যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্ ? যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহি।

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে যে অমৃতময় বাণী শুনাইয়া ছিলেন, উপনিষদের পাঠকের তাহা অবিদিত নাই।

এই যাজ্ঞবল্ক্যের পার্শ্বে আমরা একজন ক্ষত্রিয় রাজর্ষির সাক্ষাৎ পাই। তিনিও মহাশাল মহাশ্রোত্রিয়। তিনি বিদেহাধিপতি জনক।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির্যস্মৈ ব্রহ্মপারায়ণং জগৌ।

জনকোহ বৈদেহ আসাংচক্রে। অথ চ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ। তং হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য ! কিমর্থং অচারীঃ পশূন্ ইচ্ছন্ অণ্বন্তান্ ইতি উভয়মেব সম্রাট্ ইতি হোবাচ—

বৃহ ৪।১।১

'একদা বিদেহরাজ জনক সভাসীন আছেন, এমন সময় যাজ্ঞবল্ক্য তথায় উপনীত হইলেন। জনক বলিলেন, 'যাজ্ঞবল্ক্য ! কি অভিপ্রায়ে আগমন ? পশু কামনায় অথবা সূক্ষ্ম প্রশ্নের আলোচনায় ?' যাজ্ঞবল্ক্য (তিনি তখনও গৃহাশ্রমী) বলিলেন 'সম্রাট্ ! উভয়ই'। তখন উভয়ের মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম অধ্যাত্মতত্ত্ব আলোচিত হইল, বৃহদারণ্যকে তাহা রক্ষিত হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা এই বৈদেহ জনকের আবার সাক্ষাৎ পাই। সেখানে তিনি উপদেশ আদান করিতেছেন না, প্রদান করিতেছেন। এখানে তিনি শিষ্য নহেন—শিক্ষক। আশ্বতরাশ্বি বুড়িলকে (ইঁহার সহিত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষি অশ্বতরের কোনও সম্বন্ধ আছে না কি ?) গায়ত্রীর 'তুরীয় দর্শত পদ', গূঢ়তম রহস্য উপদেশ করিতেছেন। সে পদের স্তুতি করিয়া ঋষি বলিতেছেন, ইহা "পরোরজঃ"—অজ্ঞানতিমিরের অতীত। ইহা জানিলে সাধক শুদ্ধ, পূত, অজর, অমর হয়

এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজঃ * * এবং যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্ব্বমেব তৎ সংপায় শুদ্ধঃ পূতোঽজরোঽমৃতঃ সম্ভবতি।

- বৃহ, ৫।১৫।৮

এই গায়ত্রীর উচ্চতত্ত্ব বিবৃত করিয়া বৃহদারণ্যকের ঋষি বলিতেছেন -

এতদ্ধবৈ তজ্জনকো বৈদেহো বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিম্ উবাচ যন্নু হো তদ্‌গায়ত্রীবিদ্‌ব্রূথা অথ কথং হস্তীভূতো বহসীতি মুখং হ্যস্যাঃ সম্রাট্ ন বিদাঞ্চকারেতি।—বৃহ,৫।১৪।৮

'বৈদেহ জনক বুড়িল আশ্বতরাশ্বিকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন।'

এই বৈদেহ জনক ব্যতীত, উপনিষদে আরও কয়েকজন রাজর্ষির উল্লেখ দৃষ্ট হয়—প্রবাহন জৈবলি, অশ্বপতি কৈকেয়, গার্গ্যায়ণি চিত্র,কাশীরাজ অজাতশত্রুপ্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই বেদবেত্তা, গরিষ্ঠ, ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন এবং অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকেও নিগূঢ় ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ উপনিষদে এইরূপ ক্ষত্রিয়ের প্রভাব সমধিক অনুভূত হয়। এরূপ রাজর্ষির শাসনাধীনে যে প্রজাপুঞ্জের সুখ সমৃদ্ধি প্রোজ্জ্বল ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ একজন রাজর্ষি নিজ জনপদের পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—

সহ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপো নানাহিতাগ্নি র্নাবিদ্বান্ ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতো।—ছা, ৫।১১৫

'আমার রাজ্যে কোনও চোর নাই, কৃপণ নাই, মদ্যপায়ী নাই, অনগ্নি নাই, অবিদ্বান্ নাই, পরদারী নাই, স্বৈরিণী নাই।'

এইরূপ রাজর্ষিরা রাজর্ষি হইলেও গৃহাশ্রমী কিন্তু 'অকায়মান'—অকামো নিষ্কাম আপ্তকাম (বৃহ ৪।৪।৬) ছিলেন।

অবশ্য সকল রাজাই রাজর্ষি ছিলেন না। উপনিষদের যুগে ভারতবর্ষ কাশী, কোশল, বিদেহ, কেকয়, কুরুপাঞ্চাল প্রভৃতি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ সকল খণ্ড দেশের রাজারা সময় সময় দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সম্রাট্ বা সার্ব্বভৌম হইবার চেষ্টা করিতেন।

রাজা রাজসূয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত।

জনকের তর্কসভায় ভুজ্যু যাজ্ঞবল্ককে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

ক নু অশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তি।

সেইজন্য শ্রৌতসূত্রে বিধি নিবদ্ধ হইয়াছিল—

রাজা সার্ব্বভৌমঃ অশ্বমেধেন যজেত।

এইরূপ রাজার অভিষেক সময়ে পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতেন—রথীনাং ত্বা রথীতরং জেতারম্ অপরাজিতম্। এইরূপ রাজসূয় বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞকারী রাজার দুরাশা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—

অহং সর্ব্বেষাং রাজ্ঞাং শ্রৈষ্ঠ্যমতিষ্ঠাং পরমতাং গচ্ছেয়ং সাম্রাজ্যং ভৌজ্যং স্বারাজ্যং বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং রাজ্যং মাহারাজ্যং অধিপত্যমহং সমন্তপর্য্যায়ী স্যাম্ সার্ব্বভৌমঃ সার্ব্বায়ুষ আন্তাদাপরার্দ্ধাৎ পৃথিব্যৈ সমুদ্র পর্য্যন্তায়া একারাড়িতি।

'সমুদ্রমেখলা সসাগরা পৃথিবীর একরাট্ হইব, সম্রাট্ হইব, মহারাজ হইব, সকল রাজার অধিরাজ হইব, সার্ব্বভৌম হইব, পরমেষ্ঠী হইব, স্বারাজ্য বৈরাজ্য ভৌজ্য সাম্রাজ্য অধিকার করিব।'

বৈদেহ জনকের মত রাজাও যজ্ঞ করিতেন, কারণ গৃহীর কর্ম্ম ছিল—যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানম্—ছা, ২।২৩

কিন্তু সে যজ্ঞ ঐশ্বর্য্য বা প্রভুত্বের বিজৃম্ভণ নহে।

জনকোহ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেন ঈজে—বৃহ,৩।১।১

রাজা মহারাজার কথা স্বতন্ত্র রাখিয়া সাধারণ গৃহস্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তাঁহারাও যাগ যজ্ঞ, 'ইষ্টাপূর্ত্তে'র অনুষ্ঠান করিতেন।

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠম্—মুণ্ডক ১।২।১০

ইষ্টং = যাগাদি শ্রৌতং কর্ম্ম, পূর্ত্তং = বাপী কূপ তড়াগাদি স্মার্ত্তম্—শঙ্কর।

রাজা মহারাজার অশ্বমেধ রাজসূয়, সাধারণ গৃহস্থের সত্র, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি। কদাচ নচিকেতার পিতা রাজশ্রবসের মত কেহ কখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিতেন।

উষন্ হবৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসং দদৌ—কঠ ১।১

কারণ, তাঁহাদের ধারণা ছিল—যজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠন্তং যজমানঃ অনুপ্রতিষ্ঠতি (ছা,৪।১৬।৫)—'যজ্ঞের প্রতিষ্ঠায় যজমান প্রতিষ্ঠিত হন।' তাঁহাদের জন্য এই বিধি বিহিত ছিল—কুর্ব্বন্নেবেহকর্ম্মাণি জীজিবিশেৎ শতং সমাঃ—ঈশ, ২। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদ্ যজমনেকে সতর্ক করিতেন যে, প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ—মুণ্ডক ১।২।৭

'সংসার তরণে যজ্ঞ ভঙ্গুর ভেলা মাত্র'—যাহারা যজ্ঞের উপর নির্ভরঃকরে, তাহারা চরমে বিড়ম্বিত হয়; কারণ, যজ্ঞের ফলে যে লোক লাভ হয়, সেই স্বর্গাদি লোক অক্ষয় নহে, 'ক্ষয্য লোক'।

নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা
ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চবন্তে ॥—মুণ্ডক, ১।২।৯, ১০

যজ্ঞ ছাড়া গৃহীর কর্ত্তব্য ছিল অধ্যয়ন ও দান—যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানম্। সেই জন্য তাঁহার প্রতি ব্যবস্থা - শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ানঃ—ছা, ৮।১৫

শুধু অধ্যয়ন নহে, গৃহীকে অধ্যাপনেরও ভার লইতে হইতে—ইহার নাম ছিল প্রবচন—স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ (তৈত্তি ১।১১।২)। এইরূপে বেদবিদ্যা গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রবাহিত হইয়া অক্ষুণ্ণ থাকিত। গৃহীকে ততদিন গ্রন্থ অভ্যাস করিতে হইত, যতদিন না তিনি জ্ঞানবিজ্ঞান-তৎপর হইয়া তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিতেন।

গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞান-বিজ্ঞান তৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থীত্যজেদ্ গ্রন্থান্ অশেষতঃ ॥
—ব্রহ্মবিন্দু, ১৮।

সে যুগে গৃহস্থের পক্ষে অতিথি-সৎকার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। গৃহাগত অতিথি (অতিথির্দুরোণসৎ)* নমস্ত-জ্ঞানে পূজিত হইতেন। 'অতিথীংশ্চ লভেমহি' ইহা গৃহস্থের নিত্য প্রার্থনা ছিল। এমন কি অগ্নিহোত্রও যদি অতিথিবর্জ্জিত হইত, তবে যজমানের সপ্তম লোক পর্য্যন্ত নষ্ট করিত।

যস্যাগ্নিহোত্রম্ × × অতিথি বর্জ্জিতঞ্চ।
আসপ্তমান্ তস্য লোকান্ হিনস্তি॥—মুণ্ড, ১।২।৩

কঠ-উপনিষদ্ আরও কঠোর ভাষায় বলিয়াছেন:—

আশা প্রতীক্ষে সঙ্গতং সুণৃতাং চেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্। এতদ্ বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসঃ যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে॥—কঠ, ১।১৮

(সঙ্গতং = সৎসংযোজনং ফলং,
সুণৃতা = প্রিয়া বাক্—শঙ্কর)

'যাহার গৃহে ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত থাকে,—সেই নষ্ট-বুদ্ধির আশা-প্রতীক্ষা, সঙ্গতি, প্রিয়বাদ, ইষ্টাপূর্ত্ত, পুত্র পশু—সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।' 'ব্রাহ্মণ' এ স্থলে উপলক্ষণ মাত্র, কারণ—'সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ'। অতএব গৃহস্থের প্রতি উপদেশ ছিল—'অতিথিদেবো ভব'।

এই অতিথি-সেবার সহিত দান ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেই জন্য বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন,—এতৎ ত্রয়ং শিক্ষেৎ দমং দানং দয়াম্—৫।২।৩

ঐ যে আকাশে অশনি-নিনাদে 'দ দ দ' শব্দ শ্রুত হওয়া যায়, ঐ দৈবী বাণী কি বলে? যাহার দিব্যশ্রুতি আছে, সে মুগ্ধ কর্ণে শুনিতে পায়—দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্—'দান্ত হও, দাতা হও, দয়া কর'।

তদেতদ্ এব এষা দৈবী বাগ্ অনুবদতি স্তনয়িত্নুঃ দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি। এতৎ ত্রয়ং শিক্ষেৎ দমং দানং দয়ামিতি—বৃহ, ৫।৩।৩

ছান্দোগ্য উপনিষৎ সেই জন্য প্রথম ধর্ম্মস্কন্ধের নির্দ্দেশ করিতে বলিয়াছেন—

যজ্ঞঃ অধ্যয়নং দানম্ ইতি প্রথমঃ—২।২৩

মহানারায়ণ-উপনিষদ্ এই দানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তারস্বরে ঘোষণা দিয়াছেন—

দানেন অরাতীঃ অপানুদন্ত, দানেন দ্বিষন্তো মিত্রা ভবন্তি, দানে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। তস্মাৎ দানং পরমং বদন্তি—২২।১

'দানের দ্বারা অরাতি শমিত হয়, শত্রু মিত্র হয়। দানই সমস্তের প্রতিষ্ঠা—দানই পরায়ণ।'

'দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম'—দান, দয়া, দম। গৃহস্থ ত্রিবর্গেরই যথাসম্ভব সেবা করিবেন বটে, ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ—কিন্তু দমের সহিত, সংযমের সহিত। ছান্দোগ্য গৃহাশ্রমীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধৎ আত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য অহিংসন্ সর্ব্বভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ। স খলু এবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষম্—ছান্দোগ্য ৮।১৫

তিনিই আদর্শ গৃহী—'যিনি বিবিক্তদেশে বেদাধ্যয়ন করিয়া ধার্ম্মিক পুত্রের জনক হইয়া আত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া, শাস্ত্রবিধির অনুসারে* সর্ব্বভূতের অদ্রোহী হইয়া যাবজ্জীবন যাপন করেন।' বস্তুতঃ উপনিষদের শিক্ষাই এই যে, ভোগকে যোগদ্বারা সংযত, নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্
—ঈশ, ১

গর্দ্ধা, তৃষ্ণা বর্জ্জন করিয়া, ত্যাগযুক্ত হইয়া ভোগ করিতে হইবে, সংসারে 'উদাসীনবৎ আসীন' থাকিতে হইবে—তবেই গার্হস্থ্য সার্থক হইবে।

বলা বাহুল্য, গৃহাশ্রমই জীবনযাত্রার চরম নহে—একটি পর্ব্বমাত্র। Die in harness (বল্‌গা কামড়িয়া মৃত্যু) —আয়ুর শেষ দিন পর্য্যন্ত কর্ম্মব্যাসঙ্গ, উপনিষদের আদর্শ নহে। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ—গৃহীকে জীবনের অপরাহ্ণে সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে 'আরণ্যক' হইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে (বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাম্) অথবা চিত্তে বৈরাগ্য বদ্ধমূল হইলে গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে।

যদ্ অহরেব বিরজ্যেত তদ্ অহরেব প্রব্রজেৎ—
বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদিবা ইতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদ্ এব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা—জাবাল, ৪

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল—আগামী বারে আমরা বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

---

* অতিথির্দুরোণসৎ—কঠ, ৫।২
ব্রাহ্মণঃ অতিথিরূপেণ বা দুরোণেষু গৃহেষু সীদতীতি—শঙ্কর

* অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ—তীর্থংনাম শাস্ত্রানুজ্ঞাবিষয়ঃ ততোঽন্যত্র—শঙ্কর।

ভরত মল্লিক

[মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্-এ, সি-আই-ই]

ভরত মল্লিকের নাম বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে কে কি বৃত্তান্ত তা বোধ হয় সকলে জানেন না। তিনি কত কালের লোক তাহাও লোকের জানা নাই; কিন্তু তিনি একজন প্রকাণ্ড পুরুষ ছিলেন, ব্যবসা ছিল চিকিৎসা। তাঁহার বংশাবলী এখনও চিকিৎসা করিতেছেন।

তাঁহার বাড়ী কোথায়?

তাঁহার টীকায় তাঁহার বাড়ীর নাম দেওয়া আছে মালঞ্চি। তাঁহার বংশধরেরা চুঁচুড়ায় থাকিতেন। দ্বারিক (মল্লিক) কবিরাজ মহাশয় চুঁচুড়ায় চিকিৎসা করিতেন। তিনি বলিতেন, তাঁহাদের বাড়ী জামগাঁর নিকট পাতিলপাড়া। তাঁহার আর এক বংশধর লোকনাথ মল্লিক কবিরাজ মহাশয় শেষ বয়সে কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা করিতেন। তিনিও বলিতেন, তাঁহাদের বাড়ী জামগাঁর নিকট পাতিল-পাড়া। লোকনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতির্ম্ময় মল্লিক মহাশয় কলিকাতায় চিকিৎসা করেন। পাতিল-পাড়ায় এখনও তাঁহার ভিটা আছে।

তাঁহার সময়

লোকনাথ কবিরাজ মহাশয় বলিতেন, 'তিনি আমার বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ছিলেন।' তাহা হইলে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমাংশে ভরত মল্লিক মহাশয়ের প্রাদুর্ভাবের কাল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মুগ্ধবোধের টীকাকার দুর্গাদাস ভরত মল্লিকের অনেক জায়গা তুলিয়া দিয়াছেন। দুর্গা-দাসের মুগ্ধবোধের টীকা ১৬৩৯ সালে লেখা। সুতরাং ভরত মল্লিক তাঁহারও আগেকার লোক। তিনি ইংরেজি সপ্তদশ শতকের প্রথমাংশে জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ভরত মল্লিক আপনার পিতার নাম দিয়াছেন গৌরাঙ্গ মল্লিক এবং বলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা বিনায়ক সেন-সন্তান হরিহর খানের বংশসম্ভূত।

কিন্তু বাংলায় একটা কথা আছে—অনাশ্রয়া ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ। তিনি পণ্ডিত ছিলেন; তিনি কাহা আশ্রয়ে এ সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন? তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, সূর্য্য-বংশীয় একজন ক্ষত্রিয় রাজার অধীনে থাকিয়া তাঁহার একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন। এ সূর্য্যবংশের রাজা কে ঠিক জানা যায় না, বোধ হয় চকদীঘির রায়েরা। তিনি আর এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছেন, ভুরস্থটের একজন রাজার আশ্রয়ে একখানি টীকা লিখিয়াছেন। সুতরাং চকদীঘির রায়েরা এবং ভুরস্থটের রাজারা তাঁহার আশ্রয় ছিলেন। এই ভুরস্থট রাজাদের বংশে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ভরত-চন্দ্রের প্রাদুর্ভাব কাল। তখন কিন্তু ভুরস্থট মুসলমান-দিগের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া করদ-রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

ভরত মল্লিক মহাশয় মুগ্ধবোধ ব্যবসায়ী ছিলেন। মুগ্ধবোধের সেকালের যত টীকা টীপ্পনী ছিল সকলই তাঁহার দুরস্ত ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মুগ্ধবোধ লোকে আর পড়িয়া উঠিতে পারিবে না, তাই তিনি মুগ্ধবোধের দুইখানি সংক্ষিপ্তসার তৈরী করেন। উহাদের মধ্যে যেখানি বই তাহার নাম 'দ্রুতবোধ'। প্রথমে বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইয়াছিল। তিনি ইহার টীকাও করেন। রাজেন্দ্র-লাল মিত্র বলেন, সেই টীকার নাম 'দ্রুত-বোধিনী।' উহাতে তিনি সুপদ্ম, কাতন্ত্র ও সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সাহায্য লইয়াছিলেন। তিনি আর একখানি ছোট ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'প্রসিদ্ধপদবোধ'। এত ছোট ব্যাকরণ আর সংস্কৃতে নাই। এখানি গত শতাব্দীর প্রথমে বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপা হইয়াছিল। তিনি যাঁহার উৎসাহে ব্যাকরণগুলি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কল্যাণমল্ল, তাঁহার পিতার নাম গজমল্ল, পিতামহের নাম ত্রৈলোক্যচন্দ্র। ইনি ভরত মল্লিকের বাড়ীর নিকটে কোথাও জমীদার ছিলেন, বোধ হয় চকদীঘির।

তিনি অমরকোষের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। তিনি মুগ্ধবোধ-ভক্ত; সেইজন্য টীকার নাম দিয়াছিলেন

কোষের টীকা

'মুগ্ধবোধিনী'। Eggeling (Catalogue of Sanskrit Mss.—Part II, p. 276, Column b.) বলেন, তিনি দ্বিরূপকোষ নামে একখানি অভিধান লিখিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে যে সকল সংস্কৃত শব্দের দুরকম বানান আছে, তাহা-দের একটা কোষ আছে। অনেকেই সেই রকম কোষ লিখিয়াছেন, ভরত মল্লিকও একখানি লিখিয়াছেন।

ভরত মল্লিক মুগ্ধবোধের মতে বহুসংখ্যক সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়াছেন। শিশুপাল-বধ, মেঘদূত-টীকা,

কাব্যের টীকা

ভট্টিকাব্যটীকা, নলোদয়, নৈষধ-টীকা, ঘটকর্পরটীকা, কুমারসম্ভব-টীকা, কিরাতার্জ্জুনটীকা, রঘুবংশটীকা, তিনি এই সকল গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। তাঁহার কয়েকখানি টীকার নাম মুগ্ধবোধিনী, অধিকাংশ টীকার নাম সুবোধ।

তিনি উপসর্গের অর্থ এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লেখেন, তাহার নাম উপসর্গবৃত্তি। একখানি একাক্ষর শব্দকোষ লেখেন, তাহার নাম 'একবর্ণার্থসংগ্রহ' এবং আর একখানি গ্রন্থ লেখেন তাহার নাম 'কারকোল্লাস'। কারকোল্লাস গ্রন্থখানি গত দুই শত বৎসর ধরিয়া নৈয়ায়িকেরা বিশেষ শাব্দিকেড়া বড় পছন্দ করিতেন। প্রায় সকল বাড়ীতে কারকোল্লাসের পুঁথি পাওয়া যায়। উহাতে কারকের বাদার্থ (Logical relations) দেওয়া আছে। ব্যাকরণ শেষ হইলে পণ্ডিতেরা বিশেষতঃ শাব্দিকেরা প্রায়ই বাদার্থের বই পড়িতেন বা লিখিতেন। ইহাতে ব্যাকরণ-ঘটিত দর্শন-শাস্ত্রের কথা আছে, যাহাকে এখন Philosophy of Grammar বলা হয়।

ভরত মল্লিক ছিলেন বৈদ্য। তাঁহার বাদার্থের পুঁথি ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আদর করিয়া পড়িতেন ও পড়াইতেন, —এ বড় কম গৌরবের কথা নয়।

ভরত মল্লিক বৈদ্যদিগের মধ্যে মহাকুলীন। তাঁহার বংশের কৌলীন্য-মর্য্যাদা এখনও খুব আছে। ভরত মল্লিক বৈদ্যদিগের একখানি কুলগ্রন্থ লিখিয়া যান; ইহার নাম—বৈদ্যকুলতত্ত্ব।

চাঁদের কলঙ্ক

(গল্প)

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

তটিনীর বিবাহ হ'য়েছিল নিতান্ত বালিকা বয়সে।

সেদিনের কথা তার স্পষ্ট কিছু স্মরণে আসে না বটে, তবে ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনে শুনে একটা বহু দিনের ভুলে-যাওয়া স্বপ্নের মত মনে পড়ে শুধু তার আব-ছায়াটুকু!

যেন একদিন রাত্রে টোপর মাথায় দেওয়া একটী ছেলের হাতের উপর তার হাতখানি রেখে ফুলের মালা দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছিল। সেদিন তার পরণে ছিল লাল রংয়ের চেলি, কপালে ছিল ক'নে-চন্দন!

তটিনী ঠাকুরমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করে—"তাকে তোমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে না বাবু-মা? আচ্ছা, তুমি তোমার নাতজামায়ের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা ক'রতে?"

তটিনীর ঠাকুরমা আঁচলে চোখ মুছে ব'লতেন—"হায় রে অভাগী! তোর নেহাৎই পোড়া কপাল, তাই অমন ইন্দ্র চন্দ্র তুল্য নাতজামাইও আমার—বছর ঘুরল না—চলে গেল! বর্ষার ভরা জোয়ারে গঙ্গার যখন এ-কূল ও-কূল দেখা যেতো না—তখনও সে হাসতে হাসতে দশবার সাঁতরে এ-পার ও-পার হ'ত! ডুব-সাঁতারেও সে ছিল ওস্তাদ! সেই ছেলে কি না একদিন নাইতে গিয়ে আর ফিরলো না! কেমন ক'রে বেটপকায় জেটির নীচে আটকে গিয়েছিল—দস্যি দাদু আমার! আহা!—আর ভেসে উঠ্‌তে পারে নি।"

শুনতে শুনতে তটিনীর দুই চোখও কি যেন এক অজানা বেদনায় জলভরাতুর হ'য়ে উঠতো! সে লজ্জিত হ'য়ে মৃদু হেসে বলতো—"তোমার দাদু বুঝি খুব দস্যি ছেলে ছিল বাবু-মা?"

ঠাকুরমা ব'লতেন—"শুধু কি সে দস্যিই ছিল তটি? পড়া-শুনাতেও কেউ তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতো না! নাত-জামাই ক'রেছিলুম আমি—একেবারে যাকে বলে রূপে-গুণে! কি করবি বল্ দিদি; তোর বরাতে যে সুখ নেই, বিধি বাম—তা' কি হবে!"

তটিনী অভিমান ক'রে ব'লতো, "ঠাকুমা! তুমি কেবলই বলো আমার অদৃষ্ট মন্দ—তাই সে রইলো না; আমি অভাগী—তাই তাকে পেলুম না! পাবার আগেই জীবনের সে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমার হারিয়ে গেছে! এর মানে কি? তুমি কি বলতে চাও তোমার নাত-জামাইটী খুব ভাগ্যবান্—তাই এ পোড়ারমুখীর সঙ্গে তার পরিচয় হবার আগেই সে পালিয়ে বেঁচেছে? ক্ষতিটা বুঝি আমার একারই? আর, এই যে আমার এ বুকভরা ভালবাসা আজকে আমি অঞ্জলি ভরে' যা' তার পায়ের তলায় লুটিয়ে দেবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে রয়েছি—এ অর্ঘ্য যে সে বেঁচে থেকে নিতে পেলে না—এটা বুঝি তারও বড় কম দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করো?

ঠাকুরমা বলেন—"অত-শত বুঝি নি বাপু তোদের একেলে কথার ছাঁদ! তবে, এটুকু বেশ জোর করেই বলতে পারি যে আমার সে সোনার চাঁদ যদি আজ বেঁচে থাকতো, তা হ'লে তোর মত অমন অনেক দাসীই তার পায়ে নিজেকে অঞ্জলি দিতে পেলে নিজেদের ভাগ্যবতী বলে মনে করতো!

"ইস্! তাই না কি? ঠাকুমা বুঝি তার প্রেমে পড়েছিলে?—নিশ্চয়! আমার সন্দেহ হচ্ছে"—বলে তটিনী হাসতো—

"দূর পোড়ারমুখী!"—ব'লে ঠাকুরমা তার গালে যেমনি ঠোনা মারতে যেতেন—আর তটিনী হো-হো ক'রে হেসে উঠে চঞ্চলা হরিণীর মত ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যেত!

দুই

তটিনী তার পূজার ঘরে ব'সে পতি-দেবতার অর্চনা করছিল। ঠাকুরমার কাছে সে শিখেছে—স্বামীই নারীর জপ-তপ, ধ্যান-জ্ঞান, ইষ্ট ও একমাত্র আরাধ্য রত্ন! তাই সে তার স্বর্গগত স্বামীর একখানি ছবি সংগ্রহ ক'রে তার ঠাকুরঘরে নারায়ণের সিংহাসনের উপর সাজিয়ে রেখেছিল। নিত্য ফুলচন্দন দিয়ে সে এই চিত্রখানিকে পূজা ক'রত! সন্ধ্যায় মালা গেঁথে এই ছবির গলায় পরিয়ে দিত। অগুরু ধূপে তার দেবতার আরতি করতো!

চোখ বুজে ব'সে সে ধ্যান ক'রতো ঐ ছবির মূর্ত্তি যেন সজীব হ'য়ে উঠে আসে তার কাছে! কিন্তু, তার সমস্ত একাগ্রতাকে ব্যর্থ করে—সেই এক অপরিচিত যুবার চিত্রখানি প্রাণহীন প্রতিকৃতি হয়েই প্রতিদিন তার চোখের সামনে ভেসে উঠতো!

তটিনী তার ঠাকুরমার মুখে শোনা স্বামীর অনেক গুণের কথার মনে মনে আলোচনা করতো—ভাববার চেষ্টা ক'রতো—যেন ভাদ্রের ভরা নদীর বুকে একটী বলিষ্ঠ পুরুষ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সাঁতার দিচ্ছে। তার সুস্থ সুপুষ্ট পৃষ্ঠ ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দিয়ে গঙ্গার গৈরিক তরঙ্গ যেন দাঁড়াতে না পেরে পিছলে পড়ছে!

ঠাকুরমার কাছে সে শুনেছিল তার স্বামী না কি ভারী দেশভক্ত ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সে না কি লাঠি খেলা, অসি খেলায় পাড়ার সকল ছেলের অগ্রণী হ'য়ে উঠেছিল। বিলাতী জিনিস সে প্রাণ গেলেও কিনতো না। রাখী-বন্ধনের দিন সে না কি একলাই শহর মাত ক'রে রাখত। বড় সুন্দর স্বদেশী গান ক'রতে পারত সে। তাই প্রভাস না হ'লে তখনকার কোনও স্বদেশী সভাই জমতো না! এমন চমৎকার সে বাঁশী বাজাতো যে শুনলে বোধ হয় বনের পশুও মুগ্ধ হতো।

সংসারের কাজ কর্ম্ম সারা হ'লে তটিনীর প্রধান কাজ ছিল, ঠাকুরমার কাছে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার না-জানা স্বামীর সম্বন্ধে সব কিছু গল্প শোনা। সেই সব শুনে শুনে সে আপন কল্পনার সাহায্যে তার সেই না-পাওয়া মানুষটীর সম্বন্ধে একটা কিছু সুস্পষ্ট ধারণা ক'রে নেবার চেষ্টা ক'রতো। এমনি ক'রেই আজ সুদীর্ঘ সাত বৎসর ধ'রে সে তার বৈধব্য জীবনের নিঃসঙ্গ দিনগুলিকে একে একে উত্তীর্ণ হ'য়ে এসেছে—আপনার স্মরণাতীত স্বামীকে স্বীয় বিস্মরণের পার হ'তে টেনে আনবার প্রাণপণ প্রয়াসে!

তবু তার অন্তরের হাহাকার—জীবনের শূন্যতা—নিষ্ফল যৌবনের একান্ত ব্যর্থতা—তাকে মাঝে মাঝে মর্ম্মান্তিক পীড়িত ক'রে তুলতো! চিত্রের চরণতলে লুটিয়ে দেওয়া তার আকুল প্রেম-নিবেদন প্রতিদিন তেমনিই নিরুত্তর থেকে যেতো। তটিনী চিত্রখানিকে টেনে নিয়ে বুকের উপর চেপে ধ'রতো!—"ওগো! কথা কও! কথা কও! সাড়া দাও!—" বলে অধীর ব্যগ্র চুম্বনে চিত্রখানিকে সে আচ্ছন্ন ক'রে ফে'লত!...মূক চিত্র কিন্তু নিস্পন্দ অসাড়! তার চোখের দৃষ্টিতে প্রেমের নিগূঢ় রহস্য ফোটে না। তার অধরে সোহাগ সমুদ্রে ঢেউ খেলে না!

কত বিনিদ্র রজনী সে যাপন করেছে তার প্রিয়তমের উদ্দেশে পত্র রচনায়! দু'তিনখানি মোটা মোটা খাতা একেবারে ভ'রে গেছে তরুণী তটিনীর রঙীণ মনের ভাব-ধারার উসিচ্ছত তরঙ্গে! কিন্তু উত্তর কই? উত্তর কই তার সে চিত্ত-বিমথিত চিঠি-পত্রের? কেউ তো পাঠালে না আজও তার সেই কতো নিশি জেগে লেখা লিপির একটী ছত্রেরও উত্তর!

যাকে ভালবাসার জন্য তার সমস্ত সত্তা উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে, যাকে আদরে সোহাগে আচ্ছন্ন ক'রে দেবার জন্য তার হৃদয় অধীর আগ্রহে ব্যাকুল; যার সেবায়—যার পরিচর্য্যায়—তটিনী নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে ধন্য হ'তে চায়—কোথায় তার সেই ধ্যানের ধন—তার মনের ছবি—জীবনের দেবতা তার?

নেই! নেই! সে কোথাও নেই! সে শুধু ছবি—শুধু পটে লেখা!

তিন

সকালে উঠে ঘর-সংসারের কাজ স্নান করা, পূজা করা, রাঁধা—খাওয়া—শোয়া, বসা, বাসনমাজা, আর—ঠাকুর মাকে রামায়ণ পড়ে শোনানো। এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে কথায় কথায় সেই একটী লোকের বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা—এই ছিল তটিনীর জীবনের নিত্য কাজ। বৈচিত্র্য-হীন—এক ঘেয়ে—নিরানন্দ দিনপাত।

বাসন্তী বৈকালে তাদের বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে 'বেল ফুল'ওয়ালা হেঁকে যেতো। বর্ষায় সে বেচতো কেয়াফুল! শরতে কমল! তটিনী তার একজন মস্ত বড় খরিদ্দার। একরাশ বেলকুঁড়ি নিয়ে সে বসতো। দখিন হাওয়ায় গুঞ্জরণে গুণ্ গুণ্ ক'রে গান গেয়ে তার প্রিয়তমের জন্য মালা গাঁথতে। সে মালা গাঁথা তার যেন আর শেষ হয় না! সাতবার ছিঁড়ে সাতবার ক'রে সে গাঁথতো। শেষে ঠাকুরমার কাছে বকুনী খেয়ে তবে তার সে মালা নিয়ে খেলা শেষ হ'তো। চুপি চুপি সে ঠাকুর ঘরে ঢুকে তার স্বামীর ছবির গলায় সেই বেলের মালা দুলিয়ে দিয়ে আসতো! রাত্রে শুতে যাবার আগে আবার লুকিয়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকে ছবির গলা থেকে সে মালা ছড়াটী খুলে নিজের খোঁপায় জড়িয়ে নিয়ে যেতো! ঠাকুরমার গলাটী ধরে—কাণে কাণে বল্'ত, "তোমার নাত-জামাই যে পরিয়ে দিলে ঠাকুমা, কিছুতে ছাড়লে না!— তুমি আমায় বোকো না যেন!—"

বৃদ্ধা নিঃশব্দে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে গোপনে চোখের জল মুছে নাতনীকে বুকে টেনে নিয়ে বল্‌তো,—"থাক্ থাক্, বেশ করিছিস্'—ওতে কোনো দোষ নেই!"

কেতকীর পরিমল রেণু বাদল সাঁঝে তাকে যেন পাগল ক'রে তুলত। কদম্ব কেশর যেন তার শ্রাবণ ধারার দোসর হ'য়ে দেখা দিত! শরতের শেফালী কমল কাশ তার পুষ্প-বিলাসের প্রধান উপকরণ হ'য়ে উঠতো!"

কিন্তু, ফুলও তাকে সান্ত্বনা দিতে পারতো না। কুসুম-কলি তার পক্ষে শুধু পুষ্পশরই হ'য়ে উঠত! তবু ফুলই সে ভালবাসতো জীবনে তার সব কিছুর চেয়ে বেশী!"

ফুল দিয়ে সে লিখত—প্রভাস! প্রভাস! প্রভাস! তার খাতার আষ্টে-পৃষ্ঠেও সে এই নামটাই লিখে রেখেছিল। তার বিয়ের পর বাম হাতের উল্কীতে সখীরা লিখে দিয়েছিল "প্রভাস-তটিনী।" সে রেখা এখন আরও যেন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। সে ক্মার-কোর রুমাল বুনে রেশম দিয়ে তার কোণে লিখতো "আমার-প্রভাস" সে কার্পেটের জুতো বুনে তার উপর লিখে রাখত—"চরণাশ্রিতা তটিনী।" 'সই'য়ের ছেলের জন্যে সে রকম রকম কাঁথা শেলাই করতো—'বকুল ফুলে'র খোকার জন্যে সে পশমের ছোট ছোট মোজা টুপী গেঞ্জী বুনে দিত! পাড়া-পড়শী মেয়েদের সে ধুম ক'রে পুতুলের বিয়ে দিয়ে দিত!

কিন্তু, কিছুতেই যেন সে সুখী হ'তে পারতো না! অন্তরে একদিনের তরেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি পেতো না!

কোথায় যেন একটা কিসের অভাব সকল কাজেই তাকে অকস্মাৎ গভীর নিরুৎসাহ এনে দিত। তার প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন হাহাকার ক'রে ব'লে উঠত,—'মিথ্যা! মিথ্যা! এ সকলই মিথ্যা! ওরে ও অভাগী! তোর এ বিড়ম্বনা কেন?' তখন আর হাতের শিল্প-কাজ তার কিছুতে শেষ হতো না। সেলাই-বোনা, ভাঙা-গড়া,—আঁকা-লেখা—পুতুলের বিয়ে সব কিছুই তার একান্ত অনাদৃত ও অবহেলার বস্তু হ'য়ে অসমাপ্ত পড়ে থাকতো!"

এমনিতর একটা উদাস বেদনাময় মনের অবস্থায় তটিনী যখন তার নিঃসঙ্গ জীবন ভারে একান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করছিল নিজেকে—ঠিক সেই সময় বিভূতি এলো তার জীবনের মরু-পথে—তৃষ্ণার্ত্তের জন্য সুশীতল পানীয় জলের মর্ম্মর-শুভ্র ভৃঙ্গার নিয়ে!

চার

ছোট একখানি একতলা বাড়ী। কিন্তু দু'মহল। প্লোরের উপরে তৈরী। বাইরে রাস্তার ধারে উঁচু রকের কোলে তিনখানি ঘর, তারপর একটি উঠান—তারপর আবার উঁচু ও চওড়া দালানের কোলে আর দু'খানি ঘর। উঠানের একধারে টিনের চালায় তটিনীদের রান্নাঘর ও ঠাকুরঘর। দালানের কোলের ঘর দুটীতে পৌত্রী ও পিতামহীর বাসা। বাইরেটা তারা ভাড়া দেয়। তা' থেকে মাসে তিরিশ টাকা ক'রে আয় আছে তাদের। তা'ছাড়া বুড়ীর হাতে আরও কিছু ছিল। তাইতেই দু'টী বিধবার বেশ সচ্ছল অবস্থাতেই চলতো। কিছুদিন থেকে তাদের বাইরের অংশটা খালি প'ড়েছিল। আজ একজনরা ভাড়া এসেছে।

একটী বলিষ্ঠ সুন্দর যুবা—প্রশস্ত বক্ষ, দীর্ঘ দেহ, দীপ্ত দৃষ্টি কালো চোখ—বুড়ি তাকে একলা আসতে দেখে ব'ললে—"কইগো, তুমি যে ব'ললে—তোমার মা আছেন, একটী বিধবা বোন আছে, একটী ছোট ভাই আছে, তাদের তো কই আনো নি বাছা?"

ছেলেটী ব'ললে—"এ মাসে যে দিন ভাল নেই ঠাকুরমা, তাঁরা সব ওমাসে আসবেন। কিন্তু, আমার যে ইস্কুল খুলেছে—আমি তো আর থাকতে পারি নি, তাই একলাই আসতে হ'ল!"

ছেলেটী তাকে 'ঠাকুরমা' ব'লতে বুড়ি ভারি খুশী হ'য়েছিল। ব'ললে—"আহা! তা' আসতে হবে বই কি দাদা! ইস্কুল তো আর কামাই করা চলে না?—তা ভাই তোমার খাওয়া দাওয়ার কি হবে?"

ছেলেটী ব'ললে—"বামুনের ছেলে আমি ঠাকুমা—আর কিছু জানি আর না জানি উনুনে ফুঁ, শাখে ফুঁ আর কাণে ফুঁ এ তিন বিদ্যে শিখে রেখেছি। নিজেই রেঁধে খাবো; আপন হাত—জগন্নাথ! কি বলেন ঠাকুরমা?—"

'তা বটে! তা বটে!' ব'লে বুড়ি জিজ্ঞাসা ক'রলে—"তোমার নামটী কি ব'লে ছিলে ভাই সেদিন? আমি ভুলে গেছি! আমার নাত্নী জানতে চাইলে যখন, আমি ব'ল্তে পারলুম না।"

ছেলেটী হেসে ফেলে ব'ললে—আমার নাম 'প্রভাস' ঠাকুমা! সেদিন যে আপনি আমার নাম শুনে বল'লেন—আমার নামে আপনার কে একটী নাতী না নাতনী আছে! তাইতো আমি আপনাকে 'ঠাকুমা' 'ঠাকুমা' বলে ডাকছি! আপনি রাগ ক'রছেন না তো?—

বুড়ির দুই চোখে ধারা নেমে এল! এরও নাম 'প্রভাস'! অনেকক্ষণ ছেলেটীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে মনে মনে ব'ললে—ঠিক যেমনটী সে ছিল তেমনটী না হ'লেও ধরণটা একই রকম বটে! আহা, বেঁচে থাক্ সুখে থাক্, রাজা হোক্! ঠাকুর মা তাঁর দক্ষিণ হস্তে প্রভাসের চিবুক স্পর্শ করে সস্নেহে চুম্বন করলে।

তারপর চোখ দুটী মুছতে মুছতে প্রভাসকে ব'ললে—"ভাই, লক্ষ্মী দাদা আমার! এ বুড়ো মানুষটার একটা কথা তোমাকে রাখতেই হবে!—তোমাকে ও নামে আমি ডাকতে পারবো না!—সে ছোঁড়া আমার নাতি নয়, নাত জামাই ছিল। তটির সিঁথির সিঁদুর মুছে নিয়ে—আমার ত্রিভুবন অন্ধকার করে দিয়ে সে নিষ্ঠুর চলে গেছে। তার নাম আর আমি ক'রব না—আমি তোমায় 'বিভূতিভূষণ' বলেই ডাকবো—কেমন? তোমার আপত্তি নেই তো ভাই?—"

প্রভাস ঘাড় নেড়ে ব'ললে—"যে নামে ইচ্ছে আপনি আমায় ডাকবেন ঠাকুরমা! আপনাকে আমি ঢালা হুকুম দিয়ে রাখছি!—'গাধা' বলে ডাকলেও আমি সাড়া দেবো। 'বিভূতিভূষণ' অত বড় নামেই বা দরকার কি? শুধু

'বিভূতি' কিংবা 'ভূত' ব'ললেই তো হবে!—কি বলেন ?—"

"বালাই, ষাট! ভূত হবে কেন ভাই! তোমরা যে আমাদের ভূষণ! বলতে বলতে বুড়ি বহুদিন পরে আজ একটু প্রাণখুলে হাসতে পেয়ে যেন অনেকটা আরাম বোধ করলে।

পাঁচ

দু'দিনেই ছেলেটার উপর বুড়ির মায়া প'ড়ে গেল। তাই সেদিন গঙ্গাস্নান সেরে বাজার ক'রে বাড়ী ঢুকতেই—'তটিনী' তাকে যেই ব'ললে "ও ঠাকুরমা, তোমার ভাড়াটে নাতীর যা রান্নার শ্রী! চড়িয়ে ছিলেন তো ভাতেভাত, তাও গেছে - চুয়ে পুড়ে তলা ধরে!"

বুড়ী শুনেই তখনি ছুটলো বার-বাড়ীতে। প্রভাসকে ডেকে বললে—"বিভু, ভাত না কি পুড়িয়েছো ?"

প্রভাস চমকে উঠে বললে—"সে কি ? পুড়ে গেছে না কি ঠাকুরমা ? চলো চলো দেখি! চড়িয়ে দিয়ে এসে একটা অন্য কাজে বসেছিলুম—ভাতের কথা আর মনেই ছিল না। ভাগ্যিস তুমি বললে প্রভাস তাড়াতাড়ি উঠে এসে দেখলে—তাই তো! ভাতটা তার সত্যিই পুড়ে গেছে!

বুড়ি ব'ললে, "কি খাবে আজ ? ছি ছি, এমন ভুলো ছেলে তো আমি দেখিনি ?—ভাত ধ'রে যাচ্ছে—খেয়াল নেই ?"

প্রভাস যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে হাসতে হাসতে ব'ললে,—"যাক্‌গে, তুমিও যেমন!—কলকাতা শহরে পয়সা থাকলে কি আবার খাবার ভাবনা থাকে ঠাকুরমা! রাতদুপুরেও গরম মাছের ঝোল ভাত পাওয়া যায়!"

বুড়ি ঘাড় নেড়ে ব'ললে,"না—তা আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। রোজ রোজ হোটেলের ভাতগুলো গিলে শেষে অসুখে পড়বে। আজ আমার কাছেই ভাত খেয়ো বুঝলে ভাই; নিমন্ত্রণ করে গেলুম। তুমি নিরামিষ খাও যখন তখন আর তোমার ভাবনা কি ?"

প্রভাস রহস্য ক'রে ব'ললে,—"আমি কিন্তু বড্ড বেশী খাই ঠাকুরমা—রাক্ষসের মতো! শেষে রাগ ক'রবে না তো ?"

"দূর পাগল ছেলে! তুই বুঝি আমাকে কেবলই রাগ ক'রতেই দেখিস ? যে খেতে পারে তাকেই তো মানুষের খাওয়াতে ভাল লাগে—"

বাধা দিয়ে প্রভাস ব'ললে, "হাঁ, এই এত বেলায় আবার যখন তোমায় উনুন গোড়ায় গিয়ে বসতে হবে আর একবার রাঁধবার জন্যে তখন মনে মনে নিশ্চয় বলবে—'ঘাট হ'য়েছে—ছোঁড়াকে খেতে বলে। রাক্ষসটাকে আর কখনো নিমন্ত্রণ করছি নি।"

বুড়ি বললে, "আমাকে কি আর তটি রান্নাঘরের ত্রিসীমানা মাড়াতে দেয়! অনেকদিন হ'লো সেখান থেকে আমাকে নির্ব্বাসিত ক'রে সেই এখন নিজে তার চৌহদ্দির পুরো দখল নিয়ে বসেছে!—একবার ছেড়ে দশবার রাঁধতেও সে কাতর নয়।"

—"তটি' ? সে আবার কি জীব ঠাকুরমা ?—'ঘটি' দেখেছি, আছেও আমার! কবিরাজী বটী জানি এমন কি 'চটি'ও পাওয়া যায় এই তালতলা' গলি থেকে সেই হিমালয়ের বদ্রিনারায়ণের পথেও! পায়ে দেবার এবং মাথা গুজে থাকবার কিন্তু 'তটি' তো কখনও শুনি নি ঠাকুরমা!—"

ঠাকুরমা হাসতে হাসতে বললেন, "এত রঙ্গও জানিস দাদা তুই!—'তটি' যে আমার নাত্‌নী রে। আমি তাকে 'তটি' বলে ডাকি বটে, কিন্তু তার নাম হ'চ্ছে শ্রীমতী তটিনীরাণী দেবী—বুঝলি ?—"

প্রভাস যেন বিশেষ বিস্মিত হ'য়ে বললে, "ও-ও-ও! তাই বলো ?"

ঠাকুরমা তার চোখ-মুখের রকম দেখে আর একবার হেসে উঠে বললেন, "তার কাছেই তো আমি তোমার এই ভাত পোড়ানোর খবর পেলুম!"

প্রভাস চমকে উঠে বললে, "ঠাকুরমা! তবেই তিনি যা রাঁধিয়ে তা' বোঝা গেছে! ভাতটা ধরে যাচ্ছে দেখে কি তিনি এসে দয়া করে হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে দিয়ে যেতে পারতেন না ? ভাল রাঁধুণী হলে নিশ্চয় তাই করতেন। ধর না কেন, তুমি যদি বাড়ী থাকতে ঠাকুরমা! আমার ভাতটা ধ'রে যাচ্ছে দেখে তুমি কি এই 'ঘটী' না কি বললে —'চটি'র মত চুপ করে বসে থাকতে পারতে ?"

ভিতর থেকে ডাক এল—"বাবু মা!"

"যাই দিদি!"—তটিনী ডাকছে শুনে ঠাকুরমা ভিতরে

চলে গেলেন। যাবার সময় আর একবার ভাল ক'রে ব'লে গেলেন, "আমার কাছেই আজ খেতে হবে বিভু। হোটেল খুঁজতে বেরিয়ো না যেন—খবরদার!—তা হলে আমি বড় রাগ করবো কিন্তু!"

ছয়

তটিনীর জীবনে আজ এই প্রথম অতিথি সৎকার! একটা অপরিচিত অনাত্মীয় যুবককে নিজের হাতে পাঁচরকম রেঁধে খাইয়ে আজ সে যা তৃপ্তি পেয়েছে, এ তার পক্ষে এক নূতন অভিজ্ঞতা! প্রভাসের সেই "আরও একটু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে" বলে চেয়ে নিয়ে প্রত্যেক জিনিসটী পরিতোষের সঙ্গে চেটে পুটে খাওয়া! রন্ধন সম্বন্ধে তার মুখের সেই উচ্চ প্রশংসা তটিনীকে যেন এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদ এনে দিলে! রন্ধনের ভার সে অনেকদিন থেকেই নিজের হাতে নিয়েছিল বটে, কিন্তু তার মধ্যে যে এতখানি সার্থকতা থাকতে পারে সে কথা আজ যেন প্রথম সে অনুভব করতে পারলে।

ঠাকুরমাকে বললে, "বাবুমা, ওঁদের বাড়ীর মেয়ে ছেলেরা যে কদিন না আসেন ওঁকে বল যেন সে কদিন উনি আমাদের কাছেই খাওয়া দাওয়া করেন। এরকম মানুষকে খাইয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায়!"

ঠাকুরমা হেসে বললেন, "সে আর বলতে হবে না দিদি। যে অমৃত পরিবেষণ করেছিস, আমার ভাড়াটে নাতিটী নিজেই উপযাচক হয়ে এখন কিছুদিনের জন্য ওই অনুগ্রহটুকু আমার কাছে ভিক্ষে চেয়ে গেছে।"

তটিনী শুনে খুশ্রী হয়ে নবোদ্যমে ও নবীন উৎসাহে গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করলে। প্রভাস 'চা' খায় শুনে সে নূতন করে চায়ের ব্যবস্থা করলে। প্রভাস পান খায় জেনে সে পান সাজবার সরঞ্জাম আনালে। প্রভাসের দু'বেলার জল খাবারটুকুন পর্য্যন্ত সে নিজে হাতে তৈরী করে পাঠায়। বাজার থেকে তাকে এতটুকু সামগ্রী কিনে আনিয়ে খেতে দেয় না। অন্তরাল হ'তে এই মেয়েটীর এতখানি আন্তরিক সেবা যত্ন প্রভাসের ভারি ভাল লাগে।

প্রভাস প্রত্যহ বাইরে বেরুবার সময় তার মহলের চাবী ঠাকুরমার কাছেই রেখে যেতো। আজও রাখতে এসেছিল কিন্তু শুনলে ঠাকুরমা বাড়ী নেই। ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করে সে তার রিংশুদ্ধ চাবীর থোছাটা তটিনী যে ঘর থেকে বলেছিল—'ঠাকুরমা বাড়ী নেই' সেই ঘরের মধ্যে ছুড়ে দিয়ে বলে গেলো, "আমার চাবীটা তা হলে দয়া করে আপনিই রেখে দিন; কারণ প্রতিমার অন্তরালস্থ দেবীর মতো আপনিই যে এ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী এ কথা আমি জানি।"

জুতোর আওয়াজে তটিনী বুঝতে পারলে প্রভাস চ'লে গেল।

প্রভাসের মুখের ওই সামান্য কটী কথা আজ যেন তটিনীর বুকের মধ্যে এক নূতন সুরের তরঙ্গ-হিল্লোল তুলে দিয়ে গেল! চাবীর রিংটা কুড়িয়ে নিয়ে আঁচলে বাঁধতে গিয়ে কি ভেবে সে যেন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো।

প্রতিদিন খেতে বসে ঠাকুরমার সঙ্গে প্রভাসের সেই অনাবিল হাস্য-পরিহাস তটিনীর খুব ভাল লাগতো। সোজা তটিনীর সঙ্গে কোনোদিন সে একটি কথাও বলে নি। তাই আজকে সে বাইরে যাবার সময় বিশেষ ক'রে তটিনীকেই যে কথাগুলি বলে গেল, তটিনীর কাণে সেগুলি শুধু নূতন নয়—ভারী মিষ্টি শোনালো!"

"প্রতিমার অন্তরালস্থ দেবীর মত! কি সুন্দর ক'রে কথা বলেন উনি!" তটিনী রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল প্রভাসের আরও অনেকদিনের অনেক কথা স্মরণ করে! ঠাকুরমার সঙ্গেই সে কথা কয় বটে, কিন্তু, সে সব কথা সে যে কা'কে শোনাবার জন্য বলে, সেটা তটিনী তার নারীসুলভ সহজ অনুভূতি থেকে অনায়াসেই বুঝতে পারতো।

ঠাকুরমা কতদিন বলেছে, "বিভূতি ছেলেটী দেখছি অবিকল আমাদের প্রভাসের মতন। সেও যেমন স্বদেশী ক'রে বেড়াত' এ ছোঁড়াও কি ঠিক তাই! বলে কি না "ঠাকুরমা তোমায় চরকা কাটতে হবে! তোমায় খদ্দর পরতে হবে!"

তটিনী শুনে হাসে কিন্তু, তার পরদিন থেকেই ঠাকুরমা দেখে—তটিনী খদ্দর পরে চরকা কাটছে! ঠাকুরমা বলে—"ওমা! কি হবে! কোথা যাবো! তুই যে দেখছি তুটি একেবারে বিভুর চেলা হয়ে উঠলি!'

তটিনী লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে! বলে—"বয়ে গেছে!

আমার দায় পড়েছে! আমি মহাত্মাজীর আদেশে পরেছি। ওঁর কথায় পরতে যাবো কেন?—"

আজ সে প্রভাসের চাবীর রিংটা অনেকক্ষণ নেড়ে-চেড়ে দেখে, অনেক ইতস্ততঃ করে শেষটা কপালে ঠেকিয়ে সযত্নে যেই আঁচলে বেঁধে নিলে, সেই সময় ঠাকুরমা বাড়ী ঢুকে বললে, "তটি ছেলেটা রোজ আমাদের সঙ্গে নিরিমিষ খেয়ে খেয়ে যে রোগা হয়ে গেলো। আজ এই দোর গোড়া দিয়ে তপ্‌সে মাছ বেচ্‌তে যাচ্ছিল—ডেকে এনেছি। ভাল করে একটু রেঁধে দিস্ তো বল্ কিছু কিনি।"

তটিনী চম্‌কে উঠে বললে, "সে কি বাবুমা,—উনি যে মাছ-মাংস একেবারে খাননা বললেন সেদিন তোমাকে অমন করে শোন নি?—সেই যে গল্প করলেন, সেদিন একবার কোথায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে ভুলে ওঁর পাতে নিরামিষ ডাল বলে মুড়িঘণ্ট দিয়েছিল। সে খেয়ে ওঁর বমি হয়ে গেছলো! না বাপু, কাজ নেই, তুমি ও ফিরিয়ে দাও। তা'ছাড়া আমাদের নিরিমিষ হেঁসেলে আর ও সব আমি ঢোকাতে চাই না।"

অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ঠাকুরমা অগত্যা তপ্‌সে মাছওয়ালাকে ফিরিয়ে দিলেন।

তটিনী ব'ললে—"বাবু মা! একবার এসো তো, তোমার ভাড়াটে নাতিটী আমাদের ঘর-দোর গুলার কি দুর্দ্দশা ক'রে রেখেছে দেখে আসি।"

ঠাকুরমা ব'ললেন—"বিভূ কি আছে? ঘর-দোর সব চাবী দেওয়া দেখে এলুম যে!"

তটিনী ব'ললে—"এই বেলাই তো সুবিধে!—চাবী রেখে গেছে। চল দেখিগে!"

সাত

ঠাকুরমা আর নাত্‌নীতে গিয়ে যা' দেখলে, তা'তে ওদের কান্না পেয়ে গেল! বিছানা-মাদুর, কাপড়-জামা, বই-খাতা, বাক্স-পেটরা সব উল্টে পাল্টে চারিদিকে ছড়ানো পড়ে রয়েছে। ঘরে যে কতদিন ঝাঁট পড়েনি তার ঠিক নেই! এক হাঁটু ক'রে ধুলো জমে রয়েছে! আলোর চিম্‌নিটার কালী মোছা হয় নি অনেক কাল। মশারীর এক কোণের দড়ী ছিঁড়ে গেছে;

তটিনী আর কোনও কথাবার্ত্তা না ব'লে তৎক্ষণাৎ কোমর বেঁধে প্রভাসের গৃহ-সংস্কারে লেগে গেল!

চক্ষের নিমেষে সবকিছু ঝেড়ে মুছে গুছিয়ে ঘরদোর গুলিকে সে ঝক্-ঝকে তক্-তকে ক'রে তুললে! টেবিলের উপর বই খাতাগুলি সাজিয়ে রাখতে রাখতে—তটিনী কি দেখে যেন চম্‌কে উঠে ব'ললে—"বাবু-মা! তুমি একে 'বিভূতি' ব'লে ডাকো শুনি, কিন্তু 'বিভূতি' তো এর নাম নয়! সমস্ত বইগুলি এবং খাতা পত্রে যে অন্য নাম লেখা র'য়েছে দেখছি, এর নাম 'বিভূতি' তোমাকে কে ব'ললে?"

ঠাকুরমা ব'ললেন "হাঁ রে, তোকে বলতে ভুলে গেছি বটে। বিভুর নাম আর আমার নাতজামায়ের নাম এক ব'লে, আমিই ওর নতুন নাম রেখেছি 'বিভূতিভূষণ!'

তটিনীর সর্ব্বাঙ্গ যেন বিহ্বল ও অবশ হয়ে এল! কি যেন একটা অকূল ভাবনার অতল সমুদ্রে সে তলিয়ে গেল! বইগুলা সে নাড়ছিল-চা'ড়ছিল বটে, কিন্তু বইয়ের দিকে তার মন ছিল না। গ্যারিবল্ডী, ম্যাজিনী, বিবেকানন্দ, তিলক, ডি ভ্যালেরা, ওয়াশিংটন, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি অসংখ্য স্বদেশের জন্য উৎসর্গিত-প্রাণ বীরগণের জীবন-চরিতের সঙ্গে প্রভাসের টেবিলের উপর ছিল—রবীন্দ্র-নাথের 'গীতাঞ্জলি' ও 'চয়নিকা'!

প্রভাসের মাথার বালিশের নীচে থেকে একটা বাঁশের বাঁশী ও পাওয়া গেল বটে, কিন্তু, তটিনী অবাক্ হ'য়ে ভাবছিল—এবাড়ীতে এসে পর্য্যন্ত কই একদিনও তো ওঁকে এটা বাজাতে শুনি নি!

বাঁশীটার উপর আবার বালিশটা চাপা দিয়ে তটিনী জিজ্ঞাসা ক'রলে—"আচ্ছা, বাবু-মা! তোমার নাতজামাই কি বাঁশী বাজাতে পারতো?"

ঠাকুরমা মহা উৎসাহিত হ'য়ে উঠে ব'ললেন—"নিশ্চয়, খুব ভাল বাজাতো।"

তটিনী আর একবার বালিশটা তুলতেই দেখে বাঁশীর সঙ্গেই ওপাশে একখানি ছোট্ট পকেট ডায়েরীও রয়েছে। তটিনী সেই ডায়েরীখানি যেই খুলেছে—বাইরে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল, তটিনী তাড়াতাড়ি সেখানি যথাস্থানে রেখে দিলে। ঠিক্ সেই সময় প্রভাস ফিরে এসে ঘরে ঢুকে পড়লো। তটিনী আর পালাতে পারলে না। একপাশে ঘোমটা টেনে জড় সড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রভাস

তার গৃহের নবীন শ্রী দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে ব'ললে—"ঠাকুরমা একি সৌভাগ্য ? আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম কে জানে ? আমার ঘরে তোমাদের পা'য়ের ধূলো প'ড়ে এ শ্মশান দেখছি একেবারে ইন্দ্রসভার তুল্য অপরূপ হ'য়ে উঠেছে ?"

ঠাকুরমা কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুরে ব'ললেন—"ঘর দোর গুলা কি ক'রে রেখেছিলি বল্‌তো বিভু ? ছি ছি! যেন আঁস্তাকুড়। কি ক'রে বাস করছিলি ভাই ওর মধ্যে ?"

প্রভাস হাসতে হাসতে ব'ললে—"তোমার ভাড়াটে নাতীটা যে লক্ষীছাড়া ?"

ঠাকুরমা হেসে ফেলে ব'ললেন—"তা' একটী লক্ষী ঠাকুরুণ খুঁজে এনে দেবো না কি ?"

প্রভাস ব'ললে—"তুমি যেখানে রয়েছো, সেই তো লক্ষী-নিবাস ঠাকুরমা! লক্ষী আবার খুঁজতে যাবে কোথা ?"

আট

প্রভাসের শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছিল ব'লে সেদিন খুব সকাল সকালই সে বাড়ী ফিরেছিল; রাত্রে তার খুব জ্বর এলো!

সকালে ঠাকুরমা খবর পেয়ে দেখতে এলেন। প্রভাসের অবস্থা দেখে তাঁর ভয় হ'য়ে গেলো! পরের ছেলে তাঁর বাড়ীতে এসে কি শেষে বেঘোরে মারা যাবে ? তিনি ডাক্তার আনালেন। তটিনীকে ব'ললেন—"এখন আর লজ্জা ক'রে লুকিয়ে থাকলে চলবে না দিদি! আমি বুড়োমানুষ কিছু ক'রতে পারবো না। রোগীর ভার তোকেই নিতে হবে। বিভুর কাছে ঠিকানা নিয়ে ওর দেশে আমি টেলিগ্রাম করিয়ে দিয়েছি। ওর মা-বোনেরা এসে পড়লেই তোর ছুটী!"

তটিনী একবার শুধু ব'ললে—"আমি কি পারবো বাবু-মা ? রোগীর সেবা তো কখনও করি নি!"

ঠাকুরমা জোর ক'রে ব'ললেন—"খুব পারবি ভাই! হিঁদুর ঘরের বিধবার সেবাই তো প্রধান ধর্ম্ম রে! আহা! ছেলেটা বড় ভালো! ওর এখানে কেউ নেই যখন, তখন আমাদেরই দেখতে হ'বে ওকে!"

তটিনী আর দ্বিরুক্তি না ক'রে রোগীর শুশ্রূষার সমস্ত ভারই নিজের হাতে তুলে নিলে।"

ডাক্তার তার সেবার পদ্ধতি দেখে খুব প্রশংসা ক'রে গেলেন এবং ঠাকুরমাকে ব'লে গেলেন—"রোগী যদি বাঁচে তবে সে কেবল ওর সেবার গুণে! নইলে জ্বরটা যেরকম বাঁকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তাতে কেবল মাত্র ডাক্তার আর ওষুধে কিছু হ'ত না!"

তিন-চার দিনের মধ্যেই প্রভাসের মা, বোন আর ছোট ভাই এসে পড়লো।"

প্রভাসের বোন সুষমা দাদার পরিচর্য্যার ভার নিতে চাইলে, কিন্তু ডাক্তার ভয়ানক আপত্তি ক'রলেন। তিনি ব'ললেন—"এ অবস্থায় আর কারুর হাতে আমি রোগীর ভার দিতে ভরসা করি নি!"

অগত্যা তটিনীকেই রোগীর পার্শ্বে র'য়ে যেতে হ'ল! এবং ডাক্তারের আদেশে তাকে সেখানে একাই থাকতে হতো। রাত্রে প্রলাপের ঘোরে বিকারের রোগীর মুখে কেবলই সে শুনতো তার নিজের নাম। প্রতিবারই সে চম্‌কে উঠতো। তার কেমন যেন একটা ভয় ভয় ক'রতো, কিন্তু, তবু আর একবার শোনবার জন্যও প্রাণের মধ্যে একটা যেন ব্যাকুলতা অনুভব করতো। রাত্রি জাগরণের তার প্রধান অবলম্বন হ'য়ে উঠেছিল প্রভাসের সেই ডায়েরী খানি। পড়তে পড়তে সে যেন একেবারে পাগল হ'য়ে যেতো! যে লোক একটী দিনের তরেও কখনও তার মুখের দিকে ফিরে চায় নি, সে যে অন্তরে অন্তরে প্রতিদিন তাকে কত নিবিড়ভাবে ভাল বেসেছে তারই সকরুণ ইতিহাস এই ডায়েরীখানির প্রত্যেক পাতে লিপিবদ্ধ ছিল!

তটিনীর অক্লান্ত সেবা-যত্নে প্রভাস একমাসের মধ্যেই আরোগ্য হ'য়ে উঠল! সে যেদিন পথ্য ক'রলে তটিনী ফিরে এসে তার নিজের ঘর সংসারের মধ্যে ঢুকে পড়লো। এমনভাবে নিজেকে সে লুকিয়ে ফেললে যেমন ক'রে বিপদের সাড়া পেয়ে শামুক তার খোলের মধ্যে ঢুকে পড়ে!"

ঠাকুরঘরে স্বামীর প্রতিকৃতি পূজা ক'রতে গিয়ে সে আর স্থির হ'য়ে বসতে পারে না। পতির ধ্যানে বসলে তার মানস নেত্রে ভেসে ওঠে প্রভাসের মুখ! রাত্রে শুয়ে শুয়ে তার মনে পড়ে প্রভাসের ডায়েরীতে লেখা কথাগুলি!

তটিনী প্রাণপণে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিত্য ক্ষতবিক্ষত হ'তে লাগল।

সুষমার বড় ভাল লেগেছিল এই তটিনীকে। সে দেখেছে কেমন ক'রে এই মেয়েটী দিনের পর দিন রাত্তের পর রাত যমের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সাবিত্রী যেমন ক'রে তাঁর মৃত পতিকে ফিরিয়ে এনেছিল তেমনি করেই তার দাদাকে নিশ্চিত মরণের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছে তাদের কাছে। শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়, একটা আন্তরিক স্নেহের আকর্ষণেই সুষমা যখন-তখন ছুটে আসত তটিনীর কাছে! তাকে 'দিদি' বলে ডেকে সে মনের মধ্যে যথার্থ ই একটা তৃপ্তি পেতো! তার নারীসুলভ অন্তর্দৃষ্টি থেকে একথা সে বেশ বুঝতে পেরেছিল যে, তার দাদা এই মেয়েটীকে একটু বিশেষ অনুরাগের চোখেই দেখে! তটিনীর প্রতি তার আশক্তির এও ছিল একটা প্রধান কারণ

সুষমা এসে তটিনীর কাছে তার দাদার গল্প অনেক কিছুই ক'রতো তটিনী কিন্তু দেখাতো সে যেন ও সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাস। সে ভুলেও কখনও সুষমাকে তার দাদার কথা কিছু জিজ্ঞাসা ক'রতো না। কিন্তু, অধীর আগ্রহে উদ্-গ্রীব হ'য়ে সে প্রতিদিন সুষমার আগমন প্রতীক্ষা করতো। প্রভাসের জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কথাটী শোনবার জন্য তার সমস্ত চিত্ত যেন উন্মুখ হ'য়ে থাক্‌তো!"

নয়

একদিন সুষমা এসে ব'ললে, "দিদি, আমরা এই সংক্রান্তীর দিন যোগে গঙ্গাস্নান ক'রতে যাবো, মা যাবেন, আমি যাবো, তোমার ঠাকুরমা তো যাবেনই, তোমাকেও যেতে হ'বে ভাই!—দাদা বলছিলেন তোমাকেও নিয়ে যেতে!

তটিনী চম্‌কে উঠে ব'ললে, "উনিও কি নাইতে যাবেন না কি ?"

সুষমা বললে,—"বেশ! সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার ভার্য্যা! দাদার ভরসাতেই যাচ্ছি! দাদা যে স্বদেশী ভলান্টিয়ার ? দাদা না নিয়ে গেলে কি ওই ভিড়ের মধ্যে আমরা যেতে পারবো ?"

তটিনী ক্ষণকাল কি ভেবে বললে,—"আমি যাবো না!"

সুষমা শুনে একেবারে কাঁদো কাঁদো হ'য়ে ব'ললে, "তা হ'লে যে আমাদের কারুর যাওয়া হ'বে না ভাই! দাদা যে ব'লেছে—"তুমি যদি যাও তবেই আমাদের নিয়ে যাবে, নইলে নিয়ে যাবে না!"

শেষ পর্য্যন্ত তটিনীকে যেতেই হলো। সুষমা কিছুতেই ছাড়লে না!

সেদিন প্রভাস যে উল্লাসে বার বার গঙ্গার এপার-ওপার সাঁতরে বেড়ালে দেখে তটিনী অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠ্‌ছিলো! বার বার তার ঠাকুরমার মুখে শোনা একটা কথা ঘুরে ফিরে মনে পড়তে লাগলো—'বর্ষার ভরা জোয়ারে গঙ্গার যখন এ কূল-ওকূল দেখা যেত না—তখনও সে হাসতে হাসতে দশবার সাঁতারে এ পার-ওপার হোত!"

ঠাকুরমার মুখে এই কথা শুনতে শুনতে—তার মানসদৃষ্টির সম্মুখে যে ছবিখানি ভেসে উঠতো—সেই ভাদ্রের ভরানদীর উত্তাল বুকে একটী বলিষ্ঠ পুরুষ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সাঁতার দিচ্ছে!—তার সুস্থ ও সুপুষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দিয়ে গঙ্গার গৈরিক তরঙ্গ যেন দাঁড়াতে না পেরে পিছলে পড়ছে! আজ সে ছবি আর ছবি নয়! সে সবই যে একেবারে সজীব ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তার সহজ দৃষ্টির সম্মুখে—এই প্রকাশ্য দিবালোকে অসংখ্য লোকচক্ষুর গোচরে! তটিনীর কেমন যেন একটা লজ্জাবোধ হ'তে লাগলো! আশৈশবের নীতি-শিক্ষা ও পাপ-পুণ্যের সংস্কারবশে তার কেবলই মনে হ'তে লাগলো—সে বোধ হয় তার স্বর্গগত স্বামীর নিকট অপরাধীনী হ'চ্ছে! এই মানুষটী কেন এমন ক'রে তার মনের ভিতর ছায়া ফেলে তার স্বামীর ছবিখানিকে আড়াল ক'রে দাঁড়াচ্ছে!

সেদিন সংক্রান্তীর যোগে গঙ্গাস্নান ক'রে বাড়ী ফিরে আসবার পর থেকে—তটিনী নিজেকে আরও যেন নিভৃত অন্তরালে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রাণপণে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা ক'রতে লাগলো! স্বামীর ছবিখানিকে সে পূর্ব্বের চেয়েও আরও বেশী ক'রে আঁকড়ে ধ'রতে চাইলে। পূজা অর্চ্চনার সময় তার ক্রমেই বাড়তে লাগ্‌লো!

সুষমার সঙ্গেও সে আর এখন বেশী কথা বল'তে চায় না। তাকে এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করে। তার ভয় হয়, সুষমার সঙ্গদোষেই সম্ভবতঃ তার চরিত্রের এই পরিবর্ত্তন ও নৈতিক অবনতি ঘটছে!

প্রভাসকে সুষমা এসে গল্প করে,—"ও বাড়ীর দিদি—কি ঠাকুর পুজো করে জানো দাদা ?—তাঁর স্বামীর—ছবি !" প্রভাসের মুখ অকারণ অন্ধকার হ'য়ে উঠে !

সুষমা তা' দেখতে পেয়ে বলে—"দিদির পুজো যেন আর শেষ হ'তে চায় না!—সাতবার গিয়ে ফিরে ফিরে আসি। শুনি যে, এখনও ঠাকুর ঘর থেকে বেরোয়নি! এটা কিন্তু, আমার বড় বাড়াবাড়ী ব'লে মনে হয় দাদা !—এদিকে বলেন স্বামীকে আমার মনে পড়ে না—এদিকে কিন্তু তাঁর ছবি-পূজোর ধুম ক্রমেই বেড়ে চলেছে !—আচ্ছা, এ কি ভণ্ডামী নয় !

প্রভাস ক্ষণকাল চুপক'রে থেকে ধীরে ধীরে বলে—"অমন কথা আর কখনও মুখে আনিস নি—সু! তুই স্বামীর ভালবাসা পেয়ে ও স্বামীকে ভালবেসে সার্থক হ'তে পেয়েছিলি বোন্, তাই স্বামীর বিচ্ছেদ—আজ তোর জীবনের বোঝা হ'য়ে না উঠে অসংখ্য সুখ-স্মৃতির নিবিড় স্পর্শে সুবহ হয়ে এসেছে ! কিন্তু—এর যে কোনও সম্বলই নেই রে ! তাই তো' যে জীবন আজ এর কাছে দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠেছে, তাকে টেনে নিয়ে যেতে প্রতিপদে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছেন বলেই এমন জোর ক'রে মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরতে হ'চ্ছে তাঁকে বাধ্য হয়ে !"

মাস দুই তিন পরে প্রভাস একদিন তটিনীর ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"হাঁ ঠাকুরমা ! যা' শুনছি তা কি সত্যি ? তুমি—না কি তোমার ওই 'তটি' না 'ঘটি' নাতনীটিকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থ-ভ্রমণে বেরুচ্ছো ? সেটি তো একেবারে ডুমুরের ফুল হ'য়ে উঠেছেন! একবার চোখের দেখাও দেখতে পায়না কেউ তাঁকে! অথচ শুনি, রাতকে দিন ক'রে তিনি না কি আমাকে যমালয় থেকে টেনে এনেছেন!" বুড়ি ব'ললে—"হ্যাঁ, ভাই! যেতেই হবে। তটি বড্ড জিদ্ ধ'রেছে! সে আর কিছুতে এ বাড়ীতে থাকতে পারছে না! বলে—'জগন্নাথ আমাকে টেনেছে!—তীর্থে না বেরিয়ে' পড়তে পারলে এখানে দমবন্ধ হ'য়ে মারা যাবো !'—

প্রভাস ব'ললে—"ঠাকুরমা ! তার চেয়ে ওঁকে বলো না কেন যে, আমরাই এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। আর আমার দিনও বোধ হয় ফুরিয়ে এসেছে, আর বড় জোর একটা সপ্তাহ! এক'টা দিন আর ওঁকে নিয়ে কোথাও যেও না ঠাকুরমা! দোহাই—তোমার!"

বুড়ি বললে—"কই ভাই, আমি তো তোমার সঙ্গে—সে রকম কোনও মেয়াদের কিছু চুক্তি ক'রে বাড়ী ভাড়া দিই নি। তুমি যতদিন ইচ্ছে থাকতে পাবে বলেছি যখন, তখন তোমার দিন ফুরিয়ে আসার কোনও কথাই তো এস্থলে উঠতে পারে না! তোমার ভরসাতেই যে ঘর বাড়ী ছেড়ে দিয়ে আমরা তীর্থে বেরিয়ে প'ড়তে সাহস করিছি! তটি যে ব'ললে—'বাবু-মা, তোমার কোনো ভয় নেই। তোমার নাতিটী রইলেন যখন, উনিই তোমার সব তদ্বির ক'রবেন! বাড়ী ভাড়া আদায় ক'রে ঠিক সময়ে তোমাকে মণিঅর্ডার ক'রে পাঠাবেন।' আমি বরং ব'ললুম—সে কি হয় তটি'! পরের ছেলের উপর এতখানি জুলুম করা কি আমাদের উচিত ? এমনিই ওরা যা' কর'ছে আমাদের, ঢের ক'রছে !—

প্রভাস শুধু গম্ভীর ভাবে ব'লে গেলো—"পরের ছেলে বোধ হয় তোমাদের আগেই বিদায় হবে ঠাকুরমা!"—

সেইদিন রাত্রি দু'টোর-পরও প্রভাস বাড়ী এলোনা দেখে প্রভাসের জননী ও ভগিনী সুষমা ব্যাকুল ও চিন্তিত হ'য়ে উঠলো তটিনীর ঠাকুরমাকে ডেকে প্রভাসের মা জিজ্ঞাসা ক'রলে—"কি হবে মা ? ছেলেটার জন্য কি করি বলো:তো ?—স্বদেশী-মদেশী ক'রে বেড়াতো বটে বরাবর কিন্তু আজকাল না কি শুনছিলুম বোমার দলে গিয়ে ভিড়েছে! তাই তো ভয়ে আর বাঁচি নে মা!"

বাইরে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেলো। প্রভাসের—মা উৎসুক ব্যাগ্রতাপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"কেরে ? প্রভাস এলি না কি ?"

প্রভাস চাপা গলায় বল'লে—"হাঁ, চুপ চুপ। এতো রাত পর্য্যন্ত সবাইও বাড়ীতে কেন ? শীগ্গির এ বাড়ীতে চলে এসে শুয়ে পড়ো। পুলিশ এসে যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, "বোলো—সে তার ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।"—

সুষমা ও তার মা ছুটে এসে দোর-জাড়া বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লো।

ঠাকুরমা তটিনীকে চাপা গলায় ব'ললেন—"এ আবার কি আপদ বল্তো ?—পুলিশ হাঙ্গামায় প'ড়তে হবে না

কি আমাদের ?—হাতে দড়ি পড়বে না তো ? ছোঁড়াটা যে ডানপিটে !—ঠিক সেই ছোঁড়াটার মতই হালচাল সব ? কোথায় কি করে এসেছে কে জানে ?—"

ঠাকুরমার কথা শেষ হয় নি তখনো তটিনী তাঁর মুখে হাত চাপা দিয়ে ব'ললে—"চুপ চুপ ! পুলিশ এসেছে বোধ হয় !"

বাইরের সদর দরজায় ঘন ঘন ঘা' পড়ছিলো তখন। "কে ! কে !" ব'লতে ব'লতে প্রভাসের মা উঠে দরজা খুলে দিতেই চার পাঁচ জন পুলিশ পাহারাওয়ালা, ইন্সপেক্টর, সার্জ্জেণ্ট, বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো।—প্রভাসের মাকে তারা প্রভাসের কথা জিজ্ঞাসা ক'রলে। প্রভাসের মা বললেন—"সে ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে !"

প্রশ্ন হ'ল "কত রাত্রে সে বাড়ী ফিরেছে ?"

প্রভাসের মা কিছু ব'লতে পারে না—চুপ করে থাকে…।

প্রশ্নের সঙ্গে এবার ধমক্ আসে—"কত রাত্রে ?"

প্রভাসের মা নিরুপায়ের মত এবার সুষমার মুখের দিকে চাইলে।

সুষমা ব'ললে—"কত রাত্রে তা তো জানি নি ? আমরা তখন ঘুমিয়ে প'ড়েছি !"

প্রশ্ন—"কে দরজা খুলে দিয়েছে"—

মা ও মেয়ে দু'জনেই চুপ !—পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ইন্সপেক্টার ব'ললে—"এই একটু আগে বাড়ী এসেছে তো ?" সুষমার মা ব'লে উঠলো- "না না ! বাছা আমার অনেকক্ষণ হ'ল বাড়ী ফিরেছে !"

"তবে যে এইমাত্র ব'ললেন আপনারা জানেন না সে কখন্ এসেছে, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ?—

সুষমা ব'ললে—"দাদা বেশী রাত পর্য্যন্ত কখনও বাইরে—থাকেন না। প্রায় নটা দশটার মধ্যেই ফেরেন। আজ আমরা খুব সকাল ক'রে রান্না-খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিলুম বলে—টের পাই নি ?"

"হুঁ ! টের পাওয়াচ্ছি !"—ব'লে ইন্সপেক্টার হুকুম দিলে—"বাড়ীর সব ঘর খুঁজে দেখ কোথায় আসামী শুয়ে আছে, ধ'রে নিয়ে এস তাকে।"

প্রভাসকে ধ'রে নিয়ে আসা হ'ল। প্রশ্ন হল—"কখন কতরাত্রে তুমি আজ বাড়ী ফিরেছ ?"—

প্রভাস ব'ললে—"রাত্রি দশটায় !"

ধমক এলো—"মিথ্যে কথা। প্রমাণ কি তুমি রাত্রি দশটায় বাড়ী ফিরেছো।"

এই সময় প্রভাস বিস্মিত হ'য়ে দেখলে যে তটিনী ধীরে ধীরে সেখানে এসে উপস্থিত হলো এবং গম্ভীর ভাবে ইন্স্পেক্টারকে ব'ললে—"তার প্রমাণ দেব আমি !—কারণ, আমিই ওঁকে দরজা খুলে দিয়েছিলুম !"

পুলিশ ইন্স্পেক্টার হাসতে হাসতে ব'ললে—"বেশ কথা। কিন্তু ইনি যে আবার রাত্রি বারোটার সময় আপনাদের সকলের অজ্ঞাতসারে নিঃশব্দে বেরিয়ে যান নি, তার প্রমাণ কি ? রাত্রি বারোটার পর অমুক থানায় যে বোমা প'ড়েছে—সে যে ইনিই ফেলে এসেছেন আমরা তা জানতে পেরেছি।"

তটিনী তৎক্ষণাৎ এ কথার প্রতিবাদ ক'রে বললে—"সে হতেই পারে না। আপনারা নিশ্চই ভুল ক'রেছেন, কেন না, রাত্রি দশটার পর থেকে এ পর্য্যন্ত আমি ওঁর ঘরেই ছিলুম। উনি কোথাও বেরুন্নি আমি জানি।"

প্রভাস, সুষমা তার মা, ও তটিনীর ঠাকুরমার চোখে-মুখে একটা বিপুল বিস্ময় জেগে উঠল।—ইন্সপেক্টর, ব'ললে—"বেশ, আদালতে গিয়ে একথা ব'লবেন। আপনি যে আপনার স্বামীকে রক্ষা করবার জন্য মিছে কথা ব'লছেন না তার প্রমাণ—

বাধা দিয়ে তটিনী ব'ললে—"উনি আমার—স্বামী নন্।"

এবার ইন্সপেক্টর শুদ্ধ বিস্মিত হলো। কিন্তু, প্রভাসকে পুলিস ছাড়লে না। হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে গেল।

*　　*　　*　　*

তটিনীর সাক্ষ্যে আদালত প্রভাসকে বেকসুর খালাস দিলে। বিচারক কিছুতেই তটিনীর কথা অবিশ্বাস ক'রতে পারলেন না। তিনি তাঁর মামলার রায়ে লিখলেন যে—'একজন হিন্দু-বিধবা কখনই মিথ্যা ক'রে—এত বড় কলঙ্কর বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিতে পারেন না। এই সম্ভ্রান্ত মহিলা যা ব'লেছেন তা নিশ্চয়ই সত্য !'

প্রভাস ফিরে এসে গভীর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ চিত্ত নিয়ে তটিনীর কাছে ছুটে গেল—তাকে শাস্ত্রমতে বিবাহ করবার সাধু প্রস্তাব নিয়ে।

কিন্তু তটিনীকে দেখে সে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হ'য়ে গেল

তটিনী তার কালো চুলের রাশি মুচিয়ে কেটে ফেলেছে! হাতের চুড়ি খুলে ফেলে শুধু হাত ক'রেছে। পেড়ে কাপড় ছেড়ে সে তার ঠাকুরমার থান কাপড় পরেছে!

শুনলে, সেই দিনই রাত্রের গাড়ীতে তাদের তীর্থ-যাত্রার সব আয়োজন ঠিক!

যাবার সময় সে শুধু প্রভাসকে প্রণাম ক'রে বলে গেল - "তোমার পায়ের ধূলা দাও। এতদিন আমি কুমারীই ছিলুম, কিন্তু আয়তি চিহ্নে এ জন্মে আর আমার অধিকার নেই! কারণ দেশাচার মতে আমি বিধবাই! সমাজকে আমি আঘাত ক'রতে চাই নে বন্ধু! সকল আঘাত তাই নিজের বুকেই নিয়ে চললুম।"

সেকালের কথা

[রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর]

সেকালে অর্থাৎ আমরা যখন বালক ছিলাম, সেই সময় পাঠশালায় কি ভাবে অধ্যাপনা হইত, তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ছয় সাত বৎসর বয়সেই বালকগণ পাঠশালায় প্রবেশ করিত। পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিতে অনেক ছাত্রকে ষোল, সতর বৎসর বয়স পর্য্যন্তও অবস্থান করিতে হইত। এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন পাঠ-শালায় বাইশ তেইশ বৎসরের যুবকও অধ্যয়ন করিত। এরা যে বিশেষ স্থূলবুদ্ধি ও অমনোযোগী ছাত্র, তাহা না বলিলেও চলে। পাঠশালার দুষ্ট বালকগণ এই সকল অধিক বয়সের ছাত্রদিগকে নানা প্রকারে উত্যক্ত করিত এবং তাহাদের উল্লেখ করিয়া ঠাট্টা তামাসা করিতে ছাড়িত না।

পাঠশালার ছাত্রদের দেখিলেই চিনিতে পারা যাইত। তাহাদের পরিধানে মসিরঞ্জিত স্বদেশী মোটা জোলার ধুতি। নাকে, মুখে, গালে, হাতে পায়ে বিশেষতঃ-পায়ের দুই হাঁটুতে বহুদিনের সঞ্চিত চিত্র-বিচিত্র কালির দাগ। এখনকার মত বিবিধ নামের সাবান ছিল না। তবে মাঝে মাঝে পিসিমা মাসিমাদের প্রক্ষালনে সেই মলিনতা কিছু কম হইয়া পড়িত মাত্র।

পাঠশালায় প্রত্যেক ছাত্রের বসিবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন থাকিত। তাহার অধিকাংশই নলের চাটাই, পাটীর ছিন্ন খণ্ড, বুনানো ছোট হোগলা, এবং ছালার চট। প্রথম শিক্ষার্থীরা তালপত্রে লিখিত। পাঠশালা ছুটী হইলে তালপাতার গড়া আসনে মুড়িয়া ছাত্রেরা বাড়ীতে লইয়া যাইত এবং পাঠশালায় আসিবার সময় বগলে করিয়া লইয়া আসিত।

তালপাতা লেখা শেষ হইলে অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেরা কলার পাতে লিখিত। কলার পাতা শেষ হইলে বয়স্ক ও শ্রেষ্ঠ ছাত্রেরা কাগজে লিখিত। ইহাদের কাগজ কলম একখানি মোটা পুরাতন কাপড়ের টুক্‌রায় মুড়িয়া বাঁধা হইত। ইহার ডাক নাম ছিল বস্তানি বা দপ্তর। বড় ছাত্রদের এই দপ্তরে দুই একখানি মুদ্রিত পুস্তকও দৃষ্ট না হইত এমন নহে। তাহাদের নাম শিশুবোধক, গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী প্রভৃতি। অধিকাংশ ছাত্রেরা খাগের কলমে লিখিত। লোহার কিংবা পিত্তলের নিব ও কাঠের হ্যাণ্ডেল্ তখন কল্পনার বহির্ভূত ছিল। পেনের কলম ক্বচিৎ কাহারো কাহারো কাছে দৃষ্ট হইত। কালি থাকিত মাটীর কিংবা কড়ির দোয়াতে। কড়ির দোয়াত বলা হইত চিনা মাটীর দোয়াতকে। ছাত্রেরা নিজ হস্তে কালি প্রস্তুত করিত। তাহার উপকরণ ছিল নারিকেলের ছোলা, বাঁশের খোসা, ভাতের হাঁড়ির কালি, লৌহ, হরিতকী-ভাজা চাউলের জল, এই সকল। তন্মধ্যে লৌহ-ভাজা চাউলের জলের কালিই উৎকৃষ্ট হইত।

বাঁশের খোসা ও ছোলা পুড়াইয়া কালি নিম্ন অঙ্গের হইত। ভাতের হাঁড়ির কালি পেষণ করিলে তাহা মধ্যম রকমের হইত। ছাত্রেরা কালি প্রস্তুত করিবার সময় এই গাথা ঘোষণা করিত—

"কালি ঘুটি কালি ঘুটি সরস্বতীর বরে,
যার দোয়াতের ঘন কালি মোর দোয়াতে পড়ে।"

এই সময়ে দেশে ও গ্রামে উৎকৃষ্ট কাগজের প্রচলন হয় নাই। দেশীয় জোলারা এক-প্রকার মোটা কাগজ প্রস্তুত করিত। তাহার দিস্তা ছিল তিন চার পয়সা। পুরী এবং অন্য প্রকারের সাদা কাগজ অল্পবিস্তর পাওয়া যাইত। এই কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিলে ছাত্রেরা নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ করিত।

এখন যেমন রবিবারে বিদ্যালয়ের পাঠ বন্ধ থাকে, তখন সে নিয়ম ছিল না। তখন চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, প্রতিপদ এবং পূর্ণিমা এই চারিটী তিথিতে পাঠশালার কার্য্য বন্ধ থাকিত। এই ছুটীর ভিতরে ছাত্রেরা লিখিবার কালি প্রস্তুত করিত, বন জঙ্গল হইতে খাগের কলম সংগ্রহ করিয়া আনিত; এবং ১০।১২ দিনের উপযোগী কলার পাতা কাটিয়া রাখিত। এই ছুটী আসিলে ছাত্রদের আনন্দের সীমা থাকিত না। পাঠশালার ছাত্রেরা গরমের দিনে দলে দলে মিলিত হইয়া পুকুরে গ্রামের অপ্রশস্ত খালে, ঘণ্টার উপরে ঘণ্টা সাঁতার কাটিয়া, ক্রমাগত ডুব দিয়া এক একজন আরক্ত-নয়ন হইয়া উঠিত পুনরায় আহারান্তে বিকাল বেলা আম, জাম, গাব, বেতফল প্রভৃতি সেকালের ফলের অন্বেষণে অনেক জঙ্গল এবং বাগান পরিভ্রমণ করিত এবং গাছে চড়িয়া ফলাহারে উদরপূর্ণ করিয়া সন্ধ্যা হইলে বাড়ী ফিরিত। শীতের দিনে খেজুর রস, কখন বলিয়া, কখন না বলিয়া নানাভাবে শিয়ালীর (যারা খেজুর গাছ কাটে) অগোচরে পান করিত। "না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়"—তখন এই নীতিবাক্য কেহ কখনো উচ্চারণ করিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। ভাদ্র মাসে নষ্টচন্দ্রের রাত্রিতে চৌর্য্যকার্য্যে কোন অপরাধ নাই, এই বাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া পাঠশালার ছাত্রেরা এবং গ্রামের যুবকেরা একযোগে প্রতিবেশী গৃহস্থের বাড়ী হইতে শশা, কলা, তাল এবং নারিকেল প্রভৃতি অবাধে মহোৎসাহে আত্মসাৎ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে; তাহাতে গ্রামের ভিতরে কিন্তু কোন ফৌজদারী হয় নাই।

এখন যেমন যুবকগণের এম্-এ, বি-এ উপাধি জামাতা-নির্ব্বাচনের অন্যতম সার্টিফিকেট, তখন কিন্তু ছাত্রদের ভিতরে ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক বালকগণের বিবাহ সর্ব্বদাই প্রায় দেখা যাইত। পাত্র-নির্ব্বাচনের উপায় ছিল হস্তাক্ষর এবং মৌখিক অঙ্ক।

এই স্থানে পাঠশালার শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে দুই একটী কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। শিশুদিগকে পাঠশালায় পাঠাইবার পূর্ব্বে হাতে-খড়ি নামে সুন্দর একটী (বিদ্যারম্ভ) অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইত। শিশুদিগের হাতে খড়ি হইয়া গেলে গুরুমহাশয় তাল পাতায় একটী লৌহশলাকা দ্বারা ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণ আঁকিয়া দিতেন। কোন্ অক্ষরের কোন্ স্থান হইতে প্রথম কলম লইয়া কোথায় শেষ করিতে হইবে, গুরুরা তাহা বালকদিগকে হাতে ধরিয়া লিখিয়া শিখাইতেন। গুরুমহাশয় নিজের হস্ত-মুঠের ভিতরে শিশুর কলম-সংযুক্ত হস্ত রাখিয়া লিখিতেন। ইহাকেই হাতে ধরিয়া লেখান বলিত।

পাঠশালার অক্ষর-পরিচয়েরও একটী সুন্দর নিয়ম ছিল। তাহাতে শিশুদের কৌতূহলাক্রান্ত চিত্ত সহজেই অক্ষর-পরিচয় লাভ করিতে পারিত অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষরের পূর্ব্বে এক একটী অদ্ভুত বিশেষণ সংযোগ করা হইত। বিশেষণগুলি সত্যসত্যই অক্ষর সকলের অবয়ব প্রকাশক হইত; যথা—কাকুড়ে "ক" বকা খ, বুকচেরা ঘ, মাথায় পাকড় 'ঙ', বেগুনিয়া 'চ', দুইভাই ছ, দোমাত্রা 'জ', দুইভাই 'ঝ', পিঠে বোচকা 'ঞ', নাইমাত্র 'ণ', হাঁটুভাঙ্গা 'দ', কাঁধেবাড়ী 'ধ', পুটলিয়া 'ন', পেটকাটা 'ব', অন্তস্থ 'ব', পেটকাটা 'য', ইত্যাদি। ক এবং ষ যোগে ক্ষ তাহাও স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হইত।

এই ক খ শিক্ষার পরে ছাত্রেরা তাল-পাতাতেই ফলা, বানান, লিখিত। ফলা এবং বানান লিখন কার্য্য দুটী; ফলাগুলির ভিতরে ব্যঞ্জন বর্গের যত প্রকার বর্ণসংযোগ অথবা যোজনা হইতে পারে তাহাই প্রকাশ করে মাত্র। তাহার মধ্যে এই কয়েকটীর নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—ক্য, ক্র, ক্ন, ক্ল, ক, ক্ব, আক্ব, আক্ষ, সিদ্ধি। এইরূপ ক হইতে হ পর্য্যন্ত প্রতি ব্যঞ্জনের সহিত য, র, ন,

ল, ব, ম, ঋ, এবং রেফ্ প্রভৃতি বর্ণের যোগ করিয়া লিখিতে হইত। বর্ত্তমান সময়ে ইহার বিশুদ্ধ নাম য ফলা, র ফলা, ন ফলা, প্রভৃতি। আঙ্ক আস্ক ফলার ঙ, ঞ, ণ, ম এই কয়েকটী অর্থাৎ বর্গের পঞ্চম বর্ণগুলির যোগে এবং আস্ক ফলার যোগে ব্যঞ্জন ও বিসর্গ-সন্ধির যুক্তবর্ণগুলিই কার্য্যতঃ লিখিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। আঙ্ক ফলার উচ্চারণ যথা ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ম্ন, ঞ্চ, ণ্ড, ঞ্জ, ক্ষ প্রভৃতি। আস্ক ফলা সকল হইতে কঠিনতম বলিয়া কথিত হইত; তাহার দৃষ্টান্ত যথা— স্ক, স্খ, দ্গ, দ্ঘ, শ্চ, শ্ছ, জ্ঞ, ঝ প্রভৃতিরূপে স, দ, শ, ষ, স প্রভৃতি যুক্তবর্ণ শিক্ষার ফলা শিক্ষার এই সময়টা বালকগণের মধ্যে একটী গুরুতর কঠিন শিক্ষার কাল বলিয়া গণনীয় ছিল; আঙ্ক, আস্ক ফলা সহজে ২।৪ মাসের মধ্যে কোন বালক লিখিয়া শিক্ষা করিতে পারিলে তাহার বিশেষ প্রশংসা করা হইত।

ফলা শিক্ষার পরে বানান শিক্ষার অধ্যায়, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যঞ্জন বর্ণ,আকার, ইকার, উকার প্রভৃতি স্বরবর্ণের যোগে বা সাহায্যে কিরূপ উচ্চারিত ও লিখিত হইবে, ইহাই বানান শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা সাহিত্য ব্যাকরণের অস্ফুট প্রকাশ মাত্র। গণিত শিক্ষার জন্য এক হইতে একশত পর্য্যন্ত রাশি লিখনকে শতকিয়া, এককড়া হইতে ৮০ কড়ায় ২০ গণ্ডা লিখনকে কড়ানুকিয়া কহিত। পাঠশালায় তালপাতার অধ্যায়েঃএই লিখন পঠনকালে ক, খ প্রভৃতির বিশেষণের ন্যায় এক দুই রাশি প্রভৃতি হইতে পর্য্যন্ত রাশি শিক্ষার কালেও এক-একটী বিশেষণ অথবা পদার্থের নাম শিখান হইত। তাহাতে অঙ্কের রাশি-পরিচয় সহজে হইতে পারিত। যথা ১ একে চন্দ্র, ২ দুইয়ে পক্ষ, ৩ তিনে নেত্র, ৪ চারে বেদ, ৫ পঞ্চ বাণ, ৬ ছয়ে ঋতু, ৭ সমুদ্র, ৮ অষ্টবসু, ৯এ নবগ্রহ, ১০ দিক্, ১১ এগার রুদ্র, ১২ বৎসর ইত্যাদি।

তাল-পাতায় লেখা শেষ হইলে কলার পাতে লিখিবার নিয়ম ছিল। তাহাতে লোকের নাম লিখনই প্রধান বিষয় ছিল, অর্থাৎ বানান-যোগে ভাষার ভিতরে যত নাম আছে, তাহা লিখিতে গেলে কার্য্যতঃ ভাষা শিক্ষা বা ক্ষুদ্র সাহিত্য শিক্ষার কার্য্যই এই স্তরে চলিত। তাহার পর ছাত্রেরা কড়ানুকিয়া, পণকিয়া, সেরকিয়া এবং ছটাক, মন প্রভৃতি লিখিতে শিখিত। কেবল লিখিলেই হইত না। প্রতিদিন দুইবেলা এই সকল অঙ্কের যোগ-বিয়োগ করিতে হইত। গুণন শিক্ষার জন্য ২০০ শত ঘরের নামতা শিক্ষাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পন্থা ছিল। এই ভাবে এক বৎসর কিংবা ছয়মাস কলার পাতায় লেখা শেষ হইলে বালকদিগকে কাগজ ধরান হইত। কাগজে পত্র-লিখনই অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিষয় ছিল। যাহারা কাগজে লিখিত তাহারা প্রধান ছাত্রমধ্যে পরিগণিত হইত। গুরুজনের কাছে পাঠ লিখন, কনিষ্ঠের কাছে, সমবয়স্কদের কাছে নানা ভাবের পাঠ লিখন শিখিতে। তার পরে কওয়ালা কর্জ্জপত্র প্রভৃতি সংসার-পথের উপযোগী অনেক দলিলাদি লিখন শিক্ষা দেওয়া হইত। পাঠশালার উচ্চ-গণিত বিভাগে কালিকষা, মাসমাহিনা, মনকষা, জমাবন্দী, রোজনামা লিখন, খতিয়ান, তেরিজ লিখন এবং শুভঙ্করী প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহাই পাঠশালার শেষ শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইত। বাস্তবিক পক্ষে এই শিক্ষার বলে এবং নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার প্রভাবে এই পাঠ-শালার অনেক ছাত্র বড় বড় জমীদার-সরকারে তখন নায়েব, আমিন, এমন কি উচ্চ ম্যানেজারের পদ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন।

পাঠশালা সকাল বিকাল দুইবেলা বসিত। ছাত্রগণ পড়িয়া পড়িয়া লিখিত। উপর শ্রেণীর ছাত্রগণ নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণকে তাহাদের লিখিত বিষয়গুলি পড়াইয়া দিত। ইহাতে পাঠশালা সর্ব্বদাই বালকগণের শব্দে মুখরিত হইত। হইত। গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিলেই দূরে থাকিয়া বুঝিতে পারা যাইত, গ্রামে একটী পাঠশালা আছে।

পাঠশালার উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ গুরুমহাশয়ের সহকারী শিক্ষকের কার্য্য করিতেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাল-পাতা, ও কলার পাতায় যাহারা লিখিত তাহারা উর্দ্ধতম ছাত্রের কাছে নিজ নিজ লিখিত বিষয় পড়িয়া লইত। এই পঠন-কার্য্যটী বড় সুন্দর ঝঙ্কারে সম্পন্ন হইত। দুইটী ছাত্র দুইটী খাগের কলম হাতে করিয়া মাঝখানে পঠনীয় পাতা রাখিয়া সমস্বরে সুর করিয়া ফলা বানান এবং কড়া, কাহন প্রভৃতি সমস্ত অধ্যয়ন করিত। দুই দিক হইতে তালে তালে দুইটী কলম একত্রে একই অক্ষরের উপরে নিপতিত হইত। সংযুক্ত বর্ণগুলির উচ্চারণে যেমন খ, ঋ, জ, জ্ব, স্প, স্ফ, ষ, স্ত প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণে যেন একটী মধুর সঙ্গীত ঝঙ্কার উঠিত। পাঠশালার ছুটী হইলে দুইবার

সমস্ত ছাত্র একত্র হইয়া নামতা পড়িত। দুই তিনজন উপর উপর শ্রেণীর ছাত্র বা সর্দ্দার পড়ুয়া কোন এক উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সুর সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন —যেমন এক একে এক, দুই একে দুই, তিন দুগুণে ৬, ৪ দুগুণে ৮ ইত্যাদি, আর ৫০ কি ততোধিক ছাত্র সারি সারি দাঁড়াইয়া এক সুরে তাহার প্রতিধ্বনি করিত! এই মধুর ধ্বনিতে গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিত। কেবল তাহাও নহে; ইহা দ্বারা পাঠশালার ছুটী বিজ্ঞাপিত হইত। এই নামতাকে ডাক নামতা কহিত। ইহা দ্বারা অতি সহজে ২০০ শত ঘরের নামতা অভ্যস্ত হইত। বর্ত্তমান সময়ে দশ ঘরের নামতা অমনোযোগী বালককে শিক্ষা দেওয়া কঠিন হইয়া পড়িতেছে। আজকাল অনেক ছাত্র ১২।১৪ ঘরের নামতার কার্য্য গুণনের সাহায্যে সম্পন্ন করিতে বাধ্য হন। দোকানের হিসাবে একমণ পাঁচসের আড়াই ছটাক অঙ্ক লিখিতে হইলে অনেক কৃতবিদ্য উপাধিধারীকে খাতার এ-পাশ ও-পাশ জুড়িয়া ভাষার সাহায্যে এ লেখা সম্পন্ন করিতে হয়। ইহাতে মুদীর দোকানে মাঝে মাঝে দোকান সরকারদের বেশ একটু আমোদের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই সামান্য পরিচয় হইতে সেকালের পাঠশালার শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি বিবরণ জানিতে পারা যাইবে।

বিবাহের সর্ত্ত

(গল্প)

[শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল, বি-এ]

(১)

সে দিন রবিবার। সুরেশ দিবানিদ্রা শেষ করিয়া সবেমাত্র শয্যার উপর উঠিয়া ধূমপানের আয়োজন করিতেছে, এমন সময় নিভা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাঁহার মুখখানি যেন শ্রাবণের আকাশের মত মেঘাচ্ছন্ন। সুরেশ বুঝিল সে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাই সে চুপ করিয়া থাকাই সমীচীন মনে করিল।

নিভা হতাশভাবে কহিল, "সইকে কি বলব, বল দিকি?"

সুরেশ কহিল, "একেবারে জবাব দিয়েছে?"

নিভা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তা' হ'লে তো ছিল ভাল। হঠাৎ বড়লোক হয়েছে, সোজা জবাব কি দেয়। কিন্তু এতটা দেমাক ভাল নয় তা' বলে রাখছি।"

সুরেশ কহিল, "কি বলেছে শুনি? তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন বস।"

নিভা বিরক্তভরে কহিল, "কিছু ভাল লাগছে না। এ রকমের লোক জানলে কে এর মধ্যে যেত। কিছু নেব না, মেয়েটী পছন্দ হ'লেই হ'ল—তার পর এমন কথা মানুষ যে বলতে পারে, তা আমি ভাবতেও পারি নি। বলে কি না গয়না, বরসজ্জা, যা ইচ্ছে হয় দেবেন না হয় না দেবেন, তবে বাড়ীর আর্দ্ধেক ভাগ লিখে পড়ে দিতে হ'বে। এমন কথা তো কোথাও শুনি নি বাপু!"

সুরেশ বলিল, "সত্যি, এ নতুন কথা বটে! মন্মর তো পয়সার অভাব নেই, তবে পরের বাড়ীর ভাগ নেবার জন্যে এত লোভ কেন?"

নিভা কহিল, "আখেরের ব্যবস্থা করে রাখছেন! ও ব্যবসায় পয়সা কবে আছে কবে নেই, ঠাকুরঝি তা বেশ জানে—আমরা তখন জায়গা না দিলে পয়সা রোজগার করত কোত্থেকে তা দেখতাম। অত দেমাক ভাল নয়, এ পয়সা যেতে কতক্ষণ। তা তো হ'ল, এখন সই এলে কি বলব?"

সুরেশ বলিল, "যা বলেছে তাই বলবে, তা ছাড়া আর কি করবে।"

নিভা কহিল, "তা ঠিক, কিন্তু আমার মাথাটা এতে কি রকম হেঁট হবে তা তো বুঝতে পারছ। ঠাকুরঝি আমায়

নিজের মুখে বলেছিলেন, ছেলের বিয়েতে আমি একটা পয়সাও চাইব না, তাই তো বড় মুখ করে সইকে বলেছিলাম। এখন আমার মুখ থাকবে কোথায় ?"

সুরেশ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "তা হ'লে আজ আর ও কথাটা বল না, আমি একবার যামিনী আর মনুর সঙ্গে দেখা করি, কথাটা তাদের বুঝিয়ে বলি, আমার কথা ঠেলতে পারবে না।"

নিভা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "দেখ একবার চেষ্টা করে, ঠাকুরঝির যে রকম মেজাজ দেখলাম, তাতে তো মনে হয় না তোমার কথা তিনি রাখবেন। সংসারের নিয়মই এই,—উপকারের কথা কি কেউ মনে রাখে। বরং সে কথাটা লোকে ভুলতেই চায়। ঠাকুরঝির এখন পয়সা হয়েছে, সে সব কথা কি আর মনে পড়বে। দুবেলা পেট ভরে খাওয়া জুটত না, মাথা গোঁজবারও জায়গা ছিল না। তখন এইখানে এসেই পড়তে হয়েছে।"

সুরেশ আর কোন কথা বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

(২)

যাহার সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল, সে সুরেশের সহোদরা মনোরমা। প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে যামিনীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। তখন যামিনীর অবস্থা খুব সচ্ছলই ছিল। কলিকাতায় বাড়ী এবং চিনির দালালি করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার হইত। যামিনী আই-এ পাশ করিয়া পিতার কার্য্যে সবে যোগদান করিয়াছিল—মনোরমার পিতাও তখন জীবিত ছিলেন। বৎসর দুই পরে তিনি পরপারে যাত্রা করিলেন। পিতা থাকিতে মনোরমা মাঝে মাঝে পিতৃগৃহে যাইত, এবং কোন বার আট দিন কোন বার বা দশ দিন সেখানে অতিবাহিত করিয়া আসিত, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর এক বৎসরের মধ্যে একটী দিনের জন্যও সে পিত্রালয়ে যাইতে পারিল না। সুরেশ প্রায় আসিয়া তাহাকে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত কিন্তু যাওয়া তাহার আর ঘটিয়া উঠিত না। সুরেশ কত দুঃখ করিত, নিভাননী বলিয়া পাঠাইত, "আমরা ত আর ঠাকুরঝির মত বড়লোক নই, সে আমার বাড়ী আসবে কেন ?"

তারপর যেদিন মনোরমা প্রথম পিত্রালয়ে গেল, সেদিন নিভা তাহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিল, "এতদিন পরে গরীবের বাড়ী পায়ের ধুলা পড়ল ঠাকুরঝি ?"

মনোরমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি করব ভাই বৌদি শ্বশুরের শরীর ভাল না, তাঁর কাছে কাছে সব সময় থাকতে হয়, দুবেলা যা খান, তা আমাকেই রাঁধতে হয়, কি করে আসি বল ভাই। এতদিন পরে তিনি ভাল হ'য়ে উঠেছেন তাই আসতে পেরেছি ভাই।"

নিভাননী কহিল, "তা আমি শুনেছি ঠাকুরঝি, কিন্তু এবার যখন তোমাকে কাছে পেয়েছি, তখন আর শীগগির ছাড়ছি নি। পনর দিনের আগে তুমি কিছুতেই যেতে পাবে না, তা এখন থেকে বলে রাখছি ঠাকুরঝি!"

মনোরমা হাসিয়া কহিল, "পনর ঘণ্টা থাকতে পারলে হয় ভাই বৌদি, তায় পনর দিন।"

নিভাননী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "বল কি ঠাকুরঝি তুমি অবাক করলে ভাই। এত সাধ্যসাধনার পর এলে তো এক বছর বাদে, এসেই যাই যাই। আসুন ঠাকুর-জামাই তার পর বোঝা যাবে।"

মনোরমা কহিল বেশ তো ভাই বৌদি, আমার কি আর থাকতে অসাধ, তাঁকে বলে হুকুম করিয়ে নিও।"

সেদিন রাত্রে যামিনীর সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল। যামিনী আসিতেই নিভা প্রথমেই মনোরমাকে এখানে কিছুদিন রাখিবার কথা পাড়িল—কহিল, ঠাকুরঝিকে এবার আমি কিন্তু এক মাসের আগে যেতে দিচ্ছি না।"

যামিনী হাসিয়া কহিল, "এক মাস কেন, আপনি ছ'মাস রাখুন না, কিন্তু আপনার ঠাকুরঝি না থাকলে যে বাবার একটা দিনও চলে না। মাঝে মাঝে আসবে যাবে তার আর কি।"

নিভা কহিল, "ঠাকুরঝি তা আসে কৈ। এই তো এক বছর পরে, আপনাদের ঘরের গাড়ী রয়েছে, যাওয়া-আসার তো কোন অসুবিধে নেই।"

যামিনী কহিল, "তার আর কি, বেশ তাই হবে।" তবে আর এক কাজ করুন না কেন ? আপনার ঠাকুরঝির আসবার সময় যদি না হয়ে ওঠে আপনিই যাবেন। যে দিন যাবেন বলে পাঠাবেন, গাড়ী আসবে।"

নিভা কহিল, "আমি না হয় গেলুম, তাতে তো আর

ঠাকুরঝির বাপের বাড়ী থাকা হল না। আপনি তাকেও মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দেবেন।"

যামিনী হাসিয়া কহিল, "বেশ তাই হ'বে।"

মনোরমা ও নিভাননী প্রায় সমবয়সী ছিল। সেইজন্য হয় তো উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতাও বেশ জন্মিয়াছিল। তবে মনোরমা দরিদ্রের ঘরে পড়িত তাহা হইলে কি হইত তাহা ঠিক বলা যায় না,—বলা যায় না, এই কথাটা কিন্তু ভুল হইয়া গেল। বরং ইহা বলাই ঠিক হইবে, উভয়ের মধ্যে এ ভাবের প্রীতির সম্বন্ধ একেবারেই স্থাপিত হইত না। বোধ করি সংসারের ইহাই চিরন্তন নিয়ম—ব্যতিক্রম সব কিছুরই আছে, এ নিয়মেরও থাকিতে পারে।

সপ্তাহে একদিন করিয়া সুরেশ ও নিভাননীর যামিনীর বাড়ী নিমন্ত্রণ থাকিত। মনোরমা প্রতিবারই সাধারণের অতিরিক্ত আয়োজন করিত,—সুরেশ এই আতিশয্যের জন্য ভগিনীকে মৃদু ভৎর্সনা করিত; নিভাননী রীতিমত ঝগড়া বাধাইয়া দিত। সে কলহের ভিতর কোন বিষ থাকিত না, কাজেই সকলে তাহা উপভোগ করিত। এই নিমন্ত্রণ ছাড়া আজ বড় একটা মাছ, কাল এক থালা ভাল সন্দেশ, এমনই ধরণের নানা দ্রব্য মনোরমা তাহার দাদা ও বৌদিদিকে পাঠাইয়া দিত। সুরেশও যে মাঝে মাঝে কিছু না পাঠাইত এমন নহে এবং মনোরমাকে তাহাদের গৃহে লইয়া রাখিবার জন্য সুরেশ ও নিভাননী অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিত দুই, একদিন জোর করিয়াও তাহাকে লইয়া যাইত।

এমনই ভাবে দীর্ঘ আট বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। যামিনীর পিতা হঠাৎ একদিন হৃদ্‌রোগে মরণের কোলে আশ্রয় লইলেন। এই আঘাত সামলাইয়া লইয়া যামিনী যেদিন প্রথম কার্য্যে যোগদান করিল, সেদিন কারবারের অবস্থা দেখিয়া সে একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, লোকসানের পরিমাণ এত বেশী যে বাড়ীঘর সমস্ত বিক্রয় করিয়াও তাহা সামলান যাইবে না। স্ত্রী পুত্র-কন্যাদের হাত ধরিয়া তাহাকে পথে বসিতে হইতে হইবে! তাহা ছাড়া, আর কোন পথ নাই! বাজারের যে অবস্থা তাহাতে শীঘ্র যে সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, এমন আশাও তাহার নাই।

এক বৎসর পরের কথা, বাড়ী অপরে ক্রয় করিয়াছে, আজ তাহাদের গৃহ ছাড়িয়া যাইবার দিন। গৃহের মূল্যবান্ দ্রব্যাদি সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সামান্য তৈজস-পত্র যাহা ছিল, তাহাই গুছাইয়া লইয়া মনোরমা হাসিমুখে তাহার স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। কুড়ি টাকার দুইখানি একতলার ঘর ভাড়া করা হইয়াছে, সেইখানে তাহারা গিয়া আশ্রয় লইবে। যামিনীর চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছিল। মনোরমা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া অঞ্চলে চোখ মুছিয়া প্রাণপণ বলে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া সহজ শান্তভাবে কহিল, "গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে চল।"

যামিনী হাত দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, "হাঁ চল, সে বাড়ীতে তোমরা কি করে থাকবে, তাই ভাবছি,—তোমার বাপের বাড়ী গিয়ে উঠলে হ'ত না?"

মনোরমা কহিল, "এখন না, যদি সে রকম অবস্থা হয় ওঠা যাবে। এখন যেখানে যাবার ঠিক করেছ, চল বেরিয়ে পড়ি। আমার গায়ের গয়না গুলো তো এখনও রয়েছে সে টাকা দিয়ে আবার তুমি কারবার করবে। ভগবান মুখ তুলে চান ভাল, না চান তখন যা হয় হ'বে। তার জন্য ভেবে কি হ'বে।" এস, এই বলিয়া পুত্র কন্যাদের হাত ধরিয়া সে অগ্রসর হইল। যামিনী নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল

মনোরমার-জেদে পড়িয়া যামিনী তাহার অলঙ্কার বিক্রয়-লব্ধ অর্থে চিনি কেনা-বেচা আরম্ভ করিল। কিন্তু গ্রহ যাহার প্রতি বিরূপ তাহার আর কোন উপায় থাকে না। একে একে মনোরমার সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় হইয়া গেল, কিন্তু অর্থাগম হইল না। বাড়ী ভাড়া বাকি পড়িতে লাগিল, সংসার চলাও অসম্ভব হইয়া উঠিল।

যামিনী কহিল, "মনু, আর তো কোন উপায় নেই?—ত্রিশটা টাকায় কোন রকমে খাওয়া চলতে পারে, কিন্তু বাড়ী ভাড়া দেওয়া চলে না। আর তো থাকতে দেবে না। এইবার তুমি—সে আর বলিতে পারিল না।

মনোরমা কহিল, "হাঁ তাই যাব।"

যামিনী কহিল, "সেখানে তোমাদের অযত্ন হবে না।"

মনোরমা তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল, "না কোন অযত্ন হ'বে না। বাড়ী ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেল, আমরা কালই সেখানে চলে যাব।"

যামিনী কহিল, "আমি তিন দিনের সময় নিয়েছি-

মাইনের ত্রিশটে টাকা পরশু পাব, আর বাকি গোটা কুড়ি টাকা সেটা এক রকম করে জোগাড় করে দেব। দিন চারেক পরে আমরা যাব। হঠাৎ গিয়ে ওঠাটাও ভাল দেখাবে না,—তোমার দাদাকে আজ বলে রাখব 'খন।"

মনোরমা নিঃশব্দে কি যেন ভাবিল, তারপর কহিল, না "থাক্, খবর দেবার দরকার নেই। আমরা একেবারে গিয়ে উঠ্‌ব।"

কেন যে সে একথা বলিল, যামিনীর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে আর কোন কথা বলিল না। কোনখানে আশ্রয় লইতে হইবে তো? স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পথে তো দাঁড়াইতে পারে না। শুধু একটু আশ্রয়—ত্রিশটা টাকায় দুমুঠা ভাতের সংস্থান তো হইবে, শ্যালকের গলগ্রহ তো হইতে হইবে না। সত্যই দুই সংসার সুরেশবাবু একাই বা চালাইবেন কি করিয়া?

মনোরমা বেশ সহজ ভাবে কহিল, "তুমি অত ভাবছ কেন বল দিকি? বাপের বাড়ী কি কেউ থাকে না। কত লোক এমন দুমাস ছমাসও থাকে। সেখানে যায়গারও তো অভাব নেই, দাদাও আমার গরীব নয়। তা ছাড়া সে সব কথা ভেবেও তো লাভ নেই, থাকতেই যখন হবে।"

দিন চারেক পরে মনোরমা সংসার তুলিয়া দিয়া তাহার দাদার গৃহে গিয়া উঠিল। নিভাননী সমাদর করিয়া কহিল "এস ভাই ঠাকুরঝি! ওঁকে রোজই বলি তোমায় নিয়ে আসতে, তা এমন কাজের চাপ পড়েছে যে সময়ই করে উঠতে পারছেন না। তুমি আপনি এসেছ ভালই হয়েছে। ঠাকুর জামাই কোথায় বাইরে বুঝি। যাই ডেকে নিয়ে আসি।"

তাহাকে আর ডাকিতে যাইতে হইল না। যামিনী জিনিস-পত্র লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল গৃহস্থলীর খুঁটিনাটী দ্রব্যাদি দেখিয়া নিভাননী নির্ব্বাক-বিস্ময়ে সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

মনোরমা হাসিয়া কহিল, "অমন করে কি দেখছ বৌদি! হাঁ, তোমায় এখনও বলা হয় নি, আমরা বাসা তুলে এখানে থাকতে এসেছি।"

নিভাননী কথাটা পরিহাস বলিয়া গ্রহণ করিল। তাহার মনটাও অনেকখানি হাল্কা হইয়া গেল। সেও হাসিয়া কহিল, "সে তো ভাল কথাই ঠাকুরঝি,—কিন্তু তুমি কি তা থাকতে পারবে ভাই।"

মনোরমা কহিল, "এত আর পরের জায়গা নয়, কেন পারব না। আমার এ তো বাপের ভিটে,—থাকলে দোষ কি। তোমাদের তো ঘরের অভাবও নেই।"

নিভাননীর মুখখানি সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। সে হঠাৎ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

মনোরমা এইবার গাঢ়কণ্ঠে কহিল, "থাকতেই যে হ'বে বৌদি। বাড়ী ভাড়া দেবার মত অবস্থা যে আর নেই, ত্রিশটা টাকা মাইনে পান, বুঝতে পারছ, এতে কোন রকমে দুমুঠো খাওয়া চলে না। তোমার তো ঘর পড়ে রয়েছে বৌদি, একটায় আমরা থাকব,—তাই ঠিক করেই বাড়ী ছেড়ে দিয়ে এসেছি।"

নিভাননী ঢোঁক গিলিয়া কহিল, "এখানে থাকতে পারবে, কষ্ট হ'বে না ঠাকুরঝি?"

মনোরমা মৃদু হাসিয়া কহিল, "বাপের বাড়ী কুড়ে ঘর হলেও সেখানে থাকতে কারুর কষ্ট হয় না বৌদি। এ তো রাজপ্রাসাদ। তা ছাড়া কষ্ট হবার দিন এখন চলে গেছে বৌদি। কষ্টই বা হ'তে যাবে কেন? তোমার আশ্রয়ে থাকব যখন কষ্ট কিসের?"

নিভাননী আর কিছু বলিল না। বলিবার মত কোন কথা হয় তো সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

সে কিছু বলুক আর না বলুক, মনোরমা সেখানে রহিয়া গেল। পূর্ব্বে যখন সে নিজে পিতৃগৃহে বেড়াইতে আসিত বা নিভা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিত, তখন নিভারই সজ্জিত গৃহে তাহার বাসের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কিন্তু এইবার তাহার বাসের জন্য অপর একটী কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইল। নিভা যদি একবার মুখ ফুটিয়া বলিত, "ঠাকুরঝি তোমরা আমার ঘরেই শুয়ো", তাহা হইলে মনোরমা তখনই বলিয়া দিত, "না বৌদি, ও ঘরে আমরা কেন শোব, দুদিনের জন্যে আসতাম সে আলাদা কথা ছিল, কিন্তু এখন আমরা এখানে থাকতে এসেছি—কতদিন থাকতে হবে তারও কোন স্থিরতা নেই—আমরা এমন একটা ঘরে থাকতে চাই, যে ঘরটায় থাকলে তোমার বিশেষ কোন অসুবিধে না হয়।"

কিন্তু হায় নিভা মৌখিক আপ্যায়িতটুকুও করিল না! মনোরমা তাহার অপেক্ষাও করিল না, একটী ঘরে অদরকারী

কতকগুলা দ্রব্য থাকিত, সেইগুলি কক্ষের একপাশে সাজাইয়া রাখিয়া মনোরমা ঘরটীকে বাসের উপযুক্ত করিয়া লইল। নিভা তাহা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল, কোন কথা বলিল না, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াও আসিল না।

রাত্রে যামিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "এখানে তো এনে ফেললাম, কিন্তু থাকতে পারবে মনু ?"

মনোরমা চোখ তুলিয়া একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, তারপর গাঢ়কণ্ঠে কহিল, "পারাপারির কথা তো আর নেই, এখন যে থাকতেই হবে, এ আমার বাপের ভিটে, এখানে মান-অপমান আমার কিছু নেই, কিন্তু তুমি কি করে—"তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

যামিনী গভীর স্নেহে তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া কহিল, "তোমরা যদি পার মনু, আমিও পারব। দুদিন পরে না হয় একটা হোটেল দেখে নেওয়া যাবে।"

মনোরমা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "না না তা হবে না, তোমাকে এখন আমি কিছুতেই কাছ ছাড়া করতে পারব না। তুমি যদি না থাক, আমিও এখানে থাকব না। আর তুমি তো এমনই থাকছ না, মাসে মাসে খরচ দেবে।"

যামিনী চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

দিন চলিতে লাগিল। পাচক বিদায় হইয়াছে, মনোরমা এখন রন্ধনশালার ভার লইয়াছে। অবশ্য এ ব্যবস্থা মনোরমা নিজেই করিয়াছে। দুই বেলা রাঁধে, বাড়ীর সব কাজকর্ম্ম করে, নিভাকে একটী কুটা পর্য্যন্ত নাড়িতে দেয় না, নিভার ছেলে-মেয়েদের নাওয়ায়, খাওয়ায় ধোয়ায় তাহাদের যাহা কিছু দরকার নিভা বলিবার পূর্ব্বে তাহা সে করিয়া রাখে। কিন্তু সে নিভার মন পায় না। মাসে পঁচিশ টাকা করিয়া দিবে স্থির হইয়াছে, তবুও নিভা তাহাকে শুনাইয়া পাঁচজনকে এই রকমের কথা বলে, "এই দেখদিকি, আবার ঠাকুরঝির সংসার এসে পড়ল ঘাড়ে,— কি করে সামলাই তার ঠিক নেই। একা মানুষের রোজগার। এতই বা পারেন কোত্থেকে।" মনোরমা চুপ করিয়া শুনিয়া যায়। অতি কষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলে। বুকের ভিতরটা সজোরে আন্দোলিত হইয়া উঠে।

পরের মাসের তিন তারিখে মনোরমা যখন পঁচিশটা টাকা নিভার হাতে দিতে গেল, তখন নিভা হাত পাতিয়া টাকা কয়টী লইল কিন্তু টিপ্পনী করিতেও ছাড়িল না, কহিল, "টাকা তো দিলে ঠাকুরঝি, কিন্তু এতে জাতও যাবে, পেটও ভরবে না। না নিলে চলে না, তাই নেওয়া—তুমিই দু'দিন পরে বলতে ছাড়বে না,—এমনই থাকতে কি দিয়েছিল, রীতিমত পয়সা দিয়ে তবে থেকেছি। পাঁচজনে মনে করবে এটা আমাদের ব্যবসা। যাক, ও সব কথা বলেই বা এখন কি ফল। থাকতে যখন দিতেই হবে।"

মনোরমা মনের আঘাত চাপিয়া কহিল, "সে ঠিক কথা বৌদি, - আমাদের তো পথে বার করে দিতে পারবে না— থাকতেও দিতে হবে, দুটো খেতেও দিতে হবে। আগেও তো তোমার বাড়ী এসে কত খেয়ে গেছি বৌদি।"

নিভা মনে মনে খুসী হইয়া বলিল, "সে কথা তোমার মত ক'জনে স্বীকার করে ঠাকুরঝি।"

এমনই ভাবে মাস তিনেক কাটিয়া গেল। মনোরমা প্রফুল্লমুখে সব সহ্য করিয়া যায়। নিভা প্রথম প্রথম দিন পাঁচ-সাত যামিনীর খাওয়ার সময় কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, এখন আর দাঁড়ায় না, যামিনী কখন খায় তাহার সংবাদ পর্য্যন্ত রাখে না। আগে সে আর মনোরমা এক সঙ্গে খাইত, এখন সে আলাদা খাইয়া উপরে চলিয়া যায়, মনোরমা সমস্ত কাজ সারিয়া আহার করে। সুরেশ ও ভগিনী বা ভগিনীপতির কোন খোঁজ খবরই রাখে না। রাখিবার বোধ করি কোন আবশ্যকতাও বোধ করে না,— খাইতে-থাকিতে দিয়াছে ইহাই হয় তো সে যথেষ্ট মনে করে। এই ভগিনী এবং ভগিনীপতিকে কিছুদিন পূর্ব্বেও কত সাধ্য-সাধনা করিয়া এই গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে, একদিনের বেশী দুই দিন রাখিতে পারে নাই বলিয়া কত দুঃখ করিয়াছে। আর আজ ?

সেদিন নিভা মনোরমাকে কহিল, "আমার ছোট বোন আর ভগিনীপতি কাল বিদেশ থেকে আসচেন, এখানে এসেই উঠবেন। দিন দশ পনর থাকবেন, তাঁদের গোটা দুই ঘরের দরকার। ওপরে ত আর ঘর নেই, সে কদিন তোমায় নীচের ঘরেই থাকতে হবে ঠাকুরঝি। আজ খাওয়া-দাওয়ার পর তোমার জিনিস পত্তরগুলা সব নামিয়ে নিও।"

মনোরমার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। এ বাড়ী তো তাহারই পিতার। পিতা বাঁচিয়া থাকিলে এমন কথা কি

পরের মেয়ে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত। কোন রকমে যন্ত্রণা চাপিয়া সে কহিল,—"তাই হ'বে বৌদি।"

নীচের ঘরটীতে আলো-বাতাসের বড় বেশী সম্পর্ক ছিল না। সেই ঘরেই মনোরমাকে থাকিতে হইল। উপায় যে নাই। মাথা গুঁজিবার মত স্থান যে তাহার আর কোথায় নাই।

যামিনীর রাত্রির আহার শেষ হইলে, মনোরমা বাষ্প-রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আজ নীচের ঘরে আমাদের বিছানা হয়েছে!"

যামিনী কহিল, "ও আজ যে কুটুম এসেছে।"

মনোরমা হাসিয়া কহিল, "হাঁ বৌদির বোন আর ভগিনীপতি, দাদার নয়। যাও শোও গে, আমি যাচ্ছি।"

মনোরমার এই হাসি যামিনীর বুকে শেলের মত বিঁধিল। সে টলিতে টলিতে তাহার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল।

দিন ষোল পরে নিভার ভগিনী চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে উপরের ঘরটায় চাবি পড়িল। মনোরমা তাহা দেখিল। কোন কথা বলিল না। নিভাই অবশেষে বলিল, "দেখ ঠাকুরঝি, ও ঘরটা না হইলে আমাদের চলে না—নীচের ঘরে তো তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না, এতদিন থেকে তো দেখলে খারাপ নয়। এমন ঘরেই বা কজনে থাকতে পায়।"

মনোরমা সারা দেহে যেন বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করিল। তাহার ক্ষুব্ধ অন্তর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। হা ভগবান! কিছুক্ষণ সে কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল বলিয়া ফেলে, এ বাড়ী তোমার বাবার নয়, আমার বাবার। কিন্তু সে যে কন্যা হইয়া জন্মিয়াছে এ কথা বলিবার অধিকার তাহার কোথায়? এত বড় কথা বলিলে, হয় তো তাহাকে আশ্রয়চ্যুত হইতে হইবে। থাক, নিজেকে কতকটা সংযত করিয়া লইয়া সে কহিল, "একটু আশ্রয় পেলেই হ'ল বৌদি আর কিছু আমরা চাই না। ওপর আর নীচে আমার পক্ষে এখন সবই সমান।"

নিভা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "তা রাগ করলে কি করব. ঠাকুরঝি,—বার মাস ত ওপরের একটা ঘর ছেড়ে দিলে আমাদের চলে না এটা ত তুমি বুঝতে পার।"

মনোরমা আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। কম্পিত-কণ্ঠে কহিল, "খুব পারি বৌদি, খুব পারি। যাদের মাথা গোঁজবার ঠাই নেই, তাদের পক্ষে ঐ নীচের ঘরই প্রাসাদের তুল্য।" এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল।

ইহারই দিন পনর পরে হঠাৎ যামিনীর উপর ভাগ্য-দেবতা প্রসন্ন হইলেন। তাহার এক পিতৃবন্ধু দালালী কারবারের তাহাকে শূন্য অংশীদার করিয়া লইলেন। এই শুভ সংবাদ যখন মনোরমা শুনিল, তখন সে একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লইল। যেন সে এই কান্না দিয়া অন্তরের পুঞ্জীভূত যাতনা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে চায়।

কান্না থামিলে মনোরমা কহিল, "তা হ'লে কবে বাড়ী ভাড়া করবে?"

যামিনী কহিল, "বাড়ী একটা ঠিক করেই এসেছি। দোতলা বাড়ী, পঞ্চাশ টাকা ভাড়া। বেশ খোলা। কালই উঠে যাব ঠিক করেছি। সংসারের খরচের জন্য তিনি আমায় পাঁচশ টাকা দিয়েছেন। এই নাও সেই টাকা।"

মনোরমা কম্পিত হস্তে নোটগুলি ধরিল। সে আজ কতদিন, এতগুলা নোট একসঙ্গে হাতে করে নাই।

পরদিন প্রাতঃকালেই তাহারা নূতন বাড়ীতে গিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে বৎসর পাঁচ সাতের মধ্যে তাহারা পূর্ব্ব সম্পদ আবার ফিরিয়া পাইল। বাড়ী গাড়ী কিছুরই অভাব রহিল না। তাহা ছাড়া ব্যাঙ্কে নগদ টাকার পরিমাণও যথেষ্ট হইল। ভাগ্যদেবতা যখন প্রসন্ন হন, তখন চারিদিকে লক্ষ্মীশ্রী যেন উপচাইয়া পড়ে। যামিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, এম-এসসি, পরীক্ষায় রসায়নে প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করিল। সেই পুত্রের বিবাহের কথা লইয়া সুরেশ ও নিভাননীর মধ্যে আলোচনা চলিয়াছিল।

(৩)

পরদিন আপিস হইতে বাড়ী না গিয়া সুরেশ মনোরমার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। যামিনী বাহিরের ঘরে বসিয়াছিল, তাহাকে সেইদিকে আসিতে দেখিয়া নিজে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে মহা সমাদর করিয়া

নিজের চেয়ার খানিতে বসাইয়া কহিল, "বসুন দাদা বসুন।" তারপর ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিল, "যারে তোর মা ঠাকরুণকে বলে আয়, দাদাবাবু এসেছেন।"

এরূপ খাতির যত্ন করা যামিনীর নিত্যকার অভ্যাস। কাজেই সুরেশ ইহাতে কোনরূপ অস্বস্তি বোধ করিল না। চেয়ারে বসিয়া জুতাটা খুলিয়া হাসিয়া কহিল, "তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি হে যামিনী।"

যামিনী কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "ও রকম কথা আপনি বলবেন না দাদা। কি করতে হ'বে বলুন।"

সুরেশ কহিল, "মনু আসুক, তারপর বলব।" রজনীর আর কোন সম্বন্ধ এল ?

যামিনী কহিল, "সম্বন্ধ তো রোজই আসছে সবই প্রায় বড় লোকের বাড়ীর, পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকার কম কেউ বলে না। দুইটী মেয়েও দেখে এসেছি বেশ ভাল মেয়ে।"

সুরেশ কহিল, "কাউকে কথা দিয়াছ না কি ?"

যামিনী কহিল, "না কথা এখনও কাউকে দিই নি।"

এমন সময় মনোরমা কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়া সুরেশের পদধূলি গ্রহণ করিল। তার পর কহিল, "আগে মুখে হাতে জল দিয়ে নাও দাদা আমি ঠাকুরকে জলখাবার আনতে বলে এসেছি।"

সুরেশ কহিল, "যাচ্ছি, তার জন্যে এত তাড়া কিসের। আমি এসেছিলাম জানতে কি ঠিক করলে ? মেয়ে তো তোদের পছন্দ হয়েছে, আর মেয়ে সত্যই সুন্দরী। তারা তো কেবলই আমার বাড়ী হাঁটা-হাঁটি করছে, যখন দেনা-পাওনার কথা নেই, তখন ঠিক করে ফেললেই তো হয়।"

মনোরমা কহিল, "দেনা-পাওনার কথা নেই, এটা ঠিক নয় দাদা। আমার একটা সর্ত্ত আছে, ঠাকুরঝিকে তো তা বলে দিয়েছি—তাতে রাজি হ'লে আমার আর কোন আপত্তি নেই; আরও তো অনেক সম্বন্ধ আসছে কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে একটা জবাব না পেলে ত কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারি না। বৌদির সইয়ের মেয়ে। যাকৃগে দাদা, সে সব কথা পরে হ'বে'খন। হাত মুখ ধুয়ে নাও লুচিগুলা সব জুড়িয়ে যাবে।"

সুরেশ আর কিছু না বলিয়া হাতমুখ ধুইবার জন্য উঠিয়া গেল। জলযোগান্তে যামিনীকে কহিল, "মনু ও সব কি ছেলেমানুসী করছে,—যার ছেলে রয়েছে সে কি আদ্দেক বাড়ী মেয়েকে কখনও লিখে দেয়, না দিতে পারে ? এই তো আরও পাঁচ জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসছে—ও কথা শুনলে কেউ রাজি হ'বে না। এ আমি তোমায় বলছি।"

যামিনী কহিল, "আমাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলা বৃথা। আপনার বোনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কথা বলতে পারব না। পান আনতে গেছে, এখনই আসবে, তাকে বুঝিয়ে বলুন। অন্যায় হ'লেও সে মেনে নেবে।"

মনোরমা পান লইয়া উপস্থিত হইয়া সুরেশের সম্মুখে পানের ডিবাটী রাখিয়া দিল।

একটী পান তুলিয়া লইয়া সুরেশ কহিল, "তোর বৌদিদিকে ও সব কি বলেছিস ? এ কি কেউ কখনও করে,—আদ্দেক বাড়ী কি কেউ লিখে দেয়।"

মনোরমা কহিল, "কেন দেবে না দাদা,—ছেলে মেয়েকে যে সমান চোখে দেখে সেই দেবে।"

সুরেশ কহিল, কহিল, "পৃথিবীতে যা চলে আসছে তাই চলবে, না তোর জন্যে সব উল্টে যাবে।"

মনোরমা কহিল, "সইয়ের কথা আমি কি করে বলব দাদা—তবে আমার নিজের কথা আমি এই বলতে পারি, এই এক সর্ত্ত ছাড়া আমি ছেলের বিয়ে দেব না। বৌদিদি সইকে যদি বলে কয়ে রাজী করাতে পারেন, তা হ'লে এই মাসেই বিয়ে দেব।"

সুরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল, "তার ছেলে রয়েছে, ও রকম সর্ত্তে সে কখনও রাজি হয়। না তাকে আমি অমন কথা বলতে পারি। যাহ'ক একটা মিথ্যে করে বলতে হবে।"

মনোরমা কহিল, "মিথ্যে করে বলতে যাবে কেন দাদা। আমি যা বলেছি তাই তাঁদের বল রাজি হবেন না। এমন তো কোন কথা নেই।"

সুরেশ কহিল, "যা তা কথা অমনই বল্‌লেই হ'ল। সে আমি পারব না। এই তো তোর মেয়েও বড় হয়েছে কেউ যদি এ বাড়ীর ভাগ চেয়ে বসে তুই দিতে রাজি হ'বি।"

মনোরমা কহিল, "নিশ্চয়ই হ'ব। তা ছাড়া চাইতে হ'বে না দাদা। পরের বাড়ী মেয়ে এসে যে আমার মেয়েকে এ বাড়ী থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে, তা আমি করতে দেব না। আর আমি যাকে বৌ করে আনব বাপের বাড়ীতে যাতে সে দলিলের জোরে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা না ক'রে আমি ছেলের বিয়ে দেব না। তুমি বৌদিকে এ কথাটা বুঝিয়ে বল দাদা।"

সুরেশ নিঃশব্দে নতমস্তকে বসিয়া রহিল।

আঁখি-জলধি

[শ্রীসুকুমার সরকার]

ও আঁখি-জলধি-কালো তরঙ্গে
একি চঞ্চল লীলা ;
কভু মন-ভোলা ক্ষীণ বিদ্যুৎ
কভু নিষ্প্রাণ শিলা !
হৃদয়ের তীর জানো না কি মোর
শারদাকাশের মত ;
দোষ শুধু তার সহজে সে ভোলে
সারল্যে অবনত !
বোঝেনা চোখের চকিত ছলনা
চরণের চারু চলা ;
কেমন পরশে কখন কি ক'রে
না-বলা কথারে বলা !
ও সাগরে তব বিষ থাকে যদি
যদি বা অমৃত থাকে ;
একটীবারের চাহনিতে কেন
মথিয়া তোলোনা তাকে
নরক না হয় নন্দন-বন
যাহাই দাওনা কেন ;
মিনতি আমার দয়া ক'রে তারে
একবারে দিও যেন !

———

দমকা হাওয়া

(উপন্যাস)

[শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]

—সাত—

সন্ধ্যারতি শেষ করিয়া স্বামীজী তাঁহার আশ্রমে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইবার জন্য আসন গ্রহণ করিতেই আজিকার সকালের ঘটনা হঠাৎ তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। বীণার কথাগুলি কাণের মধ্যে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি আত্মভোলা হইয়া গেলেন।

সম্মুখে খোলা যায়গায় গোলাপ-গাছে ফুলিগুলি সুগন্ধ বিস্তার করিয়া প্রাণ মাতাইয়া তুলিতেছিল, পশ্চাতে পুণ্যতোয়া সুরধুনী কুল কুল করিয়া ব্যাকুল প্রাণে ছুটিয়া চলিয়াছিল।

স্বামীজীর আশ্রমের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না। এক-খানি মাত্র মাটীর র, খখড়ের চালা, আশে-পাশে পাঁচ ছয় খানি গৃহ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি বুকে লইয়া পড়িয়া আছে। মাধব রায় যখন জীবিত ছিলেন তখন এই আশ্রমটাকে পাকা করিয়া দিবার জন্য অনেক-বার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু এ কথায় স্বামীজী হাসিমুখে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে উত্তরে বলিয়াছিলেন, আমার এই মাটীর ঘরে যে ঐশ্বর্য্য লুকান আছে, মাধব ইমারত হ'লে সেটা মলিন হ'য়ে পড়বে। করালী মার মন্দিরে পূজারীর জাঁকজমকের কিছু প্রয়োজন নাই।

একথার পর মাধব আর এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে সাহস পান নাই।

ইহার পর স্বামীজী একবার ফুটন্ত ফুলগুলির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া পরক্ষণে ভাগীরথীর দিকে ব্যগ্রভাবে চাহিয়া দেখিলেন; তার পর ঊর্দ্ধে পূর্ণ চন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—দেখিলেন যেন তাহার ভিতর হইতে গলিত রৌপ্যের ধারা পৃথিবীর বুকের উপর, গাছের পাতায়, জলে স্থলে প্রতি ধূলিকণায় ঝরিয়া পড়িতেছে।

তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন।

কিন্তু এ তন্ময়তা তাঁহার অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। প্রাতঃকালের ঘটনা তাঁহার তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া দিয়া মনটাকে কেমন বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। সত্যই কি এই সব নবাগত প্রজাদের নির্ভয়ে বাস করিবার জন্য মার রাজ্যের কতকটা স্থান ছাড়িয়া দেওয়ার মানে অত্যাচারী শয়তান দের দল পুষ্ট করিবার সুযোগ দিতেছেন ?...মার রাজ্য কি দানবের লীলা-ক্ষেত্রে পরিণত হইল ?...না—না, তাও কি হয় ?

তখনই বীণার কথাটা মনের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখা দিল। হয় তো সেইটাই সম্ভব, তাহা না হইলে সকলেই সলিলকুমারের জমিদারী হইতে আসিবে কেন ?...তাহাই যদি হয়, তবে ষড়যন্ত্রকারী কে ? মহানন্দ না সলিল-কুমার—না উভয়েই ?

সন্ন্যাসীর উদার প্রাণ আজ সন্দেহ-মসী-লিপ্ত হইল।

ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে মহানন্দের নাম মনে হইতেই কেমন তিনি অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। যে মহানন্দকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসেন, নিজের অবর্ত্তমানে যাহাকে করালীমার পূজারীর আসন দিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেও তাঁহার প্রাণের মধ্যে জ্বালা দেখা দিল।

আর যদি সলিলকুমারেরই কোনও ষড়যন্ত্র হয় ? তাহার উদ্দেশ্যই বা কতখানি সফল হইবার সম্ভাবনা ?

হঠাৎ চালাঘরখানা হইতে গাভীটা ডাকিয়া উঠিল—হাম্বা!

স্বামীজী দাবা হইতে বলিলেন,—কি মা ?

গাভীটা পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

শিবানন্দ চালা-ঘরে উঠিয়া গেলেন। তাঁহার আশ্রমের ভিতর এই গাভীটা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। ইহার চীৎকার তিনি অবহেলা করিতে না পারিয়া তাহার মুখে গায়ে হাত

বুলাইতে বুলাইতে ভাবিতে লাগিলেন, জমীদারির এই সমস্তার সমাধান তিনি কি করিয়া করিবেন।

একবার মহানন্দের সহিত এই বিষয়ের কথা কহিবার জন্ত আকুল আকাজ্ঞা তাঁহার মনের মধ্যে উদয় হইল। কিন্তু সেটাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না, কারণ আজ কয়েকদিন হইল মহানন্দ গুরুদেবের আশ্রমে গিয়াছে।

তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া পরাণ আসিয়া ডাকিল—'বাবাঠাকুর!'

চালাঘর হইতেই উত্তর দিলেন—'কে, পরাণ?'

তাঁহার পদধূলি লইয়া পরাণ বলিল—'মার সেবা হচ্ছে?'

সহাস্তকণ্ঠে শিবানন্দ বলিলেন—'ছেলের জন্তে মনটা বোধ হয় কেমন করছিল, তাই মা আমার না ডেকে থাকতে পারলেন না, ছ'চার বার ডাক দিল। যা'ক এ সময় তুমি এসেছ ভালই হয়েছে; চল দেখি বাবা, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

উভয়েই পুনরায় দাবায় আসিয়া বসিলেন,···সম্মুখে সেই জ্যোৎস্নাস্নাত প্রস্ফুটিত গোলাপের হাসিমুখ।—পরাণ বলিল—'কাল একবার গরীবের কুঁড়েতে যে পায়ের ধুলা দিতে হবে, বাবাঠাকুর।'

"কেন পরাণ?"

'বৌটার অসুখ করেছে, বড় ডাক্তার আনবার কথা অনেকবার বলছি কিন্তু কিছুতেই রাজী হচ্ছে না, ব'লে আপনি গিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে পায়ের ধুলো দিয়ে এলেই সেরে যাবে।'

স্মিতহাস্তে স্বামীজী বলিলেন,—'এতখানি বিশ্বাস যখন তাঁর তখন যেতেই হবে, বাবা—আমি কাল সকালেই যাব।'

উৎফুল্ল প্রাণে পরাণ আর একবার তাঁহার পদধূলি লইল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। তার পর প্রথমে স্বামীজী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। কি ভাবিয়া তিনি বলিলেন—'এইবার কিছুদিনের জন্য তোমাদের ছেড়ে যেতে হ'বে পরাণ!'

ব্যগ্র-চঞ্চল কণ্ঠে পরাণ বলিল,—'সে কি, বাবাঠাকুর?'

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন,—'জীবনের শেষ দিকটায় এসে পৌঁছেছি, অদৃশ্য হস্ত কখন যবনিকা টেনে দেবে। তাই মনে করছি তীর্থকটা ঘুরে আসি। মহানন্দ যখন তোমাদের কাছে রইল তখন অসুখী তোমরা কেউই হবে না।'

জড়িত কণ্ঠে উৎকণ্ঠিত পরাণ বলিয়া উঠিল,—'তাও কি হয়, বাবাঠাকুর? তুমি আর তিনি স্বর্গ আর পাতাল তফাৎ। তবুও তোমার গুণ, তোমার যশ আমরা সবাই গেয়ে বেড়াই। আমাদের রাজা ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মা দয়া করে তেনাকে এখানে দয়া ক'রে এনেছেন। রাজারই মত সকলকার সুখ-দুঃখের খোঁজ লওয়া, কারও অসুখের খবর পেলে তার শিয়রে ব'সে সেবা করা, এসব শুধু মায়ের দয়াতে ঘটেছে, বাবাঠাকুর। তেনার গুণের কথা শুনে আশ্চর্য্য হবেন, মধু যখন বৌটাকে ছেড়ে দিয়ে ঐ কালী জেলেনীর ঘরে ধন্না দিচ্ছিল, তখন মধুর বৌ বাবাঠাকুরের পায়ে আছড়ে পড়ল। সেইখানে ব'সেই তিনি কি তুকতাক করলেন, আর সেই দিন রাত্তিরেই মধু যে বাড়ী ফিরে এল সে আর বাড়ীর বার হয় না। দিব্বি খাটছে খুটছে। দুই স্বোয়ামীছিরিতে কেমন সুখে ঘর-কন্না করছে।'

আজ সকাল হইতে কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিবানন্দের অন্তরের মধ্যে সন্দেহের যে কাল মেঘ উঠিয়াছিল, পরাণের এই কথায় সেটা একেবারে উড়িয়া গিয়া মেঘমুক্ত আকাশ আবার রবির কনক কিরণের সোনালি আভা ঝিকমিক করিয়া উঠিল,—মহানন্দও সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর প্রাণ কলুষ কালিমায় ভরা হইবে কেন? বীণামার সন্দেহ হয় তো অমূলক, না হয় ইহার মধ্যে সলিলকুমারের হস্তই অলক্ষ্যে কার্য্য করিতেছে। পরাণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আচ্ছা পরাণ, যেসব নূতন লোক তোমাদের মাঝে এসে বাস করছে তারা তোমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে?'

পরাণ কহিল—'এমন খারাপও কিছু দেখি নি বাবা, আর সে ব্যবহার করবার সুবিধেই বা পাবে কোত্থেকে?'

আপন মনেই শিবানন্দ বলিলেন, 'তাও বটে।'

পরাণ বলিতে লাগিল—'মহানন্দ ঠাকুর অনেক সময়ই তাদের কাছে থেকে এখানে লোকের সঙ্গে মিলেমিশে কি

ক'রে বাস করতে হয় তা শিখিয়ে দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে এই সব লোকেদের জড় ক'রে ফাঁকা নিরালা বায়গায় নিয়ে কত সব উপদেশ দিয়ে আসেন—'

কিসের একটা সন্দেহ পুনর্ব্বার স্বামীজীর উদার প্রাণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, বলিলেন,—'ফাঁকা যায়গায়—কেন? একথা তো এতদিন শুনি নি?'

একথার উত্তরে পরাণ কোনও কথা বলিল না বা বলিতে পারিল না।

অনুচ্চ কণ্ঠে স্বামীজী আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলেন,—'সকালের সেই সব আলোচনা. ফাঁকা যায়গায় এই সব লোকদের পরামর্শ দান—'

একটু বিস্মিত ভাবে পরাণ জিজ্ঞাসা করিল,—'তাঁর সম্বন্ধে? আজ আপনার কি হ'ল, বাবা ঠাকুর?

'একটু ভাবিয়ে তুলেছে পরাণ, আমি যতদূর তাকে বুঝেছি তা'তে এইটাই জানতে পেরেছি, সে সরল উদার মহানুভব। কিন্তু সংসারের বা সমাজের আর একটা যে চোখ আছে, সেই চোখ নিয়ে কেউ কেউ দেখছে তার এই সরলতা উদারতার ভেতর কি যেন লুকান আছে প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারি নি; কিন্তু তোমার কাছে ফাঁকা যায়গায়—'

বাধা দিয়া পরাণ বলিয়া উঠিল,—'ও এই কথা? তা' বাবাঠাকুর; ফাঁকা যায়গায় না হ'লে এই এতগুলোলোককে কোথা জড় করেন বলুন তো?'

সুস্থির ভাবে স্বামীজী বলিলেন—'হুঁ, তাও বটে।'

তারপর মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া শিবানন্দ বলিতে লাগিলেন—'আচ্ছা, পরাণ—'

'কি, বাবাঠাকুর?'

পরাণ তাহার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি শিবানন্দের মুখের উপর ফেলিতেই তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার আর বলা হইল না, দেখিলেন সম্মুখে এক যুবতী সারা অঙ্গে কাঁচা সোনার লাবণ্য মাখিয়া পরিপূর্ণ যৌবনের তরঙ্গ ভঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পরিধানে গৈরিক বর্ণের লাল কস্তাপাড় শাড়ী, দুই হাতের মণিবন্ধে দুইগাছি শাখা সীমন্তে ও ভ্রূযুগলের মাঝে সিন্দুরের ফোটা।

তাহাকে এইরূপ ভাবে নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া শিবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে মা?'

সরম-জড়িত কণ্ঠে তরুণী উত্তর দিল—'ভিখারিণী আশ্রয়প্রার্থিনী, একটু আশ্রয় দিলে মা আপনার মঙ্গল করবেন, বাবা!'

শিবানন্দ প্রথমটা কিছুই বলিতে পারিলেন না। সন্ধ্যার সময় এইভাবে এই যুবতীর আগমনে বিস্ময়ে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী বলিলেন,—'কেন, মা? তোমার কি কোনও আশ্রয়—'

বক্তব্যের অবশিষ্টটুকু বুঝিতে পারিয়া যুবতী বলিল—'আশ্রয় থাকলে কি হবে, বাবা? দুর্দ্দান্ত জমীদার সলিলকুমারের জমীদারিতে নারীত্ব বজায় রাখা'—

বলিতে বলিতে যুবতীর মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া যুবতী পুনরায় বলিতে লাগিল—'অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে যারা চ'লে আসছে শুনেছি আপনি তা'দিকে আশ্রয় দিয়ে নির্ভয়ে বাস করবার সুযোগ দিচ্ছেন।'

সলিলকুমারের নাম শুনিয়া স্বামীজীর প্রাণের মধ্যে কেমন একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। সে অত্যাচারী হইলেও কি এতদূর অধঃপাতে গিয়াছে? যুবতীকে আশ্রয় দিবার জন্য কর্ত্তব্য হাতছানি দিয়া ডাকিলেও কিসের একটা সন্দেহ সে পথে বাধা দিল, একবার তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—'তার জমীদারির আর কাউকে আশ্রয় দিতে পারব না মা। আজ তুমি বীণামার নিকট আশ্রয় লও—তারপর যদি একান্তই এখানে থাকবার দরকার হয় তবে সলিলকুমারের স্ত্রীর নিকট হ'তে চিঠি নিয়ে এস।'

একটু সঙ্কুচিত ভাবেই তন্বী বলিল—'বাবার জয় হোক আশ্রয় একটু দিতেই হবে।'

বিনীত ভাবেই শিবানন্দ বলিলেন, 'তা যে আর পারি না মা। আজ রাত্রের মত বীণামার নিকট থাক, তাকেও এই কথাটা বল।'

—'আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দেবেন তাতে বীণাদিদির অনুমতি কিসের জন্য, বাবা? দেবোত্তর সম্পত্তির সর্ব্বময় কর্ত্তা আপনি—তিনি নন, মায়ের রাজ্যে আপনি তাঁর

সবিস্ময়ে স্বামীজী চাহিয়া দেখিলেন—সম্মুখে মহানন্দ,

দেখিয়া আনন্দও তাঁহার যেমন হইল বক্তব্য শুনিয়া দুঃখিত হইলেনও ততোধিক। বলিলেন—'কখন এলে, মহানন্দ ?'

'এই আসছি, বাবা। কিন্তু আশ্রয়প্রার্থীকে বিমুখ করা-'

'বিমুখ তো করি নি, মহানন্দ। সলিলকুমারের জমীদারি হইতে আগত প্রজাদের এমন ভাবে স্থান দেওয়া আমাদের কোনমতেই সমীচীন হবে ব'লে মনে হয় না। সলিলকুমার অত্যাচারী হ'তে পারে কিন্তু যতদূর বুঝেছি, তা'তে এইটাই জেনেছি—বেণুমা তার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় তার বিনা অনুমতিতে—

স্বামীজীর আজিকার এই নূতন ধরণের কথায়, মহানন্দের অন্তরের মধ্যে কিসের একটা মাতন সুরু হইল। সে বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।...

তাহাকে এইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া শিবানন্দ বলিলেন—'নূতন ব্যবস্থা দেখে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছ, না ? এ ব্যবস্থাটা যে কোনও দিক দিয়েই অমঙ্গলকর হবে সেটা মনে হয় না বরং এটা ভালই হয়েছে।... তুমি আমি কেউই নই, মহানন্দ। মায়ের রাজ্য, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে, ভবিষ্যৎ অশান্তির গুরু আশঙ্কা মা যদি এম্নি ভাবেই কাটিয়ে দেন, মন্দ কি ?'

একটু তিক্ত কণ্ঠেই মহানন্দ বলিল—'আদেশ—মায়ের, না বীণাদিদির ?'

সহজ ভাবেই শিবানন্দ বলিলেন—'যাঁরই হোক, কিন্তু তোমাকে এত উত্তেজিত দেখছি কেন, মহানন্দ ?'

'উত্তেজিত নয় বাবা, আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি। যেদিক দিয়েই হোক জমীদারির আয় বাড়লেই হ'ল।'

'—মহানন্দ! সেও মারই ইচ্ছা, কিন্তু সন্ন্যাসী তুমি, নিজেকে হারিয়ে ফেলা তো তোমার উচিত নয়। মনে রেখ মার সেবক তুমি। তোমাকে আমি সেই সেবকরূপেই দেখ্‌তে চাই। এখন যাও, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

—আট—

নিজের প্রভুত্ব জাহির করিতে যাইবার প্রথম মুখেই বাধা প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দ সমস্ত রাত্রি কেমন করিয়া কি ভাবে অতিবাহিত করিতে লাগিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না,...আজ এমনটা কেন হইল ? এতদিন পর্য্যন্ত সেইই তো প্রজার দলকে লইয়া আসিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত তো এ বিষয়ের কোনও কথাই ওঠে নাই। প্রার্থনা মাত্রেই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, তবে আজ ?... একজন নারীর প্রার্থনা বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল কেন ? সংসারানভিজ্ঞ শিবানন্দ প্রার্থীকে যে বিমুখ করিলেন, ইহার গূঢ় রহস্য কি ? সত্যই কি জমীদারি হইতে প্রজা আনাই ইহার প্রধান কারণ, না তাহার প্রতি সন্দেহ ?

প্রাণের মধ্যে কথাটা উঠিতেই তাহার হৃদয় তন্ত্রীতে কে যেন বিষম ঘা দিল। মহানন্দ ভাবিল, তাহার কার্য্যের মধ্যে ইহারা এমন কি দেখিল, যাহাতে একজনেরও প্রাণে সন্দেহের ছায়াপাত হইতে পারে ? অশান্ত অন্তরে দ্বিতলের বারান্দায় বাহির হইয়া একবার অসীমের দিকে সে তাকাইয়া দেখিল। পাতলা মেঘ আকাশের গায়ে ছাইয়া গিয়া জ্যোৎস্নার হাসিকে অনেকটা ম্লান করিয়া দিয়াছে, অদূরে, পুষ্করিণীতে অসংখ্য কুমুদ প্রস্ফুটিত হইয়া বাতাসের বেগে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে,... আনন্দের হিল্লোল তাহাদের গায়ে যেন খেলিয়া বেড়াইতেছে।

ক্ষণিকের জন্য তাহার চিন্তার কথা ভুলিয়া গেল। সম্মুখে জমীদারের প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকার দিকে তাহার অনুসন্ধিৎসু আঁখি দুটী মুগ্ধ অপলক ভাবে স্থির হইয়া রহিল।

জমীদার বাড়ীর পেটা ঘড়িতে বাজিয়া উঠিল টং-টং সকলকে জানাইয়া দিল রাত্রি এখন দুইটা।...আরও কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া সে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তারপর সে এইটাই স্থির করিল—সন্দেহই যদি হইয়া থাকে, তবে সেটাকে যেমন করিয়াই হউক অপনোদনের চেষ্টা সে করিবে।

কোনওরূপে রাত্রিটা কাটাইয়া দিয়া পরদিন প্রত্যূষে সে পরাণের বাড়ী যাইবার জন্য স্থির করিল। ইহার সম্বন্ধে সে হয় তো কিছু জানিতে পারে। তাহার উপস্থিতির বহু পূর্ব্ব হইতেই সে যখন সেখানে বসিয়াছিল, তখন তাহার সহিত এসম্বন্ধে হয় তো কোনও কথা হইয়া থাকিবে।

সঙ্কল্প মত যখন সে পরাণের বাড়ীর নিকটে যাইয়া পৌঁছিল তখন পূর্ব্ব আকাশ লালে লাল হইয়া উঠিয়াছে। চারি পাশের গাছগুলি নবকিশলয়ে ভরিয়া গিয়া কেমন

নয়নাভিরাম হইয়া উঠিয়াছে···সম্মুখে ডোবায় দশ বারটী হাঁস 'কোয়াক' 'কোয়াক' করিয়া পাঁক হইতে তাহাদের আহার্য্য খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

পরাণ তাহার রুগ্না স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেছিল,—'আর একটু পরেই বাবাঠাকুর আসবেন, রাত্তিরে যা ছট-ফট করেছিস, ডাক্তারবাবুকে না হয় ডাক দিই—'

পথে দাঁড়াইয়া উন্মুক্ত গবাক্ষের মধ্য দিয়া পরাণের কথা শুনিয়া মহানন্দ ডাকিল--'পরাণ ?'

শশব্যস্তে পরাণ দ্বার খুলিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া একটু কাতরভাবেই বলিল—'এত সকালে এসেছেন বাবা-ঠাকুর ?—'

সহাস্যমুখে মহানন্দ বলিল,—'আসতেই হল পরাণ,··· মায়ের আদেশ। ক'দিন তো এখানে ছিলাম না, তাই ধ্যানযোগে মায়ের কাছে সংবাদ নিতেই তিনি তোমাদের কথা ব'লে দিলেন—তোমার স্ত্রীর অসুখ, আদেশ দিলেন, তাঁর অর্ঘ্য নিয়ে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তোমাদের এখানে আসতে।'

মহানন্দের কথা শুনিতে শুনিতে ভক্তিভরে পরাণের চক্ষু দুইটা আর্দ্র হইয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিল, মহানন্দ ঠাকুর এত বড় ! মার সঙ্গে কথা ক'ন !···তা' না হ'লে জানবেন কি ক'রে যে, বৌএর অসুখ ? তারপর ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বলিল—'এই গরীব চাষার ওপর মার এতখানি দয়া ?'

মৃদু হাসিয়া মহানন্দ বলিল—'তোমরা যে সাধককে আশ্রয় দিয়েছ, পরাণ। যখনই তাঁর মুখে শুনলুম, তোমার স্ত্রীর অসুখ, তখনই তাঁর কাছ হ'তে ওষুধ চাইতেই তিনি যা ব'লে দিলেন, তাই নিয়েই এসেছি, আর দেরী ক'র না তুমি, চল দেখি শীগ্‌গীর, অর্ঘ্য-জল খাইয়ে দিই।'

পরাণ আর বিলম্ব না করিয়া মহান্দকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

উভয়কে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পরাণের স্ত্রী মাথার অবগুণ্ঠন একটু বেশী করিয়া টানিয়া দিতেই উচ্ছ্বসিত আবেগে পরাণ বলিয়া উঠিল—'লজ্জা 'করিস্‌নে বৌ, ছোট বাবাঠাকুর এয়েছেন মার অগ্‌গি নিয়ে।'

পরাণের স্ত্রী তেমনই অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া তাহার পদধূলি লইবার জন্য উঠিবার চেষ্টা করিতেই মহানন্দ বলিয়া উঠিল—'ওঠবার দরকার নেই, মা, আমি আশীর্ব্বাদ করছি, আজই তুমি ভাল হ'য়ে উঠবে এই অর্ঘ্যটা লও, ধুয়ে সেই জলটা পান কর। মার নিজের হাতে দেওয়া এই জিনিস।'

পরাণ বলিল—'ওর নাড়িটা একবার দেখুন না, বাবাঠাকুর।' সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু তাহাকে বলিবার অবকাশ না দিয়া মহানন্দ বলিয়া উঠিল—দেখব বৈ কি, পরাণ। তুমি ত হ'লে পুকুর হ'তে একটু জল নিয়ে এস। সেই জলে অর্ঘ্য ধুয়ে পান করিয়ে দাও।'

পরাণ চলিয়া গেলে পরাণের স্ত্রীর নাড়ি দেখিতে দেখিতে মহানন্দ তাহার মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল—উজ্জ্বল না হোক, কি চমৎকার মুখশ্রী তাহার অন্তরের মধ্যে একটা উত্তাল তরঙ্গ ছুটিলেও যথাসম্ভব সেটাকে গোপন করিয়া বলিয়া উঠিল—'তোমার বুক আর পেটটা একবার দেখতে হবে, মা।'

তাহার কম্পিত ওষ্ঠের উপর হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

পরাণের স্ত্রী সসঙ্কোচে একটু সরিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেই সে বলিয়া উঠিল,—'সাধকের কোনও কাজই দোষের নয়—তারা যা করে তা মারই আদেশে করে।'

জমীদারির সকলেই তাহাকে একজন সাধক বলিয়া জানিত, পরাণের স্ত্রীও তাহাকে সেইরূপই জানিয়াছিল সুতরাং এ কথার পর সে অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেও সেটাকে দূরে সরাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইল।

দিনের আলো তখন ঘরখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সব স্থানটুকুই বেশ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল। মহানন্দ তাহার কম্পিত বুকখানার উপর হাত দিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি ফেলিয়া সাহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল—'মাঝে মাঝে বুকটা ধড় ফড় করে কি ?'

সে বুকে হাত দিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত সহাস্য মুখে বসিয়া থাকিতেই পরাণের স্ত্রীর যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল। একটু দূরে সরিয়া বসিয়া অনুচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি হাসছেন কেন ?'

পুনরায় তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া গম্ভীর ভাবেই মহানন্দ বলিল—"সদাহাস্যময়ীর সন্তান না হেসে কি থাকতে পারে, মা ? তার সম্বলের মধ্যে ঐটুকুই যে সব। সেটুকু হারালে সে বাচবে কি ক'রে !'

তাহার এই বড় বড় কথা পরাণের স্ত্রী বুঝিতে না পারিলেও সে মাত্র এইটুকুই বুঝিয়াছিল, তাহার হাসির মধ্যে এতটুকু আবিলতা নাই। সে মুখখানি নত করিয়া বসিয়া রহিল;

—"মায়ের সন্তান যারা, তারা সকলেরই হাসি-মুখ দেখতে চায়, এইটাই তার ধর্ম্ম। জগতে এসেছে সে হাসি বিলাতে আর সেই জন্যেই তাকে হাসতে হয় দিন-রাত; এই হাসিটুকু তার যেদিন ফুরুবে জগতের কাজ তার সেই দিনই শেষ হ'য়ে যাবে।—'

পরাণের স্ত্রীর অন্তরে যে একটু সন্দেহের ছায়াপাত হইয়াছিল, মহানন্দের এতগুলা কথার পর সেটা কোথায় উবিয়া গিয়া পুনরায় ভক্তির পূতবন্যা তাহার অন্তরের মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে মহানন্দের পায়ে প্রণাম করিল।

মহানন্দ বলিল,—'তোমার পেট্‌টা যে একবার দেখতে হবে, মা!'

পরাণের স্ত্রী সম্মতা হইলে, মহানন্দ বলিয়া উঠিল—'এঃ লিভার আর পিলে ছ'টো মিলে পেটটা যে জুড়ে বসেছে গো। ক্ষেতপাবড়া, গোলঞ্চ, গোটাধনে,—গোলঞ্চ নিমের হলেই ভাল হয়—ক'টা একসঙ্গে মিশিয়ে পাঁচ সের জল দিয়ে ফুটতে দেবে। যখন সেটা পাঁচ পোয় এসে দাঁড়াবে তখন নামিয়ে নেবে। রোজ সকালে বিকালে ছ'বার ক'রে খেয়ে নিও। দশ বার দিনের ভেতরই ঐগুলা সব সেরে যাবে।'

মহানন্দের মুখে পুনরায় সেই হাসি, বলিল—'পরাণ গেল কোথা—সে কি পুকুর কেটে জল আনছে?'

'এই যে এসেছি, বাবাঠাকুর!' বলিয়া পরাণ জলের ঘটিটা তাহার হাতে দিতেই, মহানন্দ বিল্বপত্র ও ফুল জলে ফেলিয়া বলিল—'এইটার কতকটা খাইয়ে দাও আর কতকটা পেটে বুকে মাথায় দিয়ে দাও—মার অর্ঘ্য।'

মহানন্দ বাহিরের দাবায় আসিয়া বসিল। প্রাঙ্গণের একটা পার্শ্বে দুই তিনটী রক্ত-জবার গাছ, ফুলের গহনা পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে সেইদিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার মনে পড়িয়া গেল আজ যেজন্য সে এখানে আসিয়াছে, সেটার সম্বন্ধে পরাণের সহিত এখনও কোনও কথাই হয় নাই।

তাহার চিন্তা-স্রোতে বাধা দিয়া পরাণ আসিয়া ব্যস্ত ভাবেই বলিয়া উঠিল—'এখানে নিজ মনে ব'সে কি ভাব্‌ছ, বাবাঠাকুর?'

তাড়াতাড়ি একখানা পিঁড়ি আনিয়া পরাণ তাহাকে বসিতে দিতেই মহানন্দ বলিয়া উঠিল—'ব্যস্ত হচ্চ কেন, পরাণ? এই মৃত্তিকাই আমাদের শয্যা, হাতই আমাদের বালিস, চাঁদ আমাদের প্রদীপ, নিবৃত্তিই ভার্য্যা আর আকাশই আচ্ছাদন।'

নিরক্ষর পরাণ মহানন্দের কথা শুনিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—'আপনাদের যা'হোক, আমাদের যে ভক্তি-শ্রদ্ধা কিছু নেই; কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢুকেছে, তার যোগ্য—'

কথা কা'ড়িয়া লইয়া মহানন্দ বলিল—'এতটাই যখন ঐকান্তিক আগ্রহ তখন দাও।'

পরাণের দেওয়া আসনে উপবেশন করিয়া মহানন্দ জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা পরাণ?'

"কেন, বাবাঠাকুর?"

"—এই যে কাল রাত্তিরে—"

হঠাৎ শিবানন্দ আসিয়া ডাকিলেন—'মা কৈ রে পরাণ?'

তাঁহাকে বসিবার আসন দিতে দিতে আনন্দ-গদগদ কণ্ঠে পরাণ ডাকিল—'ও গো! শীগ্‌গীর এস আজ আমাদের কি সৈভাগ্যি দেখসে—'

শিবানন্দ আসন গ্রহণ করিতেই পরাণের স্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে আশীর্ব্বাদ করিয়া শিবানন্দ, মহানন্দকে বলিলেন,—'বীণামাই কাছে একবার যাও। মহানন্দ সেই মেয়েটীর কি হ'ল একবার খবর নাও, তাঁর জন্যে মনটা বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

হাসিয়া মহানন্দ বলিল—'চাঞ্চল্যকে ডেকে নিয়ে এলে আর আসবে না?'

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া শিবানন্দ বলিলেন, —'যাও, খবরটা নাও, বাবা!'

মহানন্দ দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেই শিবানন্দ ডাকি-লেন—'মহানন্দ!'

মহানন্দ ফিরিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—'মার পূজা আজ তুমিই ক'র, ফিরতে আমার দেরী হবে।'

সম্মতি জানাইয়া মহানন্দ প্রস্থান করিল বটে. কিন্তু তাহার অন্তর-আকাশে যে মেঘ ঘনীভূত হইয়াছিল তাহা কাটিবার অবসর পাইল না। পরাণের বাটীতে আসা ব্যর্থ হইয়া গেল। সন্দেহ দোলায় দুলিতে দুলিতে পথে মহানন্দ বাহির হইয়া পড়িল।

—নয়—

সন্দেহের বিষবীজ মানুষের মনে উপ্ত হইলে মহীরূহে পরিণত হইতে বিলম্ব লাগে না। সলিলকুমারের জমীদারি হইতে এতগুলি প্রজার চলিয়া আসিবার রহস্য নিজে নিজে ভেদ করিতে গিয়া বীণার প্রাণে যে সন্দেহের ছায়াপাত হইয়াছিল, সেটা আরও বাড়িয়া গেল। সে দিন যেদিন তরুণীটী তাহার নিকট আশ্রয়প্রার্থী, হইয়া আসিল, সে রাত্রির মত সে যদিও তাহাকে আশ্রয় দিল; কিন্তু জমীদারির মধ্যে বাস করিবার অনুমতি সে কিছুতেই দিতে পারিল না। যখনই সে শুনিল, ইহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মহানন্দের আবির্ভাব হইয়াছে, তখনই তাহার উপর সন্দেহ অতি মাত্রায় দেখা দিল। তাহার মনে এই কথাটাই জাগিয়া উঠিতে লাগিল—'কে এই যুবতী? ইহার সঙ্গে মহানন্দের কি কোনও—' কিন্তু সে তো অবিবাহিত সন্ন্যাসী,…তবে? কে এই মহানন্দ একটা দমকা হাওয়ার মত এখানে আসিয়া সব ওলট-পালট করিয়া দিতেছে!

অথচ তাহার বিরুদ্ধে নিজের ধারণা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার উপায় নাই। তাহার বাহিরের অমায়িক ব্যবহারে সাধারণকে সে বাস্তবিকই আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। অমন যে পুরুত কাকা তাঁহার অন্তরে এতটুকু সন্দেহ আনিবার মত অবকাশ সে দেয় নাই। কি এমন মোহিনী মায়া তার?

মহানন্দের সম্বন্ধে বীণা যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই তাহার চিন্তা-স্রোত প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। অবশেষে সে স্থির করিল, সত্যই যদি নির্য্যাতিত হইয়া এই সব প্রজা সলিলকুমারের জমীদারি হইতে চলিয়া আসে তবে বেণু সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু জানে। তাহাকে পত্র লিখিয়া এ সম্বন্ধে যথাযথ সংবাদ সে সংগ্রহ করিবে। সত্যই যদি অনাচারের তাড়নায় সবাই এখানে ছুটিয়া আসে তবে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহার স্বর্গগত পিতার কর্ম্মের ধারা সে ঠিকই বজায় রাখিবে। আর যদি তাহা না হয় তবে? এই ষড়যন্ত্রের জাল সে ছিন্ন করিবে কেমন করিয়া?

সে-সম্বন্ধে আর কোনও রূপ চিন্তা না করিয়া সে বেণুকে পত্র লিখিতে বসিল।

বীণার পত্র লইয়া ডাকপিয়ন যখন বেণুর বাড়ী উপস্থিত হইল, তখন সে হারমোনিয়মে সুর মিলাইয়া শিক্ষকের নিকট হইতে গান শিক্ষা করিতেছিল।

স্বামী তাহাকে গান শিখিবার অনুরোধ করিয়া এই ব্যবস্থা দিয়াছে। প্রথমটা সে অসম্মতা হইলেও পিতার মৃত্যু-শয্যায় সেই প্রতিশ্রুতি স্বামীর ইচ্ছানুসারে চলিতেই প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। এই ভাবে তাহার বাসনা চরিতার্থ করিতে করিতে কোনও দিন যদি তাহাকে তাহার মতে টানিয়া আনিতে পারে। আর কতকটা সে, যে বিষয়ে সফলকামও হইতেছিল।

পিয়নের নিকট হইতে পত্রখানা লইয়া হরলাল যখন বেণুর হাতে দিল, তখন তাহার গান অর্দ্ধ-পথেই থামিয়া গেল।

পত্রখানা পড়িতে পড়িতে তাহার মুখখানা কেমন এক-রূপ অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল। শিক্ষককে বলিল, "আজ আর নয় মাষ্টারমশায়, আপনি যান, আমার কাজ আছে।"

শিক্ষক চলিয়া গেলে বেণু হরলাকে জিজ্ঞাসা করিল,—প্রজাদের ওপর আবার কি অত্যাচার সুরু হয়েছে, হর-কাকা, যার জন্যে দলে দলে লোক জমীদারি ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে?"

অবাক হইয়া হরলাল বলিল, "কৈ তা'ত কিছু শুনি নি মা, তাহ'লে কি আমাদের কানে এসব কথার একটাও আসত না?"

বেণু বলিল—"দিদি লিখছেন, প্রায় তিন চার-শো প্রজা, অত্যাচারের জন্যে তাঁদের জমীদারিতে চ'লে গেছে, এখনও যাচ্ছে, এমন কি অসহায় স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত।"

হরলালের বিস্ময়ের সীমা আরও বাড়িয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি মা?"

বেণু কহিল—"হাঁ, তাই লিখেছে। তুমি এক কাজ কর তো, কাকা, ম্যানেজার-বাবুকে একবার ডেকে দাও।"

"যাচ্ছি মা, কিন্তু এসব কি? জমীদারির ভেতর এত কাণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে অথচ আমরা কিছু জানছি না?"

বলিতে বলিতে হরলাল বাহির হইয়া গেল।

বেণু পুনরায় চিন্তিত হইয়া পড়িল—একি সত্য না আর কিছু?

তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া একটী ভিখারী আসিয়া বলিল—"জয় রাধে কৃষ্ণ, দু'টী ভিক্ষা পাই, মা।"

অন্য দিন দাস-দাসীরাই ভিখারীকে ভিক্ষা দেয়, কিন্তু বেণুর মনের অবস্থা আজ তাহাকেই সেই পথে টানিয়া আনিল, যখন সে ভিখারীর নিকট পৌঁছিল, তখন সে গান ধরিয়াছে—"গৌর ভজ কৃষ্ণ ভজ
নিতাই ভজ মন রে—"

বেণুকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, সে গান বন্ধ করিয়া বলিল—"রাণি-মা, দু'টি ভিক্ষে পাই, মা।"

বেণু জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বাড়ী কোথা, বাছা? আমাদেরই জমীদারিতে?"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভিখারী বলিল—"হাঁ, মা।"

"তোমাদের ওপর জমীদারের কোনও রকম অত্যাচার হয়?"

"আমাদের ওপর? কেন রাণি মা, আমাদের কি আছে দয়াময়ি, যে জমীদারের অত্যাচার আমাদের ওপর হবে? সারাটা দিন এক মুঠা ভিক্ষের জন্যে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াই। সন্ধ্যার সময় কিছু নিয়ে ফিরলে তবে হাঁড়ি চড়ে কি আছে আমাদের?"

বাধা দিয়া বেণু জিজ্ঞাসা করিল—"বৌ ঝিরা মা-বোনেরা, সব নিরাপদ তো?"

হাসিয়া ভিখারী বলিল—"মা, নেংটার নাই বাটপাড়ের ভয়—"

ভিখারীর নিকট এই ধরণের উত্তর পাইয়া বেণুর মনটা যেন উদাসীনতায় ভরিয়া উঠিল। ভাবিয়াছিল, ইহার নিকট কতকটা সংবাদ পাইবে, তবুও একবার জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য কারও ওপর কোনরূপ অত্যাচার হচ্ছে?"

পুনঃ পুনঃ একই প্রশ্নে ভিখা[illegible] হইয়া পড়িতেছিল; বলিল,—"জমীদার কেন অত্যাচার করবে, মা? যদি করে তবে তার কর্মচারীরাই, নাম হয় জমীদারের।"

বেণু একটা নূতন আলোর ক্ষীণ রেখা দেখিতে পাইল। সে তাহাকে একটা টাকা দিয়া পুনরায় ঘরের মধ্যে আসিয়া কি চিন্তা করিতে করিতে ম্যানেজার-বাবুর আগমনের জন্য উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে এবং সলিলকুমারের ইচ্ছানুরূপ হইয়া উঠিয়া, বেণু, সম্পূর্ণভাবে না হউক কতকটা তাঁহার প্রতি প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং জমীদারির কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চালাইবার জন্য স্বামীর দু একজন অন্তরঙ্গ প্রিয় পাত্রকে জবাব দিতেও বাধ্য হইয়াছিল। ইহাতেও সলিলকুমার কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই।

কিছুক্ষণ পরে তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া অনুপম বাবু ডাকিলেন,—"আমাকে ডেকেছেন কেন, মা?"

উৎকণ্ঠার সবটুকু চিহ্ন মুখ হইতে সরাইয়া দিয়া বেণু জিজ্ঞাসা করিল—"এতখানি অত্যাচার হচ্ছে কেন, ম্যানেজার-বাবু?"

অনুপম বলিল,—"কি বলছেন, মা! অত্যাচার হ'বে কেন?"

গম্ভীরভাবেই বেণু বলিল,—"হয় নি? প্রজারা সব জমীদারি ছেড়ে চলে যাচ্ছে কেন, ম্যানেজার-বাবু?"

অনুপম বলিল, "কৈ তা' তো জানিনা।"

কঠোর কণ্ঠে বেণু বলিয়া উঠিল,—"যদি না জানেন বা এখানে কাজ ক'রেও জানবার প্রবৃত্তি যদি না হয়, তবে আপনার মত লোকের দরকার নেই। এক মাসের মাইনে আপনাকে দেবার ব্যবস্থা করছি, কাল হ'তে আর আপনি আসবেন না।"

কথাগুলা তীরের ফলার মত অনুপমের বুকে গিয়া বিদ্ধ করিল। ব্যগ্র কাতর কণ্ঠে বলিল,—"মা!"

তাহাকে কোনও কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া বেণু বলিল,—"আপনার কোনও কথা শুনিতে চাই নি, ম্যানে[illegible]

নাকে [illegible] রিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—'মার পূজা আজ তুমিই ক'র, ফিরতে আমার দেরী হবে।'

মহিষমর্দ্দিনী

অষ্টভুজা

মহামায়া

রুদ্ধকণ্ঠে বেণু বলিয়া উঠিল,—"আপনার কোনও কথা আমি শুনতে চাই না ম্যানেজার-বাবু। তাঁর যথেচ্ছাচারিতার আগুনে ইন্ধন জুগিয়ে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি হ'তে পারে, কিন্তু আমার স্বর্গবাসী শ্বশুরের অভিসম্পাত আমাদিগকেই মাথা পেতে নিতে হবে। পাপের স্রোত যেখানে ব'য়ে চলেছে বুঝতে পারছি, সেখানে আমাদের কর্ত্তব্য আমাদিগকে করতেই হবে। এক-একখানা গ্রাম হ'তে চল্লিশ পঞ্চাশ জন ক'রে গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে, তার প্রতিকার করা দূরে থাক, আপনারা এতদূর পর্য্যন্ত অকর্ম্মণ্য যে, সেগুলার খোঁজ নেবার মত অবকাশ আপনার নেই। আপনাকেও আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই। যান নিজের পথ দেখুন।"

বেণুর মুখে আজ এই ধরণের কথা শুধু অনুপমকে নয় হরলালকে পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিল। অনুপমের কার্য্যের জন্য তাহার উপর সে হাড়ে হাড়ে চটিয়া থাকিলেও বেণুমায়ের আজিকার এই ব্যবহার সলিলকুমার কি ভাবে দেখিবে সেইটাই চিন্তা করিয়া যুক্তকরে বলিল, "মা

বেণুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখনও ক্রোধের হল্কা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, তেমনই ঝাঁঝাল সুরেই বলিল,—"কেন ?"

সঙ্কোচ-জড়িতকণ্ঠে হরলাল বলিল, "বাবু না আসা পর্য্যন্ত—":

তাহাকে আর বলিতে হইল না, রাগে গস গস করিতে করিতে বেণু বলিল, "আমার কাজের কৈফিয়ৎ দিতে তোমাদের কাউকে ডাকব না, হরকাকা। সেটা আমিই দেব। আপনি যান, ম্যানেজার-বাবু। হরকাকা, সোফারকে গাড়ী আনতে বল। আমি নিজে যাব জমীদারি দেখতে। আজ শ্রীপুর, জীবনপুর আর বলরামবাটী দেখে আসব। তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।"

বেণুর এই ধরণের কাজ করিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া, এই কাজের ভবিষ্যৎ ফল একবার মানস-চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া লইয়াই শঙ্কাতুর কণ্ঠে বলিল—"মা।"

"ভয় পাচ্ছ, হরকাকা ?"

বেণুর কথায় হরলাল চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল—"ও কথাটা হরলালকে ব'ল না, মা। ভয় ব'লে কোন জিনিস সে জানে না, আজ তোমাদের কাজ করছি, না হয় বাবু তাড়িয়ে দেবেন। এই হাত দু'টা যতদিন কাজের আছে মা, পা দু'টা যত দিন—"

"তা আমি জানি, কাকা"—বলিয়া বেণু পুনরায় বলিল, "তা হ'লে তুমি যাও, আমার কথা শোন—" বেণুর এই জেদ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি ভীষণ হইয়া উঠিতে পারে তাহা চিন্তা করিতে করিতে সে উদ্বেলিত হৃদয়ে প্রস্থান করিল।

অনুপম ডাকিল—"মা!"

বেণু বলিল—"বিরক্ত করবেন না। আমার অনেক কাজ আছে—যান।"

অনুপমবাবু তাহাকে আর অধিক কথা না বলিয়া নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই চিন্তা করিতে করিতে প্রস্থানোদ্যত হইতেই বেণু বলিল—"আপনার সহকারীকে আপনার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন—জানলেন ?"

অনুপম একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া যাইবার জন্য তাহার ডান-পাখানা বাড়াইয়া দিতেই বেণু বলিল—"শুনুন, হিসেব আমি নিজেই দেখব—সন্ধ্যার পর নিয়ে আসবেন।"

বেণুর আদেশে অনুপম বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। এতদিন ধরিয়া জমীদারের নিকট সে অপ্রতিহত প্রভাবে কাজ করিয়া আসিল। তাহার মনস্তুষ্টির জন্য সে না করিয়াছে এমন কাজ নাই, এবং নিজের একগুঁয়েমিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন অত্যাচার করিলেও এমন ধরণের কৈফিয়ৎ চাওয়া ত দূরের কথা একটা দিনের জন্য তিরস্কৃত পর্য্যন্ত হয় নাই।—আর আজ ?

তখনই তাহার মেঘাচ্ছন্ন অন্তর-আকাশে আশার ক্ষীণ বিজলী-রেখা খেলিয়া গেল। কার্য্য হইতে তাহাকে অবসর দিবার ক্ষমতা একমাত্র জমীদারের—তাঁহার স্ত্রীর নয়। তিনি তাহাকে এতখানি অপমানিত করিলেও জমীদারবাবু হয় তো সে-কথায় কর্ণপাত করিবেন না।

মনে হইতেই মুখখানা তার হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জমীদারের সে যখন এতখানিই প্রিয়পাত্র, তখন তাহার আসন হইতে তাহাকে নামাইয়া দিবার ক্ষমতা কার ? জমীদার-গৃহিণী—সামান্য কুলরমণী মাত্র, জমীদারির কার্য্যে হাত দিবার মত ক্ষমতা ও সাহস তাঁর কোথা ?

মোটরের হর্ণের শব্দে তাহার চিন্তা কোথায় ভাসিয়া গেল। জমীদারের আগমন হইয়াছে মনে করিয়া আনন্দে ফুল্ল-হৃদয়ে পথের দিকে চাহিয়া দেখিতেই, দেখিতে পাইল —হরলালকে লইয়া বেণু মোটরে বাহির হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল শ্রীপুর প্রভৃতি গ্রাম তিনখানির কথা। সত্যই বেণু যদি সেখানে যায় আর সমস্ত সংবাদ জানিতে পারে।

ডান হাতখানা দিয়া অনুপম নিজের কপোল চাপিয়া ধরিল।

—দশ—

জমীদারি-পরিদর্শনে যাইবার প্রস্তাব হইবামাত্রই হরলালের অন্তরে ভবিষ্যৎ আশঙ্কার যে ভয়াল মূর্ত্তি তাহার রক্তচক্ষু বাহির করিয়া দেখা দিতেছিল, সেটা যেন আরও ভয়ঙ্কর হইয়া দেখা দিল, যখন তাহার নিরাভরণ বেণু-মা একখানা অর্দ্ধমলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া বাহিরে আসিলেন। বেচারা ব্যথিতকণ্ঠে বলিল—"এই বেশে মা ?—"

উত্তরে সহাস্যমুখে বেণু বলিল—"গরীব ছেলেদের মা গরীবই হয়, কাকা।"

অনেক চেষ্টা করিয়া হরলাল ইহার উত্তর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া বলিল—"বাবুর কাছে খবর শুনে বেরুলেই ভাল করতে মা, তাঁর অমতে—"

সস্মিতমুখে বেণু বলিল—"মরবার সময় বাবা আমাকে ব'লে গিয়েছেন, প্রজাদের মার আসন দখল ক'রে তাদের জন্যে প্রাণটাকে যদি আমি বলি দিতে পারি, তা'হ'লে তাঁর স্বর্গগত আত্মার আশীর্ব্বাদই পাব, তা'ছাড়া একটা কাজ নিজের জেদেই ক'রে দেখি না কি দাঁড়ায়।"

ইহার পর হরলাল আর একটা কথাও বলিল না। সশ্রদ্ধচিত্তে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"সত্যিই মা, তুমি প্রজাদের মা!"

সহরতলী পার হইয়া গাড়ী যখন পল্লীগ্রামের মেঠো পথ দিয়া শ্রীপুর যাইবার বাঁধে আসিয়া পৌছিল, তখন বেণু একবার মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চারিদিক্ চাহিয়া দেখিল। তাহার অস্বস্তি-ভরা প্রাণ এক অননুভূত আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বাঁধের দুই পাশে অফুরন্ত মাঠ, মাঠ ভরিয়া পাকা ধানের হরিদ্রা বর্ণের শিষ বাতাসের ভরে যেন ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। দূরে—সম্মুখে নারিকেল ও তাল গাছেরশ্রেণী। আকাশের নীলিমা যেন ইহাদেরই পশ্চাৎ দিকে মিশিয়া গিয়াছে।

বেণুর চোখে-মুখে যেন আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল বলিল—"হরকাকা!"

সে কি বলিতে যাইতেছিল, হরলাল যেন তাহার বক্তব্যটুকু বুঝিতে পারিয়াছে এই ভাবে বলিয়া উঠিল—"ঐ যে মা, শ্রীপুর লি-লি করছে। আমরা প্রথমেই ঐ গ্রামে যাব।"

বেণুর যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল। বলিল—"তাই না কি ? গাড়ী গ্রামের বাইরে রেখে দিও কাকা, ওখান হ'তে আমরা পায়ে হেঁটেই যাব।"

তাহাই হইল। গ্রামের প্রান্তভাগে গাড়ি থামাইয়া উভয়ে পদব্রজেই চলিল।

সূর্য্যদেব তখন মাঝ পথে চলিয়া আসিয়াছেন।

গ্রামে প্রবেশ করিয়াই এক ভাঙা বাড়ীতে বালকের ক্রন্দন আর নারী-কণ্ঠের তাড়না শুনিয়া বেণু বলিল—"আমি এই বাড়ীতে যাই, কাকা। এই গ্রামে কতগুলা ঘর লোকশূন্য হয়েছে সেটা দেখে এস, আর পার যদি কারণটা জানবারও চেষ্টা ক'র।"

হরলাল চলিয়া গেল। বেণু একবার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাড়ীখানার ভিতর প্রবেশ করিতেই গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিল—"কে বাছা তুমি ?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া বেণু একবার বাড়ীখানার চারিদিক্ দেখিয়া লইল। অন্য গৃহের দাবায় একটী রোগজীর্ণ প্রৌঢ় ব্যক্তি ব্যাধির যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে, দেখিয়া সে তাহার অবগুণ্ঠনটা একটু টানিয়া দিল।

গৃহিণী পুনরায় বলিল—"কে তুমি বাছা, বল না।"

তাহার বক্তব্যটাকে চাপা দিয়া ছেলেটী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ক্ষিধেয় আমি ম'রে যাচ্ছি—খেতে দে না, মা।"

বেণু ততক্ষণে সেই স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছিল। নিম্নকণ্ঠেই বলিল—"এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম মা, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, মনে করলুম, বামুন-বাড়ী দু'টী পেসাদ পেয়ে যাই।"

একটু বিরক্ত ভাবেই গৃহিণী বলিল—"ক্ষিধের জ্বালায় ছেলেটা ছটফট্ করছে ; তাকে একমুটো ভাত দিতে পারি নি, পয়সার জন্যে কাল হতে ডাক্তার ওষুধ দেয় নি, এই দেখ না কর্ত্তা পড়ে ছটফট্ করছে, একটু সাগু দেব, তা কেনবারও মত পয়সা নেই।"

বেণু জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, মা ?"

পীড়িত গৃহস্বামী ক্ষীণ-কণ্ঠে দাবা হইতে বলিল—"দুপুর বেলায় অতিথি ফিরিও না, গিন্নি ও বাড়ীতে যদি মুড়ী পাও দেখ।"

স্বামীর কথা ততখানি আমলে না আনিয়া গৃহিণী বলিল—"জমীদারের দয়া বাছা, আর কেন ? দু'টা টাকা ছিল ওষুধ আনবার জন্যে। এই অসুখ-বিসুখে এক সন খাজনা দিতে পারি নি ব'লে গোমস্তা কাল তাগাদায় এসে যা মুখে এল তাই ব'লে গাল দিতে সুরু করলে। উনি টাকা দু'টা ফেলে দিলেন। তাতেও তার সন্তোষ হ'ল না। গোয়াল হ'তে একটা গরু পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেল, এমন জমীদারকে—"

"জমীদারের সদরে একথা জানালে না কেন, মা ? শুনেছি সে না কি খুব ভাল লোক ?"

"সে ভাল কি মন্দ তা কি করে জানব, মা ? কিন্তু ম্যানেজারের কাছে কতবার কত কারণেই তো গেছেন, আমল পান না, আর জমীদারই বা ক'দিন বাড়ীতে থাকেন ?"

বেণু বলিল—"শুনেছি জমীদারের স্ত্রীও খুব ভাল। সদরে বিচার না পেলে, তাঁর কাছেও ত যেতে পার, মা ?"

"হুঁ—ভাল লোক! জমীদারই বড় দেখে, কথায় কথায় চৌথ, কথায় কথায় জোর-জুলুম।"

বেণু অন্তরের মধ্যে তীব্র জ্বালা অনুভব করিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কত টাকার জন্যে তোমার এসব জিনিস গিয়েছে, মা ?"

"খাজনা পাঁচ টাকা—"

তাহাকে আর বেশী বলিতে না দিয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে গৃহস্বামী পুনরায় বলিলেন—"কি করছ, গিন্নী ? জমীদারের বিরুদ্ধে কথা কোনও গতিকে গোমস্তার কাণে গেলে ভিটে-ছাড়া হ'তে হ'বে, দেখ ও-বাড়ীতে যদি দু'টী মুড়ি পাও,—দুপুর বেলার অতিথি ক্ষিধে তেষ্টায় কাতর এসব কথা ওঁকে কেন ?"

গৃহিণী উঠিবার উদ্যোগ করিতেই বেণু বলিল—"কারও বাড়ী যাবার দরকার নেই, মা। এই টাকা ক'টা নিয়ে যা যা দরকার আনিয়ে নাও।" বলিয়াই দশটী টাকা তাহার হাতে দিয়া ধুলিমাখা ছেলেটাকে কোলে লইয়া সস্নেহে বলিল—"এখান হ'তে খাবারের দোকান কতটুকু বাবা, যেতে পারবে ?"

উৎসাহের সহিত বালকটী বলিয়া উঠিল—"ঐ যে ও-খানে ; খুব পারব—আমি ত একলাই যাই।"

বেণু তাহার হাতে একটি টাকা দিয়া বলিল—"খাবার আনতো, বাবা, বেশ ভাল দেখে এন। দু'জনেই খাব, কেমন ?"

ছেলেটি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

তাহার মুখের দিকে বিস্মিত-দৃষ্টি ফেলিয়া গৃহিণী বলিল—"একি করছ মা, বাড়ীতে এলে জল খেতে এ-সব কি ?"

"এই ত খেলুম মা", বলিয়া বেণু বলিল—"কর্ত্তার ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা কর। আর গোমস্তার অত্যাচারের কথা জমীদারবাবুর স্ত্রীর কাছে লোক পাঠিয়ে জানাতে না পার চিঠি লিখে জানিয়ো, সেখান হ'তেই সে ব্যবস্থা ক'রে দেবে। আর একটা কথা মা, আসবার সময় দেখে এলুম অনেক বাড়ীতে লোক নেই। সবাই কি গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে না কি ?"

"হাঁ, তবে যারা গেছে সবাই পাজী বদমায়েস, গোমস্তা তা'দিকে টাকা দিয়ে কে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছে।"

বেণুর সারা দেহের ভিতর রি-রি করিয়া উঠিল। কোনও রূপে নিজেকে সংযত করিয়া বলিল—"তোমরা কি ক'রে জানলে ?"

"আমরা কেন বাছা, দেশের সব লোকেই জানে। গোমস্তা কারসাজি ক'রে সব পাঠাচ্ছে।"

একটী একটী করিয়া কথা বাহির করিয়া লইয়া বেণু কিছুক্ষণ সেইখানে থাকিয়া বাহির হইয়া পড়িল। আর তার কোথাও যাইবার প্রবৃত্তি রহিল না। যাহার জন্য আসা তাহা যখন একরূপ শেষই হইয়া গেল, তখন আর বিলম্ব করিয়া কোনও লাভ নাই।

মোটরের নিকট আসিয়া দেখিল, হরলাল বহুক্ষণ পূর্ব্বেই পৌছিয়া গিয়াছে, বলিল—"এখনও তোমার একটু কাজ বাকী আছে, কাকা। এই পঁচিশটা টাকা কর্ত্তা বা গিন্নির হাতে দিয়ে বলে এস জমীদারের খাজনা মিটিয়ে দিতে আর কর্ত্তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। মুখের দিকে কি দেখছ, কাকা? যাও, খাজনা দিতে পারে নি ব'লে গোমস্তা ওদের যা-কিছু সব কেড়ে নিয়ে গেছে।"

হরলাল চলিয়া গেল। চিন্তার মধ্যে বেণু নিজেকে ডুবাইয়া দিল। সন্ন্যাসী…গোমস্তা…যারা গিয়েছে তারা সব পাজী বদমায়েস…ভিতরের রহস্য স্বামী কি জানেন—কে জানে?

হরলাল ফিরিয়া আসিতেই মোটর ছাড়িয়া দিল।

বেণু জিজ্ঞাসা করিল—"কিছু জানতে পারলে?"

হরলাল যাহা বলিল, বেণু যাহা শুনিয়াছিল তাহারই অনুরূপ। পার্থক্যের মধ্যে এই, চেলির জোড় পরা সন্ন্যাসী বা গোমস্তার ষড়যন্ত্রের কথা সে জানিতে পারে নাই। যতটুকু জানিতে পারিয়াছে, তাহাতে এই টুকুই বুঝিয়াছে, লোকগুলা খুবই দুর্দ্দান্ত ছিল।

ঘরের কড়ি দিয়া গোমস্তা তাহাদিগকে বিদায় করিয়া গ্রামবাসীকে অনেকটা চিন্তামুক্ত করিয়াছে।

বেণু গম্ভীর হইয়া গেল।

একটা নূতন সমস্যা বেণুর অন্তরের মধ্যে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। বীণার পত্রে সে জানিয়াছে, যাহারা চলিয়া যাইতেছে তাহারা সকলেই নির্য্যাতিত; অথচ এখানে সে যাহা জানিতে পারিল তাহা দিদির পত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে কি সেই ভিখারীর কথাই ঠিক? জমীদারির মধ্যে যে অত্যাচারের স্রোত বহিয়া যায় তাহা জমীদারের অজ্ঞাতসারে তাহার কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়—আর ইহাদের পাপের জন্য অভিসম্পাত কুড়ায় জমীদার?

তখনই আবার মহানন্দের কথা মনে পড়িয়া তাহার চিন্তার সূত্র ছিন্ন করিয়া দিল। কে সেই মহানন্দ?…সেই মহানন্দই কি এই সন্ন্যাসী?…চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সমস্যার, সে, কোনও দিক দিয়াই সমাধান করিতে পারিল না।

গাড়ী যখন তাহাদের বাটীর দ্বারে আসিয়া পৌছিল—সূর্য্যদেব তখন আকাশের পশ্চিম গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া সেদিকটা লালে লাল করিয়া তুলিয়াছে। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই জানিল, বাবু তখনও পর্য্যন্ত বাড়ী ফিরেন নাই।

কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া, বিশ্রামান্তে সন্ধ্যার পর পুনরায় সে ম্যানেজারকে ডাকিতে পাঠাইল।

শঙ্কাকুলপ্রাণে ম্যানেজার সেই স্থলে উপস্থিত হইলে, বেণু বলিল—"কাগজপত্তর সব ঠিক হয়েছে—কৈ দেখি?"

অনুপম কিন্তু দেখাইতে পারিল না বা ইচ্ছা করিয়া দেখাইল না। কাতরকণ্ঠে বলিল, "এখনও সব তৈরী হয়ে ওঠে নি, মা, এবারটা ক্ষমা করুন গরীবের অন্ন—"

কথা কাড়িয়া লইয়া বেণু বলিল—"কিন্তু নিজেরা যখন গরীবের অন্ন কেড়ে খান, তখন ও কথাটা মনে থাকে না?"

যেন কিছু জানে না, এই ভাব দেখাইয়া অনুপম বলিল, "সে কি মা?"

বেণু বলিল, "লুকুবেন না, ম্যানেজার বাবু। আমি আজ নিজের চোখে দেখে এসেছি, আপনাদের নির্ম্মম অত্যাচারে শ্রীপুরের মোহিনী মুখুয্যের গোয়াল হ'তে—"

তাহাকে আর বলিতে হইল না, সাফাই গায়িবার জন্য অনুপম বলিল, "আমি তো কিছু জানি নি, মা।"

তিরস্কারের সুরে বেণু বলিল, "জানা কি আপনার উচিত ছিল না, ম্যানেজার-বাবু? আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার নিযুক্ত গোমস্তা যদি প্রজাদের উপর অত্যাচার করে, তবে সে দোষ আপনার। কেন আপনি তার খোঁজ রাখেন না বা তার ব্যবস্থা করেন না?"

তিরস্কারের সুর হইলেও সুরের উত্তাপ অনেকটা কম দেখিয়া অনুপম বলিল, "এবারকার মত ক্ষমা করুন,—"

অনুপম হাতদু'টী জোড় করিয়া দাঁড়াইল।

গম্ভীরভাবে বেণু বলিল, "ক্ষমা আমি করতে পারি যদি আমার কাছে আপনি প্রতিজ্ঞা করেন, প্রজাসাধারণকে নিজের সন্তানের মত এবার হ'তে দেখবেন।"

আশায় উৎফুল্ল হইয়া অনুপম বলিল, "নিশ্চয়ই দেখব, মা।"

"বেশ। শ্রীপুর হ'তে যে অতগুলা লোক চ'লে গেছে তা আপনি জানেন?"

"না, মা।"

"গোমস্তাকে খবর পাঠান—কালই যেন সে দেখা করে।"

অনুপমের মুখখানা হঠাৎ কাল হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া বলিল—"যে আজ্ঞা,মা।"

"বেশ যান।"

বাহিরে যাইবার জন্য অনুপম পা বাড়াইতেই, বেণু বলিল, "আমি যে আজ শ্রীপুর গিয়েছিলুম তাঁর কাছে যেন সেটা প্রকাশ না পায়, পেলে কিন্তু কিছুতেই চাকরি রাখতে পারবেন না বুঝলেন ?"

মাথা নাড়িয়া অনুপম বলিল—"আচ্ছা"

অনুপম চলিয়া গেল।

নানারূপ দুশ্চিন্তা আসিয়া আবার বেণুকে পীড়িত করিতে লাগিল।

—এগার—

হরলালের কাকুতি মিনতিতে বেণু নিজে আর জমীদারি পরিদর্শনে বাহির না হইলেও হরলাল নিজে অনুসন্ধান করিয়া যাহা বর্ণনা করিল; তাহা এইরূপ:—খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর একটু জুলুমই হয়, অন্য কোনও রকম অত্যাচার নাই, তবে দু'চারখানা গ্রামে একটু অমানুষিক অত্যাচার হয়—সেটা গোমস্তারই দোষ, প্রায় সমস্ত তালুক হইতেই দশ বিশজন লোক চলিয়া গিয়াছে, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা গোমস্তার অত্যাচারে আর কতক স্বেচ্ছায় স্থানান্তরে নিরাপদে বাস করিবার জন্য চলিয়া গিয়াছে।

বেণু জিজ্ঞাসা করিল—"মহানন্দ বলে জীবটার কোনও সংবাদ পেলে কাকা ?"

"—না মা, তবে কে একজন গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী, মাঝে মাঝে গোমস্তার সঙ্গে আর যে সব প্রজা উঠে গিয়েছে, তাদের সঙ্গে কথা বলত'।"

সমস্যা আরও বাড়িয়া উঠিল, প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী আর গোমস্তা।

বেণু বলিল—"আমি একবার যেতে পারলে ভাল হ'ত কাকা।"

হরলাল ভৃত্য হইলেও বেণু কোনও দিনই তাহাকে সেভাবে দেখিতে পারিত না। এই নিঃসঙ্গ বাড়ীখানার মধ্যে তাহার মাত্র অবলম্বন ছিল এই হরলাল, তাহারই পরামর্শে চলিয়া সে স্বামীকে অনেকটা বশে আনিতে পারিয়াছিল, তাহার উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিতেও সমর্থ হইয়াছে।

বেণুর কথা শুনিয়া হরলাল বলিল—"তুমি যাবে কেন মা ? নিঃশ্বেসটা যখন এখন বুকের ভেতর হ'তে বেরুচ্ছে—"

হরলালের কথাগুলা তাহার কর্ণে বোধ হয় প্রবেশ করে নাই, তাহার নিকট হইতে জমীদারির অবস্থার কথা শুনিয়া তাহারই চিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, তাই তার কথার অর্দ্ধপথেই বলিয়া উঠিল—"কোন্ কোন্ এলেকার গোমস্তা অত্যাচারী হয়ে পড়েছে বলছিলে কাকা ?"

"—খেঁজুরপুর, নারকেলডাঙ্গা, জামনগর—" বলিয়া হরলাল একটু থামিল তারপর বলিল—"লোকগুলাকে জবাব দিলেই ভাল হয় মা।"

বেণু বলিল,—"কি গ্রাম বল্লে—খেঁজুরপুর, নারকেলডাঙ্গা, জামনগর, তার সঙ্গে শ্রীপুরটাকেও ধরে নাও।"

হরলাল বলিল—"এই লোকগুলাকে সরাতে না পারলে—"

স্মিতহাস্যে বেণু বলিল—"পারব' তো ?"

হরলাল উত্তর দিল, "একটু চেষ্টা করতে হবে মা,—আর পারব' নাই বা কেন মা ?"

আর কোনও কথা হইল না, হরলাল চলিয়া গেল।

বসিয়া বসিয়া বেণু চিন্তা করিতে লাগিল; বীণার পত্র হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীপুরে নিজের অনুসন্ধান, অন্যান্য গ্রামগুলির সম্বন্ধে হরলালের মন্তব্য, এক একটা করিয়া বিশ্লেষণ করিতে করিতে সে যেন অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, গোমস্তার সঙ্গে সন্ন্যাসীর ষড়যন্ত্র, প্রজার অন্তর্দ্ধান এসব যে নিজেদেরই ভবিষ্যত বিপদের সূচনা করিয়া দিতেছে। এত বড় একটা শাণিত খড়্গ মাথার উপর ঝুলিতে থাকিলেও স্বামী কেমন তাহার চলা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়া এই সব লোকগুলার উপর নিশ্চিন্তভাবে নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন। অথচ ইহার আশু প্রতিকার না করিতে পারিলে ধ্বংশ অনিবার্য্য। কিন্তু স্বামী যে প্রকৃতির লোক—তাহাকে কোন্ দিক দিয়া এসব বুঝাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবে ?

তাহার বুকের মাঝে হাহাকার করিয়া উঠিল।

হঠাৎ তাহর মনে পড়িয়া গেল, শ্রীপুরের গোমস্তার কথা, এই সব প্রজা স্থানান্তরে যাইতেছে গোমস্তার কারসাজিতে, আর তাহার জন্য সরকারী খাজনাখানা হইতে অর্থ সাহায্য করা হইতেছে।

যতই সে চিন্তা করিতে লাগিল, জমীদারির দুর্ভাবনা ততই যেন তাহার চারিদিকে বেড়িয়া ধরিতে লাগিল; এই কঠিন সমস্যা তাহাকে এমনভাবে পাইয়া বসিল যে, সে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না, অস্থির হইয়া সে ছটফট করিতে লাগিল।

পাচিকা ঠাকরুণ আসিয়া বলিল,—"আহার করবে এস না মা, মিছিমিছি রাত করবার দরকার কি ?"

অন্যমনস্কভাবেই বেণু বলিল—"আর একটু দেখে, এখনও তাঁর আসবার সময় উতরে যায় নি।"

পাচিকা চলিয়া গেলে পুনরায় সে এই বিষয়ের চিন্তায় ডুবিয়া গেল। জমীদারির ভিতরে এই যে এত বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, তাহা স্বামী জানেন কি না? তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবারও উপায় নাই—আজ কয়দিন হইল তিনি বাহির হইয়াছেন। বাহিরই হউন আর দশবার দিন নাই আসুন, তাতে তো কিছু আসে যায় না, কিন্তু এত বড় একটা ঘটনা যে সময়ে জানবার দরকার সে সময়ে না আসলে সময় কি আবার ফিরে আসবে ?

চিন্তায় দুর্ভাবনায় সে কেমন একরূপ হইয়া উঠিল, চেয়ার হইতে উঠিয়া আলমারি খুলিয়া সাজান পুতুলগুলা নাড়িয়া চাড়িয়া রাখিতে রাখিতে মনে করিল—অনুসন্ধান করিয়া স্বামীকে না হয় ডাকাইয়া আনে।

মনে হইতেই সেই স্থান হইতেই ডাকিল—"হরু কাকা?"

"—তুমি যে এখনও গান গাও নি বেণু—মাষ্টার আসে নি?"

জড়িতকণ্ঠের কথা শুনিয়া বেণু পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিল,—স্বামী স্বয়ং।

তাহার স্খলিত চরণ আর রক্তবর্ণ চক্ষুর দিকে একবার তাকাইয়া বলিল—"এসেছিলেন, তাঁকে ছেড়ে দিয়েছি।"

জড়িতকণ্ঠেই সলিলকুমার বলিল—"কেন ?"

স্বামীকে ধরিয়া চেয়ারে বসাইতে বসাইতে অভিমানের সুরে বেণু বলিল;—"কার জন্যে শিখব, কে শুনবে গান? কড়ি বরগা ছাড়া ঘরে তো আর কেউ থাকে না।"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সলিলকুমার বলিল—"কেন আমি।"

বেণু নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

সলিলকুমার সেইভাবেই বলিল—"দাঁড়িয়ে রইলে কেন বেণু—ব'স, একখানা গান শোনাও, তোমার গান শোনবার জন্যে—"

মুখ খানাকে ভার করিয়া বেণু বলিল—"আর কাজ নাই—যাও। যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ দেখাতে চাই না।"

স্খলিত চরণে সলিলকুমার আলমারির নিকটে যাইতেই বেণু তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"পা টলছে আবার খাবে ?"

সহাস্যে জড়িতকণ্ঠে সলিলকুমার বলিল—"ভয় নেই গো ভয় নেই, একটা পিপে যার পেটের ভেতর ধরে, দু'চারটে বোতলে তার কিচ্ছু হবে না; টললেই বা পা।"

আব্দারের সুরে বেণু বলিল, "না, আমি তোমাকে কিছুতেই খেতে দিব না।"

বিহ্বল দৃষ্টি বেণুর গোলাপী মুখের উপর ফেলিয়া সলিলকুমার জড়িতকণ্ঠে বলিল, "খেতেও দেবে না, গানও শোনাবে না।"

ব্যগ্রভাবে বেণু বলিল, "না—না, তুমি বসবে চল, আমি তোমাকে গান শোনাব।"

তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে শয্যার উপর বসাইয়া দিয়া বেণু হারমোনিয়মের সুরে সুর মিলাইয়া গান ধরিল।

গানের তন্ময়তায় নিজেকে ডুবাইয়া দিলেও কিছুক্ষণ মধ্যেই সলিলকুমার আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিল না। শয্যা হইতে উঠিয়া সে নিজের আনন্দেই নৃত্য সুরু করিয়া দিল এবং সঙ্গীতের মধ্যপথেই বেণুকে সেই স্থান হইতে উঠাইয়া আনিয়া তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া পুনরায় নৃত্য সুরু করিয়া দিল।

তিরস্কারের সুরে বেণু বলিল, "এ কি হচ্ছে ?"

সলিলকুমার বলিল, 'মেম-সাহেবদের নাচ, ধ্যাৎ

ভের গান বন্ধ হয়ে গেল, কিসের তালে পা ফেলে নাচি বল তো ?"

হতাশভাবে সলিলকুমার শয্যার উপর বসিয়া পড়িল।

হাস্যের তরঙ্গ তুলিয়া বেণু বলিল, "কৈ নাচলে না ?"

সলিলকুমার কহিল, "নাঃ, তুমি গাও।"

বেণু পুনরায় গান ধরিল।

গান শেষ হইলে বেণু তাহার নিকট আসিয়া বসিতেই সলিলকুমার বলিল, "একটা পেগ দাও বেণু লক্ষ্মীটি, কিছু হবে না আমার।'

মুহূর্ত্তের মধ্যে কি ভাবিয়া লইয়া বেণু বলিল, "না খেলেই কি ভাল হ'ত না।"

"—না; আর থাকৃতে পার্‌ছি না। আমায় একটু দাও নিজের হাতে—"

তাহার অনুরোধ পালন করিয়া বেণু বলিল, "বাইরে তুমি কিসের জন্য যাও বল তো ? কিসের টান ?"

স্মিতহাস্যে সলিলকুমার উত্তর দিল, "একটু স্ফূর্ত্তি।"

সজল চোখে বেণু বলিল, "সেটা কি বাড়ীতে পাও না ?"

"না—না তাও নয় তবে কি জান বেণু—একটু নাচ গান—"

বেণু বলিয়া উঠিল, "আমি যে গান শিখলুম, কার জন্যে ? নাচলুমও তোমার সঙ্গে।"

সলিলকুমার বলিল, "হাঁ—তা--"

"বেশ, তোমার জন্যে আরও নাচ শিখব" বলিয়া বেণু পুনরায় বলিল, "তুমি কিন্তু আর বাইরে যেতে পাবে না—"

সলিলকুমার একটু মৃদু হাসিল, বলিল, "সত্যই তুমি নাচ শিখবে ?"

বেণু বলিতে লাগিল, "বিশ্বাস করলে না ? ভেবে দেখ দেখি আমি কি ছিলুম, তোমার জন্যে নিজেকে কি রকম পরিবর্ত্তনের পথে এনে ফেলেছি, তুমি যা চাও আমার কাছে তাই পাবে।"

সলিলকুমার বলিল, "তোমার হাতের সুধা বড় মিষ্টি লাগল'—আমাকে আর একটা পেগ দাও বেণু।"

বেণু বলিল, "আবার খাবে ?"

"হাঁ বেণু, ভয় পেয়োনা কিছু হ'বে না আমার।"

যে সমস্যা সারাদিন ধরিয়া বেণুর অন্তরে মাতামাতি করিতেছে, সেইটার সমাধানের জন্য, স্বামীর মুখ দিয়া যদি একটা কথাও বাহির করিয়া লইতে পারে, সেইটা ভাবিয়া আর একটা পেগ স্বামীর মুখের কাছে ধরিল।

সেটাকে শেষ করিলে বেণু বলিল, "লক্ষ্মীটী, আর তোমার বাইরে পড়ে থাকা ভাল দেখায় না। নায়েব-গোমস্তাদের অত্যাচার—"

তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া সলিলকুমার বলিল, "কেন তুমি তো রয়েছ ?"

"—আমি ?—"

"হাঁ, তুমি—জমীদারি আমারও যেমন, তোমারও তেমনই।"

"আমার ব্যবস্থায় তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও ?"

সলিলকুমার বলিল, "অসন্তুষ্ট হব কেন ? আমার চাই টাকা, আমার দরকার মত সেইটা দিয়ে তুমি যা ইচ্ছে করগে। আমার বলবার কিছু থাকবে না। জমীদারির ভাল'র জন্যে যা হয় তুমি করবে আমি তাতে বাধা দেব কেন ?"

সানন্দেই বেণু বলিল, "বেশ তোমার যা দরকার হ'বে তাই আমার কাছ হতে পাবে।"

সলিলকুমার বলিল, "বাস, তোমার যা ইচ্ছে করতে পার, আমার টাকা চাই টাকা—"

বেণু বলিল, "কিন্তু আমার হুকুম ম্যানেজার যদি তামিল না করে ?"

"আলবৎ করবে। সে আমারও যেমন চাকর তোমারও তেমনি—".

ক্রমশঃই সলিলকুমারের স্বর বিকৃত হইতেছে এবং মত্ততার ভাব উত্তোরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া তাহাকে আবেগভরে জড়াইয়া বেণু বলিল, "আচ্ছা, মহানন্দকে চেন ?"

সলিলকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠি দিয়েছে না কি ?"

বেণুর বুকের মাঝে একবার ধ্বক করিয়া উঠিল, উদ্বেলিত হৃদয়ে আব্দারের সুরে বলিল, "কে সে ? বল না।"

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সলিলকুমার বলিল, "সে একজন সন্ন্যাসী। আমাকে এই পথ হ'তে ফেরাবার জন্যে এক খানা

কবচ দেবে বলেছে। তৈরী হ'লে চিঠি দেবার কথা আছে কি না ?...তার কি কোনও চিঠি এসেছে ?"

হতাশায় বেণুর সারা অঙ্গ ছাইয়া গেল, সে প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া তেমনই আব্দারের সুরে বলিল, "তুমি একটু লিখে দাও না, ম্যানেজার যদি আমার কথা না শোনে, তোমার হুকুম দেখাব।"

সলিলকুমার বলিল—"নিয়ে এস কাগজ-দোয়াত-কলম, নাঃ, তুমিই লিখে নিয়ে এস আমি সই ক'রে দিচ্ছি।"

বেণু তাড়াতাড়ি লিখিয়া তাহার নাম সহি করিবার জন্য তাহার নিকট আসিলে, দেখিল স্বামীর আর কোনও সাড়া শব্দ নাই। তিনি তখন সজ্ঞাহীনের মত পড়িয়া আছেন।

বেণুর সারাটা অঙ্গের ভিতর রি, রি, করিয়া উঠিল——কাজটা হাসিল হইবার মুখের বাধা পাইল। চোখের জলে বুক ভাসাইয়া সে বীণাকে পত্র লিখিতে বসিল।

—আর—

পরদিন সলিলকুমার বাহির হইয়া পড়িল। অন্যান্য সময় দুই একদিন বাড়ীতে থাকিয়া তবে বাহির হইত, কিন্তু কি ভাবিয়া সে একটা দিনও আর বাটীতে থাকিল না।

বেণু ধরিয়া বসিল, "আজই তুমি কেন যাচ্ছ ? পাঁচ ছয় দিন পরে কাল রাত্তিরে এসেছ, আবার আজই যাবে না—না—তা' হতে পারে না।"

তাহার অধর একটু টিপিয়া সলিলকুমার বলিল,—"আজই আমি ফিরে আসব, যাচ্ছি একটু বিশেষ কাজে।"

সারা পথটা তাহার কেবল এই চিন্তাই জাগিতে লাগিল, শত্রুতা সাধনের জন্য যে জাল পাতা হইয়াছে, তাহাতে এখনও কেহ পা দিয়াছে কি না ?...তাহার পর ভাবিতে লাগিল, হঠাৎ বেণু মহানন্দের নাম পাইল কোথা হইতে ? সে কি তার স্বরূপ জান্‌তে পেরেছে ? তাহার পর আবার ভাবিতে লাগিল, কার্য্যোদ্ধারের জন্য মহানন্দ যাহা চাহিতেছে, তাহাই তো সে অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহাকে দিয়া আসিতেছে বিনিময়ে কেবল সে চায় তাহার উপর যে অবিচার হইয়াছে তাহার প্রতিশোধ লইতে ? সে চায় প্রতিশোধ দিবার জন্য সেখানে অধর্ম্মের স্রোত বহাইয়া দিতে, অত্যাচারের দাবানল প্রজ্বলিত করিতে। আর কিছু কিছু তো সে চায় না, কিন্তু সে সম্বন্ধে তো মহানন্দের কোনও সংবাদ নাই, কি করিতেছে সে ?

সলিলকুমার যেন একটু দমিয়া গেলেন, দুইটা বৎসরের মধ্যে যদি সে কার্য্যোদ্ধার করিতে না পারিল, তবে তাহার কার্য দক্ষতা কোথায় ? সত্যই কি সে তাহার পক্ষ লইয়া কার্য্য করিতেছে ? না, তাহার আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া আমাকে স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিতেছে মাত্র।

চিন্তার খরস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সে সর্ব্বরী ঠাকরুণের বাড়ীর সম্মুখে যখন আসিয়া পৌছিল, তখন বেলা অনেকটা হইয়া গিয়াছে।—

বাহির হইতে তাহাকে ডাকিতেই সর্ব্বরী তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া তাহাদের এই অতি বড় আত্মীয়কে সহাস্যে আদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার আসন প্রদান করিল।

সলিলকুমার আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহানন্দের সংবাদ কি ঠাকরুণ ?"

সর্ব্বরী বলিল, "আমিও জো সেইটাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করব মনে করছিলুম। মাস দুয়ের মধ্যে কোনও সংবাদই তো পাই নি।"

গম্ভীরভাবে সলিলকুমার বলিল—"দলে মিসে গেল না কি ঠাকরুণ ?"

স্মিতহাস্যে সর্ব্বরী বলিল, "তা কি হ'তে পারে ? বোধ হয় কাজের ঝনঝাট খুবই বেড়ে গেছে।"

"হবেও বা,"—বলিয়া সলিলকুমার একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

সলিলকুমারের এই উদ্বেগ প্রশমিত করিবার জন্য সর্ব্বরী বলিল—"মার প্রসাদী কারণবারি একটু দিই ? কি বলুন ?" বলিয়াই ঘরের একটা কোণ হইতে একটা বোতল ও কাঁচের গ্লাস তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিল। উচ্ছ্বসিত আনন্দে সলিলকুমার বলিল, "প্রসাদি জিনিস একটু শ্রীমুখে দিয়ে প্রসাদ করে দাও ঠাকরুণ।"

জিহ্বার অগ্রভাগ একবার দাঁতের সঙ্গে চাপিয়া সর্ব্বরী বলিল, "আমি কখনও ও জিনিষ স্পর্শ করিনি আপনি পান করুন।"

সলিলকুমার বলিল,—"যখন খান না তখন দিন।"

সর্ব্বরী বলিল, "আপনি ততক্ষণ পান করুন, আমি

ভাতের ফেনটা ততক্ষণ গেলে আসি। হাঁ, আপনাকে কিন্তু আহারাদি এই খানেই সেরে যেতে হবে।"

"না সেটা আর পারব না" বলিয়া সস্মিতমুখে সলিলকুমার বলিল, "অর্দ্ধাঙ্গিনীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি আজই ফিরব—বেচারা না খেয়ে না দেয়ে হা পিত্যেশ করে বসে আছে!"

এক পাত্র শেষ করিয়া সলিলকুমার পুনরায় বলিতে লাগিল, "মহানন্দের সঙ্গে দেখা হওয়াটা বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে?"

"—যখন খুব দরকার হয়েছে তখন নিশ্চয়ই দেখা হ'বে জমীদারবাবু। মনের আকুল বাসনা মা তো কখনও অপূর্ণ রাখেন না।"

কথাটা শেষ হইতে না হইতে উভয়ে দেখিল—সহাস্য মুখে দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া মহানন্দ।

সলিলকুমার তাহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই মহানন্দ বলিল, "দীর্ঘায়ুরস্তু।"

সলিলকুমার বলিল, "আর দীর্ঘায়ুতে কাজ নেই মহানন্দ, এখন সংবাদ কি, তাই বল।"

মহানন্দ বলিল, "জগদম্বার ইচ্ছে।"

একটু অধীভাবে সলিলকুমার জিজ্ঞাসা করিল—"ইচ্ছেটা কি তাই বল না মহানন্দ, আমার বাসনা পূর্ণ হ'তে কত দেরী?"

মহানন্দ বলিল—"মার ইচ্ছা জমীদারবাবু, যার ইচ্ছা মাত্রে একটা প্রলয় হয়ে যায়—"

অতিষ্ঠভাবে সলিলকুমার বলিল—"আমি সেই প্রলয়টাই চাই। কতদিন—আর কতদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে মহানন্দ?"

"সেও সেই ইচ্ছাময়ী মার করুণা। প্রাণ ভ'রে তাঁকে ডাকুন আপনার বাঞ্ছিত ফল তিনিই দেবেন। ক্ষুদ্র জীব আমরা—আমাদের ক্ষমতা কতটুকু, যোগাযোগ সব তিনিই ক'রে রেখে দেন, উপলক্ষ্য হই মাত্র আমরা, তাও সেই জগন্ময়ীর করুণা।"

মহানন্দের হেঁয়ালিভরা কথার একটাও সলিলকুমারের ভাল লাগিতেছিল না, বলিল—"তোমার কথার খেই আমি ধরতে পারছি না, তোমার জগন্মাতার ইচ্ছা, যোগাযোগ প্রভৃতি সব শিকেয় তুলে রেখে স্পষ্ট কথাটা খুলে বল। কাজ শেষ হতে দেরী কত?"

"শত্রু বিনাশিনী মার ইচ্ছে জমীদারবাবু।"

মহানন্দের কথায় সলিলকুমার এবার রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে তাহার হাত ধরিয়া নিজের কাছে বসাইয়া বলিল, "সর্ব্বরী ঠাকরুণ একবার বেরিয়ে যান তো—"

সর্ব্বরী ঠাকরুণ চলিয়া গেলে বলিল,—"সব কথা খুলে বল মহানন্দ, তোমার আধ্যাত্মিকতা তুলে রাখ। সংসারে সরল লোক আমি, আমার বিশ্বাসের প্রতিদান এমন ভাবে দিলে তোমার রক্ষে থাকবে না। জলের মত তোমাকে টাকা দিয়েছি—একদিনের জন্যও না বলি নি—বা কি ভাবে কি করছ তাও জানতে চাই নি—জানতে চাই আমার আশা পূর্ণ হ'তে কত দেরী? আর যদি না পার তাও বল?"

হাস্যতরলকণ্ঠে মহানন্দ বলিতে লাগিল—"এতদিন সব কাজই শেষ হয়ে যেত জমীদারবাবু কিন্তু মাঝখানটায় আপনার জ্যেষ্ঠ শ্যালিকা বীণা...ওঃ কি ধড়িবাজ মেয়ে বাবা—"

সাগ্রহে সলিলকুমার জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি আবার কি করলেন? দেখ এখনও মুখ সামলে কথা বল—সে দেবীর সম্বন্ধে কোন মিথ্যা কথা বলো না—আমি যতদূর অধঃপাতে যাই না কেন, এখনও তার যথোপযুক্ত সম্মান বজায় রাখব'।"

মহানন্দ বলিল—"বলছি শুনুন না, প্রজাদের মধ্যে একতা নষ্ট করবার জন্যে যে নূতন প্রজা নিয়ে যাচ্ছি, তার সংখ্যার আধিক্য দেখে তিনি যেরকম সন্দেহ করতে সুরু করলেন—"

ব্যগ্রাতুরকণ্ঠে সলিলকুমার জিজ্ঞাসা করিল,—"বুঝতে পেরেছেন না কি?"

হাসিয়া মহানন্দ বলিল—"সবই সেই মহামায়ার মায়া; ঝ'ড়ো মেঘ একখানা উঠেছিল দিন কতকের মধ্যেই কেটে গেছে। কিন্তু আর দেরী করা নয় জমীদারবাবু, এইবার আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে, আমি ধ্যানে বসে বুঝতে পেরেছি, আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন।"

আশার আলোকে সলিলকুমারের অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, মদের বোতলটা শেষ করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "তা'হ'লে মহানন্দ—"

তাহাকে কিন্তু আর বলিতে হইল না। হঠাৎ চঞ্চলা রুদ্র

মূর্ত্তিতে সেইস্থলে আসিয়া ঝা ল সুরে বলিয়া উঠিল—"
"সর্ব্বরীর আঁচল ধরতে শিখে' স রে মুখপোড়া, তাই তো বলি দু'মাসের মধ্যে দেখা নাই কন ?"

রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে হঠাৎ চঞ্চলার আবির্ভাবে সলিল-কুমার হতভম্বের মত বলিল—"কি বলছ চঞ্চল ? একটা কাজ—"

তেজোদীপ্ত কণ্ঠে চঞ্চলা বলিল—"তোর কাজের মাথায় মারি ঝাড়ু। ওঠ্ বলছি চল্।"

দুঃখিতের ন্যায় সলিলকুমার বলিল—"চঞ্চল, তুমি প্রেমিকা, তোমাদের প্রেম নিয়ে আজ সাহিত্য-জগৎ সমুদ্ভাসিত, ছিঃ, অতখানি তরল হতে আছে ? তুমি যাও—আমি সন্ধ্যার পর আসব।"

হাত-পা ছুড়িয়া চঞ্চলা বলিল—"সন্ধ্যার পর কেন, নীচে আসতে পেরেছ আর ওপরে যেতে পার নি ?"

তাহাদের মাঝে পড়িয়া মহানন্দ চঞ্চলাকে বলিয়া উঠিল—"আ হা হা হা কর কি চঞ্চল জমীদার—"

তাহাকে আর বলিতে হইল না, বিকৃতকণ্ঠে চঞ্চল বলিয়া উঠিল—"অমন হাজার হাজার জমীদার আমাদের পায়ের কাছে গড়াগড়ি যায়—হাত্তোর জমীদার।"

চোখ দুইটাকে কপালে তুলিয়া মহানন্দ বলিল—"আমার ঘরে ফের যদি ওঁকে অপমান করবে, আমি অভিসম্পাত করব।"

তাহার রক্ত চক্ষুকে ভয় না করিয়া, যাহা মুখে আসিল, চঞ্চলা তাই বলিয়া গালি পাড়িতে পাড়িতে সলিলকুমারকে লইয়া চলিয়া গেল।

চঞ্চলা ও সলিলকুমার ঘরের বাহিরে যাইতেই মহানন্দ বলিল—"দেখলে সর্ব্বরী মায়ার ব্যাপারখানা—আমি তো মনে করেছিলুম আজ বুঝি আমার ভবলীলা সাঙ্গ হ'ল। সলিলকুমারের ওরকম রক্ত চক্ষু এ কয় বছরে একদিনও দেখি নি। পকেটে মাঝে মাঝে হাত ঢোকাচ্ছিল—মনে হ'চ্ছিল পিস্তলটা বুঝি বার ক'রে ছুড়্লে আর কি ? জগদম্বে তোমার সব মায়া মা—!"

হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি মহানন্দের মুখের উপর ফেলিয়া সর্ব্বরী বলিল, "দেখচি বৈ কি অনেকদিন আগে হতেই। বাল্যের সীমারেখার বাইরে পা দিতেই,—মনে নেই ?"

"মনে আবার নেই সর্ব্বরী—"বলিয়া মহানন্দ বলিতে লাগিল—"সেই তুমি সেই আমি। গণেশপুর গ্রামের শ্যামল বুকের ওপর যখন খেলা করতুম, কত ভাব, কত ভালবাসা, এখনও মনের ভেতর জ্বলজ্বলে হয়ে রয়েছে। তুমি হতে কনে আমি হতুম বর।...তার পর যখন দু'জনেই যৌবনে পা দিলুম, তোমার বিয়ের জন্যে তোমার বাপ মায়ের আকুল চেষ্টা, মনে সবই আছে সর্ব্বরী, যখন জোর করে তোমার অমতে তারা তোমার বিয়ে দিলে তোমার চোখের এক এক ফোঁটা জল আমার বুকের ভেতর এক একটা তীরের ফলার মত বিঁধতে লাগল, তার পর যখন শ্বশুর বাড়ী হ'তে বাপের বাড়ী এলে, এই বাপ-মা মরা একান্ত নিঃসহায় লোকটার বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখখানা দেখে তোমার বুকে যে শেল বিঁধেছিল তাও তোমার কথাতেই বুঝেছিলুম, যেদিন তুমি বলেছিলে অধর্ম্মের হাত হ'তে বাঁচাবার জন্যে তুমি আমায় নিয়ে পালাও, ওগো নিয়ে চল!"

বাধা দিয়া সর্ব্বরী বলিল—'সে পুরান কাসুন্দি ঘেঁটে আর কাজ কি ? এখন স্নান ক'রে এস।"

মহানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তার সাথে তোমার জন্যে মার প্রসাদী যা এনেছি ধর—"বলিয়া ঝোলার মধ্য হইতে বার গাছা জড়োয়া চুড়ি, দুইটী হীরার টোপ ও একছড়া হার বাহির করিতেই আশ্চর্য্যের সহিত সর্ব্বরী বলিল—'এ সব কি—কোথা পেলে ?"

হাসিয়া মহানন্দ বলিল,—"এ সব মায়ের দান।"

আশ্চর্য্যভাবেই সর্ব্বরী বলিল—"বুঝতে পারলুম না, খুলে বল, কারও চুরি কর নি তো ?'

সেইরূপ ভাবেই মহানন্দ বলিল,—"না-না, চুরি করব কেন ? এক ধনীর স্ত্রী, স্বামী নিয়ে ঘর করতে পায় না, চঞ্চলার মত একজনের কাছে সে পড়ে থাকে। আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ল স্বামীকে তার ঘরবাসী করতে হবে। তার গায়ে এই ক'খানা গহনা যে কি মানিয়েছিল সর্ব্বরী তা আর কি বলব ? লোভ হ'ল এই রকম গহনা তোমাকে পরাবার জন্য, বললুম 'মা তোমার অলঙ্কারের মত অলঙ্কার যদি মাকে দিতে পার তবে তোমার গয়না চিরদিন বজায় থাকবে, স্বামী তোমার আজই ঘরে ফিরবে।' স্বামীকে ফিরে পাবার আশায় রমণী এক কথায় তার দেহ হ'তে সবগুলি খুলে দিলে, আমিও একটু সিঁদুর-পড়া তাকে দিলুম, আর তোমার জন্যে—"

বাধা দিয়া সর্ব্বরী সভয়ে বলিল, "তা, হাঁগা, এতে কোনও ভয় নেই তো ?"

"ভয় কিসের সর্ব্বরী ?...এ তো চুরি নয়, এ যে একজনের দান, এস পরিয়ে দিই। এই যে গেরুয়া সর্ব্বরী, এর অনেক গুণ।"

ভারতের প্রাচীনতম স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য নিদর্শন

[ডাঃ গুরুদাস রায়]

একদিন ছিল যখন হিন্দু তাহার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দুয়ার খুলিয়া দিয়া জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিয়াছিল—শিল্পে, ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে—যেখানে সেখানে তাহার প্রতিভার ও কলাকুশলতার অক্ষয় অমোঘ কীর্ত্তি রচনা করিয়াছিল।

সেই সুপ্রাচীন বৌদ্ধযুগে কত মন্দির, মঠ, বিদ্যাপীঠ যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তাই করা যায় না। আমি এইরূপই কতকগুলি অধুনা-অজ্ঞাত ভারতের প্রাচীনতম পার্ব্বত-গুহার উল্লেখ করিব।

বিখ্যাত বৌদ্ধ-সম্রাট্ অশোকের সময় ভারতে কতকগুলি প্রাচীনতম গুহা-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে যুগের আজ কেহ জীবিত নাই, কিন্তু "বরাবর" পাহাড়ের ও নাগার্জ্জুনীর পাদমূলে যে সুপ্রশস্ত সুবৃহৎ গুহা-সপ্তক খোদিত হইয়াছিল, তাহা এখনও পর্য্যন্ত বিশ্ববাসীর নিকট বৌদ্ধ-গরিমার বার্ত্তাই বিঘোষিত করে।

পাটনা-গয়া রেল লাইনের "বেলা" ষ্টেশন হইতে ৮৷১০ মাইল দূরে এই "বরাবর" পাহাড় শ্রেণী অবস্থিত। বেলা হইতে দিগন্ত-বিতত মাঠের মাঝখান দিয়া একটী মাটীর উঁচু রাস্তা পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া শেষ হইয়াছে। কোন যান-বাহন পাওয়া যায় না—দস্যুভীতিও আছে—তাহার উপর স্থানে স্থানে ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তুও উপদ্রব করে। আমরা তিনজন; সঙ্গে একটী বন্দুক, একটী ইলেক্‌ট্রিক্ বাতি, একটী ক্যামেরা ও কিছু খাবার। রাত্রি ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সেই অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোতে কত মাঠ, সেতু বালুভূমি পার হইয়া শেষে এক পাহাড়ের সম্মুদেশে আসিয়া উপনীত হইলাম। তারপর সকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত গ্রীষ্মকালের সেই খরকরদীপ্ত উত্তপ্ত পার্ব্বত-ভূমিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাহা কিছু সঙ্কলন করিয়াছি তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। সেই মার্ত্তণ্ড-তাপ-তপ্ত গিরি-প্রদেশের মধ্যে অসহায় অবস্থায় মরণের যন্ত্রণা যে কত নির্ম্মম, তাহা আমরা সেখানে দ্বিপ্রহরের প্রতি মুহূর্ত্তটী দিয়া অনুভব করিয়াছি—এমন কি সেই ছায়াহীন, আশ্রয়হীন স্থানে নিঃসহায় নিরবলম্ব অবস্থায় মধ্যাহ্নের সৌরকরোজ্জ্বল পাহাড়ের উপর তিলে তিলে জীবনের আশা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম—তারপর সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় সেখানকার একজন অসভ্য পার্ব্বত্য অধিবাসীর যত্নে প্রাণ পাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পাটনা জেলার আধুনিক রাজগীর বা প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহকে পশ্চিমদিকের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই বরাবরে একটী পার্ব্বত দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাভারতেও আমরা বরাবরের উল্লেখ দেখিতে পাই। মগধের রাজা জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন ভীম-অর্জ্জুনের সহিত রাজগৃহে আসিয়াছিলেন সেই সময় তাঁহারা সেখান হইতে এই বরাবরের তুঙ্গ শৃঙ্গ দেখিয়াছিলেন। রাজগৃহ যখন রাজধানী হইয়াছিল সেই সময় বরাবর বিহারের বিখ্যাত দুর্গ হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় শিলালিপিতে আমরা বরাবরের উল্লেখ পাই। খৃষ্টের জন্মাইবার দুই শত বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যার বিখ্যাত ক্ষমতাশালী রাজা কারাভেলা তাঁহার বিহার আক্রমণের সময় এই বরাবরেই মগধের রাজাকে পরাজিত করেন এবং ভুবনেশ্বরের দ্বারে খণ্ড-গিরি পাহাড়ে তাঁহার লিপির মধ্যে এইখানকার নাম 'গোরাথাগিরি' খোদিত করিয়া রাখিয়া যান। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই গোরাথাগিরি নাম পরিবর্ত্তিত হয়—এবং তখনকার শিলালিপিতে 'পারাতার' পর্ব্বত বলিয়া লেখা থাকে এবং তাহা হইতেই বর্ত্তমান বরাবর নাম হয়।

বরাবরের আর একদিকে আছে 'কউডল' পাহাড়—অনেকখানি স্থান লইয়া সারি গাঁথিয়া মাথা তুলিয়া বেশ সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে—তাহারই নিকট খানিকটা উন্মুক্ত প্রশস্ত প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে—এবং একটী প্রাচীন

যুগের বৌদ্ধ মূর্ত্তিও আছে—সেখানে প্রাচীন পুষ্করিণী বা তালাও এর চিত্রও দেখা গেল—এবং মূর্ত্তিটী প্রাচীন কালের বৌদ্ধ-মূর্ত্তির মধ্যে অন্যতম বলিয়াই মনে হয়। সেখানে যদি এখন খনন-কার্য্য আরম্ভ করা হয় তাহা হইলে বোধ হয় ভারতের আর একটী প্রাচীন সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেইজন্য আমি সরকারী প্রত্নতত্ব-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ওখান হইতে তিন মাইল দূরে বরাবর পাহাড়—বহুদূর পর্য্যন্ত শাখা-প্রশাখা লইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায় ভগবান অংশুমালী তাঁহার প্রথম ও শেষ কিরণ তাহাদের মাথার উপর ছোঁয়াইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। প্রকৃতির সেই স্বচ্ছ উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যের মাঝখানে চারিদিক শান্ত স্তব্ধ নিঝুম হইয়া সেখানকার নিথর গাম্ভীর্য্যের পরিপূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে—পাথরের স্তূপ আশে পাশে জমা হইয়া পড়িয়া আছে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটী মন্দির—এবং সেখানকার মূর্ত্তিগুলি সবই বৌদ্ধ-মূর্ত্তি—সংস্কার অভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

এইবার মৌর্য্য-রাজত্বকালের সাতঘরা বা সাতটী গুহা। ইহাদের মধ্যে চারটী এই পাহাড়েই আছে—এবং বাকী তিনটী ইহার পার্শ্ববর্ত্তী নাগার্জ্জুনী পাহাড়ে। বরাবর পাহাড়ে চারটী গুহার মধ্যে তিনটীতে অশোকের লিপি আছে—এবং একটী অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এমন কি গুহাগুলির নাম পর্য্যন্ত এই দুই সহস্র বৎসরের ব্যবধানে অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং গুহাগুলির আর একটী বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, চিনা-মাটীর জিনিস অপেক্ষাও ইহা এত মসৃণ যে, ইহার গায়ে হাত দিলে হাত পিছলাইয়া পড়িবে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গুহাটীর নাম সুদামা—ইহাতে তখনকার খোদিত লিপিও আছে। এইটী এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গুহাটী আজকাল বিশ্বকর্ম্মা নামে কথিত হয় এবং সম্রাট্ অশোকের দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব সময়ে আজীবক-সম্প্রদায়ের জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বরাবর এবং নাগার্জ্জুনীর পাহাড়ে সাতটী গুহার মধ্যে পাঁচটী আজীবক-সম্প্রদায়ের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল—আজীবক-সম্প্রদায় ছিল বৌদ্ধ এবং জৈনদেরই মত একটী সম্প্রদায়, তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা গোশাল ছিলেন বুদ্ধ ও মহাবীর বর্দ্ধনেরই সমসাময়িক। খৃষ্টের জন্মাইবার প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই গুহাগুলি যে অ-বৌদ্ধ এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য বিনির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা হইতে সেই বৌদ্ধ যুগও মৌর্য্য-রাজবংশের মধ্যে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের আর একটী নূতন প্রমাণই জ্ঞাপন করে। সুদামা এবং বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত হইবার সাত বৎসর পরে আর একটী গুহা নির্ম্মিত হয়, লিপি হইতে তাহার নাম পাইয়া থাকি "সুপিয়া" বা প্রিয়, কিন্তু এখন তাহাকে "চৌপর" বলে। এই গুহা তিনটী পাশা-পাশি পাথর কাটিয়া মাঝখানের পাথরকে দেওয়াল করিয়া এক একটীতে ২০০।৩০০ লোকের স্থান হইতে পারে এইরূপ সুবৃহৎ ও সুমসৃণ কক্ষরূপেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাহিরের দিকে কোন কারুকার্য্যই নাই কিন্তু প্রতি প্রাতে ও অপরাহ্নে সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মিচ্ছটা দিক্‌চক্রবালের কোল হইতে পথ করিয়া লইয়া যখন গুহার ভিতরে প্রবেশ করে, তখন সেই সুমসৃণ দেওয়ালের গায়ে লিপিগুলি পর্য্যন্ত জল্ জল্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। ইহার দ্বারদেশে যে খিলানের মত স্থান আছে তাহা মিশরের কর্ণাক নগর ছাড়া ভারতের আর অন্য কোন মন্দির, গুহা বা প্রাসাদে দেখা যায় না।

আর একটী শ্রেণীতে লোমশ ঋষির গুহা আছে—তাহার বাহিরের দিক্‌টা কারুকার্য্য-সমন্বিত—ইহাতে কোন লিপি নাই। এইখানে যে ভাবের কারুকার্য্য আছে এবং কাঠের খিলানের মত তৈয়ারী করা আছে ইহাই হইতেছে সর্ব্বপ্রাচীন কারুকার্য্য, যাহার অনুকরণে কারলী, নাসিক, অজন্তা এবং এলোরায় সব প্রাসাদ ও গুহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।—এমন কি, মধ্যযুগের কতকগুলি হিন্দু মন্দিরও এইভাবে সুসজ্জিত ছিল।

ইহা ছাড়া এক মাইল দূরে নাগার্জ্জুনী পর্ব্বতে যে তিনটী গুহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার সমস্তগুলিই অশোকের এক প্রপৌত্র দশরথের অনুমত্যনুসারেই হইয়াছিল। লিপি হইতে জানিতে পারি যে, তাহাদের নাম বাহিরকা, গোপিকা এবং বদাতিকা। এই গুহাগুলিও বরাবরের মত মসৃণ ও কারুকার্য্য-বিহীন।

এই গুহাগুলিই ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গুহা। ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইয়া

যাইতে লাগিল তখন বরাবরের লোমশ ঋষির গুহাটী কৃষ্ণমূর্ত্তির এবং নাগার্জ্জুনীর দুইটী গুহাতে শিব দুর্গা এবং দুর্গা-পার্ব্বতীর পূজা হইয়াছিল। তবে ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনন্ত বর্ম্মার যে লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মূর্ত্তি-বিশেষের কোন নামই পাওয়া যায় না।

বরাবর দেখিয়া আসার পর সেখান হইতে যে লিপির অনুকরণ লইয়া আসিয়াছিলাম সেই লিপির উদ্ধার সাধন এবং অন্যান্য তথ্য অবগত হইবার জন্য আমি নানা পুস্তক ও পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি—এজন্য আমি তাহাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। ভবিষ্যতে আরও কিছু সংকলন করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

ইস্‌লামে নারীজাতি

[ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম]

ইস্‌লাম ধর্ম্ম-জগতে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বকালীন অবস্থা সম্যক্ রূপে অবগত না হইলে ইস্‌লাম ধর্ম্ম স্ত্রীজাতির সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন কত উন্নত করিয়াছে তাহা জানা সহজসাধ্য নহে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে শিশুহত্যা ও সতীদাহ প্রথা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত ছিল। স্বামিহীনা বিধবার পক্ষে মৃত্যুই বরণীয়া ছিল; কেন না পুত্র-কন্যার জননী না হইলে তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। স্ত্রীজাতির বেদ অধ্যয়নে, পিতৃশ্রাদ্ধে যোগদান ও দেবতা-চর্চ্চায় কোন প্রকার অধিকার ছিল না। স্বামি-সেবাই তাহাদের একমাত্র ধর্ম্ম এবং উহা সম্পাদন করিবার উপরই তাহাদের পারলৌকিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করিত।

ইস্‌লাম ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদ মোস্তফা যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালীন স্ত্রীজাতির অবস্থা এত শোচনীয় ছিল তাহা বলিবার নহে। প্রাচীন পারসীক্ জাতিরা স্ত্রীজাতির কোন প্রকার অধিকার স্বীকার করিতেন না। তাঁহাদের ইচ্ছাই সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত হইত। পুরুষগণ ইচ্ছানুযায়ী বিবাহোচ্ছেদ বা নিকট আত্মীয়াকে বিবাহ করিতে পারিতেন। অবরোধ-প্রথা শুধু পারসীক্ জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রীক্ জাতির মধ্যেও স্ত্রীদিগকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখা হইত, বাহিরে কখনও যাইতে অনুমতি দেওয়া হইত না। গ্রীসের ন্যায় পারস্য-দেশে গণিকা-ব্যবসা সমাজে প্রচলিত—অনুমোদিত ও ভগিনীগণের সহিত ভ্রাতার বিবাহ সামাজিক অনুমোদিত ছিল। প্রাচীনকালে সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য ও সুশিক্ষিত এথেনিয়ান জাতির মধ্যে স্ত্রীগণ সাধারণ বিক্রয়-সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইত। সন্তান-প্রসব ও গৃহস্থালী পর্য্যবেক্ষণ করাই স্ত্রীদের একমাত্র কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল। রোমক জাতির মধ্যেও স্ত্রীগণের অবস্থা অত্যন্ত হেয় ছিল। পুরুষেরা যতগুলি বিবাহ করিতে ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন। প্রথমা স্ত্রী ভিন্ন অন্যান্য বিবাহিতা স্ত্রীগণের কোন অধিকার স্বীকৃত হইত না এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিরা জারজ বলিয়া প্রতিপন্ন হইত।

ইহুদীজাতির মধ্যেও নারীজাতি অধিকতর উন্নত ছিল না। কুমারীদিগকে পিত্রালয়ে সাধারণ দাসদাসীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে হইত; ইঁহাদের পিতারা না বালিকা অবস্থায় ইহাদিগকে ইচ্ছামত ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিতেন। পিতার অবর্ত্তমানে, পুত্রগণ যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিতেন। কন্যারা পিতার কোন সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারিতেন না। পুত্র না থাকিলে অবশ্য ইহার অন্যথা হইত।

যীশুখৃষ্ট বা তাঁহার ধর্ম্ম নারীজাতির উন্নতির জন্য বিশেষ

কিছু চেষ্টা করেন নাই। পরন্তু তিনি নারীজাতির প্রতি তাঁহার জননীর নিকট যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেই প্রতীয়মান হয়,—"Woman, what have I to do with thee!" সেন্ট্ পল (St. Paul) বলেন,—"নারীগণ সর্ব্বপ্রকার বিনীতভাবে শিক্ষা গ্রহণ করুক। তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে বা তাহারা পুরুষের উপর প্রভুত্ব করুক ইহা আমি আদৌ ইচ্ছা করি না, কারণ, আদম (ADAM) প্রথমে ও হবা (EVE) পরে জগতে আসিয়াছিলেন; হবা শয়তান-কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আদম হন নাই।" সেন্ট্ বার্ণার্ড বলেন,—"নারী শয়তানের প্রসূতি।" সেন্ট্ এন্টনি বলেন,—"নারী শয়তানের জননী—তাহার স্বরসর্পের ফোঁসের সমান।"

মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন আরব দেশে নারীর প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার হইত তাহার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই তাহাকে কবরস্থ করা হইত। জনক সাধারণতঃ এই পাশবিক ও নৃসংশ কার্য্য নিজেই সম্পাদন করিতেন। আরবদেশে নারীর কোনপ্রকার অধিকার ছিল না—তিনি কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারিতেন না; তাহার সম্পূর্ণ অসম্মতিতে তাহার বিবাহ হইত। এই সমস্ত কারণে বিমাতার সহিত পুত্রের ধর্ম্মানুমোদিত বিবাহ প্রায়শঃ সম্পন্ন হইত। যথেচ্ছাচারে বহু বিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। স্বামী ইচ্ছানুযায়ী স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে বা গ্রহণ করিতে পারিতেন,—মোটকথা স্ত্রীর উপর স্বামীর অসাধারণ ও অন্যায় ক্ষমতা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। হজরত মহম্মদের আবির্ভাবে সমাজের অবস্থা কিরূপ বিসদৃশ ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বে সম্যকরূপে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছি। হজরত মহম্মদ এই সমস্ত অন্যায়-অবিচার বিদূরিত করিয়া সমাজে স্ত্রী-পুরুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বসাধারণকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন,—"হে মানবগণ! তোমরা—যে দয়াময় তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে ভয় করিও; তিনি তোমাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই তাহা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রকারে বহু স্ত্রী পুরুষজাতির বিস্তার করিয়াছেন। তোমরা তোমাদের যে অধিকার একটীর পর একটী পাইবার দাবী কর তাহাকে এবং যে মাতৃজাতি হইতে তোমাদের জন্ম তাহাদিগকে ভয় করিবে।" পবিত্র কোর-আনের এই মহতী বাণীতে স্ত্রীপুরুষের সমাজে সাম্যভাব আমরা স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই। বস্তুতঃ যখন আমরা দেখি—জন্মের একত্ব ও সমতা থাকা সত্ত্বেও পুরুষ উপর আধিপত্য দাবী করে, তখন ঈদৃশ ব্যবহারকে আমরা জঘন্য ছাড়া আর কি বলিতে পারি? কোর-আনের প্রথম শ্লোকেরই প্রথমাংশে আমরা স্ত্রী পুরুষের সাম্যের কথা স্পষ্টরূপেই জানিতে পারি। দ্বিতীয়ার্দ্ধে এই ভাবটী অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। "যিনি তোমাকে গর্ভধারণ করিয়াছেন তাঁহাকে সম্মান করিবে।"

কোর-আনের দ্বিতীয় শ্লোকে আমরা জানিতে পারি—স্বামীস্ত্রীর মধ্যে পরস্পর একটী প্রগাঢ় ভালবাসার সৃষ্টি হয় এবং তাহারা শান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারেন দয়াময়েরও ইহা ঈপ্সিত। ইহার অর্থ পুরুষ ও স্ত্রীর পরস্পর সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরস্পরের উপরই নির্ভর করে। তাহারা যখন এক ঈশ্বরের অংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং পরস্পরের সুখ-শান্তি যখন অন্যের অপেক্ষা করে তখন পুরুষ যে স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এই ভাব অন্তরে পোষণ করা সমীচীন নহে। মানব হিসাবে তাহারা প্রত্যেকেই পরস্পর সমান, সমাজ গঠনে প্রত্যেকেরই সমান প্রয়োজন প্রত্যেকেরই সাহায্য প্রত্যেকেরই আবশ্যক; পুরুষ যেমন স্ত্রীকে উপেক্ষা করিতে পারে না—স্ত্রী সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য।

কোর-আনের বহুস্থানে স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কোর-আন অনুযায়ী স্ত্রীগণ যেমন স্বামীর অঙ্গাভরণ স্বরূপ, স্বামীও স্ত্রীদের তদ্রূপ। এই সাদৃশ্য হইতে আমরা স্বামীস্ত্রীর প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারি। আভরণে মানুষের তিনটী কার্য্য সম্পাদিত হয়—বর্ষাতিশয্যে ইহা শরীর-রক্ষক, নগ্নতা-আচ্ছাদক এবং সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা-দায়ক। এই শ্লোকানুযায়ী স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরস্পরের সুখ-শান্তি-বর্দ্ধক,—সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা উভয়েরই উপর নির্ভর করে। সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ ব্যক্তি মাত্রেরই তাঁহার সৃষ্টি রহস্যে সম্পূর্ণ আস্থা আছে। মানব ঈশ্বরেরই প্রতিবিম্ব মাত্র।

দয়াময়কে ভালবাসা ও তাহার স্বকীয় জীবনে ভগবদ্-গুণাবলী প্রস্ফুটিত করিয়া তোলাই মানব জীবনের আদর্শ। আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও নারীকেই পুরুষের সমান অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে; তিনি পুরুষেরই ন্যায় ইচ্ছা করিলে আধ্যাত্মিক-জীবনে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পাবেন।

সেণ্ট্ গ্রেগরী নারীকে নরকের দ্বার ও শয়তানের অনুচর আখ্যা দিয়াছেন বটে, কিন্তু কোর-আনের অনুশাসনে নারী জগৎপাতার দ্বার ও তাঁহারই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। The Holy Quoran says "Whosoever does righteous deeds, be it a woman or a man and he or she a believer—they are sure to get paradise and will be dealt wth fairly and justly."

যিনিই ধর্ম্ম ও ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করেন, তিনি স্ত্রী হউন বা পুরুষই হউন, তিনি অন্তিমে স্বর্গলাভ করিবেন এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্ত হইবেন।

নারীজাতির সামাজিক অবস্থা-সম্পর্কীয় বিশদ বিবরণ কোর-আনের প্রতি পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়।

"For women there are equal rights over men as for mean over woman" অর্থাৎ নারীর যেমন পুরুষের সহিত সমান অধিকার আছে পুরুষের সেইরূপ নারীর সহিত সমান অধিকার।" ইসলাম ধর্ম্মে নারীর সামাজিক প্রতিপত্তি অতীব উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। পুরুষের নিছক খেয়ালে তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় না। ইচ্ছা মাত্রেই ধর্ম্মপত্নীকে পুরাতন ও ছিন্ন আভরণের ন্যায় পরিত্যাগ করা যায় না। প্রয়োজন হইলে অবশ্য সহধর্ম্মিণীকে বিবাহোচ্ছেদের দ্বারা পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু ইসলাম ধর্ম্মে বিবাহোচ্ছেদ ইচ্ছা করিলেই করা সহজ নহে—বিশেষ ও সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে উহা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। জীবনের উদ্দেশ্য যখন ব্যর্থ হইয়া দাঁড়ায়, যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অচ্ছেদ্য মনোমালিন্য বিরাজমান ও যখন স্ত্রীর বা স্বামীর সন্তান জন্ম হওয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলোপ প্রাপ্ত হয়, তখনই বিবাহোচ্ছেদ করা সহজসাধ্য, অন্যথা নহে। এমন কি এই বিবাহোচ্ছেদেও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তুল্য অধিকার বিদ্যমান। যিনি প্রথমে বিবাহোচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে অর্থগত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। যদি কোন স্বামী তাঁহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে বিবাহের সময়ে প্রতিশ্রুত সমস্ত অর্থ স্ত্রীকে দিতে হইবে এবং তাহার স্ত্রীকে বিবাহকালীন যে সম্পত্তি যৌতুক দিয়াছে তাহা ফেরৎ পাইতে অধিকারী হইবে না। নারী বিবাহের পরই তাহার পৈতৃক উপাধি ত্যাগ করে না,—তখনও তিনি পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। যত প্রকার অন্যায় কাজ আছে—বিনা কারণে স্ত্রী-ত্যাগ তন্মধ্যে অন্যতম।

অবশ্য আমরা ইহা বলি না যে, পুরুষের স্ত্রীর উপর কোন প্রভুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নাই। নারী ক্ষুদ্র লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন না ইহাই দেখান আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। গার্হস্থ্য-জীবনে স্বামী তাহার সহধর্ম্মিণী অপেক্ষা একটু শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারেন। গৃহ একটা ক্ষুদ্র রাজ্য-বিশেষ। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের কার্য্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য—সর্ব্বোপরি কোন এক প্রধান ব্যক্তির প্রয়োজন। এমন কি প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশে দেশশাসনভার কোন এক প্রধান ব্যক্তি বা কতিপয় প্রধান ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র গৃহের প্রত্যেক সভ্যের স্ব স্ব অধিকার অবশ্য আছে। কিন্তু কোন এক ব্যক্তি বিশেষের উপর সম্পূর্ণ ভার থাকা প্রয়োজন। পিতাই এই সংসারের কর্ত্তা, যাহাকে সন্তানসন্ততিগণ তাহাদের জনক ও সহধর্ম্মিণী স্বামী বলিয়া থাকেন। তাহাকে এইরূপ কর্তৃত্ব দিবার কারণ তিনি সংসারের অন্ন-বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিয়াও সংসার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। সংসারে অভাব-অভিযোগ, ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া, তাহাকেই সংসারের সমগ্র দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া ইহা প্রকৃতই স্বাভাবিক যে সমস্ত ব্যাপারে তাহার একটা কর্তৃত্ব থাকিবে। কিন্তু যেখানে নারী তাহার সংসারের গৃহ-কর্ত্রী সেখানে সংসারের সমগ্র কর্তৃত্ব তাহারই উপর ন্যস্ত হইবে। পুরুষ সংসারের সমস্ত তত্ত্বাবধান করা সত্ত্বেও পুরুষ যে নারী অপেক্ষা সমাজে অধিকতর উপকার করিয়া থাকেন ইহা সর্ব্বথা প্রযোজ্য নহে। পুরুষ যেমন সন্তান-সন্ততি ভরণ-পোষণের জন্য অর্থোপার্জ্জন করেন, স্ত্রীও সেইরূপ তাহাদের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন;

কাজেই উভয়ের কে যে সমাজের অধিকতর কল্যাণ করিয়া থাকেন তাহা বলা সুকঠিন। নারী-জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ইস্‌লাম প্রবর্ত্তক মহামনীষী হজরত মহম্মদ যে সমস্ত সুন্দর নিয়মাবলী করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য করুণানিধানের শুভ আশীর্ব্বাদ নিরন্তর বর্ষিত হউক। নারীর সংসারে সভ্য হিসাবে তিনটী কার্য্য আছে, গুণবতী ভার্য্যা, কন্যা ও স্নেহময়ী জননী। "Treat your wives with kindness and live with them amicably and if you see in them that displeases you, bear it up, it may be, that you dislike a thing and God has kept for you astreo of goodness in that everything. —Holy Quoran." অর্থাৎ সহধর্ম্মিণীদের উপর সদয় ব্যবহার করিবে এবং তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে; যদি এমন কিছু করিতে দেখ যে, যাহা তোমাকে আঘাত বা অসন্তোষ উৎপাদন করে, তুমি তাহা সহ্য করিবে, তুমি যাহা অপছন্দ কর, হয়ঃতো তাহারই মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে।"

উপদেশের আর প্রয়োজন কি, হজরত মহম্মদ মোস্তফা স্বয়ংই তাহার পুত জীবনে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন প্রেমময় স্বামী। জীবন-প্রভাতে তিনি তদপেক্ষা পঞ্চদশবর্ষ বেশী বয়স্কা মহিলাকে নিজের সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার সহিত তিনি পঞ্চবিংশতি বৎসর একত্র বাস করিয়াছিলেন—কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তাহাদের ভিতর এক বিন্দু মনোমালিন্যের সৃষ্টি কখন হয় নাই। মাতৃ-জাতির প্রত্যেককেই তিনি সম্মান প্রদর্শন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এমন কি তাঁহার নিজ কন্যা ফতিমা তাঁহার সম্মুখে আসিলে তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইতেন।

মোট কথা ইস্‌লাম ধর্ম্ম নারী-জাতিকে সর্ব্বত্র যে উচ্চ সম্মান দিয়াছেন, পূর্ব্বতন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইয়াও জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুসভ্য জাতি এখনও নারীজাতিকে সেইরূপ সম্মান দেয় নাই।

সমর্পণ

[শ্রীভবেশ দাশ গুপ্ত বি-এ]

যে কথা বলিতে সাহস হয় নি আজি তা' বলিতে সাধ,
হ'য়ো না বিরূপ রোষভরে সখি নিয়োনাক' অপরাধ!
নিরালায় ব'সে যো মালা গেঁথেছি মন-বাগানের ফুলে,
আজি তা' এনেছি সব লাজ ভুলে তব হাতে দিতে তুলে!

কতদিন যারে থামায়ে রেখেছি মাঝ পথে ভয়ে লাজে,
প্রয়াস পেয়েছি প্রকাশিতে যাহা নিত্য শতেক কাজে—
লুকায়ে রেখেছি মনের ভিতর চিরকাল যেই আশা
আজিকে মিটাব তাহার দ্বন্দ্ব যত কিছু কাঁদা-হাসা!

যে গান বাজাতে ছিন্ন হয়েছে আমার বীণার তার
ব্যর্থ হ'য়েছে মেলাতে কণ্ঠ যে সুরে বারম্বার,
আজিকে বাজাব সে গান বীণায় মিলাব সে সুরে সুর
মুক্ত করিব রুদ্ধ আমার অন্ধ মানসপুর!

মনের কুঞ্জে নীমিল্ নয়নে নিরালায় নিশিদিন
বাসনা-কমল বিষাদ-ব্যথায় ব্যাকুল ধৈর্য্যহীন—
শঙ্কিত চিতে পরতে পরতে পাপড়ি মেলিয়া তার
শতদলে আজ এনেছি তুলিয়া দিতে তোমা উপহার।

জানিনাক তুমি লবে কি না লবে আমার হাতের মালা,
দেবে কি না দেবে মোরে উপহার তোমার হাসির থালা,
রাখিবে কি দুখী সুধা ঢালা আঁখি আমার আঁখির 'পরে
কিম্বা চাবে না তুলিয়া নয়ন মূক অবহেলাভরে!

জানিনা আমার সুরটী তোমার কণ্ঠে পাবে কি স্থান,
অলস দুপুরে শিথিল-শয়নে মোর সঙ্গীত-তান
তুলিবে কি মনে গুঞ্জন তব, যবে একা আনমনা
রচিবে নিজনে একেলা বসিয়া সুরের আলিম্পনা?

মোর কাননের কুরুবকটীরে সোহাগে আদরে হেসে,
পরিবে কি সখি ধীরে সযতনে তব কালো এলোকেশে?
দোলাবে কি বুকে মোর মালাখানি—লবে কি কমল হাতে,
ছড়াবে শয়নে কুসুম-পরাগ নীরব নিশুতি রাতে?

কুন্দ-কেতকী-কদম-কেশরে সুরভিত করি' চুল
পরিবে কি কাণে আমার হাতের ঝুমকার দুটী দুল
চম্পা-রেণুতে রঙাবে অধর পলাশে চরণতল
দুলায়ে দেবে কি মেখলায় তব সিক্ত নীপের দল—

জানিনাক' শুধু আপন খেয়ালে তব তরে রচি' মালা,
আমার মনের মাধুরী মিশায়ে সাজাই অর্ঘ্য-ডালা!
বাধাহীন চিতে আপনার মনে গেয়ে যাই মোর গান—
খুসী হয়, তুমি চেয়ো মোর পানে—তুলে নিয়ো মোর দান!

না হয় হাসিয়ো তীব্র নিঠুর ভরিয়া ব্যঙ্গ-জ্বালা,
অনাদরে দূরে দিয়ো ওগো ঠেলে আমার অর্ঘ্যথালা,
তবু দেব মালা তবু গাব গান—সঁপে দেব প্রাণ পায়—
ক'য়ে যাবো কথা অর্থবিহীন যাহা প্রাণ মোর চায়!

———

রক্তকমল

(উপন্যাস)

[রায় সাহেব শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি-এ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৫)

পরদিন বিকালে গরম বড় কোটটা জড়াইয়া, মাথার উপর সালের এক খানা রুমাল ফেলিয়া লীলা যখন আলিকদল্ সেতুর উপর যাইয়া উঠিল তখন দেখিল সেতুর অপর পারে অরুণ দাঁড়াইয়া আছে। লীলাকে দেখিয়াই অরুণ দীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ কালো হইয়া গেল।

অরুণের সেই ভাব লীলাকে স্পর্শ করিল।

অরুণ বিনীতকণ্ঠে বলিল, "কাল মনের আবেগে হঠাৎ আপনাকে "তুমি" বলেছি, আমায় ক্ষমা করুন।"

কথাগুলি লীলাকে তীক্ষ্ণভাবে বিঁধিল।

লীলা বলিল, "কেন তাতে আর দোষ হয়েছে কি? আমিও ভেবেছি, আর 'আপনি' না বলে, 'তুমি' বলব'।"

অরুণ তীব্র চক্ষে লীলার মুখের দিকে চাহিল।

লীলা বলিল—"তুমি আসতে বলেছিলে, আমি এসেছি। আমি ভাবলেম আসাটা নিতান্তই দরকার। যতটা ঘটেছে তার জন্য আমিও দায়ী। সে কথা আমি জানি।"

আরও দুই চারিটা কথার পর তীব্র অথচ অত্যন্ত গম্ভীরকণ্ঠে অরুণ বলিল —"তুমি তবে আগেই জান্‌তে?"

লীলা অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অরুণ বলিল,—"আমি যে তোমায় ভালবাসি, তা কি আগেই বুঝেছিলে?"

লীলার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিয়া উঠিল। সে ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল—"হাঁ।"

কিছুক্ষণ গেল। অরুণও কিছু বলিল না, লীলাও বলিল না। উভয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল।

যাইতে যাইতে লীলা বলিল, "আমি বুঝতে পেরেছি, বড় স্বার্থপর হয়েছিলাম। তোমার মার্জ্জিত বুদ্ধি, মার্জ্জিত রুচি আর রূপের সাধনা আমার অন্তরে যখন দাগ কেটেছিল, তখন আমি নিজেকে সামলাতে চেয়েও সামলাতে পারি নি। মনে হয়েছিল, তোমায় বাদ দিলে আমার বলতে আমার আর কেউ থাকে না। আমার দিকে প্রবল বেগে তোমায় টেনে আনব' ব'লে, আমি তাই চেষ্টাও করেছি। শুধু তাই নয়, টেনে এনে তোমায় ধরে রাখতেও চেষ্টার কম করি নি। এটা জেনো যে বুকে পাথর বেঁধে আমি সে-খেলা খেলি নি। তবুও কিন্তু সেটা একটা খেলা ভিন্ন আর কিছু নয়।"

অরুণ মাথা নাড়িয়া বুঝাইয়া দিল, সেটা যে শুধুই খেলা তাহা সে বুঝতে চায় না, বিশ্বাসও করে না।

লীলা বলিল, "হাঁ, ঠিকই বল্‌ছি, সে ছিল ভালবাসার অভিনয় মাত্র। অভিনয় করা আমার স্বভাব নয়—কিন্তু তবুও ক'রে ফেলেছিলাম। অভিনয়ের প্রথম সিঁড়িটা যে দিন পার হই, ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবার জন্য একটা মারাত্মক কৌতূহলী সেই দিন থেকে আমায় পেয়ে বসেছে। শেষে তার টান বরদাস্ত করতে না পেরে আমিই চলেছি এগিয়ে। এটা আমি জানি যে সেই খেলার যুদ্ধে জিতে তুমি আমায় মুক্তি দেবার মূল্য চাইবে না। তুমি হয় তো এতটা বুঝতে পারনি। তোমার তাতে কোন দোষ নাই। অন্তর যাদের সরল ও মহৎ তারা এসব বোঝে না। কিন্তু আমি তো সবই জানি! আজ তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় হ'ব বলে' এসেছি।"

বিষাদ-মাখা কোমলতার সঙ্গে অরুণ লীলাকে বলিল যে, সে তাহাকে ভালবাসে। গোড়ায় তাহার ভালবাসাটাই তাহাকে আনন্দ দিত। তখন সে আর কিছু চাহে নাই—শুধু দেখা, আবার দেখা—আবার একবার দেখা। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাহার বুক যে চিরিয়া দিল, তাহাকে যে পাগল করিল—কে সে? সে কি লীলা নয়? শঙ্খ-কুটীরের বাগানের সেই প্রাচীরের কাছে তাহার সকল আকাঙ্ক্ষা একদিন প্রবল বেগে বাঁধ

ভাঙ্গিয়া ছুটিল। আজ আর সে নীরবে কেমন করিয়া সেই তরঙ্গের ঘা সহিবে? সে তাই বাঁচিবার জন্য আজ লীলারই শরণ লইতে চায়। আজ যখন অরুণ লীলাকে দেখিল, তখন সে জানিত না যে তাহাকে কি বলিবে। কিন্তু তাহার মন আজ আর কোন শাসনই মানিতেছে না—সে কেবলই প্রেম-নিবেদন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। কেন যে এমন হইয়াছে, লীলা কি তাহা জানে?

লীলার কাছে লীলার কথা বলিবার জন্যই যে অরুণের আজ দারুণ তৃষ্ণা—লীলাই যে আজ অরুণের সর্ব্বস্ব হইয়াছে—তাহার যে আর কেহই নাই, কিছুই নাই। অরুণ যে বাঁচিয়া আছে, সে শুধু লীলারই প্রাণের ভিতরে। লীলাকে তাই আজ শুনিতেই হইবে যে অরুণ লীলাকে ভালবাসে—লীলাকে আজ বুঝিতে হইবে যে অরুণ খেলে নি, সত্যই লীলাকে ভালবাসিয়াছে। সে ভালবাসা মৃদু নয়—দু'দণ্ডের নয় উহা আজ অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভুক—আজ উহা অতৃপ্ত তীব্র কামনার স্বেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর সম্রাট্!

অরুণের মন কি লীলা বুঝে? যে আনন্দ পাইলে বাঁচিয়া থাকিতে সুখ—অরুণ জানে যে উভয়ের মিলন হইলেই তাহা মিলিবে। দুই জনে মিলিয়া তাহারা যে বাঁচিয়া থাকিবে, সে যেন বিধির গড়া সুন্দর একখানা শিল্প-সম্ভার। আজ হইতে সে একা আর কোন কিছুই ভাবিবে না—ভাবিবে তাহারা দুই জনে; সে একা আর কোনো কথাই বুঝিবে না—বুঝিবে তাহারা দুই জনে এক সঙ্গে। তাহার নিজের তো আর কোন অনুভূতিই নাই—দুই জনে মিলিলে তবে তাহারা নূতন একটা অনুভূতি পাইবে। তখন তাহাদের সম্মুখে যে নূতন জগৎ জাগিবে তাহা বিস্ময়কর—তাহা অলৌকিক। সেখানে আর কিছু থাকিবে না, শুধু নবীন কল্পনার নূতন ভাব, অভিনব জীবন।

অরুণ বলিল—শোন লীলা, আমার মিনতি রাখ। এসো আমরা জীবনকে একটা মধুময় কুঞ্জবন করে' তুলি।"

লীলা বুঝাইতে চাহিল, মিলন না হইলেও তো মানুষের এই স্বপ্নকে সফল করিতে পারা যায়। সে বলিল,"তুমি তো বুঝেছ অরুণ, তোমার অন্তর আমাকে কেমন নিবিড়ভাবে ঢেকে ফেলেছে। তোমার দেখা আর তোমার মুখের কথা শোনা—আমার কাছে প্রাণবায়ুর মতই আবশ্যক হয়েছে। তুমি নিশ্চয় জেন' আমি চিরদিন সে সম্বন্ধ স্থির রাখব'। তুমি আমার চিরদিনের বন্ধু।"

অরুণ বাধা দিয়া বলিল, "তোমার বন্ধুতা আমি চাই নে লীলা—চাই নে। আমি চাই তোমায় আমার করে' পেতে। যদি না পাই আর তোমার সামনে এসে দাঁড়াব না। কি যে তোমার মনে ছিল, তা' জানি নে। কিন্তু তুমিই তো আমার অন্তরে এই আগুন জেলেছ—তুমি খেলতে এসে সত্যিকার বাণ হেনেছ! আর আজ বলছ, আমায় 'বন্ধু' বলে' স্মরণ করবে! যদি তুমি আমায় সত্যই ভালবাসতে না পার, তবে ভালবাসার খেলায় আমার আর কাজ নাই। আমায় বিদায় দাও। কোথায় যে যাব তা' জানি নে। সেই দেশে যাব, যেখানে গেলে তোমায় ভুলতে পারব'। সেই দেশে যাব, যেখানে গেলে তোমায় ঘৃণার চোখে দেখতে পারব'। লীলা—লীলা—আমি তোমায় ভালবাসি, প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি।"

অরুণের কথা লীলা বিশ্বাস করিল।

অরুণ যদি সত্যই চলিয়া যায়, এই ভয়ে লীলা আকুল হইয়া উঠিল। সে জানিত সে মুখে যাহাই বলুক, কিন্তু অরুণের সঙ্গ না পাইলে যে তাহার দুঃখের শেষ থাকিবে না! লীলা বলিল—"আমার প্রাণের মধ্যে আমি তোমায় পেয়েছি। তোমায় তো আমি হারাতে পারব না। কিছুতেই না।"

ভীরু অরুণকুমার—গাঢ় অনুরাগে আকুল অরুণকুমার—কি যেন বলিতে চাহিল, কিন্তু কথা কণ্ঠে বাধিয়া গেল। তখন দূর শৈলচূড়ায় ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিতেছিল—সূর্য্যের বিদায়-রশ্মি তখন হিমানীরাশিকে আরক্ত করিয়া বিদায় হইতেছিল। লীলা আবার বলিল—"আমার যে কত দুঃখ তা' যদি তুমি জানতে। তুমি যেদিন আমার সামনে এসেছিলে, তার আগে আমার জীবনটা যে কত ফাঁকা, কত অর্থশূন্য ছিল, তা যদি একবার দেখতে—তা হ'লে তুমি বুঝতে বন্ধু, যে তুমি আমার কি। তা হ'লে আর আমার কাছে এমন করে' চির-বিদায় চাইতে না।"

লীলার আবেগ-তরঙ্গহীন কণ্ঠ অরুণকে কাতর করিল না—রুষ্ট করিয়া তুলিল। সে বলিল—"তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি, তোমার দেওয়া উৎসাহ, তোমার অন্তরের ভাব-সম্পদ—তোমার মহিমার যা কিছু—ধূপের গন্ধের মতই তো আমি প্রতি নিঃশ্বাসে নিচ্ছি। তুমি যখন কথা বল, আমার মনে হয়, তোমার ঠোঁট দু'খানির উপর তোমার অন্তরকেই আমি দেখতে পাই। আমি যে আমার ওষ্ঠে তার পরশ পাইনে এই দুঃখেই আমি দণ্ডে দণ্ডে মরি। তোমার রূপের সকল গৌরব ফুটে আছে ওই তোমার অন্তরে। সেই আদিম কালের প্রথম মানুষের প্রেম আমার হৃদয়ে এতদিন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিল। তুমিই তো তাকে সাধ করে' জাগিয়ে তুলেছ লীলা। আদিম বর্ব্বরের নগ্ন সরলতা দিয়ে আমি যে তোমার ভালবেসেছি—আমি তো তোমার সঙ্গে হার-জিতের খেলা খেলি নি? তোমার কাছে দিনের পর দিন হেরেই যে আমি সুখ পেয়েছি।"

লীলা বাক্যশূন্য হইয়া কোমল-নয়নে অরুণের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই সময় কয়েকটী লোক মশাল হস্তে একটী মুসলমানের শবদেহ বহন করিয়া মসজেদের দিকে আসিতেছিল। অরুণ ও লীলা সরিয়া গিয়া পথ ছাড়িয়া দিল।

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লীলা বলিল—"এই তো জীবন! একে দুঃখ দিয়ে লাভ কি!"

লীলার কথা অরুণের কাণে গেল না। সে বলিতে লাগিল—"তোমার দেখার আগে আমার তো কোন দুঃখই ছিল না লীলা। জীবনের উপর তখন আমার মমতা ছিল। সে যেত আমায় নিয়ে স্বপ্নরাজ্যে—সে আমায় পায়-পায় বিস্মিত করে' তুলত'। শুধু বাহিরের মূর্ত্তি দেখেই তখন ছিল আমার আনন্দ কত! সেই মূর্ত্তির প্রাণই তখন আমায় সুখী করতে পারত'। দুনিয়ায় সবই ছিল তখন আমার ভোগের জিনিস। আমি ছিলাম মুক্ত। ধরা-দেওয়ার সুখ আর ধরা-দেওয়ার দুঃখ—এর কোনটাই আমার জানা ছিল না। আমার অপরিতৃপ্ত বিস্ময়ের রথে চড়ে' তখন আমি দিগ্বিদিকে বিচরণ করেছি—দুই চোখে দেখেছি যা,' তাই যেন মনে হয়েছে মধুময়। কিন্তু কোন-কিছুর উপরই তখন আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। এখন বুঝতে পারছি এই পাওয়ার আশাটাই আমাদের দুঃখ দেয়।"

"অবসাদ কাকে বলে, আগে তা কখনও জানা ছিল না। কাজ নিয়েই সুখী ছিলাম আমি। আমার সম্পদ ছিল সামান্য বটে, কিন্তু সংসারে আমায় সুখী রাখতে তখন তার বেশী আর লাগে নি। সেদিন তো আর এখন নাই লীলা। আমার সুখ, জীবনের উপর মমতা- শিল্প-রচনায় আমার আগ্রহ, আমার মানসী-প্রতিমাকে মূর্ত্তি দিয়ে তখন আমার যে বিপুল আনন্দ হত সে সবই তো তুমি চুরি করেছ লীলা, কিন্তু সে জন্যত এক বিন্দু চোখের জলও ফেল নি!"

"আর তো আমি স্বাধীনতা চাই নে—মুক্তি চাই নে। আমি চাই ধরা দিতে। আমার গত জীবনের শান্তিতে আমার আর কাজ নাই। তোমায় দেখার আগে আমি যে মানুষটী ছিলাম—তাকে আর আমি বলিনে—বেচে থাকা! যখন তোমায় দেখে বুঝেছি, জীবনটা কি, তখন এমন দায়েই ঠেকলাম—তোমায় ছাড়তেও পারিনে, ধরতেও পারিনে। পথে আসতে আসতে পোলের কাছে যে ভিখারীর দল দেখলে, আমি আজ তাদের চেয়েও দীন। বিশ্বের বাতাসটুকু অন্ততঃ তাদের আছে, তারা প্রাণ ভরে' তা' নেয়। কিন্তু আমার যে আজ তাও নেই, লীলা। আমার প্রাণ-বায়ুও যে তুমি। কিন্তু তোমায় তো আমি পেলাম না।"

"হোক্ তা। তোমায় যে আমি চিনেছি, এতেই আমার আনন্দ। সেইটেই এখন আমার কাছে সব চেয়ে বড় কথা। এখনি বলছিলাম না যে আমি তোমায় ঘৃণা করি! কিন্তু ভুল ভুল—সেটা আমার মস্ত ভুল! তোমাকে যে আমি দেবীর মতই পূজা করি লীলা। আমায় যে দুঃখ দিলে, তাই হোক্ তোমার বর। তুমি যদি হাতে তুলে' দাও, বিষকেও আমি অমৃত বলেই নেব।"

লীলা ও অরুণকুমার সেই অন্ধকারের মধ্যে সম্মুখের একখানা বেঞ্চের উপর গিয়া বসিল। চেনারের পাতাগুলি ঝরিয়া ঝরিয়া তাহাদিগকে ঢাকিতে লাগিল। বিতস্তার বাম তীরে তখন সেই বিস্তীর্ণ উপত্যকা অন্ধকারে সীমাহীন, দিশাহীন ও অস্পষ্ট দেখাইতেছিল। অরুণকে নীরব দেখিয়া লীলা মনে করিল, মনের কবাট

খুলিয়া দিয়া অরুণ এইবার শান্ত হইয়াছে। অরুণের আবেগ বুঝি ছিল তাহার কল্পনাতেই, কথার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি উহা উবিয়া গিয়াছে। অরুণ এতক্ষণ যে স্বপ্ন দেখিতেছিল, জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়াছে! লীলা মনে করে নাই যে এত সহজে, এত অল্প আয়াসে, এত অল্প সময়ের মধ্যেই অরুণ আপন ভবিষ্যৎকে মানিয়া লইবে। লীলার মনে ভয় ছিল যে অরুণ বুঝি না-বুঝ হইয়া আজ বিশেষ একটা বিপদই ঘটাইবে! সেই কল্পিত বিপদ হইতে এমন সহজে ত্রাণ পাইয়া লীলা সুখী হইল না। মাছ বড়সীতে গাঁথিয়া খেলান'র যে আনন্দ, লীলা মনে করিত তাহার চেয়ে বড় আনন্দ কমই আছে! সুতা ছিঁড়িয়া গাঁথা মাছ পলাইবে ইহা লীলার সহ্য হইত না। মাছ তুলিয়া তাহার রক্তাক্ত মুখ হইতে বড়শী খুলিয়া সে যদি আপন হইতেই মুক্তি দিতে না পারিল তাহা হইলে তাহার আর গৌরব রহিল কোথায়!

লীলা তাই বলিল—"তবে এস অরুণ, আজ থেকে আমরা দু'জনে বন্ধু। রাত হয়ে উঠল'। এখন বাড়ী ফিরতে হয়। অনন্তনাগ মন্দিরের কাছে আমার টাঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে। আমায় এগিয়ে দেবে চল। আগেও আমি তোমার যেমন বন্ধু ছিলাম—চিরদিনই তেমনি থাকব।"

অরুণ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিল—"না-না-তা হবে না। আমার মনের সব কথা না শুনলে আজ তোমার যাওয়া হবে না। কিন্তু আমার মুখে যে ভাষা আসছে না লীলা। কেমন ক'রে আমি তোমায় সব কথা বোঝাব'। আমি তোমায় ভালবাসি। আমি তোমাকেই যে চাই লীলা, আর কিছু চাইনে। বল—বল—তুমি কি আমায় ভালবাস? ওই একটা কথার উপরই যে আমার প্রাণ নির্ভর করছে। তোমার শপথ লীলা, সন্দেহের এই মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে কিছুতেই আমি যে আর একটা দণ্ডও কাটাইতে পারছিনে।"

লীলাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া সেই অন্ধকারেও অরুণ তাহার চোখের দিকে চাহিয়া রহিল। আবেগের সঙ্গে বলিল—"আমাকে তোমায় ভালবাসতেই হ'বে। 'না' বল্লে আমি শুনব না। আমিও তাই চাই—তুমিও তা-ই চেয়েছিলে। বল—বল—তুমি আমার—"

ধীরে ধীরে অরুণের হাত ছাড়াইয়া সঙ্কুচিতা লীলা দুর্ব্বল কণ্ঠে বলিল—"তা' আমি বলতে পারব না! কিছুতেই পারবনা। আমি তো তোমার কাছে কিছু গোপন করি নি। তুমি যা' চাও তা' হয় না অরুণ।"

সেই মুহূর্ত্তেই ডাক্তার মিত্রের মূর্ত্তি লীলার চোখের সম্মুখে ভাসিল। লীলা দেখিতে পাইল, কত আকুল হইয়া ডাক্তার তাহার পথ চাহিয়া আছে। লীলা বলিল—"না অরুণ—কিছুতেই তা হয় না।"

লীলার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অরুণ দেখিল, তাহার নত নয়ন যেন সন্দেহের দোলায় দুলিতেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া অরুণ বলিল—"কেন নয়? তুমি যে আমায় ভালবাস, তুমি না বল্লেও তা' আমি প্রাণ দিয়ে বুঝেছি। কেন তবে আমার হ'তে চাওনা বল?"

অরুণ আবার লীলাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয় তাহাকে চুম্বন করিতে চাহিল।

এইবার লীলা তড়িদ্বেগে নিজেকে-ছাড়াইয়া লইল এবং দৃঢ়স্বরে বলিল, "তা হবে না অরুণ। আর তুমি বল' না। কিছুতেই আমি তোমার হ'তে পারব না।"

অরুণের ওষ্ঠ দুইখানি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মুখের মাংসপেশীগুলি কুঞ্চিত হইয়া গেল। অপেক্ষাকৃত উচ্চ-কণ্ঠে এবং অত্যন্ত তীব্র স্বরে সে বলিল—"বুঝেছি-বুঝেছি। তুমি আর—আর একজনকে ভালবাস! কেন আর আমায় ভাঁড়াও লীলা?"

লীলা বলিল—"ধর্ম্ম সাক্ষী আমি তোমায় ভাঁড়াতে চাইনি। সংসারে যদি কখন কাউকে ভালবাসি, তবে জেন' সে তোমাকেই—সে তোমাকেই—"

অরুণ আর লীলার কথা শুনিল না।

সে আরও উচ্চকণ্ঠে কহিল—"যাও-যাও—এখান-থেকে—"

পরমুহূর্ত্তেই অরুণ সেই সীমাহীন অন্ধকার উপত্যকার দিকে ছুটিল। বিতস্তা সেদিনের বৃষ্টিতে ফুলিয়া উঠিয়া পথ ডুবাইয়া সেই দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই বদ্ধজলের বুকে অর্দ্ধমেঘাবৃত ক্ষীণ চন্দ্রের কর এক একবার ঝাঁপিয়া উঠিতেছিল। অরুণ সেই জল ভাঙ্গিয়া পাগলের মত ছুটিল।

লীলা ভয়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল এবং উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল—"অরুণ—অরুণ—!"

অরুণ ফিরিয়াও চাহিল না। উন্মত্তের মত চলিতেই লাগিল। লীলা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। পাথরে পা কাটিয়া গেল, শালের শাড়ীর অঞ্চল খসিয়া জলে লুটাইতে লাগিল।

লীলা গিয়া অরুণকে ধরিল এবং বলিল—"তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?"

অরুণ বুঝিতে পারিল লীলার স্বরেই তাহার ভয় প্রকাশ করিতেছে। সে বলিল—"ভয় নাই। কোথায় যে যাচ্ছিলেম তা' জানি নে। আমার কথা বিশ্বাস কর—আমি আত্মহত্যা ক'রব না। আশা ভঙ্গে আমি ভেঙ্গে চূর্ণ হয়েছি বটে, কিন্তু অত বড় মহাপাপ ক'রব না। আমি শুধু তোমার কাছ থেকে পালাচ্ছিলেম। বলে' ফেল্লেম বলে' ক্ষমা কর। কিছুতেই আমি আর তোমার দিকে চাইতে পারছিনে। মিনতি করি—ছাড়। তোমার যেখানে খুসি যাও—আমায় বিদায় দাও।"

লীলা বল হারাইল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"এস—"

অরুণ বিষণ্ণ বদনে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লীলা তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"এস—"

অরুণের দেহের বিদ্যুৎ খেলিল। সে বলিল—"বল, আমার হ'বে—?"

"এখনও কি তোমাকে নিরাশ করতে পারি?"

"তবে শপথ কর। আবার দেখা হ'বে।"

"তা' করতেই হ'বে।"

অরুণ বলিল "তবে কাল—?"

আত্মরক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া লীলা বলিল—"না—না—কাল নয়।"

ব্যগ্রকণ্ঠে অরুণ বলিল—"তবে কবে?"

লীলা বলিল—"সাতদিন পর—শনিবারে।"

(ক্রমশঃ)

মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক রামানন্দ

[অধ্যাপক শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী পি-এইচ্-ডি,
পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ]

মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত-বিজয় হিন্দু-ধর্ম্ম-ইতিহাসের এক সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্ত। এই সময় মুসলমান আক্রমণে আচার্য্য ও পুরোহিতগণ নানাদিকে বিতাড়িত, দেববিগ্রহ চূর্ণীকৃত ও বহু মন্দির বিধ্বস্ত হইয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে এই আঘাত হিন্দুধর্ম্মের বিলক্ষণ ক্ষতিকারক প্রতীত হইলেও পরিণামে ইহা হইতে যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল একথা অস্বীকার করিবার জো নাই। তৎকালীন হিন্দু ধর্ম্ম শুষ্ক জ্ঞানবাদে ও প্রাণহীন বাহ্য অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল এবং তাহাও উচ্চ বর্ণের ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চ নীচের মধ্যে পার্থক্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়া সমাজ-দেহকে নিতান্ত শক্তিহীন করিয়া দিয়াছিল। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত আনুগত্যমূলক ও মনুষ্যের ভিতর সাম্য-সংস্থাপক ইস্লামের প্রবল প্রতিক্রিয়াফলে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজে এক অভিনব জাগৃতির সঞ্চার হইল। এই জাগৃতি যে ধর্ম্মান্দোলনকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার নায়ক ছিলেন—রামানন্দ।

রামানন্দ-প্রবর্ত্তিত এই ধর্ম্মান্দোলন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল মনীষী রাণাডে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, এই ধর্ম্মান্দোলনের ফলে প্রচলিত ভাষায় একটী শক্তিশালী সাহিত্যের সৃষ্টি হয় এবং উহা জাতিভেদের কঠোরতাকে অনেকটা শিথিল করিয়া দেয়। এই আন্দোলনের প্রভাবে শূদ্রজাতি আধ্যাত্মিক সম্পদে ও সামাজিক

গৌরবে ব্রাহ্মণের প্রায় সমকক্ষতা লাভ করে। গৃহস্থাশ্রম গৌরবান্বিত ও নারীজাতি সম্মানের পদবীতে অধিষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলনের ফলে দেশের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার মত উদার মনোবৃত্তি লাভ করে। আচার-অনুষ্ঠান, তীর্থযাত্রা, উপবাস, পাণ্ডিত্য ও ধ্যান-ধারণা ভক্তির নীচে স্থান পায় ও বহু দেববাদের আতিশয্য অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ পক্ষে এই ধর্ম্মান্দোলন নানাপ্রকারে জাতিকে চিন্তা ও কর্ম্মের উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়া দেয়।" *

রামানন্দের আবির্ভ্যবকাল ও গুরুপরম্পরা লইয়া বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। প্রচলিত মতানুসারে রামানন্দ রামানুজ হইতে শিষ্য-শাখায় পঞ্চম (ক)। এক তালিকায় দেখা যায় রামানুজ ও রামানন্দের ভিতরে ২১ পুরুষের ব্যবধান। (খ) Sir R. G. Bhandarkar অনুমান করেন রামানন্দ ১২৯৯ কিংবা ১৩০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ডাক্তার গ্রিয়ারসনও এ মতের সমর্থন করেন। তিনি বলেন, "রামানন্দের জন্মকাল (১২৯৯) কতকটা সঠিক ভাবে নিরূপণ করিতে পারা গেলেও তাঁহার মৃত্যুকাল বড়ই জটিলতায় আবৃত। এ বিষয়ে প্রচলিত মত এই যে তিনি ১৪৬৭ সম্বতে (১৪১০ খৃঃ) দেহত্যাগ করেন।" ভক্তমাল হইতেও জানা যায় রামানন্দ দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। সুতরাং আমরা রামানন্দের জীবিতকাল ১২৯৯-১৪১০ পর্য্যন্ত ধরিয়া লইতে পারি।

পবিত্র প্রয়াগক্ষেত্রে রামানন্দের জন্ম হয় †। তাঁহার পিতা পুণ্যসদন কাণ্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ, মাতার নাম সুশীলা দেবী।

রামানন্দ বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। শিক্ষায় সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিবার জন্য দ্বাদশ বৎসর বয়সে রামানন্দ বারাণসীধামে প্রেরিত হন। তিনি সেখানে গভীর অভিনিবেশ সহকারে ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ঐ সময়ে রাঘবানন্দ শ্রী-সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। রামানন্দ রাঘবানন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রী-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। কিয়ৎকাল গুরু শুশ্রূষার পর রামানন্দ তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন।

শ্রী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব ব্রাহ্মণদিগেরই একচেটিয়া ছিল। তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ব্যতীত আর কাহাকেও দীক্ষাদান করিতেন না। আহার বিষয়ে তাঁহারা অত্যন্ত খুঁটি-নাটি মানিয়া চলিতেন। কোন ব্রাহ্মণ আহারে বসিলে ব্রাহ্মণেতর অপর কেহ তাহাকে দেখিলে "দৃষ্টি দোষ" ঘটিত এবং ঐ অবস্থায় আহার গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। রামানন্দ যখন তীর্থ ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন রাঘবানন্দ তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে সম্প্রদায়ে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কারণ—নানাস্থানে ভ্রমণকালে রামানন্দ নিশ্চয়ই আহার-বিষয়ক নিয়ম-পদ্ধতি মানিয়া চলিতে পারেন নাই। এই লইয়া রামানন্দ ও রাঘবানন্দের মধ্যে খুব তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল। অবশেষে রামানন্দ ঐ অন্ধ সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র গণ্ডী ত্যাগ করিয়া প্রেমের উদার রাজবর্ত্মে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেদিন

---

* cf. Mr. Justice M. G. Ranade, Rise of the Marhatta Power. Cap. vii "The Saints and Prophets of Maharastra.

ক। ভক্তমালের গুরুপরম্পরা (১) রামানুজ (২) দেবানন্দ (৩) হরিনন্দ (৪) রাঘবানন্দ (৫) রামানন্দ।

খ। ডাক্তার গ্রিয়ারসন সাহেবের নিকট শেষোক্ত গুরুপরম্পরার এইরূপ তালিকা পাওয়া যায়—(১)রামানুজ (২)শঠকোপাচার্য্য (৩)কুরেশাচার্য্য (৪) লোকাচার্য্য (৫) পরাশরাচার্য্য (৬) বাকাচার্য্য (৭) লোকার্থ লোকাচার্য্য (৮) দেবাধিপাচার্য্য (৯) শৈলেশাচার্য্য (১০) পুরুষোত্তমাচার্য্য (১১) গঙ্গাধরানন্দ (১২) শ্রীরামেশ্বরানন্দ (১৩) শ্রীদ্বারানন্দ (১৪) শ্রীদেবানন্দ (১৫) শ্রীশ্যামানন্দ (১৬) শ্রীশ্রুতানন্দ (১৭) শ্রীনিত্যানন্দ (১৮) শ্রীপূর্ণানন্দ (১৯) শ্রীহর্যানন্দ (২০) শ্রীশয্যানন্দ (২১) শ্রীরাঘবানন্দ (২২) শ্রীরামানন্দ।

Indian Antiquary XXII 1893 p. 266.

† শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিত আছে যে শ্রীশঠকোপাচার্য্য রামানুজের পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন কিন্তু এ তালিকায় রামানুজের পরে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য এই তালিকা যে নির্ভুল তাহাতে সন্দেহ হয়। Bhandarkar's Vaisnavism etc p. 66

Macaulifeর মতে রামানন্দ দক্ষিণ ভারতে মৈলকোট (মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মতে রামানন্দের আবির্ভাব কাল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যভাগে। The sikh Religion p 100

Dr. Farqunhar বলেন রামানন্দ দক্ষিণ ভারত হইতে উত্তর ভারতে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। রামানন্দের প্রথম নাম ছিল রাম দত্ত, দীক্ষা গ্রহণের পরে তাঁহার ঐরূপ নামকরণ হয়।

J. R. A. S. (1900 April) p. 187 ff.

হইতে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-ইতিহাসে একটী নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

রামানন্দ প্রচার করিতে লাগিলেন, মানুষ যে এই জাতিতে জাতিতে ভেদের গণ্ডী টানিয়া একে অপরকে ঘৃণা করিতেছে তাহার ভিতরে কোন ধার্ম্মিকতা নাই। হরির চক্ষে সকলেই সমান। যে কেহ তাঁহার ভজনা করে সেই তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে। *

রামানন্দ কাশীধামে আসিয়া পঞ্চ-গঙ্গাঘাটে থাকিয়া আপন নামানুসারে বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিলেন। শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্যেরা উচ্চ বর্ণ হইতেই শিষ্য গ্রহণ করিতেন, শূদ্রদের উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্বে কোন অধিকার ছিল না। রামানন্দ ধর্ম্ম-রাজ্যের প্রবেশ-দ্বার জাতি বর্ণ স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে তিনি যে সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিলেন তাহা উত্তরকালে তদীয় শিষ্য কবীরের প্রচারের ফলে (পঞ্চদশ শতাব্দী) আরও অনেক দূর পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

রামানন্দের বার জন প্রধান শিষ্যের মধ্যে প্রায় সকলেই অন্ত্যজ। ৭২ জন অপ্রধান শিষ্যের মধ্যে প্রায় ৫৬ জন হীনজাতীয়। প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তিনি নারীদিগকেও মন্ত্র-দীক্ষিত করিয়াছিলেন। পদ্মাবতী ও সুরসরী † তাহার প্রমাণ স্থল. নাভাজী তাঁহার প্রসিদ্ধ ভক্তমাল গ্রন্থে রামানন্দের দ্বাদশ জন শিষ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ;—(১) অনন্তানন্দ (২) সুখানন্দ (৩) সুরসুরানন্দ (৪) নরহরিআনন্দ (৫) পীপা (৬) কবীর (৭) ভবানন্দ (৮) সেন (৯) ধন্না (১০) রুইদাস (১১) পদ্মাবতী (১২) সুরসরী। ইহাদের মধ্যে অনন্তানন্দ ও সুখানন্দ ব্রাহ্মণ, পীপা ক্ষত্রিয়, কবীর মুসলমান জোলা ; সের নাপিত ; ধন্না জাঠ এবং রুইদাস ছিলেন চামার, নারী সাধিকার মধ্যে সুরসরী ছিলেন জাতিতে গোয়ালা।

রামানন্দের প্রধান বার জন শিষ্যের মধ্যে কাহারও কাহারও রচনা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহার অন্যতম শিষ্য পীপা গগরৌন গড়ের (gagaraun garh) রাজা ছিলেন। রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। সেন রেওয়ার রাজ-দরবারে নাপিত ছিলেন। এই তিন জনের রচিত কয়েকটী ভজন আদিগ্রন্থে সংগৃহীত আছে। তাঁহার অপর শিষ্য ভবানন্দ "অমৃত-ধার" নামক গ্রন্থে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা করেন। রুইদাস জাতিতে চামার হইলেও ভক্তির সাধনায় অতি উচ্চস্তরে উঠিয়াছিলেন। "আদিগ্রন্থে" তাঁহার রচিত ৩০টীর অধিক ভজন সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট আছে। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কবীরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি একদিকে যেমন অসামান্য কবিত্ব প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তেমনি আবার সাধনা রাজ্যের অতি উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন।

রামানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থ সমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করাতে তাহা জন-সাধারণের ভিতর প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। রামানন্দ সাধারণের বোধগম্য হিন্দীভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-সংস্কারের (reformation) যুগে ইয়ুরোপে যেমন বাইবেল বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষায় অনূদিত হওয়াতে জন সাধারণের অধিগম্য হইয়াছিল তেমনি রামানন্দ ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ-কর্ত্তৃক প্রচলিত ভাষার সাহায্যে ধর্ম্মপ্রচারের ফলে উহা দেশের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিল। রামানন্দকে হিন্দী সাহিত্যের ঠিক জন্মদাতা বলা না গেলেও তিনিই যে উহার ভিতর নূতন দ্যোতনার সঞ্চার করেন এবং তাঁহারই অনুপ্রেরণায় যে তদীয় শিষ্য-প্রশিষ্যগণ হিন্দী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া হিন্দী সাহিত্যকে সুপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। ডাক্তার গ্রিয়ারসন বলেন, "প্রধানতঃ রামানন্দ ও তদীয় শিষ্যগণের প্রভাবেই হিন্দী সাহিত্যিক ভাষারূপে পরিণত হইয়াছিল। হিন্দী ভাষার উজ্জ্বল আলোক স্বরূপ তুলসীদাস রামানন্দের কেবল অনুরক্ত ভক্তমাত্র ছিলেন না, প্রত্যুত তাঁহার সমুদয় কবি-প্রতিভার উৎসই হইতেছে রামানন্দের প্রদত্ত উদার শিক্ষা। হিন্দী ভাষা রামানন্দের নিকট বিশেষ ঋণে আবদ্ধ।

* জাতি পাঁতি পুছৈ নহী কোঈ।
হরি কো ভজে সো হয়কো হোঈ।

† মতান্তরে 'ক্ষেমশ্রী'

রামানন্দ কোন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। গ্রন্থ-সাহেবে তাঁহার রচিত একটীমাত্র ভজন সন্নিবিষ্ট আছে। মন্দিরে কীর্ত্তন হইতেছিল; রামানন্দকে সেই কীর্ত্তনে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইলে তিনি উত্তর করিলেন :—

"কোথায় আমি যাইব, নিজ ঘরেই সুখে আছি। আমার অন্তরও আমার সঙ্গে যাইবে না, ইহা যে খঞ্জ হইয়া গিয়াছে, একদিন আমারও যাইবার সাধ ছিল। চন্দন ধূপ ধুনা লইয়া মন্দিরে পূজা করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় গুরু আমায় দেখাইয়া দিলেন যে, ঈশ্বর হৃদয়েই আছেন। যেখানেই আমি যাই সেখানেই আমি দেখি শুধু জল আর পাথর; কিন্তু তুমি, হে প্রভু, সর্ব্বত্র সমভাবেই বিরাজ করিতেছ। বেদ ও পুরাণ সবই আমি দেখিয়াছি, সকলের ভিতরই তো অনুসন্ধান করিয়াছি। ঈশ্বর যদি এখানে না থাকেন তবে তুমি সেখানে যাও। হে সত্যগুরু তোমার নিকট আমি বলিস্বরূপ। তুমি আমার সকল সন্দেহ দূর করিয়া দিয়াছ। রামানন্দের প্রভু সর্ব্বব্যাপী ভগবান্। গুরুবাক্যে কোটি কোটি পাপের ক্ষয় হয়।" *

রামানন্দী সম্প্রদায়ের উদাসীন সাধুদিগকে রামানন্দী বৈরাগী বা "অবধুত" বলা হয়। পান-ভোজন বিষয়ে এই সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈরাগীদের বর্ণ বা জাতি বিচার নাই। বারাণসী অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে ইহাদের মঠ আছে। হিন্দুস্থানের গৃহস্থদিগের উপরও রামানন্দের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। তবে তাহারা কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা পন্থের অন্তর্ভুক্ত নহে। তাঁহার শিষ্যগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দুই তিনটী ছোট-খাট সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব এখনও অনুসন্ধান করিলে বাহির করা যায়। রামানন্দের প্রধান শিষ্যদিগের মধ্যে কবীর, সেনা ও রুইদাস স্ব স্ব "পন্থ" স্থাপন করেন। অন্যেরা গুরুর মতবাদ প্রচার করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন; নিজেরা কোন বিশেষ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ডাক্তার গ্রিয়ারসনের হিসাবে রামানন্দী সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তীদের সংখ্যা ১৫ হইতে ২০ লক্ষের মধ্যে। বর্ত্তমানে উত্তর-ভারতে রামানন্দীমতের বিশেষ প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রয়াগের পশ্চিম গঙ্গা ও যমুনার তটবর্ত্তী প্রদেশ প্রায় এই সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তীদের দ্বারা পরিপূর্ণ। আগরা প্রদেশের উদাসীনদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ জন রামানন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত।

* cf. Macauliffe—The Sikh Religion Vol. IV.

রামানন্দ সম্প্রদায়িকেরা রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের উপাসনা করে। রামোপাসনার প্রাধান্য হেতু ইহারা "রামাৎ" নামে প্রসিদ্ধ। অপরাপর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ন্যায় তুলসী ও শালগ্রাম শিলাকেও ইহারা বিশেষ ভক্তি করে। 'শ্রীরাম' এই সম্প্রদায়ের বীজ মন্ত্র। "জয়রাম, জয় শ্রীরাম বা সীতারাম" ইহাদের অভিবাদন-বাক্য। তিলক-সেবা শ্রীসম্প্রদায়ীদের তুল্যরূপ; কিন্তু আপনাপন রুচি অনুসারে কেহ কেহ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যবর্ত্তী রেখা কিছু হ্রস্ব করিয়া অঙ্কিত করে।

রামানন্দী-সম্প্রদায়ের ভিতর অধ্যাত্ম রামায়ণের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। তুলসীদাসের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'রামচরিত-মানস' অধ্যাত্ম-রামায়ণের দ্বারা প্রভাবিত। ইহাদের ভিতর প্রচলিত আর একখানি গ্রন্থের নাম "অগস্ত্য-সুতীক্ষ্ণ সংবাদ"। এতদ্ব্যতীত শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়-উপনিষৎ, রামোত্তর-তাপনীয় উপনিষৎ, দামোদর মিশ্রের হনুমান নাটক, অবধূত রামায়ণ ও রামায়ণ এই সম্প্রদায়ের অপরাপর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ।
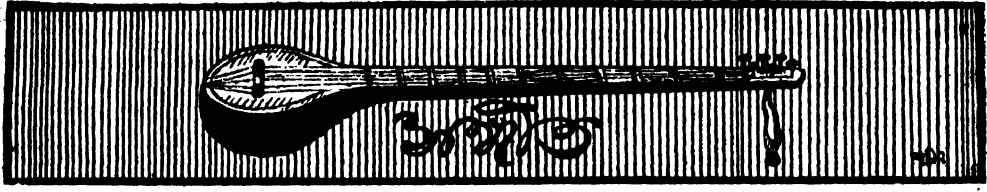
কবীরের গান

কথা ও সুর-সংগ্রহ—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী স্বরলিপি—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

কোই কুচ্ছ কহৈ, কোই কুচ্ছ কহৈ
হম অট্‌কে হৈঁ জহঁ অটকে হৈঁ।
সুরত:কমল পর অমল কিয়া
মহবুবকে প্রেমসে মটকে হৈঁ ॥
সংসার বিচারকো ছোড় দিয়া
হম ইসী বাত পৈ সটকে হৈঁ।
কবীর পিতমকে ঝুলনে মেঁ
জনম মরণ ছোড় লটকে হৈঁ ॥

স্বরলিপি

ভৈরোঁ মিশ্র—কার্ফা

স্থায়ী

		+				২		[পা -দা	
সা ঋা	{	মা	-া	মা	মা	গমা -া	গা	মা	
কো ই	{	কু	-	চ্ছ	ক	হৈ - -	কো	ই	

+		ম		২			ম
পদা	-র্সনা	দা]					
গমা	পদা	দা	দা	পদা	-পমা	মা	গা
কু-	--	চ্ছ	ক	হৈ -	--	হ	ম

+				২			ম	+ ম		ম	
গমা	-গা	দা	পদা	-পমা	-া	মা	পা	গা	-মা	ঋা	-া
অ-	ট্‌	কে	হৈঁ	--	-	জ	হঁ	অ	ট্‌	কে	-

২ + [না]
সা -া (সা ঋা) } -া -া { র্সা র্সা -না র্সা |
হৈঁ - কো ই } - - { সু র ত ক |

২
স
র্ঋা -া র্সা -া + না র্সা -নর্সা না দা | ২ পা -া (-া -দা) } |
ম ল্ প র্ অ ম - - ল্ কি | য়া - - - } |

ম +
গা মা | পা -া -া পা | প ২ দা -া -া পমা |
ম হ | বু -, ব্ কে | প্রে ম্ - সে- |

+ ২ +
মা -া মা -া | গমা -পণা -দপা -মা | মা -া মা -া |
ম ট্ কে - | হৈঁ- -- -- - | ম ট্ কে - |

২ + গ
মমা -পমা -গা -া | গমা -গা ঋা -া |
হৈঁ- -- - - | ম- ট্ কে - |

২
সা -া সা ঋা ||
হৈঁ - কো ই ||

অন্তরা

+ ২
|| { মা ণদা -া দা | দা -না না -র্সা |
|| { সং সা র বি | চা র্ কো - |

+ ২ +
নর্সা -র্ঋা -র্সা না | র্সা -া -া -া | র্সা র্সর্গা র্গা র্গা |
ছো- - ড় দি | য়া - - - | হ- ম ই সী |

২ + ২
গ
র্ঋা -া র্সা -া | [না -র্সা না -দা] না -া না -া | [পা -া -া -া] নর্সা -র্ঋর্সা -নর্সা া } |
বা ত্ পৈ - | স ট্ কে - | হৈঁ -- -- - } |

\+ র্স ২ +
{ পা ঋা -র্সা র্সা | র্সা -ঋা র্সা -া | না -র্সা -নর্স ন দা |
{ ক বী র পি | ত ম্ কে - | ঝ্ - - - ল্ নে |

২ + প ২ প
পা -া -া -া } [দা দা -া দা | পদা -পা পা মা]
মেঁ - - - } [জ ন ম্ ম | র ণ্ ছো ড়]

\+ ২
মা -া মা -া | গমা -পণা -দপা -মা]
ল ট্ কে - | হৈঁ - - - -]

\+ ২
মা -া মা -া | মমা পমা - গা া |
ল ট্ কে - | হৈঁ - - - - - |

\+ গ ২
গমা -গা ঋা -া | সা -া সা ঋা || ||
ল - ট্ কে - | হৈঁ - কো ই || ||

প্রাত্যহিক

(গল্প)

[শ্রীনুটবিহারী মুখোপাধ্যায় বি-এল]

(১)

"ওগো শুনছ, চেয়ে দেখ, চান করাতে লোমগুলার কেমন খোলতাই হ'ল।"

"আহা! খুব খোলতাই হ'য়েছে, যা হু' চোখে দেখতে পারি না তাই, বামুনের বাড়ী যত সব তোমার ম্লেচ্ছমি কাণ্ড।"

"চট কেন? ল্যাজটা দেখ দিকিন কি সুন্দর! ঠিক চামরের মত।"

"তবে আর কি, ব'সে ব'সে ঐ চামরের হাওয়া খাও আর আদালতে যাবার দরকারও নেই।"

যা'কে নিয়ে আজ সকালেই এই ছোট্ট একটুখানি অঙ্ক শেষ হ'ল, সেটা বংশীর মতে একটা খাঁটী বিলাতি কুকুর। বংশীর অনেকদিনের সখ একটা কুকুর পোষে, কিন্তু এতকাল মনের মত একটাও মেলে নি, তাছাড়া স্ত্রী শৈলবালা কুকুর মোটেই পছন্দ করে না, কিন্তু আজই সকালে যখন শিয়ালদার হাটে গাছ কিনতে গিয়ে কুকুরটা নজরে পড়ল তখন না কিনে থাকতে পারলে না। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর দাম ঠিক হ'ল, সাড়ে সতের টাকা। বিক্রেতা একজন আর্দ্দালী।

বংশী ব'ল্লে—"চোরাই মাল নয় তো হে, দরকার কি বাপু একটা রসিদ দাও।"

আর্দ্দালীটা পকেট থেকে এক টুকরা সাদা কাগজ আর একটা ছোট্ট পেন্সিল বার ক'রে রসিদ লিখতে লিখতে অল্প একটু হেসে বল্লে—"যা পেলেন বাবু, খুব। অল্প সময় হ'লে

সত্তের কেন, সত্তর টাকায় বেচতুম না।" রসিদ শেষ ক'রে আর্দালী হাত তুলে ব'ল্লে—"সেলাম বাবু, ওতেই আমার নাম, ঠিকানা সবই রইল।"

বংশী মনের আনন্দে কাগজটাকে দুমড়ে পকেটে রেখে দিলে। হাট থেকে বেরিয়ে এসেই 'বাসে' উঠতে গেল। কন্‌ডাক্টার 'হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এল—"হবে না মশাই, কুকুর নিয়ে ওঠবার নিয়ম নয়!"

"যাক'গে, দশ মিনিটের পথ, এইটুকু হেঁটেই যাই" ব'লে চেনটাকে হাতে বেশ ক'রে জড়িয়ে নিয়ে বংশী সারকুলার রোড ধ'রে চলল। পথে একখানা 'ডগ্-সোপ' কিনে নিলে। বাড়ীতে এসেই ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে ৯টা। নিজের মাথায় খানিকটা তেল ঘ'সে চেনশুদ্ধ কুকুরটাকে কলের মুখে টেনে এনে চা'ন করিয়ে দিলে। কুকুরটাকে বাস্তবিকই দেখতে ভাল, বিশেষতঃ ন্যাজটা।

বংশীর খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়েছে। শৈল পাতের কাছে দুধের বাটীটা নামিয়ে দিয়ে ব'ল্লে—"তোমার ঐ বিলিতি না ফিরিঙ্গি কুকুর কি খাবেন ব্যবস্থা ক'রে যাও, আমি কিছু পারব না ব'লে রাখছি।"

বংশী দুধটুকু এক নিঃশ্বেসে শেষ ক'রে বল্লে—"মোখুলা, মোখুলা কোথায় গেল, দুপয়সার মাংসর ছাঁট এনে দিক, বুঝছ না বিলিতি কুকুর। ভাত ও'র' সইবে না। আমার আর সময় নেই।"

শৈল ঝাঁঝের সুরে বল্লে—"সময় নেই ত আনলে কেন! মোখুলা না হয় আনলে। কিন্তু সেদ্ধ করবে কে? ঠাকুর ও সব ছাঁট-টাট ছোঁবে না। তুমি মনে করেছ আমি করব; মরে গেলেও আমি পারব না

প্রায় সাড়ে দশটা।—দেরী হ'য়ে গেছে। কোনও রকমে সুটটা প'রে টুপীটা তুলে নিয়ে বংশী ব'ল্লে—"আমি তা হ'লে চল্লুম।" শৈল বংশীর জুতার ফিতে বাঁধছিল, মুখটা উঁচু করে অনুনয়ের সুরে বল্লে—"সত্যি, কেন ঐ আপদটাকে আনলে! নিজের ছেলে পুলে তাই ভাল ক'রে দেখতে পারি না আবার এক জানোয়ারকে—"

শেষ দিক্‌টায় শৈলর গলা ভারি হ'য়ে উঠল। বংশী টুপীটা রেখে দিয়ে শৈলকে হাত ধরে তুলে নিয়ে বল্লে, "কি আশ্চর্য্য! তুমি কি ছোট ছেলের মত কাঁদবে না কি? আচ্ছা, একটা জানোয়ার, এক দিকে থাকবে, কি ক্ষতিটা শুনি।"

শৈলর চোখ দিয়ে সত্যিই দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। বংশীর বুকে মুখ রেখে বল্লে—"কি জানি আমার কেমন ভয় হ'চ্ছে। বাবার কুকুরের জন্যে মা সাত বছর বাবার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা বলেন নি। শেষ দিকটায় দুজনের বড় দুঃখে দিন কাটত। বাবার অত বড় অসুখের সময় পায়ের কাছে কুকুর থাকত ব'লে মা ঘরে পর্য্যন্ত ঢুকতেন না।"

বংশী একটা নিঃশ্বেস ফেলে হেসে' বল্লে—"ওঃ এই কথা। না গো না, তোমার বাবা যা করেছেন আমি তা করব' না, তোমায় কিছু ভয় নেই, কুকুরের জন্যে তোমার আদর মোটেই কম করব' না।" ব'লে মাথায় গালে হাত বুলিয়ে আদর ক'রে নির্ভাবনায় থাকতে উপদেশ দিয়ে বংশী টুপী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

আজ বংশীর সব কাজেই বেশ স্ফুর্ত্তি। দু দুটো মামলা আজ সে বিনা কারণেই হেরে গেল তবু তা'র দুঃখ নেই। তখনও পাঁচটা বাজে নি বংশী বার লাইব্রেরীতে শিষ দিতে দিতে ঢুকল। লাইব্রেরীর গায়েই উকীলদের বাথ রুম। মুখ হাত ধুয়ে বাড়ী যাবার জন্যে টুপীতে হাত দিতেই যামিনী চেঁচিয়ে উঠল—"কিহে বংশী, ব্যাপার কি? আজ এত শীগ্‌গির যে, বলি সস্ত্রীক কোথাও যাবার বরাত আছে না কি; সিনেমা-টিনেমা? আমিও কাল গেছলুম—বড় সুন্দর বই, 'হক্‌স্ আই', যেমি ছবিগুলি ফুঠেছে তেমি অটি'ষ্টিক্......"

বংশী হেসে বল্লে—"না ভাই অন্য একটু দরকার" বলে বেরিয়ে গেল। ট্রামে সমস্ত রাস্তা মনে মনে ঠিক্ করতে লাগল—কুকুরটার কি নাম রাখবে। ইংরেজি নাম নিশ্চয়ই—পাপ্পি, কিটি, নেলী, বুলী, রুবী—শেষ রুবী নামটাই পছন্দ হ'ল। বাড়ীর কম্পাউণ্ডে পা দিয়াই বংশী ডাকলে—রুবী রুবী রুবী।

(২)

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে ব'য়। বইলে কি হ'য় শৈলর মনে সুখ কই? দুপুর বেলা মোখুলা ছোট খুকীকে কোলে নিয়ে বাইরে ঘুম পাড়াতে গেল। ছোট

ছেলেদের কান্না থামান বড় শক্ত। মোখুলা আলমারী থেকে বই টেনে বার ক'রে ছবি দেখাতে ব'সল। একটু থামে আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে। সুইচ্ টিপে আলো জেলে দিলে, পাখা ঘুরিয়ে দিলে। তবু কাঁদে। ঘরের কোণে বেঞ্চের পায়াতে কুকুরটা বাঁধা। কিছু খায় নি। নতুন জায়গা বোধ হয় মন বসছে না। একটু চুপ ক'রে থাকে আবার ঘেউ ঘেউ ক'রে ওঠে, হয় তো মনিবকে মনে পড়েছে। মোখুলা ডাকলে—"আয় আয় তু তু! খুকুর সঙ্গে খেলবি।" কুকুরটা একবার একটু ল্যাজ নেড়ে আড় চোখে দেখে নিলে বোধ হয় সন্দেহ হ'ল—ডাকলে ঘেউ। এবার খুকুর কান্না থেমে গেছে। মোখুলা ঘরের সব দরজা বন্ধ ক'রে কুকুরের বকলোস থেকে চেনটা খুলে দিলে। কুকুরটা বসে ছিল সটান দাঁড়িয়ে উঠল, দেখে নিলে সত্যিই মুক্তি পেয়েছে কি না। মিনিট টাক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে এক লাফে টেবিলের উপর। তার পর মোখুলার পায়ের কাছে। মোখুলা ভয়ে ভয়ে গায়ে হাত বুলালে, ছোট খুকীর হাতটা টেনে নিয়ে কুকুরের পিঠে বুলিয়ে দিলে। মোখুলা খুকুকে নিয়ে একটু আনমনা হ'তেই কুকুর একলাফে দরজা। বুদ্ধি আপনি জোগায়। পা দিয়ে দরজা টানতেই ফাঁক হয়ে গেল। এক ছুট। বাবুর সখের কুকুর, মাত্র আজকের কেনা। মোখুলার বুকের মধ্যে গুর গুর ক'রে উঠল। ধপ ক'রে খুকীকে বসিয়ে দিয়েই প্রাণপণে ছুট দিলে। রাস্তায় এক ধাঁধাঁয় পড়ল। কোন দিকে যাবে। 'জয় সীতারাম' বলে বাঁ দিক দিয়ে মোখুলা ছুটল। একদম বৌবাজার। কিন্তু কুকুর কোথায়। হায়! হায়! মোখুলা একবার ভাবলে বাড়ী আর ফিরবে না, কিন্তু না ফিরেই বা উপায় কি?

মোখুলা যখন হতাশ হ'য়ে মুখটা শুকনো ক'রে বাড়ী ফিরল, তখন শৈল বুকে উৎকণ্ঠা আর কোলে ছোট খুকীকে নিয়ে বাইরের ঘরে অপেক্ষা কচ্ছে। মোখুলার মুখ দেখে শৈলর বুঝতে একটু ও বাকি রইল না যে কুকুর পাওয়া যায় নি। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে—"মোখুলা কি হ'ল রে পাওয়া গেল না।"

মোখুলা একটা নিঃশ্বেস ফেলে ঘাড় হেট করে বল্লে—"না মা।"

"—যাঃ কি করলি বল দিকিনি, সর্ব্বনাশ করলি, এখন উপায়? যা, যা, বাবু আসবার আগে আর একবার খুঁজে আয়, আর না পাওয়া যায় তো থানায় একটা ডাইরি লিখিয়ে আসিস।"

মোখুলা চ'লে গেল।

শৈল ওপরে এসে খুকীকে খাটের ওপর বসিয়ে দিয়ে নিজের মনেই বল্লে—"হা ভগবান্। যা চেয়েছিলুম তা হ'ল বটে, কিন্তু মনটায় যে বড় অস্বস্তি হ'চ্ছে। তাঁরও আবার আসবার সময় হয়ে এল। তাঁকে কি বলব?" বলে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল।

রুবির সাড়া না পেয়ে বংশী এঘর ওঘর-খুঁজতে লাগল। বেঞ্চের পায়ে শুধু চেনটা দেখে চমকে উঠল—কুকুর ত নেই। এ নিশ্চয়ই শৈলর কাজ। মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল। কোনও রকমে সিঁড়ি কটা উঠে এসে ঘরে ঢুকেই বল্লে—"হ্যাগা, আমার কুকুর।"

শৈলর মুখের ভাব এমন হ'ল যেন শৈলই তাকে ছেড়ে দিয়েছে। ভয়ে ভয়ে বল্লে—"জামা কাপড় ছাড়, বলছি।"

—"ওসব বলাবলি শুনতে চাই না, কুকুর কোথায়—তাই বল।"

—"ও মেজাজ দেখ, যেন আমিই তাকে ছেড়ে দিয়েছি জানি না তোমার কুকুর।"

বংশী রাগে দুঃখে চুপ করে রইল। শৈল গলার স্বর একটু নরম করে ব'ল্লে "এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি কুকুর জানি না। মোখুলা দুপুর বেলা দরজা বন্ধ করে কুকুর ছেড়ে দিয়ে ছোট খুকীর সঙ্গে খেলছিল। তারপর দরজার ফাঁক দিয়ে কি রকম ভাবে পালিয়েছে। মোখুলা খুঁজতে গেছে এখনও ফেরে নি।"

বংশী জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে গজরাতে লাগল—"আসুক রাস্কেলটা, তাকে আজ চাবুকে বিদেয় করব। হতভাগা, ষ্টুপিড্ সবাই যেন ষড়যন্ত্র ক'রে আমার পেছনে লেগেছে।"

শৈল একটা কথা না ক'য়ে বংশীর জলখাবার আনতে নীচে চলে গেল।

বংশী ঘরের কোণে ইজি চেয়ারটা হেলান দিয়ে চোখ বুজে পড়ে রইল। শৈল টেবিলের ওপর খাবারের রেকাব আর জলের গেলাসটা নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে—"শুনছ, খাও খাবার দিয়েছি।"

বংশী দু টুকরা পেঁপে আর একটা মিষ্টি মুখে দিয়ে ঢক্ ঢক্ ক'রে খানিকটা জল খেয়ে আবার চেয়ারে এসে বস্‌ল। শৈল ঠাকুরকে রান্নার জোগাড় করে দিতে নীচে নেমে গেল।

মোষুলা যে কত রাত্রিরে ফিরেছে তা শুধু সেই জানে। তার পরদিন আদালতে বেরুবার সময়ে বংশী ডাকলে—"মোষুলা"। মোষুলা ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়াতেই বংশী খিঁচিয়ে উঠল—"উল্লুক কাঁহাকা, আস্কারা পেয়ে দিন দিন মাথায় উঠছ'। কাল রাত্তিরে কোথায় ছিলি, খেতে আসবার পর্য্যন্ত সময় পাস নি। শীগ্‌গির চান করে খেয়ে নিগে যা।" একটু থেমে ব'ল্লে—"কাল ডাইরি করে দিয়েছিস ?"

মোষুলা আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লে "হাঁ।

বংশী বেরিয়ে গেল, কি মনে হ'তে আবার তখুনি ফিরে এসে ডাকলে—"কোথা গো শুনছ।"

শৈল তাড়াতাড়ি গায়ে কাপড় দিতে দিতে তেতলার বারান্দায় এসে মুখ বাড়িয়ে বল্লে—"এই যে ! কিছু বলছ না কি ?"

"—হাঁ, দেখ, আমার পাঞ্জাবীর পকেটে একটা ছোট্ট ভাঁজ করা কাগজ আছে ফেলে দাও তো।"

বংশী উঠান থেকে কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বেলা প্রায় তিনটা। কুকুরের জন্যে বংশীর মনটার স্বস্তি নেই। একটু আগে অনেক দিনের পুরাণ মক্কেল জাওলাপ্রসাদকে মিথ্যে মিথ্যে গোটাকতক কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে। লাইব্রেরীর এক কোণে মক্কেলদের জন্যে যে বেঞ্চটা পাতা, সেইটার ওপর ব'সে পড়ে বংশী পকেটে হাত দিলে রসিদের সন্ধানে, ঠিকানা দেখে কুকুরটার যদি কিছু কিনারা করতে পারে। ছোট ভাঁজ করা কাগজ খানি খুলে অবাক্ হয়ে গেল। এটাই কি সে সেদিন নিয়েছিল, এ কি ভাষায় লেখা। তার বেশ মনে হ'ল এইটাই রসিদ—সেদিন সে না দেখে পকেটে রেখে দিয়েছিল। তাড়াতাড়িতে খুলেও দেখে নি কি লেখা বা কি ভাষায় লেখা। ডাকলে—"দেবেন।"

দেবেন বংশীর ক্লার্ক। কাছে এসে দাঁড়াতেই বংশী বল্লে—"দেখ তো এটা পড়তে পার কি না ?"

দেবেন কাগজটা হাতে নিয়ে অবাক্। বাবু কি রসিকতা কচ্ছেন না কি ? মুখের চেহারা দেখে তা তো মনে হয় না ! একটু চুপ ক'রে থেকে ব'ল্লে—"আজ্ঞে, না স্যর, এ আমি পড়তে জানি না।"

বংশী বল্লে "আচ্ছা চেষ্টা দেখদিকিন যদি কারুকে দিয়ে পড়িয়ে আনতে পার, যদি দুচার পয়সা লাগে তাতে ক্ষতি নেই।"

দেবেন কাগজটা হাতে নিয়ে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে এসে ভাবলে, কার কাছে সে যাবে। বেঞ্চ কোর্টে এক পার্শী কেরাণী আছে। দেবেন তারই কাছে গেল। সে দুবার তিনবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বল্লে—"না বাবু, এ আমি পড়তে পারলুম না।" দেবেনের হঠাৎ, মনে হইল এক নেপালী বেয়ারার কথা। তার কাছে যেতেই সে বল্লে—"হাঁ বাবু এ আমাদের ভাষা" ব'লে খাকী হাফ প্যান্টের পকেট থেকে চশমা ব'ার করে চোখে লাগিয়ে পড়লে—"সাড়ে সতের টাকা। আমার কুকুর।

দধিরাম নেপালী
আর্দ্দালী
গভর্ণমেণ্ট হাউস্।

দেবেন তাড়াতাড়ি এক টুকরা কাগজ বার ক'রে ঠিক ঐ ঐ কথা লিখে নিয়ে বংশীর কাছে হাজির হতেই বংশী বল্লে—"কি হে, কিছু জানতে পারলে।"

দেবেন অল্প একটু হেসে ব'ল্লে—"আজ্ঞে হাঁ, নেপালী ভাষা। এই নিন" বলে দুখানা কাগজই বংশীর হাতে দিয়ে দিলে।

বংশী টুপীটা তুলে নিয়ে ব'ল্লে, "চল দিকিন আমার সঙ্গে। আজ একটু গোয়েন্দাগিরি করা যা'ক্, যদি কাজে সফল হই, তোমায় পাঁচটাকা বকশিষ।"

দেবেন হেসে বল্লে—"বকশিষ কেন স্যর, কি কাজটা বলুন না, আমি করে দিচ্ছি।"

বংশী কোর্টের পোষাক পরেই বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় যেতে যেতে কুকুর সম্বন্ধে সমস্ত কথাই দেবেনের কাছে খুলে বল্লে। গভর্ণমেণ্ট হাউসের কাছাকাছি এক পিয়নকে দেখে বংশী বল্লে—"ওহে দেবেন, ওকে জিজ্ঞাসা কর-দিকিন, আর্দ্দালী দধি নেপালীকে চেনে কি না। ওতো

এই দিকে চিঠি বিলি করে হয়, তো সন্ধান দিতেও পারে।"

দেবেন জিজ্ঞাসা করতেই পিয়নটা বল্লে "না মশাই, দধি নেপালী চিনি না, তবে অনেক নেপালী আর্দ্দালী ঐ সামনের লাল বাড়ীটায় থাকে। ওটা আর্দ্দালীদের ব্যারাক্। জিজ্ঞাসা করে দেখুন হয় তো ওখানে থাকতেও পারে।"

অনেক অনুসন্ধানের পর ব্যারাকের একটা লোক বল্লে "উত, জানতা তেতলায়ে রয়তা।"

বংশী দেবেনকে বল্লে, "আমি এইখানে আছি, তুমি ওর সঙ্গে যাও, লোকটাকে দেখে এস।"

একটু বাদে দেবেন ফিরে এসে বল্লে—"লোকটা বেরিয়েছে ঘরে নেই, ঘরে তালা দেওয়া, পাশের ঘরে একটা লোক বল্লে—এখনই ফিরবে।"

বংশী বল্লে—"চল দিকিন, দেখি।"

ঘোরান সিঁড়ি ভেঙ্গে কত রকমের রাজ্যের মধ্যে দিয়ে বংশী যেখানে এসে দাঁড়াল সেটা ফাঁকা জায়গা, দুপাশে লম্বা টিনের ছোট ছোট ঘর। ঘরের ভেতর থেকে অজ্ঞেয় ভাষায় ছোট ছেলেমেয়েদের গোলমাল। বংশী এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বল্লে—"ওহে দেবেন, এ খানে দাঁড়ান কি ঠিক হ'বে? মেয়েরা সব যাতায়াত কচ্ছে এযে একদম পঞ্চাশটা সংসারের অন্তঃপুর হে।"

দেবেন হঠাৎ চাপা গলায় ব'লে উঠল—"আচ্ছা স্যর, দেখুন তো কোণের ঘরটায় একটা কুকুর বাঁধা রয়েছে ঐটা না তো?"

বংশী তাড়াতাড়ি মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়েই ব'ল্লে—"দেবেন, ওদিকে আর তাকিও না, ঐ কুকুরই আমার। এরা বুঝতে পারলে সরিয়ে ফেলবে একটু সরে দাঁড়াই চল।" বলে নিজে আর একবার আড়-চোখে দেখে নিয়ে উল্টোদিকে মুখ ক'রে একটু এগিয়ে দাঁড়াতেই একটী ভদ্রলোক—বোধ হয় অনেকক্ষণ কথা বলবার লোক না পেয়ে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন বল্লেন—"এই যে বসুন না এখানে জায়গা রয়েছে।" বংশী ভদ্রলোকটীর পাশে ব'সে পড়ে বল্লে—"থ্যাঙ্ক্‌স্" (ধন্যবাদ)। ভদ্রলোকটী বল্লেন—"থ্যাঙ্ক আর কি মশাই, এখানে কি আর সখ ক'রে কেউ বসতে আসে না বেড়াতে আসে। আপনি কি কোন মক্কেলের 'ইনষ্ট্রক্‌সন' (অভিমত) নিতে এসেছেন বুঝি?"

বংশী ব'ল্লে "না, অন্য একটু দরকার আছে—আপনি?" ভদ্রলোকটী একটা নিঃশ্বেস ফেলে বল্লেন—"আর বলেন কেন মশাই পাপের ভোগ। আজ পাঁচ দিন হ'ল চৌরঙ্গীর মোড়ে এক কুকুর কিনি—"

বংশী মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে—"কি কিনলেন?"

ভদ্রলোকটী অল্প একটু হেসে বল্লেন—"আপনি বুঝি কুকুর পছন্দ করেন না, তা অনেকে অপছন্দ করে বটে, আমার আপন মামারাই হাড়ে চটা, কথাতেই আছে "ভিন্ন রুচির্হি"। কিন্তু আমার মশাই কুকুর পোষা বাতিক, থাক্‌গে কুকুরটী দেখতে বেশ ভাল মানুষটী, কিন্তু অতবড় শয়তান তা কে জানে। আর পরদিন একটা ভাল চেন পরাব ব'লে গলার সরু চেনটা যাই খুলিছি, চোখের পাতা ফেলতে দিলে না—তোঁ দৌড়। ভাগ্যিস্, সে বেটা ঠিকানা দিয়েছিল, আজ অনেক সন্ধান ক'রে এসে হাজির হ'য়েছি। যা ভেবেছি ঠিক তাই, মহাপ্রভু এখানে এসে হাজির, সে বেটা কোথায় বেরিয়েছে কে জানে, যদিও আমার জিনিস, কিন্তু উপস্থিত যখন তা'র ঘরে বাঁধা নিয়ে যাওয়া কি ঠিক, আপনি তো উকীল মানুষ বলুন না?" বক্তা আপনার খেয়ালে ব'লে গেলেন এদিকে বংশীর মুখে যে অন্ধকার ক্রমশঃ জমাট হ'য়ে আসছে, সে দিকে লক্ষ্যই নেই। বংশীর দিকে হঠাৎ তাকিয়ে বল্লেন—"আশ্চর্য্য হচ্ছেন কি? বাস্তবিক পালিয়ে এসেছে, চলুন না আপনাকে দেখাই।"

নির্জীব পুতুলের মত বংশী লোকটীর সঙ্গে গেল। কুকুরের কাছ বরাবর যেতেই বংশী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"খবরদার! ওদিকে আর এক পা বাড়াবেন না"।

কিছু বুঝতে না পেরে লোকটী চমকে উঠে বল্লেন—"কেন ব্যাপার কি? আপনি অত মেজাজ গরম করছেন কেন? ওখানে মেয়েরা রয়েছে? তা'তে কি? আমাদের চেয়েও ওরা ঢের স্বাধীন তা জানেন?"

বংশী আবার হুঙ্কার দিলে—"কুকুর আমার দেবেন! ইনি বলেন কি? ড্যাম্ রোগ্ (পাজী-বদমাস্)।"

ভদ্রলোকটী এতক্ষণে ব্যাপারটী বুঝতে পেরে রুখে' উঠে বল্লেন—"ননসেন্স। শুধু শুধু গালাগালি করেন কেন? কুকুর আপনার কি রকম? ওকালতী করবার

জায়গা এ নয়। ওসব ফন্দিবাজি অপরের কাছে করবেন। এ ক্ষেতা ঘোষের কাছে ওকালতির ধাপ্পাবাজি চলবে না। বে-আইনী ক্ষেতা ঘোষ করে না" বলেই টুইল সার্টের পকেট থেকে একটুকরা কাগজ বা'র ক'রে' বংশীর মুখের কাছে একবার ধরেই আবার চট্ করে টেনে নিয়ে বল্লে-"এই হচ্ছে রসিদ।"

বংশী চীৎকার ক'রে উঠল—"দেবেন. আমাদের রসিদটা বা'র কর তো?"

দেবেন বল্লে—"সে তো আপনার কাছেই।"

বংশী এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে কাগজটা বার ক'রে বল্লে—"এই দেখুন রসিদ, আসল নেপালী ভাষা, আপনার ওটা জোচ্চুরি, ডাষ্টবিনে (আস্তাকুঁড়ে) ফেলে দিন।"

ভদ্দরলোকটী সার্টের হাত গুটিয়ে বল্লেন--"সাবধান।"

এতক্ষণে এদের দুজনকে ঘিরে ছোট্ট একটুখানি ভিড় জমে উঠেছে। ভিড়ে সর্ব্বজাতিরই সমন্বয় ছিল। বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক, এবং নেপালী স্ত্রীলোক। ভিড়ের দিকে চেয়ে বংশীর লজ্জা হ'ল।—ছিঃ সে এ কি কচ্ছে! হঠাৎ নরম সুরে বল্লে—"দরকার কি মশাই একটা 'সিন' ক্রিয়েট্' (দৃশ্যের অবতারণা) ক'রে। সে আসুক, সে যা ব'লে, বিবেচনা ক'রে যা হয় করা যাবে Either he is a cheat or yourself." (হয় সে জুয়াচোর না হয় আপনি)

ভদ্দরলোকটী বল্লেন—Or yourself (কিংবা আপনি)

দুজনেই চুপচাপ ব'সে রইল। কারুর মুখে একটীও কথা নেই। নিজেদের ব্যবহারে নিজেরাই একটু লজ্জিত হইয়াছে। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর ভদ্দরলোকটী দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন, "আমার ধারণা ছিল, আপনারা শুধু আদালতেই জোচ্চুরি করেন, কিন্তু তা নয় আদালতের বাইরেও করেন, সুবিধে পেলে নিজেদের বাড়ীতেও কর্ত্তে পারেন। কুকুর আপনিই নিন, আমি চল্লুম—" ব'লেই তর তর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেলেন।

বংশী তাড়াতাড়ি পাঁচিলে মুখ বাড়িয়ে দেখলে—একদম একতলার সিঁড়ির কাছে, চেচিয়ে বল্লে—"ভেরী মেনি থ্যাঙ্ক্স্" (বহুৎ বহুৎ ধন্যবাদ।)

যা'রা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল তা'রা' সকলেই যে যার কাজে চলে গেল। আসল ব্যাপার কি না বুঝতে পারলেও এটা তারা বুঝেছিল যা হ'ল তা' মারামারির পূর্ব্ব লক্ষণ। কিন্তু হঠাৎ থেমে যাওয়াতে তা'রা মনঃক্ষুন্ন হল। তা'দেরই মধ্যে একজন লোক একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে বংশীর কাছে এসে বল্লে—"কা হুয়া বাবুজী"। বংশী ধমকের সুরে বল্লে "কুছ নেই, তোম লেকেগা, তো তোমায় বলি।"

লোকটা বল্লে—"বলিয়ে তো"।

বংশী বল্লে—"ঐ কুকুরটা আমি দধিরামের কাছ থেকে কিনেছি, এই আমার রসিদ, আমি নিয়ে যেতে চাই।"

লোকটা যা বল্লে—তা বাংলা ভাষায় এই দাঁড়ায়—"হুজুর কিনেছেন যখন ও আপনারই, আপনি নিয়ে যান, আমি বলছি। কেউ বাধা দেবে না। লেকিন্ একটা লিখে দিয়ে যান, আমি দধিরামকে দেব।" বংশী মোটেই আশা করে নি যে কাজটা এত শীগ্গির হাসিল হ'বার সম্ভাবনা আছে। তাড়াতাড়ি এক টুকরা সাদা কাগজে লিখে দিলে—"—কাছ থেকে আমার পলাতক কুকুর আমি ফিরিয়া পাইলাম, ইতি বংশী চট্টোপাধ্যায়।"

বংশী কাছে যেতেই কুকুরটা চেঁচিয়ে উঠল—ঘেউ ঘেউ।

বংশী কোনও দিকে কর্ণপাত না ক'রে চেনটা খুলতে লাগল, কে জানে, হয় তো সে লোকটা ফিরতে পারে, না হয় দধিরামও এসে প'ড়ে' একটা গোলমাল বাধাতে পারে। চেনটাকে হাতে বেশ ক'রে জড়িয়ে নিয়ে লোকটাকে সেলাম ব'লে সিঁড়ির দিকে যেতেই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

সিঁড়ির মুখেই দরজা। সিঁড়িও সরু দরজাও ছোট। দুটী কবাটে দুটী হাত রেখে একটী ১৮।১৯ বছরের নেপালী মেয়ে দাঁড়িয়ে। সূর্পণখার বংশ হ'লেও গাল দুটী লাল টুকটুকে যেন রক্ত জমে জমাট বেঁধে আছে। এখনই গড়িয়ে পড়বে, অল্প একটু আঘাতের অপেক্ষা কচ্ছে। পরণে একটা মোটা ঘাগরা। বংশী কাছে এসে হিন্দীতে বল্লে—"একটু সর তো আমি যাই।"

মেয়েটী হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল নিমিষের মধ্যে দুটী গাল চোখের জলে ভিজে জবজবে হ'য়ে উঠল। কান্নার আওয়াজে দেখতে দেখতে অনেকগুলি নেপালী মেয়ে-ছেলে জড় হ'য়ে গেল।

বংশী হতভম্ব। দেবেনকে বল্লে—"ব্যাপার কি? কি বলছে? ভাষাও তো বুঝি না, মিথ্যে ক'রে কিছু লাগাচ্ছে

না তো ? এ বেটাদের বিশ্বাস নেই, আবার এদের কাছে কুকুরীও থাকে। মেয়েটার কাছ থেকে একটু স'রে দাড়ান ভাল।" নিজে স'রে' এল বটে, কিন্তু কুকুর নড়ে না। মেয়েটার ঘাঘরা কামড়ে ধরে আছে।

একজন স্ত্রীলোককে ডেকে বংশী বল্লে—"কি ব্যাপার ?"

স্ত্রীলোকটী যা ব'ল্লে তার মর্ম্ম এই—যে,—"মেয়েটার নাম দেবী, কুকুরটাকে সেই একরকম মানুষ ক'রেছে, আজ দু-দিন কুকুরটা না থাকাতে, দেবী দু-দিন অন্নজল স্পর্শ করে নি ; সুতরাং কুকুরটা নিয়ে গেলে ও বাঁচবে না।"

বংশী একবার কুকুরেব দিকে আর একবার মেয়েটার দিকে তাকাতে লাগল। চোখের জলের ফোঁটাগুলা সত্যিই মুক্তার মত গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে—একটার পর একটা, অজস্র…। গাল দুটী রক্ত জবার টাট্‌কা পাতা, চোখের জল দাঁড়াতে পাচ্ছে না. পিছলে পড়ছে। ছোট ছোট দুটী চোখ জল জল কচ্ছে। সাপের চোখে সম্মোহনী শক্তি আছে, এ মেয়েটার চোখেও আছে।

মুঠা আলগা হ'য়ে এল, চেনটা পড়ে গেল। কে যেন বংশীকে সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল।

চেন ছাড়তেই দরজার পথ খোলা। মেয়েটী কুকুরটাকে বুকে তুলে নিল। বংশী আর একবার মেয়েটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল।

সমস্ত রাস্তাটা বংশী নিস্তব্ধ. একটা কথা বললে না। তার চোখের উপর কেবলই মেয়েটার শিশিরভেজা জবার মত রাঙা মুখখানি ভেসে উঠতে লাগল। বংশী মনে মনে বলতে লাগল—কি সুন্দর! বংশী যখন লাইব্রেরীতে ফিরে এল তখন ৬টা। সকলেই প্রায় চলে গেছে, কেবল একদিকে যামিনী এবং আরও জনকতক উকীল ব'সে গল্প কচ্ছে। যামিনীর গলাই বেশী. বংশীর কাণে এল, যামিনী বলছে—"তা তোমারা যাই বল, মেয়েদের চোখের জল বড় ভয়ানক জিনিস, বিশেষতঃ যদি অপরিচিতা রূপসী যুবতীর চোখের জল হয়। চেখের জলের কাছে হার মানা একটা দুর্ব্বলতা, আর এই দুর্ব্বলতা আমার বিশ্বাস সকল পুরুষেরই প্রায় আছে অন্ততঃ আমার তো আছে। এই সে-দিন আমি তেইশটা টাকা জল দিয়ে এসেছি। দিন কুড়ি আগে জগুবাবুর বাজারের কাছে একটা লোকের কাছ থেকে ২৩৲ টাকা দাম দিয়ে একটা কুকুর কিনি—"

বংশী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।—

"শালা কুকুর, তার পরদিনই চম্পট। খোঁজ করে লোকের বাড়ী হাজির হ'তেই কুকুর ফেরৎ দিলে কিন্তু একটা স্ত্রীলোক তাও খাঁজা ভুটিয়া, কে জানে লোকটার কে হয় এম্নি কান্না জুড়লে আমার মত লোককে বোকা বানিয়ে দিলে—কুকুরটা আনতে পারলুম না।"

বংশীর মুখ শুকিয়ে গেল। মেয়েটার ব্যবসাই ঐ তাকে বোকা বানিয়ে দিলে। বংশী তাড়াতাড়ি টুপী নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

শৈল খাবার দিয়ে বংশীর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বল্লে—"হাঁগা, সে আর পাওয়া গেল না। হাজার হ'ক তোমার সখের কুকুর তুমি হয় তো আমায় ঠাট্টা কর্ত্তে পার। কিন্তু আমার সত্যিই দুঃখু হ'চ্ছে।"

বংশী শৈলর হাত দুটী স্নেহভরে নিজের মুঠায় ধরে গদগদভাবে বল্লে—"আচ্ছা শৈল তুমি কি আমায় এতই নিষ্ঠুর ভাব। তোমার মনে কষ্ট আমি কোনও কালে দিয়েছি, না কখনও দিতে পারব। গেছে, আপদ বিদেয় হ'য়েছে ; কুকুরটার সন্ধান তো পেলুম, লোকটা আমায় ফেরৎও দিতে চাইলে কিন্তু তোমার কথা ভেবে মনটা বড্ড কষ্ট হ'ল। কুকুর কি এমন জিনিস যে তোমায় কষ্ট দিতে হ'বে।" ব'লে বংশী শৈলর দুই গণ্ডে প্রণয়ের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল।

আনন্দে শৈলর চোখদুটী জলে ভারি হ'য়ে উঠল।

অষহে পন্‌তাও

সুপ্রাচীন আর্য্য বা 'ইন্দো-ইরাণীয়' জাতির দুইটী প্রশাখা—ভারতীয় ও ইরাণীয়। এই উভয় জাতির রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মমতের কতদূর সৌসাদৃশ্য আছে, তাহার অল্প একটু আভাস আমার পূর্ব্ববর্ত্তী এক প্রবন্ধে দিয়াছি।* আর এই দুই মহাজাতির ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব যে প্রায় একরূপ—বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সম্বন্ধেই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার চেষ্টা করিব।

ভারতীয় ও ইরাণীয়—এই উভয় ধর্ম্মের ভিত্তি 'ঋত বা 'অষে'র উওর সুপ্রতিষ্ঠিত। এই ঋত বা অষের কল্পনা প্রথম কোন্ সত্যদ্রষ্টার মস্তিষ্কে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা স্থির করিবার কোন উপায়ই বর্ত্তমানে আমাদের জানা নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুরাতনতম বৈদিক ঋঙ্‌মন্ত্রে অথবা অবেস্তার প্রাচীনতম গাথা-সাহিত্যে—সর্ব্বত্র এই মহীয়সী কল্পনার পূর্ণ বিকাশই দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার উৎপত্তির কোন সন্ধানই মিলে না। সুবিদ্বান্ অধ্যাপক বার্থলমি (Professor Chr. Bartholomæ) শব্দতত্ত্বের বহুবিধ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বৈদিক 'ঋত' শব্দ ও ইরাণীয় 'অষ' শব্দের মূল একই। কিন্তু মাত্র এই তথ্যটুকু আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় নহে।

শব্দতত্ত্বের সুনিপুণ আলোচনা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ব্যক্তিবিশেষের গভীর পাণ্ডিত্য প্রকটিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু দুইটী মহাজাতির ধর্ম্মমত ও চিন্তাধারার মধ্যে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে সাদৃশ্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে দার্শনিক অন্তর্দ্দৃষ্টির প্রয়োজন। 'ঋত' ও 'অষ' এই দুইটী শব্দের অন্তর্নিহিত শাশ্বত ভাব এত মহান্, এত অপার্থিব, এত অতীন্দ্রিয় যে, আমাদের মনে হয়, উহা কখনও পৌরুষেয় হইতে পারে না। সকল চিরন্তন ভাবধারাই পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসের মত প্রবাহরূপে নিত্য—কখনও উহা অধর্ম্মের ছায়াপাতে মলিন, আবার কখনও বা ঈশ্বরানুগৃহীত সত্যদ্রষ্টার প্রচেষ্টায় আপনার তেজে আপনি উজ্জ্বল। অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ যখন কোন নূতন তত্ত্ব প্রথম লোক-সমাজে প্রচার করেন, তখন উহা দিগন্তবিস্তৃত নীলাম্বরের মতই মহান্ ও উদার বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু সাধারণের বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃ সঙ্কোচ-ভাবাপন্ন। অসীম কল্পনা সে বুদ্ধিতে সসীম না হইলে প্রতিফলিত হইতে পারে না। আমাদেরই বুদ্ধিমান্দ্য-বশতঃ সত্যের মর্য্যাদা হ্রাস পাইতে থাকে। ক্রমশঃ ঘনাচ্ছন্ন মিহিরের মত জ্ঞানরাশি অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হইয়া যায়। তখন পুনরায় উহার উদ্ধারের নিমিত্ত অবতারের জন্মগ্রহণ আবশ্যক হইয়া পড়ে। জগতে যত মত প্রচারিত হইয়াছে—সকলের সম্বন্ধেই একথা প্রয়োজ্য, কারণ মূলতঃ সত্য এক ভিন্ন বহু নহে। কেবল দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে উহা আপততঃ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তাই অষ ও ঋত এক বলিয়া আমাদের বিস্মিত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

কেহ কেহ 'অষ' শব্দটীর প্রতিবাক্যরূপে 'শুচিতা', 'পুণ্য', 'ধর্ম্ম' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে অবশ্য আপাততঃ ব্যাখ্যার কার্য্য চলিয়া যায় বটে, কিন্তু শব্দটীর অন্তর্নিগূঢ় ভাবটুকু মোটেই ধরা পড়ে না। আসল জিনিসটুকু সবই ধোঁয়াটে থাকিয়া যায়। 'অবেস্তা'র অপেক্ষাকৃত আধুনিক (অর্ব্বাচীন) অংশে ও পহ্লবি-সাহিত্যে 'অষ' শব্দটি 'ধর্ম্ম' বা 'শুচিতা'র পর্য্যায় রূপে ব্যবহৃত হইলেও সুপ্রাচীন গাথা-সাহিত্যে উহার অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। প্রাচীন-সাহিত্যের সে সুন্দর মহান্ ভাব আধুনিক-সাহিত্যে অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। কেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গাথা-সাহিত্যে অষের মাহাত্ম্য পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন আমরা সেই মহাজ্ঞানী আচার্য্য জরথুশ্ত্রের পবিত্র সান্নিধ্যে উপনীত হইয়াছি। আচার্য্যের পবিত্র শাশ্বত মহান্ উদার ভাব যেন চক্ষুর সমক্ষে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। এ ভাব অবশ্য যে 'জরথুশ্ত্রে'রই চিন্তা-প্রসূত তাহা আমরা বলিতে চাহি না। ইহা অনাদি ও চিরন্তন। আচার্য্য তাহার অন্যতম সংস্কর্ত্তা মাত্র।

* পঞ্চপুষ্প (চৈত্র, ১৩৩৬)—প্রাচীন ইরাণ।

যুগ-যুগান্তরের পুঞ্জীভূত মোহান্ধকার জ্ঞানালোকসম্পাতে বিদূরিত করিয়া আর্য্য জরথুশ্ত্র ইরাণবাসীকে যে পথ দেখাইয়াছিলেন, তাহা এই "অষহে পন্তাও" বা "ঋতস্য পন্থাঃ"।

সেই প্রাচীন ভাবধারা কালবশে বহু বিকৃত হইলেও ইরাণীয়গণের বংশধর, বর্ত্তমানে পারসীগণ, উহা একেবারে ভুলেন নাই। 'অষে'র নববিবর্ত্তিত নাম হইয়াছে "অষোই"। শব্দটী বিশেষ পরিবর্ত্তিত না হইলেও অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়াছে অনেক। 'অষোই' বলিতে ইদানীং বাস্তব বা পার্থিব পবিত্রতার ভাবটিই মনে পড়ে। অবশ্য পার্থিব শুচিতা বলিতে শুধু স্নান, বস্ত্রধাবন প্রভৃতি বাহ্য দৈহিক পবিত্রতাই বুঝায় না, আভ্যন্তরীণ বা মানসিক শুচিতার ভাবও প্রকাশ পাইয়া থাকে। তথাপি এ পবিত্রতা আমাদের এই জড় পার্থিব জগতের সহিত সংবদ্ধ। উন্নত আধ্যাত্মিক পবিত্রতার ভাব 'অষোই' শব্দটী হইতে বুঝায় কি না বলা বড় কঠিন। ভারতেও ঠিক এই দশাই ঘটিয়াছে বৈদিক 'ঋত' কলেবরও অর্থ উভয়ই পরিবর্ত্তন করিতে করিতে অধুনা-প্রচলিত 'ধর্ম্ম' রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। আধুনিক যুগে "ধর্ম্ম" বলিতে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র বুঝাইয়া থাকে। 'ঋতের' অধ্যাত্ম-গন্ধও 'ধর্ম্মের' মধ্যে পাওয়া যায় না। মনুর যুগেও 'ধর্ম্ম' বলিতে আধ্যাত্মিক ভাবের কিছু আভাস পাওয়া যাইত। বর্ত্তমানে আর কিছুই নাই। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেও এরূপ ঘটনার উদাহরণ বিরল নহে। 'Sermon on the Mount' দিবার সময় যীসাস্ যে অর্থে 'Righteousness' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এখন কি আর সেই ভাবপূত অর্থে শব্দটী কোন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যবহার করিয়া থাকেন? আচার্য্যগণ পবিত্র আধ্যাত্মিক ভাবে বিভোর হইয়া যেন গভীর অর্থে, এই সকল শব্দের প্রয়োগ করিতেন, আমরা ক্রমশঃ সেই পবিত্র চিন্তাস্রোত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ায় সে সাম্প্রদায়িক অর্থ বিস্মৃত হইয়াছি। স্বর্লোক হইতে মর্ত্ত্যে গঙ্গার অবতরণ ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে। বিষ্ণুপদোদ্ভূতা অলকানন্দা যখন পৃথিবীতে প্রথম পতিত হইলেন, তখন দেবাদিদেব মহাদেব ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে তাঁহার পতনবেগ শিরে ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। ঐশী প্রেরণার প্রবল বেগও সত দ্রষ্টা মহাপুরুষগণ ব্যতীত আর কেহই সহ্য করিতে পারেন নাই। আমাদের মত নরবৃন্দের সেই ঐশী প্রেরণাস্রোতে কেবল স্নান-পানের অধিকার আছে মাত্র—তাহাও অতি নিম্নস্তরে, যথায় উহার প্রবলতা নাই বলিলেও চলে।

এখন পারসীদিগের মধ্যে 'অষোই' বলিতে পার্থিব সদাচার (শুদ্ধদেহ ও ভদ্র ব্যবহার) মাত্র বুঝায়। আচার্য্য জরথুশ্ত্রের সময় উহাতে আরও গভীর অর্থ নিহিত ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, যতই পিছু হটিয়া আচার্য্যের নিকট হইতে নিকটতর যুগে ফিরিয়া যাওয়া যায়, 'অষের' কল্পনা ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর রূপে প্রতিভাত হইতে থাকে।

খ্রীষ্টের জন্মের প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে যে-সকল জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের রচনায় অষের যে কল্পনা দৃষ্ট হয় তাহা আধুনিক যুগের পারসীগণের কল্পনা হইতে অনেক অধিক উন্নত। সাসানীয় সাম্রাজ্যের "দস্তুর"গণ* (অদর্বাদ্ মারস্পন্দ্, অর্তা বিরাফ্ প্রভৃতি) অষের যে বর্ণনা করিয়াছেন, সে কল্পনা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের সাধনালব্ধ দিব্য অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সে ছিল সাধারণ যুগ। শাস্ত্রবচনের সার্থকতা সাধনার বলে নিজ নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া শ্রেষ্ঠ সাধকগণ তাহা সাধারণের নিকট প্রচার করিতেন। তাই তখনকার অষের কল্পনা ছিল এত মহান্, এত উন্নত! এখন যে অর্থে 'অষোই' শব্দ ব্যবহৃত হয়, সে পার্থিব পবিত্রতা বুঝাইবার জন্য আর একটী শব্দ ব্যবহৃত হইত—"যওঝ্দাও"। 'অষ' বলিতে তখন আধ্যাত্মিক শুচিতাই প্রকাশ পাইত। কিন্তু সাসানীয় যুগের শেষ ভাগ হইতেই আধ্যাত্মিক পবিত্রতার ভাবটুকু ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। এই ভাবে আধ্যাত্মিকতার হ্রাস, পুরোহিতগণের ধর্ম্মান্তরের প্রতি অসহিষ্ণুতা (ও তজ্জনিত 'মানি' এবং 'মজ্দকে'র অনুচরগণের প্রতি অকথ্য অমানুষিক অত্যাচার) প্রভৃতিই জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্ম্মের পতনের মূল কারণ। ইহারই কিছুদিন পরে ইস্লাম ধর্ম্মের নব অভ্যুত্থান আরম্ভ হইল। অন্তঃসার-শূন্য, আত্মশক্তিবিহীন প্রাচীন ইরাণীয় ধর্ম্ম নবতেজো-

* দস্তুর—প্রধান ধর্ম্মযাজক, প্রধান পুরোহিত।

দীপ্ত ইস্‌লামধর্ম্মের সম্মুখে ম্লান হইয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিল না। ইস্‌লামের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধানলে ইরাণীয় ধর্ম্ম পতঙ্গের মত স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জ্জন দিল। প্রাচীন জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্ম্ম তখন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ও বাহ্য সদাচারের বাহুল্যে এতদূর প্রপীড়িত হইয়াছিল যে, প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে উহার মধ্যে চিত্তশুদ্ধির কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইত। ক্রমশঃ দলে দলে ধর্ম্মপ্রাণ ইরাণীয়গণ আত্মতৃপ্তির আশায় ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। ধরাপৃষ্ঠ হইতে ইরাণীয়ধর্ম্মের মহিমা একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গেল

যাক্—সে-সব ইতিহাসের কথা। অবেস্তার নবীনতর অংশ (অর্থাৎ 'যশ্‌ত,' 'যস্ন' ও বীস্‌পেরেদ') আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অষের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য উহাতেও বেশ পরিস্ফুট রহিয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, 'যজত'গণ* অষপ্রভাবেই তাঁহাদের দৈব অধিকার লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ স্থলে অষ বলিতে অবশ্য আধ্যাত্মিতত্ত্বই বুঝাইতেছে। বস্তুতঃ এমন কথাও কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বয়ং 'অহুর' ও তাঁহার সর্ব্বোচ্চ অধিকার লাভের নিমিত্ত অষের নিকট অবেস্তার এই সকল মন্ত্রকে নিতান্ত আধুনিক বলা যায় না। আর এ গুলির অধিকাংশই ক্রিয়াকলাপের অঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়া মন্ত্রগুলির বিশেষ বিকৃতিও ঘটিতে পারে নাই। বিশেষতঃ 'যস্নের' মন্ত্রগুলি (বৈদিক মন্ত্রের মত) শ্রুতিপরম্পরায় একরূপ অবিকৃত অবস্থাতেই বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

এইবার দেখা যাউক; 'গাথা'য় 'অষ' শব্দটী কিরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'গাথা' অবেস্তার প্রাচীনতম অংশ। পাঁচটী গাথাই স্বয়ং আচার্য্য জরথুশ্‌ত্রের মুখ-নিঃসৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ভাষাতত্ত্ব ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ প্রমাণের বলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন যে, অবেস্তার উপলভ্যমান অংশসমূহের মধ্যে গাথাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। স্বয়ং আচার্য্যরচিত যদি নাও হয়, তাহা হইলে এগুলি যে তাঁহার তিরোভাবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে সঙ্কলিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইরাণীয় জাতিকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া আচার্য্য সমগ্র মানবজাতির প্রতি যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই গাথাতেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আচার্য্য যেভাবে জীবন-সমস্যার সমাধান ও সংসার-রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহা যথাযথভাবে এই গাথাতেই সংগৃহীত হইয়াছে। আচার্য্যের মতবাদ বা দার্শনিকতা এই অষের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কোন কোন স্থলে অষকে আকার বিশিষ্ট দেবতারূপেও খাড়া করা হইয়াছে (কিন্তু উহার বর্ণনা খুব অস্পষ্ট)। মূর্ত্তিমান্ দেব অষ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অংশবিশেষ—শ্রেষ্ঠতার দিক্ হইতে অহুরের পরেই তাঁহার স্থান। অথচ অষ বলিতে বুঝায় জগৎ-পালনের হেতুভূত অধ্যাত্মতত্ত্ব। জগতে যাহা কিছু ঘটে, সবই অষের প্রভাবে, অষ না মানিয়া আমাদের একপদও চলিবার ক্ষমতা নাই, আর অন্তিমে এই অষই আমাদিগকে পরমেশ্বরের সম্মুখে লইয়া যায়। এইরূপ অষের মহিমা কীর্ত্তনেই জরথুশ্‌ত্রের মতবাদ সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

এখন দেখিতে হইবে এই অষ পদার্থটী কি? পণ্ডিত-মণ্ডলী নানাভাবে উহার ভাষান্তর করিয়াছেন। কেহ বলেন 'শৌচ', কেহ—'ধর্ম্ম', কেহ বা বলেন উহা 'সত্য'। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা শুচিতা, ধর্ম্ম বা সত্য বলিতে যাহা বুঝি, অষের তাৎপর্য্য তদপেক্ষা অধিক নিগূঢ়। ইহা সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', সনাতন, শাশ্বত সত্য—যাহা হইতে বিশ্ব বিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাক্য ইহার স্বরূপ বর্ণনায় অক্ষম, অসংযত-চিত্ত ইহার ধারণা করিতে অসমর্থ। ইহা অনুভূতির বস্তু। শুদ্ধ সংযত চিত্তের একাগ্র নিদিধ্যাসনে ইহার সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভব। ইহারই উপর শ্রীভগবানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। ইহাই সেই 'শাশ্বত ধর্ম্ম', পরমেশ্বরের ঈক্ষা বা সিসৃক্ষা—যাহারই ফলে এই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি। কবিবর টেনিসনের ভাষায় বলিতে গেলে—

"That God who always lives and loves,
One God, One Law, One Element,

* যজত—হির 'দেব' খ্রীষ্টানগণের আর্কেঞ্জেল—"The Adorable Ones"

And one far-off divine Event,
To which the whole Creation moves."
(In Memorium)

অর্থাৎ, সোজা কথায় অষ বলিতে বুঝায় ভগবানের নিয়ম (অথবা plan) যাহার দ্বারা এই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। অষের প্রভাবেই আত্মা ও অনাত্মার ইতরোধ্যাস ; আবার এই অষের প্রভাবেই আত্মা অনাত্মার কলুষ সংস্পর্শ ত্যাগ করিতে পারে—অন্ততঃ জরথুশ্‌ত্রের ইহাই অভিপ্রায়। অষের একটী দিক্—সৎ ও অসতের বিরোধ। আর একটী দিক্—কর্ম্ম ও অকর্ম্মের দ্বন্দ্ব (—হিন্দুর নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় প্রভৃতি ইহারই অন্তর্ভুক্ত)। জরথুশ্‌ত্রদর্শনে এই দুইটী দিকই বেশ বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হইয়াছে।

অষের এই মুখ্য অর্থ পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সাধকের চিত্ত ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর—উচ্চতম স্তরে পৌঁছান আবশ্যক। চিত্ত যতই উন্নত হইতে থাকিবে সাধকও ততই উন্নত গতি লাভ করিতে থাকিবেন। এই উচ্চনীচ গতির কল্পনা হইতে ক্রমশঃ অষের গৌণ অর্থ দাঁড়াল—"ভগবৎ প্রাপ্তির পন্থা"। আর যেহেতু এই পন্থা অবলম্বন করিতে হইলে সাধককে কতগুলি সদাচার অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হয়—ধর্ম্মপথে থাকিতে হয়, সেই জন্য অষের গৌণতর তৃতীয় অর্থ হইল "ধর্ম্ম" বা "সদাচার"। যীশাস্ তাঁহার Righ teousness শব্দটী মূলতঃ এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলেন।

বৈদিক "ঋত" শব্দটী অবেস্তার "অষ" শব্দের পর্য্যায়ভুক্ত বলিলেও চলে। পুরাকালে "ধর্ম্ম" শব্দটীও প্রায় এই অর্থেই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু পরের যুগে উহার অধ্যাত্মভাব অনেকাংশে বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায়, এখন 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—"ধর্ম্মমতসম্পর্কীয় অনুষ্ঠানযোগ্য ক্রিয়াকলাপ"। ঋগ্বেদে বরুণকে বলা হইয়াছে—"ঋতপতি"; 'ঋতে'র প্রভাবেই দেবগণ স্ব স্ব অধিকার রক্ষায় সমর্থ। 'ঋষি' শব্দটীও বোধ হয় একই মূল ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অবেস্তার 'অষবন্' শব্দের মত, 'ঋষি' শব্দের প্রাচীন অর্থ—"ঋত পথের অনুসরণকারী"—হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অবেস্তার "অষবন্" শব্দ হইতে দেব, দিব্য ঋষি, সত্যদ্রষ্টা ও সত্যালোক প্রদর্শক প্রভৃতি নানারূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে। অবেস্তায় ইহার অনুরূপ আর একটী শব্দ আছে—'রতু' (অধ্যাত্মতত্ত্বের উপদেশক)। এই 'রতু' শব্দটী সংস্কৃত 'ঋষি' শব্দের পর্য্যায়, ইহা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে।

অবেস্তায় কয়েকটী অতি সংক্ষিপ্ত মন্ত্র আছে। শুনা যায় যে, সেগুলি জরথুশ্‌ত্রেরও আবির্ভাবের পূর্ব্বে গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। মন্ত্রগুলির আক্ষরিক অর্থ অতি সরল বৈশিষ্ঠ্যহীন হইলেও উহাদের আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অর্থ অতি নিগূঢ়। এই মন্ত্রগুলিতেও (বিশেষতঃ ইরাণীয়গণের গায়ত্রী—"অহুন বইর্য্য"* অষের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে অষের এই কল্পনা শাশ্বত ও সনাতন।

"হোস্‌বাম্" (উষস্) সূক্তের শেষ ঋকৃটীতে অষের পথের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোচ্চ অষের সাহায্যে আমরা তোমায় (অহুরকে) দেখিতে পাই, তোমার নিকটে যাইতে পাই ও তোমার সহিত মিলিত হইতে পাই !"

অষই ভগবদ্দর্শন, ভগবানের সমীপে গমন ও ভগবানের সহিত সম্মেলনের একমাত্র উপায়। গীতায়ও শ্রীভগবান্ ঠিক্ এই কথাই বলিয়াছেন—

"অনন্যা ভক্তি দ্বারাই আমি যথার্থতঃ জ্ঞাত, দৃষ্ট ও প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হই" (—গীতা—১১।৫৪)

গীতোক্ত 'অনন্যা ভক্তি' ও গাথোক্ত 'অষ'—উভয়ই অভিন্ন। অধ্যাত্মতত্ত্বের যাহা চরম অর্থ—বৈদিক 'ঋত,' স্মার্ত্ত 'ভক্তি' ও অবেস্তার 'অষ' শব্দে তাহা সমুজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

তাই বেদ ও অবেস্তা সমভাবেই অষের পথের (অষহে পন্তাও"=বৈদিক "ঋতস্য পন্থাঃ") মহিমা-কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাই 'যস্নে'র পুষ্পিকায় বলা হইয়াছে :—

"অএবো পন্তাও যো অষহে, বীস্‌পে অন্যএষাম্ অপন্তাম্"—পথ মাত্র একটী, উহা অষের, অন্য পথগুলি অপথমাত্র।

আচার্য্য জরথুশ্‌ত্রের উপদেশের ইহাই সার মর্ম্ম।

---

* পঞ্চপুষ্পে (চৈত্র, ১৩৩৩) "প্রাচীন ইরাণ" ও ভারতবর্ষে (শ্রাবণ, ১৩৩৩) "পারসিকগণের গায়ত্রী" নামক মদীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি-এ]

অনুকরণ ও অনুমরণ

যে কোন নূতন জিনিস আবিষ্কৃত বা প্রবর্ত্তিত হইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলেই চারিদিক্ হইতে তাহার অনুকরণ হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে যে কোন ভাব, ভঙ্গি বা ছাঁদ নূতন বলিয়া সমাদরলাভ করিলেই তাহার অনুকরণ অনিবার্য্য। যে সাহিত্য অতুলনীয়, অনির্ব্বচনীয় ও অননুকরণীয় তাহারও অনুকরণ হয়—কিন্তু তাহার সহিত মূলের এত অধিক ব্যবধান থাকিয়া যায় যে, তাহাকে অনুকরণ বলিয়া ধরাই যায় না। আমাদের দেশের তথাকথিত সমালোচকগণ তাহাকে ব্যর্থ অনুকরণ বলেন—কেহ কেহ ইংরেজীর Aping কথাটার অনুসরণে হনূকরণ বলেন। এগুলি আর যাই হ'ক অনুকৃতের কোন অনিষ্ট করে না—নিজেরাই উপহাস্য হয়। এই শ্রেণীর অনুকরণ যুগৈশ্বর্য্য-স্বরূপ সাহিত্যের চারিপাশে ভিড় করিয়া বা কোলাহল তুলিয়া তাহার স্বস্তিভঙ্গ করিতে পারে না।

যে সাহিত্য ঐ শ্রেণীর নয়—অথচ যাহার ভাবভঙ্গি কতকটা নূতন, তাহাকে অনুকরণই ক্রমে ধ্বংস করিয়া ফেলে—অনুকৃতি নিজেও মরে—অনুকৃতকে মারে। এই শ্রেণীর অনুকরণকে অনুমরণও বলা যাইতে পারে।

কথাটাকে আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাক। বঙ্গসাহিত্যে মাইকেলের মেঘনাদ বধ, বঙ্কিমের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্পদ্ ও প্রবন্ধ, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ও শরৎচন্দ্রের কোন কোন উপন্যাস এতই উচ্চ শ্রেণীর যে, ইহাদের তথাকথিত অনুকৃতিগুলি ইহাদের কোন ক্ষতিই করিতে পারে নাই। উঁহাদের প্রতিভালোকের দীপ্তির সহিত তাহার প্রতিফলিত বিম্বগুলির এতই তফাৎ যে ঐগুলি কাহারও চোখেই পড়ে না। ঐ সকল সৃষ্টির অনুকৃতিগুলি নিজেরাই মরিয়াছে—মূল সৃষ্টির কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই।

যে সকল সাহিত্য-সৃষ্টির অনুকরণ চলে—অনুকরণের দ্বারা যাহারা অতিক্রান্ত হইয়া যায়—এমন কি অনুকৃতি যাহাদের সমকক্ষ হইয়া উঠে—তাহাদের মৃত্যু হয় অনুসৃষ্টির জনতাতেই। উদ্ভিদ্ রাজ্যের দিকে চাহিলেই ইহার উপমান পাওয়া যাইবে।

যে অনুকরণ মূল সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া উঠে তাহার বাঁচিবার কথা—কিন্তু তাহাও বাঁচে না—যাহাকে সে অতিক্রম করে তাহাকে সে গ্রাস করে—কিন্তু সে নিজেও কিছুক্ষণ স্থূলকায় দেখাইলেও, দীর্ণজঠর হইয়া শেষে মারা যায়। অর্থাৎ মূল সৃষ্টিটী প্রতিষ্ঠা হারায় অনুকৃতির দ্বারা অতিক্রান্ত হইয়া; আর অনুকৃতি প্রতিষ্ঠা হারায় পরকীয় উপকরণে গঠিত বলিয়া। উপবৃক্ষক (পরগাছা) নিজেও বাড়ে না—মূল বৃক্ষকেও বাড়িতে দেয় না। এই কথা বহু লেখকের নিজের রচনার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। অনুকরণ যেমন পরের হইতে পারে তেমনি নিজেরও হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যদি উর্ব্বশীর অনুকরণে—উর্ব্বশীর ভাব, ভঙ্গি ও ছন্দে রম্ভা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী ইত্যাদি আরও কতকগুলি কবিতা লিখিতেন, তাহা হইলে রসস্বর্গের মন্দাকিনীর জলে রম্ভা, তিলোত্তমা ইত্যাদি স্বর্গবনিতাগণ উর্ব্বশীকেও জড়াইয়া ধরিয়া ডুবিয়া মরিত। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটীকে যেমন বুঝেন তেমনটী আর কেউ না। তাই রবীন্দ্রনাথ এক ভাবভঙ্গি ও ছাঁদের দুইটী কবিতা লেখেন নাই। নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথে। অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া মুহুর্মুহু নব নব ভাবভঙ্গি, ঢং ও ছাঁদের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই এবং অনুকারকগণ সেই গুলির কাছাকাছি আসিতে পারে নাই বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ এত বড় কবি। আশ্চর্য্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসগুলির দুইখানিও একশ্রেণীর নয়। রবীন্দ্রনাথ দুইখানি 'গোরা' বা দুইখানি 'চিরকুমার সভা' লেখেন নাই। কেবলমাত্র সঙ্গীত ও রূপক নাট্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের অনুকরণ

নিজেই করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে রবি তাঁহার কোন' আকাশেই হাজার তা স্থষ্টি করিতে চাহেন নাই, তিনি চাহিয়াছেন তাঁহার সকল স্থষ্টিই হইবে—

Like a star when only one
Shining in the sky.

কোন একটী বিশিষ্ট ভাব-ভঙ্গির চারিদিকে অনুকরণ হইলে দেশের যে কোন লাভ হয় না তাহা বলা যায় না। অনুকরণের বাহুল্যকে অনেকটা Broadcasting বলা যাইতে পারে। Broadcastingএর যে সার্থকতা পাঠক-সমাজ তাহাই লাভ করে। কিন্তু কে যে সেই ভাব-ভঙ্গির তত্ত্ব-তথ্যের প্রবর্ত্তক, সাহিত্যের ঐতিহাসিক ছাড়া অন্য কেহ খোঁজও করে না—মনেও রাখে না। কাহার দান আগে কাহার দান পরে—এ বিচার কেহ করে না। এ বিষয়ে তাঁহাদের স্থষ্টির ক্রমটী পরম্পরা হারাইয়া এক সমতলে পাশাপাশি সমাসীন হইয়া পড়ে। অনুকরণের যোগ্যতা বা অনুবর্ত্তনীয়তার অপরাধেই স্থষ্টি তাহার স্রষ্টাকে ভুলাইয়া দেয়।

যে যুগের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক চারিদিক হইতে তাহার অনুকরণের প্রয়াস স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য। আর কিছু না হউক ইহাতে তাঁহার স্থষ্টির গুণোপলব্ধি (appreciation) স্থচিত হয়। কতকগুলি লেখক তাঁহার অনুকরণ করে—তাহাদের নূতন কিছু স্থষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই বটে কিন্তু তাহারা রসজ্ঞ। আর কতকগুলি অক্ষম লেখক অনুকরণ করিতে না পারিয়া বিরক্ত বা কুপিত হইয়া ঐ যুগ-প্রবর্ত্তক লেখকের স্থষ্টিকে অসার প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে,—নূতন কিছু স্থষ্টি করিব বলিয়া শাসাইতে থাকে। চারিদিক হইতে কোলাহল, চীৎকার ও গর্জ্জন করিতে থাকে। তাহাদের কোলাহলে যুগ-প্রবর্ত্তকের স্থষ্টির ধ্যানভঙ্গ হয় না। কারণ তাহাদের নূতন কিছু স্থষ্টি করিবার সংকল্প তর্জ্জন-গর্জ্জনেই পর্য্যবসিত হয়। উপরন্তু প্রমাণিত হয় যে, তাহারা রসিক বা রসজ্ঞও নয়। যাহা অনুকরণের অতীত তাহাকে অনুকরণ করিতে না পারিলে যে বিরক্তি বা ক্রোধের কারণ নাই—এই সহজবুদ্ধিটুকুও তাহাদের নাই। তাহাদের চেয়ে যাহারা অনুকরণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করে তাহারা বরং ভাল। তাহাদের রচনা স্থষ্টি হিসাবে বাঁচে না বটে কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের গুণোপলব্ধি হিসাবে টিকিয়া যায়।

কোন কোন অনুকারক ফাঁকি দিয়া অনুকৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। পাঠকের দৃষ্টি ও বুদ্ধিকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করিবার জন্য প্রাণপণে অনুকৃতকে ব্যঙ্গ করিয়াছে—যেন সে অনুকৃতের নিকট বিন্দুমাত্র ঋণী নহে। পাঠক-সমাজ এত নির্ব্বোধ নয় যে তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারিবে না। রবীন্দ্রনাথ তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

রস-সমালোচনা

"রথ চলেছে সমারোহে বাজছে শানাই ঢোল,
উড়ছে নিশান, হাজার লোকে তুলছে কলরোল,
হুলু দিয়ে পুরাঙ্গনা লাজ বরিষে পথে
সবই আছে রথের ঠাকুর নেইক শুধু রথে।"

আমাদের সাহিত্যের কাব্যবিচারের দশাও তাই। ভাষার কথা উঠে,—তত্ত্বের কথা উঠে, ভঙ্গির কথা উঠে, ছন্দের কথা উঠে, চোরাপুঞ্জী-গোবিসাহারা-মার্কা শাণিত পংক্তির কথা উঠে, কেবল উঠে না কাব্যের যাহা প্রাণস্বরূপ সেই রসের কথা।

রবীন্দ্রনাথের কথার ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতে হয়;—

রস কথা হেথা কেহ ত বলে না
করে শুধু মিছে কোলাহল,
রস সাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল॥

ভঙ্গি, ছন্দ, ভাষা একটা অপূর্ব্ব অসাধারণ রকমের না হইলেও—কোন একটা সমস্যা বা তত্ত্বের কথা না থাকিলেও, কবিতা যে রসসম্পদহিসাবে সার্থক হইতে পারে তাহা আজকালকার নবাঙ্কুরিত প্রতিভার সমালোচকরা তো ভুলিয়াও বলেন না।

রবীন্দ্রনাথের পর একদল কবি পদলালিত্য ও ছন্দো-বৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দিয়া কবিতা লিখিলেন—Poetic Convention গুলিকে Permutation Combination করিয়া কিছু কিছু কারুচাতুর্য্য ও দেখাইলেন।

"স্বস্তি"

(উমর-ই-খৈয়াম)

তাঁহারা রসকেই কাব্যের প্রাণস্বরূপ মনে করিয়া সাধনা করিলেন না।

আবার একদল ইদানীং আসিয়াছেন—তাঁহারা সব conventionএর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। ইঁহারা কাব্যের ভাষাকে গদ্যাত্মক করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী; ইঁহারা কাব্যে একটা তত্ত্ব বা 'বাদ' ফুটিলেই বা কোন-একটা তথাকথিত সত্যের আভাস থাকিলেই, কাব্য সার্থক হইল মনে করেন—মাঝে মাঝে গোটাকতক শাণিত পংক্তি মাজিয়া ঘষিয়া কাব্যের মধ্যে পুরিয়া দেন। তাঁহাদের সগোত্রীয় সমালোচকগণ বলেন, ঐ পংক্তিগুলির মধ্যেই কবির সর্ব্বস্ব ভরা আছে। ইঁহারাও রসকে কাব্যের প্রাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

উভয় দলই কাব্যের উপকরণ লইয়াই ব্যস্ত, উপকরণগুলিকেই কাব্যের সর্ব্বস্ব মনে করিয়া দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দ্বৈতভাবের সহজেই সামঞ্জস্য হইতে পারে—অদ্বৈতবুদ্ধিতে রসকে কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করায়। উপকরণকেই সৃষ্টির চরম লক্ষ্য মনে করিয়া তদ্গত থাকা সত্ত্বেও উভয় দলের কবিরা মাঝে মাঝে অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছেন,—তাহাতে মাঝে মাঝে এক-আধটা রসঘন প্রকৃত কবিতার জন্ম হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ইঁহাদের তপোভঙ্গ ঘটিয়াছে, তাই ছোট ছোট শকুন্তলার জন্ম হইয়াছে। কবিরা এই ছোট ছোট শকুন্তলাগুলিকে অনাদর করিয়া চলিয়া গিয়াছেন—কিন্তু প্রকৃত রসজ্ঞ সমালোচকের কর্ত্তব্য সেইগুলিকে প্রতিপালন করা।

চাই প্রকৃত সমালোচক—যে জানে রসই কাব্যের হৃন্মর্ম্ম। সে সমালোচক—একটা শাণিত পংক্তির আঘাতেই মূর্চ্ছা যাবেন না—সে সমালোচক ছন্দের জল-তরঙ্গ শুনিয়াই নিদ্রায় বিভোর হইবেন না—নির্লজ্জ কামলালসার মদিরতার স্বাদ পাইয়া নেশায় বিভোর হইবেন না—কোন একটা অর্দ্ধ-দার্শনিক অর্দ্ধ-বৈজ্ঞানিক চিরপুরাতন তত্ত্বের প্রথম আস্বাদ পাইয়াই স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন না। তিনি কবিতায় খুঁজিবেন রস—কবির সমগ্র কাব্য-জীবনে খুঁজিবেন একটা ব্রত বা message.

সেই সমালোচকেই দেখাইয়া দিবেন, উভয় দলের আত্মবিস্মৃত কবিদের কোন্‌গুলি তাহাদের অজ্ঞাতসারেও সত্যসত্যই কবিতা হইয়া গিয়াছে।

রসবোধের সূত্র

সাহিত্যের রসবোধ করিতে হইলে আমাদের মনটাকে যে কতদূর শাসন-সংযত, নিয়ন্ত্রিত ও একাগ্র করিতে হয়—তাহা কবিদের উপমা-প্রয়োগের কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

অর্জ্জুন যখন একটা পাখীর চক্ষু বিদ্ধ করিবার জন্য আদিষ্ট হ'ন তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—তুমি কি দেখিতেছ? অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—একটা পাখীর চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। সত্যই সে-সময়ের জন্য তাঁহার দৃষ্টি হইতে বিশ্বজগৎ অপসারিত হইয়াছে।

সাহিত্যের রসবোধ করিতে হইলে মনের বিবিধ বৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিয়া কেবলমাত্র রসোপভোগিনী বৃত্তিকে উন্মুখ ও একাগ্র করিয়া তুলিতে হইবে—ক্ষণকালের জন্য অন্যান্য বৃত্তির সহিত সম্বন্ধ লোপ করিতে হইবে। যাঁহারা ইহা করিতে পারিবেন না—তাঁহারা নাটক পাঠ কালে ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল না—লালিকা (প্যারডি) পাঠ কালে মহাকবির শ্রেষ্ঠ একটী রচনার অপমান হইল—উপন্যাস পাঠকালে সামাজিক পারিবারিক বা গার্হস্থ্যনীতি ক্ষুণ্ণ হইল—কবিতা পাঠকালে সনাতন ব্রাহ্মণ্যসমাজের অমর্য্যাদা হইল মনে করিয়া ব্যথা পান বা রুষ্ট হন; সেই ব্যথা বা রোষের জন্য তাঁহাদের ভাগ্যে সাহিত্য-রস-বোধের আনন্দ ঘটিয়া উঠে না। আবার সাহিত্য-পাঠকালে সাহিত্যের উপাদানের মধ্যে আপনার মনোমত সামাজিক, পারিবারিক, ধর্ম্মগত আদর্শকে পাইয়া অথবা আপনার চিরপোষিত মতামত, সিদ্ধান্ত, মীমাংসা ইত্যাদিকে পাইয়া চিত্তকে এই সকল অবান্তর ব্যাপারে উল্লসিত করিয়াই সন্তুষ্ট হ'ন—ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর যে রস, তাহার উপভোগে যে আনন্দ তাহা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না। রঙ্গীন কাচ পাইয়াই সন্তুষ্ট—কাঞ্চনকে হেলায় ঠেলিয়া রাখেন।

রসবোধের জন্য চিত্তকে কিরূপ ভাবে শাসন-সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়—কবিদের উপমা-প্রয়োগের প্রকৃতি হইতেই বুঝান যাইতে পারে।

চন্দ্রবদন বলিলে চাঁদের এক কান্তি ছাড়া কিছু ভাবিতে হইবে না—ইহা অতি সোজা ব্যাপার। কিন্তু 'সাপের মত

সুন্দরীর বেণী' বলিলে একমাত্র সাপের আকার, দোদুল্যভাব ও চিক্কণতাটুকু লইতে হইবে—সাপের সমস্ত উপদ্রব, সমস্ত বিষ, সরীসৃপের সমস্ত জঘন্যতা ভুলিতে হইবে। ইহার চেয়েও ভীষণ আছে—গৃধিণীর মত কাল।' গৃধিণীর সমস্তই ন্যকারজনক— কিন্তু সমস্ত ভুলিয়া তাহার আকারটুকু লইতে হইবে। করিশুণ্ড ও সিংহকটির উপমাতে আবার সমগ্র হইতে অংশ বাছিয়া লইতে হইবে-সেই অংশের আবার ক্ষীণতা বা পীনতাটুকু আকারের সঙ্গে ভাবিতে হইবে। সবচেয়ে বেশী সতর্কতার প্রয়োজন 'গজেন্দ্র-গমনে।' সব বাদ দিয়া শুধু গতিটুকুকে নিতে হইবে। একটু এধার-ওধার হইলেই বীভৎসতা। এই সকল উপমার রসবোধে যে সতর্কতার প্রয়োজন—সকল সাহিত্য-বিচারেই সেই সতর্কতার প্রয়োজন আছে—নতুবা রসের বদলে ন্যকারজনক বীভৎসতাই লভ্য হইবে।

একজন অখ্যাতনামা কবি বলিয়াছেন—

শিরঃ শার্ব্বং স্বর্গাৎ পততি শিরসস্তৎ ক্ষিতিধরঃ
মহীধ্রাদুত্তুঙ্গাদবনি মবনেশ্চাপি জলধিং।
অধো গঙ্গা সেয়ং পদমুপগতা স্তোকমথবা
বিবেকভ্রষ্টানাং ভবতি বিনিপাত শতমুখঃ।

গঙ্গা যেমন স্বর্গ হইতে মহাদেবের শিরোদেশে পড়িয়া তথা হইতে গিরিশিখরে, গিরিশিখর হইতে ধরাতলে, ধরাতল হইতে সমুদ্রে এইরূপ ক্রমাগত নিম্নগামিনী হয়, বিবেক-ভ্রষ্টদের অধঃপতনও সেইরূপ শতমুখে ঘটিয়া থাকে।

কি সর্ব্বনাশ! হরিপদোদ্ভবা গঙ্গার সঙ্গে বিবেক-ভ্রষ্টের অধঃপাতের উপমা! গঙ্গা যে হরিপদ হইতে মোহনা পর্য্যন্ত আগাগোড়া পতিতপাবনী এই ভাবটী মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করিতে দিলে রসাভাসই ঘটিবে। এখানে গঙ্গার পতনের ক্রমটীকে শুধু ভাবিতে হইবে—অন্য কিছু না।

সাহিত্য-রসবোধ করিতে হইলে আপনার ব্যক্তিগত বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও সংস্কারের দ্বারা রচনা বিশেষকে পরীক্ষা করিলে চলিবে না—ক্ষণকালের জন্য মনকে সর্ব্বসংস্কারের উপরে তুলিয়া কবির মনের কামনাকে অনুসরণ করিতে হইবে—কবির নিজের উদ্দেশ্যটীকে লক্ষ্য করিয়া কবির ইঙ্গিতে ও পরিচালনায় কবিরই সৃষ্ট বা কল্পিত পথে চলিতে হইবে।

লালিকার (প্যারডির) কথা—

কাহারও কাহারও বিশ্বাস কোন কবির কোন গানের প্যারডি লিখলে—সেই কবিতা—সেই গানের অবমাননা করা হয়। প্যারডি-রচনা-পদ্ধতি বাংলা ভাষায় ছিল না, —পূর্ব্বকালে চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত ও ছাত্রগণ রসিকতা করিবার জন্য কোন কোন মহাকবি-রচিত শ্লোকের ভাষার ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া কৌতুকাকারে শ্লোক রচনা করিতেন—সে সকল শ্লোক পণ্ডিতগণের মুখে মুখে প্রচারিত হইত—সেগুলি উদ্ভট শ্লোকের পর্য্যায়ে পড়ে। সেগুলিকে ঠিক প্যারডি বলা যায় না—তবে প্যারডির সগোত্র বটে। বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্যে টুকরা টুকরা প্যারডির ছত্র পাওয়া যায়—সেগুলি কোন্ শ্রেণীর তাহা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "মুচিরাম গুড়ে"র মধ্যে একস্থলে আভাস দিয়াছেন। একদিন যাত্রার দলের ছোকরা মুচিরাম গাহিতেছে—একজন পিছন হইতে বলিয়া দিতেছে—মুচিরামের গানের পদ মনে থাকে না। মুচিরাম গাহিল—নীরদকুন্তলা—থামিল, আবার পিছন হইতে বলিল—লোচনচঞ্চলা—মুচিরাম ভাবিয়া-চিন্তিয়া গাহিল—লুচি চিনি ছোলা—পিছন হইতে বলিয়া দিল—দধতি সুন্দর রূপং—মুচিরাম না বুঝিয়া গাহিল, দধিতে সন্দেশ রূপং—লোচনচঞ্চল, দধাতি সুন্দর রূপং—ইহার প্যারডি দাঁড়াইল—

"লুচি চিনি ছোলা দধিতে সন্দেশ রূপং" এই ভাবে "পার্ব্বতীসুত লম্বোদরে"র প্যারডি 'পাক দিয়ে সুতো লম্বা কর।' ইত্যাদি। মোট কথা—আমরা প্যারডি বলিতে আজকাল যাহা বুঝি—ঠিক সেই ধরণের সম্পূর্ণাঙ্গ কবিতা আগে ছিল না।

ইহা বিলাত হইতে আমদানী। বিলাতের লোকেরা যে ভাবে প্যারডির বিচার করেন, সেইভাবেই বাংলার প্যারডিরও বিচার করা উচিত।

সাধারণতঃ দেশবিখ্যাত কবির সর্ব্বজন-পরিচিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বা কবিতারই প্যারডি রচিত হইয়া থাকে। যে সঙ্গীতের প্যারডি করা হয়—সে সঙ্গীতটী সম্পূর্ণ স্মরণে না থাকিলেও প্যারডি উপভোগ করা যায় না। সেজন্য যে সঙ্গীতটী সকলেই জানেন তাহারি প্যারডি হইয়া থাকে এবং সর্ব্বজন-সমাদৃত সঙ্গীত, ভগবৎপ্রেম, দেশপ্রেম বা নরনারীর পবিত্র প্রেমকে অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ

রচিত। ভাষার ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ছন্দ সুর ও ধ্বনিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া Sublime শব্দ সমুচ্চয়কে যেমন করিয়া Ridiculous করিয়া তুলা যায়, শান্তিরসপেত রচনাকে কিরূপ কৌতুক-রচনায় পরিবর্ত্তিত করা যায়, এই কলা-কৌশল দেখাইবার জন্যই প্যারডি।

কাজেই প্যারডি রচনার দ্বারা আদৌ সূচিত হয় না যে,প্যারডিকারের মূল সঙ্গীতের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা নাই—অথবা সঙ্গীতের পবিত্র বিষয় বস্তুকে অবমাননা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। বরং পক্ষান্তরে মহাকবির প্রতি প্যারাডিকারের গভীর শ্রদ্ধাই সূচিত হয়। সেইজন্যই সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কবি সতীশচন্দ্র ঘটক পর্য্যন্ত অনেকেই নিঃসঙ্কোচে যুগপাবন শ্লোক বা সঙ্গীতের প্যারডি লিখিয়াছেন। বিষবৃক্ষে চণ্ডীর শ্লোকের প্যারডি পড়িয়া কে বলিবে চণ্ডীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি ছিল না। কে না জানে গীতা ও চণ্ডী বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের প্রধান উপাস্য ছিল? তাই সতীশচন্দ্র-রচিত—"আমার জন্মভূমি" গানের প্যারডি "আমার কর্ম্মভূমি" ও 'সোনার তরী'র প্যারডি "সোনার ঘড়ি" পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ কতই উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মোট কথা,প্যারডি এক শ্রেণীর কারুকলা। উহাকে শিল্প হিসাবেই বিচার করিতে হইবে—উহার ঈষদম্ল রস উপভোগ করিতে হইলে অন্য কোন রসের পাত্রে অথবা কোন বিশিষ্ট সংস্কারের পিতল-কাঁসার পাত্রে ঢালিয়া সেবন করিলে চলিবে না।

লাঞ্ছিতা

(গল্প)

[শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী]

এক

তাকে আমি দেখেছিলুম—শুধু দুঃখ লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের মধ্যে এবং চোখের জলেই সে দেখার পরিসমাপ্তি।

তাই জীবনের উপকূলে এসে ও তার ব্যথা-মলিন স্মৃতিটুকু নির্ম্মল শরতাকাশে এক খণ্ড হাল্কা মেঘের মত আমার অন্তরের নিরালা কোণটীতে ছায়া ফেলে এতটুকু ঝাপ্‌সা ক'রে রেখেছিল।

আজও সুদূর অতীতে হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলির মধ্যে খোঁজ করলে সবের আগে মনে প'ড়ে যায়, সেই স্মরণীয় দিনটী, যেদিন তার সাথে আমার প্রথম দেখা।

সেদিন সকালবেলা রোগী দেখে ফিরছি, পথের ধারে একখানি ছোট্ট মেটে বাড়ী, কুঁড়ে বল্লেই হয়, তার সামনে দেখলুম জনকতক পুরুষ ও স্ত্রীলোক ভিড় ক'রে গোলমাল করছে।

এ শহর নয় পল্লীগ্রাম, সুতরাং জনতা সামান্য হ'লেও উপেক্ষা করা যায় না, ব্যাপার কি দেখবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখি—চমৎকার দৃশ্য! ঘরের দরজায় কপাটে ঠেস দিয়ে ব'সে একটা শীর্ণকায় দীনবেশা প্রৌঢ়া নারী; তা'র সারা অঙ্গে রোগের অবসাদ সুস্পষ্ট, কেবল কোটরগত চক্ষুদুটী ক্রোধ ও উত্তেজনায় যেন ধ্বক্ ধ্বক ক'রে জ্বলছিল। সেই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সম্মুখবর্ত্তিনী কিশোরীর পানে চেয়ে, তীব্র তর্জ্জন-স্বরে সে বলছিল—"গেলি না? এখনও দাঁড়িয়ে আছিস? আবাগী! সর্ব্বনাশী! পোড়ার মুখ দেখাতে এতটুকু লজ্জা হ'ল না তোর? যা—বেরিয়ে যা,—দূর হ'য়ে যা আমার সামনে থেকে—"

তিরস্কৃতা মেয়েটী—তার বয়স চোদ্দ কি পনের'র বেশী হবে না—দাওয়ার উপরকার একটা খুটী ধ'রে ম্লান আনত মুখে নীরবে দাঁড়িয়েছিল। দুর্য্যোগ-ধর্ষিতা বর্ষা-

প্রকৃতির মত তার অবস্থা। পরণে আধ-ময়লা ডুরে কাপড়-খানি ছিন্ন-ভিন্ন, রুক্ষ চুলের রাশি এলোমেলো ভাবে বুকে পিঠে ও মুখের উপর ছড়িয়ে প'ড়ে মুখখানি প্রায় দৃষ্টির অগোচর ক'রে রেখেছিল; তথাপি জনতার জোড়া জোড়া চোখের উৎসুক দৃষ্টি সেই মুখের উপরই নিবদ্ধ।

প্রৌঢ়ার কঠোর তিরস্কারেও মেয়েটীর নত মৌন মুখে একটী কথা ফুটল না। খুটীটা শক্ত ক'রে চেপে, সে নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। দেখে সমবেত স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন আধাবয়সী, গালে হাত রেখে, সবিস্ময়ে বল্লেন,— "ধন্যি মেয়ে মা!—সেই অবধি কত র্ভৎসনা, কত গালমন্দ খাচ্ছে, তবু মুখে 'টু' শব্দটী নেই! যেন পাথরের পুতুলটী! যা না,—ঘরে গিয়ে মা মাগীর হাতে পায়ে ধর, তা'নয় কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন! এমন মেয়ে নইলে কি—"

তার মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তে পাশের পুরুষটী, যিনি এতক্ষণ ড্যাবড়েবে চক্ষুদুটীর তীব্র ক্ষুধিত দৃষ্টিতে মেয়েটীকে যেন গিলে খেতে চাইছিলেন, তিনি মাথা নেড়ে সবেগে ব'লে উঠলেন—"ও মেয়েকে ঘরে ঢুকতে দেবে কে তা' শুনি! হ'লই বা পেটের সন্তান—কাদু মাগীর কি এতটুকু ধর্ম্ম-ভয়, সমাজ-ভয় নেই যে ওই মেয়েকে—"

একটী বর্ষীয়সী নারী দুয়ারে উপবিষ্টা প্রৌঢ়ার পানে সদয় নেত্রে চেয়ে, শশব্যস্তে বল্লেন—"আহা! তা আর ব'ল না, বাছা! আমাদের কাদম্বিনীকে সে অপবাদ দিতে আজ পর্য্যন্ত কেউ পারে নি—পারবেও না! তারক যখন মারা গেল—তখন ওর বয়স কতই বা? সেই অবধি ওই মেয়েটীকে কোলে নিয়ে গতর খাটিয়ে কত কষ্টে কত দুঃখেই না দিন গুজরান করেছে; কিন্তু ওর চাল-চলন নিয়ে একটী কথা কেউ কোনও দিন বলতে পেরেছে কি? এখনও; বুড়ো মাগী, মরতে বসেছে, তবু পথ চলতে এক গলা ঘোম্‌টা দিয়ে মরে! তবে ভুল করেছে মেয়েকে আইবুড়ো ধাড়ী ক'রে রেখে,—বিপিন সরকার তখন অত সাধাসাধি করলে, সে সময় বিয়েটা দিয়ে ফেল্লেই আজ কি এই খোয়ারটা হ'ত?—হ'লই বা তেজবরে! পয়সা নেই যখন—"

আমি গ্রামে নূতন এসেছি, অবশ্য খুব ছোট বেলায় কিছু দিন না কি এখানে ছিলুম, কিন্তু তখনকার কথা একটুও মনে ছিল না। গ্রামের অনেকের সঙ্গেই আমার এখনও আলাপ-পরিচয় হয় নি। কাজেই এই মা ও মেয়েকে আমি চিনতে পারলুম না। তবে শান্ত পল্লীতে আজ বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে যে ওই কিশোরীই—তা বেশ বুঝতে পারলুম। কিসের জন্য এ বিপ্লব! জানবার জন্য বড় কৌতূহল হ'ল।

জনতার মধ্যে প্রবেশ ক'রে আমি জিজ্ঞাসা করলুম,— "ব্যাপার কি? ও মেয়েটী কি ক'রেছে যে—"

মেয়ের মা, আমার দিকে তাকিয়ে, কপালে করাঘাত ক'রে আর্ত্ত স্বরে ব'লে উঠলেন, "করতে আর বাকি কি রেখেছে, বাবা!—হতভাগী আমার পোড়া মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে একেবারে!—এর চেয়ে যদি পুকুরে ডুবে মরত—তাই মরলি না কেন রে পোড়াকপালী!—কালামুখ নিয়ে আবার কেন এলি মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে?"—

আমার তখন বয়স অল্প, তাই স্ত্রীলোকটী যে কত দুঃখে কত বেদনায় সন্তানের মৃত্যু কামনা করছিলেন তা বুঝতে পারি নি। মনে হ'ল কি পাষাণী মা!"

জনতার মধ্যে যাঁ'রা আমাকে চিনতেন, আমাকে দেখে তাঁ'রা শশব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন, "এই যে ডাক্তারবাবু! আসুন আসুন!—বেচারী মালতীর মার দুর্ভোগের কথা শুনেছেন? অনাথা বিধবার ঐ তো একটী মেয়ে, তারও……সংক্ষেপে শুনলুম—এই ভাগ্যহতা জননী ও দুহিতার দুঃখের কাহিনী। মালতীর মা কাদম্বিনীর স্বামী জমীদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন, বেতন যৎকিঞ্চিৎ, তাই সঞ্চয় কিছু ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর কাদম্বিনী নিতান্ত অভাবে প'ড়েও প্রকাশ্য ভাবে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করতে পারেন নি, কারণ তিনি কায়স্থ-কন্যা, গরীব হ'লেও বংশ-সম্মানে গ্রামের ভদ্র মহিলাদের চেয়ে কোন অংশেই হীন ছিলেন না।

কিন্তু যেখানে সঞ্চয় নেই, রোজগার নেই, সেখানে দুটী প্রাণীর দিন চলে কি প্রকারে? সামান্য অলঙ্কার ক'খানি এবং ঘরের তৈজস-পত্রগুলিও যখন একে একে নিঃশেষিত হ'য়ে গেল,—তখন মেয়েটার মুখ চেয়ে কাদম্বিনীকে অবশেষে জমীদার-গৃহিণীর শরণাপন্ন হ'তে হ'ল। জমীদার-গিন্নি বড় দয়াবতী, তাঁ'র দয়ায় মা ও মেয়ের দু'মুঠা অন্নের অভাব ঘুচে গেল, কিন্তু গরীব হ'লে কি হয়—মালতীর মা'র আত্মসম্মান-জ্ঞানটা ছিল বিলক্ষণ, তাই জমীদার-গিন্নির এই দয়ার দান সে দান ব'লে গ্রহণ করতে পারে নি, এই

উপকারটুকুর পরিবর্ত্তে সে জমীদারের বৃহৎ সংসারে ছোট বড় অনেক কাজই ক'রে আসত। এমন কি, ইদানীং জ্বরে ভুগে ভুগে শরীর ভেঙে পড়লেও খাটুনীর একদিনও বিরাম দেয় নি সে, অবশ্য মেয়েটী তার সকল কাজে সাহায্য করত।

কাল জ্বরটা বড় বেশী রকম চেপে ধরেছিল ব'লে মালতীর মা কাজে যেতে পারেনি, ওদিকে কুটুম-সাক্ষেতের ঠেলায় জমীদার-বাড়ীতে কাজের বড় ভিড় পড়েছিল, তাই দুপুর-বেলা জমীদার-গিন্নি তাঁ'দের বুড়ো ঝিকে পাঠিয়ে মালতীকে নিয়ে যান, কথা ছিল বুড়ো ঝি সন্ধ্যাবেলা মেয়েকে আবার রেখে যাবে।

কিন্তু সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল, তখনও মেয়ে এল না, কাজেই মালতীর মা সেই জ্বর গায়েতেই কাঁপতে কাঁপতে গেলেন মেয়েকে ডাক্‌তে, সেখানে শুনলেন মা'র অসুখ ব'লে মালতী না কি সন্ধ্যের আগেই ছুটী চেয়ে নিয়েছিল; বুড়ো ঝির তখন কাজে হাত-জোড়া, তাই মালতীকে একটু অপেক্ষা করতে বলে, কিন্তু মালতী—তখন মা'র জন্য এতই ব্যস্ত, যে এইটুকু পথ সে একাই চ'লে যেতে পারবে ব'লে তাড়াতাড়ি চ'লে যায়।

মালতীর মার তখন যে অবস্থা হ'ল, তা বলবার নয়। শক্তিহীন অবসন্ন দেহ-মন নিয়ে হতভাগিনী খানিক পাগলের মত পথে পথে ঘুরে শেষে কোনমতে ঘরে ফিরে সেই যে শুয়ে পড়েছিল, একেবারে বেহুঁস বেঘোর। শেষ রাত্রে যখন তার জ্ঞান হ'ল, তখন দেখে মালতী তার পায়ের তলায় ব'সে কাঁদছে।"

জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল, ছোটবাবু না কি তাকে ফুস্‌লে ডেকে নিয়ে গিয়ে আটক ক'রে রেখেছিল। রাগে ক্ষোভে আমার আপাদ-মস্তক রি রি ক'রে উঠল'।—উঃ। কি ভয়ানক!—এযে যে রক্ষক সেই ভক্ষক! গ্রামের হর্ত্তা কর্ত্তা জমীদার-পুত্রের এই কাজ! দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের এই নৃশংস অত্যাচার—এর কি কোনও প্রতিবিধান নেই? যত লাঞ্ছনা—যত ধিক্কার ঐ কচি মেয়েটার উপর।

উত্তেজিত হ'য়ে বল্লুম—"সব জেনেও আপনারা সব চুপ ক'রে আছেন? সেই পাষণ্ডকে ধ'রে আগাগোড়া চাবকে দিতে পারেন নি? মেয়ের দোষ কি?—ছেলে মানুষ, ওর ফোস্‌লানোতে ভুলে যদি—"

জনতার এক প্রান্ত থেকে চাপা বামাকণ্ঠে শোনা গেল—"ম'রে যাই! সেকী কচি খুকী কি না!—ফোস্‌লানতে অমনি ভুলে গেলেন! বিয়ে হ'লে কবেই না ছেলের মা হ'ত।—"

"ও মা! তা আব হ'ত না? আমার বৌদি ওরই বয়সী তো? কোলে সেটের এক বছরের খোকা, আবার পোয়াতী। হুঁ! ও সব ন্যাকামীর কথা শোন কেন? মেয়ে-মানুষের কাছে আসকারা না পেলে ব্যাটাছেলের কি অতটা ভরসা হয়?—ও তখুনি পালিয়ে এল না কেন? বেঁধে তো আর রাখে নি?"

দুই

মালতী তখনও তেমনি নিশ্চল নীরব হ'য়েই দাঁড়িয়ে ছিল। এই সব তীব্র আলোচনা ও যুক্তির বিরুদ্ধে তার বল্‌বার কি কিছুই নেই? সেকি বাস্তবিক অপরাধিনী কিংবা লজ্জার পীড়নে…

আমি আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে, তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"সে হতভাগাটার কারসাজী যখন জানতে পারলে তুমি তখন জোর ক'রে চ'লে এলে না কেন? সে কি তোমাকে বন্ধ ক'রে—"

"হাঁ, তা না হ'লে আমি তক্ষুনি পালিয়ে আসতুম না?"

মেয়েটী এতক্ষণ পরে মুখ খুলে—চোখ মেলে তাকাল; ডাগর চোখ দুটী তা'র আরক্ত, স্ফীত, দেখলেই বোঝা যায়, বেচারী সারারাতই কেঁদে কাটিয়েছে। আর সেই বিষাদমাখা মুখখানির ব্যথাভরা করুণ-শ্রী দেখে আমার তরুণ চিত্তে বাস্তবিক অতর্কিতে একটা আঘাত লাগল, যেন বর্ষা-ভেজা অপরাজিতা ফুলটী!

তার কথা শুনে শশব্যস্তে বল্লুম—"কি ভয়ানক কথা! তোমাকে বন্ধ ক'রে রেখে সে এই অত্যাচারটা করলে? সেখানে আর কেউ কি ছিল না?"

"না, সে ঘর খানা যে বাগানের এক টেরে, সন্ধ্যেবেলা সেখানে কেউ থাকে না। তবু আমার চেঁচামেচি, আর কান্নাকাটিতে ভয় পেয়ে সে আমাকে গাল দিতে দিতে, যেই চ'লে গেল, তখনই—"

"চ'লে গেল? তোমাকে একলাটী সেই ঘরে বন্ধ করে? তার পর?"

"আমিও তাড়িতাড়ি সেই বন্ধ দরজার ভেতর থেকে হুড়কো তুলে দিলুম, তাই আর ঢুকতে পারে নি। বাইরে থেকেই ক'বার শাসিয়ে চ'লে গেলে, তারপর নিশুতি রাতে একটা জানলার ফাঁক দিয়ে গ'লে অতিকষ্টে আসি ...তাই দেখুন না, কি দশা হয়েছে—"

মালতী হাত দুখানা তুলে দেখালে, জানলা গলতে গিয়ে কত জায়গায় আঘাত লেগেছে; ডান হাতের কনুইয়ের কাছে খানিকটা ছ'ড়ে গিয়েছিল, তার রক্ত এখনও শুকোয় নি।

আমি শিউরে উঠে বললুম—"ইঃ, তাই তো! সেই পাষণ্ডটার নামে নালিশ আনা উচিত যে! আপনারা সবাই যদি সাহায্য করেন—"

"জমীদারের ছেলের নামে নালিশ ফৌজদারী করবে, কার ঘাড়ে, দুটা মাথা আছে বাপু? আর, মেয়েটী যে সত্যি কথাই বলছে, তারই বা প্রমাণ কি?"

কথাটা বল্লেন এক প্রবীণ ব্যক্তি, যিনি এ গ্রামের একজন মোড়ল, সুতরাং অন্যের কাছে আর কি প্রত্যাশা করা যায়?

একজন প্রবীণা নিঃশ্বাস ফেলে ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন—"সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, এখন নালিশ ফৌজদারী ক'রে কেলেঙ্কারীটা বাড়িয়ে আর কি হ'বে বল? মেয়ে মানুষের সুনাম যে কাঁচের চেয়েও ঠুন্‌কো,—একবার ভাঙ্গলে আর তো জোড়া লাগে না, সাধে কি বলে—'মরল' মেয়ে উড়ল' ছাই তবে মেয়ের গুণ গাই' -আহা! মা মাগী মরছিল একে নিজের জ্বালায়, তার ওপর এই এক যন্ত্রণ হ'ল!!— এখন মায়া ক'রে ঐ মেয়ে যদি ঘরে নেয়—তা'হ'লে সমাজ কি আর ওকে—"

মালতীর মা, দুর্ব্বল শরীরে উত্তেজনার ফলে এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে হাঁপাচ্ছিলেন, প্রবীণার শেষ কথা শুনে ব্যথাহতকণ্ঠে, উদাসস্বরে তিনি বল্লেন—"সমাজের ভয় আমি এতটুকু করি না, দিদি! কিসের জন্যেই বা ক'রব? সংসারে সব ঘুচিয়ে, সব খেয়েই ব'সে আছি, তাও বেশী দিন আর থাকৃতে হ'বে না; তারপর মরে গেলে মড়া ফেলতে কেউ যদি না-ই আসে, গ্রামে ডোম-মুদ্দোফরাস আছে তো?—"

কথাগুলো মনে বড় লাগল আমার। আমি সহানুভূতির সহিত বললুম—"সে তো ঠিক কথা। তবে আর মেয়েটাকে বৃথা কষ্ট দিচ্ছ কেন, বাছা! এই অপরাধের বোঝা মাথায় চাপিয়ে তুমি মা হ'য়ে ওকে যদি তাড়িয়ে দাও তাহ'লে ও বেচারী এখন দাঁড়াবে কোথায় বল?"

মালতী তা'র ব্যথাভরা করুণ আঁখিদুটী তুলে আমার দিকে চাইল,—সে দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা উছলে পড়ছিল শত ধারে।

মালতীর মা একটা মর্ম্মভেদী গম্ভীর নিঃশ্বাস ফেলে আর্ত্তস্বরে বললেন—"কিন্তু, যাকে তুমি অপবাদ বলছ, তা যদি বাস্তবিক অপবাদ না হয়, যদি ও হতভাগী সত্যই··· না বাবা! ও মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে ধর্ম্মে পতিত হ'তে আমি পারব না, পাপকে ভয় ক'রে এসেছি চিরদিন এখন এ মরণ কালে আর কেন—"

"তবে আমার কি হবে?—আমি কোথায় যাব, মা?"

অভাগিনী বালিকা, এবার উচ্ছ্বসিত বেদনায়—মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল', কিন্তু মায়ের মন তাতেও টলল না,—আশ্চর্য্য!

সেই ধর্ম্ম-ভয়ে ভীতা, নিষ্ঠাবতী বিধবা নারীর কোমল চিত্তবৃত্তিগুলি বুঝি কঠোর সংযম ও নিষ্ঠার চাপে নিষ্পেষিত হ'য়ে অসাড় হ'য়ে গিয়েছিল! জননী-হৃদয়ের অফুরন্ত অপত্যস্নেহ-উৎস শুচিতার কঠিন আবরণের তলে চাপা প'ড়ে বুঝি নিঃশেষে শুকিয়ে গিয়েছিল, তাই রোরুদ্যমানা দুহিতার সেই আর্ত্ত আকুল প্রশ্নের উত্তরে দাঁতে দাঁতে চেপে নির্ম্মম কণ্ঠে তিনি বল্লেন—"কোথায় যাবি, কি করবি; তা আমি কি জানি রে রাক্ষুসী? ইহকাল তো আমার খেয়েছিস্—আবার পরকালও খাবি না কি?"

"না না, ও কথা ব'ল না,—মাগো! তোমার দুটী পায়ে পড়ি মা!—"

বিপর্য্যস্ত কেশ বেশ, লাঞ্ছিত অবসন্ন দেহখানা কোন মতে টেনে নিয়ে মালতী মায়ের কাছে এগিয়ে গেল, পরক্ষণেই, থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সে মূর্চ্ছাহত হ'য়ে মায়ের চরণপ্রান্তে অসাড়ে লুটিয়ে পড়ল।

জনতা কোলাহল ক'রে উঠল'।

"আহা গো! মেয়েটী মূর্চ্ছা গেল বুঝি?—তা আর হবে না,—কাল থেকে হয় তো পেটে জলরত্তিও পড়ে নি, তার ওপর এই প্রহার"—ব'লে কোন দয়ালু একটু সম-

বেদনা প্রকাশ করলেন, কেউ বা চোখ মুখ ঘুরিয়ে শুধু বললেন 'চং !!'

"ও মা ! মাগো ! তোর পাষাণী মাকে সত্যি সত্যি ছেড়ে চ'লে গেলি, মা !"

অমৃতা জননী এবার ধৈর্য্যহারা হ'য়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে এসে মূর্চ্ছাতুরা কন্যাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। হায় রে মাতৃ-স্নেহ ! আমি আর নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকতে পারলুম না,—কাছে গিয়ে শশব্যস্তে বললুম—"করেন কি ? দেখছেন না ওর শুধু মূর্চ্ছা হয়েছে, মুখে চোখে জল দিন, বাতাস করুন, তাহ'লেই জ্ঞান হবে এখনি।"—

মূর্চ্ছাটা গভীর হয় নি, তাই জ্ঞান হ'তে দেরী হ'ল না। মেয়েটীর জন্য একটু গরম দুধের ব্যবস্থা দিয়ে আমি মনে একটা অস্বস্তি ও ক্ষোভের গ্লানি বহন ক'রে বাড়ী চ'লে এলুম।

হায় ! এই আমাদের হিন্দু-সমাজ ! অসহায়া অবলার প্রতি নিষ্ঠুর নির্য্যাতন অত্যাচার অবিচার করতে যে সমাজ একটুও কুণ্ঠিত হয় না, নারীর পবিত্রতা, নারীর মহিমা পথের ধূলায় লুটিয়ে দিতে যে সমাজের প্রাণে এতটুকু বাজে না, তার আবার মঙ্গলের আশা কোথায় ?

তিন

পরদিন আবার কালকের সেই রোগীটীকে দেখতে খুব ভোরেই যেতে হ'ল। যাবার সময় মালতীদের ঘরের দুয়ার বন্ধ দেখে গেছলুম, কিন্তু ফেরবার সময় দেখি সে পথের ধারে এসে দাঁড়িয়ে আছে, উদ্বিগ্ন মুখ, উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিয়ে—আমি তাকে কুশল প্রশ্ন করবার আগেই সে তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি ডাক্তার ?—না ?—"

"হাঁ, কেন বল দেখি ?"

"তা হ'লে দয়া ক'রে আপনি একবারটী যদি আমার—"

বলতে বলতে সে হঠাৎ থেমে গেল,—বোধ করি কথাটা বলতে তার কুণ্ঠা হচ্ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"তুমি কি চাও বল না ? তোমার মা—কি—"

"মা কাল দিনের বেলা তো ভালই ছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যের সময় আবার ঘাড়মুড় ভেঙ্গে জ্বর এল। জ্বরের ঘোরে সারারাত খালি বিভুল বকেছেন ; তারপর শেষ রাত্তিরে খুব ঘাম হয়ে জ্বরটা মগ্ন হয়েছে, এখন গা একেবারে ঠাণ্ডা, কিন্তু কেমন যেন অঘোর হ'য়ে আছেন, ডাক্‌লে সাড়া দেন না, চোখও খোলেন না, আমার বড্ড ভয় কচ্ছে, ডাক্তারবাবু ! মা যদি না বাঁচেন, তবে···"

উদ্বেলিত দুঃখাবেগে মালতীর যেন কণ্ঠরোধ হ'য়ে গেল। ব্যস্ত হ'য়ে বল্লাম—চল তো দেখি গিয়ে ব্যাপার কি ?"

কিন্তু দেখবার শোনবার আর বাকি কিছুই ছিল না তখন, সবই শেষ হয়ে গেছে। হতভাগিনী মালতীর মা, জগতের সকল দুঃখ-তাপ-জ্বালা-যন্ত্রণা হ'তে নিষ্কৃতি লাভ ক'রে চ'লে গিয়েছেন সেই চিরশান্তির রাজ্যে। আর ! এ তো মরণ নয় মুক্তি ! শান্তিছায়ায় চিরশান্তি লাভ ! এতে দুঃখ করবার কিছু নেই ; কিন্তু মালতী—আহা ! মেয়েটীর যে আর কেউ নেই এ জগতে—বেচারী !—

"কি রকম দেখছেন, ডাক্তার-বাবু ?—মা অমন অসাড় হ'যে গেছেন কেন ?"

মালতীর এই ব্যগ্র ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে যখন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম,—"কি আর বলব বল ? তোমার মা'র আজ সকল যন্ত্রণার অবসান হ'য়ে গেছে, মালতী !"

তখন মৃতা জননীর পায়ের তলায় আছড়ে প'ড়ে তার সে কি বুকফাটা কান্না—উঃ ! সে কান্নায় বুঝি পাষাণ গ'লে যায় !

ডাক্তার মানুষ, জীবনে কান্নাকাটি বিস্তর সহ্য করতে হয়। পাঠ্যাবস্থায়, যখন মনটা নিতান্ত কাঁচা ছিল, তখনও কত রোদনাকুলা জননীর ক্রোড় থেকে গতপ্রাণ পুত্র, শোকাতুরা স্ত্রীর ব্যগ্র-ব্যাকুল বাহু-বেষ্টন থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি, কিন্তু সেদিন সেই অসহায়া ব্যথিতা বালিকার কাতর ক্রন্দন আমার মর্ম্মে অতখানি আঘাত করেছিল কেন, তা আজও বুঝতে পারি নি।

কথাটা শুনে পাঠক-পাঠিকা হয় তো মুচকে হাসছেন, বলবেন—এতে আর বোঝাবুঝির কথা কি আছে, বাপু ? তরুণ-তরুণীর মধ্যে চিরন্তন কাল থেকে যা ঘটে আসছে এও তাই—

কিন্তু তা কি সম্ভব ? একজন শিক্ষাভিমানী যুবক উচ্চ

আদর্শ ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় যে সাংসারিক সচ্ছলতা এবং আরাধ্যা জননীর একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোন নারীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করতে পারে নি, সে কি মালতীর মত একজন অশিক্ষিতা শ্যামাঙ্গিনী পল্লীবালা, যার আকৃতি-প্রকৃতিতে এতটুকু বৈশিষ্ট্য, এতটুকু মাদকতা নেই, তার প্রতি আসক্ত হ'তে পারে?

না, তা নয়,—এ শুধু করুণা, ভাগ্যহতা লাঞ্ছিতা বালিকার প্রতি একটুখানি আন্তরিক দরদ ও সহানুভূতি মাত্র।

কিন্তু অন্তরে আঘাত পেলেও মেয়েটীকে মুখ ফুটে এতটুকু সান্ত্বনাও দিতে, সমবেদনা জানাতে পারলুম না। তাকে শান্ত করতে, সান্ত্বনা দিতে সেখানে আর কেউ ছিল না। কাল যাঁরা মেয়েটীর লাঞ্ছনা দেখতে সাত-সকালে ছুটে এসেছিলেন তার বুককাটা কান্না শুনতে পেয়েও তাঁরা কেউ আজ সাড়া দিলেন না।

কাজেই মৃতা জননীর পাশে মৃতপ্রায়া বালিকাকে রেখে আমাকে অমনই বেরতে হ'ল লোকের সন্ধানে।

ডোম-মুদ্দফরাস ডাকতে হ'ল না, কাদম্বিনীর সুকৃতি ভাল, তাই সমাজপতিরা দয়া ক'রে তার ভ্রষ্টা (?) কন্যাকে এক রাত্রি ঘরে স্থান দেওয়ার অপরাধটুকু মার্জ্জনা করলেন সৎকার নির্ব্বিঘ্নে হ'য়ে গেল। অবশ্য খরচপত্রের ভার আমিই নিয়েছিলুম।

মালতীর মা তো ম'রে বাঁচলেন, কিন্তু বিভ্রাট হ'ল মেয়েটীকে নিয়ে। মালতীর মত অল্পবয়সী মেয়ের পক্ষে পরের ঘরে দাসীবৃত্তি করা নিরাপদ নয়। তারপর এই দুরপনেয় কলঙ্কের ছাপ নিয়ে বেচারী যে এ গ্রামের কোন গৃহস্থ সংসারে আশ্রয় পাবে, সে আশা একান্ত দুরাশা। তবে এখন কি করা যায়? এক উপায় হতে পারে, মালতীর যদি আত্মীয়-কুটুম্ব কোথাও থাকেন, তা'হ'লে তাঁদের কাছে মালতীকে পাঠিয়ে দেওয়া।

কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পরদিন মালতীদের বাড়ী গিয়ে দেখি,—মা'য়ের মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল, মালতী সেই স্থানটীতে নিঃসাড়ে প'ড়ে আছে। রাত্রে একজন প্রতিবাসিনী দয়া ক'রে তার কাছে ছিলেন, এখন সে একলা।

আমার সাড়া পেয়ে ভূলুণ্ঠিত অবসন্ন দেহখানা কষ্টে তুলে মালতী উঠে বসল। কি বিষণ্ণ, কি উদাস-করুণ

ব্যথিত হ'য়ে বল্লুম—"কালথেকে বুঝি কিছুই মুখে দাও নি, মালতী! কি মুস্কিল! ওদের এত ক'রে বলে গেলুম তোমাকে খাওয়াবার কথা—"

মুখের উপর ছড়িয়ে-পড়া চুলগুলি সরাতে সরাতে মালতী বল্লে—"খাবার নিয়ে তো ক্ষ্যান্ত মাসী কতক্ষণ সাধাসাধি করেছিলেন, কিন্তু পারলুম না খেতে কিছুতে—"

কিন্তু না খেয়ে কদ্দিন থাকবে? এমন ক'রে উপোস দিয়ে প'ড়ে থাকলে তোমার মা তো আর ফিরে আসবেন না, মালতী?"

মালতী কিছু না ব'লে—শূন্যদৃষ্টিতে অন্যদিকে চেয়ে রইল। আমি আর দেরী না ক'রে যে কথা বলতে এসেছিলুম, সেই কথা পাড়লুম।—"আচ্ছা, মালতী! তোমাদের আত্মীয়-স্বজন কোথাও এমন কেউ আছেন কি জান যার কাছে তুমি এখন আশ্রয় পেতে পার?"

মালতী তার ব্যথা-ভরা আঁখিদুটী—আমার দিকে ফিরিয়ে ঘাড় নেড়ে বল্লে,—"উহুঁ—"

"তবেই তো মুস্কিল! তুমি এখন কোথায় যে থাকবে—আচ্ছা, এ বাড়ী কি তোমাদের নিজবাড়ী?"

"কোন সময় তাই ছিল, কিন্তু এখন নয়। বাবা মারা যাবার পর যাঁরা এ বাড়ী নিয়েছিলেন তাঁ'রা দয়া ক'রে আমাদের থাকতে দিচ্ছেন মাত্র—"

"কিন্তু থাকতে দিলেও এখন তোমার একলাটী এ শূন্যবাড়ীতে থাকা তো নিরাপদ নয়; তা ছাড়া জমীদার গিন্নি আর যে তোমাকে—"

"না না, তাঁদের সাহায্য আমি চাই না, তার চেয়ে না খেয়ে শুকিয়ে মরি সেও ভাল।"

"তা হলে তুমি এখন কি করবে, মালতী? কোথায় যাবে?"

"মার কাছে, আমার যাবার জায়গা আর কোথায় আছে বলুন?—মা আমাকে এবার তাড়িয়ে দিতে পারবেন না বোধহয়!"—

মালতীর শুষ্ক অধর-কোণে বেদনার ম্লান হাসি চকিতে ফুটে উঠল', সেই হাসিটুকুর তলে চাপা ছিল—অফুরন্ত অশ্রু-উৎস। মুখখানা নামিয়ে নিয়ে মালতী আবার বল্লে, "যাবার আগে মা আমাকে বিশ্বাস ক'রে আশীর্ব্বাদ ক'রে গিয়েছেন, কি ভাগ্যি!—"

র-।

"তোমার মা যে কথা বিশ্বাস করে গেছেন, সে কথা একদিন সকলকেই বিশ্বাস করতে হ'বে মালতী! সত্য কথা তো অপ্রকাশ থাকে না, কিন্তু আপাততঃ তা'র তো কোনই সম্ভাবনা দেখছি না, যা চমৎকার লোকগুলি এখানকার! তাই ভাবছি—তোমার জন্যে এখন কি যে করি—"

"আমার জন্যে আপনি যা করেছেন, ঢের করেছেন ডাক্তারবাবু!—আর কিছু করতে হবে না আপনাকে, আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করব।—"

"কি করবে শুনি?"

"আত্মহত্যা?

"ছিঃ মালতী! আত্মহত্যা মহাপাপ জান না কি?"

মালতী নীরব, তার হতাশ-ক্লিষ্ট মুখখানি গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন।

এক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করে আমি বললুম-- "মালতী!"

"কি বলছেন?"

"ও পাপ সংকল্প তুমি মনেও এন না, লক্ষ্মীটী! আমি মা'কে বলে তোমার জন্য শীগগিরই একটা ব্যবস্থা করছি—"

"আপনার মা'কে?"—

"হাঁ, আমার মা'র যে রকম দয়ার শরীর, তাতে তোমার মত অসহায়—অনাথাকে আশ্রয় দিতে তিনি কুণ্ঠিত হবেন না, জানি—"

"আমার সমস্ত কথা জেনেও?"

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত প্রশ্নটা করেই মালতী বিস্মিত-উৎসুক নেত্রে আমার পানে চেয়ে রইল।

আমি বললুম—"হাঁ সব জেনেও—আমার মা'র মনে অতটা উদারতা আছে। তিনি জীবনে অনেকের অনেক অপরাধই ক্ষমা করেছেন, তখন যে সত্যকার অপরাধী নয় তা'কে—"

"কিন্তু আমাকে আশ্রয় দিলে আপনাদের এ গ্রামে বাস করা সহজ হ'বে না, জানেন? হয় তো এর জন্যে শেষকালে আপশোষ—"

"না, মালতী! তোমার মত সর্ব্বহারা নিরাশ্রয়াকে আশ্রয় দিয়ে যদি আমাকে অসুবিধায় পড়তে হয় তার জন্য আমার মনে আপশোষ কখনই হবে না জেন"

"কিন্তু আমি,—আমি যে…"

"তুমি আমাকে বিশ্বাস কর মালতী! সংসারে সব পুরুষই তো ছোটবাবু নয়! মনে কর আমি তোমার বড় ভাই।"

মালতী চকিতে উঠে আমার পায়ের ধূলা মাথায় তুলে নিলে—তারপর বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বল্লে—

"অশৌচ গায়ে প্রণাম করতে নেই শুনেছি, তবু পারলুম না থাকৃতে আপনি মানুষ নয় দেবতা!"

আমার মনে তখন কিসের একটা উচ্ছাস ঠেলা-ঠেলি করছিল, সেটা সবলে দমন করে নিয়ে বললুম—"তা হ'লে আমি যাই এখন, মা'কে জিজ্ঞাসা করে পারি যদি কালই তোমাকে—"

"কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কি?"

"আপনি জানেন না,—আপনার মত দেবতাকেও দুর্ণাম দিতে ছাড়বে না এরা, এরি মধ্যে কত কথা উঠেছে, দুঃখিনী অনাথাকে দয়া করেছেন বলে—"

"ওঃ এই কথা! কিন্তু দুর্ণামের ভয় করতে গেলে জীবনে কোন ভাল কাজই করা যায় না মালতী! ওসব আমি গ্রাহ্য করি না। আচ্ছা, এখন আসি তবে। হাঁ দেখ—তুমি খুব সাবধানে থেক বুঝলে? অমন করে উপোস দিয়ে নিজেকে আর কষ্ট দিও না, আর তোমার খরচ-পত্র যা দরকার হয়—"

"কিছু দরকার নেই, কাল যা দিয়েছেন তাই এখন—"

"তবু বলে রাখলুম- আমার কাছে সঙ্কোচ করবার কারণ তোমার কিছু নেই—"

খানিক পথ গিয়ে কি মনে হল, হঠাৎ ফিরে দেখলুম মালতী তখন দুয়ারে দাঁড়িয়ে আঁচলে চোখের জল মুছছে—এ অশ্রুপাত কিসের, ব্যথার না কৃতজ্ঞতার?

পাঁচ

মাকে সেদিন মালতীর সমস্ত কথাই বললুম। করুণাময়ী মমতাময়ী জননী আমার! সেই নির্য্যাতিতা

অভাগিনী বালিকার লাঞ্ছনার কাহিনী শুনে তাঁর চোখ দুটীতে জল ভরে এল। একটা ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলে সমবেদনা-ভরে তিনি বল্লেন—"আহা গো! কি পোড়া কপাল নিয়েই মেয়েটা জন্মগ্রহণ করেছিল!"

সাহস পেয়ে বল্লুম—"তা আর বলতে? কিন্তু জন্মগ্রহণ যখন করেছে, তখন তার জীবন-ধারণের উপায় একটা কিছু দেখতে হবে যে মা! এ সময়ে মেয়েটী যদি কোনও ভদ্র-পরিবারে আশ্রয় না পায়—তা হ'লে সে দুর্গতির চরম সীমায় গিয়ে দাঁড়াবে যে!"

"এমন ভদ্র পরিবার এগ্রামে কে আছে অজিত! এসে পর্য্যন্তই দেখছ তো—"

"খুব দেখছি!—দেখে দেখে এরি মধ্যে বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। কেবল পরনিন্দা-পরচর্চ্চা আর দলাদলি, দ্বেষা-দ্বেষি! সত্যি বলছি মা! এক এক সময় আমার মনে হয়—বড্ড ভুল করেছি আমি, ভাগলপুরে সে চাকরীটা—"

"না বাবা! ভুল নয়—তোমার উচিত কাজই করেছ তুমি। ভাল হোক, মন্দ হোক যেখানে তোমার বাপ-পিতামো জন্মগ্রহণ করেছেন—সেই খানেই তুমি—জান তো বাবা! উনি এই আশা মনে নিয়ে তোমাকে ডাক্তারী শিখতে—"

"জানি মা! বাবার চিরদিনের সেই ইচ্ছাটুকু পূর্ণ করতেই তো এই বনদেশে বাস করা! নইলে যে দেশের লোকেরা—মাচার লাউকুমড়া, পুঁইশাক দিয়ে ডাক্তার বিদায় করে, সে দেশে না কি—"

মা এবার হেসে উঠে বল্লেন—"তা বড় মিথ্যে নয়! কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় তোমার তো কোন অভাব, কোন দায় নেই অজিত! ভাই নেই, বোন্ নেই, বিয়ে থাওয়াও কর নি যে একটা—হাঁ, ভাল কথা, সারদা ঠাকুরঝি আজ আবার এসেছিল,—যে মেয়ের কথা বলছে সে মেয়েটী না কি পরমাসুন্দরী, লেখা-পড়া, শিল্পকর্ম্ম সকল দিকেই তৎপর, বাপ চন্দননগরের একজন নামী উকীল, তাই বলছিলুম—"

এই রে! আমি বাধা দিয়ে হাসতে হাসতে বললুম—"তোমায় এই পাড়াবেড়ানী ঠাকুরঝিদের বুঝি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই মা! যাক্ সে পরামর্শ পরে হ'বে, এখন এই আতান্তরে পড়া মেয়েটীর কি করা যায়, বল দেখি?"

মা'র মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, চিন্তিত ভাবে তিনি বল্লেন, "তাই তো!"

"আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না মা! মালতীকে যদি তুমি নিজের কাছে রাখ—"

মা একথার উত্তর সহসা দিতে পারলেন না, চুপ করে কি ভাবতে লাগলেন।

আমি আবার মিনতি করে বললুম—"তাকে নিয়ে তোমার একটুও অসুবিধে হ'বে না মা! ভারি ঠাণ্ডা প্রকৃতির মেয়ে সে—এই তো ক'দিন ধরেই দেখছি, এত দুঃখ, এত কষ্টের মধ্যেও কি রকম—"

"সুবিধে-অসুবিধের কথা বলছি না অজিত! ও মেয়েকে কাছে এনে রাখলে গ্রামের লোকেরা কি আমাদের ছেড়ে কথা কইবে মনে কর? একে বউ-ঝি কেউ নেই ঘরে আইবুড় সোমত্ত ছেলে—"

"হ'লই বা? তোমার ছেলেকে তুমি যদি বিশ্বাস করতে পার মা, তা হ'লে যে যা বলে বলুক,—আমি গ্রাহ্য করব না। পারবে না মা তোমার ছেলেকে—"

"পাগল!" আমাকে কোলে টেনে নিয়ে মাথার উপর হাত বুলাতে বুলাতে মা পরম স্নেহভরে বললেন, "আমার ছেলেকে আমি তো ভাল করেই চিনি বাবা!"

"তবে আর অমত কর না মা! শুধু অসহায়া নিরাশ্রয়াকে আশ্রয় দেওয়াই নয়, একটা নিষ্পাপ জীবনকে দুর্ণিবার পাপ থেকে রক্ষা করা, কত বড় পুণ্যের কাজ একবার ভেবে দেখ দেখি! মেয়েটী যে অবস্থায় পড়েছে, তাতে এখন আত্মহত্যা করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়।"

মা শিউরে উঠলেন—"ইঃ তা হ'লে আর ভেবে চিন্তে কাজ নেই, মেয়েটীকে আনিয়ে নি, তারপর দেখা যাবে।"

আহ্লাদে মা'র পায়ের উপর মাথা লুটিয়ে বললুম—"সাধে কি বলি আমার মা জগদ্ধাত্রী! তা হলে এখন—"

"তোকে আর কিছু করতে হবে না বাবা! এখন যা করবার আমিই করছি।"

"কিন্তু মা! মালতীর মায়ের শ্রাদ্ধশান্তির হাঙ্গামা চুকে না গেলে তো তাকে—"

"শ্রাদ্ধশান্তি তার করবে কে বাবা?"

"কেন ;—মেয়ে, তা হয় না না কি ?"

"হবে না কেন ? কিন্তু ঐ মেয়ে যদি শ্রাদ্ধ করে, তা হ'লে সে কাজে গ্রামের লোক কি দাঁড়াবে মনে কর ? হরি বল! পুরুত পাওয়াই ভার হবে যে! যাক্ সে পরের কথা পরে দেখা যাবে, ওরা কায়স্থ, এক মাস না গেলে তো শুদ্ধ হবে না, এখনও ঢের সময় পড়ে আছে। আপাততঃ মেয়েটার একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়।"

কিন্তু কোন ব্যবস্থাই করতে হ'ল না ; মা মালতীকে আনতে যখন লোক পাঠালেন, তখন মালতী নিরুদ্দেশ! অন্ধকার নিশুতি রাতে সে যে ঘর ছেড়ে কোন্ সময় চুপি চুপি বেরিয়ে গেছে, তা কেউ জানে না।

মেয়েটীর এই আকস্মিক তিরোধানে গ্রামে একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল। যত মুখ তত কথা।

"আহা গো! মেয়েটা সত্যি সত্যি পুকুরে ডুবে মরল না তো ?"

"হাঁ, বয়েই গেছে ওর মরতে! ও সব মেয়ে পুকুরে ডুবে মরে, তা হলে পৃথিবীতে পাপের ভরা পূর্ণ করবে বল ? এখন ও কত কীর্ত্তি করবে আর, কত লোকের মাথা খাবে রস! এই তো সবে—"

"যা বলেছ দিদি! আমি তো অজিত ডাক্তারের মাকে কালই বলেছিলুম ও মেয়ে ঘরে থাকবার নয়, কেন বৃথা বদনামের ভাগী হও, মাগীর ভাগ্যি ভাল, তাই আগে থাকতেই সে সট্‌কে পড়ল।"

মেয়ে-মহলে এইরূপ এবং পুরুষ-মহলে—

"তাই তো! মেয়েটা রাতারাতি যে কোথায় গুম্ হয়ে গেল, তা কেউ জানতেও পারলে না ; এ যে বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছি!—"

"এ ব্যাপারে আশ্চর্য্য হ'বার আর কি আছে ভায়া ? এ তো ধরা কথা! সে ছোঁড়াটা, বুঝলে কি না ? (চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখিয়া) একবার মুখের গ্রাস ফস্‌কে গিয়েছিল বলেই কি এমন সুবিধে ছেড়ে দেবে মনে করছ ?—হুঃ!"

"বাস্তবিক তাই,—তবে বলি ? কাল মুখুজ্যেদের বাড়ী তাস খেলে ফিরতে অনেক রাত হ'য়ে গেছল. ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, পথ জনমানবশূন্য, তাড়াতাড়ি লম্বা লম্বা পা ফেলে হন্ হন্ করে চলে আসছি,—এমন সময় দেখি না,—মালতীদের ঘরের পেছনে, দু জন লোক দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস্ করে কি পরামর্শ করছে। তার মধ্যে ছিপ্‌ ছিপে ঢ্যাঙ্গা মত যে লোকটা সে আর কেউ নয়—সে-ই! অন্ধকার হ'লেও আমি ঠিক চিনে ফেলেছিলুম।"

এই রকম সম্ভব-অসম্ভব আলোচনা উঠে দিনকতক গ্রাম খানিকে বেশ সরগরম করে তুললে ; তারপর সব চুপচাপ।

হত ভাগিনী মালতীর স্মৃতিটুকুও গ্রামবাসীদের মন থেকে হয় তো নিঃশেষে মুছে গেল!
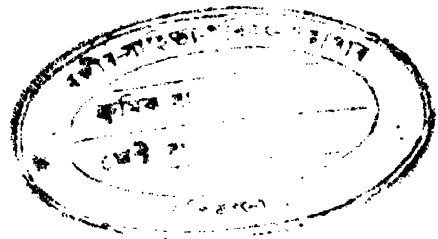
পাঁচগাণির যক্ষ্মাশ্রমে

[শ্রীমতী ঊষা মিত্র]

রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ও তার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া ক'রে নেবার ইচ্ছায় আজ জব্বলপুর থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এ অনাত্মীয়—অচিন দেশের উদ্দেশ্যে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ধাওয়া করা যাচ্ছে। আশা, আবার যদি কার্য্যক্ষম হ'য়ে সংসারের কোণটীতে জায়গা একটু ক'রে নিতে পারি। হয় তো এ বৃথা আশা—শুধুই কল্পনার সোনালী নেশা, তবুও এর মোহন চিত্রের আকর্ষণী শক্তি বড় তীব্র—বড় মিঠা, হয় তো—হয় তো—যাক্ সে কথা—। আত্মীয় পরিজন ছেড়ে আমার কিন্তু যেতে ভাল লাগছে না; বন্ধু-বান্ধব, স্নেহভাজনদের মুখগুলা চোখের সামনে ভেসে উঠে বড় কষ্ট দিচ্ছে। শুধু ইচ্ছে করছে চীৎকার করে বলি ওগো প্রভু—কত দিনে,আমার এ যাতনার শেষ হ'বে! দোটানার মধ্যে আর কত—কতদিন আমায় ফেলে রাখবে? তোমার ওজনের নিক্তির কাঁটা কত দিনে সমান হ'বে? একটী মারাঠী মেয়ে, আমার সহযাত্রী ছিল।—সে জিজ্ঞাসা করলে,—'বহিন তোমার চোখে জল কেন?' উত্তরে বললুম,—'বহিন, তোমায় এ 'কেন'র উত্তর দিতে হ'লে আজ আমায় মস্তবড় পুথী খুলে বসতে হ'বে যে। আমি মরণ-পথের যাত্রী হ'লেও আমার সাধের সোণার সংসার ছেড়ে যেতে মন কিছুতেই চাচ্ছে না—যদি সেখানে আমার ভবলীলা সাঙ্গ হয়, তা' হ'লে প্রাণের আত্মীয়-স্বজনকে তো আর চোখের দেখাও দেখতে পাব' না।' রাত্রে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগতে চোখ খুলে গেল। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে বাইরের দিকে চেয়ে রইলুম। কি এ বিরাট্ সৌন্দর্য্য? মনের বিমর্ষতা কোথায় চলে গেল, খুসীতে সারা চিত্ত ভ'রে উঠল'। দুধারে সবুজ ঘাস ও ছোট্ট ছোট্ট গাছে-ঢাকা উঁচু-নীচু, পাহাড়। মধ্যে মধ্যে গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে লীলায়িত ভঙ্গীতে ট্রেণ সামনের দিকে ছুটে চলেছে

পাঁচগানি উপত্যকা

পাঠাগার

পাহাড়ের গায়ে খড়ে-ছাওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগুলি শান্ত-শ্রীমণ্ডিত হয়ে হরিতাভ সূর্য্যমুখীর মত পাহাড়ের বুকে যেন ফুটে রয়েছে। কোথাও বা পাহাড়ের গা বেয়ে জল পড়ছে। পাহাড় শেষ হ'বার পরই খানিকদূর পর্য্যন্ত গুল্মাবৃত অসমান মাঠগুলার মধ্যে কাদের নিপুণ হাতের চষা চৌকো জমীগুলা দেখাচ্ছে—যেন কারুকার্য্যযুত শোভন সবুজ গালিচার মত।

আগের দিন বৃষ্টি হয়ে গেছে—ঝির্ ঝিরে বাতাসের সঙ্গে ভিজামাটীর গন্ধটুকু কিসের যেন ব্যথা ভাসিয়ে আন্‌ছে। সবুজ পাতায় ঢাকা দু'ধারের উঁচু ভিজা গাছগুলা বিরহের বেদনা বুকে নিয়ে—কার যেন আকুল প্রতীক্ষায় ধ্যানমগ্ন হ'য়ে রয়েছে। পাতার মর্ মর্ শব্দ উদাস সুর যেন ব'য়ে আন্‌ছে? কোন স্থানের পর্ব্বতের উঁচু চূড়া পবিত্র মন্দিরের মত দেখাচ্ছে আর মনের ভিতর ঐ শান্তরসাস্পদ স্থান যেন মূর্ত্তি ধ'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবার ওরই হাজার হাজার হাত নীচে—গুল্মাবৃত খাদের মধ্য দিয়ে—সাপের মত এঁকে বেঁকে জলের ধারা ছুটে চলেছে—কে জানে কোন দিকে? মাঝে মাঝে ষ্টেশনের কোলাহল যাত্রীদের স্বপনের নেশা ছুটিয়ে দিয়ে—পৃথিবীর নিত্যকার সুখ-দুঃখের মাঝে জোর ক'রে টেনে আনছে; সম্ভবতঃ তাদের রঙ্গীন স্বপ্নের গভীর আচ্ছন্নতার ওপর কোনরূপ দাগ কাটতে পারছে না। এরূপ দৃশ্যের মাঝখানে ভগবানের শ্রীহস্তের পরিচয় যেন স্পষ্ট দেখা যায়।

সবে মাত্র রোদ উঠেছে। দু'ধারের শ্যামল পাহাড় অতিক্রম ক'রে ট্রেণ আবার তার অসমাপ্ত যাত্রা সুরু করে দিল। মেঘে-ঘেরা মিঠে রোদটুকু এক একবার ঝিলিক্ দিয়ে এক ধারের পাহাড়ের ওপর খানিক আবীর মাখিয়ে দিচ্ছে এবং অপর ধারে একটু সোনালী আভা ভেসে উঠছে। আকাশের নীচে খণ্ড খণ্ড সাদা-কালো মেঘগুলা আবীর নিয়ে যেন কৌতুক খেলা সুরু করে দিয়েছে। বাংলা দেশের ফাগুয়ার দিনের কথা মনে পড়ে গেল। আবীরে সর্ব্বত্র যেন লালে লাল হ'য়ে উঠেছে। দু' দিকে লাল ও সোণালীর অপূর্ব্ব সমাবেশ—দু' চোখে ব্যগ্র, ব্যাকুল, বিস্মিত দৃষ্টি মেলে উপভোগ করলুম। প্রায় ২টার সময় পুণা ষ্টেশনে ট্রেণ এসে দাঁড়াল। যদিও স্বপনের রাজত্ব ছেড়ে বাস্তবের দেশে

বিলমোরিয়া ব্লক অফিষ
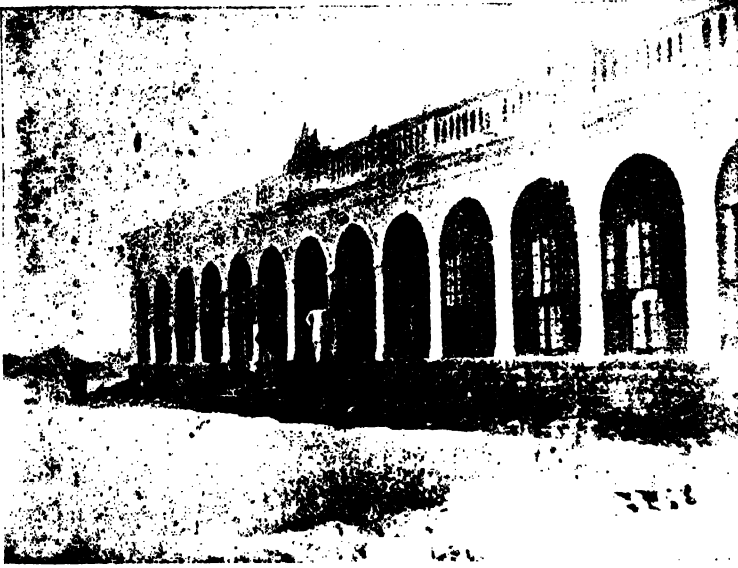
এসে পড়লুম, তবুও নয়ন-মনোমোহকর সুন্দর দৃশ্যগুলা বুকের মধ্যে তুমুল আন্দোলন সুরু করে দিল। প্রত্যেক শিরা-উপশিরার মধ্যে যেন তাদের অস্তিত্ব অনুভূত হতে লাগল'। তারা বুকের মাঝে যে নিজেদের শান্তরূপ এঁকে দিয়ে গেল, তা যেমনই শোভন, তেমনই বিরাট্। লাবণ্যভরা সে শোভা অবর্ণনীয় বল্লেও বেশী বলা হয় না। যাত্রীদের নামবার হুড়াহুড়ি, কুলিদের জিনিস নামাবার ব্যস্ততা একটু কম্‌লে—নেমে পড়ে ষ্টেশনের কাছেই এক মহারাষ্ট্রীয় হোটেলে আশ্রয় নেওয়া গেল। একটু জিরিয়ে স্নানান্তে খেতে বসলুম। সুন্দর বন্দোবস্ত। সর্ব্বোপরি ভাল লাগল—হোটেলের চাকর গুলার বিনীত নম্র ব্যবহার। খেতে দিল গরম গরম ভাত, দু রকমের ডাল, চাটনী, ছোট্ট বাটীতে একটু মাখমের ঘী, ঘী মাখান রুটী, শিম ও ছোলার ডাল দিয়ে একটা ও আলুর একটা তরকারী। আহারাদির পর ট্যাক্সির জন্য খানিক অপেক্ষা করলুম। হোটেলের সামনেই ট্যাক্সি দাঁড়াবার স্থান। প্রায় ৪টার মধ্য ট্যাক্সি নিয়ে শ্রীমান্ কেষ্ট ফিরে এল, তখন পাঁচগাণির উদ্দেশে যাত্রা করা গেল।

তারপর দুদিকের গগনস্পর্শী উচ্চ পর্ব্বতের মাঝ দিয়ে লাল টুকটুকে রাস্তা অতিক্রম ক'রে ট্যাক্সি সামনের দিকে চল্ল। উঁচু পাহাড়ে ওঠবার সময় তার গতি মন্থর হ'তে লাগল। আমাদের সহযাত্রী লক্ষপতি এক মাড়োয়ারী বুড়া ভদ্রলোক ছিলেন। বল্লেন,—বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য প্রায় দু'মাস আগে থেকে পাঁচগাণিতে বাঙ্‌লা ভাড়া নিয়েছেন—তাতে ওঁর বাড়ীর লোকেরা আছেন, আরও বল্লেন, আমরাও যদি তাঁর বাঙ্‌লায় গিয়ে উঠি, তা হ'লে খুব খুসী হ'বেন। শ্রীমান্ কেষ্ট তখন আশ্রয় পাবার আশায় মনের আনন্দে বুড়ার সঙ্গে জোর আলাপ সুরু করে

ফিমেল ওয়ার্ডে রোগীরা যন্ত্রের সাহায্যে ঔষধ-মিশ্রিত বিশুদ্ধবায়ু সেবন করিতেছেন

দিয়েছে—ঠিক সেই সময় একটা ধাক্কা লেগে 'টিফিনক্যারি-য়ার' গেল উল্‌টে। হঠাৎ ভদ্রলোকের আর্ত্তকণ্ঠের চীৎকারে বিস্মিতভাবে তাঁর পানে ফিরে চাইলুম—কিন্তু তাঁর অদ্ভুত মুখভঙ্গিমা দেখে ভয়ানক রকমে অসভ্যতা ক'রে ফেল্লুম। হাজার চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে বিশ্রীভাবে হাসিটুকু

পারক, ডবাল ইত্যাদি ব্লক

বেরিয়ে পড়ল'। যদিই বা কোন রকমে তাকে থামান গেল কিন্তু শ্রীমানের হাসি কিছুতে থামতে চাইল না। খানিক পরে তাঁর হঠাৎ বিরূপ হবার কারণ আবিষ্কার করা গেল। রাতে—নিজের খাবার জন্যে শ্রীমান্ পুণার হোটেল থেকে কিছু মাংস আদি সংগ্রহ করে এনেছিল,—সে গুলা সব পড়ে গেছে দেখলুম। মাংস দেখে ঘৃণায় আর বুড়া আমাদের সঙ্গে কথা কইলেন না। মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন। টিফিন-ক্যারিয়ারের মুখ যদি ভাল ভাবে বন্ধ থাকত' তা হ'লে আর এ বিভ্রাট ঘটত না। এমন আশ্রয়ও হারাতে হ'ত না। ভারি দুঃখ হ'ল, রাগও হ'ল। একে তিনি বয়সে পিতৃতুল্য, তার পর হাসিয়া যে অভদ্রতা করেছি তাঁর জন্যে ক্ষমা চাইবার অবসর পাবার লোভে অগত্যা তার সঙ্গে পুনরায় আলাপ করবার জন্যে দু' চার বার বৃথা চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হ'লাম, সুতরাং তখন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পুরামাত্রায় উপভোগের জন্যে মনোনিবেশ করলাম। প্রকৃত এখানে রাজ-রাজেশ্বরী, তার নিত্য নূতন রূপ ও ভাণ্ডারের অফুরন্ত সৌন্দর্য্য উজাড় ক'রে যেন ঢেলে দিয়েছে। লতা পাতা-ঘেরা পাঁচগাণি উপত্যকা যেন স্বর্গের শিল্পী বিশ্বকর্ম্মার হাতের আঁকা মনোরম ছবিখানির মত। মানব চিত্রকরের তুলিকা এ ছবি আঁকতে পারে না, এমন বর্ণসম্পাত করা কাহারও সাধ্য নয়। এই পাঁচগাণির মধ্যস্থিত ডালকেথ (Dalkeith) নামক স্থানে (T. B) টীউবরকুলেসেস রোগীদের (Sanitorium) জন্য হাঁসপাতাল—যক্ষ্মাশ্রম—তৈরী করা হয়েছে। প্রথমে এ হাঁসপাতাল পুনায় ছিল কিন্তু এখানকার জলবায়ু খুব ভাল ব'লে সার ডোরাবজী টাটা এস্থানটুকু যক্ষ্মারোগীদের সেনিটেরী-য়ামের জন্য টিবারকুলিসিসের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিলিমোরিয়াকে (Dr Billimoria) দান করেন—এবং এবং নর-নারীর প্রভূত উপকারের জন্য ডাক্তার বিলিমোরিয়া এখানে হাঁসপাতাল তৈরী করেছেন। এ সেনেটেরীয়ামের পৃষ্ঠপোষক আছেন কতকগুলি পার্শী বড়লোক। তাঁরা এখানে নিয়মিতভাবে চাঁদা দিয়ে এই অনুষ্ঠানের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। পার্শীদের দয়া,তাদের স্বজাতীয় প্রীতির বুঝি তুলনা নেই। এদের কথা ভেবে দেখলে সত্যিই ভক্তিতে মাথা আপনি নত হ'য়ে পড়ে। কত গরীব অসহায় রোগী জীবনের শেষ সীমানায় এসে হতাশ

অপর কয়েকটী ব্লক

হ'য়ে পড়্‌লেও স্বজাতিয়ের দয়ায় কার্য্যক্ষম হয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে। এঁরা প্রত্যেক বছর ১৫টী পার্শী ক্ষয়রোগীর ব্যয়ভার বহন ক'রে থাকেন—অবশ্য যারা অর্থ দিতে অক্ষম। এথাওর ষ্টেশন থেকে ৩০ মাইল, সমুদ্রের ধার থেকে ৪২০০ ফুট উঁচু।

পার্শীরা নিজ নিজ নাম দিয়ে কতকগুলা ব্লক (Block)

তৈরী করে দিয়েছে। সব শুদ্ধ ১০টা বড় ব্লক আছে। তা' ছাড়া দুটা অতিথিশালা, অফিস, বিশ্রাম-ঘর (Recreation Hall) পাঠাগার ইত্যাদি অনেক আছে। এই হাঁসপাতাল বেশ একখানি ছোটখাট গ্রামের মত। ওপরে মেঘে ঢাকা আকাশ, নীচে লাল মাটী, পিছনে এক বহু দুরব্যাপী উপত্যকার কোলে উঁচু 'সিলভর ওক', পাইন, ইউক্লিপটস্‌আদি গাছে ঢাকা ছোট-বড় ব্লক। গাছগুলা যেন সবুজ রংয়ের ওড়না গায়ে জড়িয়ে—আলতায় পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপর অবিরাম মেঘগুলা ছুটাছুটী, মাতামাতি করে বেড়ায়।

এই আশ্রমের পুরুষ ও মেয়েদের জন্য বিভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। মেয়েদের মহলে মেয়েরা ও পুরুষদের মহলে পুরুষরা চিকিৎসিত হয়ে থাকেন। মেয়েদের মহলে ডাক্তার ছাড়া অন্য পুরুষদের গতাগতি নিষিদ্ধ।

এস্থানের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে উপত্যকার ভিতর হ্রদটী বড়ই সুন্দর। এখানে রোগী ও রোগিণীরা নিয়মিত ভাবে স্নান করিয়া থাকেন দুখানি ছবি দেওয়া গেল।

মেঘগুলা যখন জোর করে ঘরের মধ্যে ঢোকে, তখন তাদের স্পর্দ্ধা দেখলে সত্যিই অবাক হ'তে হয়। সকালে কুয়াসায় চারিদিকের গাছগুলা সাদা হয়ে থাকে, মিঠে বাতাসটুকু এক একবার তাদের মাঝে জাগরণের সাড়া দিয়ে ছুটে পালায়—তখন মনে হয় স্বপ্নাবেশে ওরা যেন শিউরে উঠ্‌ছে।

ব্লকগুলার দুপাশে দুটা ক'রে দালান—মধ্যে এক মস্ত হল। চার কোণে চারখানা লোহার খাটিয়া, শিয়রে একটা ক'রে মার্ব্বেল টেবিল ওষুধ রাখবার জন্যে। ছোট্ট একটা ক'রে মার্ব্বেল টিপয় থুথু ফেলবার,—টিনের ঢাকন দেওয়া বাসন রাখবার জন্যে দেয়ালের সঙ্গে লাগান কাঠের একটা ক'রে বাক্স—প্রসাধনের জিনিস রাখবার জন্যে। হলের মধ্যে খাবার জন্যে এক মার্ব্বল টেবিল, একটা আলমারী ও ড্রেসিং টেবিল, ছোট্ট চারটী আলনা ও চারখান চেয়ার।

বাইরে বসবার জন্যে সামনের বারান্দায় খানকতক চেয়ার, দুদিকে দুটা গদী-পাতা হেলান-দেওয়া (Recliner) ছোট ছোট খাট। পিছনের বারান্দায় রোগীদের

উপত্যকার হ্রদ

উপত্যকার হ্রদে স্নান-রত নর-   নারী
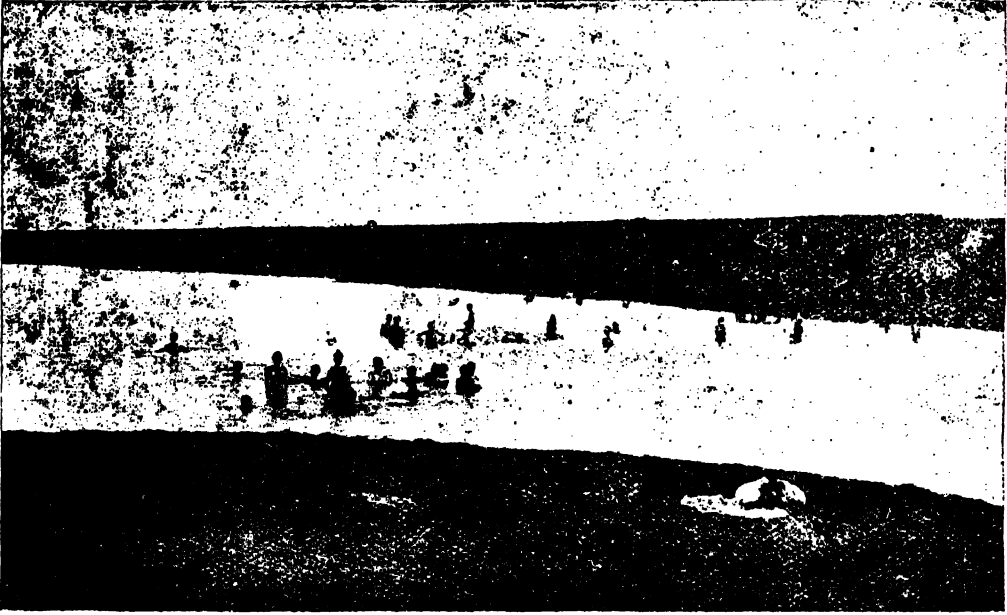
বাসন রাখবার জন্য একটা কাঁচের আলমারী। দুটা বাথরুম। সব পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন। প্রত্যহ ওষুধ-যুক্ত জলে ঘর মোছা হয় এবং সপ্তাহে একদিন টেবিল, চেয়ার-আদি জল দিয়ে প্রত্যেক জিনিস ধোয়া হয়। সব ব্লকগুলার একই প্রকারের ঘর নেই। বড় ব্লকে বেশী ঘর আছে।

এই সকল ঘরে থাকবার জন্য ১৫০৲ টাকা থেকে ৭০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক দেবার ব্যবস্থা আছে। ওই টাকায় খাওয়া, থাকা, ঔষধ-পথ্য ইত্যাদি সমস্ত খরচ সংকুলান হয়। যে ঘরের জন্য মাসিক ১৫০৲ টাকা দিতে হয়, সেই ঘরে বার জন রোগীকে একসঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়। ২৫০৲ টাকা থেকে ৭০০৲ পর্য্যন্ত দিলে স্বতন্ত্র ঘর পাওয়া যায়। রোগীদের খেতে দেয় সকাল ৭টায় ১ কাপ চা বা দুধ, দুটা কাঁচা ডিম, খানিক মাখন ও রুটীর টোষ্ট।

৯টায়—এক কাপ দুধ। ১১টায়—ভাজা মাংস, মাংসের একটা ঝোল, তরকারী, ডাল, ভাত, একটুকরা পাঁউরুটী। ৩টায়—চা, কোকো বা দুধ, মাখন-রুটী বা কেক।

৬টায়—রুটীর সহিত এক টুকরা মাংস, একটা কারী, একটা ভাজা, তরকারী বা পেটী—স্যুপ, ১টা করে কাঁচা ডিম। ৮টায়—পুডিং, দুধ বা চা। আটদিন অন্তর পোলাও ও মুরগীর ব্যবস্থা।

প্রত্যহ একই রকম আহার্য্য এখানে দেওয়া হয় না।

রোগীদের খেলবার জন্যে তাস, পিংপং ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে; বাজাবার জন্য হারমোনিয়াম, গান শুনিবার জন্য গ্রামোফোন, রেডিও আছে। চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা এখানে বেশ ভাল রকমই আছে। মাঝে মাঝে রোগীদের ব্যায়াম (exercise) করিবার ব্যবস্থাও আছে। মাসে একবার ক'রে সিনেমা দেখান হয়। বিশ্রাম-আগারে ফিল্ম গুলা রাখা হয়।

প্রত্যেক ব্লকের সামনে নানারকম ফুলের বাগান তারই মধ্যে খাট পেতে গরমের সময় রোগীরা শোয়। এই বাগান থেকে সুধাবর্ষী গন্ধ এসে রোগীদের মনকে উৎফুল্ল করে। বাগানের পরই মস্ত মস্ত গাছ—পরে পরিষ্কার লাল মাটীর রাস্তা।

এখানে অতিরিক্ত বর্ষা বলে যে সব রোগীদের বেশী বর্ষা সহ্য হয় না, তাহাদের জন্য এঁদেরই এক ছোট জায়গা আছে সেখানে ইঁহারা মোটরকার রোগীদের পাঠিয়ে দেন। যাবার খরচ ইত্যাদি রোগীদের নিকট লওয়া হয় না। প্রত্যেক কাজ ইহারা নিয়মমত করিয়া থাকে। সকাল ৬টায় ঘণ্টা বাজে তখুনি ঝি এসে গরম জল নিয়ে দাঁড়ায়—মুখ হাত ধোবার জন্য। তার পরই চায়ের ঘণ্টা! প্রত্যেক

বার খাবার দিবার ১৫ মিনিট আগে ঘণ্টা বাজে।

এখানে পুরুষ নার্স ৩ জন এবং 'মেয়ে নার্স' তিন জন আছে। ডাক্তার আছেন দু জন। দিনের মধ্যে চার বার
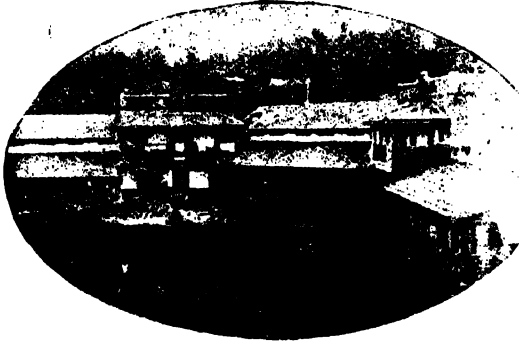
কতকগুলি ব্লক একত্রে

তাপমান যন্ত্রে জ্বর এবং নাড়ী দেখে চার্টের মধ্যে লিখে রাখে। চার্টগুলা প্রত্যেকের মাথার দিকে টাঙ্গান থাকে। ডাক্তাররা নিয়মিত ভাবে দিনের মধ্যে পাঁচ বার দেখতে আসেন।

পুরাতন ম্যানেজারের বিদায় সংবর্দ্ধনার চিত্র একখানা দিলাম।

ডাক্তারদের ভেতর যিনি বড়, ডাক্তার বিলিমোরিয়া, তিনি থাকেন বোম্বায়ে। মাসে একবার ক'রে দেখতে আসেন। এখানকার নিয়ম রাত ৯টা বাজলেই আলো নিবিয়ে দেওয়া। তখন আর জেগে থাকবার নিয়ম নেই।

এখানে একটা কথা বলি। কথাটার ভিতর যদিও আমার লজ্জিত হ'বার বিশেষ কারণ আছে, তা হ'লেও সত্যের খাতিরে বল্‌তে চাই আমার মত মেয়েদের মন থেকে অযথা ভয়টা যাতে দূর হয়—আর আমরাও যাতে ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতিনীদের মনে ছেলে বেলা থেকে ভূত, জুজু প্রভৃতির মিথ্যা আতঙ্কের ছবি এঁকে না দিই। আলো নেবার এক মজার গল্প বলি। আলো নিব্‌বার ১৫ মিনিট আগে তিনবার আলো নিবে আবার তখুনি জ্বলে ওঠে। এ হ'ল আলো একেবারে নিববার সঙ্কেত। আমি ছিলুম একলা—মাত্র এক আয়া নিয়ে, উপত্যকার নীচেই যে ব্লক সেই টায়। টেবিলে বসে লিখছিলুম। আয়াটা ঢুলতে ঢুলতে মেঝেয় পড়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে আর আলো নিবে যাবার সঙ্কেত হয়ে গেছে এ সব কিছু লক্ষ্য করি নি। আমার এক বদ অভ্যাস আছে,—রাতে একলা যখন বাইরে অন্ধকারে যাই, তখন নিজের ভয়কে তাড়াবার জন্যে চীৎকার করে গান করে থাকি। মনে হয় একলা নাই—আমার ভেতরের কেউ সঙ্গীরূপে সাড়া দিয়ে চলেছে, একই সঙ্গে। পাঠক-পাঠিকারা আমার লেখা পড়ে খুবই হাসছেন নিশ্চয়; কিন্তু আমার বিশ্বাসটা আমি সরল ভাবে বলে যাচ্ছি। কিন্তু এতে সত্যিই আমি সাহস পাই। সেদিন সে সময়ে বাথরুমের দরজায় খিল দিয়ে কমোটে বসে মনের আনন্দে গান করছি। হটাৎ দেখি ঘর গেল আঁধার হয়ে—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এক বিশ্রী রকম ছুটাছুটীর শব্দ হ'ল বাথরুমের মধ্যে। বুঝতে পারলুম্ জলের ঘটী নিয়ে কেউ ফুটবল খেলা সুরু করে দিয়েছে। বাইরে তখন ঝড় আর বৃষ্টি জোরে হচ্ছে। বাইরের হাওয়ার শব্দ এবং ভেতরের ছুটাছুটী এই দুটায় এক ভয়াবহ আওয়াজের সৃষ্টি করে তুললে। মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে হ'ল—দানো-দৈত্য-

কয়েক জন রোগী 'আলট্রা-ভায়লেট রে' লইতেছেন
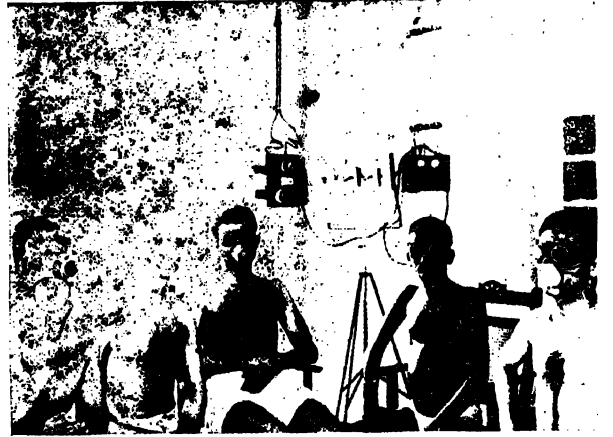
গুলা ঝড়-বৃষ্টির প্রচণ্ড বেগ সইতে না পেরে বড় দুটা খোলা জানালাও দিয়ে ঘরে ঢুকে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দিয়েছে। আঁধারের যে এক রূপ আছে—তখন তারই মধ্যে বায়স্কোপের চিত্রের মত,—আমার চোখের সামনে—বড় বড় দৈত্যের মূর্ত্তি ভেসে উঠ্‌তে লাগল। ছোট বেলায় ঠাকুমার মুখে শোনা গল্প গুলাও সম্ভবতঃ সে সময়ে অনেক খানি সাহায্য করে ফেলেছিল। প্রথমটা ভয়ে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম মুহূর্ত্ত পরেই যথাশক্তি

১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মহাবালেশ্বর-যাত্রী কয়েকজন রোগীর চা-পার্টি

চীৎকার করেছিলাম। কিন্তু এ ভীষণ চীৎকারেও আমার ঘুমের কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি। পাশেই ডাক্তারদের অফিস—তাঁরা লণ্ঠন নিয়ে ছুটেছেন। চেঁচিয়ে যখনক্লান্ত হয়ে পড়েছি তখন বাইরে থেকে তাঁরা যত বলছেন—দরজা খোল, আমি তখন উদারা ছেড়ে দিয়ে উঠেছি একেবারে অতি তারায়।

চাইনা ব্লক

অগত্যা তাঁরা বাধ্য হ'য়ে বন্ধ দরজার ওপরের শার্সী ভেঙ্গে হাত দিয়ে ভেতরের খিল খুলে ফেললেন। কিন্তু আমার চীৎকারের তখনও বিরাম ছিল না—যদিও পরিষ্কার শব্দ বেরুচ্ছিল না। আগত ডাক্তারদের সমবেত কণ্ঠের উচ্চ হাসির শব্দে, লণ্ঠনের আলোয় চেয়ে দেখলুম, ম্যানেজারের পোষা কাল কাবুলী বেড়ালটা লেজ উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে কোণটাতে, আর তার বিস্ময় ব্যাকুল দৃষ্টি-টুকু আবদ্ধ করে রেখেছে আমারই মুখের ওপর। ভয়ানক রাগ হ'ল বেড়ালের ওপর। অত কাণ্ডর পরও তার অমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকার কি এমন প্রয়োজন ছিল? আর ঐ লোকগুলা তাদেরই বা এত মাথা ব্যথা কেন? খানিক পরে হয় তো আমি নিজেই চুপ করে যেতুম। সব চেয়ে বেশী রাগ হ'ল আমার ওপর। অমন অজ্ঞান হ'য়ে সে ঘুমাল কেন? পরের দিন সকালে সেই হাসির মাত্রা সীমাতিক্রম করতে যখন চলল তখন রাগ করে ওঁদের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলুম। একজন মেয়ে ডাক্তার বল্লেন,—মিসেস মিত্রা—তোমাদের দেশে তোমার মত বীর নারী আর ক'জন আছেন? সব শেষে রাগ গিয়ে পড়ল ঠাকুমা,-দিদিমাদের ওপর। কেন ওঁরা ওই—সব দানা দৈত্য গুলার চিত্র ছেলে বেলা থেকে মনের ভেতর এঁকে দেন, লেখা-পড়া শিখেও যার হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় নাই? সাধে কি বলে 'অভ্যাসো মূর্দ্ধনি বর্ত্ততে—'অভ্যাস যায় মলে।' আবার মজার কথা হ'চ্ছে যে, আয়াটা মরাঠী কথা

ডাক্তার ফুসফুস ও পাঁজরার মাঝে হাওয়া ভরে দিচ্ছেন

পুরাতন ম্যানেজারের বিদায় সংবর্দ্ধনা (বাম দিক থেকে (১) কণ্ট্রাক্টর, (২) মেডিকেল অফিসর কাঙ্গারাণা, (৩) পুরাতন ম্যানেজার, (৪) ডাঃ ভাওনাগরী, (৫) নূতন ম্যানেজার আগুরীয়া)

ছাড়া কিছু বোঝে না। তাকে বললুম, 'খবরর্দ্দার কাল থেকে আবার যদি তুই অমনি করে ঘুমাবি।' আশ্চর্য্য! পরের দিন আবার তেমনি অজ্ঞান হ'য়ে ঘুম লাগিয়েছে। ভারি বিরক্তি লাগল। রাতে ঘুম হয় না বলে ব্রোমাইড নিয়ে থাকি। তার হাঁ করা মুখে দিলুম খানিক ব্রোমাইড ঢেলে তবুও তেমনি নিশ্চিন্দ আরামে সে ঘুমাতে লাগল।

পাচগণি উপত্যকার বর্ষানামা

অগত্যা নিরুপায়ভাবে তার উদ্বেগহীন ঘুমান্ত মুখের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি রেখে বসে রইলুম। আচ্ছা মানুষ— কেমন করে এমন গভীর, নিশ্চিন্দ আরামে, ঘুমিয়ে থাকে? আমার মনে হয়,—যাক্ সে কথা।

তারপর বর্ষা নামা যে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। ভাষায়

বর্ষানামার আর একখানি চিত্র
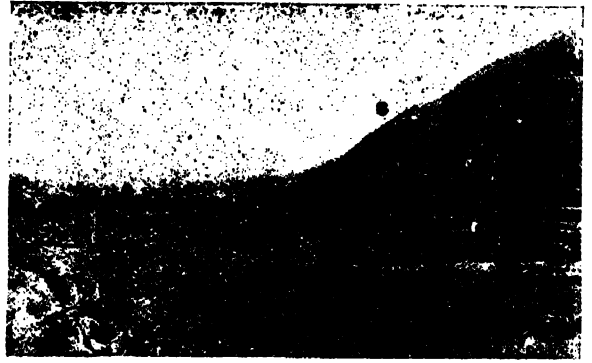
লিখে সে সৌন্দর্য্য ফুটান যায় না। চিত্রখানি দিলাম। পাঠক-পাঠিকারা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মত এই ছবি খানি দেখে আসল রূপটা কল্পনায় এঁকে নেবেন। উপর হ'তে পাহাড়ের গায়ে কাল মেঘের অবতরণ-দৃশ্য এমন-ভাবে আমাকে মুগ্ধ করেছিল যে আসন্ন-বৃষ্টি বুঝেও ফিরতে ইচ্ছে হয় নি—এমন তন্ময় হ'য়ে পড়েছিলাম যে ভুলে গেছলাম যে আমি সবেমাত্র রোগমুক্ত হয়েছি। তারপর তাড়াতাড়ি ওয়ার্ডে ফিরে আসি।

এরপর একদিন পাহাড়ের পিছন দিকের যে মস্ত লম্বা-চৌড়া কৃষ্ণা উপত্যকা আছে সেটার দৃশ্যও বেশ সুন্দর তারও একটা ফটো দিলাম। পাহাড়ের মাঝে

কৃষ্ণা উপত্যকা

মাঝে জল আছে। কত লোক সেখানে স্নান করতে যায়। আর Devils kitchen (সয়তানের রসুইঘর) বলে উপত্যকার যে আর এক দৃশ্যের চিত্র দিলুম সেটা

বড় বিস্ময়কর জিনিস। এখানে কি যে দেখলাম তাও বুঝিয়ে বলা যায় না। পাহাড়ের খানিকটা জায়গা কুচকুচে কাল, তার মধ্যে বেশ বড় রকমের একটা গর্ত্ত আছে। কালোর মাঝে ধবধব সাদা জিনিসটা দেখে কি ভাব্‌তে

Devil's Kitchen—রাবণের চুল্লী

লাগলাম। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হ'ল বুঝি বিদ্যুৎ এখানে এসে আস্তানা গেড়েছে। বৃষ্টির সহচর হ'য়ে বুঝি এখান থেকে আমাদিগকে ভীত-চকিত করবার জন্য মাঝে মাঝে দর্শন দিয়ে থাকেন। সাহেবরা Devil's kitchen 'সয়তানের রসুইঘর' নাম কেন যে দিয়েছেন ঠিক বুঝতে পারলাম না? বোধ হয় কুপ-কুপে অন্ধকারে সয়তান বাস করে, ইংরাজদের এই বিশ্বাস; আর তার ভেতর একটু ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে বলে রসুই ঘরের আলোর সঙ্গে তুলনা করছে, কিন্তু আমার মনে হয়, 'রাবণের চুল্লী' বলাই অধিকতর সঙ্গত, কারণ দিনমানের সর্ব্বক্ষণই ধব-ধব করে আলো দেখা যায়, আলোটা যেন জ্বল জ্বল করতে থাকে; কিন্তু প্রকৃতির বিষাদের সময় ঘনঅন্ধকারের ভেতর এটা ঠিক দেখা যায় কি না তা বল্‌তে পারি না?

যাই হউক প্রকৃতির এই দৃশ্যটা অতীব মনোরম। ঘোর অন্ধকার যখন চোখটাকে পীড়া দেয়, তার মাঝে সাদা আলোটা একটা তৃপ্তি আনে। যাই হোক ভাল করে চেয়ে দেখলাম যে এই গর্ত্তটা দিয়ে পেছন দিকটায় কতকটা দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মানুষের হাত যে এখানে কোনরূপ কাজে লেগেছে তা তো মনে হ'ল না। এত বড় গর্ত্ত করতে কত ডিনামাইট ও কত লোক যে লাগ্‌ত তাও কল্পনা করা যায় বটে, কিন্তু মানুষের কাজের ভেতর একটা সৌন্দর্য্যবুদ্ধির পরিচয় যেমন পাওয়া যেত—একটা শৃঙ্খলার ভাব দেখা যেত, এখানে তার সম্পূর্ণ অভাব। এটা কোন নৈসর্গিক কারণে হ'তে পারে, কিংবা বিশ্বনিয়ন্তার অপার করুণায় অন্ধকারের ভেতর আলোর রেখা চক্ষুর তৃপ্তি দেবার জন্য সৃষ্ট হয়েছে। এই গুল্মলতা ও কণ্টকসমাচ্ছন্ন স্থানেও মানব কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয়ে উঠে, দেখবার চেষ্টা করে এটার স্বরূপ কি? এখানে আরও অনেক দেখবার জিনিস আছে। কিন্তু সত্য বলতে কি, প্রকৃতির এই সব নয়ন-তৃপ্তি-দায়ক জিনিস একা একা উপভোগ করে মনের বাসনা পূর্ণ হ'ত না। একখানা সুন্দর ছবিও যেমন একা একা দেখে সম্পূর্ণ রস উপভোগ করা যায় না, সুন্দর প্রাকৃতিক-দৃশ্যও তেমনি একা একা উপভোগ করা যায় না। আমার বড়ই ইচ্ছা কর্‌ত জব্বলপুরের মাসিমা, পিসিমা, মা, দিদি, বৌদি, কাকিমা, ছোট-বোনদের—সকল আত্মীয় স্বজনকে—এনে এখানকার দৃশ্য দেখাই।

বাইশ দিন এখানে থেকে আশ্রমের চিকিৎসায় চিকিৎসিত হয়ে রোগমুক্ত হ'লাম। ওখান থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্য প্রাণটা আগেই উতলা হ'য়ে পড়েছিল। ভগবানকে প্রাণের ঐকান্তিক ভক্তি নিবেদন করে বেরিয়ে পড়্‌লাম।

এখানকার চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত ও যাকে ইংরাজীতে বলে upto date, জগতের এ সম্বন্ধে যেখানে যা কিছু চিকিৎসা প্রণালী বেরুচ্ছে সবই এখানে পরীক্ষিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে। আশা করি এই আশ্রমের অনুরূপ চিকিৎসালয় বাংলার খোলা মাঠে স্থাপিত হ'ক? এই বিষম রোগ যে ভারতের ভয়ঙ্কর রকমে ক্ষতি করছে, অধিবাসীদিগকে ধ্বংসের পথে তিলে তিলে নিয়ে যাচ্ছে, তা থেকে রক্ষা করবার জন্য মুষ্টিমেয়' পার্শী সম্প্রদায়ের প্রাণে প্রেরণা এসেছিল, তাই এত বড় একটা জনহিতকর অনুষ্ঠান তারা করতে পেরেছেন, আর বাঙ্গালীরা কি এই রকমের একটা অনুষ্ঠান বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠা করে নর-নারীর ধন্যবাদের ভাজন হ'তে পারেন না?

এখানকার যাঁরা কর্ম্মী তাঁদের শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়ে হৃদয়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিলাম। এঁদেরই দয়ায় আর ভগবানের আশীর্ব্বাদে এ-যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলাম। জীবনটাকে আবার কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করতে পারব বলে আশা হয়েছে।

মাতা-পুত্র

[শিল্পাচার্য্য শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়]

(রাহুল ও যশোধরা)

প্রাচীর-চিত্র, অজান্তা, গুহা নং ১৭, ষষ্ঠ শতাব্দী

বে দ্ধযুগে ভারতের শ্রমণ-শিল্পিগণ অজন্তার গুহা-মন্দির ও শ্রমণশালার প্রশস্ত ভিত্তিগাত্রে ভাবরসে উজ্জ্বল বহু পট্টমালার অপূর্ব্ব রত্নসম্ভারে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। গভীর অকপট ধর্ম্মভাব প্রকাশে, কল্পনার সমারোহে ও ছন্দসঙ্গতিতে এবং মুক্তগতি ও বেগমান রেখা-সমন্বয়ে সর্ব্বোপরি সুমহান কল্পলোকের ভাব ব্যঞ্জনায় এই প্রাচীরচিত্রগুলি অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যে অজন্তার চিত্রাবলী পৃথিবীর যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রকলার সমকক্ষ হইতে পারে। ইতালী দেশের পেলব সুষমায় শ্রেষ্ঠ চিত্রকলার জ্ঞান ও পূজা ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাধারায় অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছে। এসিয়া মহাদেশের চিত্রকলার নব-জাগরণে, অজন্তার প্রাচীর চিত্রাবলীও ঠিক অনুরূপ দাবী করিবার অধিকারী। ইংলণ্ডের স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই দা ভিঞ্চির Madonna of the rocks.অথবা বত্তিচেলীর Madonna of the Pomegranate চিত্রের সহিত সুপরিচিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, আমাদের দেশের কয়জন স্কুলের শিক্ষক বা কলেজের অধ্যাপক ভারতের বৌদ্ধ মাতৃকা চিত্রের সহিত পরিচয়ের দাবী রাখেন, যে চিত্র অজন্তার সপ্তদশ-সংখ্যক গুহার গাত্রে অঙ্কিত চিত্রাবলীর অপূর্ব্ব অবশেষ-রূপে আজও দীপ্যমান রহিয়াছে এই সকল বৌদ্ধ ভিত্তিচিত্রের শ্রমণ-শিল্পিগণ আমাদের চিত্তকে যেন এক আধ্যাত্মিক স্বপ্নময় অভিনব জগতে লইয়া যায়। সে আধ্যাত্মিক স্বপ্ন যেন মানবজীবনের দুঃখ, হর্ষ ও বাসনা-প্রবৃত্তির সহিত এক গভীর ও ঘনিষ্ট পরিচয়ের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত এবং যাহা, প্রকাশ-ভঙ্গীর অপূর্ব্ব কৌশলে শারীর-ভাব ও অধ্যাত্ম ভাবের সম্মিলনে মনোহর শ্রী ধারণ করিরাছে। আমি অজন্তার পুত্র ও জননী অথবা রাহুল ও যশোধরার চিত্রের কথাই বলিতেছি। এই চিত্রে বুদ্ধদেবের জীবনের একটী ঘটনা অভিব্যক্ত হইয়াছে। রাজকুমার শাক্যসিংহ যে কপিলাবস্তু ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তিনি আবার ভিক্ষুকের বেশে সেখানে ফিরিয়া আসিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে পত্নী যশোধরা ও পুত্র রাহুলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রাহুলকে কোলের কাছে রাখিয়া যশোধরা তাঁহার মুখ উত্তোলন করিয়াছেন। সেই মুখে প্রশান্ত কোমলতা ও সুতীব্র বেদনা প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। এই কোমলতা ও বেদনার দীপ্তি ইতালীর বহু ম্যাডোনা-চিত্রের কোমলতা ও বেদনার দীপ্তির সমকক্ষ। যশোধরার দুইটী নয়ন অশ্রুধারায় প্রায় পরিপূর্ণ—সে চক্ষু হইতে অনুনয় ও ভর্ৎসনা দুইই বিচ্ছুরিত হইতেছে। সে চক্ষু দুইটী যেন পরিত্যক্ত পত্নীর বিদগ্ধ হৃদয়ের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছে. আবার ভিক্ষাভাণ্ড গ্রহণ ও সন্ন্যাসীর বেশ-ধারণের জন্য রাজপুত্রকে ভর্ৎসনা করিতেছে। এই চিত্রে যশোধরা বৌদ্ধ-চিত্রকলার অশ্রুময়ী জননীর যথার্থ Mater Dolorosaরূপে কল্পিত হইয়াছেন। এই চিত্রে ধর্ম্মভাব বা অনুভূতির যে আকর্ষণ আছে তাহা ছাড়িয়া দিলেও চিত্র-বস্তুর সৌন্দর্য্য ও রসমাধুর্য্য গুণে ইহা পরিপূর্ণ ও চিরন্তন আনন্দের উৎস। যশোধরার মস্তকটী বহন-ভঙ্গীর সামঞ্জস্যে অঙ্কিত, মস্তকের রেখাগুলি অপূর্ব্ব ললিত ও পেলব। জননীর মস্তকের ভঙ্গী শিশুর গ্রীবা-ভঙ্গীর যথার্থ প্রতিধ্বনি। দ্বৈতরসের অপরূপ শিল্পী চিত্ররেখার কৌশলে, তাহার পরিকল্পনা দ্বিগুণ পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। কোমল স্নেহে সন্তানের দুই স্কন্ধে বেষ্টিত বাহুর বক্ররেখা ললিত অথচ বেগমান এবং বাহু হস্তের নিম্নগামী রেখার কমনীয়তা, বালকের মূর্ত্তির সীমা-রেখার প্রায় নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে দুইটী মূর্ত্তি অপূর্ব্ব ঐক্যে সুসঙ্গত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে দুইটী মূর্ত্তির সমস্ত ভঙ্গী ও মনোভাব পরস্পর এক সূক্ষ্ম ও কোমল ও সামঞ্জস্যের সুরে বাধা। বক্তব্য বিষয়টী আলো-

ছায়া বা গড়নের সাহায্য ব্যতিরেকে, ললিত ও অভ্রান্ত রেখা-সমন্বয়ে পরিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রকলায় ভাব-প্রকাশের এই অসাধারণ সাফল্যে ভারতীয় চিত্রশিল্পী ইতালীয় শিল্পীর বহু শতাব্দীর অগ্রণী।

বৌদ্ধ তারা মূর্ত্তি

(সুবর্ণখচিত তাম্র প্রতিমা)

নেবারী ভাস্কর্য্য, দ্বাদশ শতাব্দী

ভারতবর্ষে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার ও পরিণতির ফলে, ভারত-শিল্পের ভাস্কর্য্য-শালা নানা দীপ্তিময় প্রতিমা-মালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; এই মূর্ত্তিমালার নানা পরিকল্পনা—গভীর ভাব-সম্পদে অতুলনীয়,—রূপ-রেখার অবয়বে "চৈতন্যময়," এবং নানা অঙ্গ-ভঙ্গী ও ভাব-ভঙ্গিমায় বহুল বিচিত্র। সম্মুখের প্রতিলিপির 'স্থানক' কল্পনার "তারা" মূর্ত্তিটি মহাযানীদের আরাধ্য একটী প্রতিমা। মূর্ত্তিটির রস-কল্পনা স্নিগ্ধ-সৌকুমার্য্যে সুমধুর, অথচ ভাবের গাম্ভীর্য্যে ভাস্বর ও শক্তিশালিনী। পূর্ণ যৌবনার ;—ললিত দেহ-যষ্টি ঈষৎ চঞ্চল "আভঙ্গে"র বক্রঠামে দণ্ডায়মান দুই পার্শ্বে অতীব কোমল ও সুষ্ঠু রেখায় কল্পিত বাহুযুগল, বাহু-প্রান্তে পেলব হস্তযুগল ;—এক হস্তে 'অভয়' মুদ্রা, হস্তে 'লোল'-মুদ্রায় কল্পিত। দুইটী হস্তের নিম্নগামী রেখা-গুলি বিশ্রামের আশায় যেন দুটী কটিতটে আশ্রয় নিয়েছে ;—এই বিশ্রাম ও বিরামের ভাবটী, সমগ্র মূর্ত্তির শান্তরস ও স্থৈর্য্যের ভাবটী যেন নিবিড় করে ফুটিয়ে তুলেছে। এই সুস্থির গতিহীন ভাবটী—মুখ-মণ্ডলের অপূর্ব্ব কল্পনায় সার্থক, শিখরযুত ও চূড়ান্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছে,কেন না শিল্পী দেবীর মুখমণ্ডল 'আপনার মধ্যে আপনি নিমজ্জিত' গভীর ও নিবিড় ধ্যান-যোগের অপরূপ রসে অভিষিক্ত ও উজ্জ্বল করে লিখে রেখেছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের দেবী, "তারা" অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্রী সারা জগতের 'জীবগণকে সর্ব্বদুঃখ হইতে ত্রাণ করিবার গুরুভার সহাস্যে কাঁধে তুলে নিয়েছেন। দেবীর এই গুরু দায়িত্ব তাঁহার ভাবগম্ভীর বদনে, ও শান্তিপূর্ণ আত্মস্থ সুস্থির ভঙ্গীতে বেশ স্পষ্ট প্রতি-ফলিত হয়েছে। এই মুখভাব অলস বা কর্ম্মহীন নিরুৎসাহ ভাবাবেশ মাত্র নহে ; জীবজগতের যে দুঃখ-সম্ভার তিনি আপনার বলে বরণ করে নিয়েছেন, সেই দুঃখময়-জগতের দুঃখ বিমোচনের জন্য গভীর সমবেদনাপূর্ণ প্রতিজ্ঞা ও অক্লান্ত কর্ম্মচেষ্টার চিত্রটী দেবীর মুখে অনায়াসে পরিব্যক্ত করেছেন—নেপালের প্রতিমা-শিল্পী। এই গম্ভীর ও গম্ভীর 'ধ্যানী ভাব' এক ক্ষীণ অথচ মধুর হাস্যরেখায় সরস ও দ্যুতিমান হ'য়ে উঠেছে। আপনার নহে,—সমস্ত জগতের দুঃখভারে এই ক্ষীণ হাসি-রেখাটী যেন জর্জ্জরিত ও ক্ষণভঙ্গুর হ'য়ে উঠেছে। দেবীর দেহ কল্পনার শিল্প-কৌশল ও রেখাচাতুরী, বেশ-ভূষা ও মূর্ত্তি তত্ত্বের নানা খুটিনাটির পারিপাট্য এমন নিপুণভাবে সংযোজিত হয়েছে—যাহাতে মূর্ত্তিটীর এই প্রশান্ত ভাব ও যোগ-তন্ময়তার রসটী উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। বাম পদে দেহভার ন্যস্ত করিয়া পদ্মপীঠের উপর দণ্ডায়মান মূর্ত্তির ভঙ্গিটী ভার-সাম্যের মধুর ছন্দে কল্পিত হয়েছে। এই মধুর ভার-সাম্যের ছন্দলীলা পরিস্ফুট হয়েছে হস্তযুগল, পরিচ্ছদ ও বিশেষ করিয়া উত্তরীয়ের নিম্নগামী রেখাবলীর ভঙ্গীতে,—কেন না উত্তরীয়টী অতীব শোভন ছন্দময় তরঙ্গে বাম হস্ত হইতে লম্বিত হইয়া প্রান্তভাগে কমলপীঠ স্পর্শ করিয়া যেন ক্ষান্ত ও সুস্থির হইয়াছে। এই নিম্নগামী রেখা রাশির বিরুদ্ধে মাত্র একটী ঊর্দ্ধগামী উদ্ধত ভঙ্গী লক্ষিত হইতেছে ত্রি-চূড় মুকুটের তিনটী চূড়ায়। কিন্তু মস্তক বেষ্টিত "শিরশ্চক্র" বা জ্যোতির্ব্বলয়ের বৃত্তাকার রেখায় এই ঊর্দ্ধগতির ঔদ্ধত্য যেন ব্যর্থ হইয়াছে।

কর্ণবল্লীর কুণ্ডলদ্বয় প্রলম্বিত হইয়া দুই স্কন্ধ স্পর্শ করিয়াছে ;—তাহাদের বক্ররেখা সরল স্বাভাবিক গতিতে বাহুমূলের আভরণ কেয়ূরের মুখ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে ; এই গতিলীলার সঙ্গতি লইয়া বাহুদ্বয়ের রেখার ছন্দগতি ললিত ভঙ্গিমায় নামিয়া আসিয়া হস্তদ্বয়ের নিম্নরেখায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। রেখারাজীর এই নিম্নগতি পরিচ্ছদের রেখাশ্রেণীর উপর প্রবাহিত হইয়া কমলপীঠের আশ্রয় পাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। পাছে এই নিম্নগামী রেখারাজীর সুললিত প্রবাহের রস ভঙ্গ হয়, এইজন্য মূর্ত্তিটীর তির্য্যগ্-রেখাগুলি অত্যন্ত কোমল ও দমিত লক্ষণে অতি ক্ষীণলঘু হস্তে চিত্রিত হইয়াছে। প্রতিমাটীর "উপগ্রীব" (কণ্ঠহার) ও কটিবন্ধ অতিক্ষীণ রেখাপাতে সূচিত,—প্রায় অদৃশ্য, এবং বক্ষঃস্থলের উপরিস্থিত বস্ত্র, মাত্র দুইটী রেখায় সূচিত, চিহ্নিত হয় নাই বলিলেও চলে। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে গতিশীল
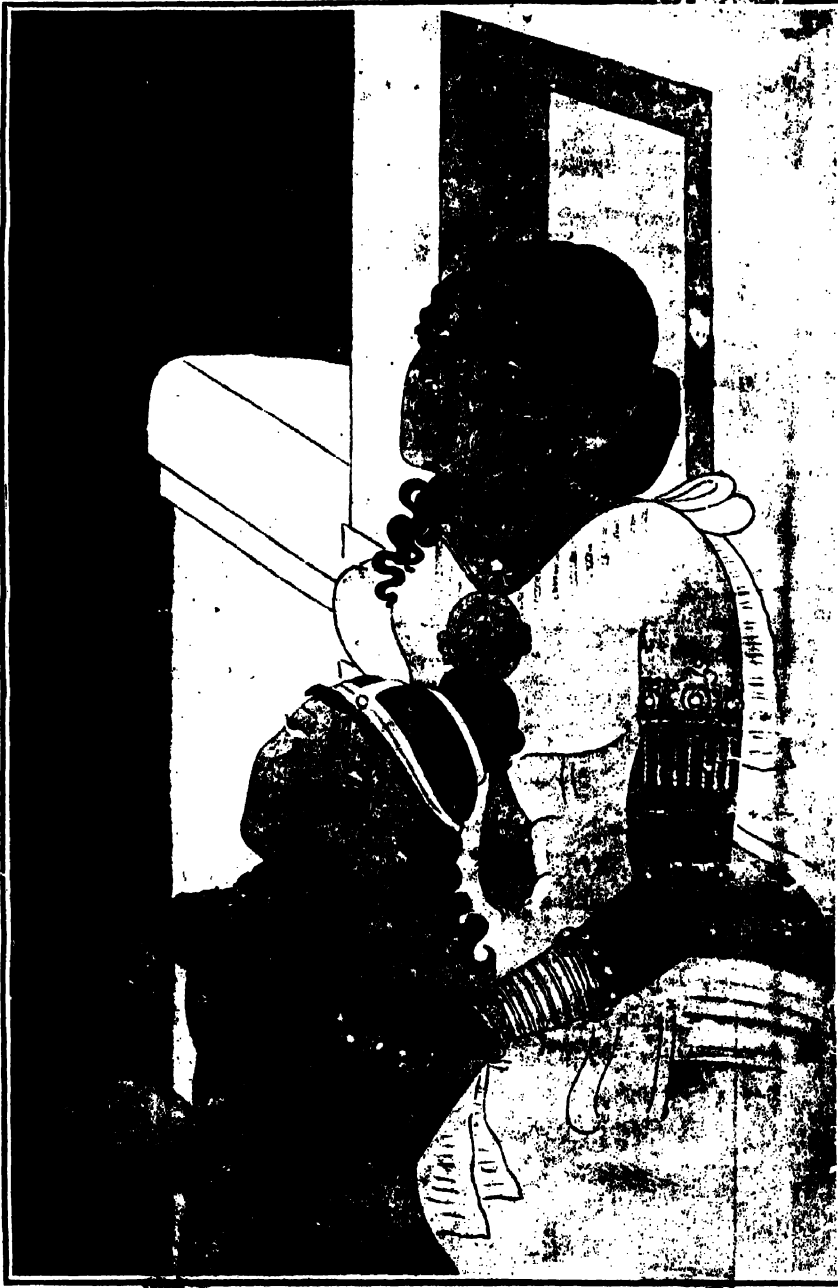
স্মৃতিরেখা

[স্যর শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম-এ, ডি-লিট্]

পল্লী-চিত্ত-বিনোদনের আর এক উপকরণ ছিল; তাহাও এখন চলিয়া গিয়াছে। গ্রামে মাঝে মাঝে বহুরূপী আসিত। নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রাম লইয়া কয়েকদিন তাহার কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইত। এক এক চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া এক এক সাজে নবীন ছাঁদে বহুরূপী সাজিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইত—হাটে-বাজারেও দেখা দিত। সময় সময় তাহাদের কৃতিত্বে অবাক হইতে হইত; আবার সময় সময় ভীত ত্রস্ত ও ব্যস্ত হইত। তাহাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন শুধু পৌরাণিক চরিত্রেই আবদ্ধ থাকিত না। অনেক সামাজিক চরিত্রেরও অভিনয় হইত। গ্রামবাসিগণ তাহাদের বাসায় নিত্য সিধা পাঠাইত এবং কতিপয় দিনব্যাপী অভিনয় শেষে তাহাকে উপযুক্ত বস্ত্র ও পুরস্কার দিত। সময় সময় লোকের বিশ্বাসভাজন হইয়া বহুরূপীর দ্বারায় অসংকার্য্য সম্পাদিত হইত না, এমন নহে। পল্লী-জীবনে এইরূপ আমোদ-প্রমোদের যেমন আয়োজন ছিল, ভীতি-আতঙ্ক তদনুপাতে কম নয়। ছিঁচকে চুরি-চামারী বেশী হইত না বটে,—পুকুর-ঘাটে রাত্রে বাসন ফেলিয়া রাখা হইত, তাহা প্রায় চুরি যাইত না। কিন্তু আশ-পাশের সর্দ্দারেরা দূর গ্রামে ডাকাতি করিয়া রাতা-রাতি আশ্রয়দাতাদের গৃহ ঘিরিয়া নিজের সাফাইয়ে পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিত। আর এক আতঙ্ক ছিল ছেলে-ধরার দল। গ্রামের প্রান্তে 'বেদেরা' আসিয়া 'টোল' ফেলিত; সে 'টোল' ঠিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোলের অনুরূপ নয়! ছোট ছোট গোল তাঁবু—আশে-পাশে, ঘোড়া, গরু, কুকুর ও ছাগল লইয়া সে টোল পড়িত। দিনে হাত-দেখা, ওষুদ দেওয়া ও ছুরি কাঁচি বেচা প্রভৃতি যেমন চলিত, রাত্রে চুরি-চামারিও তেমনই চলিত —মধ্যে মধ্যে ছেলে চুরিও হইত। থানা পুলিশ বহু দূরে। গ্রামবাসীর সাহায্য লইয়া গ্রামের চৌকীদার অতি কষ্টে গ্রামের শান্তিরক্ষা করিতে পারিত।

'বেদিয়া'রা ধমক-ধামকে কতক বশ হইলেও গ্রামে মধ্যে মধ্যে আর এক সম্প্রদায় আসিয়া জুটিত। তাহারা সকল বিধি-নিয়মের অতীত। নাগা ফকীর বা খগুর দল বলিয়া তাহারা আখ্যাত। পুরুষোত্তম হইতে বারাণসীর পথের দুই ধারের গ্রামবাসীকে তাহারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। সঙ্গে ঘোড়া, উট, এমন কি হাতী পর্য্যন্ত থাকিত—তুরী, ভেরী, ভেপু, দুন্দুভির সাহায্যে পল্লী-প্রদেশ মুখরিত হইয়া উঠিত। বড় বড় লোহার চিম্‌টা ও ত্রিশূল তাহাদের আভরণ ও প্রহরণ। কাহারও কাহারও সঙ্গে বর্শা, বল্লম, শড়কী ও তরবারিও থাকিত। গ্রামের বাহিরে তাঁবু ফেলিয়া দুই মণ ঘীউ, দশমণ আটা, দশসের গাঁজা, দশসের সিদ্ধি ইত্যাদির ফরমায়েশ তলব আসিত; আবার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়-সহকারে "ভূখে অন্ন, পিয়াসে পানি, লাংটে বস্ত্র; দেলায় দে রাম," বচনও কপ্‌চান হইত। গ্রামবাসী বিশেষতঃ জমীদার যথাসাধ্য আতিথ্য করিয়া পাপ নিষ্কৃতির চেষ্টা করিতেন। ছাইমাখা মুখে "হর-হর-ব্যোম্" শব্দে ধর্ম্ম-ভাবের উদয় হওয়া দূরে থাক, ত্রাহি ত্রাহি রবে গ্রামবাসী পলাইত। সৌভাগ্যের মধ্যে দুই এক দিনের বেশী এ বিভীষিকা কোনও গ্রামে থাকিত না। পিতামহর "তীর্থভ্রমণ" গ্রন্থের "হরিদ্বারের কুম্ভমেলা"র চিত্রের এ সকল মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছি। কিন্তু এ চিত্রের আর একটা দিক ছিল, শান্ত, সৌম্য, সাধু সন্ন্যাসীর দলও মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া অধিষ্ঠান করিতেন এবং তাঁহাদের শিক্ষা, আদর্শ ও উপদেশে গ্রামবাসী আনন্দিত ও লাভ-বান হইত। ভক্তি-প্রদত্ত উপহার-সম্ভার হইতে তাঁহারা দরিদ্র গ্রামবাসীকে অন্নবস্ত্র দান করিতেন এবং রোগ-শোকাক্রান্ত গ্রামবাসীকে বহু আশীষ ও আশ্বাস প্রদান করিতেন। তাঁহাদের 'ধুনি'তে প্রস্তুত 'লেপ্টী'র স্বাদ কখনও ভুলিতে পারিব না। কোনও কোনও মন্দভাগ্য

সিদ্ধি ও গঞ্জিকার দীক্ষা পাইত, কেহ বা উচ্চতর দীক্ষা পাইয়া ধন্য হইতেন। তাঁহাদের 'আসন' 'আস্তানা' মাতুলালয়ে নয়, সংলগ্ন 'পঞ্চাননতলায়' হইত। প্রকাণ্ড অশ্বত্থ-বৃক্ষ-তলে 'পঞ্চাননের' অধিষ্ঠান। সিন্দুর-শোভিত সেই শিলা'র সম্মুখে সকলে আসিয়া মাথা খুঁড়িত। অনতিদূরে নিবিড় বাঁশবন, পঞ্চানন-তলার এক দিকের "পাড়" ব্যাপিয়া ছিল। পঞ্চানন-সহচরেরা কেহ কেহ সেখানে আশ্রয় লইত বলিয়া প্রসিদ্ধি, সে'দিক কেহ বড় ঘেঁসিত না। ভবিষ্যৎ-সাহিত্যিকরে কল্পনা-ক্ষেত্রে সে বন কখনও 'মৃণালিনী'তে উল্লিখিত "মহাবনের" কাজ করিত। কখনও সন্ধ্যায় নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সামান্য গ্রাম্য পুকুর হইলেও "দেবীচৌধুরাণীর" "বজরা বাঁধিয়া দিতাম, কখনও বা সেইবন "শরৎ-সরোজিনী"তে উল্লিখিত তেঁতুল-তলার ঘাটের" কাজ করিত। পঞ্চাননতলার পুকুরের পূর্ব্বদিকে শরৎ চক্রবর্ত্তীর খোড়ো-বাড়ী, তাঁহাদের ঠাকুর প্রমাণ আকারের কাষ্ঠময় মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রামটীর নাম যদিও বামুনপাড়া, গ্রামে কিন্তু এই এক ঘর বামুনেরই বাস ছিল। একটু নেড়া-নেড়ী ভাবের প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া মাতামহ আমাদিগকে ওদিকে যাওয়ার প্রশ্রয় দিতেন না, কারণ পরম বৈষ্ণব হইলেও এসকল বিষয়ে তিনি ঘোর প্রতিবাদী। গ্রামের উত্তর প্রান্তে একটা বড় বৈষ্ণব পাড়া ছিল। সেই বৈষ্ণবেরা নিত্য মাতুলালয়ে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। সে বৈষ্ণবদিগের নেতা ছিলেন প্রিয়দর্শন ওজস্বী দীর্ঘবপু সুগায়ক নবীন বৈরাগী। তাঁহার মূর্ত্তি ও গান কখনও ভুলিতে পারিব না। কার্ত্তিক মাসের নিয়ম সেবার পর মহোৎসবে নবীন বৈরাগীর সম্প্রদায়ই ছিল বিশিষ্ট অঙ্গ এবং সেই 'সম্প্রদায়ে' খোলের তালে তালে উঠানে গড়াগড়ি দিয়াছি আর সেই ধূলি-ধূসরিত দেহ কোলে করিয়া মাতামহ গাহিতেন "এই আমার গোরা এসেছে"। নবীন বৈরাগীর সম্প্রদায়ে নেড়া-নেড়ী ভাব ছিল না। তাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণব। শিরোমণি মহাশয় ও মাতামহ নবীন বৈরাগীকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। মহোৎসবের কথাটা অনেকে আজকাল ভুলিয়াছে বলিয়া পরে ইহার বিবরণ কিছু বলিব।

বৈষ্ণব পাড়া যখন আসিয়া পড়িয়াছে তখন গ্রামের এ অংশটা সংক্ষেপে সারিয়া যাই। বৈষ্ণবপাড়া গ্রামের পাশেই মুশলমান পাড়া; ইহা বামুনপাড়া গ্রামের একটা স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য। "বুড়া শালিকের ঘাড়ে রোঁ"-বর্ণিত মুসলমান পাড়ার সহিত ইহার কোনও সাদৃশ্য নাই। কোনও বাড়ীতে কিংবা পথে কোনও নোংরা বা অপরিষ্কার দেখা যাইত না। বরং হিন্দু পাড়ার চেয়ে অনেক বিষয়ে পরিষ্কার। অনেক মুসলমান মাংস খাইত না। কেহ কখনও গ্রামের বাহিরে পর্ব্ব উপলক্ষে খাসি পাঁটা 'জবেহ' করিত। অনেকে মাছ পর্য্যন্ত খাইত না। পাড়ার বাহিরে মাঠের দিকে দাদা মহাশয় তাহাদের জন্য একটী ছোট পাকা মস্‌জিদ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন। পাশাপাশি বৈষ্ণব ও মুসলমান নির্ব্বিবাদে বাস করিত। নিগ্রহ-বিগ্রহ সম্বন্ধে কাহার মনে স্থান পাইত না। রামেশ্বরপুর স্কুল হইতে আসিবার পথেই বৈষ্ণব পাড়া ও মুসলমান পাড়া নিত্য মাড়াইয়া আসিতে হইত। নির্নিমেষ নয়নে নির্জ্জনের সেই ক্ষুদ্র শুভ্র মস্‌জিদ্‌টীতে নীরবে শ্রদ্ধানত শীর্ষে একান্ত তন্ময়তায় ভক্তি-পূর্ণ নামাজ পড়িতে দেখিয়া পুলকিত হইতাম। মন আশে-পাশে দূরে দূরান্তরে কাহাকে সাধিয়া ডাকিয়া সেই শান্ত মৌনতার বেদিকার সম্মুখে, নিকটে বসাইয়া কত কথাই বলিতে চাহিত—কত আদর করিতে আরতি করিতে ও আপ্যায়িত করিতে চাহিত। সকল পার্থক্য মিশিয়া যাইত, দূরত্ব নিকট হইত। আমি আত্মহারা হইয়া যাইতাম। যেমন নবীন বৈরাগীকে মনে পড়ে, তেমনই মনে পড়ে ইউসুফ্‌ মিয়াকে।

হজরত মহম্মদের পুণ্য জীবনকথা ও মর্চ্ছিয়া খানের করুণ কাহিনী তদানীন্তন প্রচলিত মুসলমানী বাঙ্গালায় শ্রবণ করিয়া গদ্‌ গদ্‌ হইতাম। উত্তর কালে যখনই দেশে বড় বড় মক্‌বরা মস্‌জিদ্‌ ও ইমামবাড়া দেখিয়াছি; তখনই পল্লী প্রান্তে সেই ক্ষুদ্র মস্‌জিদের কথা মনে পড়িয়াছে। ইদের দিন পথে ঘাটে ও কলিকাতার ময়দানে সহস্র সহস্র শ্বেতবস্ত্রপরিহিত মুসলমানকে এক তালে নামাজ পড়িতে দেখিয়া সে দৃশ্য মনে পড়িত; আর মনে পড়িত সুদূর আফ্রিকার কেপটাউন এ সেখানে এই বামুনপাড়ায় মুসলমানগণের বহুতর আত্মীয় প্রতিবেশী বন্ধু ও কুটুম্বগণ আমার দক্ষিণ অফ্রিকা (South Africa) অবস্থান-স্থলে নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল। ব্যবসায় করিতে গিয়া তাহারা দক্ষিণ

আফ্রিকায় যে নানাভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহারই প্রতিকার চেষ্টায় গিয়াছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় (Sonth Africa) এবং তাহারই প্রতিকার চেষ্টায় এই জীবন-অপরাহ্নের উৎসাহ ও শক্তি নিযুক্ত হইয়াছে। বুঝি না হিন্দু মুসলমানের এ দারুণ বাদ-বিসংবাদ কেন? রাজা রামমোহন রায় যখন প্রথম ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্থাপনের চেষ্টা করেন, কোরাণ-প্রচলিত একেশ্বর বাদ তাঁহার কল্পিত ভিত্তির একাঙ্গীভূত ছিল। সে মসজিদের নামাজ পড়ার প্রণালী দেখিয়া মনে হইত যে, পাঁচ ওক্‌ত ওজু করিয়া যে নিত্য নামাজ পড়ে ও যথানিয়মে রোজা রাখে সে রোগ শোকের অতীত। নবীন বৈরাগীর খোলের তালে তাহাদের ধর্ম্ম-চিন্তায় ব্যাঘাত হইত না। '

'বৈষ্ণবপাড়া' ছাড়াইয়া 'সদ্গোপ পাড়া'। চাষা কথাটা পল্লীগ্রামে ব্যবহার ছিল না। চাষী শব্দ শুনিতাম। 'সদ্গোপ' পাড়ার 'মণ্ডল' ঈশ্বর ঘোষ। পাড়ার বাহিরে তাঁহার একটী সুন্দর পুষ্করিণী ছিল। গ্রামের বহু লোক সে পুষ্করিণীর জল পান করিত। নাতিদীর্ঘদেহ, উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ 'ঈশ্বর মামা' সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। শুনিয়াছি, তাঁহার পুত্র সম্যক প্রতিষ্ঠা ও ধন অর্জ্জন করিয়াছেন; তাহা হইবার কথা। শান্ত-স্বভাব, ধর্ম্মভীরু ঈশ্বর ঘোষ আদর্শ পল্লীবাসী ছিলেন এবং মাতামহেরও বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন। 'পাড়ার' ও গ্রামের 'হাউড়' ছিল 'দুঃখী' সদ্গোপ—ঈশ্বর ঘোষের দূর আত্মীয়। সকলে তাহাকে লইয়া রঙ্গ করিত। সেও সে-সকল ব্যঙ্গে যোগ দিত। বাঁ'হাত বাঁ'পা পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট, বিকৃত-মস্তিষ্ক 'দুঃখীরাম' সকলের স্নেহ ও কৃপার পাত্র ছিল। সে বিদ্যা-দিগ্‌গজের ন্যায়ই সুকণ্ঠ ছিল। তাহার ছোট ভাইদের বিবাহ হইয়াছিল; তাহার হয় নাই। মধ্যে মধ্যে সে আর্ত্তনাদ করিত—

"বাবা দে, আমার বিয়ে।
বেলেঘাটায় দেখে এলাম নাককাটা মেয়ে॥"

"যার নাই পুঁজি-পাটা, সেই যায় বেলেঘাটা।" এই কথাই শুনিতাম, কিন্তু নাককাটা মেয়ের সন্ধানে কেহ কখনও 'বেলেঘাটা' গিয়াছে, এমন কথা শুনি নাই। নাক-কাটা মেয়ে না জুটিলে এমন "রাজ-যোটক" হইবে কেন? এ উপলক্ষে "ফ্রাঙ্কিন্ ষ্টাইন"এর (Frnkin Styne) পাত্রী অন্বেষণ বোধ হয় কাহারও কাহারও মনে পড়িবে? ঈশ্বর ঘোষের পুষ্করিণী ছাড়াইয়া আসিয়া 'বৈকুণ্ঠ দত্তের" খোড়ো বাড়ী বাঁশবনের লাগাও'—বড় স্নিগ্ধ রম্য স্থান। তিনি সেখানে একখানি ছোট মুদির দোকান রাখিতেন; গ্রামের লোকের সাধারণ অভাব তাহাতে মোচন হইত এবং গ্রাম্য পথিক সেই ছায়া-শীতল আশ্রয়ে বসিয়া শান্তি লাভ করিত। হাঁটু উঁচু করিয়া, হাঁটুর মাথায় কোমরের কাপড় ফের দিয়া বাঁধিয়া একটু হেলিয়া শ্রান্ত পথিক নিজের "আরাম চৌকি" তৈয়ারি করিয়া লইত এবং গামছা ঘুরাইয়া হাওয়া খাইতে খাইতে "টানা পাখা" ও ইলেক্ট্রিক্ ফ্যান্‌কেও" লজ্জিত করিত। তার পর যখন দুই হাতের তেলো সুকৌশলে অঞ্জলীবদ্ধ ভাবে জড়াইয়া 'কল্কে' ধরিয়া 'দা' কাটা তামাক এক 'ছিলিম' নিঃশেষ করিত তখন সেই বা কে, আর রাজাই বা কে? পল্লীগ্রামে 'ঘড়ী-ঘণ্টার প্রচলন আধুনিক। মোটামুটি দিনমানের ভাগ ছিল—ভোরবেলা, সকালবেলা, জলপানের বেলা, নাওয়ার বেলা, খাওয়ার বেলা, দুপুরবেলা, বিকেল বেলা, সাঁঝের বেলা আর ঝুঁজাকা রাত'। সময়-বিভাগটা মোটের উপর মন্দ ছিল না। কোনও কোনও পণ্ডিতম্মন্য লোক উঠানে গর্ত্ত কিংবা দাগ কাটিয়া, ঋতু পরিবর্ত্তনভেদে সূর্য্যের ছায়ায় লক্ষ্য করিয়া সময় নির্ণয় করিতেন। তদপেক্ষা অভিজ্ঞ লোককে তাহাও করিতে হইত না। কেবল সূর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা সময় নির্দ্ধারণ করিতেন। প্রচলিত কথা ও ছড়াতেও সময় নিরূপণের সঙ্কেত থাকিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা গল্প শুনিয়াছি—একজন দ্বিপ্রহরে মৃত্যুকালে পুত্রদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার ধনসম্পত্তি আছে তালগাছের মাথায়। সেখানে কিছুই পাওয়া গেল না, কিন্তু ইঙ্গিতোক্ত সময়ে যখন তালগাছের ছায়া পড়িয়াছিল সেই ছায়ার শীর্ষ নির্দ্দেশে খনন করিতেই কথিত অর্থ পাওয়া গেল। খনা লীলাবতীর বচন খুব চলিত হইয়া লোকের মুখে মুখে ফিরিত এবং আবহাওয়া-বিভাগে (Met-orological Depart ment.) কৃষি বিভাগ (Agrie-cultural Department) ও পূর্ত্তবিভাগে (Engineer-ing Department)এর বহু সারতত্ত্ব তাহার ভিতর নিহিত থাকিত।

"—অমোঘ পূর্ব্ব বায়বঃ"—খনা বলে চাষি বাঁধ আল,

আজ না হয় তো হবে কাল" "দক্ষিণে ছেড়ে উত্তরে বেড়ে—ঘর করগে যা ভেড়ের ভেড়ে", "খান পাঁচ ছয় ঘর, ছোট ছোট :কর!" পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ,—" ইত্যাদি গ্রাম্য কথা বহু সাধনার ধন।

কথা হইতে আবার অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম। বৈকুণ্ঠ মামার দোকানের সামনে "জলপানের" অনেক জন মজুর, কৃষাণ, চাষীকে বসাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। যাহারা গৃহস্থের বাটীতে কাজ করিত তাহারা মনিব-বাটী হইতে জলপান পাইয়াছে—খেঁসারি বা মুগুর কলাই সিদ্ধ, গুড়, শশা, লঙ্কা ইত্যাদি; অপরে আসিয়া বৈকুণ্ঠ মামার আশ্রয় লইত। মুড়ী, মুড়কী, কলাইসিদ্ধ, লঙ্কাভাজা, ছোলা-পাটালি, ভিঁড়ে লাড়ু, খ'য়ে মোয়া, ঝাল মকুন্দ ও গুড় পক্কান্ন, অবস্থা-মত সংগ্রহ করিয়া যে যা'র জলপান করিত; কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার একটা বিষয় ছিল, তাহা সবিশেষ উল্লেখ করিতেছি। এক শ্রেণীর জন-মজুর খালি কাঁচা চাল মুখে দিয়া চিবাইয়া ঈশ্বর ঘোষের পুকুরে বা বামুনডাঙ্গার পুকুরে নামিয়া আঁজলায় আঁজলায় এক-পেট 'জল' পান করিত। ইহাতে খাবার বেলা পর্য্যন্ত তাহাদের পেটে জল থাকিত। "ভাইটামিন্" (Vitamin) তবুও তখনও আবিষ্কার হয় নাই এবং চাউল হইতে বেরীবেরী এ হুজগ জাহির হয় নাই। 'কমল-কণ্ঠাভরণ' মহাশয়ের প্রেস্ক্রপশন' (Prescription) ছিল কিনা জানি না। পরজীবনে জ্যেষ্ঠ সহোদর যখন অম্লরোগে ত হন, তখন প্রাতে চাল খাইয়া—জল খাওয়ার ব্যবস্থা তাহার প্রতি হইয়াছিল এবং তাহাতে আরোগ্যও হন। দেশী রাজি চালের মাহাত্ম্য তখনও লুপ্ত হয় নাই। পরে দেখিয়াছি, পল্লীগ্রামের লোকজন কলিকাতায় আসিলে তাহারা প্রাণান্তেও পরিষ্কার বালাম চালের ভাত খাইতে পছন্দ করিত না, সেই লাল চালই খুঁজিত। এ সব বিষয়ে জ্ঞাতব্য অনেক তত্ত্ব রহিয়াছে; কে তাহার নিরূপণ করিবে? "বেলগেছিয়া কারমারকাইকেল কলেজে" (Belgachia Carmichael College) এক বৎসরের প্রাথমিক সভার সভাপতিরূপে চিকিৎসা শাস্ত্রের উদীয়মান ছাত্রদিগকে অভিভাষণচ্ছলে এই সকল গুরুতথ্য নিরূপণের জন্ম নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম; ফলে কিছু হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই।

মাজু গ্রামে দাদামহাশয়ের এক বর্দ্ধিষ্ণু হাট ও বাজার ছিল। বলদের পিঠে ছালা দিয়া বৈকুণ্ঠমামা সেই হাট হইতে জিনিস-পত্র আনিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন; পঞ্চানন-তলার দক্ষিণ পাড়ে দেখিয়াছি, রামস্বরূপমামার (রামস্বরূপ উপাধ্যায়) বাসা ও ঠাকুর বাড়ী ও পটুয়ার বাসা। তাহারই সম্মুখে বিদেশী করাতিয়াদের করাতের মাচান ও বর্দ্ধমানের পাল্কী মিস্ত্রিদের বাসা। কলিকাতা হইতে গরুর গাড়ী করিয়া 'বর্ম্মার' বড় বড় 'বাহাদুরি' ও 'চকোর' কাঠ যাইত। তাহা নানা আকারে চিরিয়া দশ বা বারখানা পাল্কী প্রস্তুত হইতেছিল এবং মাতামহের প্রকাণ্ড দ্বিতল বাসভবনের বাকী কাজ ও আসবাব শেষ হইতেছিল। এত পাল্কী কেন তৈয়ারী হইতেছিল পরে বলিব। এই সময় এই সকল সূত্রে নানা বিদেশী লোক স্থলপথে ও নৌকা-পথে আসিয়া বামুন পাড়ায় বাস করিতেছিল। অবসর কালে রামস্বরূপমামার ঠাকুর বাড়ীর অতিথি হইয়া ও ওই সকল লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াই দিন কাটিয়া যাইত। কল্পনায় তাহাদের বর্ণিত অজানা কত দেশে চলিয়া যাইতাম, কত স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতাম, তাহার বর্ণনা সুকঠিন। রাধানগরের নীচের নদীও কানা বামুনপাড়ার নীচের নদীও কানা; কিন্তু ছোট ছোট নৌকার অবাধ গতি তখন ছিল। দাঁড় টানিয়া, পাল উড়াইয়া সে সব নৌকা যখন ঘাটের নিকট দিয়া যাইত, তাহার আরোহী হইয়া দূর দূরন্তে—দিগ্ দিগন্তে যাইবার কোনও বাধা হইত না। মনের গতি "রাশেলাস্" বা শাক্যসিংহের অপেক্ষা কিশোর বয়সে বোধহয় কাহারও কম থাকে না, আমারও ছিল না। কিসের ভিতর দিয়া কি শিক্ষা হয় বলা দুষ্কর। করাতিয়া মামারা তেঁতুল তলায়—বড় বড় মাচান বাঁধিয়া প্রকাণ্ড 'বাহাদুরি' কাঠ চাপাইত; সুতায় খড়ি লাগাইয়া কাঠের উপর দাগ ফেলিত; নির্ণিমেষ নয়নে রামস্বরূপমামার দাওয়ায় বসিয়া তাহা দেখিতাম। আর দেখিতাম উচ্চ তেঁতুলের ডাল হইতে কাঁচা তেঁতুল খাইতে খাইতে রামস্বরূপমামার উপাস্য মহাবীরের প্রতিকৃতি 'পবন-নন্দন'। ভাবিতাম কাজের লোক—ডাগর কারি-করেরা এমন সুতা ও খড়ি লইয়া ছেলে খেলা করে কেন!—বহুকাল পরে যখন পড়িয়াছিলাম "নান্দন্তে সূত্রধরঃ" আর যখন জানিয়াছিলাম ছুতার মামার

জাতি সূত্রধর, তখন ইহার অর্থ বুঝিয়াছি।

পঞ্চানন তলার পুকুরের তিন পাড় বেড়ান হইয়াছে, এখন পশ্চিম পাড়ে ফিরিয়া যাই। পাড়ের উপর 'ছটা' বড় বড় মরাই বা গোলা। মাতামহের চাষের বা ভাগের ধান, চাল এই খানে জমা হইত। আপদে-বিপদে সে গোলা হইতে আত্মীয় ও প্রজাগণ সাহায্য পাইত ও বারমাসের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। 'মরাই'-শ্রেণীর সম্মুখে রাস্তা-পারে সেই পূর্ব্বকথিত গোল বারান্দা। বারান্দার দুই পাশে পাকা মঞ্চ, মাঝখানে বাটীর ভিতরে যাইবার পথ। দরবার বল, বৈঠক বল নিত্য প্রাতে সেই খানে বসিত। এক দিকে ছোট সতরঞ্চের উপর ছোট গালিচা পাতা। গালিচাখানি বাবা সিপাই-বিদ্রোহের (Mutinyর) পর মৃজাপুর হইতে আনিয়া মাতামহকে বসিবার জন্য দিয়াছিলেন। গালিচার পিছনে বড় তাকিয়া। তাহার বামে দপ্তর—খাতা লইয়া গোমস্তা কারকুন, সম্মুখে স্বতন্ত্র আসনে ব্রাহ্মণ সদস্যগণ। অপর পার্শ্বের পৃথক-পৃথক আসনে কায়স্থ, সদ্গোপ ও মুসলমান। মুসলমানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল কম্বল আসন।

আজ কাল কথায় কথায় প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের কথা শুনিতে পাই। যাট বৎসর পূর্ব্বেও নির্ব্বাচন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত না হউক, এই ক্ষুদ্র পল্লী-সাম্রাজ্য পল্লী প্রতিনিধিগণের পরামর্শ ও অনুজ্ঞা ব্যতীত গৃহস্থালী কিংবা সাধারণ কোনও কার্য্যই নিষ্পন্ন হইত না। এ বৈঠকে নবীন বৈরাগী, ইউসুফ মিঞা, ঈশ্বর ঘোষ, মহেশ চুড়ামণি, গণেশ চক্রবর্ত্তী, মহেশমামা সকলেই উপস্থিত থাকিতেন। আরও থাকিতেন অন্য পাড়ার ও অন্য গ্রামের অনেক লোক। দেউড়ীর ভিতরে থাকিতেন মামারা ও বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা। গোল বারান্দার বাহিরে বসিত জেলে, দুলে বাগ্দী ও অন্যান্য জাতির বিস্তর লোক। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে দরবার করিতে আসিত। যদিও গোল বারান্দার বাহিরে জায়গা খুব বিস্তৃত নয়, উত্তর কালে দেখিয়াছি সেই জমীরই প্রান্তভাগে 'মহেশ পুরের কশাই 'জয়ন্তিকে' মারিবার জন্য মঞ্চের উপর বেত উঠাইতেছে আর অপর অংশের এক গাছের উপর হইতে "চন্দ্রচূড় ঠাকুর" বৃক্ষতলস্থ "শ্রী"কে "সীতারামের জাতা জানের কবর" হইতে উদ্ধার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছে। আবার দেখিয়াছি নদীর ধারে চালতা তলার নীচে "ঝোপে-ঝাপে কামান ঢাকিয়া "সীতারাম"নদী পরবর্ত্তী শত্রুর উপর "তোপ দাগিতেছে।"

বৈকালের দরবারটা কিছু পাতলা রকম হইত। মাতামহ ও মামারা ঢেরা দিয়া স্বহস্তে 'পাট' ও 'শোন্' কাটিতেন; কোনও কোনও মামা জাল বুনিতেন। সন্ধ্যার সময় কৃষাণ ও 'জন'-মানুষের হিসাব চুক্তি হইত। পর দিনের 'চাস-বাসের' বন্দোবস্ত হইত; আদায়-উসুলের কথা হইত ও হাট বাজারে তোলা তুলিবার ব্যবস্থা হইত। ইদানীং প্রায়ই নানা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে রাউণ্ড টেবল্ কন্ফারেন্সের (Round Table Conference) ব্যবস্থা হয়। ইচ্ছা মত কেহ বা তাহা গ্রহণ করে, কেহ তাহা গ্রহণ করে না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণের ভাগ্য-নির্ণয় জন্য যে রাউণ্ড টেবল্ কন্ফারেন্সের সম্বন্ধে সহায়তা করিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছলাম, তাহার ভিত্তি বুঝি যাট বৎসর পূর্ব্বে এই গোল বারান্দায় 'রাউণ্ড টেবল্ কন্ফারেন্সে (Round Table Conference) স্থাপিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে 'ইউসুফ মিঞা মামা'র বংশধর ও হাওড়া ও হুগলী জিলার বিখ্যাত 'চিক্কণ' কাজের কারিকরেরা দক্ষিণ আফ্রিকায় রাউণ্ড টেবল্ কন্ফারেন্সে (Round Table Conference) উপকার লাভের অংশীদার হইয়াছিল।

গোল বারান্দার কথা বাহিরে বাহিরেই শেষ করিয়া দিলে চলিবে না। গোল বারান্দা হইতে সরাসরি লম্বা দরদালান ধরিয়া মাতামহের বৃহৎ আঙ্গিনায় পড়িতে হইত। তাহাকে উঠান বা প্রাঙ্গণ না বলিয়া আঙ্গিনা বলিলাম। উৎসবে, মহোৎসবে সেখানে অনেক বৈষ্ণবের পদধূলি পড়িত। পুলিনের রজ মানিয়া অনেক বৈষ্ণব তাহাতে গড়াগড়ি দিত। একদিকে নানা কারুকার্য্যখচিত প্রকাণ্ড তিন-কুকুরে দালান, সেখানে 'পাঠ' 'কথা' 'ব্যাখ্যা' মহোৎসব আদি মহা সমারোহে হইত। বাকী তিন দিকে চকমিলান ঘর ও বারান্দা। একতলে বিদেশী অতিথির স্থান। অপর দিকে ভাণ্ডার প্রভৃতি ও ভাণ্ডারী দিগের স্থান। আর তৃতীয় দিকে পূর্ব্বোক্ত দশ বারখানি পাল্কী রাখিবার জায়গা এবং পাশে চুণের গুদাম। অবাধ্য প্রজার সেখানে কখনও কখনও অতিথি সৎকার হইত।

জমীদার যেমন প্রজাবৎসল, বন্ধুবৎসল ও আত্মীয়বৎসল, আততায়ী দমনেও তেমনই সিদ্ধ হস্ত। লোকে বলিত, 'রামকৃষ্ণ সরকারের প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়'।

দালানের পিছনে অন্দর বা অন্তঃপুর। তিন দিকে চওড়া বারান্দা এবং দ্বিতল বাসগৃহ। মাতামহী মাতুলানী-গণ সেই সকল বাসগৃহ ব্যবহার করিতেন। মাতৃদেবী মাতামহের নিতান্ত আদরের কন্যা ছিলেন। যখন আমরা মাতুলালয়ে থাকিতাম, দ্বিতলে আমাদের বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হইত। দ্বিতলের সদর-অন্দরের মধ্যে দরদালানে পর্দ্দার পিছন হইতে শুনিয়াছি, 'নগেন্দ্রনাথে'র সুচিকিৎসা হইতেছে না বলিয়া 'সূর্য্যমুখী' ডাক্তারকে তিরস্কার করিতেছেন। মাতামহের প্রাসাদতুল্য এই বিস্তীর্ণ বাসগৃহ আমি 'নগেন্দ্র দত্ত'কে খাসদখল দিয়া রাখিয়া-ছিলাম। সদর বাড়ী ও অন্দর বাড়ীর পিছনে উচ্চ প্রাচীর-ঘেরা বিস্তীর্ণ পুষ্করিণী ও বাগান। সেই পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটের উপর বসিয়া থাকিতেন,—'কুন্দনন্দিনী, আর চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া যাইয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতেন,—'নগেন্দ্রনাথ'। পুকুরের ধারে রসুইশালা, ঢেঁকীশালা, গোশালা ও পরিচারিকাগণের আবাস-স্থান এবং তাহাদের আস্ফালনের এই সকল মহল 'নগেন্দ্রনাথের' মহলের ন্যায়ই মুখরিত থাকিত। প্রসন্ন বলিয়া এক ঝী ছিল, তাহাতে আমি 'হীরা'র সাদৃশ্য দেখিতাম। কালের প্রভাবে প্রাসাদতুল্য সেই ভবন এখন বিধ্বস্ত। মুন্সীর হাট ও কতালী হইতে যে সৌধ-শোভা দেখিয়া বাল্যের উৎসাহে প্রাণ নৃত্য করিত, সে শোভা এখন অন্তর্হিত। প্রাসাদের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে বাস করিতেছেন এক মাতুলের বংশধরগণ, অপরেরা অন্যত্র 'উঠিয়া' গিয়াছেন। এক মাতুলের বংশধরগণ তাহাদের নূতন বাটীতে এখনও কার্ত্তিকমাসে মহোৎসবের কখনও কখনও অনুষ্ঠান করে। বুঝি মাতুলদের বংশ ও বাটীর এই সনাতন নিয়ম।

বাটীর বর্ণনা যৎকিঞ্চিৎ করিলাম। আসবাব সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়াই সে বিষয়ে দুই একটা কথা বলা উচিত। ঝাড়, লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি, বেল, মাইলবরণ, ডাবা আলো, টিনের সরপোষ দেওয়া সেজ প্রভৃতি ও গালচে, দুলচে, সতরঞ্চি, জাজিম, তাকিয়া, সপ্, পাটী, কম্বল, মাদুর, ঝেঁতলা, চেটাই, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অতিথির জন্য আয়োজন থাকিত। বাহিরে যেমন ছিল বড় বড় মরাই ও গোলা, তেমনি ঢেঁকীশাল ও রসুইশালের মধ্যে ছিল বড় বড় চেটাইয়ের 'ডোল', মাটীর লেপ দিয়া তাহার মধ্যে নিত্য খাবার জন্য ও পাল-পার্ব্বণের জন্য সংগৃহীত থাকিত, খয়না ধান। সুবৃহৎ 'ঠোকর' (ডোলের রূপান্তর) মধ্যে থাকিত, মুড়ি ও খই। প্রয়োজন মত সেই খই হইতে প্রস্তুত হইত, মুড়কী। আবাল্যপ্রচলিত একটা কথা মনে পড়িতেছে,—'নেই কাজ, খই ভাজ'। এ প্রবচনের অর্থ হয় তো অনেকেই জানেন না। উল, পশম, ক্রুচেটের কাজের দৌরাত্ম্য তখন এত তো ছিল না। কাজেই যখন কাহারও হাতে কাজ থাকিত না, তিনি অবসর-কাল ভাবী ব্যবহারের জন্য খই ভাজিয়া 'ঠোকর' পূর্ণ করিয়া রাখিতেন।

খয়না ধান হইতে খই ভাজিয়া খই বাছা ও চালা সহজ কাজ ছিল না; অতএব তাহা অবসর সময়েরই কাজ ছিল। মুড়ি ভাজা, চাল ভাজা ও খুদ ভাজা অবসর-বিনোদনের উপায় ছিল। অন্তঃপুরশিল্পের অপ্রাচুর্য্য কিছু-মাত্র ছিল না। শোণ ও রেশম সাহায্যে ছোট বড় 'শিকা' প্রস্তুত হইত। বাড়ীর আলনা, দোলনা, বালস গোঁজ ও শিকা প্রভৃতি প্রস্তুত এবং এই সুরম্য শিকায় রাখিবার উপযুক্ত সুরম্য চিত্রিত সখের-হাঁড়ি বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত হইত। বুঝি বা এই রম্য শিকার রম্য সখের-হাঁড়িতেই 'নন্দরাণী' নবনীত লুকাইয়া রাখিতেন এবং এরূপ সঞ্চয় সহিতে না পারিয়া সে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া 'নন্দনন্দন' 'বান্দরে খাওয়ায় নবনী'। আর এক শ্রেণীর শিল্প ছিল, 'পুঁতির কাজ'। সুপারীর ও খয়েরের ফুল, ফল, মালা ও 'বাগানের' কাজ;—নানা রংএর ও নানা ঢংএর ক্ষীরের মাছ, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলী ও ক্ষীরপুলি এবং নারি-কেলের চিঁড়া, ফল, মূল। ছোট বড় পিঁড়া নানা রঙ্গে চিত্রিত হইয়া বিবাহাদির সময় ব্যবহৃত হইত। নিত্য, এবং ক্রিয়া কার্য্যে যে আলিপনা দেওয়া হইত, এখনকার শিল্প নৈপুণ্যে সিদ্ধহস্ত বিদুষী মহিলাগণের নিকট তাহা প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। বিবাহের সময় পিঁড়ায় আলিপনা দেওয়ার জন্য পাড়ায় লোক খুঁজিতে হয়, না

হয় 'পটুয়া' ডাকিতে হয়। শুনিয়াছি আর্ট স্কুলের কৃতবিদ্য কোনও কোনও ছাত্র পিঁড়ায় আলিপনা দিয়া দু'পয়সা রোজগার করেন। ভিজা খুদ শিলে গুড়াইয়া গাছ-গাছড়ার পত্র ও শিকড়ের রসে তাহা রং করিয়া ব্রত, পূজা-পার্ব্বণের বিধানমত পাঁচরঙ্গা, সাতরঙ্গা পঞ্চগুড়ির বা সপ্তগুড়ির আসন তখনকার মেয়েরা যে অপূর্ব্ব কৌশলে রচনা করিতেন ও বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন আদি উৎসবের নান্দী-কার্য্যের জন্য যে শিল্পসুশ্রী 'শ্রী' গঠন করিতেন, 'ওরিয়েন্টেল আর্টের' (Oriental Art) আদর্শ হিসাবে উহাদের একটা বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। ঐ 'আসন' ও 'শ্রী'র রং ও রচনায় ধর্ম্ম ও আচরণের ভাব ও রূপগত একটা স্পষ্ট অর্থপূর্ণ ধারা ছিল। এখন ইঙ্গিত ও অস্পষ্টতাই কলাবিদ্যার কৃতিত্ব।

পিঁড়ে লেখা, ফুল তোলা, সাজাশকাটী করা, 'শ্রী' গড়া পঞ্চগুড়ি বা সপ্তগুড়ির আসন করা ও লক্ষ্মীর গাছ আঁকা প্রভৃতিতে তখনকার মা-লক্ষ্মীদের যে লক্ষ্মীশ্রীর নিদর্শন নির্ণীত হইত, আজ আর তাহার স্থানও নাই আর সে দিনও নাই। সর্ব্ব-সাধারণের ভিতরও এই সকল উন্নত রুচি ও শিক্ষার উৎস অনুসন্ধান করিলে, আদি তাহার যেখানে প্রতীয়মান হয়, তাহাই জাতির প্রাণগত ভাবের পরিচায়ক।

এখন পুরোহিত-গৃহিণী কোনও মতে নিতান্ত বিচ্ছিরি রকমে 'ছিরি' গড়েন, আর পাড়ায় খোঁজ করিয়া পিঁড়ায় আলিপনা দিয়া আনিতে হয়। বাঙ্গালার সকল শ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে 'শ্রী'র এই নিদর্শনও অন্তর্হিত হইয়াছে। ভারতের মধ্যে বম্বে প্রদেশেই 'শ্রী'র প্রধান আসন; সেখানে এখনও এই 'শ্রী'র অপূর্ব্ব নিদর্শন সম্পূর্ণভাবে জাজ্বল্যমান। 'দেওয়ালী' পর্ব্ব ও অন্যান্য শুভ কর্ম্মোপলক্ষে 'মহারাজ'-সম্প্রদায়ের রমণীগণ ঘরে ঘরে, ঘরের মেজেতে এমন কি রাস্তার ধূলার উপর নানাবিধ গুড়া রঙ্গে যে অপূর্ব্ব কারু-কার্য্যের সৃষ্টি করেন, তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। শূন্য ঘরের মেজে ও রাস্তার উপর মালায় জল রাখিয়া জলের উপর এবং জলতলেও অপূর্ব্ব সৃষ্টির উদ্ভব হয়। পৌরাণিক ও সাময়িক সকল বিষয় অঙ্কনে তাঁহারা সিদ্ধহস্ত। বোম্বাইএর অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের ন্যায় মহারাজ-সম্প্রদায়ের মধ্যেও অবরোধ-প্রথার প্রচলন নাই। যখন দেশমান্য জয়াকর প্রভৃতি সহৃদয় বন্ধুর কৃপায় এ চিত্র-সৃষ্টি-সম্ভার দেখিবার অবাধ আনন্দ পাইয়াছিলাম, তখন সুদূর অতীতের সেই পল্লীশিল্পের কথা মনে পড়িয়াছিল। গত পূর্ব্ব বৎসর এই নগণ্য লেখককে সম্মান ও আতিথ্য প্রদর্শন-ছলে ইউনিভারসিটীর (University) লাল গাউন ও হুড পরা বিশ্রী মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহাতেও কথঞ্চিৎ 'শ্রী' চিহ্নের আবির্ভাব, নিপুণ ও সহৃদয় অঙ্গুলি চালনে সম্ভব হইয়াছিল। চোখের সামনে দেখিতে দেখিতে নিমেষের মধ্যে এই চিত্রকলা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

বামুনপাড়ায় অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি। কোন্ বার মনে নাই, 'আকবন্তে'র হাকিম ডেপুটি কলেক্টর রামসুন্দরবাবু গ্রামের বাহিরে মুন্সীর হাটের কাছাকাছি, 'বেলে এঠে'র উপর তাঁবু ফেলিয়াছিলেন ও তাঁবুতে কাছারি করিতেন। এই 'বেলে এঁঠে' গ্রামের বাহিরে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর। চতুর্দ্দিকে সুন্দর উর্ব্বর ভূমির মাঝখানে 'বেলে এঁঠে' কোথা হইতে কবে কিরূপে আসিয়া, পল্লীবাসীর প্রয়োজনীয় বালীর সরবরাহ করিত, ভূতত্ত্ববিদ তাহা বলেন না। 'বেলে এঁঠে'টী নিতান্ত মরুভূমি ছিল না, বেশ ঘাস গজাইত, সেজন্য গ্রামের তাহা গোচারণ-স্থান। ইচ্ছা করিলেও কেহ এই গোচারণ নষ্ট করিয়া চাষ করিতে পারিত না। আর এই 'বেলে এঁঠে' ছিল আমাদের খেলার মাঠ। কত গ্রাম্য-খেলা সেখানে খেলিয়াছি বলিতে পারি না, মায় 'ব্যাটম্ বল'। এখন ছেলেরা 'ব্যাটম্ বল' খেলেনা, খেলে ব্যয়সাধ্য ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, টেনিস্ ইত্যাদি। সেই নির্জ্জন খেলার মাঠে তাঁবু পড়াতে গ্রামবাসী জমীদার ও প্রজা, লোকজন স্ব স্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্প্রতি মধুপুর সেটেলমেণ্ট তাঁবুতে যে সব অত্যাচার অনাচারের কথা শুনিয়াছিলাম, তখনও প্রবলতর বেগে সেই সকল ব্যাপার প্রচলিত ছিল। 'স্বর্ণলতা'য় ওয়ার্ডস ষ্টেটের হাকিম 'রাম সুন্দর' বাবুর কথা পড়িবার সময় বামুনপাড়া তাঁবুর রামসুন্দর বাবুর কথা মনে পড়িয়াছিল। অতএব মাতামহকে ঘন ঘন পরামর্শ সভা আহ্বান করিতে হইত। নদীতে বাঁধ কাটা লইয়া মাঝে মাঝে গ্রামে শান্তিভঙ্গ হইত। বাঁধ কাটিয়া জল ছাড়া ও মাছ ধরা সম্বন্ধেও হাঙ্গামা হইত, মামলা মোকদ্দমাও চলিত। এইসব মামলা মোকদ্দমা সম্পর্কে উকীল বাবু শ্রীনাথ দাস, তারকনাথ সেন, চন্দ্রমাধব ঘোষ প্রভৃতির নাম শুনিতাম। তাঁহারা সকলেই পিতার বন্ধু; অতএব মাতামহের সহায়ক। বাঁধ কাটিয়া বা পুকুরে টানাজাল দিয়া মাছ ধরিয়া, মাতামহ এই সকল সহায়কদিগের নিকট কলিকাতায় ভারে ভারে মাছ পাঠাইতেন। আমাদের বহুবাজারের বাসায়ও তাহার অংশ পৌঁছিত।

উইলবারফোসে'র প্রতি

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

(মহানুভব উইলবারফোর্স ইংলণ্ডের গৌরব, এই মহাপ্রাণ দাসপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন। এই বিশ্ব-প্রেমিক ইংলণ্ডকে জাতীয় আত্ম-ত্যাগ আত্ম বিসর্জ্জন, শিখাইলেন, জগৎ ইংলণ্ডের আত্মত্যাগে মুগ্ধ হইল।)

ইংলণ্ডেতে আবার তুমি এসো
এসো দেখ আবার তোমার কাজ,
বজ্রগর্ভ এসো হে বিদ্যুৎ
পদে পদে অভাব তোমার আজ।

ক্রীত দাসের অতি দারুণ প্রথা
উঠায়েছ ঢালি' নয়ন-জল,
নূতন বেশে আবার যে দেয় দেখা
এসো তাপস—এসো অচঞ্চল।

একটা জাতির অধীনতার ভার
সন্তানেরা বইবে চিরদিন,
চৌদ্দ পুরুষ শুধবে নিরন্তর
এক পুরুষের কাপুরুষের ঋণ!

বৃহত্তর দাস-প্রথা বই
ইহারে আর কি নাম দেয়া যায়,
তোমার জাতি ভাবছে না ত কই
মোহাচ্ছন্ন অহঙ্কারে হায়।

তুচ্ছ কথা—চাকরে-লোকের আইন
তার মাঝে ও শরের ফলাটুক্
নাচবে যখন দেশের ছেলের দল
তাদের ছেলে রইবে নত মুখ।

দেশের কাজে লাগবেনাক' তারা
বাবা তাদের খেটে বেতন পায়,
কে যে ভবে বেশী অধীন ছিল
দিবা-নিশি ভাবছি বসে হায়।

বৃটিশ জাতি দাসত্ব শৃঙ্খল
ঘুচায়েছে সকল লোকে জানে;
একি নহে ব্যাপার বিপরীত
প্রাচীন শিকল রঙ করিয়া আনে।

জাগাও জাতির মর্য্যাদা-জ্ঞান পুন
সেই আদর্শ সামনে ধর তার,
এসো সাধক, কর্ম্মী অনুপম,
তুমি এসো তোমারি দরকার!

কর বুকের অমৃত সিঞ্চন
পবিত্র হ'ক বৃটন পুনরায়,
পাঠাও তোমার প্রেমের নিমন্ত্রণ
ব্যথিত ধরা আবার তোমায় চায়।

"এপ্রেল ফুল্"

(গল্প)

[রায় শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, বি এ]

১

"কার্ত্তিকবাবু যে, আসুন আসুন—"

এই বলিয়া হরিনারায়ণবাবু একটী গৌরবর্ণ যুবককে সমাদর করিয়া বসাইলেন। হরিনারায়ণবাবু সদরপুর জেলার সবজজ। তাঁহার বাসায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে সেই জেলার ডেপুটী মুনসেফ, সবডেপুটী, ডাক্তার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের এক মজলিস্ বসে। সকলে মিলিয়া গল্প-গুজব করেন, পান তামাক খান, কেহ কেহ বা ব্রিজ্ খেলেন। ললিতবাবু পোষ্টমাষ্টারও আসেন, তিনি খুব সুরসিক লোক, তিনি লোককে খুব হাসাইতে পারেন, তবে সময় সময় তাঁহার বিদ্রূপের ঝাঁজটা মাত্রা ছাড়াইয়া যায়।

আগন্তুক কার্ত্তিকবাবু একজন ডেপুটী, তাঁহার বয়স প্রায় ৩০।৩২, খুব স্ফুর্ত্তিবাজ লোক, সকলের সঙ্গে খুব মেলা-মেশা করেন, সকলে তাঁহাকে ভালও বাসেন।

তিনি একখানা চৌকীতে উপবেশন করিলে, হরিনারায়ণবাবু বলিলেন, "কোলকাতা থেকে কবে এলে? বদলীর কি হ'ল?"

কার্ত্তিকবাবু একখানা পাখা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "আজ সকালে এসেছি। চিফ্ সেক্রেটারির সঙ্গে মোলাকাৎ ক'রে এলুম। বললুম্—আমার এখানে তিন বৎসর হয়ে গিয়েছে, এখন বদলীর সময়, আমাকে একটা ভাল সবডিভিসনে যদি অনুগ্রহ ক'রে দেন, তবে ভাল হয়।"

তাঁহার কথা শুনিয়া অনন্তবাবু ডেপুটী বলিলেন, "বোধ হয় চিফ্ সেক্রেটারী বলিলেন—You are too Junior for a Sub Division. Babu" (তুমি সবডিভিসন পাবে কি ক'রে, তুমি যে অত্যন্ত জুনিয়ার)"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "Too Junior" কিসে হলুম মশাই? আমার ছ'বছর সার্ভিস হয়েছে। সে কথা বললে আমি বলতুম—our Collector is also too Junior, Sir (আমাদের কলেক্টারও তো নেহাৎ ছোকরা); তাঁরও তো কেবল ৫ বৎসরের সার্ভিস্।"

চন্দ্রবাবু সিনিয়ার ডেপুটী বলিলেন, "আরে থামো, থামো, ছোকরা। বেশী চালাকি করনা। তোমার কত খানি বুকের পাটা যে তুমি চিফ্ সেক্রেটারিকে একথা সাহস ক'রে বলবে?"

হরিনারায়ণবাবু বলিলেন, "আপনারা মন্তব্য না ক'রে আগে কার্ত্তিকবাবুর কথাটাই শুনতে দিন। তার পর কি হ'ল, কার্ত্তিকবাবু—চিফ্ সেক্রেটারি কি বললেন?"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "বললেন সেই মামুলি কথা "I will consider your prayer Babu—" (আমি তোমার প্রার্থনা বিবেচনা করিয়া দেখিব।)

চন্দ্রবাবু বলিলেন, "তুমি কোন জায়গা-টায়গার নাম করলে না কেন? সবডিভিসন তো কতই আছে—যথা কক্স্-বাজার, আলিপুর-দোয়ার প্রভৃতি।"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "আমি আণ্ডার সেক্রেটারিকে ব'লে এসেছি; কচুডাঙ্গা হ'লেই আমার খুব ভাল হয়—যেমন কোলকাতার কাছে—রেলের ধারে তেমন কাজকর্ম্ম খুব কম; সেখানে অনেক রকম সুবিধা।"

পোষ্টমাষ্টার ললিতবাবু বলিলেন, "অর্থাৎ আপনার মতে এই কচুডাঙ্গাই হচ্ছে ভূতলের একটী স্বর্গবিশেষ। কিন্তু আমি একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রতে পারি কি? সবডিভিসনের জন্য আপনারা কেন এত লালায়িত হ'ন?"

অনন্তবাবু বলিলেন, "জান না, সবডিভিসনে গেলে আমাদের আর দুখানা হাত বেরোয়—অর্থাৎ আমরা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করি—"

হরিনারায়ণবাবু বলিলেন, "সভডিভিসনের অনেক রকম সুবিধা আছে বৈ কি—বিশেষতঃ কম মাহিনার জুনিয়ার অফিসারদের পক্ষে। বাড়ীভাড়া লাগে না

গবর্ণমেণ্টের ফ্রি কোয়াটার আছে, T. A. (ভাতা) আছে,—"

ললিতবাবু বলিলেন, "আবার যারা নিতে চায় বা নিতে জানে তাদের জন্য কলাটা মূলোটা অর্থাৎ "ডালি"ও আছে—

এই কথায় সকলে হাসিয়া উঠিলেন। তখন হরিনারায়ণ-বাবু বলিলেন, "না হে—সকলে সে রকম নয়। তবে আরও একটা কথা আছে, সভডিভিসন্যাল অফিসার হচ্ছে মহকুমার সর্ব্বেসর্ব্বা—এক রকম all in all—খাতির কত—"

চন্দ্রবাবু বলিলেন, "আর মুনসেফ্‌রা বুঝি কেউ না"

ললিতবাবু বলিলেন, "হবে না কেন, ঐ কেউটে সাপ আর ঢোঁড়াসাপে যা তফাৎ—"

হরিনারায়ণবাবু বলিলেন, "একজন ডেপুটী বলতেন, মুনসেফ্‌ আবার হাকিম আরসুলা আবার পাখী"

ললিতবাবু বলিলেন, "আমি জানি কোন কোন সবডিভিসনে ডেপুটী আর মুনসেফে তুমুল ঝগড়া বেধে যায়—সাধারণতঃ স্কুলের কর্ত্তৃত্ব নিয়ে

হরিনারায়ণবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ ভায়া। আমারও সে অভিজ্ঞতা আছে। কার্ত্তিকবাবু শুনলেন তো—সবডিভিসনে যাচ্ছেন, খুব সাবধান। আপনি কচুডাঙ্গা পেলে খুব খুসী হবেন? আমাদের খুব খাওয়াবেন তো?"

চন্দ্রবাবু বলিলেন, "কেন, তুমি কোন প্রকার ভৌতিক প্রক্রিয়া ক'রবে নাকি? তুমি তো থিওসফির চর্চ্চা কর, অনেক মহাত্মার সঙ্গেও মোলাকাত হয়—"

হরিনারায়ণবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমরা সকলে সমবেত হইয়া যদি একটা wrlll force (ইচ্ছাশক্তি) প্রয়োগ করি, তবে অবশ্যই তার ফল হ'তে পারে।"

এই কথার পরে উপেনবাবু মুনসেফ, বিপিন বাবু সব-ডেপুটী, সত্যবাবু ডাক্তার চারুবাবু ডেপুটি—ইহার ব্রিজ্‌ খেলা আরম্ভ করিলেন। কার্ত্তিকবাবু ও অমরবাবু বিদায় হইলেন, তাঁহাদের বাসা একটু দূরে!

২

পরদিন বেলা প্রায় পাঁচটার সময় কার্ত্তিকবাবু কাছারিতে কাজ করিতেছিলেন, এই সময়ে তাঁহার বাসার চাকর একখানা হলুদে রঙের খামে আঁটা চিঠি আনিয়া দিয়া বলিল,—"

হুজুর, এই চিঠিটা একজন পিয়ন বাসায় দিয়ে গেল। মা বললেন, এটা টেলিগ্রাফ শীগ্‌গির দিয়ে আয়—তাই আমি ছুটে এসেছি।"

কার্ত্তিকবাবু খুব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই হলুদে খাম খুলিয়া তাহার মধ্যে একখানা ঈষৎ লাল রঙের কাগজ পাইলেন। তাহাতে পেনসিলে এরূপ লেখা ছিল,—

To

Kartik Chandra Chatterjee

Deputy Magistrate, Sadarpur.

You are appointed to have charge of Kachudanga Subdivision

Under, Bengal.

এই টেলিগ্রাফ পড়িয়া কার্ত্তিকবাবু আহ্লাদে নাচিয়া উঠিলেন। তিনি অমনি সিনিয়ার ডেপুটী চন্দ্রবাবুর কাছে ছুটিলেন। চন্দ্রবাবু তখন ট্রেজারির মধ্যে কাজে ব্যস্ত ছিলেন; কার্ত্তিকবাবুর মুখে কথাটা শুনিয়া বলিলেন- "এই দেখ আমাদের will forceএর বল আছে কি না। আমরা সকলে মিলে সন্ধ্যাবেলা আসছি—মেঠাই-মোণ্ডার জোগাড় রেখো।"

কার্ত্তিকবাবু কাছারিতে বন্ধু-বান্ধবদিগের মধ্যে যাহাকে যাহাকে পাইলেন, সকলকেই এই সুসমাচার জ্ঞাপন করি-লেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া দেখিলেন তিনি আপীল শুনিতেছেন। তখন গৃহিণীকে বলিবার জন্য তাড়াতাড়ি বাসায় ছুটিলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সবজজবাবুর বাসার আড্ডাধারীগণ প্রায় সকলেই দল বাঁধিয়া কার্ত্তিকবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে Congratulate (অভিনন্দন) করিবার জন্য—কেবল আসিলেন না সবজজবাবু ও সিনিয়ার ডেপুটী চন্দ্রবাবু। এই দুই বৃদ্ধ আসিলেন না, তাহার কারণ বোধ হয়, এই সকল নব্য-যুবকদিগকে তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ আমোদ আহ্লাদ করিবার সুযোগ দিবার জন্য। কার্ত্তিক-বাবুর স্ত্রী তাঁহাদিগকে মিষ্টিমুখ করাইবার জন্য প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন।

সমাগত অতিথিবৃন্দ কার্ত্তিকবাবুর ঘরের লম্বা বারান্দায় লম্বা মাদুরের উপর লম্বা হইয়া পড়িলেন। অনন্তবাবু বলিলেন—"কার্ত্তিকবাবু, আপনি কালেক্টার সাহেবকে সেই টেলিগ্রামটা দেখান নাই ?"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন—"না আমি তাঁহাকে দেখাতে গিয়া খাস-কামরায় উঁকি মেরে দেখলুম তিনি আপীল শুনছেন।"

অনন্তবাবু বলিলেন—"তখন সাহেবের কাছে না গিয়ে ভালই করেছেন। এত তাড়াতাড়ির প্রয়োজন কি ? ম্যাজিষ্ট্রেটের আপীল শোনার এক গল্প আছে, আপনারা শুনবেন ?"

শ্রোতৃবৃন্দ "বলুন বলুন" বলিয়া উঠিলেন।

অনন্তবাবু বলিলেন "এই সাহেবের আগে এক সাহেব ছিলেন, তাঁর নাম রেভিংটন (Mr. Ravington) —তিনি উকীলের argument (সওয়াল জবাব) শুনিয়া অর্ডারসিটের উপর এই সংক্ষিপ্ত হুকুম লিখিতেন— "Heard appellant's pleader. Appeal dismissed (আপীলান্টের উকীলের সওয়াল জবাব শুনিলাম, আপীল ডিসমিস হইল)—একদিন তাঁহার কুঠী হইতে পেষ্‌কার অনেকগুলি কাগজ-পত্রের সঙ্গে একটা আপীলের নথী পাইল—তাহাতেও ঐ রূপ হুকুম লেখা রহিয়াছে, অথচ সেই আপীল শুনানির জন্য তাহার পরের দিন ধার্য্য ছিল। অর্ডার সিটে তারিখ সেই পরের দিনই দেওয়া ছিল।

পরে একটা মোকদ্দমায় তাঁহার হুকুমের বিরুদ্ধে হাই-কোর্টে মোসন হওয়ায় হাইকোর্ট তাঁহাকে খুব গালাগালি দিয়াছিল। তদবধি তিনি আপীল ডিসমিস করিলেও দুই চারি লাইন রায় লিখিতে আরম্ভ করেন।

"আমাদের এই হটপট্‌ (Mr. Hotpot) সাহেবের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ট্রেন্‌চ (Mr. Trench) ছিলেন, তাঁকে আপনারা অনেকেই দেখিয়াছেন। তাঁর মত অব্যবস্থিত-চিত্ত লোক আমি আর কখনও দেখি নাই। আমার হাতে General file, আমি মোকদ্দমার এজাহার লই ও অন্য বিচারকদিগকে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করি। আপনারা জানেন, এখানে অনেকগুলি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, তাঁদের কাহারও 2nd class power, কাহারও 3rd class power, তাঁহাদের আপীল সব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহবকে শুনতে হয়। কিন্তু ট্রেঞ্চ সাহেব ততটা পরিশ্রম করিতে নারাজ, আবার বাঙ্গলা না জানাতে, তিনি সাক্ষীর জবানবন্দীও পড়িতে পারিতেন না। তিনি একদিন আমাকে এক হুকুম দিলেন—এখানকার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটরা নিতান্ত অপদার্থ ("a worthless lot"), তাদের মোকদ্দমা দিবেন না। সেই অনুসারে আমি তাঁদের মোকদ্দমা দেওয়া একদম বন্ধ করিলাম। ইহাতে দুই তিনজন "অনাহারী"র বিশেষ অসুবিধা হইল—অর্থাৎ যাঁহারা চাকুরী পাওয়ার দরখাস্ত দিয়াছিলেন—"হুজুর আমাকে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য দিয়া প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা হয়।" কিন্তু ভবতারণবাবুকে আপনারা অবশ্য চেনেন—তিনি সে দলের নহেন। তিনি একজন বড় জমীদার, সুশিক্ষিত, ভদ্র ব্যক্তি। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের এই হুকুমকে একটা insult (অপমানজনক) মনে করিলেন। তিনি তখন দার্জ্জিলিং ছিলেন, সেখানে বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিয়া এই কথা জানাইলেন, এবং Bengal Council এ একজন মেম্বর দ্বারা Interpellation করাইলেন। সেই Interpellation এর নকল রিপোর্ট দেওয়ার জন্য যে দিন আমাদের সাহেবের কাছে আসিল, সাহেবের অমনি চক্ষুঃ স্থির। সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল—"well, Ananta Babu, I wish to inspect your criminal work today." (আমি আপনার ফৌজদারী কার্য্য পরিদর্শন করিব)। আমি বলিলাম "All right, Sir" (বেশ তো, দেখুন)—আমি তখন পেষ্‌কারকে রেজেষ্টারী বই ও নথিপত্র লইয়া সাহেবের খাস কামরায় আসিতে বলিলাম। পেষ্‌কার ফৌজদারী মোকদ্দমার নথিপত্র আনিয়া সাহেবের সম্মুখে টেবিলের উপর সাজাইয়া দিতেই, সাহেব খুব গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "Well Ananta Babu, I see your file is now very heavy, you can now make over case to Honorary magistrates, Good morning," (আপনার ফাইলে তো দেখছি এখন অনেক মোকদ্দমা—আপনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটদের মোকদ্দমা দিবেন।) এই ত সাহেবের inspection—আমি যেন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না আমি মনে মনে হাসিয়া বিদায় হইলাম।"

কৃষ্ণধনবাবু মুনসেফ্ বলিলেন, "এ সাহেবটা তো দেখছি একটা আস্ত হাঁদারাম। ওর এতটুকু বুদ্ধি নেই—যে ওর এই চালবাজি সকলেই বুঝ্‌তে পারে ?"

অনন্তবাবু বলিলেন—"বুদ্ধি খুবই আছে, তবে সে বদ-মাইসি বুদ্ধি। লোকটা নিতান্ত ভীতু উপরওয়ালার কাছে কোন বিষয়ে কৈফিয়ৎ দিতে হইলেই দিগ্-বিদিগ্ জ্ঞান থাকে না। যাক এ সব কথা। এখন তোমরা ভাই, কেউ একটা গান টান কর—আজ শুভদিনে আমরা কার্ত্তিক-বাবুকে অভিনন্দন করতে এসেছি অবশ্য farewellটা এর পরে হবে।"

এই কথায় বিমলবাবু সব-ডেপুটী হার্ম্মোনিয়ম লইয়া আরম্ভ করিলেন। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় জলযোগান্তে তাঁহারা সকলে হাসিতে হাসিতে বিদায় হইলেন।

৩

পরদিন সকালে ৯টার সময় কার্ত্তিকবাবু কালেক্‌টার সাহেবের কুঠীতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইলেন। কালেক্‌টার হট্‌পট্ সাহেব তাঁহার কার্ড পাইয়াই তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কার্ত্তিকবাবু তাঁহার আফিস কক্ষে যাইয়া তাঁহাকে সেলাম করিয়া বসিয়া বলিলেন,—

"Sir, I got this telegram yesterday after-noon from Government. I have been trans-ferred to Kachudanga as S.D.O." (আমি কাল বৈকালে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই টেলিগ্রাম পাই-য়াছি, আমাকে কচুডাঙ্গা মহকুমার ভারার্পণ করিয়া বদলী করা হইয়াছে)

সাহেব হাত বাড়াইয়া সেই টেলিগ্রামটী লইয়া বলিলেন,—"I am glad to hear it Kartik Babu. But I have not yet got any order from Govt. How is it ?" (আমি শুনে সুখী হইলাম, কিন্তু আমার কাছে তো এ পর্য্যন্ত কোন হুকুম আসে নাই ইহার কারণ কি ?)

এই বলিয়া সাহেব মনোযোগের সহিত সেই টেলি-গ্রামটা দেখিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন—

"You see,Kartik Babu, the telegram does not bear any p.o. seal on it. It is very sus-picious." (কার্ত্তিকবাবু আপনি দেখুন না, এই টেলি গ্রামে কোন পোষ্টাফিসের মোহর নাই, এটা বড়ই সন্দেহ-জনক)

কার্ত্তিকবাবু কি বলিবেন, কিছু বুঝিতে না পারিয়া সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সাহেব হাসিতে হাসিতে আবার বলিলেন,—

"Now I have solved the mystery. Some-body must have played hoax upon you. You see 1st. April is writeen on the top of it. "Ho ho-ho—" (আমি এখন এই রহস্য ভেদ করিতে পারিয়াছি। কোন ব্যক্তি আপনাকে তামাসা করিয়াছে। এই দেখুন না, টেলিগ্রামের উপরে-ই ১লা এপ্রিল লেখা রহিয়াছে।) এই বলিয়া সাহেব কার্ত্তিকবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকবাবুর মুখ চুণ হইয়া গেল। এই সময়ে একজন চাপরাশি সদ্যঃ প্রাপ্ত ডাকের চিঠি-গুলি খুলিয়া তাহাতে তারিখের মোহর মারিয়া একটা ঝুড়িতে করিয়া সাহেবের সম্মুখে আনিয়া দিল। সাহেব সেগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, এবং একখানা চিঠি হাতে করিয়া কার্ত্তিকবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন —

"Here you are. This is the Govt. order transferring you to the headquarters station of Dinajsahi." (এই দেখুন—গবর্ণমেণ্ট আপনাকে দিনাজসাহী জেলার সদরে বদলী করিয়াছেন)

কার্ত্তিকবাবু চিঠিখানা হাতে লইয়া নিতান্ত কাঁদো-কাঁদো ভাবে তাহা পড়িতে লাগিলেন। সাহেব তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"Don't be upset Kartik Babu. Dinaj-sahi is not a bad place. I was there as an Assistant Magistrate. You will get plenty of Hilsa fish and good mangoes. Of course it is not a subdivision. And I think you will get a Subdivision in due course. You have got a good record of service. Good morning." (কার্ত্তিকবাবু আপনি ঘাবড়াবেন না। দিনাজসাহী জায়গা খারাপ নয়, আমি সেখানে এসিষ্টাণ্ট

ম্যাজিষ্ট্রেট, ছিলাম। সেখানে গিয়ে খুব ইলিস মাছ ও ভাল ভাল আম খাবেন। তবে অবশ্য সেটা মহকুমা নয়, কিন্তু আপনার গবর্ণমেণ্টে যেরূপ কাজের সুখ্যাতি আছে, আপনি যথাসময়ে মহকুমার ভার পাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে এখন আসুন।)

কার্ত্তিকবাবু সাহেবকে তাঁহার সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে সাহেবের কাছে গিয়াছিলেন, এবার কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিলেন। তিনি কাছারিতে গিয়া আর কাহারও সঙ্গে মিশিলেন না। সন্ধ্যাবেলা সবজজবাবুর আড্ডায়ও গেলেন না, কিন্তু সবজজবাবু স্বয়ং তাঁহার দলবল লইয়া তাঁহার বাসায় আসিয়া তাঁহাকে সকলে মিলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকবাবু বুঝিলেন, কেষ্ট মাষ্টার বাবুই যত নষ্টের গোড়া, নচেৎ টেলিগ্রামের খাম ও ফর্ম্ম কোথায় পাওয়া যাইত? অবশ্য অন্যান্য ছোকরা বাবুরাও সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলেন। যাহা হউক, কার্ত্তিকবাবু যেদিন চার্জ্জ দিয়া দিনাজসাহী যাত্রা করিলেন, তাহার পূর্ব্বদিন এই সকল বাবু মিলিয়া সবজজবাবুর বাসায় তাঁহাকে এক মস্ত farewell dinner (বিদায় ভোজ) দিলেন। তাঁহার মনের মালিন্য কাটিয়া গেল।

গানের ফুল

[শ্রীকরুণাময় বসু

চোখের জলে ভাসিয়ে দিনু
　　গানের যত ফুল।
ভিড়্‌বে গিয়ে কোন্ ঘাটেতে,
　　কোথায় পাবে কূল?
কোথায় যেতে কোন্ দেশেতে,
সীমাবিহীন উদ্দেশেতে,
আঁখির আলো আঁধারেতে
　　উঠ্‌ছে শুধু ফুটে!
যাহার তরে কান্না আমার
　　নিরুদ্দেশে লুটে।

এ মোর নহে কথাই শুধু,
　　এ যে গানের ডালা।
দেখা হ'লেই তাহার গলে
　　জড়িয়ে দেব মালা।
সকাল থেকে সন্ধ্যে বেলা
গানের কুঁড়ির কর্‌ছি মেলা;
ভাসিয়ে দিছি একটি ক'রে
　　অসীম পারাবারে,—
রঙীন হ'য়ে তার চরণে
　　ফুটুক পরপারে।
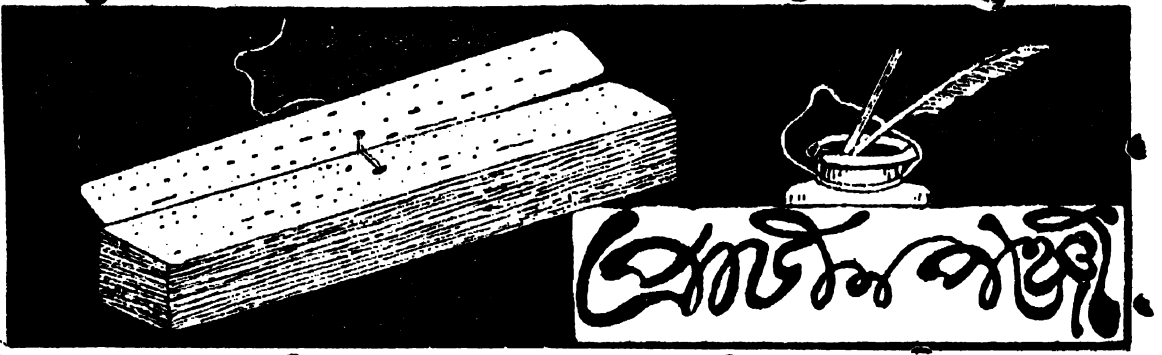
দুর্গোৎসব

দুর্গোৎসব বাংলা দেশের পরব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এর নাম গন্ধও নাই ; বোধ হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল হতেই বাংলায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। পূর্ব্বে রাজা-রাজড়া ও বনেদী বড় মানুষদের বাড়ীতেই কেবল দুর্গোৎসব হতো, কিন্তু আজকাল অনেক পুটে তেলীকেও প্রতিমা আন্‌তে দেখা যায় ; পূর্ব্বেকার দুর্গোৎসব ও এখনকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।

ক্রমে দুর্গোৎসবের দিন সংক্ষেপ হয়ে পড়লো ; কৃষ্ণনগরের কারিকরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসে গেল। জায়গায় জায়গায় রং করা পাটের চুল, তবলকীর মালা, টীন ও পেতলের অসুরের ঢাল তলওয়ার, নানা রঙ্গের ছোবান প্রতিমের কাপড় ঝুলতে লাগলো ; দর্জ্জিরা ছেলেদের টুপি, চাপকান ও পেটী নিয়ে দরোজায় দরোজায় বেড়াচ্চে ; 'মধুচাই !' 'শাকা নেবে গো।' বোলে ফিরিওয়ালা ডেকে ডেকে ঘুরচে। ঢাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে মহাজন, আতরওয়ালা ও যাত্রার দালালেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছে। কোনখানে কাঁসারীর দোকানে রাশীকৃত মধুপর্কের বাটী, চুমকী ঘটী ও পেতলের থালা ওজন হচ্চে, ধূপ-ধুনো, বেনে মসলা ও মাথাঘসার একটা দোকান বসে গেছে। কাপড়ের মহাজনেরা দোকানে ডবল পর্দ্দা ফেলেচে। দোকানঘর অন্ধকার প্রায়, তারি ভিতরে বসে যথার্থ পাই-লাভে বউনি হচ্চে। সিন্দুর চুপড়ী, মোম বাতী, পিঁড়ে ও কুশাসনেরা অবসর বুঝে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে 'অ্যাকুডেক্টর' উপর বার দিয়ে বসেছে। বাঙ্গাল ও পাড়াগেঁয়ে চাকরেরা আরসি, ঘুন্‌সি, গিল্টির গহনা ও বিলাতী মুক্তা একচেটেয় কিনচেন ; রবারের জুতো, কম্‌ফরটার, টিক্ ও স্তাজওয়ালা পাগড়ী অগুন্তি উঠ্‌চে, ঐ সঙ্গে বেলোয়ারি চুড়ী, আঙ্গিয়া, বিলাতী সোনার শীল আংটী ও চুলের গার্ডচেনেরও অনঙ্গত খদ্দের। এতদিন জুতোর দোকানে ধুলো ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পূজোর মরসুমে, বিয়ের কনের মত কেপে উঠচে ; দোকানের কপাটে কাই দিয়ে নানা রকম রঙ্গিণ কাগজ মারা হয়েচে, ভিতরে চেয়ার পাতা, তার নীচে এক টুকরো ছেঁড়া কারপেট। সহরে সকল দোকানেরই, শীতকালের কাজের মত, চেহারা ফিরেচে। যত দিন ঘুনিয়ে আস্‌চে, ততই বাজারে কেনা-বেচা বাড়চে ; কলকেতা বড় গরম হয়ে উঠ্‌চ্ছে। পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাধতে বেরিয়েচেন ; রাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড় লেগে গেচে।

কোনখানে খুন, কোনখানে দাঙ্গা, কোথায় সিঁধ চুরী, কোনখানে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছ থেকে দু'ভরি রূপো গাঁট কাটায় কেটে নিয়েচে ; কোথায় কোন মাগীর নাক থেকে নথ ছিড়ে নিয়েচে। পাহারাওয়ালা শশব্যস্ত, পুলিস বদমাইস পোরা "লাগে তাক্ না লাগে তুক্কা", "কিনি তো গণ্ডা'র, লুটি তো ভাণ্ডার" চোরের পুজোর মরসুমে দেদার কার্ব্বার ফালাও কচ্চে। চুরী তাদের জপমন্ত্র হয়েচে। অনেকে পার্ব্বণের পূর্ব্বে শ্রীঘরে ও রেঙ্গুণে বসতি কচ্চে ; কারো পুণ্যার পাথরে পাঁচ কিল ; কারো সর্ব্বনাশ ! ক্রমে চতুর্থী এসে পড়লো !

এবার অমুক ববুর বাড়ীতে পূজোর ভারী ধুম। প্রতিপদাদি-কল্পের পর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েচে, আজও চোকে নাই—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে বাড়ী গিস্‌গিস্ কচ্চে। বাবু দেড় ফিট উচ্চে গদীর উপর তসর কাপড় পরে বার দিয়ে বসেচেন। দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হবীশ্বর ন্যায়ালঙ্কার সভাপণ্ডিত অনবরত নস্য নিচ্চেন ও নাসা-নিঃসৃত রঙ্গিণ কফজল জাজিমে পুঁচ্চেন। এদিকে জহুরী জড়ওয়া গহনার পুঁটুলী ও ঢাকাই মহাজন ঢাকাই শাড়ীর গাঁট নিয়ে বসেচেন। মুন্সি মশাই জামাই ও ভাগনে বাবুরা ফর্দ্দ করচেন। সামনে কতক-গুলি প্রিতিমে-ফেলা দুর্গাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, বাইয়ের দালাল, যাত্রার অধিকারী ও গাইয়ে ভিক্ষুক 'যে আজ্ঞা' 'ধর্ম্ম অবতার' প্রভৃতি প্রিয় বাক্যের উপহার দিচ্চেন। বাবু মধ্যে মধ্যে কারেও এক আধটা আগমনী গাইবার ফরমাস্ কচ্চেন। সভাপণ্ডিত মহাশয় করপুটে পিরিলীর বাড়ীর বিধবাবিবাহের দলের এবং বিপক্ষ পক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাট্‌চেন। অনেকে তাঁর পা ছুঁয়ে দিব্বি গাল্‌লেন যে, তাঁরা পিরিলীর বাড়ী চেনেন না। বিধবা-বিয়ের সভায় যাওয়া চুলোয় যাক্, গত বৎসর শয্যাগত ছিলেন বল্লেই হয়। কিন্তু বাপের মুখে জেলে ডিঙ্গীর মত তাঁদের কথা তল্ হয়ে যাচ্চে, নাম-কাটাদের পরিবর্ত্তে সভাপণ্ডিত আপনার জামাই, ভাগনে, নাতজামাই, দৌহিত্র

ও খুড়তুতো ভেয়েদের নাম হাসিল কচ্চেন ; এদিকে নাম-কাটার বাবু ও সভাপণ্ডিতকে বাপান্ত করে পৈতা ছিঁড়ে গালে চড়িয়ে শাপ দিয়ে উঠে যাচ্চেন। অনেক উমেদারের অনবরত হাজরের পর বাবু কাকেও 'আজ যাও' 'কাল এসো' 'হবে না', 'এবার এই হলো' প্রভৃতি অনুজ্ঞায় আপ্যায়িত কচ্চেন—হজুরী সরকারের হেকমত দেখে কে! সকলেই শশব্যস্ত, পুজার ভারী ধূম।

ক্রমে চতুর্থীর অবসান হলো, পঞ্চমী প্রভাত হলেম—ময়রারা দুর্গোমণ্ডা বা আগাতোলা সন্দেশের ওজন দিতে আরম্ভ কল্লে। পাঁঠার রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট বাজারে প্যারেড কত্তে লাগলো, গন্ধবেণেরা মস্‌লা ও মাথাঘসা বেঁধে বেঁধে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো। আজ সহরের বড় রাস্তায় চলা ভার, মুটেরা প্রিমিয়মে মোট বইছে ; দোকানে খদ্দের বস্‌বার স্থান নাই। পঞ্চমী এইরূপে কেটে গেলো, আজ ষষ্ঠী ; বাজারের শেষ কেনা-বেচা, মহাজনের শেষ তাগাদ আশার শেষ ভরসা। আমাদের বাবুর বাড়ীর ত অপূর্ব্ব শোভা ; সব চাকর-বাকর নতুন তকমা উর্দ্দী ও কাপড় পে'রে ঘুরে বেড়াচ্চে। দরজার দুই দিকে পূর্ণ কুম্ভ ও আম্রসার দেওয়া হয়েচে। ঢুলীরা মধ্যে মধ্যে রোশণচৌকী ও শানাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজাচ্চে। জামাই ও ভাগনেবাবুরা নতুন জুতা ও নতুন কাপড় পোরে ফর্‌রা দিচ্চেন। বাড়ীর কোন বৈঠকখানায় আগমনী গাওয়া হচ্চে। কোথাও নতুন তাস-জোড়াটা পরকানো হচ্চে। সমবয়সী ও ভিক্ষুকের মেলা লেগেচে। আতরের উমেদারেরা বাবুদের কাছে শিশি হাতে করে রাতদিন ঘুরচে। কিন্তু বাবুদের এমনি অনবকাশ যে, দুফোঁটা আতর দানের অবকাশ হচ্চে না।

এদিকে সহরের বাজারের মোড়ে ও চৌরাস্তায় ঢুলী ও বাজন্দারের ভিড়ে সেঁধোনো ভার! রাজপথ লোকারণ্য ও মালীরা পথের ধারে পদ্ম, চাঁদমালা, বিল্লিপত্র ও কুচো ফুলের দোকান সাজিয়ে রেখেচে ; দইয়ের ভার, মণ্ডার খুলী ও লুচি ও কচুরীর গুড়ায় রাস্তা জুড়ে গেচে। রেয়ো ভাট ও আমাদের মত ফলারেরা মিমো করে নিচ্চে— কোথা যায়?

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সহরে প্রতিমার অধিবাস হয়ে গেলো! কিছুক্ষণ পরে ঢোল-ঢাকের শব্দ থামলো। পুজাবাড়ীতে ক্রমে 'আন্‌রে' 'কর রে' 'এটা কি হলো' কত্তে কত্তে ষষ্ঠীর শর্ব্বরী অবসন্না হলো ; সুখতারা মৃদু পবন আশ্রয় করে উদয় হলেন, পাখীরা প্রভাত প্রত্যক্ষ করে ক্রমে ক্রমে বাসা পরিত্যাগ কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে ; সেই সঙ্গে সহরের চারিদিকে বাজনা বাদ্দি বেজে উঠলো, নব পত্রিকায় স্নানের জন্য কর্ম্মকর্ত্তারা শশব্যস্ত হলেন—ভাবুকের ভাবনায় বোধ হতে লাগলো যেন সপ্তমী কোরমাথান নতুন কাপড় পরিধান করে হাস্‌তে হাস্‌তে উপস্থিত হলেন। এদিকে সহরের সকল কলাবউয়েরা বাজনাবাদ্দি করে স্নান কত্তে গেলেন, বাড়ীর ছেলেরা কাঁসর ও ঘড়ী বাজাতে বাজাতে সঙ্গে সঙ্গে চল্লো। এদিকে বাবুর কলাবউয়েরও স্নানের সরঞ্জাম বেরুলো, আগে আগে কাড়া, নাগরা, ঢোল ও শানাই-দারেরা বাজাতে বাজাতে চল্লো, তার পেছুনে নতুন কাপড় পরে আশাশোটা হাতে, বাড়ীর দরওয়ানেরা; তার পশ্চাৎ কলাবউ কোলে পুরোহিত, পুথি হাতে তন্ত্রধারক, বাড়ীর আচার্য্য বামুন, গুরু ও সভাপণ্ডিত, তার পশ্চাৎ বাবু। বাবুর মস্তকে লাল সাটীনের রূপার রামছাতা ধরেচে। আশে পাশে ভাগনে, ভাইপো ও জামাইয়েরা। পশ্চাৎ আমলা ফয়লা ও ঘরজামাইয়েরা, ভগিনীপতেরা, মোসাহেব ও বাজে দল ; তার শেষে নৈবেদ্দ লণ্ঠন ও পুষ্পপাত্র, শাঁখ ঘণ্টা ও কুশাসন প্রভৃতি পুজার সরঞ্জাম মাথায় মালীরা। এই প্রকার সরঞ্জামে প্রসন্নকুমার ঠাকুরবাবুর ঘাটে কলাবউ নাইতে চল্লেন ; ক্রমে ঘাটে পৌঁছিলে কলাবউয়ের পুজো ও স্নানের অবকাশে হুজরও গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করে নিয়ে, স্তব পাঠ কত্তে কত্তে অনুরূপ বাজনা-বাদ্দির সঙ্গে বাড়ীমুখো হলেন।

পাঠকবর্গ! এ সহরে আজকাল দু চার এজুকেটেড ইয়ং বেঙ্গলও পৌত্তলিকতার দাস হয়ে পুজো আচ্ছা করে থাকেন ; ব্রাহ্মণ ভোজনের বদলে কতকগুলি দিলদোস্ত মদে ভাতে প্রসাদ পান ; আলাপি ফিমেল ফ্রেণ্ডরাও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন ; পুজোরো কিছু রিফাইণ্ড কেতা। কারণ, অপর হিন্দুদের বাড়ী নিমন্ত্রিত প্রদত্ত প্রণামী টাকা পুরোহিত ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য ; কিন্তু এদের বাড়ীর প্রণামীর টাকা বাবুর অ্যাকাউণ্টে ব্যাঙ্কে জমা হয় ; প্রতিমার সামনে বিলাতী চর্ব্বির বাতী জ্বলে ও পুজোর দালানে জুতো নিয়ে ওঠবার এলাওয়েন্স থাকে। বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে সাজ নিয়ে প্রতিমে সাজানো হয়—মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্ত্তে বনেট্ পরেন, স্যাণ্ডউইচের বোতল খান, আর কলাবউ গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে কাৎলো-করা গরম জলে স্নান করে থাকেন। শেষে সেই প্রসাদী গরমজলে কর্ম্মকর্ত্তার প্রাতরাশের টী ও কফি প্রস্তুত হয়।

ক্রমে তাবৎ কলাবউয়েরা স্নান করে ঘরে ঢুকলেন। এদিকে পুজাও আরম্ভ হলো, চণ্ডীমণ্ডপে বারকোসের উপর আগাতোলা মোণ্ডাওয়ালা নৈবিদ্দ সাজানো হলো। সঙ্গতি বুঝে সাড়ী, চিনীর থাল, ঘড়া, চুমকী ঘটী ও সোনার লোহা, নয়তো কোথাও সন্দেশের পরিবর্ত্তে গুড় ও মধুপর্কের বাটীর পরিবর্ত্তে খুরী ব্যবস্থা। ক্রমে পুজো শেষ হলো ; ভক্তেরা এতক্ষণ অনাহারে থেকে পুজোর শেষে প্রতিমাকে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। বাড়ীর গিন্নিরা চণ্ডী শুনে জল খেতে গেলেন, কারো বা নবরাত্রি। আমাদের বাবুর বাড়ীর পুজোও শেষ হলো প্রায়, বলিদানের উদ্‌যোগ হচ্চে। বাবু মায় ষ্টাফ্ আদুড় গায়ে উঠানে দাঁড়িয়েচেন, কামার কোমর বেঁধে প্রতিমের কাছ থেকে পুজো ও প্রতিষ্ঠা করা খাঁড়া নিয়ে, কাণে আশীর্ব্বাদী ফুল গুজে, হাঁড়-কাটের কাছে উপস্থিত হলো, পাশ থেকে একজন মোসাহেব 'খুটী ছাড়' ! 'খুটী ছাড়' ! বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে পাঁঠাকে হাড়কাঠে পুরে খিল এঁটে দেওয়া হলো। একজন

পাঁঠার মুড়ি ও আর একজন ধড়টা টেনে ধল্লে—অমনি কামার 'জয় মা ! মাগো' বোলে কোপ তুল্লে। বাবুরাও সেই সঙ্গে 'জয় মা মাগো !' বলে প্রতিমের দিকে ফিরে চেঁচাতে লাগলেন—ধুপ্ করে কোপ পড়ে গেলো—গীজা গীজা গীজা গীজা, নাক্ টুপ টুপ্ টুপ্, গীজা গীজা টুপ টুপ শব্দে ঢোল, কাড়ানাগরা ও ট্যামটেমী বেজে উঠলো ; কামার সরাতে সমাংস করেদিলে, পাঁঠার মুড়ির মুখ চেপে ধরে দালানে পাঠানো হলো। এদিকে একজন মোসাহেব সন্তর্পণে খর্পরের সরা আচ্ছাদিত করে প্রতিমের সম্মুখে উপস্থিত কল্লে। বাবুরা বাজনার তরঙ্গের মধ্যে হাততালি দিতে দিতে, ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে উঠলেন্। প্রতিমার সাম্নে দানের সামগ্রী ও প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হলো ; আরতি আরম্ভ হলো। বাবু স্বহস্তে গঙ্গাজল ধবল চামর ব্যজন কত্তে লাগলেন, ধূপ-ধূনোর ধোয়ে বাড়ী অন্ধকার হয়ে গেল। এইরূপে আধঘণ্টা আরতির পর শাখ বেজে উঠলো—সবাবু সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বৈঠক-খানায় গেলেন। এদিকে দালানে বামুনেরা নৈবিদ্দ নিয়ে কাড়াকাড়ি কত্তে লাগলো ; দেখতে দেখতে সপ্তমী পুজো ফুরালো। ক্রমে নৈবিদ্দবিলি, কাঙ্গালী বিদায় ও জলপান বিলানোতেই সে দিনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো ; বৈকালে চণ্ডীর গানওয়ালারা খানিকক্ষণ আসর জাগিয়ে বিদায় হলো। জগা স্যাকরা চণ্ডীর গানের প্রকৃত ওস্তাদ ছিল। সে মরে যাওয়াতেই আর চণ্ডীর গানের তেমন গায়ক নাই ; বিশেষতঃ এক্ষণে শ্রোতাও অতি দুর্লভ হয়েছে।

ক্রমে ছটা বাজলো, দালানের গ্যাসের ঝাড় জ্বেলে দিয়ে প্রতিমার আরতি করে দেওয়া হলো এবং মা দুর্গার শেতলের জলপান ও অন্যান্য সরঞ্জামও সেই সময়ে দালানে সাজিয়ে দেওয়া হলো। মা দুর্গা যত খান বা না খান, লোকে দেখে প্রশংসা কল্লেই বাবুর দশ টাকা খরচের সার্থকতা হবে। এদিকে সন্ধ্যার সঙ্গে দর্শকের ভিড় বাড়তে লাগলো ; বাঙ্গাল দোকানদার, * * * খুদে খুদে ছেলে ও আদবয়সি ছোড়া সঙ্গে কাতারকাতার প্রতিমে দেখতে আসতে লাগলো। এদিকে নিমন্ত্রিত লোকে সেজেগুজে এসে ঝনাৎ করে একটা টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম কল্লে। অমনি পুরুত একছড়া ফুলের মালা নেমন্তন্নের গলায় দিয়ে টাকাটা কুড়িয়ে ট্যাকে গুজলেন, নেমন্তন্নেও হন্ হন্ করে চলে গেলেন। কলকেতা সহরে এই একটা আজগুবি কেতা ; অনেক স্থলে নিমন্ত্রিতে ও কর্ম্মকর্ত্তার চোরে কামারের মত সাক্ষাৎ হয় না, কোথাও পুরোহিত বলে দিন 'বাবুরা ওপরে'। ঐ সিড়ি মশাই যান্ না।' কিন্তু নিমন্ত্রিত যেন চির প্রচলিত রীতি অনুসারেই আজ্ঞে না, আরো পাঁচ জায়গায় যেতে হবে, থাক্ ; বলেই টাকাটি দিয়ে অমনি গাড়ীতে উঠেন, কোথাও যদি কর্ম্মকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে গীরগিটের মত উভয়েই একবার ঘাড় নাড়ানাড়ি হয়ে থাকে। সন্দেশ মেঠাই চুলোয় যাক্, পান তামাক মাথায় থাক, সর্ব্বত্রই সাদর সম্ভাষণেরও বিলক্ষণ অপ্রতুল। দুএক জায়গায় কর্ম্মকর্ত্তা জরির মছলন্দ পেতে সামনে আতরদান, গোলাবপাশ সাজিয়ে, পয়সার দোকানের পোদ্দারের মত বসে থাকেন। কোন বাড়ীর বৈঠকখানায় চোহেলের রৈ রৈ ও হৈ হৈয়ের তুফানে নেমন্তন্নদের সেদুতে ভরসা হয় না—পাছে কর্ম্মকর্ত্তা ত্যেড়ে কামড়ান কোথায় দরজা বন্ধ, বৈঠকখানায় অন্ধকার, হয় তো বাবু ঘুমুচ্চেন, নয় বেরিয়ে গ্যাচেন, দালানে জনমানব নেই, নেমন্তন্নে কার সুমুখে যে, প্রণামী টাকা ফেলবেন ও কি করবেন, তা ভেবে স্থির কোত্তে পারেন না। কর্ম্মকর্ত্তার ব্যাভার প্রতিমা পর্য্যন্ত অপ্রস্তুত হন। অথচ এরকম নেমন্তন্ন না কল্লেই নয়। এই দরুণ অনেক ভদ্রলোক আর 'সামাজিক' নেমন্তন্নে যান না,ভাগনে বা ছেলেপুলের দ্বারাতেই ক্রিয়েবাড়ীর পুরুতের প্রাপ্য কিংবা বাবুদের ওৎকরা টাকাটা পাঠিয়ে দেন , কিন্তু আমাদের ছেলেপিলে না থাকায় স্বয়ং গমনে অসমর্থ হওয়ায় স্থির করেচি, এবার সব প্রণামীর টাকায় পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প কিনে ডাকে পাঠিয়ে দেবো। তেমন তেমন আত্মীয় স্থলে (সেফ্ অ্যারাইভ্যালের জন্য) রেজেষ্টরী করে পাঠান যাবে। যে প্রকারেই হোক টাকাটি পৌছনো নেয় বিষয়। অধ্যাপক ভায়ারা এ বিষয়ে অনেক সুবিদে করে দিয়েচেন। পুজো ফুরিয়ে গেলে তাঁরা প্রণামীর টাকাটি আদায় কত্তে স্বয়ং ক্লেশ নিয়ে থাকেন ; নেমন্তন্নের পূর্ব্ব হতে পুজোর শেষে তাঁদের আত্মীয়তা আরও বৃদ্ধি হয় ; অনেকে প্রণামী চাইতে আসাই পুজোর প্রুফ্ ! !

মনে করুন, আমাদের বাবু বড্ডো বড় মানুষ ; চাল স্বতন্তর। আরতির পর বেনারসী জোড় পরো সভাসদ সঙ্গে নিয়ে দালানে বার দিলেম ; অমনি তকমাপরা বাঁকা দরওয়ানেরা তলওয়ার খুলে পাহারা দিতে লাগলো; হরকরা ; হুকোবরদার, বিবির বাড়ীর বেহারা ও মোসাহেবরা জোড়হস্ত হয়ে দাঁড়ালো, কখন কি ফরমাস হয়। বাবুর সামনে অ্যাকটা সোনার আলবোলা,ডাইনে অ্যাকটা পান্নাবসান ফুরসি, বাঁয়ে অ্যাকটা হীরেবসান টোপদার গুড়গুড়ি ও পে নে অ্যাকটা মুক্তো বসান পেঁচুয়া পড়লো ; বাবু আঁস্তা কুড়ের কুকুরের মত ইচ্ছা অনুসারে আশে পাশে মুখ দিচ্চেন ও আড়ে আড়ে সাম্নে বাজে লোকের ভিড়ের দিকে দেখচেন—লোকে কোনটার কারীগরীর প্রশংসা কচ্চে ; যে রকমে হোক্ লোককে ভ্যাখানো চাই রে বাবুর রূপো-সোনার জিনিস অঢেল ; অ্যামন কি বসবার স্থান থাক্লে আরও দুটো ফুরসি ও গুড়গুড়ি ভ্যাখানো যেতো। ক্রমে অনেক অনাহুত ও নিমন্ত্রিত জড় হতে লাগলেন, বাজে লোকে চণ্ডীমণ্ডপ পুরে গ্যাল। জুতো চোরেরা, সেই সুযোগে তলোয়ারের পাহারার ভিতর থেকেও দুঝুড়ি জুতো সরিয়ে ফেল্লে। কচ্ছপ জলে থেকেও ডাঙ্গায় ডিমের প্রতি যেমন মন রাখে, সেইরূপ অনেকে দালানে বাবুর সঙ্গে বসে কথাবার্ত্তার মধ্যেও আপনার জুতোর

গুপোরও নজর রেখেছিলেন ; কিন্তু ওঠবার সময় দেখেন যে, জুতোয়াম কচ্ছপের ডিমের মত ফুটে মরেচেন, ভাঙ্গা ডিমের খোলার মত হয় তো এক পাটী ছেড়া চটী পড়ে আছে।

এ দিকে দেখতে দেখতে গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গ্যাল ; ছেলেরা 'বোমকালী কলকেত্তাওয়ালী' বোলে চেঁচিয়ে উঠলো। বাবুর বাড়ি নাচ, সুতরাং বাবু আর অধিকক্ষণ দালানে বোস্‌তে পাল্লেন না, বৈঠকখানায় কাপড় ছাড়তে গ্যালেন ; এদিকে উঠানের সমস্ত গ্যাস জ্বেলে দিয়ে মজলিসের উদ্‌যোগ হতে লাগ্‌লো, ভাগ্নেরা ট্যাসল দেওয়া টুপি ও পেটী পোরে ক্ষপরদালালী কত্তে লাগ্‌লেন। এদিকে দুই অ্যাকজন নাচের মজলিসি নেমন্তন্নে আস্‌তে লাগলেন। মজলিসে তরফা নাবিয়ে দেওয়া হলো। বাবু জরি ও কালাবৎ এবং নানাবিধ জড়ওয়া গহনায় ভূষিত হয়ে ঠিক একটি 'ইজিপসন মমী' সেজে মজলিসে বার দিলেন—বাই সারঙ্গের সঙ্গে গান করে সভাস্থ সমস্তকে মোহিত কত্তে লাগ্‌লেন।

নেমন্তন্নেরা নাচ দেখতে থাকুন, বাবু ফর্‌রা দিন ও লাল চোকে রাজা উজীর মারুন—পাঠকবর্গ অ্যাকবার সহরটার শোভা দেখুন—প্রায় সকল বাড়িতেই নানা প্রকার রং তামাসা আরম্ভ হয়েচে ; লোকেরা খাতায় খাতায় বাড়ি বাড়ি পুজো দেখে ব্যাড়াচ্চে। রাস্তায় বেজায় ভীড়। ঝাড়ওয়ারি খোট্টার পাল, মাগির খাতা ও ইয়ারের দলে রাস্তা পুরে গ্যাচে। নেমন্তন্নের হাত লাঠনওয়ালা, বড় বড় গাড়ীর সইসেরা প্রলয় শব্দে পইস্ পইস্ কচ্চে, অথচ গাড়ী চালাবার বড় বেগতিক। কোথায় সকের কবি হচ্চে, ঢোলের চাটি ও গাওনার চীৎকারে নিদ্রাদেবী সে পাড়া থেকে ছুটে পালিয়েছেন, গানের তানে ঘুমন্তো ছেলেরা মার কোলে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠচে। কোথাও পাঁচালী আরম্ভ হয়েচে, বওয়াটে পিলইয়ার ছোকরারা ভরপুর নেশায় ভোঁ হয়ে ছড়া কাটুচেন ও আপনা আপনি বাহোবা দিচ্ছেন ; রাত্তির শেষে শ্রাদ্ধ গড়াবে, অবশেষে পুলিশে দক্ষিণা দেবে। কোথাও যাত্রা হচ্ছে, মণিগোঁসাই সং এসেছে, ছেলেরা মণিগোঁসায়ের রসিকতায় আহ্লাদে আটখানা হচ্চে, আশে পাশে চিকের ভেতর মেয়েরা উঁকি মাচ্চে, মজলিসে রামমসাল জ্বলচে, বাজে দর্শকদের বাতকর্ম্ম ও মসালের দুর্গন্ধে পুজোবাড়িতে তিষ্ঠন ভার! ধুপ ধুনোর গন্ধও হার মেনেচে। কোনখানে পুজোবাড়ির বাবুরাই খোদ মজলিস রেখেছেন—বৈঠকখানায় পাঁচো ইয়ার জুটে নেউল নাচানো, ব্যাং লাগানো, খ্যাবটা ও বিদ্যাসুন্দর আরম্ভ করেচেন ; অ্যাক অ্যাক বারের হাসির গর্‌রায় সিয়াল ডাকে ও মদন আগুনের তানে—দালানে ভগবতী ভয়ে কাঁপচেন, সিঙ্গি চোরাকে কামড়ান পরিত্যাগ করে ল্যাজ গুটিয়ে পলাবার পথ দেখচে, লক্ষ্মী সরস্বতী শশব্যস্ত! এ দিকে সহরের সকল রাস্তাতেই লোকের ভিড়, সকল বাড়িই আলোময়!!

এই প্রকারে সপ্তমী, অষ্টমী ও সন্ধিপুজো কেটে গ্যালো ; আজ নবমী, আজ পুজোর শেষ দিন। এতদিন লোকের মনে যে আহ্লাদটি জোয়ারের জলের মত বাড়তেছিল, আজ সেইটির একেবারে সারভাটা!!

আজ কোথাও জোড়া মোষ, কোথাও নবইটা পাঁঠা, গুপারি, আক, কুমড়ো, মাগুরমাছ ও মরীচ বলিদান হয়েচে ; কর্ম্মকর্ত্তা পাত্র টেনে পাঁচোইয়ারে জুটে নবমী গাচ্চেন ও কাদা মাটি কচ্চেন, ঢুলীর ঢোলে সঙ্গত হচ্চে, উঠানে লোকারণ্য ; উপর থেকে বাড়ির মেয়েরা উঁকী মেরে নবমী দেখচেন। কোথাও হোমের ধুমে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেছে ; কার সাধ্য প্রবেশ করে—কাঙ্গালী, রেওভাট ও ভিক্ষুকের পুজোবাড়ী ঢোকা দূরে থাকুক, দরজা হতে মশাগুলো পর্য্যন্ত ফিরে যাচ্ছে। ক্রমে দেখতে দেখতে দিনমণি অস্ত গ্যালেন, পুজোর আমোদ প্রায় সম্বৎসরের মত ফুরালো। ভোরাও ওক্তে ভয়রোঁ রাগিণীতে অনেক বাড়িতে বিজয়া গাওনা হলো ; ভক্তের চক্ষে ভগবতীর প্রতিমা পরদিন প্রাতে মলিন মলিন বোধ হতে লাগলো, শেষে বিসর্জ্জনের সমারোহ সুরু হলো—আজ নিরঞ্জন!!

ক্রমে দেখতে দেখতে দশটা বেজে গ্যাল, দইকড়মা ভোগ দিয়ে প্রতিমার নিরঞ্জন করা হলো, আরতির পর বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে উঠলো, বামুন বাড়ির প্রতিমারা সকালেই জল সই হলেন। বড়মানুষ ও বাজে জাতির প্রতিমা পুলিশের পাশ মত বাজনা-বাদ্দির সঙ্গে বিসর্জ্জন হবেন—এ দিকে একাল্ল সে কাজে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং টুং টাং করে দুপুর বেজে গ্যাল, সূর্য্যের বৃদ্ধ তপ্ত উত্তাপে সহর নিম্‌কি রকম গরম হয়ে উঠলো ; এলোমেলো হাওয়ায় রাস্তায় ধুলো ও কাঁকর উড়ে অন্ধকার করে তুল্লে। বেকার কুকুরগুলো দোকানের পাটাতনের নীচে ও খানার ধারে শুয়ে জিব বাইর কয়ে হাঁপাচ্চে, বোজাই গাড়ির গরুগুলোর মুখ দে ফ্যানা পড়চে—গাড়োয়ান ভয়ানক চীৎকারে "শালার গরু চলে না" বলে ল্যাজ মুলচে ও পাঁচনবাড়ি মাচ্চে ; কিন্তু গরুর চাল বেগড়াচ্চে না, বোজাইয়ের ভরে চাকাগুলি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা মাতিয়ে চলেচে। চড়াই ও কাকগুলো বারাণ্ডা, আলসে ও নলের নীচে চক্ষু মুদে বসে আছে। ফিরিওয়ালারা ক্রমে ঘরে ফিরে যাচ্চে, রিপুকর্ম্ম ও পরামাণিকরা অনেকক্ষণ হলো ফিরেচে ; আলু পটোল! ঘি চাই! ও তামাকওয়ালা কিছুক্ষণ হলো ফিরে গ্যাছে। ঘোল চাই! মাখম চাই! ভয়সা দই চাই। ও মালাই দইওয়ালারা কড়ি ও পয়সা গুন্তে গুন্তে ফিরে যাচ্চে, অ্যাখন কেবল মধ্যে মধ্যে পাণিফল! কাগোজ বদল! পেয়ালা পিরিচ! ফিরিওলাদের ডাক শোনা যাচ্চে—নৈবিদ্দি মাথায় পুজো বাড়ির লোক, পুজুরী বামুন, প্যাটো ও বাজন্দার ভিন্ন রাস্তায় বাজে লোক নাই ; গুপুস্ করে একটার তোপ পড়ে গ্যাল। ক্রমে অনেক স্থলে ধুমধামে বিসর্জ্জনের উদ্‌যোগ হতে লাগলো।

হায়! পৌত্তলিকতা কি শুভদিনেই এ স্থানে পদার্পণ করেছিল ;

অ্যাতো দেখে শুনে মনে স্থির জেনেও আমরা তারে পরিত্যাগ কত্তে কত কষ্ট ও অসুবিধা বোধ কচ্চি। ছেলেব্যালা যে পুতুল নিয়ে খ্যালাঘর পেতেছি, বৌ বৌ খেলেছি ও ছেলেমেয়ের বে দিয়েচি, আর বড় হয়ে সেই পুতুলকে পরমেশ্বর বলে পুজো কচ্চি ;—তাঁর পদার্পণে পুলকিত হচ্চি ও তাঁর বিসর্জ্জনে শোকের সীমা থাকচে না—শুধু আমরা কেন কত কত কৃতবিদ্য বাঙ্গালী সংসারের ও জগদীশ্বরের সমস্ত তত্ত্ব অবগত থেকেও হয় ত সমাজ না হয় পরিবার-পরিজনের অনুরোধে পুতুল পুজে আমোদ প্রকাশ করেন, বিসর্জ্জনের সময় কাঁদেন ও কাহারও মধ্যে কোলাকুলি করেন ; কিন্তু নাস্তিকতায় নাম লিখিয়ে বনে বসে থাকাও ভাল, তবু "জগদীশ্বর অ্যাক্‌মাত্র" এটি জেনে আবার পুতুলপূজায় আমোদ প্রকাশ করা উচিত নয়।

ক্রমে সহরের বড় রাস্তা চৌমাথা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা আলাপিতে পুরে গ্যাল, ইংরাজি বাজনা, নিশেন, তুরুকসোয়ার ও সার্জ্জন সঙ্গে প্রতিমারা রাস্তায় বাহার দিয়ে ব্যাড়াতে লাগলেন—তখন 'কার্ প্রতিমা উত্তম' 'কার্ সাজ ভাল' 'কার্ সরঞ্জাম সরেস' প্রভৃতির প্রশংসারই প্রয়োজন হচ্চে, কিন্তু হায়! 'কার্ ভক্তি সরেস' কেউ এ বিষয়ের অনুসন্ধান করে না—কর্ম্মকর্ত্তাও তার জন্য বড় কেয়ার করেন না। এদিকে প্রসন্নকুমার বাবুর ঘাট ভদ্দর লোক গোচের দর্শক, খুদে খুদে পোষাক করা ছেলে, মেয়ে ও ইস্কুলবয়ে ভরে গ্যাল। কর্ম্মকর্ত্তারা কেউ কেউ প্রতিমে নিয়ে বাচ খেলিয়ে ব্যাড়াতে লাগলেন—আমুদে মিন্‌ষে ও ছোঁড়ারা নৌকোর উপর ঢোলের সঙ্গতে নাচতে লাগলো ; সৌখীন বাবুরা খ্যামটা ও বাই সঙ্গে করে বোট, পিনেস ও বজরার ছাতে বার দিয়ে বস্‌লেন—মোসাহেব ও ওস্তাদ চাকরেরা কবির সুরে দু অ্যাকটা রংদার গান গাইতে লাগলো।

"বিদায় হও মা ভগবতি এ সহরে এসো নাকো আর।
দিনে দিনে কলিকাতার মর্ম্ম দেখি চমৎকার।
জষ্টিসেরা ধর্ম্ম অবতার, কায়মনে কচ্চেন সুবিচার।
এদিকে ধুলোর তরে রাজপথেতে চেঁচিয়ে চেয়ে চলা ভার।
পথে হাগা মোতা চল্‌বে না, লহোরের জল তুলতে মানা ;
লাইসেন্সটেক্স মাথটচাঁদা, পাইখানার বাসি ময়লা রবে না।
হেল্‌থ অফিসর, সেতখানার মেজেষ্টর,
ইন্‌কমের আসেসর সাজে সবারে,
আবার গভর্ণরের শুয়ে দৃষ্টি সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার।
অসহ্য হতেছে মাগো। অসাধ্য বাস করা আর।
জীয়ন্তে এই ত জ্বালা মাগো।—
মলেও শান্তি পাবে না ;
মুখাগ্নির দরকার্কা কলেতে কর্ব্বে সৎকার।
হুতোমদাস তাই সহর ছেড়ে আসমানে করেন বিহার।"

এদিকে দেখতে দেখতে দিনমণি ধ্যান সম্বৎসরের পুজোর আমোদের সঙ্গে অস্ত গ্যালেন। সন্ধ্যাবধূ বিচ্ছেদ-বসন পরিধান করে দ্যাখা দিলেন। কর্ম্মকর্ত্তারা প্রতিমা নিরঞ্জন করে, নীলকণ্ঠ শঙ্খচীল উড়িয়ে 'দাদাগো' 'দিদিগো' বাজনার সঙ্গে ঘট নিয়ে ঘরমুকো হলেন। বাড়িতে পৌঁছে চণ্ডীমণ্ডপে পূর্ণ ঘটকে প্রণাম করে শান্তিজল নিলেন ; পরে কাঁচা হলুদ ও ঘটজল খেয়ে পরস্পর কোলাকুলি কল্লেন। অবশেষে কলাপাতে দুর্গানাম লিখে সিদ্ধি খেয়ে বিজয়ার উপসংহার হলো। ক দিন মহাসমারোহের পর আজ সহরটা খাঁ খাঁ কর্ত্তে লাগলো—পৌত্তলিকের মন বড়ই উদাস হলো ; কারণ লোকের যখন সুখের দিন থাকে, তখন সেটীর তত অনুভব কত্তে পারা যায় না, যত সেই সুখের মহিমা দুঃখের দিনে বোঝা যায়।

—হুতোম প্যাঁচার নক্সা
শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

আমার দুর্গোৎসব

সপ্তমী পূজার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল! আমি কেন আফিঙ্গ খাইলাম! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখনও দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল অন্ধকার, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-সঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা! মা!' বলিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা? কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা! চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্ভুজা নানা প্রহরণ-প্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী

ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞান-মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্য-সিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।

কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম,সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে,আমার সর্ব্বার্থসাধিকে। অসংখ্যসন্তান-কুলপালিকে। ধর্ম্ম-অর্থ-সুখদুঃখ-দায়িকে। আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি প্রীতি বৃত্তি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি ; তুমি এই অনন্ত জলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎ-সমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নব রাগরঙ্গিণি, নব-বল-ধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিণি!—এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটী সন্তান একত্রে, এককালে, দ্বাদশ কোটী কর জোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটী মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎ-সুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধু-সেবিতে, সিন্ধু-পূজিতে, সিন্ধুমথনকারিণি! শত্রু বধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকাল-স্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্ত-শক্তি-প্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব, মা? এই ছয় কোটী মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটী কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব—এই ছয় কোটী দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটী চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এস, যাঁহার ছয় কোটী সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত-কাল-সমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গ-সঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পুরিল! তখন যুক্ত-করে সজল-নয়নে ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা! দেবি দেবানুগৃহীতে! এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব, অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ, উঠ মা, উঠ বঙ্গজননী!

মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?

এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটী মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে। উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি,—সেই স্বর্ণ-প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃ-হীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধুম বাধিবে। কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লুচি-মণ্ডার লোভে বঙ্গ-পূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশ-বিদেশ হইতে ভদ্রাভদ্র মায়ের চরণে প্রণামী দিবে—কত দীন-দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পুরিবে। কত নর্ত্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে—মা! মা! মা!

জয় জয় জয় জয়া জয়দাত্রি!
জয় জয় জয় বঙ্গজগদ্ধাত্রি!
জয় জয় জয় সুখদে জয়দে।
জয় জয় জয় বরদে শর্ম্মদে।
জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি।
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমঙ্করি।
দেবক-দলনি, সন্তান-পালিনি।
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।
জয় জয় লক্ষ্মি বারীন্দ্রবালিকে।
জয় জয় কমলাকান্তপালিকে।
জয় জয় ভক্তি-শক্তি-দায়িকে।
পাপ-তাপ-ভয়-শোক-নাশিকে।
মৃদুল-গম্ভীর-ধীর-ভাষিকে।
জয় মা কালি করালি অম্বিকে।
জয় হিমালয়-নগবালিকে।
অতুলিত-পূর্ণচন্দ্র-ভালিকে।
শুভে শোভনে সর্ব্বার্থ-সাধিকে।
জয় জয় শান্তি শক্তি কালিকে।
জয় মা কমলাকান্তপালিকে।
নমোঽস্তু তে দেবি বরপ্রদে শুভে।
নমোঽস্তু তে কামচরে সদা ধ্রুবে।
ব্রহ্মাণীন্দ্রাণি রুদ্রাণি ভূতভব্যে যশস্বিনি।
ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি।
নমোঽস্তু তে জগন্নাথে জনার্দ্দনি নমোঽস্তু তে।
প্রিয়দান্তে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে।
ত্রায়স্ব মাং বিশালাক্ষি ভক্তানামার্ত্তিনাশিনি।
নমামি শিরসা দেবী বন্ধনৈস্তু বিমোচিতঃ। *

কাঙালিনী

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।

---

* কমলাকান্তের দপ্তর— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি,
কানে তাই পশিতেছে আসি',
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন।
চারিদিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক-তপন।
কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশ ভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,—
কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপরে পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন।
হের তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।
শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মা'র মায়া পায় নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে।
তাই বুঝি আঁখি ছলছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা।
চেয়ে যেন মা'র মুখপানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে, "মাগো, এ কেমন ধারা?
এত বাঁশি এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন ভূষণ;
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন?"

ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি,
ভাই বোন করি' গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই!
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে—
"আমি তো ওদের কেহ নই!
স্নেহ ক'রে জননী আমার
পরায়ে তো দেয় নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক'রে নিয়ে
মুছায়ে তো'দেয় নি নয়ন।"
আপনার ভাই নেই ব'লে
ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ?
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কিরে করিবে না স্নেহ?
ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে র'বে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে?
ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড় বাঁশি,
দুয়ারেতে সজল নয়ন
এ বড় নিষ্ঠুর হাসিরাশি।
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব?
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লান মুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা,
তবে মিছে মঙ্গল-কলস!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মর্ম্মর-সীতা

(গল্প)

[শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়]

এক

সুন্দরসিং ভাস্করের কার্য্য করে। পাথর কাটিয়া তাহার দিনগুলি যেন কঠোর হইয়া যায়। আঘাতের পর নিষ্ঠুর আঘাত করিয়া সে পাথরের নিস্পন্দ বক্ষে তরুণীর চটুল চাহনি—প্রবীণের সজল স্মৃতি ফুটাইয়া তোলে; তথাপি তাহার ভাবান্তর নাই। সে যে শ্রমিক, কেবল শ্রমের মূল্য পাইলেই সন্তুষ্ট।

একদিন এক প্রৌঢ় আসিল তাহারই দ্বারে,—সসম্ভ্রমে সুন্দর তাহাকে ভিতরে আহ্বান করিল।

সন্তর্পিত চরণে ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রৌঢ় বলিল, "শুনেছি তোমার গড়া মূর্ত্তি দেখে দর্শকও মূর্ত্তির মতই অচল হ'য়ে যায়। আমায় কয়েকটা মূর্ত্তি দেখাবে?" প্রৌঢ়ের জীর্ণবিলাস পরিচ্ছদ একটা হারাণ সম্পদের কথা জানাইয়া দেয়। তাহার ললাটে একটি কুঞ্চনও নাই, তথাপি যেন মনে হয় এই বয়সেই জীবনের চরম পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে

শিষ্ট-হাস্যে সুন্দরসিং বলিল, "এই ত অনেক মূর্ত্তিই রয়েছে, দেখুন,—এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থেকেও আমি ত কই অচল হ'য়ে যাই নি।"

প্রৌঢ় একটি মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "মূর্ত্তি গড়তে তুমি কত পারিশ্রমিক নাও?"

সুন্দরসিং বলিল, "সেটা মূর্ত্তির আকারের উপর নির্ভর করে, তবে ৫০০৲ টাকার কমে কাজ হয় না।"

"পাঁচ শ টাকা। তা এমন কি বেশী,—তার তুলনায় ওর চতুর্গুণও তুচ্ছ। আচ্ছা—আমায় একটা মূর্ত্তি গ'ড়ে দেবে?—কিন্তু কি করেই বা গড়বে তার মূর্ত্তি,—সে মানবীও নয়—দেবীও নয়!"

লোকটাকে উন্মত্ত ভাবিয়া সুন্দরসিং বলিল, "ওরূপ অদ্ভুত মূর্ত্তিতে আমার ক্ষমতায় কুলবে না।"

"কি বললে—অদ্ভুত! ছিঃ ভাস্কর, এই প্রৌঢ়ের উপর যে তার কতখানি দাবি ছিল তা তুমি বুঝ্‌বে না। এই হতভাগার পক্ষে সে ছিল একটি পবিত্র আশীর্ব্বাদের মত,—আমার শতছিন্ন সৌভাগ্যের মাঝে তার কোন বিকৃতিই ঘটে নি।—নাও ভাস্কর এই হীরের আঙটি নাও, দয়া ক'রে তার একটী মূর্ত্তি আমায় গড়ে দিও।—ওকি তুমি নীরব কেন? বল করবে কি না।"

সুন্দরসিং বলিল, "কাজের আপত্তির দিক দিয়ে আমি নিরুত্তর নই। কি দেখে হবে—একখানি ছবিও ত চাই।"

"তা নেই, তবে আমার মনের ছবি যদি দিই? তাতেই তার সবটাই গাঁথা আছে; কিন্তু দেখে নেওয়ার কাজটা যে তোমার, ভাই।"

কোন জটিলতাই যে অবসন্ন মস্তিষ্কের খাদ্য নয়, তথাপি একটা কৌতূহলের বশে সুন্দরসিং তাহার পরিচয় চাহিয়া বসিল।

প্রৌঢ় বলিল, "পরিচয় যে দিতেই হবে, আমার পরিচয়ের সঙ্গে যে তার পরিচয় জড়িত রয়েছে।"

একটী গাঢ় দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রৌঢ়ের ললাট হইতে রক্তিম আভা অপসারিত করিয়া দু একটি করুণ রেখা ফুটাইল।

প্রৌঢ় আরম্ভ করিল, "আমার অদৃষ্ট বলে কিছু নেই,—সবই দৃষ্টির পথ আগ্‌লে অযোগ্যতার মর্ম্মঘাতী সার্থকতা লুটে নিয়ে আমায় মনুষ্যত্বের দাবি বুঝিয়ে দিয়েছে। লোকে বলে আলো ও ছায়া। আমার সবটাই ছিল ছায়া—সেথায় কর্ম্ম নেই—কেবল তার শৈথিল্যটুকুই আরামে লুটিয়ে পড়ে। এই ছায়াতেই নিজের বিতৃষ্ণায় নিজেই শিউরে উঠতুম। তাই কাউকে নিজের পরিচয় দিতুম না। লোকে যা জান্‌ত তা আমার পরিচয় নয়—আমার নামের একটা অর্থহীন পরিচয় মাত্র।"

সুন্দরসিং একটা কেদারা দেখাইয়া বলিল, "কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?—বসুন।"

প্রৌঢ় আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "আমার জন্মস্থান সেই হিমালয়ের গায়ে। আমি রাজার বংশধর! আশ্চর্য্য বোধ কোরো না, বন্ধু। ২৫ খানি গ্রামের অধীশ্বর আমি,—আমার উপাধিও ছিল রাজা। রাজকীয় বলে আমার জুতারও ইজ্জৎ আমার চেয়ে বেশী ছিল। এখন এই ললাটে সেই উপাধিগত রাজটীকার একটি ক্ষীণ রেখাও রাখি নি। রাজা—রাজা—আমি রাজা! রক্তের জোরে নয়—রক্তের সম্পর্কে, আর সেই অনর্থক সম্পর্কের সহায় হ'য়েছিল সেই উচ্ছিষ্ট উপাধিটা। আমার চেয়ে আমার ফটকের বিকলবন্দুকধারী সিপাহীরও একটা মূল্য আছে,—সেও তবু শাসনদণ্ডের একটা নিষ্ফল প্রতিধ্বনি করবার অধিকারী। আমিই কেবল দর্শনযোগ্য বিলাসপিণ্ড,—তবুও আমার আভিজাত্যের গৌরব! কিন্তু এ আভিজাত্যের জন্য রাজা যে অপরাধী নয় তার রাজত্বটাই অপরাধী। আজ আভিজাত্য-বিদ্রোহীর এই শীর্ণ দেহ ও মলিন বসন তা ভাল করেই বুঝিয়ে দেবে। রাজছত্রের শুষ্ক গর্ব্বটাকে তুচ্ছ করে বাইরে এসে দাঁড়ালেই রাজাও যে তোমাদেরই মত মানুষ। এই রকম আসনে বসে আমি যে শত-সহস্র নিয়মবদ্ধ অন্যায়ের জন্য দায়ী,—এ জন্মগত দায়িত্বের কে হিসাব নেবে?"

দুই

প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা তোমার ভাল লাগছে?"

সুন্দরসিং একটী কথায় উত্তর দিল, "বলুন।"

প্রৌঢ় বলিয়া চলিল, "চৈত্র মাসের শেষে দেশ মহামারীতে ভ'রে গেল। যে দিকে শুনি—কেবল যমরাজারই জয়ধ্বনি। গ্রামে গ্রামে শিশুর ক্রন্দনও আড়ষ্ট হ'য়ে গেল। একদিন এক বৃদ্ধ এসে সসম্ভ্রমে সম্মান জানিয়ে বললে, 'তুমি রাজা—আমাদের মা-বাপ, তবে এমন হয় কেন? আমার একটি মাত্র ছেলে তার বুড়ী মায়ের কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে চায়, কিন্তু রাজা, তোমার কর্ম্মচারীরা এমন অবস্থা ক'রে দিয়েছে যে, তার পথ্য-পাত্রটি পর্য্যন্ত নেই।' বৃদ্ধ বালকের মত কেঁদে উঠল, কিন্তু আমার শুষ্ক কণ্ঠ থেকে একটা সান্ত্বনার শব্দও বেরুল না। সে পাগলের মত ব'লে উঠল, 'রাজা!—রাজা! একটা প্রতিকার ভিক্ষা করি।' আমার মুখ থেকে একটা রাজোচিত কপট উত্তর শুনে বৃদ্ধ আশ্বস্ত হ'য়ে ফিরে গেল।

"দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করলুম—উত্তর পেলুম ঠিক আমারই মত। প্রতিকারের ব্যবস্থায় সে বললে, 'রাজা হয়ে প্রজা-শাসন কার্য্যে বাধা দেওয়া উচিত নয়।' ঠিক বলেছে দেওয়ান,—রাজা আছি, রাজাই থাকব,—প্রজা-শাসনের কখনও অধিকার ছিল না, থাকবেও না। রাজত্ব থাকলেই প্রজাশাসন চলবে, তাতে রাজার অস্তিত্বের মূল্য নেই।

"কেবল এই এক বৃদ্ধের কথা নয়—কত সংবাদ কত দিক থেকে এসে কেবল আমাকেই দায়ী করে। বিরক্ত হ'য়ে প্রাসাদের বাইরে অনেক সময় কাটাতে হ'ত।

"এমনি একদিন প্রাসাদ থেকে কিছু দূরে এক গাছতলায় তাকে দেখলুম—সে কিশোরী। তখন সে রোগ-যন্ত্রণায় কাতর ছিল। প্রাসাদে নিয়ে এলুম—শুশ্রূষায় সে সেরে উঠল, কিন্তু পরিচয় দিতে পারল না। সে যে অশিক্ষিতা সে যে বোবা,—কেবল আচরণেই তার বংশ পরিচয়। তার নাম রাখা হল কমলা। তার উদ্দাম প্রকৃতি সকলকেই বিরক্ত করে তুল্‌ত, কিন্তু আমার সামান্য ইঙ্গিতটী সে একদিনের জন্যও অমান্য করে নি। লোকে বল্‌ত—ভিখারীর মেয়ে বুঝি রাজরাণী হবে। আমার মন বলত—ক্ষতি কি? চাঁদ থেকে রূপের ফাঁদ নিয়ে সে নেমে আসে নি,—তার মুখখানি ছিল জলে ভাসা পদ্ম-পাতাটির মত নির্ম্মল আর তারই উপর তার চোখ দুটী শিশিরের মত টলমল করত। যত বার আয়নায় মুখ দেখেছি, ততবারই মনে হয়েছে তার মুখের সঙ্গে আমার মুখের যেন কত জন্মের কত মিলই রয়েছে। এই মিলটাতেই সে যেন আমায় দিন দিন বেঁধে ফেলছিল।

"একি! আমার গালে জল কিসের? চোখের বুঝি,—কেন এল? কঙ্কালে আবার করুণা কেন তা হবে না," বলিয়া প্রৌঢ় সজোরে চক্ষু মুছিল।

"এমনি ক'রেই দিন কেটে যায়। একদিন একটা এল, তাতে বড় বড় কত অসংযত অভিশাপের পর

মন্তব্য,—আমি মনুষ্য নামেরও অযোগ্য। রাজকীয় রক্ত চক্ষুকে তারা মানল না—প্রজা ক্ষেপে উঠল,—রাজধর্ম্মের বিপক্ষে নয়—আমার বিপক্ষে, যেন আমিই শিশুপালের মত শত অপরাধী। তাদেরই বা অপরাধ কি? পেষণের চোটে, তাদের ভিতর বাহির চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে—আর তাদেরই অস্থিচূর্ণ দিয়ে রাজত্বের বর্ম্ম তৈরি হ'চ্ছে। অবজ্ঞার একটা স্বস্তিও তারা পায় না—কত সইবে বল?"

"আমার অন্তরের অনেকখানি বিষাক্ত হয়ে গেল। মনে হ'ল যেন রাজত্বের বিশাল মর্ম্মটা সেই দেওয়ালে ইঁটের গাঁথনির সঙ্গে জমাট হয়ে গিয়েছে, আর প্রাসাদময় একটা কঙ্কালের নির্ম্মম আধিপত্য! কি ভয়ঙ্কর! আমারই গলার মুক্তামালা আমাকেই উপহাস করে! তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলুম। কিংখাপ মোড়া বিছানায় যেন জ্বলন্ত অঙ্গার ছড়ান! লাফিয়ে নেমে পড়লুম। বহুমূল্য পোষাক রক্ত-শোষণের আশায় সারা অঙ্গে চেপে বসে যেন কণ্ঠরোধ করতে চায়! তাড়াতাড়ি সেটা খুলে ফেললুম। প্রজার কথাই সত্য হ'ল,—আমিই অরাজক! নিজের বিপক্ষে নিজেই বিদ্রোহী!"

চার

গভীর রাত্রে প্রাসাদ ত্যাগ করলুম পথও জনশূন্য, নির্লজ্জ আত্ম-গোপনের উপযুক্ত সময়। নগ্নপদে সেই প্রথম মুক্তির নিঃশ্বাস। শৈশব যৌবনের কত স্মৃতি সেদিন গুমরে উঠল। জন্মস্থানের মায়া যেন মায়ের মত পিছন থেকে ডাকে,—ব্যথিত হয়ে ফিরে দাঁড়ালুম,—কিন্তু একটা করাল ছায়া এসে পথ-রোধ করে দাঁড়াল আর দুর্ব্বল মনটাকে তীব্র কশাঘাতে কঠোর করে তুললে। আমারই মত চঞ্চল-চরণে কে যেন এগিয়ে এল। সে কমলা! কেন? সে কেন আমার দুর্ভাগ্যের দোসর হবে?—সেই দিন প্রথম সে আমার হাত ধরতে সাহস পেলে,—কোমল স্পর্শে আত্ম-নিবেদন জানাল যে তাকে তো পৃথক করা হয় নি—আমাতেই যে তার সার্থকতা। একটা ঘুমন্ত প্রবৃত্তি জেগে উঠে শুদ্ধ হয়ে গেল। নিশার সাক্ষ্যে অন্ধকার পূজারী—ধীরে ধীরে তার হস্ত আমার চরণ স্পর্শ করল, তারপর দুজনে হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হলুম।

"সোনার শিকল ছিড়ে গিয়েছে। একটা অবসাদের তৃপ্তিতে সমস্ত দেহটা ঢলে পড়তে চায়,—তবু অন্ধকার ভেদ করে চতুর্দ্দিকের অস্তিত্বটা বেশী করে ফুটতে চায়। একটু ঝাপসা আলো, ক্রমেই সেটা পরিষ্কার হয়ে এল। দুজনেই ক্লান্ত হয়ে এক গাছতলায় বসলুম। কত পথ চলেছি তার হিসাব নেই। রৌদ্রের তাপ বেড়ে চলল। কমলাকে অনুনয় ক'রে ফিরে যেতে বললুম কিন্তু তার অসহায় করুণ দৃষ্টি পূর্ব্ব রাত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। আবার অগ্রসর হয়ে সেই বিশাল প্রান্তরের সীমানায় একটা ঝোপের ভিতর এসে পড়লুম। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আবার গভীর রাত্রি এল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সমস্ত শরীর নিরস হয়ে গিয়েছে। অল্পক্ষণ তন্দ্রার পর দেখি কমলার কোলে আমার মাথা—সে অঞ্চল দিয়ে মশা তাড়াচ্ছে। কিন্তু এই অল্প বিশ্রামের ফলে সমস্ত শরীরের রক্ত যেন জ্বলে উঠল। চক্ষুর সম্মুখে এই বিশাল পৃথিবী দুলে উঠল—এতটুকু তার মমতা নেই,—কেবল একটী ক্ষুদ্র হৃদয় যার মূল্য হয় তো দারিদ্র্যের কষ্টি-পাথরে দু'একটা ক্ষীণ রেখাপাত করত—কেবল সে এই দিশাহারার দরদী।—কিন্তু কত কড় তৃপ্তি! সেই নীরব নিশীথে জনহীন প্রান্তরে একত্রে দুটী হৃদয় আবর্জ্জনার মত আপন মর্য্যাদায় অসহ-যোগ করে বসে রইল।"

পাঁচ

"আবার সকাল হল। জল—জল—তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়! এই আঙটী ছিল, কিন্তু এর লোভী কেউ ছিল না যে এর বিনিময়ে আমায় আকণ্ঠ জল পান করাবে। তবে কাকে বলি? কমলা?—না, প্রাণ থাকতে শেষ অবলম্বনটুকুকে সেই নিরালায় বিলিয়ে দেওয়া যায় না। মাথা তুলে দেখলুম—কি হ'ল! কমলা কোথায় গেল! দূরে গাছের পাশের বাঁকটায় সে ছুটে চলে গেল। আত্ম-হারার মত হাহাকার করে ডেকে উঠলুম,—গলায় ব্যথা লাগল। শুষ্ক কণ্ঠ ছিড়ে গেলেও একটা কথা বেরুবে না—চোখের জলও নেই যে ঠোঁট ভিজিয়ে দেবে। মনে হল দূরে যেন একটী ঝরণা,—সেটা যেন এগিয়ে এল! কিন্তু স্পষ্ট দেখা যায় না—কেবল তার পাথর থেকে পাথরে আছড়ে পড়া রূপার ঝলকে সোনার ঝিলিক লাগছে।

উঠতে চাইলুম, পারলুম না—যেন জমীর সঙ্গে আমার দেহটা বাধা। ঈশ্বরের নাম নিয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লুম।

ঈশ্বর—ঈশ্বরের নাম! সমৃদ্ধির লীলায় একদিনও সে তার অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দেয় নি! আঘাতের পর আঘাত দিয়ে সে তার পরিচয় দিচ্ছে! চক্ষু মেলে দেখি কমলা আমায় পাতার ঠোঙ্গায় জল খাওয়াচ্ছে। কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোথায় গিয়েছিলে কমলা?' উত্তরে সে যেন তার মূক-ভাষায় দৃঢ় অনুযোগ করলে, 'জলটুকু খাওয়া শেষ হয় নি।' মন্ত্রমুগ্ধের মতই তার অনুযোগ মেনে নিলুম। দৃষ্টি-বিনিময়ে দেখলুম দুফোঁটা অশ্রু তার গালে জমাট হয়ে রয়েছে আর তার লজ্জা-রক্তিম মুখখানি থেকে একটা দুশ্চিন্তার রেখা কেটে যাচ্ছে।

কমলা—দরিদ্র ঘরের কমলা,—রাজাকে জল খাইয়ে বুঝি কৃতার্থ মনে করছিল! কিন্তু আভিজাত্যের যে স্থান-বিচার আছে। না—না—তা তো নয়, জন্ম-জন্মান্তরের কথা বুঝি তাই এ জন্মে থেকে যেচে প্রতিদান দিতে এসেছে! তার হাত দুটী ধরতে গিয়ে চমকে উঠলুম, 'একি! তোমার ওড়নায় রক্ত কেন? কমলা খিল খিল করে হেসে উঠে তার ওড়নায় বাঁধা কয়েকটী ফল দেখাল,—তার ওড়নাটীও ছিড়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে থেকে বললুম, "এ ঋণ কবে শোধ হ'বে কমলা, তোমার প্রাণের মায়ার চেয়ে কি আমার খাওয়াটাই বড় হল। এই সর্ব্বনাশী খেয়ালের শেষ অভিশাপটা বইবার শক্তি যে আমার নেই।" ততক্ষণে সে ওড়না পেতে ফলগুলি সাজিয়ে ফেলেছিল; একটী ফল আমার হাতে দিয়ে বুঝিয়ে দিলে, 'খাও।' আমি বললুম, 'তুমি খাও।' সে অসম্মতি জানাল। তাকে জোর করে খাওয়াতে গেলুম,—সে তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দুটী দিয়ে ঘোর আপত্তি বুঝিয়ে দিলে। আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আমার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে তোমার লাভ কি কমলা।' সে বুকে হাত রেখে সলজ্জ হাস্যে বুঝিয়ে দিলে 'নিজের জন্য।' মধুর স্বার্থপরতায় তার উজ্জ্বল চোখ আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।' ফলগুলি আমায় ভোগ দিয়ে সে কেবল প্রসাদ-স্বরূপ দুটী খেলে। সেই আমাদের প্রথম হৃদয় বিনিময়। মনে হ'ল আমার হৃদয়ের মধ্যে তারই অনেকখানি,—আর এ যদি কখনও বিফল হয় তাহলে আমার অনন্ত হাহাকার, সুন্দর—সুন্দর, তাই বুঝি আজ হয়েছে!"

দুই

"কিন্তু এ স্থান তো চির-বাসের জন্য নয়। একটা লোকালয়ের পরিত্যক্ত সীমানাও তো চাই। দুর্ব্বল দেহে উঠে দাঁড়াতেই পা টলে উঠল।' ক্ষিপ্রতায় কমলা ধরে ফেললে,—তারপর তার নিজের কাঁধেই আমার হাতটী রেখে সে ধীরে ধীরে আমায় নিয়ে চলল।' রাজ্যে প্রজার পৌরুষ,—এখানে নারীর রক্ত—নারীর বল! এই বুঝি রাজ-শক্তি,—নইলে একটা ক্ষুদ্র মানুষকে অত বড় করে কতদিন বাঁচিয়ে রাখা যায়। স্খলিত শক্তি রাজা! একটা অপূর্ব নারী-শক্তির উপর নির্ভর ক'রে পা-পা করে চলল! এমনি করেই সে জীবনের প্রথমে চলতে শিখেছিল—সেদিন তার নূতন জীবনে আবার নূতন করেই চলতে শিখল। মাটির নিচে দিয়ে যদি চলার পথ থাকত তা হ'লে এই পাশের হাওয়া ওই সামনের গাছটার বিদ্রূপটাও অন্ততঃ সইতে হ'ত না!

কমলার দিকে চেয়ে দেখি—তার ক্লিষ্ট মুখখানি অ-বিচলিত,বললুম,—'আর কত সইবে কমলা?'—মূক উত্তরে সেই উচ্ছৃঙ্খল হাসি। গরিবের মেয়ে, তাই বুঝিয়ে দিলে সহ্য করাই তার অভ্যাস। তার মত গরমিল প্রাসাদে সইবে কেন? সোণার তবক দেওয়া সৌখীন সম্মান সেথায় সাজে ভাল, কিন্তু বেহায়া বন ফুলের প্রণামী তো নেওয়া হয় না।

সন্ধ্যার পর একটা গ্রামে এসে উঠলুম—সেথা অন্য এক জমীদারের অধিকার। গ্রামের এক প্রান্তে পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ করে সংসার পাতা হ'ল,—কমলা হ'ল সেই ঘরের ঘরণী। ভিক্ষাই আমাদের উপজীবিকা। চমক উঠ না বন্ধু! সত্যই ভিক্ষা,—নিজের সমস্ত অভিমানকে অঞ্জলি ভরে দিয়ে তার বিনিময়ে সেই অঞ্জলি ভরেই চাল নিয়েছি, আর স্বস্তির নিঃশ্বাসে নিজেই চমকে উঠেছি। কমলা কতবার করযোড়ে ফিরে যাবার কথা বুঝিয়েছে, কিন্তু নূতন মোহটা যে দুর্জ্জয়।'

সাত

"এক বৎসরের পরের ঘটনাটাই চরম। আমারই হাতে গড়া দীনতার মহাতীর্থে সে আমায় ফেলে গেল। শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে কত অপূর্ণ সাধের আভাষ দিয়ে একটা মধুর মিলনের আশা রেখে গেল। বলতে পার ভাস্কর—সেটা কোন জন্মে সম্ভব হ'বে?"

"কুটীর চুরমার করে তাইতেই তাকে চাপা দিয়ে এলুম! এইবার বল সুন্দর—তুমি তার মূর্ত্তি গড়তে পারবে কি না,—যদি পার তো এই আঙটী পারিশ্রমিক নাও।"

সজল চোখে সুন্দরসিং বলিল, "আপনি অস্থির হবেন না। আমি এ মূর্ত্তি গড়ব। দেবীর অন্তরে পরিচয়ে তাঁর প্রতিমা গড়ব। এইতেই আমার জীবনের পরীক্ষা হোক। তারপর যদি সার্থক হয় তো পুরস্কার চাইব—পারিশ্রমিক নয়।"

"তা হলে তুমি স্বীকৃত হচ্ছ?"

"নিশ্চয়—তবে আপনি তিন দিন পরে আসবেন। তার আগে এসে যেন কাজে বাধা দেবেন না।"

"বেশ"—বলিয়া প্রৌঢ় প্রস্থান করিল।

আট

তিন দিন পরের ঘটনা। সুন্দরসিংএর শিল্পালয়ের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র জনতা। সকলেরই মুখে একই মন্তব্য—"সুন্দরের গড়া অনেক মূর্ত্তি আমরা দেখেছি, কিন্তু এমনটী নয়। এ যেন জন্ম-দুঃখিনী সীতার প্রতিমা,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখ ছাপিয়ে আসে।"

দু'একজন ধনী আশাতিরিক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত, কিন্তু সুন্দরসিং তাহাদের নিবৃত্ত করিয়া বলিল, "এর জন্য একজন তাঁর মহামূল্য—অগ্রিম দিয়ে গেছেন।"

হঠাৎ জনতা ভেদ করিয়া সেই প্রৌঢ় উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "সুন্দর—সুন্দর! তুমি ওকে কোথায় কেমন করে পেলে!"

সুন্দরসিং তাহার কম্পিত দেহ শ্রদ্ধাভরে আলিঙ্গন করিয়া ধীরে ধীরে মূর্ত্তির নিকট লইয়া গেল।

প্রৌঢ় উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিল, "কমলা—কমলা! কে বলে তোমার ভাষা নেই,—তোমার চোখে-মুখে আজ কত ভাষা ফুটে উঠেছে। কত জন্মের কত কথা আজ ব্যাকুল হ'য়ে উঠছে। চল জন্ম-দুঃখিনী—চল সীতা,—তোমায় নিয়ে রাজসূয় করব'—রাজার মতে নয় প্রজার মতে! প্রজাপালন থেকে ভিক্ষা পর্য্যন্ত শিখে নিয়েছি, আর আমায় কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না। এস রাণি! তোমার অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করে আমাদের মধুর মিলন সফল করি।" প্রৌঢ়ের মস্তক সেই মর্ম্মর-মূর্ত্তির অঙ্গে লুটাইয়া পড়িল।

সুন্দরসিং, আকুল-কণ্ঠে বলিল, "রাজা—আমার জন্ম-দেশের রাজা! বহুদিন সে দেশ ছেড়ে এসেছি তবুও পাহাড়ের গায়ে মায়ের সে কুটীর এখনও ভুলতে পারি নি। আজ রাজ-সেবার পরম পুরস্কার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।"

প্রৌঢ়ের সংজ্ঞাহীন দেহ ঈষৎ কম্পিত হইল। জনতার কোন চক্ষুই শুষ্ক ছিল না।
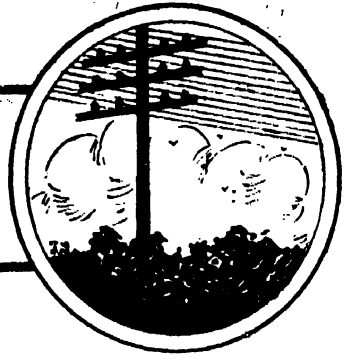
রাসায়নিক পশম

সম্প্রতি British Research Association এক প্রকারের রাসায়নিক পশম প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে প্রতি বৎসর যে কোটী কোটী পাউণ্ড পশমের প্রয়োজন হয় তাহা আর ভবিষ্যতে ভেড়ার লোম হইতে কাটিয়া জোগাইতে হইবে না, রাসায়নিক উপায়ে যখন ইচ্ছা যত খুসী জোগান যাইবে। এই কৃত্রিম পশম ভেড়ার চামড়া হইতেই তৈয়ারী হয়। কিছুদিন হইল এ বিষয়ে এক পরীক্ষা হইয়াছে। প্রথমে ঐ পরীক্ষাগারের অধ্যক্ষ কয়েক খণ্ড ভেড়ার চামড়া লইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দেন, তাহার পর ইহার উপর দিয়া নানারূপ রাসায়নিক প্রবাহ চালান। এইভাবে ইহা দুই চারি দিন রাখিয়া দেখা যায় যে, আপনা হইতেই ঐ মেষচর্ম্মগুলির উপরে পশম গজাইয়া উঠিয়াছে। একবার এই চামড়াগুলির উপর হইতে পশম কাটিয়া লইলে যে আর ভবিষ্যতে ব্যবহার করা যায় না এমন নহে—পুনরায় উহাদের উপর রাসায়নিক দ্রব্যাদি ঢালিয়া দিলে পশম উৎপন্ন হয়।

উর্ব্বরতাদায়ী বটিকা

বিজ্ঞান দিন দিন যে অসাধ্য সাধন করিতেছে তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়! পূর্ব্বে প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সকল দেশেই কিছু কিছু জমী অনুর্ব্বর পড়িয়া থাকিত—তাহাতে কোন কিছুরই চাষ হইতে পারিত না। ইহাতে অধিকাংশ দেশে বিশেষ করিয়া মরু-প্রদেশে ফসল উৎপাদন করা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। এই কারণে বহু দেশ অপরাপর দেশের তুলনায় দরিদ্র ছিল। কয়েকজন ধীমান বৈজ্ঞানিক কয়েক বৎসর ধরিয়া এবিষয়ের প্রতিকারের জন্য গবেষণা করিতেছিলেন। সম্প্রতি California বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ Dr. W. F. Gericke এক প্রকার ("Plant-Pili") বটিকা আবিষ্কার করিয়াছেন।··· যে সমস্ত স্থানে কখনও কোনরূপ ফসল উৎপন্ন হইত না সেই স্থানে এই বটিকা বীজের সহিত রোপণ করিয়া দিলে খুব কম সময়ের মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম হয়।
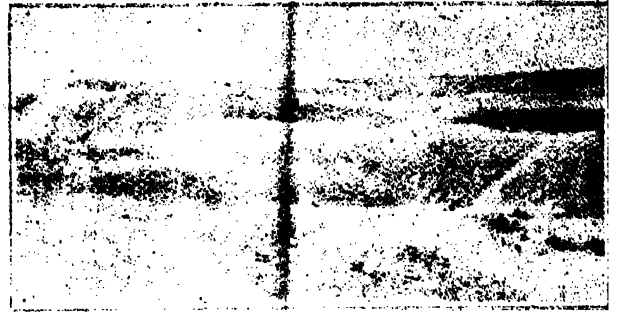
Dr. Gericke কিছুদিন পূর্ব্বে মরুভূমিতে তাঁহার এই বটিকার গুণ পরীক্ষা করিয়াছেন। কয়েকটী বীজের সহিত কতকগুলি বটিকা রোপণ করিয়া দিবার পর খুব অল্প দিনের মধ্যেই অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। আমরা ইহার একখানি ছবি দিলাম। ছবিখানিতে পাঠক পাঠিকাগণ ভবিষ্যতে বালু বারিধির বুকে কিরূপ সবুজের তরঙ্গ বহিবে তাহারই খানিকটা কল্পনা করিয়া লইতে পারিবেন।

সাবাস্ রেডিও!

রেডিও আবিষ্কার হইবার পর যে সভ্যতালোকের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গত মাসের কাগজে রেডিওতে সংবাদ পত্র পাঠাইবার খবর দিয়াছি; আবার আজ আর এক রেডিওর সম্বন্ধে অভিনব খবর দিতেছি।

আমেরিকার Radiogram খবর দিতেছেন যে, একপ্রকারের নূতন রেডিও যন্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে যাহার সাহায্যে কোন দূরদেশ হইতে অপর দেশে যখন যাহা ইচ্ছা করা যাইবে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যদি কাহার মোটার,গ্যারেজ হইতে বাহির করিয়া আনিবার দরকার হয় তাহা হইলে ঘরে বসিয়াই রেডিওর কল-কাটি নাড়িলে আপনিই তাহা গ্যারেজ হইতে বাহির হইয়া আসিবে, জলে জাহাজ চলিবার সময় কাপ্তেন ডাঙায় বসিয়া যে দিকে ইচ্ছা জাহাজ চালাইতে পারিবেন, আকাশে বিমানপোত চলিবে অথচ তাহার কোন পথ-নির্দ্দেশক (pilot) থাকিবে না।

প্রাচীন যুগের বর্ণপরিচয়

ইংরেজী বর্ণ (Alphabet) প্রথম কোন্ দেশে প্রচলিত হয় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধান হইতেছে। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন গ্রীসে; আবার কেহ বলেন, আসেরিয়ায়, কেহ বা ফিনিসিয়ায়; কিন্তু প্রকৃত স্থানটীর সঠিক পরিচয় আজও কেহ দিতে পারেন নাই। তবে মধ্য-এসিয়ার কোন স্থান হইতে যে ইহা প্রথম অদ্ভুত হইয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই।

কিছুদিন হইল Arabia র Written Valley নামক স্থানটীতে এক অনুসন্ধান হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ এই স্থানটীর আশে পাশে পাথরের উপর খোদিত কয়েকটী লিপি পাইয়াছেন। এই খোদিত লিপিগুলির সহিত বর্ত্তমান ইংরেজী বর্ণের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সেই কারণে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এইস্থান হইতেই প্রথম ইংরেজী বর্ণের জন্ম।

আমরা এই প্রাপ্ত পাষাণ খণ্ড গুলির মধ্যে একটীর ছবি দিলাম। এই পাষাণ-লিপি গুলির মধ্যে অতীতের কি ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে কে জানে ?···

অভিনব হোটেল গৃহ

যে ছবিখানি দেওয়া হইল তাহা কি, বুঝিতে বোধ হয় পাঠক পাঠিকাগণের কিছু অসুবিধা হইবে। তাঁহাদের সুবিধার জন্য বলিতেছি উহা আমেরিকার একটী হোটেল গৃহের মডেল।··· বাড়ীটী এমন ভাবে তৈয়ারী করা হইবে যে, উপরের চক্রাকার অংশটী আস্তে আস্তে ঘুরিতে পারে। এইরূপ করিবার কারণ, যখন হোটেলের খরিদ্দারগণ উপরে বসিয়া পানাহার করিবেন, তখন উপরের সমস্ত flat টী আস্তে আস্তে ঘুরাইতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা জাহাজ ট্রেণ প্রভৃতির ন্যায় কোন চলমান জিনিসের উপর বসিয়া থাকিবার আরাম পাইবেন। এই

হোটেলটীতে বসিয়া আহার করিবার সময় যাহাতে দূরের প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্ভার সম্যকরূপে উপভোগ করা যায় সেই কারণে ইহার উচ্চতাও পর্ব্বত প্রমাণ করা হইয়াছে। এই হোটেলটীর পরিকল্পনা করিয়াছেন আমেরিকার Bel Geddes নামক একজন শিল্পী।

নব-নির্ম্মিত কামান

গত মহাযুদ্ধের সময় কত ভয়ানক অস্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছিল তাহা বোধ হয় কেহই বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু আজ বার বৎসর যুদ্ধ শেষ হইলেও নানারূপ প্রাণনাশক অস্ত্র আবিষ্কারের সখ এখনও ইউরোপের মেটে নাই। উদাহরণ স্বরূপ আজ আমরা একটী নূতন কামানের পরিচয় দিতেছি।

এই কামানটী তৈয়ারী করিয়াছেন Robert F. Hudson নামক এক অস্ত্র বিশেষজ্ঞ। এই কামানটীর বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহা ইহাতে প্রতি মিনিটে আট শত করিয়া গুলি নয় মাইল স্থানের মধ্যে ছোঁড়া যায়। তাহা ছাড়া শেল্ প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র ও যে কোন মুহূর্ত্তে ইহারা মুখ দিয়া উদ্গীরণ করান যায়।

এই কামানটীর আবিষ্কারে বিজ্ঞান জগতে নূতন আলোকপাত হইল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভাবিলে সত্যই কাঁপিয়া উঠিতে হয়। আমরা এই কামানটীর একখানি ছবি দিলাম।

দুঃসাহসী লারকিন্স্

বিলাতের Westminister নামক গির্জ্জার ঘড়ীটী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘড়ী। এই ঘড়ীটী মাটী হইতে ১৮২ ফুট উচ্চে গির্জ্জার গম্বুজের সহিত লাগান আছে। ঘড়িটী প্রতিদিন প্রাতে পরিষ্কার করা হয়। Larkins নামক এক ব্যক্তি এই কাজ করিয়া থাকে। সে গির্জ্জার চূড়া হইতে একটী দড়ীর দোলনার মত ঝুলাইয়া তাহার উপর বসিয়া ঘড়িটী পরিষ্কার করে। এই কাজ যে কতদূর বিপজ্জনক তাহা সকলে বুঝিতে পারিতেছেন

ইহার যে ছবি দেওয়া হইল তাহা গির্জ্জার মাথার উপর হইতে তোলা হইয়াছে। এই ছবিখানি হইতে লারকিন্সের কাজ কিরূপ বিপজ্জনক তাহা বেশ বোঝা যায়।

চন্দ্রলোকে সূর্য্যোদয়

আমাদের পৃথিবীতে যেমন নিত্য সূর্য্যোদয় হয় সেইরূপ চন্দ্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহেও হয়; একথা এতদিন ভূগোলের
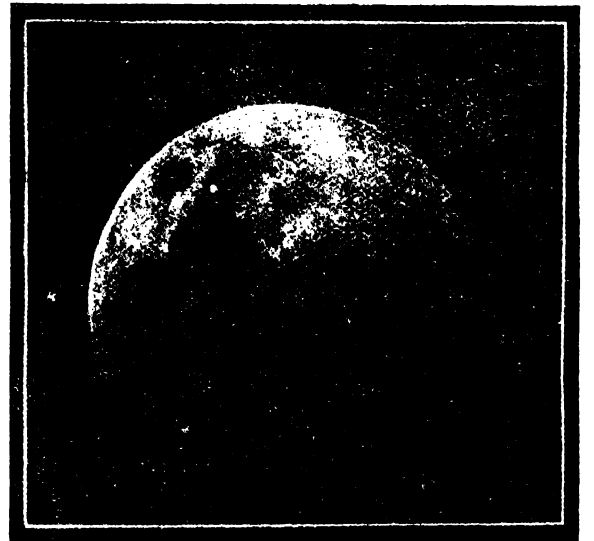
পত্র মধ্যে বন্দী ছিল, চর্ম্মচক্ষুতে দেখিবার সুযোগ আর হইয়া উঠে নাই। সম্প্রতি "Victor" নামে একপ্রকার ক্যামেরা তৈয়ারী হইয়াছে। এই ক্যামেরায় কোন্ গ্রহে কি হইতেছে তাহার ছবি তুলিতে পারা যায়। কিছুদিন হইল Princeton বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক Dr, John Q. Stewart এই ক্যামেরা দিয়া চন্দ্রলোকে সূর্য্যগ্রহণের একখানি ছবি তুলিয়াছেন। ছবিখানি বেশ সুন্দর উঠিয়াছে। ছবিটীর একখানি প্রতিলিপি দেওয়া হইল।

এলুমিনিয়মের গির্জ্জা

এলুমিনিয়মের আবিষ্কারে সভ্য-জগতের যে অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহা যে কেবল আমাদের বাসন তৈয়ারীর কাজেই লাগে তাহা নয়, বর্ত্তমানে ইউরোপে এলুমিনিয়মের তৈয়ারী আস্‌বাবের প্রচলন হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার একটী বাড়ী তৈয়ার করিবার সময় এলুমিনিয়মের পাত দিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে এইরূপ শুনা গিয়াছিল। সম্প্রতি ঐ দেশ হইতে আর এক নূতন খবর আসিয়াছে। আমেরিকার কোন সহরের একটী গির্জ্জা এলুমিনিয়মের পাত দিয়া তৈয়ারী হইয়াছে।… দূর হইতে দেখিলে গির্জ্জাটীকে রূপার তৈয়ারী বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপ ধরণের গির্জ্জা না কি ইহাই প্রথম।
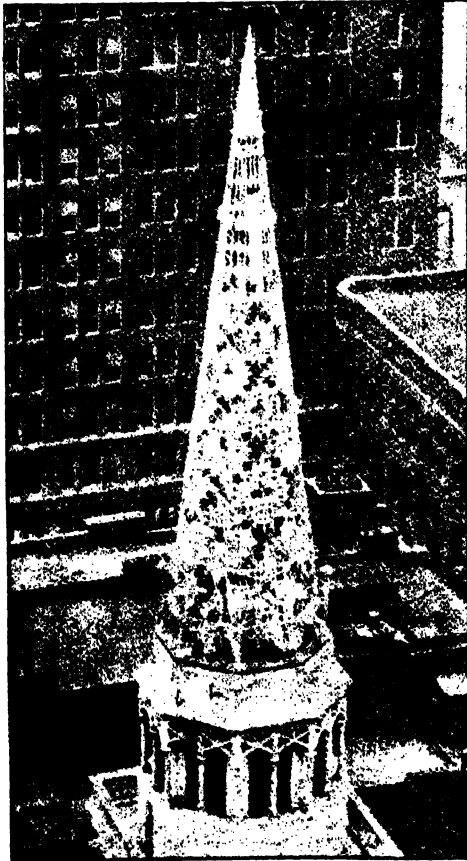
গৃহস্থের সান্ধ্য-বিশ্রাম

ইংরেজ জাতিটা যেমন খাটিতে জানে তেমনই আবার বিশ্রাম সময়টী পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতেও ছাড়ে না। সমস্ত দিনের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যার সময় সকলেই রেডিওর গান শুনিয়া অথবা রসাল আলোচনা করিয়া মনটাকে তাজা করিয়া তোলে।

কিছুদিন হইল সন্ধ্যার এই বিশ্রাম-মুহূর্ত্ত গুলি কাটাইবার পদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।… এটা চলচ্চিত্রের যুগ; তাই সন্ধ্যায় রেডিও উপভোগ করার স্থান চলচ্চিত্র অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমানে আর কেহ রেডিও শুনিয়া সন্ধ্যা কাটায় না—ঘরে বসিয়াই চলচ্চিত্রের ছবি দেখে।

New York-এর Eastern Kodak Co. ঘরে বসিয়া চলচ্চিত্র দেখিবার জন্য গ্রামোফনের ন্যায় এক প্রকার বায়োস্কোপ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রটী মুড়িয়া রাখিলে সাধারণ গ্রামোফন বলিয়া ভ্রম হয়। এই যন্ত্রটীর নিম্নভাগে সিন্ধুকের মধ্যে ছবির 'রিল' রাখিবার খোপ

আছে তাহার মধ্যে চার শত ফুট দীর্ঘ ছাব্বিশটী 'রিল' রাখিবার স্থান সঙ্কুলান হয়। এই যন্ত্রে ছবি দেখিবার জন্য দোকান হইতে ছবি ভাড়া করিয়া আনা যায়, সেইকারণে প্রত্যহ নূতন নূতন ছবি দেখিবার সুবিধা ঘটে। আমরা দুইখানি ছবি দিলাম। একটীতে এক ইংরেজ পরিবার

কেমন সন্ধ্যায় বিশ্রাম সময়ে চলচ্চিত্রে ছবি দেখিয়া সময় কাটাইতেছে তাহা দেখা যাইবে; অপরটীতে এই নবাবিষ্কৃত চলচ্চিত্র যন্ত্রটী মুড়িয়া রাখিলে কিরূপ দেখায় তাহারা নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

পরলোকগত লন্ চ্যানি

গত ২৬ আগষ্ট 'হাজার মুখের অভিনেতা' (An actor of thousand faces) স্বনামধন্য লন চ্যানি (Lon Chaney) হলিউডে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ের যে সমস্ত ছায়া-চিত্র-অভিনেতা হলিউডে অভিনয় করিয়া নাম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে লন চ্যানি যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহার একটী বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা সমস্ত পৃথিবীকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা তাঁহার মুখভাব পরিবর্ত্তন করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা।

লন চ্যানি জাতিতে স্পেনদেশবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা দুইজনেই বিকলাঙ্গ ছিলেন। সেইকারণে তাঁহার প্রথম জীবন ভয়ানক কষ্টের মধ্য দিয়া কাটে। প্রথমে তিনি সাধারণ দর্শকের নিকট সার্কাসের ক্লাউনরূপে দেখা দেন, পরে তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে ছায়া-লোকের বড় বড় শিল্পীদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন; তাঁহারা তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে চলচ্চিত্রে অভিনয় করিবার জন্য আহ্বান করেন।

মৃত্যুকালে লন চ্যানির বয়স হইয়াছিল মাত্র ৪৭ বৎসর। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে পৃথিবী একজন শ্রেষ্ঠ কলাবিদকে হারাইল, সন্দেহ নাই। তাঁহার অভিনীত বইগুলির মধ্যে "The Hunch back of Notre Dame.", "London After midnight", "Mockery", "The Unknown" "Thunder" "Laugh Clown Laugh" "Phantom of the Opera" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

বন্ধুবিয়োগে *

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি-এ]

আমারে চিনি নি আমি, তুমি মোরে চিনাইয়া দিলে,
মানের মালিকাখানি স্নেহ-ডোরে কণ্ঠে তুলাইলে ;
চির অবনত দীন ধূলায় লুণ্ঠিত দুর্ব্বাঘাস
বিগ্রহের শিরে উঠি' লভিল সে আত্মার আভাষ !

বটুকৃষ্ণ ঘোষ

কিন্তু তবু দীনই আমি-আরো দীন করিয়াছ মোরে
তোমার চিত্তের বিত্তে অযোগ্যের রিক্ত থালি ভরে' ;
বিন্দু শিশিরের বুকে বিম্বিত যে অনন্ত আকাশ,
কেমনে লুকাবে,, বন্ধু, সে বিন্দুর ক্ষুদ্র ইতিহাস ?

তবু তার বক্ষ ভরে উদারের সখ্য:পরশনে,
তবু তার চক্ষু জ্বলে আনন্দের অনিন্দ্য কিরণে ;
তারি শ্যাম সমারোহ কোলে তার মেলে ঘনচ্ছায়া,
বিচ্ছুরিত বর্ণচ্ছটা প্রাণে আঁকে মর্ম্মস্পর্শী মায়া !

আজিকে নয়ন মেলি' সে আকাশ হেরি শূন্য ফাঁকা,
বারবার ডানা মেলি' আজি শুধু স্মৃতির বলাকা
যেতে চায় পরপারে অতীতের আলোক-সন্ধানে ;
বদ্ধ হ'য়ে আসে পাখা, অন্ধকারে পথ নাহি জানে !

---

* বন্ধুশ্রেষ্ঠ সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার বটুকৃষ্ণ ঘোষের মৃত্যু উপলক্ষে

আজি তুমি কথাশেষ –কিন্তু সে যে রামায়ণী কথা,
কল্পকালে কভু যার ফুরায় না ব্যথার বারতা
বিদগ্ধ ভক্তের কাণে ; দিন যায়, যত দিন যায়,
পুঞ্জীভূত হাহাকার ঘনাইয়া উঠে বেদনায় !

জা। এ জগৎরীতি—যায় যায় সবি হেথাকার,
দীর্ঘ এ পথের প্রান্তে তপ্ত রক্তে করেছি সৎকার
আত্মার আত্মীয়জনে—তবু মনে সেই প্রশ্ন জাগে,
সাঞ্চত বাঞ্ছার ধন ভেসে গিয়ে কোন্ কূলে লাগে ?—

—কোন্ সাহারার বুকে ? সে বক্ষ কি এমনি উষর
তপ্ত বালুকার বেলা—অগ্নিগর্ভ ধূধূধূ ধূসর—
বারিহীন তৃণহীন প্রাণীহীন অট্ট পরিহাস,
নির্ম্মম কঠোর রুক্ষ প্রভুত্বের বর্ব্বর বিকাশ ?

তাই হোক্, ভালোমন্দ মিথ্যা সব ! সবচেয়ে ভালো,
ধরণীর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য—সৃষ্টি-পুষ্প অকালে শুকালো !
কি হ'বে কথায় মিছে ! প্রচণ্ডের বজ্র পদতল
অভিষেক-অশ্রুজলে কে করিবে পবিত্র উজ্জ্বল ?

তবু হা রে ! অশ্রু ঝরে ; অভিমান, সেও বুঝি যায়,
ন্যায়ের বালুকা-বাঁধে প্রকৃতির বন্যা রাখা দায় !
বাণবিদ্ধ শালবৃক্ষে ঝর্ঝরিত সর্জ্জরস ঝরে—
ধূপগন্ধ ভরি' উঠে নিয়তির নিগ্রহের ঘরে !

জগতের জতুগৃহ জ্ব'লে উঠে কথায় কথায়,
প্রাণপণ ভালবাসা মুহূর্ত্তেকে ভস্ম হ'য়ে যায় !
প্রকৃতির বাজী পুড়ে, ফট্ ফট্ লক্ষ হিয়া ফাটে,
মহাকাল অট্টহাসে সৃষ্টিভাঙা তাণ্ডবের নাটে !

———

ভাষা-মঙ্গল

(এ যুগের গোড়ার কথা)

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

কেবল মাতৃভূমির মহিমা-কীর্ত্তন নয়—মাতৃভাষার মহিমা-কীর্ত্তনও আমরা ইংরেজের আমলে করিতে শিখিয়াছি। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বে যেমন দেশ-প্রীতিমূলক কোনও বাঙ্গালা রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না, তেমনি রামনিধি গুপ্তের পূর্ব্বে মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধক কোনও বাঙ্গালা রচনারও অস্তিত্ব দেখা যায় না। নিধুবাবুই সর্ব্বপ্রথম 'স্বদেশীয় ভাষা'র গুণ গান করিয়া স্বদেশবাসীকে শুনাইয়াছেন—

"নানান দেশে নানান ভাষা—
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা!
কত নদী-সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা!"

ঈশ্বর গুপ্তের 'মাতৃভাষা' সম্বন্ধে যে একটী কবিতা আছে, তাহার প্রশংসা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবু বলেন—"মাতৃসম মাতৃভাষা, সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেকে বুঝিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া একথা বলে? 'বাঙ্গালা বুঝিতে পারি'—এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত।"—কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত বয়সে নিধু গুপ্তের চেয়ে পঁয়ষট্টি বৎসরের ছোট। সুতরাং নিধুবাবুর সময়ে বঙ্গভাষার অবস্থা যে আরও শোচনীয় ছিল, এ কথা সহজেই অনুমেয়। শুনিতে পাওয়া যায়, 'হিন্দুস্থানি খেয়াল ও টপ্পা' শিখিবার সময় ও বন্ধুবর্গকে তাহা শুনাইবার সময় 'বিনে স্বদেশীয় ভাষা হৃদয়ের তৃষা যে ঘুচে' না, এ কথা নিধুবাবু মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন; এবং সেই অনুভূতিরই ফলস্বরূপ বাঙ্গালা টপ্পা ও উপরি উক্ত গানটি তাঁহার নিকট হইতে আমরা শুনিতে পাইয়াছি। নিধুবাবু তাঁহার 'গীতরত্ন' নামক পুস্তকের 'ভূমিকা'য় নিজেও লিখিয়া গিয়াছেন,—"এই পুস্তকান্তর্গত গীত সকল আপ্তবন্ধুগণের এবং গানে আমোদিত ব্যক্তিদিগের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়াছিলাম।"*—এই সব কথার উপর নির্ভর করিয়া যদি মনে করা যায়, নিধুবাবু যৌবনে না হউক, অন্ততঃ মধ্য বয়সেও মাতৃভাষা সম্বন্ধে ঐ মহিমামূলক গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত তখন জন্মেন নাই, রামমোহন তখন নিতান্ত নাবালক, এবং মৃত্যুঞ্জয়ও বোধ হয় সে সময়ে সাহিত্য-আসরে অবতীর্ণ হন নাই; কারণ, ইঁহারা সকলেই নিধুবাবুর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তাঁহার জন্মের একুশ বৎসর পরে মৃত্যুঞ্জয় ও তেত্রিশ বৎসর পরে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বর গুপ্তের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তবে এই স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যদি কেহ মুদ্রিত পুস্তকের তারিখ দেখিয়া বঙ্গভাষা-প্রীতিমূলক রচনার প্রথম নিদর্শন খুঁজিতে যান, তাহা হইলে খুব সম্ভব নিধুবাবুর গানের পরিবর্ত্তে মৃত্যুঞ্জয়ের লেখাই তাঁহার নজরে পড়িবে। 'গীতরত্ন' নামক যে গ্রন্থের ভিতর ঐ গান আমরা দেখিয়াছি, সে গ্রন্থ নিধুবাবু তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে,—অর্থাৎ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে যদিও তাঁহার গানের বই কেহ কেহ ছাপিয়াছিলেন, কিন্তু সে সব বই আমরা কখনও দেখি নাই। সুতরাং সে পুস্তকগুলির মধ্যে কোন্‌খানি কবে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং তাহার ভিতর নিধুবাবুর ঐ গান ছিল কিনা,

---

* নিধুবাবুর লিখিত 'ভূমিকা'য় আছে,—"এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্র[চা]র করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎকাল পরে তাহা হইতেও অধিকাংশ ভূরি ভূরি বর্ণাশুদ্ধি এবং অশুদ্ধ পদে পরিপূরিত করিয়া প্রচার করিল, এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম মৎকৃত সঙ্গীত সকল এক্ষণেও যদ্যপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপ প্রকাশিত না হয়, তবে হানি আছে, এই আশঙ্কা-প্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম।"

বলিতে পারি না। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" নিধুবাবুর 'গীতরত্নে'র প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র 'মুখবন্ধে' আছে,—"অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড় দেশীয় ভাষা উত্তমা,—সর্ব্বোত্তমা সংস্কৃত ভাষা বাহুল্য হেতুক। যেমন দুই এক পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ হইতে বহুতর পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ উত্তম ইত্যনুমানে সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেব জাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধচন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন।"—এই কয় ছত্র অবশ্য নিধুবাবুর কয় ছত্রের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর হইলেও উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন,—"মৃত্যুঞ্জয় যে সময়ে অপোগণ্ড বঙ্গগদ্যের লালন-পালন ভার গ্রহণ করেন, তৎকালে সত্য সত্যই ভাষা পিতৃ-মাতৃহীনা বালিকার মত অনাদৃতা ধূল্যব-লুণ্ঠিতা, বিষয়ী ব্যক্তির অবহেলায় ম্রিয়মাণা, সংস্কৃত-পণ্ডিত-মণ্ডলীর ঘৃণায় অবজ্ঞায় রোরুদ্যমানা। সেই সময়ে মৃত্যুঞ্জয়ের মত প্রতিভাশালী পণ্ডিত তুমি সমস্ত প্রাকৃত ভাষার মধ্যে উৎকৃষ্ট ভাষা বলিয়া আদর করিয়া, গৌরব বাড়াইয়া, মুখ চুম্বন করিয়া, কোলে না লইলে এবং ক্রমাগত শৈশবকাল কোলে পিঠে করিয়া মানুষ না করিলে, আজি এই সাগর-তরঙ্গের তেজধারিণী, অক্ষয়-ভূষণে-ভূষিতা, হেম-ভূষণে জড়িতা, বঙ্কিম ভঙ্গিমাশালিনী অপূর্ব্ব দেবী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পবিত্র শ্রীচরণে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতে পারিতাম না।"

সরকার মহাশয়ের কথাগুলি অনেকাংশে সত্য হইলেও এই সঙ্গে আরও একটী কথা স্বীকার করা আমাদের কর্ত্তব্য। দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ই যে সর্ব্ব-প্রথম "সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষা" বলিয়াছিলেন, এ কথা সত্য। কিন্তু ঐ মন্তব্যের আদি প্রচারক তিনি কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। 'অভিনব সাহেব জাতের শিক্ষার্থে' তিনি 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' লিখিলেও এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, তাঁহার বাঙ্গালা লেখার প্রবৃত্তির মূলে যে কয়জন সাহেব উদ্যোগ ও উৎসাহের জল সেচন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে নিজের লিখিত—"A grammar of the Bengalee language" নামক পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন,—"The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India; for though it contains many words of Persian and Arabic origin, yet four fifths of the words in the language are pure Sungskrita. Words may be compounded with such facility, and to so great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to its copiousness. On these, and many other accounts, it may be esteemed one of the most expressive and elegant languages of the East."—শুধু মুদ্রিত পুস্তকের তারিখ দেখিয়া বিচার করিতে গেলে পাদ্রী কেরী সাহেবের এই লেখাটীকেই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম প্রশস্তি বলিয়া গণ্য করিতে হয় এবং বলিতে হয়, মৃত্যুঞ্জয় পাদ্রী কেরীর বাক্যেরই কতকটা প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। কেরী সাহেবও নবাঙ্কুর বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রথম পথ-প্রদর্শক। যে বৎসরে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম রচনা "বত্রিশ সিংহাসন" বাহির হইয়াছিল, সেই বৎসরেই—অর্থাৎ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কেরী সাহেবের উপরি-উক্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও বাঙ্গালার নানারূপ কথিত ভাষার দৃষ্টান্ত-সংবলিত "Colloquies" মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে দেখা দেয়। ভারতীয় নানা ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনা করিতেন। সুতরাং মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে অক্ষয় সরকার মহাশয়ের যে স্তুতিটুকু উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা কেরীর প্রতি প্রয়োগ করিলেও কিছু অসঙ্গত হয়, মনে করি না।

ইঁহাদের পরই রামমোহনের যুগ। রামমোহন কার্য্যতঃ যদিও গৌড়ীয় ভাষা-প্রীতির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু মাতৃ-ভাষার গুণ কীর্ত্তন করিয়া বা শিক্ষা-কার্য্যে তাহার উপযোগিতা বুঝাইয়া কখনও কিছু লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। এ হিসাবে বরং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যের নাম কতকটা করিতে পারা যায়।

গৌরীকান্তের রচনা-মধ্যে মাতৃ-ভাষার প্রশংসাসূচক বাক্য বিশেষ কিছু না থাকিলেও বাঙ্গালা-ভাষায় বাঙ্গালীর ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া যে উচিত, এ কথা বাঙ্গালীর মধ্যে বোধ হয় তিনিই প্রথম বলিয়াছিলেন। তাঁহার "কর্ম্মাঞ্জন" নামক গ্রন্থ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—"বালকাদির স্বদেশীয় ভাষাতে উপদেশ করা ও কৌশল দর্শান উচিত হয়, কেন না তাহাদিগের পৈতৃক ভাষা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। এবং যেমত যেমত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে তাহার মত নিজ ভাষার পারিপাট্যগ্রহ অথচ শিক্ষিত বিষয় নৈপুণ্য হইতে পারে। * * যদ্যপি রাজার ভাষা ভাষা সকলের রাজা ও অর্থকরী বিদ্যা সর্ব্বজনমান্যা এবং তাহাতেই অনুরাগ অনেক হয়। তথাপি শিক্ষকের উচিত যে বালকাদির স্বদেশীয় বিদ্যা ও ধর্ম্মের মূল প্রথমতঃ উপদেশ করিয়া তাহাতে অধিকার জন্মান, তদনন্তর অর্থকরী বিদ্যা যে কোন ভাষাতে হউক না কেন তাহার শিক্ষা ও আমূল তাহার পারিপাট্য অভ্যাস করান। নতুবা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ প্রায় হইয়া থাকে।"—ইহা ভারত-গভর্ণর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতিরই কতকটা প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বেণ্টিক সাহেব এক বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা এই নিয়ম করেন যে, এ দেশের সমস্ত শিক্ষা-কার্য্যই ইংরাজি ভাষায় সম্পাদিত হইবে। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে বাঙ্গালা ভাষা উত্তরোত্তর উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইতে থাকে। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলেন যে, এই সময়ে "সাধারণ লোকে ইংরাজী শিক্ষা করিবার আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল; এমন বোধ হইতে লাগিল যে দেশীয় ভাষা বা একেবারে উৎসেদ দশা প্রাপ্ত হয়।"* এইরূপ ভয় যে গৌরীকান্তও তখন পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত "কর্ম্মাঞ্জন" পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ মাতৃভাষার এই মঙ্গলকামী লেখকটির নাম বড় একটা কাহাকেও করিতে দেখি না। এমন কি, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় অত বড় পণ্ডিতও তাঁহাকে ভুলক্রমে গৌরী-শঙ্কর ভট্টাচার্য্য বা গুড়্ গুড়ে ভট্টাচার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু গৌরীকান্তকে ভুলিলে আমাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীনতারই পরিচয় দেওয়া হইবে।

* তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ—১৭৭৮ শক।

এইবার ঈশ্বর গুপ্তের কথা বলিব। ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকর' যেন সত্যই প্রভাকরের ন্যায় আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়া বাঙ্গালীর মনকে এক অপূর্ব্ব আনন্দে জাগ্রত করিয়াছিল। গৌরীকান্ত বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গালা ভাষা পড়িবার জন্য পরামর্শ দিলেও তাঁহার 'জ্ঞানাঞ্জন' ও 'কর্ম্মাঞ্জন', বৈকুণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদান্ত-চন্দ্রিকার উত্তর' ও 'ঈশ্বর সাকার' প্রভৃতি নীরস ভাষায় লিখিত নীরস বিষয়ক গ্রন্থ সকল বাঙ্গালী পাঠকের মনে বোধ হয় বিভীষিকার সঞ্চারই করিয়াছিল। এমন সময় প্রভাকরকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের মন হইতে মাতৃ-ভাষা-বিদ্বেষ দূর করিবার চেষ্টা না করিলে বঙ্কিম, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ ও রঙ্গলাল প্রভৃতি কলেজীয় ছাত্রকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধনা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহের বিষয়। বাঙ্গালা ভাষার দুর্দ্দশা গুপ্ত-কবিকে কিরূপ ব্যথিত করিয়াছিল, তাহা তাঁহার লিখিত এই কয় ছত্র পড়িলেই বুঝা যায়—

"হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ॥
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা।
কোনমতে নাহি তার জীবনের আশা॥
নিশাযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণা।
বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে।
কোনরূপে কেহ নাহি সমাদর করে॥"ইত্যাদি—

শুধু পদ্যে নয়, গদ্যেও বাঙ্গালীকে তিনি বুঝাইয়া বলেন, "সম্প্রতি স্বদেশীয় ভাষার উন্নতিকল্পে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ যত্ন করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেশের উচ্চ গৌরব কোন মতেই রক্ষা হইতে পারে না। অধুনা আমরা অন্য কোন বিষয়ের অধিক আন্দোলন না করিয়া দেশীয় মহাশয়দিগের কেবল দেশের ভাষার প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিতে অধিক অনুরোধ করিতেছি; কারণ ভাষাই সকল বিষয়ের মূলাধার, ভাষা ভিন্ন কিছুই হয় না, আমরা শুদ্ধ ভাষার পরিচয়েই পরস্পর পরিচিত হইতেছি,সাংসারিক তাবৎ কর্ম্মই নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি, পরমেশ্বরকে জানিতে পারিয়াছি, সুতরাং এমত মহোপকারিণী যে জাতীয় ভাষা তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করাতে কিরূপ

অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইতেছে, তাহা কি কেহই বিবেচনা করেন না? * * আমাদিগের ভাষা অতি সুশ্রাব্য ও সুকোমল এবং মাধুর্য্য-রসে পরিপূরিত। এই ভাষায় বাক্য দ্বারা ও লেখনী দ্বারা উত্তমরূপে নানা কৌশলে ও সহজে মনের অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করা যায়, অতএব ইহার প্রতি বাবুদিগের এত আন্তরিক দ্বেষ হইল কেন? কেবল আপনারা দ্বেষ করিলেও হানি ছিল না, যাঁহারা মনের সহিত অনুরাগ করেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়াও জ্ঞান করেন না। হায় কি আক্ষেপ! নব্য বেঙ্গাল বাবুসাহেবেরা যে জাতির দৃষ্টান্ত দ্বারা সভ্য বলিয়া অহঙ্কার করেন, তাঁহারা দেশের ভাষার প্রতি কিরূপ যত্ন করেন, তাহা কি দেখিতে পান না? * * কয়েকজন যুবা ব্যক্তি এ বৎসর টাউনহলে অতিশয় সদ্বক্তৃতাপূর্ব্বক বড় বড় ইংরাজদিগকে হতগর্ব্ব করিয়াছেন, তাহাতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু বাবুসাহেবেরা যদি দেশস্থ জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিবর্গের দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নিমিত্ত বঙ্গভাষায় এইরূপ সুবক্তৃতা করিতে পারিতেন, তবে অস্মৎ পক্ষে কি এক আশ্চর্য্য সুখের ব্যাপার হইত। ফলে তাহার চেষ্টা নাই, বাঙ্গালা দুইটি কথা এক করিয়া কহিতে হইলে মাথায় অমনি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। অতি সম্ভ্রান্ত কোন আত্মীয় ব্যক্তি যিনি ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত নহেন, অথচ জাতীয় ভাষায় অতি নিপুণ, তাঁহার সহিত কোনও নবীন বেঙ্গলের সাক্ষাৎ হইলে কথোপকথনকালীন শুনিতে বড় কৌতুক হয়। যথা,—কেমন ভাই, বাড়ীর সকল মঙ্গল তো,—মশয়. আসুন, লাষ্ট নাইটে বড় ডেঞ্জারে পড়েছি, আঙ্কেলের কলেরা হয়েছে, পলস্ বড় উইক হোয়েছিল, আজ মর্ণিংয়ে ডাক্তার এসে অনেক রিকভার করেছে, এখন লাইফের হোপ হয়েছে।'—সে ভাল মানুষ—বাবুজির উত্তর শুনিয়া ভাল-মন্দ কিছুই বুঝিতে পারে না। ভ্যাভ্যা রামের ন্যায় অবাক হইয়া খাড়া থাকে। এইরূপ কত আছে, যাহা লিখিতে লেখনীর মুখে হাস্য আইসে।"

—মাতৃ ভাষার দুঃখে এমন মর্ম্মভেদী আক্ষেপ ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই, পরেও যে ইহার চেয়ে বেশী কেহ কিছু বলিতে পারিয়াছেন, এমন মনে করি না। বলিতে লজ্জা হয়, প্রায় আশি বৎসর পূর্ব্বে, ঈশ্বর গুপ্ত তখনকার 'নব্য বেঙ্গাল বাবু সাহেবদিগের' কথোপকথনের ভাষার যে কৌতুক-জনক নমুনা দিয়াছেন, তাহার মাত্রা এই ঘোর স্বাদেশিকতার দিনেও প্রবলবেগে বাড়িয়াই চলিয়াছে! যাহা হউক, ঈশ্বরগুপ্ত শুধু জন্মভূমিকে 'জননী' বলিতে নয়, স্বদেশীয় ভাষাকেও 'জননী' মনে করিয়া তাঁহার সেবা করিতে বাঙ্গালীকে যে প্রথম শিখাইয়াছিলেন, এ কথা বাঙ্গালী আজ ভুলিয়া গেলেও বাঙ্গালী জাতির পক্ষে উহা সব-চেয়ে স্মরণযোগ্য বোধ করি। তাঁহার "মাতৃ-ভাষা" ইতিশীর্ষক কবিতার শেষ কয়টী ছত্র এই—

"যে ভাষায় হ'য়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত
বৃদ্ধকালে গান কর সুখে।
মাতৃ-সম মাতৃ-ভাষা পুরালে তোমার আশা
তুমি তার সেবা কর সুখে॥"

নিধু গুপ্তের "নানান্ দেশে নানান্ ভাষা—বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা" গানের পর ঈশ্বর গুপ্তের ঐ কবিতাকেই বঙ্গ-ভাষার প্রকৃত বন্দনা বলা যাইতে পারে। 'মাতৃভাষা' কথাটা ঈশ্বর গুপ্তের লেখাতেই আমরা প্রথম দেখিতে পাই। এবং মাতৃভাষা যে মাতৃসম গরীয়সী, এ কথাও তাঁহার নিকট আমরা প্রথম শিখিয়াছি।

মাতৃ ভাষার দুর্গতিতে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাণে যে দুঃখানুভূতি জাগে এবং সেই দুঃখোপশান্তির চেষ্টায় তাঁহার মনে যে ভাবের উদ্বোধন হয়, তাহার পরিচয় 'প্রভাকরে' প্রকাশিত রচনার যে যে সামান্য অংশ আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই যথেষ্ট পরিস্ফুট বলিয়া মনে করি। ইহার ফলও যে শীঘ্র ফলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা 'তত্ত্ব-বোধিনী'তে দেখিতে পাই। ১৭৭০ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠ মাসে 'তত্ত্ব-বোধিনী' লিখিয়াছিলেন,—"এ দেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি যে ইংরাজী ভাষার অনুশীলনা যত্নের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল? * * ইহা সত্য যে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন, এবং বিদ্যার প্রভাবে তাঁহারদিগের সংস্কৃত চিত্ত অজ্ঞান ঘনাম্বুদোপরি উত্থিত হইয়া অতি প্রসারিত নির্ম্মল জ্ঞানাকাশে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু তাহারদিগেরও মধ্যে কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে বিনা সংশয়ে রচনা করিতে পারেন? আর সমস্ত দেশস্থ লোকের তুলনায় সেই দুই সহস্র

সংখ্যাই বা কত? * * ব্যক্ত করিতে লজ্জা উপস্থিত হইতেছে যে আমারদিগের স্বদেশস্থ ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কতিপয় যুবা-পুরুষ অম্লান বদনে কহিয়া থাকেন যে,—"সেই বাঞ্ছিত কাল কোন্ দিন আগমন করিবে, যখন কেবল ইংরাজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে। * * * যাহা হউক, এ সকল ব্যবহার জন্মভূমির প্রতি প্রেমের চিহ্ন নহে। যে স্থানে আমরা শৈশব-কালে স্নেহ-মিশ্রিত যত্ন দ্বারা লালিত হইয়াছি, যে স্থানে বাল্য-ক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে যৌবনের প্রারম্ভাবধি সহযোগি মিত্রদিগের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, * * সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাবসিদ্ধ নহে? * * এখন বিবেচনা কর, যে স্থানের নদী-পর্ব্বত-মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রীতি-পাত্র, সে স্থানের ভাষা, যে ভাষাতে আমরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া শৈশব-কালের অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতা-পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম, সে ভাষার প্রতি প্রীতি না হওয়া মনুষ্য-স্বভাবের যোগ্য নহে। জননীর স্তন্য দুগ্ধ যদ্রূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্ম-ভূমির ভাষা অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য্য প্রকাশ করে। * * আমারদিগের দেশ-ভাষা যে এমত সুললিত হইবে, ইহা সম্যক্ সম্ভব, কারণ তাহার বর্ত্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত, তাহার ন্যায় সুশোভন সর্ব্বার্থ প্রতিপাদক মহাভাষা এই ভূমণ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই।"—ইহা খুব সম্ভব অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা। দেশের লোকের মনে মাতৃ-ভাষার মহিমা-বোধ জাগাইবার উদ্দেশ্যেই উহা রচিত। ঈশ্বর গুপ্তের রচনার সহিত এই রচনার বেশ একটি ভাবগত যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী সাহিত্যে এই ভাব-ধারারই কেমন বিকাশ ও বিস্তার ঘটিয়াছিল, বারান্তরে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

সরল চণ্ডী

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি-ই]

পুরাকালে সুরপুরে বেধেছিল সুরাসুরে
রাজ্য লইয়া ঘোর দ্বন্দ্ব,
ভীষণ মহিষাসুর সুররাজে করি' দূর,
স্বর্গের গেট করে বন্ধ।
রবি শশী যমরাজ ত্যজি' পুরাতন সাজ
শিরে ধরি' অমরারি পাকড়ি,
ঘর-বার রাখিবারে দৈত্যের দরবারে
নিয়ে নিল ভাল ভাল চাকরী।
লভি' ইন্দ্রত্বম্ দৈত্য হ'য়ে গরম,
চালাইল চাবুক ও তয়ফা;
দেবগণ মুক্তির করে যুক্তি স্থির,—
দাসত্ব কত কালই সয় বা?
হোথা বীর সুরপতি ঘুরে দুঃখিত মতি,
অপ্সরী সুধা রতি পায় না,—
ত্রিভুবন হেঁটে হেঁটে অবশেষে কেঁদেকেটে
ভবাণী-চরণে ধরে বায়না :—

মা—গো, মা—গো, জাগো—রাগো—
দৈত্য মারিয়া রাখো স্বর্গ,
নহে,—তেত্রিশ কোটী তোর পায়ে মাথা কুটি'
অমর মরিব আজ সর্ব্ব।
স্তুতি-প্রবুদ্ধা শিবা সংক্ষুব্ধা
গর্জ্জি' কহেন,—শুন সুরনাথ!
মারিতে অমর-অরি বল কি উপায় করি?
সবই আছে, শুধু মোর নেই হাত!
প্রণমি' ইন্দ্র কহে, অনুতাপে তনু দহে,
দনুজের সহ তুমি যুঝ মা!—
মোরা পাঁচজনে মিলে নিজ ভুজ কাটি' দিলে
আপনি হইবে দশভুজ মা।
শুনি' চণ্ডীর তোষ, দানবের গ্রহদোষ,
ভাগ্য কলসী চিরছিদ্রা;—
মায়ের সাহস পেয়ে সুরপতি নেয়ে খেয়ে
বহুকাল পরে দিল নিদ্রা।
শিব কন—শিবানি! শুনিলাম কি বাণী?
আমার মহিষে না কি মার্ব্বে?
পরম সে শৈব, আমি পিছে রৈব,
তুমি তার কি করিতে পার্ব্বে?
শিবানী কহেন হেসে – সত্য ক্ষেপিলে শেষে,
তোমার ভক্তে আমি মারিব!
সুখে-ঐশ্বর্য্যে সে তোমা ভুলেছে যে
তাই আজ তারে আমি তারিব।
শিবসনে করি' রফা, সারিতে মহিষ-দফা
ধরে দেবী দশভুজা মূর্ত্তি।
দৈত্যের হ'ল ক্ষয়, বকলমে রণজয়
করি', দেবগণ করে ফূর্ত্তি!
এ কথা জগজ্জন হ'য়েছে বিস্মরণ,
এ কথা মা নিজে গেছে ভুলিয়া;
শুধু এ শক্তি-বীজ বাঙালী করিয়া নিজ,
বিজয়ার ভাঙ্ খায় গুলিয়া!
শাস্ত্র পুরাণ গাথা সত্য কি মিথ্যা তা
অধম হাতুড়ে কবি কি জানি?
বাংলার হাওয়া জলে যে কথা ভাসিয়া চলে
সেই কথা পাঁচালীতে বাখানি,
মনে ভাবি মায়ের বাঁ পা-খানি।

উদ্বোধন, ভাদ্র ১৩৩৭

পাশ্চাত্যে উপনিষদের প্রভাব—শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী

সম্রাট্ সাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাসেকো তাঁহার ধর্ম্মমতের উদারতার জন্য ভারত ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয় সাধনে বিশেষ চেষ্টা করেন। এবং সে উদ্দেশ্যে একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে অবস্থানকালে দারা প্রথমতঃ উপনিষদের মহিমার কথা অবগত হন। তিনি বারাণসী হইতে কয়েকজন পণ্ডিত আনাইয়া তাঁহাদের সাহায্যে ৫০ খানি উপনিষদের পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে এই অনুবাদ সমাপ্ত হয়। ইহার প্রায় ৩ বৎসর পর ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে দারাসেকো আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নিহত হন।

আকবরের রাজত্বকালেও উপনিষদের অনুবাদ কতকটা হইয়াছিল (১৫৫৬-১৫৮৫)। কিন্তু আকবর কিংবা দারা কর্ত্তৃক সম্পাদিত এই সকল অনুবাদের প্রতি ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজসভার ফরাসী রেসিডেণ্ট M. Gentil ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পর্য্যটক ও জেন্দ আবেস্তার আবিষ্কারক Anquetil Duperronকে দারাসেকো সম্পাদিত উক্ত পারসিক অনুবাদের একখানি পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করেন। আর একখানি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া A. Duperron এই দুইখানি মিলাইয়া ফরাসী ও লাটিন ভাষায় উক্ত পারসিক অনুবাদের পুনরনুবাদ করেন। লাটিন অনুবাদটি ১৮০১।২ খৃষ্টাব্দে ঔপনেখত (Oupnekhat) নামে প্রকাশিত হয়। ফরাসী অনুবাদটি মুদ্রিত হয় নাই।

জার্ম্মানীর সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক সোপেনহোর অশেষ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক উক্ত অনুবাদ অধ্যয়ন করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, "তাঁহার স্বকীয় দার্শনিক মতবাদ উপনিষদের মূল তত্ত্বসমূহ দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত।" যে দেশে উপনিষদের গভীর সত্যসমূহ প্রচারিত হইয়াছিল সে দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা যে ব্যর্থ হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপীয় চিন্তাধারা যে উপনিষদের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রভাবিত হইয়া উঠিবে সে-সম্বন্ধে Schopenhouer এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন,—"ভারতবর্ষে আমাদের ধর্ম্ম কখনও শিকড় গাড়িবে না। মানবজাতির "পুরাণী প্রজ্ঞা" গ্যালিলিওর ঘটনাবলীর দ্বারা কখনো নিরাকৃত হইবার নহে। পরন্তু ভারতীয় প্রজ্ঞার ধারা ইউরোপে প্রবাহিত হইবে এবং আমাদের জ্ঞান ও চিন্তাতে আমূল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবে।"

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকার শিষ্যা Sarra Bull তাঁহার লিখিত এক চিঠিতে বলিয়াছেন, জার্ম্মানীর দার্শনিক সম্প্রদায়, ইংলণ্ডের প্রাচ্য পণ্ডিতগণ, এবং আমাদের দেশীয় ইমার্সন ইঁহারা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন যে পাশ্চাত্যের চিন্তা আজকাল সত্যসত্যই বেদান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত।"

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে Schellingএর উপনিষদ সম্বন্ধীয় বক্তৃতাবলী শুনিয়া বিখ্যাত প্রাচ্য পণ্ডিত Max Mullerএর মনোযোগ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়। উপনিষদের আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি দেখিলেন, উহার সম্যক্ মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে হইলে তৎ পূর্ব্বে রচিত বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগের আলোচনা আবশ্যক। এই ভাবে উপনিষদই তাঁহাকে বেদচর্চ্চার প্ররোচনা দিয়াছিল। Schopenhouerএর পর বহু পাশ্চাত্য মনীষী উপনিষদ আলোচনা করিয়া নানা ভাবে ইহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেহ কেহ উপনিষদকে "মানব-চিন্তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

৬ই—সঙ্গীতবিশারদ রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয়ের জন্ম (১২৬০)। ইনি ক্রমান্বয়ে ১৮৭০ খৃঃ টাঁকশালের নায়েব দেওয়ান, ১৮৮১খৃঃ রাজা সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের স্থাপিত "বেঙ্গল একাডেমী অব্ মিউজিক্" সভার অনারারি সেক্রেটারী, ১৮৮২ খৃঃ কারেন্সি আফিসের ডেপুটী ট্রেজারার প্রভৃতি নিযুক্ত হন।

"সাধু নাগ মহাশয়" নামে পরিচিত সাধক দুর্গাচরণ নাগের নারায়ণগঞ্জের অদূরবর্ত্তী দেওভোগ গ্রামে ১২৫৩ সালে জন্ম। ইনি রামকৃষ্ণ দেবের একজন শিষ্য এবং বঙ্গভাষার একজন লেখক।

৭ই—মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মৃত্যু (১৩৩১)।

৮ই— বিখ্যাত সাহিত্য "সোমপ্রকাশ" সংবাদপত্র-সম্পাদক, বিবিধগ্রন্থ-রচয়িতা এবং নীতিসার, বিশ্বেশ্বরবিলাপ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যু (১২৯১)।

৯ই—চারুবার্ত্তা, হিতবাদী ও উপাসনা সম্পাদক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম (১৮৫৯ খৃঃ) দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রচিত 'সমরশেখর' গ্রন্থে ইঁহার প্রতিভার পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায়।

১০ই—"সম্মিলনী"-সম্পাদক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী বিখ্যাত কালীমোহন বসু মহাশয়ের ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ (১২৮৪ সাল)।

১৫ই—প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু (৩১।৮।১৯০০)।

স্বনামধন্য মহাপুরুষ শঙ্করদেবের তিরোভাব-তিথি।

১৬ই—সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও প্রবন্ধকার উমেশচন্দ্র বটব্যালের জন্ম। ইনি স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের জন্য বহু চেষ্টা করেন।

আনন্দকৃষ্ণ বসুর জন্ম (১৭৪৪ শকে। ১৮২২ খৃঃ)।— শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব ইঁহার মাতামহ। ইনি অনেকগুলি বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহার নিকট ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করেন।

১৭ই—হুগলি জেলার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে চন্দ্রনাথ বসুর জন্ম (১২৫১)। ইঁহার গ্রন্থ শকুন্তলা-তত্ত্ব, ত্রিধারা, পশুপতি-সংবাদ, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি, ফুল ও ফল প্রভৃতি।

১৯এ—সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু (৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯১৭খৃঃ) জন্ম—১৯এ ডিসেম্বর, ১৮৪৮খৃষ্টাব্দ। ইনি বহু সংস্কৃত স্তোত্রাদির সমাবেশে "রত্নমালা" গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতদ্ভিন্ন মহাভারত হইতে সঙ্কলন করিয়া "ভারতরত্নমালা" গদ্য অনুবাদ সহ "চাণক্যশ্লোক" প্রভৃতি তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, প্রকৃতি-রঞ্জন Mukerjee's Magazine প্রভৃতি পত্রে ইনি উমিচাঁদ, উৎকলে শ্রীচৈতন্য ও পুরন্দর খাঁ এবং বিশ্ববিদ্যালয়, নারীশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লেখেন। ইনি হাওড়া হিতকারী ও ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সারদাচরণ হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া 'ঈশান স্কলার' পান। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এম্-এ পাস করিয়া ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হ'ন। অতঃপর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইনি বি-এল পাস করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে

আনন্দকৃষ্ণ বসু

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য হ'ন। ১৯০১—৪ খৃষ্টাব্দে তিনি Faculty of Law President থাকেন।

সারদাচরণ যেমন একজন প্রকৃত বাণী-সেবক এবং সাহিত্যিক ছিলেন, তেমনই অনেক জনহিতকর কার্য্যেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সারদাচরণ এরিয়ান ইন্‌ষ্টিটিসনের স্থাপনা করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কো-অপারেটিভ্ সোসাইটিতে যোগদান করিয়া উহার কার্য্যে বহু সহায়তা করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ২৯এ জানুয়ারী তিনি উহার সভাপতি হ'ন।

মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু—১৩২৯ সালের ১৯শে ভাদ্র (ইং ১৯২২ ৫ই সেপ্টেম্বর) জন্ম—১২৫৪ সালের ১২ই কার্ত্তিক (ইং ১৮৪৭ । ২৮শে অক্টোবর) যশোহর জেলান্তর্গত।

মতিলাল ঘোষ

মহাত্মা শিশিরকুমার লিখিয়া গিয়াছেন যেমন কাদা দিয়া মূর্ত্তি গড়ে, তাঁহার দাদা বসন্তকুমার তাঁহাকে সেইভাবে গড়িয়াছিলেন। মতিবাবুও সেইরূপ শিশির বাবুর হাতে গড়া। শিশিরবাবুর প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। মতিবাবু কতকগুলি বিষয়ে ঠিক শিশিরবাবুর অনুকরণ করিয়া-

সারদচরণ মিত্র

ছিলেন। অমৃতবাজারের পাঠকদিগের মধ্যে অতি সামান্য লোকেই বুঝিতে পারিতেন কোন্‌টী শিশিরবাবুর ও কোন্‌টী মতিবাবুর লেখা। বাঙ্গালাও মতিবাবু বেশ লিখিতে পারিতেন। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথমাবস্থা হইতে তিনি ইহাতে বরাবর নিয়মিত লিখিতেন। শিশিরবাবুর ন্যায় তাঁহার লেখা বেশ সরস ছিল।

অমূল্যচরণ বসু মহাশয়ের মৃত্যু (৪।৯। ১৮৯৮)।

২১এ—মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মাতুল পুত্র, সুবিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনয়শিক্ষক অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী মহাশয়ের মৃত্যু (১৩১৫ সাল)।

২২এ—স্বনামধন্য মনীষী রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কলিকাতার দক্ষিণ বোড়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ (১৮২৬ খৃঃ, ৭ই সেপ্টেম্বর)। ইনি আশৈশব বিদ্যানুরাগী ছিলেন। নি পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ১ম ও ২য় ভাগ, ব্রহ্মসাধন, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ১ম ও ২য় ভাগ, সেকাল ও একাল প্রভৃতি। ইনি মাইকেল মধুসূদনের বন্ধু ছিলেন।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু (১৩০৫)

২৫এ—গোবিন্দপ্রসাদ রায় মহাশয়ের জন্ম (১২৪৫)।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
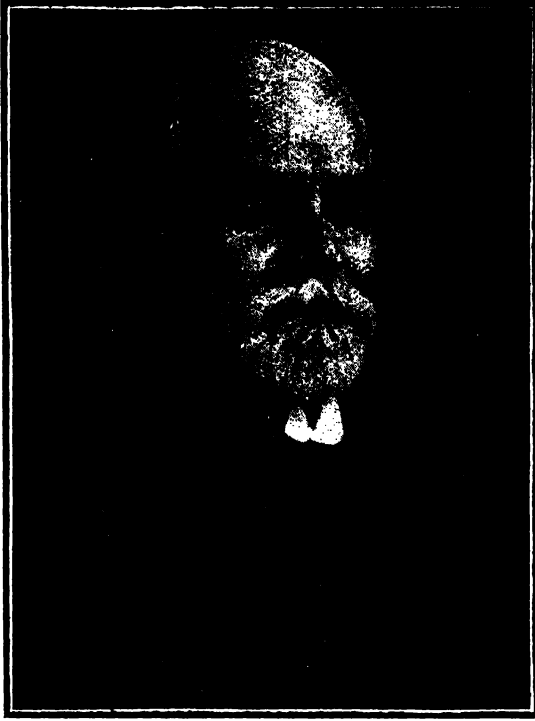
২৭এ—ধাত্রীবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী, 'চিকিৎসা-দর্পণ' ও 'ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার' পত্রের প্রকাশক, 'সরল জ্বরচিকিৎসার" গ্রন্থকার প্রতিপত্তিশালী ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম (১২৪৬ সাল)।

২৮এ—কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের মৃত্যু (১৩১৭)।

সুকবি, সুরসিক, ও সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের জন্ম (১২৩৬)। শোনা যায়, বিচার সভায় ইঁহাকে দেখিলে অনেক জিগীষু পণ্ডিতের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।

২৯এ—বিখ্যাত সাহিত্যসেবী, ঐতিহাসিক গ্রন্থ-প্রণেতা বাগ্মী রজনীকান্ত গুপ্তের জন্ম (১২৫৬)।

৩০এ—মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার ঘোষণা (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩৫ খৃঃ)।

৩১এ—ইং ১৯০০ (১২৯৫ সাল) রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মৃত্যু (১৯০০ খৃঃ, ১২৯৫ সাল)

বিখ্যাত ব্যবহারাজীব ও স্বদেশসেবক কর্ম্মী ভূপেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যু (১৩৩১)। ইনি ১৯১৪খৃঃ কংগ্রেসের সভাপতি, তিনবার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, ও ১৯১৭ অব্দে ভারত-সচিবের মন্ত্রণা-সভায় বেসরকারী সদস্য মনোনীত হন। ১৯২২ সালে ইনি ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া জেনেভার জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে গমন করেন।

মাসপঞ্জী

ভাদ্র

১লা—শ্রীযুক্ত যতীন সেনের এক বৎসর কারাদণ্ড। কলিকাতা কর্পোরেশনে শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু অলডারম্যান মনোনীত। পেশোয়ারে চাঞ্চল্য। বিহারের প্রথম বাঙালী মহিলা শ্রীমতী মীরা দেবী গ্রেপ্তার। বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক সভায় সাইমন কমিশনের নিন্দা।

২রা—সিন্ধুদেশে ভীষণ বন্যা। মহাত্মা গন্ধীর পত্র বড়লাটের নিকট প্রেরিত ও সিমলা-বৈঠকে তৎসম্বন্ধে আলোচনা। মহাত্মাজীর 'নবজীবন'-প্রেস চিরতরে বাজেয়াপ্ত।

৩রা—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাঙ্গামার বিস্তৃত

বিবরণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নিউ ইয়র্কে ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মিঃ কুলিজ কর্ত্তৃক ভারতের স্বাধীনতা উত্তরাধিকারে আপত্তি।

৪ঠা—শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সেতু সিডনি হারবার ব্রিজের কার্য্য সমাপ্ত। কলিকাতার ইংরাজগণ কর্ত্তৃক ইউরোপীয়ান এসোসিয়েসনে সাইমন বিল সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশিত। কংগ্রেস-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ গ্রেপ্তার।

৫ই—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ সারওয়ার্দ্দি কর্ত্তৃক "বিদ্যালয়-সমূহে রাজনীতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা। ফরিদপুরের মুসলমান যুবক জমিদার লালমিয়া গ্রেপ্তার। সপ্রু ও জয়াকার সিমলায় উপস্থিত।

৬ই—দিল্লীর চিফ কমিশনার কর্ত্তৃক কংগ্রেস বেআইনী বলিয়া ঘোষিত। ডাঃ আনসারী, পণ্ডিত মালব্য, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি ১০ জন নেতা গ্রেপ্তার। স্যর নীলরতন সরকার কর্ত্তৃক মতিলালের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

৭ই—মান্দ্রাজ স্বদেশী-মেলায় স্বরাজ সম্বন্ধে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা। মেদিনীপুরে পুলিশের গুলি বর্ষণ। নেতৃবৃন্দ ধৃত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

ডাঃ আনসারী

৮ই—ডালহৌসী স্কোয়ারে পুলিশ কমিশনার স্যর চার্লস টেগার্টের প্রতি জোড়া বোমা নিক্ষেপ। ঢাকা হাঙ্গামার বিবরণ প্রকাশিত।
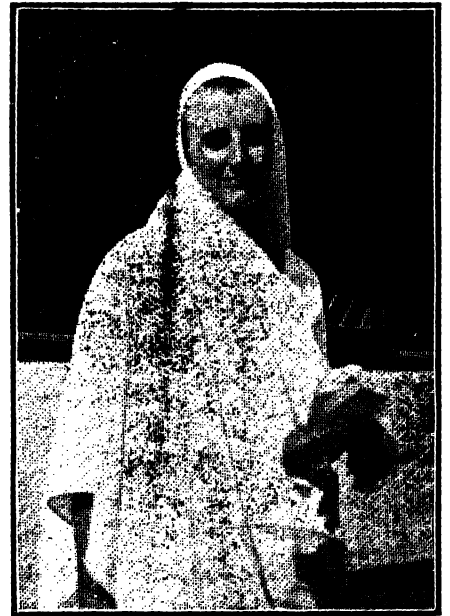
মীরা বেন

৯ই—কলিকাতা জোড়াবাগান কোর্টের নিকট আর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত। ডালহাউসী স্কোয়ারে বোমা নিক্ষেপ সম্পর্কে ১৩জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ধৃত।

১০ই—কলিকাতা খিদিরপুরে আর একটী বোমা নিক্ষিপ্ত। মৌলানা আবুল

কালাম আজাদ ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত। মেদিনীপুর হত্যাকাণ্ডের মামলা।

১১ই—গভর্ণর কর্ত্তৃক ঢাকায় পুলিশ প্যারেডে বক্তৃতা। ঢাকায় বঙ্গের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যান ও ঢাকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হডসন গুলির আঘাতে আহত। আসাম বন্যা রিলিফ কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত।

১২ই—শ্রীমতী হংস মেহতা ধৃত। মিঃ লোম্যানের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন ও মিঃ হডসনের অবস্থা কিঞ্চিৎ আশাপ্রদ।

১৩ই—ইনস্পেক্টার জেনারেল মিঃ লোম্যানের মৃত্যু। ভবানীপুর হাঙ্গামার সম্পর্কে ৬জন শিখ ধৃত

১৫ই—বোম্বাইয়ে ৬০,০০০ মিলের শ্রমজীবিগণের বেকার সমস্যা। কাবুলের ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লার কনষ্টাণ্টিনোপলে উপস্থিতি।

১৬ই—চন্দননগরে একটী বাটিতে বোমা আবিষ্কারের ফলে পুলিশ কর্ত্তৃক ১জন হত ও ৪জন আহত ও ধৃত। শ্রীমতী হংসমেহতার ৩ মাসের কারাদণ্ড।

১৭ই—মিঃ সপ্রু ও জয়াকারের শান্তি-স্থাপনের প্রয়াস বিফল। কলিকাতার হেল্‌থ কমিটি কর্ত্তৃক সহরে ম্যালেরিয়া বিস্তারের আশঙ্কা।

১৮ই—বোম্বাইয়ে ভারতীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ীগণ-কর্ত্তৃক বিলাতী বস্ত্র—বর্জ্জনের দৃঢ় সংকল্প। কলিকাতা হাইকোর্টে মেছুয়া বাজার বোমার আপিল মামলার শুনানী।

১৯এ—লাহোর ষড়যন্ত্রের রিপোর্ট প্রকাশিত। কংগ্রেস-নেতৃবর্গের সহিত শান্তিস্থাপনপ্রয়াসীদিগের পত্র আদান-প্রদান। বাগবাজারে শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায়ের সভা-পতিত্বে কলিকাতা ১নং ওয়ার্ড কবি-রাজবৃন্দের সম্মেলন। ১নং পল্লী আয়ুর্ব্বেদ পরিষদ নামে স্থায়ী সমিতি গঠন।

শ্রীমৎসচ্চিদানন্দ গোস্বামী

২০এ—নাগপুরে গণপতি শোভাযাত্রা উপলক্ষ্যে হাঙ্গামা ও ৬জন আহত। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলের ট্রেণ দুর্ঘট-নার জন্য ট্রাফিক সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ ক্র্যাগস্‌ অভিযুক্ত। ১০০৲ টাকা জরীমানার আদেশ।

২১এ—পণ্ডিত মতিলালের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটাজনক। ঢাকা মেলে লাইনচ্যুত। ৪জন হত এবং ৫৪ জন আহত।

২২এ—বোম্বাইয়ের অন্তর্গত দ্বারভীতে হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ। ৩জন হত ও ২৪জন আহত। রাণাঘাটের থানালুটের মামলার বিচার। ১৯ জন অপরাধী কারাদণ্ড।

২৩শে-পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাইনী জেল হইতে মুক্তি দান। কলিকাতায় বিষম কাণ্ড। শ্রীমতী মীরাবাই এর অভ্যর্থনাসূচক শোভাযাত্রায় পুলিশ কর্ত্তৃক বাধাপ্রদান। হাওড়া পুলের নিকট ও আশুতোষ বিল্ডিংএর নিকট ও কলিকাতা ইউনিভারসিটিতে গোলযোগ।

২৯এ—শ্রীমদ্‌ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর জন্মোৎসব—কাশীধাম, আনন্দাশ্রমঅনুষ্ঠিত। উহাতে শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী রচিত একখানি সুন্দর সঙ্গীত গীত হয়।

বাঙ্গালী অধ্যাপকের কৃতিত্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম-এ, মহাশয় বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিভুক। ১৯২৯ সালে "পলিনেশীয় সভ্যতায় ভারতের দান"—সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য হনুলুলুর Bishop Museumএর কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। সেখানে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া হাউই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ভারতবর্ষ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, জ্ঞান-গরিমা ও প্রত্নতত্ত্বের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় পাইয়া শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই সকল স্থানে তিনি ভারতের বিদ্বৎ-সমাজের মুখোজ্জল করিয়া আসিয়াছেন। ইহার পর তিনি Hawai Oahu-Kanaii, Samoa, Taviuni, Tahiti, ফিজি, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করেন। তিনি এমন অনেক দ্বীপে গিয়াছিলেন যেখানে তাঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী পদার্পণ করেন নাই। ইহার পর তিনি আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ ডাক্তার ক্লার্কউইসলার সাহেবের নিকট "Historical investigations into the methods and research concepts on American Anthropology" বিষয়ে গবেষণা করিয়া উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে-সর্ব্বোচ্চ উপাধি ডক্টর অব ফিলসফি (Ph. D.) পান।

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন মিত্র

ইতিপূর্ব্বে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকার নৃতত্ত্ব বিষয়ে কোন ভারতবাসী গবেষণা করেন নাই। ইহার পর তিনি "American School of Prehistory"র সদস্য হইয়া উহার অধ্যক্ষ ডাক্তার ম্যাক্‌কার্ডির সহিত ফ্রান্স ও স্পেনের Altamoia, Castillo, Nianx প্রভৃতি প্রসিদ্ধ

প্রাগৈতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শন করেন, এবং স্পেনের পেণ্ডো নামক গুহায় খনন কার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করেন। তারপর তিনি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলির এ বিভাগের কার্য্য প্রণালী কি ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। আশা করি শীঘ্রই আমরা তাঁহার নিকট নৃতত্ত্ব-সম্বন্ধে নূতন কথা শুনিতে পাইব।

* * * *

অভিনেতার সম্মান

প্রসিদ্ধ নট শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম.এ, গত ২৩এ ভাদ্র আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার দল-বল ২৫এ ভাদ্র তাঁহার ভ্রাতা শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অধিনায়কত্বে গমন করিয়াছেন। সেখান হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়া তিনি যাইতেছেন।

বাঙ্গালার একজন সন্তান যদি নাট্য-কলায় পৃথিবীতে যশোলাভ করেন তো বাঙ্গালী মাত্রেরই গর্ব্বের বিষয় হইবে। আমেরিকাবাসী তাঁহার অভিনয়-কলার যথোচিত পুরস্কার দিতে যে কৃপণতা করিবেন না তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। শিশিরকুমারের যাত্রা সফল ও সার্থক হউক ইহাই আমাদের কামনা।

* * * *

বাঙ্গালী সাঁতারুর কৃতিত্ব

সম্প্রতি শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার ঘোষ একাদিক্রমে ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট হেদুয়া পুষ্করিণীতে সন্তরণ দিয়া সহনশীলতার যে অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ। গত বৎসর পঞ্চপুষ্পে সাঁতার সম্বন্ধে যে সকল সচিত্র প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা হইতেই জানিতে পারা যায় যে, জগতের সাঁতারুদের ভিতর দু-এক জন ছাড়া কেহ এত অধিকক্ষণ সাতার দিতে পারেন নাই। এবিষয়ে জগতের ভিতর প্রথম স্থান অধিকার করিতে না পারিলেও শ্রীমান্ যাহা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই গর্ব্বের সামগ্রী, খেলা-ধূলার দিক হইতে শ্রীমান্ বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ২৮এ ভাদ্র কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহার এই কৃতিত্বে তাঁহাকে নাগরিকদের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন ও স্বুবর্ণের হাত-ঘড়ি পুরস্কার দিয়াছেন। গত বৎসর মহম্মদ সুফী নামক জনৈক সাঁতারু যাহার সন্তরণ-পটুতা প্রফুল্লকুমার অপেক্ষা অনেকাংশে কম, তাহাকে তাহার দেশবাসীরা ইংলিশ চ্যানেল উত্তীর্ণ হইবার জন্য বিলাত পাঠাইয়াছেন, আর বাঙ্গালীরা কি এই প্রসিদ্ধ সাঁতারুকে বিলাতে পাঠাইয়া প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার অবকাশ দিবার সহায়তা করিবেন না?

* * * *

মোটর ইঞ্জিনিয়ারিংএ মান্দ্রাজবাসীর কৃতিত্ব

মহামান্য মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজ মিঃ আয়েঙ্গারেরপুত্র মিঃ বেণুস্বামী আয়েঙ্গার মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কৃতিত্ব দেখাইয়াই নিউইয়র্কে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারদের সভার 'এসোসিয়েট সভ্য' নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এই পদলাভের সৌভাগ্য কোন ভারতবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই। এক্ষণে তিনি মাদুরার গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডাসট্রিয়েল ইনস্টিটিউটের সুপারিণ্টেনডেণ্ট।

* * * *

প্রথম ভারতীয় বাণিজ্যপোতের নাবিক

(Mercantile Marine)

এ বিষয়ে ভারতবাসীর লক্ষ্য বড় ছিল না। সম্প্রতি যে কয়জন ভারতবাসী ডাফরিণে বানিজ্যপোতের নাবিক হইবার জন্য শিক্ষার্থীরূপে গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে পার্শী যুবক বৈখোক্র আর, এম, কাপ্তেন 'ক্যাডেট' এই সম্মানার্হ উপাধিতে ভূষিত হইয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কাপ্তেন বহু পরিশ্রমে জাহাজ চালান কার্য্যে সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিয়া বিলাতের পোয়েট লরিয়েট-প্রদত্ত সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার জেমস্ ম্যাক্সফিল্ড পারিতোষিক পাইয়াছেন। ডাফরিণে তিনি ক্যাডেট্ কাপ্তেন উপাধির সহিত রৌপ্য-নির্ম্মিত 'কাপ' পাইয়াছেন। তাঁহার গুণপনা ও কৃতিত্বের জন্য পরীক্ষকবৃন্দ (Board of Examiners) তাহাকে অতিরিক্ত সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি পি এণ্ড ও, এস, এন কোম্পানীর "খিদিরপুর" নামক চীনদেশ-গামী জাহাজে 'কেডেটে'র কার্য্য করিতেছেন। আমরা আশা করি ভারতবাসী যুবকেরা এই পার্শী যুবকের আচরিত মার্গে চলিয়া অন্নসংস্থানের একটা নূতন পথ দেখিতে পাইবেন।

ভ্রম-সংশোধন

এ মাসের 'প্রাত্যহিক' গল্পের লেখক শ্রীযুক্ত সুটবিহারী মুখোপাধ্যায় বি-এল মহাশয় আষাঢ় মাসের পত্রে 'বিকৃত দস্তা নামে যে গল্পটী লিখিয়াছিলেন তাহা ভুল-ক্রমে তাঁহার নামের স্থলে শ্রী সুটবিহারী মজুমদারের নামে বাহির হইয়াছে। আমরা এই ত্রুটির জন্য বাস্তবিকই দুঃখিত।

ভাদ্রসংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মী সম্বন্ধে দুটা কথা

১৩৩৭ সালের ভাদ্র-সংখ্যা "বঙ্গলক্ষ্মীতে" 'বণিক' হইতে প্রাচীন ভারতের 'সুতা-কাটায় স্ত্রী সহায়তা,' নামক একটী রচনা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার একস্থলে আছে 'এখন বাঙলায় চরকা নাই' এবং অন্যত্র আছে, 'চরকা বাঙলার একটি সম্পদ ছিল, সে সম্পদলুপ্ত হইয়াছে। চরকায় যে সকল রমণী সুতা কাটিতেন, সুতা কাটা হয় না বলিয়া সেই সকল মহিলা সূচ-সুতার কাজ করেন'। পড়িয়া মনে হইল ঐ 'এখন' কখন ? এ কোন্ বাঙ্গালা দেশের কথা, যেখানের মেয়েরা চরকায় সুতা এখন আর কাটে না, যেখানে চরকা এখন লুপ্ত হইয়াছে। যিনি ঐ নিবন্ধের রচয়িতা তিনি কোন্ শতাব্দীর লোক, তাঁর রচনা কোন্ যুগের—তাঁর চোখের কোন অসুখ নাই তো ?

ঐ সংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মীতে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের মৈমন সিংহে প্রদত্ত কোনও অভিভাষণও উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার একস্থানে আছে;—'দু একজন ছাড়া যথার্থ সাহিত্যিক আজ কাল দেখা যায় না।' আই-সি-এস পাশ করা চোখে বাঙ্গালার অনেক জিনিসই দেখা যায় না দেখিতেছি। বাঙ্গালা দেশে আজকাল দু একজন ছাড়া সাহিত্যিকই নেই। যদি শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বর্ণকুমারী দেবী এবং কামিনী রায়ের নাম করি তাহা হইলেই সংখ্যা 'দু একজন' এর বেশী হইয়া যায়। 'বঙ্গলক্ষ্মী' কি আজকাল ব্যঙ্গ রচনার কারবার করিতেছেন ?

* * * *

"বিরাট্ গো গৃহ এণ্ড ফার্মিং কোম্পানী

অত্যন্ত আশার কথা যে একটী নব-প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ দেশে স্বাস্থ্যযুক্ত ও বলিষ্ঠ গাভী সৃষ্টি দ্বারা দেশের দুগ্ধের অভাব ঘুচাইতে উদ্যত হইয়াছেন। কোনও গো-বৎসর যাহাতে কসাইদের হাত হইতে উদ্ধার পায় সে ব্যবস্থাও ইহা হইতে হইবে। দুগ্ধাভাবে দেশের শিশুরা রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইতেছে—এই প্রতিষ্ঠান কৃতকার্য্য হউক। এ প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ১০ এ কার্ত্তিক বসু লেন, কলিকাতা।

মানময়ী।

[শ্রীমতী সুরবালা বিশ্বাস]

কদমের মূলে নবীনা কিশোরী ভামের গুমরে গুমরি,'
হেরিবনা আর কালরূপ বলি' নয়ন রেখেছে আবরি।'
বৃথা এ শাসন মানে কি নয়ন হেরিবারে চায় চকিতে,
যেথা কালাচাঁদ করুণা ভিখারী জানু পাতি' ব'সে মহীতে।

"হও আগুসার" কহিছে অধর,
"কর মধুপান,—শ্যাম মধুকর,"

বাহু কহে, "কেন বক্ষ-বাঁধনে এখনো বিরত তুষিতে ?"
বক্ষ কহিছে, "এস হে দয়িত, বারি দান কর তৃষিতে"।

শ্রবণ কহিছে, "কত বিভাবরী মুরলীর রব লাগিয়া,
ওই বুঝি বাজে, ওই বুঝি বাজে ছিনু এই আশে জাগিয়া,
আজি সে বাঁশরী, সে বাঁশরীধারী করুণা-ভিখারী অদূরে,
শোননাকি ধনি! সোহাগের বাণী বুকে তুলে লও বঁধুরে,
যে বাঁশীর তান জগতের প্রাণ,
আজি সে বাঁশরী ভূতল-শয়ান,
'রাখ' রাখ' বলি চরণ-কমলে সে কাল মধুপ মাগিল,
মান-সরোবরে নীল পঙ্কজ ভাসিল আজিরে ভাসিল।

কর কহে, "নাহি সহে বিলম্ব, সাদরে উঠাও যতনে,
ধরণী ধন্য মানিল যে ধনে হেলা কেন সেই রতনে?
রজনী যে যায়, কি হ'বে উপায় বৃথা অভিসার সাজে রে,
অযথা বেদনা দিওনা দিওনা নব নটবর রাজে, রে,
হৃদয় যাহারে করে আবাহন,
এস ব্রজরাজ, এস প্রাণধন!
তোমার বিরহ সহি অহরহ মিলন ক্ষণের লাগিয়া,
এ শুভ লগন কত সাধনার—ব্যর্থ রহিব জাগিয়া!

প্রভাহীন আজি গগনের চাঁদ, কালাচাঁদে হেরি কালিমা,
চাঁদিনী যামিনী ম্রিয়মান আজি হেরিয়া সেমুখ ম্লানিমা,
কানন-কুসুম হ'ল শোভাহীন, সুবাস না বয় পবনে,
শারী শুক পিক গাহেনা হরিষে, নাচেনা ময়ূর সে বনে,
যমুনার জল উজান না বয়,
মুখর বাঁশরী নীরব যে রয়,
কহে সখিগণ, বৃথা কেন আর বেদনা দিতেছ ব্যথিতে,
ব্যর্থ হ'বে যে এই অভিসার রাখিলে ধূলি পতিতে।
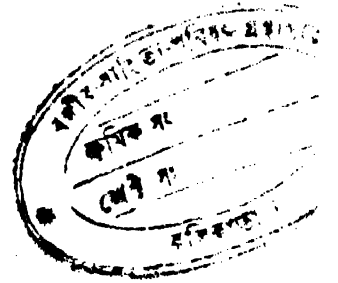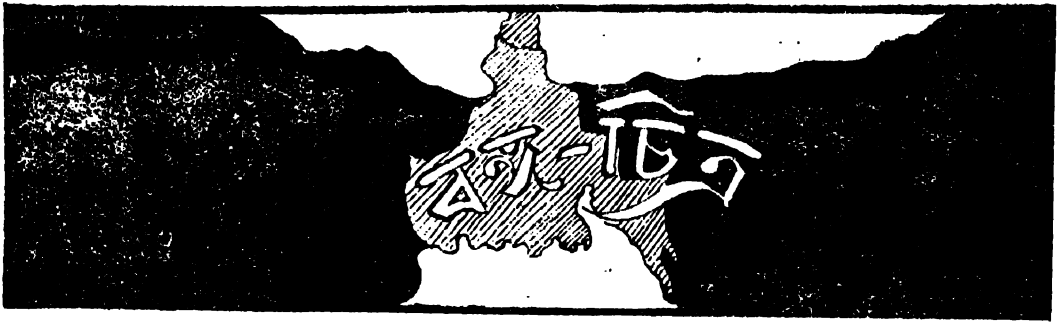
পল্লীর উন্নতি

সর্ব্বপ্রথম প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারা আধুনিক ও প্রাচীন নানা উপায়ে পল্লীকে স্বাস্থ্যের আবাস করিবার জন্য ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্রভৃতি ব্যাধিকে দূরীভূত করিতে হইবে। ইহাই প্রথম কথা। তার পর বহু শতাব্দীর দূষিত পল্লীর দীনভাবাপন্ন, বিকৃত পরশ্রীকাতর মনগুলিকেও ব্যাধিমুক্ত করিতে হইবে। সকলেই জানেন, পল্লী দলাদলির অধিষ্ঠানভূমি এবং পরশ্রীকাতরতা দলাদলির জন্ম দিয়া থাকে। শুধু বক্তৃতা দ্বারা পরশ্রীকাতরতা দূর হইবে না। কর্ম্মীগণের সুস্পষ্ট আদর্শ, নানা প্রকার কুটীরশিল্প, সমবায়, ব্যবসা, চাষবাসের উন্নতি সাধন দ্বারা পল্লীর অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া বেকার সমস্যার সমাধান না করিলে, নিষ্কর্ম্মা পাটোয়ারী দলকে দলাদলিমুক্ত করা সম্ভবপর নহে। ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালন জন্য এক একটী ইউনিয়নে ৬জন যোগ্য লোক পাওয়া পর্য্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু পল্লীর দাসত্বপ্রবণতা শুধু রাজনৈতিক নহে। শত শত সামাজিক কুসংস্কার ও গতানুগতিকতার পায়ে পল্লীর জনসাধারণ এমন মর্ম্মান্তিক ভাবে নিজের বিচারবুদ্ধি, মনুষ্যত্ব ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দেয়, কোন বেদনা বোধ করে না, অভিযোগ পর্য্যন্ত করিতে জানে না—যে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। এই পল্লীর শরীর ও মনকে সবল সুস্থ করিয়া তোলাই পল্লীসংস্কার-প্রয়াসীর সবচেয়ে আগেকার কাজ। তার পর সুস্থ সবল দেহ মনের অধিকারী পল্লীবাসীকে গণতন্ত্রের শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন অনুভূত হইবে। ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ আপনাদিগকে সর্ব্বক্ষমতার অধিকারী মনে না করিয়া প্রত্যেক ব্যাপারে পল্লীর মতানুসারে আপনাদিগকে ও বোর্ডের সকলকে পরিচালিত করিলে ইহা দুঃসাধ্য হইবে না। প্রত্যেক ওয়ার্ডে বা গ্রাম লইয়া একটী করিয়া করদাতা সমিতি গঠন করা প্রয়োজন। উক্ত সমিতিগুলিতে যাহাতে গ্রামবাসী যোগদান করেন, সেজন্য ইউনিয়ন বোর্ড সভ্যগণ প্রচার-চেষ্টা করিবেন। বজেটের খসড়া, বর্ষান্তে পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব, নগদ টাকা-পয়সার ব্যবস্থা, জনহিতকর প্রত্যেক কার্য্যের পরিচালন, সর্ব্বপ্রথম এই সব করদাতা সমিতিতে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। এবং যথাসম্ভব তাহাদের নির্দ্ধারণ অনুসারে সেই সব ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৎসরে মোট কত টাকা ইউনিয়ন রেট নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক ও কাহের কত টাকা টেক্স হওয়া প্রয়োজন, এই সব সমিতিই নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য ও সভাপতি এই সব করদাতাগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া বোর্ডের পক্ষ হইতে তাহাদের বক্তব্য জ্ঞাপন করিবেন, এবং প্রতিবারের নির্ব্বাচনে ভোটারের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বসমূহ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া তদনুযায়ী রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করিবেন। তাহা হইলে বোর্ড যোগ্য ব্যক্তিদ্বারা গঠিত হইবে এবং বাংলার পল্লী ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের পথে পদার্পণ করিতে শিখিবে। এইরূপ শুদ্ধ মন লইয়া পল্লীসংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিলে পল্লীর রাজনৈতিক সম্প্রসারণ, অভাব-অভিযোগের ও যাবতীয় বাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা ও অর্থনৈতিক সমাধান দ্বারা যে সুস্থ সুন্দর পল্লী গঠিত হইয়া উঠিবে সেইগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সমষ্টিগত মুক্তিসাধনার সঙ্গে সঙ্গে যে বিরাট সবল জাতীয়-জীবন বাংলায় গড়িয়া উঠিবে,—তাহার তুলনা নাই।

পল্লী-স্বরাজ

কৃষি কৌশল

কোন ক্ষেত্রে চুণের অভাব হইলে তাহার উর্ব্বরতা-শক্তি কমিয়া যায়। ক্ষেত্রে চুণ আছে কিনা তাহা পরীক্ষার সহজ উপায় ক্ষেত্রের ৩।৪ স্থানের ৩।৪ কোদাল মাটী তুলিয়া তাহা শুষ্ক করিয়া খুব সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিতে হইবে এবং সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ স্থানের মাটী একত্র মিশাইয়া ৩।৪ আউন্স একটা লৌহের হাতায় লইয়া আগুনে চড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে হইবে। এই ভস্মগুলি যখন শীতল হইবে, তখন একটা কাঁচের গ্লাসে যথেষ্ট পরিমাণ জল দিয়া সেই চূর্ণগুলি ফেলিয়া দিয়া একটা কাটি দ্বারা বা কাচের দণ্ড দ্বারা নাড়িতে হইবে। এই যে আটারমত দ্রব্যটী হইল, ইহাকে ১ আউন্স হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যাহা মিউরেটিক অ্যাসিড অথবা স্পিরিট অব সল্ট নামে বিক্রয় হয় তাহাই মিশাইতে হইবে; এবং খুব ঘন ঘন নাড়িতে হইবে। যদি এই পদার্থটা ফুটিতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ক্ষেত্রে যথাযোগ্য চুণের অংশ বিদ্যমান আছে; আর যদি না ফুটিতে থাকে বা অতি সামান্য ফুটে, তাহা হইলে ইহার চুণ নাই বা চুণের অংশ অতি সামান্য আছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং চুণ দেওয়া আবশ্যক আছে।

হাজারী কাঁটাল

যে গাছে শত শত, হাজার হাজার কাঁটাল ফলে, সেই গাছকেই

উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। অনেকে ইচ্ছা করিলে বহু-ফলধারী কাঁটাল তৈয়ারী বৃক্ষ করিতে পারেন। তবে বিশেষ সাবধানত ও যত্ন না লইলে এরূপ গাছ প্রস্তুত করা কঠিন। প্রথমত বীজের জন্য একটী কাঁটাল বাছাই করিতে হইবে। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, যে কাঁটাল সরু ডালে ফলে, তাহার বীজের গাছ শীঘ্র ফলবান হইয়া থাকে। কথাটা নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে। সেই কারণে হজারী কাঁটালের গাছের জন্য এমন একটি কাঁটাল সংগ্রহ করা চাই, যাহা গাছের সরুডালে ফলিয়াছে। সেই কাঁটালটী বেশ নিটোল এবং সুপক্ব হইবে। সেই কাঁটালকে আস্ত মাটীর নীচে উর্দ্ধাধঃভাবে অর্থাৎ বোঁটাটা উপর দিকে রাখিয়া ঠিক সোজাভাবে পুঁতিয়া ফেলিলে এবং বেশ করিয়া মাটী চাপা দিয়া কাঁটার বেড়া দিবে। নতুবা শিয়াল কুকুরে কাঁটালটা খাইয়া ফেলিতে পারে। কিছুদিন পরে কাঁটালের বোঁটাটা আলগা হইলে টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া দিবে। বোঁটাটী তুলিয়া লইলে কাঁটালের ভিতর সরাসরি একটা লম্বা ছিদ্র হইবে—সেই ছিদ্রটা আলগা মাটী দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। যথাসময়ে এক গোছা চারা সেই কোকর হইতে বাহির হইতে থাকিবে।

এখন এই চারাগুলি যতই বাড়িবে ততই খড় দিয়া জড়াইয়া একত্র করিয়া দরকার।

গাছের গুঁড়িটা যত লম্বা রাখা প্রয়োজন ততদূর খড় দিয়া এইরূপ ভাবে চারাগুলিকে এক সঙ্গে বাঁধিয়া যাইতে হইবে। পরিণামে সমস্ত গাছগুলি একত্র সম্মিলিত হইয়া একটী গাছে পরিণত হইবে এবং সুন্দর শাখা-প্রশাখায় শোভিত হইয়া যথাকালে ফলিতে আরম্ভ করিবে। এইরূপে হাজারী কাঁটাল গাছ জন্মান হইয়া থাকে।

বারমাস লেবু ফলাইবার উপায়

যখন বসন্তকালে লেবুর ফুল ধরে তখন গাছের অর্দ্ধেক বা বারআনা আন্দাজ ফুল নষ্ট করিয়া দিতে হয়। অথবা লেবু কচি অবস্থাতেই ভাঙ্গিয়া খাইতে হয়। এইরূপ করিলেই বারমাস লেবু ধরিতে আরম্ভ করে। এইরূপে আমের মুকুল ভাঙ্গিয়া দিয়া বারমেসে আমগাছও করা হয়।

—চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ

অর্থাগমের উপায়

আমাদের দেশের আনাচে-কানাচে জীবনধারণোপযোগী প্রকৃতি-দত্ত কত উপায়ই যে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিদেশীরা আমাদের চোখের সামনে সেই সমস্ত জিনিষ লুণ্ঠন করিয়া ধনী হইতেছে।

হরীতকী গাছ আকারে আম কাঁটাল গাছ অপেক্ষাও বড় হইয়া থাকে। এই গাছ মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা, ছোট নাগপুর উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে,

হরিতকী গাছের ফল, ছাল, পাতা, কাণ্ড সমস্তই আমাদের কাজে লাগে। হরীতকী কাঠ খুব শক্ত এবং উহাতে উই ধরে না। কেহ কেহ বলেন যে, হরীতকী পাতা খাওয়াইলে গরুর দুধ খুব বৃদ্ধি হয়। কয়েক বৎসর হইতে প্রচুর পরিমাণে হরীতকী বিলাতে চালান হওয়ায় ব্যবসা হিসাবে উহার কদর খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

জামতাড়া, দুমকা অঞ্চলে গন্দ নামক এক শ্রেণীর বুনো লোক বাস করে। উহারা প্রচুর পরিমাণে হরীতকী সংগ্রহ করিয়া ঔষধ এবং রং তৈয়ারী করিবার জন্য বাজারে বিক্রয় করে। জব্বলপুরের হরীতকীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঐ সকল হরীতকী-বহুল স্থান হইতে হরীতকী সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। সর্ব্বপ্রথম, বাগানগুলি এক বৎসরের জন্য "বন্দোবস্ত" লইতে হয়। ফলগুলি পাকিলে লোক দ্বারা পাড়াইয়া কলিকাতা বড়বাজারে হরীতকীর আড়তে চালান করিতে পারিলে প্রচুর অর্থাগম হয়।

হরীতকী, চামড়া পরিষ্কার এবং সংশোধন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হরীতকীর কষে কাপড় ছোপাইলে এক প্রকার ছাইয়ের রং পাওয়া যায়। হরীতকী-ভিজান জলে ফিটকিরী মিশাইলে উৎকৃষ্ট পীতবর্ণ পাওয়া যায়; কিন্তু কাল রং তৈরী করিতেই ইহার ব্যবহার বেশী, হরীতকীর কষের সহিত একটু গুড় কিংবা নীল মিশাইলে রংএর উজ্জ্বলতা সম্পাদিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ইহার সহিত গাবের কষ মিশাইয়া লিখিবার কালী প্রস্তুত হয়। ছোট নাগপুরে হরীতকীর সহিত 'কুসুম ফুল' মিশাইয়া কাল রং করা হয়। চট্টগ্রামে হরীতকী দ্বারা যে কাল রং প্রস্তুত হয়, তাহা কাপড় ছোপাইবার পক্ষে উৎকৃষ্ট। হীরাকষ ও হরীতকীর কষ আধাআধি মিশাইলে খাকি রং পাওয়া যায়। মাদ্রাজ অঞ্চলে তুলা, চামড়া এবং পশমে খয়ের রং করিতে হরীতকী বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হরীতকীর কষ মিশ্রিত জলের সহিত তেঁতুল এবং নীল মিশাইয়া কাল ও সবুজ, নীল মিশাইয়া ঘন নীল এবং খয়ের মিশাইয়া পিঙ্গল রং পাওয়া যায়। কেহ কেহ হরীতকীর কাদা মিশাইয়া এক প্রকার উৎকৃষ্ট পুটিং প্রস্তুত করিয়া থাকে। হরীতকীর ছাল হইতেও কাল এবং খাকি রং পাওয়া যায়। মণিপুরে বাঁশের রং করিতে এবং আসামে তসর, কোরা,এণ্ডি, মুগা এবং পশমে রং করিতে হরীতকী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশ হইতে যে সমস্ত হরীতকী বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহা চামড়া পাকা করিবার জন্যই ব্যবহৃত হয় এবং বিদেশে শুধু এইজন্যই ইহার এত আদর।

ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, বেল্‌জিয়ম, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ইটালী, রুশিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু স্থানে প্রচুর পরিমাণে ইহার রপ্তানি হইতেছে এবং দিন দিন চাহিদা ও দর বাড়িয়া যাইতেছে। কলিকাতা হইতে রেলিব্রাদার্স, গিলেণ্ডার প্রভৃতি বণিকগণ হরীতকী বিদেশে চালান দিয়া থাকেন। কলিকাতা বড়বাজারের পোস্তায় ইহাদের আড়ত আছে।

বৎসরে আমাদের দেশ হইতে কত হরীতকী বিদেশে চালান

হইয়াছে এবং ঐ হরীতকী দ্বারা ব্যবসায়িগণ কত টাকা পাইয়াছেন নিম্নে তাহার ছোট একটু হিসাব দিলাম—

১৯২০—২১, ৩১,৬৪৭ টন দাম ২৭১,৮৭৩ পাঃ,১৯২১—২২, ৩১, ৯৪৭ টন দাম ৩৯১,১০৬ পাঃ,১৯২২—২৩, ৭২০৩৮ টন দাম ৪৯৩২৪৭ পাঃ, মাত্র তিন বৎসরে ১ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকার হরীতকী আমাদের দেশ হইতে বিদেশে চালান হইয়াছে। তবু আমরা নিরন্ন!

(আর্থিক উন্নতি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১)।

—রঙ্গপুর-দর্পণ

বঙ্গদেশের প্রাথমিক শিক্ষা

মহামতি গোখেল ভারতের নিম্নশিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেন। তখন হইতে সংবাদপত্রে, সভায়, ব্যবস্থাপরিষদে এই ব্যাপার লইয়া যথেষ্ট আলোচনা ও আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। সরকারপক্ষ অর্থাভাবের কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়া এতকাল যাবৎ এই অবশ্যকরণীয় কার্য্যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়বহনে অস্বীকার করার জন্যই ব্যবস্থাপক সভায় এই অত্যাবশ্যক বিলটী পরিত্যক্ত হইয়া আসিতেছে।

এবার পুনরায় সেই বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে। এই বিল দোষ-পরিশূন্য হইয়াছে, এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না এবং উহা সংশোধন করা হইবে না, তাহা বলাও সমীচীন হইবে না। যাঁহারা বিলের সমর্থক এবং যাঁহারা বিলের বর্ত্তমান আকারের বিরোধী উভয়েরই শেষলক্ষ্য বাধ্যকরী নিম্ন-শিক্ষার প্রবর্ত্তন। তর্ক সেই লক্ষ্যের পন্থা লইয়া মাত্র। এক পক্ষ বলেন, প্রজা ও জমিদারকে ট্যাক্স ধরিয়া এক কোটীর বেশী টাকা পাওয়া যাইবে, তদ্দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। অপর পক্ষ বলেন, দেশের যেরূপ দুর্দ্দিন, সাধারণ লোক ও জমিদার বিশেষ ভাবে বিপন্ন, এমত অবস্থায় তাহাদিগকে আর করভারে প্রপীড়িত করা চলে না। ঐ সকল লোক ঋণজালে জড়িত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। অতএব নিম্ন শিক্ষার ব্যয়ভার সরকার গ্রহণ করিয়া দেশের অজ্ঞানতা দূর করতঃ প্রজার মঙ্গলসাধন করুন। এই তর্ক হইতেই শিক্ষাবিল একদল সদস্য সিলেক্ট কমিটীতে দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। মন্ত্রী বলেন,সিলেক্ট্ কমিটীতে গেলেই এই বিল পাথর-চাপা পড়িবে, ইহার প্রয়োগের আর সম্ভাবনা রহিবে না। অতএব এই বিলটী যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, সেই ভাবেই গৃহীত হউক।

কথাটা লইয়া তর্ক উঠে। স্বায়ত্তশাসন-মন্ত্রী পদত্যাগ করেন এবং ৫০ জন হিন্দু সদস্য লইয়া তিনি সভাগৃহ পরিত্যাগ করেন।

এখন কথা হইতেছে কাজটা কিরূপ হইল! শিক্ষাবিল সরাসরি গ্রহণ করার বিরুদ্ধে মিঃ এ, কে ফজলল হক্ তীব্র বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। অবস্থা-ক্রমে সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িয়াছে। এই বিলের তর্ক সম্বন্ধে শিক্ষা-মন্ত্রী বলেন, পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ করিয়া আমি বিলের পক্ষে প্রচুর সহানুভূতি পাইয়াছি।

কথাটা এই যে, শিক্ষা বিলের আবশ্যকতা সম্বন্ধে দ্বিমত নাই, কিন্তু দেশের অবস্থা দৃষ্টে সিলেক্ট্ কমিটীর হাতে ইহাকে সমর্পণ না করিয়া কার্য্যকরী করার প্রস্তাব অনেকেই কিছুতেই সমর্থন করেন না। দেশের প্রজাসাধারণের উপর এক কোটী টাকার ট্যাক্স চাপাইবার সময় এখন নহে। ইহাই তাঁহাদের অজুহাত।

—ঢাকাপ্রকাশ

ভেজাল খদ্দর

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন—স্বদেশীর অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালীর শিক্ষিত সম্প্রদায় আজ খদ্দরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ধীরে ধীরে বুঝিতে সুরু করিয়াছেন যে, বস্ত্রে স্বাবলম্বী হওয়া খদ্দর ভিন্ন সম্ভবপর নহে। খদ্দর স্বদেশীর সর্ব্বপ্রধান উপাদান। মূল্যের মহার্ঘতা সত্ত্বেও তাই আজ অনেকে খদ্দর কিনিতেও দ্বিধা করিতেছেন না।

কিন্তু এই চাহিদার বৃদ্ধিই খদ্দরের ব্যবসায়ে একটা হীন প্রতারণা এবং দেশদ্রোহিতার একটা সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। স্বার্থই যাহাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ, এমনি ধরণের এক দল স্বার্থপর ব্যবসায়ী খদ্দরের ক্ষেত্রেও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত লাভালাভের জন্য খদ্দরের ভিতরেও ব্যবসাদারীর অতি নিকৃষ্টতম পন্থাসমূহ অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে আজ অসম্ভব মাত্রায় ভেজাল খাদি তৈয়ারী হইতেছে এবং খাদির পরিচয়ে তাহা বাজারেও বিক্রয়ার্থ হাজির হইতেছে।

এই ভেজাল খাদিটা যে কি জিনিষ, তাহা জানা দরকার। ভেজাল খাদি সামান্য কিছু চরকার সুতা এবং বেশীর ভাগই মিলের সুতার দ্বারা তৈরী হয়। যে মিলের সুতা তাহার ভিতর থাকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাও আবার জাপানী বা ল্যাঙ্কাশায়ারে কলে তৈয়ারী। সুতরাং তাহাকে খাদি ত বলাই যায় না, দেশী জিনিষও বলা যায় না। দেশের নবজাগ্রত ভাবাবেগের সুযোগ লইয়াই এই অপবিত্র জিনিষটা দ্বারা অসাধু ব্যবসায়ীরা আমাদিগকে ঠকাইতেছে —কেবল দেশাত্মবোধের দিক দিয়া নহে—অর্থনীতির দিক দিয়াও। কারণ, চরকায় কাটা সুতায় তৈয়ারী বলিয়াই বেশী দাম দিয়াও মানুষ উহা ক্রয় করে; নতুবা বিদেশী সুতা উহার ভিতর আছে জানিলেও জিনিষটা কোন লোক মিলের বস্ত্রের দামেও কিনিত না।

কিন্তু কেবলমাত্র ইহাই নহে। একটা সদ্য-প্রতিষ্ঠিত প্রকাণ্ড গৃহশিল্পের বনিয়াদকেও ভেজাল খাদি আল্গা করিয়া দিতেছে। ফেণী প্রভৃতি অঞ্চলে যে সমস্ত স্থানে এত দিনের চেষ্টায় জনসাধারণকে সুতা কাটায় অভ্যস্ত করিয়া তোলা হইয়াছে, ভেজাল খাদির ব্যবসায়ীরা সেই সব স্থানে গিয়াও চড়া মূল্যে সব

সুতা কিনিয়া লইতেছেন। চড়া মূল্য দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে কঠিন নহে। কারণ, তাঁহারা যে বস্ত্র তৈয়ারী করেন, তাহাতে চরকার সুতা সামান্যই থাকে, বেশী থাকে বিদেশী মিলের মোটা সুতা—তুলনায় যাহার দাম অতি অল্প। কিন্তু ইহার ফল কি হইতেছে? যে-সব প্রতিষ্ঠান শুদ্ধ খদ্দর লইয়া কারবার করেন, তাঁহারা প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া পড়িতেছে। এইরূপে ইহাদের দ্বারা খাদি আন্দোলনটাই ব্যর্থ হওয়ার একটা আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

এক দিকে যেমন ইহার দ্বারা খাদি প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা আছে, অন্য দিকে আবার তেমনি যাঁহারা সুতা কাটিতেছেন, তাঁহাদেরও বিপদের আশঙ্কা কম নহে। অজ অন্যায় প্রতিযোগিতায় দুই পয়সা হয় ত তাঁহাদের বেশী আসিতেছে, কিন্তু খাদি প্রতিষ্ঠানগুলি যদি কর্ম্মক্ষেত্র গুটাইয়া লন, তাঁহাদের উপার্জ্জনের পথও চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে। দেশের লোক চিরদিন কখনো এরূপ নির্ব্বোধ থাকিবে না যে, ঐ ভেজাল জিনিষটাকে উহার যথার্থ মূল্য অপেক্ষা দ্বিগুণ বেশী দাম দিয়া কিনিয়া লইবে। তাঁহাদের কাছে দুই দিন আগেই হোক্ আর পরেই হোক্ এ চাতুরী ধরা পড়িবেই। তখন ঐ ভেজাল খাদির ব্যবসাটা অকস্মাৎ একদিন যেমন গজাইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি একদিন আবার অকস্মাৎই ধ্বসিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহার আগে যদি প্রতিষ্ঠানগুলি নষ্ট হয় তবে দরিদ্র কাটুনী—যাহারা সুতা কাটিয়া দিনান্তে দুমুঠা অন্নের সংস্থান করিতেছে—তাহাদের আর দিন গুজরানেরও উপায় থাকিবে না।

যাঁহারা খাদি কেনেন তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে, ভেজাল খাদি খাদি নহে, ও জিনিষটা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। খাদি যদি কিনিতে হয় তবে যাচাই করিয়া শুদ্ধ খদ্দর ক্রয় করিতে হইবে, এবং যাঁহারা সুতা কাটেন তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে, ভেজাল খাদির ব্যবসায়ীদের কাছে চরকার সুতা বিক্রয় করা মহাপাপ, তাহা ত তাঁহাদের স্বার্থের অনুকূল নহে বরং তাঁহাদের পক্ষে আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র।

কেবল দেশাত্মবোধের দ্বারাই দেশ স্বাধীন হয় না। তাহার জন্য এই দেশাত্মবোধকে যথাযথভাবে কাজে লাগান দরকার। তাহার জন্য প্রয়োজন—গভীর অনুসন্ধিৎসা ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা পথ যাচাই করিয়া লইয়া সেই পথে নির্ভুল ভাবে চলিবার শক্তি অর্জ্জন করা।

ঢাকা প্রকাশ

সমালোচনা

বঙ্গের চৈতন্যপরবর্ত্তী সহজিয়া ধর্ম্ম (Post-Chaitanya Sahajyia Cult of Bengal)। অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, এম.-এ-লিখিত, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ১৮+৩২০। মূল্য ৪।০ টাকা।

গ্রন্থকার তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে নয় বৎসর বিশেষ গবেষণার ফলে তিনি এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রম যে সার্থক হইয়াছে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সহজিয়া ধর্ম্ম বিষয়ক যে সকল অদ্ভুত কথা সাধারণে প্রচলিত আছে, তাহাতে ইহার সম্বন্ধে একটা সঙ্কীর্ণ ধারণা অনেকেই পোষণ করিয়া থাকেন, এবং ইহাও সত্য যে এই ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষাও অনেকের মনেই জাগরিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মণীন্দ্রবাবু সহজ ধর্ম্মের স্বরূপ ও ইতিহাস সম্বন্ধে যেভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের সেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

এক-একটী ধর্ম্ম জগতে নানাভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে; ইহাকে বুঝিতে হইলে বিভিন্ন দিক্ দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। হিন্দুধর্ম্মে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষতলে রক্ষিত শিলাখণ্ডের পূজাও প্রচলিত আছে। ইহার দার্শনিক তত্ত্বের নিবৃত্তির জন্য বিভিন্ন দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। সহজিয়া ধর্ম্মেরও এইরূপ বিভিন্ন প্রকার বিশিষ্টতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে ধর্ম্ম এদেশে ছোট বড় বহু লোকে অবলম্বন করিয়াছেন, পরকীয়া রমণী লইয়া সাধনাই যে তাহার একমাত্র বিশিষ্টতা নহে, ইহা নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধিতেই ধরা পড়ে। মণীন্দ্রবাবু তাঁহার গ্রন্থে সহজিয়া ধর্ম্মের বিভিন্ন প্রকার বিশিষ্টতা অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই হিসাবেও তাঁহার এই গ্রন্থখানি অতিশয় উপাদেয় হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বৈধী ও রাগানুগা সাধনা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পরে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে সহজিয়ারাও বৈষ্ণবদের ন্যায় রাগানুগার শ্রেষ্ঠতাই স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। বৈষ্ণব-দর্শনে পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, সহজিয়ারাও সেই মতাবলম্বী। স্বকীয়া হইতে পরকীয়া শ্রেষ্ঠ কেন, এবং পরকীয়া অবলম্বন করিবার দার্শনিক কারণ কি, ইত্যাদি বিষয় মণীন্দ্রবাবু

এমন সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন যে পড়িলেই মুগ্ধ হইতে হয়। তারপর রমণী লইয়া সাধনার কথা। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে যাহা আছে, ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন পুস্তকে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। অবশেষে পরকীয়ার দার্শনিক ব্যাখ্যা—ইহাতে অনেক নূতন তত্ত্বের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। পরকীয়া অর্থে পরধর্ম্ম, নিষ্কামধর্ম্ম বা পরমাত্মার সাধনা—ইহাই সহজিয়া ধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ডের বিশেষত্ব।

পরকীয়া রমণী লইয়া যে সাধনা তাহা তান্ত্রিক মতের, ইহা এক ভিন্ন স্তরের জিনিস, যেমন হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি বহু ধর্ম্মেই আছে। কিন্তু ঐ সকল ধর্ম্মও যেমন প্রধানতঃ দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সহজিয়া ধর্ম্মের একটা দিকও সেইরূপ জ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে। গ্রন্থকার বিস্তৃতভাবে ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে সহজিয়া ধর্ম্মের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। রমণী লইয়া সাধনার প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল। লেখক বেদ, উপনিষদ এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ সাধনার দ্বারা যে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায় তাহার দার্শনিক তত্ত্ব প্লেটোর বহিতেও রহিয়াছে। লেখক "বেঙ্কোয়েট" নামক বহি হইতে সঙ্কলন করিয়া বর্ত্তমান সহজিয়া মতের সহিত তাহার সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। হিন্দু তন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিয়া মতেও স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই উভয় ধর্ম্মের নিকট বর্ত্তমান সহজিয়ারা যে অনেক বিষয়ে ঋণী, তাহা বিস্তৃতভাবে অতি নিপুণ-তার সহিত আলোচিত হইয়াছে। চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগেও বৈষ্ণব ধর্ম্মে বিশুদ্ধ: সহজিয়া মতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ও দানপত্রাদি হইতে সঙ্কলন করিয়া লেখক ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই, সকল মাল-মসলা হইতে বর্ত্তমান সহজিয়া ধর্ম্মের উপকরণ সংগৃহীত হইলেও ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল চৈতন্যদেব-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে। উক্ত ধর্ম্মের বিশেষত্ব কি, এবং কিভাবে তাহা হইতে বর্ত্তমান সহজিয়া ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে তাহা অতি সুন্দরভাবে লেখক প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রেম মার্গীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন বৈষ্ণবগণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে প্রেমের সাধনা সহজিয়ারা অবলম্বন করিয়াছেন। যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এই সকল বিষয় এমনভাবে ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়ে সহজিয়া ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। ভগবান সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। আনন্দের প্রকৃত অভিব্যক্তি প্রেমে, অতএব 'ভগবান প্রেমময়' এই ধারণাই সহজিয়ারা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রকৃতি-পুরুষ নিত্য প্রেমে আবদ্ধ, জগতের সর্ব্বত্রই এই প্রেমলীলা প্রকটিত রহিয়াছে। যে প্রেম-বলে সমগ্র জগতকে আপনার করিয়া লইতে পারে সেই সিদ্ধ পুরুষ। প্রকৃত সহজিয়া ধর্ম্মের ইহাই মূল সূত্র। মণীন্দ্রবাবু এই দার্শনিক তত্ত্বগুলি অতি প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে সহজিয়া সাহিত্য লইয়া আলোচনা হইয়াছে। সাধারণের একটা বিশ্বাস আছে যে বর্ত্তমান সহজিয়া ধর্ম্ম বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এক খানা সহজিয়া বহিতেও বৌদ্ধধর্ম্ম কি কোন বৌদ্ধ গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ নাই। অথচ এমন কোন সহজিয়া গ্রন্থ নাই যাহাতে চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের কথা উল্লিখিত হয় নাই। সহজিয়ারা বিশ্বাস করেন যে চরিতামৃতে প্রচ্ছন্ন সহজিয়া মত প্রচারিত হইয়া-ছিল। অতএব তাঁহারা কথায় কথায় উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া-ছেন। চরিতামৃত সহজিয়া ধর্ম্মের ব্রহ্মসূত্র। আর একটী অতি জটিল বিষয়ের সমাধান মণীন্দ্রবাবু করিয়াছেন। রূপ, রঘুনাথ, জীব, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনের নামে প্রচলিত অনেক সহজিয়া গ্রন্থ আছে। এই সকল বৈষ্ণবগণ যে সহজিয়া গ্রন্থ লেখেন নাই, এমন একটা সন্দেহ অনেকের মনেই জাগিয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তাহার কোনই পন্থা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মণীন্দ্রবাবু যুক্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা কতকগুলি সূত্র বাহির করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে অনেক গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। গ্রন্থশেষে প্রায় ২৫০ খানা চৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণব গ্রন্থের নাম দেওয়া আছে, তাহার অধিকাংশই সহজিয়া মতের গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, কিন্তু তাহা কোথায় পাওয়া যায়, তাহার সন্ধানও অনেকে জানেন না। মণীন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে এই সকল গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত আছে, এবং প্রত্যেক পুথির ক্রমিক নম্বরও তিনি প্রদান করিয়াছেন। সাহিত্যসেবী-মাত্রেই ইহাতে উপকৃত হইবেন তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সর্ব্বশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে এই সহজিয়া গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। সহজ-ধর্ম্মের এমন গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই।

Printed by Sarat Chandra Bhar at the Manasi Pres s, 77 Hari Ghosh Street and
Pu blished by the same from the Panchapushpa Office, 28B, Telipara Lane, Calcutta.
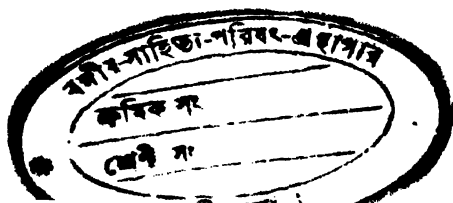
তৃতয় বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৩৭ { ষষ্ঠ সংখ্যা

বিসর্জ্জনে

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি-এ]

এসে চ'লে গেছ-খবর পেয়েছি
আজই বিদায়ের বাঁশীতে;
নানা ভক্তের সেবায় এবারে
এঘরে পারনি আসিতে!
আপনারে নিয়ে হেথা আমি হারা,
যে কাজ দিয়েছ, তাই নিয়ে সারা,
তব আগমনী চোখেই পড়েনি
আকুল অশ্রুরাশিতে।

এসে চলে' গেছ—হে দেবী আমার,
বছরের দেখা হ'ল না—
তোমারি আদেশে পাইনি সময়,
আজিকে সে কথা ভুল না!
যে পূজা সেথায় তারকায় জ্বলে,
তাই মেঘ হ'য়ে ঝরিছে ভূতলে,
কেহ না জানুক তুমি তো জানিছ
তোমারি কাজের তুলনা।

নয়নের আলো নিবিয়া আসিছে,
ছায়া হ'য়ে আসে এ ভুবন;
এবারের মত সন্ধ্যা আগত
বন্ধ বা চির দরশন!
তাই যদি হয়, হে দেবী আমার,
কোনো নিবেদন নাহি তবে আর,
বেদনার মাঝে শেষের আরতি,
চরণে করিনু সমাপন।

সন্থ বিধবা বিজয়া দশমী
সাজিল সন্ধ্যা গেরুয়ায় ;
আসে একাদশী অঙ্গনে বসি'
শূন্য নয়নে ফিরে' চায় !
পূর্ণ ঘটের জলভরা বুকে
সহকার-শাখা শুকায় সমুখে,
স্মৃতির মতন আলিপনাগুলি
চারিধারে চাহে নিরুপায়।

আদিশূর

[প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু]

গৌড়-বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে আদিশূরের নাম চির-প্রসিদ্ধ। কি ব্রাহ্মণ-সমাজ, কি কায়স্থ-সমাজ, কি বৈদ্য-সমাজ, সমাজ-পত্তন বা সমাজ-সংস্কারের কথা উঠিলেই কি কুলজ্ঞ কি কুলাচার্য্য সকলেই আদিশূরের দোহাই দিয়া থাকেন। বলিতে কি আদিশূরের নাম শোনেন নাই বা জানেন না, সামাজিকগণের মধ্যে এমন লোক দেখি নাই। কিন্তু নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়—এই নামটী যেমন সর্ব্বজন-পরিচিত, ইঁহার প্রকৃত ইতিহাস সেইরূপ তিমিরাচ্ছন্ন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ যে আদিশূরকে তাঁহাদের বীজপুরুষগণের আনয়নকারী ও সম্মানদাতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই আদিশূরের সহিত কায়স্থগণের প্রতিষ্ঠাতা আদিশূর অভিন্ন বলিয়া মনে হয় না। আবার বিভিন্ন ব্রাহ্মণ-কুলগ্রন্থে যে আদিশূরের নাম পাইতেছি তাঁহাকে উপরোক্ত আদিশূর হইতে পৃথক্ মনে করি।

বুদ্ধদেব ও শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর সময় হইতে গুপ্তবংশের প্রভাব-বিস্তারকাল পর্য্যন্ত গৌড়মণ্ডলে বৌদ্ধ ও জৈনপ্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল। গৌড়মণ্ডলে গুপ্তপ্রভাব প্রসারের সহিত এখানে ধীরে ধীরে বেদপাঠক ব্রাহ্মণ-সংস্পর্শে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের চেষ্টা হয়। কুমারগুপ্ত, বুধগুপ্ত, ভানু-গুপ্ত প্রভৃতি গুপ্ত সম্রাট্‌গণের অধিকার-কালে এখানে সত্র, চরু ও বলি কর্ম্মের জন্য বহু বেদপাঠী ব্রাহ্মণ-স্থাপনের সংবাদ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুপ্তবংশের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে, তাঁহাদের আধিপত্য-কালে যাঁহারা সামন্ত নৃপতিরূপে রাজ্য শাসন করিতে ছিলেন, গুপ্ত-বংশের প্রভাব খর্ব্ব হইলে সেই সকল সামন্তবংশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া পরম ভট্টারক মহারাজা-ধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন, এইরূপে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে রাঢ়দেশে জয়নাগ ও বারকমণ্ডল বা বারেন্দ্রে ধর্ম্মাদিত্যদেব, গোপচন্দ্র দেব ও সমাচার দেবের সন্ধান পাইতেছি। উক্ত নৃপতিগণের অধীন সামন্তগণ রাঢ়দেশের অন্তর্গত ঔদুম্বরিক বিষয় (বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগে) এবং বারকমণ্ডলের অন্তর্গত (অধুনা ঢাকা ও ফরিদপুর জেলায়) বেদপাঠী ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ছিলেন, তাহা সমসাময়িক পাঁচখানি তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল নৃপতি পুরুষপরম্পরায় বহু পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

যে দিগ্বিজয়ী নৃপতি পুরুষ-পরম্পরায় গৌড় বঙ্গে আধি-পত্য ও সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী ছিলেন, তিনিই কুল-গ্রন্থে 'আদিশূর' বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। এখন কথা হইতেছে কোন্ দিগ্বিজয়ী নৃপতিকে আমরা কুলগ্রন্থ বর্ণিত

প্রথম আদিশূর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি ?

প্রায় তিন শত বর্ষের হস্তলিখিত একখানি সংক্ষিপ্ত কুলগ্রন্থের পুথি পাইয়াছি। এক সময় গৌড়-বঙ্গের সকল সমাজে—কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থ বলিয়া নহে, নবশাখাদিগের মধ্যেও প্রশ্নোত্তরমূলক সংক্ষিপ্ত কুলপরিচয় প্রচলিত ছিল, তাহা 'জিজ্ঞাসা' নামে পরিচিত হইত। পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিখানিকে এইরূপ 'জিজ্ঞাসা' বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই 'জিজ্ঞাসায়' আদিশূর সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"সোন সবে একমনে বচন মধুর।
যে কালেতে যজ্ঞ কৈল রাজা আদিশূর ॥
পঞ্চ বিপ্র আনাইল যজ্ঞের কারণ।
সৌকালিন ভরদ্বাজ গৌতম ব্রাহ্মণ ॥
আলিম্যান বাৎস্য আদি এই পঞ্চজন।
তাহার দিগের সঙ্গে আইল কায়স্থ দশজন ॥

*　*　*　*

সোন সভে এক মনে বচন মধুর।
ছোট বড় ভেদ কৈলেন রাজা আদিশূর ॥
যার শিষ্য যে করিলা সেই গোত্র পায়।
সবারে সন্তোষ করি করিলেন বিদায় ॥"

ঐ দশ জনের উদ্ভব সম্বন্ধে উক্ত কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

"মোর এক নিবেদন সোন মহাসএ।
রাঢ়েতে আছিলেন যখন বিচিত্র উদএ ॥
পদ্মিনীর দুই কন্যা বিবাহ করিল।
দুই ঘরে দস পুত্র তাহার জন্মিল ॥
তাহারে দেখিয়া ব্রহ্ম সন্তোস হইআ।
রাখিল সভার নাম পদ্ধতি করিআ ॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ নারায়ণ দত্ত মহাসএ।
মহানাদ ঘোষ বসু মিত্র মৃত্যুঞ্জএ ॥
এ চাইর পুত্র হইল, পদ্মিনীর ঘরে।
আর ছয় পুত্র হইল সত্তবার উদরে ॥
চন্দ্র সেন বড় জন দেও মহাসয়।
হরিপুরী দাস সিংহ মহাতেজোময় ॥
তাহার অনুজ নাহি আর কেহ।
সকলের কনিষ্ঠ হইল চন্দ্রভান গুহ ॥"

উদ্ধৃত পরিচয় হইতে পাইতেছি—রাঢ়দেশে বিচিত্রের বংশে দত্ত, ঘোষ, বসু, মিত্র, চন্দ্র, সেন, দেব, দাস, সিংহ ও গুহ এই দশ পদ্ধতির কায়স্থ বাস করিতেন। যে সময় সৌকালিন, ভরদ্বাজ, গৌতম, আলম্যান ও বাৎস্য এই পঞ্চ গোত্র আদিশূরের সভায় উপস্থিত হন, তৎকালে দত্ত, ঘোষাদি দশঘরের দশজনও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত ১০ জনের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন নারায়ণ দত্ত, ঘোষ বংশে মহানাদ ঘোষ ও মিত্র বংশে মৃত্যুঞ্জয় মিত্র এই তিন জনের নাম পাইতেছি। উত্তর-রাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থকারিকায় দত্ত বংশের বীজী পুরুষোত্তম দত্ত, ঘোষ বংশের বীজী সোম ঘোষ (তৎপৌত্র মকরন্দ ঘোষ) এবং মিত্রবংশে সুদর্শন মিত্র (তাঁহার প্রপৌত্র কালিদাস মিত্র) হইতেছেন। সুতরাং উপরোক্ত দত্ত, ঘোষ ও মিত্র বংশের বীজপুরুষের সহিত শেষোক্ত বীজপুরুষগণের নামের মিল হইতেছে না। উক্ত 'জিজ্ঞাসা'র পুথিতে আরও পাইতেছি—

"আকনাতে গেল ঘোষ মাহিনাতে বসু।
বরিসা রহিল মিত্র দুঃখ রহে কিছু ॥
বালীতে রহিল দত্ত প্রতাপ প্রচুর।
ব্রহ্মগ্রামে গেল সেন দেও চিত্রপুর ॥
সিংহপুরে রয় সিংহ হারপুরে দাস।
পানিহাটী গত চন্দ্র গুহ বঙ্গবাস ॥"

উপরে ঘোষ বসু মিত্রাদির যে কয়টী সমাজস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ সকল স্থান দক্ষিণ-রাঢ়ের মধ্যে পড়িতেছে। অথচ দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলপঞ্জিকার সহিত মূল বা বীজ-পুরুষের নাম সম্বন্ধে আদৌ মিল হইতেছে না।

উক্ত 'জিজ্ঞাসা'র পুথিতে ব্রাহ্মণের যে পঞ্চ গোত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিতও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-দিগের পঞ্চ গোত্রের মিল নাই।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই পঞ্চ গোত্রের ব্রাহ্মণ দেখা যায়, কিন্তু সৌকালিন, গৌতম ও আলম্যান এই তিন গোত্র নাই বা কোন কালে ছিল না; এছাড়া পরবর্ত্তী কালে যে সকল বৈদিক ব্রাহ্মণ এদেশে আগমন করেন,

তাঁহাদের মধ্যেও আমরা সৌকালিন বা আলিম্যান গোত্র খুঁজিয়া পাই না। এ অবস্থায় স্বীকার করিতে হয় রাঢ়ীয় ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণের পঞ্চ বীজপুরুষের আগমনের পূর্ব্বে রাঢ়দেশে সৌকালিন, ভরদ্বাজ, গৌতম, আলিম্যান ও বাৎস্য গোত্র ব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিলেন। এখন কথা হইতেছে রাঢ় দেশে ঠিক কোন্ সময়ে ঐ সকল গোত্রের ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন? বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ডে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ বীজপুরুষ-গণের আগমন-প্রসঙ্গে এবং রাজন্যকাণ্ডে শূরবংশ বিবরণ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে দেখাইয়াছি যে ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষ আনয়ন-কারী আদিশূর বিদ্যমান ছিলেন। রাজন্যকাণ্ডে শূরবংশ বিবরণ মধ্যে জয়ন্তশূর প্রসঙ্গে এই আদিশূরের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শূরবংশের মধ্যে ইনি পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর হইয়া 'আদিশূর' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহাকেই আমরা ১ম আদিশূর মনে করিতাম এবং ইঁহারই সভায় শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই পঞ্চ গোত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখন দেখিতেছি, সৌকালিন, গৌতম ও আলম্যান গোত্র যখন এই আদিশূরের সভায় আগমন করেন নাই, তখন সৌকালিনাদি পঞ্চ গোত্র ও দশজন কায়স্থ যাঁহার সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি ভিন্ন আদিশূর হইতেছেন।

রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে যেমন দশজন (বিভিন্ন গোত্রের) কায়স্থের রাঢ়ে উপস্থিতির কথা পাই-তেছি, সেইরূপ রাঢ়ীয় শাকল-দীপিকা নামক রাঢ়ীয় শাক দ্বীপী ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থে মহারাজ শশাঙ্কের সময় রাঢ়-দেশে কাশ্যপ, কৌশিক বা ঘৃতকৌশিক, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, মৌদ্গল্য, পরাশর, গৌতম, ভরদ্বাজ, জমদগ্নি ও আলম্যান এই দশ গোত্র ব্রাহ্মণ আগমন করেন।*

নদীয়া-বঙ্গ সমাজের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, গৌড়-পতি শশাঙ্ক গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ পীড়িত হইয়া অতিশয় ক্লেশ ভোগ করেন। কিন্তু বৈদ্যগণের চিকিৎসায় রোগসঙ্কট দূর না হওয়ায় তিনি গ্রহশান্তি করাইবার জন্য সরযূতীর হইতে দ্বাদশ গোত্র ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। রাঢ়ীয় শাকলদীপিকায় যে দশগোত্রের উল্লেখ আছে, ঐ দশটী গোত্র ছাড়া মৌদ্গায়ন ও গর্গ এই দুইটী অতিরিক্ত গোত্র ধরিয়া দ্বাদশ হইতেছে।†

উক্ত দশ বা দ্বাদশ গোত্রের মধ্যে সৌকালিন গোত্র নাই। অপর চারি গোত্রের সন্ধান পাইতেছি। বলা বাহুল্য, মহারাজ শশাঙ্কদেব একজন দারুণ বৌদ্ধবিদ্বেষী ব্রাহ্মণভক্ত শৈব ও প্রাচ্য ভারতের অর্থাৎ এক সময়ে মগধ, গৌড়, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ এই পঞ্চ জনপদের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। রোগমুক্ত হইয়া তিনি দশ গোত্র বা দ্বাদশ গোত্র ব্রাহ্মণকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-প্রভাবের ফলে সেই পূর্ব্বস্মৃতি পরবর্ত্তী কুলগ্রন্থ হইতে উৎক্ষিপ্ত বা বিলুপ্ত হইলেও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের আদি পরিচয় গ্রন্থ হইতে এককালে সম্পূর্ণ স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। দশগোত্র বা দ্বাদশ গোত্র-ব্রাহ্মণানয়নকারী শশাঙ্কদেবও এক 'আদিশূর' রূপে পরিচিত হওয়া বিচিত্র নহে।

রাঢ় দেশে কর্ণসুবর্ণে মহারাজ শশাঙ্কদেবের রাজধানী ছিল। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন ও প্রাগ্জ্যোতিষপতি ভাস্করবর্ম্মা উভয়ে মিলিত হইয়া মহারাজ শশাঙ্কদেবকে পরাজয় করেন। শশাঙ্কদেবের পরাজয়ের পর মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা ঐ কর্ণ-সুবর্ণে কিছু দিন আধিপত্য করিয়াছিলেন। এই কর্ণসুবর্ণে অধিষ্ঠান কালে সুদূর উত্তর গৌড় বা প্রাগ্জ্যোতিষ হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভাস্করবর্ম্মার সভায় উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। এই কর্ণসুবর্ণ রাজধানী হইতে ভাস্করবর্ম্মার যে সুবৃহৎ তাম্র শাসন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ৩০ গোত্র ও ২০ ঘর স্বামিপাদের উল্লেখ আছে, অন্ততঃ ২০৫ দুইশত পাঁচজন ব্যক্তি উক্ত শাসনের জমি পাইয়াছিলেন? এই তাম্রশাসনের সম্পূর্ণ অংশ এখনও পাওয়া যায় নাই। যতটা পাওয়া গিয়াছে, পণ্ডিতবর পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তিনি ২০ ঘর স্বামিপাদগণের অকারাদিক্রমে এইরূপ পদ্ধতি দিয়াছেন— ১ কুণ্ড, ২ ঘোষ, ৩ দত্ত, ৪ দাম, ৫ দাস, ৬ দেব, ৭ ধর, ৮ নন্দ, ৯ নন্দি, ১০ নাগ, ১১ পাল, ১২ পালিত, ১৩ ভট্ট, ১৪ ভট্টি, ১৫ ভূতি, ১৬ মিত্র, ১৭ বসু, ১৮ শর্ম্মা, ১৯ সেন ও ২০ সোম। উক্ত ২০ ঘরের গোত্র পাইতেছি ৩৮টী

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪র্থ অংশ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বিবরণ, ৮৬ পৃষ্ঠা।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থ অংশ, ৮৭ পৃষ্ঠা।

যথা অগ্নিবেশ্য, আঙ্গিরস, আলম্বায়ন বা আলম্যান, আত্রায়ন, কবেন্তর, কাত্যায়ন, কাশ্যপ (কশ্যপ), কৃষ্ণাত্রেয়, কৌটিল্য, কৌণ্ডিন্য, কৌৎস, কৌশিক, গার্গ্য, গৌতম, গৌরাত্রেয়, জাতকর্ণ, পাস্কল্য, পারাশর্য্য, পৌতিমাষ্য, পৌর্ণ, প্রাচেতস, ভারদ্বাজ, (ভরদ্বাজ), ভার্গব, মাণ্ডব্য, মৌদ্গল্য, যাস্ক, বাৎস্য, বারাহ, বার্হস্পত্য, বাসিষ্ঠ, বৈষ্ণবৃদ্ধ, শাকটায়ন, শাণ্ডিল্য, শালঙ্কায়ন, শৌনক, সাঙ্কৃত্যায়ন ও সাবর্ণিক।

এই সকল গোত্র মধ্যে সৌকালিনের উল্লেখ নাই। তবে উক্ত তাম্রশাসনের এখনও সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় নাই। অপ্রাপ্ত অংশে সৌকালিন গোত্রের উল্লেখ থাকিতে পারে। অথবা এই গোত্র পরে আসিয়া মিলিত হইতে পারেন।

এখন কথা হইতেছে—মহারাজ শশাঙ্কদেবের সময় যে ১০ গোত্র বা ১২ গোত্রের ব্রাহ্মণ রাঢ়ে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ গোত্রের সহিত পূর্ব্বোক্ত দশ ঘর কায়স্থের গোত্র মিল হইলেও পদ্ধতি বা পদবীর আদৌ মিল নাই, কিন্তু ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে কেবল গোত্র বলিয়া নহে, পদ্ধতি বা পদবীর মিলও পাইতেছি।

'জিজ্ঞাসা'র পুথিতে আছে—

"সোন সবে এক মনে বচন মধুর।
ছোট বড় ভেদ কৈলেন রাজা আদিশূর ॥
যার শিষ্য যে হইলা সেই গোত্র পায়।
সবারে সন্তোষ করি করিলেন বিদায় ॥
বিদায় পাইয়া সবে রাঢ়েতে চলিল।
দশজনা দশ গ্রামে বসতি করিল ॥"

উদ্ধৃত পরিচয় হইতে মনে হয় গুরুপুরোহিতের গোত্র অনুসারে উক্ত দশ ঘরের গোত্র হইয়াছিল।* পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে বসু, ঘোষ, মিত্র, দত্ত, দাস, দেব, সেন, সিংহ প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত স্বামিপাদের উল্লেখ আছে। কামরূপপতি ভাস্করবর্ম্মা যে সময়ে রাঢ়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে বিজয়োৎসবে অতিবাহিত করিতেছিলেন, সেই সময় চন্দ্রপুরি বিষয়ে ময়ূরশাল্মল অগ্রহার হইতে স্বামিপাদগণ আসিয়া কামরূপপতিকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ মহারাজ ভূতিবর্ম্মা তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকে তাম্রশাসন দ্বারা যে সকল ভূমিদান করিয়াছিলেন, সেই তাম্রপট্ট নষ্ট হওয়ায় রাজপুরুষেরা কর ধার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি এবং তাঁহাদের অধিকার যাহাতে বজায় থাকে, তজ্জন্য পুনরায় একখানি তাম্রশাসন দিতে আজ্ঞা হউক। তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা তাঁহাদের সকলের জমি পৃথক্ পৃথক্ অংশ নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন। যে সকল জমির উল্লেখ আছে, তাহা যখন ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মার সময়ে প্রদত্ত, তখন উক্ত ভূমিগৃহীতাগণের ৪।৫ পুরুষ অধস্তন বংশধরগণ রাঢ়দেশে কর্ণসুবর্ণে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত তাম্রশাসন হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং তাম্রশাসনের উক্তি অনুসারে ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি উপাধিধারী স্বামিপাদগণ খৃষ্টীয় ৫ম শতকে চন্দ্রপুরি বিষয়ে উক্ত ময়ূরশাল্মল অগ্রহারে বিরাজ করিতেন। তাম্রশাসন উদ্ধারকারী পণ্ডিতবর পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন, "চন্দ্রপুরি বিষয়ের অন্তর্গত যে ভূমি শাসনের বিষয়ীভূত হইয়াছে, তাহার সীমা-বর্ণনায় 'গঙ্গিনিকা' শব্দটী রহিয়াছে। কামরূপের অপর কোনও শাসনে এ যাবৎ এই শব্দটী পাওয়া যায় নাই। গঙ্গিনিকা শব্দ এখনও গঙ্গিনী নামে বরেন্দ্রমণ্ডলে প্রচলিত আছে। মরা নদীর পুরাতন খাত এই নামে কথিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমানে কামরূপে মরা নদীর খাত থাকিলেও এই নাম সম্পূর্ণ অপরিচিত। অপিচ খালিমপুরের শাসনে 'মাঢ়া শাল্মলী' নামক গ্রামের উল্লেখ আছে।† ইহাও কতকটা 'ময়ূরশাল্মলের সদৃশ। নামসাদৃশ্যও সন্নিকর্ষসূচক বটে। ঐ শাসন কামরূপ-সংলগ্ন করতোয়ার পশ্চিমে অবস্থিত পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভূমির কোন গ্রাম সম্বন্ধে ছিল তাই চন্দ্রপুরি

* দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, "এতে সপ্তাশীপদ্ধতিঃ সিদ্ধাঃ দ্বাদশসংজ্ঞকাঃ। সর্ব্বৈব নবাধিকনবতিঃ পদ্ধতিঃ। এতেষাং পুরোহিতগোত্রপ্রবরা গোত্রপ্রবরং।" (কুলপঞ্জিকা) অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে মোট ৯৯টী পদ্ধতি হইতেছে, তন্মধ্যে দ্বাদশ ঘর সিদ্ধ এবং ৮৭ঘর মৌলিক হইতেছেন। পুরোহিতের গোত্রপ্রবর অনুসারে তাঁহাদের গোত্রপ্রবর।

† গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য।

বিষয় যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অতি সন্নিকৃষ্ট তাহাই সূচিত হইতেছে।"‡

এক্ষণে ভাস্করবর্ম্মার উক্ত তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারিতেছি যে, তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মার সময়ে খৃষ্টীয় ৫ম শতকে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকট বসু, ঘোষ, মিত্র প্রভৃতি উপাধিধারী স্বামিপাদগণ বাস করিতেন এবং দামোদরপুর হইতে আবিষ্কৃত গুপ্তসম্রাট্‌গণের সময়ে উৎকীর্ণ ৪ খানি তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারিয়াছি যে খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ে দত্ত, মিত্র, দাস, দেব, নন্দী, পাল, ভদ্র প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থ রাজপুরুষ অবস্থান করিতেন। ইহারা কেহই স্বামিপাদ বলিয়া চিহ্নিত হন নাই। এরূপ স্থলে মনে হয় যে গৌড় বা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে দেড় হাজার বর্ষ পূর্ব্বে বসু, ঘোষাদি পদ্ধতিযুক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বাস করিতেন। ভাস্করবর্ম্মার শাসন ও উক্ত জিজ্ঞাসার পুথি হইতে মনে হয় ঘোষ, বসু, মিত্রাদি বহু পদ্ধতিযুক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয়ে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দশ গোত্র ও পদ্ধতিযুক্ত দশজন ব্রাহ্মণ ও সেই সেই গোত্র ও পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থ রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার বংশে এক শাখা এই রাঢ়দেশে আর এক শাখা কামরূপে রাজত্ব করিতেন। রাঢ়ের শাখা 'ভৌমান্বয়' ও 'গৌড় উড্র-কলিঙ্গ কোশলপতি'। বলিয়া শিলালিপি ও তাম্রশাসনে পরিচিত হইয়াছেন। এই রাঢ়ে বা গৌড়ে মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা ভৌমবংশীয় আদি বা প্রথম নৃপতি মহাশূর বীর ছিলেন বলিয়া "আদিশূর" নামে পরবর্ত্তী কালে পরিচিত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইনিই প্রথম আদিশূর। শ্রীহট্টের বৈদিকানয়নকারীর নামও আদিধর্ম্মপা হইতেছেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—৬৫৪ শকে বা খৃষ্টীয় ৮ম শতকে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবীজ পুরুষ-আনয়নকারী আদিশূরের অভ্যুদয়। ইহার প্রকৃত নাম জয়ন্তশূর। যদিও পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবীজ পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থগণের আগমন কীর্ত্তন করিয়াছেন।

‡ রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, সন ১৩০৪, ১ম—৪র্থ সংখ্যা সভাপতির অভিভাষণ, ৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু তাঁহাদের গোত্রের সহিত, যখন উক্ত কায়স্থগণের গোত্রের মিল নাই, তখন কেমন করিয়া বলিব, উক্ত পঞ্চ সাগ্নিকের সহিত কায়স্থাগমন ঘটিয়াছিল? জয়ন্তশূর গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে (বর্ত্তমান বগুড়া জেলায় মহাস্থানগড়ের নিকট) রাজত্ব করিতেন। এরূপ স্থলে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষ পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেই আসিয়া ছিলেন। কিন্তু বসুঘোষাদি দশজন কায়স্থ জিজ্ঞাসাবর্ণিত আদিশূরের নিকট সম্মানিত হইয়া দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত দশগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে উক্ত প্রাচীন কুলপরিচয় গ্রন্থে লিখিত আছে—

"আকনাতে গেল ঘোষ মাহিনাতে বসু।
বরিসা রহিলা মিত্র দুঃখ রহে কিছু॥
বালীতে রহিল দত্ত প্রতাপ প্রচুর।
ব্রহ্মগ্রামে গেলা সেন দেও চিত্রপুর॥
সিংহপুরে রয় সিংহ হরিপুরে দাস।
পানিহাটী গত চন্দ্র গুহ বঙ্গবাস॥"

এরূপ স্থলে বলিতে হইবে যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা পূর্ব্ব বারেন্দ্রবাসী পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের সহিত দক্ষিণরাঢ়বাসী কায়স্থগণের কোন সম্বন্ধই ছিল না।

আদিশূর নামে পরিচিত জয়ন্তশূরের রাজ্যনাশ ঘটিলে বৌদ্ধ পাল-বংশের অভ্যুদয়ে জয়ন্তের বংশধর রাঢ়দেশে আসিয়া সাতশতীগণের সাহায্যে নূতন সমাজ পত্তন করেন। তাঁহারই সময়ে রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও সাতশতী এই শ্রেণিভেদ ঘটে। রাঢ়বাসী পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ সন্তানগণ এ সময়ে সাতশত ঘর থাকায় তাঁহারা সাতশতী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কোন কোন কুলগ্রন্থে দেখা যায় রাজা আদিশূরই উক্ত শ্রেণিভেদ করিয়াছিলেন, স্থলে এরূপ রাঢ়ে শূরবংশীয় ১ম-নৃপতি ভূশূরও একজন 'আদিশূর' মধ্যে গণ্য হইতেছেন।

ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূরের সময় গৌড়াধিপ দেবপাল উত্তররাঢ় অধিকার করেন। এই সময় শূররাজবংশ দক্ষিণরাঢ়ে সরিয়া আসেন এবং এখানেই কিছুকাল রাজত্ব করেন। গৌড়াধিপ ১ম বিগ্রহপালের সময় রাষ্ট্রকূটপতি ২য় কৃষ্ণ এবং অপর দিকে হৈহয়রাজ গুণাম্ভোধিদেব গৌড় আক্রমণ করেন।

পালনৃপতি নিজ রাজ্যরক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই

সুযোগে রাজা ক্ষিতিশূরের পৌত্র ধরণীশূর উত্তররাঢ় অধিকার করিয়া 'আদিত্যশূর' উপাধি ধারণপূর্ব্বক সিংহেশ্বরে ৮০৪শকে (৮৮২খৃষ্টাব্দে) অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কোন কোন আধুনিক উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে ইনিও 'আদিশূর' নামে চিহ্নিত হইয়াছেন এবং ইঁহার সভায় ক্ষিতীশাদি পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আগমনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক ইঁহার সভাতেই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের পঞ্চবীজপুরুষ ও সুশীল, মাধবাদি পঞ্চ যাজ্ঞিক উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কান্যকুব্জের সিংহাসনে যে আদিধরাহ নামে নৃপতি বিরাজ করিতেছিলেন, তিনিও উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে 'আদিশূর' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।*

দ্বিজ বাচস্পতির 'বঙ্গজকুলজীসারসংগ্রহে' লিখিত আছে—

"নয়শত চৌরানই শক পরিমাণে।
আইলেন দ্বিজগণ রাজ-সন্নিধানে॥
পঞ্চ কায়স্থ সঙ্গে আরোহণ গোযানে।
সম্মানপূর্ব্বক ভূপ রাখিলা সর্ব্বজনে॥"

অর্থাৎ ৯৯৪শকে দ্বিজগণ রাজার নিকট আসিয়াছিলেন, পঞ্চকায়স্থও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। রাজা সকলকেই সম্মানিত করিয়াছিলেন। ভাটের কথায় ও যদুনন্দনের বারেন্দ্র ঢাকুরগ্রন্থেও আমরা সেই স্মরণীয় ৯৯৪শক পাইতেছি। এদিকে 'সারাবলী' নামক বঙ্গজকুলগ্রন্থে লিখিত আছে, ৯৯৪ শকে বিরাটগুহ আদিশূরের যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখন কথা হইতেছে—ঐ শকে কে রাজা হইয়াছিলেন? এবং কোন্ কোন্ ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন?

পাশ্চাত্য-বৈদিককুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায়, 'মহারাজ সামলবর্ম্মা ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) নিজ বাহুবলে শত্রুগণকে পরাভূত করিয়া স্বয়ং গৌড়ে রাজা হইয়াছিলেন' এবং তাঁহার সভায় পাশ্চাত্য বৈদিকগণের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চ গোত্র আগমন করেন।

রাজা সামলবর্ম্মা একজন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি দিগ্বিজয়ী চেদিসম্রাট্ কর্ণদেবের দৌহিত্র, মালবপতি উদয়াদিত্যের পুত্র, মহাবীর জগদ্বিজয়মল্ল বা জগদেও পরমারের জামাতা, দিগ্বিজয়ী জাতবর্ম্মার পুত্র। উদয়াদিত্যের জ্যেষ্ঠপুত্র লক্ষ্মণদেবের নাগপুরপ্রশস্তি পাঠে জানা যায় যে উদয়াদিত্যের পুত্রগণ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, আক্রমণ করিয়াছিলেন ও গৌড়েন্দ্র ভীত চকিত হইয়াছিলেন। এদিকে চেদিসম্রাট্ কর্ণদেবের গৌড় আক্রমণকালে তাঁহার জামাতা জাতবর্ম্মা তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। এরূপ স্থলে সামলবর্ম্মা পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের সাহায্যে ও নিজের শক্তিতে একজন অসাধারণ প্রভাবশালী হইয়া রাজ্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, এবং তিনিও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ ছিলেন, তাহা কুলগ্রন্থেই প্রকাশ।

এই সামলবর্ম্মার সভায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ উভয়েই সমবেত হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় পরবর্ত্তীকালে এই রাজার নাম ভুলিয়া তাঁহার স্থানে আদিশূরের নাম দিয়া তৎসাময়িক ঘটনার আরোপ কিছু বিচিত্র নহে। তাঁহার মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল এদেশ ত্যাগ করিয়া গেলে মহারাজ বিজয়সেন সামলবর্ম্মার অধিকার গ্রাস করেন, সামলবর্ম্মা পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া সেনবংশের করদ নৃপতিরূপে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তিনি এখানে আসিয়া ১০০১শকে শাকুনসত্র সম্পন্ন ও বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রথিত হইয়াছেন।

সেনবংশের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রতিপন্ন হইবে যে সময়ে সামলবর্ম্মা পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরে যে সময় শাকুনসত্র অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন, ঠিক ঐ সময়ে ১০০১শকে বা ১০৭৯খৃষ্টাব্দে মহারাজ বিজয়সেন দক্ষিণ গৌড় ও সমগ্র রাঢ় অধিকার করিয়া পশ্চিম বঙ্গে বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া অজস্র দক্ষিণাদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। দত্ত প্রভৃতি দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের কুলকারিকায় পাওয়া যায় যে, এই 'শ্রীবিজয় মহারাজ' নৃপতির সভায় বহু কায়স্থ আসিয়া সমবেত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। কোন কোন কুলগ্রন্থে ইনিও 'আদিশূর' নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহাকেই আমরা শেষ 'আদিশূর' বলিয়া মনে করি।

———

বঙ্গসাহিত্যে "নক্সা"

(অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ, এম-এ)

(ক)

"হুতোম প্যাঁচার নক্সা"র আমল হইতে আজকাল-কার দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে নক্সার অভাব নাই। দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ইন্দ্রনাথ, প্রভৃতি কেহই "নক্সা" রচনা করিতে ছাড়েন নাই। রবীন্দ্র নাথের কোনও কোন রচনায়ও নক্সার ছাপ আছে। বাঙ্গালার জল-হাওয়া নক্সার অনুপযোগী হয় নাই,বরং ইহার পুষ্টিসাধনের পক্ষে সহায়তা করিয়াছে। বাঙ্গালার নিজস্ব হাস্যরস নক্সার ভিতর দিয়া বহুক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; আবার সময় সময় নক্সার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া শিখণ্ডীর ন্যায় অলক্ষ্যে স্বকার্য্য সাধন করিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত এ শ্রেণীর সাহিত্য বাঙ্গালায় বিরল হয় নাই। তাই দেখি আজও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকগণ নক্সা রচনা করিতে কার্পণ্য করিতেছেন না। আবার, ছদ্ম নামেও কত লেখক কত নক্সা রচনা করিতেছেন ও কত নক্সা মাসিক পত্রের কুক্ষিগত হইয়া ক্রমশঃ লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়া যাইতেছে। এই শ্রেণার সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি, ইহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, ইহার প্রকৃত মুল্য-নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে এপর্য্যন্ত কেহই বিশদ আলোচনা করেন নাই, অন্ততঃ আমার জানা নাই। তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে এসমন্ধে একটু আলোচনা করিব।

এখন নক্সা বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি? এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া সহজ নহে। "নক্সা" বলিতে সকলে এক জিনিস বুঝেন না এবং কখনও বুঝিবেনও না। "কাব্য," "সাহিত্য" প্রভৃতির সংজ্ঞা দেওয়া যেমন সহজ নহে, এসব বিষয়ে যেমন মান্ধাতার আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত মতান্তর রহিয়া গিয়াছে, নক্সা সম্বন্ধেও ঠিক তাহা সত্য। তবে, তফাৎ এই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অনেক বড় বড় কবি, পণ্ডিত ও রসজ্ঞ সমালোচক কাব্য সাহিত্য প্রভৃতির এক একটী নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু নক্সার ভাগ্যে এরূপ চেষ্টা বোধ হয় কোন বড় সাহিত্যিক বা সমালোচকের দ্বারা এপর্য্যন্ত হয় নাই। তবে ইহা নিশ্চয়ই সত্য যে, সাহিত্যামোদী মাত্রেই নক্সা বলিতে একটা কিছু বুঝেন এবং অপর এক জন সাহিত্যামোদীর সহিত এই বিষয় লইয়া তাঁহার যতটাই মতান্তর থাকুক না কেন, কিছু সাদৃশ্যও থাকিবেই। নক্সা বলিতে কেহ রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ, শকুন্তলা, বিষ-বৃক্ষ, নৌকা ডুবি প্রভৃতি শ্রেণীর রচনা নিশ্চয়ই বুঝিবেন না। আবার ৺কালী প্রসন্ন ঘোষের নিভৃত চিন্তা বা ৺অক্ষয় কুমার দত্তের প্রবন্ধাবলিকেও নিশ্চয় কেহ নক্সা বলিয়া ভুল করিবেন না। মাইকেলের প্রহসন দুইখানি নক্সা কিনা, দ্বিজেন্দ্রলালের "কল্কি অবতার" নক্সা কিনা, বঙ্কিমচন্দ্রের "মুচিরাম গুড়" নক্সা কিনা, এসম্বন্ধে মতান্তর থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণ-চরিত্র" বা রবীন্দ্রনাথের "প্রাচীন সাহিত্য" বা শরৎচন্দ্রের "নারীর মূল্য" যে নক্সা নহে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারের নেতি নেতি প্রণালী অবলম্বন করিলে অনেক শ্রেণীর রচনাই যে নক্সা নহে ইহা বুঝা যায়, কিন্তু এমন অনেক রচনা আছে যে গুলিকে তাহাদের স্রষ্টারা নক্সা নামে অভিহিত না করিলেও তাহাদিগকে নক্সা বলা চলে,—যথা, বঙ্কিমচন্দ্রের "মুচিরাম গুড়", ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের "ডমরু চরিত",পরশুরামের "সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" ও "কচি সংসদ", সুরেন্দ্রবাবুর (মজুমদার) "হুঁকা বন্ধ"। এমন ঢের প্রহসন, পঞ্চরং, ব্যঙ্গ চিত্র এবং হাসির গল্প আছে যাহাকে "নক্সা" বলিতে অনেকেই প্রস্তুত হইবেন,—যথা, গিরিশ চন্দ্রের অনেকগুলি পঞ্চ রং, অমৃতলালের "অবতার", দেবেন্দ্রবাবুর "পিণ্টু গোপাল"। এখন, কি কি উপাদান থাকিলে একটী রচনাকে "নক্সা" বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে,—

(১) প্রথমতঃ,"নক্সার" ভিতর যথেষ্ট পরিমাণে হাস্য-রসের উপাদান থাকিবে। পাঠককে একটু হাসান, একটু নির্দোষ (?) ব্যঙ্গ-তামাসার অবতারণা করিয়া কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার চিত্তবিনোদন করা, একটা নিছক্ হাসির চিত্র তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত মনকে একটু তৃপ্তি দেওয়া—যে নক্সার একটী প্রধান উদ্দেশ্য তাহার সন্দেহ নাই। ইংরেজিতে যাহাকে 'sense of the ludicrous' বলা যায় তাহা নক্‌সার প্রধান উপাদান, অর্থাৎ কোন চরিত্রমূলক বা ঘটনামূলক অত্যদ্ভুত বৈচিত্র্য, অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য লইয়া ব্যঙ্গ করা ইহার প্রধান কার্য্য। ইহা হইতেই নক্‌সার রসোৎপত্তি।

(২) দ্বিতীয়তঃ, সমাজ, শিক্ষাপদ্ধতি, সাহিত্য প্রভৃতির ভিতর কোন গলদের প্রতি একটা কটাক্ষ অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষের ভণ্ডামি, জুয়াচুরি, ধাপ্পাবাজি, এককথায় তাহার কোন ত্রুটি লক্ষ করিয়া একটু বিদ্রূপের ইঙ্গিত নক্সায় থাকিবেই। শ্লেষ-বিদ্রূপ থাকিবে না, আক্রমণের হুল থাকিবে না, এরূপ হাস্য-রচনাকে বোধ হয়, নক্সা বলা চলে না। "হিউমার" বলিতে অধিকাংশ ইংরেজসমা-লোচকগণ যাহা বুঝেন তাহা হইতে "নক্‌সার" এই-খানেই প্রভেদ। "হিউমারে" আক্রান্ত ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা সমাজের প্রতি একটা করুণা বা সহানুভূতির ভাব থাকিবে, নক্‌সাতে তাহা না থাকাই সাধারণ নিয়ম। সুধু একটা Broad laughter (অবহাস) থাকিবে, গ্রন্থকারের তরফ হইতে একটা খোঁচা বা কটাক্ষ থাকিবে না—এরূপ রচনাকে ঠিক নক্সা বলা সঙ্গত হইবে না। পক্ষান্তরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কয়েকটী নক্সায় এরূপ খোঁচা প্রায় নাই বলিলেই হয়

(৩) তৃতীয়তঃ, নক্সার আর একটী উপাদান হইতেছে শিক্ষাদানের চেষ্টা। আক্রান্ত ব্যক্তি বা সমাজের চোখে আঙুল দিয়া তাহার দুর্ব্বলতা বা ভুল দেখাইয়া দেওয়া এবং তাহা যে সংশোধন করিতে হইবে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া নক্সাকারের একটী প্রধান কার্য্য। নক্সা অনেকটা "moral agent" অথবা "social scavenger" এর কার্য্য করে। ব্যাধিবিদ্রূপের খোঁচায় লোককে শুধরণ, সমাজের উন্নতি সাধন করা, "প্রকাশ্যে বেল্লেমো-গিরি, বদমাইসী, বজ্জাতি" যাহাতে লাঘব হয় তাহা করা —নক্‌সার একটা প্রধান অত্যুক্তি বা উদ্দেশ্য।

(৪) চতুর্থতঃ, নক্সায় অতিরঞ্জন থাকিবেই। অত্যুক্তি, আত্যান্তিকতা বা অতিরঞ্জন নক্সার প্রাণ, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অবশ্য এখানে অতিরঞ্জন কথার মানে বর্ণনা-বাহুল্য নহে; যে ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম লইয়া ব্যঙ্গ করা হইতেছে তাহার অতিরঞ্জিত চিত্র, এই অর্থে অতিরঞ্জন শব্দ ব্যবহার করিতেছি। "এনোফেলিস্" জাতীয় মশক কি প্রকারে ম্যালেরিয়ার বীজ বহন করিয়া আনে, ইহা বুঝাইতে গেলে উক্ত শ্রেণীর মশকের যেমন বর্দ্ধিতায়তন ছবি দেখাইতে হইবে, সেইরূপ কোন সামাজিক বা প্রচলিত প্রথা সম্বন্ধীয় ত্রুটি, অসঙ্গতি, দুর্ব্বলতা বা গলদের প্রতি পাঠক ও আক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত নক্সাকারকে ঐ ত্রুটি বা গলদের এক অতিরঞ্জিত চিত্র আঁকিতে হইবে, তিলকে তাল করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিতে হইবে। যথা, কোন এক "হটাৎ অবতারের" ভণ্ডামি দেখাইতে গেলে তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইতে হইবে; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ও সমাজের দলপতিদিগের "মদ খাওয়া যে বড় দায়", তাহা দেখাইতে গেলে সমাজের গোস্বামী, বাচস্পতিদের জোর করিয়া সভায় আনিয়া হাজির করিতে হইবে; অতিরিক্ত স্ত্রী-স্বাধীনতার-কুফল দেখাইতে গেলে এরূপ "তাজ্জব ব্যাপারের' বর্দ্ধিতায়তন চিত্র দিতে হইবে। নক্সাকারের কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, অনর্থক বর্ণনা-বহুল্য দ্বারা নক্সার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অতিরিক্ত ডালপালা জুড়িয়া দিলে নক্সা অনেকস্থলেই প্রহসনে দাঁড়াইয়া যায়।

(৫) পঞ্চমতঃ, নক্সার ভাষা লঘু, সহজে এবং কৌতুক-মূলক হওয়া চাই। যে ভাষায় কার্লাইল ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন বা অক্ষয়কুমার দত্ত চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ লিখিয়াছেন তাহা নক্সার পক্ষে নিতান্ত অনুপ-যোগী। অবশ্য, ক্রীড়াচ্ছলে নক্সাকার সময় সময় গুরুগম্ভীর ভাষা ব্যবহার করিবেন ও serio comic হাস্য গম্ভীর ভাষা ব্যবহার করিয়া রসসৃষ্টি করিবেন, কিন্তু, সাধারণতঃ, তাঁহার ভাষা লঘু ও কৌতুকমূলক হইবে। সংস্কৃতশব্দ-বহুল সাধুভাষা অপেক্ষা প্রবাদবাক্য ও চলিত কথা ব্যবহার করিলে নক্সার উদ্দেশ্য বেশী সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া

নক্সা শ্লীলতা ও সুরুচির গণ্ডী অতিক্রম করিবে না। অতিরিক্ত গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট বা অশ্লীলতাদুষ্ট ভাষা নক্সাতেও অচল।

(৬) আবার, নক্সায় নীতিমূলক বক্তৃতা অথবা সুদীর্ঘ বর্ণনা অপেক্ষা ইঙ্গিতের ভাগ বেশী থাকিবে। অবশ্য ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"য় উপদেশচ্ছলে অনেক স্থলে বক্তৃতা করিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু আজ-কালকার জনপ্রিয় নক্সাগুলিতে 'সারমনের' ভাগ কম ও গল্প এবং ইঙ্গিতের ভাগই বেশী। "সাত পেয়ে গরু" নামক (সাড়ে তিন লাইনে সমাপ্ত) একটী ক্ষুদ্র নক্সায় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় যতটা ইঙ্গিত করিতে পারিয়াছেন তাহা তাঁহার সুদীর্ঘ, বর্ণনা-বহুল "কলিকাতায় বারোইয়ারী পূজা"য় পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। "পাঁচু ঠাকুরের" অন্তর্গত কয়েকটী ছোট চিত্রে ইন্দ্রনাথ যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা, বোধ হয়, "কল্পতরু", "ক্ষুদিরাম" প্রভৃতি রচনায় পারেন নাই। নক্সাকার সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে নরুণের কার্য্য কোদলে হয় না, আঁশ-বঁটিতে ফোড়া অস্ত্র করা চলে না।

(৭) সপ্তমতঃ, নক্সা আকারে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র হইবে। 'Brevity is the soul of wit' ও 'restraint is the soul of art' ইহা নক্সাকার সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। অবশ্য, অমৃতলাল লিখিত কয়েকটী "সামাজিক নক্সা" আকারে বড় ছোট নহে, কিন্তু সাধারণতঃ নক্সা বলিতে খুব বড় রচনা বুঝাইবে না। অমৃতলালের সামাজিক নক্সাগুলি অনেক স্থলেই প্রহসনে পরিণত হইয়াছে ; সেগুলিকে নক্সা না বলিয়া প্রহসন বলিলেই ভাল হয়। বিদ্রূপ, শ্লেষ ও সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা থাকিলেই নক্সা হইবে না, তাহা হইলে "সধবার একাদশী" ও "খাসদখল"কে নক্সা বলা যাইত। নক্সা প্রবন্ধের আকারে (যেমন "হুতোম প্যাঁচার নক্সার" অন্তর্গত অনেকগুলি নক্সা, "পাঁচুঠাকুর" গ্রন্থের অন্তর্গত কয়েকটী নক্সা), ব্যঙ্গচিত্রের আকারে (যেমন গিরিশ-চন্দ্রের "নক্সা", ত্রৈলোক্যনাথের "ডমরু চরিত" দেবেন্দ্র বাবুর "ঘন্টা মারো", "কাঠে কাঠে", "ডেভিল ম্যারেজ)" ক্ষুদ্রায়তন নাটিকা বা প্রহসনের আকারে (যেমন গিরিশ চন্দ্রের 'বেল্লিক বাজার', অতুলকৃষ্ণে 'বকেশ্বর', অমৃতলালের 'বৌমা', দেবেন্দ্রবাবুর 'পিন্টু গোপাল', অথবা গত বৎসর আশ্বিন মাসের বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত, "শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা" লিখিত 'প্রমত্ত মর্ত্ত্যলোক'), ব্যঙ্গ কবিতার আকারে (যেমন, হেমচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর মেয়ে', দ্বিজেন্দ্রলালের 'নন্দলাল'), কিংবা ছোটগল্পের আকারে (যেমন, ত্রৈলোক্যনাথের "মুক্তামালা"র অন্তর্গত কয়েকটী গল্প ও দেবেন্দ্রবাবু, পরশুরাম, সুরেন্দ্রবাবু, কেদারবাবু প্রভৃতির কয়েকটী ছোট গল্প) লেখা যাইতে পারে কিন্তু তাহা আকারে খুব বড় হইবে না। পঞ্চাঙ্কনাটক বা বড় উপন্যাসকে কিছুতেই নক্সা বলা চলে না। এক কথায়, উপদেশ-বহুল, চিত্র-বহুল, চরিত্র-বহুল বড় রচনাকে নক্সা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না।

(খ)

"নক্সা"-সাহিত্য যে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন নহে ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য বলিতে সাধারতঃ যাহা বুঝি তাহার পত্তন খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে ধরিলে দোষের হইবে না। বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ ও ভারতচন্দ্রকে বাদ দিলে ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য রচনা খুব কম। পাঠক সাধারণ তাহার সহিত বিশেষ পরিচিত ও নহেন। "ভদ্রার্জ্জুন", "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব", "সুবর্ণ শৃঙ্খল", মাইকেল-প্রণীত "শর্ম্মিষ্ঠা", "বুড়োশালিক", "একেই কি বলে সভ্যতা", এবং দীনবন্ধু-প্রণীত "নীলদর্পণ" লইয়াই আমাদের নাট্য-সাহিত্যের জন্ম বলিলে ভুল হইবে না। আবার, "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালায় লিখিত প্রথম উপন্যাস ইহাও মোটামুটি ভাবে সত্য। যদিও একথা মানিতে পারা যায় না যে, "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" নাটক এবং মাইকেলের প্রহসন দুখানি ভাষা ও ভাবের দিক দিয়া অত্যন্ত সেকেলে ধরণের জিনিস কিংবা টেকচাঁদ ছাড়া তখনকার দিনে কেহই চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন নাই, তথাপি মোটা-মুটি হিসাবে ধরিলে সংস্কৃত-বহুল শব্দ অনেক পরিমাণে বর্জ্জন করিয়া চলিত ভাষায় উপন্যাস রচনা ও সাহিত্য সৃষ্টি করিতে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন টেকচাঁদ যে তাঁহাদের অগ্রণী, ইহা মানিয়া লইলে হানি নাই। টেক-চাঁদের পরেই খুব সহজ ও চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হইয়াছিলেন মহাভারতের অনুবাদক মহাত্মা কালী-প্রসন্ন সিংহ। এ প্রয়াসের প্রকৃষ্ট নিদর্শন হইতেছে "হুতোম

প্যাঁচার নক্সা"। যে হস্তে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতি-প্রধান ইতিহাস সুসংস্কৃত বাঙ্গালা গদ্যে অনূদিত হইয়াছিল, সে হস্তে যে তথাকথিত সাধুভাষা যথাসাধ্য' বর্জ্জন করিয়া চলিত ভাষায় হুতোমের নক্সা বাহির হইতে পারে ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এই নক্সা খানি বাহির হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় নক্সা-সাহিত্য ছিল কি না তাহা প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ অনুসন্ধান করিবেন। সে সংবাদ আমাদেরও জানা নাই, হুতোমের সৃষ্টিকর্ত্তারও জানা ছিল না। গ্রন্থকার এই নক্সায়—"ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা" বলিতে গিয়া পাঠকগণকে স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে নক্সা লইয়া ভাঁড়ামো করার চেষ্টা বাঙ্গালা ভাষায় এক নূতন জিনিষ। এই নক্সাটী পাঠকদের উপহার দিয়ে 'এই এক নূতন' বলে তিনি তিরস্কার বা পুরস্কার লইতে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার ভাষায়, "কি অভিপ্রায় এই নক্সা প্রচারিত হল, নক্সা খানির দুপাত দেখ্‌লেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন; কারণ, এই নক্সায় একটী কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই। সত্য বটে, অনেকে নক্সাখানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটী যে তিনি নন, তা বলা বাহুল্য। তবে কেবল এই মাত্র বল্‌তে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই, অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করেচি। এমন কি স্বয়ং নক্সার মধ্যে থাকতে ভুলি নাই।" *

নক্সা-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে হুতোমকে সর্ব্বাগ্রে রাখিয়া কথা বলিতে হইবে এজন্যও বটে এবং এই নক্সা খানি অধুনা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে ও আজকালকার পাঠক-সাধারণের নিকট এক প্রকার অপরিচিত বলিয়াও বটে, এ সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম ও বলিতেছি। (১৭৮৪ শকাব্দায় প্রকাশিত ও দুই খণ্ডে সমাপ্ত) এই নক্সা-খানিতে তদানীন্তন কলিকাতার বাবু মহলের একখানি জীবন্ত (হয়তো স্থলে স্থলে কতকটা অতিরঞ্জিত) চিত্র পাওয়া যাইবে। এ হিসাবে "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থের ন্যায় এ গ্রন্থখানি অমূল্য। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বেকার কলিকাতার চড়কপার্ব্বণ, বারোইয়ারী পূজা, রথ, দুর্গোৎসব ও রামলীলা বর্ণনা উপলক্ষে, মাহেশের স্নানযাত্রা বর্ণনা উপলক্ষে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে—নক্সাকার তখনকার কলিকাতা সমাজের যে চিত্র দিয়াছেন, কলিকাতার বড় মানুষদের নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা, "গুরুপূজা" প্রকৃতি প্রথার কদর্য্যতা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত(?)গণের শিক্ষাহীনতা, ভট্টাচার্য্যগণের কথায় ও কার্য্যে প্রভেদ, এক কথায় সমাজিক অধঃপতনের যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা না পড়িলে বুঝা যায় না। আবার এই গ্রন্থে তখনকার দিনের "ক্রিশ্চানি হুজুক" "বুজরুকি", "ভূত নাবানো" প্রভৃতির যে বর্ণনা আছে এবং "রসরাজ" ও "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" প্রভৃতি কাগজ-ওয়ালাদের খেঁউড় লড়াই লইয়া যে সব মন্তব্য আছে, তাহাতে বোধ হয় নক্সাকার যেন চোখে আঙুল দিয়া তখনকার সমাজের চিত্র পাঠককে দেখাইয়া দিতেছেন। সত্য বটে, ব্যক্তিগত আক্রমণের জন্য এই নক্সা খানি অনেকস্থলে দূষিত হইয়াছে, সত্য বটে নক্সা আঁকিতে গিয়া গ্রন্থকার বহুস্থলে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিয়া নক্সা খানির সৌন্দর্য্য হ্রাস করিয়াছেন, সত্য বটে তাঁহার ভাষা অনেক স্থলে গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট হইয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালার এই সর্ব্বপ্রথম নক্সাখানি অবজ্ঞা ও অনাদরের সামগ্রী নহে। ইহ তে হিউমার'না থাকিলেও শ্লেষ-বিদ্রূপ যথেষ্ট পরিমাণে আছে, ইহার ভাষা * তখনকারের দিনের কলিকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষা হইলেও শ্রুতি-কঠোর বা বিরক্তিকর হয় নাই। মোট কথা, অধুনিক যুগের ইঙ্গিত-মূলক ও আখ্যায়িকা-প্রধান নক্সা গুলির শিল্প-চাতুর্য্য ইহাতে বেশী না থাকিলেও নক্সার যাহা প্রধান উদ্দেশ্য তাহা এক্ষেত্রে নিষ্ফল হয় নাই। ইহার প্রমাণ গ্রন্থকার নিজেই দিয়াছেন। দ্বিতীয়বারের 'গৌর চন্দ্রিকা'য় গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, এই নক্সাখানি ("কেউ লুকিয়ে কেউ প্রকাশে") প'ড়ে "অনেকে শুধ্‌রেচেন, সমাজের উন্নতি হোয়েচে, প্রকাশ্য বেলেল্লাগিরি, বদ্‌মায়েসী বজ্জাতি অনেক লাঘব হোয়েচে।"

(ক্রমশঃ)

* বর্ত্তমান যুগের একজন প্রবীন সাহিত্যিক ও প্রসিদ্ধ নক্সাকার তাঁহার একটী নক্সা উপলক্ষ্য করিয়া আমায় বলিয়াছেন যে, ইহার ভিতর তিনি নিজেও আছেন। তাঁহার অনেকগুলি নক্সার ভিতর autobiographical element আছে ইহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

* এই নক্সার ভাষার নমুনা স্বরূপ দুই একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(১) "ভট্টাচার্য্য মশাইদের ছেলে বেলা যে কদিন আসল সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তার পর এজন্মে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না; কেবল সংবচ্ছর অন্তর একদিন মেটে সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সেও কেবল কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যের জন্য।"

(২) "এক এক জন কলারমুখো বামুনকে ক্রিয়া বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেখলে হটাৎ বোধ হয়, যেন গুরুমশাই পাঠশালা তুলে চলেচেন। কিন্তু বেরোবার সময়ে বোধ হয় এক একটা সর্দ্দার ধোপা;—লুচিমণ্ডার মোটটী একটা গাধায় বইতে পারে না।"

(৩) ইংরেজি পড়্‌লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ("হটাৎ অবতার" মহাশয়) ছেলেগুলিকে ইংরেজি পড়ান না, অথচ বিদ্যাসাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধনে সংস্কৃত পড়ানও হয়ে উঠে নাই, বিশেষতঃ শূদ্রের সংস্কৃতে অধিকার নাই এটীও তাঁর জানা আছে।"

বন্দে মাতরম্

(গল্প)

[শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ]

১

শৈলেন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। ছেলেবেলা হইতেই সে খুব স্বদেশানুরাগী—তাহার প্রতিজ্ঞা এই সে কখনই চাকরী বা কাহারও দাসত্ব করিবে না। সে দিন সোমবার স্কুলে আসিয়া সে দেখিল দরজায় একখানা কাগজে লেখা আছে "আজ মায়ের আহ্বান, স্বরাজের জন্য স্কুল ছাড়িয়া টাউন হল-সভায় যোগদান করিবেন।"

শৈলেন ভাবিল এতদিন ছাত্রদের কেহ 'আপনি' বলে নাই, 'তুই', বড় জোর 'তুমি' তাহাদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়। আজ এই বিজ্ঞাপনটীর শেষ শব্দ তাহাকে জানাইয়া দিল সেও সম্ভ্রান্ত। পিতা, মাতা, শিক্ষক প্রভৃতির কাছে সম্ভ্রম দুরের কথা। পিতা বলিতেন "মূর্খ," মাতা বলেন "ছেলের কাঁথায় আগুন!" আর শিক্ষকের কাছে সে "রাসকেল ছেলে!" এই বিজ্ঞাপনের ভাষা তাহাকে বুঝাইয়া দিল—বাড়ী ও স্কুলের বাহিরে তাহার ডাক পড়িয়াছে।

সেদিন সে স্কুলে গেল না। একেবারে টাউন হলের দিকে অগ্রসর হইল।

পথে কয়েকটী সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হইল। তাহারা স্কুলে যায় নাই। শৈলেন বলিল, "তোমরা কি টাউন হলে যাবে?"

একজন বলিল, "সে আবার বলতে?"

নরেন বলিল, "তুইও টাউন হলে যাচ্ছিস্ তো? আজ অনিমেষবাবুর ইংরেজী বক্তৃতা—বুঝতে পারবি?"

সন্তোষ একটু হাসিল। শৈলেনের মনে হইল এই হাসিটার সহিত উপহাসের কোন প্রভেদই নাই। সে জানিত সন্তোষ ক্লাশের শ্রেষ্ঠ বালক।

টাউন হলে আসিয়া সে দেখিল সভাস্থলে লোকারণ্য, দাঁড়াইয়া দেখিবার স্থানও প্রায় শেষ হইয়াছে। সহপাঠীরা কে কোথায় ভিড়ের মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছে তাহা সে ঠিক রাখিতে পারিল না।

অনিমেষবাবু বলিতেছিলেন, "হে তরুণ সঙ্ঘবদ্ধ হও, দেশমাতার আহ্বান আসিয়াছে, তোমরা স্কুল কলেজ ছাড়িয়া দাও। এস, সকলে তোমরা কাল বেলা দুইটার মধ্যে 'শক্তি-সঙ্ঘ' আফিসে জড় হয়ে যে যা পার কাজ ঠিক করে নাও।"

আরও অনেক কথা হইল। অনিমেষবাবুর নাকে চশমা, পরিধানে খদ্দর, মাথায় গান্ধী ক্যাপ। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হইল। ঘন ঘন হাততালি পড়িতে লাগিল।

বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হইল। চারিদিকে সকলে সমস্বরে চীৎকার করিল, "বন্দে মাতরম্।"

২

পথে চলিতে চলিতে শৈলেন ভাবিল 'বন্দে মাতরম্' কথাটার অর্থ কি? সে স্থির করিল সারা দেশটাকে জননীর মত দেখিতে হইবে; বুঝিতে হইবে এই দেশই তাহাকে প্রসব করিয়াছে—এই দেশকেই মায়ের মত যত্ন করিতে হইবে, সম্ভ্রম করিতে হইবে—তবেই স্বরাজ সম্ভব।

সে ভূগোলে পড়িয়াছিল বাঙ্গালা সামান্য দেশ নয়। নানা জেলা, নগর, গ্রাম ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। তার পর বাঙ্গালার মত কত প্রদেশ লইয়া এই ভারতবর্ষ। শৈলেন ভাবিল—হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এই বিপুল ভূমি কত নদনদী, পর্ব্বত, অরণ্য, কত কীটপতঙ্গ, নরনারীকে কোন্ অতীত যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত পোষণ করিয়া আসিতেছে। ইহারই বুকে আমার পূর্ব্ব পুরুষ পালিত হইয়াছেন, আমিও বিংশশতাব্দীর কয়েকটা বৎসর কাটাইয়ে আসিয়াছি। এই শ্যামলা ভূমি সত্যই আমার জননী, তাহার সেবা আমার পরম ধর্ম্ম। এ কথা অতি

সামান্য ইহার জন্য সভাসমিতি কেন, এত মত্ততার প্রয়োজন কি ?

সে ধীরে ধীরে আপনার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ তিন বৎসর তাহার পিতা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। দারিদ্র্য হইতে আত্মরক্ষার জন্য মা নিকটস্থ এক ধনীর সংসারে রাঁধুনীর কাজ কারন।

দেশের চিন্তা ছাড়িয়া সে এইবার নিজের অবস্থায় কথা । মা বলিলেন, "শৈলেন, কবে তুই পাস দিয়ে চাকরি করবি ! আমি আর পারি না।"

শৈলেন চীৎকার করিল, "মা, খিদে পেয়েছে।"

মা সামান্য একটা পাত্রে কতকগুলি মুড়ি আনিয়া পুত্রকে খাইতে দিলেন। তখন পথ দিয়া অনিমেষবাবুর মোটর শৃঙ্গনিনাদ করিতে করিতে ধীরগতিতে চলিতেছিল ছেলেরা মত্তের মত চীৎকার করিতেছিল, "বন্দে মাতরম্।"

পরদিন শৈলেন বেলা দুইটার মধ্যে শক্তিসঙ্ঘ আফিসে উপস্থিত হইয়া দেখিল প্রায় চল্লিশ জন ছাত্র জড় হইয়াছে, ইহাদের দুই চারিজন তাহারই সহপাঠী।

অনিমেষবাবু বলিতেছিলেন, "আজ আমাদের স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা দুশো হয়ে উঠ্ল। তোমরা সবাই আমার ভাই, এস ভাই তরুণ, আমরা মাতৃযজ্ঞে আত্মাহুতি দিই। তোমরাই দেশের ভরসা—সব বাঁধন তোমরা ছিঁড়ে ফেল—স্কুল-কলেজ বা সংসার কিছুতেই যেন তোমাদের বেঁধে রাখতে না পারে। তোমরা মুক্তির দূত হয়ে দেশকে পথ দেখাও। সকল দেশে তোমরাই নেতার কাজ করে এসেছ ; এ দেশকেও কালোপযোগী করে নেওয়া তোমাদেরই কাজ।"

শৈলেনও স্বেচ্ছাসেবকদের দলে যোগ দিল ; একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই আমাদের কি কর্‌তে হবে ?"

সে বলিল, "কি করতে হবে তা জান না ? দেশের অবস্থা কি সেটা তোমার জানা নেই কি ? এমন অন্ধ জগতে নেই—"

সকলে একে একে চলিয়া গেল। কেবল শৈলেন নড়িল না। সন্ধ্যার সময় অনিমেষবাবু বাহির হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সে নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের কি করতে হবে ?"

অনিমেষবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন, সে কথা তো আমি বলে দিয়েছি, তোমরাই নেতা, তোমাদের পথ দেখাতে হবে।"

"কাকে ?"

"দেশবাসীকে।"

"কিসের পথ ?"

"শক্তির পথ। তুমি কিছুই শোন নি দেখতে পাচ্ছি।"

শৈলেন বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, আমার বুঝতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এখনও বুঝি নি।"

অনিমেষবাবু বলিলেন, "দেখ, আমরা চাই শক্তি, আমরা শুধু দেশের মধ্যে একতা আন্‌তে চাই। মহাত্মা গান্ধী ছেলেদের স্কুল কলেজ ছেড়ে দেশের কাজ করতে বলেছিলেন, কিন্তু কোন কাজ তাদের হাতে দিতে পারেন নি। তাঁর ভুল তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—আমি কিন্তু সে ভুল করি নি—এই জেলায় আমি ছাত্র-সমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষ মাত্র—ছাত্রেরাই এখানে নেতা, তাদেরই ইচ্ছা হয়েছে তারা স্কুল-কলেজ ছেড়ে দেশের সেবা করবে। আমি তাদের মতেই চলেছি।"

শৈলেন বলিল, "সবাই আপনারই কথামত কাজ কর্‌ছে, এই তো আমার মনে হয়।"

"ঐটা তোমার প্রকাণ্ড একটা ভুল ; কিছুদিন পরে সব ভুল ভেঙ্গে যাবে।"

৩

পরদিন খাতাপত্র হাতে করিয়া শৈলেন স্কুলে আসিতেছে এমন সময় মোহিত বলিল, "কাল তুই ভলাণ্টিয়ার হলি, আজ আবার স্কুলে যাচ্ছিস্. তোর লজ্জা করছে না ?"

শৈলেন বলিল, "কি করি ভাই, মা বল্‌লে।"

মোহিত বলিল, "দেশের কাজে বাপ-মা, ভাই-বোনের পরামর্শ নেওয়া চলে না। বাপ-মা তোমার, তাঁরা দেশের কেউ নন্—দেশের কাজ করতে গেলে তাঁদের অগ্রাহ্য ক'রতে হ'বে।"

শৈলেন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বলিল, "তা হলে একবার মাষ্টার মশাইকে বলে আসি।"

মোহিত বলিল, "মনে থাকে যেন মাষ্টার মশাই গোলাম খানার—দেশের কথায় তাঁরা বড় একটা থাক্‌তে চান্ না।"

"যাই হোক্ একবার জিজ্ঞাসা করি না।"

"তা হ'লে পুলিশে যেতে হ'বে।"

"সে ভয় আমার নেই" বলিয়া শৈলেন স্কুলে চলিয়া গেল। সে একেবারে প্রধান শিক্ষকের নিকট গিয়া এক মাসের ছুটি প্রার্থনা করিল। প্রধান শিক্ষক তাহার সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজ করবার সময় আমার মতে এখনও আসে নি। কাজেই স্কুল ছাড়ার উপদেশ আমি তোমাকে দিতে পারি না।"

"তা হ'লে শুধু আজ ছুটি দিন্।"

"কেন? তোমার অভিভাবক কি তোমাকে ছুটি দিতে বলেছেন?"

"না।"

"তা হ'লে আজও আমি তোমাকে ছুটি দিতে পারি না। আমার আদেশ যদি না মানতে চাও—বল—আমি তোমাকে ছেড়ে দেব!"

শৈলেন বলিল, "আপনার আদেশ মান্‌ব না এ কথা আমি কখনও বলি নি।"

শৈলেন ক্লাসে চলিয়া গেল। ছুটির পর বাড়ীতে ফিরিবার পথে আবার মোহিতের সঙ্গে দেখা হইল। মোহিত বলিল, "দেখ্‌লি আমি তো বলেছিলুম মাষ্টার মশাইরা কখন দেশের কাজ করতে দেন না।"

শৈলেন বলিল, "কই, মাষ্টার মশাই তো আমাকে জোর ক'রে স্কুলে বন্দী করেন নি।"

মোহিত বলিল, "আমরা সে জোর যে ঘুচিয়েছি, এখন আর জোর করে কিছু করবার যো নেই।"

শৈলেন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে এইবার প্রকাশ্যে বলিল, "দেখ মোহিত, জোর ঘুচিয়েছ কার? যাঁরা জোর করেন না অর্থাৎ বাপ-মা, মাষ্টার মশাই তাদের? এতে কি কোন বীরত্ব আছে? আমি তো তা' স্বাধীনতার অপব্যবহার মনে করি।"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "তুই দাস, বরাবর দাসত্ব করেছিস্, সারাজীবন ঐ দাসত্বই কর্‌তে হবে।"

৪

তিন বৎসর পূর্ব্বে অনিমেষবাবু এই জেলায় একজন উকিল হইয়া আসেন। আদালতে তাঁহার প্রতিপত্তি কিরূপ ছিল তাহা আমরা জানি না, তবে মহাত্মা গন্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনিই প্রথমে ওকালতি ছাড়িয়া দেন। ইহাতেই তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বক্তৃতায় তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করিতে পারিতেন। এই জন্য ছাত্রের দল তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিল, অনিমেষবাবুকে তাহারা দেবতার মত সম্ভ্রম করিত। স্থানীয় সকল ছাত্রই তাঁহার "শক্তিসঙ্ঘের" সভ্য হইয়াছিল।

প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসের প্রথম সাতদিন "শক্তিসঙ্ঘে"র বিশেষ অধিবেশন হয়। আজ তিন দিন কাটিয়াছে। এই সাত দিন অনিমেষবাবুর মতে ছাত্রকে বিদ্যালয়ে না গিয়া কিসে দেশের উন্নতি হয় তাহা চিন্তা করিতে হইবে। চতুর্থ দিনে জেলা স্কুলের নিকটবর্ত্তী মাঠে এক বিপুল সভা হইল। অনিমেষবাবু বলিলেন, "আমি তিন মাসের মধ্যে তোমাদের স্বরাজ আনিয়া দিব—মহাত্মাজী যাহা পারেন নাই—আমি তাহাই করিব; তোমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইবে আমার এসব কথা পাগলের প্রলাপ নয়, কেবল আমি যাহা বলিব তাহা তোমরা মানিয়া চল।"

ছাত্রদল "বন্দে মাতরম্" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

সভাস্থলে ক্রমশঃ পুলিশের আবির্ভাব হইল। শ্রোতারা নানা দিকে পলাইয়া গেল। কেহ কেহ লাঠির আঘাত সহ্য করিল। অনিমেষবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সাবধান, কেহ আঘাত করিও না—অহিংসাই আমাদের নীতি।"

পরদিন খবরের কাগজে অনিমেষবাবুর বীরত্ব ও ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের কথা প্রকাশিত হইল।

৫

শৈলেন জিলাস্কুলে বিনা বেতনে পড়িত। ছাত্রদের ধর্ম্মঘটে সে এক দিন যোগ দিয়াছিল বলিয়া স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ রেজেষ্টারী হইতে তাহার নাম কাটিয়া দিলেন।

মা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ্ শৈলেন, তুই অভাগীর ছেলে,অনেক কষ্টে তোকে লেখাপড়া শেখাচ্ছিলুম এমন সর্ব্বনাশ কেন করলি বল্ তো?"

শৈলেন চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, "মা, দেশের সেবা কর্‌তে গেলে নিজের ক্ষতি আপনা হ'তেই হ'য়ে থাকে।"

মাতাপুত্রে আর বেশী কথাবার্ত্তা হইল না।

মা রাঁধুনীর কাজ করিতে চলিয়া গেলেন, ছেলে বাড়ীর

বাহিরে আসিয়া দেখিল—স্কুলের ছেলেরা চারিদিকে গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে। অনিমেষবাবুর জেল হইয়াছে বলিয়া সেদিন তাহারা কেহই স্কুলে যায় নাই।

বড়দীঘির দক্ষিণে প্রকাণ্ড একটা বটগাছের নীচে চারিজন বালক তাস খেলিতেছে। রাস্তায় একটা পাগল ধুলাকাদা মাখিয়া বালকগণকে তাড়া করিয়াছে, আর দশ বারটী বালক এক একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া "বন্দে মাতরম্" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার পিছনে ছুটিয়াছে। অদূরে অপর দুইটী বালক কি একটা সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া মারামারি আরম্ভ করিয়াছে।

শৈলেন নিকটে আসিতে না আসিতে আরও কয়েকটী বালক সেই মারামারিতে যোগদান করিল। ক্রমশঃ প্রতি দলে দশবার জন বালক জমিয়া একটা দাঙ্গার আয়োজন করিল।

এমন সময় শৈলেন নিকটে আসিয়া বলিল, "ভাই, তোমরা দেশের কাজ করবে বলে স্কুল ছেড়েছ; কিন্তু যে কাজ করতে যাচ্ছ সেটা ভ্রাতৃ-বিরোধ।"

"কি হে ভাল ছেলে, ভারি যে শুদ্ধ শুদ্ধ কথা বল্‌ছ।" বলিয়া একটী বালক তাহার দিকে অগ্রসর হইল ?

শৈলেন বলিল "মারবে না কি ? মনে পড়ে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছ দেশের সেবা করবে, আর আজ কি হচ্ছে ? ভায়ের গলায় ছুরি বসাবে ? এই কি অনিমেষবাবু বলেছেন ?"

বালকটী থতমত খাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু আর একজন আসিয়া "রাধুনীর ছেলে তোর এত স্পর্দ্ধা ?" বলিয়া তাহার কপালে এক ঘা ঘুসি মারিল। শৈলেন মাথায় হাত দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

এই ব্যাপারের পর বালকেরা সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পল্লীর মধ্যাহ্ন তাহার স্বাভাবিক স্তব্ধভাব ধারণ করিল। শৈলেন যখন তাহার অচল অবস্থা হইতে আপনাকে মুক্ত করিল তখন সম্মুখে সেই শূন্যদৃষ্টি প্রহার-জর্জ্জরিত পাগলটী ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

সে ধীরে ধীরে বাড়ীতে চলিয়া আসিল। সামান্য এক খানি কুটীর। গত বর্ষার জলে তাহা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

নিস্তব্ধ কক্ষে সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্রমশঃ সন্ধ্যার মেঘান্ধকার একটা নিবিড় মর্ম্ম বেদনার মত ঘনাইয়া আসিল। রাত্রি দশটার সময় মা ঘরে ফিরিলেন। তাঁহার শরীর তখন জ্বরে অবসন্ন।

৬

প্রভাতে শৈলেন দেখিল মা জ্বরে প্রায় অচৈতন্য। পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া একবার বহুকষ্টে তিনি বলিলেন, "শৈলেন উঠ্‌তে পারছি না, তুই একবার চৌধুরীদের বাড়ীতে বলে আয় আজ আর আমি রাঁধতে যেতে পারব না।"

শৈলেন বলিল, "বল্‌তে হ'বে না মা, তারা বুঝে নেবে —অত দাসত্ব করা যায় না।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "দাস হ'য়ে যদি দাসের কাজে অবহেলা কর তাহলে দাসেরও অধম হতে হ'য়। আমার দাসত্ব তো ঘোচাতে পারলি না, লেখা-পড়া ছেড়ে দিলি এখন করবি কি বল্ তো ?"

"আমি ব্যবসা কর্‌ব।"

"কি ব্যবসা করবি ?"

"বিড়ির দোকান খুলব। আমাকে গোটা কুড়ি টাকা দাও।"

"যা' এখন, আমার কথা শোন্।"

"টাকা কখন দেবে ?"

"তুই ফিরে এলেই দেব ?"

পনেরো মিনিটের মধ্যে শৈলেন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কই মা টাকা দাও।"

মা বলিলেন, "দেখ চাকুরি কর—সামান্য টাকা নিয়ে ব্যবসা করে লাভ করতে পারবি না।"

আমি চৌধুরীদের বল্‌লেই তারা তোকে একটা চাকুরি দেবে। সব কথা ঠিক করে রেখেছি। এখন তোর ইচ্ছা হলেই হয়।"

"আমি চাকরি করব না।"

"তুই চাকরি কর্‌বি না, আর আমাকে দিয়ে চাকরি করাবি।"

"না মা আমি ব্যবসা করে তোমারও দাসত্ব ঘোচাব।"

মা টাকা দিলেন। শৈলেন বিড়ির দোকান খুলিল। প্রতিদিন কিছু লাভ হইতে লাগিল। সে প্রায়ই মাকে

ব লত, "আর এক মাস পরে মা আর তোমাকে রাঁধুনিগিরি ক তে হ'বে না।

এমন সময় একদিন "বন্দেমাতরম্" শব্দে পাড়া কাঁপিয়া উঠিল। অনিমেষবাবু সেদিন জেল হইতে মুক্ত হইয়া শক্তিসঙ্ঘের আফিসে পুষ্পমাল্যে সজ্জিত হইয়া প্রবেশ করিলেন।

সেদিন অনিমেষবাবু বলিলেন, "আমরা বিদেশী জিনিস বর্জ্জন করিব। হে শক্তিসঙ্ঘের তরুণ সভ্যগণ তোমরা এই কার্য্যে সহায়তা কর।"

যে সব দোকানে বিলাতী দ্রব্য পাওয়া যায় ছেলেরা সেখানে দলে দলে ছুটিয়া গেল। বলিল "বিদেশী জিনিস সব ফেলে দাও।"

যাহারা অস্বীকার করিল তাহাদের দোকানে ক্রেতারা আর আসে না—দূর হইতে ছেলেরা তাহাদের ভয় দেখাইয়া ফিরাইয়া দেয়। ক্রমশঃ সেখানে লাল পাগড়ীর যাতায়াত সুরু হইল। অধিবাসীরা ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

৭

শৈলেন দোকানে বিঁড়ির সঙ্গে বিদেশী সিগারেটও বেচিতে আরম্ভ করিয়াছে; এমন সময় একদল স্কুলের ছেলে নিকটে আসিয়া চীৎকার করিল বন্দে মাতরম্' ও বলিল 'বিদেশী' জিনিস সব পুড়িয়ে ফেল।"

শৈলেন বলিল, "তা হ'লে আমার বড়ই ক্ষতি হ'বে।"

একটী ছেলে বলিল, "দেশের কাজ করতে গেলে নিজের সুবিধা-অসুবিধা অত দেখ্‌লে চলে না।"

শৈলেন বলিল, "দেখ আমি এ সম্বন্ধে অনিমেষবাবুর সঙ্গে দু-চারটা কথা কইতে চাই।"

ছেলেরা বলিল, "আমরা অপেক্ষা করতে পারব না। এখনি বিদেশী জিনিসের শ্রাদ্ধ কর।"

শৈলেন বলিল, "হুকুমটা কার?"

একজন বলিল, "আমার"। শৈলেনের সহিত তাহার সদ্ভাব ছিল না।

অপর জন বলিল, "দেশের।"

আর একজন বলিল "লজ্জা করে না, আজকালকার দিনে এসব কথা বল্‌তে।"

একজন চশমাধারী বালক বলিল, "ইনি দেশদ্রোহী।"

শৈলেন দোকান বন্ধ করিয়া একেবারে 'শক্তিসঙ্ঘের আফিসে আসিয়া অনিমেষবাবুকে বলিল, "আপনি কি বিদেশী জিনিস বিক্রী কর্‌তে নিষেধ করেছেন? অনিমেষবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বিদেশী বর্জ্জন আমাদের সঙ্ঘের একটা ব্রত।"

জানেন আপনি—"আমার একটা দোকান আছে—লোকে চেয়েছে বলেই আমি সেখানে বিদেশী মাল এনেছি, লোকে না চায় আমি সে জিনিস আর আন্‌ব না। আমি জানি এখনও গরীব লোকেরা অল্প মূল্যে বিদেশী মাল কিন্‌তে চায়। আমাকে বিদেশী মাল না ফেল্‌তে বলে তাদের শেখান যেন তারা বিদেশী মাল না কেনে।"

অনিমেষবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিলেন, "তাই তো শেখান হচ্ছে।"

"দোকানদারদের ওপর জুলুম করে?"

"এও একটা উপায়।"

"এতে কি অনেকের স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হচ্ছে না?"

অনিমেষবাবু হাসিয়া বলিলেন, "দেশের উন্নতির জন্য ক'জনের স্বাধীনতা বা অন্ন নষ্ট করা 'শক্তিসঙ্ঘ' অন্যায় মনে করে না।"

শৈলেন নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে অনিমেষবাবু বলিলেন, "দেখ শৈলেন, তুমি শক্তিসঙ্ঘের সভ্য—তোমাকে আমি কয়েক দিন সময় দিলুম—বিদেশী মাল সব বিক্রয় করে ফেল, আর কিন্তু এ জিনিসের আমদানি কোর না।"

শৈলেন বলিল "আর আমি শক্তিসঙ্ঘের সভ্য থাকব না? এই কথা বলিয়া সে ধীরপদে অফিসের বাহিরে চলিয়া গেল।

৮

শৈলেন দোকানের নিকট উপস্থিত হইল। সেদিন হাট বসিয়াছে। নানা দিক্ হইতে লোক কেনা-বেচার জন্য জড় হইয়াছে। ছেলেরাও সেখানে আসিয়া ভিড় করিয়াছে। দোকানদারকে বিদেশী জিনিস বিক্রয় করিতে ও ক্রেতাকে তাহা কিনিতে না দেওয়াই তাহাদের অভিপ্রায়। কেহ ক্রেতাকে নিষেধ করিতেছে; কেহ বা দোকানদারকে গালাগালি দিতেছে। তাহাদের কলরবে দেশের লোকও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

শৈলেনের বিড়ি সিগারেটের দোকানে এখন বিদেশী

সিগারেটই অধিক, কেন না লোকে এখন সিগারেটই বেশী পছন্দ করে। দুই চারিজন খরিদ্দার সেখানে জড় হইতে না হইতেই ছেলেরা সেদিকে ছুটিয়া আসিল। একজন বলিল, "শৈলেন তোর সব সিগারেট গুলি আগুনে পুড়িয়ে ফ্যাল—সিগারেট বিক্রী করে আর দেশের সর্ব্বনাশ করিস্ নি।"

শৈলেন বলিল, "দেখ ভাই, অনিমেষবাবু আমাকে বিদেশী জিনিস বিক্রী করতে অনুমতি দিয়েছেন।"

ছেলেটি বলিল "সত্যি না কি ?"

শৈলেন বলিল, "যাও জিজ্ঞাসা করে এস, যদি আমার কথা মিথ্যা হয়, তুমি আমায় দোকানে আগুন লাগিয়ে দিও।"

"কেন এ হুকুম দিলেন ?"

আমি শক্তিসঙ্ঘের সভ্য বলে অনিমেষবাবু আমার প্রতি দয়া দেখিয়েছেন।"

ছেলেটী চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "হাঁ ভাই তোমার কথাই ঠিক।"

শৈলেন বলিল "তা হলে আর তোমরা আমায় বিরক্ত করবে না ?"

"না।"

"তা হ'লে আমি বিদেশী জিনিস বিক্রী করি ?"

"অনিমেষবাবু যখন বলেছেন কর।"

"অনিমেষবাবু কি ঠিক কথা বলেছেন ?"

"অত বড় বক্তা, অত বড় কর্ম্মী কি বেঠিক কথা বলতে পারেন ?"

"আমি কিন্তু ভাই তাঁর কথা মানতে পারলুম না" এই কথা বলিয়া সে দোকান হইতে সব সিগারেটগুলি বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল।

ছেলেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "বন্দে মাতরম্।"

শৈলেন বাড়ী ফিরিবার মুখে একবার শক্তিসঙ্ঘের অফিসে প্রবেশ করিল। দেখিল সেখানে কেহ নাই।

শক্তিসঙ্ঘের অফিসের গায়েই দুই খানি ঘর। এই তিন খানি ঘর অনিমেষবাবু ভাড়া করিয়াছিলেন। ইহারই একখানিতে তিনি বাস করিতেন। শক্তিসঙ্ঘের চাঁদা হইতে তিন খানি ঘরেরই ভাড়া দেওয়া হইত।

একজন চাকর ছিল। শৈলেন তাহাকে বলিল, "বাবু বাড়ীতে আছেন ?"

চাকর বলিল, "আছেন, কিন্তু এখন কারও সঙ্গে তিনি দেখা করেন না।"

"আমি শৈলেন একবার তাঁর সঙ্গে এখন দেখা করতে চাই।"

চাকর ভিতরে গেল। শৈলেন বাহির হইতে অনিমেষবাবুর অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনিল "বলে দাও আমার সময় নেই।"

শৈলেন ভিতরে প্রবেশ করিল, দেখিল টেবিলের উপর বাতি জ্বলিতেছে—তাহার পার্শ্বেই দুটী বোতল ও একটী গেলাস। একখানি চেয়ারে অনিমেষবাবু বসিয়া আছেন—তিনি মত্ত।

শৈলেন বলিল, "আমার নামটা সভ্যের তালিকা থেকে কেটে দিয়েছেন ?"

"না—আমি তোমাকে সভ্য রাখতে চাই।"

"আপনার দাস হয়ে থাকবার জন্য ?"

"তা কেন ? তা কেন ? আজ তুমি যাও, কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা কইব। দেখ আজ দেশের লোকেরা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছেন, তাই নিয়ে কাল আমি একটা এমন মতলব ঠিক করব, যাতে দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী ; আজ তুমি যাও ?"

শৈলেন্দ্র বাহিরে আসিল। তখন কতকগুলি নারিকেল বৃক্ষের উপর চাঁদ উঠিয়াছে। শরৎ কাল। নীল আকাশের জ্যোৎস্নার তরঙ্গ—এক অভিনব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। চারিদিকের প্রসন্নতা আজ তাহার হৃদয়কে প্রসন্ন করিতে পারিল না।

বাড়ী ফিরিয়া শৈলেন মাকে বলিল, "মা, আমার ব্যবসা আজ শেষ হোল ?"

"কেন বাবা ?"

"দেশের কাজ করতে গেলে অনেককে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয় ?"

"আমি তো বাবা অনেক দিন থেকে তোকে চাকরী করতে বলছি। যদি ইচ্ছে করিস এখনি আমি তোকে কাজে লাগিয়ে দিতে পারি।"

শৈলেন কোন কথা কহিল না।

৯

রাত্রে তাহার নিদ্রা হইল না। মাথাটা দপ্‌ দপ্‌ করিতে লাগিল।

মা রাত্রি প্রায় এগারটার সময় ঘরে আসিয়া শয়ন করিলেন। সে দিন একাদশী। তিনি আসিয়াই একখানা তক্তাপোষের উপর শুইয়া পড়িলেন? অপর তক্তাপোষে শৈলেন তখন চিন্তায় বা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন?

কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া শিয়রের জানালাটী খুলিয়া দিল। মাথার ভিতরে যে আগুন জলিয়া উঠিয়াছিল তাহা বাতাসে কতকটা প্রশমিত হইল।

জানালা দিয়া সে দেখিল নীল আকাশ ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া জ্যোৎস্নাধৌত বৃক্ষের পত্র-পুঞ্জে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিয়াছে—গভীর সীমাহীন শূন্যে অম্লান অবাধ চন্দ্রালোকে পরমা শান্তির রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে? সেখানে দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই,—স্বাধীনতার গর্ব্ব, বা পরাধীনতার লাঞ্ছনা নাই। স্বার্থের সংঘাত, অর্থ ও যশের কলরব, বলীর দর্প দুর্ব্বলের ক্রন্দন সে রাজ্য হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। শৈলেন তন্ময় হইয়া জানালার দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর তাহার দৃষ্টি পড়িল মায়ের দিকে। সে দেখিল মা নিদ্রায় অচেতন। বিশ্বসংসারে তিনি ছাড়া আর তাহাকে দেখিবার কেহ নাই। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া শৈলেন দেখিতে পাইল, অসংখ্য দুঃখের রেখা তাহাতে অঙ্কিত আছে। এই সব দুঃখ শুধু তাহাকে বাঁচাইবার জন্য, তাহারই ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য। সে উঠিল—নিদ্রাভিভূত জননীর পা-দুটি নিজের মস্তকে রাখিয়া তাঁহাকে মনে মনে বাহিরের সেই শান্তিময় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলিল "বন্দে মাতরম্।"

তারপর বাহিরে হঠাৎ একটা গোলযোগ শোনা গেল। একজন বাহিরে চীৎকার করিয়া বলিল, "শৈলেন, বাহিরে আয়, অনিমেষবাবুর ঘরে পুলিশ এসেছে।"

শৈলেন জাগিল একেবারে অনিমেষবাবুর বাসার নিকটে আসিয়া দেখিল পুলিশে তাহাকে বাঁধিয়াছে।

নিকটে আসিয়া শৈলেন শুনিল অনিমেষবাবুর প্রকৃত নাম হারাধন মিত্র, ঢাকা জিলায় তাঁহার বাড়ী, সেখানে প্রায় দশ হাজার টাকা একটী ব্যাঙ্ক হইতে চুরি করিয়া তিনি এদেশে আসেন। তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট ছিল; এতদিন পরে পুলিশ তাহার সন্ধান পাইয়াছে।

অনিমেষবাবুকে লইয়া আজ পুলিশ অগ্রসর হইল। অনেক লোক তাহার পিছনে চলিল বটে, কেহই কিন্তু আজ আর 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া চীৎকার করিল না।

১০

নীল আকাশে সূর্য্যের আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পুষ্করিণী কাণায় কাণায় ভরিয়া আছে। মাঠে শ্যামল শস্যের হিল্লোল। অপর দিকে কাশের বন। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্য্যন্ত একটা বিরাট্‌ পরিপূর্ণতার ছবি প্রাণ মন মাতাইয়া তোলে।

শৈলেন চলিল। শরতের আলোকস্পর্শে তাহার প্রাণ নির্ম্মল ও সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। ঊর্দ্ধে অন্তহীন আকাশ, নিম্নে স্নিগ্ধশ্যাম ধরণীর কমনীয় শারদশ্রী তাহাকে উদাস করিয়া তুলিল। আজ তাহার হৃদয় তাহাকে জানাইয়া দিল সে কোন একটা বিশিষ্ট দেশের গণ্ডীর ভিতর বদ্ধ নয়, তাহার জাতি নাই, কুল নাই, সমাজ নাই। পথে একটী বট গাছের নীচে একজন কৃষক মাথা হইতে একটা প্রকাণ্ড মোট নামাইয়া বিশ্রাম করিতেছিল। শৈলেন তাহার নিকটে গিয়া বলিল, "আমি তোমারি মোটটা বয়ে নিয়ে যাব, তোমার বড় কষ্ট হয়েছে দেখতে পাচ্ছি।"

কৃষক বলিল, "তুমি তোমার কাজ করগে যাও—আমি আমার কাজ সেরে নেব।"

শৈলেন ভাবিল আমার কাজ কি। কৃষক তাহার কাজ বাছিয়া লইয়াছে—আমি এখনও জানিতে পারি নাই আমার কি কাজ করিতে হইবে?

বাতাস বহিতেছে—চিন্তা নাই, বাধা নাই—যদি কোন বাধা আসিয়া পড়ে তাহা সে খুব সহজভাবেই অতিক্রম করিয়া যায়। প্রজাপতিরা এদিকে সেদিকে সানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দু-চারিটা পক্ষী অদূরে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা কলরবের সৃষ্টি করিয়া উড়িয়া গেল। তাহারা স্বাধীন—এই স্বাধীনতার জন্য তাহাদের সংগ্রাম করিতে হয় না। ইহা তাহারা সহজেই পাইয়াছে এবং সহজেই চিরদিন উপভোগ করিবে।

কুটীরে প্রবেশ করিয়া শৈলেন দেখিল, মা রাঁধিতে যাইতেছেন। সে তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল, খুব সহজভাবেই বলিল, "মা, আমি চাকরী করব। তোমায় আর কাজ করতে দেব না।"

উপবাসশীর্ণ মুখে মা বলিলেন, "দাসত্ব করবি ?" তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শৈলেন বলিল, "তোমার সেবায় আমার দাসত্বও মুক্তি হ'য়ে উঠবে।"

হেমন্তিকা

[শ্রীপ্রণব রায়]

দূরপথ'পরে হেমন্ত রাতি
রচেছে মায়া,—
ভীরু চন্দ্রের আধো ইঙ্গিত,
আধেক ছায়া !
চলিনু দূরের অপরূপ রূপলোকে ;
কেবলি কুহেলি ভাসে এ ক্লান্ত চোখে,—
নাহিক' কায়া !
নিমিষে নিভিলো ছায়া-নিশিথের
চন্দ্রা-মায়া।

কুহেলি আড়ালে খুঁজে নাহি পাই
ছায়াঙ্গিনি !
অপরূপা, তব অরূপ রূপেরে
আজো না চিনি !
কাছে যবে আসি, হ'য়ে যাও তুমি দূর
গীতি-শতদল তবু তোমা লাগি' সুর
সৌরভিনী।
মিলনেও তাই সুচির বিরহ
ছায়াঙ্গিনি !

মোহনীয়া মোর মনো-ভুবনের
হেমন্তিকা !
তোমারো লোচনে হেরেছিনু আমি
যে চন্দ্রিকা,
মিলায়েছে কবে সেই আলো-সমারোহ,
সেথা ভাসে শুধু পাণ্ডু মৃত্যু-মোহ ;
কুজ্ঝটিকা
তোমারে আজি আড়াল করেছে
হেমন্তিকা !

উপনিষদে আশ্রম-চতুষ্টয়

[শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল, বেদান্তরত্ন]

(২)

গত মাসের 'পঞ্চপুষ্পে' ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের কিরূপ বিবরণ উপনিষদে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম, সে যুগে আর্য্য-মানবের জীবন চারিটী নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বে সুবিন্যস্ত ছিল—ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ -তিনি প্রথমতঃ ব্রহ্মচারী হইতেন- তদনন্তর পর পর গৃহস্থ ও আরণ্যক হইয়া চরমে প্রব্রজ্যা করিয়া সন্ন্যাসী হইতেন। গত মাসে আমরা প্রথম দুই আশ্রমের যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনের শেষ দিন অবধি কর্ম্মব্যাসঙ্গ—পাশ্চাত্ত্যেরা যাহাকে বল্গা কামড়িয়া মৃত্যু (Die in harness)—বলেন, উপনিষদের আদর্শ এরূপ ছিল না। গৃহী জীবনের অপরাহ্নে সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন। যাঁহার চিত্তে বৈরাগ্য বদ্ধমূল হইত, তিনি গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া একবারে সন্ন্যাসী হইতেন।

যদ্ অহরেব বিরজেৎ, তদ্ অহরেব প্রব্রজেৎ। যদি বা ইতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা—জাবাল, ৪

এ মতে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা আরণ্যক—যাঁহারই চিত্তে বৈরাগ্য প্রবল হইবে, তিনিই সন্ন্যাস করিতে পারেন। কঠরুদ্রের বিধান কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। কঠরুদ্র বলেন, প্রথম ব্রহ্মচারী হইয়া বেদাধ্যয়ন করিতে হইবে; তাহার পর দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হইবে। তদনন্তর গুরুজনের ও বান্ধবগণের অনুমতি লইয়া যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মচারী বেদমধীত্য বেদোক্তাচরিতব্রহ্মচর্য্যঃ দারান্ আহৃত্য পুত্রান্ উৎপাদ্য × × ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈঃ। তস্য সন্ন্যাসো গুরুভিঃ অনুজ্ঞাতস্য বান্ধবৈশ্চ

বর্ত্তমান প্রবন্ধে শেষ দুই আশ্রম—বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের বিষয় আলোচিত হইবে।

পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—অরণ্যাং মনুষ্যে—অর্থাৎ অরণ্যবাসী মনুষ্যকে 'আরণ্যক' বলে। গৃহ ছাড়িয়া যিনি বনে প্রস্থান করিয়াছেন, সেই আরণ্যকের অবলম্বিত আশ্রমের নাম বানপ্রস্থ। যেমন ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম ছিল স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন), গৃহস্থের 'ইষ্টাপূর্ত্ত', সেইরূপ আরণ্যকের ধর্ম্ম ছিল—'তপঃ' এবং সন্ন্যাসীর 'ন্যাস'।

তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন, তপসা অনাশকেন। এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি

—বৃহ, ৪।৪।২২

এই বচনে আমরা জানিলাম, প্রথম তিন আশ্রমী যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন,—ব্রহ্মচারী বেদাভ্যাস দ্বারা, গৃহস্থ যজ্ঞ-দান দ্বারা, বানপ্রস্থ তপঃ ও অনাশক (fasting) দ্বারা—চতুর্থাশ্রমী (ন্যাস দ্বারা) সেই পরম পুরুষকে জানিয়া 'মুনি' হয়েন। মুনির কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। সম্প্রতি আমাদের লক্ষ্যের বিষয় বানপ্রস্থ। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে—তপঃই তাঁহার ধর্ম্ম।

তপ এব দ্বিতীয়ঃ (বানপ্রস্থ)—ছান্দোগ্য ২।২৩

যে চ ইমে অরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইতি উপাসতে—ছান্দোগ্য, ৫।১০।১

যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যম্ উপাসতে—বৃহ, ৬।২।১৫

মুণ্ডক উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—তপঃ শ্রদ্ধে যে হি উপবসন্ত্যরণ্যে (১।২।১১)

প্রশ্ন-উপনিষদের নিম্নোক্ত বচনে এই আরণ্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে:—অথ উত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া আত্মানম্ অন্বিষ্য আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে—১।১০

এখানেও 'তপঃ'কেই মুখ্য বলা হইয়াছে। অন্যত্র প্রশ্ন উপনিষদ্ বলিতেছেন—

তেষামেব এষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ (১।১৫)

যাঁহাদের তপঃ ও ব্রহ্মচর্য্য আছে, যাঁহাদিগে সত্য প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারাই ব্রহ্মলোকের অধিকারী।'

কেন-উপনিষদ্ও তপের মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন:—

তস্মৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা—এই যে ব্রাহ্মী উপনিষদ্ ইহার প্রতিষ্ঠা তপঃ, দম ও কর্ম্ম। এখানেও তপেরই প্রথম গণনা।

মহানারায়ণ উপনিষদ্ এই সমস্ত কথার সারোদ্ধার্ করিয়া বলিয়াছেন—

ঋতং তপঃ, সত্যং তপঃ, শ্রুতং তপঃ, শান্তং তপঃ, দানং তপঃ, যজ্ঞং তপঃ।—অষ্টম অনুবাক্

ঋগ্বেদের বহু স্থলে তপের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে—

সপ্ত ঋষয় স্তপসে যে নিষেদুঃ—ঋগ্বেদ, ১০।১০৯।৪

(তপশ্চরণায় নিষণ্ণা বভূবুঃ—সায়ণ)

অর্থাৎ সপ্তর্ষিগণ তপশ্চরণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সাধক উৎকট তপশ্চর্য্যার ফলে সাধনোচিত ধামে উপনীত হইলে, তাঁহার অভিনন্দন জন্য ঋগ্বেদের ঋষি নিম্নোক্ত মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন—

তপসা যে অনাধৃষ্যা স্তপসা যে স্বর্যযুঃ।
তপো যে চক্রিরে মহঃতান্ চিদেবাপি গচ্ছতাৎ॥
১০।১৫৪।৪

(অনাধৃষ্য = Invincible ; মহঃ = মহৎ)

সহস্রনীথাঃ কবয়ো যে গোপায়ন্তি সূর্য্যং।
ঋষীন্ তপস্বতো যম তপোজান্ অপি গচ্ছতাৎ॥
—১৫৪।৫

(সহস্রনীথাঃ = সহস্রনয়নাঃ। তপোজান্—তপসঃ সকাশাদ্ এব উৎপন্নান্ তান্ ঋষীন্ হে যম ত্বমপি গচ্ছ—সায়ণ)

অর্থাৎ "তপস্যার দ্বারা যাঁহারা অধৃষ্য হইয়াছেন, যাঁহারা মহৎ তপশ্চরণ করিয়াছেন, তপস্যার দ্বারা যাঁহারা জ্যোতির্ম্ময় লোক লাভ করিয়াছেন (হে সাধক) তাঁহাদের ধামে প্রবেশ কর। যাঁহারা কবি, যাঁহারা সহস্রনয়ন, যাঁহারা সূর্য্যকে ধারণ করেন, তপোজ তপস্বী সেই সকল ঋষির ধামে প্রবেশ কর।"

তপস্যার এতই মহিমা যে, তপঃ তপিয়া তবে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল।

স তপস্তপ্ত্বা স সর্ব্বমিদম্ অসৃজত।

ঋতং চ সত্যংচাভীদ্ধাৎ তপসোহধ্যজায়ত।

— ঋগ্বেদ ১০ ১৯০।১

অভীদ্ধাৎ—অভিতপ্তাৎ ব্রহ্মণা পুরা সৃষ্ট্যর্থং কৃতাৎতপসঃ —সায়ণ।

'ঋত ও সত্য ব্রহ্মার সুদীপ্ত তপস্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।' *

যে তপস্যার এত মহিমা, সেই তপ আরণ্যকের ধর্ম্ম ছিল, কারণ,

নাতপস্কস্য আত্মজ্ঞানে অধিগমঃ—

তপস্বী না হইলে আত্মজ্ঞান অধিগত হয় না।

গৃহস্থ গ্রামে বসতি করিতেন—গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তং দত্তমিতি উপাসতে (তখনও নগরের আধিক্য হয় নাই)—আর বানপ্রস্থের আবাস ছিল অরণ্যে—অরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইতি উপাসতে। সেই জন্যই তাঁহার নাম 'আরণ্যক।'

আরণ্যকের ধর্ম্ম ছিল তপঃ—তপসা অনাশকেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন তপঃ অর্থে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি।—কৃচ্ছ্র কঠোর দ্বারা শরীর শোষণ। যাজ্ঞবল্ক্যের কথা পাঠকের স্মরণ হইবে। অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ অন্যদ্বৃত্তমুপাকরিষ্যন্ মৈত্রেয়ি ইতি হোবাচ যজ্ঞাবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা অরে অহম্ অস্মাৎ স্থানাদ্ অস্মি—বৃহ ৪।৫।১ †

'যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম হইতে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়া ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে বলিলেন আমি এ স্থান হইতে প্রব্রজিত হইব।' এ প্রসঙ্গে মৈত্রী উপনিষদে রাজা বৃহদ্রথের বিবরণ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বৃহদ্রথো বৈ নাম রাজা বিরাজ্যে (অর্থাৎ সার্ব্বভৌম আধিপত্যে) পুত্রং নিধাপয়িত্বা ইদম্ অশাশ্বতং মন্যমানঃ বৈরাগ্যমুপেতো অরণ্যং নিজগাম। স তত্র পরমং তপ আস্থায় আদিত্যমুদীক্ষমান ঊর্দ্ধবাহুস্তিষ্ঠতি। অন্তে সহস্রাহস্য মুনে রন্তিকমাজগাম অগ্নিরিবাধূমক * * ভগবান্ শাকায়ণ্য—১।২

স তস্মৈ নমঃ কৃত্বা উবাচ—'ভগবন্ নাহম্ আত্মবিৎ। ত্বং তত্ত্ববিৎ শুশ্রুমো বয়ং স ত্বং নো ব্রূহি—১।২

'রাজা বৃহদ্রথ পুত্রকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া জগতের অনিত্যতাবোধে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। তিনি তথায় পরম তপঃ অনুষ্ঠান করিয়া ঊর্দ্ধ-বাহু হইয়া সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। এইরূপে এক সহস্র দিবস বিগত হইলে নির্দ্ধূম

* এই প্রসঙ্গে অথর্ব্ববেদ ১০।৭।৩৬, ৩৮ ও ১১।৫ দ্রষ্টব্য।

† অন্যৎ বৃত্তম্ উপাকরিষ্যন্ পূর্ব্বস্মাৎ গার্হস্থ্যলক্ষণাৎ বৃত্তাৎ অন্যৎ পারিব্রাজ্যলক্ষণং বৃত্তম্ উপাচিকীর্ষুঃ—শঙ্করঃ।

অগ্নির ন্যায় তেজস্বী শাকায়ণ্য ঋষি বৃহদ্রথের নিকট উপনীত হইলেন। বৃহদ্রথ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'ভগবন্! তপস্যা করিলাম বটে, কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই—শুনিয়াছি আপনি তত্ত্ববিৎ, আমাকে উপদেশ করুন।'

বলা বাহুল্য বনবাসী আরণ্যকের পক্ষে দ্রব্য-সম্ভার সহকারে গৃহস্থের ন্যায় যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সম্ভব হইত না। তাঁহার পক্ষে বিধান ছিল—

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ

—তৈত্তি ২।৫

তাঁহার পক্ষে জ্ঞান-সহকৃত 'উপাসনা'ই যজ্ঞ ও কর্ম্মের প্রয়োজন সিদ্ধ করিত। তিনি যজ্ঞাদিতে রূপক ভাবনা ও 'প্রতীক' উপাসনা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল-লাভ করিতেন।* বানপ্রস্থের আলোচ্য গ্রন্থ আরণ্যকে † এবং তাহার উত্তর ভাগ উপনিষদে ঐরূপ ভাবনা ও উপাসনার বহুবিধ উপদেশ আছে। ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

এষ বৈ যজ্ঞো যোঽয়ং পবতে * * তস্য মনশ্চ বাক্ চ বর্ত্তনী। তয়োরণ্যতরাং মনসা সংস্করোতি ব্রহ্মা, বাচা হোতা—অধ্বর্য্যুরুদ্গাতা অন্যতরাম্। ছা ৪।১৬।২

'পবনে যজ্ঞ ভাবনা করিবে। তাহার দুই বর্ত্ম—বাক্য ও মনঃ। তন্মধ্যে ব্রহ্মা মনের দ্বারা এবং হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা বাক্যের দ্বারা সংস্কার করেন'। [যজ্ঞাভিজ্ঞ পাঠক অবশ্যই জ্ঞাত আছেন—যজ্ঞে চারি জন ঋত্বিকের প্রয়োজন হইত, ঋগ্বেদের ব্রহ্মা, যজুর্ব্বেদের অধ্বর্য্যু সামবেদের উদ্গাতা এবং হবনকারী হোতা। ইনি কি অথর্ব্ব বেদজ্ঞ ?]

বৃহদারণ্যক ইহার বিস্তার করিয়াছেন। 'কেন যজমানো মৃত্যোরাপ্তিম্ অতিমুচ্যতে'? ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

হোতা ঋত্বিজা অগ্নিনাবাচা × ×

অধ্বর্য্যুনা ঋত্বিজা চক্ষুষা আদিত্যেন × × উদ্গাত্রা ঋত্বিজা বায়ুনা প্রাণেন × × ব্রহ্মণা ঋত্বিজা মনসা চন্দ্রেণ।

—বৃহ ৩।১

ইহার ফলে কি হয়? স মুক্তিঃ সা অতিমুক্তি। ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

যজমানস্য অধ্যাত্ম পরিচ্ছেদরূপ-মৃত্যুমতিক্রম্য ফল-ভূতাগ্ন্যাদিভাবাপত্তিরূপাতিমুক্তি সাধনম্ *

এখানে দেখিতে পাইতেছি, গৃহস্থের সম্পাদ্য যজ্ঞের অঙ্গ চারিজন ঋত্বিক্, (হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মার) স্থলে, আরণ্যক আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় (বাক্, চক্ষু, প্রাণ ও মন) এবং আধিদৈবিক দেবতা-চতুষ্টয় (অগ্নি, আদিত্য, বায়ু ও চন্দ্রমার) ভাবনা করিতেছেন। †

এই প্রতীক-উপাসনার চরম দৃষ্টান্ত প্রাণাগ্নিহোত্র ব্যাপারে। সকলেই জানেন, সাগ্নিক গৃহস্থকে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে অগ্নিতে এক একটী আহুতি দিতে হইত। ইহার নাম ছিল অগ্নিহোত্র। এইরূপ আহুতি দান অগ্নিহোত্রীর নিত্যকর্ম্ম ছিল। আরণ্যক কিরূপে এই বিধি পালন করিতেন?

দ্বিজাতির অগ্নিশালায় যেমন ভৌতিক অগ্নি, প্রত্যেক মানুষের দেহের মধ্যে সেইরূপ আধ্যাত্মিক প্রাণাগ্নি প্রতিক্ষণ প্রজ্বলিত আছে—এবং ঐ অগ্নিতে অহোরাত্র নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসরূপ আহুতিদ্বয় অর্পিত হইতেছে।

---

* আরণ্যকের নাম আরণ্যক হইল কেন? ইহার উত্তরে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—অরণ্যে অনুচ্যমানত্বাৎ আরণ্যকম্—বৃহদারণ্যক-ভূমিকা। যেমন ঐতরেয় আরণ্যক, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, বৃহদারণ্যক ইত্যাদি।

† India more than any other country is the land of symbols. As early as the period of the Brahmanas, the separate acts of the ritual were frequently regarded as symbols, whose allegorical meaning embraced a wider range. But the Aranyakas were the peculiar arena of these allegorical expositions. In harmony with their prevailing purpose to offer to the Vanaprastha an equivalent for the sacrificial observances, for the most part no longer practicable, they indulge in mystical interpretations of these, which are then followed up in the oldest Upanishads.—Deussen's Philosophy of the Upanishads, p. 120.

* Union with the Atman as realised in the Universe.—Deussen.

† Yet more frequently, conditions of the Atman as embodied in the world of nature or of man, were substituted for the ceremonies of the ritual—Deussen.

যদ্ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসৌ এব আহুতী সমং নয়তি ইতি সমানঃ—প্রশ্ন ৪।৪

নিঃশ্বাসে কি হয়? বাচং তদা-প্রাণে জুহ্বতি। আর প্রশ্বাসে? প্রাণং তদা বাচি জুহ্বতি। আরণ্যকের এই-রূপ ভাবনাকে কৌষীতকী-উপনিষদ্ 'আন্তর অগ্নিহোত্র' বলিয়াছেন।

অথাতঃ সাংযমনং প্রাতর্দনম্ আন্তরম্ অগ্নিহোত্র মাচক্ষতে—২।৪

'সাংযমন' কি? নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। এই উপাসনার প্রবর্ত্তক দিবোদাসপুত্র প্রতর্দ্দন, সেই জন্য ইহা তাঁহার নামাঙ্কিত (প্রাতর্দ্দনম্)। কৌষীতকী ইহার প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন—"এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-রূপ যুগ্ম আহুতি অন্তহীন অমৃতাহুতি—কি জাগ্রতে, কি নিদ্রায় সতত অবিরত চলিতেছে। অন্য আহুতি অন্তবৎ, ইহা অনন্ত। সেই জন্য পূর্ব্বতন মনীষিগণ এই আন্তর অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতেন, বাহ্য অগ্নিহোত্রের আহুতি দিতেন না।

এতে অনন্তে অমৃতাহুতী জাগ্রচ্চ স্বপশ্চ সততম্ অব্যবচ্ছিন্নং জুহোতি। অথ যা অন্যা আহুতয়ঃ অন্তবত্যস্তা কর্ম্মময্যো হি ভবন্তি। এতদ্ হ বৈ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহুবাংচক্রুঃ।

এই যে দেহ-শালাস্থিত প্রাণাগ্নি, ইহার ইষ্টক কি? মৈত্রী-উপনিষদ বলেন—প্রাণ, অপান উদান, সমান, ব্যান।

প্রাণোঽগ্নি স্তস্য ইমা ইষ্টকাঃ যঃ প্রাণোব্যানোঽপানঃ সমান উদানঃ—৬।৩৪

অতএব—প্রাণায় স্বাহা অপানায় স্বাহা ব্যানায় স্বাহা সমানায় স্বাহা উদানায় স্বাহা ইতি পঞ্চভিরভিজুহোতি

—৬।৯

এইরূপ আহুতি দিবার সময় আরণ্যক নিম্নোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আত্মার ভাবনা করিবেন যে,—প্রাণরূপে দেহ মধ্যে সন্ধুক্ষিত অগ্নি পরমাত্মারই প্রকাশ মাত্র।

প্রাণোঽগ্নিঃ পরমাত্মা বৈ পঞ্চবায়ু-সমন্বিতঃ।
স প্রীতঃ প্রীণাতু বিশ্বং বিশ্বভুক্ ॥
বিশ্বোঽসি বৈশ্বানরোঽসি বিশ্বং
ত্বয়া ধার্য্যতে জায়মানম্।
বিশন্তু ত্বাম্ আহুতয়শ্চ সর্ব্বাঃ
প্রজাস্তত্র তত্র বিশ্বামৃতোঽসি

—মৈত্রী ৬।৯

'প্রাণাগ্নিহোত্র'-উপনিষদ্ এই রূপক-ভাবনার সম্প্রসারণ করিয়াছেন। এই প্রাণাগ্নিহোত্র 'অন্নসূত্রং শারীরং যজ্ঞম্'। এ যজ্ঞের কে যজমান? কে পত্নী? কে হোতা? কে অধ্বর্য্যু? কে উদ্গাতা? কে ব্রহ্মা? এ যজ্ঞের যজমান আত্মা, পত্নী বুদ্ধি, বেদাঃ মহা-ঋত্বিজঃ, অহঙ্কার অধ্বর্য্যু, চিত্ত হোতা, প্রাণ ব্রহ্মা, উদান উদ্গাতা ইত্যাদি। ভূমিতে অন্ন নিক্ষেপ করিয়া জঠরাগ্নির স্তবের পর, জলের বিশুদ্ধি বিধানানন্তর অপানাদি একর্ষিতে হবন করিতে হইবে। তাহার পর 'প্রাণোঽগ্নি পরমাত্মা বৈ' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া 'ধ্যায়েত অগ্নিহোত্রং জুহোমি'—ধ্যান করিবে যে, অগ্নিহোত্র হোম করিতেছি। ইহাই আরণ্যকের অনুষ্ঠেয় প্রাণাগ্নিহোত্র—আন্তরম্ অগ্নিহোত্রম্।

এইরূপে তৃতীয়াশ্রমী বানপ্রস্থে সুস্থিত হইয়া বিবিধ 'উপাসনা' ও তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার চিত্তে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইত।

নির্ব্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন—মুণ্ডক, ১২।১২

তিনি উপলব্ধি করিতেন, এই যে কৈশোর অবধি অনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ, তপঃ—ইহাদিগের অনুষ্ঠান দ্বারা

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
ভাবি তাই মনে।

—এ সকল তো উপায় মাত্র, উপেয় নহে—সাধন মাত্র, সিদ্ধি নহে, গতি মাত্র, গম্য (goal) নহে। আমি অমৃতের পুত্র—অমৃতত্ব আমার লক্ষ্য, আমি ব্রহ্মকণ, সেই সচ্চিদানন্দের অংশকলা—ব্রহ্মসাযুজ্যই আমার নিয়তি; আমি নিত্যমুক্ত মহামহিম—অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ. মোহের বশে পাশবদ্ধ রহিয়াছে—এই পাশাপহানি (মোক্ষে, মুক্তিতেই) আমার সার্থকতা—আমি কি বিষম আত্ম-বিস্মৃত! জীবনের কি ভীষণ ব্যর্থতা সম্পাদন করিতেছি! তখন উপনিষদের অমোঘ বাণী তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হয়—ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ব মানশুঃ—কৈবল্য, ২। তিনি বুঝিতে পারেন,—

যো বা এতদ্ অক্ষরং গার্গি! অবিদিত্বা অস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবৎ এবাস্য ভবতি।

যো বা এতদ্ অক্ষরং গার্গি! অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ য এতদ্ অক্ষরং গার্গি! বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।—বৃহ ৩।৮।১০

'সেই অক্ষর ব্রহ্মের বিজ্ঞান ব্যতীত যদি না বহু সহস্র বর্ষ হবন, যজন, তপস্যার অনুষ্ঠান করা হয়, তথাপি তাহার ফল ভঙ্গুর। যদি তাঁহার বিজ্ঞান ব্যতীত প্রয়াণ করা হয়, তবে তাহা দৈন্য মাত্র। কিন্তু যিনি ব্রহ্মবিদ্ হইয়া তবে দেহত্যাগ করেন, তিনিই 'ব্রাহ্মণ'।

বস্তুতঃ, জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ শ্বেত ১।১১ 'পাশমুক্তির একমাত্র উপায় ব্রহ্মজ্ঞান।'

তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় শ্বেত, ৩।৮

'তাঁহাকে জানিলে তবেই মোক্ষ হয়—শুভা গতির অন্য পন্থা নাই।'

কারণ,

যদা চর্ম্মবদ্ আকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় সংসারান্তো ভবিষ্যতি॥—শ্বেত ৬।২০

'বরং অনন্ত আকাশকে মুষ্টির মধ্যে বেষ্টন করা সম্ভব, কিন্তু সেই পরম দেবতাকে না জানিয়া মোক্ষলাভ অসম্ভব।' সেই জন্য ব্রহ্মচারী স্বাধ্যায় দ্বারা, গৃহস্থ যজ্ঞ দান দ্বারা, বানপ্রস্থ তপঃ দ্বারা যাঁহাকে জানিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন (বিবিদিষন্তি), আজ আরণ্যক তাঁহাকেই জানিবার জন্য 'ন্যাস' গ্রহণ করিয়া প্রব্রজ্যা করিবেন।

তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন * * এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি—বৃহ ৪।৪।২২

নারায়ণ-উপনিষদের ৭৮ অনুবাকের ভাষ্যে এই সন্ন্যাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন—অথেদানীং; সর্ব্বকর্ম্মময়-সংসার-বীজদাহার্থং সন্ন্যাস-প্রকরণম্ আরভ্যতে। নারায়ণ উপনিষদের ঋষি প্রথমতঃ একে একে ১১টী গৌণ মোক্ষসাধন নির্দ্দেশ করিলেন—সত্য, তপঃ, দম, শম, দান, ধর্ম্ম, প্রজন (অপত্যোৎপাদন), অগ্নি, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও মানস (মনোনিষ্পাদ্য উপাসনা)। এই সকল সাধনই উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু ন্যাসই সর্ব্বোত্তম।

তানি বা এতানি অবরাণি পরাংসি* ন্যাস এব অত্যরেচয়ৎ অর্থাৎ উত্তমত্বেন তারতম্যং তত্র বিশ্রান্তম্। পরিশেষে উপনিষদ্ এই বলিয়া বক্তব্য শেষ করিতেছেন—তস্মাৎ ন্যাসং সর্ব্বেষাং তপসাম্ অতিরিক্ত মাহুঃ।

সেইজন্য চতুর্থাশ্রমের নাম 'সন্ন্যাস'। সন্ন্যাসী আরণ্যকের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা করেন।

প্রব্রজিষ্যন্ অয়ে অহম্ অস্মাৎ স্থানাৎ—বৃহ ৪।৫।২
এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি
—বৃহ ৪।৪।২২

যেহেতু চতুর্থাশ্রমী 'অনিকেতন', সেইজন্য তাঁহার নাম পরিব্রাড়্ বা পরিব্রাজক। যেহেতু তিনি সম্বলহীন, সমস্তই 'সংন্যাস' করিয়াছেন, সেইজন্য তিনি 'সন্ন্যাসী'। যেহেতু তিনি ভিক্ষার দ্বারা পিণ্ডপোষণ (দেহধারণ) করেন সেইজন্য তিনি 'ভিক্ষু'।

পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি—বৃহ, ৩।৫।১

চতুর্থাশ্রমীর আর একটী সার্থক নাম 'মুনি'।

এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি বৃহ ৪।৪।২২

মুনি কি? মননশীল, যোগী। (মুনির্মননশীলো যোগী ভবতি ইতি যাবৎ—নিত্যানন্দ-বিরচিত বৃহদারণ্যক মিতাক্ষরা)

বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিদ্যাথ মুনিঃ—বৃহ, ৩।৫।১

শঙ্করাচার্য্য বলেন বাল্য অর্থে বলভাব-বালভাব নহে—অনাত্মদৃষ্টি-তিরস্করণ-সামর্থ্য। অর্থাৎ বিদ্যাবত্তা ও বলবত্তাতে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া 'মুনি' হয়েন। এই মুনির একটী মনোজ্ঞ চিত্র আমরা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে প্রাপ্ত হই।

মুনয়ো বাতরশনাঃ পিশঙ্গা বসতে মলা।
বাতস্যানু ধ্রাজিং যন্তি যদ্ দেবাসো অবিক্ষত॥
১০।১৩৬।২

(পিশঙ্গানি কপিলবর্ণানি মলা মলিনানি বল্কলরূপাণি বাসাংসি বসতে। বাতস্য ধ্রাজিং গতিম্ অনুযন্তি। অবিক্ষত—প্রাবিশন্ দেবতা স্বরূপং।—সায়ণ)

উন্মদিতা মৌনেয়েন বাতাঁ আ তস্থিমা বয়ং।
শরীরেদ্ অস্মাকং যূয়ং মর্ত্তাসো অভি পশ্যথ॥ ৩

(মৌনেয়েন=মুনিভাবেন; আতস্থিমা=আস্থিতবন্তঃ—সায়ণ)

অন্তরিক্ষেণ পততি বিশ্বরূপাবচাকশৎ।
মুনির্দেবস্য দেবস্য সৌকৃত্যায় সখা হিতঃ॥ ৪

* তপাংসি ইহাই বোধ হয় শুদ্ধ পাঠ।

(পতন্তি = গচ্ছন্তি। বিশ্বরূপা = বিশ্বানি রূপাণি, অনচাশকৎ = অভিগচ্ছন্—সায়ণ)

বাতস্যাশ্বো বায়োঃ সখা অথ দেবেষিতো মুনিঃ।
উভৌ সমুদ্রাবা ক্ষেতি যশ্চ পূর্ব্বমুতাপরঃ॥ ৫

(অশ্বঃ = অশিতা। দেবেন বেষিতঃ প্রাপ্তঃ। আক্ষেতি = অভিগচ্ছতি—সায়ণ)

"মুনিগণ,—(বায়ু যাঁহাদিগের মেখলা, যাঁহারা পিঙ্গলবর্ণ মলিন বল্কল ধারণ করিয়া, (কেশী) জটাধারী হইয়া বায়ুর বিজন গতির অনুগমন করেন—সাধারণ মানুষ তাঁহাদিগের স্থূলদেহ মাত্র দেখিতে পায়, কিন্তু তাঁহারা মুনিভাবে উন্মদিত হইয়া বায়ুর সহিত একত্বলাভ করেন, অন্তরিক্ষে উৎপতিত হন, সমস্ত রূপ দর্শন করেন, বাতাহারী হইয়া বায়ুর সখা হন এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে যুগপৎ অবগাহন করেন।"*

এইরূপ অলৌকিক শক্তিশালী মুনির ঋদ্ধি-সিদ্ধির বিষয় বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য নহে। অতএব সে প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া চতুর্থাশ্রমীর জীবন-যাত্রার প্রতি লক্ষ্য করিব। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি প্রাচীন উপনিষদে এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সন্ন্যাসীর সম্পূর্ণ চিত্র দেখিতে হইলে, যাহাদিগকে 'সন্ন্যাস'-উপনিষদ্ বলে সেই সকল উপনিষদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়।

Another hymn of the Rigveda portrays the inspired muni as with long hair, in dirty yellow robes, girt only with the wind, he roams on the desert paths. Mortals behold only his body. But he himself, endowed with supernatural power, flies through the air, drinks with the storm-god from the bowl of both the oceans of the unverse, on the track of the wind is raised aloft to the gods, transcends all forms, and as companion of the gods co-operates with them for the salvation of mankind.

'সন্ন্যাস' উপনিষদের প্রধান— জাবাল, ব্রহ্ম, আরুণেয়, সন্ন্যাস, পরমহংস, কঠরুদ্র ও শাঠ্যায়ণী। এই সকল উপনিষদে সন্ন্যাসীর সম্পর্কে কিরূপ বিধিনিষেধ আছে?

বানপ্রস্থ যখন নিজকে সংন্যাসের অধিকারী মনে করিবেন—স্যাৎ বা আশ্রমপারং গচ্ছেয়ম্ ইতি—তখন তিনি—

অরণ্যে গত্বা অমাবস্যায়াং প্রাতরেব অগ্নীন্ উপসমাধায় পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধতর্পণং কৃত্বা ব্রহ্মেষ্টিং নির্বপেৎ—সন্ন্যাস, ১। 'অমাবস্যা তিথিতে প্রাতঃকালে অরণ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পিতৃতর্পণ করিয়া ব্রহ্ম-ইষ্টি নিষ্পন্ন করিবেন।' এই তাঁহার শেষ তর্পণ, শেষ যজন। অতঃপর তিনি ন নমস্কারো ন স্বধাকারো ন নিন্দা ন স্তুতিঃ যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ—পরমহংস, ৪।

অতঃপর তিনি পূর্ব্বাশ্রমের শেষ চিহ্ন শিখা ও সূত্র ত্যাগ করিবেন—সশিখান্ কেশান্ নিকৃষ্য বিসৃজ্য যজ্ঞোপবীতম্—কঠরুদ্র

শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া তিনি মুণ্ডী হইবেন। তৎসহ সমস্ত আত্মীয় স্বজন এবং সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দশ ভুবনও বিসর্জ্জন করিবেন।

পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ বন্ধ্বাদীন শিখাং যজ্ঞোপবীতং চ যাগংচ সূত্রং চ স্বাধ্যায়ং চ ভূর্লোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক-মহর্লোক জনলোক-তপোলোক সত্যলোকংচ। অতল-পাতাল-বিতল-সুতল-রসাতল-তলাতল মহাতল ব্রহ্মাণ্ডং চ বিসর্জ্জয়েৎ। দণ্ডমাচ্ছাদনং চ পরিগ্রহেৎ শেষং বিসৃজেৎ শেষং বিসৃজেৎ—আরুণেয়ী, ১

পরমহংস উপনিষদ্ এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়া বলিতেছেন—

অসৌ স্বপুত্র মিত্র কলত্রবন্ধ্বাদীন্ শিখা-যজ্ঞোপবীতে স্বাধ্যায়ং চ সর্ব্বকর্মাণি সংন্যাস্যায়ং ব্রহ্মাণ্ডং চ হিত্বা কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনং চ স্বশরীরোপভোগার্থায় চ লোকস্যোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ।

এই যে শিখা-সূত্র ত্যাগ, ব্রহ্মোপনিষদ্ ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্ বুধঃ।
যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎ সূত্রমিতি ধারয়েৎ॥
শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতং চ তন্ময়ম্।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥

'বুধ শিখার সহিত যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিবেন। অক্ষর পরব্রহ্ম যাঁহার সূত্র, বহিঃসূত্রে তাঁহার প্রয়োজন কি? যাঁহার

* অধ্যাপক ডয়সন এই মন্ত্রের সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

জ্ঞানময়ী শিখা, যাঁহার জ্ঞানময় উপবীত, ব্রহ্মবেত্তারা বলেন, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য সম্পূর্ণ।'

'দণ্ডমাচ্ছাদনং চ পরিগৃহেৎ'। আচ্ছাদন অর্থে কৌপীন। শঙ্করাচার্য্য যতিপঞ্চকে বলিয়াছেন—কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ। সন্ন্যাস পরিপক্ক হইলে যতি কৌপীন ত্যাগ করিয়া আশাম্বর বা দিগম্বর হইতে পারেন।

আশাম্বরো ন নমস্কারো ন স্বধাকারঃ—পরমহংস

দণ্ড ধারণ করেন বলিয়া সংন্যাসীর নাম দণ্ডী—দণ্ড, সংযম ও জ্ঞানের প্রতীক।

জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে।

—পরমহংস, ৩

দক্ষসংহিতায় আছে—

বাগ্‌দণ্ডে মৌনমাতিষ্ঠেৎ কর্ম্মদণ্ডে ত্বনীহতাম্।

মানসস্য তু দণ্ডস্য প্রাণায়ামো বিধীয়তে॥

সন্ন্যাস-উপনিষদ্‌ এ সম্পর্কে নিয়ম-রজ্জু কিঞ্চিৎ শ্লথ করিয়া বিধান করিয়াছেন—

কুণ্ডিকাং চমসং শিক্যং ত্রিবিষ্টপমুপানহম্।

শীতোপঘাতিনীং কন্থাং কৌপীনাচ্ছাদনং তথা॥

পবিত্রং স্নানশাটীং চোত্তরাসঙ্গং ত্রিদণ্ডঃ।

অতোঽতিরিক্তং যৎ কিঞ্চিৎ সর্ব্বং তদ্‌বর্জয়েদ্‌ যতিঃ॥

'ভিক্ষাপাত্র, পানপাত্র, শিক্য (flask), ত্রিবিষ্টপ (কাষ্ঠত্রয়), পাদুকা, শীতনিবারক কন্থা, কৌপীন, জলশোধক বস্ত্র, স্নানশাটী, উত্তরীয় ও ত্রিদণ্ড ব্যতীত অপর সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন।' জাবাল-উপনিষদ্‌ ইহার অনুমোদন করেন না।

জাবাল বলেন, ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, পাত্র, শিক্য, জলপবিত্র, শিখা, উপবীত, এ সমস্তই 'ভূঃ স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সলিলে পরিত্যাগ করিয়া আত্মার অন্বেষণ করিবে।

ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং পাত্রং শিক্যং জলপবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতং চ ইত্যেতৎ সর্ব্বং ভূঃ স্বাহা ইত্যপ্সু পরিত্যজ্য আত্মানমন্বিচ্ছেৎ।

কঠরুদ্র উপনিষদের মত জাবালের অনুকূল এবং সন্ন্যাস-উপনিষদের প্রতিকূল।

তদপি শ্লোকা ভবন্তি

কুণ্ডিকাং চমসং শিক্যং ত্রিবিষ্টপমুপানহৌ।

শীতোপঘাতিনীং কন্থাং কৌপীনাচ্ছাদনং তথা।

পবিত্রং স্নানশাটীং চ উত্তরাসঙ্গমেব চ।

যজ্ঞোপবীতং বেদাংশ্চ সর্ব্বং তদ্বর্জয়েদ্‌ যতিঃ॥

সন্ন্যাস-উপনিষদ্‌ সন্ন্যাস-প্রবেশের অভিমুখে অগ্নিবর্জ্জনের পর "মন্যুঃর্জায়া" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক একটী দীক্ষার ব্যাবস্থা করিয়াছেন—গুহাং প্রবেষ্টুমিচ্ছামি পরং পদম্‌ অনাময়ম্‌ ইতি সংন্যস্য অগ্নিং পুনরাবর্ত্তনং যৎ মন্যুঃর্জায়াবহৎ ইতি অধ্যাত্মমন্ত্রান্‌ জপেৎ, দীক্ষাং উপেয়াৎ।

এইরূপে বানপ্রস্থ চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সংন্যাসী হইতেন। উপনিষদে দেখা যায়, সন্ন্যাসের চারিটী স্তর ছিল—নিম্ন স্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম স্তরে উঠিতে হইত। প্রথম স্তরের সন্ন্যাসীর নাম কুটীচক, দ্বিতীয়ের নাম বহূদক, তৃতীয়ের নাম হংস এবং চতুর্থের নাম পরমহংস। পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধেরা যে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ—ভিক্ষুর এই চারি শ্রেণীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ইহারই অনুরূপ।

অথ খলু সৌম্য! কুটীচকো বহূদকো হংসঃ পরমহংস ইত্যেতে পরিব্রাজকাশ্চতুর্বিধা ভবন্তি। সর্ব্ব এতে বিষ্ণুলিঙ্গিনঃ শিখিনোপবীতিনঃ শুদ্ধচিত্তা আত্মানমাত্মনা ব্রহ্ম ভাবয়ন্তঃ শুদ্ধচিদ্রূপোপাসনারতা উপযমবন্তো নিয়মবন্তঃ সুশীলিনঃ পুণ্যশ্লোকা ভবন্তি। তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। কুটীচকো বহূদকশ্চাপি হংসঃ পরমহংস ইতি।

শাঠ্যায়নীয়োপনিষৎ; ১১

অর্থাৎ 'হে সৌম্য, কুটীচক, বহূদক, হংস এবং পরমহংস এই চারি প্রকারের পরিব্রাজক আছেন। ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুলিঙ্গ, শিখা ও উপবীতধারী। এই পুণ্যশ্লোক, শান্তস্বভাব, জপ-যম-নিয়মাভ্যাসী পরিব্রাজকগণ, আপনাকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া শুদ্ধচিত্তে পরমাত্মার কেবল মাত্র চিন্ময় সত্তারই উপাসনা করিয়া থাকেন। ঋক্‌ মন্ত্রেও একথা বলা হইয়াছে—কুটীচক, বহূদক, হংস এবং পরমহংস এই চারি প্রকারের পরিব্রাজক।'

কোন কোন সংন্যাস-উপনিষদে ইঁহাদের বৃত্তিভেদ লইয়া অনেক খুঁটিনাটি আছে—সে জটিল অরণ্যে আমরা প্রবেশ করিব না। তবে এই মাত্র লক্ষ্য করিব যে, সন্ন্যাসী যেমন যেমন সাধনার উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিবেন, তাঁহার ত্যাগ ও সংযমের পরিমাণ তাহার অনুপাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। অবশেষে পরমহংসপদারূঢ় হইলে—

ন দণ্ডং ন শিখাং ন যজ্ঞোপবীতং নাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ। ন শীতং ন চোষ্ণং ন সুখং ন দুঃখং ন মানাপমানে চ ষড়ূর্ম্মিবর্জ্জং নিন্দাগর্ব্বমৎসরদম্ভদর্পেচ্ছাদ্বেষ সুখ-দুঃখ-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-হর্ষাসূয়াহংকারাদীংশ্চ হিত্বা স্ববপুঃ কুণপমিব দৃশ্যতে—পরমহংস, ২

'পরমহংসের দণ্ড নাই, শিখা নাই, উপবীত নাই, কৌপীন নাই। তিনি শীত উষ্ণ, সুখদুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত। ক্ষুৎপিপাসা, শোক মোহ ও জরামৃত্যুরূপ সংসার-সমুদ্রের ছয়টি উর্ম্মি তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তিনি নিন্দাগর্ব্ব হিংসাদম্ভ দর্প ইচ্ছাদ্বেষ সুখ-দুঃখ কাম ক্রোধ লোভ মোহ হর্ষ অসূয়া অহংকারাদি বর্জ্জন করিয়া, (দেহাত্মবুদ্ধি অতিক্রম পূর্ব্বক), নিজ শরীরকে শবদেহ জ্ঞান করেন।'

বলা বাহুল্য ইহা সাধনার খুব উচ্চ অবস্থা—যে অবস্থায় সন্ন্যাসী পরমপদের সম্মুখীন হন। ইহা যোগের পরিপক্ব দশা—এ অবস্থায় 'অভিতো ব্রহ্ম নির্ব্বাণম্।' আমাদের আলোচ্য সন্ন্যাস-আশ্রমের স্থূল বিষয়। সন্ন্যাস গ্রহণের পর সন্ন্যাসীর অশন, বসন,শয়ন, বর্ত্তন কিরূপ—এক কথায় সংন্যাসীর আচরণ বা জীবনযাপন কি প্রণালীতে নিষ্পন্ন হয়।

সংন্যাসীর ভিক্ষাই বৃত্তি—

"যতয়ো দীক্ষার্থং গ্রামং প্রবিশন্তি পানিপাত্রম্ উদর-পাত্রং বা—আরুণেয়

ভিক্ষাশনং দধ্যাৎ—সন্ন্যাস

অযাচিতং যাচিতং বোত ভক্ষ্যম্—শাঠ্যায়ণী ১৯

তাঁহার ভোজন উদর-পূর্ত্তির জন্য নহে—শরীর-ধারণ নিমিত্ত।

ঔষধবদ্ অশনম্ আচরেৎ।

প্রাণ সংধারণার্থং যথোক্তকালে বিমুক্তো ভৈক্ষমাচরন্ উদরপাত্রেণ—জাবাল ৬

সেই জন্য তাঁহার নাম ভিক্ষু।

তিনি সুধু ভিক্ষু নন, পরিব্রাজক—অনিকেত-স্থিতিরেব ভিক্ষুঃ—পরমহংস, ৪

তিনি 'অনিকেত'—আবাস স্থিতিহীন।

নদীপুলিনশায়ী স্যাদ্দেবাগারেষু বাহ্যতঃ।—সন্ন্যাস ৪

শূন্যাগার-দেবগৃহ-তৃণ-কূট-বল্মীক-বৃক্ষ-মূল-কুলালশালা-অগ্নিহোত্র-নদীপুলিন-গিরি-কুহর-কন্দর-কোটর নির্ঝর স্থণ্ডিলেষু অনিকেতবাসী জাবাল, ৬

শাঠ্যায়নী উপনিষদ্ ইহার সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

দেবাগ্ন্যগারে তরুমূলে গুহায়াং বসেদসঙ্গোঽলক্ষিত-শীলবৃত্তঃ। ২১

'দেবমন্দির-অগ্নিশালা-তরুমূল কিংবা গুহাতে একাকী অলক্ষিত-শীলবৃত্ত বাস করিবেন।' শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন :—

সুরমন্দির তরুমূল-নিবাসঃ।
শয্যা ভূতলম্ অজিনং বাসঃ ॥

তাঁহার পরিধান অজিন (অযত্নলব্ধ মৃগচর্ম্ম) কিংবা বল্কল অথবা গৈরিক বস্ত্র —কাষায়বাসাঃ—সন্ন্যাস ৩

পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসঃ মুণ্ডঃ অপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষাণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি—জাবাল

অর্থাৎ বিবর্ণবাসধারী, মুণ্ডিতমস্তক, ভিক্ষাবৃত্তি, শুচি, অদ্রোহী, ত্যক্ত-পরিগ্রহ পরিব্রাজক ব্রহ্মলাভের যোগ্য হন। সন্ন্যাস পরিপক্ক হইলে যতি, দণ্ড অজিন মেখলা উপবীত প্রভৃতি সমস্তই ত্যাগ করিয়া দিগম্বর (আশাম্বরঃ—পরমহংস, ৪) হন এবং 'যথাজাত-রূপধরঃ' (naked as he was born) (জাবাল, ৬) হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ের প্রতীক্ষা করেন।

সংন্যাসীর পক্ষে স্বাধ্যায় (বেদাভ্যাস) নিষ্প্রয়োজন—অত উৰ্দ্ধম্ অমন্ত্রবদ্ আচরেৎ (আরুণেয়ী ১)

স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মাণি সংনস্য—পরমহংস ১

তাঁহার আলোচ্য গ্রন্থ আরণ্যক ও উপনিষদ্—যাহা বেদের অন্ত বা প্রপূর্ত্তি।

সর্ব্বেষু বেদেষু আরণ্যকম্ আবর্ত্তয়েৎ উপনিষদম্ আবর্ত্তয়েৎ—আরুণেয়ী, ২

সন্ন্যাসীর ইহাই স্বাধ্যায়।

নানোপনিষদভ্যাসঃ স্বাধ্যায়ো যজ্ঞ ঈরিতঃ
—শাঠ্যায়নীয় ১৫

সন্ন্যাসী কি ভাবে জীবন যাপন করিবেন? ইহার উত্তরে আরুণেয়ী-উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসা চ অপরিগ্রহং চ সত্যং চ যত্নেন হে রক্ষত হে রক্ষত হে রক্ষত—৩

'হে সন্ন্যাসী। তোমরা ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা অপরিগ্রহ ও সত্য সযত্নে রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

সঙ্গে সঙ্গে কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্প হিংসা মমত্ব অহংকার অসত্য সর্ব্বথা বর্জ্জন কর।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্পাসূয়া মমত্বাহংকারানৃতাদীন্ অপি ত্যজেৎ—আরুণেয়ী, ৪

সন্ন্যাসী কিরূপ আচরণ করিবেন?

দুঃখে নোদ্বিগ্নঃ সুখে ন স্পৃহা ত্যাগো রাগে, সর্ব্বত্র শুভাশুভয়োঃ অনভিস্নেহঃ ন দ্বেষ্টি ন মোদতে—পরমহংস, ৪

'দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে স্পৃহাহীন, কাম্যবস্তুতে কামনাহীন, সর্ব্বত্র শুভাশুভে স্নেহহীন—সন্ন্যাসী দ্বেষরাগ-বর্জ্জিত।' তিনি নিন্দা স্তুতির অতীত—

স্তূয়মানো তুষ্যেত নিন্দিতো ন শপেৎ পরান্—সন্ন্যাস ৪

তাঁহার সম্পর্কে শাঠ্যায়নী উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্পাসূয়া মমত্বাহংকারাদীন্ বিতীর্য্য মানাপমানৌ নিন্দা স্তুতী চ বর্জ্জয়িত্বা বৃক্ষ ইব তিষ্ঠাসেৎ। ছিদ্যমানো ন ব্রূয়াৎ। তদৈবং বিদ্বাংস ইহৈব অমৃতা ভবন্তি—১৮

সংন্যাসী 'কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্প ঈর্ষা মমতা অহংকার প্রভৃতি নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া মান-অপমান নিন্দা স্তুতি বর্জ্জন করিয়া তরুর মত (সহিষ্ণু হইয়া) অবস্থান করিবেন। কাটিয়া ফেলিলেও কথা কহিবেন না। এইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি এখানেই অমৃতত্ব লাভ করেন।'

ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া আরুণেয়ী উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

বিদ্বান্ য এবং বেদ 'সংন্যস্তং ময়া সংন্যস্তং ময়া সংন্যস্তং ময়া' ইতি ত্রিঃকৃত্বা অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে'—

অর্থাৎ যিনি বিদ্বান্ তিনি তিনবার 'সংন্যস্তং ময়া' ইহা উচ্চারণ করিবেন—যাঁহার সর্ব্বভূতে ঐক্যবুদ্ধি—তাঁহার সর্ব্বত্র অভয়।

সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে উপনিষদ্ মৌন, সমাধি ও যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন—

মৌনী বসেদ্ আশ্রমে যত্র তত্র—শাঠ্য ৬

সন্ধিং সমাধৌ আত্মনি আচরেৎ—আরুণেয়ী ২

(সন্ধিং—পরমাত্মনা সন্ধানম্ অভেদম্ আচরেৎ—নারায়ণ)

অজরমমরমক্ষরমব্যয়ং প্রপদ্যতে তদভ্যাসেন প্রাণাপানৌ সংযম্য—সন্ন্যাস ৪

'প্রাণাপানের গতিরোধ দ্বারা প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিয়া যোগী সেই অজর, অমর অক্ষর অব্যয় তত্ত্বকে প্রাপ্ত হন।'

ইহার ফলে কি হয়? বৃহদারণ্যক বলিতেছেন :—

তস্মাদ্ এবংবিৎ শান্তো দান্ত উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেব আত্মানং পশ্যতি সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি—৪।৪।২৩

'শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান প্রভৃতি সম্পত্তিতে সম্পন্ন হইয়া তত্ত্ব-বিৎ (পরমহংস) আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করেন, সর্ব্বত্র আত্মাকে দর্শন করেন।'

ইহা গীতার সেই অমোঘ কথা—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। পরমহংস উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন : —সর্ব্বে কামা মনোগতা ব্যাবর্ত্তন্তে। সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গতিঃ উপরমতে য আত্মনি এব অবস্থীয়তে যৎ পূর্ণানন্দৈকবোধঃ তদ্ ব্রহ্মাহমস্মি ইতি কৃতকৃত্যো ভবতি কৃতকৃত্যো ভবতি।

'মনঃস্থিত সমস্ত কামনা ব্যাবৃত্ত হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গতি উপরত হয়। যিনি আত্মাতে অবস্থিত হন, তিনি সেই চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সহিত ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সোহং ভাব প্রত্যক্ষ করতঃ কৃতকৃত্য হন— কৃতকৃত্য হন।'

এখন তাঁহার জীবনের প্রয়োজন অবসিত হইয়াছে—প্রারব্ধক্ষয় হইয়াছে গম্য অধিগত হইয়াছে। এইবার তিনি—

ঊর্দ্ধং সম্পদ্যতে দেহাৎ ভিত্বা মূর্দ্ধানমব্যয়ম্—সন্ন্যাস ৫

কঠরুদ্র সাধনার উচ্চ চূড়ায় স্থিত সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

অত ঊর্দ্ধম্ অনশনং অপাং প্রবেশম্ অগ্নিপ্রবেশং বীরাধ্বানং মহাপ্রস্থানং বৃদ্ধাশ্রমং বা গচ্ছেৎ—কঠরুদ্র ১

'ইহার পর তিনি অনশন, জলপ্রবেশ, অগ্নিপ্রবেশ, যুদ্ধমৃত্যু, মহাপ্রস্থান বা বৃদ্ধাশ্রম আশ্রয় করিবেন।'

অয়ং পরিব্রাজকানাং বিধিঃ। বীরাধ্বানে বানাশকে বাহপাং প্রবেশে বাগ্নিপ্রবেশে বা মহাপ্রস্থানে বা—জাবাল, ৫

'পরিব্রাজক রণমুখে, অনশনে, সলিল বা অগ্নি-প্রবেশনে কিংবা মহাপ্রস্থানে মহাযাত্রা সম্পন্ন করেন।' আদিত্যপুরাণ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন :-

স্বীয়দেহবিনাশস্য কালে প্রাপ্তে মহামতিঃ।
প্রবিশেৎ জ্বলনং দীপ্তং করোত্যনশনং তথা।
অগাধং তোয়রাশিং বা ভৃগোঃ পতনমেব বা ॥
গচ্ছেৎ মহাপথং বাপি তুষারগিরিমাদরাৎ।
প্রয়াগ বটশাখাগ্রাৎ দেহত্যাগং করোতি বা ॥

বলা বাহুল্য ইহা আত্মহত্যা নহে—অবসিত প্রয়োজন দেহের বিসর্জন। অগ্নি-প্রবেশ, অনশন, ভৃগুপতন, সমুদ্র-মজ্জন, মহাপ্রস্থান, শাখাশাতন প্রভৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়া চরমপন্থী পরিব্রাজক এইবার পরম ধামে তীর্থযাত্রা করেন। তাঁহার জন্য 'বৈতরণী'র ঘাটে ওঁকার নৌকা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, (ওঁকার-প্লবেন- অন্তর্হৃদয়াকাশস্য পারং তীর্ত্বা –মৈত্রী ৬।২৮), তিনি ঐ তরীতে আরোহণ করিয়া অনায়াসে ভবপারে চলিয়া যান—অথবা

ওঁকাররথমারুহ্য বিষ্ণুংকৃত্বাথ সারথিম্।
ব্রহ্মলোকপদান্বেষী রুদ্রাধারণতৎপরঃ ॥

—অমৃতনাদ, ২

—ব্রহ্মপদান্বেষণে ভগবান্‌কে সারথি করিয়া প্রণব-রথে আরূঢ় হইয়া পরমধামে প্রস্থান করেন এবং অসৎ হইতে সতে, তমঃ হইতে জ্যোতিতে এবং মৃত্যু হইতে অমৃতে উপনীত হন। অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়—বৃহ ১।৩।২৮

উপনিষদ-গ্রন্থে আমরা আশ্রম-চতুষ্টয়ের যেরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হই,তাহা যথাসাধ্য বিবৃত করিলাম। আমাদিগের আর্য্য প্রপিতামহদিগের জীবন কিরূপ সুবিন্যস্ত ছিল, পাঠক তাহার কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। বর্ত্তমান যুগে কি সেই জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা যায় না ?

সংন্যাস উপনিষদ্ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত সারাত্মক নিম্নোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থিন্নো গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
বেদানধীত্যানুজ্ঞাত উচ্যতে গুরুণাশ্রমী ॥
দারমাহৃত্য সদৃশম্ অগ্নিমাধায় শক্তিতঃ।
ব্রাহ্মীমিষ্টিং যজেৎ তাসাম্ অহোরাত্রেণ নির্বপেৎ ॥
সংবিভজ্যসুতান্ অর্থৈগ্রাম্যান্ কামান্‌বিসৃজ্য চ।
চরেত্ত বনমার্গেণ শুচৌ দেশে পরিভ্রমন্ ॥

* * *

তস্মাৎ কলবিশুদ্ধাঙ্গী সংন্যাসং সহতেহর্চিমান্।
ত্যক্ত্বা কামান্ সংন্যসতি ভয়ং কিমনুপশ্যতি।

'মানব প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে প্রবেশ করিয়া গুরু-শুশ্রূষায় রত থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন। পরে গুরুর অনুমতি লইয়া দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ হইয়া অগ্ন্যাধান পূর্ব্বক যথাশক্তি যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। (জীবনের অপরাহ্নে) পুত্রদিগের মধ্যে বিত্ত বণ্টন করিয়া গ্রাম্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া আরণ্যক হইয়া শুচি প্রদেশে অবস্থান করিবেন। তাহার পর কলাকজ্ঞা সন্ন্যাস করিয়া দ্যুতিমান্ সন্ন্যাসী হইয়া সর্ব্বত্র অভয় দর্শন করিবেন এবং দেহপাতের পর পরম গতি লাভ করিবেন।

যে প্রাপ্য পরমাং গতিং ভূয়ঃ তে ন নিবর্ত্তন্তে।

ইহাই মনুষ্য জীবনের চরম –ম নব-নিয়তির প্রপূর্ত্তি—পরম পদপ্রাপ্তি।

তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥

গ্রাম্য দেবতা

জয়দুর্গা

[অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম্-এ]

বর্ত্তমান যুগে বঙ্গদেশে দুর্গা অন্যতম প্রধান দেবতা। দুর্গাপূজা বঙ্গদেশের প্রধানতম উৎসব। মনে হয় দুর্গাদেবীর এই প্রাধান্যের জন্য কালক্রমে ইঁহার নানা রূপভেদ কল্পিত হইয়াছিল। এইরূপ ভেদের মধ্যে বনদুর্গা ও জয়দুর্গা—পূর্ব্ববঙ্গে সুপরিচিত। ইঁহাদের মধ্যে বনদুর্গার পূজাই অধিক প্রচলিত সত্য। তবে জয়দুর্গার পূজা তত প্রচলিত না হইলেও ইঁহার পূজার পদ্ধতির মধ্যে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য ও অতি প্রাচীন আচারের আভাস রহিয়াছে যাহা সচরাচর অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য আমরা জয়দুর্গা পূজার কথা প্রথমেই বলিতেছি।

এই জয়দুর্গা পূজা কোথায় কোথায় প্রচলিত আছে বা ছিল তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে ফরিদপুর জেলার অনেক স্থলে পূর্ব্বে এই পূজা অতি সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। বর্ত্তমানে ইঁহার প্রচলন খুবই কম। কালক্রমে যে ইহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় সম্প্রতি এই পূজা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। পূজা কোটালিপাড়ায় গত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে আর হয় নাই।

বনদুর্গা ও জয়দুর্গার প্রতিমা প্রস্তুত* করার প্রথা নাই। কোনও বৃক্ষতলে বা 'খোলায়'+ ঘটের উপর দেবীর পূজা করা হয়। জয়দুর্গাপূজার পূর্ণ নাম পত্রাবলী জয়দুর্গা পূজা। পূজার পূর্ব্বে দেবীর আবাহন-প্রসঙ্গে পত্রাবলীর সং বা ভুজিরা উলঙ্গভাবে নৃত্য করিয়া দেবীকে আবাহন করে—না আসিলে দেবীকে নানারূপ লাঞ্ছনা করিবে ভয় দেখায়।

কোনও পূজা প্রসঙ্গে এইরূপ উন্মত্ত নির্বাধ নৃত্য-গীতাদির প্রথা অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। Augus-tus Sovervile তাঁহার Crimes and Religious Beliefs in India নামক পুস্তকে (পৃঃ ১৬৫-৭) হুদুম দেব নামক বৃষ্টিদেবের পূজোপলক্ষে রাজবংশীদিগের ভিতর প্রচলিত এইরূপ নৃত্যগীতের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। বর্ষণ না করার অপরাধে এই সময় দেবতাকে অতি কুৎসিত ভাষায় গালি দেওয়া হয় এবং দেবমূর্ত্তির উপর থুথু ফেলিয়া উহাকে পদদলিত করা হয়। বিজয়া দশমীর দিন কালিকা পুরাণে শাবরোৎসব নামে যে উৎসবের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাও অনেকটা এইরূপ। ইহা ছাড়া অন্যান্য উৎসবেও এইরূপ নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। ফলতঃ এইরূপ উৎসবগুলি ছিল সর্ব্বত্রই প্রাক্তন ধর্ম্মের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ।

এইবার প্রারম্ভিক উৎসবের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা আসল পূজার কথা আরম্ভ করিব। পূজার সঙ্কল্পে চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তির কামনা করা হয় এবং দদ্ধ মৎস্যরূপ উপচার প্রদান ও গায়ন-বাদ্য-নৃত্য নাটক রূপ পত্রাবল্যাখ্য মহোৎসব কর্ম্ম করা হইবে তাহার উল্লেখ করা হয়। দেবীর পূজার সঙ্গে ক্ষেত্রপালাদি দানব পূজা করিতে হয়। সুতরাং সঙ্কল্পে তাহারও উল্লেখ থাকে। প্রথমেই সন্ধ্যার পূজা। ধ্যান যথা—

সন্ধ্যাং ধূম্রবর্ণাং পট্টবস্ত্রপরীধানাং
ত্রিনেত্রাং চতুর্ভুজাম্।
স্বরাধিষ্ঠিতাং নৈর্ঋতদিগবস্থিতাং
অগুরুধূপাদিভিঃ স্নানাসিতাং প্রৌঢ়বয়স্কাম্॥

তার পরেই ক্ষেত্রপালের পূজা। তাঁহার ধ্যান—

ভ্রাজচ্চন্দ্রজটাধরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভং
দোর্দ্দণ্ডাত্তগদাকপালবরুণাং স্রগ্ বস্ত্রযুগ্মোজ্জ্বলম্।

---

* । জয়দুর্গা-পূজার পদ্ধতি গ্রন্থে দেবীমূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিধান আছে। সুতরাং পূর্ব্বে প্রতিমা প্রস্তুত করা হইত বলিয়া মনে হয়।

+ । খোলা শব্দের অর্থ দেবস্থান। সাধারণতঃ জনপরিত্যক্ত স্থান-বিশেষে এক এক দেবতার খোলা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

ঘণ্টামেখলঘর্ঘরাদ্বিবিধ্বতং ঝঙ্কারভীমং বিভুং
বন্দে সংহিতসর্পস্বর্ণকুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা ॥

ক্ষেত্রপালকে দধি, মাষ ও অন্ন দিবার সময় এইরূপ প্রার্থনা করা হয়—

এহ্যেহি বিদ্বিষ বিদ্বিষ তরুং ভঞ্জয় ভঞ্জয় তর্জয় তর্জয় বিঘ্নভৈরব ক্ষেত্রপাল বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা।

ইহার পর কোকিলাক্ষনামক দেবের পূজা। ধ্যান—

কোকিলাক্ষং মহাভাগং ব্যাঘ্রস্তোপরি সংস্থিতম্।
ভক্তভীতিহরং দেবং কোকিলাখ্যমহং ভজে ॥

এই কোকিলাখ্য যমের ন্যায় দক্ষিণ দিকের অধিপতি তাঁহার প্রণাম মন্ত্র হইতে এইরূপ জানিতে পারা যায়।[১] জয়দুর্গার বর্ণ কৃষ্ণ মেঘের মত—হস্তে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ এবং ত্রিশূল। দেবী সিংহারূঢ়া এবং চতুর্ভুজা[২]।

পরিবার দেবতার মধ্যে দক্ষিণেশ্বরী[৩], মগধেশ্বরী[৪] ও দানবমাতার নাম উল্লেখ-যোগ্য। পরিবারদেবতার পূজার পর দানবপূজা। দানবদিগের নামগুলি কৌতুকপ্রদ যথা—ছোটেশ্বর, কৃষ্ণকুমার, অগ্নিমুখ, পুষ্পকুমার, জলকুমার লৌহজঙ্ঘ, ধবলাক্ষ, কোকিলাক্ষ, শূকরশিরাঃ, বিড়ালাক্ষ, দ্বাদশ ভ্রাতা[৫], একজঙ্ঘ, একপাদ, তালকেতু, হস্তিমুখ, রক্তনয়ন, শালকুমার, আকুলকুমার, বকুলকুমার, দীর্ঘকুমার, দীর্ঘকর্ণ, উদ্ধর্পাদ, দীর্ঘজঙ্ঘ, ভ্রামর, ময়ূরমোদ, কালকেতু, শিশুকুমার, আকুল, মুকুল, বিমুখ, বেতাল, তালকবন্ধ, সবিতাক্ষ, সনৎকুমার, বলিকুমার, অঙ্কুর, যক্ষাধিরূঢ়, মার্জ্জনীসাংখ্য, কালাক্ষ, বংশকুমার, মুকুট, উষ্ণকুমার, দুর্ম্মুখ, গোশৃঙ্গাধিরূঢ়, শুকাক্ষ, ভূত, প্রেত খেচর, ভূচর, ধনেশ, চাটকুমার, চাটেশ্বর, শাখোটারূঢ়, রণকুমার, ছলকুমার, অরুশূর, ঘটকুমার, যূপকুমার, রণপণ্ডিত[১], রক্তমুখ, ক্রোধমুখ, শুষ্কা, শৃঙ্গ, অজা, দন্ত, মাণিকা, সপ্ত, বিদ্যুৎসঞ্চার, চৌরাখ্য, হট্টাধিপ, রস্তাধিপ, বহ্যধিপ, হরিপাগল, কর্ণচাপ, স্থচিমুখ, মোচরাসিংহ, গাভুরডলন, সৌভট্ট, নিশাচৌর, আকাশকুমার, স্থলকুমার, সুরমর্দ্দন, জলমর্দ্দন, কালাসুর, কালমেঘ, ছলেশ্বর, হেমন্তকুমার, রণকুমার, লুণ্ঠ, অগ্নি[২], নারায়ণ[৩], অঘোর, আয়ুধ, ভৈরব, একদন্ত[৩] ওঅষ্টগণ[৪]।

তারপর রাত্রিশেষে নির্জন স্থানে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া গোপাল হাজরার পূজা করিতে হয়। গোপাল হাজরার ধ্যান—

ধূম্রবর্ণং মহাকায়ং সর্বদা প্রাণিহিংসকম্।
কৃষ্ণাম্বরধরং ক্রূরং ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়কম্ ॥
দ্বিভুজং দ্বিমুখং ঘোরং পাশমুদ্গরধারিণম্।
গোপালহাজরাং বন্দে সর্ব্বভীতিহরং পরম্ ॥

গোপাল হাজরার প্রীতির জন্য ভুবনেশ্বরী বিদ্যার পূজা এবং হংস বলি দিতে হয়। জয়দুর্গার প্রীতির জন্য দগ্ধ-মীনাদি সহিত সিদ্ধান্ন ক্ষেত্রপালকে দিবার বিধান আছে। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে সমস্ত জিনিষ অশুভ এবং অপবিত্র বলিয়া সাধারণতঃ ধারণা, এস্থলে তাহাদের সাহায্যেই দেবতার প্রীতিসম্পাদনের চেষ্টা করা হয়।

১। দক্ষিণাধিপতির্বীর শরীররক্ষিতকারক।
শার্দূলবাহনো দেব কোকিলাক্ষ নমো নমঃ ॥

২। কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্ ।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং পূজিতাং সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ ॥

৩। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আরাধ্য ও রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরী কালিকা ও এই দক্ষিণেশ্বরী অভিন্না হইতে পারেন।

৪। চট্টগ্রামে মগধেশ্বরীর পূজা খুব প্রচলিত। এই পূজার নানা বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য।

৫। পূর্ববঙ্গে দ্বাদশভ্রাতা দ্বাদশ দানব, দানবমাতা বনদুর্গা ও দানবভগ্নী রণবক্ষিণীর পূজার বহুল প্রচলন আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত দানবদিগের কেহ কেহ (যথা, মোচরাসিংহ, গাভুরডলন পুষ্পকুমার, নিশাচৌর, হরিপাগল) দ্বাদশভ্রাতার অন্তর্গত। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ মল্লিখিত The Cult of Baro Bhaiya of Eastern Bengal প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

১। রণপণ্ডিতের ধ্যান—
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং নীলবস্ত্রপৃথূদরম্।
দ্বিভুজং খড়্গহস্তঞ্চ ব্যালযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥
বরদং শুভ্রবংশাঙ্কং ভজেৎ ত্রিভুবনেশ্বরম্।
প্রণামমন্ত্র—রণপণ্ডিত মহাসত্ত্ব বৈরিবারণকেশরী।
ব্যাঘ্রাদিপশুভীতেভ্যো রক্ষ মাং কুরু সর্ব্বতঃ

২। ইঁহারা কিরূপে দানবদিগের অন্তর্ভুক্ত হইলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

৩। সাধারণতঃ একদন্ত শব্দে গণেশকে বুঝাও।

৪। অষ্টগণ কি তাহা বুঝা যায় না।

পরদিন পূজান্তে চাউলের গুঁড়া দ্বারা ২৯টী মণ্ডল আঁকিয়া তাহার উপর কলার পাতা রাখিতে হইবে এবং দুধের দ্বারা ঐ কলাপাতা ধুইয়া তাহার উপর ২৯ ভাগ পোড়া মাছ ও সিদ্ধ চাউলের ভাতের ভোগ জয়দুর্গাকে দিতে হইবে। প্রচুর চাউল এবং বহু মৎস্য দ্বারা এই ভোগ দেওয়া হয়। তবে দেবীর প্রসাদ কেহ গ্রহণ করে না।

ইহার পর শতবলি এবং [illegible]।

৫। জয়দুর্গা পূজার একখানি লিখিত ও হস্তলিখিত পদ্ধতির আদি কোটালিপাড়ার শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি এজন্ত তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তবে এজাতীয় প্রায় সকল পুথির ন্যায় এখানিও অশুদ্ধিবহুল। স্থানের মধ্যে অনেক স্থলে অপ্রতীকার্য্য ছন্দোদোষ রহিয়াছে।

শরৎ কমল

[শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর]

পূব গগনের দুয়ার খুলে
মেঘের' পরে দাঁড়িয়ে ছিল
উষা সতী ঘোমটা তুলে।
পাখীর গলায় কি কাকুতি,
কুঞ্জসভার কি আকূতি!
আমন্ত্রণী বহি পবন
দোলা দিল হিরণ চুলে।
হায়—ধরার ধূলায় নাম্‌ল উষা
ক্ষণিক ভুলে।

কোথায় গেল উষারাণী?
কোথায় গেল কুঞ্জ শোভা
কোথায় পাখীর ব্যাকুল বাণী?
মিলাইল স্বপ্ন কোথায়
দিবাদাহের তপ্ত ব্যথায়?
দাগ রেখেছে পাতায় পাতায়
কারা ব্যথার অশ্রু হানি?
শুধু—তড়াগবুকে চিহ্ন রেখে
গেছে উষার পা-দু'খানি।

দমকা-হাওয়া

(উপন্যাস)

[শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]

—তের—

মহানন্দের উপর সন্দেহ বীণার মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া গেল, কিন্তু প্রমাণ করিবার কোনও প্রকার উপকরণ হাতের কাছে না পাইলেও সেটাকে কিছুতেই সে দূর করিতে পারিল না। অন্য লোক তাহার নিকট হইতে সেরূপ ধরণের কোনও আভাস না পাইলেও তাহার সহিত কথা কহিবার সময় মহানন্দের চাহনির ভিতর দিয়া এমন একটা কিছু সে দেখিতে পায়, যাহাতে তাহার সারা দেহের ভিতর রি রি করিয়া উঠে, ঘৃণায় অন্তর ভরিয়া যায়,—তাহার মুখদর্শন করিলেও বীণার মনে হয়, যেন সে নরক দর্শন করিতেছে; তাই সে যে করালীমার পূজা ও সন্ধ্যারতির সময় না গিয়া একদিনও থাকিতে পারিত না, সেই মন্দিরে যাওয়া একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

আজকাল মহানন্দই করালীমার পূজারতি করে।

এই সময়ে বীণাকে দেখিতে না পাইয়া মহানন্দের বুকখানা নিরুৎসাহে যেমনই ভরিয়া ওঠে শিবানন্দের প্রাণটা তেমনই দুঃখের ভারে তাহাকে পীড়া দিতে থাকে।

তাঁহার মনে হয় বীণা-মার অনুপস্থিতিতে, করালী-মা কোনও কিছুই যে গ্রহণ করিতেছেন না। মৃন্ময়ী মূর্ত্তির মধ্য দিয়া চিন্ময়ী মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়া এত দিন পর্য্যন্ত তিনি যে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিতেন, আজ সেটা দেখিতে না পাইয়া তাঁহার বুকের ভিতর হাহা করিয়া উঠিত, আপন মনে বলিয়া উঠিতেন—মা—মা—মাগো!

চক্ষের ধারায় তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইত, কিন্তু মায়ের সাড়া কিছুতেই পাইতেন না।

হাহাকারে হৃদয় পূর্ণ করিয়া তিনি বীণার কাছে একদিন ছুটিয়া গেলেন, ডাকিলেন—"বীণা-মা?"

তাঁহার কণ্ঠস্বরের গাঢ়তা লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বীণা বলিল, "কেন কাকা?"

"মন্দিরে তুই যাস নি কেন, মা?"

বীণা, মাথা হেঁট করিয়া নিরুত্তরেই দাঁড়াইয়া রহিল।

আবেগাপ্লুত কণ্ঠে শিবানন্দ বলিলেন,—"আজ হ'তে তুই চল মা, তুই না গেলে, মা যে, নৈবেদ্যের একটুও গ্রহণ করে না মা, মায়ের অংশ তুই মা, মন্দিরে যাওয়া ছেড়ে দিতে আছে? ছিঃ, চল আজ হ'তে।"

জলের ভারে বীণার চোখ দু'টা যেন চক্ চক্ করিয়া উঠিল।

আবেগজড়িত কণ্ঠে শিবানন্দ বলিতে লাগিলেন, "এতদিন মায়ের ঐ মাটীর চেহারার ভেতর দিয়ে যা দেখেছিলাম, যে দিন হ'তে তুই নিজের হাতে ধূপ ধুনা দেওয়া বন্ধ করেছিস সেই দিন হতে আর তা যে দেখতে পাই নি মা, দেখছি শুধু একটা প্রাণহীন মাটীর তৈরী মূর্ত্তি।"

বীণার বুকের মাঝে কে যেন একটা ধাক্কা মারিয়া দিল, একবার মনে করিল বলে, কাকা, কাকা, মার পূজা তুমি নিজে কর; শুধু ফুল আর বেলপাতা চাপালে তিনি দর্শন দেবেন না কাকা, অর্ঘ্যের সঙ্গে ঐকান্তিক ভক্তি চাই, চক্ষের জল চাই, উন্মত্ত, আবেগ চাই ...

কিন্তু হঠাৎ সে কথাটা বলিতে পারিল না; চক্ষুর কোল দিয়া অশ্রুর বন্যা তাহার গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া দিল।

শিবানন্দ গদগদভাবেই বলিতে লাগিলেন—"বেটীকে এম্নি ভাবে ছেড়ে দিলে তো চলবে না বীণা, তাঁকে যে ধরে রাখতেই হ'বে, সেই বাঙ্‌-মনের অগোচর মা-ই যে তোর আমার প্রজাদের সব। সে আছে ব'লেই শ্মশানে পদ্মফুল ফোটে, প্রজারা দু'বেলা পেট পুরে খায়, না গিয়ে তুই যদি তাঁকে তাড়িয়ে দিস, অদৃশ্যলোক হ'তে মাধবের সাধের জমিদারীর মধ্যে প্রেতের খেলা সুরু হবে—আমাদের অমঙ্গল হ'বে।"

অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে বীণা বলিল—"যাব, কাকা।"

কান্নার সঙ্গে হাসি মিশাইয়া শিবানন্দ বলিতে লাগিলেন —"যাবি বৈ কি মা, না গেলে কি চলে? সেই জগন্ময়ীর

অংশ তুই, তুই না গেলে সে আসবে কেন ? আজই যাস, তুইই আজ ধূপ-ধুনা দিবি, দেখি বেটী কেমন না এসে থাকতে পারে ?”

আনন্দের আতিশয্যে শিবানন্দ যেন দেখিতে পাইলেন, চারিদিক আলো করিয়া মা করালীমার মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বীণাকে বলিলেন. “দেখ্ দেখ্, তোর যাবার কথা শুনে মা কেমন হেসে উঠেছে, দেখ্ মা দেখ্ ঐ অসীমের কোলে গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে। ঐযে ঐ ঐ—”

বীণার ভাষা লোপ পাইয়া গেল ; শিবানন্দের পায়ের তলায় আছাড় খাইয়া বলিল—“কাকা কাকা, —”

শিবানন্দ বলিলেন,—“করছিস কি মা ? সত্যই ঐ চেয়ে দেখ, আমি যাচ্ছি মা, মহানন্দকে বলি গিয়ে। সাধক সে, যেন প্রাণ দিয়ে আরতি করে।”

বীণাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শিবানন্দ চলিয়া গেলন।

বীণার হৃদয়ে বীণার সব তন্ত্রীগুলাই এক সঙ্গে ধ্বনিয়া উঠিল—সে আপন মনে ব'লয়া ফেলিল—কাকা, কাকা, সে সাধুবেশী ভণ্ডকে পূজার আসন ছেড়ে দিও না। যে নারীর মধ্যে মাতৃ-মূর্ত্তি না দেখে তার সম্ভ্রমে আঘাত দিয়ে হীন কটাক্ষপাত করে, তার পূজায় মা আসবে না,—আসে না, সভয়ে সরে যায় লক্ষ যোজন দূরে। তাকে আসন দিয়ে করালীমার অপমান ক'র না।”

সে মাথা তুলিয়া দেখিল, শিবানন্দ নাই। তাহার বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। আজ সন্ধ্যার সময় মন্দিরে যাইতে হইবে, সেই অধার্ম্মিকের মুখখানা দেখিতে হইবে।...

চিন্তার তন্ময়তায়, সে এম্নি ভাবে ডুবিয়া গেল যে, সারা অপরাহ্নটা কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন ধরার বুকে কালো রংএর একটা পর্দ্দা পড়িয়া গিয়াছে।

বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া সে তাড়াতাড়ি যখন করালীমার মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইল, মহানন্দ তখন আরতির উদ্যোগ করিতেছিল, শিবানন্দ তখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই। তাহাকে দেখিয়াই মহানন্দের মুখখানা হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—এত দিন এই মুখখানি দেখিবার জন্যই তাহার ব্যগ্র দৃষ্টি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, হাসোজ্জ্বলমুখে বলিল “কে—দিদি ?”

তাহাকে প্রণাম করিয়া বীণা বলিল, “হাঁ, আপনি সরুন, আমি সব আয়োজন ক'রে দিচ্ছি।”

বীণার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে মহানন্দ সরিয়া বসিল।

তাহার এই হাসি দেখিয়া বীণার মুখখানা অস্বাভাবিক রূপে গম্ভীর হইয়া গেল। মনে করিল দুইটা কথা বেশ কড়া করিয়া সে শুনাইয়া দেয়, কিন্তু কি ভাবিয়া অন্তরের ক্রোধ অন্তরের মধ্যে চাপিয়া সে আরতির উদ্যোগেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। করালীমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল পুরুত-কাকার কথাই বর্ণে বর্ণে সত্য। মার সেই হাসিভরা মুখ তো নাই। গম্ভীর ভাবেই বলিল, “সন্ন্যাসী ঠাকুর, মা কৈ ?”

ঈষৎহাস্যে মহানন্দ বলিল, “শক্তি না এলে কি শক্তির আবির্ভাব হয়, দিদি ?”

বীণার মুখখানা ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। সে আর কোনও কথা না বলিয়া কর্ম্মের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে আপনাকে নিযুক্ত রাখিল।

কিছু দূরে বসিয়া মহানন্দ তাহার ক্ষুধিত চক্ষু দুইটা লইয়া বীণার প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালনের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

শিবানন্দের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার এই ভাব কাটিয়া গেল। “তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “বীণা এসেছে, মহানন্দ ?”

এক মুখ হাসিয়া মহানন্দ বলিল,—“হাঁ, বাবা।”

ভিতরে প্রবেশ করিয়া শিবানন্দ বলিলেন, “এসেছিস, মা ? এই যে মাও কেমন হাস্‌ছেন, মায়ের মুখের এই হাসি—”

বাধা দিয়া বীণা বলিল, “হাসি কৈ ?—মার চোখে যে জল।”

“জল ?” বলিয়া শিবানন্দ করালীমার মূর্ত্তির প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনা যেন এক লহমায় স্তব্ধ হইয়া গেল।

আরতির আয়োজন বীণা তখন শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল। বাহিরে নাট-মন্দিরে তখন জনতা জমিয়া গিয়াছে

তাহারই মধ্য হইতে একজন ভক্ত করুণ রাগিণীতে নিম্নলিখিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়া হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য মায়ের পায়ে নিবেদন করিতেছে।

অনুপম শ্যামরূপ হের রে মন নয়নে।
স্থির সৌদামিনী বামা বেষ্টিত সেই নবঘনে ॥
সে শোভা হেরি নয়নে, রবি শশী দুইজনে,
নবঘন তারা সনে, মিলিত মায়ের চরণে।
কিবা অপরূপ শ্যামা রূপের সীমা নাই,
(এরূপ তুলনা দিতে ত্রিজগতে নাই,)
কিবা রূপেরি মাধুরী, কোটি চন্দ্র নখোপরি,
বেণী হেরি বিষধরী বিবরে লুকায় সঘনে।
এরূপে মা ত্রিনয়নে, নীলকণ্ঠের হৃদয় পদ্মবনে,
নাচ মা আনন্দ মনে, সদানন্দ বরাঙ্গনে।

গান শেষ হইলে শিবানন্দ বলিলেন, "এইবার তুমি আসনে যাও, মহানন্দ।"

মহানন্দ তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল।

নিজের আসনে বসিয়া শিবানন্দ ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন :—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গ-বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং।
অভয়ংবরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধ পাণিকাং।
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালী-গলদ্রুধিরচর্চিতাং
কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্ম-ভয়ানকং।
ঘোরদ্রংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত-পয়োধরাং।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং।
সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্ত-ধারা-বিস্ফুরিতাননাং।
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং।
বালার্ক-মণ্ডলাকার লোচনত্রিতয়ান্বিতাং।
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-লম্বমান-কচোচ্চয়াং।
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাং।
শিবাভির্ঘোর-রাবাভি-শ্চতুর্দিক্ষু-সমন্বিতাং।
মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাং।
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাং।
এবং সঞ্চিতয়েৎ কালীং ধর্ম্মকাম-সমৃদ্ধিদাং।

একপার্শ্বে বীণা প্রকাণ্ড ধুনাচিতে অগ্নির উপর ধুনা দিতেছিল। সমস্ত ঘরখানার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে ভরিয়া উঠিয়া ধূপ-ধুনার গন্ধে সকলেরই মনের মধ্যে আনন্দের আবেশ জাগাইয়া তুলিতেছিল।

পঞ্চ প্রদীপ জ্বালিয়া মহানন্দ আরতির জন্য নিজেকে নিযুক্ত করিলেও তাহার চক্ষু দুইটাকে মার মূর্ত্তির সম্মুখে ঠিক ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, মাঝে মাঝে বীণার মুখের উপর সঞ্চালিত করিতে লাগিল।

পূজার এই ভাণ, বীণা আর কোনও দিক দিয়াই সহ্য করিতে পারিল না. দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছ, সন্ন্যাসী ঠাকুর? আরতি করছ মায়ের—আমার নয়।"

শিবানন্দের স্তবগান বন্ধ হইয়া গেল। মহানন্দ কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বুকের মধ্যে তখন তাহার আশঙ্কার ঝড় উঠিয়াছে।

শিবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,"ব্যাপার কি, মহানন্দ?"

নিজেকে কতকটা সংবরণ করিয়া মহানন্দ বলিল, "দিদির মুখের দিকে চেয়ে দেখছি তার রূপ আর ভাবছি যিনি ঐ রূপের সৃষ্টি করেছেন—তাঁর রূপ কতখানি, কবে কতদিন পরে সেই রূপের দর্শন পাব?"

এক লহমায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শিবানন্দ বলিলেন, "আরতি কর।"

পুনরায় আরতি সুরু হইল, শিবানন্দ স্তবপাঠ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কোনটাই যেন জীবন্ত নয়।

আরতি শেষ হইলে আর্দ্রকণ্ঠে শিবানন্দ বলিলেন, "বীণা—মা, আজও যে মূর্ত্তির ভেতর—"

উদ্বেলিত হৃদয়ে, কাতরকণ্ঠে বীণা বলিল, "ঐ আসনে আপনি না বসলে তিনি আসবেন না কাকা, কাল হ'তে আপনি বসবেন।"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শিবানন্দ বলিলেন, "তোর মুখ দিয়ে মা যে আদেশ করছেন তাই আমি পালন করব। মহানন্দ কাল হ'তে আমিই আসনে বসব।"

মহানন্দের পৃষ্ঠদেশে কে যেন সপাং করিয়া এ কথা বেত মারিয়া দিল। সে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল, ভাবিতে

লাগিল আর কতদিন অপেক্ষা করা তাহার পক্ষে উচিত ?

* * * বীণার কথা কয়টা শিবানন্দের প্রাণের মধ্যে আজ তুমুল ঝড় তুলিয়া তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল।...এই মহানন্দ, যে আপনাকে সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহার এই কলুষিত ভাব ?...না-না একি সত্য হইতে পারে ? সন্ন্যাসীর পবিত্র বেশকে গ্রহণ করিয়া সে আমা অপেক্ষাও যে উচু...সন্দেহের দোলায় তাঁহার মন দুলিতে লাগিল, ক্রমশঃ মনের মধ্যে তাঁহার বেদনার পাষাণ-ভার চাপিয়া বসিল।

আকাশের গায়ে তখন মেঘখানা গাঢ় হইয়া চন্দ্র তারা সবগুলাকেই ঢাকিয়া দিয়াছিল। সম্মুখে মহানন্দকে দেখিতে পাইয়া শিবানন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"কে—মহানন্দ ? ঝড়-বৃষ্টি সুরু হ'ল ব'লে,—এ সময় কিসের জন্যে এলি, বাবা ?"

বিনীতভাবে রুদ্ধকণ্ঠে মহানন্দ বলিল,—"আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি বাবা, আজ প্রত্যুষেই আমি চ'লে যাব।"

স্নেহপ্রবণ শিবানন্দের প্রাণে ব্যথা জাগিয়া উঠিল, বলিলেন—"সে কি—কেন, মহানন্দ ?"

বিমর্ষভাবে মহানন্দ বলিতে লাগিল,—"তখন হ'তেই আমি ভাব্‌ছি বাবা, এতখানি কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে কোনও দিক দিয়েই আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়।"

শিবানন্দ কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মহানন্দ বলিতে লাগিল—"রাজ-অট্টালিকা, রাজ-ভোগ, গাছের তলা বা ফলাহার সন্ন্যাসীর পক্ষে সবই সমান। একদিন নিজের আশ্রমটুকু ছিল, সেটুকু যখন গেল, তখনও মনের মধ্যে যেমন শান্ত স্নিগ্ধ ভাব, সেটা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন রাজ-অট্টালিকায় বাস ক'রে আপনার বুকের স্নেহটুকু আদায় ক'রে নিলুম,তখনও ঠিক সেই ভাব। এখন যে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি এখনও সেই ভাব,... আমায় বিদায় দিন, বাবা"—

শিবানন্দের ভাব-ধারার সবই ওলটপালট হইয়া গেল, বলিলেন—"আজ তুমি যাও মহানন্দ, জল এল ব'লে, ও-সব পাগলামী ছেড়ে দাও।"

"—আজ আপনার কাছেই থাকতে চাই বাবা আপনার একটু পদসেবা করবার জন্যে। নিরুদ্দেশ পথের যাত্রী, আপনার পদসেবা করতে করতে আপনার মুখে দুটো উপদেশ শুনতে চাই,"—

"—শোবার অসুবিধা যদি না হয়, তবে রাত্রিটা এই খানেই থাক। বৃষ্টি নেমেছে, ভিজে যদি একটা অসুখ করে।"

আকাশের কোণে ভীষণ বজ্রের শব্দে স্থাবর-জঙ্গম, বিশ্বচরাচর কাঁপিয়া উঠিল, শিবানন্দ বলিলেন—"যেয়ে আর কাজ নেই মহানন্দ, ভয়ানক দুর্য্যোগ সুরু হয়েছে।"

হাসিমুখে মহানন্দ বলিয়া উঠিল,—"এই দুর্য্যোগই, বাবা, আমার মনে হয়, যার আশীর্ব্বাদ, তাঁর এই আশী-র্ব্বাদ না পেলে, জগতে মানুষ যে তাঁর ঈপ্সিত ফল না পেয়ে হা হুতাশ ক'রে মরে।"

ভাবের আবেগে শিবানন্দ বলিলেন,—"সাধক তুমি, মায়ের খেলা তুমিই বোঝ ভাল, রাত্রি হ'য়ে গেছে শোও।"

শয়নের জন্য মহানন্দ এতটুকুও আগ্রহ দেখাইল না, শিবানন্দের পা দুইটায় হাত বুলাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে শিবানন্দ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

নিশীথ নিঝুম রাত। তাহার উপর দুর্য্যোগের তাণ্ডব মাতন। মহানন্দের হৃদয়ে যেমন অননুভূত আনন্দের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল, তেমনই লক্ষগুণ অধিক উদ্বেগ ও উত্তেজনা দেখা দিতেছিল। উদ্বেলিত হৃদয়ে বাহিরের দাবায় আসিয়া দাঁড়াইতেই জল ও ঝড়ের সম্মিলিত আঘাত আসিয়া তাহার সর্ব্বশরীরে লাগিতে লাগিল, কিন্তু সেটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইবার পর দেখিতে পাইল কতকগুলি লোক কৃষ্ণবর্ণের আচ্ছাদনে সারাদেহ আবৃত করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইঙ্গিতে তাহাদিগকে ভিতরে যাইবার কথা-বলিয়া মহানন্দ অগ্রে গমন করিল।

শিবানন্দ তখন নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অভিভূত।

মহানন্দ কহিল—"আর দেরী নয়।"

সঙ্গে সঙ্গে একজনের হাতের ছোরা শিবানন্দের ফুস-ফুসের মধ্যে আমূল বসিয়া গেল।

শিবানন্দ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"মা—মা"—মা।

মহানন্দ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া বলিল,—"আর একটা ফুসফুসে।"

আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল।

শিবানন্দের মুখ দিয়া কেবল এই কথাটাই বাহির হইল—"তোর নির্ব্বোধ সন্তানকে ক্ষমা করিস, মা।"

—চৌদ্দ—

মন্দিরের মধ্যে মহানন্দের কলঙ্ক-কালিমা বীণার দেহ-মনে শত-বৃশ্চিক-দংশনের মত জ্বালা আনিয়া দিল। শিবানন্দের ব্যবহার তাহার কতকটা কমাইয়া দিলেও তাহার হাত হইতে একেবারে সে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল না। তাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কি করা উচিত ভাবিতে ভাবিতে বাটী ফিরিয়া দেখিল, তাহার টেবিলের উপর বেণুর হাতের শিরোনামা লেখা একখানা খাম।

আনন্দে-উৎসাহে সেখানা খুলিয়া পাঠ করিতে করিতে সেই ভাব কোথায় অন্তর্হিত হইয়া হতাশায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ইহার মধ্য হইতে এমন কিছু সে পাইল না যাহাতে মহানন্দকেই মহাপরাধীর যূপকাষ্ঠে ফেলিয়া বলি দিতে পারে।

তবুও দুই তিনবার পড়িবার পর এইটাই তাহার মনে হইল যে, ইহার মধ্য হইতে যতটুকু উপাদান সে পাইয়াছে তাহাই হয় তো তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ইহারই সাহায্যে, সে সকলকেই মহানন্দের স্বরূপ দেখাইয়া দিবার সুযোগ পাইবে।

কথাটা মনে হইতেই তাহার সমস্ত প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এইবার সে সকলকে বুঝাইয়া দিবে মহানন্দের চক্রান্ত ধরিয়া দিবার মত ক্ষমতা মার জমিদারীতে একজন সামান্য স্ত্রীলোকের আছে। আর তার ধমনিতে যতক্ষণ এতটুকুও রক্ত বহিবে, ততক্ষণ সে তাহার একটা কাজও সাফল্যমণ্ডিত হইতে দিবে না।

আর একবার বীণা উঠিয়া দাঁড়াইল,—নীলাম্বরবাবুকে ডাকিতে পাঠাইবার জন্য, দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া সে দাঁড়াইল। এই এতখানি রাত্রি পর্য্যন্ত হয় তো তিনি নাই, সে পুনরায় নিজের আসনে আসিয়া বসিল। এমন সময়ে বাহির হইতে শব্দ আসিল—"মা"।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে বীণা বলিল—"কে কাকা? আসুন না।"

নীলাম্বরবাবু ও তাঁহার সঙ্গে হরলাল সেখানে প্রবেশ করিতেই বীণা বলিয়া উঠিল,—"হরুকাকা যে?—এমন সময়? ব্যাপার কি, হরুকাকা?"

হরলাল তাহার পদধূলি লইয়া বলিল,—"মা একবার আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন"—

"কে—বেণু? কেন কাকা? ভাল আছে তো সে? সলিলকুমার কেমন আছে?"

সহাস্যমুখে হরলাল বলিল—"সবাই ভাল আছে মা, তিনি আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, যদি ম্যানেজার বাবুর সন্ধানে কোন উপযুক্ত লোক থাকে, তবে আমাদের ওখানে পাঠিয়ে দিতে, এখনকার ম্যানেজারকে তিনি জবাব দিতে চান।"

বীণা ও নীলাম্বর আশ্চর্য্যভাবে হরলালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর বীণা বলিল,—"সলিলকুমার দিতে দেবে?"

একমুখ হাসিয়া হরলাল বলিল—"দেবে বৈ কি মা, তা' না হ'লে—"

আনন্দাপ্লুতকণ্ঠে বীণা বলিল—"সলিলকুমারের সুমতি হয়েছে?"

"—হতেই যে হ'বে মা, জমিদারীর সঙ্গে সম্পর্ক তো কেবল টাকার। প্রজার ওপর অত্যাচার হোক দেখবার তাঁর দরকার নেই, প্রজারা অনাহারে মরুক তাতেও তাঁর কিছু আসে যায় না, কর্ম্মচারী তাঁর অভাব মিটিয়ে বাকী টাকায় নিজেরা জমিদারী কিনুক, কুচপরোয়া নেই,…তাঁর বাপের আমলের চাকর কি করে এগুলা চেয়ে দেখি? তাই মাকে ধ'রে বসলুম, বাবু তোমাকে যেমনটী দেখতে চান তেমিটী হও মা,—মা আমার তাই হ'য়েছেন, তাঁর মনের মত হ'য়ে, তাঁকে এখন অনেকটা মুঠার মধ্যে এনেছেন কি না? তাই এখন স্থির হ'য়েছে, মা, তাঁকে তাঁর দরকার মত টাকা দেবেন, আর জমিদারী দেখবেন মা নিজে।"

এতক্ষণ পরে নীলাম্বরবাবু আবেগাপ্লুতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"এটাও একটা মস্ত বড় সুখবর হরলাল, মা যে আমার এতদিন পরে সুখী হয়েছেন—"

বীণা বলিয়া উঠিল—"বাবা যদি এটা দেখে যেতে পারতেন।"

নীলাম্বরবাবু কহিলেন—"মাকে ব'লে হরলাল, দু' এক দিনের ভেতরই আমি একজন ভাল লোকই পাঠিয়ে দেব।"

তাঁহার পায়ে গড় করিয়া হরলাল বলিল—"আর একটা কথা, মা আপনাদের প্রণাম জানিয়ে বলেছেন যে, যে-সব লোক তাঁর জমিদারী হ'তে চ'লে এসেছে, তাদের ওপর কোনও অত্যাচারই হয় নি, তাঁদের আসার সম্বন্ধেও তাঁরা কিছুই জানেন না, সুতরাং তা'দি'কে যেন—আবার তাঁর জমিদারীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।"

এই বিনীত অনুরোধের মধ্য দিয়া বেণু যে কঠোর আদেশ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া নীলাম্বরবাবু বলিলেন,—"বেণু যে এইখানেই একটা মস্ত সমস্যার মধ্যে এনে ফেল্লে হরলাল, তারা সব এখানে বসবাস সুরু করেছে, তা'দি'কে কি ক'রে উঠে যেতে বলব ?"

বীণা বলিল—"আমি তো এই রকম আশঙ্কাই অনেক দিন হ'তেই করছিলুম কাকা, বেণু আমাকে একখানা চিঠি দিয়েছে এই দেখুন।"

পত্রখানা তাঁহার হাতে দিয়া হরলালকে বলিল,—"তুমি এখন খাওয়া-দাওয়া কর গিয়ে কাকা. তার অনুরোধ রাখবার জন্যে আমরা চেষ্টা করব।"

হরলাল চলিয়া গেলে, নীলাম্বরবাবু বলিলেন,—"এও এক সমস্যা মা, তবে একথাও অস্বীকার করতে পারি না, যে, সেখানকার সেই সন্ন্যাসীই এই মহানন্দ।"

বীণা কহিল—"অনেক দিন হ'তেই তার কাজগুলা আমাকে আকুল ক'রে তুলেছে।"

স্মিতহাস্যে নীলাম্বরবাবু বলিলেন—"আকুল হ'বার কোনও কারণ নেই মা, একটা দমকা হাওয়ার মত এসে জুটেছে আবার তেমনি ভাবেই চ'লে যেতে হ'বে, এত দিনের মধ্যে তাকে যদি এতটুকুও বুঝতে পারতুম, তা'হ'লে কি তার অস্তিত্ব এর ত্রিসীমানার মধ্যে এতদিন থাকত ?"

চিন্তিতভাবে বীণা বলিল,—"এখন একটু কষ্টসাধ্য হ'বে কাকা, প্রজাদের অন্তরের মধ্যে সে যে-রকম শিকড় গেড়ে বসেছে—"

"—কিছু ভেব না মা, যতক্ষণ আমি আছি—"

মলিন হাস্যে বীণা কহিল—"ভুলে যাচ্ছেন কেন, কাকা, জমিদারী আর আপনারও নয় আমারও নয়, মার প্রজাদের—তাদের অমতে কোনও কাজই তো আমরা করতে পারব না।"

সহজভাবেই নীলাম্বরবাবু বলিলেন—"তুমিই বা ভুলে যাচ্ছ কেন মা, শিবানন্দ ঠাকুর এখনও মার পূজারী।"

"—ঐটুকুই যা ভরসা কাকা"—বলিয়া বীণা পুনরায় বলিতে লাগিল—"কাল সকালে আমি পুরুত-কাকার কাছে এই চিঠি নিয়ে যাব। প্রজাদের মুখের দিকে চেয়ে তাকে আর একদিনও এই জমীদারীর ভেতর থাকতে দেওয়া উচিত নয়।"

বাহিরের দিকে চাহিয়াই বীণা বলিল, "ওঃ বড্ড মেঘ করেছে, কাকা, আর দেরী করবেন না—যান। আপনিও এ বিষয়টা ভাবুন, পুরুতকাকাও কি বলেন শোনা যাক। তারপর তিন জনে মিলে যা হয় একটা ঠিক করা যাবে, কি বলেন ?"

"তোমায় কিছু ভাবতে হ'বে না, মা, যা করবার আমিই করে যা'ব। তা' হ'লে আজ আমি চল্লুম, মা, সত্যিই মেঘটা বড্ড হয়েছে ?"

নীলাম্বরবাবু প্রস্থান করিলেন।

বীণা পুনরায় চিন্তিত হইয়া পড়িল।

সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া তাহার একই চিন্তা, এই মহানন্দই সেখানকার সেই সন্ন্যাসী। যেমন করিয়া হউক ইহাকে তাড়াইতে হইবে।

পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বীণা স্নানাদি শেষ করিয়া পুরুতকাকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেই হরলাল বলিল, "কোথা যাচ্ছ, মা ?"

গন্তব্য স্থানের নাম শুনিয়া হরলাল তাহাকে অনুনয়ের স্বরে বলিল, "আমাকেও নিয়ে চল না মা, বাবাঠাকুরের পায়ে একটা গড় ক'রে আসি। এখানে আসবার যখন সৌভাগ্য হয়েছে—"

বীণা বলিল, "বেশ তো !"

হরলালও তাহার সহিত চলিল। গত রাত্রের বৃষ্টিতে পথের খোয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে জল জমিয়া গিয়াছে, ঝড়ের দাপটে বড় বড় গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পথের মাঝে পড়িয়া পথিকের চলার বিঘ্ন ঘটাইতেছিল।

শিবানন্দের আশ্রমে আসিয়া অন্যান্য দিনের মত বীণা

তাঁহাকে দাবায় দেখিতে পাইল না, গাভীটাকেও বাহিরে আনা হয় নাই। গোশালার ভিতর হইতে প্রাতঃকালীন আহারের জন্ম সে ঘন ঘন চীৎকার করিতেছিল। গাছের ফুলগুলি যেন দুঃখের ভারে তুমড়াইয়া পড়িয়াছিল।

চারিদিক একবার দেখিয়া লইয়া বীণা ডাকিল, "পুরুতকাকা!"

পুরুতকাকার কিন্তু কোনও উত্তরই পাওয়া গেল না।

দুই তিনবার ডাকিবার পরও যখন কোনও উত্তর পাইলেন না, তখন নিতান্ত অসহায়ের মতই বীণা বলিল, "পুরুতকাকা হয় তো বাইরে গিয়েছেন, হরকাকা, একটু অপেক্ষাই করা যাক, কি বল? তুমি একবার গরুটাকে দেখবে? বড্ড চেঁচাচ্ছে!"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে দাবার উপর উঠিয়া গেল। শয়ন-কক্ষের উন্মুক্ত দ্বারপথের সম্মুখে আসিয়া বীণা সরোদনে বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে গো—কাকাকে কে খুন করেছে!"

বীণা বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ম্যানেজারবাবুকে একবার খবর দাও, কাকা।"

হতভম্বের মত হরলাল বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেই মহানন্দের চীৎকার শোনা গেল, "বাবা বাবা, নীলাম্বরবাবুকে কে খুন করেছে।"

যখন সে প্রাঙ্গণে আসিয়া পৌঁছিল মুখখানা তখন তাহার পাংশু বর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বীণা বলিয়া উঠিল, "কাকাকেও যে—"

অঝোর-ঝরে কাঁদিতে কাঁদিতে মহানন্দ বলিল, "বাবাকেও।"

সে আর একটা কথাও বলিতে পারিল না, সর্ব্বহারার মতই বসিয়া পড়িল।

—পনের—

একই রাত্রে জমীদারির স্তম্ভ দুইটী এইরূপ পৈশাচিক ভাবে নিহত হওয়ায় সকলেই যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। পুলিসের অনুসন্ধানও হইল যথেষ্টই, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বীণার জবানবন্দিতে গত নিশার আরতির সময়ের ঘটনা এমন কি বেণুর পত্রখানার ভিতর হইতে তাহাকে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কিছু থাকিলেও এবং প্রথমটা তাহাকে লইয়া খুব হৈ-চৈ করিলেও কোন্ যাদুমন্ত্রে যে এমন একটা ঘটনা চাপা পড়িয়া গেল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

মহানন্দ প্রচার করিল, মার নির্দ্দোষী ছেলেকে তিনি তাঁহার অভয় বাহু বিস্তার করিয়া রক্ষা করিয়াছেন; সম্পূর্ণ নিরপরাধ সে, তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা দিয়া গড়া ষড়যন্ত্র আর প্রবল বন্যার বিরুদ্ধে বালির বাঁধ দেওয়া সমানই কথা। এখনও চন্দ্র-সূর্য্য আকাশের গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, ধার্ম্মিকের বিপদ হইবে কেন—হইতেই কি পারে? সঙ্গে সঙ্গে সে শিবানন্দের শোকে এতটা মুহ্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল, যে লোকে পিতৃ-হারা হইয়া ততটা হয় কি না সন্দেহ।

প্রজা সাধারণের প্রথমে মহানন্দের উপর একটু সন্দেহ থাকিলেও, শিবানন্দের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিয়া সে সন্দেহ দূর হইয়া গেল।

বীণা কিন্তু এই অতি-ভক্তি দেখিয়া হাড়ে হাড়ে জ্বলিতে লাগিল—তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, মহানন্দের টুঁটি টিপিয়া এখনই দেশ হইতে বাহির করিয়া দেয়, কিন্তু পারিতেছিল না। জমীদারি এখন তাহাদের নয়, নিজের কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও নিজের হাতে-গড়া আইন-কানুন নিজেই ধ্বংস করিয়া যাহা ইচ্ছা একটা কিছু করিবে কেমন করিয়া? প্রজাদের প্রতিনিধি মাত্র সে, প্রজাদের অভিমতে সে কার্য্য করিতে পারে।

অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া সে তাহার জমীদারির প্রত্যেক গ্রামের প্রতিনিধিকে ডাকাইয়া করালীমার নাটমন্দিরে বর্ত্তমানে তাহাদের কর্ত্তব্য কি তাহারই আলোচনা করিতে লাগিল। বীণা বলিতে লাগিল,—"যখনই দেশের ভিতর কোনও একটা গুরু সমস্যা এসে দেখা দেয় তখনই আপনাদিকে আমি ডাকাইতে বাধ্য হই। তার জন্যে যেমন আমি খুবই আনন্দিত, দুঃখিতও বড় কম হই না, কেন না আমার নিমন্ত্রণ রাখবার জন্যে আপনাদের অনেকের হয় তো অনেক কাজের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়; কিন্তু উপায় নেই, কারণ সমস্যা যে কেবল আমার তা নয়, আপনাদেরও বটে।"

একজন বলিল,—"তা' তো বটেই, কিন্তু এতে আমাদের কোনও কষ্টই নাই বরং এতে আমরা গর্ব্বানুভব করি এই ব'লে যে, আপনি, দয়া ক'রে আমাদের

পরামর্শ দেন—এতকাল আমাদের কথা কোন ভদ্রলোক শুন্‌তে বা শোনবার উপযুক্ত ব'লে মনে করত না।"

বাবার উইলের আদেশ অনুযায়ী আপনাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী নিয়ে হয় তো আমি নিজেই সে সমস্যার মীমাংসা করতে পারতুম, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু শয্যায় আমাকে যে শপথ করিয়ে নিয়েছেন, সেটা স্মরণ ক'রে আপনাদিগকে ডাকতে আমি বাধ্য হ'য়েছি। জমীদারি করালীমার। আপনারাও যেমন তার সন্তান, আমিও তেমনই তাঁর একজন কন্যা মাত্র। সেইজন্যেই তাঁর জমীদারির কোনও একটা কাজ করতে হ'লেও প্রতিনিধিত্বের দাবীর কথা ছেড়ে ভাই-বোনে পরামর্শ ক'রে কাজ করাই ভাল।"

অপর একজন বলিল—"এ আপনার মহত্ত্ব, জমিদারী করালীমার হ'লেও প্রকৃত পক্ষে আপনারই—তবুও মাঝে মাঝে যে আমাদিগকে এমন ভাবে স্মরণ করেন সেটা আপনার একান্তই দয়া—স্বর্গীয় মহাত্মা কর্ত্তাবাবুর যোগ্য কন্যারই যোগ্য কথা।"

বীণা বলিতে লাগিল—"যাক্, এখন পুরুতকাকার বিভীষিকাময় মৃত্যুর পর মার মন্দিরের পূজার আসন যে শূন্য হ'য়ে রয়েছে—"

তাহার বক্তব্যের মধ্য পথে বাধা দিয়া কয়েকজন বলিয়া উঠিল—"কেন? সে ত মা নিজেই ঠিক ক'রে রেখেছেন।"

বীণা বলিতে লাগিল—"মহানন্দের কথা বলছেন? পুরুতকাকার নির্দ্দেশ মত যদিও সে এখনও সেই আসনে ব'সে রয়েছে তবুও আপনাদের মতামত না নিয়ে এতখানি দায়িত্বপূর্ণ আসনে তাকে স্থায়ী ভাবে বসতে দিতে পারি না। সে আসনের উত্তরাধিকারী যে হ'বে তাকে সম্পূর্ণ ভাবে ব্রহ্মচারীই হ'তে হ'বে। তার চরিত্রে বা কাজে এতটুকুও সন্দেহ করবার অবকাশ থাকবে না, আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ—"

অন্য একজন বলিয়া উঠিল,—"তাঁর সম্বন্ধে তেমন একটা মন্দ ধারণা আনবার কোনও কারণই তো খুঁজে পাই নে মা; সন্ন্যাসী তিনি, অনিষ্টকারীও কারুর নন্, তাঁকে দেখলেই—"

তাহার বক্তব্যের মধ্য পথেই বাধা দিয়া তাহাকেই আর একজন বলিয়া উঠিল—"আ হা হা, মা যখন বলছেন শচীন-বাবু..."

দুই তিন জন সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"ঠিকই তো, ঠিকই তো।"

আর একজন বলিয়া উঠিল,—"যাকে এতদিন ধ'রে দেখছি, যাঁর একটা কাজের মধ্যেও কোনও খুঁৎ ধরবার কিছু খুঁজে পাই নি, তাঁর সম্বন্ধে নূতন ক'রে খোঁজ নেবার কিছু আছে ব'লে আমরা বুঝতে পারছি না, আপনারা তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে কি—"

সকলেই বলিয়া উঠিল,—"না না, তাঁকে আমরা স্বর্গীয় পূজারীর উপযুক্ত স্থলাভিষিক্ত ব'লেই মনে করি।"

বীণা জিজ্ঞাসা করিল—"সকলেরই কি ঐ মত?"

সকলেই নীরব হইয়া রহিল। কাহারও মুখে চোখে সন্দেহের চিহ্ন মাত্রও দেখা গেল না।

এই নীরবতাই তাহাদের পক্ষে সম্মতির কারণ মনে করিয়া বীণা বলিল—"আমার কিন্তু তার সম্বন্ধে ধারণা অন্যরূপ। জমীদারির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দুইটী লোকের একসঙ্গে নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের ভিতর মহানন্দের হস্তের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি। আর একটী লজ্জার কথা আপনাদের সামনে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে না পারলেও এইটুকু বল্‌লেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, অজাতশত্রু পুরুতকাকার হত্যার দিন, আরতির সময় এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যা দেখে তিনি মহানন্দকে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, —'কাল হ'তে ঐ আসনে আমিই পুনরায় বসব, মহানন্দ।' তাঁকে কিন্তু আর বসতে হ'ল না, গুপ্ত ঘাতকের হাতে তাঁর সব শেষ হ'য়ে গেল।...তাঁর আদেশের সঙ্গে-সঙ্গেই এই যে পৈশাচিক খুন—অবশ্য তাও ব'লে রাখি এ-কথা এখন আর প্রমাণ করবার আমার কোন সাক্ষী নাই।"

একটু উত্তেজিতভাবে একজন বলিয়া উঠিল—"বলেন কি, মা? সত্যই যদি ঘটনা এই রকমই হয়, আর তার জন্যে তাঁকে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণই আপনার হাতে থাকে, তবে আমাদিগকে না ডেকেই আপনি তার ব্যবস্থা করতে পারতেন? আমরা প্রজা, জমিদারী করলীমার হ'লেও আপনারই—"

বীণা কহিল—"সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ না থাকলে আপনাদিকে এতখানি কষ্ট দিতুম না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বেণুর পত্রখানা একজনের হাতে দিয়া বলিল, "দয়া ক'রে চিঠিখানা প'ড়ে সকলকেই শোনান।"

সে পড়িতে লাগিল—

"পূজনীয়া দিদি !

অসংখ্য প্রণাম জেনো। তোমার পত্র অনুযায়ী বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান ক'রে জানলুম, আমার প্রজাদের উপর এমন কোনও অত্যাচার হয় নি যাতে তারা জমিদারি ছেড়ে চ'লে যেতে বাধ্য হয়েছে,...অনেকে গেছে বটে, কিন্তু তারা সব গ্রামের অনিষ্টকারী বদমায়েস, তারা যাওয়াতে গ্রামের লোক যেন নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। তুমি যে মহানন্দের কথা লিখেছ, সে কে তা জানি না, তবে এইসব লোক-গুলাকে নিয়ে যাবার মূলে যে একজন সন্ন্যাসী আছে, এটা বিশেষ ভাবেই জানতে পেরেছি। আরও জানতে পেরেছি, কোনও কোনও যায়গায় গোমস্তাদের সঙ্গে তার ষড়যন্ত্র ছিল,...তাদি'কে আমি ডেকে পাঠিয়েছি। পরের কথা পরে জানাব, তোমার আশীর্ব্বাদে এখন তাঁর -"

বীণা বলিল—"আর পড়বেন না, বাকীটুকু নিজের ঘর-সংসারের কথা। এখন এই চিঠি প'ড়ে আপনাদের কি মনে হয় ?"

যে লোকটী প্রথমেই মহানন্দের ওপর গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব প্রকাশ করিয়াছিল সে বলিয়া উঠিল—"সেই সন্ন্যাসীই যে এই মহানন্দ তার তো কোনও প্রমাণ নেই ; সুতরাং এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ রূপ অনুসন্ধান না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার সম্বন্ধে একটা কিছু করা চলে না। বিশেষতঃ যখন আপনি, আমি, প্রত্যেকেই জানি যে, আমাদের স্বর্গীয় পুরোহিত মহাশয় ইহাকেই পূজারীর গদী ছেড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এ অবস্থায় তাকে যদি সে আসনে বসতে না দেওয়া হয়, তবে তাঁর স্বর্গীয় আত্মা অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠবে।"

আর একজন বলিয়া উঠিল,—"কিন্তু এই জটিল সমস্যা ভেদ করতে, আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করে যা বুঝেছি, তাতে আমার মনে হয় তিনি আমাদের ওপর যতখানিই সহানুভূতি-সম্পন্ন হ'ন না কেন তাঁর বিরুদ্ধে যা যতগুলি কথা বল্লেন, সেই সবগুলো চিন্তা করলে, তার মত লোককে একদণ্ডও এখানে রাখা উচিত নয়,...আমরা চাই ত্যাগী সন্ন্যাসী, তার মত সেই বেশধারী প্রবঞ্চক নয়।"

কিছুক্ষণের জন্য সকলেই অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হইয়া উঠিল, কাহারও মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

বীণা জিজ্ঞাসা করিল—"দুইটী পরস্পর-বিরোধী মতের সমর্থক যাঁরা আছেন তাঁরা নিঃশঙ্কচিত্তে তা প্রকাশ করুন। মনে রাখবেন, আপনাদের আজিকার মীমাংসা, আমার ধারণায়, একদিকে আপনাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা—আর এক-দিকে সর্ব্বনাশ—বেছে নিন যেটা আপনাদের মনের মত হয়।"

তাহার কথার কোনও উত্তর না দিয়া সকলেই যেন নিজেকে বিষম চিন্তার মধ্যে ডুবাইয়া দিল, বীণা বলিল,—"আপনাদের বিবেচনার উপর সবটাই যখন নির্ভর করছে—"

তাহাকে আর কিছু বলিতে হইল না—মহানন্দ সেই স্থানে দেখা দিয়া বলিতে লাগিল—"আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছি, বাপ সকল। যাবার সময় তোমাদের আশীর্ব্বাদ করছি, আমাকে বিদায় দাও।"

হঠাৎ মহানন্দকে দেখিয়া সকলেই তাহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

সে বলিতে লাগিল—"জগন্মাতার আদেশে করলীমার মন্দিরের লোভনীয় আসন ত্যাগ ক'রে হিমালয়ে প্রস্থান করবার জন্যে আমি সেইদিনই শিবানন্দ বাবার পদধূলি নিতে গিয়েছিলুম। তারপর ঘটনা-স্রোত আমার যাত্রার পথকে কণ্টকাকীর্ণ ক'রে তুলেছিল। এখন যখন সেটা অপসারিত হ'য়ে গেছে তখন আমাকে বিদায় দাও, জগন্মাতা হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকছেন—যেতেই হবে।"

সকলেই যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, একজন বলিয়া উঠিল, "সেকি বাবাঠাকুর ? তা হবে না, আপনার অবর্ত্তমানে—"

মহানন্দ বলিয়া উঠিল—"জগতের মধ্যে আকর্ষণ যার মার পাদু'খানি, পৃথিবীর যা' কিছু সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়ে যে মায়ের রূপ দেখবার জন্যে লালায়িত হ'য়ে ওঠে, তার যায়গা এখানে নয় বাপ। এতদিন ছিলাম কেবল স্বর্গীয় বাবার পদসেবা ক'রে, সেই মহাত্মার শ্রীমুখের দুটা উপদেশ-বাণী শুনতে। কিন্তু ভাগ্য যখন আমাকে তা'হ'তে বঞ্চিতই করল তখন আর কেন ভোগের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে আমার আকাঙ্ক্ষিত পথের বিঘ্ন ঘটাই ?

আমাকে ছেড়ে দাও, ঐ দেখ মায়ের হাতছানি,... মা-মা মা।"

এই 'মা' শব্দ তাহার মুখ দিয়া এমন ভাব-বিহ্বল ভাবে বাহির হইল, যাহাতে তাহার বিরুদ্ধে আর কেহই মত পোষণ করিতে পারিল না। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল —"না, না, বাবা, কিছুতেই আপনার যাওয়া হ'তে পারে না। দয়া ক'রে মা যদিই আপনাকে টেনে এনেছেন, ছাড়ব না আপনাকে।"

বীণার মুখখানা যুগপৎ ঘৃণা ও বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে জনতার দিকে চাহিয়া সে বসিয়া রহিল।

মহানন্দ বলিয়া উঠিল,—"আর কেন আমাকে ধ'রে রাখ বাপ, ছেলের প্রাণ যখন মায়ের কাছে যাবার জন্যে আকুল হ'য়ে উঠেছে—"

তাহার বক্তব্যের মাঝখানেই বাধা দিয়া সকলেই বলিয়া উঠিল,—"আপনার ওসব কোনও কথা শুনতে চাই না, চাই কেবল আপনাকে আমাদের মাঝে দেখতে। অভিমান যদি হ'য়ে থাকে ক্ষমা করুন।"

হঠাৎ মহানন্দের চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, কম্পিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"মা-মা-মা, এ আবার তোর কোন্ খেলা মা? যে জিনিস স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে যেতে চাচ্ছি সেইটাতেই তুই এম্নিভাবে আমাকে জড়িয়ে রাখবি? এদের অনুরোধের ভিতর দিয়ে কেন তুই এমন কঠোর আদেশ করছিস মা? আদেশ অমান্য করবার ক্ষমতা সে আমার নেই, এদের সব সুমতি দে—আমাকে ছেড়ে দিক।"

সকলেই বলিয়া উঠিল "যাওয়া কিছুতেই হ'বে না, বাবা।"

অশ্রুনিরুদ্ধকণ্ঠে মহানন্দ বলিতে লাগিল—"সন্তানের পক্ষে তোর আদেশ অমান্য করবার ক্ষমতা নেই, মা। আদেশ আমাকে পালন করতেই হ'বে। যে আদেশ এদের মুখ দিয়ে তুই আমাকে করলি তা আমি মাথা পেতে নিতে বাধ্য।"

রাগে গর গর করিতে করিতে বীণা বলিয়া উঠিল,—"বাঃ মহানন্দ! বাঃ! তোমার বুদ্ধির তারিফ করছি। স্বীকার করছি, বাহাদুরী আছে তোমার, সাধুতার আবরণে—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া সমবেত প্রতিনিধিরা বলিয়া উঠিল—"আমাদের ভিক্ষা মা—"

কথার মাঝখানে "বেশ"—বলিয়া বীণা নীরব হইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, আকাশের কোল হইতে বজ্র আসিয়া আজ যে পিতার জমীদারীর ভিতর পড়িল, তাহাতেই সকলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে,...তাহাদের ভবিষ্যৎ দুঃখ বুঝিতে পারিয়া বুঝিবা বাতাস পর্য্যন্ত হাহাকার করিয়া উঠিল।

—ষোল—

নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্বেও প্রতিনিধিগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মহানন্দ যখন করালী মার পুরোহিতের আসন দখল করিয়া বসিল, তখন ভবিষ্যৎ বিপদের ঘোরতর আশঙ্কায় বীণার মন ভরিয়া উঠিল। তাহার দিক দিয়া করিবার আর কিছুই নাই। সর্ব্বনাশকে যদি তারা স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লয়, তবে সে আর কি করিতে পারে?...দুঃখে অভিমানে ঘৃণায় সে আর কোনও সংবাদই রাখিত না। ম্যানেজার কাকার স্থানে মহানন্দের নিযুক্ত কর্ম্মচারীই কাজ করিতেছে। পুরোহিত কাকার স্থানে মহানন্দ স্বয়ং। ...তাহার আর করিবার কি আছে?

তবুও এক একবার তাহার মনে হইত, এ কি করিতেছে সে? জমীদারি করালীমার হইলেও এ যে তার পিতৃপিতামহের কীর্ত্তি। কেন সে চোরের উপর অভিমান করিয়া ভূমিতে ভাত খাইবে? প্রতিনিধিদিগের দ্বারা জমীদারির শাসন-কার্য্য চালাইবার নিয়ম সে নিজের হাতে গড়িলেও পিতার উইল অনুসারে তাহাদেরই প্রতিনিধিত্বের দাবী লইয়া, যেটা তাহার ভাল বলিয়া মনে হইবে, সেইটাই সে যখন করিতে পারে, তখন তাহারই ক্ষমতায়, সে, মহানন্দ-রূপ দেশের অভিসম্পাতটাকে দূর করিয়া দিয়া নিজেই অন্য ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

কথাটা মনে হইতেই তাহার অন্তরের মধ্যে একটা নূতন আলো জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই আবার মনে হইল, মহানন্দ যদি না ছাড়ে?...কাহার সাহায্য লইয়া সে এই লোকটাকে দূর করিয়া দিবে? তাহার নিজের নিযুক্ত ম্যানেজার এখন জমীদারির কাজ চালাইতেছে। প্রজাদের সকলেই তো তার পায়ে মাথা নুয়াইয়াছে—তবে?

অন্তরের মধ্যে অবসাদ আসিয়া দেখা দিল।

শান্তিহারা প্রাণে সে ঘরের ভিতর কেবল এধার-ওধার ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথাই তাহার মনে প্রথমে জাগিতেছিল। হঠাৎ বীণা চমকাইয়া উঠিল। প্রজাদের চিন্তা অন্তর্হিত হইয়া নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তাই বড় হইয়া দেখা দিল।...ভাবিতে লাগিল, এখানে বাস করা তাহার পক্ষে কি নিরাপদ হইবে ?

তাহাকে কিন্তু নিজের বিষয় অধিকক্ষণ চিন্তা করিবার অবকাশ না দিয়া মহানন্দ আসিয়া ডাকিল—"দিদি ?"

বীণা চমকাইয়া উঠিল। মহানন্দের ডাকের সাড়া সে কিছুতেই দিতে পারিল না।

মহানন্দ পুনরায় ডাকিল—"দিদি।"

রৌদ্র তখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। নিদাঘের দ্বিপ্রহর, চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে কেবল বায়স-কুলের কা কা শব্দ।

ঘৃণিত দৃষ্টি মহানন্দের মুখের উপর ফেলিয়া বীণা বলিল —"কি দরকার, মহানন্দ ?"

মুহূর্ত্তমাত্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত থাকিয়া মহানন্দ বলিল, "আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি,দিদি। হাসি মুখে বিদায় দাও, আমি চ'লে যাই।"

সহজ সরল ভাবেই বীণা বলিল—"বিদায় দেবার আমি কেউ নই, মহানন্দ। যারা তোমাকে নিযুক্ত করেছে, তারাই বিদায় দিতে পারে, তাদের কাছে—"

কি একটা ভাবের আতিশয্যে মহানন্দ বলিয়া উঠিল—"তারা দেবে না।"

"তবে আমিই দিতে পারি কোন্ অধিকারে ?"

মহানন্দ বলিয়া উঠিল—"তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে আমি তোমার নিকট বিদায় নিয়ে চ'লে যেতে চাই, কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না। তারা যখন দেখবে পূজারীর আসন শূন্য তখন কয়েক দিন একটু হা-হুতাশ করলেও আবার নূতন লোক নিযুক্ত করবে, আর তোমার ইচ্ছা বিনা বাধায় পূর্ণ হ'য়ে যাবে, দিদি। দিদি ছাড়া—মন্দিরে পূজা করতে ব'সে কোনও দিনই আমি তৃপ্তি পাই নি—পারও না।"

মহানন্দের স্বর কান্নায় যেন ভরা।

সংযমশীলা বীণা এতক্ষণ তাহার ক্রোধ গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে কিন্তু এ কথার পর আর সে কিছুতেই ক্রোধ চাপিয়া রাখতে পারিল না। রাগত স্বরেই বলিল, "তোমার বুদ্ধির তারিফ করি,মহানন্দ কিন্তু যাবার অনুমতিটা তোমায় আমার কাছে নিতে হ'বে না—তোমার এই অধিকার থেকে আমিই যত শীগ্‌গির পারি বিদায় নেব।"

সহসা বজ্রপাত হইলে মহানন্দ যতটা বিস্মিত না হইত, তাহার অধিক বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বীণা বলিতে লাগিল,—"তোমার মত, প্রজাদের মঙ্গলকামী যখন একজন জমীদারীর মধ্যে পাওয়া গেছে মহানন্দ, তখন এখানকার কাজ আমার শেষ হ'য়ে গেছে—আমি তীর্থ বাস করতে চাই।"

মহানন্দ বলিল,—"তোমার অভিমানের সম্পূর্ণ কারণ যে, সে যখন নিজে হ'তেই তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছে দিদি, তখনও তোমার দুঃখ বা অভিমান কিছু থাকতে পারে না। একটা দুষ্ট গ্রহের মত এসে, তোমাদের চিত্তক্ষোভের কারণই যখন হয়েছি, তখন হাসিমুখে আমায় বিদায় দাও ?"

মহানন্দের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বীণার পাদুইটী জড়াইয়া পুনরায় বলিল,—"তোমার পায়ে পড়ি, দিদি।"

কতকটা পশ্চাৎ দিকে সরিয়া বীণা বলিয়া উঠিল,—"কি কর মহানন্দ ?"

"আর যে নিজেকে কিছুতেই ধ'রে রাখতে পারছি না, দিদি, একজনেরও সন্দেহের কারণ হ'য়ে এখানে থাকার চেয়ে হয় আমাকে বিদায় দাও, আর না হ'লে স্বর্গীয় বাবাকে তুমি যে চোখে দেখতে আমাকেও সেই চোখে দেখে তুমি মন্দিরে চল।"

এতক্ষণ ধরিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে বীণার মনে হইতেছিল, দ্বারবানকে আহ্বান করিয়া এই ভণ্ডলোকটার গলাধাক্কা দিয়া বাটী হইতে দূর করিয়া দেয়, কিন্তু মহানন্দের হঠাৎ এই ব্যবহার তাহার নারীহৃদয়কেও বিচলিত করিয়া দিল, নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া সে যেন অনন্ত চিন্তার মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়া দিল।

মহানন্দ ব্যাকুল স্বরে বলিল,—"একটা কথাও বল্লে না দিদি, এখনও যদি সন্দেহের এতটুকু কালিমা তোমার বুকে থাকে তবে করুণাময়ীর নামে শপথ ক'রে বলছি—আমি নিষ্পাপ,...বিশ্বাস কর আমাকে।"

পুনরায় সে বীণার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল।

বাহির বারান্দায় ময়না পাখীটা ডাকিয়া উঠিল—"কালী তরাও—কালী তরাও।"

চিন্তার সমস্ত খেই হারাইয়া বীণা বলিল,—"ব'স মহানন্দ।"

পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে মহানন্দের অন্তর ভরিয়া উঠিল, চোখে জল, মুখে হাসি।...সে একটা তাহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

বীণা জিজ্ঞাসা করিল,—"পুরুতকাকা আমাকে যে চোখে দেখতেন, তুমি কি আমাকে সে চোখে দেখতে পারবে?"

মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মহানন্দ বলিল, "তিনি তোমাকে দেখতেন পিতার স্নেহ নিয়ে কিন্তু এখানে এসে পর্য্যন্ত তোমাকে 'দিদি ব'লে ডাকি, দাদার স্নেহ বু:[illegible] এতদিন যে ভাবে তোমাকে দেখে আসছি সেই ভাবেই দেখব।"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বীণা বলিল,—"তা যদি দেখতে, মহানন্দ!"

মহানন্দ বলিয়া উঠিল—"এ সন্দেহটা কোথা হ'তে আসছে, দিদি?"

"সেটার অবকাশ যে সব দিক দিয়েই দিয়েছ মহানন্দ" বলিয়া বীণা পুনরায় বলিতে লাগিল—"আচ্ছা,—"

ব্যগ্রকণ্ঠে মহানন্দ বলিল—"কি, দিদি?"

"নীলাম্বর বাবুর স্থানে যে নূতন ম্যানেজার নিযুক্ত করলে, তাঁর সম্বন্ধে আমার মত কি নিয়েছিলে একবারও? তাঁর ছেলে যখন রয়েছে, তাঁর পদে তাকে বসিয়ে অন্য লোক বসাবার কারণ কি?—"

বীণার প্রশ্নে, মহানন্দ প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পড়িলেও নিজের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বলিয়া উঠিল,—"ম্যানেজারের দায়িত্বপূর্ণ কাজে যে বয়সের প্রয়োজন দিদি, তাঁর পুত্র তো এখনও সে বয়স পায় নি!"

বীণা বলিয়া উঠিল—"এই জমীদারির কাজে যে লোক তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ফেলে গিয়েছেন তাঁর উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত ক'রে অন্য লোক নিযুক্ত করা কোনও দিক দিয়েই মঙ্গলকর নয়।"

কিন্তু ভাবেই মহানন্দ বলিল,—"তোমাকেও সে-কথা বলেছি দিদি, ভাল বিবেচনা কর তাকে জবাব দাও, কিন্তু তাদের সংসারকে আমি বঞ্চিত করি নি কোনও দিক; দিয়েই তাঁর বিধবাকে আমি পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেছি, যতদিন তিনি বাঁচবেন এই টাকাটা তিনি পাবেন।"

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বীণার মুখ বন্ধ হইয়া গেল। তার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"আবার আমি তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করছি মহানন্দ, কিন্তু কার অনুমতি নিয়ে তুমি এ সব করেছ বলতে পার? আমাকে না জানিয়ে এসব ব্যবস্থা করবার তোমার কতটুকু অধিকার আছে?"

মহানন্দ বলিল,—"অন্যায়ই যদি একটা ক'রে থাকি তবে আমাকে ক্ষমা কর, ম্যানেজারকে জবাব দিয়ে অন্য লোক ব্যবস্থা কর, তবে পরামর্শ না নেবার যে দোষটা আমার ওপর চাপালে, সত্যি কথা বলতে কি, আমার ওপর যতখানি ক্রোধ তোমার ছিল বা অপবাদ দিয়ে দূর ক'রে দেবার চেষ্টা করেছিলে তা'তে তোমার সঙ্গে দেখা করতে কেমন একটা লজ্জা হচ্ছিল; বাড়ীর দ্বারে এসে ঘুরে ঘুরে ফিরে গিয়েছি—তবুও সেই লজ্জায় দেখা করতে পারি নি—আমাকে ক্ষমা কর, দিদি।"

কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বীণা বলিল,—"না থাক, জবাব কাকেও দেবার দরকার নেই।"

উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া মহানন্দ বলিল,—"আর একটা কথা।"

বীণা বলিল,—"কি?"

মহানন্দ বলিল,—"দু'একজন আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্যে এসেছে।"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই বীণা বলিল,—"এ সম্বন্ধে আমার মতামতের কোনও দরকারই নেই।"

"একটু আছে দিদি—"বলিয়া মহানন্দ বলিল—"ব্রহ্মচারী তারা, আমার অবর্ত্তমানে করালীমার পূজার ব্যাঘাত যাতে না ঘটে সেটা তো তোমার আমার প্রত্যেকেরই দেখা উচিত।"

বীণা আপত্তি করিল না।

মহানন্দে মহানন্দ বলিয়া উঠিল,—"তা'হ'লে এখন আমি উঠি দিদি, কিন্তু আরতির সময় তোমার যাওয়া চাই।"

এ কথায় বীণা কোনও উত্তর দিল না।

মহানন্দ বলিল,—"জমীদারীর কাজ দেখবার মত প্রবৃত্তি আমার নেই, সেটা তুমি যেমন দেখছিলে তেমনই দেখো—"

মহানন্দ চলিয়া গেল।

বীণা পুনরায় চিন্তার অতল তলে ডুব দিল। এই মহানন্দ? এত দিন ধরিয়া ইহার সম্বন্ধে যে ধারণা সে হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করিতেছিল সেইটাই সত্য—না ভ্রান্ত? মহানন্দের আজিকার সরল শিশুর মত ব্যবহার কি তাহার নূতন কোন স্বার্থসাধনের একটা নূতন চাল মাত্র?

—সতের—

এতদিন পর্য্যন্ত মহানন্দের উপর বীণার সন্দেহ করিবার যতটুকু অবকাশ ছিল, এই ঘটনার পর সেটাকে অপসারিত করিয়া দিবার জন্য সে তাহার কর্ম্মের ধারা একেবারেই বদলাইয়া ফেলিল।

নবনিযুক্ত ম্যানেজার জমিদারীর প্রত্যেক কাজই করে তাহার পরামর্শ লইয়া। মহানন্দ নিজে কোনও কিছু করিবার পূর্ব্বে তাহার অনুমতি লয়।

বীণা, পুনরায় করালীমার মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য লইয়া প্রত্যহই যায়। মহানন্দের আনন্দের সীমা থাকে না, বলে, "দেখ দেখি দিদি, তুমি না এলে কি পূজা সুশৃঙ্খলে হয়—না মা গ্রহণ করেন?"

শিষ্যদের উপর মহানন্দ মন্দিরের ভার দিয়া মাঝে মাঝে প্রজাদের সুখ দুঃখের সংবাদ লইতে বাহির হয়।

সফলতার হেমমুকুট শিরে ধারণ করিয়া মহানন্দ একদিন সর্ব্বরীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়।

মহানন্দকে দেখিয়া সর্ব্বরীর সমস্ত দেহের মধ্যে পুলক খেলিয়া গেল, বলিল—"সেদিন সলিলবাবু এসেছিলেন, সেখানকার খবর শুনে কি যে আনন্দ তাঁর, তা আর কি বলব?"

হাসিয়া মহানন্দ বলিল,—"তাকে উপলক্ষ ক'রে তোমার আমার হতচ্ছাড়া জীবনটা যে এমনভাবে দূর হ'য়ে যাবে, কিছুদিন পূর্ব্বেও তা বুঝতে পারি নি সর্ব্বরী; এত বড় জমীদারির সর্ব্বেসর্ব্বা, প্রজার দল হাতের মুঠায়, এ সৌভাগ্য সহ্য করতে পারব তো?"

তাহাকে কণ্ঠালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া সর্ব্বরী বলিল, "পারবে বৈ কি, নাই যদি পারবে তবে ও সব হাতে আসবে কেন?...কিন্তু ভুলে যেও না যেন আমাকে।"

তাহার অধরপ্রান্তে সোহাগের চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া মহানন্দ বলিল,—"তা' যদি ভুলব, তবে সে রাজসুখ ছেড়ে ছুটে আসব কেন?"

তেমি ভাবেই সর্ব্বরী বলিল,—"এবার কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাব। এমন ক'রে এতদিন ধ'রে তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারব না।"

তাহার কথায় বাধা দিয়া মহানন্দ বলিল,—"ছিঃ—তা কি কখনও হয়?"

"—কেন—নিয়ে যাবে না?—"

হাসিয়া মহানন্দ বলিল,—"সেখানে যে আমি সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী।"

সর্ব্বরী জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে সেখানকার পূজা কার হাতে তুলে দিয়ে তুমি কেমন ক'রে আস?"

মহানন্দ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"চেলা জুটেছে সর্ব্বরী, চেলা জুটেছে,...এখন আমি কি কেউকেটা?...তোমার কাছে কি আসি আমি সর্ব্বরী, আমি আসি শ্রীগুরুর চরণ দর্শন করতে—বুঝলে?"

হাসিয়া সর্ব্বরী বলিল,—"শ্রীগুরুর?"—

তেমি ভাবেই মহানন্দ বলিল—"নয়?...তুমি কি আমার যে সে গা? তুমিই আমার প্রেমের গুরু" বলিয়া মহানন্দ তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া অধরসুধা পান করিল।

উপরের ঘরগুলিতে তখন হল্লা চলিতেছে।

তাহার আলিঙ্গন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্ব্বরী বলিল,—"পূজার আসন ক'রে দিই।"

"—এখন আর ওসব দরকার নেই, সর্ব্বরী, সিদ্ধিকে বরণ করেছি—এখন আমি বিধি-নিষেধের বাহিরে।"

স্ফীত হাস্যে সর্ব্বরী বলিল,—"বেশ।"

উপরের ঘরগুলা হইতে হল্লা তখন বেশ বাড়িয়া উঠিতেছিল। মহানন্দ বলিল,—"ঝোলা হ'তে বোতলটা বার কর না সর্ব্বরী, মাকে নিবেদন ক'রে প্রসাদ পাই।"

সর্ব্বরী বোতল বাহির করিয়া দিলে মহানন্দ দুই চার গ্লাস পান করিয়া বলিতে লাগিল,—"খাসা এই পোষাক সর্ব্বরী? কি ছিলুম, তোমায় নিয়ে কি অবস্থাতেই না পড়েছিলুম, কোনও দিন খেতে পাই, কোনও দিন পাই

না, মনে আছে সে-সব ? তারপর এই গেরুয়ার আবিষ্কার। এরই মাহাত্ম্যে তখন আহারটা কোনও গতিকে জুটত, ক্রমে ক্রমে ছোটখাট আয়ের জমীদারি,...এই পোষাকের সঙ্গে যদি একটু বুদ্ধি থাকে,বুঝলে, যদি লোকের মনের ইচ্ছা বুঝে কাজ করতে পারা যায়, তা হ'লে এই ধর্ম্মভীরু জাতটার গলা টিপে অনেক পয়সা ঘরে আনা যায়, তারপর যদি আবার তন্ত্র মন্ত্র দুটো জানা থাকে, বুঝলে—"

সর্ব্বরী আর বুঝিতে চাহিল না, বলিল,—"সব তো চোখেই দেখচি, কিন্তু এখানে আমি কিছুতেই থাকব না।"

বিস্ময়ের সহিত মহানন্দ বলিল - "এখানে থাকবে কি, সর্ব্বরী ?...লক্ষ টাকা আয়ের সন্ন্যাসীর ঘরণী তুমি, আরও কি এখানে প'ড়ে থাকবে ? কালই একখানা বাড়ী দেখব, তারপর এবার যখন আসব তোমা'কে একখানা কিনেই দেব, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী আমি, আমার ব'লে কিছু থাকতে নেই।"

মহানন্দ পুনরায় তাহাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল।

তাহার আজ এতখানি আনন্দ দেখিয়া সর্ব্বরী বলিল,—"খাওয়া-দাওয়া সবই কি বন্ধ ক'রে বসলে ? করছ কি ?"

হঠাৎ বাহির হইতে সলিলকুমার ডাকিল, "সর্ব্বরী ঠাকরুণ!"

মহানন্দের সারা দেহ জলিয়া উঠিলেও সর্ব্বরীকে দ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া নিজে একখানা আসন পাতিয়া মুদিতচক্ষে বসিয়া রহিল।

সর্ব্বরী দ্বার উন্মুক্ত করিতেই সলিলকুমার যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিল,—"প্রণাম হই ঠাকরুণ।"

ঈষৎহাস্যে সর্ব্বরী বলিল,—"আসুন।"

সলিলকুমার একাকী ছিল না। চঞ্চলাও তাহার সঙ্গ ছাড়ে নাই, সে বলিল—"পেন্নাম হইগো ভৈরবী মা, খবর সব ভাল তো ?"

সলিলকুমার জিজ্ঞাসা করিল,—"মহানন্দের কোন সংবাদ পেয়েছ ঠাকরুণ ?"

"—এসেছেন আজ; এখন তিনি জপে বসে'ছেন, আসুন না—বসুন।—"

আনন্দের আতিশয্যে সলিলকুমার মহানন্দের গা ঠেলিয়া তাহার ধ্যানভঙ্গ করিবার উদ্যোগ করিতেই সর্ব্বরী বলিল,—"বাধা দেবেন না, ঐটুকুই আমাদের সুখ-শান্তি ঐশ্বর্য্য।..আপনি একটু অপেক্ষা করুন, ওঁর ওঠবার সময় হ'য়ে এল।"

নিজের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে মহানন্দের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যাইবার পথে সর্ব্বরীর বাধায় সলিলকুমার লজ্জিত হইয়া প'ড়ল, সেই ভাবেই বলিল,—"সত্যিই আমি অন্যায় করছি।.ধরার মানুষ আমরা ও আনন্দ কি তাতো জানি না। আনন্দ যেটুকু পেয়েছি তাতেই আত্মহারা হয়েছিলুম আর কি ?"

দুইজনকেই বসিবার জন্য সর্ব্বরী আসন প্রদান করিল।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া এই কয়টী প্রাণীর সময় একটু একটু করিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ মহানন্দ তাহার উদাত্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"মা—মা," তারপর ইহাদের প্রতি দৃষ্টি ফেলিয়া হাসিভরা মুখে বলিল,—"এই যে এসেছেন আপনারা,—আপনারা যে আসবেন এ কথা আমি সন্ধ্যার সময়ই সর্ব্বরীকে বলেছিলুম,...তারপর—সব কুশল তো ?"

তাহাকে প্রণাম করিয়া সলিলকুমার বলিল, "সর্ব্বাঙ্গীন, এতদিনে বুঝলুম মহানন্দ, তুমিই মায়ের প্রকৃত ভক্ত, তোমার অকল্যাণ দূর করবার জন্যেই মা বুঝি খড়্গ-ধারিণী।

হাস্য-তরল-কণ্ঠে মহানন্দ বলিল,—"সবই মায়ের খেলা, জমিদার, বাবু, তা'না হ'লে আমরা কে-কতটুকু ক্ষমতা আমাদের ?...তবে দয়া ক'রে মা আমাদের সঙ্গে কথা কন কোনও কিছু করবার আগে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়ে তবে সে কাজে হাত দেই। তা না হ'লে ঐযে বললুম কতটুকু ক্ষমতা আমাদের ? নিজেকে ধ'রে রাখবার ক্ষমতা যাদের নেই·—"

তাহার বলিবার পথে বাধা দিয়া সলিলকুমার বলিল,—"বাধাগুলাকে তো সব সরিয়ে ফেলেছ, মহানন্দ। এইবার জমীদারিটা আমাকে দখল দিয়ে দাও, লাখটাকা থোক আর মাসে হাজার টাকা বৃত্তি।"

কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে থাকিয়া মহানন্দ বলিল,—"মায়ের দয়ায় অনেক উকিল ব্যারিষ্টার আমার শিষ্য। তাদিগকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম ও কথা।"

"কি বল্লে তারা ?"

বার দুই ঘাড় নাড়িয়া মহানন্দ বলিল,—"কোনও উপায় নেই; দু'তিন বছর কেটে গিয়েছে। আদালতে আপত্তি দেওয়া হয় নি উইলের সঙ্গে সঙ্গে যদি আপত্তিটা দিতে পারতেন—"

সলিলকুমার বলিল,—"তবু আমি আদালতে যাব মহানন্দ, এখন যখন তুমিই সেখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা তখন আমার জন্যে চেষ্টা তুমি নিশ্চয়ই করবে।"

সহাস্য মুখে মহানন্দ বলিল,—"নিশ্চয়ই, তবে কি, জানেন?"

ব্যগ্রভাবেই সলিলকুমার জিজ্ঞাসা করিল,—"কি মহানন্দ?"

"—মাকেও আমি সেই দিন ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তিনি বল্লেন,—তাকে নিষেধ ক'রে দিও তার অপমানের যোগ্য প্রতিশোধ আমি দিয়েছি; কিন্তু আমার জমীদারির ওপর যদি সে হাত দিতে আসে তা হ'লে তার বংশের সর্ব্বনাশ করব, তার জমীদারির সর্ব্বনাশ ক'রে তার নাম জগতের বুক হ'তে মুছে দেব। এর পরও জমিদার-বাবু আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে সেখানে যেয়ে আপনি সব ব্যবস্থা করুন, আমি হাসতে হাসতে সেখান হতে চ'লে যাচ্ছি। মার আদেশ অমান্য করবার ক্ষমতা আমার নেই।"

সলিলকুমার মহাচিন্তিত ভাবেই বলিল,—"হুঁ, সব যেই হারিয়ে গেল মহানন্দ, মার একটু প্রসাদ দাও।"

সর্ব্বরী বোতল ও গ্লাস তাহার সম্মুখে রাখিলে, সে পান করিতে করিতে বলিল,—"হুঁ, তাই তো মহানন্দ, এর ভেতর মায়ের আদেশও পেয়ে গিয়েছ?"

চঞ্চলা এতক্ষণ নীরবেই বসিয়াছিল, সে সলিলকুমারের নিকট হইতে কতকটা কারণবারি পান করিয়া বলিল,—
—"আচ্ছা সন্ন্যাসী ঠাকুর, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা কর তো কতদিন ইনি আমার এই আঁচল ধ'রে থাকবেন?"

মহানন্দ বলিল,—"তামাসা করছ, চঞ্চল-দি? এ সব তামাসার চেয়ে মার নাম যদি একখানা শোনান।"

"ওরে বাবাঃ" বলিয়া চঞ্চলা বলিল—"ও নাম কি আমাদের জিভ দিয়ে বেরুবে ঠাকুর?"

মহানন্দ বলিল,—"একটা গাও, অনেকক্ষণ বৈষয়িক ব্যাপারে কেটে গেল।"

সলিলকুমার কহিল,—"জমীদারি আমার চাইই, মহানন্দ, যেমন ক'রে হ'ক।"

চঞ্চলভাবেই মহানন্দ বলিল,—"সংসারের কীট! একটু মার নাম শুনব এতেও তুমি বাধা দেবে? তোমার কথার সময় কি পালিয়ে যাচ্ছে?"

হঠাৎ মহানন্দের এই ভাবান্তরে সলিলকুমার যেন হত-বুদ্ধি হইয়া গেল। চঞ্চলাকে বলিল,—"একটা নামই শোনাও।"

হাস্যতরল কণ্ঠে চঞ্চলা বলিল,—"দূর মুখ্‌পোড়া!"

বলিল বটে, কিন্তু গাহিতেই হইল তাহাকে।

গানের মাঝে মাঝে মহানন্দ অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিল। করতালি দিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। চক্ষের দুই কোল দিয়া ধারা নামিতে লাগিল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত সলিলকুমার সেইস্থানে বসিয়া রহিল। গান শেষ হইলে বলিল, "শোন, মহানন্দ; জমীদারি চাই, যেমন ক'রে হোক, তাতে বীণাদিদির সর্ব্বনাশ করে—"

মহানন্দ চক্ষু দুইটীকে উর্দ্ধে তুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"মা—মা।"

সলিলকুমার সেইদিন আর কোনও কথা তাহার নিকট হইতে আদায় করিতে পারিল না। যেই কোনও একটা কথা বলতে যায় আর সে চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া বলিয়া ওঠে,—"মা—মা—মা।"

বিরক্ত হইলেও সলিলকুমার আর কোনও কথা বলিল না, উঠিয়া পড়িল।

তাহারা চলিয়া গেলে সর্ব্বরী বলিল,—"শুধু গেরুয়ায় কোনও কাজ হয় না, সর্ব্বরী,বুদ্ধিটাও বড় কম দরকার নয়। এখন এক কাজ কর দেখি, ঐ ঝোলার ভেতর শ'খানেক গিনি,দু'খানা বেনারসী সাড়ি আর গোটাচার ব্লাউজ আছে, বার করে নাও।

সর্ব্বরী জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথা পেলে?"

করালীমার মহান্ত যে, তার আবার অভাব? মা নিজের হাতেই এ সব যুগিয়ে দেন বুঝলে না?" বলিয়া মহানন্দ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

১১

যবে সম্ভ্রমে বরিল মেঘনাদ
জয়গর্ব্ব সহযোগিনীর,
তখন উছলে হিয়া সর্ব্ব সার্থকতা নিয়া,
গৌরবে সে পতিপদে লুটাইলা শির।

১২

কভু দেখি সোনালী উষায়
নিদ্রালসা প্রাণাধিক পাশে,
সাদরে জাগায় পতি, যথা দেব দিনপতি
জাগায় [illegible]-পদ্মে [illegible]।

১৩

পুন দেখি রাজশীলা [illegible]
অবরুদ্ধা [illegible]দেশে,
বড় সাধ ছিল মনে, বীরশ্রেষ্ঠ পতি সনে
সমরাঙ্গনে যাবে [illegible]ধর্ম্মিণীর বেশে।

১৪

হ'লে যজ্ঞ শুভ সম্পাদন
নিজ হাতে সাজাবে দয়িতে,
যথাবিধি দেবে স্মরি,' সুমঙ্গল মন্ত্র পড়ি'
শুভ লগ্নে পাঠাইবে অরি বিমর্দ্দিতে।

১৫

সে কামনা শাশুড়ী-নিষেধে
অমনি রাখিল চাপি' বুকে—
এ ভারতবর্ষ বই, এ হেন আদর্শ কই,
কোথা এ সংযতি ত্যাগ, ধীর নম্র মুখে!

* *

১৬

শেষে একি কাল-রাহু গ্রাসে,
পড়িল উজল দিনমণি,
আলোময়ী বসুন্ধরা, সহসা আঁধার-ভরা,
শুকাইল সরো মাঝে সোনার নলিনী!

১৭

বলি' গেল, এখনি ফিরিব,
হায়! আর আসিল না ফিরে,
হাসিমাখা চন্দ্রানন, সে সোহাগ-সম্ভাষণ,
সকলি ফুরায়ে গেল—বুক গেল চিরে।

১৮

মহাঝড়ে উন্মূলিত তরু
ছিঁড়ে গেল কুসুমিত লতা,
ভীষণ অশনি-ঘা'য় ফুলদল পুড়ি' যায়,
পলকে হারায় দীন সুখ-সাধ যথা!

১৯

কোথা সে আনন্দময়ী রাণী,
কোথা সে অপূর্ব্ব তেজস্বিনী,
কোথা সে অজেয়া শক্তি, কোথা সে বিনয় ভক্তি,
এ যে দেখি সর্ব্ব-হারা রিক্তা কাঙালিনী।

২০

মৃত-পতি-পদ রাখি' বুকে,
সিক্ত করি' তপ্ত আঁখি-জলে,
নবীন বয়সে বালা, জুড়াতে প্রাণের জ্বালা,
আপনা আহুতি দিল জ্বলন্ত অনলে।

২১

অতুলন কুসুম-যুগল
পুড়ি গেল লঙ্কেশের পাপে,
তাই তার প্রাণে ধূ ধূ এ চিতা জ্বলিবে শুধু,
পুড়িল কনক-লঙ্কা বিধাতার শাপে।

২২

বিস্মিত বিমুগ্ধ জনগণ,
ধন্য কবি ধন্য এ কল্পনা,
ধন্য এ [illegible] তব পলে পলে অভিনব,
[illegible]ভারতপুরে না মিলে তুলনা!

২৩

শিখাইল প্রমীলা তোমার,
নারী নহে হীন অবজ্ঞেয়া,
সংসারের শুভ শক্তি, হৃদয়ের প্রেমভক্তি,
চিত্তে বুদ্ধি পবিত্রতা, সর্ব্বত্র অজেয়া!

২৪

বসো দেব! অমর-আসনে
বিতরি' ও অরুণ কিরণ
মেঘনাদ শঙ্খ বহে মন্ত্র-মুগ্ধ বিশ্বে সবে,
তাই এত মধু-মাখা এ মধু মিলন।*

* খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরীর অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ বার্ষিক মধু-মিলনে পঠিত।

পরিহাসের পরিণাম।

(গল্প)

[শ্রীমতী [illegible] বসু]

অশোক তার ঘরে বসে সবে একটী কবিতা লেখবার উপক্রম করছে, এমন সময় তার বৌদিদি এসে ঘরে ঢুকল।

অশোক সহাস্যমুখে তার খাতা-পত্তর সরিয়ে রেখে বললে, "এস বৌদিদি।"

শোভনা পাশের একখানি চেয়ারে বসে পড়ে বললে, "কি হচ্ছিল ঠাকুরপো, কবিতা লেখা না কি ?"

অশোক বললে, "লিখি নি, তবে লিখতে বসবার চেষ্টা করছিলুম মাত্র।"

"আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমার কবিতা পড়ে, বা তোমার কথা বার্ত্তা শুনে তুমি যে একজন নারী বিদ্বেষী তা তো মনে হয় না।"

অশোক হেসে বললে, "আমি যে নারী-বিদ্বেষী, হঠাৎ এটা আবিষ্কার করলে কোথা থেকে বৌদিদি ?"

"তবে মামিমা এত বের জন্যে বলছেন, করতে চাইছ না কেন ? বলেছ ও সব জঞ্জাল জুটিয়ে কি হবে মা ?"

"সেটা ভুল বৌদিদি. আমি নারী-বিদ্বেষী মোটেই নই, বরং তাদের আমি শ্রদ্ধাই করে থাকি। তবে মা রোজ-রোজ নানা রকমের মেয়ে আমদানী করে বাড়ী এনে দেখিয়ে বলেন, এই মেয়েটী বেশ বাবা, এইটীকে বিয়ে কর। তাই তাঁকে বিয়ে করবো না বলেই ঠেকিয়ে রাখি, নইলে আমি মনের মত মেয়ে পেলে বিয়ে করবো না এমন কথা কখনও বলি নি। নিজে এলুম ব্যারিষ্টার হয়ে বিলেত ঘুরে। তার আমার স্ত্রী হবে কথামালা-পড়া মেয়ে, এ আমার ধাতে সইবে না। তাই বিয়ে কত্তে নারাজ।"

"বেশ তা হ'লে আমি ঘটকালি করে তোমার উপযুক্ত মেয়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ করে দেব। আমার ঘটক-বিদেয় কোর ভাল করে।"

"তুমি বুঝি ঘটকালি করবার জন্যেই সেই পাটনা থেকে এখানে এসেছ ?"

"এসেছিই তো, মামিমা লিখলেন বৌমা, অশোক ছ'মাস হ'ল বিলেত থেকে ফিরেছে, প্র্যাক্‌টিসও করছে, কিন্তু কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না। তোমরা রইলে বিদেশে, আমি একলাটী কি করে দিন কাটাই।' আমি উত্তরে লিখলুম "মামিমা কিছু ভাববেন না, আমি গিয়েই আপনার ছেলের ধনুকভাঙ্গা পণ ভেঙ্গে দিচ্ছি। তারপর ইনি ছুটি নিয়ে এলেন, এখন আমার হাতযশ।"

অশোক হেসে বললে, "বেশ, তুমি ঘটকালিতে উঠে পড়ে লাগো আমিও ততদিন নিশ্চিন্ত হ'য়ে কবিতা লিখি।"

"না গো মশাই, আজ আর কবিতা লিখতে পারছ না, আজ আমায় সঙ্গে করে বায়োস্কোপে নিয়ে যেতে হ'বে, তোমার দাদা তো মক্কেল নিয়েই অস্থির, পাটনায়ও তাই, এখানে ছুটিতে এসেও তাই। কোন মক্কেলের বাড়ীতে গেছেন, সদাই ব্যস্ত। এখন তুমি যদি নিয়ে যাও তবেই যাওয়া হয়।"

"যো হুকুম বৌদিদি, আমি প্রস্তুতই আছি।"

"বেশ বেশ বেঁচে থাক ভাই, তোমার মত লক্ষ্মণ দেওর থাক্‌তে আমার ভাবনা কি ? একটু আগে বেরুতে হ'বে, কারণ আমার এক বন্ধু শুভাকে তার বাড়ী থেকে তুলে নিতে হ'বে। তাকে বলে পাঠিয়েছি।"

"এ বন্ধুটী কে বৌদিদি ?"

"আমার বিশেষ বন্ধু, এক সঙ্গে কলেজে প'ড়তুম, তার পর আই-এ, পাশ করতে না করতেই আমার বিয়ে হয়ে গেল, আর সে বেশ মজায় বিয়ে না করে, আই-এ, বি-এ, পাশ করে এম-এ, পড়ছে। তার বাপ-মা নেই, বুড়া ঠাকুর-দাদা আনন্দমোহনবাবু হাইকোর্টের বড় উকিল ছিলেন, এখন ওকালতি ছেড়েদিয়ে দিব্য ব'সে আছেন। তাঁর অগাধ পয়সা, আর ওই শুভাই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। কলেজ ছেড়ে আসতে সব বন্ধুরাই একে একে ভুলে গেছে। একমাত্র শুভাই তার শোভনা দিদিকে ভোলে নি, চিঠি-পত্তর নিয়মিত লেখে, খোঁজ-খবর করে। যেমন তার

রূপ, তেমনি তার গুণ, একবার দেখলে আর ভোলা যায় না।"

"বৌদিদি কি তাহলে ঘটকালি আজ থেকেই সুরু করলে না কি ?"

শোভনা হেসে উত্তর দিলে "হচ্ছে তো তাই, কিন্তু মস্ত বাধা যে শুভা বিয়ে করতে চায় না বলে বিয়ে সে করবেই না। যদি আমার দেওরটিকে দেখিয়ে তার পণ ভাঙ্গতে পারি তাহলে একেবারে রাজযোটক হয়। তুমি প্রস্তুত থেক, সওয়া পাঁচটায় বেরুব। আমি কাজ সেরে নি গে। ওই খোকা বাবুও উঠেছেন দেখ্ছি" বলেই শোভনা চলে গেল।

অল্প বয়সে শোভনার স্বামী অরিন্দম বসু তাঁর বাপ-মাকে হারান। তাঁর মামা-মাসী তাঁকে নিজের ছেলের মত মানুষ করে তুলে শোভনার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন, বিয়ে আজ ৬।৭ বছর হয়েছে। অরিন্দম এখন পাটনায় ওকালতী করেন, অরিন্দমের মামা বছর তিনেক হ'ল মারা গেছেন, অশোক তাঁর একমাত্র সন্তান। অশোক আজ ছমাস হ'ল ব্যারিষ্টার হয়ে এসে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ করেছে।

বিয়ে হয়ে এ বাড়ীতে আসা অবধি শোভনা অশোককে নিজের ভাইয়ের মতই স্নেহ-যত্ন করে এসেছে, সেও তেমনি বৌ-দিদির খুব অনুগত ছিল। তারপর মাঝে ক'বছর দেখাই সাক্ষাৎ ছিল না, অশোক বিলেত থেকে ফিরেও একবার পাটনায় ঘুরে এসেছিল।

সুসজ্জিতা শুভা তার বাবার ঘরে বসে একখানি মাসিকপত্র পড়ছিল, কিন্তু বইয়েতে তার মন ছিল না, সে কেবলি ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ্ছিল, আর মোটরের হর্ণ শুনলেই উঠে জানলার কাছে যাচ্ছিল, শেষে সে বিরক্ত হয়ে মোটরের হর্ণ শুনেও আর শুন্ছিল না। সহসা কে এসে পিছন থেকে দুহাতে চোখ তার টিপে ধরলে।

সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে চোখ ছাড়িয়ে নিয়ে হেসে বললে "এইযে শোভনাদি এসেছ, এত দেরী হ'ল যে ?"

শোভনা মৃদু হেসে বললে "বেরচ্ছি এমন সময় ইনি বাড়ী ফিরলেন, তাই দেরী হয়ে গেল। চলনা এখনও দেরী আছে বায়োস্কোপ আরম্ভ হ'তে।"

"আমি তো প্রস্তুত হয়েই আছি।" "তবে চল্।" বলেই শোভনা শুভার হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অশোক তাদের দেখেই মোটরের দরজা খুলে দাঁড়াল।

শুভা চুপি চুপি বললে "উনি কে ভাই ?"

শোভনা বললে "আমার মামাতো দেওর, সম্প্রতি বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে ফি রছে আর কবিতাও লেখে বেশ, পড়েছিস্ বোধ হয়, নাম অশোক রায়।"

"হাঁ হাঁ পড়েছি বৈ কি, বেশ লেখেন, ওঁর কবিতা আমার ভারি মিষ্টি লাগে।"

শোভনা মৃদুহাস্যে বললে "ঠাকুরপো শুনলে খুসী হ'বে যে তার লেখা তোর খুব মিষ্টি লাগে। চল্ চল্ দেরী হয়ে যাবে" বলে শোভনা শুভার হাত ধরে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল।

অশোক শোফারের জায়গায় বসে মোটর চালিয়ে দিলে। পরক্ষণেই তারা পিকচার প্যালেসের সামনে এসে দাঁড়াল। অশোক নেমে তিন খানি ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট কিনলে, আর তিনজনে পাশাপাশি তিনখানি চেয়ারে বসল; ছবি আরম্ভ হতে তখনও দশ মিনিট বাকি ছিল।

শোভনা এই অবসরে দুজনের সঙ্গে দুজনের পরিচয় করিয়ে দিলে, বললে "ইনি আমার বন্ধু, শুভা আর ইনি আমার ঠাকুরপো অশোক রায় যশস্বী কবি, যাঁর কবিতা তোমার খুব মিষ্টি লাগে বল্ছিলে শুভা, ইনিই তিনি।"

দুজনেই দুজনকে নমস্কার করলে। অশোক খুব মিশুক। সে দু মিনিটেই বেশ আলাপ জমিয়ে নিলে, মৃদু হেসে বললে, "আমার কবিতা আপনার সত্যিই ভাল লেগেছে না কি ? আপনাদের ভাল লাগলেই আমাদের লেখা সার্থক।"

শুভা মৃদুস্বরে বললে আপনার লেখা চমৎকার, সবারি ভাল লাগ্বে। তা ছাড়া আপনার লেখার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।"

অশোক জিজ্ঞাসা করলে "আপনিও লেখে থাকেন বুঝি ?"

শুভা নতমুখে হাস্লে। শোভা বললে "হাঁ ঠাকুরপো শুভাও লেখে, সে কথা বল্তে ভুলে গেছি। পড়েছ বোধ হয়, শুভা দেবী নামে অনেক কাগজেই লেখা বেরোয় ওর।"

অশোক বলে উঠ্লো "হাঁ হাঁ বৌদিদি, পড়েছি বৈ কি,

ওঁর লেখা আমি ভারি পছন্দ করি, বেশ তরতরে ঝরঝরে লেখা, সরল ও অল্প কথায় মনের ভাবটী বেশ গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা ওঁর খুব চমৎকার। আর শুভাদেবী নামে যে সব ছবি মাসিকে বেরোয় সেও আপনা আঁকা নাকি?"

শোভা হেসে বললে "ওসব বাজে ছবি।"

"মোটেই বাজে নয়, ভারি সুন্দর ছবি আঁকেন আপনি, আপনি যে দেখ্ছি সকল বিষয়েই সিদ্ধহস্ত" আপনার সঙ্গে আজ আলাপ হওয়ায় নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছি।"

শুভা সহাস্য সরমে মুখ নীচু করলে। তার শুভ্র সুন্দর মুখখানি ক্ষণেকের তরে আরক্ত হয়ে উঠলো।

এমনি সময়ে বায়োস্কোপ আরম্ভ হয়ে গেল।

বায়োস্কোপের শেষে শুভাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে, অশোক শোভনাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলো। পথে শোভনা জিজ্ঞাসা ক'রলে "ঠাকুরপো কেমন দেখলে শুভাকে?"

"ভারি সুন্দর মেয়েটী বৌদিদি, অত রূপ গুণ, অত বিদ্যা, বড় লোকের ঘরের মেয়ে, কিন্তু এত টুকু অহংকার নেই, কেমন মৃদু স্বভাব, যেমন নম্র, তেমনি বিনয়ী। দেখলে মনে হয় না যে অত লেখা-পড়া শিখেছে।

শোভনা বললে "তাহলে শুভাকে তোমার খুব মনে ধরেছে বল? একবার চেষ্টা করে দেখব না কি যদি শুভার পণ ভাঙ্গে।"

অশোক হেসে বলে উঠল "তোমার যে ভাবনায় আর ঘুম হচ্ছে না বৌদিদি।"

শোভনা স্মিত হাস্যে বললে "কার যে ঘুম হচ্ছে না তা বাড়ী গেলেই টের পাওয়া যাবে, ওঁর যেন কিছু ভাবনা হচ্ছে না; তবু যদি না লক্ষ্য করতুম যে যতক্ষণ বায়োস্কোপ দেখেছ, তার বেশীর ভাগ সময় তুমি শুভার সুন্দর মুখখানির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছ?"

"সেটিও আবার লক্ষ্য করে দেখা হয়েছে। সুন্দর কিছু দেখলেই মানুষ তা বার বার দেখে থাকে। এই যে বাড়ী এসে পড়েছে।" বলে অশোক নেমে দাঁড়াল, শোভনাও নেমে পড়লো।

ক্রমে শোভনার চেষ্টায় অশোকের সঙ্গে শুভার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠল, শোভনা শুভাকে দুবার নিমন্ত্রণ করে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে গেল, অশোকও শোভনার সঙ্গে শুভাদের বাড়ী গিয়ে দুদিনেই শুভার ঠাকুরদাদার খুব প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠল। তিনি শুভার বন্ধু বলে শোভনাকে খুব ভালবাসতেন। একদিন শোভনাকে ডেকে বললেন "দেখোনা দিদি, একবার চেষ্টা যদি তোমার দেওরটির সঙ্গে শুভার বিয়ে দিতে পার। শুভার যে ধনুক ভাঙ্গা পণ ও বিয়ে করবে না।"

শোভনা বললে "আচ্ছা শুভাকে বলব।"

তারপর সে একদিন শুভাকে নিভৃতে বললে "ভাই ঠাকুরপোর বড় ইচ্ছে তোকে বিয়ে করেন, ঠাকুরদাদারও ইচ্ছে এ বিয়ে হয়। তোর কি মত বল্।"

শুভা মুখ নীচু করে বললে "আমি বিয়ে করব না সে তো বলেই রেখেছি শোভনাদি।"

"ও সব বাজে কথা ছাড়; আমার ঠাকুরপোকে কি তোর অনুপযুক্ত মনে করিস্ শুভা?"

"না না, তা কেন মনে করব শোভনাদি, বরং আমাকেই তাঁর অনুপযুক্ত বলে মনে করি।"

"আচ্ছা গো, আচ্ছা; তুই তাকে বিয়ে করতে রাজি হ' ভাই, না হ'লে সে বড় দুঃখ পাবে, তারও বিয়ে না করার পণ তোকে দেখেই ভেঙ্গেছে। যদি তুই তাকে বিয়ে না করিস্ তবে সে বোধ হয় আর বিয়েই করবে না।

"ভাই শোভনাদি, আমার যদি একটা কঠিন পণ না থাকৃত তবে আমার বরমাল্যখানি ওরই গলায় পরিয়ে দিতুম।"

"তোর কি কঠিন পণ খুলে বল; তাতে যদি সে রাজি হয়, তাহ'লে তোর বিয়ে করতে আপত্তি নেই তো?"

"না তা নেই।"

শোভনা হেসে শুভার গাল টিপে বললে "তবে তোরও দেখছি ঠাকুরপোকে দেখে, তার মত ধনুক-ভাঙ্গা পণ ভেঙ্গেছে।"

শুভা লজ্জিত হ'য়ে বললে, "তা ভেঙ্গেছে, কিন্তু আসল পণটা যে এখনও বাকি।"

"তা নিয়ে তুই ঠাকুরপোর সঙ্গে বোঝাপড়া করিস্ গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" ব'লে শোভনা চলে গেল।

তারপর অশোক এসে একদিন শুভার হাত দুটী ধরে বললে "বল শুভা তোমার কি কঠিন পণ। সে পণ রেখে তোমায়

লাভ করতে পারলে নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলেই মনে করবো ?”

শুভা নতমুখে ব'ল্লে, “আমার কঠিন পণ অই যে বিয়ের পর ত্রিরাত্রি ছাড়া আমি এবাড়ী ছেড়ে আর কোথাও গিয়ে একরাত্রিও •বাস করবো না। একি কঠিন নয় ? কে এ পণ রক্ষা করতে চাইবে, বলুন। আপনি কি রক্ষা করতে পারবেন ?”

অশোক বিস্মিত হয়ে শুভার মুখের দিকে চাইলে, দেখলে সে সরল সুন্দর মুখে অহঙ্কারের লেশ মাত্র নাই।”

অশোক ব'ললে “আচ্ছা আমি তোমার এ পণ যদি রাখি তবে তোমার আমায় বিয়ে করতে কোন আপত্তি নেই তো ?”

শুভা বিনম্রভাবে বললে, “না।”

অশোক চেয়ে দেখ্‌লে শুভার মুখখানিতে ভালবাসা যেন ঢল্‌ ঢল্‌ করছে ?

“বেশ আমি মার মত জেনে, বৌদিদিকে দিয়ে খবর পাঠাব” ব'লে অশোক সেদিনের মত শুভার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

অশোক চলে যেতে শুভা সেখানে বসে ভাবতে লাগল, হায়! হায়! না বুঝে কঠিন পণ করে, শেষকালে এমন দেব-দুর্লভ স্বামী পাবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হ'তে হ'বে। হয় হ'বে, তা বলে যাকে ভালবাসি তার অমঙ্গল করতে পারবো না।”

শোভনার কাছে অশোকের মা সব শুনে বললেন, “অশোকের যখন শুভাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়েছে করুক। নৈলে ও মোটেই বিয়ে করবে না আর। বৌ নিয়ে ঘর করা আমার ভাগ্যে থাকে, হ'বে।

শোভনা বল্লে, “শুভার আশ্চর্য্য পণ, ঠাকুরদাদাও ওকে টলাতে পারেন না। সেই জন্যেই ও এতদিন বিয়ে করতে চায় নি, এর ভিতরে কি একটা রহস্য আছে শুভা বলতে চায় না। যাই হোক্‌ ঠাকুরপোকে তা'হলে বলি আপনার মত আছে।”

“হাঁ, বল।”

তারপর একদিন শুভদিনে অশোকের সঙ্গে শুভার বিয়ে হয়ে গেল। শুভা বিয়ের পর তিনদিন মাত্র শ্বশুর বাড়ী থেকে চলে এল।

শুভা প্রায়ই শ্বশুর বাড়ী যেত, শাশুড়ীর অসুখ বিসুখ হ'লে সেবা শুশ্রূষা করতো, কিন্তু কোনদিন রাত্রি কাটাত না।

অশোক ও শুভা দুজনেই দুজনের মনের মত হওয়ায় দুজনেই খুব সুখী ছিল। কিন্তু একটু অসুবিধা হ'ল এই যে, অশোককে বেশীর ভাগ শ্বশুর বাড়ীতেই থাকৃতে হ'ত। তার বন্ধুবান্ধবরা তাকে ঠাট্টা করত 'কি ভাই বৌ ঘর করতে এলনা, শেষ তোমাকেই ঘর-জামাই হ'য়ে ঘর করতে যেতে হ'ল।' অশোক প্রথম প্রথম ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিত। ক্রমে ক্রমে দু'বছর এম্‌নি গেল। বন্ধুদের কথা শুনে শুনে অশোকের রোজ রোজ বিরক্তি বোধ হ'ল, সে শুভাকে বললে “তোমার পণ এবার ভাঙ্গতে হ'বে, নৈলে বন্ধুদের কাছে বড়ই লজ্জা পেতে হয়।”

শুভা চুপ করে বসে রইল তার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়তে লাগল তবুও সে অচল অটল। অশোক বললে, “এ পণ কি তোমার ভাঙ্গবে না, চিরজীবনই থাকৃবে ?”

শুভা বললে “যতদিন ঠাকুরদাদা বেঁচে থাকবেন ততদিন অবধিই আমার এ পণ, তারপর আর নয়।”

অশোক রেগে বললে, “তোমার এ পণ ভাঙ্গতেই হবে, শুধু কাঁদলেই হবে না।

শুভা মৃদুস্বরে বললে, 'পণ তা আমি ভাঙ্গতে পারব না ?

“তবে আমার চেয়ে তোমার ঠাকুরদাদার ভালবাসাই বেশী হ'ল, বেশ তাই হোক্‌। আমি চললুম।”

শুভা কেঁদে অশোকের পা দুটী জড়িয়ে ধরে বললে, “ওগো ভুল বুঝে, রাগ করে চলে যেও না।”

“ভুল তাহ'লে আগে ভেঙ্গে দাও।”

“এখন আমি তা পারব না।”

“তবে তোমায় আমার সম্বন্ধের এই শেষ জেন',” বলে অশোক দ্রুতপদে বেরিয়ে চলে গেল।

শুভা দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল, তার চোখ মুখ ফুলে উঠল।

তারপর অশোক তার মাকে নিয়ে পাটনায় অরিন্দমের বাসায় চলে গেল এবং সেখানের কোর্টে বেরুতে লাগল। কলকাতায় তার বেশ পসার হয়েছিল, সে সব ছেড়েছুড়ে

চলে গেল। শুভা কেঁদে কেঁদে সারা হ'ল। ভাবতে লাগল 'আমার মত অভাগিনীকে বিয়ে করে তাঁর সব গেল, ওই জন্যেই তো বিয়ে করতে চাইনি।'

ক্রমে শুভা ভাবনায় চিন্তায় শুকিয়ে যেতে লাগল। তার ঠাকুরদাদা ডাক্তার দেখান, শুভাকে কত বোঝান, বলেন "চল্ দিদি তোকে পাটনায় নিয়ে যাই। উত্তরে সে বলে, "না – তা হ'বে না।"

এমনি ভাবে চার পাঁচ মাস কেটে গেল, শুভা শুভদিনে একটী পুত্র-সন্তান প্রসব করলে। একটু সুস্থ হয়ে উঠে স্বামীকে পুত্রের জন্ম-সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখলে। অশোক জবাব দিলে না। শোভনা লিখলে, "শুভা তোর পণ ছেড়ে দে ভাই, ঠাকুরপো তোর জ'ন্য মনমরা হয়ে আছে।"

শুভা লিখলে "দিদি শরীর বড় খারাপ, বোধ হয় এবাত্রা দেখা আর হ'ল না।"

এর ক'দিন পরেই শুভার ঠাকুরদাদা কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন, ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেল। এমন সময়ে অশোক একখানি চিঠি পেলে শুভার ঠাকুরদাদার কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন :—

ভাই অশোক,

আমি আজ মৃত্যু-শয্যায় ; তুমি শীগগিরই এস, নইলে আর দেখা হবে না।

শুভার পণ ভঙ্গ হ'তে আর দেরী নেই। তার এ কঠিন পণের একটী কাহিনী আছে, সেটী তোমায় না জানিয়ে সুস্থ হ'তে পারছি না। সে যখন ১৩।১৪ বছরের তখন একদিন আমি ঠাট্টা করে বলি, 'দিদি তুমি তো একবারও আমায় চোখের অন্তরাল কর না, কিন্তু এবার তো তোমার বিয়ে দেব, তখন আমায় ছেড়ে যেতে হ'বে।' সে বল্লে বিয়ে সে করবে না। আমি হেসে বললুম 'তাকি হয় রে বোকা মেয়ে, বিয়ে তোমায় করতেই হ'বে।' সে বললে, 'তা হ'লেও তোমায় ছেড়ে যাব না।'

'যে বিয়ে করবে, সে তোমায় রাখবে কেন দিদি? সে জোর করে নিয়ে যাবে যে।'

আমার এ কথার উত্তরে সে রাগ করে ব'লে ফেললে, তবে বিয়ের পর ত্রিরাত্রি ছাড়া, আমি তোমায় ছেড়ে আর' একরাত্রিও কোথায় থাক্‌ব না, এ আমি আমার সেই হবু স্বামীর নামে দিব্যি করেই বল্‌ছি দাদা।'

আমি বলে উঠলুম, 'ওকি বল্‌ছিস রে বোকা মেয়ে। সেও চুপ হ'য়ে গেল। তারপর সে আর কিছুতেই বিয়ে করতে চাইলে না। এতদিন পরে তোমায় দেখে তার সে পণ ভঙ্গ হ'ল, কিন্তু এ পণ সে ভাঙ্গলে না। সে বললে 'প্রাণ থাক্‌তে এ পণ ভঙ্গ ক'রে সে তোমার অমঙ্গল করবে না। পাছে তোমায় বললে তুমি জোর করে পণ ভঙ্গ কর, তাই সে তোমায় বলে নি। তোমার সাধ্বী স্ত্রী তোমার অমঙ্গল আশঙ্কায় এ পণ রক্ষা করে অনেক দুঃখে দিন কাটাচ্ছে। সে যে তোমায় কত ভালবাসে, তা একমাত্র আমিই জানি। আমার একটী পরিহাসের পরিণাম যে এমন দাঁড়াবে তা কে জান্‌ত বল? এখন আমি তো বললুম, তুমি এখন তোমার স্ত্রী-পুত্রের ভার গ্রহণ কর। আশীর্ব্বাদ নাও।

ইতি—আঃ
তোমাদের ঠাকুরদাদা।

ঠাকুরদাদার চিঠি পড়তে পড়তে অশোকের চোখ দুটী 'সজল হয়ে উঠল।' শুভার ভালবাসার পরিচয় পেয়ে, তার বুক আনন্দে ভরে উঠল, আবার দুঃখও হ'ল যে এমন অনুরক্ত সাধ্বী পত্নীর মনে সে কষ্ট দিয়েছে, একখানা চিঠিও তাকে লেখেনি।

যাই হোক, পরদিনই অশোক মাকে নিয়ে কল্‌কাতায় রওনা হল।

অশোকের ও শুভার নয়নজলে দু'জনের মিলন সাধিত হ'ল।

অশোক যাবার ২।৪ দিন পরে শুভার ঠাকুরদাদা অশোকের হাতে শুভাকে সঁপে দিয়ে আর তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাদের দু'জনকে দিয়ে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করলেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার জন্মকথা

[শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ]

কেহ হয় তো বলিতে পারেন, বাঙ্গালা দেশের একখানি সংবাদ পত্রের প্রচারের সঙ্গে এমন কি ঘটনাবলী বিজড়িত থাকিতে পারে যাহা অপর সকল সংবাদপত্র হইতে বিভিন্ন এবং যাহাতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ?

কিন্তু প্রকৃতই অমৃতবাজার পত্রিকার জন্মকথা ও উদ্দেশ্যের ভিতর এমন কিছু নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে যাহা অপর কোন সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তে আছে বলিয়া জানা যায় নাই এবং যাহা কেবল বাঙ্গালীর নহে, সমগ্র ভারতবাসীর গৌরববর্দ্ধক সুতরাং সকলেরই জানা আবশ্যক। তাহাই বলিবার জন্য এই প্রসঙ্গের সূচনা। (১)

৬২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৭৪ সালের শুভ ফাল্গুন মাসে (ইংরেজি ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে) যশোহর সহরের ১২ মাইল পশ্চিমে স্বচ্ছসলিলা কপোতাক্ষী নদীর তীরে পলুয়া মাগুরা (আধুনিক অমৃতবাজার) নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে "অমৃতবাজার পত্রিকা"র জন্ম হয়।

সে সময় এদেশীয়দিগের দ্বারা সম্পাদিত ও পরিচালিত যে কয়েকখানি সংবাদপত্র বাঙ্গালা দেশে বাহির হইত তাহার সকলগুলিরই জন্ম ও প্রচারক স্থান, হয় কলিকাতা না হয় অপর কোন প্রধান সহর। তন্মধ্যে সম্ভবতঃ "রংপুর দিক্‌প্রকাশ"ই একমাত্র সংবাদপত্র যাহা সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন রংপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনার বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী। তাঁহার ধন বল ও জন বল যথেষ্ট ছিল, সুতরাং নিজ বাসস্থান হইতে একখানি খবরের কাগজ বাহির করা তাঁহার পক্ষে বেশী কথা ছিল না।

"অমৃতবাজার পত্রিকা" ও (অবশ্য ইহার কিছুকাল পরে) এক সুদূর সামান্য পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার স্বত্বাধিকারী বা পরিচালকগণের সেরূপ অর্থের সচ্ছলতা ছিল না,—তাঁহারা ছিলেন পল্লীগ্রামের সাধারণ মধ্যবৃত্ত পরিবারের সন্তান। সুতরাং সে সময়কার কোন কোন কাগজওয়ালাদের মত কোনরূপ সখ বা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সংবাদপত্র পরিচালনা করা তাঁহাদের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর ছিল না। অর্থোপার্জ্জনও অবশ্য তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না; কারণ সে সময় সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা এত অধিক ছিল না যাহাতে সংবাদপত্র পরিচালনা একটী লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করা যাইতে পারিত। সুতরাং তাঁহারা যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া এত বড় দায়িত্বপূর্ণ ও ব্যয়সাধ্য একটা গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সুনিশ্চিত। সেই উদ্দেশ্য বিবৃত করিবার পূর্ব্বে "অমৃতবাজার পত্রিকা"র পরিচালকদিগের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক।

"অমৃতবাজার পত্রিকা"র পরিচালকগণ হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার ও মতিলাল—এবং তাঁহাদিগের অগ্রজ বসন্তকুমার, জন্মাবধি পল্লীগ্রামে বাস করিয়া, পল্লীবাসী সকল শ্রেণীর লোকদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা মেশা করিয়া এবং তাহাদের সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়া তাহাদিগের সুখ দুঃখের ভাগী হইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের উপর তাঁহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, যখন জীবমাত্রই শ্রীভগবানের সৃষ্ট, তখন সকলেই সকলের সহিত ভ্রাতৃভাবে বিজড়িত, সুতরাং পরস্পরের সাহায্য করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই যেন

---

(১) Mr Foulger নামক একজন ইংরেজ বিলাতের Daily Mail নামক দৈনিক পত্রের গ্রাহক-সংখ্যা ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি অল্পদিনের মধ্যে কিরূপ হইয়াছিল তৎ সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দেন। এই সম্পর্কে মহাত্মা শিশিরকুমার ১৯০৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখের দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় Romance of an Indian news paper শীর্ষক একটা প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার জন্মকথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন

"Is the public aware that this humble journal, the Amrita Bazar Patrika has also a romance of its own,—a romance which is perhaps more enthralling than that of the Daily Mail or any other paper in the world."

তাঁহারা: জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাহারও দুঃখ কষ্ট দেখিলে, কিংবা কাহারও দুরবস্থার কথা শুনিলে, তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিতেন না, তাঁহাদের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। যখনই তাঁহারা কয়েকটী ভাই বোন একত্রিত হইতেন তখন তাঁহারা বাজে কথায় সময় কাটাই-কেন না,—কিসে গ্রামবাসীর ও দেশবাসীর দুঃখ দূর হইবে তাহাই হইত তাঁহাদের আলোচনার একমাত্র বিষয়।

তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, লোকের অবস্থার উন্নতি করিতে না পারিলে তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা কিছুতেই ঘুচিবে না, আর অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজন। এই জন্য বিশেষ চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা নিজগ্রামে উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয়, শিল্প-কৃষি ও নৈশ বিদ্যালয়, নারী-শিক্ষা-মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয়, ডাকঘর, সেবা-সমিতি, ব্যায়ামাগার, দরিদ্র ভাণ্ডার, হাটবাজার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত এবং গ্রাম্য রাস্তাঘাট, জলনিকাশের পথ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া নিজ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই সময় বসন্তকুমার ও তাঁহার ভ্রাতারা বুঝিয়াছিলেন, যেভাবে তাঁহারা ২।৪খানি গ্রামের উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছেন, সেভাবে সমগ্র দেশের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। সমগ্র দেশবাসীকে উন্নত করিতে হইলে সম্ভবতঃ সংবাদপত্রের মধ্য দিয়াই তাহা করিতে পারা যাইবে। কিন্তু এই ধারণা তখনও তাঁহাদের মনে তেমন বদ্ধমূল হয় নাই। বিশেষতঃ সামান্য পল্লীগ্রাম হইতে সংবাদপত্র প্রকাশিত করিবার মত অর্থ ও সামর্থ তাঁহাদিগের ছিল না বলিয়া এ বিষয় তাঁহারা অগ্রসর হইতে চেষ্টাও করেন নাই।

তাঁহারা আরও বুঝিয়াছিলেন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ তাহাদের প্রকৃত অবস্থা এবং তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রকৃত কারণ ও প্রতিকারের উপায় তাহাদিগকে জ্ঞাত করা তদপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় নহে। একমাত্র প্রচারের দ্বারা ইহা সুসিদ্ধ হইতে পারে, আর এই প্রচার কার্য্য সংবাদপত্রের সাহায্যে করিতে পারিলে অল্প আয়াসেই সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব। কিন্তু একটী বিশেষ কারণে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহাদের এই ধারণা ঠিক কি না। তাঁহারা দেখিলেন দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত যে কয়েক খানি সংবাদপত্র সে সময় চলিতেছিল তাহার অধিকাংশ পত্রেরই কলেবর ধর্ম্ম, সমাজ, হাস্যকৌতুক বা সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি পূর্ণ থাকিত,—দেশের ও দেশবাসীর কিসে মঙ্গল হইবে এবং তাহাদিগের প্রকৃত অভাব অভি-যোগ কি, তৎসম্বন্ধে কোন কথা বা আলোচনা তাহাতে থাকিত না।

তাঁহারা দেখিলেন, ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অতি কম, এবং পল্লীবাসীদিগের সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবরই রাখেন না, রাখিবার আবশ্যকও বোধ করেন না। অপর দিকে, ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা শিখিয়াছিলেন যে, ইংরাজেরা কখনও অন্যায় কার্য্য করেন না। আর তাঁহারা এ দেশে যে কার্য্যই করুন ভারতবাসীর মঙ্গল সাধনাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজা প্রজার মধ্যে যে কোন সম্বন্ধ আছে কি প্রজার প্রতি রাজার কোন কর্ত্তব্য আছে, তাহা লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই তাহারা কখনই উপলব্ধি করিতেন না) সুতরাং সংবাদপত্রগুলিও সেইভাবে পরিচালিত হইত যে দেশের লোকদিগের মতিগতি এইরূপ, সে দেশের সংবাদ পত্র দ্বারা প্রকৃত কোন মঙ্গল সাধিত হইতে পারে ইহা বসন্তকুমার তাঁহাদের ভ্রাতাদিগের ধারণার মধ্যেই আসিল না। কাজেই তাঁহারা কতকটা হতাশ হইয়া পড়িলেন।

যাহা হউক, এই সময় এরূপ একটী ঘটনা ঘটিল যাহা দ্বারা সংবাদপত্রের সাহায্যে দেশের লোককে সুশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ হইল। ইং ১৮৫৮ সালে নীলকরদিগের অত্যাচারে যশোহর ও তন্নিকটস্থ জেলাসমূহের কৃষককুল বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় যশোহর শহরের নিকটবর্ত্তী চৌগাছা নামক গ্রামের বিশ্বাসেরা প্রজাদিগের সাহায্যার্থে বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারা বহু অর্থব্যয় করিয়া প্রজা-দিগের দ্বারা নীলকরদিগের বিরুদ্ধে যশোহর আদালতে অনেকগুলি মোকদ্দমা রুজু করেন, কিন্তু ইহাতে কৃষকেরা কোন সুফল পায় নাই।

শিশিরকুমার তখন যশোহর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছিলেন। নীলকর-ঘটিত মোকদ্দমা লইয়া শহরে

বেশ একটু আন্দোলন আলোচনা চলিতেছিল। অষ্টাদশ-বর্ষীয় যুবক শিশিরকুমারও ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি অনেকসময় আদালতে উপস্থিত হইয়া মকদ্দমার বিবরণ শুনিতেন। প্রজাদিগের দারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। কি করিয়া কৃষক-দিগকে নীলকরদিগের কবল হইতে উদ্ধার করা যায় এই চিন্তায় তিনি বিভোর হইয়া থাকিতেন। শেষে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দাদাদের সহিত পরামর্শ করিয়া শিক্ষকের কার্য্য ছাড়িয়া দিলেন, এবং কৃষককুলের উপকারার্থে মনপ্রাণ নিয়োগ করিলেন।

শিশিরকুমার সামান্য বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া কেবলমাত্র একগাছি বংশখণ্ড সম্বল করিয়া নীলকর-প্রপীড়িত কৃষককুলের সাহায্যার্থে বাটীর বাহির হইলেন এবং আপন বিপদ গ্রাহ্য না করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রজাদিগের সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়া তাহাদিগের সহিত বসবাস করিয়া তাহাদিগের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহারা এতদিন সহায়সম্পত্তি বিহীন হইয়া একরূপ অকূলে ভাসিতেছিল। এক্ষণে শিশির কুমারের অভয়বানী শুনিয়া, তাঁহার নিকট হইতে সহানুভূতি পাইয়া তাহারা অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

তিনি কৃষকদিগকে বুঝাইলেন যে, নীলকরেরা প্রবল প্রতাপান্বিত, তাহাদের অর্থ ও সামর্থ্যের অভাব নাই। বিশেষতঃ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদিগের সহানুভূতি তাহাদের দিকে। এরূপ অবস্থায় নীলকরদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মকদ্দমা করিয়া সুফলের আশা নাই। তাহাদের সহিত লড়িতে হইলে একমাত্র অহিংস-অসহ-যোগের সহায়তা লইতে হইবে। কিন্তু ইহাও সহজসাধ্য নহে; ইহাতেও অনেক বাধাবিঘ্ন আছে, অনেক অত্যাচার, অনেক আপদ-বিপদ সহ্য করিতে হইবে। তবে কষ্টসহিষ্ণু হইয়া এই পথে অগ্রসর হইতে পারিলে, পরিণামে সুফল নিশ্চয় লাভ হইবে। ইহা করিতে হইলে "সঙ্ঘবদ্ধ" হওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ভিন্ন উদ্ধারের আর উপায় নাই। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সঙ্ঘ বদ্ধ হইতে হইবে; যেন কিছুতেই, শত সহস্র অত্যাচারেও ইহা ভাঙ্গিয়া না যায়। তখন ঈশ্বরের নাম লইয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, নীলের চাষ আর কখনও—প্রাণ গেলেও করিব না। এইরূপে নীলবোনা বন্ধ করিতে পারিলে, নীলের ব্যবসায় ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিবে, এবং তখনই নীলকরদিগকে পাততাড়ি গুটাইয়া এস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং তখনই কৃষকদিগের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর হইবে।

শিশিরকুমারের এই যুক্তি- এই অভয়বাণী—কৃষকেরা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিল। বিশেষতঃ নীলকরদিগের চক্রান্তে মকদ্দমাগুলি যে ভাবে মীমাংসিত হইল তাহাতে প্রজাদের চক্ষু খুলিয়া গেল, তাহারা হাড়ে হাড়ে বুঝিল 'সিন্নিবাবুর' (২) সুপরামর্শমত না চলিলে তাহাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই। তখনই ঈশ্বরের নামে তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল—"এই হাতে আর নীল বুনিব না।" যেমন
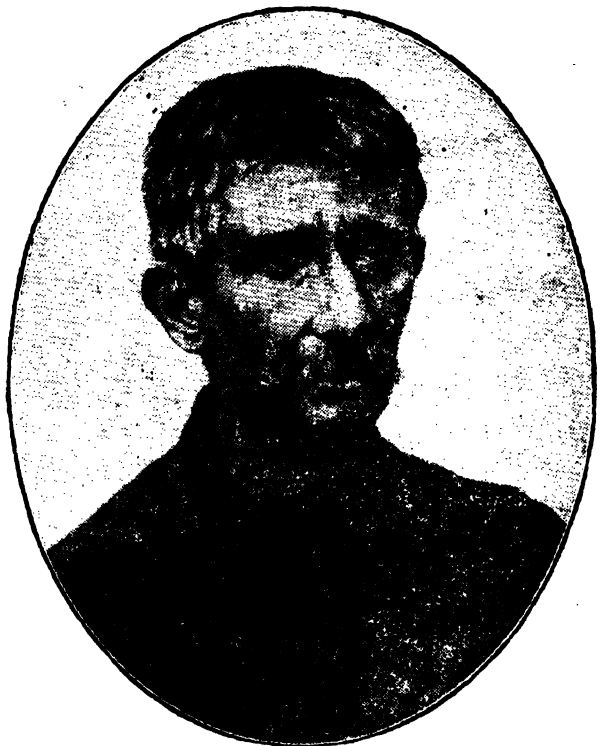
মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

কথা তেমনি কাজ। দেখিতে দেখিতে নীলের চাষ বন্ধ হইয়া আসিল এবং ক্রমে প্রজাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।

এই সময় নীলকর-প্রপীড়িত প্রজাদিগের দুরবস্থার হৃদয়বিদারক কাহিনী "হিন্দু পেট্রিয়ট" কাগজে প্রকাশিত হইত। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক শিশিরকুমার এই সকল লিখিয়া পাঠাইতেন এবং "হিন্দুপেট্রিয়টের" তৎকালীন

(২) কৃষকেরা শিশিরবাবুকে "সিন্নিবাবু" বলিয়া ডাকিত।

কর্ণধার প্রাতঃস্মরণীয় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গুলি যত্ন সহকারে আপনার কাগজে প্রকাশ করিতেন এবং নিজেও সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই সম্বন্ধে তীব্রভাষায় লেখনী চালনা করিতেন।

ক্রমে শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর দৃষ্টি এই দিকে পড়িতে লাগিল। তাঁহারা এই সকল কাহিনী পাঠ করিয়া বিচলিত হইলেন এবং এই সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন উত্থাপিত করিলেন। জনকয়েক সদাশয় ইংরেজও এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন। তাহার ফলে পার্লিয়ামেন্টে পর্য্যন্ত এই বিষয়ে আলোচনা হইল।

বসন্তকুমার ও তাঁহার ভ্রাতারা "হিন্দুপেট্রিয়ট" মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। এই সময় তাঁহাদের পূর্ব্বের ভুল ধারণা দূর হইল,—সংবাদপত্রের সাহায্যে দেশের ও দশের মঙ্গল প্রকৃতই যে সাধিত হইতে পারে তাহা তখন

হেমন্তকুমার ঘোষ

তাঁহারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা এতদিন তাঁহাদের মনোমধ্যে যাপ্য ছিল, এখন ইহা প্রবলবেগে তাঁহাদের সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করিয়া বসিল। তখন তাঁহারা সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সে সময়ে আর্থিক অবস্থার অসচ্ছলতার জন্য তাঁহারা কোনপ্রকারে কিছু টাকা জোগাড় করিলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সহ একটী প্রেস ক্রয় করার পক্ষে এই টাকা যথেষ্ট নহে জানিয়াও শিশিরকুমার ইহাই লইয়া কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে গিয়া কয়েকদিনের চেষ্টায় একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রেস সরঞ্জামসহ অতি সস্তায় হস্তগত করিলেন। (৩)

প্রেস তো জোগাড় হইল, এখন ইহা চালাইবার ব্যবস্থা কি করা যাইবে, তাহাই হইল শিশিরকুমারের বিশেষ চিন্তার বিষয়। কারণ কলিকাতা হইতে প্রেসের লোকজন লইয়া যাওয়া বিশেষ ব্যয়সাধ্য। শেষে তিনি স্থির করিলেন, আর কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া প্রেস সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য নিজে শিখিবেন এবং গ্রামে গিয়া লোক শিখাইয়া লইবেন। তখন একটী ছাপাখানার মালিকের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া সেই ছাপাখানায় দিবারাত্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে অক্ষর সাজান হইতে কর্ম্ম ছাপান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য মোটামুটি শিক্ষা করিলেন। (৪) তাহার পর ছাপাখানার সরঞ্জামসহ শিশিরকুমার নৌকাযোগে বাটীতে আসিলেন।

বসন্তকুমারের বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হওয়ায় তিনি

(৩) The Amrita Bazar Patrika cost its founders only Rs 24[illegible] when they ushered it into existence. This is how the 'Patrika' first made its appearance, Some body had purchased printing materials at Ahiritola, Calcutta, but he failed and dying soon after, his widow wanted to dispose of them. These materials were purchased and carried to Amrita Bazar, an ordinary village in the district of Jessore. The most valuable of these materials was the printing press, a wooden one, called Balion press, which cost Rs—32. B. P. 4. 1. 04.

(৪) Those who did all this pad, however, to learn the business of printing before leaving Calcutta.—Ibid.

কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভগিনী গোলোকগতা স্থিরসৌদামিনী দেবী নিজ করচায় এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন :-

"দাদার (বসন্তকুমারের) চিরজীবনের সাধ এদেশে একটী ছাপাখানা করিয়া একখানি সংবাদপত্র বাহির করিবেন। এইজন্য কলিকাতা হইতে কাষ্ঠের একটী মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া বাটীতে আনা হয়। আমি তখন শ্বশুরালয়ে। মুদ্রাযন্ত্র পাইয়া তিনি আমাকে একখানি পত্র লেখেন। পত্রখানি পাঠ করিলে বোঝা যাইবে তিনি কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন। ইহা ঠিক যেন কোন সরল বালকের লেখা বলিয়া ধারণা হইবে। বহুকাল হইয়া গেলেও এই পত্রের কথা এখনও আমার পরিষ্কার স্মরণ আছে। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

'ভগিনি, আমি একটা জিনিস পাইয়াছি, তাহাতে আমার এত আনন্দ হইয়াছে যে, তোমাকে তাহা লিখিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তুমি মনে ভাবিবে আমার একটা খুব বড় চাকুরী হইয়াছে, কিন্তু চাকুরী ইহার কাছে অতি তুচ্ছ। হয় তো তুমি ভাবিবে আমার একটী পুত্র-সন্তান হইয়াছে! ইহার তুলনায় তাহাও অতি সামান্য বলিয়া বোধ করি। তোমরা মনে কর দাদা বড় পুণ্যবান্‌। কিন্তু সর্ব্বান্তর্য্যামী জানেন আমি কত বড় পাপী। তবুও এই হতভাগার উপর তাঁহার কত করুণা! আমি কলিকাতা হইতে একটী মুদ্রাযন্ত্র আনাইয়াছি। আজ আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইল!'"

প্রথমে গ্রাম্য সূত্রধরের সাহায্যে কাঠের প্রেসটী মেরামত করিয়া খাটান হইল (৫)। তাহার পর শিশিরকুমার কয়েকটী যুবককে অক্ষর সাজান হইতে কাগজ ছাপা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যগুলি শিখাইতে লাগিলেন। ছাপাখানার কার্য্যগুলি মোটামুটী ঠিক হইয়া গেলে, প্রথমেই সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি বিষয়ক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল। ইহার নাম দিলেন "অমৃত-প্রবাহিনী পত্রিকা", আর সম্পাদকীয় ভার লইলেন বসন্তকুমার নিজে। ইচ্ছা থাকিল ক্রমে রাজনীতি সম্বন্ধে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিবেন।

কিছুকাল "অমৃত-প্রবাহিনী" নিয়মমত বাহির হইবার পর বসন্তকুমার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে লইয়া সকলে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় কাগজ বন্ধ রাখিতে হইল। চিকিৎসাও সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটী হইল না, কিন্তু পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে একদিন বসন্তকুমারের অন্তিম কাল উপস্থিত হইল। সেই সময় তিনি বলিলেন, "বড় সাধ ছিল দেশের কিছু কাজ করব, তা তো হ'য়ে উঠলো না। তোমরা আমার সেই সাধ পূর্ণ ক'রে আমাকে সুখী কোরো।" ১২৭১ সালের ১২ই চৈত্র বসন্তকুমার পরলোকগত হইলেন।

মতিলাল ঘোষ

অগ্রজের মৃত্যুতে তিন ভাই মুহ্যমান হইলেও তাঁহার শেষ কথাগুলি লইয়া প্রায়ই তাঁহারা আলোচনা করিতেন। ক্রমে তাঁহারা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার ইঙ্গিতানুসারে দেশের ও দশের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা আলোচনা করিবার জন্য একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সত্বর বাহির করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

কিন্তু একটী বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হইল। তাঁহারা দেখিলেন, স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র পরিচালনা করিতে না

(৫) It was set up with the help of the village carpenter H. B. P. 4. 10. 4.

পারিলে সকল কথা খুলিয়া বলা ও গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ সরলভাবে সমালোচনা করা সম্ভবপর হইবে না। আর স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ের আলোচনা না করিলেও দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হওয়া অসম্ভব।

এই সময় তাঁহাদের পিতার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় এই বৃহৎ পরিবারের ভার তাঁহাদের উপর পড়িল। সংসার চালাইবার জন্য বসন্তকুমারের প্রথম তিন ভ্রাতাকে চাকুরী গ্রহণ করিতে হইল। [বসন্তকুমারের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তৎকালীন যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মনরো ও তাঁহার সহযোগী মিঃ ওকিনালী (যিনি পরে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন) সাহেবদ্বয়ের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার ইনকমট্যাক্সের এসেসরের কার্য্য গ্রহণ করেন। সংবাদপত্র স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিতে হইলে চাকুরী ছাড়িতে হইবে, ইহা তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিলেন। তখন জননীর অনুমতি লইবার জন্য তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন, ছেলেদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "বাবা, জীবের মঙ্গলের জন্যই শ্রীভগবান তোমাদিগকে এরূপ মতিগতি দিয়াছেন। জীবের দুঃখ দূর করার মত মহৎ কার্য্য আর কি আছে? দুটো শাক-ভাত খাইয়াও আমরা জীবনধারণ করিতে পারিব। সুতরাং আমাদের জন্য তোমরা ভাবিবে কেন? জীবের মঙ্গলার্থে যখন তোমাদের মন ব্যাকুল হইয়াছে, তখন তোমরা কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন গ্রাহ্য না করিয়া সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলকার্য্যে মন-প্রাণ ঢালিয়া দাও। শ্রীভগবান তোমাদের সহায় হইবেন। এই কার্য্যের দ্বারা তোমাদের পিতৃদেবকে এবং আমার বসন্তকে তোমরা সুখী করিতে পারিবে।"

জননীর আশীর্ব্বাদ ও অনুমতি পাইয়া পুত্রদিগের হৃদয়ের গুরুভার যেন নামিয়া গেল। তাঁহারা সোৎসাহে কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। শিশিরকুমার ও হেমন্তকুমার প্রথমে মনরো ও ওকিনালী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা সমস্ত কথা শুনিয়া নানা প্রকারে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহারা অচল-অটল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন তাঁহাদের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "এই কার্য্যে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য পাইবে।" পরে তাঁহারা নানাপ্রকারে বিজ্ঞাপন দিয়া ও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া সাহায্যও করিয়াছিলেন। সাহেবেরা তখন ভাবিয়াছিলেন এই সংবাদ পত্রের দ্বারা তাঁহারা নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইবেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের সে ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

ঘোষ ভ্রাতারা তখন ছাপাখানাটী গোছাইয়া লইবেন। সংবাদপত্র বাহির করিবার মত সাজসরঞ্জামাদি কলিকাতা হইতে আনীত হইল। যে সকল দ্রব্যাদি সর্ব্বদা আবশ্যক হইতে পারে তাহা বাটীতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। কার্য্যের সুবিধা হইবে বুঝিয়া, শিশিরকুমার ছাপার কালি প্রস্তুত করিলেন, কালি ভালই হইল, সুতরাং কলিকাতা হইতে কালি আনিবার আর প্রয়োজন হইল না। কাগজের অভাব দূর করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে গিয়া কাগজ প্রস্তুত-প্রণালী শিখিয়া আসিলেন, কিন্তু আবশ্যক মত কাগজ তৈয়ার হইল না। অক্ষরাদিরও অনেক সময় অভাব হইবে বুঝিয়া অক্ষরঢালা যন্ত্র ও অক্ষরের ছাঁচ আনিলেন, ইহাতে কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইল। কখনও কখনও এরূপ অক্ষরের আবশ্যক হইত যাহার ছাঁচ আনা হয় নাই। সেই ছাঁচ বাটীতেই প্রস্তুত করিয়া লইতেন, এবং তদ্দ্বারা মোটামুটি কাজ চলিয়া যাইত; আবার কোন অক্ষরের বিশেষ অভাব হইলে এবং তাহা প্রস্তুত করিতে না পারিলে প্রবন্ধ হইতে সেই অক্ষরটী বাদ দিবার জন্য উহা অন্যরূপ করিয়া লিখিয়া লইতেন। অক্ষর-যোজনা করা কাগজ ছাপা, কালির রোলার ঢালা, শিশিরকুমার পূর্ব্বেই শিখিয়াছিলেন এবং গ্রামস্থ কয়েকজনকে শিখাইয়াও লইয়াছিলেন। (৬)

সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়া, বসন্তকুমারের মৃত্যুর একবৎসর পরে অর্থাৎ ১২৭৪ সালের ফাল্গুন মাসে ডিমাই ৮পৃষ্ঠা একখানি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র অমৃতবাজারের

---

(৬) Besides holding composing sticks and pulling the press for printing their sheets they had to cast rollers and types, prepare matrices, manufacture ink, as also paper, In paper making they failed, but they manufactured fine ink. The matrices and types which they cast were also very poor products, though they were utilized in times of urgent needs.

অমৃত-প্রবাহিনী যন্ত্র হইতে প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহার অক্ষর-যোজনা হইতে কাগজ ছাপা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য কনিষ্ঠভ্রাতা ও অন্যান্য কয়েকজনকে লইয়া শিশিরকুমারকেই করিতে হইল। এই ধরণের কার্য্য পরবর্ত্তী সময়েও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে করিতে হইত। কারণ ডিমাই ৮পৃষ্ঠা একখানি খবরের কাগজ নিয়ম মত প্রতি সপ্তাহে বাহির করিবার মত লোকজনের ব্যবস্থা তখনও করিতে পারেন নাই। তাহার পর কেহ অনুপস্থিত থাকিলে কিংবা কার্য্যের চাপ বেশী পড়িলে শিশিরকুমারকে দিবারাত্র খাটিতে হইত।

কাগজের নাম রাখা হইল "অমৃতবাজার পত্রিকা।" জননী অমৃতময়ীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই ঘোষ ভ্রাতারা পূর্ব্বেই নিজ গ্রাম, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও ডাকঘরের নাম করণ "অমৃতবাজার" বলিয়াই করিয়াছিলেন। এইবার সংবাদপত্রের নামের সহিত মাতা অমৃতময়ীর নাম বিজড়িত করিয়া ইহা জগদ্ব্যাপী করিলেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার মটো (motto) হইল :—

"অধীনতা-কালকূটে—মরি হায় ! হায় !
করেছে কি আর্য্যসুতে !! চেনা নাহি যায়।"

এইভাব ইহার পূর্ব্বে ভারতবাসীদিগের মধ্যে আর কেহও বোধ হয় এরূপ পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করেন নাই। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটী প্রস্তাবনা শিশিরকুমার স্বয়ং লিখিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন বলা ঠিক হয় না, কারণ তিনি ইহা কাগজে লিপিবদ্ধ করেন নাই, অক্ষরাধারের সম্মুখে উপবেশন করিয়া অক্ষর সাজাইবার ষ্টিক (Stick) হাতে লইয়া, মনে মনে প্রবন্ধ রচনা করিয়া, একেবারে সাজাইয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে সময়েরও অনেকটা সাশ্রয় হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে কোনও কোনও প্রবন্ধ তিনি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সাজাইয়া লইতেন।

শিশিরকুমার পূর্ব্বে নীলকরদিগের অত্যাচার-কাহিনী ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে ইংরেজীতে "হিন্দুপেট্রিয়ট" কাগজে প্রবন্ধ লিখিতেন। ইহা পাঠ করিয়া অনেকে মুগ্ধ হইতেন। কিন্তু তিনি যে এমন সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালা লিখিতে পারেন তাহা কেহই জানিতেন না। Mottoর ভাবটী তিনি তাঁহার প্রবন্ধে এরূপ জীবন্ত ভাষায় মনোমোহকর রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন যে, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে নূতন একটী আলোক পাইলেন। এই ভাব ক্রমে আরও প্রস্ফুটিত করিয়া তিনি এ দেশীয়দিগকে তাহাদের অবস্থার কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়াছিলেন। তাহার ফলে এদেশীয় অনেকেই অমৃতবাজার পত্রিকাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন ও তাহার কর্ণধারকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। এই সকল কথা এবং অমৃতবাজার পত্রিকা এই ৬২ বৎসর নানারূপ বিপদ-আপদ বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া আপন পদমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া, কি ভাবে দেশের ও দশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়া আসিতেছেন, তাহা বারান্তরে বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শীতকালে লণ্ডন

[শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি-এল]

গত শীতকালে লণ্ডনে ছিলাম। দারুণ শীত। বাংলা দেশের সহিত শীতের তুলনা করা যায় না। যাঁহারা পাহাড়ে বা সুদূর পশ্চিম প্রদেশের শীত ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা এ শীতের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন। তবে শুক্‌না শীত এখানকার মত স্যাঁৎসেঁতে নয়। ভাল রকম পোষাক পরিয়া শীতে চলা-ফেরা করিয়া বেড়াইলে সর্দ্দি কাশিতে যে ভুগিতে হইবে তাহা নয়। ইহার উপর যে-দিন বরফ পড়ে, সে-দিন শীত বড়ই বৃদ্ধি পায়। বরফও কয়েকদিন মাত্র পাইয়াছিলাম। তবে প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে, বরফ পড়িবার পর চারিদিক সূর্য্যকিরণে হাসিয়া উঠে। বোধ হয় তাহা না হইলে মানুষ সহ্য করিতে পারিত না। অন্ধকার যে দুই হাত দূরের জিনিস কিছুই দেখা যায় না—রাস্তাঘাট চলা অত্যন্ত দুষ্কর ও সর্ব্বদা বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠে। পাহারাওয়ালারা টর্চ জ্বালিয়া চারিদিকে নরনারীগণকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। 'ফগ' হইলে কাজকর্ম্ম প্রায় বন্ধ থাকে। প্রকৃতির আর একটী নিয়ম এই যে, 'ফগ' বেশী সময় থাকে না। এইরূপ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াও লণ্ডনবাসী বেশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করে, আমোদ-প্রমোদ করিয়া বেড়ায়; তাহার প্রধান কারণ আবহাওয়া খুব ভাল। অতঃবড় কলকারখানায় শহর ধোঁয়ায় ভর্ত্তি তথাপি আমাদের যে কোন শহর অপেক্ষা আবহাওয়া ভাল বলিয়াই বোধ হয়।

ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড

লণ্ডনের আর একটী বৈশিষ্ট্য—লণ্ডন 'ফগ' বা আঁধি। লণ্ডন 'ফগ'—যাঁহারা সুদূর পশ্চিম-ভারতের আঁধি দেখিয়াছেন তাঁহারা কতকটা অনুভব করিতে পারিবেন। এতই

লণ্ডনে দেখিবার স্থানসকল

লণ্ডনে অনেকগুলি দেখিবার জিনিস আছে। আমি যেখানেই যাইতাম সেইখানেই অনেক লোকসমাগম

দেখিতে পাইতাম– শীত বলিয়া লণ্ডনবাসিগণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। রাস্তায়, ট্রামে, ট্যাক্সিতে, বাসে পথিকের সর্ব্বদাই ভিড়। কলিকাতায় ডালহাউসি স্কোয়ার কিংবা এসপ্লানেডে যেরূপ ভিড় দেখেন তাহার অপেক্ষা বহুগুণ

বাকিংহাম প্যালেশ

লণ্ডন ব্রিজ
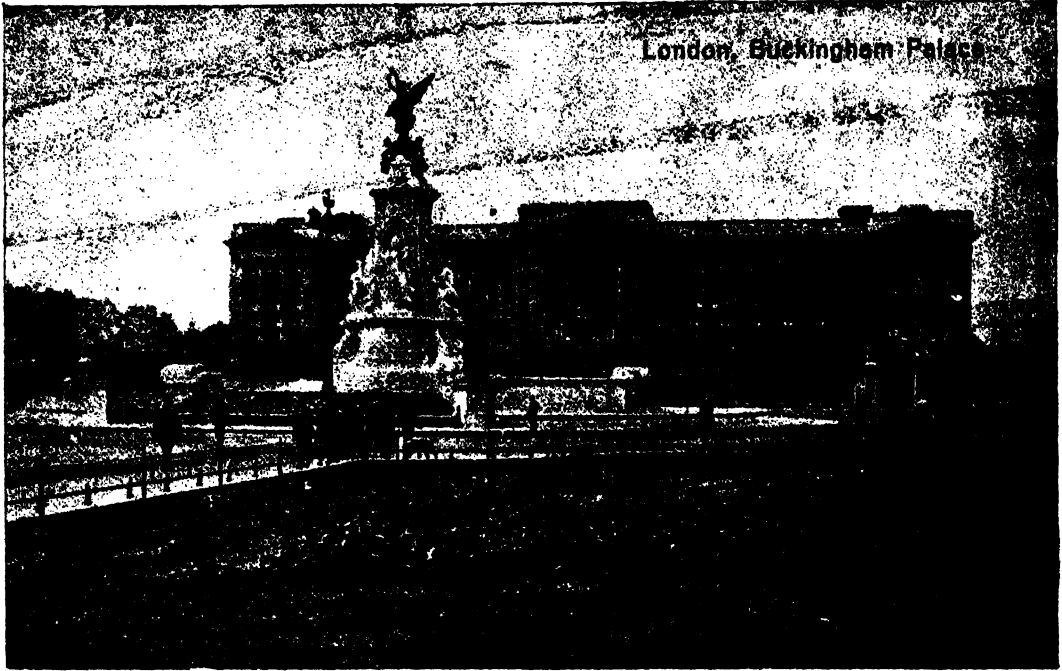
বেশী ভিড় লণ্ডনে দেখা যায়। অনেক সময় প্রাণ হাতে করিয়া রাস্তায় পার হইতে হয়। রাস্তায় দুর্ঘটনাও বহু ঘটে। প্রতিদিন প্রায় ৫০০ পাঁচশত দুর্ঘটনা লণ্ডনে ঘটিয়া থাকে। তাহার মধ্যে কয়েক জন করিয়া প্রতিদিন মৃত্যুমুখে পতিত

ওয়েষ্টমিনিষ্টর ব্রিজ ও পার্লামেণ্ট

রয়েল হর্স গার্ডস, হোয়াইট্ হল
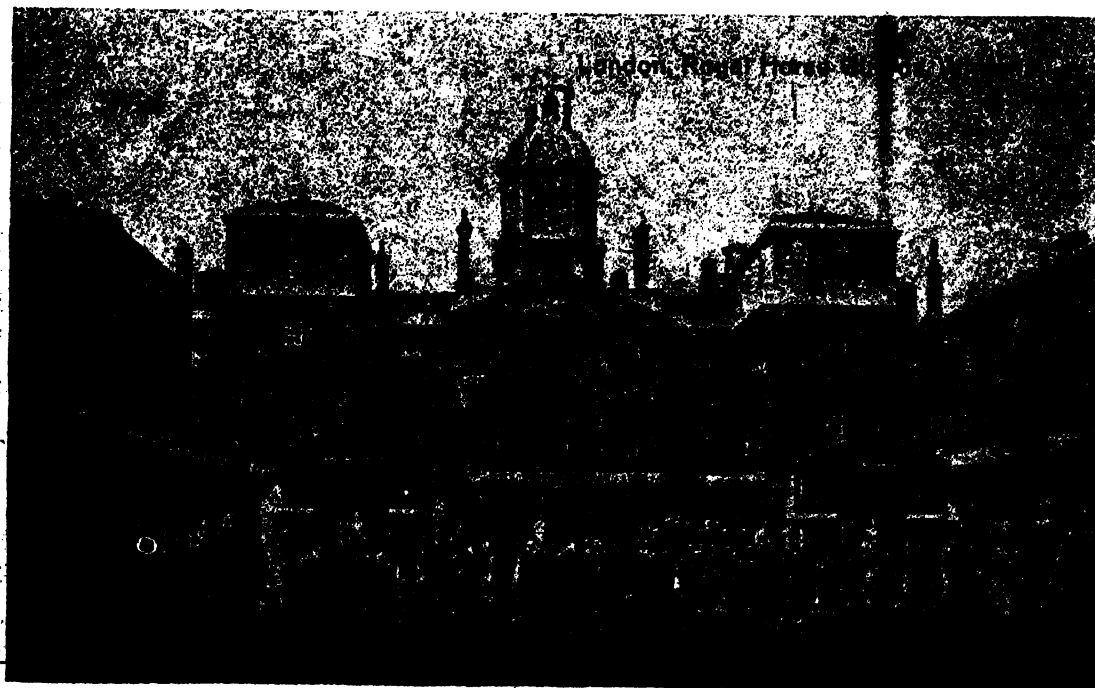
হয়। সেই জন্য খুব ভিড়ের জায়গাগুলি পার হইবার নিমিত্ত কোন কোন স্থানে মাটীর নীচে দিয়া রাস্তা ('সবওয়ে') আছে। কর্ম্ম উপলক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে অনককেই যাইতে হয়, এখানেও খুব ভিড়; তবে ইহার অপেক্ষা অধিকতর ভিড়ের জায়গা আরও অনেক আছে। আর বেলা ১০॥০ টার সময় প্রহরী বদল হয়। প্রহরীদের উর্দ্দির রং এবং তাহাদের সাজসজ্জা ও বদল হয়। আর একটী দেখিবার স্থান লণ্ডন ব্রিজ। এইটী অবশ্য 'উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর' নহে। ইহার উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে রেল—মাটীর নীচের ষ্টেশন (টিউব ষ্টেশন) ওয়াটার্লুর নিকট। মাটীর নীচের রেলগুলি যাতায়াতের পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক। খুব তাড়াতাড়ি চলে—অথচ ভাড়া বেশী নহে —একটাই শ্রেণী। কোনও স্থান হইতে কোন স্থান লণ্ডনে যাইতে হইলে টিউব রেল দিয়া যাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক প্রথমে লণ্ডনে পৌঁছিয়া চলন্ত সিঁড়িতে একেবারে পাতালপুরী নামিয়া বৈদ্যুতিক আলোকমালায় শোভিত ইন্দ্রভুবন টিউব ষ্টেশনগুলি দেখিয়া হকচকিয়া যাইতে হয়। পৌঁছিবার ২।৩ মিনিট মধ্যে টিউব রেল পাওয়া যায়। গাড়ী পৌঁছিবামাত্র কলে গাড়ীর দরজাগুলি খুলিয়া যায়। যাত্রীগণ উঠিবামাত্র দরজাগুলি আবার কলে বন্ধ হইয়া যায়। তবে একবার দরজা বন্ধ হইতে আরম্ভ হইলে যত বড়লোক হউন না কেন বা যত প্রয়োজন থাকুক না কেন, উঠিতে পারিবেন না। লণ্ডনে ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজ এবং পার্লামেণ্ট আর একটী বিশেষ দ্রষ্টব্যস্থান। দর্শকগণ প্রতি শনিবার বেলা সাড়ে তিনটার পূর্ব্বে যদি পার্লামেণ্ট না বসে তাহা হইলে বিনা দর্শনীতে দেখিতে পারেন। আরও কয়েকটী ছুটির দিন ঐরূপ দেখিতে দেওয়া হয়। বেলা সাড়েতিনটার অর্থ বেলা সাড়ে তিনটার সময় শীতকালে সন্ধ্যা হয়। আর বেলা ৮টায় সূর্য্যালোক দেখিতে পাওয়া যায়। তবে দিনের বেলায়ও বৈদ্যুতিক আলোক

ট্রাফালগার স্কোয়ার

একটী দেখিবার স্থান বাকিংহাম প্যালেস—সম্রাটের শহরের বাসস্থান। সাধারণকে এই প্রাসাদের ভিতর ঢুকিয়া দেখিতে দেওয়া হয় না। যখন সম্রাট এই প্রাসাদে থাকেন প্রাসাদের উপর রাজপতাকা উড়িতে থাকে এবং ব্যতীত কার্য্য করা কঠিন, কারণ প্রায় সর্ব্ব সময়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে। বেলা ১০টা হইতে সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত হাউজ অফ লর্ডস নরম্যান টর্চ দিয়া ঢুকিতে হয়। তবে পার্লামেণ্টের মেম্বরগণ যে কোন দিন

দর্শকগণকে লইয়া যাইতে পারেন এবং যে সকল স্থান সাধারণতঃ দর্শকগণকে দেখিতে দেওয়া হয় না—তাহাও দেখাইতে পারেন। রবিবার ব্যতীত যে কোন দিন যদি পার্লামেন্ট না বসে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হল দর্শকগণ বেলা ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত দেখিতে পারেন। যখন পার্লামেণ্ট বসে তখন বেলা ১০টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত দেখিতে পারেন। হাউজ অফ কমন্সের বক্তৃতা শুনিতে হইলে রবিবার ব্যতীত যে কোন দিন বেলা ৪টা ১৫ মিনিটের পর, কিন্তু শুক্রবার বেলা ১১টা ১৫মিনিটের সময় টিকিটের সব দিন যাইলে অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হয়। অপেক্ষা করিবার জন্য দর্শকগণের ওয়েটিং রুম আছে। একজন লর্ড আদেশ দিলে হাউজ অফ লর্ডসের বৈঠক দেখিতে পাওয়া যায়। হাউজ অফ লর্ডসের বৈঠক প্রায় বেলা ৪টা ১৫ মিনিটের সময় সুরু হয়। যখন হাউজ অফ লর্ডসে আপীল মোকর্দ্দমার শুনানি হয় সেই সময় সাধারণে মোকর্দ্দমার শুনানি স্থানে হাজির থাকিতে পারেন। পার্লামেণ্টের সন্নিকটে হোয়াইট হল। এই খানেও সব সরকারী বড় বড় আফিস। রাজকীয় অশ্বারোহী
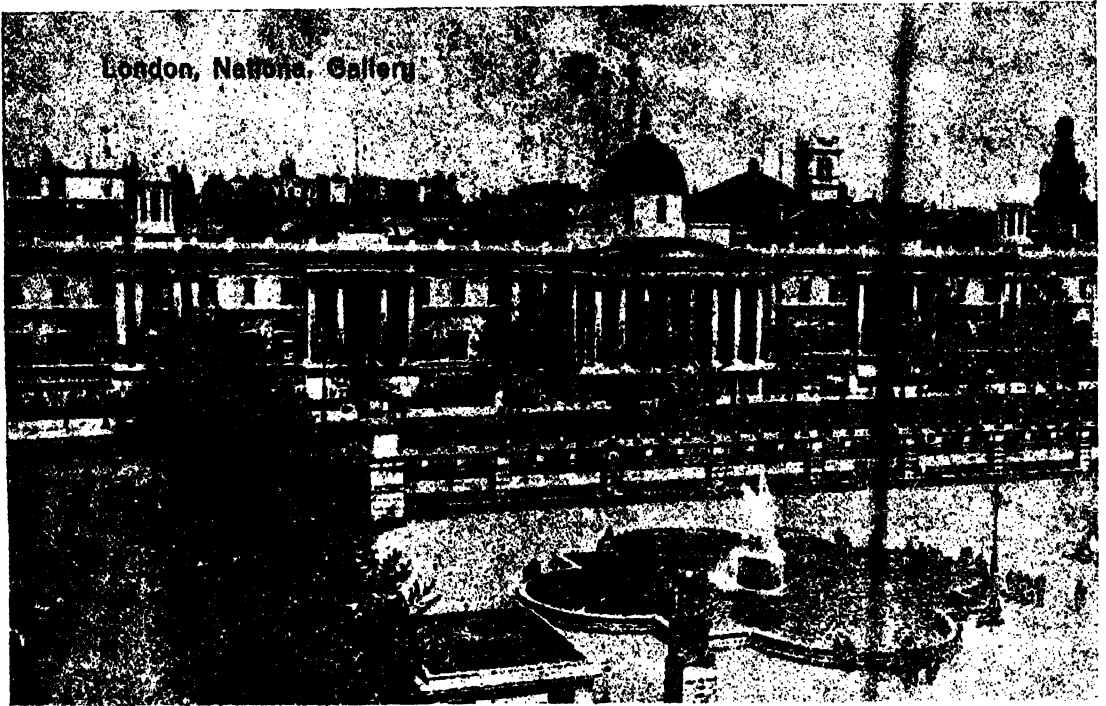
ন্যাশানাল গ্যালারি চিত্র-প্রদর্শনী)

জন্য সেণ্ট ষ্টিফেনস হলে দরখাস্ত করিলে টিকিট পাওয়া যায়। হাউজ অফ কমন্সের বৈঠক শুক্রবার ব্যতীত অন্য-দিন বেলা পৌণে তিনটার সময় বসিয়া সাধারণতঃ রাত্রি ৯টা হইতে ১১টার মধ্যে শেষ হয়। তবে কখন কখন বহুরাত্রি পর্য্যন্ত বৈঠক বসে। শুক্রবার বেলা ১১টায় বসিয়া বেলা সাড়ে চারিটার সময় সাধারণতঃ বৈঠক শেষ হইয়া থাকে। শনিবার ও রবিবার পার্লামেণ্টের বৈঠক বসে না। প্রধান প্রধান বিষয় সমাধানের জন্য পার্লামেণ্টে উপস্থিত হইলে দর্শকগণের স্থান পাওয়া কঠিন হয়। সেই প্রহরীরা এখানে পাহারা দিতেছে রয়েল হর্স গার্ড চিত্রে দেখিতে পাইবেন। ট্রাফলগার স্কোয়ার আর একটী দেখিবার স্থান। এই ট্রাফালগার স্কোয়ারের সম্মুখেই ন্যাশন্যাল চিত্র-প্রদর্শনী। এই চিত্রশালার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে ইতালীয়, ইংরেজেরও ডাচদিগের চিত্রগুলি বিশেষভাবে সজ্জিত আছে। ইতালীর এবং ফ্লোরেনটাইন চিত্র দেখিবার স্থান ইতালী ব্যতীত এই স্থান একমাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রবিবার এবং ব্যাঙ্কের ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খোলা

থাকে। রবিবার বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার দর্শনী ছয় পেনি এবং অন্যান্য দিন বিনা দর্শনীতে ঢুকিতে দেয়। বৃহস্পতিবার চিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়া থাকে।

কিংসওয়ে থিয়াটারে অভিনীত
The School for Scandalএর একটি দৃশ্য

লণ্ডনের মিউজিয়ম ও প্রদর্শনী অনেকগুলি দেখিবার আছে। সেই গুলি ভবিষ্যতে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল। অদ্য সেইগুলি বাদ দিয়া নাট্য-জগৎ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমার এবারকার বক্তব্য শেষ করিব।

ডিউক অব ইয়র্ক থিয়াটারে অভিনীত
Jew Sussএ Naemiর মৃত্যু-দৃশ্য

লণ্ডনে থিয়েটার।

লণ্ডনে বহু থিয়েটার এবং বায়োস্কোপ আছে। ইহাদের ভিতর যে কোনটীতেই গিয়াছি সেখানেই প্রেক্ষাগৃহ জনতায় পরিপূর্ণ। এত লোক থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখিতে যায়, তাহা আমরা ভারতবর্ষে ধারণা করিতে পারি না। আমাদের অপেক্ষা বহু লোকাকীর্ণ থিয়েটার ও বায়স্কোপ গুলি হইলেও ভারতবর্ষের মতন টিকিট কিনিবার দুর্ভোগ ভোগ করিতে হয় না। সব থিয়েটার এবং বায়স্কোপের এজেন্ট আছে তাহাদের নিকট টিকিট পাওয়া যায় এবং বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট (Reserve) থাকে। আর রঙ্গমঞ্চে টিকিট কিনিতে বহুলোক একত্র জমিলেই 'কিউ' করিয়া টিকিট কিনিয়া থাকে। লণ্ডনে কোন প্রকার ভিড়ের জন্য কোথাও প্রবেশলাভ কষ্টজনক নহে। প্রত্যেকেই 'কিউ' করিবার পক্ষে উদ্যোগী হইয়া রাস্তা সুগম করিয়া ফেলে।

লণ্ডনে প্রায় ৪৫টী থিয়েটার আছে। ইহার মধ্যে তিনটী "Talkei"তে পরিণত হইয়াছে—তিনটী আমি যে সময়ে ছিলাম সে সময় বন্ধ ছিল—১৩টী থিয়েটার পুরাতন নাটকগুলি অভিনয় করিতেছিল, বক্রী ২৬টী নিত্যনূতন নাটকে লণ্ডনবাসীকে আমোদ প্রদান করিতেছিল। রঙ্গ-মঞ্চ চালান বিলাতে বহু খরচ সাপেক্ষ। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের বেতন অত্যন্ত বেশী—বাটীর ভাড়া আগুন এবং গ্রন্থকারকে লভ্যাংশও যথেষ্ট দিতে হয়। তাহার উপর মার্কিণ দেশ হইতে Talkieর হুজুক আসিয়া থিয়েটার গুলিকে কোন ঠেসা করিয়া ফেলিয়াছে। মার্কিণ দেশ হইতে ভ্রমণকারী Talkie কোম্পানীতে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। আমি যে সময়ে ছিলাম সেই সময় Kings Way থিয়েটারে পুরাতন নাটক "The School for Scandal" অভিনীত হইতেছিল—Criterionএ "The Private Secretary—Everyman এ "The passing of the Third floor Back"—Comedyতে "The Ghost Train" অভিনীত হইতেছিল। দৃশ্যপটগুলি অতি মনোরম—Stage খুব বড়—অভিনেতাদের অভিনয় খুব স্বাভাবিক। এখানকার এবং সেখানকার থিয়েটারের মস্ত একটা তফাৎ দেখলাম—এখানে যেন বড় দেরী করে করে অভিনয় করে—সেখানে খুব তাড়াতাড়ি। এখানে যেন

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নড়িতেই চায় না—সেখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দর্শকগণের সহিষ্ণুতা অতিক্রম করে না। আমি ২।১টী দৃশ্য দেখাইয়া থিয়েটার বিষয়ের বক্তব্য শেষ করিব।

Duke of York Theatreএ "Jew Suss" অভিনীত হইতেছিল— Naemi এর মৃত্যু দৃশ্যটী আমার মনের উপর আঁকিয়া রহিয়াছে।

লণ্ডনের Cinema

অত্যন্ত শীতেও সমস্ত লণ্ডন আমোদ-প্রমোদে মাতিয়া থাকে। এত লোক থিয়েটার দেখে যে থিয়েটারের টিকিট অগ্রিম না কিনিলে স্থান পাওয়া যায় না। কিন্তু Cinema গুলিতে যাইলেই প্রায় স্থান পাওয়া যায়। এখন Rio Rita এখানে আসিয়াছে। আমি যে সময় ছিলাম সে সময় Tivoliতে Rio Rita দেখান হইতেছিল। Londonএ Cinema গুলিতে একটানা দেখান হয়। অর্থাৎ একটা সময় ধরুন বেলা ১২টার সময় Cinema আরম্ভ হইল—একবার শেষ হইল বেলা ২টায়; অমনি সঙ্গে সঙ্গে বেলা ২টায়, আবার আরম্ভ হইল—আবার শেষ হইল—বেলা ৪টায় আবার ৪টায় আরম্ভ হইল এইরূপ রাত্রি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত Continous performance চলিতেছে। দর্শক যখন খুসি কিংবা যখন তাহার ছুটি তখন গিয়া বসিল—আবার ঘুরিয়া যখন যে দৃশ্য হইতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই দৃশ্যে পৌঁছাইবে অমনি উঠিয়া যাইবে। এইরূপ Continious performanceর প্রথা হয় নাই। Rio Rita সম্বন্ধে বলিতেছিলাম—Rio Rita—উনিইয়র্কের একটী থিয়েটারের নাটক। থিয়েটারের দৃশ্যগুলি ছায়াচিত্রে পরিণত করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহার জন্যই Rio Rita অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং মাধুর্য্যময় হইয়াছে। সে সময় "New Galleryতে "Sunny side up" দেখান হইতেছিল। The Regalএ "Gold Diggers"—Capitolএ "Splentius, Alhambraতে "Atlantic" দেখান হইতেছিল।

এক্ষণে মধুরেণ সমাপয়েৎ করিতে চাহি। একটী সুন্দরী নর্ত্তকীর চিত্র দিয়া আমার অগুকার বিষয় শেষ করিব। কিংসওয়ে থিয়েটারের খ্যাতনামা অভিনেত্রী Angela Baddeleyর ছায়া চিত্র দিয়া আমি আজিকার মত বিদায় লইলাম।
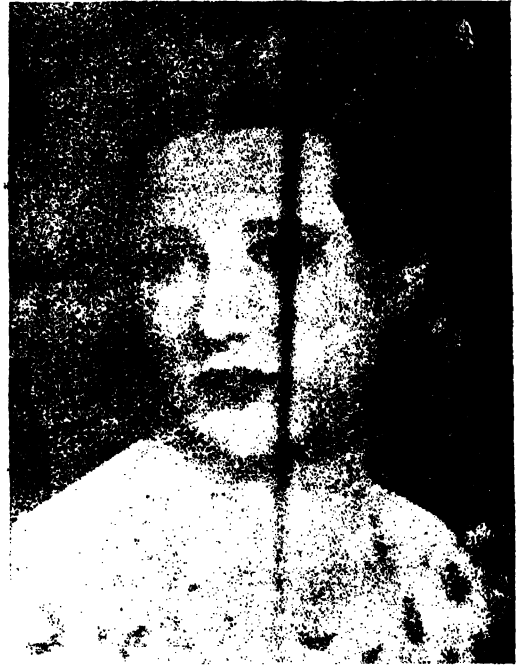
খ্যাতনামা অভিনেত্রী Angela Baddeley

নৈহাটীর নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু
ও
নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণি

(ন্যায়শাস্ত্রে বিচার)

[কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ]
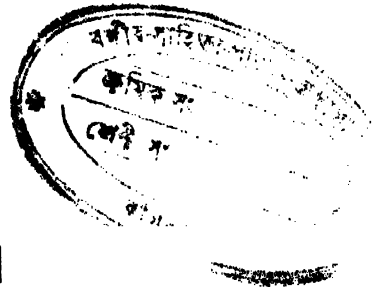
যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়ালের রায়-বংশ অতি প্রাচীন, প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত। কালীশঙ্কর রায় মহাশয় এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কালীশঙ্করের একটী মাত্র পুত্র ছিলেন, —ইঁহার নাম রামনারায়ণ। রামনারায়ণের তিন পুত্র, —রামরতন, হরনাথ ও রাধাচরণ। যখন বৃদ্ধ কালীশঙ্কর ৺কাশীধামে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র রামনারায়ণের মৃত্যু হয়। রামনারায়ণের তিনটী কৃতী পুত্রের মধ্যে রামরতনের নাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। লোকে অদ্যাবধি তাঁহাকে "রতন রায়" বলিয়া থাকে। তিনি যেরূপ প্রবল-প্রতাপ, সেইরূপ অতুল-ঐশ্বর্য্যশালী জমীদার হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ঘোর নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং হিন্দুর ক্রিয়া কলাপে মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। বাটীতে বিবাহের বা শ্রাদ্ধের সভায় তিনি বাঙ্গালা-দেশের যাবতীয় প্রধান প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপককে মহাসমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন, এবং তাঁহাদিগের বিচারের ফল দেখিয়ামুক্তহস্তে তাঁহা দিগকে বিদায় প্রদান করিতেন। রতনবাবু নড়াল-নিবাসী হইলেও চিৎপুরের উত্তর-দিগ্‌বর্ত্তী কাশীপুরে তিনি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া সেই স্থানেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন।

১২৬০ বঙ্গাব্দে, ৬ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, ১৬ ফেব্রুয়ারী) দিবসে রতন বাবু কাশীপুরে গঙ্গাতীরে মৃত পিতা রামনারায়ণের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করেন। শ্রাদ্ধ-সভায় বাঙ্গালা-দেশের বড় বড় অধ্যাপক উপস্থিত হন। সেই সভায় নবদ্বীপনিবাসী শ্রীরাম শিরোমণি ও তাঁহার পরম-প্রিয় বুদ্ধিমান্ ছাত্র গোলকচন্দ্র ন্যায়রত্ন, এবং নৈহাটী-নিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রামকমল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। এই নন্দকুমার, পরম-পূজনীয় সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর। তখন নন্দকুমারের বয়স্ ১৯ বৎসর মাত্র, এবং শ্রীরাম শিরোমণি প্রৌঢ়বয়স্ক পুরুষ। নন্দকুমার, "কেবলান্বয়ি"-গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য্যের টিপ্পনীর উপর দোষারোপ করিয়া পূর্ব্বপক্ষ করেন। শ্রীরাম শিরোমণিকে উত্তর পক্ষ গ্রহণ করিতে হইল। বারাসত-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় মধ্যস্থ হইলেন। শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের সম্ভ্রান্ত লোকগণও সভায় উপস্থিত রহিলেন। ঘোর ন্যায়যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বালক নন্দকুমার, প্রৌঢ় শ্রীরাম শিরোমণিকে এই তুমুল যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিলেন। তখন সভাস্থ লোক সকল বালক নন্দকুমারের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। "সংবাদ-ভাস্কর"-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য্য) মহাশয় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বীয় সংবাদ-পত্রে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল। ৭৬ বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালা ভাষার কিরূপ অবস্থা ও গঠন ছিল, তাহা এই উদ্ধৃত অংশ দেখিলে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায় :—

সংবাদ-ভাস্কর

১৩১ সংখ্যা। ১৫ বালম। ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৪। ৮ ফাল্গুন, ১২৬০, শনিবার।

শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ন রায়।

"জিলা যশোহর নড়াল নিবাসি কলিকাতার উত্তর কাশীপুর প্রবাসি ধর্ম্মরাশি মধুভাষি পুণ্যাকার বাবু রামরত্ন রায় মহাশয় গত বৃহস্পতিবারে (১২৬০ বঙ্গাব্দে, ৬ ফাল্গুন) গঙ্গাতীর কাশীপুরে তাঁহার পিতাঠাকুরের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, শ্রাদ্ধ-সভায় নবদ্বীপাদি নানা সমাজস্থ ন্যূনাধিক পাঁচশত ব্রাহ্মণপণ্ডিত

উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা । ন্যায় বেদান্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি নানা গ্রন্থের বিচার করিলেন, বিশেষত নৈহাটী-নিবাসি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামকমল ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুপাত্র পুত্র শ্রীমান্ নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্রের "কেবলাম্বয়ি" নামক গ্রন্থের গদাধর ভট্টাচার্য্যের টিপ্পনীর উপর এক আপত্তি করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শিরোমণি প্রভৃতি কেহ তাহার উত্তর করিতে পারেন নাই, এইক্ষণে শাস্ত্রীয় বিচারের আমোদ কেবল রামরত্ন বাবুর সভাতে দেখিতে পাই, আর কোন সভায় শাস্ত্রীয় বিচার হয় না, ধনি লোকেরাও বিচার শ্রবণে আমোদ করেন না অতএব শাস্ত্রলোপ হইবার এই এক প্রধান কারণ হইয়াছে।

শ্রাদ্ধসভায় মান্যলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মতিলাল এবং যশোহর কলিকাতাদি নিবাসি আর ২ মান্যবরগণ ও রঙ্গপুর মন্থনা ভূম্যাধিকারি শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীত্যাদি প্রায় দুইশত প্রধান মনুষ্য পর্ব্বোক্ত রাজাবাহাদুরের আবরণরূপে সভা শোভা করিয়াছেন, ব্রাহ্মণভোজন সময়ে রাজাবাহাদুর সাবরণ গাত্রোত্থান পুর্ব্বক বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান হইয়া রামরত্নবাবুর ব্রাহ্মণ-ভোজনের পারিপাট্য দর্শনে আহ্লাদ জ্ঞাপন করিয়া রামরত্নবাবুর নিকট বিদায় লইলেন এবং অন্যান্য মান্য লোকেরাও বাবুর সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া গৃহমুখ হইলেন তৎপরে কায়স্থভোজনারম্ভ হইল, রামরত্নবাবুর বাটীতে যত কায়স্থ নিমন্ত্রণ ভোজন করিতে আইসেন একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে এত কায়স্থভোজনের কাণ্ড অন্যত্র দেখি নাই, বাবু রামরত্ন রায় যেমন বিষয় কর্ম্মে শক্ত, দৈব পৈত্রিক কর্ম্মেতেও তেমনি ভক্ত, রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত কায়স্থাদি ভোজনে তুল্যরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।"

৬ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবারের সভায় পরাস্ত হইয়া শ্রীরাম শিরোমণি, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও রতনবাবুর নিকট প্রার্থনা করেন যে, আগামী ৯ ফাল্গুন, রবিবার দিবসে পুনর্ব্বার বিচারের জন্য সভা করা হউক। তাহাতে উভয়েই শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। রবিবার উপস্থিত হইলে প্রাতঃকাল হইতেই বিচার চলিতে লাগিল।

নন্দকুমার বাদী, শ্রীরাম শিরোমণির সর্ব্বপ্রধান ও বুদ্ধিমান্ ছাত্র গোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রতিবাদী, শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মধ্যস্থ এবং রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। সিংহ ও ব্যাঘ্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সমস্ত দিন ধরিয়া বিচারের পরে গোলোক ন্যায়রত্ন পরাস্ত হইলেন। বালক নন্দকুমারের জয়লাভ হইল। সভায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই একবাক্যে বালক নন্দকুমারের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য সভায় বসিয়া বিচার শুনিয়া স্বীয় "সংবাদ-ভাস্করে" যথাযথভাবে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া দিলেন। ইহাতে শ্রীরাম শিরোমণি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার ভয় দেখাইয়াছিলেন। তখন গুড়গুড়ে ঠাকুর নিজমূর্ত্তি ধরিয়া স্বীয় সংবাদ-পত্রে যাহা লিখিয়া ছিলেন, তাহাও নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

সংবাদ-ভাস্কর

১৩৩ সংখ্যা। ১৫ বালম। ১৮৫৪ খৃঃ, ২৩ ফেব্রুয়ারি,
বৃহস্পতিবার। ১২৬০ বঙ্গাব্দ, ১৩ ফাল্গুন। ৫৩ পৃষ্ঠা।

শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় মহাশয়ের পিতাঠাকুরের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে কাশীপুরের বাটীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মহা সভা হইয়া ছিল তাহাতে রামকমল ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্রের কেবলান্বয়ি গ্রন্থে গাদাধরী টীকার উপর এক পুর্ব্বপক্ষ করেন, তদুপলক্ষে আমরা লিখিয়াছিলাম নবদ্বীপ সমাজস্থ শ্রীরাম শিরোমণি প্রভৃতি কেহ তাহার উত্তর করিতে পারেন নাই। সভা-ভঙ্গের পর ন্যূনাধিক দশ জন অধ্যাপক আমারদিগের নিকট এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়াছেন,তাঁহাতেই যথার্থ বিষয় লেখা হইয়াছিল, তথাপি শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় গাত্রদাহে আমারদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি কটুক্তি করিয়াছেন এবং শুনিলাম দ্বিতীয় সভায় বাবুর সাক্ষাতেও নানাবিধ শ্লেষবাক্য বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ন রায় মহাশয় এমতবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই অসঙ্গত বিষয়ের উত্তর না করিয়া ক্ষমা করেন, তবে যে শ্রীরাম শিরোমণির অসঙ্গত বাক্যে মৌনী ছিলেন ইহাতে বোধ হয় স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন কেন না তিনি নবদ্বীপের অধ্যাপকগণকে পোষ্যপুত্রের ন্যায় দেখেন, যাহা হউক, আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম শ্রীযুতের সাক্ষাতে দ্বিতীয় সভায় তাহা সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। গত রবিবারে রায় বাবুর বাটীতে নবদ্বীপের অধ্যাপকগণের প্রার্থনানুসারে দ্বিতীয় সভা হয়, তাহাতে শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় মধ্যস্থ ছিলেন, গোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় উত্তরপক্ষ পূর্ব্বপক্ষ বাদী নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য, আপত্তি সেই যাহা শ্রাদ্ধসভায় হইয়াছিল এবং শ্রীরাম শিরোমণি প্রভৃতি সকলে ঐ সভায় যে উত্তর করিয়াছিলেন গোলোক ন্যায়রত্ন সেই উত্তর করিলেন, ইহাতে মধ্যস্থ মহাশয় কহিলেন এ উত্তর উত্তর মাত্র। কিন্তু নন্দকুমার ইহার উপর যে দোষ দিয়াছেন তাহা অকাট্য, মধ্যস্থ মহাশয় যখন এ কথা কহিয়াছেন তখন আমারদিগের লিখন সপ্রমাণ হইয়াছে, অতএব শিরোমণি মহাশয়কে অনুরোধ করি নবদ্বীপের প্রধানাভিমানী হইয়া অকারণ আমারদিগকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করুন। প্রায়শ্চিত্ত করণে তাঁহার ভয়

নাই, আমারদিগের এই লেখনী তাঁহাকে তিন বার গোময় ভক্ষণ করাইয়াছে, এক কাণকাটা গ্রামের বাহির দিয়া যায়, দুই কাণকাটা গ্রামের ভিতর প্রবেশ করে, শিরোমণি মহাশয়ের তিনবার প্রায়শ্চিত্তে দুই কাণ এবং নাকটী পর্য্যন্ত কাটা গিয়াছে তবে কেন প্রায়শ্চিত্ত করিবেন না।

শিরোমণি ভট্টাচার্য্যের আস্পর্দ্ধাও সামান্য নহে, সভা-ভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া অনেকের সাক্ষাতে বলিয়াছেন আমারদিগকে মারিবেন বরং কলিকাতায় আসিবেন না তথাচ দেখিবেন, আমা-দিগকে মারিবেন, এ কথায় চিরকাল হাসিব, আর দেখিবেন যাহা বলিয়াছেন তাহাতে জিজ্ঞাসা করি আমরা বালক নহি ক্রোড়ে করিয়া নগ্ন দেখিয়া চুম্ব দিবেন, তবে আর কি দেখিবেন? পণ্ডিত-গণের এই স্বভাব যাহাকে যাহা বলিতে হয়, তাহার সাক্ষাতেই তাহা বলেন, আমারদিগের সাক্ষাতে দুর্ব্বাক্য কহিলে আমরা তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া প্রণাম করিতাম, তাঁহার সে সাধ্য নাই, শ্রীমতী রাণী কাত্যায়নীর বেলুড়ের বাড়ীর সভায় আমারদিগের সাক্ষাতে দুই একটী কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে অশ্রুপাতে গাত্রবস্ত্র আর্দ্র করিতে হইয়াছিল, শত শত প্রধান লোকে তাহা দেখিয়াছেন এবং তাঁহার যে পুত্রকে শিখণ্ডির ন্যায় সম্মুখে রাখেন, তিনি ও ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য, প্রভাকর ভট্টাচার্য্যাদি মান্য লোকেরা তাহাতে তাঁহাকে অবিজ্ঞ বলিয়া আমারদিগের নিকট পরিহার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সভায় শ্রীযুক্ত রাজা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত ইত্যাদি মান্য লোকেরা শ্রীরাম শিরোমণির অশ্রুপতন নিবারণ করিয়াছেন।

শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা নবদ্বীপের প্রধান হন নাই। অমুক পুত্ররূপে প্রধান বিদায় পাইতেছেন, তিনি পাত্রকা অর্থাৎ পাতড়া বিদ্যায় ভাল, রাজ্যের পাতড়া উদরস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, এ প্রকার পাতড়া মারা যোড়া অধ্যাপক আর দৃষ্টিগোচর হইবেন না, কিন্তু কোন গ্রন্থের একটী নূতন কথা হইলে শ্রীরাম শিরোমণি নস্তের উপর নির্ভর করেন, আমরা বহু কাল ন্যায়শাস্ত্রে অব্যবসায়ী হইয়াছি তথাপি প্রতিজ্ঞা করিতে পারি শ্রীরাম শিরোমণিকে ঠেকাইতে আমারদিগের বহুলায়াস হইবেক না, শিরোমণি মহাশয় কি ভুলিয়া গিয়াছেন, ৺মধুসূদন শাণ্ডাল মহাশয়ের পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে ব্যাপ্ত্যনুগম মথুরাটীকায় কি তিনি ঠেকেন নাই এবং মৃত উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গরাণহাটার বাড়ীতে যখন সপ্তাহব্যাপক বিচার হয়, তখন কি ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব গ্রন্থের ভট্টাচার্য্য টীকায় তিন দিবস পরাজয় মানেন নাই, বদ্যনাথ বাবুর ধর্ম্মপুরের বাগানে শ্যামাপূজার নিমন্ত্রণে তাঁহাকে পরামর্শ গ্রন্থের জগদীশ টীকায় পরিহার স্বীকার করিতে হইয়াছিল, ৺প্রাপ্ত রাধাচরণ ন্যায় পঞ্চানন, কাশীনাথ ন্যায়-বাচস্পতি, নীলমণি ন্যায়পঞ্চানন, দেবনাথ তর্কসিদ্ধান্তাদি মধ্যস্থ ছিলেন, শিরোমণি মহাশয় আমারদিগকে মারিবেন কি আমরা পঠদ্দশায় তাঁহাকে মারিয়া রাখিয়াছি আমারদিগের অসাক্ষাতে দুর্ব্বচন বলিয়াছেন আমরা সহ্য করিতে পারিব না, হয় যাহা বলিয়াছেন আমারদিগকে মারিবেন তাহাই করুন, না হয় দাঁতে কুটা করিয়া বলুন, কুকর্ম্ম করিয়াছি, দেবল ব্রাহ্মণেরাও আমারদিগকে ভয় দেখান কি ঘৃণার বিষয়।"

নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু

খুলনা-জেলার অন্তর্গত "কুমীরা"-নামক গ্রামে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে মাণিক্যচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (তর্কভূষণ) মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি নৈহাটী গ্রামে আসিয়া বসতি করিবার কিছু পরেই একটী চতুষ্পাঠী খুলেন। তিনি ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন না। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার চতুর্থ পুত্র নীলমণি ন্যায়পঞ্চানন টোল-রক্ষা করেন। মাণিক্য-চন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্রের নাম শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার বর্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে বিদায় লইয়া আসিবার সময় সিজে-ডুমুরদহের ডাকাতেরা তাঁহার প্রাণনাশ করে। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়সেই তিনি পিতার ন্যায় প্রবল নৈয়ায়িক হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রীনাথের মৃত্যুর পরে নীলমণি ন্যায়পঞ্চানন টোল রাখিয়া দিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে শ্রীনাথের পুত্র রামকমল ন্যায়রত্ন মহাশয় চতুষ্পাঠী রক্ষা করেন। রামকমল ও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) নীলমণির প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রামকমলের জন্ম ও ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। রামকমলের ৬টী পুত্র ও ১টী কন্যা। পুত্রগুলির নাম,—নন্দকুমার, রঘুনাথ, যদুনাথ, হেমনাথ, হরপ্রসাদ ও মেঘনাদ। নন্দকুমার নিঃসন্তান থাকিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। রঘুনাথ গড়োয়া-লের রাজমন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র,—পুলিনবিহারী ও শিবনাথ। পুলিনবাবু লক্ষ্ণৌ-স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন। শিবনাথ বাবু মেডিক্যাল-কলেজ হইতে এম্-বি পরীক্ষায় গৌরব-সহকারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি শ্যামবাজারে চিকিৎসা করিতেছেন। যদুনাথ ও হেমনাথ অল্প বয়সেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হরপ্রসাদ অন্য কেহই নন,—ইনি

আমাদের বর্ত্তমান মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। মেঘনাদবাবু জয়পুর কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মঞ্জুগোপাল বাবু এখন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক।

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ঘোর নৈয়ায়িক ছিলেন। রতন রায় মহাশয় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহাকে বরাহনগর-আলমবাজারে তাঁহার বসতি-বাটী ও চতুষ্পাঠী করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বোর্ণিও কোম্পানী সেই বাটী ও ভূমি অধিকার করিয়া লইলে রতন-বাবু তাঁহাকে কাশীপুরস্থ নিজ বাটীর পশ্চিম দিকে তাঁহার বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কালক্রমে রতনবাবুর সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য হইলে তিনি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজে "এসিষ্ট্যাণ্ট্-সেক্রেটারী" হন। ১০ মাস কর্ম্ম করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই পদ গ্রহণ করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে রামমাণিক্যের মৃত্যু হয়। নন্দকুমার স্বীয় মাতামহ রাম-মাণিক্যের নিকটেই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দেখা গিয়াছিল। তাঁহার মত বিচার-মল্ল ছাত্র তৎকালে দেখা যাইত না। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

শ্রীরাম শিরোমণি

"শব্দ-শক্তি-প্রকাশিকা"—গ্রন্থকার সুবিখ্যাত জগদীশ তর্কালঙ্কারের শেষাবস্থায় গদাধর ভট্টাচার্য্যের আবির্ভাব। ইনি বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম জীবাচার্য্য বা জীবদেব ভট্টাচার্য্য। পাবনা-জেলার অন্তর্গত "লক্ষ্মীচাপড়"-নামক ক্ষুদ্র পল্লী তাঁহার আদি নিবাস স্থল। তিনি সপুত্র নবদ্বীপে আসিয়া বসতি করেন। গদাধর বহুকষ্টে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তবে চতুষ্পাঠী খুলিতে পারিয়া-ছিলেন। তিনি ৬৪ খানি ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ের নৈয়ায়িকগণ এখনও পাঠ করিয়া থাকেন। নবদ্বীপে এখনও লোকে বলিয়া থাকে

হরের গদা, গদার জয়।
জয়ার বিশু, লোকে কয়॥

ইহার অর্থ এই যে, হরিরামের ছাত্র গদাধর ভট্টাচার্য্য, গদাধরের ছাত্র জয়রাম এবং জয়রামের ছাত্র বিশ্বনাথ প্রধান।

গদাধরের বংশধর গণ এখনও নবদ্বীপে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে এই ঃ—গদাধর ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদেব তর্কভূষণ, হরদেব ন্যায়ভূষণ, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কার, শ্রীরাম শিরোমণি, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, নগেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ।

এই সময়ে নবদ্বীপে শ্রীরাম শিরোমণি ও মাধব তর্ক-সিদ্ধান্ত, এই দুই জন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। মাধব তৎকালে নলডাঙ্গার রাজসভার সভাসদ্ থাকিয়া সেইস্থানে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি বিচার-সভায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে না পারায়, শ্রীরাম শিরোমণিই প্রাধান্য লাভ করেন। আলোকনাথ ও গোলোকনাথ তাঁহার প্রধান ছাত্র ছিলেন। বেনারস-কলেজে ন্যায়-শাস্ত্রের সর্ব্ব-প্রধান অধ্যাপক স্বর্গত পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় এই গোলোকনাথের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, গোলোকনাথের মত প্রতিভাবান্ ছাত্র তৎকালে নবদ্বীপে কেহই ছিলেন না। শ্রীরাম শিরোমণির পরে তাঁহার পুত্র ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় পিতার টোল রক্ষা করিয়াছিলেন। ভুবনমোহনই গদাধর ভট্টাচার্য্যের নাম রাখিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। এজন্য নৈয়ায়িক গণ এখনও বলেন "ভুবনান্তো গদাধরঃ।" ভুবনমোহনের পুত্র বন্ধুবর সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় এখন সেন্টপলস্-স্কুলে সুযোগ্য ও প্রধান সংস্কৃত-অধ্যাপক।

রতনবাবুর বাটীতে বিচার করিয়া শ্রীরাম শিরোমণি রোগে আক্রান্ত হন। এ সম্বন্ধে গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন ঃ—

সংবাদ ভাস্কর

১৮ মার্চ, ১৮৫৪।৬ চৈত্র, ১২৬০, শনিবার।

সাধারণ দুঃখজনক পক্ষাঘাত।

"আমরা অত্যন্ত পরিতাপিত হইয়া লিখিতেছি নিদারুণ পক্ষাঘাত নবদ্বীপের প্রধানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহা-শয়কে অকস্মাৎ কুক্ষিগত করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ন রায় মহাশয়ের পিতাঠাকুরের একোদ্দিষ্ট সভায় জয়শালী বিচারে জয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই জয়াভিলাষার্থে বাবুর কাশীপুরের উপবেশনাগারে দ্বিতীয় সভা করেন, তাহাতেও পরাজিত

হইয়া থাস্ত জন্ত মহিষাদলে যান, তথা হইতে আসিয়া পক্ষাঘাতের কবলগত হইয়াছেন, আমরা কোম্পানি-বাহাদুরের চিকিৎসালয়ের উপযুক্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত নেলার সাহেবের প্রমুখাৎ এই অমঙ্গল সমাচার শ্রবণ করিয়া পরিতাপিত হইয়াছি, শিরোমণি মহাশয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন বরং কলিকাতায় আসিবেন না তথাচ আমারদিগকে নির্ঘাত প্রহার করিবেন এবং কটুকাটব্য যত বলিয়াছেন আমরা তাহা লিখিতে লজ্জাজ্ঞান করি, কিন্তু আমারদিগের সাক্ষাতে বলিতে পারেন নাই এজন্ত আমরা আক্ষেপ করিয়াছিলাম এবং বাসনা ছিল পুনর্ব্বার কোন সভায় যদি শ্রীরামের দর্শন পাই তবে তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে কষ্ট দিব, কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দাম্ভিকতা ও কটুভাষিতায় পরে ত্রিপক্ষও গেল না ইহার মধ্যেই পক্ষাঘাতে আঘাতী হইলেন। হে পরমেশ্বর, শ্রীরাম শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে রক্ষা কর, নবদ্বীপ সমাজের নাম থাকুক, শ্রীরাম শিরোমণির পরে নবদ্বীপের নাম রাখিতে পারেন এমন মনুষ্য কে আছেন? লক্ষ্মীকান্তের লক্ষ্মী সরিয়াছেন, ব্রজনাথ পক্ষপাত করেন, মাধবে বিচার-মধু দেখিতে পাই না, তবে আর কে আছেন? লোকেরা গোলোকে নির্ভর করুন।"

রতন বাবুর অর্থব্যয়ে ও নেলার-সাহেবের চিকিৎসায় শ্রীরাম শিরোমণি সুস্থ হন। এসম্বন্ধে গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন:—

সংবাদ ভাস্কর

১১ এপ্রিল, ১৮৫৪। ৩০ চৈত্র, মঙ্গলবার, ১২৬০।

"নবদ্বীপের প্রধানাধ্যাপক শ্রীরাম শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় পক্ষাঘাত রোগের কুক্ষিগত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ন রায় মহাশয় বহুব্যয়ে তাঁহাকে এযাত্রায় রক্ষা করিলেন। উপযুক্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত নেলার সাহেবের সুচিকিৎসায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হস্তপদাদি বহিরিন্দ্রিয় সকল সবল হইয়াছে, উদরাময় নিরাময় হইলেই নবদ্বীপের বাটীতে যাইয়া যাবজ্জীবন রামরত্ন বাবুকে আশীর্ব্বাদ ও ডাক্তার সাহেবকে ধন্যবাদ দিবেন।"

সাগরিকা

(গল্প)

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, বি-এ]

এক

প্রশান্ত কলিকাতার কোন বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক। বয়স ৩০।৩২ বৎসর, কিন্তু এখনও অবিবাহিত। যে সমাজে বিবাহ করাটাই সাধারণ নিয়ম, সেখানে প্রশান্তের এই কৌমার্য্যের নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কারের জন্য যে নানা বিচিত্র গবেষণার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

বলা বাহুল্য, এই গবেষণালব্ধ ফল সকলের একরকম ছিল না। প্রশান্তের সমবয়স্ক বন্ধু-বান্ধবেরা বলিত, 'ম্যালথাসের 'থিওরি' পড়িয়া তাহাতে মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে, তাই সে বিবাহ করিতে নারাজ। প্রশান্তের অপরাধ, সে ম্যালথাসের মতবাদ সম্বন্ধে কিছুকাল পূর্ব্বে কোন সভায় একটী বক্তৃতা করিয়াছিল। প্রবীণেরা কিন্তু এ কথায় কাণ দিতেন না। প্রশান্তের গৃহে স্বামী জ্ঞানানন্দ নামক একজন সন্ন্যাসী কোন এক সেবাশ্রমের চাঁদা আদায়ের জন্য মাঝে মাঝে আসিতেন। প্রবীণেরা এই ঘটনা হইতে দৃঢ় সিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রশান্ত স্বামীজীর শিষ্য হইয়াছে এবং লোটা কম্বল লইয়া কবে অকস্মাৎ হরিদ্বার যাত্রা করিবে, তাহার ঠিকানা নাই। এইরূপ আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়া প্রশান্তের বৃদ্ধ পিতৃব্য, প্রতিবেশীদের কাছে, গোপনে দু' এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিয়াছিলেন, শোনা যায়।

প্রশান্তের তরুণ ছাত্রেরা কিন্তু বলিত, ও সব বাজে কথা। তাহারা পাকা খবর জানে, মাষ্টার মশায় একজন বি-এ পাশ করা দেশী খৃষ্টান মেয়ের প্রেমে পড়িয়া গিয়াছেন এবং তাহারই ফলে এই বিপত্তি। প্রশান্ত খৃষ্টান হইতে চাহেন না, মেয়েটীও হিন্দু হইতে নারাজ। সুতরাং দুইজনেই চক্রবাক মিথুনের ন্যায় নদীর দুই পারে বসিয়া হা-হুতাশ করিতেছেন। খৃষ্টান মেয়েটীর অসাধারণ রূপ গুণ সম্বন্ধেও ইতিমধ্যেই ছাত্রমহলে নানা কৌতূহলপূর্ণ সংবাদ রটিয়া গিয়াছিল,— যদিও ঐ মেয়েটীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এমন কথা কেহই হলপ করিয়া বলিতে পারিত না।

এ সব অদ্ভুত গবেষণা যে প্রশান্তের কাণে না আসিত, এমন নয়। কিন্তু সে কখন কোন প্রতিবাদ করিত না, একটু হাসিত মাত্র। বৃদ্ধা পিসীমা বিবাহের কথা উঠাইয়া পীড়াপীড়ি করিলে, প্রশান্ত কহিত,—"বিয়ে ক'রে এনে খেতে দেব কি, পিসীমা?" পিসীমা গালে হাত দিয়া বলিতেন,—"শোন একবার ছেলের কথা, আমরা সকলে যেন না খেয়েই আছে!"

কারণ যাহাই হউক, প্রশান্ত লোকটী একটু গম্ভীর, অন্যমনস্ক প্রকৃতির ছিল। সে কাহারও সঙ্গে বড় একটা মিশিত না; হাসি গল্পগুজব করিতে তাহাকে কচিৎ দেখা যাইত,— কোনরূপ আমোদ-প্রমোদ-উৎসব পার্টি প্রভৃতিতেও সে কখনও যোগ দিত না। কলেজে পড়াইবার জন্য তাহাকে একবার যাইতে হইত, তা ছাড়া সে বড় একটা বাড়ীর

বাহির হইত না, অধ্যয়নেই ডুবিয়া থাকত ;—প্রায়ই গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার পড়ার ঘরে আলো জলিতে দেখা যাইত। সংসারে কি হইত না হইত, তাহারও কোন সংবাদ সে রাখিত না, বৃদ্ধ পিতৃব্য এবং বৃদ্ধা পিসীমার উপরেই ও-ভার দিয়া সে নিশ্চিন্ত ছিল।

কেবল একটা বিষয়ে প্রশান্তের খুব উৎসাহ ছিল। কলেজের ছুটী হইলে আর এক মুহূর্ত্ত প্রশান্ত কলকাতায় থাকিত না, বাঙ্গলার বাহিরে কোনস্থানে ভ্রমণে বহির্গত হইত। এইরূপে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানেই সে ভ্রমণ করিয়াছিল। তাহার মনে যে অন্তর্গূঢ় বেদনা ছিল, এই 'ভবঘুরে বৃত্তিতে' তাহার কিছু শান্তি হইত কি না কে জানে!

এবার গরমের ছুটীতে প্রশান্ত পুরীতে বেড়াইতে বাহির হইল। চক্রতীর্থের উপরেই তাহার কোন বন্ধুর একখানি বাড়ী খালি ছিল, সেইটাই সে দখল করিয়া বসিল।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় বন্ধু প্রশান্তের কাণে কাণে বলিয়াছিলেন,—"কোন বাঙ্গালিনীকে তো পছন্দ হ'ল না, এবার না হয় কোন উৎকল-সুন্দরীর চরণেই আত্মসমর্পণ কর।" এই পরিহাসেও প্রশান্ত তাহার অভ্যাস-মত মৃদু হাস্য করিয়াছিল মাত্র, কোন উত্তর দেয় নাই।

বাড়ীখানি সমুদ্রের খুব নিকটেই। সম্মুখেই কিছুদূর পর্য্যন্ত বালিয়াড়ী, তাহার পরই বিস্তীর্ণ জলরাশি। প্রশান্তের মন এই দৃশ্য দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই একটা তীব্র নৈরাশ্যের হাহাকার তাহার অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আর একবার সে পুরীতে আসিয়াছিল। কিন্তু সে দিন আর এ দিনে কত প্রভেদ! সে দিন প্রশান্তের জীবন উৎসবের রাগিণীতে পূর্ণ ছিল, আকাশ-বাতাস সবই তাহার কাছে মধুময় বোধ হইত। আর আজ?—প্রশান্ত একটা মর্ম্মভেদী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

কলিকাতায় সব সময়ে যেমন সে গৃহকোণে আবদ্ধ হইয়া থাকিত, পুরীতে আসিয়া কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত হইল। গৃহে আর প্রশান্তের মন বসিত না, অধিকাংশ সময় সমুদ্রের ধারেই সে কাটাইয়া দিত। প্রত্যুষে উঠিয়াই সে সমুদ্রতীরে যাইত এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমুদ্রের শান্ত মূর্ত্তি উপভোগ করিত। তারপর সমুদ্র-গর্ভ হইতে ধীরে ধীরে সূর্য্যের আবির্ভাব—সে অপূর্ব্ব দৃশ্য যে না দেখিয়াছে, সে কখনও কল্পনা করিতে পারবে না। বেলা হইলে বহুক্ষণ ধরিয়া সমুদ্রস্নান করিয়া প্রশান্ত বাড়ী ফিরিত।

বৈকালে রৌদ্রের তেজ কমিলেই আবার সে বাহির হইয়া পড়িত। সন্ধ্যার আঁধারে সমুদ্রের গম্ভীর শোভা তাহার বড় ভাল লাগিত। বালির উপর শুইয়া তরঙ্গ-মালার অশ্রান্ত কলরোল, মাঝে মাঝে হুঙ্কার ও গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে সে নিজের হৃদয়ের হাহাকার কিছুক্ষণের জন্য বিস্মৃত হইত।

সমুদ্রের ধারে বহু লোকই বেড়াইত, কিন্তু তাহাদের কাহাকেও প্রশান্তের পরিচিত বোধ হইত না। কাহারও সঙ্গে যাচিয়া আলাপ করিবার মত মনের উৎসাহও তাহার ছিল না। সকাল-সন্ধ্যায় অনেক বাঙ্গালী মহিলাও সমুদ্রের ধারে বেড়াইতেন। যাঁহারা পর্দ্দানশীন কুলবধূ, তাঁহারাই এই সমুদ্রতীরে আসিয়া কেমন "অকুণ্ঠিতা অনবগুণ্ঠিতা" হইয়া উঠেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রশান্ত বেশ কৌতুক অনুভব করিত।

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মনে ভাসিয়া উঠিত আর একজনের ছবি,—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই সমুদ্রের ধারেই তো তাহাকে সে প্রথম দেখিয়াছিল। তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্যদেব সমুদ্রগর্ভ হইতে তখনও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পান নাই। কেবলমাত্র অরুণ রাগরেখা-সাগর বারির উপরে পড়িয়া মৃদুতরঙ্গ-বিক্ষেপে আন্দোলিত হইতেছে। ভ্রমণকারীর দল তখনও সমুদ্র-তীরে আসিয়া পৌঁছায় নাই। প্রশান্ত অন্যমনস্কভাবে বারিরাশির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিল। সহসা কাণে আসিল সঙ্গীতেরই মত অপূর্ব্ব মধুর কলহাস্যধ্বনি! চাহিয়া দেখিল, একটী ১৬।১৭ বৎসরের কিশোরী, বালির উপরে চঞ্চলা হরিণীর মতই ছুটাছুটি করিয়া ঝিনুক কুড়াইয়া বেড়াইতেছে। অদূরে একজন প্রৌঢ় বয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া কিশোরীর দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

মেয়েটী আবদারের সুরে বলিতেছিল,—"এদিকে এস না, বাবা! কত বড় একটা ঝিনুক পেয়েছি দেখ,—এই ঝিনুকেই নিশ্চয়ই মুক্তা হয়—"

পিতা কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"রাজ্যের ঝিনুক নিয়ে করবে কি,—ঘর যে একেবারে বোঝাই হ'য়ে গেছে! শেষকালে তোর ঝিনুক বইবার জন্যই একটা মালগাড়ী ভাড়া করতে হবে দেখছি!" কিশোরী মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল,—"বেশ, তবে কাজ নেই—" বালির সংগৃহীত ঝিনুকগুলি সজোরে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল।

"অমনি রাগ হ'ল মেয়ের?" বলিতে বলিতে প্রৌঢ় সস্মিত মুখে কন্যার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রশান্তের গতিশক্তি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া পিতাপুত্রীর আদর-অভিমানের পালা দেখিতেছিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় বাহিরের অন্য সমস্ত দৃশ্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঐ লীলাময়ী চঞ্চলা কিশোরীর উপরেই নিবদ্ধ হইয়াছিল।

কাব্যে উপন্যাসে তো বহু সুন্দরীর বর্ণনাই সে পড়িয়াছে। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা, কালিদাসের তন্বী শ্যামা বিরহিণী যক্ষপত্নীর রূপও মাঝে মাঝে সে কল্পনায় ধ্যান

করিয়াছে। কিন্তু এমন সৌন্দর্য্য তো সে কখনও দেখে নাই। কল্পনাও করে নাই!

হঠাৎ কিশোরীর দৃষ্টি পড়িল ভাব-বিহ্বল প্রশান্তের উপর। একজন অপরিচিত যুবককে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে একটু লজ্জিত অপ্রস্তুত হইল। নিম্ন-পিতাকে বলিল,—"বাবা, চল যাই, ওই দেখ, কে এক-জন ওখানে 'হাঁ' ক'রে চেয়ে আছে!"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী প্রশান্তের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন। তারপর নিজেই একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"সূর্য্যোদয়ের শোভা দেখতে বেরিয়েছেন বুঝি! আমারও এই সময়টা বড় ভাল লাগে।"

প্রশান্ত তখন পর্য্যন্ত আত্মস্থ হইতে পারে নাই। একটু থতমত খাইয়া বলিল,—"আজ্ঞ হ্যাঁ—রোজই আসি—"

প্রৌঢ় কহিলেন,—"কবে পুরী এসেছেন? আপনাকে তো এর আগে সমুদ্রের ধারে দেখি নাই"

প্রশান্ত বিনীতভাবে উত্তর দিল—"এই তিন চার দিন হ'ল—"

"ও, তাই বলুন! কতদিন থাকিবেন ঠিক করে-ছেন—?"

প্রশান্ত কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—"এখনও কিছু ঠিক করি নাই।"

এই কথা-বার্ত্তার সময়ে কিশোরী নীরবে পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল এবং মাঝে মাঝে অপাঙ্গে প্রশান্তকে দেখিয়া লইতেছিল। প্রশান্ত একবার সেদিকে চাহিতেই দুইজনের চোখাচোখি হইয়া গেল। প্রশান্ত চকিতে চক্ষু ফিরাইয়া লইল, তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিল।

পিতার কাণে কাণে কিশোরী কি যেন বলিল। মৃদু হাসিয়া প্রৌঢ় কহিলেন,—"এরই মধ্যে বাড়ী ফেরবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিস? অন্যদিন তো সাধাসাধি করলেও যেতে চাস্ নে—!"

তারপর কি ভাবিয়া প্রশান্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এটী আমার মেয়ে সুনীলা। বড় লাজুক!"

সস্নেহ হাস্যে প্রৌঢ়ের মুখ কোমল হইয়া উঠিল।

সে দিন সমুদ্র-তীর হইতে প্রশান্ত যে মনের অবস্থা লইয়া ফিরিল, তাহা কোন যুবকের পক্ষেই নিরাপদ বলা যায় না। প্রশান্তের কেবলই মনে পড়িতে লাগিল, সেই হরিণীর মত লীলা-চঞ্চলা কিশোরীর কথা, তাহার সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখ, সঙ্গীতের মত মধুর কলহাস্য, অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর,—আবার পিতার উপর অভিমানে বিষণ্ণ গম্ভীর বদন! না,—ওই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটীরও বড় অন্যায়! অমন ফুলের মত কোমল হৃদয়ে তিনি আঘাত করিলেন কোন প্রাণে? গোটাকয়েক বেশী ঝিনুকই না হয় কুড়াইয়াছিল ও,—তার জন্য এমন তিরস্কার! আহা ওর মুখখানি তখন কেমন ম্লান বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছিল, চোখ দুটী ছল ছল করিতেছিল! অতি কষ্ট করিয়া কুড়ান ঝিনুকগুলা কত দুঃখেই ও জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিল! প্রশান্ত হইলে কখনও ওকে এমন তিরস্কার করিতে পারিত না, হাজার অপরাধ করিলেও নয়! এই বুড়ার দল নিজেদের হিসাবী বলিয়া জাঁক করেন বটে, কিন্তু অনেক সময় ওঁদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। যাক,—প্রশান্ত আজই বৈকালে সমুদ্র-তীরে যাইয়া অনেক ঝিনুক সংগ্রহ করিবে, এবং কাল সকালে মেয়েটাকে দিবে। তাহা হইলেই বোধ হয় ওর মনের দুঃখ ঘুচিবে!...

সে দিন বৈকালে সমুদ্রের ধারে যাইয়া প্রশান্ত সত্য সত্যই রাশীকৃত ঝিনুক কুড়াইল। কিন্তু পরদিন সে যখন প্রত্যুষে বেড়াইতে বাহির হইল, তখন সেগুলা সঙ্গে লইয়া যাইতে কেমন একটা সঙ্কোচ হইতে লাগিল। হয় ত মেয়েটী একটু অবজ্ঞার হাস্য করিবে—প্রৌঢ় ভদ্রলোকটীই বা তাহার এই ছেলেমানুষী দেখিয়া কি মনে করিবেন! যাক, সামান্য পরিচয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়!...

সে দিন সমুদ্রের ধারে বসিয়া আবার পিতা-পুত্রীর সঙ্গে দেখা হইল। আবার প্রশান্তের সঙ্গে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটীর আলাপ জমিল। এইরূপে ক্রমেই উভয় পক্ষে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। অবশেষে "লাজুক" সুনীলারও লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

তরুণ তরুণীর বন্ধুত্ব যে কোন্ পথে, কি আশ্চর্য্য উপায়ে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহা পাকা মনস্তত্ত্ববিদেরাও বলিতে পারেন না। তর্কশাস্ত্রের যুক্তি, ন্যায়-অন্যায়ের উচিত, লাভ লোকসানের হিসাব—সংস্কারের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া পার্ব্বত্য নদীর মতই উদাস গতিতে ছুটে। গতিরোধ করিলে আরও তীব্র, আরও বেগবান হইয়া দাঁড়ায়। প্রশান্ত ও সুনীলার বন্ধুত্বও এইরূপে সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া ক্রমে নিবিড় প্রেমে পরিণত হইল।

প্রৌঢ় ভোলানাথবাবু যখন ব্যাপারটী বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। প্রশান্তকে একান্তে ডাকিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"দেখ বাপু, তুমি ব্রাহ্মণ, আমরা কায়স্থ; সুতরাং সুনীলার সঙ্গে তোমার আর বেশী মেশামেশি না করাই ভাল!" এবং পাকা বিষয়ীর মত সেইদিন রাত্রেই ভোলানাথবাবু কন্যাসহ পুরী ত্যাগ করিলেন।

সন্ধ্যাকালে বিদ্যুৎ-বিকাশের মত ক্ষণকালের জন্য সুনীলা একবার প্রশান্তের নিকট বিদায় লইতে আসিয়া-ছিল। সেই মুহূর্ত্তে প্রশান্ত বা সুনীলা কেহই একটী কথাও বলিতে পারেন নাই। কেবল চিত্রার্পিতবৎ পরস্পরের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল অবশেষে প্রশান্ত অর্দ্ধস্ফুট স্বরে ডাকিল,—"সুনীলা!"

সুনীলা অস্তমান সূর্য্যরশ্মির মত ম্লান হইয়া বলিল, "বিদায়! আর হয় তো দেখা হ'বে না। কিন্তু এ জীবনে আর কাউকে ভালবাস পারবো তুমি নিশ্চয় জেনো -!"

প্রশান্তের মাথা ঘুরিতে লাগিল, দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইল। পুনর্ব্বার সে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন সুনীলা অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার পরদিন প্রশান্তও একেবারে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, সমুদ্র তাহার মনকে আর এক মুহূর্ত্তও আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

তিনমাস পরে প্রশান্ত একখানি হলুদে রঙের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইল, ভোলানাথবাবু ছাপার অক্ষরে বন্ধুবান্ধবকে জানাইয়াছেন যে, জগন্নাথগঞ্জের ধনী জমিদার পুত্রের সঙ্গে তাঁহার একমাত্র কন্যা সুনীলার বিবাহ হইবে। প্রশান্ত পত্রখানা জানালা গলাইয়া বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।...

অতীতের এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রশান্তের চিন্তা ও কল্পনা সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সম্ভব-অসম্ভবের সীমা ছাড়াইয়া কোথায় ভাসিয়া যাইত! কখন কখন সহসা তাহার মনে হইত, কোন এক আশ্চর্য্য উপায়ে সুনীলা আবার সেই সমুদ্রের ধারে ফিরিয়া আসিয়া ঝিনুক কুড়াইতেছে! এমন কি সময় সময় মুহূর্ত্তের জন্য সুনীলার মৃদু নিঃশ্বাসের স্পর্শ, কেশের সৌরভ সে যেন অতি নিকটে অনুভব করিয়া, কখনও বা, শেষ বিদায়ের সময়কার তাহার সেই বিষাদ-ম্লান দৃষ্টি মনে ভাসিয়া উঠিত। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্যই, পরক্ষণেই –স্বপ্ন দেখিয়া যাইত, প্রশান্ত এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বালির উপরে হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িত।

দুই

কয়েক দিন পরে প্রশান্ত লক্ষ্য করিল সন্ধ্যার পর অধিকাংশ লোক চলিয়া গেলে, সে একা নহে, আর একটী মেয়েও সমুদ্রের ধারে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে। শুভ্রবসনে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, মুখের অর্দ্ধাংশ অবগুণ্ঠনে আবৃত। ধ্যান-মগ্না যোগিণীর মতই সে নিশ্চল ভাবে সমুদ্রের তরঙ্গমালার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহার আকৃতি স্পষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু অবয়বের রেখা দেখিয়া সে যে তরুণী তাহার অনুমান করা কঠিন নহে।

কে এই তরুণী,—কেন সে এমনভাবে একাকিনী সমুদ্র-তীরে বসিয়া থাকে? তরঙ্গমালার দিকে চাহিয়া কি ভাবে? সে কি কোন প্রিয়-বিরহ-বিধুরা? অথবা কোন সংসার-ত্যাগিনী তরুণ-তপস্বিনী?

প্রশান্ত যতই দেখে, ততই তাহার নিকট সেই তরুণীকে রহস্যময়ী বলিয়া বোধ হয়। মেয়েটীর যেন কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই, প্রশান্ত যে অদূরেই বসিয়া থাকে, বোধ হয় কোন দিনও সে তাহা লক্ষ্যই করে নাই! সমুদ্রতীর একটু নির্জ্জন হইলে, প্রত্যহ তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটীতে আসিয়া বসে এবং প্রশান্তের উঠিবার পূর্ব্বেই চলিয়া যায়। ধীর-মন্থর তাহার গতি, যেন কোন চাঞ্চল্য নাই, ব্যস্ততা নাই! দেখিতে দেখিতে অন্ধকারের মধ্যে সহসা কোথায় সে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সময় সময় প্রশান্তের মনে হয়, এ যেন কোন শরীরী মানবী নহে, কোন অদৃশ্যলোক-বাসিনী ছায়ামূর্ত্তি, অন্ধকারের বুক হইতেই আবির্ভূতা হয়, আবার অন্ধকারেই মিশিয়া যায়! কিন্তু পরদিনই প্রশান্ত আবার যখন সেই শুভ্রবসনা মূর্ত্তি দেখে, তাহার ধীর-মন্থর গতি লক্ষ্য করে, তখন তাহার মন হইতে অশরীরী ছায়া-মূর্ত্তির কল্পনা তিরোহিত হয়।

প্রশান্তের কৌতূহল ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। প্রতিদিন তাহারই অদূরে একটী তরুণী বসিয়া থাকে, অথচ সে তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তাহার মুর্ত্তিখানি পর্য্যন্ত দেখিতে পায় না, এ চিন্তা তাহার মনকে কি জানি কেন একটু পীড়া দিতে লাগিল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইত, মেয়েটীর সঙ্গে নিজেই যাচিয়া আলাপ করে। কিন্তু যে সমাজে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এমন দুর্ল্লঙ্ঘ্য ব্যবধান, সে সমাজের লোক হইয়া একটী অপরিচিতা তরুণী মহিলার সঙ্গে আলাপ করিতে যাওয়া,—এ যে তাহার পক্ষে অসম্ভব ধৃষ্টতা! আচ্ছা এই মেয়েটীর মনেও কি কোন কৌতূহল জাগে না,—প্রশান্তের অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত কোন দিনই সে অনুভব করে নাই, প্রশান্তের সঙ্গে কথা বলিতে তাহার কি একবারও ইচ্ছা হয় না! অথবা হইলেও, কঠিন সংস্কারের বন্ধনকে অতিক্রম করিতে সেও তাহারই মত অক্ষম! দুইটী নর-নারী এমনই ভাবে প্রতিদিন পরস্পরের অদূরে বসিয়া থাকে,—অথচ তাহাদের মধ্যে অজ্ঞাত রহস্যের কি দুর্ল্লঙ্ঘ্য ব্যবধান!

কিন্তু একদিন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই এই রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হইল। পুরাতন বর্ষের অবসানে বৈশাখ মাস সবেমাত্র কালের রঙ্গভূমিতে পদক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু সে দিন এমন অকস্মাৎ, সে যে কালবৈশাখীর রুদ্রলীলা দেখাইবে তাহা প্রশান্ত বা অপরিচিতা তরুণী কেহই বোধ হয় ভাবে নাই। সমুদ্রতীরের কালবৈশাখী,—সে একটা ছোটখাট প্রলয়কাণ্ড! সাগরের জল গর্জ্জিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া উন্মত্তের মত তাহার উপরে আছড়াইয়া পড়িতেছে, সমস্ত আকাশ ঘোর কালো মেঘে আচ্ছন্ন। অকস্মাৎ একটা ঘূর্ণিবাত্যা সমুদ্রতীরের বালি উড়াইয়া দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহার পর আসিল, পদাতিক সৈন্যের মত মুষলধারে বৃষ্টি! প্রথম ঝড় উঠিতেই প্রশান্ত পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বালির

ঝাপটায় তাহার চোখ অন্ধকার হওয়াতে সে পলাইতে পারিল না। একটু পরে, চোখ চাহিতে সক্ষম হইলে, সে সভয়ে দেখিল, অদূরে সেই তরুণী ঘূর্ণিবাত্যার বেগে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। প্রশান্তের এতক্ষণ মেয়েটীর কথা মনেই হয় নাই। মনে মনে এজন্য সে নিজেকে সহস্রবার ধিক্কার দিল। এখনই যাইয়া এ বিপদে যে মেয়েটীকে সাহায্য করা উচিত, তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রশান্ত এক বিষম দ্বিধায় পড়িল। সে কি উপযাচক হইয়া একজন অপরিচিতা তরুণীকে সাহায্য করবার জন্য অগ্রসর হইবে? তাহার এই 'অযাচিত সহৃদয়তা' তরুণী যদি সন্দেহের চোখে দেখে, যদি সে তাহার সাহায্য অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে? কি অদ্ভুত তাহাদের এই সমাজের বিধান! মানুষের বিপদের সময়েও সাহায্য করিবার জো নাই,—চারিদিকেই বিধি-নিষেধের কাঁটার বেড়া! প্রশান্ত ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময়ে ঝড়ের সঙ্গে আরও প্রবল বেগে বৃষ্টি নামিল। প্রশান্ত আর কোন দ্বিধা না করিয়া প্রাণপণ বেগে তরুণীর দিকে ছুটিল। তরুণী তখনও মাটী হইতে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না। প্রশান্ত মুহূর্ত্তকাল ভাবিল, তার মনের সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া অপরিচিতা তরুণীকে হাত ধরিয়া মাটী হইতে তুলিল!

"চোটটা আপনার খুব লেগেছে কি?"

তরুণী নির্ব্বাক—যেন পাথরের মূর্ত্তি। মুখের অবগুণ্ঠন যেন আরও দুর্ভেদ্য রহস্যময় হইয়া উঠিল।

প্রশান্ত মিনতিব্যাকুল স্বরে বলিল—"এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে একা তো যেতে পারবেন না! যদি অনুমতি করেন, বাড়ীতে রেখে আসি—"

অবগুণ্ঠিতা প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া জানাইল,—"না!" —সঙ্গে সঙ্গে গৃহে ফিরিবার জন্য উদ্যত হইল। এমন সময় ঘূর্ণিবায়ুর একটা প্রবল ঝাপটা আসিয়া তরুণীর মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিয়া দিল।

প্রশান্ত মুহূর্ত্তকাল সেই দিকে চাহিয়াই, দুই হাত পিছাইয়া গিয়া সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"এ কি তুমি—তুমি সুনীলা—একি সত্যি!"

তরুণী স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল প্রশান্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"হাঁ আমি সুনীলা,—কিন্তু তুমি যাকে জানতে সে নয়—!" বলিয়াই আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তরুণী দ্রুতপদে ঝড়বৃষ্টি ঠেলিয়া সেই বালির চর অতিক্রম করিয়া চলিল। প্রশান্ত অবসন্নভাবে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। তাহার মাথার উপর দিয়া যে প্রলয়ঝঞ্ঝা বহিয়া গেল, তাহা সে গ্রাহ্যও করিল না।...

এই কি সেই সুনীলা? পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে আনন্দরূপিণী তাহার জীবনে বিধাতার প্রথম আশীর্ব্বাদের মতই আবির্ভূতা হইয়াছিল,—যে লীলাচঞ্চলা কিশোরী তাহার প্রাণমন মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল,—একি সেই? এযে সাক্ষাৎ বিষাদের প্রতিমা! কত যুগযুগান্তের দুঃখভার যেন ইহার মুখের উপর আপনার হিমশীতল স্পর্শ রাখিয়া গিয়াছে। সুনীলার পরিধানে বিধবার শুভ্রবসন,—চুলগুলি রুক্ষ—অযত্নবিন্যস্ত, একটা উদাস বৈরাগ্যের ছায়া তাহার সমস্ত অবয়বে পরিব্যাপ্ত! প্রশান্ত তাহাকে সুনীলা বলিয়া চিনিতেই পারিত না;—কেবল তাহার জ্যোতির্ম্ময় বিশাল চোখ দুইটাই মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুদ্দীপ্তির মত তাহাকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল।

প্রশান্ত যে ঐ চোখ দুইটী খুবই চিনে, ইহা যে তাহার মর্ম্মের অন্তরতম কোষে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে!

প্রশান্ত দীর্ঘকালের সাধনায় মনকে একটু সংযত করিয়াছিল। কিন্তু কোন নিষ্ঠুর নিয়তি তাহার হৃদয় লইয়া আবার এই নূতন খেলায় প্রবৃত্ত হইল? না—না, প্রশান্তকে পুরী ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইবে। সুনীলাও যে আর তাহার সঙ্গে কোনরূপ পরিচয় রাখিতে চায় না, ইহা তো তাহার আচরণেই বুঝা গেল। ধনী জমিদারের বিধবা পত্নী সে;—তাহার মান-সম্ভ্রম সুনাম—অতি সাবধানে রক্ষা করিতে হইবে!

যাই যাই করিয়াও কিন্তু প্রশান্ত কয়েক দিনের মধ্যে পুরী ছাড়িতে পারিল না, কোন এক অজ্ঞাত শক্তি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন তাহাকে জোর করিয়া ফেলিয়া রাখিল। তবে প্রশান্ত আর সমুদ্রের ধারে যাইতে সাহস করিল না। যদি সুনীলার সঙ্গে তাহার আবার দেখা হয়, যদি সে আত্মসংযম করিতে না পারিয়া—হঠাৎ কোন বিহ্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলে। একথা কল্পনা করিতেই প্রশান্তের সমস্ত দেহমন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

তিন

সুদীর্ঘ বিনিদ্র রজনীর অবসানে একদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া প্রশান্ত ভাবিল, এত সকালে সুনীলা নিশ্চয়ই সমুদ্রের ধারে আসিবে না, অতএব রোদ উঠিবার পূর্ব্বেই প্রশান্ত শেষ একবার সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া আসিবে। সেইদিনই রাত্রের গাড়ীতে পুরী ত্যাগ করিবে, ইহাও সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল।

সমুদ্রতীর জনমানবশূন্য। তখনও ভাল করিয়া অন্ধকার দূর হয় নাই,—অল্পদূরের বস্তুও স্পষ্ট দেখা যায় না। চিন্তামগ্নভাবে চলিতে চলিতে সহসা প্রশান্ত দেখিল সম্মুখে সেই শুভ্রবসনা নারীমূর্ত্তি—ধ্যানমগ্না যোগিনীর মত তেমনই ভাবে সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। অকস্মাৎ

সম্মুখে কাল ফণিনী দেখিলেও বুঝি লোকে এত ভীত সন্ত্রস্ত হয় না। প্রশান্ত স্তম্ভিত বিমূঢ়বৎ দাঁড়াইয়া রহিল, ধ্যানমগ্নার অজ্ঞাতসারে সেস্থান ত্যাগ করিয়া সে পলাইতে পারিল না।

এমন সময় সুনীলার চমক ভাঙ্গিল। প্রশান্তকে সম্মুখে দেখিয়াই তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।—সেও কি প্রশান্তকে এই সময়ে দেখিবার আশা করে নাই? কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে নিজেকে সংযত করিয়া লইল। প্রশান্তের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া ধীর শান্ত স্বরেই সে বলিল,—"এই যে, প্রশান্তবাবু! ক'দিন না দেখে ভেবেছিলাম, পুরী থেকে চ'লেই গেলেন বুঝি। অসুখ বিসুখ করে নি তো?"

প্রশান্তের বিমূঢ়ভাব বিস্ময়ে পরিণত হইল। অদ্ভুত এই নারী—কেমন সহজ স্বাভাবিক ভাবে তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে! ওর মনে কি কিছুমাত্র চাঞ্চল্য হয় নাই—হৃদয়ে একটুও দাগ পড়ে নাই? পাঁচ বৎসরে অতীতের সমস্ত স্মৃতিই কি জলের রেখার মত নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে?

প্রশান্তকে নিরুত্তর দেখিয়া সুনীলা কহিল,—"চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন যে! বড় বড় পণ্ডিতদের এই বুঝি শিষ্টাচারের রীতি? এই বালির উপরেই না হয় একটু বসুন!" সেই তীক্ষ্ণ শ্লেষ—সেই কৌতুকপ্রিয়তা! তবু, অতীত ও বর্ত্তমানে কি গভীর পার্থক্য! এই শ্লেষ, এই কৌতুকের মধ্যে যেন কোথায় একটু তার বেসুরা বাজিতেছে! অথবা এ প্রশান্তেরই মনের কল্পনা মাত্র?

এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে প্রশান্ত অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে সুনীলার অদূরে বালির উপরে বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। অবশেষে অসহ্য নীরবতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই যেন প্রশান্ত শুষ্কস্বরে বলিল,—"তুমি বেশ ভাল আছ, সুনীলা?"

সমুদ্রের অশান্ত তরঙ্গমালার দিকে চাহিয়া উদাসকণ্ঠে সুনীলা উত্তর দিল,—"হাঁ ভাল আছি বৈ কি! রাণীর ঐশ্বর্য্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মানসম্ভ্রম—লোকে যা কামনা করে, কিছুরই তো আমার অভাব নেই!" বলিতে বলিতে সুনীলার মুখ এক রহস্যময় হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

"কিন্তু—আপনি—আপনি কেমন আছেন? মুখের চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে, কতকালের রোগশয্যা থেকে উঠে এসেছেন—"

তারপর গলার স্বর একটু নামাইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"আপনার গৃহিণী বুঝি তেমন শক্ত নন, আপনাকে কড়া শাসনে রাখতে পারেন না?"

প্রশান্ত কয়েক মুহূর্ত্ত বিস্মিতভাবে সুনীলার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—

"—গৃহিণী—না, গৃহিণী তো কেউ নাই?"

"—ওঃ এখনও বিয়ে করেন নি বুঝি? তাই বলুন!"

সুনীলার মুখে অকস্মাৎ কে যেন কালি ঢালিয়া দিল। অন্তরের অন্তঃস্তলে একটা প্রবল আঘাত সে যেন অতি কষ্টে সামলাইয়া লইল। একটু পরে হাসিতে হাসিতে সে বলিল,—

"যারা ঘোর কৃপণ, তারাই নারী-জাতিকে ভয় করে! আপনিও বুঝি সেই দলের?"

তখন পূর্ব্বাকাশে ঊষার রক্তরাগ কেবল ফুটিয়া উঠিতেছে, লুলিয়ারা তাহাদের ডিঙ্গী নৌকা লইয়া সমুদ্রজলে মাছ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই দিকে চাহিয়া, যেন সুনীলার কথার উত্তর এড়াইবার জন্য প্রশান্ত বলিল,—

"—এ লুলীয়ারা কি অসীম সাহসী! মরণের ভয় ওদের মোটেই নেই! ওঃ কতবড় পাহাড়ের মত ঢেউ আসছে—এই বুঝি ওরা ডুবে গেল!—"

কিন্তু শীঘ্রই সমুদ্রতরঙ্গ ভেদ করিয়া লুলীয়ার ডিঙ্গী আবার উপরে ভাসিয়া উঠিল। প্রশান্ত রুদ্ধনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—"আঃ বাঁচা গেল—"

কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তোমার বোধ হয় মনে নাই, সুনীলা,—একদিন তুমি আর আমি দুজনে লুলিয়াদের ডিঙ্গীতে চড়ে সমুদ্রের মধ্যে গিয়েছিলাম। সে দিনও সমুদ্রে খুব ঢেউ ছিল। ডিঙ্গী যখন বিষম দুলতে লাগল, তুমি ভয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলে—!"

সুনীলার মুখ সহসা মড়ার মত সাদা হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া সে বলিল—"যাই এখন—!"

কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় বলিল,—"আমাকে না জানিয়ে পুরী থেকে পালাবেন না কিন্তু—"

• • • •

সুনীলার অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্যই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক, প্রশান্ত কিছুতেই পুরী ত্যাগ করিতে পারিল না। তাহার মনে বার বার এই প্রশ্নই উঠিতে লাগিল, সুনীলা তাহাকে থাকিতে বলিল কেন? এই রহস্যময়ী নারী তাহাকে কি বলিতে চায়? কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে সুনীলার সঙ্গে আর তাহার দেখাই হইল না। হঠাৎ একদিন সমুদ্রতীর হইতে বাড়ী ফিরিয়া প্রশান্ত দেখিল তাহার নামে একখানি পত্র আসিয়াছে। মেয়েলী হস্তাক্ষর যেন খুবই পরিচিত। কম্পিত হস্তে পত্র খুলিয়া প্রশান্ত পড়িল—

পুরী—সিন্ধু-নিবাস

কাল দুপুরে আমার বাড়ীতে 'ব্রাহ্মণ-ভোজনের' নিমন্ত্রণ। আসতেই হবে।—সুনীলা।

পত্রখানি হাতে লইয়া প্রশান্ত কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। সুনীলার নিমন্ত্রণ সে গ্রহণ করিবে কি? সুনীলা পূর্ব্ব-কথা ভুলিতে চায়। প্রশান্তই বা তাহা তাহার মনে জাগ্রত করিয়া রাখিতে সহায়তা করিবে কেন? আর এই 'ব্রাহ্মণ-ভোজনের' নিমন্ত্রণ? এ কি তাহার ন্যায় দরিদ্রের প্রতি ধনী জমিদার-পত্নীর বিদ্রূপ? একদিন যাহার নিকট হইতে সে সর্ব্বস্ব দাবী করিয়াছিল, নিজে যাহাকে সর্ব্বস্ব দিতে চাহিয়াছিল, তাহারই বাড়ীতে আজ ভিক্ষুকের মত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইবে? না প্রশান্ত সুনীলার নিমন্ত্রণে যাইবে না—!

প্রশান্তের মনের ভিতর কিন্তু যে মন, সে এই সিদ্ধান্ত আছে কিছুতেই প্রসন্নভাবে মানিয়া লইতে পারিল না। সমস্ত রাত্রি প্রশান্ত বিষম চিন্তা ও উদ্বেগে কাটাইল। পরদিন যতই দ্বিপ্রহর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই প্রশান্তের দৃঢ় সঙ্কল্প শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কে যেন তাহাকে জোর করিয়া সিন্ধু-নিবাসের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ধনীর গৃহ, আড়ম্বরের অভাব ছিল না। ফটকে তক্‌মা-আঁটা দরোয়ান, লোকজনও ছুটাছুটি করিতেছে, তবু বাড়ীর সর্ব্বত্র যেন একটা শান্ত নীরবতার ছায়া। প্রশান্ত ফটকের নিকট পৌঁছিতেই এক জন ভৃত্য তাহাকে লইয়া সসম্মানে বাহিরের বৈঠকখানায় বসাইল। পাঁচ মিনিট পরেই একটী দাসী আসিয়া তাহাকে একেবারে অন্দরে লইয়া গেল। প্রশান্ত কতকটা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করিল কোনরূপ উৎসব বা অনুষ্ঠানের চিহ্ন বাড়ীতে নাই। ভিতরের একটী কক্ষের দরজার নিকটে থামিয়া দাসী বলিল, "রাণীমা এই ঘরে আছেন, আপনি যান—।" বলিয়াই দাসী চলিয়া গেল। প্রশান্ত দ্বিধাত্রস্তভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই প্রশান্ত যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে সে বিস্ময়ে, ততোধিক সম্ভ্রমে অভিভূত হইল। সম্মুখের দেয়ালে টাঙ্গান একটী প্রকাণ্ড তৈলচিত্র—একটী রূপবান যুবকের। প্রচুর মাল্যদামে সেই চিত্র ভূষিত,—ছবির নীচে সাষ্টাঙ্গে প্রণতা সুনীলা। সাদা গরদের কাপড়ে তাহার দেহ আবৃত। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা রুক্ষ কেশজাল পিঠের উপরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রশান্ত তন্ময় হইয়া সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

প্রণাম করিয়া উঠিয়াই সম্মুখে প্রশান্তকে দেখিতে পাইয়া সুনীলা বিস্মিতমুখে বলিল—"এসেছেন! ভয় হ'চ্ছিল, বুঝি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কোরবেন না।"

প্রশান্তের একবার বলিতে ইচ্ছা হইল, যে, সে সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত কেমন করিয়া যে সে আসিল, তাহা নিজেই ঠিক জানে না! কিন্তু সেই পূজারিণী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া কিছুই সে বলিতে পারিল না।

প্রশান্ত দেয়ালের তৈলচিত্রের দিকে মাঝে মাঝে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া সুনীলা বলিল—"আমার স্বামীর ছবি। আজ ওঁরই বাৎসরিক স্মৃতি-পূজায় আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। তিন বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়ে উনি ডুবে যান—।" বলিয়া সুনীলা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

প্রশান্ত একটী কথাও বলিতে পারিল না, তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন হিম অবশ হইয়া আসিল সুনীলা কি তাহাকে শাস্তি দিবার জন্যই আজ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে?

প্রশান্তের মনের ভাব সুনীলা কিছু অনুমান করিতে পারিয়াছে কি? শান্ত স্নিগ্ধস্বরে সে বলিল,—"পূজা শেষ হ'য়েছে, এইবার আপনি খেতে চলুন—আর কাউকে নিমন্ত্রণ করি নি—"বলিয়া সুনীলা নিজ হাতে একখানি বহুমূল্য আসন পাতিয়া দিল। প্রশান্ত দ্বিরুক্তি না করিয়া খাইতে বসিল।

সুনীলা সম্মুখে বসিয়া পরম যত্নে তাহাকে খাওয়াইতে লাগিল। অন্যমনস্কভাবে খাইতে খাইতে প্রশান্ত সহসা বলিল,—

"তোমার সঙ্গে দেখা না হ'লেই ভাল হ'ত সুনীলা? আমি ভাবতাম, তুমি ঐশ্বর্য্যবান্ স্বামীর গৃহে বেশ সুখে আছ। তোমাকে যে এ ভাবে দেখ্‌বো তা কল্পনা করি নি—!"

সুনীলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"পতিব্রতা স্ত্রীর আর দুঃখ কিসের? স্বামীর ধ্যান করেই তো সে চিরজীবন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আপনাকে একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই। কার জন্য আপনি এই জাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেছেন? অন্যের ধর্ম্মপত্নীকে মনে মনে চিন্তা করাটা কি পাপ নয়? আমি আপনাকে পরামর্শ দিই, একটী শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েকে শীগ্‌গীর বিয়ে ক'রে ফেলুন। বলেন তো আমিই ঘটকালি করি।—"

সুনীলা রহস্যপূর্ণভাবে হাসিল। সুনীলার কথাগুলি শুনে প্রশান্তের বুকে জ্বলন্ত শেলের মত যাইয়া বিদ্ধ হইল। তাই তো, তাহার ব্রহ্মচর্য্য কি সত্যই একটা ভণ্ডামি? অন্যের স্ত্রীকে মনে মনে চিন্তা করিয়া সে কি মহাপাপ করিতেছে?...

"এ কি কিছুই খেলেন না যে,—এ আপনার ভারি অন্যায়। না না, সে হ'বে না, এগুলি আপনাকে খেতেই হবে—!"

আহারান্তে ব্রাহ্মণ-বিদায়ের সময় আসিল। সুনীলা গলবস্ত্র হইয়া প্রশান্তকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"তোমাকে দক্ষিণা দেবার মত কিছুই আমার নাই! সমস্ত ঐশ্বর্য্য সত্বেও আমি আজ একান্ত নিঃস্ব—সর্ব্বহারা—"

সুনীলারচক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত স্বর গাঢ়।...

প্রশান্তের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ বুঝি ভাঙ্গিয়া যায়। না—না, এত দুর্ব্বল হইলে তাহার চলিবে না। নিজেকে আরও শক্ত করিতে হইবে।...

সুনীলা ম্লান হাসিয়া পুনরায় বলিল,—"আমার শেষ অনুরোধ এক অকৃতজ্ঞ হৃদয়হীনার জন্য তোমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ করো না,—তার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেল।—তা' হ'লে সেও হয় তো সুখী হবে।"

প্রশান্ত কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ব্যথিতকণ্ঠে বলিল—"মানুষ ইচ্ছা করলেই কি অতীতকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে, সুনীলা?...আমি স্বীকার করছি, আমি দুর্ব্বল—পাপী!...কিন্তু তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা, আমাকে ক্ষমা কোরো—!" বলিয়া প্রশান্ত দ্রুতপদে আঙ্গিনা পার হইয়া বাহির হইয়া গেল, একবারও পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল না।

সুনীলা নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল!

———

স্মৃতি-রেখা

[সার শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম-এ, ডি-লিট্]
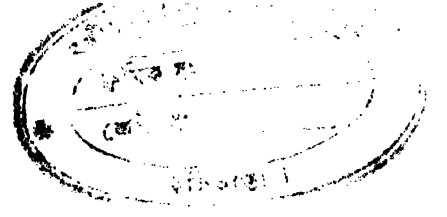
কাটা বাঁধের স্রোতের মুখে বড় বড় 'ঘুনী' 'মুগরী' 'হালুক' 'পাং' 'ঝেঁপো' প্রভৃতি দুই পাশে 'বাড়' গাড়িয়া রাখা হইত, তাহার দুই পাশে জাল 'আড়া' থাকিত। মাছ ধরার আর এক প্রকরণ ছিল,—মাথা-ঘুরণী জাল, গাঁতি জাল, চাবি জাল, চাটুনী জাল ও ছিপ, টাঙ্গা, সট্কা, প্রভৃতিতে নিত্য খোরাকের মৎস্য সংগ্রহ হইত। এইজন্য পাট কাটা, শোণ কাটা, জাল বোনা সকল গৃহস্থেরই অভ্যাস ছিল। আর 'চরকা'. 'কাটনা' মেয়েদের অভ্যাস ছিল। পুরুষেরা টেকো সাহায্যে সূতা কাটিতেন। এখন টেকোর নাম হইয়াছে 'টাকুলী' কিন্তু সেই অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতা ও তেমন মিহি সূতার উদ্ভব আর হয় নাই। উল, পশমের রেওয়াজ তখনও পল্লীগ্রামে পৌছে নাই। সকলেই নিজ চেষ্টায় দড়ি সূতা প্রভৃতি সংগ্রহ করিত। প্রবীণেরা জানালার 'গরাদে'তে পাট বা শোণ বাঁধিয়া ঢেরা দিয়া পাট কাটিতেন. বোধ হয় ঐ '×' ঢেরার অনুকরণে ঢেরা সহির প্রচলন হইয়াছে। ইংরাজি × (cross mark) ঢেরা সহির অনুকরণ কিংবা 'সমান্তরাল' ইহা প্রত্নতাত্ত্বিকের বিবেচ্য। কাছির বেটে, গরুর দড়ির বেটে, ঘুণির বেটে. সুতলী বেটে, 'চাটুনী চাবি' ও কাতলা গাঁতির বেটে ও 'চিক্' বোনা বেটে ইত্যাদি এমন চোস্ত ও চিক্কণ করিয়া কাটা হইত ও এত তৎ-পরতার সহিত সম্পন্ন হইত যে আজকালের 'হাত-কাছি কল' ঝক্‌মারিয়া যায়। যেদিন টানা জাল দিয়া পুকুরে কিংবা বাঁধকাটা স্রোতের মুখে নদীতে মাছ ধরার ব্যবস্থা হইত, সেদিন গ্রামে একটা রীতিমত সাড়া পড়িয়া যাইত। ইস্কুল, পাঠশালা আটটা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইত। ছেলে, বুড়া, স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই মাছ ধরার কাছে জড় হইতেন। 'দিও কিঞ্চং, না ক'র বঞ্চিত' এই সে দিনকার মন্ত্র। মালিকেরা যে যার অংশ বণ্টন করিয়া উপস্থিত, অনুপস্থিত, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই সম্মান রক্ষা করিতেন; দূরস্থ আত্মীয় স্বজনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন; অতিথি অভ্যাগতের আশু ব্যবহার জন্য পুষ্করিণীতে জীবিত মৎস্য 'গাঁৎ' দিয়া রাখিতেন এবং ছোট ছোট চারা মাছ বাড়িবার জন্য স্বতন্ত্র পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিতেন। দামোদরের 'পোণা' আনিয়াও পুকুরে ফেলা হইত। এ সব মাছের কোনও অংশই হাট বাজারে বিক্রয় জন্য যাইত না। জেলে, মালা. দুলে, নিকিরীরা যে সকল পুকুর জমা করিয়া লইত, তাহারই মাছ বাজারে বিক্রয় হইত। এই মাছ ধরা যেমন একটা পল্লী-উৎসবের মধ্যে গণ্য ছিল, তেমনই আর এক মহোৎসব ছিল, গ্রামপ্রান্তে 'আকের শাল' বসা। সকলের চাষের আক আসিয়া পর্য্যায়ক্রমে শালে জমা হইত এবং 'গাঁতা' করিয়া মাড়া হইত। খোয়া বা মাড়া আক বা আকের শুকনা পাতাই জ্বালানীর কাজ করিত। হিসাব স্বতন্ত্র থাকিত। গুড় তৈয়ারী হইলে 'শাল খরচ', জালুই 'বাড়ুই', 'কল-খরচ' বাদে অংশমত যে যাহার হিসাব করিয়া লইয়া যাইত। যে কয়দিন 'শাল' চলিত, গ্রামের লোক ইচ্ছামত আক খাইতে পাইত, আকের রস পাইত; মুড়ি দিয়া খাইবার জন্য 'তাতরসি' পাইত, গুড় প্রস্তুত হইলে তাহারও যথাসম্ভব অংশ পাইত, ভিঁড়ে লাড়ু এবং 'রশচাল' করিয়া লইয়া যাইত, কেহ বঞ্চিতও হইত না। যৌথ কারবার বল, কো-অপারেটিভ সোসাইটী (Co-operative Society) বল, তাহার সম্পূর্ণ বেসরকারী ব্যবস্থা এই আকশালে দেখিতে পাওয়া যাইত। আর দেখিতে পাওয়া যাইত গ্রামের 'খামারে'। যাহাদের বেশী চাষ তাহাদের নিজ নিজ 'খামার' ও গোলা ছিল। যাহাদের অল্প চাষ তাহারা স্থানে স্থানে একটা কো-অপারেটিভ 'খামার' স্থাপন করিয়া ধান ঝাড়িয়া 'গোলা' 'কড়ুই', 'মরাই' কিংবা 'ডোলে' তুলিত। সাধারণ লোকের ধারণা ও প্রবাদ ছিল যে 'মা লক্ষ্মী খড়ে বড়ই ভাল

থাকেন'। পাকা গোলার রেওয়াজ আমি ও প্রদেশে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ধান তোলার শেষে 'পৌষ বাড়ান' বা 'লক্ষ্মী তোলা' একটী ক্ষুদ্র ও সম্পূর্ণ পল্লী-কৃষি-উৎসব ছিল। কৃষকের ভবিষ্যৎ আশা, বংশের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী বা জ্যেষ্ঠ সন্তানবৎ আদৃত, কৃষিকার্য্যের ভৃত্য, ধান তোলার শেষ দিন, শেষ জমীর মাঝের ও গোছ ধান কৃষিমন্ত্রে পূজা করিয়া কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁক বাজাইতে বাজাইতে সমূল উপড়াইয়া, ক্ষুদ্র লাল চেলী জড়াইয়া জলের ধারা দিতে দিতে মহানন্দে শেষ দিনের সকল কৃষাণসহ বাটীতে পৌছিয়া ঐ 'পৌষ বীড়' 'মরাই' বা 'গোলা'য় তুলিয়া রাখিত ও সকল কৃষাণ শ্রমিক বন্ধু আত্মীয় মিলিয়া পিঠা পায়স খাইত। ইহা ঘটিত প্রায়ই পৌষ পার্ব্বণের পিঠাপিঠি। 'পৌষ বীড়া' উৎসব অনুষ্ঠানের পর পৌষ সংক্রান্তিতে 'পৌষ আগলা' আর একটা উৎসব। পৌষ আগলান কৃষিপল্লীর সাধারণ উৎসব। লক্ষ্মীশ্রী বাঙ্গালা মা লক্ষ্মীকে পাইয়া আগলাইয়া রাখিতে চাহিত। তাই এই সংক্রান্তির ভোরে কুললক্ষ্মীগণ পূজার আসনে পৌষবীড়কে স্থাপিত করিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদি দিয়া সম্বর্দ্ধিত করিতেন ও শঙ্খ-ধ্বনি সহকারে বড় আদর করিয়া ডাকিয়া বলিতেন, "এস পৌষ যেয়ো না, জন্ম জন্ম ছেড়ো না।" "এস লক্ষ্মী যেয়ো না, জন্ম জন্ম ছেড়ো না।" মা লক্ষ্মী ও তাই আসিতেন, বসিতেন, আপনার হইয়া থাকিতেন। তেমন আদর করিয়া এখন আর কেউ ডাকে না, তাই বাঙ্গালার চির-আদরিণীও আজ পর হইয়া গিয়াছেন।

যেমন ধান উঠিত, তেমন ছোট চাষীদের চাল তৈয়ারীও কো-অপারেটিভ বা সমবায় প্রণালীতেই হইত। কোনও মোড়লের বাড়ীতে সকলে মিলিয়া ধান সিদ্ধ করিত, শুখাইত ও ভানার ব্যবস্থা করিত। ঠিক 'ধর্ম্মগোলা' সর্ব্বত্র স্থাপিত না হউক, ধর্ম্মগোলার প্রচলিত আদর্শে দরিদ্রগৃহস্থ অনেক সাহায্য পাইত। গ্রামের আর একটা কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা ছিল, কাঁচা আমের সময় 'কাসুন্দি', পাঁচ বাড়ীর মেয়ে একত্র না হইলে তাহা হইত না। 'কাসুন্দি' প্রস্তুতের সময় সকল বাড়ীর মেয়েরা কোনও এক বা একাধিক নির্দ্দিষ্ট গৃহস্থের অন্তঃপুরে প্রাতে পূত স্নাত হইয়া উপস্থিত হইতেন। যে যাহার নিজের আম, মসলা, তেল, হাঁড়ি, সরা, ও বঁটী লইয়া উপস্থিত হইতেন। একত্রে কাসুন্দী প্রস্তুত করিয়া যে যাহার হাঁড়িতে তুলিতেন এবং তাহার পর যে কয়দিন প্রয়োজন ধারাবাহিকভাবে কাসুন্দী নাড়িতেন ও 'ভোগা' দিতেন। পাকা আমের সময় আমসত্ত্ব ও বড়ী দিবার সময় বড়ী দেওয়া, এই প্রণালী ব্যতীত কোনও প্রকারে সম্ভব হইত না। বড়ী দেওয়ার একটা মরসুম ছিল সেটা অগ্রহায়ণ-মাসের শেষা-শেষি। নূতন কার্ত্তিকী বিরী হাত বাছা করিয়া ভিজা-ইয়া ও পরে বাটিয়া ও শুধু কলাইবাট', আদা, লঙ্কা, মরিচ, মৌরী, হিঙ্গ, কালোজিরা ইত্যাদি মসলা দিয়া ও সেই সঙ্গে ছাঁচি-কুমড়া-কোরা মাখিয়া ছোট ও বড় নানাবিধ বড়ী, ঝিলাপী বড়ী, পাপর বড়ী, খাস্তাদার বড়ী, অম্বলের মিঠা বড়ী, পোস্ত বড়ী ও ব্যাসন বড়ী প্রভৃতি বহুবিধ বড়ী, পাঁচগাড়ীর গিন্নীরা মিলিয়া দিতে বসিতেন। রীতিমত আনন্দ হুলাহুলির মধ্যে বুড়াবুড়ির বিয়ে দেওয়ার প্রথাটা বেশ লাগিত। বড়ী এখন বাজারে কিনিতে হয়, তাও পয়সায় বারোটা (১২)। খাস্তাবড়ী ও পাপর বড়ী লুচিতে ও জামাই কুটুম ও সম্ভ্রান্ত অতিথি অভ্যাগতকে দেওয়া হইত। এখন পাপরেই চলে, অত ঝঞ্ঝাট করে কে? পোস্তবড়ী ভাজা যাহা আজকাল দেখা যায়, তাহার বাসও তেমন নয় আর মুচমুচেও তেমন হয় না। উপাদেয় ও সুলভ তরকারির এই একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। এই সকল জিনিস সময়মত সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে বর্ষাকালে যখন পথঘাট একাকার, হাট-বাজারে যাওয়া অসাধ্য, তখন গৃহস্থের প্রাণধারণও অসাধ্য হইত। কাসুন্দী ঠিক হইল কি না চাকিয়া বলিবার জন্য মাঝে মাঝে ছেলেদের তলব হইত। সে চাকিবার প্রণালীর একটু বৈশিষ্ট্য ছিল, হাতের চেটোর উল্টা দিকে কাসুন্দী লইয়া চাকিতে হইত। কুচরিত্রা স্ত্রীলোকের কাসুন্দী তৈয়ার ব্যাপারে কিছুমাত্র অধিকার বা স্থান ছিল না। তাই বা ইহার নাম আচার? বিবাহের 'স্ত্রী'-আচারেও এই সব আচার-হীনার স্থান ছিল না বা নাই।

পিঠা পার্ব্বণের কথাও বলিয়াছি এবং আমের কথাও তুলিয়াছি। আম যখন কাঁচা থাকিত, ছুরী ও লবণ

সংগ্রহ করিয়া 'বড়'দের সাহাচর্য্যে বাগানে বাগানে ঘুরিয়া বেড়ান দ্বিপ্রহরের নিত্যক্রিয়া ছিল। 'কাঁগমিঠা'র সন্ধান পাইলে লবণের প্রয়োজন হইত না। আম পাকিলে সকলে আদর করিয়া খাওয়াইতেন। আমের চোষা আঁঠী দাড়ি পর্য্যন্ত না পৌছিলে আম খাওয়াই সম্পূর্ণ হইত না। পিঠার সময় সেইরূপ আদরেই বাটী-বাটী ছেলেদের খাওয়ান হইত। সে সব পিঠার নাম স্মরণ করিলেও এখন অজীর্ণ দোষ আসিয়া পৌছে। এখনকার সৌখীন ছানার পিঠার ছাল ছাড়াইয়া খাওয়া তখনকার অনুমোদিত ছিল না। তখন খাইতাম,—আসকে পিঠে, পুর পিঠে বা সিদ্ধ পিঠে, সরু চাকলি, মুগ সামলী, আলুর ভাজা পিঠে, গুড়পিঠে, ফুলুরী, মূলাবড়া, কাস্তিপিঠে, পাটিসাপটা, পুলিপিঠে, মুনবড়া, রসবড়া, ইত্যাদি; ইহার উপর সমাবেশ হইত, পায়সায়,—চালের পায়স, চিঁড়ার পায়স, শ্যামাচালের পায়স, লাউ, পেঁপে ও আলুর পায়স, ইত্যাদি। এই পায়সের জন্য স্বতন্ত্র চাল ছিল, পরমান্ন শাল। প্রত্যেক সুগৃহস্থেরই পায়সের পরমান্নশাল চাল, খইয়ের জামাই লাড়ধান, চাষ কিংবা সংগ্রহ থাকিত। সম্পন্ন গৃহস্থের অন্নসচ্ছলতাও যেমন ছিল, অন্ন-পারিপাট্যও ছিল তেমনই। 'শাঁকোলের' শালী আউয়ল জমীগুলিতে ক্রিয়া কর্ম্ম জামাই-কুটুম পাল-পার্ব্বণাদির জন্য 'জীরেশাল' 'পালক-মাল', 'দাউদখানি', 'নবাবভোগ', 'সীতাশাল', 'কাটারী-ভোগ', 'বামামতি', 'ধাঁকতুলসী', 'মুগীবালাম', 'রাঁধুনী-পাগল' প্রভৃতি উত্তম মিহী ও সুগন্ধি ধানের চাষ হইত। ভাতরান্নার তদ্বির ও তারিফ যথেষ্ট ছিল। ভাতবাড়ার পারিপাট্যে রুচিজ্ঞতা ও আদরভরা থাকিত। সে ভাতও নাই, ভাতের সে আদরও নাই! এখন 'হা অন্ন'ই সার হইয়াছে,—চাষ নাই, 'পাশ' হইয়াছে,—খাওয়াও হইয়াছে 'ছাই পাশ'! এত ক্যালসিয়মেও (Calcium) 'ক্যালসিয়ম ডিফিসিয়েন্সী' (Calcium Difficiency) ব্যাধি বাড়িয়াই চলিয়াছে। সাধের ভোগ ভুগিতেই হইবে। নিত্য মুক্তের সন্তান আলো ও হাওয়ার মুক্ত আঙ্গিনায় পূবের আলোয় ফিরিয়া না দাঁড়াইলে ভদ্রতা নাই।

গৃহস্থের ভাণ্ডারের কথা কিছু ইঙ্গিত করিলাম। এই প্রসঙ্গে আরও দুই একটা কথা সারিয়া লই। ভাল গৃহস্থের বাটীতে পুরাতন চাউল, পুরাতন ঘৃত, পুরাতন তেঁতুল, পুরাতন গুড় প্রভৃতি সংগ্রহ থাকিত। আত্মীয়, কুটুম্ব, দীনদুঃখী প্রতিবেশী সকলেই তাহা চিকিৎসার্থে প্রয়োজন মত অংশ পাইত। প্রতি বৎসর যেমন খরচ হইত, সঙ্গে সঙ্গে ভাণ্ডারে সেইরূপ যোজনাও হইত, কখনও অভাব হইত না।

'পটো'র কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, আর এক বিষয়ে 'পটো'র কথা উল্লেখ করিতেছি। তাহার কারণ এ শ্রেণীর শিল্প সম্পূর্ণ অন্তর্হিত না হউক, অবনতির পথে দ্রুত চলিয়াছে। বামুন পাড়ার সংলগ্ন যাদববাটী নামক একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম, নদীর ধারে নদীর ঠিক বাঁকের মাথায় ছিল। সমৃদ্ধ তেলি, তামলি, গ্রামের অধিবাসী। মাজুর বাজার ও মুন্সীহাটে এবং নিকটবর্ত্তী হাটে তাহাদের কারবার। কেনারাম সরকার নামে একঘর সমৃদ্ধ কায়স্থেরও সেখানে বাস ছিল। তাঁহার বাটীতে দুর্গোৎসব হইত। প্রতিমার খড়, কাঠাম হইতে প্রতিমা গঠন, রং ফলান, সাজান পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেখিয়াও তৃপ্তি হইত না। মধ্যাহ্নে অতি অল্প সময়ের জন্য ধড়পাকড়ের চোটে বাটিতে আহার করিতে যাইতাম; আর বাকী সময় ছুতার, কুমার ও 'পটো'র কাজ যথাযথ সময়ে যেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত দেখিতাম, তাহা কার্য্যান্তরে প্রয়োগ করিলে কত ফল ফলিত তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অধ্যবসায় প্রয়োগও নিতান্ত নিরর্থক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। হিঙ্গুল, হরিতাল, হাঁসের ডিম এবং গর্জ্জন বা ঘাম তৈলের সাহায্যে রং ফলানর বাহাদুরী ও চালচিত্রের পারিপাট্য দেখে কে? সে পারিপাট্যের সম্যক বর্ণনার চেষ্টা আমার অসাধ্য। বঙ্কিমবাবু দেবী চৌধুরাণীর 'বজরা'র দরবার ঘরের ছাদে নিখুঁতভাবে সে চিত্র আঁকিয়াছেন। শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ; মহিষাসুরের যুদ্ধ, দশ অবতার, অষ্টনায়িকা, সপ্তমাতৃকা, দশ মহাবিদ্যা, কৈলাস, বৃন্দাবন, লঙ্কা, ইন্দ্রালয়, নবনারীকুঞ্জর, বস্ত্রহরণ সকলই চিত্রিত। চালচিত্রের চলতি নাম 'মেড়', 'ছটা' ইত্যাদি। মহেশ্বরীর স্বরূপকে কেন্দ্র করিয়া এভাবের পরিকল্পনা এক বিশিষ্ট শিক্ষা ও সাধনার পরিচয়। তদানীন্তন পল্লীশিল্পের অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রাম্য মালাকারের সমৃদ্ধ ধারণা ও অভ্যস্ত হস্তের অনায়াস-নির্ম্মাণ-সুলভ মূল্যের

তারকুসীর মুকুট ও ডাকের অলঙ্কার। রূপালী তারের প্যেচের ফাঁকে চুমকীর টিপ ও ঝুটা জরীর কারচুপী অতি চমৎকার, সাজ ও বস্ত্রাদি প্রতিমার সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করিত। আজকাল কুমারটুলীর গড়া ফরমাসী প্রতিমায় সে কৃতিত্বের শতাংশের একাংশও দেখিতে পাই নাই। কুমারটুলীর কারিকর ও কৃষ্ণনগরের কারিকরের কারিগরি উত্তরকালে অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু 'থলে'র কারিকরের সেই ললিত কম অঙ্গ-নির্ম্মাণ;—সেই পায়ের আগে কুঁড়ির মত ফুটিয়া উঠা অঙ্গুলী, সেই দেহ-যষ্টির তেজোভঙ্গিমা, সেই আকর্ণবিশ্রান্ত কমলদলনেত্রে করুণাগলিত সংহারদৃষ্টির অপূর্ব্ব প্রয়োজনা ও ভাববিন্যাস এক অসাধারণ সৃষ্টি। অমন কোপ-প্রেম-গর্ব্ব-সৌভাগ্যমণ্ডিত মুখচ্ছবি, মাতৃমূর্ত্তির অমন যথার্থ ব্যঞ্জনা, ওই পল্লীস্বাপ্নিকের যুগ-যুগের তপোলব্ধ ধন। এই সব অতীত স্মৃতির শ্মশান হইতে আজ তাত্ত্বিকের চিন্তা খোরাক পাইতেছে। সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে, কিন্তু সাধনা ডুবিতেছে। এস্বপ্ন আর মরণ-নিদ্রায় কেহ দেখিতেছে না। দশপ্রহরণধারিণী জননীর এই পালিনী রূপ, আত্মবিস্মৃত সন্তানকে চিরমৃত্যু হইতে অমৃতবক্ষে লইবার এই স্নেহবিজড়িত শাসনের অতুলনীয় সুন্দর পরিকল্পনা ও পরিপূর্ণ রূপসজ্জা 'থলের' কারিকরের 'দৈবীকৃপা' বলিয়াই প্রসিদ্ধি। তেমনটী আর দেখি নাই। পূজককে শিল্পীসূত্রধরের নিকট পূজারম্ভে 'চক্ষুদান' প্রার্থনা করিয়া লইতে হইত, এখনও হয়। যে চক্ষু দিয়া শিল্পী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছে, যে তুলি দিয়া মাটীর চক্ষে সজল কৃষ্ণতারকা চিত্রিত করিয়া উদার মাধুরীতে প্রাণবন্ত করিয়াছে, পূজকের মন্ত্র তথায় পৌছিতে পারে না; সে যে তিলে তিলে আত্মদানের স্বর্গীয় অবদান! এই পরিণত বয়সে সেই মাতৃমূর্ত্তির মাধুর্য্য স্মরণ করিলে আমার পুত্রত্ব আজও নবীভূত আনন্দে উথলিয়া উঠে। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক 'যাজপুরের' প্রস্তরময়ী মাতৃকা মূর্ত্তির সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়া বসিয়াছেন যে সুকুমার মাতৃমূর্ত্তির করুণ মাধুর্য্যের মধ্যে কঠোর বীরভাব শিল্পী কি করিয়া আনিয়াছিল বলা যায় না। 'থলের' কারিকরের প্রতিমা-গঠন-চাতুর্য্য দেখিবার সৌভাগ্য বোধ হয় তাঁহাদের ঘটে নাই। বামুনপাড়া মাতুলালয়ের নিকটবর্ত্তী গ্রাম 'থলে'; হাওড়া জিলার তথা পশ্চিম রাঢ়ের গৌরব-পরিচয়।

প্রতিমা গঠন শেষ হইলে বোধন, কলাবৌএর স্নান, জল সওয়া, নবপত্রী সাহায্যে শক্তি-সঞ্চার, শাস্ত্রোক্ত নানা রঙের গুঁড়ি দিয়া দেবতাবিশেষের পূজায় প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক চিত্র ও বর্ণ, বিশেষরূপ ও ভাবব্যঞ্জক এবং নির্দ্দিষ্ট ব্যাস বা পরিধির আঁকা আসনের উপর ঘটস্থাপন প্রভৃতির পর গুরু-গম্ভীরস্বরে পল্লীপূজকের 'পূজা' ও 'চণ্ডী'-পাঠের প্রাণগলা মাধুরী এ জীবনে কখনও ভুলিব না। উত্তরকালে একাসনে নিত্য সপ্তসতী পাঠের শক্তি ও প্রবৃত্তি বোধ হয় এই সময় এই সকল পারিপার্শ্বিকতা হইতেই অর্জ্জিত হইয়াছিল। তিন দিনের মহোৎসব, পূজা, হোম ও ভূরিভোজন ব্যবস্থায় পল্লী মুখরিত থাকিত। সর্ব্বস্তরব্যাপী এমন সার্ব্বজনীন আনন্দোৎসব সারাবর্ষের এই প্রথম, তাই জ্যেষ্ঠ বড় পূজা, শরতের শ্রেষ্ঠ দান শারদীয়া, বাঙ্গালার বাঞ্ছিত পরব। পশুবলির ব্যবস্থা ছিল না বলিয়া উদার বৈষ্ণব মাতামহ আমার নিত্য এ মহোৎসবে যোগদানে কোনও আপত্তি করিতেন না।

পূজান্তে বিসর্জ্জনের পালা, সে কি করুণ দৃশ্য! বাণীতে বায়ুতে ও বাদ্যে বিসর্জ্জনের সুর! পূজক ঘট নাড়িয়া কজ্জলি ছিঁড়িয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে যখন বলেন 'সংবৎসরব্যতীতেতু পুনরাগমনায় চ—'; যখন স্নানকুম্ভের দর্পণ লইয়া এবং থালায় হলুদজল রাখিয়া স্থলে, জলে ও আকাশে পাদপদ্মের প্রতিবিম্ব দর্শন করাইয়া ইষ্টার্ঘ্য প্রদান করেন, তখন সে পূজা অভিনয় শেষ হইয়া, মহীয়সী দেবী শক্তির পুনরাবির্ভাব হয়। ইহা বাঙ্গলার বিশেষতঃ বাঙ্গালা পল্লীর নিজস্বধন,—পল্লী-পুরন্ধ্রী সাশ্রুনয়নে বাষ্পগদগদ ভাষায় বরণ করিয়া মাকে যখন বিদায় দিলেন, তখন মহামায়া মহাশক্তির কথা যেন কাহারও মনে রহিল না,—পল্লী-বালিকাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার করুণ অভিনয় হইয়া গেল। কনকাঞ্জলির পর মুখে পান সন্দেশ দিয়া, হলুদ জলে পা ধোয়াইয়া, অঞ্চলে পা মুছাইয়া যখন কর্ত্রী প্রতিমার চিবুকের চুমা খাইতে খাইতে সজল নয়নে স্নেহভরে বলিলেন, 'মা! আবার এস' 'মা! আবার এস', 'মা! আবার এস', মন তখন আর মানিল না, সবাই বলিল 'মা! আবার এস' আবার এস, আবার এস'। তাই আজিও আসিতেছেন, ডাকার মত ডাকিলে কি মা না আসিয়া থাকিতে পারেন?

এ মোহজাল ভাঙ্গিল, পুরোহিতের বারবেলা, কালবেলা প্রভৃতির তাড়নায়। কন্যাবিদায়ের সময়ের মোহও এইরূপেই কাটে। মহাসমারোহে সবস্ত্রা, সালঙ্কৃতা প্রতিমা নদীজলে নিমজ্জিত হইল। তাহার পর বিজয়ার মহোৎসব। অপরাজিতার ডুরি বাঁধা, শান্তি নেওয়া, প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, আবাহান ও শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে কোলাকুলি। নিজ হাতে গড়িয়া, নিজ হাতে সাজাইয়া, অর্চ্চিয়া, নিজ হাতে ভাসাইয়া, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের এ অভিনয়কে পৌত্তলিকতা বলিতে হয় বল, কিন্তু শৈশবের কোমল মনের উপর ইহার যে ছাপ পড়ে, তাহা মুছিবার নয়। যখন এ ছাপ পড়িয়াছিল তখন কমলাকান্তের দুর্গোৎসবের আয়োজন হয় নাই বা তখন বন্দেমাতরম্-স্রষ্টা ঋষির অপূর্ব্ব ভাব-বিন্যাসের অধিকারী হই নাই—এবং গীতাসভার সভাপতির আসনে বসিয়া পণ্ডিতপ্রবর খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীরও মহামহোপাধ্যায় সিতিকণ্ঠ বাচস্পতির অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা তখনও শুনি নাই। এইরূপ বহু পল্লী-উৎসবের মাঝে সে ছাপ দৃঢ়তর হইল।

'বার মাসে তের পার্ব্বণ' কথার কথা; তেইশ কি তেত্রিশ কত যে পার্ব্বণ পল্লী-সমাজে ছিল তাহার ইয়ত্তা করিতে পারি না। সব কথা বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। চৈত্র-পার্ব্বণের কথাটা বলি। চৈত্রপার্ব্বণের সে সকল দৃশ্য তিরোহিতপ্রায়। কলিকাতায় ছাতু বাবু-লাটুবাবুর মাঠে এবং কোনও কোনও বস্তীর ভিতর হয় তো কেহ কেহ ইহার কিয়দংশ দেখিয়া থাকিতে পারিবেন; কিন্তু পল্লীতেই ইহার পূর্ণবিকাশ ছিল। গাজন-তলায় প্রকাণ্ড এবং বহু উচ্চ মাচা বাঁধা হইত। সমস্ত চৈত্রমাস ধরিয়া সন্ন্যাসীর দল প্রস্তুত হইয়াছে, জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল সন্ন্যাসী গ্রামবাসি-মাত্রেরই নমস্য এবং সেবাধিকারী। সন্ন্যাসীদের ফিকা গৈরিক বস্ত্র, গলায় উত্তরী—মোটা এলো সুতার গুচ্ছ, মাঝে কুশাঙ্গুরী; হস্তে দণ্ড, মাথায় বিনান বেত্রগুচ্ছ; রুক্ষ আনন্দ-নির্ভরতার-মূর্ত্তি, অতি চমৎকার! চৈত্রের 'গজকা'বাঁধা ঢাকের চঞ্চল গম্ভীর শব্দের লয়ে লয় মিলাইয়া 'সেবাথাটা' 'স্মরণ বাণী' এবং 'ফুল কাড়ানো' 'ঝাঁপভাজা', 'কাঁটাকাটা', 'লীলাবতীর বিবাহ', 'সালে ভর', 'হেঁদোলা', 'কাগকে পাতাড়ির নৃত্য' এই সকল ব্যাপারের মধ্যে এক অদ্ভুত শক্তিমত্তা, গাম্ভীর্য্য ও অকপট ভগবৎ প্রীতির সম্মিলন-দৃশ্য দেখিতে পাইতাম। ফুল কাড়ানো মাহাত্ম্য, নবোদ্গত ত্রিদল বিল্বপত্র ঘন-চন্দন-চর্চ্চিত হইয়া গ্রামের ভাবী মঙ্গল কামনায় মঙ্গলময় দেবাদিদেব চন্দ্র-চূড়শীর্ষে অর্ঘ্য স্থাপিত হইত। তেমন ঘন-চন্দন-চর্চ্চিত বিল্বদলও স্ফুরিত হইয়া প্রার্থিত অঞ্জলি মধ্যে আসিত; 'ভর'-প্রাপ্ত সন্ন্যাসীর কাণে 'চিতেন' বাজনা বাজান হইত। গ্রামবাসী উপবাসী, উৎকণ্ঠিত, করুণার্থী, গলবাসে দণ্ডায়মান। বৈজ্ঞানিক প্রমাণের যুগে ইহা প্রকাশিত হইবার মত ভাষা আজিও বাহির হয় নাই। 'ঝাঁপভাজা',—সু-উচ্চ মঞ্চ হইতে উপবাসী সন্ন্যাসীর বহুনিম্নে বঁটি, কাঁটা, কাটারী, তলোয়ার, আগুন, এমন কি সাপ ইত্যাদির উপর বুক দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ার প্রথা ছিল। যেন সন্ন্যাস-শক্তি-বলে সন্ন্যাসী-শ্রেষ্ঠের কৃপায় জীবনের সকল বিঘ্ন-বাধা-বিপত্তির মধ্যে অকুতোভয়ে ঝাঁপ দিয়া অক্ষত শরীরে অভীষ্টকর্ম্মোদ্ধারের চেষ্টার অভিনয় হইত। আবার দেখিতাম তীক্ষ্ণ লোহার বঁড়শী দিয়া পিঠের চামড়া ও মাংস-পেশী ভেদ করিয়া উচ্চ 'চড়ক' কাঁধে 'দে পাক—দে পাক' চীৎকারের মধ্যে সন্ন্যাসীকে ঘোরান। নৃশংস বলিয়া যখন আইন এ প্রথা প্রতিষেধ করে, তখন পিঠে কাপড় বাঁধিয়া এ ঘোরান চলিত। বুঝাইবার বোধ হয় চেষ্টা এবং উদ্দেশ্য যে জীবন-চক্রের ঘূর্ণিপাক কিছুতেই বন্ধ হইবার নয়—তাহাতে পিঠের চামড়া ও মাংস ছিঁড়িয়া যায়, যাউক!

শিবের গাজনের ন্যায় গ্রামপ্রান্তে 'ধর্ম্মের গাজন' ও হইত। আর এক গাজন হইত, উহা 'আকল গাজন'। —কিন্তু পুঁথি বাড়িয়া যাইতেছে।

যাদববাটী গ্রামের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সে গ্রামের ভিতর দিয়া অদূরে নদীর পরপারে মাতামহের নীলকুঠী। প্রকাণ্ড স্বচ্ছ সরোবরের উপর বাঁধাঘাট, ধাপের উপর ধাপ, আরও ধাপ, তাহার উপর বৃহৎ পাকা 'হৌজ' বা চৌবাচ্চা। বর্ষায় নদীর জল বাড়িয়া গিয়াছে, গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে ডোঙ্গা, নৌকা, সাল্তী বোঝাই হইয়া নীল আসিয়া লোহার শিকলের বেষ্টনে পাম হইয়া 'হৌজ' বোঝাই হইতেছে। হৌজের এ পার

হইতে ও পার পর্য্যন্ত বড় বড় বাহাদুরী কাঠের কড়ি ও তক্তা সাহায্যে নীলের গাছের উপর জাঁক দিয়া যত দূর সম্ভব চাপান দেওয়া হইতেছে। সেই উচ্চ ধাপের উপর ধাপের দুইদিকে দাঁড়াইয়া বহুসংখ্যক মজুর বড় বড় 'সিউনি'তে দড়ি বাঁধিয়া চৌবাচ্চা হইতে চৌবাচ্চার জল তুলিয়া সেই জলে 'হৌজ' পূর্ণ করিতেছে। হৌজের গায়ে উচ্চে, নীচে বহুসংখ্যক ছোট বড় গর্ত্ত। নীল পচিলে পচাজল পাকা নালীতে পড়িতেছে। নালী দিয়া নীচের অন্য হৌজে জল পৌছিলে, কাঠের হাতা দিয়া অসংখ্য মজুরের নীল গাঁজিবার পালা। তারপর গাঁজা জল থিতাইলে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। তার পর নানা হৌজের ভিতর দিয়া নানা নালী পার হইয়া, নানা প্রক্রিয়ার পর নীল জলের কাদানী সংগ্রহ করিয়া নীলের বড়ী প্রস্তুত হইল। স্বতন্ত্র ঘরে সরু বাখারীর মাচার উপর সে বড়ী শুখাইলে বাক্সবন্দী হইত। তাহার পর গোযানে কলিকাতা নীলের হাটে চালান দেওয়া হইত। নীল বোনা হইতে নীল চালান দেওয়া পর্য্যন্ত একটা দীর্ঘকালব্যাপী পল্লী-উৎসবের ন্যায় ছিল।

কৃষক ও মজুর ন্যায্য পাওনা গণ্ডা পাইত, আনন্দের সহিত কার্য্য করিত এবং মাতামহেরও যথেষ্ট অর্থাগম হইত। ইহার ভিতর কণামাত্র অত্যাচার, নির্য্যাতন বা অসদ্ ব্যবহারের চিহ্ন মাত্রও ছিল না। বহু বৎসর পরে 'নীলদর্পণে' বিষধর নীলকরের বীভৎস বর্ণনা পড়িয়া বুঝিতে পারিতাম না যে, নীলকরের হাতে মাতামহ-প্রচলিত নিয়মের বীভৎস ব্যভিচার কোন হইত। ব্যবসাদার নীলকর যে পাপের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। তাহাদের নীলের লাভজনক ব্যবসা উঠিয়া গিয়া এখন সস্তা অকর্ম্মণ্য Synthetic Dye এর উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। যে ব্যবসায়ে বা কর্ম্মে লোকের উপর অমানুষ অত্যাচার হইয়া পাপ প্রশ্রয় পায়, তাহারই এই দশা অবশ্যম্ভাবী।

কার্ত্তিক মাসে নিয়ম-সেবার কথা পূর্ব্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। বিশিষ্ট বৈষ্ণব বংশেও এপ্রথা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। সেজন্য আরও একটু বিস্তৃত উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সমস্ত কার্ত্তিক মাস পরিবারস্থ সকলে ও পল্লীবাসিগণ সংযতচিত্তে ভগবৎ-সেবা ও অর্চ্চনায় একমনে ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ, অপরাহ্নে ব্যাখ্যা ও সন্ধ্যার পর সুমধুর হরি-সংকীর্ত্তন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও দরিদ্র নারায়ণের সেবা, এই সেবার অঙ্গ ছিল এবং মাসাবধি সেবা নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হইত বলিয়া তাহার নাম নিয়মসেবা। ভোরে 'টহলিয়া'গণ গ্রামে সকল বাটীতেই হরিনামের 'টহল' দিয়া বেড়াইতেন এবং তাহা শুনিয়া গ্রামবাসী নরনারী পূত, স্নাত ও শুদ্ধ হইয়া মাতামহের ঠাকুরদালানে ও প্রাঙ্গণে সমবেত হইতেন। মাসান্তে মহোৎসব, তাহা অপূর্ব্ব বিরাট্ ব্যাপার। তাহার পূর্ব্বেই মাসকালব্যাপী পাঠ ও ব্যাখ্যা শেষ হইয়াছে। প্রাতঃকালে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে সমাগত কীর্ত্তনীয়া ও গ্রামিক দল, নগর সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইয়া আনন্দে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতেন। সঙ্গে তুরী, ভেরী, ধ্বজ, পতাকা, খুন্তী ও পাঞ্জা, কারুকার্য্যখচিত রেশমের ছাতার তলে স্বয়ং গোস্বামী মহাশয় কীর্ত্তন-দলের শেষে চলিয়াছেন, কার্ত্তিকের শেষেও তাঁহার সেবার্থ দুই আড়ানী পাখা চলিয়াছে। পথে যথা তথা গৃহস্থ 'হরিরলুট' দিতেছে। সে কি আনন্দদৃশ্য! মধ্যাহ্নে আনন্দবিভোর নগরকীর্ত্তন ফিরিয়া আসিয়া বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে উন্মাদ-নর্ত্তন আরম্ভ করিল; কাহারও বা দশা-প্রাপ্তি হইল। কাহারও বা মূর্চ্ছা, কাহারও বা তাণ্ডব নৃত্যের সহিত হুহুঙ্কার, তারপর উঠানে কলসী কলসী হলুদজল ঢালিয়া তালঠাণ্ডা হইল; সে পঙ্কচর্চ্চিত হইয়া ভক্ত ধন্য হইলেন।

ইতোমধ্যে ভিতর দালানে মহোৎসব বা মোচ্ছবের আয়োজন হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য বড় বড় মালসা সারি সারি সাজান হইয়াছে। পাশে মাটির গামলা তাহা মহাবীরের ভোগে নিযুক্ত। মহাবীরের না কি সর্দ্দি কাশির আশঙ্কা আছে? সেজন্য তাহার সহিত জল-স্পর্শের ব্যবস্থা ছিল না। তাঁহার চিঁড়া মুড়কীর ভোগ দুধে মাখা হইত। মালসাগুলির ভোগ জলে মাখিয়া দধিসংযোগ হইত। তাহার উপর নানাবিধ ফল ও বৈষ্ণবের চিরপ্রিয় 'মালপো' ভোগ। দ্বাদশ গোপাল, ছয় গোস্বামী, চৌষট্টি মহান্তের স্বতন্ত্র মালসা; বকুলপাতায় কিংবা আম্রপাতায় তাঁহাদের স্বতন্ত্র নাম লিখিয়া স্বতন্ত্র মালসার টিকিটের কার্য্য করিত। ভিতর ও বাহির দালানের,

দালানের থামের মাঝের ফোকরে ফোকরে মোটা নীল রঙের পর্দা। ভোগের সময় ভিতর দালান হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া গোস্বামী মহাশয় ভোগ নিবেদন করিলেন। ভোগ নিবেদনান্তে পর্দা খুলিয়া দেওয়া হইল; সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া লুণ্ঠিত হইলেন; টাকা, আধুলী, সিকি, দুয়ানী, পয়সা যাহার যেমন সাধ্য প্রণামী দিলেন। 'ঢপুয়া', 'ছাদাম', 'দামড়ি' এমন কি 'কড়ি'রও অভাব হইল না, এসকল তখন পল্লীপ্রচলিত মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত

তাহার পর ভোগবণ্টন ও বিতরণ। গ্রামের সকলকেই ভোগের অংশ প্রেরিত হইল, কোথাও পূরা, কোথাও অর্দ্ধেক মালসা, কোথাও কম। তারপর অবশিষ্ট অংশ উপস্থিত ব্রাহ্মণ সজ্জন, বৈষ্ণব ও দরিদ্র নারায়ণ সেবায় প্রাঙ্গণের তিন দিকে বিস্তীর্ণ দালানে ব্যবহৃত হইত। বহুপরে পুরীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের অন্নশালা দেখিয়াছি, এ দৃশ্য তাহার নিতান্ত বিসদৃশ নহে। মধ্যে প্রসাদভোজী বৈষ্ণবগণের 'সাধু সাবধান' উচ্চারণসহিত হুঙ্কার। প্রসাদবিতরণের পূর্ব্বে গৃহস্থ হলদে ছোপান গামছা অথবা নামাবলী যাহা বিতরণ করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবের মাথায় বাঁধা। এ দৃশ্য কি কখনও ভুলিতে পারিব? সময়ে সময়ে তাহার পুনরভিনয়ের ক্ষীণ ব্যর্থ চেষ্টা-সময়ে সে দৃশ্য বহুবার মনে পড়িয়াছে

বৈষ্ণব-পরিবার-প্রচলিত আর একটী প্রথার উল্লেখ করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব—তাহা অষ্টপ্রহর বা চব্বিশ প্রহরব্যাপী হরিনাম। তুলসীমঞ্চ বা শালগ্রামশিলা বেড়িয়া দলে দলে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় পালা করিয়া অধিবাসের পর নামকীর্ত্তন করিতেন এবং তাহার শেষে ক্ষুদ্রাকারে মহোৎসবের পালা হইত।

এরূপ কত পল্লী-উৎসবের উল্লেখ করিব প্রচলিত তখন একটী ছড়া শুনিতাম, 'আশ্বিনে অম্বিকা পূজা ইত্যাদি'। তখনকার পল্লী-সমাজ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আকারে এ সকল উৎসবেরই আনন্দ উপভোগ করিত, তাহাতেই সমাজ সজীব থাকিত। ম্যালেরিয়ার নামগন্ধ ছিল না। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি শুধু মুখের নয়—যথার্থ অন্তরের সহানুভূতি। এক বৎসর অজন্মা হইলেও অন্নকষ্ট ছিল না, বিলাসিতা ও আড়ম্বর তিলার্দ্ধ ছিল না। এখন চারিদিকে নানাপ্রকারের হাহাকার! কাজেই সে সকল উৎসব-ভাব তিরোহিত হইয়াছে। মানুষের ন্যায়, ধর্ম্মের ন্যায়, উৎসবেরও নামমাত্র আছে, সব কঙ্কালসার। সে সব উৎসবের স্মৃতিতেও আনন্দ; তাই যত্ন করিয়া মেয়েদের নিকট বিস্মৃতি-জলে নিমগ্ন সেই ছড়া সংগ্রহ করিয়াছি। এ তালিকা বর্ণে বর্ণে সত্য।

রাধানগরে থাকিবার সময় আমার জ্যেঠতুতো ভগিনীর ধুমধামে বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছি। বামুনপাড়াতেও আর এক ধুমধামের বিবাহ দেখিয়াছিলাম। আঁটপুরের মিত্রদের বাটীতে আমার ছোট মামার বিবাহ হয়। বর্দ্ধমানের কারিকরেরা কয়েকখানা পাল্কী তৈয়ার করিতেছিল, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে সকল পাল্কী এই বরের শোভাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বরের পাল্কীখানা বড় বিশেষ কারিকুরির সহিত তৈয়ার হইয়াছিল। তাহার রং চং, রেশমের ঝালর, বিছানা ও বালিস এবং পাল্কীর বাঁটের মুখে রূপার কাজ, পাল্কীর শোভা ও সমৃদ্ধি যথেষ্ট বাড়াইয়াছিল। তৈয়ারীর সময় এবং পরে গ্রাম গ্রামান্তরের লোক তাহা দেখিতে আসিত। ষোলজন বেহারা না হইলে সে পাল্কী চলিত না। কি অধিকারে জানি না; শোভাযাত্রার সময় বরের সহিত সে পাল্কীতে আমি স্থান পাইয়াছিলাম। পাল্কীর আগে, পিছে, পাশে ২৫০।৩০০ পাইক, বরকন্দাজ ও লাঠিয়াল লাল পাগড়ী বাঁধিয়া দীর্ঘ লাঠি হাতে দৌড়াইতেছিল। কাহারও কাহারও হাতে রূপার বালা, সর্দ্দারদিগের গলায় সোণার ডুমরো মালা। পিছনে পাল্কীতে এবং পদব্রজে বিস্তর বরযাত্রী। আগে নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড,—ঢাক, ঢোল, ঢোলশানি, গরুর গাড়ীতে নহবৎ ও রসুনচৌকী, কাড়া, নাগড়া, জগঝম্প ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে পুতুলনাচ ও শোলা ও কাগজের নানারূপ জীবজন্তু ও মানুষের মূর্ত্তি, সঙ্গে পিছনে অনেক খাসগেলাস, ফুলের ছড়ি, সিঁড়ি, মই ইত্যাদি। আঁটপুর গ্রাম দূরে বলিয়া আলো জ্বালা দেখার সৌভাগ্য ঘটে নাই; কারণ কিয়দ্দূর গিয়াই আমাকে অন্য পাল্কীতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে হইল। অতদূর যাওয়া-আসা ও রাত্রি জাগরণে মাতামহ বিশেষ আপত্তি করিলেন।

কাজেই আঁটপুরে আলোজ্বালা, আতসবাজী ও অন্যান্য সমারোহ দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই।

আঁটপুরের মিত্ররা প্রসিদ্ধ কায়স্থবংশ; ব্যারিষ্টার রাজনারায়ণ মিত্র, * ইঞ্জিনিয়ার আশুনাথ মিত্র' সেই বংশের বংশধর। বরপক্ষের শোভাযাত্রায় যেরূপ সমারোহ শুনিয়াছি, কন্যাগৃহে আতিথ্যেরও সেইরূপ প্রাচুর্য্য। পরদিন বর আসিবার সময় 'হাটতলা' পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্গমন করিতে গিয়াছিলাম। কন্যাপক্ষের বহুতর লাঠীয়ালও সঙ্গে আসিয়াছিল। হাটতলায় উভয় পক্ষের লাঠিয়ালগণের রণাভিনয় দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম, সময় সময় ভীতও হইতেছিলাম। লাঠিয়ালদের হাতে শুধু লাঠি ছিল না, অনেকের হাতে ঢাল তলোয়ার। সেজন্য সে রণাভিনয় বিশেষ খরতর হইয়া উঠিয়াছিল। লাঠিয়ালের সহিত লাঠীয়াল, ঢালীর সহিত ঢালী সড়কীওয়ালার সহিত সড়কীওয়ালা সমান তেজে ও উৎসাহে লড়িতেছিল! সময় সময় উত্তেজনা বাহুল্যে অভিনয় ভুলিয়া রক্তপাতের সম্ভাবনা যখন হইল তখন সর্দ্দারেরা খেলা থামাইয়া দিল। খেলার গোড়ায় দম্ রাখার বাহাদুরী দেখাইবার জন্য একজন লাঠিয়ালকে লম্বা গর্ত্তে উপুড় করিয়া পুতিয়া ফেলা হইল। পুতিবার সময় সে কেবল হাতের কনুই দুটী মাটিতে রাখিয়া, একটু মাথা উঁচু করিয়া শুইয়াছিল। এ 'জীতাজানে কবর' এর কি ফল হয় জানিবার জন্য সমস্ত সময়টা আমার যে ভয় ও ঔৎসুক্যে কাটিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। আশে-পাশে কেহ চুলে বাঁধিয়া বা দাঁতে ধরিয়া ঢেঁকী ঘুরা-ইতে ছিল; কেহ দীর্ঘ 'রায়-বাঁশ' চালাইতেছিল; কেহ skateএর মত দীর্ঘ লম্বা বাঁশের সাহায্যে ভীষণ লম্ফ দিয়া বর্ণনাতীত দ্রুত বেগে অভিনয়-ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৌড়িতে-ছিল; কি করিয়া ক্রোশের পর ক্রোশ অতি অল্প কালে অতিক্রম করিতে পারা যায় ও উচ্চ প্রাচীর ডিঙ্গান যায়, তাহার কৌশল দেখাইতেছিল। মহরমের সময় যে আগুনের খেলা হয় তদপেক্ষা বহুতর কৌশল ও নৈপুণ্যের পরিচায়ক আগুনের খেলাও কেহ কেহ দেখাইয়াছিল। এই সব খেলা সাঙ্গ হইতে হইতে শোভাযাত্রা পুনরারম্ভের সময় আসিল। বারবেলা নয়—এমনি একটা কি ছিল বলিয়া "বর-কনে" বাড়ী পৌঁছিবার সময় পিছাইয়া দিতে হইয়াছিল। সেইজন্য এই সময়টা এইরূপ খেলায় কাটান হইল। যাহা দেখিলাম তাহা পরে আর কখনও দেখি নাই, আর কখনও দেখিব না। সে অস্ত্র-কৌশল তিরোহিত হইয়াছে, সে সব কৌশলী লোকও তিরোহিত হইয়াছে। আর যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সে কৌশল সৃষ্টি হইয়াছিল ও প্রসার পাইয়াছিল তাহাও লুপ্তপ্রায়।

আলো, আতসবাজি, বাদ্যোদ্যম ও বিজয়ী সেনার প্রত্যাবর্ত্তন অভিনয়সজ্জায় শোভাযাত্রা চলিল। বিবাহ শোভাযাত্রাটা অধম বাঙ্গালাতেও রণাভিনয় সজ্জার অনুরূপ ছিল, সুদূর পশ্চিমে প্রয়োজনমত বীরকেশরী শিবাজী বিবাহ শোভাযাত্রার অনুসরণে রণসজ্জা করিতেন। যাঁহারা পল্লীগ্রামে বৈবাহিক ব্যয়-তালিকার মধ্যে 'ঢেলা' মারুণী বাবু লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে শোভাযাত্রা গ্রামপ্রান্তে পৌঁছিলে কন্যাযাত্রদল প্রচণ্ড বেগে 'ঢেলা' বর্ষণ করিতেন এবং উপযুক্ত দক্ষিণা বা মর্য্যাদা পাইলে তবে শোভাযাত্রা অগ্রসর হইতে দিতেন। বিবাহের পরদিন কন্যাকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন-যাত্রা অন্য পথে করিতে হইত এবং বোধহয় পূর্ব্ব দিনের সংঘর্ষ স্মরণ করিয়া এ সতর্কতার সৃষ্টি হইয়াছিল। এখন পুলিশরক্ষিত সহরে ও ম্যালেরিয়া পীড়িত পল্লী-গ্রামে পূর্ব্বেকার মত হাতাহাতি মারামারি হয় না; হয় কথার কাটাকাটি, তাহাও উঠিয়া যাইতেছে, কারণ সুসভ্য কন্যাযাত্রী কেবল বিশদ-দশন প্রদর্শন করিয়া ও শারীরিক গ্লানির অজুহাত দেখাইয়া বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। আলাপ-পরিচয়, কথাবার্ত্তা আহারাদির মর্য্যাদা উঠিয়া গিয়াছে, আছে বাকী কেবল দন্তবিকাশ। "ঢেলা মারুণী" ও উঠিয়া গিয়াছে আছে বাকী "দোর ধরুণী" "শয্যা তুলুনী" "ননদ ক্ষেনী" "মাতুল ব্যবহার" ও "গ্রামভাটী"। নূতন গজাইয়াছে লাইব্রেরী (Library)—ক্লাব (Club) জিম্‌নেসিয়াম্ (Gimnasium) আর আমার সাধের "রিফি-

---

* ইনি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না, গবর্ণমেণ্ট একাউণ্টেণ্ট ছিলেন, শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয়ের মাতুল পরমারাধ্য অদ্বৈতকুমার সরকারের জ্যেষ্ঠ কন্যা মনোমোহিনীকে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন। পঃ পুঃ সঃ

উজ" (Refuge)। কাঙ্গালি-বিদায় উঠিয়াছে—ব্রাহ্মণ-বিদায় উঠিয়াছে। বিপুল বাদ্যোদ্যমের সহিত বর-কনের অভ্যর্থনা হইল। সদর দরজায় জীবন্ত মৎস্য দেখান হইল। শ্বশুর বংশের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় দুধ খেলান দেখান হইল ধেড়ে মেয়ের চলন তখনও হয় নাই, কোনও বর্ষিয়সী পুরন্ধ্রী অক্লেশে কনেকে কোলে লইয়া সদর দরজার চৌকাঠ পার হইলেন। শুদ্ধান্তঃপুর আবাসোপযোগী করিবার অভিপ্রায়ই বোধ হয় কনের এই চৌকাঠ ডিঙ্গান বারণ। উদ্বাহ উত্তমরূপ বহন করা—সার্থক-নামা হইল। তারপর ভিতর বাটীতে যে আচার ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ সমাধা হইল তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, সকলেই জানে। মেয়ের অলঙ্কারাদি খোলা হইয়া পিত্তলের ছোট ছোট 'গুলম্যাক মারা' ছোট ছোট কাঠের বাক্সে রাখা হইল। কাপড় চোপড় আসিয়াছিল নবপ্রচলিত চামড়া মোড়া মাঝারি 'গুলম্যাক-মারা' তোরঙ্গে, তাহাও দেখিতে সুন্দর। সে বাক্স, তোরঙ্গ তুলিয়া রাখিবার জায়গায় ইঙ্গিত করিব বলিয়া এ কথার প্রস্তাবনা। আমাদেরও অজানা এক চোর-কুঠারির ভিতর তাহার স্থান হইল। কত আঁকা বাঁকা গলি-পথ ও সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া সে চোরা কুঠরিতে পৌছিতে হইত তাহা বর্ণনাতীত। যে দিকে সে কুঠরী অবস্থিত সে মহলে উঠিবার সিঁড়ীর মাঝামাঝি হেলান প্রকাণ্ড একজোড়া লোহার গুলম্যাক মারা কপাট সিঁড়ি বন্ধ করিয়া পড়িত। দেওয়ালের ভিতর বহুদূর যাইতে পারে এমন মোটা 'তসলায়' তাহা বন্ধ হইত। কফিকল ও কাছির সাহায্যে সে কপাট খুলিতে হইত। দুর্গ পরিখার উপর কাঠের পোল সে কালে যেরূপ উঠান হইত, ইহা সেই ভাব। সে কপাটে ছিদ্রও থাকিত, প্রয়োজনমত তীর চালান যাইত। চোর ডাকাতের পর সকল সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাটীতেই এই সকল আয়োজন ছিল। বাঁহিরের সদর দরজাও এইরূপ তসলার সাহায্যে কাজ হইত। সর্ব্বদা টাকা গহনা রাখিবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় ছিল; এখনও কোনও কোনও দোকানে ক্ষুদ্রাকারে তাহা দেখা যায়। প্রকাণ্ড তক্তপোষের তক্তা পাড়নের নীচে 'চোরা বাক্স' আঁটা থাকিত। আলমারী, দেরাজ, লোহার সিন্দুকের রেওয়াজ তখনও হয় নাই।

তদানীন্তন বিবাহ-ব্যাপারে 'দান' 'পণের' বাড়াবাড়ি এবং বিবাহের পূর্ব্বে এবং পরে 'তত্ত্ব তাবাসের' প্রাচুর্য্য ছিল না। কৌলীন্য, আভিজাত্য, বংশ-মর্য্যাদা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার আদর ছিল এবং আদর ছিল চরিত্রের, কৃতিত্বের এবং বিদ্যার। পল্লীগ্রামের গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে 'দেওয়া থোওয়া'র বাড়াবাড়ি ছিল না, কিন্তু 'তত্ত্ব তাবাসের' মধ্যে মহিলা-শিল্পের ও কারুকার্য্যের প্রচুর নমুনা পাওয়া যাইত। সে নমুনার মধ্যে নানাবিধ 'পুঁতির অলঙ্কারে সালঙ্করা 'পুতুল' ও তাহাদের পুরাতন, পরিষ্কার রঙ্গিন 'ন্যাকড়া'র 'তর বেতর' সাজ পোষাক; আসন গালিচা-তুল্য আস্তরণ ও নানাবিধ সজ্জা দেখিয়াছি। পুঁতি'র পাখা, 'পুঁতি'র ছড়ি, 'পুঁতি'র গেঁজে (Money Purse), 'পুঁতি'র সিকে, 'পুঁতি'র মশারির ও বালিশ-অড়ের ঝালর; 'পুঁতি'র জাঁতি, পাল্কী, কাজললতা, কলম-খাপ, কুর্সি, চৌকি ইত্যাদির শিশু-সংস্করণ, আয়না ঢাকা ও বাটা-পোষ প্রভৃতি। কড়ির আলনা, কড়ির তেথরি, চৌথরি, সাতথরি, ও ন'থরি সাদা ও ঝালর-কাটা "তেকাটা' বালিশ গোঁজ ও ঐ প্রকার বহুবিধ কড়ির সজ্জা; এসকলও তত্ত্বে পাঠানর মত সামগ্রী ছিল। সে সকলের যথাযথ সন্নিবেশে সে দিনের গৃহগুলির রূপ সে দিনের রুচিতে ভালই লাগিত। সে সকল সাজে সাজান, 'নিকান পোঁছান' মাটির ঘরগুলি পর্য্যন্ত দেখিলে ছোট ছোট ঠাকুর ঘরগুলিরই মত মনে হইত। খাবার বাক্স, খাবার বাসন, চালের হার, মিহি কাটা সুপারি, ঐ সুপারির 'দারকো' ঢাকা, জানালার চিকের ঝালর ও চাকা কাটা সুপারির গড়েমালা তদানীন্তন মহিলা-শিল্পের অসদৃশ ও বিশিষ্ট অবদান আজিও কেহ দেখিলে তাহার সম্মান করিবে। সুলভ উপাদানে প্রস্তুত সে সকল সুশ্রী শিল্প তখনকার তত্ত্বের বিশেষ গৌরবের নিদর্শন ছিল।

শহরে যখন 'সোণার বেনে হইতে কায়স্থ, কায়স্থ হইতে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ হইতে অন্যান্য জাতির মধ্যে বিবাহে দান, পণের বাড়াবাড়ি হইয়া সমাজকে দুর্ব্বল করিতেছিল সেই সময়ে তদনুপাতে 'তত্ত্ব তাবাসের' বাড়াবাড়িও হইয়াছিল। কারণে অকারণে, সময়ে অসময়ে, অভাবে ও অভাবের অভাবে কিছুদিন এই 'তত্ত্ব'-প্রণালী দুঃস্থ গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। একবার কোনও বড় মানুষের বাড়ী হইতে

গ্রীষ্মকালে আমি 'পাখার তত্ত্ব' যাইতে দেখিয়াছিলাম। রং বেরংএর নানা ঢংএর রাশি রাশি পাখা তাহার কেন্দ্র; টানাপাখা, হাতপাখা, এড়ানি পাখা, চন্দন কাষ্ঠের পাখা, কুঁচিকাঠির পাখা, খসখসের পাখা, ময়ূর পুচ্ছের পাখা, কাপড় ন্যাকড়ার পাখা, উলের পাখা, মেমেদের পাখা, কাগজের পাখা, তলতা বাঁশের হাত ঘুরান পাখা, তারকেশ্বর কালীঘাটের চিত্রিত পাখা, ঘাসের পাখা, এমনই কত কি পাখার বিকট সম্ভার দেখিয়াছিলাম তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। তখনও বিজলী পাখার প্রচলন হয় নাই যে গৃহস্থের বাড়ীতে এ তত্ত্ব যাইতেছিল তাহারা এই পাখার 'তাড়সে' গদ্‌গদ্ ঘর্ম্ম হইয়া উঠিবে তাহা কাহারও মনে একবারও হয় নাই। পাখার সঙ্গে ছিল অবশ্য দাতব্য বস্ত্র পাদুকাদি, আহারীয়াদি এবং আরও ছিল বেশ-বিন্যাসাদির উপকরণ এবং অন্যান্য উপকরণ। যিনি তত্ত্ব পাঠাইতেছিলেন তাঁহাকে আমি ভাল জানিতাম, জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপার কি? তিনি হাসিয়া বলিলেন একটা নূতন কিছু করিলাম। দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের 'নূতন কিছু কর' গানটা তখনও প্রচলিত হয় নাই।

আমি বলিলাম, আমি আরও একটা নূতন কিছু করিতে বলিতে পারি; একটা 'ঝাঁটা'র তত্ত্ব ব্যবস্থা করুন—দাতার মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইল। এখন এসকল বাতিক অনেক কাটিয়াছে। আবার পল্লী আদর্শে কাজ চলিতেছে, তত্ত্ব ও সন্দেশের বৈয়াকরণ অর্থ আবার লোকের মনে পড়িতেছে। 'কোটা কুটনো' 'বাটা বাটনা' 'রাঁধা তরকারি' পাঠাইয়াও বড়মানুষের আত্মীয়তা সম্ভব একথা লোকে বুঝিতেছে।

এই বিবাহে যদিও 'দীয়তাং ভুজ্যতাং', এর অভাব ছিল না, লাঠী, শড়কী খেলা, আতস্ বাজী ও সামাজিক প্রথা-প্রচলিত বস্ত্রালঙ্কার, কারুকার্য্য প্রভৃতির অভাব ছিল না, কিন্তু অকারণ অপব্যয় কিছুমাত্র উৎসাহ পায় নাই। বিবাহের আনুষঙ্গিক আমোদরূপে 'গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা' 'সোনা পোটোর পাঁচালি' এবং কি জানি কার মনে নাই শম্ভু নিশম্ভুর যাত্রা হইয়াছিল। সাধারণ লোকের মনোরঞ্জনের জন্য বাহিরে 'তরজা' ও 'কবির লড়াই'ও হইয়াছিল। অর্ব্বাচীন সমাজ সংস্কারক বলিবেন, এগুলি যদি অপব্যয় না হয় তবে অপব্যয় কি, আমি জোর গলায় উত্তর দিতে প্রস্তুত যে যদি সুরুচির সীমা অতিক্রম না করে তাহা হইলে সুগৃহস্থের ব্যয়ে এসকল আমোদ-প্রমোদে সাধারণ পল্লীবাসীর স্বাভাবিক অধিকার আছে। তাহাদের কর্কশ, বন্ধুর এবং ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন সুখশান্তি ও উৎসাহহীন জীবনে এই সকল ক্ষণিক জ্যোতির আবির্ভাবে তাঁহারা বাঁচিয়া যায়, সমাজ বাঁচিয়া যায়। এ সকলের অভাবে সমাজ দিন দিন নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে। ইহার সজ্ঞশক্তি ও বল সঞ্চয়ের পরিমাণ নিতান্ত ন্যূন নগণ্য নহে। গোবিন্দ অধিকারীর নূতন পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। তাঁহার রচনা ও সঙ্গীত-শক্তির পরিচয় প্রত্যক্ষ-ভাবে পাইবার সৌভাগ্য যাঁহারা পাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ধন্য বলিতে হয়। যাত্রার সাহায্যে কৃষ্ণকথার ভূয়ঃ প্রচার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল।

মাতামহের নূতন কুটুম্ববাড়ী আঁটপুরের পাশে তাঁহার বাস; একারণে ও নিজগুণে তিনি সমাদৃত অতিথি। গোবিন্দ অধিকারীই "গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা"। তিনি দূতীর ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, একাই একশো; যাহাকে যা' বলাইতে হয় বলিতেন, যাহাকে যা' গাওয়াইতে হয় গাওয়াইতেন, সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত 'বেহালা' বাজাইতেন এবং সেই 'বেহালা'র ছড়ির অপর রূপ সাহায্যে 'ছোকরা' দিগকে 'দোরস্ত' রাখিতেন। পোষাকটা অনেকটা আমার উত্তরকালে লব্ধ "এবার্ডিন ইউনিভার-সিটীর" (Aberdeen University) 'গাউনের (Gown) ন্যায়, বুকের দুই ধারে পরতে পরতে বড় বড় ভাঁজে পড়িয়া থাকিত। গান সব মনে নাই, একটা গানের দুইটা ছত্র মাত্র মনে আছে। প্রভাসতীর্থে বৈষ্ণব-ছিন্ন-শোণিত দ্বারিগণের হস্তে নিদারুণ প্রহার খাইতে খাইতে "যশোমতী" গাহিতেছেন—

> "পায়ে ধরি, ওরে দ্বারী!
> আর প্রহার করিসনে তোরা;
> আমি সেই মা যশোদা,
> নীলমণি যার নয়নতারা!"

গোবিন্দ অধিকারীর পদাবলী—পদাবলী বলিতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নাই—সাধারণ লোক-প্রচলিত। অতএব তাহার বহুল পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। দুই একটা গান তুলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

যেমন কৃষ্ণ কীর্ত্তন হইল তেমনই কালী কীর্ত্তনেরও আয়োজন হইল। গোড়ায় বলিয়াছি মাতামহ গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন না, তিনি উদার-হৃদয়। শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের পালা হইল। যাত্রাটা কার তা' মনে নাই, বড় ভাল জমিল না। গানের অভাব রং তামাসায় সারিয়া লইল। ধূম্রলোচন আসরে আসিলে গান উঠিল—

"মা মা ধূম্রলোচন !
তুমি রণে মহাবীর,
তোমার প্রকাণ্ড শরীর।"

* * * *

সুগ্রীব রণস্থলে যাইবার পূর্ব্বে— রামায়ণের সুগ্রীব নয়— গাইলেন—

"কাল সকালে রাজা হব,
একটা কাঁঠাল খাব।
এক ধামা মুড়ী খাব।"

* * * *

গ্রাম্য বীরের এই স্বাভাবিক উচ্চ আশার কথা মনে পড়াতে মনে হইতেছে, 'দল'টাও 'বুলি বটমের" (Bulli Bottom) দলের ন্যায় নিতান্ত গ্রাম্য "দল"। "শ্রীমন্তের মশান" পালায় চাটগেঁয়ে নাবিককে গাহিতে শুনিয়াছি—

"তিনটী টকা লইবো বাবু,
সিংহলে যাইতে,
আর কিছু লইবো পিয়াজ,
পথেতে খাইতে।

* * * *

স্থান, কাল, পাত্র ও ভূমিকা ভেদে 'কুশী-লবের' আভ্যন্তরীণ আশা ও আশয় এইরূপ স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত হইত। সময় সময় ইহারও সীমা অতিক্রম করিত। সাধারণ লোকের জন্য যে বাহিরে 'তরজা' ও 'কবির' ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার সীমা আরও বহু দূরে; সেজন্য আমরাও থাকিতাম সে আসর হইতে বহু দূরে কিন্তু দূরশ্রুত সে 'ঢোল' ও 'কাঁশির' সঙ্গত কখনও ভুলিতে পারিব না।

জমাট গান—গানের মত গান করিয়াছিলেন "সোনা পোটো"। 'দাশরথির পাঁচালী'র পর আর তেমন 'পাঁচালী' শোনা যায় নাই; 'বাজখাঁই গলা' ও ঢোলক-মন্দিরার সঙ্গত কাণে এখনও বাজিতেছে, আর মনে পড়িতেছে একটা গানের কয়টা ছত্র—

মন-মানসে সদা ভজ !
দ্বিজ-চরণ-পঙ্কজ;
দ্বিজরাজ করিলে দয়া,
বামনে ধরে দ্বিজরূপ।

কি রোগ হইল বিধী,
বৈদ্যেতে না দেন বিধী,
এ রোগের মহৌষধি,
(শুধু) ব্রাহ্মণেরি পদরজঃ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি 'সোনা পোটো" আমাদের স্বগ্রামের নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসী ও 'দাশরথির প্রিয় শিষ্য।

সকল আমোদ, আহ্লাদ, আপ্যায়নের শেষ আছে, এ ক্ষেত্রেও তাহা হইল, তাহার পরে দীর্ঘ অবসাদ। মাতামহের বিষম হাঁপানি রোগ ছিল। শেষ সময় উপস্থিত বুঝিয়া তিনি সজ্ঞানে 'তীরস্থ" হওয়ার সুদৃঢ় অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, পিতৃদেবের উদ্যোগে তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। কোন্ তেঁতুল গাছ কাটিয়া জ্বালানি কাঠ হইবে, কোন্ বেল গাছ হইতে, "বৃষকাষ্ঠ" খোদাই হইবে, তাহার যথাযথ উপদেশ দিয়া তাঁহার বড় সখের বর্দ্ধমানের কারিকরের তৈয়ারী পাল্কিতে শেষবার তিনি চড়িলেন; দশ ক্রোশ পথ আসিয়া আমাদের "হাওড়া বাসুন্দের" নূতন বাটীতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন; তারপর গঙ্গাতীরে "রামকৃষ্ণপুরে" 'তীরস্থ' হইলেন। আবার সমারোহে দান-সাগর শ্রাদ্ধ— তারপর সনাতন প্রথা-প্রচলিত মনোবাদ— তারপর ধীরে ধীরে অবশ্যম্ভাবী শেষ। পল্লী-আনন্দের সে অপূর্ব্ব কেন্দ্র ক্রমশঃ শ্মশানে পরিণত হইল। ১৮৭৭ খৃঃ অঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষা (Entrance Examination) দিবার পূর্ব্বে, শেষবার মাতুলালয় গিয়াছিলাম; তারপর অনেকবার নিকটস্থ গ্রামে, বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ প্রভৃতি উপলক্ষে গিয়াছি, কিন্তু "ডেসার্টে'ড ভিলেজ

"এর (Deserted Village) সম্মুখীন হইবার শক্তি আর কুলায় নাই। নাম-যজ্ঞের আকর্ষণে আর একবার জন্মস্থান দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিবে কিনা জানিনা; অনেক অংশে বামুন পাড়ার মাটী ভাল, এখনও সাধু সন্ন্যাসীর জন্ম হইতেছে। আমার এক বাল্য-সহচরের পিতৃব্য-পুত্র সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দোবোত্তর করিয়া দিয়া দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। পাকা দেব-মন্দিরে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

মাতামহের শ্রাদ্ধের পর কলিকাতা আসিবার সময় একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বলিয়া এ অধ্যায় শেষ করিতেছি। বামুন পাড়া হইতে পাঁইতেনের ভিতর দিয়া, বড়গেছের গীর্জ্জা অর্থাৎ "ট্রিগনোমের্টি ট্রিক্যাল সর্ভের" (Trigonometrical Survey) সহায়ক, "মনুমেণ্ট" (Monument) তুল্য অত্যুচ্চ ও অতি প্রকাণ্ড স্তম্ভের পাশ দিয়া যে সরকারি রাস্তায় উঠিতে হইত তাহা তখন অনেকটা ভাঙ্গিয়া ধুইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। সালতীর উপর পাল্কী—সালতীর বাদা-জলা পার হইয়া, 'লগি' ঠেলিতে ঠেলিতে অপরাহ্নে 'ঝাপড়দা', 'মাকড়দা'র নিকট 'চটি'তে পৌছিয়া দেখা গেল যে হাওড়া হইতে যে গাড়ী যাইবার কথা ছিল তাহা যায় নাই; অতএব সে রাত্রি 'চটি'তেই কাটাইতে হইল। তখন বিলক্ষণ দস্যুভয়। উত্তরকালে "ডানকুনীর" 'ড্রেনেজ' (Drainage) খালের সাহায্যে সে বাদা-জলা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে, রাস্তায় মার্টিন্ কোম্পানির (Martin coy.) 'ট্রেন' (Train) চলিতেছে, দস্যুভয় আর তত নাই।

সঙ্গে ছিল 'ভূপাল সিং' পুরবীয়া দারোয়ান—আকার দীর্ঘ—লাঠী দীর্ঘ—কথাও তদনুপাতে দীর্ঘ। পিতার নিতান্ত অনুগত ও ভক্ত ভৃত্য! ১৮৫৭।৫৮ সালের সিপাই বিদ্রোহের সময়—ভূপাল সিং তাহাকে 'গদ্দর' বলিত—সে ছিল পিতার অনুচর; পিতাকে অনেক বিপদে রক্ষা করিয়াছিল। নিজে সে পুরাতন বিদ্রোহী—জগদীশপুরের বিদ্রোহী-নায়ক 'কুমার সিংহের' দলভুক্ত, সদর্পে পায়ের 'ভিমেয়' গুলীর চিহ্ন দেখাইত, নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিত বাবু ভূপাল সিং।

বিদ্রোহী দলের দশা হইতে পিতা তাহাকে মুক্ত করেন, তদবধি সে পিতার কেনা গোলাম; প্রাণ দিয়া তাঁহার কার্য্য উদ্ধার করিত। 'চটি'তে পৌছিবার অব্যবহিত পরে, তাহার মনে সন্দেহ হওয়াতে, চারিদিক্ আলো ও লাঠী লইয়া ঘুরিয়া আসিল। সংবাদ আনিল যে আমরা 'বাদার' নিকট যে সাঁকো পার হইয়াছি তার নীচে, ডাকাইতের দল অপেক্ষা করিতেছে, পাল্কী পৌছিবার ও গাড়ী না পৌছিবার সংবাদ তাহারা পাইয়াছে, সুবিধা পাইলেই রাত্রে 'চটী' আক্রমণ করিবে। সম্ভবতঃ 'চটীওয়ালাও' তাহাদের সহায়ক। ভূপাল সিং তখনই হুকুম জারী করিল যে পাল্কী-বেহারাদিগকে সে রাত্রে ফিরিতে দেওয়া হইবে না। বাহকদিগকে ও সঙ্গের অন্যান্য লোককে লাঠী সংগ্রহ করিয়া দিয়া 'চটী'র আশে পাশে রাখিল। 'চটীওয়ালা'কেও 'নজরবন্দি'তে রাখিল। সমস্ত রাত্রি স্বয়ং 'চটী'র চারিদিকে বাহকদিগের সর্দ্দারকে লইয়া লাঠী খেলিতে লাগিল—উদ্দেশ্য লাঠী ঠোকাঠুকীর শব্দে অদূরস্থ ডাকাতেরা বুঝিতে পারে যে 'দলে' শুধু 'গোলা লোক' নই পাকা খেলোয়াড়ও আছে। রাত্রে কাহারও নিদ্রা হইল না; ভীত ত্রস্ত মনে অথচ নির্নিমেষ নয়নে ভূপাল সিংহের বীরত্ব ও ব্যূহ-রচনা-নৈপুণ্য দেখিতে লাগিলাম। ভূপাল সিংহের নিকট অনেক গল্প শুনিলাম কারণ সে মাঝে মাঝে চটীর ভিতর আসিয়া মাতৃদেবীকে আশ্বস্ত করিতেছিল।

শুনিলাম পিতৃদেব যখন গাজীপুরে সিপাহী-পল্টনের ডাক্তার ছিলেন বিশ্বস্ত বালকভৃত্য "কুঞ্জ-পাঁড়ের" মুখেই তিনি "চাপাটী" পৌছান এবং মধ্যরাত্রে বিদ্রোহ-সূচনার সংবাদ প্রথম পাইয়াছিলেন। সংবাদ তিনি পানোন্মত্ত অফিসার (Officer) বা পল্টনের কর্ম্মচারিগণের নিকট বলিতে গিয়া অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া আসেন। তাহারা তাঁহাকে নিঃশঙ্কে নিদ্রা যাইবার উপদেশ দিয়া বিদায় করে। সে উপদেশ পিতৃদেব গ্রহণ করেন নাই। যে 'হাঁসপাতাল' (Hospital) তাঁহার জিম্মায় ছিল সেখানে রোগিগণকে রক্ষা করিবার উপায় শীঘ্র করিয়া ফেলিলেন। 'হাঁসপাতাল' (Hospital) বাটীর তিনদিকে ছিল খরস্রোতা গঙ্গার প্রবাহ, রাস্তার দিকে ছিল একটা

খাদ্, খাদের উপর ছিল একটা সেতু। স্থিরবুদ্ধি হাঁসপাতালের ডাক্তার যতদূর সম্ভব ইট, পাটকেল, পাথর প্রাচীরের ভিতরে সংগ্রহ করিলেন। যতগুলি থলে পাওয়া গেল গঙ্গার মাটী পুরিয়া তাহা প্রাচীরের উপর রক্ষা করিলেন, মাঝে মাঝে 'বন্দুক' চালাইবার পথ রাখিলেন, নিকটস্থ বাজারের সমস্ত আহারীয় ও ঔষধ ক্রয় করিয়া হাঁসপাতাল বোঝাই করিলেন এবং নিঃশঙ্কচিত্তে বিপদের প্রতীক্ষায় রহিলেন। রাত্রি বারটা বাজিল, তখনও কর্ম্মচারিগণ বারুণি সেবা কিরিতেছেন। বারটায় তোপের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আবাসগৃহ দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

গাজীপুরের "গদ্দর" আরম্ভ হইল! কর্ম্মচারীর দল অস্ত্র শস্ত্র লইয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া যে যে ভাবে ছিল হাঁসপাতালে (Hospital) দৌড়িয়া আসিল—ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর অপূর্ব্ব রণ-সজ্জায় আশ্চর্য্য হইল, আয়োজনের যাহা বাকী ছিল করিয়া লইল। বিদ্রোহীর দল আটদিন ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর হাঁসপাতাল (Hospital) অবরোধ করিয়াছিল। ক্রমাগত যুদ্ধ চলিয়াছিল। তাঁহার দূরদর্শিতার গুণে 'রসদ' ও ঔষধের অভাব হয় নাই। ইংরাজসৈনিক ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ সস্ত্রীক আটদিন এই আশ্রয়ে রহিলেন। আটদিন পরে কাশী হইতে নৌকাযোগে সৈন্যদল আসিয়া তাহাদের উদ্ধার করিল। এই কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ছিলেন গাজীপুরের 'অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কলেক্টার' (Assistant Collector) বেলী সাহেব—পরে সার ষ্টুয়ার্ট বেলী; (Sir Sturart Baelly) গাজীপুর হইতে 'জেনারল নীল' (General Nill) ও জেনারল হ্যাভ্‌লকের (General Havelock) সহিত লক্ষ্ণৌ (Lucknow) উদ্ধারের জন্য যাত্রাকালে পিতৃদেব 'ব্রিগেড্ সার্জ্জেন' (Brigade Surgeon) পদে উন্নীত হ'ন। তখন কোনও ভারতবাসীর এ সম্মান ঘটে নাই। এখানে সে সকল বিস্তারিত বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক। সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধানে ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাসের 'বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী' পুস্তকে এসকল ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ভূপাল সিং সহজ সরল অথচ তেজোব্যঞ্জক ভাষায় এই সকল কথা বিবৃত করিতে লাগিল আমরা স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

কথা হইতে কথা উঠে—কাহিনী হইতে কাহিনী জন্মে। বেহারার দলের মধ্যে ছিল এক পুরাতন খেলোয়াড়; অনেক ডাকাত ও 'ঠেঙ্গাড়ে'র গল্প করিয়া আমাদিগকে যুগপৎ ভীত ও আশ্বাসিত করিল। এইরূপ একটা গল্পের কথা পরেও শুনিয়াছি বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। বেহারারা রাধানগরের দিকে সর্ব্বদা যাতায়াত করিত, তাহারা সে অঞ্চলে এ গল্প সংগ্রহ করিয়াছিল। রাধানগরের উত্তর পশ্চিম দিকে "সাপোথ" ও "পাতুলের" মধ্যস্থলে মাঠের মাঝে একটা পুকুরের পাড়ে একটা খুব বড় বটগাছ আছে সেখানটাকে লোকে "যদুনন্দন" বলে। সে স্থান হইতে চারিধারে এক রশির বেশী দূর পর্য্যন্ত লোকালয় নাই:— সাপোথ প্রায় চার রশি পশ্চিম, পাতুল এক রশির উপর, পূর্ব্বে ও উত্তর দক্ষিণে উভয় গ্রামেরই পাড়া তাহাও প্রায় ঐরূপ দূরবর্ত্তী।

দক্ষিণের পাড়ায় 'যদু' বলিয়া এক 'ঠেঙ্গাড়ে' ছিল। সংসারে তাহার স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র। পুত্রের নূতন বিবাহ হইয়াছে। শ্বশুরবাড়ী সন্নিকটস্থ ভিন্ন গ্রাম। 'ঠেঙ্গাড়ে 'যদু' রাহাজানি করিয়া সোনা, রূপা ও নগদ টাকা অনেক রকমই পাইত। চেনহার, আংটী, কবচ প্রভৃতি সোনার দ্রব্যও পাইয়াছিল ও একটীমাত্র ছেলে বলিয়া তাহাকেই দিয়াছিল। সেই সকল পরিয়া অন্ধকার রাত্রে একদিন একা সে সেইপথে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিল। তাহাই তাহার পথ। এক জায়গায় তামাক খাইতে একটু দেরী হইয়াছিল। নূতন শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার আনন্দে সাহসী পল্লীযুবা বিভোর হইয়া চলিয়াছে;—যেস্থানটাকে "যদুনন্দন" বলে সেখানটা প্রায় পার হইয়াছে এমন সময় ভৈরব হুঙ্কারে আদেশ হইল, "কে যায় দাঁড়া," প্রথমটা চমকিত পরে সকল বুঝিয়া পুত্র বলিল 'বাবা আমি গো', — 'এমন সময় সবাই বাবা বলে' এই প্রত্যুত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই, মস্তকে. বজ্র কঠোর প্রচণ্ড লাঠির আঘাত পাইয়া পুত্র হতচেতন এবং গতায়ু। পিতা অন্ধকারে, মৃত পুত্রের পরিহিত বস্ত্রালঙ্কার খুলিয়া লইয়া, প্রচুর লাভের আনন্দে বাড়ী ফিরিয়া পত্নীকে সে সকল দেওয়ামাত্র পত্নী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া "ওগো কি কর্ল্লে গো,—মণি যে আমার এই সব পরেই শ্বশুরবাড়ী গেছ্‌লো গো",—বলিয়া বুক-ফাটা ব্যথায় আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। পিতা অন্ধ-শোক

বিমূঢ়-অনুশোচনায় উন্মাদ। আপনার ক্ষিপ্ত হিংসার বিষ-দংশনের অসহ্য জ্বালায় আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প। "যাহা হইবার হইয়াছে, পাপের ভরা ডুবিয়াছে, পুত্র শোকাতুরা বহু জননীর ক্ষুব্ধ আত্মা উথলিয়া উঠিয়াছে, কৃত কর্ম্মের উপযুক্ত ফল ফলিয়াছে, এখন আর পাপ না বাড়াইয়া চির অনুতাপের তুষানলই প্রায়শ্চিত্ত-বিধি।" অনন্তসহায় পত্নী এই বলিয়া বহু সাধ্য-সাধনায় ও নানা সান্ত্বনা বাক্যে স্বামীকে আত্মহত্যা হইতে বহু কষ্টে নিবৃত্ত করিলেন। তদবধি 'যদু' কঠিন দিলাসা করিয়া এ নৃশংস কার্য্য ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু সেস্থানের প্রতি পরমাণুতে এই নিষ্ঠুরতার শোণিত-নিস্রাব যে মিশিয়া গিয়াছিল তাহা আজো তেমনই জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে! আজিও লোকের একলা অসময়ে সেখান দিয়া যাইতে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে, আজিও সেই মৃতপ্রায় সরসীর পঙ্কিল-ঘন জলোচ্ছ্বাসে নিবিড় ঘন বটবৃক্ষের পত্র-মর্ম্মরে, শূন্যে বিলীন বায়ুর হা হা রবে, ত্রাসিত-সজাগ পক্ষিকর্ণে বড় করুণস্বরেই যেন ধ্বনিত হয়, বাবা আমি গো!—বাবা আমি গো!!—এইরূপ গল্প গাছায় রজনী প্রভাতোন্মুখ, দূর হইতে ডাকাইতের দল ভোজপুরী ছাতুখোরকে "বড় বেঁচে গেলি" বলিয়া গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল।

ততক্ষণে হাওড়া হইতে গাড়ী পৌছিয়াছে। অতি অল্প সময় মধ্যে গঙ্গাতীরে হাওড়ার ঘাটে আসিয়া পৌছান হইল; তখন হাওড়ার পোল হয় নাই। পান্‌শিতে গঙ্গা পার হইয়া বহু বাজারের বাসা পৌছিয়া তরুণ জীবনের নূতন অধ্যায় খুলিয়া গেল।

স্কুল ও কলেজ স্মৃতি।

এ স্মৃতিও বড় মধুর! এজীবন পুনশ্চ করিয়া অতি-বাহন করিতে আবার ইচ্ছা হয়। পল্লীগ্রামের মুক্ত হাওয়ায় বহুদিন ছুটাছুটীর পর, সহরের অলিগলি এমন কি বড় রাস্তা মাঠ ময়দানও, কেমন ধরাবাঁধার মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিল। বাড়ীর সিঁড়ীর দেওয়াল, ঘরের দেওয়াল পর্য্যন্ত যেন দুই দিক্ হইতে গায়ে ঠেকিতে লাগিল। আশ্রয়ের মধ্যে তেতলার খোলা ছাত ও রাস্তার ধারের বারাণ্ডা! ঠিকা গাড়ীর পিছনের টিকিটের পরের পর নম্বর, পেন্সিল দিয়া দেওয়ালে লেখা, নবীন ময়রার কচুরি ও গরম জিলাপী সংগ্রহ, বৃদ্ধ কোচেয়ান ও আকবর সহিসকে সন্তুষ্ট করিয়া, পিছনের গলিতে ঘোড়ায় চাপা; ঘোড়ার বালাঞ্চি লইয়া হার বিনান ও ঠাকুমা'র হাতের উপাদেয় মূলা, ভেট্‌কী, মুগের ডাল, পুঁইশাক চচ্চড়ী, তেঁতুলের অম্বল ও মাছের ঝোলের নিত্য সদ্ব্যবহার; মধ্যে মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ পাতের ন্যায় পাতলা সরুচাকলি ও পুলি পিঠার শ্রাদ্ধ করা প্রভৃতি খাদ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে, কয়েকদিন জীবন পরমানন্দেই কাটিল। কিন্তু সুখের দিন চিরদিন সমান বহে না। বাড়ীর সামনে, রাস্তার ওপারে "দুগো ঘোড়েল" তাহার বাড়ীর দোতলায় এক স্কুল ফাঁদিয়াছিল; সেই ফাঁদে ধরা পড়িলাম এবং তথা হইতে শীঘ্র বহু বাজারের পাশে বহুবাজার 'অ্যাংলো ভারনাকুলার" বিদ্যালয়ে উন্নীত হইলাম। ইচ্ছা ছিল সেখানে তদানীন্তন প্রচলিত ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়া হয়। হেড্ মাষ্টার গিরীশ বাবু ও নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক রাজকুমার বাবু এবং পরজীবনের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট নবগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথেষ্ট যত্ন করিতেন। অল্প বিস্তর বাঙ্গালা চর্চ্চাও হইল তাহাতে পরজীবনে কিছু উপকারও হইয়াছে। ক্লাসে ওঠা নামার সম্বন্ধে 'ইন্‌স্পেক্টর অফিসে' রচিত শৃঙ্খলের তখনও সৃষ্টি হয় নাই। বৎসরের মধ্যে, 'পড়া পারিনে'ই দুই তিন বার ক্লাসে ওঠা হইত। দেখিতে দেখিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের 'রামের রাজ্যাভিষেক'; রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের "টেলিমে-কাশ", অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' ও বাঙ্গলায় রচিত কতক কতক ভূগোল, পাটীগণিত এমন কি জ্যামিতিও 'সাঙ্গ' হইয়া গেল; অল্প বিস্তর রচনাও বাদ গেল না, তাহার ভিত্তি 'লোহারামের ব্যাকরণ'।

পুস্তকগুলির বিস্তারিত উল্লেখ করিবার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তাহা এই যে শিক্ষক ও গুরুজনের উৎসাহ ও প্ররোচনায় সকল সময় ক্লাশ রুটিনের বাধ্য না হইলে এবং দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা থাকিলে লেখা পড়ার কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। 'বিজয়-বসন্ত' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙ্গালা 'শকুন্তলা', 'ভ্রান্তি-বিলাস' 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও আউট বইয়ের মধ্যে গণ্য হইয়া বিশেষ আনন্দ ও সুখ প্রদান করিল। কিন্তু ছাত্রবৃত্তি

বিদ্যালয়ে ইংরাজি পড়া কম বলিয়া, পিতৃদেবের আশঙ্কা ও আক্ষেপের কারণ হইয়াছিল, সেইজন্য ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়-লীলা দুই এক বৎসরে সম্বরণ করিয়া, পাল্কী চড়িয়া সরাসরি, মোটা ঘাস ও বড় উঠানযুক্ত পটলডাঙ্গা গোল দিঘীর ধারে, সংস্কৃত কলেজে উপস্থিত হইলাম।

সাক্ষাৎভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত পরিচয় আপাততঃ এইখানেই শেষ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নবপ্রণীত ও অপেক্ষাকৃত বহুল প্রচারিত বাঙ্গলা পুস্তকাবলীও সংস্কৃতজ্ঞানের ভাষার প্রতি অনাদর তখনও কমাইতে পারে নাই। পূর্ব্বযুগে বাঙ্গলা না জানিলে যেমন ইংরাজি নাটকের পসার বাড়িত, আমার সংস্কৃত কলেজে অবস্থান কালেও 'ভাষা' অর্থাৎ প্রচলিত বাঙ্গলা না জানিলে, সংস্কৃতজ্ঞের‌ও সেইরূপ আদর বাড়িত। বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া বর্ণাশুদ্ধি অনেক পণ্ডিতের গর্ব্বের কারণ ছিল। অবশ্য এ নিয়মের যথেষ্ট ব্যত্যয়ও ঘটিতেছিল।

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশের' ওজস্বী ভাষা 'পণ্ডিত' মণ্ডলীকেও দলে আনিতেছিল। পণ্ডিত হরিনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের 'রচনাবলী'ও 'বিরাটপর্ব্ব' এবং তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী' দ্রুত গতিতে শিক্ষাজগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিতেছিল, নাটকে রামনারায়ণের নাটকাবলী, পণ্ডিত মহাশয়গণকে একটা নূতন যুগের আলোক দেখাইতেছিল; এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারীর পাটীগণিত ও বীজগণিত প্রমাণ করিতেছিল যে, বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক রচনা-গুচ্ছ ফলবতী নয়, কার্য্যকরীও হইতে পারে। অপর পক্ষে যখন বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বহু-বিবাহ-নিবারণ আন্দোলন বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত করিলেন এবং পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার বেনামায় সমর্থন করিতে লাগিলেন, তাহাদের প্রতিপক্ষ মহাপণ্ডিত এবং সংস্কৃত রচনায় বিশেষ পারদর্শী তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বাঙ্গালায় উত্তর দিতে পারিলেন না! তাঁহার পুত্র জীবানন্দ বি, এ, বিদ্যাসাগর অতি নিস্তেজ বাঙ্গালা ভাষায় উত্তর দিলেন। উপযুক্ত 'ভাইপোস্ত' প্রণেতা জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় 'বি, এ, বিদ্যাসাগরকে নিরস্ত ও অপ্রতিভ করিলেন।

যদিও আমাদের সময় সংস্কৃত কলেজে বাঙ্গালা পাঠনার প্রাচুর্য্য ছিল না, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট পরিপুষ্টি হইতেছিল দেখাইয়াছি। যে মনীষিগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া এই সাহিত্য-সম্পদ বাড়িতেছিল তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, তারাকুমার কবিরত্ন, শিবনাথ শাস্ত্রী, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুপ্ত ও ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত। শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজি 'গ্রামার'ও এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ তাহার সাহায্যে দুর্দ্দান্ত ইংরাজি ব্যাকরণ সহজে আয়ত্ত হইয়াছিল। যে সকল বিশিষ্ট গ্রন্থকারের নাম করিলাম ইঁহারা সকলেই জ্যাঠা মহাশয়ের বিশেষ প্রিয় ছাত্র এবং তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। তিনি অনেকের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন এবং অন্ন-সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। এ স্থলে সে সকল বিষয়ের ও তাঁহাদের গ্রন্থাদির বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। আর এক শ্রেণীর বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছিল; ইংরাজি ও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিকর উপাদান সংগ্রহ-চেষ্টা—বিদ্যাসাগর মহাশয় ধারাবাহিকরূপে প্রথম চেষ্টা করেন, কিন্তু অনুবাদ তাঁহার সে চেষ্টার অঙ্গীভূত নহে। তিনি ভাবের ছায়া লইয়া ভাষার পুষ্টিসাধন করিতেন। কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারতের অনুবাদ তখন আরম্ভ বোধ হয় যেন শেষ হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন এবং যে অদ্ভুত অনুক্রমিকা লিখিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থায়ী স্থান অধিকার করিয়াছে। মহাভারতের আদর্শে আরও নানা শাস্ত্র গ্রন্থের আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ এই সময় আরম্ভ হইল। পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, সত্যব্রত সামশ্রমী, কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি এই প্রচেষ্টার নেতা জ্যাঠামহাশয় ইহার বিশিষ্ট সাহায্যক ও পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন। প্রায় এই সকল গ্রন্থেই তাঁহার নাম পৃষ্ঠপোষকরূপে উল্লিখিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সংশোধিত·

মহাভারতের আদি পর্ব্বের টাইটেল পেজে লিখিত আছে—"Published under the patronage of Babu Prsanna Kumar Sarvadhikary, Principal Government Sanskrit College, Calcutta"। উত্তর কালে, শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় মহাভারতের বৃহত্তর সংস্করণ প্রকাশিত হইবার সময়, আমার নগণ্য নাম তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার অধিকার পাইয়াছে। এই বিষয়ে জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের পদাঙ্কানুসরণ করিবার সৌভাগ্য আমার অসাধারণ। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের মহাভারতে নীলকণ্ঠের টীকা আছে এবং সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় স্বরচিত ভারত-কৌমুদী নামে টীকা আছে ও সুললিত বাঙ্গালা অনুবাদ আছে।

বিজয়া-গীতি

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু]

গাল বাজিয়ে আস্‌ছে ভোলা
বুঝিয়ে তোরা বল গো হরে।
নিয়ে না যায় প্রাণের উমা
পাষাণ-পুরী শ্মশান করে।

ভস্মমাখা, বলদ চাপা,
ধরে একটা ন্যাংটা ক্ষ্যাপা,
রাজাকে ধিক্! সোনার চাঁপা
দেছে শ্মশানবাসীর করে॥

চিতের ধোঁয়ায় গৌরী আমার
কালী-বরণ হয়েছে সার
মায়ের ব্যথা সয় কত আর
মড়ার মাথা গলায় পরে!

প্রতীক

[শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত]

প্রতীক বা চিত্র বুঝিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময়ে কিভাবে উঠিয়াছিল এবং সেই সেই জাতিগত ভাব কি করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা বিশেষভাবে জানা আবশ্যক। বর্ত্তমানকালে যদিও নানা জাতির চিত্র ও প্রস্তর-মূর্ত্তি আমরা পরিদর্শন করিয়া থাকি এবং নানারূপ দোষ-গুণের ব্যাখ্যা করি, কিন্তু সেই সকল জাতির অন্তর্নিহিত মৌলিকভাব যতক্ষণ না উপলব্ধি করিতে পারি, ততক্ষণ তাহাদের জাতীয় মাধুর্য্য ও উৎকর্ষ সম্যক্ অবগত হইতে পারি না।

ভারতীয়রা বহুকাল হইতেই এই বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের "চিত্র" শব্দে এই বুঝায় যে 'চিৎ' বা ব্রহ্মের অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় পরিণতি, চিদ্রূপ আকাশ হইতে চিত্তাকাশে অথবা চিদাকাশ হইতে চিদাভাসে পরিণত করিয়া সাধারণের বোধগম্য হয় এরূপ প্রত্যক্ষরূপই প্রতীক বা চিত্র। এইজন্য প্রত্যেক বিগ্রহ বা মূর্ত্তিগঠনের ভিতরে তার বিশেষ ধ্যান বর্ত্তমান, সেই ধ্যান অনুযায়ী বিগ্রহ-নির্ম্মাণই শিল্পীর কৃতিত্ব। কোন মহাপুরুষ ধ্যানমগ্নাবস্থায় চিদাকাশ হইতে চিত্তাকাশে কোন ধ্যেয় বস্তু উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে বিভোর হইয়া আনন্দ উপভোগ করেন এবং অন্তেবাসীদিগকেও সেই ধ্যেয় বস্তুর অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ধ্যানে নিয়োজিত করেন। এইরূপে শিষ্য-পরম্পরায় শুধু উপলব্ধির ভিতর দিয়াই ধ্যেয় বস্তুর আনন্দাস্বাদন চলিতে থাকে; কিন্তু পরবর্ত্তিকালে সাধারণ লোকের বোধগম্যের জন্য সেই ধ্যেয় (Conceived Concept) বস্তুকে কোন স্থায়ী পদার্থ যেমন মৃত্তিকা, কাষ্ঠ বা প্রস্তরের উপর প্রতিবিম্বিত করিয়া পার্থিব রূপ দেওয়া হয়।

এইজন্য বিগ্রহ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে; প্রথম শ্রেণী যথা—অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থায় পরিণতি অর্থাৎ নির্গুণ হইতে সগুণ অবস্থা কিরূপ ধীরে ধীরে আসে তাহা দেখানই প্রথম বিভাগের লক্ষ্য। দ্বিতীয় বিভাগের লক্ষ্য হইল মনকে সগুণ হইতে নির্গুণ অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করা অর্থাৎ মন সগুণের স্থূল অবস্থা হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম গতিশীল হইয়া কিরূপে নির্গুণ বা চিদাকাশের দিকে যায় তাহা দেখান। এই দুই বিভাগের ভিতরে সকল প্রকার প্রতীককেই আনয়ন করা যাইতে পারে।

ভারতীয় প্রতীকে একটা দেবভাব, একটা অতীব পবিত্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বামাচারী-সম্প্রদায়ে রুচি-বিগর্হিত অনেক প্রকার প্রতীক দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই সকল সাধন-সহায়ক যন্ত্র বা মুদ্রা বিশেষ। সেই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাদর্শ অনুযায়ী সেই সকল যন্ত্র বা উপাসনা প্রণালীরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অপর অপর সম্প্রদায়ের চক্ষে সেই সব প্রতীক অতি বীভৎস বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু তদুপাসক সম্প্রদায়ের নিকট এই সকল যন্ত্র উপাসনার পবিত্র প্রণালী মাত্র। এইজন্য তাঁহারা ইহাদের ভিতর দেবভাব বা মহা পবিত্র ভাব ধারণা করেন। ভারতীয় যুগল মূর্ত্তির তাৎপর্য্য এই যে লীলা নিত্যকে অনুসরণ করিতেছে এবং নিত্য লীলার নিকটে প্রতিভাত হইতেছে, অর্থাৎ একজন আশ্রয় পাইয়া পূর্ণ আর অপর আশ্রয় দিয়া পরিতৃপ্ত বা পরিপূর্ণ। স্ত্রীপুরুষ-মিলনসম্ভূত পাশ্চাত্য ভাব এস্থলে মোটেই নয়।

সহজ কথায় ভারতীয় সমস্ত প্রতীককে দুই শ্রেণীর বলা যায়। এক শিবের ধ্যানী ভাব অর্থাৎ সমাধি অবস্থা হইতে মন দেহেতে কিরূপে আসিতেছে এবং অপর দুর্গার সক্রিয়ভাব অর্থাৎ সাধারণ অবস্থা হইতে মন সমাধির দিকে কিরূপে যাইতেছে। ভারতীয় সব প্রতীকেই এই দুই ভাবের কোন না কোনও আভাস পাওয়া যায়।

অসুর (Assyrian) জাতির চিত্রের আদর্শ

অসুর (Assyrian) জাতির আদর্শ অন্য প্রকার ছিল। ইয়া (Ea) এবং অনু (Anu) তাহাদের এই দুই উপাস্য দেবমূর্ত্তি। ইয়া বলিতে পৃথিবী (Earth) বুঝায় এবং অনু বলিতে ব্যোম (Firmament) বুঝায়

পরে তাহারা নগ্নকায় স্ত্রী ও পুরুষের আকারে পরিবর্ত্তিত হয়। উহাদিগের দর্শনশাস্ত্র ও যাবতীয় কলা-বিদ্যা এই দুই ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ কয়েক শতাব্দী অন্তে তাহারা প্রতীকে দেবত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য দুইটী করিয়া পক্ষ সংযোজনা করিয়াছিল। পৃথিবী হইতে স্বর্গ এবং স্বর্গ হইতে পৃথিবী দেবতাদের অনায়াসগম্য করিবার জন্য তাহারা প্রতীক-পৃষ্ঠে দুই দুইটী পাখা সংযোগ করে। ঐসময়কার সমস্ত মূর্ত্তি যথা—পক্ষ-বিশিষ্ট অশ্ব, সিংহ এবং দীর্ঘচঞ্চু ও পক্ষ-বিশিষ্ট মানুষ দেখিলে স্বতঃই মনে হয় যে, তখন জাতির ভিতরে একটা নূতন ভাব উদ্ভূত হইয়াছিল। মৎস্যপুরী (Ninevah) হইতে ইব্রাহিমকে যখন অপসারিত করা হয়, তখন জাতীয় দেবতাদের বিপর্য্যস্ত ভাব ঘটিল। নগ্নকায় ইয়া ও অনু—আদম (Adam) ও ইভ্ (Eve) নামে পরি-গণিত হইল এবং চঞ্চু ও পক্ষ-বিশিষ্ট নৃমূর্ত্তিটী স্বর্গীয় দূত (Angel) নামে অভিহিত হইল; এবং উহাই পরিশেষে আরবদিগের হুর (Hour) ও পারস্যজাতির পরী (পর—পক্ষ) রূপে পরিগণিত হইল। ইহার আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভারতীয়রা যোগবলে স্বর্গ বা ইন্দ্রপুরী যাতায়াত করিতেন—এই ছিল তাঁহাদের যথার্থ জাতীয় ভাব; কিন্তু অসুর (Semitic) দিগের যোগবলের কোন প্রকার ধারণাই ছিল না। এইজন্য তাহারা সাধারণ জীবের ন্যায় পাখার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বর্গারোহণের উপায় উদ্ভাবন করে। ভারতীয় প্রতীকের সহিত অসুরদের প্রতীকের অসীম পার্থক্য। সেমিটিক্‌দের এই পক্ষ-সংযোগের ভাব ভারতীয়, গ্রীক্ বা রোমান্ কোন চিত্রের আদর্শেই দৃষ্ট হয় না।

রোমক বা ইজিপ্সিয়ান জাতির চিত্রের আদর্শ

রোমকজাতি অতি প্রাচীনকাল হইতেই সভ্যতা লাভ করিয়াছিল এবং চিত্রকলা, দর্শনশাস্ত্র ও বহু বিদ্যায় উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। তাহাদের উপাস্য ছিল গৃধ্ররাজ (Horus), ব্যোম বা আকাশকে তাহারা পক্ষী বলিয়া কল্পনা করিত, শুক্লপক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ উহার দুই ডানা, তারকা-মণ্ডলী তার পালক বিশেষ এবং সেই গৃধ্ররাজ শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষকে যথাক্রমে গ্রাস ও উদ্গার করিতেছে। এই ভাব লইয়া তাহাদের প্রতীকের উৎপত্তি, এইজন্য দীর্ঘ চঞ্চু ও দীর্ঘ নাসিকা তাহাদের সকল বিগ্রহে দেবভাব-ব্যঞ্জক! অসুর জাতির ভিতরে দুই পক্ষ যেমন দেবভাবের পরিচায়ক, রোমক জাতির ভিতরে দীর্ঘ চঞ্চু তেমন দেবভাবের পরিচায়ক। এস্থলে বলা আবশ্যক যে ভারতীয় প্রতীকে প্রাচীনকালে বাহুর বাহুল্য ছিল না। সাধারণতঃ দুই হাত দুই পা থাকিত; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ছয় বা সাত শতাব্দী হইতে বেশ দেখা যায় যে ভারতীয়রা দেবত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্য হস্তের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন। প্রথমে চতুর্ভুজ হইল, তৎপর ষড়ভুজ, অষ্টভুজ, দশভুজ এবং পরিশেষে হয় তো বহুভুজও হইতে পারে। ইহা নিতান্ত আধুনিক ভাব, পুরাতন ভাবের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই, বোধ হয় জাতীয় মস্তিষ্ক যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, চিন্তাশক্তি যখন ক্ষীণ হইয়া গেল, তেজোময় জলন্ত ভাব ধারণা করিবার সামর্থ্য যখন আর রহিল না, তখন হইতেই বাহুর বাহুল্য সন্নিবিষ্ট হইল। রোমকজাতির ভাব স্বতন্ত্র, তাহাদের প্রতীক আলোচনা করিতে হইলেও তাহাদের দর্শনশাস্ত্র এবং জাতীয় ভাবধারা সম্যক্ অবগত হওয়া দরকার।

গ্রীকজাতির চিত্রের আদর্শ

গ্রীক্‌জাতি সভ্যতা হিসাবে খুবই উন্নতি লাভ করিয়া-ছিল। তাহাদের প্রতীকের ভিতরেও জাতীয় জাগরণের ইতিহাস এবং জাতীয় ভাবধারা সন্নিহিত। অল্পসংখ্যক গ্রীক্ এক পার্ব্বত প্রদেশে বাস করিতে গেল, তথায় অসভ্য বর্ব্বরজাতি উহাদের উপনিবেশকে অবরোধ করিয়া

রাখিল। সর্ব্বদা দ্বন্দ্ব, আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া গ্রীক্‌দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। দেশবাসীদের মধ্যে বিশেষতঃ যুবকদের মধ্যে শক্তিসঞ্চয় না করিলে আত্মরক্ষা হয় না; দেহ সম্যক্‌রূপে পরিপুষ্ট দৃঢ় ও সুঠাম না হইলে অস্ত্র-সঞ্চালন সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শন করা যায় না, এইজন্য জাতির যুবকমণ্ডলীর ভিতর বিশেষভাবে দৈহিক বল বৃদ্ধির জন্য হারকিউলিস্ (Hercules) নামে এক দেবতার আবির্ভাব হইল এবং সেই দেবতার বীরত্ব-ব্যঞ্জক মূর্ত্তিই গ্রীক্‌যুবকদের শক্তি-চর্চ্চার আদর্শ হইল। গ্রীক্ প্রতীকে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, সুঠাম ও পূর্ণাঙ্গ শারীরিক শক্তি যেন পরিস্ফুট হইতেছে। যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব করিতে যেন সর্ব্বদাই প্রস্তুত; কিন্তু উচ্চাঙ্গের মনোভাব তাহাদের ভিতর বিশেষ কিছু পরিলক্ষিত হয় না। ভারতীয় প্রতীকের বৈশিষ্ট্য হইতেছে উচ্চাঙ্গের মনোভাব নানা প্রকারে ব্যক্ত করা,—সেই ভাব বা আদর্শের অনুযায়ী দৈহিক ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন দেখান হইয়া থাকে। মন ঊর্দ্ধতন স্তরে উঠিলে দেহ কিরূপ সূক্ষ্ম, কৃশ বা অন্য ভাবের হয় তাহাই দেখান হইয়া থাকে; ধ্যানের ন্যায় উচ্চস্তরের কোন আভাস নাই, কেবলমাত্র শারীরিক বলবীর্য্য প্রদর্শন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্য দৃঢ় অবয়ব ও অঙ্গসৌষ্ঠব তাহাদের প্রতীকে পরিলক্ষিত হয়, ভারতীয় প্রতীকের সহিত এ আদর্শের কোনই সামঞ্জস্য নাই। এক জাতির আদর্শ দিয়া অপরজাতিকে বিচার করা অসঙ্গত। গ্রীক্‌জাতির পক্ষ সমর্থকগণ ভারতীয় প্রতীককে যেরূপ হীনচক্ষে দেখিয়া থাকে ও কুৎসা করিয়া থাকে, ভারতের পক্ষসমর্থকগণ ও গ্রীক্ প্রতীককে সেইরূপ বালকোচিত বা উচ্চভাববিহীন বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। জড়বাদীদের শিল্পনৈপুণ্য মাত্র, দেবভাবের কোনই লক্ষণ নাই বলিয়া থাকে। উভয় জাতির মধ্যেই নিরন্তর এই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতীয় ভাবের বৈশিষ্ট্য না জানিলে শিল্পনৈপুণ্যের মাধুর্য্য উপলব্ধি হয় না।

রোমান্ (Roman) জাতির শিল্পাদর্শ

রোমান্‌জাতি অতিশয় চঞ্চল প্রকৃতির লোক ছিল। রাজ্যবিস্তার ও রাজনীতির অনুশীলন করা তাহাদের জাতীয় লক্ষ্য ছিল। গণসমূহকে কিরূপ সম্ভাষণ করিতে হইবে, গণসভা (Senate) কে কিরূপ যুক্তি-তর্ক দিয়া আহ্বান করিলে নিজমত সমর্থিত হইতে পারে?—এই সবই ছিল তাহাদের বিশেষ শিক্ষনীয়। রোমান্ প্রতীকে আমরা দেখিতে পাই যে, বক্তা বামহস্ত উত্তোলন করিয়া সম্ভাষণ করিতেছে, বামদিকে মুখ ফিরাইয়া ক্ষিপ্রবেগে আপন মনোভাব প্রকাশ করিয়া কথা বলিতেছে। বামদিকে মুখ ফিরাইয়া কথা বলিলে যুক্তিতর্কের দৃঢ়তা জন্মে। বক্তারা আজিও উত্তেজিত হইয়া গণবৃন্দকে যখন সম্ভাষণ করেন, তখন সর্ব্বদাই বামহস্ত সঞ্চালন করিয়া থাকেন এবং বামপার্শ্বে বক্রভাবে হেলিয়া সম্বোধন ও অভিভাষণ করেন। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ডানদিকে ফিরিয়া কথা বলিলে বক্তার সেরূপ উত্তেজনা দেখা যায় না। রোমান্‌-দিগের পক্ষে এইটীই বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়, বাকী অনেকাংশ তাহারা গ্রীক্‌দের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করে এবং গ্রীক্ শিল্পীদের দ্বারাই সব আলেখ্য ও নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভারতীয় ভাব হইতে স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে উহাদের উৎপত্তি হয় এবং গতিও ভিন্নমার্গে হইয়াছিল। ক্ষিপ্র মনোভাব, চিত্তের দৃঢ়তা ও অপরের উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার—এই সকল ভাবই রোমান্ প্রতীকে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট; কারণ রোমান্‌রা সর্ব্ববিজয়ী ও অর্দ্ধ-পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা ছিল। ভারতীয়দিগের নম্রভাব তাহাদের প্রতীকে দৃষ্ট হয় না। যে যে জাতি যে যে প্রতীকের নির্ম্মাতা, সেই সেই জাতীয় ভাবই তত্তৎ প্রতীকে অন্তর্নিহিত থাকিয়া দর্শকের নিকট নির্দ্দিষ্ট পরিচয় ঘোষণা করে।

মাংসপেশী-বিকাশক শিল্পী-সম্প্রদায়
(Anatomical School of Art)

খৃষ্টীয় বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে এক নব পন্থীর আলেখ্য উদ্ভূত হয়, ইহাকে Anatomical School of art বলা হইত; শরীরের মাংসপেশীর নানারূপ স্ফীত, বক্র ও বিকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করাই এই পন্থীদের উদ্দেশ্য ছিল। যীশুকে ক্রুসে বিদ্ধ করিয়া মারা হইতেছে এই চিত্র আঁকিতে গিয়া তাহারা দেখাইয়াছে যে যন্ত্রণায় যেন তাঁহার মাংসপেশীসমূহ স্ফীত, বক্র ও বিকৃত হইয়াছে। কিন্তু যীশুর অন্তিম সময়ে শান্ত,

ধীর ও নির্ভরতা-পূর্ণ ভাব যাহা আমরা Michael Angelo অঙ্কিত Contortion of Jesus নামক অলেখ্যে দেখিতে পাই তার কোনই লক্ষণ নাই। এই Anatomical School কতকগুলি কুস্তীর পালোয়ান ও গুণ্ডার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল, বহু চিত্রের আমদানি হইয়াছিল কিন্তু রুচিবিগর্হিত বলিয়া অল্পদিনের ভিতরেই তিরোহিত হয়। দর্শকের তৃপ্তিসম্পাদন না হওয়াতে ঐ প্রকার চিত্র এত অল্প দিনের ভিতর বিলুপ্ত হইয়াছে।

গান্ধার চিত্রশালা

কয়েক বৎসর যাবৎ এক রব উঠিয়াছে যে আলেকজাণ্ডারের পারস্য বিজয়ের বাল্ক-(Bullhk) রা গ্রীকো-ব্যাক্ট্রিয়াতে বসতি করে এবং পরে তাহারা স্থালুকসের সময় এক রাজ্য স্থাপন করে ও তদ্দেশীয় লোক বলিয়া পরিগণিত হয়। 'মিলিন্দোপাখ্যান' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, রাজা মিলিন্দ (Menander) নামে কোন গ্রীক্ কাবুলে রাজত্ব করিত। ঐ সব কাহিনী উল্লেখ করিয়া এক শ্রেণীর লোক এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, গ্রীকদেশ হইতে শিল্পীরা আসিয়া গান্ধারদেশে আপন কর্ম্মনৈপুণ্য দেখাইয়াছিল এবং ভারতীয় প্রতীকবিষয়ে নূতন ধারা ও ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল। নিজেদের উৎকর্ষ ও প্রাধান্য সমুন্নত রাখিয়া ভারতীয় শিল্পীদিগকে নিম্নস্তরের লোক বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া শিষ্য বা ভৃত্যরূপে কিছু শিক্ষা দিয়াছিল,—এইজন্য গ্রীক্‌দেশীয় উৎকর্ষ অদ্যাপি গান্ধার দেশে বিদ্যমান। সমস্ত প্রতীক বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে গ্রীক্‌দিগের প্রভাব তত অনুভূত হয় না। সাধারণতঃ ভারতে যেরূপ প্রতীক হইয়া থাকে, গান্ধারদেশীয় প্রতীকও সেইরূপ; তবে এইমাত্র বুঝা যাইতেছে যে, এক এক প্রদেশে বা রাষ্ট্রে তৎস্থানীয় লোকদের মনোবৃত্তি, শরীরের গঠন, দৈর্ঘ্য ও কৃশত্ব, আয়তন ও ভাবব্যঞ্জক দেহসঞ্চালনের ভঙ্গী—ইত্যাদি অনুসারে অল্প-বিস্তর পৃথক হইয়া থাকে। ইহাকে প্রাদেশিক প্রভাব (Provincial influence) বলা যায়। গান্ধার-দেশীয় প্রতীকেও তাহাই ঘটিয়াছে, আসলে সমস্তই ভারতীয় শিল্পি সম্প্রদায়ের। উদাহরণস্বরূপ এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, বাংলাদেশের স্বতন্ত্র একটী মত আছে, তাহা বাংলার বাহিরে দৃষ্ট হয় না; আবার বাংলার ভিতরেই পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে আলেখ্য ও প্রতীক গঠনে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে, যথা—বিক্রমপুরে প্রাচীন বৌদ্ধদের যে সমস্ত প্রস্তরময় প্রতীক পাওয়া যাইতেছে এবং ভাগ্যকুলের কয়েক মাইল দূরে ৺বাসুদেবের যে মূর্ত্তি আছে তাহা নিজস্ব একশ্রেণীর গঠন, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-প্রণালীর সহিত সম্পূর্ণ পৃথক্! এইরূপ বাংলা ও বিহারে, বিহার ও হিন্দুস্থানে, হিন্দুস্থান ও পাঞ্জাবে এবং পাঞ্জাব ও আফগান বা গান্ধার প্রদেশের আদর্শ ও শিল্পনৈপুণ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। এক গণেশের মূর্ত্তিই বাংলাদেশে এক প্রকার, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে অন্যপ্রকার এবং বোম্বাই প্রদেশে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকার দৃষ্ট হয়। স্থানীয় প্রভাব একই বস্তুকে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ করিয়া দেয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পাঞ্জাবের লোকেরা দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ এবং তাহাদের মাথা বড়। তাহাদের প্রাচীন প্রতীক যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা নিজেদের দেহের অনুরূপ শিল্পকলাই প্রদর্শন করিতেছে। আফগানিস্থানের অধিবাসীরা যেরূপ দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ ও স্থূলমস্তকবিশিষ্ট—তাহাদের আদর্শ ও প্রতীক তদ্রূপই হইয়াছে। জল-বায়ুর প্রভাব পার্ব্বত-দেশের আবর্ত্তন এবং শুষ্ক মরুসম স্থানে বসতি-নিবন্ধন তাহাদের মনোবৃত্তি যেরূপ প্রতীকও ঠিক সেইরূপই হইয়াছে। নদীমাতৃক জলো বাংলাদেশের অধিবাসীদিগের মনোবৃত্তি যেমন একপ্রকার ;—শুষ্ক পার্ব্বতদেশবাসী আফ্‌গানদিগের মনোবৃত্তি তেমনই অন্যপ্রকার। এইজন্য বাংলার প্রতীকের সহিত গান্ধার দেশীয় প্রতীকের বিশেষ সৌসাদৃশ্য নাই কিন্তু সমগভাবে দেখিলে সবই এক হিন্দুশিল্পকলার অন্তর্গত। হিন্দু শিল্পকলার যে নিয়ম, লক্ষণ ও পদ্ধতি আছে তাহা বাংলা ও গান্ধার উভয় দেশীয় প্রতীকেই বিকাশ পাইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে গ্রীক্‌দেশের আদর্শ ও ভারতবর্ষের আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন! উভয় দেশের আদর্শে পার্থক্য থাকায় শিল্পনৈপুণ্যও পৃথক্ হইয়াছে। গান্ধার চিত্রশালায় যে গ্রীক্‌দিগের প্রভাব আছে ইহা

কোনক্রমেই অনুমিত হইতে পারে না এরূপ অনুমান আমাদের ধারণাতীত! লেখক স্বয়ং যতদূর পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহাতে গান্ধার শিল্পকলা ভারতীয় শিল্পকলারই ভিন্ন শাখা বলিয়া বিশ্বাস করেন। কোন এক ইউরোপীয়ান আসিয়া গান্ধার চিত্রশালা (Gandhar School of art) বলিয়া যেই রব তুলিয়া দিল অমনি শত শত লোক বিনা বিচারে এবং স্বয়ং কিছুই পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া সেই রবের প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল। কি কি কারণে ও লক্ষণে যে গান্ধার চিত্রশালা গ্রীক্‌ভাবাপন্ন হইবে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই অপর এক ব্যক্তির মত অনুযায়ী সকলেই "তারস্বরেণ ফুৎকর্ত্তুমারেভে"।

বিভিন্নদেশের আদর্শ ও ভাব অনুযায়ী প্রতীক কিরূপ বিভিন্ন হয় তাহা আলোচা করা হইয়াছে। ভারতবাসী, অসুর জাতি, রোমকজাতি গ্রীক্‌ জাতি, রোমান্‌ জাতি ইত্যাদির প্রতীক ও আলেখ্যের প্রধান প্রধান কয়েকটী লক্ষণ উল্লেখ করা হইল। চীন জাতি ভারতীয় ভাবাপন্ন সেজন্য তাহাদের আদর্শ ও ভাব মিশ্র, কাজেই ইহাদের শিল্পকলা সম্বন্ধে পৃথক্‌ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। গান্ধার চিত্রশালা সম্বন্ধে অভিনব ধারণাটী যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, আমরা এই ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবার পক্ষপাতী। ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে যিনি যত অনুধাবন করিবেন তিনি তত স্পষ্টভাবে এই আধুনিক গান্ধার মতবাদের অযৌক্তিকতা বুঝিতে পারিবেন। শিল্পবিষয়ে অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি আমরা এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

ফলিত বেদান্ত

[শ্রীনন্দি শর্ম্মা]

এবার পেয়েছি সত্য গভীর তত্ত্ব,
জনার্দ্দনে ভজিয়ে;
শুধু মিছে এতদিন হয়ে উদাসীন
গেল—দাড়ি গোঁফ্‌ জটা গজিয়ে।

যখন হয় না কিছুই কেবলি পিছুই
দেখি দুনিয়াটা সব মিছে,
হায়, যশ মান ধন হয় না আপন
তখন কামড়ায় যেন বিছে।

বলি,—"কেনো এত যত্ন সকলি স্বপ্ন—
দেখছো যা এ সবই,—
সবই অসত্য দারা, সুত, ভৃত্য
গীতায় কয়েছেন কেশবই।

"তবে আসে যদি আলপো ক্ষীর, ছানা, মালপো
খেতে নাই কারুর বাধা,
পেলে আরো দশখানা নাই কোনো মানা,
এবং আরো কিছু শোনো দাদা—

"অনিত্য বলবে স্বপ্নও বলবে
কিন্তু টাকাটা জমাবে ব্যাঙ্কে,
আর, যদি এক পয়সা চুরি করে মশা
ভেঙে দেবে তার ঠ্যাংকে।—

"চালের খুদটা টাকার সুদটা,
রেখো—দুয়েতেই সমান দৃষ্টি ;
তারপর যদি বল, 'সবাই রদি'
দেখো—লাগবে কতই মিষ্টি !

ঝাঁটাটা কুলোটা নেয় যদি ভুলোটা,
দেবে নম্বর ঠুকে ;
'স্বপ্নের সংসার কেইবা কাহার' ?
বলতে ভুলোনা মুখে।—

"করবে তর্ক 'কিবা সম্পর্ক
দুনিয়ার সঙ্গে আমার ?'
দেখিবে তাহাতে পয়সা বাঁচাতে
পারিবে,—ভরিতে খামার।

"অন্যে, কামড়ালে বিছে বলিবে 'মিছে,
যাতনাটা সেরেফ্ স্বপ্ন' ;
অন্যের ক্ষতিতে কহিবে ঝটিতে
'অনিত্যের কি আর যত্ন' !

থানাটা ভরায়ে বেড়াটা সরায়ে
জমিটে বাড়ায়ে লবে ;
"স্বপ্ন কেবলি জমি জমা সকলি—
কাহারো কিছু নয়—ক'বে।

এই যে দেহটা　　　　আমার কে ওটা ?
দেখ নাই কেন বিচারি—
অপরে কহিবে　　　　আপনি রহিবে
ফেলিয়ে কিন্তু মশারি।—

"খেতে আস্বাদন　　　　কোরোনা গ্রহণ,—
ভালো-মন্দ আবার কি ?
নিজের ভোজন　　　　দুধ চিনি মাখন
আর আধপোটাক্ গাওয়া ঘি।

—স্বপ্ন জানিবে　　　　কিছু না রাখিবে
বলিবে শিখিতে 'ত্যাগ' ;
কিন্তু, নিজের স্বার্থে　　　　সমূহ বাঁচাতে
টিপে থাকিবে 'মনিব্যাগ'।

"বিষয়ের বিষবৎ　　　　ত্যজিতে সহবৎ
দিবে সবে উপদেশ ;
নিজে, পোড়শির বাড়ীটা　　　　বন্ধুর গাড়ীটা'
নিলামে তুলে, নেবে শেষ।

বলিবে' এই যে সৃষ্টি　　　　এতো মোর দৃষ্টি
চক্ষু মুদিলেই নাই,—
এটা শুধু মায়া　　　　অলীকের ছায়া,
আমি আছি—আছে তাই।

'দয়া আর ভক্তি　　　　দুর্ব্বলের উক্তি,—
দানেরেই ভাবে সে ধর্ম্ম ;
জ্ঞানীর লক্ষণ　　　　এ নহে কদাচন,—
কোরোনাক' এমন কর্ম্ম।—

"বুদ্ধি যার পাথর,　　　　পর দুঃখ কাতর
সেই সে মূর্খই হয় ;
বিচারে খুঁজিলে　　　　স্বপ্ন বুঝিলে
দেখিবে—কিছু না রয়—

"তাই সে দৃঢ়তার　　　　অনেকেই অবতার,
বিষয়টাই তাঁর রক্ত
"কি পাপ কি পুণ্য　　　　সকলি শূন্য
বুঝিয়ে,—হয়েছেন শক্ত !

উদ্ভিদ্-জীবনে বিহঙ্গের সাহচর্য্য

[শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু বি-এ]

পক্ষীরা ফলভোজন করিতে আসিয়া বৃক্ষের যে কত উপকার করে তাহা এক কথায় বলা যায় না। অবশ্য, এ বিষয়ে আমাদিগকে ক্ষতিস্বীকার করিতে হয় বলিয়া আমরা বিহঙ্গের এই ফলভোজনকে বিরক্তির চক্ষেই দেখিয়া থাকি এবং বৃক্ষের কল্যাণের দিকে না চাহিয়া বাগানের ফলবান্ বৃক্ষ সমূহকে জাল দিয়া ঢাকিয়া রাখি। কিন্তু উদ্ভিদ্ জীবনে বিহঙ্গের এই যথেচ্ছ ফলভোজনের প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক তাহা একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিয়া শেষ করা যায় না। একথা স্মরণ রাখা উচিত যে বিহঙ্গদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া আনিবার নিমিত্তই বৃক্ষেরা নানারূপ সুস্বাদু ফল প্রসব করিয়া থাকে। এই ফল প্রজননকে আমরা আমাদের রসনা-তৃপ্তির হেতুভূত বলিয়াই অনুমান করি তাহা হইলে বৃক্ষের নিগূঢ় উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যর্থ হইয়া যায়। উদ্ভিদেরা স্ব স্ব বংশবিস্তারের সাহায্য লাভের জন্য বিহগকুলকে সুমিষ্ট ফল উৎকোচ স্বরূপ দিয়া থাকে। বিহগেরা কি প্রকারে বৃক্ষের বংশ বিস্তারের সহায়তা করিয়া প্রকৃতির নিগূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া দেয় তাহাই এক্ষণে আলোচনা করা যাইতেছে।

পুষ্পের বর্ণ ও গন্ধ বিষয়ক প্রবন্ধদ্বয়ে আমি কুসুমের পরাগসম্মিলনে কীটপতঙ্গের সহায়তার বিষয় বিবৃত করিয়াছি। এই কীটপতঙ্গ ব্যতীত কতকগুলি পুষ্পকে বিহগের সাহায্য লইতে হয়। অনেক তরু-লতায় যখন কুসুমের উদ্গম হয় তখন পুংকেশর হইতে গর্ভকেশরে পরাগ-চালনার নিমিত্ত কুসুম মৌনভাবে বিহগ সমাগমের প্রতীক্ষা করে এবং বিহঙ্গেরা পরিমলের লোভে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া এবং কুসুমান্তরে পরাগ চালনা করিয়া প্রসূনের গোপন উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া দেয়। মধ্য আমেরিকায়, যুক্তরাজ্যের ফ্লোরিডা, ক্যালিফোরনিয়া প্রভৃতি প্রদেশে, ব্রাজিলের বনভূভাগে এদেশের ভ্রমর প্রজাপতির মত ক্ষুদ্র হামিংবার্ডেরা পরাগসম্মিলনের কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করে। সে দেশের বহু কুসুমকে পরাগ চালনার নিমিত্ত একমাত্র হামিংবার্ডের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। এই কারণে ঐ সকল দেশের কুসুমের বর্ণ ও গঠন হামিংবার্ডের যথেচ্ছ বিহারের অনুকূল হইয়া থাকে। হামিংবার্ডেরা ঘোর রক্তবর্ণ পছন্দ করে বলিয়া ঐ সকল স্থানের অধিক পুষ্পের বর্ণ ঘোর লোহিত হইয়া থাকে এবং হামিংবার্ডেরা যাহাতে তাহাদের সরু চঞ্চু অনায়াসে প্রবেশ করাইতে পারে তজ্জন্য কুসুমের গঠনও তদনুরূপ হইয়া থাকে। এই সকল হামিংবার্ডের দেহ এত ক্ষুদ্র যে মধুপানের সময় ইহাদের দেহের অর্দ্ধেক খানিকও কখন কখন পুষ্পের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

আমাদের এদেশে আমেরিকার হামিংবার্ডের মত ক্ষুদ্র মধুচোরা (হনি সাকার্স) পক্ষীরাও মধুপান করিতে আসিয়া কতকগুলি ফুলের রেণু চালনা করিয়া থাকে। বাল্যে আমি আমাদেরই উঠানে একটী বিলাতি ফুলের গাছে শীতের প্রভাতে এই মধুচোরদের মধুপান লক্ষ্য করিয়াছিলাম। মধুচোরারা ফুলের গুচ্ছ তাহাদের সরুপদ দ্বারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িত এবং ফুলের মধ্যে তাহাদের লম্বা, সরু ও বক্র চঞ্চু প্রবেশ করাইয়া মধু শোষণ করিত। দক্ষিণ আফ্রিকার সান্‌বার্ডারা বহু কুসুমের পরাগসম্মিলন ঘটাইয়া থাকে। ১৯২৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের "ফরওয়ার্ড" পত্রিকায় কদলী-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে (Medicinal uses of banana) আমি প্রসঙ্গক্রমে সানবার্ডের পরাগ-চালনার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তঃপাতী নেটাল প্রদেশের কদলীতরুতে ও ম্যাডাগাস্‌কার দ্বীপের পান্থপাদপ সমূহের পুষ্পস্তবকে মধুপান করিতে গিয়া এই ক্ষুদ্র সান্‌বার্ডেরা পরাগ-চালনা করিয়া থাকে। Scott-Elliot সাহেব দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু আয়াস

স্বীকার করিয়া এইসকল ক্ষুদ্র বিহঙ্গের কর্ম্মপদ্ধতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের ফলে আজ Ornithophilous পক্ষী প্রয়াসী প্রসূনের বিষয় বিশদ ভাবে জানা গিয়াছে। একবার খিদিরপুরের একটী বাগানে আমি একটী ক্ষুদ্র মধুচোরাকে কদলী কুসুমের (মোচার) মধ্যে প্রবেশ করিয়া মধুপান করিতে দেখিয়াছিলাম প্রভাত ব্যতীত মধুচোরাদের বড় একটা দেখা যায় না বোধ হয় কাকের ভয়েই ইহারা প্রাতঃকালের পরেই নিভৃতে আত্মগোপন করিয়া ফেলে। নিউজিল্যাণ্ডের কতিপয় কুসুমে তদ্দেশীয় বিহগেরা পরাগ-চালনাকরিয়া থাকে।

হামিংবার্ড, হনিসার্কাস ও সান্‌বার্ড ব্যতীত কাক, ময়না প্রভৃতিরাও পরাগ চালনার দ্বারা বৃক্ষের বহু উপকার সাধন করে। প্রথমে কাকের কথাই বলিব। কাকের বিষয় আমি পূর্ব্বে ১৯২৭ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখের "নবযুগে" 'কাকচরিত্র শীর্ষক' প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছিলাম। কাকের স্বভাব এত চঞ্চল যে কাককে অনেক সময়েই অনধিকারচর্চ্চা করিতে দেখা যায়। শীতের সময় শিমুলের ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিলেই শিমুলের ডালে কাকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়া যায়। কাক সারা দিন শিমুলের বড় বড় ফুলগুলিকে চঞ্চুদ্বারা উৎপাটন করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। ফুলগুলিকে ঠোকরাইয়া ফেলিবার প্রচেষ্টায় বায়স পুংকেশরের পরাগ গর্ভকেশরে চালিত করিয়া থাকে। শীতকালে শিমুলগাছ পত্রপর্ণ হইয়া যাওয়ায় রক্তকেতনের মত হইয়া পুষ্পগুলি বেশ সুস্পষ্ট হইয়া দূর হইতে বায়সকুলকে আমন্ত্রিত করিয়া আনে। কৃষ্ণচূড়ার ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিলে কাকেরা সেখানেও এইরূপ উৎপাত করিয়া পরাগ-চালনা করিয়া থাকে। শালিক, ময়না প্রভৃতিরাও এইরূপে অনেক কুসুমের পরাগ-মিলন ঘটাইয়া দেয়। সাধারণতঃ যে সকল কুসুম পরাগ-সম্মিলনের নিমিত্ত বিহগ-সমাগমের প্রতীক্ষা করে তাহাদের গঠনের যে তারতম্য ঘটিয়া থাকে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সকল বিহগ-প্রত্যাশী কুসুমের বর্ণ উজ্জ্বল লোহিত হয়, পুষ্পের পাপড়ীসকল কঠিন ও আকারে বড় হয় এবং প্রায়শই পুষ্প-কেশর-গুলি বুরুশের রোমের মত কঠিন হয় এবং তাহাদের বর্ণও বেশ উজ্জ্বল লোহিত থাকে।

এইবার বীজবিস্তারের কথা। বীজবিস্তারে বিহঙ্গের প্রভাব এতই অধিক যে, বিহঙ্গকে এ বিষয়ে "বৃক্ষবন্ধু" বা "তরুসখা" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাননে পক্ষীসমাগম না থাকিলে এত শীঘ্র উদ্ভিদের বংশ-বিস্তারের সুযোগ ঘটিত না। আজ যে বসুন্ধরার চারি-দিকে সুদূর পাহাড়ে-পর্ব্বতে, ঊষর মরুর মাঝে, ওয়েসিসের বক্ষে, দূর সমুদ্রের মাঝে, নির্জ্জন দ্বীপে, নির্জ্জন উপত্যকা, অধিত্যকা ও প্রান্তরে এত সুস্বাদু ফলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার বিস্তারের মূলে এই বিহঙ্গ। বীজবিস্তার-প্রসঙ্গে আমাদের চির-পরিচিত কাকের কথাই প্রথমে উল্লেখ করিব।

কাক যে কত গাছের ফল ভক্ষণ করে, তাহা তাহার বিষ্ঠা পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া কাক নানাপ্রকার ফল উদরস্থ করে। এই সকল ফলের সহিত অনেক বীজও বায়সের অন্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। সেই কারণে ইহাদের পুরীষে প্রায় সকল সময়েই একাধিক বৃক্ষের বীজ থাকিতে দেখা যায়। এই সকল বীজের মধ্যে অশ্বত্থ ও বটের বীজই প্রধান। এই অশ্বত্থ ও বটবীজসকল পাকস্থলীর পাচকরসে নষ্ট না হইয়া বরং গুণগরিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং কাকের বিষ্ঠার সহিত নির্গত হওয়ায় ঐ সকল বীজের শক্তি আরও প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তবে যে সকল বীজের আবরণ-ত্বক্ অতি পাত্‌লা তাহারা যে পাচকরসে নষ্ট হয় না একথা বলা যায় না। এ বিষয়ে কোনও কোনও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদের মতভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, পক্ষীর বিষ্ঠার সহিত যে বীজ নির্গত হয় নাই তাহা যথাকালে উপযুক্তক্ষেত্রে উপ্ত হইলে বিষ্ঠানির্গত বীজের মত একই সময়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। যাহা হউক কাক বীজ সমেত অশ্বত্থ ও বট ফল ভক্ষণ করিয়া পল্লীমধ্যে বা সহরে গৃহস্থের বাটীতে উড়িয়া চলিয়া যায় এবং ছাদের আলিসায়, প্রাচীরের উপর, পাইখানার ছাদ প্রভৃতিতে বিষ্ঠা ত্যাগ করে। এই বিষ্ঠার সহিত দূরস্থিত অশ্বত্থ বটের বীজ গৃহস্থের বাটীতে পড়িয়া এবং যথাকালে আলিসা প্রভৃতির উপর অশ্বত্থ বটাদির প্ররোহ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যেসকল বীজ কাক গলাধঃকরণ করিতে পারে না

সেগুলি চঞ্চুপুটে লইয়া গৃহস্থের বাটীতে উড়িয়া যায় এবং ছাদের আলিসায়, প্রাচীরের মাথায় বা চালের মধ্যে লুকাইয়া রাখে। এইরূপে নিম, জাম, পাকুড়, খেজুর, কুল, লিচু, আঁশফল, কাঁটাল, আমড়া, এমন কি ছোট আমের আঁঠি পর্য্যন্তও কাক কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বাটীর ছাদ ও আলিসা পর্য্যবেক্ষণ করিলে কাক-সঞ্চিত এইরূপ দুই চারিটী বীজ লক্ষিত হইবে এবং আলিসার উপরে দুই চারিটী অশ্বত্থ, নিম্ব ও বটের চারাও দেখিতে পাওয়া যাইবে। পল্লীগ্রামে বৃহৎ বৃহৎ প্রাচীন মন্দিরের উপর, এমন কি তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষের মাথায় ও গায়ে যে সকল অশ্বত্থ, নিম্ব ও বটের আবির্ভাব দেখা যায় তাহাদের চালক হইতেছে এই বায়স।

বায়সের মত কোকিলও বহু ফল ভক্ষণ করে। সেওড়া, ঝিঞ্চি, বিম্ব, জাম, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতির ফল পর্য্যাপ্তপরিমাণে ভক্ষণ করিয়া কোকিলেরা বায়সের মতই বীজ-বিস্তারে সহায়তা করিয়া থাকে। বনের মাঝে, বাগানের আশে-পাশে যে এত তেলাকুচা গাছ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উৎপত্তির মূলে এই কোকিলেরই কৃতিত্ব। তেলাকুচার ফল কোকিলের অত্যন্ত প্রিয়। পক্ক বিম্বফল দেখিতে পাইলে পিক আর কিছুই চাহে না। নিদাঘের মধ্যাহ্নে যে কোনও ছায়া-শীতল উপবনের আশে-পাশে লুকাইয়া থাকিলে পিকদিগের ফল-ভোজনের উৎকট লালসা ও ফল-ভোজন-সম্ভূত প্রাণ-ঘাতী কলহ ও কলহ-সম্ভূত সমরের দৃশ্য লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে। আমি একবার প্রবল গ্রীষ্মের সময় দ্বিপ্রহর কালে একটী ভগ্ন মন্দিরের গাত্র-জাত নাতিদীর্ঘ শাখোট বৃক্ষে এইরূপ বহু কোকিলের যথেচ্ছ ফল-ভোজন ও ভোজনকালের ভীষণ কলহ সুন্দরভাবে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম। তৎকালে কোকিলেরা এতই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, আমি ধীরে ধীরে বৃক্ষ-তলে উপস্থিত হইয়া তাহাদের নয়ন-পথবর্ত্তী হইলেও তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে নাই। শালিক, ময়না প্রভৃতিরাও এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুপক্কফল বীজসহ ভক্ষণ করে এবং কাক ও কোকিলের ন্যায় তাহারা বীজ বিস্তার করিয়া থাকে। টিয়া ও শুকজাতীয় পক্ষীরাও সুপক্ক ধান্য ও তৃণাদির বীজ কর্ত্তন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়।

বীজবিস্তার প্রসঙ্গে বাদুড়ের নামোল্লেখ করিলে বোধ হয় অশোভন হইবে না। যদিও বাদুড়েরা বিহগ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে, তথাপি পক্ষীদিগের সহিত এক্ষেত্রে ইহাদের কর্ম্মপদ্ধতির অনেক মিল থাকায় ইহাদের বিষয়ে দুই এক কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমি পূর্ব্বে ১৩৩৩ সালের ৮ই আশ্বিন তারিখের "বিজলী" পত্রিকায় বাদুড়ের বিস্তৃত জীবনীর বিষয় লিখিয়াছিলাম। এই বাদুড়েরা বাগান-বাগিচায় পরিভ্রমণ করিয়া বহু ফল ভক্ষণ করিয়া থাকে। আমার বোধ হয় সারা দিবসে কাক কোকিলে বাগানের যে-পরিমাণ ফল নষ্ট করে, এক রাত্রে বাদুড়েরা তাহার অষ্টগুণ বা ততোধিক ফল ধ্বংস করিয়া দেয়। পক্ক ফল-পাকড়ে যে ক্ষতচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই বাদুড়ের কীর্ত্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। বাদুড়েরা ফল ভোজনান্তে আবাস-তরুতে প্রত্যাগমন করিবার কালে মুখে করিয়া বহু ফল লইয়া আসে। যে সকল তরুতে বাদুড়ের বাস তাহাদের তলে প্রভাতে বাদাম, পেয়ারা, জাম, জামরুল, শুপারি প্রভৃতি বহু ফল অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহারা ফলের সন্ধানে বহু ক্রোশ পরিমিত স্থান ভ্রমণ করে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ফলের বীজ বহু দূরে চালনা করিয়া থাকে।

কাক ও কোকিলের প্রসঙ্গে আমি পরগাছার বিষয় বিবৃত করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। পল্লীগ্রামের বন-বাদাড়ে আমগাছের ডালে বহু পরগাছা দেখিতে পাওয়া যায়। আমি যশোহরের স্থানে স্থানে বহু পরগাছাকে চুতশাখায় জন্মাইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। এক একটী আম্রের শাখা পরগাছায় একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল এবং তাহাতে বৃক্ষের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। টালিগঞ্জের আমবাগানেও বহু পরগাছা দেখিতে পাওয়া যায়। এখন কথা হইতেছে, আমের শাখায় পরগাছা জন্মায় কিরূপে? কাক, কোকিল প্রভৃতি পক্ষীরাই পর-গাছার পক্ক ফল ভোজন করিয়া থাকে এবং তাহারা যখন আমের শাখায় মলত্যাগ করে তখন তাহাদের পুরীষের সহিত পরগাছার বীজ শাখার উপর পতিত হয়। পরগাছার ফলগুলির মধ্যে আটার মত চট্‌চটে পদার্থ থাকে বলিয়া এবং আম্রশাখারক্‌ উপরের ত্বক ফাটা ফাটা বলিয়া পরগাছার

বীজ পক্ষীবিষ্ঠার সহিত ভূমিতে পড়িয়া যাইতে পারে না। কখনও বা ফলগুলি আঠার সাহায্যে কাক-কোকিলের পায়ে লিপ্ত হইয়া স্থানান্তরিত হইয়া পড়ে। অনেক স্থলে দেখা যায়, পরগাছাগুলি ডালের ঠিক উপরেই না জন্মাইয়া ডালের পাশের দিক হইতেই জন্মাইয়া থাকে। পক্ষীর মল ডালের উপর পড়িয়া পাশের দিকে গড়াইয়া যায় বলিয়াই পরগাছার এইরূপ উৎপত্তি হইয়া থাকে। এখানকার আমগাছের মত ইউরোপে কাল পপ্‌লার বৃক্ষেও নানাপ্রকার পরগাছা দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে থ্রস, ব্ল্যাকবার্ড প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গায়ক পক্ষীরাই এখানকার কোকিলের মত পরগাছার বীজ মলের সহিত বৃক্ষশাখায় পাতিত করে। বিলাতের ক্ষুদ্র রবিন বহুসংখ্যক হথর্ণের ফল ও ষ্ট্রবেরি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া মলের সহিত তাহাদের বীজ স্থানান্তরে চালিত করে।

আজকাল যে কচুরিপানা সারা বাঙ্গলার খাল, বিল, নদী, পুষ্করিণী মজাইয়া দিতেছে, সেই কচুরিপানার বংশ বিস্তৃতির মূলে পক্ষীর সাহচর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে এদেশে কচুরিপানার এত প্রসার হয় নাই। বৎসর কয়েকের মধ্যেই ইহা দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহা প্রাণীদের খাদ্য নয়; কেহ ইহাদিগকে সখ করিয়া লইয়া যায় না এবং ইহাদের বীজ কার্পাস-বীজের মত বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে না। অথচ ইহাদের স্বাভাবিক বিস্তৃতি দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাদের বিস্তৃতির কারণ বোধ হয় অনেকেই অবগত নন। বক, কাদাখোঁচা, পানকৌটী, ডাহুক, নানা জাতীয় হংস প্রভৃতি জলচর পক্ষীরাই মৎস্য ও কীটের সন্ধানে এক জলাশয় হইতে অপর জলাশয়ে গমন করিবার সময় তাহাদের পদলিপ্ত পঙ্কের সহিত ইহাদের বীজ বা অঙ্কুরাদি বহন করিয়া লইয়া যায়। পুষ্করিণী প্রভৃতির পানা ও নানা প্রকার জলজ লতার বীজ ও অঙ্কুরাদি জলচর পক্ষীরাই এইভাবে দূরতর স্থানে চালনা করিয়া থাকে।

পুষ্করিণীর পঙ্কে যে কতপ্রকার উদ্ভিদের বীজ থাকিতে পারে তাহা ডারুউইন্ প্রগাঢ় অনুশীলন সহকারে-পরীক্ষা করিয়াছিলেন। একবার তিনি একটী ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে তিন চামচ কর্দ্দম উঠাইয়া তাঁহার পরীক্ষাগারে একটী পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দেন। ছয় মাসের মধ্যে ঐ সামান্য পরিমাণ কর্দ্দম হইতে একে একে প্রায় ৫৩৭টী বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল। ডারুউইন্ আর একবার একটী বন্য কুক্কুটের পদলিপ্ত মাত্র নয় গ্রেণ মৃত্তিকার মধ্যে একটী আগাছার বীজ থাকিতে দেখিয়াছিলেন। আর একবার তিনি একটী আহত তিত্তিরের পদলিপ্ত প্রায় সাড়ে ছয় আউন্স মৃত্তিকা লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ মৃত্তিকা হইতে একে একে বিভিন্ন প্রকারের ৮২টী উদ্ভিদ্ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। আমাদের দেশের সাধারণ পাতিহাঁসেরাও এক পুষ্করিণী হইতে অন্য পুষ্করিণীতে গমন করিবার কালে তাহাদের চরণলিপ্ত পঙ্কের সহিত নানা জলজ উদ্ভিদের বীজ ও অঙ্কুর চালনা করিয়া থাকে। পক্ষীরা দলবদ্ধ হইয়া দেশ-ভ্রমণ করিবার কালে নানাপ্রকার গাছের বীজ নানা প্রকারে বহন করিয়া লইয়া যায়। কতক গাছের বীজ তাহাদের পালকে আটকাইয়া থাকে এবং কতক বীজ তাহাদের পদলিপ্ত পঙ্কের সহিত চালিত হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত যথেচ্ছ ফল-ভোজন নিমিত্ত বহু বৃক্ষের বীজ তাহাদের অন্ত্রমধ্যে রহিয়া যায়।

অ্যালব্যাট্রস, সি-গল প্রেটেল প্রভৃতি সামুদ্রিক পক্ষীরা স্থলভাগ হইতে সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে বহু তরুলতার বীজ বহন করিয়া লইয়া যায় এবং এক দ্বীপের গাছ-পালার বীজ অপর দ্বীপে চালিত করিয়া থাকে। পক্ষীর ঝাঁক দেশ-ভ্রমণ করিবার কালে কখন কখন গমন-পথের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপমধ্যে অবতরণ করিয়া বিভিন্ন দেশের বীজ চালিত করে। এতদ্ব্যতীত প্রবল বাত্যায় নানা বৃক্ষের পক্ষযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ এবং সমুদ্রস্রোতে নারিকেল, গুবাক, বাদাম প্রভৃতির অনুরূপ পুরু ত্বক্ বা কঠিন আবরণযুক্ত ফলও ভাসিতে ভাসিতে দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হয়। সমুদ্রের লবণাক্ত জলে বহুকাল নিমজ্জিত থাকিলেও ঐ সকল ফলের প্রজনন-শক্তির অপলাপ ঘটে না।

এ বিষয়ে অ্যাজোরস্ (Azores) দ্বীপের উদ্ভিদশ্রেণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অ্যাজোরস্-দ্বীপপুঞ্জ ইউরোপ হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইলেও উক্ত দ্বীপের গাছপালা ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগের অনুরূপ। ইউরোপের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ এবং যে সকল বৃক্ষ বৃহৎ বৃহৎ ফল

প্রসব করে সে সকল পাদপ এখানে পূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দ্বীপের সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের গাছ ও গুল্ম দেখিতে পাওয়া যায়। বোধহয় অধিকাংশ বৃক্ষের বীজই ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ হইতে সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পক্ষী, বাত্যা বা সমুদ্রস্রোতে চালিত হইয়া এই দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া পড়িয়াছিল। বৃক্ষের স্থান-বিশেষে যে তাহাদের বংশরক্ষার প্রচেষ্টা করে তাহা এই দ্বীপের তরুলতার মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এ দ্বীপের বৃক্ষাবলীর বীজ হয় পক্ষযুক্ত ও আকারে ক্ষুদ্র, আর না হয় সমুদ্রস্রোতে বাহিত হইবার উপযোগী হইতে দেখা যায় এবং অবশিষ্ট বীজ সুমিষ্ট ফলের মধ্যে জন্মিয়া পক্ষীদ্বারা সাগ্রহে গৃহীত হইয়া থাকে; সুতরাং মানুষের সাহায্য ব্যতিরেকেও এখানে প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে বৃক্ষেরা স্ব স্ব বীজ বিস্তার করিয়া থাকে।

আমেরিকার পশ্চিম উপকূল হইতে প্রায় দুই হাজার মাইল দূরবর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের তরুলতাদির বিস্তারেও পক্ষীর অনেক সহায়তা লক্ষিত হইয়া থাকে। সমুদ্রের মধ্যে যখন নূতন নূতন দ্বীপের আবির্ভাব হয় তখন সামুদ্রিক পক্ষীরাই সর্ব্বাগ্রে তাহার মধ্যে অবতরণ করিয়া বীজ চালনা করিয়া থাকে।

পক্ষীরা কখন কখন বীজের বর্ণে আকৃষ্ট হইয়া উহার বিস্তার-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এ দেশের রক্তকুঁচ, রক্তকম্বল, মাখমশীমের বীজ প্রভৃতি এই শ্রেণীর বীজের অন্তর্গত। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছে যে লাল রংএর পোকা দেখা যায় উহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত দুই বীজের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এই সকল বীজের উপরে দুই একটী কাল দাগ বা ডোরা এমন ভাবে অঙ্কিত থাকে যে, দূর হইতে উহাদিগকে কোনও পোকা-মাকড় বলিয়া বোধ হয়। এই ভ্রমেই পতঙ্গভুক্ পক্ষীরা অনেকসময়ে উহাদিগকে চঞ্চুপুটে গ্রহণ করিয়া লইয়া যায় এবং পরোক্ষভাবে বীজের বিস্তারকার্য্যও সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ভক্ত

[শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত]

আরাধ্য দেবতা মম, আসিয়াছি আর্ত্তসম
তোমারে পূজিতে দূর হ'তে।
জীবন সর্ব্বস্ব ধন, দিতে মম কায়মন
হ'ব না বিমুখ কোন মতে॥

কৃপা তব লভিবারে লয়ে মম পাপভারে
আসিয়াছি জুড়াবার তরে।
ক'রোনা বিমুখ দাসে, আসিয়াছি বড় আশে,
মঙ্গল করহ শুভকরে॥

সাধিবারে তব কাজ যায় প্রাণ যাক্ আজ,
নাহি ক্ষোভ কিছু মাত্র তাহে।
তুমি না চাহিলে মোরে বাঁচি আমি কার তরে,
এ ছার জীবন বা কে চাহে॥

সাহিত্যের স্বরূপ

[শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, এম-এ]

ব্যাপকভাবে গ্রহণ করলে বিজ্ঞানকে এবং দর্শনকে সাহিত্যের মধ্যে ধ'রে নিতে পারা যায়; কিন্তু সাহিত্য কোন দিনই বিজ্ঞান বা দর্শন নয়। সাহিত্যের কারবার সুন্দরকে নিয়ে, আর সৌন্দর্য্য মানেই পরিপূর্ণতা, অভাব-রিক্ততা, সামঞ্জস্য।

বিজ্ঞানের মূলে আছে কৌতূহল, কিন্তু সাহিত্যের মূলে আছে আনন্দ। মানুষের কৌতূহল জন্মে সন্দেহ থেকে। মানুষ যখন তার নিজের জানাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারে না, পলে পলে এই বিশ্বলীলার অনন্ত রহস্যের বিচিত্রতার নিকট নিজেকে অত্যন্ত ছোট ব'লে মনে করে,—তখনি তার সন্দেহ জন্মে—যা এতকাল ধ'রে জেনে এসেছে এবং আজও জানছে, হয় তো বা তা ঠিক নয়। এমনি ক'রে নিজের জানাকে যতই সে ছোট ক'রে দেখতে থাকে, বড় জানার কৌতূহল ততই তার মধ্যে প্রবল হ'য়ে ওঠে। তখন সে ব'লে ওঠে—"এই যে দেখছি শুনছি এসব যে ঠিক তা কে বলতে পারে?" দার্শনিক তখন বিচার করতে ব'সে গেলেন—আমাদের দেখা-শোনার যন্ত্রগুলা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম যা দেখাচ্ছে এবং শোনাচ্ছে তা বিশ্বাসযোগ্য কি না;—তারা যে আমাদের ঠকাচ্ছে না কে তা হলফ ক'রে বলতে পারে? এমনি ক'রে জ্ঞানের অভাব-বোধ থেকে কৌতূহল এবং কৌতূহল থেকে দর্শনের সৃষ্টি। বিজ্ঞানের ব্যাপারটাও ঠিক তাই। বিজ্ঞানও চোখ-কানকে বিশ্বাস করতে পারলে না,—সে বল্লে, কাছ থেকে যে পৃথিবীটাকে সমতল ব'লে মনে হয়, দূর থেকে তাই আবার গোলাকার হ'য়ে চোখে ঠেকে; সুতরাং আমাদের চোখ দু'টাকে বিশ্বাস করি কেমন ক'রে? এখানেও সেই জ্ঞানের অভাববোধ থেকে কৌতূহল এবং কৌতূহল থেকে বিজ্ঞানের জন্ম।

সাহিত্যের মধ্যে এই কৌতূহলটুকু নেই। পূর্ব্বেই বলেছি—সাহিত্যের কারবার সুন্দরকে নিয়ে। সুন্দরকে জানা যায় না—ভোগ করা যায়। সুন্দর হচ্ছে পরিপূর্ণ সার্থকতা,—কৌতূহল অপূর্ণতাকে নিয়ে। আমরা যাকে সুন্দর ক'রে দেখি, তাকে সমগ্রভাবে দেখি। সুন্দরকে দেখা মানেই সমগ্রকে দেখা—তা সে যত ছোটই হোক্ না কেন। তাই সুন্দরের মধ্যে কোথাও অসম্পূর্ণতা নেই এবং সেইজন্যেই তার মধ্যে কৌতূহলের অবকাশও এত অল্প। যাকে পাওয়া মানেই সম্পূর্ণরূপে পাওয়া—তার সম্বন্ধে কৌতূহলের অবকাশ কোথায়? সাহিত্যিকের দৃষ্টি হচ্ছে বিশ্বাসের দৃষ্টি। কোথাও সন্দেহ নেই,—কোথাও অবিশ্বাসের ছিটা-ফোঁটা মাত্র নেই। একটী মাত্র জোছ্না-রজনীর রূপ-ব্যঞ্জনার শেষ কোথায়? সে যে তখন অনন্তকালের চেয়েও অসীম, পরিপূর্ণ। তাকে পাওয়া মানেই যে পরিপূর্ণ ক'রে পাওয়া—বুকের মধ্যে ঘন আলিঙ্গনের নিবিড়তার মধ্যে পাওয়া। এত নিকটের জিনিসকে ভোগ করা যায়—অনুভব করা যায়, কিন্তু তার সম্বন্ধে কৌতূহল পোষণ করা যায় না। তাই আর্টের মধ্যে কোথাও কৌতূহল নেই, কোথাও জানবার ইচ্ছা নেই, শেখবার ইচ্ছা নেই, আছে কেবল আনন্দের প্রেরণা।

অনেকে বলেন, আর্ট হচ্ছে সত্য-শিব-সুন্দরের একত্র সমাবেশ। আমার মনে হয় আর্ট হচ্ছে, সুন্দরের বিকাশ। সত্য এবং শিব আর্টের জীবনে আকস্মিক বা আগন্তুক ব্যাপার মাত্র। সব জিনিসেরই একটা উদ্দেশ্য আছে। আর্টেরও নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য আছে—সেটা হচ্ছে রস-সৃষ্টি।

প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি রসসন্ধানী। নদী যেমন সমুদ্রে মিশতে চায় শিল্পসৃষ্টি তেমনি রসের সন্ধানে ছুটেছে। গঙ্গা নদী ছুটেছে সমুদ্রের সন্ধানে। তার মোহানার মাথায় দরমার ঘরখানির মধ্যে ব'সে ব'সে যে টোল্-বাবুটী দিবারাত্র নৌকা গুনে গুনে টোল সংগ্রহ করছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি—"এ নদীর এই

'অবিশ্রাম প্রবাহ কিসের জন্য?' সে ঠিক বলবে—'তার কাচ্ছা-বাচ্ছাগুলির মুখে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন তুলে দেবার জন্য।' বণিককে জিজ্ঞাসা করুন;—সে বলবে, 'তা না হ'লে মালপত্র নিয়ে যাবার কত অসুবিধাই হোতো।' দুই তীরে যে-সকল শস্য-ক্ষেত্র সোনার ধানে ভ'রে উঠেছে—তাদেরি মালিক ঐ কৃষকগুলিকে জিজ্ঞাসা করুন—তারা বলবে, 'তাদের জমীকে উর্ব্বর ক'রে তোলবার জন্যেই গঙ্গা নদীর এই অবিশ্রাম প্রবাহ।' আবার ঐ যে পুণ্যলোভাতুরা বিধবাটী ভোর না হ'তে গঙ্গা-স্নানে চলেছেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি বলবেন, 'তাঁদের মত অভাগিনীদের ইহজন্মের সমস্ত পাপ তাপ ধুয়ে মুছে নেবার জন্যেই মা ভাগীরথী ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে ধরায় নেমে এসেছেন।' কিন্তু আসলে গঙ্গা নদী চলেছে সমুদ্রে মেশবার জন্যে। কেন না টোল-বাবু ব'লে কোন জীব পৃথিবীতে যখন ছিলেন না, বাণিজ্য-পোত ব'লে কোন পদার্থ বিশেষ যখন কেউ কল্পনাতেও সৃষ্টি করতে পারে নি, মানব-সভ্যতা যখন কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা পর্য্যন্ত অনুভব করে নি—তখনও গঙ্গা নদী বইত, যেমন আজও বয়ে থাকে। গঙ্গা নদী যে কৃষকের জমিকে উর্ব্বর করে না, টোল-বাবুটীর কাচ্ছা-বাচ্ছাগুলির মুখে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন যোগায় না, বণিকের বাণিজ্যপোত বুকে ক'রে বয়ে নিয়ে যায় না, বা পুণ্যলোভাতুরা বিধবার পাপ মোচন করে না, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়,—আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলো হচ্ছে আকস্মিক বা আগন্তুক ঘটনা মাত্র। আসল কথা—গঙ্গা নদী চলেছে সমুদ্রের সন্ধানে।

সাহিত্যকেও মানুষ তার আকস্মিক বা আগন্তুক ঘটনাগুলার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে—অনেক গণ্ডগোলের সৃষ্টি ক'রে বসেছে। জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মাত্রেই সমাজের উপকার সাধন করেছে, তা থেকে ধর্ম্ম এবং নীতিরও অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে—সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই; কেন না ইতিহাস তার প্রচুর সাক্ষ্য দেবে। সমাজ-সংস্কারক ফোঁস ক'রে উঠলেন—"সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমাজকে গ'ড়ে তোলা।" ধর্ম্ম-যাজক ফোঁস্ ক'রে উঠলেন—"সাহিত্য হ'চ্ছে ধর্ম্মের বাহন,—তার কাজ হ'চ্ছে জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম-পরিবেশন।" এ টোল-বাবু, বণিক, চাষা, এবং পুণ্যলোভাতুরা বিধবার গঙ্গা নদীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মনগড়া সঙ্কীর্ণ ধারণার মতই একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার। নদী বাণিজ্য-সম্ভার বুকে ক'রে নিয়ে যায় একথা সত্য, কিন্তু তাই ব'লে একথা সত্য নয় যে, নদীর সৃষ্টি বাণিজ্য-পোতগুলাকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যেই। তেমনি, সাহিত্য লোকহিত করে একথা সত্য, কিন্তু তাই ব'লে লোকহিতের জন্য সাহিত্য নয়।

সাহিত্যের মধ্যে এই যে শিবের অংশ এটা হ'চ্ছে তার অজ্ঞাত-দান। আমার এক ধনী বন্ধু তাঁর দেশের বাড়ীটীর চারিদিকের বাগানটী সুন্দর ক'রে সাজিয়ে-ছিলেন;—সে যেন একটী নন্দন-কানন। একটী ঝরা পাতা কোথাও প'ড়ে থাকবার যো ছিল না,—এমনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লোকটী। তার পর এক বছর দেশে ভয়ানক ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হ'ল। কোম্পানির ডাক্তার বন্ধুবরকে বল্লেন—"আপনার বাগান-বাড়ীটী ত প'ড়েই রয়েছে,—কিছুদিনের জন্যে হাঁসপাতাল হিসাবে ব্যবহার করতে দেন তো বড়ই উপকার হয়,—কেন না অমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর স্থান এ অঞ্চলেই নেই—রোগীদের পক্ষে বায়ুপরিবর্ত্তনের কাজ করবে—ইত্যাদি।" বন্ধুবর রাজি হ'লেন। দেশশুদ্ধ লোক চেঁচিয়ে উঠল—"লোকটা কি পরোপকারী,—এত পয়সা খরচ ক'রে, এত পরিশ্রম ক'রে রোগীদের জন্যে কি বাগানটাই বানিয়েছেন তিনি।" আসলে কিন্তু তিনি সখের জন্য বাগানটাকে মনের মতন ক'রে বানিয়েছিলেন—পরোপকারের জন্যে নয়, এবং বাগানটীকে সুন্দর করতে গিয়েই তিনি স্বাস্থ্যকর ক'রে তুলেছিলেন। ঠিক এমনি ক'রেই কবি চিরকাল লোকহিত ক'রে এসেছেন। তিনি সুন্দরকে সৃষ্টি করেছেন, আর সেই সুন্দর আপনা হ'তেই লোকহিতের উপলক্ষ্য হ'য়ে উঠছে।

সাহিত্য-জগতে সত্য কথাটার সংজ্ঞা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। যা দেখছি বা শুনছি তাই কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা—ঠিক এ অর্থে শিল্পজগতে 'সত্য' কথাটা ব্যবহৃত হয় না। আমরা প্রতিদিন যা দেখছি, যা শুনছি তা প্রত্যক্ষ সত্য—সাহিত্যিক সত্য নয়। যা ঘটছে বা প্রতিদিন ঘটে, তাই কেবল সাহিত্যিক

সত্য নয়, যা ঘটতে পারে এবং যা ঘটলে সৃষ্টিলীলা আরও সুন্দররূপে অভিব্যঞ্জিত হ'য়ে ওঠে তাই হ'চ্ছে সাহিত্যিক সত্য।

সাহিত্য হচ্ছে ভোগলিপ্সা—কৌতূহল নয়। তাই সাহিত্যিক সত্য হচ্ছে, জানার কৌতূহল নয়—ভোগের আনন্দ। সাহিত্য সত্যকে আবিষ্কার করে না—সত্যকে সে সৃষ্টি করে। মাটির তলায় কয়লার খনি আছে—এ হ'চ্ছে প্রত্যক্ষ সত্য—এ হ'চ্ছে আবিষ্কারের সত্য, মাটির তলায় বাসুকী আছেন এ হ'চ্ছে সৃষ্টি। সাধারণ মানুষ সত্যকে আবিষ্কার করে—কবি সত্য সৃষ্টি করে। আসল কথা, শিল্প-জগতে সত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। যা সুন্দর এবং যা আনন্দ দেয়, তাই হ'চ্ছে শিল্পীর সত্য। এখানেও সেই সুন্দরকেই আমরা ঘুরে ফিরে পাচ্ছি। কেন না, যা আমরা দেখছি তা শিল্পীর সত্য নয়—যা আমরা দেখতে চাই তাই শিল্পীর সত্য। যা আমরা শুনছি তা শিল্পীর সত্য নয়—যা আমরা শুনতে চাই তাই শিল্পীর সত্য। আমরা প্রতিদিন যা দেখছি যা শুনছি তা অল্প, তা বিচ্ছিন্ন; কবির কিন্তু 'নাল্পে সুখমস্তি' - অল্পে সুখ নাই—খণ্ডে সুখ নাই। তাই এই খণ্ডকালের মধ্যে, এই খণ্ড স্থানের মধ্যে তাঁকে অখণ্ডকে সৃষ্টি করতে হয় এবং এই অখণ্ড সৃষ্টিই হচ্ছে কবির সত্য। মোট কথা, সুন্দরকে, সম্পূর্ণকে, আনন্দকে ব্যক্ত করবার জন্যে যে বিষয়বস্তু বা আধারকে আশ্রয় করতে হয় তাই হচ্ছে শিল্পীর সত্য। তা সব সময়ে যে প্রত্যক্ষ সত্যের সঙ্গে মিলবে এমন কোন কথা নেই।

এইখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, সৃষ্টি মানে কি তবে সৃষ্টি-ছাড়া একটা কিছু? প্রত্যক্ষ-জগতে যা দেখছি, যা শুনছি তাকে কি বাদ দিয়ে একটা অদ্ভুত কিছু খাড়া ক'রে তুলতে হ'বে? এবং তা না করতে পারলে তাকে কি সৃষ্টি বলব না? না তা নয়! সৃষ্টি-ছাড়া কিছু করাটাই সৃষ্টি নয়। সৃষ্টি করা মানে চিরকালের এই প্রত্যক্ষ জগতের অতি বড় পুরাতন ঘটনাগুলোকেই নূতন চোখে দেখা—নূতন ক'রে রূপ দেওয়া। কথাটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক।

শিল্পী যখন একটা পরিপূর্ণ শিল্প-সৃষ্টি খাড়া ক'রে তোলেন, তখন সেটা নিজেই একটা স্বতন্ত্র জগৎ হ'য়ে দাঁড়ায়, এবং তার ভিতরকার মানুষগুলো চরিত্রগুলো তার মধ্যে এমনি খাপ খেয়ে যায় যে, তারা তখন আমাদের এই প্রত্যক্ষ-জগতের মানুষের সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক মিলল কি না তা নিয়ে আমাদের মনে প্রশ্নই ওঠে না। বিচার ক'রে, তর্ক ক'রে চরিত্রগুলোকে যতই অস্বাভাবিক বোধ হোক না কেন, পড়বার সময় তা মনে হয় না। এই যে এমন ধারাটা হয় এর কারণ এই যে, পড়বার সময় তার চারিদিকের আবহাওয়াটাকে বাদ দিয়ে পড়ি না, কিন্তু বিচার করি যখন, তখন চরিত্রগুলির চারিপাশের আবহাওয়া থেকে তাদের সরিয়ে নিয়ে দেখি। অমনি আমরা চেঁচিয়ে উঠি—"এ কেমন ক'রে হ'বে—এ যে অনাসৃষ্টি ছাড়া কিছুই নয়!"

সাহিত্যের মধ্যে যদি অসত্য ব'লে কোন বালাই থাকে, যা তাকে অবাস্তব ক'রে ফেলে সে হচ্ছে সঙ্গতির অভাব—সামঞ্জস্যের অভাব। রাজলক্ষ্মীর মত বাইজী ভূ-ভারতে আছে কি না এবং সাবিত্রীর মত ঝি কোন মেসে আজ পর্য্যন্ত চাকরী করেছে কি না সে নিয়ে রাজলক্ষ্মী বা সাবিত্রী চরিত্রের বাস্তবতার বিচার হ'বে না, দেখতে হ'বে শরৎবাবু তাদের চারিপাশে যে আবহাওয়া, যে ঘটনা-পরম্পরার সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে ঐরকম চরিত্র গজিয়ে ওঠা স্বাভাবিক কি না এবং এই দিক থেকেই ঐ সকল চরিত্রের বাস্তবতা-অবাস্তবতার বিচার করতে হ'বে।

এই সম্পর্কে চিত্রকলার প্রসঙ্গ তুলে সেই দিক থেকে জিনিসটাকে দেখবার চেষ্টা করলে ব্যাপারটা নেহাত অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না, অথচ তাতে ক'রে আমাদের বক্তব্য হয় তো কিঞ্চিৎ সরল হ'য়ে উঠতে পারে।

আজকালকার খুব শিক্ষিত লোকদেরও বলতে শুনেছি – অবনীবাবুর অমুক ছবিটার অমুক স্ত্রীমূর্ত্তি একেবারেই অবাস্তব। জিজ্ঞাসা করুন—"তার মানে কি?" তাঁরা উত্তর দিয়ে বসবেন—"স্ত্রীলোকের হাত অত সরু আর অত লম্বা কোনকালেই হ'তে পারে না, এবং তার গায়ের রংও অমনধারা হওয়া সম্ভব নয়।" নয়-ই তো! কিন্তু সম্ভব নয় কোন্ স্ত্রীলোকের পক্ষে? না, যে-স্ত্রীলোক আমাদের এই প্রত্যক্ষ জগৎটার চারিদিককার রং এবং রেখার গণ্ডীর মধ্যে বাস করছে—তাদের পক্ষে। কিন্তু

অবনীবাবু তো ই স্ত্রীলোক ... বাবিক রং বদলান — বা তার হাত-পায়ের রেখাগুলিকেই শুধু অপূর্ব্ব ক'রে তোলেন ; তার চারিপাশের গাছপালা, ঘরবাড়ী, নদনদী, পথ-ঘাট সবই যে তিনি রেখায় এবং রংএ এমনি অপূর্ব্ব ক'রে তুলেছেন, যার মধ্যে ঐ স্ত্রীলোকটাই হচ্ছে একমাত্র বাস্তব এবং আমাদের প্রতিদিনকার চোখে দেখা স্ত্রীলোকটী একেবারেই অবাস্তব।

চিত্রকলার মূল বিষয়বস্তু হ'চ্ছে রূপ এবং রূপ ফুটিয়ে তোলবার দুটীমাত্র যন্ত্র শিল্পীর হাতে আছে—একটা হ'চ্ছে রেখা আর একটি হ'চ্ছে রং। এই যে প্রত্যক্ষ জগতে আমরা প্রতিদিন নানান্ রূপ দেখছি এগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে, সেগুলি হ'চ্ছে গোটাকতক রেখা এবং রংএর সমাবেশের ফল মাত্র। গাছের রং সবুজ, জলের রং নীল, মাটির রং ধূসর, এ কথা সকলেই জানেন—শিল্পী কিন্তু তার চেয়ে কিছু বেশী জানেন,—তিনি জানেন গাছের রংকে যদি সবুজ না ক'রে বেগুনী করা যায় তা হ'লে সেই অনুপাতে জলের রংও বদলে যেতে পারে এবং তার কাছে যে মানুষটী দাঁড়িয়ে আছে তার রংও সেই হিসাবে নূতন বর্ণসঙ্গতি (Tone) নেবে। এগুলা শিল্পীর কাছে আপেক্ষিক সত্য মাত্র। মানুষের রূপ যদি রেখা এবং রংএর সমষ্টি হয় এবং এই রং ও রেখাগুলির মধ্যে যদি কোন ছন্দ সঙ্গতি থাকে তা হ'লে এই রং এবং রেখাগুলির যে-কোনটাকে আমরা বাড়াতে পারি, কমাতে পারি, গাঢ় করতে পারি, ফিকে করতে পারি বা একটা রংএর পরিবর্ত্তে আর-একটা নূতন রংও জুড়ে দিতে পারি —তাতে ক'রে ছবিটা আদবেই অবাস্তব হ'য়ে উঠবে না —যদি বাস্তব-জগতের প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের রং ও রেখার মধ্যে যে বর্ণ-সঙ্গতি-সম্বন্ধ (Tonic relation) আছে চিত্রটীর রং এবং রেখার মধ্যে তার ওজনটাকে অব্যাহত রাখতে পারি। গাছের পাতা সবুজ যে-জগতে, সে-জগতে জলের রং নীল, কিন্তু গাছের পাতা বেগুনী যে-জগতে জলের রং হবে সেই Tonic relation টা বর্ণ-সঙ্গতি সম্বন্ধটা—যেটা সবুজ এবং নীলের মধ্যে ... বই না। বাস্তব জগতের সঙ্গে ছবির বাইরের রং মিলল না বটে, কিন্তু নীল এবং সবুজের ভিতরকার যে আপেক্ষিক রংএর ওজন তা অব্যাহত রইল। চিত্রকলার মধ্যে যদি বাস্তবতা ব'লে কোন জিনিস থাকে, তবে সে এই ভাবেই আছে। এ কথা শুধু Indian art এর (ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির) বেলাই-ই যে খাটে তা নয়—জগতের প্রত্যেক জাতির চিত্রকলার ভিতরকার কথাই এই।

উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাও ঠিক এমনি ক'রেই বদলায়। তাদের মনের রং এবং জীবনের ঘটনাবলীর রেখাগুলি কথাশিল্পীর হাতে প'ড়ে প্রতিনিয়তই বদলাচ্ছে, প্রত্যক্ষ জগতের নরনারীর মনের রংএর সঙ্গে হয় তো কাঁটায় কাঁটায় মিলছে না, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি না তার চারিপাশে অন্যান্য যে মানসিক রংগুলি ফোটান হয়েছে তাদের সঙ্গে এই চরিত্রটীর যে মানসিক রংএর ওজন তা সাধারণ নরনারীর পরস্পরের মধ্যকার রংএর ওজনকে অব্যাহত রেখে চলেছে। শিল্প-জগতের বাস্তবতা এইখানে। আমরা যে অনর্থক হাঁক-পাক ক'রে মরি, আমাদের সঙ্গে মিলছে না, আমাদের প্রতিদিনকার দেখা নরনারীর সঙ্গে মিলছে না—অতএব ওটা অবাস্তব—সে কেবল শিল্পকলার স্বরূপ জানি না ব'লেই। চিত্রকলার রং এবং রেখার মধ্যে সত্য ব'লে যদি কোন জিনিস থাকে, তো সে হ'চ্ছে এই রং এবং রেখাগুলির পরস্পরের সহিত পরস্পরের আপেক্ষিক ওজন এবং পরিমাণ। এই ওজন এবং পরিমাণ অব্যাহত রেখে আমি যাই করি না কেন, তাকে আর অবাস্তব বলবার উপায় নেই। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মনের রং ও জীবনের ঘটনাবলীর অসংখ্য রেখার মধ্যে সত্য ব'লে যদি কিছু থাকে তো সে তাদের ভিতরকার আপেক্ষিক ওজন এবং পরিমাণ, আর কিছুই নয়। এই ওজন এবং পরিমাণ যতক্ষণ অব্যাহত থাকবে, ততক্ষণ তা সে প্রত্যক্ষ জগতের অসংখ্য নরনারীর চরিত্রের সঙ্গে মিলুক চাই নাই মিলুক।

স্মৃতি-পূজা

শিল্পী—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
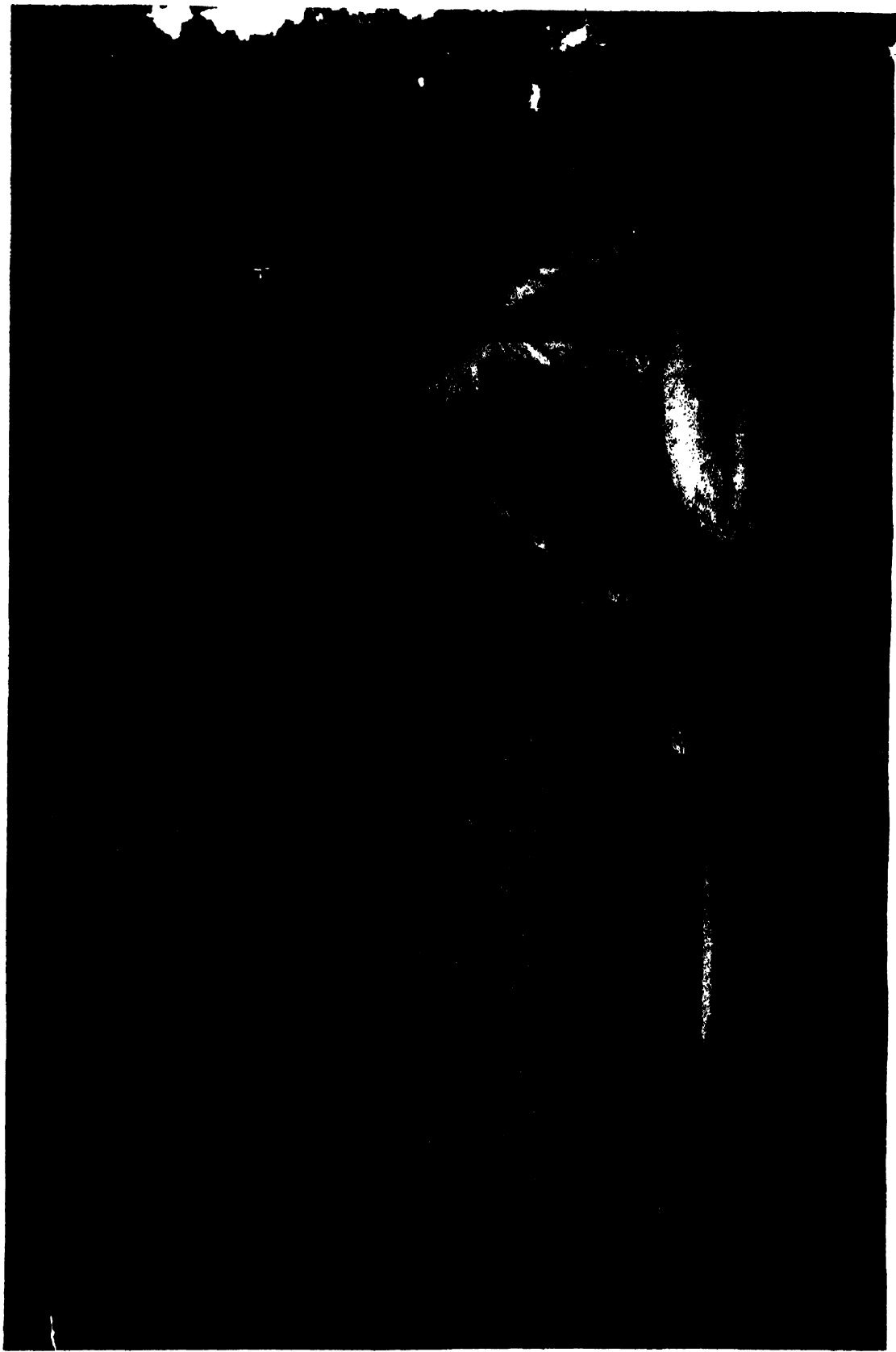
গাধা ধরি ?

[শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, পি-এইচ-ডি]

বোকা বলিতে অনভিজ্ঞ বুঝায়, অর্থাৎ যাহার ব্যবহার-চাতুর্য্য নাই, যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে গেলে পদে পদে ঠকিয়া থাকে, অর্থাৎ যে মূঢ়, যাহার সকল জিনিস বোধগম্য হয় না। বোকা সকল দেশেই ছিল, আমাদের দেশেও ছিল; এখনও অন্যদেশে আছে, আমাদের দেশেও আছে। সভ্যতার পরিবর্ত্তনে বোকার সংখ্যা বাড়ে এবং কমে, কিন্তু এখন কি জানি কেন, বোধ হয় বিলাতী শিক্ষার ফলে মূর্খের সংখ্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, বিশেষ বাঙ্গালাদেশে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালীর দল যতই দিন যাইতেছে ততই আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান মনে করিতেছে এবং গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিতেছে। ফলে, বাঙ্গালায় বোকা ও গাধার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সেইজন্য গাধা কি করিয়া ধরিতে হয়, কত রকম গাধা আছে, ইত্যাদি সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্য দিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হইয়াছে।

সংস্কৃত-সাহিত্যে সকল বিষয়েই একটা শাস্ত্র আছে, সেইরূপ মূর্খেরও একটি শাস্ত্র আছে, তাহার নাম মূর্খশতক। এই পুস্তকখানি ছাপা হইয়াছে। গুজরাতের লোক ব্যবহার-চতুর বলিয়া এই পুস্তকের গুজরাতী তর্জ্জমা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে বাঙ্গালায় কে কি লিখিয়াছে আমার জানা নাই। বইখানির পশ্চিম-ভারতে বেশ সম্মান আছে। কে যে এইরূপ অপরূপ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাঁহার নাম জানা যায় না, কিন্তু বহুকাল হইতে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে, বইখানি চলিয়া আসিতেছে।

বইখানি অত্যন্ত ছোট, মাত্র ২৫টি শ্লোক, কিন্তু ভারি দরকারী। এক-একটি শ্লোকে চারি প্রকারের মূর্খের লক্ষণ দেওয়া আছে; তাহা ছাড়া গোড়ায় একটি আর শেষে একটি শ্লোক উপক্রমণিকা ও উপসংহার হিসাবে দেওয়া আছে। পুস্তকখানি হইতে বুঝা যায়, সেকালেও অনেকরকম মূর্খ ছিল, এবং মোটামুটি মূর্খদের একশত ভাগে ভাগ করা হইত। মূর্খলোক যাহাতে [illegible] করিয়া ব্যবহারচতুর হইতে পারে এবং অ[illegible] সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহারই জন্য [illegible] গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছিল। তাই [illegible] মূর্খের সংখ্যা একালের চেয়ে ঢের কম ছিল [illegible] মূর্খদের ব্যবহারচতুর করিবার জন্য কোন ব্যব[illegible] দেখিতে পাই না। বরং যেরূপ হাওয়া বহিতেছে এবং যেরূপ অদ্ভুত শিক্ষাপ্রচার হইতেছে তাহাতে মূর্খের সংখ্যা যে অতি শীঘ্রই বিস্তৃত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি [illegible]

অনেকে বলেন, সংস্কৃতে [illegible] লাভ করা যায়? এই মূর্খশতক [illegible] যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সে-কথা বেশ [illegible] মূর্খশতকের প্রত্যেক [illegible] উপদেশ নিহিত আছে [illegible] কার্য্যোপযোগী হইতে পারে। [illegible] ছাপাইয়া [illegible] টাঙ্গাইয়া রাখা উচিত এবং প্রত্যেক ছেলেকে মুখস্থ করাইয়া রাখা উচিত। যদি এইরূপ করা যায় তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে [illegible] বোকার সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং তাহা[illegible] উপকার হইবে। কারণ, আপনাকে মূর্খ বলিয়া ধরা [illegible] কেহই চাহে না।

নিম্নে একশত রকম মূর্খের লক্ষণাবলী বিবৃত হইল। পাঠকবর্গ, কে কি রকম মূর্খ সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে তাহাদের চিনিয়া লইবেন এবং তাহাদের সহিত যথোচিত ব্যবহার করিবেন। নিজেদের ভিতর যদি কোনরূপ লক্ষণাবলীর প্রবেশ [illegible] সেগুলি সহজেই বইখানি পড়িয়া ত্যাগ করা যাইতে পারে। এখন প্রত্যেক রকম মূর্খের লক্ষণ এবং তাহার বাঙ্গালা টীকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। সামর্থ্যে বিগতোদ্যোগঃ

যাহার সামর্থ্য বা ক্ষমতা সত্ত্বেও উৎসাহ নাই। পয়সা রোজকার করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও যে-সব লোক আলস্যে কাল কাটায় এবং নির্ধন থাকে ; পাঠাদি করিবার ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও যাহারা পড়াশুনা না করিয়া হেলায় আপনাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে, তাহারা প্রথম প্রকারের মূর্খ। কোন বিষয়ে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আলস্যহেতু বা উদ্যমের অভাবে যদি তাহা নষ্ট হয় তাহা বোকার লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নহে।

২। স্বশ্লাঘী প্রাজ্ঞপর্ষদি

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পণ্ডিতগণের সভায় বসিয়া নিজের শ্লাঘা করিয়া থাকে, এমন ব্যক্তি যত বড়ই শাস্ত্রজ্ঞ হউন না কেন তিনি মূর্খ হইবেনই।

৩। বেশ্যাবচসি বিশ্বাসী

অর্থাৎ বেশ্যার কথায় যিনি বিশ্বাস করেন এবং তাহাদের প্রেমে মুগ্ধ হন এবং সংসার ছারেখারে দেন তিনি মূর্খ। এ বিষয়ে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন।

৪। প্রত্যয়ী দম্ভডম্বরে

অর্থাৎ যিনি দম্ভ ও আড়ম্বর দেখিয়া আসল জিনিসের কথা ভুলিয়া যান। এরূপ মূর্খ যে কত আছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কলিকাতায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য যদি কেহ সোণার ঘড়ি-ঘড়ির-চেন লাগাইয়া বা মোটর চড়িয়া না যান, তিনি যতই সম্ভ্রান্ত হউন না কেন, তাঁহার কোন খাতিরই নাই। আবার চালচুলা নাই এমন লোক কোন আত্মীয়ের বা বন্ধুবান্ধবের মোটর ধার লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইয়া প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। অনেক যৌথকারবারের ম্যানেজিং ডিরেক্টরও ঠিক এই ভাবের আড়ম্বর করিয়া থাকেন এবং তাহা দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া থাকেন। যাহারা চালাক তাহারা ঠকায়, আর যাহারা বোকা তাহারা ঠকে।

৫। দ্যূতাদি চিত্তবদ্ধাশঃ

দ্যূত বা জুয়াতে নিশ্চয় টাকা পাইবার আশায় যিনি বসিয়া থাকেন তিনি একজন মূর্খ। এরূপ মূর্খের অভাব নাই। শনিবার ঘোড়দৌড়ের দিন যিনি ১টা ১৷৷০ টার সময় আফিসের কেরাণীবাবুদের খিদিরপুরের ট্রাম ধরা দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন এইরূপ মূর্খের সংখ্যা কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছে। বহুৎ পয়সা পাইবার আশায় নিজের কষ্টার্জ্জিত বা অপরের নিকট ধার করা অর্থ উড়াইয়া মনস্তাপ পাইতেছেন এইরূপ মূর্খ ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। কৃষ্যাদ্যায়েষু সংশয়ী

অর্থাৎ যিনি কৃষিকর্ম্ম হইতে লাভ হইবে কি না সংশয় করিয়া সে কার্য্য হইতে বিরত থাকেন। কৃষিকার্য্য মন দিয়া করিলে লাভ হইবেই, এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবেই, এবং যতই লোকে কৃষিকর্ম্ম করে ততই দেশের মঙ্গল। যাঁহার এরূপ মঙ্গলজনক কার্য্যে লাভা-লাভ খতানর দরুণ সংশয় হয়, পণ্ডিতরা তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া বিবেচনা করেন।

৭। নির্বুদ্ধিঃ প্রৌঢ়কার্য্যার্থী

অর্থাৎ বুদ্ধিহীন হইয়াও যে বড় বড় কার্য্য করিতে যায় সে একটি মূর্খ। যেমন আজকালকার গ্রাজুয়েটদের ব্যবসা করিয়া পয়সা উড়ান ; পূর্ব্বে কিছু না জানা থাকায় বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হওয়ায়, ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ বড়মানুষ হইতে গেলে ঠকা ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

৮। বিবিক্তরসিকো বণিক্

অর্থাৎ যে ব্যবসাদার হইয়াও অরসিক সে একজন মূর্খ। অরসিক হইলে খরিদ্দার চটিয়া যায়, পরে আর তাহার নিকট যায় না, কাজেই ব্যবসার ক্ষতি হয়। বণিক্ যদি অরসিক হয় তাহার ব্যবসা না করাই উচিত।

৯। ঋণেন স্থাবরক্রেতা

অর্থাৎ ধার করিয়া স্থাবর সম্পত্তি যে ক্রয় করে সে একজন মূর্খ। ধার করিলেই সুদ দিতে হয়। স্থাবর

সম্পত্তিতে লাভ নাই বলিলেই চলে; তাহার আয় হইতে সুদের টাকা দেওয়া যায় না। তাই সেরূপ লোক মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হয়। এরূপ মূর্খের সংখ্যা বড় কম নয় তাঁহাদের অবস্থা সাপের ছুঁচোগেলা গোছ হইয়া দাঁড়ায় এবং বড়ই মনঃকষ্টে তাঁহারা দিন যাপন করিয়া থাকেন।

১০। স্থবিরঃ কন্যকাবরঃ

অর্থাৎ যে বৃদ্ধ, তরুণী বিবাহ করিয়া ঘরে আনে সে একটি মূর্খদিগের সেরা। এরূপ ক্ষেত্রে বৃদ্ধকে বড়ই মনঃকষ্টে দিন কাটাইতে হয়। অধিক এ বিষয়ে বলা বাহুল্যমাত্র।

১১। ব্যাখ্যাতা চাশ্রুতে গ্রন্থে

অর্থাৎ যে অজানা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করে সে একটি মূর্খ, কারণ যাহা নিজেই জানে না তাহা অপরকে বুঝাইবে কি? বুঝাইতে গেলেই হাস্যাস্পদ হয় এবং আপনাকে বোকা বলিয়া ধরা দেয়। যেমন আজকালকার স্কুল-কলেজের ছেলেদের রাজনীতিচর্চ্চা আর রেলের যাত্রীদের আঠার পেন্স রেশিও (Ratio) বুঝান।

১২। প্রত্যহক্ষার্থেহঃ প্যপহ্নবী

অর্থাৎ যিনি কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না তিনি একটি মূর্খ। যেমন অনেক বাপ আছেন, ছেলের দোষ হাজার থাকিলেও তাহাকে সকলের কাছে অতি সুশীল ও সচ্চরিত্র বলিয়া পরিচয় দেন, যেমন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী আপনাদের অজ্ঞান বলিয়া মনে মনে জানিয়াও বাহিরে মহাপণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনাদের মূর্খশ্রেণীভুক্ত করেন।

১৩। চপলাপতিরীর্ষ্যালুঃ

অর্থাৎ কুলটা বিবাহ করিয়াও যিনি স্ত্রীর প্রতি দ্বেষ করেন তিনি একটি মহামূর্খ। কুলটা বিবাহ করিলে সেরূপ স্ত্রীলোক যে অন্যে আসক্ত হইবে ইহা স্বভাব-সিদ্ধ। স্বামী যদি তাহাতে দ্বেষভাব হৃদয়ে পোষণ করেন তাহা হইলে জনসমাজে তিনি একটি অজ্ঞ-মূর্খ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন।

১৪। শক্তশক্রবশঙ্কিতঃ

অর্থাৎ প্রবল শত্রু থাকা সত্ত্বেও যিনি নিঃশঙ্কচিত্তে কাল যাপন করিয়া থাকেন তিনি একজন মূর্খ। কারণ এ অবস্থায় সতর্ক না থাকিলে শত্রু প্রবল বলিয়া সহজেই তাঁহাকে বিপদে ফেলিতে পারে।

১৫। দত্ত্বা ধনান্যনুশয়ী

অর্থাৎ টাকা দান করিয়া যিনি পরে অনুশোচনা করিয়া থাকেন তিনি একটি মূর্খ। টাকা দান করিবার ইচ্ছা ও সাহায্য থাকিলে তাহা দান করা উচিত এবং সেজন্য অনুশোচনা করা কর্ত্তব্য নহে। আর যেহেতু অনুশোচনা করিলেও সে টাকা ফেরে না, কাজেই যিনি এরূপ করেন তিনি মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হন।

১৬। কবিনা হঠপাঠকঃ

অর্থাৎ যিনি নিজে অপণ্ডিত হইয়াও পণ্ডিতের সহিত হঠকার করিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ করিলে অতি শীঘ্র মূর্খত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে বলিয়া যিনি এরূপ করেন তিনি মূর্খ হন।

১৭। অপ্রস্তাবে পটুবক্তা

অর্থাৎ কোন প্রসঙ্গ বা কারণ ব্যতিরেকে যিনি বক্ বক্ করিয়া প্রচুর বকিতে থাকেন, তিনি একটি উজবুক। ছোটরা যদি এরূপ করে তাহাদের "জ্যাঠা" বলা হয় আর বড়রা যদি এরূপ করে তাহাদের বক্তার (Garrulous old man) বলা যায়। উভয়ই বোকার লক্ষণ।

১৮। প্রস্তাবে মৌনকারক

অর্থাৎ যখন প্রসঙ্গ বা কারণ উপস্থিত হয় তখন কথা-বার্ত্তা না কহিয়া যিনি মৌনাবলম্বী হন, তিনি মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হন।

১৯। লাভকালে কলহকৃৎ

অর্থাৎ লাভের সময় উপস্থিত হইলে যিনি লাভদাতার সহিত কলহ করিয়া লাভের পথ বন্ধ করেন তিনি একটি মূর্খ।

২০। মন্যুমান্ ভোজনক্ষণে

অর্থাৎ ভোজন করিবার সময় যিনি রাগিয়া আগুন হইয়া যান তিনি একটি হস্তিমূর্খ। ভোজন করিবার সময় ঠাণ্ডা মেজাজে এবং পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন না করিলে তাহা সহজে হজম হয় না। যিনি সামান্য কারণে রন্ধনকৃত দ্রব্যাদি ভাল নয় বলিয়া বা অন্য কোন প্রকারে রাগিয়া যান, তাঁহার ভুক্তদ্রব্য হজম হয় না বলিয়া এরূপ লোক মূর্খের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকেন। এরূপ শ্রেণীর মূর্খ বাঙ্গালাদেশে বহুৎ।

২১। কীর্ণার্থঃ স্বল্পলাভেন

অর্থাৎ সামান্য লাভের জন্য যিনি অজস্র অর্থব্যয় করিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলা হইয়া থাকে। অনেকসময় দেখা যায়, কেহ মানরক্ষা করিতে গিয়া অজস্র পয়সা খরচ করিয়া ফেলিলেন। বিবাহাদিতে জাঁকজমক দেখাইতে গিয়া জলের মত অর্থব্যয় করিয়া ফেলিলেন। আপনাকে বড়লোক বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য পয়সা না থাকিতেও একটা মস্ত টাকা চাঁদা দিয়া ফেলিলেন। সামান্য চাকুরীতে সম্মান রাখিবার জন্য মোটর কিনিয়া ফেলিলেন। এইরূপ কার্য্য মূর্খ না হইলে কেহ করে না।

২২। লোকোক্তৌ ক্লিষ্টসংবৃতঃ

অর্থাৎ লোকের উক্তিতে যিনি ব্যথিত হইয়া থাকেন তিনি একজন মূর্খ। লোকের কথার কিছু ঠিক নাই, আজ যাহার প্রশংসা করিতেছে, কালই তাহার নিন্দা করিতেছে। যিনি লোকনিন্দা শ্রবণে ব্যথিত হইয়া কোন ভালকার্য্য করিতে বিরত হন তিনি মূর্খ হইয়া যান।

২৩। পুত্রাধীনে ধনে দীনঃ

অর্থাৎ পুত্রের হাতে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া যিনি শেষে কষ্ট পাইয়া থাকেন, তিনি মূর্খ বলিয়া গণ্য হন। অর্থসম্পত্তি বড় খারাপ জিনিস; পিতা তাহা পুত্রের হাতে সমর্পণ করিলে পুত্র যে কর্ত্তব্যপরবশ হইয়া তাহা দ্বারা পিতার সেবাশুশ্রূষা করিবে, তাহার কোন মানে নাই। অতএব বৃদ্ধ হইলে পিতার উচিত নহে পুত্রের হস্তে সমস্ত সম্পত্তি ন্যস্ত করা; যদিই বা নিতান্ত অসুবিধায় পড়িয়া তাহা করিতে হয়, তাহা হইলেও একেবারে নিঃসম্বল হইতে নাই। সমস্ত সম্পত্তি পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিলে পুত্র শীঘ্রই বাপের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। অতএব সেরূপ পিতা মূর্খ ছাড়া আর কি?

২৪। পত্ন্যামর্থার্থযাচকঃ

অর্থাৎ পত্নীর নিকট একবার কোন জিনিস বা অর্থ দিয়া আবার তাহার নিকট হইতে যে চাহে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়। পত্নীকে ভবিষ্যৎ বিপদ্-আপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বামী তাহার হস্তে অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন। তাহা যদি চাহিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে পুনরায় তাহার সম্বল কমিয়া যায়। অথবা স্ত্রীলোক একবার অর্থ পাইলে তাহা গোপন করিয়া ফেলে বলিয়া, চাহিলেও পাওয়া যায় না, সেইজন্য যে চাহে সে বোকা হয়।

২৫। ভার্য্যাখেদাৎ কৃতোদ্বাহো

অর্থাৎ এক ভার্য্যায় বিরক্ত হইয়া দ্বিতীয়বার সুখের আশায় দারপরিগ্রহ যিনি করিয়া থাকেন, তিনি মূর্খ-শ্রেণীভুক্ত হন। দাম্পত্য-জীবন সংসারিক কর্ত্তব্য-পালনের জন্য, সুখের জন্য নহে। সেইজন্য যিনি মনে করেন প্রথম স্ত্রী হইতে কোন সুখই পাওয়া গেল না, কেবল কষ্ট এবং সুখের আশায় আবার বিবাহ করেন, তাঁহার স্কন্ধে একটির স্থলে দুইটি আরোহণ করে এবং তাঁহার সকল সুখের আশা মুহূর্ত্তের ভিতর বিলীন হয়। নিতান্ত হস্তীমূর্খ না হইলে এরূপ কার্য্য কেহ করে না।

২৬। পুত্রকোপাৎ তদন্তকঃ

অর্থাৎ যিনি পুত্রের উপর রাগ করিয়া তাহার প্রাণনাশ করিয়া থাকেন, তিনি মূর্খ বলিয়া গণ্য হন। পুত্র অন্যায় করিলে দণ্ডবিধান করা প্রয়োজন; কিন্তু তাহার প্রাণনাশ করিয়া বংশলোপ করা কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। এরূপ লোক একশ'বার মূর্খ।

২৭। কামুকস্পর্দ্ধয়া দাতা

অর্থাৎ যে-ব্যক্তি কামীলোকের সহিত রেষারেষি করিয়া বেশ্যা-আদিকে ধনপ্রদান করিয়া থাকে সে মূর্খ শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে।

২৮। গর্ব্ববান্ মার্গণোক্তিভিঃ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কৃপাকাঙ্ক্ষীর চাটুবাক্যে আপনাকে গর্ব্বিত বোধ করিয়া থাকে তাহাকে মূর্খ বলা হইয়া থাকে। কার্য্যসিদ্ধির জন্য যাচক নানারূপ তোষামোদ করিবেই, তাহার কোন অর্থই নাই, কিন্তু তাহাতে যাহার লেজ মোটা হইয়া যায়, সে মূর্খ ছাড়া আর কি?

২৯। নি হিতশ্রোতা

অর্থাৎ আপনাকে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করিয়া দর্পে যিনি হিতবাক্য শ্রবণ না করিয়া বিপদে পড়েন, তিনি মূর্খপদবাচ্য হইয়া থাকেন। অনেকে আছেন নিজেকে অতিরিক্ত বুদ্ধিমান মনে করিয়া অপরের বাক্যে অবহেলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হঠকারিতার জন্য এরূপ লোক সংসারে পদে পদে বিপদে পড়িয়া থাকেন; এবং বিপদে পড়াই তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া এই শ্রেণীর লোকদের মূর্খ বলা হইয়াছে।

৩০। কুলোৎসেকাদসেবকঃ

অর্থাৎ কুলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া প্রয়োজন হইলেও যিনি চাকুরি করিতে ঘৃণা বোধ করেন এবং দৈন্যে দিন-যাপন করেন, তিনি মূর্খপদবাচ্য হইয়া থাকেন। গত-বৈভব জমিদারদিগের ছেলেদের মধ্যেই এই শ্রেণীর মূর্খ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট চাকুরি করিতে তাঁহারা অপমানজনক মনে করেন, এদিকে অর্থাভাব। তাঁহারা যে কিরূপ মনঃকষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। এরূপ লোকই এই শ্রেণীর মূর্খের সংখ্যা বাড়াইয়া থাকেন।

৩১। দত্ত্বার্থান দুর্লভান কামী

অর্থাৎ যে কামীপুরুষ দুর্লভ সামগ্রী দিয়া আপনার কামচরিতার্থ করে সে একটি গোমূর্খ। অনেক বেশ্যাসক্ত বড়লোকের ছেলেদের এইরূপ বংশপরম্পরায় রক্ষিত মূল্যবান রত্নপ্রস্তরাদি সামান্য বেশ্যা-আদিকে দিতে শুনা যায়। তাহারাই এই শ্রেণীর মূর্খের দলবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

৩২। দত্ত্বা শুল্কমমার্গগঃ

অর্থাৎ যে ব্যবসায়ী মালের উপর সরকারী শুল্ক দিয়াও গুপ্তমার্গ দিয়া মাল লইয়া গিয়া অনর্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে তাহাকে মূর্খ বলিয়া গণ্য করা হয়।

৩৩। লুব্ধে ভূভুজি লাভার্থী

অর্থাৎ যে রাজাকে অত্যন্ত লোভী জানিয়াও তাহার নিকট হইতে কোনরূপ লাভের আশা করিয়া থাকে, সে একটি মহামূর্খ। কারণ লোভী রাজা সকলকে শোষণ করিতে ব্যস্ত, সে কখনও নিজের লাভের অংশ কাহাকেও ছাড়িয়া দিতে পারে? এরূপ স্থলে আশা পরিপূর্ণ কখনই হইতে পারে না বলিয়া যিনি বা যাঁহারা আশা করেন, তিনি, বা তাঁহারা সকলেই মূর্খ-পদবাচ্য হইয়া থাকেন। এখনকার মত সভ্যদিনেও এইরূপ মূর্খের সংখ্যা ভারতে বড় বিরল নহে।

৩৪। ন্যায়ার্থী দুষ্টশাস্তরি

অর্থাৎ যেখানে শাসক দুষ্ট ও অত্যাচারী তাঁহার নিকট হইতে যে ন্যায়বিচার আশা করিয়া থাকে সে

একটি আস্ত মূর্খ। রাজা ন্যায়পরায়ণ হইলে তবেই তাঁহার নিকট ন্যায়ের আশা করা যায়, রাজা যদি দুষ্ট ও অত্যাচারী হয় তাহার নিকট ন্যায়-বিচারের আশা করা বৃথা। তাহা সত্ত্বেও যাঁহারা ঐরূপ দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন তাঁহারা বোকার সরদার।

৩৫। কায়স্থে স্নেহবদ্ধাশঃ

এস্থলে কায়স্থ বলিতে রাজকর্মচারী বুঝায়, বিশেষতঃ যাহারা খাজনা আদায় করিয়া থাকে। ইহারা প্রজাদের উপর অতিরিক্ত উৎপীড়ন করিত এবং বিশেষ অত্যাচারী ছিল। অতএব যিনি কায়স্থের স্নেহের উপর নির্ভর করিয়া কোন আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন, তিনি মূর্খ বলিয়া গণ্য হন। কারণ কায়স্থদের দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা বলিয়া কোন জিনিস জানা নাই। তাহারা জানে, অত্যাচার করিয়া সরকারের এবং নিজের পাওনা টাকা আদায় করিতে। এইরূপ নির্ম্মম, নিষ্ঠুর লোকের উপর যে-ব্যক্তি কোন লাভের আশা রাখে সে খুব বোকা।

৩৬। ক্রূরে মন্ত্রিণি নির্ভয়ঃ

অর্থাৎ রাজ্যের মন্ত্রী ক্রূর প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও যে লোক নির্ভয়ে বিচরণ করে সে মূর্খ; কারণ মন্ত্রীর হাতে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, তিনি ক্রূর হইলে যখন-তখনই যাহার তাহার উপর সামান্য কারণে অসীম অত্যাচার করিতে পারেন। অতএব সকলেরই সে-সময় সতর্কভাবে অবস্থান করা প্রয়োজনীয়। যাহারা অসতর্ক থাকিয়া এইরূপ মন্ত্রীর কোপে পড়ে তাহারা মূর্খের অগ্রগণ্য।

৩৭। কৃতঘ্নে প্রতিকার্য্যার্থী

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কৃতঘ্নের জন্য উপকার করিতে ব্যগ্র হয়, সে একটা আসল হাঁদা। উপকার পাইয়া যে প্রত্যক্ষ নিমকহারামী করে তাহাকেই কৃতঘ্ন বলে। যে একবার এইরূপ পরিচয় দিয়াছে, তাহার প্রতি আর সহানুভূতি থাকা উচিত নহে, এমন কি সম্পর্ক রাখাও উচিত নহে। সম্বন্ধ রাখিলে ভবিষ্যতে বিপদাপন্ন হইতে হয়। পুনরায় যদি নিমকহারামের জন্য উপকার করিতে কেহ চেষ্টা করে, সে একটা নির্জ্জলা হাঁদা বলিয়া গণ্য হয়।

৩৮। নীরসে গুণবিক্রয়ী

অর্থাৎ যে-ব্যক্তি রসগ্রহণ করিতে জানে না, তাহার নিকট নিজের গুণের পরিচয় দেওয়া মূর্খের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গুণের মর্য্যাদা জানে, তাহারই নিকট স্বগুণের পরিচয় দিলে ফলদায়ক হইয়া থাকে, অন্যথায় নিষ্ফল হয়।

৩৯। স্বাস্থ্যে বৈদ্যক্রিয়াম্বেষী

অর্থাৎ যে সুস্থ অবস্থায়ও নানারূপ ঔষধাদি সেবন করিয়া শরীরস্থ যন্ত্রাদির বিকার ঘটাইয়া থাকে, তাহাকে মূর্খ বলা হয়। দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর মূর্খ শিক্ষিত-সমাজের ভিতর প্রচুর বাড়িয়া যাইতেছে। বাড়িয়া যাইবার প্রধান কারণ অতি সুন্দর সুন্দর বিলাতী ঔষধের বিজ্ঞাপন ও ডাক্তারদের অবহেলা। অনেক ডাক্তারও এই শ্রেণীভুক্ত! সদাসর্ব্বদা এণিমা লওয়া, জোলাপ খাওয়া, টনিক সেবন করা প্রায় ডাক্তারদের লাগিয়াই আছে। তাঁহাদের ছোঁয়াচ লাগিয়া এই ব্যাধি সংক্রামকরূপে দেশ ব্যাপিয়া গিয়াছে। ঔষধের একটা ক্রিয়া আছে, রোগের সময় সেই ক্রিয়া দ্বারাই রোগ আরোগ্য হয়, অন্য সময় তীব্রবীর্য্য ঔষধাদি সেবন করিলে তাহার বিষাক্ত ক্রিয়া শরীরে অল্পদিনেই হউক বেশী দিনেই হউক প্রকাশ পাইবেই। কাজেই যাঁহারা এইরূপ বিষাক্ত দ্রব্যাদি খাইয়া হেলায় স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকেন তাঁহারা নিতান্ত আহাম্মক ছাড়া আর কি?

৪০। রোগী পথ্যপরাঙ্মুখঃ

অর্থাৎ যে রোগী রোগের ভোগকালে পথ্য যদি না করিয়া নিজের ইচ্ছামত খাওয়া-দাওয়া করিয়া বিপদ আনয়ন করে সে মূর্খশ্রেণীভুক্ত হয়। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ সকল ঘরেই এই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

৪১। লোভেন স্বজনত্যাগী

অর্থাৎ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যে আপনার আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করে সে মূর্খ; কারণ সংসারে আত্মীয়-স্বজনের প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, বিপদাদিতে সাহায্য করিতে আত্মীয় ছাড়া কেহই আসে না, আর এই বিপদসঙ্কুল সংসারে বিপদ লাগিয়াই আছে। এ সকল জানিয়াও লোভবশবর্ত্তী হইয়া যে আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করে তাহার মত গণ্ডমূর্খ আর দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না।

৪২। বাচা মিত্রবিরাগকৃৎ

অর্থাৎ পরুষবাক্য প্রয়োগে যিনি বন্ধুর সহিত মনোমালিন্য করিয়া থাকেন, তাঁহাকে মূর্খ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। বন্ধু যদি সত্যসত্যই অকৃত্রিম হন, তিনি জীবনের সম্পদরূপে পরিগণিত হন। সেরূপ বন্ধু যদি কোন অন্যায়ও করে তাহাও সহিতে হয়। তাহা না করিয়া যদি তাহার সহিত পরুষবাক্য প্রয়োগে মনোমালিন্য করা হয়, তাহা হইলে অতি মূর্খের ন্যায় কার্য্য করা হয়।

৪৩। লাভকালে কৃতালস্যঃ

অর্থাৎ লাভের সময় আগত দেখিয়াও যিনি আলস্য-বশতঃ লাভ নষ্ট করিয়া থাকেন, তাঁহাকে মূর্খ বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ একটু চেষ্টা করিলেই যেখানে বেশ একটা লাভ হইতে পারে, সেই সময়ে যদি কেহ চেষ্টা করিতে বিরত হয়, তাহাকে মূর্খ নামে অভিহিত করা হয়।

৪৪। মহর্দ্ধিঃ কলহপ্রিয়ঃ

অর্থাৎ অশেষ ধনশালী হইয়াও যিনি সামান্য অর্থ লইয়া হৈঁচড়াহৈঁচড়ি করিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলা হইয়া থাকে। যেমন রাজা হইয়া যদি তিনি চাকরের মাহিনা লইয়া নানারূপ দর-কষাকষি করেন, সেটা ভাল দেখায় না এবং তাহাতে নিন্দা হয় বলিয়া এরূপ লোককেও মূর্খ বলা হইয়া থাকে।

৪৫। রাজ্যার্থী গণকস্যোক্তেঃ

অর্থাৎ; গণক 'রাজযোগ আছে' বলিয়াছে বলিয়া যিনি তাহার কথায় নির্ভর করিয়া রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় বসিয়া থাকেন তিনি গণ্ডমূর্খ বলিয়া পরিগণিত হন। এইরূপ ধনদৌলত, বাড়ীঘর, দাসদাসী ইত্যাদির ভরসা সকল গণকেই দিয়া থাকে, তাহার কোন মূল্য নাই, সকলেরই জানা উচিত। গণকের কথার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া যে ব্যক্তি আলস্যে কালযাপন করে এবং মনে মনে নিতান্ত দুরাশাসকল পোষণ করে তাহারা মূর্খের রাজা।

৪৬। মূর্খমন্ত্রে কৃতাদরঃ

অর্থাৎ যিনি মূর্খের বা অনভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিয়া বিপদে পড়েন তাঁহাকে মূর্খ-শ্রেণীভুক্ত করিতে হয়। অনভিজ্ঞলোকের পরামর্শ লওয়াই উচিত নহে। যদিই বা লওয়া হয় তাহা কার্য্যে পরিণত করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কার্য্য এবং তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা। কাজেই, যাঁহারা মূর্খের পরামর্শে নিতান্ত আদর প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহারা সহজেই মূর্খপদবাচ্য হইয়া থাকেন।

৪৭। শূরো দুর্ব্বলবাধয়ে

অর্থাৎ যিনি দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া আপনাকে বীর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাকে মূর্খ-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে। দুর্ব্বলের উপর অত্যাচর করিলে লোক হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে, কাজেই যাঁহার বীরত্ব প্রবলের উপর প্রযুক্ত না হইয়া দুর্ব্বলের উপরই প্রযুক্ত হয় তিনি লোকসমাজে মূর্খ বলিয়া পরিচিত হন। এরূপ মূর্খ একটু বুদ্ধি খরচ করিলে সকল বিভাগেই প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

৪৮। দৃষ্টদোষাঙ্গনারতঃ

অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের চরিত্রদোষ একবার দেখা গিয়াছে তাহার সহিত যিনি তাহা সত্ত্বে আসক্ত

থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া অভিহিত করা হয়। যদি দেখা যায় কোন স্ত্রীলোকের চরিত্র নষ্ট হইয়াছে তখন বুঝিতে হয়—স্বামীর প্রতি তাহার আসক্তি নাই—সেরূপ স্ত্রীলোকের সহিত বাস করা সর্ব্বথা বিপজ্জনক।

৪৯। ক্ষণরাগী গুণাভ্যাসে

অর্থাৎ ভাল কার্য্যে বা গুণের অভ্যাসে যাহার আসক্তি অল্পকালের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়, তিনি একটি মূর্খ। গুণের অভ্যাস করিতে হইলে, আপনাকে উন্নত করিতে হইলে তাহা অল্পকালের জন্য করা উচিত নহে, সারাজীবনই গুণের অভ্যাস করা উচিত।

৫০। সঞ্চয়েঽন্যৈঃ কৃতব্যয়ঃ

অর্থাৎ বাপদাদার সঞ্চিত অর্থসম্পত্তি যিনি উড়াইয়া দেন তাঁহাকে মূর্খ বলা হইয়া থাকে। ছেলে দুরকম হয় একজন কেনারাম আর একজন বেচারাম। এই বেচারাম শ্রেণীর ছেলেই এই দফার বিষয়ীভূত। বাঙ্গালাদেশে এই শ্রেণীর মূর্খ ঘরে ঘরে পাওয়া যায়। অতএব এবিষয়ে বেশী বলা বাহুল্য।

৫১। নৃপানুকারী মানেন

অর্থাৎ সকলে সম্মান করে বলিয়া গর্ব্বে রাজার বেশভূষাদি যাঁহারা অনুকরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা মূর্খ। কারণ রাজার চালচলন, বেশভূষা ইত্যাদি যদি কেহ অনুকরণ করে, রাজা জানিতে পারিলে তাঁহার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া যান, ফলে রাজার কোপে পড়িয়া সেইরূপ লোকবিশেষ বিপদগ্রস্ত হয়, এবং কাজেই যিনি এইরূপ অনুকরণ করেন তিনি সমাজে মূর্খ বলিয়া পরিচিত হন।

৫২। জনে রাজাদিনিন্দকঃ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে রাজা, রাজমন্ত্রী ইত্যাদির নিন্দা করে সে মূর্খ। পূর্ব্বেরই ন্যায় রাজা বা রাজমন্ত্রীর যদি কেহ কুৎসা করে তাহাদের কর্ণগোচর শীঘ্রই হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের হস্তে প্রভূত ক্ষমতা থাকায় কুৎসাকারীকে বিপদাপন্ন হইতে হয়। এইরূপে বিনা-কারণে যে বিপদ ডাকিয়া আনে পণ্ডিতেরা তাহাকে মূর্খ বলিয়া থাকেন।

৫৩। দুঃখে দর্শিতদৈন্যার্ত্তিঃ

অর্থাৎ দুঃখে বা দারিদ্র্যে পড়িয়া যে দারিদ্র্যদুঃখ সকলের নিকট ব্যক্ত করে, তাহাকে মূর্খ বলা হয়। আপনার দারিদ্র্যজাত দুঃখকষ্ট প্রকাশ করিলে কোন লাভ নাই, কেবল লোকে ছোট মনে করে, হেয়-জ্ঞান করে এবং বাজারে যাহা একটু সুনাম আছে তাহা নষ্ট হয়, এবং তাহাতে বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। অকৃত্রিম আত্মীয়-বান্ধব ছাড়া দারিদ্র্যে কেহ সাহায্য করিবে না, কাজেই সেইরূপ কষ্ট ব্যক্ত করিলে লাভ তো হইবেই না, উল্টাইয়া লোকসান। কাজেই যিনি এইরূপ করেন তাঁহাকে বোকা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

৫৪। সুখে বিস্মৃতদুর্গতিঃ

অর্থাৎ সুখের সময় আগত হইলে যিনি পূর্ব্বের কষ্টের কথা বিস্মৃত হন তিনি একজন মূর্খ; কারণ, পূর্ব্বদুর্গতির কথা ভুলিয়া গেলে মানুষের সতর্কতা থাকে না এবং অসতর্ক হইলে পুনরায় দুর্গতি আসিয়া পড়ে, কাজেই তাহা সদাসর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

৫৫ বহুব্যয়োঽল্পরক্ষার্থম্

অর্থাৎ সামান্য জিনিস রক্ষা করিতে গিয়া প্রচুর ব্যয় করিয়া ফেলা একটি মূর্খের লক্ষণ।

৫৬। পরীক্ষায়ৈ বিষাশনঃ

অর্থাৎ বিষ খাইলে শরীরে কি হয় পরীক্ষা করিবার জন্য যে ব্যক্তি কৌতুহলপরবশ হইয়া বিষ ভক্ষণ করে এবং করিয়া বিপদাপন্ন হয় তাহাকে পণ্ডিতেরা মূর্খনামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

৫৭। দগ্ধার্থো ধাতুবাদেন

অর্থাৎ নিকৃষ্ট ধাতু হইতে সোনা বাহির করিবার চেষ্টায় যিনি আপন অর্থাদি ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন তাঁহাকে পণ্ডিতেরা মূর্খ-শ্রেণীভুক্ত করেন।

৫৮। রসায়নৈ রসক্ষয়ী

অর্থাৎ রসায়নাদি তীব্রবীর্য্য কবিরাজী ঔষধাদি সেবন করিয়া যিনি শরীরস্থ রসাদির ধ্বংস সাধন করিয়া থাকেন তাঁহাকে পণ্ডিতেরা মূর্খ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

৫৯। আত্মসম্ভাবনাস্তব্ধঃ

অর্থাৎ নিজেকে একজন মস্ত বড়লোক বা পণ্ডিত মনে করিয়া যিনি সর্ব্বদাই ফুলিয়া থাকেন, তাঁহাকে লোকে মূর্খ বলিয়া থাকে।

৬০। ক্রোধাদাত্মবধোদ্যতঃ

অর্থাৎ ক্রোধবশতঃ যিনি আত্মঘাতী হইতে যান, তিনি মূর্খ বলিয়া পরিচিত হন।

৬১। নিত্যং নিষ্ফলসঞ্চারী

অর্থাৎ যিনি নিত্যই কোন কার্য্য না থাকা সত্ত্বেও কেবলই ভবঘুরের ন্যায় টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহাকে মূর্খ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

৬২। যুদ্ধপ্রেক্ষী শরাহতঃ

অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে গিয়া শরের আঘাত খাইয়াও যিনি যুদ্ধ দেখিতে থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলা হয়।

৬৩। শয়ী শক্তবিরোধেন

অর্থাৎ প্রবল শত্রুর সহিত বিরোধ করিয়াও যিনি নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইয়া থাকেন তাঁহাকে পণ্ডিতেরা মূর্খ বলিয়া অভিহিত করেন। এরূপ অবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকা কোন প্রকারে যুক্তিসঙ্গত নহে, সর্ব্বদাই প্রতিকারের চেষ্টায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

৬৪। স্বল্পার্থঃস্ফীতডম্বরঃ

অর্থাৎ অতি অল্প আয় থাকা সত্ত্বেও যিনি অত্যন্ত আড়ম্বর ও চাকচিক্য বাহিরে দেখাইয়া থাকেন তাঁহাকে লোকে মূর্খ বলিয়া থাকে। আজকাল এই শ্রেণীর বহুত মেকী সাচ্চা বলিয়া চলিতেছে। তাঁহাদের ধরিয়া ফেলা দরকার।

৬৫। পণ্ডিতোঽস্মীতি বাচালঃ

আপনাকে পণ্ডিত মনে করিয়া যিনি সদা সর্ব্বদা বাচালতা করিয়া থাকেন, তিনি পণ্ডিত হইলেও মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হন।

৬৬। সুভটোঽস্মীতি নির্ভয়ঃ

অর্থাৎ যিনি আপনাকে ভাল যোদ্ধা মনে করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খ-শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

৬৭। প্রফুল্লিতোঽতিস্তুতিভিঃ

অর্থাৎ যিনি চাটুকারের তোষামোদবাক্যে অত্যন্ত হর্ষপ্রাপ্ত হন তাঁহাকে বোকা বলা হয়।

৬৮। মর্ম্মভেদী স্মিতোক্তিভিঃ

অর্থাৎ কেহ উপহাস করিয়া কথা বলিলে তাহার মর্ম্মভেদী উত্তর যে দেয় তাহাকে অজমূর্খ বলিতে পারা যায়। আজকাল কাহারও সহিত ঠাট্টা করাও মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে। খুব কম লোকে ঠাট্টা বুঝেন, অনেকেই না বুঝিয়া রোষান্বিত হইয়া থাকেন। তাই আজকাল এই শ্রেণীর মূর্খ খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

৬৯। দরিদ্রহস্তন্যস্তার্থঃ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অত্যন্ত দরিদ্রের হস্তে অর্থসম্পত্তি গচ্ছিত রাখে তাহাকে লোকে মূর্খ বলিয়া চিনিতে পারে।

৭০। সন্দিগ্ধেঽর্থে কৃতব্যয়ঃ

অর্থাৎ যাহার কৃতকার্য্যতা বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে এরূপ বিষয়ে অর্থ ব্যয় করা মূর্খের লক্ষণ।

অনেক সেয়ারহোল্ডাররা এই জাতীয় মূর্খতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

৭১। স্বব্যয়ে লেখ্যকালস্যো

অর্থাৎ যিনি আপনার জমাখরচাদি লিখিতে আলস্য করিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খনামে অভিহিত করা যায়। কারণ শুধু লিখিলেই চাকর-বাকর সায়েস্তা থাকে, চুরিচামারি কম করে, এবং বাজে খরচ করিবার প্রবৃত্তি কমিয়া যায়; কাজেই এইরূপ অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ে যিনি আলস্য বোধ করেন তিনি একটী আহাম্মুক।

৭২। দৈববশাৎ ত্যক্তপৌরুষঃ

অর্থাৎ দৈবের উপর নির্ভর করিয়া যিনি পুরুষকারকে বিদায় দেন তিনি একজন মূর্খ। 'যখন হবে তখন হবে কিংবা ভগবান যখন দিবেন তখন পাইব' এই আশা লইয়া দরজায় খিল লাগাইয়া বসিয়া থাকিলে কিছুই হয় না তাই এ শ্রেণীর লোক মূর্খ বলিয়া পরিচিত।

৭৩। গোষ্ঠীরতির্দরিদ্রশ্চ

অর্থাৎ যে দরিদ্র হইয়াও বড় বড় লোকের সহিত, বড় বড় সমাজে মেলামেশা করে তাহাকে পণ্ডিতেরা মূর্খ বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ এই জাতীয় রোগকে গরীবের ঘোড়ারোগ কহিয়া থাকেন।

৭৪। দৈন্যে বিস্মৃতভোজনঃ

অর্থাৎ শোক বা তাপ পাইয়া যিনি আহারের কথা বিস্মৃত হন তাঁহাকেও মূর্খ বলিতে পারা যায়।

৭৫। গুণহীনঃ কুলশ্লাঘী

অর্থাৎ নির্গুণ হইয়াও যে-ব্যক্তি আপনার কুলের শ্লাঘা করিয়া থাকে সে একটি নিরেট মূর্খ। কারণ লোকে মনে করিবে যে সমস্ত বংশই বুঝি এইরূপ অকালকুষ্মাণ্ডে ভরা।

৭৬। গীতগায়ী খরস্বরঃ

অর্থাৎ গাধার মত গলা লইয়া যিনি অনবরত গর্দ্দভ-রাগিণী ভাঁজিতে থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

৭৭। ভার্য্যাভয়ান্নিষিদ্ধার্থী

অর্থাৎ স্ত্রীর ভয়ে যে টাকাকড়ি গোপনে রাখিয়া দেয়, বা টাকাকড়ির কথা গোপন রাখে তাহাকে মূর্খ বলা হইয়া থাকে।

৭৮। কার্পণ্যেনাপ্তদুর্যশঃ

অর্থাৎ অতিরিক্ত কার্পণ্যবশতঃ যিনি চতুর্দ্দিকে দুর্ণাম কিনিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলা হয়। সংসারে বাস করিতে গেলে অতিরিক্ত কার্পণ্য দেখান অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। কাজেই যাহার কৃপণ বলিয়া খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে তাহাকে মূর্খ বলাই উচিত।

৭৯। ব্যক্তদোষজনশ্লাঘী

অর্থাৎ যে ব্যক্তির দোষ জনসমূহে ব্যক্ত হইয়াছে, এইরূপ লোকের সুখ্যাতি যিনি করিয়া থাকেন তিনি একটি আস্ত বোকা বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত হইয়া থাকেন।

৮০। সভামধ্যার্দ্ধনির্গতঃ

অর্থাৎ সভাতে বসিয়া সভাশেষ হইবার পূর্ব্বে যিনি সকলের সমক্ষে বহির্গত হইয়া যান তাঁহাকে অসভ্য বলিয়া লোকে মূর্খ-শ্রেণীভুক্ত করিয়া থাকে।

৮১। দূতো বিস্মৃতসন্দেশঃ

অর্থাৎ যে দূত নির্দ্দিষ্টস্থানে আসিয়া কি খবর দিতে আসিয়াছে তাহা ভুলিয়া যায় তাহাকে মূর্খ বলা হয়।

৮২। কাসবাংশ্চৌরিকারতঃ

অর্থাৎ কাসীর ব্যারাম থাকা সত্ত্বেও যে রাত্রে ঘরে সিঁদ দিয়া চুরি করিতে যায়, সে একটি খাজামূর্খ, কারণ তাহাকে ব্যারামের জন্ম কাসিতে হইবে এবং কাসিলেই গৃহস্থ জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।

৮৩। ভূরিভোজ্যব্যয়ঃ কীর্ত্তেঃ

অর্থাৎ যিনি শুধু নাম হইবে বলিয়া বাড়ীতে খুব খাওয়ান-দাওয়ান করেন, তিনি একটী মূর্খ; কারণ শুধু নামের জন্ম বহু অর্থব্যয় করিয়া ভোজ দেওয়াতে অপব্যয় হয় এবং যে এরূপ করে লোকে তাহাকে বোকা বলিয়া থাকে।

৮৪। শ্লাঘায়ৈ স্বল্পভোজনঃ

অর্থাৎ নিজের খ্যাতি ও গৌরব বিস্তৃত হইবে বলিয়া যিনি অত্যল্প পরিমাণ আহার করিয়া থাকেন তিনি একটী অজমূর্খ। ক্ষুধানিবৃত্তি করিবার জন্ম যে পরিমাণ খাওয়া দরকার তাহা খাওয়াই উচিত। লোকে ভাল বলিবে বলিয়া ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও যিনি যৎকিঞ্চিৎ আহার করেন তিনি একটি মূর্খ ছাড়া আর কি? বাঙ্গালাদেশের অনেক বাড়ীর জামাই এই শ্রেণীভুক্ত।

৮৫। স্বল্পে ভোজ্যেতিহৃতিরসিকঃ

অর্থাৎ যে তরকারি অতি অল্প রান্না হইয়াছে তাহাই বার বার যিনি চাহিয়া থাকেন তিনি একটী মূর্খ। কোন নূতন জিনিস বাজারে উঠিলে তাহা অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হয়, কাজেই বাড়ীতে তাহা সামান্ম আনাইয়া রন্ধন করিতে হয়। যাঁহার সেইরূপ খাদ্য অতিমাত্রায় খাইতে রসনা ব্যগ্র হয় তিনি সভ্যসমাজে মূর্খ বলিয়া পরিচিত হন। সকল বাড়ীতেই এরূপ এক-আধটি অদ্ভুত জীব দেখিতে পাওয়া যায়।

৮৬। বিক্ষিপ্তশ্চদ্মচাটুভিঃ

অর্থাৎ লুক্কায়িত চাটুবাক্যে যিনি বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া ঠকিয়া থাকেন তাহাকে মূর্খ নামে অভিহিত করা হয়।

৮৭। বেশ্যাব্যাপারকলহী

অর্থাৎ বেশ্যাঘটিত ব্যাপার লইয়া যাঁহারা আপনা-আপনির ভিতর প্রকাশ্যে কলহ করিয়া থাকেন তাঁহারা নিতান্ত অজমূর্খ বলিয়া গণ্য হয়। এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

৮৮। দ্বয়োর্মন্ত্রে তৃতীয়কঃ

অর্থাৎ দুইজনে যেখানে গোপনে পরামর্শ করিতেছেন সেইখানে যাইয়া হাজির হওয়া একটী মূর্খের কার্য্য; কারণ তাহাতে প্রথম দুইজনের কার্য্যে ব্যাঘাত করা হয়, এবং তৃতীয় ব্যক্তির সহিত তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া বাজে কথা বলিতে হয়। এবং তাহারা তৃতীয় ব্যক্তিকে নিতান্ত আহাম্মক মনে করিয়া থাকে।

৮৯। রাজপ্রসাদে স্থিরধীঃ

অর্থাৎ রাজা কোনরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে যিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া অচঞ্চল চিত্তে বসিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলা হইয়া থাকে। ইহাতে রাজা তাঁহাকে অসভ্য মনে করিয়া ভবিষ্যতে কোনরূপ অনুগ্রহ প্রকাশে বিরত থাকেন।

৯০। অন্যায়েন বিবর্দ্ধিষুঃ

অর্থাৎ কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়া যিনি উন্নতির আশা করিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া অভিহিত করা হয়। চুরি করিয়া বড়মানুষ হইব, রেশ খেলিয়া গাড়ীঘোড় চড়িয়া রাজার হালে থাকিব, অন্য লোকের প্রবন্ধ বা বই নিজের নামে ছাপিয়া সুনাম করিব, ইত্যাদি আশা যাঁহারা পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের শেষজীবন প্রায়ই রাজার অতিথি হইয়া যাপন করিতে হয়। এই শ্রেণীর লোককে সাধারণ মূর্খ না বলিয়া হস্তীমূর্খ নামে অভিহিত করিতে হয়।

৯১। অর্থহীনেহার্থকার্য্যার্থী

অর্থাৎ অর্থহীন হইয়াও যিনি ব্যয়বহুল কার্য্যে নিযুক্ত হন তাঁহাকে মূর্খ বলা হয়। কারণ ব্যয় বেশী হইলে নিজের অর্থে তাহা সামলান যায় না, কাজেই অত্যধিক ঋণগ্রস্ত হইয়া শেষে সিবিলজেলে বাস করিতে হয় বলিয়া এই শ্রেণীর মূর্খ অজমূর্খ বলিয়া পরিগণিত হয়।

৯২। জনে গুহ্যপ্রকাশকঃ

অর্থাৎ যিনি গোপন কথা প্রকাশ্যে প্রচার করিয়া নিজেকে ও আত্মীয়-স্বজনকে বিপদে ফেলিয়া থাকেন তাঁহাকে খাজামূর্খ বলা যাইতে পারে। প্রকাশ্যে বলা হয় না বলিয়াই গোপন, গোপন। তাহা যিনি বাহিরে বলেন, তিনি একটা খাজা।

৯৩। অজ্ঞাতপ্রতিভূঃ কীর্ত্ত্যৈ

অর্থাৎ শুধু কীর্ত্তি বা নাম হইবে বলিয়া যিনি অজ্ঞাত লোকের হইয়া জামিন হন তিনি একটা মূর্খ। অজ্ঞাত লোকের জন্য জামিন হওয়া উচিত নহে, কারণ সে পলাইয়া গেলে তাহাকে ধরা যায় না এবং খামকা বিপদ বা লোকসানগ্রস্ত হইতে হয়। টাকার জামিন হইলে টাকাটা নষ্ট হয়। এই সকল বিপদ আছে বলিয়া যিনি এইরূপ নামকে ওয়াস্তে জামিন দাঁড়ান তিনি সমাজে মূর্খ বলিয়া পরিচিত হন।

৯৪। হিতবাদিনি মৎসরী

অর্থাৎ হিত উপদেশ দিতে আসিলে যিনি উপদেশকের প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকেন, তিনি একটা মূর্খ।

৯৫। সর্ব্বত্র বিশ্বস্তমনাঃ

অর্থাৎ যিনি সদাই সকলকে বিশ্বাসের চক্ষে দেখেন, যিনি অত্যন্ত সরলপ্রকৃতি, ভাল ও খারাপ লোকের তফাৎ বুঝিতে পারেন না, ভাল ও মন্দ কার্য্যের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহাকে মূর্খ বলা হয়। কারণ এরূপ লোককে পদে পদে ঠকিতে হয় এবং বহুকাল বাদে তাহার জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে বলিয়া, কেন যে ইঁহাদের মূর্খ বলা হয় তাহা সহজেই বোধগম্য।

৯৬। ন লোকব্যবহারবিৎ

অর্থাৎ যিনি লোক-ব্যবহার জানেন না তাঁহাকে মূর্খ বলা হয়। যাহার সংসার-সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই, কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় জানেন না, তাঁহাকে মূর্খ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সে-সব লোকের সন্ন্যাস লইয়া বনে বাস করা উচিত।

৯৭। ভিক্ষুকশ্চোষ্ণভোজী চ

অর্থাৎ যে ভিক্ষুক হইয়াও সর্ব্বদা উষ্ণভোজন করিতে চাহে, তাহাকে মূর্খ বলা হয়। ভিক্ষুকের উচিত যাহা যখন পাইবে তখন তাহা আহার করা। ভিক্ষালব্ধ জিনিস ভাল কি মন্দ, গরম কি ঠাণ্ডা, বিচার করা তাহার শোভা পায় না। ভিক্ষুক যদি গরম খাবারের জন্য লালায়িত হয়, লোকসমাজে তাহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হয় বলিয়া এরূপ শ্রেণীর লোককে অজমূর্খ বলা হইয়া থাকে।

৯৮। গুরুশ্চ শিথিলক্রিয়ঃ

অর্থাৎ যে গুরু গুরুগিরি করিতে থাকিলেও ক্রিয়া-কলাপ ও সদাচার বর্জ্জন করিয়া থাকেন তাঁহাকে মূর্খ বলা হয়। কারণ গুরুর আচার-ব্যবহার আদর্শস্বরূপ বলিয়া সকলেই তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকে। গুরু আচারভ্রষ্ট হইলে তাহার অতি শীঘ্র দুর্ণাম হয়, এবং অচিরে শিষ্যবৃন্দ সেরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করে।

৯৯। কুকর্ম্মণ্যপি নির্লজ্জঃ

অর্থাৎ কুকর্ম্ম করিয়া যিনি অপ্রস্তুত হন না, এবং নির্লজ্জের মত কুকর্ম্মের সমর্থন করিয়া থাকেন, তিনি একটি গাধা। যাহারা কুকর্ম্ম করিয়া লজ্জিত হয় না,

বুঝিতে হইবে কুকর্ম্ম তাহাদের হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়া ধাতুগত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সংশোধন করা অসম্ভব, কাজেই পণ্ডিতেরা মূর্খ আখ্যা দিয়াই ক্ষান্ত হইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর মূর্খ বড়ই ভয়াবহ।

১০০। সাম্মুর্খশ্চ সহাসগীঃ ৮

অর্থাৎ যিনি আহ্লাদে গোপালের মত অনবরতই হ্যা হ্যা করিয়া হাসিয়া কথা কহিয়া থাকেন তিনি সমাজমধ্যে একটি গণ্ডমূর্খ বলিয়া পরিচিত হন। এ শ্রেণীর বোকা শহর অপেক্ষা পাঁড়াগাঁয়ে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরে একশত প্রকারের গাধা ধরিবার সঙ্কেত বিবৃত হইল। জনসাধারণের বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজের কল্যাণকর হইবে বিবেচনা করিয়া আমার অতি আদরের সামগ্রী এই মূর্খশতক পাঠকবর্গের হস্তে সমর্পিত হইল। এই প্রসঙ্গে আর-একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার। উপদেশচ্ছলে আমি বিজ্ঞের ন্যায় কোন কথা এই প্রবন্ধে বলিতে সাহস করি নাই। এই সংসারে মূর্খের সংখ্যা কমাইবার দুরাশা কেহই করিতে পারেন না, আমারও সে দুরাশা নাই। আমি কেবল সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে কতক গুলি লোকহিতকর কথা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপন করিয়াছি মাত্র। মূর্খশতকের প্রথম সন্ধান আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট পাই, তাহার পর উহা পড়িয়া অত্যন্ত আকৃষ্ট হই। অনেক বিপদ হইতে এই পুস্তকখানি আমাকে বাঁচাইয়াছে, বোধ হয় পরে আরও বাঁচাইবে।

সংসার অতি কঠিন স্থান। সংসারযাত্রার পথে অন্ততঃ একশতটী খানার কথা মূর্খশতকে বিবৃত হইয়াছে। যাত্রা করিবার সময় যাহাতে সকলে এই একশতটী খানা এড়াইয়া চলিতে পারেন, সেই আশায় এই প্রবন্ধটী বিরচিত হইয়াছে। অলমতিবিস্তরেণ।

খুড়োর দায়মুক্তি

(চিত্র)

শ্রীকালীকুমার দত্ত, এম্‌-এস্‌-সি, বি-এল্

সহসা শ্রাবণের শেষ লগ্নে একদিন দ্বিপ্রহরে রালির বাড়ীর ক্যাশঘরে নিতান্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমাদিগের সার্ব্বজনীন খুড়ো উপস্থিত—বড়বাবু প্রভৃতি আমাদিগের চারিজনকে গোপনে তাঁহার কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলিল। আমরা স্তম্ভিত; বড়বাবু বলিলেন, "আচ্ছা খুড়ো! তোমার মেয়ে?—তার বিয়ে?" তামাকে টান দিয়া পুনরায় বলিলেন, "আচ্ছা খুড়ো, গত উনিশ বছর তো তোমাকে কখনও দেশমুখো হইতে কেউ দেখে নি—কি বল, হে রাখাল? কেমন তাই না?"

খুড়ো গালভরা হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "তোমাদের কেমন সব তাতেই ঠাট্টা আর ইয়ারকি—আর যাই বল, খুড়ী তোমার কারও দিকে মুখ তুলে চায় না। এখন সে কথা যাক্। মেয়েটা বড় হয়েছে—পাত্র যখন একটা মিলেছে, কোনও রকমে দায়মুক্ত যাতে হই—বুঝলে কি না, বাবা! আমি এই ১-৩৭এর গাড়িতে ফিরছি, তোমরা চারজনে ৬-১৭র ট্রেণে চাংড়িপোতার টিকিট ক'রে যাবে—আমি ষ্টেশনে গাড়ি নিয়ে থাকব—যাওয়া চাই, না গেলে গরীব ব্রাহ্মণ বড়ই মনঃক্ষুণ্ন হ'ব। না গেলে—বেশী আর কি বলব বল—এ পর্য্যন্ত বলতে পারি, তোমাদের কোনও কষ্ট হ'বে না—পাড়াগাঁর একটা আইডিয়া তো হ'বে!"

"পাত্রটী কি করে?"

"বিশেষ কিছু করে না, ম্যাট্রিক পাশ সদ্বংশ—বাপ

উলুবেড়িয়ার এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন-মাষ্টার—দুই ছেলে—পাত্র ছোট, একেবারে ব'সে খাবার সংস্থান না থাকলেও সংসার-ধর্ম্ম একরকমে চ'লে যায়। পাত্রটির একটা চাকরী তোমাদের বাবা ক'রে দিতে হবে—যাক্ সে পরের কথা পরে হ'বে।" কথা শেষ না হইতে খুড়ো ঝড়ের মত চলিয়া গেল।

খুড়োর পরিচয় জানার আবশ্যক করে না—আমার দিদির বাড়ীর বাহিরের ঘর তাহার খাসদখলে। তবে কিংবদন্তী আছে যে খুড়োর একটা দেশ আছে—পুত্র, কন্যা, মাতা, পিসি, বিধবা ভগিনী ও স্ত্রী—খুড়োর সকলই বর্ত্তমান, কিন্তু খুড়ো সে-সবের ধার ধারে না। খুড়ো সুখী লোক, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা, দায়িত্ব, মায়া-মমতার অতীত যেন কলির জনক ঋষি—গৃহী অথচ সন্ন্যাসী।

খুড়ো অন্তর্হিত হইলে আমাদের ক'নেকে কি দেওয়া যায় সে-বিষয়ে একটা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, নগদ ৫০৲ টাকা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত, বড়বাবু তাহার অর্দ্ধেক দিবার ভার লইলেন। খুড়ো আমাদের প্রিয়পাত্র, বিদ্রূপ বা পরিহাসের লক্ষ্যস্থল তো বটেই, আবার গোবধে কর্ত্তা, বেগার দিতে বোনাপার্টি; তাহার মত অক্লান্তদেহে বিনা বাক্যব্যয়ে বেগার খাটিতে কাহাকেও দেখা যায় না। রোগীর সেবায়, কর্ম্মবাড়ীর পরিবেষণে, ভোটের ঘোঁটে খুড়ো অদ্বিতীয়। অনেকের মা-খুড়ী, মাসী-পিসী-দাদা-দাদীর কাঁধকাঠ, পাড়ার মুরুব্বি, তীর্থ-যাত্রার সঙ্গী, মোকদ্দমার মিথ্যা সাক্ষী, এমেচার পার্টির ডুপ্লিকেট, আহিরীটোলা অবৈতনিক কনসার্ট পার্টির অন্যতম করতালীবাদক এ হেন খুড়োর কন্যাদায়; কাজেই আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিব মনস্থ করিয়া ফেলিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি, খুড়ো আমার ভগিনীপতি রাখালবাবুর একদা সহপাঠী ছিলেন—আমার বড় ভাগিনেয় প্রথমে খুড়োর নামকরণ করে; তদবধি দিদির শ্বশুর থেকে সকলেই তাহাকে খুড়ো নামে অভিহিত করে। খুড়োর আসল নাম ছোট ভুয়ানির মত দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে।

খুড়ো তামাক-বিড়ি-সিগার-দোক্তা ছাড়া হামেশা আর কোনও নেশা করে না। বড়বাবুর বাগানে গিয়া একবার আকণ্ঠ তালরস পানে এতই আনন্দ করিয়াছিল যে, পালপাড়ার ফাঁড়িতে ধরা পড়িয়া চারি টাকা অর্থদণ্ড দেয়। রালির বাড়ীতে খবর দিয়া তবে দায়মুক্ত হইয়াছিল। সে কথা উত্থাপন করিলে খুড়ো একগাল হাসিয়া বলিত, "সেই বিলাতীর দরুই পড়িয়া গেল।" খুব গোপনে খুড়ো সোমরস পানে কাহাকেও বিমুখ করিত না, কারণ খুড়োর অনুরোধ-রক্ষা সকলের জীবনের ব্রত ছিল।

রাত্রি আট ঘটিকায় আমরা চাংড়িপোতা ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। ট্রেণ থেকে নামিতে প্লাটফর্ম্মে খুড়ো গামছা কাঁধে আমাদিগের দিকে গালভরা হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, "চল চল—গাড়ি ঠিক আছে—উঠে পড়বে চল—সবেধন নীলমণি—এই ট্রেণেই বর বোধ করি এসেছে—আর গাড়ি নেই, এই গাড়ি ছেড়ে দিলে তবে আবার বর নিয়ে আসবে—শীঘ্র এস, বেটাদের সঙ্গে আবার দেখা হ'য়ে না যায়।" ইত্যাদি শুনিয়া আমরা হতভম্ব হইয়া গেলাম। আমরা আপত্তি করিলাম; কিন্তু খুড়োর টানাটানিতে অগত্যা গাড়িস্থ হইলাম। খুড়ো গাড়ির চালে—বড়বাবু গাড়ির নাড়া পাইয়া একবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন; মনে হইল তাঁহার প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিবার জন্য শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি হাঁটিয়া যাইবার জন্য গাড়ি থামাইতে বলিলাম—কিন্তু খুড়ো গাড়োয়ানকে সে কথায় কর্ণপাত করিতে দিল না। রাত্রি সাড়ে নয়টায় খুড়োর বাড়ীর গলির মুখে বোসেদের বাগান-বাড়ীর সম্মুখে গাড়ি থামিল। ফিরিবার ট্রেণ রাত্রি সওয়া তিনটায়, ভেজিটেবল ট্রেণে প্রত্যুষে বেলিয়াঘাটায় নামাইয়া দিবে। আমরা বোসেদের বৈঠকখানার, গ্রাম্য ভাষায় চণ্ডীমণ্ডপের, আশ্রয় লইলাম। বড়বাবু নিবিষ্টচিত্তে অস্থিগুলি অটুট আছে কি না পরীক্ষা করিয়া লইলেন।

ইতিমধ্যে খুড়ো কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিল, কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই। চারি বাটি চা ও মিষ্টান্ন লইয়া খুড়ো সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে জলযোগ করিতে অনুরোধ করিল এবং সত্বর মুখহাত প্রক্ষালন সারিয়া জলযোগ-কার্য্য সমাপন করিয়া না লইলে খুড়ো সেখানে বরের আদর করিতে পারিবে না—তাহাও জানাইয়া দিল। আমরা যন্ত্র-চালিতের মত খুড়োর ইঙ্গিতমত জলযোগ সারিলাম এবং সম্মুখস্থ সদর পুষ্করিণীর সোপানশ্রেণীর আশ্রয় লইলাম। "তামাক ইচ্ছা করুন" বলিয়া আমাদিগকে প্রতিবেশী পরেশ ও তিনকড়ি সমাদর করিল। বড়বাবু

কতকটা তাম্রকূট সেবনে ধাতস্থ হইয়া বর আনিতে গাড়ি ষ্টেশনে গিয়াছে কি না খবরদারি করিতে, খুড়ো তাহার বাঞ্ছিত সুখটান নিমেষে সমাপন করিয়া প্রশ্নের উত্তর দিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় শকট-ধ্বনি ও সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খরব ও উলুধ্বনিতে জানাইয়া দিল যে, বর আসিয়াছে। আমরা বর দেখিয়া আসিলাম, বরটী বেশ সুস্থ, সুশ্রী ও সৌম্যমূর্ত্তি।

পুষ্করিণীর ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া আমরা দেখিলাম, খুড়ো একমনে ফুৎকার সহযোগে নূতন ছিলিমের ব্যবস্থা করিতেছে। দেখিয়া বড়বাবু ধমক দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা লোক যা হোক, দিব্য তামাকে ফুঁ দিচ্ছ—যার বিয়ে তার মনে নাই আর পাড়াপড়শীর ঘুম নাই।" খুড়ো একগাল হাসিয়া বড়বাবুর গড়গড়ায় কলিকাটী স্থাপন পূর্ব্বক নিঃশব্দে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে তাহার বাটীতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল এবং অচিরাৎ তাহার কথামত কার্য্যে অগ্রসর না হইলে তাহার যে কত অসুবিধা হইবে তাহাও জানাইয়া দিল। গিয়া দেখি, আমাদিগের চারিজনের আহারের আয়োজনে কোনও ত্রুটি হয় নাই। রাখালবাবু বিরক্তি জানাইলেন। খু বলিল, "এই ফাঁকে তোমরা আহারটা সেরে নিলে আমি সম্প্রদানে বসিব, পরে আর এদিকে মন দিতে পারিব না।" বড়বাবুকে অগ্রগামী হইতে দেখিয়া আমরা আর প্রতিবাদ করিবার সাহস করিলাম না। আহারান্তে বোসেদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া, দেখি বর-যাত্রীরা সাড়ে তিন মাইল কর্দ্দমময় পথ হণ্টন-যোগে অন্ধকারে আসিয়া খুড়োর বৈবাহিকের উপর খড়্গহস্ত হইয়া "ন ভূত ন ভবিষ্যতি" গালিবর্ষণ করিতেছে। বৈবাহিক মহাশয় খুড়োর অনুসন্ধান করিতেছেন এমন সময়ে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া মস্তকে তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে খুড়ো আসরে আসিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে জানাইল যে, সারাদিন হাট-বাজার ও স্বর্ণকারের বাড়ী যাতায়াত করিতে বার পাচেক সে কলিকাতায় গিয়াছে, স্নান পর্য্যন্ত করিবার সময় পায় নাই। আর হরিনাভির ঝুলনে সব গাড়ি সেই দিকে যাওয়ায় কোনমতে কাহাকেও বরযাত্রী আনিতে সম্মত করিতে পারা যায় নাই—ছোটলোক কি না! স্কন্ধের গামছাখানিকে গলবাস করিয়া জোড়হস্তে খুড়ো মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া ঘাটে পাদ প্রক্ষালনাদির জন্য তাহাদিগের কয়েকজনকে লইয়া চলিয়া গেল। দল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহাদের ক্রোধ কিয়ৎপরিমাণে উপশমিত হইল। স্নানাদি সমাপন করিয়া পাত্রস্থ করিবার জন্য অনুমতি লইয়া বরের হাত ধরিয়া খুড়ো বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। আমরা, বরকর্ত্তা ও পুরোহিত মহাশয় তাহাদের অনুসরণ করিলাম।

কন্যা সম্প্রদান হইয়া গিয়াছে। বড়বাবু প্রায় দুই ছিলিম তামাক ভস্মসাৎ করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে বরযাত্রীদের পাতের কতদূর কি হইল এবম্প্রকার ফাঁকা আওয়াজ করিতেছেন। এহেন সময়ে সহসা কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল, সঙ্গে সঙ্গে মারপিটের শব্দ ও বরযাত্রীগণের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। খুড়ো আমার কর্ণে গোপনে বলিল, "শুধু ঝগড়া বাধাইবারই তো কথা ছিল, এ আবার মারপিট করিয়া বসিল দেখিতেছি—ন', যেদিক না দেখিব সেই দিকেই গোলমাল।" বলিয়াই খুড়ো বেগে সে-স্থান ত্যাগ করিল। আমরাও খুড়োর অনুসরণ করিলাম। বোসেদের চণ্ডীমণ্ডপ পর্য্যন্ত যাইতে হইল না। পাত হইয়াছিল। খান দুই তিন লুচি, পটলভাজা ও ডাল দিবার পর পরিবেষণকারীদের সহিত বরযাত্রীদের কথাটি কাটাকাটির সূচনা হয়, তাহা হইতে গালি-গালাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে বরযাত্রীদের উপর আকস্মিক আক্রমণ, প্রহার ও তাহাদের আর্ত্তনাদ করিতে করিতে জুতা-ছাতা আদি ফেলিয়া পলায়নতৎপরতা দেখিয়া আমরা একেবারে স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক হইয়া গেলাম। খুড়ো কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হায় হায় শব্দে কপালে সজোরে করাঘাত করিতে করিতে বৈবাহিকের দিকে ও ২।১ জন প্রবীণের পাদমূলে পড়িয়া জানাইল "এই দেইজী বেটারা আক্রোশ করিয়া আমাকে এইরূপ অপদস্থ করিল আমার, দেশে আসিয়া একার্য্য করাই ভুল হইয়াছে, ইত্যাদি।" আরও কত কি বলিয়া অবশেষে পুনরায় পাত. করিবার অনুমতি যাচ্ঞা করিল। খুড়োকে সম্মুখে পাইয়া তাহাদের ক্রোধবহ্নি বিকটাকার ধারণ করিল। বর ফিরাইয়া লইবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া যখন জানিতে পারিল যে, বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে, তখন বরকর্ত্তার সাহায্যে খুড়ো পুনরায় তাহাদিগকে আসন পরিগ্রহ করিবার অনুরোধ করিল। কেহ সে কথায় কর্ণপাত করিল না। একে পল্লীগ্রামের অন্ধকার—বর্ষাকাল, সাড়ে

তিন মাইল পথ পদব্রজে একপাত লুচির আশায় অতিক্রম করিয়াছে তাহার স্থলে কি না কেবল লাঞ্ছনা, অপমান ও প্রহার, সকলে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর প্রহারক্লিষ্ট দেহে গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া পুনরায় পদব্রজে ষ্টেশনের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে এই চিন্তায় তাহাদের মনকে যথেষ্ট সংযত করিয়া দিল, কিন্তু অপমান ভুলিতে না পারিয়া আত্ম-সম্মানের বশে অন্ধকারেই তাহারা সদলবলে ষ্টেশনের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে ধাবিত হইল। বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহাদের অনুসরণ করিল। খুড়ো বরের পিতাকে কতকটা শান্ত করিয়া তাহাদের আহারাদি সমাপন করাইয়া তাহাকে ও পুরোহিত মহাশয়কে লইয়া গোসেদের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলে আমাদিগের নিদ্রার প্রতি মনোযোগ করিতে হইল।

আমরা প্রায় তন্দ্রাগত। খুড়ো, ষ্টেশনে আমাদিগকে লইয়া যাইবার গাড়ি আসিয়াছে জানাইল। আমরা বৈবাহিকের নিকট বিদায়গ্রহণ করিবার সময় খুড়ো স্বর্ণকারের নিকট হইতে অলঙ্কার আনিতে পুনরায় কলিকাতায় যাইতে হইতেছে জানাইয়া আমাদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া নিজে গাড়ীর চালে এক চেঙারি খাবার লইয়া জাঁকিয়া বসিল। ভেজিটেবল ট্রেণে প্রত্যূষে বেলিয়াঘাটায় পঁহুছিলাম।

রাখালবাবু আপিসে আসিয়া বলিলেন যে, টেবিলের উপর খাবার স্তুপ করিয়া খুড়োকে অগাধ নিদ্রায় মগ্ন অবস্থায় তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন। স্বর্ণকারের নিকট অলঙ্কারাদির কথা বৈবাহিককে স্তোক দিয়া খুড়ো বোধ হয় সরিয়া পড়িয়াছে। পরেশ ও তিনকড়ি গত দুই তিন দিন খুড়োকে যথেষ্ট তাগিদ দিয়াছে। খুড়ো তাহাদের নিকট জানিতে পারিয়াছে সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করিয়া বর-বধূ লইয়া বৈবাহিক রওনা হইয়াছে। খুড়ী না কি আমাদিগের প্রদত্ত ৫০৲ টাকা বৈবাহিককে দিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া বিদায় দিয়াছেন, এ কথাও পরে আমরা জানিতে পারিয়াছি।

রবিবার পরামর্শক্রমে আমরা সকলে রাখালবাবুর বাড়ীতে মিলিত হইলাম। বড়বাবু কোনও বিশেষ কারণে আসিতে পারেন নাই। খুড়োকে আমরা বিশেষ করিয়া বলিলাম, খুড়ো এক গাল হাসিয়া উত্তর করিল যে, সে তাহার সাধ্যমত যথাসম্ভব কর্ত্তব্য করিয়াছে। এখন পাত্রটীর যদি একটা চাকুরী বড়বাবু করিয়া দেন, তাহা হইলে সে সব দিক রক্ষা করিতে পারে। দেখিলাম, খুড়ো কিছুতে দমে না।

বড়বাবু সাহেবকে ধরিয়া অগত্যা খুড়োর জামাতার ৪০৲ টাকা বেতনে চাকুরী করিয়া দিলেন। খুড়ো উলুবেড়িয়ায় সংবাদ দিয়া আসিল। আমরা সকলেই বুঝিলাম যে, খুড়ো কি একটা বন্দোবস্ত করিয়াছে। বহুদিন পরে জানা গেল যে, বাবাজী প্রতি মাহা তাহার বেতন হইতে পিতাকে খুড়োর তরফ হইতে বরপণ ও অলঙ্কারাদি বাবদ দেনা শোধ করিবার জন্য ২৫৲ টাকা হিসাবে দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান ১৫৲ টাকা বেতনে এপ্রেন্টিস ভাবে কার্য্য চলিবে। আর দুইমাস পরে তাহার বেতন বৃদ্ধি হইবে। বাবাজী খুড়ীর হাত-খরচের জন্য মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে তখন দিতে স্বীকার করিয়াছে। খুড়ো একগাল হাসিয়া সে কথা আমাদিগকে জানাইতে ক্রটি করিল না। এইরূপে খুড়ো তাহার দায় হইতে মুক্তি লাভ করিল।
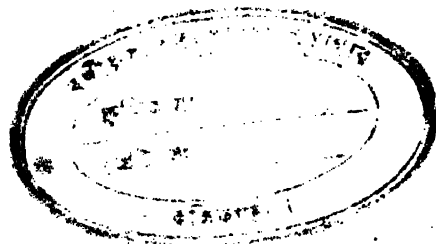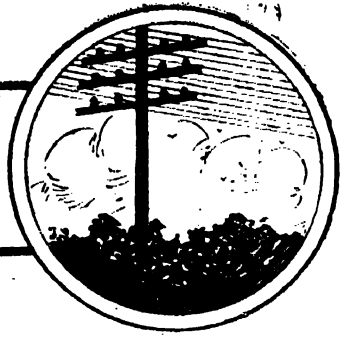
অভিনব ফনোগ্রাফ-রেকর্ড

নূতনের পূজারী পশ্চিমের কৃপায় আমরা নিত্য কত জিনিসের মধ্যে যে নূতনত্বের আভাস পাইতেছি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সামান্য জিনিসের মধ্যেও একটা নূতন কিছু করিবার চেষ্টা তাহাদের উন্নতির পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দেয়।

সামান্য গ্রামোফোন-রেকর্ড যাহা আমরা চিরকালই এক রকমের দেখিয়া আসিতেছিলাম তাহার মধ্যেও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

বার্লিনের একজন কুশলী বৈজ্ঞানিক এক প্রকারের গ্রামোফোন-রেকর্ড আবিষ্কার করিয়াছেন; এই রেকর্ড-গুলির বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, ইহার উপর সাধারণ

নূতন ফনোগ্রাফ-রেকর্ড

রেকর্ডের ন্যায় সূক্ষ্ম রেখা টানা থাকে না; তাহার পরিবর্ত্তে যে গায়ক সেই রেকর্ডখানিতে গান গাহিয়াছেন তাঁহার ছবি দেওয়া থাকে। রেকর্ডটী ঘুরিতে আরম্ভ করিলে কলের সূচ (needle) ছবির বহিঃ-রেখা (outline) গুলির পাশে পাশে ঘুরিতে থাকে এবং গান আরম্ভ হয়।

আমরা পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার জন্য ইহার একখানি ছবি দিলাম। ইহা হইতে তাঁহারা এই অভিনব রেকর্ড-খানির সম্বন্ধে বেশ একটা স্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, এইরূপ নূতন-কিছুর সৃষ্টি করা সর্ব্বদেশেই সর্ব্ব সময়ে প্রার্থনীয়।

রহস্যময়ী রমণী

সম্প্রতি জনৈক 'রহস্যময়ী রমণী'র সংবাদ বিদেশের সংবাদ-পত্র হইতে যে ভাবে পাওয়া গিয়াছে তাহা পড়িলে সত্যই স্তম্ভিত হইতে হয়।

বিলাতে একজন ভদ্রমহিলা আছেন যিনি যে কোন গৃহে যখনই পদার্পণ করেন তখনই সেই বাড়ীর ঘড়িগুলি আশ্চর্য্যভাবে বন্ধ হইয়া যায়। প্রথমে লোকে তাঁহার কথা বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু তিনি বহুস্থানে তাঁহার এই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে তিনি একটী ঘড়ি ছাড়া পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সমস্ত ঘড়ির উপরেই তাহার ক্ষমতা খাটাইতে পারেন। যে ঘড়িটীর উপর তাহার জারি-জুরি খাটে না, সেটী তাহার পিতামহের ঘড়ি।

একজন ডাক্তার এ বিষয়ের কোন সন্তোষজনক সমাধানের চেষ্টায় কয়েকদিন বহু পুথিপত্র ঘাটিয়া বলিয়াছেন যে, কোন কোন লোকবিশেষের গায়ের চামড়া ধাতু-বিশেষের উপর রাসায়নিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে এবং বোধ হয় ঐরূপ কোন কারণ থাকায় এই মহিলাটী ঘড়ি বন্ধ করিতে পারেন। এরূপ উত্তরের পর জানিবার ইচ্ছা স্বতঃই মনে জাগিয়া ওঠে, তাঁহার পিতামহের

ঘড়ির ধাতু কি অন্যান্য ঘড়ি হইতে পৃথক ছিল? আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ডাক্তারের মতের (থিওরির) মূল্য কিছুই থাকে না।

অভিনব গাছ

ছবিখানির ভিতরের গাছগুলিকে দেখিয়া খুব সাধারণ গাছ বলিয়া ধারণা হইলেও, মোটেই উহা সেরূপ নয়।

অভিনব গাছের ছবি

এই গাছগুলি দক্ষিণ আমেরিকার কোন জঙ্গলে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, যদি কেহ মদ খাইয়া এই গাছগুলির তলায় আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে সে আপনা হইতেই সেইখানে মোহমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রঙীন স্বপ্ন দেখিবে—পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ক্ষণিকের জন্য ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু এমনি মজা যে আবার যদি কেহ এই গাছের-ই রস পান করে, তাহা হইলে সে পাগলের মত হইয়া উঠে—নেশার ঘোরে বহু বীভৎস কার্য্য করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না।

সত্যই চির-বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির লীলা বুঝিয়া ওঠা ভার!

নবাবিষ্কৃত পিস্তল

খুব তাড়াতাড়ি ছবি তুলিবার জন্য এক প্রকারের Flash-light পিস্তল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পিস্তলগুলি আকৃতিতে সাধারণ পিস্তলের ন্যায়—সাধারণতঃ পিস্তলে নল, ঘোড়া প্রভৃতি যা কিছু থাকে সে সবই ইহার মধ্যে আছে। কেবল মধ্যে বারুদের গুলি না পুরিয়া Flash-light powder পুরিয়া দেওয়া হয়; তাহাতে ঘোড়া টিপিলেই পিস্তলের মুখ হইতে Flash-light বাহির হয়। এবং চারিদিক আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। অন্ধকারে যখন কোন ছবি তুলিবার দরকার হয় তখন পিস্তলটার ঘোড়াটী ক্যামেরার Shutter এর সহিত একটী তার দিয়া সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। তখন পিস্তলটার মুখ হইতে আলোক বিকীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যামেরায় ছবি উঠিয়া যায়। বিলাতে আজকাল অন্ধকারে ছবি তুলিবার জন্য এইরূপ Flash-light পিস্তল যথেষ্ট ব্যবহৃত হইতেছে। কেবল তাহাই নহে এদেশের পুলিশ-বিভাগ এইরূপ ধরণের কতকগুলি পিস্তল কিনিয়াছেন; কারণ রাত্রিকালে ডাকাত প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্তদের ছবি তুলিবার ক্ষমতা ইহার মত আর কোন যন্ত্রেরই নাই।
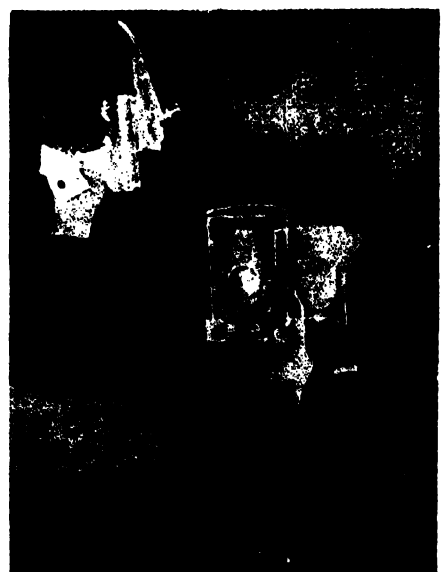
Flash-light পিস্তলের দ্বারা ছবি তোলা হইতেছে

আমরা একখানি ছবি দিলাম। ইহাতে রাত্রিকালে একজন ডিটেক্‌টিভ্‌ কেমন একটী চোরের ছবি তুলিয়া লইতেছেন দেখা যাইবে।...

বৈদ্যুতিক উপায়ে উদ্ভিদের প্রাণরক্ষা

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিকেরা বৈদ্যুতিক উপায়ে কিরূপে উদ্ভিদের জীবনী-শক্তি বর্দ্ধিত করা যায় তাহা লইয়া গবেষণা করিতেছিলেন। এ বিষয়ে আমরা আমাদের 'বিশ্ব-জগতে' পূর্ব্বেও কিছু আভাস দিয়াছি। সম্প্রতি জনৈক বার্লিনবাসী তাঁহার বাগানের গাছগুলির সহিত শক্তিশালী বৈদ্যুতিক বাতি বসাইয়া দিয়াছেন। এই বাতিগুলি বসাইবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আশ্চর্য্য রকম ফল পাওয়া গিয়াছে। যে সমস্ত গাছ নানা প্রক্রিয়া অবলম্বন করা সত্ত্বেও দিন দিন মুসড়াইয়া যাইতেছিল, সেগুলি এখন দিন দিন আশাতিরিক্ত ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই বাগানের মালিক মহোদয় বলিয়াছেন যে মাঝে মাঝে গাছগুলিতে কিছু কিছু বৈদ্যুতিক আলোর উত্তাপ দিবারও প্রয়োজন আছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত বাগান

আমরা পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার জন্য এ বাগানটীর একখানি ছবি দিলাম।

বৃহত্তম দিগ্‌ নির্ণয়-যন্ত্র

এই জটিল যন্ত্রটী যে কি তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। ঐ যন্ত্রটী একটী দিগ্‌ নির্ণয়-যন্ত্র ও Stabiliser এর সংমিশ্রন এবং আয়তনে ইহাই নাকি পৃথিবীর
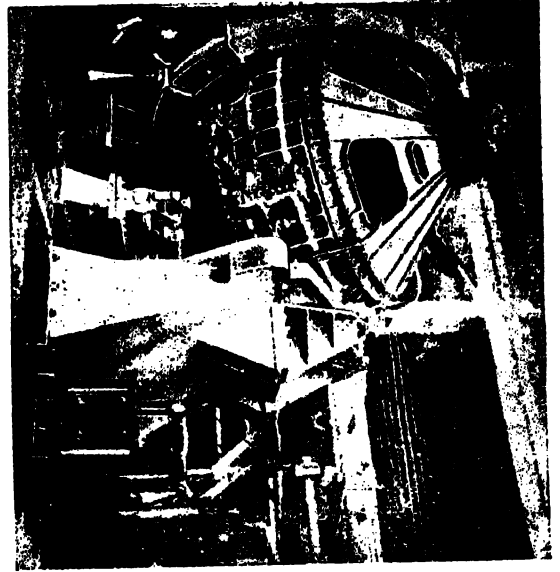
বৃহত্তম আশ্চর্য্য দিগ্‌ নির্ণয়-যন্ত্র

মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই যন্ত্রটীর গুণ হইতেছে এই যে, সমুদ্রমধ্যে ঝড় উঠিলে উহা জাহাজকে সোজা করিয়া রাখিয়া ঠিক পথে চালাইতে পারে—ইহাতে ঝড়ের সময় দিগ্‌ভুল হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

কেবল তাহাই নয়! এ যন্ত্রটীর আরও একটী বিশেষ গুণ হইতেছে যে ইহা শান্ত স্নিগ্ধ বারিধির বুকে যে কোন মুহূর্ত্তে তুফান তুলিয়া প্রলয় ঘটাইতে পারে।

এই বিচিত্র যন্ত্রটী আবিষ্কার করিয়াছেন—Dr. Elmer Sperry নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক।

ক্ষুদ্রতম মোটর

চিত্রের ছোট মোটর গাড়ীখানিকে দেখিয়া উহা কোন গাড়ীর 'মডেল' বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু মোটেই তাহা নয়। Philadelphiaর একজন দ্বাদশ বৎসরের বালক ঐ মোটরটী তৈয়ারী করিয়াছে।
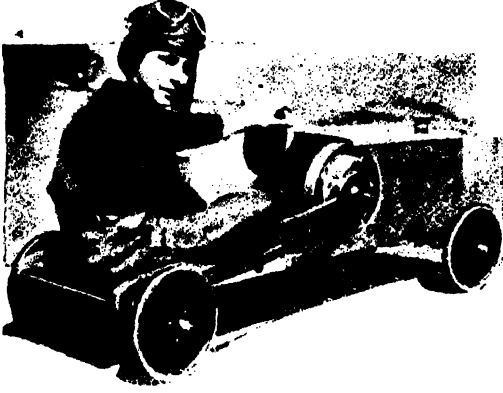
ক্ষুদ্রতম মোটরে আবিষ্কারক বালক

উহার মধ্যে এঞ্জিন প্রভৃতি সমস্তই আছে—যখন খুসী চালাইতে পারা যায়। শুনা যায় নাকি ঐ গাড়ীখানি তৈয়ারী করিতে বালকটির মাত্র এক ডলার খরচ পড়িয়াছে এবং পৃথিবীর মধ্যে আর কেহ আজ পর্য্যন্ত এত অল্প ব্যয়ে মোটর তৈয়ারী করিতে পারে নাই।

বালকটীর নাম Robert Dodge এবং তাহার পিতা Mr. Keru Dodge, American Society of Mechanical Engineer এর সভাপতি। এই বালকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সন্দেহ নাই।

অক্সিজেন গ্যাসচালিত মোটর
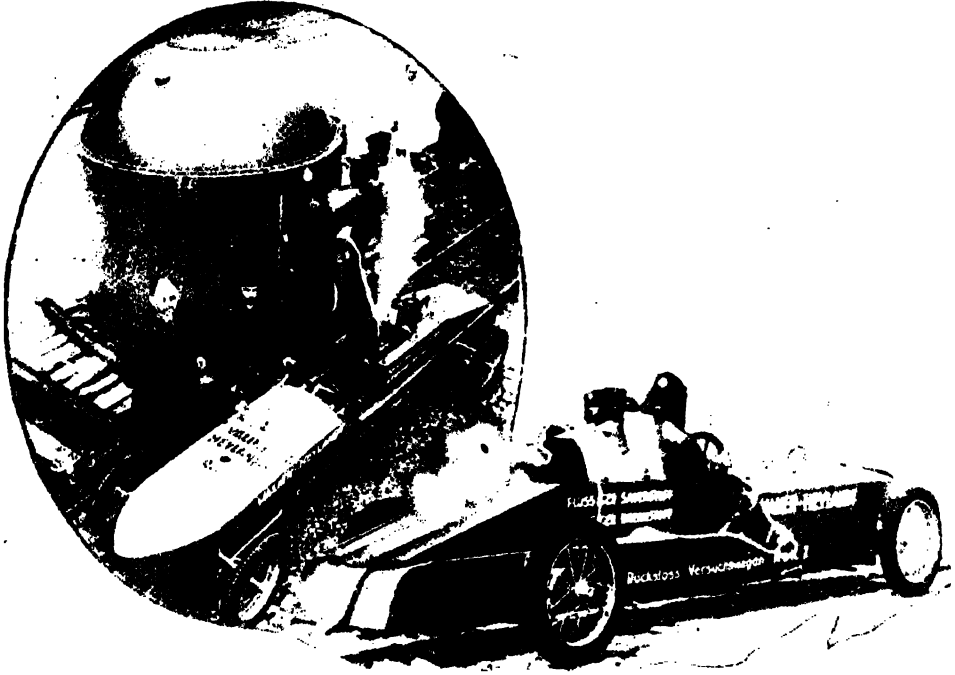
অক্সিজেন গ্যাসচালিত মোটর

পূর্ব্বে রেসে (Race) দৌড়াইবার 'রকেট্' (Rocket) গাড়ীগুলি সাধারণ পেট্রোলে চালান হইত, কিন্তু ইহাতে আশাজনক ফল না পাওয়ায় কিছুদিন হইল, গাড়ীতে পেট্রোলের পরিবর্ত্তে অক্সিজেন গ্যাস (Oxygen Gas) দিয়া দেওয়া হইতেছে।

ইহাতে সুবিধা এই যে, পূর্ব্বে পেট্রোল-চলিত 'রকেট' গাড়ীতে দৌড়াইবার সময়ে খুব সামান্য কারণেই আগুন লাগিয়া যাইত, কিন্তু ইহাতে তাহা হয় না; কারণ গ্যাসের সহিত অন্য আর একটী রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া থাকে, তাহাতে হঠাৎ আগুন লাগিতে পারে না।

চন্দ্রে সংবাদ-প্রেরণ

দু'একমাস পূর্ব্বের "বিশ্বজগতে" মঙ্গল গ্রহে সংবাদ প্রেরণের কথা সকলেই পড়িয়াছেন। সম্প্রতি আমেরিকায় Naval Research Laboratoryর অধ্যক্ষ Dr. A. Hoyt Taylor চন্দ্রগ্রহে সংবাদ প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সংবাদ-প্রেরণের জন্য তিনি একটী প্রকাণ্ড যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন। এই যন্ত্রটীর নির্ম্মাণ-কার্য্য নাকি যন্ত্র-বিদ্যার (Mechanism) দিক দিয়া চরম
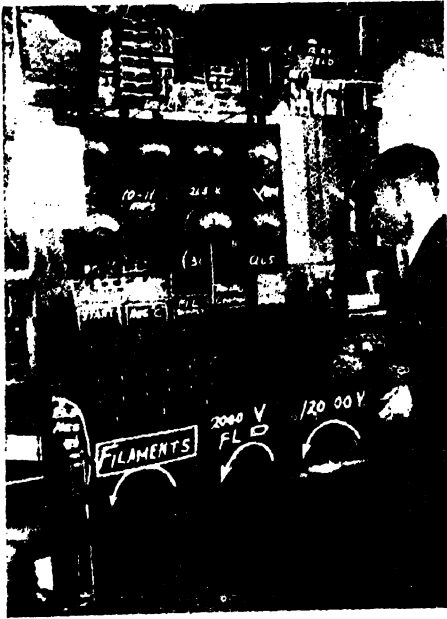
চন্দ্রে সংবাদ প্রেরণ যন্ত্র

হইয়াছে, দেখা যাক্ Mr. Taylorএর প্রচেষ্টা কতদূর ফলবতী হয়!

আমেরিকান ব্যাঙ্ক

আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সভ্য চোর-ডাকাতের এতই উৎপাত হইয়াছে যে ওদেশের অধিবাসীরা ভয়ানক উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যাঙ্কের টাকা লইয়া কেসিয়ারের বসিবার জো নাই, যখন-তখন ডাকাত আসিয়া পিস্তল দেখাইয়া সমস্ত লুঠ-পাট করিয়া লইয়া যাইবে। এই সমস্ত দেখিয়া আজ-কাল ওদেশের ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা এক খাঁচার মত স্থানে বসিয়া টাকা দেন। আমরা যে ছবি দিলাম তাহার মধ্যে সম্মুখে যে প্রকাণ্ড কাঁচখানি দেখা যাইতেছে উহা এমন ভাবে তৈয়ারী যে কোন গুলি লাগিলে

ব্যাঙ্কে টাকা লইবার স্থান

ভাঙ্গিয়া যাইবে না। ছবির মধ্যে বা ধারের জানালার তলায় যে কাল স্থানটী দেখা যাইতেছে সেই স্থানটীতে সর্ব্বদা টোটা ভরা দুইটী পিস্তল থাকে। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলেই নিজে না আহত হইয়া যতইচ্ছা গুলি চালাইতে পারেন। কেবল তাহাই নয়, টাকা দিবার সময় তাঁহারা মোটেই হাত বাহির করেন না—Shot এর সাহায্যেই তাহা চলে।

—শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

(আশ্বিন)

২রা···ক্ষীরোদ রায়চৌধুরী মহাশয়ের জন্ম (১২৫৭)।

৩রা·ভূকৈলাসের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুরের জন্ম (১১৫৯)। ১৫ বৎসর বয়সে ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী ও পারসী ভাষায় ইনি ব্যুৎপন্ন হন। ১১৭২ সালে ইনি মুরসিদাবাদে নবাবের অধীনে কর্ম্ম করেন। কালীঘাটের কালীর চারিখানি রৌপ্যহস্ত নির্ম্মাণ, বারাণসীতে 'করুণানিধান' নামক রাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তি, গুরুপ্রতিম', গুরুকুণ্ড প্রভৃতি হইতে তাঁহার ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার সাহিত্যসেবার নিদর্শন—(সংস্কৃত) শঙ্করীসঙ্গীত, ব্রাহ্মণার্চ্চন-চন্দ্রিকা, কল্পদ্রুম, ও (বাঙ্গলা) কাশীখণ্ডের পদ্যানুবাদ ও করুণা-নিধানবিলাস গ্রন্থরাজি।

৪ঠা··লালমোহন ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু (১৩১৬)। ইনি একজন নির্ভীক বক্তা। ভারতের অভাব-অভিযোগের কথা ইনি ওজস্বিনী ভাষায় বিলাতে প্রচারিত করেন। সংবাদপত্র-বিষয়ক আইন ও ইলবার্ট বিল পাশ হইলে ইনি ইঁহার বক্তৃতায় যে নির্ভীকতা ও দেশ-হিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা চির-স্মরণীয়।

প্যারীমোহন কবিরত্ন মহাশয়ের জন্ম (১২০১)। ইনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও সুগায়ক। ইঁহার রচিত বহু গীত যাত্রাওয়ালা ও ভিখারিদের মুখে শোনা যাইত। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহতাব চাঁদ ইঁহাকে "কবিরত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেন।

লালমোহন ঘোষ
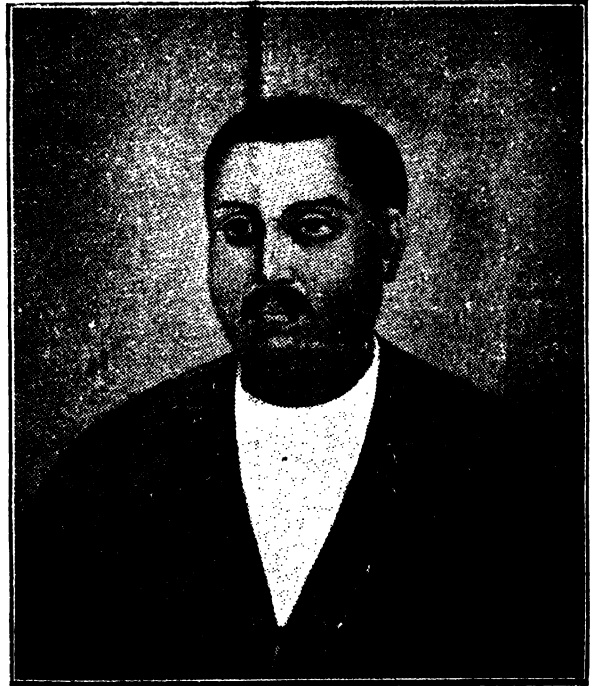
গিরিশচন্দ্র ঘোষ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু(১২৭৬)। ২০ বৎসর বয়সে বেঙ্গল রেকর্ডার নামক সাপ্তাহিক পত্রপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৩ খৃঃ ইহার 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামকরণ হয়, তখনও ইনি ইহাতে লিখিতেন। ১৮৬১ খৃঃ ইনি "বেঙ্গলী" পত্রের সম্পাদক হন। ১৮৬৮ খৃঃ ইনি বিখ্যাত ধনকুবের রামদুলালের জীবন-চরিত রচনা করেন।

৫ই···জগদানন্দ সরকার ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যু (১৭৮২ খৃঃ। ১৭০৪ শক)।

তারকনাথ প্রামাণিক মহাশয়ের জন্ম (১২২৩)। ইনি একজন প্রসিদ্ধ দাতা ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। সংযম, সহিষ্ণুতা, দেবদ্বিজে ভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগ ইঁহার কয়েকটী উল্লেখযোগ্য গুণ। ইনি সর্ব্বদাই বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া চলিতেন। দীনদরিদ্র ও নিরাশ্রিতের ইনি আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক ছিলেন। বহু ছাত্রের শিক্ষা-লাভের ব্যয়ভার ইনি প্রতি মাসে বহন করিতেন। শিক্ষার প্রতি ইঁহার বেশ উৎসাহ ছিল।

৬ই···তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু (১২৯৮)। প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'ইঁহারই' স্বর্ণলতা রচিত।

রাজা রামমোহন রায়

১০ই...কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মৃত্যু (১৩১৮)। শঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদসহ 'বেদান্তদর্শন', 'সাংখ্যদর্শন', 'চরিত্রানুমান-বিদ্যা' প্রভৃতি ইহাঁর গ্রন্থ।

১১ই...আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক খ্যাতনামা রাজা রামমোহন রায়ের ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে মৃত্যু (১৮৩৩)। ইনিই প্রথম মার্জ্জিত বাঙ্গালা গদ্য-লেখক।

১২ই...প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম (১২২৭)।

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম (১২৫৬)।

প্যারীচরণ সরকার

১৫ই...প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের মৃত্যু (১২৮২)। প্রসিদ্ধ শিশুপাঠ্য ইংরেজী গ্রন্থপ্রণেতা। "সুরাপান নিবারিণী সভা" ও "ওয়েল উইশার" এবং "হিতসাধক" পত্রদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইহাঁর শিক্ষকতার গুণে ইনি "Arnold of the East" উপাধিভূষিত হন।

১৬ই...দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের মৃত্যু (১৮৮৫)। ইহাঁর সঙ্গীতবিদ্যায় বিপুল পারদর্শিতা ছিল। "ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত" ও "গীতমঞ্জরী" ইহাঁর

দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়

বঙ্গসাহিত্যে এক শ্রেষ্ঠ দান। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইহাঁর অন্যতম পুত্র।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

বিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মৃত্যু (১৩২৪)। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—পিতাপুত্র, সনাতনী, কবি হেমচন্দ্র, সাহিত্য-সাধনা, রূপক ও রহস্য প্রভৃতি। ইনি সাধারণী, বঙ্গদর্শন ও নব-জীবনের সম্পাদক ছিলেন।

তারকনাথ পালিত মহাশয়ের মৃত্যু (১৩২১)। কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার। ইনি বিজ্ঞানালোচনার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পনের লক্ষ টাকা দান করেন।

২০এ···নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জন্ম (১২৪৩)।

২১এ...মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক "তত্ত্ব-বোধিনী" সভার প্রতিষ্ঠা (১৭৬১ শক। ১৮৩৯ খৃঃ)। অক্ষয়কুমার দত্ত ইঁহার প্রথম সম্পাদক।

২৩এ···কৃষ্ণদাস কবিরাজের মৃত্যুতিথি। চৈতন্যচরিতামৃত ইঁহার প্রসিদ্ধ রচনা। ইনি জাতিতে বৈদ্য, ধর্ম্মে বৈষ্ণব।

২৪···রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মৃত্যু (১৩০১)। ইঁহার গ্রন্থরাজির মধ্যে 'বাঙ্গালা ভাষা' ও 'বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' উল্লেখযোগ্য।

২৬এ···কালীময় ঘটক মহাশয়ের জন্ম (১২৪৭) ইঁহার রচিতগ্রন্থ—মিত্রবিলাপ, চরিতাষ্টক, ছিন্নমস্তা, কৃষিশিক্ষা প্রভৃতি।

২৭এ···কবিরাজ কৃষ্ণদাস সেন মহাশয়ের মৃত্যু (১৮১৩ খৃঃ)।

দীনেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের মৃত্যু (১৩০৫)।

মনোমোহন ঘোষ

৩১এ···প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও দেশভক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু (১৩০২)। ইনি দেশের অভাব-অভিযোগ ইংলণ্ডে গিয়া বিবৃত করেন। ইনি জাতীয় সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও একজন নির্ভীকচিত্ত পুরুষ ছিলেন। দেশ-প্রেমিক লালমোহন ঘোষের ইনিই ভ্রাতা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকজন চিত্রশিল্পী

[শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ]

মানুষ চিরকালই সৌন্দর্য্যের উপাসক। অসভ্য অবস্থা হইতেই মানুষ বৃক্ষ-শাখায়, গিরি-গুহায়, প্রস্তরখণ্ডের উপর বিচিত্রভাবে বিচিত্র-কৌশলে চিত্র অঙ্কিত করিয়া আপনার সৌন্দর্য্য-পিপাসা ব্যক্ত করিত। সৌন্দর্য্য-বোধ যখন প্রথম মানুষের মনে জাগিয়া উঠিত তখন সে বৃক্ষশাখায় ও হাড়ের উপর পশু পক্ষীদিগের রেখা-চিত্র অঙ্কন করিতে আরম্ভ করিত। এই সমস্ত অঙ্কনকার্য্য অতি বিচক্ষণতার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দান করিত। ইহার পরবর্ত্তী যুগে, অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, মানুষ পাহাড়-পর্ব্বতে ও গুহাগাত্রে পশু-পক্ষীর মূর্ত্তি খোদিত করিত। এই সমস্ত অঙ্কন ও খোদন-কার্য্য অতি যত্নের সহিত সম্পন্ন হইত এবং চিত্রটী যাহাতে আসল জিনিসের অনুরূপ হয় তাহার তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও পরিশ্রম করিত।

ইহার পর আমরা ঐতিহাসিক যুগে দেখিতে পাই—প্রথমতঃ মানুষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে, পরে চিত্রগুলিকে রঞ্জিত করিয়া নানারূপে বিচিত্রিত ও পরিবর্দ্ধিত করে। Spain ও প্রাচীন Egyptএ এই সকল চিত্রের খুব প্রচলন ছিল। Egypt ও Assyriaতে এই সময়ে ভাস্কর্য্য আরম্ভ হয়। খৃঃ পূঃ ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসবাসিগণ মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁতভাবে ভাস্কর্য্যে পরিস্ফুট করে। ইহাদের পরই চিত্র-জগতে স্পেন, ডচ, ফরাসী ও ইংরেজের অভ্যুত্থান। পূর্ব্বে ইংরেজ মিশনারিগণের নাকি মত ছিল—"Cursed be all who paint pictures"। এখন দেখা যায় সে মত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইংরেজ চিত্রকরগণের মধ্যে আমরা William Hogarthকে ইংরেজী চিত্রের স্রষ্টা বলিয়া জানি। কারণ, তিনিই প্রথমে ইংরেজী চিত্রশিল্পে স্বজাতীয় ভাব প্রবেশ করান। তিনি প্রথমে চিত্রশিল্পকে চিত্ততোষ দানে সক্ষম হ'ন এবং তিনিই প্রথম নিজের চিত্রগুলি খোদিত করিয়া জীবন্ত করিয়া তোলেন। এই বিশ্ব-বিশ্রুত চিত্রশিল্পীর জন্মস্থান—Bartholomew Close, Smithfieldএ। ১৬৯৭ খৃঃ অঃ ১০ই নভেম্বর তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক শিক্ষকের পুত্র। যৌবন কালে তিনি Leicester fieldsএ (এক্ষণে Leicester Square) একজন রৌপ্য-ব্যবসায়ীর নিকট রূপার উপর ক্ষোদন-কার্য্য শিক্ষা করিতেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে তিনি একজন ক্ষোদক (Engraver) রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইত্যবসরে তিনি Sir James Thornhillএর (ইনি একজন Potrait painter এবং Decorative artist বলিয়া পরিচিত ছিলেন) শিক্ষা-মন্দিরে চিত্র-অঙ্কন-বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করেন।

Hogarth, Thornhillএর শিক্ষা-প্রণালীতে বেশী দিন আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী ছিল কেবলমাত্র নকল করা। ইহা তাঁহার আদৌ ভাল লাগে নাই। তিনি প্রায়ই তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখরের উপর ক্ষুদ্র আকারে চিত্র অঙ্কিত করিতেন ও পরে কাগজের উপর তাহা বড় করিয়া আঁকিতেন। এইরূপে তিনি তাঁহার স্মরণশক্তি প্রখর করিয়াছিলেন। তিনি যাহা দেখিতেন তাহা নিজের মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন। এই বিশিষ্ট মনোভাব সত্ত্বেও তিনি Sir Thornhillএর বিদ্যালয়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং Thornhillএর বিনা অনুমতিতে তাঁহার কুমারী কন্যা Miss Jane Thornhillকে বিবাহ করেন।

ইহার চারি বৎসর পরে Mr. Gay 'The Beggar's Opera' নাম দিয়া একটী থিয়েটার খোলেন। Hogarth এই থিয়েটারের কয়েকটী সুন্দর দৃশ্য আঁকিয়া দেন। ইহাতেই তিনি জনসাধারণের নিকট পরিচিত হ'ন এবং এই সময়ে তিনি কয়েকখানি মূর্ত্তিচিত্র আঁকেন। এইগুলি চিত্র-জগতে নূতন ভাব আনয়ন করিয়াছিল। তিনি সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে তত ভালবাসিতেন না বলিয়াই সম্ভ্রান্ত পরিবারের চিত্র অঙ্কন করেন নাই। তিনি তাঁহার আত্মীয়দিগের, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের এবং তাঁহার অনুচরবর্গের চিত্র অঙ্কন করিতেন। তিনি যে সমস্ত মূর্ত্তিচিত্র আঁকিতেন তাহা অর্থের জন্য নয়, কেবলমাত্র আত্মতৃপ্তির জন্য। ক্ষোদনকার্য্য ও অপরাপর চিত্রের দ্বারা তিনি জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন এবং ইহার জন্যই তিনি গৃহে গৃহে পরিচিত ছিলেন। নাট্যচিত্রের দ্বারা তিনি বহু অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়াছেন দেখিয়া Sir James Thornhill তাঁহার উপর প্রীত হইয়াছিলেন।

ইতালিয়ান চিত্রকর Giotto প্রভৃতি Bible হইতে নীতিযুক্ত চিত্র অঙ্কিত করিতেন। Hogarthও এই সময়

Hogarth অঙ্কিত একখানি সাধারণ চিত্র দেওয়া গেল। চিত্রখানির নাম "The Shrimp girl"। চিত্রখানি দেখিলে মনে হয় ইহার জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন লোপ পাইয়াছে।

নূতনভাবে দেশের প্রচলিত প্রবাদ ও আমোদজনক গল্পগুলিকে চিত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন।

প্রভূত যশ ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তিনি বিলাসে কখনও মগ্ন হন নাই। তিনি অতি সাধারণভাবে ও সরল মনে কালযাপন করিতেন। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে তিনি পরলোকে যাত্রা করেন।

William Hogarthএর সমসাময়িক দুইজন চিত্রশিল্পী ছিলেন। একজন ছিলেন Richard Wilson এবং অপরজন Sir Joshua Reynolds। Richard Wilson যদিও প্রভূত যশ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থলাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। শেষ বয়সে তাঁহাকে দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। Richard Wilson ১৭১৪ খৃঃ অঃ ১লা আগষ্ট Montgomeryshire এর অন্তর্বর্ত্তী Penegoesএ জন্মগ্রহণ করেন। ঐদিনই Queen Anne মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন এবং George I সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন সামান্য ধর্ম্মযাজক এবং মাতা একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী ছিলেন। তাঁহার মাতার একজন আত্মীয় তাঁহাকে লণ্ডনে অঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

Hogarthএর ন্যায় ইনিও স্বাধীন গতিতে অঙ্কন কার্য্য করিতেন। ইঁহার মূর্ত্তিচিত্র আঁকিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ১৭৪৮ খৃঃ অঃ ইনি Prince of Wales এবং Duke of Yorkও তাঁহাদের শিক্ষকের মূর্ত্তিচিত্র আঁকেন এবং যে অর্থ ইহাতে প্রাপ্ত হয়েন সেই অর্থ দ্বারা তিনি ইতালী ভ্রমণ করিয়া আসেন। তিনি ইতালী গিয়া নানাভাবে প্রাকৃতিক দৃশ্য (Landscape painting) আঁকিতে থাকেন এবং Romeএর মধ্যে একজন প্রধান দৃশ্য-চিত্রকররূপে পরিচিত হ'ন। ইনিই প্রথম দেশবাসীকে তাঁহার দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন করিয়া

ইতালীর একটী প্রাকৃতিক দৃশ্য

দেখান। তাঁহার অঙ্কিত ইতালীর প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি অতি উচ্চদরে বিক্রীত হইয়াছিল, সেইগুলি দেখিতে এত সুন্দর হইয়াছিল যে, the Earl of Pembroke, the Earl of Thanet, the Earl of Essex, Lord of Bolingbroke, Lord Dartmouth প্রভৃতি বড় বড় ইংরেজ ব্যক্তিগণ অতি উচ্চহারে ছবিগুলি ক্রয় করেন। ১৭৫৬ খৃঃ অঃ যখন তিনি ইংলণ্ডে ফিরিলেন তখন পর্য্যন্তও তিনি বেশ সম্মান পাইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সময় অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিত্রভাবগ্রাহীদিগের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; সেইহেতু Englandএ তিনি সমাদৃত হ'ন নাই।

যাহা হউক কয়েকজন বন্ধুর অর্থ সাহায্যে তিনি জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। এইরূপে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। ১৭৬৮ খৃঃ অঃ যখন Royal Academy স্থাপিত হইল, George III. Richard Wilsonকে এই Academyর একজন প্রবর্ত্তক বলিয়া ঘোষণা করেন। Academy প্রদর্শনীতে তিনি একখানি অত্যুৎকৃষ্ট ছবি পাঠান। সেই ছবি George III ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়া Lord Bruteকে পাঠান।

Lord Bute তাহাকে দাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—৬০ গিনি। Lord Bute বলিলেন—দাম বড় বেশী। তাহার উত্তরে Richard Wilson বলিয়াছিলেন রাজাকে বলিবেন যেন তিনি Instalmentএ কিনেন। এই ঠাট্টা হয়তো রাজা বুঝিতে পারিতেন; কিন্তু Lord Bute তাহা বুঝিতে না পারিয়া অপমান বোধ করিয়াছিলেন। পরে অপমানের প্রতিশোধ স্বরূপ তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করেন। সেই সময়ে তিনি Royal Academyর পুস্তকাধ্যক্ষ (Librarian) হইলেন এবং অতিকষ্টে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইহার পর দুই তিন বৎসর পরে তিনি লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া নিজের গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং ১৭৮২ খৃঃ অঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

Sir Joshua Reynolds Rev. Samuel

শিশুর প্রার্থনা

Reynoldsএর পুত্র, ১৭২৩ খৃঃ অঃ ১৬ই জুলাই ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবন সুখেই কাটিয়াছিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই মেধাশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। যৌবনকালে ইনি সৌভাগ্যক্রমে Commodore Keppleএর সহিত পরিচিত হন। Commodore Kepple তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ভূমধ্যসাগর ও রোম প্রভৃতি ভ্রমণ করেন। রোম হইতে তিনি ফ্লোরেন্স ও ভেনিস ও ইতালীর অপরাপর দেশে ভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন। ইনি কখনও বিবাহ করেন নাই। ভেনিস ও রোম প্রভৃতি দেশের উচ্চাঙ্গের চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ইনি ইংলণ্ডের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যখন Royal Academy স্থাপিত হয় তখন ইহাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি করা হয়।

Reynolds কেবলমাত্র একজন চিত্রকর ছিলেন না, তিনি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। রাজা তাঁহাকে Knight উপাধি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছিলেন।

যদিও Reynolds বিবাহ করেন নাই, তথাপি তাঁহার গার্হস্থ্য-জীবন বড় সুখময় ছিল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে লইয়াই তাঁহার আমোদে দিন কাটিয়া যাইত। তাহাদিগের নানারূপ ছবি আঁকিয়া তিনি বেশ আমোদ উপভোগ করিতেন। এই সময়ই "শিশুর প্রার্থনা" "মাতা-পুত্র" "বাল্যকাল" প্রভৃতি অনেকগুলি চিত্র অঙ্কিত করেন।

মাতা-পুত্র

বাল্যজীবন কত মধুর তাহা তাঁহার ছবিতেই বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। শিশুর প্রার্থনা যে কত সরল, মায়ের ভালবাসা কত মধুর, তাহা ছবি দুইখানিতে বেশ বোঝা যায়।

৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার বাম চক্ষু নষ্ট হইয়া যায় এবং এই সময়ে তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে কয়েকজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়—এই শোকে এবং তিন বৎসর অসুখে ভুগিবার পর ১৭৯২ খৃঃ অঃ ২৩এ ফেব্রুয়ারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। তাঁহার মৃত্যুর পর Dr. Johnson বলিয়াছিলেন—"I know of no man who has passed through life with more observation than Reynolds."

কালোপরী

[শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল]

নীল লাল আর সাদা পরীর বাসার ঠিকানাটি,
বড় বড় কবির কৃপায় জেনেছি ত খাঁটী,
ওসব পরী গরীবের নয়, আমরা খোঁজ করি
কোন দেশেতে কোন বেশেতে আছেন কালোপরী,
আষাঢ়স্য প্রথম দিনে আকাশঢাকা মেঘে
কালোপরীর কাজলমাখা মূর্ত্তি ওঠে জেগে,
অত যদি দেরী না সয়—এই জ্যৈষ্ঠ মাসে
তালশাঁসে নয় কালো জামেই কালোপরীই হাসে,
কালো দীঘির কালোজলে পদ্ম যেথায় ফোটে
ভ্রমরী নয় কালোপরীই পদ্ম-মধু লোটে,
যদি বল পদ্মটা ত কালো নয় ক সাদা
আচ্ছা তবে পুকুর-পাড়ে নাই বা গেলে দাদা,
উঠান-কোণে চেয়ে দেখ কয়লা ঢালা আছে
কালোপরী আলো করি নিত্য সেথায় নাচে,
দাঁতে দেবার মিশি আছে, আছে কালির শিশি,
অমাবস্যার নিশি আছে গদাধরের পিসী,
কালোর দেশে কালোপরীর আস্তানা ঢের আছে,
সবার সেরা সস্তা ডেরা আছে হাতের কাছে,
প্রিয়ার গায়ের রঙের কথা কে এখন ভাই তোলে,
বিদায়-বেলায় কাজ নাই আর ওসব গণ্ডগোলে,
প্রিয়ার ভ্রমর-কালো চোখে, চামর-কালো কেশে
অমর হ'য়ে বাস করে প্রেম কালোপরীর বেশে।

গাছের গোড়ায় মাটীর মধ্যে এক প্রকার কীট লুকাইয়া থাকে তাহারা অত্যন্ত অনিষ্ট করে। ইহা-দিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া মারিয়া ফেলা উচিত। এক রকম পরগাছা তামাক-ক্ষেতে জন্মে; উহার নাম ভূঁকি (Orobanche)। ইহা অত্যন্ত অনিষ্ট করে; ইহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

দেশী তামাক—মাঘ-ফাল্গুন মাসে নীচের পাতাগুলি পুরট হইতে শুরু করে। তখন এইগুলি মোটা এবং আটাযুক্ত হয় এবং উহাদের উপরে তামাটে রংএর দাগ ফুটিতে থাকে। পুরট পাতাগুলি বাছিয়া গাছ হইতে একখানা বাঁকাছুরি দিয়া কাটিয়া লইবে। চাষী এই সময় প্রত্যহ সকালে ক্ষেত্রের মধ্যে যাইয়া এইরূপ পাকা পাতা সংগ্রহ করে ও ঘরে লইয়া আসে; পরে চারিটি করিয়া পাতার বোঁটা একসঙ্গে বাঁধিয়া বাহিরে একটা বাঁশের মাচানে ঝুলাইয়া দেয়। পাতাগুলি যখন প্রায় শুকাইয়া যায় তখন ঘরের ভিতর লইয়া সেইগুলিকে দেওয়ালের গায়ে কিংবা মাচানে ঝুলাইয়া রাখে। এইরূপে দুইমাস শুকাইলে পাতা বিক্রয়ের উপযোগী হয়।

মতিহারী তামাকের ব্যবস্থা একটু অন্যরূপ, কাটার পরে পাতাগুলি দিনভোর মাঠেই ফেলিয়া শুকাইতে হয়। সন্ধ্যায় সেগুলিকে ঘরে আনা হয় এবং পরদিন সকালে দেশী তামাকের মত ৪টি পাতার ঝুকি বাঁধা হয় এবং এইগুলি একটি মইএর উপর ৬"।৯" পুরু করিয়া এমন ভাবে সাজান হইয়া থাকে যে পাতার ডাঁটাগুলি সমস্তই বাহিরে থাকে। এই মইটি প্রত্যহ সকালে রৌদ্রে দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যায় ঘরে তোলা হয়। ৮।১০ দিন পর পুনর্ব্বার সাজাইয়া দিতে হয়, যেন পাতা চাপা লাগিয়া না পচে।

নিকৃষ্ট জাতের মতিহারী তামাকের গাছ খুব ঘন করিয়া ক্ষেতে রোপণ করা হয়। এ কারণে গাছগুলি ছোট হয়. উহাদের গোড়া কাটিয়া মাঠেই রৌদ্রে শুকান হয়। এইগুলির স্বাদ ভাল হয় না, এজন্য নিকৃষ্ট গুড়ক তামাকে ব্যবহৃত হয়।

দেশী তামাকের চাষ-আবাদ সম্বন্ধে এই পত্রিকার উল্লিখিত বিবরণ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে Superintendent of Agriculture-in-charge, Tobaccoর কাছে আবেদন করিতে হইবে। তাঁহার ঠিকানা—ঢাকা ফার্ম্ম; পোষ্ট রমনা, জেলা ঢাকা।

—সম্মিলনী

আলোচনা

"উর্ব্বশী।"

[অধ্যাপক—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন এম-এ]

"পঞ্চপুষ্পের" গত আষাঢ়সংখ্যায় "উর্ব্বশী" নাটক সম্বন্ধে অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত বিবরণ পড়িয়া সুখী হইলাম।

উত্তরপাড়ায় অবস্থান-কালে সেখানকার প্রাচীন পুস্তকাগারে "উর্ব্বশী" নাটক পড়িতে পাই। তখনকার লেখা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হইতে দেখিলাম, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতির রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরিনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় পুস্তকখানি আগাগোড়া সংশোধন করিয়া দেন। অধ্যাপক যোগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে "হরিলাল" নামটী কি তবে মুদ্রাকর-প্রমাদ? আমার ত তাহাই মনে হইতেছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কৃত অনুবাদ সুবিদিত এবং সেকালে ছাত্রবৃত্তি ও প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য পাঠ্য নির্দিষ্ট ছিল। দ্বিজ-তনয়া তাঁহারই কোনও আত্মীয়া কি?

"উর্ব্বশী"তে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। যদিও উহা পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত, এবং দৃশ্য-বিভাগ বলিয়া বস্তু নাই, তথাপি চতুর্থ অঙ্কে প্রতিষ্ঠানপুর হইতে অমরাবতীতে দৃশ্য পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। সুতরাং নামে না হইলেও কার্য্যতঃ অঙ্কের সংখ্যা পাঁচ ইহা স্বীকার করিতে হইবে অথবা বলিতে হইবে যে "দ্বিজতনয়া" দৃশ্যবিভাগ প্রবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অধ্যাপক গুপ্ত মহাশয় উপসংহারে বলিতেছেন— "নাটকখানি গীতবহুল এবং গদ্য ও পয়ার ছন্দে বিরচিত।" নাটকে গদ্য থাকা সাধারণতঃ আশা করা যাইতে পারে, ছন্দের কথা উল্লেখ করিলে কিন্তু ত্রিপদীর কথাও বলা প্রয়োজন, কারণ "উর্ব্বশী"তে পয়ার ও ত্রিপদী, উভয়েরই ছড়াছড়ি আছে।

"দ্বিজ তনয়া" কে ছিলেন তাহার রহস্য রহিয়া গেল।

প্রাচীন ভারতে বৃষ্টিমাপক যন্ত্র

[শ্রীবিমলাচরণ দেব এম্-এ, বি-এল্]

প্রতি বৎসর নূতন পঞ্জিকায় লেখে—এ বৎসর সমুদ্রে এত আঢ়ক জল, পর্ব্বতে এত আঢ়ক জল। এ কথাটার মর্ম্ম বোধহয় অনেকে বুঝেন না। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে একটী সুন্দর তথ্য জানা যায়।

অনেকেই জানেন যে, বর্ত্তমান সভ্য-জগতে অনেক স্থানে Raingauge বা বৃষ্টিমাপক যন্ত্র রাখা হয়। তাহার দ্বারা কোন স্থানে কোন সময়ে কি পরিমাণ বৃষ্টি হইল মাপিয়া দেখা হয়। যথা—অমুক দিন এত

ঘণ্টায় এত ইঞ্চি বৃষ্টি হইল বা বৎসরের প্রথম দিন হইতে আজ দিন পর্যান্ত অমুক স্থানে এত ইঞ্চি বৃষ্টি হইল। এই সমস্ত আবহ-বিভাগের রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতেও বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের ব্যবহার ছিল। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, ২৩ অধ্যায়, ২ শ্লোকে পাই :—

"হস্তবিশালং কুণ্ডকমধিকৃত্যাম্বুপ্রমাণনির্দেশঃ।
পঞ্চাশৎপলমাঢ়কামনেন মিনুয়াজ্জলং পতিতম্॥"

অর্থাৎ বর্ষণের প্রমাণ নির্দেশ করিবে এক হস্ত ব্যাসের কুণ্ডক-সাহায্যে। অর্থাৎ এক হস্ত ব্যাসের একটি কুণ্ডক বর্ষণের সময় বাহিরে রাখিলে তাহাতে যে জল জমিবে, তাহা মাপিবে—যদি ৫০ পল হয়, তাহা হইলে এক আঢ়ক বৃষ্টি হইয়াছে জানিবে। ৪ আঢ়কে এক দ্রোণ।

বৃহৎসংহিতা, ২১ অধ্যায়, ৩২ শ্লোকের ভট্টোৎপলের টীকায় পরাশর হইতে উদ্ধৃত আছে :—

"সমে বিংশাঙ্গুলানাহে দ্বিঃতুঙ্গাঙ্গুলোচ্ছ্রিতে।
ভাণ্ডে বর্ষতি সম্পূর্ণে জ্ঞেয়মাঢ়কবর্ষণম্॥"

অর্থাৎ ৮ অঙ্গুলি উচ্চ ও ২০ অঙ্গুলি ব্যাস একটা ভাণ্ড যে বর্ষণ দ্বারা পূর্ণ হইবে, সে বর্ষণে ১ আঢ়ক বৃষ্টি হইয়াছে জানিতে হইবে।

এখানে দেখিতেছি—বরাহমিহির-মতে এক হস্ত (অর্থাৎ ২৪ অঙ্গুলি) ব্যাসভাণ্ড। পরাশর-মতে ২০ অঙ্গুলি ব্যাসভাণ্ড। বরাহমিহিরকথিত ভাণ্ডের উচ্চতা নির্দ্দিষ্ট নাই, আবশ্যকও নাই, কারণ যতটুকু জল জমিবে তাহা মাপিয়া দেখিতে হইবে। পরাশরকথিত ভাণ্ডের উচ্চতা নির্দ্দিষ্ট আছে, কাজেই তাহার ঘন পরিমাণ জানা। জল আর মাপিবার প্রয়োজন নাই। ভাণ্ডপূর্ণ হইলেই এক আঢ়ক বর্ষণ হইয়াছে জানিতে হইবে।

এখানে আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। মাপিয়া দেখিবার প্রথা দুইটা ছিল—কালিঙ্গ মান ও মাগধ মান। এখানে মাপিতে হইবে মাগধ মাপে।

চরকসংহিতা, ১-১২-১৭ শ্লোকেও আছে :—

"মানং তু দ্বিবিধং প্রাহুঃ কালিঙ্গং মাগধং তথা।
কালিঙ্গান্মাগধং শ্রেষ্ঠমেবং মানবিদো বিদুঃ॥"

মাসপঞ্জী

আশ্বিন

১লা—কলিকাতার কমিশনার সার চার্লস্ টেগার্টের উপর বোমা-নিক্ষেপের অপরাধে ধৃত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র মজুমদারের আজীবন দেশান্তরের দণ্ড। জালিয়ানাবাগে পুলিশের হানা। পার্লামেন্টের সভ্য মিঃ ওয়েলকের নিকট মহাত্মাজীর প্রত্যুত্তর।

২রা—দমদমা জেলে খাদ্য সম্বন্ধে চাঞ্চল্য। কলিকাতার নানাস্থানে খানা-তল্লাস—বাগবাজার তরুণ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ বসু এবং অন্যান্য কয়েকজন সভ্য ধৃত। মহাত্মা গান্ধীর ষাষ্টি জন্মদিন পালন।

৩রা—লণ্ডনে ভীষণ ঝড়ের প্রকোপ—বহু নিহত, আহত এবং গৃহহারা।

৫ঠা—শিবসাগরে বন্যার প্রাদুর্ভাব।

৬ই—বোম্বাই ওয়ার কাউন্সিলের অষ্টম সভাপতি মিসেস্ রমাবাঈ কামদার তিনমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

৬ই—শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মুক্তি। নাগপুরে গোলটেবিল বৈঠকের ডেলিগেটদের মিছিল। কান্দিতে বোমা-বিস্ফোরণ—একজন মহিলা আহত। বড়বাজার কংগ্রেস-কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম রায় মুক্ত।

৭ই—কলিকাতা কর্পোরেশনে সুভাষচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা।

৮ই—দাসপুরে ১২ জনের দেশান্তর ও ২১ জনের কারাদণ্ড।

৯ই—চট্টগ্রামে এ, বি, রেলওয়ের গাড়ী লাইন-ভ্রষ্ট—ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান আহত। বোম্বাইয়ে পুলিশের সহিত জঙ্গল-আইন-ভঙ্গকারী সত্যাগ্রহীদলের সংঘর্ষ—১৫ জন নিহত এবং ৫০ জন আহত। বোম্বাইয়ে কংগ্রেস-সভায় চাঞ্চল্য।

১০ই—মহাত্মাজীর স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া প্রচার। কাবরায় খাজনা আদায়ের উপর গভর্ণমেণ্টের নজর। কলিকাতায় বহু রাজবন্দীর মুক্তি।

১১ই—লাহোরে এশিয়ার নারী-সম্মেলনের বৈঠকের উদ্যোগ। বোম্বাইয়ে গোল-টেবিল-বৈঠকের প্রতিবাদ।

১২ই—বোম্বাইয়ে ৬০ বৎসর বয়স্কা মুসলমান মহিলা মিসেস্ লথমানির কারাদণ্ড ভুল বলিয়া স্থিরীকৃত এবং উহার অপরাধ সামাজিক কার্য্য বলিয়া ঘোষিত।

১৩ই—লণ্ডনে লর্ড বার্কেনহেডের মৃত্যু। মেদিনীপুরে পুলিশের গুলিবর্ষণ—একজন নিহত।

১৪ই—বোম্বাইয়ে গোলটেবিল-বৈঠকের প্রতিবাদ।

১৫ই—লণ্ডনে ভারতীয়দের দ্বারা মহাত্মা গন্ধীর জন্মোৎসব পালন। বিলাসপুরে রেল-দুর্ঘটনা—একজন নিহত। মুন্সীগঞ্জে পদ্মার প্রকোপ—[illegible] আশঙ্কা—বহুগ্রাম জলমগ্ন।

১৬ই—শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেল অসুস্থ।

১৭ই—গোলটেবিল-বৈঠকের প্রতিনিধি আলোয়ারের মহারাজা স্যর তেজবাহাদুর, শ্রীযুক্ত জয়াকর, মিঃ জিন্না প্রভৃতি ২২ জনের ইংলণ্ড উদ্দেশে ভারত পরিত্যাগ। তমলুকে সংঘর্ষ—পাঁচজন আহত। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা স্থগিত।

১৮ই—মুস্লিম ইনষ্টিটিউট হলে বাঙ্গালার মুসলমান প্রতিনিধি এ, কে, ফজলুল হক ও এ, এচ, গাজনভীকে সম্মান প্রদর্শন। বিউভেসে 'আর—১০১' আকাশ-যান-দুর্ঘটনা, বহু প্রধান প্রধান অফিসার নিহত এবং আহত।

১৯এ—'আর-১০১' আকাশ-যানের দুর্ঘটনায় ৪৭ জনের মৃতদেহ আবিষ্কার।

২০এ—লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলার রায়-প্রকাশ। শ্রীযুক্ত ভগৎসিং, শ্রীযুক্ত সুখদেব ও শ্রীযুক্ত রাজগুরুর প্রাণদণ্ড এবং কিশোরীলাল, মহাবীর সিং, বিজয়কুমার সিংহ, শিব বর্ম্মা, গয়া প্রসাদ, জয়দেব ও কমলনাথ তেওয়ারীর আজীবন দেশান্তর এবং কুন্দনলাল ও প্রেম দত্তের ৭ বৎসর ও ৫ বৎসর কারাদণ্ড।

২১এ—মামুদাবাদের মহারাজের অসুস্থতার জন্য গোল-টেবিল-বৈঠকে গমন স্থগিত। লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলার রায়ে লাহোর ও বোম্বাইয়ে চাঞ্চল্য। বোম্বাইয়ে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নরীমান সম্বর্দ্ধিত।

২২এ—লাহোর ষড়যন্ত্রের রায়ের প্রতিবাদে কলিকাতায় ও ভারতের নানাস্থানে হরতাল পালন।
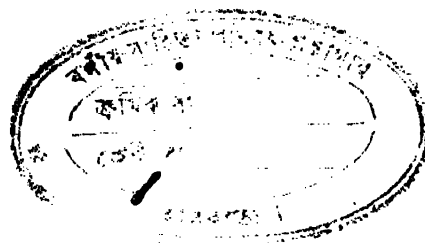
বিজয়ার সম্ভাষণ

আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-অনুগ্রাহক বন্ধু-বান্ধবদিগকে বিজয়ার প্রীতি-অভিবাদন ও যথাযোগ্য প্রণাম ও নমস্কার জানাইয়া আবার কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম। যে পরিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর এবার মায়ের আগমন হইয়াছিল, সে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দেশের এই দুর্দ্দিনে ভারতবাসী দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিয়া জননীর অভয়-মূর্ত্তির দিকে সোৎসাহে চাহিয়া প্রাণের আগ্রহে শান্তি ভিক্ষা করিয়াছে। বিজয়ার দিন আত্মার মিলন-উৎসব। জগজ্জননীর চরণে আমাদের এই কামনা যেন এই মিলন উৎসবের ফলে মিলন-বন্ধন চির-অক্ষুণ্ণ থাকে।

* * *

উমানন্দের পাদমূলে সলিল-শয়নে

আসামের ভিতর কামাখ্যা একটী পীঠস্থান। এখানে মাতার যোনি পতিত হইয়াছিল, ভারতের নরনারী আকুল প্রাণে এখানে ছুটিয়া আসে। দেবী-দর্শনের পূর্ব্বে ভৈরব উমানন্দকে দেখিতে সকলে ছুটিয়া থাকে। এ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। ব্রহ্মপুত্র নদের গর্ভে একটী ছোট দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের উপর পর্ব্বতের মাথায় উমানন্দ বিরাজ করেন, ইংরাজেরা এই পর্ব্বতের নাম দিয়াছেন Peacock Hill ময়ূর-পাহাড়। এখানে অসংখ্য ময়ূর-ময়ূরীকে নৃত্য করিতে দেখা যায়। গৌহাটী হইতে এ স্থানের দূরত্ব খুবই অল্প। পারাপারের বাহন আমাদের দেশের শালতী বা ডোঙ্গার ন্যায় ছোট নৌকা। পূজার ছুটিতে এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের সম্পাদক ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, পিএইচ-ডি সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিতে গিয়াছিলেন। পরিবারের ভিতর ছিল তাঁহার পত্নী, ৬ বৎসর বয়সের পুত্র ও এক বৃদ্ধা ঝি এবং একজন পাচক। এই দলের পথি-প্রদর্শক হ'ন কটন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র গিরীশচন্দ্র বড়ুয়া। এইখানে একটী ঘূর্ণি আছে ও কয়েকটী ছোট ছোট পাহাড় আছে। এই ঘূর্ণির ভিতর পড়িলে আর রক্ষা নাই। ঠিক সংবাদ পাই নাই এই ঘূর্ণির ভিতর পড়িয়াই ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ সপরিবারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন কি না? সংবাদ পত্র হইতে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহা হইতে বলিতে পারা যায় প্রবল তরঙ্গে বিপর্য্যস্ত হইয়া নৌকাখানি পাহাড়ের পাদমূলে আসিয়া ডুবিয়া যায়। মাঝি ও পাচক কোন গতিকে প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে। বাঙ্গলার যে কৃতবিদ্য সন্তান আজ উমানন্দের পাদমূলে সলিল-শয়নে চিরনিদ্রায় শায়িত রহিল, তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে বলিবার ভাষা আমাদের নাই। মৃত্যুকালে ডাঃ গৌরাঙ্গনাথের বয়স হইয়াছিল মাত্র ৪১ বৎসর।

* * *

এইখানে ১৯০৮ সালে যখন আমরা পাঁচজন বন্ধু মিলিয়া দেবী দর্শনে গিয়াছিলাম, সে সময়ে ধুলা-পায়ে প্রথমেই উমানন্দ দেখিতে যাই, সঙ্গে ছিল আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্রজপতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র সোদরপোম রঘুপতি (এক্ষণে Capt R. Bannerjee কলিকাতার এক্স-রে-বিশারদ ডাক্তার) তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। অপরাহ্নে ঝড়-ঝাপটা কিছুই ছিল না। একজন মাঝি আমাদিগকে লইয়া চলিল। বেচারার অসীম সাহস দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। প্রথমে সে আমাদিগকে গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল, 'আমরা জলের মানুষ—জলকে আমরা ভয় করি না।' অবশ্য সে নিজের অসমীয়া ভাষায় কথা বলিয়াছিল। তার পর হঠাৎ যখন একটা বড় জাহাজের তরঙ্গ আসিয়া আমাদের ছোট ডিঙ্গিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ঘূর্ণির ভিতর ফেলিয়া দিল, তখনও তাহার বীরত্বের কিছুমাত্র হ্রাস দেখি নাই—প্রাণপণে সে চেষ্টা করিতে লাগিল—একঘণ্টা চেষ্টার পর সে হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাবু নারলেম"—আর পারলাম না। আমি বন্ধুদের বয়োজ্যেষ্ঠ। তাহাদের মুখ দেখিয়া দেবাদিদের নাম স্মরণ করিতে লাগিলাম। তাহারা বলিতে লাগিল, 'দাদা, পাড়াটা যে অন্ধকার হ'য়ে যাবে।' আমি আশ্বাস দিলাম ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হ'বে ভাই ভয় কি? তাঁকে ডাক। দেবাদিদেবের অনুগ্রহে জানি না কেমন

করিয়া সেই বিপদসঙ্কুল পথ হইতে নৌকা পাদমূলে আসিয়া রক্ষা পাইল।

*　　*　　*

তাই বলিতেছি এই স্থানে যখন মাঝে-মাঝে এই-রূপ নৌকাডুবি হয়, তখন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য একটী ব্রীজ তৈয়ারী করা, যাহাতে উমানন্দকে দেখিতে সকলেই অনায়াসে যাইতে পারে। এখানকার পাণ্ডারা ও সমগ্র হিন্দু-সমাজ যথাযোগ্য ব্যয়ভার বহন করিতে কোন দিনই পশ্চাদ্‌পদ হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

*　　*　　*

জার্ম্মাণীতে ভারতীয় ছাত্রের কৃতিত্ব

জার্ম্মাণীর মিউনিক শহরে 'ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব ডাইড্রিউশ্ একাডেমী' বলিয়া যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার কর্ম্মকর্ত্তারা সম্প্রতি কলিকাতার ডাক্তার ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী এম-বিকে টুবিঙ্গেন মেডিকেল কলেজে গবেষণার জন্য বৃত্তি দিয়াছেন। তিনি সেখানে শিশু-চিকিৎসা সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন।

*　　*　　*

বন্ধু-বিয়োগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, মহানবমীর দিন আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু 'পুষ্পপাত্রে'র অন্যতম সম্পাদক সতীশচন্দ্র মিত্র পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি লক্ষ্মীবিলাস প্রেসের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন। সাহিত্য ও কলা-বিষয়ে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। সাহিত্যের মন্দিরে তিনি বহুবার বহু অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হ'ন। প্রথম জীবনে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ধীরেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের সম্পাদকতায় সচিত্র 'নমুনা' পত্রিকা বাহির করেন। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে তিনি ঐ পত্রের সম্পাদন ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। তারপর প্রথম শ্রেণীর সচিত্র সাহিত্যিক সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিবার জন্য তিনি 'প্রবাহিণী', 'বাসন্তী' প্রভৃতি কয়েকখানি পত্রই প্রকাশ করেন। তারপর শ্রদ্ধেয় ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় প্রথমে গল্পের কাগজ 'পুষ্পপাত্র' বাহির করেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক বন্ধুবৎসল মিত্রবিয়োগে আমরা সন্তপ্ত।

*　　*　　*

সন্তরণে সহনশীলতা

একাদিক্রমে সন্তরণে সহনশীলতার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-ক্ষণস্থায়ী পরিচয় দিবার জন্য আমাদের কল্যাণভাজন শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার ঘোষ হেদুয়া পুষ্করিণীতে সে-দিন ৬৭ ঘণ্টা ১৬ মিঃ কাল সন্তরণ করেন। এই রেকর্ডকে অতিক্রম করিবার জন্য গত ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে মণ্টার আর্থার রিজ্জো সন্তরণ দিতে আরম্ভ করেন ও ৬৮ ঘণ্টা ১১ মিঃ ৬ সেকেণ্ড সন্তরণ দিয়া প্রফুল্লকুমারের সময়কে অতিক্রম করেন। ইহার সন্তরণের সময় কিছুক্ষণের জন্য মণ্টার গবর্ণর সদলবলে উপস্থিত ছিলেন।

১৬ই অক্টোবর তারিখে বিলাতের ওয়াপিং বাথে জগতের মধ্যে এ সম্বন্ধে রেকর্ড স্থাপন করিবার জন্য হাইদ্রাবাদের সন্তরণবিদ্ সাফি অহম্মদ নামিয়াছেন।

এলাহাবাদের রবীন চাটুজ্জেও শীঘ্রই কলিকাতায় আসিয়া আর একবার চেষ্টা করিবেন।

*　　*　　*

ত্রিশ মাইল সন্তরণ-প্রতিযোগিতায়

আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অখিল-ভারত সপ্তম সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় এবার শ্মশানেশ্বর স্পোর্টিংএর শ্রীমান্ নলিনচন্দ্র মালিক প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। গত বৎসরও শ্রীমান্ প্রথম হইয়াছিল। এই ত্রিশ মাইল সে ৫ ঘণ্টা ২ মিঃ সময়ে আসিয়াছে। গতবৎসর সে ইহার অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে আসিয়াছিল। সেণ্টাল সুইমিংএর শ্রীমান্ কালীপ্রসাদ রক্ষিত ২য় স্থান ও আহিরী-টোলা-স্পোর্টিংএর সুধীরকুমার ঘোষ ৩য় স্থান অধিকার করে। ইহাদের যথাক্রমে ৫ ঘণ্টা ২৮ মিঃ ৩০ সেঃ ও ৫ ঘণ্টা ৩১ মিঃ ৩০ সেঃ লাগিয়াছিল।

এই প্রতিযোগিতায় ১৭ জনের ভিতর ১৩ জন গন্তব্য স্থানে আসিতে পারিয়াছিল। এবারে বেলুড়ের কাছে প্রতিযোগীদের দুর্য্যোগের ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছিল।

*　　*　　*

বাঙ্গালী সঙ্গীতে কুমারী বীণা আঢ্যের দক্ষতা

কুমারী বীণা আঢ্যের বাড়ী কলিকাতায় ইটালী অঞ্চলে। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিলাতে সঙ্গীতশিক্ষা করিতে যান এবং সেখানে বিলাতী সঙ্গীতশাস্ত্রে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া যশোমাল্যে মণ্ডিত হইয়াছেন। তিনি যে কেবল বিলাতী বাদ্যসংযোগে গান করিতে পারেন তাহা নহে, গোবিন্দ দাস রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের বাঙ্গালা গানে ইংরাজ শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিয়া সুযশও অর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা কুমারীর এই সাফল্যে আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

*　　*　　*

আগা খাঁর পুরস্কার

হিজ হাইনেস　　　　খাঁ যে কোন ভারতবাসী একাকী

উড়ো জাহাজে করিয়া ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ-আফ্রিকার কেপটাউন পর্য্যন্ত যাইবেন তাঁহাকে ৫০০ পাউণ্ড পুরস্কার দিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই পুরস্কারের জন্য কলিকাতার জনৈক মুসলমান যুবক মিঃ এ, এম, মোরাদ বোম্বাই শহরে উড়ো-জাহাজ ও সরঞ্জামাদি কিনিতে গিয়াছেন ও একটী Gipsy Moth খরিদ করিয়াছেন। শীঘ্রই তিনি পুরস্কারের জন্য কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবেন।

মোরাদের বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। ফ্লাইং ক্লাবের প্রধান শিক্ষক মিঃ ডাব্লিও, এফ ওয়র্ণারের শিক্ষাধীনে থাকিয়া ইনি ১ম শ্রেণীর পাইলটের লাইসেন্স পাইয়াছেন, যাহার বলে ইনি বিট্রিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র গমনাগমনের অধিকারী হইয়াছেন। অবশ্য ইহাও বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়।

আমরা তাহার সাফল্য সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

*　*　*

"ডমরু" ও "নাগপাশ" পুস্তক বাজেয়াপ্ত

অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় 'ডমরু' নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। 'নাগপাশ' নামে অপর একখানি পুস্তকও বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি সরকার বাহাদুর এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন যে ঐ ঐ পুস্তক যেখানে পাওয়া যাইবে সেইখানে উহা সরকার-কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইবে।

*　*　*

স্যর জগদীশচন্দ্র

স্যর জগদীশ য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর নিকট তাঁহার নবাবিষ্কৃত পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়া আসিয়াছেন যে, প্রাণী ও উদ্ভিদের মাংসতন্তুর (tissues) উপর কার্য্যকারিতায় আশ্চর্য্যরূপ ক্ষমতা আছে। এই আবিষ্কারের উপর মিলানের **Serum-Theraputic Institute**এ পরীক্ষা দ্বারা স্যর জগদীশের বাণী—সর্ব্বত্র জীবন-ধারার সমতা—প্রমাণিত হইয়াছে।

*　*　*

প্রসিদ্ধ নট শিশিরকুমারের সম্মান

গত ১০ই অক্টোবর তারিখে প্রসিদ্ধ নট-শিশিরকুমার ভাদুড়ী সদলবলে নিউইয়র্ক শহরে উপস্থিত হইয়াছেন। সমগ্র শহরের পক্ষ হইতে City Hallএ তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। আশা করি শীঘ্রই নিউইয়র্ক-বাসীরা তাঁহার অপূর্ব্ব অভিনয়ের পরিচয় পাইবেন।

*　*　*

উর-আবিষ্কার

সম্প্রতি মেসোপোটেমিয়া হইতে Mr. Lenard Woolley বিলাতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। উর-খনন কার্য্য হইতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে নোয়ার বন্যার ঠিক পরবর্ত্তী কালের সভ্যতার পরিচয় তিনি পাইয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য পাঠকদিগের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিব। এই সকল কার্য্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও পেন্‌সিলভেনিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়-কর্ত্তৃক এক-যোগে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে একটী মনুষ্যের কঙ্কাল (skeleton) পাওয়া গিয়াছে। মেসোপোটেমিয়ায় যত-গুলি মানবের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে ইহা তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। ইহা বন্যার যুগের অব্যবহিত পরের সময়ের এবং নোয়ার পরবর্ত্তী কালের সমসাময়িক বলিয়া অনুমিত হয়। মাটীর ভারে ইহা কতকটা চেপ্টা হইয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু দন্তপাটী বেশ সুন্দর সুরক্ষিতভাবেই আছে।

মেসোপোটেমিয়ায় প্রস্তর-যুগ বলিয়া কোন সময় ছিল না। এ স্থান প্রথমে জলমগ্ন অবস্থায় ছিল। সভ্য মানব আসিয়া এখানে প্রথমে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ধাতু-নির্ম্মিত অস্ত্র ইহারা ব্যবহার করিতে জানিত। এখনকার অধিবাসী অপেক্ষা দৃঢ়তর কঞ্চি ও শর (Reeds) দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিত। সময়টা ঠিকমত ধরিতে না পারিলেও খৃঃ পূঃ ৩৫০০ বছরের আগে যে তাহারা এরূপ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই। ইহার পরবর্ত্তী কালের গৃহাদি নির্ম্মাণের ছয়টী বিভিন্ন স্তর পাওয়া যায় ও তাহার ৮ ফুট নিম্নে কুম্ভকারদের পরিত্যক্ত মৃত্তিকার অবশিষ্ট অংশ পাওয়া গিয়াছে। এইখানে বন্যার চিহ্ন বিদ্যমান। এখানে ইষ্টকের বাড়ী-ঘরের নমুনাও পাওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশ গৃহই কঞ্চি, শর মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারাই নির্ম্মিত। অনেকগুলি শর একত্র করিয়া গৃহের স্তম্ভ গঠিত হইত।

শস্য ভাঙ্গিবার যাঁতাও পাওয়া গিয়াছে। রন্ধন করা হাড় হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এখানকার অধিবাসীরা রন্ধন কার্য্য জানিত; গো, ভেড়া ও ছাগলের হাড় প্রচুর পরিমাণে এখানে পাওয়া গিয়াছে।

বহু জল-পাত্রের ভিতর একটীতে গাছ-গাছড়ার রসা-বশিষ্ট পাওয়া গিয়াছে। মিঃ উলি বিবেচনা করেন ইহাতে পানীয় দ্রব্য ছিল।

নব পরিচয়

[রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর]

চণ্ডীদাসে কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে।

সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্য জুড়িয়া এই কালিয়া বঁধুর সঙ্গে 'নব পরিচয়ের' চিরনবীন কাহিনী। শ্যামসুন্দর চিরনবীন কিশোর, শ্রীরাধা চিরনবীনা কিশোরী। নব কিশোর বয়সে রূপেরও যেমন ছটা, প্রেমেরও তেমনি মাধুর্য্য। জীবনে এমন সময় আর আসে না। যখন কিশোর-কিশোরী বরবধূ প্রেমের প্রথম স্পন্দনে চমকিত হয়, তখন সে এক আনন্দ! সেই প্রথম শুভ-দৃষ্টি! সেই নব পরিচয়।

যাহার হৃদয়ে প্রেম আছে, সেই রসিক। "পিরীতি রসের সার।" সকল রসের সেরা প্রীতি। শৃঙ্গার রসই আদি এবং শ্রেষ্ঠ রস। প্রেম চিরদিনই নূতন। প্রেম কখনও প্রবীণ হয় না। প্রেম যখন প্রবীণ হয়, যখন পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে তাহার পরমায়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। যতদিন প্রেমের সবুজ আভা হৃদয়ে খেলে, ততদিনই মানুষ কিশোর থাকে। তাই প্রেমের কথা বলিতে গেলেই সেই চিরকিশোর কিশোরীর কথা মনে পড়ে। তেমন পিরীতির আদর্শ আর কোথায় পাইব?

চণ্ডীদাস কয় ঐছন পিরীতি
জগতে কি আর হয়?
এমন পিরীতি না দেখি কখন
ইহা না কহিলে নয়।

কিশোরী মুগ্ধা নায়িকা। সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার সরলতাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। কখনও তাহাকে বালিকা বলিয়া ভ্রম হয়, কখনও যুবতী বলিয়া মনে হয়।

বিদ্যাপতি কহ শুন বরকান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান॥

হে সুন্দর কানাই, সে তরুণ (যুবতী) বা শিশু তাহা চেনা যায় না। জীবনের এই সময় বড় মধুময়। এই যে 'কো কহু বালা কো কহু তরুণী' এই শুভ সন্ধিক্ষণই কৈশোর। এ সেই বয়স যখন প্রথম নয়ন-কোণে চকিত চাহনি খেলে, আবার তার পরক্ষণেই বসন ধূলি-লুণ্ঠিত হয়।

ক্ষণং সরলবীক্ষণং ক্ষণমপাঙ্গ সংবীক্ষণং
ক্ষণং রজসি খেলনং............

কেহ কোনও ঠাট্টা করিলে বা কিছু বলিলে
কাঁদন মাখি হাসি দেয় গারি।—বিদ্যাপতি

হাসি-কান্নায় মিশাইয়া গালি দেয়। কি সুন্দর সেই কাঁদনমাখা হাসিপূর্ণ গালি, তাহা যাহারা দেখিয়াছে তাহারাই জানে। তখন—

আধ আঁচর খসি আধ বদনে হসি
আধহি নয়ান-তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥—বিদ্যাপতি

দেখিলাম আধ আঁচল খসিয়া পড়িতেছে, ঈষৎ হাসি অধর-কোণে মিলাইতেছে, নয়নের চটুল চাহনিও ঈষৎ ঢেউ খেলিয়া গেল, বক্ষ আধ উন্মুক্ত হইল আবার তখনই আধ আবৃত হইল—এই সেই প্রণয়-বিহ্বলা নবীনা কিশোরী!

শ্রীকৃষ্ণও 'সামর সুন্দর' না কিশোর।
'শ্যাম নব-কিশোর বয়েস মণিকাঞ্চন—অভরণ'
চূড়া চিকণ বনান। জ্ঞানদাস

তাহার কিশোর বয়স, অঙ্গে নানা মণিকাঞ্চনের অলঙ্কার আর মোহনচূড়া অতি সুচিক্কণভাবে নির্ম্মিত। শ্রীমতী বলিতেছেন—

তরুতলে ভেটল তরুণ কানাই।
নয়ন-তরঙ্গে জনি গেলিহু সিনাই।—বিদ্যাপতি

নীপ তরুমূলে কিশোর কৃষ্ণকে দেখিলাম, তাহার দৃষ্টি অমিয়-হিল্লোলে যেন আমাকে স্নান করাইয়া দিল।

আমি তখন দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। দৃষ্টি ফিরাইবে কে? মন? মনও আমার দৃষ্টির সঙ্গে চলিয়া গেল। তখন কি করি? শাশুড়ী ননদিনী সঙ্গে। তখন আমি

গলার মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। আমার শাশুড়ী-ননদিনী মুক্তা কুড়াইতে কুড়াইতে সেই ফাঁকে আমি একটু দেখিয়া লইলাম।

সেই দেখাই আমার কাল হইল। আমি নয়ন-কোণে ঈষৎমাত্র সেই রূপ দেখিয়া আসিলাম, কিন্তু তাহাতেই কোটী কুসুম-শরে আমায় জর্জ্জরিত করিয়াছে, এখন আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি।

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলু কান।
কত শত কোটী কুসুম-শরে জারত
রহত কি যাত পরাণ॥—গোবিন্দদাস

সখি, আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। নয়ন-কোণে একবার মাত্র দেখিলাম—কিন্তু সে কি দেখা? দৃষ্টি-কোণের অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক তাহার অর্দ্ধেক (আধক আধ আধ) দিয়া যে অবধি (যব ধরি) কানাইকে দেখিলাম, সেই হইতে আমাকে কত শত কোটী মদন-বাণে জর্জ্জর করিতেছে, এখন আমার প্রাণ থাকে কি যায়, তাহাই সংশয়-স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আধ নয়ন কিয়ে তাকর আধ।
কত বা সহব মনসিজ অপরাধ॥—বিদ্যাপতি

অর্দ্ধেক নয়নে—তাহাও নয়,—তাহারও অর্দ্ধেক দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিলাম। আমি মদনের অত্যাচার আর কত সহ্য করিব?

মনে করি, সেই শ্যামল সুন্দর রূপ একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই। কিন্তু কেমন করিয়া দেখিব! অল্পমাত্র দেখিয়াই আমার এই অবস্থা, ভাল করিয়া দেখা বুঝি আমার ভাগ্যে নাই।

দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম।

যে সৌভাগ্যবতী দু'নয়নে ভরিয়া শ্যামরূপ দেখিতে পারেন, তাঁহার পায়ে আমার শত শত প্রণাম! আমার ধারণাতেও আসে না, যে সে মোহন রূপ কেমন করিয়া নয়ন ভরিয়া দেখা যায়। সেই রূপ নয়ন ভরিয়া দেখিলে বাঁচিয়া থাকা যায় কি?

শ্যামরূপ দেখিয়া অবধি শ্রীরাধিকার ভাব-বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। এখন আর সে বালিকা-সুলভ চঞ্চলতা নাই। এখন—

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ানের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥—চণ্ডীদাস

তাহার মুখে হাসি নাই। ধ্যান-ধরা যোগীর মত মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে। যোগিনীর মত গেরুয়া বসন পরিধান করে। আবার কখনও কখনও নীল শাড়ী পরিয়া শ্যামা সখীর কোলে গড়াইয়া পড়ে।

লোচনে শ্যামর বচনাই শ্যামর
শ্যামর চারু নিচোল।
শ্যামর হার হৃদয়ে মণি শ্যামর
শ্যামর সখি করু কোর॥—গোবিন্দদাস

শ্রীরাধার এই উন্মত্ততা প্রেমের পরাকাষ্ঠা। তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা শ্যাম-রূপে পরিপূর্ণ—'রূপে ভরল দিঠি।'

যদি নয়ন মুদে থাকি, অন্তরে গোবিন্দ দেখি
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যাম॥—যদুনন্দন

তাঁহার কর্ণযুগল সর্ব্বদাই তাঁহার বাঁশীর গানে ভরপুর—'মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত'। অন্য শব্দ সেখানে প্রবেশ করে না। নাসিকা শ্যাম-অঙ্গের পরিমলে উন্মত্ত। তিনি নিজে বলিতেছেন—সখি,

খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বঁধু বিনা আর নাহি ভায়।

বঁধু ভিন্ন আমার আর কিছুই মনে পড়ে না। আমি এখন কি উপায় করি, তাই বল। পদকর্ত্তা বলিতেছেন, এমন পিরীতির বালাই যাই! এমন প্রেম যাহার হয়, সে নিজে ধন্য হয় এবং জগৎকেও ধন্য করে।

মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমন হৈলে
তার গুণ তিনলোকে গায়।

রাধার ব্যথায় সখীরা সকলেই ব্যথিত। তাহাদের মত ব্যথার ব্যথিত কে আছে? বৈষ্ণব কবিরা এদিকে রাধার ব্যথা যেমন নিপুণ তুলিকায় আঁকিয়াছেন, সখী-দিগকেও তেমনি অপূর্ব্ব সমবেদনায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীমতী কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইলেন। সারারাত্রি তিনি রোদন করিয়াই কাটান।

জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন।
অসিত চান্দের উদয় দিন॥—জ্ঞানদাস

জাগিয়া জাগিয়া তাহার তনু ক্ষীণ হইয়াছে, যেন দিনের বেলায় কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিয়াছে—শোভাহীন, মলিন ও ক্ষীণ।

সখীরা দেখিলেন রাধার প্রেম বিরহের আগুনে পোড় খাইয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাঁহার জীবন-রক্ষা হওয়া কঠিন হইল।

তখন সখীরা যুক্তি করিয়া মাধবের নিকট গিয়া সে কথা বলিলেন। কিন্তু সুচতুর-শিরোমণি তাহা উড়াইয়া দিতে চাহিলেন।

রাইক রাগ কহনি বহু মোয়।
কৈছনে ঐছন সাহস হোয়॥—রাধামোহন

রাইয়ের অনুরাগ-সম্বন্ধে অনেক কথা আমায় বলিলে, কিন্তু আমার এরূপ সাহস হইবে কেমন করিয়া? পরনারী গ্রহণের মত পাপ নাই, জাগ্রৎ অবস্থা দূরে থাক্, স্বপ্নেও আমি এসব কথা কখনও ভাবিতে পারি না।

সখি হে পরিহর বচন-বিলাসম্।
গোপ শিশূনাং　বিদিত মিদং মম
জনয়তি গুরু পরিহাসম্॥—রায় রামানন্দ

সখি, এসকল বাক্-চাতুর্য্য পরিত্যাগ কর। আর কখনও এরূপ বলিও না। ছি-ছি! গোপ-বালকেরা ইহা শুনিলে আমাকে অত্যন্ত পরিহাসাস্পদ হইতে হইবে।

সখী ছলছল নেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার কালে চোখের জলে তিনি পথ দেখিতে পান না, এমন অবস্থা। 'লোরে পন্থ না হেরি।'

শ্রীমতী তাহার নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া মরিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। বলিলেন, তোমরা আমার যাহা জন্য করিয়াছ, তাহা যথেষ্ট। তোমাদের আর কোনও দোষ দি না। তোমরা কাঁদিতেছ কেন?

মনু লাগি যতন　করলি দুঃখ পায়লি
দৈবহি যদি নহ কাজ।
তুহুঁ কাছে বিরস　বদনে ঘন রোয়লি
ফিরে পুন করলি অকাজ॥
—রাধামোহন

তোমরা আর কাঁদিও না। বরং আমার এই একটী উপকার করিও। আমি এই বৃন্দাবনে যখন দেহত্যাগ করিব, তখন আমার মৃত তনু তমালের শাখায় বাঁধিয়া রাখিও, বৃন্দাবন-ছাড়া করিও না। কেন না, মরিলেও তাহার অঙ্গ-পরিমলে আমার শান্তি হইবে।

কবহুঁ শ্যাম তনু　পরিমল পায়ব
তবহুঁ মনোরথ পূর।
—রাধামোহন

প্রেমের শেষ দশা মৃত্যু। সত্য যাহার প্রেম হয়, সে প্রিয়তমের বিরহে বাঁচিয়া থাকে না। আবার প্রেমের জন্য যে মরিতে পারে, তাহার প্রেম কখনও নিষ্ফল হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন রাধার প্রেম গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র।

অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম　যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি তার হয় রোগ　না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হইলে না জীয়য়॥
—চৈতন্য-চরিতামৃত

বিশুদ্ধ স্বর্ণের মত তাহা চিরদিন অমলিন, ভাস্বর। তখন তিনি রাধার কথা সর্ব্বদা ভাবিতে লাগিলেন।

রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী:—জয়দেব

তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া অন্য ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিলেন।

কোজাগরী পূর্ণিমা

[শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য]

কে জাগিয়া আছে আজ এই নিশীথে? প্রদোষে মাতৃপূজায় উদ্বুদ্ধ হইয়া—মাতৃচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে শক্তিলাভ করিয়া—হরিণীর অপূর্ব্ব জ্যোতিদর্শনে তম ও রজ বিদূরিত করিয়া কোন্ সন্তান আজ এই নিশীথে অক্ষক্রীড়াপরায়ণ হইয়া জাগিয়া আছে? কোন্ সন্তান মাকে দেখিবার জন্য আজ উন্মুখ হইয়া আছে? যে জাগিয়া আছে—মাতৃদর্শনের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, মা আজ তাহারই নিকট বরদারূপে আবির্ভূতা হইবেন—তাহাকেই আজ বিত্তপ্রদানে সমৃদ্ধিশালী করিবেন। ইহাই কমলা মায়ের অমৃতবাণী। প্রতি বর্ষেই লোকমাতা কমলা তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের নিকটে এইরূপে নিশীথে আসিয়া থাকেন। কিন্তু অচেতন-নিদ্রায় অভিভূত আমরা মাকে দেখিতে পাই না—তাঁহার আবির্ভাব লক্ষ্য করিতে পারি না। তাই ঋষি আমাদিগকে জাগাইবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন,—

নিশীথে বরদা দেবী কো জাগর্ত্তীতিভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ॥

কিন্তু এ জাগরণ কোন্ জাগরণ—এ অক্ষক্রীড়াই বা কিরূপ অক্ষক্রীড়া? এই তো কমলার শত শত সন্তান প্রদোষে মাতৃপূজা সম্পন্ন করিয়া—শঙ্খ-নির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া—সমস্ত রজনী অক্ষক্রীড়ায়—তাস, পাশা, দাবা খেলায় জাগিয়া কাটায়। কৈ, তাহাদের নিকট তো বরদারূপিণী কমলার আবির্ভাব হয় না—কি পার্থিব, কি শ্রদ্ধানিষ্ঠাদি অপার্থিব, কোন বিত্তই তো মা তাহাদিগকে প্রদান করেন না। উভয় বিত্ত হইতেই তো আমরা ক্রমশঃ বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছি। ইহার একমাত্র কারণ, মাতৃপূজাদি কোন অনুষ্ঠানই আমাদের সত্যে প্রতিষ্ঠিত নহে। ঋষি বলিয়াছেন,—সত্যমেব জয়তে, সত্যই জয়যুক্ত হয়, মিথ্যা কখন বিজয়শ্রীকে আলিঙ্গন করিতে পারে না, ক্রিয়ার সফলতা সত্যপ্রতিষ্ঠার উপরই নির্ভর করে—সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লোকসকল হইতে দেবশক্তি অথবা মাতৃশক্তিকে এই স্থূল লোকে আবির্ভূত করাইয়া মানবের ঈপ্সিত কামনা পূর্ণ করিতে—মনুষ্যকে কৃতার্থ করিতে একমাত্র সত্যই সমর্থ। কিন্তু আমরা এই সত্য হইতে বহুদূরে রহিয়াছি বলিয়া মাতৃপূজা করিয়াও তাহার ফল হইতে আমরা বঞ্চিত—মা আমাদের দ্বারে আসিয়াও প্রত্যাখ্যাতা।

সত্য ও মিথ্যা এ দুইটিই মায়ের রূপ—উপনিষৎ ইহা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে দেববৃন্দ সত্যপরায়ণ; তাই তাঁরা অমৃতসেবী—অমর; মনুষ্য অনৃতপরায়ণ—তাই মৃত্যুই তাহার পরিণাম। কিন্তু মনুষ্য তো দেবতারই ন্যায় মায়েরই—অমৃতেরই সন্তান। সুতরাং অমৃতলাভে তাহারও অধিকার আছে এবং সেইজন্যই তাহার মাতৃপূজার এ আয়োজন। মনুষ্যের মাতৃপূজা—মিথ্যা হইতে সত্যে পৌঁছিবার জন্য, অসৎ হইতে সতে গমনের জন্য, মৃত্যু হইতে অমৃতত্ব প্রাপ্তির জন্য। আর দেবতার পূজা আত্মরমণের জন্য। উভয়েই পূজা করে—ফল উভয়েরই পৃথক্। কিন্তু যে সন্তান আজ মাতৃদর্শনে অভিলাষী—যে মিথ্যাকে মায়েরই রূপ-সত্যেরই প্রকাশ বলিয়া, ঋষিবাক্যানুসারে দর্শন করিতে শিখিয়াছে, সে তো চতুর্দ্দিকে আজ মায়েরই রূপ দেখিবে, মায়েরই কণ্ঠস্বর শুনিবে, মায়েরই স্নেহকোমল স্পর্শ অনুভব করিবে। সত্যকণ্ঠে—সত্যমন্ত্রে সে আজ মাকে আহ্বান করিবে। তাহার সে অগ্নিসম সত্যআহ্বানে দহরের মিথ্যা আচরণ ভস্মীভূত হইয়া, সত্য-হরিণীর হিরণ্ময় মন্দিরের জ্যোতিতে তাহার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে। সে জ্যোতিঃ-স্নাত হইয়া মাতৃপূজায় উদ্বুদ্ধ হইবে—সে জাগিবে, সে ক্রীড়াপরায়ণ হইবে, সে মায়ের বিত্ত—মায়ের বিভূতি লাভ করিবে।

অচেতন জগতে এই যে আমাদের জাগরণ ও দিবা, সত্য দৃষ্টিতে ইহারই তো নাম নিদ্রা ও রাত্রি—ইহা মাতৃপূজার পরিপন্থী। আর জীব-দৃষ্টিতে যাহা রাত্রি ও নিদ্রা, সত্য

দৃষ্টিতে তাহাই তো দিবা ও জাগরণ। এই দিবা ও জাগরণই মাতৃপূজার প্রশস্ত মণ্ডপ।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ

সংযমী যেখানে জাগেন, দ্রষ্টা মুনি যেখানে স্বসম্পন্ন হন, তাহাই প্রকৃত জাগরণের ক্ষেত্র—প্রকৃত অক্ষক্রীড়ার ভূমি অচেতন জগতে অক্ষের—ইন্দ্রিয়ের ক্রীড়া কখন সম্ভব হইতে পারে না। এখানে ইন্দ্রিয় অবয়ববদ্ধ—প্রণালীবদ্ধ অচেতন প্রাচীরে তাহার গতি রুদ্ধ। ইন্দ্রিয় তো ইন্দ্র আত্মারই প্রকাশ—"ইন্দ্রস্য আত্মনো লিঙ্গাং ইন্দ্রিয়ম্।" আত্মাই তো কথা কহিয়া বাক্য, দেখিয়া চক্ষু, শুনিয়া শ্রোত্র, মনন করিয়া মন হইয়াছেন—"বদন্ বাক্, পশ্যান্ চক্ষু, শৃণ্বন্ শ্রোত্রং, মন্বানো মনঃ।" কিন্তু এখানে সে শক্তি রুদ্ধ আর ঐ ক্ষেত্রে—ঐ জাগরণের ভূমিতে ইন্দ্রিয় নিরবয়ব মায়েরই শক্তি এবং সন্তান ওখানে চেতোন্মুখ। সেখানে মায়ে ও সন্তানে ক্রীড়া, অচেতন নাই, দ্বিতীয় নাই—কোন বাধা নাই, কেবল মাতৃক্রীড়া, আত্মক্রীড়া—এবং সেই ক্রীড়ারই ফলরূপে অনন্ত বিত্ত—অনন্ত বিভূতির প্রকাশ—চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, দ্যু—ভূঃ—অনন্ত জগতের উদ্ভব। পূর্ণ ষোড়শ কলা চিদিন্দুর উদয়।

আজ এই কোজাগরী পূর্ণিমায় সাধক! তোমায় ঐ ভূমিতেই জাগিতে হইবে—ঐখানেই অক্ষক্রীড়া করিতে হইবে। তবেই তুমি মাতৃশক্তে—আত্ম বিভূতিতে সম্পন্ন হইতে পারিবে। আজ তোমায় অসত্যদর্শী হইলে চলিবে না। তোমায় দেখিতে হইবে মায়ের রূপ, শুনিতে হইবে মায়ের কণ্ঠস্বর, স্পর্শ করিতে হইবে মায়ের স্নেহকোমল হস্তস্পর্শ। এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ঐ চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র—এ সমস্ত কমলার রূপ বলিয়াই তোমায় দেখিতে হইবে। তারপর তোমার ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণবর্গ—ইহাদিগকেও মাতৃপ্রকাশ বলিয়া অনুভব করিতে হইবে। প্রতিবোধ-বিদিত অমৃতত্ব তোমায় লাভ করিতে হইবে। তবেই তুমি আত্মবীর্য্যে বীর্য্যমান্ হইতে পারিবে। আত্মবীর্য্যে বীর্য্যমান হইলেই তোমার দহর খুলিবে—হরিণী আসিবে এবং তখনই তুমি বলিতে পারিবে—

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং হিরণ্যরজতস্রজাং।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ॥

সমালোচনা

শতনরী

"কবিত্বং দুর্লভং লোকে শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা"

কবি করুণানিধানের কাব্য-চয়নিকা "শতনরী" প্রকাশিত হইল। বাণী মন্দিরের ধ্যানী সাধক কবি ভাব-সমুদ্রে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া যে সকল রত্ন সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে আরও কয়েকটী নূতন মহার্ঘ্য রত্ন মিলাইয়া নিপুণ শিল্পীর মত শতনরী গড়িয়া মহামূল্য হার রত্ন বঙ্গবাণীর কমকণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বাংলার আজ আগমণীর আনন্দময় শুভমুহূর্ত্তকে আরও আনন্দময় ও চির' সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলি কবির শতনরী গাথা সার্থক হইয়াছে। যাহাদের রঙ্‌বেরঙের সারঙ বীণার সুর-লহরী অতীতের মহা-প্রস্থানকে মুখর করিয়া রাখিয়াছে, বর্ত্তমানে যাহাদের সম্পদ-সম্ভারে বাণীমন্দির গৌরবময়, উজ্জ্বলময়। বঙ্গবাণী মন্দিরের বিজয়-কেতন তুলিয়া দূর ভবিষ্যতের যাত্রী যাহারা আসিবেন, কবি করুণানিধান তাহাদেরই অন্যতম। কবির শতনরী অমূল্য গ্রন্থরত্ন। দশদিক খুঁজিয়াও ইহার বিনিময় এমন কিছু পাওয়া যায় না তবু নিরহঙ্কার কবি দশদিকের জন্য ইহার বিনিময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন দশখানি সিকি। আয়ুর্ব্বেদের পরিভাষা মনে পড়ে, "বজ্রাভাবে বরাটিকা—' "হীরার বদলে কড়িভস্ম।"

কবির যথা-সন্নিবেশ রত্ননিচয়ের গাঁথুনিতে বেশ কৌশল দৃষ্ট হয়। মহামূল্য রত্ন যখন কাহাকেও দান করিতে হয় তখন তাঁহার বন্ধুদের আহ্বান করিয়া প্রথমে "কানে কানে" গোপনে বলিয়া দান করে। দানের পর তাহা আর গোপন থাকে না। তখন সে দান দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল আলোকের মত প্রকাশমান। কবি তাঁহার "কানে কানে" কবিতাটীতে "শুভ্র নীরবতার" মাঝে সখীকে লইয়া প্রকৃতির গোপন দিব্যবারতা শুনিতে উদ্যোগী হইয়াছেন,

"হের, সখি, আঁখি ভরি' শুভ্র নীরবতা,
পাহাড়ের দুটি পার্শ্ব, জ্যোৎস্না আর নদী।

নিথর নিশার কণ্ঠে কি দিব্য বারতা,—
কান পেতে শোন' হেথা বালুতটে বসি ।"

জ্যোৎস্নাস্নাতা যামিনী, সম্মুখে পাহাড়, নীরব নিশার নদী-সৈকতে বসিয়া সখীর সঙ্গে প্রকৃতির দিব্য গোপন বারতা শুনিতে কবি উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা কবিরই সম্ভবে, হাজার হাজার বছরের প্রকৃতির লুকান কথা কবিই ধরাইয়া দিতে পারেন, আর পারে বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ বড়ই মূর্ত্তি দেখিয় কবি আত্মহারা। বৈজ্ঞানিক তাহাকে মরুময়, জলবায়ুহীন দগ্ধ পাহাড় বলিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের উক্তি যতই সত্য হউক না কেন, সৌন্দর্য্যের চির-উপাসক মানব চন্দ্রালোকে আত্মহারা হয়, তাই সেদিন বাংলার এক-জন বৃদ্ধ কবি জোরের সহিত বলিয়াছেন,

"বিজ্ঞানের যুক্তিযুক্ত যথার্থ বচন
কবি কল্পনার কাছে না পায় সম্মান।

অতীত যুগের কবিসম্রাট চন্দ্রের কলঙ্কে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি"

বার্দ্ধক্যের প্রথম যাত্রী কবির 'মানসী' "বাসন" কবিতা পল্লী-শিশুর সরলতায়, যুবকের উদ্যমে ও বৃদ্ধের ধর্ম্মপ্রবণতায় গড়িয়া উঠিয়া কেমন একটা মিশ্র নূতন সৃষ্টির বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, সারল্যে,—

"ছুটব আসি সরল প্রাণে
পর্ণকুটীর হ'তে,
ধান-নাচোন মাঠের হাওয়ায়
ছুটব আলি-পথে।
বনের মাথার আঁধার ফুঁড়ে,
শুক তারাটি জাগবে দূরে,
কান জুড়াবে পাখীর গানে
সুরের মিঠে স্রোতে।"

উদ্যমে,

"এলিয়ে দেব নগ্ন বাহু
গাঙের রাঙা জলে,
ঝাপিয়ে পড়ে' উজান বা'ব
ঢেউয়ের টলমলে ;
তুচ্ছ ক'রে জোয়ার-ভাটা
এপার ওপার সাঁতার কাটা,
নাচবে আলো জলের বুকে,
নীল আকাশের তলে।

ধর্ম্মপ্রবণতায়-

"শুনতে যাব ভারত কথা,
রামায়ণের গান,
সীতার দুখে চোখের জলে
গলবে মন প্রাণ ;
বনবাসের করুণ কথা,
শুনতে বুকে বাজবে ব্যথা,
ফিরব ঘরে দুঃখ ভরে
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ।

আজ এই জীবনের অপরাহ্নে কবির 'অতীত' কবিতাটি মনের সঙ্গে একেবারে সুর মিলাইয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে। মনোবিজ্ঞানে একটা দিক্ কবিতা ছন্দে ফুটাইয়া তোলার ক্ষমতা কবির পক্ষে সম্ভব। আমরা উহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

"নাই সে সরল কিশোর বয়স
সাজ সুখের খেলা
আম্রবনে সখার সনে
প্রাণের কথা বলা,—
মিলত কত খেলার সাথী
সাঁঝের বেলাটীতে,
আসছে ভাসি' তাদের হাসি
স্মৃতির তটিনীতে,—

প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রান্তে আসিয়া কবির প্রাণে অতীতের কথা নূতন করিয়া ঝঙ্কৃত হইয়াছে। এমন এক দিন ছিল যখন আগমনীর আগমনে প্রাণ মাতিয়া উঠিত।

"স্থল-কমলে করত আলো
দত্ত-দীঘি'র তীর,
'চাল চিত্তির করত 'গোটো
সিংহ বাহিনীর—
আগমনীর ললিত স্বরে
ঘরের ছেলে ফিরত ঘরে,
বছর পরে কোলাকুলি
ভাসন্ রজনীর।

কবি করুণানিধানের কবিতাগুলির তদ্ তদ্ ভাবানুযায়ী ছন্দের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা বাংলার অনেক কবির কবিতায় সচরাচর দৃষ্ট হয় না। আমরা এযাবৎ অন্য প্রসঙ্গে যে দু-চারটী কবিত উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেও এ নিয়মের অন্যথা হয় নাই। তবুও দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইব। কবিতাটী 'বসন্ত বিলাস', যে সময় প্রকৃতির পুলক নৃত্য, তখন ছন্দও নর্ত্তনশীল।

"আজি ফাল্গুন-বন-পল্লব-হার কোন কোন রঙ ফুলে ?
কেন কিংশুক ফুল চীনবাস গায় চঞ্চল হয়েছ উঠল ?

পিক পঞ্চম গায়
বয় দক্ষিণ বায়

নাচে ফুল হিন্দোল, ছন্দের দোল, ঘোমটার জের টুটল।

কাব্যের আত্মরস "বাক্যং, রসাত্মকং ; কাব্যং" রসের বিকাশেও এই কবিতা গ্রন্থখানি বেশ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। নিপুণ কবি করুণ সুরে যে স্থানে রসের বিকাশ করিয়াছেন, বাস্তবিকই সে স্থানে অশ্রুসংবরণ করা সম্ভবপর হয় না। "উদ্দেশে" কবিতায় যেখানে বিয়োগ-বিধুর কবি গাহিতেছেন—

"গেছে বসন্ত গোরি আমার
নিছিয়া মুছিয়া সকল সাধ,
শোন' কাণ পেতে কলিজা ভরিয়া
গুমরে গোপন আর্ত্তনাদ।
অয়ি চারুতমে চির সখি মোর,
বারণ মানে না মন-কাঁদন,
ঘরের ভিতর সহি পরবাস,
জনতার মাঝে নির্ব্বাসন।"

সুদূর অতীতে শুনিয়াছি কবিসম্রাট্ কালিদাসের বিয়োগিনী ছন্দে পত্নীবিলাস আর শুনিলাম বাংলার বিয়োগিনী ছন্দে পতিবিলাস, মূর্ত্ত করুণ রসের উৎস।

ভক্ত কবি যেন জয়দেবের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানমগ্ন হইয়া কবিতাকে প্রথম রসের ভাবধারায় সিক্ত করিয়া তুলিয়াছেন,—

রুদ্ধ তারবহির্নে ত্র, মৃত্যু মুক্ত অনন্ত জীবন—
হরিল বেদীর'পরে অন্তরঙ্গ পূর্ণ সনাতন,
নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বরূপোত্তম,
নীলমাধবের কান্তি উজালছে স্থাবর জঙ্গম।—
কিশোর সেদিন হ'তে রহিল সে দেবপুরী মাঝে
ভুবন-পাবনী বীণা সদা তার সুধাকণ্ঠে বাজে!

অলঙ্কারের সমাবেশেও এই গ্রন্থখানি ভরপুর। বিশেষতঃ অনুপ্রাশের নিবেশে ভাষার মাধুরী বাড়িয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের উদাহরণ দিতেছি। বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের সমাবেশ বড় বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। 'মর্ম্মর স্বপ্ন' (তাজমহাল্) ইহার শিল্প চাতুর্য্য জগতে বিখ্যাত। মণি দিয়া গড়া পদ্মকিশলয়, মণিনির্ম্মিত লতা দেখিয়া ভ্রমরগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাদেরই উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে।

"মণি কিশলয়ে কল্প-লীলায়
ফুটেছে লতিকা বিলাস-শিলায়
পড়ে ঢলি ঢলি প্রতারিত অলি
ভুলি' গুঞ্জর তান।

কবির প্রতিভোত্থিত এই অলঙ্কারের সমাবেশে শিল্পীর কলা-চাতুর্য্য যেন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। শতনরীর প্রত্যেক কবিতাটী মধুময়! কোনটীকে বাদ দিয়া কোনটীর সমালোচনা করিব বুঝিতে না পারিয়া দিশাহারা হইয়াছি। কবি তুমি মালা গাঁথিতে যে বন্দনা গীতি গাহিয়াছ তাহা সার্থক হইয়াছে, তোমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলি—

'তব আরতির পূজা-উপচার
সাজায়ে আজি
অঞ্জলি ভরি' এনেছি জননি
কুসুম রাজি ;
জ্যোৎস্না-রেণুর ঝিকিমিকি রচি'—
আঁচল-ভাঁজে,
দাঁড়াও আসিয়া আমার মানস-
সরসী মাঝে!"

শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন

জানবার কথা

কায়স্থ-সমাজ, শ্রাবণ ১৩৩৭

আর্য্য-মহিলার সীমন্ত এবং সিন্দুর—শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ। বাম হাতের প্রকোষ্ঠে লোহার একগাছিকঙ্কণ সিঁথির উপরে সিঁদুরের রেখা অনেকদিন হইতেই বাঙ্গালা-দেশের মহিলাদের সৌভাগ্যের—প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইতেছে।

ভট্ট ভবদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতকে এবং ভূপতি পণ্ডিত পশুপতি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে বাঙ্গালা-দেশের ব্রাহ্মণদিগের দশবিধ সংস্কারের পদ্ধতি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালার সামবেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণদিগের গৃহ্য সংস্কারগুলি আজিও সুসম্পন্ন করা হইতেছে। তাঁহারা উভয়েই বর কর্ত্তৃক বধূর সীমন্তে সিঁদুর দানের উপদেশ দিয়াছেন। এই প্রমাণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, সহস্র বৎসর বা তাহারও

অধিক কাল হইতে এ দেশের শিষ্ট-সমাজে বিবাহিতা নারীর সীমন্তে সিন্দুর পরিবার সদাচার চলিয়া আসিতেছে।

তান্ত্রিক দেবদেবীদিগের পূজার্চনার ব্যাপারে ঘটস্থাপন এবং অন্যান্য কার্যে সিন্দুরের ব্যবহার প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়, পক্ষান্তরে, বৈদিক কোনও আচার বা অনুষ্ঠানে উহার ব্যবহার আদৌ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিবাহ বৈদিক সংস্কার,—এই সংস্কারের অনুষ্ঠানগুলির ভিন্ন ভিন্ন বেদানুগত গৃহ্যসূত্রের ব্যবস্থা দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। গৃহ্যসূত্রাবলীর ন্যায় স্মৃতি সংহিতা এবং পুরাণ শাস্ত্রেও গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য সংস্কারগুলির অল্পাধিক পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। গৃহ্যসূত্র, স্মৃতি এবং পুরাণশাস্ত্রে বিবাহ সংস্কারের অঙ্গস্বরূপ বরকর্ত্তৃক "বধুর সীমন্তে সিন্দুর-দানের" কোন ব্যবস্থা আমরা খুঁজিয়া পাই নাই।

দেশ বিশেষের অভ্যাস, আচার এবং সংস্কারের ফলে, নারীর মাথার কেশরাশিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পথ বা রেখা প্রস্তুত করিয়া তাহার "সীমন্ত" রচনা করিয়া দেওয়া হয়। সেই সময় হইতেই তিনি "সীমন্তিনী" আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন।

বিবাহিতা তরুণীর প্রথম গর্ভ যখন ছয় মাসের (কিংবা কিছু অধিক দিনের—যাহার যেমন কুলাচার, তেমন সময়ে) হয়, সেই সময়ে এক নির্দিষ্ট দিনে স্বামী স্বয়ং বেদমন্ত্র পাঠের সহিত বেশ ঘটা করিয়া সেই নূতন গর্ভিণী পত্নীর সিঁথিটিকে অতি যত্নের সহিত প্রথম তুলিয়া দেন বা "সীমন্ত"কে "উন্নয়ন" করিয়া দেন। ইহার নাম "সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার" অর্থাৎ নারীর মাথার চুলে প্রথম সিঁথি পাড়ার উৎসব। কুমারী কন্যার কেশে "সীমন্ত" থাকা দূরে থাকুক, প্রথম গর্ভ হওয়ার আগে—গর্ভের বয়স অন্ততঃ ছয় মাস হইবার আগে, কোন নবপরিণীতা যুবতীর মাথার চুলের কোথায়ও কোন কেশবর্ত্ম বা সিঁথির অস্তিত্বই থাকিত না। সেই "সীমন্ত উন্নয়ন সংস্কারের" অর্থাৎ "সিঁথিটি তুলিয়া দিবার উৎসবের আগে বিবাহিতা তরুণীর মাথার চুল সম্মুখ হইতে একত্র পশ্চাদ্দিকে টানিয়া সংযত করিয়া বেণী বা কবরী রচনার রীতি ছিল।

সিন্দুর কি এবং কোথা হইতে এরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্মান লাভ করিয়া বসিল? নারীগণের প্রসাধনের অঙ্গস্বরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া "শৃঙ্গার" সীসধাতু হইতে উহার উৎপত্তি জন্য "নাগসম্ভব" সীসধাতু হইতে উৎপন্ন অথচ লোহিত হেতু "নাগরক্ত" (Redlead), চীন দেশ হইতে আনা হয় সেই কারণে ইহাকে "চীনপিষ্ট"—নামে সংস্কৃত ভাষা কোষে সিন্দুর পরিচিত হইয়াছে। সীসধাতু হইতে উৎপন্ন এবং চীনদেশ হইতে আনীত (Red lead বা চীনা সিন্দুর) সিন্দুরের বর্ণ প্রকৃতই উজ্জ্বল লোহিত শোণিত সদৃশ। তৎগুর পর্ব্বতীয় অরণ্যপ্রদেশসমূহে স্মরণাতীত কাল হইতে নিষাদ, শবর, কোল্ল বা কোল এবং ভীল্ল বা ভীল প্রভৃতি নানা অসভ্য জাতির (য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা যাহা দিগকে "আদিম জাতির লোক" বলেন) লোক বসতি করিয়া আসিতেছে। শ্রীশ্রীমনুমহারাজের বর্ণিত আট রকম বিবাহ প্রথার উল্লেখ আছে। উহারা সেই স্মরণাতীত কাল হইতে নিজের ক্ষুদ্র "গোঠ" বা "দল" বা নিকটবাসী সভ্যাসভ্য যে কোন জাতি বা হইতে ছলে বলে বা কৌশলে বিবাহযোগ্য কন্যা হরণ করিয়া আনিত এবং পথিমধ্যে কিংবা নি অধিকারে আনিয়া যদি হরণকারী যুবক নিজের এ আঙ্গুল কাটিয়া সেই রক্তের দ্বারা সেই অপহৃতা কন্যা ললাটে একটা ছাপ বা ফোঁটা দিতে পারিত, তাহা হইলে অনার্য জাতির অলিখিত কিন্তু চিরাগত আইন অনুসারে সেই কন্যার উপরে তাহার স্বত্ব-স্বামিত্ব নিয়তিবন্ধনের অটুট ও চিরস্থায়ী বলিয়া গণ্য হইত। শক্তি অথবা সু থাকিলেও ঐরূপ শোণিত মুদ্রায় মুদ্রিতা বা লাঞ্ছিত কন্যা তাহার পিতৃমাতৃকুলের কোন আত্মীয়-স্বজন ফিরাইয়া লইতে পারিত না; আর যতদিন সেই শোণিত-মুদ্রার কথা জীবিত থাকিত, ততদিন পর্য্যন্ত স্বজাতীয় অথবা বিজাতীয় কে পুরুষই তাহাকে অহিংস উপায়ে লাভ করিতে সমর্থ হই না। তবে যদি কোন অধিকতর শৌর্য্য এবং সাহস সম্পন্ন বীরপুরুষ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অথবা সংগ্রামে পূর্ব্ব স্বামীকে নিহত করিবার পর সেই নারীকে নিজের আয়ত্তে আনিয়া আপনা আঙ্গুল কাটিয়া সদ্যক্ষতনিঃসৃত শোণিতের দ্বারা তাহা ললাটে একটা ছাপ বা ফোঁটা দিতে সমর্থ হইত, তাহা হ সদ্যবিধবা সেই নারীর উপর হইতে পূর্ব্ব স্বামীর স্বামি অপগত এবং নূতন ধর্ষণকারীর স্বত্বাধিকার সুপ্রতি হইত। আরও ঐরূপ জাতির কোন অনূঢ় যুবকযুব পরস্পরের প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে পিতৃ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যখন পলায়ন করিত, তাহারা তখন দুই জনেই নিজের আঙ্গুল কাটিয়া উভয়ের দেহনিঃসৃত শোণিত একত্র মিশাইয়া লইয়া যুবক সেই রক্তের দ্বারা তরুণীর ললাট রঞ্জিত করিয়া উভয়ের মধ্যে মিলনের প্রতিজ্ঞাকে অপরিবর্ত্তনীয়—চিরস্থায়ী করিয়া দিত।